প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভাগ—প্রথম খণ্ড

১৩ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন

প্রবাসী কার্য্যালয়,

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা।

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

Barcode - 4990010225306
Title - Prabasi (1929) vol. 1, pt.29
Subject - LITERATURE
Author - Chattopadhyay, Ramananda, ed.
Language - bengali
Pages - 1022
Publication Year - 1929
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 225306

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩৬ | ১ম সংখ্যা

স্মৃতিসভা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রত্যেক দেশের দুটি দিক্ আছে, এক হচ্চে তা'র জীবপ্রবাহ, জনতা, প্রতিদিনের কর্ম্ম-সংসারে যাদের নিয়ে আমাদের ব্যবহার। প্রত্যেক দেশেরই আবার একটি অমরাবতী আছে—যাঁরা অতীতে জন্মগ্রহণ ক'রে বর্ত্তমানে রয়েছেন, দেহমুক্ত হয়েও সর্ব্বব্যাপী যাঁদের প্রভাব তাঁরাই সেই শাশ্বত মঙ্গললোকের স্রষ্টা। এই স্মরণীয়দের সংখ্যা যে-দেশে বহু সেই দেশই মহৎ- যে-দেশে এঁদের অভাব সে-দেশ আয়তনে এবং জনসংখ্যায় যতই বড়ো হোক না কেন তার অস্তিত্ব-গৌরব নেই বল্লেই চলে। বস্তুত প্রতি দেশ আপনার সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করে দেখায় তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা বর্ত্তমান নেই—অশরীরী হয়েও তাঁরা সেই দেশের সত্যকে বহন করছেন। এইজন্যেই ইতিহাসের মূল্য। সব দেশের মানুষই তাঁদের সম্পদের ভাণ্ডার করে রেখেছেন ইতিহাসকে—বহুমূল্য প্রাণের পরিচয় সেই ভাণ্ডারে। প্রত্যেক দেশেরই তার প্রতি একটি নিষ্ঠা, একটি অনুরাগ আছে।.....

আমাদের আশ্রম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যাঁরা ইহলোক থেকে অপসৃত হ'য়ে এর সত্যকে উজ্জ্বল রূপকে প্রকাশিত করছেন, তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। তাঁদেরকে আমাদের বড়ো প্রয়োজন,—যদি দীর্ঘকাল এ আশ্রম থাকে তবে তাঁদের সংখ্যা বহু হবে, এই আশা করি। যাঁরা এ আশ্রমে বাস করছেন তাঁরা সেই মহাত্মাদের উপর নির্ভর করেন।......

যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়, লৌকিকতা করতে হয়, নইলে তাঁদের মনে হতে পারে যে বুঝি তাঁদের অস্বীকার করছি। এই যে তাঁদের অস্তিত্বকে স্বীকার করি এ-দ্বারা তাঁরাও পুষ্টিলাভ করেন, লোকে তাঁদের সঙ্গসুখলাভ ক'রে আনন্দ অনুভব করছে এদ্বারা তাঁদের যে সত্তার আনন্দ তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যাঁরা চলে গিয়েছেন সে-রকম ব্যবহারের তাঁরা অতীত, বরং তাঁরা যে আছেন সে প্রমাণ তাঁরাই দেন, আপনার গুণে অমর অক্ষয় হয়ে সমস্ত সংসারে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করেন। আমাদের দেশে যাঁরা বিশ্বের সম্মুখে ভারতবর্ষের সত্য পরিচয় দিচ্ছেন,.. যেমন যাজ্ঞবল্ক্য, বা কবি বাল্মীকি বা কালিদাস, বা তত্ত্বজ্ঞানী শঙ্কর, এঁদের তো আমরা বলে

দিতে পারিনে। ভারতবর্ষের কতলোক প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়ায় মারা যাচ্ছে, তারা ত ছায়ার মতন, তাদের আমরা সহজেই ভুলে যাই। কিন্তু এঁদের তো আমরা ভুলে যেতে পারিনে—তাঁরা নিজের সত্তা প্রমাণ করতে আমাদের সাহায্য প্রত্যাশা করেন না।……

য়ুরোপে মৃত ব্যক্তিকে বাইরে থেকে স্মরণ করবার উপায় করা হয়েছে। গোরস্থানে একখানা পাথর দিয়ে যে মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া হল—যে স্মরণীয় নয় তাকেও স্মরণীয় করে তোলা হল। ফলে তাদের কথা পাথরে লেখা রইল, মনে লেখা রইল না। লোককে স্থূলভাবে দেখবার রীতি রয়েছে পাশ্চাত্যদেশে—সে দেশের শাস্ত্রে আছে যে, কালের শৃঙ্গ যখন বাজে তখন মানুষ আবার মর্ত্ত্য-দেহ ধারণ করে, তাই একে রক্ষা করবার প্রয়োজন আছে। এই যে আত্মার আচ্ছাদন একে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করতে গীতায় বলেছে, তাকেই কালের হাত থেকে, কীটের হাত থেকে রক্ষা করবার দুরাশা পাশ্চাত্য দেশে।

আমরা এই পাশ্চাত্য দেশের অনুষ্ঠানেরই নকল করেছি। বৎসরে বৎসরে আমরা বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে থাকি—কিন্তু তা যে কত ব্যর্থ হয় তা সে-সব সভার যাঁরা অনুষ্ঠাতা তাঁরাই জানেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য থেকে কে তাঁকে সরাতে পারে? কেউ তাঁর জীবনের অনুসরণ করে না, শুধু কথার ধ্বনি প্রতিধ্বনি করে চলে—যতটুকু সয় ততটুকু বলে, বিধবা-বিবাহের সময় ঘাড় বাঁকায়। এই যে বছরে বছরে জয়দেবের মেলা হয়, এর তো সভাপতি নেই, সভা নেই, বক্তৃতা নেই। জয়দেবের যে একটি ব্যক্তিগত রূপ ছিল, জীবনযাত্রায় যে নানা লোকের সঙ্গে তাঁর নানা সম্বন্ধ ছিল, তা লোকে বিস্মৃত হয়েছে। এখন তাঁর কাব্যরূপে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বুকে কৌস্তুভ-মণি হয়ে রয়েছেন। আধুনিক য়ে-সব উৎপাত এর মধ্যে যেন বন্ধন আছে যা পরলোকগত মুক্ত ব্যক্তিকেও বেঁধে রাখতে চায়। আমাদের যে শ্রাদ্ধের মন্ত্র আছে পৃথিবী মধু, আকাশ মধু, বাতাস মধু, দিন-রাত্রি মধু বিশ্বের সেই অমৃতরূপের সঙ্গে মুক্তরূপে পরলোকগত ব্যক্তিকে আমরা মিলিয়ে দেখতে চেয়েছি। তাঁর যে বদ্ধ ব্যক্তিগত স্বরূপ তাতে তিনি নানা ভাবে পীড়িত, সেখানে তিনি বড়ো নাও হতে পারেন; কিন্তু যেখানে তিনি বড়ো সেখানে মৃত্যুর দ্বারা সমস্ত কিছু বড়োর সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করে দেখি। এই পৃথিবীতে নানারূপ প্রয়োজনে তিনি বদ্ধ ছিলেন, দেহমুক্ত হবামাত্র আপনার যা কিছু চিরন্তন তাতে বিরাজ করছেন। যা কিছু মধুমৎ পার্থিবং রজঃ তারই সঙ্গে আপনাকে মিশিয়েছেন—তাঁর তো মৃত্যুর বিশেষ কোন দিন নেই—সাধনা দ্বারা যেখানে তিনি অন্তহীনকে পেয়েছেন সেখানেই তো দেহমুক্তের পরিচয়। আমাদের দেশে আমরা এই কথা স্বীকার করি—সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ যা আছে তা পরিবারের মধ্যেই বদ্ধ। সভা করাটা আমাদের দেশের নয়—আমরা কন্‌গ্রেস্ স্থাপিত করেছিলুম পার্লামেণ্টের নকল ক'রে; বছর বছর বড়ো বড়ো প্রেসিডেন্‌শ্যাল্ এড্রেস্ ছাপা হল, পড়া হ'ল, নানা বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক চল্‌ল—তারপর সেখানেই রইল। আসল কাজ, ইংরেজিতে যাকে বলে কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ ওয়ার্ক তা সিকি পয়সার হল না। আমাদের যে-সুরে তার বাঁধা, তাতে হাত পড়ল না—কাজেই বাজ্‌লও না—জলাভাব রইল, অন্নকষ্ট রইল। এ-সব প্রচেষ্টা দেশকে স্পর্শই করছে না। এ-সবই বৈলাতিক আনুষ্ঠানিকতা। প্রথমত অনুষ্ঠান মাত্রেরই একটা দৈন্য আছে। তবু সে অনুষ্ঠান যদি নিজস্ব হয় তবে তার একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়—যেমন শ্রাদ্ধের মন্ত্র, এ আমরা যতটা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারি বা না পারি, এর মধ্যে একটা কৈফিয়ৎ আছে, এ মন্ত্র যে পিতৃপিতামহের সময় হতে আমাদের দেশে উচ্চারিত হয়ে আসছে। কিন্তু অনুষ্ঠান যেখানে ধার করা সেখানে তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। বৎসরে বৎসরে রামমোহনকে আমরা স্মরণ করি। এ যে একটা কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, সে-কথা স্মরণ করলে আমার মন বিমুখ হয়ে ওঠে। শুধু শুধু বাক্য রচনা করব কেন? তাঁর বই কেউ পড়বে না, তাঁর বই প্রকাশিত হচ্ছে না—আমাদের এ ফাঁকিকে ধিক্। এ ফাঁকিটা য়ুরোপীয়, এ মিথ্যা। আমাদের অনেক সুহৃৎ, আশ্রমের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা বিজড়িত রয়েছেন, তাঁদের কথা স্মরণ না

ক'রে আমাদের উপায় নেই। ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের মনে পড়বে, নানারূপে তাঁদের ভাব ও অভাবের কথা প্রতি পদক্ষেপে আমাদের মনে পড়বে।

মোগল বাদশারা নিজেদের সমাধিমন্দির নিজেরাই তৈরি করিয়ে যেতেন—আশঙ্কা ছিল খরচের ভয়ে পুত্রেরা মন্দির নির্মাণ নাও করতে পারে। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁরা এসব বালাই চুকিয়ে যেতেন। আমিও তাই করতে চাই। আমার কথা যদি আপনাদের কখনো স্মরণ করতে হয় তবে এভাবে বিশেষ দিনে সভা ডেকে কখনো আমাকে স্মরণ করবেন না। আমার জন্মদিন মৃত্যুদিন দুটোই আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—এ আপনারা পাবেন না। তাই ব'লে কি বৎসরে বাকি ৩৬৩ দিনই আমি জুড়ে থাকব? তা নয়—আমার গানে, আমার কবিতায় আমাকে ক্ষণে ক্ষণে আপনাদের মনে পড়বে, সেই আমার ভালো। আমাকে অনেকে বিদেশীভাবাপন্ন মনে করেন, কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকতায় আমার মনে সত্যই বাধে, এগুলো যে ঘোর বিদেশী, মজ্জাগতভাবে বিদেশী। এর মধ্যে একটু কষ্ট আছে, কৃত্রিমতা আছে, তা ফেলে দিন্। মৃত্যুর পরে দিনক্ষণ নেই—মৃত্যুর দিনক্ষণ যাদের আছে তাদের কেউ স্মরণ করে না—সে দিনক্ষণ যাদের নেই, তাঁরাই স্মরণীয় হয়ে থাকেন।*

* দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে কথিত।

শিবাজীর অভ্যুদয়

শ্রীযদুনাথ সরকার

শিবাজীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক মারাঠাদের জাতীয় জীবন-প্রভাত। তিনিই দেশের শক্তিহীন, খ্যাতিহীন বিক্ষিপ্ত মানুষগুলিকে একত্র করিয়া, শক্তি দিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘে গাঁথিয়া, হিন্দুর ইতিহাসে এক নবীন সৃষ্টি গড়িয়া দেন। এটি যে তাঁহার ব্যক্তিগত কীর্ত্তি তাহার প্রমাণ পাই যখন আমরা তাঁহার আদি-পুরুষদের ইতিহাস এবং তাঁহার পৈত্রিক পুঁজিপাটা খুঁজিয়া দেখি। বিশাল বেগবতী স্রোতস্বতীর মত তাঁহার উদ্ভব অতি ক্ষুদ্র স্থান হইতে, প্রায় অজ্ঞাত তমসাচ্ছন্ন।

মারাঠা নামক জাতের যে শাখায় শিবাজীর জন্ম, তাহার উপাধি "ভোঁশলে"। এই ভোঁশলে পরিবার দাক্ষিণাত্যে অনেকস্থলে ছড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহারা রাজপুতদের বংশ-শাখার মত এক রক্তের টানে বাঁধা ছিল না, অথবা কোনো একজন দলপতির আজ্ঞায় চালিত হইত না। প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবার লইয়া নিজ গ্রামে থাকিত, কোনো সাধারণ গোষ্ঠীপতিকে মানিত না, বা জাতের মিলনে কখন সমবেত হইত না। জমি-চাষ ও পশুপালনই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা ছিল, যদিও মারাঠা জাতের দুই-চারিজন ধনী ও ক্ষমতাশালী প্রধান বা জমিদারের নাম মধ্যযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বহমানী-সাম্রাজ্য ভাঙিবার সময় এবং তাহার শতবর্ষ পরে আহমদনগরের নিজাম-শাহী রাজবংশের দ্রুত অবনতির বিপ্লবে, মারাঠারা এক মহাসুযোগ পাইল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ফলে মারাঠা কৃষক-বংশের অনেক বলিষ্ঠ, চতুর ও তেজী লোক হল ছাড়িয়া অসি ধরিল, সৈনিকের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া পরে জমিদার ও রাজা হইতে লাগিল। কিরূপে কৃষক-পুত্র ক্রমে ক্রমে দস্যুর সর্দ্দার, ভাড়াটে সৈন্যের দলপতি, রাজ-দরবারের সম্রান্ত সামন্ত এবং অবশেষে স্বাধীন নর-পতির পদে উঠিতে পারিত তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত—শিবাজী।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাবাজী ভোঁশলে পুণা জেলার হিঙ্গনী এবং দেবলগাঁও নামক দুইটি গ্রামের

পাটেল্ (অর্থাৎ মণ্ডল)-এর কাজ করিতেন। গ্রামের অন্যান্য কৃষকগণের ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যের এক অংশ পাটেল-পদের বেতনস্বরূপ তাঁহার প্রাপ্য ছিল; ইহা ছাড়া তিনি নিজের কিছু ক্ষেতও চাষ করিতেন। এই দুই উপায়ে তাঁহার সংসার চলিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মালোজী ও বিঠোজী প্রতিবেশীদের সহিত বনিবনাও না হওয়ায় সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া এলোরা পর্ব্বতের পাদ-দেশে বিরুল গ্রামে চলিয়া গেলেন। এখানে চাষবাসে আয় বড় কম দেখিয়া তাঁহারা সিন্ধখেড়ের জমিদার এবং আহমদনগর রাজ্যের সেনাপতি লখজী যাদব রাও-এর নিকট গিয়া সাধারণ অশ্বারোহী (বারগীর্) সৈন্যের চাকরি লইলেন। প্রত্যেকের বেতন হইল মাসিক কুড়ি টাকা।

যাদব রাও ভোঁশলেদেরই মত জাতে মারাঠা। মালোজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজী দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন, যাদব রাও এই বালকটিকে সোহাগ করিতেন এবং সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন। একদিন হোলীর সময় যাদব রাও নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধব অনুচরগণ লইয়া নাচ-গান উপভোগ করিতেছিলেন। পাঁচ বৎসরের বালক শাহজীকে এক কোলে এবং নিজের তিন বছরের কন্যা জীজা বাঈকে অপর কোলে বসাইয়া তাহাদের হাতে আবীর দিলেন এবং শিশু দুটির হোলী খেলা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বিধি মেয়েটিকে কি সুন্দর করিয়াই গড়িয়াছেন! আর শাহজীও রূপে ইহারই সামিল। ঈশ্বর যেন যোগ্যে যোগ্যে মিলন ঘটান!"

যাদব রাও হাসির ভাবে একথা বলিলেন, কিন্তু মালোজী অমনি দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আপনারা সকলে সাক্ষী, যাদব রাও আজ তাঁহার কন্যাকে আমার ছেলের সঙ্গে বাগদত্তা করিলেন।" একথা শুনিয়া যাদব রাও ক্ষুণ্ণমনে মেয়ের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন; অন্যদিনের মত শাহজীকে সঙ্গে লইলেন না।

যাদব রাও-এর পত্নী গিরিজা বাঈ অতি বুদ্ধিমতী ও তেজস্বী বীর-রমণী। (১৬৩০ সালে, যখন নিজাম শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দরবার-মধ্যে হঠাৎ তাঁহার স্বামীকে খুন করেন, তখন গিরিজা বাঈ এই দুঃসংবাদে অভিভূত না হইয়া তৎক্ষণাৎ পরিবারবর্গ অনুচর ও ধনসম্পত্তি লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে রাজধানী হইতে বাহির হইলেন এবং দলবদ্ধভাবে কুচ করিতে করিতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলেন। শত্রুপক্ষ তাঁহাকে বন্দী করিতে অথবা তাঁহাদের সম্পত্তি লুঠিতে পারিল না। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা ঐ সময়ে তাঁহার স্থিরবুদ্ধি ও সাহসের খুব প্রশংসা করিয়াছেন।)

হোলীর মজলিসে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত শুনিয়া গিরিজা বাঈ রাগিয়া স্বামীকে বলিলেন, "কি! এই গরীব ভবঘুরে সামান্য ঘোড়সোয়ারের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের সম্বন্ধ? বিবাহ সমান সমান ঘরেই সম্ভব। তুমি কি অবিবেচনার কাজই করিয়াছ! কেন উহাদের এই অন্যায় কথার উপযুক্ত জবাব দিলে না, এবং উহাদের ধমকাইলে না?"

যাদব রাও পরদিনই দুই ভাইকে তাহাদের বেতন চুকাইয়া দিয়া চাকরি হইতে বরখাস্ত করিলেন। মালোজী ও বিঠোজী অগত্যা বিরুল গ্রামে ফিরিয়া আবার চাষ করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে মালোজী ক্ষেতের শস্য পাহারা দিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, এক গর্ত্ত হইতে একটি বড় সাপ বাহির হইল, আবার তথায় ঢুকিল। মাটির তলে গুপ্তধন প্রাচীন সাপে রক্ষা করে এই বিশ্বাস সেকাল হইতে অনেক দেশে চলিয়া আসিতেছে। মালোজী ঐ গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেখানে সাতটি লোহার কড়াই-ভরা মোহর পাইলেন।*

এতদিনে মালোজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরাইবার উপায় জুটিল। ঐ গুপ্তধন চামারগুণ্ডা গ্রামের একজন বিশ্বাসী মহাজনের জিম্মায় রাখিয়া, তাহার কিছু খরচ করিয়া

* পরে লোকের মুখে ঘটনাটি এই আকার ধারণ করে—"মালোজী বড় দেব-দেবীভক্ত গৃহস্থ। একদিন মাঘ মাসের রাত্রে ক্ষেতে পাহারা দিতে দিতে তিনি দেখিলেন যে, মাটির তল হইতে শ্রীদেবী (অর্থাৎ শিবাণী) আবির্ভূত হইলেন এবং নিজ জ্যোতির্ময় অলঙ্কার-মণ্ডিত হাত তাঁহার মুখ ও পিঠে বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "বৎস! আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এই গর্ত্তটি খুঁড়িলে সাত কড়াই-ভরা মোহর পাইবে। উহা আমি তোমাকে দান করিলাম। তোমার বংশে ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজপদ চলিবে। তোমাদের সব বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

ঘোড়া, জীন, অস্ত্র ও তাম্বু কিনিয়া তিনি এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত করিলেন এবং তাহাদের নেতা হইয়া ফল্‌টন গ্রামের নিম্বলকর-বংশীয় জমিদারের সহিত যোগ দিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন। অল্পদিনেই তাঁহার ক্ষমতা ও খ্যাতি এত বাড়িয়া গেল যে, অবসন্ন-প্রায় নিজামশাহী-রাজ তাঁহাকে সরকারী সৈন্যমধ্যে ভর্ত্তি করিয়া সেনাপতি উপাধি দিলেন। মালোজী আর সাধারণ ঘোড়সোয়ার বা চাষী নহেন, তিনি এখন ওমরা—যাদব রাও-এর সমপদস্থ। তখন যাদব রাও নিজ কন্যার সহিত শাহজীর বিবাহ দিলেন (সম্ভবতঃ ১৬০৪ খৃঃ)।

ধনবৃদ্ধির সঙ্গে মালোজী অনেক জনহিতকর কাজ ও দানধর্ম্ম করিলেন। মন্দির-নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন ছাড়া, সাতারা জেলার উত্তর অংশে মহাদেব পর্ব্বতের শিখরে শম্ভু-মন্দিরে চৈত্র মাসে সমবেত লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য তথায় পাথর কাটিয়া একটি বড় পুষ্করিণী খুঁড়িলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে বর দিলেন, "আমি তোমার বংশে অবতীর্ণ হইয়া দেবদ্বিজকে রক্ষা করিব, দক্ষিণ দেশের রাজ্য তোমাকে দিব।"

ধনে মানে বাড়িয়া কালক্রমে মালোজী মারা গেলেন, তাহার পর তাঁহার জমিদারী ও সৈন্যদল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিঠোজী চালাইলেন। বিঠোজীর মৃত্যুর পর (অনুমান ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) শাহজী পৈত্রিক সম্পত্তির ভার পাইলেন, এবং ভোঁশলে বংশের সেনাদলের নেতা হইলেন। এই দল এতদিনে বাড়িয়া দু হাজার আড়াই হাজার হইয়াছিল।

১৬২৬ সালে নিজামশাহী রাজ্যের সুদক্ষ মন্ত্রী, মালিক অম্বর আশী বৎসর বয়সে মারা গেলেন, এবং তাঁহার পুত্র ফতে খাঁ উজীর হইলেন। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই দিল্লীর বাদশাহ জহাঙ্গীর এবং বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহও প্রাণত্যাগ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে ভীষণ গোলমাল ও যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

শাহজীর কাজের উল্লেখ ইতিহাসে ১৬২৮ সালে প্রথম পাওয়া যায়। সেই বৎসর তিনি ফতে খাঁর আজ্ঞায় সসৈন্যে মুঘল-রাজ্যের পূর্ব্ব-খান্দেশ প্রদেশ লুঠ করিতে যান, কিন্তু স্থানীয় মুঘল-সেনানীর হাতে বাধা পাইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর-রাজ্যে শেষ ভাঙ্গন ধরিল। দরবারে দলাদলি যুদ্ধ ও খুন, শাসনে বিশৃঙ্খলা ও রাজ্যে অরাজকতা নিত্য ঘটিতে লাগিল। শাহজী এই সুযোগে নিজের জন্য রাজ্য জয় করিতে সুরু করিলেন। কখন-বা তিনি মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেন, কখন-বা বিজাপুর-রাজ আদিল শাহের সহিত; আবার কখনও-বা নিজাম শাহের চাকরিতে ফিরিয়া আসেন। মুঘলেরা শেষ নিজামশাহী রাজধানী দৌলতাবাদ জয় করিয়া সুলতানকে বন্দী করিল (১৬৩৩)।

তখন শাহজী ঐ বংশের একজন বালককে 'নিজাম শাহ' বলিয়া মুকুট পরাইয়া, নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া তিন বৎসর ধরিয়া পুণা-দৌলতাবাদ অঞ্চলে রাজ্য-পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৬৩৬ সালে মুঘলদের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, সব ছাড়িয়া দিয়া বিজাপুর-সরকারের চাকরি লইতে বাধ্য হইলেন।

জীজা বাঈ-এর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র হয়,—শম্ভুজী * (১৬২৩) এবং শিবাজী (১৬২৭)। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পূর্ব্বে জীজা বাঈ জুন্নর শহরের নিকটস্থ শিবনের গিরিদুর্গে বাস করিতেছিলেন; দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "শিবা-ভবানীর" নিকট তিনি ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। এইজন্য পুত্রের নাম রাখিলেন "শিব" (দাক্ষিণাত্যের উচ্চারণ "শিবা")।

১৬৩০ হইতে ১৬৩৬ পর্য্যন্ত শাহজী নানা যুদ্ধবিগ্রহ, বিপদ ও অবস্থা-পরিবর্ত্তনের মধ্যে কাটান। এজন্য তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরিতে হয়। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় শিবনের-দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার পর ১৬৩৬ সালে মুঘলদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ মিটিল, এবং তিনি বিজাপুর-রাজসরকারে কার্য্য লইলেন বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রে আর রহিলেন না, মহীশূর প্রদেশে নূতন জাগীর স্থাপন করিতে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তুকা বাঈ মোহিতে ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ব্যাঙ্কোজী

* এই শম্ভুজী যৌবনে কনকগিরি দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া মারা যান। ইতিহাস তাঁহার সম্বন্ধে নীরব।

(ওরফে একোজী)-কে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও দ্বিতীয় পুত্র যেন ত্যজ্য হইল; তাহাদের বাসের জন্য পুণা গ্রাম এবং ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য ঐ জেলার ক্ষুদ্র জাগীরটি দিয়া গেলেন। জীজা বাঈ এখন প্রৌঢ়া, তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর। তরুণ-বয়স্কা সুন্দরী সপত্নীর আগমনে তিনি স্বামী-সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইলেন। জন্মের পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিবাজী পিতাকে খুব কম সময় দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর তাহার পর দুজনে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেলেন।

স্বামীর অবহেলার ফলে জীজা বাঈ-এর মন ধর্ম্মে একনিষ্ঠ হইল। আগেও তিনি ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন, এখন একেবারে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন,—যদিও উপযুক্ত সময়ে জমিদারির আবশ্যক কাজকর্ম্ম দেখিতেন। মাতার এই ধর্ম্মভাব পুত্রের তরুণ হৃদয় অধিকার করিল। শিবাজী নির্জ্জনে বাড়িতে লাগিলেন; সঙ্গীহীন বালক, ভাই নাই, বোন নাই, পিতা নাই, এই নিঃসঙ্গ জীবনের ফলে মাতা ও পুত্র আরও ঘনিষ্ঠ হইলেন; শিবাজীর স্বাভাবিক মাতৃভক্তি শেষে দেবোপাসনার মত ঐকান্তিক হইয়া দাঁড়াইল।

শিবাজী বাল্যকাল হইতে নিজের কাজ নিজে করিতে শিখিলেন—অন্য কাহারও নিকট আদেশ বা বুদ্ধি লইবার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইত না। এইরূপে জীবন-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দায়িত্ব-জ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। বিখ্যাত পাঠান-রাজ শের শাহের বাল্যজীবনও ঠিক শিবাজীর মত; দুজনেই সামান্য জাগীরদারের পুত্র হইয়া জন্মান, বিমাতার প্রেমে মুগ্ধ পিতার অবহেলার মধ্যে বাড়িয়া উঠেন, বনজঙ্গল ঘুরিয়া, কৃষক ডাকাত প্রভৃতির সহিত মিশিয়া দেশ ও মানুষ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন, চরিত্রের দৃঢ়তা শ্রমশীলতা ও স্বাবলম্বন নিজ হইতে শিক্ষা করেন, পৈত্রিক জাগীরের কাজ চালাইয়া নিজকে ভবিষ্যৎ রাজ্যশাসন-কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন। দুজনেরই চরিত্র ও প্রতিভা একরূপ, দুজনেই ঠিক একশ্রেণীর ঘটনার মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত হন।

আজ পুণা শহর বম্বে প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী, মারাঠাদের শিক্ষা সভ্যতা ও আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কিন্তু ১৬৩৭ সালে যখন বালক শিবাজী এখানে বাস করিতে আসিলেন, তখন পুণা একটি গণ্ডগ্রাম—অতি শোচনীয় দশায় উপস্থিত। ছয় বৎসর ধরিয়া যুদ্ধে দেশ ছারখার হইয়া গিয়াছিল, বারবার বিভিন্ন আক্রমণকারীরা আসিয়া গ্রাম লুঠ করিয়া পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইত, তাহার পর অরাজকতার সুযোগে আশপাশের ডাকাত-সর্দ্দারেরা নিজ আধিপত্য স্থাপন করিত। এই অঞ্চলটি ভূতের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মানুষের মধ্যে যুদ্ধ, অশান্তি, ও লোকক্ষয়ের ফলে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের বংশ খুব বাড়িয়া গিয়াছিল; তাহাদের উৎপাতে পুণা জেলার গ্রামগুলিতে ভেড়া-বাছুর এবং ছেলেপিলে নিরাপদ ছিল না; ভয়ে চাষবাস প্রায় বন্ধ হইল।

১৬৩৭ সালে, শাহজী বিজাপুরের চাকরি লইয়া মহীশূর প্রদেশে চলিয়া যাইবার সময় দাদাজী কোণ্ডদেব নামক এক বিচক্ষণ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণকে পুণা জাগীরের কার্য্যকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমার প্রথম স্ত্রী ও পুত্র শিবাজী শিবনের দুর্গে আছে। তাহাদের পুণায় আনিয়া রক্ষণাবেক্ষণ কর।" তাহাই করা হইল। *

এই পুণা জাগীরের খাজনা কাগজে চল্লিশ হাজার হোণ (অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা) ছিল, কিন্তু আদায় হইত অনেক কম। দাদাজী কোণ্ডদেব জমিদারি কাজে সুপরিপক্ক। তিনি সহ্যাদ্রি শ্রেণীর পাহাড়ী লোকদিগকে পুরস্কার দিয়া সেখানকার নেকড়ের দল নির্ব্বংশ করিলেন; ঐ লোকদের হাত করিয়া প্রথমে জমির খাজনা খুব কম, পরে ধীরে ধীরে বর্দ্ধনশীল নিরিখে ধার্য্য করিয়া তাহাদিগকে সমতলভূমিতে আসিতে ও চাষ করিতে রাজি করাইলেন। এইরূপে দেশে লোকের বসতি ও কৃষিকার্য্য দ্রুত বাড়িতে লাগিল।

শান্তিরক্ষার জন্য তিনি কতকগুলি স্থানীয় সৈন্য,

* দুই বৎসর পরে (১৬৩৯) জীজা বাঈ ও শিবাজী দাদাজীর সহিত শাহজীর নিকট বাঙ্গালোরে গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের পুণায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

অর্থাৎ বর্ক-আন্দাজ, নিযুক্ত করিয়া জায়গায় জায়গায় থানা বসাইলেন। দাদাজীর দৃঢ়শাসন ও ন্যায় বিচারে দস্যু ও অত্যাচারীর নাম পর্য্যন্ত দেশ হইতে লোপ পাইল। তাঁহার নিয়মপালনের একটি গল্প আছে। তিনি "শাহজী বাঘ" নাম দিয়া একটি ফলের বাগান করেন। তাঁহার কড়া আদেশ ছিল, কেহ গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত লইলে শাস্তি পাইবে। একদিন ভুলিয়া তিনি নিজেই একটি আম পাড়িলেন। নিয়মের কথা মনে পড়িলে নিজের উপর দণ্ড দিবার জন্য তিনি অপরাধী নিজ হাত কাটিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সকলে ধরিয়া তাঁহাকে থামাইল। ইহার পর হইতে তিনি অপরাধের চিহ্নস্বরূপ একটি লোহার শিকল গলায় পরিয়া থাকিতেন।

শিবাজী লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষতি হয় নাই। আকবর, হাইদর আলী, রণজিৎ সিংহ—ভারতের এই তিনজন কর্ম্মশ্রেষ্ঠ রাজাও নিরক্ষর ছিলেন। সে সময়টা মধ্যযুগ, অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত; তখনকার দিনে এই পুঁথিগত বিদ্যার অভাব তাঁহার মনকে অন্ধকার অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে নাই, অথবা তাঁহার কার্য্যদক্ষতা হ্রাস করে নাই। কারণ, শিবাজী রামায়ণ মহাভারতের গল্প এবং পুরাণ-পাঠ ও কীর্ত্তন শুনিয়া শুনিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য-কাহিনীর আস্বাদ পান, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রণকৌশল ও শাসন-বিধান শেখেন। যেখানে কীর্ত্তন হইত সেখানে তিনি যাইতেন এবং তন্ময় হইয়া শুনিতেন; কোন হিন্দু-সন্ন্যাসী বা মুসলমান পীরের আগমন হইলে তিনি তাঁহার কাছে গিয়া ভক্তি দেখাইতেন এবং ধর্ম্মের উপদেশ লইতেন। কাজেই শিক্ষার প্রকৃত ফল তাঁহাতে সম্পূর্ণ ভাবে ফলিয়াছিল।

পুণা জেলার পশ্চিম প্রান্তে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের গা বহিয়া ৯০ মাইল লম্বা এবং ১২ হইতে ২৪ মাইল প্রশস্ত যে ভূমিখণ্ড আছে, তাহার নাম 'মাবল' * অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দেশ বা পশ্চিম। মারাঠী গাথা ও জনপ্রবাদে বলা হয় যে, পুণা জেলায় বারোটি মাবল-গ্রাম এবং জুন্নর জেলায় বারোটি। কিন্তু এই অংশের গ্রামগুলির সংখ্যা চব্বিশের অধিক এবং তাহাদের নামের শেষাংশ শুধু 'মাবল' শব্দ দ্বারা নহে, অনেক স্থলে 'খোরে' ও 'নের' শব্দ দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত অসমান, অধিত্যকার পর অধিত্যকা, আর তাহাদের ধারগুলি খাড়া হইয়া নামিয়াছে; নীচে আঁকা-বাঁকা গভীর উপত্যকা। এই নীচের সমভূমি হইতে ছোট-বড় অনেক পাহাড় স্তরে স্তরে উঠিয়াছে, তাহাদের উঁচু গায়ে কাল কষ্টিপাথরের বড় বড় বোল্ডার্ ছড়ানো। স্থানে স্থানে পর্ব্বত-গাত্র বনে আবৃত, গাছের তলায় ঘন গাছড়া ও লতাপাতা চলিবার পথ বন্ধ করিয়াছে।

এই মাবল প্রদেশের উত্তরাংশে কোলী নামক এক প্রাচীন অসভ্য দস্যুজাতির বাস, আর দক্ষিণাংশে মারাঠা কৃষক। মাবলের মারাঠাদের শরীরে কিছু পাহাড়ী জাতির রক্তমিশ্রিত আছে; তাহাদের আকৃতি কাল সরু, কিন্তু মাংশপেশী-বহুল ও কর্ম্মঠ। এদেশের বাতাস শুষ্ক ও হালকা, এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থান হইতে কম গরম। মাবলের জলবায়ু শরীরে বল বৃদ্ধি করে।

দাদাজী মাবলদেশ নিজের অধীনে আনিলেন। অনেক গ্রামের মণ্ডল (দেশপাণ্ডে)-কে হাত করিলেন; যাহারা অবাধ্য হইল তাহাদের যুদ্ধে বিনাশ করিলেন। এইরূপে সেই অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপিত হইল এবং মাবল গ্রামগুলি পুণা জেলার অধিকারীর পক্ষে অর্থ ও লোকবলের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই মাবল দেশ হইতে শিবাজীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদাতিক সৈন্য আসিল; এখানে তাঁহার বাল্যবন্ধু ও অত্যন্ত অনুগত কর্ম্মচারিগণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে বালক শিবাজী পশ্চিমঘাটের বন-জঙ্গল ও পর্ব্বতে, নদীতীর ও উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি ক্রমেই কষ্টসহিষ্ণু ও অক্লান্তশ্রমী হইয়া উঠিলেন এবং দেশ ও দেশবাসীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে চিনিলেন। শিবাজীর

* মারাঠী ভাষায় 'মাবলনে' (infinitive) ক্রিয়াপদ, অর্থ 'অস্ত যাওয়া'। পর্ব্বত-গাত্রের এই দেশকে উত্তরে (অর্থাৎ বগলানায়) 'ডাঙ্গ', মধ্যভাগে (অর্থাৎ নিজ মারাঠে) 'মাবল' এবং দক্ষিণ অর্থাৎ কর্ণাটকে 'মল্লাড়' বলা হয়।

উত্থানে মাবল-জমিদার ও বলিষ্ঠ কৃষকদের পক্ষে সমস্ত দাক্ষিণাত্য ব্যাপিয়া কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ক্ষমতা ও খ্যাতিলাভের মহাসুযোগ জুটিল। শিবাজীর যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সহকারী হইয়াই এই কোণঠেশা গরিব গাঁয়ালোকেরা সেনাপতি ও সম্ভ্রান্ত পুরুষের পদে উঠিতে পারিল। সুতরাং তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার রাজ্যাভিলাষের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা হইল; তিনি খোলাখুলিভাবে মিশিয়া তাহাদের ভাইবন্ধুর সামিল হইলেন। ফরাসী-সৈন্যদের চক্ষে নেপোলিয়ন যেমন একাধারে বন্ধু নেতা ও দেবতার সমান ছিলেন, মাবলদের নিকট শিবাজীও তাহাই হইলেন।

দাদাজী ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ যে রামায়ণ মহাভারত ও শাস্ত্র পাঠ করিতেন তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিবাজীর তরুণ হৃদয় গঠিত হইল। সন্ন্যাসিনীতুল্য মাতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ পাইয়া শিবাজীর মনে সাত্ত্বিক ভাব, দৃঢ়তা, ও ধর্ম্মপ্রাণতা জন্মিল। স্বাধীন জীবনের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল; কোন মুসলমান-রাজার অধীনে সেনাপতি হইয়া অর্থ ও সুখ আকাঙ্ক্ষা করাকে তিনি দাসত্ব বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিলেন। স্বাধীন রাজা হওয়া তাঁহার জীবন-প্রভাতের কাম্য ছিল, সমগ্র হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করার বা রক্ষা করার ইচ্ছা অনেক পরে তাঁহার মনে স্থান পায়।

শিবাজী বড় হইলে কোন্ পথে চলিবেন—এই প্রশ্ন লইয়া অভিভাবকের সঙ্গে তাঁহার মতের অমিল হইল। দাদাজী কোণ্ডদেব বিচক্ষণ জমিদারি দেওয়ান ও ধার্ম্মিক গৃহস্থ; কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ আদর্শ বা দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তিনি শিবাজীকে বারবার বলিতে লাগিলেন যে, পিতৃপিতামহের মত কোন মুসলমান-রাজার মনসবদার হইয়া সৈন্য লইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনের দ্বারা জাগীর, অর্থ ও উপাধি লাভ করাই ভাল; বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া ডাকাতদের সঙ্গে মিশিলে, স্বেচ্ছায় বিপদরাশি বরণ করিয়া লইলে, অথবা স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করিলে পরিণাম শোচনীয় হইবে। শিবাজী শুনিলেন না; দাদাজী শাহজীর নিকট নালিশ করিলেন, কিন্তু পিতার নিষেধে কোনই ফল হইল না। দুশ্চিন্তায় ও মনঃকষ্টে বৃদ্ধ দাদাজী প্রাণত্যাগ করিলেন (১৬৪৭) এবং বিশ বৎসর বয়সে শিবাজী নিজেই নিজের কর্ত্তা হইলেন।

ইতিমধ্যে শিবাজী যুদ্ধবিদ্যা এবং জমিদারি-চালানো সম্পূর্ণরূপে শিখিয়াছিলেন, এবং ঐ প্রদেশের প্রজা ও সৈন্যগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। নিজের বুদ্ধিতে কাজ করিতে এবং লোককে অধীনে রাখিতে ও খাটাইতে তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল। তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগুলি বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ,—শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ রাঞ্জেকর ছিলেন পেশোয়া বা দেওয়ান, বালকৃষ্ণ দীক্ষিত ছিলেন মজমুয়াদার (হিসাব-লেখক), সোণাজী পন্ত দবীর (বা পত্রলেখক) এবং রঘুনাথ বল্লাল কোরডে সবনীস্ অর্থাৎ সৈন্যদের বেতন-কর্ত্তা। ইহাদের শাহজী আগে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

১৬৪৬ সালে বিজাপুর-রাজ্যে দুর্দ্দিন দেখা দিল। রাজা মুহম্মদ আদিল শাহ্ অনেককাল গৌরবে রাজ্যশাসন এবং দেশ-বিজয় করিবার পর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবন-সংশয় হইল। তিনি আরও দশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা অর্দ্ধমৃত জড় অবস্থায়। সাধারণ লোকেরা বলিত, সাধু ফকীর শাহ হাসিম উলুবী মন্ত্রবলে নিজ জীবনের দশ বৎসর পরমায়ু রাজাকে দান করেন, সেই ধার-করা প্রাণ লইয়া রাজা এই দশ বৎসর কোনক্রমে বাঁচিয়া ছিলেন। রাজা অচল, পুতুলের মত; রাণী বড়ি সাহিবা শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন, রাজ্যের কেন্দ্রে জীবনী-শক্তি রহিল না।

ইহাই ত শিবাজীর পরম সুযোগ। এই বৎসর তিনি বাজী পাসলকর, যেসাজী কঙ্ক এবং তানাজী মালুসরেকে কতকগুলি মাবলে পদাতিকের সহিত পাঠাইয়া বিজাপুর-রাজার পক্ষের কিলাদার (দুর্গস্বামী)-কে ভুলাইয়া তোরণা * দুর্গ দখল করিলেন;

---

* পুণা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এখানে দুই লক্ষ হোণ রাজস্ব জমা হইয়াছিল, তাহা শিবাজীর হাতে পড়িল। তোরণার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ঐ পর্ব্বতের অপর এক চূড়ায় তিনি রাজগড় নামক একটি নূতন দুর্গ গড়িলেন, এবং তাহার নীচে ক্রমান্বয়ে তিনটি স্থানে জমি সমান করিয়া দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া 'মাচী', অর্থাৎ রক্ষিত গ্রাম নির্ম্মাণ করাইলেন।

দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর (১৬৪৭) শিবাজী সর্ব্বপ্রথমে পিতার ঐ প্রদেশস্থ সমস্ত জাগীর হস্তগত করিয়া একটি সংলগ্ন একচ্ছত্র রাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। পুণার ১৮ মাইল উত্তরে চাকন দুর্গের অধ্যক্ষ ফিরঙ্গজী নরসালা শিবাজীকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলেন; বারামতী ও ইন্দাপুর নামক দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের দুইটি ছোট থানার কর্ম্মচারিগণও শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার করিল।

তাহার পর শিবাজী বিজাপুর-রাজ্য হইতে দেশ কাড়িয়া লইয়া নিজ অধিকার-সীমা বাড়াইতে লাগিলেন। পুণার ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোণ্ডানা দুর্গ বিজাপুর রাজার ছিল; ইহার কিলাদার ঘুষ লইয়া দুর্গটি শিবাজীর হাতে তুলিয়া দিল।

১৬৪৮ সালের মাঝামাঝি শিবাজী এতদূর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় এক নূতন বিপদ আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিল। ২৫এ জুলাই তাঁহার পিতা শাহজী বিজাপুর-সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর আজ্ঞায় জিঞ্জি দুর্গের বাহিরে কারাবদ্ধ হইলেন; তাঁহার সম্পত্তি ও সৈন্য রাজসরকারের জব্‌ত করা হইল। অনেক পরে রচিত ইতিহাসে এই ঘটনার কারণ মিথ্যা করিয়া লেখা হইয়াছে যে, বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করিবার জন্য শাহজীকে কয়েদ করেন, এবং শিবাজী বশ না মানিলে শাহজীর কারাগার ইট গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া তাঁহাকে জীবন্ত গোর দেওয়া হইবে, এরূপ শাসানো হয়। কিন্তু সমসাময়িক সরকারী ফারসী-ইতিহাস (জহুর বিন জহুরী-কৃত মুহম্মদ আদিল শাহের রাজত্ব-বিবরণ) হইতে জানা যায়, বিজাপুরী সৈন্যগণ যখন বহুদিন যুদ্ধ করিয়াও জিঞ্জি দুর্গ লইতে পারিল না—তাহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, তখন শাহজী প্রধান সেনাপতির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সসৈন্য রণত্যাগ করিয়া নিজ জাগীরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সর্ব্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ নবাব মুস্তাফা খাঁ দেখিলেন, দুর্গ-অবরোধ ত একেবারে পণ্ড হইয়া যায়, অথচ শাহজীর পলায়নে বাধা দিলে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি আরম্ভ হইবে। তিনি বুদ্ধি করিয়া বিনাযুদ্ধে শাহজীকে বন্দী করিলেন; তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জব্‌ত করিলেন,—এক কণামাত্র গোলমালে লুঠ হইতে পারিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত মারাঠী গ্রন্থে প্রকাশ, মুদ্‌হোল গ্রামের জাগীরদার বাজী রাও ঘোরপড়ে মুস্তাফা খাঁর ইঙ্গিতে নিমন্ত্রিত শাহজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে কয়েদ করেন। এই অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য কয়েক বৎসর পরে শাহজী শিবাজীকে আজ্ঞা দিয়া এই মুদ্‌হোলের ঘোরপড়ে-বংশ প্রায় উচ্ছেদ করান। কিন্তু বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য ফারসী-ইতিহাস "বসাতীন্-ই-সলাতীন্" হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই গল্প সত্য নহে; শাহজীকে কয়েদ করিবার প্রণালী অন্যরূপ, যথা, "শাহজীর অবাধ্যতায় নবাব মুস্তাফা খাঁ তাঁহাকে গেরেফ্‌তার করা স্থির করিয়া, একদিন বাজী রাও ঘোরপড়ে ও যশোবন্ত রাও (আসদ-খানী)-কে নিজ নিজ সৈন্য সজ্জিত করিয়া অতি প্রত্যূষে শাহজীর শিবিরের দিকে পাঠাইলেন। শাহজী সারা রাত্রি নাচগান উপভোগ করিয়া ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই রাও-এর আগমন ও উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া হতভম্ব হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া শিবির হইতে একাকী পলাইতে লাগিলেন। বাজী রাও পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া নবাবের সম্মুখে আনিলেন।...আদিল শাহ সংবাদ পাইয়া বন্দীকে রাজধানীতে আনিবার জন্য আফ্‌জল খাঁকে, এবং তাঁহার সম্পত্তি বুঝিয়া লইবার জন্য

একজন খোজাকে জিঞ্জিতে পাঠাইলেন।" বিজাপুরে শাহজীকে আনিয়া অনেক দিন কারাবদ্ধ রাখা হইল।

শিবাজী মহা বিপদে পড়িলেন; পিতাকে বাঁচাইতে হইলে তাঁহাকে বিজাপুর সুলতানের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, আর এই বশ্যতার ফলে নূতন জয়-করা সমস্ত রাজ্য ফিরাইয়া দিতে হইবে,—এত পরিশ্রম সব পণ্ড হইবে। সুতরাং দুইদিক রক্ষা করিবার জন্য তিনি রাজনীতির কূট চাল চালিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী মুঘল-সম্রাট বিজাপুরের শত্রু, বিজাপুর-রাজ তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিতে সাহস করেন না। অতএব শিবাজী নিকটবর্ত্তী মুঘল-শাসনাধীন দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা যুবরাজ মুরাদ বখ্শকে দরখাস্ত করিলেন যে, যদি বাদশাহ শাহজীর পূর্ব্ব অপরাধ (অর্থাৎ ১৬৩৩-৩৬ পর্য্যন্ত বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা) ক্ষমা করেন এবং ভবিষ্যতে শাহজী ও তাঁহার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে সম্মত হন, তবে যুবরাজ অভয়-পত্র পাঠাইলে শিবাজী গিয়া মুঘল-সৈন্যদলে চাকরি করিবেন। কয়েক মাস ধরিয়া চিঠি লেখা-লিখি এবং দূত-প্রেরণের পর ১৬৪৯ সালের ৩০এ নবেম্বর মুরাদ শিবাজীকে জানাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই বাদশাহের নিকট যাইবেন এবং তথায় সাক্ষাতে শিবাজীর প্রার্থনা নিবেদন করিয়া সম্রাটের হুকুম লইবেন। এইরূপে এক বৎসর নষ্ট হইল। ইতিহাস হইতে বোঝা যায় যে, বাদশাহ শিবাজীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। বিজাপুর-রাজ্যের বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি শর্জা খাঁর অনুরোধে এবং অপর এক প্রধান রণদৌলা খাঁ (যিনি পরে 'রুস্তম্-ই-জমান' উপাধি পান)-র জামিনে আদিল শাহ শাহজীকে মুক্ত করিলেন। ১৬৪৯ সালের শেষে শাহজীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কিছুকাল তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে উত্তর-মহীশূরের বিদ্রোহী জমিদার (পলিগার)-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পুনরায় বিজাপুরের অধীন করেন এবং তথায় নিজ জাগীর স্থাপন করেন।

শাহজী জামিনে খালাস পান; সুতরাং পিতা পাছে আবার বিপদে পড়েন, এই ভাবিয়া শিবাজী ১৬৫০ হইতে ১৬৫৫ পর্য্যন্ত শান্তভাবে কাটান, বিজাপুর-সরকারকে কোনমতে ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

কিন্তু এই সময়ে তিনি পুরন্দর দুর্গ হস্তগত করেন। এটি "নীলকণ্ঠ নায়ক" উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের জাগীর ছিল। এসময়ে নীলোজী, শঙ্করাজী ও পিলাজী তিন ভাই একান্নভুক্ত শরিকরূপে উহার মালিক ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলোজী বড় কৃপণ ও স্বার্থপর, তিনি অপর দুই ভাইকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য আয় ও ক্ষমতা দিতেন না। পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার জন্য তাহারা মনের দুঃখে শিবাজীকে ধরিয়া পড়িল। শিবাজীর সহিত এই পরিবারের দুই-তিন পুরুষের হৃদ্যতা ছিল, এবং পুরন্দর পুণা হইতে মাত্র নয় ক্রোশ দূর। শিবাজী দেওয়ালীর সময় অতিথিরূপে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তৃতীয় দিবসে কনিষ্ঠ দুই ভাই রাত্রে জ্যেষ্ঠকে বাঁধিয়া শিবাজীর নিকট আনিল, আর শিবাজী তিনজনকেই বন্দী করিয়া দুর্গটি নিজে দখল করিলেন ও তথায় মাব্‌লে-সৈন্য বসাইলেন! কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাদের ভরণপোষণের জন্য চাম্‌লী নামক গ্রাম দান করিলেন, এবং পিলাজীকে নিজ সৈন্যদলে চাকরি দিলেন।

সাতারা জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে বিখ্যাত মহা-বলেশ্বর পর্ব্বতের পাঁচ-ছয় মাইল পশ্চিমে জাবলী গ্রাম। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে মোরে নামক এক মারাঠা-বংশ বিজাপুরের প্রথম সুলতানের নিকট হইতে জাবলী পরগণা জাগীর-স্বরূপ পান এবং ক্রমে আশপাশের জমি দখল করিয়া প্রায় সমগ্র সাতারা জেলা এবং কোঁকনের কিছু কিছু অংশে নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথম মোরে স্বহস্তে বাঘ বধ করায় বিজাপুর-রাজ তাঁহার বীরত্বের জন্য "চন্দ্ররাও" উপাধি দেন; এই উপাধি পুরুষানুক্রমে মোরেদের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোগ করিতেন। কনিষ্ঠ ভাইগণকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম দেওয়া হইত।

আট পুরুষ ধরিয়া যুদ্ধ ও লুঠ করিবার পর মোরেদের ভাণ্ডারে অনেক ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীনে বারো হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল, ইহারা মাবলেদের জাতভাই বলবান সাহসী পার্ব্বতীয় সেনা। ফলতঃ, তখন জাবলী-রাজ্য বলিতে প্রায় সমস্ত সাতারা

জেলা বুঝাইত। ইহার পশ্চিম দিকে খাড়া সহ্যাদ্রি পর্ব্বত, সমুদ্র হইতে ৪,০০০ ফিট উঁচু, তাহার পূর্ব্ব দিকের উপত্যকাগুলি ঘন বনজঙ্গল ও বিক্ষিপ্ত পাথরে আচ্ছন্ন; এই বৃক্ষ-প্রস্তরময় প্রদেশ পশ্চিমে ৬০ মাইল বিস্তৃত, তাহা ভেদ করিয়া ওধারে কোঁকনে যাইবার পথে আটটি গিরি-সঙ্কট আছে; তুইটি এমন প্রশস্ত যে তাহা দিয়া গরুর গাড়ী চলিতে পারে।

এই জাবলী দেশ দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে শিবাজীর রাজ্যবিস্তারের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি রঘুনাথ বল্লাল কোরুডেকে বলিলেন, "চন্দ্ররাওকে না মারিলে রাজ্যলাভ হইবে না। তুমি ভিন্ন একাজ আর কেহ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দূতরূপে তাঁহার নিকট পাঠাইতেছি।" রঘুনাথ সম্মত হইলেন এবং শিবাজীর পক্ষ হইতে সন্ধি-প্রস্তাব-বহনের ভাণ করিয়া ১২৫ জন বাছা বাছা সৈন্যসহ জাবলী গেলেন।

ইহার তিন-চারি বৎসর আগে কৃষ্ণাজী মোরে, চন্দ্ররাও উপাধি লইয়া রাজা হইয়াছিলেন। রঘুনাথ প্রথম দিন সাধারণ ভদ্রতা ও আলাপের পর বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং চন্দ্ররাও-এর অসতর্ক অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজ প্রভুকে সৈন্য লইয়া জাবলীর কাছে উপস্থিত থাকিতে লিখিলেন,—যেন খুনের পরে জাবলী আক্রমণ করিতে বিলম্ব না হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ গোপন-গৃহে হইল; রঘুনাথ আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়া, হঠাৎ ছোরা খুলিয়া চন্দ্ররাও এবং তাঁহার ভাই সূর্য্য রাওকে হত্যা করিয়া ছুটিয়া ফটক দিয়া বাহির হইলেন; দ্বার-পালগণ ভীত ও হতভম্ব হইয়া বাধা দিতে পারিল না; সৈন্যদের যাহারা তাড়া করিল, তাহারা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। রঘুনাথ বনে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া লুকাইলেন।

শিবাজী কাছেই ছিলেন। মোরেদের হত্যার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি জাবলী আক্রমণ করিলেন। নেতাহীন সৈন্যগণ ছয় ঘণ্টা ধরিয়া সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে দুর্গ ছাড়িয়া দিল (১৫ জানুয়ারী ১৬৫৬)। চন্দ্ররাও-এর দুইপুত্র ও পরিবারবর্গ বন্দী হইল। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় ও কার্য্যাধ্যক্ষ হনুমন্ত রাও মোরে ঐ বংশের অনুচরদের একত্র করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। শিবাজী দেখিলেন, "হনুমন্তকে হত্যা না করিলে জাবলীর কণ্টক দূর হইবে না।" তিনি শম্ভুজী কাবজী নামক এক মারাঠা-যোদ্ধাকে দৌত্যের ভাণ করিয়া হনুমন্তের নিকট পাঠাইলেন। কাবজী সাক্ষাতের সময় হনুমন্তকে খুন করিল। এইরূপে সমস্ত জাবলী-প্রদেশ শিবাজীর করতলগত হইল—তিনি এইবার দক্ষিণে কোলাপুর ও পশ্চিমে রত্নগিরি জেলা অধিকার করিবার সুযোগ পাইলেন। তাঁহার আরও এই একটি লাভ হইল যে, মাবলে সৈন্য জুটাইবার ক্ষেত্র দ্বিগুণ বিস্তৃত হইল, কারণ এখন সাতারার পশ্চিম প্রান্তে ৬০ মাইল-ব্যাপী পর্ব্বত ও উপত্যকা তাঁহার অধিকারে আসিল। মোরেদের সমস্ত সৈন্যসামন্ত এবং আট পুরুষের সঞ্চিত অগাধ ধনরত্ন তাঁহার হাতে পড়িল।

মোরে-বংশের কয়েকজন লোক ধরা পড়েন নাই, শিবাজীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা ১৬৬৫ সালে জয়সিংহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

জাবলী গ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে শিবাজী প্রতাপগড় নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভবানী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কারণ, আদি ভবানী দেবীর মন্দির ছিল তুলজাপুরে, বিজাপুর-রাজ্যের মধ্যে। এই প্রতাপগড়ের ভবানীই শিবাজীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন, তথায় তিনি অনেকবার তীর্থযাত্রা করেন এবং বহুমূল্য ধনরত্ন দান করেন।

জাবলী-জয়ের পর শিবাজী রায়গড়ের বিশাল গিরিদুর্গ মোরের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন (এপ্রিল, ১৬৫৬); ইহা পরে তাঁহার রাজধানী হয়। ২৪এ সেপ্টেম্বর তিনি বৈমাত্রেয় মাতুল শম্ভুজী মোহিতের নিকট দশহরা পর্ব্বের প্রীতিউপহার চাহিবার ভাণ করিয়া গিয়া, তাঁহাকে হঠাৎ বন্দী করিলেন। শম্ভুজী শাহজীর তরফ হইতে সুপে পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি শিবাজীর অধীনে কার্য্য করিতে অস্বীকার করায়

শিবাজী তাঁহাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া সুপে পরগণা দখল করিলেন।

৪ঠা নবেম্বর ১৬৫৬, বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যুতে যে বিপ্লবের সূচনা হইল, তাহা শিবাজীর পক্ষে মহা লাভের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

রামমোহন রায় ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

(সরকারী কাগজপত্র-অবলম্বনে)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটিশ যুগের আগে, মোগল-বাদশার দরবারে প্রত্যেক আমীর-ওমরা, প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা এবং করদ-রাজার একজন করিয়া উকীল থাকিত। তাহারা নিয়মিতরূপে, অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার, নানাবিধ সংবাদ নিজেদের প্রভুর কাছে লিখিয়া পাঠাইত। এই-সব সংবাদপূর্ণ পত্রের নাম ছিল—'আখ্‌বার' বা 'আখ্‌বারাৎ'। আখবারাতে শুধু যে রাজসভার খবর লিখিত হইত তাহা নয়, রাজধানীতে এবং অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল আশ্চর্য্য অথবা বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিত, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিলাতের রাজধানী (লণ্ডন) হইতে এমনি হস্তলিখিত সংবাদের পত্র মফঃস্বলে প্রেরিত হইত—মেকলের ইতিহাসে তাহার বর্ণনা আছে। ভারতবর্ষে কিন্তু এরূপ সংবাদপূর্ণ পত্র শুধু ধনীরাই আনাইতেন—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা দেখিবার উপায় ছিল না। স্থানীয় সরাইখানায় যে-সব পান্থের আগমন হইত তাহাদের মুখে শোনা গুজব বাজারে রটিত, অথবা ধনী বণিকের গদিতে বা ওমরার দরবারে যাঁহাদের গতায়াত ছিল তাঁহারা সেখান হইতে দু'এক কথা শুনিয়া আসিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে গল্প করিতেন। এই দুইটি উপায় ছাড়া সে যুগে সাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইবার অন্য কোন পন্থা ছিল না। বড় বড় বণিকদের কর্ম্মচারীরা দূর-দূরান্তর হইতে যে-সকল খবর নিজ নিজ প্রভুকে লিখিয়া পাঠাইত তাহা, এবং রাজা ওমরার নিকট আগত 'আখবারাৎ'-এর সংবাদ, অনেক সময় চাপিয়া রাখা হইত না, তাহা মুখে মুখে শহরবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। সংবাদপূর্ণ হইলেও এই পত্রগুলি আজকালকার সুপরিচিত রাজনৈতিক সংবাদপত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আখবারাতে শুধু ঘটনার উল্লেখমাত্র থাকিত,—রাজনৈতিক মন্তব্য অথবা শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমালোচনা কখনও ইহার বিষয়ীভূত হইত না। বর্ত্তমানে সংবাদপত্র বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা পাশ্চাত্যের দান; বৃটিশ-যুগেই ভারতে তাহার অভ্যুদয়। ইহার পূর্ব্বে সাধারণের জন্য সত্য সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করিবার কোন উপায়ই সম্ভবপর ছিল না। এমন কি কোনরূপ সংবাদ সংগৃহীত হইলেও, মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে তাহা মাঠে মারা যাইত, আর, পয়সা দিয়া কাগজ কিনিতে পারে, এরূপ সাক্ষর পাঠকের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এদেশে কোন মুদ্রাযন্ত্র আসে নাই। হিকি'র 'বেঙ্গল গেজেট' ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত ইংরেজী সংবাদপত্র (২৯ জানুয়ারী ১৭৮০)। ইহার পরমায়ু মাত্র দুই বৎসর ছিল। এই অল্প সময়েই ইহার লেখা এ দেশীয় ইংরেজ-সমাজে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করে। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্ত্রী ও জনকয়েক পদস্থ লোকের উপর মানহানিকর প্রবন্ধ বাহির করিবার জন্য কাগজখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হিকি'র গেজেটের পর ইণ্ডিয়া গেজেট: নভেম্বর

শিবাজী

প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে

১৭৮০), ক্যালকাটা গেজেট (ফেব্রুয়ারী ১৭৮৪) ও অন্য কতকগুলি কাগজ বাহির হয়।* অধিকাংশ সংবাদ-পত্রের রচনা-ভঙ্গী উগ্র, এবং ভাষা ও ব্যবহার ইতর ও অশ্লীল বলিয়া গভর্মেণ্ট মনে করিতেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্ব-প্রথম সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচ বিধান করিলেন (১৩ই মে, ১৭৯৯)। আইনটি এই, সরকারের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে কোন সংবাদ-পত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়ম ভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, তখনকার সকল সংবাদপত্রই ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। বড়লাট মিণ্টোও সংবাদ পত্র-শাসনে কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বরং সম্পাদকদের উপর তিনি কঠিনতর বিধি-নিয়মের বাঁধন প্রয়োগ করেন (অক্টোবর ১৮১৩)। ডাঃ স্মিথকে লিখিত একখানি পত্রে জে-সি-মার্শম্যান বলিতেছেন,—"সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদ-পত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্ন-শোভিত হইয়া বাহির হইত; কেন-না সে-সব অংশে 'সেন্‌সর' তাঁহার সাজ্যাতিক কলম চালাইয়াছেন,—শেষ মুহূর্ত্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই।"

সাময়িক পত্রগুলির উপর সরকারের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, ১৮১৮, এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন হইতে 'দিগদর্শন' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানিতে সংবাদও থাকিত। 'দিগ্‌দর্শন' লোকের কাছে আদরলাভ করে। এখানির সাফল্যে মিশন 'সমাচার-দর্পণ' নামে একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইল। জে-সি-মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮, ২৩শে মে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। সমাচার-দর্পণই প্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র। পাদরী লঙ-এর এক ভুল মন্তব্য অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া অনেকে এক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট'কে এই সম্মান প্রদান করেন!

রামমোহন রায়

মিণ্টোর পর লর্ড হেষ্টিংস বড়লাট হন। হেষ্টিংস উদারপন্থী ছিলেন। সুশাসকের পক্ষে লোকমতকে ভয় করিবার যে কিছু নাই, এই নীতি অনুসারে সাহস করিয়া তিনিই প্রথম কাজ করেন। প্রকাশের পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন-সমেত সংবাদপত্রের সমস্ত লেখাই সরকারের এক বিশেষ কর্মচারীর কাছে পেশ করিতে হইত,—তিনি সম্পাদকদের এই বন্ধন হইতে অব্যাহতি দিলেন (১৮১৮, ১৯শে আগষ্ট)।* ইহার পরিবর্ত্তে পথনির্দ্দেশ-স্বরূপ এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন, যাহাতে

* Busteed সাহেব তাঁহার *Echoes from Old Calcutta* (4th ed.) গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় এই-সকল কাগজের তালিকা দিয়াছেন।

* লর্ড হেষ্টিংসের সময়কালে (১৮১৮) এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদের অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিল। হিট্‌লী নামে এক ফিরিঙ্গী কলিকাতায় 'মর্ণিং পোষ্ট' সংবাদপত্রের একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হয়। ১৮১৮, এপ্রিল মাসে সংবাদপত্র-পরীক্ষক বেলী সাহেব তাঁহাকে বিশেষ আপত্তিজনক কয়েকটি প্যারা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন।

সরকারের কর্তৃত্বহানিকর অথবা লোকহিতের প্রতিকূল কোন আলোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশ না হইতে পারে।* লর্ড হেষ্টিংসের এই নিয়ম-প্রবর্তন লোকে অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল এবং উৎসাহ-বশে কলিকাতায় বাঙ্গলা ও ইংরেজী অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল।

রামমোহনের কাজ ছিল দেশকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা। একেশ্বরবাদ-সম্পর্কিত গ্রন্থ-প্রচার, ইংরেজী বিদ্যালয়-স্থাপন ও সংবাদপত্র-পরিচালন—এ-সকলই জ্ঞান-বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। স্বদেশের মঙ্গল-কামনা রামমোহনের হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিত। দেশবাসীর শিক্ষার জন্য তিনি অনেক ভাবিয়াছিলেন—অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনা তাঁহারই; কিন্তু সকলই যখন ঠিক হইল, গোঁড়া হিন্দুরা তখন রামমোহনকে দলে লইতে আপত্তি করিলেন; তাঁহার অপরাধ—তিনি প্রকাশ্যে হিন্দু-শাস্ত্রকে আক্রমণ করিতেছেন! রামমোহন দেখিলেন, সংবাদপত্র দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার আর এক মহৎ উপায়। সময় আসিয়াছে, তাই তিনি দেশীয় সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিতে মনোযোগী হইলেন। 'সংবাদ-কৌমুদী' নামক বাঙ্গলা সাপ্তাহিকখানি প্রথম বাহির হইল—৪ ডিসেম্বর, ১৮২১। পত্রখানি সম্পূর্ণ ভারতীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। † রামমোহন ছিলেন ইহার একজন প্রধান হিতৈষী। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদ-কৌমুদীতে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে নিবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। প্রধানতঃ এই বর্ব্বর প্রথার সপক্ষে আন্দোলন চালাইবার জন্যই আর-একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইল। সেখানি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ-চন্দ্রিকা',—খুব সম্ভব '৮২২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই ইহার জন্ম।

'উচ্চশ্রেণীর পাঠকদের জন্য একখানি ফার্সী-সাপ্তাহিক প্রকাশ করিবার ইচ্ছাও রামমোহনের ছিল। ১৮২২ সালের প্রারম্ভে তাঁহার সম্পাদকত্বে 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' ('সংবাদ-দর্পণ') প্রকাশিত হইল। দেশের খুব কম লোকই তখন ইংরেজী পড়িতে পারিত। প্রায় ৮৩০ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট, অথবা রাজনৈতিক পত্র লেখালেখি ফার্সী ভাষায় চলিত; সভা-সমাজের, এমন কি দেওয়ানী আদালতের ভাষাও ছিল ফার্সী। কাজেই টাকা দিয়া ফার্সী-সংবাদপত্রের যথেষ্ট গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা ছিল।

রামমোহনের সংস্কার ও স্বাধীনতার উৎসাহ দূরদৃষ্টি রাজনৈতিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেবের চোখ এড়ায় নাই। ১৮২২ সালে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে রামমোহন সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারি, তাহা চিত্তাকর্ষক:—

"পত্রে এখনও স্থান আছে। দেশীয়দের আশ্চর্য্য উন্নতি—বিশেষতঃ বাঙ্গলায়—যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিয়া স্থানটুকু ভরাইয়া দি। একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র আছে। সেখানিতে সব বিষয়েরই কথা থাকে। এই আলোচনায় অনেক সময় ভুলভ্রান্তি ও ছেলেমানুষি থাকিলেও, ইংরেজ-পাঠকদের নিকটেও তাহা কৌতূহলোদ্দীপক;

"রামমোহন রায়, বুদ্ধিমানের মত হিন্দুনাম ও আচার বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু তিনি একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য বই লিখিতেছেন। দেশের শাসনতন্ত্র ও তাহার কার্য্যাবলী এবং বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি-সংক্রান্ত সংস্কারের দিকে বহু দেশীয় লোকের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়াছে। এ বিষয়ে অনেক ভণ্ডামিও আছে; বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা ও বিশ-

---

উত্তরে হিটলী বলে, সে ইউরোপীয় নয়—ভারতবর্ষীয়—অতএব সেন্সরের আদেশ অমান্য করিলে তাহার কোন শাস্তি হইতে পারে না। সত্যই নিষিদ্ধ অংশগুলি কাগজে বাহির হইল। বেলী তখন সে কথা কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেণ্টের কানে তুলিতে বাধ্য হইলেন। আইন-অনুযায়ী ক্ষমতা লাভ করিয়া, স্থানীয় সরকার যতক্ষণ না সেন্সরের কার্য্য অবাধে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, ততক্ষণ সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ রাখা যে নিষ্প্রয়োজন—ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস তখন বাঙ্গলার বাহিরে; তিনি ফিরিলে ব্যাপারটির বিবেচনা সুরু হইল। শেষে সেন্সরের পদ তুলিয়া দেওয়াই সাব্যস্ত হয়।—

Bayley's Minute on Native Press, dated 10 Oct. 1822.—*Modern Review*, Nov. 1928, pp. 553-560.

* *Public Consultation*, 28 Aug. 1818, No. 9.

† For "The Prospectus of a Bengallee Weekly Newspaper, [*Sambad Kaumudi*] to be conducted by Natives. Printed and circulated in Bengallee and English"; "Address to the Bengal Public (From No. 1, Dec. 4, 1821)", and the "Contents of the *Sambad Kaumudi* from No. I. to No. VIII",—see *Asiatic Journal*, 1822, August, p. 136; Sept. pp. 284-87.

হিতৈষণার কথা কহিতেছে এবং রক্ষণশীল টোরী-সম্প্রদায় কর্তৃক সংবাদপত্রের শৈশবাবস্থাতেই স্বাধীনতা-হরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে উচ্চ চীৎকার করিতেছে (বোম্বাই-নিবাসী ...কে লিখিত জনৈক কলিকাতাবাসীর পত্রের ঠিক কথাগুলি স্মরণ করিয়া উপরিউক্ত অংশ লিখিতেছি)। না বুঝিয়া এই ধরণের কথা ব্যবহার করাও যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ। অর্থবোধের সঙ্গে ক্রমে কথা কাজে পরিণত হইতে পারে।"*

সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতা বড় বেশীদিন টিকিল না। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা জর্নালে' সম্পাদক জেম্‌স্ সিল্ক বাকিংহাম কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। সরকার সেগুলি আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া ভাবিলেন। বাকিংহামকে বারবার সতর্ক করিয়া কোন ফল না হওয়ায়, সরকার শেষে তাঁহাকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করাই সাব্যস্ত করিলেন। শুধু ইহাতেই সরকারের রাগ মিটিল না,—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-লোপের জন্য পুনরায় নূতন আইনকানুন-সৃষ্টির কল্পনা-জল্পনা চলিতে লাগিল। ১৮২২, ১০ই অক্টোবর উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেলী কলিকাতা কাউন্সিলে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে এক দীর্ঘ মিনিট পেশ করিলেন। সরকার দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলির উপরও যে তেমন প্রসন্ন ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই 'মিনিট'। ইহাতে 'মীরাৎ-উল-আখবার' সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাই এবং জানিতে পারি, সরকারের চক্ষে আপত্তিকর লেখা ইহাতেও বাহির হইয়াছিল।—

"বর্ত্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাঙ্গলায় এবং দুইখানি ফার্সীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক।......ফার্সী কাগজগুলির উপরই আমি মন্তব্য করিতেছি। তাহাদের নাম—'জাম-ই-জাহান নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল-আখবার'—উভয় নামেরই অর্থ সংবাদ-দর্পণ। প্রথমখানি কলিকাতার কোন ইংরেজ সওদাগরী হৌসের সম্পত্তি ও প্রধানতঃ হৌসের দ্বারা পরিচালিত। দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের।

"জাম-ই-জাহান নুমা গত ২৮শে মার্চ্চ [১৮২২] প্রথম প্রকাশিত হয়; বিজ্ঞাপনে ছিল এই সাপ্তাহিকের মাসিক চাঁদা দুই টাকা।......

"মীরাৎ-উল-আখবারের লেখার ধরণও অনেকটা অপরখানিরই মত। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ-সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক। কলিকাতার পরলোকগত বিশপ ডাঃ মিডলটনের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া মীরাৎ উল্-আখবারে আলোচনাটির সূত্রপাত হয়। বিশপের বিদ্যা ও ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাবাদের পর প্রবন্ধটি এইরূপ শেষ করা হইয়াছে—সংসার চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বিশপ এখন 'পিতা, পুত্র ও হোলি গোষ্টের করুণার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন।'*

"লেখক ত্রিত্ববাদের বিরোধী—ইহা সকলেই জানে।

---

* "As I have some room left I may as well fill it up by remarking on the wonderful inprovement of the natives that begins to be discernible, in Bengal especially. There is a Bengalee newspaper, which discusses all subjects, and is interesting even to English readers, though of course often puerile and often mistaken.

"Rammohun Roy, wisely retaining the name and observances of a Hindoo, is writing books in favour of Deism, and many natives begin to discover curiosity and interest about the form of their government as well as its proceedings, together with a strong spirit of reform as applied to the science, religion, and morals of their nation. Amidst all this there is a great deal of cant, affectation, and imposture, Bengalees talking about liberty and philanthropy, and declaiming against the efforts of the Tories to crush the infant liberty of the press (verbatim as far as I can recollect from the letter addressed by a native in Calcutta to ...(illegible) in Bombay); but even to use this sort of language without understanding it is a wonderful advance, and from admiring the sound, people must come to relish the sense."—Mountstuart Elphinstone to Strachey, dated Bombay March 23, 1822.—Sir T. E. Colebrooke's *Life of the Hon'ble Mountstuart Elphinstone*, (1884), ii. 135.

* শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাহাদের 'সমাচার দর্পণ' ও *Friend of India* পত্রে হিন্দুধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিতে থাকেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৮২১ সালে প্রকাশিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মার '*Brahmunical Magazine* ও ব্রাহ্মণসেবধি'তে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হয়, তাহার অনেকাংশের সহিত 'মীরাৎ'-এর লেখার মিল আছে। সুতরাং শিবপ্রসাদ শর্ম্মা যে রামমোহন রায়েরই ছদ্মনাম—এই প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার লেখনী-প্রসূত এরূপ মন্তব্যকে বিদ্রূপাত্মক, ছাড়া আর-কিছু বলা চলে না। ইহা যে আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অপর একখানি কাগজও এই মত প্রকাশ করিয়াছে। অন্যায় করিয়াছেন জানিয়া, মীরাৎ-উল্‌-আখবারের সম্পাদক ইহা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাপ্রসূত বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেই ব্যাপারটি শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু সম্পাদকের তার্কিক স্বভাব, এ উপায় তাঁহার মনে লাগিল না। ১৯শে জুলাই তারিখের পত্রে তিনি ইহার সমর্থক এক লম্বা কৈফিয়ৎ বাহির করিলেন। আপত্তির প্রকৃত মর্ম্ম ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিয়া তিনি এমন কতকগুলি মতামত প্রকাশ করিলেন, যাহা আমার মনে হয় অপরাধ বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। তিনি লিখিলেন,—'যখন হিন্দু-মুসলমানের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়া খৃষ্টান পাদ্রীরা সারা বৎসর ধরিয়া অবিরত গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় উচ্চৈঃস্বরে আপনাদের ধর্ম্মমত প্রচার করেন, এবং বলিয়া থাকেন—একেই তিন, এই বিশ্বাসের উপরই শুধু মুক্তি নির্ভর করে,—তখন আমি যে ত্রিত্বের উল্লেখ করিয়াছি তাহা যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?...দেখিতেছি, ফার্সী ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মের মূলনীতির উল্লেখেই বড়লাট ও তদনুচরবর্গ-সেবিত বিশ্বাসে আঘাত লাগে, অতএব ভবিষ্যতে এ দোষ হইতে বিরত থাকিব।"

"৯ই আগষ্টের পত্রেও আলোচনাটি ঐ ধরণে চালানো হইয়াছে। প্রশ্ন করা হইয়াছে,—'কোন হিন্দুর মৃত্যু-সংবাদে গঙ্গা অথবা অপর কোন পূজ্য জিনিষের উল্লেখ থাকিলে হিন্দুরা কি রাগ করিবে?' তারপর তথাকথিত এক ফার্সী-কবির কাব্য হইতে একটি বয়েৎ উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—'এমন যদি কাহারও ধর্ম্ম থাকে যার উল্লেখমাত্র লজ্জার কারণ হয়, তাহা হইলে বেশ অনুমান করা যাইতে পারে সেই ধর্ম্মই বা কি এবং সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাই বা কিরূপ।'

"এই-সব সংবাদপত্রে কিরূপ ভিত্তিহীন গল্প স্থান পায়, তাহা সম্প্রতি মীরাৎ-উল-আখবারে প্রকাশিত বড়লাটের সহিত পারস্য-রাজকুমারের সাক্ষাতের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। লেখা হইয়াছে, রাজকুমারকে সসম্মানে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য একদল গোরা-পল্টন পাঠানো হইয়াছিল এবং মার্কুইস-অফ-হেষ্টিংস নিজে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া কুমারকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

"রাজকুমারের আদর-অভ্যর্থনা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে একান্ত ভ্রান্ত ধারণা ভারতে ও পারস্যে প্রচার করিবার জন্যই সম্ভবতঃ এই অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার ফল নিশ্চয় ঐরূপ হইবে।

"এই মাসের ৪ঠা তারিখের মীরাৎ-উল-আখবারে প্রকাশিত নিম্নলিখিত আপত্তিজনক লেখাটুকুর দিকে পার্সিয়ান সেক্রেটারী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন:—

'একদিন মন্ত্রী (তিনি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা) নূতন উজীরের বৃত্তির হিসাবের জন্য মীর ফজ্‌ল আলীকে তলব করিলেন। এই আদেশ পালন করিতে রাজকুমার তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। পাদিশা বেগম বলিলেন, এই বৃত্তির কর্তৃত্বভার তাঁহারই উপর; অপরাপর হিসাব দাখিল করিবার সময় আসিলে তিনি হিসাব দিবেন।

'ইহার পর মন্ত্রীর শত্রুতা ও হিংসা-হেতু পাদিশা বেগম ও রাজকুমার অন্যত্র প্রস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া জানাইলেন—যাহারা তাঁহাদের উত্তরের অনুসরণ করিতে এবং বিপদে সহায়তা করিতে চায় তাহারা সঙ্গে চলুক; অন্য সকলে বেতন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করুক। সকলেই একবাক্যে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মত হইল। রাজকুমার তখন সকলকে তাহাদের পদানুযায়ী শাল ও অন্যান্য উপহার বিতরণ করিলেন। এতগুলি লোককে একত্র হইতে দেখিয়া মন্ত্রী রাজার কাছে নিবেদন করিলেন, কুমারের মনে নিশ্চয়ই কোন কু-ইচ্ছা আছে;—আসন্ন বিপদ হইতে রাজাকে রক্ষা ও নিরাপদ করা দরকার। রাজা মিথ্যাবাদী মন্ত্রীর কথায় প্রতারিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন। সেই অধমমনা ব্যক্তি তখন সৈন্য-সংগ্রহ করিতে ও ইংরেজ-সেনার সাহায্য চাহিতে আরম্ভ করিল।

'পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা অবশিষ্টাংশ দিব।'

"অন্যান্য আপত্তিজনক অংশ উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। সেগুলি ফার্সী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষার সংবাদ-পত্রেই আছে। 'সতীদাহ' লইয়া বাঙ্গলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই-সকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে।" *

১৮২৩, ৯ই জানুয়ারী লর্ড হেষ্টিংস ইংলণ্ড-যাত্রা করিলেন। তাঁহার স্থলে অস্থায়িভাবে বড়লাট হইলেন—

* *Bengal Public Consultations*, Vol. 55, 17th October 1832, No. 8 Minute (India Office Records).

জৈ-অ্যাডাম। তিনি কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্র-সম্বন্ধে লর্ড হেষ্টিংসের মত উদার মত পোষণ করিতেন না। ১৮২৩, ১৪ই মার্চ তিনি এক কড়া প্রেস আইন পাস করিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অপহারক বলিয়া রামমোহন রায়-প্রমুখ ছয়জন সম্ভ্রান্ত কলিকাতাবাসীর স্বাক্ষর-যুক্ত আবেদন ও প্রতিবাদসত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা সে আইন রেজেষ্ট্রীকৃত হইল (৪ এপ্রিল)।

এই আইন অনুসারে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদের লাইসেন্স লইতে হইত। ইহার জন্য (নিখরচায়) কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গভর্মেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর কাছে পাঠাইতে হইত। সংবাদপত্রে আইন-নিষিদ্ধ কোন বিষয় আলোচনা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, যে লাইসেন্সের বলে কাগজ চলিত, সেই লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত।

নূতন আইনের একটি ফল হইল এই যে, সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা তাহা রেজেষ্ট্রীকৃত হইবামাত্র রামমোহনের 'মীরাৎ' বন্ধ হইয়া গেল। * পত্রের শেষ সংখ্যায় তিনি জানাইলেন,—'এমন অপমানজনক সর্ত্তে রাজি হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতে তিনি অসমর্থ।' 'সংবাদ-কৌমুদী' কিন্তু আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইতে লাগিল। মিলিটারী বোর্ড আপিসের কেরাণী গোবিন্দচন্দ্র কোঙার ছিলেন ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক।†

'মীরাৎ' বন্ধ হইবার কয়েক বৎসর পরে রামমোহন অল্পদিনের জন্য মণ্টগোমারি মার্টিন-সম্পাদিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড' বা উইকলি মেসেঞ্জার নামক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হন।

মিস কোলেটের রচিত রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতে আছে,—"বেঙ্গল হেরাল্ডে একজন য়্যাটর্নীর সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা হয়;—রামমোহন এই কাগজের স্বত্বাধিকারিরূপে আদালতে অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪)। কথাগুলির মোটেই প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুপ্রীম কোর্টে একটি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি-প্রসঙ্গে, জনৈক সংবাদদাতার বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, 'বেঙ্গল হেরাল্ডে' বাদীর তরফের য়্যাটর্নী রাইট (Wright) সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে কটু মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই অপরাধে, ১৮৩০ সালে হেরাল্ডের সম্পাদক মণ্টগোমারি মার্টিন ফৌজদারীতে মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত হন। প্রধান বিচার-পতির রায়ে, কাগজের দেশীয় স্বত্বাধিকারীদের প্রত্যেকের এক টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হয়। আর সম্পাদক মার্টিনের জরিমানা হয়—পাঁচশত টাকা; যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই টাকা জমা না দেওয়া হয় ততক্ষণ কারাবাস।* এই সময় রামমোহন রায় বেঙ্গল হেরাল্ডের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন না—তিনি ১৮২৯, জুলাই মাসে এই কাগজের সম্পর্ক ত্যাগ করেন।†

সুপ্রীম কোর্ট নূতন আইনের বিরুদ্ধে আবেদন অগ্রাহ্য করিলে রামমোহন বিলাতে রাজার নিকট এক নিবেদন-

* মুদ্রাকরগণের অবগতি ও পথ-নির্দ্দেশের জন্য গভর্মেণ্ট ১৮২৩, ২৮ এপ্রিল প্রত্যেক সংবাদপত্রের আপিসে ৫ই এপ্রিল তারিখযুক্ত নূতন প্রেস আইনের প্রতিলিপি (বাঙ্গলা ও ফার্সী অনুবাদ সমেত) পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী দপ্তরখানায় এই-সকল সংবাদপত্রের যে তালিকা আছে (*Public Con.* 8 May 1823, No. 59) তাহাতে মীরাৎ-উল-আখবারের নাম নাই; ফার্সী ও বাঙ্গলা কাগজের মধ্যে আছে কেবল এই তিনখানির নাম,—জাম-ই-জাহান্ নুমা, সংবাদ-কৌমুদী, সংবাদ-চন্দ্রিকা। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নূতন প্রেস আইন রেজেষ্ট্রীকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন রায় মীরাৎ-উল-আখবারের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

† Affidavit, dated 18 April 1823.—*Public Con.* 8th May 1823, No. 42.

* যাঁহারা এই মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে *Bengal: Past and Present*, Vol. VI, July—Sept. 1910, pp. 165-170 দেখিতে অনুরোধ করি। এই মণ্টগোমারি মার্টিনই ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের অনুসন্ধান-ফল নিজের নামে *The History Antiquities Topography and Statistics of Eastern India* গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

† ১৮২৯, ৫ই মে মার্টিন সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স পান। ৩০শে জুলাই সম্পাদক ও প্রধান স্বত্বাধিকারী মার্টিন গভর্মেণ্টকে লেখেন, 'বেঙ্গল হেরাল্ডের' উপর রামমোহন রায় এবং রাজকিষণ সিংহের আর কোন স্বত্বাধিকার নাই।—*Public Con.* 4th August 1829, No. 52.

পত্র পাঠাইলেন। এই পত্রে তাঁহার এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না।*

১৮২৩, ৩১শে মার্চ্চ যে আবেদন-পত্রখানি সুপ্রীম কোর্টে পেশ করা হইয়াছিল, তাহা রামমোহনেরই রচনা। মিস্ কোলেট সত্যই লিখিয়াছেন, "ইহাকে ভারত-ইতিহাসের 'এরিয়োপ্যাজিটিকা' বলা যাইতে পারে। যুক্তি ও রচনা-ভঙ্গীর গুণে ইহা প্রাচ্যে ইংরেজী সভ্যতা-বিস্তারের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।" যাহা হউক, তখনকার কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, ইহা সত্যই বুঝি কোন ইংরেজের লেখা। সিল্ক বাকিংহামের নির্ব্বাসনে, বিলাতের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে ১৮২৪, জুলাই মাসে যে বাদানুবাদ হয়, সেই বিবরণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে, রামমোহনই ইহার লেখক এবং ইংরেজী রচনায় তাঁহার অসামান্য কৃতিত্ব ছিল :—

"সার জন ম্যালকম :—

আমরা একখানি আবেদন-পত্র শ্রবণ করিয়াছি। শোনা যায়, এখানি সেই সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী রামমোহন রায়ের লিখিত। ইহা যে ঠিক, তাহা আমি মোটেই সন্দেহ করি না। রামমোহনকে আমি জানি ও শ্রদ্ধা করি।" (১৮২৪, ৬ই জুলাই)†

"ক্যাপ্টেন গাওয়ান

পরে বলিতে উঠিলেন ; এই সময় যেরূপ গোলমাল হইতেছিল তাহাতে, দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার সব কথা শুনিতে পাই নাই। তাঁহার কথা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিয়াছিলাম, আলোচনায় যে আবেদন-পত্রের এতবার নাম করা হইয়াছে তাহা লিখিবার মত যোগ্যতা রামমোহন রায়ের আছে—ইহাই জানাইবার জন্য তিনি উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামমোহনের নিকট হইতে তিনি একখানি চিঠি পাইয়াছেন, সেখানি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত লিখিত ; পত্রখানি তিনি কোর্টের সমক্ষে পাঠ করিবেন।" (১৮২৪, ২৩শে জুলাই)*

"মিঃ বাকিংহাম :—

আবেদন-পত্রখানির লেখক আমি,—এ সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলিতে চাই, ভারতবর্ষ-ত্যাগের পূর্ব্বে আমি দলিলখানির অস্তিত্বই জানিতাম না। আমার কলিকাতা-ত্যাগের সময় সংবাদপত্র সম্বন্ধে কোন নূতন আইন জারি হইবে,—এরূপ কোন আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং যে ঘটনা ঘটিবে পূর্ব্বেই তাহার পরিণামদর্শী হইব, অথবা সেইরূপ অবস্থার জন্য কোন আবেদন-পত্র রচনা করিব, ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে, ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষমতা আমার আছে—এরূপ অনুমান করিতে হয়।"†

সার চার্লস মেটকাফই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বাধক সকল বিধি তুলিয়া দিলেন (সেপ্টেম্বর ১৮৩৫)। ইহার জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাকে বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের যে উপকার তিনি করিয়াছেন, কলিকাতার অধিবাসীদের দ্বারা নির্ম্মিত মেটকাফ হল তাহারই স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন।

---

* দুইখানি আবেদন-পত্রই রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে ছাপা হইয়াছে। পাণিনি আপিস সংস্করণ পৃঃ ৪৩৭-৪৩, ৪৪৫-৬৭ দ্রষ্টব্য।

† Speech delivered at a General Court of Proprietors of East India Stock on 9th July, 1824. —Malcolm's *Political History of India* (1826), ii. ccxlvii.

* *Oriental Herald* and Colonial Review, Vol. III, Sept.—Dec. 1824, p. 124 ; *Asiatic Journal*, July—Dec. 1824, pp. 270-307.

† *Oriental Herald*, Vol. III, Sept.—Dec. 1824, p. 125.

রামমোহনকে লেখা বিখ্যাত দার্শনিক জেরিমি বেন্থামের একখানি চিঠি হইতেও জানা যায়, রাজা ইংরেজী রচনায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন :—

"Your works, by a book in which I read, a style which, but for the name of an Hindoo, I should have ascribed to the pen of a superiorly well-educated and instructed Englishman." পুনরায়, জেমস্ মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশংসা করিয়া তিনি এই চিঠিতে লিখিতেছেন,—"though, as to style, I wish I could with truth and sincerity pronounce it equal to yours." -Bowring's *Works of Bentham*, x. 589—90.

দক্ষিণভারতের বিশ্বভারতী কলাভবনের ভ্রাম্যমান চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর্ট যতদিন শুধু দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ থাকে, যতদিন জনসাধারণের হৃদয়ের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ ঘটে না, দেশের মাটি হতে সে তার প্রাণরস সংগ্রহ করে না, ততদিন তার সত্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না, ততদিন সে শুধু পরগাছাই থেকে যায়। আজ ভারতবর্ষে আর্টের এই অবস্থাই হয়েছে অথচ এককালে এদেশে আর্ট জনসাধারণেরই বস্তু ছিল; একটি সূক্ষ্ম কলাবোধ দেশের

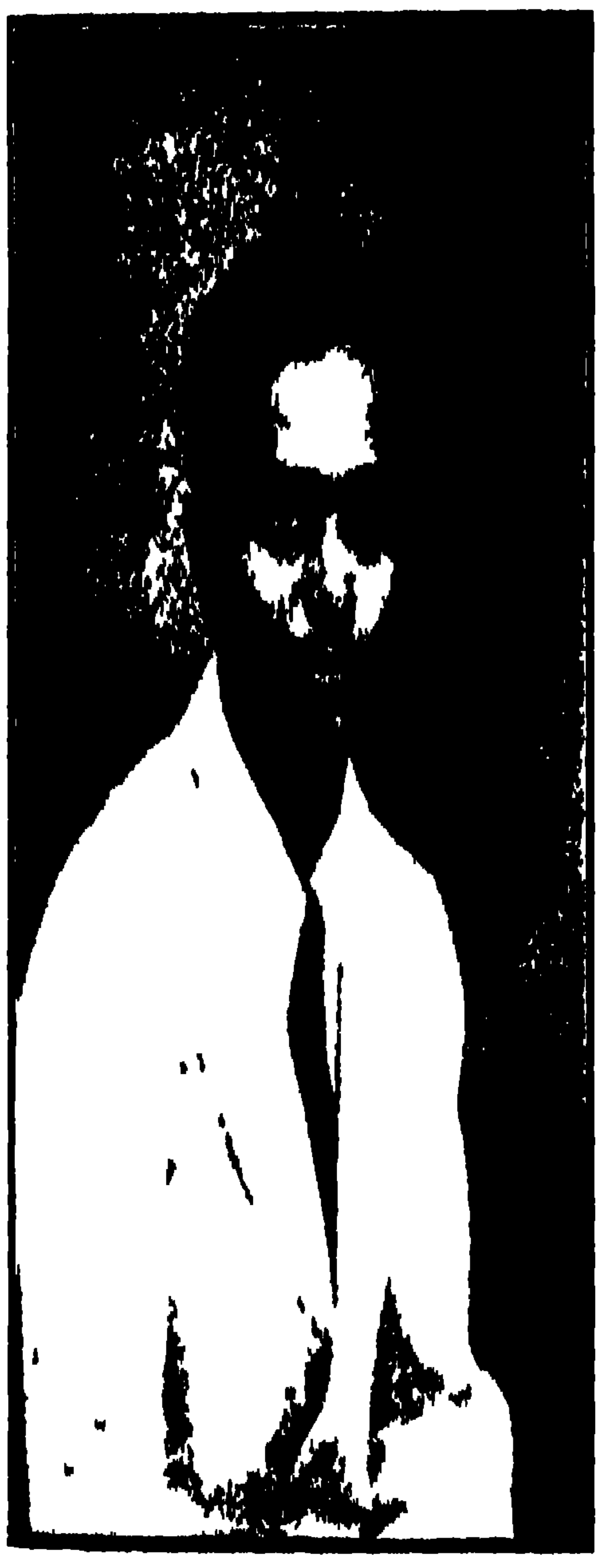

শ্রীবীরভদ্র রাও চিত্রা

জনসাধারণের সমস্ত চেষ্টার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল; তখন দেশের রাজা-রাজড়ারা এদেশের শিল্পীদের যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, অন্ন জুগিয়েছেন, কিন্তু তাদের সেবা শুধু তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যেই বদ্ধ থাকেনি, সমস্ত দেশবাসীর সকলেই তাদের রসের সমান অধিকারী হয়েছিল। তখন এদেশের পূজাপার্ব্বণে, ব্রতে উৎসবে আলপনায় জনসাধারণের গভীরতর ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল। এই রসবোধের স্রষ্টা ছিলেন সেই আমলের শিল্পীরা।

আজ ভারতে সেই শিল্পীও নেই, সেই সূক্ষ্ম রসবোধও

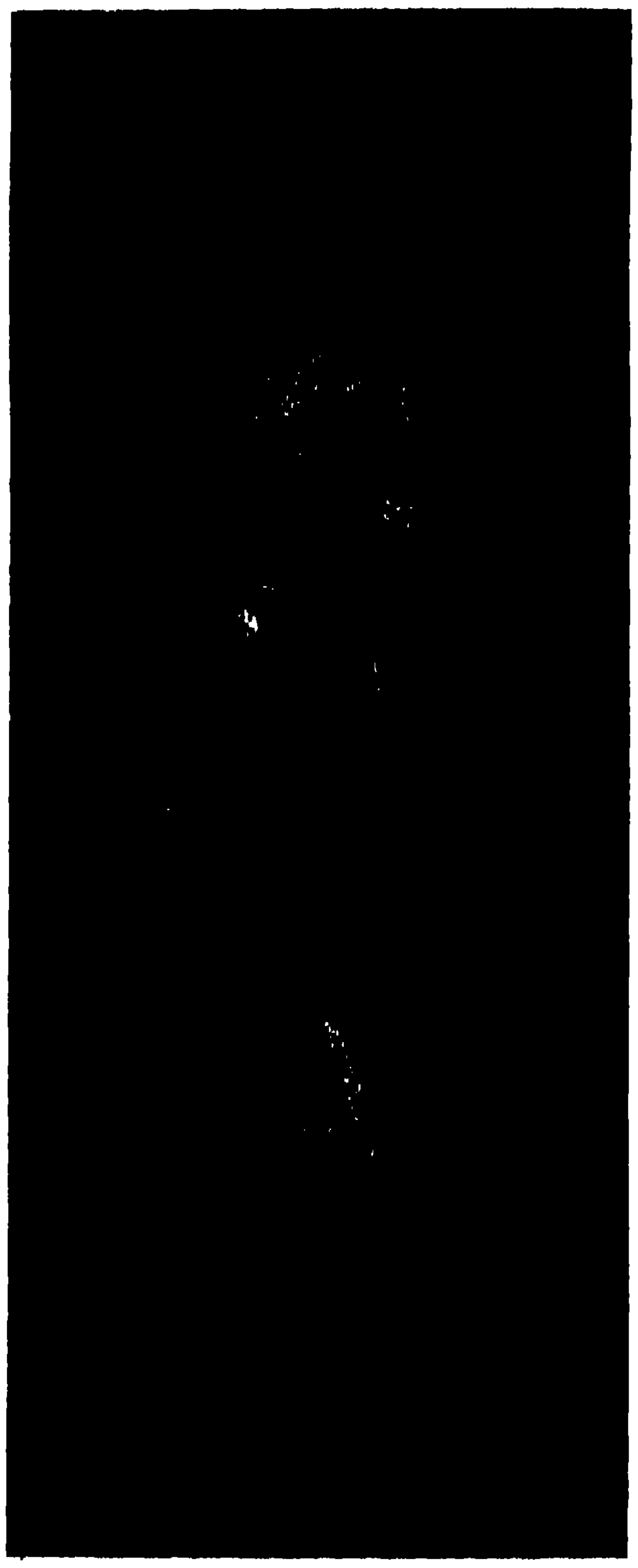

শ্রী পি, হরিহরণ

নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আজ যাঁরা পরম সাহসে শিল্পের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করছেন তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো আদরই পাচ্ছেন না। তাঁদের সামনে শুধু যে সেই পুরাতন ভারতীয় শিল্পের নূতন করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার কাজ রয়েছে তা নয়, দেশের জনসাধারণের

হৃদয়ে সেই নষ্ট রসবোধ, শিল্পবোধও তাঁদেরই জাগিয়ে তুলতে হবে।

এর কোনো আয়োজন আমাদের দেশে নেই। রাজধানীতে বা বড় বড় নগরগুলাতে মাঝে মাঝে যে দু'একটা চিত্রপ্রদর্শনী হয়, সেগুলা দেশের সকলের অধিগম্য

তো সেগুলোকে বুঝিয়ে দেবার, চিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে বলে দেবার, কেউ থাকে না। কাজেই দেশে যা সামান্য চেষ্টা এবিষয়ে চলছে তার সঙ্গে জনসাধারণের হৃদয়ের সত্যকার যোগ সংস্থাপিত হতে পারছে না। জাপান প্রভৃতি দেশে একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান

হিরামণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

আছে, নয়; মুষ্টিমেয় শিক্ষিতমাত্র কয়েকজনই তার পরিচয় পান। আর একটা কথা, দেশের সাধারণ লোক কেউ কেউ যদিও সেই প্রদর্শনীগুলাতে গেলো; রস-শিক্ষার অভাবে সে যাওয়ায় তাদের কোনো ফলই হল না। কারণ সেখানে

সে দেশে মাঝে মাঝে শিল্পীরা তাদের চিত্র নিয়ে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘুরে বেড়ান। এরা যে সকলেই নিম্ন শ্রেণীর শিল্পী তা নয়, এঁরা যে শুধু ছবিগুলি বিক্রী করবার উদ্দেশ্যেই ঘুরে বেড়ান তা নয় যাতে জনসাধারণের

মৃত্তিকা:

শ্রীনন্দলাল বসু

শিল্পবোধ জাগ্রত হয়, সেইদিকেই তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। এই-সব ভ্রাম্যমান চিত্র-প্রদর্শনী জাতীয় সভ্যতা গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান।

বোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও তার মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এখানকার দুইজন ছাত্রের এইরূপ একটি প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে।

যোধবাঈ—শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-প্রমুখ শিল্পিগণ ভারতীয় প্রাচ্য চিত্রকলার পুনরভ্যুদয়ের যে চেষ্টা করছেন, এই রকম ভ্রাম্যমান চিত্র-

শ্রীযুক্ত বীরভদ্র রাও চিত্রা এবং পি হরিহরণ ছয় বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছেন; নানা প্রদর্শনীতে তাঁদের ছবি প্রশংসিত

বিশ্বভারতীর কলাভবনের সাধনার বিশেষ বাণীটি তাঁদের জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হয়, এইজন্যে তাঁরা এবৎসর কলাভবনের অনেক চিত্র নিয়ে সমগ্র অন্ধ্রদেশ ভ্রমণ করেছিলেন, আর স্থানে স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন

বর্ষা—শ্রীযদুপতি বসু

করেছিলেন। পূর্ব্বেই বলেছি, বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের শিল্পানুষ্ঠানের সঙ্গে অন্ধ্রদেশীয়দের পরিচয়সাধন করবার ও ভারতীয় শিল্পের 'নবজাগরণের' রূপটি নিজের দেশের লোকদের দেখাবার জন্যেই তাঁরা ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্যে নানা বাধা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে।

এখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা প্রথম ভিজাগাপত্তম সহরে উপস্থিত হন। এ সহরে এর পূর্ব্বে আর কখনো চিত্র-প্রদর্শনী হয়নি। কাজেই কোথায় তাঁরা প্রদর্শনী করতে পারবেন তাই ঠিক করতে কিছুদিন লাগে; শেষে তাঁরা স্থানীয় টাউন হলে জায়গা পান। সেখানে কিছুদিন থাকায় সহরের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। মাদ্রাজ লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত নরসিংহ রাজু এই প্রথম প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন

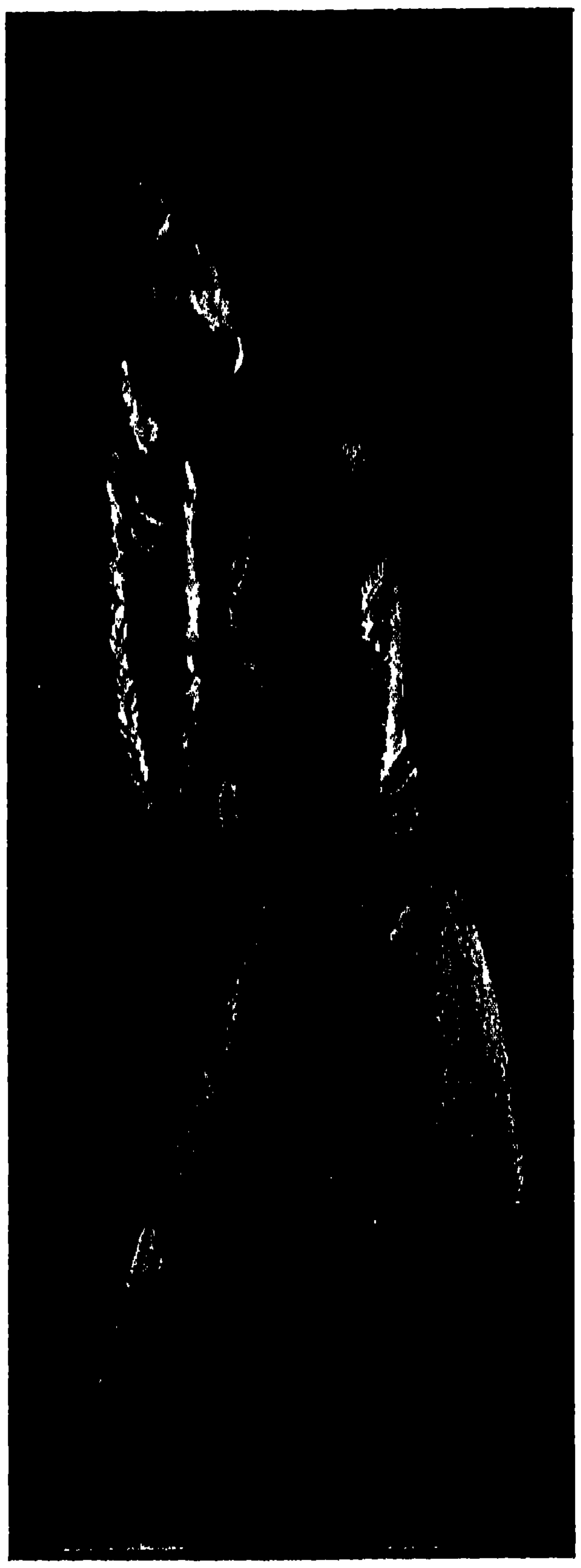

নটীর পূজা—শ্রী পি হরিহরণ

করেন। প্রদর্শনীর মাঝখানে তাঁরা নিজে আলপনা দিয়েছিলেন। ধূপে, আলপনায় প্রদর্শনী-গৃহ দেবালয়ের মত পবিত্র মনে হচ্ছিল। চিত্রগুলিও সুন্দরভাবে সাজান হয়েছিল।

ভিজাগাপত্তমে প্রদর্শনী পাঁচদিন খোলা ছিল, এর মধ্যে একদিন বিশেষ করে মেয়েদের জন্যেই ছিল। বহুলোক প্রদর্শনী দেখে আনন্দ উপভোগ করেছিল।

ভিজাগাপত্তম থেকে তাঁরা বেরামপুরে এসে সেখানকার টাউন-হলে প্রদর্শনী খোলেন; বিশ্বভারতীর প্রাক্তণ ছাত্র শ্রীযুক্ত পি, এল, রাও এই প্রদর্শনীর জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম

পল্লীপ্রান্তে—শ্রী পি হরিহরণ

কাঠুরিয়া শ্রীমতী গৌরী দেবী

ছিলেন। বেরামপুরের চিত্র-প্রদর্শনীও সকলের দৃষ্টি কর্ষণ করেছিল।

প্রথমে তাঁরা প্রদর্শনীর জন্য জায়গাই পান নি, শেষে স্থানীয় ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রামবতরণ মহাশয়ের

এখানে একদিন তাঁরা ভিজিয়ানগরম মহারাজ কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; তাঁদের বক্তৃতা সকলেই উপভোগ করেছিল।

গৃহ—শ্রীকেশব রাও

ভিজিয়ানগরম থেকে শ্রীযুক্ত হরিহরণ ও চিত্রা যান কোকনদে। এখানে কোকনদ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ লক্ষ্মণ রাও ও ছাত্রগণ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করে প্রদর্শনীর আয়োজন করে দেন। স্থানীয় আনন্দ সঙ্ঘ হলে প্রদর্শনী হয়; প্রদর্শনী খোলেন রাও বাহাদুর ডি, শেষাগিরি রাও। অধ্যাপক লক্ষ্মণ রাও সকলের সঙ্গে তঁাদের পরিচয় করে দেন। কোকনদ-প্রবাসী বাঙালী শ্রীযুক্ত বিনায়ক কুমার দীক্ষিত এঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সকলের চেষ্টায় ও উৎসাহে কোকনদের প্রদর্শনী সফল হয়েছিল।

কোকনদ হ'তে এঁরা যান রাজমহেন্দ্রীতে। রাজমহেন্দ্রীতে অন্ধ্রদেশের পরলোকগত বিখ্যাত শিল্পী রামরাও-এর স্থাপিত একটি চিত্র-বিদ্যালয় আছে; রামরাও-এর মাতা এবং বিধবা ভগিনী শান্তিনিকেতনের এই শিল্পীদ্বয়কে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করে নেন। সেখানকার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পট্টবী রাও প্রভৃতি সকলে উৎসাহের সঙ্গে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

এখান হ'তে তাঁরা যান বেজুয়াডায়; সেখানকার প্রদর্শনী খুলেছিলেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত সি, আর, রেড্ডী।

এর পর মছলিপট্টমে প্রদর্শনী হয়। খ্যাতনামা নেতা শ্রীযুক্ত পট্টবী সীতারামায়া প্রদর্শনীতে বক্তৃতা করেন; তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল; কয়েকটি কথায় তিনি প্রদর্শনী কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে বুঝিয়ে বলেন।

মছলিপট্টম হ'তে গুণ্টুর হয়ে শ্রীযুক্ত হরিহরণ ও চিত্রা মান্দ্রাজে যান। মান্দ্রাজেই তাঁদের এ যাত্রার শেষ প্রদর্শনী হয়েছিল। মান্দ্রাজে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুব্বা রায়েন। এখানকার প্রদর্শনীতে বহুলোক এসেছিল। প্রায় সপ্তাহকাল প্রদর্শনী খোলা ছিল।

এইভাবে এবারকার প্রদর্শনী শেষ হয়। প্রদর্শনী যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, এঁরা যে যে স্থানে প্রদর্শনী করেছিলেন, প্রত্যেক জায়গায় লোকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, সকলেই তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল; তা ছাড়া এ অঞ্চলের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলোতেও প্রদর্শনী-সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। স্থানে স্থানে এঁদের চেষ্টার ফলে কলাসমিতি গঠনের চেষ্টা চলছে। ভিজাগাপত্তমের শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটপতি রাজু এঁদের অনুপ্রেরণায় কলাভিবৃদ্ধিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের সঙ্গে তার যোগ থাকবে। আরও অনেক স্থান হতে তাঁরা নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে সে সকল স্থানে এঁরা যেতে পারেন নি।

আমরা আশা করি, এই চেষ্টাই এ বিষয়ে শেষ চেষ্টা হবে না। শ্রীযুক্ত হরিহরণ ও চিত্রার মত ভারতবর্ষের অন্যান্য নবীন শিল্পীরাও দেশের মধ্যে শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলবার এই ব্রত গ্রহণ করবেন।

এই সঙ্গে যে-সকল ছবি প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছিল, তাদের কয়েকটি ও প্রদর্শনীর আলোকচিত্র দেওয়া হ'ল।

আপন-পর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

২৪

এমনও ঘটে, মেঘ কাটিয়া গেলে বাষ্পের চিহ্ন তখন আর কণামাত্রও থাকে না। স্বচ্ছ সুনীল প্রসন্ন আকাশ—কে বলিবে একদিন উহারি বুকের ভিতর সহস্র অগ্নিময় সরীসৃপ কৃষ্ণমেঘের অন্তরালে মৃত্যুর ক্রন্দন তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। প্রকাশ ও অণিমার মনের অন্ধকারও একদিন ঠিক সেইমত কাটিয়া গেল।

ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর হইতে সোফির ভবিষ্যৎ, কিসে তাহার দুঃখ যাইবে, কিরূপে তাহার পুত্রকন্যা মানুষ হইবে—ইহাই তাহাদের আলোচনার একমাত্র বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের সম্পর্ক একটা উদার মনোবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এক্ষণে তাহারি ব্যাপকতা দুজনার চক্ষে দুজনার চরিত্র বেশ বড় করিয়াই আঁকিয়া দিল।

সোফির সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিতে অণিমা কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রতিদিন সে তাহাকে কাছে আনিয়া বসাইত এবং সতর্ক কোমল স্পর্শে মনের ব্যথায় সান্ত্বনার স্নিগ্ধ চন্দন লেপিয়া দিয়া অল্পে অল্পে দুঃখের কাহিনীটি তাহার সমস্তই শুনিয়া যাইত। সোফির আর তাহাদের উপর কোন রাগ ছিল না, ইহারা ত প্রভুর দম্ভ লইয়া আধিপত্য করিতে আসে নাই—আসিয়াছে, অসময়ের বন্ধুরূপে তাহার অভাব মুক্ত করিতে। এত দরদী যাহারা তাহাদের উপর নির্ভর না করিয়া সে কি থাকিতে পারে? বস্তুতঃ অণিমাকে সে দেবীর মত ভক্তি করিতে আরম্ভ

করিয়াছিল, তাই আপনার ও সন্তান কয়টির ভাগ্য-পরিচালনার ভার তাহার হাতে সঁপিয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না।

শৈশবেই সোফির পিতামাতার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, দূর-সম্পর্ক কোনো আত্মীয়ের সংসারে সে প্রতিপালিত হয়। অনুসন্ধান করিয়া অণিমা তাহার সেই আত্মীয়টিকে ডাকাইয়া আনিল; কিন্তু সে গরীব, অর্দ্ধেক দিন নিজেরই অনশনে কাটিয়া যায়, এতগুলি ছেলেপুলে ও সোফির ভার লইবে কিরূপে? অণিমা তাহাদের ভরণ-পোষণ বাবদ মাসহারা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, এই দরিদ্র আত্মীয় হৃষ্টচিত্তে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

করুণা আসিয়া প্রকাশকে বলিল,—ভাই তোমরা সকলেরই সকল ব্যবস্থা করচ। কেবল কি মারই কিছু করবে না?

প্রকাশ বিস্মিত হইল,—কেন দিদি?

—নয়ত কি? সেই যে মাকে কাশী পাঠাবার কথা বলেছিলাম তার কি ব্যবস্থা করেচ শুনি?

প্রকাশ হাসিয়া কহিল,—ও এই কথা!—তা বাধা কি? পাঠালেই ত হয়।

করুণা কহিল,—তুমি যেন বললে। কিন্তু সঙ্গে কে কে যাবে সে-সব ব্যবস্থা করা চাই ত।

প্রকাশ বলিল,—তুমি গেলে আমি কোনো কথাই ভাবি না।

করুণা হাসিয়া উঠিল,—কিন্তু ঐখানেই ত গোল। আমার যে যাওয়া হবে না।

—কেন?

হাসিতে হাসিতে করুণা কহিল,—তুমি বেশ ত! অণিমার যে ছেলে হবে। তাকে এ অবস্থায় ফেলে কি আমি যেতে পারি?

প্রকাশের মুখে, চোখে সহসা একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। এমন কথাটিও অণিমা তাহাকে জানায় নাই! অণিমার পানে ফিরিয়া দেখিল, তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

মৃদুস্বরে সে কহিল,—অণিমা তুমি ত আমায় কিছু বলনি!

অণিমা নতমুখে বসিয়া রহিল—কিছু বলিল না।

করুণা বলিল,—তোমাদের বোঝাপড়া তোমরা পরে করো ভাই। আমি যা বল্‌চি শোন। দিদিমা, কিষণ আর সরকার-মশায় মার সঙ্গে যাবে, তারপর মাস-কতক পরে আমার যখন অবসর হবে তখন আমি গিয়ে মার সঙ্গে থাকবো। কি বল?

—বেশ ত।

—মাকে কালই পাঠাতে চাই।

—তাই হবে।

করুণা চলিয়া গেল। বেলা তখন অপরাহ্নের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কলের বাঁশী অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। কামিজ পরিয়া প্রকাশ বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া অণিমা জিজ্ঞাসা করিল,—এখনি বেরুবে?

—হাঁ, কলে যেতে হবে।—তারপর ফিরিয়া আসিয়া সে অণিমার পাশে বসিয়া পড়িল, স্মিতমুখে কহিল,—এই সৌভাগ্য-সম্ভাবনা তুমি কি নিজের জন্য জমিয়ে রেখেছিলে অণিমা, আর কাউকে অংশ দেবে না বলে?

অণিমাও হাসিল,—না, অত স্পর্দ্ধা আমার নেই। বিশেষতঃ আগে হোক, পরে হোক, অংশ যখন দিতেই হবে।

অতুলগৌরবে তাহার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর সমস্ত আনন্দ সে নিজের মধ্যে উপভোগ করিতে লাগিল। জীবনের শ্রেষ্ঠ দান স্বামীর পদে নিবেদন করিয়া সে যে সত্যসত্যই ধন্য হইতে চলিয়াছে। এত বড় দানের কথা স্বামীর কাছে সে কি কখনো নিজমুখে ঘোষণা করিতে পারে?

নয়ন ভরিয়া প্রকাশ তাহার সেই স্নিগ্ধপাণ্ডুর মূর্ত্তি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এ সৌন্দর্য্য এতদিন কোথায় লুকাইয়াছিল? সে কি অন্ধ যে দেখিয়াও দেখে নাই? চন্দ্রোজ্জ্বল সিন্ধুর মত তাহার অন্তর নবভাবে উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছিল, অকস্মাৎ সে যেন জীবনের এক নূতন পরিণতির সন্ধান পাইয়াছে। ধীরে ধীরে অণিমার তৃপ্তি-কোমল মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সে কহিল,—ভগবান করুন অণিমা, যেন আমাদের এই সুখ-স্বপ্ন সফল হয়।

কলে আসিয়া প্রকাশ আবার কাজে মন দিল। ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর হইতে কি একটা অবসাদের ভারে সে পীড়িত হইতেছিল। সে যেন এমন ধারা আর মানুষের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। ব্যবসার প্রতি, প্রভুত্বের প্রতি তাহার ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। কি কয়লা-সমস্যা, কি বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা, নানা কারণে ব্যবসার অবস্থাও এক্ষণে ক্রমেই খারাপ হইয়া আসিতেছিল। সে স্থির করিয়াছিল, বাজারের পাওনাগুলি আদায় করিয়া লইয়া কল বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু আজ এক নূতন উদ্যম, পরিপূর্ণ উৎসাহ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল, ব্যবসার এই অধঃপতনের সম্ভাবনা সে আর নির্ব্বিকারচিত্তে চিন্তা করিতে পারিল না। কে জানে, তাহার সকল ভাল-মন্দ আজিকার এই চরম সার্থকতার দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলে নাই? কে জানে, অদূর ভবিষ্যতে এক পূর্ণতর সত্তা জীবনে যাহা কিছু গর্হিত, নিন্দনীয়, স্বার্থ-সম্পৃক্ত সবই মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে কি না? না, এতকাল পর সে তাহার পরিশ্রম, অধ্যবসায় পণ্ড হইতে দিবে না—কলটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

প্রকাশ যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন সেখানে বাঁধা-ছাঁদার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। করুণা ব্যস্ত, কিরণ ব্যস্ত—এমন কি সুরধুনীও আজ একটু উঠিয়া চলিয়া বেড়াইতেছেন। কেবল অণিমা বারান্দার এক পার্শ্বে টিপয়ের উপর অশোকের জন্য একটি ঘর গড়িয়া দিতেছে, আর অশোক গৃহনির্ম্মাণের উপকরণগুলি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া কেবলি হাসিতেছে।

তাহাকে আসিতে দেখিয়া করুণা কহিল,—এস ভাই। দেখছ ত কি ঝঞ্ঝাট? একটু সংসারের জিনিষ-পত্র গোছ-গাছ!

প্রকাশ হাসিয়া বলিল,—কিন্তু এতবড় শক্ত কাজটা একদিনে সেরে ফেলতে কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে? দুদিন পরে পাঠালে হত না?

করুণা বলিল,—না ভাই। শীগগির আর ভাল দিন নেই।

ছুটিয়া আসিয়া অশোক প্রকাশের হাত ধরিল। কহিল,—মেশো-মশায়, আমার বাড়ী দেখবে এস।

আদর করিয়া প্রকাশ তাহার গাল দুটি টিপিয়া ধরিল, হাসিতে হাসিতে কহিল,—তোর বাড়ী কি রে? ওযে আমার বাড়ী।

ঈস্!

প্রকাশ অণিমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নিবিষ্টমনে অণিমা ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রাগুলি যথাস্থানে বসাইতেছে, তাহার চম্পক-অঙ্গুলির নিপুণ সৃষ্টি সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। একটির পর একটি, তারপর আর একটি অংশ মিলিয়া গৃহখানি যেন এক যাদু-মন্ত্রে গড়িয়া উঠিতেছে। ও কি শুধু খেলার ঘর! সারা অন্তর দিয়া প্রকাশ অনুভব করিতেছিল, অমনি পলে পলে সে যেন তাহাদের সুখের নীড় নূতন করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে!

২৫

কয়েক মাস পর একদিন রাত্রে ঘরের ভিতর একাকী বসিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে প্রকাশ কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার বিবর্ণ মুখের রেখায় রেখায় উদ্বেগ, শঙ্কা ও ভয়ের ছায়া। বাহিরে তখন দুর্য্যোগের ভীষণ মাতামাতি চলিতেছিল। ঝাপটে ঝাপটে বৃষ্টির জল নীচের বারান্দা ভাসাইয়া খড়্‌খড়িগুলির উপর পট্‌পট শব্দে আঘাত করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তীক্ষ্ণ শিস।

সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। পরক্ষণে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া ডাক্তারবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে প্রকাশ তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল, কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন,—পূর্ব্ববৎ।

প্রকাশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। আজ দুইদিন ধরিয়া যমের সহিত অণিমার সংগ্রাম চলিতেছিল।

ডাক্তারবাবু একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন, তারপর বলিলেন,—আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। পরে যদি দরকার হয় অস্ত্র প্রয়োগ করা যাবে।

উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। বাহিরে রণচণ্ডী প্রকৃতির রুদ্র প্রলাপ তেমনি চলিতেছিল। অনেকদিন পর প্রকাশের আজ মনে পড়িল, এমনি আর একটি দুর্য্যোগময় নিশীথের কথা। সেই রাত্রে রুগ্না স্ত্রীর পাশে বসিয়া সে কি একটিবারও ভাবিয়াছিল যে, দূর ভবিষ্যতে জীবনের ইতিহাসে সেইদিনই আবার ফিরিয়া আসিবে? প্রায় তিন বৎসর কাটিতে চলিল,—সে ত অতীতকে ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু অতীত তাহাকে ছাড়িল কই?

অনিদ্রায় তাহার শরীর বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে ডাক্তার কখন উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে টের পায় নাই। তাহার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিল, পরিচালনার শক্তিটুকুও যেন রহিল না। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া শিশুর মত অসহায়ভাবে সে রোদন করিতে লাগিল,—দয়া কর ভগবান, রক্ষা কর, অণিমাকে বাঁচাও!

রাত্রি অনেক হইল। তাহার মুদ্রিত চোখ দুটির উপর তন্দ্রা আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছিল, এইরূপে কতক্ষণ কাটিল। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর করস্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—খবর কি?

প্রসন্নমুখে ডাক্তারবাবু বলিল, - আর ভয় নেই।

প্রকাশের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধন্য ভগবান!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। উৎসুক হইয়া ডাক্তারবাবুর হাতখানি দুই হাতে টানিয়া লইতে তিনি কহিলেন,—আপনার একটি পুত্র-সন্তান হয়েচে।

ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে উষার রক্তপতাকা ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া দেখা দিল। আজিকার এই অরুণালোক যেন কোনো নবসৃষ্টির নূতন উন্মেষ।

যখন একটু বেলা হইল তখন প্রকাশ আস্তে পা টিপিয়া একটি রুদ্ধ কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এটি সূতিকাগার। মুহূর্ত্তকাল সে কোনো অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দের প্রতীক্ষায় কান পাতিয়া রহিল, তারপর ডাকিল,—দিদি!

ভিতর হইতে করুণা জবাব দিল,—কি ভাই?

—অণিমা কেমন আছে?

—ভাল আছে। ঘুমুচ্ছে।

—আর—আর ছেলেটি?

—সেও ভাল আছে।.........

নবজাত শিশুটিকে প্রথম দেখিল সে একটি মাংস-পিণ্ডের মত—অপরিপুষ্ট অবয়ব, মনুষ্য-আকৃতির সুদূর ছায়া মাত্র! কিন্তু দিনের পর দিন যেমন কাটিতে লাগিল, কোনো দিব্য ভাস্কর যেন এই পিণ্ডটিকে গড়িয়া-পিটিয়া দেবশিশুর আকার দিয়া তাহার মধ্যে এক নির্ম্মল প্রাণের আনন্দ-নিশ্বাস ফুঁকিয়া দিতে লাগিল।

এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সাড়া প্রকাশের অন্তরে অচিরাৎ জাগিয়া উঠিল। ক্রমেই এই শিশুটির আকর্ষণ সে অনুভব করিতেছিল। ইহার সুকুমার অঙ্গের ললিত ভঙ্গি, নিরর্থক হাসি, স্বচ্ছ সুন্দর চাহনি সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত এবং চাহিয়া চাহিয়া তাহার আত্মা এক অতুল আনন্দের অমৃত-সাগরে ডুবিয়া যাইত।

অণিমার দেহশ্রী এক বিচিত্র শোভায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মাতার পরিণত রূপের গৌরবে তাহার উদ্দাম প্রকৃতি ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। একটা দায়িত্ব-জ্ঞানের ভার তাহার নিত্যকার আচরণগুলিকে সংযত অথচ মধুর করিয়া তুলিতেছিল। এই যে শিশু, পুরস্কারস্বরূপ ভগবান তাহাদের দান করিয়াছেন, ইহার পরিরক্ষণ ও যত্ন সে ছেলাখেলা বলিয়া ভাবিতে পারিল না। প্রচুর বারি তপন ছায়া বাতাস দিয়া এই ক্ষুদ্র চারা গাছটিকে মহীরুহের মত উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই ত মাতৃজীবনের মহাব্রত।

দেবদূতের মত এই শিশুটি আসিয়া তাহার নবনীত-কোমল হাত দুটি দিয়া প্রকাশ ও অণিমার দাম্পত্য সম্বন্ধ দৃঢ়সূত্রে বাঁধিয়া দিল। তাহাদের মধ্যে এই তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব দুজনাকেই দুজনার একান্ত প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিল এবং ইহারি মিলনক্ষেত্রে তাহাদের স্নেহের ধারা দুটি আসিয়া মিশিতে, প্রীতি ও তৃপ্তির রসে উভয়ের সত্তা এক্ষণে অধিকতর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রকাশের মনে আর কোনো দুঃখ রহিল না। তাহার দৈন্যের নিশি ভোর হইয়া আসিল। যে-সকল মানসিক দুশ্চিন্তা এতকাল তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,

মায়াবীর কুহকজালের মত এখন তাহা মিলাইয়া আসিতেছিল। সুরবালার কথা সে একেবারে ভুলিয়া গেল, অপরাধের কথা সে আর মনেও স্থান দিল না। এত-বড় পুরস্কার যে অপরাধের সে আবার অপরাধ? ক্ষতি কি, যদি প্রবঞ্চনার উপরই তাহার সুখের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে? যখন-তখন নীতির দোহাই পাড়িও না।

দুইজনের মধ্যে প্রায়ই তর্ক উঠিত এই লইয়া, ছেলেটি কাহার মত হইয়াছে। মাতা বলিত, সে তাহারি মত হইয়াছে—পিতা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া সমস্ত গৌরবটুকু নিজের লভ্য বলিয়া দাবী করিয়া বসিত। করুণাকে অনেক সময় তাহারা মধ্যস্থ মানিত এবং সকল সময় সে প্রকাশের দিকে টানিত দেখিয়া কৃত্রিম রোষে অণিমা ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া থাকিত। শেষে অনেক তর্কবিতর্কের ফলে ইহার চোখ মুখ নাসিকা ভ্রূ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেটি যাহার ভাগে পড়ে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রফা হইত। এত-সব গুরুতর সমস্যার কারণ যে শিশু, সে বেশ নির্ব্বিকার চিত্তে দুজনার কোলে চড়িয়া আদর কুড়াইয়া, দুজনারই মুখে নখের আঁচর বসাইয়া খল খল করিয়া হাসিত।

অনেক দিন পূর্ব্বেই করুণার কাশী চলিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ ও অণিমা উভয়ে ধরিয়া বসিল অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে কোনমতে তাহাকে ছুটি দেওয়া হইবে না। এখানকার কাজ তাহার ফুরাইয়া আসিয়াছিল। যেরূপ আনন্দে অণিমা ও প্রকাশের দিনগুলি কাটিতেছিল তাহা দেখিয়া সে সুখী হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিল যে এখানে থাকিবার আর তাহার প্রয়োজন নাই। অণিমার ছেলের লালনপালনের ভার ত এখন অণিমাই লইতে পারে। উন্মাদিনী জননীর কাছে থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা করিবার প্রয়োজন যে তাহার ঢের বেশী। সে ছিল মূর্ত্তিমতী সেবা, সুখের সংসারে তাহার ঠাঁই কোথায়?

অন্নারম্ভের দিন আসিয়া পড়িল। স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন লইয়া করুণা রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতেছিল;—কি প্রকাশ, কি অণিমা অনেক বলিয়াও কেহই তাহাকে বিরত করিতে পারে নাই। স্বর্ণকার খোকার জন্ম গহনা প্রস্তুত করিয়াছিল, ভাতের দিন করুণা খোকাকে সে গহনা পরাইয়া, বেনারসী জোড় দিয়া সাজাইয়া আসনখানির উপর বসাইল। তারপর অণিমার পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—এইবার বলত অণিমা—কারমত দেখাচ্ছে? বাবার মত না মার মত?

অণিমা হাসিয়া কহিল,—তুমি কি বল?

করুণা কহিল,—আমি বলি, বাবার মত।

অণিমা বলিল,—আশীর্ব্বাদ কর দিদি, তাই হোক। ও যেন ওর বাবার মত হয়—অমনি কর্ম্মী, অমনি যশস্বী।

বস্তুতঃ ভাগ্যলক্ষ্মী এখন প্রকাশের উপর সকল বিষয়ে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কাপড়ের বাজার কোনো বিশেষ কারণে হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই অনুপাতে তূলার দর কমই রহিয়া গেল। সুতরাং কলের কাজ খুব জোর চলিতে লাগিল এবং বৎসর ঘুরিতে-না-ঘুরিতে মোটা লাভ আসিয়া প্রকাশের হাতে জমিল। এখন তাহার যশের সৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা কিরূপে সে সামান্য ব্যক্তি হইয়াও যত্ন ও অধ্যবসায়গুণে একজন ধনী হইয়া উঠিয়াছে, গৃহে গৃহে তাহা আলোচিত হইত; সকলেরই সে আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া যুবকেরা নিজ নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের আকাশ-কুসুম নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তাহাকে অনুসরণ করিয়া ব্যবসায়ীরা বুকে বল বাঁধিল।

জনহিত-কার্য্যে প্রকাশ একজন অগ্রণী হইয়া উঠিল। সভা-সমিতিতে সে আগ্রহের সহিত যোগ দিত এবং নানারূপে সাহায্য করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিত। ছাত্রদের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সে তাহাদের কর্ম্মের পথে আপন-আপন বিশিষ্ট স্থান বাছিয়া লইয়া অধিকার করিতে বলিত। ছাত্রেরা তাহার এই উপদেশ উৎসাহের সহিত শুনিয়া যাইত এবং ভাবিয়া বিস্মিত হইত, না জানি কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া জীবন সার্থক করিয়াছে!

অন্নপ্রাশনের পর একদিন করুণা যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, প্রকাশ আসিয়া কহিল,—চল্‌লে দিদি?

করুণা কহিল,—হাঁ ভাই, অনেক দিন হয়ে গেল—আর ত থাকা চলে না।

অণিমা বলিল, তুমি গেলে বাড়ী যে একেবারে খালি হয়ে যাবে দিদি।—তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল।

করুণা ম্লানমুখে একটু হাসি টানিয়া আনিল, কহিল—তোদের সংসার এইবার তোরা কর। মাকে ছেড়ে আমার যে থাকবার যো নেই ভাই।

—আবার কবে দেখা হবে?

করুণা হাত দুটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিল,—বাবা বিশ্বনাথই জানেন!

প্রকাশ কহিল,—যে কাজের চাপ। নৈলে আমরাই ত তোমাদের ওখানে বেড়িয়ে আসতে পারতুম।

করুণা বলিল,—ইচ্ছা করলেই তা পার। যাবে ভাই একবার পূজোর সময়?

প্রকাশ কহিল,—দেখি যদি পারি।

অশোকের হাত ধরিয়া করুণা গাড়ীতে গিয়া উঠিল। তাহাদের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে প্রকাশ ও অণিমার মনে হইতেছিল যেন দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরদিন প্রকাশ একখানি চিঠি পাইল, নীলবর্ণ পুরু খাম, ঠিকানা অপরিচিত হস্তে লেখা। খামটি খুলিয়া সে দেখিল, ভিতরে নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া খবরের কাগজের একটু কাটা অংশ, সঙ্গে পিন দিয়া গাঁথা একখানি পত্র—সেটি শ্যামবাবু লিখিয়াছেন। কৌতূহলী হইয়া প্রথমেই সে কাগজের দাগ দেওয়া অংশটি পড়িয়া ফেলিল—তাহারি সম্বন্ধে লেখা, প্রবাসে বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া জনৈক বাঙ্গালী কাগজওয়ালা স্বদেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তারপর সে পত্রখানি পড়িল। পত্র এইরূপ—

প্রিয় প্রকাশ,

এমনি বিধাতার খেলা, আমি এখানে যে-ধীবরটির পথ চেয়ে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিলাম, দূর প্রবাসে সেই এখন তোমার অদৃষ্টের ছিপি খুলে দিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে দৈত্য বেরিয়ে পড়েছে! এর বিশাল কলেবর দেখে দেশশুদ্ধ লোক কিরূপ মেতে উঠেছে, কাগজের দাগ দেওয়া অংশটুকু পড়লেই তা জানতে পারবে। দৈত্য বের হয়েছে, সে এখন যারই হোক—এতেই আমি খুশী জেনো।

মনে পড়ে, একদিন তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে—কোথায়? কোন্ পথে? আমাদের লক্ষ্যই বা কি?—এখন বোধ করি নিজেই বুঝতে পারছো যে, আমি যে অন্ধ শক্তির কথা বলেছিলাম, সেই শক্তিই মানবজাতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এমন পথে, যার শেষ নাই এবং এই পথেই তাকে এগিয়ে চলতে হবে। বিশ্ব অনন্ত, পথ অনন্ত, লক্ষ্য অনন্ত —আর মানুষ সেই অনন্ত পথের পথিক, পরিপ্রশ্ন না করে তাকে শুধু কাজই করে যেতে হবে। শেষে এমন দিন আসবে যখন তার কাজ আর পৃথিবীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে না, পৃথিবী তার কাছে গোষ্পদের মত সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠবে—তখন তার কর্ম্মক্ষেত্র গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়বে। আজ যারা বেঁচে আছে তারা সেদিন দেখবে না সত্য, কিন্তু তারাই এই শ্রেষ্ঠ পরিণতির উপকরণগুলি যোগাচ্ছে, এই আনন্দ-টুকুই কি তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? ইতি

মেসের শ্যামবাবু।

পত্রখানি প্রকাশ একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিল।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ

কর্ণাটকের লিঙ্গায়েৎ মহিলাদের মধ্যে ডাঃ কৃষ্ণদেবী আর পাটিলই সর্ব্বপ্রথম বিলাত গমন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ১৯২৪ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-বি-বি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া,

ডাঃ কৃষ্ণদেবী আর পাটিল

চিকিৎসা ও শল্য-বিদ্যায় অধিকতর উৎকর্ষলাভের জন্য তিনি পর বৎসর বিলাত যাত্রা করেন। সুখের বিষয়, ইতিমধ্যেই তিনি ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি উপাধি লাভ করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি গ্লাসগোর Royal Faculty of Physicians and Surgeons-এর 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। F. R. C. S. (Edinburgh) হইয়া শীঘ্রই তাঁহার দেশে ফিরিবার কথা আছে।

কুমারী এস, শ্রীনিবাসগুরু পালামকোটার স্কুল-পরিদর্শন-বিভাগে সহকারীর কাজ করেন। তিনি সম্প্রতি টিনেভেলী জেলা-শিক্ষাপরিষদের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ভাগীরথী আম্মা

'মহিলা' মলয়ালম ভাষার একখানি বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকা। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে কেরল (মালাবার) মহিলাদের উন্নতিবিধানকল্পে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুমারী ই স্যামুয়েল

পত্রিকাখা'নর সম্পাদিকা ও স্বত্বাধিকারিণী—বি, ভাগীরথী আম্মা। ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের ছোটরাণীর পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য সম্বল করিয়া এই মহিলা কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী আম্মা অল্পদিন পূর্ব্বে মধ্য-ত্রিবাঙ্কুড়ে অনুষ্ঠিত আরিয়াস্থ কনফারেন্সের সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

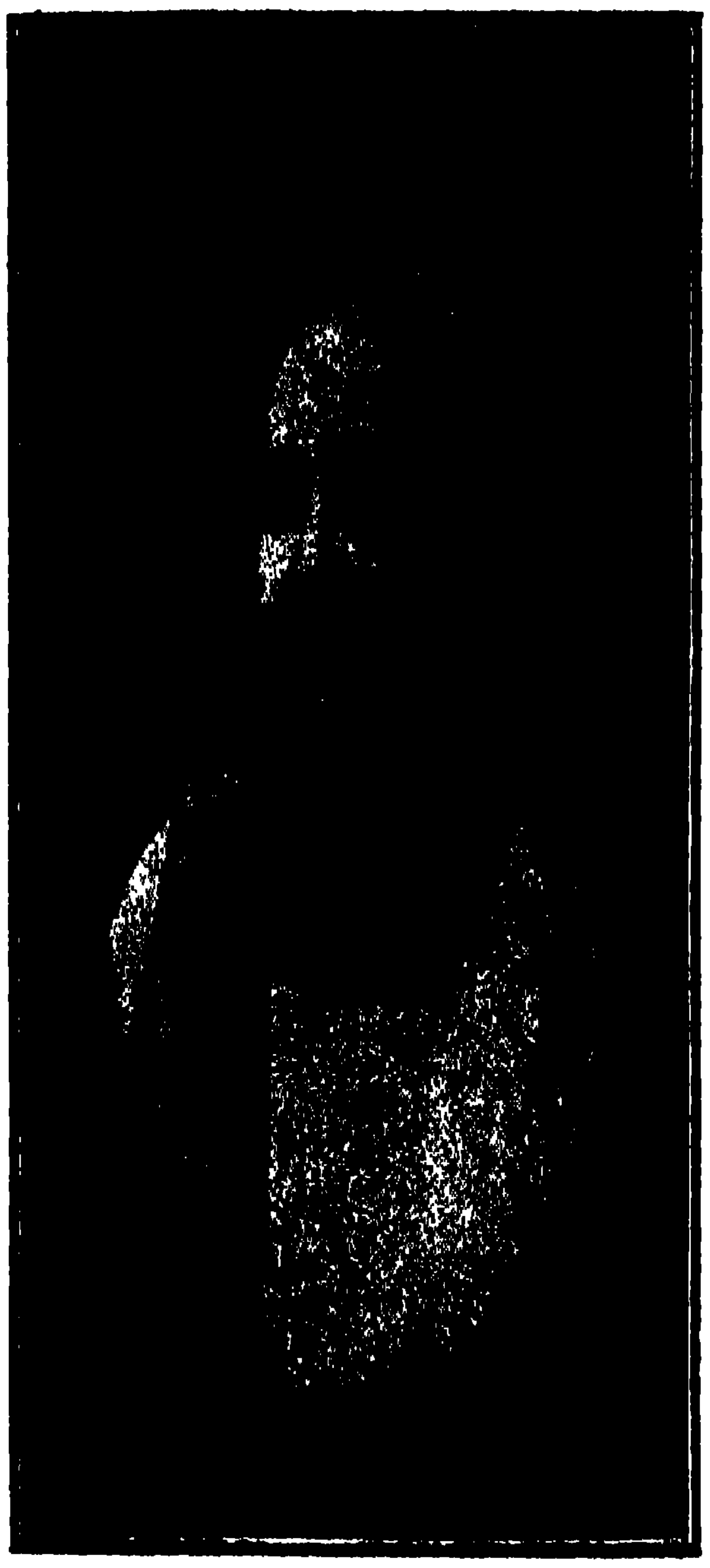

দাদিবা মেহ্‌তা

আমেদনগরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজের পত্নী শ্রীমতী দাদিবা মেহ্‌তা সম্প্রতি স্থানীয় গার্ল-গাইডস্ এসোসিয়েশনের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কুমারী ই, স্যামুয়েল কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্য হইতে উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য বিলাত গমন করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল তিনি অনেকগুলি ডিপ্লোমা লাভ করিয়া ত্রিবেন্দ্রমে ফিরিয়াছেন।

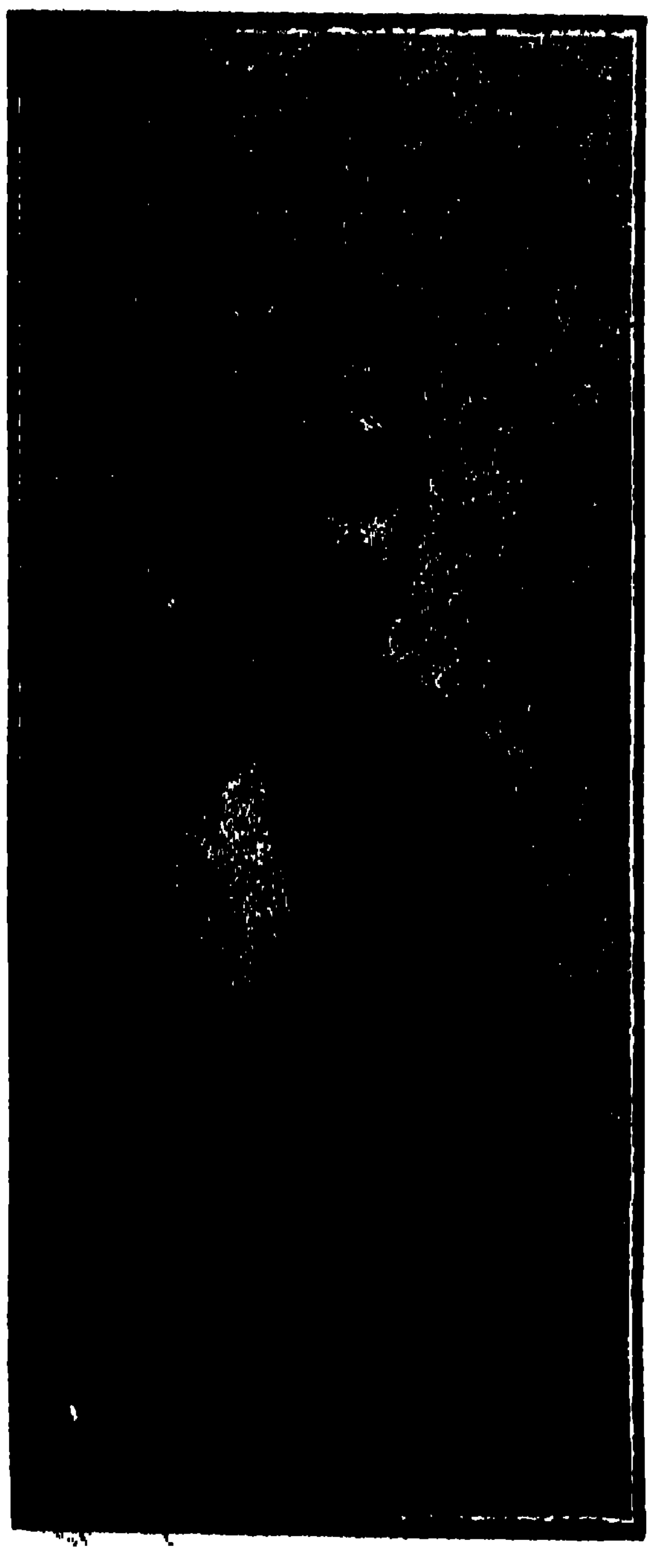

কুমারী এস্ শ্রীনিবাসন

সৌন্দর্য্যতত্ত্বে নন্দলাল বসু

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সেদিন শান্তিনিকেতন-কলাভবনে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের সহিত শিল্প ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-বিষয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

আমার প্রশ্নগুলি আমি একখানি কাগজে ধারাবাহিকভাবে লিখিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে দিয়াছিলাম। উহার একটির সমাধান আর-একটির সমাধানের অপেক্ষা করায় একেবারেই খণ্ডিতভাবে একটির উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। আমার খণ্ডিত প্রশ্নগুলি ও তাঁহার অখণ্ড উত্তরটি তাই আমি পৃথক পৃথকরূপেই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম :—

১। সৌন্দর্য্য কি?

২। সৌন্দর্য্য-বিচারের কোনো সার্ব্বজনীন্ আদর্শ আছে কি না?

৩। এই এই ভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সংস্থান হইলে গতির ভঙ্গিটি এরূপ আকারে হইলে, তাহা সুন্দর হইবে।—সুন্দর—কেন সুন্দর হইবে?—ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া ইহার আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় কি?

৪। যাহা সৎ (চিরন্তন), যাহা মঙ্গলকর, যাহা চিত্তচমৎকারী ও যুগপৎ বিশুদ্ধ আনন্দবিধায়ক, তাহাই সুন্দর কি না?

৫। সৌন্দর্য্য-বিচারে অনুভূতি-বৈষম্য সৃষ্টি হয় কেন? এক কবি বর্ষাকে আনন্দের রূপে, আর একজন তাহাকেই দুঃখের রূপে দেখিতে পান কেন?

৬। সৌন্দর্য্য কি রস অথবা রূপ?

৭। অনুভূতিই যদি সৌন্দর্য্যের মূল হয়, তবে জীবমাত্রেরই সে অনুভূতি (সুপ্ত থাকুক বা জাগ্রতাবস্থায়ই থাকুক) মূলে থাকে কি?

৮। সেই অনুভূতি বস্তুটি কি অনুশীলনলভ্য?

৯। অনুশীলনলভ্য হইলে চেষ্টা করিয়া কেন কবি বা শিল্পী হওয়া যায় না?

১০। সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির সাধারণ কৌশলটি কি?

সৌন্দর্য্য কি, প্রথমে এই কথাটির ব্যাখ্যান দিতে গিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—এ তত্ত্ব নিয়ে মনীষী-মণ্ডলে বহু আলোচনা চলেছে, তা থেকে মত-বৈষম্যেরও সৃষ্টি হয়েছে কম নয়। এই মত-সংঘাত থেকে সৌন্দর্য্যকে নানাদিক দিয়ে নানারকমে দেখ্‌বার অনেক আলো যে আমরা পেয়েছি, এইটেই একটা মস্ত-বড় লাভ বলতে হবে। মহামতি টলষ্টয় তাঁর *What is Art* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এরূপ বহু সমালোচকের আদর্শ সংগ্রহ করে, তার উপরে তাঁর নিজেরও একটি বিশেষ মত স্থাপন করেছেন। এ পর্য্যন্ত আমি যতদূর এ সম্বন্ধে অনুধাবনা করবার সুযোগ পেয়েছি, তার অভিজ্ঞতা থেকেই আজকের আলোচ্য বিষয়ের সমাধানে সচেষ্ট হব।

এক কথায় সৌন্দর্য্য কি তা বলা বড় শক্ত, তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, সৌন্দর্য্য হচ্ছে পূর্ণতারই প্রকাশ। বস্তু, মন ও অভিব্যক্তি (expression) এই তিনটি জিনিষ নিয়ে তবে পূর্ণতার উদ্ভব হয়। কবি তাঁর কাব্যে যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করেন, বিশ্লেষণ করে দেখলে, আমরা গোড়ায় গিয়ে দেখতে পাব, সেখানে রয়েছে মূলতঃ দুটি জিনিষ—একটি বস্তু, আর একটি তাঁর মন; তা ছাড়া 'মনের মাধুরী' বলে আরও একটি জিনিষ আছে সেখানে—দৃষ্টির অগোচরে। এই মনের মাধুরীই হচ্ছে—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় mode of expression। শিল্পী যিনি, তিনি এই আপন মনের মাধুরী মিশায়েই তাঁর সোনার স্বপন সাধের সাধনার ধন মানসীকে রচনা করেন। বস্তু ত অনেকই দেখি, মনও হয়ত সে

সেখানে কখন কখন সাড়া দেয়, কিন্তু এক এই mood জিনিষটির অভাবে সকলে আমরা কবি বা শিল্পীর পদ লাভ করতে পারিনে। মনের এই মাধুরী-লাভ সাধনা-সাপেক্ষ। মানবমাত্রেরই সৃষ্টির প্রথম থেকে হৃদয়-বীণাটি নয় রকম অনুভূতির নয়টি তারে সমান করে বাঁধা থাকে এবং একথাও সত্যি যে, প্রতি বস্তুরই অন্তরে এক একটি বিশিষ্ট সত্তা বা ধর্ম্ম আছে—জগতে যা নিয়ে তার অস্তিত্ব। মানুষের সেই প্রাণের তারে বস্তুর যে গুণ (বা ধর্ম্মটি) যখনি যতখানি জোরে আঘাত করে, তখনি তার চেতনা তত বেশী জাগ্রত ও আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এই আবেশের অবস্থায় দুটি ভাবের উদ্ভব হয়—একটি রস আর একটি ভাবাবেগ বা emotion।

রস ও ভাবাবেগ দু'টিকে সাধারণতঃ আমরা একই জিনিষ বলে গণ্য করে থাকি। কিন্তু এ'করে এখানে একটা মস্ত ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। রস ও ভাবাবেগ দুটিই একেবারে স্বতন্ত্র বস্তু। একটা উদাহরণ দিলে আশা করি, সে স্বাতন্ত্র্যটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একটি অসামান্য সুন্দরী ষোড়শীকে সাধারণভাবে দেখলে সাধারণ মানুষ মনে একটা নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করে। সেটা নিছক ভাবাবেগ বা মোহ—কামজ ভোগেই তার পরিণতি। কিন্তু শিল্পীর চোখে যদি দেখতে যাই, তরুণীর যৌবন-বিকশিত তনুর তনিমা, রূপ-সায়রে সে যেন একটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পূর্ণ শতদলের মতই আমার মানসপটে প্রতিভাত হবে এবং তখন তার রূপের স্বর্ণ-মায়াটি আমার চিত্তে নিরাবিল আনন্দ-রসের উদ্রেক করে আমাকে সুন্দরের মহিমার ধ্যানে গভীরভাবে সমাহিত করে দেবে। শিল্পীও ভোগ করে, কিন্তু ধারাটি আলাদা। সে বস্তুর বাহ্যিক রূপেই বিহ্বল হয়ে মোহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে না—আগে রূপের পথেই ভিতরে প্রবেশ করে, তারপর সেখানে তার সত্তাগত গুণ বা স্বরূপটিকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করে নিয়ে পুনরায় তার শিল্পকলার সাহায্যে বাহ্যিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ রসের একত্র সমাবেশে পূর্ণতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। এখানে কাম নয়, বস্তুতঃ এখানেই হচ্ছে প্রেমের লীলা। প্রেমিক যে সে এমনি করেই আপন মনের মাধুরী দিয়ে মানসীকে আত্মগত করে নেয়।

সংযত ঘন ভাবাবেগই রসের স্রষ্টা, সুতরাং রস ও ভাবাবেগকে আমরা ঠিক একই পরিমাপে ফেলতে পারিনে। রস চিরন্তন—সে কিছু সৃজন করে, ভাবাবেগ বিহ্বলতায় ক্ষণিকের অবসরে বিলীন হয়ে যায়। রস বস্তুর প্রাণ, রূপ তার দেহ, যে পটের মধ্যে প্রাণ এবং দেহের পূর্ণযোগ ঘটে, সেইখানেই সৌন্দর্য্য আপনার রহস্য-অবগুণ্ঠন অনাবৃত করে প্রকাশ পায়।

তবেই দেখতে পাচ্ছি,—সৌন্দর্য্য নিছক রসও নয় আবার রূপও নয়—অথচ এ দু'য়েরই যৌগিক পরিণতিতেই তার পত্তন। আপনি যাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি বলেছেন—আমি আগেই বলে এসেছি, তা হচ্ছে রসেরই নামান্তর। একমাত্র অনুভূতির উপরেই যদি সৌন্দর্য্যের ভিত্তি হত, তবে চিনি না খেয়েও কেবলমাত্র শুনে শুনেই তার মিষ্টত্বের রসাস্বাদন নেওয়া যেত—যেটা একেবারেই অসম্ভব। আবার যদি একান্ত রূপের দ্বারাই সৌন্দর্য্য-রচনা সম্ভবপর হত, তবে সামান্য এই একটা কাষ্ঠ-পেটিকা আমার চোখে এত সুন্দর, এমন মূল্যবান, এরূপ পবিত্র হয়ে উঠত না। দেখতেই পাচ্ছেন—এর না আছে গঠন-শ্রী, না আছে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য—তাতে কাঠটা আবার আকাঠা। বাইরের দিক দিয়ে এ একটা নেহাৎ সাদাসিধে চৌকো আকাঠার বাক্স ভিন্ন আর কিছুই তো নয়! তবে, আমি কেন এ'কে এত অভিনব দেখছি?—তার একটা কারণ আছে। সত্যিই সাধারণ হলে পরে এর কোনই মূল্য থাকত না—আমার কাছেও না, পরের কাছে তো নয়ই। কিন্তু, এরও একটি বিশেষত্ব আছে—বাক্সটি আমার একজন নিকট-আত্মীয়ের প্রীতি-উপঢৌকন। আমি যখন বাক্সটিকে দেখ্‌ছি, তখন শুধু ও'র বহিরাবরণটাই একান্ত করে দেখছি না—এর বহিরাবরণের মধ্য দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি—সেই আত্মীয়টির প্রীতিপূর্ণ হৃদয়েরই অনুপম মাধুরী,—কত বিচিত্র হয়েই না তা উহাতে বিকশিত হয়েছে। হৃদয়ের তো মূল্য নেই—তাই সে মাধুরী অমূল্য। যদি এই নিদর্শনটি না থাকতো, তবে হয়তই না প্রীতির গভীরতা

থাক আত্মীয়ের সঙ্গে, এখন এমন সৌন্দর্য্য উপভোগের সুযোগ ঘটতো না কোনমতেই। তবেই দেখলুম, রূপের উপর রস এসে যখন রং ফলালো, তখনই তাতে একটি অনুপম মাধুরী সৃজনের সূত্রপাত হল, এখনো একটি কথা বাকি রইল—কথাটি আর কিছু নয়—সেই গোড়াকার expression।

হোক্ না আমার আত্মীয়ের উপহার, তাকে যেমন-তেমন ভাবে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখলে আমি ছাড়া অন্য কোনো লোকের চোখে তো সেটি তার পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হবে না। তারা শুধু দেখে যাবে—একটা আকাঠার অকেজো বাক্সমাত্র।

এখনও সার্ব্বজনীনতার অভাবে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হতে একটু বাকি রয়েছে। সুন্দর যা তা শাশ্বত, আর একটা তার বিশেষ লক্ষণ এই যে, সহজ স্বাভাবিকতার গুণে সে সকলের চিত্তেই কোনো-না-কোনোভাবে কিছু-না-কিছু আনন্দের স্পর্শ দিয়ে যাবেই,—কারোর সেই চিত্তবীণাটির তারগুলি যদি একেবারেই বিকল হয়ে না গিয়ে থাকে তবেই অবশ্য সেক্ষেত্রে এ কথা প্রযুজ্য হবে। নয়তো অনুশীলনের অভাবে অনুভূতি যার সমূলে বিলয়প্রাপ্ত হয়েছে, তার কাছে কোনোদিনই সুন্দরের আবির্ভাব যে ঘটবে না, তা বলাই বাহুল্য।

যদি কারুর দুঃখের অনুভূতি খুব জাগ্রত হয়, তবে সে একই জিনিষকে দুঃখের রূপে সুন্দর দেখবে—আর সে দেখা থেকে আনন্দ লাভ করবে,—যার যেখানে হর্ষের অনুভূতিটি তীব্র, সেখানে সে ঐ একই বিষয়কে দুঃখের না দেখে আনন্দের রূপে দেখবে—আর সে দেখাতেও হৃদয়ে তার আনন্দের উৎসই প্রবাহিত হবে।

এখানে একটা মজা হচ্ছে এই, যিনি সত্যকার অনুভাবক হবেন, সুখের ভিতর দিয়েই দেখুন আর দুঃখের ভিতর দিয়েই দেখুন—চরমে দুইয়েরই লাভ ঐ এক; সে-ঐক্যের মিলনক্ষেত্র হচ্ছে আনন্দ। বিশুদ্ধ আনন্দেই সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা। তবেই দেখুন, বস্তুকে আনন্দের রূপে বা দুঃখের রূপে—যেভাবেই দেখুক না কেন, তা বলে পরিণতির বেলায় লাভের দিকে বস্তুর সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার থেকে সৌন্দর্য্য কেউ কম উপভোগ করছেন না এবং সে উপভোগের দাক্ষিণ্য বা ফলশ্রুতিস্বরূপ আনন্দও কারো ভাগে অলভ্য থাকছে না। সৌন্দর্য্য-বিচারে মতবৈষম্যের মূল রহস্যটি এইখানেই।

সুন্দর যা—তা চির সত্য, বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক এবং কল্যাণকরও বটে। জগতে সত্য নিয়ে মারামারি নয়—যত মারামারি তার তত্ত্ব-নির্ণয়ে। যার যে অনুভূতিটি প্রখর সে বস্তুকে তাতেই নিষিক্ত করে হৃদয়ে বরণ করে নেয়। তবে শিল্পী যদি তার উপলব্ধ সৌন্দর্য্যের আলেখ্যটিকে অনুরূপ আধারে যথার্থভাবে সাজিয়ে ধরতে পারে, তবে ঠিক তদনুভূতিশীল ব্যক্তিমাত্রেই তার মর্ম্মানুধাবন না করে যায় না। কথাটির আর-একটু স্ফুটতর সহজ ব্যঞ্জনা প্রয়োজন। এখানেই সে আগের অসমাপ্ত কথাটিতে ফিরে আসা যাক। আমার আত্মীয়ের উপহৃত সেই বাক্সটিকে যদি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সযত্নে বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় এমন একটি ঝকঝকে তকতকে কাঁচের আলমারীতে সাজিয়ে রাখি, যার মধ্যে কেবল আমার জীবন-স্মৃতির অতি সাধের জিনিষগুলিই শুধু রক্ষিত হয়ে আসছে, তা হলে যে-কেউ দেখবামাত্র, সেই সাধারণ জিনিষটিকেই একটি মূল্যবান সুন্দর জিনিষ বলে মনে করবে না কি? কিন্তু সেটিকেই আবার ঘরের এককোণে আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলে রাখলে, কারো সেদিকে দৃষ্টিও যাবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে, সৌন্দর্য্য তার পূর্ণতায় উপনীত হবার পথে প্রকাশ-পদ্ধতিরও কিছু অপেক্ষা রাখে। আগের ঐ অনুরূপ আধার ও যথার্থ ভাবের ইঙ্গিতে আমি যে বিষয়টি নির্দ্দেশ করতে চেয়েছি, তা এই প্রকাশ-পদ্ধতি বা mode of expression বই আর কিছু নয়।

এই modeটিই হচ্ছে শিল্পীর শিল্পপ্রতিভা। এই জিনিষটিই সৌন্দর্য্যকে সার্ব্বজনীন করে তুলবার পরম সহায়ক। বস্তুর মধ্যে কেমন করে কোথায় আমি সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেলুম, তার পরিচয়টি ফুটে উঠবে আমার শিল্পকলায়। সময়ে রূপ যেমন অনুভূতিকে আলোড়িত করে, দু'য়ে মিলে একটা সৌন্দর্য্য গড়ে তুলে, তেমনি অনুভূতিও রূপের উপর রং ফলিয়ে সমগ্র

সুন্দরের আবির্ভাব ঘটায়। কিন্তু সে আবির্ভাবকে আমরা পূর্ণ বলতে পারিনে—কারণ, তখনো তা বিশিষ্টজনের নিভৃত মনের উপভোগ্য হয়ে থাকে বলে। কিন্তু একবার যদি সে উপলব্ধ সৌন্দর্য্যকে 'মনের মাধুরী' দিয়ে বাইরে রূপের দর্শন-স্পর্শন ও আস্বাদনের উপযোগী করে তুলতে পারি, তখনই বলব—'এবার যথার্থই সৌন্দর্য্য সৃজিত হয়েছে।'

নিজে আমি বিশ্বাস করি, অনুশীলনের দ্বারা সৌন্দর্য্য ভোগ ও তাকে অপরের ভোগ্য করে তুলবার কৌশলটি আয়ত্ত করা যায়। একজন্মেই আয়ত্ত হবে—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, ক্রম-অভিব্যক্তি বিশ্বব্যাপারে একটা প্রাকৃতিক বিধানেরই জয়-জয়কার ঘোষণা করে গেছে। ক্রম-অভিব্যক্তিবাদ যদি স্বীকার করি, অবশ্য আজ তা অস্বীকার করবারও উপায় নাই একরকম,—তবে অনুশীলন দ্বারা যে শক্তিবৃদ্ধি করে একদিন আমরা সৌন্দর্য্যভোগে সৌভাগ্যবান হব না, তাই বা বলি কি করে? আমরা যে সৌভাগ্যবান হবই, তার কয়েকটা সম্ভাবনাও আমি হাতে-হাতে দেখতে পেয়েছি। অবনীন্দ্রনাথ যেদিন ভারত-শিল্পের চর্চ্চা আরম্ভ করেছিলেন, সেদিন তিনি কাউকে তাঁর পথে সহযাত্রী পাননি। যে ধারায় এদেশে তখন শিল্পচর্চ্চা চলছিল, তার থেকে নূতন কোনো পদ্ধতিতে যে সৌন্দর্য্য রচনা করা যেতে পারে, এ ধারণাই একটা পাগলামির লক্ষণ বলে গণ্য হত। তিনি কিন্তু ভগীরথের মত তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার বলে ভারতশিল্পের ভাগীরথী-ধারাটিকে নানা বাধাবিঘ্নের হাত এড়িয়ে এদেশের বুকে প্রবাহিত করে দিলেন। তাঁর সিদ্ধি ঘটেছে চল্লিশ বছরে। তারপর আমরা যখন তাঁর কাছে গেলুম, আমরা সে শিল্পটিকে বিশ বছরেই একরকম করে আয়ত্ত করতে সমর্থ হলুম। তখন আমাদের কাছে যারা আসতে লাগল তাদের লাগল দশ বছর—পাঁচ বছর; শেষে আজ এমনও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখবার সৌভাগ্য হচ্ছে যে ঘর থেকে একেবারে তৈরী ছেলে এসে হাজির! ভারতের আকাশে-বাতাসে আজ অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রকলা আপন প্রভাব বিস্তার করে দিয়েছে। তাই তাঁর অধস্তন বংশধরগণ জন্ম হতেই আশ্চর্য্যরূপ উন্নত সৌন্দর্য্যবৃত্তিলাভের অধিকারী হচ্ছে।

সে অনেকদিন আগের কথা, আমাদের কলাভবনে একবার একজন শিক্ষার্থী এসেছিলেন—তাঁর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। অদম্য তাঁর অধ্যবসায়—বিপুল তাঁর প্রচেষ্টা। ভারতশিল্প তিনি শিখবেনই। আমরা তাঁকে একটু পরিহাসচ্ছলে বলতাম—"দেখ, তুমি আর কদিনই বা বাঁচবে, শিখবেই বা কত? বৃথা তোমার এই পরিশ্রম।" তাতে তিনি উত্তর দিতেন বড় চমৎকার, বলতেন—"যে ক'দিনই বাঁচি না মশায়, তবু তো কিছুটা এগিয়ে থাক্‌ব। আসছে জন্মে খাটুনিটা তবু কিছু লাঘব হবে। আর কিছু হোক-না-হোক, এই শিল্পের ধাতটা তো অন্ততঃ পাব।" আমারও ধারণা তাই। যথাযথ অনুশীলন করলে, শক্তির বিকাশ হবেই।

সৌন্দর্য্য ধ্যানের বস্তু, বইয়ের পাতায় এর অতি অল্প পরিমাণই খোঁজ মিলে। যে বইতে শুধু পাণ্ডিত্য ফলানো—যাতে জীবনগত অনুভূতির মাত্রা কম, সে-সব বই তো এতে কোনো কাজই দেবে না। নিবিষ্ট মনে ধ্যান করে করে বস্তুর অন্তর-সত্তার সন্ধান পেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কত রাত জেগে জেগে যে এক-একটি গাছের, একটি রাত্রির, একটি তারার সঙ্গে আত্মপরিচয় করেছেন, তা তাঁর জীবনস্মৃতি পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায়। তেমনিতর সাধনা না হলে সুন্দরকে ধরা সহজ নয়! ক্রমাগত অনুধ্যান ও যাঁরা সত্যি সত্যি ব্যক্তিগত জীবনে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি লাভ করেছেন, তাঁদের সান্নিধ্যে বসে আলাপ-আলোচনা করা বা তাঁদেরই লেখা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন, আমি এইমাত্র কৌশল জানি সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(১)

রাত্রি নয়টার বেশী বাজে নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামের পথঘাট ইহারই মধ্যে নির্জ্জন নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। বেশীর ভাগ গৃহস্থের ঘরেই সদর দরজা বন্ধ, ছেলেপিলে খাইয়া ঘুমাইতেছে, বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাহাদের অনুসরণ করিতে ব্যস্ত। মধ্যে মধ্যে কোথাও একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছে, নয় গাছের পাতার মধ্যে পাখা ঝাপ্‌টাইয়া কোনো একটা পাখী চারিদিকের নীরবতার সাগরে একটা মৃদু হিল্লোল তুলিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছে।

বাঁড়ুজ্জেদের সদর দরজাটা ক্যাঁচ করিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া খুলিয়া গেল। একটি ভদ্রলোক বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "যাক্, মায়ের কাজ উপযুক্ত ছেলের মতই করেছ। মনে দুঃখ রেখোনা বাবা, জগতের গতিকই এই। মা বাপ কি আর কারো চিরকাল থাকে?"

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলা হইতেছিল, সে দীর্ঘাকৃতি শ্যামবর্ণ যুবক, পা খালি, গায়ে একটা র‍্যাপার জড়ানো। মুখ তাহার শুষ্ক, চুল এলোমেলো, সর্ব্বদেহে ক্লান্তি এবং অবসাদের ছাপ বড় স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রৌঢ়ের কথার উত্তরে সে বলিল, "সে কথা ত ঠিকই ঘোষাল-কাকা। তবে মা চিরকালটা কষ্ট পেয়ে গেলেন, যেই একটু গুছিয়ে বসবার সময় এল, তখনি আমরা তাঁকে হারালাম। এই একটা বড় দুঃখ থেকে গেল।"

অভ্যাগত ভদ্রলোক বলিলেন, "সে কি বাবা? কষ্ট আর তাঁর কি ছিল? হিন্দুঘরের বিধবা, কৃচ্ছ্রসাধন ত তাঁদের ধর্ম্মই। শ্বশুরস্বামীর ভিটেতেই, সব ক'টি ছেলে মেয়ে বড় করে, তাদের বিয়ে দিয়ে, ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, এর চেয়ে আর সুসময়ে কি যেতে পারতেন? মেয়েটার বৈধব্য দেখে গেলেন, এই যা দুঃখ।"

যুবক নিরঞ্জন আর কথা বলিয়া কথা বাড়াইল না। সমস্ত দেহমন তাহার তখন বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দিন একলা সে চারটা মানুষের খাটুনি খাটিয়াছে। আজ তাহার মাতৃশ্রাদ্ধের দিন। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া যে-মা কয়েকটা মাত্র দিন আগে তাহাদের চিরকালের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন, আজ বিপুল সমারোহ ও কলরবের ভিতর দিয়া তাঁহার পুত্রকন্যারা তাঁহাকে এ-সংসার হইতে চিরবিদায় দিল। আর তাঁহার জন্য ইহাদের কিছু করিবার রহিল না।

ভদ্রলোক বাহির হইয়া যাইতেই, নিরঞ্জন সদর দরজা বন্ধ করিয়া লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া গিয়া নিজের শয়নকক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল। একটুখানি ঠেলা দিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ নাই, ভেজান রহিয়াছে। দরজা খুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

ঘরখানি বেশ বড়। আসবাবের মধ্যে দুখানা তক্তপোষ, ছোটবড় কতকগুলি কাঠের এবং টীনের বাক্স, একটি কাপড়ের আলনা এবং কোণে মস্তবড় একটি পিতলের পিলসুজের উপর প্রদীপ। তক্তপোষ দুটির উপরেই পরিষ্কার ধবধবে বিছানা পাতা। একটি বিছানা খালি, অন্যটিতে চার পাঁচ বছরের একটি বালিকা শুইয়া, এ পাশ ও পাশ করিতেছে, তাহার পাশে একটি যুবতী বসিয়া, বালিকার বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া, পা টিপিয়া দিয়া, চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিয়া, তাহাকে ঘুম পাড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া এখনও ঘুমল না? রাত ত ঢের হয়েছে।"

মেয়ের মা মেয়ের পিঠে সরোষে এক চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ঘুমবে বৈকি! তেমনি হাড়জ্বালানে মেয়ে কিনা? এক ঘণ্টা হয়ে গেল বসে চাপ্‌ড়াচ্ছি, তা একবার কি চোখের দুটো পাতা এক করল?"

এত সেবাযত্নেও যাহার ঘুম আসিতেছিল না, চড়ে এবং

বকুনিতে তাহার ঘুম যে আসিল না তাহা বলাই বাহুল্য। মেয়ে হুর সপ্তমে তুলিয়া ভঁ্যা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "চুপ, চুপ, চ্যাচায় না। কাল দেখো এখন তোমার জন্যে কি রকম সুন্দর মোটর গাড়ী নিয়ে আসি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোও ত। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।"

মায়া বাপের কাঁধে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। তাহার মা বলিল, "হাঁ, তেমনি লক্ষ্মী মেয়েই তোমার বটে। ছুটো মিষ্টি কথায় ঘুমিয়ে যাবে। ঢের ঢের দুষ্টু দুরন্ত ছেলে পিলে দেখেছি, কিন্তু এমনটি বাপের জন্মে দেখিনি।"

নিরঞ্জন অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "হয়েছে ত নগদ একটা মেয়ে, এত ছেলে মেয়ে তুমি কোথায় দেখ্‌লে?"

পত্নী সাবিত্রী বলিল, "ওমা, নিজের পেটেই না হয় একটা হয়েছে, তাই বলে' ছেলেপিলে আমি চোখে দেখিনি নাকি? আমরাই ত কম করে ছয় ভাই, চার বোন। আমার বড়দির এখনই পাঁচটি হয়েছে, মেজদির তিনটি।"

এমন সময় বাহির হইতে কোমলকণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, "মেজদা ঘরেই নাকি? আমি দুধ নিয়ে তোমায় সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

নিরঞ্জন দরজাটা খুলিয়া বলিল, "দে, দে, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। আজ আর কিছু খাব না, এখন একটু ঘুমতে চাই। এটাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে আন্‌তে পারিস? চেঁচিয়ে ত বাড়ী মাথায় করছে।"

নিরঞ্জনের বিধবা ভগিনী ইন্দু তাড়াতাড়ি মায়াকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া বলিল, "আবার সুর 'রেছ, ঠাকরুণ? আচ্ছা দাদা, তুমি ঘুমোও, যা খাটুনি গেছে সারাদিন! আমি এটাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার কাছেই রেখে দেব এখন। নইলে রাত্রে উঠে আবার চ্যাচালে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে।"

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি মায়ার কাঁথা বালিশ প্রভৃতি উঠাইয়া ননদের হাতে দিয়া দিল। সমস্ত দিন তাহারও খাটুনি কম যায় নাই, এখন রাত্রে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার সম্ভাবনায় সে আরামই বোধ করিল। মায়া পিসীর কাছে শোয়াটাই নানাকারণে পছন্দ করিত। মা অপেক্ষা পিসীর যে মেজাজ ভাল, সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, হাজার জালাতন করিলেও চড় চাপড় তাহার কাছে লাভ করিতে হইত না। রাত্রে বেশী আবদার করিলে এমন কি খৈ-এর মোয়া বা আমসত্ত্বের টুকরাও পাওয়া যাইত। কাজেই শোওয়ার নূতন ব্যবস্থাটা সর্ব্ববাদীসম্মতই হইল। ইন্দু মায়ার যাহা যাহা দরকার সব গুছাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সাবিত্রী দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। বলিল, "আমরা আর মা-মাসীর ক্ষমতা পেলাম না। মাকে দেখেছি বুড়ো বয়সে এক হাতে পাঁচশো লোকের রান্না করেছেন, পরিবেশন করে খাইয়েছেন। আর আমরা অল্পতেই মূর্চ্ছো যাই। আমাদের মেয়েগুলো বোধ হয় সব কাজের বার হবে। তুমি আবার যা সাহেবী-আনার ভক্ত, মায়া ত হাতাবেড়ী ধরতেই শিখ্‌বে না।"

নিরঞ্জন তখন শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণ পরে যদি বা ঘুমাইবার অবসর মিলিল ত ঘুম আর আসে না। স্ত্রীর কথায় একটুখানি বিরক্তভাবেই সে বলিল, "আমি যতই সাহেব হই, তুমি ত বিন্দুমাত্রও মেম নও? কাজেই মায়ার আর কোনো শিক্ষা হোক বা নাই হোক, হাঁড়িঠেলার শিক্ষাটা বেশ ভাল ভাবেই হবে।"

সাবিত্রীও তর্ক করিতে কোমর বাঁধিয়া বসিল। বলিল, "তা আমার কাছে মানুষ হলে, আমি যেমন ভাল বুঝি, তাই ত শেখাব? মা বাপের ঘরে যেমন শিক্ষা পেয়েছি, তেমনই হয়েছি। তোমার যখন পছন্দই অন্য রকম, তখন সেইরকম দেখে বিয়ে করা উচিত ছিল। এখন কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দিয়ে কি হবে? যাদের মনুষ্যত্ব বলে জিনিষ আছে, তারা অমনি কথায় কথায় আচার-ব্যবহার সব বদলে ফেল্‌তে পারে না।"

স্ত্রীর বক্তৃতায় বাধা দিয়া নিরঞ্জন বলিল, "দোহাই তোমার, এখন রাত দশটায় দোস্তাল কন্‌ফারেন্স আরম্ভ কোরো না। ঘুমটা আমার একান্তই দরকার। মায়া বই পড়বে, কি বেড়ী ধরবে, তার আলোচনা করবার

সময় এখনও ঢের আছে। একটু দয়া করে উঠে, যদি প্রদীপটা নিবিয়ে দাও, ত ভাল হয়। চোখে আলো লাগ্‌ছে বলে আরোই ঘুম আস্‌ছে না।"

তর্কটা এমন মাঝপথে থামিয়া যাওয়াতে সাবিত্রীর মেজাজটা আরো গরম হইয়া গেল। কিন্তু পরিশ্রান্ত স্বামীকে আর বেশী বিরক্ত করিতে তাহার ভরসা হইল না। উঠিয়া গিয়া প্রদীপটা নিভাইয়া আসিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। ঘুম তাহার চোখে আসিল না। নিদ্রাহীন চোখে ছাদের দিকে তাকাইয়া সে মনে মনে নিজের স্বপক্ষে এবং স্বামীর বিপক্ষে খুব চোখাচোখা যুক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল। স্বামী সে-সব শুনিবার জন্য জাগিয়া নাই, এটা তাহার কাছে বড়ই অসহ্য লাগিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে ত আর এখন জাগাইয়া ঝগড়া করা যায় না? কাজেই সাবিত্রী একাই বাদী ও প্রতিবাদীর কাজ করিয়া চলিল।

আচ্ছা, তাহার অন্যায়টা কোন খানে? নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের কন্যা সে। মা, ঠাকুরমা, খুড়ী-জেঠীর কাছে সে যাহা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা খাঁটি আর্য্য শিক্ষা। লেখাপড়া একেবারে জানে না তাহা নয়, বাংলা ত ভালই জানে, সংস্কৃতও পিতার কাছে কিছু কিছু শিখিয়াছিল। ইংরেজি ফরাসী জানেনা বটে। তা হিন্দুঘরের কটা মেয়েই বা সে সব জানে? সেলাই করিতে পারে, রান্নাবান্না ঘরকরণার কাজে সে এতখানি পটু যে, শাশুড়ী পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। আর নিজের মুখে বলিতে নাই, চেহারাটাও তাহার কুশ্রী নয়, রীতিমত সুন্দরীই তাহাকে বলা চলে। অন্ততঃ এঁদের বাড়ীর আর কোনো বউ বা মেয়ে তার কাছে দাঁড়াইতেও পারে না। তবুও স্বামীর তাহাকে বিন্দুমাত্র পছন্দ নয়। তা নয়, ত নয়, সে কি করিবে? তিনি এখন পিতৃপুরুষের আচার বিচার সব ছাড়িয়া পুরা সাহেব বনিতে চান, সাবিত্রীর প্রাণ থাকিতে তাহার দ্বারা ও সব হইবে না। ইহকালে না হয় দুঃখই পাইবে, কিন্তু স্বামীর মতে চলিতে গিয়া পরকাল খোয়াইতে পারিবে না। মেয়ের উপর অবশ্য তাহার হাত নাই, স্বামী যদি তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া মেমসাহেবী শিক্ষা দেন, দিতে পারেন। তাহার নিজের যেন কখনও অধর্ম্মে মতি না হয়। দেবতার কৃপায়, সে যেন হিন্দুর মেয়ে হইয়াই মরিতে পারে।

নিরঞ্জন ঘুমের ঘোরে একবার পাশ ফিরিয়া শুইল। খোলা জানলার পথে অল্প একটু চাঁদের আলো ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সাবিত্রীর মনের তাপটা কখন যেন জুড়াইয়া গেল। তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। তাহার কপালই খারাপ, তাহা না হইলে এমন স্বামী কয়জনের হয়? তবু তাহার অদৃষ্টে সুখ হইল না। স্বামীকে কি সে ভালবাসে না? তাহা ত নয়। স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে সে আজীবন শিক্ষা পাইয়াছে, সব সময় ভক্তি অচলা রাখিতে পারে নাই, কলহ-বিবাদ করিয়াছে, তাই কি তাহার অদৃষ্টে এত দুঃখ? কিন্তু স্বামী তাহার কাছে যাহা চান, কোথা হইতে সে তাহা দিবে? ধর্ম্ম বড়, না স্বামী বড়? হায়, কে তাহাকে পথ বলিয়া দিবে? ধর্ম্ম বলিয়া সে যাহা জানিয়াছে, তাহা রাখিতে গেলে স্বামীর অপ্রিয় তাহাকে হইতেই হইবে। আর যদি স্বামীকে আঁকড়াইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ আচার গ্রহণ করিতে হইবে? কোন্ পথে সে যাইবে?

স্বামীর প্রতি অভিমান আবার তাহার মনে উঁকি মারিতে লাগিল। মতামত লইয়া এত বাড়াবাড়ি করার কি-ই বা দরকার ছিল? পুরুষের কাছে বিধবার মত আচার নিষ্ঠা কেহই প্রত্যাশা করে না, কিন্তু মেয়েরাও যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করে তাহা হইলে সংসার ছারখার হইয়া যায় নাকি? নিরঞ্জনের সবই অনাসৃষ্টি। সে নিজে কোনো কিছুই মানে না, আহার বিহার কিছুর মধ্যেই তাহার কোনো বিচার নাই। ভাল, তাহার জন্য সাবিত্রী তাহাকে কিছু ত এখন বলে না। গোড়ায় অল্প বয়সের মূর্খতায় কঠিন কথা বলিয়া থাকিবে, তাহা এতদিন মনে করিয়া রাখা উচিত নয়। কিন্তু নিরঞ্জন তাহাকেও নিষ্কৃতি দিতে চায় না। সাবিত্রীকেও নিজের দলে টানিবার চেষ্টার তাহার বিরাম নাই। মেয়েটাকে

যত্ত পায়ে তুশিকা দিবার দিকেই তাহার ঝোঁক। সে এখনি মুসলমানের তৈয়ারী পাউরুটী-বিস্কুট খাইয়া, সাবিত্রীর গায়ে মাখামাখি করিয়া দেয়। জুতা পায়ে দিয়া ছুটিয়া গিয়া ঠাকুর ঘরে ঢোকে। যাকে তাকে ছুঁইয়া আসে। এ মেয়ে বড় হইয়া কি যে হইবে তাহার কিছু ঠিকানা নাই।

নিরঞ্জন মায়ের অসুখে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল, আবার কয়েক দিন পরে চলিয়া যাইবে। মায়ার জন্মের পর হইতেই সে একরকম বাহিরে বাহিরেই ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে যখন বাড়ী আসে, তখন সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ম জেদ করে, সাবিত্রী একটা-না-একটা ওজর দিয়া কাটাইয়া দেয়। এবারে কাটানোটা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত, কারণ এখন আর শাশুড়ী বাঁচিয়া নাই।

সাবিত্রী মনে মনে স্বর্গগত পিতার উদ্দেশ্যে, গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। মনটা খানিকটা যেন শান্ত হইল। কখন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(২)

নিরঞ্জনের পিতা জয়কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এককালে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। দেবত্র ও ব্রহ্মত্র সম্পত্তির কল্যাণে তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহের পূজাই তাঁহার দেহমনের সকল ক্ষুধাকে মিটাইয়া চলিত। মন্দিরের অদূরেই তাঁহার বাড়ী ছিল। পৈত্রিক যে খড়ের ঘর তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন নিজে তাহার উপর একটি মাঝারি গোছের পাকা বাড়ী যোগ করিয়া, পরিবার-পরিজনের আরামের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। পরিবারটিও তাঁহার ছোটখাট ছিল না। তাঁহারা তিন ভাইয়েই একান্নে বাস করিতেন। তাঁহার নিজের চারটি পুত্র ও ছুইটি কন্সা ছিল।

কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বড় ছেলে তখন মাত্র বারো বছরের বালক, মেজটি দশ বৎসরের। অন্য পুত্র-কন্যাগুলি তখন নিতান্তই ছোট। তাঁহাকে সাহায্য করিবার বা উপদেশ দিবার একটি মানুষ ছিল না। দেওয়ারা স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথক হইবার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। ফলে যে সম্পত্তিতে এতদিন সকলের স্বচ্ছন্দে চলিতেছিল, তাহাই ভাগ হইয়া কাহারও কাজে না লাগিবার জোগাড় হইল। নিরঞ্জনের মা ন্যায্য পাওনা যাহা তাহা পাইলেন না। অল্পস্বল্প যাহা ছিল, তাহা লইয়াই অতিকষ্টে ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীখানা তাঁহারই থাকিয়া গেল। গ্রামের সকলেই জয়কালী বন্দোপাধ্যায়কে অতি শ্রদ্ধা করিত, কাজেই আত্মীয়স্বজন শত্রুতে পরিণত হইলেও পরের সাহায্যেই বিধবা ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

বড়ছেলে মনোরঞ্জন গ্রামের স্কুল হইতে পাশ করিয়া স্কলারশিপ্ পাইয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল। সহরে কত বিপদ, কত পাপের জাল, নবীন পথিকের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে মনে করিয়া বিধবা কেবলি চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা দিতে আসিয়া তাঁহার আশঙ্কা আরোই বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। অবস্থা যদি আগের মত থাকিত, তাহা হইলে কখনই তিনি ছেলেকে কলিকাতায় পাঠাইতেন না। কিন্তু এখন ত তাহাদের চাকরী করিয়া খাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে? লক্ষ্মীনারায়ণ যে তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন।

মনোরঞ্জন আই-এ পাশ করিল বেশ ভাল করিয়াই, কিন্তু স্কলারশিপ পাইল না। তাহার চাল-চলনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া গ্রামের লোক হাসাহাসি করিতে লাগিল। তাহার মায়ের অশ্রুজল আরো বেশী করিয়া ঝরিতে লাগিল। এ কি সেই ছেলে যে যাইবার দিন কাঁদিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল? এ যেন তাহার মূর্ত্তি ধরিয়া অচেনা কোনো মানুষ তাঁহাদের ঘরে আসিয়া পুত্রের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। ভাইবোনের সঙ্গে সে কথাই বলে না, তাহারা চোখের সামনে আসিয়া পড়িলে এমন অবজ্ঞাভরে তাকায় যেন তাহারা অন্য কোনো নিকৃষ্ট গ্রহবাসী জীব, মনোরঞ্জনের কাছে আসিবার চেষ্টা করা তাহাদের ধৃষ্টতা মাত্র। মা কথা বলিলে, অনেক কষ্টে একটা উত্তর দেয়, নিজ হইতে কাছে আসিয়া একটা কথাও বলে না। খাওয়া-দাওয়া কিছুই তাহার পছন্দ

হয় না। মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না, ভাতের থালা এক রকম স্পর্শ না করিয়াই উঠিয়া পড়ে। সকালে চা না খাইয়া তাহার মাথা ধরে। বোন ইন্দুকে দিয়া গরম জল আনাইয়া সে নিজে চা বানাইয়া পান করে। মা সব ক'টি ছেলেমেয়ে লইয়া শুইতেন, মনোরঞ্জনও আগের মত তাঁহার কাছে শুইবে মনে করিয়া আর তাহার শয়নের আলাদা ব্যবস্থা করা হয় নাই। মনোরঞ্জন কাণ্ড দেখিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল, এবং যতক্ষণ না অন্য ঘরে তাহাকে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল, ততক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়াই কাটাইয়া দিল।

বিধবা তারাসুন্দরী সকলের কাছে কাঁদিয়া পরামর্শ চাহিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের সামনে অবশ্য সকলেই সমবেদনা জানাইল, বিবিধ রকমের পরামর্শ দিতেও ত্রুটি করিল না, তবে তিনি পিছন ফিরিতেই বিদ্রূপের হাসিও অনেকের মুখেই ফুটিয়া উঠিল। এসব বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার চেষ্টা করা কেন? চিরজন্ম পুরুষানুক্রমে যাহারা টিকি রাখিয়া, খড়ম পরিয়া ঠাকুর পূজা করিয়া দিন কাটাইল, তাহাদের বংশের ছেলের সাধ হইল বি-এ, এম্-এ পাশ করিবার। মায়ের যেমন আক্কেল! ছেলের ত এখন পছন্দই বদ্লাইয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের মাকে, ভাইবোনকে দেখিলে তাহার ঘৃণাই হয়। এখন পরামর্শ চাহিতে আসিলে কি হইবে? কলিকাতায় পাঠাইবার সময় ত ঠাকুরাণী কাহারও পরামর্শ চাহেন নাই?

জায়েরাই অবশেষে সৎপরামর্শ দিলেন। "বড়-সড় দেখে একটি বিয়ে দিয়ে দাও। কেমন তখন ঘরে মন না বসে দেখা যাবে। যখনকার যা তা না হলে ঘরে মন টিকবে কেন?"

তারাসুন্দরীর কাছে এ উপায়টা খুবই ভাল মনে হইল। হিন্দু-সমাজে ছেলের বিবাহ দেওয়াটা সব চেয়ে সহজ কাজ, কাজেই মনোরঞ্জনের বিবাহ হইতে বিশেষ দেরি হইল না। পাত্রীর পিতা কর্ম্মোপলক্ষ্যে কলিকাতায়ই বাস করেন, অবস্থা মোটের উপর ভালই। মেয়েটি বড় বটে, বছর তের চৌদ্দর হইবে; দেখিতে সুন্দরী না হইলেও নিতান্ত মন্দ নয়। মনোরঞ্জন আপত্তি করিবার কোনো কারণ দেখিল না। মেয়েটি লেখাপড়াও কিছু কিছু করিয়াছে, সহরে আদবকায়দায় অভ্যস্ত। শ্বশুরের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বিবাহ করিলে, মনোরঞ্জনের অনেক দিক দিয়াই সুবিধার সম্ভাবনা।

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু তারাসুন্দরীর অদৃষ্টই খারাপ। বিবাহের ফলে ছেলের মন বসিল বটে, তবে তাঁহার ঘরে নয়, বধূর পিতার ঘরে। মনোরঞ্জন ছুটিতে বাড়ী আসা ছাড়িয়া দিল। মাতার ইচ্ছা ছিল বধূকে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার ভয়ে কন্যার পিতামাতা রাজি হইলেন না। মনোরঞ্জন পড়াশুনা একরকম ভালই করিতে লাগিল। মেসে থাকিলে শরীর ভাল থাকে না, কাজেই শ্বশুর তাহাকে নিজের বাড়ীতেই আনিয়া রাখিলেন।

তারাসুন্দরী ছেলের অকল্যাণের ভয়ে চোখের জল ফেলিলেন না বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা তাঁহার ব্যথায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। এতকষ্টে মানুষ করা ছেলে, একেবারে এমনই পর হইয়া গেল? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরপর আর সহরের মেয়ে আনিবেন না। তাঁহারা যেমন, তেমনি পরিবার দেখিয়াই ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবেন। বড়মেয়ে ইন্দুর বিবাহও তিনি দেখিয়া শুনিয়া এমন ঘরে দিলেন, যেখানে আচার-ব্যবহার লইয়া তাঁহাকে কোনোদিন কষ্টে পড়িতে হইবে না।

নিরঞ্জনের যখন আঠার বৎসর বয়স তখন হইতে তাহার জন্য কনে খোঁজা আরম্ভ হইল। এত অল্পবয়সে মানুষ না হইয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার একেবারেই ছিল না। এর ওর সাহায্যে সেকথা মাকে জানাইতেও সে ত্রুটি করিল না। কিন্তু তারাসুন্দরী কাঁদিয়াই তাহার সকল আপত্তি ভাসাইয়া দিলেন। এক ছেলে ত তাঁহাকে ত্যাগই করিয়া গেল, নিরঞ্জনও কি তাঁহাকে আবার যন্ত্রণা দিতে চায়? মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। তখন রোগে পড়িলে তারাসুন্দরী কি এক ফোঁটা জলও পাইবেন না? বড়ছেলে যেমন বউ আনিয়াছে, সে কোনোদিন শ্বশুরবাড়ীতে পা স্পর্শ করিবে না। নিরঞ্জনেরও কি সেইরকমই ইচ্ছা?

নিরঞ্জন হাল ছাড়িয়া দিল। আচ্ছা মেয়ে না হয় মা

পছন্দ করুন, কিন্তু এত শীঘ্র বিবাহ দিবার দরকার কি? তাহার পড়াশুনা শেষ হউক, সে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক, তাহার পর বিবাহ দিলেই চলিবে? মা বলিলেন, বিবাহ কি আর তিনি কালই দিতেছেন? পছন্দমত মেয়ে পাইতে ঢের খোঁজ করিতে হয়। নিরঞ্জন পড়াশুনা করিতে থাকুক, মেয়ে ঠিক হইতে হইতে তাহার পাশ করা হইয়া যাইবে।

কিন্তু তারাস্থন্দরীর এবারে কপাল বড়ই ভাল ছিল। পাশের গ্রামেই চমৎকার মেয়ে পাওয়া গেল। বংশানুক্রমে তাহারা নিষ্ঠাবান পুরোহিতের ঘর, কোনোদিন সনাতন আচারের পথ হইতে এক চুল বিচ্যুতি তাহাদের ঘটে নাই। অথচ শিক্ষাদীক্ষাহীন মূর্খও নয়। পাণ্ডিত্যের জন্ত বংশের পুরুষরা দেশবিখ্যাত। মেয়েটি অতি স্থশ্রী দেখিতে, বাপের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছে। ঘরের কাজে অদ্বিতীয়া। তারাস্থন্দরী যাহারই কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই শতমুখে মেয়েটির প্রশংসা করিল।

নিরঞ্জন আর একবার আপত্তি জানাইল। এত শীঘ্র বিবাহ নাই বা হইল? কথা হইয়া থাক্, বছর কয়েক পরে বিবাহ হইবে। তারাস্থন্দরীর ভরসা হইল না। এমন স্থন্দরী মেয়ে, আর কেহ দেখে টপ্ করিয়া লইয়া যাইবে? মেয়ের বাড়ীর লোকেও রাজি হইবে কিনা সন্দেহ। তাহাদের বংশে ধেড়ে বুড়ো মেয়ে করিয়া রাখার প্রথা নাই। তাহার পর নিরঞ্জনেরই যে মত পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অগত্যা নিরঞ্জনকে বিবাহ করিতেই হইল। নিজের মতামত এমন করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া তাহার মনের ভিতরটা ভার হইয়া রহিল। যে-সকল সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে সে এতদিন এত বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছে, বন্ধুবান্ধবকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছে, আজ নিজেই কিনা তাহাদের কাছে মাথা হেঁট করিল? ইহার পর তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। মায়ের প্রতি অভিমানেও তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সন্তানকে সৎপথে চালানো যাঁহার ব্রত হওয়া উচিত ছিল, সেই মাই কিনা অবশেষে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিলেন?

[illegible] দিল, "আরে রাখ তোমার ঢং। বউয়ের চাঁদমুখ দেখে মত, প্রিন্সিপ্‌ল্ কনভিক্‌শন্ সব ভুলে যাবে। তখন আমাদের মত বুঝবে,—অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়।"

বধূ সাবিত্রীর চাঁদমুখ সত্য সত্যই ছিল বটে। কিন্তু তাহাতেও নিরঞ্জন বিশেষ কিছু সান্ত্বনা পাইল না। তাহার মন যেমন ভার হইয়া ছিল তেমনিই ভার হইয়া রহিল। বধূর সহিত ভাল করিয়া আলাপ-পরিচয় করিবারও কোনো স্থযোগ হইল না। যে সামান্ত কয়টা দিন বিবাহের পর বধূ তাহাদের গৃহে ছিল, লোকের ভীড়ের মধ্যে সে যেন হারাইয়াই গেল। রাত্রি এগারোটা বারোটায় তাহাদের সাক্ষাৎ হইত। নিদ্রাকাতর বালিকার সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে তাহার মায়াই হইত। সাবিত্রীও বিছানায় বসিতে-না-বসিতে ঘুমে ঢুলিয়া পড়িত এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে ঘুমাইয়াই পড়িত। স্থতরাং সপ্তাহখানেক পরে সাবিত্রী যখন বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন স্বামী স্ত্রী যেমন অপরিচিত ছিল, প্রায় তাহাই রহিয়া গেল। বালিকার মনে জাগিয়া রহিল একটু অভিমান। সে এমনি কি ফেল্‌না যে বর তাহার সঙ্গে আলাপ করিবারও একটু চেষ্টা করিল না? তাহার সঙ্গিনীদের কাছে গিয়া সে বলিবে কি? তাহারা সব কত রকমের গল্প এক একজন করিয়াছে! তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়া লইবে যে, সাবিত্রীকে তাহার বরের একেবারেই পছন্দ হয় নাই। স্বামীকে জানিবার চিনিবার আগেই সাবিত্রীর মন তাহার প্রতি একটু যেন বিমুখ হইয়া গেল। নিরঞ্জনের মনে সাবিত্রীর কোনো ছাপই পড়িল না। মায়ের প্রতি বুকভরা অভিমান লইয়া সে কলিকাতায় আবার পড়িতে চলিয়া গেল। যে মেসে আগে থাকিত, সেখানে গিয়া উঠিতে লজ্জা অনুভব করিল। অন্ত একটা মেসে গিয়া উঠিল, কিন্তু মেস ছাড়িলেই ত নিষ্কৃতি নাই। কলেজে সকলে তাহাকে ছাকিয়া ধরিল। কেহ ঠাট্টা করিল, কেহ সহানুভূতি জানাইল, শ্লেষাত্মক অভিনন্দনে তাহার দুই কান বোঝাই এবং পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

একেই স্বকৃত অপরাধের বোঝায় তাহার মন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর এই-সব উৎপাত জোটাতে

তাহার প্রাণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। বাড়ীতে কিছু না জানাইয়াই সে কলেজ ছাড়িয়া দিল এবং অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ভাইয়ের শ্বশুরের সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে গিয়া ঢুকিল। বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিল।

সাবিত্রী এক বছর পরে শ্বশুরবাড়ী আসিল। সে-সময় কলেজের ছুটি, তারাসুন্দরী অনেক কান্নাকাটি করিয়া নিরঞ্জনকে বাড়ী আনাইলেন। তাঁহার এমন রাজকন্যার মত সুন্দরী বউ, ছেলে তাহাকে কখনই অবহেলা করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস তাঁহার খুবই ছিল।

সাবিত্রী কিন্তু স্বামীকে বশ করিতে ঠিক পারিল না। তাহাদের শুভদৃষ্টিটা অতি অশুভক্ষণেই হইয়া থাকিবে বোধ হয়। যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই ভালবাসা। পত্নীর সুন্দর মুখ যে নিরঞ্জনকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিল না তাহা বলা যায় না। বিবাহ যখন হইয়াই গিয়াছে তখন আর চিরকাল এই লইয়া ঝগড়া করিয়া লাভ কি? এখন এই স্ত্রীকেই যদি সে নিজের মনের মতন করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবন তাহাদের সুখেরই হইবে।

কিন্তু একটু চেষ্টা করিতেই বুঝিতে পারিল যে, বউয়ের চেহারাখানি যতই কোমল হউক না কেন, মতামতগুলি বেশ শক্ত। প্রথম কয়েকদিন ত প্রণয়-চর্চ্চাতেই কাটিয়া গেল, নিরঞ্জনের মনের অনেক দিনের সঞ্চিত বেদনা, অভিমান, বেশ খানিকটাই মুছিয়া গেল। যে-ব্যথার মূলে সাবিত্রী, তাহার উপশমও সেই করিবে, ক্রমেই নিরঞ্জনের মনে এই আশা প্রবল হইতে লাগিল। তারাসুন্দরীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ছেলে বউ পাড়াগাঁয়ের রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দিনের বেলাও গল্প করিতে বসিলে তিনি চোখ বুজিয়া দেখিয়াও দেখিতেন না। কোনোরকমে ছেলের মনকে বাঁধিতে পারিলেই তিনি বাঁচেন। পাড়াপ্রতিবেশী একথা লইয়া আলোচনা করিলে তিনি ধমক দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন।

দিন পনেরো কাটিয়া যাইবার পর নিরঞ্জনের ভালবাসা-বেগের প্রথম উচ্ছ্বাসটা একটু যেন কমিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল পত্নীর উপর শুধুমাত্র আদর বর্ষণ করিলেই তাহার স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। সে বালিকামাত্র, তাহার সকল শিক্ষাই এখনও বাকি রহিয়াছে। এখন হইতে আরম্ভ না করিলে, কোনো কাজই হইবে না।

দুপুরবেলা আহারান্তে ছোট বোন বিভাকে দিয়া সে সাবিত্রীকে ডাকিতে পাঠাইল। সাবিত্রী তখন শাশুড়ীর ঘরে বসিয়া তাঁহার জন্য পান ছেঁচিয়া রাখিতেছিল। তারাসুন্দরী একটি মাদুর পাতিয়া শুইয়া এক প্রতিবেশিনী প্রৌঢ়ার সহিত গল্প করিতেছিলেন।

বিভা ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "মেজ বৌদি, মেজদা ডাকছে।"

সাবিত্রীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, ঘাড়টা একেবারে নুইয়া পড়িল। যেমন দাদা, তেমনি বোন! দুটিরই বুদ্ধি সমান!

প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব হয়েছে স্বাধীন, মা খুড়ী মানে না। আমাদের কালে রাত বারোটার আগে ঘরমুখো হবার জো ছিল না।"

তারাসুন্দরীও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। ছোট মেয়েকে একটা চড় দিতে পারিলে হইত ভাল, কিন্তু সে তাহা হইলে আরো কি যে বলিবে তাহার ঠিকানা নাই। বধূর লজ্জাকে একটু চাপা দেবার চেষ্টায় বলিলেন, "যাও মা, দেখে এস কি চায়; পানটান পায়নি হয়ত।" প্রতিবেশিনীকে বলিলেন, "ছেলের বয়সই হয়েছে, আক্কেল হয়নি। সারাদিন পড়া আর পড়ান তার এক বাতিক। বোন, ভাই বউ, কেউ বাদ যাচ্ছে না। পারলে আমাকেও পড়াতে বসে।"

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়াই অস্বাভাবিক ঝাঁজের সহিত বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তোমার আক্কেল কি রকম বল দেখি?"

স্ত্রীর মুখে এ হেন স্বর শুনিতে নিরঞ্জন অভ্যস্ত ছিল না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? আমার আক্কেল সম্বন্ধে সংশয় হল তোমার কিসে?"

সাবিত্রী বলিল, "মায়ের ঘরে রয়েছি, সেখান থেকে

কি বলে আমায় ডাকতে পাঠালে। ওবাড়ীর খুড়ীশুদ্ধ সেখানে বসে। ছি, ছি, লজ্জায় আর আমি বাঁচি না।"

নিরঞ্জন বিরক্ত হইয়া গেল। এইটুকু মেয়ের মুখে এ ধরণের কথা কেন? সে বলিল, "আমি ত শুণতে জানি না, কাজেই মায়ের ঘরে আছ সেটা বুঝতে পারিনি। আর বুঝলেই বা কি? ডেকে পাঠানোটা এমন কিছু অপরাধ নয়, ওতে ছি ছি করবার কিছু নেই। এসব পাকামী আমার ভাল লাগে না।"

স্বামীর ভর্ৎসনার স্বরে সাবিত্রী একটু দমিয়া গেল। জিনিষটায় অপরাধ যে কোনখানে তাহা সে নিজেও ঠিক জানে না, বড়দের যেমন বলিতে শুনিয়াছে, নিজেও তেমনি বলিয়া বসিল। কিন্তু স্বভাবটা তাহার জেদী, তর্ক করাতেও উৎসাহ খুব। সে বলিল, "আহা ঐ রকম বুঝি করে? হিন্দুর ঘরে ওরকম কেউ করে না, ওতে নিন্দে হয়।"

নিরঞ্জন বলিল, "হিন্দুর ঘরে নিন্দে হলেই যে কাজটা খারাপ তা প্রমাণ হয় না। এরপর নিন্দে করবার মত অনেক কাজই হয়ত তোমাকে করতে হবে।"

সাবিত্রী নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "মাগো, কি ঘেন্না। আমি কখনও তা করব না।"

নিরঞ্জন তাহাকে ডাকিয়াছিল পড়া সুরু করিবার জন্য। কিন্তু কলহের সূত্রপাত দেখিয়া তাহার মনটা নিরুৎসাহ হইয়া গেল। একটু রাগও হইল। এক ফোঁটা ত মেয়ে, কথা বলে যেন প্রপিতামহীর মত। একটু ঠাট্টার স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অত পাকা-পাকা কথা এরি মধ্যে শিখ্‌লে কি করে? এতে নিন্দে হয় না?"

সাবিত্রী রাগে অভিমানে আটখানা হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

আদি নাট্যশাস্ত্র

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

'ভরত-নাট্যশাস্ত্র' নামক গ্রন্থখানি সঙ্গীত ও নাট্য-শাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ। ভরত এই নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা। রামায়ণে আছে, মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণের খানিকটা অভিনয়ের উপযোগী করিয়া তৈরী করেন ও তৌর্য্যত্রিকসূত্রকার ভরতের হাতে সমর্পণ করেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, ভরত বাল্মীকির সমসাময়িক (১)। কিন্তু ভরত ঠিক কোন্ সময়ের লোক তাহা জানা যায় না। আর জানিয়াও বিশেষ ফল নাই। কেন-না আধুনিক সময়েও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এত লোকের হাত পড়িয়াছে যে, কোন্‌টি নকল আর কোন্‌টি আসল চেনা যায়। এখনকার মুদ্রিত ভরত-নাট্যশাস্ত্রে পরবর্ত্তীকালের লেখকদের রচনাও একটু-আধটু প্রবেশ করিয়াছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। রাঘব ভট্ট শাকুন্তলের টীকা লিখিয়াছেন। এই টীকায় তিনি আচার্য্য (২) মাতৃগুপ্তের নাট্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ (৩) ও "নাট্যালোচন" হইতে কতক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেইগুলি আজকালকার মুদ্রিত ভরত-নাট্যশাস্ত্রে

(১) রামদাস সেন-রচিত 'সঙ্গীত-রহস্য', ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১১৭।

(২) 'নাট্যপ্রদীপে' মাতৃগুপ্তকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। নাট্যপ্রদীপের উক্তি এই:—'তত্র ভরতঃ...অস্য ব্যাখ্যানে মাতৃগুপ্তাচার্য্যৈরুক্তম্——"[Sylvain Levi: *Theatre Indien*, p. 15] রাঘব ভট্টও তাহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) মাতৃগুপ্তের কোন বই পাওয়া যায় না। তবে উল্লিখিত বচন হইতে বোঝা যায়, তিনি শ্লোকে নাট্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; আর তাঁহার গ্রন্থ ভরতেরই ব্যাখ্যাপুস্তক। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের সমসাময়িক।

স্থানলাভ করিয়াছে। তারপর এই নাট্যশাস্ত্রের কতকগুলি রকম-ফের আছে বলিয়া মনে হয়। 'কাব্যমালা' গ্রন্থমালার অন্তর্গত নাট্যশাস্ত্রের সংস্করণে এই রকম একটি রকম-ফেরের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইখানি "নন্দি-ভরত" অর্থাৎ নন্দি মতের ভরত।

নাট্যশাস্ত্র (৩৪ অধ্যায়) বলে—

"ধূর্যবদেকো যস্মাদ্‌ভ্যারোহনেকভূমিকাযুক্তঃ।

ভাণ্ডগ্রহোপকরণৈর্নাট্যং ভরতো ভবেত্তস্মাৎ॥" ২৩

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্লোকোল্লিখিত গুণ-বিশিষ্ট নাট্য "ভরত" নামে আখ্যাত। আবার দেখা যায়, ক্রমশঃ 'ভরত' শব্দ সাধারণ নাট্যশাস্ত্রেরই নামান্তর হইয়া পড়িল। 'মতঙ্গভরতম্' ইহার দৃষ্টান্ত। 'মতঙ্গভরতম্' বলিলে লক্ষ্মণভাস্করের গ্রন্থকে বুঝায়। এইটি একখানি ভরত। তবে এইগুলি পরবর্তী ভরত। অর্জ্জুন-রচিত নাট্যশাস্ত্রের নাম—"অর্জ্জুনভরতম্"। শার্ঙ্গদেব ও রাঘবভট্ট আদি ভরতের নাম করিয়াছেন। পরে অন্য ভরত না থাকিলে 'আদি ভরত' নামের সার্থকতাও থাকে না। আদি ভরতের একখানি পুঁথি Mysore Oriental Libraryতে আছে। ভবভূতি ভরতকে "তৌর্য্যত্রিকসূত্রকার" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। (৪) তৌর্য্যত্রিক বলিলে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনটি বোঝায়। সুতরাং বলিতে হয় ভবভূতির মতে ভরত এই তিনের সূত্র করিয়াছিলেন। কালিদাস (৫) ভরত নামক মুনির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে—ইঁহারা ভরতের গ্রন্থ জানিতেন। সংস্কৃত নাটকের অভিনেতাদের একটি সাধারণ নাম 'ভরতপুত্র' বা 'ভরতশিষ্য'। ইহাতে শেষের দিকে যে আশীর্ব্বাদ-বাক্য থাকে তাহার সাধারণ নাম—'ভরতবাক্য।'

অভিনবগুপ্ত ভরত-নাট্যশাস্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন—নাম 'নাট্যবেদবিবৃতি'। এই টীকার নাম হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভরত-নাট্যশাস্ত্রের একটি নাম—'নাট্যবেদ'। 'সঙ্গীতরত্নাকরে'ও (২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ) এই নামের উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গধর নর্ত্তনাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ।"

ভরত স্বয়ং নাট্যশাস্ত্রে (১ম অধ্যায়) উপদেশ করিয়াছেন—

"সঙ্কল্প্য ভগবানেবং সর্ববেদাননুস্মরন্।

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্॥ ১৬

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্বণাদপি॥ ১৭

ভগবান্ ভরতমুনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত বেদ অনুস্মরণ করিলেন; তারপর নাট্যবেদ রচনা করেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য অর্থাৎ বাক্যাবলী, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়, আর অথর্ব্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিলেন।

শার্ঙ্গধর এই কথাই একটি শ্লোকে বলিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

ঋগ্‌যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্বণঃ ক্রমাৎ।

পাঠ্যং চাভিনয়ান্ গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মভূঃ॥

নাট্যশাস্ত্রকে 'নাট্যবেদ' নাম দেওয়ায় এই শাস্ত্রের বৈদিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; বেদ হইতেই যখন ইহার উপকরণ সংগৃহীত তখন ইহাকে 'বেদ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কল্লিনাথ সঙ্গীতরত্নাকরের টীকায় (২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ) এই কথাই বলিয়াছেন—

"ঋগাদিমুখ্যবেদমূলত্বেন চ চতুর্মুখেন দত্তস্য বেদত্বে সিদ্ধে তদর্থভূত নাট্যপ্রতিপাদক ভরতমুনিপ্রণীতস্য চতুর্বিধপুরুষার্থফলস্য শাস্ত্রস্য বেদমূলত্বেন বৈদিকত্বং বেদিতব্যম্।"

কিন্তু এই নাট্যবেদ উপবেদের মধ্যে পরিগণিত; কেন-না, শাস্ত্র বলে—"সামবেদস্যোপবেদো গান্ধর্ববেদঃ।" আর কল্লিনাথ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"নাট্যবেদ

(৪) উত্তর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে লবের উক্তি——'তৎ চ স্বহস্তলিখিতং মুনির্ভগবান্ ব্যসৃজৎ ভগবতো ভরতস্য মুনেস্তৌর্য্যত্রিকসূত্রকারস্য'। ভগবান্ মুনি (বাল্মীকি) [রামায়ণের নাটিকটা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে] তৈরী করিয়া অভিনয়ের জন্য তৌর্য্যত্রিকসূত্রকার ভরতের হাতে দিলেন।

(৫) উদাহরণ যথা—বিক্রমোর্ব্বশীর তৃতীয় অঙ্কে দুজন ভরতশিষ্য আলাপ করিতেছেন। একজন আর একজনকে বলিতেছেন,—'আমাদের গুরু (ভরতের) অভিনয়-কৌশলে দর্গের লোকেরা খুসী হইয়াছেন তো?'—"অপি গুরোঃ প্রয়োগেণ দিব্যা পরিষদারাধিতা।"

এবং গীতপ্রাধান্তবিবক্ষয়া গান্ধর্ববেদ উচ্যতে। অভিনয়-প্রাধান্যবিবক্ষয়া তু নাট্যবেদ ইত্যুচ্যতে।"

শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকরে' (পৃঃ ৫—৬) ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের নাম আছে। সঙ্গীতরত্নাকর ১২১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লেখা। শার্ঙ্গদেবের উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকাররাই শুধু মাঝে মাঝে এই-সমস্ত গ্রন্থের কিছু কিছু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব যতগুলি নাট্যশাস্ত্রকারের নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 'কোহল'ই ভরতের ঠিক পরবর্ত্তী। ভরত-নাট্যশাস্ত্রের শেষে (৩৭ অধ্যায় ১৮ শ্লোক) লেখা আছে, নাট্যের অবশিষ্ট কথা 'কোহল' বলিবেন।

'আপ্তোপদেশসিদ্ধং হি নাট্যং প্রোক্তং স্বয়ংভুবা।
শেষং প্রস্তারতন্ত্রেণ কোহল (৬) কথয়িষ্যতি।'

ভরত-নাট্যশাস্ত্রের এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভরতের পরবর্ত্তী লেখক কোহল তাঁর নিজের গ্রন্থ লিখিবার পর নাট্যশাস্ত্রের এই সংস্করণ তৈরী হইয়াছিল। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাও অযৌক্তিক নয়। মতঙ্গ শার্ঙ্গদেবের পরবর্ত্তী একজন আধুনিক লেখক। শার্ঙ্গদেব ত্রয়োদশ শতকে যাহা করিয়াছিলেন, মতঙ্গ পরবর্ত্তীকালে তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। এই মতঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রসঙ্গে ভরত, কোহল, কাশ্যপ ও দুর্গাশক্তির নাম করিয়াছেন।

১৮৬১—৬৫ খৃষ্টাব্দে Fitz Edward Hall ধনঞ্জয়-কৃত দশরূপকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। (৭) এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে (১৯৯—২৪১ পৃঃ) তিনি নাট্যশাস্ত্রের ১৮শ, ১৯শ, ২০শ ও ৩৪শ অধ্যায় প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে সাধারণের ধারণা ছিল যে, এই গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হল দুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন। একখানি খণ্ডিত, তাহাতে প্রথম সাতটি অধ্যায় মাত্র ছিল। অপরখানি সম্পূর্ণ ভূর্জপত্রে নাগরী অক্ষরে ছাপা। এইখানির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এ চারিটি অধ্যায় ছাপান। অতঃপর ১৮৭৪ সালে হেমান (W. Heymann) নামে একজন জার্মান পণ্ডিত একখানি জার্মান পত্রে (৮) ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কয়েকখানি পুঁথির উপর জার্মান ভাষায় একটি প্রবন্ধ বাহির করেন। তাঁহার প্রবন্ধের নাম—"Ueber Bharata's Nytyasastram." তারপর নাট্যশাস্ত্রের পুঁথি-সংগ্রহের আয়োজন চলিতে লাগিল। কয়খানি পুঁথিও পাওয়া গেল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রেগো (Paul Regnaud) পারী নগরীতে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ১৭শ অধ্যায় ছাপেন। (৯) তারপর ঐ সালেই আবার ১৫শ অধ্যায়ের শেষাংশ ও ১৬শ অধ্যায় মুদ্রিত করেন। (১০) এগুলি *Annales du Musee Guimet* (I ও II)-তে বাহির হয়। ইহার পর তিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থের (১১) শেষে ১৮৮৪ সালে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় ছাপেন। এক বৎসর পরে ১৮৮৬ সালে পুণা আর্য্যভূষণ প্রেস হইতে 'সঙ্গীত-মীমাংসক' নামে একখানি কাগজে অন্নাসাহেব ঘরপুরে একখানি পুঁথির সাহায্যে

(৬) কাব্যমালা সংস্করণে পাঠ আছে—'কোলাহল কথিষ্যতি।' Paul Regnaud and J. Grosset-এর পুথিতে আমাদের প্রদত্ত পাঠ আছে। কাব্যমালার নাট্যশাস্ত্রের ৪৪৬ পৃঃ ২৪ শ্লোকে 'কোহলোদিভিরেবং তু' নিশ্চয়ই ভুল; শুদ্ধপাঠ হইবে—'কোহলাদিভিরেবং তু'।

(৭) 'দশরূপ' Bibliotheca Indica (New Series) গ্রন্থমালাভুক্ত হইয়া বাহির হয়। ১২, ২৪ ও ৮২ সংখ্যায় এই চারিটি অধ্যায় মুদ্রিত হয়। এই দশরূপে ধনিকের 'অবলোক' নামে টীকাও আছে।

(৮) Nachrichten Vonder Koenigl Gesellschaftder Wissen Schaften und der G. A. Universitaet zu Goettingen (February 25, 1874) পৃঃ ৮৬—১০৭।

(৯) গ্রন্থের নাম—Le dix-Septieme Chapitre du Bharatiyanatya Sastra intitule Vag-abhinaya. Paris, Leroux, 1880. পৃঃ ৮৫—৯৯।

(১০) এই অতি মূল্যবান্ অলঙ্কার গ্রন্থের নাম—Rhetorique Sanskrite. L'Academie des Inscriptions et Belles Lettres কর্ত্তৃক প্রকাশিত। Paris, Leroux, 1884. রেগো বয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত গ্রন্থ অক্ষরে লেখা পুঁথি অবলম্বন করিয়া তাঁহার ফিরবাণি বই সম্পাদন করেন।

(১১) গ্রন্থের নাম—La Metrique de Bharata. Paris, Leroux, 1880. পৃঃ ৬৬—১৬০।

নাট্যশাস্ত্রের ১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৭১টি শ্লোক বাহির করেন। ইনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে পাঠোদ্ধার করেন। আর-একজন ফরাসী সংস্কৃত-নবীশ গ্রোসে (Joanny Grosset) ১৮৮৮ সালে লিয়োঁ (Lyon) নগরে নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায় ফরাসী-তর্জমা ও টিপ্পনী-সমেত প্রকাশ করেন। (১২) এই গ্রন্থ সম্পাদনকালে তিনি রেগোর সাহায্যে হলের পুঁথি ও রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালে 'কাব্যমালা' গ্রন্থমালার ৪২ সংখ্যক পুস্তকরূপে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র প্রকাশিত হয়। শিবদত্ত ও পরব মাত্র দুইখানি পুঁথি হইতে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ইঁহাদের সম্পাদিত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলেও বড়ই অশুদ্ধ। তবে একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে এটি মন্দের ভাল। ১৮৯৮ সালে রেগো ও গ্রোসে নাট্যশাস্ত্রের একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডও (Annales de l' Universite de Lyon) বাহির হইল; কিন্তু তাঁহাদিগের সম্পাদিত গ্রন্থ আর বাহির হইল না। তবে সুখের বিষয়, ডক্টর শ্রীপদকৃষ্ণ বেল্‌ভলকর ১৯১৪ সালে ১৬ এপ্রেল American Oriental Societyর অধিবেশনে প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি Harvard Oriental Seriesভুক্ত করিয়া ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রকাশ করিবেন—তার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমও করিতেছেন। অনেকগুলি পুঁথিও * তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভরত-নাট্যশাস্ত্রের অনেক জায়গাই দুর্ব্বোধ্য। টীকার সাহায্য না লইয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে অভিনবগুপ্ত (১০০০ খৃঃ) এই গ্রন্থের একখানি অতি সুন্দর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। টীকাটি এখনও ছাপা হয় নাই। তাঁহার টীকার নাম—"ভরত-নাট্যবেদবিবৃতি।"

---

(১২) গ্রন্থের নাম—'Contribution a l'etude de Musique hindoue; Lyon, 1888. পৃঃ ৯১। Bibliotheque de la Faculte des Lettres de Lyon'তে খণ্ডরূপে গ্রোসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

* নাট্যশাস্ত্রের পুঁথি—

১। ১৮৭৪ সালে হেমান (Heymann) ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর একটি প্রবন্ধ ('Ueber Bharat's Natya Sastaram'—Nachrichten der K Gesellschaft der Wissenschaften.) লেখেন। এই প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রের পুঁথির একটি তালিকা আছে।

২। Fitz Edward Hallএর দুইখানি পুঁথি এখন T. Grossetএর কাছে।

৩। Annasaheb Gharpureর ব্যবহৃত পুঁথির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪। Dr. Sylvain Leviর নিকট একখানি নকল করা পুঁথি আছে। এখানি তিনি কাটমাণ্ডুতে নেপালী পুঁথি হইতে নকল করিয়াছেন।

৫। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর পুঁথি। মধ্যে খণ্ডিত। নেওয়ারি অক্ষরে লেখা।

৬। Deccan College Libraryতে দুইখানি নকল-করা পুঁথি আছে। তালিকায় নং ৬৮, ৬৯ (১৮৭৩-৭৪)। মহারাজ বিকানীর লাইব্রেরীতে দুইখানি পুঁথি আছে। সেই দুইখানির নকল [Rajendralala Mitra's Bikaner Catalogue—0.1092 A & B.]

৭। Royal Asiatic Society of Great Britain and Irelandএর সংগৃহীত তালপত্রের পুঁথি। গ্রন্থ অক্ষরে লেখা।

৮। Mysore Oriental Libraryর একখানি পুঁথি। এই নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতার নাম—আদিভরত।

৯। স্বর্গীয় Dr. H. A Duruvaর নিকট একখানি গুজরাটের পুঁথি ছিল। এ পুঁথির সন্ধান জানা নাই।

১০। The Govt Oriental MSS. Library at Madras. নয়খানি খণ্ডিত পুঁথি। এ ছাড়া দুইখানি কোহলাচার্য্যের পুঁথি। এই দুইখানিও খণ্ডিত।

১১। The Palace Library of H. H. the Maharaja of Trivandrum তিনখানি পুঁথি। একখানি পুঁথি ২৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত। একখানি অসম্পূর্ণ। একখানি আচার্য্য অভিনবগুপ্তের 'নাট্যবেদবিবৃতি' নামক টীকা সমেত। অভিনবগুপ্ত খৃষ্টীয় দশম শতকে জীবিত ছিলেন।

১২। M M. Haraprasad Sastri—Report for the Search of Sanskrit MSS. (1895-1900) এই বিবরণে (পৃঃ ১০) একখানি পুঁথির কথা আছে। পুঁথিখানিতে ২২ অধ্যায় মাত্র আছে।

(ক) হলের পুঁথিতে আর একটি নাম আছে, সেটি 'ধেকাগৃহ'। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিতে আছে—প্রেক্ষাগৃহ লক্ষণ।

(খ) হলের পুঁথিতে—মণ্ডপবিধান, পূর্ণা বিধান।

(গ) Deccan Collegeএর পুঁথিতে ও কাব্যমালায় পূর্ব্বরঙ্গ বিধান।

(ঘ) Deccan College পুঁথিতে ও কাব্যমালায়—রসাধ্যায়।

(ঙ) কাব্যমালায়—ভাবব্যঞ্জন।

ভরত-নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় আটত্রিশটি ; নিম্নে বিষয়-সূচী দেওয়া হইল :—

১। নাট্যোৎপত্তি ৯৪
২। মণ্ডপবিধান (ক) ৯৩
৩। রঙ্গদেবতা পূজাবিধান (খ) ৯৩
৪। তাণ্ডব লক্ষণ ৩০২
৫। পূর্ব্ব রঙ্গবিধি (গ) ১৬১
৬। রস বিকল্প (ঘ) ৮৩
৭। ভাবব্যঞ্জক (ঘ´) ১.৩
৮। উপাঙ্গ লক্ষণ (ঙ) ১৬১
৯। শরীরাভিনয় (চ) ২৪৭
১০। চারী বিধান [=(R. A. S) ৯] ৯৯
১১। মণ্ডল বিধান (চ´) [=(R. A. S.) .০] ৫৮
১২। গতি প্রচার [=(R. A. S.) ১১] :৯২
:৩। কক্ষাযুক্তি ধর্ম্ম-ব্যঞ্জক (চ´´)[=R.A.S.) :২] ৬৪
১৪। বাচিকাভিনয় (ছ)[=(ঐ) :৩] ১১
১৫। ছন্দোবিধান (ছ´) [=(ঐ) ১৪] ১৬৭
১৬। কাব্যলক্ষণ (জ)[=(ঐ) ১৫] :২৮
১৭। বাগভিনয়ে কাকুস্বরব্যঞ্জক (ঝ) ১৩৩
:৮। দশরূপ লক্ষণ (ঞ) :৮৪
:৯। অঙ্গবিকল্প (ট)[=(R.A.S.) ১৭=(D.Coll.) :৮] :২৮
২০। বৃত্তিবিকল্প (ঠ)[=(ঐ):৮=(ঐ):৯] ৬৫
২১। আহার্য্যাভিনয় [=(ঐ) ১৯] ১৯১
২২। সামান্যাভিনয় [=(ঐ) ২০=(D. Coll.) ২:] ৩১৬
২৩। বেশ্যোপচার (ঠ´)[=(ঐ) ২:=(ঐ) ২২] ৭৬
২৪। স্ত্রীপুরুষোপচার (ড)[=(ঐ)২২=(ঐ)২৩] ১:৯
২৫। বাহ্যোপচার (ঢ)[=(ঐ)২৩=(ঐ)২৪]
২৬। চিত্রাভিনয় [=কাব্যমালা)২৫] :৩১
২৭। সিদ্ধিব্যঞ্জক (ণ)[=(D.Coll.)৩৪] ৯৩
২৮। জাতি লক্ষণ (ত)[=(ঐ)২৭] :৬১
২৯। ততাতোদ্য বিধান (থ) ১:৫
৩০। সুষিরাতোদ্য বিধান (থ´)[=D. Coll.)২৮] ১৩
৩১। তালব্যঞ্জক (থ´´)[=(ঐ)৩০] ৩৩৯
৩২। ধ্রুবা বিধান (দ)[=(ঐ)৩১] ৪৪৩
৩৩। ভাণ্ডবাদ্য (ঐ) (দ´)[=৩২] ২৬০
৩৪। প্রকৃত্যধ্যায় (ধ)[=(কাব্যমালা)২৬] ২২
৩৫। ভূমিকা বিকল্প (ন)[=(ঐ)৩৬] ৩৯
৩৬। নাট্যাবতার [=(D. Coll.)৩৫] ২৬
৩৭। নাটশাপ (প) ৫৯
৩৮। গুহ্য বিকল্প (ফ) ৬৩

(ঙ) Deccan College পুথিতে—উপাঙ্গাভিনয় ; কাব্যমালার উপাঙ্গাভিনয়।

(চ) বিলাতের R. A. S. পুথিতে—হস্তাভিনয় ; Deccan College ও কাব্যমালায়—অঙ্গাভিনয়।

(চ´) কাব্যমালায়—মণ্ডল বন্ধন।

(চ´´) কাব্যমালায়—করযুক্তি ধর্ম্মব্যঞ্জক।

(ছ) কাব্যমালায়—বাচিকাভিনয়ে ছন্দোবিধান।

(ছ´) D. Coll.—ছন্দোবৃত্তিবিধি ; কাব্যমালায়—ছন্দোবৃত্তবিধি।

(জ) R. A. S.—ছন্দোবিচিতি ; কাব্যমালায় ও D. Coll.—অলঙ্কার লক্ষণ।

(ঝ) R. A. S.—বাগভিনয় ; কাব্যমালায়—বাগভিনয়ে কাকুস্বর বিধান।

(ঞ) R. A. S.—ভাবাবিধান।

(ট) R. A. S.—বাগঙ্গাভিনয় ; কাব্যমালায়—সন্ধি নিরূপণ।

(ঠ) D. Coll.—সন্ধি নিরূপণ।

(ঠ´) কাব্যমালায়—বৈশিক নামাধ্যায়।

(ড) D. Coll.—বৈশিক নামাধ্যায় ; কাব্যমালায়—স্ত্রীপুংসোপচারাধ্যায়।

(ঢ) হলের পুথিতে এই অধ্যায় নাই।

(ণ) কাব্যমালায়—প্রকৃতি বিকল্পনাধ্যায় ; D. Coll.—প্রকৃতি বিকল্প—৩৪

(ত) R. A. S.—আতোদ্যবিধি।

(থ) R. A. S.—ততোদ্য ; কাব্যমালায়—ততোদ্যেতি জাতি বিধান।

(থ´) কাব্যমালায়—শুষিরাতোদ্যাধিকার।

(থ´´) কাব্যমালায়—তালবিধান।

(দ) কাব্যমালায়—ধ্রুবাধ্যায়।

(দ´) R. A. S.—বাদ্যাধ্যায়।

(ধ) R. A. S. ও কাব্যমালায়—গুণাধ্যায় প্রকৃত্যাধিচার ; D. Coll.—গুণাধ্যায়।

(ন) R. A. S.—ভূমিকাপাত্র বিকল্প ; কাব্যমালায় ও D. Coll.—পুরুষ[illegible]।

(প) (ফ) হল ও R. A. S.—পুথিতে এই দুই অধ্যায় নাই ; D. Coll. পুথিতে এই দুই অধ্যায় আছে।

মধুমালতী

শ্রীশান্তা দেবী

১

ছোট্ট একখানি একতালা বাড়ী। পাঁচিল দিয়া ঘেরা একটুখানি জমি, পাঁচিলের গায়ে একটা চারা পেয়ারা গাছ, দুটো কলাগাছ আর সরু লম্বা একটা পাতাঝরা পেঁপে গাছ। ছোট একটা বাঁশের মাচায় দুইটা ঝিঙে-লতা উঠিয়াছে।

দুপুর বেলা সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে। পথে প্রায় লোক চলাচল নেই, মাঝে মাঝে দুই একটা ফিরিওয়ালা বাঁক কাঁধে আলু পেঁয়াজ ডাল ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে, কারণ গৃহিণীদের এই সময়ই খরিদ করার অবসর। পাশের মাঠে কয়েকটা ছাগল সুদীর্ঘ নারিকেল গাছের হ্রস্ব ছায়ায় আহারের সন্ধান করিতেছে। তাহাদের পিছনে গোটাচারেক চড়াই পাখী নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। ঝোপের ভিতর কাকের কা কা আর দূরের ধোপাপুকুরে ধোপাদের কাপড়-কাচার ঝপাস্ ঝপাস্ শব্দ দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতার গায়ে কষ্টিপাথরে সোনার আঁচড়ের মত স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছে।

ছাতামাথায় প্রৌঢ় একটি কালো শুক্‌নো মানুষ ময়লা একটা ঝাড়নে কপালের ও গলার ঘাম মুছিতে মুছিতে দরজার কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "মধু, দরজাটা খোল্ মা, বেলা দুটো বেজে গেল, এই রোদে হাঁটাহাঁটি এ বুড়ো বয়সে আর পারি না।"

ছোট মেয়ে মধুমালা মল বাজাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দরজার হুড়কা সজোরে খুলিয়া দিয়া বলিল, "ইস্, বাবা একেবারে যে ঘেমে নেয়ে উঠেছ; আজ আর সাড়ে তিনটের তোমাকে দোকানে যেতে দিচ্ছি নে।" বিষ্ণুচরণ দরজার গোড়া হইতেই হাতের বাঁশের ছাতা, গলার চাদর, গায়ের ছিটের কোট একে একে কন্যার হাতে সঁপিয়া দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। রান্নাঘর হইতেই মালতীমালা একপাত্র জল ও একবাটি পান সাজিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "বাবা, আজ রাত্রে ফেরবার সময় মধুর জন্য একটা মালিশ এন ত! ওর হাতটা কিছুতেই সারছে না।"

মধুমালা দিদিকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, তোমার কি আক্কেল! আমাকে কি কচি খুকী পেয়েছ যে সারাক্ষণ দোলায় শুইয়ে হাত-পায়ের তোয়াজ করবে? বাবা এই তেতে-পুড়ে এলেন এখন তোমার আহ্লাদী বোনের কথা ছেড়ে তাঁর নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থাটা আগে কর তো।"

বিষ্ণু বলিল, "ওরে, এমন দিদি পেয়েছিস তোর বড় ভাগ্যি। নইলে বাপ বুড়ো মরলে তোর গতি কি হত বল্ ত।"

মালতী সস্নেহ দৃষ্টিতে মধুর মুখের দিকে চাহিল। মধুমালা ঠোঁট উল্টাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দিদির গায়ে একবার হেলান দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেল। মালতী পিতার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "সত্যি বাবা, সেদিন পড়ে যাবার পর থেকে হাতটা আর ও উপরদিকে তুলতে পারে না। আমার বড় ভাবনা হচ্ছে, মেয়েছেলে হাতটা খোঁড়া হয়ে গেলে কি হবে শেষে?"

বিষ্ণু হাসিয়া বলিল, "কিছু হবে না রে হবে না, অমন কত লোকে পড়ে আবার সারে। একটু চূণহলুদ দিয়ে দিস্ আর কোনো ডাক্তার-বদ্যির দরকার হবে না।"

মধু একখানা কাঁথা হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা দেখেছ দিদি আজ এখানা শেষ করেছে। কেমন দুটো ময়ূর দিয়েছে মধ্যিখানে। এমন কেউ পারে না, বাবা। দিদির সেলাই দেখে ও-পাড়ার মেয়েগুলো হিংসেয় মরে। আমি কাউকে শেখাতে মানা করে দিয়েছি। ওরা শিখ্‌লেই ত খত্তি খত্তি করে আগে নিজেদের ঢাক বাজাতে যাবে। দিদি হাবার মত ঘরে বসে থাকবে আর নাম কিনবে সব ওরা।"

মালতী বলিল, "এই না বাবার নাওয়া-খাওয়ার ভাবনায় তোর ঘুম হচ্ছিল না। এরি মধ্যে দিদির জয়ঢাক না পিটুলে চল্‌ছিল না? যা পালা।"

বিষ্ণুচরণ এক ঘণ্টার মধ্যে স্নান-আহার সারিয়া আবার ছাতাহাতে তাহার মণিহারী দোকানের তদারক করিতে চলিয়া গেল। মাতৃহীনা দুটি বোন সেই রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত পরস্পরের বন্ধু আশ্রয় ও সঙ্গী হইয়া ছোট বাড়ীখানি আগ্‌লাইয়া রহিল। সাড়ে তিনটার পরই দরজায় আবার হুড়কা পড়িল। বাবা না ফিরিলে সেদিনকার মত আর দরজা খুলিবার হুকুম নাই।

মালতী তরকারী কুটিতে বসিল, মধুমালা পিঁড়িটা আগাইয়া দিল। তরকারী কোটা শেষ হইলে মধুমালা জামবাটিতে জল আনিয়া তরকারী ধুইয়া একটা পিতলের গামলায় তুলিল। মালতী উনুন ধরাইতে গেল; মধুমালা পিছনে ছুটিল কুচাকাঠ, ঘুঁটে, কেরোসিন লইয়া। মালতী একখানা করিয়া তরকারী নামায়, মধুমালা তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়া খোরাগুলি তাকের উপর তুলিয়া রাখে। মালতীর ইচ্ছা ছোট বোনটিকে সকল কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখে, মধুমালার পণ দিদির প্রতিটি কাজের পরিশ্রম একটুখানি লাঘব করিবে। দুটি বোন যেন একই মানুষের ডান হাত বাঁ হাত।

কাজ সারিয়া মালতী বলিল, "মধু, সন্ধ্যে হয়ে এল, চল্ তোর চুলটা বেঁধে দিইগে। এত বড় মেয়ে হলি এখনও নিজের দিকে একটু নজর দিতে শিখ্‌লি না, বোকা কোথাকার। এমন করলে কি আর কারুর মনে ধরবে ভেবেছিস্।"

মধুমালা হাসিয়া দিদিকে একটা চড় দিয়া বলিল, "দিদি, তুই যাহোক পাকাবুড়ী হয়েছিস্ বাপু। কে বল্‌বে যে আমার চেয়ে আড়াই বছরের বড়। কিসে কার মনে ধরে, না ধরে সব তোর জানা আছে, না? আদ্যিকালের [illegible] ঝি। নিজের দিকে তোর বড় নজর তাই আবার আমাকে শেখাতে আসিস্।"

মালতী বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দে। তোকে ফেলে আমি ভাই কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। বাবাকে বল্‌ব এখন তোরই যেন আগে বিয়ে দেন, তোকে ছেড়ে আমি কোথাও নিশ্চিন্দি হতে পারি না।"

মধু দিদির গায়ে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "দূর বেহায়া! বাবাকে ঐসব বল্‌তে পার্‌বি? তুই বাবার মা না মেয়ে ভুলে গেছিস্ বুঝি!"

মালতী বলিল, "না ভাই, তুই যাই বল্‌না কেন, বাবা যখন সম্বন্ধ খুঁজবে তখন আমি বল্‌ব বিয়ে যদি দিতেই হয় এক ঘরে যেন দুজনকে দেয়, তাহলে আমার আর আইঢাই করে মরতে হবে না। তোকে ছেড়ে জন্মে কি কখনও থেকেছি আমি? আজ যদি হঠ্ করে যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দেয় কি করে যাব বল্ দেখি?"

মধু পরম বিজ্ঞের মত মুখ নাড়িয়া বলিল, "শ্বশুর-ঘরই ভাই মেয়েমানুষের জন্মজন্মান্তরের ঘর, সে ঘরে পা দিলেই দেখবি বাপ-মা সব পর হয়ে যাবে।"

মালতী মধুমালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না ভাই, তোদের চেয়ে আমার আপনার আর কেউ হবে না। আমি এই ঘরেই চিরকাল বেশ কাটাতে পারব। নাই বা বিয়ে হল?"

মধুমালা গালে হাত দিয়া বলিল, "মাগো মা, দিদি কি সব খিষ্টানী কথাই শিখেছিস্! আইবুড়ো মেয়ে চিরকাল এই ঘর আঁকড়ে থাক্‌বি কি রকম? বিধাতাপুরুষ যার ঘরে তোর চাল মেপেছেন সেখানে তোকে যেতেই হবে। তখন মধু মর্‌লেও দেখ্‌তে আস্‌বার সময় পাবি না।"

মালতী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "খবরদার ওসব কথা মুখে আন্‌বি না!"

চুলবাঁধা, সন্ধ্যা দেওয়া, তুলসী তলায় জল দেওয়া সকল কাজের মধ্যেই দুই বোনের গল্প চলিতে লাগিল। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কত খুঁটিনাটির বিষয় তাহাদের অফুরন্ত গল্প অবাধে বহিয়া চলিল। দর্পণে যেমন মানুষ নিজের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব দেখে, এই দুইটি মানুষ পরস্পরের অন্তরে নিজেদের তেমনি পরিষ্কার প্রতিবিম্ব দেখিত। একজনের চোখে তাহারা দুইজনেই দেখিত, একজনের কানে দুইজনেই শুনিত বলিলেও ভুল হয় না। ক্রমে দুইজনেই একই প্রাণীর ভাবিতে সুরু করিল।

মালতীর যাহা অপছন্দ তেমন কথা ভাবিতেও মধুমালা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত, ছিঃ দিদি কি মনে করবে? আর মালতীর'ত সমস্ত প্রাণটা জুড়িয়াই ছিল মধুমালা।

দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া দুইবোনে ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে ঘর-সংসারের অভাব-অনটনের আলোচনা করিতেছিল, মধুর একছড়া হার হইলে এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাওয়ার সুবিধা হয়, কিন্তু টাকায় কিছুতেই কুলাইতেছে না। এমন সময় আবার বাহিরে কড়া নড়িয়া উঠিল। আজিকার মত বিষ্ণুচরণের ছুটি। কাল আটটা পর্য্যন্ত তাহার বিশ্রামে কেহ আর বাধা দিবে না। মধুমালা বালিশটা বুকে চাপিয়া উপুড় হইয়া শুইয়াছিল, বলিল, "দিদি, যা না ভাই, দোরটা খুলে দিগে, আমি আর উঠতে পারছি না।"

মালতী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কেমন শুয়ে শুয়ে বড় বোনকে হুকুম হচ্ছে দেখ না। বড় যে শ্বশুর-ঘরের কথা বলিস্, সেখানে গেলে এত নবাবী চল্‌বে কি করে?"

মালতী দরজাটা খুলিয়া দিয়া ছুটিয়া আর একখানা মাদুর আনিয়া দাওয়ায় পাতিল। এই দারুণ গ্রীষ্মে ঘরে ঢোকা যায় না। বাহিরে দক্ষিণের হাওয়ায় একটু জিরাইয়া না লইলে বিষ্ণুর শরীরটা ঠাণ্ডা হইবে না।

মধু শুইয়া দেখিয়া বিষ্ণুচরণ তাহার নিকট সরিয়া আসিয়া মালতীকে শুনাইয়া বলিল, "মা মধু, তোদের মা ত সকল দায় আমার কাঁধে ফেলে সরে গেল, এখন আমি কার সঙ্গে দুটো সলা পরামর্শ করি বল্ ত! মালতী যে এত বড়টা হল, ষোল্ বছর পেরিয়ে গেছে; মা তোদের বেঁচে থাক্‌লে কবে বিয়ে-থা হয়ে যেত; আমি একা পুরুষমানুষ কি যে করব ভেবে পাই না। তালডিঙি থেকে একটা সম্বন্ধ এসেছে, ঘর বর সবই ভাল, কথা একরকম দিয়েছি, কিন্তু বড় দূর, নয় মা? তোর মনে ধরে কি না আমায় বল্ দেখি। নিজের বকিতে কাজটা করে যদি পস্তাতে হয় সেই ভয়ে একেবারে পাকা কথা দিতে পারছি না। তারা আসছে মাসেই চায়।"

মধু মালতীর মুখের দিকে তাকাইল। মালতী পিতার দিকে পিছন ফিরিয়া মিনতি-ভরা চোখের দৃষ্টি মধুমালার দৃষ্টির সহিত মিলাইল; বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার হাতের উপর আসিয়া পড়িল। মধুমালা অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, "অতদূরে? বাবা, দিদি কি তাহলে বাঁচবে?"

বিষ্ণু বলিল, "কিন্তু মা, মেয়েছেলে ত চিরকাল ঘরে রাখা যায় না।" মালতী ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তের এক কথায় পিতা আজ তাহাকে পর করিয়া দিতে বসিয়াছে। চিরকালের মত কোন্ তেপান্তরের দেশে! তাহার চাপাকান্নার শব্দ শুনিয়া বিষ্ণু ও মধুমালা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

খানিক পরে মালতীমালা চোখ মুছিয়া ভাতের থালা আনিয়া পিতার কোলের কাছে রাখিল; আজ আর সে মধুমালার মালিশের কথা জিজ্ঞাসা করিল না, পিতার শ্রান্তির উল্লেখও করিল না। এ সংসারে যেন সে একেবারে নূতন মানুষ। বিষ্ণুচরণও আর কোনো কথা বলিতে পারিল না। মালতীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতেও তাহার ভয় করিতেছিল। সে অপরাধীর মত নতমস্তকে বসিয়া ভাতের গ্রাসগুলি গিলিয়া যাইতেছিল। ভাতটা ফুরাইয়া গেলে মুখ তুলিতে হইবে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত চালাইতেও ইতস্ততঃ করিতেছিল। মধু পিতার আশঙ্কা ও দিদির অভিমানের কথা এক মুহূর্ত্তে বুঝিল। এই তিনজন মানুষের পরস্পরের মন বুঝিতে ভাষার প্রয়োজন হইত না। তাহারা তিনজনে সকল বিষয়ে এক সুরে বাঁধা তিনটি তারের মত একই আঘাতে এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিত।

মধুমালা ব্যাপারটা সহজ করিয়া তুলিবার জন্য বলিল, "বাবা, নিত্য-পিসি তার মেয়ের জন্যে বর খুঁজছিল, তালডিঙিতে খোঁজ নিতে বল না। ও মেয়ে তাদেরও পছন্দ হবে।"

বিষ্ণু যেন এতক্ষণে একটা মুক্তির পথ পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে বলিল, "হ্যাঁরে, তাই বলব। আমাদের কি ওসব তেপান্তরের দেশ পোষায়?"

মালতীকে একটু খুসী করিবার জন্য সে আবার বলিল, "আর নাই-বা হল এখনি মালতীর বিয়ে? আমরা কি কারুর ভয় করি? আজ মনের মত বর ঘরের কাছে

না হয় ছ বছর বাদে দেব। উঃ, মরেই গেল লোকের কথাতে।"

সে সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া যেন সত্যসত্যই একদল বাকপটু আত্মীয়-পরিজনকে অবজ্ঞাভরে দূরে তাড়াইয়া দিল।

সেদিন কিন্তু মালতী আর পিতার সম্মুখে কথা বলিল না। তাহার মনে কেবল এইকথা বারবার ঘুরিতে লাগিল, আজ না হউক কাল পিতা তাহাকে এঘর হইতে বিদায় করিয়াই দিবে। সকলের খাওয়া-দাওয়া হইলে দুই বোনে শুইতে গেল। কতরাত পর্য্যন্ত তাহাদের কথা আর ফুরায় না। অন্ধকারে দুজনে দুজনের মুখে মুখ রাখিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের শত সুখ দুঃখ ও উদ্যত বিচ্ছেদের কথা বলিয়া চলিল। মাঝে মাঝে মালতী মুখে কাপড় চাপিয়া কাঁদিয়া উঠে, মধুমালা নীরবে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দেয়। পাশের ঘর হইতে বিষ্ণুচরণ বলে, "ওরে তোদের কি চোখে ঘুম নেই? অনেক রাত হল যে বাছা, এইবার চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়।"

বিষ্ণুকে প্রত্যহই রাত বারোটার সময় মেয়েদের ঘুমাইতে বলিতে হইত। কারণ পিতার নিকট বকুনি না খাইলে কোনোদিন তাহাদের গল্প শেষ হইত না। তবে অন্যদিনের তুলনায় আজ বিষ্ণুর বলার ভঙ্গিটা নূতন। অন্যদিন হইলে এতক্ষণ সে চটিয়া চেঁচাইয়া উঠিত, "ওরে রাক্ষুসীরা, সকাল বেলা আমার কি দোকান নেই যে রাত দুপুর অবধি কাণের কাছে গজর্ গজর্ করছিস? শীগগির ঘুমো, নইলে এই আমি চল্লুম বাড়ী ছেড়ে।" তাড়া খাইয়া মধু ও মালতী চুপ হইয়া যাইত। আজ কিন্তু তাহাদের কোনো কথায় হুঁস নাই।

অনেক রাতে মধু বলিল, "দিদি, আমি তাই নিজে এই পাড়ায় তোর সম্বন্ধ খুঁজ্ব, না হয় বাবাকে বল্ব বিয়ে নাই হবে। তুই চুপ কর্ ভাই লক্ষ্মীটি, একটুখানি ঘুমো।"

কথাটা মালতীর মনে লাগিল; সে চুপ করিল, কিন্তু ঘুমাইল না। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রের ভাঙা চাঁদ যখন একটুখানি ম্লান জ্যোৎস্না ছড়াইয়া নারিকেল-কুঞ্জের পিছনে অস্ত যাইতেছে, তখনও সে নিদ্রাহীন চোখে তাহার আজন্ম-পরিচিত ঘরের তুচ্ছ জিনিষগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে মমতার জাল বুনিতেছিল। অস্তোন্মুখ চাঁদের আলোয় মধুমালার ঘুমন্ত মুখখানি তাহার মনে নূতন মোহের সৃষ্টি করিতেছিল। আজ যে মধু তাহার সর্ব্বস্ব, কাল সে তাহার কুটুম্বমাত্র হইবে। মধুকে ভুলিবে সে কেমন করিয়া?

ভোর বেলা উঠিয়া সে বলিল, "মধু, বাবাকে বলিস্ আমি বিয়ে কর্‌ব না।"

আজ কিন্তু মধু বলিল, "সে কি কখনও হয়, ভাই?"

(২)

ছোট সংসারটি আবার আগের মতই নিরুপদ্রবে চলিতেছিল, মালতীমালার বিবাহের কথাটা তখনকার মত চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনের সন্দেহ ঘোচে নাই। মধুর সহিত বিষ্ণুর কথাবার্ত্তায় আগের মত স্বচ্ছন্দে আসিয়া সে আর যোগ দেয় না, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশী সজাগ দৃষ্টি সে সেদিকে রাখে। এক সুরে বাঁধা তিনটি তারের ভিতর একটি যেন বেসুরে বাজিতে সুরু করিয়াছে। নিজেকে মালতী যতই ইহাদের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া পর হইয়া যাইবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছে, যতই সে নিজের মনের সুরটি সংসারের সুরে মিলাইবার জন্য প্রাণতন্ত্রীটি কঠিন করিয়া পীড়ন করিতেছে, ততই যেন তাহা আল্‌গা হইয়া অন্য সুরে বাজিতেছে। মালতীর মন কেবলই বলিতেছে বিচ্ছেদের আগমনী বাজিয়া উঠিয়াছে, আর বেশী দেরি নাই। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কেবলি সে কাণ পাতিয়া শুনে তাহাকে লইয়া পিতা-পুত্রীতে কি গোপন পরামর্শ চলিতেছে। সামান্য কথায়ও সে গভীর অর্থ খুঁজিয়া বাহির করে।

মধু বলে, "দিদি, তুই হঠাৎ এত ভারি চালে চল্‌তে সুরু করলি যে? আমার সঙ্গে আর কথাই ক'স্ না।"

মালতী অভিমান করিয়া বলে, "বাবার সঙ্গেই ত তোর কত কথা হয়; আমি আর কি বল্‌ব? আমাকে কি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে?"

• মধু বলে, "তোর ভাই, অদ্ভুত রাগ। কবে কি কথা হয়েছিল সবাই ভুলে গেল, তুই এখনও রাগ পুষে রেখেছিস্। যা হয়ে বয়ে গেছে তাই নিয়ে কি চিরকাল গুমরোতে হবে?"

তবু মালতী আগের মত সহজ হয় না। মধুমালার মনটা ভিতরে ভিতরে গুমড়াইয়া যায়। তাহাদের আত্মার সখ্যের মাঝখানে সামান্য একটা কথার বাণ এত বড় হইয়া উঠিবে সে কোনোদিন ভাবে নাই। তাও কথা যদি সে তুলিত ত মালতীর অভিমানের কারণ ছিল। কথা তুলিল বিষ্ণুচরণ অথচ তার কোপটা আসিয়া পড়িল মধুমালার উপর। মধুমালার প্রতি তাহার সে গভীর ভালবাসা কি এত পল্কা? মধুমালা বুঝিত না যে, সামান্য কথাটা কেবল কথা মাত্রই নয়, তাহার চেয়ে অনেক গভীর জিনিষ, সে বুঝিত না যে, মালতীর এই দূরত্ব, এই অভিমান সবটাই স্বেচ্ছাকৃত নয়, ভালবাসার অভাব ইহার কারণ নয়। বিষ্ণুর ও মধুর কথা মালতীর মনে তাহার ভবিষ্যতের যে-ছবি স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া দিয়াছে সে-ছবি এতদিন একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তাই মালতীর সমস্ত জগৎটাই ছিল মধুকে লইয়া। বিচ্ছেদের বেদনা তাহাকে আর একটা জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে, সে অজ্ঞাত জীবনের দুঃখ-বেদনার পিছনে সুখ-আশাও থাকিয়া থাকিয়া উঁকি দিতেছে, তাই সে আর তাহার পুরাতন জীবন-স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যাইতে পারিতেছে না। জীবনের একটা পর্ব্ব যে এইখানে শেষ হইল তাহা সে বুঝিয়াছে।

মধু এত কথা ভাবিতেও জানিত না, কাজেই কোনো সান্ত্বনাও পাইত না। সে দিনে দিনে নিঃসঙ্গ হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই নিঃসঙ্গতার দুঃখের সে কোনো কারণ কিংবা প্রতিকার খুঁজিয়া পাইতেছিল না। আর কিছুদিন যাইলে তাহার দিদি আবার চিরকালের সেই তাহার একান্ত নিজস্ব দিদি হইয়া উঠিবে, এই ছিল তাহার একমাত্র আশা ও সান্ত্বনা।

কিন্তু তাহা হইল না। স্রোতের মুখে যেখানে বাধা পড়িয়াছিল সেই পথে স্রোত আর চলিল না, স্রোতের গতি ফিরিয়া গেল। মালতী ভাবিতে লাগিল তাহার নূতন জীবনটা কি করিলে পুরাতনের সহিত একেবারে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে। পুরাতনে আর যে ফিরিয়া যাওয়া যা'বে না, সে কথা তাহাকে কাহারও বলিয়া দিতে হইল না।

সকালে মধুমালা রোজই ঘুমাইয়া পড়িত বলিয়া মালতীর কাজ ছিল জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তোলা। তিন-চারদিন মধুমালা লক্ষ্য করিল মালতী তাহাকে আর ডাকে না। ঘর রোদে যখন ভরিয়া উঠিয়াছে বিষ্ণুচরণ পাথরবাটির চা শেষ করিয়া মটকার চাদরটি কাঁধে ফেলিয়া দোকানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে তখন মধু লজ্জিতভাবে চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখে মালতী কোন্ ভোরে ঘাট হইতে স্নান সারিয়া আসিয়া ভিজা চুল শুকাইতেছে। মধুমালা অনুযোগের সুরে বলে, "দিদি, আমাকে ডাক্‌লি না যে বড়।"

মালতী উদাসভাবে বলে, "তুই নিজে উঠ্‌লেই ত পারতিস্।"

মধুমালা বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া ভাবে সে কি কোনো দিন নিজে উঠিয়াছে যে আজ উঠিবে? তাহাকে জাগাইয়া দেওয়া ত তাহার দিদিরই কাজ। এ দাবীতেও কি তাহার অধিকার ফুরাইল? দিদির এ কি রকম সৃষ্টিছাড়া অভিমান? কিন্তু দুইদিন পরে মধুমালা বুঝিল এ অভিমান নয়, আর কিছু। দিদি তাহার সঙ্গ এড়াইতেই চায়। পাছে সে ভোরে উঠিয়া পড়ে এই ভয়ে মালতী আজকাল রাত থাকিতে উঠে। এ ত স্বেচ্ছায় মধুকে হতাদর।

মধুমালা কিছু বলিল না। এবার তাহার অভিমানের পালা। মনটা চঞ্চল থাকিত বলিয়া তাহার আগেকার স্বচ্ছন্দ নিদ্রা টুটিয়া গিয়াছিল। মালতী বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই মধুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত। কিন্তু সে চোখ বুজিয়া বালিশ আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। বুঝিত মালতী অতি সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলিয়া যথাসাধ্য নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। দিদির এমন নির্মম ব্যবহারে মধুর ইচ্ছা করিত দেশত্যাগী হইয়া যায়।

মধু ও মালতীর মনের মাঝখানে এতদিন যেমন কোনো বেড়া ছিল না, বাহিরে কোনো জিনিষেও তেমনি তাহাদের দাওয়া বলিয়া কিছু ছিল না। একটা কাপড়

জামা যাহার যখন প্রয়োজন হইত পরিত, একই অলঙ্কার যাহার সখ যাইত সে লইত, একই বাক্সে তাহাদের দুজনের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি তোলা থাকিত; কিন্তু তাহা লইয়া কোনোদিন মামলা-মোকদ্দমা হয় নাই।

একদিন ভোরবেলা জাগিয়া মধু মালতীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া বসিল। দেখিল শীতকালের তোলা লেপের গাদার আড়ালে মালতী ছোট একটি রঙীন টিনের বাক্স লুকাইয়া রাখিতেছে। প্রথমটা মধুর কোনো সন্দেহ হয় নাই, ভাবিয়াছিল বাবা হয়ত তাহাদের জন্য কিছু একটা নূতন জিনিষ আনিয়া দিদির হাতে দিয়াছে। মধু লাফাইয়া উঠিয়া মালতীর কাছে গিয়া পরম কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা ওখানে কি রাখ্‌ছিস্ ভাই? মালতী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ও কিছু না, ও আমার একটা বাক্স।"

মধু বিস্মিত হইয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিল। তাহারা দুইবোনে জন্মাবধি সকল জিনিষ "আমাদের" বলিয়াছে, "আমার" বলিবার লোভ তাহাদের কখনও হয় নাই। মালতী আজকাল সকল কথায় অভিমান করে বলিয়া বিষ্ণুচরণ হয়ত তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য এটি আনিয়া দিয়াছে ভাবিয়া মধু আপনাকে প্রবোধ দিল, যদিও বাবা এবং দিদি দুজনের উপরই তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। তবু রাগটা সামলাইয়া সে বলিল, "দেখি না কেমন বাক্সটা! বাবা কখন আন্‌লে?"

মালতী একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, "সব জিনিষই তোর দেখ্‌তে হবে? ওটা আমি কিনেছি, আমার জিনিষ কাউকে দেখাব না।"

মধু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এসব কোন্ লোকের ভাষা? তাহাদের সংসারে এমন কথা সে ত কোনোদিন শোনে নাই। তাহার নিজের দিদির জিনিষ সে দেখিবে না এমন অসম্ভব কাণ্ড জগতে ঘটিতে পারে কি করিয়া? নিশ্চয় সে এমন কিছু অন্যায় করিয়াছে যাহার জন্য রাগ করিয়া দিদি তাহাকে এই শাস্তি দিল। মধুমালা "আমি কি করেছি ভাই?" বলিয়া দিদির দুইটা হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মালতী তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি স্বাতন্ত্র্যবাদ বিষয়ে মধুমালাকে বক্তৃতা শুনাইয়া কোনো লাভ ছিল না, মালতীর সে ক্ষমতাও ছিল না, সুতরাং সে আরো বেশী করিয়া মধুকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। সে যতই দূরে সরিয়া যাইতে চায়, মধুমালার বিস্ময় ততই বাড়িয়া উঠে। দিদির মন জোগাইবার জন্য সে কেবলি তাহার পিছন পিছন ঘুরে। কিন্তু যতই তাহার অল্প বয়স ও বুদ্ধি হউক শীঘ্রই সে বুঝিল যে, মালতী তাহাকে আর চায় না।

মধুমালার কিন্তু মালতীকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকাই দুর্ঘট হইল। সে দূর হইতে মালতীর চলাফিরা লক্ষ্য করিত আর আড়ালে আসিয়া কাঁদিত। তাহার দিদি কোন্ অপদেবতার দৃষ্টিতে এমন হইয়া গেল? কবে আবার সে তাহাকে ফিরিয়া পাইবে? মধুমালার মনে কত গভীর দুঃখ, কত মধুর সুখের কথা জমিয়া উঠিত, একমাত্র বন্ধুকে তাহার কোনো ভাগই না দিতে পারিয়া সে হাঁফাইয়া উঠিত। তাহার বিকাশোন্মুখ নারী-জীবনের যত সুখ-দুঃখের কথা সে কি আর কাহাকেও বলা যায়?

মধুমালা প্রায় দেখিত অনেক রাত্রে মালতী জাগিয়া উঠিয়া তাহার টিনের বাক্সটা খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সিন্দুকের আড়ালে বসিয়া কি করে। বারবার সে চমকিয়া বিছানার দিকে তাকায়, কিছু সন্দেহ হইলে তখনই ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়ে। আঁচলের তলে যখন-তখন কি চাপা দিয়া বেড়ায়, সুবিধা পাইলেই ঘরে আসিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখে। পুকুর-ঘাটে একলা জল আনিতে যায়, মধুমালা যাইতে চাহিলে বলে, "তবে তুই যা, আজ আর আমি যাব না।"

একলা গিয়া দিদি কি করে দেখিবার জন্য মধু সেদিন রান্নাঘরের জানালায় গিয়া বসিয়া রহিল। দেখিল মালতী সোজা পথে না গিয়া বাঁকা পথে বটগাছতলা ঘুরিয়া গেল। কে একজন বাহির হইয়া আসিয়া মালতীর সম্মুখে দাঁড়াইল। মধুমালা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল কান্তদিদির দেবর। হাসিয়া হাসিয়া দুজনে কত কি কথা বলিল, তারপর মালতীর হাতে কি একটা দিয়া বউ পিছন ফিরিয়া আর একবার হাসিয়া চলিয়া গেল।

মালতী বাড়ী ফিরিতেই মধু সকলের আগে বলিয়া বসিল, "বটুদাদা তোকে কি দিল ভাই, দিদি?"

মালতী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি আবার দেবে? আমার সঙ্গে কি তার পাঁচশ বার দেখা হচ্ছে?"

মধু বলিল, "আমি দেখলাম বটতলায় তোকে কি দিয়ে গেল।"

মালতী রাগিয়া বলিল, "আমি কি বটতলায় ধন্না দিয়ে থাকি নাকি? কাকে না কাকে দেখে যা তা বল্‌বি ত টের পাবি মজা! বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোর!"

এই সামান্য কথায় মালতীকে এত রাগিতে দেখিয়া মধুর সন্দেহ বাড়িয়া উঠিল। সে আরো সজাগ হইয়া উঠিল; গোপনে দেখিল মালতী বুকের ভিতর হইতে কি বাহির করিয়া টিনের বাক্সে লুকাইয়া রাখিল। দেখিয়া মধু বিছানায় পড়িয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিল। তাহার সোনার দিদি এমন হইল কি করিয়া? যে-দিদি তাহার ঘর-বই কিছু জানিত না, বিবাহের নামে যে চক্ষে অন্ধকার দেখিত, সে ঘাটের পথে লুকাইয়া এ কি করিতে বসিয়াছে?

বসন্ত দেবতা যে আজ কলিদেবতার মত মালতীর জীবনে প্রবেশ-পথের ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে-কথা বালিকা মধুমালা কেমন করিয়া বুঝিবে? ঘর ছাড়িবার ভয়েই যে মালতী ঘরের মায়া কাটাইয়া উঠিয়াছে তাহা মধুমালাকে স্বয়ং দেবতা আসিয়া বলিলেও সে বিশ্বাস করিত না।

কি অমূল্য ধনের লোভে দিদি এমন অদ্ভুত ব্যবহার করিতেছে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া মধুমালা মালতী বাহিরে যাইতেই ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিয়া মালতীর একান্ত আদরের রঙীন টিনের বাক্সটি দায়ের নিষ্ঠুর কঠিন আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিল। মধুমালা কি দেখিবে আশা করিয়াছিল সে নিজেই বলিতে পারে না; কিন্তু যখন দেখিল ভাঙা টিনের বাক্সের ভিতর একগোছা রঙীন খামের চিঠি ও দুই চারিটি ফুলের মালা ছাড়া আর কিছু নাই, তখন তাহার বিস্ময় ও অবজ্ঞার সীমা রহিল না। পাড়াপড়শীর মেয়েদের মজলিসে বসিয়া যে চিরকাল ফুলের মালা ও রঙীন চিঠিকে মহাপাপের অগ্রদূত বলিয়াই শুনিয়া আসিয়াছে; মূর্খের মত যাহারা এই সকল মোহের জালে জড়াইয়া পড়ে তাহাদের প্রতি মধুমালার বিন্দুমাত্রও করুণা ছিল না। আজ তাহার দিদিকে যে সেই পাপজাল জড়াইয়া ধরিবে তাহা সে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবে নাই। পিতার অজ্ঞাতে পরের কাছে ফুলের মালা লইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখা! ভাবিতেও মধুমালা শিহরিয়া উঠিল।

সে চিঠিগুলি খুলিয়া পড়িতে যাইবে, এমন সময় দরজায় আঘাতের শব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া হুড়কা খুলিয়া দিল। মালতী পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল তাহার এতদিনের সঞ্চিত সম্পদ হতাদরে ধূলায় লুটাইতেছে, মধুমালা কঠোর নির্মম দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া।

মালতী রাগে আগুন হইয়া ছেলে বেলার মত মধুর গালে একটা প্রচণ্ড চড় লাগাইয়া দিল। মধুও রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "লক্ষ্মীছাড়ী, একি করেছিস্ কি? বাবার মুখটা মাটিতে না হেঁট করালে চল্‌ত না? এখুনি আমি এ জঞ্জাল সব উনুনে দিয়ে আসছি।"

মালতী বলিল, "খবরদার! আমার জিনিষে হাত দিবি ত তোরই একদিন কি আমারই একদিন। আমি বেশ করব, আমার যা খুশী তাই করব।"

মধুমালা অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মালতী চিঠি ও ফুলগুলি সযত্নে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়া আহত পক্ষীশাবকের মত সেগুলির গায়ে হাত বুলাইয়া ভাঙা বাক্সের ভিতর আবার সাজাইয়া রাখিল।

(৩)

মধুমালা দেখিল দুইচার দিন মালতী আর ঘরের বাহির হয় না। তারপর হঠাৎ একদিন একটা ডাকপিয়ন আসিয়া মালতীর নামে একখানা পত্র দিয়া গেল। এ বাড়ীতে ডাকপিয়ন আসাটা একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। মধুর ভয় জাগিয়া উঠিল। সে মনে মনে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। যেমন করিয়াই হউক এ মহা বিপদ হইতে দিদিকে সে রক্ষা করিবেই।

দ্বিপ্রহরে বিষ্ণুচরণ ছোট পাথরের বাটিতে সরিষার তেল লইয়া পিঁড়িতে বসিয়া সবে মাখিতে সুরু করিয়াছে, রান্নাঘরে মালতী কচি আমের অম্বলটা নামাইতে গিয়াছে, মধু ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

বিষ্ণুচরণ তেলমাখা হাত দুটা শূন্যে তুলিয়া শশব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন রে, কি হয়েছে বল্ ত !"

মধু আঁচলটা দাঁতে কাটিতে কাটিতে পায়ের দিকে চাহিয়া ঘামিতে লাগিল। তারপর মালতী আসিয়া পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলিল, "দিদির বিয়ে দিয়ে দাও, বাবা।"

বিষ্ণু বলিল, "আর ক'টা দিন যাক্, ওকে একটু ঠাণ্ডা হতে দে।"

মধুমালা বলিল, "না বাবা, দিদির মত হয়েছে, ওকে আর কোনো কথা না বলে তুমি সব ঠিক করে ফেল। এই বোশেখ মাসেই বিয়ে দাও, নাহলে শেষে আবার কবে কি বলে বসবে, তুমি বুড়ো বয়সে ভাবনায় পড়বে। আমি খারাপ স্বপন দেখেছি, তুমি আর দেরি করো না।"

বিষ্ণু মধুমালার বিজ্ঞের মত কথায় বিস্মিত হইলেও ভাবিল হয়ত মধু সত্যই পিতার মৃত্যু কি কিছু অমঙ্গলের স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে, এখন তাহার কথা শোনাই ভাল। স্বপ্নে বিষ্ণুর খুব অবিশ্বাস ছিল না। সে বলিল, "আচ্ছা, তোর কথাই রইল। কিন্তু তালডিঙীর সে পাত্র ত অন্য জায়গায় বিয়ে করেছে, এখন চট্ করে বর কোথায় পাই ?"

মধুমালা বলিল, "এইখানেই খুঁজে দেখ না। কত ত ছেলে আছে।"

বিষ্ণু একটু ভাবিয়া হাতের তেলোয় তেল লইয়া মাথায় ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "আছে বটে আমাদের বটু ! সে ক'দিনই আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল। আমি মালতীর ভয়ে বল্লাম এখন মেয়ের বিয়ে দিতে দেরি হবে, একটা বাধা পড়েছে। তবু ছোঁড়া পিছনে লেগে রয়েছে।"

মধু ভয় পাইয়া বলিল, "না বাবা ওর সঙ্গে বিয়ে দিও না, ও ছেলে ভাল নয়।"

বিষ্ণুচরণ বলিল, "তুই একরত্তি মেয়ে এত কথা জান্‌লি কোত্থেকে ? কেন সে মন্দ হল কিসে ?"

মধুমালা বাবার কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলিল, "বটুদা দিদিকে বটগাছতলায় নিয়ে গিয়ে চিঠি দেয়।"

বিষ্ণুচরণ ভীষণ গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঃ, তাইতে মেয়ের বিয়ের অমত।"

তারপর কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, মালতীর বিয়েটা হয়ে যাক্, তারপর ছোঁড়াকে দেখে নেব। তুই তার জন্যে ভাবিস্ না।" মধু বলিল, "তুমি যা ভাল বোঝ করো, বাবা, বিয়ের আর দেরি কোরো না।"

মালতী অম্বল নামাইয়া দাওয়ায় আসিয়া দেখা দিল। মধুমালার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে ঘরে চলিয়া গেল।

(৪)

মধু মনে করে নাই যে, বিষ্ণুচরণ বটকৃষ্ণের সহিতই মালতীর বিবাহ দিবে। সে মনে করিয়াছিল আগে কোনো গোলমাল না করিয়া মালতীর বিবাহটা দিয়া পরে সে বটকৃষ্ণকে একটা কঠিন শাস্তি দিবে। কিন্তু বিষ্ণুর মতলব দেখিয়া দিদির ব্যবহারের চেয়েও পিতার ব্যবহারে সে বিস্মিত হইল। যাই হোক বিনাপণে মালতীর বিবাহ হইয়া গেল স্বগ্রামে।

বটকৃষ্ণ ও মালতীর বিবাহের পর মধুমালা আর কোনোদিন দিদির নাম করিতে চাহিত না। দিদি পাপ করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্ত করিত তবু সে দিদিকে ক্ষমা করিত, কিন্তু এমন পাপ করার পর আবার সেই বটুকেই বিবাহ ! দিদির উপর সব টান তাহার চলিয়া গিয়াছিল।

মালতী বিবাহের পর বটুকে বলিল, "দেখ, দেশে থাক্‌তে পাব বলেই তোমার ফাঁদে আমি পা দিয়েছিলাম। কথাটা মধুই তুলেছিল আমার বিয়েতে ভয় দেখে। মধুকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণটা বেরিয়ে যেত। কিন্তু সেই মধুই আমার শত্রুতা সুরু কর্‌লে।"

বটু বলিল, "কিন্তু সেই বল্‌লে বলেই ত শেষে আমাদের

বিয়েটা হল। তোমার বাবার ত কি জেদ চেপেছিল কিছুতেই রাজি করানো যেত না।" কেন যে বাবা রাজি হইতেন না ভাবিয়া মালতী মনে মনে হাসিল।

মালতী বলিল, "সে কথা যাক্; কিন্তু যখন আমি মধুর দিকে ফিরে তাকাতাম না তখন মেয়েটা আমার জন্য মরত, আর আজ কাছে ডাকলেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। মেয়েটার আশ্চর্য্য অভিমান। সব দিয়ে একেবারে পর করে দিলে। ওর কাছে আমিই হেরে গেলাম।"

যম-পুকুর ব্রতের প্রাচীনত্ব

শ্রীঅনিলচন্দ্র গুপ্ত

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক তক্ষশিলা-খননকালে শিরকাপ নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ-স্তুপের আশেপাশে কয়েকটি মাটির রৌদ্রদগ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি বৌদ্ধ-পূজোপচারে উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহাদের এক কোণে একটি দীপদান, অপর দিকে ভিতরে

রৌদ্রদগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুকুর

নামাইয়া দেওয়া একটি সিঁড়ি ও তলায় মৎস্য, ভেক ইত্যাদি জলজন্তুর আকৃতি আছে। আমাদের বাংলা দেশেও হিন্দু-কুমারীগণ অনুরূপ পুকুর প্রস্তুত করিয়া যম-পুকুর বা পুণ্যি-পুকুর ব্রত পালন করে। স্যার জন মার্শালের মত এই যে, বাংলা দেশে প্রচলিত যম-পুকুর ব্রতের উৎপত্তি এই বৌদ্ধ আচার হইতে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনো কথা নাই; কারণ এককালে বৌদ্ধ আচারে সমস্ত বাংলা দেশ ছাইয়া গিয়াছিল, হয়ত সেই সময়ে এই ব্রত-পদ্ধতি আরম্ভ হয়। স্যার জন আরও নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, মিশরে তৃতীয় রাজবংশের আমলের সমাধির মধ্য হইতে অবিকল এইরূপ পুকুর পাওয়া গিয়াছে। সে প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা এবং তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পুকুরগুলি খৃষ্টের সমসাময়িক। এখন স্যার জন্ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, এই ব্রত বা পূজার প্রথা মিশর হইতে ভারতবর্ষে নীত হইয়াছিল, না, ইহা আর কোনো স্বাধীন সভ্যজাতির পূজা পদ্ধতির অঙ্গীভূত ছিল—যাহার নিকট ভারতবর্ষ ও মিশর উভয়েই ঋণী?

ভয়

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম্‌-বি

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ভয় একটি সহজ প্রবৃত্তি(instinct)। সহজ প্রবৃত্তি বলিলেই আমরা বুঝি যে তাহার আর বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। কি কি ঘটনায় ও কি কি অবস্থায় ভয়ের উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভয়ের মূলে কি আছে, তাহার বিচার চলিতে পারে না। মানুষের যে-সকল বিভিন্ন প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার মূলে কয়েকটিমাত্র সহজ প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যেমন পৃথিবীর নানা পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া কৈমিতিক বলেন যে, তাহাদের অধিকাংশই যৌগিক পদার্থ, কয়েকটি মাত্র মূল উপাদানের বিভিন্ন প্রকার ও পরিমাণের সংমিশ্রণে তাহাদের উৎপত্তি; সেইরূপ প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ বলেন, মানুষের বিভিন্ন মনোভাব কয়েকটিমাত্র মূল প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছে। কোন্ কোন্ উপাদান মূল উপাদান, সে-সম্বন্ধে কৈমিতিকদের মধ্যে মতভেদ নাই; কিন্তু কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি সহজ প্রবৃত্তি, সে-সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহারা ভালবাসা, শত্রুতা, ভয়, কৌতূহল, ইত্যাদি চার পাঁচটি সহজ প্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ত্রিশ পর্য্যন্ত সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমি তাহার আলোচনা করিব না।

ভয় যে একটি আদি প্রবৃত্তি সে-সম্বন্ধে সকল প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ই একমত। তাঁহারা যাহাকে সহজ প্রবৃত্তি বলেন, মনোবিদ্‌গণও সেইগুলিকেই মূল প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন। এই হিসাবে প্রায় সমস্ত মনোবিদই স্বীকার করেন যে, ভয়ের আর বিশ্লেষণ করা চলে না। প্রাণিতত্ত্বের দিক দিয়া ভয়কে মূল প্রবৃত্তি বলিয়া মানিলেও, মনোবিদ্যার দিক হইতে আমি সেকথা স্বীকার করিতে পারি না। ভয়ের মূলেও যে অন্য উপাদান রহিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার মতে, কামনা হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। নিজের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কামনা ও ভয় একেবারেই বিভিন্ন পদার্থ, কিন্তু শুধু বহির্মনের (conscious mind) সাক্ষ্য না লইয়া যদি নির্জ্ঞানের (unconscious mind) বিচার করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, অবস্থা-বিশেষে কামনা বাধা পাইলে ভয়ে পরিণত হয়। ভয় কামনারই পরিণতি—একথা যদি সত্য হয়, তবে বহির্দৃষ্টিতে দুইটিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে হইলেও ভয়কে মূল প্রবৃত্তি বলা চলিবে না।

প্রথমতঃ বহির্মনে বা সংজ্ঞানে কি কি অবস্থায় ভয় দেখা দেয়, তাহার বিচার করা যাক। যে-কোন বিপদের সম্ভাবনায় মনে ভয় দেখা দিতে পারে। সাহসী ব্যক্তির যে ক্ষেত্রে ভয় হয় না, ভীরু তাহাতে ভয় পায়। এক ব্যক্তির যাহাতে ভয় নাই, অন্যের তাহাতে ভয়। আজ যাহা ভয়ের, কাল তাহাতে ভয় হয় না। ভয়ের এইরূপ নানাপ্রকার বিশেষত্ব সহজেই ধরা পড়ে। ভয়ের কারণ যে বিপদের সম্ভাবনায়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এখন মনোবিদ্যার দিক হইতে বিপদ কাহাকে বলে দেখা যাক। বাঘের মুখে যাইতে ভয় হয়, কেন-না প্রাণহানির সম্ভাবনা। একতলা হইতে লাফাইয়া পড়িতে ভয় খাই, কেন-না প্রাণহানি না হইলেও অঙ্গহানি হইতে পারে। চোরের ভয় খাই, কেন-না চুরিতে অর্থহানি হয়। ছেলেকে বৃষ্টির মধ্যে বাহিরে পাঠাইতে ভয় পাই, কেন-না তাহার অসুখ হইতে পারে। দেখা গেল, যাহা কিছু আমাদের প্রিয়, তাহার বিনাশের সম্ভাবনা দেখা দিলেই মনে ভয় উঠিতে পারে। আমরা প্রত্যেকে নিজেকে ভালবাসি বলিয়াই মৃত্যুকে এত ভয় করি; অর্থ ভালবাসি বলিয়াই অর্থনাশের ভয় খাই, ইত্যাদি। ভয়ের সহিত ভালবাসার যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা এখন স্পষ্টই দেখা গেল। কেবল প্রিয়বস্তুর বিনাশেই যে ভয় দেখা দেয়, তাহা নহে—প্রিয় বস্তুর অভাবেও দেখা দিতে পারে। কোন কোন মনোবিৎ বলেন, ছোটছেলে যে একলা থাকিতে ভয় পায়,

তাহা এই কারণেই। শিশুর অন্ধকারের ভয় তাহার পিতা-মাতার অদর্শনহেতু। শিশু অন্ধকারের অন্য কোন বিপদের কথা জানে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১ম অধ্যায়,৪র্থ ব্রাহ্মণে মিথুনোৎপত্তির বিবরণ আছে। ইহাতে আত্মার ভয়ের কথা আছে। আত্মা প্রথমে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। তিনি বলিলেন,—'আমি আছি।' তিনি আপনাকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। সেইজন্য লোক একাকী থাকিলে ভীত হয়। তখন আত্মা আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, তিনি যখন একাকী তখন কেন তিনি ভয় করিবেন, কারণ দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হয়। ইহাতে আত্মার ভয় চলিয়া গেল। ভয় গেল বটে, কিন্তু আত্মা আনন্দলাভ করিলেন না। সেইজন্য কেহ একাকী থাকিয়া আনন্দলাভ করে না। তখন আত্মা স্বীয় দেহকে দুইভাগ করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী সৃষ্ট হইল।

ঋষিদের উক্তি তাঁহাদের অনুভূতিলব্ধ বিবরণ বলিয়া মানিলে পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে দেখা যায় যে, মিথুনের আনন্দের অভাবেই আত্মার ভয় হইয়াছিল। এই ভয় দূর হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দলাভ সম্ভব হয় নাই, ততক্ষণ আত্মা ম্রিয়মান ছিলেন। প্রিয়বস্তুর অভাবেই যে ভয়ের উৎপত্তি, ঋষি সেই কথাই বলিলেন। উপনিষদে ভয়-সম্বন্ধে আরও আলোচনা আছে, তাহার বিবরণ পরে দিব।

এ পর্য্যন্ত ভয়োৎপত্তির যে বিবরণ দিয়াছি, তাহা মানিতে কাহারও আপত্তি হইবে না, কারণ এ-সমস্তই বহির্মন বা সংজ্ঞানের কথা। সকলেই নিজ নিজ অন্তর্দর্শনের (introspection) চেষ্টা করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। মানসিক ব্যাপারের যেটুকু আমরা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা জানিতে পারি, মানুষের মন কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। মনের এক বৃহৎ অংশ আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচরে কাজ করিতেছে। কেবল ক্রিয়া দেখিয়া ইহার অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে পারা যায়। আধুনিক মনোবিদ্যা এই নির্জ্ঞান প্রদেশের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। ভয়ের উৎপত্তি সম্যক বুঝিতে হইলে, এই নির্জ্ঞানে কি কি ঘটিতেছে তাহার সন্ধান লওয়া দরকার। ভয়ের মূল এই নির্জ্ঞানেই অবস্থিত,—বহির্মনে কেবল তাহা পরিস্ফুট হয় মাত্র। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নির্জ্ঞানে ভয়োৎপত্তি-সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য বিশদভাবে আলোচনা করা চলিবে না। বিষয়টিও এত জটিল যে সাধারণ পাঠকের বুঝিতে ধৈর্য্য-চ্যুতির সম্ভাবনা। আমি মোটামুটি এই বিষয়ের আলোচনা করিব মাত্র।

মানুষের পেটের মধ্যে যে প্লীহা আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় বহির্দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে না। দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির উদরে প্লীহা আছে, দেখা যাইবে। ইহা ব্যতীত প্লীহার সত্তা ধরিবার অন্য উপায় নাই। সময়ে সময়ে রোগে এই প্লীহা বৃদ্ধি পায়, তখন সহজেই তাহা বহির্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা নজরে আসে না, রোগে তাহা প্রকট হইতে পারে। মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে মানসিক ব্যাপার সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে ধরিতে গেলে সূক্ষ্ম মনো-বিশ্লেষণের প্রয়োজন, তাহা সময়ে সময়ে রোগীতে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। এমন মানসিক রোগ আছে, যাহাতে অতিরিক্ত মাত্রায় ভয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ ভয়গ্রস্ত রোগীর ভীতির উৎপত্তির কারণ জানিতে পারিলে সুস্থ মানবেরও ভয়ের অনেক তত্ত্ব ধরা পড়িবে।

Anxiety Neurosis বা 'উৎকণ্ঠা উন্মায়ু' বলিয়া এক প্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী সামান্য কারণে ভয়গ্রস্ত হয়। রোগীর মনে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠা—পাছে মৃত্যু হয়, পাছে তাহার প্রিয়পরিজনের বিপদ ঘটে। সর্দ্দি হইলে মনে হয় বুঝি নিউমোনিয়া হইবে, সামান্য পেটের অসুখে রোগী ভাবে তাহার কলেরা হইয়াছে ও মৃত্যু সুনিশ্চিত। বাড়ীর কেহ বেড়াইতে বাহির হইয়া ফিরিতে দেরি করিলে, মনে হয় বুঝি-বা সে গাড়িচাপা পড়িয়াছে, ইত্যাদি। মনোবিদ্-চিকিৎসকগণ বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে স্থির করিয়াছেন, কামজ-ইচ্ছা অবদমিত হইলে (repressed) এই প্রকার উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। রোগীর বহির্মনে অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ কোন কামজ-ইচ্ছার সন্ধান না মিলিতে পারে, কিন্তু নির্জ্ঞানে যে এরূপ ইচ্ছা আছে তাহা বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা ধরিতে পারা যায়।

অতএব এক্ষেত্রে ভয়ের মূলে ইচ্ছা রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে উদাহরণগুলি দিয়াছি তাহাতেও দেখান হইয়াছে যে, নিষিদ্ধবস্তু-ভোগের ইচ্ছা বাধা পাইলে সময়ে সময়ে ভয় দেখা দেয়। এইরূপ ইচ্ছার এবং উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীর ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য এই, প্রথম পক্ষের ইচ্ছাগুলি সবই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সহজেই সকলে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে ইচ্ছা বাধা পাইয়া উৎকণ্ঠা রোগ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা রোগীর প্রত্যক্ষের বাহিরে, নির্জ্ঞানেই তাহা অবস্থিত এবং অনুমানসিদ্ধমাত্র। অনুমানসিদ্ধ হইলেও এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। যে-প্রকার পারিপার্শ্বিক ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া, কেবলমাত্র অনুমানের সাহায্যে বিচারক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর অভাবেও খুনী আসামীকে সাজা দেন, এই অনুমানও সেই শ্রেণীর। ইহার যৌক্তিকতা সেইরূপই দৃঢ়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই-সকল রোগীর মনোবিশ্লেষণের সম্পূর্ণ ইতিহাস এরূপ প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নয়, কাজেই পাঠককে অনেক কথাই মানিয়া লইতে হইবে। তবে এমন অনেক রোগীর ইতিহাস দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে সাধারণ পাঠকও সহজেই ভয়ের মূলে যে ইচ্ছার অস্তিত্ব আছে তাহা ধরিতে পারিবেন। আমি এক ব্যক্তির কথা জানি, যিনি কলিকাতায় গত দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় রিকশ' ভাড়া করিয়া দাঙ্গার স্থানে যাইতেন ও সেখানে মারামারি দেখিয়া রিকশ'তে ভয়ে প্রায় অচেতন হইয়া পড়িতেন। দাঙ্গা যে তিনি ভয় করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু অপর পক্ষে তিনি যে দাঙ্গা দেখিতে ইচ্ছুক, রিকশ' ভাড়া করিয়া ঘটনাস্থলে যাওয়াই তাহার প্রমাণ। ট্রাজিডি বা বিয়োগান্ত নাটক কষ্টের কারণ, কিন্তু তবু আমরা পয়সা খরচ করিয়া তাহা দেখিতে যাই। এই ব্যক্তির দাঙ্গা দেখিতে যাওয়া ও আমাদের ট্রাজিডি দেখিতে যাওয়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। নির্জ্ঞানবিৎ বলিবেন যে, আমাদের মনের মধ্যে কষ্ট পাইবার ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে। কষ্ট পাইবার ইচ্ছা বলিলে ঠিক কথা বলা হইল না। যে ঘটনায় সাধারণতঃ আমরা কষ্ট পাই, সেইরূপ ঘটনায় সুখ উপভোগ করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। কাজেই ইচ্ছাটি দুঃখ পাইবার হইল না—সুখ ভোগেরই ইচ্ছা হইল। সামাজিক ও অন্যান্য কারণে এই ইচ্ছার পরিতৃপ্তির পথে বাধা আছে, সেই-জন্য যাহা মূলতঃ সুখকর ইচ্ছা, তাহার সহিত দুঃখ জড়িত হইয়া পড়ে। দুঃখ এই বাধা বা দ্বন্দ্বের ফলেই উৎপন্ন হয়। বিয়োগান্ত নাটকের বর্ণিত অবস্থা আমাদের নির্জ্ঞানের কাম্য, সেইজন্যই পয়সা খরচ করিয়া আমরা এরূপ নাটকের অভিনয় দেখিতে যাই। সংজ্ঞান এই প্রবৃত্তিকে বাধা দেয় বলিয়াই তাহাতে কষ্টের উৎপত্তি হয়। এমন লোক আছেন যাঁহারা এইরূপ অভিনয় দেখিয়া কেবল সুখই অনুভব করেন, দুঃখের লেশমাত্র তাঁহাদের মনে দেখা দেয় না। তাঁহাদের নির্জ্ঞান সংজ্ঞানকে পরাজিত করিয়াছে; আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা বিয়োগান্ত নাটক কখনই দেখিতে পারেন না। তাঁহাদের সংজ্ঞানই প্রবল, নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছা তাঁহাদের মনে উঠিতে পায় না। পূর্ব্ববর্ণিত ব্যক্তির বিপদে পড়িবার ইচ্ছাই রহিয়াছে। বিপদে পড়িলে তাঁহার নির্জ্ঞান-মনে সুখই হয়, সেইজন্য তিনি দাঙ্গা দেখিতে ভালবাসেন। সংজ্ঞান এই ইচ্ছাকে বাধা দিয়া ভয়ের সৃষ্টি করে। কথা বড়ই অদ্ভুত হইল। দাঙ্গার ভয়—দাঙ্গায় পড়িবার ইচ্ছারই সাক্ষী।

এক রোগী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত, পাছে তাঁহার 'হার্ট ফেল' করে। তিনি নড়িতে-চড়িতে ভয় খান। যখনই সংবাদপত্রে কোন পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ পড়েন, ভয়ে তখন তাঁহার দেহ কাঁপিতে থাকে, ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যায়; মনে হইতে থাকে, বুঝি-বা এখনই তাঁহার নিজের মৃত্যু হইবে। পূর্ব্বের উদাহরণগুলির সহিত তুলনা করিয়া যদি বলা যায়, এই রোগীর নির্জ্ঞানে মৃত্যু-ইচ্ছা রহিয়াছে, তবে অনুমান এমন-কিছু অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু এই ব্যক্তির নির্জ্ঞানে যে মৃত্যু-ইচ্ছা আছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা জানিতে পাঠকের স্বতঃই কৌতূহল হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই রোগীর একদিকে যেমন মৃত্যু-ভয় অপরদিকে তেমনই এক অদ্ভুত ঝোঁক মাঝে মাঝে তাহার মনে উদয় হয়;— 'চলন্ত রেল দেখিলে ছুটিয়া তাহার নীচে পড়িতে ইচ্ছা

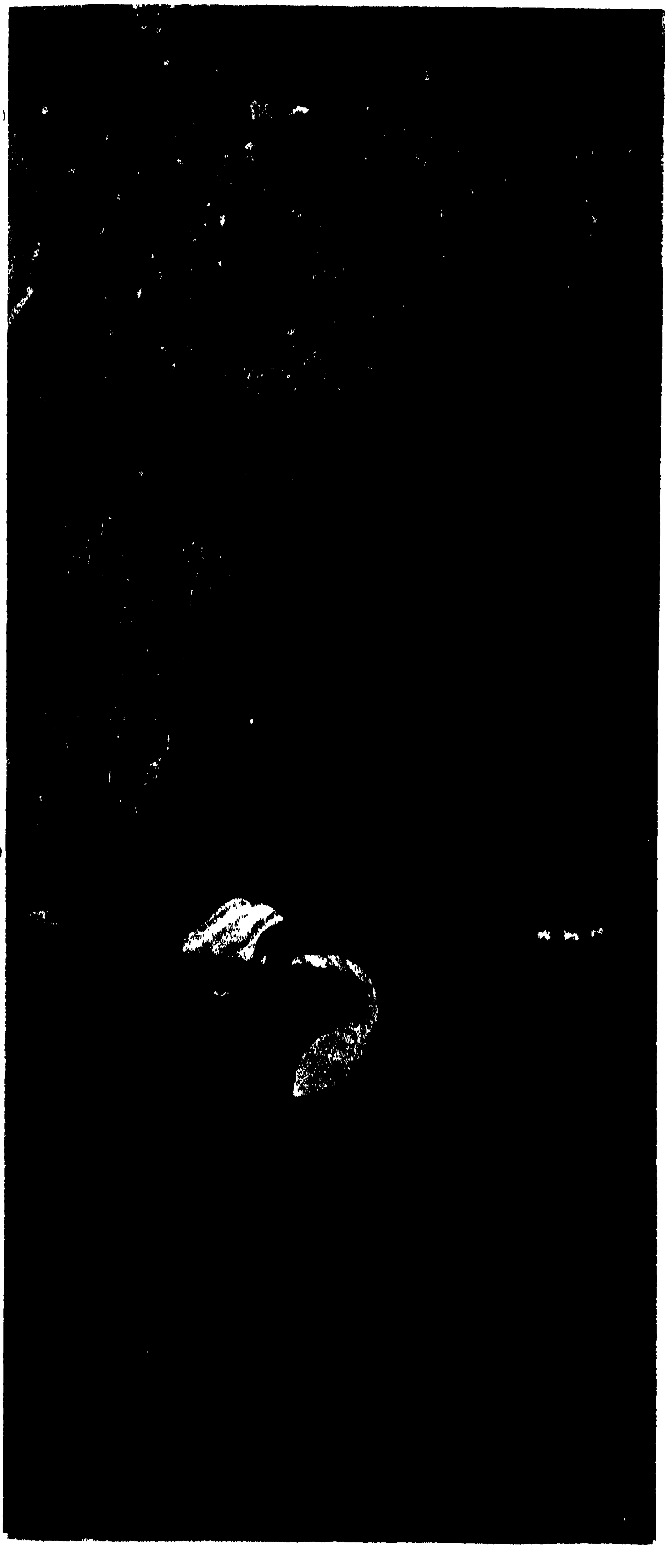

অন্ধ্র দেশীয় স্বর্ণকার

শ্রী ভেমূরী নাগেশ্বর রাও

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

করে। রোগী বন্ধুবান্ধবদের বলে,—'আমাকে ধরিয়া রাখ।' তেতলা বাড়ীর ছাদে উঠিলে তাহার লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। এজন্য রোগী কিছুতেই ছাদে যাইতে চায় না। মৃত্যু-ইচ্ছা যে রোগীকে সময় সময় কিরূপ অভিভূত করে, পাঠক সহজেই তাহার প্রমাণ পাইলেন। মনের মধ্যে বাঁচিবার ও মরিবার পরস্পর-বিরোধী দুইটি ইচ্ছার দ্বন্দ্বেই রোগীর মনে ভয়ের উৎপত্তি। এ-সকল রোগী বাহিরে যাহা ভয় করে, ভিতরের মনে তাহাই চায়। এখানে ভয় ইচ্ছারই রূপান্তর।

কলিকাতায় তেতলার ঘরে সাসি-দরজা বন্ধ করিয়া এক ব্যক্তি সাপের ভয়ে দিবারাত্র সন্ত্রস্ত। কুঁজা হইতে জল ঢালিলে মনে হয় বুঝি-বা সাপ পড়িল। ইলেকট্রিক সুইচে হাত দিলে মনে হয় বুঝি সাপে কামড়াইল। রোগী বেশ বুদ্ধিমান; সে ভালই বোঝে যে সুইচে সাপ থাকে না, থাকিতে পারে না, তবু যদিই থাকে—এই ভয় সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারে না। সেইজন্য হাত দিয়া সুইচ ছুঁইতে তাহার সাহসে কুলায় না। যেখানে সাপ থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, রোগীর মন সেখানে সাপের অস্তিত্ব দেখিতেছে ও তাহাতে ভয় খাইতেছে। কেন তাহার মন সাপের আলোচনায় এত ব্যস্ত?—নির্জ্ঞানবিৎ বলিবেন, তাহার ভিতরের মনে তাহাকে সাপে কামড়াক, এইরূপ ইচ্ছা রহিয়াছে। কেন এইরূপ অদ্ভুত ইচ্ছা মনে উঠে, তাহার আলোচনা করিব না। তাহার মন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। এক মন সর্ব্বত্রই সাপ দেখিতে চায়, সেইজন্যই যেখানে-সেখানে সাপের কল্পনা করে; অপর মন এই কল্পিত সাপকে তাড়াইতে যাইয়া ভয়ে অভিভূত হয়।

আর উদাহরণের প্রয়োজন নাই। রোগীর মনে ভয়ের উৎপত্তির কারণ যেরূপ সহজে ধরা পড়ে, সুস্থ ব্যক্তির মনে সেরূপ সহজে পড়ে না। সাধারণ ব্যক্তি এরূপ কাল্পনিক ভয়ে ভীত হয় না; তবে বাস্তবিক ভয়ের কারণ থাকিলে ভয় পায়। বাঘ দেখিলে, সাপ দেখিলে সে ভীত হয়। যেখানে সাপ আছে সেখানে সে যাইতে চায় না। এরূপক্ষেত্রে ভয়ের মূলে ইচ্ছার অস্তিত্ব কোথায়? বড়-জোর বলা যায়, সে নিজেকে ভালবাসিতে চায় বলিয়াই নিজের বিনাশের সম্ভাবনায় ভয় পায়। ভয়গ্রস্ত রোগীর উৎকণ্ঠার সহিত যদি সাধারণ লোকের ভয়ের তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, একজনের ভয়ের কারণ কাল্পনিক, অপরের ভয়ের কারণ বাস্তব। অতএব উভয়ের ভয় যে একই উপায়ে উৎপন্ন, তাহা মানিতে আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু সকলেরই নির্জ্ঞানে মৃত্যু-ইচ্ছা ও অন্য প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইবার ইচ্ছা আছে। এইরূপ ইচ্ছা আছে বলিয়াই বিপদের সম্ভাবনা আমরা বুঝিতে পারি। চোর কি প্রকার ব্যক্তি বুঝিতে হইলে, সে কেন চুরি করে, কি করিয়া চুরি করে, বোঝা দরকার। কিন্তু নিজের মধ্যে চুরি করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, পরের চুরি করিবার ইচ্ছা ধরিতে পারিব না। যে জিনিষ আমার ভিতর নাই, বাহিরে তাহার অস্তিত্ব ধরিতে পারি না। মৃত্যুর ইচ্ছা না থাকিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা মনে আসে না। কিরূপ অবস্থায় পড়িলে মৃত্যু হইতে পারে, তাহাও মনে আসে না। নিজেকে যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত একাত্ম করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বুঝিতে পারিব না। মানুষের মনে যদি কেবল মরিবার ইচ্ছাই থাকিত, তবে সে কি করিলে মৃত্যু হয় তাহা খুঁজিয়া বেড়াইত ও সেরূপ অবস্থায় পড়িলে মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠিক বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইত। কিন্তু মানুষের মন অতীব জটিল। বিভিন্ন বিরুদ্ধ ইচ্ছা তাহার মনে রহিয়াছে। মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছা ও মরিবার ইচ্ছা উভয়ই আছে। সাধারণতঃ মরিবার ইচ্ছা চাপা থাকে ও মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিলে তাহা ফুটিবার চেষ্টা করে। তখন বাঁচিবার ও মরিবার ইচ্ছায় দ্বন্দ্ব বাধে আর সেই দ্বন্দ্বের ফলে ভয় উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভয় জয় করা সম্ভব হইবে না। এরূপ দুইটি বিরুদ্ধ শক্তিকে একই সময়ে কি উপায়ে শান্ত করা যাইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। কেবল যে মৃত্যু-সম্ভাবনায় আমাদের মনে বিরোধী ইচ্ছা জাগিয়া উঠে তাহা নহে। আমার মতে, আমরা যে-কোন অবস্থায় পড়ি না কেন, সেই অবস্থার অনুযায়ী পরস্পর-

বিরোধী ইচ্ছা মনে জাগিবেই; এমন কি যে-কোন ইচ্ছা মনে উদয় হইলেই তাহার বিরোধী ইচ্ছা নির্জ্ঞানে উঠিবেই। সাধারণ ব্যাপারে এই নির্জ্ঞানস্থিত বিরুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি না, কিন্তু যখনই সংজ্ঞানের ও নির্জ্ঞানের ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখনই মনে ভয়, ইত্যাদি কষ্টকর ভাবের উদয় হয়। কোন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি আমার কাছে আসিল, তাহার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাহাকে জল দিলাম। আমার মতে, এই যে জল দিবার ইচ্ছা মনে উঠিল, ইহার সহিত তাহার বিরুদ্ধ ইচ্ছাও নির্জ্ঞানে দেখা দিল। 'জল দিবার ইচ্ছা'র বিরুদ্ধ ইচ্ছা 'জল পাইবার ইচ্ছা'। এই দুই ইচ্ছায় যদি দ্বন্দ্ব হইত, তবে মনে অশান্তি আসিত। কি করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে এই জল পাইবার ইচ্ছা উঠিল এবং কি করিয়াই বা তাহা শান্ত হইল, বুঝাইতেছি। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া বা তাহাকে দেখিয়া সে জল খাইতে চায় বুঝিতে পারিলাম, অর্থাৎ, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে মনে মনে আমি অনুভব করিলাম, অর্থাৎ 'জল পাইবার' কথা মনে উঠিল। সমস্ত মনটাই যদি এইভাবে পূর্ণ হইত তবে তৃষ্ণার্ত্তের জল পাইবার ইচ্ছা অনুভব করিতাম মাত্র—তাহাকে জল দিতাম না। কিন্তু যখন মনে জল দিবার ইচ্ছা উঠিল, তখন বুঝিতে হইবে যে, মন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে;—এক মন তৃষ্ণার্ত্তের সহিত একাত্ম হইয়া জল পাইতে ইচ্ছা করিতেছে, অপর মন জল দিতে ইচ্ছা করিতেছে। মনের একাত্মভাব অজ্ঞাতসারেই ঘটিতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জল খাইয়া তৃপ্ত হইলে আমার এই একাত্ম মনও তৃপ্ত হইতেছে। জল দিয়া বহির্মন তৃপ্ত হইল ও তৃষ্ণার্ত্তের সহিত এক হইয়া নির্জ্ঞানের বিরোধী ইচ্ছাও তৃপ্ত হইল। এইরূপে পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছার দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া সমস্ত মনে আনন্দ জন্মিল।

কেহ আমাকে মারিল। এক্ষেত্রেও আমার মন দ্বিধা-বিভক্ত হইল। আমি বুঝিলাম একজন মারিতেছে, অর্থাৎ তাহার সহিত একাত্ম হওয়ায় মারা কেমন তাহা অনুভব করিলাম। বহির্মনে 'মার খাওয়া' অনুভব করিতেছি। মারা ও মার খাওয়া দুইটি বিরোধী ব্যাপার। আমার মতে, মার খাইলেই আমাদের নির্জ্ঞানস্থিত 'মার খাইবার ইচ্ছা' পরিতৃপ্ত হয় ও মারিবার ইচ্ছা বহির্মনে জাগে। যে মারিতেছে তাহার সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম হইতে পারিলে মারিবার ইচ্ছা তৃপ্ত হইতে পারে; এরূপ অবস্থায় মার খাওয়ায় মনে কোন কষ্ট হয় না। যদি পূরা একাত্মভাব না হয়, তবে মার খাওয়ার ইচ্ছা ও মারিবার ইচ্ছার দ্বন্দ্ব মিটিবে না। মার খাওয়া অপমানকর মনে করিব ও মার খাইতে ভয় হইবে। মারের শারীরিক কষ্টের কথা আলোচনা করিব না। নিজের দুই বৎসরের ক্রীড়াশীল সন্তানের সহিত আমার পূর্ণ একাত্মভাব থাকায় তাহার হাতে মার খাওয়ায় আনন্দই হয়।

এবার মৃত্যু-ভয়ের বিচার করিয়া দেখা যাক। মৃত্যু-ভয়ের মূলে, আমার মতে, মৃত্যু-ইচ্ছা রহিয়াছে। মরিবার ইচ্ছার বিরোধী ইচ্ছা—মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা। এই মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা ও বাঁচিবার ইচ্ছা মূলতঃ এক। বাঁচা মানেই পারিপার্শ্বিকের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা। যতক্ষণ প্রাণী বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ সে নিজের সুবিধামত বিভিন্ন পদার্থের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করে। মৃত্যু মানে—পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দেওয়া। মৃত্যু—বহির্জগতের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্পূর্ণ একাত্মবোধ জন্মিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহার মরিবার ও বাঁচিবার উভয় ইচ্ছাই চরিতার্থ হয়। পারিপার্শ্বিকের সহিত একাত্মবোধ মানেই—পারিপার্শ্বিক যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, অর্থাৎ মারিবার যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার সহিত সহানুভূতি। প্রভাব-বিস্তারই বাঁচার ইচ্ছা। অতএব এই একাত্মবোধের ফলে বাঁচিবার ইচ্ছা চরিতার্থ হইল। মৃত্যু-ইচ্ছা আত্মসমর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। এক্ষেত্রে আর কোন বিরোধ রহিল না ও ভয়ের কোন কারণই রহিল না। সকল পদার্থের সহিত যে লোক একাত্ম হইয়াছে, সে ভয়কে জয় করিয়াছে। সর্ব্বাবস্থাতেই তাহার আনন্দ। তৈত্তিরীয়োপ-নিষদের দ্বিতীয় বল্লীতে আছে, যখন সাধক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় হন। যখন তিনি

ইহাতে অনুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন, তখন তাঁহার ভয় হয়। ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব যিনি জানেন না, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম ভয়ের কারণ।···যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন, তিনি কোন বস্তু হইতে ভয় পান না। তিনি পাপ-পুণ্য উভয়কে আত্মভাবে দেখিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করেন।—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।'

বন্ধু

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, এম-এ,

(১)

প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া করুণাময়বাবু বাড়ী ফিরিতেই তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় পুত্র সঞ্জয় ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "পপির তিন্‌টে বাচ্চা হয়েছে, বাবা। বাচ্চাগুলো দেখতেও চমৎকার হয়েছে।"

করুণাবাবু কহিলেন—"সত্যি নাকি? চল্ তো দেখে আসি।"

সঞ্জয় পিতার হাত ধরিয়া চলিল।

সত্যই তিনটি বাচ্চা হইয়াছে—বেশ হৃষ্টপুষ্ট; কালো সাদা রংয়ে মিলানো, বড় বড় কান ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দেখিতে ঠিক মায়েরই মত হইবে। পপি শুইয়া আছে—তাহারই বুকের মধ্যে তিনটি বাচ্চা কুঁইকুঁই করিতেছে। প্রভু ও প্রভু-পুত্রকে দেখিয়া পপি মাথা তুলিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। করুণাবাবু অত্যন্ত খুশী হইলেন। সঞ্জয় উৎসাহের সহিত কহিল, "আমি যা বলেছি—সত্যি নয় বাবা? সুন্দর হয়নি দেখ্‌তে? বলতো বাবা কোন্‌টার কি নাম রাখি?" এই বলিয়া সে মায়ের কোল হইতে সন্তানগুলি টানিয়া বাহির করিতে অগ্রসর হইল।

করুণাবাবু কহিলেন,"এখনই অমন ঘাঁটাঘাঁটি করিস্ নে সঞ্জয়, একটু বড় হোক, চোখ ফুটুক—তারপর নামটাম রাখা যাবে।"

পপি এইবার উঠিয়া অগ্রসর হইয়া করুণাময়বাবুর পায়ের উপর মস্তক ঘর্ষণ করিয়া অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল। তিনি নত হইয়া পপির মাথায় সস্নেহ করাঘাত করিতে করিতেই কহিলেন—"কি বল্‌ছিস্ রে পপি?"

পপি তেম্‌নি পায়ের উপর মাথা ঘষিতে লাগিল। করুণাবাবু বুঝিলেন এই মূক প্রাণী কি যেন বুঝাইতে চাহিতেছে। তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন—"তোর হ'ল কি রে পপি?" তারপর যেন তিনি সহসা এই অসহায় জীবের মনের কথা পড়িয়া ফেলিলেন; সহাস্যে কহিলেন,—"তোর ভয় নেই রে, এবার তোর বাচ্চা বেঁচে যাবে, আমি তোকে বলে দিলুম।"

পপি মনিবের কথা বুঝিল কিনা সেই জানে, সে মাথা তুলিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আনন্দসূচক ঘেউ ঘেউ শব্দ করিতে লাগিল। সঞ্জয় এই অবসরে বাচ্চাগুলির গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

করুণাময়বাবু জানিতেন পপির পূর্ব্বে আর দুইবার সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা জীবিত নাই। এই মৃতবৎসা পশুটির আকুলতা যে তাহার এই জীবন্ত সন্তানগুলির প্রাণের ভয়ে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিয়া ঘরের এককোণে খড় বিছাইয়া তাহার উপর কম্বল পাতিয়া পপি ও তাহার বাচ্চাগুলির স্থান করিয়া দিলেন। তারপর পুত্রকে কহিলেন—"তুমি আর এখন বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করো না সঞ্জয়, এখন ওরা বড্ড ছোট কিনা, ওদের কষ্ট হয়।

সঞ্জয় পিতার কথায় উঠিয়া আসিয়া কহিল—"এই তিনটি বাচ্চাই কিন্তু আমাদেরই থাকবে বাবা, আমি আর কাউকে দিতে দেব না। ওরা নিশ্চয়ই পপির চেয়েও শিকারী হবে না বাবা?

করুণাবাবু হাসিলেন; নূতনের কাছে পুরাতন

চিরকালই এমনি হীন হইয়া যায় তাহা তিনি জানিতেন, তাই তিনি আর কিছু বলিলেন না।

কুকুরগুলির সুব্যবস্থা করিয়া করুণাবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখের বাগানে চেয়ার-টেবিল দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার গৃহে চা-পানের জন্য যাহারা নিত্য আসিয়া থাকে তাহাদের কাহারও আসিতে বাকি নাই। গৌরহরি চক্রবর্তী, বাংলা স্কুলের হেড পণ্ডিত, গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার, জমিদারের নায়েব সকলেই যথাসময়ে হাজির হইয়াছেন।

তাঁহাকে দেখিয়া চক্রবর্তী মহাশয় বিরল-দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"গৃহকর্তার আগমনে বিলম্ব দেখে আমরা তো একটু উতলাই হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের এই নিত্য আসাটা—।" কিন্তু তাঁহার কথা সমাপ্ত না হইতেই ভৃত্য সুদৃশ্য ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম ও প্লেট-বোঝাই বিস্কুট আনিয়া হাজির করিল। উপস্থিত সকলেই লুব্ধ দৃষ্টিতে এই লোভনীয় দ্রব্যসম্ভারের দিকে চাহিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় চক্রবর্তীর অর্দ্ধসমাপ্ত কথার ধুয়া ধরিয়া কহিলেন—"ও কথা আর নিত্যি আওড়িয়ে ফল নেই চক্কোত্তি খুড়ো। করুণাবাবু যে নেশা ধরিয়েছেন, এর পর যদি লাঠিও ধরেন তবু আমাদের আসতে হবে—কি বল হে পণ্ডিত, কি বল হে পোষ্ট মাষ্টার?

করুণাময়বাবু সহাস্যে কহিলেন—ও কি কথা। আসবেন বৈকি—বরং না এলেই আমি দুঃখিত হব। কুকুরটার বাচ্চা হয়েছে কিনা—বেড়িয়ে ফিরতেই সঙ্গ টেনে নিয়ে গেল। বাচ্চাগুলো যাতে শীতে কষ্ট না পায় তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এই আসছি।

পেয়ালায় পেয়ালায় চা ঢালা হইয়াছে। শুদ্ধাচারী চক্রবর্তী মহাশয় পেয়ালায় চা খান না—তাঁহার জন্য পাথর-বাটি ব্যবস্থা। বাটিতে এক চুমুক দিয়াই চক্রবর্তী কহিলেন—"আঃ! শীতের দিনে এটি অমৃত বল্লেই চলে। হ্যাঁ, কি বলছিলেন করুণাবাবু? আপনার কুকুরের বাচ্চা হয়েছে? একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর! ওরাই আমাদের তাড়াবে দেখছি।" তারপর প্লেটের উপর বিস্কুটের স্তূপ দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, আজকের বিস্কুট একটু বড় বড় দেখাচ্ছে না? দেখ্‌তে খাসা কিন্তু—চেহারা দেখে সত্যি খেতে লোভ হয়। কিন্তু ওতে আণ্ডা-কাণ্ডা দেয় শুনতে পাই—সেই না হয়েছে মুস্কিল!

পোষ্ট মাষ্টার বিস্কুটে কামড় দিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল—"তাতে কি হলো চক্কোত্তি মশায়। অখাদ্য কুখাদ্য যদি কিছু থাকেই, গঙ্গা তো আর বেশী দূর নয়, ডুব দিয়ে এলেই হলো। এখন রসাল জিনিষ ছেড়ো না।

চক্রবর্তী এতদিন কোনও রকমে এই জিনিষটি পরিহার করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশই তাঁহার রসনার উপর শাসনের মাত্রা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এতগুলি লোক যে-জিনিষটি পরমানন্দে উপভোগ করিতেছে, তাহারই জন্য এই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের চিত্ত ভিতরে ভিতরে লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া করুণাবাবু এতদিন জিদ করেন নাই, আজ ব্রাহ্মণের মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—"খাওয়ার জিনিষে দোষ নাই চক্কোত্তি মশায়, আর ওতে কি আছে, ঠিক যখন আমরা জানিনে।

চক্রবর্তী একবার নায়েব মশায় এবং আর একবার পোষ্ট মাষ্টার ও পণ্ডিত-মশায়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভাবখানা এই যে, কথাটা যদি তোমরা কেউ রাষ্ট্র করিয়া না দেও তাহা হইলে না হয় অন্ততঃ একটা দিনও চাখিয়া দেখি।

নায়েব মহাশয় কহিলেন—"ওতে কোনও দোষ নাই চক্কোত্তি, আমি বলছি তুমি খাও। তবে চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেও, নইলে ভাঙতে পারবে না।

চক্রবর্তী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, দন্তহীনতার অপবাদ দিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, কহিলেন—"তুমি আমাকে কি ভাব নায়েব-মশায়? মাড়ির জোরে তিলের নাড়ু চিবিয়ে খাই—ও তো তার কাছে নরম তুলো। আচ্ছা, দাও দেখি দুখানা এগিয়ে এদিকে"—বলিতে বলিতে নিজেই ডিশ্‌ হইতে বিস্কুট তুলিয়া লইয়া মুখে ফেলিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে চিবাইতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

সূর্য্যতাপ ও উষ্ণ চায়ের সদ্ব্যবহার করিয়া সকলেই গরম হইয়া উঠিলেন। চক্রবর্তী মশায় ছিন্ন র‍্যাপারখানি

গায়ে উড়াইয়া কহিলেন—"কুকুর-বাচ্চার শীতে কষ্ট পাওয়ার কথা বলছিলেন না করুণাবাবু? না, আপনি হাসালেন দেখছি। ওদের আবার শীত-গ্রীষ্ম? বাড়ীতে ছায়ের গাদা নেই? টান মেরে ফেলে দিন তার ওপর, দিব্যি থাকবে।

পোষ্ট মাষ্টার চক্রবর্ত্তীর মূর্খতায় মনে মনে বিরক্ত হইল, কারণ সে জানিত এই কুকুর করুণাবাবুর কতখানি প্রিয়। সে কহিল—"ও কথা বলো না খুড়ো, জীবমাত্রই সমান, হতশ্রদ্ধা করতে নেই। ক'টি বাচ্চা হয়েছে করুণা-বাবু? তিনটি? বেশ, বেশ, আমাকে কিন্তু একটা দিতে হবে—তা আগে থেকেই বলে রাখছি। শিকারী কুকুরের জাত কিনা—তাই চাওয়া। আর মশায়, শেয়ালের উপদ্রবে তো আর বাঁচিনে। রান্নাঘরে হাঁড়িকুঁড়ি রাখা পর্য্যন্ত দায় হয়েছে। একটা নেড়ি কুকুর আছে বটে, কেবল ভাত খাওয়ার যম, শেয়ালের ডাক শুনলেই সে ঘরে ঢোকে। তাহলে ঐ কথাই রইলো—আমি একটা চাই কিন্তু।

নায়েব মহাশয় কহিলেন—"ঐ সঙ্গে আমারও একটা করুণাবাবু। আমার ছেলেটির কুকুর পোষবার ভারি সখ—ঠিক সঞ্জয়ের মত।

চক্রবর্ত্তী-মশায় ইহাদের কথায় বিরক্ত হইয়া পণ্ডিত-মশায়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তুমিই বা বাকি থাক কেন পণ্ডিত? তিনটির মধ্যে দুটি গেল—একটি রয়েছে, ওটার জন্ম তুমি বায়না ধর।" তারপর পোষ্ট মাষ্টারও নায়েব-মশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"সখ তো আছে খুব, কিন্তু খাওয়াতে পারবে তো মাষ্টার? মাছ, মাংস, ডিম, বিস্কুট খাওয়া ওদের অভ্যাস—এতো জানো নায়েব-মশায়। শুধু সখ করলেই হয় না বাপু, পয়সা থাকা চাই।"

তাঁহার কথায় পোষ্ট মাষ্টার মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল, কিন্তু নায়েব-মশায় বলিয়া উঠিল—"আমরাও উপোস করে থাকিনে চক্কোত্তি, মাছ-মাংস খাওয়ার অভ্যাস আমাদেরও আছে। একটা কুকুর 'প্রিতিপালন' করবার ক্ষমতা তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু হলুদগাঁর জমিদারের নায়েব ওতে ভয় পায় না, বুঝেছ?

কথার ঢেউ বক্রভাবে যাইতেছে দেখিয়া করুণাবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন—"তা আছে বৈকি নায়েব-মশায়। একটা কুকুর-পোষা সে আর কঠিন কথা কি। আর ওসব প্রাণীকে যেভাবে রাখা অভ্যাস করবেন,—সেইভাবেই থাকবে।

নায়েব মহাশয়ের ক্রোধ তখনও হ্রাস পায় নাই, তিনি ঝাঁঝের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আপনার ঘরে না-হয় একটু বেশী সুখে থাকে, তাই বলে যে আমাদের ঘরে হতচ্ছেদ্দায় পড়ে থাকবে তাও নয়। ঐ উনিশ আর বিশ। হাঁ, তাও বলি চক্কোত্তি, তোমার সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না বটে! আমরা তো আর পরম বৈষ্ণব সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক নই যে, একবেলা দুটো চাল আর কাঁচকলা ফুটিয়ে নিলেই চলে। কুকুর-ঘেন্না কি তোমার সাধে আসে!

দারিদ্র্যের উল্লেখে চক্রবর্ত্তীর মুখের ভাব ম্লান হইয়া আসিল, কহিলেন—"সে কথা সত্যি নায়েব-মশায়, নিজেই খেতে পাইনে, তার উপর আবার ঐসব অবলা জন্তু নিয়ে কি খাওয়াই! তুমি ঠিক কথাই বলেছ।" এই বলিয়া তিনি নিজের অপমান ভুলিয়া গিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সকলেই উঠি উঠি করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভৃত্য এক ঝুড়ি তরকারি করুণাবাবুকে দেখাইতে আসিল। এগুলি করুণাবাবুর নিজের বাগানের। তিনি নিজ হাতে প্রত্যহ তরকারি তুলিতেন, যেদিন তাহা না পারিতেন সেদিন তোলা হইলে তাঁহাকে দেখাইবার আদেশ ছিল। বৃহৎ ঝুড়ির দিকে চার জোড়া চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টি পতিত হইল। চক্রবর্ত্তী-মশায় বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ, চমৎকার বেগুন তো! ছ'সেরা গাছের বেগুন বুঝি? সেই যে পাজির বিজ্ঞাপনে ছবি দেখেছিলাম—কিন্তু চোখে দেখা আর ভাগ্যে ঘটেনি।" এই বলিয়া তিনি ঝুড়ি হইতে খপ্ করিয়া বড় বেগুনটি তুলিয়া লইয়া চোখের সামনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

করুণাবাবু সহাস্যে কহিলেন "পছন্দ হয় তো নিন না চক্রবর্ত্তী-মশায়, ঐ সঙ্গে আর দুটি বেগুন আর একটা

কপিও দিয়ে যে রঘুয়া।" রঘুয়া অপ্রসন্ন মুখে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল।

পোষ্ট মাষ্টার দেখিলেন—ব্রাহ্মণ রোজগার মন্দ করিল না, সে বলিয়া উঠিল—"এখনই কপি উঠেছে নাকি? এত শীগ্‌গির কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ওসব দেখা যায় না। এখানে উঠতে উঠতে ঐ মাঘ মাস। বাঃ ফুলগুলির বাঁধুনিও চমৎকার!

নায়েব-মহাশয় একবার ঝুড়ির দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"পাড়াগাঁয়ে হবে না কেন, একটু চেষ্টা করলেই হয়। আমারও তো বিঘে-কয়েক জমি অমনি পড়ে আছে, কিন্তু আলিস্যি, ঘোর আলিস্যি। ওসব করে কে!"

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—"তা যাই বল নায়েব-মশায়, ওসব বাগান-ফাগান করতে গেলে সখের সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও থাকা চাই। আমাদের ঐ দুটো লঙ্কা গাছ, দুটো বেগুন চারা, আর পুঁইয়ের শাক জন্মালেই বারো মাস এক রকম কেঁদে-ককিয়ে চল্‌লো। কপিটপি আর পাই কোথায়?" এই বলিয়া সে ঘন ঘন চক্রবর্ত্তীর হাতের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

প্রত্যেককেই কিছু কিছু করিয়া দিবার জন্য করুণাবাবু ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। রঘুয়া রাগ করিয়া ঝুড়িটি নিঃশেষ করিয়া দিল।

একে একে সকলেই উঠিয়া পড়িল, উঠিলেন না শুধু চক্রবর্ত্তী-মশায়। সবাই চলিয়া গেলে তিনি জোর গলায় বলিতে লাগিলেন—"দেখলেন দেমাকটা নায়েবের! ভাবখানা যে, ও আর আপনি সমান। তুই তো তুই-তোর মনিব লাগ্‌তে পারে এঁর কাছে। হলুদগাঁয়ের জমিদার দেখাস্—তাকে যে ইনি কিন্‌তে পারেন রে বেল্লিক।

করুণাবাবু হাসিতে লাগিলেন, চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"না, এ হাসির কথা নয় করুণাবাবু। দুবেলা আপনার বাড়ীতে চা-বিস্কুট মারবো, আর আপনারই নিন্দে করে বেড়াবো—এ আমাকে দিয়ে হবে না, সে কথা আমি বলে রাখলুম। আবার তুলনা করা হলো সঞ্জয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের। গলায় দড়ি আর কি! হাঁা, সে বরং করতে পারি আমি। আমার নাতি মহেন্দ্রকে দেখেন নি? বাপ-মা মরা ছেলে আমিই মানুষ করেছি। একদিন না হয় নিয়ে আসবো।"—

করুণাবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু মুখে কহিলেন—"বেশ তো, আনবেন একদিন সঙ্গে করে!"

"হাঁা আনবো একদিন।"—এইবার তিনি হাতের বোঝা লইয়া উঠিলেন, তারপর সেইদিকে চাহিয়া লইয়া কহিলেন—"যাক্, আপনার করুণায় এখন তিনটি দিন নিশ্চিন্দি, তরিতরকারির কথা আর ভাবতে হবে না।" এই বলিয়া তিনি বিরলদন্তের হাসি হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

(২)

করুণাময়বাবু বিপত্নীক। প্রায় বছর-পাঁচেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়, আর তিনি বিবাহ করেন নাই। পশ্চিমের কোনো বড় সহরে তিনি ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন এবং আয়ও তাঁহার প্রভূত ছিল। কিন্তু পত্নী-বিয়োগের পর তাঁহার কার্য্যের উৎসাহ কমিয়া গেল এবং তাহার বছর-দুয়েক পর কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র পুত্র ও ব্যাঙ্কের খাতায় একটি বৃহৎ অঙ্ক লইয়া তিনি বাঙলায় ফিরিলেন। অথচ বাঙলায় তাঁহার আত্মীয়স্বজন বলিতে একরূপ কেহই ছিল না। পৈত্রিক ভিটা তাঁহার ছিল বটে, কিন্তু তিনি সেখানে গেলেন না, রূপনারায়ণ নদীর তীরে বিঘা-কয়েক জমি কিনিয়া তিনি ছোট্ট অথচ সুদৃশ্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন—সম্মুখে নয়নমনোহর ফুলের বাগান এবং পশ্চাতে ফল ও সব্জীর বাগান গড়িয়া উঠিল।

পশ্চিম হইতে আসিবার সময় তাঁহার সহিত পপিও আসিয়াছিল। এই কুকুর-সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। তিনি যেদিন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর শেষকার্য্য সমাধা করিয়া গঙ্গাতীর হইতে শিশুপুত্রকে বুকে করিয়া শূন্যগৃহে ফিরিতেছিলেন, সেইদিন একটি ক্ষুদ্র কুকুরছানা অনুসরণ করিতে করিতে একেবারে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। মাতৃহারা শিশু সঞ্জয় যখন এই কুকুর-বাচ্চাটিকে দেখিল, তখনই সে ক্রন্দন ভুলিয়া তাহাকে

জড়াইয়া ধরিল এবং ইহাকে লইয়াই অনেকটা ভুলিয়া রহিল। সেই হইতে কুকুরটিও এই ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

নদীর তীরে যখন সুদৃশ্য গৃহ প্রস্তুত হইতেছিল, তখন নিকটস্থ গ্রামের লোকগুলি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। করুণাবাবু কলিকাতা হইতে লোকজন এবং মালমশলা লইয়া আসিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোক বলিতে লাগিল—লোকটির বোধ হয় পাগলামির ছিট আছে, নইলে রূপনারায়ণের তীরে এত ব্যয় করিয়া বাড়ী তুলিবার চেষ্টা করে। তারপর যখন দেখা গেল রূপনারায়ণের তীর ইঁট ও পাথরে বাঁধা হইয়া গেল, তখন তাহারা বুঝিল লোকটি কিসের জোরে এতবড় অসাধ্যসাধন করিতেছে। অবশেষে এই আগন্তুকের অর্থের পরিমাণ লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া গ্রামের লোকগুলির দিন কাটিতে লাগিল।

মনের মত করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ হইয়া গেল—পুত্রকে লইয়া তিনি এইস্থানে স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এই নির্জ্জন স্থানে, সহরের কোলাহল হইতে দূরে, এই বিচিত্র নদীর তটে তিনি কেন ঘর বাঁধিলেন তিনিই জানেন। তাঁহার শূন্য হৃদয় কোন্ ধ্যানে পূর্ণ করিবার জন্য তিনি এই স্থান নির্ব্বাচন করিলেন, তাহা তাঁহার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারিত না। সমস্ত দিন পুত্রকে লইয়া তাঁহার কাটিত—তাহার আহার, শিক্ষা, ক্রীড়া, সমস্ত তত্ত্বাবধান তিনি নিজেই করিতেন। একাধারে পিতা মাতা হইয়া তিনি একমাত্র পুত্রকে লালন করিতেন। রাত্রি গভীর হইলে তিনি পুত্রের শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া একাকী তাঁহার কক্ষের সম্মুখস্থ প্রশস্ত বারান্দায় চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতেন। এই নিয়মের কোনও দিন ব্যতিক্রম হইত না। রাত্রের গভীর অন্ধকারে অথবা চন্দ্রের অম্লান জ্যোৎস্নায় তিনি সম্মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন—অন্ধকারের কুক্ষিতলে অথবা জ্যোৎস্নার পর্দ্দার অন্তরালে কি রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাই যেন তিনি পাঠ করিয়া ফেলিবেন। তাঁহার এই বিচিত্র ধ্যানের একমাত্র সাক্ষী ছিল পপি। তিনি যখনই শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানে বসিতেন, তখনই এই কুকুরটি নিঃশব্দে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া বসিত, তারপর যতক্ষণ তিনি এইখানে ধ্যানে নিরত থাকিতেন, পপি একটি শব্দ পর্য্যন্ত করিত না। অদূরে শিবাকুল তারস্বরে চীৎকার সুরু করিত, কিন্তু পপি তেমনি স্থিরভাবে বসিয়া থাকিত, বোধ হয় তাহার গায়ের একটি রোম পর্য্যন্ত নড়িত না, শুধু সে একবার প্রভুর মুখের দিকে আর-একবার তাঁহার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিত।

অদূরেই গ্রাম, কিন্তু করুণাবাবু কাহারও সহিত পরিচয় করিতে গেলেন না। তবু গ্রামের লোক একে একে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া গেল। প্রথম আসিলেন চক্রবর্ত্তী-মশায়। তিনি পৌরহিত্য করিয়া খান। সুতরাং করুণাবাবুর মত ধনীকে যজমান করিবার চেষ্টা হইতে তিনি বিরত হইলেন না। নূতন গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্য করিয়া তিনি যাহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিবার জন্য তিনি হাজির হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র পপি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, এমন সময় সঞ্জয় আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল। করুণাবাবু তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু পপির উপর তাঁহার জাতক্রোধ রহিয়া গেল।

তারপর আসিলেন পণ্ডিত-মশায়। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র পপি ছুটিয়া আসিল বটে, কিন্তু দুই-একবার গোঁ গোঁ করিয়া ফিরিয়া গেল। পণ্ডিত-মশায় আগমনের উদ্দেশ্য করজোড়ে নিবেদন করিলেন। গ্রামের মধ্যে একটিমাত্র স্কুল, সাহায্য করিবার লোক নাই, স্কুলটি ভাঙিয়া গেলে এদেশের ছেলেদের লেখাপড়ার চর্চ্চাই উঠিয়া যাইবে, ইত্যাদি। করুণাময়বাবু তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশটি টাকা দিয়া দিলেন।

তারপর আসিল পোষ্ট মাষ্টার। তাহাকে দেখিয়া পপি একবার উগ্রদৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু কোনও শব্দ করিল না। পোষ্ট মাষ্টার কহিল—"গ্রামের পোষ্টাপিসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। করুণাবাবু ধনী লোক, এদেশে দয়া করিয়া বাস করিতেছেন। তিনি যদি চেষ্টা করেন—,

পোষ্টাপিসটি থাকিয়া যায় এবং গরীবেরও অন্ন মারা যায় না। করুণাবাবু আশ্বাস দিলেন—পোষ্টাপিসটি স্থায়ী হইয়া গেল।

অবশেষে আসিলেন—নায়েব-মশায়, অত্যন্ত গম্ভীর ও ভারিক্কি হাবভাব লইয়া। তাঁহাকে দেখিয়া আবার পপি ক্ষেপিয়া উঠিল—যেন তাঁহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু করুণাবাবু আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। নায়েব-মশায় তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—এমন কুকুরকে গুলি করিয়া মারা উচিত। তিনি হলুদগাঁয়ের জমিদারের নায়েব, থানার দারোগার সহিত তাঁহার অত্যন্ত দহরম-মহরম—এমন রিপোর্ট করিয়া দিলে আর রক্ষা নাই, ইত্যাদি।—করুণাময়বাবু মনে মনে হাসিলেন এবং তাঁহাকে অতি কষ্টে শান্ত করিলেন। তাহার পর নায়েব-মহাশয় ভালভাবে তাঁহার নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন—তিনি হলুদগাঁয়ের জমিদারের নায়েব, এদিকে তাঁহার মান-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি অসাধারণ। মাহিনা পনেরটি টাকা পাইলে কি হয়—উপরি আয় তাঁহার যথেষ্ট—গড়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকা পড়ে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া তিনি দুধ-ঘি খাইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন।

ইহার পর আরও অনেকে আসিল বটে, কিন্তু তাহাদের কথা উল্লেখ না করিলেও চলে। কিন্তু যে যে-ভাবেই আসুক, একবার যে করুণাবাবুর সহিত পরিচিত হইয়া গেল সে পুনরায় না আসিয়া পারিল না এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে।

(৩)

পপির বাচ্চাগুলি কিছু বড় হইয়াছে—এখন দৌড়াইয়া ঝাঁপাইয়া খেলিয়া বেড়ায়। সঞ্জয় দিবসের অধিকাংশ সময় তাহাদের লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সে তাহাদের নাম দিয়াছে—টমি, জনি, ডলি। করুণাময়বাবুও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে দেখিয়া যান। পপি সেই সময় আকুল আগ্রহে প্রভুর দিকে চায়—তিনি তেমনি আশ্বাস-বাক্য দিয়া বলেন—"ভয় কি রে? এবার তো বেঁচে গেল।" পপি আনন্দে লেজ নাড়িতে থাকে।

এমনি করিয়া দিন যাইতে লাগিল। একদিন সঞ্জয় কহিল—"ডলির পায়ের লোম উঠে যাচ্ছে, দেখেছ বাবা?"

করুণাবাবু কহিলেন—"বলিস কিরে? ঘা-টা তো হয়নি?"

তিনি তৎক্ষণাৎ দেখিতে চলিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—ঘায়েরই সূচনা। তিনি সাবান দিয়া ধুইয়া ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ঘায়ের নিবৃত্তি হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল এবং একে একে তিনটিই আক্রান্ত হইল।

সঞ্জয় সেই ক্ষতবিক্ষত কুকুর-ছানা লইয়াই ঘাঁটা-ঘাঁটি করিত—করুণাবাবু নিষেধ করিলেও সে যেন গ্রাহ্য করিত না। পপির উল্লাস গিয়াছে—প্রভুকে দেখিলেই তাঁহার পায়ের উপর মাথা গুঁজিয়া আর্ত্তনাদ করে, করুণাবাবু তেমনি সান্ত্বনা দেন। পপি মুখ তুলিয়া বিহ্বলভাবে চায়। এই অসহায় প্রাণীর ব্যাকুল ভাব দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে থাকে। ইহার ব্যথা তিনি নিজের বুক দিয়া অনুভব করেন।

সেদিন সকালবেলা চায়ের মজলিসে কথাটা উঠিল। শুনিয়া চক্রবর্ত্তী-মশায় ভারি খুশী, তিনি হেলিয়া দুলিয়া বসিয়া মাথা ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে কহিতে লাগিলেন—"বামুনের কোপে পড়লে মানুষের বংশ লোপ পায়—এতো বাবা কুকুরের বংশ। সেবার প্রথম যখন করুণাবাবুর বাড়ী দেখা করতে আসি, ওঁর কুকুরটিতো আমাকে ছিঁড়ে খাওয়ারই জোগাড় করেছিল। ভাগ্যিস সময়মত সঞ্জয় এসে হাজির হলো। সে একবার 'পপি' বলে ডাক্‌তেই একেবারে কেঁচোটি! হ্যাঁ, বাপের ব্যাটা বটে! নইলে সেদিন ব্রহ্মহত্যার পাতকটা আপনারই ঘাড়ে পড়তো করুণাবাবু।" এই বলিয়া তিনি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

করুণাবাবু কোনও কথা কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু আমিও যে-সে বামুন নই, দুর্ব্বাসা মুনির বংশধর কিনা, রাগ আমার কিছুতেই পড়লো না। এখান থেকে বের হয়েই পৈতে হাতে নিয়ে ওকে অভিসম্পাত দিলুম।

কেমন, সে অভিশাপ ফলেছে তো? বদির বামুন, ভস্ম করতে পারিনে বটে, কিন্তু শাপমন্যি এড়ানো যায় না, বুঝেছেন?" এই বলিয়া তিনি নায়েব মহাশয়ের দিকে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘৃণায় ক্রোধে করুণাবাবুর মুখচোখ লাল হইয়া উঠিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করিলেন না।

নায়েব-মশায় বলিলেন—"এতো ভাল কথা নয় করুণা-বাবু—বিদেয় করুন, বিদেয় করুন। কুকুরের ঘা বড্ড ছোঁয়াচে, মানুষের হলে বিপরীত হয়ে পড়ে। শুনতে পাই আপনার ছেলে বড্ড ঘাঁটাঘাঁটি করছে। আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"

করুণাময়বাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"কি করবো বলুন। জেনে-শুনে তো আর ফেলে দিতে পারিনে। যতদিন প্রাণ আছে—।"

নায়েব-মশায় বলিয়া উঠিলেন—"না, আপনি হাসালেন দেখছি। কুকুরের জাত—তার আবার প্রাণ! এযুগে জন্মানই আপনার অনুচিত হয়েছে দেখছি। আমি হলে তো এতদিন গুলি করে মারতাম। আপনারও কিন্তু তাই করা উচিত। বন্দুক-টন্দুক আছে? না থাকে তো আমি দারোগাবাবুকে একটু বল্লেই—ওকি, উঠলেন যে এখুনি। আচ্ছা তাহলে আমরাও আসি। বেলাও হয়েছে। ওহে মাষ্টার আমাদেরই আশাটা সফল হ'ল না—ভেবেছিলাম শিকারী কুকুরের একটা বাচ্চা নেব, কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন। যেমন শুনছি—পটল তুলবে নিশ্চয়। যাক্ খরচ-খরচাটা তো বেঁচে গেল—কি বল হে চক্কোত্তিখুড়ো?" এই বলিয়া তিনি চক্রবর্ত্তীর দিকে চাহিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

করুণাবাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে পোষ্ট মাষ্টার কহিলেন—"দেখুন।"

করুণাবাবু ফিরিয়া দাঁড়াতেই পোষ্ট মাষ্টার কহিল— "ওদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কুকুরের ঘা না-হয় করে? সেরে যাবে বুঝেছেন।"

লোকটির সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস দেখিয়া করুণাবাবু একটু হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

সেইদিনই তিনি পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন—"সঞ্জু, তুমি আর কুকুরের ঘরে যেও না।"

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সঞ্জয় কহিল—"কেন বাবা?"

"ওদের ঘা হয়েছে কি না, এখন ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই।"

সঞ্জয় ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার সঙ্গীহীন জীবনে একমাত্র যাহারা বৈচিত্র্য দান করিতেছিল, তাহাদের নিকট হইতেও দূরে থাকিতে হইবে?

কুকুর-বাচ্চাগুলির ক্ষত ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল, দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া যায় না। তবু করুণাবাবু প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যান, নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ক্ষত ধৌত ও ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমশঃ ইহাদের নড়িবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইল, চোখ মুদিয়া জড় মাংসপিণ্ডের মত একই জায়গায় পড়িয়া থাকে। পপি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার সন্তানগুলির নিকট দিনরাত শুইয়া থাকে, তাহার প্রভু আসিলেও আর সে উঠিয়া আসে না, শুধু করুণ দৃষ্টি দিয়া তাঁহার মুখের দিকে চায়। এই মরণাধিক যন্ত্রণা দেখিয়া করুণাবাবু ইহাদের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মৃত্যু সহজে আসিল না। পচনশীল বিষাক্ত ক্ষত হইতে মাংস ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তবু ইহারা দিনের পর দিন বাঁচিয়া থাকে। করুণাবাবু বিচলিত হইলেন— এইরূপ তিলে তিলে মরিতে দেওয়া অপেক্ষা তো একেবারেই মারিয়া ফেলা ভাল। জীবনের আশা যখন লোপ পাইয়াছে, তখন কি হইবে আর ইহাদের ধূলার মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া?

সেদিন পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কুকুর-বাচ্চাগুলির সম্বন্ধে যেভাবে তিনি বিচার করিতে বসিয়াছেন, তাহাই কি তিনি নিজের ছেলের উপর প্রয়োগ করিতে পারেন? সে যদি এমনি প্রাণসংশয় পীড়ায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তিনি কি তাহার যন্ত্রণা-লাঘবের জন্য গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারেন? তিনি এই চিন্তাতেই অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে বুকে চাপিয়া

ধরিয়া মনে মনে কহিলেন—নিজ সন্তানের সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেও পারি না, অন্যের সম্বন্ধে তাহাই যেন ধারণা করিয়া না বসি। এমন কি পশু হইলেও নয়।

সেইদিন রাত্রে পুত্র নিদ্রিত হইলে চিরঅভ্যাস-মত তিনি বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—সঞ্জয় শয্যায় নাই। তিনি বিস্মিত হইলেন। যে-পুত্র সন্ধ্যা হইলেই পিতার কোলে আশ্রয় লয়, ভয়ে একাকী কক্ষের বাহির হইতে পারে না—সে এই গভীর রাত্রে কোথায় গেল ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। তখন তন্নতন্ন করিয়া সমস্ত কক্ষ সন্ধান করিলেন, অবশেষে তাঁহার মনে হইল—পপির ঘরে নাই তো! তিনি সেইদিকে ছুটিলেন।

সত্যই সঞ্জয় সেখানে ছিল। করুণাময়বাবু দেখিলেন—সঞ্জয় মেঝের উপর বসিয়া সেই পূঁয-রক্তমাখা লোমহীন কুকুর-ছানাগুলির গায়ে পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতেছে—আর পপি সঞ্জয়ের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে। সে ইহাদের লইয়া এমনি তন্ময় হইয়া আছে যে পিতার আগমন জানিতেও পারিল না।

করুণাবাবু এই দৃশ্য দেখিয়াই ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। দুর্গন্ধে তাঁহার বমনোদ্রেক হইতেছিল। তিনি ক্রোধকম্পিত স্বরে ডাকিলেন—"সঞ্জয়!"

সঞ্জয় চমকিত হইয়া পিতার দিকে চাহিল। পিতা কহিলেন—"উঠে এস।"

সঞ্জয় একবার করুণ দৃষ্টিতে গলিত-দেহ পশুগুলির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

শয়নকক্ষে ফিরিয়া করুণাবাবু কহিলেন—"ছিঃ! তুমি এমন হয়েছ?"

মাত্র কয়েকটি কথা! কিন্তু অভিমানী বালক ইহাতে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কি করিয়া এই শিশুর ক্রন্দনের ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন! কি করিয়া তিনি বুঝিবেন—এই নিঃসঙ্গ বালকের দিন কিভাবে অতিবাহিত হয়! কি করিয়া তিনি জানিবেন—কেন এই বালক এই অসহায় পশুদের লইয়া এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! যাহার মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগ্নী নাই, এমন কি সমবয়সী সঙ্গী পর্য্যন্ত নাই—সেই জানে কেন একটি সাথী পাইবার জন্য মন এমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, কেন এম্‌নি করিয়া পশু ও মানবের পার্থক্য পর্য্যন্ত ভুলিতে হয়।

পুত্রের কান্না দেখিয়া করুণাবাবুর হৃদয় বিচলিত হইল বটে, কিন্তু তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে তিনি নিজহস্তে অনেকদিন পর পপিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। মনিবের এই আচরণে পপি বিস্মিতনেত্রে চাহিল। করুণাময় কুকুর-ছানাগুলিকে নদীতটে আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। আদেশ শুনিয়া পপি চঞ্চল হইয়া উঠিল। করুণাময়বাবু বন্দুক হাতে লইয়া বাহিরে আসিলেন।

তিনটি কুকুর-বাচ্চা সারি সারি করিয়া রাখা হইল। করুণাময়বাবু কিছুদূর হইতে 'ফায়ার' করিলেন। তিনটির একটি নিস্পন্দ হইল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করিতে করিতে পপি ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল—তাহার গ্রীবাদেশে মোটা শিকলের অৰ্দ্ধেকটি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। করুণাবাবু এইবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই পপি কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া উগ্রনেত্রে চাহিল। আবার বন্দুক ছুটিল, পপি তেমনি বিকট শব্দ করিয়া ছুটিয়া আসিল, আবার পিছাইয়া গেল। সর্ব্বশেষ 'ফায়ারটি' করিয়া করুণাবাবু বন্দুকটি সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তারপর তিনটি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড ও তাহা হইতে নিঃসৃত ক্ষীণ রক্তধারার দিকে চাহিলেন। পপি ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া গিয়া তাহার মৃত সন্তানগুলির দেহের ঘ্রাণ লইয়া তাহাদের ক্ষতস্থান জিব দিয়া চাটিয়া মস্তকের আঘাতে তাহাদের চেতনা-সম্পাদনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া এবং পরিশেষে কিছুই না করিতে পারিয়া বিকট মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের স্বরে আকাশ, বাতাস, জলস্থল চিরিয়া চিরিয়া ফেলিতে লাগিল।

করুণাময়বাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে পপির আর্ত্তস্বর শুনিলেন, তারপর টলিতে টলিতে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন সঞ্জয় মাটির ধূলায় লুটাইয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে।

(৪)

ছয়মাস পরের কথা।

সেদিন সঞ্জয়ের হঠাৎ জর আসিল, করুণাবাবু ভাবিলেন বোধ হয় শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। কিন্তু জর কমিল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল এবং জরের ঘোরে সঞ্জয় অজ্ঞান হইয়া রহিল। পঞ্চম দিনে জর কমিল বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া বসন্ত দেখা দিল। করুণাবাবুর অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল, তিনি পুত্রের আরোগ্যের জন্ত ভগবানের নিকট দিবারাত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পীড়ার প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। দেশ-বিদেশ হইতে অনেক চিকিৎসক আসিল, কিন্তু কেহই আশার বাণী শুনাইল না, সকলেই হতাশ হইয়া একে একে সরিয়া পড়িল।

করুণাবাবুর আপনার বলিতে কেহই নাই, তিনি নিজেই প্রাণপণে পুত্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পুত্র সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত লইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, পিতার বুক দুঃখে, কষ্টে, হতাশায় বিদীর্ণ হইতে চায়। যাহারা সুখের সময় করুণাবাবুর বাড়ী নিত্য আনাগোনা করিত, এখন তাহারা একবার মুখের কথাও বলিতে আসে না, এ বাড়ীর ছায়া যাহাতে না মারাইতে হয় এজন্ত সকলেই সতর্ক হইয়া চলে।

শুধু করুণাময়বাবুর সঙ্গী ছিল একজন, যে নিশিদিন আহার-নিদ্রা ভুলিয়া সঞ্জয়ের শিয়রে বসিয়া থাকিত। সে পপি। সঞ্জয়ের পীড়ার সূচনা হইতে পপি কদাচিৎ এই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মুখের দিকে চাহিতেই করুণা-বাবুর আঁখি দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। যাহার সন্তানগুলিকে তিনি নিজ হস্তে হত্যা করিয়াছেন, সেই অসহায় প্রাণীর তাঁহার নিজ সন্তানের প্রতি অসীম দরদ দেখিয়া প্রাণ আকুল হয়।

ক্রমে ক্রমে সঞ্জয়ের গায়ের ক্ষতে দুর্গন্ধ হইল। সঞ্জয় যন্ত্রণায় ছটফট করে, মাঝে মাঝে ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বলিয়া ওঠে—"বাবা আর যে পারিনে!"

করুণাবাবু উর্দ্ধে রক্তচক্ষু মেলিয়া কহেন—ভগবান্!

পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া করুণাময়বাবুর সেইদিনকার ছবি অন্তরে ভাসিয়া উঠে, যেদিন কুকুরছানা-গুলির অপরিসীম যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি গুলি করিয়া মারিবার সঙ্কল্প করেন। আর আজ তাঁহার নিজের পুত্রও তেমনি মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আরোগ্য হইবার বিন্দুমাত্র আশাও আর অবশিষ্ট নাই। তিনি কি নিজ হস্তে তেমনিভাবে পুত্রের কষ্টের পরিসমাপ্তির জন্ত তাহাকে হত্যা করিতে পারেন? এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ভগবান, রক্ষা কর।" তারপর উন্মাদের মত পুত্রের গলিত দেহ জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পপি তেমনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

রাত্রি গভীর নিস্তব্ধ। রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট করুণাবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। পুত্রের যন্ত্রণার অবসান হইয়া আসিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই কখন্ জীবনের ক্ষীণ দীপশিখা চিরকালের মত নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তিনি যক্ষের মত সতর্ক হইয়া পাহারা দিতেছিলেন। আশা ছিল তাঁহার এই সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে শমন পরাস্ত হইয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু কিছুই হইল না—ধীরে অতি ধীরে সঞ্জয়ের ক্ষীণ বক্ষ-স্পন্দন থামিয়া গেল। করুণা-বাবু আকুলস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"সঞ্জয়, চলে গেলি বাবা!"

পপি এতক্ষণ নীরব হইয়া রোগীর শিয়রে বসিয়াছিল, করুণাবাবুর এই আর্ত্তকণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, তারপর শয্যার চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। করুণাবাবু সেই একইভাবে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু পপির কান্নার স্বরে নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

* * * *

পুত্রের মৃত্যুর সাতদিন পর বৈকালে করুণাবাবু তাঁহার কক্ষে বসিয়া আছেন—তাঁহার দেহ ক্ষীণ, কেশ রুক্ষ, দৃষ্টি পাগলের মত। আর তাঁহার নিকট বসিয়া ছিল পপি। কখনও সে চুপ করিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, আবার কখনও উঠিয়া দুই-একবার ডাকিয়া তাঁহার বক্ষে, পৃষ্ঠে, হস্তে, পদতলে মস্তক ঘর্ষণ করিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল। করুণাবাবু তেমনি নিস্তব্ধ বসিয়াছিলেন—সহসা পপির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া

ফেলিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা অশ্রুও বহির্গত হয় নাই—এইবার বুকের জলন্ত অগ্নি অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর 'করুণাবাবু ঘরে আছেন নাকি' বলিয়া নায়েব-মশায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পপি বিকট রব করিয়া ধাইয়া আসিল। নায়েব-মশায় উপায়ান্তর না দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। করুণাবাবু তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন—'পপি, ও কি হচ্ছে?' পপি তখন শান্ত হইয়া প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। নায়েব-মশায় ভয়ে ভয়ে করুণাবাবুর নিকটস্থ হইয়া মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা! বড়ই দুঃখের কথা করুণাবাবু। ঐ একটিমাত্র ছেলেই ছিল আপনার অবলম্বন। মন কি আর প্রবোধ মানে! তা কি-আর করবেন বলুন, ভগবানের ইচ্ছাকে রোধ করে, কার সাধ্য!" এই বলিয়া তিনি ফোঁস করিয়া এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

করুণাবাবু রক্তচক্ষু মেলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া পুনরায় মাথায় হাত দিয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। নায়েব-মশায় বলিতে লাগিলেন—"অমন ছেলে কি আর হয়! একেবারে হীরের টুক্‌রো বল্লেই চলে। দুটি নয়, পাঁচটি নয়,—ঐ একটি। বড় দাগা দিয়েই গেল। আমি সঞ্জয়কে বড়ই ভালবাসতুম করুণাবাবু—কিন্তু একবার শেষ দেখাটাও দেখতে পারলুম না।" কান্নায় যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। তারপর শুষ্ক চক্ষুদুটি ঘর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কি যে বাতব্যাধিতে ধরলো আর শয্যা ছেড়ে উঠ্‌তে পারিনে। সবেমাত্র দু'তিনদিন হলো একটু বল পেয়েছি। এখন আপনার মনটা বড়ই উদাস লাগবে করুণাবাবু। আমি বলি কি আমার সেজো ছেলেটাকেই এখানে পাঠিয়ে দি। সেও সঞ্জয়ের সমবয়সী কিনা। আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাকে চিরকাল আপনার কাছেই রাখবেন, আমি তার উপর দাবী ছেড়ে দিতে রাজি আছি, বুঝলেন। আর মানুষের বিপদে মানুষ যদি সাহায্যই না করলো, সহানুভূতি না দেখালে——।

করুণাবাবু মুখ তুলিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"থামুন আপনি!" সঙ্গে সঙ্গে পপিও উঠিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। নায়েব-মশায় ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন।

প্রায় মিনিট-পনের পরই চক্রবর্ত্তী-মশায় আসিয়া উপস্থিত, তিনি কহিতে লাগিলেন—"নায়েব এসেছিল বুঝি? ব্যাটা মতলববাজ, বাস্তুঘুঘু বুঝেছেন না? ওসব মুখে দরদ দেখালে করুণাবাবু, আপনি বুদ্ধিমান লোক বুঝতেই তো পারছেন। আহা কি ছেলেই ছিল—একেবারে সাক্ষাৎ রাজপুত্তুর। কপাল করুণাবাবু—কপাল! সবই ভাগ্যের কথা। তাই তো বলে—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে! ভাগ্য চাকার মতই ঘুরছে যে। হাঁ, নায়েব তার ছেলের কথা বলে গেল বুঝি? খবরদার, সে কর্ম্মটি করবেন না। ঐটুকু ছেলে বটে, কিন্তু তার গুণ অনেক। সিগারেট, তামাক থেকে গাঁজা পর্য্যন্ত ওর চলে। তার চেয়ে আমার নাতি মহেন্দ্রকেই পাঠিয়ে দি। আহা, সত্যি কথাই তো, একা একা এই বাড়ীতে ফাঁকা ফাঁকা লাগ্‌বে না! আর নায়েব বলে কি জানেন। বলে—খুব হয়েছে, সেবার গুলি করে কুকুর-বাচ্চাগুলো সাবাড় করলো, সেই পাপের ফল ফলবে না। ছিঃ, ছিঃ, এমন কথা কি উচ্চারণ করতে আছে। আপনার মত এমন অমায়িক লোক—।"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই করুণাবাবু উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। পপিও একবার জলন্ত উগ্রদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া তাহার প্রভুর অনুসরণ করিল।

গভীর রাত্রি। করুণাবাবু কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার—শুধু আকাশে অসংখ্য তারকা জ্বলিতেছে। তিনি একবার নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন—তিনিই একাকী নন, তাঁহার সহিত পপিও কখন নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়াছে। করুণাবাবু দাঁড়াইলেন, তারপর তাঁহার প্রিয় কুকুরটিকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগ-রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—সবাই ছেড়ে গেল তুই আমাকে ছাড়বিনে রে।

তারপর এই দুইটি প্রাণী—মনিব ও পশু রাত্রের অন্ধকারে কোথায় লুকাইল, কে জানে।

বিদ্যাসমবায়

শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নেই, অথবা তার স্থান সব পিছনে,—সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা ব'লে পদার্থই নেই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বললেই হয়। এমন সময়ে হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনতে পাই অমনি উন্মত্ত হয়ে বল্‌তে থাকি পৃথিবীতে আর সকলের বিদ্যা মানবী আমাদের বিদ্যাদৈবী। অর্থাৎ আর সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ভ্রম কাটিয়ে বেড়ে উঠ্‌ছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক-মুহূর্ত্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ভ্রমলেশ-বিবর্জ্জিত হ'য়ে অনন্তকালের উপযোগী আকারে বার হ'য়ে এসেছে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে Special Creationএ তাই, এতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না; এ ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং এ-কে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; এ-কে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করতে হবে, বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণ করতে হবে না; অহঙ্কারের আঁধি লেগে একথা আমরা একেবারে ভুলে যাই যে, কোনো একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করে দিয়েছেন, এসব কথা বর্ব্বর কালের কথা। Special Creationএর কথা আজকের দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদীই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে Solitary cellএ থাকে, সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই Solitary cellএ অন্তরায়িত ক'রে রেখেছেন, একথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে ক'রে রেখেছিলাম। দু'রকম করে একঘরে করা যায়—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বললেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা, আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সঙ্কল্প হ'ল তখন তাঁর অতি-মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে তাঁকে সর্ব্বসাধারণের গোচর ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তা সকল দেশের বিদ্যা হ'তে একান্ত স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছিল, পাছে বিপুল বিশ্ব-সাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশ হ'ল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো; আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা ক'রে নিরন্তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে তুল্‌ছে সে-ই শোগুন হ'য়ে আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করছে। আমরা অন্তরিকে উদ্দেশে নমস্কার ক'রে এ-কেই প্রত্যক্ষ সেলাম করলুম; এ-কেই খাজনা দিলুম এবং এ-রই কান-মলা খেলুম। ঘরে বসে একে ম্লেচ্ছ ব'লে গাল দিলুম, এ-র শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হচ্চে ব'লে আক্ষেপ করলুম; এদিকে স্ত্রীর গহনা বেচে, নিজের বাস্তবাড়ি বন্ধক রেখে এ-র খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করবার জন্যে ছেলেটাকে নিত্য এ-র কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাতে লাগলুম।

শিশু যে, সে-ই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হ'তে তাকে রক্ষা করেই মানুষ করতে হয়। তার ঘরটি নিভৃত, তার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু তাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল ক'রে রাখি তা হ'লে উল্টো ফল হয়। অর্থাৎ যে-শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল ব'লেই পরি-পুষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে তার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্ম্মণ্য কাণ্ড-জ্ঞানবিবর্জ্জিত হয়ে উঠে। খুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হয়েচে, ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্দ্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈসর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড় জাতিই ভারতীয়ের মতন ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড় ক'রে তুলেছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হয়েচে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করবার দিন আর আর নেই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ এসেচে। সেই সমবায়ে যে-বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হ'য়ে থাকবে, সে নিষ্ফল হ'য়ে মরবে।

অতএব আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা হবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে।

তা করতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র ক'রে জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পেলে তার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হ'তে পারে। কাছের জিনিষের বোধ দূরের জিনিষের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারত-চিত্তগঙ্গোত্রীতে এ-র উদ্ভব। কিন্তু দেশে যে নদী চলছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হ'তেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলেচে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটেচে। বাহির হ'তে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন ক'রে এনেচে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করেচে, তা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভেঙে দেশকে প্লাবিত করেছে, তাকে হেসে উড়োতেও পারিনে, কেঁদে ঠেকানোও সম্ভবপর নয়।

অতএব আমাদের বিদ্যারজনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যারা ভারতকে একান্ত ক'রে দেখে তারা ভারতকে সত্য করে দেখে না। তেমনি যারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হ'তে খণ্ডিত ক'রে দেখে তারাও ভারত-চিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে না। এই কারণবশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করতে পারি নে। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যা শাশ্বত ভিত্তি তাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড় বলে জান্‌তে হবে; কারণ এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারচি নে। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পার্সি, খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজী মুখস্ত করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নয়। নেবার জন্যে অঙ্গুলিকে বাঁধ্‌তে হয়, দেবার জন্যেও;—দশ আঙুল ফাঁক ক'রে দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করলে তবে আমরা সত্যভাবে নিতেও পারব দিতেও পারব।

(বিচিত্রা—ফাল্গুন, ১৩৩৫) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

বলশেভিকবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জগদ্বিখ্যাত কার্ল মার্কস্ (১৮১৮-১৮৮৩) যে সাম্যবাদের (Socialism) প্রবর্ত্তনা করেন, তাহা সমগ্র বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নানা সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রায় প্রত্যেক দেশেই এইরূপ দুই বা ততধিক দল দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ বা নরমপন্থী, মার্কস-এর বিপ্লববাদ পূরামাত্রায় গ্রহণ করিতে রাজি নহেন—কেহ বা চরমপন্থী, আবার কেহ বা এ দুইয়ের মাঝামাঝি। রাশিয়াতে যে সমুদয় সাম্যবাদীর দল ছিল তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থী যারা তারাই বলশেভিক নামে খ্যাত। 'বলশেভিক' শব্দের অর্থ majority অর্থাৎ সংখ্যাধিক্য। সাম্যবাদিগণের কোনো একটি বিশিষ্ট অধিবেশনে একটি বিশেষ মতবাদের আলোচনায় অন্যান্য সাম্যবাদী দলের অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যাধিক্য হয়—এই ঘটনা হইতেই ইহারা বলশেভিক নাম প্রাপ্ত হয়।...

কার্ল মার্কস এর মতে কলকারখানা সৃষ্টির ফলে মনুষ্যসমাজ ধনিক ও শ্রমিক মোটামুটি এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শ্রমিকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কঠোর পরিশ্রম সহকারে যাহা উৎপাদন করে, তাহা হইতে কোনোমতে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে মাত্র এই পরিমাণ মজুরী তাহারা পায়, অথচ তাহাদেরই পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ ধনিকের ধন বৃদ্ধি করে। এই তীব্র প্রতিযোগিতায় শ্রমিকের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনত হইতেছে, আর ধনিকের ধনসম্পদ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। আবার একদল ধনিকের ধনসম্পদ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছোটখাট ব্যবসায় চালাইয়া লাভবান হইতে পারিতেছে না, কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে, যাহার মূলধন যত বেশী সে কল-কারখানার সাহায্যে তত সস্তায় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে। কাজে-কাজেই অল্প মূলধন বিশিষ্ট লোকেরা প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া ধনিকের দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া শ্রমিকের দলে পরিণত হইতেছে। এইরূপে জগতের যাবতীয় ধনসম্পদ ক্রমশঃ স্বল্পসংখ্যক ধনিকের হস্তে যাইয়া পড়িতেছে। অপর দিকে শ্রমিকের সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইতেছে, ফলে একদিকে মুষ্টিমেয় ধনিক—ভোগ-বিলাসের চূড়ান্ত—অপর দিকে দারিদ্র্য, পীড়া, অনাহার ও মৃত্যু। এক দিকে রাজপ্রাসাদতুল্য ভবনে ধনিকের দল পৃথিবীর যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আলস্যে দিন কাটাইতেছে, অপর দিকে শ্রমিকের দল দিনান্তে কঠোর পরিশ্রমের পর ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষে অশন-বসনের অভাবে কোনোমতে দুঃসহ জীবনভার বহন করিতেছে,—আলো নাই, স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই, আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই—কেবল পশুর ন্যায় বাঁচিয়া আছে মাত্র। বর্ত্তমান মানব-সমাজের এই অতিবাস্তব চিত্র অপূর্ব্ব উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় জগৎ-সম্মুখে প্রকটিত করিয়া মার্কস তারস্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন—কিন্তু ইহাই কি মানবের চরম পরিণতি? তিনি নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন—বলিয়াছেন মানবের ইতিহাসে দেখিতে পাই যুগে যুগে আর্থিক অবস্থার বৈষম্যে সমাজে এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রেণীর উদ্ভব হয়, কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম (১) শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ এবং (২) এই সংঘর্ষের ফলে অত্যাচারীর পতন ও উৎপীড়িতের উত্থান। মধ্যযুগে অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত 'সম্পন্ন' শ্রেণীর এইরূপ সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও 'সম্পন্ন' দলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান যুগে ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে—এই সংঘর্ষই মানব-সমাজের শেষ সংঘর্ষ, কারণ এই সংঘর্ষের ফলে ধনিকের তিরোভাব হইবে ও সমুদয় জগৎ শ্রমিকের করতলগত হইবে—তখন আর শ্রেণিগত বৈষম্য থাকিবে না, সুতরাং কোনো সংঘর্ষেরও সম্ভাবনা নাই।...

মার্কস এর মূলমন্ত্র ধনিক শ্রেণীকে উৎসন্ন করিয়া শ্রমিকদলের প্রতিষ্ঠা। বলশেভিকরাও এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাই যখন নরমপন্থী শ্রমিকদলের নেতা কেরেন্‌স্কি রাশিয়ার প্রথম বিদ্রোহের পরে ধনিক শ্রেণীর সহযোগে নূতন শাসন-প্রণালী গঠন করিতে লাগিলেন, তখন বলশেভিক দলের নেতারা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা মার্কস-এর মতের দোহাই দিয়া পুনঃ পুনঃ কেরেন্‌স্কিকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, ধনিকের সহিত শ্রমিকের মিলন অসম্ভব, সুতরাং ধনিককে বাদ দিয়া কেবল শ্রমিকদিগকে লইয়াই রাজ্যশাসন-প্রণালী গঠন করিতে হইবে। এইখানেই বর্ত্তমান গণবাদের (Democracy) সহিত বলশেভিকদের বিরোধ। কেরেন্‌স্কি গণবাদের দিকেই আকৃষ্ট হইলেন, ফলে বলশেভিকরা সাম্যবাদী দলের মধ্যে স্বীয় মতবাদ প্রচার করিয়া কেরেন্‌স্কিকে ক্রমশঃ হীনবল করিয়া তুলিলেন। সমুদয় রাশিয়া জুড়িয়া শ্রমিক, সৈন্য ও দরিদ্র কৃষকদলের যে-সমুদয় সংঘ বা সমিতির (Soviet) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারা ক্রমশঃ বলশেভিক মতবাদ গ্রহণ করিল। অবশেষে ৭ই নবেম্বর বলশেভিক দল কেরেন্‌স্কির মন্ত্রসভাগৃহ আক্রমণ করিল। জনসাধারণ ও সৈন্যদল তাহাদেরই পক্ষে, সুতরাং একপ্রকার বিনা রক্তপাতে বলশেভিক দল নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিল। কেরেন্‌স্কি কোনো মতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

বলশেভিকরা যে নূতন রাজ্যশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিল তাহাতে ধনিকদের কোন হাত রহিল না, কেবলমাত্র কৃষক ও শ্রমিকের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা হইল। প্রতি গ্রাম ও প্রতি

কারখানায় একটি সংঘ বা সভিয়েট স্থাপিত হইল। এই সমুদয়ের প্রতিনিধি লইয়া জিলা কংগ্রেস (Volost); জিলা কংগ্রেসের উপর বিভাগীয় কন্‌গ্রেস (Uyezd), তাহার উপরে প্রাদেশিক কংগ্রেস (Gubernia); তাহার উপরে দেশীয় কংগ্রেস, সর্ব্বোপরি রাশিয়া (Russian Socialist Federal Soviet Republic) ও অন্যান্য পাঁচটি রাজ্য মিলিয়া যে Union of Socialist Soviet Republics-এর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কংগ্রেস। এইরূপে প্রতি গ্রামে বা কারখানায় যে শ্রমিক দলের সংঘ আছে তাহাদেরই প্রতিনিধি লইয়া সর্ব্বোচ্চ ও তদন্তর্গত বিভিন্ন কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভাগুলি গঠিত হইয়াছে, ইহার কোনোটিতেই ধনিকদলের ভোট দিবার বা সভ্যপদ গ্রহণ করিবার যো নাই—কেবলমাত্র শ্রমিকদলই অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ ও জাতি-নির্ব্বিশেষে যাহারা রাশিয়া দেশে বসবাস করিয়া স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে তাহারাই এই সমুদয় অধিকার লাভ করিতে পারে। ধর্ম্মযাজকেরাও এই সমুদয় অধিকার হইতে বঞ্চিত।

এইরূপে কেবল শ্রমিকদলের প্রতিনিধি লইয়া যে কংগ্রেস বা সর্ব্বোচ্চ জাতীয় মহাসভা গঠিত হইয়াছে, তাহাই নামতঃ সমগ্র রাশিয়া দেশের রাজশক্তির কেন্দ্র ও আধার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৎসরে একবার কি দুইবারের অধিক এই মহাসভার অধিবেশন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং শাসনকার্য্য পরিচালন করিবার জন্য এই মহাসভা একটি কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচিত করেন। যখন জাতীয় মহাসভার অধিবেশন স্থগিত থাকে তখন এই সমিতির হস্তেই সমগ্র শাসনভার ন্যস্ত হয়। এই সমিতিও কিন্তু সংখ্যাধিক্য-বশতঃ (ইহার সদস্য সংখ্যা তিন শতের উপর) প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে না পারায় নিজেদের মধ্য হইতে একটি Council of People's Commissars অথবা 'সচিব সংঘ' নির্ব্বাচিত করেন। এই সংঘের প্রত্যেক সদস্য (Commissar) বিশেষ বিশেষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব—যেমন শিক্ষা-সচিব, বাণিজ্য-সচিব ইত্যাদি। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি পৃথক মন্ত্রণা-সভা আছে, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ইঁহারা নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করেন। কিন্তু মোটের উপর শাসনকার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সচিব-সংঘের উপরই ন্যস্ত। অর্থাৎ সচিব-সংঘ অনেকটা বিলাতের ক্যাবিনেটের মত, আর প্রত্যেক সচিব ভিন্ন ভিন্ন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের অনুরূপ এবং কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নামতঃ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ও রাজশক্তির অধিকারী হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বিলাতী ক্যাবিনেটের ন্যায় রাশিয়াতেও সচিব-সংঘই সর্ব্বেসর্ব্বা।...

বলশেভিকরা যে নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহাতে নিঃস্ব শ্রমিকেরা প্রকৃত রাজশক্তি লাভ করিতে পারিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যদি এই নূতন ব্যবস্থায় দেশে সুখ-শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং অধিকাংশ লোকের সর্ব্ববিধ ও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, তবে জগতে ইহার প্রবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিদ্রোহের ফলে রাজশক্তির কেন্দ্র অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে সম্পন্ন শ্রেণীর হস্তে গিয়া পড়িয়াছিল। যদি রাশিয়ার বলশেভিকদের বিরাট প্রচেষ্টা সুফলপ্রসূ হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে চিরনিপীড়িত শ্রমিক-নবজাগরণের আশা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কার্ল মার্কস্ যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইবে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ কেবল রাশিয়ার নহে, সমস্ত জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ঘটনা।

আজ দশ বৎসরের অধিক হইল রাশিয়াতে বলশেভিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দশ বৎসরে দেশের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে অতঃপর তাহাই আলোচনা করা যাউক। এই দশ বৎসরের ইতিহাসকে মোটামুটি দুই যুগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম চারি বৎসর অর্থাৎ ১৯১৭ হইতে ১৯২১, এবং পরের ছয় বৎসর অর্থাৎ ১৯২১-১৯২৭। প্রথম যুগের ইতিহাস দুঃখ দুর্দ্দশা ও চরম বলশেভিক নীতির অগ্নিপরীক্ষার ইতিহাস। এই যুগে ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্ররোচনায় ও সাহায্যে প্রাচীনতন্ত্রের কয়েকজন রাশিয়ান সেনাপতি (কোলচাক্, ডেনিকিন্, য়ুডেনিচ প্রভৃতি) বলশেভিক দলের উচ্ছেদসাধন মানসে নানাদিক হইতে রাশিয়া আক্রমণ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত বলশেভিক দল এই সমুদয় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কিনা ইহা বিশেষ সন্দেহের বিষয় ছিল। কিন্তু রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় বলশেভিকদের দলে যোগ দেওয়ায় এই সকল আক্রমণকারীর চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।... ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যে কারণেই হউক রাশিয়ার জনসাধারণ বলশেভিক দলের প্রাধান্যলাভের বিরোধী নহে এবং তাহাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠার অনুকূল। এই অন্তর্বিদ্রোহের যুগেই বলশেভিকরা চরম সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পায়। এতকাল যে-সকল মতবাদ কেবল বিচার-বিতর্কের বিষয় ছিল, কার্ল মার্কস্ তাঁহার Communist Manifesto ও Das Kapital নামক গ্রন্থে যে সমুদয় সামাজিক নীতি ও অর্থনীতির প্রচার করিয়াছিলেন, বলশেভিকরা রাজকীয় ক্ষমতালাভের অব্যবহিত পরেই সেই সমুদয় বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিল। মার্কস্-এর প্রথম নীতি সম্পন্নশ্রেণীর উচ্ছেদ ও নিঃস্ব দলের (Proletariat) অবাধ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মার্কস্ এর দ্বিতীয় মূলমন্ত্র সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পদে (ভূমি কলকারখানা প্রভৃতি) সকলের সমান অধিকার। এই নীতির অনুসরণপূর্ব্বক বলশেভিকগণ প্রাচীন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর স্বত্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া দেশের সমগ্র ভূমি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিল। কৃষকগণের সহিত ব্যবস্থা হইল যে, তাহারা চাষবাস করিয়া নিজেদের আহারের উপযোগী শস্য রাখিয়া বাকি সমস্ত সরকারে জমা করিয়া দিবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদের আবশ্যক যন্ত্রপাতি সরকার সরবরাহ করিবেন। কৃষকেরা কিন্তু সাম্যবাদের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উচ্ছেদসাধন বিষয়ে তাহারা বলশেভিকদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইল। কিন্তু তাহার পর এই সকল জমিতে তাহাদের স্বত্ব সাব্যস্ত না হইয়া, তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ শস্যে অন্যের অধিকার কেন জন্মিবে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। সুতরাং যখন বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট উদ্বৃত্ত শস্য দাবী করিলেন, তখন কৃষকগণ তাহা দিতে অস্বীকার করিল। ওদিকে খাদ্যের অভাব, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক এই উদ্বৃত্ত শস্য কাড়িয়া আনিতে লাগিলেন। কৃষকগণ মাত্র তাহাদের নিজ প্রয়োজনানুযায়ী শস্য বপন করিতে লাগিল, অবশিষ্ট জমি পতিত অবস্থায় রহিল। ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল।

অপর দিকে কলকারখানায় চরম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে অনুরূপ গোলযোগের সূত্রপাত হইল। ধনিকগণকে বিতাড়িত করিয়া শ্রমিকগণের হস্তে কলকারখানার যাবতীয় ভার ন্যস্ত হইল। সাম্যবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এইরূপে শ্রমিকগণকে কলকারখানার স্বত্বাধিকার দান করিলে তাহারা আর কেবলমাত্র ভারবাহী পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিবে না, পরন্তু নূতন দায়িত্ব ও অধিকার-

বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কার্য্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে কিন্তু বিপরীত দেখা গেল। নিজেদের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা লাভ করিয়া অনভিজ্ঞ শ্রমিকগণ দৈনিক মজুরীর হার বৃদ্ধি করিল এবং দৈনিক পরিশ্রমের সময় অনেক কমাইয়া দিল। অল্প শ্রম অধিক বেতন ইহা মনুষ্য মাত্রেরই অভিপ্রেত সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্থনীতির কঠোর নিয়মে ইহা অধিককাল স্থায়ী হইবার নহে। প্রত্যেক কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যজাতের পরিমাণ যতই কমিতে লাগিল, শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার খরচও ততই বাড়িতে লাগিল। ফলে কারখানাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। অবশেষে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই সমুদয় কারখানা চালাইবার ভার লইলেন। শ্রমিকেরা কাজ করিতে না চাহিলে জোর করিয়া কাজ করাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক কারখানায় সৈন্য বসিল, যাহাতে কেহ অলস হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিতে না পারে। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা বিশেষ সুফলপ্রসূ হইল না।

এইরূপে ১৯১৭ হইতে ১৯২১ এই চারি বৎসর চরম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টায় অতিবাহিত হইল। অবশেষে বলশেভিক দলের নেতা লেনিন এই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থনৈতিক প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহাই তাঁহার New Economic Policy (সংক্ষেপতঃ N. E. P.) নামে বিখ্যাত এবং ১৯২১ সাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রাশিয়াতে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী—চৈত্র, ১৩৩৫) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

—

সূর্য্য

...সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্র এবং সৌরজগতের সমস্ত প্রাণের মূলীভূত। যদি কোনও রূপে সূর্য্যের অবস্থান্তর ঘটে, তাহা হইলে এই বিশ্বের সমস্ত প্রাণ বিনষ্ট হইবে একথা প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা বেশ বুঝিতেন। প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিরই আদিদেবতা ছিল সূর্য্য—যেমন প্রাচীন মিশরের 'রা'—বৈদিক মিত্র, বা ইরাণীর মিথ্। শুনা যায়, প্রাচীন মিশরের এক রাজা আখেনাটেন্ খৃষ্টের জন্মাইবার ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বহু দেববাদের উপর বিরক্ত হইয়া সৌর চক্রকেই (Solar disc) ঈশ্বরের একমাত্র প্রতীক্ বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈদিক আর্য্যগণও সূর্য্যকে বিশ্বের প্রাণের উৎস বলিয়া পূজা করিতেন, আমরা গায়ত্রীমন্ত্রে তাহার উল্লেখ পাই।...

বর্ত্তমান জ্যোতিষের প্রথম ধারাবাহিক চর্চ্চা হয় মিশর দেশে এবং টাইগ্রীস ইউফ্রেটিস এই নদীদ্বয়-বিধৌত মেসোপটেমিয়া বা ব্যাবিলন দেশে। ব্যাবিলন দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণের দেবতার প্রতীক্ ছিল সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদি। এবং তাঁহারা এই সমস্ত গ্রহাদির স্থান পর্য্যবেক্ষণের জন্য বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। মন্দিরের তলগুলি থাকে থাকে উঠিত এবং এক এক তল এক এক গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইত। পরবর্ত্তীকালে ইহা Tower of Babel নামে পরিচিত হয়। এই সমস্ত মন্দিরের পুরোহিতগণ গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কাদার ফলকে লোহা দিয়া লিখিয়া তাহা শুকাইয়া বা সূর্য্যতপ্ত করিয়া রাখিতেন এবং সেই সমস্ত কাদার ফলকই ছিল তখনকার পুস্তক। বর্ত্তমানে পুরাতত্ত্ববিদ্গণের খননের ফলে এইরূপ বহু ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রায় খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০০ হাজার শতাব্দী হইতে মেসোপটেমিয়াতে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি রীতিমত পর্য্যবেক্ষিত হইত। এই সমস্ত গবেষণার ফলে প্রাচীন ক্যাল্ডীয়গণ যে-সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করেন তাহাই পরবর্ত্তীকালে হিন্দু, গ্রীক, বা চীন, বা আরবদের জ্যোতিষিক গণনার ভিত্তি। তাঁহারা বৎসরের পরিমাণ জানিতেন এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার সঙ্কেত অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎকীর্ণ ফলকে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস সম্বন্ধে যে-সমস্ত উল্লেখ আছে সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সময় নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রাচীন ক্যাল্ডীয় বা গ্রীক-হিন্দু বা আরবগণ সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আজকাল সকলেই সূর্য্যকলঙ্কের কথা শুনিয়াছেন। সূর্য্যবিম্ব জ্বলন্ত, মাঝে মাঝে উহাতে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দৃষ্ট হয়—উহাকে সূর্য্য-কলঙ্ক বলে। সৌরকলঙ্ক সূর্য্যদেহে সর্ব্বদা দেখা যায় না। এগার বৎসর অন্তর অন্তর উহারা বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয় এবং বর্ত্তমান পণ্ডিতদের মতে সূর্য্যকলঙ্কের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের বিকিরণ শক্তির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয় এবং পৃথিবীর ঋতু ও তাপমাত্রার বৈষম্য ঘটে। প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষপাঠে মনে হয় যে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ সৌর-কলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সৌরকলঙ্ককে বলিতেন "তামস কীলক" এবং তাহারা রাহুর সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইত।...

হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন যে, সূর্য্যবিম্বে কলঙ্ক দৃষ্ট হইলে পৃথিবীতে বহু অনর্থ ঘটে। ইউরোপেও দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে কোন কোন জ্যোতিষী সূর্য্য-কলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম ধারাবাহিক পর্য্যবেক্ষণ করেন,—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্ত্তক, দূরবীক্ষণের উদ্ভাবয়িতা—Galileo। সকলেই জানেন যে গ্যালিলিও তাঁহার জ্যোতিষিক আবিষ্কারের জন্য গোঁড়া পাদরীগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হন এবং পোপের বিচারে আজীবন কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে—"এই প্রবঞ্চক (অর্থাৎ গ্যালিলিও) বিমল দেহে কলঙ্ক আবিষ্কার করিয়া বিধাতার পবিত্র সৃষ্টির উপর লোকের অবিশ্বাস উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।"—সৌরকলঙ্ক আবিষ্কারের বহুকাল পর পর্য্যন্ত সূর্য্য-সম্বন্ধে তেমন বড় কিছু একটা আবিষ্কার হয় নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Schwab নামে জ্যোতিষী বহুকালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফলে আবিষ্কার করেন যে, প্রায় একাদশ বৎসর পর পর সূর্য্য-কলঙ্কের প্রাচুর্য্য ঘটে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে একটি পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ হয়—এই সময় কোন কোন জ্যোতিষী পর্য্যবেক্ষণ করেন যে, ঠিক পূর্ণগ্রাসের সময় যেন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে হঠাৎ লাল আভা মণ্ডিত আলোকচক্র ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পূর্ণ সূর্য্যগ্রাস অতি অল্পকাল স্থায়ী বলিয়া কেহ তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই।

সূর্য্য-সম্বন্ধে তৎপরবর্ত্তী গবেষণা সম্যক্ বুঝিতে হইলে দুইটি জিনিষ বোঝার দরকার—বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ-তত্ত্ব, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব। দুইটি জিনিষই আমি কিছুদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বুঝাবার চেষ্টা করিয়াছি।...

সকলেই জানেন যে, চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয় তখন চন্দ্রের ছায়ায় পৃথিবীর কতকাংশ ঢাকিয়া যায় এবং পৃথিবীর সেই অংশ হইতে সূর্য্য আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর একসূত্রে অবস্থিতি প্রত্যেক অমাবস্যাতেই ঘটে, কিন্তু চন্দ্র-কক্ষ সূর্য্য-কক্ষের সহিত এক সমতলে সন্নিবিষ্ট নয় বলিয়া তিনের অবস্থান ঠিক প্রতি অমাবস্যাতেই এক লাইনে হয় না। চন্দ্র ও সূর্য্যের কক্ষ যে দুই বিন্দুতে বিচ্ছেদ করে,

ই দুই বিন্দুতে অমাবস্যা হইলেই ঠিক গ্রহণ হয়। এই দুই পাত-দুকেই রাহু ও কেতু বলা হয়। পাঠক দেখিবেন যে, জ্যোতিষিগণ রূপে বৈজ্ঞানিক গল্পের সঙ্গতি করিয়াছেন।'

চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীকে যে বৃত্তাকারে ছেদ করে, তাহার ব্যাস ড় জোর ৫০ মাইল হইবে। এই ছায়া মিনিটে প্রায় ৮ মাইল বেগে পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং যাহারা এই ছায়ার ধ্যে অবস্থান করে, তাহারাই শুধু উর্দ্ধবয়ে ৭ মিনিটের জন্ম পূর্ণ সূর্য্যগ্রাস দেখিতে পায়। আজ যদি কলিকাতায় পূর্ণ সূর্য্যগ্রাস য়, তাহা হইলে ১৮ বৎসর ১১ মাস পর কলিকাতায় বা নিকটবর্ত্তী স্থানে আর দু'বার পূর্ণ সূর্য্যগ্রাস দেখা যাইবে। তাহার পর ৩৬০ বৎসর আর পূর্ণগ্রাস কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখা যাইবে না। প্রতি বৎসরেই সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর কোন-না-কোনও স্থানে হইতেছে, কিন্তু একই স্থানে পুনরায় পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ ঘটিতে অন্ততঃ ৩৬০ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।...

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যগ্রহণের সময় Airy এবং অন্যান্য জ্যোতিষিগণ দেখিতে পান যে, যে মুহূর্ত্তে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস ঘটে, অভিনিবেশসহকারে দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, তখন সূর্য্যদেহের প্রান্ত হইতে রক্তবর্ণ শিখা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই ব্যাপার এত অল্পকাল স্থায়ী যে, অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, উহা জ্যোতিষিগণের দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে আলোক-সাহায্যে চিত্র লওয়ার প্রথা (Photography) উদ্ভাবিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের প্রথম ফটোগ্রাফ লওয়া হয়; এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, ও রক্ত-শিখাগুলি সূর্য্যদেহ হইতেই উদ্ভূত।

কিন্তু পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সব চেয়ে অতুলনীয় দৃশ্য হইতেছে সূর্য্যের কিরীটমণ্ডল বা করোণা। করোণা মধ্যযুগ হইতেই জ্যোতিষিগণের নিকট দৃশ্যমান হইয়াছে। পূর্ণগ্রাসের সময় অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য্যের চারিদিকে হঠাৎ উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি কিরীটাকারে চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। দৃশ্যের মত অতুলনীয় দৃশ্য জগতে দুর্লভ। পূর্ব্বে যে রক্তশিখার বলিয়াছি, তাহা এই কিরীটমণ্ডলের অংশ, অল্পদূরব্যাপী। কিরীটমণ্ডলের রশ্মিগুলি বহুদূর বিস্তৃত হওয়াতে মনে হয় যেন দেহ বেষ্টন করিয়া রশ্মিগুলি একটি রাজমুকুটের সৃষ্টি করিয়াছে।

সূর্য্য-গ্রহণের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায় ১৮৫৯ হইতে। এই সনেই বর্ণচ্ছত্রের মূলসূত্র আবিষ্কৃত হয়—ষ্কার করেন জার্ম্মান পদার্থতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক কির্শফ। ১৬৮০ ব্দে এক ত্রি-শির কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক যাইতে দিয়া নিউটন তে পান যে, সাদা আলোক বিভক্ত হইয়া সাত রঙে পর্য্যবসিত এবং এই সাত রঙের আলো আবার কৌশলে মিশাইয়া দিলে য় পূর্ব্বেকার সাদা আলো পাওয়া যায়। এই পরীক্ষাটির দ্বারা ন প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সাদা আলো বিভিন্ন বর্ণের আলোর য়ে উৎপন্ন।

প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ফ্রাউনহোফার নামক জার্ম্মানীর একজন র চশমাওয়ালা নিউটনের এই পরীক্ষাটি অতি যত্নের সহিত বৃত্তি করেন। তিনি দেখিতে পান যে, বর্ণচ্ছত্র কেবল নিরবচ্ছিন্ন র সমাবেশে গঠিত নয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ র দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এইরূপ কৃষ্ণ রেখা সৌরবর্ণচ্ছত্রে আজকাল ২০,০০০ হাজারেরও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও ফ্রাউনহোফার মাত্র ২০০০ হাজার রেখাই দেখিতে পাইয়াছিলেন। বর্ণচ্ছত্রটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গের সমষ্টি দ্বারা গঠিত, এইজন্য বর্ণচ্ছত্রের বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে সূচিত করে। অতএব নিরবচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে কৃষ্ণরেখার প্রাদুর্ভাবের এই অর্থ হয় যে, যে যে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ রেখা পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানের আলোক-তরঙ্গ কোনও কারণে সেখানে পৌঁছায় নাই। এই কৃষ্ণ রেখাগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ফ্রাউনহোফার অতি যত্নের সহিত নিরূপণ করেন।

ফ্রাউনহোফারের এই সকল কালো রেখাগুলি পরবর্ত্তীকালে বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট চিত্রলিপির আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সূর্য্য-দেবতা এই লিপির সাহায্যে আপনার বাস্তব প্রকৃতির কাহিনী চতুর্দ্দিকে লিখিয়া পাঠাইতেছেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কির্শফ প্রথমে এই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

দ্রব্যমাত্রকেই উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে আলো নির্গত হয়। এই আলোক বিকীরণের শক্তি সমস্ত জিনিষের সমান নয়। যে-জিনিষ যত কৃষ্ণবর্ণ তাহার আলোক বিকীরণ করিবার শক্তিও তত বেশী। ইহার কারণ এইরূপ—

আমরা সকল বস্তুকেই তাহার প্রতিফলিত আলোক দ্বারাই দেখিতে পাই। কোনও বস্তুর উপর সূর্য্যের সাদা আলো পড়িল অথচ সেই বস্তুকে লাল দেখি কেন?—ইহার কারণ এই যে, বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টিযুক্ত সূর্য্যের সাদা আলো সেই লাল বস্তুর উপরে পড়িলে লাল রঙ ব্যতিরেকে সবুজাদি সকল রঙই সেই বস্তুটির দ্বারা অন্তর্গৃহীত হইয়া যায়। তেমনি যাহা সবুজ, তাহা শুধু সবুজ রঙই প্রতিফলিত করিতে পারে, অন্যান্য রঙ অন্তর্গ্রহণ করিয়া লয়। আবার এই সকল পদার্থ যখন উত্তপ্ত হয়, ঠিক উল্টা ফল দেখিতে পাওয়া যায়। লাল বস্তুকে উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে যে আলো নির্গত হয়, তাহাকে যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিলে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে লাল ছাড়া অন্য সব রঙই বিদ্যমান থাকে। সবুজকে উত্তপ্ত করিলে যে আলো পাওয়া যায়, তাহাতে সবুজ ব্যতিরেকে সকল রঙই পাওয়া যায়। এই সকল পরীক্ষা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে পদার্থ যে আলোক অন্তর্গ্রহণ করিতে পারে, উত্তপ্ত হইলে ঠিক সেই আলোকই বিকীরণ করে। দেখা গিয়াছে কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্তর্গ্রহণের ক্ষমতা রাখে; অতএব উত্তপ্ত হইলে ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকীরণের ক্ষমতাও বর্ত্তমান।

আমরা দেখিয়াছি যে, বায়বীয় পদার্থ উত্তপ্ত হইলে বা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় উত্তেজিত হইলে বিশিষ্ট আলোক প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ সোডিয়াম হইতে পীত আলো, ক্যালসিয়াম হইতে লাল আলো অথবা তাম্র হইতে উজ্জ্বল সবুজ আলোর বিচ্ছুরণ বলা যাইতে পারে। এই আলো বর্ণ-বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন রঙের কতকগুলি রেখা দেখিতে পাওয়া যায়—সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রের মত সাত রঙের একটা অবিচ্ছিন্ন বর্ণসমষ্টি পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বস্তুর বিশিষ্ট আলোর রেখার অবস্থান বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ যন্ত্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকে। অতএব যন্ত্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ রেখা পাইলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে বস্তু হইতে আলো নির্গত হইতেছে তাহাতে অমুক অমুক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্র বিভিন্ন।...এইজন্য বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে রেখাগুলির অবস্থান দেখিয়া সেই রেখা কোন্ মূল পদার্থের উত্তেজনা হইতে সৃষ্ট হইতেছে তাহা বলিতে

পারা যায়। এই প্রণালীতে পদার্থের বিশ্লেষণকে ইংরেজীতে Spectrum Analysis বলে। কির্শফ ও তাঁহার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকারে ৪০টি মূল পদার্থের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মনে করা যাক, আমাদের সম্মুখে একটা প্রজ্বলিত লৌহের অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে। জ্বলন্ত পিণ্ড হইতে যে আলোক বাহির হইতেছে তাহার বর্ণচ্ছত্র হইবে অবিচ্ছিন্ন। মনে করুন যে, এই জ্বলন্ত পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটা প্রজ্বলিত সোডিয়াম গ্যাসের আবেষ্টনী আছে। সোডিয়ামের বর্ণচ্ছত্রে পীত বর্ণের দুইটি রেখা বিদ্যমান। এখন দীপ্ত লৌহের আলোক সোডিয়াম গ্যাসের আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া চলিয়া আসিবার সময় তাহাতে কি প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইবে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে বস্তু যে বর্ণের আলোক বিকীরণ করে—সেই বর্ণের আলোক অন্তর্গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও সেই বস্তুতে বিদ্যমান, অতএব জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড হইতে আলোক সোডিয়াম গ্যাসের ভিতর হইতে যাইবার সময় তাহা সোডিয়াম যে দুইটি পীতরেখা বিকীরণ করে সেই দুইটি, সোডিয়াম তাহাদের অন্তর্গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, অন্তর্হিত হইবে এবং প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিলে পীত রেখা দুইটি অবস্থানের স্থানে তাহাদের অভাব হেতু কৃষ্ণবর্ণ রেখার আবির্ভাব ঘটিবে। সুতরাং ফ্রাউনহোফারের আবিষ্কৃত কৃষ্ণবর্ণ রেখাগুলির ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়াইল—

সূর্য্যদেহ একটি কঠিন ঘনীভূত জ্বলন্ত পিণ্ড। উহা হইতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রবর্ত্তী পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ন্যায় অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পের একটি আবরণ আছে। হাইড্রোজন, হিলিয়াম, লৌহ, তাম্র, প্রভৃতি বহু মূল পদার্থ এই বহিরাবরণে বাষ্পাকারে বিদ্যমান। এই আবরণটির ভিতর দিয়া যখন পিণ্ডনিঃসৃত আলোক আসে, তখন প্রত্যেক মূল পদার্থ তাহার বিশিষ্ট বর্ণ অন্তর্গ্রহণ করিয়া লয়, এবং সেই সেই স্থানে কৃষ্ণরেখা উৎপন্ন হয়।

সূর্য্যের এই বায়ুমণ্ডলের বহির্ভাগকে Chromosphere বা বর্ণমণ্ডল বলে। এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ এই যে, খালি চোখে ইহাকে উজ্জ্বল জ্বলন্ত রক্তশিখাময় বলিয়া মনে হয়। এই লাল আভা জ্বলন্ত হাইড্রোজন গ্যাস-জনিত। অন্যান্য সমস্ত বর্ণ এই লাল আভার প্রখরতা হেতু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কেন্দ্রস্থ জ্বলন্ত ঘনপিণ্ডকে Photosphere বা আলোক-মণ্ডল বলা হয়। পূর্ণগ্রহণের সময় যখন Photosphere বা আলোক-মণ্ডল চন্দ্র-দেহ দ্বারা আবরিত হয়, তখন দেখা যায় যে, বর্ণমণ্ডল হইতে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র রশ্মিরাজি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহার নাম Corona বা সূর্য্য-কিরীট। বর্ণমণ্ডল হইতে সর্ব্বদাই জ্বলন্ত লোহিত বর্ণের শিখা অতিবেগে চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উহা হাইড্রোজন বাষ্প-ময়। ইহার ইংরেজী নাম Prominences।

বর্ত্তমানে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, পরমাণু বা Atomই দ্রব্যমাত্রের সূক্ষ্মতম অংশ নয়। বর্ত্তমানে প্রমাণ প্রয়োগে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে মাত্র দুইটি আদিম পরমাণু আছে—সে দুটি হইতেছে—যোগ তাড়িতের পরমাণু বা প্রোটন এবং বিয়োগ তাড়িতের পরমাণু বা ইলেকট্রন। এই প্রোটন্ ও ইলেক্‌ট্রনের সংযোগে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সৃষ্টি। ইলেকট্রনের ওজন অতি সামান্য এবং প্রোটনের ওজন উদ্‌জানের পরমাণুর ওজনের সমান। সুতরাং প্রোটন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রায় স্থির থাকে, ইলেক্‌ট্রন উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অর্থাৎ পরমাণুকেও একটি ক্ষুদ্র সৌরজগতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রোটন সূর্য্যের মত উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত, ইলেক্‌ট্রন গ্রহের মত উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইলেকট্রনের স্পন্দনে আলোকের উৎপত্তি হয়। নানা উপায়ে ইলেক্‌ট্রনকে স্পন্দিত করা যায়—যেমন গ্যাসকে উত্তপ্ত করিলে বা উহার ভিতর দিয়া খুব জোরে তড়িৎপ্রবাহ পরিচালন করিলে সূর্য্যদেহের প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণু জগতে ইলেক্‌ট্রনগুলি স্পন্দিত হইয়া আলোকের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক পরমাণু হইতে নিজস্ব আলোক নিঃসৃত হয়।

রাসায়নিকগণের মতে জলের অণু দুই উদ্‌জানের পরমাণু ও এক অম্লজানের পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে গঠিত। বেশী উত্তপ্ত করিলে পারমাণবিক সংযোগ আংশিক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমরা শুধু উদ্‌জানের পরমাণু অথবা অম্লজানের পরমাণু প্রাপ্ত হই। সেণ্টিগ্রেডের প্রায় ২০০০ হাজার ডিগ্রী উত্তাপে এইরূপ পরমাণুতে বিভাজন সম্ভব হয়। আরও উত্তপ্ত করিলে কি হয়? উত্তর—আরও উত্তপ্ত করিলে পরমাণুও তাহার উপাদান—প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ হওয়ার পূর্ব্বে ইলেক্‌ট্রনগুলি স্পন্দিত হইতে থাকে এবং পরমাণু নিজস্ব আলো প্রদান করে। এই তাপপ্রভাবে নিজস্ব আলো উৎপাদন ও তড়িতাণুতে বিভাজনের উপপত্তি (theory) প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রবন্ধকার কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়।

পূর্ব্বে সৌর-কলঙ্কের কথা বলিয়াছি। কিন্তু তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই। সূর্য্যবিম্ব সাদা আলোকময়, সৌরকলঙ্ক তাহার তুলনায় নিষ্প্রভ, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। প্রমাণ প্রয়োগে স্থির হইয়াছে যে, সূর্য্যবিম্বের তাপমান প্রায় ৬৫০০ ডিগ্রী। কিন্তু সৌর-কলঙ্কের তাপমান মাত্র ৪০০০ ডিগ্রী। সৌর-কলঙ্কের তাপমান অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া উহাকে সূর্য্যবিম্ব অপেক্ষা নিষ্প্রভ দেখা যায়। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মত যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যেমন মাঝে মাঝে বাত্যাবর্ত্তের (Cyclone) উৎপত্তি হয়, সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলেও তেমনি মধ্যে মধ্যে বাত্যাবর্ত্তের উৎপত্তি হইয়া উক্ত স্থানে তাপমান অনেক কমিয়া যায় এবং সূর্য্যের অপরাপর অংশের তুলনায় উক্ত স্থান নিষ্প্রভ হইয়া সৌরকলঙ্করূপে দৃশ্যমান হয়। এখন প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, রুবিডিয়ম, সীসিয়ম প্রভৃতি ধাতু, যাহাদের ইলেক্‌ট্রন সূর্য্যবিম্বে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাপমান কমিলে তাহারা পুনরায় যুক্ত হইতে পারে কি না? অঙ্ক কষিয়া দেখা যায় যে, সৌর-কলঙ্কে রুবিডিয়ম ও সীসিয়ম আংশিকভাবে অবিভক্ত অবস্থায় থাকিবে, সুতরাং সৌর-কলঙ্কের বর্ণচ্ছত্রে এই দুইটি ধাতুর রেখা পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান লেখকের এই উপপত্তি আমেরিকার বিখ্যাত মানমন্দির মাউণ্ট উইলসনে অধ্যাপক রাসেল কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়। সৌর-কলঙ্কের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, সত্যই রুবিডিয়ামের দুইটি রেখা উহাতে বর্ত্তমান আছে। এই পরীক্ষা দ্বারা লেখকের তড়িতাণু বিভাজন উপপত্তি প্রমাণিতই হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইউরোপে আমেরিকায় বহু অধ্যাপক এই বিষয়ে আরও অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

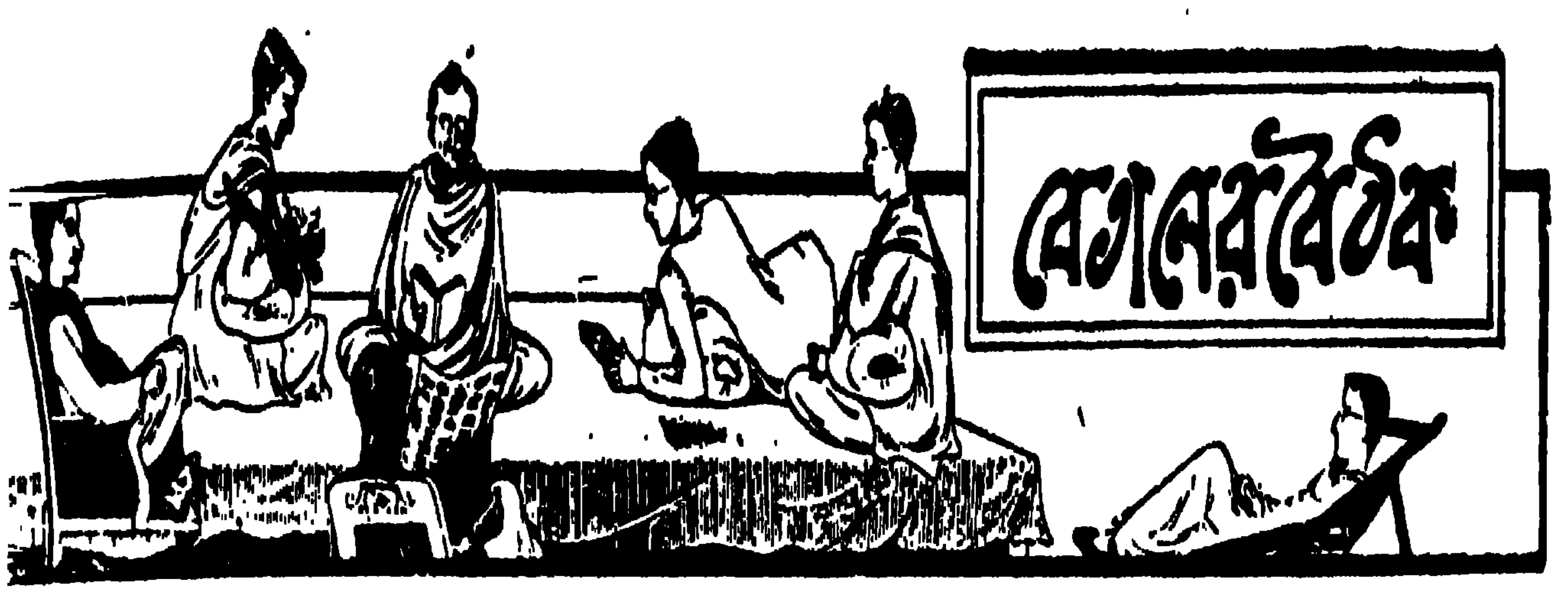

জিজ্ঞাসা

(১)

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর কোনো ইংরাজী পদ্যানুবাদ হইয়াছে না, হইলে কোথায় পাওয়া যাইবে ?

(২)

বাঙলা ভাষায় প্যারডী'র সর্ব্বপ্রথম রচয়িতা কে ? এবং সর্ব্ব-থম প্যারডী কি ? সমুদয় প্যারডী সংগৃহীত হইয়া কোনো বাঙলা বুক বাহির হইয়াছে কিনা।

(৩)

মাথায় মরা-মাস বা খুস্কি হইলে তাহা কি ব্যবহারে সম্পূর্ণ রোগ্য হইতে পারে, এবং গায়ে চুলকানি হইলে সহজোপায়ে সত্বর রাইবার কি উপায় আছে।

(৪)

পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায় সপ্তাহের ভিতর দুই-একদিন ব্যতীত ার সকল দিনই ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না-কানো কারণে ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষৌর-র্য্যের সহিত মানুষের শারীরিক, আর্থিক ও অন্যান্য বৈষয়িক কি আছে ? এই নিষেধাজ্ঞার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কিনা তাহা কি ? প্রাচীনেরা কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এ নিয়ম করিয়াছিলেন ?

(৫)

বাঙলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম কোন্ কবি স্বদেশ-প্রেমের বা জাতীয় তা রচনা করেন ? সেই কবিতাটির নাম কি ? এবং কোন্ রচিত হয় ?

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৬)

মহাভারতে মদ্রদেশবাসী মদ্রকদের বর্ণনা কয়েক স্থানে আছে। দেশবাসী মদ্রক রাজা শল্য, নকুল ও সহদেব পাণ্ডবদের মামা লন, ও রথচালন-বিদ্যাতে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ ছিলেন। এই দেশ কোথায় ছিল, মদ্রকরা কোন্ জাতীয় ক্ষত্রিয় ছিল, ইহাদের চার ও ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল ?

শ্রীঅমৃতলাল শীল

(৭)

ঈশপ্ ও বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলির মধ্যে প্রায়ই অপূর্ব্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত । তাঁহারা উভয়েই কি পরস্পরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া গল্প-লি রচনা করিয়াছিলেন ? অন্যথা কে কাহার নিকট ঋণী ?

শ্রীকালীপদ সিংহ

(৮)

আতসবাজীর উদ্ভব ও তাহার ইতিহাস বা ঐ প্রকার কোন পুস্তক আছে কি না ? যদি থাকে, তাহা কোথায় পাওয়া যাইতে পারে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

(৯)

Electric ও Mechanical Eogineering সম্বন্ধে কোন বাঙলা বহি আছে কিনা ? থাকিলে কাহার কৃত, মূল্য কত এবং কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রীসুধাংশুভূষণ ভৌমিক

(১০)

কলিকাতার মধ্যে বা নিকটবর্ত্তী জায়গায় কোথায় কোথায় অনাথ বালক-বালিকা আশ্রম আছে এবং তাহাদের ঠিকানা কি, কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

(১১)

যশোহর জেলার নামের কোনো ঐতিহাসিক তথ্য আছে কি না ? থাকিলে উহা কত প্রকার এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থে প্রাপ্তব্য ?

(১২)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ের বিস্তৃত জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি না ? হইয়া থাকিলে উক্ত গ্রন্থের সবিশেষ পরিচয় কি ? উহার মূল্য কত ও প্রাপ্তিস্থান কোথায় ?

(১৩)

ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা কে করিয়াছেন ? উহার অর্থ কি ? কোন্ কংগ্রেসে উহা অনুমোদিত হইয়াছে ?

(১৪)

বাঙালী বালক-বালিকাদের হিন্দী-শিক্ষার উপযোগী কোনো পুস্তক আছে কিনা ? উহা কোথায় পাওয়া যায় এবং মূল্য কত ?

শ্রীসরোজকুমার সরকার।

(১৫)

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বলিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ২৪৪৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল। স্মিথ সাহেব বলেন যে, ইহা ৩১০২ খৃঃ পূঃ ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, যুদ্ধটি ১০১২ খৃঃ পূঃ হয়। ইহার কোন্‌টি ? ঠিক কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তারিখটি গ্রহণ করিব ? আর কোন্ কোন্ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দ্বারা যুদ্ধের আরম্ভ ও শেষ হওয়ার তারিখগুলি নির্ণয় করিতে পারিব ?

শ্রীকুমুদবন্ধু দত্ত

(১৬)

বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া সম্প্রদায়ের পরিণতি কখন, কোথায় এবং কি ভাবে হইল, উত্তরকালেই বা ইহা কোন্ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া লুপ্ত হইয়া গেল ?

বাঙ্গলা দেশে ইহার প্রভাব কিভাবে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল ?

(১৭)

বৌদ্ধ-সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সাধন-প্রণালী এবং কায়া-সাধনের সম্বন্ধে ইংরেজী বা বাংলায় কোনো বই আছে কি—থাকিলে তাহার নাম কি, দাম কত ও প্রাপ্তিস্থান কোথায় ?

(১৮)

চর্য্যাচার্য্যে ব্যবহৃত ডিণ্ডালী, চণ্ডালী, জিনপুর, দশবল, তথতা, শূণ্যতা, করুণা, কবালী ও রজ্জালী প্রভৃতি বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বৌদ্ধ সহজিয়া মতানুযায়ী সান্ধ্যভাষায় কি অর্থ দ্যোতনা করে ?

শ্রীহরিপদ সেন গুপ্ত

(১৯)

প্রবাসীর কোনও পাঠক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে অনুগৃহীত হইব।

(ক) কৈলাস ও মানসসরোবর যাত্রার প্রকৃষ্ট সময় কখন ? সাধারণভাবে যাইতে হইলে এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে যাইতে হইলেই বা কত টাকা আন্দাজ খরচ পড়ে ?

(খ) কতজন আন্দাজ সাথী যাত্রী পথে পাওয়া যায় ?

(গ) যাওয়া আসায় (কলিকাতা হইতে) কতদিন সময় লাগে ?

(ঘ) কোথা হইতে কোন্ পথে যাইতে হয় ? কতদূর ট্রেন বা অন্য যান আছে, কতদূর হাঁটিতে হয় ? বরাবর কোনো যানাদি পাওয়া যায় কি না ? যাইলে কিরূপ ভাড়া পড়ে ?

(ঙ) সঙ্গে camp আদি লইতে হয় কি না ? সেখানে উহা ভাড়া পাওয়া যায় কিনা ?

(চ) কোনো Guide পাওয়া যায় কিনা ? যাইলে কোথা হইতে লইতে হয়, তাহাদের দক্ষিণা কত ?

(ছ) চমরী'র ভাড়া কত ? একটা চমরী'তে কত ওজন বহিতে পারে ? 'চমরীর' পিঠে মানুষে যায় কি না ?

(জ) কোনো জায়গায় passport ইত্যাদি লইতে হয় কিনা ?

(ঝ) বন্দুক বা পিস্তল সঙ্গে লইতে দেয় কিনা ? কোন্ কোন্ জায়গায় লাইসেন্স দেখাইতে হয় ? British Indiaর লাইসেন্স থাকিলে ছাড় দেয় কি না ?

(ঞ) কি কি আহার পাওয়া যায় ? পথে কোনো 'চটি' বা পান্থশালা আছে কি না, সেখানে কি কি আহার পাওয়া যায় ?

(ট) এসম্বন্ধে কোন পুস্তক পাওয়া যায় কিনা ? পেলে কত দাম, কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মীমাংসা

স্বপ্নতত্ত্ব

স্বপ্নতত্ত্ব :—এসম্বন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু সম্প্রতি "স্বপ্ন" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য ১।০, প্রাপ্তিস্থান—১৪নং পার্শীবাগান, কলিকাতা।

সাড়ে চুয়াত্তর

৭৪।০ :—এ বিষয়ে ১৩২৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসীতে' (পৃঃ ৮০ ৮১) আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সকলেই আকবর বাদশা কর্তৃক চিতোর-ধ্বংসের পর পত্রপৃষ্ঠে ৭৪।০—এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিবার প্রথা প্রবর্তন সম্বন্ধে টড সাহেবের 'রাজস্থানে' লিখিত প্রবাদ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রবাদের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সার এইচ-এম-এলিয়ট এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। (Elliot : *Supplemental Glossary*, ed. Beames 1869, vol. II, p. 68n দ্রষ্টব্য।

দাবাখেলার ইতিহাস

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আগরতলা হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা' নামক মাসিকপত্রিকার গোড়ার দিকের একটি সংখ্যায় দাবা-খেলার সুস্তিতত্ত্ব প্রকাশ করেন। *Encyclopaedia Metropolitana* গ্রন্থেও দাবা খেলার বিস্তৃত ইতিহাস দেওয়া আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অদৃশ্য কালি

অদৃশ্য কালির আমি যতগুলি প্রস্তুতপ্রণালী তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়েছি।

১। পরিমাণমত জলে কিছু নিশাদল গুলিয়া, সেই জল দিয়া অব্যবহৃতপূর্ব্ব নিবযুক্ত লেখনীদ্বারা সাদা কাগজে লেখ্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে, সে-লিপি সম্পূর্ণ অদৃশ্যরূপেই থাকে ; কিন্তু অগ্নুত্তাপে সেই কাগজ ধরা মাত্র উক্ত অদৃশ্য লিপিসমূহ ঘন বাদামী রঙে পরিবর্তিত হইয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। এক পয়সার নিশাদলে ৩,৪ বা ততোধিক আউন্স উক্ত কালি প্রস্তুত হইতে পারে।

২। পিঁয়াজের রস দিয়া সাদা কাগজে কিছু লিখিলেও তাহা অদৃশ্যরূপে থাকে ; কিন্তু অগ্নুত্তাপে ধরা মাত্র অক্ষরগুলি সুপরিস্ফুট হয়।

৩। লেবুর রস দিয়া সাদা কাগজে লিখিলেও তাহা অদৃশ্যরূপে থাকে, এবং অগ্নুত্তাপে ধরিলেই তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

৪। দুধেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

মেয়েদের ব্যায়াম

১১২নং লিউক রোড এলাহাবাদ—এই ঠিকানায় শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত "মেয়েদের ব্যায়ামচর্চ্চা" নামক পুস্তকখানি পাওয়া যায়। অথবা ১৩৩৫ সনের কার্ত্তিক মাসের স্বাস্থ্যসমাচার ও ১৩৩১ সনের আশ্বিন মাসের ১২শ সংখ্যা "নবযুগ" ২৩৩ পৃষ্ঠায় ১২, ১৩ প্রকার ব্যায়ামের বিষয় অবগত হইবেন,

ওড়িয়া সাহিত্য

ওড়িয়া সাহিত্যের বর্ত্তমান ও প্রাচীন প্রধান প্রধান লেখকগণের পুস্তক কলিকাতার নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় :—

(ক) মনোমোহন বুক সপ
৪৮, মেবুতলা লেন, বহুবাজার।

(খ) চন্দ্রোদয় প্রেস এজেন্সী ও মনোমোহন লাইব্রেরী
২৯।১ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, মেবুতলা বহুবাজার।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র কোম্পানী

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা

১। এডুকেশনাল ফিল্ম কোং লিঃ
১৫ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। দি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান্ ফিল্মস লিঃ
৪০ নং দমদম রোড, দমদম, কলিকাতা।

৩। ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস
৮ নং বাগমারী রোড, কলিকাতা।

৪। অরোরা সিনেমা কোং
৪১, কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

৫। ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড্
৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৬। পাইওনিয়ার ফিল্ম কোং
৫নং ডালহৌসি স্কোয়ার কলিকাতা

৭। মোতি প্রোডিউসার্স
জোড়াসাঁকো কলিকাতা

শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতা

ফরাসী ভাষার উচ্চারণ

ফরাসী ভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করিবার পুস্তক, পরলোকগত ডাঃ পশুপতি নাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত Easy French Reader, part 1 নামে একখানা বই আছে। বইখানা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইলেও, ফরাসী বর্ণমালা এবং শব্দাবলীর উচ্চারণ বাঙলায় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য, ফরাসীভাষার উচ্চারণ শিখিবার পক্ষে পুস্তকখানা বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। দাম ১৲ টাকা। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা সম্বন্ধীয় পুস্তক।

১। রবীন্দ্রনাথ—৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী কৃত—দাম ॥০ আনা।

২। কাব্যপরিক্রমা—৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী কৃত, দাম ১৲।

৩। রবীন্দ্রনাথের নাবত—৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, দাম ৵০ আনা। তিনখানা বই-ই ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসে প্রাপ্তব্য।

৪। রবীন্দ্র প্রতিভা—মৌলভী একরাম উদ্দীন কৃত, দাম ১৲। প্রাপ্তিস্থান—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ গুরুদাস বাবুর দোকান।

৫। রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। (কোন্ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে, সঠিক বলিতে পারিলাম না।)

৬। On the Poetry of Matthew Arnold, Robert Browning & Rabindra Nath Tagore, by A. C. Aikat, M. A. দাম ৭॥০ আনা, প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক রেভারেণ্ড টম্সনের লেখা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুইখানা বই আছে। কিন্তু বই দুইখানা আগাগোড়া বাজে কথায় পূর্ণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যত বই লেখা হইয়াছে, তাহার অপেক্ষাও ঢের বেশি আলোচনা হইয়াছে বাংলা ও ইংরেজী মাসিক পত্রিকাদিতে। তন্মধ্যে, কয়েক বৎসর আগে 'প্রবাসীতে' ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের 'রবীন্দ্র পরিচয়' নামক প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র।

শারদীয়া পূজা

সাধারণতঃ দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ—এই ত্রিবিধ পুরাণমতে শারদীয়া পূজা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের কোন্-কোন্ জেলায় মৎস্যপুরাণ (ময়মনসিংহ জিলায়) ও দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী মতেও পূজা বিহিত হয়।

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি আমরা যে দুর্গা পূজা করিয়া থাকি, (তাহাতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ—এরূপ একত্র সংযুক্ত মূর্ত্তিরূপই পূজা করি), তাহা একটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও নাই—একমাত্র "কালীবিলাসতন্ত্রে" লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ স্বরসিংহযুক্ত দেবীর আরাধনার কথা আছে।

শুঁড়ি পানা

শুঁড়ি পানা সহজে নষ্ট হইতে চায় না। তবে এক উপায়ে উহার হাত হইতে কতকটা রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। এই উপায়ে আমি নিজেই ফল পাইয়াছি। উপায়টি হইতেছে এই :—

যেখানে শুঁড়ি শুঁড়ি পানার মত জিনিষ দেখিতে পাইবেন, সেইখানেই খুব বড় বড় পানা আনিয়া ফেলিয়া দিবেন। তাহার ফলে, ঐ সকল বড় পানার গায়ে ছোট-ছোট পানাগুলি লাগিয়া যায়। তখন বড় পানাগুলি উঠাইয়া ফেলিলেই তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ছোট পানাও উঠিয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়াটি শ্রমসাপেক্ষ বটে।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নৈশবিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোনো নৈশ-বিদ্যালয় নাই। শ্রমজীবী শিক্ষাপরিষদের অন্তর্ভুক্ত ২৮টি নৈশ-বিদ্যালয় বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় ও কলিকাতায় পরিচালিত হইতেছে। উক্ত পরিষদের সভাবে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন অনেক নৈশ-বিদ্যালয়ও আছে। প্রশ্ন পাঠাইলে বা সাক্ষাৎ করিলে নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে সাহায্য করা যাইতে পারে। নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় কোনো পুস্তক আছে কিনা জানা নাই।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দে

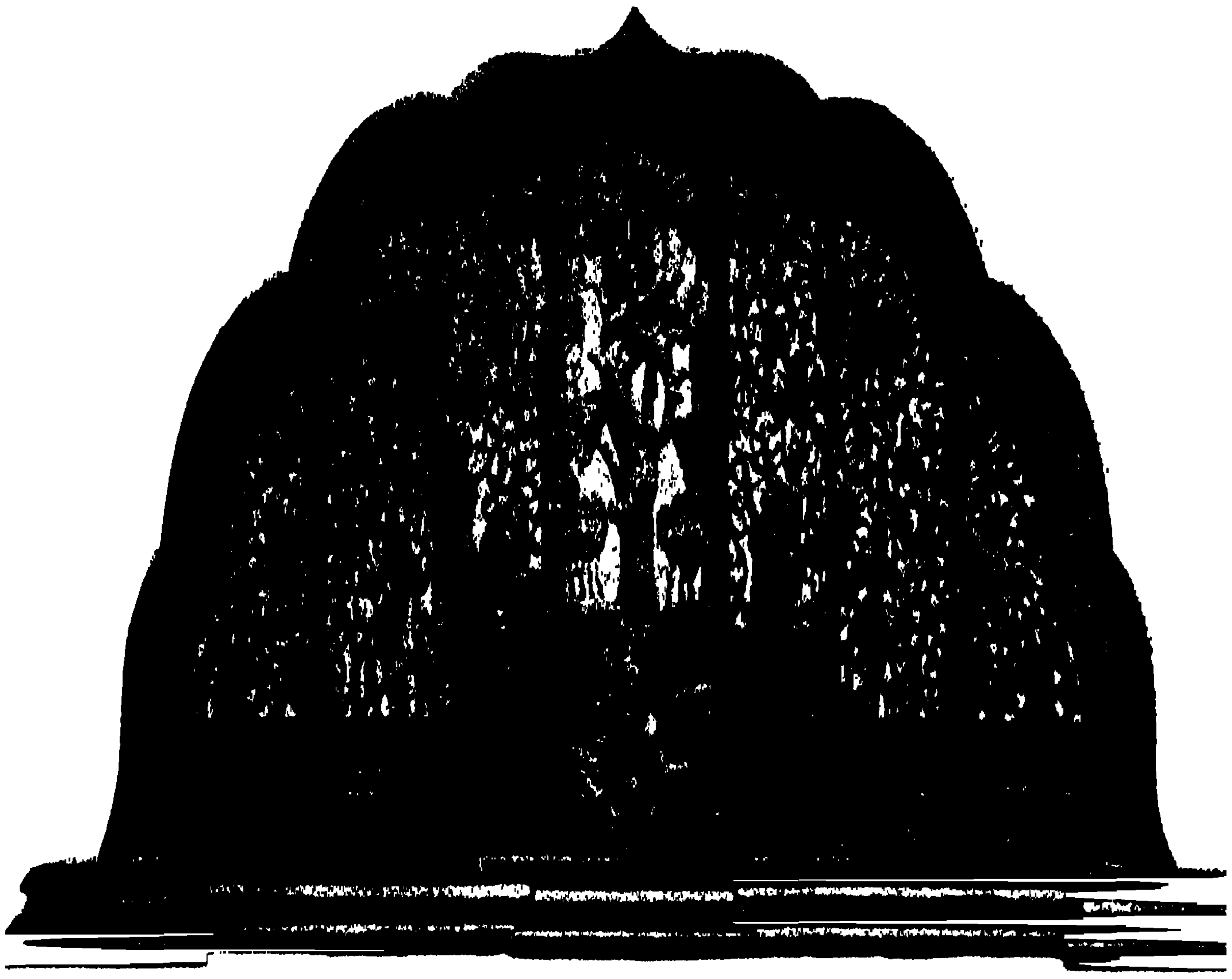

মহীশূরী চন্দনকাষ্ঠ শিল্প

কলাশিল্প

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেশে এখন রাষ্ট্রনীতির বন্যা চলিয়াছে। এখন কোনো নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে প্রথম প্রশ্ন হয় "ইহাতে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের কি বিচার আছে?" দেশের "নেতাদের" মতে এখন যুদ্ধের সময়, সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তার অবসর বা প্রয়োজনীয়তা নাই।

কৃষি, অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান. শিল্প-বিজ্ঞান, স্থপতিবিজ্ঞান, ইত্যাদি যখন এই-সকল ভাবোন্মত্ত মহারথীদিগের নিকট হেয় বলিয়া গণ্য হইতেছে তখন কলাশিল্প-সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র বোধ হয়। তবে ইংরেজীতে প্রবাদ-বাক্য আছে "fools rush in where angels fear to tread", এবং এই-সকল মহাজ্ঞানীর তুলনায় আমি যে মূর্খ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, সুতরাং এবিষয়ে দু'চারিটি কথা বলিলে আশা করি কেহ অপরাধ লইবেন না।

যুদ্ধের সময়, যুদ্ধজয়ই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহা নিশ্চিত এবং যুদ্ধের উপকরণসকলই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক বলিয়া বিচার করা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও সত্য যে, যুদ্ধ কি উদ্দেশ্যে করা হইতেছে তাহা নির্দেশ করা প্রয়োজন এবং সে উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও উচিত। যুদ্ধে জয়ী হইয়া ব্যর্থকাম হওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই—একথা সকল দেশের ইতিহাসেই স্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে।

এখন ইহাই মাত্র বিচার্য্য যে, কলাশিল্প যুদ্ধজয়ের সহায়তা করে কি না এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্য যাহা, কলাশিল্প তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে কিনা।

বিগত মহাযুদ্ধে কলাশিল্প, যথা—রঞ্জন, ইলেক্ট্রোপ্লেট করা ইত্যাদি যুদ্ধের সময়ও প্রয়োজনীয় বলিয়া ধার্য্য করা হয়, এমন কি opera পর্য্যন্ত * প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরা হয়। এই ত' গেল হিংসাযুক্ত যুদ্ধের কথা, অহিংস যুদ্ধে ত কথাই নাই!

বর্ত্তমান অহিংস যুদ্ধে এদেশবাসীর প্রধান অস্ত্র খদ্দর। এই অস্ত্র যে এখনো এদেশে বর্ত্তমান আছে তাহার প্রধান কারণ এদেশীয় তন্তুবায়শ্রেণীর কলাশিল্পিগণের চেষ্টা ও যত্ন। স্বদেশী ক্রেতা ও বিদেশী বিক্রেতার অনাদর ও শত্রুতা সত্ত্বেও যে তাহারা বাঁচিয়া আছে, এ গৌরব সর্ব্বৈব

---

* Exemption of Sir Thomas Beecham and others from compulsory militaservice. ry

চিত্রাঙ্কিত মৃৎকলস—বোম্বাই

তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের। আজ দুদিন যাবৎ "স্বদেশীর" প্রচলন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইত কেবলমাত্র গুণের কারণে।

এই শিল্পিদিগের প্রাণপণ যুদ্ধের ফলে বয়কট নামক ব্রহ্মাস্ত্র নেতাদের হস্তের সম্মুখে রহিয়াছে। নেতারা তাহা গ্রহণ করিতে উৎসুক, কিন্তু যাহাদের চেষ্টায় সে অস্ত্র নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে, এই অন্ধ ভগবানের দল তাহাদের কথা একবারও ভাবেন না।

বিলাতি সূতার বয়কট চালাইতে হইবে, অতএব বিলাতি সূতা নির্ম্মিত কাঁচি, ঢাকাই, মাদুরা, পুণা ইত্যাদির শাড়ী কাপড়ও বয়কট কর! কর মুড়িমুড়কির একদর, যাহাতে দীর্ঘশতাব্দীব্যাপী যুদ্ধক্লিষ্ট তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়, যাহাতে এদেশের তন্তুবায়গণের শিল্প-নৈপুণ্য বলিয়া আর কিছু না থাকে। বিলাতি সূতার বয়কট সফল হউক!

গল্প আছে যে, কোনও চীন-সম্রাট তাঁহার রাজধানীর অন্ধ খঞ্জ আতুরগণের দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ইহার প্রতিকার করিতে বলেন। মন্ত্রীবর ঐ সকল লোকের মাথা কাটিয়া পোড়াইয়া সমস্যা পূরণ করেন। আমাদের নেতৃবর্গের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় হয়ত বা রিজ্‌লী সাহেবের মঙ্গোলীয় মিশ্রণ সিদ্ধান্তই ঠিক।

এদেশের তন্তুবায়-শিল্প বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বিদেশী যন্ত্রের সাহায্যে বিলাতীর তুল্য সূক্ষ্ম সূতা উৎপাদনের চেষ্টা

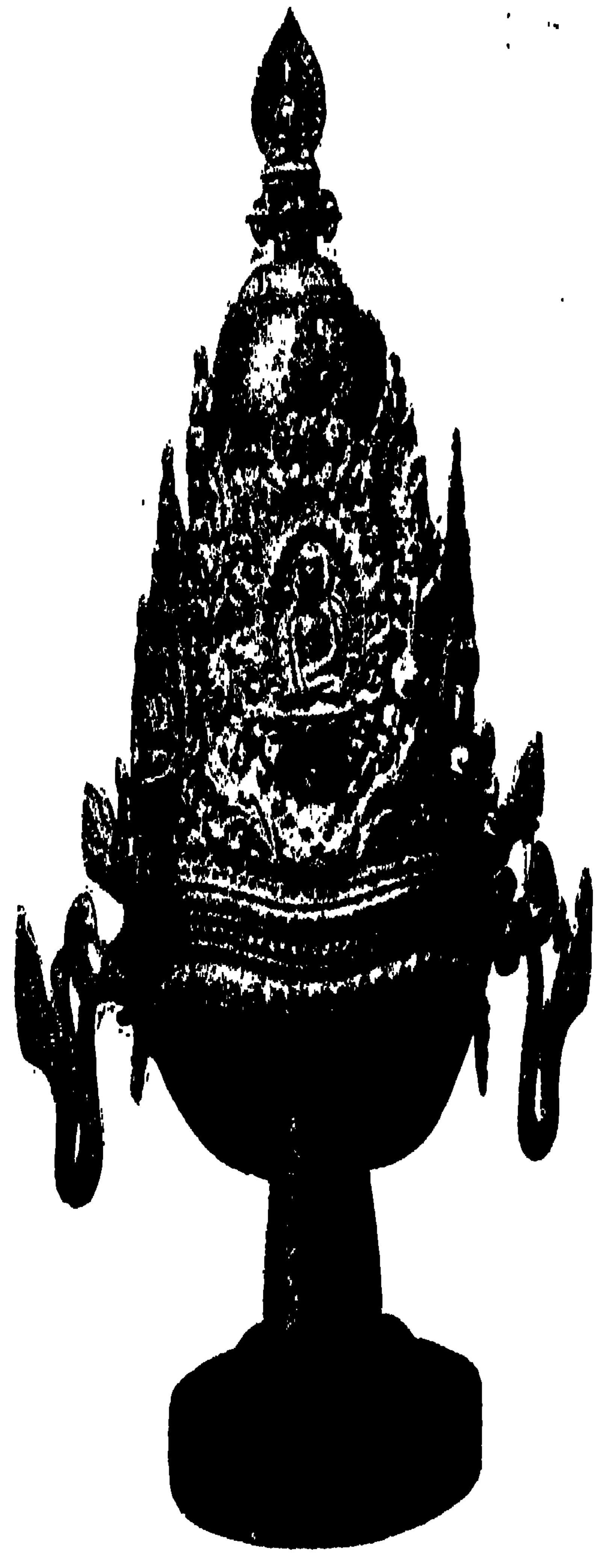

তাম্র শিরস্ত্রাণ—নেপাল

করা উচিত, তাহাতে শিল্পেরও উন্নতি হইবে, বয়কটও সহজেই চলিবে। ভাল সূতা ও ভাল খরিদ্দার পাইলে এদেশের তাঁতি এখনও বিদেশীকে সহজ প্রতিযোগিতায়

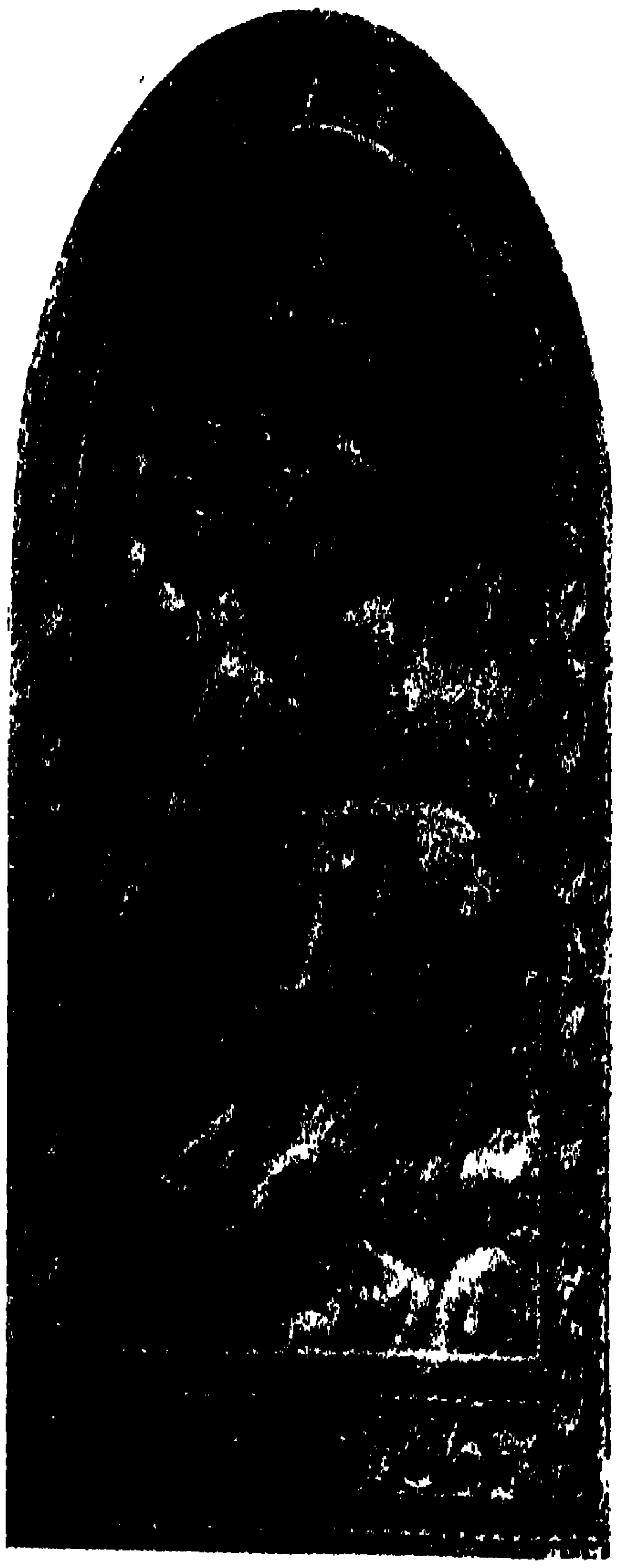

চন্দনকাষ্ঠ শিল্প—মহীশূর

হটাইতে পারে এবং তাহা হইলে দেশের স্থায়ী উপকার হইবে। বর্ত্তমান খদ্দর-অভিযানে বিলাতী বস্ত্র-বিক্রেতার অপকার হইতে পারে, কিন্তু দেশের স্থায়ী উপকার হওয়া সম্ভব নহে, কেননা ইহা ক্রমেই organized charity হইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, এই খদ্দর-অভিযানরূপ অহিংস যুদ্ধ কেবলমাত্র এদেশীয় তন্তুবায়শ্রেণীর কলাশিল্পিগণের দরুণ সম্ভব হইয়াছে। তাহারা না থাকিলে সশিষ্য মহাত্মা গান্ধী লক্ষমুদ্রাব্যয়েও একদিনের জন্ম খদ্দর-অভিযান চালাইতে পারিতেন না। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঐ তন্তুবায়দিগের মধ্যে সূতাকাটা শিল্পহিসাবে লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় আজ প্রায় দশবৎসর অশেষ চেষ্টা এবং বহু লক্ষ টাকা খরচ করা সত্ত্বেও ভাল মজবুত, সমান চরখা-কাটা সূতা এখনও এদেশে জন্মাইল না।

সুতরাং কলাশিল্প যে যুদ্ধের সহায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন দেখিতে হইবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি এবং সে উদ্দেশ্যের সহিত কলাশিল্পের কোনও যোগ আছে কিনা।

ধর্ম্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য সভ্যতার রক্ষা, ইহাই চিরকাল লোকপ্রথিত। বিগত মহাযুদ্ধেও দুই দলই জোর-গলায় তাঁহাদের যুদ্ধ "For the cause of civilization" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এদেশেও স্বাধীনতার উদ্দীপনার প্রধান উৎস আমাদের প্রাচীনকালের সভ্যতার ইতিহাস। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য যে স্বাধীন সভ্যতা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন এই সভ্যতার বাহ্যিক প্রকাশ কি?

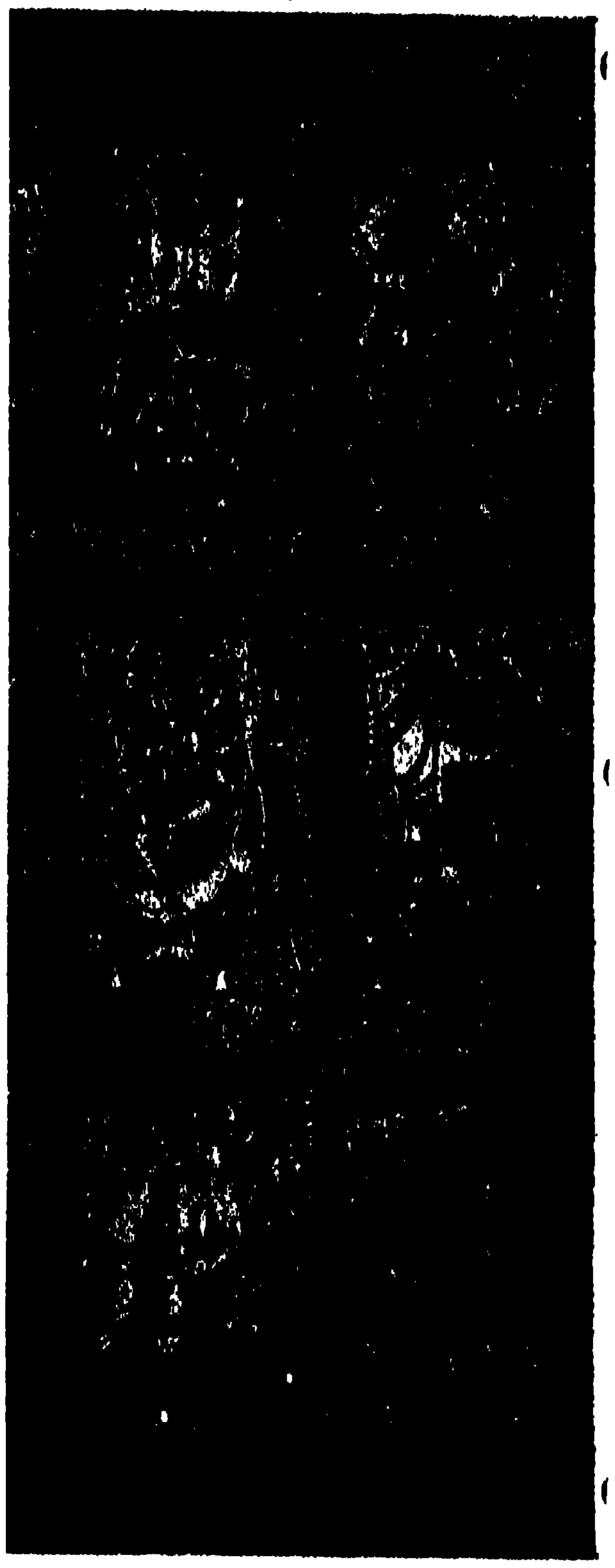

খোদিত প্রস্তরের ছাদ—খারওয়ার

জনৈক "আধুনিক" বলিয়াছেন যে, কোনও দেশের সভ্যতার পরিমাপ সে দেশের গন্ধকদ্রাবকের ব্যবহারের অনুপাতে স্থির করা যায়! যত বেশী গন্ধকদ্রাবক খরচ

তত্তই বড় সভ্যতা! অর্থাৎ রসায়ন, যন্ত্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাপারের বিস্তারই সভ্যতার প্রধান নিদর্শন।

যদি এই বিচারই ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে, এদেশ সভ্যতার পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। পাট, কার্পাস, চর্ম্ম, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদির কলকারখানা ত চারিদিকেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, রেল, মোটর, জাহাজ, —যায় এরোপ্লেন—ত দেশের সর্ব্বত্রই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, দেশ সভ্যতার চরমে পৌছাইতে আর দেরি কি?

কিন্তু এই বিচার অনুসারে আধুনিক মার্কিন দেশের তুলনায় প্রাচীন গ্রীস—এদেশের কথা ছাড়িয়াই দিই—সম্পূর্ণ অসভ্য ছিল! হোমর, ইস্কিলস্, সোক্রাটিস্, আরিষ্টটল যে-দেশে জন্মগ্রহণ করেন, যে-দেশের স্বর্ণযুগের শিল্পিগণ—ফিডিয়াস্, প্রাক্সিটেলিস্, থিব্সবাসী আরিষ্টাইডিস্ ইত্যাদি—ললিতকলার এরূপ একটি প্রবল ধারার সৃষ্টি

রৌপ্যের চা-দান—বোম্বাই

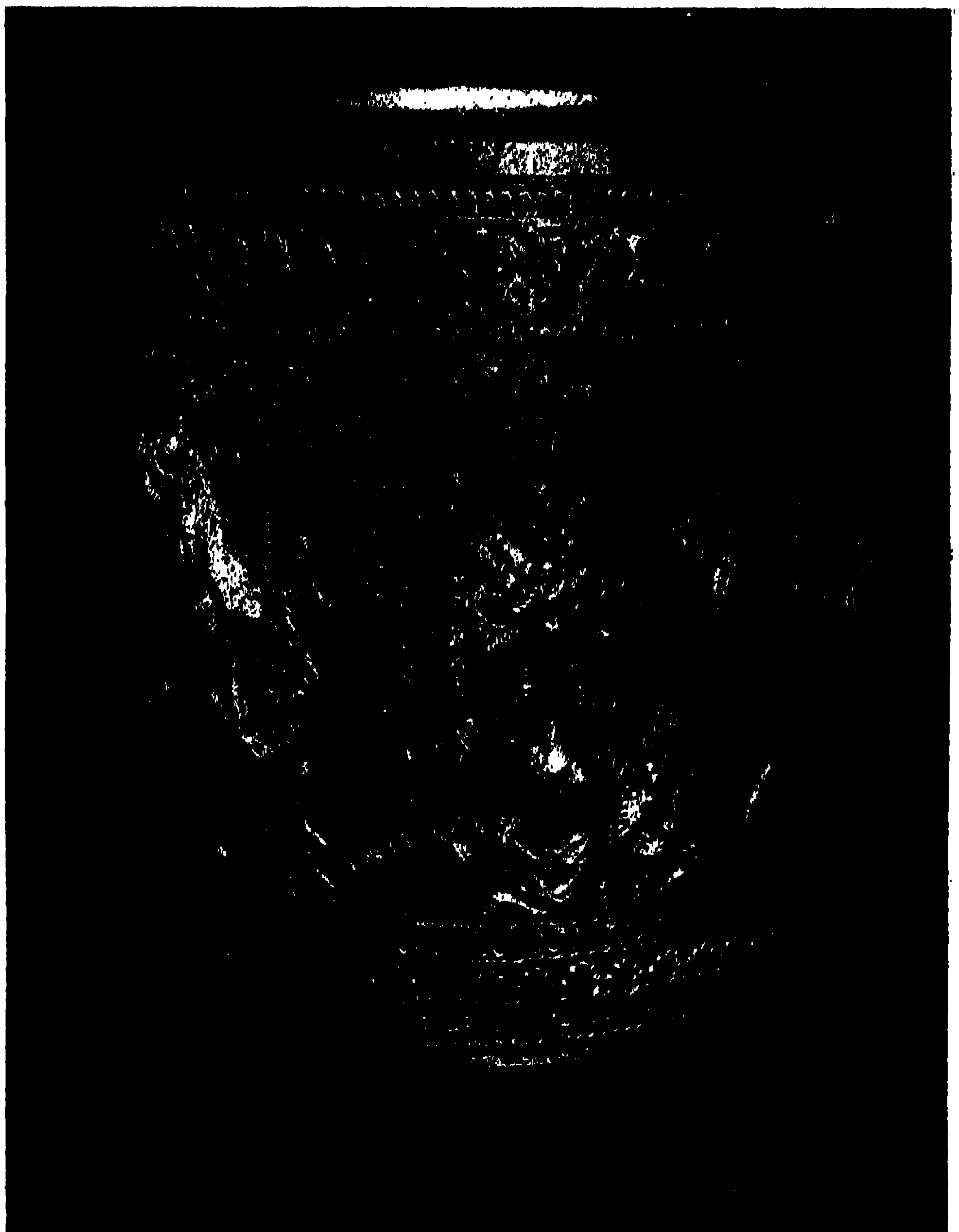

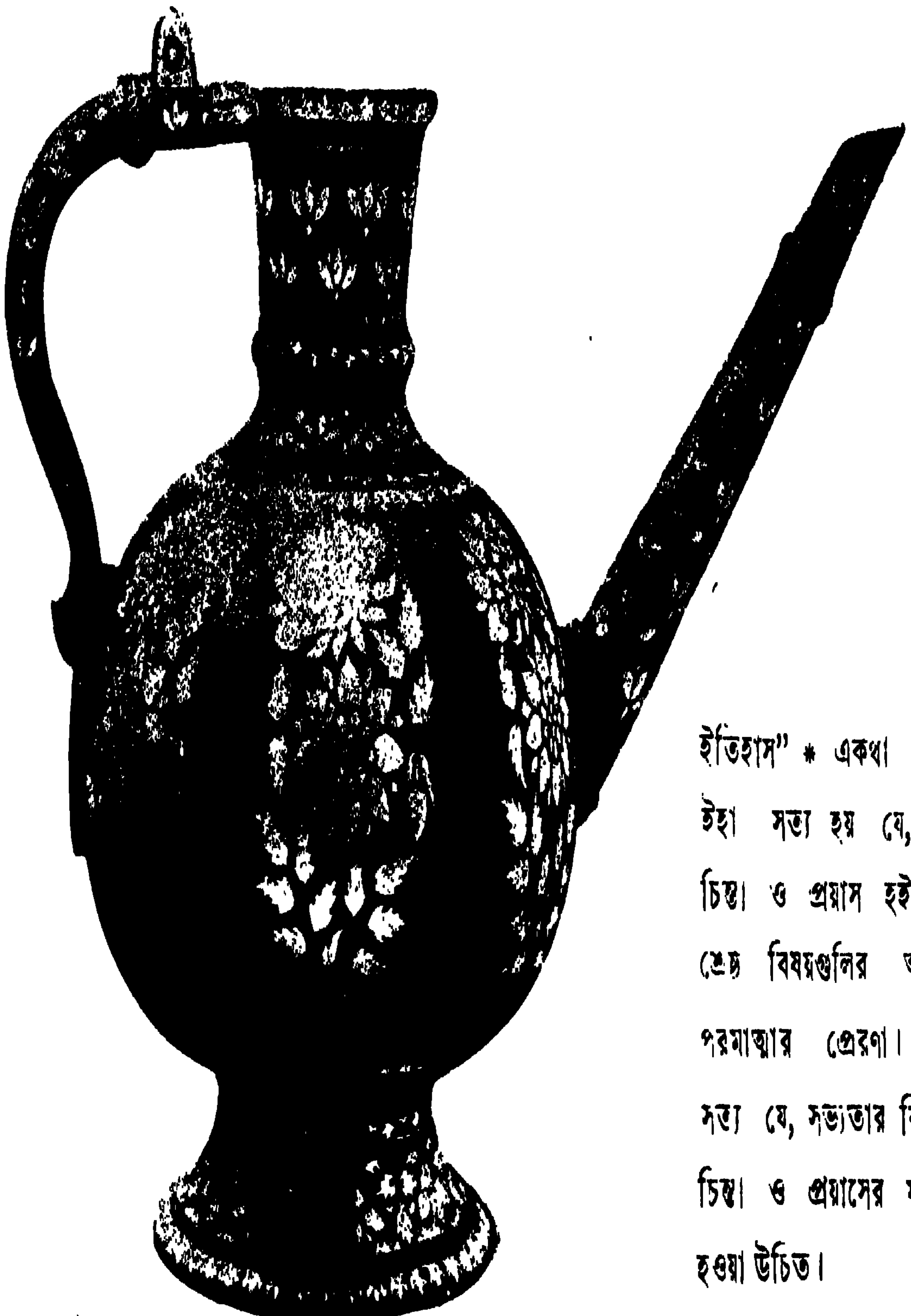

বিদরি শিল্প—হায়দরাবাদ

করেন যে, তাহার প্রবাহ আজ দুই সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সভ্য জগৎময় বহিতেছে,—সেই দেশকে অসভ্য বলা যায় কি?

সুতরাং গন্ধকদ্রাবক, খনিজ তৈল বা স্বর্ণের পরিমাপে সভ্যতার বিচার করা চলে না।

আবার একদল পার্থিবশক্তির উপাসক বলেন যে, দেশের বিজয়ী সৈন্যের দ্বারা রক্তের প্লাবনেই সে দেশে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এই যুক্তিও সত্য বলিয়া মনে করা যায় না। হূন, মোঙ্গল, তাতার, ইহারাও ত নিজ নিজ যুগে প্রচণ্ড বিক্রমে দেশের পর দেশ জয় করিয়াছিল, উহাদের সভ্যতার কি পরিচয় পাওয়া যায়? ফিনিশিয়গণের সংগ্রাম-শক্তির লেশমাত্র ছিল বলিয়া জানা যায় না, কিন্তু তাহাদের সভ্যতার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ আছে কি? তবে সভ্যতা কি?

"জড়জগতে পরমাত্মার ভ্রমণ-কাহিনীই সভ্যতার ইতিহাস" * একথা সত্য—যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষের চিন্তা ও প্রয়াস হইতে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলির আদি উৎস পরমাত্মার প্রেরণা। এবং ইহাও সত্য যে, সভ্যতার বিচার ঐরূপ চিন্তা ও প্রয়াসের ফল হইতে হওয়া উচিত।

কোনও রাষ্ট্র তাহার পার্থিব শক্তির প্রভাবে বিশাল সাম্রাজ্য, অগণিত অর্থ এবং অজেয় সেনানীর সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সে জাতি সভ্যজগতে তবেই স্থান পাইবে যদি তাহার জীবনকালে সে জগতকে কলা শিল্প সাহিত্য বা ঐরূপ চিন্তাপ্রয়াসপ্রসূত কিছু দিতে পারে যাহাদ্বারা মানব-জগৎ উন্নত ও বিশুদ্ধ হয়। এই হিসাবে, বালাওয়াটের কপাট শালমানসেরের বিজয়-অভিযান হইতে এবং পার্থেনন মন্দির আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় অপেক্ষা অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিজয়ী জঙ্গীস খাঁর নাম ছায়ায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মিলোসের আফ্রোডাইটির মর্ম্মরমূর্ত্তি এখনও জীবন্ত প্রেরণারূপে বিরাজ করিতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কলাশিল্প, সাহিত্য ইত্যাদিকে

* "The history of a civilization is the history of the travels of the Holy Ghost through Matter" *What Art Is*—O. W. F. Lodge.

এত উচ্চে স্থান দিবার কি প্রয়োজন, ঐ সকল দ্বারা মানব-জীবনের মূল্য সমস্তাগুলির কোন্‌টির পূরণ হইতে পারে? সভ্যজগতের সম্মুখে বাস্তবরূপ যে বিষম বাধা রহিয়াছে, কলাশিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি কল্পনাপ্রসূত ছায়াময় ক্ষণভঙ্গুর বা অমূর্ত্ত পদার্থ তাহার অপসারণে কি সাহায্য করিতে পারে?

ইহার উত্তর এই যে, জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ম্মাতা যদিও বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিশারদ, অর্থনীতিবিদ্‌ ইত্যাদি বিশেষজ্ঞগণ, কিন্তু ঐ সকল মন্দিরের রূপকল্পনা, এবং কোনো কোনো স্থলে ভিত্তি-স্থাপন—সুতরাং উহাদের জন্ম—প্রথমে হয় কলাশিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি অমূর্ত্তব্যবসায়ী স্বপ্নদ্রষ্টাগণের মানসচক্ষে।

এইরূপে রসায়নের বিস্তার হয় স্পর্শমণির অন্বেষণ হইতে, ও বিরাট আনিলিন কারবারের জন্ম হয় ভারতীয় রঞ্জনশিল্পীর কুটিরে। পূর্ত্তবিজ্ঞান ও মানশাস্ত্রের জন্মদাতা যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কলাবিদ্‌ স্থপতি ও নগরনির্ম্মাতা ইহা তো সর্ব্বজনবিদিত।

কাশ্মীরি শাল

সুতরাং জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানের স্থান যতই উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হউক, কলাশিল্প ইত্যাদির স্থান যে তাহারই পার্শ্বে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—বাস্তববাদিগণ যাহাই বলুন।

ইহাও সত্য যে, বাস্তবের পূর্ণপ্রকাশ কল্পনা-রাজ্যবিহারী স্বপ্নদ্রষ্টাদিগের নিকটই হইয়া থাকে—যখন এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের স্বপ্নাবিষ্ট চক্ষে অলৌকিক প্রেরণার আলোক আসিয়া পড়ে। এবং ঐ সকল পলকদৃষ্ট স্বপ্নময় ইন্দ্রজালের সাকার প্রতিরূপের মধ্যেই বাস্তবের পূর্ণ বিকাশ হয়। কোনার্কের সূর্য্যরথ, মমতাজের সমাধি-মন্দির উভয়ই বাস্তব, কিন্তু উহাদের জন্ম স্বপ্নের মায়াজালের মধ্যে—ইহাতে কি সন্দেহ আছে?

ব্যাধ নিষ্পন্দ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলে অতি সতর্ক শিকারও তাহার নিকটে নিঃসন্দিগ্ধভাবে আসিয়া পড়ে, ঐরূপে বাস্তব আমাদের নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমাদের

চক্ষুর অগোচর থাকে যতক্ষণ না শিল্পী বা ভাবুকের দিব্য দৃষ্টিরশ্মির ঝলকে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সুতরাং ভাবুক ও শিল্পী উভয়েই যে জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক, এ সত্য প্রশ্নের অতীত এবং যে-দেশে উঁহাদের আদর নাই সে-দেশ যে অব্যর্থ লক্ষ্যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে ইহাও সত্য।

অতএব বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি এদেশের সভ্যতা রক্ষাই হয়, তবে এদেশের কলাশিল্পের প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ইহা নিঃসন্দেহ।

এখন দেখা যাউক কলাশিল্প-পর্য্যায়ে সভ্যজগতে এদেশের কি স্থান ছিল। এ সম্পর্কে ভারতপ্রেমিক বিদেশীয়গণের মতামত না দেওয়াই ভাল, কেননা তাহাতে নিরপেক্ষ বিচার নাও হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ শিল্পকলাবিদ জন রস্কিন তাঁহার *Two Paths* নামক পুস্তকে বলেন :—

"এই প্রতিষ্ঠানে (কেনসিংটন মুাজিয়ম্) আপনাদের সম্মুখে যে-সকল দ্রব্য আদর্শরূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং এই রাজ্যে (ব্রিটিশ) শিল্পকলার পরিকল্পনা শিক্ষার জন্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে সকলে স্থিত আদর্শগুলির মধ্যে, ভারতীয় আলেখ্যমণ্ডিত দ্রব্যাদি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়; বর্ণপ্রয়োগের উপযোগী সকল উপাদানেই, পশম, মর্ম্মর, ধাতু ইত্যাদি—যে-সকল দ্রব্য প্রস্তুত এবং সত্য সত্যই সূক্ষ্ম বর্ণচ্ছায়া ভেদে এবং অপরূপ রেখাপাতের সুন্দর বিন্যাসে ঐ সকল দ্রব্য অতুলনীয়। উঁহাদের (ভারতীয় শিল্পীদের) পক্ষে এইরূপ কারুকার্য্য কষ্টসাপেক্ষ বা বিরল নহে, ঐ জাতির মধ্যে গূঢ় পরিকল্পনাপ্রিয়তা সর্ব্বসাধারণ-ব্যাপক এবং তাহাদের প্রত্যেক যন্ত্র ও প্রত্যেক গৃহ নির্ম্মাণমধ্যে উহা দেখিতে পাওয়া যায়।"

যদি বা কেহ রস্কিনকে হ্যাভেলের ন্যায় ভারতপ্রেমিক ও পক্ষপাতিত্বদোষে দুষ্ট বলেন, এইজন্য ঐ পুস্তক হইতেই সিপাহী বিদ্রোহ-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত দিলাম :—

"এ পৃথিবীতে মানবজাতির পাপজীবনের আরম্ভকাল হইতে এতদূর পশুত্বের প্রকাশ—পশু অপেক্ষাও হীনত্বের প্রকাশ—কোনও কার্য্যে হয় নাই, যেরূপ ভারতবাসীদিগের গত বৎসরের আচরণে হইয়াছে।"

রৌপ্য থালকোশ—ব্রহ্মদেশ

আওয়েন জোনস্, যাঁহার *Grammar of Ornament* নামক পুস্তক এখনও প্রসিদ্ধ, লিখিয়াছেন :—

"১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনী আরম্ভ হইবামাত্র সকলের দৃষ্টি ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত হইয়াছিল।

"ঐ সকল দ্রব্যে আলেখ্য-অলঙ্কার প্রয়োগ সর্ব্বদাই অতি সমীচীনভাবে হইয়াছে।

"জমির উপর অলঙ্কার-প্রয়োগের সমতায় ভারতীয়গণ আশ্চর্য্য বিচার-বুদ্ধি ও অঙ্কনক্ষমতা দেখায়।

"সবুজ ও লাল জমির উপর সোনার চিকনের কাজ এতই নিখুঁত ও সমভাবযুক্ত যে উহার যথাযথ অনুকরণ করাও ইয়োরোপীয় শিল্পিগণের অসাধ্য।"

চিকন-করা কাবলা—কচ্ছ প্রদেশ

আর একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে অভিমত দিলাম :—

"ভারতীয় শিল্পিগণের প্রাচ্যজাতি-সুলভ একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে যাহার প্রভাবে প্রকৃত কলা-দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং এখনও, বিদেশী প্রভাব-দুষ্ট না হইলে, তাহাদের মধ্যে ঐ অসাধারণ গুণ দেখা যায়।"*

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও এদেশের শিল্পকলার গৌরব জগদ্ব্যাপী ও অত্যুচ্চ ছিল এবং ইহার ক্ষেত্র যে কিরূপ প্রশস্ত ও বিস্তৃত ছিল তাহাও জগদ্বিখ্যাত।

জয়পুরের মিনা; কাশ্মীরের শাল; ঢাকার মস্‌লিন; কাশ্মীর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও সিংহলের স্বর্ণ রৌপ্য ও জড়োয়া গহনা ও বহুমূল্য তৈজসপত্র; মুর্শিদাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর ও সিংহলের গজদন্তশিল্প; সাহারানপুর, মহীশূর

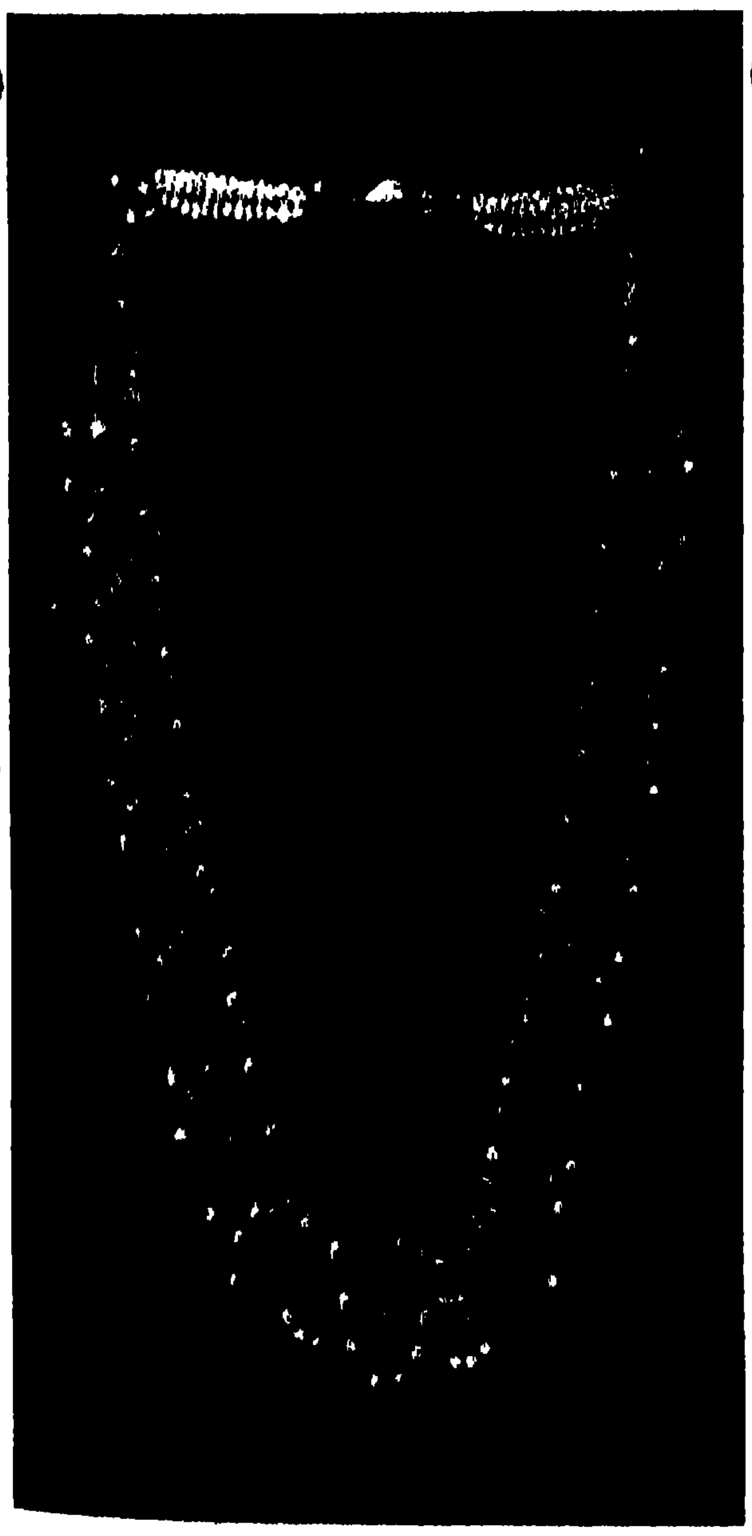

স্বর্ণের কণ্ঠমালা—মান্দ্রাজ

* *Suggestions in Design*—John Leighton, F. S. A. and James K. Colling, F. R. I. B. A.

মিনা—জয়পুর

ও পেশোয়ারের কাষ্ঠশিল্প; ওয়ারাঙ্গাল, জয়পুর ও দিল্লীর "দামস্কস্" কাজ; বিদার ও লক্ষ্ণৌয়ের বিদরি; নেপাল, পেশোয়ার, কাশ্মীর, খাগড়া, মান্দ্রাজ ইত্যাদি স্থানের পিত্তল ও কাংসের কাজ; লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর সাঁচ্চা ও সল্মা চুমকি, এ সকল একদিন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না কি?

এখন দিনকাল এমনই খারাপ যে, হয়ত আর কিছুদিন পরেই ভারতের অগণ্য লুপ্ত গৌরবের ন্যায় এ সকল সম্বন্ধেও

যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতা উত্তরকোশলা

বলিয়া বিলাপ করিতে হইবে।

সত্য বটে এদেশ দরিদ্র, বিলাস-সামগ্রী কিনিবার সামর্থ্য এস্থানের অল্প লোকেরই আছে, কিন্তু দেশে ধনী বা বিলাসী কি কেহই নাই। সাধারণ মধ্যবিত্তের গৃহে কি কোনও দ্রব্য থাকে না, যাহার অস্তিত্বের কারণ প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে? বিবাহ যৌতুকাদিতে কি কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক পদার্থই দেওয়া হয়?

এদেশের শিল্পকলার পতনের কারণ অর্থের অভাব নহে। উহা কেবলমাত্র শিক্ষা ও সুরুচির অভাব। তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে "বহুমূল্য" নকল শেরাটন, এম্পায়ার বা চিপেন্‌ডেল জাতীয় আসবাব যথেষ্ট দেখা যায়, গৃহের কর্ত্তার এ জ্ঞানবুদ্ধি বা বিবেচনা নাই যে, ঐ অর্থব্যয়ে খাঁটি এদেশী মূল্যবান শয্যাসন প্রস্তুত হইতে পারিত যাহা তাঁহাদের দেবতা বিদেশী বিশেষজ্ঞও প্রশংসা করিতেন। এখন যে-সকল বিদেশী দ্রব্যে তাঁহারা গৃহের শোভাবর্দ্ধন করেন, সে-সকল পদার্থ—কি আসবাব, কি অন্য সজ্জাকারী দ্রব্য—বিশেষজ্ঞের হাস্যোদ্রেক ভিন্ন অন্য কিছু করে না। আমাদের দুরবস্থা এই যে, "বড় সাহেব" নামক প্রাণিগণ যা করেন তাই শোভা পায়; তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯জন যে কি প্রকার অশিক্ষিত তাহা কে জানে? এই মহাত্মারা এদেশ ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহাদের আসবাবপত্র সমস্তই নিলাম হয়। ঐসব নিলামে বহু সহস্র টাকা মূল্যের আসবাব, মোটর, ছবি, চীনামাটির দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য আসে, কিন্তু পুস্তকাদি

বা সে সকল রাখিবার উপযুক্ত আলমারি কচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়!

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এস্কুইথ তাঁহার আত্মজীবনীতে ইংলণ্ডের এক হাইকোর্টের জজের কথা লিখিয়াছেন। এই জজবাহাদুর একবার একদলের সঙ্গে শিকারে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি এস্কুইথকে গর্ব্ব করিয়া লিখেন যে, তাঁহাদের সমস্ত দলের মধ্যে কাহারও কাছে একটিও পুস্তক নাই ("Not a single d—d book amongst the lot of us")। এস্কুইথ এই ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর লোকেরা নিজের কাজ ভাল জানিলেও সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। এস্কুইথ যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (illiterate) তাহার অর্থ "নিরক্ষর"। এই ত খাস্ বিলাতী বড়সাহেব-সম্বন্ধে বিলাতী বিশেষজ্ঞের অভিমত। তাঁহাদের ঔপনিবেশিক সংস্করণ যে কিরূপ জীব তাহা এদেশে এস্কুইথের ন্যায় স্পষ্ট বক্তা না থাকায় প্রকাশ পায় নাই।

এখন ত বর্জ্জনের মন্ত্র অনেকেই উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছেন। ফল কি হইবে জানি না, কিন্তু বোধ হয় যে, যেরূপে বর্জ্জন-নীতি প্রচারিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশীয় পণ্য ও শিল্পদ্রব্যের গুণকীর্ত্তন ও যথাযথভাবে তাহার ব্যবহারে দেশের উপকারের কথা অল্পমাত্রায়ও বলা হয়, তবে তাহা স্থায়িভাবে সফল হইতে পারে।

খদ্দর ত রাজনীতির সাহায্যে জাতে উঠিয়া পৈতার সামিল হইয়া গিয়াছে। তবে তাহা "আটপৌরে" দ্রব্যের ন্যায় সুলভ ও স্থায়ী নহে এবং সৌখিনের ব্যবহার্য দ্রব্যের ন্যায় সুন্দর ও কলাশিল্পগুণযুক্তও নহে, সুতরাং তাহার আয়ুষ্কাল কত তাহা বলা কঠিন। কিন্তু দেশে অন্য জাতীয় অনেক প্রকার সামগ্রী এখনও প্রস্তুত হয় যাহা গুণ ও মূল্য হিসাবে এখনও বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে,যথা—কাংস পিত্তল ও কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

এসকল যাহারা প্রস্তুত করে সেই শিল্পীদিগকে অল্পমাত্রায় উৎসাহ দিলে এবং বিদেশী যন্ত্রপাতি ও বিদেশী কার্য্যপ্রথা তাহাদিগকে যথাযথভাবে শিখাইলে, অর্থাৎ খদ্দরের ন্যায় তাহাদেরও শুদ্ধির বন্দোবস্ত করিলে—দেশের সভ্যতা এবং জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে।

তারকার জন্ম

শ্রীগোপাল হালদার

অবশেষে একদিন এই একান্ত-অপরিচিত গ্রামখানায় আসিয়া নামিলাম।

প্রথম প্রথম স্কুলের কাজ চুকিয়া গেলে আমি আমার ছোট ঘরের তক্তপোষের উপর পড়িয়া একবার অতীত দিনের সামান্য স্মৃতিগুলিকে মনে মনে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতাম। নগণ্য জিনিষ, তুচ্ছ কথা, ঘটনার অর্থহীন টুক্‌রা, ক্ষণিকের চাহনি, বন্ধুর লঘুহাস্য, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ-সম্ভাষণ মনের অযত্নবিন্যস্ত ভাণ্ডারে কখন কোনটি জমা হইয়াছিল জানা নাই। এই নূতন জীবন-যাত্রার নিঃসঙ্গতার মধ্যে ইহাদের যেন নূতন করিয়া পাইতাম—চিরদিনকার আত্মীয় যেন পাশে আসিয়া বসিত।

সপ্তাহ-দুই পরে আর অবসর পাইতাম না। জগদীশ-বাবুর ভৃত্য মধুসূদন আসিয়া জানাইত—চা প্রস্তুত। স্মৃতির চিত্রশালার আর দ্বার খুলিবার অবসর থাকিত না, শহরে জীবনের ছিন্ন স্বপ্নগুলি দিয়া আর অপরাহ্ণের শূন্যতা ভরিবার প্রয়োজন হইত না। যাই—বলিয়া উঠিয়া মধুর অনুসরণ করিতাম।

নারিকেল গাছের ফাঁকে জগদীশবাবুর বাড়ী দেখা যায়। নদীপারের প্রকাণ্ড মাঠের সম্মুখে স্কুলের ঢেউ-

খেলানো টিনের লম্বা ঘর। মাঠের একপার্শ্বে নারিকেল গাছের আড়ালে হেড্‌মাষ্টার জগদীশবাবুর বাড়ী,—খান-তিনচার ছোট ও মাঝারি টিনের ঘর, আর এক পার্শ্বে, বাঁশবনের সম্মুখের বাড়ী এসিষ্টেন্ট হেড্‌মাষ্টার আমার,—খানদুই নাতিবৃহৎ ঘর।

মাঠ পার হইয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া বসিতাম। জগদীশবাবু ডাকিতেন, "নিমু মা, পরেশবাবু এসেছেন। চা-টা"-কন্যা নির্ম্মলা চা লইয়া আসিত। যে-দিদি মাতৃহীনা এই মেয়েটি ও পত্নীহীন এই বৃদ্ধটিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, চা'এর উপর তাঁহার নিরতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু, ভাগ্যক্রমে নির্ম্মলা চা তৈয়ারীতে হইয়া উঠিল সুপটু; তাই জগদীশবাবুর অসুবিধা হইল না—এমন কি চা-রসিক পাইলে জোর করিয়া তাহাকে নিজ গৃহে সন্ধ্যায় চা না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু বেশী দিন কেহ এই সদাব্রতের সুখ ভোগ করিতে স্বীকৃত হইত না; তাহার কারণ চা'এর সঙ্গে এই সময়ে অতিথিকে জগদীশবাবুর তত্ত্বকথাও পান করিতে হইত।

সপ্তাহ দুই গেল। তারপর চা'এর পেয়ালাটি আগাইয়া দিয়া জগদীশবাবু আমাকেও বলিতে সুরু করিতেন 'তারপর'—

তারপর আর কিছু নয়, সেই পূর্ব্বদিনকার আলোচনা —দেহবিচ্যুত মানবাত্মা দেহাতীত সত্তা লইয়া কোথায় অবস্থান করে, কিরূপে পৃথিবীর এক একটি স্মৃতি ও সংস্কারের নির্ম্মোক খসিয়া যায়, কিরূপে লঘু স্বচ্ছ তরঙ্গায়িত বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া সেই মানবাত্মা অনন্ত শূন্য পারাবারে ভাসিয়া ভাসিয়া চিরস্বচ্ছ চিরানন্দময় শান্তিলোকে আসিয়া পৌঁছায়। সেই আত্মা চিরঅম্লান, চিরজ্যোতিঃস্নাত, সৌর-কিরণের নিত্যঅভিষেকে তাঁহার শান্ত সমাহিত শক্তি, তাহা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববিসপিত চেতনাসমৃদ্ধ! আমি শুনিয়া যাইতাম, কৌতুক ও কৌতূহল বাড়িয়া উঠিত, মাঝে মাঝে সহজ অনাস্থায় দুই একটি প্রশ্ন করিয়া বসিতাম। সস্নেহে হাসিয়া বৃদ্ধ বলিতেন, "নিমু আর দু' পেয়ালা চা"—তারপর আবার আমার সন্দেহ-নিরসনে প্রবৃত্ত হইতেন।

নির্ম্মলা দুয়ারের পার্শ্বে বসিয়া অতৃপ্তকর্ণে শুনিত, পিতার ডাকে তাহার চমক ভাঙিলে উঠিয়া চা'এর ব্যবস্থা করিতে যাইত। খানিক পরে চা লইয়া আসিয়া আবার পূর্ব্বস্থানটিতে নিবিষ্টমনে বসিয়া পড়িত। দুয়ারের আড়ালে মাটির উপর তাহার একখানা হাত দেখা যাইত, মাঝে মাঝে মুখের একটি পাশ ও দুই-একটি অলকগুচ্ছ চোখে ঠেকিত। বাক্যস্রোত বাড়িয়া চলিত, রাত্রি গভীর হইয়া আসিত বিপত্নীক বৃদ্ধের কণ্ঠে আমি যেন একটি প্রগাঢ় আস্থা ও অতি আয়াসলব্ধ সান্ত্বনার সুর শুনিতে পাইতাম। তাই, দুই-চারিদিন পরেই আমার তর্কের ইচ্ছা ও কৌতুক-বাসনা নিঃশেষ হইয়া গেল। শুনিতে শুনিতে আমিও তখন সশ্রদ্ধচিত্তে বলিয়া ফেলিতাম—ফুরায় নাই, ফুরায় নাই, পার্থিব বিয়োগ-বিরহের পরপারে অনন্ত শূন্যলোকের মধ্যেও আমাদের আনন্দ-বেদনার চেতনা, আমাদের স্নেহস্মৃতি, সমস্ত মালিন্যমুক্ত হইয়া জ্যোতিঃতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। আমাদেরই কামনা বেদনাময়, প্রেম বাষ্পময় জ্যোতিঃকণার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্ত শূন্যলোকে এক একটি জ্যোতির্ম্ময় তারকা হইয়া ফুটিয়াছে, শেষ হয় নাই, —শেষ হইবে না, কাল হইতে কালে সেই ক্ষুদ্রতম তানটিও বাজিবে, ক্ষীণতম প্রেমের প্রদীপটিও দীপ্তি পাইবে!

বৃদ্ধের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত—যেন আমার এই সম্মতির মধ্যে তিনি একটা অখণ্ডনীয় যুক্তি পাইলেন। নির্ম্মলার স্থির শান্ত চক্ষুতেও সেই আশা ও আনন্দ প্রতিফলিত হইত, কৃতজ্ঞতায় তাহার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিত, সে আর-একটু কাছে আসিয়া বসিত।

কোনও দিন বা জগদীশবাবু জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা পাড়িতেন, আমাকে গ্রহ-নক্ষত্রের মর্য্যাদা বুঝাইতেন। এই সৃষ্টির বিরাট দেহে আমাদের পৃথিবী কতটুকু? চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের জপমালায় ইহাও একটি গুটিকা-মাত্র, অভ্রান্ত তরঙ্গস্রোতের মধ্যে ইহাও একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গ! সৌরলোকের উৎসধারায় এই ধরিত্রী নিত্য

অবগাহন করিতেছে, চান্দ্রলোকের শুভ্র মুকুরে নিত্য সে তাহার মুখখানি দেখিতেছে, গ্রহনক্ষত্রের সৈকত হইতে তাহার সৈকতে আমাদের চেতনাতীত, ধারণাতীত বাণীতে নিত্য আদান-প্রদান চলিতেছে। জীবজগতের ক্ষুদ্রতম জীবনটুকুর মধ্যেও কোন্ দূরদূরান্তরের অজানিত, অচিন্তিত, অকল্পিত প্রভাব স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে, কোন্ সুচিহ্নিত, সুনির্দ্দিষ্ট পরিণামের দিকে প্রতিমানবের জীবনকে তাহা টানিয়া লইতেছে,—আমাদের পরিমিত দৃষ্টি, পরিমিত জ্ঞান, অপরিচ্ছন্ন চেতনা তাহা বুঝিবে কি করিয়া?

আমিও বুঝিতাম না। গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য; কিরূপে জীবজগতের কর্ম্ম ও জ্ঞান, আয়ু ও চেতনা জন্মক্ষণেই তাহারা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, সে পরিচয়ে তাহার সন্ধান আমি পাইতাম না। নব-নব নক্ষত্রের সৃষ্টি হইতেছে, মানবের চক্ষু নব-নব গ্রহের সন্ধান পাইতেছে,—ইহাদেরও কি প্রভাব আছে? সে-প্রভাবের সন্ধানও কি অতীতের মানব পাইয়াছিল? মানব-ভাগ্য কি তাহারা তখনো নিয়ন্ত্রিত করে নাই? আরো অজানিত কত গ্রহ-নক্ষত্র, আজও যাহারা মানবদৃষ্টির বাহিরে, তাহারাও কি তবে তেমনি করিয়া জীবজগতকে টানিতেছে না?—সন্দেহ ঘুচিত না, আমি প্রশ্ন করিতাম, তর্ক করিতাম, তর্ক জমিয়া উঠিত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় মিলন ঘটিত না। সহৃদয় বৃদ্ধের প্রাণে এমনি করিয়া ধীরে ধীরে জ্যোতির্লোকের সঙ্গে পরিচয়ের বাসনা জাগিয়া উঠিল—আমার সামান্য জ্ঞান পুঁজি লইয়াই আমি সে কার্য্যে অগ্রসর হইলাম।

সন্ধ্যাশেষে আমরা এখন ঘরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াই, পিছনে পিছনে নির্ম্মলাও আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়ায়। জগদীশ-বাবু বলেন—"মা নিমু, আমার চশ মা-জোড়া ফেলে এসেছি যে।" নির্ম্মলা চশমা হাতে লইয়াই আসে, বস্ত্রাঞ্চলে একবার কাচ দুইখানা মুছিয়া পিতার হাতে তুলিয়া দেয়। তারপর বিচিত্র আকাশের দিকে চক্ষু মেলিয়া আমরা বসিয়া থাকি। রাত্রি গভীর হইয়া আসে, আকাশ প্রদীপ্ত তারকাপুঞ্জে রহস্যময় হইয়া উঠে, শেষে যখন গৃহে ফিরিবার জন্য উঠিয়া পড়ি তখন দেখি, আমাদের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, একটি সসম্ভ্রম বিস্ময়ে ও অকারণ শ্রদ্ধায় হৃদয় দোলা খাইতেছে। নির্ম্মলার শান্তদৃষ্টি গভীর হইয়া উঠিয়াছে।

মাঠ পার হইয়া ঘরে তেমনিভাবে ফিরিয়া আসি, নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া পড়ি। অদূরের নদীতে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে জলধারা কলভাষী হইয়া উঠে, নৌকার মাঝিরা নির্ভাবনায় ভাটিয়ালী রাগিণী টানিতে থাকে, গানের কথাগুলি ধরিতে পারি না, ধ্বনিটি পাক খাইয়া খাইয়া আমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। খানিক দূরে বাজারের ঘাট হইতে অনেক অস্পষ্ট কণ্ঠ ভাসিয়া আসে, মাঝিদের শিঙ্গা থাকিয়া থাকিয়া শহরের যাত্রীদের আহ্বান করে, তারপর একবার 'গঙ্গামাঈ' বলিয়া একটা সমবেত জয়ধ্বনি —বুঝিতে পারি, শহর-গামী নৌকা ঘাট ছাড়িয়া ভাসিয়া পড়িতেছে। আবার নিস্তব্ধতা, একেবারে গাঢ়, অচেতন, জমাটবাঁধা,—শুধু ঝুপ্ ঝাপ্, ঝুপ্ ঝাপ্, দ্রুত দাঁড়-পতনের শব্দ, ধীরে ধীরে তাহাও মিলাইয়া যায়। খানিকক্ষণ অসাড়—যেন চরাচর দিনান্তের পরম শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িয়াছে। তারপর আবার ধ্বনিময় জগতের প্রাণ-প্রবাহের ছন্দ কানে আসিয়া পৌঁছায়। ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে, দুই একটা নাম-না-জানা নিশাচর পাখী পাখা ঝাপ্টা দিতেছে—কদাচিৎ তাহাদের অস্বাভাবিক নিম্নধ্বনি দূরে শুনিতে পাওয়া যায়। হয়ত কখনো বা স্কুলের মাঠে কোনো গৃহগামী গ্রামবাসীর স্বরলয়হীন গীত ভয়ার্ত্ত কণ্ঠের অসহজ প্রকাশে কুণ্ঠিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হয়। কখনো সব থামিয়া যায়—শুধু আমার ঘরের পিছনের বাঁশঝাড়ে আন্দোলিত বাঁশের বনে কেমন একটা শির শির, শির শির শব্দ চলিতে থাকে; সহসা বাঁশবনে তীব্র আর্ত্তনাদ উঠে, বিমস্ত মন চমকিত হয়। রাত্রি বাড়িয়া চলে, নিশীথ রাতের বাতাস উতলা হইয়া উঠে, নদীপাড়ের ঝাউ-সারের করুণ ক্রন্দনে নৈশ নিস্তব্ধতা যেন উচ্ছলিত হইয়া পড়ে, অকারণে একটি মৃদু বেদনা বুকে জমিতে থাকে। কখনো সেই ঝাউ-সারি হইতে গাংচিলের কর্কশ চীৎকার বা বেলেহাসের বিলীয়মান শব্দ শোনা যায়। ঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না চক্রাকারে প্রবেশ করে, মাটির মেঝেয়, বিছানায়, শিয়রে,

পদতলে, পাশের বেড়ায়, অন্ধকার ও আলোকের একটি অনির্ব্বচনীয় চিত্র লেপিয়া যায়। শিয়রের খোলা জানালায় খণ্ড আকাশে কয়েকটি তারা জ্বলিতে থাকে—অপলকনেত্রে তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমি নিজকে হারাইয়া ফেলি। অনন্ত শূন্যলোকে ইহারা কবে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে? কবে যাত্রা ইহাদের শেষ হইবে? ইহারাও কি জ্যোতিঃস্নাত মানবাত্মার মত নিত্যকালের যাত্রী? ইহাদেরও ঘিরিয়া কি নব-নব জীবনের নব-নব লীলা উদ্ঘাটিত হয়? ইহাদের তটেও কি দুঃখ-বেদনার আনন্দজয়ধ্বনির তরঙ্গ উঠিতেছে? না, মৃত্যুর অশেষ প্রবাহ ইহাদের স্পর্শ করে না? সেইসব অগণিত সৌরজগতে কি জীব নাই, দেহ নাই, প্রাণ নাই, শুধু মহাশূন্যের অক্ষুণ্ণ শূন্যতা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে? সৃষ্টির আদিক্ষণ হইতে এই বায়ুহীন, জীবহীন, শব্দহীন চিন্তায়, নিঃসন্তানা জগন্মালা সৃষ্টির অন্তিম নিমেষটি পর্য্যন্ত শুধু কি বন্ধ্যা নারীর অপার ব্যথা লইয়া এমনি অপেক্ষা করিবে?—নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত নির্ব্বিশেষ সেই নক্ষত্রচয়ের একাকীত্বের কথা ভাবিয়া আমি একক শয্যায় শিহরিয়া উঠি। আকাশের আলোকের জোয়ারে দিনান্তে ভাটা পড়িয়া আসে, ঘনায়মান অন্ধকারের মায়া নিশীথ রাত্রে গাঢ়তর হইয়া উঠে, রাত্রিশেষে আবার আলোকের জোয়ার ফিরিয়া আসে,—অনন্ত কালস্রোতের মধ্যে শুধু এই তারকারা নীলসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের মত অসাড়, নিশ্চল, জীবনচাঞ্চল্যহীন, শাশ্বত নিস্তব্ধতায় চিরকবলিত! মনে হয় নিরন্ধ্র অন্ধকার বুঝি আমায় ঘিরিয়া ধরিতেছে, আমি বুঝি চেতনাতীত রহস্যের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছি, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি যেন কোন্ বিভ্রমকুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। ভয়ে ভয়ে একবার চোখ মেলিয়া খণ্ড আকাশটুকুর দিকে তাকাই—সেই নক্ষত্র কয়টির মুখে চিরন্তন সেই কৌতুকরহস্যময় হাসি!

তিনমাস মাত্র—কিন্তু আমি পুরাতন পরিচিত ধূলা-ধূসর পৃথিবী হইতে যেন অন্য আর এক পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছি, তিনমাস মাত্র—কিন্তু আমার আজন্ম নাগরিক সংস্কার, আজন্মের স্মৃতি, আজন্মের অভ্যাস যেন কত পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। দিনের বেলায় আমি আমার স্কুলের কাজ করিয়া যাই, কখনো সম্মুখের নদীর দিকে তাকাইয়া থাকি—নীল, সাদা, গেরুয়া রঙের পাল তুলিয়া দ্রুত মন্থর গতিতে ছোটবড় নানা রকম নৌকা চলিয়াছে, গরুর গাড়ীগুলি মালবোঝাই হইতেছে, একটু পরেই কঠিন কর্কশ ধ্বনি তুলিয়া স্কুলের পার্শ্বের কাঁচা পথের ধূলা উড়াইয়া উহারা গ্রামান্তরে যাত্রা করিবে। চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার জ্যামিতির প্রতিজ্ঞায় মন দিই।

স্কুল শেষ হয়, পড়ানো চুকিয়া যায়, কিন্তু ম্লান অপরাহ্নে এখন আর পিছনের জীবনের খণ্ড স্বপ্নগুলি করুণ হইয়া দেখা দেয় না—আমি তাহাদের আর উদ্দেশ পাই না। শান্ত, অক্লান্ত, উত্তেজনাহীন সন্ধ্যা নিস্তব্ধ গ্রামখানার উপর নামিয়া আসে, তাহার আকর্ষণে আমি বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি। যুগ-যুগান্তরের রহস্য আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছে। নিম্নে পৃথিবীতে এই নদী, এই ঝাউবন, এই বাঁশঝাড়, এই নারিকেলের কুঞ্জ, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলিমার দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই জ্যোতিঃপুঞ্জ, আর ইহার মধ্যস্থলে শুধু দুইটি মানব-হৃদয়, সরল শিশুপ্রায় শুভ্রহৃদয় বৃদ্ধ ও নির্ব্বাক সেবারতা তাহার বালিকা কন্যা,—ইহার বাহিরের বিপুল পৃথিবী আমার নিকট অস্পষ্ট অপরিচিত হইয়া একেবারে মুছিয়া গিয়াছে।

একটু সকাল-সকালই আসিয়াছিলাম। শনিবার, স্কুল অনেকক্ষণ ছুটি হইয়া গিয়াছে। বেলা পড়িতেই চলিলাম জগদীশবাবুর নিকটে।

বাঁশের বেড়ার বাহির হইতে কথা শুনিতে পাইলাম।

—কই, কথা বল্‌ছ না যে?

বুঝিলাম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন জগদীশবাবুর ভগ্নী, বাড়ীর কর্ত্রী। মাতৃহীনা কন্যা ও গৃহহীন ভ্রাতাকে ইনিই আগলাইয়া আছেন। প্রশ্নের উত্তরও শুনিলাম।

—কি বল্‌ব বল?

—মেয়ে চোদ্দ বছর পেরিয়ে গেল—এটা বুঝেছ?

—চোদ্দ বছর শেষ হ'ল—এত? হবেও বা।

—হবেও বা নয়, হয়েছে। কতদিন ত বল্‌ছি। কিছু ভেবেছ? কোনো ব্যবস্থা ঠিক করেছ?

এবার আর উত্তর আসিল না।

—বিয়ে যে এবার দিতে হবে তা বুঝেছ ত? একমাস দু'মাস করে ত অনেক মাস, গোটা বছরটাই কাটিয়ে দিলে। এখন ত আর দেরি করা চলে না।

—আরও কিছুদিন যাক্। এমন তাড়াতাড়ির কি?

—তাড়াতাড়ি! বিস্মিতা ভগ্নী সবিস্তারে বুঝাইতে লাগিলেন,—কত দেরি হইয়া গিয়াছে, ইহাতে ভালো ঘরের ছেলে পাওয়া কত শক্ত হইয়া উঠিতেছে। ভ্রাতা নীরব। ভাবিলাম এইবার হাঁক দিয়া বিপন্ন ভাইটিকে উদ্ধার করিয়া লই। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার প্রশ্ন শুনিলাম—

—তা কি করতে বলো?

—ছেলের খোঁজ নাও, দেখ-শোনো, বসে থাকলে ত চলবে না।

—আমি কি করে খোঁজ নেব—স্কুল রয়েছে, কাজ-কর্ম্ম দেখছ ত?

—সামনেই ত ছুটি আসছে তখন বেরুবে—সব ঠিক করে ফেলবে। এখন বরং সন্ধান নাও।

—আচ্ছা তা রয়ে-বসে দেখা যাবে। তুমিও বরং পাড়ার চাটুজ্যে, মুখুজ্যে ওদের বাড়ী জিজ্ঞাসা করে জেনে রাখ।

দিদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গলার স্বর একটু নামাইয়া কহিলেন,—একটি ছেলে কিন্তু ছিল।

—কে?

—এই যে তোমাদের পরেশ। আমি খোঁজ নিয়েছি আমাদেরই পাল্টা ঘর।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন হইল—পরেশবাবুর কথা বলছ?

—হাঁ। কেন হবে না, আপত্তি আছে নাকি?

—আপত্তি আমাদের নেই, কিন্তু ওঁরা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন। শুনেছি এক সময় ওঁদের সম্মান-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল—ঘরও খুব উঁচু।

—আমরাই বা কিসে ছোট?

—আমরা হলুম পাড়াগাঁয়ের লোক—ওরা শহুরে। আমাদের চালচলন সমাজ সাদা-সিধে,—ওঁদের মত ভব্য নয়। নিমু আমাদের শান্ত মেয়ে, কথাটি কয় না, ওঁদের সে শিক্ষিত সমাজে পেরে উঠবে না—ওঁরাও নেবেন না।

—কেন? নিমুর চেয়ে ভালো মেয়ে কোথায় পাবে? দেখেছি ত, ওঁদের শহুরে মেয়েও দেখেছি—লেখাপড়া ত জানে ছাই—কেবল কথায় ওস্তাদ। আমার নন্দাই'র বৌকেও দেখেছি, তারিণী-খুড়োর নাতবৌকেও দেখলুম —আমাদের নিমুর কাছে ঢের ঢের শিখ্তে পারে। তুমি একবার পরেশবাবুদের কথাটা তুলেই দেখ না।

—না না। উনি মহাবিব্রত হবেন, অপমানিত হবেন; আমার সঙ্গে প্রীতি আছে, নিমু ওঁর কাছে অবাধে আসে-যায়, আমি এমনভাবে ওঁর প্রতি অত্যাচার করতে পারব না।

তাঁহার কথা নড়িল না। আমি ভাবিতেছিলাম ফিরিয়া যাইব কি? নিজের সম্পর্কে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, একবার ভালো করিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইব নাকি, কি কর্ত্তব্য। বৃদ্ধের মতের দৃঢ়তা দেখিয়া আমার সঙ্কোচে আমি লজ্জিত হইলাম। যেখানে কুণ্ঠা নাই, সেখানে আমি কেন কুণ্ঠার আশ্রয় লইয়া কপটতার সৃষ্টি করিব? সহজ কণ্ঠে ডাক দিলাম—

—জগদীশবাবু!

—আসুন! আসুন!—ভিতরের আঙিনা হইতে সাদরে উত্তর আসিল।

আমি বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম—একাকী দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা মাটির মেঝেয় পায়ের নখে কি আঁচড় কাটিতেছিল। আমি ঘরে ঢুকিতেই সে চোখ তুলিল, চিরদিনকার পরিচিত সেই গভীর শান্ত-দৃষ্টির মধ্যে আজ আমি যেন একটি নূতন সংজ্ঞা আবিষ্কার করিলাম। চমকিত হইলাম—নির্ম্মলাও সব কথা শুনিয়াছে কি?

নিত্যকারের মতই গল্প জমিয়া উঠিল, আলোচনা চলিল। আমরা দুজনে কথা তুলিলাম, নির্ম্মলা নীরবে তাহাতে যোগ দিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল—একটি দুইটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল। নিত্যকারের মতই আমরা যেন তাহাদের আহ্বান শুনিতে পাইলাম। বাড়ীর ভিতরের প্রাঙ্গণে মাদুর বিছাইয়া আমরা আকাশের তলে আসিয়া বসিলাম।

নির্মেঘ আকাশ জুড়িয়া কৃষ্ণপক্ষের ঘনীভূত অন্ধকার—অসংখ্য তারকার অদ্ভুত দীপ্তি। নিজের লজ্জা ও দৈন্য যেন নিজের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। পৃথিবীর শিয়রে এই যে অগণিত জ্যোতির্মণ্ডলী অতন্দ্র নেত্রে অনন্ত রাত্রি ধরিয়া জাগিতেছে, আমি তাহাদের কতটুকু জানি, কতটুকু সন্ধান লইয়াছি! মানব-জীবনের এত বড় সুহৃদ্ আর কে আছে? কাহাদের সঙ্গে এমন অশ্রান্ত বাক্‌হীন আলাপন সম্ভব?

বৈশাখের আকাশে আজ কালপুরুষ সন্ধ্যার পরেই বিদায় লইয়াছেন—না, মহাকাশের পটে সেই গম্ভীর রূপ আজ আর দেখিতে পাইব না। মহাকালের তিমির-ফলকে কোন্ বাণী সে লেখে জানি না—কোন্ ভীম পরিণামের সে সঙ্কেত করে জানি না। ছয় মাস আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাকি ছয় মাস কোন্ মায়াবসনে কেন সে আপনাকে গোপন করিয়া লয়? গ্রীক্-কাহিনীর মতে দুর্দ্ধর্ষ শিকারী এই ওরায়ন তারকার নীবিবন্ধ আঁটিয়া ঊর্দ্ধ-উৎক্ষিপ্ত নেত্রে সে তারকার তরবারি ঝুলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নিম্নে, পার্শ্বে শিকারী কুকুর সিরিয়াস্-আমরা যাহাকে বলি লুব্ধক, তাহার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসিয়া আছে—পদতলে ভয়ার্ত্ত শশক। আশ্বিনের নির্মেঘ আকাশ ফিরিয়া আসিলে আবার ঐরূপেই সে উদিত হইবে। আজ সে কোথায়?

ওই সপ্তর্ষিমণ্ডল—বশিষ্ঠাদি ত্রিকালদর্শী অমৃত-পুত্রগণ ওইখানে তাঁহাদের আশ্রম রচনা করিয়াছেন, এখানে বসিয়া তাঁহারা মানব-ভাগ্যের পট-পরিবর্ত্তন নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অন্ধকার গগনপট কালে কালে এমনি করিয়া তাঁহাদের পুণ্যপ্রভায় আলোকিত হইয়াছে। পার্শ্বে ঐখানে ঋষিপত্নী অরুন্ধতী—আমাদের চক্ষুর মর্ত্ত্য-মোহ না ঘুচিলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, নব-পরিণীতা বধূ শুধু এই সাধ্বীর উদ্দেশে নমস্কার জানায়, যুগে যুগে ওইখান হইতে দেবী স্নেহোজ্জ্বল নেত্রে কন্যাদের শিরে অলক্ষ্যে শুভাশীষ বর্ষণ করিতেছেন। হাঁ হাঁ, ঐ স্বাতীনক্ষত্র দীপ্ত, ভাস্বর, মানব-সৌভাগ্য বিধাত্রী। উহার শিয়রে জ্যোতির্ম্ময় রত্নমুকুট।

ঐ উত্তরেই পূর্ব্বাকাশে উঠিয়া বীণাবর্ম্মাকৃতি জ্যোতির্মণ্ডলী—গ্রীক্ জ্যোতিষী যাহার নাম দিয়াছেন লিরা। এই আলোকবীণায় কোন্ অনাহূত জ্যোতির্ম্মন্ত্র নিশিদিন ধ্বনিত হইতেছে, কে তাহা বলিতে পারে? কোন্ পুণ্যবান্ দিব্যজ্ঞানবান্ তাহা শুনিতে পায়?—ওইটি? ওই জ্যোতি-র্মণ্ডলের প্রোজ্জ্বলতম নক্ষত্র ভেগা দেখা যাইতেছে? কবে ইহার যাত্রা কে বলিবে? পনের হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানবাকাশে উহাই ছিল ধ্রুবতারা, পৃথিবীর ভাগ্যে কত বড় মহাপ্রলয় সাধিত হইতেছে ভেগা তাহার সাক্ষী। এখনো প্রতি নিমেষে পাঁচক্রোশ বেগে আমাদের সূর্য্যদেবতার রথ উহারই দিকে ধাবিত হইতেছে। আরো পনের হাজার বৎসর পরে ধরিত্রী আবার উহাকেই ধ্রুবতারা বলিয়া গ্রহণ করিবে—মানবাকাশে পনের হাজার বৎসর পরে আবার ভেগাই হইবে দিক্‌কালের স্থির আশ্রয়। পশ্চিমে বিলীয়মান ওই যুগ্ম নক্ষত্র ক্যাষ্টর-পোলক্স ভ্রাতৃদ্বয়—যাঁহারা অচ্ছেদ্য সৌভ্রাত্রে যুগ-যুগনিবদ্ধ, যাঁহারা তারকার তরী ভাসাইয়া গোল্ডেন্ ফ্লীস্-এর সন্ধানে বাহির হইয়া ছিলেন, প্রতিমানবের জীবন কি তেমনি পরম-প্রার্থিতের সন্ধানে নিরুদ্দেশযাত্রা নয়? ঐ দক্ষিণ আকাশে এখনো সেই মহাযাত্রার তরণী ভাসিয়া চলিয়াছে—ওই মাস্তুল, ওই পাল পিছনে প্রায় আমাদের মাথার উপরে ভির্গো ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী এষ্ট্রিদেবী যিনি মানবজগতে ধন-ধান্য-শস্য বিলাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন, যিনি আমাদের অন্যায়ে, অবিচারে, উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়া ঐ ঐখানে ফিরিয়া গেলেন। ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী কি আর ফিরিবে না, পৃথিবী কি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবে না, ন্যায়ের লক্ষ্মী কি চিরদিন ওখানে দূরেই রহিবে, পৃথিবীতে পূজা পাইবে না? ঐ সাতটি নক্ষত্র দেখ, যেন একবৃন্তের সাতটি ফুল—আকাশের পুষ্পোদ্যানে যেন সৌন্দর্য্যস্তবক। না, না, উহারা বুঝি ধরণীর সেই সপ্ত রাজপুত্র এ পারের খেলাশেষে যাঁহারা ওপারের কোন্ নূতন বৃন্তে সাত ভাই চম্পার মত ফুটিয়াছেন। আর ঐ দিক্‌কার ঠিক নিম্নের এই পৃথিবী এই বুঝি বোন পারুল শূন্যের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে এই সপ্তনক্ষত্রের দিকে নিমন্ত্রণ

পাঠাইতেছে—'সাত ভাই চম্পা জাগো রে'! জাগিয়া আছে, জাগিয়া আছে, নিদ্রাহীন, নিষ্পলক চোখে তাহারা জাগিয়া আছে—ক্ষুদ্র ধরণীর চিরাগ্রজ তাহারা।

নক্ষত্রলোক যেন কাঁপিতে লাগিল! মনে হইল নক্ষত্র-সভায় নৃত্য সুরু হইয়াছে—কেহ বাকি নাই, সপ্তর্ষিদল, লিরা, স্বাতী, ভির্গো, সকলেই জাগিয়াছে, ছায়াপথের ক্ষীণালোকিত বর্ত্ম সহসা নৃত্যমুখর হইয়া উঠিয়াছে!

মনে হইল, চোখ বুঝি অন্ধ হইয়া গেল, মস্তিষ্কের শিরা বুঝি অসহ্য ভাবস্রোত বহিতে না পারিয়া ছিঁড়িয়া গেল। চোখ মুদিলাম। অন্ধকার আবর্ত্তে আমি কি ঘূর্ণমান পালকের মত তলাইয়া যাইতেছি? পদতলের পৃথিবী কি লুপ্ত হইয়াছে? চারিদিকে এক নৃত্যরত জ্যোতিঃপুঞ্জ, হাতে যেন কাহার হাত ঠেকিল, সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ভাবিলাম, না, না, এই পৃথিবী যেন কিছুতেই সরিয়া না যায়, আমি ইহাকে ছাড়িব না, ইহাকেই আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিব।

চোখ খুলিলাম, দেখিলাম তেমনি অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ গর্জ্জিয়া চলিয়াছে—সম্মুখে শুধু একখানি ছোট সুকুমার মুখ—তাহার দেহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার নীলবসন মহাকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—বুঝি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, কোনোকালে ছিল না—স্বপ্নাবিষ্ট সুকুমার মুখখানি তারকার চূর্ণ জ্যোতিঃকণায় চর্চ্চিত—সেই মুখে জাগিয়া আছে এক জোড়া অদ্ভুত চোখ, অনন্ত নক্ষত্রালোকের তীব্রদ্যুতি যেন সে আপনার আঁখি-তারকার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, এই মুখ বুঝি কোনো মানব-কন্যার নয়—বুঝি কোনো মানব মায়া মানব কামনা অন্তরীক্ষে কোন্ নক্ষত্রসৃষ্টি করিতেছে, বুঝি কোনো নৃত্যচপলা রূপসী তারকা ছায়াপথ হইতে নামিয়া আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে—তাই অধরকোণে সেই নক্ষত্রলোকের রহস্যমধুর অদ্ভুত হাসি—যে হাসির আদি নাই, অন্ত নাই, যে হাসি অপরিসীম প্রহেলিকা!

পূর্ব্বদিন শ্রান্তবর্ষণ সায়াহ্নে বরকনে বিদায় হইয়াছে। যাত্রার সময়ে ভাগ্যক্রমে বৃষ্টিটা থামিয়াছিল—যেন ক্রমাগত দুইদিন, অশ্রান্ত অশ্রুমোচনের পর বিবর্ণ আকাশ অবসন্ন হইয়াছে। বুঝিলাম, এইবার জগদীশবাবুর চোখে বান ডাকিবে। কিন্তু, আশ্চর্য্য মানুষ! পিসিমা তখন কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন—যাহাকে দুই বৎসর হইতে চোদ্দ বৎসরের করিলেন সে আজ চিরদিনের মত পরের হইতে চলিল! নির্ম্মলার চোখ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে—প্রণাম করিতেই পিতার পায়ে ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সহাস্য মুখে জগদীশবাবু বলিলেন—

—দাঁড়া মা, দাঁড়া। চশ্‌মার খাপ, বাক্সের চাবি, দিদিকে এসব বুঝিয়ে দিয়েছিস ত? নইলে কিন্তু কাল থেকে চোখেও কিছু দেখ্‌ব না, খেতেও কিছু জুটবে না।

সকলে একটু আশ্চর্য্য হইল—এত কঠিন।

আমাকেও নির্ম্মলা প্রণাম করিল প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম, চিরায়ুষ্মতী হও। সে মুখখানি তুলিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম—সেই রহস্যময় হাসির আভাস!—যে স্মৃতি মনের অচেতন-লোকে সুপ্ত হইয়াছিল, নিমেষমধ্যে তাহা আমার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া দেখা দিল। মাস পাঁচ পূর্ব্বে নক্ষত্রের ছায়াতলে সে রাত্রিতে আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টি কি সত্যই এমনি হাসি দেখিয়াছিল—আমি কি ভুল করি নাই?

নদীপারের ঝাউবনের মধ্য দিয়া নৌকা বরকনে লইয়া মিলাইয়া গেল—মনে হইল, আমি যেন তখনো দূরের নৌকায় সেই রহস্যময় হাসি দেখিতেছি, নদীর খরস্রোতে যেন সেই তীক্ষ্ণ বক্র হাসিরই প্রতিচ্ছায়া।

দুইদিন বিবাহোপলক্ষে খুব পরিশ্রম করিয়াছিলাম, জগদীশবাবুকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। একবার শিয়রের জানালা দিয়া আকাশের দিকে তাকাইলাম—আশ্বিনের মেঘ থম্-থমে আকাশ রূপহীন, ক্লান্ত, বিবর্ণ।

পরদিন ভোরে গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিলাম—বর্ষণ-স্নাত আশ্বিনের মেঘমুক্ত আকাশের তলে ধরণী যেন সূর্য্যকরের স্বর্ণ কিরীটখানি পরিয়া দাঁড়াইয়াছে! পূর্ব্বদিবসের কথা মনে পড়িল—নিজের অদ্ভুত কল্পনা-বিলাসে নিজেই হাসিলাম।

অপরাহ্ণ নামিয়া আসিল। আজ একটু সকাল-সকালই জগদীশবাবুর নিকট চলিলাম। বৃদ্ধ আজ একা, আমি না গেলে নিতান্তই একা পড়িবেন।

চোখের চশ্‌মা আজ তিনি নিজেই খুঁজিয়া লইয়াছেন, আলমারির বইও আর কাহাকেও আনিয়া দিতে হইল না; আজ মধুসূদন নিজ হইতেই চা লইয়া উপস্থিত। সুন্দর ব্যবস্থা, শুধু জগদীশবাবুর চশ্‌মার কাচ আর কিছুতেই তেমনটি পরিষ্কার হইতেছে না, চায়ের সেই সুপরিচিত স্বাদ ও ঘ্রাণটিও তিনি আজ আর পাইতেছেন না। আমার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন,—"খেতে পারবেন তো—যে অপূর্ব্ব রসায়ন হয়েছে"—। বিশেষ কোনো নূতনত্ব আমি অন্তত বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আজ আর কিছুতেই আমাদের কথা জমিল না। আলোচনার জাল যত যত্ন করিয়া বুনিতে চেষ্টা করিলাম, বারে বারে ছিঁড়িয়া গেল। মনে হইল, কোথায় যেন ছেদ পড়িয়াছে, কি ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, কেমন যেন একটা কি নাই। কথা বলিতে-না-বলিতেই জগদীশবাবু অভ্যাসমত দুয়ারের নির্দ্দিষ্ট স্থানটির দিকে চোখ তুলিয়া ডাকেন,—"নিমু—"। তারপর লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলেন—"দেখছেন পরেশবাবু, মেয়েটা আমাকে একেবারেই অসহায় করে রেখে গেছে।" চেষ্টা করিয়া আমিও হাসিতে যোগ দিই—আবার কথা আরম্ভ করি, কিন্তু অল্পক্ষণেই আবার বৃদ্ধের দৃষ্টি উদাস হইয়া উঠে, মন বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

সন্ধ্যা হইল—প্রাঙ্গণে আসিয়া বসিলাম। আকাশে তারকার সভা বসিয়াছে। পূর্ব্বেকার মত তাহাদের দেখিতে চেষ্টা করিলাম—দেখিলামও—পূর্ব্বে প্রতিদিনকার দেখার মত দেখা এ নয়—এ যেন সাধারণ চোখের সচরাচর দর্শন-বিস্ময়লেশহীন, মায়াহীন, মমতাহীন দেখা।

বুঝিলাম আমাদের নক্ষত্রসভা ভাঙিয়াছে।

খানিকক্ষণ পরে ঘরে ফিরিলাম—ঘরের সম্মুখের সিঁড়িতে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে বসিয়া রহিলাম।

অন্ধকার নদীপারে আজ আর কিছুই দেখা যায় না, শোনা যায় না। সাড়াহীন নিঃস্তব্ধতা চারিদিকে আপনার শাসন বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, মুখরা সৃষ্টি যেন মৌনাবলম্বন করিয়া ধ্যানে সমাসীনা। কাণ দিয়া আর কিছুই শুনিতেছি না—প্রাণ দিয়া বিশ্ব-স্পন্দনের নির্ব্বাক ধ্বনি উপলব্ধি করিতেছি। এ শোনা নয়, এ অনুভূতি,—এ যেন ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম বোধ। নদীপারের ঝাউ-সারের আন্দোলিত দীর্ঘশ্বাসে অন্ধকার রজনীর অন্তর মথিত হইতেছে—আমার বুকের চারিদিক যেন বেদনার গাঢ় গুঞ্জনে শতপাকে ঘিরিয়া উঠিতেছে—অদূর নদীর কুল-ছাপানো কলস্রোত দেখা যায় না, তবু তাহারই মধ্যে যেন আমি অবগাহন করিতেছি—কল্‌ কল্‌ কল্‌, আমার অন্তর ঘিরিয়া যেন সেই অশান্ত কলরোল। মাথার উপরে বুঝি একসার বেলেহাঁস অকস্মাৎ ধ্বনিতে আমাকে আহ্বান করিয়া দূরে—দূরে—দূরে চলিয়া গেল—তবু যেন তাহাদের ধ্বনি শূন্যে মিলাইয়া গেল না, আমার কাণের উপরে কাঁপিতে লাগিল। পদতলে শিশির-স্নাত শষ্পদল প্রতি নিমেষে বাড়িয়া চলিয়াছে—সেই ছন্দ আমি শুনিতে পাইলাম। উপরের আকাশে কি উচ্ছলিত সঙ্গীত প্রবাহ—যেন সমস্ত সৃষ্টিকে একটা দুর্দ্দম, গম্ভীর, উদার অসহনীয় রাগিণীতে উচ্ছৃত করিয়া দিতেছিল।

ঊর্দ্ধে চোখ মেলিয়া বসিলাম—সম্মুখে পূর্ব্বাকাশে কালপুরুষের সুদীর্ঘ বপু—আমার অন্তরের কাঁপুনি আমি শুনিতে পাইলাম। পৃথিবী বিস্মৃত হইল। অন্ধকার আকাশের সঙ্গে আমার পলকহীন চক্ষু দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিল।

রাত্রির প্রবাহে তখন কত যায়? নিম্নেকার পৃথিবীর মতই কালও আমার চেতনা হইতে সরিয়া গিয়াছে—কিছুই জানি না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের চোখ বুঝি নিদ্রায় কাতর হইয়া উঠিল,—অত্রি মারীচী আদির চক্ষু বুঝি স্তিমিত হইয়া আসিল, বশিষ্ঠারুন্ধতী ধীরে ধীরে নারিকেল-বনের পিছনে লুকাইলেন।

মুহূর্তমধ্যে আকাশ জুড়িয়া এক অপূর্ব্ব চপলতা দেখা দিল—অগণিত নক্ষত্র স্থির প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া চঞ্চল পদ-বিক্ষেপে নামিয়া আসিতেছে—সেই দূর নীলাভ সপ্ত-তারকা প্লিয়াইডিস, সেই লিরা, দীপ্তিময়ী ভেগা, সিগনাস, সেফিয়স—কেসিওপীয়া, য়ানবাত্রি পার্সিয়ুস,

দীপ্ততারকার মেখলাময়ী শৃঙ্খলিতা এণ্ড্রোমিডা! নক্ষত্র-সমাজ চপল, তরল, অস্থির;—আকাশ উদ্বেল, অশান্ত, নৃত্যমুখর! পরিচিত, অপরিচিত, দৃষ্ট, অদৃষ্ট, অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল!—নারিকেলের ছায়ায় যেখানে বশিষ্ঠারুন্ধতী অন্তর্হিতা হইলেন ঠিক সেইখানে একটি নূতন জ্যোতির রেখা। রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আরো স্পষ্ট—গতিশীল লক্ষ লক্ষ জ্যোতিঃকণা;—আরো স্পষ্ট—বুঝি কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাষ্পময় নীহারিকা জমিয়া উঠিতেছে। বুঝি কোনো নূতন নক্ষত্র সৃষ্ট হইতেছে। অপূর্ব্ব দীপ্তিময় এক নক্ষত্র! চক্ষু বিস্ফারিত হইল, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল—সেই মুখ, সেই রহস্যময় হাসি সেই মুখে! একবার আকাশের চারিদিকে তাকাইলাম—সমস্ত তারকার মুখে সেই অবর্ণনীয় কৌতুকহাস্য।

নূতন নক্ষত্র অগ্রসর হইয়া আসিল—নারিকেলের বন পিছনে পড়িয়া রহিল। সম্মুখের প্রসারিত মাঠ কাঁপিতে লাগিল। দেহহীন চরণহীন গতিতে সে আসিতে লাগিল, চূর্ণ তারকার রশ্মিতে তাহার পদচিহ্ন আঁকিয়া। দেহের চেতনা থাকিলে আমি হয়ত দেখিতাম আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোকের প্লাবন চলিয়াছে।

আরো কাছে, আরো কাছে একেবারে আমার নিকটে ঠিক আমার চোখের সম্মুখে সেই মুখ, সেই হাসি!

বুঝিলাম আমার চেতনা লোপ পাইয়াছে। পৃথিবীকে আর আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিলাম না—এই আনন্দময় জ্যোতির্লোকে আমি আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে চাই। হাত বাড়াইয়া দিলাম, কহিলাম,—ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী, আমাকে তুলিয়া লও, তুলিয়া লও! ভাবিয়াছিলাম নিশ্চয় কাহার হাত আমার হাতে ঠেকিবে, কেহ কৃপাস্নিগ্ধ হস্তে আমার প্রসারিত হাতখানি ধরিয়া লইবে। কেহই আমাকে ধরিল না। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—

—ওগো রহস্যময়ী, কেন আমায় লইলে না? লইতেই হইবে, লইতেই হইবে—এই পৃথিবী হইতে আমাকে তোমায় উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে! তোমার অপূর্ব্ব হাস্য আমি বুঝিতে চাই। কি করিয়া আমায় ত্যাগ করিবে? এই আমি তোমায় জড়াইয়া ধরিলাম।

নক্ষত্রসভায় একটা ত্বরিত চরণ-ক্ষেপের ধ্বনি উঠিল, চঞ্চল নক্ষত্রমালা সরিয়া গেল—দূরে, দূরে একেবারে নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে আমার শূন্য আলিঙ্গন হইতে দেহহীন সেই নূতন নক্ষত্র সরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল—মুখের হাসিতে তীব্রতর কৌতুকের আভাস। উপরে, আরো উপরে, আরো-আরো-আরো—ছায়াপথ শেষ হইয়া গেল, সমস্ত নক্ষত্র স্বস্থানে সরিয়া গেল, লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল, শূন্য আকাশের একটি কোণে উত্তীর্ণ হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অবশেষে স্থির হইয়া আমার দিকে তাকাইল—চোখে তেমনি তারকার বিভ্রম দৃষ্টি, অধরে তেমনি রহস্যময় হাসি!

কিছুদূরে নদীপারের মন্দিরে সহসা শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভোর হইয়াছে? না এ নবজাত তারকার অভিনন্দন?—নশ্বর মানবের অবিশ্বর প্রেমের আরতি? চমকিয়া দেখিলাম, আমার চোখের সম্মুখে রাত্রিশেষের শুকতারাটি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

কলের সাহায্যে পেশা-নির্দ্ধারণ—

ডাঃ ক্লার্ক এল হাল নামক একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক একটি কল আবিষ্কার করিয়াছেন—এই কলের সাহায্যে একজন লোকের পক্ষে কোন্ কাজ বা পেশা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইবে তাহা স্থির করা চলিবে। কলের মধ্যে কাগজের লম্বা ফিতা আছে। পরীক্ষার সময়

পেশা-নির্দ্ধারণের যন্ত্র

এই ফিতার উপর লোকটির বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি নানাপ্রকার মানসিক এবং শারীরিক গুণ এবং দোষবাচক বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন পড়িবে। বিশেষ চিহ্নের দ্বারা বিশেষ গুণ বা দোষের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন কাজ বা পেশার জন্ম বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা আছে। পরীক্ষার পূর্ব্বে কতকগুলি পেশা স্থির করিয়া লইয়া কলের কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষার পর কোন্ পেশাতে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা হইবে—তাহা লোকে সহজেই স্থির করিয়া লইতে পারিবে।

—

ছাতার মধ্যে রেডিও-সেট—

নিউইয়র্কের দুইজন লোক ছাতার মধ্যে একপ্রকার অভিনব রেডিও-সেট তৈয়ার করিয়াছে। এই সেটের সাহায্যে পথ চলিতে চলিতে ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশনের নানাপ্রকার গীতবাদ্যাদি শোনা যায়।

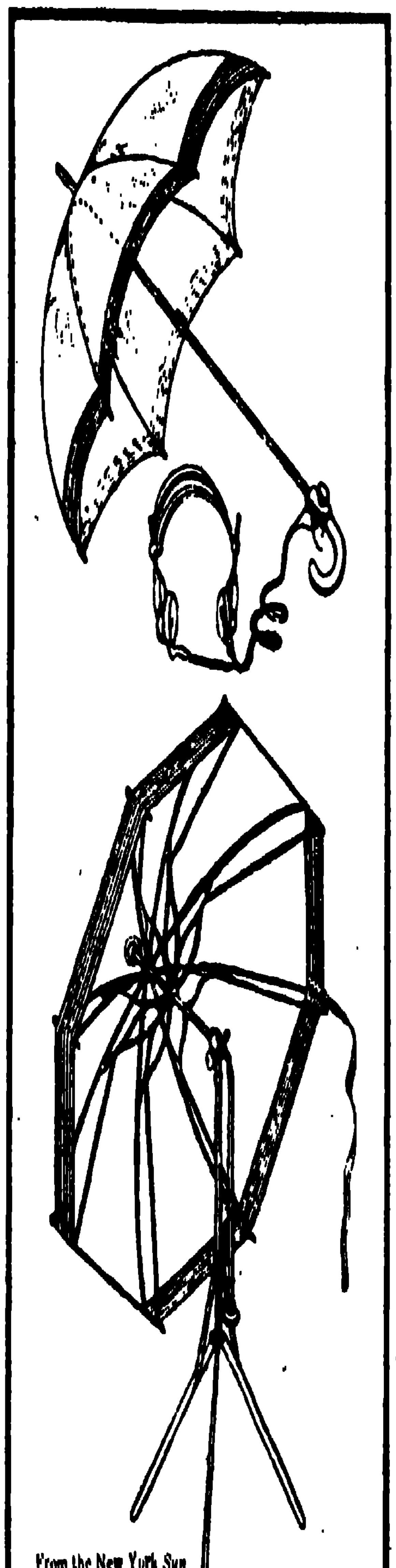

THE UMBRELLA RADIO

ছাতার মধ্যে রেডিও সেট

খোলা অবস্থায় থাকিলে ছাতার মধ্যে অন্য কিছু যে আছে তাহা বোঝা যায় না। কেবলমাত্র হাতলের কাছে কানে লাগাইবার যন্ত্রটি বাহির হইতে দেখা যায়।

—

পোষা কুমীরের মুখে—

El Guarany নামক একজন লোক একটি কুমীরকে অদ্ভুতভাবে

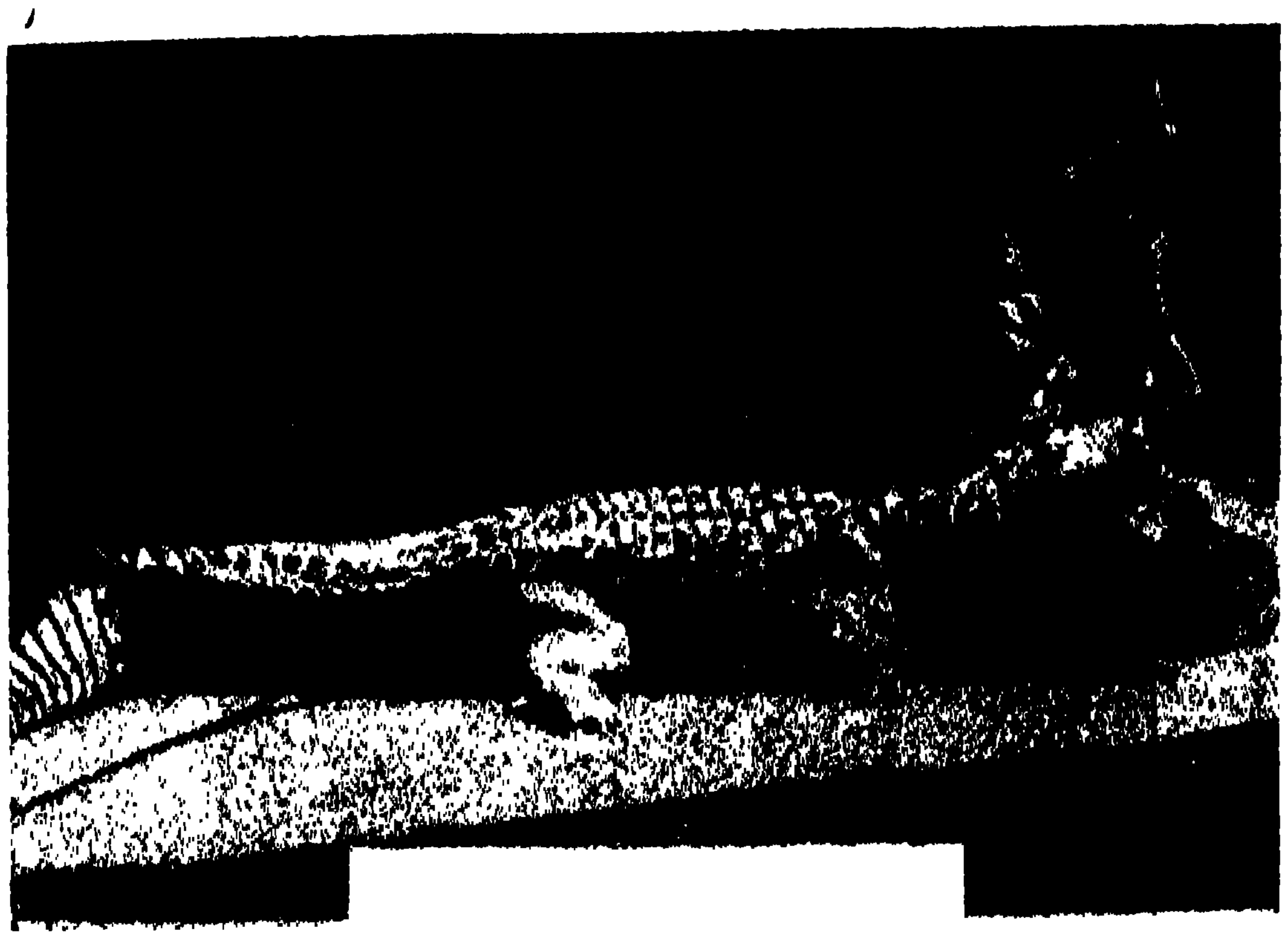

কুমীরের মুখে

বশ করিয়াছেন। তিনি নির্ভয়ে ইহার প্রকাণ্ড মুখে নিজের মাথা প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন।

সমুদ্রতলের বিচিত্র বাসিন্দা।—

(১) বাঘা-হাঙ্গর—এই সকল হাঙ্গর মানুষ খাইতে বড় ভালবাসে। লম্বায় এক একটি ২৫ ফুট পর্য্যন্তও হয়। ইহাদের প্রকৃতি অতি ভীষণ।

(২) Spotted Eagle নামক গভীর সমুদ্রের অভিনব মৎস্য। ইহারা ডানা-মেলা অবস্থায় প্রায় ২৫ ফুট হয়। ইহাদের মুখের সহিত মানুষের মুখের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

(৩) দুই টন ওজনের ডেভিল-ফিশ। এমন অদ্ভুতদর্শন জীব সচরাচর চোখে পড়ে না। ইহারাও অতি গভীর জলে বাস করে।

ডেভিল-ফিশের পিঠের দিকও দেখিতে অতি বিচিত্র। সাউথ-সি আইল্যাণ্ডের নিকট এই জীব প্রায়ই পাওয়া যায়।

বাঘা হাঙ্গর

সমুদ্রের অভিনব মৎস্য

(৪) কাপ্তান উইলিয়াম টাকার এই অক্টোপাসটিকে গভীর জলের মধ্যে ধরিয়া জীবন্ত অবস্থায় উপরে তোলেন। মনের এবং দেহের অসীম শক্তি না থাকিলে এইভাবে অক্টোপাস পাকড়াও

অক্টোপাস

ডেভিলফিশের পিঠ

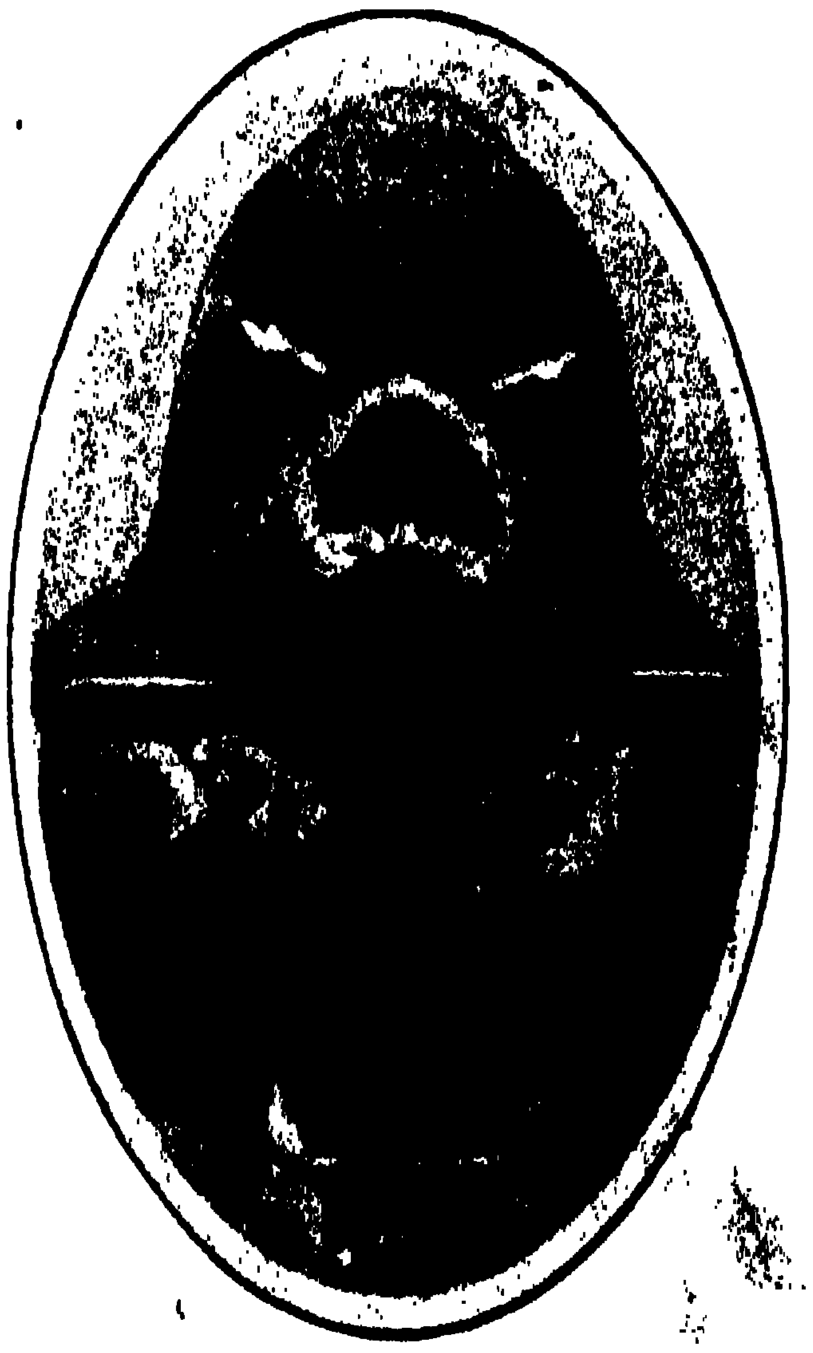

ডেভিল ফিশের মুখ

করিয়া আনা যায় না। ইহাদের পাল্লায় পড়িয়া প্রাণ হারাইবারও আশঙ্কা আছে

"দি থ্রি মাস্কেটিয়ার" গ্রন্থের লেখক কে ?—

আলেকজান্দার ডুমা উল্লিখিত বিখ্যাত পুস্তকখানির গ্রন্থকার বলিয়াই এ যাবৎ লোকে জানিত। সম্প্রতি ইহা লইয়া গোলোযোগ উঠিয়াছে। মিঃ আর এস কেনড্রিক নামক একজন পণ্ডিত বলিতেছেন যে, ডুমা একখানি পুরাণ বই হইতে 'থ্রি মাস্কেটিয়ারে'র গল্পাংশটি গ্রহণ করেন। তিনি সেই পুরাণ বইখানিকে কিছু বাড়াইয়া নিজ-নামে প্রকাশ করেন, একথাও বলা যায়। এই পুরাণ বইখানির নাম "Memoires de Mr D'Artagnan এবং ইহার লেখকের নাম Gatien de Courtilz de Sandias.

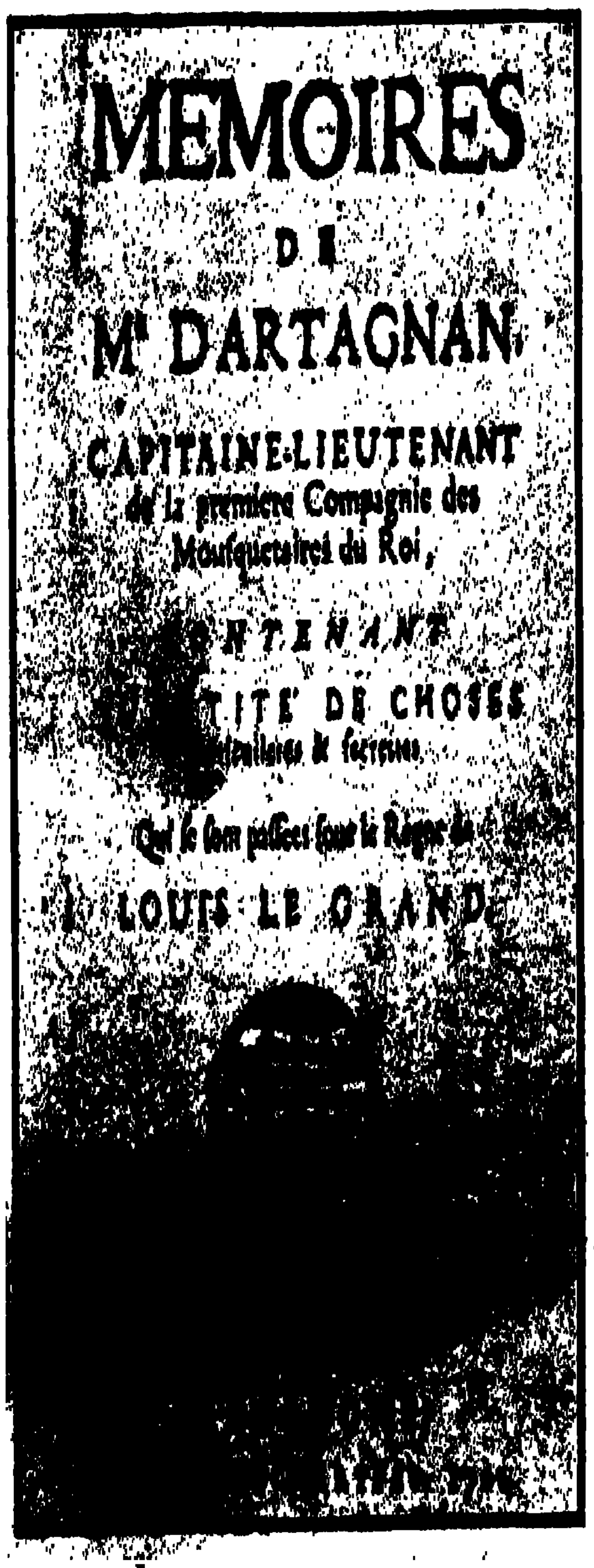
MEMOIRES
DE
Mr D'ARTAGNAN
CAPITAINE-LIEUTENANT
de la premiere Compagnie des
Mousquetaires du Roi,
TITE DE CHOSES
LOUIS LE GRAND

[কুর্টিলজ্‌ দ্য সাঁড্রা প্রণীত পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা

মূল পুস্তকখানির মলাটের একটি ছবিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকপাঠে জানা যায় যে D'Artagnan (পুস্তকের নায়ক) কল্পিত ব্যক্তি নন—ইনি সত্যিকার একজন মানুষ ছিলেন। কেনড্রিক বলেন যে ডুমা এবং তাহার দলের আরো কয়েকজন লেখক এই প্রকারে বহুলেখকের বই নিজেদের নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই কার্য্য ইহাদের মূল পেশা ছিল বলিয়াই এই পণ্ডিতের মত। কেনড্রিক বলেন যে যদিও ডুমা পরের লেখা রূপান্তরিত করিয়া নিজের নামে চালাইতেন তথাপি তিনি যে একজন অতি পণ্ডিত এবং বিখ্যাত লেখক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপর লোকের সাধারণ লেখাকে ডুমা এমন আশ্চর্য্যভাবে পরিবর্ত্তন করিতেন যে তাহা অতি ক্ষমতাশালী লেখকের লেখা বলিয়া মনে হইত।

আলেকজান্দার ডুমা

এরোপ্লেন হইতে মেল-ব্যাগ ধরিবার জাল—

খুব উঁচু করিয়া একটি জাল অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া টাঙান

মেল ব্যাগ ধরিবার জাল

থাকে। জালের নীচের দিক থলির মত—কোনো জিনিষ মাটিতে পড়িতে পায় না। এরোপ্লেন দূর হইতে বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া জালের অবস্থান ঠিক করিয়া লয় এবং দড়ি বাঁধিয়া মেল ব্যাগ ঝুলাইয়া দেয়। মেল-ব্যাগ জালের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই জালের ওপরের তারের দড়ির সহিত যুক্ত ছুরিতে লাগিয়া ব্যাগের দড়ি কাটিয়া ব্যাগ জালের নীচে আসিয়া পড়ে। ব্যাগ মাটিতে না পড়ায় ব্যাগের মধ্যে মাল-পত্রাদি কিছুই নষ্ট হয় না।

মেল-ব্যাগ এইভাবে যথাস্থানে ফেলিয়া দেওয়াতে মেল এরোপ্লেনের গতি বিশেষ হ্রাস করিতে হয় না—এবং সময়ও নষ্ট হয় না। মেলব্যাগ দিবার জন্য এরোপ্লেনকে অতি নীচে নামাইবার দরকার হয় না। ইহাতে অসম্ভব-রকম সময়সংক্ষেপ হইতেছে।

অদ্ভুত বর্ম্ম

অদ্ভুত বর্ম্ম—

বুক এবং পেটের মাঝামাঝি এই বর্ম্ম আঁটা থাকে। বর্ম্ম হইতে দুইটি দড়ি লোকের দুই হাতে লাগান থাকে। হাত তুলিবামাত্র বর্ম্মের মধ্যে লুকান মেশিনগান হইতে গুলি বাহির হইতে থাকে। বর্ম্মপরা থাকে বলিয়া শত্রুপক্ষের গুলি বর্ম্ম পরিধানকারীর কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। এই অভিনব বর্ম্মের সাহায্যে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা দুইই সম্ভবপর।

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার সময় একখানি নৌকা দক্ষিণমুখী হইয়া গঙ্গায় বাহিয়া যাইতেছিল। মাঝিরা দূরদেশবাসী, যাত্রীরাও দূর হইতে আসিতেছে; গঙ্গার ধারে কোথায় কোন গ্রাম সকলে জানে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা কোথাও জল তুলিতেছিল, কোথাও গঙ্গার ধার দিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছিল। নৌকা কিছু গভীর জলে, যেখানে ভাঁটার স্রোত একটানা সেইখান দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। জলের ধারে একটু দূরে কোথাও বাঁশবন, কোথাও পাকুড় গাছ, কোথাও নোনা গাছ। গাছে ঘুঘু কাঠঠোকরার ডাক, কোনো গাছে চড়াই পাখীর ঝাঁক কলরব করিতেছে। সন্ধ্যা হইতেই সব শুদ্ধ, কোথাও আর জনমনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল মাঝে মাঝে একটা শিয়াল পাড়ের উপর দিয়া ছুটিয়া আবার বনে প্রবেশ করিতেছে।

নৌকায় মাঝি ছয়জন, যাত্রী আট জন। যাত্রীরা সকলেই পুরুষ, কয়েকজন প্রবীণ, দুইজনের বয়স অল্প, তাহার মধ্যে একজন বালক আর একজন বাইশ বৎসরের যুবক। প্রবীণদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি বলিতেছিলেন,—আর একটা রাত কাটাতে হয়, কাল গ্রামে পৌছান যাবে।

আর একজন মুখের হুঁকা সরাইয়া বলিলেন,—কাল এতক্ষণ আমরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে গল্প করব।

যে মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়াছিল সে হাঁকিল,—দক্ষিণে মেঘ উঠেছে। শশব্যস্ত হইয়া সকলে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। তখন ঘোর করিয়া আসিয়াছে, বেশী অন্ধকার হয় নাই। দক্ষিণ হইতে মেঘ আকাশ ছাইয়া আসিতেছে, বাতাসের বেগ বাড়িয়াছে।

কর্ত্তা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—ভিড়াও, ডাঙ্গায় ভিড়াও।

মাঝি হাল ফিরাইল, চারজন দাঁড় ধরিল, নৌকা কিনারার দিকে চলিল। একজন যাত্রী বলিল,—এ ঝড় বেশীক্ষণ থাক্‌বে না। তারপর কি আবার নৌকা খুলে দেবে?

কর্ত্তা কহিলেন,—এ রাত্রে আর নয়, শেষরাত্রে দেখা যাবে। না হয় গ্রামে পৌছুতে কিছু বিলম্ব হবে।

—সে জন্য নয়। অচেনা, আঘাটা জায়গা, নৌকা বাঁধা থাকলে ভয় আছে ত।

—তার কি করতে হবে! ভয় নেই কোথায়? ডাঙ্গায় ডাকাতের ভয়, জলে বোম্বেটের ভয়, ঝড়ে নৌকা-ডুবির ভয়। হাবুডুবু খেয়ে মর্‌তে চাও?

—মধুসূদন, মধুসূদন! আমি এই কথার কথা বল্‌ছিলাম।

নৌকা কিনারায় আসিয়া ভিড়িল। আরোহীরা তাড়াতাড়ি ডাঙ্গায় নামিল। মাঝিরা কাছি-খুঁটি লইয়া নৌকা মজবুত করিয়া বাঁধিল।

দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার করিয়া, গাছের মাথা নোয়াইয়া, নদীর জল তোলপাড় করিয়া প্রচণ্ড বেগে ঝড় আসিল। মাঝিরা, আরোহীরা সকলে মিলিয়া প্রাণপণে কাছি টানিয়া ধরিল, নহিলে খুঁটিসুদ্ধ নৌকা ভাসিয়া যায়। ঝড় কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না। এক দণ্ডের মধ্যে বাতাসের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইল, মাথার উপর নক্ষত্র দেখা দিল। মাঝিরা, আরোহীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া সবে রাত্রি হইয়াছে। নৌকার লোকেরা আবার নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বিশ-পঁচিশজন জোয়ান লাঠিয়াল নিঃশব্দে আসিয়া নৌকা ঘেরাও করিল। সকলের হাতে বড় বড় লাঠি, দুই-তিনজনের কোমরে তরওয়াল। তাহাদিগকে দেখিয়া যুবক আরোহী লাফ দিয়া নৌকায় প্রবেশ করিয়া লাঠিহাতে বাহির হইয়া আসিল।

নাবিকেরা ভয়ে জড়সড়। আরোহী কয়েকজন ইষ্ট-দেবতার নাম করিতেছিলেন। কর্ত্তা তবু শক্ত, বলিলেন,—আমাদের কাছে টাকাকড়ি কিছুই নেই, ইচ্ছা হয় তোমরা নৌকা তল্লাস কর।

যে-যুবক নৌকা হইতে লাঠি লইয়া আসিয়াছিল সে উদ্ধতভাবে কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আর একজন আরোহী তাহাকে থামাইয়া দিলেন, কানে কানে বলিলেন,—ব্রজনাথ, তুমি কি পাগল হয়েচ? একা পঁচিশজনের মহড়া নেবে? মাঝে থেকে আমাদের মেরে রেখে যাবে।

ব্রজনাথ আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

লাঠিয়ালদের মধ্যে একজন ছিল নিরস্ত্র। সে আগাইয়া আসিয়া কর্ত্তার সম্মুখে গায়ের দোছোট খুলিয়া গলার পৈতা দেখাইল। কহিল, আমি ব্রাহ্মণ। তোমরা যা ভাব্‌চ আমাদের সে-রকম কোনো মতলব নেই। তবে যেজন্য আমরা এসেচি তাও এখন বল্‌তে পারচিনে।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের এক জনের হাতে একটা লণ্ঠন ছিল। ব্রাহ্মণ সেই লণ্ঠন লইয়া আরোহীদের মুখ দেখিতে দেখিতে ব্রজনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তোমার সঙ্গে আড়ালে দুটো কথা আছে।

ব্রাহ্মণ ব্রজনাথের হাত ধরিয়া কিছু দূরে লইয়া গেল। চুপি চুপি কহিল, গলা খাটো করে' কথা কও যেন আর কেউ না শুন্‌তে পায়। তোমার নাম কি?

ব্রজনাথ চৌধুরী।

নিবাস?

উলুবেড়ে।

জাতি?

কায়স্থ।

উপাধি?

মিত্র। চৌধুরী পদবী।

তোমার বিবাহ হয়েছে?

না।

উত্তম। বাপ-মা বর্ত্তমান?

হাঁ।

একবার তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। অন্য কথা পরে বল্‌ব। তবে এ কথা বল্‌তে পারি যে, তোমাদের কারও কোনো আশঙ্কা নেই।

ব্রাহ্মণ হাঁকিল,—রঘুনাথ,তোমরা ছয়জন এ দিকে এস।

বলিবা মাত্র ছয়জন লাঠিয়াল—একজনের তরবারিও ছিল—আসিয়া ব্রজনাথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজনাথ বলবান, লাঠিতে তাহার মত খেলোয়াড় কম, অন্য অস্ত্র চালনায়ও দক্ষ, ইচ্ছা করিলে এক নিমেষের মধ্যে দুই তিন জনকে ধরাশায়ী করিতে পারিত, কিন্তু তাহার পর? ব্রজনাথ তাহার পর পলায়নও করিতে পারিত, বনের মধ্যে তাহাকে কে খুঁজিয়া পাইত? কিন্তু তাহার সঙ্গীদের কি দশা হইবে? তাহাদের মারিয়া জলে ফেলিয়া দিলেও রক্ষা করিবার কেহ নাই। ব্রজনাথ বল প্রকাশ করিল না, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাড়ী ফিরব কবে?

তুমি কালই বাড়ী ফিরে যাবে।

ব্রজনাথ গলা উঁচু করিয়া বলিল,—মল্লিক মশায়, আপনারা কিছু ভাব্‌বেন না, আমি কাল বাড়ীতে ফিরে যাব। ঠাকুর-মশায় একটা কাজে আমাকে একবার নিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রাহ্মণও জোরে বলিল,—তোমাদের কোনো ভাবনা নেই। ব্রজনাথ সুস্থ স্বচ্ছন্দ শরীরে কাল গ্রামে ফিরে যাবে।

ব্রাহ্মণ ও ছয়জন ডাকাত কিংবা লাঠিয়ালের সঙ্গে ব্রজনাথ চলিয়া গেল। তাহারা দৃষ্টির বাহির হইতেই অসিধারী একজন কঠিন কর্কশকণ্ঠে বলিল,—তোমরা সব নৌকায় ওঠ।

সুড় সুড় করিয়া সকলে নৌকায় উঠিল। সেই কণ্ঠে আবার আদেশ হইল,—মাঝি কাছি খুলে খুঁটি তুলে নে। নৌকা খুলে দে।

মাঝিরা তাড়াতাড়ি খুঁটি তুলিয়া কাছি গুটাইয়া লইল, একজন গিয়া হাল ধরিল। আর একজন লগী দিয়া নৌকা ঠেলিয়া স্রোতের মুখে ফেলিল। যে নৌকা খুলিতে হুকুম দিয়াছিল সে মাঝিকে ডাকিয়া বলিল—পিছনে চেয়ে দেখ্। যদি রাত্রে কোথাও নৌকা বাঁধিস্ ত ওরা কাছি কেটে, হাল খুলে ফেলে তোদের নৌকা ভাসিয়ে দেবে।

নৌকার সকলেই দেখিতে পাইল পিছনে অন্ধকারে বিশ দাঁড়ের একখানা লম্বা ছিপ আসিতেছে। মাঝিরা দাঁড় টানিতেছে না, দাঁড় চাপিয়া জলের উপর ধরিয়া রহিয়াছে। বার-কয়েক দাঁড় টানিলেই তাহারা নৌকাকে ধরিতে পারে।

মাঝি অনুচ্চস্বরে কহিল, ডাঙ্গায় ডালকুত্তো আর জলে ছিপ, পালিয়ে রক্ষে পাবার যো নেই।

আরোহী একজন বলিল,—এই বল্‌লে কোনো ভয় নেই আবার এই শুন্‌লে ত! ছেলেটাকে রাখবে কি মারবে কে জানে!

—এ ত মগের মুল্লুক।

—আর নয় ত কি!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ একরকম বন্দী। ধরা-বাঁধার কোনোরূপ দৌরাত্ম্য হয় নাই বটে, কিন্তু হইতে কতক্ষণ? যে পর্য্যন্ত ব্রজনাথ ব্রাহ্মণের কথা শুনিবে ততক্ষণ অপর ছয়জন বল প্রকাশ করিবে না, এই পর্য্যন্ত। ব্রাহ্মণ আর ব্রজনাথ পাশাপাশি, সামনে তিনজন লাঠিয়াল, পিছনে তিনজন। লণ্ঠনে পথ দেখা যাইতেছিল। নিবিড় বন, কোনোদিকে জঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার ভিতর দিয়া সরু পথ।

ব্রাহ্মণ বলিল,—দেখাচ্ছে যেন আমরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সত্যি কথা এই যে, তোমাকে বিপদে পড়ে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি সে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

ব্রজনাথের মনে যাহাই থাকুক মুখে কিছুমাত্র ভয় নাই। বলিল,—কার বিপদ? আপনার ত মনে হয় না।

—না, না, আমার নয়। আমার একজন যজমানের।

—এত লাঠি তরওয়ালে বিপদ ঠেকানো যায় না?

—বাপু, তুমি ছেলেমানুষ, বিপদ অনেক রকম হয় তা কি জান না? সব বিপদের মাথায় কি লাঠির ঘা দেওয়া যায়? তোমার সাহায্যে এ বিপদ কেটে যাবে।

—তবে কি কোনো রোগ? তা আমি ত কবিরাজ নই।

—কবিরাজের বাড়ী কি আমি চিনিনে, না দেশে কবিরাজ নেই? বিপদ কন্যাদায় আর সেই দায় থেকে তোমাকে রক্ষে করতে হবে?

—কাকে?

—কন্যার বাপকে।

ব্রজনাথ পথে থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? সব কথা খুলে বলুন।

ব্রাহ্মণ কোমরের কসি হইতে শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া কহিল,—তাইত বলচি। চল যেতে যেতে বল্‌চি। আর বড় বেশী পথ নেই।

আবার পথ চলিতে ব্রাহ্মণ বলিল, এইখানে একঘর কায়স্থ জমিদার আছে তার মেয়ের বিয়ে। তোমাকে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে হবে।

—পথের মাঝখান থেকে ধরে' নিয়ে গিয়ে এ কোন্ দেশী বিয়ে?

—মেয়ে অরক্ষণীয়া, গায়ে হলুদ হয়েচে, আজ বিয়ে, র এসে উপস্থিত হয়নি। বোধ হয় কোনো রকম কেউ ভাংচি দিয়ে থাকবে কিংবা হঠাৎ তাদের কোনো বিপদ টে থাক্‌বে। কিন্তু কোনো খবর আসেনি, আর তাদের গ্রাম অনেক দূর, আজ লোক গেলে কোনো তে আজ ফিরে আসতে পারে না।

—আমাকে মাপ কর্‌বেন, আমি এ বিয়ে করতে পারব না। আমার বাপ-মা আছেন, তাঁদের না জানিয়ে আমি এমন কর্ম্ম করতে পারব না।

—তাঁদের খবর দেবার সময় কই? রাত্রি দণ্ডটার মধ্যে গ্ন, আজ রাত্রে বিয়ে না হলে মেয়ের বাপের জাত যায়, আর এমন বিয়েতে তোমার বাপ-মার কোনও আপত্তি তে পারে না। মেয়ের বাপ ধনী, কন্যা পরমাসুন্দরী, তোমার ত বেশ ভাল বিয়েই হবে। তা ছাড়া তাদের তুমি মস্ত দায় থেকে রক্ষে করবে। এমন শুভকর্ম্মে তুমি আর আপত্তি কোরো না।

ব্রজনাথ ভাবিতে লাগিল। আর খানিক গিয়াই বন ফুরাইয়া গেল, সামনে বেশ বড় কোঠাবাড়ী। ব্রাহ্মণ বলিল,—তোমার লাঠিগাছা আমাকে দাও।

—কেন?

—লাঠি কাঁধে করে' কেউ কি বিয়ে করতে যায়?

ব্রজনাথ তাহার লাঠি ব্রাহ্মণের হাতে দিল।

বাড়ীর সদর দরজায় কয়েকটা বড় বড় আলো, ভিতরে চকমিলান বাড়ীর মস্ত উঠান, দালানে বরের আসর। লোকজন অধিক নাই, কন্যাযাত্রের সংখ্যা অল্প। ব্রজনাথকে একেবারে আসরে না লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে একটা পাশের ঘরে লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ব্রাহ্মণ ও পট্টবস্ত্রপরিহিত এক পুরুষ সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ব্রজনাথের সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল সে কহিল,—ইনিই পাত্র। চীনবস্ত্রধারী পুরুষকে দেখাইয়া কহিল,—ইনি কন্যার খুড়া, ইনি সম্প্রদান কর্‌বেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্রজনাথকে দেখিয়া কহিল,—বেশ সুপাত্র। কন্যা ভাগ্যবতী। আমরা ত ভেবে অস্থির হয়েছিলাম।

কন্যার খুড়া ব্রজনাথের পরিচয় লইলেন। নাপিত চেলির জোড়, টোপর, মালা, চন্দন, জরির জুতা লইয়া আসিল। বরকে কাপড় ছাড়াইয়া সাজাইয়া আসরে বসান হইল। ব্রজনাথ ভাবিতেছিল, জেগে আছি না স্বপন দেখ্‌চি? সে বরের মত ঘাড় হেঁট করিয়া না থাকিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। একজন উন্নতকায়, বলিষ্ঠ পুরুষ বড় বড় গোঁফ পাকাইতে পাকাইতে আসিয়া, ব্রজনাথের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া চলিয়া গেল। ব্রজনাথের পাশে একজন চুপি চুপি বলিল,—উনি কন্যার বাপ।

ব্রজনাথ সেইরকম গলায় বলিল,—চাউনি কিন্তু সে রকম নয়।

চুপ চুপ! বলিয়া সে ব্যক্তি ঠোঁটে আঙুল দিল।

ব্রজনাথ মনে করিল বরের পক্ষে এরূপ প্রগল্‌ভতা নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া সে ব্যক্তি নিষেধ করিতেছে।

বরকে তখনি তুলিয়া সম্প্রদানস্থলে লইয়া গেল। কন্যাকর্ত্তার আর দেখা নাই।

কন্যার অবয়ব সঙ্কুচিত ও মুখে লম্বা ঘোমটা টানা থাকিলেও ব্রজনাথ পিঁড়িতে বসিবার সময় বুঝিতে পারিল যে, কন্যা নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা নয়, বেশ ডাগর মেয়ে। সেকালে এক কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ছাড়া অত বড় অবিবাহিতা মেয়ে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না।

যে-ব্রাহ্মণ ব্রজনাথকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল সে তাহার পুরোহিত হইয়া ব্রজনাথের পিতৃপিতামহের নাম, গোত্রাদি জানিয়া লইল। কন্যাপক্ষে পুরোহিত দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

স্ত্রী-আচারের সময় ছান্‌লাতলায় কনের মা ঝলমলে জড়োয়া গহনা পরিয়া, বরকে বরণ করিয়া, সূতা হাতে জড়াইয়া তাহার হাতে যখন মাকু দিলেন তখন আর একজন স্ত্রীলোক বেশ চাঁচা গলায় বলিলেন, একবার ভ্যা কর ত বাপু।

বর বলিল,—ও ডাক আমার মুখে আসে না, হালুম্-হুলুম বলেন ত পারি। স্ত্রীলোকটি বলিলেন,—বর ত বড় বাচাল।

পিছন হইতে কে বলিল,—বর ঠিক বলেচে। বাঘের ঘরে বাঘই আসে, বাঘের ঘরে কি ঘোঘে বাসা করে?

আর একজন বলিল,—থাম্ থাম্, ওসব কি কথা!

কনের পিঁড়ি দুজন মামা ধরিয়াছিল। যখন বরের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল তখন দুই-চারজন চেঁচাইল,—বর বড় না কনে বড়?

কেহ বলিল, দুজনে সমান। কেহ বলিল, দুজনেই বড়। কনে বড় বলিতে হয় বলিয়া একবার বলিল।

শুভদৃষ্টির সময় নাপিত অনেক ছড়া কাটাইয়া বর-কনের মাথার উপর চাদর ঢাকা দিল। ব্রজনাথ চাহিয়া দেখিল। ব্রাহ্মণ বাড়াইয়া বলে নাই, কন্যা যথার্থ রূপবতী। কিশোরী? যদি ষোড়শীকে কিশোরী বলিতে পারা যায় তবে কিশোরী। বিশাল চক্ষে স্থিরদৃষ্টিতে ব্রজনাথের মুখ দেখিতে ছিল। চারি চক্ষে মিলিল। চক্ষের দৃষ্টি চক্ষের দৃষ্টির সঙ্গে জড়াইয়া গেল। চক্ষু যেন হাত বাড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল। বিস্ফারিত চারিচক্ষু কোমল হইয়া আসিল, চক্ষের পল্লব পড়িল, দৃষ্টি নত হইল।

স্ত্রী-আচারের পর বরকন্যা আবার সম্প্রদানস্থানে বসিল। বিবাহ সমাধান হইলে তাহারা বাসর-ঘরে যাইবে, ব্রজনাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া, গাঁটছড়া ধরিয়া একটু দাঁড়াইল। কাপড়ে টান পড়াতে কন্যাও দাঁড়াইল। যিনি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাকে ব্রজনাথ বলিল,—আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন। আমার পক্ষ থেকে এখানে কেউ নেই, কাজেই আমাকে বল্‌তে হচ্চে। কাল কখন আমাদের দেশে পাঠিয়ে দেবেন?

জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌ব, বলিয়া কন্যার খুড়া পাশের একটা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই কে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কী! এতবড় আস্পর্দ্ধা! চালচুলো আছে কি না, না জেনেই মেয়ে পাঠানো হবে?

কে যেন তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিল, কণ্ঠস্বর যেন দূরে চলিয়া গেল, মাঝে ঝনাৎ করিয়া দরজা পড়িল।

এ ত সুন্দরবনের গর্জ্জন! কাহার ভীম কণ্ঠ? ব্রজনাথের মনে হইল যিনি একবার মাত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া অপসৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার গোঁফের গোছা ও বুকের পাটার সঙ্গে এই বজ্রকণ্ঠ খাপ খায়। এ আর কেহ নয়, সদ্যবিবাহিত ব্রজনাথের পিতৃতুল্য শ্বশুর-মহাশয়! নবজামাতাকে এইরূপ সম্ভাষণ! কথা সাক্ষাতে না হইলেও শুনাইয়া বলা। ব্রজনাথের মুষ্টি দৃঢ় হইল, চক্ষের মুখের ভাব কঠিন হইল।

সেই তর্জ্জন শুনিয়া কন্যা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর গাঁটছড়ায় একটু টান পড়িল। ব্রজনাথ আর দাঁড়াইল না, বরবধূ বাসরে গেল। সেখানেও যেন সেই গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। সকলেই কিছু সশঙ্কিত, যেন কোথাও কিছু ত্রাসের কারণ আছে। ক্রমে সে ভাব গেল, বাসর-ঘরে বরের সঙ্গে যেমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ হইয়া থাকে সেই রকম আরম্ভ হইল। কিন্তু বরের ভাবান্তর হইয়াছিল, অনেকক্ষণ ভাল করিয়া কথা কয় না, কুঞ্চিত ললাটে কি যেন ভাবিতেছিল। একজন রসিকা প্রৌঢ়া বলিলেন,—বিয়ে হতেই তোমার এত ভাবনা কিসের? হঠাৎ 'হ'ল বলে'? তা যদি মেয়ের

বেলা বল্‌তে পারা যায়, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, তা' হলে ছেলেকে ওঠ্ ছোঁড়া তোর বিয়ে বল্‌তে দোষ কি?

ব্রজনাথের ললাট সরল হইল. মুখে হাসি দেখা দিল। বলিল,—কে বল্‌বে? বাপ মায়ে না লেঠেলের দল?

সকলে হাসিতে লাগিল। প্রৌঢ়া বলিলেন,—লাঠি আজকাল কার হাতে না থাকে? আমরা মেয়েমানুষ, আমরাও সড়কি চালাতে জানি?

—সে কখন বিয়ের বেলা? যখন বিয়ের সম্বন্ধ আসে সে সময় কি কনে ঘটকীকে সড়কির খোঁচা মারে?

মেয়েরা সব মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া অস্থির। এক যুবতী বলিলেন,—বরের সঙ্গে কথায় কারুর পারবার জো নেই। হ্যাঁগা বর, তোমার বাড়ী কি শান্তিপুর?

—কেন বলুন দেখি? শান্তিপুরে ত মেয়েরাই জবর শুন্‌তে পাই। আমার বাড়ী ফরীদপুর।

শেষ কয়টা কথায় দস্তুর মত পূর্ব্ববঙ্গের টান। কে কত হাসে।

হাসি সামলাইয়া সেই যুবতী বলিলেন,—আর যাত্রার সঙ্ দেখ্‌তে হবে না, বাসর-ঘরেই বসে দেখ্‌চি।

—প্যালা-টালা কিছু পড়্‌বে না? টাকাটা সিকিটা?

—না চাইতে সাত রাজার ধন এমন মাণিক পেয়েচ তাতে মন ওঠে না? আবার সিকি দুয়ানিতে লোভ?

এবার যুবতীর ষোল আনা জিত। বর বলিল, আমার হার। শান্তিপুর ছাড়া আর কোথাও কথায় এমন শান দিতে জানে না।

প্রৌঢ়া বলিলেন,—তুমি ধরেছ ঠিক। উনি শান্তিপুরের সেরা মেয়ে।

—শান্তিপুরের সঙ্গে ফরিদপুর পারবে কেন?

একটি কিশোরী বরের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, —তুমি ত কুড়িয়ে পাওয়া বর!

—গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছিলুম আমাকে তুলে এনেচে। আমি যে রাজপুত্তুর নই তা কেমন করে জানলে?

—ঈস্! তা সত্যি, এ যেন ঠিক রূপকথার মত। কার যে কোথায় ভবিতব্য কে জানে? কোথায় সব ঠিক হ'ল, গায় হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেল তারপর সব ফেঁসে গেল, কোত্থেকে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লে।

—হাঁ, আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া এখন চরে বেড়াচ্ছে, ভোর হলেই এসে হাজির হবে।

এসব কথা মৃদুস্বরে হইতেছিল, সকলে শুনিতে পাইতেছিল না। কিশোরী গলা আরও খাটো করিয়া বলিল,—তাও রঙ্গ রাখ। শুভদৃষ্টির সময় কেমন দেখ্‌লে?

—বেশ, ঠিক তোমার মতন।

—কানমলা খাবে কিন্তু বল্‌চি।

—সে ত সরপুরিয়ার মত মিষ্টি। তুমি কখনো নাক-মলা খেয়েচ? তোমার নাকটি আমার হাতের খুব কাছে।

এই রকমে খানিক রাত কাটিল। বাসর-ঘর আস্তে আস্তে খালি হইতে আরম্ভ হইল। কিশোরী তামাসা ভুলিয়া কনের পাশে অগাধে ঘুমাইয়া পড়িল, প্রৌঢ়া ও যুবতীরা উঠিয়া গেল। বাসর-ঘরে প্রায় কেহ রহিল না। ব্রজনাথ শুইয়াছিল, কিন্তু নিদ্রা তাহার চক্ষে আসে নাই। এমন অবস্থায় পড়িলে কাহার আসে? কোথাও কিছু নাই পথ চলিতে পথের মাঝে বিবাহ। যদি ব্রজনাথ একেবারে অস্বীকৃত হইত তাহা হইলে কি তাহার প্রতি বল প্রকাশ করিত? এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছাড়া পুরুষেরা কেহ তাহার সহিত বেশী কথাও কহে নাই। আর যাঁহাকে ব্রজনাথ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিল? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক ইতর লোকের মত ব্রজনাথকে শুনাইয়া দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ সম্ভাষণে একটা কথাও কহেন নাই। ধনী জমিদারের একি রকম ব্যবহার? লোকটার মাথা খারাপ নয় ত? তাহা ত মনে হয় না, কিন্তু তাহার পাশে নিদ্রিতা এই তন্বী পিতার কণ্ঠ শুনিয়া ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিল কেন? ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য নিশ্চয় আছে।

ব্রজনাথ বধূর দিকে পিঠ করিয়া শুইয়াছিল, তাহার কথা মনে হইতে তাহার দিকে ফিরিয়া শুইল। দেখিল, বধূও বিনিদ্রনয়নে, স্নিগ্ধ, শান্ত, কৌতূহলোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মাথার ঘোমটা একটু সরিয়া গিয়াছে, কেশ কিছু আলুথালু হইয়াছে, সীমন্তে স্থূল রেখায় সিন্দূর। এ সিন্দূর ব্রজনাথের নিজের হাতে দেওয়া, কুনকের গায় মাখানো, সেই কুনকে ব্রজনাথ কন্যার সিঁথিতে টানিয়া দিয়াছিল। সিন্দূরে কন্যকা অবস্থা উত্তীর্ণ

হইয়া কন্যা ব্রজনাথের ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী হইল, কুনকে হাতে করিয়া ব্রজনাথ পত্নীর অন্নসংস্থানের ভার লইল।

ব্রজনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অতি লঘু স্বরে কহিল, —আজ রাত্রে হয়ত আমাদের কথা কইতে নেই, তোমার লজ্জা হ'তে পারে, কিন্তু আমি গোটা-কতক কথা জান্‌তে চাই। তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে?

কন্যা আরও মৃদুস্বরে কহিল,—দেব।

—বিয়ের পর অমন করে পাশের ঘরে যিনি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তিনি কি তোমার বাবা?

—হ্যাঁ।

—তিনি ত কিছু না জেনেই আমাকে তাঁর জামাই করেচেন। আমাদের চালচুলো আছে কি নেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই ত পারতেন।

—উনি বড় রাগী।

—তা ত বুঝলুম। রাগের কি এই সময়?

কোন উত্তর নাই।

ব্রজনাথ বলিল,—তুমি আর এবিষয়ে কি বল্‌বে? তোমার কাকা ছাড়া বাড়ীর পুরুষেরা কেউ আমার সঙ্গে কোনো কথা কয়নি। কেন?

—তা আমি কেমন করে জান্‌ব?

—তোমাকে আমার সঙ্গে না পাঠালে আমাকে ত বাড়ীতে একাই ফিরে যেতে হবে।

কন্যা কোনো উত্তর দিল না, ব্রজনাথের পিছনে দরজার দিকে তাকাইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া শুইল। ব্রজনাথও সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, দরজার চৌকাটে দাঁড়াইয়া পুরোহিত-ঠাকুর। এই ব্যক্তি ব্রজনাথকে নৌকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কোনো কথা কহিল না, অঙ্গুলি দিয়া ব্রজনাথকে ডাকিল। ব্রজনাথ উঠিয়া তাহার কাছে গেল। গাঁটছড়া উত্তরীয় কন্যার পাশে পড়িয়া রহিল। ব্রাহ্মণ ব্রজনাথের কানে কানে বলিল,—তুমি একটু দাঁড়াও আমি কনেকে একটা কথা বলে আসি।

কন্যা জাগিয়া আছে ও বর তাহার সহিত কথা কহিতেছে ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কন্যার কাছে গিয়া হেঁট হইয়া চুপি চুপি কি বলিল। ব্রজনাথ দেখিল, ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কন্যা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলিল,—সাবধান, তোমায় দিয়ে যেন কোনো কথা না প্রকাশ হয়।

ব্রজনাথকে ব্রাহ্মণ বলিল,—তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এলাম বলে'।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল। ব্রজনাথ কন্যার কাছে আসিয়া দেখে ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিয়াছে। ব্রজনাথ আসিয়া কাছে বসিতেই চক্ষু উথলিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। ব্রজনাথ তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েচে? কাঁদ্‌চ কেন?

কন্যা অনেক চেষ্টা করিয়া সামলাইয়া বলিল,—আমি কিছু জানি নে। ঠাকুর-মশাই বলে গেলেন এখনি তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে, তুমি কোনো রকম আপত্তি করো না। আর আমাকে বলে গেছেন আমি যেন কাউকে কোনো কথা না বলি। উনি এখানে এসেছিলেন আর তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েচেন আমি যেন তার কিছুই জানি নে। কি হয়েচে? কিসের ভয়?

—তা আমি কেমন করে জানব, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। ও বামুন কি বিশ্বাসী লোক?

—উনি আমাদের আপনার লোকের চেয়েও বাড়া। উনি যা করবেন আমাদের ভালর জন্য।

ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। আবার সঙ্কেতে ব্রজনাথকে ডাকিল। ব্রজনাথ উঠিয়া যাইতেই পূর্ব্বের মত কানে কানে কহিল,—জুতা পায় দিও না।

দরজা-গোড়ায় ব্রজনাথ ফিরিয়া বধূর দিকে চাহিল। সেও চক্ষের জল মুছিয়া ব্রজনাথের দিকে চাহিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল।

দুজনে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির বাড়ীতে আসিয়া যে ঘরে ব্রজনাথ কাপড় ছাড়িয়াছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ কহিল,—চেলি ছেড়ে নিজের কাপড় পর।

—কি হয়েচে?

—বাইরে গিয়ে বল্‌ব। বড় আশঙ্কা।

—কার? বাড়ীর লোকের?

—না, শুধু তোমার। এখানে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না।

একটা পাশের দরজা দিয়া দুইজনে বাড়ীর বাহির হইল। ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে ব্রজনাথের সঙ্গে অরণ্যে প্রবেশ করিল। সাবধানে কথা কহিবার আর কোনো প্রয়োজন রহিল না। ব্রজনাথ কহিল,—আশঙ্কা কি রকম? প্রাণের আশঙ্কা? ও বাড়ীতে কি বিয়ের রাত্রে জামাইকে মেরে ফেলে, সেইজন্য যেখানে আগে কথা হয়েছিল তারা সরে পড়েছে?

ব্রাহ্মণ কহিল,—কি বিপদ! একটু আস্তেই কথা কও না। গলা বড় করে কি ফল?

—তুমি কি ঠাকুর মনে করেচ যে আমি প্রাণের ভয়ে গলা খাটো করব? মেয়ে-মহলে পাছে একটা গোল হয় বলে' আমি তোমার সঙ্গে চলে এসেচি।

—তা ভালই করেচ। তোমার যে প্রাণের ভয় ছিল এমন কথা ত আমি বলিনি।

—তবে কিসের ভয়?

—অপমানের। আমি কোনো আশঙ্কা নেই বলে তোমায় নিয়ে আসি। অপমানের আশঙ্কা বলে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

—কে অপমান করবে? যাঁকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা করেচি তিনি ত? তিনি না বলেচেন আমাদের চালচুলো নেই। উপকারের উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েচি।

—ও কথায় ত কোনো ফল নেই। এখন তুমি দেশে ফিরে যাও।

—তারপর আপনি যে বিয়ের মন্ত্র পড়ালেন সে কি মিথ্যে?

—মিথ্যে কেন হতে গেল? এর পর সময় বুঝে তোমার বউ তুমি নিয়ে যেও।

—তখন হয়ত লাঠি মাথায় পড়বে, শুধু লেঠেলের হাতে থাক্‌বে না।

ব্রাহ্মণ আর কোনো কথা কহিল না। এক জায়গায় গঙ্গার পাড় পর্য্যন্ত বনের অন্ধকার, তার নীচেই ছিপ বাঁধা। ব্রাহ্মণ ব্রজনাথকে বলিল, নৌকায় ওঠ। মাঝিদের বলিল, এই বাবুকে উলুবেড়ের কাছে নামিয়ে দিবি। যাবি আর আস্‌বি। ভোরবেলা তোদের খোঁজ পড়তে পারে।

ব্রজনাথ নৌকায় উঠিলে পর ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিল,—মাঝিদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না। ওদের বল্‌তে বারণ আছে।

ব্রজনাথ বলিল,—ভাল। আবার যখন আস্‌ব তখন কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

ছিপ খুলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ বলিল, দুর্গা! দুর্গা!

কুড়িখানা দাঁড় জলে পড়িতে লাগিল, লম্বা সরু পান্সি তীরের মত চলিল। ব্রজনাথ মাঝিদের সঙ্গে কোনো কথা কহিল না, নৌকার মাঝখানে তক্তায় হেলান দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। নৌকাতে শীত লাগিবে বলিয়া ব্রাহ্মণ একখানা বালাপোষ দিয়াছিল, সেইখানা জড়াইয়া মাথায় ঢাকা দিয়া বসিয়া রহিল। ছিল এক নৌকায় এখন আর এক নৌকায় আসিয়াছে, কিন্তু এই নৌকা-বদলের মধ্যে কি হইয়া গেল! কোথাও কিছু নাই হঠাৎ বিবাহ। বিবাহ কি ব্রজনাথের মনের মত হয় নাই? শুভদৃষ্টির সময় মুখখানি কেমন দেখিয়াছিল? যাহাকে বিবাহ করিয়াছে তাহার কথা ভাবিতে কোনো দোষ আছে? কেমন সরল কোমল দৃষ্টিতে ব্রজনাথের মুখের দিকে চাহিয়াছিল? ব্রজনাথের আশঙ্কার কথা মনে করিয়াই ত তাহার চক্ষু জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। অমঙ্গলের আশঙ্কা? ইহার অপেক্ষা আর কি অমঙ্গল হইতে পারে যে, বাসর-রাত্রে বর মাঝগঙ্গায় নৌকায় বসিয়া হিহি করিয়া শীতে কাঁপিতেছে? এ কি-রকম বিবাহ আর যাহার কন্যাকে ব্রজনাথ বিবাহ করিয়াছে সেই বা কি রকম লোক? ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল অপমানের ভয়। বিবাহের পরেই ত ব্রজনাথকে শুনাইয়া অপমান করা হইয়াছিল, আবার কি অপমান? জামাইকে কি মারিয়া তাড়াইয়া দিত? মনে করিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ অগ্নির দাহে জ্বলিয়া উঠিল, হাতের লাঠির উপর মুষ্টি বজ্রের মত কঠিন হইল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বদিকে শুকতারা উঠিয়াছে, এমন সময় ব্রজনাথ তাহার সঙ্গীদের নৌকা দেখিতে পাইল। ব্রজনাথ মাথায় মুড়ি দিল, কোনো কথা কহিল না। ছিপ শাঁ শাঁ করিয়া নৌকাকে ছাড়াইয়া গেল। একটা বাঁক ফিরিতে নৌকা আর দেখা গেল না।

ঘোর ঘোর থাকিতে উলুবেড়ের খানিক উত্তরে ছিপ

ডাঙ্গায় ভিড়িল। মাঝি বলিল,—বাবু নেমে যাও। উলুবেড়ে ঐ আগে দেখা যাচ্ছে।

ব্রজনাথ উঠিয়া, হাত পা ছড়াইয়া, আলস্য ভাঙ্গিয়া, বালাপোষখানা ফেলিয়া দিল। বলিল,—পুরুতঠাকুরের বালাপোষ এই রইল। তাহার পর লাঠি হাতে করিয়া, লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল।

মাঝি দাঁড়ের আগা দিয়া ডিঙ্গী ঠেলিতে উদ্যত হইল। ব্রজনাথ মুক্ত,স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল,—আস্‌বার সময় তোমাদের সঙ্গে কথা কইনি, এখন একটা কথা বলি শুনে যাও। পুরুত-ঠাকুরকে বলো আর সাহসে যদি কুলোয় ত তোমাদের পানের গোদাকেও বলো যে আমি যদি বাপের বেটা হই ত এ অপমানের শোধ নেব।

মাঝি নৌকায় উঠিয়া হাল ধরিয়া দাঁড়াইল। সবে জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে, এক পাশের দাঁড় টানিয়া দাঁড়ীরা নৌকার মুখ ফিরাইল। তখন মাঝি ব্রজনাথকে শুনাইয়া কহিল,—যে জায়গায় পড়েছিলে মানে মানে রক্ষে পেয়েচ এই তোমার বাপের ভাগ্যি।

মাঝি তখনও দাঁড়াইয়া। ব্রজনাথ হাতের লাঠি ঘুরাইয়া, ছুঁড়িয়া তাহার মাথায় মারিল, তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়া সে জলে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। দুইজন দাঁড়ী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিল। মাঝি অজ্ঞান।

গঙ্গাবক্ষ কাঁপাইয়া ব্রজনাথ বজ্রনাদে বলিল,—আমি একা তোদের সব-কটাকে জলে চুবিয়ে মার্‌তে পারি। এখন যা, আমার হাতের ঢেরাসহি মাথায় দেখাস্‌। যার লেখা তারেও এর পর দেখ্‌তে পাবি। ব্রজনাথ চলিয়া গেল, আর পিছনে ফিরিয়া চাহিল না।

(ক্রমশঃ)

কাব

শ্রীঅমিয়া দেবী

নব নব সৃজনের স্বপ্নে আত্মহারা
সুন্দরের পূজারত ধ্যানমৌনী তারা
ওগো কবি তরুণ তাপস!
নিঙাড়িয়া অন্তরের যত সুধারস
পুলক-প্লাবনে কভু অভিষিক্ত করি'
ব্যথার অমৃতে কভু ভরি'
সঙ্গীত সৌন্দর্য্যমধু গন্ধ অনুভবে
ধরণীর মর্ম্মখানি পূর্ণ করি তুলিতেছ বিচিত্র গৌরবে;
পানপাত্র লয়ে করে বিশ্ব তব দুয়ারে ভিখারী,
অমৃতের তুমি অধিকারী!

হে তন্ময়, ওগো আত্মভোলা,
আপন আনন্দে নিতি দিতেছ ধরার বুকে
নব নব কৌতুকের বেদনার দোলা,
আপনারি অজানিতে তুমি স্রষ্টা তুমি অন্তর্যামী,
সবিস্ময়ে হেরি তোমা আমি,
হে বিচিত্র লীলাময় কল্পনা-কুশল,
সৃজনের আনন্দ-চঞ্চল!

জীবনের দীপখানি করিয়া উজ্জ্বল
তুলিয়া ধরেছ ঊর্দ্ধে দেবতার আরতির লাগি'
চিত্তমাঝে অনির্ব্বাণ জ্বালি হোমানল
যুগে যুগে জাগি'
বিশ্বের বেদন-সুখ বহি'
আপনারে পলে পলে দহি'
ত্যাগব্রত হে দধীচি সাধিতেছ সুমহান্ তপ
বহ্নিদীপ্ত আনন্দিত জ্যোতির উৎসব।

অলক্ষিত চিত্তলোকে নিত্য অহরহ
পুষ্পিত অন্তর দলে পূজিতেছ জাগ্রত বিগ্রহ,
তারি পদমূলে
নিশিদিন আপনারে ভুলে
ধ্যানশিল্পী রচিতেছ মানস-নন্দন,
তোমারি এ সাধনা যে মৃত্যুশীল জগতের ছিল প্রয়োজন,
জরা মরণের দেশে তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
হে অমৃত জয় তব জয়!

নানা সাহেব—(ঐতিহাসিক উপন্যাস) শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক—আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০।৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ২৷৷০।

দীনেন্দ্রবাবুর নাম বাঙ্গলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার পল্লী-চিত্রগুলি আজও বাঙ্গলার অতুল সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস—সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক নানা সাহেবের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল—কোথাও ইংরেজীর গন্ধ নাই বলিলেও চলে।

বিলাতে প্রকাশিত শশীদত্তের ঐতিহাসিক গল্প-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত *Shankara* উপন্যাস অবলম্বনে "নানা সাহেব" রচিত। কিন্তু গ্রন্থকার পুস্তকের কোথাও সেকথা স্বীকার করেন নাই।

পুস্তকের ছাপা ভাল, কিন্তু অসংখ্য ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। বাঁধাই সুন্দর, কিন্তু মলাটের উপর সোনার জলের ডিজাইনটি শিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন-অঙ্কিত "বিচিত্রা" পত্রিকার 'সঙ্কলনের' ডিজাইনটির হুবহু নকল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্ন—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক লিখিত। প্রকাশক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ পার্শীবাগান, কলিকাতা। পৃঃ ৯+১৫৬ (Sigmund Freud-এর পেন্সিল চিত্রসহ); মূল্য পাঁচ সিকা।

গ্রন্থের ভূমিকাতে গ্রন্থকার ফ্রয়েড (Freud)এর কার্য্য ও মতামত বিষয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। শেষ ভাগে (১) বাংলা শব্দের এবং (২) ইংরেজী শব্দের নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বপ্ন-তত্ত্বকে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বপ্ন কি, কেন হয়, ইহার অর্থ কি, ইহার উপাদান কি, সাধারণতঃ কত প্রকার স্বপ্ন হয়—ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ডাক্তার বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"ফ্রয়েড বলেন, প্রত্যেক স্বপ্নেই মনের কোনো-না-কোনো ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে চরিতার্থতা লাভ করে" (পৃঃ ৵/)। গ্রন্থকার এই পুস্তকে নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু "সম্প্রতি ফ্রয়েড তাঁহার পূর্ব্ব মত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোনো কোনো স্বপ্নে ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি না ঘটিতেও পারে" (পৃঃ ।৵-।০)। বসু মহাশয় বলেন—"এবিষয়ে আমি কিন্তু ফ্রয়েডের সহিত এখনও একমত হইতে পারি নাই" (পৃঃ ।'০)।

কিন্তু আমাদিগের মনে হয় ডাক্তার বসুই ভুলমত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বপ্নের কারণ এক নহে। পরস্পর বিপরীত কারণেও স্বপ্ন দৃষ্ট হইতে পারে। ইহা সত্য যে অনেক স্বপ্নের মূলে ভোগাসক্তি আছে; কিন্তু ইহাও সত্য যে অনেক স্বপ্ন বিরক্তিমূলকও। আরও অনেক কারণ আছে।

ফ্রয়েড (Freud) এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ মনোবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্ব নূতন—আবার কোনো কোনো তত্ত্ব পুরাতন—কিন্তু ইহাও ফ্রয়েডের নামে চলিয়া যাইতেছে। ফ্রয়েডের পূর্ব্বেই Myers, Janet, Boris-Sidis, Morton Prince প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, জাগ্রৎ অবস্থাতেই মানব যেন দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ জ্ঞাতসারে চিন্তা ও কার্য্য করে এবং অপর ভাগ নিজেরই অজ্ঞাতসারে চিন্তা ও কার্য্য করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত ভাগকে Myers সাহেব Subliminal Self নাম দিয়াছেন—অনেকে নামকরণ করিয়াছেন Sub-conscious Self. ফ্রয়েড সাহেব ইহাদেরই মতকে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজেও নূতন কিছু দিয়াছেন। তাঁহার এই নূতন তত্ত্বের স্থায়ী মূল্য কতটুকু, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। তিনি স্নায়ু-বিকারের চিকিৎসক—অনেক ব্যাধিকে তিনি স্নায়ু-বিকার বলিয়া মনে করেন। তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া অনেক বিচক্ষণ লোকের ধারণা হইয়াছে যে, ফ্রয়েড (Freud) নিজেই স্নায়ু-বিকার-গ্রস্ত। তাঁহার মস্তিষ্ক ও মন এতই বিকৃত যে, তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই দেখেন ব্যভিচারের স্থল ও ব্যভিচারের স্পৃহা; রক্তমাংসময় ভোগ ছাড়া জগতে যেন আর কিছু নাই। তিনি বিশ্বাস করেন যে, পিতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে, এবং মাতা কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক ভাল বাসেন। অপর দিকে পুত্রও পিতা অপেক্ষা মাতাকে এবং কন্যা মাতা অপেক্ষা পিতাকে অধিক ভালবাসে। ফ্রয়েড এই ভালবাসার মূলে দেখেন কাম-ভোগের তৃষ্ণা। ফ্রয়েড-সাহিত্যে এই শেষ দুইটির নামকরণ করা হইয়াছে 'Electra Complex' এবং 'Oedipus Complex.' এই দুইটি নামই (Electra এবং Oedipus) গ্রীক-সাহিত্য হইতে গৃহীত। Oedipus না জানিয়া ঘটনাক্রমে নিজের মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ফ্রয়েড-সম্প্রদায় অসত্য ঘটনা, অসত্য ভাব এবং কুৎসিৎ ভাষা প্রচারিত করিয়া পবিত্র সম্বন্ধকেও ব্যভিচার-মূলক সম্পর্ক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা যে সর্ব্বস্থলেই পরোক্ষ তাহা নহে, অনেকস্থলে অপরোক্ষভাবেও ঐ সমুদায় ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি পরিবারে প্রচার করা যায় যে, পিতা ও কন্যা এবং মাতা ও পুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার মূলে রক্তমাংস ভোগ করিবার কামনা, তাহা হইলে এ সমুদায় সম্বন্ধের আর পবিত্রতা থাকে না। একবার কল্পনা আসিলে সে কল্পনা দূর করা এক প্রকার অসম্ভব। ফ্রয়েডের দল পরিবারের যথেষ্ট অকল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

ইহারা জগতের অধিকাংশ বস্তুকেই রক্তমাংসমূলক কাম-ভোগের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এ সমুদায় কুৎসিৎ বিষয় বর্ণনীয় নহে (দুই-একটি দৃষ্টান্ত গ্রন্থকারের পুস্তকে পৃঃ ৯৭, ১০০, ১০২, ১১১ অংশে পাওয়া যাইবে)।

এইজন্য আমরা ইচ্ছা করি না যে, 'ফ্রয়েড'-সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়। Freud-এর *Interpretation of Dreams* যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন প্রকাশকগণ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে এ পুস্তক কেবল চিকিৎসকগণের জন্য।

আমরা কেবল নীতির দিক হইতে যে ঐ প্রকার কথা বলিলাম, তাহা নহে। ফ্রয়েডের অনেক মতও ভ্রমপূর্ণ। তাঁহার অনেক শিষ্যও তাঁহার 'ব্যভিচার-দর্শন'কে 'কু দর্শন' বলিয়া মনে করেন। Jung, Adler, Stekel প্রমুখ অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার দল ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

এখন ডাক্তার বসুর গ্রন্থবিষয়ে দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। তিনি চিন্তাশীল লেখক; তাঁহার এই গ্রন্থ গভীর গবেষণার পরিচায়ক। অনেকে হয়ত জানেন না যে, তিনি 'ফ্রয়েড' দলের মত-বিষয়ে ইংরেজীতে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন—পুস্তকের নাম '*The Concept of Repression.*' কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, এই গ্রন্থ Coriat's *Repressed Emotions*-এর অনুকরণে লিখিত। কিন্তু তাহা নহে। ডাক্তার বসু Psycho-Analysis বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী; তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ভারতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা এই গ্রন্থে নিজের মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ গ্রন্থেও তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উভয় গ্রন্থই সুলিখিত। কিন্তু 'ফ্রয়েড'-পন্থীদিগের কোনো পুস্তকই সাধারণ নরনারীর পাঠোপযোগী নহে। এ সমুদায় পুস্তক বিশেষজ্ঞদিগের জন্য।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

গল্পে উপনিষৎ—শ্রীসুধীরকুমার দাশ, এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার। পৃঃ ৷৵০+২৩৬। পাইকা অক্ষরে এণ্টিক কাগজে ছাপা, ছয়খানি চিত্রযুক্ত, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য দুই টাকা।

এই বইখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। এইরূপ বই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, এবং ইহার আলোচ্য বস্তু ও রচনা-রীতি, উভয় দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইহা একখানি অত্যন্ত উপযোগী পুস্তক হইয়াছে। ভূমিকায় এই বইয়ের উদ্দেশ্য গ্রন্থকার বিবৃত করিতেছেন—"সাধ হইয়াছে, বাঙ্গালী সাধারণকে, বিশেষভাবে বাঙ্গালার ছাত্র ও যুবকগণকে, নূতন করিয়া উপনিষৎ শুনাইব। এই উদ্দেশ্যে উপনিষৎ-শাস্ত্রের আবশ্যকীয় অংশ ও তত্ত্ব যথাসম্ভব সরল সহজভাবে বিবৃত করিয়া চারিভাগে বাহির করা হইতেছে। প্রথম ভাগ 'ঋষিদের প্রার্থনা'। ইহাতে উপনিষদের সমুদয় শান্তিপাঠ এবং সমুদয় প্রার্থনা-মন্ত্র বেদের আর কয়েকটি প্রার্থনা মন্ত্রসহ প্রকাশ করা হইয়াছে। [এই পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই 'প্রবাসী' পত্রে প্রশংসিত হইয়াছে] দ্বিতীয় ভাগ, এই "গল্পে উপনিষৎ"। ইহাতে বিভিন্ন উপনিষদের সমুদয় আখ্যায়িকাভাগ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া প্রকাশ করা হইল। জটিল দার্শনিক আলোচনা সাধারণতঃ বাদ দিলেও ঋষিদের সাধনা ও নানাবিধ শিক্ষা ও উপদেশ অনেকস্থলেই বিবৃত করা হইয়াছে।...একে উপবাস-গর্বিত দেশ, তাহাতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ধর্ম-হীনতা যুবক-সমাজে বিষের ন্যায় বিসর্পিত হইতেছে। জানি না যাহাদের জন্য লেখা হইয়াছে, তাহাদের নিকট এজাতীয় গ্রন্থের কোনও সমাদর হইবে কি না।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তি, যাঁহার প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সহিত স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তিনি, সহানুভূতি অনুভব করিবেন। পিতৃপুরুষের মানসিক culture বা সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় প্রগতির পক্ষে একটি বড় পাথেয়, জাতীয় জীবনযাত্রার এক অপরিহার্য্য বিত্ত। ভারতের সংস্কৃতি জগৎকে অনেক কিছু দিয়াছে—চিন্তা ও দর্শনে, শিল্প ও কলায়, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে; মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে এশিয়াখণ্ডের নানা জাতিকে ভারতবর্ষ বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারত তাঁহার যে আধ্যাত্মিক বাণী ঘোষণা করিয়াছেন, সেই সংযম ও সাধনা, সত্যদিদৃক্ষা ও নিদিধ্যাসন, সমন্বয় ও অহিংসা, অনুকম্পা ও জীবদয়া, করুণা ও মৈত্রীর বাণী ভারতের সংস্কৃতির অন্য সমস্ত অঙ্গকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে উদ্ভাসিত করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছে, এবং বিশ্বমানবের সমক্ষে মানবিকতার পূর্ণ প্রকাশের পক্ষে চরম আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। ভারতের এই বাণী, যাহার জন্যই ভারতের ভারতত্ব, তাহার অনন্ত আকর, গভীরতম উৎস হইতেছে উপনিষৎ; ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ গর্ব্বের নিদর্শন, তাহার জাতীয় আভিজাত্যের পরিচায়ক এই উপনিষৎ। ভারতের উপনিষৎ এখন পৃথিবীর তাবৎ জাতির শিক্ষিতবর্গ কর্ত্তৃক সাদরে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং উপনিষদের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব এখন যে-কোনও জাতির উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে লজ্জার কথা। ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের এক বিশেষ কৃতিত্ব এইখানেই, যে তিনি উপনিষদের প্রতি ভারতীয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, উপনিষদের উপরই তিনি ভারতের নবীন সাধনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী নানা দিক দিয়া অসম্পূর্ণ ও অনুপযুক্ত। এই অসম্পূর্ণতার একটি প্রধান দিক এই যে, ইহাতে ভারতের জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের জন্য সাধারণ ছাত্রের উপযোগী ব্যবস্থা নাই। এইরূপ স্থলে, আমাদের ছাত্রদের পাঠের ও অনুশীলনের জন্য আলোচ্য পুস্তকের ন্যায় পুস্তকের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নিজে কি, নিজের ভিতরে কি শক্তি বা কি দৌর্ব্বল্য আছে তাহা না বুঝিলে উদ্দিষ্ট কর্ম্মে সাফল্য অর্জ্জন করা যায় না। উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনায়, জাতীয় চিন্তাশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত পরিচয় হয়। এই পরিচয় মনুষ্যত্বলাভ-প্রয়াসী সমাজ-হিতৈষী ও দেশহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তির, বিশেষ করিয়া প্রত্যেক যুবকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। আলোচ্য পুস্তকে গ্রন্থকার সেই পরিচয়লাভের পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। আজকাল ইস্কুল ও কলেজের শিক্ষার শোচনীয় অধঃপতন হেতু ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে আগ্রহ বা কৌতূহল নাই, শ্রমসাপেক্ষ সাধনারও অভাব। এদিকে আবার চিত্তবিক্ষেপকারী সহস্র বিষয় তাহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে। একদিকে জীবনের নানা অভাব, এমন কি অন্নবস্ত্রের সংস্থানের চিন্তা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার আদর্শ, অন্যদিকে সমাজের ঘোরতর দুরবস্থা, নানা ভীষণ সামাজিক সমস্যা, ও তদবলম্বনে সাহিত্যে নানা প্রকার পঙ্কিলতা; এবং এই অবস্থায় গোষ্ঠী শক্তি-প্রতিষ্ঠাই যাহাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য নেতৃনামধারী এইরূপ কতকগুলি চতুর ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার অভাবকে অবলম্বন করিয়া, দেশসেবার পবিত্র নামে, সাধনা ও সংযম এবং প্রকৃত সমাজ ও জনসেবা হইতে তাহাদিগকে অশিক্ষিত উন্মত্ত ও বর্ব্বরোচিত অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে আকর্ষণ। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের যুবকগণ যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দেশের এই জীবন-মরণ দশায় দেশের যুবকবৃন্দের মধ্যে চিত্তবিক্ষোভের স্থলে যে ধীরতার, যে অনাবিল বিচারময় দৃষ্টিশক্তির আবশ্যক, তাহা কোথা হইতে পাইব? আধুনিক সংস্কৃতি ও আধুনিক চিন্তা দেশে আসিতেছে না, সুশিক্ষার অভাব তাহার প্রধান অন্তরায়। আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎও যে সংস্কৃতি ও চিন্তার শ্রেষ্ঠতাকে বহুশঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছে, যে সংস্কৃতি ও চিন্তার বংশগত উত্তরাধিকারী আমরা, একবার সেই সংস্কৃতি ও চিন্তা হইতে আমরা কোনও শক্তি, কোনও

স্থিরদৃষ্টি পাইতে পারি কি না, দেখিলে ক্ষতি কি? এইরূপ আলোচনার পথকে যাঁহারা সুগম করিয়া দেন, তাঁহারা সকলেই জাতির হিতকামীদের নিকট সাধুবাদার্হ। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম, মাতৃভাষার সাধনায় ও প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার আলোচনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। স্বদেশের সেবাবিষয়ে তিনি তাঁহার একনিষ্ঠতার প্রমাণও দিয়াছেন। নিষ্ঠা, শ্রম ও সাধনার দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া তিনি যে এই শুভকার্য্যে দেশের যুবকদের সাহায্য করিতে আসিয়াছেন, তাহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। "গল্পে উপনিষৎ" বাঙ্গালী ছাত্র ও যুবকদের পক্ষে অতি সুন্দর ও কার্য্যকর পুস্তকই হইয়াছে; উপনিষদের মনোহর ও গভীরভাব সংবলিত উপাখ্যানগুলি তিনি প্রাঞ্জল সাধু ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তাহাদের আভ্যন্তরীণ মর্ম্মকথা যাহা আমাদের আধুনিক কালের জীবনেও কার্য্যকর, তাহা আবশ্যকমত সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এই উপাখ্যানগুলিতে যে-সমস্ত নিগূঢ় দার্শনিক ও নৈতিক আলোচনা আছে তাহা কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরের সহিত আদর করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু। সর্ব্বসুদ্ধ ১৮টি উপাখ্যান এই বইয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি চিত্রদ্বারা বইটির শোভাবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি মোটের উপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, এবং এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। উচ্চশ্রেণীর ও কলেজের ছাত্রদের উপযুক্ত এইরূপ বই নাই বলিলেও হয়। আশা করি গ্রন্থকার এই পুস্তকের যথাযোগ্য সমাদরে উৎসাহলাভ করিয়া শীঘ্রই তাঁহার প্রস্তাবিত তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত করিতে পারিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্থির-বিদ্যুৎ—রায়-সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, পৃঃ ১৬৯, মূল্য দেড় টাকা।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে রায় মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। জটিল তত্ত্বসমূহ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বুঝিবার মত করিয়া লেখা সহজসাধ্য নহে। এ বিষয়ে রায় মহাশয়ের ক্ষমতা অসাধারণ। এখনকার যুগকে 'বৈদ্যুতিক যুগ' বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আকাশের বিদ্যুৎ কি করিয়া জন্মে, সেই বিদ্যুতের সহিত মানুষের তৈয়ারী যন্ত্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের সম্পর্কই বা কি, বিদ্যুৎ কি পদার্থ, ইত্যাদি বিষয়ে জানিবার স্বভাবতঃই সকলের কৌতূহল আছে। মোটামুটি বৈদ্যুতিক ব্যাপারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। আকাশে যে-বিদ্যুৎ থাকে, তাহা স্থির বিদ্যুৎ। বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে স্থির-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে। তারের মধ্য দিয়া যে-বিদ্যুৎ চলিয়া পাখা ঘোরায়, আলো জ্বালে, কলকব্জা চালায়, তাহা প্রবাহ-বিদ্যুৎ। একটিকে ছাতের উপরের ট্যাঙ্কে জমা-করা জলের সহিত, অপরটিকে নলের মধ্য দিয়া প্রবাহমান জলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই পুস্তকে স্থির-বিদ্যুতেরই আলোচনা আছে। বর্ণনা এমনই সরস ও সরল যে, অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষেও সমস্ত বোঝা সহজ। পাঠক এই পুস্তকে অনেক অভিনব ও জ্ঞাতব্য তথ্য পাইবেন। অতি আধুনিক বৈদ্যুতিক-তত্ত্বেরও সহজবোধ্য বর্ণনা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। বজ্রাঘাত কেন হয়, কি করিয়া তাহা নিবারণ করা যায়—সমস্তই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকে বজ্রপাতের ভয়ে যে সদাই সশঙ্কিত থাকেন, তাহা যে কত অমূলক, লেখক তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। এই পুস্তকপাঠে বালক ও বয়স্ক ব্যক্তিরও বিশেষ জ্ঞানলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। পুস্তকে বহুচিত্র দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ভাল; ছাপার ভুল বিশেষ নাই। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

ভ্রষ্ট লগ্ন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ৯০।২ হ্যারিসন রোড। মূল্য ১৸০। ইহা একখানি উপন্যাস। উপাখ্যানভাগ এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে—সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদার বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁর একমাত্র বংশধর, মাতৃহীন বীরেশের সমুদায় ভার তাঁর বাল্যবন্ধু বিপ্রদাসবাবুর হাতে দিয়া হঠাৎ একদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বিপ্রদাসবাবু ছিলেন "কঠোর নীতিবাদী সংস্কারক ব্রাহ্ম।" সংসারে তাঁর একমাত্র কিশোরী কন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরী রেবা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রেবা বীরেশের সমবয়স্কা আর তারই মত শৈশব হইতে মাতৃহারা। রেবা ও বীরেশের স্নেহপিপাসু মন সহজেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। উভয়েরই ছাত্র-জীবন যখন অবসানপ্রায়, তখন সহসা একদিন বিপ্রদাসবাবুর পরপারের ডাক আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় নিজের দুই হাতে বীরেশ ও রেবার দুইখানি হাত টানিয়া লইয়া একত্র করিয়া দিয়া 'সুখী' হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্বেগে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিবাহের পর রেবাকে লইয়া বীরেশ তাহার পদ্মার চরের জমিদারী কাছারীর বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরেশের এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রজার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রেবাকে বাংলোতে একাকী রাখিয়া সে যখন-তখন ভ্রমণে বাহির হইত। এইরূপে একা থাকা অবস্থায় রেবার মনে প্রথম প্রশ্ন উঠিল—বীরেশকে বিবাহ করিয়া সে কি প্রকৃতই সুখী হইতে পারিয়াছে? আশৈশব কলিকাতার চালচলন ও আমোদ প্রমোদে অভ্যস্ত রেবার মন বলিল 'না'। এদিকে ঘটনাচক্রে একটি বিপ্লববাদী যুবকের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী দুইয়েরই পদ্মাচরের বাংলোতেই পরিচয় ঘটে। যুবকের যুক্তিতর্কের ফলে রেবার অগোচরে বীরেশ বিপ্লববাদী দলে ভর্ত্তি হয়।

এইখান হইতেই নানা ঘটনার ভিতর দিয়া এই উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকাকে এ যুগের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার মধ্য দিয়া চালাইয়া আনিয়া শেষকালে রাজবন্দী দশায় বন্ধু-বান্ধবহীন সুদূর এক গণ্ডগ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্ন কুটিরের ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বীরেশের অকাল মৃত্যু দ্বারা গ্রন্থকার উপন্যাসখানিকে ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছেন। লেখকের বর্ণন ভঙ্গী কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই। তাঁর এই রচনাটিকে সকল দিক দিয়াই কালোপযোগী বলা যায়।

উপন্যাসখানিতে চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্য ও কলাকুশলতা আছে। ইহার ভাষাও প্রাঞ্জল।

সু

হাস্নাহানা—গোলাম মোস্তফা, বি এ, বি টি প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতার বই, এবং কবিতার বই বলিতে যাহা বুঝায় এখানিতে তাহার অসদ্ভাব নাই। 'না পাওয়ার দুখ', 'তুমি যাহা চাহিয়াছ...তাই যেন পাও' 'যৌবন উন্মনা', 'গভীর বেদনা', 'মানসী প্রিয়া', 'ঝিঁঝিঁরিয়া' প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় নাই। 'ঝিঁঝিঁরিয়া'

শুনিলেই, কেন জানি না, কথামালার কাঠুরিয়ার কথা মনে পড়ে। কবিতার মিলগুলি খারাপ নয়। কিন্তু

'পাষাণি!

তোমারে জানাব ব্যথা—এর ভাঁষা নি।'—অসহ্য। গ্রন্থকারের ছন্দে হাত আছে। হাস্নাহানার দু'একটি কবিতা ভাল লাগে। মামুলি ভাব ও ভাষার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিলে কবির আশা আছে। বইখানির ছাপা কাগজ উত্তম।

কল্যাণ-প্রদীপ—শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী প্রণীত ও ৭নং ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট হইতে লেখিকার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় বিগত যুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় ডাক্তার হইয়া যান। কুট-এল-আমারায় জেনারেল টাউনশেণ্ডের সঙ্গে তিনি তুর্কীদের হাতে বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় টাইফস রোগে মারা যান। পুস্তকখানি দিদিমার লেখা দৌহিত্রের জীবন-চরিত ও শোকোচ্ছ্বাস।

শৈ

বড়দিদি

শ্রীসীতা দেবী

বাড়ীখানি কলিকাতার মধ্যেই, তবে বালীগঞ্জের দিকে। সহরের সুবিধাগুলি পাওয়া যায় ; কলের জল, ট্রামগাড়ী, ট্যাক্সি, স্কুল, কলেজ, মেয়ে স্কুল, বায়োস্কোপ থিয়েটার। সহরের অসুবিধাগুলি নাই। বাড়ীর আশে-পাশে খোলা জায়গা রোদ বাতাস প্রচুর। পিছন দিকে ছোট একটি বাগান। রাত নটার সময় চারিদিক এমন চুপচাপ হইয়া যায় যে, সূঁচ ফেলার শব্দ টের পাওয়া যায়। কোনো সময়েই বেশী হৈ হৈ রৈ রৈ নাই।

অনেক কালের পুরান বাড়ী, বাহিরের গোলাপী রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভিতরেও জায়গায় জায়গায় চূণবালি খসিয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর অধিবাসীদের আগাগোড়া মেরামত করিবার পয়সা নাই, আবার দারিদ্র্যের এমন উৎকট দংষ্ট্রা প্রকাশ সহ্য করিতেও পারে না। কাজেই চূণবালী-খসা জায়গার উপর কোথাও বা ছবি টাঙান, কোথাও বা বই অথবা কাপড়ের আলমারী ঠেসান। যেখানে কিছুই করা যায় না, সেখানটায় ইঁটের উপরেই চূণ গুলিয়া প্রলেপ দেওয়া।

নবীন দত্তের এক কালে অবস্থা ভালই ছিল। বাড়ী করিবার নমুনা দেখিলেই বোঝা যায়। কোথাও সংক্ষেপে কাজ সারিবার চেষ্টা নাই, যে-জমিতে ঠাসাঠাসি করিলে দুইটা বাড়ী ধরানো চলিত, সেইখানেই আশে-পাশে জমি ফেলিয়া রাখিয়া মাঝারি গোছের একখানি বাড়ী। পিছনে বাগান, তাহার মাঝে বাঁধানো বেদী, বসিয়া হাওয়া খাইবার জন্য।

গৃহস্বামী কয়েক বছর হইল মারা গিয়াছেন। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বহু সাধ্যসাধনায় তিনি ঘরে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেবীও তিরোহিতা হইয়াছেন। বিধবা গৃহিণী তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে লইয়া কোনো রকমে দিন কাটান। নীচের তলাটি ভাড়া দেওয়া, নইলে সংসার চলে না।

গৃহিণী হিরণমালাকে দেখিলে কেহই বলিবে না যে তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। শ্বেতপাথরের গড়া দেবীপ্রতিমার মত রূপ দর্শকের চোখে এখনও ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। মুখে সর্ব্বদাই একটু অসন্তোষের ভাব, সংসার তাঁহার মত রত্নকে উপযুক্ত পরিমাণ যত্ন দেখায় নাই। স্বামীর নয়নতারা ছিলেন তিনি। স্বামী নাই এখন, কিন্তু তাঁহার আমলের অভ্যাসগুলি রহিয়া গিয়াছে। শীতকালে খাঁটি দুগ্ধ সহযোগে তিনবার কোকো পান না করিলে মাথাই তুলিতে পারেন না। গ্রীষ্মকালে ফলের সরবৎ, শ্বেতপাথরের গ্লাসে। বিধবা হইয়া অবধি মাছ-মাংস খান না, কিন্তু ফল, মেওয়া, দুধ, ঘি, ভালমত না পাইলে স্বাস্থ্য এমন ভাঙিয়া পড়ে যে ডাক্তার-সুদ্ধ শঙ্কিত হইয়া উঠেন। সাদা কাপড়ই পরেন, কিন্তু তাহাও তাঁতের, বাহিরে যাইতে হইলে সাদা রেশম। বাঁ হাতের

আঙুলে একটি হীরার আংটি, পরলোকগত স্বামীর উপহার।

মেয়ে তিনটি তিন রকমের। বড়মেয়ে কিরণমালাকে দেখিলে কেহই বলিবে না, গৃহিণীর কন্যা। তাহার রং ময়লা, শরীর শীর্ণ, চেহারা ঠিক বাপের মত শক্ত ও উগ্র। পুরুষ হইলেই তাহাকে মানাইত। পরমাসুন্দরী মা এমন সন্তানকে জন্ম দিয়া বড়ই যেন লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে আসিত, সেই বলিত, "ওমা, কে বল্‌বে যে হিরণের মেয়ে।" মেয়েও সুদে আসলে চুকাইয়া দিল বড় হইয়া, তাই এমন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল যেন সে হিরণমালার মেয়ে নয়। পিতা বাঁচিয়া থাকিতে, তাঁহার সঙ্গেই এই মেয়ের যা কিছু স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। স্ত্রীর ভয়ে মেয়েকে মুখ ফুটিয়া বেশী আদর করিতে পারিতেন না, কিন্তু কিরণ জানিত, অন্য সন্তানদের চেয়ে সে-ই পিতার স্নেহ বেশী পাইয়াছে। সকলের চোখে তাহার প্রধান অপরাধ যে সে মায়ের মত দেখিতে না হইয়া বাবার মত হইয়াছে। এ অপরাধটা বাবার আরো কাছে তাহাকে আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার সব আবদার ছিল বাবার কাছে, সব গল্প ছিল তাঁহার সঙ্গে। বাবার কাজ ছিল তাহার একচেটিয়া, ভাইবোনেরা এই অধিকারে হাত দিতে আসিলে, তাহাদের নাকমুখের যা অবস্থা হইত, তাহাতে হিরণমালা-সুদ্ধ সশঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। অন্য ছেলে-মেয়েদের তাড়া দিয়া বলিতেন, "যাস্ কেন ওটার কাছে? যেমন রূপ মেয়ের তেমনি গুণ।"

মেজমেয়ে কুন্দমালা ছিল মায়ের প্রতিমূর্ত্তি। তেমনি রং, তেমনি মুখশ্রী, তেমনি নিখুঁৎ গড়ন। এই পূর্ণিমা-রূপিণীকে কোলে পাইয়া মা কিরণকে জন্ম দেওয়ার সব লজ্জা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ভাবী শিশুর জন্য দামী সৌখীন পোষাক-পরিচ্ছদ কিনিয়া এবং সেলাই করিয়া দুইটা বাক্স ভরিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কিরণের চেহারা দেখিয়া আর তাহাকে সাটীন, কিংখাব বা বেনারসীর জামা পরাইবার কথা ভাবিতেই পারেন নাই। সে-সব বাক্সেই তোলা রহিল, কুন্দমালা সংসারে আসিয়া তবে মায়ের পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় সার্থক করিল। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগরের জল যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, হিরণের স্নেহ তেমনি করিয়াই এই সন্তানের মুখ চাহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ছোটমেয়ে রত্নমালা ছিল দুইয়ের মাঝামাঝি। সে মায়ের মুখ, চোখ, গঠন সবই পাইয়াছিল, পায় নাই কেবল তাঁহার কাঁচা সোনার রং। তাই বলিয়া কিরণের মত কালোও সে ছিল না। সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলে, কুন্দমালা যদি তাহার পাশে না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই বলিত, "দিব্যি মেয়েটি ত।" এইজন্য কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে, রত্নমালা গাড়ী হইতে নামিবামাত্রই দলচ্যুত হইয়া কোথায় যে ছিটকাইয়া পড়িত তাহার ঠিকানা নাই। পারৎপক্ষে কুন্দমালা যে দিকে থাকিত, সেদিক সে মাড়াইত না।

গৃহিণীর একমাত্র পুত্র রাজীব, তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। চেহারায় তাহার বড়দিদির সঙ্গে যথেষ্টই সাদৃশ্য ছিল। তবে রং ফরশা এবং বেটাছেলে, কাজেই তাহার রূপ বা রূপের অভাব লইয়া বেশী কিছু সমালোচনা হইত না। স্বভাবটা ছিল তাহার সৃষ্টিছাড়া। সংসার সমাজ বা স্নেহ, কিছুর বন্ধনেই সে ধরা দিতে চাহিত না। ঝড়, জল, রোদ মাথায় করিয়া, টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলেই সে থাকিত সবচেয়ে ভাল। এইজন্য বাড়ীতে তাহার নাম ছিল "বেদুইন।"

বিকাল চারিটা বাজে, রাজীব হন্ হন্ করিয়া মায়ের শোবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার খাবার কোথায়? ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে আমার, আর তুমি দিব্যি শুয়ে আছ। কাল থেকে আমি আর স্কুলেই যাব না।" বলিয়া সশব্দে হাতের বই খাতা, একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল।

রোদ বেশ পড়িয়া না গেলে, হিরণ কোনোদিনই ঘর হইতে বাহির হইতেন না। রোদের ঝাঁজে তাঁহার মাথা ধরিত, চোখ জ্বালা করিত। নিন্দুকে বলিত, পাছে রং ময়লা হইয়া যায়, এই ভয়েই তিনি বাহির হন না। ছেলের চীৎকার এবং বই ফেলার শব্দে তিনি তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ওমা, তুই এসে পড়েছিস্? রোজ তোর বড়দিদি এসে খাবার

ঠিক করে, আজ বুঝি সে এখনও আসেনি? ডাক ত বেচারামকে।"

"বয়ে গেছে আমার। বেচারাম, কেনারাম কাউকে আমি ডাকতে পারব না। আমি চল্লাম ফুটবলের মাঠে, রাত ন'টার আগে আর এমুখো হচ্ছি না।" হুড়মুড় করিয়া সে সিঁড়ির দিকে ছুট দিল। মা পিছন হইতে ডাকিতে লাগিলেন, "ও বেদুইন্, ওরে, শুনে যা"; কিন্তু কে বা কার কথা শোনে?

সিঁড়ির মাঝামাঝি সে নামিয়াছে এমন সময় দেখা-গেল কিরণমালা মস্ত একটা ডোরাকাটা শান্ ব্যাগ লইয়া উপরে উঠিতেছে। এই ব্যাগটি তাহার এক পিতৃবন্ধু বর্ম্মা হইতে তাহাকে আনিয়া দিয়াছিলেন; নির্ব্বিচারে সব জিনিষ ইহার ভিতর ঠাসা যায় বলিয়া, এটি সব সময় কিরণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কুন্দমালা এবং রত্নমালাও এক একটা ব্যাগ পাইয়াছিল বটে, তবে বড় বিদ্‌ঘুটে দেখিতে বলিয়া তাহারা কোনো সময়েই উহা ব্যবহার করিত না।

রাজীবকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া কিরণ বলিল, "কোথায় ছুটেছিস্ এই রোদে রে?"

রাজীব বলিল, "ছুট্‌ব না ত কি, ঘরে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটব? স্কুল থেকে এলাম ত কেউ খেতেও দিল না।"

কিরণ দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া চলিল। মায়ের ঘরের সামনে আসিয়া বলিল, "সব ত প্রায় ঠিকই থাকে, বেদুইনকে একটু খেতে দিলেই ত পারতে।'

হিরণমালা ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, "গরমে মাথাই তুলতে পারছি না ত খেতে দেব। তোর আসতে এত দেরি হল কেন? স্কুল ত সাড়ে তিনটায় ছুটি হয়, এখন ত সাড়ে চারটা বেজে গেছে।"

কিরণ বলিল, "গরম বলে কি আর জগৎ-সংসার পাতালে চলে গেছে? গরমেই সকলে কাজ করছে। এই ত আমি ট্রাম থেকে নেমে এতটা হেঁটে এলাম, এখনও ত মরিনি। তুমি না পার, কুন্দ কি খুকি পারত না?"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যা যা, ক্যাট্ ক্যাট্ করিস না। তোর মত লোহার শরীর নাকি সকলের? কুন্দ, খুকী ত এখনও বাড়ীতেই আসেনি। সব শেষ 'বাসে' তাদের দেয়, একেবারে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বাছারা আসে একেবারে মুখ শুকিয়ে।"

কিরণ বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, "রোস, তোমার মেয়েদের প্রাণের চেয়ে, কমপ্লেক্সনের ভাবনা বেশী। তা না হলে আমার সঙ্গেই ত আসতে পারত।"

খাবার ঘরে ঢুকিয়া সে জালের আলমারি খুলিয়া রুটি, মাখন, কলা, বাড়ীর তৈয়ারী নারকেল নাড়ু প্রভৃতি বাহির করিয়া একটা কাঁসার রেকাবীতে সাজাইল। ডাকিয়া বলিল, "বেদুইন্, এদিকে আয়, খেয়ে যা। কেউ যখন দেবার নেই, নিজে নিয়ে খেলেই ত পারিস্? ওদের দেখাদেখি তুইও একটা নিষ্কর্ম্মা ফুলবাবু হচ্ছিস্? বড় হয়ে কার বাড়ী ভিক্ষে করে খেতে যাবি?"

রুটি চিবাইতে চিবাইতে বেদুইন্ বলিল, "আলমারি ভেঙ্গে নেব নাকি?"

কিরণ আলমারি বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "মায়ের কাছে ত একটা চাবি থাকে।"

বেদুইন্ বলিল, "আমি তা জানব কোথা থেকে? ভিক্ষে করে খেতে আমার বয়ে গেছে। ম্যাট্রিকটা পাশ করতে দাও না, অ্যামেরিকা না পালাই ত কি বলেছি। কত রাজরাজড়ার ছেলে বলে সেখানে হোটেলে ওয়েটারের কাজ করে পড়ার খরচ চালায়, আমি ত কোন্ ছার।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "আর জাহাজের ভাড়া পাবি কোথা থেকে?"

বেদুইন্ বলিল, "মায়ের কাছে আদায় করব। তাঁর গহনাগুলো বিক্রী করলে এখনও পাচটা ছেলে বিলাত যেতে পারে।"

কিরণ বলিল, "হ্যাঁ, সেগুলো তোমার কপালেই নাচ্ছে আর কি? তোমার মেজদি, ছোড়দি, তাহলে তোমার মাথার সব ক'টা চুল উপড়ে নেবে।"

বেদুইন্ উত্তর না দিয়া, খাওয়া শেষ করিয়া চলিয়া গেল। বাড়ীর একমাত্র ভৃত্য বেচারামকে চায়ের জল চড়াইতে বলিয়া কিরণমালা নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরখানি অবশ্য তাহার একলার নয়। তিন বোনেই এই ঘরে শোয়, কারণ দোতলার উপর ঘরের সংখ্যা এত নয় যে, প্রত্যেককে এক একখানি ঘর দেওয়া যায়। বড় দুইটি শুইবার ঘর, একটিতে গৃহিণী শয়ন করেন, অন্যটিতে তিন মেয়ে থাকে। গৃহিণীর ঘরেই একটা পার্টিশন দিয়া বেদুইন্ শোয়। তাহার জিনিষপত্রও মায়ের ঘরেই থাকে। তবে অত্যন্ত অগোছাল বলিয়া তাহার বইখাতা হিরণ নিজের ঘরে রাখেন না। সিঁড়ির মুখে যে খানিকটা জায়গা আছে, সেইখানেই বেদুইনের পড়িবার আড্ডা। এখানে সে মনের সুখে কালি ঢালে, কাগজ ছিঁড়িয়া ছড়ায়, চীনাবাদাম খাইয়া খোসা ফেলিয়া রাখে।

কিরণ ঘরে ঢুকিয়া, সর্ব্বাগ্রে শান্ ব্যাগটাকে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর স্কুলের বই, ছাত্রীদের খাতার বোঝা সব গুছাইয়া টেবলের উপর রাখিল। স্কুলের কাপড় জামা ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া, একখানা তালপাখা হাতে করিয়া চা খাইতে চলিল। সত্যই অসহ্য গরম। জানলার সার্শির ভিতর দিয়া যে-রৌদ্রের ধারা ঘরে বহিয়া আসিতেছে, তাহার প্রখরতায় এখনও সেদিকে চাওয়া যায় না। পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে সে খোঁপার কাঁটাগুলি এক একটা করিয়া বাহির করিতে লাগিল।

বেচারাম টি-পটে চা ভিজাইয়া আনিয়া হাজির করিল। কিরণের কাছে চাবি লইয়া আলমারি হইতে দুধ চিনি, রুটি মাখন প্রভৃতি বাহির করিয়া টেবলে সাজাইল। তিনটা পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে কিরণ বলিল, "বেচু, জানলার খড়খড়িটা একটু বন্ধ করে দে, ভারি গরম।"

এমন সময় সিঁড়িতে চঞ্চল পদধ্বনি শোনা গেল। একটা কলহাস্যের তরঙ্গও উপর পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিল। মিনিটখানিক পরেই কুন্দমালা এবং রত্নমালা বইয়ের স্তূপ লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। খাবার ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া রত্নমালা বলিল, "বড়দি এসে গেছ? বাঁচলাম বাবা, চায়ের জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে।"

কুন্দমালা বলিল, "যদিও এখন চায়ের বদলে বরফ দেওয়া সরবৎ হলেই ভাল হত।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "যা, যা, হাত মুখ ধুয়ে আয়। সরবৎ ওয়ালা ত তোর শ্বশুর নয় যে বিনা পয়সায় জিনিষ দিয়ে যাবে?"

বোনেরা চলিয়া যাইতেই কিরণ তাহাদের চা জল-খাবার সব ঠিক করিয়া রাখিল। কমলালেবু গোটা-কয়েক বাহির করিয়া চাকরকে দিয়া বলিল, "মায়ের জন্যে রস করে দিয়ে আয়, আর তিনি কিছু খাবেন কিনা জিগ্‌গেষ কর্।"

কুন্দমালা আর রত্নমালা আসিয়া চা খাইতে বসিল। কুন্দমালা বলিল, "দিদি, ধোপা আসে নি?"

কিরণ বলিল, "কৈ, তার্ ত কোনো লক্ষণ দেখছি না।"

কুন্দ হতাশার সুরে বলিল, "ওমা, তবেই হয়েছে!"

কিরণ বলিল, "কেন রে? এখনও ত দেরাজ ভর্ত্তি শাড়ী ব্লাউস্ রয়েছে, অত ভাবনা কিসের?"

রত্নমালা বলিল, "আহা মেজদির ভাবনা অন্য কারণে। কাল সরসীদির জন্মদিনের পার্টি না? তাতে ভাল করে সাজতে হবে ত? অনেক বলে কয়ে মায়ের সেই নীল রংএর ফিরফিরে বেনারসীখানা বাগিয়েছে, ব্লাউসও তার সঙ্গে match করা আছে, কিন্তু সাদা পেটি-কোটের উপর ত আর সে শাড়ী পরা যাবে না? ধোপাকে দিয়েছিল একটা পেটিকোট রং করতে, সে না এলে সব মাটি।"

কিরণ ঠোঁট উল্টাইয়া একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যিস্ দেখতে বিশ্রী হয়েছিলাম রে। তা না হলে সারাক্ষণ তোদের মত ভাবনার চোটেই আমার মাথা গুলিয়ে যেত।"

রত্নমালা বলিল, "অমন ভূত সেজে আর হিঁচ্‌ড়ে চুল বেঁধে বেড়ালে, স্বয়ং উর্ব্বশীকেও বিশ্রী দেখাত। তুমি যে কেন ওরকম কর, আমি যদি কিছু বুঝি।"

কিরণ বলিল, "না বুঝলেও ক্ষতি নেই।"

চা খাওয়া শেষ হইতেই কুন্দ বলিল, "খুকী চল, মায়ের ঘরে গিয়ে বসি। একটু ফ্যানের হাওয়া খেয়ে প্রাণ বাঁচবে। বাপ্‌রে কি গরম।"

গৃহিণীর ফ্যান না হইলে কিছুতেই চলে না। অগত্যা তাঁর ঘরে একটি ফ্যান্ আছে। আর কোনো ঘরে নাই।

মেয়েদের ঘরেও তিনি একটি রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিরণের কঠোর প্রতিবাদে তাহা আর হইয়া ওঠে নাই। অগত্যা বেশী গরম লাগিলে ছোট দুই মেয়ে মায়ের ঘরেই গিয়া আশ্রয় নেয়, কিরণের শীত-গ্রীষ্ম বোধ বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না, সে নিজের তালপাতার পাখা হাতে রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এখনও সে বোনদের অনুসরণ না করিয়া সোজাসুজি নিজের ঘরেই গিয়া ঢুকিল। ঘরখানি বড়ই, আসবাব বেশী নাই। কর্ত্তার আমলের দামী সৌখীন আসবাব বেশীর ভাগই বিক্রী হইয়া গিয়াছে, অল্প যাহা কিছু আছে, তাহা গৃহিণীর শয়নকক্ষে এবং বসিবার ঘরেই থাকে। মেয়েদের ঘরে ভাল জিনিষের মধ্যে একটি কাপড়ের আলমারি। ইহা কিরণের সম্পত্তি, তাহার ষোড়শ জন্মদিনে তাহার পিতা এইটি কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য হাজার টানাটানির অবস্থাতেও সে এটি বিক্রয় করিতে রাজি হয় নাই। ইহার ভিতর তাহার কাপড়-চোপড় খুব কমই থাকিত, সংসারের যত বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, পরদা, ছেঁড়া কাপড় ইহার ভিতর স্থান পাইত। ইহাতে দুইটা দেরাজ ছিল, তাহা সর্ব্বদাই চাবিবন্ধ থাকিত। সেগুলিতে কিরণ কি যে রাখিত, তাহা আন্দাজ করিলেও বোনেরা কোনোদিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পায় নাই। আলমারির চাবি প্রয়োজন হইলেই তাহারা হাতে পাইত, কিন্তু এই দেরাজ দুটির চাবি কোনোদিনই পায় নাই। তাহাদের বাবার ব্যবহৃত অনেক ছোটখাট জিনিষ, তাঁহার ছবি, তাঁহার ডায়রি প্রভৃতি সব কিরণের কাছে ছিল। সেগুলি একটা দেরাজে থাকিত। উহা খুলিয়া অনেকদিন কিরণ ভাইবোনদের দেখাইয়াছে। কিন্তু অন্যটিতে কি যে থাকিত তাহা ভগবানই কেবল জানিতেন। একদিন কেবল অতর্কিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া কুন্দ দেখিয়াছিল, একখানা ফোটো বাহির করিয়া কিরণ দেখিতেছে। কিন্তু উহা ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা তাহার হয় নাই, কারণ বোনের পায়ের শব্দ পাইবামাত্র কিরণ ছবিখানা দেরাজে ঢুকাইয়া ফেলিল।

এই গুপ্ত ভাণ্ডারটি সম্বন্ধে হাজার প্রশ্ন করিয়াও ভাই-বোনেরা কিরণের কাছে কোনো সদুত্তর পায় নাই। সে কেবলি বলিত, "তোদের শুনে কিছু লাভ হবে না। এমন কিছু ওর মধ্যে নেই, যাতে তোরা ইন্টারেষ্ট নিবি।"

কুন্দ প্রায়ই বলিত, "জানিস্ খুকি, বাবা মারা যাবার বছর গ্রীষ্মের ছুটির সময় সেই যে বড়দি আর বাবা পিসীমার ওখানে গিয়ে তিন মাস ছিলেন না, সেই সময়ে দিদির নিশ্চয়ই একটা 'অ্যাফেয়ার' হয়ে গেছে। দেখিস না ছেলেদের উপর ও কিরকম চটা? ছবিখানা দেরাজ থেকে বার করতে পারলে বুঝতাম মানুষটা কে। চিঠিপত্রও হয়ত আছে।"

রত্ন বলিত, "থাক্‌গে বাপু, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কি হবে? তার চেয়ে যদি ওর হীরের ব্রোচটা দেখায় ত আমি খুসী হই। আমাদের যেমন কপাল, সোসাইটিতে বেরবার সময় হতে-না-হতেই বাবা গেলেন চলে। থাকলে হীরেটিরে আমরাও দুচারটে পেতাম, আর দিদির মত সেগুলো বাক্সে বন্দী করেও রাখতাম না।"

কুন্দমালা অনেক বারই ব্রোচটি হাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমল পায় নাই। সে কিরণকে মাঝে মাঝে বলিত, "দিদি, ও দুলজোড়া আর ব্রোচ্ কিসের জন্য রাখছ? বিয়েও ত করবে না বল।" কিরণ বলিত, "কি করি, দেখতেই পাবি।"

কিরণ ঘরে ঢুকিয়া, আলমারিটাই খুলিল। একটা বিছানার চাদর ও দুইটা বালিশের ওয়াড় বাহির করিল। তাহার ইহাই একমাত্র বিলাসিতা ছিল, সপ্তাহে দুইবার করিয়া বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় বদল করিত। বড় একখানি তক্তপোষের উপর ছোট দুই বোন শুইত। কিরণ আলাদা একটা ছোট তক্তাপোষে শুইত। বিছানা ঠিক করিয়া সে আবার আলমারির কাছে আসিল। দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতরের কাগজপত্র, একখানি ছবি, একগোছা শুকনো ফুল, পুরাতন সংবাদপত্র ও দুইটি পুস্তক বাহির করিল। জিনিষগুলি সযত্নে ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। আলমারিরই গায়ে এক জায়গায় একটি কর্পূরের মালা টাঙান ছিল, তাহার দুইটি গুলি খুলিয়া লইয়া সে কাগজপত্রের মধ্যে রাখিল।

তাহার পর ছাত্রীদের খাতা লইয়া দেখিতে বসিয়া গেল। যতক্ষণ দিনের আলোতে কাজ করা চলিল, ততক্ষণ কাজ করিল।

হঠাৎ বাগান হইতে কুন্দর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "দিদি, নীচে নেমে এস না। বেশ হাওয়া দিচ্ছে।"

গরমে বসিয়া বসিয়া হাজার রকম অদ্ভুত ইংরেজীর নমুনা দেখিতে দেখিতে কিরণও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বোনেদের ডাক শুনিয়া সে নামিয়াই গেল।

কুন্দ ও রত্ন বাঁধানো বেদীটার উপর বসিয়াছিল, কিরণও গিয়া সেইখানে বসিল। রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল, "কাল দিদি যাবে না সরসীদের ওখানে?"

কিরণ বলিল, "তারা আমায় যেতে বলেছে নাকি?"

রত্ন বলিল, "ওমা, না বলে আবার কবে? প্রতি বছর আমাদের তিন বোনকেই ত বলে। দেখ এখন চিঠিও একটা এসে হাজির হবে, কাল সকালের মধ্যে।"

কিরণ বলিল, "তোরাই যাস্, বেদুইনকে নিয়ে। আমার অত গোলমালের মধ্যে যেতে ভাল লাগে না।"

কুন্দমালা বলিল, "ব্রাহ্মসমাজে যদি কনভেণ্ট থাকত, তাহলে দিদি এতদিনে ঠিক নান্ হয়ে যেত।"

কিরণ বলিল, "মোটেই না! চারটে দেওয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা আমার দ্বারা কিছুতেই ঘটে উঠ্‌ত না। বরং বেদেনী হলে আমার লাগ্‌ত ভাল, সারাক্ষণ পথে মাঠে ঘাটে ঘুরতাম।" গল্পটা আরো খানিকক্ষণ চলিত বোধ হয়, কিন্তু হিরণমালা ছোট দুই মেয়েকে কি কারণে জানি না ডাকিয়া পাঠাইলেন, কাজেই কিরণও উঠিয়া পড়িল। ঘরে ঢুকিতে তখনই ইচ্ছা করিল না, বাগানের মধ্যেই সে ঘুরিতে লাগিল।

সকাল হইতে কিরণের আর অবসর থাকে না, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। চা করা, ভাঁড়ার দেওয়া, বাজারের পয়সা দেওয়া, কি রান্না হইবে ঠিক করা, মধ্যে মধ্যে বেদুইনকে পড়া বলিয়া দেওয়া, এইসব করিতে করিতেই স্কুলের সময় হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি নাইয়া খাইয়া তাহাকে প্রস্তুত হইতে হয়, কারণ স্কুলের গাড়ী দশটাতেই আসিয়া পড়ে। রত্নমালা ও কুন্দমালা একটু ধীরে-সুস্থে প্রস্তুত হয়, কারণ তাহাদের কলেজের গাড়ী আসিতে আরো আধ ঘণ্টা-খানিক দেরি হয়।

সকালে উঠিয়াই সেদিন কুন্দমালা বলিল, "দিদি, আজ যেন সাড়ে তিনটা বাজবা মাত্র ট্রাম লাইনের দিকে রওয়ানা হোয়ো না। আমাদের কলেজ থেকে নিয়ে এস, আমরাও আজ ট্রামেই আসব।"

কিরণ বলিল, "আচ্ছা, একটা বোরকা নিয়ে যাস্, তা না হলে ট্রামেই শেষে এমন ভীড় হবে যে বসবার জায়গা পাব না।"

কুন্দ বলিল, "যাও, যাও, পথেঘাটে বাঙ্গালী মেয়ে দেখা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয় যার জন্যে ভীড় হবে।"

কিরণ বলিল, "শুধু বাঙ্গালী মেয়ে বলে কি আর? তাহলে ত আমার জন্যেও ভীড় হত। তা সে কথা যাক, আজ তা হলে শাদা শাড়ী আর একটু লম্বা আস্তিনের ব্লাউস পরে যেয়ো।"

কুন্দমালা বলিল, "সে যেন হল। কিন্তু ধোপানী না এলেত সব মাটি। কি যে লক্ষ্মীছাড়ী, এত করে বলে দিলাম ত গ্রাহ্যই করল না।"

কিরণ বলিল, "নে, নে, অত ঢংএ কাজ নেই। তোর বিয়েও নয়, বৌভাতও নয় যে অত ভাবছিস্। পরের জন্মদিনে নীলের বদলে সবুজ পরলে কিছু চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

কুন্দমালা গাল ফুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এক কাপড় পরে সব জায়গায় যেতে লজ্জা করে না বুঝি? আমার ত বাই র বেরবার ড্রেস আট-ন'টার বেশী নেই। সেগুলো সরসীরা কতবার দেখেছে তার ঠিকানা নেই।"

কিরণের তখনও তরকারি কোটা, ভাঁড়ার দেওয়া, সব বাকি, সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিল।

সাড়ে তিনটায় তাহার স্কুল যখন ছুটি হইল, তখন রাস্তার দিকে চাহিতে পারা যায় না, এমন প্রখর রোদ। এই রোদে কলেজ পর্য্যন্ত হাঁটিতে কিরণের ভরসা হইল না, একখানা গাড়ীই ডাকিল। কলেজের সামনে আসিয়া দেখিল, দুই বোনে প্রায় গেটের কাছে আসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে, এতই তাহাদের তাড়া।

কিরণ বলিল, "আরে বাস্ রে এত জোর দরকার? আমি মনে করে আসছিলাম, একটু বোর্ডিংএ ঢুকে ওদের সঙ্গে গল্প-টল্প করে যাব।"

কুন্দমালা মাথার কাপড় পিন দিয়া খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ করিতে করিতে বলিল, "না ভাই দিদি, আজ থাক, আর কোনোদিন এসে যত পার গল্প কোরো। ঐ দেখ ট্রাম আসছে একটা।"

সৌভাগ্যক্রমে ভীড় বেশী ছিল না, তিন বোনে উঠিয়া পড়িল।

ধোপানীর মিথ্যাচরণে কুন্দমালার উৎসাহ অনেকটাই কমিয়া গিয়াছিল। সে মুখ বিষণ্ণ করিয়া বহুবার ব্যবহৃত একটি বেগুনী রংএর বুটাদার ঢাকাই শাড়ী এবং সেই কাপড়েরই একটি ব্লাউস বাহির করিয়া বিছানার উপর রাখিল, তাহার পর তোয়ালে সাবান লইয়া মুখ ধুইতে চলিল। রত্নমালা বলিল, "আমি যে ছাই কি পরি তার ঠিক নেই, মেজদির যাও বা দুচারটে কাপড়-জামা আছে, আমার তাও নেই। এক গেরুয়া রংএর মান্দ্রাজী শাড়ী হয়েছে, উঠ্‌তে বস্‌তে তাই পর।"

ভগিনীদের সাজসজ্জা সম্বন্ধীয় আলোচনায় কিরণ প্রায়ই যোগদান করিত না। এসব বিষয়ে ঠাট্টা করা এবং বকুনি দেওয়াই তাহার স্বভাব ছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ রত্নমালার হতাশ ভাব দেখিয়া তাহার দয়া হইল। সংসার চলে অতি টানাটানি করিয়া, অথচ মেয়েদের মানুষ করা হইয়াছে বিলাসের পথেই। কাজেই এখন তাহাদের পদে পদে ঘা খাইয়া চলিতে হয়। গৃহিণীর বহুমূল্য কাপড়-চোপড় যাহা আছে তাহা ছোট দুই মেয়ের বিবাহের সময় দিবেন বলিয়া তিনি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন। কিনিয়া দিবার সাধ্য আর তাঁহার নাই বটে, তবু নিতান্ত হাঘরের মেয়ের মত তাঁহার মেয়েরা শ্বামীর ঘরে যাইবে না। মায়ের গহনা কাপড় যাহা এখনও আছে, তাহাতেই দুই মেয়ের বিবাহ শোভনভাবেই হইবে। এই কারণে পারৎপক্ষে এ-সব জিনিষে তিনি এখন কাহাকেও হাত দিতে দেন না।

কিরণ বলিল, "তোদের সব অভ্যাস হয়েছে বিবি-য়ানার, অথচ ঘরে নেই টাকা। তা আমার একখানা শাড়ী দিতে পারি, কিন্তু আমার জামা ত তোর গায়ে হবে না; যা দিনের দিন মুটচ্ছিস্।" রত্নমালা বলিল, "কি শাড়ী দিদি, দাও না! আমি আমার কোন জামার সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে পরব এখন; কিন্তু তুমি কি যাবে না?"

কিরণ বলিল, "আমি যাব না আগেই ত বলেছি। শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশতে আমার ভাল লাগে না। দাঁড়া শাড়ী দিচ্ছি।"

আলমারির এক কোণে তাহার গুটিকয়েক পোষাকী কাপড়-জামা বছরের পর বছর একইভাবে সাজান থাকিত। সে নিজে এসব ব্যবহার করা বহুদিন হইল ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং বেশভূষা সম্বন্ধে তাহার উগ্র মতামত জানা থাকায় বোনেরাও এসব চাহিতে সাহস করিত না। আজ কিরণ নিজেই দিতে চাওয়ায় রত্নমালা অতিরিক্ত রকম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিরণ আলমারি খুলিয়া একখানি হাল্কা বাসন্তী রংয়ের রেশমের শাড়ী বাহির করিল। তাহার পাড়টা জরির, শেলাই করিয়া বসানো।

রত্নমালা চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি চমৎকার! আমার গরদের জামাটার সঙ্গে এটা গ্র্যাণ্ড মানাবে।"

কুন্দ মুখ ধুইয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "কি গ্র্যাণ্ড মানাবে রে? ওমা, এ শাড়ীটা আবার কোথা থেকে এল?"

এমন সময় বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "এই নেও বাবা, তোমার পেটিকোট। সব কাপড় আজ আন্‌তে পারি নি, অনেক করে বলে দিয়েছিলে বলে এটা নিয়ে এসেছি।"

কুন্দমালা বলিল, "বাঁচলাম বাপু। এত দেরি করলি কেন রে মুখপুড়ী?"

ধোপানী তাহার মস্ত এক বিপদের ইতিহাস বলিতে বসিল। কিন্তু শ্রোত্রীদের তখন একান্তই সময়াভাব, মাঝপথেই তাহারা তাহাকে ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। সাজসজ্জা শেষ করিতে না করিতে বেহুইন্ আসিয়া জুটিল। তাহাকে কথা বলিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া কাপড় ছাড়িতে এবং গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সাজসজ্জা সমাপ্ত করিয়া, আনন্দের এবং রূপের হিল্লোল তুলিয়া যখন রত্নমালা এবং কুন্দমালা ঘর হইতে চলিয়া গেল, তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস কিরণের বক্ষভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। এই আনন্দের জগৎ হইতে সে ভাগ্যচক্রে চিরনির্ব্বাসিতা। পিতা যেদিন গিয়াছেন সেদিন হইতে কিরণের কাছে জগৎ শুধু কঠোর কর্ত্তব্যপালনের ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তব্যই এখন তাহার সঙ্গী, তাহার প্রণয়ী, তাহার সব। সংসারে ইহার চেয়ে প্রিয়তর কিছুকে বরণ করিয়া লইবার কোনো আশা তাহার নাই।

কিন্তু জোর করিয়া মন হইতে তখনই সে ঐ বিষাদের ভাবটা দূর করিয়া দিল। কত কাজ তাহার পড়িয়া রহিয়াছে, যাহা হয় নাই, হইবার নয়, তাহার জন্য কাঁদিবার তাহার অবসর কোথায়?

ঘর ঝাঁট দিয়া, বোনদের পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখিয়া সে একলাই চা খাইতে গিয়া বসিল। হিরণের খাবার এবং ফলের রস বেচারাম গিয়া দিয়া আসিল। দুইটি সন্দেশ এবং এক গেলাস সরবৎ ভিন্ন তিনি বিকালে কিছুই খাইতেন না।

রাত্রির খাওয়া সারিয়া সে শুইবার জোগাড় করিতেছে, তখন ভাই-বোনেরা ফিরিয়া আসিল। বেদুইন্ ঢুকিয়াই বলিল, "আমি আর কিছু খাব না বড়দি। যা আইসক্রীম্ ঠুসেছি, গলা অবধি ভরে উঠেছে।"

কুন্দমালা বলিল, "সত্যি ভাই দিদি, বেদুইনটাকে নিয়ে আমি আর কোথাও যাব না। এমন হ্যাংলার মত খায় যে কি বলব!"

কিরণ বলিল, "খেতেই যখন তারা ডেকেছে, তখন খেলে আর দোষ কি? তোরা নিশ্চয়ই খাবি? আধখানা সন্দেশ আর এক চামচ আইসক্রীমের বেশী কিছু খাস্‌নি ত?"

রত্নমালা বলিল, "খাব না ত কি? দাঁড়াও কাপড় বদলে আসি। ভাগ্যে দিদি আজ শাড়ীটা দিয়েছিলে। সবাই আজ এত সেজেছিল যে কি বলব!"

কুন্দ বেশী কথাবার্ত্তা বলিল না। ঘরে ঢুকিয়া নীরবে পোষাকী কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, সেগুলি গুছাইয়া রাখিল। খোঁপা খুলিয়া, চুল আঁচড়াইয়া বিনুনী করিয়া বাঁধিল, তাহার পর বিছানা ঠিক করিতে গেল।

রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল, "কি মেজদি, এত গম্ভীর যে? কার কথা ভাবছ? সরসীদির বিলাতফেরৎ মামার?"

কুন্দ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "যা যা, যত ঢং তোদের!"

রত্নমালা বলিল, "তুমি তার কথা ভাবছ কিনা জানি না, তবে সে নিশ্চয়ই এতক্ষণ তোমার কথা ভাবছে। ভদ্রলোক সমস্তক্ষণ তোমার দিকে হাঁ করে চেয়েছিল। সরসীদির মাকে সেই ত বলে কয়ে পাকড়ে আনল তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে।"

কুন্দর গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তুই কি সারাক্ষণ ডিটেক্টিভের কাজেই ব্যস্ত ছিলি?"

রত্নমালা বলিল, "কি আর করি, ভাই? আমি ত আর তোমার মত সুন্দরী নই! আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে কেউ ছট্‌ফটিয়ে বেড়ায় না। কাজেই অন্যের কাণ্ডকারখানা দেখেই সময় কাটাতে হয়।"

কুন্দমালা বলিল, 'কিন্তু মায়ের কাছে কি দিদির কাছে এসব বলিস্ নে যেন। দিদি তাহলে বকবে, আর মা এই নিয়ে আকাশকুসুম গাঁথতে বসে যাবেন।"

রাত মন্দ হয় নাই। কাজেই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাহাদের শুইয়া পড়িতে হইল। শুইয়া শুইয়াও অবশ্য অনেকক্ষণ গল্প চলিল, তবে কিরণ ঘরে থাকাতে সরসীর মামার গল্প আর হইল না। অভ্যাগতদের শাড়ী, জামা, গহনা, কাপড়, পরিবার ফ্যাশান ঐসবের গল্প করিতে করিতেই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে গল্প করিবার সময় প্রায় কাহারও থাকে না, কিরণ ব্যস্ত থাকে কাজে, অন্যরা ব্যস্ত থাকে পড়ায়। কুন্দ কিন্তু আজ বড়ই অন্যমনস্ক, তাহার রকম দেখিয়া রত্নমালা থাকিয়া থাকিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "হল কি তোদের? শুধু শুধু হেসে মরছিস্ কেন?"

রত্নমালা বলিল, "দাঁড়াও, কলেজ থেকে এসে বলব।"

কুন্দ বলিল, "না দিদি, ওটার কথা বিশ্বাস কোরো না, সব বাঁদরামী ওর।"

কলেজ হইতে আসিয়া রত্নমালার হাসির ঘটা এতই বাড়িয়া গেল যে হিরণ-সুদ্ধ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন, "কেন রে অত হাসছিস্ কেন?"

রত্নমালা হাসিতে হাসিতেই বলিল, "একজন লোক মেজদির রূপ দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছে।"

হিরণের মুখেও একটু হাসি দেখা দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরশুর পার্টিতে বুঝি দেখেছে? কে ছেলেটি?"

কুন্দ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। রত্ন বলিল, "সরসীদির ছোট মামা বিলেত থেকে এসেছে না? সেই ভদ্রলোক। সে নাকি সরসীদিদের কাছে বলেছে 'বাঙালীর মেয়ে যে এত সুন্দরী হতে পারে তা জানতাম না'।"

হিরণ বলিলেন, "তা নিজের মেয়ে হলেও স্বীকার করতে হবে যে ওর মত চেহারা পথেঘাটে দেখা যায় না।" তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন দেখিয়া রত্নমালাও চলিয়া আসিল।

বাহিরে আসিতেই কিরণ তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "যত বাজে কথা নিয়েই আছিস্ সারাক্ষণ। পড়াশুনো চুলোয় গেল, এখন কে কাকে সুন্দরী বলেছে না বান্দরী বলেছে তাই নিয়ে ঘোঁট হচ্ছে।"

রত্নমালা গাল ফুলাইয়া বলিল, "আহা, সব মেয়েতেই এসব গল্প করে, পড়াশুনোও করে।" যাহা হউক, আরো বেশী বকুনি খাইবার ভয়ে সে কিরণের নিকট হইতে পলায়ন করিল।

রত্নমালা কলেজে গিয়া আরো অনেক খবর সংগ্রহ করিয়া আনিল। সরসীর ছোটমামা বিলাতফেরৎ, বেশ ভাল কাজও পাইয়াছেন, দেখিতেও মন্দ নয়, কাজেই তাঁহাকে লইয়া একটু কাড়াকাড়ি সুরু হইয়াছে। বাড়ীতে চ. খাইবার অবসর তাঁহার প্রায়ই হয় না। বিবাহ করিতে তাঁহার কিছু আপত্তি নাই, পছন্দমত মেয়ে হইলেই হয়। শীঘ্রই সরসীর মা ইহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন।

রাত্রে হিরণমালার নামে একখানি চিঠি আসিল। সামনের রবিবারে ছেলে-মেয়েদের লইয়া সরসীর মা একটু বনভোজনের ব্যবস্থা করিতেছেন, দমদমার এক বাগানে, হিরণমালা যদি পুত্রকন্যাদের লইয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন।

এবার কিরণের বকুনির ভয়ও রত্নমালাকে নিরস্ত করিতে পারিল না, সে হাসিয়া বাড়ী মাথায় করিতে লাগিল, এবং কুন্দকে ক্ষ্যাপাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

হিরণমালা পারৎপক্ষে সন্ধ্যার আগে কোথাও যান না। কিন্তু মেয়ের জন্য এই দারুণ গ্রীষ্মে সকালেই তিনি যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া কিরণ-সুদ্ধ অবাক হইয়া গেল। বলিল, "যাচ্ছ, যাও, কিন্তু এসে যেন মাথার যন্ত্রণায় শয্যা নিও না। মেয়েরা একলা গেলে কি ক্ষতি হত? সব জায়গাই ত তারা যায় একলা।"

হিরণমালা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সব কাজের কৈফিয়ৎ তোকে দিতে হবে নাকি? দরকার মনে করছি, তাই যাচ্ছি। আমি সমস্তক্ষণ থাকব না, খানিক পরেই চলে আসব। আমার জন্যে রান্না করতে দিস্।" কিরণ এ-সব ব্যাপারে কোনোকালেই যায় না, কাজেই বাড়ীর লোকে তাহাকে আর অনুরোধও করে না।

আজ হিরণমালা নিজে দাঁড়াইয়া মেয়েদের, বিশেষ করিয়া কুন্দর সাজসজ্জার তদারক করিলেন। নিজের শাড়ী এবং গহনার ভাণ্ডার হইতে অনেক জিনিষ আনিয়া তাহার রূপ উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিলেন। তাহার পর গাড়ী ডাকাইয়া চলিয়া গেলেন। কিরণ রবিবারের জন্য যথেষ্ট কাজ জমাইয়া রাখে; সেসব সারিয়া, খাওয়া-দাওয়া করিয়া সে এক পীড়িতা বন্ধুকে দেখিতে চলিয়া গেল। চাকর বেচারাম বহুদিনের পুরানো বিশ্বাসী লোক, বাড়ী তাহারই জিম্মায় রহিল।

কিরণের আসিতে একটু দেরিই হইয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল, ভাইবোনদের তখনও দেখা নাই, তবে হিরণমালা আসিয়া নিজের ঘরে শুইয়া আছেন। কিরণকে দেখিয়া বলিলেন, "কোথায় গিয়েছিলি রে?"

কিরণ বলিল, "এই করুণাকে একটু দেখে এলাম। কুন্দ, খুকী ওরা কোথায় ?"

"ওরা একেবারে চা-টা খেয়ে আসবে, আমি আগেই চলে এলাম।"

কিরণ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, তিনি আবার বলিলেন, "ছেলেটি চমৎকার। ওখানেই কুন্দর বিয়েটা ঘটে গেলে, ভালই হয়।"

কিরণ বেশী উৎসাহ দেখাইল না, বলিল, "তাই বলে কুন্দকে সারাক্ষণ তার ঘাড়ে ফেলতে যাওয়া উচিত নয়।"

হিরণমালা বলিলেন "ঘাড়ে ফেলাফেলি কি আবার ? মেলামেশার সুবিধে না হলে কোথা থেকে কি হবে ? ছেলেটিকে পরশু বিকেলে চা খেতে বলেছি। সরসীদেরও বলতে হল, না হলে খারাপ দেখায়।"

কিরণ বলিল, "যা তোমার খুসী কর গিয়ে, কিন্তু মাসের শেষে যখন খরচে কুলবে না তখন আমি জানি না।"

হিরণ বলিলেন, "তোর যত অনাসৃষ্টি কথা। টাকা নেই বলে কি মেয়েদের বিয়ের চেষ্টাও করব না ? এর পর আমি মরলে, তারা দাঁড়াবে কোথায় ? তোর মত ত ওরা শক্ত না! তোরও একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতাম। তা তোর জেদ ত ছাড়বি না।"

"আমার ব্যবস্থা চিরকাল আমিই করতে পারব," বলিয়া কিরণ চলিয়া গেল।

কর্ত্তা মারা যাইবার পর হইতে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাওয়ানোর পালা একরকম চুকিয়াই গিয়াছিল। কালে-ভদ্রে দুচারজন লোককে খাওয়ানো হইত। এবার লোকের সংখ্যাও দশ-বারোটি, খাওয়াটাও নিতান্ত বাজে হইলে চলিবে না, কারণ ভাবী কুটুম্বের চক্ষে খেলো হওয়াটা কিছু নয়। সুতরাং একদিন সময় হাতে রাখিয়া হিরণ ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেলেন। নিজে অবশ্য কাজ বেশী করিতে পারিলেন না, কিন্তু কুন্দ ও রত্ন অন্য সময় যতই আলস্য প্রকাশ করুক, এখন তাহারা খুব মন দিয়াই কাজ করিতে লাগিল।

প্রথম বসিবার ঘরটার সংস্কার আরম্ভ হইল। চা খাইবার সময় পর্য্যন্ত বাগানে অত্যন্ত রোদ থাকে, তাহা না হইলে সেখানেই ব্যবস্থা করা যাইত। তাহা যখন হইবার নয়, তখন বসিবার ঘরটাকেই ঝাড়িয়া মুছিয়া ঝক-ঝকে করিয়া তোলা হইল। ঝুল ঝাড়া, ঘর মোছা, চেয়ার টেবলের আবরণ উন্মোচন, ছবি পরিষ্কার করা, সব দুই বোনেই সারিয়া ফেলিল। তাহার পর কুন্দ কতকগুলি পুরাতন টেবল ঢাকনী বাহির করিয়া, সেগুলি মেরামত করিতে বসিল। রত্নমালা প্লেট, পেয়ালা, পিরীচ, ফুলদান প্রভৃতির তদারক করিতে গেল। এ-সব কিরণের জিম্মাতেই চিরকাল থাকে, কাজেই তাহার শরণ লওয়া ভিন্ন উপায় রহিল না।

কিরণ তখন কাজে ব্যস্ত, রত্নমালা গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়দি পেয়ালা, পীরিচ, প্লেট সব আছে ত, না আবার জোগাড় করতে হবে ?"

কিরণ সংক্ষেপে বলিল, "যথেষ্ট আছে।"

রত্নমালা বলিল, "আচ্ছা, কি কি খাবার হবে দিদি ঠিক করেছ কিছু ?"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "তোমরাই ঠিক কর, তোমাদের বন্ধুদের কি পছন্দ তা কি আমি জানি ?"

রত্নমালা বলিল, "আচ্ছা বড়দি, লোকের নামেই তুমি অত চটে যাও কেন ? রোজ ত কেউ আসে না ? দু বছরে একটা মানুষ এলেও তোমার ভাল লাগে না ?"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "যা, যা, পাকামী করতে হবে না। খাবার টাবার সব আমি গুছিয়ে দেব এখন, তা হলেই ত হল ? কিন্তু তোমাদের স্বয়ংবরা সভায় আমায় ডেকনা, আমার ওসব ভাল লাগে না।"

রত্ন বলিল, "ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও করবেনা ? কি ভাববে ?"

কিরণ বলিল' 'আমি যে আছি তাই বা সে জানবে কি করে ? তোমরা ত আর তাকে বলে রাখনি যে বাড়ীতে তোমাদের একটি দিদি আছে ?"

রত্নমালা বলিল,, "ওমা, আমাদের বলবার কি দরকার ? সরসীদিরা এসে তোমায় বুঝি ডাকবে না ভেবেছ ? তখন না এলে মিঃ রায় হাঁ হয়ে যাবে না ?"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের মিঃ রায়টির বাংলা নাম নেই কিছু ?"

রত্নমালা বলিল, "কে জানে কি? মিঃ বি, এন, রায় বলে ত introduce করল, সরসীদির মা তাকে রুণু বলে ডাকছিলেন শুনলাম।"

হঠাৎ কিরণ উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। রত্নমালা কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া কুন্দর কাজে সাহায্য করিতে চলিয়া গেল। রবিবার সকাল হইতে বাড়ীর সকলে এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিল যেন ভয়ানক একটা সঙ্কট তাহাদের সম্মুখে। কিরণ একমাত্র স্থিরভাবে নিজের কাজ করিতেছিল, কিন্তু তাহাকেও অত্যন্ত বেশী শ্রান্ত দেখাইতেছিল।

কুন্দ একবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে।"

কিরণ বলিল, "না, এইটুকু কাজেই শরীর খারাপ লাগলে চল্‌বে কেন?"

বিকাল হইতেই ঘরদোর ঝাঁট দিয়া সাজাইয়া রাখা হইল। বাগান হইতে ফুলপাতা কাটিয়া আনিয়া ফুলদানী সাজাইতে বসিলেন মালতী স্বয়ং। কিরণ বেচারামকে লইয়া খাবার ঠিক করিতে এবং ফলের সরবৎ করিতে বসিল। কুন্দ এবং রত্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া অতিথিদের অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। নিজেদের বাড়ী বলিয়া তাহারা বেশী কাজ করিল না বটে তবু কুন্দকে বাংতে একটুও ম্লান না দেখায় সেজন্য হিরণ যত্নের ত্রুটি করিলেন না, কুন্দও সেদিকে বেশ দৃষ্টি রাখিল।

পাঁচটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুইখানি মোটর গাড়ী বোঝাই করিয়া নিমন্ত্রিতের দল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রত্নমালা উর্দ্ধশ্বাসে ভাঁড়ার ঘরে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "দিদি, ওঁরা ত সব এসে পড়েছেন, তুমি যে এখনও কাপড় ছাড়া, চুলবাঁধা কিছুই করনি।"

কিরণ বলিল, "তোরা বসাগে যা, মাকে বল্‌। আমি একটু পরে যাব এখন।" রত্ন যেমন বেগে আসিয়াছিল, তেমনই বেগে প্রস্থান করিল।

কিরণ বেচারামকে ডাকিয়া বলিল, "সব ঠিক রইল, দরজাটা বন্ধ করে রাখ, আর বরফ ভেঙে রাখ সরবতের জন্য, আমি একটু ওদিকে যাচ্ছি।"

নিজের ঘরে গিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর গায়ের জোরে কি একটা বাধাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল আঁচড়াইয়া, একটা ফরসা কাপড় পরিয়া, বাহির হইয়া আসিল। সাজসজ্জা সে অনেক কালই ত্যাগ করিয়াছিল, আজও সে-সবের কোনো চেষ্টা করিল না।

বসিবার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। সকলেই বসিয়া মহোৎসাহে গল্প করিতেছে। নবাগত যুবকটির দিকে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, "এখন আরো দেখতে ভাল হয়েছে, কুন্দর সঙ্গে বেশ মানাবে।" কুন্দ যুবকের নিকটেই বসিয়াছিল, দুজনে একেবারে পরস্পর ভিন্ন কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্রও মনোযোগ খরচ করিতে ছিল না।

কিরণ বেশ একটু শব্দ করিয়াই ঘরে ঢুকিল। হিরণমালা বলিলেন, "এই আমার বড়মেয়ে কিরণ।"

যে মুখে এতক্ষণ ভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল, কিরণের দিকে চাহিবামাত্র তাহা যেন জমিয়া পাথরের মত হইয়া গেল। কোনোরকমে মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া সে একটা নমস্কার করিল। কিরণ প্রতিনমস্কার করিয়া, নিতান্ত সাধারণ দুচারটে কথা বলিয়া, সরসীর মায়ের কাছে গিয়া বসিয়া, মাছ-তরকারীর দর সম্বন্ধে গল্প জুড়িয়া দিল।

অন্য সকলে দিব্য জমাইয়াই গল্প করিতে লাগিল। বেদুইন এবং সরসীর ভাইয়ে মিলিয়া ত রীতিমত কোলাহল বাধাইয়া তুলিল। কেবল যাহার জন্য সব আয়োজন, সেই ব্যক্তিটির কাছে সবই যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। সে জোর করিয়া দুইচারিটা কথা কোনোরকমে বলিয়া কাজ সারিতে লাগিল, এবং সরসীর অনুরোধে কুন্দ যখন গান করিতে উঠিল, তখন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

জলযোগও হইয়া গেল। সরসীর মা কিরণের গিন্নীপনার দশমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচল হয়ে থাকবে।"

হিরণমালা একটু বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "কই আর তা হচ্ছে? মেয়ে ত বিয়ের নামেই জলে ওঠে।"

কিরণ খাওয়ানোর ব্যাপার সাঙ্গ করিয়াই কোথায় যে ডুব মারিল, তাহার ঠিকানা নাই। অতিথিরা বিদায় লইতে উঠিবার আগে তাহার আর দেখাই পাওয়া গেল না। সবাই যখন যাইতে উঠিল, তখন কিরণ আসিয়া আবার জুটিল।

সরসীর মা কুন্দকে যথেষ্ট আদর করিয়া, হিরণের কাছে বিদায় লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন, সরসী রত্নমালাকে টানিয়া লইয়া গেল, কি একটা রেশমের কাজের নমুনা দেখিবার জন্ত। হিরণমালা তাঁহার শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন, বাচ্চা-কাচ্চার দল আগেই বেদুইনের সঙ্গে বাগানে গিয়া ছুটাছুটি লাগাইয়া দিয়াছিল।

কুন্দকে এবং অভ্যাগত যুবক বিজয়কে একটু নিভৃতে কথা বলিতে দেওয়ার উদ্দেশ্য সকলেরই বোধ হয় ছিল। ব্যাপারটা কিন্তু ঘটিয়া বসিল অন্য রকম। হঠাৎ এক সময়, বিজয় দেখিল ঘরে কেহই নাই, শুধু দরজার কাছে কিরণ দাঁড়াইয়া।

কিছু একটা তাহার বলা উচিত, কিন্তু কি বলিবে, কিছুই যেন সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিরণই তাহাকে উদ্ধার করিল। কাছে আসিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আমাকে দেখে অত অপসেট হবার কোনো দরকার নেই। এই চিঠিটা সময় মত পড়ে দেখবেন।"

চিঠি লইয়া বিজয় পকেটে রাখিল, কিরণও ঘর হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। তখন কুন্দ ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু কিছু বলা আর হইল না। কেবল বিদায় গ্রহণ করিয়া বিজয় চলিয়া গেল। কুন্দর মনটা কেমন যেন একটু ভারি হইয়া গেল।

বাড়ী গিয়া বিজয় চিঠিখানা খুলিয়া দেখিল। কয়েক লাইন মাত্র লেখা।—

"আমার সঙ্গে কখনও যে আগে আপনার দেখা হয়েছিল, তা কেউ জানে না, জানবেও না। আপনি এ নিয়ে নিজেকে কিছু বিপন্ন মনে করবেন না। আপনাকে যতটা জানি, যে-কোনো মেয়েকে আপনি সুখী করতে পারবেন। আমি কোনো দাবী মনে রাখিনি। নিজেকে একটুও বঞ্চিত মনে করছি না। ভালবাসাই অধিকাংশ মেয়ের জীবনের সবটা জুড়ে থাকে, জীবনের মূল্য বুঝবার আগে, সুতরাং অনেকেরই ভুল ভাঙে। আমার ভুলটা একটু আগে ভেঙেছে। এত কাজ জগতে আছে, কাজের মধ্যে এত আনন্দ আছে, তা হয়ত চোখের নেশা, মনের নেশা না কাটলে বুঝতাম না। এর জন্তে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। স্বাধীনতাই আমার একমাত্র ভালবাসার জিনিষ এখন, কোনো মানুষের ভালবাসার পরিবর্তে আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ব না। ভালবাসার দাসত্বের মাধুর্য্য অসীম, কিন্তু তার লোভ আমি কাটিয়ে উঠেছি। আমাদের কারো কাছে কারো লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমাদের বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে যার যতটা পাবার ছিল তা পাওয়া হয়ে গেছে। এর বেশী দিন তাকে ধরে রাখতে গেলে বঞ্চিত হতে হত, এবং বঞ্চিত করতে হত।

কিরণ।"

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্যা-কৌশলী সোমেশচন্দ্র বসু

শ্রীসত্যভূষণ সেন

বাংলার কৃতী সন্তান সোমেশচন্দ্র বসু যে গণিতবিদ্যা-কৌশলে সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, সে-কথা অন্ততঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট অবিদিত নাই। যদি তিনি তাঁহার কৌশল-প্রদর্শনী শুধু বাংলা দেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতেন তাহা হইলে তাঁহার কৃতিত্ব বিদেশে প্রচারিত হওয়া দূরে থাকুক স্বদেশেই কতটা

আদৃত হইত, সে-সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কিন্তু তিনি যখন ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়া তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিয়া আসিলেন তখন জগৎ-সমক্ষে তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতে একটুও বিলম্ব হইল না। মৌখিক পূরণ অঙ্ক এবং বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতির মৌখিক সমাধানে এ পর্য্যন্ত জগতের ইতিহাসে যে-সকল ব্যক্তি শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিয়াছিলেন, সোমেশ শুধু তাঁহাদিগকে পরাভূত নয়,—বহু পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহাদের সকলের কীর্ত্তি একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন। অপরপক্ষে সোমেশের কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিলেও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় অনেকেই জানেন না। সোমেশের জন্মভূমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রাম; এই গ্রাম বৌদ্ধযুগের দীপঙ্কর এবং শীলভদ্রের জন্মস্থান হিসাবেও প্রসিদ্ধ। সোমেশ সর্ব্বপ্রথম মৌখিক পূরণ অঙ্কের সমাধান করেন তাঁহার গ্রামের স্কুলে একজন স্কুল সব্ ইন্‌সপেক্টরের ফরমায়েসে। ইহাতে সোমেশ নিজেও নিজের পরিচয় পাইলেন। সোমেশের বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। ইহার পর হইতেই বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহে অভ্যাস করিতে করিতে দুই মাসের মধ্যেই সোমেশ ১৪ রাশির একটি অঙ্ককে ১৪ রাশির অপর একটি অঙ্ক দ্বারা পূরণ মনে মনে সমাধান করিয়া ফল বলিয়া দিতে পারিতেন।

সোমেশের মৌখিক পূরণ অঙ্কের অভ্যাস কিছুদিনের মত ১৪ রাশিতে আসিয়াই শেষ হইয়াছিল। ১৪ রাশি হইতে ২০ রাশি, ২০ হইতে ৩০, ৪০, ৫০; পরে ৬০, ৭০, ৮০ এবং সর্ব্বশেষে তিনি ১০০ রাশির একটি অঙ্ক দ্বারা অপর একটি ১০০ রাশির অঙ্ক মনে মনে পূরণ করিয়া ফল বলিয়া দিতে পারিতেন। এই অমানুষিক কৃতিত্ব লাভ করিতে তাঁহাকে ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে।

সোমেশ কলিকাতায় থাকিবার কালে মাঝে মাঝে দেশীয় এবং বিদেশীয় অনেকের নিকট তাঁহার গণিত-বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন। অবশেষে বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ অনুসারে তিনি তাঁহার এই বিদ্যা প্রদর্শনার্থ দুই বৎসরের জন্য ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া ১৯২২ সালের জুন মাসে বিলাত-যাত্রা করেন।

বিলাতে সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর সম্মুখে সোমেশ ৪০ রাশির দ্বারা ৪০ রাশির অঙ্কের পূরণ মৌখিক হিসাবে সমাধান করিয়া দেখাইলেন—ইহাতে তাঁহার ২৫ মিনিট মাত্র সময় লাগিয়াছিল। সোমেশের আর-একটা কৃতিত্ব ছিল এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে যে-কোন রাশির বর্গমূল, ঘনমূল (sq. root, cube root) হইতে ১৫ বর্গ মূল (15th root) পর্য্যন্ত যে-কোন মূল বলিয়া দেওয়া; আরও একটা ছিল যে, কোন শতাব্দীর (গত বা ভবিষ্যৎ) যে-কোন তারিখ বলিলে (ইংরেজী হিসাবে) সোমেশ সেই তারিখে কি বার ছিল বা কি বার হইবে, তাহা এক সেকেণ্ডের মধ্যে বলিয়া দিতে পারেন। বিলাতে এই সমস্তই প্রদর্শিত হইল। সোমেশের এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা বিলাতের সংবাদপত্র-সহযোগে বহুলভাবে প্রচারিত হইল এবং তাঁহার অনেক বন্ধু ও বহু সার্টিফিকেট লাভ হইল।

বিলাত হইতে সোমেশ আমেরিকা যাইবার জন্য রওনা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বিলাতী ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার Immigration Laws-এর অত্যাচারে তাঁহাকে কুইবেক বন্দরে অবতরণ করিবামাত্রই সরকারের নিকট বন্দী হইতে হইল। ক্যানাডাতে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া সোমেশ যুক্তরাজ্যে যাইবার জন্য আবেদন করিলেন। ইতিমধ্যে বিলাত হইতে খবর পাইয়া কুইবেকের একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি—ক্যাপ্টেন জোন্স কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সোমেশকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সোমেশকে বিনা সর্ত্তে ক্যানেডাতে প্রবেশ করিবার অনুমতি আনাইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু সোমেশ ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া জোন্সের বদান্যতা স্পষ্টভাবেই প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে চল্লিশ দিন বন্দী-দশায় কাটাইয়া অনেক আবেদন-নিবেদনের পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন—তিনটি সর্ত্তে (১) অনুমতি ছয় মাসের জন্য মাত্র পাইবেন, (২) এই অনুমতিকাল বাড়াইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না, (৩) অর্থ উপার্জ্জনের

অভিপ্রায়ে কোন প্রকার চাকুরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

আমেরিকাতে সোমেশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সমক্ষে তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিলেন। নিউইয়র্কে এক বিরাট সভার অধিবেশনে তিনি ৬০ রাশির অঙ্কদ্বারা ৬০ রাশির অঙ্কের মৌখিক পূরণ সমাধা করিলেন। তিনি ৪৫ মিনিট কাল পরে তাঁহার ফল ঘোষণা করিলে যিনি অঙ্ক তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহার সহিত এই ফল মিলিল না। তখন সাধারণতঃ সকলেই মনে করিলেন যে, সোমেশেরই ভুল হইয়া থাকিবে। কিন্তু সোমেশ আর-একবার দেখিয়া লইয়া যখন তাঁহার ফল নির্ভুল বলিয়া, ঘোষণা করিলেন তখন সভাতে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। যিনি অঙ্ক প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন তিনি ছিলেন একজন Ph.D. এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক; তিনি বলিলেন যে, তিনি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া অঙ্কটি প্রস্তুত করিয়াছেন; অতএব তাঁহার ভুল হইতে পারে না। অবশেষে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, সোমেশের অঙ্কই নির্ভুল এবং অধ্যাপক মহাশয়ের অঙ্কে উনিশটি ভুল পাওয়া গেল। অতঃপর সংখ্যার মূল-নির্ণয় এবং তারিখের বার-নির্ণয়ও প্রদর্শিত হইল। তারিখের বার-নির্ণয়ে সোমেশের গণনা নির্ভুল বলিয়া অস্বীকৃত হইলে একজন পার্শী ভদ্রলোক বাজারে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ একখানা Century Calendar কিনিয়া আনিলেন এবং সোমেশের গণনার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিয়া দিলেন। আমেরিকাতে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য খবর প্রচারিত হইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। খবরের কাগজে সোমেশের নানা-প্রকার 'আখ্যা' প্রচারিত হইতে লাগিল—যথা, Lightning Calculator, Human Ready Reckoner, Machine's Rival, Mental Wizard প্রভৃতি। বাস্তবিকপক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত-বড় অঙ্কের এরূপ নির্ভুল সমাধানে অনেকের ধারণা হইল যে, ইহা যাদুবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, অতএব আবার তাঁহাকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হইল, যেমন ধরুন—সেই পূরণ অঙ্কের ৪৭শ পংক্তির ৩৯শ রাশিটা কি, ইত্যাদি।

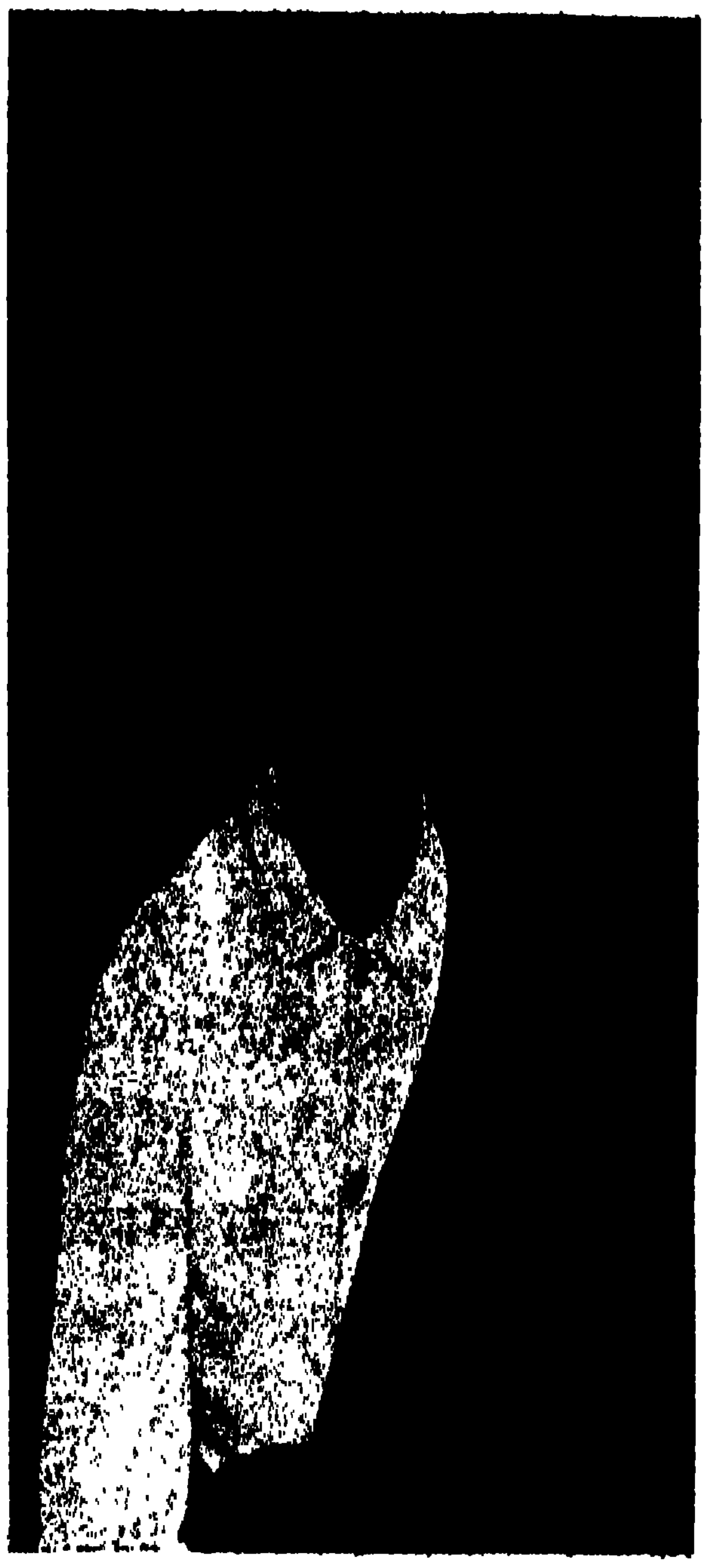

শ্রীসোমেশচন্দ্র বসু

খাদ্যাখাদ্যে বিচার করেন বলিয়া রাজকারাগারে থাকা কালে তিনি নির্ব্বিচারে সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এদিকে বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আসিবার ব্যবস্থাও নাই, অগত্যা সোমেশকে উহাদের প্রদত্ত দৈনিক একপোয়া পরিমিত দুধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইল। ইহার উপরে তিনি সপ্তাহে দুই-একদিন দুই-এক পয়সার চীনাবাদাম কিনিয়া খাইতে পাইতেন; এই ব্যবস্থাতেই তাঁহাকে চল্লিশ দিন কাটাইতে হইয়াছিল—ক্যানাডার মত শীতপ্রধান দেশে, অথচ তিনি কোনো প্রকার অসুস্থ হন নাই। এই বিষয়টা লইয়া আমেরিকায় একটা আন্দোলন হইল। একজন ডাক্তার মানুষের খাদ্যের দৈনিক ন্যূনতম পরিমাণ কতটা হইতে পারে, ইহা লইয়া একটি গবেষণা লিখিয়া Ph. D. ডিগ্রীর জন্য পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সোমেশের এই ব্যাপারে তাঁহার গবেষণার ফল ব্যর্থ হইবার উপক্রম

হইল। অগত্যা সেই ডাক্তার কৈফিয়ৎ দিলেন যে, ভারতবর্ষ আজগুবি দেশ—ঐ দেশের উপরে আমাদের বিজ্ঞানের কোনো আধিপত্য নাই; কাজেই সোমেশের এরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্তের কোনো হানি হইবে না।

সোমেশ আমেরিকাতে সেই দেশীয় এবং ভারতীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সোমেশের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেকে তাঁহাকে সেখানে থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে মাসিক প্রায় ১,৫০০ টাকা বেতনের চাকুরি পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন। সোমেশ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের সহিত যে তিনটি সর্ত্তে আবদ্ধ ছিলেন তাহার নিরাকরণের ভারও তাঁহারাই গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, অবস্থার বিপাকে পড়িয়া যে-সব সর্ত্তে আপনাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে ধর্ম্মতঃ আপনি তাহাতে বাধ্য নন; কিন্তু সোমেশ রাজি হইলেন না।

এ-পর্য্যন্ত মৌখিক পূরণ অঙ্কে Dr. Gauss ছিলেন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তিনি প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় ৩০ রাশি দ্বারা ৩০ রাশিকে মৌখিক হিসাবে পূরণ করিতে পারিতেন। সোমেশ আমেরিকাতে দেখাইলেন ৬০ রাশি দ্বারা ৬০ রাশির পূরণ—৪৫ মিনিটে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌখিক পূরণ কর্ত্তার সহিত সোমেশের এতই প্রভেদ। অপরপক্ষে ইহাও বলিতে হয় যে, ৬০ রাশি দ্বারা ৬০ রাশির পূরণই সোমেশের শেষ সীমা নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি ১০০ রাশির দ্বারা ১০০ রাশির পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাহা প্রদর্শন করিবার সুযোগ হয় নাই, কারণ এরূপ বিশাল পূরণ অঙ্কের শুদ্ধতা পরীক্ষা করাও এক অসাধ্য ব্যাপার; আমেরিকার প্রদর্শনীতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

সোমেশ সাধারণ ভগ্নাংশ এবং দশমিকের অঙ্কও অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুখে মুখে করিয়া দিতে পারেন; এই-সব অঙ্ক করিবার সময় চতুর্দ্দিকের গোলযোগেও তাঁহার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত হয় না—ইহা অনেকবার পরীক্ষিত হইয়াছে। সোমেশ Binomial theoremএ-ও সিদ্ধহস্ত। বাস্তবিকপক্ষে সকল প্রকার গণনার কার্য্যই তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে। একদিন প্যারিসে একজন গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপকের বয়স সেকেণ্ড হিসাবে কত হয় তাহা সোমেশ ২৭ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে শুদ্ধ করিয়া গণনা করিয়া দিয়াছিলেন।

সোমেশ এখন তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্ন-যুগে; এখনও তাঁহার সম্মুখে ভবিষ্যৎকাল অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে একটি মস্ত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, সেই সময় হইতে ধর্ম্মসাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছে। সকল বিষয়েই তাঁহার সংযম অসাধারণ; তিনি দিবারাত্রির মধ্যে মোটে তিন ঘণ্টা নিদ্রার জন্য ব্যয় করেন—সোমবার নিদ্রা একেবারেই বাদ; অতএব এক সপ্তাহে তাঁহার নিদ্রার পরিমাণ ১৮ঘণ্টা মাত্র। আহারের পক্ষে কিছু দুধ এবং সামান্য ফলমূলই তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। তাঁহার পোষাকে কোনো পারিপাট্য নাই —সাধারণ গৃহস্থের মত। সোমেশ আমেরিকাতে বহুমূল্য চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিয়া বিশেষভাবে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা এস্থলে সম্ভব নয়।

বর্ত্তমানে তাঁহার গণিতের প্রতি স্পৃহা নাই। তিনি বলেন যে, গণিতচর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, যে-কোনো সময় গণিতের অগণিত সংখ্যা-সমূহ স্রোতের মত তাঁহার মনশ্চক্ষুর-সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়—ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মচিন্তার ব্যাঘাত হয়। তথাপি নানা কারণে এখনও তাঁহাকে মাঝে মাঝে গণিতের চর্চ্চা করিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা উচিত যে, তিনি উপর্য্যুক্ত প্রকার বিদ্যাপ্রদর্শন ব্যতিরেকে গণিতের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নূতন কিছু দান অথবা কোনো দিকে একটা নূতন আলোকপাত করেন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান লেখকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি একখানা পাটীগণিত রচনা করিবেন, তাহাতে অন্ততঃ কিছু নূতন তথ্য জগতের জন্য প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আমরা

যতদূর জানি তিনি তাঁহার অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্ত এপর্য্যন্ত কিছু করেন নাই। অপরপক্ষে ইহাও বলা উচিত যে, তিনি দেশের লোকের নিকট যথোপযুক্ত উৎসাহ বা সাহায্য পাইতেছেন না—অনেক সময় তাঁহাকে অর্থকৃচ্ছ্রতায় ভুগিতে হয়। বোধ হয় এই-সকল কারণেও তিনি কোনো কিছু করিতে উৎসাহ পান না। দেশের লোকের উচিত ইহাকে উৎসাহিত করিয়া ইহার দ্বারা ইহারই উপযুক্ত নানাপ্রকার কাজ করাইয়া লওয়া। দেশে এরূপ একজন কৃতী ব্যক্তির সমস্ত শক্তি যদি নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে তাহাতে যে কত বড় একটা অপচয় এবং দেশের পক্ষে ইহা কত বড় একটা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, তাহা সুধীমাত্রেরই বিবেচ্য।

গিরিশিরে কুজ্ঝটিকা

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

ওই ভেসে আসে গিরিশিরে কুজ্ঝটিকা,
দূর হিমগিরি-নয়নের স্বপ্নশিখা,
শঙ্কর-জটা-ঝরা
হিম-জল-কণ-ভরা
চরাচর-একাকরা মায়াজালিকা।

আসে দিগ্‌জয়ী দৈত্যের দর্প ধরি,
তুলি বিজয়কেতন দূর দুর্গ-'পরি,
তা'র ভাবাহীন উল্লাসে
দিগ্‌বধূ কাঁপে ত্রাসে
কাঁদে নদ-নদী গিরি-বন মুখ আবরি।

পুন প্রবগতি ফিরে যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
হয়ে অস্থির বাতাসের বিষ-নিশাসে,
এই কাছে এই দূরে
শত পথে ঘুরে ঘুরে
মায়াবী রচিছে মায়া কিসের আশে!

ওকি পার্ব্বতী-কুণ্ডলে চূর্ণমণি,
ওকি শশধর-কৌমুদী অমৃতখনি,
নভ-পুষ্পের রেণু,
নন্দন-বন-বেণু,
অপ্সরী-নূপুরের ঘন রণণি!

ওকি মানস-যাত্রী শ্বেত হংসমালা,
ওকি অলকানন্দা-বুকে ঊর্ম্মি ঢালা,
পথহারা মেঘ-যূথ
চমরী গো অদ্ভুত
শুভ লাজ-অঞ্জলি কা'র শূন্যে ডালা!

ওকি নিশ্বাস বরুণের গুপ্তচারী
হল মহাকাশে উৎসৃত দরী বিদারি,
ওকি, গরুড়ের মেলা পাখা
সূর্য্যের মুখ-ঢাকা,
কোন ধবলিত রজনীর অশ্রু-বারি!

ওকি, কৈলাস-মন্দিরে যজ্ঞের ধূম,
ওকি, ধনেশের আঁখিপুটে তন্দ্রার ঘুম,
বিভূতি ও কার গায়,
অর্ঘ্য ও কার পায়,
কোন সপ্তর্ষির গাঢ় ধ্যান নিঃঝুম!

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

উদ্যোগ-পর্ব্ব

সঙ্গ-সংযোগের কথাটাই প্রথম। কারণ বিনা সঙ্গে এত বড় বিশাল তীর্থ-ভ্রমণ সম্ভবই হইত না। সেটি ঘটিল স্বামী পরমানন্দের নব-প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর-মঠে এবং শঙ্কর-উৎসবের সময়, আর পঞ্চানন জ্যোতিষী মহাশয়ের মধ্যস্থতায়। সেদিন সেখানে বহু গণ্য, মান্য, ও সাধারণের সমাবেশ হইয়াছিল।

গায়ে ফিতাওয়ালা ব্যানিয়ান, তাহার উপর পাতলা চাদর, পরনে থানধুতি, পায়ে চিনাবাড়ীর পেনেলা জুতা, মুখে কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁফ ও দাড়ি, কিছু খর্ব্বাকৃতি ভব্যযুক্ত আগমনশীল একটি মূর্ত্তিকে দেখাইয়া জ্যোতিষী মহাশয় আমায় বলিলেন, "এই যে আমাদের কৈলাস-যাত্রী-মহাশয় এইদিকেই আসিতেছেন, আসুন আলাপ করাইয়া দি।"

আরও নিকটে আসিলে নমস্কারাদির পর পরিচয় হইল "ইনি বর্ম্মা, শ্যাম, জাভা, বালী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছেন"—এই পরিচয় দিয়া সঙ্গী-মহাশয়কে, "এবং ইনিও মধ্যে মধ্যে ডুব মারেন, ভ্রমণেই বিশেষ অনুরাগ" এই পরিচয়ে আমাকে পরিচিত করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় ধীরে ধীরে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁর সেখানে অনেক কাজ।

এই যে আমার সঙ্গী-মহাশয়, ইহার বেশ দেখিলে পণ্ডিত, এবং মুখাকৃতি দেখিলে মনঃশক্তিসম্পন্ন, চতুর ও কর্ম্মক্ষম বলিয়াই মনে হয়। মাথায় টাক্ পড়ায় কপালখানি উচ্চ দেখাইতেছে। উজ্জ্বল চক্ষু-দুটিতে একটা জাজ্জ্বল্যমান "আমি" ভাবের ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট, সেটা আবার তাঁহার প্রত্যেক কথায় বিশেষভাবেই ফুটিয়া উঠে। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং স্বদেশ-সেবক বলিয়া কিছু প্রতিষ্ঠাও তাঁর আছে।

আগে তিনিই কথা কহিলেন। দৃঢ় গম্ভীর স্বরে সর্ব্ববিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া কথা কওয়াই তাঁর অভ্যাস। এক্ষেত্রে, আমার বাহ্য আকৃতিটি তাঁহার প্রথম-দর্শনেই ভাল লাগিয়াছে ইত্যাদি, প্রভুত্বের ভাবে এরূপ কতকগুলি অযাচিত গুণগরিমার কথায় উৎসাহিত করিয়া ঈষৎহাস্যে তিনি একেবারেই যাত্রার কথা পাড়িয়া বসিলেন এবং আমার সম্মতির অপেক্ষায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—আমাকে একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর দিতেও যেন নারাজ।

আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া তিনি সম্ভবতঃ সন্দেহ করিলেন হয়ত বা আমার যাওয়া ঘটিবে না, কিন্তু তিনি অনুরোধ করিতেও ছাড়িলেন না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদিনে যাত্রা করিবেন।

আগামী সপ্তাহে ত্রয়োদশীর দিন একটার এক্সপ্রেসে যাওয়াই তাঁর দৃঢ়সংকল্প, যদি আমার যাওয়া ঠিক হয় যেন শতখানেক টাকা আর যথাসম্ভব শীতপ্রধান স্থানের তৈজসপত্র এবং একটা বর্ষাতি সংগ্রহ করিয়া ঐদিনই হাওড়া ষ্টেশনেই দেখা করি। মধ্যে আর দেখাশুনার কোনও প্রয়োজনই নাই। মালপত্রের বোঝাটি একজন লোক সহজে লইতে পারে, এমনটি হওয়া চাই।

আরও জানাইয়া দিলেন যে, সকল প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র, রান্নার সরঞ্জাম, একটা লণ্ঠন এমন কি ফটোগ্রাফীর সরঞ্জামও সঙ্গে থাকিবে। মোটামুটি আমার রান্না আসে কি না খোঁজ লইয়া শেষে উৎসাহে বলিলেন, 'আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এরূপ কতই না ভ্রমণ করিয়াছি। সেইজন্য এই যোগাযোগ।"

গত তিন বৎসর ধরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ঘটিয়া উঠে নাই, এবারে তিনি দৃঢ়সংকল্প। ফিরিয়া একখানি পুস্তক লিখিবেন। রেলে কাটগুদাম অবধি, তারপর ঘোড়ায় বা পদব্রজে আলমোড়া, সেখান হইতে আবশ্যক যা-কিছু সংগ্রহ করিয়া আরও উপরের দিকে যাওয়া যাইবে। "কেমন আপনার যাওয়া ঠিক ত ?"

আমি "চেষ্টা দেখিব" বলাতে তিনি উন্নতমস্তকে বক্তৃতার সুরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "'ক্ষীণোঽহং অসহায়োঽহং দীনোঽহং, অপরিচ্ছদঃ, স্বপ্নেপ্যেবম্বিধ চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে।' যখন আমি যাইব সংকল্প করিয়াছি তখন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আমার যাওয়ার প্রতিবন্ধক হইতেই পারে না, বুঝিলেন ?" আমি বলিলাম, "ইহা সত্য বটে, যদিও আমরা সব সময়ে ঠিক সঙ্কল্পমত কাজ করিতে পারি না।" তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমার একটা 'মটো' আছে সেটা এই—প্রভু তোমার চরণ স্মরণ করিয়া সিংহের হৃদয়ে সদাই ফিরি ;—রাজা বা প্রজা মানি না কাহারে, মানুষ দেখিয়া কভু না ডরি—আমি এই মন্ত্রে কাজ করিয়া থাকি।" আমি বলিলাম, "অতীব সুন্দর ভাবটি ; ইহার মধ্যে যে নির্ভীকতা ও আত্মনির্ভরতার প্রেরণা আছে একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না।"

যাহা হউককথা এই পর্য্যন্ত রহিল যে, আগামী বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশীর দিন দুইটার দিল্লী এক্সপ্রেসের সময়ে আমি টাকাকড়ি ও প্রয়োজনমত মালপত্র সঙ্গে করিয়া হাওড়া ষ্টেশনের দশ নম্বর প্ল্যাটফরমে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।

৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সাল, বৃহস্পতিবার শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন কথামত বেলা ১২টার সময়ই হাওড়ায় উপস্থিত হইলাম। কি ভয়ঙ্কর ভীড়, মাড়বারী-তাহাদের দেশে যাইবার দিন, তাহার উপর সঙ্গে আমার স্ত্রী—তাঁহাকে এলাহাবাদে রাখিয়া যাইতে হইবে, তাহার উপর আমরা, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ভীড় দেখিয়াই ত আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত। সঙ্গী-মহাশয়কেই বা পাইব কোথা ?

তিনিই আমায় খুঁজিয়া বাহির করিলেন,—দেখিয়া ভরসা হইল; সঙ্গে স্ত্রীকে দেখিয়া এবং সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"আমি আগে যাইয়া দেখি, পরে ফটক খুলিলে, আপনারা যাইবেন। ট্রেণখানি ত আসিয়াছে দেখিতেছি" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি এদিক-ওদিক নানাদিক দিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টায় অপারগ হইয়া শেষে বড় কষ্টে ষ্টেশন-মাষ্টারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারিয়াছিলাম। প্রবেশ করিয়া সেই পূর্ণজনসমষ্টি ট্রেনখানির অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম সঙ্গী-মহাশয় একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ির দণ্ড ধরিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা যাইতেই ক্ষিপ্রগতিতে দ্বার খুলিয়া স্থান দখল করিতে বলিলেন। তিনি দুই-একজন বিপন্ন যাত্রী ছাড়া আর কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সেইজন্য সঙ্কটের মধ্যে ভগবানের কৃপায় আমরা বড়ই আরামে স্থান পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। অল্পক্ষণেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

অন্তরের কৃতজ্ঞতা সঙ্গী-মহাশয়কে কি ভাবে জানাইব—একটু সুস্থ হইয়া বলিলাম, "আপনার আকর্ষণই আমার যাত্রার চেষ্টা সফল করিয়াছে।" তিনি সহাস্যে "পূর্ব্ব হইতেই এই-সব ঠিকঠাক হইয়াই আছে, আমার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই" বলিয়া কি কি সংগ্রহ করিয়াছি জানিতে চাহিলেন।

দুইখানি কম্বল, একটি মোটা পট্টুর কোট, একটি উলেন সোয়েটার, ছোট তুলাভরা জামা একটি, চারিখানি কাপড় এবং একটি পুরাতন বর্ষাতি ও দুইশত টাকা—ইহাই আমার পুঁজি। "আপাততঃ ইহাতেই চলিয়া যাইবে," বলিয়া তিনি তাঁহার সরঞ্জাম দেখাইলেন। উহা প্রায় ঐরূপই, বেশীর মধ্যে উলেন মোজা, একটি পাঞ্জাবী ধরণের পাগড়ী, আর একটা ছাতা। আরও একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগে খান-পঞ্চাশ গীতা, উহা তাঁহার নিজ সম্পাদিত, ভগবদ্গীতার হিন্দী-সংস্করণ। তাহার কীটদষ্ট মলিন লাল মলাট অনেকদিন ঘরে পড়িয়া থাকার পরিচয় দিতেছিল। তিনি আরও লইয়াছিলেন একটি ছোট

ব্যারোমিটার এবং একখানি Tibetan Manual. পথে কতকটা তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিবেন। ছোট একটি সমচতুষ্কোণ কাগজের বাক্সে কয়েকটি ছোটছোট শিশিতে কতকগুলি ঔষধও ছিল। বলিলেন, "কাল গণনাথের ওখানে গিয়াছিলাম, ইষ্টানিষ্ট ভাবিয়া সে যত্ন করিয়া এগুলি দিয়াছে। ইহাতে পেটের পীড়া, জ্বর, বমন, বিরেচন প্রভৃতি সাধারণ রোগের ঔষধ আছে।"

আমাদের কামরায় বেশী লোক ছিল না, আমরা তিনজন আর দুইটি মাত্র হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। বেশ আরামেই আমরা গাড়ির গতিতে গা ভাসাইয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলাম। অপরিচিত লোক-দুইটির মধ্যে একজন সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গে এক-বেঞ্চে বসিয়া যাইতে-ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে পরিচয়ে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া সঙ্গীমহাশয় তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দিলেন, আর তাহাতে তিনিও পরমাপ্যায়িত হইলেন, তা ভাবে বুঝা গেল। তারপর একথা-সেকথা হইতে হইতে সেই ব্যক্তি পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া খাইবার যোগাড়ে পুনরায় পকেটে যেমন হাত দেওয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গী-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ক্যা হ্যায় ?" সে অপ্রতিভ হইয়া "ও বিড়ি হ্যায়, হাম্ পিতা হ্যায়," বলিয়া যেন কত অপরাধী এরূপভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

তখন সঙ্গী-মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আরম্ভ করিলেন,—"তোম ব্রাহ্মণ হোয়কে ও চিজ্ কেঁও পীতা হ্যায়্। তোমারা পীনা দেখকে তোমারা লেড়কা লোকভি পীনেকো শিখেগা। উসমে জহর হ্যায়, তামাকু কা পাত্তিমে কোই জানোয়ার ভি মু নেহি লাগাতা হ্যায়্। যো আদমি ও পীতা ও জানোয়ারসেভি জানোয়ার হ্যায়্—ও চিজ হরগিজ্ মৎ পিনা করো।" সে বেচারা ত একেবারে যেন এতটুকু হইয়া গেল।

"কেতনা রোজসে পীতা হায় ?" সে "বহোৎ রোজসে জী, মহারাজ বাবপনসে" বলিয়া চাহিয়া রহিল। তখন "ও পীনা ছোড় দেও, শিকো গে ?" বলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "ধীরে ধীরে ছোড়েগা, মহারাজ।" অবশেষে তাহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তিনি "যাও ওধার যায়কে পিও," বলিয়া তাহাকে তখনকার মত অনুমতি দিয়া আরও একবার "ছোড় নে কোবাস্তে কোসিস করো," হুকুম করিলেন। সে বেচারা সম্মত হইয়া তখন একটু তফাতে যাইয়া সেটি ধরাইয়া বাঁচিল।

কিছুক্ষণ পরে সে ব্যক্তি কাজ শেষ করিয়া আসিয়া আবার নিজ স্থানে বসিল এবং ক্রমে ধীরে ধীরে পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহার প্রদত্ত গীতাখানির মূল্যস্বরূপ লইতে অনুরোধ করিল।

তিনিও লইবেন না, সেও ছাড়িবে না, অবশেষে তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি টাকাটা গ্রহণ করিলেন এবং আমার কাছে রাখিতে দিলেন, বলিলেন, "পথে এরূপ কত হইবে, টাকা আসিবে, জিনিষপত্র কত আসিবে তখন দেখিবেন।"

এইরূপে ট্রেনে আমাদের নিয়মিত কালটুকু কাটিয়া গেল। পরদিন সুনিদ্রার পর সকালে আমাদের মোগল-সরাইয়ে ছাড়াছাড়ি হইল বটে, কিন্তু কথা রহিল পরদিন সাজাহানপুরে তাঁহার সঙ্গে আবার মিলিত হইব। আমার মালপত্র তাঁহার সঙ্গেই দিলাম।

পরদিন কথামত, জ্যৈষ্ঠমাসের সেই অসহ্য গরমে দগ্ধীভূত হইয়া আউদ-রোহিলখণ্ডের রেলে এলাহাবাদ হইতে সাজাহানপুর যাত্রা করিলাম। কিন্তু ষ্টেশনে আসিলে নামিবার পূর্ব্বে দেখি সঙ্গী-মহাশয় মোটঘাট্ কুলির মাথায় দিয়া গাড়ীতে আসিয়া চাপিলেন। বলিলেন, "আর এখানে নামিয়া কাজ নাই, চলুন একেবারে বেরেলীতেই যাওয়া যাক্—ভারি ধূলা ও বড় গরম, অসহ্য।" তাই হইল, রাত্রি আটটার সময় বেরেলী পৌঁছিয়া হাত-পা, মুখ ধুইয়া একটু ঠাণ্ডা হওয়া গেল। রাত্রি সাড়ে-এগারোটার পর কাটগুদামের গাড়ি।

জ্যোৎস্না রাত্রি, একবার সহরটি দেখিতে গেলে হয়। সঙ্গী-মহাশয় রহিলেন, আমি একখানি টাঙ্গা লইয়া বাহির হইলাম। দুইটি লোটারও প্রয়োজন ছিল, এখনও হয়ত সহরের দোকানপাট বন্ধ হয় নাই। কিন্তু দুরদৃষ্ট, একটু ঘুরিয়া সহরের প্রধান রাজপথ, জেলখানা, টাউন হল, স্কুল, খেলিবার ময়দান, হাঁসপাতাল বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, দেখা হইল বটে, কিন্তু লোটা পাওয়া গেল না জানিয়া সঙ্গী-মহাশয় একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "বৃথা

এত দেরি করিবার কি দরকার ছিল, আপনার জন্য আমায় এতটা উদ্বেগ ভোগ করিতে হইল।" গাড়ি ছাড়িবার তখনও তিন কোয়ার্টার দেরি ছিল। যাহা হউক আমরা মালপত্র গুছাইয়া গাড়িতে উঠিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে হলদেওয়ানী হইয়া কাটগুদামে পৌঁছাইতে প্রায় ৮টা হইল। আমরা তৈজসপত্রাদিসহ ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এখানে এজেন্সি থাকায়, মোটরগাড়ি, ঘোড়া, ডাণ্ডি, মোটবাহক বা কুলি, প্রভৃতি নিয়মিত হারে পাওয়া যায়। নৈনিতাল, রানীখেৎ, আলমোড়া যাইবার এখান হইতে প্রশস্ত রাস্তা আছে।

একজন দালাল আসিয়া কি কি চাই সন্ধান লইল। যাহা আমাদের প্রয়োজন দুইটি ভাল ঘোড়া ও একটি কুলি, তাহা কাল সকালে নিশ্চয়ই হাজির করিবে জানাইয়া গেল। প্রত্যেক ঘোড়া সাত টাকা, ও কুলি-তিন টাকা স্থির হইল।

হলদেওয়ানীতে এবং এখানে কাঠের কারবার আছে। পাহাড়ি ঝাউকেই পাইন, ও এ অঞ্চলে চৌড় বলে। ইহা হইতে প্রভূত গন্ধবিরজা ও টারপিন তৈল উৎপন্ন হয়। ভীমতাল হইতে ভাওয়ালী তিন মাইল, সেখানে কারখানা আছে। এখান হইতে চালান যায়। এখানে কাঠের কারবারও প্রসিদ্ধ। মধ্য এবং নিম্ন হিমালয়ের মধ্যে যত সরকারী জঙ্গল আছে তাহাতে উৎপন্ন যত কাঠ এখান হইতে কাটাই হইয়াই চালান যায়।

আমরা স্নান করিলাম—ষ্টেশনের নিকটেই একটি প্রবল ধারায়, আর হালুয়াইর দোকানের দগ্ধীভূত ঘৃতপক্ক খাবার খাইয়া সমস্ত দিন এবং রাত্রি কাটাইলাম। প্রভাতে ঘোড়া ও কুলি আসিল। দুইটির মধ্যে একটি নির্জ্জীব, আর সেইটিই আমার ভাগ্যে পড়িল, কারণ সঙ্গী আমাপেক্ষা স্থূল শরীর। যাইবার সময় ঘোড়ার কথা বলিতে, "কোন চিন্তা নাই, পাহাড়ি ঘোড়া, দেখিতে যেমনই হোক কর্ম্মে খুব পটু", ইত্যাদি ভরসার কথা শুনাইয়া বিজয়চাঁদ দালাল দামটি অগ্রিম আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিল। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, "এই কাট-গুদাম হইতে যাত্রাই আমাদের ঠিক কৈলাসযাত্রা। রেলে যেটুকু আসা হইল, এটা ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

আলমোড়ার পথে

এখান হইতে প্রথম পড়াও ভীমতাল। দুইটি রাস্তা দুইদিকে গিয়াছে। রাণীখেৎ-নৈনিতাল যাইবার দক্ষিণ দিকের রাস্তা পাকা এবং প্রশস্ত,তাতে মোটর প্রভৃতি চলে; আর একটি রাস্তা সরু, বামদিকে নামিয়া গিয়াছে—এটিই আলমোড়া যাইবার পথ, সে পথে মোটর যায় না কেবল মানুষ, ডাণ্ডি, ঘোড়া প্রভৃতি চলে।

প্রায় দুই-আড়াই মাইল চড়াই, তারপর আরও দুই মাইল গেলে পাঁচ মাইলের মাথায় ভীমতাল। ক্ষুণ্ণমনে আমি সেই মুমূর্ষু ঘোড়াটির উপর চড়িয়া মাঝে ছিলাম, প্রথমে ছিলেন একজন মাড়য়ারী ভদ্রলোক, তাঁর বেশ সুন্দর ঘোড়াটি, আর শেষে সঙ্গী-মহাশয়। আমার ভয় কখন ঘোড়াটির কি অবস্থা ঘটে। সেই ঠিকাদার লোকটার উপর রাগ হইতেছিল, পয়সা লইয়া এরূপ প্রবঞ্চনা। এখন নিরুপায়।

ঘোড়াটি কিছুদূর যাইয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইতে লাগিল, পরে কাঁপিতে কাঁপিতে শুইয়া পড়িল। তখনও ভীমতাল আধ মাইলের উপর। সঙ্গী-মহাশয় পশ্চাতে ছিলেন। একজন পাহাড়ি যাত্রীর সাহায্যে ঘোড়াটিকে দাঁড় করাইয়া কোনমতে লাগাম হাতে করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। এরূপ অবস্থায় আধ ঘণ্টা পরে ভীমতাল পৌঁছিলাম। ততক্ষণে সঙ্গী-মহাশয় আসিয়া পড়িলেন। ভীমতালও একটি লম্বা ধরণের হ্রদ। এ অঞ্চলে ছোট বড় মিলাইয়া প্রায় সাতটি তাল আছে। তাহার মধ্যে "তাল তো নৈনি, আউর সব তলিয়া—" এই প্রবাদটিই বুঝাইতেছে যে, নৈনিতালই সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাল। কতকগুলি ছোট ছোট দোকান; দোকানী ও কতকগুলি শ্রমজীবী লোকের বসতি। এই হ্রদের চারিদিক লইয়াই এই পড়াও। হ্রদের জল স্বচ্ছ, সাধারণের স্নান, বা কাপড়-কাচা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। জল হইতে একদিকের জমিটি ক্রমশ উচ্চ হইয়া রাস্তা অবধি আসিয়াছে। তাহাতে কতকটা শস্যক্ষেত্রও রহিয়াছে। কিছু দূরে ডাক-বাংলায় সাহেব-সুবাদের ঘন যাতায়াতও আছে।

মধ্যে সদর রাস্তা, দুইধারে দ্বিতল ত্রিতল কাষ্ঠনির্ম্মিত

ঘোড়াটি কিছুদূর যাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শুইয়া পড়িল

পাহাড়ী ঘর বা মকান। তলাগুলি সব নীচু, প্রথম তলে মুদিখানা, কাঠ, চাল, ডাল, লবণ, তৈল, ঘৃত, গুড়, আলু প্রভৃতি, আবার সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাই এই সকলও পাওয়া যায়। পান মহার্ঘ। দ্বিতলে যাত্রিদের থাকিবার ঘর, ত্রিতলে চৌকা বা রান্নাঘর। সব গৃহই এক ছাঁদের। দরজাগুলি নীচু, মাথা হেঁট না করিয়া ঢুকিবার যো নাই। জানালা না থাকারই মত, মাঝে মাঝে চতুষ্কোণ ঘুলঘুলির মত আছে। সরু সিঁড়িগুলি সব কাঠের, এ অঞ্চলে খাটিয়া, চৌকী, জামা-কাপড় ঝুলাইবার গোঁজা প্রভৃতি সকল আসবাব চীড় কাঠের। সাধারণতঃ এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও ছত্রি।

আমরা একখানা ঘরে বাসা করিয়া, একজন ব্রাহ্মণ-কুমারকে দুইচারি আনা পারিশ্রমিক দিয়া ভাত-তরকারীর যোগাড় করিলাম। ইতিমধ্যে ঘোড়ারও যোগাড় হইল, এখান হইতে আলমোড়া পাঁচ টাকা বারো আনা। কাটগুদাম হইতে ঘোড়ার সাথে যে লোকটা ছিল তার মারফতে সেই বিজয়চাঁদকে একখানা রোকা লেখা হইল যে, তোমার ঘোড়া অব্যবহার্য্য হওয়ায় আমরা ছাড়িয়া গেলাম, তুমি আমাদের প্রাপ্য বাকি দামটা আলমোড়ায়

[illegible]

পোষ্টমাষ্টারের জিম্মায়ে পাঠাইয়া দিও না হইলে আইন আছে। বলা বাহুল্য এর সবটাই বৃথা হইয়াছিল। আহারাদির পর আনন্দে নূতন ঘোড়ায় উঠিয়া রামগড়ের দিকে যাত্রা করা গেল। ঘোড়াটি এবারে ভাল পাইয়া মনটা প্রফুল্ল ছিল। মোটঘাট লইয়া আমাদের বাহক আগেই রওনা হইয়াছিল। এখানকার বাহক বা কুলী বড়ই পরিশ্রমী। তাহারা একমণ দেড়মণ বোঝা লইয়া বনপথে খাড়া চড়াই উঠিয়া যায়। আমরা সে পথে যাইতে পারি না। বনপথকে পাকডাণ্ডি বলে।

এবারে আমাদের উৎরাইয়ের পালা। প্রায় চার মাইল ছাড়াইবার পর ঘোড়া হইতে নামিয়া আমরা পদব্রজে যাইতে লাগিলাম। উৎরাইয়ের মুখে হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল। কিছুদূর আসিয়া আমরা দেখিলাম একটি য়ুরোপীয় ভদ্রলোক, কাঁধে বন্দুকের বাঁট—নলটি বামহস্তে মুষ্টিবদ্ধ এবং দক্ষিণ হস্তে পাহাড়ি লাঠি, মাথায় টুপী, পরণে খাকির অর্দ্ধ পাজামা ও শার্ট,—সস্ত্রীক ধীরে ধীরে বাক্যালাপ করিতে করিতে উঠিতেছিলেন। সঙ্গী-মহাশয় অগ্রে ছিলেন, অগ্রসর হইয়া কথা কহিলেন। পরিচয় হইল তিনি শ্রীযুক্ত নেশফিল্ড, আই-এম-এস, বেরেলীর সিভিল সার্জ্জন,—পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার প্রভৃতি হিমালয়ের বিখ্যাত স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া বাগেশ্বর ও আলমোড়া হইয়া কাটগুদাম যাইতেছেন। সঙ্গী-মহাশয় আমাদের তীর্থযাত্রী, সুদূর তিব্বতে কৈলাস মানস সরোবর ভ্রমণে যাইতেছি পরিচয় দিলেন।

তিব্বতের ওদিকে দস্যুভয় আছে জানাইয়া মিঃ নেশফিল্ড আমাদের সঙ্গে কোনরূপ হাতিয়ার আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সঙ্গী-মহাশয় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "আমরা অহিংসাপরায়ণ দরিদ্র হিন্দু ব্রাহ্মণ, তীর্থযাত্রী, হিংসা ভয় আমাদের নাই।" পরে সাহেবের স্কন্ধস্থিত বন্দুকটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পবিত্র হিমালয়ে আপনার সঙ্গে এ অস্ত্র কেন?" তাহাতে মধুর হাসিয়া তিনি বলিলেন, "এ অঞ্চলে জঙ্গলে বাঘের ভয় যথেষ্ট। পথে একটি ছেলেকে বাঘে লইয়া গিয়াছে, এই কারণেই আমরা উহা সঙ্গে রাখিয়াছি, নচেৎ অনর্থক প্রাণিহত্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুনিলে সুখী হইবেন আমরা নিরামিষাশী।" পরে স্ত্রীর হাতখানি লইয়া তাঁহার অঙ্গুলীতে "ওঁ"কার মুদ্রিত একটি আঙটি দেখাইয়া জানাইলেন পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহারা কতটা আস্থাবান। তিনি সঙ্গীমহাশয়ের এই প্রবীণ বয়সে এতবড় পর্য্যটন-প্রবৃত্তিকে গৌরবের বিষয় বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, "আপনাদের কাছে যদি নোট থাকে ত আলমোড়ার মধ্যেই এদিকে ভাঙ্গাইয়া লইবেন, কারণ ওদিকে আর নোট চলিবে না।" তাঁহারা চলিয়া গেলে সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন "কেমন বলা হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "বাস্তবিক এরূপ স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনভাবে একত্র ভ্রমণ দেখিলেও আনন্দ হয়? যেন হরপার্ব্বতী।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামগড় পৌঁছিলাম। ডাক-বাংলায় না গিয়া চটিতেই উঠিয়া কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে আট মাইলের মাথায় পিউড়ে নামক একটি পল্লীতে উঠিলাম। সেখানে মুদীর দোকান হইতে আবশ্যক মালপত্র লইয়া স্বয়ং পাক-ভোজন সমাপ্ত করিয়া ডাক-বাংলার পার্শ্বে একটি আখরোট গাছ তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও পরে দুইটার সময় যাত্রা। তের মাইল গেলে আলমোড়া।

পথিমধ্যে একটি লৌহ-সেতু, তাহার বামদিকে একটি পাকা প্রশস্ত রাস্তা, বরাবর নৈনিতালের দিকে গিয়াছে।

সেই সেতু পার হইয়া আলমোড়ার রাস্তাটি খাড়া চড়াই দক্ষিণে বাঁকিয়া উঠিয়াছে। বামে সোজা প্রস্তর-সমষ্টির উচ্চে পর্ব্বতশৃঙ্গ, দক্ষিণে যেন অতলস্পর্শ খড্ নামিয়া গিয়াছে, নীচে পার্ব্বত্য জলস্রোত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উন্মাদ হুঙ্কারে ছুটিয়াছে। ব্যবধানে একটি তিনহাত পরিমিত পাথর-সাজানো প্রাচীরমাত্র। একটি জীবন্ত বিশালতা দেখিলে ভয় হয়, কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই এপথে দেখিয়াছিলাম, যাহা চিরকালের জন্য স্মৃতির মধ্যে জাগ্রত থাকিবে। অপরাহ্নে আমরা আলমোড়া পৌঁছিলাম। সঙ্গী-মহাশয়ের উদ্যোগে নরসিং বাড়ীতে ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের শাখা কার্য্যালয়ের একখানি ঘরে আমরা বাসা পাইলাম।

সেই সেতু পার হইয়া আলমোড়ার রাস্তাটি খাড়া চড়াই দক্ষিণে বাঁকিয়া উঠিয়াছে

জেলার সদর ও পাইন ফরেষ্টের জন্য আলমোড়ার যে খ্যাতি, এক শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আর্য্যবংশীয়গণের শাসনে ইহার গৌরব অনেক বেশী ছিল।

গাড়োয়াল, কুমায়ুঁ, দোতি, শোর, আসকোট্ প্রভৃতি মধ্য-হিমালয়ের কয়েকটি প্রাচীন হিন্দু জনপদ। তাহার মধ্যে গাড়োয়াল, কুমায়ুঁ ও দোতি এই তিনটিই প্রবল ছিল। বাকিগুলি ইহাদেরই কাহারো-না-কাহারো অধীন থাকিত। নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। কুমায়ুঁতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিতেন, চম্পাবতী ছিল রাজধানী। কুমায়ুঁ-রাজ্যের পূর্ব্বসীমানায় সারদা নদী। তাহার পূর্ব্বে দোতিরাজ্য, সেখানে ছিলেন রায়ক রাজারা। এখন তাহা নেপালের অধিকারে।

পূর্ব্বে মাঝে মাঝে দোতিয়ালেরা রাজার অনুপস্থিতিতে অতর্কিত অবস্থায় কুমায়ুঁ রাজ্যের রাজধানী আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাবীর ভীষ্মচন্দ্র ছিলেন রাজা। অপুত্রক বলিয়া বালকল্যাণ নামে তাঁহার পিতৃব্যপুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন, তিনি অসাধারণ কর্ম্মদক্ষ ও যুদ্ধবীর ছিলেন। দোতিয়ালগণের উৎপাতে রাজা চম্পাবতী হইতে দূরে রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন কেন্দ্রে রাজধানী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

চম্পাবতী হইতে প্রায় বারো ক্রোশ পশ্চিমে খাগমারা নামক স্থানে একটি পুরাতন কেল্লা ছিল, তিনি এই স্থানকে রাজধানীর উপযুক্ত মনে করিয়া সসৈন্য কুমার বালকল্যাণকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। যতদিন রাজ-প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ না হয় ততদিন দুর্গমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল দোতিয়ালেরা আবার রাজধানী আক্রমণ করিয়াছে। তিনি তাহাদের দমনার্থ অধিকাংশ সৈন্যসঙ্গে কুমার কল্যাণকে পাঠাইয়া দিলেন। নিজের কাছে অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিলেন।

এদিকে রামগড়ের এক দুর্গমধ্যে গজোয়া নামে এক খাসিয়া সর্দ্দার তাহার অনুচরবর্গের সঙ্গে বাস করিত। এখানে তাহারই প্রাধান্য ছিল বেশী এবং কুমায়ুঁ রাজার সঙ্গে মর্ম্মগত শত্রুতা। রামগড় হইতে মাত্র একদিনের পথ খাগমারায় নূতন রাজধানী স্থাপিত হইবার কথা তাহাদের

কানে গিয়াছিল,—তাহারা সুযোগও খুঁজিতে ছিল। অধিকাংশ সৈন্যের সঙ্গে কুমার বালকল্যাণের চম্পাবতীর দিকে যাত্রার কথাও রাষ্ট্র হওয়ার সুযোগ বুঝিয়া সদলবলে গঙ্গোয়া একদিন রাত্রে আসিয়া দুর্গমধ্যে দুর্বল প্রহরী-বেষ্টিত রাজাকে বধ করিয়া, এবার তাহারা নিশ্চিন্ত হইল ভাবিয়া প্রস্থান করিল। এসংবাদ চম্পাবতীতে পৌঁছিবামাত্র কুমার কল্যাণ রোতিয়ালগণের সঙ্গে কৌশলে সন্ধি করিয়া সসৈন্যে খাগমারার দিকে যাত্রা করিলেন এবং সদলবলে গঙ্গোয়াকে ধ্বংস করিয়া সেই রক্তে ভীষ্মচন্দ্রের তর্পণ করিলেন। পরে তিনি কুমায়ুঁ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং এই খাগমারাকেই আলমোড়া নাম দিয়া এখানেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বহুকাল সুশৃঙ্খলার রাজত্ব করিয়াছিলেন

এক কল্যাণ আলমোড়া প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর এক কল্যাণ ইহার অথবা কুমায়ুঁ-রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হইলেন। ইনিই শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। রোহিলাগণের রাজা আলি আহম্মদ ইহাকে পরাস্ত করিয়া ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আলমোড়া অধিকার করেন। তারপর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আলমোড়া কিছুদিনের জন্য গোরখালি অর্থাৎ নেপালের অধিকারে আসে। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রার সময়ে ব্রিটিশাধিকারভুক্ত হইয়াছে।

পুরাতন স্মৃতির মধ্যে আছে কেল্লাটি, নন্দাদেবী আর মিশনরী স্কুলের নিকট পুরাতন লুপ্তপ্রায় রাজবাটি-সংলগ্ন উদ্যানের কতকটুকু। আলমোড়ার নন্দাদেবী ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বাজবাহাদুরচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার শৌর্য্য, বীরত্ব ও রাজ্যবিস্তারের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাজবাহাদুর চন্দ জুনিয়াগড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ জয় করিয়া নন্দাদেবীকে বিজয়চিহ্নস্বরূপ লইয়া আসেন এবং আলমোড়ার পুরাতন দুর্গমধ্যস্থ একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বকালে রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজ্যের ইষ্টদেব বা দেবীটিকেও অধিকার করিবার প্রথা ছিল। জয়ের ভাবনা না থাকিলে ঠাকুর-চুরির প্রথাও ছিল। সেই কারণে রাজা বা রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেব বা দেবী সুরক্ষিত কল্লা বা সেনানিবাসের মধ্যেই স্থাপিত এবং সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত রাখা হইত।

এ অঞ্চলে মধ্য-হিমালয়ে নন্দাকোটে নন্দাদেবী নামে এক চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ আছে। এই নন্দাদেবী তাহারই প্রতীক বলিয়া এতদঞ্চলে পূজিত। এ-সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে তাহা বড়ই বিস্ময়কর।

ব্রিটিশ-অধিকারে আসিবার অব্যবহিত পরেই এই নন্দাদেবীর পূজা অনেকদিন বন্ধ থাকে। নূতন বন্দোবস্তের জন্য সরকার সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি খাসে রাখেন। সেই সঙ্গে নন্দাদেবীর যা-কিছু আছে সে-সকল সরকার কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল, পূজাও বন্ধ রহিল। অনেকে কাতর প্রার্থনা করিলেও সরকার কোন কথায় কান দিলেন না। তিন বৎসর পরে কুমায়ুঁ বিভাগের কমিশনার ট্রেল সাহেব পরিদর্শনের জন্য যোহার উপত্যকা দিয়া যাইতেছিলেন। নন্দাকোট পার হইবার সময় প্রখর সূর্য্যকিরণে দীপ্ত নন্দার ধবল শিখরের প্রতি চাহিতেই তাঁহার চক্ষের পীড়া উপস্থিত হইল, তিনি যন্ত্রণায় কাতর এবং দৃষ্টিহীন হইলেন। তখন সেখানকার কয়েকটি লোক তাঁহাকে বলিল যে, দেবীর পূজা অনেক দিন হইতে সরকার কর্ত্তৃক বন্ধ হইয়াছে, তুমি যদি দেবসম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং পূজার বন্দোবস্ত না কর তাহা হইলে অন্ধ হইয়া থাকিবে। সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অচিরে পূজার ব্যবস্থা এবং সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইবে তখনই তিনি সুস্থ হইলেন।

পরে পূজার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নন্দাদেবীকে কেল্লা হইতে সরাইয়া সদর রাস্তার ধারে একটি মন্দিরে রাখা হইয়াছে। সে মন্দিরের কোন বিশিষ্টতা নাই, সর্ব্বপ্রকার স্থাপত্যালঙ্কারশূন্য।

আলমোড়া একটি অতীব সুন্দর প্রাচীন পার্ব্বত্য নগর। চারিদিকে বেড়িয়া তার পরিষ্কার রাস্তাগুলি। চারিপাশেই পর্ব্বতমালা, কতক 'পাইন' বন কতক বা শস্যক্ষেত্র। একটি বড়রাস্তা পর্ব্বতটি বেড়িয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার দুই পার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল গৃহ-সকল। নীচের তলে দোকান, উপরের তলা বাসগৃহ, তলাগুলি নীচু এবং একদিকেই গবাক্ষ।—ছাদ শ্লেট পাথরের, দুইদিকে ঢালু।

হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ-শাসনাধীন ভূখণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত লোকালয়গুলি এই একই স্থাপত্যের অন্তর্গত। শীতের প্রাধান্যহেতু ঘরগুলি

প্রায়ই গবাক্ষশূন্য, কেবল রাস্তার ধারে বা গৃহের সম্মুখের দিকে একটি করিয়া তিনটি কপাটওয়ালা গবাক্ষ।

গোদেরা

উহাতেই যা কিছু কারুকার্য্য। ব্রিটিশ-সীমানার শেষ পর্য্যন্ত সকল-গৃহই একই স্থাপত্যের অন্তর্গত।

বড় রাস্তার দুই ধারে যা-কিছু দোকানপাট। জীবন-যাত্রার যতকিছু প্রয়োজনীয় বস্তু সকলই এই বড় রাস্তার দুধারেই পাওয়া যায়। ইহাই বাজার। ফলের মধ্যে আপেল, খোবানী, আখরোট, আনার, পিচ, ন্যাকল। এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই জাতি বেশী। বৈশ্যও কিছু আছে, তাহারাই এখানকার বর্দ্ধিষ্ণু, ব্যবসায়ী এবং ধনবান। বাকি জাতিগুলি গরীব। ক্ষত্রিয় বা ছত্রিরা জমি-জমা রাখে।

শীতের প্রাধান্য ও জলের অপ্রাচুর্য্যহেতু এদেশীয়গণের আচার কিছু ভিন্ন। এরা চুড়িদার পাৎলুন, তার উপর বুক-খালা কোট, ভিতরে কামিজ ও ফতুয়া, মাথায় টুপী বা পাগড়ী পরে। স্ত্রীলোকে ঘাগরা, কাপড় দুইই পরে, ভিতরে কাঁচুলী।

আজকাল বিদ্যার প্রচার উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলি গ্রাজুয়েট ও অণ্ডারগ্রাজুয়েট দেখিলাম। প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যাও কম নয়। তবে শেষে বাঙালী বা মান্দ্রাজিগণের মত চাকরি ছাড়া গতি নাই। এরা বড়ই সুন্দর ও শান্তপ্রকৃতি, সরল এবং প্রায়ই অকপট, তবে দেশটি বড় গরীব। প্রয়োজনীয় মালপত্র-সংগ্রহের জন্য, আর এদেশের জলবায়ু উপভোগের এবং শরীরে অভ্যাস করিয়া লইবার জন্যও বটে, আমরা দশদিন এখানে থাকিব

• এখানে জলের ব্যবস্থা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির একটি

আলমোড়া
শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কীর্ত্তি। পার্শ্বস্থ পাহাড় একটি ধারা হইতে নলযোগে জল আনিয়া সহরের স্থানে বড় বড় জলাধার (tank) পূর্ণ করিয়া রাখার ব্যবস্থা। সর্ব্বশ্রেণীর লোক সেখান হইতে জল পায়। আমরা যেস্থানে ছিলাম সাধারণ জলাধার হইতে দূরে বলিয়া ব্যবহার্য্য জল প্রায় একপোয়া পথ উৎরাইয়ের মুখে এক গোধেরা হইতে আনিতে হইত। ছোট একটি সম-চতুষ্কোণ চৌবাচ্চা পাথরে-বাঁধানো মন্দিরের স্থায়, উপরে গম্বুজের আচ্ছাদন। পাড়ের ধাপগুলি প্রশস্ত ও উচ্চ। ভূগর্ভস্থ ঝরণা হইতে অবিরাম জল, উঠিয়া প্রস্তরাধারটি কানায় কানায় পূর্ণ। বাহিরের চাতাল ঢালু, যাহাতে বাহিরের ব্যবহৃত জল ভিতরে যাইতে না পারে। স্নান, মুখধোয়া কাপড়-ধোয়া সকল কাজই বাহিরে করিতে হয়।

অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, তাহার মধ্যে দুই শত মুসলমান। ভাদ্রমাসের নন্দাষ্টমীতে এখানে একটি উৎসব হয়, সেইটি এখানকার সর্ব্বপ্রধান উৎসব। নন্দা-দেবীর স্থানে বহু ছাগল মহিষও বলি হয়। আশ্বিন মাসকে অশোজ বলে, সেই সময়ে নবরাত্রের পর্ব্ব হইয়া থাকে। তখনও এখানে দেবীপূজা ও মেলা হয়। ইহা ছাড়া গণেশ-পূজার প্রচলনও এদিকে আছে। বাঙলা দেশ ছাড়া বোধ হয় ভারতের আর কোথাও লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার পৃথক অনুষ্ঠান নাই।

"মাস মস্‌লিখোর" এবং আচারভ্রষ্ট বলিয়া বাঙালীদের একটি দুর্নাম বহুদিন চলিতেছে। তাহাতে এক-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও নিরামিষাশী গোঁড়া হিন্দুসমাজে তাহাদের একত্র ভোজনের স্থান নাই। দেখিলাম এখানে অতটা বাড়া-বাড়ি নাই, যেহেতু পলাণ্ডু ও মাংস ইহাদের সাধারণ খাদ্য, দেবীস্থানে বলি দেওয়া মাংস কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণেও খায়।

এই পশ্চিমাঞ্চলের রন্ধনশালাটি একটু বিশিষ্ট ধরণের। যিনি রাঁধিবেন তিনি স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া চৌকার মধ্যে থাকিয়া রন্ধন করিবেন ও সেইখান হইতেই পরিবেশন করিবেন। রন্ধন ভোজন ও পরিবেশনের সকল কার্য্য শেষ করিয়া তবে চৌকা হইতে বাহির হইবেন। রন্ধন ও ভোজন-স্থান পৃথক, উঁচু করিয়া মাটির আল দেওয়া। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের এ দেশে প্রাতে উঠিয়া শৌচ, স্নান ও পূজান্তে অন্যান্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিয়ম।

এখানে আমাদের কথা একটু বলা যাক। সঙ্গী-মহাশয়ের পরিচিত নন্দকিশোর জীই এখানে আমাদের বাসা দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই আমাদের প্রথম মুরুব্বি। এখানকার ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের যে শাখা, তিনিই তাহার প্রধান কর্ম্মী; কার্য্যালয়ের একখানি নাতিক্ষুদ্র ঘরেই আমরা দুজনে দুইটি পৃথক আসন বা কম্বলাদি বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়াছিলাম। মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ীতে ভূষিত পণ্ডিত নন্দকিশোরজি আমাদের অনেক ভরসা দিলেন।—তিনি যাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ঘোড়া কুলি যাহা প্রয়োজন, সকলই এখানে পাওয়া যাইবে। এখান হইতে আমরা আসকোট হইয়া গারবেয়াং যাইব। সেখান হইতেই তিব্বতে যাইবার কথা এখন কিছুদিন এখানে আনন্দে থাকিয়া যান।

সঙ্গী-মহাশয় এহেন সহায় পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইলেন। সহাস্যে বলিলেন "বাহা মেরা নন্দকিশোরজী হ্যায় উহা সব পূরা হ্যায়, কোই চিজ কা কমি নাই।" নমস্কারান্তে তিনি আবার দেখা হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরাও পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম, জলযোগান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলাম। ভগবৎ কৃপায়, নিদ্রা চিরবাধ্য থাকায় সঙ্গী-মহাশয়ের নাক ডাকিতে বিলম্ব হইল না। পিশু ও একটি ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে আমার সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না।

একটি গণপতির বাহন, প্রথম হইতেই জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিকে তিনি যাহাই করুন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার ক্ষীণ শরীরটির উপর দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যাতায়াত করিতেছিলেন। আবার মধ্যে মধ্যে আমার বক্ষের উপর বসিয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তাও করিতেছিলেন। শুধু আমার নহে, সঙ্গী-মহাশয়ের ঘনশ্মশ্রুযুক্ত গণ্ডের উপর দিয়াও যাতায়াত করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া সতর্ক হইতে হইয়াছিল। এই পাহাড়ি মূষিকবরের বীর আচরণে আমি স্তম্ভিত হইলাম, এরূপ ভয়াবহ নাসিকা-গর্জ্জনেও তাহার সেই বিন্দুপ্রমাণ ক্ষীণ শরীরে ভয়ের

উদ্রেক হইল না। প্রভাতে দেখা গেল আমার গরম কাপড়ের এবং পরনের কাপড়খানির কতকটা কাটিয়া দিয়াছেন। সঙ্গী-মহাশয় নিজের সকল দ্রব্য দেখিয়া বলিলেন, "না আমার কিছু কাটে নাই, তার আমার প্রতি শ্রদ্ধা আছে দেখিতেছি।" সম্ভবতঃ কাজের চাপ বেশী থাকায়, এদিকে নন্দকিশোরজীকে দুইদিন পাওয়া গেল না। অনুসন্ধানে পুনরায় আমাদের পরিচারকটিকে পাঠানো গেল।

অস্থায়িভাবে, বাসার কাজকর্ম্মের জন্য নাগুয়া নামে একজন লোক রাখা হইয়াছিল। পারিশ্রমিক রোজ চারি আনা হিসাবে। চূলা ধরানো, বাজার হইতে জিনিষপত্র আনা, মশলা-পেষা, জল-আনা, কাপড়-কাচা, আর ফাইফরমাস খাটা।

তিনি আসিলেন না, আমরা আর এক সহায় পাইলাম। ইনি লালা অস্থিরাম সা, জাতিতে বৈশ্য, এখানকার একজন গণ্যমান্য, ধনবান ব্যবসায়ী। প্রথম পরিচয়েই তিনি পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

সদর রাস্তার উপরেই তাঁর গৃহ। রাজধানীর পত্তন সময়ে চন্দ্রবংশী রাজা ভীসম চন্দের সঙ্গেই তাঁর পূর্ব্বপুরুষ

লালা অস্থিরাম সা

লালা নারায়ণ সা এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তাঁর চারিটি পুত্র, জ্যেষ্ঠ পিউড়ের ডেপুটি কলেক্টর, মধ্যম ও তৃতীয় তাঁহার কারবারে সহকারী, এবং কনিষ্ঠ এলাহাবাদে বি-এ পড়েন। গৃহখানি তাঁর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুচারু-রূপে আধুনিকভাবেই সজ্জিত। পরদিন লোক পাঠাইয়া আমাদের সযত্নে লইয়া গেলেন এবং নানা প্রকার ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া যাত্রার সকল আয়োজন ঠিক করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন।

ইতিমধ্যে আমরা পথের জন্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। রন্ধনের পাত্র, ছোট থালা দুইখানি, একটি হাঁড়ি, লোটা, চিমটা, চাটু প্রভৃতি। গরম মোজা, রঙীন চসমা, পশমের টুপী। প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে যাওয়া হইত। ফিরিবার সময় যাহা কিছু খরিদ করিবার করিয়া এবং অস্থিরাম সার সঙ্গে দেখাশুনা করিয়া সন্ধ্যায় বাসায় আসা ও ভোজনের যোগাড়।

কৈলাস-যাত্রা

সেই সময় য়ুরোপের মহাসমর চলিতেছিল। রিক্রুটের ধূম লাগিয়াছে, চলিত কথায় এখানে তাহার নাম "রংরুট্।" কুমায়ুঁ ও গাড়োয়াল প্রায় যুবকশূন্য হইয়াছিল। নৈনিতাল, গাড়োয়াল ও আলমোড়া, এই তিনটি জেলা লইয়া কুমায়ুঁ বিভাগ, অধিবাসীর সংখ্যা মোটামুটি ১৩,২৮৭৯০। ইহার মধ্যে যতগুলি যুবক থাকা সম্ভব, যুদ্ধের খাতায় নাম লিখাইয়াছে। নিত্য দেখিতাম সৈনিকবেশে সজ্জিত যুবকের দল আলমোড়া সহরে আসিতেছে। দুই একদিন থাকিয়া কাটগুদামের রাস্তায় চালান হইতেছে। রণবাদ্য, তূরী, ভেরী, অবিরাম বাজিত। বেড়াইতে গেলে ফিরিবার পথে নিত্যই নবীন সেনাদলভুক্ত যুবকগণের হর্‌রা-গর্‌রা দেখিতাম।

সেদিনও আমরা ফিরিবার পথে কাছারী পার হইয়া সদর রাস্তার ধারে দেখিলাম কতকগুলি রংরুট যুবক দাঁড়াইয়া সশব্দে সিগারেট্ ফুঁকিতেছিল। সঙ্গী-মহাশয় তাহাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথারম্ভ করিয়া দিলেন। প্রথমে তাহাদের নাম-ধাম জানিয়া পরে আদেশসূচক গম্ভীর-কণ্ঠে ধূমপানের দোষ বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং

পুনঃ পুনঃ "যো চিজ্ কোই জানোয়ার নহি ছুঁতা ও চিজ্ তোমলোক আদমি হোয়কে কেঁও পীতা হ্যায়। উসমে জহর হ্যায়, কলেজা জল্‌তা" ইত্যাদি তাঁহার নির্ব্বাচিত এবং অভ্যস্ত বাক্যগুলি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রথমটা তাহারা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, পরে "যো চিজ্ জানোয়ার কভি মু নাহি লাগাতা" ইত্যাদি কথাগুলি শুনিয়া সেটাকে অসম্মানের কটাক্ষ বুঝিয়া একজনের মেজাজ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। একে মিলিটারী, তার উপর পাহাড়ি জোয়ান মরদ, বুট-পটি আঁটিয়া যুদ্ধে যাইতেছে, একেবারেই বুক ফুলাইয়া সোজা-মূর্ত্তি সঙ্গী-মহাশয়ের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সতেজে উত্তর করিল, "কাহে নহি পিয়েগা, তোমরা ডরসে পীনা ছোড়েগা, তোমরা ক্যা হ্যায়; যব সরকার বাহাদুর হপ্তেমে নও প্যাকট্ করকে সিকরেট্ হর্ সিপাহিকো বাঁটতা হ্যায়, আচ্ছা না মানো তোম, তোম মৎ পিও দুনিয়ামে এতনা আদমি"—তাহার দফাদার ভদ্রলোকের সহিত কথান্তর হইতেছে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া ওদিকে ঠেলিয়া দিল। যাইতে যাইতেও সে একবার মুখ ফিরাইয়া "যব সরকার বাহাদুর মুফৎ দেতা, তব্ কেঁও নেহি পীয়েগা," বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

আমরাও সেদিক ছাড়াইয়া মিশনরী স্কুলের নিকট আসিলাম, রেভারেণ্ড জে, এস, বুডেন কর্ত্তৃক এই স্কুলটি ১৮৬৫ সালে স্থাপিত হয়। সহরের এই একান্ত দেশে রুদ্রচন্দ্রের পুত্র মহারাজ উদয়চন্দ্রের একটি বিশাল কীর্ত্তি ছিল। তিনি ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির এবং মল্লামহল নামে একটি প্রাসাদ, তৎসংলগ্ন একটি উদ্যান এবং তাহার মধ্যে একটি বিস্তৃত সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। আজ তিনশত বৎসরের কথা, এখন তাহার যৎকিঞ্চিৎ চিহ্নমাত্র আছে।

এখানে ডাকঘরে ওদিকের অর্থাৎ উত্তর-হিমালয়ের পথের ঘোড়া কুলি প্রভৃতির হার ছাপানো পাওয়া যায়। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যবহারের কোনও সম্বন্ধ নাই, সরকারী ছাপানো কাগজে,—

আলমোড়া হইতে কত মাইল	স্থানের নাম	ঘোড়ার হার	কুলির হার	
১৩½ মাইল	ধওলছিনা	২৲	।৵০	আসকোটের পর যে রাস্তা, তাহার
৩০ "	গনোই	৪৲	৸০	সকল স্থানে ঘোড়া যাইবার সুবিধা নাই।
৪২ "	বেরীনাগ	৬৲	১৲	আর তাহা ছাড়া আসকোট হইতে
৫২ "	থল্	৮৲	১।০	আরও উত্তর দিকে যাইবার কুলি
৬১ "	ডাণ্ডিহাট	৯।০	১।০	আলমোড়ায় পাওয়া যায় না।
৮৩ "	আসকোট	১১৲	১৸৵০	উহা আসকোট হইতেই বন্দোবস্ত করিতে
১৩০ "	গারবেয়াং	২১৲	৩৸৵০	হয়।

সরকারী ইস্তাহারের লিখন-মতে আলমোড়া হইতে আসকোটের ঘোড়া ১১ টাকা, আর কুলি ১৸৵০। কিন্তু একজন ঘোড়াওয়ালা ঠিকাদার চাহিল ত্রিশ টাকা আলমোড়া হইতে আসকোট পোঁছাইতে। কুলির কথা এক টাকা দশ আনা—চাহিল পাঁচ টাকা ছয় আনা।

ঘোড়ার এতটা ভাড়া দেখিয়া আমরা হাঁটিয়া যাত্রা সম্পূর্ণ করিতেই সঙ্কল্প করিলাম। সঙ্গী-মহাশয় ত একেবারেই তটস্থ। বলিলেন, "এই হিমালয়ে আমি হাজার মাইল বেড়াইয়াছি। কাশ্মীর গিয়াছি মোটরে, কেদার-বদরী গিয়াছি লোকের কাঁধে চড়িয়া, তা হইলেও এখনও আমার বল যথেষ্টই আছে, হাঁটিতে খুব পারিব।"

আমরা মক্ষিকার উৎপাতে দ্বিপ্রহরে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইতাম। সঙ্গী-মহাশয় প্রথম হইতেই "আপনি" সম্বোধন করিতেছিলেন; এখন দেখিতেছি আলমোড়ায় আসার পর হইতে "তুমি" আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি·

বিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ, ইহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভয় পাছে ইহাপেক্ষা আরও বেশী কিছু হয়। তিনি বলিতেছিলেন যে, কাল ও পরশু এই দুইদিনের মধ্যে যাহা কিছু কিনিতে বাকি আছে কিনিয়া পরদিন চল যাত্রা করা যাক্।" এমন সময় একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন দেখিয়া আমরা কথা বন্ধ করিলাম।

যিনি আসিলেন তাঁহার নাম পদম প্রধান। এই সহরে তাঁহার একখানি মসলাপাতির দোকান আছে। মানস

পদম প্রধান

সরোবরের যাত্রী শুনিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। বড়ই সুন্দর, নম্র তাঁর স্বভাব। তিনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। যতকিছু দ্রব্য আমাদের খরিদ করিতে বাকি ছিল, তিনি সমস্তই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামী সত্যদেব এই রাস্তা দিয়া মানস সরোবরে গিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে এই পদম্ প্রধানের উল্লেখ আছে। ইনি অতিশয় সৎ, পরোপকারী, সাধুসঙ্গপ্রিয়, সরল এবং সর্ব্ববিধ বিলাস-বর্জ্জিত। গৃহস্থাশ্রমের একজন সাধু। তিনি আসিলে আমাদের প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইল। অনেকক্ষণ পর সকলে ভ্রমণে বাহির হইলাম। তিনি এবং আরও দুচারজন স্থানীয় ভদ্রব্যক্তি যোগাযোগ ঘটাইয়া সঙ্গী-মহাশয়কে এক বক্তৃতা দেওয়াইলেন। সেইদিনই বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া স্থির হইল, পরদিন নন্দাদেবীর প্রাঙ্গণে সঙ্গী-মহাশয়ের তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে; লালা অস্তিরাম সা সভাপতি।

পরদিন তাঁহার বক্তৃতা হইল, ভাবটি বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। পুরাকালের ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা "বেদাহরণ কার্য্যার্থে" ও তীর্থস্নানের জন্য বসুধা পর্য্যটন করিতেন। তাহার ফলে ভারতীয় আর্য্যগণ সিংহল, শ্যাম, জাভা প্রভৃতি দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছিলেন। দেশ-পর্য্যটন না করিলে কখনও কোনও দেশের কোনও জাতি জ্ঞান ও ধনৈশ্বর্য্যবান হইতে পারে না—ইহাই ছিল বক্তৃতার বিষয়। তৎপরদিনও আবার তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমি অন্য কর্ম্মে ছিলাম।

পরদিন আবার লালা অস্তিরাম সার ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানেও অনেক কথা হইল। আসল কথা এই যে, এখান হইতে গারবেয়াং পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তিব্বতে বিনা হাতিয়ারে যাওয়া উচিত নয়। কারণ সেখানে ডাকাতের ভয়, সামান্য পয়সার জন্য সহজেই মারিয়া ফেলে। কেবল গৈরিকধারী সন্ন্যাসিদের উহারা লামা মনে করিয়া কিছু বলে না। সা-জী বলিলেন ল্যানডর যখন তিব্বত গিয়াছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি আমারই কাছে রাখিয়া যান, পরে তাঁহার বিপদের সময় এখান হইতে টাকা পাঠাই! তাঁহার পুস্তকে আমার কথাও আছে দেখিবেন। তিনি ভাল ড্রইং জানিতেন, ফটোগ্রাফের সকল সরঞ্জাম তাঁর সঙ্গে ছিল, কিন্তু তিব্বতের লোকেরা সে-সমস্তই ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছিল।" আমি শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে সঙ্গী বলিলেন, শরৎচন্দ্র দাসের ঐ ব্যাপারের পর তাহারা পর্য্যটক কাহাকেও কোন নক্সা করিতে বা ফটো লইতে দেখিলেই সর্ব্বনাশ।

আমার যে এতটা শ্রম বৃথা হইল। ডাকযোগে কলিকাতা হইতে Colour-box, কাগজ প্রভৃতি সরঞ্জাম সব আনাইলাম, পথে ছবি আঁকিব বলিয়া, তাহার কি হইবে? সা-জী বলিলেন, "ওসব এখন আমার কাছে থাকুক, আপনারা ফিরিয়া আসিলে লইবেন।" কেবল পেন্সিল ও কাগজ সঙ্গে লইব সঙ্কল্প করিলাম। সা-জীর কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা তিব্বতে টের পাইয়াছিলাম।

বাসায় আসিয়া সঙ্গী-মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আমাদেরও গৈরিক লইতে হইবে। তিনি কাশীর লামা, যেহেতু তিনি কাশীতে বিদ্যাভাস করিয়াছেন, এবং আমি কলিকাতাবাসী সুতরাং কলিকাতার লামা। আসল কথা ড়ুইজনের ড়ুইখানি চাদর গৈরিকে রং করিয়া রাখা হইল। আমি ভ্রমণশেষ পর্য্যন্ত মাথায় বাঁধিয়াছিলাম, আর সঙ্গী-মহাশয় উহা একদিন ব্যবহার করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ছোটখাট দ্রব্য বাঁধিতে প্রয়োজন হইলে একটু একটু ছিঁড়িয়া দিতেন। বাকিটুকু পবিত্র তীর্থের চিহ্নস্বরূপ ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন।

এখানে সরকারী কোষাগার হইতে একশত টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লওয়া হইল। টাকা পঞ্চাশটি ও রেজকী বা খুচরা পঞ্চাশ টাকার। কথা হইল, সামান্য কয়টি টাকা ও সমস্ত রেজকী আমার কাছে থাকিবে, আর সকল খরচ আমার হাত দিয়াই হইবে, আর সঙ্গী মহাশয়ের কাছে টাকা পঞ্চাশটি থাকিবে। এমন সাবধানে আমরা অর্থগুলি লইব যে, বাহিরের কাহারও সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ হইবে না। পর্য্যাপ্ত টাকা হাতে থাকিলেও খরচের সময় বাহিরের লোকের কাছে আমরা বিলক্ষণ কৃপণকল্প দেখাইব।

সন্ধ্যার পর চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সঙ্গী-মহাশয়কে বিদায়-সূচক সম্মান দিতে আসিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হাতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী কিছু কিছু উপহার। তাঁহারা কিছুক্ষণ থাকিয়া আমাদের কৈলাস-যাত্রার সফলতা কামনা করিয়া বিদায় লইলে সঙ্গী-মহাশয় মালা ফিরাইতে লাগিলেন। আমি সকল জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলাম। আমাদের আহারাদির পর অম্বিরামের পুত্র আসিয়া পথের জন্য কয়েকখানি পরিচয়-পত্র দিয়া গেল, আরও সংবাদ দিয়া গেল যে একটি ঘোড়া যোগাড় হইয়াছে, প্রভাতে আসিবে। তাহার পর পদম প্রধান একটি মিলিটারী 'স্যাকে'র মধ্যে আমাদের সকল দ্রব্যই আনিয়া হাজির করিলেন। আর কিছুই বাকি রহিল না—দুইটি পাহাড়ি লাঠি পর্য্যন্ত।

প্রভাতে উঠিয়াই প্রাতকৃত্য শেষ করিয়া আমরা বাহির হইলাম। পিশু ও মশার জ্বালায় ও উদ্বেগে সারা-রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, সেজন্য শরীর স্বচ্ছন্দ ছিল না। ছাতা বগলে ও একহাতে লাঠি সঙ্গী-মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে "জয়তি জয় বলরাম লক্ষ্মণস্তু মহাবল, রাজা জয়তি সুগ্রীবো, রাঘবেণাপি পালিতম্‌" ইত্যাদি শুভযাত্রার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রে, আর পশ্চাতে গৈরিক পাগড়ি বাঁধিয়া লাঠি হাতে আমি চলিলাম। ঘোড়াওয়ালা আসিয়াছিল। সদর রাস্তায় ঘোড়ায় উঠিতে হয়, কাজেই সে ঘোড়া লইয়া পশ্চাৎ চলিল।

বড় রাস্তায় উঠিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়াকা কিরায়া কেত্‌না দেউঙ্গা"? সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, "যো-রেট্‌ হ্যায় ওই মিলেগা।" তখন সে ব্যক্তি বলিল, "ও রেটমে কৌন যায়েগা?" পঁচিশ রূপেয়া সে কৌড়ি কম নেহি লেগা।" যাত্রার আরম্ভেই এই কচাকচিতে সঙ্গী-মহাশয় চটিয়া ঘোড়া ফিরাইয়া দিলেন। আমরা ততক্ষণে বড় রাস্তায় আসিয়া কুলির আড্ডায় পৌঁছিয়াছি।

একটু কড়া মেজাজে সঙ্গী-মহাশয় "এই কৌন জমাদার হ্যায়, হামরা দোঠো কুলি চাইয়ে, আসকোট যায়েগা, হুকুম করিলেন। জমাদার সাহেব, হঠাৎ একজন আগন্তুকের মুখে সকালবেলা তামাকু খাইবার সময় এরূপ কথা শুনিয়া একটু রুক্ষভাবে "আচ্ছা, খাড়া রহিয়ে, কুলি বোলায়েগা, রেট ঠিক হোগা, তব চলেগা" বলিয়া একটা হাঁক দিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাতন সরকারী দর চার আনা করিয়া পড়াও এখন ছয় আনা করিয়া হইয়াছে। আসকোট পাঁচটি পড়াও, সুতরাং একটাকা চৌদ্দ আনা হয়। দর লইয়া অনেক বকাবকি হইল। সঙ্গী-মহাশয় ত চটিয়া আগুন। অনেক রূঢ় কথাও বলিয়া ফেলিলেন, শেষে নিরুপায় হইয়া প্রত্যেক কুলিকে পাঁচ টাকা, আর ছয় আনা করিয়া খোরাকী দিতে স্বীকার করিতে হইল।

ভারতবর্ষ

নিখিলভারতীয় হিন্দুমহাসভার দ্বাদশ অধিবেশন—

এবারে সুরাটে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্যত্র তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে হিন্দুসমাজের সমস্যা ও হিন্দুমহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেন ভবিষ্যতে প্রবাসীতে সেই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। এই স্থলে মোটামুটি ভাবে তাঁহার অভিভাষণের আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

তিনি বলেন যে, হিন্দুমহাসভা যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত তাহার সম্বন্ধে অন্য কোনও সমাজের বা ধর্ম্মের আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। এবং হিন্দুমহাসভা তাহার সভ্যবৃন্দকে হিন্দু হিসাবে যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে উদ্বোধিত করিতেছে,তাহার সহিত শুধু মানুষ হিসাবে হিন্দুদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে, তাহারও কোনো বিরোধ নাই। হিন্দুসমাজের নিজেকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা সমগ্র জাতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার বৃহত্তর চেষ্টার একটা দিক মাত্র। ইহার পর তিনি ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন গৌরবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সভ্যতার ধারাকে চিরপ্রবহমান রাখা হিন্দুরই কর্ত্তব্য, কারণ হিন্দুই বিশেষ করিয়া এই সভ্যতার উত্তরাধিকারী, হিন্দুসমাজই সেই সভ্যতার প্রধান অবলম্বন। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, হিন্দুসমাজকেও বাঁচিতে হইবে। তাহার এই বাঁচিবার চেষ্টার মধ্যে অন্য কোনও জাতি বা ধর্ম্ম বা সমাজকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোনও ইচ্ছা নাই। হিন্দু মহাসভা শুধু হিন্দুসমাজকে তাহার ন্যায্য এবং প্রাপ্য অধিকার দিয়া সগৌরবে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়।

এই মহদুদ্দেশ্যের সহিত অন্য কোনও ধর্ম্মের বিরোধ নাই। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুর এই বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাকে নিজেদের উপর আক্রমণ মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ঐতিহাসিক ও অন্যান্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা প্রচার, হিন্দুর সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া, নিম্নশ্রেণীর লোককে উন্নত করা, এ সকল হিন্দুসমাজে অভিনব জিনিষ নয়। যুগে যুগে হিন্দুরা ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে ও বাহিরে এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে (১) হিন্দুর একতাসাধন, (২) হিন্দু ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বির মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন; (৩) অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধান; (৪) হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি, প্রভৃতি হিন্দুমহাসভার কয়েকটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার মতে কি করিয়া সেগুলি সিদ্ধ হইতে পারে তাহার আলোচনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে জাতি বিশেষের উন্নতি অবনতি কি কারণে হইয়া থাকে, তাহারও উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা, হিন্দুর অধিকাররক্ষণের উপায় বিচার করিয়া, ফলে অধিকার না থাকিলেও কাজ করিয়া যাইতেই হইবে হিন্দুগণকে এই উপদেশটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া তাহার অভিভাষণ সমাপ্ত করেন।

লণ্ডন বাংলা সাহিত্যসম্মিলনী—

মাঘমাসের প্রবাসীতে লণ্ডন বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীর যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও লণ্ডনে আর একটি সাহিত্যসম্মিলনী ছিল। শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে,

"আমাদের সময়ে ১৯২১ সালে লণ্ডনে ঐরূপ একটী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নাম ছিল 'লণ্ডন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'।' প্রতিমাসে (বা ১৫ দিন অন্তর ঠিক স্মরণ নাই) অধিবেশন হইত এবং সেখানে প্রবন্ধাদি পাঠ করা হইত। আমাদের ঐ সভায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার ও শ্রীযুক্ত কে, এন, গুপ্ত সভাপতি ছিলেন। এক অধিবেশনে ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ সেন এম-এ (এড্, লিড্স্), ইহার বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। জানি না ঐ পরিষৎ কতদিন জীবিত ছিল। বাঙালীদের সম্মিলনী লণ্ডনে পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্যও অন্ততঃ ছিল এই কথা জানানই আমার উদ্দেশ্য।"

জয়পুর স্কুল অফ্ আর্টস—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জয়পুর স্কুল অফ্ আর্টস্ নামক বিদ্যালয়টি কার্য্যতঃ যখন একটা সামান্য পণ্যগৃহে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং জয়পুরের বাহিরে জয়পুর শিল্পের যে আদর ছিল তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তখন ইহার নষ্ট গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে জয়পুর কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মাননীয় স্যর আর, গ্লেন্সী সাহেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়কে উক্ত বিদ্যালয়টির আমূল সংস্কার করিবার ভার অর্পণ করিয়া অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করেন। অসিতবাবু এই শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পণ্যব্যবসায়ের গতিরোধ করিয়া নষ্ট শিল্পের উন্নতি ও ভারতীয় প্রথামত চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার প্রচলনের জন্য রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁহার সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নিকট অশেষ সহায়তা লাভ করেন। কিন্তু কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই অসিতবাবু লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট স্কুল অফ আর্টসের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন। অতঃপর জয়পুর কাউন্সিলের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ও রাজপুতানার বর্ত্তমান এ, জি,

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ছাত্রীগণ

জি মান্যবর এল, ডবলিউ রেনল্ডস্ সাহেব ভাস্করশিল্পী শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী মহাশয়কে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনোনীত করেন। তাঁহার ঐকান্তিক উদ্যোগে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় অধিবাসীগণের মনে শিল্পশিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে দেখা যায় এবং এ যাবৎ শিল্পের প্রতি স্থানীয় লোকের মনে যে উদাসীনতা ও অনাদরের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল তাহা সম্প্রতি সম্যকরূপে অপসারিত হইবার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। অধিকন্তু এই বিদ্যালয়ের উন্নতির পরিচয় অবগত হইয়া অধুনা দূরদেশ হইতে আগত ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা লাভ করিতেছে। গত বৎসর আগষ্ট মাসে বড়লাট সাহেব বাহাদুর জয়পুর পরিভ্রমণে আগমন করিলে মিউজিয়ম পরিদর্শনে গিয়া তাহার সংগঠন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। চৌধুরী মহাশয় জয়পুর প্রবাসী বাঙালীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত শিল্পচর্চ্চা করিয়া তাঁহাদের মনে শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মাইতে সক্ষম হন। তাঁহার অভাব স্থানীয় অধিবাসীগণ বিশেষত বাঙালী সম্প্রদায় বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন।

—

বাংলা

বিদ্যাসাগর বাণীভবন—

গত ১৪ই চৈত্র দেশবরেণ্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় নারীশিক্ষাসমিতির পরিচালনাধীন বিদ্যাসাগর বাণীভবন নামে পরিচিত হিন্দু বিধবাশ্রমে পদার্পণ করিয়া আশ্রমবাসীগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবনের রীতি-নীতি ও কার্য্যকলাপের পদ্ধতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং লিখিয়া গিয়াছেন, "এখানে হিন্দুবিধবাগণের শাস্ত্রসম্মত ও শিষ্টসমাজানুমোদিত আচারের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে এবং ঐ সকল আচার-যেমন একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে উপবাস প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বিহিত সন্ধ্যা ও পূজা প্রভৃতি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। এইরূপ সর্ব্বপ্রশংসনীয় এবং একান্ত আবশ্যক প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও উত্তরোত্তর সমুন্নত হয়, তাহার জন্য আমি প্রত্যেক উদারহৃদয় স্বজাতিহিতৈষী হিন্দুমাত্রকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।" তিনি নিজে ইহার সাহায্যার্থ মাসিক ৫ টাকা করিয়া দান করিবেন।

নারীশিক্ষাসমিতির কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়

পণ্ডিতপ্রবরকে সঙ্গে লইয়া আসিলে দ্বারদেশে সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্তা লীলা বসু, শ্রীযুক্তা শেফালিকা শেঠ ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর তাঁহাকে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লেডী বসুর সহিত সমস্ত আশ্রমগৃহ পরিদর্শন করান হয়। তাহার পর তাঁহাকে আসনস্থ করার পর আশ্রমবাসিনীগণ এবং বাণীভবনের কতিপয় ভূতপূর্ব্বা ছাত্রীগণ আসিয়া প্রণাম করেন। বাণীভবনের প্রধানতমা হিতকারিণী শ্রীযুক্তা হরিমতি দত্ত তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলে তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্তা হরিমতির মত হৃদয়বতী আরও নারীর উদ্ভব কামনা করিলেন।

বাণীভবনের ছাত্রীগণের পক্ষ হইতে একটি বালিকা তাঁহাকে মাল্যদান করিবার পর অন্য একটি ছাত্রী তাঁহার লিখিত একটি কবিতা পাঠ করেন। ইহার উত্তরে তর্কভূষণ মহাশয় আশ্রমবাসিনীদিগকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন :—

"মা, তোমরা এই সুন্দর কবিতাটিতে বলিলে যে, তোমাদের জীবন লক্ষ্যহারা, কিন্তু মা আমি তা বিশ্বাস করি না। তোমাদের জীবন লক্ষ্যহারা কিছুতেই নয়, তোমরা জীবনকে গঠন করিবার এবং দশের মধ্যে বিলাইয়া দিবার যে সুযোগ পাইয়াছ, সেই রকম সুযোগ সকলের ঘটে না। তোমাদের জীবন লক্ষ্যহারা কোথায়? তোমরা নিজেদেরকে দুঃখিনী বা ভাগ্যহীনা বলিয়া কখনও মনে করিও না। একদিকে তোমাদের জীবন সাধারণ লোকের জীবন হইতে অন্যরূপ হইলেও, মা, তোমরা ব্যাকুল হইও না। তোমরা একজনকে হারাইয়াছ যদিও, এবং যদিও সেইজন্যই তোমরা সংসারের অবলম্বন হারাইয়াছ মনে করিতেছ, তবুও আমি বলি, মা, তোমরা ধীর হও, এবং স্থিরমনে সমস্ত হিন্দুর সংসারকে তোমাদের আপন সংসারজ্ঞানে সেবা কর, দেশের মধ্যে নানা মঙ্গলকার্য্যে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্য কর। তোমাদের এই ভবন এবং ইহার সুন্দর রীতিনীতি দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমি অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদের জন্য কি করিতে পারি? মা, শুধু প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা আপন চরিত্র রক্ষা করিয়া সুন্দর, সবল চরিত্রের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া দেশের নানা সৎকর্ম্মের মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া দাও। তোমাদিগকে দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে, তোমাদের দ্বারাই দেশের দুর্দ্দশার মোচন হইবে. নানা অশান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত এই দেশে তোমরাই শান্তিবারি বর্ষণ করিবে। যে মহাপুরুষের নামের সহিত এই ভবনের নাম জড়িত তিনি ইহাকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তাই বিশ্বাস করি, এই ভবনের কল্যাণ না হইয়া পারে না। মা, তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে, মন্দিরে গিয়া ফুলচন্দনে ভূষিত করিলেই ঠাকুরের পূজা হয় এবং যে নিত্য তাহা করে সে-ই যথার্থ পূজা করে। কিন্তু আমি বলি মা, ঠাকুরের পূজা শুধু ফুলচন্দনদ্বারা হয় না। যথার্থ পূজা তখনই হয়, যখন জীবদেহে যে নারায়ণ আছেন তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করা হয় এবং জীবের কল্যাণের জন্যই তাহার সেবা করা হয়। দেবতা এই পূজাই যথার্থ পূজা বলিয়া গ্রহণ করেন। এই পূজাই ফুলচন্দনের পূজা অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী; তোমরা এই কথাই মনে রাখিয়া জীবদেহ মাত্রেই ভগবান আছেন বিশ্বাস করিয়া দেহ ও মনের পবিত্রতা কার্য্যকলাপে বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। ইহাই মানুষের পক্ষে শান্তি ও কল্যাণের পথ।

আমি মনে করি, যাঁহারা এই সুপবিত্র কার্য্যের ভার নিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি অতি দীন, অক্ষম ব্রাহ্মণ মাত্র, এই মহৎ কার্য্যে সুচারুরূপে সহায়তা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমাদিগের মত অনাথা অসহায়াদিগের জন্য যে মহাপ্রাণদিগের প্রাণ নিরত কাঁদে, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া এই মহানকার্য্যের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিয়া দেশের কল্যাণ করুন এবং দেশের সকল অনাথা অসহায়াদিগকে এখানে আশ্রয় দিয়া শিক্ষাদানে চরিত্র গঠনের সহায়তা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা দেশে শান্তি ও পবিত্রতা আ য়ন করুন।

সম্পাদিকা মহাশয়াকে আমি আর কি বলিব, তিনি আমাকে যে ভাবে আদেশ করিবেন আমার ক্ষুদ্র শক্তি এই ভবনের উন্নতি-সাধনে আমি নিয়োজিত করিব।"

সভান্তে সভায় উপস্থিত সকলের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

মহাদেবপুর বালিকাবিদ্যালয়—

রাজশাহী জেলায় মহাদেবপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানকার বালিকাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের দর্শকদের মন্তব্য-পুস্তকে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অন্য অনেক স্থানের প্রতিও প্রযোজ্য বলিয়া নীচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

মহাদেবপুরের বালিকাবিদ্যালয়ে
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"মহাদেবপুরের মত ছোট গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। ইহার পুরস্কার বিতরণ সভায় ইহার যে রিপোর্ট শুনিলাম এবং ছাত্রীরা যেরূপ গান ও আবৃত্তি করিল, তাহা সন্তোষজনক মনে হইল। গ্রামের সকল ভদ্রলোক—বিশেষত তাঁহাদের বাড়ীর মহিলারা—বিদ্যালয়টির প্রতি মনোযোগী হইলে ইহার বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। এবং তাঁহাদের মনোযোগী হওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। বাঙালী পুরুষদের মানসিক শক্তিতেই

প্রধানতঃ বাঙালী জাতি যশস্বী হইয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধেক যশ এখনও আমাদের পাওনা আছে। নারীরা শিক্ষিতা হইলে তাহা আমরা পাইব। কিন্তু আমাদের যশের জন্তই আমি নারীদিগকে শিক্ষা দিতে বলিতেছি না। যদি আমরা সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং আনন্দ চাই, তাহা হইলে তাহার জন্ত তাঁহাদের শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।"

নারীরক্ষাশ্রম—

ময়মনসিংহ ভূম্যধিকারী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, বি-এল আমাদিগকে ময়মনসিংহে একটি নারীরক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠার সংবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, "বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অবলা, অসহায়া বহুসংখ্যক রমণী যেরূপ ভীষণভাবে প্রতারিত, অপহৃত, নির্য্যাতিত ও ধর্ষিত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ অবগত হইলে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে এবং যে সমাজ ইহার প্রতিকারে অসমর্থ তাহার প্রতি ধিক্কার জন্মে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, সমাজের পুরুষগণ নারীর মাতৃত্ব ও সতীত্বের এরূপ লাঞ্ছনা ও অপমান নিবারণের জন্ত সমুচিত চেষ্টার পরিবর্ত্তে সেই আত্মরক্ষায় অসমর্থা হতভাগিনীদিগকে আবার সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের গুরুভারে নিষ্পেষিত করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করেন।

হতভাগিনীগণ দুর্ব্বৃত্তদের কবল হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া, পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত জীবন যাপন করিবার ব্যাকুল আগ্রহ লইয়া পিতৃকুল বা পতিকুলের আশ্রয়প্রার্থিনী হইলে, প্রায়ই নৃশংসভাবে বিতাড়িত হইয়া থাকে ; এমন কি ধর্ম্মানুমোদিত স্বাধীন জীবিকা দ্বারা আত্মপোষণ করিবার মানসে সমাজের এক কোণে মাথা গুঁজিবার স্থান চাহিলেও তাহা পায় না। সমাজের এই আত্মপ্রতারণামূলক নৈতিক দৌর্ব্বল্য ও অবিচারের ফলে, হতভাগিনীদের মধ্যে কেহ বা আত্মহত্যা দ্বারা লাঞ্ছনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে, কেহ বা অন্তবিধ কোন সম্প্রদায়বিশেষের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক পুরাতন সমাজকে তীব্র অভিশাপের হলাহলে নির্জ্জীব করিতে থাকে, কেহ বা পেটের দায়ে পাপস্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়।

এই সকল রমণীগণ যাহাতে সমাজে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে সুবিধা পায়, এই উদ্দেশ্যে বিগত বৎসর ভূম্যধিকারী সভার বাৎসরিক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই সব নিগৃহীতা আশ্রয়হীনা রমণীগণের আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে একটি নারীরক্ষাশ্রম এবং তৎ-পরিচালনাবন্দে একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানের জন্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এই কার্য্যের মূল-প্রস্তাবক সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী মহাশয় কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং আরও কতিপয় সদাশয় জমিদার ও ধনী ব্যক্তির প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যের নিমিত্ত, ধর্ম্মের নামে, সমাজের নামে, মাতৃজাতির নামে আমরা ময়মনসিংহ জেলাবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই দ্বারে উপস্থিত হইতেছি। আমরা ভরসা করি, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব-বিবেচনায় সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে অর্থ প্রদান ও সর্ব্ব প্রকার সাহায্যদান করিয়া অনতিবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন।"

ময়মনসিংহের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই কার্য্যের ভার লইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রবাসীতে আমরা বহু বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। যে দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশ-শাসনের এই গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন সে দেশের জনসাধারণকেই উদ্যোগী হইয়া এই সকল কর্ত্তব্যের ভার বহন করিতে হইবে।

সমাজহিত—

বৃত্তিদান - সিলেট এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জানাইয়াছেন যে,—

বিদেশে, অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে যাইয়া শিক্ষার সাহায্যার্থ বর্ত্তমান বর্ষে সিলেট এসোসিয়েশন একটি বৃত্তি প্রদান করিবেন, এবং তজ্জন্য আগামী ১০ই মে পর্য্যন্ত আবেদন গৃহীত হইবে। বিজ্ঞান বা কার্য্যকরী শিল্পবিদ্যা (Scientific or technical education) শিক্ষার্থীর আবেদন অধিকতর আদরণীয় হইবে। বৃত্তির মোট পরিমাণ তিন হাজার পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে না।

আবেদনকারীর বয়স, পিতার নাম, বাসস্থান ; কোন দেশে কোন বিদ্যালয়ে কতদিন শিক্ষালাভ করিতে চান এবং তথায় ভর্ত্তি হইবার অনুমতি পাইয়াছেন কি না ; তথায় মাসিক বার্ষিক ব্যয় কত হইবে এবং আসবাব যাতায়াত প্রভৃতির জন্ত কত ব্যয় হইবে ; সমুদয় ব্যয়ের কি পরিমাণ টাকা নিজ পরিবার হইতে বা অন্ত কি কি উপায়ে সংগ্রহ করিবেন এবং এসোসিয়েশন হইতে কোন সময় কত টাকা চান, ইত্যাদি আবেদনপত্রে লিখিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন কোন বিদ্যালয়ে কি কি শিক্ষালাভ করিয়াছেন উল্লেখ করিয়া, তাহাতে স্বীয় কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিদর্শন দাখিল করিতে হইবে। আবেদনকারীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধেও একখানা সার্টিফিকেট দিতে হইবে। আবেদনকারী বিবাহিত কি অবিবাহিত, অবিবাহিত হইলে শিক্ষা সমাপনের পূর্ব্বে বিবাহ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি না তাহাও লিখিবেন।

সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রকে এসোসিয়েশনের ব্যয়ে ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার টাকার জন্ত জীবনবীমা করিতে হইবে, এবং বৃত্তি ও জীবনবীমা প্রভৃতি বাবদে ব্যয়িত সমুদায় টাকা শিক্ষা সমাপনান্তে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে বিনাসুদে পরিশোধ করিবেন বলিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে। এই দলিল অন্ত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে জামিনস্বরূপ স্বাক্ষর করিতে হইবে, এবং যাঁহারা জামিন হইতে প্রস্তুত আছেন এরূপ দুই তিন ব্যক্তির নাম ধাম ও ব্যবসায় আবেদনপত্রে লিখিতে হইবে।

(জনশক্তি)

অনুন্নত জাতির বালকের বিশেষ বৃত্তি।—পাবনা হিন্দুসভা অনুন্নত হিন্দুবালক শিক্ষার্থীগণের জন্ত বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। আমরা ডিঃ স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের পত্রে অবগত হইয়া সুখী হইলাম যে, গত ১৯২৮ সনের পরীক্ষায় নিম্নলিখিত তিনজন অনুন্নত শ্রেণীর বালক ঐরূপ বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত হলদার টেগ্রি উঃ প্রাঃ স্কুল ২। শ্রীজগবন্ধু মালো রায় দৌলতপুর প্রাঃ স্কুল ৩। শ্রীকালীপদ সরকার ধুলাউরি প্রাঃ স্কুল।

(সুরাজ)

দাতব্য চিকিৎসালয় :—

অমৃতবাজারের স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষা কল্পে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ইতনা পল্লীতে ৺রাসবিহারী বিশ্বাস মহাশয়ের স্মরণার্থ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। (যশোহর)

পাঠাগার স্থাপন—

গত ২০শে ফাল্গুন সোমবার মৌলবীবাজার লোকেল বোর্ড গৃহে কলিকাতার শিশুসাহিত্য প্রকাশক "কুলজা সাহিত্যমন্দিরে"র প্রতিষ্ঠাতা "মাস পয়লা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মাতৃস্মৃতির উদ্দেশ্যে, তাঁহার সাহায্যে "কুলজা স্মৃতি পাঠাগার" নামে একটি সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজার বাঙ্গালা পুস্তক পাঠাগারে সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠাগারে শিশু পাঠ্যপুস্তকের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। এ ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত ভ্রমণ কাহিনী, প্রাণিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গ্রন্থমালা, ধর্ম্মগ্রন্থ বিবিধ-বিষয়ক পুস্তক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

তিনি পাঠাগারে বার্ষিক অন্ততঃ ১০০৲ এবং ২৫ খানা মাসিক পত্রিকা প্রদান করিবেন। তাঁহার এ প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিয়া তুলিবার জন্য স্থানীয় টাউন ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে ৩৫০৲ পাঠাগারে সাহায্য করিয়াছেন।

প্রতি বৎসর ক্ষিতীশ বাবুর মাতার মৃত্যুর তিথিতে পাঠাগারে বার্ষিক উৎসব করিবার জন্য এবং তাহাতে ছাত্রদের কয়টি পুরস্কার দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় ২০৲ করিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

(জনশক্তি)

ডিষ্ট্রিক্‌বোর্ড ও শিক্ষা—

যশোহর জেলা বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ সহরের মমীন বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার টাকা এবং বীরেশ্বর বিদ্যাপীঠ নামক সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ২০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যশোহর জেলা বোর্ড যশোহর মেডিক্যাল স্কুলের সাহায্যকল্পে তিন হাজার টাকা প্রদান করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

(যশোহর)

শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী :—

গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ্চ তারিখে যশোহর তারিখে যশোহর টাউনহলে একটি স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী ও বি, সরকার মেমোরিয়াল হলে শিশুমঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা চার্ট ও চিত্রাদি টাউন হলে রক্ষিত ছিল। শত শত দর্শক শনি ও রবিবারে দর্শন করিয়া নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

(যশোহর)

সমাজহিতকর কার্য্যের জন্য পুরস্কার

বাঁকুড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর শ্রীযুক্ত মহাতাপ চন্দ্র ঘোষ সমাজহিতকর কার্য্যের জন্য একটি বাৎসরিক পুরস্কার প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই পুরস্কার দিবার ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর মার্চ্চ মাসে বাঁকুড়া কলেজ ও বাঁকুড়া জেলাস্থিত স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে যিনি সমাজহিতকর কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন, তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিচারের জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ ও স্কুলসমূহের একজন প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। বাঁকুড়া জেলার যে কোনও স্কুল-কলেজের প্রিন্সিপাল বা হেড মাষ্টার, অথবা অন্য যে কোনও ব্যক্তি এই পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করিয়া যে কোনও ছাত্রের নাম কমিটির নিকট পাঠাইতে পারেন। কমিটি অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে এই পুরস্কার দিবেন।

নারী কায়স্থ সমিতি—

নোয়াখালী জিলার ইতিহাস বিশ্রুত ভুলুয়া সমাজের অন্তর্গত বাবুপুরে একটি কায়স্থ নারী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারী সমাজে "জ্ঞান" "কর্ম্ম" ও "সনাতন ধর্ম্ম" বিস্তার করিবার, নারী জাতির বেদ ও যজ্ঞাধিকার এবং যজ্ঞসূত্র প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্র প্রচার করিবার ব্রত ইঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের পরিবর্ত্তে স্বজাতি সুহৃদগণের উপদেশ ইঁহারা গ্রহণ করিবেন এবং স্বগৃহের যজ্ঞপূজা ও নিত্যদেবসেবা ইঁহারা নিজেরাই সম্পন্ন করিবেন। নারীসমাজে সংস্কৃত-চর্চ্চা ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ, কায়স্থজাতির দশাহাশৌচ ও দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ এবং জাতির স্বার্থরক্ষা ও পালনের যাবতীয় কর্ত্তব্য ইঁহারা প্রচার করিবেন এবং নিজ নিজ সন্তানগণকে ক্ষাত্রধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবেন। শ্রীচারুলতা দেবী এই সমিতির প্রচারিকা, শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী ও শ্রীস্নেহময়ী দেবী এই সমিতির সম্পাদিকা মনোনীতা হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পরিব্রাজকাচার্য্য অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নিকট যজ্ঞসূত্র সহ গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা—

বালিকা কলেজ—বরিশালে বালিকা কলেজ স্থাপন হইতে চলিল। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সহরে বালিকাদিগের জন্য একটি গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলেজ ও দুইটি খৃষ্টানদিগের দ্বারা পরিচালিত কলেজ আছে কিন্তু বালিকাদিগের জন্য একটিও প্রাইভেট কলেজ নাই। উপরন্তু বঙ্গদেশের কোনও জেলায়ও বালিকাদিগের সরকারি বা বেসরকারি কলেজ নাই। বরিশালের জন-সাধারণের চেষ্টায় ৪॥০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বালিকা কলেজ স্থাপনের কথা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট ১॥০ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। সম্প্রতি ২॥০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। (সত্যবাদী)

ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুলে মহিলাদের জন্য একটী কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। সিটিকলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাময়ী স্কুল কমিটীতে দুইটী ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন।

(টাঙ্গাইল হিতৈষী)

শুদ্ধি—

গৌহাটীতে শুদ্ধি আন্দোলন—হিন্দুধর্ম্মের নূতন ধারা পুরাতন-কালের গোঁড়ামী ও কুসংস্কারকে অতিক্রম করিয়া যে সামনেরদিকে চলিয়াছে তাহা গত ১৭ই, মার্চ্চ গৌহাটী কামাখ্যা মন্দিরে সপ্রমাণ হইয়াছে। তথায় ৩টী খাসিয়া বালক ও ১টী বালিকা হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের জীবনের ধারাকে তাহারা ঠিক হিন্দুদের মত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের দিন তথাকার পাণ্ডারা প্রথমে তাহাদিগকে কামাখ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, কিন্তু পণ্ডিত দুর্গেশ্বর গোস্বামী প্রভৃতি হিন্দুমিশনের প্রচারকগণ পাণ্ডাদিগকে কালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার অপকারিতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলে পাণ্ডারা নবদীক্ষিতাদিগকে মন্দিরের সমস্ত স্থানে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। (দেশবার্ত্তা)

"উদ্ভিজ্জ ঘৃত"

ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমার কিছু বক্তব্য আছে—

১ম। লেখক বলিয়াছেন—"আসল ঘি সাধারণতঃ ১৪০ হইতে ১১০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপে প্রস্তুত হয়।" তিনি এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা জানান নাই। আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন ল্যাবোরেটারীতে ভিন্ন ভিন্ন তাপে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি ১১০ হইতে ১১৫ ডিগ্রি তাপে মাখন জ্বাল দিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুপক্ক ঘৃত পাওয়া যায়। তদূর্দ্ধে তাপ বাড়াইলে ক্রমশঃ ঘৃত হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে এবং ১২০° অধিক তাপে ঘৃতের বর্ণ ও গন্ধ উভয়েই বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১৪০°১৫০° ডিগ্রীতে ঘি পুড়িয়া যায়। বাজারে যে ঘি বিক্রয় হয়, উহা সাধারণতঃ কাঁচা পাকের থাকে—কারণ কাঁচা পাকের ঘি ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারী। ব্যবসায়ীরা তাপমান যন্ত্র ব্যবহার না করিলেও ঘৃতের বর্ণ ও গন্ধ হইতে সম্যক বুঝিতে পারে যে, উহা ১১০° ডিগ্রীর অধিক তাপে প্রস্তুত হয় নাই। একটু কাঁচা রাখিলে ব্যবসায় হিসাবে লাভজনক বলিয়া ব্যবসায়ীরা যথাসম্ভব কম তাপে ঘৃত প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে।

২য়। "১২০ ডিগ্রীর অধিক তাপে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায় ইহা বিশেষজ্ঞদের অভিমত"—

উপরে বলা হইয়াছে, ১১০ হইতে ১১৫ ডিগ্রী তাপে ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায় এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শুধু "১২০ ডিগ্রীর অধিক তাপে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়" বলিলেই বিশেষজ্ঞগণের মত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয় না। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, Vitamine A-যুক্ত ঘৃতজাতীয় স্নেহপদার্থকে ২০ হইতে ৪৮ ঘণ্টা কাল উত্তপ্ত রাখিয়া উহার ভিতর দিয়া ক্রমাগত বায়ু অথবা অক্সিজেন গ্যাস সঞ্চালন করিলে তবে Vitamine—A নষ্ট হইয়া যায়, নতুবা শুধু কিছুক্ষণের জন্য গরম করিলে নষ্ট হয় না। এসম্বন্ধে Benjamin Harrowর Vitamines এবং Dr. Plimmerএর Vitamines—What We Should Eat and Why নামক গ্রন্থগুলিতে ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। যতক্ষণ ঘি, আমরা যাহাকে চলিত ভাষায় 'পোড়া ঘি' বলি, সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ উহাতে ভাইটামিন থাকে। পোড়াঘিয়ে প্রস্তুত খাদ্য ভাইটামিনের অভাববশতঃ দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে এবং পাকস্থলীকে অত্যধিকরূপে উত্তেজিত করিয়া অধিক পরিমাণে অম্লরসের নিঃসরণ করায়, ফলে অম্ল উদ্গার উঠিতে থাকে।

৩য়। "উদ্ভিজ্জ তৈলে মানুষের দেহের পক্ষে হিতকর এমন কোনো কোনো পদার্থ আছে যাহা তেলের সহিত হাইড্রোজেন মিশাইবার প্রক্রিয়ায় নষ্ট হইয়া যায়—ইহার প্রমাণ কি?" প্রমাণস্বরূপ বিশেষজ্ঞগণের কয়েকটি মত এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

"Dr Drummond gives the vitamine contents of the following vegetable oils, butter fat being taken as 10

Linseed oil	1 to 2	Hardened linseed oil 0
Palm oil	2 to 4	„ palm oil—0
Peanut oil	2 to 4	„ peanut oil—0
Cottonseed oil	1	„ cottonseed oil—0

Experiments show that some of the vegetable oils do contain vitamin and the process of hardening completely destroys it" (quoted by Benjamin Harrow)

ইংলণ্ডের মেডিকেল রিসার্চ কমিটি ("Report on Vitamines"—published by His Majesty's Stationary Office) বহু গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—Vitamine A is completely destroyed during the hardening of oils by the action of hydrogen, a process now widely employed for the preparation of edible fats". Elsdon বলেন, "the question of the effect of hydrogenation upon any substances present in natural oils and fats which are essential to nutrition is a difficult one. It has been proved that in many cases such substances (or the properties of the oil that are ascribed to them) are entirely destroyed during the process."

লেখক বলিয়াছেন, "হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় অহিতকর উপাদান নষ্ট হয় ও ঘনীভূত তৈল আহার্য্যের উপযোগী হয়।" হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়া কেবল অহিতকর পদার্থগুলিকে বাছিয়া লইয়া নষ্ট করে এবং হিতকর পদার্থগুলিকে নষ্ট করে না, এ কথা কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন নাই।

লেখক বলেন, "কার্লটন এলিসের Hydrogenation of Oils গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞগণের মত উদ্ধৃত করিয়া এলিস দেখাইয়াছেন যে, হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত তৈল দেহের পক্ষে পুষ্টিকর, অনিষ্টকর নহে"—সাধারণতঃ খাদ্যের পক্ষে অব্যবহার্য্য তৈলকে ঘনীভূত করিয়া margarine-এর আকার দিবার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এলিস এ বিষয়ে একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি নিজে কয়েকটি হাইড্রোজেনেশন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া পেটেণ্ট লইয়াছেন এবং এই ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই তাঁহার গ্রন্থে ঘনীভূত তৈলকে খাদ্যের উপযোগী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হাইড্রোজেনেশন প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের নিরপেক্ষ বিচার তাঁহার দ্বারায় সম্ভব হইতে পারে না। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিচার করে না।

ভারতবর্ষে অধুনা-প্রচলিত vegetable product-এর মধ্যে দামী brandগুলি তুলার বীজের তৈল হইতে প্রস্তুত, ইহা আমরা পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছি। অপরাপর brandগুলি আরও নিকৃষ্ট উপাদান হইতে প্রস্তুত। Ellisএর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, Germanyতে ৬,৭৪,০০০ ব্যারেল তুলার বীজের তৈল প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয় এবং ইহার অধিকাংশই ঘনীভূত অবস্থায় খাদ্যরূপে বাজারে চালান হইতেছে।' ইহা ব্যতীত যে সমস্ত জান্তব ও উদ্ভিজ্জ

তৈল কখনও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত না, তাহাও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, এমন কি foot oil, অর্থাৎ গরু, ঘোড়া প্রভৃতির ক্ষুর জলে সিদ্ধ করিয়া যে তৈল পাওয়া যায় তাহাকেও ঘনীভূত করিয়া edible fat বলিয়া বিক্রয় করা হইতেছে।

লেখক পরিশেষে বলিয়াছেন, ঘনীভূত তৈল মাখন হইতেও পুষ্টিকর যেহেতু ইহাতে স্নেহপদার্থের ভাগ বেশী। স্নেহপদার্থই হউক অথবা অন্য কোনো পদার্থই হউক কোনও গতিকে শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেই পুষ্টিসাধন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

রাসায়নিক পণ্ডিতগণ একদিন কৃত্রিম Protein, কৃত্রিম carbo-hydrate, এবং কৃত্রিম fat ও উপযুক্ত পরিমাণে লবণাদি-পদার্থ খাওয়াইয়া দেখিলেন তাহাতে শরীর রক্ষা হইতে পারে না। আজ আবার সেই ভুল আরম্ভ হইয়াছে। কৃত্রিম খাদ্য মৃত পদার্থ। প্রাণহীন পদার্থে শরীর পুষ্ট হয় না। শরীর রক্ষা ও পুষ্টিসাধনের জন্য protein, carbo-hydrate, fat প্রভৃতি যেমন আবশ্যক, ভাইটামিনও সেইরূপ আবশ্যক। ভাইটামিনবিবর্জ্জিত খাদ্য শরীর চাহে না, পরিত্যাজ্য মনে করে। মানুষ ঘি খায় শুদ্ধ স্নেহ-পদার্থের জন্য নহে, ভাইটামিনের জন্যও বটে।

"The fats we eat, whether animal or vegetable are practically alike except for the A Vitamine which they may contain. It matters little whether we eat butter, margarine, dripping lard or olive oil as far as the fat is concerned, but the A Vitamine question must be borne in mind." Plimmars Vitamines—what should we eat and why. Sir W. M. Bayliss তাঁহার Principles of Physiology গ্রন্থে এই কথা আরও সুস্পষ্ট-রূপে বলিয়াছেন। শুধু স্নেহ-পদার্থের জন্য ঘৃত খাওয়া হয় এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাহা হইলে ভাইটামিন বিবর্জ্জিত Stearin খাইলে আরও বেশী পুষ্টিসাধন হইত যেহেতু Stearinএ শতকরা ১০০ ভাগ স্নেহপদার্থ আছে, দামেও খুব সস্তা।

দেশের বড়ই দুর্দ্দিন যে বিদেশী আচার-ব্যবহার, খাদ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনুকরণ করিবার মোহ এখনও কাটে নাই। রিফাইণ্ড চিনি, রিফাইণ্ড ময়দা, condensed milk, vegetable prou:t ইত্যাদি খাদ্যের প্রচলন লোকের তথা জাতির পক্ষে অমঙ্গলজনক। নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবহার-বাহুল্য দেখিয়া বিদেশীরা এখন হইতেই সাবধান হইবার চেষ্টা করিতেছে, প্রতীচ্য মনীষিগণ আমাদের দেশের খাদ্যপ্রণালীকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া নিজ দেশবাসী-দের শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইতেছেন, আর আমরা এমনই হতভাগ্য যে, নিজেদের ভাল অভ্যাসগুলি ত্যাগ করিয়া অপরের পরিত্যক্ত মন্দ অভ্যাসগুলি গ্রহণ করিতেছি।

করপোরেশন ল্যাবরেটারী কলিকাতা — এস্ এন দে, (ডি-পি-এইচ, ডি-টি-এম্)

—

নারীর পদবী সংজ্ঞা

আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের নামের শেষে পদবী লেখার প্রচলন ছিল না। নামের শেষে পদবীর পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণেরা লিখিতেন "দেবী", ব্রাহ্মণেতর সকলে লিখিতেন "দাসী"। ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেবীদের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু অব্রাহ্মণদের মধ্যে "দাসী" শব্দটির অপ্রচলন হইতে লাগিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে সেন-গুপ্তা, দাশ গুপ্তা, ঘোষ, বসু ইত্যাদি লিখিত হইতে লাগিল। অধুনা আবার ব্রাহ্মণদের অনুসরণে সকলেই "দেবী" লিখিতেছেন—যাঁহারা ছিলেন সেন গুপ্তা, দাশ-গুপ্তা, ঘোষ, বসু তাঁহারা তো দেবী লিখিতেছেনই, যাঁহারা "দাসী" ছিলেন তাঁহারাও দেবী হইয়া পড়িতেছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, সকলেরই নির্ব্বিচারে দেবী বলিয়া যাইবার আবশ্যকতাটা কি এবং ইহার সার্থকতাই বা কোথায়। কেবলমাত্র দেবী এবং দাসী শব্দের প্রচলনে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখন স্ত্রীলোকের কোনো প্রকার পদবী-সংজ্ঞার আবশ্যকতা ছিল না। স্ত্রীলোক যখন চিরকালই পুরুষের—পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীন তখন তাহার নামের শেষে পদবীচিহ্নও নিরর্থক। কিন্তু যখন তাঁহারা সেন-গুপ্তা, দা-গুপ্তা, ঘোষ, বসু লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই তাঁহাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধের আকাঙ্ক্ষার পরিচয়ই পাওয়া যায়। এখন আবার পদবী-সংজ্ঞার লোপ করিবার আকাঙ্ক্ষা কেন?—বিশেষতঃ আধুনিক সমান-অধিকার-বাদের দিনে, বর্ত্তমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে।

কথা উঠিবে স্ত্রীলোকদের অতটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? প্রয়োজনীয়তা খুব জরুরি না হইলেও ব্যাপারটা একেবারে নিরর্থকও নয়। আমাদের দেশের যেখানে ভিত্তিভূমি অর্থাৎ গ্রামসমূহে স্ত্রীলোকের নামের প্রচলনও খুব কম—তাহারা সাধারণতঃ যদুর মা, মধুর দিদি, রামের মাসী, শ্যামের পিসি বলিয়াই পরিচিত। নামের ব্যবহার না থাকিলেও নাম সকলেরই একটা থাকে—একটা শোভনতার দিকও তো আছে। সেইরূপ স্ত্রীলোক-দিগকে দেবী বা দাসীরূপে অনির্দ্দিষ্ট না রাখিয়া তাহাদিগকে পদবীসূচক সংজ্ঞা দ্বারা নামের পূর্ণ পরিচয়ের অধিকার দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নামের শেষে পদবী থাকিলে জাতি, বংশ ও পরিবারের অনেকটা নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে নিজ পরিবার ব্যতিরেকে অপর কোনো স্ত্রীলোকের পরিচয় জানিবার কোনো আবশ্যকতা ঘটিত না। এখন পরিবারের বাহিরে ও দেশের নানা প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের পরিচয় ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র যতই প্রসারলাভ করিবে, তাহাদের পূর্ণ পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাও ততই বৃদ্ধি পাইবে। অথচ নামের শেষে পদবী-সংজ্ঞা দ্বারা পূর্ণ পরিচয়ের প্রচলন হইলে তাহাতে সমাজের পক্ষে কোনো হানি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিবাহের সময় স্ত্রীলোকের পদবী একবার পরিবর্ত্তিত হইবার খুবই সম্ভাবনা। কোনো কোনো স্থলে পরিবর্ত্তন নাও হইতে পারে; যেমন সেনের দুহিতা বিবাহের পরে কোনো সেনেরই জায়া হইতে পারেন। তথাপি অধিকাংশ স্থলেই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, এরূপ পরিবর্ত্তন যেমন আমাদের দেশে তেমন সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই হইয়েছে। আমাদের দেশেও চিরকালই হইয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতেও হইবেও। কামিনী সেন—কামিনী রায় হইয়াছেন (কামিনী দবী হন নাই; সরলা দেবী—সরলা দেবী চৌধুরাণী হইয়াছেন ইত্যাদি।

এখন আর এক সমস্যা। পদবীগুলিকে স্ত্রীবাচক করিতে হইলে সেন গুপ্তকে অনায়াসে সেন-গুপ্তা করা যায়, কিন্তু সেনকে সেনা বা সেনানী, ঘোষকে ঘোষা বা ঘোষানী, চক্রবর্ত্তীকে চক্রবর্ত্তিনী, ভট্টাচার্য্যকে ভট্টাচার্য্যা লিখিতে হইবে কি? আমরা বলি ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বাংলাতে স্ত্রীবোধক শব্দ মাত্রকেই স্ত্রীবাচ্য করিবার জরুরী আবশ্যকতা নাই। আমরা সংস্কৃতের অনুযায়ী সুন্দর হইতে সুন্দরী বাংলাতে ব্যবহার করি বটে, তাহা ত সব স্থলে নাই। কিন্তু ভাল হইতে ভালী, মন্দ হইতে মন্দা

এরূপ করিবার দুঃসাহস এপর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই, অতএব স্ত্রীলোকের বেলায়ও নিঃসঙ্কোচে চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, শর্ম্মা, রায়, ঘোষ, বসু, সেন, গুপ্ত (গুপ্তা লিখিবারও আবশ্যকতা নাই) ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতে পারে। স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে শ্রীমতী অথবা শ্রীযুক্তা ত পূর্ব্বেও চলিত এখনও চলিতেছে—তাহাতেই ত স্ত্রী-সংজ্ঞা জ্ঞাপনের পক্ষে যথেষ্ট। বরং সেনজায়া, ঘোষজায়া লিখিলেই অর্থবিভ্রাট ঘটিবার অবকাশ ঘটিবে।

এস্থলে আর একটা সমস্যার কথা উত্থাপন করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিতে হইলে অথবা তাহাদের উল্লেখ করিতে হইলে এমন কোন শব্দ নাই, যদ্দারা তাহাদের নামের রিক্ততার উপরে একটু সম্ভ্রমের আবরণ দেওয়া যাইতে পারে—যেমন পুরুষের পক্ষে "বাবু" শব্দ। পুরুষের বেলায় আমরা যাহাদিগকে বিশেষ সম্ভ্রম দেখান প্রয়োজন মনে না করি, যেমন বয়সে ছোট অথবা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু, তাহাদিগকে শুধু নাম দ্বারা সম্বোধন বা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, যেমন বীরেন, সুরেন ইত্যাদি। কিন্তু বয়সে বড় অথবা অপরিচিত হলে তাহাদিগকে বীরেন বাবু, সুরেনবাবু বলিয়া থাকি। আমাদের মনে হয় স্ত্রীলোকের বেলায় ঠিক অনুরূপ স্থলেই "দেবী" শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যেমন কল্যাণী দেবী, বাণী দেবী, লীলা দেবী ইত্যাদি। এ সব স্থলে দেবী শব্দের বিশিষ্ট কোনো অর্থ নাই, একটা সৌজন্যসূচক সাধারণ সংজ্ঞা মাত্র; এরূপ একটা সাধারণ সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাও এইখানে।

আমরা এস্থলে সাধারণভাবে কয়েকটা কথা উত্থাপন করিলাম মাত্র। এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলে প্রাসঙ্গিকভাবে আরও সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং আরও বিস্তৃতভাবে বিচার-বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা ঘটিতে পারে। এসব বিষয়ে যাহারা চিন্তা করেন তাঁহারা আলোচনায় যোগদান করিলে সুখী হইব।

শ্রীসত্যভূষণ সেন

—

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সম্পদ"

ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটিতে একটি ভুল দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমহাশয়ের ভ্রমক্রমেই ইহা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস।

"জাভাতে ময়মনসিংহ নিবাসী রায় সরোজিনী বর্দ্ধন বাহাদুর ডাক্তারী ব্যবসায় করিয়া যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন্।" এইস্থলে উল্লিখিত সরোজিনী বর্দ্ধন মহাশয়ের জন্মভূমি ময়মনসিংহ নহে। তিনি ত্রিপুরা জিলার বিরামপুর গ্রামবাসী, এবং "উপার্জ্জন করিতেছেন" না হইয়া 'করিয়াছেন' হওয়া বাঞ্ছনীয়—কারণ উক্ত বর্দ্ধন মহাশয় কিছুকাল হইল স্বর্গীয় হইয়াছেন।

আর একটি কথা। বর্দ্ধন মহাশয়ের কর্ম্মস্থল জাভা নহে, সিঙ্গাপুর। সেখানে তাঁহার নিজের বাড়ী আছে এবং তথায় তাঁহার পুত্রগণ এখনও বাস করেন।

শ্রীরাজকুমার রায় চৌধুরী
বিটঘর, ত্রিপুরা

ফাল্গুনের প্রবাসীতে পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধ "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সম্পদ"এ একটি সামান্য ভুল আছে। ৭২৯ পৃষ্ঠায় আছে 'আগ্রার রায় নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর (পাবনা বাসী) রায় রমাপ্রসাদ বাগচী বাহাদুর (রাজসাহী বাসী) ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য্য শ্রীহট্টবাসী...... সম্প্রতি কয়েকবৎসর মধ্যে ইঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে।" কিন্তু রায় রমাপ্রসাদ বাগচী বাহাদুর এখনও সুস্থশরীরে জীবিত ও তিনি রাজসাহীবাসী মোটেই নহেন। ইঁহার নিবাস নদীয়া জেলায় "বাগচী জমশেরপুর" গ্রামে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন মৈত্রেয়

বিগত ফাল্গুনের (১৩৩৫) 'প্রবাসীতে' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ লিখিত—"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সম্পদ"—শীর্ষক নিবন্ধে ব্রহ্মদেশের ও জাভার বাঙ্গালী প্রবাসী সম্বন্ধে (৭৩২—৩৩ পৃষ্ঠা) যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে কিছু কিছু ভ্রম রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। লেখক মহাশয় রেঙ্গুন হাইকোর্টের প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর উপাধি মুখোপাধ্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উপাধি প্রকৃতপক্ষে বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিতেছেন—"ব্রহ্মে বাঙ্গালীর স্থায়ী কীর্ত্তি এ যাবৎ দেখিতেছি না।" স্থায়ী কীর্ত্তি অর্থে কি বুঝিতে হইবে জানি না। তবে বেঙ্গল একাডেমি, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, দুর্গাবাড়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ গেস্‌ট্ হাউস্‌কে—বিশেষ করিয়া শেষোক্ত দুটিকে বাঙ্গালীর স্থায়ী কীর্ত্তি বলিতে আপত্তি দেখি না। রামকৃষ্ণ মিশনের বৃদ্ধ অক্লান্তকর্ম্মী স্বামী শ্যামানন্দের সেবাযত্নে এই অহিন্দুর দেশে—হিন্দুর নামধ্বজাবাহী প্রকাণ্ড হাসপাতালটি বহু দিবসাবধি অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে এবং রেঙ্গুন শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ গেস্‌ট্ হাউস্ নির্ম্মাণ-কল্পে প্রথিতযশা দানশৌণ্ড ৺শশিভূষণ নিয়োগী এককালীন দশ সহস্র টাকা ও এক বড় রাস্তার মোড়ের উপরের প্রায় সওয়া নয় কাঠা ভূমি দান করিয়া নিশ্চয়ই স্থায়ী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা

—

মালয়ে রবীন্দ্রনাথ

চৈত্রের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটা পুরাতন তর্কের পুনরুল্লেখ করিয়া আমার প্রতি কতকগুলি অযথা কটূক্তি করিয়াছেন। মালয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি লইয়া আমি Forward পড়িয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই তাঁহার কটূক্তির বিষয়। কিন্তু—বোধ হয় তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কায়—তিনি আমার নামটি করেন নাই।

এ বিষয়ে সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবার স্বাধীনতা আমার এখন নাই। কাজেই তাঁর বক্তব্য বিষয়টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও মতামত আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। কিন্তু এ কথা আমি স্বীকার করিতেছি যে, টেলিগ্রাফে কবির উক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সুনীতিবাবুর বর্ণিত বিবরণ হইতে ভিন্ন—এবং তন্মূলে আমি যে কথা বলিয়াছিলাম তার সব কথা সঙ্গত হয় নাই। সেজন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

আর একটা কথা। সুনীতিবাবু বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চামড়া বাঁচাইবার জন্য" কিংবা লাটসাহেবের আতিথেয়তার লোভে তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন এই কথা আমি বলিয়াছিলাম।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্রখানি আদ্যোপান্ত যত্ন করিয়া পাঠ করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি বাস্তবিক একথা বলি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা ও তাঁহার আন্তরিকতার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। কিন্তু স্থানকাল হিসাবে তাঁর কথাটা সঙ্গত হয় নাই এবং ইহা হইতে লোকে সহজেই বলিবে যে, তিনি একথা কেবল to save his skin বলিয়াছেন। আমার এই অভিপ্রায় আমি যথাজ্ঞান সরল ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম এবং ইংরেজী ভাষায় আমার অপরিসর জ্ঞান অনুসারে আমার কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সুনীতিবাবুর মত ইংরেজীতে এম-এ আমি নই এবং আমার ভাষাজ্ঞানের ত্রুটি থাকিতে পারে।

বিচার্য্য বিষয়ের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক জীবনের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও তাহা লইয়া সুনীতিবাবু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কটূক্তি করিয়াছেন। তাঁর এ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার উত্তরে কোনও কথা বলিয়া আমি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয়ে আলোচনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু আমার বিবেচনায় এরূপ কটূক্তি সুনীতি বা সুরুচি দুয়ের একটারও পরিচয় দেয় না। ভাষাতত্ত্বে আমার অধিকার নাই, কিন্তু শুনিয়াছি সুনীতিবাবু সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ইতরের ভাষা ও ভাবে তাঁর এতটা দখল হইয়াছে তাহা জানিতাম না।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বীয় ত্রুটী স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় যখন নরেশবাবুর চিঠির প্রতিবাদ প্রকাশ করেন, তখন নরেশবাবু নিজের ভুল দেখেন নাই। Better late than never.

নরেশবাবুর শ্লীলতা-অশ্লীলতা, ভদ্র-ইতর সম্বন্ধে যে রুচি ও ধারণা তাহা আমাদিগের অনেকের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্; সুতরাং তাঁহার চিঠির শেষ বাক্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ দেখি না।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্র ও ছোট গল্পের প্রতিযোগিতা

১৩৩৬ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত সমুদায় ছোট গল্পের মধ্যে যে তিনটি প্রবাসীর পাঠকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাদের লেখকগণকে গুণানুসারে যথাক্রমে দুইশত, দেড়শত ও একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত বর্ষে প্রকাশিত ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলা রীতিতে আধুনিক চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্যও একশত টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। লেখক ও পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্মরণ রাখিবেন। পুরস্কার বিতরণ এই-সকল নিয়মানুযায়ী হইবে।

প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য ছোট গল্প ও চিত্র নির্ব্বাচন প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগ করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সম্পাদক উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করিতে অক্ষম। যে গল্প এক সংখ্যায় সমাপ্ত নয়, অথবা যাহার দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার শব্দের অধিক, তাহা পুরস্কার-প্রতিযোগিতার জন্য গ্রাহ্য হইবে না। একটি কথা বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রবাসীতে প্রকাশিত ছোট গল্পমাত্রের জন্যই তাহাদের লেখকগণ পৃষ্ঠা-প্রতি তিন টাকা হিসাবে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা পাইবেন। এই দক্ষিণার সহিত পুরস্কারের কোন সম্পর্ক নাই। চিত্রকরেরাও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা পাইবেন। পুরস্কার স্বতন্ত্র। প্রবাসীতে প্রকাশিত, পুরস্কারের জন্য গ্রাহ্য সমুদায় গল্প ও চিত্রের মধ্যে কোন্‌গুলি পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত তাহার বিচার প্রবাসীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ করিবেন। আগামী চৈত্র মাসের প্রবাসীতে একটি কুপন থাকিবে। তাহাতে প্রবাসীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ কোন্ তিনটি গল্প ও কোন্ চিত্রটি পুরস্কারের উপযুক্ত, সেইগুলির নাম পর পর গুণানুসারে লিখিয়া ১৩৩৬ সনের ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বে প্রবাসী কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন। প্রত্যেকটি কুপন স্বাক্ষরিত এবং গ্রাহক নম্বর ও ঠিকানা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। অস্বাক্ষরিত ও ২০শে চৈত্রের পরে প্রাপ্ত কুপন ভোট হিসাবে গণনা করা হইবে না। প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগ এই-সকল কুপন পরীক্ষা ও গণনা করিয়া যে তিনটি গল্প ও যে চিত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইবে, তাহাদের লেখক ও চিত্রকরকে পুরস্কার বিতরণ করিবেন। ছোট গল্প প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান ভোটের সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রবাসীর সম্পাদক অথবা তাঁহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও ভোট পরীক্ষা অথবা গণনা করিবার অধিকার থাকিবে না। এই ভোট ব্যতীত পুরস্কার প্রতিযোগিতার আর কোনও বিচার হইবে না। একই লেখক বা চিত্রকর একাধিক গল্প বা চিত্র পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার পাইবেন না। প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে বিজ্ঞাপিত হইবে এবং পুরস্কার সেই মাসেই বিতরণ করা হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

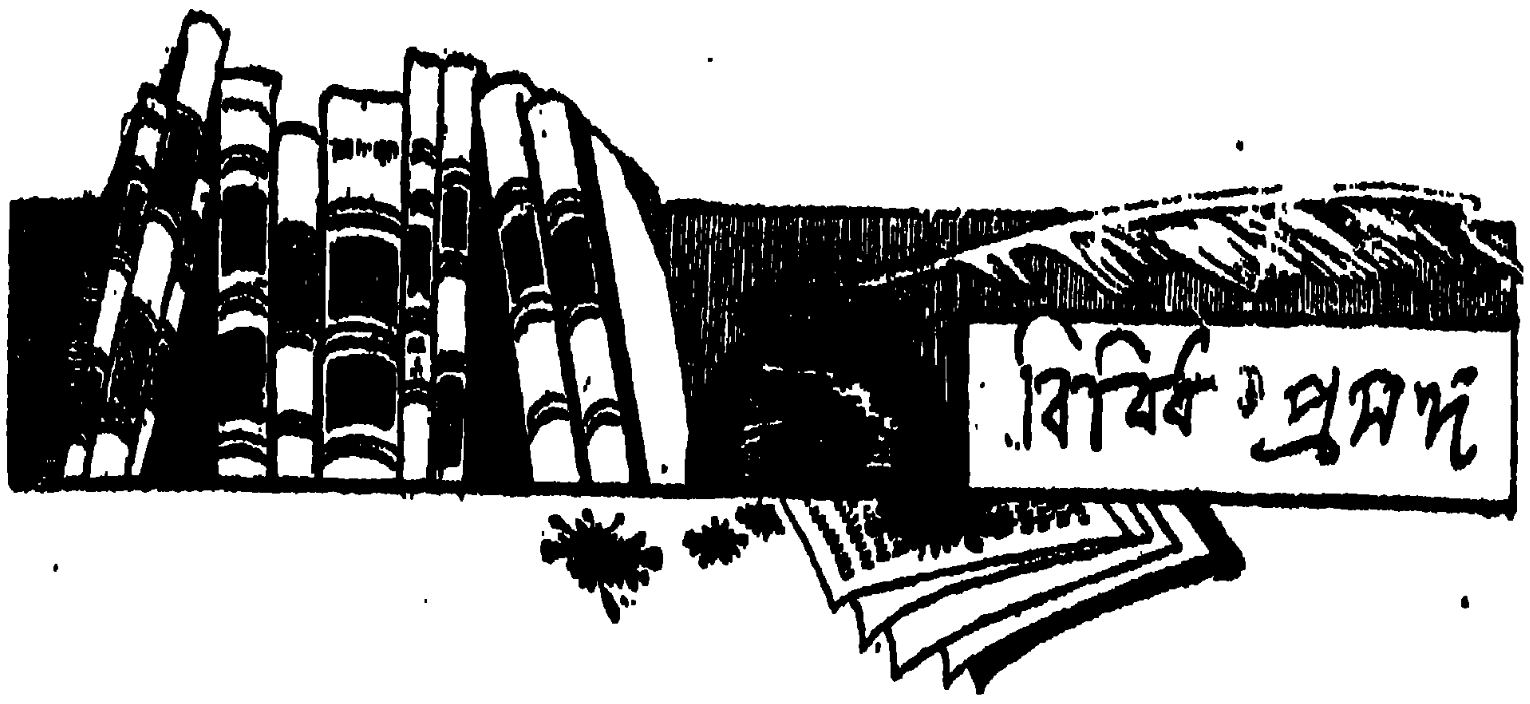

মীরাটে ষড়যন্ত্রের মামলা

মীরাটে বিচারের জন্য ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে যে একত্রিশ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া সেখানে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের অনেকে শ্রমিক সমিতির কর্ম্মী এবং কেহ কেহ যুবক-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট। অতএব, কি অভিযোগে তাহাদের বিচার হইবে, না জানিলে, সহজেই মনে হইতে পারে, যে, গবর্মেণ্ট শ্রমিক ও যুবক-প্রচেষ্টা দমন করিবার জন্য এই মোকদ্দমার আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু সরকার পক্ষের লোকদিগের নিকট হইতে অন্য অভিযোগ শুনা গিয়াছে। গত ২১শে মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে মিঃ ক্রেরার উত্তর দেন, যে, গবর্মেণ্ট যুবক-সংঘসমূহের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতেছেন না, যুবককম্যুনিষ্ট সংঘসমূহের বিরুদ্ধে চালাইতেছেন। কিন্তু ২৩শে মার্চ্চ বিলাতী পার্লেমেণ্টে মিঃ থার্টলের প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব উইণ্টার্টন বলেন, যে, অভিযুক্ত ৩১জনকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ ইহা নহে, যে, তাহারা কম্যুনিষ্ট; কিন্তু তাহারা ইংলণ্ডেশ্বরকে ভারতের রাজসিংহাসন হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিচার হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য গবর্মেণ্ট ব্যারিষ্টার ল্যাংফোর্ড জেমসকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংলিশম্যান কাগজের এক প্রতিনিধিকে তিনি বলিয়াছেন, যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতে কম্যুনিষ্টপ্রচেষ্টা চালাইবার উদ্যোগ করিতেছিল বলিয়াই গবর্মেণ্ট তাহাদের বিচার করাইতেছেন। মিঃ জেমসের মতে কম্যুনিষ্টরা স্বাজাতিকতার (অর্থাৎ ন্যাশন্যালিজ্‌মের) বিরোধী; সুতরাং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ন্যাশন্যালিষ্ট বা স্বাজাতিক থাকিলে তিনি স্বয়ং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য আদালতকে অনুরোধ করিবেন বলিয়াছেন।

মিঃ জেমসের এইরূপ বলা উচিত হয় নাই। তিনি আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, কৌশলপূর্ব্বক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লোকমত গঠন করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত। প্রমাণ না পাইলে আমরা ইহা ধরিয়া লইতে পারি না, যে, সরকার তাঁহাকে মোকদ্দমা চালান ব্যতীত লোকমত-গঠন রূপ অতিরিক্ত কাজটিরও ভার দিয়াছেন। লোকমত-গঠনের কথা কেন তুলিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দলের লোকেরা ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক—তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র স্বশাসক দেশ দেখিতে চান। কেহ বা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান, কেহ কেহ কানাডারমত জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পাইলেও সন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু কেহই ভারতবর্ষকে রুশীয় কম্যুনিষ্ট সাধারণতন্ত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত বা তদ্দ্বারা কবলিত দেখিতে চান না। ল্যাংফোর্ড জেমসের কথায় যদি অনেকে প্রতারিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা মনে করিবেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দেশটাকে রুশিয়ার হাতে তুলিয়া দিতে চায়, অতএব তাহাদের শাস্তি হইলে ক্ষতি নাই, তাহাদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য টাকা দিবার দরকার নাই। কিন্তু তাঁহাদের জন্য টাকা না উঠিলে তাঁহাদের পক্ষে ভাল উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা যাইবে না। লাখখানেক টাকা তুলিতে হইবে। তাঁহাদের জন্য টাকা না উঠিলে তাঁহাদের পক্ষ-সমর্থন ভাল করিয়া হইবে না, সুতরাং তাঁহাদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হইবে। খুব ভাল উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইলেও তাঁহাদের শাস্তি হইতে পারে; কিন্তু শাস্তি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কাহারও নামে মোকদ্দমা

হইলেই তাহাকে অপরাধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। অভিযুক্ত সকল লোককে সকলে চেনেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শ্রমিকদের হিতার্থ বিনাবেতনে অনেক দিন হইতে কাজ করিয়া আসিতেছেন।

মীরাটে মোকদ্দমা হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নানা অসুবিধা হইবে। প্রথম অসুবিধা এই, যে, অভিযোগ খুব গুরুতর, অথচ জুরীর সাহায্যে বিচার হইবে না। দ্বিতীয় অসুবিধা এই, যে, অনেক অভিযুক্তের বাড়ী মীরাটে নহে, এমন কি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশেও নহে। সুতরাং তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে বাসা-ভাড়া আদির জন্য খরচ করিয়া দীর্ঘকাল মীরাটে থাকিতে হইবে। ল্যাংফোর্ড জেমসের সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন উকীল ব্যারিষ্টারও বাহির হইতে বেশী বেশী টাকা দিয়া আনিতে হইবে। অভিযুক্তদের নিজের নিজের সহরে ও প্রদেশে মোকদ্দমা হইলে এইরূপ অতিরিক্ত খরচ হইত না। তাঁহাদের অনেকেরই অবস্থা সাধারণ উকীল নিযুক্ত করিবার মতও নহে। অতএব সর্ব্বসাধারণের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। গবর্মেণ্ট প্রজাদের পয়সা অকাতরে ব্যয় করিয়া বড় বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু অভিযুক্তদের সে ক্ষমতা নাই। ইংরেজীতে ন্যায়বিচারসম্বন্ধীয় এই একটি উক্তি আছে, যে, বরং দশজন অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি না পাওয়া ভাল, কিন্তু নিরপরাধ একজন মানুষেরও শাস্তি হওয়া উচিত নহে। আইনসঙ্গত বিচারের এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া উচিত। অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি মীরাটে এই সুযোগ পাইবেন না। কলিকাতা কিংবা এলাহাবাদে বিচার হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে তাঁহারা ভাল উকীল-ব্যারিষ্টার পাইতে পারিতেন। কোনও প্রেসিডেন্সীর রাজধানীতে বিচার হইলে তাঁহারা জুরীর সাহায্যে বিচারের সুবিধা পাইতেন। বিচারের স্থান মীরাটে নির্দ্ধারিত হওয়ায় তাঁহারা এই-সব সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইহা বলা হইতেছে, যে, তাঁহারা রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে ভারতের রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। তাঁহারা সবাই মীরাটে গিয়া জটলা করিতেন, এমন নয়। যদি তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া থাকেন, নিজ নিজ সহরে থাকিয়া পত্র দ্বারাই করিয়া থাকিবেন; মীরাটের এবং উহার বাহিরের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি হইয়া থাকিবে। অতএব, বিচারের স্থান মীরাটের মত কোন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বাসস্থান কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরেও হইতে পারিত। তাহাতে সকল অভিযুক্তের অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা হইত। এই সুবিধা হইতে কেন তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল, তাহা অনুমান করা যায়, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

ভারতব্যাপী ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইবার ক্ষমতা এবং নিজের অধীনস্থ তদর্থে ক্ষমতাশালী যথেষ্ট-সংখ্যক কর্ম্মচারী মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের নাই। ষড়যন্ত্র আবিষ্কার ও তাহার সমুদয় প্রমাণাদি সংগ্রহ ভারত গবর্মেণ্ট ও প্রাদেশিক নানা গবর্মেণ্টের চেষ্টায় হইয়াছে। ইংলণ্ডস্থ ভারতসচিবকে জানাইয়া ও তাঁহার সম্মতি লইয়া মোকদ্দমা চালান হইতেছে। মীরাটের বাহিরের উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম রাজপুরুষদের সহযোগিতায় যাহা করা হইল এবং যে মোকদ্দমায় বেশী টাকা দিয়া কলিকাতা হইতে ল্যাংফোর্ড জেমসের মত বড় ব্যারিষ্টার লইয়া যাইতে হইল, তাহার বিচারস্থান কেন যে মীরাটের মত জায়গায় নির্দ্ধারিত হইল, তাহার কারণ গবর্মেণ্টের জানান উচিত। কিন্তু গবর্মেণ্টকে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

ভারতব্যাপী ষড়যন্ত্রের একটা মোকদ্দমা ঠিক্ এই সময়ে কেন করা হইল, সে বিষয়ে নানা লোকে নানা অনুমান করিতেছে। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের নূতন সভ্য নির্ব্বাচন শীঘ্রই হইবে। এখন পার্লেমেণ্টে রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য আছে। তাহারা যদি বিলাতের লোককে বুঝাইতে পারে, যে, ভারতবর্ষের অবস্থা বড় বিপজ্জনক এবং তাহারা সেই সঙ্কটে খুব দৃঢ়তা দেখাইতেছে, তাহা হইলে নূতন নির্ব্বাচনে তাহাদের দলেরই লোকদের বেশী সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে। ঠিক্ এই সময়ে ধরপাকড় ও মোকদ্দমা করিবার ইহা একটি কারণ হইতে পারে। অবশ্য ধৃত ব্যক্তিদের

বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ সত্য কি না, সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না এবং সে বিষয়ে কিছু বলাও উচিত নয়। কিন্তু মোকদ্দমার স্থান ও সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

এখন বলশেভিক বিতাড়ন বিল (পাব্লিক সেফ্‌টি-বিল) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে রহিয়াছে। এই মোকদ্দমা এখন উপস্থিত করায় সভ্যদের মনে এই ধারণা জন্মিতে পারে,যে,দেশে সত্যসত্যই কম্যুনিষ্ট বা বলশেভিক-দের চক্রান্ত চলিতেছে। এরূপ ধারণা জন্মান গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায় কিনা, বলা যায় না; কিন্তু তদ্রূপ ধারণা উৎপন্ন হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। আমরা কম্যুনিষ্টদের মতে বিশ্বাস করি না, তাহা সমাজের ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করি। কিন্তু ঐ মত পোষণ ও প্রচার বেআইনী মনে করি না। একই ব্যক্তি কম্যুনিষ্ট ও স্বাজাতিক দুই হইতে পারে। কম্যুনিষ্ট হইলেই স্বাজাতিকতার বিরোধী হইবে,ল্যাংফোর্ড জেমসের এবংবিধ উক্তি সত্য নহে। ইহাও পড়িয়াছি, যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধমতাবলম্বী।

নরহন্তাদিগকেও যখন ন্যায়বিচার পাইবার সকল রকম সুবিধা দিবার নিয়ম আছে, তখন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও যাহাতে তাহা পান তাহার জন্য সর্ব্বসাধারণের অর্থব্যয় ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ যখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জনহিতকর প্রচেষ্টার কর্ম্মী বলিয়া সুপরিচিত।

—

ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা ও পাব্লিক সেফ্‌টি-বিল

যে-সব খবর ও তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ন্মেণ্ট পাব্লিক সেফ্‌টি-বিল বা বলশেভিক বিতাড়ন বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন, মীরাটের ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাতেও প্রমাণস্বরূপে তাহার, সবগুলি না হউক, অনেক অংশ ব্যবহৃত হইবে। যাহা বিচারাধীন, তাহার আলোচনা আইনবিরুদ্ধ, অথচ কোন বিষয়ে আইন করিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ব্যবস্থাপক সভায় হওয়া চাই। এই কারণে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পটেল মহাশয় বলেন, যে, গবর্ন্মেণ্ট, ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা এবং বলশেভিক বিতাড়ন বিলের আলোচনা, দুটিই এক সঙ্গে চালাইতে পারেন না। হয় মোকদ্দমা উঠাইয়া লউন এবং বিলের আলোচনা চলুক, কিংবা মোকদ্দমার বিচার হইয়া গেলে তাহার পর বিলের আলোচনা হইতে পারে। পটেল মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করায় সরকার পক্ষ হইতে মিঃ ক্রেরার তাহাতে আপত্তি করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তাহার পর পটেল মহাশয়ের নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার কথা ছিল। কিন্তু যেদিন তিনি তাহা করিবেন স্থির ছিল, সেদিন ব্যবস্থাপক সভাগৃহে দুটা বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় খুব আতঙ্কের সঞ্চার ও বিশৃঙ্খলা হয় এবং সভার কাজ স্থগিত থাকে।

আমাদের বিবেচনায় পটেল মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত, মোকদ্দমায় বিচারাধীন বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা অবাধে ব্যবস্থাপক সভায় হইতে পারে না; কিন্তু তাহা না হইলে কোন আইন করা উচিত হইবে না।

মোকদ্দমার রায়ের উপর একটা বিষয়ে মতামত স্থিরীকরণ নির্ভর করিতেছে। মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কম্যুনিষ্ট এবং তাহারা রুশিয়ার কম্যুনিষ্টদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অভিযোগ এইরূপ। বর্ত্তমান আইন অনুসারেই যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি হয়, তাহা হইলে পাব্লিক সেফটি বিলকে আইনে পরিণত করিবার কোন প্রয়োজন প্রমাণ করা যাইবে না। শাস্তি হইলে সরকার পক্ষের নূতন আইন করিবার প্রস্তাব অনাবশ্যক জেদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে, যদি শাস্তি না হয়, তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্টের সাড়ম্বর এত আয়োজন এবং এতগুলি লোককে হায়রান-পরেশান করা অনর্থক মনে হইবে। উভয়সঙ্কট।

—

ব্যবস্থাপক সভায় বোমা

ব্যবস্থাপক সভায় যাহারা বোমা ছুড়িয়াছে এবং যাহাদের পরামর্শ অনুসারে উহা ছোড়া হইয়াছে, তাহারা

অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছে, অধিকন্তু বেকুবীও করিয়াছে। কারণ, এই অপকর্ম্মের দ্বারা তাহাদের বা দেশের কোন লাভ হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। কোন লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও অবশ্য এরূপ কাজ করা উচিত হইত না।

একটা জিনিষ বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, যে, যখনই গবর্মেণ্ট দমনার্থ কোন আইন করিতে বা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে চান, তখনই বোমা নিক্ষেপ, অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার, বিপ্লবোত্তেজক পুস্তিকা ও পত্রীর প্রচার ও আবিষ্কার, প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহার দ্বারা গবর্মেণ্ট সর্ব্বসাধারণকে ইহা দেখাইতে সমর্থ হন, যে, অশান্তির কারণ বিদ্যমান, সুতরাং উপায় অবলম্বনও আবশ্যক। অতএব ইহা অনুমিত হইতে পারে, যে, নিয়তি বা আকস্মিকতা নাম্নী দেবতা গবর্মেণ্টের পক্ষে, এবং যে-সব বিপ্লবপ্রয়াসী লোক পূর্ব্বোক্তরূপে যথাসময়ে পরোক্ষভাবে সরকার পক্ষকে প্রমাণ যোগায়, তাহারা সরকারী বেতন বা মজুরী বা বক্শিশ্ না পাইয়াও, অনভিপ্রেতভাবে সরকার বাহাদুরের সাহায্যই করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের নিঃস্বার্থ নিষ্কাম নির্লোভ অনভিপ্রেত সরকার-ভক্তি ও বেকুবীর তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

—

রাজপালের হত্যা

অনেক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজপাল নামক লাহোরের একজন আর্য্যসমাজীর নামে "রঙ্গিলা রসুল" নামক পুস্তক লিখিবার ও প্রকাশ করিবার অপরাধে মোকদ্দমা হয়। মোকদ্দমায় প্রথমে তাঁহার শাস্তি হয়, কিন্তু পরে হাইকোর্টে আপীল করায় তিনি অব্যাহতি পান। তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, আপীলের বিচারক হাইকোর্টের জজ দলীপ সিংহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন হয়, এবং অনেকে বলেন, আদালতে ন্যায়বিচার ও শাস্তি না হইলে অপরাধীকে মুসলমান সম্প্রদায়েরই শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ আন্দোলন ও উক্তিতে কোন কোন লোকের মাথা গরম হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু রাজপালের হত্যা এই প্রকার হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার ফলে হইয়াছে, এরূপ ধারণা জন্মাইলে, তাহা ঠিক হইবে না। রাজপালের বিচার ও নিষ্কৃতি অনেক মাস পূর্ব্বে হইয়াছিল। "রঙ্গিলা রসুল" পুস্তকের ও তাহার লেখকের এবং বিচারপতি দলীপ সিংহের বিরুদ্ধে আন্দোলনও অতীত ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। এতদিন পরে লেখকের হত্যা যে করিয়াছে, সে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম করে নাই, দীর্ঘকাল ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিয়াছে—সে বিবেচনা করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছিল। যদি এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে কোন ষড়যন্ত্র থাকে এবং ইহা যদি কোন দলের কাজ হয়, তাহা হইলে সেই দলের লোকেরাও বিবেচনা করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছিল।

এইরূপ হত্যা প্রথম নহে, অনেক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত লেখরাম নামক একজন আর্য্যসমাজী প্রচারক এক মুসলমানের দ্বারা নিহত হন। তখন মুসলমান নেতারা এই হত্যার নিন্দা করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না, এখন আমাদের মনে পড়িতেছে না। কিন্তু যখন রোগশয্যায় শয়ান বৃদ্ধ শ্রদ্ধানন্দ স্বামীকে একজন মুসলমান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করে, তখন অনেক মুসলমান নেতা সেই দুষ্কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও হন্তাকে 'গাজী' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল, এবং "গাজী আবদুর রশীদ" নাম আমরা মুসলমান সংবাদপত্রে মুদ্রিত দেখিয়াছি। তাহার ফাঁসীর পর দিল্লীতে হাজার হাজার মুসলমান তাহার শব পুলিসের বাধা সত্ত্বেও ছিনাইয়া লইয়া ঘটার সহিত শোভাযাত্রা করিয়া গোর দিয়াছিল।

অল্পসংখ্যক নেতার দ্বারা ঘোষিত নিন্দা অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ণিত নানা ব্যাপার দ্বারা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক মুসলমানের মনের ভাব বুঝা যায়। এই মনের ভাবের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পরিবর্ত্তন হইলে মুসলমানদের হিত হইবে, মানবসমাজের হিত হইবে।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে প্রবল খৃষ্টিয়ান দলের সহিত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দলের মতের পার্থক্য থাকিলে শেষোক্ত দলের লোকদিগকে পুড়াইয়া মারিবার, তেলে ভাজিবার এবং অন্যান্য পৈশাচিক ব্যবস্থা করিবার রীতি ছিল। এই প্রকারে হাজার হাজার লোকের প্রাণ গিয়াছে।

এখন সে রীতি নাই। গোঁড়া খৃষ্টিয়ানেরাও বুঝিয়াছে, যে, মানুষের প্রাণ বধ করিয়া ধর্ম্মমতবিশেষের অভ্রান্ততা প্রমাণ করা যায় না। মতভেদ হইলে তর্কবিতর্ক, জ্ঞানদান, শিক্ষাদান প্রভৃতিই লোককে নিজের মতে আনিবার প্রকৃষ্ট উপায়। মুসলমানেরা যদি লোককে বিশ্বাস করাইতে চান, যে, তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ অভ্রান্ত বা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নিখুঁত মানুষ, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জ্ঞানের ও বুদ্ধির অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, ছোরা তলোয়ার পিস্তলাদি দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। খৃষ্টিয়ানেরা ইহা বুঝিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতির কুৎসা করিলেও তাঁহারা নিন্দকের প্রাণদণ্ড বা লঘুতর কোন দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করেন না।

অবশ্য কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ধর্ম্মোপদেষ্টা বা অন্য কোন লোকেরই দোষোদ্ঘাটন লঘুচিত্ততার সহিত করা উচিত নয়। যদি দোষ ত্রুটি দেখান একান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহা ধীরভাবে গম্ভীর ও সংযত ভাষায় করাই ভাল।

কথায় বলে, মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিঃ। সচরাচর ইহার মানে এইরূপ করা হয়, যে, যে-ব্যক্তি বুদ্ধিহীন ও অবুঝ তাহাকে বুঝাইবার একমাত্র উপায় লাঠিপ্রয়োগ। ইহার আরও একটা মানে এই হইতে পারে, যে, মূর্খেরা লাঠিকেই একমাত্র যুক্তি মনে করে, এবং কথায় কথায় লাঠি চালাইয়া থাকে। কিন্তু কোন অর্থেই লাঠিকে বা জড়পদার্থ-নির্ম্মিত অন্য কোন অস্ত্রকে ভ্রম এবং চিত্তবিকারাদির ঔষধ মনে করা যাইতে পারে না।

নিজের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন লোক নিহত হইলে, উত্তেজনা সহজেই হয়। কিন্তু উত্তেজনাবশে প্রতিহিংসা করা প্রাজ্ঞের কর্ম্ম নহে। এইজন্য সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা ও অনুলোকদিগকে ধীর ও শান্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

—

গবর্ণ্মেণ্টের পরাজয়

প্রতিবৎসর ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে গবর্ণ্মেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং গবর্ণ্মেণ্ট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ঘোষণা ও উল্লাসপ্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাক্যে এবং খবরের কাগজে যাহাই হউক, কর্ম্মকালে সরকার বাহাদুর নিজের মৎলব অনুসারেই কাজ করিয়া থাকেন। সুতরাং সরকার বাহাদুরকে প্রজাদের মত অনুসারে কাজ করান যদি বেসরকারী সভ্যদের পরিশ্রম ও কালক্ষয়ের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না বলিতে হইবে। আর এক উদ্দেশ্য হইতে পারে, ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ও পৃথিবীর লোককে দেখান ও বুঝান, যে, ন্যায় ও যুক্তি আমাদের দিকে কিন্তু তথাপি ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্ট আমাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় লোকদিগকে ইহা দেখান ও বুঝান অনাবশ্যক—অন্ততঃ এখন আর ইহার আবশ্যকতা নাই—তাহারা ইহা জানে। পৃথিবীর অন্য দেশের লোকদের কাছে মোটের উপর ইংরেজদের প্রেরিত খবরই পৌঁছে, আমরা যাহা জানাইতে চাই তাহার অতি সামান্য অংশই পৌঁছে। অতএব ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের পরিশ্রম ও কালক্ষয় বেশীর ভাগ বৃথা বলিয়াই মনে হয়।

—

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার নিয়মাবলী ও উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের সুবিদিত হওয়া দরকার, কিন্তু তাহা করিবার সম্যক্ চেষ্টা হয় নাই। মহাসভা "হিন্দু" শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করেন, তাহাও অনেকের জানা নাই। হিন্দু মহাসভার নিয়মাবলীতে উহার সংজ্ঞা হিন্দীতে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে।—

"কোঈ ভী ব্যক্তি জো ভারত মেঁ প্রকট হুএ কিসী ধর্ম্ম কো মানতা হো, বহ হিন্দূ হ্যায়। ঔর ইস্ শব্দ মে সনাতনধর্ম্মী, আর্য্যসমাজী, জৈনী শিখ, বৌদ্ধ ঔর ব্রাহ্ম আদি সব সম্মিলিত হ্যায়।"

"যে-কোন ব্যক্তি ভারতে উদ্ভূত কোনও ধর্ম্ম মানেন, তিনি হিন্দু। সনাতনধর্ম্মী, আর্য্যসমাজী, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ও ব্রাহ্ম আদি সকলে হিন্দুপদবাচ্য।"

অবশ্য এই-সব সম্প্রদায়ের যে-কোন ব্যক্তির এই সংজ্ঞা না মানিবার ও আপনাকে হিন্দু মনে না করিবার সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা আছে, এবং অনেকে তদ্রূপ স্বাধীনভাবে চলিয়াও থাকেন।

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য নীচে বাংলায় অনুবাদ করিয়া লিখিত হইল।

"(ক) হিন্দু সমাজের সব অবয়বের মধ্যে একতা বাড়ান এবং তাহাদিগকে একই শরীরের অঙ্গ মানিয়া পরস্পর সংগঠিত করা।

(খ) ভারতে হিন্দু ও অন্যধর্মাবলম্বী সমাজের মধ্যে সদ্ভাব উৎপন্ন করা, এবং স্বশাসক এক সম্মিলিত ভারতীয় রাষ্ট্র প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদের সহিত মিত্রভাবে চলা।

(গ) তথাকথিত নীচজাতিদের অবস্থার সংশোধন ও উন্নতি করা।

(ঘ) হিন্দুদের হিত ও অধিকার, যেখানে ও যখন আবশ্যক, রক্ষা ও উন্নতি করা।

(চ) হিন্দুজাতির সংখ্যা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা।

(ছ) হিন্দুজাতির নারীসমাজের অবস্থার উন্নতি করা।

(জ) গোবংশের রক্ষা ও উন্নতি করা।

(ঝ) সমগ্র সমাজের ধর্ম্ম, সদাচার, শিক্ষা এবং সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক হিত ও অধিকারের উন্নতি করিবার জন্য প্রযত্ন করা।

লক্ষিতব্য। মহাসভা হিন্দুদের কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বা পন্থের, কিম্বা কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতিত্ব বা বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, এবং কাহারও ব্যক্তিগত মতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

হিন্দু মহাসভার এপর্য্যন্ত বারটি বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। কংগ্রেসের ও অনেক সভার বয়স ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহাদের সমুদয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ এখনও হয় না। হিন্দু মহাসভার অবস্থাও কতকটা সেইরূপ।

—

উত্তরপশ্চিম সীমান্তে শাসনসংস্কার

হিন্দু মহাসভা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভা আদি শাসন-সংস্কারে আপত্তি করিয়াছে, ইহা তাহার একটা অপরাধ। এই আপত্তির অনেক কারণ আছে। কিন্তু অন্য নানা যুক্তির অবতারণা না করিয়া কেবল একটা কথা বলি। এই তথাকথিত প্রদেশটির লোকসংখ্যা ২২,৫১,৩৪০—আমাদের অনেক জেলার চেয়েও কম। ১৯০১ সালে পঞ্জাব হইতে কয়েকটি জেলা পৃথক্ করিয়া লইয়া এই প্রদেশ গঠিত হয়। তখন লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, অতিরিক্ত খরচ বার্ষিক ৩,৫৮,৫০৭ মাত্র হইবে, কিন্তু তাহার পর প্রথম বৎসরেই, ১৯০২-০৩ সালেই, ঘাটতি পড়ে ৩৮ লক্ষ টাকা। তাহার পর কোন কোন বৎসরে কত লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে দেখাইতেছি।—

বৎসর	ব্যয়	আয়	ঘাটতি
১৯০২-০৩	৭৪	৩৬	৩৮
১৯১৮-১৯	১৩৮	৫৭	৮১
১৯১৯-২০	১৬৮	৬১	১০৭
১৯২০-২১	১৮২	৫৬	১২৬
১৯২১-২২	১৯৫	৫৫	১৪০
১৯২৪-২৫	২১০'৮	৭৭'২	১৩৩'৬
১৯২৬-২৭	২৮৫'৩	৮৬'২	১৯৯'১

ঘাটতি ক্রমশ বাড়িয়াই চলিতেছে। ১৯২৬-২৭ সালে উহা প্রায় দুইকোটি টাকা হইয়াছিল। এখন সম্ভবতঃ আরও বেশী হইয়াছে।

কোন কোন রাজনৈতিক লেখক বলিতেছেন, তবে কি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকদিগকে নিজ শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারণের অধিকার (রাইট্ অব্ সেল্ফ-ডিটার্মি-নেশন্) দেওয়া হইবে না? তাহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিব আমরা, ইহা কোন্ শাস্ত্রে বা যুক্তিতে বলে? উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা আদি হইলে ঘাটতি বার্ষিক দুই কোটি টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। বাংলা দেশ হইতে আদায়ী ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা সরকার বাহাদুর অন্যত্র খরচ করিতে-ছেন। আমাদিগকে ম্যালেরিয়া আদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথোচিত ব্যয় হইতেছে না, প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার কথা হইয়াছে।

অথচ উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা যাহাতে আরও অধিক ব্যয়ে ব্যবস্থাপক সভা আদি পায় এবং তাহার দ্বারা পরের ধনে (প্রধানতঃ বাংলা দেশের ধনে) পোদ্দারী করিতে পারে, সেরূপ প্রস্তাবে মত না দিলেই তাহা হইল সাম্প্রদায়িকতা!

এই আর্থিক যুক্তি আমরা অনেকবার বাংলায় ও ইংরেজীতে ছাপিয়াছি। কংগ্রেস পক্ষ হইতে কেহ উত্তর দেন নাই।

—

সুরাটে সমগ্রভারতীয় হিন্দু মহাসভার কার্য্য

রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা ও কোলাহলে অন্য সকল প্রকার চেষ্টা ও প্রস্তাব চাপা পড়িয়া যায়। হিন্দু মহাসভা সুরাটের অধিবেশনে যাহা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক অল্প প্রস্তাবেরই ছিল। অথচ খবরের কাগজের আলোচনা হইতে এই ধারণাই লোকের জন্মিতে পারে, যে, ঐ অধিবেশনের নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ছাড়া আর সব কাজই তুচ্ছ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। ঐ অধিবেশনে উনিশটি মূল প্রস্তাব বিবেচিত ও গৃহীত হইয়াছিল। অনেকগুলি প্রস্তাব নানা অংশে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ প্রস্তাবের উল্লেখ করিতেছি।—

প্রথম প্রস্তাব—লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন। (ক) পুলিশের যেরূপ বেআইনী আক্রমণের ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ ও নিন্দা; (খ) পঞ্জাব গবন্মেণ্ট ও ভারত গবন্মেণ্ট লাহোরে পুলিশের উক্তরূপ অত্যাচার সম্বন্ধে স্বাধীন অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় তাহার নিন্দা; এবং পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার যে-সকল বেসরকারী নির্ব্বাচিত সভ্যের সাহায্যে পঞ্জাবের আমলাতন্ত্র অনুসন্ধানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জনসাধারণের বিশ্বাসের অযোগ্য এই মত প্রকাশ; (গ) লালা লাজপৎ রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ হিন্দুসমাজসেবক নামক একটি কর্ম্মী-সংঘ স্থাপনের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে অর্থসংগ্রহ প্রস্তাবের অনুমোদন। দ্বিতীয়—যখন নিরস্ত্রভাবে গোধ্রার শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম লাল শাহ মুসলমান জনতাকে শান্তি রক্ষা করিতে ও অপরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছিলেন তখন তাহাদের দ্বারা তাঁহার হত্যায় ঘৃণাপ্রকাশ ও নিন্দা করা, তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ, এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ হিন্দুসমাজকে অনুরোধ। তৃতীয়—(ক) হিন্দু সংগঠন রূপ পবিত্র কার্য্য এবং প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে হিন্দু সভাস্থাপন করিয়া মহাসভার উদ্দেশ্য সাধন করিতে সকল হিন্দুকে অনুরোধ; (খ) যে-সকল স্থানে হিন্দু সভা নাই তথায় তাহা স্থাপনার্থ অনুরোধ। চতুর্থ—হিন্দু মহাসভা সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশেচ্ছুদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সকল প্রকার সুবিধা দিতে অনুরোধ; নবদীক্ষিত হিন্দুরা পূর্ব্বে কোন জাতির অন্তর্গত থাকিলে সেই জাতির সকল অধিকার ও সুবিধাভোগ করিবার সুযোগ তাঁহাদিগকে দিতে অনুরোধ। পঞ্চম—(ক) সর্ব্বসাধারণের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, সাধারণ কূপ ও অন্য জলাশয় আদি হইতে জল লওয়া, সাধারণ সভায় অন্য সকলের সহিত উপবেশন এবং সাধারণ পথ দিয়া গমনাগমন বিষয়ে তথা-কথিত অস্পৃশ্য জাতিদের অন্য সকলের সমান অধিকার ঘোষণা, এবং এই-সকল বিষয়ে যেখানে যেখানে বাধা আছে তাহা দূর করিতে হিন্দু সাধারণকে অনুরোধ; (খ) দেবদর্শনে অস্পৃশ্যদের সম্পূর্ণ অধিকার ঘোষণা; (গ) পুরোহিত, নাপিত ও রজক-দিগকে অস্পৃশ্য জাতিদের কাজ করিতে অনুরোধ; (ঘ) **"এই মহাসভা এই মত প্রকাশ করিতেছেন, যে, জাতিনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমান**; (ঙ) গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক তথাকথিত অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতিনিধি নিয়োগ দেশের পক্ষে অনিষ্টকর, ঐসব শ্রেণী হইতে উপযুক্ত সভ্য-পদপ্রার্থী খাড়া করিয়া তাহাদিগের নির্ব্বাচনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ষষ্ঠ—(ক) আখাড়া ব্যায়ামশালা দেশী খেলা সাময়িক শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য হিন্দুদিগকে অনুরোধ; (খ) হিন্দু যুবকসংঘ স্থাপনের অনুরোধ। সপ্তম—নেহরু রিপোর্টের মুসলমান দাবী সম্বন্ধীয় অংশ বিষয়ে প্রস্তাব।

অষ্টম—রাজপথ দিয়া সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রার অধিকার স্বাভাবিক ও জন্মগত, এবং তাহা প্রিভিকৌন্সিলে পর্য্যন্ত সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া তাহা রক্ষার্থ হিন্দুদিগকে দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতে অনুরোধ। নবম—ভরতপুর রাজ্যে সনাতনী হিন্দুদের দ্বারা জৈনদের রথোৎসবে বাধা দানের নিন্দা এবং উভয় পক্ষে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টার অনুরোধ। দশম—ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রী, তাঁতি, দরজী, মুচি, মণিহার প্রভৃতির কাজে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসে দুঃখ প্রকাশ; এই সমস্ত কাজই সম্মানকর এবং সমাজ-রক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া ঘোষণা ও হিন্দুদিগকে ঐসব বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনুরোধ; এই-সব বৃত্তি অবলম্বী হিন্দুদের নির্ম্মিত সামগ্রীর বাজার প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপনের অনুরোধ। একাদশ—(ক) বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী আদি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর প্রতি এবং অন্য যাঁহারা ভারত-বর্ষের আধ্যাত্মিক প্রভাবে উন্নত তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি জ্ঞাপন; (খ) ভারতবর্ষের সহিত শ্যাম, কাম্বোডিয়া, জাভা, বালী, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের অনুরোধ। দ্বাদশ—বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন এবং স্বদেশী বস্ত্র (বিশেষতঃ খদ্দর) ব্যবহারের অনুরোধ। ত্রয়োদশ—ব্যবস্থাপক সভাসমূহের আগামী সভ্য নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে বিহিত কার্য্য করিবার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পণ। চতুর্দ্দশ—আফগানিস্থানে বিপন্ন হিন্দুদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ ও তাহাদিগকে ভারতবর্ষে আসিবার সুবিধা দিবার নিমিত্ত গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ। পঞ্চদশ—পুলিশ ও সৈনিক বিভাগে উপযুক্তসংখ্যক যোগ্য হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ। ষোড়শ—হিন্দু বিধবা, হিন্দু অনাথ বালক-বালিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের সমুদয় প্রস্তাবের অনুমোদন। সপ্তদশ—শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাবরকর মহাশয়কে সম্পূর্ণ রাজকীয় বন্ধন মুক্ত করিবার অনুরোধ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সে রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে কাজ হইলে দেশের উপকার হইবে। সামাজিক বিষয়ে যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা খুব দরকারী। হিন্দুসমাজে যেরূপ জাতিভেদ প্রচলিত আছে, উহা তাহার বিরুদ্ধে।

সভা করিয়া প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিবার রীতিটি আমরা ইংরেজদের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছি। সভাতে যাহা ধার্য্য হয়, ইংরেজীতে তাহাকে রেজলুশ্যন বলে। ঐ ইংরেজী কথাটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ প্রতিজ্ঞা। উহার বাংলা আমরা প্রস্তাব না করিয়া যদি "প্রতিজ্ঞা" চালাইতাম, তাহা হইলে অনেক স্থলে তাহা অধিক উপযোগী হইত। কিন্তু "প্রস্তাব" শব্দ ব্যবহার করিলেও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, সভায় যাহা স্থির হয়, তাহা সভার সভ্যদের প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা পালন করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অনেক প্রস্তাব আছে, যাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, গবর্ন্মেণ্টের আছে। কিন্তু সামাজিক অনেক প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে আমরা নিজেই পারি, যদি আমরা লোকনিন্দা ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকি ও সমর্থ হই। জাতিভেদের অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা প্রভৃতি দোষ অনেকেই বুঝেন ও বলেন, এবং কলিকাতার মত বড় সহরে ও রেলে ষ্টীমারে অনেকেই অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা মানেন না। কিন্তু নিজ নিজ গ্রামে দৈনিক জীবনে তাঁহারা ঘোরতর দেশাচার ও লোকাচারের ভক্ত সাজিয়া বসেন। এইরূপ কপট আচরণ নিন্দনীয়। হিন্দুনামধারী প্রত্যেক লোকের সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নতুবা হিন্দু সমাজের ক্ষয় চলিতেই থাকিবে। কেবল এই ক্ষয় নিবারণের জন্যই যে সকল জাতির সামাজিক সম্মান বাঞ্ছনীয়, তাহা নহে! মানুষ বলিয়া সকল মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান হওয়া উচিত।

সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

খবরের কাগজে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, ইচ্ছা-পূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ না দিলেও তাহাতে ভুল থাকিতে পারে। সম্পাদকীয় কর্ম্মীদের এবং সংবাদ-প্রেরকদের ব্যক্তিগত বদ্ধমূল ধারণা ও অনুরূপ সংস্কারবশতঃ কখন কখন ভ্রম আসিয়া পড়ে। সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের বৃত্তান্তেও সেইরূপ কিছু ভুল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার দুএকটির উল্লেখ করিব।

সভাতে কত লোক উপস্থিত হইত, তাহা হঠাৎ বলা যায় না। তাহাদের সংখ্যা কেহ গণনা করে নাই, অন্য কোন সভাতেও কেহ গণনা করে না; আন্দাজ একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয়। সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে দর্শকের টিকিট ছয় হাজারের অধিক বিক্রী হইয়াছিল বলিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামনরাও মুকদমের মুখে শুনিয়াছি। তদ্ভিন্ন বিস্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য প্রতিনিধি প্রভৃতিও উপস্থিত থাকিতেন।

অনেক কাগজেই এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যে, সুরাটে নেহরু কমিটির রিপোর্ট অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ইহা নিতান্তই আংশিক সত্য মাত্র। মহাসভা নেহরু কমিটির সমগ্র রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই বা প্রস্তাব ধার্য্য করেন নাই। কেবলমাত্র রিপোর্টের যে-যে অংশে, জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদিগের সহযোগিতা লাভের জন্য তাহাদের কোন কোন বিশেষ দাবী গ্রাহ্য করা হইয়াছিল, সেই-সব অংশসম্বন্ধে প্রস্তাব ধার্য্য করা হইয়াছিল। কোন কোন কাগজে লেখা হইয়াছে, যে, হিন্দু মহাসভা পূর্ব্বে নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া এখন পিছাইয়া যাইতেছেন। ইহাও ঠিক নয়। নেহরু রিপোর্ট বাহির হইবার পর ইতিপূর্ব্বে হিন্দু মহাসভার কোন অধিবেশন হয় নাই, সুতরাং হিন্দু মহাসভার কোন অধিবেশনে তাহা আলোচিত ও গৃহীত হয় নাই। যাঁহারা হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি বলিয়া উক্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন কোন সময়ে কোথাও কোথাও মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিল, তৎসম্বন্ধে আমি সুরাটে হিন্দু মহাসভার সভ্য ও কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। সুতরাং আমার বিশ্বাস এই, যে, হিন্দু মহাসভা একবার নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া পরে তাহা বদলাইয়াছেন, ইহা অমূলক অপবাদ।

শ্রীযুক্ত বামনরাও মুকদমে

নেহরু রিপোর্টের যে অংশ সম্বন্ধে সুরাটে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা সম্বন্ধে কাগজে দুরকম খবর দেখিয়াছি। কোন কোন কাগজে লেখা হইয়াছে, যে, উভয় দলের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল, কিন্তু আমি প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছে বলায় তাহা গৃহীত হয়। বস্তুতঃ ঘটনা এই, যে, উভয়-পক্ষের প্রথমবার হস্ত উত্তোলনের পর বিরুদ্ধবাদীরা দুই দলের সংখ্যা গণনা করিতে বলেন। তখন আমি আর একবার হাত তুলিতে বলি। সেবারে স্পষ্ট বুঝা গেল, সমর্থকদের সংখ্যাই বেশী। তাহার পর সংখ্যা গণনা সম্বন্ধে কেহ জেদ করেন নাই।

একদিন বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটিতে খুব গোলমাল হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন কাগজে খবর বাহির হইয়াছিল। সব কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হিন্দীতে

হইতেছে না বলিয়া একজন সন্ন্যাসী-গোছের লোক উত্তেজনা প্রকাশ করেন। তাঁহাকে ঠাণ্ডা করা হয়। দুজন স্বরাজী দলের লোক বাগবিতণ্ডা দ্বারা সভাপতিকে কাবু করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই, কেহ কাহাকেও ট্রেটার (বিশ্বাসঘাতক) প্রভৃতি বলে নাই। আস্তিন গুটান, পরস্পরের প্রতি কোন জড়বস্তু নিক্ষেপ প্রভৃতি রাজনৈতিক ভদ্র আচরণও হয় নাই।

নেহরু রিপোর্টের অংশ-বিশেষের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় হিন্দু মহাসভার প্রতি সাম্প্রদায়িকতা দোষ আরোপিত হইয়াছে। ইহার অনভিপ্রেত রসটি উপভোগ্য। নেহরু রিপোর্ট মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবীতে উত্তমরূপে কর্ণপাত করিয়াছেন, প্রভাবহীন ছোট কোন সম্প্রদায়ের কোন দাবী যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনাও করেন নাই; তাহা সাম্প্রদায়িকতা হয় নাই। কিন্তু হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের জন্য কোন প্রকার অন্যায় দাবী না করিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চাহিয়াছেন, ইহাই হইল সাম্প্রদায়িকতা!

—

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসী

চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী, দাতা এবং লেখক বলিয়া বঙ্গে সুপরিচিত। তিনি যে তাঁহার মাতা স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসীর প্রভাবে সৎকর্ম্মানুরাগী হইয়াছেন, তাহা এযাবৎ জানা ছিল না। তাঁহার জননীর পরলোকগমনের পর জানা গিয়াছে, যে, তাঁহার প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই হরিহরবাবু চন্দননগরের নারীশিক্ষা-মন্দির, অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয়, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির নামক বৃহৎ পুস্তকালয়ের সৌধ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণভাবিনী ভক্তিমতী, ধর্ম্মশীলা ও মধুরস্বভাবা ছিলেন।

—

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সম্মিলন

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সম্মিলন একটি অত্যাবশ্যক

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসী

সময়োচিত সদনুষ্ঠান। হিন্দুরা যে-সব পণ্যশিল্প প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সম্মিলন প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া ছিলেন। তাহাতে হিন্দুদের নির্ম্মিত চামড়ার উৎকৃষ্ট জিনিষও ছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দৈহিক বল ও পটুতা বৃদ্ধির জন্য লাঠিখেলা, তলোয়ার-চালান, ও নানাবিধ ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার-দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নানাবিধ মৃন্ময় মূর্ত্তি ও চিত্রের দ্বারা সামাজিক নানা কুরীতি অনাচার ও অত্যাচার দর্শকদের সমক্ষে ধরা হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের উন্নতি কিরূপে হইতে পারে তাহার আলোচনার জন্য আলোচনা-সভা হইয়াছিল। তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

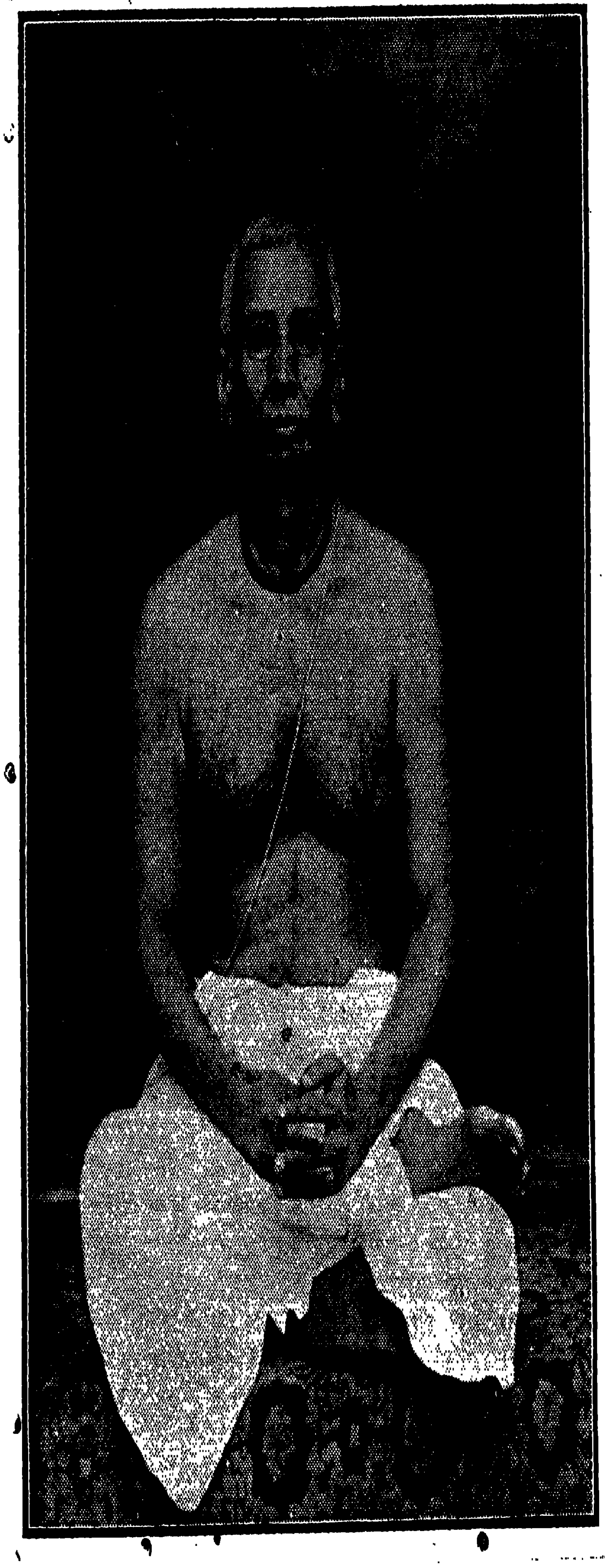

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তাঁহার অভিভাষণ তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত উদারতা এবং প্রবল স্বদেশ-প্রেমের উপযোগী হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন :—

আমাদের বাহিরের শত্রু তত ভয়াবহ নহে। সমাজের ভিতরেই যে আমাদের প্রবল শত্রু রহিয়াছে; তাহার করাল আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্ম সম্মিলিত হিন্দু-সমাজকে সর্ব্বাগ্রে প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে। এ শত্রু কে? এ শত্রু আমাদিগের অজ্ঞান-মূলক, অত্যাচার-সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা-প্রসূত, সহস্রাধিক-বর্ষব্যাপী পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কার ছাড়া আর কেহই নহে। এই কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কারকে আমরা দূর করিব।

আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা ও অধঃপতনের মূল

অনুসন্ধান করিয়া তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টভাবে ইহাই বুঝিতে পারা যায়, যে, আমাদিগের সমাজের মধ্যে জাতিগত ও বর্ণগত সভ্যসমাজ-বিগর্হিত উচ্চনীচভাব ও তন্নিবন্ধন আমাদিগের পরস্পর মিলিত হইয়া জাতির হিতকর কার্য্য করিবার অসামর্থ্যই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল ও মৃতকল্প করিয়া রাখিয়াছে, ভীরুতা আমাদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছে। এই দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরিহার করিতে না পারি, তাহা হইলে জাতি হিসাবে আমাদিগের মরণ যে অচিরভাবী ও অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

হিন্দুসমাজ-সংস্কার ব্যতিরেকে হিন্দুজাতি বর্ত্তমান যুগে স্বরাজ লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহা বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত।

তাঁহার পর তিনি বলেন :—

নবযুগে বঙ্গমনীষার বরণীয় আদর্শ রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদের দেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতেই প্রাচীন আচার-পন্থিগণও এই আন্দোলনের অনর্থকারিতা ও সনাতনধর্ম্মদ্রোহিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য আড়ম্বরপূর্ণ উদ্যোগ ও করিয়া আসিতেছেন, ইহা আমাদের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে। সতীদাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহ, বিলাতযাত্রা, অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও শুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য সমাজ-সংস্কারনিবহের মধ্যে একমাত্র সতীদাহ-নিবারণ ব্যতিরেকে আর সকল সংস্কারই যেরূপ ভাবে যত শীঘ্র হওয়া উচিত, সেইভাবে তত শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। তাহা না হইবার প্রধান কারণ হইতেছে দুইটি—প্রথম, দেশের নেতৃপদে আরূঢ় হইয়া যাঁহারা রাজনৈতিক অধিকার-লাভের আন্দোলনে সর্ব্বদা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা সমাজ-সংস্কারকার্য্যকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মুখেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু সমাজ সংস্কার ব্যতিরেকে স্বরাজলাভ যে অসম্ভব এই ধ্রুব সত্যের প্রতি তাঁহাদের যে দৃঢ়বিশ্বাস আছে, ইহার কোন প্রমাণই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া জনসাধারণ এখনও বুঝিতে পারিতেছে না। বিদেশী পণ্যবর্জ্জন, খদ্দর প্রচলন, রাজকীয় কার্য্যে অসহযোগ, খাজনা দেওয়া বন্ধ করা প্রভৃতিই তাঁহাদের নিকট স্বরাজলাভের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামাজিক দুর্নীতিনিবহের ধ্বংস দ্বারা যে পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে পরস্পর সহানুভূতিমূলক সঙ্ঘশক্তি সমুজ্জীবিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই যে তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়সমূহ ফলপ্রদ হইবে না, ইহা তাঁহারা এখনও বুঝিতেছেন না, বা বুঝিয়াও কায়মনোবাক্যে সমাজের সর্ব্বনাশকর অনাচার ও অত্যাচারনিবহকে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন না; ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে আর কি হইতে পারে? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই যে বর্ত্তমান সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য অনেক পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে। সভাসমিতি করিয়া, আবশ্যক চাঁদা আদায় করিয়া দেশের অজ্ঞ লোকের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি জাগাইবার ক্ষমতা এখন তাঁহাদিগের মধ্যেই আছে। তাঁহারা কিন্তু সেই ক্ষমতাকে নীতিসঙ্গত ব্যবহার না করিয়া বহুলভাবে আত্মশক্তির অপচয়ই করিতেছেন। তাঁহাদিগের আন্তরিক সাহায্য ব্যতিরেকে কোন জনহিতকর আন্দোলনই যে বর্ত্তমান সময়ে সার্থকতা লাভ করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে।

বঙ্গীয় হিন্দুজাতি সম্মেলনের এই, স্মরণীয় মহাধিবেশনের আরম্ভ সময়ে আমাদিগের দেশের বরণীয় রাজনৈতিক নেতৃগণকে এই অপ্রিয় সত্য কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে বাধ্য হইয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এখনও সময় আছে। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হিন্দুসমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কারের জন্য দৃঢ়তা-সহকারে অগ্রসর হউন এবং বঙ্গের এই সম্মেলনকে সার্থক্যমণ্ডিত করুন।

অতঃপর তিনি যাহা বলেন, তাহাও উদ্ধৃত করা দরকার।

বঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবস্থা অপেক্ষা শোচনীয় সামাজিক দুরবস্থা অন্য কোন সভ্য-মানব-সমাজে নাই, হইতেও পারে না। ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, সমগ্র বঙ্গদেশে এককোটি ৯১ লক্ষ হিন্দু বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক শতে ১৩জন মাত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি, ষোলজন নবশাখ ও সচ্ছূদ্র, তেরজন করিয়া তদধম জাতি, ১০জন করিয়া এমন জাতি আছে যাহাদিগের জল পর্য্যন্ত আচরণীয় নহে। বাকী আটচল্লিশজন এমন নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে, তাহাদের জল পর্য্যন্ত স্পৃশ্য নহে। তাহারা এমনই নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে, তাহাদের ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গলকার্য্যে তাহারা ব্রাহ্মণের ভূদেবের—মুখ পর্য্যন্তও দেখিবার অধিকার হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে বঞ্চিত।

আমাদের মধ্যে শতকরা ৪৮জন যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত, তাহারা কিন্তু হিন্দুর গৌরবাবহ সকল প্রকার অধিকার হইতে দূরে বিতাড়িত। তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য আমাদের মধ্যে উচ্চ জাতিগণ প্রস্তুত নহেন। তাহাদের দারিদ্র্য-পীড়িত মলিন পল্লীর মধ্যে আমাদের সমাজের নেতা ভূদেবগণ কখনও প্রবেশ করেন না; তাহারা কি খায়, কি পরে, রোগে, শোকে, অন্নাভাবে, কুসংস্কারে কিরূপ লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিতভাবে দুর্ব্বিবহ জীবনভার বহন করে, তাহার খবর লইলে, তাহাদের সুখদুঃখের খবর লইবার জন্য অপেক্ষণীয় মেশামিশি করিলে আমাদের সমাজের জাত্যভিমানে স্ফীত নেতৃবর্গের ধর্ম্ম রসাতলে যায়, জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়, ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী স্বদেশদ্রোহী স্বার্থপর ও কপটাচারী প্রভৃতি অশ্রাব্য কটূক্তি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রুতিবিবর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সনাতনধর্ম্ম কি—ইহাদিগকে তাহা আমরা জানাইবার জন্য কোন চেষ্টা করি না; জানাইবার সাহস যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে আমাদের ধর্ম্মরক্ষকগণ হিন্দুসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতে গৌরববোধ করেন এবং গোঁড়াদলের মুখপত্রের আয় গ্রহণ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের ও ব্রহ্মণ্য তেজের অসাধারণত্বের বিকট চীৎকারে বঙ্গের আকাশপবন মুখরিত করিয়া থাকেন। হিন্দুর দেব-মন্দির, হিন্দুর পুণ্যতীর্থ অত্যাচারী অশিক্ষিত দস্যুতুল্য কামুক বিধর্ম্মিগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে এই শতকরা আটচল্লিশ-জন অস্পৃশ্য তথাকথিত নীচ জাতিগণই কিন্তু সর্ব্বাগ্রে লাঠি হাতে করিয়া বিপক্ষের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয় এবং আমাদের সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে তিলমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। উচ্চজাতির পায়ের জুতা সেলাই করিয়া পায়খানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া, গমনাগমনের পথে প্রত্যহ ঝাড়ু দিয়া, উদরান্নের সংস্থানের জন্য শীত-বর্ষা-আতপে জীবনান্ত করিয়া,

ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইয়া ইহারা সেবা করিতেছে; শুধু এখনই করিতেছে তাহা নহে, শত শত বৎসর করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের ঐহিক অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা এমন কিছুই করি নাই যাহার জন্য ইহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে পারে বা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে। অথচ ইহারা আমাদিগকে প্রভূত সম্মান এখনও করিয়া থাকে এবং খ্রীষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতেও আমাদিগকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে গৌরব বোধও করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু ইহাদিগের জন্য, ইহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য, সনাতন-ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পবিত্র ভাব ইহাদের হৃদয়ে জাগাইবার জন্য কিছুই করিতেছি না এবং আমরা তাহা করিতেছি না বলিয়াই ইহাদিগকে আপনার করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ও প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিতেছে এবং ইহার ফলে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই ব্রহ্মভূমিতে মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানের দল কি পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছে, তাহার খবর আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই লইতে উদ্যত আছেন।

আমাদিগেরই এই আত্মজাতিধ্বংসকর ব্যবহারের ফলে এই সকল তথাকথিত নিম্নস্তরের জাতিগণ তাহাদিগের পক্ষে অনন্ত দুঃখের ও অবমাননার হেতু হিন্দুয়ানীর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিধর্ম্মীর দলই ক্রমে পুষ্ট করিতেছে।

পুরাকালে যে জাতিভেদ ছিল না, তাহার প্রমাণস্বরূপ তর্কভূষণ মহাশয় ভাগবত ও বায়ুপুরাণ হইতে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন। যথা, ভাগবত হইতে—

এক এব পুরা বেদ: প্রণব: সর্ব্ববাঙ্ময়:।
দেবো নারায়ণো নান্য: একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥

পুরাকালে এক অখণ্ড সকলের অধিগম্য বেদ ছিল; প্রণব সকলের দ্বারা উচ্চারিত হইত। নারায়ণ সকলের একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন, সকলের ব্যবহারার্থ এক অগ্নি ছিলেন এবং সকলে এক বর্ণের ছিল।

বায়ুপুরাণ হইতে—

বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতা:।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তথ॥

বর্ণবিভাগ ত্রেতাযুগে হইয়াছিল; সেই যুগে সংহিতাগুলিও বিভক্ত হইয়াছিল, এবং ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা মন্ত্রসকল বিভক্ত হইয়াছিল।

হিন্দুসমাজসম্মিলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, সকল হিন্দুই ব্রাহ্মণ। এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে সকলে না পারিলেও অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা বর্জ্জন করিবার সামর্থ্য সকলেরই আছে।

যাঁহারা দেশের রাজনৈতিক উন্নতি চান, তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সকল জাতির সমান সামাজিক মর্য্যাদা আবশ্যক বলিয়াছেন; সমাজসংস্কারপ্রার্থীরা বহুবৎসর হইতে তাহা বলিয়া আসিতেছেন। এখন সকল পক্ষের লোকে কথা অনুসারে কাজ করিলেই মঙ্গল হয়।

"দর্শনের দৃষ্টি"

এবার হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী মাজু গ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এই গ্রামের অধিবাসীদের জনহিতকর অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রশংসা ও অনুকরণের যোগ্য। তাঁহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কন্‌ফারেন্সের এক অধিবেশনও স্বগ্রামে করাইয়াছিলেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের সকল সভাপতির অভিভাষণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। দর্শন শাখার সভাপতি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের অভিভাষণ পাইয়াছি। উহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে; স্বাধীন ধ্যানমননের দ্বারা লব্ধ নূতন ভাব ও চিন্তার সংযোগে পাণ্ডিত্যকে নূতন রূপ দিয়া তিনি শ্রোতা ও পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটি দীর্ঘ, প্রবাসীর ২৫।২৬ পৃষ্ঠা হইবে। এইজন্য উহা হইতে কয়েকটি কথা মাত্র পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

"এতক্ষণ যা কিছু বলা হোল তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই, মন ব'লে কোন একটি স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নেই, কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরাকে সংক্ষিপ্তভাবে বোঝাবার জন্য মন শব্দটি ব্যবহার করছি। যেমন জড়রাজ্য জৈবরাজ্য, তেমনি মন বল্‌তেও একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বোঝা যায়। এই রাজ্যের ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার কোথায় সামঞ্জস্য, কোথায় তাদের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, কি তাদের প্রকারপরম্পরা এ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। এখন শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে জৈব রাজ্যকে আশ্রয় ক'রে স্তরে স্তরে অস্ফুট থেকে স্ফুটতরভাবে এই মনোরাজ্য তার বিচিত্র ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ ক'রে তুলেছে। জৈবরাজ্যের প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই, সে ব্যক্তিত্ব মূঢ়, সে ব্যক্তিত্বের মূল হচ্ছে জৈব-ব্যাপারের নিয়মকেন্দ্র, সামঞ্জস্যকেন্দ্র; তার প্রত্যেকটি ব্যাপার যে তার অন্য ব্যাপারগুলিকে অপেক্ষা ক'রে চলে, এবং প্রত্যেকটি ব্যাপার যে অন্য ব্যাপারগুলির আনুকূল্যে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়, কোনও সম্বন্ধটিই যে স্থির হ'য়ে না থেকে অপর সম্বন্ধগুলির সহিত স্বতই আবর্ত্তিত হ'তে থাকে, এইখানেই জীবকোষের ব্যক্তিত্বের মূল। কিন্তু মনো-

রাজ্যের ব্যক্তিত্বটিকে আমরা self ব'লে, আত্মা ব'লে অনুভব ক'রে থাকি।"

ইহার পর অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :—

"কিন্তু শুধু জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য নিয়ে আলোচনা করলেই গোটা মানুষটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যেমন জীবরাজ্যকে আশ্রয় ক'রে মনোরাজ্য আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি মনোরাজ্যকে অবলম্বন ক'রে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরাজ্য বা আনন্দরাজ্য প্রকাশ পায়। এই রাজ্যের প্রকাশের উপরই মানুষের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করে। মানুষ যে শুধু বাঁচে, কি চিন্তা করে, তা নয়, মানুষের মধ্যে একটা সত্যলিপ্সা, মঙ্গলেচ্ছা, সৌন্দর্য্যলিপ্সা, একটা ভক্তিলিপ্সাও কাজ করে। মনোরাজ্যটি অনেকখানি পরিমাণে জৈবভাবের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট এবং প্রয়োজনসম্বন্ধের সহিত যুক্ত, কিন্তু এই বিজ্ঞানানন্দ রাজ্যটি একেবারে প্রয়োজন-সম্পর্করহিত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি রাজ্যের মধ্যে যেমন নানাবিধ জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়, এতে তা নেই, এ যেন একটি ছায়ালোক; এই ছায়ালোকের দীপ্তিতে মানুষের মনোজীবন যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন যেন সে এক নবীন জীবন লাভ করে। আমরা যত রকমের কাজ করি আর যত রকমের কাজ করি না, এর মধ্যে নিরন্তর একটা তুলনা উঠতে থাকে, এই কাজটা ভাল কি ঐ কাজটা ভাল, এটা উচিত কি ঐটা উচিত; এই যে ঔচিত্য অনৌচিত্যের তুলনা, ভাল মন্দের তুলনা, এটা ঠিক সুবিধা অসুবিধার তুলনা নয়। সুবিধা অসুবিধার তুলনা প্রয়োজন-সিদ্ধির তারতম্যের তুলনা, জৈবব্যাপারের স্বতঃপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই সেটা সুসম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু এই ভাল-মন্দের তুলনা সুবিধা অসুবিধার তুলনা নয়, হয়ত যেটা আপাতত নিতান্ত অসুবিধার সেইটাকেই ভাল এবং উচিত বলে প্রতিভাত হয়। এই যে ঔচিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ভালর মূল্য নির্দ্ধারণ, এটা আমাদের সমস্ত জৈবপ্রবৃত্তির উপরে দাঁড়িয়ে জৈবপ্রবৃত্তিকে দমন করতে চায়, অথচ আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়েই জৈবপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির প্রতিকূলে আমাদের প্রণোদিত করে। জৈবপ্রবৃত্তির অনুকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল যেটা সেইটেকেই ভাল ব'লে মূল্যবান্ ব'লে করণীয় ব'লে গ্রহণ করা সর্ব্বপ্রাণীর সাধারণ বৃত্তি এবং এই বৃত্তি অনুসরণ ক'রেই জীবজগতে নূতন নূতন স্তরের প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যারা এই বৃত্তিটিকে যত বেশী ক'রে পালন করতে পেরেছে তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরাই জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আত্মরক্ষা ক'রে বেঁচে রয়েছে। তাই জৈব ও মনোব্যাপারের সমস্ত কাঠামটার মধ্যে এই অর্থ-অর্থীর সম্বন্ধ ও এই প্রয়োজনসিদ্ধির দাবীটি আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। অতিমূঢ় অবস্থা থেকে অতিনীচ বস্তুর থেকে জীব এই প্রয়োজনসিদ্ধির অনুসন্ধান ক'রে নিজকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী ক'রে রাখতে পেরেছে, তাই এই বোধটা তার শরীরের প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে এবং তার চিন্তাজালের শতন্তন্তুর মধ্যে তাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। এর অভিভাবকতা স্বীকার না করলে জীবজগৎ চলে না। অথচ উন্নত মানুষের জীবনে যে একটা এমন বৃত্তি জন্মে যার দ্বারা সমস্ত জীবজগতের নিয়ম উল্লঙ্ঘন ক'রে একটা নূতন মূল্য নির্দ্ধারণের সূত্র আবিষ্কার ক'রে প্রয়োজনসিদ্ধির চেয়ে প্রয়োজন বিসর্জ্জনের দাবীকে বড় ক'রে তোলে, সমস্ত জীবজগতের ইতিহাসে এটি একটি অভিনব ব্যাপার। এই যে প্রয়োজনসিদ্ধির বাহিরে শ্রেয়ঃসিদ্ধির একটা স্বতন্ত্র দাবী মানুষের মধ্যে কাজ করে, একথা উপনিষদের যুগ থেকেই আমাদের দেশে স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।..."

"কঠ উপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানে পাই যে নচিকেতা সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেছিলেন যে তিনি কিছুই চান না, কেবল জানতে চান মৃত্যুর পর কি হয়। উপনিষদের ঋষিরা এই তত্ত্বলোকের একটু স্পর্শ পেয়ে ব্রহ্মানন্দে অধীর হ'য়ে উঠতেন..."

"বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সাধকের নিকট এর স্পর্শের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, কিন্তু সকল দেশের সকল সাধকই এর একটা রসাস্বাদ পেয়েছেন।..."

"এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শ যে শুধু কর্ম্মসাধক বা ধর্ম্মসাধকের জীবনেই ধরা পড়ে তা নয়, যিনি সৌন্দর্য্যের সাধক তাঁরও অনুপ্রাণন এই লোক থেকেই আসে; এই লোকেরই একটু স্পর্শ তিনি বর্ণের ছন্দে কিম্বা কথার ছন্দে ধরতে চেষ্টা করেন..."

পরিশেষে অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলিতেছেন :—

"যে দার্শনিক তাঁর দর্শনবিচারে এই রাজ্যের অনুভূতিকে তাঁর তথ্যবিচারের মধ্যে গ্রহণ করেন নি সে দর্শনশাস্ত্র অতি দীন। কারণ এই রাজ্যের স্পর্শেই মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের বিচারের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি সমস্ত তথ্য স্থান পাওয়া উচিত। সেইজন্য যে দর্শনশাস্ত্র শুধু এই পরতত্ত্বকেই স্বীকার ক'রে পরিদৃশ্যমান আর সমস্তকেই মিথ্যা মায়া ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখতে চান, দর্শনশাস্ত্র হিসাবে সে দর্শন অতি সঙ্কীর্ণ। বিভিন্ন রকমের বিশেষত্ব নিয়ে আমাদের চোখের সামনে এই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও আনন্দময় চারিটি রাজ্য পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রকাশ করে তুলছে; এই চারিটি রাজ্যই সমানভাবে সত্য এবং চারিটি রাজ্যের পরস্পরের আদান-প্রদানে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তাও ঠিক সেইভাবেই সমান সত্য। এ পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে

যত প্রচেষ্টা হয়েছে তার কোনোটাতে চারটি রাজ্যের কোনওটির তথ্য অপর কোনোটির নিয়মের দ্বারা বা ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। যদি কোনো একটি এমন তত্ত্ব পাওয়া যেত যার দ্বারা এই চারিটিরই ব্যাপার ব্যাখ্যা করা চল্‌ত তাদের বৈচিত্র্যের উপপত্তি করা সম্ভব হোত,তবে সেরকম অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা যেতে পারত। এই চারটি জগতের যে পরস্পরাপেক্ষী বৈচিত্র্য, এই নিয়েই হচ্ছে জগতের ও মানুষের জীবন ; এ বৈচিত্র্যকে না মান্‌লে জীবনকেই মানা হয় না। ঐক্য আমরা খুঁজি বটে, কিন্তু বিচিত্রকে না মান্‌লে ঐক্যকেই মানা হয় না।—সমস্তকে হারিয়ে সমস্তকে মিথ্যা ব'লে সরিয়ে দিয়ে যে ঐক্য পাওয়া যায় সে ঐক্য রিক্ততার ঐক্য, মুক্তির ঐক্য নয়।

"রাত্রিবেলা স্বপ্নমাঝে গর্ব্বে ছিনু ভরি,
আপনাকে শূন্য দেখে মুক্ত মনে করি।
এখন মনে হয়
আপনারে রিক্ত করা মুক্ত করা নয়॥"

চারটি বিচিত্র জগতের ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের ছন্দটি যে মানুষের মধ্যে ধরা পড়েছে এবং এই চারটি জগৎ যে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে তুলেছে এবং তাদের চরম সার্থকতারূপে মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তুলছে, তাদের বিচিত্র সুরসঙ্ঘাত যে মিলিত হ'য়ে অখণ্ড একটি মানুষের স্বরে নিরন্তর ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, এই দৃষ্টিই দর্শনের দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই মুক্তির দৃষ্টি।"

—

খড়্গবাহাদুর সিংহের সম্মান

হীরালাল আগরওয়ালা নামক এক ব্যক্তি একটি নেপালী বালিকার সর্ব্বনাশ করে এবং তাহাকে নিজের ও নিজের পাপসহচরদের পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় স্বরূপে ব্যবহার করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গবাহাদুর সিংহ হীরালালের প্রাণবধ করেন। বিচারে খড়্গবাহাদুরের আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য দেশী ও ইউরোপীয় সমাজের লোকেরা বড়লাটের নিকট আবেদন করে। দুইবৎসর কারাবাসের পর খড়্গবাহাদুর খালাস পাইয়াছেন। তাঁহার আত্মোৎসর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতার টাউনহলে সভা হইয়াছিল। জনতা সমুদয় হল পূর্ণ করিয়া বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই সভাস্থলে দেখিলাম না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এই মর্ম্মের কথা বলেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষায় খড়্গবাহাদুরের মত আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই তাঁহাকে সম্মান দেখান হইবে। ইহা সত্য কথা। স্বরাজ্যদলের একজন নেতার মুখনিঃসৃত এই উক্তির মূল্য আছে। এপর্য্যন্ত স্বরাজ্যদল প্রভূত অর্থ, অনুচর ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী হইয়া আসিয়াছেন। তাহার কোন অংশ নারীরক্ষা-কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে কিনা জানি না। এপর্য্যন্ত যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভবিষ্যতেও যদি হয়, তাহা কল্যাণকর হইবে। কারণ, প্রতি সপ্তাহেই খবরের কাগজে বহুসংখ্যক নারীর চরম দুর্গতির সংবাদ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, ইহা লজ্জার বিষয় হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্র যে আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। নারীরক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়, হিন্দুর জীবন-মরণ ইহার সহিত জড়িত।

—

নারীরক্ষার অত্যাবশ্যকতা

নারীরক্ষার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে নিখিলভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে সুরাটে পাঠের জন্য আমাকে যে অভিভাষণ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আমি বলিয়াছি :—

As for the protection of our women, I consider it the highest of our duties both to give them protection at all hazards, including the sacrifice of life itself, as well as to train them for self-defence. Tales of the heroic sacrifices made for safeguarding the honour of women are among the priceless treasures of Hindu tradition and history, which are destined to inspire countless generations to live and die nobly. If I were asked which I would have, freedom from foreign domination, or security of the honour, persons and lives of our women, won by chivalrous men and heroic women capable of self-defence; I would say, both. But if I were compelled to choose only one of the two, I would choose the latter. The supposed alternatives placed before you may seem strange to those unacquainted with the state of affairs in some parts of the country. But it has often seemed to me as if some politically-minded Indians were disposed to make a choice exactly the opposite of that which I would make.

তাৎপর্য্য। "নারীরক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, যে, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করা এবং তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া আমাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। নারীর

সম্মান রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের ও আত্মবলিদানের কাহিনীসমূহ হিন্দু কিংবদন্তী ও ইতিহাসের অমূল্য রত্ন; এই-সকল কাহিনী অগণিত পুরুষপরম্পরায় ভারতীয়দিগকে মহত্তের মত বাঁচিতে ও মরিতে প্রেরণা দিবে। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি চাও, বিদেশীর প্রভুত্ব হইতে মুক্তি চাও, না, বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার শৌর্য্যে ভারতনারীর সম্মান, দেহ ও প্রাণের নিরাপদ অবস্থা চাও? তাহা হইলে আমি বলিব, উভয়ই চাই। কিন্তু আমাকে যদি দুটির মধ্যে কেবলমাত্র একটি বাছিয়া লইতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে আমি নারীর নির্ভয় নিরাপদ অবস্থাই নির্ব্বাচন করিব। এই যে দুটি আনুমানিক নির্ব্বাচ্য অবস্থা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম, তাহা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলের অবস্থার সহিত অপরিচিত লোকদের নিকট অদ্ভুত মনে হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় আমার এইরূপ মনে হইয়াছে, যে, রাজনৈতিক ভাবনার ভাবুক কতকগুলি ভারতীয় ব্যক্তির মনের গতি এরূপ, যে, তাঁহাদিগকে দেশের উক্ত দুই অবস্থার একটি মাত্র বাছিয়া লইতে বলিলে তাঁহাদের নির্ব্বাচন আমার বিপরীত হইবে।"

আমি জানি, দেশের স্বাধীনতার উপরেও নারীরক্ষার সামর্থ্য নির্ভর করে। কিন্তু আমার বক্তব্য বিশদ করিবার জন্য দুটিকে স্বতন্ত্র ব্যাপারের মত উল্লেখ করিয়াছি।

—

কলিকাতার নূতন মেয়র

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার যোগ্যতা আছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে এই কাজ করিয়াছেন বলিয়া অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে। সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি অতীতের ভ্রমপ্রমাদ পরিহার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাঁহার আমলে কলিকাতা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগর হইবার দিকে অগ্রসর হইবে, এই আশা পোষণ করা অসঙ্গত মনে করিতেছি না।

—

সেচনের ব্যবস্থার কারণ

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের-জন্য অনেক দীর্ঘ কৃত্রিম খাল আছে। বাংলা দেশে সেরূপ খাল নাই। অথচ পশ্চিম-বঙ্গে জল-সেচনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং তাহার বন্দোবস্ত করিলে উহার স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধি হয়। বাংলা দেশে কেন যে খাল খনন করা হয় নাই, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি। বঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট গম ও উৎকৃষ্ট তুলা হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আহার ও বাণিজ্যের জন্য এই দুটি জিনিষ ইংরেজদের দরকার। পঞ্জাবে খুব ভাল গম হয়। এইজন্য সেখানে খাল খনন করিয়া সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে জলসেচনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সিন্ধুদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাস হইতে পারে। এইজন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সিন্ধুনদে বাঁধ দিয়া এক বৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি হইবে। তাহার জল খাল দিয়া লইয়া গিয়া মরুভূমিকে কার্পাস উৎপাদনের উপযোগী করা হইবে। সেই কার্পাস বিলাতে লইয়া গিয়া ইংরেজ কাপড় বুনিয়া ভারতবর্ষে বিক্রী করিবে। ফরাসী জেনারাল গুরো এই-সব কথা বুঝিয়া ইংরেজের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি জানেন না, যে, ইংরেজ সিন্ধুদেশ দখল করিবার বহু পূর্ব্বে অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছিল, যে, উহা উৎকৃষ্ট কার্পাস-উৎপাদনের উপযোগী; এইজন্য উহা ছলে বলে কৌশলে অধিকার করিয়াছিল। সে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বের কথা।

জল-সেচনের বন্দোবস্ত করা কেবল যে পশ্চিম-বঙ্গেই আবশ্যক, তাহা নহে, অন্যত্রও দরকার। স্যার উইলিয়ম উইলকক্সের মতে রাজশাহীর নিকট গঙ্গায় বাঁধ দিলে ম্যালেরিয়া দূর হইবে এবং কৃষির উন্নতি হইবে। তাহা সত্য কথা; কিন্তু গম ও কার্পাস ত জন্মিবে না। সুতরাং যাহাতে ইংরেজ জাতির লাভ নাই, ইংরেজ গবর্ণেণ্ট কেন তাহা করিবেন?

—

ডাকমাশুল কমিল না

এবারও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পোষ্টকার্ডের দাম এক পয়সা এবং খামের দাম দুই পয়সা করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে। ওজুহাত এই, যে, তাহাতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব কমিবে। কিন্তু পোষ্টকার্ড ও খামের কাটতি

বাড়ায় কিছু আয় বাড়িত। তা ছাড়া, ডাকঘর একটা ব্যবসার উপায় নহে; আয় বাড়াইবার উহা একটা পন্থা নহে। উহার সাহায্যে জ্ঞানবিস্তার, শিক্ষাবিস্তার, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি ও বিস্তৃতি এবং সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও বিকাশ হয়। এইজন্য ডাকমাশুল কম করা উচিত। উচ্চহারে ডাকমাশুল—বিশেষতঃ পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির উপর—জ্ঞানের উপর ট্যাক্স আদায়। তাহা উচিত নয়। আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ভারতবর্ষের চেয়ে খুব ধনী দেশ এবং শিক্ষিতের দেশ। তথাপি ধনবত্তার তুলনায় তথাকার ডাকমাশুল ভারতবর্ষের চেয়ে সস্তা। কারণ সেই-সব দেশ স্বাধীন ও স্বশাসক, তথাকার শাসকেরা দেশের কল্যাণকর ব্যবস্থা করেন।

—

লবনের শুল্ক

লবণের শুল্ক ।০ হইতে ১৲ টাকা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়া আবার ১।০র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ মণকরা চারি আনা শুল্ক কমিলে গরীব খুচরা ক্রেতাদের কোন সুবিধা হইত না, কারণ দোকানদাররা মূল্য সেরকরা এক পাই কমাইত না। এই শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। অন্ততঃপক্ষে উহা মণকরা দশ আনা করা উচিত। তাহা হইলেও গরীব লোকে সেরকরা এক পয়সা কমদামে উহা পাইতে পারিবে। লবণশুল্ক মানুষের এবং গবাদি পশুর স্বাস্থ্যহানির একটি কারণ।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর হ্রাস

এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫,৫৯৮; গত বৎসর ছিল ১৫,৪৮৪; এবৎসর ৩০৭টি বালিকা এই পরীক্ষা দিবে; কলিকাতা হইতে ১৫৪, মফঃস্বল হইতে ১৫৩। অথচ উচ্চ (?) স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে এক শ্রেণীর লোক ভীত হইয়া উঠিয়াছে।

ইণ্টারমীডিয়েট আর্টস্ পরীক্ষা দিবে এবার ৩,৩৮৬ জন (ছাত্রী ১০৮ জন); গত বৎসর দিয়াছিল ৩,৭২৩।

এবৎসর ইণ্টারমীডিয়েট বিজ্ঞান পরীক্ষা দিবে ৩,৬২৫ জন (ছাত্রী কেবল ১৬ জন); গত বৎসর দিয়াছিল ৩,৭০৬ জন।

এবৎসর বি-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩,৬৫৪ (ছাত্রীর সংখ্যা তন্মধ্যে ৭৫); গত বৎসর ছিল ৩,৪৩০।

গত বৎসর বি-এস্‌সি পরীক্ষা দিয়াছিল ১,২৪৪ জন, এবৎসর দিবে ১,১৪০ জন (তন্মধ্যে কেবল দুইজন ছাত্রী)।

এবৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যাহ্রাসে ভাইস্‌চ্যান্সেলারকে কোন খবরের কাগজ গালাগালি দিতেছে না। কারণ, তিনি লালমুখ এবং কোন দলের লোকের উপরি-পাওনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

—

গোবিন্দকুমার আশ্রম

অনেক অল্পবয়স্কা বালিকা বেশ্যালয়ে পালিত হইয়া পরে পাপব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। তাহাদিগকে সেখান হইতে উদ্ধার করিলেও সৎপথে রাখিবার জন্য যথোপযুক্ত স্থান ছিল না। এই বিষয়ের প্রতি লর্ড লিটন সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মেয়রের ফণ্ড খুলেন। তাহাতে কিছু টাকা সংগৃহীত হইলেও যথেষ্ট টাকা আসে নাই। যাহা হউক, দমদমায় জজ স্যার ইউয়ার্ট গ্রীভসের নামে একটি আশ্রম খোলা হয়। এক্ষণে জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর বদান্যতায় পানিহাটীতে তাঁহার বাগানবাড়ী পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পিতার নামে তাহার নাম গোবিন্দকুমার আশ্রম রাখা হইয়াছে। তিনি কিছু নগদ টাকাও দিয়াছেন। উহাতে এখন ৫০টি বালিকা আছে। গবর্মেণ্ট প্রত্যেক বালিকার জন্য মাসিক দশ টাকা দেন, কিন্তু তাহাতে সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় না। সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে মাথা-পিছু আরও দশ টাকা পাইলে ঠিক্ হয়।

—

"মুসলিম হল ম্যাগাজিন"

আমরা সাময়িক পত্রের নিন্দাপ্রশংসা করি না; কিন্তু এটা এমন নিয়ম নয়, যে, কোনস্থলেই তাহার ব্যতিক্রম করা চলে না। সেইজন্য বলিতেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ম্যাগাজিনের বর্ত্তমান বৎসরের

মার্চ্চ সংখ্যা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, বঙ্গের অনেক শিক্ষিত মুসলমান যুবক সংস্কার ও উন্নতিপ্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহাদেরই লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি করিয়া বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ইস্‌লাম ও পর্দ্দা

"ভারতবর্ষে যেরূপ কঠোরতার সহিত পর্দ্দার প্রচলন আছে মুসলিম জগতে কোথাও এইরূপ নাই। আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, মিশর ও মরক্কো প্রভৃতি মুসলিম দেশ সমূহে এত কঠোরতা সহকারে পর্দ্দা পালন করা হয় না। বর্ত্তমানে তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশে পর্দ্দার আদৌ প্রচলন নাই। এছাড়া অন্যান্য স্বাধীন মুসলিম রাজ্যে হাট-বাজারে রমণীগণকে ক্রয় বিক্রয় করিতে দেখা যায়। এমন কি ইসলামকেন্দ্র আরবেও ভারতের ন্যায় পর্দ্দা সম্বন্ধে এত বাড়াবাড়ি নাই।

"শত শত বৎসর ধরিয়া আরব, পারস্য ও আফগানিস্থানের আচারব্যবহার ও প্রথার সঙ্গে ইসলাম নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া ভারতে তথাকথিত মোল্লাদিগের নিকট আমরা ইসলামের যে স্বরূপ পাইয়াছি, বাস্তবিক ইসলামের ইহা খাঁটি স্বরূপ নয়, ইহা ইসলামের ধার করা জিনিষ। ভারতে কোন দিন পর্দ্দা-প্রথার প্রচলন ছিল না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ হইতে এদেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দ্দা প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।"

"ইসলামে নারীকে তার উপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে—এ দাবী জগতের কাছে করলে তারা ঠাট্টা করবে। কারণ জগত দেখবে না ইসলামের কেতাব, দেখবে শুধু মুসলিমের ব্যভার। যদি নারীর শিক্ষা ও অধিকারের কথা উঠল, তবে পর্দ্দার কথা এখানে তোলা অন্যায় নয়। পর্দ্দা দু'রকম—এক রকম ইসলামী পর্দ্দা, সে হচ্ছে মুখ হাত পা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, আর এক অনইস্‌লামী পর্দ্দা, সে মেয়েদের চা'র দেওয়ালের মধ্যে চিরজীবনের জন্য কয়েদ করে রাখা। ইসলামী পর্দ্দায় বাইরের খোলা হাওয়ায় বেড়ান কি অন্যের সঙ্গে দরকারী কথাবার্ত্তা মানা নয়; অনইসলামী পর্দ্দায় এসব হ'বার জোটি নেই। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এই অনইসলামী পর্দ্দা ফাঁক করে দিতে। তা না হলে আমাদের নারীহত্যার মহাপাপ হবে।"

[নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক-সম্মিলনে প্রদত্ত ডাক্তার মহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট সাহেবের অভিভাষণ হ'তে]।

"কিছুদিন আগে মুসলিম হলের কয়েকজন উন্নতিকামী তরুণ যুবকের চেষ্টাযত্নে "পর্দ্দা দূরীকরণ সমিতি" নামে একটি সংঘ স্থাপিত হয়েছে। যে কঠিন ও ঘৃণিত পর্দ্দা-প্রথা মুসলিম নারীর উপযুক্ত শিক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে শিথিল করে সমাজ-জীবনে তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ দেওয়াই এ সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান মুসলমান-সমাজকে দ্রুত অধঃ-পতনের মুখ থেকে ফেরাতে হলে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নারী-সমাজকে তার জন্মগত দাবী ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তার ভিতর নব জাগরণের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করতে হবে—এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত উক্ত সমিতির সভ্যগণের সংখ্যা খুব বেশী আশাপ্রদ নয়। সারা বাংলা জুড়ে এ সমিতির আন্দোলন-কার্য্য চালাতে হ'লে অতিরিক্ত সভ্য আর উপযুক্ত অর্থের প্রয়োজন—তা বলাই বাহুল্য। এই দু'য়ের অভাবে আজ পর্য্যন্ত তেমন কিছু এ সমিতি করে উঠ্‌তে পারেনি—আমরা সমিতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।"

"ভাষার অত্যাচার"।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একদিন এই সম্পর্কেই আলাপ কর্ব্বার সুযোগ হয়েছিল, অন্যান্য কথার পর তিনি মুসলমানের আরবী পার্শী ও উর্দ্দু ভাষার মোহের কথা পাড়লেন। তিনি বল্লেন যে, এই তথাকথিত ধর্ম্ম ভাষার নেশা মুসলমানকে এমন করে পেয়ে বসেছে যে মুসলমান বুঝতে পাচ্ছে না কতবড় ও মারাত্মক ক্ষতি এই ভাষাগুলি মুসলমান-সমাজের কচ্ছে। ধর্ম্মের এই বিকৃত মোহ যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমান-সমাজ না কাটাতে পার্ব্বে, ততদিন শিক্ষার দিক দিয়ে মুসলমান হিন্দুর বহু পশ্চাতে পড়ে থাকবে। তিনি বিলেতে বহু জার্ম্মাণ স্কলারের সঙ্গে আলাপ করেছেন যারা ইংরাজী ভাষায় অল্প খুব তুচ্ছজ্ঞান নিয়েও ইংরাজী ভাব আহরণ কচ্ছেন, আমার মনে আছে তিনি

বলেছিলেন "It is the idea, the matter, that counts and not your language."

"সমাজ ও দেশের আশা-ভরসার স্থল যে তাদের তরুণ ছাত্রদল, তাদের দুরবস্থার একমাত্র না হোক, খুব প্রবল কারণ হচ্ছে, এই আরবী পার্শী ও উর্দ্দু ভাষার অত্যাচার। এ ভাষাগুলির কোন শিক্ষা ত হয়ই না, উপরন্তু সাধারণ শিক্ষার অন্তরায় হিসাবে এদের স্থান বেশ উপরে।"

"সুস্থ সমাজগাত্রে এই ভাষাগুলি এক একটা প্রকাণ্ড ক্ষত। সমাজে যে এত বড় স্থান দখল করে আছে মূর্খ কাটমোল্লা ও মৌলবীগণ, তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ঐ ভাষাগুলি। এদের দৌলতেই তারা প্রতিদিন মুসলমান-সমাজকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখছে। আজ যদি ধর্ম্মের ক্রিয়া, অনুশাসন ও অনুষ্ঠানগুলি মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণ হয়ে উঠত, তা'হলে মস্‌জিদে গিয়ে খোতবা পড়বার সময়ে ঝিমুনির পরিবর্ত্তে, নামাজে দাঁড়িয়ে ঐহিক চিন্তার পরিবর্ত্তে, ও একটা আত্মঘাতী ধর্ম্মান্ধতার পরিবর্ত্তে—ধর্ম্মক্রিয়ায় একাগ্রতা, চিন্তা ও কার্য্যে স্বাধীনতা এবং প্রতি মুসলমানের অন্তরে ধর্ম্মের উপরে একটা সত্যিকার সহজ সরল বিশ্বাস জেগে উঠত এবং সমাজের চেহারা যে তার পূর্ব্ব গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, এ কথা আশা করলে অন্যায় হতো না।"

"ইস্‌লামে সঙ্গীত ও চিত্র"

"উপরে যাহা বলা গেল, আশা করি ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে ইসলাম কোন ললিত কলাকেই, তাহার প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে, নিষেধ করে নাই।"

"নাট্যাভিনয়"

"ঈদল ফেতরের দিনে আমাদের সদালাপী প্রিয়দর্শন প্রভোষ্ট সাহেবের উৎসাহে হলে একটি বাঙ্গালা আর একটি ইংরাজী অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিলো; কোনটাতেই নায়িকার বালাই নেই। যা হোক তবু মন্দের ভালো, মুসলিম হলে অভিনয় এই প্রথম। এর আগে অনেকবার অভিনয় করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিরুৎসাহিতা আর 'সেই নানা ওজর আপত্তিতে' অভিনয়ের সঙ্কল্প আমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে। এবার প্রভোষ্ট সাহেবের উদ্যোগ-উৎসাহে আমাদের বহুদিনের আশা সফলকাম হয়েছে। তজ্জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। অভিনয় আয়োজন বর্ত্তমানের সাফল্য বা বিফলতার দিক দিয়ে যত বেশী করে বিচার্য্য তার চাইতে অনেক বেশী করে স্মরণীয় হবে এই হিসাবে যে মুসলিম হলের ভবিষ্যত জীবনে নানাবিধ ক্রীড়া-কলাপের মধ্যে নাট্যাভিনয়ও এক প্রধান অনুষ্ঠান বলে গণ্য হবে। যে জিনিষের আরম্ভ এবার হলো সুদূর ভবিষ্যতে তার যেন বৃহত্তর অনুষ্ঠানের সূচনা হয়,—এমনি করে যেন আমরা বাস্তব, অবাস্তব নানারকমের কুসংস্কার ও সমাজ-গাত্রের আবর্জ্জনাকে মার্জ্জিত রুচির সমার্জ্জনী দ্বারা দূর করতে পারি—এই প্রার্থনা।"

"মাদ্রাসা ও ভবিষ্যৎ"

"মক্তব ও নবপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ক্রমশঃ এত বেড়ে চলেছে যে ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা দিন দিন দ্রুতবেগে কমে যাচ্ছে। বর্ত্তমানে শতকরা ৪২ জনেরও অধিক মুসলমান-ছাত্র শুধু মক্তবেই পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট মুসলমান ছাত্রসংখ্যা, ১,৬৫,০৫৩ জনের মধ্যে মক্তবে ৬,২৮,৪৪৬। ১৯২২ হ'তে ২৭ পর্য্যন্ত গত পাঁচ বছরে নবপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ২৫,০০০ হ'তে ৫১,০০০, দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ঐ সময়ে ইংরেজী স্কুলে মাত্র ৩১,৫০০ হ'তে ৩৪,৫০০। এক নোয়াখালী জিলায় খারিজ্জা মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যাই ৭,০০০ এর বেশী। (এরূপ বছর বছর ৪,৬০০ জন করে বেশী মুসলমান-ছাত্র মাদ্রাসায় ঢুকছে, ফলে পরবর্ত্তী কয়েক বছরের মধ্যেই মাইনর স্কুল, হাইস্কুল, ও কলেজে মুসলমান-ছাত্র একদম শূন্য হবে। ভাষার মোহ কী মারাত্মক! দীন, না দুনিয়া?)"

"মুসলিম শিক্ষার অধিকাংশ টাকাই যায় মাদ্রাসা ও মক্তবে, যা'দ্বারা আমরা জ্ঞানের রাজ্যে গর হাজির। গভর্ণমেণ্টও তাই মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠায় খুব উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন।"

মুসলমান নারীর উচ্চশিক্ষা

'Miss Fazilatunnessa, M. A. (Math.) sailed for England in August last with Government scholarship to qualify herself for the degree of 'Master of Education' in the University of London. God

help her in her high ambition and let her be the pioneer of Muslim female education in Bengal."

মুসলিম হল ম্যাগাজিনে এই-সব কথা পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সিংহলে ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান

সিংহল-প্রবাসী ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে কিছুকাল যাবৎ বিশেষ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। উদ্দেশ্য যাহাতে সিংহলে ভারতীয়েরা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকারহীন হইয়া "কুলি-মজুরের" উপযুক্ত জীবন নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

সম্প্রতি সিংহলে আর একটি নূতন ভারত-বিরোধী ব্যবস্থার সূচনা করা হইয়াছে। এবার চেষ্টা হইতেছে যাহাতে কোন ব্যক্তি সিংহলে কোন প্রকার "স্থায়ী দাবী" (abiding interest) না থাকিলে কোন প্রকার ভোটের অধিকার না পায়। সিংহল ব্যবস্থাপক সভার ও সিংহল জাতীয় মহাসভার সভ্য শ্রীযুক্ত ফরেষ্টার অভয়শেখর মহাশয় খবরের কাগজে একটি ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি বলিতেছেন,

"গত শুক্রবার শ্রীযুক্ত ডি, সিলভা একজন গণ্যমান্ত ভদ্রলোককে আমার সম্মুখে বলিলেন যে, সকল ইংরেজের সিংহলের উপর "স্থায়ী দাবী" আছে। সুতরাং আমাদের সভায় আমরা যেরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকি না কেন, এবং তাহাতে সাধারণে যাহাই বুঝিয়া থাকুন না কেন, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ভারতীয়দিগের সম্বন্ধেই বিশেষ বিধিব্যবস্থা করা।"

উপরের কথা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, সিংহলবাসী—প্রধানত বৌদ্ধ—ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে বিশেষ নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ইংরেজদিগকে বিশেষ সুবিধা দান করিতে ইচ্ছুক। ইহা যে শুধু নির্বুদ্ধিতা এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতার পরিচায়ক তাহা নহে—ইহাতে বিশেষ কাপুরুষতা এবং দাস মনোভাবজাত নকল ইংরেজী অহঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়!

আমেরিকার ডাইনী-হত্যা

লিটেরারী ডাইজেষ্ট পত্রে দেখিলাম :—

জন, এইচ ব্লিমায়ার (বয়স ৩৩ বৎসর); জন কারী (বয়স ১৫); এবং উইলবার্ট জি, হেস (বয়স আঠার) তাহারা নেলসন, ডি, রেমেইয়ার নামক একজন বৃদ্ধ কৃষিজীবীকে হত্যা করিয়াছে! হত্যাকারীগণ বলে যে রেমাইয়ার তাহাদিগকে গুণ বা যাদু করিয়াছিল। রেমেইয়ারকে তাহারা তাহার নিজের ঘরে প্রহার করিয়া হত্যা করে এবং তাহার ঘরবাড়ী লুঠ করিয়া ও তাহার দেহ অগ্নিসাৎ করিয়া দিয়া পলায়ন করে। হত্যাকারীগণ বলে যে, হত্যাকাণ্ড পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ছিল না এবং তাহারা রেমেইয়ারের বাড়ীতে শুধু যাদু নষ্ট করিবার জন্যই গিয়াছিল। রেমেইয়ার হেসের পরিবারবর্গের উপর যাদু লাগাইয়া ছিল এবং যাদু ভাঙিবার জন্য তাহাদের মতে রেমেইয়ারের নিকট হইতে "দি লং লষ্ট ফ্রেণ্ড" নামক একখানা পুস্তক সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল; অভাবে রেমেইয়ারের মাথার একগোছা চুল কাটিয়া লইয়া আট ফুট গভীর একটা গর্ত্তে পোঁতা দরকার ছিল। সে মারা যায় তাহার কারণ চুল কাটিতে দিতে সে বাধা দেয়।

পেনসিলভেনিয়ার, ইয়র্ক সহরে একটা হত্যাকাণ্ডের বিচার চলিতেছে, তাহার তুলনা মেলা ভার। এরূপ হত্যাকাণ্ড বর্ত্তমানকালে আর হয় নাই বলিলেই চলে। হত্যাকারী অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে। ইয়র্কের করোনার ডাঃ এল, ইউ, জেক নাকি বলিয়াছেন যে, ইয়র্কের অন্ততঃ অর্দ্ধেক বাসিন্দা গুণ, ডান যাদু প্রভৃতিতে আস্থাবান। মিস মেয়োর সভ্যতম দেশের এ কি দুর্গতি হইল!

এশিয়ার নেতৃত্ব

জাপান ম্যাগাজিনে ডাঃ জে ইন্‌গ্রাম ব্রায়ান লিখিয়াছেন :—

"Asia represents the greater portion of mankind; and the future of the world very largely

depends on what Asia may think, become and do, especially during the next half century. Until the rise of the Roman Empire Asia ruled the world, for Asia was the world. What Asia may come to think and do depends very much on the attitude of justice and fairplay with which western nations meet the needs and rights of the Far East. In the solution of this vital problem Japan will play an ever increasing and important part; for Japan is the most modern and progressive of all the Asiatic nations; in the opinion of many she is the greatest of them, and may with assurance look forward to a position of decisive leadership in Asia."

তাৎপর্য্য। "এশিয়াবাসীরা মানবজাতির অধিকাংশ। এশিয়া কি ভাবিবে, হইবে ও করিবে—বিশেষতঃ আগামী অৰ্দ্ধশতাব্দীতে, তাহার উপর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বহুপরিমাণে নির্ভর করে। রোমান সাম্রাজ্যের উদ্ভব পর্য্যন্ত এশিয়া পৃথিবী শাসন করিয়াছিল, কারণ এশিয়াই তখন পৃথিবী ছিল। পাশ্চাত্য জাতিরা কিরূপ সততা ও ন্যায়পরতার সহিত সুদূর প্রাচীর দাবী ও অধিকার অনুসারে কাজ করিবে, তাহার উপর এশিয়া কি ভাবিবে ও করিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে। এই অত্যাবশ্যক সমস্যা-সমাধানে জাপানের করণীয় অংশ গুরুত্ববিশিষ্ট ও ক্রমবৰ্দ্ধমান হইবে; কারণ, জাপান এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নব্যরীতির অনুসারী ও প্রগতিশীল; অনেকের মতে জাপান তাহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় জাতি এবং এশিয়ার নিশ্চিত নেতৃত্ব পূর্ণবিশ্বাসের সহিত আশা করিতে পারে।"

প্রাচীনকালে জাপান তাহার ধর্ম্ম, দর্শন, সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য, মূর্ত্তি ও চিত্রকলা প্রভৃতি সভ্যতার অঙ্গের জন্য ভারতের নিকট বহুপরিমাণে ঋণী ছিল। ভারতবর্ষ জাপানের চেয়ে বড় দেশ এবং ভারতের লোকসংখ্যাও বেশী। এক শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে, ভারত এশিয়াকে জ্ঞানালোক দিবে।

কিন্তু এখন লোকে আশা করিতেছে, জাপানই এশিয়ার নেতা হইবে। ইহার কারণ কি? জাপান সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইহা প্রধান কারণ বটে। পরাধীনতার জন্য আমরা এশিয়ার পথপ্রদর্শক হইতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদের পরাধীনতাও ত সম্পূর্ণরূপে না হউক, বহুপরিমাণে আমাদেরই দোষে ঘটিয়াছে। সেই দোষ "উচ্চ" ও "নীচের" পরস্পরের যোগের অভাব, "নীচের" প্রতি "উচ্চে"র তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা ও অত্যাচার, যাহার ফলে ভারতের জ্ঞান, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, সভ্যতা ও শৌর্য্য বহুপরিমাণে উচ্চজাতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে।

—

খৃষ্টিয়ানদিগের ভারতীয় হইবার চেষ্টা

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যদি সাক্ষাৎভাবে ইহুদীদের দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিত, তাহা হইলে উহা এশিয়াজাত বলিয়া উহার প্রাচ্যভাব যতটা এদেশে থাকিত, প্রধানতঃ ইউরোপ হইতে উহা আসায় ততটা নাই। উহা জুডিয়া হইতে আসিলেও, প্রাচ্যভাবাপন্ন হইলেও, উহাকে ভারতীয় করিবার প্রয়োজন থাকিত। উহা ইউরোপ হইতে আসায় সেই প্রয়োজন খৃষ্টিয়ান নেতারা আরও অধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া আসিতেছেন। কারণ, কোন জিনিষ বিদেশী হইয়া থাকিলে, দেশের বাহ্য ও আন্তরিক চেহারার সহিত তাহার সামঞ্জস্য না থাকিলে, তাহার স্থায়িত্ব জন্মে না এবং তাহা পুরাপুরি দেশী ও ফলপ্রদ হয় না।

বাংলা দেশে রামপ্রসাদী সুরের খৃষ্টিয়ানী গান রচিত হইয়াছে, খৃষ্টিয়ানী কীর্ত্তন হয়; পুরীতে যীশু খৃষ্টের আরতি হয় এবং শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে। বাইবেলের এবং খৃষ্টীয় উপাসনা-পদ্ধতির সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছে।

সম্প্রতি সুপরিচিত মান্দ্রাজী খৃষ্টিয়ান মিঃ কে, টি, পল ন্যাশন্যাল ক্রিশ্চিয়ান কৌন্সিল রিভিউতে "আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি কেমন করিয়া ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইতে পারে" ("How Could Indian Life and Culture Pervade our Educational System") এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার নানা উপায়ের সঙ্কেতও তিনি দিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন:—

We should see how very poverty-stricken is the preparation we afford to the youth who comes to

us for help before he enters the welter of Indian life. Do we provide any Indian background at all? Does he find with us a chance to discern the good and beautiful in Indian life and culture, such as will set to him standards of practical value later in life? Does he at least find among us a thorough-going and convinced appreciation of India, of ancient India and modern India, of the India of Tagore and Gandhi and Natarajan, as also of the struggling foot soldier in the common-place struggles of India—such as will hearten him to a faith in India, a faith that will save him from the mad unreasoning swallowing of every nostrum which is presented by the demagogue of the hour? He sees that we are giving ourselves unstintingly to India; but he knows that it is because we have faith in what we can give India. Does he see also that we have faith in India in what is intrinsic in the soul of India? Is he getting such an under-girding of his faith, such a background for his future?

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, তিনি চান, যে, খৃষ্টিয়ান স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা যেমন একদিকে দেখিবে যে উঁহাদের শিক্ষকেরা ভারতবর্ষকে মুক্তহস্তে কিছু দিতেছেন, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের গুণগৌরব সৌন্দর্য্যও তাঁহারা বুঝেন, ভারতের আত্মার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে।

খৃষ্টিয়ান স্কুলকলেজ সমূহের ভারতীয়তাপাদনের জন্য মিঃ পল যে-সব প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি এই, যে, তৎসমুদয়ের বিদেশী শিক্ষকদিগকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন-না-কোন অঙ্গের সহিত—ভারতীয় ধর্ম্ম, ললিতকলা, লোকসাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতির কোন একটির সহিত—সম্যক পরিচিত হইতে হইবে, এবং যে প্রদেশে তাঁহারা কাজ করেন তাহার ভাষা ও সাহিত্য বরাবর অধ্যয়ন করিতে হইবে। সেই জন্য তিনি বলিতেছেন:—

As for the foreign members of the staff, he should be given time to prepare himself in some line of study that is Indian. If he is an arts, philosophy, history or economics man, this is clearly possible. If he is a science or mathematics man, he should be certainly asked to pay the price of some line of study in Indology—art, architecture, music, folk-lore, religion, whatever is possible for him. Surely to the products of the Anglo-Saxon universities who decide to devote their lives to Indian education, this should not be difficult. All foreign members of the staff should become conversant with the main language of the province and pursue its literature throughout their career in India. This should be *sine qua non.*

খৃষ্টীয় নেতাদের ভারতবর্ষের প্রতি মনের ভাব এবং তৎপ্রসূত চেষ্টা হইতে ভারতীয় মুসলমানদের কিছু শিখিবার আছে। ভারতে মুসলমান-সমাজ তাহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে কতকটা ভারতীয়ভাবাপন্ন হইয়াছে বটে; কিন্তু ভারতের মুসলমানদের নেতারা জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য মুসলমানদিগকে আরবীয় ভাবাপন্ন করা ও রাখা। পোষাকে তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিতে চান, চাল-চলনে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, দেশী ভাষা যদি দয়া করিয়া ব্যবহার করেন তাহাতে যথাসাধ্য (অনাবশ্যক হইলেও) আরবী ফারসী কথা ঢুকাইতে চান। যাহা ভারতের নিজস্ব তাহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা কিরূপ আছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

—

সভাপতি পটেলের সিদ্ধান্ত

বল্‌শেভিক বিতাড়ন বিল সম্বন্ধে সভাপতি পটেল মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, মীরাটে ষড়যন্ত্রের বিচার এবং ঐ বিলের আলোচনা একসঙ্গে হইতে পারে না, এবং ঐ বিল পেশ করা নিয়মবিরুদ্ধ হইয়াছে। মোকদ্দমাটি বিচারাধীন থাকিবার সময় বিলটির আলোচনা হইলে সে আলোচনা ফাঁকি ও প্রহসন মাত্র হইবে। সভাপতি মহাশয় ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন।

আজ ২৯শে চৈত্র এবিষয়ে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার দুই অঙ্গকে তাঁহার বক্তব্য জানাইবার কথা আছে।

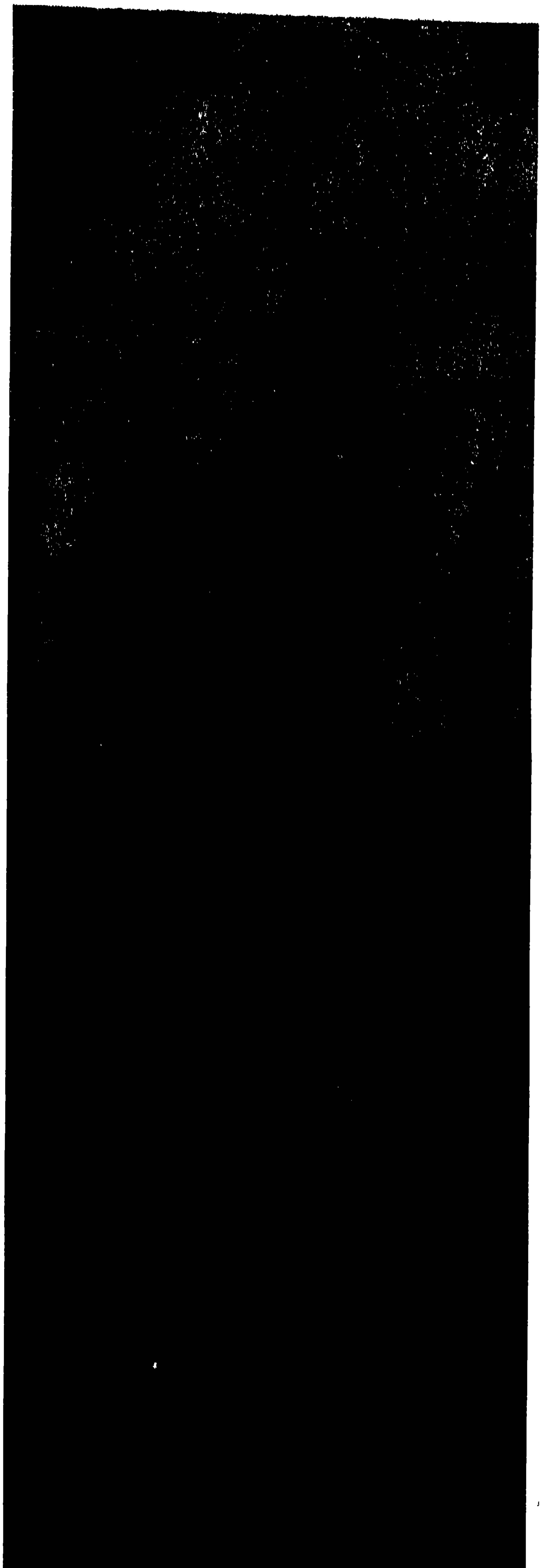

জেলে

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ | ২য় সংখ্যা

শিবাজী ও আফজল্ খাঁ

শ্রীযদুনাথ সরকার

(১)

১৬৫৬ সালের ৪ঠা নবেম্বর বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হইল, এবং অপরিণত-বুদ্ধি রাজকার্য্যে অনভ্যস্ত যুবক (দ্বিতীয়) আলী আদিল শাহ্ সিংহাসনে বসিলেন। তখন মুঘল-দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা আওরংজীব। তিনি বিজাপুর অধিকার করিবার এই সুযোগ ছাড়িলেন না। আলী মৃত সুলতানের পুত্র নহেন—এই অপবাদ রটাইয়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং অন্যান্য বিজাপুরী জাগীরদারদের মত শিবাজীকেও লোভ দেখাইয়া মুঘল-পক্ষে, যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। দুইজনের মধ্যে দেনা-পাওনা লইয়া চিঠিপত্র বিনিময় হইতে লাগিল। পরে শিবাজীর দূত সোণাজী পণ্ডিত বিদর-দুর্গের সামনে আওরংজীবের শিবিরে পৌঁছিলেন (মার্চ্চ ১৬৫৭), এবং তথায় দেনা-পাওনার আলোচনায় এক মাস কাল কাটাইলেন। অবশেষে আওরংজীব শিবাজীর সব প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে মুঘল-সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য এক পত্র লিখিলেন। (২৩ এপ্রিল)।

কিন্তু ইতিমধ্যে শিবাজী মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলেন যে, তিনি নিজের হইয়া লড়িবেন,—মুঘলের পক্ষ হইয়া নহে। মুঘল-রাজ্য লুটিলেই তাঁহার লাভের সম্ভাবনা বেশী। এই ফন্দী গোপন রাখিয়া, পরামর্শ করিবার ভাণ করিয়া সোণাজীকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নিজের নিকট ফিরাইয়া আনিলেন। আর তাহার কিছুদিন পরেই মুঘল-অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ (অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের অংশ) হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। সেখানে দিল্লীশ্বরের সৈন্যও কম ছিল, এবং সেনাপতিগণও অলস, অসতর্ক। মিনাজী ভোঁশলে ও কাশী নামক দুইজন মারাঠা-সর্দ্দার ভীমা নদী পার হইয়া মুঘলদের চামারগুণ্ডা ও রায়সীন্ পরগণায় গ্রাম লুটিয়া, আহমদনগর শহরের আশেপাশে পর্য্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। আর, শিবাজী স্বয়ং ৩০এ এপ্রিল

অন্ধকার রাত্রে দড়ির সিঁড়ি বহিয়া উত্তর-পুণা জেলায় জুন্নর নগরের প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রক্ষীদের বধ করিলেন। এখান হইতে তিন লক্ষ হোণ (বারো লক্ষ টাকা), দুইশত ঘোড়া এবং অনেক মূল্যবান গহনা ও কাপড় লুটিয়া লইয়া শিবাজী সরিয়া পড়িলেন।

(২)

এই সংবাদ পাইয়া আওরংজীব ঐ অঞ্চলে অনেক সৈন্য পাঠাইলেন এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীদের খুব শাসাইয়া দিলেন। আহমদনগরের দুর্গাধ্যক্ষ মুলতফৎ খাঁ বাহিরে আসিয়া কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর চামারগুণ্ডা থানা হইতে মিনাজীকে বিতাড়িত করিলেন। এদিকে, রাও কর্ণ ও শায়েস্তা খাঁ আসিয়া পড়ায় শিবাজী জুন্নর পরগণায় আর বেশীদিন থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি সরিয়া পড়িয়া আহমদনগর জেলায় ঢুকিলেন (মে মাসের শেষে)। কিন্তু এখানে আওরংজীব কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদল লইয়া নসিরি খাঁ দ্রুত কুচ করিয়া আসিয়া শিবাজীকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া প্রায় ঘিরিয়া ফেলিলেন (৪ঠা জুন)। মারাঠারা অনেকে মারা গেল, বাকি সকলে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

তখন মুঘল-সেনানীরা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার স্থানে স্থানে সসৈন্য বসিয়া দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন; আর মাঝে মাঝে দ্রুত অগ্রসর হইয়া মারাঠা-রাজ্যে ঢুকিয়া লুঠ করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, প্রজা ও গরু-বাছুর ধরিয়া আনিয়া আবার নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। আওরংজীবের সুবন্দোবস্ত ও দৃঢ়শাসনে শিবাজী আর কোনই অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। বর্ষা আরম্ভ হইল; দুই পক্ষই জুন জুলাই আগষ্ট মাস আপন আপন সীমানার মধ্যে বসিয়া কাটাইলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে বিজাপুর-রাজ আওরংজীবের সহিত সন্ধি করিলেন। তখন শিবাজী আর কাহার বলে লড়িবেন? তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া নসিরি খাঁর নিকট দূত পাঠাইলেন। খাঁ শিবাজীর প্রার্থনা যুবরাজকে জানাইলেন, কিন্তু কোনো সদুত্তর আসিল না। তাহার পর শিবাজী রঘুনাথ বল্লাল কোবড়েকে সোজা আওরংজীবের নিকট পাঠাইলেন। যুবরাজ অবশেষে (জানুয়ারি ১৬৫৮) শিবাজীর বিদ্রোহ ক্ষমা করিয়া এবং মারাঠা প্রদেশে তাঁহার অধিকার স্বীকার করিয়া এক পত্র দিলেন; আর এদিকে শিবাজীও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি মুঘল-সীমানা রক্ষা করিবেন, নিজের পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য আওরংজীবের অধীনে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইবেন, এবং সোণাজী পণ্ডিতকে নিজ দূত করিয়া যুবরাজের দরবারে রাখিবেন।

কিন্তু আওরংজীব সত্যসত্যই শিবাজীকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি তখন দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য উত্তর-ভারতে যাইতেছেন। দাক্ষিণাত্যে নিজ সৈন্যদিগকে শিবাজীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গেলেন। মির জুমলাকে লিখিলেন (ডিসেম্বর ১৬৫৭)—"নসিরি খাঁ চলিয়া আসায় ঐ প্রদেশটা খালি হইয়াছে। সাবধান, সেই কুত্তার বাচ্চা সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।" আদিল শাহকে লিখিলেন—"এই দেশ রক্ষা করিও। শিবাজী এ দেশের কতকগুলি দুর্গ চুরি করিয়া দখল করিয়াছে। তাহাকে সেগুলি হইতে দূর করিয়া দাও। আর যদি শিবাজীকে চাকর রাখিতে চাও, তবে তাহাকে কর্ণাটকে জাগীর দিও,—যেন সে বাদশাহী রাজ্য হইতে দূরে থাকে এবং উপদ্রব বাধাইতে না পারে।"

(৩)

কিন্তু ১৬৫৮ ও ১৬৫৯ এই দুই বৎসর ধরিয়া মুঘল-রাজকুমারগণ সিংহাসন লইয়া যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায়, শিবাজীর ঐদিক হইতে কোনই ভয়ের কারণ রহিল না। আর গত যুদ্ধে মুঘলদের কাছে পরাজয় হইল কাহার দোষে,—এই লইয়া বিজাপুরী মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। প্রধান মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদ রাজধানীতে খুন হইলেন। এই গণ্ডগোলের সুযোগে শিবাজী স্বচ্ছন্দে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। পশ্চিমঘাট (অর্থাৎ সহ্যাদ্রি পর্ব্বতমালা) পার হইয়া তিনি উত্তর-কোঁকন, অর্থাৎ বর্ত্তমান থানা জেলায় ঢুকিয়া বিজাপুরের হাত হইতে কল্যাণ এবং ভিবণ্ডী নগর দুটি কাড়িয়া লইলেন; তথায় তাঁহার অনেক ধনরত্ন লাভ হইল (২৪ অক্টোবর, ১৬৫৭)।

বিজাপুরের অধীনে মুল্লা আহমদ নামক একজন আরব

ওমরা এই কল্যাণ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শিবাজীর সেনাপতি আবাজী সোনদেব ঐ দেশ অধিকার করিবার সময় মুল্লা আহমদের সুন্দরী তরুণী পুত্রবধূকে বন্দী করিলেন এবং শিবাজীর নিকট ভোগের উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু শিবাজী বন্দিনীর দিকে একবার-মাত্র চাহিয়া বলিলেন, "আহা! আমার মা যদি এর মত হইতেন, তবে কি সুখের বিষয় হইত! আমার চেহারাও খুব সুন্দর হইত!" এইরূপে মেয়েটিকে মা বলিয়া ডাকিয়া আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে বস্ত্র অলঙ্কার-সমেত বিজাপুরে তাহার শ্বশুরের নিকট সসম্মানে পাঠাইয়া দিলেন। সেই যুগে ইহা এক নূতন ঘটনা,—শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল।

ইহার পর শিবাজী কল্যাণ ও ভিবণ্ডীর উত্তরে মাহুলী-দুর্গ দখল করিলেন (৮ জানুয়ারী, ১৬৫৮)। এইরূপে উত্তর-কোঁকন দখল করিয়া ক্রমে দক্ষিণ দিকে কোলাবা জেলার কিয়দংশ অধিকারে আনিলেন এবং তথায় অনেক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। কল্যাণের উত্তরে পর্ত্তুগীজদের দামন প্রদেশের কয়েকটি গ্রাম লুঠ করিয়া শিবাজী আসিরি দুর্গে স্থায়িভাবে আড্ডা গাড়িলেন। আর, কল্যাণের নীচে সমুদ্রের খাঁড়িতে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া মারাঠী নৌসেনার সূত্রপাত করিলেন।

(৪)

১৬৫৮ সালের প্রথমভাগে আওরংজীব দাক্ষিণাত্য হইতে চলিয়া গেলেন, তখন বিজাপুর রাজ্য শান্তি ও নূতন বল পাইল। মন্ত্রী খাওয়াস্ খাঁ বেশ বিচক্ষণ লোক, আর রাজমাতা বড়ী সাহিবা অত্যন্ত তেজ ও দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। চারিদিকে অবাধ্য সামন্তদিগকে দমন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। শাহজীকে হুকুম করা হইল যে, তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রকে বশে আনুন। তিনি উত্তর দিলেন—"শিবা আমার ত্যাজ্য-পুত্র। আপনারা তাহাকে সাজা দিতে পারেন, আমার জন্য সঙ্কোচ করিবেন না।"

তখন শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো সাব্যস্ত হইল। কিন্তু ভয়ে কোনো ওমরাই এই সময়-অভিযানের নেতা হইতে সম্মত হইলেন না। সুলতান তখন দরবারের মধ্যে একটি পানের বিড়া রাখিয়া বলিলেন,—"যিনি এই যুদ্ধের নেতা হইতে প্রস্তুত, কেবল তিনিই এই বিড়া তুলিয়া লইবেন এবং তাঁহাকে বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হইবে।"

আবদুল্লা ভটারি (পাচক-বংশীয়), উপাধি আফজল খাঁ; বিজাপুর-রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর ওমরা; মুঘলদের সহিত গত যুদ্ধে তিনি অনেকবার বীরত্ব ও প্রভুভক্তি দেখাইয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনিই পানের বিড়াটি খপ্ করিয়া উঠাইয়া লইলেন, এবং সগর্ব্বে বলিলেন যে, ঘোড়ার উপর বসিয়া থাকিয়াই তিনি শিবাজীকে পরাস্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিবেন।

কিন্তু গত যুদ্ধের ফলে রাজসরকারের অর্থ ও লোকবল বড়ই কমিয়া গিয়াছে। কাজেই আফজলের সঙ্গে দশ হাজার অশ্বারোহীর বেশী সৈন্য পাঠানো সম্ভব হইল না। এদিকে শিবাজীর অশ্বারোহী-সৈন্যই ত দশ হাজারের বেশী, তাহার উপর লোকে বলিত, জাবলী-জয়ের ফলে তাঁহার অধীনে ষাট হাজার মাব্‌লে পদাতিক জুটিয়াছে। এছাড়া একদল সাহসী, রণদক্ষ পাঠান বিজাপুরের চাকরি হারাইয়া তাঁহার বেতনভোগী হইয়াছিল। সুতরাং বিজাপুরের রাণী-মা আফজলকে বলিয়া দিলেন,—"বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া শিবাজীকে ভুলাইয়া বন্দী করিতে হইবে।" (তৎসাময়িক ইংরাজ-বণিকের চিঠিতে একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে।)

(৫)

আফজল খাঁ বিজাপুর হইতে প্রথমে সোজা উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ তুলজাপুরে পৌছিয়া সেখানকার ভবানী-মূর্ত্তি ভাঙিয়া জাঁতায় পিষিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন।* তাহার পর পশ্চিম দিকে ফিরিয়া তিনি সাতারা শহরের ২০ মাইল উত্তরে বাই নামক নগরে পৌছিলেন (এপ্রিল ১৬৫৯)। এই নগরটি তাঁহার জাগীরের সদর ছিল। এখানে অনেক মাস থাকিয়া, কিরূপে শিবাজীকে

* মারাঠী গাথায় আছে, তিনি তুলজাপুরের পর মানিকেশ্বর, পংঢারপুর, এবং মহাদেবপুর পর্য্যন্তও দেবমূর্ত্তির প্রতি অত্যাচার অবমাননা করেন। শ্রীযুক্ত রিয়াসৎ ঠিকই ভাবে বলেন, এ কথা সত্য নহে।

পাহাড় হইতে খোলা জায়গায় আনা যায় অথবা স্থানীয় মারাঠা-জমিদারদের সাহায্যে বন্দী করা যায়, তাহার ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। বিজাপুর সরকার অধীনস্থ সমস্ত মাব্‌লে দেশমুখদিগকে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, যেন তাঁহারা সৈন্য দিয়া আফজলের সহায়তা করেন। ইহার কিছু ফলও হইয়াছিল। রোহিড়খোরের দেশমুখী লইয়া খণ্ডোজী খোপ্‌ড়ে ও কান্‌হোজী জেধের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। কান্‌হোজী শিবাজীর পক্ষে ছিল। খণ্ডোজী আসিয়া আফজল খাঁর সহিত যোগ দিল এবং লিখিয়া অঙ্গীকার করিল যে, ঐ গ্রামের দেশমুখী তাহাকে দিলে সে শিবাজীকে ধরিয়া আনিয়া দিবে। খোপ্‌ড়েকে নিজ অনুচরসহ আফজলের সেনার অগ্রভাগের নেতা করা হইল।

বর্ষার শেষে অক্টোবর মাসে সৈন্যচালনা করিবার উপযুক্ত সময় আবার আসিবে। ইতিমধ্যে শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে পৌঁছিয়াছেন। এই দুর্গ বাই হইতে মাত্র ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আফজল খাঁ নিজ দেওয়ান কৃষ্ণাজী ভাস্করকে দিয়া শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"তোমার পিতা আমার বহুকালের বন্ধু, সুতরাং তুমি আমার নিকট অপরিচিত পর নহ। আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা কর, আমি বিজাপুরের সুলতানকে বলিয়া রাজি করাইব যাহাতে তোমার দুর্গগুলি ও কোঁকন প্রদেশ তোমারই অধিকারে থাকে। আমি দরবার হইতে তোমাকে আরও মান এবং সৈন্যের সরঞ্জাম দেওয়াইব। যদি তুমি স্বয়ং দরবারে হাজির থাকিতে চাও, ভালই, উচ্চ সম্মান পাইবে। আর যদি তথায় উপস্থিত না হইয়া নিজ জাগীরে বাস করিতে চাও, তাহারও অনুমতি দিবার ব্যবস্থা করিব।"

(৬)

ইতিমধ্যে আফজল খাঁর আগমন-সংবাদে শিবাজীর অনুচরগণের মধ্যে মহা ভয় ও ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা এ পর্য্যন্ত ছোটখাট লড়াই ও সামান্য পদের লোকজনের ধনসম্পত্তি লুটপাট করিয়াছে। এইবার এক শিক্ষিত, সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী এক বিখ্যাত বীর সেনাপতির অধীনে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে আসিয়াছে, বিজাপুর হইতে বাই পর্য্যন্ত অপ্রতিহত তেজে অগ্রসর হইয়াছে, মারাঠারা তাহাদের বাধা দিতে মোটেই সাহস পায় নাই। আফজল খাঁর অদম্য শক্তি ও নিষ্ঠুরতার গল্প দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শিবাজী প্রথম যেদিন নিজ প্রধানদের ডাকিয়া তাহাদের মত জানিতে চাহিলেন, সকলেই ভয়ে তাঁহাকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিল, বলিল—যুদ্ধ করিলে বৃথা প্রাণনাশ হইবে, জয়লাভ অসম্ভব।

শিবাজী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। যদি তিনি এখন আদিল শাহের বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে;—তাঁহাকে হয় বিজাপুরের বন্দীশালায়, না হয় পুণায় নগণ্য আজ্ঞাবাহী জাগীরদার হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে। আর যদি এখন বিজাপুর-রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন, তবে সুলতান আমরণ তাঁহার শত্রু হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহাকে অবশিষ্ট জীবন একেবারে অসহায় বন্ধুহীন অবস্থায় মুঘল ও অন্যান্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া কাটাইতে হইবে। সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে তাঁহার চিন্তা-জর্জরিত দেহে তন্দ্রা আসিল। প্রবাদ আছে, স্বপ্নে ভবানী দেবী তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "বৎস! ভয় নাই, আমি তোমায় রক্ষা করিব। আফজলকে আক্রমণ কর,—তোমারই জয় হইবে।"

আর সংশয় রহিল না। প্রাতঃকালে আবার মন্ত্রণা-সভা বসিল। শিবাজীর বীর-বাণী এবং দেবীর আশীর্ব্বাদের কথা শুনিয়া প্রধানগণ সকলেই উৎসাহে মাতিয়া যুদ্ধে মত দিল। মাতা জীজা বাঈও শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহারই জয় হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

যুদ্ধে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে কিরূপে রাজ্য চালাইতে হইবে, শিবাজী তখন নিজ কর্ম্মচারীদিগকে সে বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিলেন। অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সহিত আফজলকে আক্রমণ করিবার বন্দোবস্ত স্থির করা হইল। পেশোয়া ও সেনাপতি (নেতাজী)-র অধীনে দুইটি বড় সৈন্যদল আনাইয়া তাহাদের

প্রতাপগড়ের কাছে বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল।

(৭)

এমন সময় আফজলের দূত কৃষ্ণাজী ভাস্কর আসিয়া শিবাজীকে খাঁর সহিত দেখা করিতে আহ্বান করিলেন। শিবাজী এই ব্রাহ্মণকে খুব খাতির-যত্ন করিলেন; রাত্রে তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে ঢুকিয়া জানাইলেন, "আপনি হিন্দু ও পুরোহিত-জাতি। আমিও হিন্দু। সত্য করিয়া বলুন, আফজল খাঁর অভিসন্ধি কি?" পীড়াপিড়িতে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণাজী উত্তর দিলেন যে, খাঁর অভিপ্রায় সাধু নহে।

পরদিন শিবাজী নিজ পক্ষের দূত পন্তাজী গোপীনাথকে কৃষ্ণাজী ভাস্করের সহিত আফজলের শিবিরে পাঠাইলেন। খাঁ পন্তাজীর নিকট শপথ করিলেন যে, দেখা করিবার সময় তিনি শিবাজীর কোনই অনিষ্ট করিবেন না। আর, শিবাজীর তরফ হইতে পন্তাজী অঙ্গীকার করিলেন যে, আফজলের প্রতি সে সময় কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে না। কিন্তু শিবাজীর দূত প্রচুর ঘুষ দিয়া সেখানকার বিজাপুরী-সর্দ্দারদের নিকট হইতে সন্ধান লইলেন, "খাঁ এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে,সাক্ষাতের সময় তিনি শিবাজীকে বন্দী করিবেন, কারণ শিবাজীর মত ধূর্ত্তকে যুদ্ধে বশ করা অসম্ভব।" এই-সব কথা শুনিয়া শিবাজী যাহাতে আফজলকে বধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তাহার পর শিবাজী জানাইলেন যে, খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সন্ধি স্থির করিতে সম্মত, কিন্তু বাই নগরে যাইতে ভয় পাইতেছেন; প্রথমে খাঁ তাঁহার বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখা করিয়া তাঁহাকে অভয় দিন, তাহার পর তিনি খাঁর শিবিরে যাইবেন।

আফজল রাজি হইলেন। উভয়ের সাক্ষাতের জন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিছু নীচে একটি পাহাড়ের মাথার উপর তাঁবু খাটানো হইল, এবং বন কাটিয়া সেখানে যাইবার পথ প্রস্তুত করা হইল। আফজল খাঁ সসৈন্য বাই হইতে কুচ করিয়া মহাবলেশ্বর অধিত্যকার ভিতর দিয়া "পার" নামক গ্রামে আসিয়া ছাউনী করিলেন। গ্রামটি প্রতাপ-গড়ের এক মাইল দক্ষিণে, নীচের সমতলভূমিতে। তাঁহার সৈন্যগণ কয়না নদীর ধারে গভীর উপত্যকায় চারিদিকে আশ্রয় লইল।

(৮)

সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট দিনে (১০ই নবেম্বর, ১৬৫৯) আফজল খাঁ প্রথমে পার-গ্রামের শিবির হইতে এক হাজার বন্দুকধারী রক্ষী লইয়া, পাল্‌কীতে চড়িয়া প্রতাপগড়ের দিকে উঠিতে লাগিলেন। পন্তাজী গোপীনাথ বলিলেন যে, এত সৈন্য দেখিয়া শিবাজী ভয় পাইবেন এবং সাক্ষাত করিতে আসিবেন না, সুতরাং খাঁ আর-সকলকে বিদায় দিয়া মাত্র দুজন রক্ষী লইয়া উপরে উঠুন। তাহাই করা হইল। আফজলের সঙ্গে চলিল—দুইজন সৈনিক, বিখ্যাত তলোয়ার-বাজ বীর সৈয়দ বান্দা, এবং দুই পক্ষের দুইজন ব্রাহ্মণ দূত, অর্থাৎ পন্তাজী ও কৃষ্ণাজী।

যে তাঁবুতে উভয়ের মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তথায় পৌঁছিয়া সেখানকার মহামূল্য সাজসজ্জা ও বিছানাপত্র দেখিয়া আফজল রাগিয়া বলিলেন, "কি! সামান্য জাগীরদারের ছেলের এত আড়ম্বর!" কিন্তু পন্তাজী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এসব দ্রব্য সন্ধির উপহার-স্বরূপ বিজাপুর-রাজকে দিবার জন্য আনা হইয়াছে।

তখন শিবাজীকে ডাকিবার জন্য প্রতাপগড়ে লোক পাঠানো হইল। তিনি জামার নীচে লুকাইয়া লোহার জালের বর্ম্ম এবং পাগড়ীর নীচে ছোট কড়াইএর মত ইস্পাতের টুপী মাথায় পরিলেন। বাহির হইতে দেখিলে বুঝিবার যো নাই যে, তাঁহার শরীরে কোন অস্ত্র লুকানো আছে; কিন্তু তাঁহার বাম হাতের আঙুলে কড়া দিয়া লাগানো 'বাঘনখ' নামক তীক্ষ্ণ বাঁকা ইস্পাতের নখরগুলি মুঠির মধ্যে লুকানো ছিল,আর ডান হাতের আস্তিনের নীচে 'বিছুয়া' নামক সরু ছোরা ঢাকা ছিল। তাঁহার সঙ্গে দুইজন শরীর-রক্ষক—জীব মহালা নামক নাপিত (তলোয়ার-খেলায় দক্ষ) এবং শম্ভুজী কাবজী; উভয়েই অসমসাহসী, ক্ষিপ্রহস্ত ও তেজীয়ান পুরুষ। ইহাদের প্রত্যেকের হস্তে দুইখানা তরবারি ছিল। প্রতাপগড় দুর্গ হইতে নামিবার সময় শিবাজী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন। শুভ্রবসনা দেবী-প্রতিমা

জীজা বাঈ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার জয় হউক", এবং শিবাজীর সঙ্গিগণকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, "আমার পুত্রকে রক্ষা করিও।" তাহারা উৎসাহে প্রতিজ্ঞা করিল—"তাহাই করিব।"

(৯)

প্রতাপগড় দুর্গ-শিখর হইতে নামিয়া শিবাজী তাঁবুর দিকে কিছুদূর ধীরে ধীরে যাইবার পর হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, সৈয়দ বান্দাকে মিলনের স্থান হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। তাহাই করা হইল। অবশেষে শিবাজী মিলনের শামিয়ানাতে প্রবেশ করিলেন। এই বস্ত্রগৃহে উভয় পক্ষেরই চারিজন করিয়া লোক উপস্থিত ছিল,—স্বয়ং নেতা, দুইজন শরীর-রক্ষক, এবং একজন ব্রাহ্মণ দূত। শিবাজী দেখিতে নিরস্ত্র, কিন্তু আফজল খাঁর কোমরে তলোয়ার ঝুলিতেছে।

সঙ্গীরা সকলে নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। শামিয়ানার মধ্য-স্থলে যে বেদীর মত অল্প উঁচু স্থানে আফজল খাঁ বসিয়া-ছিলেন, শিবাজী তাহার উপর চড়িলেন। খাঁ গদি হইতে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই বাহু বিস্তার করিয়া দিলেন। শিবাজী বেঁটে ও সরু, তিনি বিশালকায় আফজলের কাঁধ পর্য্যন্ত উঁচু। সুতরাং খাঁর বাহু দুটি শিবাজীর গলা ঘিরিল। তারপর হঠাৎ আফজল খাঁ শিবাজীর গলা নিজ বামবাহু দিয়া লৌহবেষ্টনে চাপিয়া ধরিলেন, এবং ডান হাত দিয়া কোমর হইতে লম্বা সোজা ছোরা (যমধর) খুলিয়া শিবাজীর বাম পাঁজরে ঘা মারিলেন। কিন্তু অদৃশ্য বর্ম্মে বাধিয়া ছোরা দেহে প্রবেশ করিতে পারিল না। গলার চাপে শিবাজীর দমবন্ধ হইবার মত হইল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি বাম বাহু সজোরে ঘুরাইয়া আফজল খাঁর পেটে বাঘনখ বসাইয়া দিয়া, তাঁহার পাকস্থলীর পর্দ্দা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, খাঁর ভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িল। আর, ডানহাতে 'বিছুয়া' লইয়া খাঁর বাম পাঁজরে মারিলেন। যন্ত্রণায় আফজল খাঁর বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল; এই সুযোগে শিবাজী নিজেকে মুক্ত করিয়া বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিজ সঙ্গীদের দিকে ছুটিলেন। এসব ঘটনা এক নিমেষে শেষ হইল।

ঘা খাইয়াই আফজল খাঁ চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"মারিল, মারিল, আমাকে প্রতারণা করিয়া মারিল!" দুই দিক হইতে অনুচরগণ নিজ নিজ প্রভুর দিকে ছুটিল। সৈয়দ বান্দা তাহার লম্বা সোজা তলোয়ার (পাট্টা) দিয়া এক কোপে শিবাজীর মাথার পাগড়ী কাটিয়া ফেলিল। তলোয়ারের ঘায় শিবাজীর পাগড়ীর নীচের লোহার টুপিটা পর্য্যন্ত টোল খাইয়া গেল, কিন্তু মস্তক রক্ষা পাইল। তিনি জীব মহালার হাত হইতে একখান তলোয়ার লইয়া সৈয়দ বান্দাকে ঠেকাইতে লাগিলেন। জীব মহালা পাশ কাটাইয়া আসিয়া প্রথমে সৈয়দের ডানহাত ও পরে মাথা কাটিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে বাহকেরা আহত আফজলকে পালকীতে শোয়াইয়া তাঁহার শিবিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শম্ভূজী কাবজী আসিয়া তাহাদের পায়ে কোপ মারায় তাহারা পালকী ফেলিয়া ছুট দিল। তখন শম্ভূজী আফজল খাঁর মাথা কাটিয়া বিজয়-গর্ব্বে তাহা শিবাজীর কাছে হাজির করিল।

(১০)

আফজল খাঁর মৃত্যুর পর অমনি শিবাজী তাঁহার রক্ষী দুইটির সহিত দ্রুতপদে পাহাড় বহিয়া প্রতাপগড় দুর্গে উঠিলেন এবং সেখান হইতে তোপধ্বনি করিলেন। এই সঙ্কেত আগে হইতেই স্থির করা ছিল। তোপের শব্দ শুনিবামাত্র পার গ্রামের নিকট ঝোপ ও পর্ব্বতের মধ্যে যেখানে শিবাজীর দুইদল সেনা লুকাইয়াছিল, সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া চারিদিক দিয়া বিজাপুরী সৈন্যদের আক্রমণ করিল। আফজলের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে তাঁহার শিবিরের কর্ম্মচারী, সিপাহী ও লোকজন একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের নেতা নাই, পথঘাট অপরিচিত, অথচ অগণিত শত্রু চারিদিক ঘিরিয়া আছে। পলাইবার পথ বন্ধ; সুতরাং তাহারা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিল। কিন্তু মারাঠারা আজ বিজয়-উল্লাসে উন্মত্ত, দুইজন নামজাদা সেনাপতি তাহাদের চালনা করিতেছেন, যুদ্ধের স্থান তাহাদের সুপরিচিত। তাহারা অদম্য বেগে শত্রু বধ

করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিন ঘণ্টার পর সব শেষ হইল। তিন হাজার বিজাপুরী সৈন্য মারা গেল। মাব্‌লেরা সামনে যাহা পাইল তাহারই উপর তরবারি চালাইতে লাগিল; পলাতক হাতীর লেজ কাটিয়া ফেলিল, দাঁত ভাঙ্গিয়া দিল, পা খাল্ করিল; উটকে কাটিয়া ভূমিশায়ী করিল। যে-সব বিজাপুরী সৈন্য পরাজয় স্বীকার করিয়া দাঁতে তৃণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিল, তাহাদের প্রাণদান করা হইল। এই যুদ্ধে শিবাজী লুঠ করিয়া বিশেষ লাভবান হইলেন। আফজল খাঁর সমস্ত তোপ, গোলাগুলি ও বারুদ, তাম্বু ও বিছানাপত্র, ধনরত্ন, মাল-সমেত ভারবাহী পশু তাঁহার হাতে পড়িল; ইহার মধ্যে ছিল ৬৫টা হাতী,চারি হাজার ঘোড়া,বার শ' উট,দু'হাজার কাপড়ের বস্তা এবং নগদ ও গহনাতে দশ লক্ষ টাকা। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ বিজাপুরী সর্দ্দার, আফজলের দুই শিশুপুত্র, এবং দুজন সাহায্যকারী মারাঠা জমিদার। যে-সব স্ত্রীলোক শিশু ব্রাহ্মণ এবং শিবিরের চাকর ধরা পড়িল, শিবাজী তৎক্ষণাৎ তাহাদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু আফজলের স্ত্রীগণ ও জ্যেষ্ঠপুত্র ফজল্ খাঁ, কয়না নদীর তীর বহিয়া খণ্ডোজী খোপড়ে ও তাহার মাব্‌লে সৈন্যের সহায়তায় নিরাপদ স্থানে পলাইয়া গেলেন।

শিবাজী তাঁহার বিজয়ী সেনাদের একত্র করিয়া পরিদর্শন করিলেন। বন্দীদের অন্ন বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইল। যে-সব মারাঠা-সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল, তাহাদের বিধবাদের পেন্‌সন দেওয়া হইল এবং বয়স্থ পুত্র থাকিলে তাহারা পিতার পদে নিযুক্ত হইল। আহত সৈনিকগণ ক্ষতের গুরুত্ব অনুসারে একশত হইতে আটশত টাকা পুরস্কার পাইল। উচ্চ সৈনিক-কর্ম্মচারীদিগকে হাতী, ঘোড়া, পোষাক ও মণিমুক্তা বক্‌শিস দেওয়া হইল।

মারাঠাদের এই প্রথম কীর্ত্তি এইখানেই থামিল না। বিজয়ী শিবাজী দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া কোলাপুর জেলা আক্রমণ করিলেন, পান্‌হালা দুর্গ হস্তগত করিয়া (২৮ নবেম্বর) রুস্তম্-ই-জমানের অধীনে অপর একটি বিজাপুরী সৈন্যদলকে পরাস্ত করিলেন (২৮শে ডিসেম্বর)। আর তাহার পর জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ-কোকনে রত্নগিরি জেলায় প্রবেশ করিয়া অনেক বন্দর ও গ্রাম লুটিলেন।

(১১)

আফজল খাঁর ভীষণ পরিণাম দেশময় আলোচনা ও গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল। "অজ্ঞানদাস" ছদ্মনাম বা ভণিতাধারী একজন কবি মারাঠী ভাষায় ঐ ঘটনা সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত তেজোপূর্ণ পোবাড়া (ব্যালাড) রচনা করেন, তাহা এখনও জনসাধারণের খুব প্রিয়। আউন্ধের রাজা বালাসাহেব পন্ত প্রতিনিধি ইদানীং ঐ ঘটনা লইয়া একটি গীতিকা লিখিয়াছেন। কিন্তু এই 'ব্যালাড' ঐতিহাসিক সত্য অনুসরণ করে নাই, শুধু সুখপাঠ্য কিংবদন্তী ও কাল্পনিক শাখাপল্লবে পূর্ণ,—যেন মহাভারতের একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

মারাঠা দেশে প্রবাদ আছে যে,যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে আফজল বিজাপুর হইতে রওনা হন, তখন নানা অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাঁহার পতাকা ভাঙিয়া পড়িয়া যায় বড় হাতীটা অগ্রসর হইতে চাহে নাই, ইত্যাদি। আর তিনি মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া রওনা হইবার পূর্ব্বেই নিজের ৬৩ জন স্ত্রীকে খুন করিয়া একই চবুতরার নীচে সমান দূরে দূরে তাহাদের কবর দিয়া মনের শঙ্কা মিটাইয়াছিলেন। বিজাপুর শহরের কয়েক মাইল বাহিরে আফজলপুরা নামক স্থানে খাঁর বাড়ী ও চাকরবাকরের বসতি ছিল। স্থানটি এখন জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; শুধু ভাঙা দেওয়াল, পরিখা ও বন-জঙ্গল ও দূরে চাষের ক্ষেত্র দেখা যায়। তাঁহার মৃত্যুর ১৪ বৎসর মাত্র পরে ফরাসী-পর্য্যটক আবে কারে ঐখানে আসিয়া দেখেন যে, কারিগরেরা খাঁর সমাধির পাথর কাটিতেছে এবং একখানা প্রস্তর-ফলকে খোদা আছে যে খাঁ তাঁহার হারেমের দুই শত স্ত্রীলোকের গলা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন! আমি ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে তথায় যাই, এবং ৬৩টি কবর দেখিতে পাই। সেগুলি যে একই সময়ে এবং একই ধরণে গড়া তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এখনও স্থানীয় কৃষকগণ ঐ খুনের বিস্তারিত বিবরণ বলে এবং সেই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন স্থান গুলি দেখাইয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অনন্ত উন্নতির কথাটা আমরা য়ুরোপ হইতে পাইয়াছি। এক সময় খৃষ্টানের ঈশ্বর দূরবর্ত্তী স্বর্গের ঈশ্বর ছিলেন এইজন্য ক্রমশ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার কথাটা তৎকালীন খৃষ্টানদের মুখেই শোভা পাইত। আমাদের ব্রহ্ম সেরূপ দূরবর্ত্তী নহেন—অতএব "পাওয়া" প্রভৃতি শব্দ তাঁহার সম্বন্ধে খাটে না। একথার আলোচনা আমি অন্যত্র অনেকবার করিয়াছি।

"আত্মবোধ" প্রবন্ধটা এখানে আমার সম্মুখে নাই এইজন্য আপনারা যে বিশেষ অংশটির কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। আত্মবোধের শেষভাগে আমি এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রহ্মের প্রকাশ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ—কেবল মানবের ইচ্ছার মধ্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ করেন নাই কারণ তাহা হইলে ইচ্ছার ধর্ম্মই লোপ হইত। হাঁ ও না দুই না থাকিলে ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। যেখানে "না" বলিবার সম্ভাবনা-মাত্রই নাই একেবারেই "হাঁ" সেখানে অনুশাসন—সেখানে প্রেম নাই, ইচ্ছা নাই। যেমন জড়-প্রকৃতি—সেখানে যাহা না ঘটিলে নয় তাহাই ঘটিতেছে—অতএব সেখানে ঈশ্বরের নিয়ম প্রকাশ পাইতেছে, প্রেম প্রকাশ পাইতেছে না। প্রেম প্রেমকে চায়, ইচ্ছা ইচ্ছাকে চায়। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে "না"-কে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া যখন তিনি "হাঁ"-কে জয় করেন তখনই আমাদের ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে যখন স্বীকার করি তখনই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মিলন হয়। সুতরাং ইহার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। একসময়ে আমাদের যে-প্রেম তাঁহাকে চায় নাই কেবল বিষয়ের রাজ্যে ঘুরিয়াছিল সেই প্রেম যখন তাঁহাকে চায় তখন তাঁহার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ায় মিলন হয়—তখনই আমার প্রেম তাঁহার প্রেমকে উপলব্ধি করে এবং চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করে। অতএব মানবাত্মার ইচ্ছার মধ্যে পরমাত্মার ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ জগতে আর কোথাও দেখিতে পাই না কেবল ভক্তের জীবনে দেখি। এ পর্য্যন্ত মানব-ইতিহাসে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে পরিপূর্ণ-মাত্রায় পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে জীবাত্মার ইচ্ছার একান্ত যোগ দেখা যায় নাই—কোথাও বা জ্ঞান প্রবল, কর্ম্ম প্রবল নহে কোথাও বা অন্যরূপ। কিন্তু এই আদর্শ যে অসম্ভব তাহা নহে। বিশ্বমানবের চিত্তে এই ইচ্ছাই গূঢ়ভাবে নিয়ত কাজ করিতেছে—সে তাঁহাকে আপনার সকল দিয়া উপলব্ধি করিবে ইহাই তাহার সাধনা—মানুষ আপনার বুদ্ধি, প্রীতি ও শক্তি এই তিন পাত্রই পূর্ণ করিয়া ভরিয়া তাঁহার অমৃত পান করিবে এই পরম ইচ্ছাটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যেই আছে—ক্রমশ এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া উঠাই প্রেমের লীলা—এই লীলা কখনই শেষ হইয়া যাইতে পারে না—কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে, এই লীলা কোনো কালে আরম্ভ হইতেও পারে না, অনন্তকাল ইহা দূরেই থাকিয়া যাইবে। বাধাব্যবধানের ভিতর দিয়া দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা চলিতেছে, তাহারই মহা আনন্দের রূপ আমরা ভক্তের জীবনের মধ্যে দেখিতে পাই। ইতি ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, নদিয়া

ভারতের গবাদি পশুসমস্যা

লেফ্‌টেনেণ্ট সচ্চিদানন্দ দত্ত, বি-এস্‌-সি,
এম্‌-আর্‌-সি-ভি-এস্‌ (লণ্ডন)

আমাদের জাতীয় জীবনে গোজাতির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। গোধন কৃষিজীবীর কার্য্যকরী মূলধন, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রচালন শক্তি ও দুগ্ধোৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন। ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশে এই বিষয়ে সাধারণজ্ঞান অত্যন্ত অল্প। বিশেষতঃ, বিশিষ্ট জনমণ্ডলীতে যেখানে বিশেষ ও স্পষ্ট জ্ঞানের আশা করা যাইতে পারে, সেখানেও চিন্তাধারা অস্পষ্ট। যাহা হউক পশুসেব্যবিজ্ঞান (Veterinary) পশুচিকিৎসা-বিদ্যা নহে) কাহাকে বলে স্পষ্ট করিয়া জানা কর্ত্তব্য। সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক সহকারী সম্পাদক (Under-Secretary of State for the Colonies) মিঃ অর্ম্সবি গোর লণ্ডনে সাম্রাজ্যের কৃষিতত্ত্বানুসন্ধান সম্মেলনে (Imperial Agricultural Research Conference) বলিয়াছেন, "আমি 'ভেটারিনারি' বলিতে কেবল গৃহপালিত পশুদিগের রোগচিকিৎসা বুঝি না। আমি পশুলালন-পালন, পশুর খাদ্যব্যবস্থা এবং পশুপ্রজনন-বিদ্যাও ইহার অন্তর্গত মনে করি। ইহাই আমার মতে 'ভেটারিনারি' শব্দের প্রকৃত অর্থ।" ভারতে 'ভেটারিনারি' শব্দের এই সংজ্ঞাই আমি দিতে চাই। আমার নিকট পশুচিকিৎসা, পশুপালন, পশুখাদ্যতত্ত্ব ও পশুপ্রজননতত্ত্ব পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিদ্যা নহে। ইহারা সমস্তই এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র। অতএব ইহাদিগকে Veterinary অথবা Livestock নামধেয় একই বিভাগের অন্তর্গত করিলে সম্পূর্ণ সুফল ফলিবে। 'ভেটারিনারি' বা জান্তব-বিজ্ঞান বিভাগ যদি-কেবল গৃহপালিত পশুদিগের রোগ-প্রতিষেধ ও চিকিৎসা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে কখনই স্বীয় প্রকৃত কার্য্যকারিতা প্রমাণ করিতে এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে পারিবে না। সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যদ্বারা পশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। ইহাতেই রোগাক্রমণ হ্রাস পায়। সুতরাং, স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, পশুপালন, পশু-খাদ্যব্যবস্থা, পশুপ্রজনন ও পশুচিকিৎসা-বিদ্যা এই কয়টির একটি অন্যটিকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না। একটি আর একটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এডিনবরা পশু-প্রজনন-গবেষক প্রতিষ্ঠানের ডক্টর ক্রু (Crew) প্রমাণ করিয়াছেন যে, মড়কপ্রতিষেধশক্তিসম্পন্ন পশু হইতে প্রায় সম্পূর্ণ মড়করোগনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধজাতি উৎপাদন করিতে পারা যায়।

আমার ইহাই দৃঢ় সংস্কার ও বিশ্বাস যে,গবাদি জাতির রোগমূলোৎপাটন বা রোগনিবারণই তাহাদের উন্নতির সর্ব্বপ্রথম সোপান। মড়কের কবল হইতে গবাদি জাতির ধ্বংস ও ক্ষতি রুদ্ধ ও অব্যাহত না হইলে ভারতের দুষ্ট-বিষাক্তভ্রমণচক্র (vicious circle) কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। দেশবাসী এই কথাটি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে, আমার মতে বিজ্ঞানসম্মত যৌননির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বনে কিংবা সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাদির দ্বারা গবাদি জাতির যতই উন্নতিচেষ্টা হউক না কেন তাহা নিষ্ফল হইবে।

একই রোগে একসময়ে অগণিত পশুহানিকর সংক্রামক রোগের সহিত যুদ্ধ করাই রাজকীয় 'ভেটারিনারি' বিভাগের প্রধান ও একমাত্র কার্য্য। নানা কারণে গভর্ণমেণ্ট সাধারণ সহজসাধ্য রোগের কিংবা বিভিন্ন পশুর রোগচিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই-সকল রোগের নিরাকরণের কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে না পারিলে সাধারণের তুষ্টিসম্পাদন করা যাইবে না। এদেশের 'ভেটারিনারি' বিভাগ এখনও ত্রিশ বৎসরের অধিক অতিক্রম করে নাই। গবাদি পশুর মহামারী নিবারণ করিবার জন্য ইহারা ইতিমধ্যেই

প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন পুরোভাগে অসম্পন্ন অত্যধিক কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহা সম্পন্ন করিবার মত সঙ্গতি একেবারে নাই বলিলেই চলে। ভারতের বহুবিস্তৃতি এবং প্রদেশগুলির প্রাকৃতিক বিশিষ্ট সীমাশূন্যতা এই সমস্যাকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। এই অভিসম্পাত হইতে কৃষিজীবিগণের বাৎসরিক ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। 'ভেটারিনারি' বিভাগ প্রতিবৎসর পশুমৃত্যুর যে তালিকা প্রকাশ করেন তাহাতে প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যা থাকা সম্ভব নহে। এক কথায় বলিতে গেলে পশুমৃত্যু-সংখ্যা গণনা অসম্ভব।

কৃষিজীবিগণের মন হইতে যতদিন না পশুমৃত্যুবিভীষিকা দূর হইবে, যতদিন না পশুসমূহ সতেজ ও দীর্ঘায়ু হইবে, ততদিন গোধনের শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে সাধারণের যত্ন ও চেষ্টা, ধন ও বুদ্ধি আকৃষ্ট হইবে না। প্রধানতঃ অর্থাভাবই কৃষকদিগকে গোজাতির উন্নতিবিধানে নিশ্চেষ্ট রাখিয়াছে। অল্পসংখ্যক নীরোগ, দীর্ঘায়ু, সর্ব্বপ্রকার উপকারক্ষম এবং সবল পশু পালন না করিয়া বহুসংখ্যক রোগবীজাণুপূর্ণ, অল্পায়ু যৎসামান্য উপকারক্ষম ও দুর্ব্বল পশুপালন করার কোনো সুসঙ্গত কারণ নাই। উভয়প্রকার পশুপালনেই ব্যয় সমান। কিন্তু শেষোক্ত পশুর কার্য্যকারিতা ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য নিতান্ত অল্প। আমাদের পশুধন গুণে হীন, কিন্তু সংখ্যায় বহু হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহারা স্বতঃই রোগপ্রবণ।

গোমহিষাদির মহামারী দূরীকরণে কৃতকার্য্য হইবার জন্য চারিটি জিনিষের আবশ্যক। প্রথমতঃ, রোগের মূলানুসন্ধান ও চিকিৎসাপ্রণালী, রোগপ্রতিষেধ এবং তদ্বিষয়ে দেশীয় ও বৈদেশিক অভিজ্ঞতা। এস্থলে রোগের মূল নিরূপণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অল্পতা বা শূন্যতাই ভাবিবার বিষয় নহে। আজ পর্য্যন্ত যে-জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়াই 'ভেটারিনারি' সার্জ্জনরা ব্রিটনদ্বীপ হইতে Sheep-pox, glanders, cattle-plague, pleuropneumonia ও rabies একেবারে নির্ম্মূল করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। চিকিৎসাব্যবসায়ী সমকর্ম্মিগণের মধ্যে স্বীয় স্থান অধিকার করিতে পারায় আজ রাজকীয় ভেষজ-ব্যবসায়ীসঙ্ঘ (Royal Society of Medicine)ও ব্রিটিশ চিকিৎসকমণ্ডলী (British Medical Association) তাঁহাদিগকে সাদরে তত্তৎ সমাজের সভ্যপদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। ব্যাধিনিরাকরণ-সংগ্রামে বদ্ধপরিকর মনীষিগণ সার্ব্বজনীন হিতসাধনে ও নাগরিক দায়িত্ব-সম্পাদনে একত্রে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশুচিকিৎসাবিদ্‌গণের সুকীর্ত্তির তালিকাও একেবারে সামান্য নহে। পশুহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত জীবন শিল্‌ষ্টন্ (Shilston) এবং গেইজার্ (Gaiger)এর মত লোক, বিজ্ঞানজগতে ইভান্সের (Evans) মত কর্ম্মী, যিনি Trypanosomeএর আবিষ্কারক ছিলেন—ভারতের সম্মান ও কৃতিত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের আস্থা ও ব্যবসায়ে কার্য্যকুশলতা লাভের জন্য উপযুক্ত লোকদিগকে আবশ্যক শিক্ষা দিতে হইবে। এজন্য এখানে 'ভেটারিনারি' কলেজগুলির সম্যক্ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। দেশে কয়েকটি মাত্র 'ভেটারিনারি' কলেজ বিদ্যমান আছে। এখন সেগুলিকে প্রয়োজনমত পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে, নতুবা সেগুলি আজকালকার নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবে না। সর্ব্বপ্রকারে গুণান্বিত লোক যে 'ভেটারিনারি' বিভাগের জন্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, যথোপযুক্ত অর্থ ব্যতিরেকে কোনো কার্য্যই সফল হইতে পারে না। এই বিভাগের খরচ সরবরাহ করিতে গবর্ণমেণ্টই অগ্রণী—এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। গবাদি পশুর সংরক্ষণ এবং উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাদের উচ্চাদর্শ এবং মহৎ সঙ্কল্প প্রশংসার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি নেহাৎ সেকেলে ও অনেকস্থলেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। জনসাধারণকে সময়োপযোগী সাহায্য করিয়া সুনাম এবং আস্থা অর্জ্জন করিতে না পারিলে সরকারী 'ভেটারিনারি' বিভাগ কদাপি দশের সাহচর্য্য ও উৎসাহলাভে সক্ষম হইবে না; গবাদি

পশুর উন্নতিকল্পে দেশীয় লোকেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অর্থদান করিবে, ইহাও আশা করা, যায় না। বোম্বাইয়ে মহামনা পরলোকগত মিঃ ওয়াডিয়া পশুচিকিৎসালয় স্থাপনের জন্ম প্রভূত অর্থদান করিয়াছেন। শিকাগো সহরের মিঃ হেনরী ফিপ্‌স্ পুষাতে কৃষিতত্ত্বানুসন্ধানের জন্ম ত্রিশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়া যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা দেশবাসীর সমক্ষে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করা বিধেয়।

চতুর্থতঃ, সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়াও সম্ভবপর নহে। লক্ষ্য ও চিন্তাধারা একই না হইলে পরস্পরে সাহায্য সম্ভবে না। ভারতবর্ষ অতি পুরাতন দেশ। মানব-সমাজের প্রতিস্তরের উন্নতি বা অবনতির নিদর্শন এখানে বর্ত্তমান। এ দেশে কোনো বিষয়ে একমত হইতে হইলে, আপামর সাধারণের সহযোগিতা আশা করিতে হইলে, শিক্ষাদ্বারা লোকমত গঠন করা ছাড়া উপায় নাই। প্রচারকার্য্য বহুল পরিমাণে চালাইতে হইবে। আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। ভবিতব্যতার দোহাই দিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়াছি। আমাদিগকে জন-সাধারণের মন আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রাণের মধ্যে আবার আশা, চিত্তের মধ্যে আবার উদ্দীপনা আনিতে হইবে। উৎকৃষ্ট জিনিষ আমাদের পাইতেই হইবে। নহিলে আমরা নিরস্ত ও সন্তুষ্ট হইব না। চাই আমাদের নীরোগ সবলকায় গাভীর রোগবীজাণুবর্জ্জিত দুগ্ধ। চাই আমাদের বলীবর্দ্দকুলের মাংসপেশীর শক্তি। দেশের লোকের উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধসেবন-আকাজ্ঞা বলবতী করিতে হইবে। দেশে স্বাস্থ্য ও জীবনমূলক (positive) প্রচারের বন্যা তুলিতে হইবে। নিষেধমূলক বিধিপ্রচার কাহারও প্রাণে উৎসাহ ও বাহুতে কার্য্যকরীশক্তি প্রদান করিতে পারে না। ভারতীয় চা-কর সমিতির (Indian Tea Cess Committee) প্রচার-বিভাগের কৃতকার্য্যতা ও কর্ম্মপদ্ধতি আমাদিগকে অনুপ্রাণনা দিতে পারে।

এতদ্দেশে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে উৎকট রুচি বর্ত্তমান আছে, তাহা হয়ত স্বাভাবিক আত্মরক্ষার সাধারণ জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত। সাধারণ বাজারের অপরিষ্কৃত দূষিত দুগ্ধ বা ততোধিক অনুপযুক্ত মাংস হইতে আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছা, চেষ্টা বা জ্ঞানের অভাব বড়ই দুঃখের বিষয়। দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে নিয়মিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করান, গো-দোহনের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা, দুগ্ধভাণ্ড এবং দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কোন কোন সম্প্রদায়ের খাদ্যার্থ যে অল্পসংখ্যক গো-বধ করা হয় তৎনিবারণকল্পে দেশে প্রয়াসের অভাব লক্ষিত হয় না। কিন্তু কসাই অপেক্ষা মহামারীতে প্রতি বৎসর যে ভীষণতর অবাধ নৃশংস গোহত্যা হইতেছে, সে সম্বন্ধে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সমাজ-সংস্কারকেরা কেন যে উদাসীন, তাহা উপলব্ধি করা সহজ নয়। অথচ এই অবর্ণনীয় লোমহর্ষকর গোহত্যা কমান বা প্রতিরোধ করা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, মানব হইতে পশুতে এবং পশু হইতে মানুষে রোগ সংক্রামিত হয়। ওলাউঠা ও বসন্তরোগ নিবারণ করিয়া ডাক্তারেরা মানব-সমাজের যে উপকার করিতেছেন, 'ভেটারিনারি' চিকিৎসকেরা তড়কা (anthrax) এবং জলাতঙ্কাদি (rabies) রোগ নিবারণ করিয়া পশু ও মানব উভয়ের তদ্রূপ উপকার করিতেছেন। গোদুগ্ধ যে মানবের একটি অত্যুত্তম খাদ্য, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ক্ষয়াদি রোগবীজাণু দ্বারা দুগ্ধ দূষিত হইলে ইহা মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া অতিভীতিপ্রদ রোগ-সঞ্চার করে। শিশুদিগের উপরেই এই দুষ্টরোগ-বীজাণুর প্রকোপ একেবারে মারাত্মক। কত শত পরিবার এই রোগবীজসংক্রমণে হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছে, কত শত অসহায় শিশু এতজ্জনিত বিকৃত, বিকল অঙ্গে দুঃখ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া জীবনটাকে একটা বিয়োগান্ত-নাট্যে পরিণত করিয়াছে, তাহা আমার বক্তব্য নহে। মানব-স্বাস্থ্য যে কি প্রকারে পশুস্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এদেশে প্রতি নগরে 'ভেটারিনারি' স্বাস্থ্যবিভাগের অনুষ্ঠান প্রয়োজন।' তদ্ব্যতিরেকে অপরীক্ষিত দুগ্ধ এবং

মাংস হইতে মনুষ্যজীবন যে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হয়, ইহাই আমার দৃঢ় মত।

এ পর্য্যন্ত, আমি এই অত্যাবশ্যক বিষয়ের মাত্র সাধারণ কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছি। কয়েকটি অবান্তর কথারও অবতারণা করিয়া বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সচরাচর যে-সমস্ত মড়কে প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক গবাদিজন্তুর প্রাণহানি হয়, সেগুলির উল্লেখ প্রয়োজন।

এ সমস্তের মধ্যে গোবসন্ত বা 'রিণ্ডারপেষ্ট' সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও মারাত্মক। সুতরাং ইহার আলোচনা কর্ত্তব্য।

নৈনিতালের অন্তর্গত মুক্তেশ্বর নামক পার্ব্বত্য সহরের Imperial Institute of Veterinary Research বা ভারতীয় সরকারের রোগানুসন্ধান-প্রতিষ্ঠানের দৌলতে এই রোগ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আর অভাব নাই। মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকা যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাও আমাদের উপকারে লাগিবে। আমাদের দেশেই, অনতিদূরে মহীশূর রাজ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে কর্ম্মচারিবৃন্দ তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন, তাহারা এই রোগনির্ম্মূলকার্য্যে 'অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। অতি অল্পসময়ে অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে তাড়াতাড়ি শিক্ষা দিয়াও যে কি পরিমাণে গোবসন্ত দমনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় তাহা মহীশূর রাজ্য প্রদর্শন করিয়া আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। পঞ্জাব প্রদেশে 'ভেটারিনারি' বিভাগ দ্রুত উন্নতির যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা অন্যান্য প্রদেশের লোকদিগকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই মহামারী দমনে উৎসাহিত করিতেছে। রোগপ্রতিষেধক টীকার প্রণালী সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ করিয়া বুঝাইলে গোরক্ষাহেতু গোরক্ত ব্যবহারে যে যুক্তিহীন আপত্তি লক্ষিত হয় তাহা কালে দূরীভূত হইবে। টীকার প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রচলন করিতে হইবে। প্রথমে মালিকদের অমতে টীকা দেওয়া উচিত হইবে না। প্রথমে বিনামূল্যে, বিনাপারিশ্রমিকে টীকার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, নহিলে টীকার অবাধ ব্যবহার ও বহুপ্রচার সম্ভব হইবে না। মালিকদের আনুকূল্যে টীকার উপকারিতা ও উপযুক্ততা সাধারণে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। Serum Simultaneous প্রণালীর উৎকর্ষ সময়ক্রমে স্বীকৃত হইবে, লোকমত সাহচর্য্য করিবে। বাধ্যতামূলক টীকা প্রচলন করিতে কালপাত্রবিচার, জনমতে শ্রদ্ধা, এবং একনিষ্ঠতার বিশেষ প্রয়োজন। গোবসন্ত-বিতাড়নে ভারতের কয়েকটি সাহায্যকরী বিশেষ সুবিধা আছে। যথা টীকার সামগ্রী-সকল প্রস্তুত করিবার উপকরণ ভারতে বর্ত্তমান আছে এবং অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। নৈনিতাল অঞ্চলের পার্ব্বত্য বৃষ বড়ই উপযোগী। ভারতের মত এত সামান্য ব্যয়ে Sera অন্য কোথাও প্রস্তুত হয় না।

মুক্তেশ্বর পশুরোগ-গবেষণার প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াও পাঁচ লাখ টাকা লাভ হইয়াছে। অতীতের এই-সব সাফল্যমণ্ডিত সুকৃতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বলতর এবং আশাপূর্ণ। ভারতীয় রয়েল কৃষি কমিশনের সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, গোমহিষাদির রোগ-প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা কৃষককুলের যে প্রভূত কল্যাণসাধন হইয়াছে, তাহা হইতে অধিকতর কল্যাণ অন্য কোনপ্রকার কৃষি-তত্ত্বানুসন্ধানে হয় নাই। গত ত্রিশ বৎসরে পশুরোগ সম্বন্ধে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা যে গবেষণারাজি পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যে নিবেদন করিয়াছেন, তাহা ভারতের সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

ইদানীং "Goat virus" (অর্থাৎ ছাগ হইতে প্রস্তুত 'সংক্রামক বিষ') ব্যবহার করিয়া টীকার যে নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আশা হয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে গোবসন্ত-দমনে আমাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। এবিষয়ে এখন বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় নাই। জোর করিয়া এই প্রণালীর উৎকর্ষতা প্রচারের সময় এখনও আসে নাই।

আমি নিবেদন করিতেছি যে Livestock বা পশুসেব বিভাগ নামে একটি আরও বিস্তৃত, সুসংস্কৃত এবং সুনিয়ন্ত্রিত একনিষ্ঠ কর্ম্মমণ্ডলী গঠিত করিলে শুধু যে দরিদ্র, অসহায় মুমূর্ষ কৃষকজাতির স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি লাভ হইবে

তাহা নহে। শুধু যে মধ্যবিত্ত সমাজের বেকার-সমস্যার বা দেশবাসীর খাদ্য-সমস্যার সমাধানের নূতন প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা নহে। সরকারের কার্য্যকরী শক্তি এবং সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাইবে। কৃষিপ্রধান ভারতের উন্নতি করিতে হইলে, তথা কৃষিশিল্পের সত্যকার কল্যাণসাধন করিতে হইলে ভীষণ গোমড়ক হইতে সর্ব্বপ্রথমে গোধন রক্ষা করিতে হইবে। ইহা ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা আমাদের আশা ও গৌরবের স্থল। কত লোভনীয় চাকুরীর আশা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, যুবকেরা বিপদাপদের ভ্রূকুটি অবহেলা করিয়া, বিজ্ঞানরাজ্যের নূতন তথ্য আহরণ করিতে প্রাণপাত করিতেছেন। কিন্তু আমি বিনীতভাবে তাঁহাদের একবার জিজ্ঞাসা করি—এত স্বার্থত্যাগ কি সত্যই দেশের দুর্দ্দিনের অবসান করিবে? দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, দেশের খাদ্যসম্ভার বৃদ্ধি, কৃষিশিল্প বা বাণিজ্যের উন্নতি কি এই গতানুগতিকভাবের বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনায় হইবে?

লণ্ডনে কিছুদিন হইল রাইট অনারেবল্ এমেরি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"সাম্রাজ্যের দূরাংশগুলির, এমন কি ব্রিটিশ দ্বীপের পক্ষেও, আজ যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা আপনাদের আলোচ্য জীবস্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অর্থাৎ পশুচিকিৎসা-বিদ্যা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহুবিধ সমস্যায় এই বিদ্যার প্রয়োগের যেমন ক্ষেত্র আছে তেমন আর কোথাও নাই।"

ভারতবর্ষ মহাদেশ সম্বন্ধেও এই অকাট্য মন্তব্য সম্পূর্ণ প্রযোজ্য—ইহাই আমার বিশ্বাস।

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভোরবেলা বিবাহবাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাসর-ঘরে দুই চারিজন যাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহারা উঠিয়া দেখে বর ঘরে নাই। আরও দুই চারিজন আসিয়া বলিল, বর কোথায় গেল?

একজন বলিল,—বোধ হয় বাইরে গিয়েচে, এখনি আসবে।

আর একজন বলিল,—বরের জুতা পড়ে রয়েচে, শুধু পায়ে কোথায় যাবে?

কনের গায়ে হাত দিয়া একজন তাহাকে উঠাইল। জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁরে ইন্দু, বর কোথায়?

কনের নাম ইন্দুলেখা। সে উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—আমি কি জানি? আমি ঘুমিয়ে ছিলুম।

পাশে যে কিশোরী ঘুমাইয়াছিল সেও উঠিয়া বসিল।

বাহির বাড়ীতে বাড়ীর কর্ত্তা বরদাকান্ত ঘোষ মুখ ধুইয়া রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। একবার গোঁফচাড়া দিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,—ওরে মেধো।

গাঁটাগোটা কালোকোলো মেধো আসিয়া দাঁড়াইল। বরদাকান্ত বলিলেন,—বর বাবাজীকে একবার ডেকে নিয়ে আয় ত। বড় মরদের ভারি মুরদ কি না তাই বিয়ে করে মেয়ে নিয়ে যেতে চায়। কাল রোশনাই করে ময়ূরপঙ্খী চেপে বর এসেছিল আজ কিংখাবের ঘেরাটোপঘেরা পাল্কী করে কনেকে নিয়ে যাবে। পথের মাঝখানে একটা ছোঁড়া পেয়ে ধরে এনেচে, সেটা আবার আমার সঙ্গে টক্কর দেয়?

আদেশ-মত মেধো জামাইকে ডাকিতে যায় এমন সময় একজন ঝি অন্দরমহল হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল,

—জামাইবাবু কম্‌নে গেল? বাসি বিয়ের জন্ত মেয়েরা ডাক্‌চে যে।

কর্ত্তা বলিলেন,—বাড়ীর ভেতর নেই?

—না, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না।

—দেখো আর কে কোথায় আছিস্ খোঁজ, খোঁজ, যাবে কোথায়?

বাড়ী-ময় খোঁজ পড়িয়া গেল। খুঁজিতে খুঁজিতে একটা ঘরে বরের চেলির কাপড়, টোপর পাওয়া গেল। বরের নিজের ধুতি, পিরাণ, চাদর, জুতা নাই। বর বরের বেশ ছাড়িয়া, নিজের কাপড় পরিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শুনিয়া বরদাকান্ত কর্কশকণ্ঠে উচ্চহাস্ত করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—নবাবপুত্তুর ন্যাজ গুটিয়ে সট্‌কান দিয়েছে। পালিয়ে যাবে কোথায়? রাত্রে ঘাটে কি কোনো নৌকা ছিল?

—আজ্ঞে না।

—তা হলেও একজন মাঝিকে ডাকিয়ে পাঠা। আর রঘুনাথকে বল্ ছয়জন বাছা লোক পাঠিয়ে উলুবেড়ের পথে খোঁজ করে। পালিয়ে যাবে কোথা? কার পাল্লায় পড়েচে জানে না?

হুকুম-মত লোক ছুটিল। যে মাঝিকে ডাকিতে গেল সে খানিক দূর গিয়া দেখিল পুরোহিত প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। সে লোকটি পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যাইতে চায় ব্রাহ্মণ তাহার পথ রোধ করিল, বলিল,—কিরে ছিরে? সকাল বেলা ছুটে চলেছিস্ কোথায়?

—আর ঠাকুর-মশাই, সে কথা আর বোলো না। নতুন জামাইবাবু রাতারাতি কোথায় পালিয়েচে আর কর্ত্তা মশাই ত একেবারে আগুন। কার যে মাথা যাবে তা জানি নে।

—তা তুই যাচ্চিস্ কোথায়?

—মাঝির তলব হয়েচে তাই তাকে ডাক্‌তে যাচ্চি।

—মাঝি কি করবে?

—বোধ হয় জলে খোঁজ করবে যদি নৌকাতে জামাই গিয়ে থাকে। ডাঙ্গা পথে লোক ছুটেচে।

—চ' তা হ'লে আমিও তোর সঙ্গে যাই। অজানা অচেনা লোক কি ভেবে চলে গিয়েচে কে জানে? বাঁধা গাইগরু দড়ি ছিঁড়্‌তে চায় আর আট্‌কা-পড়া মানুষ পালাতে চায়।

গঙ্গার ধারে তাহারা গিয়া দেখে ছিপ বাঁধা আছে, মাঝির মাথায় রক্তমাখা ভিজে ন্যাক্‌ড়া বাঁধা। ব্রাহ্মণ ছিরুর পিছন হইতে ঠোঁটে আঙুল দিয়া হাত নাড়িল। মাঝিরা বুঝিল। ছিরু গিয়াই মাঝিকে বলিল,—বাবু তোমাকে ডেকেচে।

রক্ত ছুটিয়া মাঝি কাহিল হইয়াছে, তবু কোনোমতে উঠিল, ব্রাহ্মণ কহিল,—বিলক্ষণ, তোমার অমন চোট লেগেছে তুমি কেমন করে যাবে? পা হড়্‌কে বুঝি দাঁড়ের উপর পড়ে গিয়েছিলে তাই মাথা কেটে গিয়েচে?

মাঝি ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কথার সঙ্কেত বুঝিল। কহিল,—হাঁ ঠাকুর-মশাই, রাত্তিরে তেমন ভাল ঠাহর হয় নি, পড়ে গিয়ে দাঁড়ের আগায় মাথা কেটে গিয়েছে।

—তোমার গিয়ে কাজ নেই, আর কাউকে পাঠিয়ে দাও।

—তা হলে কি এই ফাটা মাথা থাক্‌বে?

—আমি সঙ্গে যাচ্চি। ছিরে, তুই এগিয়ে যা, আমরা আস্‌চি।

ছিরু চলিয়া যাইলে ব্রাহ্মণ সঙ্গের মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছিল ঠিক কথা বল্ দেখি।

মাঝি যেমন যেমন ঘটিয়াছিল বলিল। সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল,—মাঝি নিজের দোষে মার খেয়েচে। ও ছোকরা বড় সোজা নয়, তাকে মিছিমিছি ঘাঁটাতে গেল কেন? কিন্তু তাকে যে তোরা গ্রামে রেখে এসেছিস্ এ কথা কর্ত্তা টের পেলে তোদের পিঠের চামড়া থাক্‌বে না।

—আমাদের কাউকে দিয়ে কোনো কথা প্রকাশ হবে না।

—তাই সাবধান করে দিচ্চি।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া মাঝি ব্রাহ্মণের সঙ্গে কর্ত্তার সম্মুখে গেল। বরদাকান্ত রাগিয়াই ছিলেন, কহিলেন,—আমি শক্কর মাঝিকে ডেকেছি, তুই এলি কেন?

—আজ্ঞে, কাল রাত্রে ফের্‌বার সময় মাঝি কেমন হঠাৎ পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়েছিল তার লেগেছে।

ব্রাহ্মণ বলিল—হাঁ, আমি গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখেছি তার মাথা কেটে গিয়েছে।

—বেটা বোধ হয় আনাড়ী। রাত্রে তোরা সেই একখানা নৌকা ছাড়া আর কোনো নৌকা দেখেছিলি?

—আজ্ঞে, না।

—তোরা একবার ছিপ নিয়ে উলুবেড়ের দিকে এগিয়ে দেখ্ কোন নৌকায় যদি নতুন জামাইকে দেখ্‌তে পাস্ তা হলে ধরে নিয়ে আয়।

—আজ্ঞে, তাঁকে ত আমরা দেখি নি, চিন্‌ব কেমন করে'?

—কাল রাত্রে নৌকায় দেখিস্ নি?

—আমাদের ডিঙ্গি পিছনে ছিল, আমরা ত কাউকে দেখি নি।

ব্রাহ্মণ বলিল,—ওরা কি করে দেখ্‌বে? আমি ত পাত্রকে নিয়ে এগিয়ে এসেছিলাম।

বরদাকান্ত নিরস্ত হইলেন, মাঝিকে বলিলেন,—তুই এখন যা।

মাঝি চলিয়া গেল। বরদাকান্ত ব্রাহ্মণের দিকে রাগিয়া চাহিয়া কহিলেন,—তুমি ভিতরকার কথা নিশ্চয় জান। কেউ তাকে পথ বলে' না দিলে সে গেল কোথা?

সেখানে আর কেহ ছিল না। বরদাকান্তের যে রকম কোপন স্বভাব তিনি না ডাকিলে কেহ তাঁহার কাছে যাইত না। ব্রাহ্মণ নির্ভীক, কহিল,—তুমি চক্ষু ছানাবড়া করলে আমি ভয় পাব না। তোমার কন্যাদায়, জাত যায়, মেয়ে গায় হলুদ হ'য়ে রইল, পাত্র গাঢাকা দিলে, এই-সব দেখে আমি ভদ্রলোকের ছেলেকে এনে মেয়ে পাত্রস্থ করি। কোথায় তুমি জামাইয়ের সমাদর করবে, উপকার স্বীকার করবে, না উল্‌টে তাকে অপমান! আর রাত্রে তোমার ঘরে কি কথা হচ্ছিল? বল্‌ছিলে গলা ধাক্কা দিয়ে জামাইকে তাড়িয়ে দেবে।

বরদাকান্ত জানিতেন ব্রাহ্মণের পিছনে অনেক লোক। এক গ্রামে নয়, দশ গ্রামে তাহাকে সকলে জানে, সম্মান করে। ব্রাহ্মণের প্রতি কোনো রকম কুব্যবহার করিলে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ বরদাকান্তের ভিতরের সকল কথাই জানে, এমন লোক শত্রু হইলেও বিপদ। তবু বরদাকান্ত সম্পূর্ণ ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, রাগিয়া বলিলেন,—তোমার ত বড় মুখের জোর দেখ্‌চি! আমার উপর কথা!

—কি করবে তুমি আমার? গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে' দেবে, না বনের মধ্যে পুঁতে রাখ্‌বে? ব্রহ্মহত্যাটাই বা বাকি থাকে কেন?

বরদাকান্ত মুষড়াইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ রাগের মুখে আরও কিছু বলিয়া না ফেলে! বলিলেন,—ভারি ত জামাই! গিয়েছে তা যাক্ গে!

বরদাকান্ত উঠিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পিছন হইতে শুনাইয়া বলিল,—কেমন জামাই কোনোদিন হয়ত দেখ্‌তেই পাবে।

ভিতর বাড়ীতে চেঁচামেচি বেশী হয় নাই, পাছে কাহারও গলা বাহিরে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকলের মুখে ভয়ের চিহ্ন, দু'চারিজন স্ত্রীলোক আলাদা-আলাদা বসিয়া চাপা গলায় কয়দিনের আশঙ্কা-সূচক ঘটনাবলী আলোচনা করিতেছে। বাড়ীর গৃহিণী কনের মা, নিজের ঘরে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছিলেন। পাশে দুই চারিজন প্রবীণা বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন।

আর এক ঘরে কয়েকজন প্রৌঢ়া বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। একজন বলিলেন,—এমনতর অকল্যাণ তো কোথাও শুনি নি। বাপ-মার বাড়ীসুদ্ধ লোকের অকল্যাণ।

অপর একজন,—মেয়েটারই বা কি কপাল! অত বড় মেয়ে কোথায় শ্বশুর-ঘর করবে তা না যত সম্বন্ধ হয় সব ভেঙ্গে যায়। শেষে যদি একটা জায়গায় ঠিক হ'ল, গায় হলুদ হ'ল ত বিয়ের দিন বর বরযাত্তর কারুর দেখা নেই আর তাদের দেশ তিন দিনের পথ। কি হবে ভেবে আমরা ত সবাই কাঠ, ভাগ্যিস্ পুরুত-ঠাকুর ছিলেন তাই আর একটি পাত্তর পাওয়া গেল। এও সোনার চাঁদ ছেলে, যেমন দেখ্‌তে, তেম্‌নি কথাবার্ত্তায় চালাক চতুর। ওমা! কাল রাত্তিরে বিয়ে আর আজ জামাইয়ের খোঁজ নেই! চলে ত গিয়েইচে, কিন্তু কেউ কিছু বল্লে না, কোথাও

কিচ্ছু হয় নি আর বাসর-ঘর থেকে রাতারাতি বর পালিয়ে গেল। এমন অবাক্ কাণ্ড ত সাত জন্মে শুনি নি।

—এদিকে মেয়ের বাপ একটা রাজার মতন, মেয়ে গুণে সরস্বতী, রূপে লক্ষ্মী।

—কপাল, ভাই, কপাল! আমি যাই বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে।

—কর্ত্তার নামে লোকে কত কি বলে—

—ও সব কথায় আমাদের কাজ কি? মেয়েটার মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়।

—তোমাদের ও সব চাক্ চাক্ গুড়্ গুড়্ আমি ভালবাসি নে। বলব হক্ কথা তাতে—

—তা বলতে হয় উঠুনে গিয়ে চেঁচিয়ে কর্ত্তাকে শুনিয়ে বল।

কনে সেই বাসরেই বসিয়া আছে। সেই কিশোরী মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া তাহার কাছে বসিয়াছে। বরকনের দুইজনের মালা পড়িয়া আছে, ফুল ম্লান হইয়া গিয়াছে। কনে উঠিতে পারিতেছে না, কারণ বরকে যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে দুইজনকে একত্রে বাসি বিবাহের জন্য লইয়া যাইবে। বাসর-ঘরে আর কেহ বড় একটা আসে না, কেহ আসিলেও দাঁড়াইয়া দুইটা কথা বলিয়া চলিয়া যায়। কনেকে আবার কে কি বলিবে? কেহ কি তাহার কাছে গিয়া তাহার গায় হাত বুলাইয়া বলিবে, —ওলো তুই ভাবিস্ নে তোর বরকে খুঁজে পাওয়া যাবে? না আর কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, হ্যাঁ লা ইন্দু, তোর বর কার উপর রাগ করে বিয়ের রাত্তিরে বাসর-ঘর থেকে পালিয়ে গেল? কনে নিতান্ত ছোট্টটি নয় সত্য, কিন্তু বিয়ের কনে বই ত নয়, বিবাহ হইয়াছে তাহার পর এখনো অষ্টপ্রহরও কাটে নাই। তাহাকে কে কি বলিবে, কি বলিয়া বুঝাইবে? তাই কেহ বড় একটা কন্যার সঙ্গে কথা কহিতেছিল না।

আর কনের মনে কি হইতেছিল, সে কি ভাবিতেছিল? বর কোথায় গিয়াছে, কখন গিয়াছে, সে কথা ত সে জানে, তবে কেন বলিল যে, সে কিছু জানে না? পুরোহিত তাহাকে বারণ করিয়াছিল বলিয়া? সেই এক কারণ, আর কন্যার ভয় হইয়াছিল যে, বরের সন্ধান জানিলে হয়ত তাহার কোনো অনিষ্ট হইতে পারে। ব্রজনাথের প্রতি তাহার যে কোনো রকম টান হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু সে কেন ব্রজনাথের অমঙ্গলের কারণ হইতে যাইবে? সুতরাং ইন্দুলেখা যাহা জানিত তাহা প্রকাশ না করিয়া ভালই করিয়াছিল। আর কি কিছু তাহার মনে পড়িতেছিল না? পড়িতেছিল বই কি! সেই যে শুভদৃষ্টির সময় চক্ষে চক্ষে মিলন, সেই কৌতূহলের অসম্পূর্ণ তৃপ্তি, সেই ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত লজ্জায় নমিত নয়ন মনে পড়িল, সেই প্রিয়দর্শন নবযৌবনের উজ্জ্বল কান্তি, পুরুষসিংহের ন্যায় তেজিষ্ঠ অবয়ব মনে পড়িল। সেই সঙ্গে মনে পড়িল রমণীদের সহিত সরল হাস্যকৌতুক, নিরভিমান বাক্যালাপ। বিবাহের রাত্রিতেই ইন্দুলেখা স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, কথার উত্তর না দিয়া কি করিবে? সেই মৃদু সংযত কণ্ঠস্বর মনে পড়িল। যাইবার পূর্ব্বে ব্রজনাথ তাহার হাত ধরিয়াছিল—সেই যথার্থ পাণিগ্রহণ। মনে পড়িতে ইন্দুলেখার কপোল রক্তিম হইল, কেহ দেখিতেছে না তথাপি সে মস্তক অবনত করিল।

কিশোরী কহিল,—দিদি, তুমি পিছন ফিরে কি ভাবছ?

কিশোরী বরদাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী, নাম সুরমা। তাহার কথা শুনিয়া ইন্দুলেখা আস্তে আস্তে ফিরিয়া বসিল। মুখের লাল আভা মিলাইয়া গিয়াছে। কহিল,—কি আবার ভাব্‌ব?

—তোমার চোখ ফুলেছে কেন? কাঁদ্‌ছিলে বুঝি?

—দূর কাঁদতে যাব কেন?

এমন সময় পুরোহিত ঘরে প্রবেশ করিল। সে বাড়ীর লোকের মতন, যখন ইচ্ছা বাড়ীর ভিতর আসিত। ঘরে আসিয়া ইন্দুলেখাকে ভাল করিয়া দেখিল। তাহার পর বলিল,—সুরো, তোমার জেঠিমাকে ডেকে নিয়ে এস ত।

সুরমা বাহিরে যাইতেই ব্রাহ্মণ বলিল,—বর বাড়ী গিয়েছে, তার জন্য আর কোনো ভাবনা নেই। তুমি কোনো কথা প্রকাশ না করে ভাল করেচ।

ইন্দুলেখা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তাহার মা চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে আর দুই চারিজন স্ত্রীলোক। তিনি আসিয়াই আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—ঠাকুর-মশাই, আমার কপালে এই ছিল!

ব্রাহ্মণ বলিল,—একটা বড় গণ্ডগোল হল বটে, কিন্তু তোমার খুব ভাল জামাই হয়েচে।

—জামাই হ'ল কই? গেল কোথায়? বাসি বিয়ে পর্য্যন্ত হয় নি।

—তাতে ত আর বিয়ে অসিদ্ধ হয় না। ও একটা স্ত্রী-আচার, শাস্ত্রের কিছু নয়। শাস্ত্রমত বিয়ে ঠিক হয়েচে।

—ছেলে ত খুব ভালো আমরা সবাই দেখেচি। কিন্তু এমন করে পালিয়ে গেল কেন? তাকে আমরা কোথায় খুঁজে পাব?

—তার আর ভাবনা কি! তার বাড়ীঘর সব জানা (এ কথাটা সত্য নয়) ছেলেমানুষ, কি জানি কি মনে হ'ল, হয়ত ভাব্‌লে বাপ-মা বিয়ের কথা কিছু জানে না, হঠাৎ কি একটা মনে এল অমনি কাউকে কিছু না বলে' চলে গেল। দিন-কতক পরেই আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে, আমরা গিয়ে তার বাপকে বল্‌লেই মিটে যাবে। আর এ বিয়েতে তারা পাবে-থোবেও ত অনেক। এখন যা হয়েছে তার ত আর কোন উপায় নেই, তোমরা মিছিমিছি আর মন খারাপ করো না, মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে কিছু খেতে দাও।

পুরোহিতের কথামত গৃহিণী কন্যাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

এত বড় একটা কাণ্ড লইয়া বাড়ীর অন্য মহলে আন্দোলন হইবে না ইহা একেবারেই অসম্ভব। লোকজন, চাকর, বামন, ঝি, পাচিকা সকলে বিবাহের বিপরীত পরিণাম লইয়া জটলা করিতেছিল।

মধুসূদন—যাহার ডাকনাম মেধো - তামাক খাইবার আগুন লইবার জন্য বাহির বাড়ীর রান্নাঘরে গেল। পাচক-ব্রাহ্মণ কিছু রগচটা লোক, সহজেই রাগিয়া যায়। মেধোর ইচ্ছা তাকে লইয়া একটু রঙ্গ করে। কহিল,—বামন-ঠাকুর কল্কেটায় একটু আগুন দাও ত।

উনান হইতে একখানা জলন্ত কাঠ বাহির করিয়া পাচক মাটিতে এক ঘা মারিল। আগুন-সুদ্ধ কয়লা কুড়াইতে কুড়াইতে মেধো বলিল,—বামন-ঠাকুর, তোমার ত রাত বেড়ানো অভ্যেস আছে, জামাইবাবু কোন্‌দিকে গেল দেখেছিলে? বল্‌তে পার ত, বাবু তোমায় বখশিস্ দেবে।

পাচক এইমাত্র চরস টানিয়াছে, দুই চক্ষু টক্‌টকে লাল। হেঁসেল হইতে বেড়ী টানিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—ছুঁচো পাজি, নফর হয়ে আমার সঙ্গে চালাকি! বেড়ীর বাড়ি তোর বদন বাঁকা ক'রে দেব জানিস্ নে!

চরসের ধূমজাত অনুপ্রাসের তাড়নায় হউক, অথবা পাচকের হাতাবেড়ী-কিণাঙ্কিত হস্তে দোলায়মান বজ্রতুল্য বেড়ী দেখিয়াই হউক মেধো রন্ধনশালা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ সোজা গ্রামে গেল না। গঙ্গার ধার দিয়া গাছ-পালার আড়াল দিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল। শেষরাত্রে বাড়ীর দরজা ঠেলাঠেলি না করিয়া একটু পরে গেলেই চলিবে। সঙ্গীরা এখনো আসিয়া পৌছায় নাই, তাহাদের নৌকা পিছনে আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সঙ্গীদের কি বলিবে, বাড়ী গিয়াই বা কি বলিবে? প্রকৃত কথা বলিলে বাড়ীতে কি গ্রামে তিষ্ঠানো ভার হইবে। এখনি তাহার মনে হইতেছিল যেন গ্রামসুদ্ধ লোক মিলিয়া তাহার কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছে। আর সত্য কথা বলিতে হইলে ব্রজনাথ কতটুকুই বা বলিতে পারিবে? এ বিবাহের কথা ত গাঁজাখোরের গল্পের সমান। কেহ কিছু জানে না, ঝড়ের জন্য একবার নৌকা কিনারায় লাগিয়াছিল আর অমনি একদল লাঠিয়াল আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার বিবাহ দিয়া দিল! অঘটন ঘটে অনেক রকম, কিন্তু এই ঘটনা শুনিয়া লোকে কি মনে করিবে? যখন চারিদিকে লোকে ঘিরিয়া তারস্বরে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করিবে, গঙ্গা হইতে কতদূর, কোন্‌দিকে যাইতে হয় তখন ব্রজনাথ বাবাজী কি উত্তর দিবেন? বিবাহের মন্ত্র আওড়াইবার সময় সে শুনিয়াছিল দুইটি নাম, অর্থাৎ দুইটি নাম তাহার মনে ছিল, এক পাত্রীর নাম আর এক নাম তাহার পিতার। পাত্রীর নাম ত ব্রজনাথ প্রাণান্তে কোনো মতে বলিতে পারিবে না। আর শ্বশুরের নাম গ্রামের কাহারও জানা আছে কি?

সঙ্গীরা জানে ব্রজনাথকে হয় ধরিয়া কি ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহার অধিক তাহারা ত কিছু জানে না। বিবাহের বিন্দুবিসর্গ তাহারা জানে না আর সে কথা একবার প্রকাশ হইলে কি আর রক্ষা আছে! বিবাহের কি সবই আজগুবি! বিবাহই না হয় হঠাৎ হইল, বরের রাতারাতি বাসর-ঘর হইতে প্রস্থানও কি আকস্মিক ব্যাপার? বিবাহ হইল ত বধূ কোথায়, না ব্রজনাথকে ঘর জামাই হইয়া থাকিতে হইবে? বিবাহের কথা গোপন করা ভিন্ন ব্রজনাথের উপায়ান্তর রহিল না। ওদিকে কনেকে বরের পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিয়াও লুকাইতে হইয়াছিল, এদিকে বরকে বিবাহের ব্যাপারটাই চাপা দিতে হইবে। ব্রজনাথ স্পষ্টবাদী, কোনো কথা গোপন করিতে জানে না, এক রাত্রের মধ্যে তাহার জীবনে, তাহার স্বভাবে অচিন্তনীয় বিপর্য্যয় ঘটিল।

আকাশ পরিষ্কার হইয়া পূর্ব্বদিকে গঙ্গাপারে সূর্য্য দেখা দিল, গাছের মাথায়, গাছের পাতায়, মাঠের শস্যে, ঘাসের শিশিরে, গঙ্গার জলে, স্রোতের তরঙ্গে নবীন সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে কুয়াসা ঘিরিয়া আসিল। বিল, ডোবা, পুষ্করিণী জলো জমি হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিয়া চারিদিকে বাষ্প ছড়াইয়া পড়িল, গঙ্গার একূল হইতে ওকূল পর্য্যন্ত কুয়াসার আবরণ নামিল। দেখিতে দেখিতে এমন ঘনাইয়া আসিল যে, কোলের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রজনাথ ভাবিল এ একরকম সুবিধাই হইল, নিসর্গ তাহার অনুকূল হইয়া প্রচ্ছন্ন থাকিবার উপায় করিয়া দিল। গঙ্গার পাড় ধরিয়া সে সাবধানে গ্রামের ঘাটের অভিমুখে চলিল। তাড়া কিছুমাত্র ছিল না। একে ত চারিদিকে কুয়াসায় ঢাকিয়াছে, দেখিয়া শুনিয়া চলা দরকার, তাহার উপর সঙ্গীদের নৌকা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে ঘাটে উপস্থিত হইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। রৌদ্র যেমন বাড়িতে লাগিল, কুয়াসা ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যাইতে লাগিল, প্রথমে নিকটে, ক্রমে দূরে দৃষ্টি চলিতে আরম্ভ হইল। ব্রজনাথ দেখিল তাহাদের নৌকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, নৌকা ঘাটে লাগিতেই ব্রজনাথ অগ্রসর হইয়া ঘাটে দাঁড়াইল।

আরোহীরা নামিয়াই দেখে ব্রজনাথ নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অমনি সকলে মিলিয়া তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল,—সকলে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে কার কথার উত্তর দেব?

মল্লিক মহাশয় বলিলেন,—তোমরা সব থামো, আমি জিজ্ঞাসা করচি। হ্যাঁ হে, ব্রজনাথ, তুমি কখন এলে?

—এই আপনাদের আস্‌বার একটু আগে।

—হেঁটে এলে না কি?

—না, একখানা পাল্‌কি করে আমাকে পৌঁচে দিয়েচে।

—তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল কেন?

—তাদের কে একজন ছেলে না কি দেশত্যাগী হয়ে গিয়েচে, দেখ্‌তে না কি অনেকটা আমার মতন, ঐ বামন তাকে চিন্‌ত, অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোতে ভাল ঠাওর করতে পারে নি, আমাকে সেই ছোকরা মনে করে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর বাড়ীতে সকলে দেখ্‌লে ভুল হয়েচে, তখন আবার আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

—তা বেছে বেছে আমাদের নৌকা ধর্‌লে কেন?

—অমনতর অনেক নৌকা দেখেচে, পথে চল্‌তেও না কি অনেককে আটক করেচে।

—গ্রামের নাম কি?

—তা আমি জানি নে।

—কাদের বাড়ী?

—তাও আমি বল্‌তে পারি নে, আমায় কিছু বলে নি। তাদের ভুল হয়েচে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে তখনি পাঠিয়ে দিলে।

—তা যেন হ'ল, কিন্তু আমাদের নৌকা হাঁকিয়ে দিল কেন?

—সে কথা ত আমি কিছু জানি নে। আর যখন আমি ফিরে এসেচি, তারা কোনো রকম অত্যাচার করে নি, এমন অবস্থায় গ্রামে এ কথা না বলাই ভাল। মিছামিছি একটা হই-চই হবে।

—এতগুলি লোক, মাঝিরা রয়েচে, কার মুখ বন্ধ করবে?

ব্রজনাথ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

সকলে গ্রামে প্রবেশ করিল। ব্রজনাথের বাড়ীতে তাহার পিতা ও মাতা দুইজনেরই বয়স হইয়াছে। এক ভাই তাহার অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের ছোট, আর এক ভগিনী ব্রজনাথের অপেক্ষা বড়, সে শ্বশুরবাড়ী। বাড়ীতে আসিয়া ব্রজনাথ বাপ মাকে প্রণাম করিল। পিতা বলিলেন,—সব ভালয় ভালয় এসেছ ত?

—আজ্ঞা হাঁ। কোনো কষ্ট হয় নি।

মা বলিলেন,—জামাই ভাল আছে ত? টুনু আর তার মেয়ে কেমন আছে?

টুনু ব্রজনাথের বড় ভগিনী, নাম প্রভাবতী। ব্রজনাথ বলিল,—সব ভাল আছে।

—মেয়েটি ছোট্ট নিয়ে গিয়েছিল, এখন দেখ্‌তে কেমন হয়েচে?

—বেশ গোলগাল হয়েচে আর খুব সেয়ানা। আমাকে কিছুতে ছাড়্‌বে না, বলে মামার বাড়ী যাব।

—তা আবার শীগ্‌গির নিয়ে আস্‌ব। শ্বশুরবাড়ীর ওরা যে বেশী দিন রাখ্‌তে চায় না, তা ওদের ওই এক সাত আদরের বউ, তারাই বা ছেড়ে থাকে কেমন করে'?

আহারাদির পর ব্রজনাথ তাহাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটি ছোট খড়ো বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে শিকল দেওয়া, বাড়ীতে কেহ নাই দেখিয়া ব্রজনাথ কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া কহিল,—এই যে ছোটবাবু! তুমি কবে ফিরলে?

—আজ ফিরেছি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

—বেশ ত বস।

লাঠি ধরিয়া বৃদ্ধ পইঠায় উঠিল। ব্রজনাথ শিকল খুলিয় বৃদ্ধের পাশে তক্তপোষে বসিল।

বৃদ্ধের নাম হরেরাম সর্দ্দার। দেখিলেই বোঝা যায় এক কালে মস্ত জোয়ান ছিল। দেহের আড়া এখনও বড়, হাড় মোটা, চক্ষে এখনও তীব্র দৃষ্টি। গ্রামের লোক বলিত এককালে হরেরাম ডাকাতের সর্দ্দার ছিল, কিন্তু কোনো কালে গ্রামে কাহারও কোনো অনিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইল তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, সন্তানাদি হয় নাই, হরেরাম নিজের ঘরে একাই থাকিত। ব্রজনাথের পিতা তাহাকে সাহায্য করিতেন। গ্রামের জ্যাঠা ছেলেগুলা হরেরামকে বিদ্রূপ করিত, তাহাতে সে হাসিত, রাগিত না। তাহাদের সঙ্গে তামাসা করিত, আগেকার কালের গল্প করিত। হরেরাম অনেক দেশের অনেক লোকের খবর রাখিত, এখন পর্য্যন্ত দূর দূর গ্রাম হইতে তাহার কাছে লোক আসিত।

ব্রজনাথকে ছেলেবেলা হইতে হরেরাম বড় ভাল বাসিত। পাঁচ-সাত বৎসর পূর্ব্বে হরেরাম এত অথর্ব্ব হইয়া পড়ে নাই, ব্রজনাথকে নানারকম অস্ত্রকৌশল শিখাইয়াছিল, তাহার সঙ্গে গ্রামের অন্য ছেলেরাও শিখিত। ব্রজনাথ সদাসর্ব্বদা হরেরামের কাছে যাওয়া-আসা করিত। ছেলেবেলা হইতে ব্রজনাথ হরেরামকে বিশ্বাস করিত, সকল কথা তাহাকে বলিত, প্রয়োজন হইলে তাহার পরামর্শ লইত। এখন তাহার পাশে বসিয়া ব্রজনাথ বলিল,—তোমাকে যে-কথা বল্‌তে এসেছি তা আর কেউ জানে না, বাড়ীতেও আমি কাউকে বলি নি। তোমায় শুধু বল্‌চি, কিন্তু আর কারুর কানে যেন এ সব কথা না যায়!

—তা কেন যাবে? তোমায় আমায় কথা, আর কেউ টের পাবে কেন?

—সেইজন্য ত তোমায় বল্‌তে এসেছি। আমি জানি যে তোমাকে দিয়ে কোনও কথা প্রকাশ হবে না। আচ্ছা, এ অঞ্চলে কাছাকাছি কি কিছু দূরে বরদাকান্ত ঘোষ বলে কোনো জমিদার আছে?

—কই আমার ত মনে পড়ে না।

—শুধু জমিদার নয়, আমার মনে হয় ডাকাতেরও সর্দ্দার হবে। আমি সে লোকটাকে দেখেছি।

—কি রকম দেখ্‌তে বল দেখি? কোথায় তাকে দেখ্‌লে?

ব্রজনাথ আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল। শুনিয়া হরেরাম চিন্তিত হইল। কহিল,—বরদাকান্ত নাম শুনি নি, কিন্তু লোকটাক যেন জানি মনে হচ্চে, কিন্তু কে, কি বৃত্তান্ত এখন ঠিক মনে পড়চে না। আর এ বিয়ের কথা

কেমন করে লুকানো থাক্‌বে? তুমি বড় হয়েচ, এখানে তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্চে, এ কথা কেমন করে চাপা থাক্‌বে? যাদের মেয়ে তাদের যদি কোনো চাড় না থাকে কিংবা কোনো খবর না দেয় তা হলে এমন বিয়ে বিয়েই নয়, তুমি আবার বিয়ে কর্‌লে কোনো দোষ নেই।

ব্রজনাথ কিছু বেগের সহিত বলিল,—না আমি আর—বিয়ে কর্‌ব না। যেমন করেই হোক্ একবার বিয়ে হয়েচে, আবার বিয়ে কর্‌ব না।

হরেরাম ব্রজনাথের মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—মেয়েটির বয়স কত, আর দেখতে কেমন?

ব্রজনাথ কিছু লজ্জিত হইয়া মুখ হেঁট করিয়া কহিল,—বয়স পনেরো ষোলো হবে, দেখ্‌তে সুন্দরী।

হরেরামের ফোকলা দাঁতে অল্প হাসি দেখা দিল, কহিল,—তুমি ঠিক বলেচ, ছোটবাবু। অমন বউ পেয়ে কি কেউ আবার বিয়ে করে? তা বউ ঘরে আস্‌বে কেমন করে? বিয়ের পরেও কি মেয়ে চিরকাল বাপের বাড়ী থাকবে?

—সে পরের কথা। এখন কার মেয়ে বিয়ে করেচি সেই সন্ধান তোমায় নিতে হবে।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে সন্ধান নিয়ে আমি তোমায় বল্‌ব। এখন বাড়ীতে কি বল্‌বে?

—আপাততঃ কিছু বল্‌ব না। তবে যদি অন্য বিয়ের জন্য বড় পীড়াপীড়ি হয় তখন বল্‌তেই হবে।

—আমি খোঁজ নিচ্চি, ঠিক খবর পেলেই তোমাকে জানাব।

ব্রজনাথ বাড়ী ফিরিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর সংগ্রহকর্ত্তাদের মধ্যে দুইজন প্রধান, রাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণবদাস। রাধামোহনের সঙ্কলন-গ্রন্থের নাম পদামৃতসমুদ্র, বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরু। পদামৃতসমুদ্র পদকল্পতরুর অপেক্ষা প্রাচীন এবং পদামৃত-সমুদ্র দেখিয়াই পদকল্পতরু সংগৃহীত হয়। রাধামোহন ও বৈষ্ণব দাস দুইজনই পরম বৈষ্ণব, দুইজনই কবি। কলেবরে পদকল্পতরু পদামৃতসমুদ্রের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে রাধামোহন ঠাকুরের লিখিত সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি টীকা আছে, সেগুলি যত্ন করিয়া দেখিতে হয়। রাধামোহন ঠাকুরের কালে অন্ততঃ শিক্ষিত বৈষ্ণবেরা জানিতেন যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই দুই প্রধান কবির মধ্যে একজন পশ্চিমদেশবাসী। বৈষ্ণব দাসের সময় বোধ হয় সে কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। পদকল্পতরু কিরূপে সঙ্কলিত হয় বৈষ্ণব দাস তাহা নিজে লিখিয়া গিয়াছেন—

> শ্রীআচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
> কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
> যাঁহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের বিলাস।
> যেন শ্রী আচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
> গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
> জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
> নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
> তাহার যতেক পদ সব তাহা লইয়া॥
> সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
> প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥

এই যে নানাস্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিন হাজারের উপর পদ সংগ্রহ করা ইহা প্রেমের অধ্যবসায়, ভক্তির ফুলের সাজি। বটতলার প্রসাদে এই অমূল্য গ্রন্থ প্রথমে

ছাপা হয়। বৈষ্ণবগৌরব শিশিরকুমার ঘোষ জীবিত থাকিতে অমৃতবাজার পত্রিকা যন্ত্রালয় হইতে এই সঙ্কলন ছাপাইয়াছিলেন, এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ আদ্যন্ত ভাল করিয়া দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে যথাযথ আলোচনা করা বড় দুরূহ ব্যাপার এবং সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শুধু এই দুইজনকে লইয়া সমস্ত বৈষ্ণব কবিতা হয় না। জগতের কোনো সাহিত্যে এমন বিচিত্র, এমন মধুময়, এত প্রচুর গীতিকবিতা আছে কি না সন্দেহ। জয়দেব বৈষ্ণব ও সাহিত্যজগতে চিরস্মরণীয়, কিন্তু তাঁহার ভাষা সংস্কৃত বলিয়া তাঁহার প্রভাব বৈষ্ণব কবিতায় অধিক প্রসারিত হয় নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাষার ছাঁচে সকল বৈষ্ণব কবিতা ঢালা। চৈতন্যের আবির্ভাবে এই বঙ্গদেশে যেমন পুণ্যতোয় প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল তেমনি ছন্দ, গীত, সুর ভাবের উৎস উৎসারিত হইয়া বঙ্গদেশকে মধুর আনন্দে প্লাবিত করিয়াছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ছিলেন না, বৈষ্ণবও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিথিলাবাসী শৈব, তরুণ বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা মিথিলায় গিয়া তাঁহার গান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস শাক্ত ও সহজিয়া ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে, তিনি যে বৈষ্ণব ছিলেন তাহার কোনো প্রমাণ নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা বিনিময় হইত ও তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এই দুই কথাই একেবারে অমূলক, কিন্তু এখনো অনেকে ইহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে এবং চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্তে ইহা উল্লিখিত হয়। এক বৈষ্ণব দাসের পদ ছাড়া এই দুই ঘটনার আর কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বৈষ্ণব দাসের কালে বিদ্যাপতি যে মিথিলাবাসী ও তাঁহার পদাবলী মিথিলার ভাষায় রচিত এ কথা দেশের লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণব দাস কবি, ভক্ত, বহু পরিশ্রম করিয়া বৈষ্ণব কবিতা সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু তিনি ইতিহাসের কোনো ধার ধারিতেন না, ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করা তাঁহার কর্ম্ম ছিল না। তাঁহার অনুমান বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ে মহা বৈষ্ণব মহাজন, উভয়ে উভয়ের রচনা পাঠ করিতেন, উভয়ের একান্ত ঔৎসুক্যে পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিবে। তাই তিনি লিখিলেন,—

> নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল
> তাহে অতি আরতি ভেল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন-বর্ণনায় তাঁহাদের কি কথোপকথন হইয়াছিল বৈষ্ণব দাস নিজের কবিতায় তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন। এই রসালাপ কল্পিত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই মিলন যাত্রায় বিদ্যাপতির উৎসাহদাতা কাহারা? বৈষ্ণব দাস লিখিতেছেন, রূপনারায়ণ, বিজয়-নারায়ণ, বৈদ্যনাথ শিবসিংহ। রূপনারায়ণ যে রাজা শিবসিংহের উপাধি কবি সে কথা ভুলিয়া গিয়া রূপনারায়ণকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান শিবসিংহ বৈদ্যনাথের নামান্তর। বিজয়নারায়ণ কে? বিদ্যাপতির পদের ভণিতায় এই নাম পাওয়া যায়।—

> নরনারায়ণ ভূপতি ভান।
> বিজয়নারায়ণ ইহ রস জান॥

বিজয়নারায়ণ ত্রিহুতের রাজা। শিবসিংহের উপাধি যেমন রূপনারায়ণ ইঁহার উপাধি সেইরূপ বিজয়নারায়ণ, কিন্তু শিবসিংহ আর ইনি ত সমসাময়িক ছিলেন না, শিবসিংহের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ইনি রাজা হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী, তিনি কয়েকজন রাজাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু শিবসিংহ ও বিজয়নারায়ণ এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না।

অবশেষে বিদ্যাপতি যখন পথে বাহির হইলেন তখন তাঁহার সঙ্গী হইলেন রূপনারায়ণ একা! একথা বৈষ্ণব দাস দুইবার করিয়া লিখিয়াছেন—

> সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল
> বিদ্যাপতি চলি গেল।

বৈষ্ণব দাস রূপনারায়ণ ও শিবসিংহকে যে কেবল দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে করিতেন এমন নয়, রূপনারায়ণকে হয়ত তিনি বিদ্যাপতির ভক্ত শিষ্য অনুমান করিতেন। এই অমূলক কবিকল্পনা এবং ভক্তের অনুমানের ভিত্তির উপর লোকে এতকাল নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

যে কালে এই দুই কবি বর্ত্তমান ছিলেন তখন মিথিলা সমৃদ্ধ রাজ্য, বঙ্গদেশ মুসলমানের করকবলিত দরিদ্র দেশ। মিথিলা বিদ্যার আগার, মিথিলার অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের নিকট বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে শাস্ত্রশিক্ষা করিতে হইত। মিথিলায় বৈষ্ণবধর্ম্ম কোনোকালে প্রবল হয় নাই। বিদ্যাপতি সম্পত্তিশালী রাজপণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যে ও শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত, নানা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু তিনি যে বাংলা ভাষা জানিতেন, কিংবা কোনোকালে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, অথবা চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ লেশমাত্র নাই। পক্ষান্তরে, চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনাতেই পাওয়া যায়।

মিথিলার গোবিন্দদাস

বৈষ্ণব কবিতার ভাণ্ডার আলোচনা করিতে হইলে যে ভাষায় বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলী রচনা করিতেন প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতে হয়, কেন না, সমগ্র বৈষ্ণব কবিতার উপর এই ভাষার অপ্রতিহত শাসন। এমন বৈষ্ণব কবি বিরল যিনি এই ভাষার মোহিনীতে মুগ্ধ হন নাই, কিংবা এই ভাষার ভাণ্ডার হইতে শব্দরত্ন আহরণ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিয়াছেন। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কিন্তু যে দেশে বিদ্যাপতির জন্ম সেই দেশের আর একজন কবির পদাবলী যে বৈষ্ণব কবিতায় সম্মলিত হইয়াছে তাহা এখনও অনেকের জানা নাই। গোবিন্দদাস নামধারী যে কয়েকজন পদকর্ত্তা আছেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ কবি তিনি মিথিলাবাসী। পদকল্পতরুতে তাঁহার বহুসংখ্যক পদ আছে। এই কবির পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া মিথিলা হইতে আমি সেগুলি আনিয়াছিলাম। ত্রিপুরা রাজবংশের সাহিত্যানুরাগী এক বন্ধু ঐ গ্রন্থ নিজের ব্যয়ে মুদ্রিত করিবেন বলিয়া আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। পরে জানিলাম তিনি পাণ্ডুলিপি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

এই কবি কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিরাজ ইহার জাতির পরিচয় সিদ্ধান্ত করিয়া ইহার নিবাস স্থান বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড গ্রামে নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈদ্যবংশে ইহার জন্ম তাহাও লিখিত হইয়াছে। কবিসম্রাট ও কবীন্দ্র বলাতে যদি দোষ না হয় তাহা হইলে কোন শ্রেষ্ঠ কবিকে কবিরাজ বলিলে ক্ষতি কি? জগদ্বন্ধু ভদ্রের মহাজন পদাবলীতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতির নাম ছিল বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার নিবাস হয় যশোহরে কিংবা বীরভূমে। এরূপ বিশ্বাসে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই বরং ইহা স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে কবির স্থান, তিনি বাঙ্গালী না হইয়া আর কি হইবেন? যাঁহারা প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাসের ঘরবাড়ী, জন্মস্থান, বংশ সমস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা জানেন না যে, পদকল্পতরুতেই এমন পদ পাওয়া যায় যাহা হইতে এই গোবিন্দদাস যে মিথিলা নিবাসী তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ষড়বিংশতি পল্লবের শেষ পদ রামচন্দ্রের বন্দনা। পদটি এই—

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন
জনকসুতা রতিকন্ত।
সুর নর বানর খচর নিশাচর
জসু গুন গাব অনন্ত ॥
দুর্ব্বাদল নব সামর সুন্দর
কঞ্জ নয়ন রণবীর।
বাম ধনুক ধর দাহিন নিশিত শর
জলধি কোটি গভীর ॥
শ্রীপদ পাদুক ধরু ভরতানুজ
চামর ছত্র নিছোরি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শতমুখ রাহ করজোরি ॥
ভকত আনন্দন মারুত নন্দন
চরণ কমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল
হরিনারায়ণ দেবা ॥

অর্থ—রঘুনন্দন জানকীবল্লভ শ্রীল রামের জয় হউক! সুরনর বানর খেচর নিশাচর যাঁহার অনন্ত গুণ গান করেন। (তিনি) নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামসুন্দর কমলনয়ন রণবীর; বাম হস্তে ধনুক ধারণ করেন, দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ শর, (এবং তাঁহার প্রকৃতি) কোটি জলধির ন্যায় গভীর। (বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণে রামের বর্ণনায় লিখিত আছে, সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব—গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়)। অনুজ ভরত চামর ছত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীপদের পাদুকা ধারণ করেন; শিব ব্রহ্মা সনক

সনাতন ও শতমুখ ইন্দ্র করযোড়ে অবস্থান করেন; ভক্তের আনন্দ-বিধায়ক হনূমান চরণকমল সেবা করেন। গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারণ করিল হরিনারায়ণ দেব (তুল)।

এই একটি পদ ছাড়া পদকল্পতরুতে কিংবা বৈষ্ণব কবিতার অন্য কোনো সঙ্কলন গ্রন্থে রামচন্দ্রের বন্দনার পদ পাওয়া যায় না। পাইবার কথাও নয়। বৈষ্ণব কবিগণ পদ-রচনাকালে গৌরচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার বন্দনা করিতেন, আর কোন দেবদেবীর নয়, কিন্তু মিথিলার কবি যে রামচন্দ্রের বন্দনা করিতেন ইহাতে বিচিত্র কি? এই পদের শব্দ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি-কৃত রামবন্দনা শ্রুতিমধুর নয় বলিয়া উহা এদেশে আনীত হয় নাই। এই পদের ভণিতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়—

গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
　　হরিনারায়ণ দেবা।

এই হরিনারায়ণ দেব কে? শিবসিংহের বংশে যত রাজা হইয়াছিলেন সকলেরই এই রকম একটা উপাধি থাকিত। শিবসিংহের পিতৃব্য দেবসিংহ গরুড়-নারায়ণ, শিবসিংহ স্বয়ং রূপনারায়ণ; নরনারায়ণ, বিজয়-নারায়ণ পদবী পাওয়া গিয়াছে। হরিনারায়ণ কাহার উপাধি শিবসিংহের কুলপঞ্জী দেখিলেই জানিতে পারা যায়। ভণিতায় রাজার নাম ও উপাধি কিংবা শুধু নাম বা শুধু উপাধি বিদ্যাপতির পদে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস পদের ভণিতায় রাজারাণীর নাম বেশী লিখিতেন না, কিন্তু এরূপ নামসমেত পদ পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার সপ্তবিংশতি পল্লবে দুইটি পাইয়াছি। দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি, কারণ কবির ভাষা এবং রচনা-নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নব নীরদ তনু তড়িত লতা তনু
　　পীত পতনি বনি ভাল।
মালতি বকুল বলিত অতি আকুল
　　মৌলি মিলিত বনমাল॥
পেখলুঁ কালিন্দী কূল বিলাসী।
হেলি কলপতরু তরুণী মনমোহন,
　　বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥
মণিময় অভরণ নূপুর রণঝন,
　　মদ মন্থর গতি ভাতি।
গীম বিভঙ্গিম নয়ন তরঙ্গিম,
　　কত কুলবতী মতি মাতি॥
কমলা লালিত চরণ কমল মধু,
　　পাওয়ে সেই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ
　　গোবিন্দ দাস অনুমান॥

অর্থ—নব জলধরের ন্যায় তনু, তাহাতে পীত বস্ত্র তড়িৎ লতার ন্যায় উত্তম শোভিত হইল। মস্তকে মালতী বকুল জড়িত (সৌরভে) আকুলীকৃত বনফুলের মালা। যমুনাতট বিলাসী (শ্যামকে) দেখিলাম কল্পতরুতে অঙ্গ হেলাইয়া তরুণীমনোমোহন বিনোদ বাঁশী বাজাইতেছে। মণিময় আভরণ, চরণে নূপুর রণঝন বাজিতেছে, মত্ত মন্থর গতির শোভা। বঙ্কিম গ্রীবা, তরঙ্গিত নয়নে কত কুলবতীর চিত্ত উন্মত্ত হয়। কমলাসেবিত সেই চরণকমলের মধু যে পায় সেই সুজন। গোবিন্দ দাসের অনুমান রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ (সেই রূপ সুজন)।

এই রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ যে শিবসিংহের বংশের তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইঁহাদের রাজ্যের কতক অংশ ভাগলপুর জেলার চম্পারণ্য নামক স্থান, যাহা হইতে চম্পানগর হইয়াছে। মতিহারী চম্পারণও এই নাম হইতে হইতে পারে। চম্পারণ্যপতি অথবা সংক্ষেপে চম্পতি বলিলেও এই রাজাদের বুঝাইত। গোবিন্দদাসের একটি পদের ভণিতায় আছে—

রায় চম্পতি ওঁ রস গাহক
　　দাস গোবিন্দ ভান।

এই রায় চম্পতি চম্পারণ্যপতি নরসিংহ রূপনারায়ণ। বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদে চম্পতি, চম্পতিপতি ভণিত আছে।

দ্বিতীয় পদ—

তনু ঘন গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন,
　　কমল-নয়নী-নয়ন-ললিতাঞ্জন।
নন্দ সুনন্দন, ভুবন আনন্দন,
　　নাগরী নারীর হৃদয় ঘন চন্দন॥
লোচন খঞ্জন, জগ অনুরঞ্জন
　　কুলবতী যুবতী বরত ভয় ভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভন, রসিক রসায়ন,
　　রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥

এই পদ কিছু দুর্ব্বোধ।

অর্থ—তনু মেঘকে গঞ্জনা করে, যেন দলিত অঞ্জন, কমলনয়নীর নয়নের ললিত অঞ্জনস্বরূপ। নন্দের সুন্দর নন্দন, ভুবনের আনন্দ-দায়ক, নাগরীর হৃদয়ে ঘন চন্দন লেপ স্বরূপ। খঞ্জন লোচন জগৎকে অনুরঞ্জন করে ও কুলবতী যুবতীর কুলব্রতের ভয় ভঞ্জন করে। গোবিন্দদাস কহিতেছে রসময় রূপনারায়ণ ভূপতি রসের রসায়ন।

এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি। ইঁহার শব্দের

ছটা, অনুপ্রাসের ঘটা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্থানে স্থানে জটিল মৈথিল ভাষা, সে ভাষা না জানিলে অর্থ করিতে পারা যায় না। যদি ইনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কিংবা চৈতন্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন তাহা হইলে ইঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা গৌরচন্দ্রিকায় দেখিতে পাওয়া যাইত। এক চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিয়া সকল বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির প্রতিভা গৌরচন্দ্রের আলোকে আলোকিত। বাসুদেব ঘোষের পদে আছে 'যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।' মিথিলার গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রের সম্বন্ধে কোন পদ রচনা করেন নাই। তাঁহার অনুকরণে একজন কিংবা দুইজন বাঙ্গালী গোবিন্দদাস গৌরের সম্বন্ধে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাষায় ও মিথিলার কবির ভাষায় এত পার্থক্য যে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব কবিতায় যে বাঙ্গালী ছাড়া আর কাহারও রচনা আছে এ কথা লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। একজন বাঙ্গালী গোবিন্দদাস-কৃত গৌরের বর্ণনা উদ্ধৃত করি।—

চম্পক, শোণকুসুম, কনকাচল,
জিতল গৌরতনুলাবণি রে।
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব,
জগমনোমোহন ভাঙনি রে॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
কলিযুগ কালভুজগ ভয় খণ্ডন।
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকত মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দদাস উহি পরশ না ভেলি।

এই পদের ভাষা বাংলা ও মৈথিল মিশ্রিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর ও গোবিন্দদাস ঝার অনুকরণে যে-সকল বাঙ্গালী কবি পদ রচনা করিতেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ভাষা এইরূপ।

বিদ্যাপতি যে বাঙ্গালী ছিলেন না একথা এখন আমরা জানিয়াছি। আবার কবিরাজ গোবিন্দদাস ঠাকুরও যে শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈদ্যসন্তান ছিলেন না, তিনিও বিদ্যাপতির দেশের লোক, একথা স্বীকার করিতে হইলে মনে আঘাত লাগে। কিন্তু সত্য জানিতে পারিলে তাহা ত চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না। এই গোবিন্দদাসের নাম ছিল গোবিন্দদাস ঝা, ইনি বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী কবি। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে মিথিলার পক্ষ হইতে কোন দাবী-দাওয়া নাই। মৈথিল অক্ষর ঢালা হয় না, মৈথিল কবিতা ছাপাইতে হইলে দেবনাগর অক্ষরে ছাপাইতে হয়। মিথিলার কোন পণ্ডিত বা শিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। এই কবিদ্বয়ের পদাবলী যে কোনকালে মিথিলা হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে তাহারও কোন আশা নাই। দেবনাগর অক্ষরে বিদ্যাপতির পদাবলী ছাপাইবার জন্য দরভঙ্গার মহারাজা রমেশ্বর সিংহ কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল মূল পদগুলি ছাপা হয়, টীকা ও ভূমিকার ব্যয় কুলাইয়া উঠে নাই। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদন করিবার উপলক্ষ্যে যে সময় আমাকে মিথিলায় যাইতে হয় সেই অবকাশে আমি জানিতে পাই যে, কবিরাজ গোবিন্দদাস মিথিলানিবাসী এবং তাঁহার পদাবলী সেখানে হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাষার বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য আরও একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যে ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে অপন তনু ছাপএ
কর দএ ফণি মনি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয় অনুরাগ।
তুয় অভিসার রভসে বর নাগরী
জীবএ বহু পুনু ভাগ॥
যে পদতল থল কমল সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত ভাঁত নিশঙ্ক॥
মন্দির মাঝ স াঁঝ নহি ভেজত
দেহলি মানএ দূর।
অব দুহু জামিনি বিপিনে একাকিনি
গোবিন্দদাস কহ ভূর॥

অর্থ—দেওয়ালে আঁকা ভুজঙ্গের ছবি দেখিয়া যে নারী চমকিয়া চমকিয়া ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠে সে এখন নিজের দেহ অন্ধকারে আবৃত করে, হাত দিয়া ভুজঙ্গের মাথার মণি ঢাকা দেয়। মাধব, তোর প্রতি অনুরাগের কথা কি বলিব? তোর অভিসার-রসে (মুগ্ধ হইয়া)

নাগরীশ্রেষ্ঠ বহু পুণ্যফলে বাঁচিয়া আছে। স্থলকমলের স্তায় সুকোমল যে পদতল ধরণীর স্পর্শনে ব্যথিত হয় এখন উহা কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কটপূর্ণ পথে নিঃশঙ্কে যাতায়াত করিতেছে। (যে ভয়ে) সন্ধ্যার সময় গৃহের বাহির হয় না, অঙ্গনকে দূর মনে করে (সে) এখন অমাবস্যা রাত্রে বিপিনে একাকিনী চলিয়া যায়। গোবিন্দদাস স্পষ্ট কহিতেছে।

যেমন চণ্ডীদাসের স্বচ্ছ আবেগময়ী ভাষা মিথিলাবাসীর পক্ষে লেখা অসম্ভব সেইরূপ মিথিলার এই কবির মসৃণ, মার্জ্জিত, ঝঙ্কৃত ভাষা বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য। এই ভাষার নকল অনেক দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আসলে ও নকলে বিস্তর প্রভেদ।

ভণিতা

পদকল্পতরুতে সকল কবির অপেক্ষা বিদ্যাপতির রচনার সংখ্যা অধিক। সকল পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে আবার কতকগুলি ভণিতাশূন্য পদও আছে এমন পদও আছে যাহাতে বিদ্যাপতির নাম থাকিলেও সেগুলি কোন মতেই তাঁহার রচনা হইতে পারে না। তালপাতায় ও অন্য পুঁথিতে অনেক সময় ভণিতা লেখাই হইত না, 'ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি' অথবা 'ইতি বিদ্যাপতেঃ' এই রকম করিয়া সারিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর অপর লোকে নিজের ইচ্ছামত কোন রাজা কি নবাবের নাম বসাইয়া দিত। বিদ্যাপতির মৃত্যুর পর যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও নাম তাঁহার পদের ভণিতায় পাওয়া যায়। ইহাতে ঐতিহাসিকতার একটা বড় গোল বাধে।

ভণিতায় কবির নাম লিখিবার প্রথা প্রার্থনা সঙ্গীত হইতে। যে সঙ্গীতে অথবা কবিতায় দেবতার বন্দনা তাহাতেই শেষে কবির নাম দিয়া আত্মনিবেদন শুধু এদেশে নয়। পারস্যদেশের জগদ্বিখ্যাত সূফী কবি হাফেজ ও জলালুদ্দীন রুমী তাঁহাদের রচিত গজলের ভণিতায় নিজের নাম দিতেন; দুইজনই মহাজন, দুইজনই সাধক। তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, নানক, মীরাবাঈ এমন ভক্ত, ইঁহাদের গানও সেইরূপ মর্ম্মস্পর্শী। গানের শেষে নাম দিয়া ইঁহারা ইষ্টদেবতাকে আত্মসমর্পণ করিতেন। বৈষ্ণব কবিতা আগাগোড়াই ভক্তির প্রবাহ, দেবপূজার গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু সাহিত্য ও কাব্যের হিসাবে দেখিতে গেলে কি ভণিতা বিশিষ্ট প্রমাণ? যদি ভণিতার বিপর্য্যয় হয়, যদি ভণিতা না থাকে তাহা হইলে কি আর কবির নাম স্থির করা যাইতে পারে না? কবির স্বাক্ষর কি কেবল ভণিতায় থাকে? যখন আবৃত্তি করি

> বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ, সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ,
> সঙ্গীতায় প্রহতমুরজা স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।

তখন কি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে এই অমর ভারতী কাহার? জয়দেবের পদাবলীতে ভণিতা আছে কেন না সেগুলিও ভজনের গান, কিন্তু ভণিতা না থাকিলে কি আসিয়া যাইত? গীতগোবিন্দে পদের সংখ্যা অধিক নয় কিন্তু ঐরূপ মধুর কোমলকান্ত পদ আর একটি কেহ রচনা করিতে পারিয়াছে কি? বিদ্যাপতি, মিথিলার গোবিন্দদাস, রাধামোহন ঠাকুর, সনাতন ইঁহারা সকলেই জয়দেবের অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারেন নাই। ফুলের পরিচয় যেমন সৌরভে, কবি ও কাব্যের প্রকাশ তেমনি কবিতার অন্তর্নিহিত শোভায়। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, শব্দবিন্যাসে কবিতা কবির নাম ঘোষণা করে। কবির নাম তাঁহার রচনায় মুদ্রাঙ্কিত। কবির লেখায় সর্ব্বত্র তাঁহার পাঞ্জার ছাপ।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

বিদ্যাপতি কিংবা এই গোবিন্দদাস যে বিদেশী এরূপ ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না; কিন্তু কীর্ত্তনানন্দ নামক সঙ্কলন গ্রন্থে দুইটি পদে বৈষ্ণব-কবিদিগের নামের তালিকায় এই দুই কবির নামের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পদ গোপীকান্ত দাসের ও অপরটি গৌরসুন্দর দাসের রচিত। প্রথম পদের আরম্ভ এইরূপ—

> শ্রীবিদ্যাপতি কবিবর শেখর করল বহুত বিধ গীত।
> শ্রী গোবিন্দ কবীন্দ্র শিরোমণি ত্রিজগতে যাহার চরিত।

দ্বিতীয় পদে—

> বিদ্যাপতি কবিরাজ গোবিন্দদাস করল বিবিধ সব গীত।

কবীন্দ্র ও কবিরাজ এই দুই শব্দের অর্থ এক।

কীর্ত্তনানন্দে আর একটি পদে গোবিন্দদাস স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি বিদ্যাপতির নিকট ঋণী।

বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল রাধা রসময় কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈসন হেরল যে হেরি লাগএ ধন্ধা॥

অর্থ—রাধার রসময় (চরিত্রে) আমার মূল উপদেশ বিদ্যাপতির পদ হইতে। গোবিন্দদাস কহিতেছে তিনি (বিদ্যাপতি) কিরূপ দেখিয়াছিলেন (যাহা দেখিয়া আমাদিগকে) বিস্মিত হইতে হয়!

যে-সকল পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস উভয়ের নাম আছে সেখানে বুঝিতে হইবে যে এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি।

গোবিন্দদাসের যে কয়টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার কয়েকটি পদকল্পতরুতে ও অপর গ্রন্থে বিকৃত ও অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে এরূপ আরও ঘটিয়াছে। মিথিলার পুঁথি ও পণ্ডিতের সাহায্যে অনেকগুলি পদ সংশোধিত হইয়াছে কিন্তু পদকল্পতরুর অরণ্যে যে এরূপ সমস্ত পদ পাওয়া গিয়াছে নিঃসংশয়ে এমন কথা বলিতে পারা যায় না। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ষষ্ঠ পল্লবে একটি পদ যেমন পাইয়াছি সেই আকারে উদ্ধৃত করিতেছি। বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রথম সংস্করণে এই পদটি বাদ পড়িয়াছিল।—

অশনি কহতহিঁ ত্তয়ানি পয়ে হাসি,
বিসরিদে বিষয়াসয়া।
রঞ্জন ভঞ্জন সমান কানন
কঠিন করয়ে নিরাশয়া॥
আওধ আনল হঠ না মানল
নয়নে গলয়ে জলধারয়া।
চাঁদে চড়ি যেন বেঢ়ি খঞ্জন
মুক্ত মোতিম মালয়া॥
কুটিল কেশকলাপ ক্ষীণ তনু
সখিনি যতনে নিবারয়া।
জনু উজোর হাটক ছাট মনমথ
বান্ধি চামর চারয়া॥
বহু দিন গেল বহু মাস ভেল
বহু বরিখ কতয়ে সমারয়া।
নিজ নারী বিরহিণী জারি মাধব
সাধবি কোন কাজয়া॥
ইতি শাশ শুনি শুনি কহত পুনি পুনি
আকুল ভই বহু কালয়া।
নিজ নেহ গণি গণি গেহ যদুপতি
সিংহ ভূপতি জাগয়া॥

সিংহ ভূপতি শিবসিংহ। ভণিতায় সিংহ ভূপতি নাম-সম্বলিত বিদ্যাপতির আরও পদ আছে। বিদ্যাপতির ভাষা না জানিলে অথবা তাঁহার পদাবলীর ভাষায় অভিজ্ঞ মিথিলার কোন পণ্ডিতের সাহায্য না লইলে এই পদের সংশোধন বা অর্থ হয় না। সংশোধিত পাঠ এইরূপ—

অহঁ সনি কহতহি তইও ন পএ জাসি
বিসরইত বিলোআসআ।
রঞ্জন ভঞ্জন সমান কানন
কঠিন করএ নিরাসআ॥ ২।
অওধ আএল হঠন মানল
নয়ানে গরএ জলধারআ।
চাঁদে চঢ়ি জনু বেঢ়ি খঞ্জন
মুক্ক মোতিম মালআ॥ ৪।
কুটিল কেস কলাপ খীন তনু
সখিনি জতনে নিবাধআ।
জনু উজোর হাটক ছাট মনমথ
বাঁধি চামর চারআ॥ ৬।
বহু দিন গেল বহু মাস ভেল
বহু বরিখ কতএ সমারআ।
নিজ নারি বিরহিনী জারি মাধব
সাধব কওন কাজআ॥ ৮।
দূতি ভাস শুনি শুনি কহত পুনি পুনি
আকুল ভই বহু কালআ।
নিজ নেহ গুনি গুনি গেহ জদুপতি
সিংহ ভূপতি ভানআ॥ ১০।

অর্থ—১-২। (দূতী মথুরায় গিয়া মাধবকে কহিতেছে), এমন করিয়া কহিতেছি, তবুও তুই যাইতেছিস্ না, বিশ্বাস দিয়া (মথুরা হইতে সত্বর ফিরিয়া আসিবি রাধাকে এরূপ আশ্বাস দিয়া) বিস্মৃত হইতেছিস্। রম্য (নিকুঞ্জ) ভবন অরণ্যের সমান (হইল) (রাধার পক্ষে) কঠিন নিরাশা হইল। ৩-৪। (তোর ফিরিয়া যাইবার নির্দ্ধারিত সময়ের) সীমা আসিল, তুই হঠতাবশতঃ মানিতেছিস্ না (যাইতে স্বীকার করিতেছিস্ না)। (রাধার) নয়নে জলধারা ঝরিতেছে, যেন খঞ্জন (নয়ন) চন্দ্রে (মুখে) আরোহণ করিয়া, (মুখ) বেষ্টন করিয়া মুক্তামালা (অশ্রুধারা) ত্যাগ করিতেছে। ৫-৬। রুক্ষ জটিল কেশকলাপ, ক্ষীণ তনু সখীগণ যত্নপূর্ব্বক সাজাইয়া (কেশ বেণীবদ্ধ ও অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া) রাখে, যেন মন্মথ উজ্জ্বল সুবর্ণের (দেহযষ্টির) কোড়া (কষা) বাঁধিয়া চমর (মৃগ) চরাইতেছে। ৭-৮। বহুদিন গেল, বহু মাস হইল, বহু বর্ষ কেমন করিয়া সম্বরণ করিবে? মাধব, নিজের বিরহিণী নারীকে দগ্ধ করিয়া কোন্ কার্য্য সাধন করিবি? ৯-১০। দূতীর কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া শুনিয়া (মাধব) কহিলেন, বহু কাল (অতীত হইয়াছে, আমি) আকুল হইয়াছি। সিংহ ভূপতি কহিতেছে, যদুপতি নিজের স্নেহ গণিয়া গণিয়া (স্মরণ করিয়া) গমন কর।

হাতে লেখা পুঁথি ও ছাপা পুস্তকে এ রকম অনেক ভুল আছে যাহাতে পদ একেবারে অর্থশূন্য হইয়া গিয়াছে।

অজ্ঞাত ভাষা লিখিবার বা ছাপিবার সময় এ রকম ভুল অপরিহার্য্য। বিদ্যাপতিও গোবিন্দদাসের কিছুকাল পরেই তাঁহারা কোন্ ভাষার রচনা করিতেন এ দেশের লোকেরা তাহা ভুলিয়া যায়। মিথিলা ও বঙ্গদেশের সঙ্গে যে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা উঠিয়া যায়। কিছুদিন পরে এই ভাষারই নাম ব্রজবুলি হয়। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর পাঠ নির্ণয় ও অর্থ করিবার জন্য প্রাচীন ও বর্ত্তমান মৈথিল ও হিন্দী ভাষা এবং গ্রাম্য হিন্দী ভাষা, যাহাকে ঠেঠ হিন্দী বলে, জানা আবশ্যক। এই কয়েকটি ভাষা না জানিয়াই যাঁহারা টীকা ও সমালোচনা করিতে অসঙ্কোচে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। একজন টীকাকার এই পদের প্রথম দুই ছত্রের বিশুদ্ধ পাঠের উদ্ধার না হওয়ায় প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। বিশুদ্ধ পাঠ কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই পদ যে বিদ্যাপতির টীকাকার সাহস করিয়া সে কথাও বলিতে পারেন নাই, বিদ্যাপতির নামের পরে একটি প্রশ্নচিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। ভূপতি অথবা সিংহ ভূপতি ভণিতাযুক্ত সকল পদই বিদ্যাপতির বিরচিত, কিন্তু তাঁহার ভাষাই তাঁহার রচনার প্রধান প্রমাণ।

এই পদে বৎসর, (বয়স) শব্দের স্থানে বরিখ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ বরষা শব্দের পরিবর্ত্তে বরখা, বিশেষ শব্দের স্থানে বিশেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভাষা শব্দের উচ্চারণ ভাখা যেমন বৃজভাখা। মূর্দ্ধণ্য 'ষ'য়ের উচ্চারণ মিথিলায়, বেহারে, অযোধ্যায়, মথুরা বৃন্দাবন ও অপর কয়েক স্থানে 'খ'য়ের মত হয়, সংস্কৃত পড়িবার সময়ও এইরূপ উচ্চারণ করে। ষট্পদ না বলিয়া খট্পদ বলে। বিদ্যাপতির একটি পদের আরম্ভে আছে—

> গমন আধি ভূয় ন ভেল বিশেখ।
> ভিত ভরি গেল দিনে দিনে রেখ॥

পদামৃতসমুদ্রে এই পদের টীকায় রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন, "পাশ্চাত্যা মূর্দ্ধণ্য ষকারোচ্চারণং কুর্ব্বন্তি অতো বর্ণো সাম্যং।" ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে রাধামোহন জানিতেন বিদ্যাপতি পশ্চিম দেশবাসী।

বিদ্যাপতি এবং কবীন্দ্র অথবা কবিরাজ গোবিন্দদাস যে ভাষায় পদ রচনা করিতেন তাহা সেই কালের বিশুদ্ধ মৈথিল ভাষা, এবং মিথিলার লোকেরা এখনো সে ভাষা বুঝিতে পারে। বহুসংখ্যক বৈষ্ণবকবি এই ভাষা অনুকরণ করিয়া গীত বাঁধিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কীর্ত্তনে বিদ্যাপতির পদ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন ও শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেন।

ব্রজবুলি

এখন আমরা একটা মত খাড়া করিয়াছি যে, বিদ্যাপতির ভাষা মিথিলার ভাষা ও তাহার অনুকরণে যে ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার নাম ব্রজবুলি। যাঁহারা এই মত অনুমোদন করেন তাঁহারাও জানেন না যে কবিরাজ গোবিন্দদাসও বিদ্যাপতির দেশের লোক, এ দেশের নয়। এ মত মনগড়া কেন না ব্রজবুলি কথাটা যাঁহারা প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারা জানিতেন না যে বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সকলেই জানিত বিদ্যাপতি বাঙ্গালী, এখনও প্রায় সকলে জানে যে প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাস বাঙ্গালী। ব্রজবুলি শব্দ বৈষ্ণব-কবি ও বৈষ্ণব-ভক্তের কথা, ক্রমে সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের কিছুদিন পরেই লোকে ভুলিয়া যায় যে বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ কখনো বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছিল। পদাবলী থাকিত বৈষ্ণবদের ঘরে, তাঁহারা পুঁথিতে লিখিয়া রাখিতেন, গান করিতেন। বৈষ্ণব প্রেমিক, ভাবুক, রসিক, কিন্তু কোন্ মহাজন, কোন্ কবি কোন্ দেশের লোক, কোন্ ভাষা কোথা হইতে আসিল এ সকল গোলমালে তাঁহারা থাকিতেন না। বৈষ্ণব-কবি ত সকলেই বাঙ্গালী, তবে তাঁহারা এই মধুমাখা নূতন ভাষা পাইলেন কোথায়? একি কোন স্বপ্নলব্ধ বিস্মৃত ভাষা, নহিলে ব্রজের কথা ইহাতে এমন মধুর শুনায় কেন? হয়ত ব্রজধাম হইতে এই বাণী যশোহরনিবাসী বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছিল, হয়ত বীণাপাণি স্বয়ং অমৃতভাণ্ড হস্তে বৈষ্ণব মহাজন ও কবিদিগকে এই সুধা বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন! হয়ত ইহা ব্রজেশ্বর ও

ব্রজেশ্বরীর অনন্ত লীলার মধ্যে এক লীলা প্রাচীন গাথা ছন্দে গাঁথিবার জন্য নূতন ভাষা। সেই ব্রজবাল ও ব্রজবধূ, সেই ব্রজধেনু ও ব্রজরেণু, সেই ব্রজতটপ্রবাহিণী যমুনা, সেই ব্রজভূষণ কদম্ব। সেই ব্রজের বংশী-ধারী, সেই ব্রজের রাধাপ্যারী, সেই বংশীবট, সেই বিহঙ্গ মুখরিত বীথিশোভিত বিপিন। যে বিচিত্র ভাষায় সেই সকল কথা নূতন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম ব্রজবুলি ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

ব্রজবুলি বৈষ্ণবদের কথা। ব্রজবুলিতে তাঁহারা খাঁটি-মেকি জানিতেন না, তাঁহাদের হিসাবে বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া আর সকলেই ব্রজবুলিতে লিখিতেন। এ বুলি তাঁহারা কোথায় শিখিলেন তাহা তাঁহারাই জানিতেন। সংস্কৃত বাদ দিয়া বৈষ্ণব কবিতায় কেবল দুইটি ভাষা, ব্রজবুলি আর বাংলা। আজ আমরা না হয় জানি যে, এই ব্রজবুলির কতক অংশ মিথিলার ভাষা। যাঁহারা ব্রজবুলির নামকরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, ব্রজভাষা (বৃজভাখা) নাম দিলে গোল হইবার সম্ভাবনা কারণ ঐ নামের আর একটা ভাষা আছে। ব্রজভাষায় ও হিন্দীতে সামান্য প্রভেদ। এই ভাষার পদও পদকল্পতরুতে আছে। একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাই।—

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে মদন গোপাল কি।
গোঘৃত রচিত কপূরক বাতি
ঝলকত কঞ্চন থাল কি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঝরী বাজত
বেণু বিষাণ কি।
চন্দ্র কোটি ছবি ভানু কোটি জোতি
মুখশোভা নন্দলাল কি।
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোহে
উরে বৈজয়ন্তি মাল কি।
সুন্দর লোল কপোলক ছবি সোঁ
নিরখত মদনগোপাল কি।
সুরনর মুনিগণ করতহিঁ আরতি
ভকত বৎসল প্রতিপাল কি।

অর্থ—মদনগোপালের আরতি করিলে জীবনের সকল সন্তাপ হরণ করে, কালরূপী যমের যন্ত্রণা মিটিয়া যায়। কাঞ্চনের থালায় গব্যঘৃত নিষিক্ত কর্পূরের বাতি জ্বলিতেছে, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, ঝাঝর, বেণু বিষাণ বাজিতেছে। নন্দলালের মুখশোভা কোটি চন্দ্র ছবি ও কোটি সূর্য্যের জ্যোতিতুল্য। মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, অঙ্গে পীতাম্বর ও বক্ষে বৈজয়ন্তী মালা শোভিতেছে। সকলে মদনগোপালের সুন্দর লোল কপোলের ছবি দেখিতেছে, সুরনর মুনিগণ ভক্তবৎসল প্রতিপালকের আরতি করিতেছেন।

এই ভাষা মৈথিল ভাষা হইতে স্বতন্ত্র।

চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব-কবিদের মধ্যে মিথিলার ভাষায় অথবা ব্রজ-বুলিতে বিদ্যাপতি যেমন প্রথম ও প্রধান কবি, বাংলা ভাষায় চণ্ডীদাস সেইরূপ প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের ভাষার আর সকল গুণ ছাড়িয়া দিলেও তাহার সরলতা ও আধুনিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যেমন—

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

এই ভাষা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, না আজিকার লেখা? যদি কোন পরীক্ষার্থীকে এই প্রাচীন ভাষাকে আধুনিক ভাষায় লিখিতে আদেশ হয় তাহা হইলে সে কি করিবে? সে যে পরীক্ষকের ভাষাজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিবে এমন ত মনে হয় না। বাংলা ভাষায় এই যে প্রথম গীতিকবিতার রচনা ইহাই চিরন্তন আদর্শ, কখনও বিস্মৃত কিংবা পুরাতন হইবার নয়, চিরনূতন, নব রে নব, নিতুই নব। ইহার পূর্ব্বে আর কোন রকম বাংলা প্রচলিত ছিল কি না ও সেই ভাষায় কবিতা রচিত হইত কি না, সে বিচার আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। বৈষ্ণব কবিতা জীবন্ত, জাগ্রত সামগ্রী, সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় সুরভিত এবং সেই সুরভি চণ্ডীদাসের ছন্দে ছন্দে, বর্ণে বর্ণে জড়িত রহিয়াছে। ভাষার কোন্ মর্ম্ম হইতে, হৃদয়ের কোন্ অন্তস্তল হইতে এই সহজ সুন্দর সরস ভাষা নির্ঝরিত হইয়াছিল তাহা কে বলিবে?

এই যে সকল মহাপ্রতিভাশালী কবি, ইহারা গদ্য রচনা করিতেন না। কবিপতি বিদ্যাপতির বন্দনায় একটি পদে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন নাগরিকগণ

বিদ্যাপতির রসময় চম্পু শুনিয়া চমকিত হইতেন। চম্পু গদ্যপদ্যময় কাব্যগ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ বিদ্যাপতি সংস্কৃত লিখিয়াছিলেন, মৈথিল ভাষায় নয়। পুরুষপরীক্ষা এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কবিরা গদ্য লিখিবার চেষ্টাই করিতেন না। মিথিলায় যে-সকল পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে টীকা সংস্কৃতে। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে সকল টীকাই সংস্কৃত ভাষায়। পদকল্পতরুতে যে দুই চারিটি টিপ্পনী আছে তাহাও সংস্কৃতে। যদি চণ্ডীদাসের লিখিত কবিতার ভাষা ও তাহার চার শ' বৎসর পরের বাংলা গদ্য পাশাপাশি রাখা যায় তাহা হইলে কেমন দেখায়? ঈশ্বরগুপ্ত কবি ছিলেন আবার সংবাদ প্রভাকর পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কবিতা সহজ ভাষাতেই রচিত হইত কিন্তু গদ্য লিখিবার বেলা তাঁহার ভাষা আর এক মূর্ত্তি ধরিত। সমাস মাপিবার সময় গজে কুলাইত না, আর অনেকগুলি শব্দ একত্রে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার পর দন্তচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইত। আমি ঈশ্বর গুপ্তকে দেখি নাই কিন্তু আমার স্মরণ হয় শব্দমল্লবিদ্যায় পারদর্শী পালোয়ানেরা সেই সকল বিপুলকায় শব্দ স্মরণ করিয়া তাল ঠুকিতেন।

যেমন শ্যাম নাম রাধার শ্রবণ দিয়া তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল সেইরূপ চণ্ডীদাসের ভাষা আমাদের কর্ণকুহর দিয়া আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করে। সর্ব্বত্রই ভাষার শ্রুতিমধুর তরলতা, সর্ব্বত্রই ছন্দের লীলাময়ী প্রবাহিনী। আয়াসের লেশ কোথাও নাই, কষ্টকল্পনার সমস্যা কোথাও পাঠককে সংশয়ান্বিত করে না। চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিস্তর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত সংস্করণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা হয়। পরবর্ত্তী সম্পাদকেরা সকলে যে ঐ সংস্করণ দেখিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত, কারণ তাঁহার টীকা অধিক না হইলেও বিশেষ মূল্যবান। চণ্ডীদাসের প্রত্যেক পদে ভণিতা এক মাত্র প্রমাণ নয়। তাঁহার রচিত পদে তাঁহার পাঞ্জার ছাপ আছে, তাঁহার প্রতিভার মোহর আছে। কথা খুব সহজ হইলেও অর্থের গভীরতা অল্প নয়, ভাব-ঘন কবির লক্ষ্য তলাইয়া বুঝিতে হয়। এই যেমন একটি পদ—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস তেজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

ভাবুক ভক্ত না হইলে এই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজয়ী প্রেমের মর্ম্ম কে বুঝিবে? বাদ্যযন্ত্রে যেমন মীড় দেয় সেইরূপ ঘনবিন্যস্ত ভাব, প্রত্যেক চরণে সেই এক শব্দের বরাবর পুনরাবৃত্তি অথচ কোন্ অরসিক বলিতে পারে যে, ইহাতে কাব্যকলার কোন ক্ষতি হইয়াছে, অথবা ছন্দকে কোনরূপ পরুষতা দূষিত করিয়াছে? প্রীতির ব্যাপ্তি, প্রীতির সার্ব্বভৌম প্রতাপ কি অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত অনাবৃত হইয়াছে! প্রথমে প্রেমের বন্ধন সংসারের ছোটখাট সামগ্রীতে, প্রেমশূন্য স্থান ত্যাগ করিয়া প্রেমময় স্থানের অন্বেষণ, জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রেমের ফাঁস, তাহার পর প্রেম উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হইয়া বাড়বাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। প্রেম দিয়া ত ঘর বাঁধিলাম, প্রেমের কবাটে ত প্রেমের কুলুপ দিলাম, কিন্তু সে ঘর, সে প্রেমের আনন্দ কোথায় রহিল?

পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ত সবই প্রেম কিন্তু প্রাণ না দিলে ত পিরীতি মিলে না! এই মহাযজ্ঞে প্রেম দেবতা, প্রেম মন্ত্র, প্রেম হোতা, আহুতি প্রাণ! স্বাহা, স্বাহা, স্বাহা! প্রাণে কি

না লালসা, বাসনা, অতৃপ্তি। হিন্দুস্থানী সাধুদের বচন আছে, সব ছোড়ো তো সব মিলেগা। এই অলৌকিক প্রেমের পরিণতি হইল কখন? না, যখন রাধা মাধবকে উদ্দেশে বলিতেছেন,

অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন তায়॥

ইহা ভাবসম্মিলনের পদ, অর্থাৎ যে সময় শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় তখন বিরহের বিকারে রাধার মনে হইত যে কৃষ্ণ আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন, আবার তাঁহাদের মিলন হইয়াছে। এই ভাবের পদ বিদ্যাপতি প্রথমে রচনা করেন। রাধার যে কথা, ভক্তেরও সেই কথা। যিনি যোগীর আরাধ্য ধন, তাঁহার ভজন-পূজন ত জানি না, আছে কেবল প্রেম রস, সেই রসে তনু মন ডুবাইয়া তাঁহার পায় ঢালিয়া দিয়াছি। ইহাই আত্ম-নিবেদন, আত্ম-সমর্পণ, প্রাণের পূর্ণ আরাধন। মীরাবাঈ গাহিয়াছেন—

ময় তো হরি (কৃষ্ণ) গুণ গাওয়ত নাচুঙ্গী।
জ্ঞান ধ্যান কী গঠরি বাঁধ কর
হরি পদ ময় লাগুঙ্গী।
মীরা কহে প্রভু গিরধর নাগর
সদা প্রেম রস চাখুঙ্গী॥

আমি ত হরিগুণ গান করিয়া নাচিব। জ্ঞান ও ধ্যান পুঁটুলিতে বাঁধিয়া রাখিয়া আমি হরিপদে লাগিয়া থাকিব। মীরা কহিতেছে, গিরিধারী নাগর প্রভু, সদা প্রেমরস চাখিব।

মীরার প্রেম ও রাধার পিরীতি একই সামগ্রী।

আপন-পর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৬

কাশীর গণেশ মহল্লায় অমরনাথের একটি ছোট দোতালা বাড়ী ছিল। কিন্তু কাশী তাঁহার ভাল লাগিত না, তাই এ যাবৎ এখানে পরিবারস্থ কেহ আসিয়া বাস করে নাই। বাড়ীটি ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। ভাড়াটিয়া উঠিয়া গেলে যোগমায়া ও সুরধুনী আসিয়া এই বাড়ীর বাসিন্দা হইলেন।

কাশীতে ঠাকুরবাড়ী দেখিয়া বেড়াইলে যোগমায়া সুস্থ হইতে পারেন, সুরধুনীর এই ভবিষ্যদ্বাণী বোধ করি কতকটা ফলিয়া গেল, কেন না মূল রোগ না সারিলেও কিছু কিছু উপসর্গ কমিয়া আসিয়াছিল। যথাসময়ে তিনি স্নানাহার করিতেন, রাত্রে সুনিদ্রাও হইত—মাঝে মাঝে অসংলগ্ন বকিতেন বটে, কিন্তু সহজ মানুষের ভক্তি বিশ্বাস লইয়াই দেবতার সম্মুখীন হইতেন। সুরধুনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন, তাঁহাকে লইয়া এ-মন্দির ও-মন্দির দেখিয়া বেড়াইতেন ও গঙ্গাস্নান করিতেন।

যথাকালে করুণা আসিয়া পৌছিল। মাতার অবস্থা দেখিয়া তাহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, এবং কি উপায়ে তাহার মন প্রফুল্ল রাখিবে, অনবরত সেই চেষ্টাই সে করিতে লাগিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া সে ঠাকুরবাড়ী-সমূহ ঘুরিয়া দেখিতে ও পুরাণ ইতিহাসের কাহিনী শুনাইতে লাগিল। আজ এখানে কথকতা, কাল ওখানে রামায়ণ—এইসব দেখিয়া-শুনিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিত।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর হঠাৎ একদিন তাহার একজন বন্ধু জুটিয়া গেল। সকাল বেলা স্নানান্তে করুণা কাপড় শুকাইবার জন্য ছাদে আসিয়াছে, এমন সময় শুনিল অশোক ডাকিতেছে—মা, ও মা!

করুণা মুখ তুলিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিল, কোথাও পুত্রকে দেখিল না।

—মা—অ মা, এই যে আমি।

এতক্ষণে করুণা অশোককে দেখিতে পাইল। পাশের বাড়ীর ছাদের উপর চিলকুঠরির নিকট দাঁড়াইয়া সে হাসিতেছিল।

—দেখ ছেলের কাণ্ড! ওখানে কেমন করে গেলি রে?

—এ যে মাসীমার বাড়ী!

—মাসী মা? কোন্ মাসীমা?

চিলকুঠরির অন্তরাল হইতে একটি যুবতী বাহির হইয়া আসিল। সে গৌরী, বেশ ভাসা ভাসা চোখ, আকৃতি দোহারা, মুখখানি দিব্য হাসি খুসি। তাহাকে আসিতে দেখিয়া অশোক কহিল,—মাসীমা—ওই দেখ আমার মা।

সে করুণার দিকে অগ্রসর হইল। করুণা নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া একটু হাসিয়া সে কহিল,—তুমি কিছু মনে কর না ভাই। তোমাকে দেখবার আগেই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতান হয়ে গেছে। তোমার ছেলেটি কিন্তু বেশ ভাই—এসেই বল্লে, আমার এক মাসী ছিল, সে এখানে নেই, তুমি মাসী হবে? আমি বল্লুম বেশ ত। তারপর কত কথা—দুগুেই আপন করে তুলেচে।

করুণা হাসিল।

—ও-ই বুঝি তোমার এক ছেলে?

—হাঁ।

—তোমরা ভাই-বোন কটি?

—আমার ভাই নেই, বোন একটি।

—সেই বোনটির কথাই বুঝি খোকা বলছিল? তার বিয়ে হয়েচে?

—হাঁ।

এবার করুণার প্রশ্ন করিবার পালা আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাদের দেশ কোথা ভাই?

—আমাদের বাড়ী চন্দনবাড়ী।

—তোমরা কি এখানেই থাক?

—দু-বছর ধরে আছি। শ্বশুর মারা যাবার পর বাড়ী যাই নি।

—বাবু কি করেন?

—কিছু জায়গা-জমি আছে, তাতেই চলে।

—তোমরা তা হলে জমিদার। তোমার ছেলেপুলে?

—একটি মেয়ে ভাই। তোমার ছেলের সঙ্গে তার এরি মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। দেখ্‌বে তাকে?—বিরাজ!

নীচ হইতে উত্তর আসিল,—কি মা?

—একবার উষাকে নিয়ে আয় ত বাছা।

একটি সুসজ্জিত ফুটফুটে মেয়ে কোলে নাচাইতে নাচাইতে সিঁড়ি দিয়া বিরাজ উপরে উঠিয়া আসিল।

ছাদের একপ্রান্তে অশোক কতকগুলি ইট-পাটকেল জড় করিতেছিল, উষাকে দেখিয়াই দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল,—আয় উষা, খেল্‌বি আয়।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে করুণা উষার পানে চাহিয়া ছিল, কহিল,—তোমার নাম রাখা সার্থক ভাই—দিব্যি শান্ত মেয়ে।

জমিদার-গৃহিণী হাসিয়া কহিল,—সে কথা আর বলো না। বিরাজ ছাড়া ও কারু কাছে যায় না।

—বিরাজকে বুঝি দেশ থেকে এনেছিলে?

—না। এখানে আসার সময় রেলগাড়ীতে দেখা হয়—তখন থেকে আমার কাছেই আছে।

শুভক্ষণে সেই যে বিরাজ রেলগাড়ীতে ইহাদের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সে আর তাহা ত্যাগ করে নাই। যাইবেই বা সে কোথায়? সংসার-পথে একলাটি দাঁড়াইতে আর তাহার সাহস ছিল না। জমিদার সত্যেন্দ্র ও গৃহিণী নন্দরাণী তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিত। ইহাদের উদার স্বভাব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল।

এখানে আসিবার কিছুকাল পর এ বাড়ীর সেই স্থূলাঙ্গিনী পরিচারিকার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছিল। সেই হইতে উষাকে রাখিবার ভার তাহার উপর পড়িল। এই শিশুর যত্ন করিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। উষার সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া সে যেন শিশুর মতই সরল হইয়া পড়িত।

অল্পদিন মধ্যে করুণার সহিত নন্দরাণীর সৌহার্দ্দ জমিয়া

উঠিল। প্রায়ই এখন সে করুণার কাছে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিত, এবং ইহাদের মধ্যে ঊষাকে লইয়া আসা প্রয়োজন হইত বলিয়া মাঝে মাঝে বিরাজের ডাক পড়িত।

বাড়ীর একটি ঘরে সত্যেন্দ্রের পাঠাগার। এই ঘরটি ছিল নন্দরাণীর চক্ষুশূল—সমস্ত গার্হস্থ্য ঝঞ্ঝাট নন্দরাণীর উপর চাপাইয়া স্বচ্ছন্দমনে সে পাঠে মগ্ন থাকিত বলিয়া বইগুলির উপর নন্দরাণীর সপত্নী-বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে আসিয়া বইগুলিকে উনানে নিক্ষেপ করিয়া ঘুঁটের খরচ সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব করিত। রহস্যপ্রিয় সত্যেন্দ্র পরম আপ্যায়িত হইয়া তখনি উত্তর দিত—তথাস্তু, মদ ছাড়িয়া আফিম ধরার মত সেও এখন হইতে বই ছাড়িয়া ঐ স্থানীয় অপর নেশাটির সাধনায় মনোযোগী হইবে।

আজকাল করুণ র কাছে নন্দরাণী অধিক সময় থাকিত এবং তাহার সঙ্গে রোজই ঠাকুরবাড়ী দেখিয়া বেড়াইত। একদিন সত্যেন্দ্র বলিল,—তোমার সখীটি দেখ্‌চি একটি স্পর্শমণি।

নন্দরাণী কহিল,—কি রকম?

—তা নইলে কি তুমি হঠাৎ এমন মহার্ঘ হয়ে পড়।

করুণা ও তাহার পারিবারিক সুখদুঃখ এখন ইহাদের একটি আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যেন্দ্রর অন্তরে করুণার প্রতি সহানুভূতির অভাব ছিল না, কিন্তু নন্দরাণীর মুখে তাহার প্রশংসা ধরিত না দেখিয়া সর্ব্বদাই সে ব্যঙ্গ করিয়া কহিত,—সপ্ত স্বর্গের কোন্‌টিতে তোমার সখীর স্থান, দেখ্‌চি সে বিষয়ে এখন থেকে একটা মৌলিক সন্ধান আবশ্যক হয়েচে।

স্বামীকে নন্দরাণী বিলক্ষণ চিনিত। তাই তাহার কথা কানে না তুলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিয়া যাইত,—ওর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশেচে সে কখনো ভাব্‌তেই পারে না যে আজকালকার দিনে এমন চমৎকার মানুষও থাকতে পারে।

সত্যেন্দ্র কহিত,—অর্থাৎ কিনা তুমি বলতে চাও, তুমিও একটি রত্ন—কেন না, রত্নই রত্ন চেনে।...

মাস ছয় কাটিয়া গেল। পূজার সময় আসিয়া পড়িতেছিল। চারিদিকে আনন্দ। বর্ষাশেষে প্রসন্ন প্রকৃতি সকলকে এই মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য যে নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিতেছিল। পথে জনতা—ঘাটে স্নানার্থী—মন্দিরে তীর্থযাত্রীর ভীড়। দোকানে দোকানে রঙীন আলো জ্বলিয়া উঠিল।

বিরাজ আসিয়া কহিল,—আজ রাত্রে মাসীমার বোন আর ভগ্নীপতি আসচে।

—কার কাছে শুন্‌লি রে?

—মাসীমা বল্‌লে।

নন্দরাণী ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—না এলে বিশ্বাস নেই! শুনেছিস্‌ ত সে একজন মস্ত কাজ-পাগলা লোক। করুণা বলে, কাজ ছাড়া সে কিছু বোঝে না।

বিরাজ বলিল,—তা মা তারই না হয় সখ নেই। কিন্তু মাসীমার বোনটির কি ইচ্ছা হয় না যে মা-বোনকে একবার দেখে যায়?

বৈকালে ও-বাড়ী গিয়া নন্দরাণী দেখিল, করুণা উপরের দুইটি ঘর পরিষ্কার করাইয়া আসবাবপত্র সাজাইতেছে। ঘরের সম্মুখে বারান্দা, নীচে উঠান। উঠান ও বারান্দাটি ঘসিয়া তকতকে করা হইয়াছে।

নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করিল,—আজ ওরা আসবে বুঝি?

করুণা কহিল,—হাঁ ভাই। তার পেয়েছি রাত্রি বারটার গাড়ীতে আসবে। এই ঘর দুটি বেশ হবে, কি বল?

—হাঁ, ভালই হবে। বেশ খোলা-মেলা ঘর—হাওয়া খেলে।

খাট ঝাড়িয়া গদি রৌদ্রে দিয়া টেবিল চেয়ারগুলি মুছিয়া করুণা এমন হুলুস্থুল ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছিল যে, দেখিলে মনে হইত যেন কোন রাজ-অতিথির সম্বর্দ্ধনার জন্যই এত-সব আয়োজন। তাহার গোছগাছগুলি কি পরিপাটি, প্রত্যেক অনুষ্ঠান কি মধুর স্নেহরসে পরিপ্লুত—নিবিড় চোখ দুটি দিয়া নন্দরাণী তাহারি পরিমাণ করিতে লাগিল।

করুণা বলিয়া গেল,—ভগ্নীপতির আমার রাশি রাশি চিঠিপত্র লিখতে হয়, তাই এ-ঘরে টেবিলটি রেখেচি। আর এই দেখ অণিমার ছেলের জন্য কেমন ছোট্ট একটি

দোলনা আনিয়েচি। বারান্দায় দোলনা দেব না—বড় গরম। ঐ ঘরেই ঝুল্‌বে।—এই যে উষা, আয় আয়—দেখবি আয়!

একটি আসমানী রঙের জামা পরিয়া উষা বিরাজের হাত ধরিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল।

করুণা কহিল,—এই দেখ্ কেমন দোলনা। কার জানিস? খোকা আসচে—টুকটুকে, ছোট্ট খোকা।

—কোথা খোকা? আমি দেখ্‌ব—বলিয়া উষা ছুটিয়া গিয়া করুণার কাপড় ধরিল।

করুণা বলিল,—কাল সকালে দেখ্‌বি।

—না, আজ দেখব। এখনি দেখ্‌ব।

সকলে হাসিয়া উঠিল। করুণা কহিল,—সে কিরে! এখন কোথা পাবো? তারা আসবে তবে ত।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। নন্দরাণী কহিল,—আজ আসি ভাই। কাল এসে তোমার বোনের সঙ্গে আলাপ করা যাবে এখন।

নন্দরাণী চলিয়া গেল। উষাকে লইয়া বিরাজ বাহিরে যাইতেছিল, করুণা ডাকিয়া কহিল,—কাল সকালে আসিস বিরাজ। উষাকে দেখে অণিমা ভারি খুসী হবে।

সেইদিন মধ্যরাত্রে একখানা গাড়ী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র করুণা দ্রুত নামিয়া বাহিরে আসিল। গাড়ীর উপর একরাশ মোট—ভিতরে একদিকে প্রকাশ ও অণিমা, অন্যদিকে খোকাকে কোলে করিয়া একটি পরিচারিকা বসিয়া। কোচবাক্সের উপর কিষণ, সে তাহাদের ষ্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিল।

করুণা কহিল,—তবু ভাল যে এসেচ। আমি মনে করেছিলাম, তুমি আর আস্‌তে পারবে না।

প্রকাশ কহিল,—তা ঠিক দিদি। যে কাজের চাপ, মনে করেছিলুম, আসা হল না।

প্রকাশ ও অণিমা নামিয়া একে একে করুণার পায়ের ধূলি লইল। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—এ জায়গা কেমন লাগ্‌চে দিদি?

করুণা বলিল,—বেশ লাগচে ভাই। মনে হচ্ছে, এতকাল বনে জঙ্গলে কাটিয়ে এখন মানুষের দেখা পাচ্ছি। কই আমার খোকামণি কই? ঘুমিয়েচে বুঝি? এস বাপ এস—আমার সোনা এস।

পরম আদরে সে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর অণিমা ও প্রকাশের দিকে ফিরিয়া কহিল,—আয় অণু—এস ভাই। একটু দেখে এস, কাশীর বাড়ী, জানই ত—উঠতে চলতে হোঁচট খেতে হয়।

আলো লইয়া চাকর পথ দেখাইয়া চলিল, পিছনে পিছনে তাহারা কথা কহিতে কহিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিল। পরিশেষে করুণা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—সারাদিন পথের কষ্টে ক্লান্ত হয়ে পড়েচ, এখন ঘুমোও।

পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া অণিমা দেখিল, রৌদ্রে ঘর ভরিয়া গেছে। খোলা জানালার ভিতর দিয়া নীচের শান-বাঁধান উঠান দেখা যাইতেছিল, তাহার একাংশ উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যদেব গগনের অনেকখানি উঠিয়াছে। সেই বাড়ী-ঘর উঠান-বারান্দা, অণিমার কাছে সকলি অপরিচিত, এখানকার রৌদ্রটুকু পর্য্যন্ত সে নূতন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

প্রকাশ কখন উঠিয়া বাহিরে গিয়াছিল। পার্শ্বে শায়িত শিশুটির নিদ্রা তখনো ভাঙে নাই, অণিমা তাহাকে জাগাইল না। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পর স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া সে দেখিল, ছোট একটি মেয়ে অশোকের সহিত খেলা করিতেছে। অণিমাকে দেখিবামাত্র অশোক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, কহিল,—কখন এলে মাসীমা? আমি যে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসেছিলুম। আমায় ডেকে তুললে না কেন?

অণিমা তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল,—বেশী রাত্রি হয়েছিল—তাই তুলিনি বাবা।

কালো চক্ষু দুটি, মেলিয়া সলজ্জভাবে উষা অণিমার পানে চাহিয়াছিল। অণিমা জিজ্ঞাসা করিল,—ওরই নাম বুঝি উষা?

—হাঁ, মাসীমা। —তারপর উষার দিকে ফিরিয়া সে কহিল,—দেখেছিস, আমার মাসীমা।

প্রতিবেশিনী নন্দরাণীর কথা অণিমা দিদির পত্রে জানিয়াছিল। উষার দিকে অগ্রসর হইয়া বাহু ধরিয়া সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। কহিল,—আমি তোমার নাম কেমন করে জানলুম বল ত?

ঈষৎ হাসিয়া লজ্জাভরে উষা অণিমার স্কন্ধের উপর ঘাড় গুঁজিয়া রহিল। বিরাজ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল,—ও বড় লাজুক মা। অচেনা লোকের সঙ্গে সহজে কথা কয় না।

—তাই দেখচি।

করুণা আসিয়া উপস্থিত হইল। উষাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—কাল যে খোকা দেখ্‌বো, খোকা দেখ্‌বো বলছিলি—দেখেচিস খোকাকে?

এতক্ষণে উষার কথা ফুটিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—কই খোকা? আমি দেখবো।

অণিমা কহিল,—চল্, তোকে দেখিয়ে আনি।

উষাকে লইয়া অণিমা উপরে উঠিতে লাগিল. বিরাজ পিছনে আসিতেছিল। উঠিতে উঠিতে অণিমা জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি বুঝি ও-বাড়ীর ঝি?

—হাঁ মা।

—কতদিন আছ?

—প্রায় তিন বছর।

—তুমি কি এখানকার লোক?

—না মা। আমি কলকাতা থেকে এসেচি।

অণিমা কহিল,—আমি কলকাতা যাইনি। বাংলা দেশ কখনো দেখি নি। শুনেচি আমাদের দেশটা নাকি বড় সুন্দর।

তাহারা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। পরিচারিকা খোকাকে পোষাক পরাইতেছিল। খোকার কাছে গিয়া উষাকে দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে অণিমা কহিল,—দেখেচিস খোকা, কেমন তোর দিদি? দিদিকে কোলে নেব, তোকে নেব না।

অপরিচিত আর একজনকে তাহার ন্যায্য স্থান হইতে তাহাকে বেদখল করিয়াছে দেখিয়া মাতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য খোকা বিষম লাফালাফি সুরু করিল। তারপর যখন সে কান্না ধরিল তখন অণিমা উষাকে নামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে খোকার কান্না থামিয়া গেল। সে তাহার কোমল বাহু দিয়া মাতার স্কন্ধদেশ বেড়িয়া ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটি দীর্ঘ কটাক্ষপাত করিয়া যেন এই কথা বুঝাইয়া দিল যে, সে আর যাহা খুসী করিতে পারে, কিন্তু অনধিকারীর দাবী করিলে তাহার বিষম প্রমাদ ঘটিবে।

এই ভাবটি তাহার চোখে মুখে এমনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে অণিমা ও বিরাজ দুজনই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

অণিমা কহিল,—দেখেচ ছেলের কি ঈর্ষা? ও কাউকে আমার কোলে উঠ্‌তে দেবে না। —তারপর সস্নেহে খোকার মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে মাটিতে নামাইয়া কহিল,—দিদির সঙ্গে বসে খেলা কর, মারামারি কর না।

পাশের ঘরে গিয়া অণিমা আসবাবপত্রগুলি ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যথাস্থানে রক্ষিত। নূতন জায়গায় আসিয়া তাহাদের এতটুকু কষ্ট না হয় সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

অণিমা কহিল,—এ সব বুঝি দিদির কাণ্ড?

বিরাজ জানাইল, কাল সারাদিন পরিশ্রম করিয়া করুণা স্বহস্তে এ গুলি সাজাইয়াছে।

অণিমা কহিল,—সে দেখেই বুঝেচি। দিদির ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই!

এমন সময় নীচে প্রকাশের গলার শব্দ শোনা গেল। সে বলিতেছিল,—রাস্তায় খানিকটা বেড়িয়ে এলুম দিদি। আরে রাম—এই তোমাদের কাশী?

বিরাজ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। শেষের কয়েকটি কথা অস্পষ্টভাবে কানে যাইতে নীচের উঠানের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু এসেচেন বুঝি?

—হাঁ।

পাকশালার বাহিরে একটা থামের আড়ালে প্রকাশ দাঁড়াইয়াছিল। বিরাজ তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। প্রকাশ বলিতেছিল,—কি ধূলো—ছিঃ! সর্ব্বত্রই

খালি বুড়ো আর বুড়ী। সারা সহর ঘুরলেও দেখচি একখানি কচি মুখ দেখতে পাওয়া যায় না।

এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ স্বর যে সে শুনিয়াছে! বিরাজ চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় থামের আড়াল হইতে একটু সরিয়া আসিতে সে প্রকাশকে দেখিল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। কে বলিবে এ প্রকাশ নহে? সেইমত আকৃতি—নাক মুখ চোখ, সব সেই। সেই রূপ বর্ণ, শুধু গোঁফ নাই, আর ললাটের দুই পার্শ্বে চুলগুলি একটু একটু উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

—উনি বাবু- উনি? তোমার স্বামী?

অণিমা বাহিরে যাইতেছিল, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—হাঁ। উনিই আমার স্বামী।

অণিমার বিস্ময়-চকিত মুখভাব লক্ষ্য করিবার অবসর বিরাজের ছিল না। সে আবার নীচের দিকে মুখ ফিরাইল, কিন্তু প্রকাশকে আর দেখিল না। সে বাহিরে উঠিয়া আসিয়াছিল।

বিরাজের মনে তখনো সংশয়ের সংগ্রাম চলিতেছিল। কর্ণ ও চক্ষুকে অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এ কিরূপে সে হইবে? সে ছিল গরীব, এ ধনী—সে সুরবালার স্বামী, এ অণিমার স্বামী—সে কোন আপিসে সামান্য কাজ করিত, আর এ একজন ব্যবসায়ী। না না হইতেই পারে না। সেই সুপরিচিত মুখখানির স্মৃতি লইয়া মন মাঝে আবার মিলাইয়া দেখিতে অকস্মাৎ সে যেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিল। তাহার কান্তি এর চেয়ে বেশী উজ্জ্বল, ইহার কলেবর অধিকতর পুষ্ট, মুখ গুম্ফশূন্য। সে ভুল করিয়াছে। থামের পাশে ইহাকে সে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারে নাই—তাই কি এই ভ্রম?

হঠাৎ বিরাজ জোরে বলিয়া উঠিল,—না না—সে নয়।

অণিমা তাহার মুখের পানে চোখ নিবদ্ধ করিয়াছিল। কহিল,—কে নয়? কার কথা বলচ?

সে যে এতক্ষণ অণিমার সম্মুখে তাহার পর্য্যবেক্ষক একাগ্র দৃষ্টির পরীক্ষাধীন দাঁড়াইয়া আছে, সে কথা বিরাজ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। মনে মনে বিচার করিবার ফলে তাহার আর এখন কোন সন্দেহ ছিল না। অণিমার প্রশ্ন শুনিয়া অতিমাত্র লজ্জায় তাহার মুখ উচ্চকিত হইয়া উঠিল, এবং সে ভাবটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে উৎসাহের সহিত অনর্গল সে বলিতে লাগিল,—কলকাতায় থাকতে আমি একজনকে জানতুম মা, তিনি দেখতে অনেকটা বাবুর মতন। তাই হঠাৎ তাঁর কথা পড়ে গেছলো। দেবতুল্যি লোক মা, কিন্তু কি কষ্টেই যে তিনি পড়েছিলেন স্বচক্ষে না দেখলে কেউ তা বিশ্বাস করতে পারতো না। তিনি আপিসে সামান্য কেরাণীর কাজ করতেন। বাড়ীতে রোগা স্ত্রী—

—রোগা—স্ত্রী?

—হাঁ মা, সে সারবার রোগ নয়। ডাক্তার একরকম জবাবই দিয়ে গেছলো। কিন্তু সত্যি বলচি মা, এমন যত্ন করে রুগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে আমি আর কাউকে দেখি নি।

—তারপর?

এই অজ্ঞাত লোকটির বিবরণ জানিবার জন্য কেন জানি অণিমার প্রচুর কৌতূহল জন্মিয়াছিল। হয়ত তাহার অন্তরে প্রথম হইতে একটি সংশয়ের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল। এই রহস্যটির চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—সে বৌটি বুঝি বাঁচলো না?

বিরাজ কহিল,—না মা, সে মরেনি। সাহেবেরা পশ্চিমে কোন কারখানায় তাঁকে বদলি করে দিলে। তখন তিনি বৌকে তার বাপের বাড়ী রেখে চলে গেলেন। সংসারে তিনি একা—আপনার বলতে কেউ ছিল না। বাড়ী-ঘর জমি-জমা সব নদীতে ভেঙে নিয়েছিল।

—কিন্তু তুমি—তুমি তাকে কেমন করে জানলে?

অতীতের চিত্রটি স্মৃতিতে উদিত হইয়া বিরাজের নয়ন মন আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, নতুবা সে বোধহয় অণিমার শঙ্কাজড়িত পাংশু মুখমণ্ডল দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। সে এ-সব কিছুই লক্ষ্য না করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়া গেল,—তিনি আমাদের হোটেলে খেয়ে যেতেন, আমিও তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে

বসতুম। স্বামীর সম্বন্ধে কত কথাই সে বল্‌তো, এমন উদার স্বামী, কিন্তু একটি দিনের জন্যও সে তাকে সুখী করতে পারেনি, তাই নিয়ে কত দুঃখ করতো। সে আজ কত বছরের কথা, তারা কোথায় তা জানি না মা, কিন্তু এখনো তাদের কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।—বলিয়া সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল।

বিরাজ কহিল,—বাবু আসচেন। আমি যাই মা।

অকস্মাৎ দৃঢ়মুষ্টিতে অণিমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল,—যেও না—দাঁড়াও।

বিরাজ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শুধু ত্রস্ত হরিণীর মত শঙ্কাকুল চোখ দুটি নিবিড় বিস্ময়ে অণিমার পানে নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

—দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও।

পর মুহূর্ত্তে প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করিল।

বিরাজকে দেখিবামাত্র বজ্রাহতের মত প্রকাশ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে সে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

—বিরাজ!—তুমি এখানে?

বিরাজ জবাব দিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেতস-পত্রের মত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত উভয়ে কিছুকাল নীরব দাঁড়াইয়া রহিল, কাহারো মুখে কথা ফুটিল না।

ইতিমধ্যে কখন অণিমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল, কেহ তাহা জানিল না।

২৭

খানিক পরে চমক ভাঙিলে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন আছ বাবু?

জানালার গরাদে বাম মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া প্রকাশ বাহিরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল।

পূর্ব্ববৎ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বিরাজ কহিল,—আর জিজ্ঞাসা করবার দরকারই বা কি? দেখতেই ত পাচ্ছি, নতুন সংসার পেতে বাবু বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছেন।

কথা কটির ভিতর একটু শ্লেষ ছিল, তাহা প্রকাশের অন্তরে গিয়া বিঁধিল—জবাব দিবার শক্তি তাহার ছিল না।

উভয়ে কিছুকাল আবার নীরব রহিল। কোথা হইতে তাহাদের মধ্যে যোজন-প্রমাণ ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছিল, কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিতেছিল না। অতিকষ্টে বাধা কাটাইয়া বিরাজ আবার জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু, সুধুতে পারি কি—বৌ মরে বেঁচেছে, না বেঁচে মরে আছে?

এবার প্রকাশ উত্তর দিল,—সে বেঁচে আছে বিরাজ।

—তার সঙ্গে তোমার এখনকার সম্বন্ধ?

অল্পে অল্পে প্রকাশ সাহস সঞ্চয় করিতেছিল। কিসের অপরাধ? নিয়তি যে পথে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে, সেই পথেই সে অগ্রসর হইয়াছে। যে যাহা খুসী ভাবুক, তাহার বিবেক তাহাকে বে-কসুর খালাস দিবে।

সে কহিল,—সম্পর্ক? কিছু না। সম্পর্ক ত অনেক-কাল আগেই ঘুচে গেছে।

—তার দোষ কি?

প্রকাশ কহিল,—শুধু কি কষ্ট সহ্য করবার জন্যই মানুষের জীবন সৃষ্টি হয়েছিল? কষ্ট ত ঢের সয়েচি—ফল কি তাতে? কেবল আমারি ক্ষতি, পৃথিবীর কিন্তু কোন উপকার নেই।

বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত হইয়াছিল। হাত দুটি পিছনে মুড়িয়া বার-কত পায়চারি করিবার পর দৃপ্তস্বরে সে বলিতে লাগিল,—আমার জীবনের একদিকে ছিল সুখসমৃদ্ধি স্নেহ-ভালবাসা, সংসারীর কাছে যা-কিছু প্রিয়—অন্যদিকে ছিল জীবন্মৃত্যু। জীবন্মৃত্যু আমি বেছে নিতে পারিনি, সে কি আমার দোষ?

বিরাজের মুখের উপর প্রচুর অশ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বিরাজ বলিল,—মনে পড়ে কলকাতা থেকে দেশে যাবার দিন বৌ তোমার উপর কি একটা সন্দেহ করেছিল? সেদিন আমি তার উপর ভয়ঙ্কর রাগ করেছিলাম—যা মুখে এসেছিল তাই শুনিয়ে দিয়েছিলাম। তখন মনে করতাম চাঁদেও কলঙ্ক থাক্‌তে পারে, কিন্তু তোমার চরিত্রে কখনো তা থাক্‌তে পারে না। আমার

ভুল হয়েছিল—এখন আর আমি কিছু অবিশ্বাস করি না, তুমি সব করতে পার।—বড় দুঃখে দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সে কহিল,—আর এক কথা। অণিমা কি এ সব জানতো?

প্রকাশ ঘাড় নাড়িল,—না, সে কিছুই জানে না।

বিরাজ বলিল,—তা আমি আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন আর তার কাছে কিছু গোপন নেই, সে সবই জেনেচে। তোমায় আর আমি কি বলবো? তুমি সব করতে পার।

বিরজা চলিয়া গেল।

প্রকাশ কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে মনে সে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। কেন এ অস্বস্তি? একটা কথা এখন তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। একদিন এই বিরাজের মত, সুরবালা এবং অণিমাও যে তাহাকে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছিল এবং একে একে সবগুলি হারাইয়া সে আজ পথের ভিখারী হইয়া বসিয়াছে, একি কম ক্ষতি? সে স্পষ্ট অনুভব করিল যে, সারাজীবন সে কেবল আপনার সুখ-সুবিধার কথা ভাবিয়াছে, তাহাকে লইয়া পরের যে কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে সে-বিষয় একটিবারও চিন্তা করিয়া দেখে নাই। পরের মন-মন্দিরে আপনার প্রতিষ্ঠা, আজই যেন সে প্রথম বুঝিল। মানুষের স্নেহ ভালবাসা পরের হাতের স্বেচ্ছার দান, এগুলি অন্তরের জিনিষ, ঠকাইয়া লইবার নহে!

অণিমা সব জানিয়াছে। কিন্তু প্রকাশের ত জানা উচিত ছিল যে, চিরদিন এসব কিছু গোপন থাকিবে না। সে কি বোঝে নাই যে, যে-দিন অণিমা জানিবে তাহাদের সংসারের প্রতিষ্ঠা, দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি সত্যের উপর নহে, প্রতারণার উপর—সেইদিনই তাহার এত সাধের মনগড়া সুখশান্তি বালির বাঁধের মত ধসিয়া পড়িবে? সে বুঝিয়াছিল—হাঁ, বুঝিয়াছিল বৈকি—এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই ত একদিন সে অণিমার কাছে আপন চাতুরীর কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল। কেন সে-দিন সে পিছাইয়া পড়িল? অণিমা রাগ করিত? আজও ত সে করিতেছে। তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিত? কে বলিবে, আজও সে তাহাই করিবে না?

না, আজ সে তাহা করিবে না—প্রকাশের অন্তর জানে আজ সে তাহা করিতে পারে না। সে-ই না হয় প্রতারক, মিথ্যাবাদী—ভাবিতে প্রকাশ শিহরিয়া উঠিল—কিন্তু তাহাদের শিশুটি ত নির্দোষ। সেই কল-হাস্য-মুখর আনন্দ-বিগ্রহই যে উভয়ের মিলন-ধাম। প্রকাশ আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার অতীত পাপগুলি ইহার পুণ্য-কিরণ-স্পর্শে দূরীকৃত হোক! এই স্বর্গীয় অতিথির নির্ম্মল আনন্দে মিথ্যার সৌধটি তাহার শান্তিপূর্ণ উজ্জ্বল সত্যের উপর আবার গড়িয়া উঠুক।

না-ই বা থাকিল তাহার প্রতি কাহারো শ্রদ্ধা। সে জগতের শ্রদ্ধার কাঙাল নহে! এই যে শিশু, তাহার পুত্র—সমগ্র জগতের চেয়েও সে তাহার প্রিয়। আজ সে তাহার প্রাণপাত করিয়া ব্যবসাটির উন্নতি করিয়াছে,—কাহার জন্য? ইহারি জন্য সে জগতের ঘৃণার ভার, কলঙ্কের বোঝা—এমন কি, যদি প্রয়োজন হয়, আপনার ঘরে আপনার স্ত্রীর অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার পসরাও অকুণ্ঠিত চিত্তে বহিতে পারিবে। তারপর একদিন, শিশু বড় হইলে নিজ মুখে সে তাহার জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিবে। জীবনের ইতিহাস!—কত ভ্রমপ্রমাদ, কত উদারতা সঙ্কীর্ণতা, কত পাপপুণ্য একটি অনতিদীর্ঘ জীবনের মধ্যে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, বিস্তারিত বলিবার অধিকার একমাত্র তাহার, আর কাহারো নহে। সে যখন সকল শুনিবে তখন সে আর পিতার অপরাধগুলি জগতের চোখে দেখিতে পারিবে না। সে ত দেখিবে পিতা তাহার জন্য কি না করিয়াছে—সে ত বুঝিবে, পৃথিবীর আলোক-দর্শন তাহার পক্ষে সম্ভব হইল, সে কেবল তাহারি জন্য! একমাত্র সে-ই তাহার জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে, একমাত্র সে-ই তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে, ভক্তি করিবে।

চেয়ারে বসিয়া এইভাবে কতক্ষণ সে ভাবিতেছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই। ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া করুণা কহিল,—রান্না হয়েচে।

চান করগে। কাল রাত্রে ত তেমন ঘুম হয় নি, খেয়ে-দেয়ে একটু জিরোও।

—হঁ্যা যাই,—বলিয়া প্রকাশ উঠিল।

—অণু কোথা ?

—জানি না।

ঘরের বাহিরে বারান্দায় নন্দরাণী দাঁড়াইয়াছিল। প্রকাশ নীচে নামিয়া গেলে ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—অণিমা এখানে নেই বুঝি ?

করুণা কহিল,—না। বোধ করি সে ছাদে গেছে।

—চল তাকে দেখে আসি।

উভয়ে ছাদে গেল। দেখিল, চিলকুঠরির একপাশে ছায়ায় দেয়ালে ঠেশ দিয়া পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত অণিমা নিশ্চল বসিয়া আছে।

তাহারা কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে চকিত হইয়া সে উঠিয়া পড়িল। তাহার কি এখানেও শান্তি নাই ? কোথা হইতে কে ইহারা তাহার চিন্তার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল ? কেন জানি আজ সে জগতের সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল, যেন তাহার নিগ্রহের জন্য পৃথিবীর কাছে তাহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সকলে মিলিয়া একটা বিরাট ষড়যন্ত্র করিতেছে।

করুণা কহিল,—ওমা, তুই এখানে বসে আছিস্। সারা বাড়ী আমরা খুঁজেচি। নন্দরাণী তোকে দেখ্‌তে এসেচে।

অণিমা মুখ তুলিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, বলিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইল না।

হাসিয়া করুণা কহিল,—হাবা মেয়ে কথা কইছিস না যে। অন্য সময় ত তর্কের জালায় দু' দণ্ড তোর কাছে থাকবার জো নেই।

নন্দরাণী হাসিল,—সে-সব পরে হবে এখন। আগে তু চোখের পরিচয় হোক, কি বল ভাই ?

অণিমার ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কথা ফুটিল না।

নন্দরাণী কহিল,—তুমি আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নও ভাই। তোমার কথা করুণা সব সময় বলতো। তোমরা কবে আসবে আমরা সেই অপেক্ষা করছিলাম।

—না এলেই বোধ করি ছিল ভাল,—অস্ফুটস্বরে কথা কটি অণিমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বুঝিবা সে-কথা নন্দরাণী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু করুণা তাহা শুনিয়াছিল।

অকস্মাৎ করুণার মুখের উপর একটা ছায়া আসিয়া পড়িল। অণিমাকে একান্তে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—তোর আজ একি ভাব অণু ? কি হয়েছে ?

—কি আবার হবে ?

—প্রকাশের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস না কি ?

মুহূর্ত্তকাল অণিমা নীরব রহিল। তারপর অভিমান-ক্ষুব্ধ উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল,—আমার কথায় তোমাদের দরকার ? আমি কি তোমাদের কথায় কখনো গিয়েচি ?

করুণা আর কিছু বলিল না। নন্দরাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,—চল ভাই নীচে যাই।

তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। নামিবার সময় অণিমা শুনিল, করুণা কহিতেছে,—এমন মতলবি মেয়ে, হঠাৎ কি যেন হয়েচে প্রকাশের সঙ্গে··· অণিমা আর শুনিতে পাইল না।

প্রকাশ ও বিরাজকে ঘরে রাখিয়া সেই যে অণিমা ছাদে আসিয়া বসিয়াছিল তখন হইতে কত কথাই সে ভাবিয়াছে। সে ভাবিয়াছে, প্রকাশের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ, অমরনাথের মৃত্যু—কিরূপে তাহাদের অসময়ে সাহায্য করিতে গিয়া পরিবারমধ্যে প্রকাশ অল্পে অল্পে মিশিয়া যাইতেছিল, শেষে একদিন কুলিহাঙ্গামায় গুলির আঘাতে জখম হইয়া হাসপাতালে নীত হইলে, আপন ঘর লইয়া আসিয়া নিজ হাতে সে শুশ্রূষা করিয়াছিল। প্রকাশ তাহার বিবাহের কথা গোপন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু অবিবাহিত বলিয়াই কি তাহারা ইহার সেবাযত্ন করিয়াছিল ? তাহা যদি হয়, তবে ইহারাই কি কম অপরাধী ? একটি রুগ্ন নির্ব্বান্ধব প্রবাসী যুবকের মন সেবা দিয়া জয় করিবে ইহাই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য তবে আপনার দিকে চাহিয়া যে খেলাটি প্রকাশ খেলিয়াছিল ঠিক সেই খেলাই কি ইহারা খেলে নাই ?

প্রতারিত হইবার মত মনের অবস্থা সে ত নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাই না প্রকাশ তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিল?

সে ভালবাসিয়াছিল—এবং যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল, সে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। অণিমা দেখিল, প্রকাশের এই অতীত কাহিনী শুনিয়া আজ তাহার যতখানি চমৎকৃত হইবার কথা, ততখানি সে হয় নাই। বরঞ্চ তাহার মনে হইল, সে যেন এরূপ একটা কিছু বরাবর আশঙ্কা করিয়া আসিয়াছে। সেই যে-দিন সন্ধ্যাকালে রাণী পাহাড়ের ভৃগুস্থানে বসিয়া পরিহাস ছলে প্রকাশ জানাইয়াছিল, সে বিবাহিত, দেশে তাহার স্ত্রী তখনো বাঁচিয়া—সেদিনই ত সন্দেহের বীজ বপন হইয়া গিয়াছে। কথাটি ঘুরাইয়া লইয়া সে বলিয়াছিল বটে, এ শুধু তাহার পরীক্ষা—কিন্তু সত্যই কি অণিমা তাহা বিশ্বাস করিয়াছিল? তারপরও সে ইহার অতীত জীবন জানিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না,—কারণ, যে-সকল সুপরিচিত অবস্থার সহিত তাহার আত্মা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত নূতনের মধ্যে অগ্রসর হইতে কোনমতে তাহার সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই। মুখে কিন্তু প্রকাশকে সে শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, প্রবন্ধও সে লিখিয়াছিল দীর্ঘ, যুক্তিতর্ক-বহুল। কিন্তু রসনা যাহাই বলুক, লেখনী যাহাই লিখুক—শঙ্কায় দ্বিধায় তাহার মন চক্ষু মুদিয়া রহিল, সত্যের সন্ধান করিল না।

প্রবন্ধে ছাইভস্ম কি লিখিয়াছিল সে,এখন তাহার একটি বর্ণও মনে পড়িল না। শুধু এইটুকু মনে ছিল, অবনমিতা নারী-জাতিকে সে শক্তি সঞ্চয় করিতে বলিয়াছিল। সে দেখিল, প্রবন্ধটি তাহার ভীরুতার একটি মুখোস মাত্র—যাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সাহস নাই তাহাই লিখিয়া মনের ক্ষেদ মিটাইয়াছিল। এক্ষণে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগ-শিশুর মত চারিদিক হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দৃঢ় বন্ধন সে অনুভব করিতে লাগিল।

তাহার পুত্র আছে, মাতা আছে, ভগিনী আছে, স্বামী আছে। ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি তাহার যে এক একটি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট, সেই কর্ত্তব্য কখনো কি সে পরিহার করিতে পারে? শত অবিচার সহ্য করিয়া স্নেহ ভক্তি প্রেমের অর্ঘ্য বহন তাহাকে করিতেই হইবে—গৃহহারা লাঞ্ছিত জীবের মত নিরুপায় হইয়া নহে, বসুন্ধরার মত অপ্রতিহত গৌরবের দেহ-মনের সংহত শক্তি দিয়া! এই যে সংযম, এই যে সহিষ্ণুতা, পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইবার এই যে স্বভাব ভগবান নারী-জাতিকে দিয়াছেন, তাহার বল কি জগতের কোন বিদ্রোহের চেয়ে কম? বিদ্রোহই জগতের একমাত্র শক্তি নহে! অণিমা আপনাকে ইহাই বুঝাইল।

অণিমা যখন নীচে নামিয়া আসিল তখন বেলা অপরাহ্নের দিকে ঝুঁকিয়াছে। শরতের পীত রৌদ্র উঠান ছাড়িয়া বারান্দার উপর পড়িয়াছিল। দোতালার একধারে মাতার ঘরে মার কাছে বসিয়া করুণা সুর করিয়া রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল।

পাছে তাহার সাড়া পাইয়া করুণা নীচে চলিয়া আসে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি অণিমা আহারে বসিল, কিন্তু ভাত সে আজ মুখেও দিতে পারিল না। সাধ্যমত সে নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, যেন কিছুই হয় নাই, তথাপি তাহার অন্তস্তল হইতে একটা চাপা দুঃখ ফোঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। কেন এমন হইল? তাহার অপরাধ কি? অণিমা হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

—ও কিরে অণু, খেতে বসেছিস? আমায় ডাক্‌লিনি যে?—তারপর অণিমার পাতের উপর দৃষ্টি পড়িতেই করুণা বলিয়া উঠিল,—কিছু খাচ্চিস না যে, ও আবার কি? মাছটা বুঝি বিড়ালকে দিয়েচিস?

একটি বিড়াল বাটি হইতে মাছটি তুলিয়া লইয়া পলাইয়া যাইতেছিল।

কিছু না বলিয়া অণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে আসিতেছিল, এমন সময় করুণা তাহার হাত ধরিয়া মৃদু স্বরে কহিল,—কি হয়েচে অণু, বল্‌বিনি?

কে যেন অণিমার পা দুটি বাঁধিয়া দিল। করুণার হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া যাইতে পারিল না।

করুণা আবার কহিল,—আমি যে তোর দিদি, আমায় বল্।

অণিমার চক্ষু দুটি বাষ্পে ভরিয়া আসিতেছিল—সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

—জিজ্ঞাসা ক'র না দিদি, আজ আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না।

সন্ধ্যার আবছায়া অণিমার নিভৃত ঘরখানির ভিতর ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। বাহিরে তখনো নিভন্ত আলোর ম্লান দীপ্তি আকাশময় ছড়াইয়া আছে। পাখীর কুল যে যাহার নীড়ে ফিরিয়াছে—কচিৎ দুই একটি দলভ্রষ্ট বিহঙ্গ পথহারা পথিকের মত নিরুদ্দেশ হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

পথের উপর বারান্দাটিতে অণিমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পথে অসংখ্য লোকের আনাগোনা—কলরব, হাস্য-কৌতুক। অদূরে দেবমন্দির হইতে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মাতা সুরধুনী ও নন্দরাণীকে লইয়া করুণা আরতি দেখিতে গিয়াছে, অণিমা যায় নাই।

খোকাকে বেড়াইয়া আনিয়া ঝি সবেমাত্র ফিরিয়াছিল। রাস্তায় একটি মাটির পুতুল কিনিয়া সে খোকার হাতে দিয়াছে, হাত বাড়াইয়া সেটি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে খোকা মাতার কোলে যাইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল।

অণিমা মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। যাহাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে মনে হইত যেন যুগ কাটিয়া গিয়াছে, আজ সারাদিনের মধ্যে একটিবারও সে তাহাকে কোলে লয় নাই। এক্ষণে তাহার মাতার অন্তর শতবাহু মেলিয়া শিশুটিকে বক্ষে ধরিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। প্রাণপণে আগ্রহ দমন করিয়া সে কহিল,—নিয়ে যা ঝি, ওকে এখান থেকে নিয়ে যা। আমার শরীর ভাল নেই।

ঝি কহিল,—নীচ থেকে সাঁঝের বাতি জেলে আনি মা, ও এখানে থাক্। লক্ষ্মীছেলে মা, কিছু করবে না।—বলিয়া খোকাকে বারান্দার মেজের উপর নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পুতুল লইয়া শিশু মেজের উপর বসিয়া খেলিতেছিল, অণিমা তাহার পানে চাহিয়া রহিল। চারিদিক আঁধার হইয়া আসিতেছে, তবু সে শিশুর মুখাকৃতির প্রতি রেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তারপর হঠাৎ হাত বাড়াইয়া সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং উজ্জল চোখ দুটির মধ্যে দৃষ্টি মিলাইয়া আবেগপূর্ণ দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—বাবার মত হোস্ না খোকা। বল্, লক্ষ্মী বাপ আমার, বল্—

ঝি আলো রাখিয়া নীচে নামিতেছিল, দেখিল, প্রকাশ উপরে আসিতেছে।

নিম্নস্বরে সন্তর্পণে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—মাইজি কোথা?

ঝি কহিল,—খোকাকে নিয়ে বারান্দায় বসে আছেন।

প্রকাশ ঘরে ঢুকিতেছিল, ঠিক সেই সময় সে শুনিল, অণিমা বলিতেছে,—বাবার মত হোস্ না খোকা, বল্।

প্রকাশ শিহরিয়া উঠিল। তাহার শরীর দিয়া বিদ্যুত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, পা টিপিয়া-টিপিয়া সে দরজার কাছে অগ্রসর হইল। আড়ালে দাঁড়াইয়া বাহিরে বারান্দায় বাতির আলোকে সে দেখিল, চোখের জলে অণিমার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া গিয়াছে, দুই হাতে সন্তানকে বক্ষমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বাহ্যজ্ঞান-রহিতার মত আপন মনে তখনো সে বলিয়া যাইতেছিল,—লক্ষ্মী বাপ আমার—বাবার মত হোস্ না!... ....

সেরাত্রে অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রার ঘোরে তাহার ক্লান্ত চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিলে সে স্বপ্ন দেখিল, এক বিজন মহারণ্যের মধ্য দিয়া একটি পায়ে হাঁটা সরু পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বনস্থলী ঝঙ্কৃত। দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে অসংখ্য পদ-চিহ্ন। সে বিস্মিত হইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কোথায় আসিয়াছে সে? সে জানে না। কবে আসিয়াছে? মনে নাই। চারিদিক দিয়া সে অশরীরী মানুষের স্পর্শ অনুভব করিতেছিল, ইহারা কোথায় চলিয়াছে? যেন শেষ নাই, অন্ত নাই! বাতাসময় হাসি-কান্নার রোল যুগপৎ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—শীতল কোমল স্পর্শ!...এস, আমার সঙ্গে এস...কাহার কণ্ঠস্বর? ...এযে সুরবালা!...অনেক দূরে এসে পড়েছ, চল অণিমার কাছে ফিরে চল।...অণিমার কাছে?...কোথায় সে? কে সে...না না, সে আর ফিরিবে না, যে পথে আসিয়াছে সেই পথেই চলিবে। সুরবালা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া

লইয়া চলিল।...পথ ভুল করেচ, ফিরে চল।..কোথায়? ...কতদূর?...

অকস্মাৎ তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

কোথায় সে? বল, বল।

অণিমা তাহার পাশে বসিয়া হাত ধরিয়া জাগাইতেছিল।

বোধশূন্য দৃষ্টিতে চোখ মেলিয়া প্রকাশ চাহিয়া রহিল। স্বপ্নের ঘোর তখনো কাটে নাই—তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন এই শব্দ স্পর্শের জগতে এখনো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

অণিমা বলিতেছিল,—বল আমায় বল, সে কি বেঁচে আছে?

—কে?

—দিদি—আমার দিদি। সে কি বেঁচে আছে?

প্রকাশ উঠিয়া বসিল। ঘামে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। সে কহিল,—হাঁ অণিমা, সুরবালা বেঁচে আছে।

—নিয়ে চল—কালই আমায় তার কাছে নিয়ে চল।

প্রকাশ বিস্মিত হইল,—তার কাছে যাবে? তুমি?

—হাঁ গো হাঁ, কালই নিয়ে চল। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমার অপরাধের বোঝা আর তুমি বাড়িয়ে তুলো না,—বলিয়া সে প্রকাশের পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

স্বদেশী শিল্প-ফ্যাক্টরী পঞ্চক

শ্রীসান্ত্বনা বসাক

(১)

সেদিন আপিস থেকে ফেরবার পথে শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ বেশ মজবুত দেখে একটা চরকা কিনে ফেল্‌ল। মণিমালা আজকাল বড়ই অবাধ্য আর অলস হয়ে উঠছে, তাকে আজই সুতো কাটতে বসিয়ে দিতে হবে, এই কথা ভাবতে ভাবতে বঙ্কিম মহাউৎসাহে বাড়ীর পানে চল্‌ল।

বাড়ী পৌঁছে সর্ব্বাগ্রে বৈঠকখানায় ঢুকে বঙ্কিম চরকাখানি একটা চেয়ারের উপর নামিয়ে রাখল। তারপরে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটা বার করে' টেবিলের উপর রাখতে গিয়েই তার চোখ পড়ল একখানা দোয়াত চাপা দেওয়া কাগজের উপর। দেখেই তার ভুরুটা কুঁচ্‌কে উঠ্‌ল—

মহামাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ খদ্দরাধিপতি মহোদয় সমীপেষু।

হট্ট তালিকা।

এরারুট বিস্কুট—১ টিন

শ্রীমান বাবুসোনার জন্য মোজা—১ জোড়া (খদ্দরের হইলে ভাল হয়)

উড্ পেনসিল—আধ ডজন (৩টি লাল ও ৩টি হলদে রংয়ের)

শ্রীমান বাবুসোনার ফ্লানেলের সার্ট—১টি

শ্রীমান ভানুর জন্য ধুতী—১ জোড়া

ঐ　　জুতা—১ জোড়া (অবশ্য ভেজিটেবল সু না, বড় ভিজিয়া যায়)

শ্রীমান বাবুসোনার ফুটবল—১টি (ব্লাডার সমেত)

বঙ্কিম কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কাগজখানা তুলে চোখের সামনে ধরে দেখ্‌ল। তারপর জুতাজামা ছেড়ে হাতমুখ ধুতে গিয়ে দেখে সমস্ত কলতলাময় বাসন ছড়িয়ে ঝি বাসন মাজছে। দেখেই চীৎকার। ঝিও পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে এই প্রতিপন্ন করতে চাইল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাসন যখন মাজতে দেওয়া হয়েছে, তখন কলতলাটাও তার যুগ্যি হওয়া চাই। লাথি মেরে গোটাকয়েক গেলাস-

বাটি ঝন্ ঝন্ করে ফেলে বঙ্কিম যখন বীরদর্পে হাত-পা ধুচ্ছে সেই সময় সামনেই রান্নাঘরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালেন বঙ্কিমের পিসিমা। পিসিমা বললেন, "দেখিস বাছা, বাসন গুলো ভেঙে ফেলিস নি যেন।" পরে একটা ঘরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, "বৌমা, ভোনা এয়েছে।"

বঙ্কিম গামছায় হাতমুখ মুছে গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসতে গিয়েই দেখ্‌ল তার উপর ছোট ছোট ধূলোভরা পায়ের ছাপ লেগে আছে ও টেবিলের উপর তার বড় সাধের "দেশী রং" বইখানির মলাটে শ্রীমান বাবুসোনার হাতের পাঁচটি আঙুলের ছাপ কাল কালীতে পরিষ্কাররূপে চিত্রিত হয়ে আছে। চেয়ারের উপর পুরাণ একটা 'নায়ক' পেতে বসেই বঙ্কিম হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল "বাবু।"

"বাবু শৈলেন বাবুর বাড়ী বেড়াতে গেছে," বলতে বলতে বঙ্কিমের ভাই সুকুমার চন্দ্র ওরফে ভানু একহাতে চায়ের পেয়ালা ও অন্য হাতে একখানা রেকাবীতে খানকয়েক লুচি ও কিছু ভাজাভুজি নিয়ে ঢুকল। বঙ্কিম চায়ের পেয়ালাটা চট করে তার হাত থেকে নিয়ে বল্‌ল, "তোর বৌদিকে একবার ডেকে দে তো।" ভানু "আচ্ছা," বলে চলে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে চুলের ফিতেটা কপালের উপর ঘুরিয়ে বেঁধে লম্বা বিনুনী বাঁধতে বাঁধতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মণিমালা এসে উপস্থিত হয়ে বল্লেন, "আমায় ডেকেছ?"

বঙ্কিম গম্ভীরভাবে "হুঁ" বলে চায়ের পেয়ালাটা তুলে এক চুমুক খেয়ে খানিকটা তরকারী দিয়ে লুচি মুখে পুরল। মণিমালা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে অপেক্ষা করে বল্‌ল "মহাশয়ের কি আজ্ঞা হয়?"

বঙ্কিম খুব ভারীক্কি চালে সামনের টুলটা দেখিয়ে বল্‌ল, "বোস, একটা কথা আছে।"

মণিমালা "ব্যাপার গুরুতর", বলে মুখখানিকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বসল। খাওয়া শেষ করে বঙ্কিম চেয়ারের হাতল থেকে গামছাটা নিয়ে হাত মুছতে মুছতে বল্‌ল, "দেখ, এই চরকাটা কিনে এনেছি, রোজ দুপুরে আর রাত্তিরে সূতো কাটবে, কতকগুলো বাজে নভেল পড়ে আর লেস্ বুনে সময় নষ্ট করো না।"

মণিমালা গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, "যে আজ্ঞে, তারপর?"

বঙ্কিম সিগারেট কেস খুলে সিগারেট বার করতে করতে বল্‌ল, "দেখ মণি, এসব ঠাট্টার কথা নয়। শৈলেন, বামাপদ বেণী, অখিল সকলেই চরকা কিনেছে। আর দেখ, বাজে বিলিতী জিনিষ যদি একটাও আর বাড়ীতে দেখি, তো পুড়িয়ে দেব একেবারে।"

মণিমালা চোখদুটি গোল করে বল্‌ল, "তোমার এ সিগারেট কেসটা!"

বঙ্কিম একটা ঢোক গিলে বল্‌ল, "যেটা পুরানো হয়ে গেছে সেটা ফেলবার দরকার নেই, নূতন কিছু না কিনলেই হবে।" মণিমালা চরকাটার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল। বঙ্কিম রেগে বল্‌ল, "দেখ মণি, চরকাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাটা তোমার খুব অহঙ্কারের বিষয় হ'তে পারে, কিন্তু আমার নয়, সেটা মনে রেখ।"

মণিমালা কোনও উত্তর না দিয়ে মাথায় কাপড়টা তুলে দিয়ে গলার আঁচলটা বেশ করে জড়িয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় হয়ে চরকাকে এক প্রণাম করল।

বঙ্কিম একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা পকেটে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। মণিমালা নিজের ঘরে গিয়ে আলনা থেকে জামা কাপড় নিয়ে স্নানের ঘরের দিকে চলল।

রাত আটটা বেজে গেছে, বাইরের ঘরে একে একে বন্ধুসমাগম হচ্ছে। ভিতরের ঘরে বসে বৌদি ও দেবরে কি একটা পরামর্শ চলছে। খানিক পরে বাইরের ঘর থেকে "চা" বলে একটা হাঁক এল। মণিমালা রান্নাঘরে ঢুকে দেখে পঞ্চানন ঠাকুর ভাতের বড় হাঁড়িটায় এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। মণিমালা বলল, "ও কিরে?"

পঞ্চা বলল, "কলসীতে যা জল ছিল সব ঢেলে দিছি, এবার হৌস থেকে জল আনতে হবে।"

পিসিমা জপের মালাগাছটি সযত্নে পেরেকে ঝোলান থলিটায় তুলে রেখে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বললেন, "ও সব হাঁড়িকুঁড়ি নামিয়ে রেখে বাবুসোনার দুধ আগে

কর বাছা, নইলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে কাঁচা ঘুমে জাগালে অসুখ করবে বলে দিলুম।"

একখানি থালার উপর পাঁচ কাপ চা সাজিয়ে ভানু এসে সন্তর্পণে বৈঠকখানায় ঢুকে সেটা টেবিলের উপর রাখতেই পাঁচদিক থেকে পাঁচটা হাত নিমেষের মধ্যে পাঁচটা পেয়ালা ছোঁ মেরে তুলে নিল। বঙ্কিম বল্ল, "আর এক এক পেয়ালা পাঠিয়ে দিতে বল।"

ভানু বল্ল, "বাবুর দুধ চড়েছে।"

বঙ্কিম বল্ল, "ওসব পরে হবে এখন।"

শৈলেন এক চুমুক চা খেয়ে বল্ল, "হুঁ, তার পর তোমার প্ল্যানটা বলে যাও।"

বঙ্কিম বল্ল, "হাঁ, ঐ পৈত্রিক ব্যবসাটা আর কিছুতেই ত্যাগ করা হবে না, হাড়ি, মুচী, মুদ্দফরাস, যা বল।"

অখিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে বল্ল, "ইন্‌ডিড।"

বামাপদ মাথা নাড়িয়ে টেবিল চাপ্‌ড়ে বল্ল, "যা বলেছ।"

বেণীমাধব ভুঁড়িটা একটু দুলিয়ে বল্ল, "বাপকো বেটা।"

শৈলেন Tortoise shell চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে একটু মিহি হেসে বল্ল, "Well then?"

বঙ্কিম আর এক চুমুক চা খেয়ে বল্ল, "অভাব শুধু রূপচাঁদের, ঐটার কিনারা করতে পারলেই আর কোনও গোল থাকে না।"

অখিল ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বল্ল, "Money, money, money, brighter than sunshine, sweeter than honey."

বেণীমাধব বল্ল, "অর্থমনর্থম। তারপর?"

বঙ্কিম বল্ল, "যদি হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাই তো...।"

বামাপদ বল্ল, "লাখ হলেও ক্ষতি নেই।"

অখিল চায়ের পেয়ালার উপর দৃষ্টি রেখে বল্ল, "Building castles in the air, তারপর?"

বঙ্কিম হাঁক দিয়ে বল্ল, "চা শিগ্‌গীর। হাঁ, কি বলছিলাম? টাকাটা পেলেই আমি ছুধের ব্যবসাটা আরম্ভ করে দেব।"

বামাপদ বল্ল, "আমি মুদীর।"

অখিল শুদ্ধভাষায় গম্ভীর স্বরে বল্ল, "আমি তন্তুবায়ের।"

শৈলেন সাবধানে মাথার ঢেউখেলান চুলের উপর হাত চালিয়ে বল্ল, "আমি টোল খুলে বস্‌ব—দেবভাষা শিক্ষা দেব।"

বেণীমাধব বিষণ্ণ ভাবে বল্ল "অগত্যা আমাকে রজকের ভারটা...।"

বঙ্কিম বল্ল "এই যে চা।"

ভানু অত্যন্ত গম্ভীরমুখে চায়ের কাপগুলি থালাশুদ্ধ নামিয়ে রেখেই বেরিয়ে গেল। অখিল চায়ের কাপটা একবার চুমুক দিয়েই গম্ভীরভাবে নামিয়ে রেখে দিল।

বামাপদ মুখে দিয়েই "থুঃ" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

বেণীমাধব পেয়ালাটি সাবধানে নামিয়ে রেখে বল্ল, "স্বদেশী চিনি, কিঞ্চিৎ লবণাধিক্য ঘটেছে।"

বঙ্কিমের মুখটা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরেই ভানু এসে গম্ভীর মুখে বল্ল, "ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে, চায়ে চিনির পরিবর্ত্তে নুন দেওয়া হয়েছে।"

বেণীমাধব কপালে হাত বুলিয়ে বল্ল, "ভ্রান্তি, ভ্রান্তি।"

বামাপদ গরুড়নাসিকা সিঁটকে বল্ল, "Carelessness."

সবাই যেন মুষড়ে পড়ায় সেদিন রাত দশটার পূর্ব্বেই সভাভঙ্গ হল।

রাত ১১টার পর খেয়ে বঙ্কিম ঘরে ঢুকে দেখে তার মাথার বালিশের ছোট্ট ফুটোটা কি জানি কি করে বড় হয়ে গেছে আর বিছানাময় তুলোর কুচি গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেখে মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বঙ্কিম যখন মনে মনে প্রচণ্ড একটা বক্তৃতা আর ধমক জমিয়ে তুলছে, সেইসময় মণিমালা আহারান্তে একটা পান চিবোতে চিবোতে ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই খাটের মাথার কাছে ঘড় ঘড় শব্দে কি একটা টানল। বঙ্কিম আড়চোখে চেয়ে দেখল ঠিক মাথার কাছে একখানা টুলের উপর চরকা বিরাজিত। তারি পাশে কাগজের উপর যে জিনিষটা

রাখা ছিল বালিশের ফুটো বড় হওয়ার সঙ্গে তার একটা বিশেষ যোগাযোগ বোঝা গেল। বঙ্কিম ব্রহ্মাণ্ডের গাম্ভীর্য্য মুখে ও গলার স্বরে জড় করে এনে বলল, "শিমুল তুলোয় সুতো কাটে না।"

মণিমালা ঘড়র ঘড়র শব্দে চরকার চাকা ঘুরোতে লাগল।

বঙ্কিম বলল, "ওতে তেল দিতে হবে।"

মণিমালা সে কথাটা কানে তুললে না।

রাত বারটা অবধি বঙ্কিম নিছক একঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে যখন থামল, মণিমালা তখন জিজ্ঞাসা করল, "এবার শেষ হয়েছে?"

বঙ্কিম পাশ ফিরে শুয়ে রইল। ভীষণ শব্দে চরকা ঘুরতে লাগল। প্রায় পনর মিনিট পরে বঙ্কিম আর সহ্য করতে না পেরে বলল, "থামতে পার?"

মণিমালা বলল, "এখনো এক ঘণ্টাও হয় নি।"

বঙ্কিম প্রাণপণে কানদুটো চেপে বলল, "কাণের কাছ থেকে সরিয়ে নাও।"

মণিমালা বলল, "ছিঃ, চরকাকে কি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে আছে?"

সাড়ে বারটার কিছুক্ষণ পরে বঙ্কিম ঘুমিয়েছে দেখে মণিমালা একটু হেসে হাই তুলতে তুলতে উঠে দাঁড়াল, তারপর ঘড়িটায় এলার্ম দিয়ে শুতে গেল।

ভোর পাঁচটা, শীতকালের সকাল তখনও খুব অন্ধকার। লেপের ভিতর থেকে সাবধানে মাথাটা বার করতেই কাণের কাছে ভীমরবে বেজে উঠল ঘড়ির ও চরকার ঘর্ ঘর্ ঘড়র ঘড়র খট্।

বিষম ঘাবড়ে গিয়ে বঙ্কিম মাথাটা আবার তাড়াতাড়ি লেপের তলে ঢুকিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পরেই "দুত্তোর ছাই" বলে লেপ টেপ ছুঁড়ে বঙ্কিম লাফিয়ে উঠে দেখে ছাই রংয়ের মোটা আলোয়ানে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে মণিমালা একমনে চরকার চাকা ঘুরিয়ে চলেছে। বঙ্কিম ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলল "সাতসকালে হচ্ছে কি?'

মণিমালা নিবিষ্টচিত্তে টেকোর দিকে চেয়ে রইল। বঙ্কিম দুম্ করে নেমে বালিসটা ঘাড়ে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(২)

শনিবার, বেলা প্রায় দুটো। মণিমালা উপরের ঘরে বসে বাবুর একটা পেনি সেলাই করছে। পিসিমা পাশের ঘর থেকে বললেন, "হাঁ বৌমা, ভাতুর গলার আওয়াজ পাচ্ছি যে?"

মণিমালা বলল, "আজ যে শনিবার—১টায় ছুটী—।"

পিসিমা এ ঘরে এসে ঢুকলেন। পেনিটার একটা কোণা ধরে দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, "আঃ আমার কপাল, এ কি হয়েছে একখানা হাত সোজা, একখানা উল্টো।"

মণিমালা সবিস্ময়ে বলল, "ও মা, কখন আবার উল্টো হল? পারি না বাবু উল্টো ফুল্টোর জ্বালায়।"

পিসিমা বললেন, "আর বাছা আমি এই বুড়ো চালসে-পড়া চোখে যা দেখছি তোমাদের কচি চোখে ওমা, বাবুধন অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন? তাকে টেপুনের দুধ দেছ বৌমা?"

মণিমালা পেনির হাতটা পড়্‌পড়্ করে টেনে খুলতে খুলতে বলল, "কি জানি—বিস্কুট খাচ্ছিল তো এই একটু আগে।"

নীচে বাবুর চীৎকার ও তৎসঙ্গে একটা কোলাহল শুনে, পিসিমা "পারি না বাপু, পারি না," বলতে বলতে নীচে চলে গেলেন; নীচে গিয়ে দেখেন বঙ্কিমের ঘরের সামনে মহা ভিড়—তার বন্ধুরা সদলবলে কেউ বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেউ বা ঘরে ঢুকে চীৎকার করছেন—ভিতর থেকে বঙ্কিম গর্জ্জন করে বলছে, "হতভাগা, বাঁদর, ফের যদি আমার ঘরে জিনিষ হাঁটকাবি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব—পাজী ..," বলতে বলতে ঘর থেকে কাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল।

পিসিমা অবাক হয়ে সামনের দিকে চেয়ে হাসবেন কি কাঁদবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। ভাতুর একটা হাফ প্যাণ্ট পরে ও বঙ্কিমের একটা পাঞ্জাবী কোমরের কাছে উঁচু করে কষে গামছা দিয়ে বেঁধে, মাথায় একটা গান্ধী টুপী পরে এবং ঠোঁটের উপর থেকে কানের পাশ পর্য্যন্ত কালী দিয়ে গোঁফ একে, দুহাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে কাঁদতে কাঁদতে আসছেন বাবুসোনা।

চোখের জলে ও হাতের ঘষায় গোঁফের কালিতে সমস্ত গালটি ভরে গেছে, পাঞ্জাবীর একটা হাত ঝুলে হাতটিকে ঢেকে ফেলেছে, অন্য হাতটি পিন দিয়ে কাঁধের কাছে উঁচু করে আটকান আছে। পিসিমা শশব্যস্তে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "কি হয়েছে?"

ঘরের দরজার কাছে এসে হুঙ্কার দিয়ে বঙ্কিম বলল, "হয়েছে আমার মাথা—।"

বেণীমাধব করুণস্বরে বলে উঠল, "উঃ পা-টা ।"

বঙ্কিম মুখ ভেংচিয়ে বলল, "রাস্কেল···এই বয়সেই লোককে খুন জখম করতে······।"

বাধা দিয়ে শৈলেন বলল, "আহা, হয়েছে কি তাতে, ছেলেমানুষ!"

বঙ্কিম দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "বার করছি ছেলেমানুষ।"

পিসিমা তাদের কথায় কান না দিয়ে বললেন, "কি হয়েছে বলতো বাবুধন।"

বাবুসোনা কাঁধের উপর থেকে মুখ তুলে বললেন, "গুন্ডা।"

পিসিমা বলিলেন "গুন্ডা কি?"

বাবুসোনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, "বাবুদান্ গুন্ডা···নালাল থংগে দুদ্ধ····"বলতে বলতে শোক আবার উথলে উঠল।

বঙ্কিম চোখ পাকিয়ে বলল, "গুণ্ডা, গুণ্ডা, বাবুজানের সঙ্গে নেড়ার যুদ্ধ, হুঁ", বলে বেণীর দিকে দেখিয়ে পিসিমাকে বলল, "কীর্ত্তি দেখ তোমার নাতির—পাঁচসেরি রুলারটা দিয়ে পা-টা ভেঙ্গে দিয়েছে একেবারে।"

বেণী আর একবার, "উহু-হু-হু," করে উঠল।

বামাপদ তার, পিঠে কনুইয়ের এক গুঁতো দিয়ে বলল. "ন্যাকামো করিস না।"

পিসিমা বললেন "সাতটা নয় পাচটা নয় বংশের পিদ্দীম সবেধন নীলমণি ঐ এক ছেলে, শাসন দেখে বাঁচিনে।" বলে দুমদুম করে পা ফেলে বীরদর্পে চলে গেলেন।

ঝড়টা থেমে গেছে জেনে, পাশের ঘর থেকে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে একবার এদিক ওদিক চেয়েই ভানু একদৌড়ে উপরে একেবারে সটান মণিমালার ঘরে গিয়ে হাজির। বাবুর তখন মোছান ও জামা কাপড় ছাড়ান পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে। মাদুরের এককোণে পিসিমার কোল ঘেঁসে বসে জামার সামনে একরাশ লজেঞ্চ, চকোলেট এবং বিস্কুট নিয়ে তিনি নিবিষ্টচিত্তে তার সদ্ব্যবহার করছেন। পিসিমা ভানুকে দেখেই বললেন, "আঃ কপাল! তাই বলি ভানুটা গেল কোথায়; এই মাত্তর গাঁ গাঁ করে চেঁচাচ্ছিল। এ তোরই কীর্ত্তি, যা'হক তাহ'ক করে ছেলেটাকে মার খাওয়ালি। এতক্ষণ কোথায় সটকেছিলি বলতো?"

ভানু গম্ভীরভাবে বলল, "পড়ছিলাম।"

মণিমালা বলল, "কবে থেকে পড়ায় এত মন বসল?"

ভানু মণিমালার কাছে এসে বলল, "সত্যি যুদ্ধটা বেশ জমেছিল, মাঝ থেকে ঐ বেণীটা এসে সব মাটি করে দিল।" বলে বাবুর দিকে চেয়ে বলল, "আরে এ ভাইয়া আও আও লড়েগা নেহি?"

ভাইয়া কোনও উত্তর দিলেন না। মণিমালা চোখ টিপে বলল, "কয় অবতারের আগমন হয়েছে?"

ভানু বলল, "ছাগুলেদাড়ি বাদ সবাই।"

এমন সময় "শুনছ," বলে বঙ্কিম ঘরে ঢুকল। ভানু খুব মন দিয়ে পিসিমার 'কার্ত্তিকবোসের পঞ্জিকা'খানা দেখতে লাগল। বঙ্কিম হাসতে হাসতে বলল, "একটা জবর সুখবর আছে।"

সবাই চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। বঙ্কিম বলল, "কবে, কোনযুগে চার আনার একখান লটারীর টিকিট কিনেছিলাম মনেও ছিল না, আজ অকস্মাৎ দেখি আমার এই পোড়া কপালে একখানা লেগে গেছে।"

মণিমালা আর ভানু একযোগে চেঁচিয়ে উঠল, "কত? কত?"

বঙ্কিম একটু হেসে বলল, "পাঁচ হাজার-যাক্, এতদিনে আমার প্ল্যানটা কার্য্যে পরিণত করবার সুযোগ—।"

মণিমালা সভয়ে বলল, "সে কি?"

বঙ্কিম বলল, "ঠিক ঠিক লেগে গেছে, প্রত্যেকে এক হাজার করে পাঁচ জন।"

পিসিমা বললেন, "আমায় একবার বাবা বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়ে দে, আর বৌমার গায়ে খানকতক ভারি ভারি গয়না—"

মণিমালা তাড়াতাড়ি বলল, "গয়না এখন শিকেয় তোলা থাক, পুরী আর দার্জ্জিলিং যেতেই হবে, সমুদ্র-পাহাড় দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের।"

ভানু বলল, "রেখে দাও পুরী, দার্জ্জিলিং, একখানা ফোর্ড আন, দেখিয়ে দেব বেড়ান কাকে বলে, চাইকি কাশ্মীরভ্রমণ পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে।"

বঙ্কিম হেসে বলল, "আসল কথাটাই যে চাপা পড়ল, ওরা খাবার না আদায় করে যাবে না।"

মণিমালার হঠাৎ সেলাইয়ে ভয়ানক মন লেগে গেল। পিসিমা বললেন, "ওরা কারা?"

বঙ্কিম ভানুর দিকে ফিরে বলল, "যা তো চট্ করে এই টাকা দুটো নিয়ে, এক টাকার রসগোল্লা আর এক টাকার গরম গরম খাস্তা কচুরি—।"

পিসিমা বললেন, "পিরথিমির রাক্ষোসগুলো কি এসে জুটেছে হেথায়—চারটে তো মনিষ্যি তার......"

বঙ্কিম বলল, "আর আমি বুঝি বাদ পড়লাম?" বলেই মণিমালার দিকে চেয়ে বলল, "লক্ষ্মীটি, চা টা চট্ করে,..... অন্ততঃ তিন কাপ করে যেন "

মণিমালা বলল, "শুধু তিন কেন তিনশো। হুকুম হলেও তামিল করতে হবে," বলে গলার স্বরটা অনেকখানি নামিয়ে, "আমি দাসী-বাঁদী বই তো নয়, দিনরাত মুখটি বুজে গাধার মত খেটে যাই—যত লাথি ঝাঁটা আমার আর আমার ছেলের ভাগ্যে", বলতে বলতে গলাটা কেমন ভারি হয়ে এল—সেলাইটা খাটের উপর ফেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে গেল।

পিসিমা বললেন, "আমার বাধুধনের একখানা পা-গাড়ী চাই—তিনটে চাকাওলা—চৌধুরীদের ছেলের যেমন আছে; আর একটা জরীর পোষাক, মায় পালক দেওয়া পাগড়ী পর্য্যন্ত।

বঙ্কিম "সে হবে'খন" বলে চিন্তিত হয়ে বেরিয়ে গেল।

বেণী বলল, "যতক্ষণ খাবার না আসে দলিল দস্তাবেজ সব লিখ্তে থাক। হতভাগা আখ্লেটার কপালে আজকের ভোজটা নেই।" বঙ্কিম "ঠিক কথা, ঠিক কথা", বলতে বলতে ড্রয়ার খুলে এক দিস্তা লাইনটানা কাগজ টেনে বার ক'রল। শৈলেন চট করে সোনার ক্লিপ লাগান ফাউণ্টেন পেনটা খুলে এগিয়ে দিল।

কাগজ টেনেই লিখে ফেলল—

আপনি কি আপনার দেশকে ভালবাসেন?

বেণী বলল, "অবিশ্যি, তাতে কি কোনও সন্দেহ আছে?"

শৈলেন বলল, "তারপর লেখ্—যদি বাসেন তাহা হইলে স্বদেশী শিল্পের সহায়তা করিয়া—

বেণী বলল, "'শিল্প' কথাটা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে—এই যে অখ্লে, প্রাণে বেঁচে আছিস তাহলে?"

অখিল একখানা চেয়ার টেনে ধীরে সুস্থে বসে বলল, "পাঁ—চ পাঁ—চ হাজার—তা বেশ।"

বামাপদ বেণীর দিকে চেয়ে বলল, "'শিল্প' কথাটায় আপত্তিই বা কেন? ধোপা কাপড় কাচ্‌ছে, মুদী চাল ডাল বেচ্‌ছে, তাঁতী তাঁত বুনছে—এ শিল্প হবেই না বা কেন? আলবৎ শিল্প।"

অখিল বলল, "সুকুমার শিল্প নয়—অতিশয়—গুরু বাস্তব শিল্প।"

বেণী চেঁচিয়ে বলল, "এ হতেই পারে না—এ ভাষার উপর অত্যাচার।"

শৈলেন বলল, "চটো কেন, শোনই না। তোমরা শিল্পটা ঠিক ধরতে পারছ না। ধর ধোপা বাইরে কাপড় কাচছে, ভিতরে ধোপানি ভাঁটিতে কাপড় চড়িয়েছে, ছোট ছোট চুলগুলো চূড়োর আকারে মাথার উপর বাঁধা, নাকে একটা খুব বড় সুদর্শন চক্র—আর—।" বঙ্কিম বলল, "গণ্ডগোলে কাজ কি, ভোট নেওয়া যাক।"

ভোট নিয়ে দেখা গেল এক বেণী ছাড়া সবাই শিল্পের স্বপক্ষে, কাজেই শিল্পই বজায় রইল। অতঃপর বেণী আর কোন কথাই বলল না।

ইতিমধ্যে ভানু একখানা থালায় কচুরী এনে টেবিলের উপর নামিয়েছে, এবং বেণী রাগ ভুলে আস্তে হাত বাড়িয়ে

দিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অট্টহাস্তে আর 'চা', 'চা' হাঁকে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

সেদিন খাওয়াদাওয়ার পর বঙ্কিম মণিমালাকে বল্‌ল, "রাগ ক'র না লক্ষ্মীটি, সুবিধে পেলেই একদিন তোমায় বায়স্কোপে নিয়ে যাব।"

মণিমালা বল্‌ল, "আমার তো বায়স্কোপে যাবার জন্তে ঘুম হচ্ছে না।"

(৩)

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। প্ল্যানটা কার্য্যে পরিণত করবার জন্ম পাঁচজন বন্ধু উঠে পড়ে লেগেছে। সেদিন সকাল আটটার পর ভাঁড়ার ঘরে বসে কুট্‌নো কুটতে কুটতে উঠানে একটা হট্টগোল শুনে মণিমালা বারাণ্ডায় এসে দেখে ছোট, বড়, মাঝারি নানারকমের ট্যাঙ্ক নিয়ে তিন চারটে কুলী এসে উঠানে দাঁড়িয়ে মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়েছে। পিসিমা এসে বল্‌লেন, "ওমা এ সব কি গা—বাছারা তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ? পথ ভুলে হেথা—মরণ আর কি মিন্সে ইড়ির বিড়ির করে কি বলে? আরে ও কুলী তুম্‌ হেথায় কিস্‌কে মাল নিয়ে—"

বঙ্কিম বাড়ী ঢুকে বল্‌ল, "চেঁচাচ্ছিস কেন, নামা না সব এখানে!"

পিসিমা বললেন, 'এ আবার কি?"

বঙ্কিম বল্‌ল, "দুধের ট্যাঙ্ক। তুই আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ওই বারাণ্ডার ধারে ওটা নামা না।"

পিসিমা বল্‌লেন, "কি জানি বাবা, তোমাদের কি মতলব?"

বঙ্কিম কুলীদের পয়সা দিয়ে বলল, "পাড়ার সবাই এখান থেকে দুধ নেবেন—খাঁটি দুধ টাকায় তিন সের। আর দেখ চাল ডাল যা দরকার বামাপদর দোকান থেকে আনিও। কাপড় কাচা, সে বেণীর উপর ভার; আর কাপড় বোনা, সেটা অখিলের উপর।"

পিসিমা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বল্‌লেন, "সব মাথা খারাপ হয়ে গেছে," বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। বঙ্কিম মণিমালাকে বল্‌ল, "দেখছ কি? এসব প্রতিদিন নিজহাতে মেজে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। একেবারে বিজ্ঞানসম্মত খাঁটি গোদুগ্ধ নির্জ্জলা নির্ম্মলা।"

মণিমালা বল্‌ল, "হুঁ।"

ইতি মধ্যে ভানু কখন একখানি হল এণ্ড ষ্টিভেন্সের এর জ্যামিতি হাতে করে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বল্‌ল, "গরু কই?"

বঙ্কিম বল্‌ল, "সে হবে'খন, আপাতত, ইটালির থেকে দুধ আনবার বন্দোবস্ত করেছি।"

*   *   *   *

পাড়ার হরিশ চাটুয্যে গিন্নীকে ডেকে বল্‌লেন, "ওগো শুনছ, গয়লা এলে আজ আর দুধ নিও না, ও বাড়ীর বঙ্কিম গয়লার ব্যবসা আরম্ভ করেছে, সে নিজে এসে বয়ে দিয়ে যাবে, টাকায় তিন সের খাঁটি দুধ।"

গিন্নী চোখ গোল করে বললেন, "সেকি গো ক্ষেপলে নাকি?"

কর্ত্তা মাথা নেড়ে বললেন, "এতেই ক্ষ্যাপা! আরও বলি শোন, চাল ডাল যা কিছু ঐ বামাপদর দোকান থেকে আনতে হবে—আজই ধারে কিছু আনিয়ে নিতে হবে। ময়লা কাপড় চোপড় যা আছে ফেলে দাও ঐ বেণীমাধবের ঘাড়ে। আর অখিলের বাড়ী শুনছি তাঁত বসেছে, অনেক টাকা মাইনের তাঁত-মাষ্টার এসেছে। ভালই হল টাকা নিয়ে নিত্য ছোটলোকদের সঙ্গে খেঁচা মেঁচি—ভদ্দরলোকের ছেলেরা মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারবে না—কি বল?"

গিন্নী হেসে বল্‌লেন, "তা আর বল্‌তে? ভাল কথা, দুধ সের দুই নেব তো?"

কর্ত্তা বললেন, "চার সের নিও, আমার আবার আফিংটার জন্যে কিছু—"

গিন্নী বল্‌লেন, "হাঁ পাঁচুরও এগজামিনের বছর।"

কর্ত্তা বল্‌লেন, "ভাল কথা মনে পড়ল, নেড়ী, বুড়ীদের আর খ্রীষ্টানি ইস্কুলে রেখে কাজ নেই, শুধু শুধু চার আনা করে মাইনে জলে ফেলা—শেখাবে তো শুধু যীশু ভজতে। পটলাটাকেও দিয়ে দেব ঐখানে ঐ শৈলেনের ইস্কুলে।"

গিন্নী একগাল হেসে বললেন, "চট্‌ করে মণখানেক দরু চাল আর সের কতক ডাল আনিয়ে রাখ। পাড়ায়

এমন কতকগুলো মাথাপাগলা ছোঁড়া থাকলে মন্দ মন্দ হয় না," বলে হাস্‌তে হাসতে চলে গেলেন।

কর্ত্তাও খটাখট খড়মের শব্দ তুলে ব্যাপারাদি দেখ্‌তে বাইরে গেলেন।

'স্বদেশী শিল্প-ফ্যাক্টরী পঞ্চক'

দাস ঘোষ নন্দী হোড় গোস্বামী এণ্ড কোং।

দাস ফ্যাক্টরী

"ও বুঁচী মুখপুড়ী কোথায় গেলি, আয় না বাপু,কাপড় গুলো ছাদে নিয়ে চল্, কোমর যে ভেঙ্গে গেল কাপড় আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে।" এই বলে বেণীমাধব দাসের পত্নী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী চীৎকার করছেন। উঠানের একধারে স্তুপাকার ময়লা কাপড় পড়ে আছে। আর একধারে প্রকাণ্ড তিনটে উনানে বড় বড় তিনটে ডেক্‌চি চড়েছে, কাপড় সিদ্ধ হচ্ছে। উঠানের আর একপাশে কলতলা, তারি দেওয়ালে বাইরের দিকে একটা কলের মুখ বার করা হয়েছে, তার তলায় রাশি রাশি সাবান দেওয়া সিদ্ধ করা কাপড় পড়ে আছে। একটা কলতলায় কাপড় আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে হেমাঙ্গিনী চীৎকার করে বড় মেয়ে বুঁচীকে ডাকছেন। ছোট মেয়ে ছুটে এসে বল্‌ল, "দিদি কাপড়ে ইস্তিরী করছে।"

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'আমার পিণ্ডির শ্রাদ্ধ করছে, যা ওই বাল্‌টীতে যে কাপড়গুলো রেখেছি ওগুলো নিংড়ে ছাতে মেলে দে।" বলেই ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে কাপড় আছ্‌ড়াতে আরম্ভ করলেন। হেমাঙ্গিনী বললেন, "জীবন শেষ হয় তো কাপড়ের শেষ হয় না।" বলে প্রাণপণ শক্তিতে একখানা কাপড় আছ্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করলেন।

হেমাঙ্গিনীর বিধবা ননদ গিরিবালা এসে বললেন, "বৌ কাণ যে গেল।"

বৌ বললেন, "কাণ চুলোয় যাক্, প্রাণই গেল তার কাণ।" বৌ এসে বলল, "কত দেরী আর, আজ সন্ধ্যায়ই সব পাঠাতে হবে—আমাদের যে কথা সেই কাজ।"

হেমাঙ্গিনী হাঁটুর উপর ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমায় কেটে কুচি কুচি করে ওই হাঁড়িতে সেদ্ধ করে খাও—রক্তমাংসের শরীর তো বটে। তিনদিন থেকে হাতের নড়াচড়া গেল। যম ভুলেও আমায় পোছে না।"

ঘোষ ফ্যাক্টরী

দুইহাতে ছাইমাখা শালপাতা, কাপড়ে ছাই, মাথায় ছাই, মণিমালা বসে জগদ্দল দুধের ট্যাঙ্ক মাজছেন—মাথার খোপাটা খসে পড়ে কতক চুল পিঠে, কতক বা সামনে এসে ঝুলছে। বারান্দায় ভানু বসে ত্রিভুবনজোড়া আর একখান ট্যাঙ্ক থেকে দুধ বার করে ছোট ছোট পাত্রে ভরছে। ঐ ট্যাঙ্কটা খালি হলে ওটাও মাজতে হবে—প্রত্যহ এই ব্যাপার—নির্ম্মলা, নির্জ্জলা খাঁটি দুধের জন্য সুনির্ম্মল ট্যাঙ্ক চাই, তাতে ময়লার লেশমাত্রও থাক্‌বে না।

ঘর থেকে বঙ্কিম হেঁকে বলল, "কত দেরি আর—বেলা আটটার আগে বেরোন চাই কিন্তু।"

"এই হয়ে এল," বলে ভানু দালানের কোণ থেকে একটা অভূতপূর্ব্ব জিনিষ টেনে আনল—সেটা আর কিছুই নয়, একটা সাইকেলের পিছনে একটা কাঠের বাক্স বসান দুগ্ধযান; এতে চড়ে ভানুকে প্রত্যহ ছুটিবেলা পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে দুধ সরবরাহ করতে হয়। ছোট, বড়, মেজ, সেজ, ন প্রভৃতি দুধের পাত্রগুলিকে এর উপর উঠিয়ে ভানু বেরিয়ে পড়ল। বঙ্কিম একখানা কাগজ হাতে বেরিয়ে এসে বলল,"উঃ, এই তিন দিনেই চার মণের উপর দুধ বিক্রী হয়েছে।"

মণিমালা দুমদাম করে ট্যাঙ্কটা কলতলার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌ল, "ছিঃ, বিক্রী কেন দান!"

বঙ্কিম বলল, "দেখ মণি, মনটা একটু বড় করতে চেষ্টা করো।" মণিমালা বলিল, "শেষকালে বাড়ীতে ধরলে হয়। তা বলছিই তো আমায় হুকুম দিলে এবার দুধের কেঁড়ে নিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়ি—গোয়ালিনী তো বটে!"

রান্নাঘরের দালান থেকে পিসিমা চীৎকার করে বললেন, "ন্যাখ ভোলা, আমায় এবার গলায় দড়ি দিয়ে

মরতে ইচ্ছে করছে।" বঙ্কিম চোখদুটিতে অনেকখানি বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বলল, "হঠাৎ এমন ইচ্ছে হবার মানে?"

পিসিমা বললেন, "আমায় বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর্—বউটার খোয়ার আর দেখতে পারি না।" মণিমালা হেসে বলল, "কেন পিসিমা, বেশ তো গয়লানীর—" পিসিমা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তুই ত নষ্টের মূল, কোথায় কেঁদে কেটে হাট বসাবি তা না হেসে গলে পড়ছেন! বলি চুলগুলোর যে শতেক খোয়ার হ'চ্ছে,—যে না একঢাল চুল তার আবার ঐ ছিরি। দুদিন বাদে মাথায় যদি আর একগাছও চুল থাকে তো আমার নাম নয়।"

বঙ্কিম বলল, "তোমাদের আদরেই আজকালকার বৌগুলো সব মাটি হল।"

নন্দী ফ্যাক্টরী

ঐ একখানি বড় লোহার কড়ায় বালিতে যিনি ডাল ভাজছেন, তিনিই হচ্ছেন বামাপদপত্নী শ্রীমতী সরসীবালা; মুখে তাঁর শ্রাবণের মেঘ ঘনঘটায় ঘনিয়ে এসেছে, মাথায় কপাল অবধি ঢাকা একখানি ভিজে গামছা জড়ান কারণ মাথার অসুখ আছে। ঘরময় ছোট বড় হাঁড়ি, ধামা, কুলোডালা শোভা পাচ্ছে। আগুনের আঁচে এই শীত কালেও ঘরটা রীতিমত গরম হয়ে উঠেছে। দরজার বাইরে বছর খানেকের একটা ছোট ছেলে ক্রমাগতই কাঁদছে, তার পরণে তিন তিনটে জামা থাকলেও পিঠটা একেবারে হাঁ হাঁ করছে, পায়ের কাছে তার একটা ঝুমঝুমি, একটা মাথাভাঙ্গা মাটীর বাঘ আর চাট্টিখানি মুড়কি ছড়ান আছে। তাই খুঁটে কখনও বা দুটো একটা মুখে দিচ্ছে, আর পরক্ষণেই আবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠছে। ঘরের এককোণে থালার সঙ্গে মাথাটা প্রায় ঠেকিয়ে ফেলে গরম আগুন ভাত খাচ্ছে বামাপদ। মুখে বড় একগ্রাস ভাত পুরে বামাপদ বলল, "ছেলেটা সেই থেকে কাঁদছে যে।"

সরসীবালা আঁচল দিয়ে কড়ার পাশ দুটো ধরে দুম করে মাটিতে নামিয়ে রেখে জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, "কাঁদুক।"

বামাপদ বলল, "একটু ঝোল দাও।"

সরসী উঠে গিয়ে লোহার হাতায় একহাতা ঝোল এনে পাতে ঢেলে দিল। বামাপদ একটা ভাজা আলু মুখে দিয়ে বলল, "এঃ একেবারে আলুনী যে।"

সরসী এক খামচা নুন পাতে ফেলে দিলে। এমন সময় ফটফট চটির শব্দ করে বামাপদর পিতা নবীন নন্দী এসে রোরুদ্যমান পৌত্রকে কোলে তুলে নিয়ে হাঁক দিলেন, "বামা।"

বামা বামার মত বিনয়নম্রস্বরে উত্তর দিলেন, "আমি খাচ্ছি।" নবীন নন্দী গলার স্বর আর এক পরদা চড়িয়ে বললেন, "তোর জ্বালায় আমার কি আর ভদ্র-মাজে মুখ দেখাবার জো থাকবে না?"

বামাপদ পরম আশ্চর্য্যের সুরে বলল, "কেন কি হয়েছে?" নবীন নন্দী হাত নেড়ে বললেন, "হয়েছে আমার মাথা। লেখাপড়া শিখে বি-এ পাশ করে শেষে ছোটলোকের মত দোকান খুলে বসলি চাল ডালের?"

বামাপদ পরম বিনয়ের সঙ্গে বলল, "পৈতৃক ব্যবসা তো বটে।" নবীন নন্দী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কি বল্লি, পৈতৃক ব্যবসা? হতভাগা—চোদ্দপুরুষে তোর বাপকে দোকান খুলে বসতে দেখেছিস লক্ষ্মীছাড়া—মুখে মুখে জবাব দিতে খুব ওস্তাদ হয়েছ। আর দেখ বৌমা, তুমি যদি ওকে অমন করে প্রশ্রয় দাও তাহলে আমি আর পেরে উঠব না।" বলে নাতিকে কোলে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। অল্পক্ষণ পরেই ভিজে ঢাকের মত গলায় বামাপদর মা কোথা থেকে বলে উঠলেন, "বৌমা ছেলেকে দুধ খেতে দাও।"

বৌমা একটা কাঁসার বাটীতে ছোট একটা সসপ্যান থেকে একবাটি দুধ ঢেলে নিয়ে একটা কুলুঙ্গী থেকে ঝিনুক পেড়ে নিয়ে, শাশুড়ীর কোল থেকে ছেলে নিজের কোলে চিৎ করে ফেলে রুদ্ধশ্বাসে দুধ খাইয়ে যেতে লাগলেন। চীৎকারে বাড়ী প্রকম্পিত হতে লাগল।

হোড় ফ্যাক্টরী

"ও ছোট বৌ, কোথা গেলি, তাঁত মাষ্টার এসেছে যে," বলতে বলতে অখিলের বড়বৌদি এসে একটা ঘরের দরজায় সামনে দাঁড়ালেন। সেই ঘরের ভিতর ছোট একটা

জলচৌকির উপর চরকা রেখে মাঝে মাঝে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে সূতো কাটছেন অখিলের নববিবাহিতা বধূ শ্রীমতী নলিনী। পাশেই মাদুরের উপর একখানা একটাকা সংস্করণের নূতন উপন্যাস পড়ে আছে, তারি দিকে তাকিয়ে বধূর চোখের জল আর কিছুতেই বাধা মানছে না। বিয়ের পর আজ এই প্রথম সে অখিলের কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছে—বেচারী কস্মিনকালেও সূতো কাটেনি। কাজেই তার হাতের সূতো যদি 'টোয়াইনের' মত মোটা হয় তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না—তার উপর এই নূতন উপন্যাসখানা—আহা হা—সবে আরম্ভ করেছিল।

বড়বধূ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরে দৃষ্টি ফেলে অবাক হয়ে বললেন, "ওমা ছুটকী, কাঁদছিস নাকি? কি হল?"

ছোটবউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। বড়বউ হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছেন এমন সময় ছোট ননদ রাধারাণী এসে বল্‌ল, "ওমা, ছোট বৌদি এখনও কাঁদ্‌ছে?"

বড়বৌ সামলে উঠে বল্‌লেন, "কি হয়েছে ছোট বৌয়ের?"

রাধারাণী বল্‌ল, "জান না, ছোড়দা যে আজ ছোট-বৌদিকে বড্ড বকেছে।"

বড়বৌ বলল, "কেন কি করেছিল?"

রাধারাণী একটা ঢোক গিলে, "ওই নারকেল দড়ির মত সূতো কাটে আর গল্পের বই পড়ে, তাই।"

বড়বৌ ছোটবৌয়ের হাত ধরে বল্‌ল, "নে ওঠ্‌, আর কাঁদিসনে। চোখদুটো মুছে ফেল্‌ দিকি, রাঙা হয়ে উঠেছে যে। চল্‌, মা ডাকছেন।"

ইতিমধ্যে মেজবৌ খলনুড়ি হাতে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "ধন্যি মেয়ে বাবা ছোটবৌ, সেই থেকে ডেকে ডেকে গলা ফেটে গেল, মেয়ের আর সাড়াই নাই—অ-মা, কি হ'ল?" বলে মেজবৌ মাঝপথে থেমে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বড়বৌ বল্‌লেন, "হবে আবার কি? বিদ্যে-দিগ্‌গজ ছোটঠাকুরটি ছেলে মানুষ পেয়ে এক চাল চেলেছেন। ঐ তাঁত আর চরকা যদি উনুনে না দিই তো আমার নাম সারদাসুন্দরী নয়। নে চল্‌, বাবাকে

ছোটবৌ হাতের উল্টোপিঠে চোখটা চট্‌ করে মুছে নিয়ে মেজবৌয়ের হাত থেকে খলনুড়িটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেজবৌ মাদুরের উপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে বল্‌লেন, "পোড়া কপাল আমার—এই বইখানার জন্যেই বুঝি ছোটবৌ কেঁদে খুন হচ্ছিল?"

বড়বৌ মুখ টিপে হেসে বল্‌ল, "ঐ জন্যেও, আর আর বরের কাছে ধমক খাবার জন্যেও—বুঝ্‌লি?"

নীচ থেকে অখিলের চীৎকার শোনা গেল, "বাড়ীর সকলে কি মরে আছে? রাখালবাবু কতক্ষণ বসে থাকবেন?" রাখালবাবুই হচ্ছেন তাঁত-মাষ্টার। বড়বৌ সিঁড়ি দিয়ে নামতেই অখিলের সঙ্গে কলিশান লেগে গেল। অখিল দাঁত খিঁচিয়ে আরম্ভ করল, "সবাই কি—"

বড়বৌ হেসে বল্‌ল, "না সবাই বেঁচেই আছে—ভয় নেই। ততক্ষণ তুমি গিয়ে বস—রান্নাটা সেরে আমরা যাচ্ছি।"

গোস্বামী ফ্যাক্টরী।

শৈলেনের মা অন্নপূর্ণা দেবী শৈলেনের ঠাকুরদার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন, "বাবা শৈলেনকে আপনি সামলান।"

ঠাকুরদা চশমাটা কপালের উপর থেকে নাকের ডগায় নামিয়ে বললেন, "বৌমা, মিছে ভেবো না; ভায়া দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবেন।"

অন্নপূর্ণা বললেন, "বৌমাকে শুদ্ধু যে ক্ষেপিয়ে তুলল, "রাজ্যের ছেলেমেয়ে জড় করে রোজ কাণ ঝালাপালা করে তুল্‌ল।"

ঠাকুরদা বললেন, "বাপ বাড়ী নেই কিনা তাই ভায়া বাঁধনছাড়া গরুর মত একটু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ছেন, আর দুটোদিন অন্তত গেলেই আবার কাটা সুরু হবে আবার," বল্‌তে বল্‌তে ঠাকুরদা নস্যের কৌটাটা নিয়ে এক টিপ নস্য গ্রহণ করে হেঁচে টুক্‌টুক্‌ করে নীচে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে না

বাজারে যেতে হবে না, কারণ ঘরেই মেছোহাটা বসেছে।

ঠাকুরদা ঘরের দরজায় নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়্লেন। শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবীর বিজলীর চেয়ে মেঘের সঙ্গেই রংয়ের সাদৃশ্য বেশী, তিনি একখানি চেয়ারে বসে একটা শ্লেটে অঙ্ক দেখছেন—কতকগুলি ছেলে মেয়ে ঘাড়ের উপর হুমড়ী খেয়ে পড়েছে, বাকী কতকগুলো মেয়ে একটু আড়ালে সরে বসে ঘুঁটি খেল্‌ছে—দুটো ছেলে ঘুসোঘুসি লাগিয়ে দিয়েছে। এমন সময় রব উঠ্‌ল "ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ।"

বিজলীপ্রভা চম্‌কে মাথা তুলে বললে্ন, "কে কাঁদে রে?"

অমনি চার পাঁচটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "দুগ্‌গার ভাই।"

বিজলীপ্রভা ভুরু কুঁচকে ডাকলেন, "দুর্গা!"

ছোট একটা ছেলে কোলে ভয়ভয়মুখে দুর্গা এসে দাঁড়াল—মাথায় তার সোনার চিরুণী দিয়ে চ্যাপটা একটা খোঁপা বাঁধা, কানে দুটী পার্শী মাকড়ী এবং গায়ে একখানি গরম জ্যাকেট ও একখানি আধময়লা ডুরে শাড়ী। বিজলীপ্রভা বল্‌লেন, "ভাই বোন আনতে বারণ করে দিয়েছি না—এককথা একশো বার বলতে হবে?"

দুর্গা সভয়ে বল্‌লে, "মা বল্‌লে নিয়ে আসতে।"

বিজলীপ্রভা বিড়্‌বিড়্ করে বল্‌লেন, "এই মা-গুলোই সব যত নষ্টের মূল।"

একটা মেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "মাসীমা, আমার আঁক হয়েছে।"

বিজলীপ্রভা শ্লেটখানা তার হাত থেকে নিয়ে অন্যদিকে ফিরে বল্‌ল, "খেঁদী, ময়লা কাপড় পরে এসেছিস কেন?"

খেঁদী মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শৈলবালা বল্‌ল, "বিজলী দিদি খেঁদীর ঠাকুমা—"

তার কথা শেষ হবার আগেই কে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "জেঠাইমা!"

বিজলী চম্‌কে উঠে বল্‌ল "কেরে জেঠাইমা বল্‌ল?"

অমলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল "গেনি—বিজুমাসী।"

বিজলী গেনির দিকে ফিরে চোখ রাঙিয়ে বল্‌ল "খবরদার আমায় জেঠাইমা বলবি না। আরে গেল যা, আমি যেন ওর মায়ের চেয়ে বড়—যা ইচ্ছে তাই বলে ডাক্‌তে আরম্ভ করেছে—কোন দিন ঠাকুমা বলে ডেকে বস্‌বে।"

এমন সময় দরজার গোড়া থেকে শোনা গেল "নাতবৌ।" বিজলীপ্রভা দরজার দিকে চেয়ে হেসে উঠলেন, "ঠাকুর দাদা যে।" ঠাকুরদাদা বললেন, "আমি বলি বুঝি বাড়ীতে মেছোবাজার বসেছে।"

এমন সময় নিতাই অনেক বুদ্ধি খরচ করে ডাক্‌ল, "স্যার—"

বিজলী খিল্‌খিল করে হেসে উঠল। ঠাকুরদাদা বল্‌লেন, "লিঙ্গটা ভুল হয়ে গেল যে—।"

অমলা চট করে বলে উঠল, "মাষ্টারনী।"

(৪)

সকলে নিস্তব্ধ হয়ে চক্ষু ছানাবড়া করে চেয়ে আছেন—ক্যালেণ্ডারের উপর যে কাগজখানা ঝুল্‌ছে সেইটার দিকে—

স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী পঞ্চক—

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন।

প্রেসিডেণ্ট—শ্রীমতী মণিমালা ঘোষ।

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট—শ্রীমতী বিজলীপ্রভা গোস্বামী।

কার্য্যতালিকা

বক্তৃতা—৬টা হইতে ৯টা।

আহার—(কেবল মহিলাদিগের জন্য)—৯টা হইতে।

সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

বঙ্কিমের ঘরে নিস্পন্দ হয়ে পাঁচ বন্ধু বসে আছেন। অকস্মাৎ বেণী কাতরিয়ে উঠল "আ-হা-হা-হা—।"

সবাই চমকে উঠে বল্‌ল, "কি-কি?"

বেণী ব্যাকুলস্বরে বল্‌ল "নাকের ভিতর দিয়ে মরমে

পশিল গো, আ-হাহা মরি মরি পায়সের গন্ধ কিবা মধুর মধুর সকলি মধুর পায়স মধুর—পোলাও মধুর।"

বেণী বলল "আহা—'ক্ষীর হত যদি ভারত জলধি—ছানা হত যদি হিমালয়'—ওকি ও ভানুর হাতে?"

সবাই বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে দেখে ভানু দুই ঝুড়ি সন্দেশ নিয়ে তাদের সামনের বারাণ্ডা দিয়ে চলে যাচ্ছে। বেণী বুকে হাত দিয়ে বলল, "বুক ভেঙে দিয়ে গেল, হা হতোস্মি—" বলে চোখটা বুজে ফেল্‌ল। শৈলেন চট্‌ করে ঘরের কোণের কুঁজোটার থেকে ঠাণ্ডা কনকনে এক গ্লাস জল এনে তার মাথায় ঢেলে দিয়ে বল্‌ল, "ভয় নেই, আমি আছি।"

বঙ্কিম সিগারেটটা আঙুলে ধরে বলল, "কি করা যায়?"

বেণী ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেই ধপ করে আবার বসে পড়েছে—সামনে দাঁড়িয়ে বাবুসোনা। একহাতে তার কচুরী, আর এক হাতে ইয়া বড় এক লেডিকেনি।

পঞ্চানন ঠাকুরের গলা শোনা গেল, "বৌদিদি, মাংস রাখি কম্‌নে?"

সকলে স্তম্ভিত। দোতালায় ঠিক উপরের ঘরটা থেকে ভয়ানক হাসির শব্দ আসছে।

বঙ্কিম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "ঠাকুর—বিকেলের দুধ দেওয়া হয়েছে?"

পঞ্চানন ঠাকুর খুন্তীতে চারটিখানি পোলাও তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বলল, "ভানুবাবুর একজামিনের পড়া আছে।"

বঙ্কিম গম্ভীরভাবে শুধু একটা "হুঁ" বলেই বৈঠকখানায় ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ভয়ানক টেবিল চাপড়ানর শব্দ শোনা যেতে লাগল। ভানু ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শুনল বামাপদ চীৎকার করে বলছে, "আমরা নিজেরাই সব করব—ওরা কি ভাবছে ওরা কিছু না করলে আমরা মরেই যাব?"

রাত নটার সময় যখন মহিলাদের খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হয়েছে আর 'লুচী', 'পোলাও', 'আলুরদম' 'দইমাছ' প্রভৃতি নানা রকম শব্দে ও তার গন্ধে উপরের ঘর মুখরিত ও সুরভিত হয়ে উঠেছে, এবং বেণীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবার গতিক হয়েছে ঠিক সেই সময়ে বেশ বড় একটা দুধের পাত্রের হ্যাণ্ডলটা ধরে ঝুলিয়ে (বঙ্কিমের গায়ে বেশ জোর ছিল) নিয়ে বঙ্কিম তীরবেগে বেরিয়ে গেল। বামাপদ পাঁচ লাফে বাড়ী গিয়ে দোকানে বসে পড়ল শৈলেনও একখানা খিবো সাহেবের সংস্কৃত গ্রামার যোগাড় করে বাড়ী গিয়ে নিবিষ্টচিত্তে পড়তে আরম্ভ করেছে, কারণ কাল থেকে তাকে নিজেই দেবভাষা শিক্ষা দিতে হবে, যদিও সে স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশ থেকেই সংস্কৃত ছেড়ে দিয়েছিল। অখিল বাড়ী গিয়েই ঘটাং ঘটাং করে তাঁতটা চালাবার চেষ্টা করেই সেটা খারাপ করে ফেলে চরকা নিয়ে সুতো কাটতে বসে গেছে। বেণী অসহ্য বেদনা বুকে চেপে ধীরে ধীরে পা ফেলে বাড়ী চলেছে। প্রাণে তার বড় আশা ছিল, যে শেষকালে হয়তো তাদেরও ডাক পড়বে, কিন্তু সে রকম কোনও গতিক না দেখাতে শেষে নিরাশহৃদয়ে অশেষ রকম সুগন্ধ বয়ে নিয়ে 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্‌," সেরে বাড়ী ফিরছে।

রাত দশটার পর একে একে শ্রীমতীগণ যে যার বাড়ী ফিরলেন—আতর দেওয়া ছাঁচিপান চিবোতে চিবোতে। শ্রীমানেরা সেদিন আর কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না।

(৫)

সেদিন সন্ধ্যায় পৌষমাসের নবমীর কুয়াসা ঢাকা ঝাপসা চাঁদের আলোয় বাড়ীর ছাদে সভা বসেছে। সভ্যগণ সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে সংসারের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করছেন, তাঁদের কপালের রেখায় ঠোঁটের কুঞ্চনে, চোখের ভাবে ক্ষণে ক্ষণে ভাবের লহরী খেলে যাচ্ছে, সমস্ত কলিকাতা সহর যেন নিঝুম হয়ে তাঁদের মুখ থেকে কি মহাবাণী নির্গত হবে তারই অপেক্ষা করছে। হঠাৎ সকলে চমকে উঠে প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল। এক মিনিট সব নিস্তব্ধ, তারপরই নাকে রুমাল দিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বেণী বলে উঠল "ব্যথা, ব্যথা, বড় ব্যথা, সর্ব্বাঙ্গে, হাড়ে হাড়ে ব্যথা, নাকে সর্দ্দি, গলায় টন্‌সিল।"

আবার এক মিনিট সব নিস্তব্ধ। তারপর বামাপদ গরম সার্টের হাতের বোতামটা খুলে কাফ্‌টা উল্টে উপরদিকে তুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলল "দগ্ধবিদগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত।" সকলে বিস্ফারিত নয়নে অন্ধকারের মধ্যে সেই সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে চেয়ে বসে রইল।

অতঃপর শৈলেন বুকফাটা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে একখানা কি পত্রিকা টেনে বার করল। সকলে ছটফটিয়ে উঠল। শৈলেন ছাদের আল্‌সের যেখানে রাস্তার গ্যাসের আলো এসে পড়েছিল সেইখানটায় দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে কাগজখানার ভাঁজ খুলে থ্যাসথ্যাসে ভাঙা গলায় পড়ল—

'স্বদেশী আহাম্মক-ফ্যাক্টরী পঞ্চক'

গাধা গরু কুলো তাঁত বেত এণ্ড কোং

"সম্প্রতি 'স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী পঞ্চক' নাম দিয়া কয়েকটি বাঙ্গালী যুবক যে কোম্পানী খুলিয়াছেন, উহার নামকরণে কিঞ্চিৎ ভুল হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণের অবধারণার্থে আমরা উহার ঠিক নামটি উপরে লিখিয়া দিলাম। এই পাঁচ মহাত্মাগণের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির 'ফ্যাক্টরী' দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদের পিতৃপুরুষের বহু পুণ্যফলে ঘটিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যার্ণব বিদ্যানিধি শিরোমণি মহোদয়ের অধ্যাপনাকার্য্যের কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'আজ কি পড়া হবে? Sanskrit grammar, না? ব্যঞ্জনসন্ধি? Very well, let us begin. হাঁ—Final ত before an intial ট......আরে দূর্, এটা তো কাল হয়ে গেছে। হাঁ, হাঁ, পেয়েছি এটা তবে শোন্—Final ন্ before initial চ্ or ছ্ changes to Anusvara and শ্ is inserted after it—

হসন+চকার=হসংশ্চকার

'আচ্ছা বেশ বুঝলি তো সব? কি এখনও না? আরে এ তো জলের মত সোজা। শোন্—Final ন্ অর্থাৎ কিনা শেষ ন্, ফাইনাল মানে শেষ, যেমন Final M. B. এম-বি মানে জানিস্ না, দূর গাধা Bachelor of Medicine. হুঁ, তারপর before initial, initial মানে জানিস না? Nonsense! নামের যেমন initial letter থাকে তেমনি আর কি। Changes—বলতে পারিস, is replaced by অনুস্বর and শ্ is inserted মানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় after it মানে হল—ইহার পরে—ব্যাস্।

'স্থানাভাবে অল্পই উদ্ধৃত করিলাম। এই গ্রাজুয়েট পাঁচজনের মস্তকের কিঞ্চিৎ গোলোযোগ ঘটিয়া থাকিবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান চতুষ্কোণ করিয়া কামাইয়া ফেলিয়া কিঞ্চিৎ মধ্যমনারায়ণ তৈল অথবা এক ছটাক পরিমাণ ছাগলাদ্য ঘৃত ঐস্থানে মালিশ করিতে হইবে—তৎপরে উহার উপর গোময় প্রলেপ দিয়া একঘণ্টা রৌদ্রে শুকাইয়া খটখটে করিয়া উক্ত দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া উহারই আগুনে পাঁচটি করিয়া কচু পুড়াইয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণ সমেত উহা ভক্ষণ করিলে উহাদের মস্তিষ্কের গোলযোগ বিদূরিত হইতে পারে। ফল অব্যর্থ—পরীক্ষিত।

নিবেদন ইতি—জনৈক বন্ধু'

পড়তে পড়তে শৈলেনের গাল বেয়ে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

অখিল চিবুকে হাত বুলিয়ে বলল, "উঃ জগৎটা কি নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর।"

বঙ্কিম গম্ভীরমুখে বলল "হুঁ।"

প্রায় পাঁচমিনিট আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। বঙ্কিম একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। হঠাৎ সকলে চমকে উঠে শুনল পঞ্চানন ঠাকুরের গলা, "বৌদিদিমণি আপনাদিগে ডাকছেন।" সকলে ধড়ফড় করে উঠল।

নীচের ঘরে ঢুকেই সকলে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। টেবিলের চারিধারে পাঁচটি চেয়ার, তারি সামনে পাঁচটি কাপ—সোনালী চায়ে ভরা—তার থেকে ধোঁয়া উঠছে।

চারটি বড় বড় চীনেমাটির প্লেট—খাস্তাকচুরী, রসগোল্লা আর লেডিকেনিতে ভরা! টেবিলের ঠিক মাঝখানে সবচেয়ে বড় কেটলী, আর তারি সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী মণিমালা ঘোষ।

বেণী দুটিচোখ বুজে চুমুকে চুমুকে চা পান করছে এমন সময় হঠাৎ একটা গুণ গুণ রব শুনে চোখ খুলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমান ভানু—হাতে তার একখানা কাগজ। ভানু চেঁচিয়ে পড়ল—

'স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী পঞ্চক'
ঘোষ ফ্যাক্টরী।

১৪ই পৌষ হইতে ২০ শে পৌষ পর্য্যন্ত হিসাব :—

দুধ (বিক্রীত)	১৪/৫॥	মূল্য ১৮৮।৹
আদায় হইয়াছে		৩/৫
আদায় করিতে হইবে		১৮৫৷৶১৫

—

সকলে চমকে উঠল। মণিমালা একটু হেসে বলল, "ও কিছু না।"

বেণী চোখ গোল করে বলল, 'সর্ব্বনাশ;"

ভানু মুচকে হেসে মণিমালার দিকে চেয়ে বলল, "আর ইটালির থেকে আনবার আর ট্যাক্সের খরচ?"

মণিমালা আর এক এক কাপ চা ঢালতে ঢালতে বলল, "যাক্ গে।"

সকলে মনশ্চক্ষে প্রকাণ্ড এক একটা বিল দেখ্‌তে লাগল। রুদ্ধশ্বাসে খেতে খেতে হঠাৎ চমকে উঠে সবাই শুনল বাইরে থেকে কে হাঁক দিয়ে বলছে, "আজ দুধ দিয়ে যায়নি কেন?" বঙ্কিম লাফিয়ে উঠে ঘরের কোণ থেকে মোটা বাঁশের লাঠিটা নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, মণিমালা লাঠিটা চেপে ধরে বল্‌ল, "থাক গে।" বলে টেবিলের দিকে ফিরে বল্‌ল, "কাল স্বদেশী শিল্প-ফ্যাক্টরী পঞ্চকের শ্রাদ্ধ, সকলের প্রীতি-ভোজনের নেমন্তন্ন রইল।"

কদলী

কবিরাজ শ্রীঅংলাকান্ত মজুমদার কাব্যভূষণ

কদলীর সাধারণ বাংলা নাম কলা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পারিভাষিক ইংরেজী নাম Musa paradisiaca.

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার শ্রেণিবিভাগে একবীজদল (Monocotyledon) উদ্ভিদের—Scitamineaeর অন্তর্গত। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে কলাগাছের কাণ্ড বলি তাহা পত্রের অংশবিশেষ মাত্র। কাণ্ডটি (rhizome) মৃত্তিকার নিম্নে গুপ্ত থাকে। এই কাণ্ডদ্বারা নিয়মিত চাষের জন্য বীজের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বনজাত কদলীফলের বীজদ্বারাই বংশ বিস্তার হইয়া থাকে।

পুষ্পোৎপত্তির সময় যে কাণ্ড (scape) উত্থিত হয় তাহাকে চলতি কথায় থোড় বলিয়া থাকে। পুষ্প-মঞ্জরীকে (spadix) মোচা বলে।

কদলী আমাদের দেশের সর্ব্বজনপরিচিত, সকল ঋতুতে প্রাপ্য উপাদেয় ফল। কলাগাছের প্রত্যেক অংশই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ছোট কলাগাছ উৎসববাড়ীর মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। পুষ্করিণীর জল পচিয়া উঠিলে কলাগাছ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে জল স্বাভাবিক হয়। ক্রিয়াকর্ম্মের সময় ভোজনপাত্ররূপে কলাপাতার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। থোড়, মোচা ও কাঁচাকলা তরকারীরূপে নিত্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাকা কলা অতি পুষ্টিকর, উৎকৃষ্ট, এবং উপাদেয় খাদ্য। মর্ত্তমান, চাঁপা, সুরভি, কাবুলী, অগ্নিশাল, গন্ধমূরলী এবং অন্যান্য অসংখ্য জাতীয় কলা আছে, যাহা যথার্থই খাইতে সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং তৃপ্তিজনক।

একশত ভাগ পাকা ও কাঁচা কলার মধ্যে কি কি

উপাদান কত পরিমাণে বিদ্যমান আছে তাহার উল্লেখ করিতেছি—

	পাকায়	কাঁচায়
জল	৭১'৪	৬৭৬৮
ছানা জাতীয় উপাদান	১'৮০	১'৩৫
মাখন জাতীয় উপাদান	'১৩	'০৫
শর্করা জাতীয় উপাদান	১৪'১৫	১৩'১১
লবণ জাতীয় উপাদান	'৯৭	'৭৭

আহার করিলে পাকাকলা তিন ঘণ্টায় এবং সিদ্ধ কাঁচা কলা আড়াই ঘণ্টায় জীর্ণ হয়।

শুষ্ক কদলী বৃক্ষের খোলা বা পাতাভস্মে পটাশ, সোডা, ফস্‌ফরিক এসিড্ এবং ম্যাগনেসিয়া বিদ্যমান থাকে। এইজন্য এই ভস্ম পল্লীকৃষকবৃন্দের মলিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে অনেক স্থলে ইহা লবণের পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনাদিতেও ব্যবহৃত হইত।

অপক্ব শুষ্ক কদলী চূর্ণ করিয়া রাখিলে বহুদিন খাদ্য-রূপে ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই চূর্ণ দুগ্ধ ও শর্করাসংযোগে মুখরোচক, পুষ্টিকর পথ্য-রূপে পরিণত করা যাইতে পারে। পাকা কলা বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাঁচ-পাত্রে রক্ষা করিয়া বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্ত্তিত কদলী ও শর্করা সমান পরিমাণে একটি পাত্রে রাখিতে হইবে। শীতল জলপূর্ণ একটি কটাহে সেই পাত্র গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে জাল দিবে। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে কলা ও চিনি গলিয়া মিশিয়া যাইবে। তখন জাল বন্ধ করিবে। জল শীতল হইলে পাত্রটি তুলিয়া লইবে। ইহাই কলার সিরাপ নামে পরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে পক্ব কদলীর গুণ—

কষায়; মধুর, বলকারী, শীতল, গুরু, রক্তপিত্তের রক্ত নিবারক, অগ্নি-মান্দ্যে অপথ্য, তৃষ্ণানিবারক, কান্তি বৃদ্ধিকারক, কফজনক এবং আহারে আনন্দপ্রদ।

কলার মোচার গুণ—

স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, গুরু, শীতল, বলকারক ও হৃদ্য। ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও মূত্র রোগের উপশম হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে বিভিন্ন রোগে কলা ও কলাগাছের ব্যবহার—

১। কর্ণ রোগে—

কলার পেটোর রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণ-পূরণ করিবে।

২। প্রদরে—

খোসা সহিত কাঁচা কলা চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড় সহ রক্ত-প্রদরে সেবন করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

৩। ছুলীতে—

কলার ক্ষার ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

৪। বিসূচিকায়—

কদলীবৃক্ষের রস সেবনে বিসূচিকার (কলেরা) তৃষ্ণা নষ্ট হয়।

৫। সোম রোগে—

(১) কাঁচা আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ পক্ব কদলী ভোজন করিবে।

(২) কদলী-ফল কচি তাল বা খেজুর বৃক্ষের মূলসহ দুগ্ধের সহিত প্রভাতে ভক্ষণ করিলে মূত্রাতিসার নিবারিত হয়।

৬। ক্রিমি রোগে—

কদলী মূলের রস পান করিলে ক্রিমি মরিয়া যায়।

৭। রক্তপিত্ত রোগে—

কলাগাছের রস পান করিলে রক্ত বমন ও নিঃস্রবণ বন্ধ হয়।

৮। পুরাতন কাশ রোগে—

কলার সিরাপ ১ চামচ মাত্রায় সেবন করিবে। এক ঘণ্টা অন্তর পাঁচ ছয়বার সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ।

৯। সর্পাঘাতে—

সাপে কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ ৫ তোলা মাত্রায় কলা গাছের মূলের রস ১০ মিনিট অন্তর ৩।৪ বার পান করাইয়া দিবে। প্রয়োজন হইলে আরও অধিক বার সেবন করাইবে। অনেক সময় ইহাতে প্রকৃতই ফল পাওয়া যাইয়া থাকে।

শাদা ঘোড়ার সওয়ার*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

কেমন করিয়া হারানু তোমায়
জানি না প্রিয়া !
উঠেছিল ঝড় ক্ষ্যাপা বাতাসের
দাপট নিয়া !
ব্যগ্র এ মোর বাহুযুগে ধরি'
যতনে তোমায় রাখিনু আবরি'
ঘন দুর্য্যোগ হ'তে—
কেমন করিয়া চলে' গেলে সখি ?
এ বুক সাহস হারায়েছিল কি—
একসাথে দোঁহে চলেছিনু যবে
শিলা-বন্ধুর পথে ?

২

চাহিনু ও দু'টি শঙ্কা-করুণ
নয়ন-পানে,
কহিনু কাতরে—"লেগেছে আঘাত
পথ-পাষাণে।"
বেদনা যাতনা অবসাদ ভুলি'
সান্ত্বনা দিতে আঁখি দু'টি তুলি
চাহিলে মধুর হেসে।
মোর হাতখানি তুলে নিলে ধরি'
—ক্ষীণ তনু তার উঠিল শিহরি—
উন্মাদ ঝড় আঘাতিয়া গেল
ভীষণ রুদ্র বেশে।

৩

ক্ষ্যাপা জানোয়ার জাগিল আবার—
লুকালে বুকে,
শাদা হয়ে এলো কপোল তোমার
রহিলে ঝুঁকে।
অবশ অসাড় মাথাখানি প্রিয়া,
আমার ব্যাকুল বক্ষে রাখিয়া
রহিলে ক্লান্তিভরে,
"আঁখি তুলে চাও, চাও বাঞ্ছিত"—
বেদনা-বিবশ হিয়া মূরছিত
মৃত্যু-মলিন আঁখি তুলি' ধ্রুবে
রাখিলে আঁখির 'পরে।

৪

শান্ত নয়ন—কে সওয়ার এলো
এ পথ দিয়া
সহিতে না পারি' সে দিঠি, চমকি'
উঠিল হিয়া।
অতি অদ্ভুত বসন পরিয়া
শুভ্র অশ্ব বাহনে চড়িয়া
আসিল শব্দহীন'
মায়াময় তার মাথার মুকুট
যুগ-যুগান্ত কাঁপে অস্ফুট,
দুলিছে ভূষণে, আঁধার-বসনে
চিরকাল চিরদিন।

৫

সন্ধ্যা-মলিন ছায়ার বরণ
ভূষণ তার,
অস্ফুট ভাষ, স্তিমিত আদ্য
অন্ধকার।
ক্ষীণ তনুখানি শ্রান্ত প্রিয়ার।
"নিয়ে চল, যাই এই দেহভার"
—কহিল আগন্তুক।
মূর্চ্ছাকাতর ক্ষীণ দেহ ধরি।
নিঠুর—সবলে নিয়ে গেল হরি',
নিবিড় বাদলে অশ্ব, সোয়ার
—মিলাল দোঁহার মুখ।

৬

ডাকিনু কাতরে "ফিরে এসো বুকে,
এসো গো প্রিয়া,
পথ পানে চাহি' আকুল ব্যথায়
উছসে হিয়া।
কোথায় লুকাল সে তুরঙ্গম ?
কাঁদিছে ক্ষুব্ধ হিয়াখানি মম
পথ চেয়ে সাথীহারা
বনে বনে বায়ু গুমরিয়া যায়,
সিক্ত তরুর শাখায় শাখায়
শুধু উন্মাদ হাওয়ার কাঁদন
অশান্ত বারি-ধারা

*M. Ghosh—The Rider on the White Horse

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আসকোটের পথে

শহর ছাড়াইয়া আমরা যখন 'কনসাম্‌টিভ এসাইলাম্' ছাড়াইলাম তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পর্ব্বতের চূড়ায় বাঁকের মুখে দাঁড়াইয়া নয়নমুগ্ধকর আলমোড়া শহরটি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। "আলমোড়া হইতে যাত্রাই আমাদের ঠিক কৈলাস যাত্রা," বলিয়া সঙ্গী-মহাশয় এতক্ষণ পর একটু হাসিলেন এবং কুলীরা আগে যাইতেছে দেখিয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

আলমোড়া হইতে বরিছিনা নয় মাইল পথ, বরাবর 'পাইন ফরেষ্টে'র মধ্য দিয়া, চড়াই নাই। এগারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছাইয়া, স্নান, আহার ও বিশ্রাম করিয়া দুইটার পর আবার যাত্রা করিলাম। এবারে ধওলছিনা, এখান হইতে সাড়ে চার মাইল, তাহার মধ্যে মাইল দেড়েক চড়াই আছে। "ছিনা" শব্দটি "শৃঙ্গ" শব্দের হিন্দী অপভ্রংশ। সন্ধ্যায় আমরা ডাকখানাসংযুক্ত এক মুদির দোকানে গিয়া উঠিলাম।

বাঙ্গালার সরকারী স্কুলে যেমন একই ব্যক্তিকে ড্রয়িং ও ড্রিল কিংবা জিমন্যাষ্টিক্, দুই কাজের জন্য রাখা হয়, এদিকে তেমনই পোষ্টমাষ্টার ও মুদীমহাশয় একই ব্যক্তি। মাহিনা দশ টাকা হইতে বারো টাকার মধ্যেই। স্ত্রী ও চার পাঁচটি হৃষ্টপুষ্ট, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে এবং দুইটি গরু লইয়া এইখানেই থাকেন, আবার আমাদের মত দুই এক-জন অতিথিঅভ্যাগতও আছে। এত কম আয়ে কি করিয়া চলে? আমাদের তিনি সেই রাত্রে পরমযত্নে সৎকার করিয়াছিলেন।

ভোরে উঠিয়াই আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। এবার প্রায় দেড় মাইল উৎরাই পার হইয়া সরযূঘাট, এখান হইতে দশ মাইল। প্রখর বেগবতী সরযূর লৌহসেতু পার হইয়া তীরস্থ এক আম্রকাননে আশ্রয় লওয়া গেল। এখানে হিন্দুর একখানি ও মুসলমানের একখানি, এই দুই খানি দোকান আছে। পৌঁছাইতেই সেই মুসলমান মুদীর অষ্টমবর্ষীয় বালক ইব্রাহিমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল। ছেলেটি সুন্দর ও অতিশয় মিষ্টভাষী। উপযাচক হইয়া সে কত কথাই কহিল, কত খবর শুনাইল। আমাদের কি কি চাই সব খোঁজ লইল এবং সকলই সে আনিয়া দিবে বলিল। তাহার পিতা আলমোড়ায় গস্ত করিতে গিয়াছে।

বিনাতৈলে সঙ্গী-মহাশয়ের স্নান হয় না। হিন্দুর দোকানে যখন খোঁজ করিয়া তেল পাওয়া গেল না, তখন ইব্রাহিম সযত্নে আপনার দোকান হইতে আনিয়া দিল। শেষে মূল্য দিতে গেলে কিছুতেই লইল না। বিদায়ের সময় পর্য্যন্ত সে কাছছাড়া হয় নাই।

আহারের বিষয়ে আমাদের কিছু তরকারীর অভাব ছাড়া এযাত্রায় আর কোনও কষ্ট হয় নাই। বেশী ... ঘি, উরদ্‌কী ডাল ও দই দিয়া দিনের অন্ন ও রাত্রের আটা সামান্য কোন উপকরণের সাহায্যেই উচিত, আসকোট অবধি আমি মিলিয়াছিল।

সরযূঘাটের এখানে আরও একটি নাম আছে—ভানাউলিসেরা। স্নানাহার ও বিশ্রামান্তে প্রায় দুইটার সময় আবার যাত্রা। এবার গনোই নামক পড়াওটিতে পৌঁছাইতে, দশটি মাইল ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়, তাহার উপর পথে জলকষ্ট, ঝরণা নাই বলিলেই

একটি ক্ষুদ্র ধারা—সেখানে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক মিনিট কাল ভিক্ষা করিলেও এক অঞ্জলি পূর্ণ হয় না

হয়। প্রায় দুই মাইল পার হইয়া একটি ক্ষুদ্র ধারা পাওয়া গেল, সেখানে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক মিনিট কাল ভিক্ষা করিলে এক অঞ্জলি পূর্ণ হয় কি না সন্দেহ। চড়াই ভাঙিয়া যে তৃষ্ণা তাহা যেন এই অপ্রচুর দানে আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু উপায় ছিল না।

আরও কিছুদূর যাইয়া দেখিলাম প্রায় দেড় বিঘা জমি ধসিয়া এক বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য চূণের চাপ দেখা যাইতেছে। অনেক ভাবিয়া পথ বাহির করিতে হইল। পাহাড়ের এরূপ ধস্ নামিলে, হয় অনেকটা উপর দিয়া, না হয় অনেকটা নীচে দিয়া পথ পড়ে। লোক্যাল বোর্ডের দৃষ্টি পড়িয়া নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতে অনেক সময় লাগে, তত দিনে পথিকেরাই একটা সোজা পথ বাহির করিয়া লয়। জঙ্গল পথে অনেক সময় বন্য জন্তুও বাহির হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্যকর পথটি শেষ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা গণোই পৌঁছাইলাম।

এখানে চাষ-আবাদ বেশ আছে, কিন্তু জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর বোধ হইল না। আমাদের একরাত্রির আস্তানাটি হইল সদ্যপ্রস্তুত অসম্পূর্ণ এক মহাজনের গুদাম-ঘরে। সঙ্গী-মহাশয়ের বক্তৃতার প্রভাবে, বিনাখরচে অতিথি হইয়া আহার, ও ক্লান্ত শরীরে সুষুপ্তির কোলে রাত্রযাপন ঘটিয়াছিল। যাঁহারা এত যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন ও স্থান দিলেন, ভোজনান্তে যখন আমরা নিজ নিজ আসনে শয়নের যোগাড় করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে একজন যুক্তকরে, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের তৃপ্তি হইয়াছে কি না এবং আর কি চাই।" তখন সঙ্গী-মহাশয় তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দীতে তাঁহাদের উৎসাহ দিয়া, "বহুত আচ্ছা খিলায়া, হাম বহুত প্রীত্ হুয়া, তোম লোককো বহুত ভালা হোয়েগে, অব্ অউর কুছ নহি চাহিয়ে, থোড়া পয়ের তো দবাও"—বলিয়া পা বাড়াইয়া দিলেন। তাহারা এ শেষ সুখটুকুতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিল না, সৎকার তাহারা পূর্ণরূপেই করিয়াছিল।

প্রভাতে আমরা বেণীনাগ যাত্রা করিলাম। নয় মাইল পথের মধ্যে শেষের দিকে দুই মাইল চড়াই। চড়াই শেষে বেণীনাগ শৃঙ্গ। পশ্চিমাঞ্চলে বেণীনাগে উৎপন্ন চায়ের খুব প্রসিদ্ধি আছে। চা-বাগানই এখানকার বিশিষ্টতা।

চা-বাগান ও শিকার সম্পর্কে অনেক সাহেব-সুবাদের গতিবিধি আছে। এখানে বাজারের মধ্যে চারিদিকে অনেকগুলি দোকান ও মধ্যে একটি চতুষ্কোণ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। একদিকে পোষ্টাপিস। লোকালয় ইতস্ততঃ, কিছু দূরে। আমরা স্কুলঘরের দাওয়ায় আশ্রয় লইলাম। তখন গ্রীষ্মাবকাশে বিদ্যালয়ের ছুটি, সুতরাং সমস্ত গৃহটি নীরব।

এখানে জলকষ্ট কিছু বেশী। একটি মাত্র ক্ষুদ্র ধারা, তাহার নিকট দশ বারো জন স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকা অনবরত দাঁড়াইয়া আছে। এখানে খুব ভাল চাউল পাওয়া গেল। স্নানান্তে ভাত আলুর তরকারী ও

দধিসংযোগে অতি উপাদেয় ভোজনের জোগাড় করা গেল। বিশ্রামান্তে উঠিবার সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি আসিল। সে বৃষ্টি আর থামে না, অগত্যা আজ রাত্রি এইখানেই কাটাইবার ব্যবস্থা করা হইল। সঙ্গী-মহাশয় দুধের খোঁজ করাতে জানা গেল এখানে দুধ কম হয়। অনেক চেষ্টা করিয়া পোয়াটাক দুধ তাঁহার জন্য মিলিয়াছিল। জলবায়ু এখানকার ভাল নয়, ভাল শরীর একটি দেখি নাই।

এখানকার স্কুলটি উচ্চ এবং নিম্ন প্রাথমিক। এ অঞ্চলের যত গরীব ও মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থের ছেলেরা এখানে পড়ে। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল তাহারা ছেলেদের এখানে পড়াইয়া পরে আলমোড়ায় পাঠায়। আলমোড়া ছাড়াইয়া যে কয়টি স্থানের মধ্য দিয়া আসিলাম তাহার মধ্যে এইস্থানেই লোকসমাগম কিছু উল্লেখযোগ্য। চা-বাগিচার জন্য অনেক শ্রমজীবী এখানে বাস করে, মুসলমানও কিছু আছে, তাহাদের আচার-ব্যবহার প্রায়ই হিন্দুদের সঙ্গে সমান। পড়াশুনা, খেলাধুলা এক সঙ্গেই চলিতেছে, কোনও বিরোধ নাই।

সমস্ত রাত্রি জলের পর প্রভাতে এত কুয়াসা নামিল যে, কোলের মানুষ বুঝি দেখা যায় না। আমরা বাহির হইয়া প্রায় আধ মাইল গেলে দেখিলাম সঙ্গী-মহাশয় দাঁড়াইয়া যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল তাঁর টাকার ছোট থলিটি ভুল করিয়া আমার মধ্যে বিছানার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছেন; এখন স্মরণ হওয়ায় ভ্রম সংশোধন করিবেন। বলিলেন, "কি জানি কুলীদের বিশ্বাস নাই, সেটা বার করে নেওয়াই ভাল কি বল?"—আমার তাহাদের প্রতি বিশ্বাস থাকার কথা বলিলেও তিনি, কুলীরা আসিলে মোট নামাইয়া উহা বাহির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে উপদেশের ছলে আমায় বলিলেন, "দেখ মানুষকে বিশ্বাস নাই, অন্ততঃ আমি কাহাকেও বিশ্বাস করি না। আমার এক বন্ধু বলিতেন যে, তরমুজ চেনা বড়ই কঠিন তাও বরং চেনা যায়, কিন্তু মানুষ কিছুতেই চেনা যায় না। তোমরা এখনও ছেলেমানুষ, মনটি কোমল আছে তাই সব ভালই দেখ, আমরা ভালটাও দেখিয়াছি, মন্দটাও দেখিয়াছি, সংসারের অনেকটাই দেখিয়া ফেলিয়াছি, সহজে বিশ্বাস কাহাকেও করি না।"

তিনি জানিতেন না, খুচরা কয়েকটি টাকা ছাড়া আমার যথাসর্ব্বস্বই পাটকরা ওভারকোটের ভিতরের পকেটের মধ্যে, আমার বিছানার সঙ্গে বাঁধা, আলমোড়া ছাড়িবার পর হইতেই কুলীদের পৃষ্ঠেই চলিতেছে। প্রত্যেক পড়াওতে উঠিয়া একবার গোপনে দেখিয়া লইতেছি মাত্র। কুলীদের উপর আমার খুবই বিশ্বাস ছিল।

এই রাস্তায় বড়ই জোঁকের উৎপাত। পায়ে একেবারে দুই তিনটি করিয়া ধরিতেছে। সঙ্গী-মহাশয়ের পায়ে ছিল জুতা, আমি আলমোড়া হইতেই নগ্নপদ। তথাপি তাঁর সাবধানতার বিরাম ছিল না, "পা দুটি মাথায় করিয়া চলিতেছি" বলিয়া রসিকতা করিলেন। এইভাবে আমরা দশ মাইল পথ শেষ করিলাম।

এবারে, আমরা প্রায় দ্বিপ্রহরে থল্ নামক একটি অতি প্রাচীন স্থানে উঠিলাম, রামগঙ্গার বড় পুল পার হইয়া নদীতীরে একটি নাতিউচ্চ প্রস্তর-মন্দির দেখিলাম; তাহার চূড়ায় রক্তপতাকা উড়িতেছে। উহা পার হইয়া অল্প কতকটা চড়াই, তারপর যেন একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, তাহারই একদিকে একখানি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত স্কুলগৃহ, অন্যদিকে তিন চারিখানি দোকান। আমরা স্কুলের বারান্দাতেই এ বেলার মত তল্পিতল্পা রাখিলাম।

দুর্গাদত্ত নামে চন্দনচর্চ্চিত একটি সুকুমার ব্রাহ্মণ-বালক আমাদের জন্য পাক করিয়াছিল, দুই আনা তাহার পারিশ্রমিক। সে স্কুলে পড়ে, তাহার পিতা প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ। টুপী, কোট, পাৎলুন প্রভৃতি ছাড়িয়া যখন সে ক্ষুদ্রায়তন একখানি বস্ত্র পরিয়া চৌকার মধ্যে রাঁধিতেছিল, আমি সমস্তক্ষণ তাহার কাছে ছিলাম, তাহার কথা শুনিতেছিলাম। এখানে অনেক পুরাতন মন্দির আছে, বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, অর্থাৎ সপ্তম, অষ্টম, ও নবমের মধ্যে কন্যাকে বিবাহ দিতেই হয়। পরে পাঁচ ছয় বৎসর কন্যা পিতার গৃহেই থাকে। পরে শুভদিনে দ্বিরাগমন হয়; ইত্যাদি

নদীতীরে একটি নাতিউচ্চ প্রস্তর-মন্দির দেখিলাম

আসকোট

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

খলের দুর্গাদত্ত

ইত্যাদি। কর্ম্মশেষে সে তার কাজে গেল আর আমরাও আহার ও বিশ্রামান্তে ডেরা উঠাইলাম।

এক বিশাল চড়াই, আগাগোড়া অভ্রমিশ্রিত পচা পাথরের রাশি, প্রায় দুই মাইল উঠিয়া ময়দান(প্রায় সমতল) রাস্তা। পাহাড়ের পর পাহাড়, যেন শেষ নাই। একটি উত্তীর্ণ হইলে তাহার পশ্চাতে আর একটি বিরাট কায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

এইরূপে সন্ধ্যার কুয়াসা মিশ্রিত অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডাণ্ডিহাট ডাকবাঙলার বারান্দায় উঠিলাম। মুদীর দোকান আছে কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যায় এই ঝড় বৃষ্টি বাদলের নিশ্চিত সম্ভাবনায় ভিন্নগ্রামবাসী মুদী, তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া পলাইতে ব্যস্ত, আর আলোও তার কাছে ছিল না। আমরা তাহার দোকানে চড়াও হইয়া কিছু আটা, আলু ও কিঞ্চিৎ লবণ সংগ্রহ করিয়া বড়ই কষ্টে সে রাত্রে ভোজনের ব্যাপার শেষ করিতে পারিয়াছিলাম।

ঝড়বাদলের রাত্রি কোনও-রূপে কাটাইয়া ভোরে উঠিয়াই যাত্রা করিলাম। ডাণ্ডিহাট হইতে আসকোট সাত মাইল মাত্র। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পথটি শেষ করিলাম, চড়াই নাই, উৎরাইও বেশী নয়, সরল রাস্তা। ডাকবাঙলা পার হইয়া বেলা নয়টা আন্দাজ আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পোষ্টাপিসের দাওয়ায় মোটঘাট নামাইয়া আসন গ্রহণ করিলাম। এখানে আসিয়া দুইখানি পত্র পাইলাম। তাহার মধ্যে একখানায় বাড়ির খবর ছিল।

আমরা পৌছিবার অল্পক্ষণ পরেই সংবাদ পাইয়া কুমার বিক্রমসিং পাল, রাজার মধ্যম পুত্র দেখা করিতে আসিলেন। অশ্বারোহীর পরিচ্ছদ, জোয়ান শরীর। তিনি এখানকার পাটোয়ারী। ডাকমুন্সি বল্লভজী একখানি আসন পাতিয়া দিলে কুমারজী বসিলেন। সতীশমহাশয় তাঁর গীতা একখানি উপহার দিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ চলিল।

আসকোট রাজওয়াড়

পালবংশের অভ্যুদয় হয়। ঐ পালবংশের একটি শাখা অনেক দিন অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে বহিঃশত্রুর উৎপাতে হীনবল পালরাজারা অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে আসিতে থাকেন। এইরূপে পিথোরা-গড়ের পথ দিয়া শালিবাহন পাল আসকোটে আসিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চারিদিকেই পাহাড়, ত্রিশ মাইল ব্যাপী হিমালয়ের ভূখণ্ডের আধিপত্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই আসকোট-রাজওয়াড় নামে এ অঞ্চলে খ্যাত। নেপালের সঙ্গেই ইঁহাদের বিবাহ প্রভৃতি করণ-কারণ হইয়া থাকে। আসকোট্ পর্ব্বতের পাদমূলে কালীনদী, ওপারে নেপালের এলাকা।

বৃদ্ধ রাজার অনেকগুলি পুত্র, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভূপেন্দ্র সিং পাল এখানকার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও মধ্যম বিক্রম সিং পাল এখানকার পাটওয়ারী। পাটওয়ারী বলিতে পুলিসের দারোগার মত একটি পদ বুঝায়। গ্রামের মধ্যে যাহার অবস্থা ভাল তাহাকে প্রধান এবং সে অঞ্চলের মধ্যে যাহার অবস্থা ভাল তাহাকেই পাটওয়ারী করা হয়। প্রয়োজন হইলে হেডকোয়াটার হইতে ইঁহারা পুলিসের সাহায্যও পাইয়া থাকেন। এইভাবে শান্তিপ্রিয় হিমালয়ের মধ্যে এ অঞ্চলের শাসনকার্য্য চলে। আসকোট্ পর্ব্বতের পাদমূলে প্রখর বেগশালিনী কালী ও গৌরী এই দুইটি নদীর সঙ্গম।

কিছুক্ষণ আলাপের পর কুমার সাহেব চলিয়া গেলে, আমাদের জন্য সিধা আসিল, বল্লভজী রাঁধিলেন। আমরা ভোজনান্তে নির্দ্দিষ্ট যে স্থানে যাইয়া আসন বিছাইলাম, সেটি কুমার ভূপেন্দ্র সিং পালের এজলাসের পার্শ্বস্থ কক্ষ। আমাদের সকল ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল, এখানে চারি দিন থাকিয়া যাত্রা করিব।

এখানে আলমোড়ার ন্যায় গোধেরা আছে। সমুদয় আসকোটে প্রায় ছয়টি ঝরণা আছে, তাহার মধ্যে দুইটি গোধেরা, বাকিগুলি ধারা, তাহার মুখ পাথর দিয়া বাঁধান। পানীয় জলের এদিকে কষ্ট নাই। তবে সাধারণত জলের ব্যবহার কম এবং স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই বড়ই অপরিষ্কার। স্ত্রীলোকেরা রংকরা ছিটের অথবা ছাপা নানা রংয়ের বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহা কখনও কাচা বা

আসকোটের গোধেরা

পরিষ্কার করা হয় না যতদিন না জীর্ণ হয়। গায়ের হাওয়ায় দুর্গন্ধ। মাংস ও পলাণ্ডুর ব্যবহার এদিকে খুব বেশী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে পুরাণো চাল। বৈশ্য এখানে খুবই কম। মাংসকে "শিকার" বলে। আসকোটের চারিদিকেই শস্যক্ষেত্র। যব, ধান, গম, চানা, ভুট্টা ও অন্যান্য ডাল এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। তবে গমের চাষই বেশী, এ বৎসর অজন্মা হওয়ায় টাকায় সাড়ে ছয় সের গম ও চারি সের চাউল বিকাইতেছে, ফল ও তরিতরকারী বিক্রয় হয় না। বাজার নাই। নিজ নিজ জমিতে প্রয়োজনমত শাকসব্জি উৎপন্ন করাই সাধারণ নিয়ম।

আসকোট সাড়ে চারিহাজার ফিট। উচ্চতম শৃঙ্গে একটি দেবালয় আছে তাহা কালিকাদেবীর স্থান। তাহার সকল দিকই মাটি ও পাথরে ঢাকা। কেবল এক-দিকে কাঠের রেলিং আছে, ভিতরে অন্ধকার। কাহারও

নাথজী

সন্তান হইলে কিংবা মানত করিয়া রোগ আরাম হইলে এখানে পূজা দিতে আসে।

আমরা এখানে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে নাথ-সম্প্রদায়ের, লোকনাথ নামে একজন নবীন সন্ন্যাসী কৈলাস ও মানস সরোবর যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়া এখানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাঁহাকে নাথজী বলিয়াই ডাকা হইত। তিনি তৈলঙ্গী, বয়স প্রায় চব্বিশ, খর্ব্বাকৃতি ও ঘন শ্যামবর্ণ। নিঃসঙ্কোচে আমাদের সঙ্গেই তিনি আসন বিছাইয়া আমাদের একজন হইয়া গেলেন। তিনি বেশ ভজন গান করিতেন। প্রায়ই নিজ আসনে বসিয়া না হয় শুইয়া থাকিতেন, বলিতেন "চল্‌না ফিরনা বড়ী উপাধি, লেট্‌না বৈঠ্‌না বড়ী সমাধি।" আমার মনে হইত ইহা তাঁহার আলস্য-প্রসূত। সঙ্গী-মহাশয় তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না।

দিনে একবার ও সন্ধ্যায় একবার করিয়া কুমার-সাহেবেরা আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতেন। তখন সঙ্গী-মহাশয় নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। কখনও দেশের কথা, কখনও তাঁহার ভ্রমণের কথা, হিমালয়ে তিনি "হাজারো মীল ভ্রমণ" করিয়াছেন, সেই সকল অভিজ্ঞতার কথা। কখনও রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি কত কথাই হইত। একদিন পুরানো পুঁথির কথা উঠিল। বড় কুমার ভূপেন্দ্র সিং বলিলেন যে, তাঁহাদের ঘরে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত মানসখণ্ডের পুঁথি আছে। তাহা অনেক দিনের জানিয়া সঙ্গী-মহাশয় দেখিতে চাহিলেন। উহা তৎক্ষণাৎ আনানো হইল।

আমাদের দেশে অনেকেরই ঘরে পুরাণো হস্তলিখিত পুঁথি আছে, কিন্তু সে সকল বাহির করিয়া প্রকাশ বা বা প্রচার করিতে চান না। ইহা ভাল নয়। প্রচার হইলে অনেকেরই কল্যাণ হয়। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যে কত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ আছে তাহার কথাও সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন।

রাজবাড়ী হইতে যে পুঁথিখানি আসিল তাহা সঙ্গী-মহাশয় কতকমত দেখিলেন, আমিও তাহার কতকটা দেখিয়াছিলাম। অক্ষর ভাল না হইলেও বেশ পড়া যায়। ইহাতে হিমালয়স্থ সকল তীর্থের কথাই আছে। মানস-সরোবর হিমালয়ের শেষ তীর্থ বলিয়া ইহার নাম মানস-খণ্ড হইয়াছে, পুঁথিখানি বেশী প্রাচীন নহে। কোন্ তীর্থ কোন্ স্থানে, কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মানসসরোবর এবং সুদূর তীর্থপুরী প্রভৃতি যাইতে হয় তাহার পর বদরিকাশ্রম দিয়া পরিক্রমণ, তাহার মধ্যে পঞ্চপ্রয়াগ হৃষীকেশ হরিদ্বার পর্য্যন্ত সকল তীর্থের কথা অসংলগ্নভাবে বর্ণিত আছে। ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি স্থানের নাম আছে যাহার সহিত এখনকার নামের মিল নাই। যিনি এই সকল স্থান পর্য্যটন করিয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার নাম নাই। সঙ্গী-মহাশয় কুমারসাহেবকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কলিকাতায় পৌঁছাইয়াই তিনি এইখানি ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের কৈলাস হইয়া মানসসরোবর ভ্রমণ শেষ করিয়া কেদার বদরীনারায়ণের পথ দিয়া ফিরিবার ইচ্ছা ছিল। এখানকার সকলেই পুনঃপুনঃ ও পথে ফিরিতে নিষেধ করিলেন; যেহেতু ওদিকের পথে বিপদের সম্ভাবনা অনেক, ডাকাত আছেই তাহা ছাড়া অনেকগুলি ভয়ানক প্রখর বেগবতী বড় বড় নদী পার হইতে হয়।

এইরূপে আমাদের দিন কাটিত। একদিন কুমার বিক্রম তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় শিশু কন্যাটিকে কোলে করিয়া আসিলেন। সুন্দর মুখশ্রী এবং তপ্ত কাঞ্চনের মত তাহার বর্ণ কিন্তু শরীর এত ক্ষীণ, দেখিলে কষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করিলে মিষ্ট অস্পষ্ট ভাষায় তাহার নাম বলিল চন্দ্রপ্রভা। আমাদের কাছে বসাইয়া কুমার তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চন্দা, তুমনে কৈসে রামায়ণ সীখা, জরা স্বামীজীওকো সুনা তো দো;" নিঃসঙ্কোচে শিশু আরম্ভ করিল, "আদৌ রাম তপোবনাদি গমনম্, হত্বা মৃগম্ কাঞ্চনম্ বৈদেহীহরণম্,-জটায়ুমরণম্, সুগ্রীবসম্ভাষণম্, বালীনিগ্রহণম্, সমুদ্র-তরণম, লঙ্কাপুরীদহনম্, পশ্চাৎ রাবণকুম্ভকর্ণাদিহননম্ চ এতদ্ধি রামায়ণম্।" আমরা শুনিয়া যথার্থই আনন্দ পাইলাম। সঙ্গী-মহাশয়, "আরে মায়ি, তোম হামকো পুরা রামায়ণ শুনায় দিয়া, তোম বহুত ভাগ্যবতী হো, রাণী হো", ইত্যাদি সম্ভাষণে গৌরবান্বিত ও উৎসাহিত করিলেন।

এই আসকোটে আমরা দুইজন নূতন মানুষ বা সঙ্গী পাইয়াছিলাম, একজন "নাথজী" তাঁহার কথা পূর্ব্বেই

লালগীর

বলিয়াছি, আর একজন লালসিং ওরফে লালগীর। বৃদ্ধ রাজার ঔরসে ও এক ক্ষত্রিয়াণী উপপত্নীর গর্ভে ইহার জন্ম। সে রাজসংসারে ভৃত্যদের মধ্যেই লালিতপালিত। বিবাহাদিও হইয়াছিল, পরে বৈরাগ্য আসিয়া তাহাকে সংসার হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। গিরি-সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা লইয়া কিছুদিন এদেশ-সেদেশ করিয়া ঘুরিয়া আবার আসকোটে ফিরিয়া বৈরাগীর মতই সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। নাথজীর সঙ্গে তার বড়ই প্রণয়, বোধ হয় এক ছিলিমের বন্ধু বলিয়াই তাহাকে প্রায়ই আমাদের আসনের নিকটেই দেখিতে পাইতাম।

লালগীরকে দেখিতে যথার্থই সুপুরুষ। দীর্ঘ শরীর, আজানুলম্বিত বাহু, যথার্থই রাজপুত্র। রাজার এতগুলি পুত্রের মধ্যে ইহাকেই দেখিতে সুন্দর, অথচ সে বিবাহিতা রাণীর গর্ভজাত নহে। তাম্রবর্ণের উপর ভস্মমাখা, রুক্ষ চুল, ঢুলু ঢুলু আঁখি, পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস বুকের সঙ্গে বাঁধা, স্থির গম্ভীর এবং তেজস্বী স্বভাব, যেন যোগীশ্বর মহাদেব। তাহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিত।

ভজন-সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার এক বাঁধা বুলি আছে তাহাই পুনঃ পুনঃ আওড়াইত। তাহা এই—"তলধর তিপুর, উপর, অম্বর, পরমহংস মহামুনি, শ্রীবদরীনাথ বিশেশ্বরং, গুরু কেদারনাথ সদাশিবং," বলিত "গুরু হমারে শুকনে সিখায়া হৈ—।" এই কয়দিনের ঘনিষ্ঠতায় সে আমাদের অনুরক্ত হইয়া পড়িল এবং আমাদের সঙ্গে কৈলাস যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ইহা অগোচর ছিল না যে,সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে পছন্দ করিতেন না, সেজন্য আমলও দিতেন না। পাছে সঙ্গে থাকিলে আহার দিতে হয় সেজন্য তাহাকে সঙ্গে রাখিতে অস্বীকার করেন, সেইজন্য সে আগে হইতেই বলিল, "হম তো মাঁগকে খানেওয়ালা ঠহরা, হমারে বাস্তে কুছ্ চিন্তা মত করো, সির্ফ সাথ চলুঁগা।" আমাদের তিনটি দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু চতুর্থ দিন প্রাতে একটু অশান্তির কারণ ঘটিল।

আমরা প্রাতেই শৌচান্তে স্নানের কাজ শেষ করিয়া লইতাম। আজ স্নানার্থে গোধেরার দিকে গিয়া দেখি রাজবাড়ীর লোকসকল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। মজুর লোকেরা মাথায় শুষ্ক কাঁটাগাছের বোঝা লইয়া এক স্থানে জমা করিতেছে। অপর জন তাহা হইতে

কতকাংশ লইয়া আনাগোনার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিতেছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় একজন বলিল, "হৈজাকী বীমারী ফৈল রহী হৈ, সব পানীকে রাস্তে বন্দ করেঁগে।"

'হৈজাকী বীমারী' অর্থে কলেরা বা ওলাউঠা। এখন এখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সাধারণের জলের রাস্তা বন্ধ করা হইতেছে, যেহেতু জল হইতে এই রোগের বিস্তার হয়। পৃথক পৃথক পল্লী হইতে পৃথক পৃথক ধারায় জল লইবার ব্যবস্থা করা হইল। সংক্রমণ বন্ধ করিবার জন্যই এত কড়াক্কড়। মূলে কিন্তু সাংঘাতিক গলদ প্রত্যেক বাড়ীতে ছাগল ভেড়া এবং পল্লীবাসী সাধারণের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা গৃহের অঙ্গনেই মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহাতে এত মাছি যে, দিনমানে স্থির হইয়া এক মুহূর্ত্ত বসিবার যো নাই। সদর রাস্তা ছাড়া গলি-ঘুঁজিতে চলিবার উপায় নাই। এত দুর্গন্ধ যে তাহাতে অসুখ আপনিই আসে। বর্ষাতে ঐ সকল পাচয়া রোগের বীজাণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

গ্রামের মধ্যে কাহারও পেটের অসুখ হইলে রাজ-ওয়াড়াতে খবর দেওয়াই নিয়ম, সেইখান হইতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। পেটের অসুখ শুনিলে সকলের মুখ শুকাইয়া যায়। ভয়ে কেহ রোগীর সেবা করিতে সাহস করে না। জল চাহিলে কেহ জল দেয় না,—ভয় জল খাইলেই মরিয়া যাইবে। রোগের সেবা এই হিমালয়ে কোথায়ও হয় না, বিশেষত "হৈজাকী বীমারী" হইলেই মরণ সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মীয় স্বজন দূরে সরিয়া পড়ে। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া যায়।

স্নানান্তে আসিয়া শুনিলাম আমাদের পাচকঠাকুর পথ দেখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন গ্রামের লোক। কাছেই একজন প্রজা ও তাহার একটি সন্তান কাল রাত্রে মারা গিয়াছে। সেই আতঙ্ক চারিদিকে ছড়াইয়া আজ সকালে পল্লীবাসিগণের মুখের প্রফুল্লতা একেবারেই যেন লোপ করিয়া দিয়াছে। আজ আমাদের স্বয়ংপাকের ভোজন শেষ হইলে দ্বিপ্রহরে কুমার ভূপেন্দ্র আসিলে পরামর্শবৈঠক বসিল। আমরা কাল প্রত্যূষেই যাত্রা করিব, দুইজন বাহক আমাদের মালপত্র গাঁওসেরায় লইয়া যাইবে। খরচ লাগিবে না, গ্রামে যখন মহামারী তখন কুমার বাহাদুরেরা আর বেশীদিন থাকিতে অনুরোধ করিতে পারিলেন না। পথে যাহাতে আমাদের কোনও কষ্ট না হয় সেজন্য কয়েকখানি আজ্ঞা-পত্র দিলেন। এখান হইতে "খেলা" অবধি তাঁহাদের এলাকা। ফিরিবার পথে পুনরায় কিছুদিন থাকিয়া যাইতে এবং এখানকার উৎকৃষ্ট আম খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং প্রতিশ্রুতি লইলেন।

বৃদ্ধ রাজার একটি ভাই ছিল, তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না। অনেক দিন হইল দুইটি পুত্র রাখিয়া মারা যান। জ্যেষ্ঠ খড়্গসিং পাল ও কনিষ্ঠ জগৎসিং পাল। খড়্গ সিংহের খ্যাতি প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। তিনি পিথোরাগড়ের ডেপুটি কলেক্টর, কনিষ্ঠ জগৎ সিং পেস্কার। তিনিও বিখ্যাত ব্যক্তি, সৌজন্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য।

আমরা কাল চলিয়া যাইব শুনিয়া জগৎ সিং অন্যান্য কুমারগণের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় আলাপ, সাক্ষাৎ করিতে এবং আমাদের বিদায় দিতে আসিলেন। পুরুষোচিত রূপবান, দীর্ঘ শরীর প্রায় সাড়ে ছয় ফুট হইবে। বর্ণ গৌর তাহাতে রক্তের স্পষ্ট আভা, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, তাহার উপর চন্দনের ছোট একটি ফোঁটা, নিখুঁত আর্য্য মূর্ত্তি, তাহার উপর রাজবংশের সন্তান। তাঁহার তুল্য শ্রীমান এ যাত্রার মধ্যে কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার বাক্যালাপ একটি আকর্ষণের বস্তু।

সঙ্গী-মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে তিব্বতের মধ্যে সোণার খনি, রত্নের খনি থাকার কথা বলিলেন যদি তাহাদের সঙ্গে কারবার করা যায় ত অনেক লাভ আছে। তিনি জানিতেন না যে, বহুকালাবধি উত্তর হিমালয়ের ভোটিয়া অধিবাসিগণের সহিত কারবার চলিতেছে, তাহাপেক্ষা অধিক আয়তনে কারবার চালানর সুবিধা মোটেই নাই। জগৎসিং বিনীতভাবে তাঁহাকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় নিজের ভাবের আবেগে অসাধারণ যুক্তি সকল প্রয়োগ করিয়া নিজের মতই বজায় রাখিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন জগৎসিং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বোধ হয় ল্যাণ্ডর সাহেবের তিব্বতের কাহিনী পড়িয়াছেন, তাহাতে তিনি খুলিয়াই সকল কথা লিখিয়াছেন তিব্বতীয়গণ কিরূপ জঘন্য, অসভ্য

ও দুর্দ্দান্ত হিংস্র জাতি। সঙ্গী-মহাশয় তাহাতে বলিলেন- "তার ওসব কথা অতিরঞ্জিত মিথ্যা বলিয়া সরকার বাহাদুর প্রকাশ করিয়াছেন।" জগৎ সিং তখন ধীরে ধীরে বলিলেন "না, না, তা নয়, তাঁহার প্রত্যেক কথাই সত্য, আমার সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় এবং আমার ভাই খড়্গসিং—তিনি ডেপুটি কলেক্টর—তাঁর সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহা ছাড়া আমরা তিব্বতবাসীদেরও খুব ভাল জানি। তাঁহার কাহিনীর কোনটাই মিথ্যা নয়। তখনকার আলমোড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট উপর হইতে হুকুম পাইয়া তাহাকে অনেক বাধা দিয়াছিলেন।" পরে বিলাত হইতে কি ভাবে হুকুম আনাইয়া, এই পথে তিনি গিয়াছিলেন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তখন সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, "বটে! আমরা ত এত ব্যাপার জানি না। যাহা হউক আমি ফিরিয়া গিয়া যখন এ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিব তখন তাহাতে সাধারণের ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিব"—পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আর সরকারকেও বেশ করিয়া ঠুকিয়া দিব।"

আমাদের কথার শেষে কুমার বিক্রম সিং আত্মরক্ষার্থে একটি রিভলভার লইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ব্যবহার জানা না থাকায় তাহা লওয়া হইল না।

কালের অনির্ব্বচনীয় লীলা। আসকোট্ ছাড়িবার দুই সপ্তাহ পরে যখন আমরা গারবেয়াংএ আরামে রুমাদেবীর আশ্রয়ে কাল কাটাইতেছিলাম, তখন হঠাৎ কুমার জগৎ সিংএর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। তিনি "হৈজাকী বীমারী" তে মারা গিয়াছেন।

ব্যাসক্ষেত্রের পথে, বালুয়াকোট, ধারচুলা, খেলা

এদিক দিয়া তিব্বতে যাইতে হিমালয়ের উচ্চস্তরে ব্যাসক্ষেত্র হইয়াই যাইতে হয়। গারবেয়াং এই ব্যাসক্ষেত্রেই অবস্থিত। আমরা এখন গারবেয়াং অভিমুখেই যাত্রা করিলাম। আমাদের মোটঘাট গাঁওসেরায় চলিল। গ্রামের ভূস্বামী পাটওয়ারী অথবা প্রধানের হুকুমমত মাল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়াকেই গাঁওসেরা বলে। ইহাই প্রাচীন কালের নিয়ম। ইহাতে মাসুলের ব্যাপার নাই, মাল খোয়াও যায় না, তবে অসুবিধা বিস্তর।

সঙ্গী-মহাশয়, নাথজী ও আমি এই তিনজনে মঙ্গলের ঊষায় না হউক বুধের সকালে পা বাড়াইলাম। সে দিন বর্ষা। সঙ্গী-মহাশয়ের যাত্রার শুভমন্ত্র "জয়তি জয় বলরাম লক্ষ্মণস্তু মহাবল" বিফল হয় নাই। সেদিন প্রথম হইতেই বর্ষায় সমস্ত রাস্তাটি আমাদের মালপত্র-সমেত ভিজিয়া কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

কালীনদীর উপত্যকা ধরিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, বালুয়াকোট গ্রামখানি সেই পথ হইতে প্রায় একপোয়া চড়াইয়ের উপর। তাহা জানা ছিল না, আর পথে এমন জনপ্রাণী দেখিলাম না যাহাকে জিজ্ঞাসা করি। যখন গ্রাম ছাড়াইয়া প্রায় একমাইল চলিয়া গিয়াছি তখন একজনকে নদী হইতে জল লইয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম। হায়রান হইয়া আবার ফিরিলাম, এবং চড়াই ভাঙ্গিয়া বেলা প্রায় দেড়টার সময় মঙ্গল সিং প্রধানের অতিথিশালায় উঠিলাম।

প্রধান মহাশয় জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাঁহার তিনটি পুত্র, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, গৌর শরীর ও সুকুমার মুখশ্রী। কনিষ্ঠই এক্ষেত্রে আমাদের সৎকার করিল, সিধা প্রভৃতি আনিয়া পাকের জোগাড় করিয়া দিল। আসকোট পার হইয়া আর দোকানপাট নাই, সুতরাং অতিথি হওয়াই সনাতন প্রথা। নিজেদের জন্য আনাজ অর্থাৎ চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি সঙ্গে থাকিলে কোনও ভাবনাই নাই, কিন্তু পথে যে ঐসকল দ্রব্য খরিদ করিতে পাওয়া যাইবে না, ইহা জানা ছিল না। তাহা ছাড়া বেশী দিনের জন্য দুই জনের উপযুক্ত রসদ সঙ্গে লইতে বাহক বা কুলীও বেশী চাই, বোঝাও অনেক বাড়িয়া যায়। অতিথি হওয়াটা গা-সওয়া হইয়াছিল। এই আসকোট হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস অবধি যাওয়া, এবং ফিরিয়া মায়াবতী আসা পর্য্যন্ত আমাদের অর্থব্যয় করিয়া আহার জুটাইতে খুব কমই হইয়াছে।

এখন আমাদের আহারাদির পর একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। সঙ্গী-মহাশয় একখানি খাটিয়া ও একখানি সতরঞ্চ আনাইয়া তাহাতেই বিশ্রামের যোগাড় করিয়া লইলেন, আমরা মেজেতেই বসিলাম, তখনও আমাদের মালপত্র পৌঁছায় নাই। গাঁওসেরার এই সুখ।

এতটা পাইয়াও সঙ্গী-মহাশয়ের তৃপ্তি নাই, তিনি

একটি প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ—তাহার মূলে কালিকাদেবীর স্থান।

খাটিয়ার উপর শুইয়া প্রধানের সেই অনুগত কনিষ্ঠ পুত্রটিকে, "এই, হমারে পয়ের তো দবাও ছোড়া" বলিয়া তাহাকে পা টিপিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল—যেন জানাইল ওরূপ পুরস্কারের আশা সে করে নাই। পরে তেজোদীপ্তকণ্ঠে "নহী, হম লোগ ছত্রী হৈ, কিসীকে পয়ের নহী ছুতে", বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল।

কতক্ষণ পর আমাদের মাল আসিলে খুলিয়া দেখিলাম সব ঠিকই আছে। বৈকালে প্রধানের পুত্রটি আমাদের কাচা পীচ্ কতকগুলি আনিয়া দিল। পীচকে আড়ু বলে। এ দিকে পীচ পাকিতে পায় না, কাঁচাবেলাতেই নুন ও মরিচচূর্ণযোগে নিঃশেষ করা হয়। মৃদু অম্লরসটা দেখিতেছি এ পর্ব্বত অঞ্চলে মিষ্ট অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

আসকোটের পর হইতে দেখিতেছি এদিকে খুব ভাঙের জঙ্গল। তাহা হইতে চরসও উৎপন্ন হয়। ছোট ছোট ছেলেরা চরস বাহির করিতে জানে। দুটি বালক আসিল। নাথজী তাহাদের নিকট হইতে দুইটি বড় বড় ডেলা চরস বাহির করিলেন। তাহারা ঐ রূপে চরস তুলিয়া পয়সা লইয়া গোপনে বিক্রয় করে। লালগীর ঠিক আছে, মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইতেছে।

বালুয়াকোটের চারিদিকেই কৃষিক্ষেত্র, আমরা যেখানে আস্তানা গাড়িয়াছিলাম সেখান হইতে সম্মুখেই শস্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল, তারপর দূরে কালীপারে পর্ব্বত-শ্রেণী; উহা নেপালের এলাকা। মাঝে মাঝে বাঘের ডাকও শুনা যাইতেছিল। ঘন জঙ্গলময় পর্ব্বত-মালা, তাহার উপরে বর্ষার ঘোর ঘনঘটা, কি চমৎকার বর্ণের যোজনা, নির্ম্মল সবুজের উপর ঘোর নীল অথবা কৃষ্ণধূসরের ছড়াছড়ি।

প্রভাতে আমরা ধারচুলা যাত্রা করিলাম। রাস্তা ভাল, কালীগঙ্গার উপত্যকা দিয়াই সারা পথটি বিচিত্র দৃশ্যে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে দুইটির কথা বলিব। একটি প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ, পাহাড় অঞ্চলে এতবড় গাছ দেখা যায় না, সেথায় বৃক্ষমূলে এক বিশাল সিন্দুররঞ্জিত প্রস্তরে কালিকাদেবীর স্থান। বহু দূরদূরান্তর হইতে পল্লীবাসিগণ দেবীর স্থানে পূজা ও বলি দিতে আসে। বৃক্ষতল দিয়াই সাধারণ পথটি গিয়াছে। উহা পার হইবার সময়, সেই বিশাল শাখা ও ঘনপত্রসমাচ্ছন্ন বৃক্ষমূলের দিকে তাকাইলে প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে। দ্বিতীয় দৃশ্যটি একটি জনমানবশূন্য ঘন-সন্নিবিষ্ট গ্রাম।

স্থানটির নামও কালিকা। 'কালীনদীর উপত্যকা

দিয়া আসিতে বামে। প্রথমে সেই গ্রামখানিকেই ভ্রমক্রমে ধারচুলা ভাবিয়া ছিলাম। নিকটে আসিয়া দেখিলাম জনপ্রাণীর সমাবেশ নাই। সারি সারি ঘর খাড়া আছে, কোনোটির ভগ্নদশাও নয়, প্রত্যেকখানিই পরিষ্কার, কিন্তু জনশূন্য। বড় আশ্চর্য্য লাগিল, ব্যাপার কি? মনে হইল বুঝি মহামারী হইয়াই এরূপ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। এই রূপে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশখানি গৃহ পার হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেকটা আগে যাইয়া পড়িলাম। পথে একজনও পাইলাম না যাহাকে জিজ্ঞাসা করি। অবশেষে ধারচুলায় পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, শীতের সময় নেপালের সীমানার মধ্যে পূর্ব্ব-উত্তর হিমালয়ের উপস্তরের অধিবাসিগণ ঐখানে আসিয়া বাস করে। এখন সেই জন্য উহা জনশূন্য।

এই ধারচুলাও সেইরূপ একখানি গ্রাম। ইহাও উপস্তরের হিমালয়স্থ বৃটিশ প্রজাগণের শীতাবাস। গারবেয়াং, কুটি, গুঞ্জিও প্রভৃতি স্থানগুলি শীতের সময়ে যখন বরফে ডুবিয়া যায় তখন সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়, তাই শীত কাটাইবার জন্য তাহাদের এইরূপ একটি স্থানে পৃথকভাবে এক একটি আশ্রয় রাখিতে হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসে তাহারা নামিয়া আসে আবার চৈত্রের মাঝামাঝি উঠিয়া যায়।

ধারচুলায় আমরা তিনজনেই লোকমণি মুন্সিজীর গৃহেই উঠিলাম। তিনি এখানকার সরকার তরফের Import Export Traffic Clerk অর্থাৎ আমদানী রপ্তানী মালামাল সরবরাহের হিসাব-নবীশ। তিনি গাড়োয়ালবাসী। দুই দিনের জন্য আমরা এইখানেই রহিলাম, কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় নাথজীকে সঙ্গে রাখিতে চাহিলেন না, বলিলেন একে আমরা দুইজন আছি, কোনও গৃহস্থের আশ্রয়ে উঠিলে একরকম-চলিতে পারে, কিন্তু যদি তিন জন হয় তাহা হইলে গৃহস্থের আশ্রম-পীড়া উপস্থিত হইবে। কাজেই সে পৃথক হইল। পরে গারবেয়াং-এ এক সঙ্গে মিলিয়াছিল।

এই ধারচুলা গ্রামখানি কালীনদীর উপত্যকার এপারে বৃটিশ সীমানার মধ্যে আর ওপারে নেপাল রাজ্যের অধিকারে একখানি গ্রাম আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কালীনদীই বৃটিশ ও নেপালের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। নদীর অবিরাম, অতিপ্রখর স্রোতের উপর দিয়া নরশরীর লইয়া পারাপারের কোনও সম্ভাবনা নাই, যদিও নদীগর্ভ প্রস্থে কোনো স্থানেই বিশ হইতে পঁচিশ ফিটের বেশী নহে। প্রাচীন কাল হইতে মালামাল এবং জনসাধারণের পারাপার এবং কর্ম্মসম্পর্কে যোগাযোগ ঘটাইবার একটি বিশেষ উপায় আছে।

এপারে তিনটি, ওপারেও সেইরূপ তিনটি বিশাল দেওদার বৃক্ষদণ্ড, ঊর্দ্ধে লৌহকীলকসাহায্যে একত্রিত এবং নিম্নে সমব্যবধানে পৃথকভাবে প্রোথিত। দুই দিকেরই দণ্ডের ঊর্দ্ধে, সংযোগস্থলে দৃঢ় স্থূল পশুলোমনির্ম্মিত রজ্জু বা কাছি। এবং তাহার মধ্যে এক লোহার আংটায় বাঁধা ঝুড়ি বা ঐরূপ একপ্রকার আধার দৃঢ়বদ্ধ আছে। এই ভাবেই এপার ওপারের মালামাল এবং মানুষের নিত্য গতায়াতের সম্বন্ধ ঘটায়। শীতের সময় উপরে বরফ জমিয়া নদীর বেগ মন্দীভূত হইলে হাঁটিয়া পারাপার হওয়া চলে।

এই ধারচুলাই উপর হিমালয়ের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও মাল আমদানী রপ্তানীর একটি ঘাঁটি, আর লোকমণিজীই সরকার তরফের একমাত্র ভারপ্রাপ্ত হিসাব-নবীশ। গত বৎসরের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কি ভাবে এই কারবার চলিতেছে।

মাল	কত মণ	দামের হিঃ প্রতিমণে
সোহাগা	২১০০	১০৲
গন্ধ্রানী জড়ি (১)	১৬৭	১৬৲
লবণ	১৭০০	৯৲
জীমু খাস চৌকান (২)	২০০	১৬৲
মেজ তিব্বতী	১॥০	৬০৲
কাঁচা উল (পশুলোম)	৯৩২৯॥০	৪০৲
চামর পুচ্ছ	১০ মণ	৪০৲
কম্বল (নাগপুরী)	৬৯২টি	মোটদাম—২৯৬০৯৲

(১) একপ্রকার মূল, মসলার মত তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। তিব্বতেই উৎপন্ন।

(২) একপ্রকার তৃণ যাহার গন্ধ পলাণ্ডুর ন্যায়, তরকারীতে ফোড়ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাও তিব্বতে উৎপন্ন।

মাল	কত মণ	মোট দাম
ভালুপিত (ভল্লুকের পিত্ত)	১॥০	৬২০০৲
মৃগনাভি কস্তুরী	তোলা ২৪৲ হিঃ	৩২৪০০০৲
ছোট মৃগচর্ম্মাদি	১২০০টি	২৬১৬৲
বড় চামর ও ব্যাঘ্র চর্ম্মাদি	১০০টি	৫০০০৲
ঘোড়া	২০টি	২২০০৲
ঝাব্বু	২০টি	১৫০০৲
ভেড়-বকরী	৩৬৫৭টি	১৬৮০০৲
বাজ (পাখী)	৯টি	৪৯০৲
শিলাজিৎ		১৫০০৲
ইত্যাদি		

এইবার আমাদের কথা একটু বলি।

গাঁওসেরায় মাল আনার অশেষ দুর্গতি। প্রথমদিনেও মাল আসিল না। দ্বিতীয় দিনে বৈকালে আসিল। পাইবামাত্রই খুলিয়া দেখিলাম সব ঠিক আছে। এবারে আমরা নগদ মূল্যেই কুলির ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। এই যাত্রায় আমাদের যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান সহায় হইয়াছিলেন তাঁহাকে এইখানেই পাইলাম।

নাম তাঁহার লালসিং পাতিয়াল। তিনি উপর

লাল সিং পাতিয়াল

হিমালয়স্থ একজন প্রসিদ্ধ ভোটিয়া মহাজন। চৌদাসের অন্তর্গত তিজ্বা গ্রামে তাঁহার নিবাস, এই ধারচুলায় একখানি বড় দোকান আছে যাহা বারমাসই চলে আর প্রতি বৎসরেই আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ হইতে কার্ত্তিকের শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত তিব্বতে তাক্‌লাখার মণ্ডিতে কারবার চলে। কার্ত্তিকের শেষে কারবার গুটাইয়া নীচে চলিয়া আসিতে হয়। এখন লালসিং পাতিয়াল এইখানেই আছেন, মালামাল সংগ্রহ ও যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। আস্‌কোটে রাজওয়াড়া হইতে তাঁহার নামে খৎ ছিল, তাহার দ্বারাই পরিচয় হইল। লোকমণিজীও আমাদের জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বলিয়া দেওয়ার ফলে তাঁহার সহিত আমাদের বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়াছিল। তিনি নিত্যই দুই চারিবার লোকমণিজীর স্থানে আসিতেন, তাঁহাকে গুরু সম্বোধন করিতেন। তাঁহার দোকান এবং বাসস্থান পার্শ্বেই, একখানা ঘর পরই।

এই ভোটিয়া মহাজন যারা তিব্বতে ব্যবসায় উপলক্ষে যাতায়াত করে তাহারা নেপালী, হিন্দী ও তিব্বতী এই তিনটি ভাষা ভাল জানে। লালসিং জানাইল যে, আপনারা কিছু আগে আসিয়া পড়িয়াছেন। এখান হইতে গারবেয়াং যাইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ তিব্বতের কর্ত্তৃপক্ষ পথ খুলিয়া না দিলে ত যাওয়া হইবে না। এ দিকে অসুখ বিসুখ থাকিতে তাঁরা পথ খুলিবেন না, এখন এদিকে 'বীমারী' চলিতেছে। পাছে এখানকার রোগ ওদিকে যাইয়া মহামারী উপস্থিত হয়, সেজন্য তাঁহারা বিশেষ সংবাদ না পাইলে ওদেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তবে সেজন্য আপনাদের চিন্তা নাই গারবেয়াং এ আমার মাসি "রূমা দেবী" আছেন, আপনারা তাঁহার আশ্রয়ে সুখে কিছু দিন থাকিবেন, কোন কষ্ট হইবে না। তাঁহার সাধুসজ্জন ও অতিথি সেবা এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

গারবেয়াংএ জুনিয়া সিং নামক একজন অবস্থাপন্ন ভোটিয়া সওদাগর চারিটি কন্যা রাখিয়া একদিনে স্ত্রীপুরুষে "হৈজাকী বীমারী" তে মারা যায়। রূমা তাহাদের কনিষ্ঠা কন্যা, শৈশবেই পিতৃমাতৃহীনা। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তিনটি বিবাহিতা ছিল, রূমাকে তাহারাই মানুষ করে এবং পনর বৎসরের সময় তাহার বিবাহ দেয়। তাহার স্বামী দুর্দ্দান্ত মাতাল এবং দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলিয়া তাহার সহিত প্রথম হইতেই ভালবাসা জন্মে নাই। রূমা পিত্রালয়েই থাকিত। যাইতে চাহিত না, তাহাতে সে পুনরায় বিবাহ করে। সেই অবধি রূমা

নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে নীচপ্রকৃতি দুষ্ট লোকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া লোকমণিজীর শরণাপন্ন হয়। তিনি তাহাকে ভগবানের নাম ও সাধুসেবা করিতে উপদেশ দেন। সে ব্যবসায়ীর কন্যা, ব্যবসায় বোঝে। কিছুদিন মৃগনাভির ব্যবসায় চালাইয়াছিল, কিন্তু অনেকে এই সূত্রে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করে। স্বাধীনভাবে থাকাই তাহার অভ্যাস, ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় তাহার ভগিনীরা তাহাকে আর কারবার না করিয়া বাপের ঘরেই থাকিতে বলে। সেই অবধি সে সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সাধুসঙ্গে পূজা-উপাসনায় জীবন কাটাইতেছে।

সঙ্গী-মহাশয় যখন বুঝিলেন যে, লালসিং পাতিয়ালের সাহায্যই আমাদের বেশী ভরসা তখন নিভৃতে ঘরের মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া সঙ্গে যে পঞ্চাশটি টাকা নগদ ছিল তাহা গচ্ছিতস্বরূপ তাহার কাছে রাখিয়া দিলেন, বলিলেন, "এ টাকাটা আপনার কাছেই থাকুক, যখন তিব্বতে যাইবেন লইয়া যাইবেন, কারণ ওদিকে ত আপনাদের কাছেই যাইতে হইবে, তখনই টাকাটা লওয়া যাইবে। এদিকে আমাদের এখন এত টাকার প্রয়োজন নাই।" পরে সে ব্যক্তি স্বীকার করিয়া মুদ্রাগুলি গণিয়া পকেটে রাখিয়া খৈনি তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে আমাদের গরম কাপড়-চোপড় কিরূপ আছে দেখিয়া বলিলেন, "ওখানকার শীতে এই সামান্য জিনিষে হইবে না, গারবেয়াংএ রূমার নিকট হইতে আরও কিছু সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন," বলিয়া আজকের মত "রাম রাম" করিয়া বিদায় লইলেন। তখন সঙ্গী-মহাশয় আমায় বলিলেন "আঃ বাঁচা গেল, ঐ পঞ্চাশটী টাকার বোঝা আমায় পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল, সামলাইতে কষ্ট হইতেছিল, আধসের তিনপো একটা ভার অনবরত শরীরের সঙ্গে। আমি আশ্চর্য্য মানি তুমি যে কি করিয়া তোমার ঐ রেজকীর বোঝাটি ম্যানেজ করিতেছ, কখনও তোমায় অসামাল হইতে দেখিলাম না, যেন তোমার সঙ্গে কিছুই নাই।" মনে মনে হাসিলাম, বলিলাম, "অন্তরাত্মাই জানেন কি ভাবে সামলাইতেছি।"

যাহা হউক পরদিন প্রাতে "তীর্থযাত্রা সফল হউক" এই কামনা করিয়া লালসিং পাতিয়াল ও লোকমণিজী আমাদের বিদায় দিলেন। আমরা এই যে দুইটি বন্ধু পাইলাম যাত্রাশেষ পর্য্যন্ত ইহাদের সাহায্য পাইয়াছিলাম। আমরা এখন খেলার দিকে যাত্রা করিলাম, এখান হইতে নয় মাইল।

এই পথে দুইটি প্রবল এবং বিস্তৃত, আর ছোট ছোট দুই তিনটি ঝরণা পাইয়াছিলাম, সকলগুলিই কালীগঙ্গায় মিশিয়াছে। সেই সঙ্গম দেখিবার বস্তু। সে গর্জ্জন কর্ণগোচর হইলে অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রেরণা আনে, তাহার সঙ্গে সেই চঞ্চল জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য মিলিয়া গভীর আনন্দ-রসে প্রাণকে আকুলতার পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যে স্থির করিয়া দেয় যাহা রূপময়ের মহিমার আভাস তাহা দেশ ও কালের জ্ঞানবিহীন জীবন দিয়াই ভোগ করিতে হয়।

খেলায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেকটা চড়াই আছে, প্রায় এক মাইল হইবে। যে পর্ব্বতটির উচ্চ শিখরদেশে খেলা গ্রাম, তাহার নিম্নে পাদমূলে কালীনদী উত্তরে বাঁকিয়া গিয়াছে, আর নৈঋত কোণ হইতে ধৌলী আসিয়া মিলিয়াছে সেই সঙ্গম অপূর্ব্ব, যেন গঙ্গা-যমুনার মিলনের মত। এই খেলা হইতে দারমা বা মিলাম হইয়া উটাধুরা গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়াও যায়, তবে সেদিকে মানস সরোবর ও কৈলাস নয়।

অদৃষ্টক্রমে ডিষ্ট্রিকবোর্ডের একজন ওভারসিয়ার কর্ম্মোপলক্ষে খেলার পুরাতন ডাকঘরে আড্ডা করিয়াছিলেন। আমাদের বহুদূর হইতে আগত এবং কৈলাস-যাত্রী জানিয়া পরম আদরে অতিথি হইবার নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহা আমরা, ভগবানেরই কৃপা মনে করিয়া আনন্দে গ্রহণ করিলাম। সেই সহৃদয় ভদ্রব্যক্তি আলমোড়া-নিবাসী।

খেলায় আমরা একদিন ও একরাত্রি ছিলাম। এই খেলা অবধি আসকোট রাজওয়াড়ার জমিদারী বা রাজ্য। এখানে একটি পোষ্টাপিসও আছে। হিন্দু বলিতে যে জাতিটি বুঝায় তাহা এই খেলা অবধি আছে, তাহার উপরে আর হিন্দু নাই। উপরে যাহারা থাকে তাহাদিগকে

এই হিন্দুরা "ভোটিয়া" বলে। ধৌলীর ও-পার হইতেই ভোটিয়া পরগণা।

খেলাতে দেখিলাম, এ দিকের স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা সকল, যতগুলি চক্ষের সম্মুখে আসিয়াছে, সকলেই দুর্ব্বল। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বড়ই গরীব। খুব রোগেরও প্রাদুর্ভাব, বিশেষতঃ গলগণ্ড রোগটা সেই বালুয়াকোট হইতেই দেখিতেছি। উহা জলের দোষেই হয় বলিয়াই শুনিয়াছি। ধান ও গম, ডাল, কড়াই এখানে হয়, কিছু সামান্য ফলমূলও হয়। গরীব শ্রমজীবী যাহারা, তাহাদের পুরুষেরা কৌপীন পরে, আর স্ত্রীলোকেরা বক্ষে একপ্রস্থ কাপড় জড়াইয়া পৃষ্ঠে গাঁট

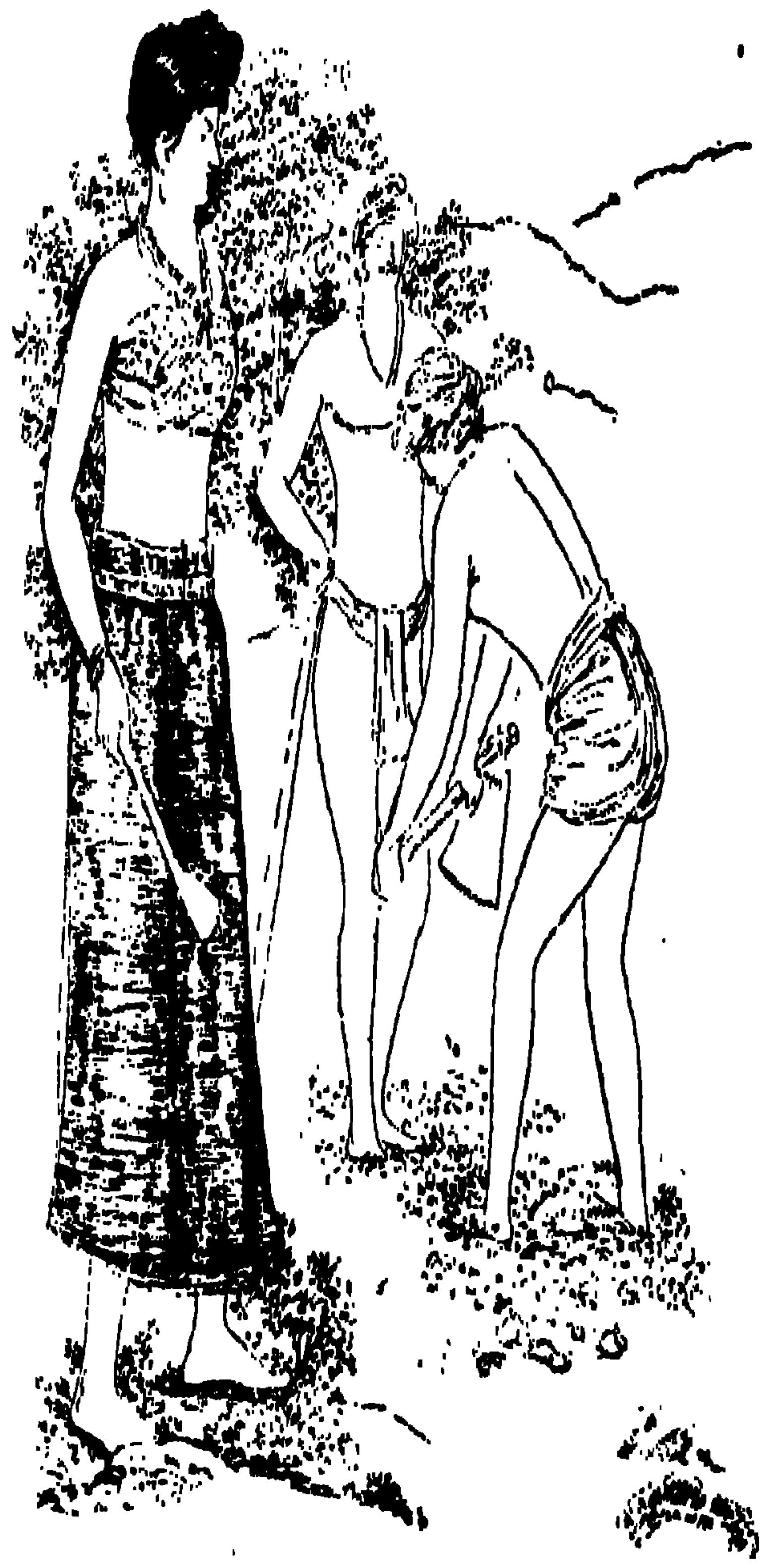

খেলার শ্রমজীবী

বাঁধে আর কটিদেশে কাল কম্বল জড়াইয়া, তাহাতে কোমরবন্ধ বা পটি আঁটে। স্ত্রী-মূর্ত্তিগুলি এদিকের কুশ্রী নয়, দারিদ্র্যদোষেই কেবল লাবণ্যহীনা। বাঙ্গলা দেশে শস্যোৎপন্নকারী চাষাদের যে কষ্ট, যে দরিদ্রতা, এদিকে সব ঠিক সেই মতই; পার্থক্যের মধ্যে আমাদের দেশে বিলাসিতা বা বিলাসদ্রব্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ দিকে সে সকলের লেশমাত্র নাই।

ওভারসিয়ার মহাশয় বলিয়া দিলেন যে, আপনারা যত শীঘ্র পারেন এদিক হইতে চলিয়া যান, কারণ মধ্যপথে, এখান হইতে তিন পড়াও পরে একটি সেতু আছে সেই সেতুটি পার হইতে হইবে। এই সময়ই জলস্রোত বাড়িয়া পুলটি ভাঙ্গিয়া যায়। যদি ভাঙ্গে তাহা হইলে পাঁচ মাইলের ফেরে পড়িতে হইবে। কারণ পুল ভাঙ্গিলে সে পথ ছাড়া আর গতি নাই। তাহাতে চারি মাইল ব্যাপী এক বিশাল চড়াই তাহা ছাড়া সে রাস্তায় কোথাও জল নাই সেইজন্য তাহাকে "নির্পানীকী সড়ক" বলে। যদি উপরে বৃষ্টি বেশী হয় তাহা হইলেও জলস্রোত বাড়িয়া পুল টুটিবে, আর যদি খররৌদ্র হয় তাহা হইলেও বেশী বরফ গলিয়া স্রোত বাড়িবে এবং পুল টুটিবে। এখান হইতে পাঙ্গুতে দিয়া শোঁসা চৌদাস, তাহার পর সাং খোলা, তাহার পর মালপার পথে সেই পুল। সুতরাং আমাদের ত্বরা করাই কর্ত্তব্য।

আমরা পরদিন প্রভাতেই খেলা হইতে নামিয়া, ধৌলী গঙ্গার পুলটি পার হইয়া ভোটিয়া পরগণার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই পাঙ্গুতে পদার্পণ করিলাম।

বলিতে হইবে না আমরা ওভারসিয়ার মহাশয়ের অতিথিসৎকারে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

ব্যবধান*

থিয়োডোর ষ্টর্ম

বৃদ্ধ

শরৎকালের শেষে এক বৃদ্ধ একদিন রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন; তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ সম্ভ্রান্ত লোকেরই মত। মনে হইতেছিল তিনি বেড়াইয়া এইমাত্র বাড়ী ফিরিতেছেন, কারণ তাঁহার পায়ের সেই পুরাণধরণের জুতার উপর ধূলাবালি লাগিয়াছিল। সোনায় মাথা বাঁধান লম্বা ছড়িটি বগলে পুরিয়া লইয়াছেন। তুষারধবল ভ্রূর নীচে তাঁহার কালো চোখের অদ্ভুত দীপ্তি! সমস্ত বিগত যৌবন যেন তাহাতে সঞ্চিত হইয়া আছে। তিনি ছোট্ট শহরটির এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যার মন্দ বাতাসে তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে।

বৃদ্ধটিকে এক রকম বিদেশী বলিয়াই বোধ হইতেছিল, কারণ পথযাত্রীদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছিল না; অনেকেই কিন্তু অজ্ঞাতসারেই তাঁহার গভীর কালো চোখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারিতেছিল না। ক্রমে বৃদ্ধ একটি উঁচু বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিলেন, আর একবার ফিরিয়া তাকাইয়া সমস্ত শহরটি দেখিয়া লইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। দরজার ঘণ্টায় শব্দ করিতেই ঘরের ভিতর হইতে একটি সবুজ পর্দ্দা সরিয়া গেল এবং ছিদ্রপথে একটি বর্ষীয়সী মহিলার মুখ দৃষ্টিগোচর হইল। বৃদ্ধ ছড়িটি তুলিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন আর বলিলেন, "এখনও আলো দেওয়া হয় নি?" উচ্চারণে বুঝা গেল বৃদ্ধ দক্ষিণ দেশের লোক।

গৃহকর্ত্রী পর্দ্দা ফেলিয়া দিলেন। বৃদ্ধ প্রকাণ্ড উঠানটি অতিক্রম করিয়া একটি স্থানে গিয়া পড়িলেন, সেখানে দেওয়ালের গায়ে তাকের উপর সুন্দর সব চীনামাটির ফুলদানি। সামনের দরজা পার হইয়া ক্রমে তিনি সরু একটি সিঁড়ির নীচে আসিয়া পড়িলেন; বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন; তারপর দরজা ঠেলিয়া প্রকাণ্ড একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। এখানে সমস্ত শান্ত, নিস্তব্ধ। একদিককার দেওয়ালের গা নানা প্রকার মূল্যবান জিনিষ আর বইয়ের তাকে ভরা; আর এক দিকের দেওয়ালে মানুষের প্রতিকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। সবুজ কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিলের উপর একখানা খোলা বই পড়িয়া আছে, তাহার পাশেই ইজি চেয়ার, তাহাতে লাল মখ্‌মলের গদি পাতা।

বৃদ্ধ টুপি ও ছড়ি রাখিয়া ইজিচেয়ারে আসিয়া বসিলেন, বোধ হয় শ্রান্তি দূর করিবার জন্য। আরও অন্ধকার হইয়া আসিল। চাঁদের একটি কিরণ-রেখা জানালার সার্সি দিয়া দেওয়ালের ছবির উপর আসিয়া পড়িল। উজ্জ্বল রশ্মিটি ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিল এবং বৃদ্ধের দুইটি চক্ষু তাঁহার অজ্ঞাতসারেই রশ্মিটির অনুসরণ করিতে লাগিল। রশ্মিটি কালো ফ্রেমে আঁটা একটি ক্ষুদ্র ছবির উপর আসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এলিজাবেথ"। বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কালের গতি পরিবর্ত্তিত হইল,—বৃদ্ধ আবার তাঁহার শৈশবে ফিরিয়া আসিলেন।

শিশু

সুন্দর একটি ছোট মেয়ে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল মেয়েটির নাম এলিজাবেথ, তাহার বয়স বছর পাঁচেক, আর এই অধুনা-বৃদ্ধ শিশুটির বয়স তখন বড় জোর তাহার দ্বিগুণ। মেয়েটির গলায় রাঙা একটি রেশমের রুমাল জড়ানো—তাহার কটা চোখ ও সেই লাল রেশম বড়ই সুন্দর মানাইয়াছিল।

মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে বলিল, "রাইন্‌হার্ট, আজ আমাদের ছুটি, ছুটি। সমস্ত দিন আজ ইস্কুল নেই, কালও নেই।"

রাইন্‌হার্ট শ্লেট আগেই বগলে পুরিয়াছিল, এবার

* মূল জার্মাণ হইতে শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।

ক্ষিপ্রহস্তে সেটি সদর দরজা ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল; তারপর দুইজনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ী পার হইয়া বাগানে ঢুকিল, এবং বাগানেরও গেট খুলিয়া ক্রমে বিস্তীর্ণ মাঠে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ আজ এই ছুটি হইয়া যাওয়াতে তাহাদের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। রাইন্‌হার্ট এলিজাবেথের সাহায্যে মাঠে ঘাসের চাপড়া দিয়া একটি ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যায় এইখানে বসিয়া তাহারা গল্প-সল্প করিবে এই আশায়। শুধু একটি বেঞ্চি প্রস্তুত করা এখনও বাকি। রাইন্‌হার্ট তখনই কাজে লাগিয়া গেল—দরকারী পেরেক, কাঠ, যন্ত্রপাতি, সবই সেখানে ছিল। এলিজাবেথ এদিকে দেওয়ালের ধারে ধারে ফুল তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল, উদ্দেশ্য মালা গাঁথিবে। রাইন্‌হার্টের অনেকগুলি পেরেকই বাঁকিয়া গেল, অবশেষে একটি বেঞ্চি খাড়া হইল। তখন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল এলিজাবেথ ফুল তুলিতে তুলিতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। রাইন্‌হার্ট তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে তাহার কোঁচড়-ভরা ফুল লইয়া ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল।

রাইন্‌হার্ট বলিল, "দেখ আমাদের ঘর সব ঠিক হয়ে গেছে। ইস্, তোমার যে ঘাম পড়্‌চে দেখ্‌চি। এস ভেতরে বেঞ্চিতে গিয়ে বসা যাক্। আমি তোমায় একটা গল্প বল্‌ব এখন।"

দুইজনে বেঞ্চির উপর বসিল। এলিজাবেথ কোঁচড় হইতে ফুল বাহির করিয়া দীর্ঘ সূতায় তাহা গাঁথিতে লাগিল। রাইন্‌হার্ট বলিতে লাগিল, "এক সময় একদেশে তিনটি বোন ছিল, তাদের কারুরই বিয়ে হয় নি..."

এলিজাবেথ বলিয়া উঠিল, "আঃ, ও ত আমি জানি, শুনে শুনে একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে, কেবল সেই একই গল্প বল কেন?"

রাইন্‌হার্টকে তখন অগত্যা তিন বোনের গল্প বাদ দিয়া সিংহ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির গল্প আরম্ভ করিতে হইল।

সে বলিতে লাগিল, "তখন রাত হয়েচে, বুঝলে তো? ভয়ানক অন্ধকার, চারিদিকে সিংহেরা সব ঘুমুচ্চে। থেকে থেকে আবার তারা ঘুমের মধ্যেই হাই তুলচে আর তাদের রক্তমাখান জিব বার কচ্চে। লোকটির গা শিউরে উঠতে লাগল আর সে খালি ভাব্‌তে লাগ্‌ল কখন সকাল হয়। এমন সময় হঠাৎ সে তার চারিদিকে একটা তীব্র জ্যোতি দেখতে পেলে, চোখ তুলে সে সামনে দেখতে পেলে একটি পরী। তিনি তাকে হাত নেড়ে ইসারা করেই আবার পাহাড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেলেন।"

এলিজাবেথ একমনে শুনিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল "পরী? তার ডানা ছিল?"

রাইন্‌হার্ট বলিল, "এ তো কেবল একটা গল্প, পরী-টরী আসলে কিছু নেই।"

এলিজাবেথ বলিল, "ছি রাইন্‌হার্ট!" বলিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। রাইন্‌হার্ট কিন্তু নির্ম্মম কঠিন হইয়া রহিল দেখিয়া দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে এলিজাবেথ বলিল, "তবে তারা কেন সব্বাই পরীর কথা বলে? মা বলেন, মাসিমা বলেন, ইস্কুলেও তো তাদের কথা বলে!"

রাইন্‌হার্ট উত্তর করিল, "সে সব আমি জানিনে।"

এলিজাবেথ প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তবে কি তুমি বল সিংহও নেই?"

"সিংহ? সিংহ আছে কি না? ভারতবর্ষে আছে। সেখানে পুরুতরা সব দেবমূর্ত্তি রথে চড়িয়ে সেই রথ সিংহ দিয়ে টানায়, এই রকম ক'রে তারা কত মরুভূমি পার হয়। আমি বড় হয়ে নিজেই একবার সেখানে যাব। সেদেশ এখানকার চেয়ে হাজার হাজার গুণ সুন্দর। সেখানে শীতকাল নেই। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। যাবে তো?"

এলিজাবেথ বলিল, "হ্যাঁ যাব, কিন্তু আমার মাকেও সঙ্গে যেতে হবে, তোমার মাকেও।"

রাইন্‌হার্ট বলিল, "না, তারা তখন বড্ড বুড়ো হয়ে যাবে; তারা আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না।"

"আমায় একলা কি যেতে দেবে?"

"হ্যাঁ, খুব দেবে; আমার সঙ্গে তখন তোমার বিয়ে হয়ে যাবে, কেউ আর তখন তোমার উপর হুকুম চালাতে পারবে না।"

"কিন্তু আমার মা যে কাঁদবে।"

রাইন্‌হার্ট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমরা তো আবার ফিরে আসবো! সোজাসুজি ব'লে দাও বাপু তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না? যদি না যাও আমি একলাই যাব, আর কখ্‌খন ফিরে আসবো না।" বালিকা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "না তুমি অত রেগো না; আচ্ছা আমি তোমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাব।"

রাইন্‌হার্ট অমনি আনন্দে অধীর হইয়া তাহার দুইহাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া মাঠে লইয়া আসিল এবং "ভারত-বর্ষ ভারতবর্ষ" বলিয়া এমনই চীৎকার ও লম্ফঝম্প করিতে লাগিল যে বালিকার গলা হইতে সেই রঙীন রুমালখানি খসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া রাইন্‌হার্ট সহসা এলিজাবেথের হাত ছাড়িয়া দিয়া কঠিন হইয়া বলিল, "নাঃ, তোমায় নিয়ে কিছু হবে না; তোমার সাহসই নেই!"

বাগানের গেট হইতে কে ডাকিল, "এলিজাবেথ, রাইন্‌হার্ট!" শিশু দুইটি "যাই যাই" বলিয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া বাড়ীর দিকে দৌড়িল।

বনে

এইরূপে শিশু দুইটি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। রাইন্‌-হার্টের কখনো মনে হইত এলিজাবেথটা বড়ই নির্জ্জীব, আর এলিজাবেথের কখনো কখনো মনে হইত রাইন্‌-হার্টের দাপাদাপিটা বড়ই বেশী; কিন্তু তবুও পরস্পরের মধ্যে কখন ছাড়াছাড়ি হয় নাই। যেটুকু সময় তাহারা ছুটি পাইত তাহার সবটাই প্রায় পরস্পরের সঙ্গে কাটাইত। শীতের সময় মায়ের ছোট্ট ঘরটিতেই তাহারা খেলাধূলা করিত, গ্রীষ্মে ঝোপে-ঝাড়ে, মাঠে মাঠে তাহাদের ছুটাছুটির সীমা থাকিত না।

রাইন্‌হার্টে্‌র সামনেই ইস্কুলে পণ্ডিত মহাশয় এলিজাবেথকে একবার খুব বকুনি দেন; রাইন্‌হার্ট্‌ অমনি সশব্দে তাহার শ্লেট টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিল—পণ্ডিতের রাগ যাহাতে তাহারই উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু পণ্ডিত সেদিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। রাইন্‌হার্ট ভূগোলের পড়া ভুলিয়া এক দীর্ঘ কবিতা লিখিতে বসিল; তাহাতে রাইন্‌হার্ট নিজে হইল ঈগল পাখীর ছানা, পণ্ডিত হইলেন কাক এবং এলিজাবেথ হইল সাদা পায়রা; নিরীহ পায়রার উপর দুষ্ট কাক অত্যাচার করিতেছে বলিয়া ঈগল ছানার পাখা উঠিতেই তাহার প্রতিহিংসা লইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছে। কবিতাটি নিজে পড়িয়া বালককবির এত ভাল লাগিল যে, তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিয়া মোটা দেখিয়া একটি খাতা জোগাড় করিয়া তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় রাইন্‌হার্ট সম্বন্ধে তাহার প্রথম কবিতা লিখিয়া রাখিল।

অল্পদিন পরেই রাইন্‌হার্ট্‌ অন্য ইস্কুলে চলিয়া গেল, সেখানে সমবয়সী অনেক ছেলের সহিত তাহার আলাপ হইল, কিন্তু এলিজাবেথের সঙ্গে মেলামেশা কিছুতেই বন্ধ হইল না। এলিজাবেথকে রাইন্‌হার্ট যে সমস্ত গল্প বার বার বলিত এইবার সে সেগুলি লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে তাহার ইচ্ছা করিত নিজের কল্পনাও কিছু সে ইহার মধ্যে ঢুকায়, কিন্তু কিছুতেই তাহা হইত না, কেন যে তাহাও সে বুঝিতে পারিত না। অগত্যা নিজে যে-গল্পগুলি যেমন শুনিয়াছিল তেমনিই লিখিয়া রাখিত, লিখিয়া সেগুলি এলিজাবেথের হাতে দিত, সে আবার এই কাগজগুলি ইস্কুল ব্যাগের মধ্যে আলাদা একটু স্থান করিয়া রাখিয়া দিত। মধ্যে মধ্যে এলিজাবেথ এই গল্পগুলি তাহার মায়ের নিকট পড়িয়া শুনাইত, তাহা দেখিয়া রাইন্‌হার্টের আনন্দের আর সীমা থাকিত না।

দীর্ঘ সাতটি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। রাইন্‌হার্টকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতে হইবে। এলিজাবেথ ভাবিয়া পাইল না রাইন্‌হার্ট না থাকিলে কিরূপে তাহার সময় কাটিবে। রাইন্‌হার্ট বিদেশে গিয়াও তাহার জন্য গল্প লিখিবে বলাতে এলিজাবেথ কতকটা আশ্বস্ত হইল; ঠিক হইল রাইন্‌হার্ট্‌ যখন তাহার মাকে চিঠি দিবে সেইসঙ্গে সে এলিজাবেথের জন্য গল্পও পাঠাইবে এবং পরে এলিজাবেথ তাহাকে লিখিয়া পাঠাইবে গল্পগুলি তাহার কিরূপ লাগিয়াছে। যাওয়ার দিন ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রাইন্‌হার্টের সেই কবিতার খাতায় অনেক নূতন কবিতা স্থান পাইল। এই কবিতার খাতাটিই কেবল এলিজাবেথের নিকট

গোপন ছিল, যদিও এলিজাবেথের উদ্দেশেই সমস্ত কবিতা লেখা এবং সেইরূপ কবিতাতেই খাতাটির প্রায় আধাআধি ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছিল।

তখন জুন মাস। পরের দিনই রাইন্‌হার্টকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইবে। এই উপলক্ষ্যে সকলে একটা প্রীতিভোজের প্রস্তাব করিলেন; অনেক লোক মিলিয়া নিকটেই একটা বনে গিয়া চড়াইভাতি করিবার বন্দোবস্ত করা হইল। গাড়ী ঘণ্টাখানেক চলিতেই বনের প্রান্তে আসিয়া পড়িল। তখন সকলে খাবারের ঝুড়ি কাঁধে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমেই একটা 'ফার' গাছের বন পার হইতে হইল—সমস্ত বনটা আধ-অন্ধকারে ঢাকা, মাটিতে সর্ব্বত্র সরু তীক্ষ্ণ কাঁটা। বনের ভিতর ঢুকিলে কেমন শীত শীত করে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বন অতিক্রম করিয়া সকলে নবীন 'বীচ' গাছের জঙ্গলে প্রবেশ করিল। এখানে গাছের পাতার রং উজ্জ্বল সবুজ, মাঝে মাঝে এক একটি সূর্য্যরশ্মি পত্রাবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের অন্ধকারের বুকে ছুরিকা হানিতেছে। একটি বনবিড়াল সকলের মাথার উপর এডাল-ওডাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কতকগুলি প্রাচীন বিশাল বীচগাছের নীচে সকলে থামিল। এলিজাবেথের মা একটি খাবারের ঝুড়ি খুলিলেন এবং একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক খাদ্য ভাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমেই বলিলেন 'এই দুষ্টুর দল, সবাই আমার কাছে এস, আর মন দিয়ে শোন কি বলি। সকালে খাবার জন্যে তোমরা প্রত্যেকে দুটি ক'রে শুক্‌নো রুটি পাবে; মাখন আনা হয়নি, বাড়ীতেই পড়ে আছে, কাজেই রুটির সঙ্গে যা খাবার তা তোমাদের নিজেদেরই জোগাড় ক'রে নিতে হবে। এই বনে নানা রকম ফল আছে, যে চেষ্টা করবে সেইই তা পেতে পারবে, আর যে পারবে না তাকে শুক্‌নো রুটিই খেতে হবে। জীবনটাই এই রকম, বুঝলে? আমার কথা বুঝ্‌তে পেরেছ তোমরা?"

ছেলেমেয়েরা বলিয়া উঠিল, "পেরেছি।"

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা দেখ, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। আমরা বুড়ো মানুষ, পৃথিবীতে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। আমরা এখানেই থেকে আলুছাড়ান, আগুন তৈরী করা, বস্‌বার জায়গা করা এইসব কাজ করব; বারোটা বাজলেই ডিমটিমগুলোও সেদ্ধ করা হবে। তোমরা যা ফলটল্ সংগ্রহ করবে তার অর্দ্ধেক কিন্তু আমাদের দিতে হবে আমাদের কাজের বদলে। যাও, এইবার তোমরা সবাই ছড়িয়ে পড়, যে যার দিকে, আর সবাই ভাল ভাবে কাজ করো।"

এই কথা শুনিয়া ছেলেমেয়েরা সকলে নানা রকম মুখভঙ্গী করিতে লাগিল, যেন প্রস্তাবটা তাহাদের ভাল লাগিল না। এমন সময় বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "থাম, আর একটা কথা। তোমরা ত বুঝতেই পারচো যে, যে কিছু ফল সংগ্রহ করতে পারবে না তাকে দিতেও হবে না, কিন্তু এটাও যেন মনে থাকে আমাদের কিছু না দিলে আমাদের কাছ থেকে কিছু পাবেও না তোমরা। আচ্ছা, আজ তোমরা ঢের উপদেশ পেলে; এইবার ফলটল্ জোগাড় করতে পার্‌লেই তোমাদের দিনটা আজ পূর্ণ হয় জান্‌বে।" ছেলেমেয়েরাও তাহাই চায়; তাহারা দু'জন দু'জন করিয়া এক একদিকে বাহির হইয়া পড়িল।

রাইন্‌হার্ট বলিল, "এস এলিজাবেথ, আমার ওদিকে একটা ফলের গাছের ঝাড় জানা আছে; তোমার আর শুক্‌নো রুটি খেতে হ'বে না।"

এলিজাবেথ তাহার টুপির সবুজ ফিতা বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল, তারপর রাইন্‌হার্টের হাতে হেলান দিয়া বলিল, "তাই চল। আমার টুক্‌রি ঠিক করাই আছে।"

ক্রমেই তাহারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঠাণ্ডা দুর্ভেদ্য গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল, সেখানে সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ ও অন্ধকার। থাকিয়া থাকিয়া কেবল মাথার উপর শিকারী পাখীর কর্কশ কণ্ঠ শুনা যাইতেছিল। কোথাও আগাছা এত ঘন হইয়া উঠিয়াছে যে, রাইন্‌হার্টকে আগে যাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইতেছিল। হঠাৎ রাইন্‌হার্ট শুনিল পিছন হইতে এলিজাবেথ তাহাকে ডাকিতেছে। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। "রাইন্‌হার্ট, দাঁড়াও, রাইন্‌হার্ট!" রাইন্‌হার্ট বুঝিতে পারিল না কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। খানিক পরে দেখিতে পাইল দূরে কাঁটাজঙ্গলে আবদ্ধ হইয়া এলিজাবেথ চীৎকার করিতেছে। তাহার [illegible]

সবটুকুই প্রায় গাছপালায় ঢাকিয়া গিয়াছে। রাইন্‌হার্ট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ঝোপের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিল এবং সযত্নে তাহার উত্তপ্ত মুখের উপর হইতে বিপর্য্যস্ত চুলগুলি সরাইয়া দিল; সে তাহার টুপিও খুলিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু এলিজাবেথ প্রথমটা রাজী হইল না; আবার বলাতে কিন্তু সে রাইন্‌হার্টকে তাহার টুপি খুলিয়া লইতে দিল।

খানিকক্ষণ পরে এলিজাবেথ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার সেই ফলটল সব গেল কোথায়?"

রাইন্‌হার্ট বলিল, "এখানেই তো ছিল, বোধ হয় আমাদের আগেই কোন দুষ্টলোক তা' পেড়ে নিয়ে গেছে, নেউলেও খেয়ে যেতে পারে; কি জানি হয়ত পরীরা এসেছিল,—তা'ও অসম্ভব নয়।"

এলিজাবেথ বলিল, "হ্যাঁ, গাছের পাতাগুলো এখনও রয়েছে বটে, কিন্তু এখানে পরীর কথা আর বলো না। চল, আমি এখনও মোটেই ক্লান্ত হইনি, আর একটু খোঁজা যাক্।"

তাহাদের সামনেই একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছিল, তাহার অপর পারে আবার বন। রাইন্‌হার্ট এলিজাবেথকে হাতে ধরিয়া স্রোতস্বিনীটি পার করিয়া দিল। খানিক চলিতে চলিতে বনের ঘন ছায়া পার হইয়া তাহারা আবার একটি খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল। বালিকা বলিয়া উঠিল, "এখানে নিশ্চয়ই ফলের গাছ আছে; আঃ, কি মিষ্টি গন্ধ!" দুইজনে চারিদিক খুঁজিয়া দেখিল কিন্তু ফলের গাছ কোথাও দেখিতে পাইল না। রাইন্‌হার্ট বলিল, "না, ও কেবল ঐ আগাছা গুলো থেকে গন্ধ আসছে।"

চারিদিকে কেবল বুনো কাঁটাগাছের ঝোপ এবং তাহার মধ্যে আগাছাগুলি হইতে একটি তীব্র মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। খোলা জায়গাটির কতকটা ছোট ছোট ঘাসে ভরা, আবার কতকটা কেবল এইসব আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া এলিজাবেথ বলিয়া উঠিল, "এখানে বড় নির্জ্জন, দলের অন্যেরা সব গেল কোন্ দিকে?"

ফিরিবার কথা রাইন্‌হার্ট্ একবারও ভাবে নাই। "দাঁড়াও, দেখি বাতাসটা কোন্‌দিক থেকে আস্‌ছে" এই বলিয়া সে হাত উঁচু করিল। কিন্তু বাতাস নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

এলিজাবেথ বলিল, "চুপ্। আমি যেন শুন্‌লাম তা'রা কথা বল্‌ছে, ঐ দিকে একটা ডাক দিয়ে দেখত।"

রাইন্‌হার্ট্ দুই হাত এক করিয়া তাহার ফাঁক দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "এস এইদিকে...।"

উত্তর আসিল "এইদিকে...।"

এলিজাবেথ আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "তা'রা সাড়া দিচ্ছে।"

রাইন্‌হার্ট্ বলিল, "না ও কিছু নয়; ও কেবল প্রতিধ্বনি।"

এলিজাবেথের মনে ভয় হইল। সে রাইন্‌হার্টের হাত ধরিয়া বলিল, "আমার গা শিউরে উঠ্‌চে।" রাইন্‌হার্ট্ বলিল "ভয় কিসের? দেখচ না, জায়গাটি কি সুন্দর? ঐ ঝোপগুলোর মধ্যে বসো না! খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে তারপর ওদের খুঁজে নিলেই হবে।"

এলিজাবেথ প্রকাণ্ড একটি বীচ্ গাছের নীচে বসিয়া কান পাতিয়া চারিদিকের শব্দ শুনিতে লাগিল। রাইন্‌হার্ট্ কয়েক পা দূরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া নিস্তব্ধভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্য মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দ্বিপ্রহরের ভীষণ উত্তাপে তীব্র উজ্জ্বল রঙের সব পোকা ডানা মেলিয়া রৌদ্র কিরণে স্থিরভাবে পড়িয়া ছিল। তাহাদের চারিদিকে যেন একটা সূক্ষ্ম সঙ্গীতের স্রোত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দূরের বনের ভিতর হইতে কাঠ্‌ঠোক্‌রার আওয়াজ আসিতেছিল, আবার কখন অন্য বন্যপাখীর কর্কশ কণ্ঠ।

এলিজাবেথ বলিয়া উঠিল, "শুনছ, কিসের শব্দ হচ্ছে।"

রাইন্‌হার্ট্ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে?"

এলিজাবেথ বলিল, "আমাদের পিছনে। শুনতে পাচ্ছ না?—এখন যে ঠিক দুপুর হয়েছে।"

"তা'হলে আমাদের এই পিছন দিকেই

গাঁ। সোজা এইদিকে চলে গেলেই ত তা হলে ওদের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে?"

তাহারা ফিরিতে আরম্ভ করিল। ফল খোঁজার চেষ্টা অনেকক্ষণই তাহারা ত্যাগ করিয়াছিল, কারণ এলিজাবেথ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃক্ষশ্রেণী ভেদ করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর হাসির শব্দ শুনা গেল। তাহারা দেখিল যে, মাটির উপর একটি কাপড় পাতা এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণ ফল ঢালা রহিয়াছে। সেই বৃদ্ধটি একখণ্ড মাংসের উপর ছুরি চালাইতে চালাইতে এখনও ছেলেমেয়েদের নৈতিক উপদেশ দিয়া চলিয়াছেন।

রাইন্‌হার্ট্‌ ও এলিজাবেথকে বন হইতে বাহির হইতে দেখিয়াই ছোটরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই যে বাবুরা আসছেন!"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এদিকে এস দেখি, কোঁচড়ে কি আছে আর টুপিতেই কি রেখেচ। বল দেখি এখন তোমাদের কি জোগাড় হয়েচে?"

রাইন্‌হার্ট্‌ বলিল, "ক্ষুধা আর তৃষ্ণা।"

বৃদ্ধটি বলিলেন, "তাই যদি কেবল থাকে, তবে সে তোমাদের নিজের জন্যেই রাখতে হবে। জানই তো এখানে সার কথা! যে আয়েস ক'রে বেড়াবে তা'কে কিছুই খেতে দেওয়া হবে না।" বৃদ্ধের কপট ক্রোধ অবশ্য শীঘ্রই প্রশমিত হইল এবং তাহার পর যথারীতি সকলের ভোজন সমাধা হইয়া গেল।

এইরূপে দিনটি কাটিল। রাইন্‌হার্ট্‌ কিন্তু একটি নূতন জিনিষ পাইয়াছিল; তাহা ফল নয়, কিন্তু বনেই তার জন্ম। বাড়ী ফিরিয়া সে তাহার পুরাতন খাতায় লিখিল —

হেথা ঢালু পাহাড়ের বুকে
শুব্ধ বায়ু স্পন্দন-বিহীন,
বৃক্ষশাখা পড়িয়াছে ঝুঁকে
বালিকা বসিয়া উদাসীন।
ঊর্দ্ধে তার ঘন পত্র-শাখা,
বায়ু বহে নির্ম্মল মধুর,
নীল মাছি কাঁপাইয়া পাখা
তুলিতেছে গুণ্‌ গুণ্‌ সুর।
চিত্রার্পিত যেন বনভূমি,
বালিকা ব্যাকুল চোখে চায়,—
পিঙ্গল অলকদাম চুমি
দীপ্ত সূর্য্যরশ্মি ঠিকরায়।
অদূরে কোকিল উঠে ডাকি,
আমি ভাবি আপনার মনে,
সোনার বরণ দুটি আঁখি
বনরাণী এসেছে কি বনে?

এলিজাবেথকে যে সে কেবল আগ্‌লাইয়া বেড়াইত তাহা নহে; তাহার নবীন জীবনের যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ ছিল, সে সমস্তের বিকাশ সে এলিজাবেথের মধ্যেই দেখিতে পাইত।

সন্ধিক্ষণ

সেদিন খৃষ্টের জন্মদিনের উৎসব। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। রাইন্‌হার্ট্‌ ও অন্যান্য বিদ্যার্থীগণ "ক্লাবে" প্রকাণ্ড টেবিলের প্রান্তে একে একে আসন গ্রহণ করিতেছিল। দেয়ালের গায়ে আলোগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেশী লোক তখনও আসে নাই। খানসামারা থামে ঠেসান দিয়া অলসভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ঘরের এককোণে একটি বেহালা-বাদক বসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে বীণাবাদিনী একটি বালিকা। মেয়েটিকে দেখিলেই বুঝা যায় যে সে বেদিয়া বালিকা। কোলের উপর যন্ত্র রাখিয়া অন্যমনস্ক ভাবে সে একদিকে চাহিয়াছিল।

ছাত্রগণ টেবিলে বসিয়া একটি শ্যাম্পেনের বোতল ভাঙ্গিল। তাহাদের মধ্যে একটি জমিদারের ছেলে এক গ্লাস শ্যাম্পেন বেদিয়া বালিকাটিকে পান করিতে দিল। বালিকাটি কিন্তু একচুলও না নড়িয়া বলিয়া উঠিল, "নাঃ, ও ভাল লাগে না।"

ছাত্রটি একটি মুদ্রা তাহার কোলে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল "তবে গান কর!" বালিকা তাহার কালো চুলের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিল, বেহালা-বাদক ফিস ফিস্ করিয়া তাহার কানে কানে কথা বলিতে লাগিল,

কিন্তু সে হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বীণাটির উপর চিবুক রাখিয়া বলিল, "ওর জন্যে আমি গান করতে পারব না।"

রাইন্‌হার্ট্ গ্লাসটি লইয়া লাফাইয়া উঠিল এবং বালিকার সম্মুখে তাহা ধরিল।

বিদ্রোহের কণ্ঠে বালিকা বলিল, "কি চাও?"

রাইন্‌হার্ট্ বলিল, "আমি তোমার চোখ দুটি দেখতে চাই।"

বালিকা। "আমার চোখ দেখে তোমার কি হ'বে?"

রাইন্‌হার্ট্ দীপ্তচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "বুঝেচি, তোমার এ কপট চোখ।"

বালিকা গালের উপর হাত রাখিয়া বিশাল চক্ষে রাইন্‌হার্টকে দেখিতে লাগিল। রাইন্‌হার্ট্ শ্যাম্পেনের গ্লাস মুখে তুলিয়া বলিল, "তোমার ঐ সুন্দর কলুষমাপা চোখের উদ্দেশ্যে।"

বালিকা হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তভাবে হাসিয়া উঠিল; মাথা ঝাঁকা দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া রাইন্‌হার্টের হাত হইতে শ্যাম্পেনের গ্লাস লইয়া তাহার তীক্ষ্ণ কাল চক্ষু রাইন্‌হার্টের মুখের উপর স্থাপন করিল এবং ধীরে ধীরে তার শেষটুকু পান করিল। তারপর বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া গভীর আবেগময় স্বরে সে গাহিতে লাগিল—

আজিকে দেহে মোর ডেকেছে রূপ-বান,
কালিকে সে রূপের পাবে কি সন্ধান!
ক্ষণিক মায়া এই,
মিলাবে নিমিষেই,
আমারি একা তুমি জাগিছে অভিমান!
মরণ মাঝে মোর একেলা অভিযান।

বেহালাবাদক দ্রুতহস্তে তখনও বাজাইয়া চলিয়াছে। এমন সময় আর একটি ছাত্র দলে আসিয়া যোগ দিল। সে বলিল, "রাইন্‌হার্ট, আমি তোমায় ডেকে নিয়ে আসব মনে করেছিলুম, কিন্তু তুমি আগে বেরিয়ে পড়েচ; তোমার ঘরে যে এদিকে বড়দিনের উপহার এসে রয়েচে!"

রাইন্‌হার্ট। "বড়দিনের উপহার? কৈ, সে তো আর আমার আসে না?"

"আসে না কি রকম? তোমার ঘর থেকে কিরকম কেকের গন্ধ বেরুচ্চে।"

রাইন্‌হার্ট শ্যাম্পেনের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া টুপি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?"

রাইন্‌হার্ট। "এখনি ফিরে আসচি আবার।"

বালিকার ললাট কুঞ্চিত হইল। রাইন্‌হার্টের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "থাক, যেয়ো না," রাইন্‌হার্ট একবার দ্বিধা করিল; তারপর বলিল, "না, পারব না।" বালিকা উচ্চহাস্যে তাহাকে পদাঘাত করিয়া বলিল, "তবে যাও। তুমি অপদার্থ, তোমরা সকলেই সমান।"

বালিকা মুখ ফিরাইয়া লইবার পূর্ব্বেই রাইন্‌হার্ট ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; রাইন্‌হার্ট তাহার তপ্ত ললাটে তীক্ষ্ণ শীতের বাতাস অনুভব করিতে লাগিল। কোথাও জানালা দিয়া উৎসব-বৃক্ষের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, আবার কখন কখন ছোট ছেলেদের বাঁশী ও বাজনার আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। একদল ভিখারী বালক দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। বড় বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া তাহারা ভিতরের আনন্দ-কোলাহল শুনিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে এক একজন লোক তাহাদের তাড়াইয়া দিতেছিল। মাঝে মাঝে কোন বাড়ীর উঠান হইতে মেয়েদের গলায় ধর্ম্মসঙ্গীত শুনা যাইতেছিল। রাইন্‌হার্ট কিন্তু সে গান শুনিতেছিল না, সে দ্রুতপদে একরাস্তা হইতে আর একরাস্তায় চলিয়া যাইতেছিল।

যখন সে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। অধীরভাবে ছুটিয়া সে ঘরে ঢুকিল; ঘর খুলিতেই একটা মধুর গন্ধে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে আলো জালিয়া রাইন্‌হার্ট দেখিল টেবিলের উপর প্রকাণ্ড একটি বাণ্ডিল পড়িয়া রহিয়াছে; সেটি খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে বহুকালের চেনা নানা প্রকার সুগন্ধ মিষ্টান্ন বাহির হইয়া পড়িল। কতকগুলির উপর চিনি দিয়া তাহার নামের

প্রথম অক্ষর লেখা রহিয়াছে। আর একটি বাণ্ডিলে দেখিল রত রকম কাপড়চোপড়। সব শেষে পাইল তাহার মা ও এলিজাবেথের চিঠি। এলিজাবেথ লিখিয়াছে—

"মিঠায়ের উপর তোমার নামের আগুক্ষর দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে কে এগুলি তৈরী করিয়াছিল। সে-ই দস্তানাগুলি তোমার জন্ম বুনিয়াছে। এবার বড়দিনের সময় আমরা বড়ই একলা পড়িয়া গিয়াছি। মা তো সাড়ে ন'টার সময়েই তাঁহার চরকা তুলিয়া রাখেন; আর আমার কি রকম নিঃসঙ্গই যে লাগে! তুমি এখানে নেই। তাহার উপর আবার গত রবিবার তোমার দেওয়া সেই পাখীটাও মারা গিয়াছে। আমি তাতে খুব কাঁদিয়াছিলাম; কিন্তু আমি সেটাকে খাওয়ান দাওয়ান বেশ ভাল করিয়াই করাইতাম। দুপুর বেলায় তার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িলে পাখীটি প্রায়ই গান করিত। তুমি জান, পাখীটি খুব বেশী চেঁচাইতে আরম্ভ করিলে মা তাহার উপর একটা কাপড় ঢাকিয়া দিয়া তাহাকে চুপ করাইতেন। এখন আমরা একেবারেই একলা পড়িয়া গিয়াছি, কেবল মধ্যে মধ্যে তোমার বাল্যবন্ধু এরিশ আমাদের দেখিতে আসে। তুমি একবার বলিয়াছিলে তাহাকে দেখিতে ঠিক তাহার ওভার-কোটের মত। সে দরজা দিয়া ঢুকিলেই আমার তাহাকে দেখিলে হাসি পায়। মাকে কিন্তু একথা বলিওনা; তিনি রাগ করিবেন। বলিতে পার, তোমার মাকে বড়দিনের সময় আমি কি উপহার দিয়াছি? পারিবে না। আমি নিজেকেই তাঁর কাছে উপহার দিয়াছি। এরিশ ক্রেয়ন দিয়া আমার একটা ছবি আঁকিয়াছে; এই জন্যে আমাকে তিন বার তার কাছে বসিতে হইয়াছিল, প্রত্যেক-বারই পূরা এক ঘণ্টা করিয়া। বাহিরের একজন লোক আমার মুখ এত করিয়া দেখিলে আমার যা বিশ্রী লাগে! কিন্তু মা বলেন, ছবিটা পাইলে তোমার মা খুব খুশী হইবেন।

"কিন্তু রাইন্‌হার্ট, তুমি তো কৈ আমায় আর চিঠি দাও না? এজন্তে তোমার মার কাছে তোমার নামে কত অনুযোগ করি। তিনি খালি বলেন, 'তোমাদের এখন ওসব ছেলেখেলা-ছেড়ে অন্য কাজ কর্‌বার সময় এসেচে।' আমি কিন্তু তা' মনে করি না।"

তারপর রাইন্‌হার্ট মায়ের চিঠি পড়িল এবং দুইটি চিঠি এক সঙ্গে মুড়িয়া রাখিয়া দিল। হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার জন্য একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চাপিয়া ধরিল। খানিকক্ষণ ধরিয়া সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল, আপন মনে, অর্দ্ধেক অর্থ না বুঝিয়াই সে আবৃত্তি করিয়া চলিল—

চলিতে পথে পথিক পথহারা,
ভাবিছে মনে পথ কে দেবে বলে,'
শিশুর রূপে দাঁড়ায়ে পথে যীশু
কহিল, "পথিক, এদিকে এস চ'লে।"

তাহার পর রাইন্‌হার্ট ডেস্ক খুলিয়া কিছু পয়সা বাহির করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তখন অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিয়াছে, উৎসব-বৃক্ষগুলির বাতি নিভিয়া গিয়াছে—ছেলেরাও আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না। সমস্ত রাস্তাটি আলোড়িত করিয়া প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছিল। বালক বৃদ্ধ সকলেই ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়াছে। খৃষ্টজন্মোৎসব সন্ধ্যার দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে।

রাইনহার্ট যখন ক্লাবের নিকট আসিয়া পৌছিল, তখনও ভিতর হইতে গান ও বাজনার শব্দ আসিতেছিল। হঠাৎ ঘরের দরজা খোলার শব্দ হইল, এবং ভিতর হইতে একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি সিঁড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিল! রাইনহার্ট তাড়াতাড়ি একটি বাড়ীর ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরে সে আলোক-উদ্ভাসিত একটি অলঙ্কারের দোকানে গিয়া পৌছিল। সেখানে একটি ছোট্ট ক্রুশ ও কতকগুলি লাল প্রবাল ক্রয় করিয়া যে পথে গিয়াছিল সেইপথেই ফিরিয়া আসিল।

রাইনহার্ট দেখিল তাহার বাসার অনতিদূরে জীর্ণ বস্ত্রপরিহিত একটি বালিকা প্রকাণ্ড একটি বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া সেটি খুলিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। রাইনহার্ট জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব কি?"

মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়া দুয়ারের ভারি হাতল ছাড়িয়া দিল। রাইনহার্ট হাতল ঘুরাইয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল,—কিন্তু তখনই বলিয়া উঠিল—"না, ওরা তোমায় তাড়িয়ে দিতে পারে। আমার সঙ্গে এস,—আমি তোমাকে বড়দিনের জন্য কিছু উপহার দেব।" এই বলিয়া সে দরজাটি বন্ধ করিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া বাড়ী চলিল।

ঘরে পৌঁছিয়া রাইনহার্ট্ দেখিল যে সে যাইবার সময় আলো নিভাইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার যত কেক ছিল তাহার অর্দ্ধেক সে মেয়েটির কোঁচড়ে দিয়া দিল, কেবল যেগুলিতে তাহার নাম লেখা ছিল, সেগুলি দিল না।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে একবার তাহার দিকে চাহিল, স্পষ্টই বুঝা গেল যে এরূপ করুণা সে কখনো পায় নাই এবং রাইনহার্টের ব্যবহারে সে এতই অভিভূত হইয়াছে, যে, তাহার আর উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই। রাইনহার্ট দরজা খুলিয়া তাহাকে আলো দেখাইল। বালিকা মুক্ত পক্ষীর মত দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

রাইনহার্ট ঘরের কোণে আগুনটিকে একবার খোঁচাইয়া দিয়া তাহার ধূলা-পড়া দোয়াতটিকে টেবিলের উপর রাখিল। তারপর সেখানে বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল—সমস্ত রাত ধরিয়া সে মাকে ও এলিজাবেথকে দীর্ঘ পত্র লিখিল। উপহারের সেই কেকগুলির অবশিষ্টাংশ সেইখানেই পড়িয়া রহিল, রাইনহার্ট্ তাহা একবারও স্পর্শ করিল না। কিন্তু এলিজাবেথ তাহার জন্য যে দস্তানাগুলি বুনিয়াছিল সেগুলি সে পরিল এবং সেগুলি তাহার পশমের জামার সহিত ভারি সুন্দর মানাইল। ভোরে যখন শীতকালের সূর্য্য উদিত হইয়াছে তখনো রাইনহার্ট বসিয়া। জানালার সার্সি দিয়া যে আলো আসিয়া পড়িতেছিল, সেই আলোয় আয়নাতে সে নিজের মুখ দেখিতে পাইল—সে মুখ বিবর্ণ এবং গম্ভীর। (ক্রমশঃ)

শান্তিনিকেতনের শ্রীভবন

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশে বালক ও বালিকাদের জীবনের একটি প্রধান প্রভেদ সকলেই জানেন। বালকেরা রাস্তায় মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র গিয়া প্রকৃতির সহিত, পৃথিবীর সহিত ; মানব-সমাজের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, তাহাদের এই স্বচ্ছন্দবিচরণের নিমিত্ত তাহাদের যে দৈনিক শ্রম হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষারও সুবিধা হয়। পার্থিব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার এই সুযোগ বালকদের যতটা আছে, বালিকাদের ততটা নাই। বালিকাদের বয়স যখন বেশী হয়, তখন ত তাহাদের এই সুবিধা আরও কমিয়া যায়।

বাংলাদেশে ও উত্তর ভারতের অন্য অধিকাংশ অঞ্চলে অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকায়, বালকবালিকাদের জীবনে এই প্রভেদটি ঘটে। এই প্রথা উঠাইয়া দিবার কথা উঠিলেই অনেকে নরনারীর অবাধ মিশ্রণের কুফলের বিভীষিকা দেখেন ও দেখান। কিন্তু অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিলেই যে কুফলজনক অবাধ মিশ্রণ ঘটে না, তাহা দক্ষিণ ভারতে একটু বেড়াইয়া আসিলেই বুঝা যায়। অন্ধ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, কেরলে, গুজরাটে—সর্ব্বত্র হিন্দু নারী (মুসলমান নারী নহেন) অতি প্রাচীন কাল হইতে অবরোধমুক্তা। কিন্তু তথাপি ঐ সকল প্রদেশে নরনারীর অবাধ মিশ্রণ হয় না। সুতরাং বাংলা দেশ হইতেও পর্দ্দা প্রথা উঠিয়া গেলে অবাধ মিশ্রণের জন্য সামাজিক কুফল ফলিবে, এরূপ মনে করা উচিত নয়। বরং

সঙ্গীতশিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীদের একত্র অধ্যয়ন

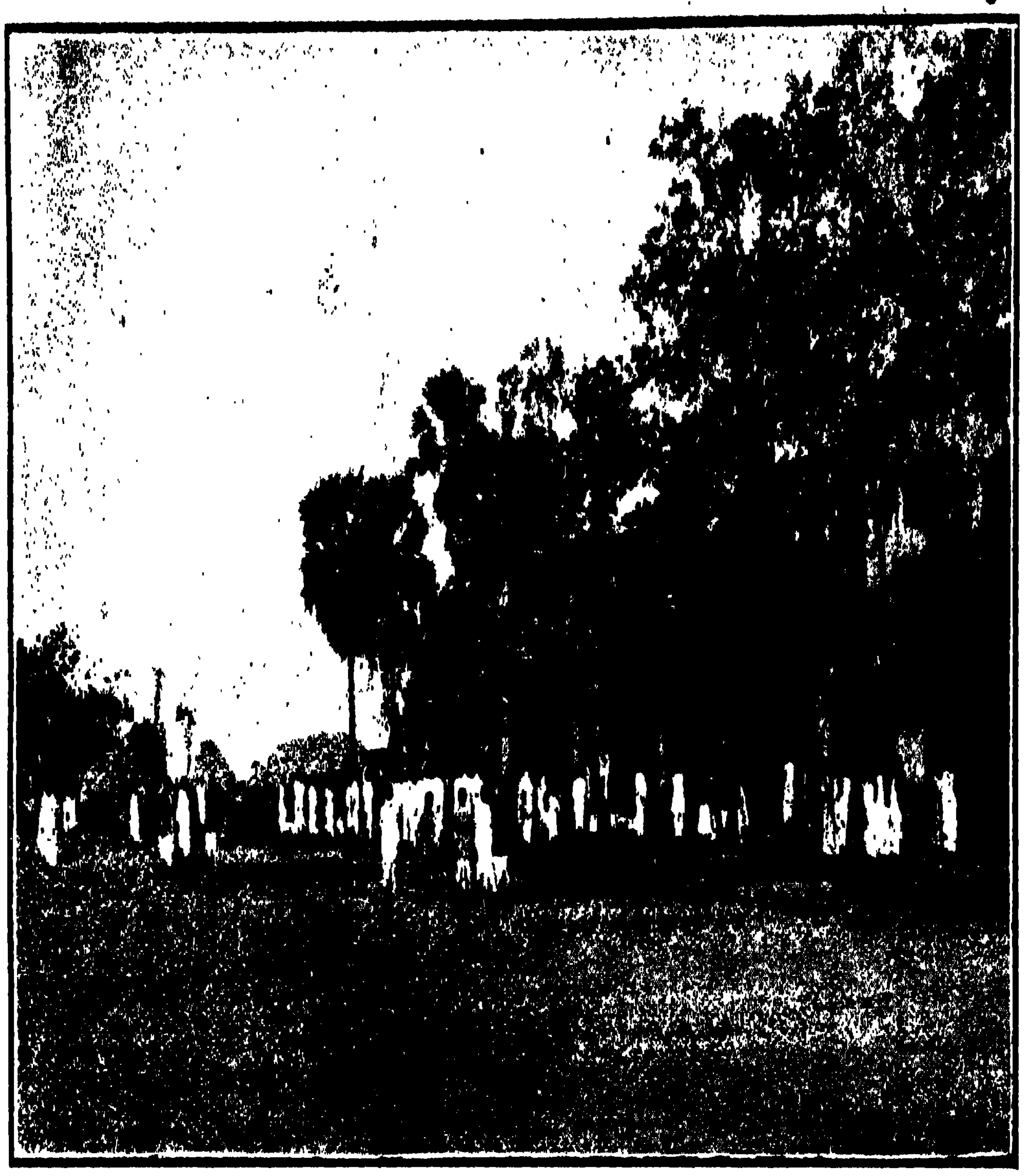

ছাত্র-ছাত্রীগণ সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে যাইতেছে

অবরোধ উঠিয়া গেলে নারীদের স্বাস্থ্য ভাল হইবে, জ্ঞান বাড়িবে, এবং মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাইবে।

যাহা হউক, আমরা অবরোধ উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী হইলেও উহা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

পুস্তক পড়িয়া কিছু জ্ঞান লাভ করা বালকদের মত বালিকাদেরও শিক্ষার একটা অংশ। কিন্তু শিক্ষা বলিতে আরও অনেক জিনিষ বুঝায়। তাহার উল্লেখ পরে করিতেছি। শুধু কেতাবী শিক্ষাও যদি এমন জায়গায় হয় যেখানে আলো ও বিশুদ্ধ বাতাস যথেষ্ট আছে, তাহা হইলে মন সতেজ থাকায় শিক্ষা সহজে হয় এবং ভাল হয়। কেতাবী শিক্ষায় মানসিক শ্রম হওয়ায় এবং মানসিক শ্রমের অনুযায়ী বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও অঙ্গচালনা আবশ্যক বলিয়া ছাত্রছাত্রীদের এবং বিদ্যার চর্চ্চায় ব্যাপৃত অন্য লোকদের উহা বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। ছাত্রেরা যত সহজে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও অঙ্গচালনা করিতে পারে, বাংলা দেশে বালিকারা তাহা পারে না। এইজন্য বঙ্গে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের স্বাস্থ্য বেশী খারাপ হইবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণে আমি কোন বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে গেলে ছাত্রীদের খেলিবার জায়গা ও সুযোগ কিরূপ আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করি। মানুষ আগে সুস্থ সবল দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তবে ত অন্য কাজ করিবে?

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মত ছাত্রীদেরও সাধারণ শিক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত হইতে পারে, এবং তাহার সমতুল্য বিশ্বভারতীর মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাও দেওয়া হয়। ঘোর বর্ষার দিন ছাড়া অন্য সব সময়ে গাছতলায় বা তাহার মত কোন স্থানে মুক্ত বাতাসে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং আঁধার ঘরে থাকায় দৃষ্টিক্ষীণতার সম্ভাবনা যেমন অনেক স্কুল-কলেজে ঘটে, এখানে তাহা ঘটে না। মুক্ত বাতাসে কাজ করার জন্য মানসিক অবসাদও সহজে হয় না।

ছাত্রীদের লাঠিখেলা

কেবল কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু কেতাবী শিক্ষাও পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে ভাল ও বড় লাইব্রেরী দরকার। শুধু পুস্তকের সংখ্যা গণনা করিলে বঙ্গের অল্পসংখ্যক কলেজে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার অপেক্ষা বেশী পুস্তক আছে বটে; কিন্তু নানা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ভাষার যত উৎকৃষ্ট পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথি বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারে অছে, তত বঙ্গের কোন কলেজে নাই; ছাত্রীদের কোন স্কুলে বা কলেজে ত নাই-ই। তা ছাড়া, এই লাইব্রেরীতে দেশী ও বিদেশী বিস্তর সাময়িক পত্র আসে। অতএব, কেতাবী শিক্ষার আয়োজন বিশ্বভারতীতে ভালই আছে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষার অনেক উপকরণ এখানে আছে। তিব্বত ও চীনের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাহা ভাল করিয়া জানিবার মত উপকরণ এখানে আছে। বিদেশী অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আসিয়া এখানে এই সকল বিষয়ে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দেন।

এখানে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রমুখ ভাল ওস্তাদেরা কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। রেখাঙ্কন, রঙীন ছবি আঁকা, মাটির ও অন্যান্য জিনিষের মূর্ত্তি গঠন, অন্য কোন কোন কারিগরী, গালার কাজ, দেওয়ালে চিত্রাঙ্কণ, রন্ধন, সাধারণ ও আলঙ্কারিক সেলাই, নানাবিধ গৃহকর্ম্ম, আহত ব্যক্তির প্রথম সাহায্য দান, রোগীর শুশ্রূষা, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকলের জন্য কোন অতিরিক্ত বেতন লওয়া হয় না। চিত্রাঙ্কণের শিক্ষা নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা দেন।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে বঙ্গের গ্রামসমূহ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, অনেক গ্রাম লোপ পাইতে বসিয়াছে। অথচ গ্রামগুলিই বঙ্গের প্রাণ। এখানেই অধিকাংশ বাঙালীর বাস। বাংলা দেশকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং বাঙালীর দ্বারা বঙ্গের, ভারতের ও জগতের কল্যাণ সাধন ও আনন্দ বিধান করিতে হইলে আমাদের গ্রামগুলিকে রক্ষা করিতে ও শ্রীমন্ত করিতে হইবে। তাহা কেমন করিয়া

শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

করা যায়, বিশ্বভারতীতে তাহার বাচনিক ও কার্য্যগত শিক্ষা দেওয়া হয়।

শান্তিনিকেতন সহর হইতে দূরে, ইহা একটা সুবিধা। অথচ ইহার অদূরে কয়েকটি গ্রাম থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লোকহিতসাধন শিখিবার ব্যবস্থা ও সুযোগ আছে।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে এখানে যে সব উৎসব হয়, তাহার দ্বারা মানব-জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আবশ্যক যে আনন্দ,তাহা ছাত্রছাত্রীদিগকে দেওয়া হয়,অধিকন্তু তাহারা মানুষের সহিত প্রকৃতির যোগ-স্থাপনের ও প্রকৃতির প্রভাব ব্যক্ত করিবার সঙ্কেতও এই সব উৎসব হইতে লাভ করে। ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার এবং শান্তিনিকেতন-স্থাপনের দিন। ঐ দিবসে বিশেষ উৎসব হয়। বৃক্ষরোপণও একটি প্রধান উৎসব।

ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য-সভায় তাহারা স্বরচিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রভৃতি পাঠ ও আবৃত্তি করে। তাহাদের হস্তলিখিত কয়েকটি সচিত্র পত্রিকা আছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন আশ্রমে থাকেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে গান শিখিবার এবং তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত নূতন প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রভৃতি তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার অসাধারণ সুযোগ ছাত্রীদেরও হয়। প্রতি বুধবার মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্রছাত্রীরা শুনিতে পান। তিনি যখন থাকেন না, তখন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ অধ্যাপকগণ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

ছাত্রীদের বাসভবন, ভোজনশালা, খেলার ও ব্যায়ামের জায়গা এবং, রুগ্ন হইলে, চিকিৎসালয় ছাত্রদের বাসভবনাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা একত্র দেওয়া হয়।

বালক-বালিকারা একত্রে অধ্যয়ন করিতেছে

বিশ্বভারতীর একটি ক্লাস

শান্তিনিকেতনের চারিদিকে সুবিস্তৃত বেড়াইবার ‍গা আছে। সেখানে অবসর সময়ে ছাত্রীরা নির্ভয়ে ‍ড়াইতে যায়।

গুরুপল্লীতে অনেক অধ্যাপক সপরিবারে বাস করেন।

শীতকালে বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গেলে, ছাত্রদের মত, ছাত্রীরাও উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে, তত্ত্বাবধায়িকার সহিত পদব্রজে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, অরণ্য প্রভৃতি দেখিতে যান। সঙ্গে গরুর গাড়ীতে তাঁবু, বিছানা ও খাদ্য-দ্রব্যাদি থাকে। বনভোজনও মধ্যে মধ্যে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রীদের দৈহিক স্বাস্থ্যের, হৃদয়মন-আত্মার বিকাশের, সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন করিতে চান, তাহা এখনও হয় নাই; কিন্তু ক্রমশ উন্নতি হইতেছে। বালিকাদের শিক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা বঙ্গে অন্য কোথাও নাই, বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আছে কিনা, ঠিক্ বলিতে পারি না।

এইরূপ শিক্ষা পাইয়া তাঁহারা সংসারের প্রকৃত শ্রী-স্বরূপিণী হইয়া উঠুন, তাঁহার ইচ্ছা এইরূপ বলিয়া তিনি

শান্তিনিকেতনের ছাত্রীনিবাসের নাম দিয়াছেন "শ্রীভবন"। শ্রীভবনের নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। ইহাতে পঞ্চাশটি বালিকার স্থান হইবে। গ্রীষ্মাবকাশের পর ছাত্রীরা এই নূতন গৃহে যাইবে। তখন যদি রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে যে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হইবে, তাহার সুষমা অনুভব করিবার ও প্রেরণা লাভ করিবার মহৎ অধিকার পুরাতন ও নূতন ছাত্রীরা লাভ করিবে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা তরকারি কুটিতেছে

মীরা বাঈ

ভারতের মধ্যযুগে অসামান্যা ভক্তিমতী মীরাবাঈ আবির্ভূতা হন। তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। মীরা ছিলেন নারী, রাজকন্যা, রাজরাণী, অন্তঃপুরিকা; তথাপি তাঁর ভক্তির আবেগ তাঁকে সকল সংস্কার ও সকল আসক্তি থেকে মুক্ত ক'রে সন্ন্যাসিনী পথচারিণী ক'রে ছেড়েছিল।...তাঁর আবির্ভাব কাল ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব। অতএব তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক। সকল লোকোত্তর-চরিত ব্যক্তির মত মীরা বাঈর জীবন-কাহিনীতেও বহু ইতিহাস বিরুদ্ধ কাল্পনিক কিম্বদন্তী জড়িত হ'য়ে গেছে।...

মাড়োয়ার প্রদেশে মেড়্তা পরগণার অধিপতি একজন রাঠোর সামন্ত ছিলেন; তাঁর নাম ছিল রতন সিংহ; কিন্তু লোকে তাঁকে ব'লত রতিয়া রাণা। তিনি ছিলেন মাড়োয়ারের রাণা রাও যুধাজীর পৌত্র। তাঁরই কন্যার নাম মীরা বাঈ। মীরার জন্ম হয় মেড়্তা পরগণার অন্তর্গত কুড়্কি গ্রামে। মীরা বাল্যাবধি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন; যে তাঁকে দেখত, সেই তাঁর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হ'ত। এই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটি মোহিনী মাধুরী এবং সঙ্গীতের সহজ পটুত্ব ছিল যে তাতে তিনি সকলেরই আদরভাগিনী ছিলেন।

মীরা বাল্যকাল থেকেই নির্জ্জনে একাকিনী থাকতে ভালবাসতেন ও আপন মনে গান গাইতেন। তিনি অন্য গান অপেক্ষা হরিভক্তি-প্রকাশক গান গাইতে ভালবাসতেন। তাঁর আর-একটি ভালবাসার সামগ্রী ছিল চন্দন-চর্চ্চিত ফুলের মালা।

মীরার বাল্যক্রীড়া ও হরিভজনের সহায় ছিলেন তাঁর খুড়ার পুত্র রায়মল্ল; ইনি উত্তরকালে পরম বৈষ্ণব সুকবি ব'লে খ্যাতি লাভ করেন; কথিত আছে যে চিতোর-অবরোধের সময় দুর্গ-প্রাকারের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে ইনি আক্বর বাদশাহের বন্দুকের গুলিতে নিহত হন।

মীরা বাল্যকালে কোনো প্রতিবেশিনী বালিকার বিবাহের উৎসব দেখে মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আমার স্বামী কে?" মাতা কৌতুকচ্ছলে গৃহদেবতার বিগ্রহকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—এই গিরিধারীলাল তোমার স্বামী। বালিকা মীরা সেইদিন থেকে গিরিধারীলালকেই আপনার স্বামী জেনে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি দিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করলেন। বিশ্বস্বামী মীরার মনে স্বামীর আসন আগেই বেদখল ক'রে ব'সলেন।...

মীরার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ গুণ ও সঙ্গীত শক্তির খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্ল; দূর-দূরান্তরের লোকেও সেই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে মীরাকে দর্শন ও তাঁর গান শুনে ক'রে চরিতার্থ হবার জন্য মীরার পিত্রালয়ে আসতে লাগ্ল। মেড়্তা মাড়োয়ারের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হ'ল। মীরার পিতা রতিয়া রাণা অভ্যাগতের যথোচিত অভ্যর্থনা ও আতিথ্য-সৎকারের ত্রুটি করতেন না।

চিতোরের রাণা মোকলদেবের পুত্র যুবরাজ কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভ (কারো কারো মতে প্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রাম সিংহের কনিষ্ঠপুত্র কুমারভোজ বা ভোজরাজ বা ভোজ) মীরার সুখ্যাতি শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হ'লেন এবং ছদ্মবেশে মীরার গৃহে গেলেন। তিনি মীরার রূপ দেখে ও সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হ'লেন।...

যখন পরগৃহে আতিথ্য স্বীকার ক'রে থাকা আর কিছুতেই চল্ল না, তখন রাজকুমার মীরার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আত্মবিস্মৃত হ'য়ে মীরার অঙ্গুলীতে একটি মহামূল্যবান হীরকাঙ্গুরীয় পরিয়ে দিতে দিতে বল্লেন—মীরা, তোমার সঙ্গ স্বর্গসুখতুল্য মনোহর। এই স্বর্গ ছেড়ে চিতোরে যেতে মন চাচ্ছে না। তুমি যদি চিতোরের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী হ'তে স্বীকার করো তা হ'লে চিতোর ও রাণার কুল ধন্য হয়।...মীরার পিতা অতিথির পরিচয় পেয়ে সানন্দেই তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন। স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী বিহঙ্গী স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দিনী হলেন। মীরার শ্বশুর-কুল শৈব। জনপ্রবাদ আছে যে, মীরা শ্বশুর বাড়ীতে আনীত হ'লে তাঁকে কুলদেবতা শিবকে প্রণাম করতে বলা হয়। তখন তিনি সেই অনুরোধ পালনে অস্বীকৃতা হয়ে বলেন যে—"এক গিরিধারীলাল ছাড়া আর কাউকে আমি প্রণাম করি না।" সেইদিন হ'তে মীরার শ্বশুর-বাড়ীতে লাঞ্ছনা ভোগ আরম্ভ হ'ল।...চারিদিকে কেবল নিষেধের বেড়া—এমন গলা ছেড়ে গান গাওয়া রাণীর সাজে না, এমন যখন-তখন গান গাওয়া কুলবধূর উপযুক্ত নয়। মীরা ম্রিয়মাণা হয়ে পড়লেন।...

রাণা কবি ছিলেন; মীরাকেও কবিতা রচনা করতে শেখাতে লাগ্লেন। তিনি ভাবলেন—কবিতার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মীরা বন্দী-জীবনের দুঃখ অনুভব করবার অবসর পাবেন না। মীরা শীঘ্রই কবিত্ব-শক্তিতে শিক্ষাগুরু স্বামীকে পরাভূত করলেন। তাঁর সমস্ত কবিতাই গিরিধারীলালকে সম্বোধন ক'রে এবং তাঁরই মিলন-বিরহের সুখ-দুঃখ অবলম্বন ক'রে রচনা করতে লাগলেন।

মীরা হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত থাকাতে তাঁর স্বামীসেবায় ব্যাঘাত ঘট্তে লাগ্ল। রাণা রুষ্ট হলেন। মীরা বৈষ্ণব পেলে তার সঙ্গেই কালযাপন করেন, এতে মীরার স্বামী মীরার চরিত্রের বিশুদ্ধিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। রাণা পুনরায় বিবাহ করবেন ব'লে মীরাকে ভয় দেখালেন। মীরা কৃতাঞ্জলি হয়ে কাতর বিনীত বচনে বললেন—'মহারাণা, আপনি বিবাহ করলে আমি অত্যন্ত সুখী হব।'...মীরার প্রতি রাণার সন্দেহ আরও প্রবল হয়ে উঠ্ল। এই সন্দেহের আগুনে বাতাস দিতে লাগলেন মীরার ননদ শ্রীমতী উদা বাঈ।...

এই সময়ে ঝালবার-রাজকুমারীর সঙ্গে মন্দর-রাজকুমারের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। তাঁদের বিবাহের রাত্রে মীরার স্বামী ঝালবার-রাজকুমারীকে হরণ ক'রে এনে বিবাহ করলেন।... একদিন মন্দর-রাজকুমার নবীন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মীরার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। সকল অতিথি মীরার প্রদত্ত প্রসাদ

গ্রহণ করলেন, কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী গ্রহণ ক'রলেন না। অতিথি-সেবাব্রতা মীরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলে নবীন সন্ন্যাসী বললেন—আমার একটি প্রার্থনা পূরণ করবেন প্রতিজ্ঞা করলে আমি আপনার আতিথ্য স্বীকার করব।

অতিথি বিমুখ হবার ভয়ে মীরা সম্মত হলেন। তখন ছদ্মবেশী মন্দর-রাজকুমার মীরার কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করে বললেন—আমি বাল্যবান্ধ-রাজকুমারীকে জন্মের শোধ শেষ একটিবার দেখে যেতে চাই।...

মীরা রাজকুমারকে নিয়ে অন্তঃপুরে গিয়েই দেখলেন রাণা সামনে দাঁড়িয়ে।...রাজা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—মীরা, তুমি চিতোরের রাজমহিষী হয়ে স্বৈরিণীর আচরণ করছ। তুমি রাজার আদেশের বিরুদ্ধাচারিণী, রাজাদেশ লঙ্ঘনের দণ্ড নির্ব্বাসন। তুমি এখনই চিতোর ছেড়ে দূর হয়ে যাও।...মীরার পক্ষে রাজাদেশ শাপে বর হ'লো। তিনি আনন্দিত মনে গান করতে করতে চিতোর ত্যাগ ক'রে চললেন—

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহে কেঁও তরসাবো।
বিরহ বিথা লাগি উর-অন্দর
পীতম, সো তুম আয়ো বুঝাবো ॥...

—তোমার জন্যে সর্ব্ব সুখ পরিত্যাগ করেছি, এখন তুমি আমাকে গ্রহণ না'করবার ভয় কেন দেখাচ্ছ? অন্তরের অন্তরে বিরহ ব্যথা জ্ব'লে উঠেছে, হে প্রিয়তম, তুমি এসে সেই জ্বালা নির্ব্বাপিত করো।

মীরাকে নির্ব্বাসিত ক'রে চিতোর নগর শ্রীহীন, রাজভবন নিরানন্দ—মীরার মধুর কণ্ঠ এখানে নীরব। রাণা নিজের ভুল বুঝে মীরাকে ফিরিয়ে আনতে দূত পাঠালেন।...

মীরা গান গেয়ে গেয়ে যেখানেই যাচ্ছিলেন সেখানেই মুগ্ধ নরনারী তাঁকে ঘিরে মেলা করছিল; কাজেই রাজদূত মীরাকে সহজেই খুঁজে পেলে। দূতের মুখে রাজার আদেশ অবগত হয়ে মীরা বললেন—মহারাণা, একদিকে আমার রাজা, অপর দিকে আমার স্বামী। আমি তাঁর দাসী, তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

মীরা চিতোর নগরের তোরণে উপনীত হ'লে মহারাণা বাদ্য বাজিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে গেলেন। রাণা মীরার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মীরা স্বামীর পদতলে প্রণাম ক'রে বললেন—স্বামী, আমি আপনার পদাশ্রিতা দাসী। আমারই পদে পদে অপরাধ ঘটছে, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন।

মীরার স্বামীর মৃত্যু হ'লে তাঁর দেবর বিক্রমজিৎ মহারাণা হলেন। তিনি মীরার সাধুসেবাতে ভক্ত-সঙ্গে কালযাপনে ও সাধন-ভজনে বাধা দিতে লাগলেন। ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন মীরার ননদ উদা বাঈ।...

মীরাকে চরণামৃত ব'লে সত্যসত্যই বিষ দেওয়া হ'ল। মীরা জেনে-শুনেও হরির চরণামৃত নাম নিয়ে আগত বিষপাত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না; তিনি বিষ পান করলেন। তার ফলে তাঁর ভগবৎ-প্রেমের নেশা চতুর্গুণ বেড়ে গেল।...

মীরা আঘাত সহ্য করবার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে চাইলেও রাণার প্রতিবন্ধকতায় তাঁর হরিভজনে নিরন্তর ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। তখন তিনি তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করতে না পেরে পরম ভক্ত তুলসীদাস গোস্বামীকে পত্র লিখে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন।...

গোসাঁই তুলসীদাসের উপদেশ পেয়ে মীরা আত্মীয়-স্বজন ও চিতোর ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। হরিবিরহবিধুরা মীরার বিরহব্যথা-প্রকাশক গানগুলি কবিত্বে ও ভাবে মনোরম।...

বরসে বদরিয়া সাবন-কী।
সাবন্-কী মন-ভাবন-কী।
সাবন-মেঁ উমগ্যো মেরো মনবা
ভনক সুনী হরি-আবন-কী ॥
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিস-সে আয়ো,
দামিন দমকে ঝর লাবন-কী।
নন্হী নন্হী বূঁদন মেহা বরসে,
শীতল পবন সোহাবন-কী।
'মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
আনন্দ-মংগল গাবন-কী ॥

—শ্রাবণের বাদল বর্ষণ করছে, শ্রাবণের না মনভাবনের বর্ষণ হচ্ছে। শ্রাবণে আমার মন উন্মনা হয়ে উঠেছে হরির আগমনের ধ্বনি শুনে। গুরুগম্ভীর মেঘ চারিদিক থেকে ঘিরে আসছে, দামিনী লাবণ্যের ধারা বিচ্ছুরিত করছে; মেঘ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বারিবিন্দু বর্ষিত হচ্ছে, শীতল পবন স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে। মীরার প্রভু গিরিধারী নাগর আনন্দ-মঙ্গল গান ক'রে শোনাচ্ছেন।...

মীরাকে প্রভু গহির গম্ভীরা, হৃদয় রহো জী ধীরা।
আধী রাত প্রভু দরশন দীন্হে প্রেম নদী-কী তীরা ॥...

—মীরার প্রভু গভীর গম্ভীর, হৃদয় ধৈর্য্য ধ'রে থাকো, অর্দ্ধরাত্রে প্রেম-নদীর তীরে প্রভু তোমাকে দর্শন দেবেন।...

নয়ন ললচায়ত জিয়রা উদাসী।
শাবল বনমেঁ বাজে শাবঁল-কী বাঁশী ॥
রৈনা-মে শয়না-মে মোরা নয়না ন লাগে,
মোরা নীঁদ ন লাগে—
পীতম-কে শোঁয়াস আবে কুসুম-সুবাসী ॥

আমার নয়ন হয় লালায়িত আর জীবন হয় উদাসী যখন শুনি শ্যামল বনে বাজে শ্যামলতার বাঁশী। রজনীতে শয্যায় আমার নয়ন মুদ্রিত হয় না, আমার নিদ্রা আসে না, আমার কাছে যে প্রিয়তমের কুসুম-সুবাসিত নিশ্বাস আসে।...

মীরা বৃন্দাবনে সাধুভক্তগণের সঙ্গলাভ ক'রে আপনার সহজ সাধনায় অগ্রসর হ'তে লাগলেন। মহাযোগী রৈদাসজীর নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন। নরসী নামক এক সাধুপুরুষের নিকটও তিনি ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন। এই সাধুর জীবনচরিত মীরা লিখে রেখে গেছেন, তার নাম নরসীজী-কী মায়রা।

মীরা একদিন সাধু সন্দর্শন করতে করতে রূপ বা জীব গোস্বামীর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন। এই গোস্বামী মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন।

গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ ॥...

মীরা গোস্বামীকে ব'লে পাঠালেন—

নিত নহানে সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খা-কে হরি মিলে তো বান্দর বাঁদরাই ॥
তীরণ ভখন-সে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত রৈ খোজা ॥

দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎস-বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম-সে ন মিলে নন্দলালা॥

গোস্বামী মীরার কথায় দিব্য জ্ঞানলাভ করলেন ও লজ্জিত হয়ে মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।...

মীরা বাঈর ভক্তগণ একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় গঠন করেছেন এবং তাঁর ভজনগুলি রাগগোবিন্দ নামে সংগ্রহ করেছেন। মীরা বাঈর গানগুলি রাজপুত বৈষ্ণব সমাজে খুব ভক্তির সহিত গীত হয়ে থাকে; পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রী সাধিকা মাত্রেই এখন মীরা বাঈ নামে নিজেদের পরিচয় দেন। মীরার গান চিরকাল সকল দেশের ভক্তি ও কাব্যরস-পিপাসুদের কাছে সমাদরের সামগ্রী হয়ে থাকবে।

(শতদল, চৈত্র, ১৩৩৫) চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

—

সত্য-ধর্ম্ম

সত্য কি?... মানুষের পক্ষে যদি কোনও সত্য-সমস্যা থাকে তবে সে প্রকৃতির অনুযায়ী জীবন-যাপনের সমস্যা। এই জীবনের আদি-অন্ত রহস্যময়; দূর হইতে এই রহস্য চিন্তা করিবার নয়—এই রহস্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া নিজেও রহস্যময় হইতে হইবে। সত্য এক নহে, বহু—এজন্য সকলই সত্য এবং সকলই মিথ্যা। যেখানে জীবনের স্ফূর্ত্তি সেইখানেই সত্য। এই স্ফূর্ত্তির কি কোনও নিয়ম আছে? এই বৈচিত্র্যকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিবে কে? এই ক্ষণসত্যের আদর্শ নির্ণয় করিবে কে? গতি ও প্রবাহই যার নিয়ম, মৃত্যুময় জীবন-প্রাচুর্য্যই যার ধর্ম্ম—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, স্বপ্ন-জাগরণ, স্মৃতি বা বিস্মৃতি যার অঙ্গে এতটুকু চিহ্ন রাখে না, তার আবার সত্য কি? কোন্ মাপ-কাঠিতে তাহাকে মাপিবে? ইহার অর্থ করিতে গেলেই—প্রহেলিকা; তত্ত্ব সন্ধান করিলেই—শূন্যবাদ। তাই যাহারা জীবন-ধর্ম্ম পালন করে, কোনরূপ সত্য-জিজ্ঞাসার মতিভ্রমে যাহারা পড়ে নাই, তাহারাই সত্য-পালন করিয়াছে—অজ্ঞানে জ্ঞানীর কাজ করিয়াছে।

সত্য কি,—প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর, বুঝিতে পারিবে। নিজের মধ্যে যে শক্তি যেটুকু আছে, সেই শক্তিটুকুই সত্য; তাহার প্রেরণায় যে জীবধর্ম্ম তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহাই সত্য। যে সংস্কার তোমার প্রাণে বদ্ধমূল তাহাই তোমার স্বধর্ম্ম, আবার যে সংস্কার তোমার প্রাণকে বিচলিত করে, বিদ্রোহী করিয়া তোলে তাহাই তোমার বিধর্ম্ম। কল্পনাবিলাস বা তত্ত্বহিসাবে যাহা তোমার শ্রেয়ঃ তাহাই সত্য নয়, কারণ, তোমার নিজ চেতনার বাহিরে, কেবলমাত্র চিন্তাহিসাবে, কোনও সত্য নাই; এবং যাহা তোমার জীবচেষ্টাকে অলস করিয়া দদ্রু কণ্ডুয়নের মত সুখসাধন করে তাহাও সত্য নয়, কারণ তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।, যাহা তুমি বিশ্বাস কর, তাহাই সত্য। সূক্ষ্ম তত্ত্ব, উৎকৃষ্ট যুক্তি বা উদার ভাব—সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট বা উদার বলিয়াই সত্য নয়; যদি প্রাণে সাড়া না পায়, যদি বিশ্বাস উৎপাদন না করে, তবে তাহাও তোমার পক্ষে মিথ্যা। এই বিশ্বাস অর্থে মনের সম্মতি নয়, ভাব-বিভোরতাও নয়—প্রাণের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার। এই বিশ্বাসের প্রমাণ—নিষ্ঠা, অভয় ও একাগ্রতা; নিরালস সুখস্বপ্ন নয়, প্রলাপোক্তি নয়, শক্তিক্ষয়ের সুখলাম্পট্যও নয়। তুমি যাহা বিশ্বাস কর তাহাই সত্য, কারণ তাহাই তোমার স্বধর্ম্ম। জীবনের স্বাস্থ্যই সত্যের একমাত্র প্রমাণ, সত্যের সত্যহিসাবে আর কোনও মূল্য বা অর্থ নাই।

(বাসন্তিকা, ফাল্গুন, ১৩৩৫) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শিল্পকলা

শিল্পশাস্ত্রেরই আলোচ্য বিষয় হইলেও শিল্পকলা-সমূহের উল্লেখ অপর তিন শ্রেণীর সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণেই বিশেষভাবে শিল্পকলার তালিকার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহের মধ্যে ললিত-বিস্তর ও উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে শিল্পকলা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কামশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে বাৎস্যায়নের কামসূত্র উল্লেখযোগ্য।

কামশাস্ত্রের প্রধানতম উপকরণই রূপ ও যৌবন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের অবয়বীভূত চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা প্রাগ্‌যৌবন বা কিশোর কাল হইতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শিক্ষণীয়। ৫১৮ অন্তর কলার উল্লেখ থাকিলেও প্রধানতঃ চতুঃষষ্টিই মূল কলা। প্রথমতঃ এই ৬৪ মূল কলার নাম ও বিবরণ যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

(১) গীত। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার জীবগোস্বামীর ও বল্লভ আচার্য্যের মতে গান শিক্ষা, গীত নির্ম্মাণ, রাগভেদ, তালমাত্রাদি রচনাপ্রকার ও সাধক বাধক স্বরাদির মেলন পরিজ্ঞান গীতের অন্তর্গত।

(২) বাদ্য। যন্ত্রাদিভেদে বাদ্যেরও নানা বিভাগ আছে। যশোধরের মতে কাংস্য, পুষ্করতন্ত্রী ও বেণু প্রভৃতির দ্বারা বাদ্যের ঘনত্ব, বিতত্ব ও সুষিরত্ব প্রভৃতি ভেদ যথাক্রমে সূচিত হয়।

(৩) নৃত্য। নৃত্য বলিতে সাধারণতঃ 'নাচ' বা নর্ত্তন বুঝায়। নাট্য ও অনাট্য নামক ইহার দুই ভেদ আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালবাসীর কার্য্যের অনুকরণ নাট্যনৃত্য এবং নর্ত্তকাশ্রিত অনাট্য নৃত্য।

(৪) নাট্য। ইহার অপর নাম দৃশ্যকাব্য। ইহাতে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পট প্রভৃতির সাহায্যে সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে কথাবার্ত্তার দ্বারা ঘটনা ও গল্পবিশেষ প্রত্যক্ষরূপে দেখান হয়।

(৫) আলেখ্য। ইহার অন্য নাম চিত্রকলা। রূপভেদ, প্রমাণ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক মাপ, ভাব ও লাবণ্য-যোজন, সাদৃশ্য রক্ষা ও বর্ণিকাভঙ্গ—এই ছয়টি আলেখ্যের ষড়ঙ্গ।

(৬) বিশেষকচ্ছেদ্য। বিবাহের প্রাক্কালে কন্যার কপোলাদিতে চন্দনাদির দ্বারা নৈপুণ্যের সহিত চিত্রাঙ্কনই এস্থলে আলোচ্য বিষয়।

(৭) তণ্ডুল-কুসুম-বলি বিকার। বস্তুতঃ এই এক শিরোনামার মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র শিল্পকলার বিবরণ আছে। তণ্ডুলবিকার অর্থাৎ নৈবেদ্যের ন্যায় ভোজনপাত্রে নৈপুণ্যের সহিত তণ্ডুলাদি ভোজ্যদ্রব্য সাজান। কুসুমবিকার দ্বারা সুশোভনভাবে ফুলের তোড়া প্রভৃতির রচন ও পাত্রবিশেষে পুষ্প সাজান বুঝায়। বলিবিকার বলিতে পূজার উপকরণের ন্যায় বিভিন্ন পাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া নৈপুণ্যের সহিত পরিবেশন করা বুঝিতে হইবে।

(৮) পুষ্পাস্তরণ। উদ্যানাদিতে ফুলের কেয়ারী রচনা করা।

(৯) দশন-বসন-অঙ্গরাগ। ইহাতেও তিনটি স্বতন্ত্র শিল্পকলা উল্লিখিত হইয়াছে। দশনরাগ বা দাঁতে মিশি মাখান। বসনরাগ বা নানাভাবে কাপড়ে রঙ করা। অঙ্গরাগ সর্ব্বজনবিদিত।

(১০) মণিভূমিকাকর্ম্ম। যশোধরের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহার দ্বারা ঘরের মেঝে মার্ব্বল প্রভৃতি প্রস্তরের উপর নৈপুণ্যের সহিত মণিপ্রদান।

(১১) শয়ন-রচন।

(১২) উদকবাদ্য। সাধারণতঃ জলতরঙ্গ নামে পরিচিত।

(১৩) উদকঘাত। জীবগোস্বামীর মতে জলের ফোয়ারা নির্ম্মাণ।

(১৪) চিত্রযোগ। ইহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে টীকাকারদের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৫) মাল্যগ্রথনবিকল্প। নানা প্রকার মালা গাঁথন।

(১৬) শেখরাপীড়যোজন। মাথার চুলে ও কপাল প্রভৃতি স্থানে নৈপুণ্যের সহিত অলঙ্কার পরিধান।

(১৭) নেপথ্য প্রয়োগ। নাটকাদির অভিনয়ের জন্য পারিপাট্যের সহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান। বল্লভাচার্য্যের মতে ষ্টেজ বা অভিনয়ের মঞ্চ-রচনাও ইহার অন্তর্গত।

(১৮) কর্ণপত্রভঙ্গ। চন্দনাদির দ্বারা আকর্ণ কপোলে চিত্রাঙ্কন।

(১৯) গন্ধযুক্তি। নানাপ্রকার সুগন্ধিনির্ম্মাণ।

(২০) ভূষণ-যোজন। পারিপাট্যের সহিত নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অলঙ্কার পরিধান।

(২১) ঐন্দ্রজাল। যাদুবিদ্যাবিশেষ।

(২২) কুচুমার-যোগ। কোন অনির্দ্দিষ্ট শিল্পকলা।

(২৩) হস্তলাঘব। হস্ত-কৌশল দ্বারা নানাদ্রব্যের গোপনাদি ক্রীড়া।

(২৪) বিচিত্র শাকপূপভক্ষবিকারক্রিয়া। বিচিত্র প্রকারের শাকসবজি, পিষ্টক ও অপর সকল প্রকারের ভোজ্যদ্রব্য রন্ধন।

(২৫) পানক রস রাগাসব যোজন। পানীয় দ্রব্যসমূহের প্রস্তুতকরণ।

(২৬) সূচিবায় কর্ম্ম। সিলাই ও বয়ন।

(২৭) সূত্রক্রীড়া। যশোধরের মতে হস্তকৌশলের সাহায্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ভস্মীভূত সূত্রকে অবিকল পূর্ব্ব অবস্থায় দেখান।

(২৮) বীণা ডমরুপ বাদ্য। বাঁশী, বেহালা প্রভৃতি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র এবং ঢোলক, মৃদঙ্গ, ডগ্‌গী, তবলা প্রভৃতি চামড়াযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বাজান।

(২৯) প্রহেলিকা। নানাপ্রকারের সমস্যা-পূরণ।

(৩০) প্রতিমালা। জীবগোস্বামী ও বল্লভ আচার্য্যের মতে ইহার দ্বারা ভাস্কর্য্য বা মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ বুঝিতে হইবে।

(৩১) দুর্বাচকযোগ। হরবোলা বা পশুপক্ষীর শব্দ বা অর্থের অনুকরণ।

(৩২) পুস্তকবাচক। যশোধরের মতে সুললিতভাবে পুস্তক আবৃত্তি বা পঠন।

(৩৩) নাটক আখ্যায়িক দর্শন। ইহা প্রকৃত নাটক হইতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন। ইহাতে কোন প্রকার কথাবার্ত্তা বা চলাফেরা নাই। ইহাতে কোন প্রসিদ্ধ চিত্র, ঘটনা বা ব্যক্তির অনুকরণ করা হয়। ইহাতে নিশ্চল ছবির মত অবিকল সাজসজ্জা করা লোকসমূহকে দেখান হয়।

(৩৪) কাব্যসমস্যা-পূরণ। শাব্দিক বা আর্থিক সমস্যা ইহার আলোচ্য বিষয়।

(৩৫) পট্টিকা (বা পেটিকা) বেত্রবসন বিকল্প। বেত, বাঁশ ও রশি প্রভৃতির সাহায্যে খস্, লাই, ওড়া, মোড়া, ডোল, বেত প্রভৃতি বানান।

(৩৬) তক্ষ কর্ম্ম। ইহার দ্বারা চরকা প্রভৃতির সাহায্যে সূতা-কাটা বুঝায়।

(৩৭) তক্ষণ। কাষ্ঠাদির দ্বারা দরজা, জানালা, চৌকি, খাট প্রভৃতি তৈয়ার করা।

(৩৮) বাস্তুবিদ্যা।

শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ মানসারে বাস্তুবিদ্যা ও বাস্তুকর্ম্মের সম্পূর্ণ সঠিক ও বিশদ বিবরণ আছে। এই বিবরণ হইতে বাস্তু বলিতে নৈপুণ্যের সহিত যাহা নির্ম্মাণ করা যায়, তাহাই বুঝিতে হইবে। বাসগৃহ, মন্দির, দুর্গ, গ্রাম, নগর ও প্রতিমাদির নির্ম্মাণ ত বুঝিতেই হইবে। অধিকন্তু গৃহের আসবাব, যান, রথ, চাকতি, কল, শিবিকা, রাস্তা, ঘাট, দীঘি, পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ, সেতু, উদ্যান, নর্দ্দমা, রাজমুকুট, পশু-পক্ষীর নীড়, গহনা, এমন কি কেশবন্ধন পর্য্যন্ত বাস্তুবিদ্যার অন্তর্গত।

(৩৯) সুবর্ণ-রৌপ্য-রত্ন পরীক্ষা। জহরীর কাজ। কিন্তু শিল্প-বিশেষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

(৪০) ধাতুবাদ। মৃৎ, প্রস্তর, রস বা পারদ প্রভৃতি পাতন, শোধন ও মেলন করিবার জ্ঞান।

(৪১) মণিরাগ-জ্ঞান। রত্নাদির উপর নৈপুণ্যের সহিত নানাবিধ রং করা।

(৪২) আকর-জ্ঞান। সোনা ও কয়লা প্রভৃতির খনি আবিষ্কার করা।

(৪৩) বৃক্ষ আয়ুর্ব্বেদযোগ। যশোধরের মতে উদ্যানাদিতে বৃক্ষাদির রোপণ, পরিপোষণ, চিকিৎসা ও সুদৃশ্যভাবে বিন্যাস করা।

(৪৪) মেষ কুক্কুট-লাবক যুদ্ধবিধি।

(৪৫) শুক-সারিকা প্রলাপন। নানাপ্রকার পক্ষীকে কথাবার্ত্তা ও গান করিতে শিখান।

(৪৬) উৎসাদন ও সংবাহন। হাত ও পা দিয়া দেহের নানা স্থান মর্দ্দন করা।

(৪৭) কেশমার্জ্জনা-কৌশল। নৈপুণ্যের সহিত চুল বাঁধা।

(৪৮) অক্ষর-মুষ্টিকা কথন। জীবগোস্বামী ও বল্লভ আচার্য্যের মতে মুঠের ভিতর লুকায়িত দ্রব্যাদি আন্দাজ করিয়া বলা।

(৪৯) ম্লেচ্ছিত বিকল্প। যশোধরের মতে অপরের দুর্ব্বোধ্যতার বা চোরা ভাষা ব্যবহার করা।

(৫০) দেশভাষা-বিজ্ঞান। নানা দেশ প্রদেশের কথিত ও লিখিত ভাষা শিক্ষা করা।

(৫১) পুষ্পশকটিকা-নির্ম্মিতজ্ঞান। ফুলের গাড়ী তৈয়ারী করা।

(৫২) নিমিত্তজ্ঞান। কাকাদির ডাক শুনিয়া শুভাশুভ নির্দ্দেশ করা।

(৫৩) যন্ত্রমাতৃকাঃ। যশোধরের মতে ইহার অর্থ সজীব ও নির্জীব যন্ত্রসমূহের যানোদক সংগ্রামের জন্য বিশ্বকর্ম্মা-প্রোক্ত ঘটনা শাস্ত্র।

(৫৪) ধারণ মাতৃকা। সাধারণতঃ ইহার অর্থ, সংক্ষেপার্থ কবিতা রচনা।

(৫৫) সংপাঠ্য। লেখা ও তর্কবিতর্কের জন্য একরূপ গ্রন্থপাঠ।

(৫৬) মানসী কাব্যক্রিয়া। বলিবামাত্র মনে মনে কাব্য রচনা করা, কবিতার পংক্তি বলিয়া দিলে পংক্তি মুখে মুখে রচনা করা।

(৫৭) অভিধানকোষ। শব্দের প্রতিশব্দসমূহ সংগ্রহ করিয়া বলা।

(৫৮) ছন্দোজ্ঞান। সাধারণ অর্থে ছন্দঃ জানা ও ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করা।

(৫৯) ক্রিয়া, বিকল্প। ধাতুরূপ প্রভৃতি ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র শিক্ষা।

(৬০) ছলিত যোগ। প্রবঞ্চনা ও ছলনা প্রভৃতি শিক্ষা করা।

(৬১) বস্ত্রগোপন। সাধারণতঃ ইহার অর্থ সূতার কাপড়কে রেশমী কাপড়ের মত প্রদর্শন করান।

(৬২) দ্যূতবিশেষ। জুয়াখেলা।

(৬৩) আকর্ষ ক্রীড়া। যশোধরের মতে পাশা খেলা।

(৬৪) বালক্রীড়নক। ছেলেদের খেলিবার পুতুল তৈয়ার করা।

(৬৫) বৈনয়িক জ্ঞান। বিনয় প্রভৃতি সদাচার শিক্ষা।

(৬৬) বৈজয়িক জ্ঞান। বিজয় বা যুদ্ধের উপযোগী ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা।

(৬৭) ব্যায়ামিক জ্ঞান। শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি শিকার করা।

এই তালিকা হইতে সহজেই দেখা যাইবে যে, অনেক বাদ দিয়া ধরিয়াও 'চৌষট্টি' কলা বলিয়া যে মামুলী কথা আছে, তাহা মিলাইতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুসংখ্যক টীকাকার কিংবা ললিত-বিস্তরের গ্রন্থকার ইহা মিলাইতে পারেন নাই। উত্তরাধ্যয়নসূত্রে চৌষট্টির পরিবর্ত্তে 'বাহাত্তর' সংখ্যা বলা হইয়াছে। কামসূত্রের গ্রন্থকার বাৎস্যায়নও তাহা মিলাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার টীকাকার যশোধর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, চৌষট্টি মূল কলা মাত্র। এইগুলিকে ৫১৮ প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে।

(মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৩৫) ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৩)

নিরঞ্জন ও সাবিত্রীর দাম্পত্য কলহটা ঠিক সনাতন-প্রথা মত হইত না। তাহাদের আরম্ভই হইত বরং সামান্য, এবং শেষটা তাহাই তুমুল ব্যাপারে দাঁড়াইত। কলহের মাঝখানে অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া, স্বামীকে অনুতপ্ত এবং স্নেহ-কোমল করিয়া তোলার বিদ্যাটা সাবিত্রীর ঠিক জানা ছিল না। তর্ক আরম্ভ করিলে সে প্রাণপণে তর্ক করিত, এবং সুযুক্তি যেখানে না জুটিত, সেখানে রাগের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া কাজ সারিয়া লইত। তর্কে হারিলে কাঁদিত বটে, কিন্তু তাহাতে ঝগড়ার মিটমাট হইত না। নিরঞ্জন তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে কাছে আসিয়া, আদর করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু ফল হইত তাহাতে অন্য প্রকার। সাবিত্রী নিজেকে অপমানিতা জ্ঞান করিয়া আবার ফোঁস করিয়া উঠিত। এত তর্ক এত রাগারাগিতেও যে স্বামীর মতের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটান যায় না, তাহার আদরের আবার মূল্য কি? সাবিত্রী নিজের মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝিত কিনা সন্দেহ, তবে খানিকটা এই ধরণের ধারণাই তাহার ছিল বোধ হয়।

নিরঞ্জন [illegible] পত্নীকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খুব যে সফল হইল তাহা বলা যায় না। স্বামীর বাধ্য হওয়া উচিত, হিন্দুনারীর ইহাই ধর্ম্ম। অগত্যা সাবিত্রী অনেক কষ্টে ঘণ্টাখানেক বসিয়া নিরঞ্জনের বক্তৃতা শুনিত। কিন্তু তাহার বাধ্যতা ঐ পর্য্যন্ত। নিরঞ্জন তাহাকে যাহা যাহা করিয়া রাখিতে বলিত, তাহার একটাও সে করিত না। স্বামী বিরক্ত হইলে, নানারকম ওজর আপত্তি দেখাইতে বসিত। তাহার কত কাজ, সংসারের কাজ ফেলিয়া, বই লইয়া বসিলে শাশুড়ী কি মনে করিবেন? দিনের বেলা স্বামীর কাছে বসিয়া থাকিলে, সকলে তাহাকে ভয়ানক ঠাট্টা করে, ইত্যাদি।

নিরঞ্জন একদিন একটু রাগিয়া বলিল, "আসল কথা পড়তে তুমি চাও না।"

সাবিত্রীর স্বভাব ছিল কাহাকেও রাগিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার চেয়েও বেশী করিয়া রাগিয়া ওঠা। সেও বেশ কিছু ঝাঁঝের সহিত বলিল, "বিয়েইত হয়ে গেছে, এখন আর পড়ার কি দরকার?"

নিরঞ্জন বলিল, "তবেই হয়েছে। মেয়েদের পড়াটা

তাহলে কেবল বিয়ের জন্তে? নিজেদের মানুষ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই?"

সাবিত্রী বলিল, "আহা, কতগুলো ছাই পাঁশ ইংরিজী না পড়লে আর মানুষ হওয়া যায় না নাকি? আমাদের মা মাসীরা তাহলে কেউই মানুষ নয়। যাতে চরিত্রের বল বাড়ে, ভাল গৃহিণী, ভাল মা হতে শেখায়, সেই শিক্ষাই আসল শিক্ষা।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বই রাখিয়া দিল। বলিল, "থাক্, আর পড়ে কাজ নেই। ছাত্রী হওয়ার চেয়ে গুরুমশায় হলেই তোমায় মানায় ভাল। চরিত্রের বল বাড়া, সুগৃহিণী, সুমাতা হওয়ার জন্তে কি কি যে দরকার তার পরিষ্কার ধারণাই তোমার হয়ে গেছে।"

পড়াশুনার উৎপাত চুকিয়া গেল, দেখিয়া সাবিত্রী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর আর বোধ হয় তাহাদের ঝগড়া হইবে না। তাহাদের সখীদের মত সেও নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর আদরিণী হইয়া দিন কাটাইতে পারিবে।

কিন্তু কপালই ছিল তাহার খারাপ। দুদিন একরকম কাটিল, তিন দিনের দিন আবার ঝগড়া বাধিয়া গেল। বেলা দশটা এগারোটায় নিরঞ্জন বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের বাড়ী আসিবার পথ, গ্রামের পুকুরের পাশ দিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী আরও দুই চারিটি মেয়ের সঙ্গে স্নান করিয়া, কলসীতে জল লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। পল্লীর প্রথামত তাহার পরণে শুধু একখানি শাড়ী, জলে ভিজিয়া একেবারে স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। উহার ভিতর দিয়া তাহার গৌরবর্ণ তনুর আভা দিব্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। নিরঞ্জন এই সব নির্লজ্জতা দু চোখে দেখিতে পারিত না। সাবিত্রীকে দেখিয়াই তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর যখন দেখিল প্রতিবেশী-পুত্র যাদব মিত্র কিছুদূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া মেয়েগুলিকে দেখিতেছে, তখন তাহার আপাদমস্তক জলিয়া গেল। দ্রুতপদে গিয়া যাদবের কান ধরিয়া মুখটা সে অন্তদিকে ফিরাইয়া দিল।

বাড়ী আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী তখন ভিজা কাপড় ছাড়িয়া চুল আঁচড়াইয়া সিঁদুর টিপ পরিতেছে। স্বামীকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা জব্দ করেছ বাঁদরটাকে। আমরা হেসে মরি আর কি!"

নিরঞ্জন হাসিল না, মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "এ সব বাঁদরের সৃষ্টি তোমরাই কর। দোষ দুজনেরই, মার খেল অবশ্য একলা সে।"

সাবিত্রী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তার মানেটা কি হল?"

নিরঞ্জন বলিল, "মানেটা এই যে, ওরকম বেহায়ার মত করে পথে ঘাটে চল্লে, যদি কেউ হাঁ করে তাকায়, তাকে দোষ দেবার কোনো অধিকার তোমাদের অন্ততঃ নেই। তোমরাই না জগতের মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাবতী বলে প্রসিদ্ধ? তা হলে ও রকম করে লোকের সামনে বেরোও কোন্ আক্কেলে? একখানা শাড়ীর বেশী কিছু পরলে যদি তোমাদের ধর্ম্মচ্যুত হতে হয়, তাহলে ঘরের মধ্যে থাকা উচিত তোমাদের। বাইরে বেরতে হলে একটু সভ্যভাবে বেরনো দরকার।"

সাবিত্রী রাগের আতিশয্যে কাঁদিয়াই ফেলিল। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "যা মুখে আসে তাই বলবে নাকি আমাকে? আমি একলা ঐ রকম করি নাকি? তোমার বোনেরা করে না? তোমার মা, খুড়ী, জ্যেঠি করেন নি? তাদের বল্‌তে পার এমনি করে?"

নিরঞ্জন বলিল, "না, তা পারি না। কিন্তু তাঁরা করেছেন বলেই অন্যায়টা ন্যায় হয়ে যেতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কেবল পরস্পরকে আদর করবার আর মিষ্টি কথা বলবার নয়। দুজনের সব দিকে উন্নতি অবনতির জন্তে দুজনে দায়ী। আমি অন্যায় করলে বা বোকামী করলে তোমার আমাকে বলবার যেমন অধিকার আছে, আমারও তেমনি আছে।"

সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "দেখতে না পারলে, মানুষের চলন বাঁকা হয়। গোড়ার থেকে আমার কিছু তুমি ভাল চোখে দেখ না। মেম সাহেব পছন্দ ত তাই বিয়ে করলেই হত। তাই যেমন করেছ।"

নিরঞ্জন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ফলে সাবিত্রীর রাগ বাড়িল বই কমিল না। নিরঞ্জনের ছুটি ফুরাইয়া গেল। স্ত্রীর সঙ্গে সব কথায় তর্ক করিয়া তার

তাহার ফোঁশ-ফোঁশানি শুনিয়া শুনিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একরকম সে হাঁফ ছাড়িয়াই বাঁচিল। মনে একটা অশান্তি তাহার থাকিয়াই গেল। নিজের বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ করার প্রতিফল তাহাকে পাইতেই হইবে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। সাবিত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িবার ক্ষমতা তাহার যে নাই তাহা ত দেখাই গেল। এখন হয় চিরদিন তাহাকে একলা কাটাইতে হইবে, না হয় নিজের মতামত বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীর বাধ্য অনুচর হইতে হইবে।

পূজার ছুটিতে সে আর বাড়ী গেল না। তারাসুন্দরী অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া চিঠি লিখাইলেন, সাবিত্রী রাগ করিয়া চিঠি লেখা ছাড়িয়াই দিল, তবু নিরঞ্জনের সঙ্কল্প টলিল না। সে পড়াশুনায় ডুবিয়া রহিল, নিজেকে কিছু ভাবিবার অবকাশও দিল না।

কয়েকটা বছর কাটিয়া গেল। তাহার পড়াশুনার পালা সাঙ্গ হইল, বেশ ভালভাবেই হইল। এখন একবার বাড়ী না যাইলেই নয়।

অবশ্য এ কয় বছরের ভিতর একবারও সে বাড়ী যায় নাই, তাহা নহে। তারাসুন্দরী অত সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না। তবে সববারে সাবিত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত না। নিরঞ্জনের উপর রাগ এবং অভিমান তাহার দিনের দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল। স্বামী যখন তাহাকে একরকম ত্যাগই করিয়াছেন, তাহাকে যখন তাঁহার পছন্দই নয়, তাহা হইলে কেন অনর্থক সে তাঁহার পায়ে পড়িয়া ভাব করিতে যাইবে? সুতরাং ছুটির পূর্ব্বে অত্যধিক রকম কান্নাকাটি করিয়া, সে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইত। যেবার থাকিত সেবার ঝগড়াঝাঁটি হইত, আবার ভাবও হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কলিকাতায় যাইবার সময় দুজনের মনেই একটু অনুতাপ দেখা দিত। সাবিত্রী ভাবিত "ক'টা দিন মাত্র ছিলেন, অত ঝগড়া না করলেই পারতাম। অদৃষ্টে ত বছরের মধ্যে একটা মাসের বেশী ওঁকে চোখে দেখাও লেখা নেই।" নিরঞ্জন ভাবিত, "মানুষের 'স্বভাব যায় না ম'লে' কথাই আছে। সুতরাং শুধু শুধু মেয়েটাকে কাঁদিয়ে আর হবে কি? দুজনে দু পথে চল্‌তে হবে, এটা মেনে নিলেই পারি।"

পরীক্ষায় পাশ যে হইবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ তাহার ছিল না। কাজের সন্ধান কিছু করিয়া তবে বাড়ী যাইবে মনে করিয়া, সে কলিকাতায় একটু দেরী করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময় সাবিত্রীর এক পত্র আসিয়া তাহার সব প্ল্যান উলট্‌পালট্ করিয়া দিল।

সাবিত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছিল। অভিমান করিয়া পূর্ব্বে সেকথা নিরঞ্জনকে সে জানায় নাই। নিরঞ্জন নিশ্চয়ই জানে মনে করিয়া তারাসুন্দরীও আর ছেলেকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি সাবিত্রীর শরীরের অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে, যে স্বামীকে না জানাইয়া আর সে পারিল না। সন্তান হইবার জন্য সে পিতৃগৃহে যাইতেছিল, কারণ তারাসুন্দরী তাহাকে রাখিতে ভরসা পাইতেছিলেন না। নিরঞ্জনকে একবার আসিয়া শেষ দেখা দিয়া যাইবার জন্য সে মাথার দিব্য দিয়া অনুরোধ করিয়া চিঠি শেষ করিয়াছিল।

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি দেশে চলিয়া আসিল। মায়ের কাছে কয়েকদিন থাকিয়া, সে সাবিত্রীকে দেখিতে গেল। পত্নীর অবস্থা দেখিয়া তাহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সাবিত্রীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাবও করিল, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী কাহারও মত হইল না। তাঁহারা নিরঞ্জনের কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। ছেলে হওয়া আর কি এমন ব্যাপার, যাহার জন্য কলিকাতায় দৌড়াইতে হইবে? নিজের বাড়ী হইলে নিরঞ্জন জেদ করিতে পারিত, কিন্তু এখানে সঙ্কোচ বোধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রসবের সময় সাবিত্রীকে লইয়া রীতিমত যমে-মানুষে টানাটানি আরম্ভ হইল। শ্বশুরবাড়ীর লোকে অত্যন্তই গোঁড়া, তাঁহারা খ্রীষ্টান লেডী ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকিতে প্রস্তুত নন। পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ ধাত্রীর উপর তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস। প্রথম দিন নিরঞ্জন কোনমতে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সাবিত্রীর যন্ত্রণাকাতর চীৎকার তাহার লজ্জা সঙ্কোচ সব দূর করিয়া দিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর অমতেই সে ডাক্তার, নার্স প্রভৃতি জোগাড় করিয়া

আনিল। দুই দিন দুই রাত মাতাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করাইয়া নিরঞ্জনের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

সাবিত্রীর অবস্থা একটু ভাল হইতেই নিরঞ্জন কলিকাতায় ফিরিবার জোগাড় করিতে লাগিল। কয়দিন এই আচার-বিচারের অচলায়তনে থাকিয়াই তাহার যেন নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। সকল রকম অন্ধতা এবং অজ্ঞতার উপর সে চিরদিনই খড়্গহস্ত ছিল, এখন তাহার মন আরো কঠিন হইয়া উঠিল, নিজের পত্নীর দশা দেখিয়া। সে উপস্থিত না থাকিলে সাবিত্রী যে নিশ্চয়ই মারা যাইত, এ বিষয়ে তাহার বিন্দু-মাত্র সন্দেহ ছিল না। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার সহিত আপোষে মিটমাট করিয়া একটু শান্তিতে থাকিবার যে ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে সে নির্ম্মমভাবে মন হইতে বিদায় করিয়া দিল। না, এ সংগ্রাম জীবন থাকিতে তাহার মিটিবার নয়। সাবিত্রীর ঘরে যাওয়াটাও এবাড়ীর লোকে পছন্দ করিত না। তবে সে ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যখন স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে গেল তখন কেহ বিশেষ কিছু আপত্তি প্রকাশ করিল না। অশুচি দেহে তাহাদের ছোঁয়া না লাগিলেই হইল।

সাবিত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "আচ্ছা, চল্লাম তবে এখন। দেখো, খুব সাবধানে থেকো। জলটল ঘেঁটে অসুখ বাধিও না যেন।"

শিশু তখন নিদ্রামগ্ন। তাহাকে দেখাইয়া সাবিত্রী বলিল, "এইবার আর উড়ে উড়ে বেড়াতে পারবে না, এইবার পায়ে বেড়ি পড়্‌বে। মায়ার বন্ধন কা'কে বলে বুঝ্‌বে।"

নিরঞ্জন বলিল, "ভাল কথা মনে করে দিয়েছ। খুকীর নাম তাহলে মায়াই থাক।"

সাবিত্রী বলিল, "শুধু মায়া আবার কিরকম নাম হবে? এতটুকু? তার চেয়ে নাম থাক্ মহামায়া। বেশ শুনতেও ভাল, আর ঠাকুর-দেবতার নাম।" নিরঞ্জন বলিল, "তা বেশ, যা তোমার খুসি। যদিও মেয়ের আকৃতি এখন যতটুকু, তাতে "মহা" ওয়ালা নাম ঠিক মানায় না। মায়া বলে ডাকলেই চল্‌বে এখন।"

নিরঞ্জন কলিকাতায় চলিয়া আসিল। মায়ার জন্মগ্রহণে তাহার চোখে জগৎ-সংসার এখন অনেকটাই অন্য মূর্ত্তি ধরিল। সন্তানকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার একটা দৃঢ় সংকল্প তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। মায়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী সে। তাহার শুভাশুভ সকলই নির্ভর করিতেছে তাহার পিতামাতার উপর। সাবিত্রী সম্বন্ধে নিরঞ্জন একরকম হতাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার যে একলা তাহাকেই লইতে হইবে, এবং তাহা লইয়াও যে সাবিত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিবে, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু কন্যা সবেমাত্র কয়েকদিন হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখনও তাহার সম্বন্ধে অত ভাবনা না ভাবিলেও চলে, মনে করিয়া এসব চিন্তা নিরঞ্জন মন হইতে দূর করিয়া দিল। এখন তাহার সাংসারিক উন্নতির বিষয় ভাবিতে হইবে, কারণ অর্থহীন লোকের যে, সকল দিকেই বাধা পাইতে হয়, তাহা নিরঞ্জন এই অল্প বয়সেই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। সে ভাল কাজের চেষ্টায় দিনরাত ঘোরাঘুরি লেখালেখি করিতে লাগিল।

কাজ দুই চারিটা জুটিতে লাগিল, কিন্তু প্রায়ই বাংলা দেশের বাহিরে। পূর্ব্বে হইলে নিরঞ্জন বিন্দুমাত্র আপত্তি করিত না,কিন্তু এখন বাংলা দেশ ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইতে তাহার মন উঠিল না। কন্যাকে তাহা হইলে সে বৎসরে একবারও দেখিতে পাইবে কিনা সন্দেহ। অবশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প টাকারই একটা চাকরী লইয়া সে কলিকাতার কাছাকাছি এক জায়গায় বাসা করিয়া বসিল।

সাবিত্রী এবং মায়াকে নিজের কাছে লইয়া আসিবার একটা আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ক্রমাগত অস্থির করিতে লাগিল। কিন্তু সহজে যে তাহা হইবার নয়, তাহাও সে মনে মনে বুঝিল। তারাসুন্দরী ত বাধা দিবেনই, এবং সাবিত্রী নিজেও আসিতে চাহিবে না। তবু, চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছায়, নিরঞ্জন মাতা এবং পত্নী, উভয়কেই এ বিষয়ে চিঠি লিখিল।

যেমন আশঙ্কা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল অবশ্য। তারাসুন্দরী কান্নাকাটি, অনুযোগ, হা হুতাশ করিলেন

তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। নিরঞ্জনও তাহা হইলে মনোরঞ্জনের দলেই ভিড়িতে চায়? মায়ের সুবিধা অসুবিধা দেখা কি কলিকালের ছেলেদের বারণ? স্বার্থই কি সব? বাপ-পিতামহের আদর্শ দেখিয়াও কি তাহারা শেখে না? ইত্যাদি।

সাবিত্রীর নিকট হইতেও বিশেষ আশাজনক উত্তর কিছু আসিল না। শাশুড়ী যাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন এমন কোনো কাজ করা তাহাদের উচিত নয়। তাহার উপর মায়া এখন একেবারে শিশু, সাবিত্রী একলা তাহাকে সামলাইতে পারে না, কিছুদিন মা বা শাশুড়ী কাহারও নিকটে তাহার থাকা প্রয়োজন। তাহার নিজেরও শরীর ভাল নয়, সহরে গিয়া আরও হয়ত খারাপ হইবে। নিরঞ্জন বুঝিল, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া তাহার কাছে আসিয়া থাকার ইচ্ছা স্ত্রীর নাই। দেশে থাকিলে সে আপনার মতে চলিতে পারে, কারণ নিরঞ্জন ভিন্ন সকলেই তাহার সঙ্গে সেখানে একমত। কিন্তু এখানে আসিলে নিতান্তই স্বামীর হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িতে হইবে, মনে মনে এ ভয়ও সাবিত্রীর ছিল বোধ হয়।

নিরঞ্জন তখনকার মত চুপ করিয়া গেল। সুবিধা পাইলেই বাড়ী গিয়া সে স্ত্রী কন্যাকে দেখিয়া আসিত। মায়ার চেহারা তাহার সুন্দরী মাতার ধরণেরই হইয়াছিল, আশেপাশে ও নিজের বাড়ীতে তাহার আদরের সীমা ছিল না। আদরের আতিশয্যে মেয়ের পাছে মাথা ঘুরিয়া যায়, এ ভয় নিরঞ্জনের মধ্যে মধ্যে হইতে লাগিল।

মায়া যখন দুই বৎসরের তখন নিরঞ্জন আরও ভাল কাজ পাইল। এবারও সাবিত্রীকে লইয়া যাইতে চাহিল। তারাসুন্দরীর শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে, সেই ওজরে, এবারও সাবিত্রী যাইতে অস্বীকার করিল।

নিরঞ্জন বুঝিল, স্ত্রী কন্যা লইয়া ঘর করা তাহার অদৃষ্টে নাই। কর্মস্থানে একলাই গেল। তবু মায়ার বন্ধনে যে সে সত্যই ধরা দিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল। ছুটি পাইলেই মেয়েকে আসিয়া দেখিয়া যাইত।

(৪)

তারাসুন্দরীর শ্রাদ্ধের পর, দিন-তিন-চার কাটিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জনের ছুটি আর মাত্র কয়েকদিন আছে। এবারে যে কি প্রকার ব্যবস্থা করিয়া যাইবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। সাবিত্রীকে এখন আর এখানে রাখার কোন প্রয়োজনই নাই। বরং রাখার অনেক অসুবিধা। কে তাহাদের দেখাশোনা করিবে? আশেপাশে জ্ঞাতিশত্রুর অভাব নাই। তারাসুন্দরী বাঁচিয়া থাকিতে, বিশেষ ভাবনা ছিল না। এক কথা শুনিলে, তিনি বাড়ী বহিয়া গিয়া দশ কথা শুনাইয়া আসিতেন। কিন্তু সাবিত্রী ছেলেমানুষ এবং বউ মানুষ, সে এতটা জোর খাটাইতে পারিবে না। নিরঞ্জনের বোন ইন্দু বৎসর-খানেক হইল, বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, সেও সাবিত্রীর সমবয়সী, কাজেই বউয়ের তত্ত্বাবধান করা তাহার দ্বারা হইবে না। ছোট বোন শ্বশুরবাড়ীতে, এবং ছোট দুটি ভাইয়ের ভিতর বড়টি কলিকাতার কলেজে পড়ে, ছোটটি এই বৎসর গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে।

নিরঞ্জনের ইচ্ছা ছিল যে, সাবিত্রীকে এবং ইন্দুকে নিজের সঙ্গে লইয়া যায়। ছোট ভাই ইচ্ছা করিলে তাহার সঙ্গেও থাকিতে পারে, না হয় কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়াও পড়াশুনা করিতে পারে। দেশের বাড়ী বন্ধ করিয়া গেলেই হইবে। আত্মীয়-স্বজনেরও অভাব নাই, তাহাদেরও কাহাকেও আনিয়া বাড়ীর চৌকিদারী করিতে রাখিয়া যাওয়া যায়। অবশ্য পরিবার দেশে থাকিলে খরচপত্রের দিক দিয়া অনেক সুবিধা; সঙ্গে লইয়া গেলে, নিরঞ্জনের মাহিনার প্রায় সবই খরচ হইয়া যাইবে, টাকা জমানো বেশী ঘটিয়া উঠিবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, উহাদের সঙ্গে লইয়া যাওয়াই সে সবদিক দিয়া শ্রেয় বিবেচনা করিতেছিল।

কিন্তু এবারেও তাহা ঘটিয়া ওঠা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। সাবিত্রীর মতামতের দৃঢ়তা বয়সের সঙ্গে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। আচারনিষ্ঠায় এবং দেবদ্বিজে ভক্তিতে এখন যে কোনো বর্ষীয়সীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে জয়লাভ করিতে পারে। দিনে কতবার যে সে স্নান করে এবং কাপড় ছাড়ে, তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। বালিকা মায়ার পৃষ্ঠে চড় কিল প্রায় সারাদিনই বর্ষিত হয়, তাহার ম্লেচ্ছ ধরণধারণের জন্য। নিরঞ্জন

আসিবার সময়, সখ করিয়া মেয়ের জন্য জুতা মোজা, রেশমী ফ্রক প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই ফ্রক, মোজা, জামা, জলে কাদার চোটে শুদ্ধ হইয়া এমন রূপ ধারণ করিল যে, রেশম বলিয়া সেগুলিকে চিনিবার আর কোনো উপায় রহিল না। অবশেষে জুতাজোড়াও যেদিন এঁটো ভাত মাড়ানোর অপরাধে, সাবিত্রী বেশ করিয়া ধুইয়া দিল, সেদিন নিরঞ্জন সেগুলিকে ছুঁড়িয়া একেবারে প্রাচীর পার করিয়া দিল। স্ত্রীর সম্বন্ধে কি যে করা যায় ভাবিয়া আর সে পার পাইল না। ইহাকে রাখিয়া গেলেও বিপদ, লইয়া গেলেও বিপদ। তবু শেষোক্ত বিপদটাই বরণ করিয়া লইবার জন্য সে মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। স্ত্রীরও সংশোধনের অতীত অবস্থা, কিন্তু মায়াকেও আর বেশীদিন কেবলমাত্র তাহার হাতে ফেলিয়া রাখিলে, সেও শীঘ্রই মাতার পদানুসরণ করিবে।

সেদিন দুপুরবেলা খাইয়া-দাইয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছিল। মায়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিরঞ্জন একখানা বই লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিল, সাবিত্রী কিছুদূরে বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিল।

বই পড়িতে পড়িতে নিরঞ্জনেরও একটুখানি তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরে সজাগ হইয়া সে আবার বইখানা চোখের সামনে ভাল করিয়া তুলিয়া ধরিল।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "আর তোমার ছুটি ক'দিন?"

নিরঞ্জন বলিল, "বেশী আর কৈ? শেষ ত হয়ে এল। আর হপ্তাখানেক মাত্র।"

সাবিত্রী বলিল, "সবাই আছে, অথচ একজনের অভাবে বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছে। এবার তুমি চলে গেলে, মনে হবে যেন একলা বাড়ীতে আছি।"

নিরঞ্জন ভাবিল, তাহা হইলে এখানে থাকা সাবিত্রী স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মুখে বলিল, "এবার ত তোমাদের সকলকে নিয়েই যাব ভাবছি।"

সাবিত্রীর হাত হইতে কাঁথা পড়িয়া গেল। সে বলিল, "ওমা, তা কি করে হবে? বাড়ী-ঘর দেখবে কে? ঠাকুরঝি রয়েছে, ছোট ঠাকুরপো রয়েছে, তাদের ফেলে যাওয়া যায় নাকি?"

নিরঞ্জন বলিল, "তাদের ফেলে যাওয়ার কথা কে বলছে? তোমার ওজর একটা না একটা লেগেই আছে। ইন্দু, খোকা আমাদের সঙ্গেই যাবে। খোকাকে কলকাতার স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। মেয়েটাও পাঁচ বছরের হতে চল্‌ল, ওরও কিছুদিনের মধ্যেই পড়াশুনো আরম্ভ করতে হবে, নইলে একেবারে বয়ে যাবে।"

সাবিত্রী বলিল, "সে তোমার যা খুসি। মেয়ের উপর আমার হাত নেই। আমি কিন্তু ঘর ছেড়ে যেতে পারব না। মা মরবার সময় তাঁকে কথা দিয়েছি শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যাব না। ঘরে প্রদীপ জ্বলবে না, গৃহদেবতা উপোস থাকবেন, এতে অকল্যাণ হবে না?"

নিরঞ্জন বলিল, "তা বেশ, সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে দেখ্‌ছি। আমার সঙ্গে তাহলে তুমি কিছুতেই যাবে না?"

সাবিত্রী বলিল, "কি করে আর যাওয়া চলে?"

নিরঞ্জন বলিল, "ভাল! কিন্তু নিজে যখন তুমি নিজের মতেই চল্‌বে, তখন আমিও তাই চল্‌ব। এতদিন ভাল ভাল কাজ সব হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি, কেবল তোমাদের কাছাকাছি থাকার জন্যে। কিন্তু সেটা আমার বোকামীই হয়েছে, কারণ আমার সঙ্গের কোনো প্রয়োজন তোমার নেই। এখনও ইচ্ছে করলে ভাল কাজ আমি পেতে পারি, দূরে গেলে। এবার তাই যাবও। কিন্তু জিগ্‌গেষ করি আমার সঙ্গে যেতে এত প্রবল আপত্তি হওয়ার কারণটা কি? আমি তোমায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল্‌ব বা কেটে ফেল্‌ব, এ রকম মনে করার কোনো হেতু আছে কি?"

সাবিত্রী খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "মরা মানুষকে কথা দিয়েছি। শ্বশুরের ভিটেয় প্রদীপ না জ্বললে তিনি স্বর্গ থেকে অসন্তুষ্ট হবেন।"

নিরঞ্জন বলিল, "তার বেশ ভাল ব্যবস্থা করে, তবে তোমাদের নিয়ে যাব।"

সাবিত্রী তখন বলিল, "দেখ, তবে আসল কথা খুলেই বলি। সহরে গিয়ে আমি থাকতে পারব না। সেখানে আচার-বিচার কিছু রক্ষা করা যায় না। তুমি আমার কথামত কিছু চলবেও না। এই নিয়ে ক্রমাগত ঝগড়া-ঝাঁটি হতে থাকবে। সুখশান্তি কিছু থাকবে না। তার চেয়ে যে যার মত থাকা ভাল নয় কি? বেশ ত আছি, মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎও হচ্ছে।"

নিরঞ্জনের মুখ একেবারে প্রলয়াকাশের মত কাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এই জন্যে যেতে চাও না? স্বামীর চেয়ে তোমার আচারই বড় হল?"

সাবিত্রী বলিল, "হিন্দুর মেয়ে ধর্ম্ম ছাড়লে তার আর থাকে কি?"

নিরঞ্জন বলিল, "আমার সঙ্গে গেলে তোমায় ধর্ম্ম ছাড়তে হবে?"

সাবিত্রী কলহের স্বরে বলিল, "তা এক রকম হবে বৈকি? এমনিতেই বলে কত কথা শুনি, আমার মা-বোনেরা জিগগেস করলে চেপে যাই।"

নিরঞ্জন বলিল, "কি শোন? চেপে যাবার মত কি কথা তুমি শুনতে পার?"

সাবিত্রী বলিল, "তুমি নাকি হোটেলে মুরগী খাও, পৈতে ফেলে দিয়েছ। আবার নাকি ব্রাহ্মসমাজেও যাও? তোমার কলকাতার লোকেই বলেছে।"

নিরঞ্জন বলিল, "কিছু মিথ্যে কথা বলে নি।"

সাবিত্রী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এই ত নিজের মুখেই স্বীকার পেলে। তবে আমি যাই কি করে? শেষে আমাকেও জুতো মোজা ঘাঘরা পরিয়ে, ব্রাহ্মসমাজে টেনে নিয়ে যাও আর কি? আমার বাপ-মা আর তাহলে আমার ছোঁয়া জল খাবে না।"

নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িল, বলিল, "ভাল, সব কথা খোলাখুলি যে হয়ে গেল, তাতে লাভ বই লোকসান নেই। এইখানেই থাক, যেমন খুসি থাক। মেয়েকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এর পর কোথায় কখন থাকব কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। অতটুকু বাচ্চা, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবেও না। আর বছর পরে ওকে নিয়ে যাব। কিন্তু তুমি আর কোনোরকমের কোনো দাবী আমার উপর রেখো না। মনে মনেও না।"

সাবিত্রী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। নিরঞ্জন উঠিয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন তাহার পরদিনই যাত্রার জোগাড় দেখিতে লাগিল। ভাই-বোনেরাও এইখানেই থাকিবে স্থির হইয়া গেল। মায়াকে পড়াইবার জন্য গ্রামের পণ্ডিত মহাশয়কে সে বলিয়া স্থির করিয়া গেল।

সাবিত্রী দুই চারবার আবার তাহার না যাওয়ার কারণগুলি ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিরঞ্জন আর সে সকল কথায় কানই দিল না। পত্নীর ব্যবহারে তাহার মনে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল। পত্নীর প্রতি মমতা ভালবাসা তাহার যথেষ্টই ছিল। ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই হওয়া সত্ত্বেও সে এতদিন মনে করিত, সাবিত্রীও তাহাকে ভালই বাসে। কিন্তু এতদিনে বুঝিতে পারিল স্বামীর প্রতি ভালবাসার অভাবই এত কলহের প্রধান কারণ। তাহার কাছে স্বামী সংসারের পাঁচটা মানুষের একটা, শাস্ত্রে আছে স্বামীকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে হয়, তাই সে যতটা পারে ভক্তি করিতে চেষ্টা করে। হিন্দুর মেয়ে, স্বামীর উপরেই তাহাদের একমাত্র নির্ভর, সুতরাং প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে সে এতদিন পারিয়া ওঠে নাই। কিন্তু যখনই স্বামীর জন্য তাহার মতামত বা স্বার্থ একটু কণামাত্র ছাড়িবার ডাক আসিয়াছে, তখনই সে উগ্রভাবে অস্বীকার করিয়াছে। যাহার হৃদয়কেই সে জয় করিতে পারিল না, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে তাহাকে দখল করিয়া রাখার ইচ্ছাও নিরঞ্জন মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতায় অধিকার আছে। সাবিত্রী হিন্দু ঘরের স্ত্রী হইলেও মানুষ; তাহার জীবনে স্বামীর যদি প্রয়োজন কিছু নাই-ই থাকে, তাহা হইলে নিরঞ্জন কেন বর্ব্বরের মত সেখানে স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে? তবে মায়ার প্রতি তাহার অধিকার সে ত্যাগ করিবে না। তাহার সন্তানের শুভাশুভের জন্য সেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কন্যা যাহাতে মনুষ্য জীবনকে সার্থক করিতে পারে, এমন শিক্ষাদীক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তাহার জীবন

যেন কোথাও পঙ্গু না হয়, তাহার দৃষ্টি যেন ক্ষীণ না হয়। কিন্তু এখনই তাহাকে লইয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। সম্মুখের কয়েকটা বৎসর তাহাকে কেবল প্রাণপণে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। এই একমাত্র সন্তান তাহার মায়া, তাহাকে যেমন করিয়া গড়িতে সে চায়, তাহার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাহার হইবে। তখন যেন অর্থাভাবে তাহাকে বিফলপ্রযত্ন না হইতে হয়।

নিরঞ্জন যে একেবারেই যাইতেছে তাহা সাবিত্রী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। তাহার জিনিষপত্র বাঁধা হইতেছে দেখিয়া মায়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি যাব তোমার সঙ্গে।"

নিরঞ্জন বলিল, "এর পরের বার এসে তোমায় নিয়ে যাব, মা।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার ক'দিন পরে আস্‌বে বাবা ?"

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে বলিল, "অনেকদিন পরে, মা।"

মায়ার স্বভাব, কথা একবার আরম্ভ করিলে সে সহজে থামিতে চায় না। আবার প্রশ্ন হইল, "আমার জন্যে কি আন্‌বে ?"

নিরঞ্জন বলিল, "তোমার জন্যে সব আনব, যা যা চাও।"

এমন লোভনীয় সম্ভাবনায় অতিশয় খুসি হইয়া মায়া পিসীমাকে খবর দিতে চলিয়া গেল।

নিরঞ্জনের ট্রেন দুপুরে। সকাল সকাল স্নানাহার সারিয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল। সাবিত্রী সকাল হইতে বিষণ্ণ হইয়া আছে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াটা এতখানি প্রবলরূপ ধরিবে, তাহা সে মনেও করে নাই। স্বামী কি সত্যই তাহাকে ত্যাগ করিলেন নাকি? ইহার পর লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? সকলে তাহাকেই দোষী করিবে। যে বাপের বাড়ীর নিন্দার ভয় তাহার এতখানি, তাহারাই কি আর তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিবে? মা বাবা নাই বলুন, বোনেরা ভাজেরা এই লইয়া নিশ্চয় বলাবলি করিবে। কিন্তু সাবিত্রী নিরুপায়। স্বামীর মতিগতি যেদিকে গড়াইতেছে, আর কিছুদিনের মধ্যে সে খ্রীষ্টান কি ব্রাহ্ম কিছু একটা হইয়া বসিবে। তাহার সঙ্গে থাকিতে হইলে সাবিত্রীকে আত্মীয়স্বজন, ধর্ম্ম, মত, সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তাহা হইলে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? মা গঙ্গা তাহাকে শীঘ্র কোলে টানিয়া লইলে সে বাঁচে। হিন্দুর মেয়ে সে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কুলে তাহার জন্ম। তাহাকে যেন শেষে গোভাগাড়ে গিয়া মরিতে না হয়। ইহকালে সুখ অদৃষ্টে নাই, কিন্তু পরকালে সদ্গতি যেন হয়।

ইন্দু আসিয়া প্রণাম করিল। বলিল, "মেজদা, পৌঁছেই খবর দিও। কি করে যে এ বাড়ীতে থাক্‌ব।"

নিরঞ্জন বলিল, "হ্যাঁ খবর দেব। তুই চিঠিপত্র লিখিস্‌। বুড়ো পণ্ডিত ঠিকমত মায়াকে পড়ায় কিনা জানাস্‌। তাকে মাসে মাসে দশটাকা করে পাঠাব, ঠিক করে যাচ্ছি।"

ইন্দু বলিল, "ওসব খবর ত বৌয়ের চিঠিতেই পাবে।"

নিরঞ্জন বলিল, "তবু তুই লিখিস্‌ ত। খোকাকে দিয়ে ইংরিজীতে ঠিকানা লিখিয়ে নিস্‌। ভাল চাকরি গোটা-দুই সন্ধানে আছে, বাংলা দেশের বাইরে। সেখানে ইংরিজীতে ঠিকানা না লিখ্‌লে চিঠি পৌঁছবে না।"

ইন্দু এসব কথার সোজাসুজি অর্থই বুঝিল। সাবিত্রী আধঘোমটা দিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বুঝিল, নিরঞ্জন আর তাহার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সম্পর্কও রাখিবে না। বাড়ীর খবর যাহাতে বোনের চিঠিতেই পায় তাহার জন্যই এত ব্যবস্থা দিয়া যাইতেছে।

মায়াকে চুম্বন করিয়া নিরঞ্জন গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সাবিত্রীকে কোনোপ্রকার বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া গেল না।

বৌয়ের মন ভাল নাই মনে করিয়া ইন্দু খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে একলা রাখিয়া নিজেই ঘরের কাজ করিতে লাগিল। মায়াকেও কাছে কাছে রাখিল।

কিন্তু মায়ার দুধ-খাওয়ানোর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু সাবিত্রীর দেখা নাই। ইন্দু এঘর-ওঘর খুঁজিয়া দেখিল, সাবিত্রী ঠাকুর-ঘরে। বিগ্রহের সম্মুখে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

ইন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওকি বৌ? অমন করে কাঁদ্‌তে আছে? দাদার অকল্যাণ হবে যে? দুদিনের জন্য গেছে বই ত নয়? বাবা, এত ঢংও তোমাদের আসে!"

সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঢংই বটে! চির-দিনের মত স্বামী মুখে ঝাঁটা মেরে ত্যাগ করে গেল, একটু কাঁদলেও সেটা ঢং হল?"

ইন্দু বলিল, "ওমা, কি বলগো? ত্যাগ করে গেল কি রকম? কেন?"

সাবিত্রী বলিল, "মেমসাহেব সাজতে পারিনি,আচার-বিচার ছাড়তে পারিনি,এই অপরাধ। তোমাদের সামনেই রয়েছি, আমার আর কি অপরাধ হয়েছে তোমরাই বল।"

ইন্দু বেশী উত্তেজনা বা আবেগের সময় সাবিত্রীকে তুই-তোকারি করিতেও ছাড়িত না। সে বলিল, "এই সব নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ বুঝি? ছেলের মা হলি, তোর বুদ্ধি হবে কবে? পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি লড়াই করে জেতা যায়? তাদের কাছে হার মেনেই, তাদের হার মানাতে হয়।"

সাবিত্রী বলিল, "হিন্দুর মেয়ে হয়ে, আচার-বিচার সব বিসর্জ্জন দিতে বল? তাহলে বেঁচে লাভ কি?"

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, "তোদের মধ্যে কতদূর কি হয়েছে জানি না বাপু। তবে দাদা যদি সত্যি না আসে আর, তাহলে এমনিতেও আর বেঁচে তোর কোনো লাভ হবে না। স্বামীকে এ জন্মের মত হারিয়েছি, তাই তার মূল্য এখন ভাল করে বুঝি। মরবার সাহস নেই, তাই মরতে পারি না, কিন্তু আমার বাঁচার কোনো মানে নেই। ধর্ম্ম রাখার জন্যে স্বামী ছাড়লি? ধর্ম্ম তোকে কি সান্ত্বনা দেবে লো? মেয়েমানুষের দেবতা পাথরের ঠাকুর নয় রে, রক্তমাংসের মানুষ। তুই তোর ঠাকুরকেও আজ হারিয়েছিস্ স্বামীর সঙ্গে। ফিরোবার পথ যদি থাকে ত তাকে ফিরিয়ে আন্।"

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ

ভারতীয় মহিলারা যে উত্তরোত্তর শিক্ষামূলক ও সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন,—ইহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণের কথা।

কুমারী নির্ম্মল হাজরা—হোলকার-রাজ্যের রাজধানী ইন্দোরে গত বড়দিনের ছুটিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য—প্রবাসী বাঙালী-সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের শিক্ষা ও প্রচার। দুই বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর অধিবাসীরা এই সম্মিলনের শাখারূপে একটি মহিলা-সম্মিলনের সূচনা করেন। এবার ইন্দোরে মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকার কার্য্য করিয়াছিলেন—কুমারী নির্ম্মল হাজরা। এই প্রবাসী বঙ্গ-মহিলা যে কৃতিত্ব ও নিপুণতার সহিত সম্পাদিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়।

কুমারী নির্ম্মল হাজরা

শ্রীমতী যমুনা বাঈ হিরলেকর, এম-এ বোম্বাই প্রদেশে সমাজের হিতকর কার্য্য করিয়া তথাকার জন-সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন। ইণ্টারমিডিয়েটে

শ্রীমতী যমুনা বাঈ হিরলেকর

গঙ্গা বাঈ ভাট-বৃত্তি এবং এম-এ পরীক্ষায় কুমারী মানকর-বৃত্তি লাভ করিয়া, এই বিদুষী মহিলা এলাহাবাদের ক্রসথোয়েট বালিকা-বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিন বৎসর সেখানে কাজ করিবার পর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। দেড় বৎসর যাবৎ ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী পরিভ্রমণ করিয়া, শ্রীমতী যমুনা বাঈ পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

কুমারী জৈনাব রহীম—একজন সুশিক্ষিতা বাঙালী মুসলমান-মহিলা। বাল্যে ইনি কলিকাতার ডায়োসেসন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। গত বৎসর তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুমারী জৈনাব এখন প্রধান

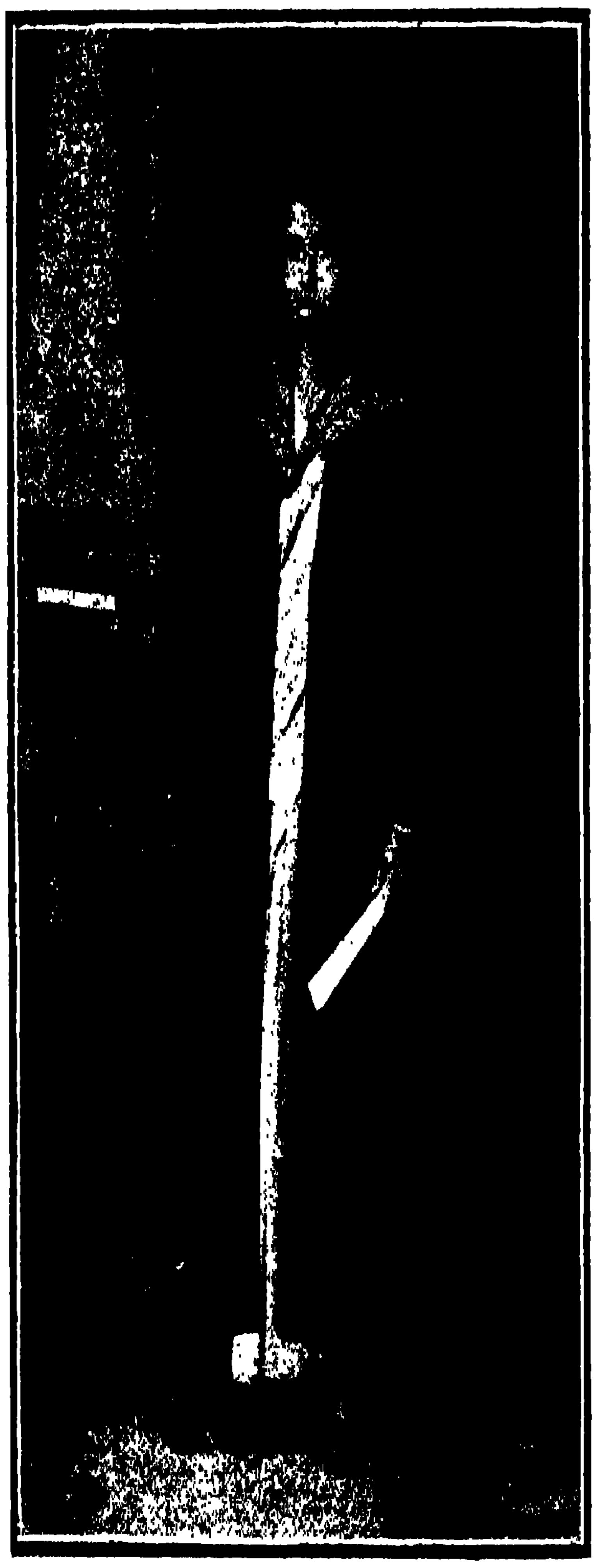

কুমারী জৈনাব রহীম

শিক্ষয়িত্রীরূপে দিনাজপুরে একটি বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। কুমারী জৈনাব তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য শীঘ্রই ঢাকা যাত্রা করিবেন।

—

কুমারী মন্দাকিনী পণ্ডিত—গুজরাট কলেজের 'ফেলো' ও এম-এ ক্লাসের ছাত্রী। গুজরাট কলেজের ছাত্র-ধর্ম্মঘটে তিনি নেতৃত্ব করিয়াছিলেন—অধ্যক্ষ ফিন্‌লে শিরাজ

কুমারী মন্দাকিনী পাণ্ডত

এই অপরাধে তাঁহাকে 'ফেলো' পদ হইতে অপসারিত করিবার ভয় দেখাইয়াও কৃতকার্য্য হন নাই।

—

ডাক্তার যমুনা দেশাই—মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত, 'স্পার্ক' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক এম্-জি-দেশাই মহাশয়ের পত্নী। শ্রীমতী দেশাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি, বি-এস্ পরীক্ষা পাশ করিয়া ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য বিলাত গমন করেন এবং সেখানে এডিনবরার এল্-আর-সি-পি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বর্ত্তমানে বোম্বাই প্রদেশে নারী-চিকিৎসকগণের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ও যশ সমধিক। তাহা ছাড়া দেশাই মহাশয়ের গ্রেপ্তারের পর শ্রীমতী দেশাই স্বয়ং স্বামীর আরব্ধ কার্য্যও পরিচালনা করিতেছেন।

—

কুমারী আনন্দ বাঈ—এ্যাডভোকেট-রূপে মাদ্রাজ হাইকোর্টে যোগদান করিয়াছেন।

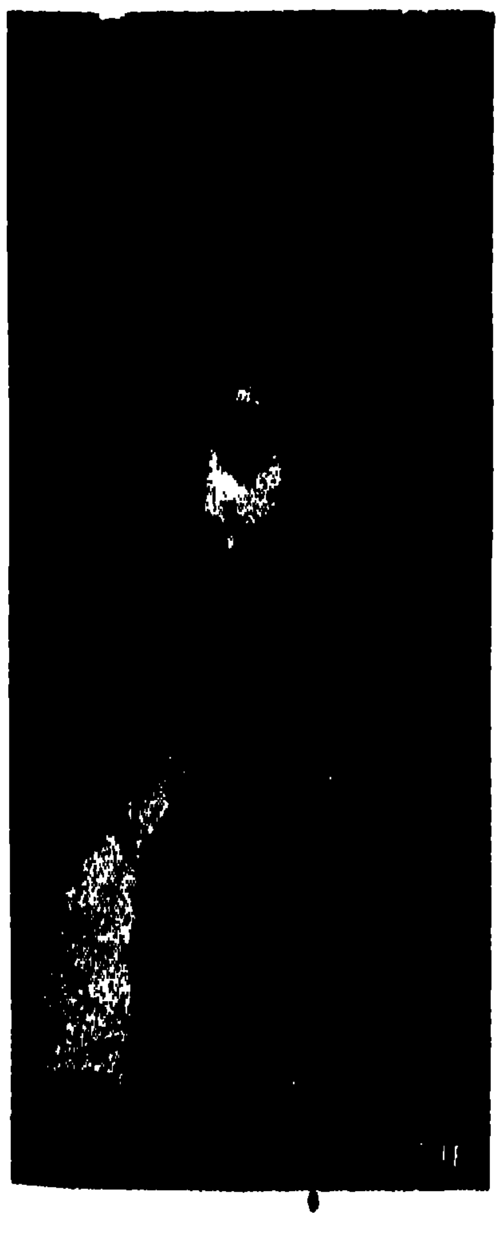

ডাক্তার যমুনা দেশাই

কুমারী আনন্দ বাঈ

লেডী বিদ্যাগৌরী রমণভাই নীলকণ্ঠ—গুজরাটের লোকনেতা স্বর্গীয় স্যার রমণভাই মহীপতরাম নীলকণ্ঠের পত্নী। তিনি নিজের জীবনকে সমাজ-হিতব্রতে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি গুজরাটের প্রায় সমুদয় লোক ও সমাজহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

লেডী বিদ্যাগৌরী রমণভাই

শ্রীমতী বিনোদিনী রমণভাই নীলকণ্ঠ, বি-এ তাঁহার কন্যা। তিনি গুজরাট ভাষায় "রসদ্বার" নামে একটি ছোটগল্পের বই প্রণয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার জন্য বৃত্তি পাইয়াছেন।

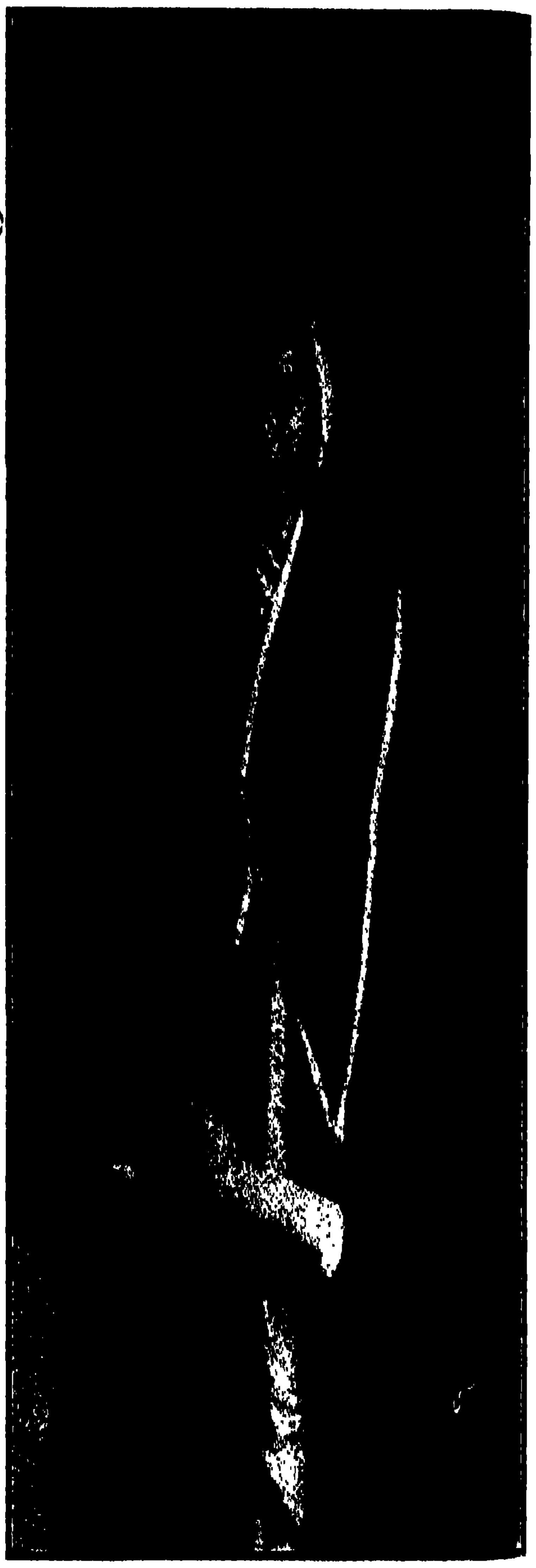

শ্রীমতী বিনোদিনী রমণভাই

মুক্তির মূল্য

শ্রীসীতা দেবী

অদূরবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছ'টা বাজিতেই মা তানের ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। সারারাত গরমে তাহার ঘুমই হয় নাই, তবু বেশী বেলা করিবার তাহার উপায় নাই। সকালের ট্রেন আসিয়া পড়িল বলিয়া। এখনি হুড়মুড় করিয়া যাত্রীর দল আসিয়া পড়িবে, তখন কাজ সামলান দায় হইবে।

বড়রাস্তার উপর প্রৌঢ়া মা তান্ বাস করে। তাহার একটি হোটেল আছে। ইহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন ত চলেই, তাহার উপর বিলক্ষণ দু পয়সা হাতেও থাকিয়া যায়। বাহির হইতে দেখিলে অবশ্য ঘরটিকে হোটেল বলিয়া মোটেই মনে হইবে না। বারান্দায় দুখানা তক্তপোষ, তাহার উপর মোটা মোটা চাটাই বিছানো। ঘরের ভিতরটায়ও আসবাব-পত্র বেশী নাই। গুটি দুই তিন বাক্স কাঠের বেঞ্চির উপর রক্ষিত, একটা আলমারি, দুটা চেয়ার, একটা ছোট টেব্‌ল্। কাঠের পার্টিশন দিয়া ঘরখানি দুই অংশে বিভক্ত। একটা অংশ একেবারে খালি, কেবল কোণে কতকগুলি চাটাই এবং পাটি গুটানো রহিয়াছে। এই ঘরে যাত্রীরা রাত্রিবাস করিয়া থাকে। অবশ্য ঘরে থাকিতে তাহারা বিশেষ পছন্দ করে না, কারণ এখানে আলো-বাতাসের বিলক্ষণ অভাব, এবং পিছনের ময়লা গলির দুর্গন্ধ ব্রহ্মদেশীয় নাসিকাকেও কাতর করিয়া তোলে। কাজেই বৃষ্টির দিন না হইলে যাত্রিগণ বারান্দায় এবং সামনের ফুটপাথে চাটাই বিছাইয়া মনের আনন্দে নিদ্রা দেয়। হাওয়া পাওয়া যায় খুব এবং দশটার পর ফুটপাথে লোকচলাচল এতটা কমিয়া যায় যে, পথিকের অসতর্ক পদক্ষেপে আহত হইবারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

আশেপাশে সবই দোকান এবং হোটেল। সব ...জাদা জায়গা, দিব্য ফিট্‌ফাট্ সাজান। একপাশে চীনা ভোজনাগার, তাহার প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড, সাদা জমির উপর বড় বড় কালো চীনা অক্ষরে লেখা, এক লাইন ইংরেজী লেখাও আছে, একটা পাউরুটির ছবিও আছে। এখানে ইংরেজ, ফিরিঙ্গী, গোরা সৈনিক, সারাক্ষণই আসে, সুতরাং একটু সাহেবীয়ানা না করিয়া উপায় নাই। জায়গাটি খুব পরিষ্কার, চীনা 'বয়'গুলি দিনে দশবার দরজার সামনে ঝাঁট দেয়, চেয়ার টেব্‌ল মুছিয়া রাখে। যখন খরিদ্দার থাকে, তারা একমনে কাজ করিয়া যায়, যখন হাত খালি থাকে, তখন ফুটপাথের উপর বল খেলে, পরস্পরের পিঠের উপর দিয়া লাফ মারে।

মা তানের দোকানের অপর পার্শ্বে মোটর মেরামত এবং রং করিবার কারখানা। দুই বিপুলদেহ মূর্ত্তি মুসলমান ইহার স্বত্বাধিকারী। তাহাদের চেহারাগত সাদৃশ্যে বোঝা যায়, ইহাঁরা দুই ভাই হইবে। তাহারা নিজেরা কোনো কাজই করে না। দুখানা বড় বড় চেয়ার টানিয়া, একরকম রাস্তার উপরেই আসিয়া বসে, এবং সাহেব-সুবা কাজে আসিলে তাহাদের সঙ্গে গম্ভীর ভারিক্কি চালে কথাবার্ত্তা বলে। ভিতরে দশবারোজন মুসলমান এবং বর্ম্মা কারিগর অবিশ্রান্ত খাটিয়া যায়, সমস্ত দিন তাহাদের নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। তাহাদের নিপুণ হাতের সেবায়, ভগ্ন, জীর্ণ বিবর্ণ, এক একখানা গাড়ী নবযৌবন লাভ করিয়া ঝক্‌ঝকে, চক্‌চকে রূপে পাড়ার বালকবৃন্দকে লুব্ধ, বিস্মিত করিয়া বাহির হইয়া আসে। এক একখানি গাড়ীর কাজ হইয়া যায়, আর সেটাকে সকলে ঠেলিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিয়া যায়। তাহার পর যাহার গাড়ী, সে আসিয়া, বিল চুকাইয়া দিয়া, গাড়ীখানা হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কারখানাটি যেন এক মোটরকারের এক্‌জিবিশান্। এখানে বিপুলাকৃতি মোটর বাস্ হইতে, ক্ষুদ্রাকার 'বেবী অস্‌টিন্' পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতীয় গাড়ীই দেখিতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সামনে, পিছনে, এদিক, ওদিকে জমকালো

দোকানের অভাব নাই। কাছাকাছি গোটা-দুই বায়োস্কোপও আছে, সন্ধ্যা হইবামাত্র ব্যাণ্ডের আওয়াজে কানে তালা ধরে, সারি সারি বৈদ্যুতিক আলোয় পথিকের চোখ ঝলসিয়া যায়।

ইহাদের ভীড়ে, মা তানের হোটেল পথিকের চোখে ধরাই পড়ে না। না আছে সাইন্‌বোর্ড, না আছে বৈদ্যুতিক আলো, না আছে শাদা রং করা বড় বড় দরজা। কোন্‌কালে বাড়ীওয়ালা দয়া করিয়া ঘরের সামনে এবং ভিতরে খানিকটা হলদে রং লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহার পর আর কিছু করা প্রয়োজন মনে করে নাই। মা তানও এ লইয়া কিছু উচ্চবাচ্য করে না, কারণ ঘর দেখিতে যেমনই হউক, তাহাতে তাহার যাত্রি-সমাগমের কোনোই হানি হইবে না। সৌন্দর্য্যবোধও তাহার কিছু প্রবল ছিল না, সুতরাং চূণবালি-খসা দেওয়াল এবং বিবর্ণ দরজা-জানালা তাহার চক্ষুকে বিন্দুমাত্রও পীড়া দিত না। অন্যান্য দোকান বা হোটেলের মত লোকের চক্ষে সে ধাঁধা লাগাইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাতে কিই বা আসিয়া যায়? তাহাদের অনেকের চেয়ে আয় তাহার বেশী এবং ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা কম। ঘরভাড়া তাহার পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র। বহুকাল হইল, এ বাড়ী যখন প্রথম তৈয়ারী হয়, তখন হইতে সে এখানে আছে। বাড়ীওয়ালা, পুরানো ভাড়াটিয়া বলিয়া, তাহার ঘরের ভাড়া আর বাড়ায় নাই, যদিও অন্য ঘরগুলির ভাড়া যথেষ্টই বাড়িয়া গিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো সে জ্বালায় না, কাজেই মাসের শেষে কুড়ি-পঁচিশ টাকার বিলও তাহার আসে না। ছ'পয়সার কেরসিন তেল কিনিলে তাহার দুদিন কাটিয়া যায়। চাকর-বাকর রাখার উৎসাহ তাহার নাই। খালি দুই বেলা ভাত দিয়া বুড়ী মা পোয়েকে সে রাখিয়াছে, তাহার কাজে একটু সাহায্য করিবার জন্য। মা পোয়ে সকাল বেলা ফুল বিক্রী করিতে বাহির হয়, বেলা বারোটা আন্দাজ সব ফুল তাহার বিক্রী হইয়া যায়, তাহার পর সারাদিন তাহার অবসর। শুধু শুধু আলস্যে কাল না কাটাইয়া, মা তানকে সে একটু সাহায্য করে, ইহার বদলে খাইতে পায় এবং থাকিতে পায়, ফুল বিক্রয়ের লাভের টাকা তাহার জমাই থাকিয়া যায়। পাড়াপ্রতিবেশী, সকলেই জানে, দুই বুড়ীর অনেক টাকা জমিয়াছে, বিশেষ করিয়া মা তানের। ইহাদের খরচ কিই বা? ঐ ত বাড়ী। খাওয়া-দাওয়ারও বাড়াবাড়ি রকম ব্যবস্থা কিছুই নাই। যাত্রীদের জন্য যে রান্না হয়, উহারা নিজেরাও তাহাই খায়। এমন কি ব্রহ্মদেশীয়া রমণীমাত্রেরই প্রায় যে খরচটা অবশ্যম্ভাবী, সেই পোষাকের খরচও তাহাদের বেশী নাই। রেশমী লুঙ্গী বা ভাল জামা, কেহ কস্মিন-কালেও তাহাদের পরিতে দেখে না। ছিটের লুঙ্গী আর শাদা জামাই তাদের সব দিনের পোষাক।

মা তানের বয়স কত ঠিক করিয়া বলা শক্ত। বারো বৎসর আগে প্রথম যখন সে এই বাড়ীতে আসিয়া হোটেল খোলে, তখনও তাহার এই রকম চেহারাই ছিল। আন্দাজে বোধ হয় বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মাঝামাঝি হইবে। শরীর ইদানীং কিছু ভারি হইয়া পড়িয়াছে, কৃশাঙ্গী বৃদ্ধা মা পোয়ের পাশে তাহাকে রীতিমত মোটাই দেখায়। রং কিছু ময়লা, রূপচর্চ্চার একেবারেই অভাব, সুতরাং যতটা কালো সে, পূরাপূরি ততটা কালই তাহাকে দেখায়। রাগী মেজাজ এবং নির্ভীকতার জন্য সে রেঙ্গুনে বিখ্যাত। এ পর্য্যন্ত ঝগড়ায় কেহ কোনোদিন তাহার সঙ্গে পারিয়া ওঠে নাই, এক পয়সা কেহ কোনদিন তাহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু ফাঁকি দিবার চেষ্টাও সে কোনোদিন করে না। এইজন্য তাহার হোটেলে যাত্রীর অভাব কোনোদিনই হয় না।

আজও সে ঘুম হইতে উঠিয়া, আর এক মিনিট বসিয়া কুড়েমী করিল না। মস্ত একটা হাই তুলিয়া, একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। নিদ্রিতা মা পোয়েকে এক ঠেলা দিয়া উঠাইয়া দিল। তাহার পর বালিশ মাদুর উঠাইয়া লইয়া ঘরের ভিতর চলিল।

মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া আসিতেই মা পোয়ে বলিল, "আজ আর বেরবো না, শরীরটা ভাল নেই; রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় নি।"

মা তান্ বলিল, "ওমা, একটু ঘুম হয়নি বলে, সারাদিন বসে কাটাবি? এইজন্যে তোর পয়সা হয় না।"

মা পোয়ে পাশের পাখাখানা তুলিয়া লইয়া হাওয়া

খাইতে খাইতে বলিল, "যাক গে। পয়সা বেশী নিয়ে করবই বা কি? না ছেলে না পিলে। যা আছে তাতে আমার শ্রাদ্ধের খরচ বেশ চলে যাবে। তুই ত ক্রমাগতই জমাচ্ছিস, তোর পয়সা খাবে কে? কোন্‌কালে বিধবা হয়েছিস, আর ত বিয়েও করলি না?"

"বিয়ের মুখে ঝাঁটা," বলিয়া মা তান্ মুখ ছুটাইয়া দিল। "গায়ের রক্ত জল করে যে পয়সা করলাম, তা কোন্ লক্ষীছাড়া এসে দুদিনে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিক্ আর কি? আমাকে এখন বিয়ে করলে লোকে টাকার লোভেই ত করবে? আর আমি পিছন ফিরলেই আমার টাকা নিয়ে অন্য কোন্ মুখপুড়ী ছুঁড়িকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে আসবে।"

রেলওয়ে ষ্টেশন খুব কাছেই। এই সময় ট্রেন আসিয়া পড়ার শব্দ শোনা গেল। মা তান্ বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা ছাড়িয়া, ছুটিল উনান ধরাইতে, কারণ যাত্রীরা আসিয়াই চায়ের জন্য গোলমাল লাগাইবে। মা পোয়ে নিজের বালিশ ঘরে রাখিয়া আসিল, এবং মা তানের নির্দ্দেশ মত ঝাঁটা লইয়া ঘর বারান্দা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পাঁচ পরেই সামনের রাস্তা দিয়া রেলগাড়ীর আমদানী যাত্রীর দল সহরের চতুর্দ্দিকে যাত্রা সুরু করিল। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ীর দল, গাড়ীর মাথায় ট্রাঙ্ক, হোল্ড-অল, স্যুটকেস্ প্রভৃতি উচুদরের মাল। তাহার পর রিক্‌শ, রেঙ্গুনের ভাষায় 'লাঙ্কা' তাহাতেও যাত্রীর পায়ের কাছে বাক্স, বিছানা, কম্বল বা শতরঞ্চিতে জড়ানো। সর্ব্বশেষে পদাতিকের দল। ইহাদের জিনিষপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ একেবারে সহরবাসী বর্ম্মার ধার দিয়াও যায় না। বেতের বাক্স, বিছানার পোঁটলা, সব নিজেরাই বহন করিয়া চলিয়াছে। কাহারও বা বাক্সও নাই, কাপড়ের পুঁটলি বাঁশের লাঠিতে ঝুলাইয়া তাহারা লাঠি ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। পুরুষ মানুষগুলিরও মাথায় লম্বা চুল। তাহা খোঁপা করিয়া বাঁধা এবং রঙ্গীন রুমাল দিয়া জড়ানো। সকলেরই পরণে পুরু ছিটের বা রং করা লুঙ্গী। রেশমের ধার ইহারা ধারে না, বেশ-ভূষার পারিপাট্যও কিছু নাই। কাহারও পায়ে বর্ম্মা চটি, কাহারও বা পা খালিই। কলিকাতার রাস্তায় পল্লীগ্রাম হইতে আগত কালীঘাটের যাত্রীদলকে যেমন চিনিতে একটুও বিলম্ব হয় না, ইহাদেরও দেখিবামাত্র চেনা যায় যে, রেঙ্গুনের অধিবাসী ইহারা মোটেই নয়।

গুটি ত্রিশ মানুষ আসিয়া মা তানের হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং মাথা হইতে ঘাড় হইতে জিনিষ-পত্র নামাইয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের ভিতর বৃদ্ধ আছে, প্রৌঢ় আছে, যুবক এবং বালকও আছে। ইহারা নানা কাজে পল্লীগ্রাম হইতে রেঙ্গুনে আসে। দোকানদার আসে জিনিষ কিনিয়া লইতে, চাষী আসে ক্ষেতে উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করিতে, কেহ বা আসে কাপড়-চোপড় কিনিতে, কেহ বা আসে মহাজনের কাছে টাকা ধার করিতে। বালকবালিকা যাহারা আসে, তাহারা আসে শুধু স্ফূর্ত্তি করিবার জন্যই। এখানে বায়োস্কোপ আছে, থিয়েটার আছে, বড় প্যাগোডা আছে। রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিলেই এখানে হাজার রকম তামাসা দেখা যায়। দেশে এসব কিছুই নাই, আছে কেবল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, বন-জঙ্গল, ঝিল। মানুষও পরস্পরের কাছে থাকে না। একজনের বাড়ী হইতে আর একজনের বাড়ী কতদূরে তাহার ঠিকানাই নাই। দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, ঘরের লোক ছাড়া অন্য একটা মানুষের মুখ তাহারা দেখে না। এইজন্য সুবিধা পাইলেই তাহারা দল বাঁধিয়া সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন উৎসব বা পর্ব্ব থাকিলে ত আর কথাই নাই। এপ্রিল মাসে বর্ম্মাদের মস্ত উৎসব, কাজেই এ সময়ে পাড়াগাঁয়ের যাত্রীর ভীড় খুব বেশীই হয়।

যাত্রীর সংখ্যা দেখিয়া, মা তান্ সঙ্গিনীকে বলিল, "যাক্, যাসনি ভালই হয়েছে। যা দল এসে পৌঁছল, একলা পেরে ওঠা দায় হত। 'জল খেলার' সময় লোক ত বেশী হবেই এর পর।"

প্রকাণ্ড ডেক্‌চীতে চায়ের জল বসাইয়া সে বাহিরে যাত্রীদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বেশীর ভাগই তাহার পুরানো মক্কেল; বছরে দশবারো বার রেঙ্গুনে আসে। কয়েকজন নূতন মানুষও দেখা গেল। ইহার ভিতর একটি যুবক বিশেষ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

অন্যদের চেয়ে তাহার বেশভূষার পারিপাট্য অধিক, মাথার চুলও ছোট করিয়া ছাঁটা। পায়ে বিলাতী জুতা। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে তাহাকে নিতান্তই খাপছাড়া বেমানান দেখাইতেছিল।

সকলের সঙ্গে দুচারটা কথা বলিয়া, মা তান্ আবার ভিতরে চলিয়া আসিল। মা পোয়েকে বলিল, "তুই চা-টা একটু দিয়ে দে, আমি বাজারটা ঘুরে আসি। সকাল সকাল গেলে সস্তায় জিনিষ পাওয়া যাবে।" প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি লইয়া সে বাহিরে চলিল। যাত্রীদের হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে উপদেশ দিয়া, সে রিকৃশ ডাকিয়া চড়িয়া বসিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মাছ তরকারি কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। যাত্রীর দলের চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছে। দুচারজন কাজে এদিক ওদিক বাহির হইয়া গিয়াছে, বেশীর ভাগ চাটাই বিছাইয়া ফুটপাথের উপর বসিয়া গিয়াছে। রাস্তার জনস্রোত, হাজার রকম গাড়ী ঘোড়া, মোটর দেখিয়াই তাহারা দিব্য আনন্দ লাভ করিতেছে। মা তান্ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, নবাগত যুবকটি নাই, কোথাও বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক তখন তাহার এসব দিকে মন দিবার অবকাশ ছিল না, সমস্ত রান্নাবান্না তাহার সম্মুখে। রিকৃশওয়ালাকে পয়সা এবং কিঞ্চিৎ গালাগালি দিয়া সে বাজারের ঝুড়ি লইয়া রান্না-ঘরে চলিয়া গেল।

সকলে যখন খাইতে বসিল, তখনও দেখা গেল, সেই যুবক অনুপস্থিত। মা তান্ এক প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সঙ্গের সেই ছোকরা কোথায় গেল? সেই যে দিব্যি ফুলবাবু সেজে এসেছিল?"

প্রৌঢ় বলিল, "কে জানে? কিসের ধান্দায় যে ঘোরে তারও ঠিকানা নেই। কি করতে এসেছে তাও জানি না। ওর বাবা মান্দালেতে দোকান রেখে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। ছোঁড়ার খাবার ভাবনা ত নেই, নিজের খেয়ালেই ঘোরে।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া যাত্রীর দল আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। ইহারা সাধারণতঃ একদিন একরাত মাত্র রেঙ্গুনে বাস করে। পরের দিন সকালেই ট্রেনে চড়িয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া যায়।

মা তান্ ও মা পোয়ে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বসিল। মা পোয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোঁড়াটা কিছু ত খায়নি। তার জন্যে কিছু রাখ্‌ব নাকি?"

মা তানের নিয়ম, সকলকে সময়মত খাইতে হইবে। কাহারও জন্য সে বসিয়া থাকে না বা খাবার তুলিয়া রাখে না। কিন্তু ঐ যুবকটির প্রতি প্রথম দর্শনেই তাহার একটু মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল। কেন যে, সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যুবক দেখিতে বেশ সুন্দর বটে, তবে রেঙ্গুনে সুপুরুষের কিছুমাত্র অভাব নাই, অমন চেহারা সে ঢের দেখিয়াছে।

মা পোয়ের কথার উত্তরে, মা তান্ বলিল, "রেখে দে কিছু। ছোঁড়া এই প্রথমবার এসেছে, খেতে না পেলে কোনোদিন আর এমুখোও হবে না।"

মা পোয়ে খাবার তুলিয়া রাখিল। তাহার পর আহারাদি সারিয়া রাত্রে ঘুমের যেটুকু ব্যাঘাত হইয়াছিল, তাহা পূরাইয়া লইবার চেষ্টায় মাদুর পাতিয়া বারান্দায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মা তানের দিবানিদ্রার অভ্যাস মোটেই ছিল না। সে মস্ত বড় একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া, মা পোয়ের পাশে বসিয়া রাস্তার লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

ছোকরার কথা আরো দুই চারিবার তাহার মনে হইল। ছোঁড়া কোথায় ঘুরিতেছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে এক পেয়ালা চায়ের বেশী কিছুই তাহার পেটে পড়ে নাই। এক যদি রাস্তায় কিনিয়া খাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কি আর করিবে? হোটেলের খরচ তাহাকে পূরাই যখন দিতে হইবে, তখন আবার গাঁঠের পয়সা খরচ করিয়া সে খাইতে যাইবে কেন? মা তান্ মনে করিত, দুনিয়ার সকল মানুষই তাহার মত হিসাবী।

ছোকরা বেলা দুইটার সময়, রোদে পুড়িয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাকে বড়ই ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। এক হাত লম্বা চুরুটটা মুখ হইতে নামাইয়া মা তান্ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভাত জুড়িয়ে ত বরফের মত হয়ে গেল।"

ছোক্‌রা বলিল, "কাজে ঘুরছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।"

মা তান বলিল, "কি কাজে সহরে এসেছ? তোমাকে ত এই প্রথম দেখ্‌ছি এখানে।"

ছোক্‌রা বলিল, "কাজ তেমন কিছু নয়। আমার এক বন্ধু এখানে এসেছে, তার সন্ধানে এসেছি।"

মা তান মনে মনে বলিল, "বন্ধু ত কত! কোনো ছুঁড়ী গুণ করেছে আর কি?" মুখে বলিল, "কোথা থেকে আসছ? তোমার নাম কি!"

যুবক বসিয়া বলিল, "আমার বাড়ী মান্দালে। নাম মঙ্‌লাট।"

মা তান বলিল, "চল, ভাত দিচ্ছি, খেয়ে নাও।"

যুবক বলিল, "ভিতরে কল নেই? একটু স্নান করে নিতাম।"

কল ছিল অবশ্যই, তবে মা তানের মক্কেলরা স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কেহই করিত না। মা তান বুঝিল এ ছোকরা সত্যই অন্য পর্য্যায়ের মানুষ। কল-ঘর দেখাইয়া সংক্ষেপে বলিল, "ঐখানে যাও।"

যুবক স্নানাহার সারিয়া, বাহিরেই আসিয়া বসিল। মা পোয়ে তখনও বিপুল নাসিকা গর্জ্জন করিয়া ঘুমাইতেছে। মঙ্‌লাট্‌ একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি তোমার বোন নাকি?"

মা তান বলিল, "না, আমার আপনার জন কেউ নেই। ওকে রেখেছি, আমার কাজের একটু সাহায্য করবার জন্যে।"

মঙ্‌লাট্‌ হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার কেউ না থাকাই ভাল।"

মা তান ভাবিল, "একেবারে আস্ত গিলে খেয়েছে গো। কে ছুঁড়ী, কে জানে?" ব্রহ্মদেশীয় মানুষ মাত্রেরই তুক্‌তাক্‌, গুণকরা প্রভৃতিতে অগাধ বিশ্বাস। বৌদ্ধ ফুঙ্গী (সন্ন্যাসী) ভারতবর্ষীয় যাদুকর, জ্যোতিষ সকলেরই প্রতি ইহাদের গভীর ভক্তি। কত পয়সা যে জুয়াচোরে ইহাদের নিকট হইতে ঠকাইয়া লয় তাহার ঠিকানা নাই। অত্যাশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তি, বশীকরণ প্রভৃতির গল্প ইহাদের মুখে লাগিয়াই আছে।

মঙ্‌লাটের পেট হইতে কথা বাহির করিবার জন্য মা তান বলিল, "আপনার জন না থাকা ভাল আর কি? আপদ-বিপদে দেখ্‌বার কেউ থাকে না। এখন গতর আছে, খাট্‌ছি খাচ্ছি, কিন্তু আজ যদি অসুখে পড়ি, মুখে জল দেবার কেউ নেই।"

যুবক কথাটা ফিরাইয়া দিল। নিজের সুখ-দুঃখের কথা সকলের কাছে প্রকাশ করার স্বভাব সব মানুষের থাকে না। বিশেষ করিয়া মা তান একেবারে অপরিচিত, এই প্রথম দিন তাহাকে সে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "ঐখানের ওটা বর্ম্মা বায়োস্কোপ না? কখনো যাও দেখ্‌তে?"

মা তান হাত উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করিয়া বলিল, "বায়োস্কোপ দেখবার সময়ও নেই, সখও নেই। ওসব তোমাদের বয়সেই সাজে। সাড়ে তিনটা বাজুক না, দেখ্‌বে ছোঁড়া-ছুঁড়ীর কিরকম ভীড় লেগে যায়।"

মঙ্‌লাট্‌ বলিল, "গিয়ে একটু দেখে এলে হয়, কাজ ত হাতে নেই। এক টাকা করে টিকিট বুঝি?"

মা তান বলিল, "বেশীও আছে, কমও আছে।" সাড়ে তিনটা বাজিতে বড় বেশী দেরি ছিল না, অল্প একটু পরেই ব্যাণ্ডের বাজনা সুরু হইয়া গেল। যুবক জুতার ফিতা বাঁধিতেছে দেখিয়া মা তান জিজ্ঞাসা করিল, "কোনো কাজে তাহলে এসনি? এমনি বেড়াতেই এসেছ?"

মঙ্‌লাট্‌ বলিল, "কাজ অল্প একটু আছে। বাবার দোকানের দুচারটে জিনিষ কিনে নিয়ে যেতে হবে। তা সে কাল কিনলেই হবে। আজ মনটা ভাল নেই, একটু বায়োস্কোপ দেখেই আসি।"

মা তান একটু উৎসুকভাবেই যেন জিজ্ঞাসা করিল, "কালও থাক্‌বে নাকি? এইখানেই?"

যুবক জুতার ফিতা বাঁধা শেষ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, দুচারদিন থাক্‌বই মনে করছি। এখানে যখন উঠেছি, এইখানেই থাক্‌ব।"

মঙ্‌লাট চলিয়া যাইতেই, মা তান ঠেলা দিয়া মা পোয়েকে উঠাইয়া দিল। বলিল, "নে ওঠ, যা নাক ডাকাচ্ছিল, যেন রেলের ইঞ্জিন। উনুনটা ধরাগে যা।

এখনি সব এল বলে, গলা শুকিয়ে।" দুইজনেই কাজে ডুবিয়া গেল, একেবারে খাওয়া-দাওয়া চুকিলে পর তাহাদের ছুটি।

রান্নাঘরে গরমে টেঁকা যায় না, প্রাণ যেন বাহির হইয়া আসে। মা পোয়ে মশলা ইত্যাদি কি সব কিনিতে গেল, মা তান্ ভাত চড়াইয়া বারান্দায় একটু আসিয়া বসিল। সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ বাজিয়াছে। বায়োস্কোপের একটা পালা শেষ হইল, হুড়মুড় করিয়া লোক বাহির হইতে লাগিল। মোটরের ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্, গাড়ীর ঘড় ঘড়, মানুষের কলরবে, একেবারে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল।

হঠাৎ মা তান উঠিয়া পড়িল। মঙ্‌লাট্ একটি বাদামী রঙের লুঙ্গী-পরা মেয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছে যেন। মা তানের বড় কৌতূহল হইল মেয়েটি কে দেখিবার জন্য। বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেল। মঙ্‌লাটই বটে! এই ছুঁড়ীর সন্ধানে মান্দালে হইতে এতদূরে আসিয়াছে? দেখিতে মন্দ নয়, তবে এমনি কি রূপসী? মেয়েটাকে কোথায় যেন সে দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল, কিন্তু স্থির করিতে পারিল না। যাহা হোক, তখন আর বেশী সময় ছিল না, ভাত পুড়িয়া যাইবার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিতে একটু রাতই হইয়া যাইত। সাড়ে ন'টা দশটার আগে প্রায়ই হইত না। রাত্রে আর মঙলাট্ দেরি করিল না, অন্য সকলের সঙ্গেই বসিয়া খাইল। মা তানের ইচ্ছা ছিল বায়োস্কোপে দৃষ্ট যুবতীর বিষয় একটু কথা বলে, কিন্তু অন্য লোকের সামনে বলিতে পারিল না।

রাত দশটা বাজিতে বাজিতেই ফুটপাথ এক রকম খালি হইয়া যায়। বর্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। কাঠের তক্তা, চাটাই, পাটি প্রভৃতি বিছাইয়া যাত্রীর দল রাস্তা জুড়িয়া শুইয়া পড়িল। সারাদিন গরমে ঘোরাঘুরি করার ফলে অধিকাংশই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। মঙ্‌লাট কেবল একটা চুরুট ধরাইয়া তাহার চাটাইয়ের উপর বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

মা তান এবং মা'পোয়েও কাজকর্ম আহারাদি সারিয়া বাহির হইয়া আসিল। দারুণ গরম। ঘরের ভিতর ঘুমানো মানুষের অসাধ্য। যাত্রীরা সকলেই বাহিরে শুইয়াছিল, বারান্দার তক্তপোষগুলি খালিই পড়িয়াছিল। উহারা দুজনে ঐখানেই শুইবে ঠিক করিয়া বালিশ প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। নিদ্রার সঙ্গে বুড়ী মা-পোয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। শয়ন করিবামাত্রই সে ঘুমাইয়া পড়িত এবং তাহার প্রবল নাসিকাধ্বনি পাড়ার ছেলে মেয়েদের কৌতুকের জিনিষ ছিল।

মা তানের অত শীঘ্র ঘুম আসিত না। অন্তত আধঘণ্টা চুরুট ফুঁকিয়া তবে সে শুইতে যাইত। আজও নিজের বিপুল বর্ম্মা চুরুটটি ধরাইয়া, তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিল। মঙ্‌লাট তখনও জাগিয়া বসিয়া আছে, অন্য যাত্রীরা সকলেই নিদ্রিত। মা তান কি বলিয়া তাহার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যুবকই কথা আরম্ভ করিল। মা তানের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখান থেকে চিমেণ্ডাইন্ কত দূর?"

মা তান মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া বলিল, "তা দূর আছে। কিন্তু দূর হলেই বা কি? হেঁটে ত কেউ যায় না। মোটর-বাসে যায়, না হয় ট্রেনে যায়।"

মঙ্‌লাট্ বলিল, "সব সময় কি গাড়ী পাওয়া যায়? কাল সকালে একবার যেতে হবে।"

মা তান বলিল, "সব সময়। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত। এই যে বায়োস্কোপ দেখ্‌ছ, এর ত অর্দ্ধেক লোক আসে ওখান থেকে। রাত বারোটায় মোটর-বাসে চড়ে সব ফিরে যায়।"

যুবক বলিল, "আমার সেই বন্ধুটির খোঁজ পেয়েছি। তারা চিমেণ্ডাইনেই থাকে, একবার যেতে হবে তাদের বাড়ী।"

মা তান আবার চুরুটটা মুখে দিয়া টানিতে লাগিল। ছুঁড়ীকে কোথায় দেখিয়াছে, এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল। চিমেণ্ডাইনেই বটে। মা তানের এক দূর-সম্পর্কের ভাই থাকে সেখানে, পাশের বাড়ীতেই ঐ ছুকরী থাকে, বাপ নাই, নিজের মাও নাই, এক সৎমা আছে। সৎমার ছেলেপিলে আছে কয়েকটা।

যুবক আর গল্প চালাইবার চেষ্টা করিল না। মা তানও শুইয়া পড়িল, তবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না।

পরদিন ভোরবেলা যাত্রীর দল পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া, টাকাকড়ি চুকাইয়া দিয়া, রেলওয়ে ষ্টেশনের পথে বিদায় হইয়া গেল। কেবল বাকি রহিল মঙ্লাট্। মা পোয়েও ভোরেই চলিয়া গেল ফুলের ডালা লইয়া। মা তান চা খাইয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। আজ তাহার হাত একেবারে খালি, কোনো কাজ নাই। মনটা, কেন জানি না, তাহার একটু ভার হইয়া ছিল। পাশের ঘরের বর্ম্মা যুবতীটির নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। তিন চারিটি ছেলে-মেয়েকে মুখ ধোয়ানো, খাওয়ানো, সাম্লানো, কম ব্যাপার নয়। ইহাকে মা তান কোনো দিন হিংসা করে নাই, বরং উহার দারিদ্র্যের জন্য কৃপার চক্ষেই দেখিত। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল একদিক দিয়া মেয়েটি তাহার অপেক্ষা ভালই আছে। তাহার স্বামী আছে, সন্তানসন্ততি আছে। তাহার নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই সত্য, কিন্তু জগৎ-সংসার তাহার কাছে পরিপূর্ণ, বাহিরের লোক না আসিলেও সে গ্রাহ্য করে না, বুড়া বয়সে কোথায় গিয়া মরিবে সে ভাবনাও তাহার নাই।

মঙ্লাট্ উঠিয়া, চা খাইয়া বাহির হইয়া গেল। মা তান আর কিছুক্ষণ শুধু শুধু বসিয়া থাকিয়া ঝুড়ি লইয়া বাজারে চলিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মঙ্লাট্ সকাল সকাল বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে, ঘরে ঢুকিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ বদল করিল, জুতাজোড়াও পালিশ করিয়া লইল। মা তান্ বারান্দায় বসিয়া তাহার রকম দেখিতে লাগিল এবং মনে মনে চটিতে লাগিল। ছোঁড়ার রকম দেখ না। যেন কোন রাজনন্দিনীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে। মেয়েটা দেখিতেই বা কি এমন ভাল? সংসারের ঝাঁটা খাইয়া ত দিন কাটে। পরণের লুঙ্গীও দুখানার বেশী চারখানা আছে কি না সন্দেহ।

মা পোয়ে ফুল বিক্রী করিয়া আসিয়া দেখিল, মা তান আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে ঝগড়া হল আবার আজ?"

মা তান বলিল, "ঝগড়া হতে যাবে কেন না? আমার কি ঝগড়া করাই ব্যবসা?"

মা পোয়ে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না তা কেন। চটে রয়েছিস্ কিনা তাই জিগ্‌গেষ করছি।"

মা তান্ বলিল, "চটি কি সাধে? চটি মানুষের আক্কেল দেখে। মরুকগে যাক্। আয় আয় খাবি আয়।"

খাইয়া-দাইয়া মা পোয়ে অভ্যাস-মত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা সুরু করিল। মা তান্ খানিকক্ষণ চুরুট ফুঁকিয়া উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। ঘরের কোণে তাহার বাক্স-প্যাটরা, বছরের পর বছর একই ভাবে সাজানো আছে, কোনোদিন সে খুলিয়াও দেখে না। আজ কি মনে করিয়া সে বড় কাঠের বাক্সটা খুলিয়া ফেলিল। তাহার ভিতর মূল্যবান রেশমী লুঙ্গী, মিহি কাপড়ের লেশ দেওয়া জামা, গলায় জড়াইবার পাতলা রেশমের টুকরা, থরে থরে সাজান। কোণে একটা ছোট, কারুকরা হাতীর দাঁতের বাক্স। সেটাও খুলিয়া দেখিল। সব ঠিক আছে। নীলা-বসান চুড়, চুণীর বোতাম, হীরার কানফুল, হীরার আংটি, চুণী-বসানো দু' ছড়া সোনার গলার হার, সোনার গিল্টী-করা পায়ের মল। এ সব মা তানের বিগত বধূজীবনের সম্পত্তি, এখন আর কোনো কাজে লাগে না। মুখে মাখিবার তানাখা, বড় বড় পাথর-বসানো চিরুণী, মখমলের চটি জুতা পর্য্যন্ত সে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। কাহার জন্যই বা রাখিয়াছে? একটা মেয়েও জন্মায় নাই পেটে, যে তাহাকে সাজাইয়া দেখিয়া সুখ হইবে। মরিলে পর এ সব কোন্ হতভাগীর গর্ভে যাইবে কে জানে?

পোষাক-পরিচ্ছদগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাক্সের ডালাটা বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে বলিল, "থাক, এখন আবার এ সব পরতে গেলে লোকে হাসবে। যখনকার যা, তখনকার তা।"

বিকালে মা তান্ আবার বাজার যাইতেছে দেখিয়া

মা পোয়ে বলিল, "তরকারি ত ঢের রয়েছে, আবার বাজার যাচ্ছিস্ যে?"

মা তান্ বলিল, "একটু মাংস নিয়ে আসি। অনেক দিন মাংস খাই নি।"

মা পোয়ে বলিল, "তা ছোঁড়া চলে গেলে আন্‌লেই ত হয়। এখন রাঁধ্‌লে তাকেও ত দিতে হবে?"

মা তান বলিল, "তা দেব এখন। ছোঁড়া খায় ত এই ক'টা। সারাক্ষণ কিসের চিন্তায় মত্ত আছে ঠিকানা নেই।"

মা পোয়ে অবাক হইয়া চুপ করিয়া গেল। মা তানের এ ধরণের বদান্যতা কেহ কখনও দেখে নাই।

মঙ্‌লাট ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার সময়। চা খাইয়া, রাস্তার ধারে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। মা পোয়ের উপর রন্ধনের ভার দিয়া মা তানও বাহিরে আসিয়া বসিল, কিন্তু গল্প মোটেই জমিল না। মঙ্‌লাট অন্যমনস্কভাবে দু-একটা উত্তর দেয়, আবার চুপ করিয়া ভাবে। মা তান্ শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। ছোঁড়াকে ধরিয়া তাহার চড়াইতে ইচ্ছা করিতেছিল। ঢং দেখ না!

রাত্রে তাহার অত যত্নে প্রস্তুত মাংস তাহাকে এবং বুড়ী মা-পোয়েকেই খাইতে হইল। মঙ্‌লাট কিছুতেই কিছু খাইল না, চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল।

সকাল বেলা মা তান বলিল, "আজ শরীরটা ভাল ঠেক্‌ছে না। কাল অতগুলো মাংস খাওয়া ঠিক হয়নি। তুই আজ ফুল বেচ্‌তে যাসনে, রান্নাটা একটু দেখ্।"

মা তানের শরীর খারাপ হইতে জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই। কিন্তু তাহার মেজাজকে মা পোয়ে সমীহ করিয়া চলিত, কাজেই আর উচ্চবাচ্য না করিয়া সে থাকিয়া গেল। মা তানের প্রতি তাহার ভালবাসাও ছিল খানিকটা, কাজেই একটু চিন্তিতও বোধ করিতে লাগিল। কেহ মাগীকে গুণটুন করিল নাকি? ঐ ছোঁড়াটার ধরণধারণ ত ভাল ঠেকে না। সব মানুষ চলিয়া গেল, সে কিসের জন্য মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে? রাজও ত তাহার কিছু দেখা যায় না। সে আসার পর হইতেই মা তানের একটা পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। কিন্তু মা তান্‌কে কিছু বলাও যায় না, এ বিষয়ে। সে হয়ত তখনি ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিয়া আসিবে।

মঙ্‌লাট্ সকাল হইতেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, চায়ের জন্যও অপেক্ষা করে নাই। মা তানের মেজাজ ইহাতে আরো বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। এতকাল এত মানুষের সঙ্গে সে কারবার করিয়াছে, কাহাকেও লইয়া তাহাকে এতটা ভুগিতে হয় নাই। কেন যে সে এত বিচলিত হইতেছিল, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। মঙ্‌লাটের দৃষ্টি নিতান্তই অন্য স্থানে, না হইলে মা তানেরও মা পোয়ের মত সন্দেহ হইত যে যুবক তাহাকে গুণ করিয়াছে। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল। গুণ করিলেও হয়ত ছিল ভাল। কিন্তু কি দেখিয়া করিবে? একদিকে সুন্দরী যুবতী, আর একদিকে বিগত যৌবনা রূপহীনা হোটেলওয়ালী। মঙ্‌লাটকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কি এ দৈবের বিড়ম্বনা। এতদিন সে নিরুপদ্রবে কাটাইয়া, এই বুড়া বয়সে মজিল কেন? তাহার কাজে মন লাগে না, সারাক্ষণ প্রাণ ছট্‌ফট্ করে। অপরিচিতা যুবতীর প্রতি হিংসায় সে জ্বলিতে থাকে। মঙ্‌লাট্‌কে সম্মুখে দেখিলে, তাহার সহিত দুইটা কথা বলিতে পারিলে, সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। ছোঁড়া কোথা হইতে মরিতে আসিল? সে কি যাদু জানে? দুই-তিনদিনের ভিতর মা তানের এমন অবস্থা হইল কি করিয়া?

মা তান দুপুরে ভাত পর্য্যন্ত খাইল না, মঙ্‌লাটের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। মা পোয়ের ঠোঁট অবধি নানা কথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে সে কিছু বলিল না। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, কি কাণ্ডই মা তান করিতেছে, লোকে বলিবে কি? তাহার পরিচিত এক ফুঙ্গী ছিল, তুকতাক, ঝাড়-ফুঁকে তাহার নাম খুব। মা তানের ভূত ছাড়াইবার জন্য তাহার শরণ লইবে কি না, মা পোয়ে ভাবিতে লাগিল।

মঙলাট ফিরিয়া আসিতেই মা তান্ গলা চড়াইয়া

ঝগড়া সুরু করিল। খাওয়ার সময় খাওয়া নাই, শোওয়ার সময় শোওয়া নাই, এসব কি ঢং? কে তাহার ভাত আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিবে? এখানে তাহার দশটা বিয়ে করা বৌ বসিয়া আছে না কি?

মঙ্‌লাট্ অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। মা তানের এমন মূর্ত্তি আগে সে কখনও দেখে নাই। যে ক'দিন সে এখানে আছে, মা তান তাহাকে খুবই যত্ন করিয়াছে, এমন কি সে আছে বলিয়া অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গালাগালি বকাবকি করে নাই। সুতরাং এমন ভাবে আক্রান্ত হইয়া সে একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

মা তান্ নিশ্বাস লইবার জন্য থামিবামাত্র সে বলিল, "আমার জন্যে বসতে ত আমি বলিনি। ভাত ফেলে রাখ্‌লেই পারতে। আমার অনেক দূর যেতে হয়েছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।"

মা তান স্বর নরম করিয়া বলিল, "একটা মানুষ সকাল থেকে গলা শুকিয়ে বসে আছে, জান্‌লে, কে কাঁড়ি গিলতে বসতে পারে? হাজার হোক, আমার ঘরেই রয়েছ ত?"

মঙ্‌লাটের চোখ দুটো কেমন যেন করুণ হইয়া আসিল। সে বলিল, "তিন দিন আগে ত আমায় মোটে দেখেছ, অথচ আমার জন্যে এত মায়া তোমার? আর যারা কত বছর ধরে দেখ্‌ছে,তারা পারে ত আমার গলায় ছুরি দেয়।"

মা তান্ বলিল, "উপরের গিল্টি দেখে ভুল্‌লেই ঐ দশা হয়। সব গিল্টির নীচে সোনা থাকে না।"

মঙ্‌লাট্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কার কথা বল্‌ছ? আমি গিল্টি দেখে ভুলেছি, কে তোমায় বল্‌লে?"

মা তান্ বলিল, "তোমার কথাই বল্‌ছি। আমায় কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু কপালে চোখ ত দুটো আছে? বায়োস্কোপে কার দেখা পেয়েছ, তাও জানি, আর কার লোভে চিমেওাইন্ ছুটছ, দিনে দশবার করে, তাও জানি।"

মঙ্‌লাট জিজ্ঞাসা করিল, "মা শিন্‌কে তুমি চেন নাকি?"

মা তান্ বলিল, "চিনি না, তবে ওদের বাড়ীর কাছেই আমার ভাইয়ের বাড়ী। অনেকবার ওদের দেখেছি, ওদের হালচাল সবই জানি।"

মঙ্‌লাট কি যেন বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। মা পোয়েও এই সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়া পড়ায়, আর কথাবার্ত্তা কিছু হইল না।

ইহার পরের দিনটা কাটিল প্রায় একইভাবে। মঙ্‌লাট্ সমস্ত দিনটা বাহিরে ঘুরিয়াই কাটাইল। মা তান্ সেদিনও শরীর খারাপের ছুতা করিয়া মা পোয়েকে ধরিয়া রাখিল, এবং খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া সারাদিন বারান্দায় বসিয়া চুরুটের পর চুরুট ধ্বংস করিতে লাগিল। মা পোয়ে রান্নাঘরে বসিয়া কত কি যে মানত্ করিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। ফুঙ্গীর কাছে যাওয়া সে এক রকম স্থিরই করিয়া ফেলিল। রাত্রের রান্না হইয়া গেলেই সে ভাইঝিকে দেখিবার ছুতা করিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কিন্তু অত কষ্ট আর তাহাকে করিতে হইল না। বিকাল বেলা মঙ্‌লাট অনেকগুলি জিনিষপত্র কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার চেহারা অত্যন্ত ম্লান ও বিষণ্ণ। মা তান্ তাহার অপেক্ষায় বারান্দায় বসিয়াই ছিল। যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব এত সওদা করে নিয়ে এলে?"

মঙ্‌লাট্ বলিল, "এ সব আমার বাবার ফরমাসী জিনিষ। কাল ভোরের ট্রেনেই আমি বাড়ী চলে যাব।"

মা তানের বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। চলিয়া যাইবে, কালই? আর তাহার মুখ দেখিতে পাইবে না, কথা শুনিতে পাইবে না। উঃ, জগৎটা কি ভয়ানক কালো, কি বিরাট শূন্যতা এখানে!

কিন্তু মুখে বলিল, "ভালই, দেশে গিয়ে কাজকর্ম্মে মন দাও। রাস্তায় রাস্তায় ছুঁড়ীর পিছনে ঘুরলে ত আর ভাতকাপড় মিলবে না?"

মঙ্‌লাট নীরবে জিনিষপত্রগুলা গুছাইয়া বাক্সে ভরিতে লাগিল। মা পোয়ে একটু দূরে সরিয়া যাইতেই মা তান্ নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "মা শিন্ তোমার বিয়ে করছে না তা হলে?"

মঙ্‌লাট মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তার ত আশা কিছু দেখ্‌ছি না।"

মা তানের মনের পাষাণ ভারটা অনেকখানি যেন লঘু হইয়া গেল। জগতে আশার বিনাশ নাই। মা তানকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা মঙ্‌লাটের খুবই কম, তবু যতক্ষণ মা শিন্‌কে সে বিবাহ না করিতেছে, ততক্ষণ মা তান্‌ মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথিতে ছাড়িবে না।

মঙ্‌লাট যাইবার সময় টাকাকড়ি চুকাইয়া দিতে আসিল। মা তান্‌ টাকা লইল না। মঙ্‌লাটের প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমার কাছে টাকা নেব না।"

মঙ্‌লাট্‌ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?" মা তান্‌ বলিল, "আমার মান্‌তি আছে, মাসে একজন লোককে বিনা খরচায় খাওয়াই। আবার রেঙ্গুনে এলে এখানেই উঠো কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই," বলিয়া মঙ্‌লাট্‌ রিক্‌শ ডাকিয়া চড়িয়া বসিল, এবং দেখিতে দেখিতে চোখের অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা তানের কাছে বিশ্বসংসার যেন বিস্বাদ নিরর্থক হইয়া গেল। পাঁচ দিন আগেকার তাহার যে জীবন, আর আজকার জীবন, কি বিপুল ব্যবধান! পূর্ব্বের জীবনের নিশ্চিন্ততা, স্বাধীনতার ভিতর আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই। কোথা হইতে, কেমন করিয়া, এ কঠিন মায়ার ফাঁস তাহার গলায় আসিয়া জড়াইল? কোথায় তাহার মুক্তি? যাহা পাইবার নয়, তাহারই জন্য মাথা কুটিয়া কি তাহার চিরটা দিন কাটিয়া যাইবে? জগতে কাহারও অনিষ্ট সে কোনোদিন করে নাই, পরিশ্রম করিয়াছে, খাইয়াছে, তবে কেন দেবতা তাহাকে এমন দুঃখ দিলেন? এ ত শুধু দুঃখ নয়, এর লজ্জাও যে সুগভীর। কাহারও সহানুভূতি সে পাইবে না, অন্যের হাস্যের খোরাকই ইহাতে জুটিবে। ঘরের কোণে রক্ষিত বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে সে মাথা কুটিতে লাগিল। সে মুক্তি চায়, যেমন করিয়া হোক। ভালবাসাহীন জীবনও তাহার স্বর্গ ছিল, কিন্তু এই বেড়া-আগুনের ভিতর সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? দেবমূর্ত্তির প্রশান্ত মুখে কোথাও করুণার রেখা দেখা দিল না।

মা তান্‌ সব দিক দিয়াই কেমন এক রকম হইয়া গেল। সে খায় না, ঘুমায় না, কাজকর্ম্ম দেখে না। হঠাৎ সাজপোষাকের ঘটা তাহার লাগিয়া গেল। এখন সে রেশমের লুঙ্গী পরে, লেশ-বসানো জামা পরে, চুলের যত্ন করে। মান্দালের দিকের ট্রেন আসিবার সময় হইলে সে একেবারে অস্থিরভাবে ঘর আর বাহির করে। মঙ্‌লাট্‌ আবার নিশ্চয়ই আসিবে, অন্ততঃ আরো একবার ত আসিবে? মা তানের জন্য নাই আসিল, কিন্তু তাহার প্রেয়সী মা শিন্‌ও ত এই সহরেই বাস করে!

একদিন চিমেণ্ডাইনে ভাইয়ের বাড়ীতে সে গিয়া হাজির হইল। তাহার নূতন সাজসজ্জা লইয়া ভাই, ভাইয়ের বউ অনেক রসিকতা করিল, বর কবে আসিতেছে তাহারও খোঁজ করিল।

মা তান সে সব কথা উড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাশের বাড়ীর ওরা কোথায় গেল?"

ভাজ বলিল, "একটু দূরে ঘর নিয়েছে, কম ভাড়াতে। মেয়েটার ত বিয়ে শুন্‌ছি।"

মা তানের মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়? কার সঙ্গে?"

তাহার ভাজ বলিল, "কে এক ছোঁড়া আসে রোজ, তার মাকে জিগ্‌গেষ করলে বলে এখানে কোন্‌ দোকানে কেরাণীর কাজ করে। ঠিক কিনা জানি-না।"

মা তান আর বসিল না। বাড়ী ফিরিবার পথে মানৎ করিল, মা শিনের বিবাহ যদি মঙ্‌লাট্‌ রেঙ্গুনে আসিবার পূর্ব্বে হইয়া যায় তাহা হইলে সে প্যাগোডায় সোনা দিবে। ট্রেন আসিবার সময় তাহার ব্যাকুলতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিত। সে ঘরের ভিতর টিঁকিতে পারিত না। সাজ-গোজ করিয়া ফুটপাথের উপর পায়চারি করিত। বুড়ী মা-পোয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কপাল ফুলাইয়া ফেলিল, যুবতীকে চুপি চুপি কত পয়সা দিল তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু মা তানকে প্রকৃতিস্থ করিতে

পারিল না। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা মা তানকে লইয়া রঙ্গ করিয়া ছড়া বাঁধিতে লাগিল।

আবার একদিন হুড়মুড় করিয়া একপাল যাত্রী আসিয়া জুটিল। যতক্ষণ দূর হইতে তাহাদের দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ মা তান্ একেবারে আগ্রহে ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া ফুটপাথে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। বুড়ী মা-পোয়ে মনে মনে দেবতাকে ধন্যবাদ দিতেছিল, কাজেকর্মে ডুবিয়া থাকিলে, মা তানের ঘাড়ের ভূত নামিয়া যাইবে।

কিন্তু কার্য্যতঃ যাহা ঘটিল, তাহাতে বুড়ী মা পোয়ে একেবারে সকল আশা ছাড়িয়া দিল। যাত্রীর দল কাছে আসিয়া, পোঁটলা-পুঁটলি নামাইবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় মা তান বলিল, "এখানে না হে, আরো একটু এগিয়ে মঙ্চিটের হোটেলে যাও। আমি হোটেলের ব্যবসা তুলে দিয়েছি।"

যাত্রীর দল অবাক হইয়া মা তানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহারা পোঁটলা-পুঁটলি তুলিয়া লইয়া আবার অন্য হোটেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

মা পোয়ে মাথায় চড় মারিয়া বসিয়া পড়িল। শয়তানে নাগাকে একেবারে গিলিয়া খাইয়াছে। মা তানের ভয় ভুলিয়া গিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুই কি ক্ষেপ্‌লি মা তান্? ঐ ছোঁড়ার জন্যে নিজের গলায় ছুরি দিবি? সে ত শুন্‌লে হাসবে। তোর কি আর বিয়ের বয়স আছে?"

মা তান হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। মা পোয়ের কথার উত্তর না দিয়া, ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। মা পোয়ে ঠিকই বলিয়াছে। মঙ্‌লাট্ হাসিবে। মা তান্ মরিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে সে ছাড়া আর কেহ দুঃখের কারণ দেখিবে না। বুড়ী মরিতেছে যুবককে ভালবাসিয়া, এ ত হাসিরই জিনিষ।

তাহার মাথায় যেন রক্ত চড়িতে লাগিল। এত অধঃপতন তাহার হইয়াছে। এখন তাহার সামনেই তাহাকে লইয়া লোকে হাসাহাসি করে। ছোট ছেলেমেয়েগুলা ছড়া বলে, চেঁচায়, হাততালি দেয়। একমাস আগে, এ পাড়ায় কেহ তাহার মুখের উপর একটা কথা বলিতে সাহস করিত না। দু পয়সা ধার পাইবার আশায় কত লোক আসিয়া হাতজোড় করিত।

কাহার জন্য সে এমন করিয়া মরিতেছে? মঙ্‌লাট্ কখনও তাহার হইবে না। দেবমূর্ত্তির সামনে সে পড়িয়া রহিল, প্রাণপণে প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহার মন হইতে এই অসম্ভবের প্রলোভন কাটিয়া যাক্, সে আবার মানুষের মত হইয়া উঠুক।

পরদিন সকালে ট্রেনের সময় সে জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিল। ঘরের ভিতরেই বসিয়া রহিল। ফুলফল লইয়া দেবতার পূজার জোগাড় করিতে লাগিল।

হঠাৎ শুনিল বাহিরে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মা তান ঘরে নাই?"

এ যে মঙ্‌লাটের গলা! দেবতা, সংকল্প, সব ভুলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সত্যই ত মঙ্‌লাট।

তাহাকে দেখিয়া মঙ্‌লাট্ বলিল, "ওখানে থাকতে শুনেছিলাম, তুমি হোটেল তুলে দিয়েছ, তবু একবার দেখে যেতে এলাম।"

মা তান ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কিসের হোটেল তুলে দিয়েছি? জিনিসপত্র নামিয়ে রাখ। মাঝে শরীর ভাল ছিল না বলে, যাত্রী ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।"

মঙ্‌লাট জিনিষ নামাইয়া রিক্‌শওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিল। মা তান্ ছুটিয়া গিয়া তাহার জন্য চা লইয়া আসিল। মা-পোয়ে রাগে বিড়বিড় করিতে করিতে ফুলের ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মা তান তাড়াতাড়ি জলখাবার করিয়া আনিল, বেশ ভাল দেখিয়া। রান্নার জোগাড় করিতে করিতে বলিল, "এবার খাওয়া-দাওয়া করবে ত ঠিক মত? না সেবারের মত খালি টো টো করবে?"

মঙ্‌লাট্ বলিল "কাল ঠিক করে বল্‌তে পারব।"

মা তান জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে কি? আজ বলতে পার না কেন?"

মঙ্‌লাট্ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ ত গিয়ে দেখি। শুনছি মা শিনের অন্য কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে। তা যদি হয়, তাহলে এর পর জেলের ভাত খাব, না হয় ফাঁসি যাব।"

মা তান্ রান্না ফেলিয়া, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। মা শিনের জন্য মঙ্ লাট্ ফাঁসি যাইতেও প্রস্তুত। এততেও কি মা তানের আক্কেল হইবে না? খানিক পরে বাহিরে তাকাইয়া দেখিল মঙ্ লাট্ চলিয়া গিয়াছে।

রান্নার জোগাড় তেমনি পড়িয়া রহিল। মা তান্ দরজায় তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মোটর-বাসে চড়িয়া একেবারে চিমেণ্ডাইনে উপস্থিত হইল।

ভাজের কাছে খোঁজ লইয়া সে মা শিনের বাড়ী শীঘ্রই বাহির করিয়া ফেলিল। মা শিন্ বাহিরে বসিয়া উল বুনিতেছিল, মা তানকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চাও? মাকে ডেকে দেব?"

মা তান তাহার পাশে উবু হইয়া বসিয়া বলিল, "না মাকে দরকার নেই, আমি তোমার কাছেই এসেছি।"

যুবতী অবাক হইয়া বলিল, "কিন্তু তোমাকে ত আগে কখনও দেখিনি।"

মা তান্ বলিল, "তা নাই বা দেখ্ লে? আমি তোমায় অনেকবার দেখেছি। মঙ্ লাট্‌কে জান ত? আমি তার আপনার লোক।"

যুবতীর মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। একটু কঠিন সুরে বলিল, "তা কি মনে করে এসেছ?" মঙ্ লাট্ আবার এখানে এসেছে না কি? তাকে এমুখো হ'তে বারণ করো, অনর্থক একটা খুনোখুনি হবে।"

মা তান্ বলিল, "তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও না কেন? তোমার কেরাণী কি তার চেয়ে দেখ্‌তে সুন্দর?"

মা শিন্ হাত তুলিয়া একটা সোনার চুড়ী দেখাইল, বলিল, "দেখেছ? সে দিয়েছে। তোমার মঙ্ লাট্‌কে নিঙ্‌ড়লেও এক ফোঁটা সোনা বেরবে না।"

মা তান হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "এর জন্যে? আচ্ছা, তুমি মঙ্ লাট্‌কে বিয়ে যদি কর, যত সোনা-দানা চাও সব পাবে।"

যুবতী বিরক্ত হইয়া বলিল, "কথায় চিড়ে ভেজে না গো। চোখে দেখলে বিশ্বাস হয়।"

মা তান বলিল, "তা, আমার সঙ্গে যাও যদি ত দেখাতে পারি।"

যুবতী কি মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, মাকে যা হোক একটা কিছু বলে আসি। না হলে চেঁচিয়ে মরবে।"

মা তান্ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে চটি পায়ে দিয়া মা শিন্ বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "চল, কোথায় যাবে? রেঙ্গুনে ত?"

মা তান্ বলিল "হ্যাঁ।" আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা মা তানের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তখনও মা পোয়ে বা মঙ্ লাট কেহই ফেরে নাই। তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, মা তান্ বলিল, "এই দেখ।"

নিজের কাপড়ের বাক্স, গহনার বাক্স সে খুলিয়া ফেলিল, বলিল, "এর ভিতর যা কিছু আছে সব দেব। তোমার কেরাণী এত দিতে পারবে? এখনই দেব। কিন্তু ঐখানে দেবতা বসে, তাঁর সামনে শপথ কর যে মঙ্ লাট্‌কে বিয়ে করবে।"

লোভে, আনন্দে যুবতীর দুই চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। সে দামী রেশমী লুঙ্গীগুলির উপর হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। আংটি হাতে পরিয়া দেখিল, গলায় হার ঝুলাইয়া দেখিতে লাগিল। নীলার চুড় দুইটা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "সব দেবে আমায়?"

মা তান্ বলিল, "সব দেব, যদি ওকে বিয়ে করে মান্দালে চলে যাও এখনি।"

যুবতী মিনিট-দুই ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা।" মা তান্ তাহাকে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল।

গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে গহনা কাপড়ের বাক্স সমেত যুবতীকে উঠাইয়া দিল। ঘরে আর প্রবেশ করিল না। মা পোয়ের অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া রহিল।

মা পোয়ে বেলা বারোটায় আসিল। মা তান্‌কে বাহিরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, এমন করে বসে আছিস্ যে? রান্না চড়াসনি?"

মা তান্ বলিল, "না, ওসব থাক্ এখন। তুই যা পারিস্ দুটো রেঁধে খাস্। মঙ্ লাট্ এলে তাকে

চিমেণ্ডাইন চলে যেতে বলিস্, আমি তার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

মা পোয়ে বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুই আবার কি ব্যবস্থা কর্‌লি? তুই কোথাও যাচ্ছিস্?"

মা তান্ ঘরের ভিতরের শূন্য কোণটা দেখাইয়া বলিল, "ঐ দেখ। তাহলেই বুঝবি।"

মা পোয়ে একেবারে বসিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিল, "সব দিয়ে দিয়েছিস্, পোড়াকপালি! বুড়ো বয়সে তোর গতি হবে কি?"

মা তান্ বলিল, "গতি যাতে হয়, সেই জন্যেই দিলাম। ওর লোভ মন থেকে না গেলে আমার আর রক্ষে ছিল না। কুকুরের মরণ হত। এখন আবার মানুষের মত হলাম। জানি, তাকে আর কোনোদিন চোখে দেখ্‌ব না। ক'দিনের জন্যে পিণ্ড যাচ্ছি, তুই ঘর-দোর দেখিস্, যাত্রী এলে রাখিস্।"

মা পোয়ে তবু বিলাপ করিয়াই চলিল, "অত টাকার জিনিষ দিয়ে দিলি?"

মা তান্ বলিল, "যাক্ গে। কোন্ কাজে আমার লাগত? মেয়েও নাই, ছেলেও নাই। টাকা এখনও কিছু আছে, আরো যতদিন বাঁচব, রোজগারই করব। মরবার সময় ভাইকে বলে যাবো, আমার নামে যেন প্যাগোডায় দু হাত জায়গা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়।"

মা তান্ খালি হাতেই বাহির হইয়া গেল। বুড়ী মা পোয়ে বিলাপ করিয়াই চলিল। শয়তানের উদ্দেশ্যে গালাগালি করিতে লাগিল।

সম্পাদকের চিঠি

গত বৎসর ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই চৈত্র গুজরাতের প্রাচীন শহর সুরতে নিখিলভারতীয় হিন্দু মহাসভার দ্বাদশ অধিবেশন হয়। আমাকে তাহার সভাপতি নির্ব্বাচন করায় যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য ১৩ই চৈত্র কলিকাতা হইতে রওনা হই। একাধিক পথ দিয়া সুরত যাওয়া যায়। আমরা পঞ্জাব ডাকগাড়ীতে আগ্রা পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে বোম্বাই বড়োদা ও মধ্যভারত রেলওয়ে দিয়া সুরত পর্য্যন্ত যাই। আহমদাবাদে ট্রেন বদলাইতে হইয়াছিল।

চলিত ভাষায় যাঁহাদিগকে হিন্দু জৈন বৌদ্ধ শিখ ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজী বলে হিন্দু মহাসভার সংজ্ঞা অনুসারে তাঁহারা সকলেই হিন্দুপদবাচ্য। কলিকাতা হইতে আমরা এইরূপ দশজন হিন্দু রওনা হই। আমাদের মধ্যে হিন্দু জৈন ও ব্রাহ্ম ছিলেন। হিন্দুরা ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন জাতির। ব্রাহ্মদের কোন জাতি নাই। সন্ন্যাসী ছিলেন একজন। দশ জনের মধ্যে নেপাল, রাজপুতানা আগ্রা প্রদেশ, বিহার ও বঙ্গের লোক ছিলেন। দুই জন ইউরোপে অধ্যয়ন ও ভ্রমণ এবং চীন জাপান জাভা বালী কাম্বোডিয়া আনাম মালয় শ্যামদেশ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। দুই জন ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন। টুণ্ডলায় আমার পূর্ব্বপরিচিত এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার ডাঃ নিহালচাঁদ বৈশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কেম্ব্রিজের এল্-এল্-ডি। তিনিও সুরত যাইতেছিলেন, আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন।

পথে আহারের কোন কষ্ট হয় নাই। ফল সঙ্গে ছিল, কোন কোন ষ্টেশন হইতেও সংগ্রহ করা হইতেছিল। পুরী তরকারী সন্দেশ আদিও কোথাও কোথাও কেনা গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈনের সঙ্গে ইক্‌মিক্ কুকার ছিল। তাহার দ্বারা তিনি ট্রেনেই সময় মত ভাত ডাল তরকারী রাঁধিয়া খাওয়াইতেছিলেন ও খাইতেছিলেন। আগ্রায় তিনি আগে হইতে টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছিলেন। যথাসময়ে প্রচুর পরিমাণে রুটি ভাত ডাল

তরকারী দধি মিষ্টান্ন আসিয়া হাজির হইল। নিহালচাঁদ-জী সঙ্গে ডাল ভাত তরকারী আনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহারও অংশ গ্রহণ করিতে বলিলেন। ট্রেনে কোনও প্রকার পংক্তিভেদ করা হয় নাই, "ছুঁৎমার্গও" একটুও অবলম্বিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, ইহার জন্য কাহাকেও কোন প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করিতে হয় নাই। পানীয় জলের বন্দোবস্ত যথেষ্ট ছিল। খুব বেশী ঠাণ্ডা হইত পদ্মরাজ-জীর কেম্বিসের থলীর জল। এইরূপ জলের থলীর রাজপুতানায় চলন আছে। ভাঙিয়া যাইবার ভয় না থাকায় ইহা ভ্রমণের খুব উপযোগী।

যাইবার সময় ভাল করিয়া গরম পড়ে নাই। কিন্তু মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে গরম বোধ হইত। রাত্রে পাতলা গরম কিছু একটা গায়ে দিতে হইত। একদিন একটা কম্বল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

বোম্বাই বড়োদা ও মধ্যভারত রেলওয়ে রাজপুতানার এক অংশের ভিতর দিয়া গিয়াছে। ইহা পার্ব্বত্য; নদী নালা যাহা আছে, তাহাতে বর্ষাকালে ভিন্ন জল থাকে না। বড় বড় গাছ খুব কম। উর্ব্বরা জমি যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহার পরিমাণ কম। উষর জমির পরিমাণ বেশী। এরূপ দেশে বাস করিতে হইলে মানুষকে স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও দৃঢ়কায় হইতে হয়। মানসিক দৃঢ়তাও তাহা হইতে আসে। যেমন করিয়াই হউক, দু মুঠা অন্ন মিলিবেই, এরূপ আশা করিবার দেশ ইহা নহে। এইজন্য অনিশ্চিতের সহিত সংগ্রাম করিবার সাহস ও অভ্যাস এখানকার অধিবাসীদের সহজে জন্মিবার সম্ভাবনা। অন্ন যাহাদের অনায়াসলভ্য নহে, এবং ঐ প্রকার সাহস ও অভ্যাস যাহাদের আছে, বাণিজ্যে তাহাদের সিদ্ধিলাভ হইবারই কথা। বিষ্ণু শর্ম্মার অতিসাবধানীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া,চাকরীর ধ্রুব সামান্য বেতনের মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক, বাণিজ্যের অধ্রুব অধিক আয়ের চেষ্টায় যাহারা পরিশ্রম করিতে পারে, বাণিজ্যলক্ষ্মী তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

কলিকাতা হইতে সুরত যাইবার পথে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাগড়ীই ত নানা রকমের। জয়পুরের মিউজিয়মে রাজপুতানার হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির পাগড়ীর মাটীর তৈরী রঙীন নমুনা আছে। তাহার সংখ্যা কত কুড়ি হইবে, এখন বলিতে পারি না।

ট্রেনে ভিন্ন প্রদেশে যাইবার সময় কোথাও না নামিলে মানুষের বাসগৃহ ও অন্যবিধ অট্টালিকাদির বাহ্য রূপ ও স্থাপত্য লক্ষ্য করিবার বেশী সুবিধা হয় না। তাহা হইলেও রেলওয়ে ষ্টেশনের ঘরবাড়ীতেও ক্রমশঃ কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। লাইনের অদূরে গ্রাম বা নগর থাকিলে তাহার ঘরবাড়ীও দেখিতে পাওয়া যায়। আলোয়ার রাজ্যের এবং পালানপুর রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, ষ্টেশনের ঘরবাড়ী সব কতকটা মসজিদের মত গুম্বজবিশিষ্ট। কয়েকটি মসজিদ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধতম সুন্দর ইমারতের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং গুম্বজবিশিষ্ট হইলেই ঘরবাড়ী কদাকার হইবে, এমন নয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমের বাড়ী নির্ম্মিত হয়। যাহা মসজিদে শোভা পায়, তাহা আফিসে মানানসই নাও হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, উল্লিখিত রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির গুম্বজগুলি ন্যাড়া ও কদাকার।

সুরতে শহরের বাহিরে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুতলা বাড়ী আমাদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী লক্ষপতি শ্রীযুক্ত চুনীলাল দালাল বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা সুরতে ৬২ ঘণ্টা ছিলাম; তাহার মধ্যে, আহার নিদ্রা ব্যতীত, অধিকাংশ সময় হিন্দু মহাসভার কাজে যাইত। রাত্রে বিশ্রামের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইত না। একদিন রাত্রে একটার পর বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির কাজ শেষ হয়। সুতরাং শহর দেখিবার সময় হয় নাই। ইতস্ততঃ যাইবার পথে যাহা চোখে পড়িয়াছে, তাহাই দেখিয়াছি। সুরত প্রাচীন নগর। আগে প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত ছিল। এখনও তাহা স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। শহরটি অপরিষ্কার। উহা পূর্ব্বে বন্দর ছিল। এখন সমুদ্র কয়েক মাইল দূরে গিয়া পড়িয়াছে।

হিন্দু মহাসভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে "বন্দেমাতরম্" গীত হইল। সুর বাংলা দেশের মত নহে। এই গানটি

বস্তুতঃ সমগ্র ভারতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জাতীয় সঙ্গীত হইবার উপযোগী নহে। রবীন্দ্রনাথের "জনগনমন-অধিনায়ক" অধিকতর উপযোগী।

শ্রীযুক্ত ডাঃ রায়জী

এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় কেহ কাহারও জাতি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ পর্য্যন্তও করিতেন না; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ও জাতির প্রতিনিধিরা একই পংক্তিতে বসিয়া একত্র ভোজন করিতেন। এখানে থাকিবার সময় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন ভিন্ন অখিলভারতীয় অছুতোদ্ধার (অস্পৃশ্যদের উদ্ধার) পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়। ডাঃ নারায়ণ দামোদর সাবরকর ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। হিন্দু মহাসভা অপেক্ষাও ইহাতে দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। উভয় সভাতেই অনেক মহিলা ছিলেন। হিন্দু মহাসভায় মহিলারাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশের পর অছুতোদ্ধার সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব ধার্য্য হয়:—

"এই পরিষদ ঘোষণা করিতেছেন, যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম মূল তত্ত্ব নহে, কিন্তু অল্পকাল হইতে প্রচলিত মিথ্যা, ভ্রমোৎপাদক, এবং কলঙ্কযুক্ত রূঢ়ি। এখন উহা শীঘ্র ত্যাগ করিলেই হিন্দুজাতির আত্মশুদ্ধি হইবে।"

ইহা ভিন্ন এই পরিষদে আরও অনেক প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সুরতে হিন্দু-নারীদের একটি সমিতির দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলাম। সভা হইয়াছিল একটি দেবমন্দির-সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দায়। গুজরাতে হিন্দুনারীদের মধ্যে অবরোধ নাই। কয়েক শত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সভানেত্রী এক বর্ষীয়সী প্রবীণা হিন্দু-মহিলা, বয়স ৭০ হইতে পারে। আমার উদ্দেশে তিনি গুজরাতীতে সৌজন্যসূচক একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন। আমাকে কিছু বলিতে বলায় আমি ইংরেজীতে কিছু বলিলাম; তাহা ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দীতে বুঝাইয়া দিলেন। আমার বক্তব্যের একটি প্রধান কথা এই ছিল, যে, গুজরাতে নারীদের স্বাধীনতা থাকায় তাঁহাদের সকল দিকে আত্মোন্নতি ও লোকহিত সাধনের সুবিধা আছে। অতএব, এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যদ্দ্বারা উত্তর-ভারতের নারীদের উপকার হইতে পারে।

একদিন "অবনত" শ্রেণীর কতকগুলি বালক তাহাদের ড্রিল প্রভৃতি দেখাইল। ইহাদের জন্য স্কুল চালাইবার নিমিত্ত রাজা নারায়ণলাল পিট্টি মাসে হাজার টাকা খরচ করেন। সুরতের মাগনলাল কলেজের অধ্যাপক জয়েন্দ্ররায় ভগবানলাল দূরকাল আমাকে তাঁহাদের কলেজ এবং "বনিতাবিশ্রাম" দেখান। বনিতাবিশ্রাম প্রথমতঃ অসহায় বিধবা হিন্দু বালিকা ও নারীদের শিক্ষা ও

নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এম্-এম্ রায়জী ও তাঁহার পরিবার

বামে হইতে দক্ষিণে—প্রথম পংক্তি—শ্রীযুক্ত রায়জীর জামাতা শিরীষকান্ত দেশাই, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুমুদ, কনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীযুক্ত রায়জীর পত্নী মীরাবাঈ, শ্রীযুক্ত রায়জী। দ্বিতীয় পংক্তি—শ্রীযুক্ত রায়জীর দ্বিতীয় পুত্র, পুত্রবধূ শ্রীমতী মল্লিকা, জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোজ, তৃতীয় পুত্র (শ্রীযুক্ত রায়জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ সুরত যুবক-সংঘের সম্পাদক ও সম্পাদিকা)

নিবাসের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন কুমারী এবং সধবা বালিকা ও নারীদিগকেও ভর্ত্তি করা হয়। ইহা বিস্তৃত বাগানের মধ্যে অবস্থিত। ইহার অট্টালিকানির্ম্মাণ এবং পরিচালনের জন্য অনেক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। বাড়ীটি বড় ও সুন্দর। স্নানাগার, পাকশালা, ভোজনগৃহ, ভাণ্ডার প্রভৃতি পরিষ্কার, প্রশস্ত এবং সুবিন্যস্ত। সাধারণ শিক্ষা, সঙ্গীত শিক্ষা, এবং সেলাই প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ ছাড়া, রামায়ণের কথা শুনিবার বৃহৎ কক্ষ, ব্যক্তিগত পূজার্চ্চনার জন্য ক্ষুদ্র সুন্দর একটি কক্ষ, সকল ছাত্রীর একত্র উপদেশাদি শুনিবার হল, প্রভৃতি আছে। একজন শিক্ষয়িত্রী আমাকে সমুদয় দেখাইলেন। কতকগুলি ছাত্রী স্তোত্র ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্কা। অন্য কতকগুলি ছাত্রী গানের সহিত গুজরাতে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত "গরবা" নৃত্য দেখাইল। এই বানতাবিশ্রাম প্রধানতঃ মহিলাদের উদ্যোগে ও দানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে।

আমরা যেদিন রাত্রে সুরত হইতে চলিয়া আসি, সেইদিন রাত্রি আটটার সময় হিন্দু মহাসভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার রায়জী তাঁহার বাড়ীতে "গর্‌বা" দেখিবার ও গান শুনিবার জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। রাস্তার ধারে প্রশস্ত উঠানে গর্‌বা হয়। গুজরাতের লোকেরা ইহাকে গর্‌বাই বলেন, নৃত্য বলেন না। আশ্বিন মাসের নবরাত্রের নয় দিন

ইহা বিশেষ করিয়া হয়। অন্য সময়েও হইয়া থাকে। সাধারণ রাস্তাতেও ইহা হয়। ডাক্তার রায়জীর বাড়ীর গরবাতে হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ীর মহিলারাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মহিলাদের বসিবার জায়গা ভারতীয় রীতি অনুসারে স্বতন্ত্র ছিল; কিন্তু কোন চীক্ পর্দ্দা ছিল না। গরবায় বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুশোভন ও ভব্যতাযুক্ত অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান করা হয়। গান নানা রকমের হইয়া থাকে। তাহার কয়েকটির অনুবাদ অন্যত্র দেওয়া হইল। আজকাল নূতন ধরণের গানও রচিত হইতেছে; যেমন 'স্বদেশী' বিষয়ক গান, বারদোলী সত্যাগ্রহের গান। ডাক্তার রায়জীর বাড়ীর গরবাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা বিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী কুমুদ শিরীষকান্ত দেশাই ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী মল্লিকা মনোজ রায়জী এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু মহিলা যোগ দিয়াছিলেন। ডাক্তার রায়জী ব্রাহ্মণ। এই গরবায় যাঁহারা গান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গলা বড় মিষ্ট। বনিতাবিশ্রামের গরবায় যে-সকল ছাত্রীর গান শুনিয়াছিলাম, তাহাদের গলা তেমন মিষ্ট নয়। এই পার্থক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না। গরবা শেষ হইয়া যাইবার পর আমি মহিলাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কিছু বলিলাম। তাহার পর ডাক্তার রায়জীর পক্ষ হইতে গরবার প্রত্যেক মহিলাকে একটি করিয়া সুন্দর বাটী উপহার দিলাম। ইহা তথাকার চলিত রীতি।

এখান হইতে আমরা সোজা ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিলাম। জিনিষপত্র আগেই স্বেচ্ছাসেবকদের হেফাজতে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সুরতে থাকিতেই আমরা আহমদাবাদ প্রার্থনাসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গটুলাল ধ্রুব মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। সুতরাং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিদাস নাগ ও আমি সেখানে নামা স্থির করিয়াছিলাম। আমাদের দলের প্রায় অন্য সকলেই গোড়াদা দেখিয়া আহমদাবাদ যাইবেন স্থির করেন। ভোর না হইতেই আহমদাবাদে ট্রেন থামিল। দেখি, ধ্রুব মহাশয় আমাদের কামরার দ্বারে দণ্ডায়মান। পরিচয়ে জানিলাম, তিনি স্বর্গীয় স্যার রমণভাই মহীপৎরাম নীলকণ্ঠের পত্নী লেডী বিদ্যাগৌরী রমণভাই নীলকণ্ঠের ভ্রাতা। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের কাজ করেন; ভগিনীর বাড়ীতে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহারা সঙ্গতিপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক; চাকর-বাকরের অভাব নাই। কিন্তু অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা লেডী বিদ্যাগৌরী ও তাঁহার কন্যারাই করিতেছিলেন। একটি পুত্র তখন বি-এ পরীক্ষা দিতেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বেশ পরিপাটি, কিন্তু বাংলা দেশের মত লোক-দেখান আড়ম্বর অপচয় নাই। সুরতেও এই রূপ দেখিয়াছিলাম। লেডী বিদ্যাগৌরী ৩০।৩৫টি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী, উপসভানেত্রী, সম্পাদিকা, ও সভ্য। এই সবগুলির কাজ তিনি নিষ্ঠার সহিত করেন, অথচ গৃহকর্ম্মও করেন। গুজরাতের হিন্দু-মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে বি-এ পাস করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

আহমদাবাদের প্রাচীন নাম কর্ণাবতী। এখানে মুসলমান-শাসনকালের অনেক কবর ও অন্য অট্টালিকা আছে। তাহার কোন-কোনটির পাথরের জালির কাজ অতি সুন্দর। তাহার অনুরূপ পিতলের কাজ কোন কোন সমাধিতে আছে। অনেকগুলির স্থাপত্য দেখিয়া বুঝা যায় মিস্ত্রী ও কারিগরেরা হিন্দু ছিল। সাবরমতী নদীর তীরে শাহীবাগ। ইহার যে বারান্দাটি নদীর সম্মুখে সেখানে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ "ক্ষুধিত পাষাণ" লিখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এখানে রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আহমদাবাদের একটি জৈন-মন্দির দ্রষ্টব্য। ইহা গত শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণ করাইতে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। মন্দিরটি ও তাহার প্রাঙ্গণ খুব পরিষ্কার রাখা হইয়াছে। ইহার পাথরের কাজ প্রশংসনীয়। কিন্তু আবু পর্ব্বতে দিলওয়াড়ার জৈন-মন্দির দেখিবার পর আর ইহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয় না। অধুনা আহমদাবাদ সূতার ও কাপড়ের কলের সংখ্যায় বোম্বাইয়ের নীচে। নগরের যে যে অংশে এই মিলগুলি অবস্থিত, তাহার সৌন্দর্য্য ব

পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করা যায় না। প্রাচীন আহমদাবাদ প্রাচীরবেষ্টিত। এখন প্রাচীরের বাহিরেও অনেক বাড়ী হইয়াছে।

ইহা বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র। ইহার দোকান-গুলির একটি বিশেষত্ব এই চোখে পড়িল,যে, অনেকগুলিরই সাইন্‌বোর্ডে কেবল গুজরাতী অক্ষরে নাম লেখা আছে, ইংরেজীতে নাই। ইহাই ত স্বাভাবিক। বাংলা দেশে অনেক স্থলেই ইংরেজী অক্ষরে নাম না লিখিলে যেন চলে না, এমন কি বাঙালীর দোকানের নামও এমন রাখা হয় যাহাতে ক্রেতা মনে করিতে পারে যে উহার মালিক ইংরেজ।

আহমদাবাদে মাত্র ৩৮।৩৯ ঘণ্টা ছিলাম। ইহার মধ্যেই যাহা কিছু দেখা শুনা করিতে হইয়াছিল।

প্রথম দিন রাত্রে লেডী বিদ্যাগৌরী রমণভাই গুজরাতী মহিলাদের ক্লাবে আমাদের জন্য গরবার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। সুরতে কিম্বা এখানে আমরা কোথাও গরবা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই। উভয় স্থানেই অতিথির প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের জন্য ইহা করা হইয়াছিল। আহ-মদাবাদেও বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা গরবায় যোগ দিয়াছিলেন। লেডী বিদ্যাগৌরীর এক কন্যা, আহ-মদাবাদের প্রসিদ্ধ মিলের মালিক ও ধনী শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাইয়ের দুইটি কন্যা,অধ্যাপক দিবাতিয়ার পত্নী প্রভৃতি গরবা-প্রদর্শিকা ও গায়িকাদের মধ্যে ছিলেন। এখানকার গরবায় সুরত অপেক্ষা রকম ও বৈচিত্র্য কিছু বেশী ছিল, কিন্তু গানের সুর ও স্বরের উৎকর্ষ সুরতকে অতিক্রম করে নাই। নৃত্য কথাটির সহিত আমাদের দেশে অসম্ভ্রমের ভাব জড়িত থাকায় তাহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু অন্য কথার অভাবে তাহাই ব্যবহার করিতেছি। আহমদাবাদের গরবায় একটি নৃত্য দেখিলাম, যাহা হইতে গরবা কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে মহিলারা মাথার উপর এক একটি মাটীর কলসী লইয়া সুন্দর ভঙ্গী ও গীত-সহকারে বৃত্তাকারে পরিক্রমণ করেন। কলসীগুলির গাত্রে সকল দিকে বহু ছিদ্র থাকে এবং ভিতরে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। সেই সব ছিদ্র দিয়া প্রদীপের আলো ফুটিয়া বাহির হয়। কলসীগুলির নাম "গর্ভ-দীপ"। এই গর্ভ-দীপ মাথায় লইয়া ছন্দোবদ্ধ বৃত্তাকার গতির পূর্ব্বে হলের আলো নিবাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে আঁধারে শত আলো-আঁধারের খেলা চমৎকার দেখাইয়েছিল।

আমি যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিবেচনায় গরবায় অনিষ্টকরও নিন্দনীয় কিছু নাই। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত যেন না করা হয়, যে, সকল রকম নৃত্যই সমর্থনযোগ্য।

গরবার পর কোন কোন মহিলা বাংলা গান শুনিবার ও শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় অধ্যাপক কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের দু একটি গান করিলেন।

এই উপলক্ষ্যে লেডী রমণভাই আমাদিগকে শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাইয়ের পত্নী শ্রীমতী সরলাবাঈ সারাভাইয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সারাভাই-জায়া পরদিন প্রাতে তাঁহার পারিবারিক বিদ্যালয় দেখিতে নিমন্ত্রণ করায় সেখানে যাওয়া স্থির হইল। তাহার পূর্ব্বেই গুজরাত বিদ্যাপীঠ দেখিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গরবার সভাতেও উক্ত বিদ্যাপীঠের অন্যতম ছাত্রী শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাইয়ের এক কন্যা আমাকে সেই অনুরোধ জানাইলেন। সাবরমতী আশ্রম দেখিবার সঙ্কল্পও আগে হইতেই ছিল। তিনটি দ্রষ্টব্য স্থান একই দিকে।

প্রাতে অম্বালাল সারাভাই মহাশয়ের মোটর আসিল। তাহাতে আমরা তিন জন তাঁহার বাড়ীর পারিবারিক বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। তাঁহার স্ত্রী বিশেষ সৌজন্য-সহকারে সমুদয় দেখাইলেন। এই বিদ্যালয় কেবল তাঁহাদের পুত্রকন্যাগুলির জন্য। প্রত্যেক বিষয় শিখাইবার জন্য আলাদা শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, এবং প্রত্যেকটির কক্ষ আলাদা। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিখিবার মত আয়োজন ও সরঞ্জাম আছে। সাধারণ সব শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া চিত্রাঙ্কন, গীতবাদ্য ও নৃত্য শিখাইবার শিক্ষক, এবং মাটীর পাত্র ও রেলগাড়ীর এঞ্জিন প্রস্তুত করিতে শিখাইবার কয়েক জন লোক আছেন। ছেলেমেয়েদের হাতের লেখা সচিত্র পত্রিকা আছে। তাহারা ভাষা শিখে গুজরাতী, ইংরেজী ও সংস্কৃত। শ্রীমতী সরলাবাঈ সারাভাই যেমন করিয়া প্রত্যেক কক্ষে লইয়া গিয়া কে কি শিখিতেছে

দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, শিশুদের হৃদয়-মনরুচি ও বিদ্যাবিশেষের প্রতি মানসিক প্রবণতা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা, এবং সন্তানদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেকে তাহাদের স্থানীয় করিয়া তাহাদের অভিলাষ ও শক্তি নির্ণয় করিবার নৈপুণ্যের পরিচয় পাইলাম। তিনি সন্তানদের শুধু দেহের নয়, হৃদয় মনেরও বিকাশের সহায়তা করিতেছেন। সত্য বটে, সারাভাই-দম্পতির প্রভূত ধন আছে বলিয়াই সন্তানদের শিক্ষার জন্য তাঁহারা এত ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যত খরচ করেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ঢালিলেও এরূপ একটি বিদ্যালয় হইত না, যদি তাহার পশ্চাতে মাতার বুদ্ধি, স্নেহ, সদা-অবহিত মন ও শ্রম না থাকিত। একটি ছেলের ঝোঁক এঞ্জিনের দিকে। তাই সে শিক্ষকের সাহায্যে ছোট সত্যিকার রেলগাড়ীর এঞ্জিন প্রস্তুত করিতেছে। কোন কোন অংশ ঢালাই হইয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলিল, একমাস পরে তাহার ট্রেন চলিবে। তার চেয়ে ছোট একটি মেয়ে তাহার পড়াশুনা সারিয়া সামনে এপ্রন্ (পরিচ্ছদপরিরক্ষক বসন) দ্বারা পোষাক ঢাকিয়া মোটরচালিত কুমারের চাক দিয়া মাটীর নানা রকম জিনিষ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল।

বিদ্যালয় দেখিবার পর শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাই মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর তাঁহাদেরই গাড়ীতে আমরা সেতুর উপর দিয়া সাবরমতী নদী পার হইয়া মহাত্মা গান্ধীর সাবরমতী আশ্রম দেখিতে গেলাম। সেখানে পৌছিয়া শুনিলাম মহাত্মাজি স্নানাহার করিতে গিয়াছেন, তিনটার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না। কেহ কেহ বলিলেন, যে, তাঁহার নিকট নাম পাঠাইয়া দিলে শীঘ্র দেখা হইতেও পারে। কিন্তু তাহা করিয়া তাঁহার কাজের ক্রম ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না। সুতরাং আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রমের ঘর-বাড়ীগুলি দেখিয়া যাইব স্থির করিলাম। কিছু দেখিবার পর দূর হইতে ঠাওর হইল, গান্ধীজি একটি গামছা মাথায় দিয়া ভোজনশালার দিকে আসিতেছেন। তিনি কতকটা নিকটে আসিতেই নমস্কার করিলাম; তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন। সামনে হইতে তাঁহার মুখে রোদ পড়িতেছিল বলিয়া তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, তিনি দূর হইতে নগ্ন মস্তক দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, কয়েকজন বাঙালী দর্শক আসিয়াছেন নিকটে আসিয়া আমাকে চিনিতে পারিলেন। অল্প ক্ষণ কথা হইল। কয়েকটি শিশু "বাপু" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। আমি ক্ষুদ্রতমটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, ইনি পরে সভাপতি হইবেন। গান্ধীজি হাসিয়া বলিলেন, কিছু আশ্চর্য্য নয়। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে আসিয়াছেন, কতদিন থাকিবেন? আমি বলিলাম, কাল আসিয়াছি, আজ যাইব। তিনি অনুযোগ করিয়া বলিলেন, ইহা আহমদাবাদের প্রতি ও আমার প্রতি বড় অবিচার। সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের বিখ্যাত পুস্তক ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজের টাইপলিপি এবং পরে মুদ্রিত পুস্তক গ্রন্থকার মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে গান্ধীজির মতের জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, উহা আমি সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মদেশে ঘুরিয়াছি, ভারতবর্ষে ঘুরিতেছি, এখনও পড়িবার সময় পাই নাই; সমস্তটি পড়িয়া কিছু বলিলে তবে আমার মতের মূল্য হইবে; বন্ধুগণ আমার উপর এত কাজের ভার দেন, যে, সমস্ত করিবার আমার অবকাশ নাই; আমাকে দয়ার পাত্র মনে করিবেন। আমি বলিলাম, আপনার সময় হইলে পড়িবেন, উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। সুনীতিবাবুর ও কালিদাসের পরিচয় দিয়া তাঁহারা কিসের জন্য সুরতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বলিলাম এবং জানাইলাম, যে, হিন্দু মহাসভার মণ্ডপে সকলে লাঠিখেলা দেখিতে ব্যস্ত থাকায় বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে লণ্ঠন-বক্তৃতার আয়োজন হইয়া উঠে নাই। তাহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, আজকাল লোকদের লাঠির দিকেই ঝোঁক বেশী বটে! রাস্তায় দাঁড়াইয়াই কথা হইতেছিল। এখন তাঁহার আহারে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমি চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলাম। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া এবং আমাদের তখনও স্নানাহার হয় নাই জানিয়া আশ্রমেই স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, এখনও

বিদ্যাপীঠ দেখিতে বাকী আছে, এবং যাঁহার বাড়ীতে অতিথি আছি তিনি হয় ত আমাদের অপেক্ষায় অভুক্ত থাকিবেন। কোথায় আছি জিজ্ঞাসা করায় নাম বলিলাম। অতঃপর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, আশ্রম দর্শনের, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের এবং তাঁহার সহিত অল্পক্ষণও কথাবার্ত্তার সুযোগ হওয়ায় সন্তুষ্ট চিত্তে বিদ্যাপীঠ অভিমুখে রওনা হইলাম। তখন ১১টা বাজিয়া গিয়াছে।

সাবরমতী আশ্রমটি বেশ বিস্তৃত জায়গায়। জমী বালুকাময় ও বৃক্ষবিরল বলিয়া স্থানটি গরম বোধ হইল। গাছপালা হইতে সময় লাগিবে।

আশ্রম হইতে আহমদাবাদ ফিরিয়া আসিবার পথে গুজরাত বিদ্যাপীঠ অবস্থিত। ইহার বাড়ীটি পাকা, দুতলা ও বেশ বড়। চকমিলান বাড়ী; মধ্যে বড় উঠান। দেখিয়া কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের উঠান মনে পড়িল; তাহা আরও বড়। কলেজের অধ্যক্ষ ও একজন অধ্যাপক আমাদিগকে লাইবেরী দেখাইলেন। তাহাতে ভাল ভাল অনেক ইংরেজী ও অন্য বহি আছে; বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বাদি সম্বন্ধে। ইংরেজী নানা উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র রাখা হয়। বিদ্যাপীঠ হইতে যে-সব বহি বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এখন ছাত্রসংখ্যা মোটামুটি একশত, মুসলমানও আছেন; ছাত্রী ছয় জন। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাইয়ের পূর্ব্বোক্তা কন্যাকে দেখিলাম। তাহার মা আমাকে বলিয়াছিলেন, সন্তানদের যাহার যেদিকে ঝোঁক তাহাকে সেইদিকে যাইবার স্বাধীনতা দিয়া থাকি; এই কন্যাটি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে শ্রদ্ধাবতী, তদনুসারে সাধারণ কলেজে না গিয়া বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভার্থ গিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীরা সকলে একটি বড় কামরায় উপবিষ্ট হইলে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে সেখানে লইয়া গেলেন। নিস্তব্ধতার মধ্যে একজন সুন্দর বেহালা বাজাইলেন। আমাকে কিছু বলিতে বলায় আমি হিন্দীতে অল্প কিছু বলিলাম। তাহার পর অধ্যক্ষ মহাশয় বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে হিন্দীতে কিছু বলিলেন। অতঃপর অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীমান্ কালিদাস রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা" গান করিলেন।

বিদ্যাপীঠ হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কানু দেশাইয়ের চিত্রাঙ্কন-কক্ষ দেখিলাম। তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন, এখানে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। বেশ কয়েকখানি ছবি আঁকিয়াছেন। গরবার একটি বৃহৎ রঙীন ছবির নক্‌সা পেন্সিলে আঁকিয়াছেন দেখিলাম। তাহা সম্পূর্ণ হইলে আমাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। বিদ্যাপীঠে ভাষার মধ্যে গুজরাতী হিন্দী সংস্কৃত ও ইংরেজী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। অধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন, বাংলা মরাঠী প্রভৃতি ধরাইবারও ইচ্ছা আছে। যাঁহাদের চাকরী ওকালতী প্রভৃতি করিবার প্রয়োজন নাই, কিম্বা প্রয়োজন থাকিলেও যাঁহারা অর্থ উপার্জ্জনের পথে যাইতে চান না, এই বিদ্যাপীঠে তাঁহাদের সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ ভালই হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে লোকহিত সাধন বিষয়েও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। ভারতীয় কোন কোন বিষয়ে গবেষণাও এখানে হয়। ইহার আরও সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার সময় পাইলাম না।

যখন আহমদাবাদে ফিরিয়া আসিলাম, তখন প্রায় ১টা। আসিয়াই গৃহের কর্ত্রী মহোদয়াকে বলিলাম, আপনার এত বিলম্ব করিয়া দিয়াছি, তজ্জন্য বড় দুঃখ ও লজ্জা বোধ হইতেছে। তিনি বিশেষ সৌজন্যসহকারে বলিলেন, আমার কোন কষ্ট হয় নাই, আপনাদের জন্যই উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম। অতঃপর তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া খাইতে বসিলাম; তিনিও আহারে বসিলেন।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সমাজে আমার বক্তৃতা ছিল। অবশ্য ইংরেজীতেই করিলাম। গুজরাতী জানিলে তাহাতেই করিতাম। মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। আজ স্থানীয় ভাষাবিজ্ঞানবিদদের সহিত আলা- আলোচনার জন্য লেডী রমণভাই সুনীতিবাবুকে একটি পরিষদে লইয়া গেলেন; তিনি তাহার সম্পাদিকা বা উপসভানেত্রী—ঠিক্ কি মনে নাই। তাহার পর সন্ধ্যায় উঁহারই বৃহৎ হলে সুনীতিবাবুর ও আমার বক্তৃতা এবং কালিদাসের বৃহত্তর ভারত

সম্বন্ধে লণ্ঠন-বক্তৃতা। খুব ভীড় হইয়াছিল। মহিলারাও আসিয়াছিলেন। স্লাইড দেখাইয়া বক্তৃতা করিবার যথেষ্ট সময় না থাকা সত্ত্বেও যাহা হইল তাহাতে শ্রোতারা সন্তুষ্ট ও কৌতূহলী হইলেন। তিনটি বক্তৃতা যখন শেষ হইল, তখন প্রায় আমাদের ট্রেনের সময় হইয়া আসিয়াছে। আমরা বক্তৃতার পর সোজা ষ্টেশনে গেলাম—জিনিষপত্র আগেই গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত গটুলাল ধ্রুব শহর দেখাইতে, বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতে এবং অন্য সকল দিকে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

গুজরাতে হিন্দু পুরুষ ও নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কিছু বেশী হইবার একটি কারণ স্ত্রীস্বাধীনতা।

আহমদাবাদ হইতে কলিকাতা আসিবার পথে আমরা আবু পর্ব্বতে দিলওয়াড়ার জৈন-মন্দির দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সেইজন্য আবুরোড ষ্টেশনে নামিলাম। সেখানে জিনিষপত্র ওয়েটিং-রুমে রাখিয়া স্নান সারিয়া লইয়া মোটর-বাসে পাহাড়ে উঠিলাম। উপরে পৌঁছিয়া এক গুজরাতী ব্রাহ্মণ হোটেলওয়ালার হোটেলে সকলে ভাত রুটি ডাল তরকারী খাইলাম। এমন সুমিষ্ট আটার রুটি অনেক বৎসর খাই নাই। হোটেলওয়ালা একটা খাতা দেওয়ায় তাহাতে সকলে তাহার ন্যায্য প্রশংসা লিখিয়া দিলাম। তাহার পর দিলওয়াড়ার মন্দির দেখিতে চলিলাম। খুব বেশী দূর উঠিতে হয় না। পাহাড়ের উপর কতকটা ঠাণ্ডা বলিয়া দুপরে হাঁটিতে কষ্ট হইল না। আমাদের সঙ্গে আমাদের জলের ঘটী লইয়া একজন ভীল শ্রমিক চলিল। মন্দিরগুলি বাহির হইতে দ্রষ্টব্য বলিয়া কিছু বুঝা যায় না। মন্দির দেখিবার পূর্ব্বে যাহা দেখিলাম ও যাহা ঘটিল বলিতেছি। অর্বুদ পর্ব্বত ও মন্দিরগুলি সিরোহীর মহারাজার রাজ্যভুক্ত।

মন্দিরের সিংহদ্বারে যাইবার পথের আরম্ভেই দেখিলাম লেখা রহিয়াছে 'ওয়েটিং-রুম ফর ইউরোপীয়ান্স্', ইউরোপীয়দের জন্য বিশ্রামাগার। দেশীয় লোকদের জন্য এরূপ কিছু নাই। তাহার পর মন্দিরে ঢুকিবার অনুমতির জন্য প্রত্যেকের নিকট হইতে পাঁচ সিকা চাহিল। পদ্মরাজ-জি বলিলেন, তিনি আগে আগে আসিয়াছেন কখনও পয়সা দেন নাই। অনেক-তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে আমরা ১।০ করিয়া দিলাম। তাহার সব টাকার জন্যও আবার সিরোহীরাজের লোকটার রসিদ না দিবার মতলব দেখিলাম। বোধ হয় কিছু টাকা আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমরা প্রত্যেকের রসিদ লইলাম। ভীল শ্রমিকটি ভিতরে না গেলেও তাহার নিকট হইতে এক আনা আদায় করিল; কেন না, সে আমাদের নিকট হইতে মজুরী পাইবে! স্বামী সত্যানন্দ সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহার কিছু লাগিল না। হিন্দু মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত পয়সা দিয়া যাইতে রাজী হইলেন না। তাহার কারণ বলিতেছি। একটা কাগজে হিন্দীতে লেখা ছিল, পাঁচ শ্রেণীর লোক ছাড়া আর সকলকে ১।০ করিয়া দিতে হইবে; যথা,—সন্ন্যাসী, তিন বৎসরের কম বয়সের শিশু, রাজপুতানার রাজা-রাজড়া, সিরোহী রাজ্যের প্রজা, এবং ইউরোপীয়গণ। গরীব ভীল শ্রমিকের নিকট হইতে পর্য্যন্ত এক আনা আদায় হইল, অথচ পাশ্চাত্য-পোষাকপরা যে-কোন লোক বিনি পয়সায় মন্দির দেখিবে—তদুপরি তাহাদের বিশ্রামকক্ষও আছে। মন্দিরের সিংহদ্বারে একটা ছাপা ইংরেজী ইস্তাহারে লেখা আছে, ভারতীয় দর্শকরা যেন জুতা খুলিয়া যান এবং নিজ নিজ দেবমন্দিরে যেরূপ সশ্রদ্ধ আচরণ করেন, এখানেও যেন সেইরূপ করেন। ইউরোপীয়দিগকে শ্রদ্ধাবান্ হইতে বলা হয় নাই—কারণ সর্ব্বত্র ভক্তিপ্রণত হওয়াটাই তাহাদেরই বিশেষত্ব! তাহাদের জুতা বুট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে, তাহাদিগকে নিরামিষ জুতা দেওয়া হইবে, তাহা পরিয়া তাহারা মন্দিরে যাইবে। আমাদের মন্দির-দর্শনের সময়েই একজন আমেরিকান অধ্যাপক নিরামিষ জুতা পরিয়া আসিলেন। সিরোহীর মহারাজার এই সব ইস্তাহার এবং ট্যাক্স আদায় ও মজুরের ফর্দ্দ পড়িয়া আমাদের অনেকের মনে হইয়াছিল, শ্বেতাঙ্গের বুটলেহক মহারাজা গুলাকে ডালহৌসী একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিলে মন্দ হইত না।

দিলওয়াড়ার দুটি মন্দিরের ভিতরের পাথরের মূর্ত্তি ও সূক্ষ্ম কাজের বর্ণনার চেষ্টা করিব না। এরূপ কখনও দেখি নাই। বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ

শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় নাই। একটি মন্দিরে আঠার কোটি টাকার উপর, অন্যটি বার কোটি টাকার উপর খরচ হইয়াছিল—তাহাও অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে। আমেরিকান্ অধ্যাপকটির সব দেখিয়া ও কালিদাসের মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া তাক্ লাগিয়া গেল।

মন্দিরগুলি দেখিয়া কতকটা নীচে আসিয়া আমরা আবার মোটর-বাসে উঠিলাম। আবু রোড্ ষ্টেশনের ও সংলগ্ন বসতির কতকগুলি লোক আবু রোডে একটি আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাতেই আমাদিগকে বক্তৃতান্তে সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সভায় আমি কিছু বলিলাম, পদ্মরাজ-জি তাহা হিন্দী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সভ্যেরা সব অল্প আয়ের মানুষ হইলেও চাঁদা করিয়া মন্দির-নির্ম্মাণের টাকা তুলিয়াছেন। কিন্তু গুণধর সিরোহী-নরেশ তাহাদিগকে জমী দিতেছেন না। অন্য অনেক কাজের জন্য দেন। সন্ধ্যার পর আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়া ট্রেনে উঠিলাম। রেলের আর্য্যসমাজী কর্ম্মচারীদের যত্নে, সেকেণ্ড ক্লাসে জায়গা না থাকায়, আমাদের জন্য একটা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইল।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে এমন সময় ট্রেন আজমীরে পৌঁছিল। আমাদের তিনজনের কাহারও আজমীরে নামিবার কথা ছিল না। কিন্তু সেখানে গাড়ী থামিতেই দেখি বিস্তর ভদ্রলোক ফুলের মালা ও মুদ্রিত হাণ্ডবিল লইয়া উপস্থিত। তাঁহারা কোথা হইতে জানিয়াছেন আমরা ঐদিন ঐপথ দিয়া যাইব। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোকও ছিলেন। হাণ্ডবিলে লেখা আছে, যে, আমি আজমীরের ব্যায়ামপ্রতিযোগিতায় জয়ী ব্যক্তিদিগকে সন্ধ্যার পর জনসভায় পুরস্কার বিতরণ করিব, বক্তৃতা করিব, এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগ বক্তৃতা করিবেন। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামিতে হইল। শ্রীযুক্ত চাঁদকরণ শারদা প্রমুখ আজমীরের অজানা এই বন্ধুগণ এক শেঠের প্রকাণ্ড বাড়ীতে আমাদের থাকিবার জায়গা করিয়া দিলেন। বাঙালী ভদ্রলোকেরা বলিলেন, তাঁহারা বাঙালী ক্লাবে জায়গা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, যাঁহারা বাঙালী নহেন, বাঙালীদের পক্ষে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে তাঁহারাও সায় দিলেন। প্রাতঃকালীন জলযোগ স্নানাদি সারিয়া মধ্যাহ্নে আমরা ডাক্তার ললিতমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে কলাইয়ের ডাল কচি আমের অম্বল প্রভৃতি বাঙালীর প্রিয় খাদ্য সহযোগে অন্ন আহার করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। আমার এলাহাবাদের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শহর দেখিবার জন্য আমাদিগকে তাঁহার মোটর দেওয়ায় খুব সুবিধা হইয়াছিল।

আজমীর একটি পার্ব্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত। ইহা প্রস্তর-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত শহর। পাঁচটি সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সম্পন্ন হয়। হিন্দুদের পুষ্কর তীর্থ এখানে থাকায় বিস্তর হিন্দু যাত্রী এখানে আসেন। পাণ্ডারা পুণ্য সঞ্চয় করাইবার জন্য চেষ্টা করিল, এবং নামধাম জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু আমাদের কাহারও নিকট সুবিধাজনক উত্তর পাইল না, পুণ্যও করাইতে পারিল না। তবে, ইহা বলা উচিত, যে, তাহারা বেশী বিরক্ত করে নাই। পুষ্কর তীর্থে বাঙালী যাত্রীদের জন্য বাঙালীদের দ্বারা একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। বিনা ভাড়ায় সেখানে থাকা যায়। যাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত

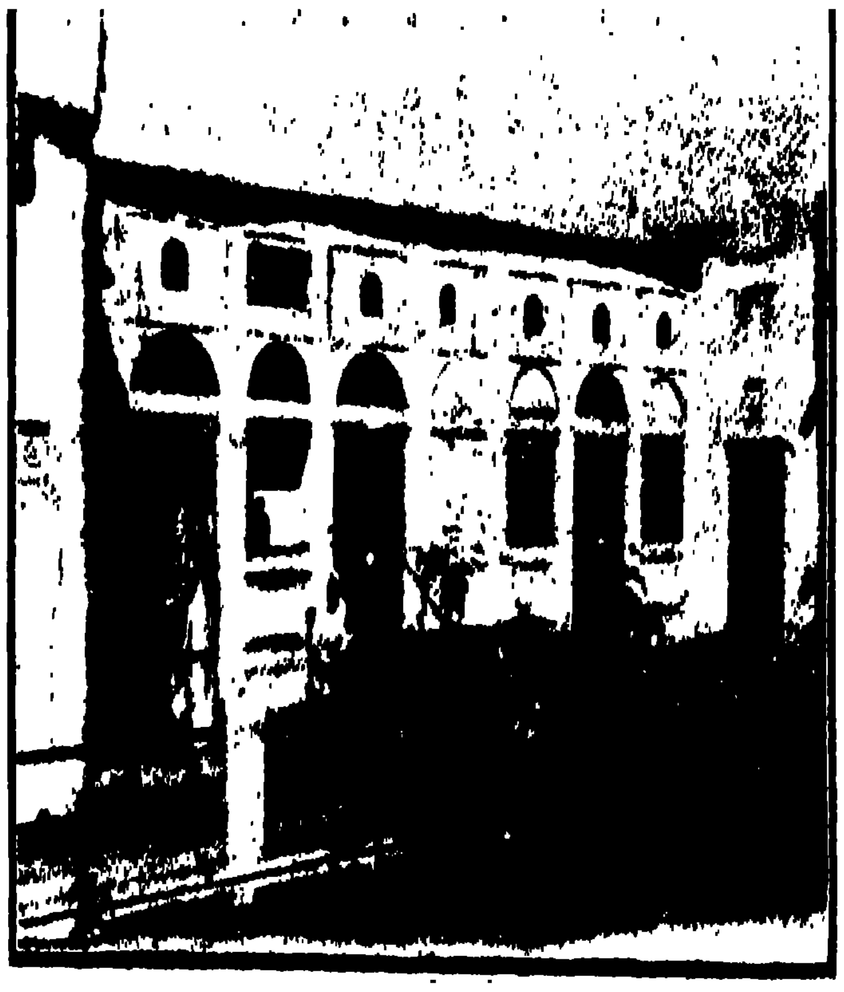

পুষ্কর তীর্থের বাঙালী ধর্ম্মশালা

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[নেগেটিভ্ শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের সৌজন্যে প্রাপ্ত

বাড়িয়া চলায় উপর তলায় আরও পাঁচ-সাতখানি ঘর তৈরী করা দরকার। ব্যয় হইবে ৩,০০০ টাকা। চাঁদা সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে প্রেরিতব্য। পুষ্করে একটি পুরাতন ব্রহ্মার মন্দির আছে, কিন্তু খুব পুরাতন মনে হইল না। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অবগত হইলাম, ইহাই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে একমাত্র ব্রহ্মা-মন্দির। মহান্ত মহারাজের সহিত সুনীতিবাবু সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিলেন। তিনি অশিক্ষিত ধাঁচের মহান্ত নন। সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানও আছে। এই মন্দিরে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কিছুকাল ছিলেন। তখন তিনি আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। মহান্ত মহারাজ স্বামীজির একটি লাঠি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছেন; তাহা আমাদিগকে দেখাইলেন। সম্রাজ্ঞী মেরী এই মন্দির দেখিয়াছিলেন বলিলেন; বিশেষ করিয়া তাঁহার জন্য নির্ম্মিত বসিবার জায়গা দেখাইলেন! একটি খাতায় দর্শকদের স্বাক্ষর ও মন্তব্য আছে। অনুরুদ্ধ হইয়া আমরাও কিছু লিখিয়া দিলাম। আমার সম্পাদকীয় পরিচয় জানিয়া আমার পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে মহান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। তিনি বাংলা ইংরেজী জানেন না। সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে একখানি হিন্দী "বিশাল ভারত" পাঠাইয়া দিয়াছি। আমরা মন্দির হইতে ফিরিবার সময় তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া কমলা লেবু দিলেন। গরমের সময় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আমাদের দেরী হইল না। ব্রহ্মার মন্দির হইতে নিকটেই সাবিত্রী পাহাড় দেখা যায়। হিন্দু-নারীরা ইহার উপরে গিয়া পূজা দিয়া থাকেন।

• •

কলিকাতার একজন মাড়োয়ারী বণিক ১৫।১৬ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাহার প্রাঙ্গণে "অস্পৃশ্য" জাতিদিগকে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। স্বামী সত্যানন্দ সেই মর্ম্মের ইস্তাহারটি নকল করিয়া লইলেন।

মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ খাজাসাহেব মুইহুদ্দীন চিশ্‌তীর দরগাহ্‌ আজমীরে স্থিত। এখানে ঠিক হিন্দু-তীর্থের মত পাণ্ডা আছে। তাহারা অবশ্য মুসলমান। মানসিক করাইয়া, ফুলের মালা পরাইয়া টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে। মুসলমান হিন্দু উভয় ধর্ম্মের অনেক লোক এখানে আসিয়া, এবং দূর হইতেও, মানসিক করে। এই কবর দেখিবার পয়সা দাও, ঐ কবর দেখিবার পয়সা দাও, ইত্যাদি দাবী আছে। দুটি প্রকাণ্ড ডেকচীতে বিতরণের জন্য খিচুড়ী রান্না হয়। সেগুলি এত বড় যে তাহার ভিতর কয়েকজন করিয়া মানুষ ঢুকিতে পারে। এই দরগাতে সময় বিশেষে সুফীদের কাওয়ালী গান হইয়া থাকে।

"আড়াই দিন্ কা ঝোঁপরা" আর একটি দ্রষ্টব্য প্রধান কীর্ত্তি। ইহা একটি জৈন বিদ্যাপীঠ ছিল। সম্মুখে যাহা ছিল, তাহা ভাঙিয়া মুসলমানী আমলে খিলানযুক্ত সাতটি দরজা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকিলেই ইহা অমুসলমান কীর্ত্তি বলিয়া বুঝা যায়। হলটির ছাদ অনেকগুলি পাথরের স্তম্ভের উপর ধৃত। স্তম্ভগুলি খুব উচ্চ। ধ্বংসকারীদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার গাত্রের মূর্ত্তি-গুলির চিহ্ন রহিয়াছে, অন্য কারুকার্য্য অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে।

আনা সাগর একটি বৃহৎ জলাশয়—কতক স্বাভাবিক, কতক কৃত্রিম। ইহা একজন রাজপুত রাজার কীর্ত্তি। ইহার একদিকের পাড়ের উপর শাহজাহান বাদশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কয়েকটি সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরের মণ্ডপ আছে।

রাজপুতানা মিউজিয়ম দেখিলাম। সেখানে হাঁটু পর্য্যন্ত বুটপরা কয়েকটি অতি প্রাচীন পাথরের সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিলাম। বুটপরা কেন, তাহার ঠিক্ কারণ জানি না। একটি কাল পাথরের প্রাচীন কালীমূর্ত্তি দেখিলাম। ইহার এক এক পাশে ২৭টি করিয়া ৫৪টি হাত। গলায় মুণ্ডমালা। মুখ অনেকগুলি; ১৫।১৬টির কম হইবে না। মধ্যেকার মুখটি মানুষের মত। অন্য সমুদয় মুখ নানা জন্তুর। এইরূপ মূর্ত্তির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কোন শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। মিউজিয়মের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয়ের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করিয়া তৃপ্ত হইলাম।

তিনি বৃদ্ধ; অতি অমায়িক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। ভারতীয় প্রাচীন নানা লিপি সম্বন্ধে ও রাজপুতানার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। এই সব দামী বহি তিনি মুক্তহস্তে আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিলেন। মিউজিয়মের বাড়ীটি মোগলযুগের।

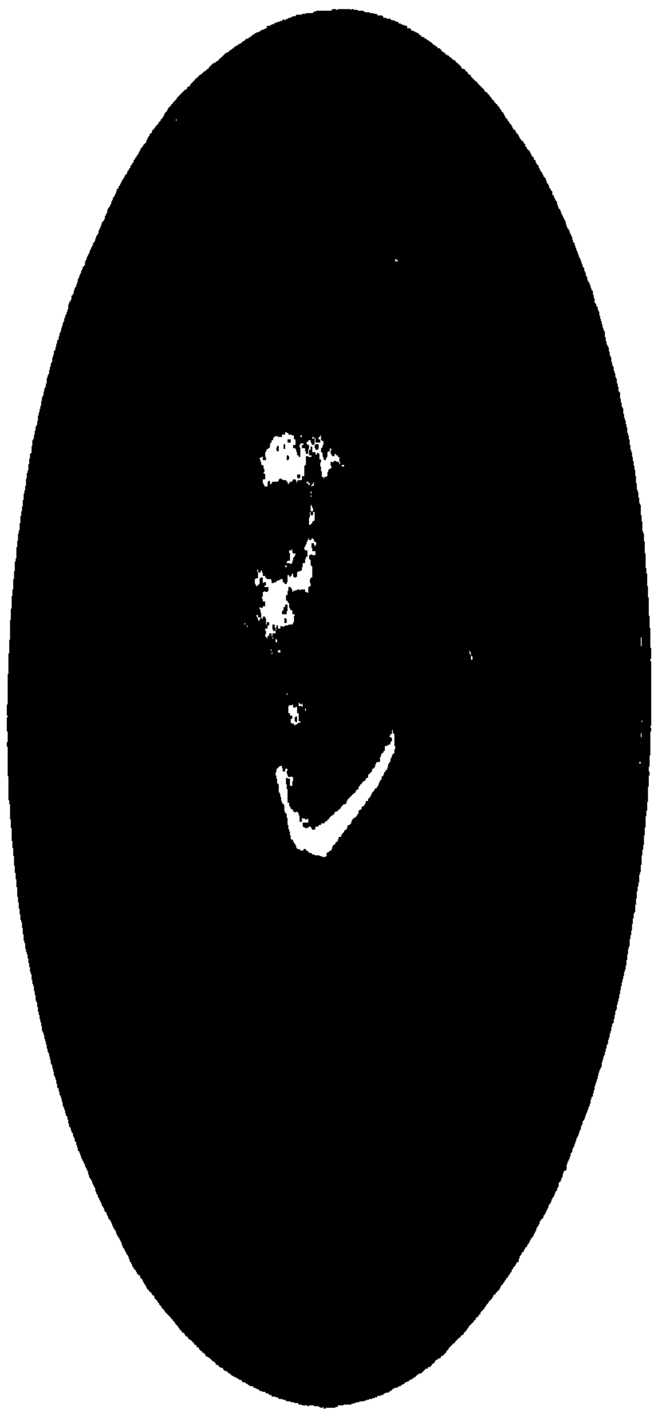

শ্রীচুনীলাল দালাল

ইহার ফাটকের বারান্দা হইতে জাহাঙ্গীর বাদশাহ ইংরেজ-দূত স্যার টমাস রোকে দর্শন দিতেন।

আজমীরে বাঙালী ক্লাবে তথাকার বাঙালী ভদ্রলোকদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা হইল। মহিলারাও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চীকের আড়ালে ছিলেন। জলযোগের পর আমি সাধারণভাবে কিছু বলিলাম, মহিলাদের উদ্দেশেও কিছু বলিলাম।

সন্ধ্যার পর হিন্দু ব্যায়ামপ্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণ সভা টাউন হলে হইল। বৃহৎ হল পূর্ণ হইয়াও বাহিরে অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিল। একটিও মহিলা ছিলেন না। ইহা পর্দ্দার দেশ। এই উপলক্ষ্যে প্রধান বক্তৃতা ছিল সুনীতিবাবুর জাভা বালি কাম্বোডিয়া সম্বন্ধে লণ্ঠন-বক্তৃতা। পুরস্কারের সংখ্যা এত বেশী ছিল, আমার ও কালিদাসের বক্তৃতা আবার হিন্দী করিয়া বুঝাইতে এত সময় গেল, এবং লণ্ঠনের আলো ঠিক করিতে এত বিলম্ব হইল, যে, সুনীতিবাবু বেশী সময় পান নাই। তথাপি তিনি গোটাপঞ্চাশ স্লাইড দেখাইয়া প্রাচীন বৃহত্তর ভারতের পূর্ব্ব অংশের বেশ একটা ধারণা জন্মাইয়া দিলেন। বক্তৃতা শেষ হইবার পর ট্রেন ধরিতে আর কয়েক মিনিট সময় ছিল। যাহা হউক, টাউন হল হইতে একাধিক ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিলাম। জিনিষপত্র আগেই গিয়াছিল।

পর দিন প্রাতে আগ্রা পৌঁছিলাম। যে ট্রেন পাইলাম, তাহা কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর তুফানী গাড়ী। কিন্তু ভীড় না থাকায় আমরা প্রত্যেকে এক-একটি বেঞ্চি পাইয়াছিলাম। বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই। পর দিন বেলা এগারটার সময় কলিকাতা পৌঁছিলাম।

স্বর্গ-ভবন—

সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান কালে আমেরিকার বড় বড় শহরে ৩০|৪০ তলা বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। এক একটি এই রকম প্রাসাদে হাজার হাজার লোক বাস করে। এই সকল আকাশস্পর্শী প্রাসাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাদগুলি পূর্ব্বে খালি পড়িয়া থাকিত। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন নীচে স্থানাভাব হইতে লাগিল তখন এই সকল প্রকাণ্ড ছাদগুলিতে বাগান, বাংলো, ঝরণা, ছোট ছোট রাস্তা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া লোকে আরামে বাস করিতে লাগিল। এক একটি ছাদের উপর এই প্রকারে লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। ছাদের উপর নির্ম্মিত বাড়ী, বাগান, নকল ঝরণা ইত্যাদির পরিচয় চিত্রে পাইবেন। দূর হইতে দেখিলে এইগুলিকে অতি চমৎকার দেখায় এবং ইহারা যে প্রাসাদের উপর নির্ম্মিত তা বুঝা যায় না।

—

অভিনব ভেলা—

জলের ঢেউএর উপর ভেলাতে করিয়া তীরবেগে চলিয়া যাওয়া ইউরোপের এবং আমেরিকার নানা স্থানের অতি প্রিয় খেলা হইয়া

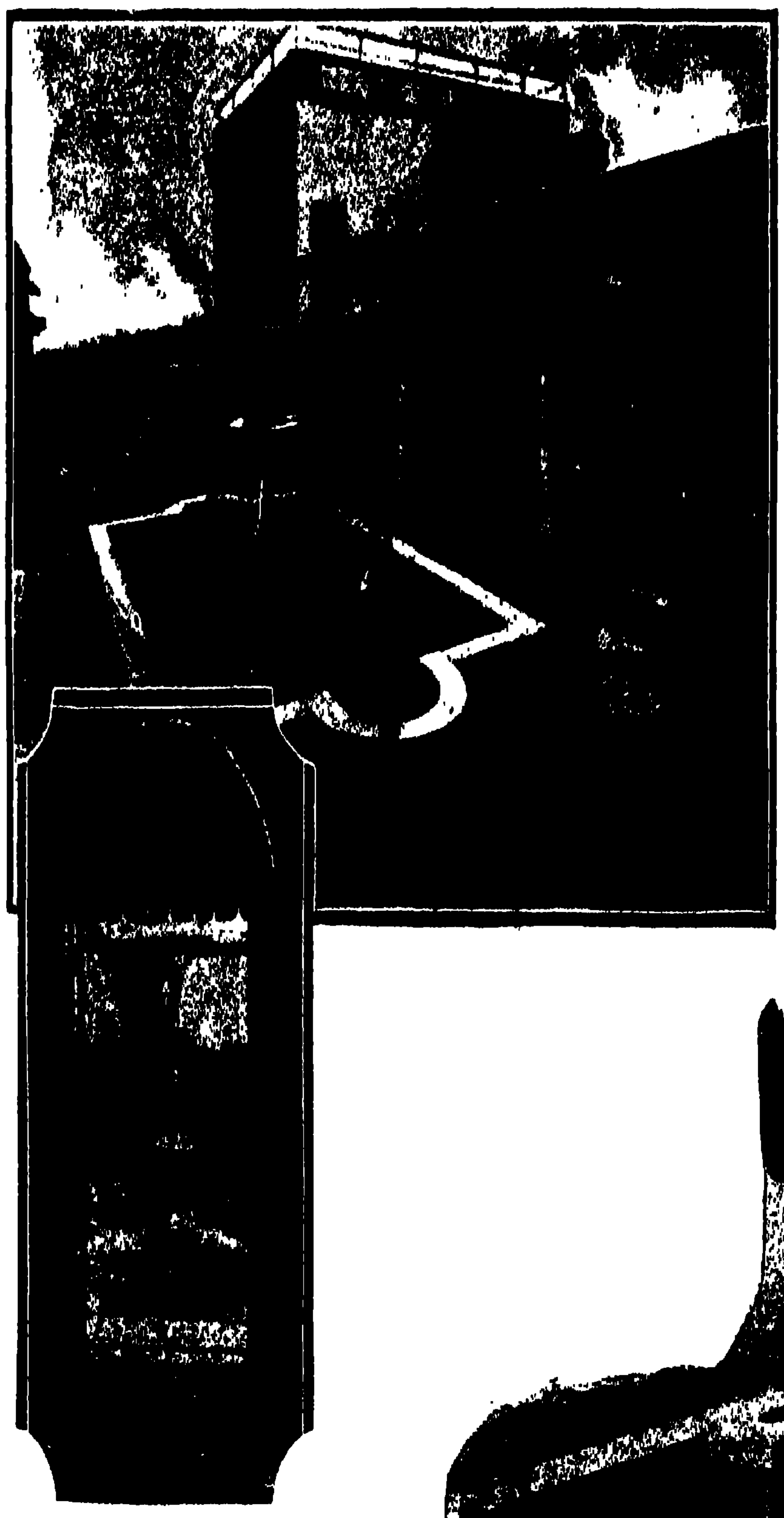

স্বর্গ ভবন—

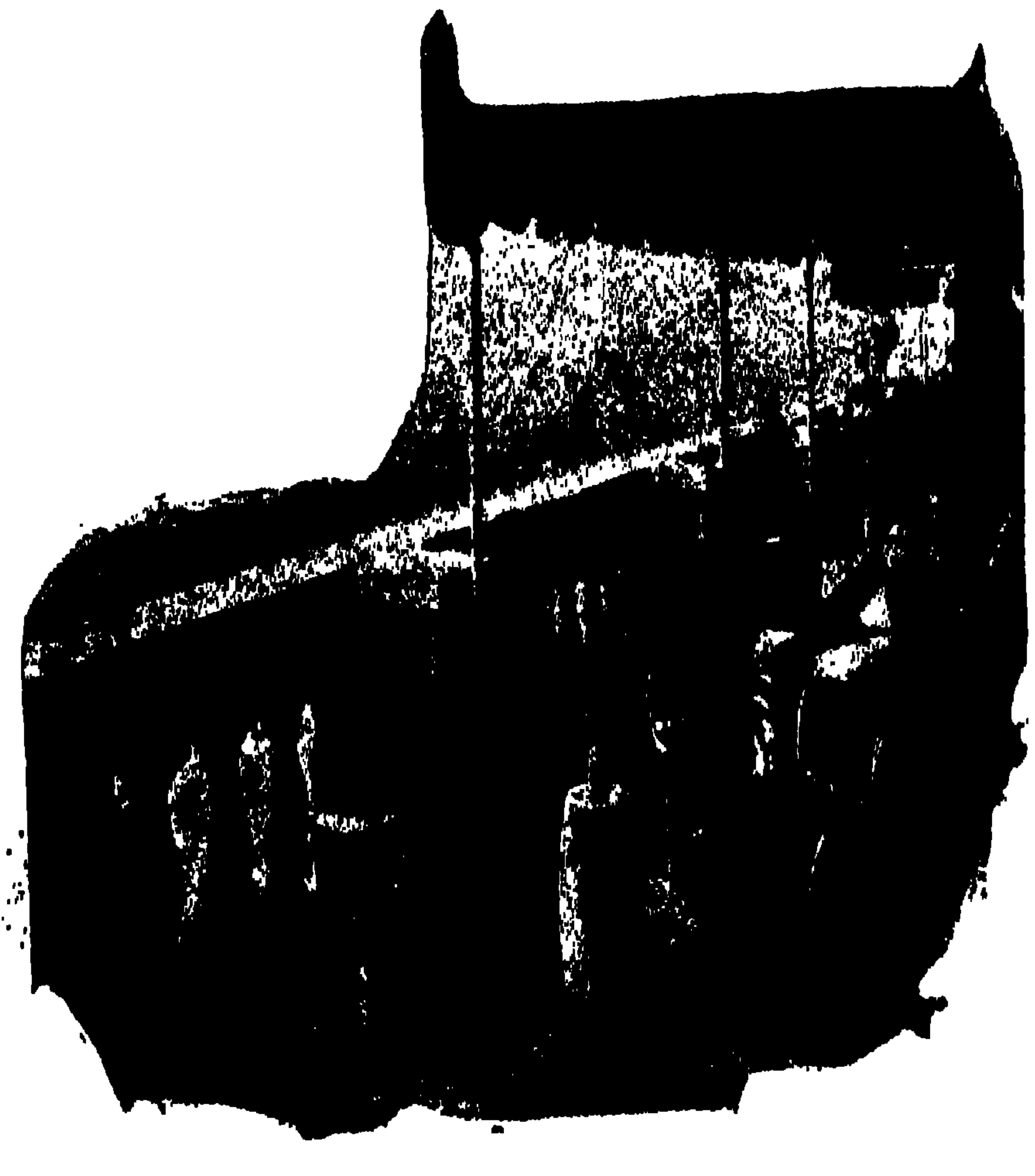

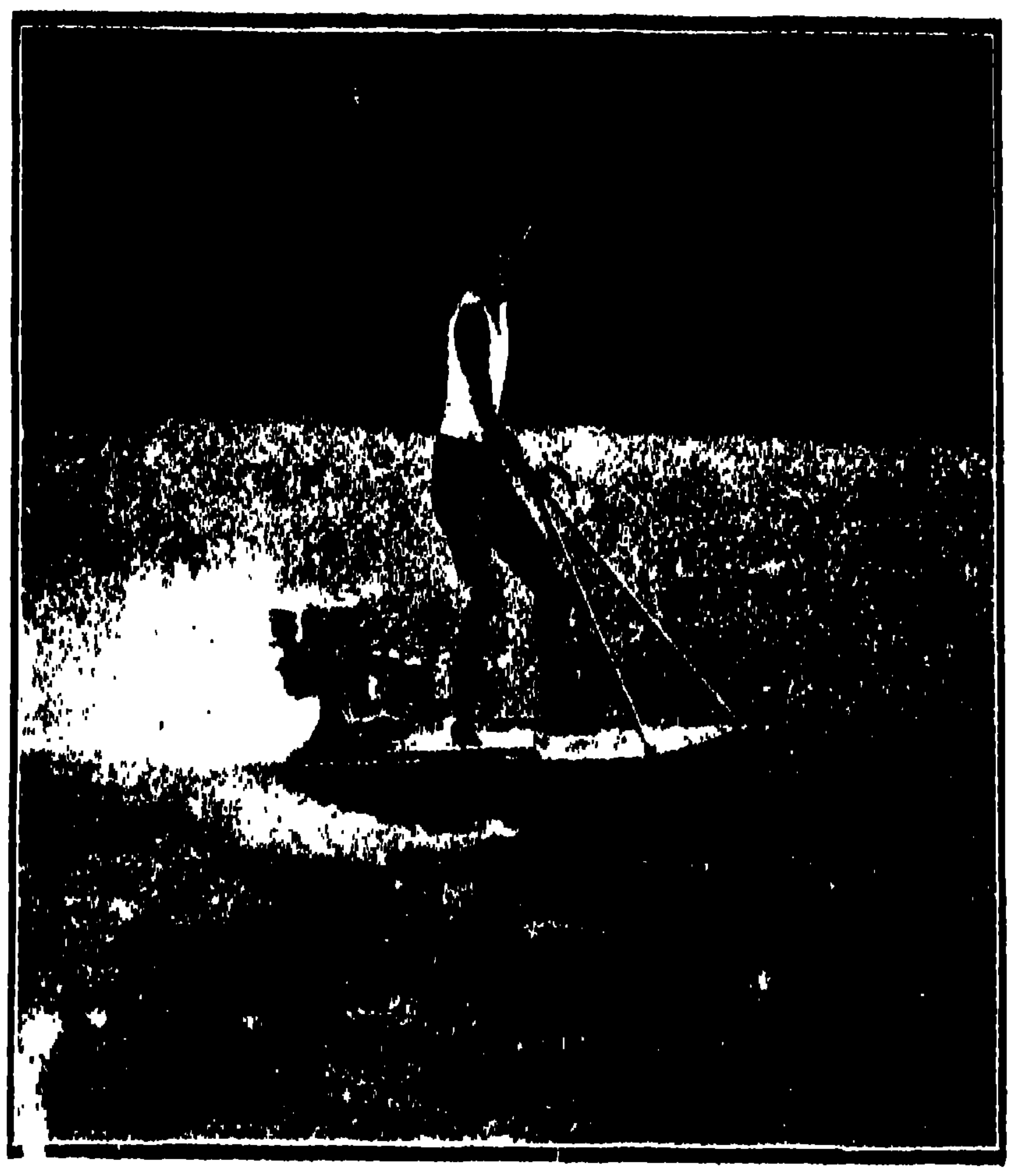

অভিনব ভেলা—

দাঁড়াইয়াছে। ভেলার গতি বাড়াইবার জন্ম ভেলার এক প্রান্তে একটি ছোট অথচ জোরালো মোটর বসান হয়। আরোহী যাহাতে পড়িয়া না যায় এবং নিজের তাল সামলাইতে পারে সেইজন্ম ভেলার সঙ্গে দড়ি আঁটা থাকে। এই ভেলায় আর একটি অভিনব ব্যবস্থা আছে—আরোহী জলে পড়িবামাত্র আপনা হইতেই ভেলা থামিয়া যায়।

—

মোটর ইঞ্জিন গরম রাখিবার ষ্টোভ—

ঠাণ্ডা জায়গায় মোটর কিছুক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিলে মোটর পুনরায় ষ্টার্ট করিবার সময় কষ্ট এবং বিলম্ব হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ম সম্প্রতি একপ্রকার ষ্টোভ আবিষ্কার হইয়াছে। এই

মোটর ইঞ্জিন গরম রাখিবার ষ্টোভ—

ষ্টোভ ইঞ্জিনের কাছে রাখিয়া দিলে ইঞ্জিন গরম থাকে এবং বহুক্ষণ বন্ধ থাকিবার পর মোটর ষ্টার্ট করিতে কোনো প্রকার বেগ পাইতে হয় না।

—

দাঁতের গোড়ায় ঔষধ দিবার যন্ত্র—

দাঁতের গোড়ার ব্যথা, ফুলা ইত্যাদি সারাইবার দরকার হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঁত তুলিয়া ফেলিতে অথবা মাড়ি কাটিতে হয়।

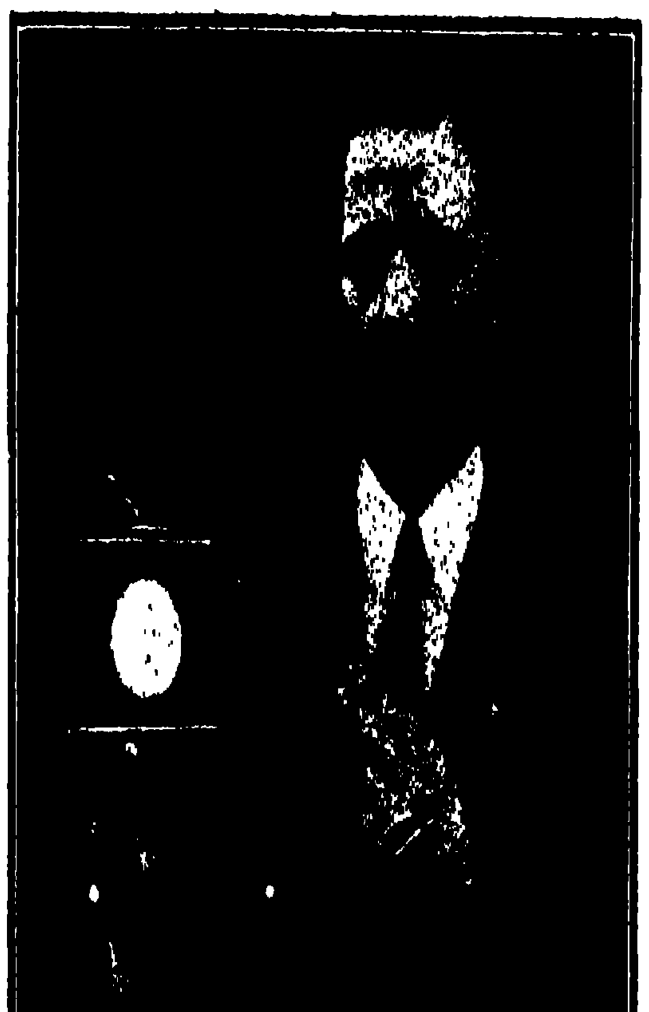

দাঁতের গোড়ায় ঔষধ দিবার যন্ত্র—

সম্প্রতি অনেক চিকিৎসক দাঁতের অসুখে দাঁতের গোড়ায় মাড়িতে আইডিন ঢুকাইয়া দিবার জন্ম একটি নূতন ইন্‌জেকশন যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে এই নূতন যন্ত্র বিশেষ ভাল কাজ দিতেছে। দাঁতের গোড়ায় মাড়িতে ভাল করিয়া ইন্‌জেকশন দিবার ফলে অনেক সময় অনাবশ্যক দাঁত তোলা বা মাড়ি কাটার হাত হইতে বাঁচা যায়।

দুগ্ধবতী বৃক্ষ—

Guatemala দেশের একপ্রকার বৃক্ষ হইতে অবিকল দুধের মত এক প্রকার পানীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই দুগ্ধ ঐ স্থানের লোকেরা

দুগ্ধবতী বৃক্ষ

কফি ইত্যাদিতে ব্যবহার করে। দুধ যেমন বাসি হইলে বা টক জিনিষের সংস্পর্শে আসিলে কাটিয়া যায়—এই বৃক্ষের দুগ্ধও ঠিক সেই প্রকারে কাটিয়া যায়।

জাল এবং নকল চিত্র ধরিবার উপায়—

বাজারে অনেক সময় প্রসিদ্ধ চিত্রকরের আঁকা ছবি বলিয়া বহু টাকাদি বিক্রয় হয়। অনেকে বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আঁকা বিখ্যাত চিত্রাদির নকল ছবি আঁকিয়া লোককে ঠকাইয়া বিক্রয় করে। বিশেষ অভিজ্ঞ শিল্পী ছাড়া অন্য কেহ এই চুরি ধরিতে পারিত না। সম্প্রতি এক প্রকার এক্স-রে বাতি বাহির হইয়াছে। ইহার আলোর সাহায্যে ছবির বয়স এবং রং কতকালের পুরানো তাহা অনায়াসে ধরা যায়। নতুন এবং পুরানো রংএর তফাৎ এই আলোর মুখে অতি স্পষ্ট হইয়া পড়ে। এই বাতি বাহির হইবার পর হইতে বাজারে জাল এবং নকল ছবি চালানো কষ্টকর ব্যাপার হইবে।

একস্-রে'র সাহায্যে চিত্রের জাল ও নকল ধরা

ঘণ্টায় ২৩১ মাইল—

প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে মেজর সিগ্রেভ নামক একজন ইংরেজ মোটর-চালক ঘণ্টায় ২৩১ মাইল বেগে মোটর চালনা করিয়াছেন। কিছুদিন

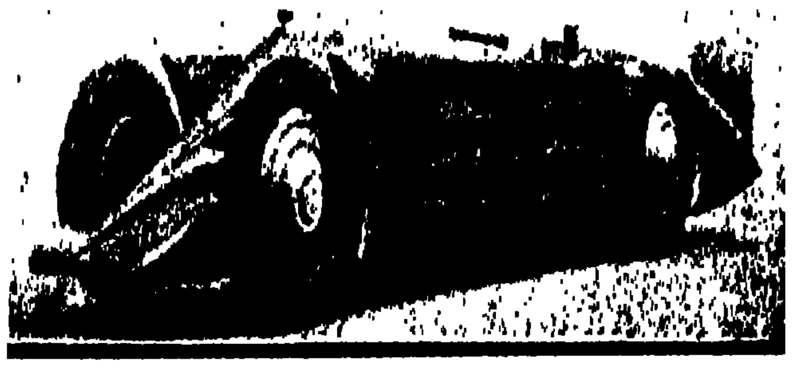

মোটর সিগ্রেভের মোটর—গোল্ডেন অ্যারো

পূর্ব্বে ইনি ২০৭ মাইল বেগে মোটর দৌড়াইয়াছিলেন। পৃথিবীতে এখন পর্য্যন্ত এত বেগে আর কেহ মোটর চালনা করিতে পারে নাই।

মেজর সিগ্রেভ ও তাঁহার পত্নী

মেজর সিগ্রেভের ২৩১ মাইল বেগে মোটর চালনা করিবার পরেই আমেরিকান মোটরচালক লি বিবল্ আরো জোরে মোটর চালনা করিতে গিয়া একচুল ভুলের জন্য প্রাণ হারাইয়াছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মোটরের ধাক্কায় একজন ক্যামেরাম্যানও মারা যায়।

আমেরিকার ডেটোনা-বিচে মেজর সিগ্রেভ তাঁহার মোটর দৌড় করান। হাজার হাজার লোক এই অত্যাশ্চর্য্য দৌড় দেখিবার জন্য সমবেত হয়। মেজরের গাড়ী ৩ মাইল দৌড়াইবার পর হঠাৎ তাহার বেগ বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং চোখের পলক ফেলিতে-না ফেলিতে গাড়ীখানি ৯ মাইল পথ ২৩১.৩৬ মাইল বেগে অতিক্রম করিয়া যায়।

মোটর দৌড় হইয়া যাইবার পর মেজর সাহেব দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, ঘণ্টায় ২৪০ মাইল বেগে গাড়ী না চলাতে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গাড়ীখানি অন্তত ২৪০ মাইল বেগে চলিবে।

অনেকে বলিতেছেন যে, এইরূপ বিষম বেগে গাড়ী দৌড় করানর উপকারিতা কিছুই নাই। মানুষের কোনো কাজে এত দ্রুতবেগ প্রয়োজন হইবে না। তাহা ছাড়া শহরের মাঝখানের রাস্তা দিয়া এত জোরে গাড়ী চালানো অসম্ভব ব্যাপার। কোনো কালে ইহা হইতে পারে না। তবে ইহাতে ইঞ্জিনের জোর এবং গাড়ীর 'বডি' নির্ম্মাণের বহু উন্নতির আশা করা যায়।

দেশবিদেশের কথা

বিদেশ

আমেরিকায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, এই সংবাদ সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সে-দেশে অবস্থানকালে শ্রীমতী নাইডু নগরে নগরে ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা সম্বন্ধে প্রায় দুই শত বক্তৃতা দান করেন। আমেরিকার সর্ব্বত্রই তিনি বিপুল উৎসাহ ও সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমেরিকা ও কানাডার অধিবাসীগণ সত্যকার ভারতবর্ষ কি, তাহার কিছু আভাস অন্ততঃ পাইয়াছে। আমেরিকা এবং ইয়ুরোপের লোকদের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা নাই। তাহারা ভারতবর্ষ ইংরেজ কর্ত্তৃক 'সুশাসিত' কুলীমজুরের দেশ বলিয়াই জানিত। সম্প্রতি মিস্ মেয়োর বইএর মত কয়েকটি বই প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভারতবাসীদের দুর্গতির কথা কল্পনা করিয়া তাহারা আরও শিহরিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নিজেই ভারতবর্ষের এই সকল মিথ্যা কলঙ্কের জীবন্ত প্রতিবাদ। তাঁহার বক্তৃতা হইতে সে সকল দেশের সাধারণ লোকের মনে ভারতবর্ষেরও জগতের সভ্যতায় কিছু দিবার আছে এই কথাটাতে প্রত্যয় জন্মিয়াছে। এইরূপ আদান-প্রদান যত হয় ততই পৃথিবীর জাতি-সমূহের মৈত্রী ও হৃদ্যতায় বৃদ্ধি হইবে। এই দিক হইতে আজিকার এই বিশ্বজনীনতার দিনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর আমেরিকা ভ্রমণের যে একটা খুব বড় একটা সার্থকতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

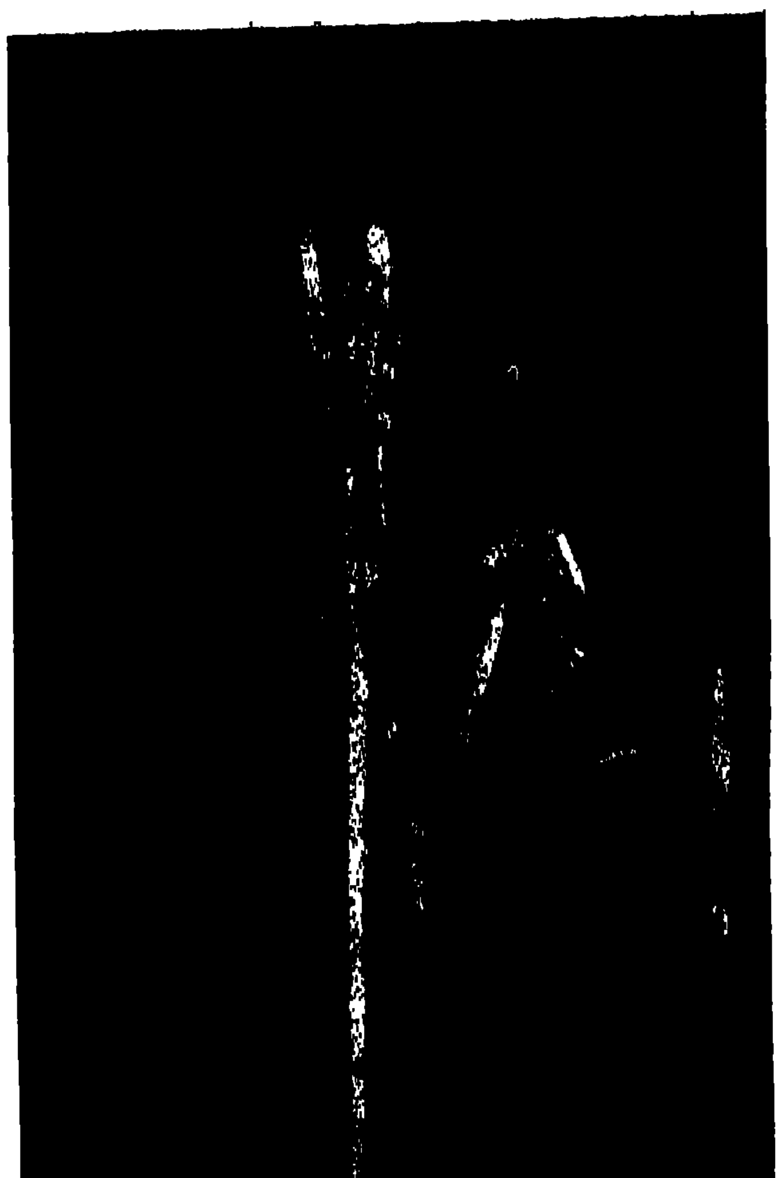

বক্তৃতামঞ্চে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

হেমেন্দ্রকুমার রক্ষিত—

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় আমেরিকার হিন্দুস্থান সম্মিলনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রক্ষিত এই সম্মিলনের একজন কর্ম্মী ও আমেরিকাপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের মুখপত্র "হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। হেমেন্দ্রবাবু এই অনুষ্ঠানের জন্য এবং তাহার সম্পাদিত পত্রিকাটির জন্য যেরূপ অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার জন্য তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। বিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-সকল মিথ্যা নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে এই সকল কার্য্যের বিশেষ একটা সার্থকতা আছে। সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনে'র যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সম্মিলনের পক্ষ হইতে হেমেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। হেমেন্দ্র বাবু হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই উদ্যম ও অক্লান্ত শ্রমে "হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট" নামক মাসিক পত্রিকাটি চলিতেছে। যাহারা বিদেশে এরূপ একটি পত্রিকা চালানো যে কিরূপ দুরূহ কাজ তাহা জানেন, তাঁহারাই এই বিষয়ে হেমেন্দ্র বাবুর কৃতিত্ব কতদূর বুঝিতে পারিবেন।

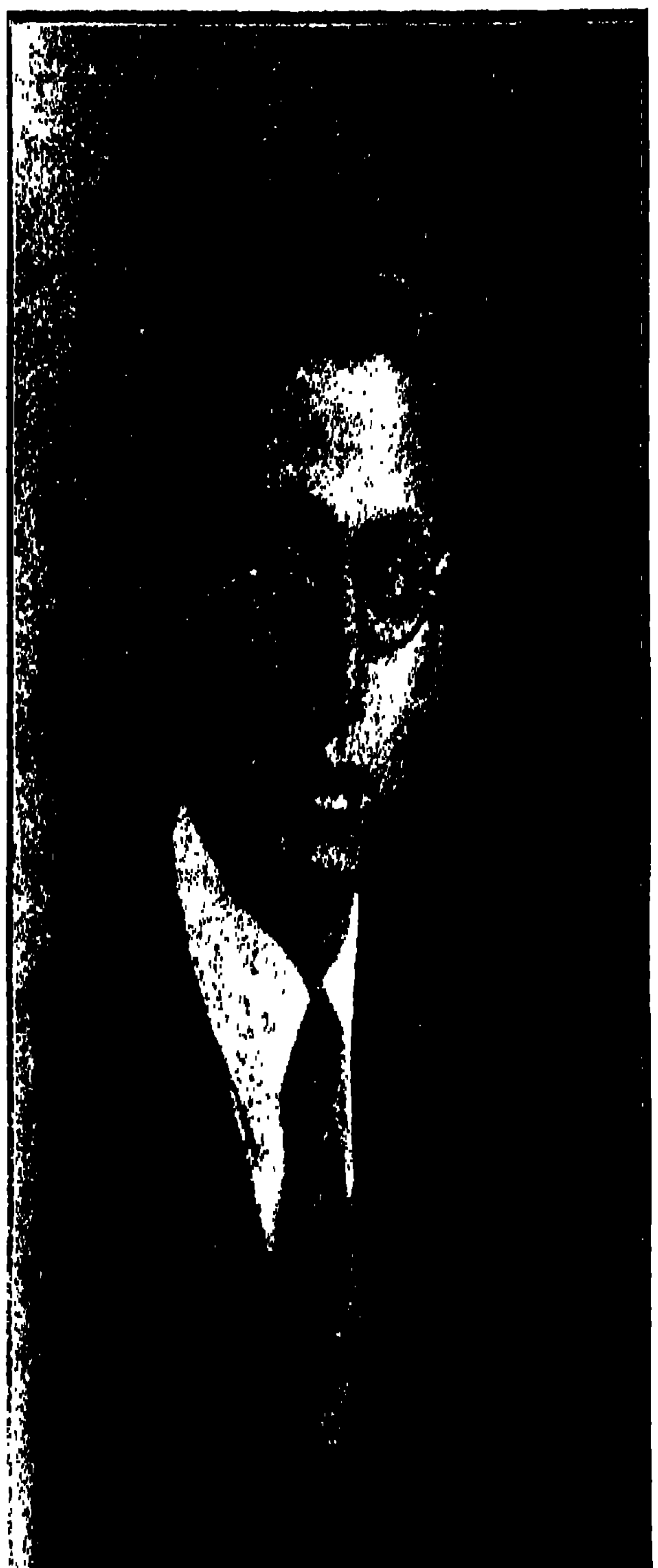

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রক্ষিত

আমেরিকায় বিদেশী বিদ্যার্থীদের একটি সংঘ আছে। হেমেন্দ্র বাবু তাহার সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সভা-সমিতিতে অনেকবার বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯২৩ সালে সান ফ্রান্সিস্কো নগরে যে শিক্ষাবিষয়ক কন্‌ফারেন্স হয় তাহাতে দেশ-বিদেশ হইতে বহু সুধী ব্যক্তি সমবেত হন। হেমেন্দ্র বাবু এই সভায় "ভারতবর্ষ ও পৃথিবী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তথায় এই প্রবন্ধটি খুব প্রশংসিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় যান তখন আমেরিকাপ্রবাসী চীনদেশীয় ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে "চাইনিজ ষ্টুডেণ্টস্ মান্‌থলী"র একটি বিশেষ সংখ্যা সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া হেমেন্দ্রবাবু লালা লাজপত রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত "ইয়ং ইণ্ডিয়া লীগ্" সংগঠিত করিয়াছিলেন।

—

বাংলা

অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র—

গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সিংহ তাঁহার বাগবাজারস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত খয়েরহদা গ্রামে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শ্রীদ্বারকানাথ সিংহ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। তিনি নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া নিজের তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাটনা কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একই বৎসরে বি-এ, ও এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি Pussa Imperial Agriculture Institute হইতে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। সাংসারিক কারণবশতঃ তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি হাজারিবাগ St. Columbus College এ উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে অত্যন্ত যশের সহিত কাজ করিবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে যোগদান করেন। তৎপরে তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ এ যোগদান করেন। এখানে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ প্রশংসার সহিত কাজ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগেও অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অনেক মৌলিক গবেষণা করেন। কয়েকটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং বাঙ্গালা মাসিকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন।

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত ডি-কে চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্সের ন্যাঁসি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত ডি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তথায় রসায়ন বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ফলিত রসায়নের চর্চ্চা ও এই বিষয়েই গবেষণা করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খেলাধূলায়ও বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তিনি ন্যাঁসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল টিমের

নেতা ছিলেন এবং 'রাগবি' খেলায় ফ্রান্সের সমুদায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে দল সংগঠিত হয় তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে লাঠিখেলা, আসচালনা,

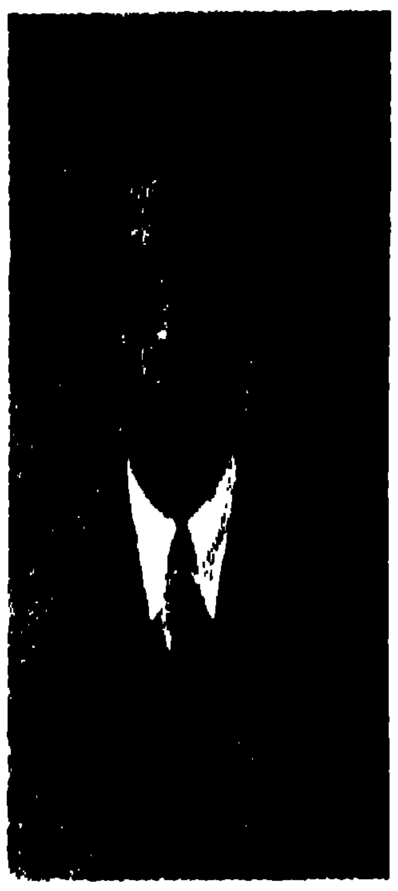

ডি, কে, চট্টোপাধ্যায়

টেনিস্ প্রভৃতির প্রতিযোগিতায়ও প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার অধ্যয়ন সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। তিনি দেশে ফিরিয়া রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদনের জন্য একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিবেন এই সংকল্প পোষণ করেন।

আগামী বৎসরের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১৭ই বৈশাখ আশুতোষ কলেজ গৃহে দক্ষিণ কলিকাতা-বাসীদের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভাতে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার ও ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সমর্থনে, দক্ষিণ কলিকাতার সাহিত্যানুরাগিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছেন, ইহা স্থির হয়। পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সভায় একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহাতে মাননীয় রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ আহ্বানকারী মনোনীত হইয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির চাঁদা অন্যূন ৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। আবশ্যকীয় সংবাদ ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড ঠিকানায় আহ্বানকারীর নিকট পাওয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (দেওঘর)—

রামকৃষ্ণ মিশন আজিকার দিনে বাংলাদেশের, শুধু বাংলা দেশের কেন সমগ্র ভারতবর্ষের, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সাত বৎসর পূর্ব্বে এই স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের চেষ্টায় দেওঘরে একটি বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহাদেরই অক্লান্ত শ্রমের ফলে এই বিদ্যালয়টি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা অর্থের অভাবে সমাজহিতকর কোনও অনুষ্ঠান করা যায় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বিদ্যালয়টির ইতিহাস শুনিলে বুঝিতে পারিবেন যে একাগ্র নিষ্ঠা লইয়া কোনও কার্য্যে অগ্রসর হইলে অর্থের অভাবে তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না। কর্ম্মী জুটিলে সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের আনুসঙ্গিক সকলই আসিয়া জুটে।

খোলা মাঠ, দূরে এবং নিকটে বন ও পাহাড়, এই দৃশ্যের মাঝখানে স্কুলটি অবস্থিত। ছেলেরা কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই স্কুলটি কলিকাতার মত কোনও বড় সহরে না করিয়া দেওঘরে করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের পরিচালক ও শিক্ষকবর্গ প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও কর্ম্মী। এই স্কুলের বিদ্যার্থিদের সকলেরই স্কুলসংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। দেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত যোগ রাখিয়া ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তির উপর খাঁটি মানুষ গড়িয়া তোলাই এই বিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। লেখাপড়ার দিক হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় এই স্কুলেও সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছেলেরা এই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যতীত এই বিদ্যালয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দেওয়া হয়, এবং শরীরচর্চ্চা, হাতের কাজ, গৃহকর্ম্ম, সঙ্গীত, প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখাইবারও সুব্যবস্থা আছে। মোটের উপর কেবলমাত্র লেখাপড়ার উপর সম্পূর্ণ ঝোঁক না দিয়া, অথচ লেখাপড়াকে বিন্দুমাত্র অবহেলা না করিয়া, সকলদিক হইতে পূর্ণ মানুষ গড়িয়া তোলাই এ বিদ্যালয়ের আদর্শ। আমাদের দেশে ভাল স্কুলের,—ছেলে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এরূপ স্কুলের অভাব খুবই বেশী; রামকৃষ্ণ মিশনের দেওঘর বিদ্যাপীঠ এরূপ একটি বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবারই প্রচেষ্টার ফল। এ বিদ্যালয়টি যে দেশবাসী সকলেরই উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার যোগ্য এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে যাঁহারা আরও বিস্তৃত সংবাদ জানিতে চাহেন তাঁহারা সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সমুদায় জানিতে পারিবেন।

কয়েকটি গুজরাটী গর্‌বা

[১]

বিদায় গীত

মোঘাঁ মূলাঁ মহেমানো অমারা,কহো কেম দইএ বিদায় রে ;
দর্শন দেজো ফরীনে।
বসমাঁ দুঃখ বিয়োগনাঁ, শুদ্ধ প্রেমময় হৃদয় চিরায় রে ;
দর্শন দেজো ফরীনে।
ফুল নহীঁ, ফূলনী পাখড়ী, অম স্বীকারশো আবার রে ;
দর্শন দেজো ফরীনে।
স্বাগতমাঁ কাঁই উণপ হোয়, তো রাখজো দীল দরিযাব রে ;
দর্শন দেজো ফরীনে।
শীখাড়জো অম উরনে নিত্য স্বতন্ত্রতা না পাঠ রে,
দর্শন দেজো ফরীনে।
নিশ দিন জোশুঁ বাটড়ী, ব্‌হালাঁ আবজো স্নেহী সংগাথরে,
দর্শন দেজো ফরীনে॥

(বাংলা অনুবাদ)

হে আমাদের মহান অতিথিগণ, বলো কেমনে বিদায় দেই?
ফিরিয়া আসিয়া আবার দর্শন দিও।
বিয়োগের দুঃখ কঠোর, শুদ্ধ প্রেমময় হৃদয় বিদীর্ণ হয় ;
ফিরিয়া আসিয়া আবার দর্শন দিও।
ফুল নাই আছে ফুলের পাপড়ী মাত্র ; এইবার ইহাই স্বীকার করিও ;
ফিরিয়া আসিয়া আবার দর্শন দিও।
যদি আমাদের এই স্বাগতে কোনও ত্রুটী হয়, তবে তোমাদের হৃদয়রূপ মহাসাগরের অন্তস্তলে তাহাকে (গুপ্ত) রাখিও ;
ফিরিয়া আসিয়া আবার দর্শন দিও।
আমাদের চিত্তকে নিত্য স্বাধীনতার পাঠ শিক্ষা দিও ;
ফিরিয়া আসিয়া আবার দর্শন দিও।
নিশিদিন তোমাদের পথ চাহিয়া থাকিব ;
হে প্রিয়গণ,
তোমাদের স্নেহাস্পদদের সঙ্গে করিয়া আসিও ;
ফিরিয়া আসিয়া আবার দর্শন দিও।

[২]

গরবো

চন্দন তলাবড়ীনে কাঁঠড়ে জী রে ঝীলবা আবো আজ।
সাগর সমো বড়ী ভরী তলাবড়ীমাঁ, নানী শী নাবড়ী ঝুলনী জী রে।
এমাঁ একলরী হিঁচুঁ, সাহেলড়ী, আনন্দ ঘেলড়ী প্রফুল্লতী জী রে।
টপকন্তী টপ টপ সোনেরী বাদলী ফরে গগনমাঁ ফুদড়ী জী রে।
রসবস হৈয়া ভীঁজে, রসিলা, ভীঁজে মারী নবরংগ চুন্দড়ী জী রে।
পাণীডাঁ হলকেনে ছলকে তলাবড়ী, আখা জগতমাঁ রেলতী জী রে।
আবো, আবো, নে সহু আবো, সাহেলড়ী, নির্মল জল পর ঝীলবা জী রে।

(বাংলা অনুবাদ)

চন্দন পুকুরের মধ্যে আজ গানের ধুয়া ধ'রতে এসো।
সাগরের মত বড়, ভরা পুকুরে, ছোট্টো নৌকোর দোলন।
এতে একলা আমি দুলি, সখি,—আনন্দে পাগল হ'য়ে প্রফুল্লিত হই।
সোনার মেঘের ফোঁটা টপ টপ পড়ে, আকাশে সুন্দর (মেঘ) ওড়ে।
হে রসিকা সখি, রসবশে হৃদয় আর্দ্র হয়, আর আমার কমলা রঙের চাদরও ভিজে ;
জলের নাচনে পুকুর উছলে, সমস্ত জগতকে প্লাবিত করে ;
এসো, এসো, সকলে এসো, সখি,—নির্মল জলের উপরে গানের ধুয়া ধ'রতে এসো।

(ক্রমশঃ)

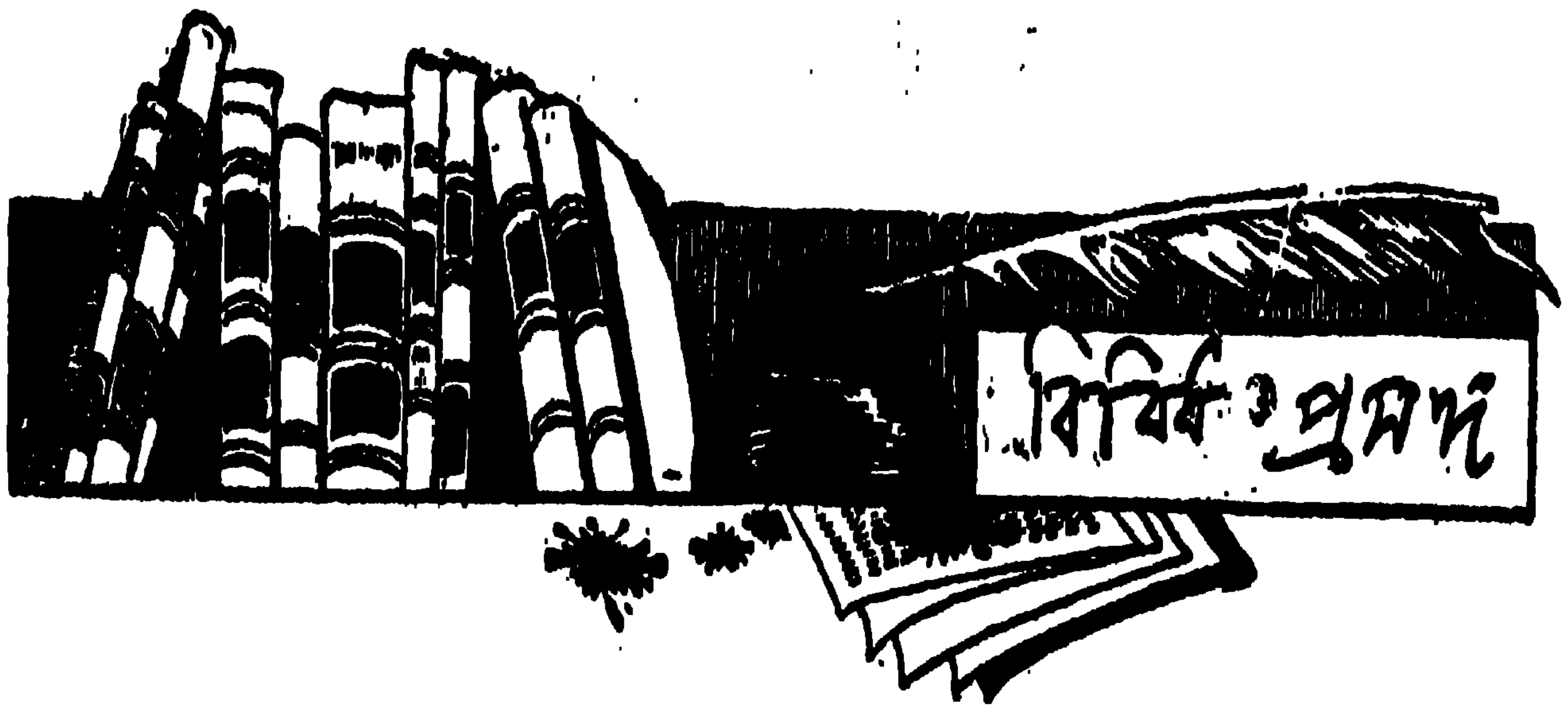

বঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচন

আর কয়েকমাস পরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাই ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার আগেই প্রথমে আসামে ও পরে বঙ্গে লাট সাহেবেরা ব্যবস্থাপক সভা ভাঙিয়া দিয়াছেন। মন্ত্রীদের উপর ব্যবস্থাপক সভায় অনাস্থা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদের পদত্যাগ এবং নূতন মন্ত্রী না-পাওয়া ব্যবস্থাপক সভা ভাঙিয়া দিয়া সাধারণভাবে সর্ব্বত্র নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের হুকুম জারীর প্রকাশ্য কারণ। গুপ্ত অন্য কোন কারণ আছে কি না জানি না। গবর্মেণ্ট আশা করেন, নূতন নির্ব্বাচনে এমন অনেক সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন যাঁহাদের সাহায্যে সরকারী ও মনোনীত সভ্যেরা নূতন মনোনীত মন্ত্রীদিগকে টিকাইয়া রাখিতে পারিবেন। আসামের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গে গভর্মেণ্টের দিকের বেশী সভ্য জুটিবে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী গবর্মেণ্ট বরাবরই লোকের অপ্রিয় আছেন। তাহার উপর সম্প্রতি বল্শেভিক্ বিতাড়ন অর্ডিন্যান্স জারী করায়, কতকগুলি লোককে দূর দূর জায়গা হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া জুরীর সাহায্যে বিচারের সুবিধা হইতে বঞ্চিত মীরাটে তাহাদের বিচারের বন্দোবস্ত করায় এবং নানাস্থানে খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় হওয়ায় লোকদের বিরক্তি আরও বাড়িয়াছে। সুতরাং এখন জোরগলায় সরকারের বিরুদ্ধতা করিব, দ্বৈরাজ্য ভাঙিব, ইত্যাদি বলিলেই নির্ব্বাচন অনেকটা নিশ্চিত। কাজেও তাহা দেখা যাইতেছে। অনেক জায়গায় স্বরাজী সভ্যপদপ্রার্থীরা বিনা প্রতিযোগিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেলে মন্ত্রী পাওয়া এবং মন্ত্রিত্বের স্থায়িত্ব হওয়া অনেকটা মুসলমান-সভ্যদের ভোটের উপর নির্ভর করিবে। যত বেশী-সংখ্যক মুসলমান সভ্যকে যে পক্ষ বেশী লোভ দেখাইতে ও সুবিধা করিয়া দিতে পারিবে, সেই পক্ষে ভোট বেশী হইবে। ইহার উপর সরকার-পক্ষের হারজিৎ নির্ভর করিবে।

এই হারজিতের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আগ্রহ উৎকণ্ঠা নাই। ব্যবস্থাপক সভায় সরকার-পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য পাওয়া যাইবে না। সরকারের সহযোগিতা অর্থাৎ অনুবর্ত্তিতা করিয়া ত পাওয়া যাইবেই না।

ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজীরা বা অন্য দলের লোকেরা প্রবল হইবে তাহা অনুমান করিতে বা জানিতে আমাদের আগ্রহ নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলির গঠন ও ক্ষমতা এখন যাহা আছে, তাহাতে সরকারের অনভিপ্রেত বড় কোন দেশহিতকর কার্য্য করিবার শক্তি কোন দলেরই নাই। হিত করিবার ইচ্ছা কাহার কতটুকু আছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন।

অনেক সভ্য যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইতেছেন, তাহা অনেক দিক দিয়া ভাল। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে যে সময়, শক্তি ও অর্থের ব্যয় হয় তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে। প্রতিযোগিতার ফলে যে ঈর্ষ্যা বিবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতেছে না। কতকগুলি যুবককে বিনি পয়সায় ভোট-সংগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যে তাহাদের শক্তি ও সময় নষ্ট করা হয়, তাহা হইতেছে না।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচনের একটি অর্থ সুস্পষ্ট। অনেক লোকে ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া দেশহিত করিবার আশা আর রাখে না; তাহার সভ্য হইলে যে ভারী একটা সম্মান হয়, সে মোহও কাটিয়া গিয়াছে।

—

নবনির্ব্বাচিত সভ্যদের কর্ত্তব্য

যাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা অল্পস্বল্প দেশহিত হইতে পারে। এই হিতের চিন্তা ও চেষ্টা তাঁহারা জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে করিলে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ কিছু কমিতে পারে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান সভ্যদিগের বিশেষ করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

—

ছাত্রদের কর্ত্তব্য

আগে আগে আমরা স্কুল-কলেজের দীর্ঘ ছুটির সময় ছাত্রদের কর্ত্তব্যের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতাম। তাহাতে কোন সুফল হইত কি না, জানি না। কিন্তু ইহা মনে করা বোধ হয় অন্যায় নহে, যে, তাহাতে অন্ততঃ কুফল হইত না। কারণ, আমরা উত্তেজক কোন ব্যবস্থা দিতাম না।

এখন যুব-সংঘ, ছাত্র-সংঘ, তরুণ-সংঘে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ছাত্র-শক্তি, যুব-শক্তি, তরুণ-শক্তির কথা ঘন ঘন পড়িতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সব সংঘের নেতারা বালক ও যুবকদিগকে বাস্তবিকই দলবদ্ধ করিতে ও কোন ভাল কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। তাঁহারা স্বয়ং কোন কল্যাণসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কি না, তাহাও জিজ্ঞাস্য। কারণ, স্বয়ং অসিদ্ধ যিনি, তিনি অন্যের সিদ্ধিলাভের সহায় হইতে পারেন না। উত্তেজনার ও হুজুকের সৃষ্টি যে হইয়া থাকে, তাহা খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরের হেড্‌লাইনেই বুঝা যায়।

একজন মনীষী বলিয়াছেন, মানুষ কথা বলে অভিজ্ঞতা হইতে কিংবা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হইতে। আমরা আগে আগে ছাত্রদিগকে যাহা করিতে বলিতাম তাহা নিজের অভাবের অভিজ্ঞতা হইতে এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হইতে। যখন ছাত্র ছিলাম, যখন ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিবার পরও বয়স কম ছিল, তখন দেশসম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, সেই জ্ঞানের অভাবের বোধ এখনও আমাদিগকে পীড়া দেয়। এখনও এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে, যে, গ্রামে ও নগরে, বাসগৃহে, রাস্তাঘাটে, চাষের ক্ষেতে, আফিসে, কারখানায় দেশের যে মূর্ত্তি প্রকট, তাহা দেখিব বুঝিব জানিব এবং এই প্রকারে দেশের প্রতি আত্মীয়তা অনুভব করিয়া যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য করিব। কিন্তু ইচ্ছা যতই বলবতী হউক না, রক্তমাংসের শরীর নিস্তেজ হইয়াছে, নানা কর্ম্মের বন্ধনে অবকাশের অভাবও ঘটিয়াছে!

যে অভাববোধ আমাদিগকে পীড়া দেয়, যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব আমাদের কর্ম্মশক্তিকে সাতিশয় সীমাবদ্ধ করে, যাহার জন্য আমাদের গতানুশোচনা হয়, সেই অভাববোধ, কর্ম্মশক্তির সীমাবদ্ধতা ও গতানুশোচনা বয়ঃকনিষ্ঠ অন্য কাহারও না হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সেইজন্য যে-সকল ছাত্রছাত্রী ও অন্য লোকদের কৈশোর আছে, যৌবন আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহার যেরূপ সুযোগ ও অবসর তদনুসারে গ্রামে নগরে বাসগৃহে মাঠেঘাটে রাস্তায় আফিসে কারখানায় দেশের মূর্ত্তি দেখুন, দেশের লোককে চিনুন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার জন করুন, নিজে ভাল হইয়া তাঁহাদের হিতসাধন করুন। তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন সার্থক হইবে, বার্দ্ধক্যে অনুতপ্ত হইতে হইবে না। দেশসেবার নানা পথ ও উপায় আছে। আমাদের দেশ অজ্ঞের দেশ, ত্রস্তের দেশ, অসুস্থের রুগ্নের দেশ, অত্যাচারিতা নারীর দেশ, দরিদ্রের দেশ, পরাধীন দেশ। আমাদের যাঁহার যেদিকে প্রবৃত্তি শক্তি সুযোগ আছে, তাঁহাকে সেইদিকে খাটিতে হইবে। কিন্তু কিছু করিতে হইবে, কেবল কথা শুনিলে ও শুনাইলে চলিবে না।

—

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের দুটা দিক্ আছে। আমরা বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহার ছাড়িয়া যদি দেশী বস্ত্র ব্যবহার করি, তাহা হইলে দেশের অর্থ বহু পরিমাণে দেশে থাকিবে, বস্ত্রনির্ম্মাণে নিযুক্ত হাজার হাজার লোকের অন্ন জুটিবে। অন্যদিকে, বিদেশী কাপড় ছাড়িয়া দিলে বিলাতী মিলের মালিকেরা ও রপ্তানীকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনুসন্ধান করিতে পারে, যে, আমরা কেন বিদেশী কাপড়

ছাড়িয়া দিতেছি। তাহারা যদি বুঝিতে পারে, যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবীতে সম্মত হইলে আমরা বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিব, তাহা হইলে তাহারা রাজী হইতে পারে।

কিন্তু সত্যই কি আমরা স্বরাজ্য পাইলে স্বদেশীর আদর না করিয়া বিদেশীর আদর করিতে থাকিব? তাহা হইলে, স্বদেশীর প্রতি আমাদের অনুরাগ বিদেশীর প্রতি ক্ষণিক বিরাগেরই কি রূপান্তর? কাহারও কাহারও তাহা হইলেও, সকলের তাহা নিশ্চয়ই নহে।

আমাদের ধারণা এই, যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ্য স্থাপিত হইলে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা বাড়িবে, স্বদেশী দ্রব্য অধিক উৎপাদিত হইবে, এবং তাহার কাটতি ও ব্যবহার বাড়াইবার নানা উপায়ও অবলম্বিত হইবে। সুতরাং বিলাতী মানুষেরা আমাদের স্বরাজ্যের দাবীতে রাজী হইলেই আমরা স্বদেশী জিনিষ ছাড়িব, ইহা সম্ভব নহে। ইহা বিলাতের লোকেরা বুঝে। সেই কারণে, তাহারা বিদেশী বর্জ্জনে ভয় পাইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই প্রকৃত স্বরাজ্য দিবে না; কারণ প্রকৃত স্বরাজ্যের ব্যবহার দ্বারা আমরা বিলাতী নানা জিনিষের কাটতি এদেশে কমাইতে চাহিব ও পারিব, তাহা তাহারা জানে। তাহারা প্রকৃত স্বরাজ্য না দিয়া, স্বরাজ্যের মত বাহ্যচেহারাযুক্ত কিছু দিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিবে—যদি তাহাতে বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রতিজ্ঞা কিছু শিথিল হয় এই আশায়।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিদেশী বর্জ্জনের দ্বারা যদি সদ্য সদ্য স্বরাজ্য না-পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার সার্থকতা কি? উহার আর্থিক সার্থকতা যে আছে, তাহা গোড়াতেই বলিয়াছি। রাজনৈতিক সিদ্ধিলাভও হইতে পারে, কিন্তু তাহা ঘটিবে যদি আমরা দীর্ঘকাল অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত বিদেশী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী চালাইতে পারি। তাহা যে প্রকারে ঘটিতে পারে, সংক্ষেপে বলিতেছি।

ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বণিকরূপে অর্থের জন্য। এখনও প্রভু হইয়া আছে, যে-যে কারণে, তাহার প্রধান একটি অর্থলাভ। ভারতের মানুষ ও ভারতের ধন দ্বারা অন্যত্র তাহার সাম্রাজ্য বাড়িয়াছে, ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে সাম্রাজ্যেরও ক্ষয় এবং লোপ হইতে পারে, ইহাও একটা কারণ বটে। এখন কিন্তু অর্থের দিক্‌টাই দেখাইতেছি। ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে অর্থ আহরণ করে, প্রধানতঃ দুই উপায়ে। এখানকার সরকারী চাকরীর উচ্চপদগুলি দখল করিয়া থাকিয়া মোটা বেতন হইতে অর্থসংগ্রহ এবং ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী প্রভৃতি দ্বারা রোজগার এক উপায়। ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী প্রভৃতিতে আগে ইংরেজদের যতটা প্রতিপত্তি ও আয় ছিল, এখন ততটা নাই। উচ্চ অনেক পদও ক্রমশঃ তাহাদের হাতছাড়া হইতেছে ও হইবে। আমরা স্বরাজ্য না পাইলেও ইহা হইবে। সুতরাং এদিক্ দিয়া ইংরেজদের আগেকার মত অর্থাগমের আশা থাকিতেছে না। যদি ইহাই তাহাদের অর্থাগমের একমাত্র পথ হইত, তাহা হইলে তাহারা ভাবিত, ভারতবর্ষে রাজত্ব রাখিয়া বেশী কি লাভ? ভারতীয়দিগকে স্বরাজ্য দিয়া ফেলা যাক্ না?

কিন্তু চাকরীর পথ অপেক্ষা বাণিজ্য দ্বারাই ইংরেজরা এদেশ হইতে বেশী টাকা বরাবর পাইয়া আসিয়াছে, এখনও পায়। সুতরাং তাহারা অন্য কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ বাণিজ্য-রক্ষার খাতিরেও আমাদিগকে স্বরাজ্য দিবে না। কিন্তু যদি আমরা আমাদের পরাধীনতা সত্ত্বেও স্বদেশীর উন্নতি ও বিস্তৃতি এবং বিদেশীর বর্জ্জনে দৃঢ় থাকিতে পারি, তাহা হইলে ইংরেজ বুঝিবে, আয়ের অন্য পথ ত রুদ্ধ হইতেই ছিল এখন বাণিজ্যও যাইতেছে; সুতরাং ভারতের উপর প্রভুত্ব রাখিবার চেষ্টায় কি লাভ? বরং ভারতের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষায় লাভ আছে। কারণ, ভারতবর্ষে এমন অনেক জিনিষ হয় বা হইতে পারে যাহা বিলাতে হয় না, এবং বিলাতে এমন অনেক যন্ত্র ও অন্য জিনিষ হয় যাহা ভারতবর্ষে এখন হয় না এবং ভবিষ্যতেও হইতে দীর্ঘকাল লাগিতে পারে। উভয় দেশে বন্ধুত্ব থাকিলে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিতে পারিবে; তাহা না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবে।

ব্রিটিশজাতির ন্যায়ান্যায়বোধ জাগিয়া উঠিয়া তাহাদিগকে আমাদের রাষ্ট্রীয় দাবী গ্রাহ্য করিতে কখনই

বাধ্য করিতে পারে না, বলা যায় না। কিন্তু স্বার্থে আঘাত না লাগিলে একটা সমগ্র জাতির ন্যায়ান্যায়বোধ সচরাচর জাগিয়া উঠে না।

এই প্রকার একটা সম্ভাবনা বহুদর্শী ভারতীয় ও ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞেরা শতবৎসর পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এবং বড়লাট মার্কুস্ অব হেষ্টিংস্ উভয়েই এই লিখিত মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, যে, ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব লুপ্ত হইলেও উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকিলে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে উভয়ে উপকৃত হইতে পারিবে।

—

স্বদেশী উৎপাদন বিদেশী বর্জ্জনের উপায়

একেবারেই সব বিদেশী জিনিষ ছাড়িয়া তাহার জায়গায় স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের চেষ্টা করিলে তাহা সফল হইবে না। কারণ, বিলাস দ্রব্য ছাড়িয়া দিলেও, এমন অনেক জিনিষ আছে যাহার ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে অথচ যাহা দেশে প্রস্তুত হয় না। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যত যন্ত্র দরকার হয়, তাহার অল্পই দেশে প্রস্তুত হয়। এই সমস্তই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। এইজন্য আপাততঃ বিদেশী বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা কেবল যে বস্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু যত রকমের যত গজ কাপড় দেশের লোকদের দরকার, তাহা দেশে উৎপন্ন হয় না। তাহ উৎপন্ন করিতে হইবে। দেশে উৎপন্ন দ্রব্য যদি বিদেশীর চেয়ে উৎকৃষ্ট ও সস্তা হয়, তাহা হইলে ত তাহার ব্যবহার আপনা হইতেই হয়। উৎকর্ষ ও মূল্য সমান হইলেও দেশী জিনিষের কাটতি নিশ্চয়ই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে দেশী বস্ত্রের কাটতি যথেষ্ট নাই এই এক কারণে যে উহার দাম বেশী, উৎকর্ষের তুলনা এখন ছাড়িয়া দিলাম। ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যদি সকলে দেশী কাপড়ই ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলেও তাহা সকলের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না। চরকায় হাতে সূতা কাটিয়া ও হাতের তাঁতে তাহা বুনিয়া ভারতবর্ষের সকল লোকের কাপড় [illegible] করা যে সম্ভব, তাহা গণনা করিয়া দেখান হয়। কিন্তু গণনায় যাহা সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হয়, কার্য্যতঃ তাহা হইবে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা খাদি উৎপাদনে বা বিক্রয়ে ব্যাপৃত নহি, সুতরাং জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কাপড়ের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে ইহা বলিতে পারি, যে, আমরা খদ্দরের চলনের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত উহারই ধুতি চাদর ও পঞ্জাবী ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে যে ধুতি কিনিয়াছি তাহা আগেকারই মত। দাম কিছু কমিয়াছে, কিন্তু এখনও দেশী মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশী আছে। দেশী মিল এবং দেশী চরকা ও তাঁতের সম্মিলিত চেষ্টায় আবশ্যক-মত কাপড় কিছু দিনের মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য চরকা ও তাঁত যেমন বাড়াইতে হইবে, মিলও বাড়াইতে হইবে। মিলে যেরূপ ধর্ম্মঘট হইতেছে এবং সাধারণতঃ দূর হইতে শ্রমিকদিগকে আনিয়া সামাজিক প্রভাবের বাহিরে স্থাপন করিলে যে নৈতিক অনিষ্ট হয়, তাহাতে মিল স্থাপন করিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু ধর্ম্মঘট ও এই নৈতিক ক্ষতি অপরিহার্য্য নহে।

—

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলন

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন সম্প্রতি রংপুরে হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দরকার-মত ঋণ না পাইলে কৃষি ও ব্যবসা চলে না, ঋণের সুদ আবার বেশী হইলে কৃষি ও ব্যবসা লাভজনক হয় না। এইজন্য, কৃষি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত দেশে এরূপ ব্যাঙ্ক অনেক চাই যাহারা অপেক্ষাকৃত কম সুদে কৃষক ও ব্যবসাদারকে টাকা ধার দিবে। ব্যাঙ্কগুলিকেও এমন লোক বাছিয়া ধার দিতে হইবে যাহাতে টাকা মারা না পড়ে। এই প্রকারে সকল দিকে সাবধান থাকিয়া অগ্রসর হইলে আমাদের দেশী ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলি প্রকৃতই কতকটা 'জাতির ভাগ্য-বিধাতা' হইতে পারিবে। সেইজন্য তাহাদের পরিচালকগণকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য রায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চ হারে ডিভিডেণ্ড যোগাইবার

যন্ত্র মাত্র নহে। আপনাদের কর্ত্তব্যকে এইভাবে সঙ্কীর্ণ করিবেন না। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ এবং জাতীয় জীবনে উঁহাদের দানও অতি মহৎ। মনীষী অধ্যাপক Conant যে আপনাদিগকে "জাতির ভাগ্যবিধাতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। আমাদের এই বিধ্বস্ত ও বিপ্রস্ত জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করিবার জন্য আমরা আপনাদের দিকেই চাহিয়া আছি। এই হৃতৈশ্বর্য্য দেশের নষ্ট শ্রী পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে, এই মহান্ লক্ষ্য লইয়াই আপনারা কাজ করুন। যে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ দিয়া এই স্বর্ণময়ী ভূমির সম্পদরাশি বিদেশে চলিয়া গিয়াছে সেই পথেই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সে শক্তি আপনাদের হাতে আছে এবং সে-দায়িত্বও আপনাদের। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে পুনর্গঠিত করিতে আপনাদের এই শক্তি যদি প্রয়োগ না করেন তাহা হইলে অচিরে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য এবং এই শোচনীয় পরিণামের দায়িত্ব হইতে ইতিহাস আপনাদিগকে নিষ্কৃতি দিবে না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও অর্থ, অর্থনৈতিক জীবনগঠনের এই তিন উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদান অর্থ আপনাদের নিকট গচ্ছিত। আমার শেষ অনুরোধ, আপনারা সেই অর্থ জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। দেশের ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িতে সহায় হউন।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক-তদন্ত সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

অন্যান্য দেশের তুলনায় বিগত ২৫ বৎসরে আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কিংএর প্রসার খুবই আশাপ্রদ; আর কোনও রকম আইনের সাহায্য ব্যতিরেকেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার Hartley Withersএর মতে আইন অপেক্ষা নিপুণ, নিষ্ঠাবান ব্যাঙ্ক-কর্মচারীই ব্যাঙ্কের উন্নতির অধিকতর সহায়ক। Dr. Reisserও এই মতের পোষকতা করেন। আইনের সাহায্যে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা করিলে সাধারণের মধ্যে একটা নিশ্চেষ্টতার ভাব আসিবে এবং ক্ষমতাও পঙ্গু হইবে। অভিজ্ঞ, কর্মকুশল এবং বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক-কর্মচারীরাই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড। সরকারী বিধি-নিষেধে আর যাহাই হউক এইরূপ লোক সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কাজেকাজেই এখনও "যোগ্যতমের জয়" এই নীতি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে।

যাহাই হউক ব্যাঙ্ক-তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না; কিন্তু বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিকূলতা যাহাতে ভারতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিতে পারে তন্নিমিত্ত তদন্ত কমিটিতে নিরপেক্ষ ভারতীয় সভ্যগণের প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। অথচ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটি গঠনের যে প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাতে ভরসা বিশেষ নাই; কারণ তাহাতে অ-ভারতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এই তদন্ত এবং ইহার ফলে যদি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোনো আইন প্রবর্ত্তন হয় তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

—

রাজসাহী জেলার শিক্ষক কন্‌ফারেন্স

আমাকে এ পর্য্যন্ত হাবড়া বাঁকুড়া ও রাজশাহী এই তিনটি জেলার শিক্ষকগণের কন্‌ফারেন্সে সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছে। সর্ব্বশেষে যে কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম, রাজশাহী জেলার মহাদেবপুর গ্রামে তাহার অধিবেশন হয়। তথাকার সৎকর্ম্মোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বদান্যতা ও পরিশ্রমে তাহা সম্ভব হয়। রাজশাহীর শিক্ষকগণের অভাব-অভিযোগ মোটের উপর অন্য জেলার শিক্ষকদের মত। শিক্ষক-মহাশয়েরা যাহা চান, তাহা ন্যায্য। তাঁহাদের কাহারও বেতন ভদ্রপরিবারের সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক ন্যূনতম আয় অপেক্ষা কম হওয়া উচিত নয়। এই আয় স্থানীয় অবস্থা এবং পোষ্যের গড় সংখ্যা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ইহার উপর যত বেশী বেতন দেওয়া যাইবে, তত ভাল লোক পাইবার সম্ভাবনা। শিক্ষকদের চাকরীর স্থায়িত্ব থাকা আবশ্যক। চাকরী থাকা-যাওয়া কাহারও খেয়াল বা মর্জ্জিসাপেক্ষ হওয়া উচিত নয়। কাহাকেও পদচ্যুত করিতে হইলে তাহার ন্যায়-সঙ্গত কারণ দেখাইতে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করা উচিত। মতের অনৈক্যস্থলে সালিসী কমিটির দ্বারা মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। বেসরকারী স্কুলেও শিক্ষকদের কিছু কাল অন্তর অন্তর বেতন-বৃদ্ধির নিয়ম থাকা দরকার। বার্দ্ধক্যে বা হঠাৎ অক্ষম হইয়া পড়িলে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সাহায্য যাহাতে শিক্ষকেরা পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র করা আবশ্যক। এমন সঙ্গতিপন্ন বেসরকারী বিদ্যালয় থাকিতে পারে, বৃদ্ধ শিক্ষকদিগকে যাহার পেন্সান দিবার ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা থাকিলে পেন্সান দেওয়া খুবই উচিত। পেন্সান অপেক্ষা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের একটা সুবিধা এই আছে, যে, কাজ করিতে করিতে কাহারও হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারবর্গ থোক কিছু টাকা পাইতে পারেন, পেন্সানের ব্যবস্থায় তাহা হয় না।

সন্তুষ্ট শিক্ষকসমষ্টির উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, ইহা সর্ব্বসাধারণকে মনে রাখিতে হইবে। শিক্ষক-মহাশয়দিগকেও মনে রাখিতে হইবে, যে, যদিও কোন দেশেই ভারতের মত কম বেতনভোগী শিক্ষক নাই, তথাপি ইহাও সত্য, যে, বর্ত্তমান সময়ে কোন দেশেই শিক্ষকেরা তাঁহাদের সমান বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত অন্য অনেক শ্রেণীর লোকদের সমান পারিশ্রমিক পান না।

ইহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা এখানে করিব না। মোটের উপর ইহাই বাঞ্ছনীয়, যে, একদিকে সর্ব্বসাধারণে শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন, এবং অন্যদিকে শিক্ষকগণ নিজেদের কাজ ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। আমরা অল্প চেষ্টা করিলেই অন্য কোন কোন ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াও, ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন বেশী করিয়া দিতে পারি। তাহা হইলে শিক্ষকদের বেতন বাড়ান যায়।

পরিশেষে অনুরোধ এই, যে, শিক্ষকেরা যেন সর্ব্বত্র শিক্ষয়িত্রীদিগের সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিলে চলিবে না।

—

উর্দ্দুর জন্য রোম্যান অক্ষর

একটা খবর বাহির হইয়াছে, যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট সকল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উর্দ্দু আরবী অক্ষরে না লিখিয়া রোম্যান অক্ষরে (যাহাতে ইংরেজী লেখা হয়) লিখিলে কেমন হয়। এইরূপ অনুসন্ধানের এই কারণ দেখান হইয়াছে, যে, ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের কাজ ও কার্য্যক্ষেত্র বাড়িতেছে। সুতরাং তাহা শীঘ্র শীঘ্র ছাপিয়া বাহির করিবার ব্যবস্থা হওয়া চাই, তাহা হইলে কাগজগুলির উন্নতি হইতে পারিবে। ইংরেজী অক্ষরের লাইনোটাইপ মনোটাইপ প্রভৃতি যন্ত্র থাকায় কম্পোজ খুব দ্রুত হয়। ভারতে প্রচলিত কোন বর্ণমালায় তাহা হয় না। আরবী অক্ষরের অনেক দোষও আছে, যাহার জন্য মুস্তাফা কমাল পাশা তুরস্ক হইতে উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভারত-সরকার কমাল পাশার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহিতেছেন, এবং কেবল এই বিষয়টিতেই চাহিতেছেন, এমন ত মনে হয় না। যাহা হউক, খবরটা সত্য হইলে সরকার বাহাদুরের উর্দ্দুর প্রতি নেকনজরের কারণ সম্বন্ধে নানা অনুমান হইবে।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তর-ভারতের কোন কোন অঞ্চলের ভাষা নাগরী অক্ষরে লিখিলে তাহাকে বলে হিন্দী, আরবী অক্ষরে লিখিলে বলে উর্দ্দু। তা ছাড়া আরও এই তফাৎ আছে, যে, পণ্ডিতেরা হিন্দীতে সংস্কৃত কথা বেশী ঢুকাইতে চান, মৌলবীরা উর্দ্দুতে বেশী আরবী ফারসী কথা ঢুকাইতে চান। নতুবা মোটের উপর হিন্দী উর্দ্দু একই ভাষা। ব্যবহারে উহাদের বিশেষত্ব এই আছে, যে, উর্দ্দু কোন কোন হিন্দু ও শিখ লেখায় ব্যবহার করেন, কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দীর ব্যবহার লেখায় খুব কম মুসলমানই করিয়া থাকেন; উর্দ্দুর ব্যবহার অমুসলমানদের মধ্যে কমিয়া আসিতেছে, হিন্দীর ব্যবহার মুসলমানদের মধ্যে বাড়িতেছে না।

ভারতবর্ষের সব প্রদেশের একমাত্র বা অন্যতম প্রধান ভাষা উর্দ্দু নহে। এমন কি উহা সব প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমানও ব্যবহার করে না। সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা সব প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে করিবার প্রয়োজন বা সার্থকতা বুঝা যায় না। আর গবর্ণমেণ্ট রোমান অক্ষরের পক্ষপাতী হইলেই যে মুসলমানেরা আরবী ছাড়িয়া রোমান অক্ষর গ্রহণ করিবে, তাহার প্রমাণ কোথায়? মুসলমানেরা নানা কারণে আরবী অক্ষরের পক্ষপাতী; তাহার মধ্যে প্রধান, উহা তাহাদের পবিত্র কোরাণ শরীফের অক্ষর। তাহারা যদি আরবী ছাড়িতে রাজী হয়, তাহা হইলে রোমান অপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক যে নাগরী বা বাংলা সংস্কৃত বর্ণমালা তাহা কি দোষ করিল? তাহাদের উদ্ভব ভারতবর্ষে এবং হিন্দুরাও তাহা ব্যবহার করে, ইহা একটা দোষ নহে।

অবশ্য আরবী অপেক্ষা রোমান অক্ষর সহজপাঠ্য ও সহজব্যবহার্য্য। উর্দ্দুতে রোমানের চলন হইলে উর্দ্দু শিক্ষা ও ব্যবহার সহজ হইবে এবং উর্দ্দু কাগজের কাটতি বাড়িবে। ইহাও সকলে জানেন, মুসলমানদের রাজনৈতিক মত অমুসলমানদের অধিকাংশের মতের সঙ্গে এক নয়। মুসলমানরা আপনাদিগকে আলাদা মনে করেন ও থাকেন। উর্দ্দুকে প্রবল করিয়া, উহাকে সব প্রদেশের সব মুসলমানের ভাষা করিবার ও হইবার সুযোগ দিয়া সরকার কি মুসলমান ও অমুসলমান রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির (কালচ্যারের) স্থায়ী ও গভীর প্রভেদ সৃষ্টির সূত্রপাত করিতে চাহিতেছেন? উর্দ্দু খবরের কাগজগুলিকে রোমানের সাহায্যে প্রাধান্য দিয়া অন্য সব দেশ-ভাষার কাগজগুলির প্রভাব খর্ব্ব করিতে চাহিতেছেন?

কংগ্রেস ও নেহেরু রিপোর্ট আরবী বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দুস্থানীকে স্বশাসক ভারতের সাধারণ ভাষা (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা) করিতে চান। কিন্তু রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সভা সমিতিতে "হিন্দী" "হিন্দী" চীৎকারই শুনা যায়, "হিন্দুস্থানী" "হিন্দুস্থানী" চীৎকার শুনা যায় না। সেইজন্য সরকার বাহাদুর কি এই চীৎকারের বিরুদ্ধে উর্দ্দুর নিশান খাড়া করিতে চাহিতেছেন?

যাহারা ভেদনীতি অবলম্বন করিতে চায়, তাহারা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম জাতি ভাষা লিপি পরিচ্ছদ প্রভৃতির নানা বৈচিত্র্যের সাহায্যে সেই নীতিকে সফল করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

—

মুসলমান সমাজে সংস্কার-চেষ্টা

পরিবর্ত্তন ও সংস্কার ব্যতিরেকে কোনও সামাজিক ব্যবস্থা চিরকাল কল্যাণকর থাকিতে পারে না। কালক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন সকল দেশেই হইতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন চাই। ত্রিকালজ্ঞ কেহ কোন সময়ে কোন দেশে জন্মিয়া সকল দেশের ও সকল কালের উপযোগী কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন বা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা কোন মহাপুরুষের মারফৎ স্বয়ং ঈশ্বর এরূপ কোন ব্যবস্থা পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, ইহা অমূলক কল্পনা মাত্র। আমরা হিন্দু-সমাজ ও হিন্দু-শাস্ত্রের বিষয়ই কিছু জানি। তাহারই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের উক্তি বুঝাইতে চাই। হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র যতগুলি আছে, তাহাদের পরস্পরের সহিত কিছু কিছু গরমিল আছে। সবগুলি এক সময়ে বা একযুগে রচিত হয় নাই। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার পার্থক্য করা হইয়াছে। তাহার একটা প্রমাণ "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" এইরূপ উক্তি। স্মৃতিগুলির পার্থক্যের নজীর দেখাইয়া হিন্দুরা বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তাঁহাদের সামাজিক ব্যবস্থার আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। সেরূপ নজীর দেখান্ বা না দেখান্, হিন্দু-সংস্কারকেরা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

আগেকার কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা আধুনিক সময়ে দেখিতে পাই, বঙ্গে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ প্রভৃতি এই চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যত্র সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সবাই যে সব-সময় নিজেদের মত ও চেষ্টার সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছেন, তাহা নহে। পুরাকালে মানুষের আত্মায় ঐশী শক্তির যে ক্রিয়ার ফলে শাস্ত্রের উদ্ভব, সেই শক্তি তাঁহাদের প্রত্যেকের আত্মাতেও প্রভাব বিস্তার করায় তাঁহারা ঠিক কথা বলিতে ও ঠিক্ কাজ করিতে পারিয়াছেন।

হিন্দু-সমাজ হইতে এইসব যেরূপ সংস্কারকের উদ্ভব হইয়াছে, মুসলমান সমাজে তদ্রূপ সংস্কারকদের আবির্ভাব হয় নাই। একমাত্র আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদের নাম উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ কেবল মুসলমান-সমাজকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিয়া তাহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অন্যান্য বিষয়ে মোল্লাদিগকে খুশি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু যেমন হিন্দু-সমাজ কেবল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রভাবাধীন থাকিলে তাহার কোন উন্নতি সম্ভব হইত না, তেমনি মুসলমান-সমাজও মৌলানা মৌলবী মোল্লাদের (বিশেষতঃ কাঠমোল্লাদের) মতানুবর্ত্তী থাকিলে তাহার উন্নতি হইবে না। ইহা কতকগুলি শিক্ষিত মুসলমান বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রবাসী, মুসলিম হল ম্যাগাজিন প্রভৃতিতে লিখিয়া, অন্যেরা আলবার্টহলে সভা করিয়া উন্নতিবিরোধী মোল্লা-প্রভাবকে নষ্ট ও অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে মুসলমান-সমাজের মঙ্গল হইবে। শুনিয়াছি ইসলামে পৌরোহিত্য প্রথা নাই। সুতরাং মোল্লাদের কু-প্রভাব অনিবার্য্য নহে। এখন অবশ্য মুসলমান সংস্কার-প্রয়াসীরা মোল্লাদের অনুবর্ত্তী না হইয়া কোরাণ শরীফ ও হাদিসের অনুবর্ত্তী হইতে চাহিতেছেন। কিন্তু কালক্রমে এমন সংস্কারকও তাঁহাদের মধ্যে জন্মিতে পারেন যিনি প্রয়োজন হইলে প্রাণপণ করিয়াও সকল শাস্ত্রেরই অকল্যাণকর বিধিকে অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

—

"নবীন অতিথি"

আমরা এই নামের একটি ছোট সচিত্র কবিতার বহি পাইয়াছি। লেখক শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় পুস্তিকাটির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :

মন্মথনাথ সরকার নামে একজন কায়স্থ যুবক কুসঙ্গে পড়িয়া বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। রেস খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় এবং শেষে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার কুটীরে তাহার সাধ্বী স্ত্রী বড় দুঃখে, বড় কষ্টে দিন যাপন করিত। দুঃখের উপর দারুণ দুঃখ ঘটিল যখন এই রমণী আসন্ন-প্রসবা হইলেন। প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া চীরবাসা রমণী পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতা করপোরেশনের মাতৃমঙ্গল ভবনে ধাত্রীগণের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে মেরী নাম্নী একটি ধাত্রী তাঁহার একটি পুত্র সন্তান প্রসব করাইল বটে, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও প্রসূতিটিকে বাঁচাইতে পারিল না।

প্রসূত শিশুটির কাহিনীই লেখক পয়ার ছন্দে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

লেখকের ভবনে লেখকের কন্যা সেই সময়ে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন এবং উক্ত ধাত্রী ঐ কন্যাটিকে প্রসব করাইয়াছিলেন। মাতৃহীন শিশুটিকে লইয়া মেরী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। শেষে সেই শিশুটিকে লইয়া লেখকের পত্নীর কাছে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার কন্যার স্তনদুগ্ধ দিয়া শিশুটিকে বাঁচাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। লেখক ও তৎপত্নী সাগ্রহে শিশুটিকে গ্রহণ করিলেন। লেখকের কন্যার স্তনদুগ্ধে ও পত্নীর যত্নে শিশুটি প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি শিশুটি আজ লেখক ও তৎপত্নীর স্নেহে যত্নে সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়াছে এবং পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতেছে।

বাৎসল্যমুগ্ধ লেখক স্নেহের আতিশয্যবশতঃ শিশুটির ক্ষুদ্র অথচ বিচিত্র জীবনের কাহিনী রচনা করিয়া মুদ্রিত করিলেন। কাহিনীটি পড়িলে যুগপৎ লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা ও শিশুটির প্রতি সহানুভূতি জাগিয়া উঠে।

ইহা সত্য কথা। শিশুটির প্রাণ রক্ষা করিয়া লেখক মহাশয়ের পরিবারবর্গ অতি সৎকার্য্য করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সামাজিক নিন্দা কুৎসা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। শিশুটির যদি কোন সদ্বংশ পরিচয় না থাকিত, তাহা হইলেও তাহাকে মানুষ করা সজ্জনমাত্রেরই কর্ত্তব্য হইত। পুরাকালে কত অজ্ঞাতকুলশীল শিশু সুশিক্ষা পাইয়া ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন। সত্যকাম জাবাল তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পিতৃমাতৃহীন শিশুমাত্রেরই গৃহস্থের গৃহে কিংবা অনাথাশ্রমে স্থান পাওয়া উচিত।

ডাকঘরের লোকের অপরাধ ও শাস্তি

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ডাকঘরের একজন নিম্নপদস্থ লোক নানা স্থানে প্রেরণের জন্য ডাকঘরে প্রদত্ত মাসিক পত্রিকাদি চুরি করিয়া টিকিটগুলি ও কাগজগুলি বিক্রী করিত। কতদিন ধরিয়া সে এই কাজ করিতেছিল এবং কোন্ কোন্ কাগজ চুরি করিত, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জানা যায় নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রবাসী আফিসের দুইজন কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়া পুলিসের হাতে দেন। সে কম দামে মডার্ণ রিভিউ বিক্রীর চেষ্টা করিতেছিল। হাইকোর্টের বিচারে তাহার সেদিন নয় মাস জেল হইয়াছে। সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া শাস্তি কম হইয়াছে। এইরূপ চোরের দুষ্কর্ম্মে অনেক গ্রাহক অনেক কাগজ পান না, কাগজের মালিকদিগকে গ্রাহকদের গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় এবং কাগজ ও ডাকমাশুল দুইবার দিতে হয়। এইরূপ চোর অন্য কোন কোন ডাকঘরেও থাকিতে পারে।

কি কারণে জানি না, এই মোকদ্দমাটির বৃত্তান্ত যথাসময়ে দৈনিক কাগজগুলিতে বাহির হয় নাই।

বিলাতে বিবাহের বয়স

বিলাতে এ পর্য্যন্ত ছেলেদের বিবাহের ন্যূনতম আইনসঙ্গত বয়স ছিল ১৪, মেয়েদের ১২। অবশ্য এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ অল্পই হইত। কিন্তু তথাপি নূতন আইন করিয়া বালক ও বালিকা উভয়েরই বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৬ করা হইয়াছে। আমাদের দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ মেয়ের বিবাহ শৈশবে হয়। এইজন্য তাহাদের আইনসঙ্গত বিবাহের ন্যূনতম বয়স অন্ততঃ চৌদ্দ করা উচিত। আরও কিছু বেশী হইলে অবশ্য ভালই হয়।

বৃদ্ধের বালিকা-বিবাহ নিষিদ্ধ

আহমদাবাদে এক ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ ১৫ বৎসরের এক বালিকার পিতাকে টাকা দিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে রাজী করে। ইহারা জৈন। বালিকার অবস্থা বড় ছিল না। কয়েকটি জৈনযুবক এই বিবাহ বন্ধ

করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করে। তাহারা দরখাস্ত করিবার পর বালিকার মাতা ও দুই বড় ভাইও দরখাস্তে যোগ দেয়। বিচারক এই বিবাহ নিষেধ করিয়া দিয়া মা ও দুই বড় ভাইকে কন্যাটির অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জজ তাঁহার রায়ে বলেন, "বিবাহার্থী লোকটার উকীল আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে, আমি তার সাধারণ বিবাহযোগ্যতার বিরুদ্ধে যেন কিছু না বলি। আমি এই মোকদ্দমায় কেবল তাহার সঙ্গে এই কন্যাটির বিবাহ বিষয়েই বিবেচনা করিব। সে বিষয়ে আমার মত এই, যে, মেয়েটির ইহার সঙ্গে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

আমাদের যুবসংঘ, তরুণসংঘ, ছাত্র সংঘ প্রভৃতির ইহা হইতে কিছু শিখিবার থাকিতে পারে।

—

সিবিল সার্বিস্ প্রতিযোগিতা

এবার দিল্লীতে সিবিল সার্বিসের প্রতিযোগিতা পরীক্ষার ফলে নয় জন ভারতীয় যুবক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রথম ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন দুইজন মুসলমান—নাম হইতে বুঝিবার জো নাই তাঁহারা কোন্ প্রদেশের লোক। ইহা মন্দ নহে। নাম হইতে অন্য যাহা অনুমান হয়, তাহাতে ২য়, ৩য়, ও ৫ম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লোক, ৬ষ্ঠ ও ৮ম হিন্দীভাষী কোন অঞ্চলের লোক, ৭ম ও ৯ম বাঙালী।

ব্রহ্মদেশীয়দের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা রেঙ্গুনে হইয়াছিল। তাহার ফলে পাঁচ জন বর্মী নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশকে ভারত সাম্রাজ্য হইতে আলাদা করা হইবে কি না, সে-বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইতিমধ্যেই উহার উচ্চতম শ্রেণীর চাকরী হইতে ভারতীয়দিগকে তাড়ান হইয়া গেল।

ভারতবর্ষের এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষা সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর স্থির করিয়াছিলেন, যে, সাতজন প্রতিযোগিতার ফল অনুসারে নিযুক্ত করা হইবে, এবং আটজন সংখ্যান্যূন সম্প্রদায়সমূহ হইতে নিযুক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক অন্যায় দূর করা হইবে। কিন্তু প্রতিযোগিতাতেই দুইজন মুসলমান কৃতকার্য্য হওয়ায় এখন ছয় জনকে মনোনয়ন দ্বারা নিযুক্ত করা হইবে।

প্রতিযোগিতায় যাহারা কৃতকার্য্য হয় না, বা অযোগ্যতা ও ভীরুতা বশতঃ যাহারা পরীক্ষা দিতেই সাহস করে না, তাহাদিগকে সুপারিসে মনোনয়ন দ্বারা নিয়োগ করা সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলে একটি সত্য কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সিবিল সার্বিসে অনুপযুক্ত লোক আনিয়া ভারতীয়দের উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য অযোগ্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গবর্ন্মেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক এই নিন্দনীয় নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

ইহাতে অবিচার ত হয়ই, এবং রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের দ্বারা সমর্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধ কাজ করা হয়। এই বৎসর ১৫টি পদেই যদি প্রতিযোগিতার ফল অনুসারে লোক নিযুক্ত করা হইত, তাহা হইলে যে-সব হিন্দুযুবক কাজ পাইতে পারিত, কেবল তাহাদের ধর্ম্মের অপরাধেই তাহারা বঞ্চিত হইল, এবং অযোগ্যতর মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান নিযুক্ত হইবে। অথচ মহারাণীর ঘোষণাপত্রে লেখা আছে, যে, জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল ভারতীয় প্রজা সমান অধিকার ও ব্যবহার পাইবে। নানা রাজকীয় ঘোষণাপত্র দেখিয়া বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ক্রীম্যান্ লিখিয়া গিয়াছেন, যে; রাজকীয় ঘোষণাপত্রসমূহ "বাছাই-করা মিথ্যার অঞ্চলের জিনিষ" (belong to the chosen region of lies") ।

—

ভারতীয় যুবকের বাইসিক্লে ভূপ্রদক্ষিণ

দুই বৎসর আগে বিমল মুখোপাধ্যায় তিনজন সঙ্গীর সহিত বাইসিক্লে ভূপ্রদক্ষিণে বাহির হন। সে তিন জন ক্ষান্ত হইয়াছেন, তিনি একা এখনও বাইসিক্ল চালাইতেছেন। তাঁহার শেষ খবর স্কটল্যাণ্ডের এবার্ডীন সহর হইতে পাওয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত তিনি দুই বৎসরে একুশ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। বাকী আছে আরও অনেক হাজার মাইল। তাহা তিনি আরও তিন বৎসরে শেষ করিতে পারিবেন মনে করেন।

কখনও বা তাঁহাকে বাঘে তাড়া করিয়াছে, অন্য সময়ে মরুভূমির হিংস্র অসভ্য লোকেরা তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে। তিনি তুরস্কের কারাগারে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়াছেন। এক সময়ে মরুভূমিতে তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ যাইতে বসিয়াছিল।

অনেক রাজারাজড়া, সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত তিনি কথা বলিয়াছেন; যথা, জার্ম্মেনীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট, রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবার্গ, তুরস্কের কমাল পাশা, অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী। বিমলবাবু আফ্রিকার উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সাইকে যাইতে এবং মধ্য-আফ্রিকায় ভৌগোলিক গবেষণা করিতে পারিবেন মনে করেন। তিনি রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। বিখ্যাত লোকদের স্বাক্ষরসংগ্রহ তাঁহার যেমন হইয়াছে, হয়ত আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন নাই।

—

ভারতীয় বিমানচারী

কাবালী নামক একজন ভারতীয় যুবক এরোপ্লেন চালাইয়া ব্রিটেন হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

—

বাঙ্গালী মাত্রেই ভীরু কিনা

এমন কোন জাতি নাই যাহার প্রত্যেক মানুষই সাহসী বীর পুরুষ। কোন জাতিকে ভীরু বলাও মূর্খতা। এখনও কিন্তু এমন বাঙালী আছে যাহারা নিজের জাতভাইকে ভীরু বলিতে লজ্জাবোধ করে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত সেদিন পাওয়া গিয়াছে। বীণাপাড়া দাদার মোকদ্দমা কালনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইউ এন্ বসুর নিকট হইতে কোন ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরণের জন্য বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ডাগলাস্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত পড়ে। দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার সময় ডাগলাস্ সাহেব যে রায় দেন, তাহার মধ্যে আছে, "দরখাস্তকারীর [বাঙালী] কৌসিলি বলেন তাঁহার স্বদেশবাসীরা স্বভাবতই কাপুরুষ। আমি তাঁহাকে ইহা জানান দরকার মনে করি নাই, যে, আমি গত মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্টনের একদলের নেতা ছিলাম, এবং সেইজন্য তাঁর চেয়ে আমার ইহা বলিবার বেশী অধিকার আছে, যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে সাহসী লোকের অভাব নাই। তাঁহার যুক্তিটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হইতেছে।"

মেকলে ও অন্য অনেক ইংরেজ নিন্দুকের কথায় বাঙ্গালীরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ মানিয়া লইয়াছিল, যে, তাহারা ভীরু। সেই কুসংস্কার এখনও অনেকের আছে। দেশভ্রমণ করিলে, বাঙ্গালীরা যত সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে এবং মেকলের প্রতিবাদ যে-সব ইংরেজ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা জানিলে ঐ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকদের ধারণা বদলাইবে। যেমন ধরুন ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান ক্রাইন্ সাহেব তাঁহার "ভারতের আশা" (*India's Hope*) নামক পুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:

"Considerations of space forbid me to discuss all the allegations made [by Macaulay] in the *Essay on Warren Hastings*, but I must refer briefly to the charge of cowardice. No quality is so widely diffused as physical courage, and healthy Bengalis possess it in a marked degree. They wage pitched battles for a morsel of land, and their cricketers stand up to fast bowling without leg-pads. If they are not a martial race the reason must be sought for in their environment."

—

নারীশিক্ষা সমিতি

নারীশিক্ষা সমিতির অনুষ্ঠানপত্র একখানি পাইয়াছি। ইহা দেশহিতৈষী সকলের পড়া উচিত। কলিকাতায় ৬।১ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে ইহার আফিস। অনুষ্ঠানপত্রে লিখিত হইয়াছে:

বাংলায় ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ কোটি ২৫ লক্ষ নারী। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, আর্থিক স্বচ্ছলতায় এই নারী জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উপর যে দেশের কল্যাণ নির্ভর করে, এ কথা সকলেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু সমস্যা যে কিরূপ গুরুতর, দেশের দিকে একটু তাকাইলেই সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বাংলার ২ কোটি ২৫ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বালিকার সংখ্যা প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ। কিন্তু তন্মধ্যে ত্রিশ লক্ষের উপর বালিকা অ আ ক খ ইত্যাদি শিখিবারও কোন সুযোগ পায় না।

তারপর বাংলায় ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বিধবার সংখ্যা সাড়ে চারি লক্ষের উপর; ইহারা অপরের গলগ্রহ হইয়া গৃহের ও সমাজের ভারস্বরূপ জীবন যাপন করে।

এই অশিক্ষা হীনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে জাতি কর্ম্মহীন ও

সবলকায় হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু অবস্থা যতই শোচনীয় হউক, প্রতীকারের ভার আমাদের নিজদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আজ দেশে জাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছে; কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র চেষ্টা বাস্তব আকার ধারণ করিয়াছে নারীশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।

স্ত্রীশিক্ষা

দশ বৎসর হইল এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। নারীশিক্ষা বিস্তারকল্পে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, এই সকল বিদ্যালয়ে মোটামুটি তিন বৎসরের মধ্যে যতটা সম্ভব শিক্ষা বালিকাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির ও শিক্ষণীয় বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শে সমিতি শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতেছেন— উদ্দেশ্য যাহাতে অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে বর্ত্তমান কালের উপযোগী একটা মোটামুটি জ্ঞান বালিকাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। সমিতি আজ অবধি কলিকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ৫০টি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

বিধবারকথা

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের প্রধান অন্তরায় হইল যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষয়িত্রীর অভাব। সমিতি অনুভব করিলেন যে, অল্পবয়স্কা বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে। অধিকন্তু এই সকল বিধবা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বাবলম্বনের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যে সমিতি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতির সহিত জড়িত রাখিয়া বিদ্যাসাগর বাণীভবন নামে এক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে বিধবা ছাত্রীগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত আচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুনিয়মে শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইতিমধ্যে ৫০টি বিধবা এখান হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন—২৫ জন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, কয়েক জন আর্ত্তসেবায় নিযুক্ত আছেন। বাণী ভবনের সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার সমিতি বহন করেন।

কুটীর-শিল্প

কিন্তু সকল বিধবা শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন না অথচ নানারূপ গৃহ-শিল্প দ্বারা তাঁহারা নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। তাহা ছাড়া দেশের বর্ত্তমান এই দারিদ্র্যের দিনে অনেক গৃহস্থ ঘরের বধূ ও কন্যা সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল করিতে কিছু কিছু গৃহ-শিল্প শিক্ষা করিতে অভিলাষিণী। সমিতি এইরূপ গৃহ-শিল্প শিক্ষা প্রদানকল্পে মহিলা শিল্পভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এখানে বয়ন, [illegible] তাঁত ও রংএর কাজ প্রভৃতি বিষয় হাতে কলমে শিখাইবা[illegible]বস্ত হইয়াছে। এ শিক্ষাও অবৈতনিক।

সমিতি যে কাজ করিয়াছেন তাহা আশাপ্রদ হইলেও তাহা যে [illegible] নহে তাহা বুঝিয়া বলিতেছেন:

আজ [illegible] নারীশিক্ষা সমিতি যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা অতি সামান্য। সমিতি ৫০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু বাংলায় এখনও সহস্র সহস্র পল্লী আছে যেখানে আজও-অবধি স্ত্রী-শিক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে ৩০টি বিধবার থাকিবার এবং শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; স্থানাভাবে বহু আবেদন প্রত্যাখান করিতে হইতেছে। পল্লীগ্রামে বিধবাদিগকে কিছু কিছু শিল্প-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা-পদ্ধতি প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না।

সমিতির সম্মুখে বিরাট কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার কার্য্যকারিতা প্রসারিত করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে সমিতি আশা করেন দেশের জনসাধারণ জাতিগঠন-কার্য্যে মুক্তহস্তে তাহা প্রদান করিবেন।

সমিতি সাহায্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সাহায্য সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসুর নামে পাঠাইতে হইবে।

—

ইংরেজদের একটি ব্যাঙ্ক ফেল হইবার কথা

এমন কোন স্পর্শমণির বিষয় জানি না যাহার স্পর্শে অপর জাতির দোষ ত্রুটি অক্ষমতা আমাদের গুণ ও সামর্থ্যে পরিণত হইতে পারে। তথাপি, আমরাই সকল দোষের আধার, ইহা ভাবিয়া অবসাদগ্রস্ত যাহাতে না হই, তাহার জন্য দোষ যে বড় বড় জাতিরও হয় তাহা মনে রাখা ভাল।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বাঙালীর দুর্নাম হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের কাজে উৎসাহহীনতা জন্মিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক ফেল হইলেই সমস্ত জাতিটা অসৎ বা ব্যবসাবুদ্ধিহীন অকর্ম্মণ্য প্রমাণ হয় না। সৎ ও ব্যবসাদক্ষ লোক বাঙালীদের মধ্যে এখনও অনেক আছে। নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়।

ইংরেজেরা খুব বড় ব্যবসাদার জাতি। তাহাদের বহু সংখ্যক ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা খাটে। তাহাদেরও বড় বড় ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ভগ্নোদ্যম হয় নাই। এই ভারতবর্ষেই ১৯০৬ সালে তাহাদের আর্বাথনট কোম্পানীর ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাহার হাজার হাজার গরীব আমানতকারী সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যক্তি সার জর্জ আর্বাথনটের সম্প্রতি ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হওয়ায় ইংরেজদের কাগজেই ইহার বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। মাদ্রাজে ইহার প্রধান আফিস ছিল। তাহা যে-দিন কারবার বন্ধ করিল, তাহার দুই-এক দিনের মধ্যে বিলাতে তাহার এক অংশীদার ম্যাকফ্যাডেন আত্মহত্যা করে। স্যার জর্জ আর্বাথনটকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, ব্যাঙ্কটি দীর্ঘকাল দেউলিয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লুকাইয়া আমানতী টাকা গ্রহণ করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন তাহাতে আর চলিল না, তখন কাজ বন্ধ করিতে হইল। তখন স্যার জর্জের বয়স প্রায় ষাট। বিচারে তাঁহার সাত বৎসর জেল

হইয়াছিল। জেল খাটিয়া খালাস পাইবার পর তিনি বিলাতে ফিরিয়া যান। এখন মৃত্যু হইয়াছে। স্যার উপাধিটা কেন বজায় ছিল জানি না।

—

নূতন স্থানে অশোকের অনুশাসন আবিষ্কার

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্নূল জেলায় কলিকাতার শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত অণু ঘোষ কিছুদিন হইল ব্রাহ্মী লিপিতে সম্রাট অশোকের ১৪টি শিলা-অনুশাসন ও অন্য দুটি অনুশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর জেনার‍্যাল স্যার জন মার্শ্যাল এই আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

—

কয়েকজন চিকিৎসকের সেবাব্রত

কোন কোন জায়গায় যত ডাক্তার আছেন, তাঁহাদের অনেকের যথেষ্ট রোগী জুটে না। তথাপি তাঁহারা পল্লীগ্রাম অঞ্চলে গিয়া আড্ডা বাঁধেন না এইজন্য, যে, সহরে তবু কিছু আয়ের আশা থাকে, পল্লীগ্রামে তাহারও আশা কম। তথাপি পল্লীগ্রামে টাকা পাওয়া যায় না বলিয়া ডাক্তারেরা যে কেহই কোন্ গ্রামে যান না, এমন নয়। কলিকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিক গার্ডিয়ানে মেডিক্যাল কলেজের গ্রাজুয়েট ছয়জন ডাক্তারের নাম না করিয়া তাঁহাদের সেবাব্রতের বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা রোজগার করেন কলিকাতায়; প্রতি শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী ইলিপুর গ্রামে যান। সঙ্গে অনেক ঔষধ লইয়া যান। রবিবার প্রাতঃকাল হইতে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। নানা গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতির রোগী আসে। প্রতি রবিবার প্রায় চারিশত রোগী দেখা হয় এবং তাহাদিগকে ঔষধ দেওয়া হয়। এই কাজ গাছতলায় বা কোন একটি ছোট ঘরে হয়। রোগী দেখিতে দেখিতে বিকাল ৪টা বাজিয়া যায়। তখন তাঁহারা আহার করেন, ও পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কোন রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে তাঁহারা তাহা কলিকাতায় তাঁহাদের ল্যাবরেটরীতে লইয়া আসেন। এই কাজ চারি বৎসর চলিয়া আসিতেছে। রোগীদের নিকট হইতে কিছুই লওয়া হয় না, ঔষধের দাম পর্য্যন্ত না। ব্যয় যাহা হয়, তাহা ডাক্তার মহাশয়েরা সংগ্রহ করেন। দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ আত্মগোপনেচ্ছু হিতকর্মীর প্রয়োজন।

—

বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা বিল

করিয়াছেন। তথাপি, ইহা সর্ব্বসাধারণের পছন্দসই হইবে বোধ হয় না। সারা বাংলার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে। দেশের সকল অংশের প্রাথমিক শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, মান (standard) সকলের সাম্য রক্ষার নিমিত্ত এবং শিক্ষণীয় বিষয় সকলের ঐক্য রাখিবার জন্য এইরূপ একটি কমিটির দরকার। কিন্তু তাহার হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা চাই। সিলেক্ট কমিটি কিন্তু এই কমিটিকে কেবল পরামর্শ দিবার অধিকার দিতে চান—কাজে যাহা করা হইবে তাহা সরকারী শিক্ষাবিভাগ করিবেন। এরূপ ছেলেভুলান অধিকারে চলিবে না। সমগ্র বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার ধারা, পদ্ধতি, শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা কমিটির থাকা উচিত। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজ করেন। মধ্যশিক্ষার প্রবেশিকার অংশ সম্বন্ধেও তাহা করিতেন। অতঃপর তাহা সেকণ্ডারী বোর্ডের হাতে যাইবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষাও একটি কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে যাওয়া ভাল। তাহাতে অবশ্য গবর্ন্মেণ্টের মনোনীত প্রতিনিধিরাও থাকিবেন।

সিলেক্ট কমিটি এই কেন্দ্রীয় কমিটির ১৬ জন সভ্যের মধ্যে ১০ জন নির্ব্বাচন করিবার অধিকার জেলা স্কুল-বোর্ডগুলির হাতে দিতে চান, বাকি ৬ জন সরকারের মনোনীত লোক হইবেন। সরকারী লোকের সংখ্যাটা বেশী হইয়াছে। তা ছাড়া জেলা স্কুলবোর্ডগুলি কেবল নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন না করিয়া শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত স্থানীয় অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট ও শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অন্যলোককেও নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়ম হওয়া চাই। জেলা স্কুলবোর্ড-সকলে যথেষ্টসংখ্যক এরূপ লোক না থাকিতে পারেন।

জেলা স্কুলবোর্ডগুলিতে এবং কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মহিলা সভ্য থাকিবার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বালকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। তাহার জন্য শিক্ষিতা মহিলাদের পরামর্শ, সাহায্য ও উৎসাহ একান্ত আবশ্যক।

গবর্ন্মেণ্ট বড় কুব্যবস্থা করিতে চান। তাঁহারা চান, যে-জেলায় যে-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বেশী, সেই সম্প্রদায় হইতে জেলা স্কুলবোর্ডের সভাপতি ও উপসভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। যোগ্যতম লোকেরেই সভাপতি উপসভাপতি হওয়া উচিত। কোন জেলায় কোন ধর্ম্মের

লোকও সেই ধর্ম্মেরই হইবে, এরূপ কোন স্বাভাবিক নিয়ম নাই। কোন জেলায় কোন ধর্ম্মের লোক বেশী হইলে নির্ব্বাচিত অধিকাংশ সভ্যের সেই ধর্ম্মের লোক হইবারই সম্ভাবনা আছে। তাহার উপর সভাপতি ও উপসভাপতিও সেই ধর্ম্মেরই হইবে এরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া সাম্প্রদায়িকতার চরম বলিয়া মনে হয়।

—

বিলাতে সাইমন কমিশন

ভারতবর্ষের লোকেরা সাইমন কমিশন বর্জ্জন ঘোষণা যত প্রকারই করিয়া থাকুন না, ঐ কমিশন পরোক্ষভাবে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর কারণ হউক না, তথাপি বিলাতে নামজাদা লোকদের দ্বারা জোরগলায় ইহা প্রচারিত হইতে থাকিবে, যে, উহা ভারতে খুব ভাল কাজ করিয়াছে, খুব সমাদর পাইয়াছে, কেবল অপেক্ষাকৃত সংখ্যান্যূন একদল লোক উহার কাছে সাক্ষ্য দেয় নাই, ইত্যাদি। তাহা হইলেও, কমিশন লণ্ডন পৌঁছিবার সময় প্রবাসী ভারতীয়েরা যে ইহা জানান দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে, ভারতবর্ষ ওরূপ কমিশন অনুমোদন করে নাই, কখন করিবে না, তাহা ভালই হইয়াছিল। আদালতে তাঁহাদের কাহারও কাহারও বিচার হওয়ায় সংবাদটার আরও প্রচার হইবে। তাহাতে স্বার্থান্ধ ও স্বার্থবধির লোকছাড়া অন্যদের চোখ-কান ফুটিতে পারে।

—

প্রবাসী বাঙালীদের বিদ্যালয়

ভারতবর্ষ এত বড় দেশ এবং ইহার কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় এরূপ সাহিত্য আছে, যে, তাহাদের মধ্যে কোন একটি ছাড়া আর সবগুলি লুপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতে কেবল একটি ভাষার চলন কখনও হইবে মনে হয় না। যদি হয়, তাহা সুদূর ভবিষ্যতে হইবে। এই জন্য আমাদিগকে নিজের নিজের মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্যের চর্চ্চা বজায় রাখিতে হইবে। যে-সব বাঙালী বাংলা দেশে বাস করেন, তাঁহাদের পুরুষনারী বালকবালিকা সকলের পক্ষে ইহা করা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। কিন্তু যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা তত সোজা নয়। তথাপি, যে-সব জায়গায় বাঙালীর সংখ্যা বেশী, সেখানে বাংলা লাইব্রেরী ও বাঙালীর ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল চালাইয়া একাজ চেষ্টা করিলেই করা যায়। সমস্যা তাঁহাদের পক্ষে কঠিনতর যাঁহারা বাংলা হইতে দূরে মাত্র ২।৪ বা ২।১০ ঘর বাস করেন। তথাপি দেখিয়া সুখ হয়, এদিকে বাঙালীদের দৃষ্টি আছে। সম্প্রতি আজমীরে দেখিলাম, অল্পসংখ্যক বাঙালী সপরিবারে সেখানে থাকেন, কিন্তু শিশুদিগকে বাংলা শিখাইবার স্কুল তাঁহারা চালাইতেছেন। এ-সব খবর আমরা জানি না। এক সময় আমরা প্রবাসীতে এই সকল খবর ছাপিতাম। সমুদয় খবর জানিতে

শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

পারিলে উৎসাহ বাড়ে। সেইজন্য ইন্দোরে প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে বিচারপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছিলেন—"এলাহাবাদে, কাণপুরে ও কাশীতে বাঙালী মেয়েদের জন্যে স্কুল আছে। এলাহাবাদের স্কুলের সঙ্গে বোর্ডিং-হাউস্ আছে। সে-সব খবর সকলকে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সভায় দেওয়া যেতে পারে।" এলাহাবাদের উল্লিখিত এই বালিকা-বিদ্যালয়টির সম্পাদক মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইহার নিজের একটি বাড়ীর জন্য কয়েক হাজার টাকা উঠিয়াছে। আরও কিছু উঠিলেই সরকারী টাকার সাহায্যে বাড়ী হইবে। তখন উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না।

খৃষ্টীয় সেবাকে ভারতীয় রূপ দান

গতমাসের প্রবাসীতে দেশীয় খৃষ্টিয়ানরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে (কাল্চ্যারকে) কি ভাবে ও কি কারণে শ্রদ্ধা দেখাইতে ও গ্রহণ করিতে চান, তাহার কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম তাঁহাদেরই একজন নেতার লেখা উদ্ধৃত করিয়া। তাহার পর বিলাতের ইণ্টারন্যাশন্যাল রিভিউ অব্ মিশনস্ নামক খৃষ্টীয় ত্রৈমাসিকে ঐ ধরণের একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছি। তাহার নাম Experiments in Indian Expression of Christian Service," "খৃষ্টীয় সেবাকার্য্যের ভারতীয় ভাবে প্রকাশের প্রযত্ন।" লেখকের নাম পি উম্যান্ ফিলিপ। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকেরা তাঁহার মতে যে নানা ভাবে ভারতের হিতার্থ নানা চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কি কি ভারতীয় ভাবে করিতেছেন, তাহারই কিছু বর্ণনা তিনি করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্গীত ইউরোপীয় গানের দেশী ভাষায় কদর্য্য অনুবাদমাত্র ছিল এবং পাশ্চাত্য সুরে গাওয়া হইত। এখন অনেক প্রদেশে ও স্থানে দেশী খৃষ্টীয় গান রচিত হইয়াছে ও দেশী সুরে তাহা গাওয়া হয়।

তামিল, তেলুগু, কন্নাড, মরাঠী, হিন্দী ও অন্য কোন কোন ভাষায় এখন খৃষ্টীয় কথকতা, কীর্ত্তন ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচলিত "কালক্ষেপম্" হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসঅবলম্বী নানা সাধু-সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও দুষ্ট প্রবঞ্চক ও অলস লোক আছে, তথাপি এই খৃষ্টীয় লেখক মনে করেন, যে, এই সাধু-সন্ন্যাসী হইবার প্রথার মধ্যে এবং প্রকৃত সাধুদের জীবনে ভারতীয় ধর্ম্মভাবের অনেক মূলতত্ত্ব নিহিত আছে ; সুতরাং ভারতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর উপর তাহার প্রভাব না পড়িলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। উত্তর-ভারতে প্রথম প্রথম পাঁচ জন খৃষ্টিয়ান সাধু ছিলেন এবং দক্ষিণ-ভারতেও ঐরূপ সংখ্যা। ক্যানন ওয়েষ্টার্ন কিছুকাল সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন। এখন খৃষ্টিয়ান সাধুর সংখ্যা ৫০।৬০ হইবে। ইহাও দেখা গিয়াছে, যে, হিন্দু-সাধুদের মধ্যে যেমন, তেমনি খৃষ্টিয়ান সাধুদের মধ্যেও জাল ও মেকি আছে। তা ছাড়া আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মনে করেন, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার রীতির প্রচলন ও অনুমোদনে এই একটা ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যে, সাংসারিক সব ব্যাপার আধ্যাত্মিকতার বিরোধী। তাহাতে পবিত্র জীবনের দুটা বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি হয়—এক গৃহীর জীবন, আর এক সন্ন্যাসীর জীবন, এবং এই ধারণা জন্মে, যে, গৃহী যত ভাল লোকই হউন তিনি সন্ন্যাসীর চেয়ে নিকৃষ্ট। প্রথাটির প্রচলন যখন ব্যক্তিগত স্বাধীনভাবে হইতেছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কোন বিশেষ শাখার চেষ্টায় হইতেছে না, তখন উহার ভাল অংশটিই রক্ষিত হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কোন শাখার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া কাহারও কর্ত্তৃত্ব ও আর্থিক সাহায্যের অধীন না থাকিয়া কাজ করিলে সুফল হইবে বলিয়া উক্ত লেখক মনে করেন।

খৃষ্টীয় আশ্রমও কতকগুলি হইয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় লেখক দিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে তিরুপত্তুর নামক স্থানে "খৃষ্টকুল আশ্রম" নাম দিয়া সাত বৎসর হইল এইরূপ একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। ময়মনসিং জেলার হালুয়াঘাটে গারোদের মধ্যে এইভাবে কাজ হইতেছে। পুণায় খৃষ্টসেবাসংঘ আর একটি আশ্রম। এইরূপ আশ্রম আরও চারিটি আছে।

খৃষ্টিয়ানেরা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কিরূপ সজাগ, পর্য্যবেক্ষণশীল, এবং ভাল নানা প্রণালী গ্রহণ করিতে কিরূপ প্রস্তুত, উপরে বর্ণিত সব চেষ্টা হইতে তাহা বুঝা যায়।

—

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ

দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯২৮ সালের রিপোর্টে দেখিলাম, এই বিদ্যালয়টি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে স্থিত, এবং এখানে বালকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়, নানা রকম খেলার বন্দোবস্ত আছে, তাহাদের শারীরিক শক্তির অনুরূপ গৃহকর্ম্ম করান হয়, সেবক-সংঘ স্থাপন দ্বারা স্বায়ত্তশাসন শিখান হয়, এবং তদ্ভিন্ন সাধারণ শিক্ষণীয় সব বিষয় শিখান হয়। গান ও অন্য কোন কোন বিষয় শিখাইবারও বন্দোবস্ত আছে। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বাড়ীর মত এখানে ছেলেরা দুবার জলখাবার খায় এবং দুবার পূর্ণ আহার করে। দুধ প্রত্যহ দেওয়া হয়। মাছ-মাংস সপ্তাহের কোন কোন দিন দেওয়া হয়।

—

পাশ্চাত্য নিন্দুকের দল

পূর্ব্বে খৃষ্টীয় মিশনরীরা নিজেদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নিন্দা করিতেন। এখন তাঁহারা সেপথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন উঁহারা এদেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে ভাল আছে মানেন, কিন্তু তাহার পূর্ণতার জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রয়োজন ঘোষণা করেন।

এখন অন্য একদল ভারতনিন্দুক দেখা দিয়াছে। তাহারা রাজনৈতিক অসদভিপ্রায়-প্রণোদিত। তাহারা

জঘন্য সামাজিক প্রথার দাস বলিয়া জগতের লোকের সমক্ষে চিত্রিত করিতেছে, যাহাতে সকলের মনে এই ধারণা হয়, যে, ভারতীয়েরা আত্মশাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং, সেইজন্য,তাহারা স্বরাজ পাইবার যে চেষ্টা করিতেছে তাহা হাস্যকর। এই প্রকারে নিন্দুকেরা ভারতীয়দিগকে তাহাদের স্বরাজ-সংগ্রামে পৃথিবীর স্বাধীন জাতিদিগের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ, তাহাদের—বিশেষতঃ আমেরিকান্‌দের—আমাদের স্বরাজ্যলাভচেষ্টায় সহানুভূতি থাকিলে তাহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজ জাতির উপর আমাদিগকে স্বরাজ দিবার জন্য চাপ দিতে পারে।

এই যে ভারত-নিন্দা, ইহাও ভারতীয় সকল ধর্ম্মের ও জাতির লোকদের নহে। ইহাও এরূপ চালাকির সহিত করা হইতেছে, যাহাতে ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে রেষারেষি হয় ও ভেদবুদ্ধি জন্মে। মুসলমান-সমাজের কোন নিন্দা করা হইতেছে না, বরং প্রশংসা হইতেছে। অর্থাৎ তাহারা যাহাতে আত্মপ্রতারিত থাকিয়া নিজেদের সমাজ-সংস্কার করিয়া শক্তিমান্ না হয়, হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা করে ও তাহাদের হইতে আলাদা থাকে। "অবনত শ্রেণী"র লোকদিগকে উচ্চজাতিদের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচারিত বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে, যাহাতে উচ্চজাতিদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ জন্মে ও বদ্ধমূল হয়। "অবনত" জাতিদের ও মানব সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, যে, ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হইলে উচ্চজাতিদের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের—হাতে ক্ষমতা যাইবে এবং তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর খুব অত্যাচার করিবে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এবং দক্ষিণ-ভারতের আরও কোথাও কোথাও যে অ-ব্রাহ্মণদের এক প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাকে নিন্দা হইতে বাদ দিয়া তাহার পিঠ চাপড়ান হইতেছে। উদ্দেশ্য, যাহাতে হিন্দুদের গৃহবিবাদটা পাকা হয়।

যাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যত অগ্রসর তাহাদের নিন্দাই তত বেশী করা হইতেছে—মুসলমানদিগকে বাদ দেওয়া হইতেছে, কেন-না তাহারা মোটের উপর কংগ্রেস হইতে বরাবর দূরে আছে এবং স্বরাজ-সংগ্রামে যোগ দিবার যে মূল্য তাহারা চায় সে সম্বন্ধে দর-কষাকষি করিতেছে। নিন্দা হইতে অন্য যাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইতেছে, তাহাদিগকে বাদ দিবারও এবংবিধ কারণ আছে। মোট কথা, যাহারা ইংরেজদের প্রভুত্বলোপ করিবার চেষ্টা করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে তাহারা বড় নীচ, নোংরা, চরিত্রহীন, কুসংস্কারাবিষ্ট, কুপ্রথার দাস, অপদার্থ; আর যাহারা তাহা করে নাই, তাহারা বড়ই ভাল।

আমাদের সামাজিক ও অন্য যত প্রকার দোষ বাস্তবিক আছে এবং যেগুলা অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হইতেছে তাহার কোনটাই যে ভারতীয় সংস্কারকদের অজ্ঞাত নহে এবং সকলগুলারই উচ্ছেদসাধনের জন্য চেষ্টা হইয়া আসিতেছে ও তাহা ক্রমশঃ আস্তে আস্তে সফলও হইতেছে, একথা পাশ্চাত্য ভারত-নিন্দুকেরা গোপন রাখিতেছে। যেন তাহারাই আমাদের হিতার্থে আমাদের সব দোষ উদ্ঘাটন করিতেছে, আমরা কিছু জানিতাম না বা জানিয়াও উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট ছিলাম; তাহারা দোষোদ্ঘাটন-ব্রত গ্রহণ না করিলে ভারতের সামাজিক উন্নতির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ঘটিত না! একথাও তাহারা গোপন রাখিতেছে, যে, সাধারণতঃ ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদিগের সংস্কার-চেষ্টায় সরকার আইনের সাহায্য দিতে নারাজ। একথা একবারও বলা হইতেছে না, যে, সরকার "অবনত" জাতিদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই, এবং তাহাদিগকে পুলিস সৈনিক প্রভৃতি নানা বিভাগের চাকরী হইতে সাধারণতঃ বঞ্চিত রাখিয়াছেন। সাধারণতঃ, দেশের স্বাস্থ্য যে খারাপ, দেশে যে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তাহার জন্য যে প্রধানতঃ গবর্মেণ্ট দায়ী, নিন্দুকেরা তাহা বলিতেছে না।

পাশ্চাত্য নিন্দা-অভিযানের রাজনৈতিক অসদভিপ্রায়ের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। অন্য কুমতলবও থাকা আশ্চর্য্য নয়। এই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, যে, আমাদের সামাজিক, চারিত্রিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক হীনতা জগতের নিকট প্রচার করিলে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন একেবারে বা বেশী পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া সমাজ-সংস্কার, চরিত্রোন্নতি ও স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টাতে লাগিয়া যাইব, এবং তাহা হইলে এখন অন্ততঃ কিছুকাল ইংরেজ প্রভুদের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কতকগুলি নিছক নিছক সমাজ-সংস্কারকের বরাবরই এই বুলি ছিল, "আগে সমাজ ভাল কর, নিজের ঘর সামলাও, তারপর স্বরাজ বা স্বাধীনতার কথা তুলিও।" সেই বুলির পুনরুত্থাপনের উপক্রম দেখা যাইতেছে। অন্যদিকে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলকদের তরফ হইতে বুলি আওড়ান আরম্ভ হইয়াছে, "সামাজিক গলদ প্রভৃতির কথা তুলিয়া আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে; অতএব আগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত কর, তারপর অন্য সব কথায় কান দিও।" প্রকৃত কথা কিন্তু এই, যে, সমাজ-সংস্কার দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় দেশের সমস্ত লোককে সঙ্গে লইতে না পারিলে স্বাধীনতা লাভ করা দুর্ঘট, পাইলেও রাখা যাইবে না, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত না হইলে সমাজ-সংস্কার আত্মোন্নতি

প্রভৃতিও বেশীদূর অগ্রসর হইবে না। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা না থাকিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা থাকিতে পারে না বা তাহার উদ্ভব হইতে পারে না, এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা থাকে না। অতএব, কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে ভাবিবার সময় ও আবশ্যক নাই। যাঁহাদের মনের ঝোঁক সকল রকম সংস্কারের দিকে, তাঁহারা যথাশক্তি সকল দিকেই লাগিয়া থাকুন; যাঁহাদের কোন এক রকম সংস্কারকেই প্রধান মনে হয়, তাঁহারা তাহাতেই লাগুন। কিন্তু কেহ কাহারও সহিত ঝগড়া করিবেন না, কাহারও কাজে বাধা দিবেন না, কাহারও নিন্দা করিবেন না।

—

মধ্যশিক্ষা বোর্ড

বঙ্গের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ও তাহাদের কর্তৃত্বের ভার, এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সরকারী শিক্ষা-বিভাগের উপর নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয় ও পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ এবং পরীক্ষা গ্রহণের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আছে। সরকারী স্কুল-পরিদর্শকের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া কোন স্কুলকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অধিকার দেওয়া না। দেওয়ার ক্ষমতাও এপর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই আছে। উপরের দুটি ক্লাস ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর বিধাতা সরকারী শিক্ষাবিভাগ, এইরূপই মনে হয়। এখন গবর্ন্মেণ্ট স্কুলগুলির সব শ্রেণীর সব ব্যাপারে ভার দিতে চান একটি সেকেণ্ডারী এডুকেশ্যন (মধ্যশিক্ষা) বোর্ডের উপর। ইহার বিলের মুসাবিদাও হইয়া গিয়াছে। নানা তর্ক-বিতর্কের পর সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এই মুসাবিদা গ্রহণ করিয়াছেন। বেশী মতভেদ হইয়াছে একটি বিষয় লইয়া। সরকার পক্ষ বলিতেছেন, বোর্ডের যে-সব স্কুল-পরিদর্শক ও আফিসের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিব আমরা। বেসরকারী পক্ষ বলিতেছেন, তাহা কেন হইবে? বোর্ডই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন, এবং সেইরূপই যে হইবে, সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে এই রফা হয়, যে, বোর্ড গঠিত হইবার পরবর্ত্তী প্রথম দুই বৎসর বা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা যে কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন ততকাল সরকার ঐ লোকগুলিকে নিযুক্ত করিবেন, তাহার পর বোর্ড করিবেন। আমাদের বিবেচনায় রফাটা এরূপ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হওয়া ভাল হয় নাই। দুই বৎসর বা জোর পাঁচ বৎসর পরে বোর্ড নিয়োগকর্ত্তা হইবেন, এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভাল হইত।

সর্ব্বশেষে, সমুদয় জিনিষটি ভোটে দেওয়ার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন অনুসারে প্রতিবাদ করেন।

—

রাণা প্রতাপ জয়ন্তী

চিতোরের মহারাণা প্রতাপ সিংহের হিন্দী জীবনচরিত-লেখক মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয়ের মতে তাঁহার জন্মদিন ৬ই মে। তদনুসারে ঐ তারিখে প্রতাপ জয়ন্তী হওয়া উচিত ছিল। অন্য, কম প্রামাণিক, মতে তাঁহার জন্মদিন জুন মাসে। তখন নানাস্থানে তাঁহার জন্মোৎসব হইবে।

মহারাণা প্রতাপ সিংহের ছত্রী

প্রতাপ সিংহের বীরত্ব, স্বদেশ-প্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং দেশের সম্মান ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিবার কাহিনী শতবার সহস্রবার গীত হইলেও পুরাতন হইবে না। তাঁহার সমসাময়িক সম্রাট আকবরের চেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাট সেকালে পৃথিবীতে কেহ ছিল না। ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের রাজা হইয়াও তিনি আকবরের সহিত আমরণ যুদ্ধ করিতে ভয় পান নাই—মানুষের মনের তেজ এমনই অজেয়। যুদ্ধদ্বারা রাজপুত জাতির রাষ্ট্রীয় পরাভব ঘটান ছাড়া আকবর মোগল বাদশাহ ও ওমরাদের সহিত রাজপুত-মহিলাদের বিবাহ দিয়া রাজপুত জাতির সামাজিক পরাজয় সাধনও করিতে চাহিয়াছিলেন। রাণা প্রতাপ কোনদিকেই হার মানেন নাই। এরূপ বীরের মহত্ত্ব বুঝিবার শক্তি আকবরের ছিল।

ওঝা মহাশয়ের লিখিত প্রতাপ-চরিতে লিখিত আছে, রাণা প্রতাপের মৃত্যু-সংবাদ আকবরের দরবারে পৌঁছিলে বাদশাহ নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন এবং তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখা দিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার দরবারীরা বিস্মিত

হইলেন—তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, রাণার মৃত্যু-সংবাদে বাদশাহ উৎফুল্ল হইবেন। তখন দরবারে দুরসা আঢ়া নামক একজন রাজপুত চারণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ছয় পংক্তি কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই :

"হে গুহিলোট রাণা প্রতাপ, তোমার মৃত্যুতে বাদশাহ দাঁতে জীভ কাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও অশ্রুপাত করিলেন। কারণ, তোমার ঘোড়ার গায়ে তুমি কখনও বাদশাহের ছাপ* দাগিয়া দিতে দাও নাই, তুমি কাহারও কাছে তোমার পাগড়ী ঝুঁকাও নাই, বাদশাহী নওরোজে কখনও হাজরী দাও নাই, বাদশাহের প্রাসাদে কখনও যাও নাই, তাঁহার দর্শনলাভের জন্য তাঁহার ঝরোকার (জানালার) নীচে কখনও দণ্ডায়মান থাক নাই। তুমি সকল লোককে তোমার গুণগৌরব গাওয়াইয়াছ, এবং তোমার রাজ্যভার বাম স্কন্ধে (অর্থাৎ অনায়াসেই) বহন করিয়াছ। অতএব সকল দিকেই তোমার জয় হইয়াছে।"

এই কবিতা শুনিয়া বাদশাহের পারিষদেরা ভাবিল তিনি চারণের উপর নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইবেন। কিন্তু, তাহার বিপরীতই ঘটিল ;—আকবর চারণকে পুরস্কার দিলেন এবং বলিলেন, "এই কবি আমার মনের ভাব ঠিক্ বুঝিয়াছেন।"

সেকালে হিন্দু প্রতাপ সিংহকে মুসলমান মোগলের সহিত স্বাধীনতার জন্য লড়িতে হইয়াছিল। এখন হিন্দু মুসলমান উভয়েই তৃতীয় পক্ষ বিদেশী জাতির পদানত। তাহাদিগকে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতাপ সিংহের গুণকীর্ত্তন হিন্দুর পক্ষে সহজ। কিন্তু মুসলমানের পক্ষেও, আকবরের মত, তাঁহার গুণগ্রহণ কঠিন নহে। সেকালে স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা ইংরেজদের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল। স্কচ্ বীরনেতা রবার্ট ব্রুস্ ও উইলিয়ম ওয়ালেসের স্মৃতি-উৎসব স্কচ্‌রা এখনও করিয়া থাকেন এবং তাহাতে ইংরেজরা যোগ দেন। এখন ইংরেজ ও স্কচ্ উভয়েই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মালিক। সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় বা বাণিজ্যিক কোন বিপদ ঘটিলে, বিপদের সম্ভাবনা মাত্র হইলে, উভয় জাতি একযোগে কাজ করেন।

অশ্বপৃষ্ঠে মহারাণা প্রতাপ সিংহ

* পরাজিত ও আশ্রিত রাজাদিগকে তাহাদের নিকৃষ্ট অবস্থা স্মরণ করাইবার জন্য তাহাদের ঘোড়ার গায়ে বাদশাহের ছাপ দাগিয়া দিবার রীতি ছিল।

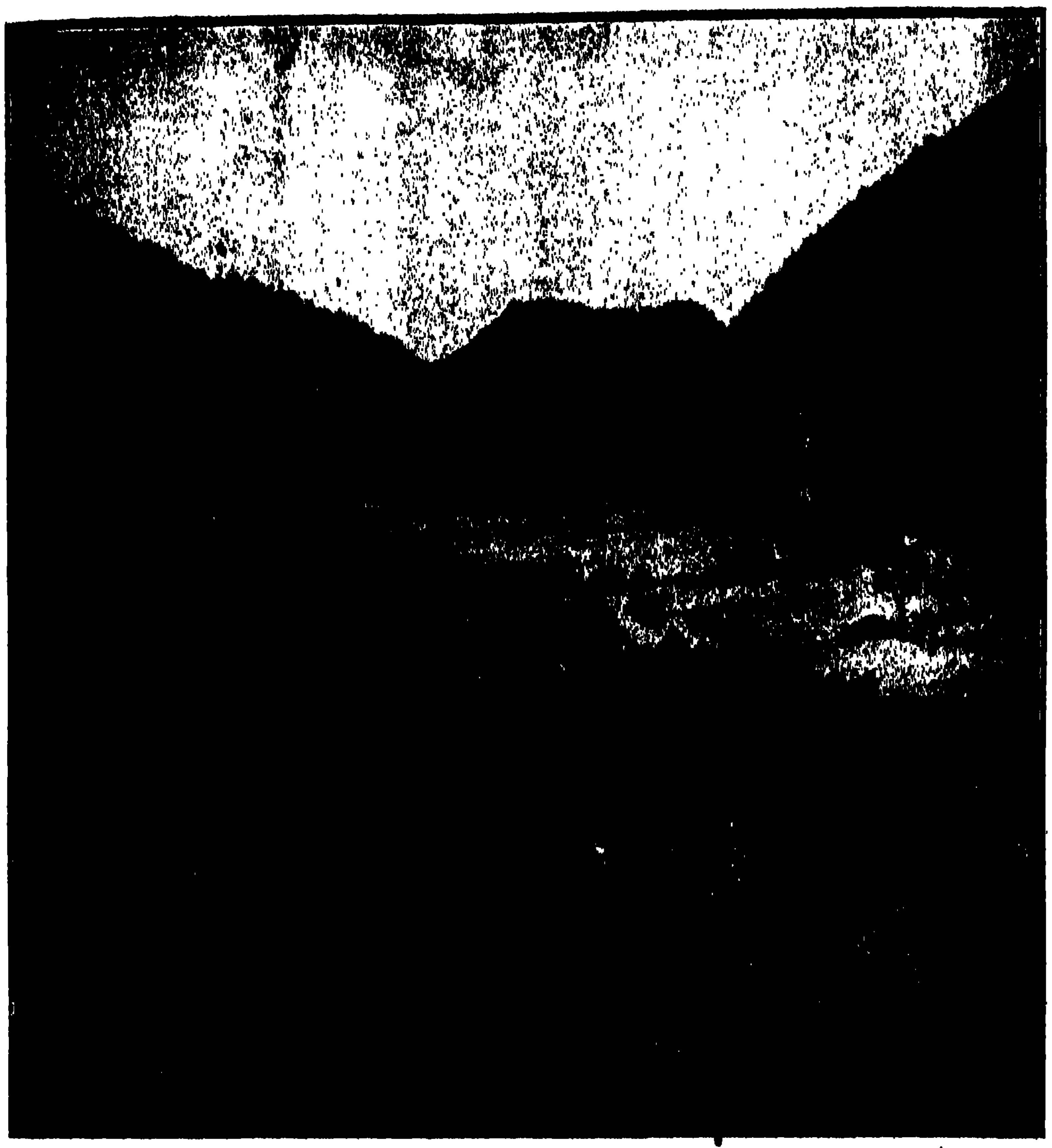

হলদীঘাটের রণক্ষেত্র

বাটলার কমিটির রিপোর্ট

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ভবিষ্যৎ নিরূপণের জন্য যেমন সাইমন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তেমনি দেশী রাজাদের শাসিত ভারতাংশের ভাগ্য বিধানের জন্য বাটলার কমিটি নিযুক্ত হয়। কিন্তু একটু তফাৎ আছে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারত বলিতে বুঝা হইয়াছে এখানকার সমস্ত অধিবাসী; কিন্তু দেশী রাজাদের শাসিত ভারতাংশ বলিতে মানে করা হইয়াছে, কেবল ঐ রাজারা, তথাকার প্রজাবৃন্দের ভবিষ্যৎ ভাবিতে বাটলার কমিটিকে বলা হয় নাই। অথচ আমাদের বিবেচনায় প্রজারাই প্রধান পক্ষ। রাজারাজড়া না থাকিলেও সাধারণতন্ত্র চালাইয়া প্রজারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ধনধান্য-উৎপাদক সর্ব্বকার্য্য-নির্ব্বাহক প্রজারা না থাকিলে রাজাদের বিলোপ হইবে। অতএব দেশী রাজ্যের প্রজাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা বাটলার কমিটির বিবেচ্য বিষয়ে অন্তর্ভূত না করায় গোড়ায় গলদ হইয়াছে। সাইমন কমিশন ভারতের নানা শ্রেণীর লোক বর্জ্জন করিয়াছিল। বাটলার কমিটি সম্বন্ধে ঠিক সেরূপ কিছু না হইলেও তাহার মত কিছু হইয়াছিল। ইংলণ্ডের একজন ব্যারিষ্টার স্যার লেসলি স্কটকে পাটিয়ালার মহারাজা প্রমুখ কতকগুলি রাজা বাটলার কমিটির সামনে আপনাদের মুখপাত্র নিযুক্ত করে। আর বাস্তবিক ঐ লোকটি ইংলণ্ডের রাজা ও ভারত গবর্মেণ্টের সঙ্গে দেশী রাজাদের সম্বন্ধ আইনের চক্ষে যেরূপ বলিয়াছে, বাটলার কমিটিও মোটামুটি তাই বলিয়াছে, এবং বলিবে বলিয়া আগে হইতে অনুমিতও হইয়াছিল। অতএব এই লেসলী স্কটকে এক হিসাবে বাটলার কমিটির অগ্রদূত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাকে হায়দরাবাদ, মহীশূর, বড়োদা প্রভৃতি বড় বড় রাজ্য এবং কোচীন, রামপুর, ও কাটিয়াবাড়ের জুনাগড় প্রভৃতি রাজ্য নিজেদের মুখপাত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

কমিটি প্রায় ৭০০ দেশী রাজ্যের মধ্যে কেবল ১৫টিতে গিয়াছিলেন, ৪৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়াছিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য হইতে তাঁহাদের প্রশ্নাবলীর ৭০টি উত্তর পাইয়াছিলেন। এই উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এক রিপোর্ট বানাইয়াছেন। তাহা আমরা পাই নাই; দৈনিক কাগজে তাহার কিছু তাৎপর্য্য দেখিয়াছি।

কমিটির সিদ্ধান্ত এই, যে, দেশী রাজ্যগুলির সম্পর্ক ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে, ভারত গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গে নয়, এবং ইংলণ্ডের রাজা এই সম্পর্ক ও তজ্জনিত দায়িত্ব নিজে ত্যাগ

করিয়া অন্য কাহারও সঙ্গে ঘটাইতে বা অন্য কাহাকেও দিতে পারেন না। এরূপ সিদ্ধান্তের অভিপ্রায়টা সুস্পষ্ট। যদি সিদ্ধান্ত এরূপ হইত,যে, দেশী রাজ্যগুলির সম্পর্ক ভারত গবর্ন্মেণ্টের সহিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতে যে প্রজাতন্ত্র জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট হওয়া অনিবার্য্য, দেশী রাজ্যগুলিকে তাহারই সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইত, এবং বর্ত্তমান ব্রিটিশ-শাসিত ভারত ও দেশী রাজ্যগুলি একজোট হইয়া একটি শক্তিশালী সম্মিলিত রাষ্ট্র গড়িতে পারিত। কিংবা যদি সিদ্ধান্ত এইরূপই হইত, যে, ইংলণ্ডের রাজার নিজের সহিত সম্পর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ভবিষ্যৎ জাতীয় ভারত গবর্ন্মেণ্টের সহিত ঘটাইবার ও তাহাকে দিবার ক্ষমতা আছে, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত সম্মিলিত শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু ইংরেজ জাতি ও গবর্ন্মেণ্ট চিরকাল ভারতবর্ষকে দুর্ব্বল ও শোষণীয় রাখিতে চায়, এবং সেইজন্য ভারতবর্ষের দুই অংশের সম্মিলনে একটা স্থায়ী প্রবল বাধা খাড়া রাখিতে চায়।

পাটিয়ালার মহারাজাপ্রমুখ কতকগুলা রাজাও ইংরেজ জাতির ও ইংরেজরাজের সহিত সম্পর্কই চাহিয়াছিল। তাহার মানেটা যে কি, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকিলে এখন তাহারা তাহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের সুবুদ্ধি হওয়া দুর্ঘট। কেন-না, তাহাদের বিবেচনায় স্বদেশবাসীর করমর্দ্দন অপেক্ষা শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর বুটলেহন শ্রেয়ঃ।

ভবিষ্যতে জাতীয় ভারত গবর্ন্মেণ্টের সহিত দেশী রাজ্যসমূহের সম্পর্ক ঘটিলে, তাহারা ভারত গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে সমানে সমানে সসম্মান ব্যবহার পাইত। এখন বস্তুতঃ তাহা তাহারা টম ডিক হ্যারী পলিটিকোদের কাছেও পায় না, ভবিষ্যতেও পাইবে না।

স্যার লেসলী স্কটের তর্ক ও বাটলার কমিটির তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত আগে হইতেই নেহরু কমিটির রিপোর্টে খণ্ডিত হইয়াছে। খণ্ডনে অবশ্য বিশেষ কোন লাভ নাই—কেন-না, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। তথাপি বলিলে ক্ষতি নাই, যে, দেশী রাজ্যগুলির সহিত সম্পর্ক প্রথমে হয়, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে, ইংলণ্ডের কোন রাজা বা রাণীর সঙ্গে নহে। পরে কোম্পানীর নিকট হইতে ইংলণ্ডের রাণী ভারতের রাজত্ব গ্রহণ করেন এবং দেশী রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও তজ্জনিত দায়িত্বও গ্রহণ করেন। সুতরাং এই সম্পর্ক ও দায়িত্ব যখন একবার হস্তান্তরিত হইয়াছে, তখন আর একবার কেন যে হইতে পারিবে না তাহার মূলে কোন যুক্তি নাই; আছে স্বার্থজনিত জেদ। তদ্ভিন্ন, ইংলণ্ডের রাজা ত স্বয়ং দেশী রাজাদের সঙ্গে কোন ব্যবহার করেন না, এমন কি ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভাও তাহা করে না। দেশী রাজ্যের সঙ্গে কোন ব্যবহার সচরাচর ভারতসচিব বা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারাল করেন। সুতরাং কার্য্যতঃ দেশী রাজ্যগুলির সহিত সম্পর্ক ভারত গবর্ন্মেণ্টেরই আছে।

বাটলার কমিটি দুই একটা বাজে কারণ দেখাইয়া বলিতেছেন,ভবিষ্যতে রাজাদের সঙ্গে ব্যবহার ইংলণ্ডেশ্বরের পক্ষ হইতে ভারতের বড়লাট করিবেন ভাইসরয় অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিধিরূপে, গবর্ণর জেনারালরূপে নহে। ইহার মানে ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট। গবর্ণর জেনারালকে কিছু করিতে হইলে তাঁহার শাসন-পরিষদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া করিতে হয়, এবং তাহাতে এখনই দুজন ভারতীয় লোক আছেন, ভবিষ্যতে আরও বেশী থাকিতে পারেন। নিগূঢ় রাজনৈতিক ব্যাপার কালা আদমীর গোচর হওয়া ভাল নয়। ভাইসরয়ের সহিত দেশী রাজাদের সম্পর্ক হইলে এরকম কোন মুস্কিল নাই।

বাটলার কমিটি বলিতেছেন, ভবিষ্যতে দেশী রাজ্যে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের তরফ হইতে কাজ করিবার জন্য কর্ম্মচারী বাছাই করা উচিত একাধিক ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে। ইহারও মতলব সহজে অনুমেয়। সিবিল সার্বিসে দেশী লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। সুতরাং পরে তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যতম লোকদিগকে দেশীয় রাজ্যে রাজনৈতিক চাকরী না দেওয়া কঠিন হইবে, অশোভন হইবে। তার চেয়ে, দেশীরাজ্যে রাজনৈতিক কাজ করিবার নিমিত্ত বিলাত হইতে খাস্ আমদানী ইংরেজ নিযুক্ত করা ভাল।

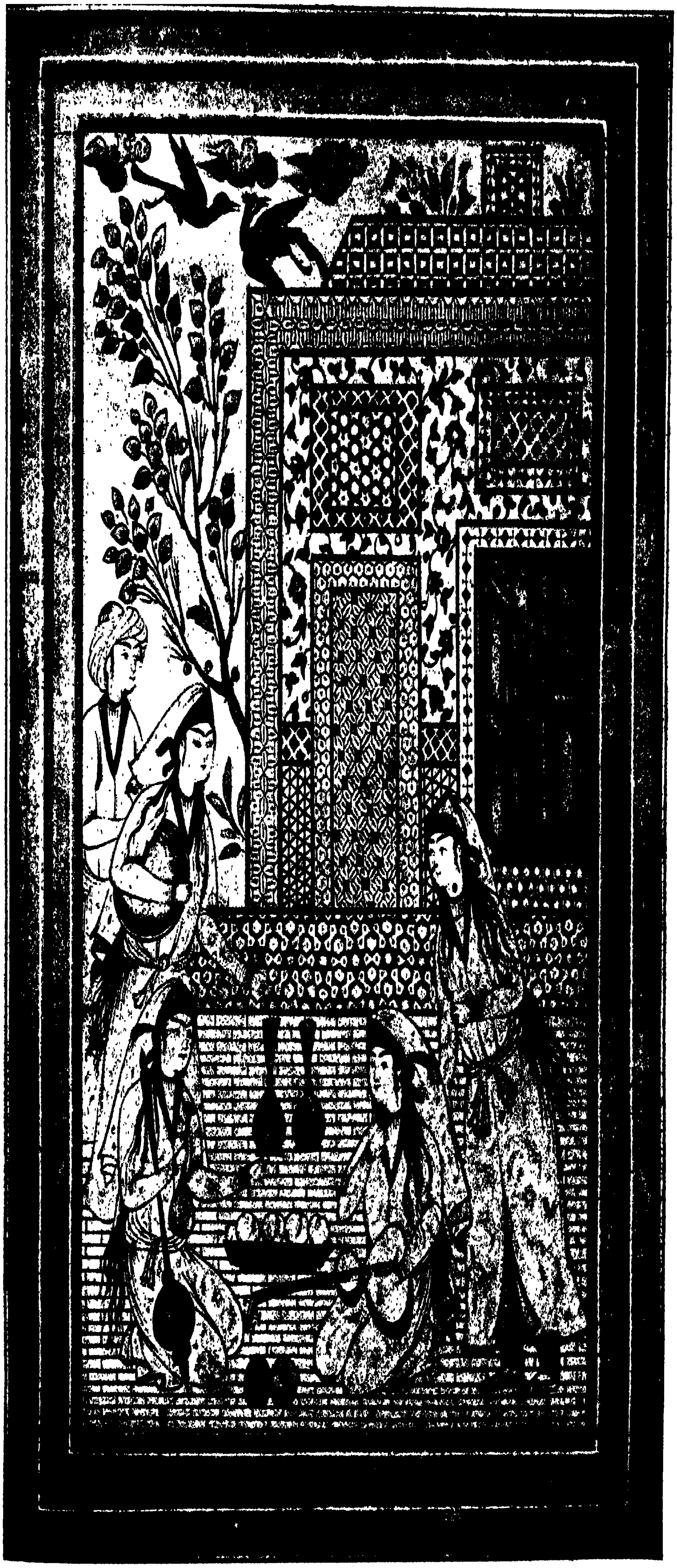

জেনানা মজলিশ

প্রাচীন পারসীক চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩৬

৩য় সংখ্যা

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিধাতা যদি প্রসন্ন হয়ে আমাদের বর দিতে আসেন তবে তাঁর কাছে আমাদের একটি বর চাইবার আছে—আমি কী চাইব এবং কেমন ক'রে চাইব সেটি আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাও। আমার যে সত্যিকারের চাওয়া সেইটি আমায় দান করে যাও, তারপরে পাওয়া, সে আমার শক্তিতেই হবে। অমনি আমি কিছু নেব না—আমার চাওয়ার রাস্তাতেই ত তুমি আমাকে দাও, নইলে ত আমি পাব না। তাই আমাদের প্রথম চাওয়া হচ্ছে—আমাকে চাইতে শেখাও।

মানুষে জন্তুতে অনেক মিল রয়েছে—দৈহিক জীবন-যাত্রায় মানুষে জন্তুতে প্রভেদ অল্পই। কিন্তু মানুষে কী চায়, আর জন্তু কী চায়, এইখানেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জন্তু যতই বুদ্ধিমান হোক্ না কেন মানুষ যে সবার চেয়ে বড়ো ক'রে কী কামনা করে তা সে কল্পনাও করতে পারে না। আমাদের মধ্যে সেই যে বড়ো চাওয়াটা আছে, সেইটিই অভিভূত হয়ে থাকে। আমরা যেখানে ছোট, জন্তুর তুল্য, তারই কান্না যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন আমাদের সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে কেটে যায়। মানুষ এই যে সবার চেয়ে বড়োকে চাইবার মহৎ অধিকার পেয়েছে এই তার সম্পৎ—এটার মধ্যে তার সত্যকার আত্মপরিচয় এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে কেবলমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই সে তার মুক্তিকে অনুভব করে। এই যে পঞ্চভূতে সে বর্ত্তমান রয়েছে, এটা ত তার বাইরের আশ্রয় মাত্র। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার সত্যতা দ্বারা সে অনুভব করতে পারে যে, না, এখানেও কুললো না—এই যে সংসার যেখানে আমরা গাছপালা জীবজন্তুর সরিক হয়ে রয়েছি এখানেও তাকে ধরল না। যদি এই বড়ো আকাঙ্ক্ষাটা ম্লান হয়ে যায় তবে ত অনুভব করতে পারিনে যে আমরা অমৃতলোকের অধিকারী। আপনার মধ্যে চিরন্তনকে জানতে পারলুম না ব'লে রিপুর দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে মরছি এইখানেই ত আমাদের মহতী বিনষ্টি—সংসারের বিভ্রান্তিবশে আমাদের এই চিরদিনের পথের সহায়টিকে যদি অশ্রদ্ধা করি তবে ত অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারব না। তার বদলে যা পেলুম ধনে মানে তা যতই উচ্চ হোক না কেন মৃত্যু যে তার চূড়ায় ব'সে উপহাস করছে। সেখানে, যে

মৃত্যুর অধিকার। যদি দেখি মানুষ সেখানেই তার অধিকার খুঁজে মরছে তবে বুঝ্‌ব তার আত্মাকে সে চাপা দিয়েছে। তাহলে সে বাঁচবে কিসে—অমৃতের অধিকারী যে প্রাণ তাকে মানুষ খোয়ালো—জন্তুর গতিকে সে পেল। জন্তু জানে না যে অমৃতেই তার শেষ লক্ষ্য, আনন্দ, তৃপ্তি। মানুষের গভীরতম অন্তরে আছে সেই আকাঙ্ক্ষা।

যখন প্রশ্ন এল—সত্য, না উপকরণ? স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে সহজেই উত্তর এল—না, এই যে উপকরণগত জীবন, এ ত তুচ্ছ। এই যে সহজ কথাটি, একে সহজে অনুভব করার সুযোগ মানুষের সব সময়ে আসে না। ব্যথা যখন আসে তখন তারই মধ্য দিয়ে, আমাদের মনে বেজে ওঠে চাইনে, চাইনে, এ নিয়ে আমার কিছু হবে না। বস্তুর মতো সংখ্যা দিয়ে বোঝাবার জিনিষ যা নয়, সেই সত্যকে চাই, অন্তরে থেকে তা অন্তরকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে, মুক্তি দেয়। উপনিষদে বলেছে, মা গৃধঃ—ছোটোকে চেয়ো না, এইখানেই ত বন্ধন। কাড়াকাড়ি ক'রে যা নিতে হয়, যে ধন নিলে অন্যের ভাগে কম প'ড়ে যায়—তাতে লোভ কোরো না। বলেছে, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।—অনন্ত যিনি, মহৎ যিনি, তিনি আপনাকে দান করেছেন, তার মধ্যেই ত পূর্ণতা, ঘরবাড়ি গোরু-বাছুরের মধ্যে ত পূর্ণতা নেই। সেই আনন্দ আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে যখন আমাদের ছোট চাওয়াগুলি দূরে যাবে। যেমন বৃহৎ বনস্পতির বীজ জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে অঙ্কুরিত হতে পারে না, কিন্তু সেই জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে দাও, তা সতেজে বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে। সেই বড় চাওয়া তেমনি কখনো মরতে পারে না, সে যে বৃহৎকে চায়, ভূমাকে চায়। ভূমৈব সুখম্—ভূমাকে ছাড়া ত সুখ নেই। ভূমৈব দুঃখঞ্চ—সেই ভূমার সাধনায় দুঃখ আছে। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেই সুখ যে নিহিত রয়েছে। অল্পেতে আরাম হতে পারে—কিন্তু তৃপ্তি হতে পারে না, সুখ হতে পারে না। যে সব জাতি জগতে বড়ো হয়েছে, তা'রা আকাঙ্ক্ষায় বড়ো, সাধনায় বড়ো। আমাদের গ্রামের লোক প্রতিদিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে চলেছে, মধ্যাহ্নে দিবানিদ্রা, বৈকালে পরনিন্দা এই নিয়ে তার আরাম অভ্যাসের চক্রে সে আবর্ত্তিত। আরামে আছে কেন না তার কোনো চেষ্টা নেই। সাধনা নেই, মানবলোকে তার প্রতিষ্ঠা নেই, মহতী বিনষ্টির ছায়ায় সে গতিহীন জীবনকে পলে পলে ব্যর্থ করছে। বড়োকে চাইবার অধিকার সে দাবি করলে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা ভূমাকে তপস্যা করলেন, কর্ম্মের ক্ষেত্রে যাঁরা ভূমাকে সাধনা করলেন, মুক্তি পেলেন তাঁরা। তাঁরা বড়ো চাওয়াকেই স্বীকার করেছেন, তার দাম দিচ্ছেন, তাই এঁরা বড়ো হয়েছেন। ঈর্ষ্যা ক'রে কী হবে? আত্মার ধর্ম্মকে স্বীকার ক'রে এঁরা আত্মাকে জয় করেছেন। আত্মাকে অস্বীকার ক'রে, ছোট চাওয়াকে বড়ো ক'রে তুলে, ম্লান জীবন যাপন ক'রে যদি আমরা বলি আমরাও ঐ রকম প্রভুত্ব করব, তা ত হয় না। বাইরে থেকে দিলেও ত আমরা পাব না। যে-জাত চাইতে শিখল না, যে শুধু কোলাহল অভিমান ঈর্ষ্যাই করে, তপস্যা করে না, সে ত পাবে না। যেটা না চাইবার তাকে অবজ্ঞা করতে হবে। এতে দুঃখ আছে—কিন্তু সব দুঃখ পূর্ণ হয়ে যায় বড়ো চাওয়ার আনন্দে। এইটেই মানবের সব চেয়ে বড়ো আত্মপরিচয় যে সে ছোটকে চায় না, সে চায় দেহের চেয়ে মনের চেয়ে যা বড়ো, মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে যা বিরাজ করছে।

অগ্নিগৃহে যেমন অগ্নি রক্ষা করা হত তেমনি সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু প্রবাহ শোক অপমান সবার মধ্যে অন্তরে নির্ব্বাণহীন শুভ্র অগ্নিশিখাকে রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে। মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের জ্যোতির্ম্ময় শিখা হতে আমাদের দীপ যদি জ্বালিয়ে নিতে পারি তবেই আমরা ধন্য হব। সেই সাধনা সেই ইচ্ছাকে যেন নিজের মধ্যে জাগ্রত করে রাখতে পারি আজকে এইটিই আমাদের স্মরণ করবার কথা। চাইতে শিখি যেন, আমাদের চাওয়া যেন সমস্ত অন্তরকে উদ্বোধিত করে তোলে। সত্যকে পেলে এখনো ত আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যেই লোভক্ষোভের দ্বন্দ্ব হ'তে উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারি—খণ্ড খণ্ড আকারে আমাদের সেই পাওয়া যেন অখণ্ডরূপে আমরা পেতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা।

শিবাজী ও মুঘল-শক্তির সংঘর্ষ

শ্রীযদুনাথ সরকার

(১)

আফজল খাঁর মৃত্যু এবং তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইবার পর (১০ই নবেম্বর ১৬৫৯), শিবাজী দক্ষিণে কোলাপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া দেশ লুটিতে লাগিলেন। ২৮এ নবেম্বর তিনি পন্‌হালা নামক বিশাল গিরিদুর্গ অধিকার করিলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য স্থানীয় শাসনকর্তা রুস্তম-ই-জমান বিজাপুররাজের আদেশে অগ্রসর হইলেন; আফজলের পুত্র ফজল খাঁ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রুস্তমের সহিত সসৈন্যে মিলিত হইলেন। কিন্তু রুস্তম জানিতেন, বিজাপুরের কর্ত্রী রাণী বড়ি সাহিবা গোপনে তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টায় আছেন, এ অবস্থায় আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় শিবাজীর সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা;—বিশেষতঃ শিবাজীর বংশের সহিত তাঁহার দুই পুরুষ ধরিয়া বন্ধুত্ব। সুতরাং রুস্তম শিবাজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, শুধু লোক দেখাইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। কোলাপুর শহর হইতে কিছু দূরে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হইল। রুস্তম গা ঢিলা দিয়া পিছনে থাকিলেন; ক্রুদ্ধ ফজল খাঁ যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর লইয়া প্রবল বেগে মারাঠাদের আক্রমণ করিলেন (২৮এ ডিসেম্বর)। তাঁহার অনেক লোক যুদ্ধে মারা গেল, দু'হাজার ঘোড়া ও বারোটি হাতী ধরা পড়িল; পরাস্ত হইয়া ফজল খাঁ ম্লানমুখে বিজাপুরে ফিরিলেন। আর রুস্তম পিছু হটিয়া নিজ জাগীর দক্ষিণ-কানাড়ায় গিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

এই সুযোগে মারাঠারা সহ্যাদ্রি পার হইয়া পশ্চিম দিকে রত্নগিরি জেলায় ঢুকিয়া অবাধে দক্ষিণ-কোঙ্কনের শহর ও বন্দর লুটিতে লাগিল। তাহাদের আর একদল পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিজাপুর শহরের কাছাকাছি পৌঁছিল।

তখন আদিল শাহ্‌র চৈতন্য হইল—তিনি শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সিদ্দি জৌহর নামক একজন হাব্‌শী ওম্‌রাকে 'সলাবৎ খাঁ' উপাধি দিয়া ফজল খাঁর সহিত পনহালা দুর্গ দখল করিতে পাঠানো হইল। পনের হাজার সৈন্যসহ জৌহর আসিয়া কোলাপুর শহরে আড্ডা গাড়িলেন এবং শিবাজীকে পনহালাতে অবরুদ্ধ করিলেন (২রা মার্চ্চ, ১৬৬০)। কিন্তু তাঁহার মনে ছিল দুরভিসন্ধি। প্রভুর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া, তিনি নিজের জন্য স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। চতুর মারাঠা-রাজ ভবিষ্যতে সহায়তা করিবার লোভ দেখাইয়া জৌহরকে হাত করিলেন। লোক দেখাইবার ছলে ছয় মাস ধরিয়া ধীরে ধীরে ঐ দুর্গের অবরোধ-কার্য্য চলিতে লাগিল।

কিন্তু ফজল খাঁ ভুলিবার পাত্র ন'ন। প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি নিজ সৈন্যদল লইয়া ক্রমাগত মারাঠাদের আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পনহালার পাশেই পবনগড় দুর্গ। নিকটস্থ একটি গিরিশৃঙ্গে কামান বসাইয়া ফজল খাঁ পবনগড়ের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পবনগড় রক্ষা করা দুর্ঘট হইল, কিন্তু একবার ইহা বিজাপুরীদের হাতে পড়িলে পনহালার পতনও অবশ্যম্ভাবী।

(২)

শিবাজী দেখিলেন অবস্থা সাংঘাতিক, তিনি ফাঁদে পড়িয়াছেন, পলায়নের পথ রুদ্ধ। ১৩ই জুলাই, আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদের রাত্রে পনহালায় কিছু সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট লোকজন-সমেত তিনি দুর্গ হইতে গোপনে নামিলেন, পবনগড়ের সম্মুখস্থ বিজাপুরী শিবির আক্রমণ করিলেন, এবং সেই গোলমালের সুযোগে বিশালগড় দুর্গের দিকে পলাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু বিশালগড় ২১ মাইল দূরে, পথও অতি দুর্গম, উচুনীচু, পাথর-ছড়ান এবং সঙ্কীর্ণ। পরদিন প্রভাত-কিরণে দেখা গেল যে তথায় পৌঁছিতে আরও আট মাইল পথ বাকি আছে। এদিকে রাত্রেই শিবাজীর পলায়নের সংবাদ এবং তাঁহার পথের ঠিক সন্ধান পাইয়া ফজল খাঁ মাহতাব্ আলাইয়া তাঁহার পিছু পিছু আসিয়াছেন। এখন দিনের আলোতে অসংখ্য শত্রুসেনা মারাঠাদের পিষিয়া মারিবে।

এই মহাবিপদে বাজীপ্রভু নামক কায়স্থ-জাতীয় মাব্‌লে জমিদার নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া শিবাজীকে রক্ষা করিলেন। গজপুরের নিকট পথটি অতি সঙ্কীর্ণ, দুদিকেই উঁচু পাহাড় উঠিয়াছে। বাজীপ্রভু বলিলেন, "মহারাজ! আমি অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া এই স্থানটিতে মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শত্রুসেনাকে দাবাইয়া রাখি। আপনি সেই সুযোগে অবশিষ্ট রক্ষী লইয়া বিশালগড়ে দ্রুত প্রস্থান করুন। তথায় নিরাপদে পৌঁছিলে তোপের আওয়াজ করিয়া আমাকে সে সুসংবাদ দিবেন।"

গজপুরের গিরিসঙ্কট মারাঠা-ইতিহাসের থার্মোপিলি। সকাল হইতে পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বারে বারে বিজাপুরী সৈন্যদল বন্যার মত আসিয়া সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর মুষ্টিমেয় মারাঠারা প্রাণপণে লড়িয়া তাহাদের হটাইয়া দিতেছে। সাত শত মারাঠা-সৈন্য সেখানে প্রাণ দিল, বাজীপ্রভুও মরণাহত হইয়া রণক্ষেত্রে শয্যা বিছাইলেন, তবুও যুদ্ধের বিরাম নাই। প্রায় দ্বিপ্রহরকালে পশ্চাতে আট মাইল দূর হইতে তোপধ্বনি শুনা গেল। শিবাজী বিশালগড়ে আশ্রয় পাইয়াছেন। বাজীপ্রভু প্রাণ দিয়া পণ রক্ষা করিলেন। তখন বিজাপুর-পক্ষের কর্ণাটকী বন্দুকচীরা গুলির পর গুলি চালাইয়া গিরিসঙ্কট জয় করিল, অবশিষ্ট মাব্‌লেরা মৃত সেনানীর দেহ লইয়া পাহাড়ে পলাইয়া গেল।

সুলতান আলী আদিল শাহ জৌহরের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া "দুই বিদ্রোহীকেই" দমন করিবার জন্য স্বয়ং রাজধানী হইতে পনহালার দিকে অগ্রসর হইলেন। জৌহর দেখিলেন আর ত ফাঁকি দেওয়া চলে না; তিনি ২২এ সেপ্টেম্বর মারাঠাদের হাত হইতে পনহালা দুর্গ ফিরাইয়া লইয়া সুলতানকে অর্পণ করিলেন।

(৩)

যখন শিবাজীর রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁহার এই পরাজয় ও ক্ষতি হইতেছিল, ঠিক সেই সময় উত্তর সীমানায় আর এক মহা বিপদ ঘটিল। ১৫ই আগষ্ট ১৬৬০ মুঘলেরা তাঁহার হাত হইতে বিখ্যাত চাকন দুর্গ কাড়িয়া লইল।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আওরংজীবের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল, ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণের আর কোন ভয় রহিল না, কারণ সর্ব্বত্রই তাঁহার জয় হইয়াছে। এইবার তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার অবকাশ পাইলেন। নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন।

শায়েস্তা খাঁ যেমন বুদ্ধিমান তেমনি বীর; নেতৃত্বে ও দেশ-শাসনে সমান দক্ষ; বহু যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ধনে-মানে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এক মীরজুমলা ভিন্ন কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি অতি চতুর প্রণালীতে আহমদনগর হইতে (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৬৬০) কুচ করিয়া পুণা জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক ঘুরিয়া, সম্মুখ হইতে মারাঠাদের ক্রমাগত তাড়াইয়া, এবং নিজের পশ্চাতের পথ নিরাপদ রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে থানা বসাইয়া, অবশেষে পুণা শহরে আসিয়া পৌঁছিলেন (৯ই মে)। পথে তাঁহার কোন সৈন্য ক্ষয় হয় নাই বলিলেই চলে; মারাঠারা ভয়ে পিছাইয়া গেল, আর যদি বা যুদ্ধ করিল এমন সুনিপুণভাবে চালিত সৈন্যদলের সামনে দাঁড়াইতে পারিল না।

পুনার ১৮ মাইল উত্তরে চাকন দুর্গ। ইহা হস্তগত করিতে পারিলে মুঘলরাজ্য হইতে দক্ষিণমুখী পথ দিয়া অতি সহজে পুণায় রসদ আনা সম্ভব হইবে। শায়েস্তা খাঁ ২১এ জুন চাকনের বাহিরে পৌঁছিয়া দুর্গ-অবরোধ শুরু করিলেন। দুর্গস্বামী ফিরঙ্গজী নরসালা প্রাণপণে লড়িলেন। কিন্তু মুঘলেরা আজ অপরাজেয়। জলকাদা অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা দুর্গের চারিদিক খুঁড়িয়া মূর্চা বাঁধিতে

লাগিল, মাটির নীচ দিয়া একটি সুরঙ্গ করিয়া তাহাতে বারুদ ভরিয়া পলিতায় আগুন দিল (১৫ই আগষ্ট)। সশব্দে চাকন দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের বুরুজ উড়িয়া গেল। আর সেই সুযোগে মুঘলেরা দুর্গ-প্রাকার আক্রমণ করিয়া, দুই দিন ধরিয়া মারামারি কাটাকাটির পর সমস্ত চাকন অধিকার করিল (১৫ই আগষ্ট)। শায়েস্তা খাঁ নিজে বীর, কাজেই বীরের আদর করিতে জানিতেন। তিনি ফিরঙ্গজীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাদশাহী সৈন্যদলে উচ্চপদ দিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত মারাঠা নিমকহারাম হইতে অস্বীকার করিলেন। তখন তাঁহাকে সসম্মানে সৈন্যসহ শিবাজীর নিকট ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইল।

(৪)

প্রায় দু'মাস ধরিয়া অবিরাম পরিশ্রমের পর চাকন অধিকার করিতে মুঘলদের ২৬৮জন সৈন্য হত ও ৬০০জন আহত হয়। সুতরাং ইহার পর তাহারা আর মারাঠী দুর্গ আক্রমণ করিতে একেবারেই ইচ্ছুক হইল না। শায়েস্তা খাঁ শীঘ্রই পুণায় ফিরিয়া আসিয়া ছাউনী করিলেন।

১৬৬১ সালের প্রথমে তিনি উত্তর-কোঁকন অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ইহাদের নেতা— চার হাজারী মনসবদার কার্‌তলব্ খাঁ উজবক্ যখন উম্বরখিণ্ড নামক স্থানে পথহীন পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে তোপ মালপত্র ও রসদ লইয়া বিব্রত, শিবাজী সেই সময় দ্রুতবেগে গুপ্তপথে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিলেন, এবং জলাশয়ে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। খাঁ তখন শিবির ও সম্পত্তি সমস্তই শিবাজীকে সমর্পণ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা লইয়া সৈন্যসহ ফিরিয়া আসিলেন (৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৬৬১)।

পনহালা ও চাকন হারাইয়া যে ক্ষতি হইয়াছিল, বিজয়ী শিবাজী এখন তাহা পূরণ করিবার জন্য দক্ষিণ-কোঁকনে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি নেতাজী পালকরের অধীনে একদল মারাঠা মুঘলদিগের বিরুদ্ধে মোতায়েন রহিল। অপর দলের সাহায্যে শিবাজী স্বয়ং বিজাপুরের অধীন দক্ষিণ-কোঁকন (বর্ত্তমান রত্নগিরি জেলা) অধিকার করিলেন। সেখানে শুধু খণ্ডরাজ্যের পর খণ্ডরাজ্য; এমন কোন একজন প্রবল প্রতাপশালী প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা ছিল না যে শিবাজীর গতি রোধ করিতে পারে। শিবাজী এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন যে অনেক স্থানীয় রাজা জমিদার আত্মরক্ষার আয়োজনের অবসর পাইল না,—তাড়াতাড়ি সব ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। আর-সকলে কর দিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

এইরূপে জাঞ্জিরা হইতে খারেপটন পর্য্যন্ত পশ্চিম-সমুদ্রের কূলবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল তাঁহার হাতে পড়িল। সর্ব্বত্রই তাঁহার পক্ষ হইতে লুটপাট অথবা চৌথ আদায় চলিতে লাগিল। এই প্রদেশটি তীর্থবহুল, তাহার মধ্যে পরশুরাম-ক্ষেত্র অতি বিখ্যাত তীর্থ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাত্রীরা এখানে তীর্থ-পর্য্যটনে আসে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাসই এখানে অধিক। শিবাজীর সৈন্যগণের দ্রুত গতি, অজেয় শক্তি, লুটপাট এবং কঠোর পীড়নের সংবাদে ভদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার, গরিব গৃহস্থ ও প্রজা সকলেই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। চাষবাস বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইল। তখন শিবাজী তীর্থক্ষেত্রে গিয়া পূজা করিলেন, ব্রাহ্মণদের অনেক দান করিলেন, এবং প্রজাদের আশ্বাস দিয়া নিজ নিজ গৃহে ও কার্য্যে ফিরাইয়া আনিলেন। এই নূতন শাসন-স্থাপনে সাহায্য পাইবার আশায় শিবাজী শৃঙ্গারপুর-রাজ্য অধিকার করিবার পর তথাকার প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী (এবং কার্য্যতঃ সর্ব্বেসর্ব্বা) পিলাজী শির্কেকে অর্থ ও ক্ষমতা দিয়া সপক্ষে আনিলেন, এমন কি তাঁহার সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধও স্থাপন করিলেন। এইরূপে পালীবন ও শৃঙ্গারপুর রাজ্য এবং দাভোল, সঙ্গমেশ্বর, রাজাপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী শহর বন্দর স্থায়িভাবে শিবাজীর হাতে আসিল। ঐ প্রদেশের অন্যান্য অগণিত নগর হইতে চৌথ আদায় হইল।

কিন্তু যে মাসে মুঘলেরা উত্তর-কোঁকনে কল্যাণ শহর (রাজধানী) অধিকার করিল এবং তাহা নয় বৎসর পর্য্যন্ত নিজের দখলে রাখিল। ইহার পর প্রায় দুই বৎসর কাল (মে ১৬৬১—মার্চ্চ ১৬৬৩) মুঘল-মারাঠা যুদ্ধ মন্দবেগে চলিতে লাগিল, কোনপক্ষেই বিশেষ কোন কীর্ত্তি অথবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর জয়-পরাজয় হইল না। দ্রুতগামী

মারাঠা-অশ্বারোহিগণ মাঝে মাঝে মুঘল-রাজ্য লুঠ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু মোটের উপর মুঘলেরা নিজ অধিকার বজায় রাখিতে এবং কখন কখন পাল্‌টিয়া মারাঠা গ্রামের উপর চড়াও হইতে সমর্থ হইল।

কিন্তু ইহার পরেই শিবাজী এমন একটি কাণ্ড করিলেন যাহাতে মুঘল-রাজদরবারে হাহাকার উঠিল এবং তাঁহার যাদুবিদ্যার খ্যাতি ও অমানুষিক ক্ষমতার আতঙ্ক সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি রাত্রে শায়েস্তা খাঁর অগণিত সৈন্য-বেষ্টিত তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া খুন-জখম করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন (৫ই এপ্রিল, ১৬৬৩)।

(৫)

চাকন দুর্গ জয় করিবার পর শায়েস্তা খাঁ পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তাঁহার বাসগৃহ হইল শিবাজীর বাল্যকালের আবাস "লালমহল"। তাহার চারিদিকে তাঁবু খাটাইয়া এবং কানাৎ, অর্থাৎ পর্দ্দার বেড়া, দিয়া পরিবারবর্গ ও চাকর-বাকরের থাকিবার স্থান করা হইল। রক্ষিগণের ঘর তাহার নিকটেই। সৈন্য-সামন্তেরা পুণা গ্রামের নানা অংশে আশ্রয় লইল। কিছু দূরে দক্ষিণে সিংহগড়ে যাইবার পথের ধারে শায়েস্তা খাঁর সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী মহারাজা যশোবন্ত সিংহ দশ হাজার সৈন্য লইয়া আড্ডা গাড়িলেন।

এমন সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিতে হইলে অত্যন্ত সাহস বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন। শিবাজী যে পূর্ণমাত্রায় এই-সকল গুণের অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার পাকা বন্দোবস্ত হইতে বেশ বুঝা যায়। এক সহস্র সাহসী রণদক্ষ সেনা নিজের সঙ্গে লইলেন, আর পেশোয়া ও সেনাপতির অধীনে এক এক হাজার করিয়া মাব্‌লে পদাতিক ও অশ্বারোহীর দুইটি দলকে মুঘল-শিবিরের দক্ষিণে ও বামে আধ ক্রোশ দূরে লুকাইয়া রাখিলেন।

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া শিবাজী সিংহগড় হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার সময় পুণার নিকট পৌছিলেন। বাহিরে নিজদলের ছয় শত সৈন্য রাখিয়া, পেশোয়া মোরো পন্ত ও সেনাপতি নেতাজীকে অপর দুইপাশে মোতায়েন করিয়া, অবশিষ্ট চারিশত বীরের সহিত তিনি মুঘল-শিবিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুসলমান প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা?" শিবাজী উত্তর দিলেন, "আমরা বাদশাহের দক্ষিণী সৈন্য, নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকিবার জন্য যাইতেছি।" প্রহরী আর দ্বিরুক্তি করিল না। তাহার পর পুণার এক নির্জ্জন কোণে চুপ করিয়া কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া, সদলে শিবাজী মধ্যরাত্রে শায়েস্তা খাঁর বাসগৃহের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্যকাল হইতেই এখানকার পথঘাট তাঁহার সুপরিচিত।

তখন রমজান মাস। এই মাসে মুসলমানেরা দিবাভাগ উপবাসে কাটাইয়া রাত্রে আহার করে। সারা দিন উপবাসের পর প্রথম রাত্রে গুরু আহার করিয়া নবাবের বাড়ীর সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শুধু জনকয়েক পাচক জাগিয়া—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাইবার খানা রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কোন শব্দ করিবার পূর্ব্বেই মারাঠারা গিয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলিল। এই রান্নাঘরটি বাহিরে, ইহার গায়েই অন্দর-মহলের চাকরদিগের থাকিবার ঘর, মধ্যে একটি দেওয়ালের ব্যবধান। পূর্ব্বে এই দেওয়ালে একটি ছোট দরজা ছিল, শায়েস্তা খাঁ সেই দরজার ফাঁক ইট দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শিবাজীর সঙ্গীরা শাবল্ দিয়া দরজার ইটগুলি খুলিতে লাগিল। সেই শব্দে ওপাশের, অর্থাৎ অন্দর মহলের, চাকরেরা জাগিয়া উঠিল এবং খাঁকে জানাইল যে বোধ হয় চোরে সিঁধ কাটিতেছে। এই সামান্য কারণে নিদ্রার ব্যাঘাত করায় খাঁ চটিয়া, ধমক দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন।

ইট সরাইয়া ক্রমে দেওয়ালের ছিদ্র মানুষ ঢুকিবার মত বড় করা হইল। প্রথমেই শিবাজী নিজে তাঁহার রক্ষী চিম্‌নাজী বাপুজীকে লইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন, পিছু পিছু চলিল তাঁহার দুই শত সৈন্য। বাকি দুইশত বীর বাবাজী বাপুজীর অধীনে ছিদ্রের বাহিরে খাড়া রহিল। তরবারি ও ছোরা দিয়া কানাৎ কাটিয়া পথ করিয়া সদলে শিবাজী তাঁবুর পর তাঁবু পার হইয়া শেষে শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে গিয়া হাজির! তাঁহাদের দেখিয়া অন্দরের স্ত্রীলোকেরা ভয়ে খাঁকে

জাগাইল। কিন্তু খাঁ তরবারি ধরিবার আগেই শিবাজী তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া এক কোপে তাঁহার হাতের আঙুল কাটিয়া দিলেন। এই সময় অন্দরের এক চতুর দাসী বুদ্ধি করিয়া ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিল; মারাঠারা অন্ধকারেই তলোয়ার চালাইতে লাগিল। দু'জন মারাঠা অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া জলের চৌবাচ্চায় পড়িয়া গেল। এই গোলমালের সুযোগে দাসীরা খাঁ-সাহেবকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া ফেলিল। কিন্তু অন্দরমহলে শিবাজীর লোকজন পূরাদমে সংহার-কার্য্য চালাইতে লাগিল, ছয়জন বাঁদী হত এবং আটজন আহত হইল।

এদিকে শিবাজীর অপর দুইশত সঙ্গী বাহিরের রক্ষী-গৃহে ঢুকিয়া নিদ্রিত ও অর্দ্ধনিদ্রিত প্রহরীদের হত্যা করিল, আর বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, "তোরা বুঝি এমনি করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পাহারা দিস্?" তাহার পর নহবতের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "খাঁ-সাহেবের হুকুম, খুব জোরে বাজাও।" তখন জয়ঢাক, তূরী ভেরী ও করতালের শব্দের সহিত মারাঠাদের চীৎকার মিশিয়া এক তাণ্ডব ব্যাপার সৃষ্টি করিল। অন্দর হইতে আর্ত্তনাদ এবং মারাঠাদের হুঙ্কার শুনিয়া মুঘল-সৈন্যগণ বুঝিতে পারিল তাহাদের সেনাপতিকে শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। অমনি চারিদিকে "সাজ সাজ" রব উঠিল।

শায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুল ফৎ সকলের আগে পিতাকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিলেন। কিন্তু একাকী কি করিবেন? তিনিও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। একজন মুঘল-সেনানীর বাসা ছিল অন্দরমহলের পাশেই। মারাঠারা অন্দরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে দেখিয়া, তিনি দড়ি বহিয়া অন্দরের আঙ্গিনায় লাফাইয়া পড়িলেন; শত্রুরা অবিলম্বে তাঁহাকেও হত্যা করিল। এইরূপে শায়েস্তা খাঁর এক পুত্র, ছয়জন বাঁদী ও ৪০ জন রক্ষী হত এবং নিজে, দুই পুত্র ও আটজন বাঁদী আহত হইল। মারাঠাদের পক্ষে শুধু ছয়জন মারা যায় এবং ৪০ জন জখম হয়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এত-সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এদিকে শিবাজী দেখিলেন, শত্রু এখন সজাগ—রণসজ্জা করিতেছে, তাঁহার আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। তিনি নিজ অনুচরদের একত্র করিয়া দ্রুতপদে শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং যশোবন্তের সেনানিবাসের পাশ দিয়া সোজা দক্ষিণে সিংহগড়ে চলিয়া গেলেন। মুঘলেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য সমস্ত শিবিরের মধ্যে অন্ধকারে এদিক-ওদিক বৃথা খুঁজিতে লাগিল। তাহারা স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিল যে মারাঠারা সংখ্যায় অন্ততঃ দশ-বিশ হাজার হইবে।

(৬)

১৬৬৩, ৫ই এপ্রিল তারিখে এই ঘটনা ঘটে। পরদিন প্রাতে সমস্ত মুঘল-কর্ম্মচারীরা সেনাপতির শোকে সমবেদনা জানাইবার জন্য তাঁহার দরবারে সমবেত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে যশোবন্ত সিংহও ছিলেন, তাঁহার অধীনে দশ হাজার সৈন্য এবং তাঁহার শিবির শিবাজীর পথে, অথচ তিনি শত্রুর আসা-যাওয়ার সময় কোন বাধাই দেন নাই এবং পশ্চাদ্ধাবনও করেন নাই। তাঁহার কপট দুঃখের কথাগুলি শুনিয়া শায়েস্তা খাঁ বলিলেন, "আঁ! আপনি বাঁচিয়া আছেন দেখিতেছি! কাল রাত্রে যখন শত্রু আমাকে আক্রমণ করে, আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি তাহাদের বাধা দিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, তবেই তাহারা আমার কাছে পৌঁছিতে পারিয়াছে।"

ফলতঃ দেশের সর্ব্বত্র লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, শিবাজী যশোবন্তের সহিত যুক্তি করিয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন। ইংরাজ-বণিকেরাও এই দুর্নামের কথা লিখিয়া গিয়াছে; কিন্তু শিবাজী নিজের অনুচর-দিগকে বলিতেন, "আমি যশোবন্তের কথায় এ কাজ করি নাই, আমার পরমেশ্বর আমাকে ইহা করাইয়াছেন।"

মহারাষ্ট্রে থাকা মোটেই নিরাপদ নহে দেখিয়া, লজ্জা ও শোকে অভিভূত শায়েস্তা খাঁ আওরঙ্গাবাদে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার অসাবধানতা ও অকর্ম্মণ্যতার ফলেই এই বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া বাদশাহ শাস্তিস্বরূপ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে বাংলায় বদলি করিলেন, কারণ তখন বাংলার

নাম ছিল "ক্লটিপূর্ণ-নয়ক"। বাংলা যাইবার পথে বাদশাহের সহিত দেখা করিতে পর্য্যন্ত শায়েস্তা খাঁকে নিষেধ করা হইল। ১৬৬৪ সালের জানুয়ারির প্রথমে কুমার মুয়াজ্জম্ (শাহ্ আলম) দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া রাজধানী আওরঙ্গাবাদে পৌঁছিলেন এবং শায়েস্তা খাঁ বাংলার দিকে রওনা হইলেন। এই বদলির সুযোগে শিবাজী অবাধে মনের সুখে সুরাট বন্দর লুঠ করিলেন (৬-১০ই জানুয়ারি)।

আপন-পর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২৮)

নদীমাতৃকার শ্যামল ক্ষেত্রগুলির মধ্যস্থলে ছোট দ্বীপের মত গ্রামখানির উপর প্রচুর রৌদ্র-কিরণ ছড়াইয়া পড়িয়া বাঁশঝাড়ে গাছের পাতায় পুকুরের জলে ঝলমল করিতেছিল। গ্রামের পাদমূল ধৌত করিয়া একটি শরৎ-শীর্ণা নদীর ধীর প্রবাহ আঁকিয়া-বাঁকিয়া পূর্ব্বমুখে দৃষ্টির আড়াল হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারি সঙ্গে সঙ্গে ওপারে মাঝিদের গুণটানার সরু পথটি নীলাম্বরীর কুঁচান পাড়ের মতন উঠিয়া নামিয়া চলিয়াছে। মাঠে কাঞ্চনবর্ণ ধান্য-গুচ্ছের ভারে গাছগুলি মাটির উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এখনও সব পাকে নাই—মাত্র দুই চারিটি ক্ষেতে কৃষকেরা ধান-কাটা আরম্ভ করিয়াছিল। গাছে গাছে পাখীরা যেন এই আগতপ্রায় নবান্নের সমারোহে মাতিয়া মঙ্গল গানে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

আজিকার শারদ প্রভাতে আকাশ-বাতাস-জোড়া এই আনন্দের কলধ্বনি গ্রামের নিভৃত প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গৃহের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া নিতান্তই নিরাশভাবে ফিরিয়া আসিতেছিল। গাছে ঘেরা নিবিড় শান্তির ছায়াতলে অবস্থিত এই গৃহ, কিন্তু সে শান্তি যেন মৃত্যুরই নামান্তর, প্রাণের সাড়া নাই। গৃহের একটি ঘরে বিছানার উপর শায়িত এক রুগ্না নারী, শীর্ণদেহ শয্যার সহিত পাতের মতন প্রায় মিশিয়া আছে, চক্ষু দুইটি কোটরগত কিন্তু উজ্জ্বল, পরপারের অগ্রদূত যেন সেই চোখ দুটির উপর অভিনয়-শেষের কৃষ্ণযবনিকা টানিয়া দিবার অপেক্ষায় আসন পাতিয়া বসিয়াছে। দ্বারে একটা বিশ্রী কালো কুকুর এই লক্ষ্মীহীন মৃত্যুপুরীর শেষ সম্পদের মত একধারে ঘুম হইয়া পড়িয়াছিল।

এক যুবক ম্লানমুখে ঘরের ভিতর শয্যাপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল। কহিল,—আজ কেমন বোধ করছ দিদি?

প্রশ্ন অনাবশ্যক, দিদির মুখে হাসির রেখাটুকু যেন সেই কথাই বুঝাইয়া দিয়া গেল। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, আলগোছে দিদির শীর্ণ হাতটি মুঠির মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল,—তোমায় একটা খবর জানাচ্ছি দিদি, দেখো উতলা হয়ো না যেন।

—কি খবর, চন্দ্র?

চন্দ্রনাথ কহিল,—কাল রাত্রে তার পেয়েচি, সে আজ আসচে।

নিমেষের জন্য সুরবালার মুখমণ্ডল বর্ণের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—সে আসচে?—আজ?—এখানে?

হাঁ দিদি।

ঈষৎ-কম্পিত হাত দুইটি বুকের উপর জোড় করিয়া ধীরে ধীরে সুরবালা চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠাধর আবেগভরে যেন একটু নড়িয়া উঠিল, চোখের কোণ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

চন্দ্রনাথের মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল—বুঝতে পারচি না দিদি, কিন্তু নিশ্চয় তার কোনো

মতলব আছে। নৈলে হঠাৎ এত বছর পরে আমার এই দুঃখিনী দিদিকে মনে পড়বে কেন? কখনো ত একখানা চিঠি লিখেও জিজ্ঞেস করেনি তুমি কেমন আছ।

সুরবালা অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল। মরণ-নদীর কূলে দাঁড়াইয়া এখন যেন সে পিছু তাকাইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় তাহাই দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। আর ত সময় নাই—বোঝাপড়ার ভার এইবার শেষ করিতে হইবে।

চন্দ্রনাথ বলিয়া গেল,—আমি বলি নিশ্চয় কিছু মতলব আছে। বিনা মতলবে কবে কোন কাজটি সে করেচে দিদি? আমি কি তাকে এখনো চিনিনি? তোমাকে এখানে রেখে গেল ঘাড়ের বোঝা ঝেড়ে ফেলবার জন্য, পশ্চিমে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বিয়ে করে বড়মানুষ হয়ে বস্‌ল। তুমিই না আমায় ঠেকিয়ে রেখেচ দিদি, নৈলে কি আমি ছাড়তুম? একবার দেখে নিতুম, কেমন করে সে তোমার উপর এরকম ব্যবহার করতে পারলো?

সুরবালা চোখ মেলিয়া চাহিল—একটু ক্ষীণ ব্যথার আভাষ সেই আঁখি দু'টির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রনাথের হাতখানি দুইহাতে ঈষৎ চাপিয়া সে কহিল,—চন্দ্র, তোর চেয়ে আপন আমার আর সংসারে কে আছে ভাই! তুই-ই ত এখনো আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিস্। কিন্তু দিন যে শেষ হয়ে এল ভাই—আর তোর কাছে কিছু চাইতে আস্‌বো না।

শেষের কথা কটি বলিতে গিয়া বুঝি বা সুরবালার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রনাথ চোখে কাপড় দিল।

সুরবালা কহিল,—আমার একটা কথা আছে—রাখ্‌বি ভাই?

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে চন্দ্রনাথ বলিল,—কোন্ দিন তোমার কথা শুনিনি দিদি যে আজ অমন করে বলচ?

চন্দ্রনাথের পিঠে হাত রাখিয়া বুলাইতে বুলাইতে সুরবালা কহিল,—ভাই আমার আজ বড় ভয় হচ্চে। কেন জানিস? তোর জন্য। তিনি আসচেন—তুই যে আজ কি কাণ্ড করে বস্‌বি, আমি কিছু ভেবে পাচ্চি না।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক দিদি, আমি তাকে কোনো কথা বল্‌বো না। বলবার সে কি কিছু রেখেচে?

সুরবালা স্থিরনেত্রে তাহার মুখপানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল,—ভাই, আমার কথা শোন্। আজকের মত ভাবতে চেষ্টা কর, তার কোনো দোষ নেই। আমার যে আজীবন অসুখে কাটলো, সে কি তার দোষ? চিরদিন আমিই তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েচি।

চন্দ্রনাথ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল,—ও সব কথা ত অনেক দিন বলেচ, আর কতবার শোনাবে দিদি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই কথাগুলি তুমি কি নিজেই বিশ্বাস কর, না কোনোদিনও করেছিলে? ও তোমার মন-বোঝান কথা, চিরদিন বুঝিয়ে এসেচ, তোমার ওপর কোনো অবিচার হয়নি, কিন্তু মন তোমার সে কথা গ্রাহ্যও করে নি। মনে পড়ে যেদিন সেই চিঠিখানা এল? তখন ত তুমি ধীরে ধীরে দিব্যি সেরে উঠছিলে—চিঠি পাওয়ার পর থেকে আবার পড়্‌লে। কেন পড়্‌লে তা কি আমি বুঝি নি? ভুল করেছিলে দিদি, আমায় তখন কিছু না বলে—তা হলে এতকাল মনের ভিতর যন্ত্রণা পুষে রেখে এমন করে অসুখ বাড়িয়ে তুলতে কিছুতেই দিতাম না।

এবার সুরবালা হাসিল, ক্ষীণ ম্লান হাসি। কহিল,—ক্ষ্যাপা ছেলে, তা যদি বলতুম তা হলে সেইদিনই তুই একটা কিছু না বাধিয়ে ছাড়তিস্ না। ওসব কথা যাক্—আজ যে তোকে কাছারি থেকে একটু আগেই ফিরে আসতে হবে। দেরি করিস নি ভাই, দেখে আয় রাঙা-দির খাবার তৈরির কদ্দূর হল।

এই অনাদৃতা উপেক্ষিতার এ কয় বৎসরের ইতিহাস সহজেই বলা যাইতে পারে। সে কলিকাতা হইতে এখানে আসিলে উমাপ্রসন্ন নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন প্রবীণ কবিরাজ ডাকিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কবিরাজ রোগসম্বন্ধে কলিকাতার ডাক্তারের মত স্থির-চিত্তে শুনিয়া গেলেন, তারপর হাসিয়া কহিলেন,—চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি, রোগীর অদৃষ্ট গণিতে বসি

নাই। দেখা যাক্ কি হয়! চিকিৎসার গুণে হোক, কি পল্লীর বিশুদ্ধ জল বাতাসের ফলে হোক এক বৎসরের মধ্যে সুরবালার শারীরিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল।

কিন্তু একদিন তাহার মাথায় সত্যসত্যই আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, সেদিন প্রকাশের পত্রখানি পাইয়া সকল সংবাদ সে জানিতে পারিয়াছিল। সে বাঁচিয়া থাকিতেই স্বামী বিবাহ করিয়াছে, সেজন্য তাহার দুঃখ হইল না—স্বামীর কাছে সে যে বাঁচিয়াও বাঁচিয়া নাই। একজন অনভিজ্ঞা তাহারি উপর একান্ত বিশ্বাসপরায়ণা তরুণীকে সে প্রতারণা করিয়া বিবাহ করিতে পারিল, স্বামীর এতবড় কলঙ্ক তাহার অন্তরে মৃত্যু অপেক্ষাও গভীর বেদনা জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। এ কথা অন্য কাহারো কাছে শুনিলে সে হয়ত বিশ্বাস করিত না, কিন্তু প্রকাশ তাহার অপরাধের কাহিনী নিজেই লিখিয়া জানাইয়াছে—অবিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে সে উপায়ও তাহার রহিল না। অণিমা এখনো ভ্রমে ডুবিয়া আছে মনে করিয়া সে আর নিজের উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভাবিল না, তাহার একমাত্র চিন্তা হইল—এই জটিল অবস্থার মধ্যে কোন্ পথে সে আপন জীবন চালাইয়া লইবে। সে বুঝিল, অণিমার সুখের সংসারটি বজায় রাখিতে হইলে চিরকাল তাহাকে চোখের আড়ালেই কাটাইতে হইবে, তাহার অনাবশ্যক জীবন অণিমার পাশে আনিয়া দাঁড় করান কোনোমতে চলিবে না।

বার্দ্ধক্যজনিত রোগের দরুণ উমাপ্রসন্ন অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, সংসারের ভার এখন চন্দ্রনাথের উপর, স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে সামান্য একটি চাকরি জোটাইয়া সে দিন চালাইতেছিল। সুরবালার অবস্থা দেখিয়া সে ভীত হইল, কবিরাজকে একান্তে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, শুধু কহিলেন,—কোনো মানসিক দুশ্চিন্তা নাই ত? কথাটা চন্দ্রনাথকে বিষম আঘাত করিল। প্রকাশ এতকাল প্রবাসে আছে, সুরবালাকে একটিবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই। কিন্তু ভগিনীর কাছে এই বিষয়টির অবতারণা যখনি সে করিতে গিয়াছে, তখনি হয় মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া নয় অন্য কথা পাড়িয়া, সুরবালা তাহাকে নিরস্ত করিয়া আসিয়াছে।

একদিন জিনিষ-পত্র গোছ-গাছ করিয়া তল্পি-তল্পা বাঁধিবার যোগাড় করিতে করিতে চন্দ্রনাথ আসিয়া কহিল,—আমি চল্লাম দিদি।

সুরবালা শিহরিয়া উঠিল,—কোথা?

চন্দ্রনাথ কহিল,—রাণীগড় দেখে আসি, কোন্ আক্কেলে তোমায় এ অবস্থায় ফেলে সে দূরদেশে নিশ্চিন্ত থাকতে পারচে। সে কি মানুষ?

সুরবালা তাহার হাতখানি প্রাণপণে চাপিয়া ধরিল, কহিল,—না ভাই, সেখানে তোমার যাওয়া হবে না, কিছুতেই না। আমি তোমাকে তার কাছে কখনো যেতে দিতে পারি না।

চন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

সুরবালা ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল। কি বলিবে সে? স্বামীর সুখের জন্যই তাহার এই জীবন্ত সমাধি, এ কথা প্রাণান্তেও সে চন্দ্রনাথকে বলিতে পারিবে না। তাহার চোখে জল দেখা দিল।

সযত্নে তাহার চোখ দুটি মুছাইয়া চন্দ্রনাথ কহিল,—কেঁদো না দিদি। আমি বলে রাখ্‌চি, তাকে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

বৃষ্টির ফাঁকে রৌদ্রের মত অশ্রুর ভিতর দিয়া একটু ক্ষীণ হাসি সুরবালার অধরে ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল,—কাকে ফিরিয়ে আন্‌বি চন্দ্র? সে যে আমাদের আর কেউ নয়। সে আবার বিয়ে করেচে।

চন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহার চক্ষু দিয়া স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, মুখে কথা ফুটিল না।

সুরবালা বলিয়া গেল,—সে যখন আবার বিয়ে করে আমায় ভুলে থাকতে পারচে, আমার কি দরকার ভাই যে কাঙালের মতন তার অনুগ্রহ চাইতে যাব?

চন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এইবার সে ভগিনীর অন্তর্বেদনার কারণ বুঝিতে পারিয়াছে। আপন নারীত্বের অগৌরব কোন্ রমণী সহ্য করিতে পারে! দিদি তাহার ঠিকই বলিয়াছে, অপমান

মাথায় বহিয়া এখন আর ইহার কাছে যাইয়া অনুগ্রহ-ভিক্ষা বৃথা।

সুরবালা কহিল,—দেখিস্ ভাই, একথা যেন বাবার কানে যায় না। শুনলে—

কথাটা সে শেষ করিল না। আশঙ্কার কারণ যথেষ্ট ছিল, উভয়ে তাহা জানিত।

জরায় ও পীড়ায় উমাপ্রসন্নের আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসা দরিদ্র পরিবারের পক্ষে যতদূর সম্ভব চলিল, কিছু ফল হইল না। শ্রাবণ মাসে একদিন যখন আকাশ ভাঙিয়া বর্ষা নামিয়া আসিতেছিল, তখন এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শ্রাদ্ধাদির পর একদিন সুরবালা সন্তর্পণে চন্দ্রনাথকে কহিল,—বাবার মৃত্যু-সংবাদ দিয়েচিস্ ভাই?

—কাকে?

—তাকে?

—না দিদি, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তাহাদের মধ্যে প্রকাশ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার আলোচনা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, চন্দ্রনাথ তাহার নামও সহিতে পারিত না।

চন্দ্রনাথ কাছারি চলিয়া গেলে রাঙাদিকে ডাকিয়া সুরবালা স্বামীর জন্ম রান্না করিয়া রাখিতে বলিয়া দিল। রাঙাদি বিধবা প্রতিবেশিনী, দরিদ্র—ইহাদের সংসারে কাজ করিত।

চাঁদনি রাতে সমুদ্রের সফেন ঢেউগুলি যেমন বেলা ভাসাইয়া দিয়া যায় তেমনি একটা হর্ষ সুরবালার বক্ষমধ্যে দুলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাটিও তাহার মনে জাগিল যে, জন্মান্তরে এমনি কি অপরাধ করিয়াছিল সে, যাহার জন্ম এই জীবনব্যাপী কঠোর শাস্তি? জেলের কয়েদীও ত জানে, কি তাহার দোষ, কেবল কি সে-ই কিছু জানিবে না?

বেলা তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর নীচেই নদীর ঘাট—সেখানে একটি নৌকা আসিয়া লাগিল। মাঝির ডাক কানে আসিতে সুরবালা ডাকিল,—রাঙা দি—রাঙা দি!

রান্নাঘর হইতে উত্তর আসিল,—কি সুর?

সুরবালা কহিল—দরজা খুলে দাও, শিগগির—

চন্দ্রনাথ এখনো ফিরে নাই, সংবর্দ্ধনা যে তাহাকেই করিতে হইবে। মনের উচ্ছৃঙ্খল ভাবগুলি গুছাইয়া লইতে সে মুহূর্ত্তকাল সময়ও পাইবে না। যুগ বহিয়া গিয়াছে, কল্প অতীত হইয়াছে—তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল। দরবিগলিত ধারার মধ্য দিয়া চোখ দুটি বাহিরের দরজার দিকে ফিরাইয়া সে দেখিল, চৌকাঠ পার হইয়া ধীরে ধীরে কে এক নারী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘাকৃতি সুস্থ সবল দেহ, অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল যেন কোনো চতুর ভাস্করের বিচিত্র কারুকার্য্য, কালো কোঁকড়ান চুলগুলি নদীর উতলা বাতাসে সেই মুখপদ্মের চারিধারে ভোমরার মত উড়িয়া বেড়াইতেছে—ক্রোড়ে একটি শিশু, নধর সুন্দর গঠন। মধ্যাহ্ন-শেষের রবি-রশ্মিগুলি এই দুইটি মূর্ত্তি ঘিরিয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের রচনা করিয়া তুলিতেছিল। সুরবালা মুগ্ধ হইল। কে এ নারী? পরক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত তাহার মনের ভিতর আলো জ্বলিয়া উঠিল। ওরে হতভাগিনী, এতক্ষণে চিনিলি? ওযে অণিমা! ওরে আজিকার এ সৌভাগ্যসুখ লাভ করিবার জন্মই কি ভগবান তোকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন? সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অশ্রুজলে তাহার চোখ দুটি প্রায় অন্ধ হইয়া আসিল।

চক্ষু উন্মীলন করিয়া সে দেখিল, জানালার কাছে প্রকাশ দাঁড়াইয়া আছে, মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না—সে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। বামে শয্যাপার্শ্বে শিশুকে ভূতলে নামাইয়া অণিমা স্থিরনেত্রে তাহারি পানে তাকাইয়া আছে, চোখ দিয়া ঝরণার ধারা নামিতেছে, ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে। তারপর সে যে কি করিতে যাইতেছে বুঝিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সুরবালা দেখিল, অণিমা তাহার পা দুটির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। চোখের জলে তাহার পদদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠিল।

অণিমা কহিতেছিল,—দিদি—দিদি, আমায় মাপ কর, দিদি।

সুরবালা কিয়ৎকাল নীরব রহিল, কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। তারপর প্রাণপণ বলে কণ্ঠস্বর ফিরাইয়া আনিয়া মৃদুস্বরে সে কহিল,—ছি দিদি, কাঁদিস নি, উঠে বোস্।

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অণিমা বলিয়া গেল,—বল দিদি, মাপ করেচ।

ধীরে ধীরে সুরবালা তাহার বাহু ধরিয়া তুলিল, কহিল,—মাপ কিসের? তুই যে আমার বড় আদরের ছোট বোন। আমার কাছে তোর কি কোনো অপরাধ থাকতে পারে?

অণিমা কহিল,—দিদি আমি পাষাণী। তোমার এই দশা, আর আমি তোমায় এতকাল ভুলে ছিলুম।

সুরবালার অধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সস্নেহে অণিমার চিবুক স্পর্শ করিয়া সে কহিল,—না দিদি আমায় ভুলে থাকতে তুই পারিস নি। তাই না আজ আমার জিনিষ আমায় ফিরিয়ে দিতে আমারি ঘরে ছুটে এসেচিস। নে ভাই,—তুই নে—আমায় আর ঠেকিয়ে রাখিস্ নে, বোন।—বলিতে বলিতে তাহার স্বর ভাঙিয়া গেল, সে আর বলিতে পারিল না।

অণিমা চোখে আঁচল দিল। অদূরে প্রকাশ দাঁড়াইয়া সকরুণ নেত্রে এই দুই সপত্নীর দিকে চাহিয়া তাহাদের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার চক্ষে অশ্রু ছিল না, কণ্ঠে ভাষা ছিল না।

খোকা এতক্ষণ মাতার পাশে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে মাতাকে চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে দেখিয়া সেও কাঁদিয়া উঠিল। সুরবালা বলিয়া উঠিল,—ষাট ষাট। কি হয়েচে বাপ? দে বোন ওকে আমার কোলে তুলে দে।

তাহাকে কোলে লইয়া সুরবালার ক্রোড় যেন জুড়াইয়া আসিল। মনে হইল, তাহারি চিরজন্মের গোপন আকাঙ্ক্ষাটি এই শিশুমূর্ত্তি ধরিয়া বক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টি তাহার বাষ্পে নিরুদ্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে ইহাকে বক্ষমধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া ক্ষণকাল সে মৌন রহিল, তারপর কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া সে কহিল,—চেয়ে দ্যাখ, অণিমা, ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখ—ঠিক বাপের মত। বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘজীবী হও।

চন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরিয়া রাঙাদির কাছে সকল কথা শুনিয়াই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—বুঝেচি ওরা এখানেও আমাদের অপমান করতে চায়, নইলে সতীন সঙ্গে করে এসে উঠবে কেন? কিন্তু তা হবে না, আমি থাকতে দিদিকে কখনো অপমান হতে দেব না।

দুই সপত্নী চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, তাহার রোষদৃপ্ত কণ্ঠ তাহাদের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। অণিমার হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে সুরবালা কহিল,—তুই কিছু মনে করিস্ না বোন, ও আমার পাগল ভাই, চন্দ্রনাথ—বড় অবুঝ।

অণিমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পানে ফিরিয়া সুরবালা কহিল,—তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কি কখনো হবে না চন্দ্রনাথ? এরা এসে আজ তোর বাড়ী উঠেছে, এ তোর কত ভাগ্যি—তাদেরি তুই অপমান করচিস? ছি ভাই, অণিমার পায়ের ধূলো নে—ও যে তোর দিদি!

চন্দ্রনাথ নড়িল না। পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধস্বরে সে বলিয়া গেল,—অপমান কে করেচে দিদি, ওরা না আমরা? এই চার বছরমধ্যে তোমার কথা একটিবারও কি ওরা ভেবেচে? তিলে তিলে পলে পলে তোমার দিন শেষ হয়ে আসচে, সেদিকে কখনো কি ওরা ফিরেও চেয়েচে? তুমি রুগ্ন, তুমি গরিব—সে কি তোমার অপরাধ? কি করেছ তুমি দিদি যে স্বামী হয়েও তোমায় এমন অবহেলার আবর্জ্জনার মধ্যে এতকাল ফেলে রেখে দিয়েচে?

অণিমার বুক ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল। এতও বিধাতা তাহার অদৃষ্টে লিখিয়াছিল? কাহার জন্য এই লাঞ্ছনা? মুখ তুলিয়া একটিবার সে স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিল,—দেখিল, একটি তোরঙ্গের উপর পা ঝুলাইয়া দুই হাত গালে দিয়া কাঠের পুতুলের মত সে বসিয়া

আছে—যেন কান নাই কিছু শুনিতেছে না, চক্ষু নাই কিছু দেখিতেছে না!

মানুষের এমন একটা সময় আসে, যখন সে সকল অনুভূতির অতীত—কে যেন মরণ-কাঠি ছোঁয়াইয়া তাহার জীবনীশক্তি অসাড় করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয়ের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুগর্ভেও তাহাকে তখন পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কেন হইল, কিরূপে হইল—এ প্রশ্ন তখন আর মনে জাগে না।

সন্ধ্যার ছায়া গ্রামখানির উপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল। পাখীর দল কলরব করিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। গৃহে সন্ধ্যাদীপ তখনো জ্বালা হয় নাই। পার্শ্বস্থ একটি ঘরে জানালার কাছে খোকাকে কোলে করিয়া অণিমা বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। সুরবালার ঘরে সেই যে প্রকাশকে সে বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে, আর সেখানে সে যায় নাই, এখানে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র নদীটি যেখানে বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। স্রোতের জলে নৌকাগুলি দাঁড় টানিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, ওপারে সারি সারি মাঝির দল উজান নৌকার গুণ টানিয়া ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া অগ্রসর হইতেছে। দুই একটি রাখালবালক দিবাশেষে গরু লইয়া সাঁতার কাটিতে কাটিতে এপারে ফিরিয়া আসিল। পশ্চিম দিগন্তে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহারি স্বর্ণরশ্মিগুলি বৃক্ষবেষ্টিত দূরবর্ত্তী গ্রামটির হরিৎ শোভা বর্ণচ্ছটায় রঙীন করিয়া তুলিল।

ছায়াবাজির মত এই বিচিত্র দৃশ্য অণিমার চোখের উপর প্রতিফলিত হইতেছিল, ছবির মতই মিথ্যা চটকদার—কিন্তু তবু যেন ইহার নীরব আকর্ষণ সেইদিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। জলে স্থলে নভোমণ্ডলে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান—আপন-ভোলারূপে আপনি আত্মহারা, কাহারো সুখ-দুঃখে লিপ্ত নাই, যেন বিশ্বজগৎ সকলকেই এই নিত্য উৎসব-যজ্ঞে আহ্বান করিয়া বলিতেছে—ভয় ভাবনা মিছা!—ঝাঁপ দে, ওরে ঝাঁপ দে! ঘরের নিতান্ত তুচ্ছ সঙ্কীর্ণ মরণ ভুলিয়া বাহিরের এই অনন্ত জীবনের মাঝে আপনাকে বিলাইয়া দে!

রাত্রি আসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর যখন আসিয়া রাঙাদি মৃণ্ময় প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে, অণিমা তাহা টের পায় নাই। মায়ের আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা লইয়া খেলিতে খেলিতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে অণিমা তাহাকে একটি জীর্ণ শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল। প্রদীপের এক ঝলক রশ্মি সেই নিদ্রিত মুখখানির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই আলোকে শিশুর অধরপ্রান্তে একটু নির্ম্মল হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ত কিছু জানে না, বুঝে না—অজ্ঞান আঁধারে ডুবিয়া হাসিয়া খেলিয়া এমনি করিয়া সারাটি জীবনই কেন কাটিয়া যায় না? জ্ঞানের নিষিদ্ধ ফল খাইয়া অশান্তির আগুনকে জ্বালাইতে চাহে? শিশুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া অণিমার বক্ষমধ্যে ফেনিল সিন্ধু আবার গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল। সে উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া, দুই হাতে সুপ্ত শিশুর বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—খোকা, লক্ষ্মী বাপ আমার—বাবার মত হোস্ না—

—দিদি!

অণিমা চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, চন্দ্রনাথ। তাহার মুখ বিষণ্ণ, কাতর দৃষ্টিতে সে তাহারি পানে চাহিয়াছিল। সে কহিল,—তোমায় বুঝিনি দিদি, তাই অযথা কথা বলেচি। তুমি আমায় মাপ কর।—নত হইয়া সে অণিমাকে প্রণাম করিল।

ঝর ঝর করিয়া অণিমার চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল, ক্ষণকাল সে কথা কহিতে পারিল না। তারপর প্রাণপণে নিজেকে সম্বৃত করিয়া, চন্দ্রনাথের মাথায় হাত রাখিয়া কহিল,—মাপ নয় ভাই, আশীর্ব্বাদ করচি।

*　*　*

সাতদিন পর ঠিক এমনি সময় ওঘরে কান্নার রোল উঠিল। ধরাধরি করিয়া সকলে সুরবালার মৃতদেহ বাহিরে লইয়া আসিল।

এঘরে নিদ্রিত শিশুকে বক্ষমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঠিক তেমনিভাবে অণিমা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—বাপরে—লক্ষ্মী বাপ আমার—বাবার মত হোস না—

সমাপ্ত

পূর্ণের আহ্বান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাত-আলোর বাঁশিতে এই যে সুর বাজ্‌ল তাতে কোন্ অলক্ষ্য রাগিণীর ছবিকে পূর্ণ করে আমাদের সাম্‌নে প্রকাশ করল। প্রান্তরের প্রত্যেকটি তরুলতা, পাখীর গান প্রভাত-সূর্য্যের দীপ্তি সমস্ত জড়িয়ে দিগন্ত-বেষ্টিত এক অপরূপ শুভ্রমূর্ত্তি আজ আমাদের কাছে আবির্ভূত। আমাদের দৈনিক জীবনকে বেষ্টন ক'রে ধীরে ধীরে একটি পরম বাণী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে তারই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। পরিপূর্ণতার একটি অখণ্ড রস আমরা অনুভব করতে পারলুম। এই প্রান্তরের কেন্দ্রস্থলে চুপ ক'রে বসে থেকে এর যে মধুটুকু আহরণ করি তাতে জন্ম-মৃত্যুর অতীত একটি অমৃতের স্বাদ আছে।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই একের যা বহুবিচিত্র কর্ম্মের অঙ্কগুলিকে একসুরে এমন একটি আনন্দসূত্রে বেঁধে দেয় যাতে দিনের প্রত্যেকটি কাজ একটি হয়ে ওঠে। এমন কেউ নেই যে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব না করেছে যে আমার জীবন বিবিধের ভারে ব্যর্থ হল। একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরেকটিকে বেঁধে সম্পূর্ণ ক'রে দেয় এমন মূলসূত্রের অভাব ব'লে মন ব্যাকুল। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ-দুঃখ লাভক্ষতি আলো-ছায়ার এই যে পর্য্যায় মনে উদ্দীপনা আন্‌ছে কিন্তু সব মিলিয়ে ঐক্যকে উপলব্ধি করছি না, হাজার ক'রে দেখছি, এতেই আমাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আপনার মধ্যে এবং অন্তরের সঙ্গে মিলিয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে কল্যাণময় অভেদ সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করলে তবেই আমাদের জীবন মুক্তলোকে উত্তীর্ণ হবে। সৃষ্টির উপকরণ নিয়ত আমাদের জীবনে প্রবেশ করছে কিন্তু সৃষ্টির তত্ত্বটিকে যদি না পাই তবে আমাদের জীবন ব্যর্থ। এই জীবনটিকে কেমন ক'রে সৌন্দর্য্যে কল্যাণে শান্তিতে রূপদান করব এই আমাদের উপর ভার—তা যদি না পারলাম ত কিছুই হল না, আমাদের শক্তি অন্ধকারস্তূপে পুঞ্জীভূত হল, আলো জ্বল্‌ল না।

এই দুঃখে আজ জগৎ পীড়িত—আবর্জ্জনার স্তূপে নীলাকাশ লাঞ্ছিত হল, মুক্তিবিহারী মানব-মন আজ অবসন্ন। এর থেকে উদ্ধার কী উপায়ে দিকে দিকে তারই প্রশ্ন জেগে উঠ্‌ছে—য়ুরোপেও এই পথের সন্ধান চলেছে। বিজ্ঞানের বলে আজ আমরা সম্পদলাভ ক'রে চলেছি—কিন্তু যা পাচ্ছিনে সে যে বড়ো ভয়ানক, তাতেই আমরা মরছি। এই সঙ্কট উৎপাদন করছে এই মূল ঐক্যের অভাব, যে অভাববশত মানুষে মানুষে সত্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। চিত্রী নিয়েছে রঙের পাত্র, তুলি—কিন্তু যতক্ষণ না তাঁ'র হৃদয়ে সুন্দরের ধ্যান পূর্ণ হয়ে ওঠে ততক্ষণ বাহিরের শত আয়োজন ব্যর্থ।

বিজ্ঞান আজ সবই খণ্ডরূপে দেখছে, ভিতরের বিচ্ছিন্নতাকে ঐক্য দিতে পারে এমন শক্তি তার নেই। আঘাতের পর আঘাত আসে—নিজেকে বাঁচাতে পারিনে। মার কোথায়? মনের কেন্দ্রে যিনি বসেন তাঁকে যখন বসাতে পারিনে তখনই চারিদিকে শূন্যতা অনুভব করি। হয়ত জীবন ধনজনে পরিপূর্ণ, কত লোককে ভালবাসি, কত কর্ম্মে জড়িয়ে আছি—কিন্তু প্রকাণ্ড শূন্যতায় সব ঢেকেছে। কাউকে নমস্কার করবার নেই—এ পৃথিবী যে তাহলে অনাথ, এ শূন্য মন্দির নিয়ে বাঁচব কী ক'রে? বেঁচে যাই যদি নমস্কার করতে পারি। অন্তর কেঁদে ওঠে "পিতা নোঽসি"—পিতা, বোধ দাও যে তুমি আছ। জীবনের সকল খণ্ডতা যদি এই একটি বোধে মিলিত না হয় তবে ত সবই আমার বোঝা। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্ম হতে প্রার্থনা জাগছে—উদ্বোধিত করো; অনন্ত চরাচরলোকে এই চিরদিনের প্রার্থনা—উদ্বোধিত করো। শান্তিনিকেতনের বিমল প্রভাতে জেগে উঠে আমরা যে ঐক্যের স্নিগ্ধ সুন্দর ছবিখানি দেখলাম তার মধ্যে আশীর্ব্বাণী আছে—আমরা যেন সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করি। আমাদের সেই জাগরণ হোক্ যাতে ক'রে বিশ্বজীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে এক ক'রে দেখে শান্তি পাই, আমাদের কর্ম্ম সুন্দর হয়ে ওঠে।

বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(২)

চণ্ডীদাসের ভাষা সহজ হইলেও তাহাতে জানিবার অনেক কিছু আছে। মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দ, কোথাও কোথাও মৈথিল শব্দ, কোথাও বা হিন্দী। বাঙ্গালী কবির ভাষা বাঙ্গালীর জানিবার কথা, কোন কঠিন অথবা অজানিত শব্দের অর্থ করিতে হইলে অন্য কোন ভাষা জানিবার আবশ্যক নাই এই বিশ্বাসে যাঁহারা টীকা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই ভুল হইয়াছে। দুই এক স্থানে পুঁথিরও ভুল মনে হয়। যাঁহারা পুঁথি নকল করিতেন সকলেই তেমন ভাষাজ্ঞ ছিলেন না, কবির মূল রচনা নকল করিবার সময় স্থানে স্থানে ভুল থাকা সম্ভব। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের টীকা সকল টীকাকারের অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছি, কিন্তু শব্দের অর্থ করিবার সময় মাঝে মাঝে তাঁহারও ভুল হইয়াছে। এইমাত্র যে পদাংশ উদ্ধার করিয়াছি তাহার শেষের চরণে আছে—

তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়।

'ভায়' শব্দের অর্থ অক্ষয়চন্দ্র করিয়াছেন ভাবে, চিন্তা করে। ভায় বাংলা শব্দই নয়, মৈথিল ও হিন্দী শব্দ, অনেক স্থলে ব্যবহার দেখা যায়। ভায় ভাওয়ে শব্দ হইতে, অর্থ, প্রসন্ন করে, শোভা অথচ আনন্দ দান করে। এখানে অর্থ হইবে আর কিছু মনকে প্রসন্ন করে না, কিংবা মনে আর কিছু আনন্দ দেয় না।

অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ যেমন

বেলি অসকালে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে।

কীর্ত্তনানন্দের পাঠ বেলা অবসানকালে। বেলি শব্দ বিদ্যাপতি ব্যবহার করিয়াছেন—

জব গোধূলি সময় বেলী
ধনি মন্দির বাহর ভেলী।

অসকাল শব্দ রামপ্রসাদ ও ঘনরামও প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন ইহার প্রচলন নাই।

মন্দির শব্দ বৈষ্ণব কবিতায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই অর্থ বাসভবন, দেবালয় নয়। গোবিন্দদাসের পদে,

মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা,

গৃহ অরণ্য, চন্দন অগ্নি হইল।

গৃহ অর্থে মন্দির শব্দের প্রয়োগ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও পাওয়া যায়—

ব্যাঘ্রেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
মন্দিরে থাকিলে সাধু নাকে দিত পদ॥

এখন মন্দির বলিতে আমরা কেবল দেবালয় বুঝি।

রাধার রূপ-বর্ণনায় চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে—

কেশের আগ চুবয়ে টাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বাজে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সম্পাদক 'টাগ' শব্দসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "জঙ্ঘা অর্থ না করিলে উপায় নাই, তবে কেমন করিয়া হইল, বুঝা যায় না।" ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ দেখেন নাই। তাহাতে টীকা আছে—"টাগ—টঙ্গ, জঙ্ঘা—ইতি মেদিনীকোষ।" এই শব্দের উৎপত্তি আরও সহজে স্থির করা যায়—টাগ, হিন্দী টাং, বাংলা ঠ্যাং। শব্দ একই, তবে শুদ্ধ হিন্দীতে টাং অথবা শুদ্ধ বাংলায় ঠ্যাং শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অপর এক পদে উক্ত শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়—

গুরু সে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরি যে সুন্দর তার।

আর এক পদে

আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।

পূর্ব্বোক্ত টীকাকার লিখিয়াছেন আদলি শব্দের অর্থ বুঝিতে

পারিলেন না। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন আদলি—আদলা—অদলী অর্থে ঘৃতকুমারী। ইহাই যথার্থ অর্থ। হাঁটুর নীচে হইতে পা পর্য্যন্ত ঘৃতকুমারী ও উরু কদলীর সহিত উপমিত হইয়াছে। ব্রজবুলি বলিয়া একটা ভাঙাচোরা ভাষার অস্তিত্ব যদি স্বীকার করিতেই হয় তাহা হইলে ঐছন ঐ ভাষার শব্দ। মূল শব্দ মৈথিল ও হিন্দী ঐসন—এমন, এইরূপ।

বদন কমলে ভ্রমরা বুলয়ে
তিমির কেশের ভার।

বুলয়ে শব্দের অর্থ হইয়াছে ভ্রমণ করে, কিন্তু বুলনা ঠিক ভ্রমণ নয়, অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘোরা। মৈথিল ও হিন্দী ভাষা না জানিলে এই সকল শব্দের যথাযথ অর্থ করিতে পারা যায় না। বুলনা প্রচলিত হিন্দী শব্দ, সাধারণ হিন্দী কথায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণব কবিরা এই শব্দের বড় মধুর ও সুন্দর ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের মত শব্দরত্নের জহরী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দীতে বুলনা ভটক্না অর্থে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো বিদ্যাপতির পদে আছে—

অব সোই যমুনা কূলে
গোপ গোপী নহি বুলে।

চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদে 'অমুরথ' শব্দ পাওয়া যায়—

এ কোন বিচার নহে ব্যবহার
বড় হবে অমুরথে।

এই শব্দ লইয়াও টীকাকার গোলে পড়িয়াছেন, কিন্তু ইহা মৈথিল কিংবা ব্রজবুলি নয়, সহজ বাংলা শব্দ। অমুরথ—অনর্থ।

একটি পদের আরম্ভ—

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।

আজুক মৈথিল শব্দ। ক এই অক্ষর ষষ্ঠী বিভক্তি অথবা অধিকরণ কারকের লক্ষণ—আজিকার। হিন্দীতে এই ক কা হইয়া যায়, স্ত্রীলিঙ্গে কি। মৈথিল জনিক—যাহার, হিন্দী ইস্‌কা, ইন্‌কি—ইহার। শুতিয়া হিন্দী প্রচলিত শব্দ।

চণ্ডীদাসের রচনায় শ্রীমদ্ভাগবত ও বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের রস-বর্ণনা আগাগোড়াই ভাগবতের অনুরূপ—

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।

সেই যামিনীতে মল্লিকা পুষ্প-সমূহ প্রস্ফুটিত হইল দেখিয়া ভগবান যোগমায়া আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিতে মানস করিলেন।

তাহার পরে সমস্ত বর্ণনাই আনুপূর্ব্বিক ভাগবতের অনুযায়ী। বংশীর আহ্বান-ধ্বনিতে কোনো ব্রজ-রমণী দুগ্ধ-আবর্ত্তন ত্যাগ করিয়া, কেহ কোলের শিশু ফেলিয়া চলিয়া গেল। আবার এই বর্ণনা নিজের প্রতিভায় রঞ্জিত করিয়া কালিদাস কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস কয়েক স্থানে বিদ্যাপতির ভাব ও উপমা গ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার দুই একটি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আর কোনো সংস্করণে এ কথার কোনো উচ্চবাচ্য নাই। বৈষ্ণব কবিতার তত্ত্ব জানিতে হইলে এ সকল বিষয়ে কিছু পরিশ্রম করিতে হয়।

চণ্ডীদাস,

অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে তাই।

বিদ্যাপতি,

কবহু ঝাপএ অঙ্গ কবহু উঘারি।

চণ্ডীদাস,

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি।

বিদ্যাপতি,

চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখশশী ডরে রোঅএ অন্ধারা।

চণ্ডীদাস,

কনক বরণ কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তাঁর।

বিদ্যাপতি,

বদন পাঁহল পরচুরে।
মাজি ধএল জনি কনক মুকুরে॥

চণ্ডীদাস,

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিকে গোটিক হয়।

বিদ্যাপতি,

হৃদয় মুখে এক সমতুল
কোটিকে গোটেক পাব।

চণ্ডীদাস,

সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি করি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আসে লিখিনু দিবসে
খোয়ালু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥

বিদ্যাপতি,

সখি মোর পিয়া।
অবহু ন আওল কুলিশ হিয়া॥
নখর খোয়াওল দিবস লিখি লিখি।
নয়ন অন্ধাওল পিয়া পথ পেখি।

জ্ঞানদাসও এইভাবে লিখিয়াছেন,

পন্থ নিহারিতে নয়ন অন্ধাওল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেও
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীদাসের ভাষা সহজ হইলেও তাহাতে মৈথিল ও হিন্দীশব্দ মিশ্রিত আছে এবং এই কারণে অর্থ করিতে গিয়া টীকাকারেরা অনবরত ভুল করিয়াছেন। সমস্ত ভুল দেখাইতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কয়েকটি প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি দেখাইতেছি—

যাবে সুনাগরী প্রেমের আগরি
আনন্দে চলিল পথে।

আগরি শব্দের অর্থ টীকাকার করিয়াছেন গৃহ, আধার। তিনি মনে করিয়াছেন আগার শব্দ এই আকারে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত শব্দ অগ্র। আগরি—অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠা। চণ্ডীদাসের একটি পদের আরম্ভ, "দুই করে ধরি অক্রূর গোহারি করল নিজহি কোর"—অক্রূর কৃষ্ণকে ডাকিয়া দুই হাতে ধরিয়া নিজের কোলে লইলেন। গোহারি শব্দের অর্থ টীকাকার লিখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কেমন করিয়া বুঝিবেন? যে ভাষায় এই শব্দের ব্যবহার আছে তাহাও তিনি জানেন না। বিদ্যাপতির পদে আছে—

অধিপক অনুচিতে কিছু ন গোহারি।

রাজা অন্যায় করিলে চীৎকার করিয়া কাহাকেও জানাইলে কোন ফল নাই। গোহারি অর্থে ডাকা, দোহাই দেওয়া, উচ্চস্বরে বিচার প্রার্থনা করা। বেহারী ও হিন্দুস্থানী সাধারণ লোকেরা সকলেই এই শব্দ এখনো ব্যবহার করে। গোহারি শব্দ মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণেও পাওয়া যায়—

খুড়ী খুড়ী করি ঠগা করিল গোহারি।
* * * *
গলায়ে কুঠার বাধি করয়ে গোহারি।
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।

প্যারী বলিতে রাধাকেই বুঝায়, কিন্তু প্যারী নাম নয়। প্রিয়া শব্দ হইতে প্যারী কিন্তু এই বাংলা শব্দে ও হিন্দী পিয়ারী শব্দে কোনো প্রভেদ নাই। পেয়ারা প্রিয় শব্দের রূপান্তর।

এই গোহারি শব্দ সিন্ধী ভাষায় ঘোরা হইয়াছে। ঘোরা রে ঘোরা অর্থে চীৎকার করিয়া দোহাই দেওয়া, বিপদ জ্ঞাপন করা।

শব্দের অর্থ না জানিয়া তাহার অর্থ করিতে টীকাকারেরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

কালিয়া বরণ হিরণ পিঁধন
বাঁকিয়া রহিল ঠারি।

ঠারি শব্দের অর্থ হইয়াছে বক্র করা। তাহা হইলে অর্থ হইবে কি? শ্যামবর্ণ পীতবসন-পরিহিত বক্র করা বাঁকিয়া রহিল। টীকাকারের ধারণা চোখ ঠারা আর ঠারি একই শব্দ। ঠারি কিংবা ঠাড়ি হিন্দী শব্দ, অর্থ দাঁড়াইয়া, বৈষ্ণব কবিতায় যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। শ্লোকার্দ্ধের অর্থ, পীতবস্ত্রধারী কৃষ্ণ, ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। হিন্দী গানে,

পিয়া কি আওয়নকি ভইরে বেরিয়াঁ,
দারোমওয়া ঠাঢ়ি রঁহু।

প্রিয়তমের আসিবার সময় হইল, দরজায় দাঁড়াইয়া থাকি। বিদ্যাপতিতে

যার মাহা ঠারি,

দরজার মধ্যে দাঁড়াইয়া।

বৈষ্ণব কবিতার ভাষার ও শব্দের দুই বিভাগ করা যাইতে পারে, এক চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে ও দ্বিতীয় তাঁহার সমকালীন ও তাঁহার পরে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে, মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের কাল এখনও স্থির করা হয় নাই, কিন্তু গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে তিনি পদ রচনা করেন নাই। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস মৈথিল ভাষায় লিখিতেন, সেই ভাষা ও সেই ভাষার অনুকরণকেই এ দেশে লোকে ব্রজবুলি বলে। চণ্ডীদাসের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা হইলেও তাহাতে মৈথিল ও হিন্দী শব্দ মিশ্রিত আছে।

গোবিন্দদাসের ভাষা ও উপমা

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদাবলীর সেরূপ আলোচনা হয় নাই। তাহার কারণ এই কবির রচনা কথনো স্বতন্ত্র সঙ্কলিত হয় নাই, গোবিন্দদাসের পদাবলীতে অক্ষয়চন্দ্র সরকারেরও অপর সঙ্কলনে ঐ নামের যত পদ রচয়িতা আছেন সকলের রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দদাস ঝার রচনা বাছিয়া বাহির করাও দুরূহ, কেন না তাঁহার ভাষা বঙ্গদেশের লোক বিস্মৃত হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া কেন যে তাঁহার খ্যাতি তাহার বিচার কঠিন হইয়া উঠে। এই কবির কয়েকটি পদ উদ্ধার করিয়াছি। ইহার রচনা-গৌরবের ও উপমা-কৌশলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাই।—

বর্ষার অভিসার পদে

ঝর ঝর বরিখ জলদ অনিবার।
কর ঠেলন নহ ঘন আঁধিয়ার।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, হাত দিয়া অন্ধকার ঠেলা যায় না। কালিদাসের সূচীভেদ্য অন্ধকারে অন্ধকারের গাঢ়তা, অবিরলতা সূচিত হয়, গোবিন্দদাস অন্ধকারকে কঠিন অবরোধের সহিত তুলনা করিতেছেন, অন্ধকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার আকার এত বৃহৎ ও কঠিন যে হাত দিয়া ঠেলিয়াও তাহাকে সরানো যায় না।

অভিসারের আর একটি পদে পিচ্ছিল পথে রাধা বরাবর পড়িয়া যাইতেছেন। তখন

বিজুরি জোতি দরশায়ল এহ।
উঠএ চাহি জলধারক থেহ।

বিদ্যুতের জ্যোতি (পথ) দেখাইতেছে, (রাধা) জলধারা (যষ্টি-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া) উঠিতে চাহিতেছেন।

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি।
কুসমহি নিরমিত সব তনু তোরি॥

সুন্দরী, তুমি কাননে ফুল ছিঁড়িতেছ কেন? তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুসুমে নির্ম্মিত।

রাত্রিকালে নিজের গৃহে রাধা অভিসারের পূর্ব্বাভিনয় করিতেছেন—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয় অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধএ
মন্দিরে জামিনি জাগি॥

অর্থ—কমলতুল্য পদতলে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া, চরণের মঞ্জীর বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া, কলসীর জল ঘরে ঢালিয়া পিচ্ছিল করিয়া, পায়ের অঙ্গুলি চাপিয়া চলে। মাধব, তোর অভিসারের লাগিয়া, গৃহে রাত্রি জাগিয়া, ধনী দুস্তর পথে গমন সাধনা করে।

আর একটি পদে ভাষা ও ভাবের কোমলতা পাঠককে মোহিত করে—

নিশসি নিহারসি সুন্দর কান।
করতল বদন সঘন অবলম্ব।
ঘনে তনু মোড়সি কএ কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ।
এ ধনি, মোহে ন কর আন ছন্দ।
জানল তেঁটলি সামর চন্দ।
ভাব কি গোপসি গুপত ন রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই।
অতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল।
আন ছলে অমন আন ছলে পহু।
সঘন গতাগতি করসি একন্ত।

অর্থ—নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রস্ফুটিত কদম্ব দেখিতেছিল, ঘন ঘন

করতলে মুখ অবলম্বন করিতেছিস্। ক্ষণে ক্ষণে নানা রূপে অঙ্গ মোচড় দিয়া আলস্য ত্যাগ করিতেছিস্ অনবরত রোমাঞ্চের ফুঁড়িতে অঙ্গ ভরিয়া যাইতেছে। ধনী, আমার কাছে অন্য কথা বলিস্ না, আমি জানি শ্যামচন্দ্রের সহিত তোর দেখা হইয়াছে। ভাব কেন গোপন করিতেছিস্, ভাব গোপন থাকে না, মর্ম্মের বেদন বদনে ব্যক্ত হইতেছে। চক্ষের জল যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করিতেছিস্, গদগদ কণ্ঠে অর্দ্ধোক্তি করিতেছিস্। কখন কোন্ ছলে অঙ্গনে, কখন কোন্ ছলে পথে ঘন ঘন সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছিস্।

যে ভাবের উল্লেখ হইয়াছে উহা সাত্ত্বিক ভাব। রোমাঞ্চ অশ্রু, স্বরভঙ্গ ঐ ভাবের লক্ষণ।

আর একটি পদ উদ্ধার করিয়া মিথিলার গোবিন্দদাসের পরিচয় সমাপন করিব। বর্ষার ঘোরা রজনীতে সখী রাধাকে সঙ্কেত অভিসারে যাইতে নিষেধ করিতেছে। বলিতেছে, সুন্দরী, কেমন করিয়া অভিসারে যাইবে? গৃহের বাহিরে কঠিন কবাট, তাহার বাহিরে শঙ্কাপূর্ণ পঙ্কিল পথ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ বজ্রনিপাত, হরি মানস সুরধুনীর পারে বাস করেন, এমন সময়ে গৃহ ত্যাগ করিলে প্রেমের তরে দেহকে উপেক্ষা করা হয়।

রাধার উত্তর ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও উদারতায় এবং ত্যাগের মহিমায় অতুলনীয়। বলিতেছেন, সখী, আমাকে কেন বৃথা পরীক্ষা করিতেছ?—

কুল মরিজাদ কবাট উদঘাটল
তাহি কি কাঠক বাধা।
নিজ মরিজাদ সিন্ধু সম পৈরল
তাহি কি তটিনি অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈসে হৃদয় করি পহু হেরত হরি
সুমরি সুমরি মন ঝূর॥
কোটি কুসুম সর বরিখএ জহু পর
তাহি কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ জাক হৃদয় সহ
তাহি কি বজরক আগি॥
জহু পদতলে নিজ জীবন সোঁপল
তাহি কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥

অর্থ—যে কুলমর্য্যাদার কপাট উদঘাটন করিয়াছে তাহার পক্ষে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহকপাট কি? যে সাগরতুল্য নিজের মর্য্যাদা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার পক্ষে কি তটিনী অগাধ? সজনী, আমার পরীক্ষা দূর কর, কিরূপ হৃদয়ে হরি আমার পথ দেখিতেছে স্মরণ করিয়া আমার মন ঝুরিতেছে। যাহার উপরে কোটি কুসুম-শর বর্ষিত হইতেছে তাহাকে কি বৃষ্টির জল লাগে? যাহার হৃদয় প্রেমের অগ্নিদাহ সহ্য করে বজ্রাগ্নি তাহার কি করিবে? যাহার পদতলে জীবন সমর্পণ করিয়াছি তাহাকে দেহ অর্পণ করিতে বাধা কি? গোবিন্দদাস কহিতেছে, ধন্য রমণী, তুমি অভিসারে গমন কর, সহচরী সান্ত্বনা পাইয়াছে।

আর একটি পদের মর্ম্মস্পর্শিতা সম্বন্ধে অনুভব করিতে পারা যায়—

যঁহা যঁহা অরুন চরন চলি জাত।
তঁহা তঁহা ধরনি হোইএ মঝু গাত।
জে সরোবর পহু নিতি নিতি নাহ।
হম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
জে দরপনে পহু নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ।
জে বীজনে পহু বীজএ গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
জহা পহু ভরমই জলধর সাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম।
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সে মরকত তনু তোহে কিএ ছোরি॥

অর্থ—যে যে স্থানে অরুণ চরণ চলিয়া যায় সেই সেই স্থানে আমার গাত্র (যেন) ধরণী হয়। যে সরোবরে প্রভু নিত্য স্নান করেন, আমি তাহাতে পরিপূর্ণ সলিল হই। যে দর্পণে প্রভু নিজের মুখ দেখেন, তাহার মধ্যে আমার অঙ্গের জ্যোতি হউক। যে বীজন দ্বারা প্রভু গাত্র বীজন করেন তাহাতে আমার অঙ্গ মৃদু বাতাস হউক। যেখানে প্রভু জলধর শ্যাম ভ্রমণ করেন সেখানে আমার অঙ্গ যেন গগন হয়। গোবিন্দদাস কহে, কাঞ্চনবর্ণ গৌরি, সে মরকত তনু তোমাকে (তোকে) কেন ত্যাগ করিবে? (কাঞ্চনে ও মরকতে যেরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ কাঞ্চনের অঙ্গুরী অথবা মালায় যেমন মরকত বসান হয় তোমাতে ও মাধবে সেইরূপ অপরিহার্য্য সম্বন্ধ)।

শব্দতত্ত্ব

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর সকল শব্দের অর্থ জানিলে বৈষ্ণব কবিতার শব্দতত্ত্ব নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হয় না। মৈথিল ভাষা এক রকম হিন্দী, তাহাতে অনেক শব্দ আছে যেগুলি সাধারণ চলিত হিন্দী ভাষায় ব্যবহার হয়। অনেকগুলি শব্দ রূপান্তরিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার বাংলা ভাষার শব্দেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যদি এখন প্রশ্ন করা যায় যে, মৈথিল ভাষা ও ব্রজবুলিতে প্রভেদ কি, ত তাহার সহজ উত্তর বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের রচনা মৈথিল ভাষায় ও যাঁহারা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাষাই ব্রজবুলি। ইহা আধুনিক কাল্পনিক মত এ কথা আমি বলিয়াছি, কারণ যাঁহারা ব্রজবুলি শব্দ প্রথমে ব্যবহার করেন তাঁহাদের ধারণা ছিল বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ব্রজবাসী। শব্দের

কিরূপ রূপান্তর হইয়াছে তাহার. কয়েকটি নিদর্শন দেখাইতেছি—

'স'য়ের স্থানে 'ছ' যেমন ঐসন, ঐছন, যৈসন, যৈছন, জমু, জমু, অর্থ যাহার। কে, সে, যে যেমন বাংলায় ব্যবহার হয় মৈথিল ভাষাতেও এই আকারে ব্যবহৃত হয়। কো, সো, যো, হিন্দী কোই, সোই, যোই শব্দের রূপান্তর। ভএ, কএ, দএ অসমাপিক ক্রিয়া, হইয়া, করিয়া, দিয়া। পহু প্রভু শব্দের কোমল প্রয়োগ, পঁহু শব্দ মিথিলার কবিগণ লিখিতেন না। স্নেহ হইতে নেহ ও নেহা শব্দ, লেহা বিদ্যাপতি কিংবা গোবিন্দদাসের পদে পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষার প্রাচীন লিপিতে ন ও ল'য়ের আকারে বিশেষ প্রভেদ নাই, সেই কারণে নেহ শব্দ লেহ হইয়া গিয়াছে। জমু ও জনি এই দুই শব্দই যেন অর্থে ব্যবহার হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ, জমু অর্থে যেমন, জনি, না। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণে চণ্ডীদাসের পদেও 'না' অর্থে জনি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কীর্ত্তনানন্দে অনেক স্থানে ঐ শব্দের ঐ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের পদে—

জনি ভেটহ হরি কুঞ্জক মাঝ।

অর্থ—হরির সহিত কুঞ্জে সাক্ষাৎ করিও না।

মৈথিল ও হিন্দী ভাষার হ্রস্ব ইকার ও উকারের মাত্রা এত লঘু যে উচ্চারণের সময় সহজে বুঝিতে পারা যায় না, শব্দ অকারান্ত মনে হয়।

জনি যারে আজ কোই পনিয়া ভরণ মত যা।

অর্থ—আজ কেউ জল তুলতে যাস্ নে, এই হিন্দী গানে সুরে কিংবা আবৃত্তিতে জনি শব্দের উচ্চারণ জন। জনি শব্দের অর্থ না, মত শব্দেরও অর্থ না।

নিছনি শব্দ কবিতায় এখন যে কেন ব্যবহার করা হয় না তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। নিছনি সংস্কৃত নির্মঞ্ছন শব্দের অপভ্রংশ। মৈথিল ভাষায় নেউছন। নেউছন প্রথা নছাওয়র। পূর্ব্বকালে এই প্রথা বঙ্গদেশে ও মিথিলায় প্রচলিত ছিল। অমঙ্গল দূর করিবার জন্য মুদ্রা অঙ্গে স্পর্শ করিয়া বা কোনো অঙ্গ প্রদক্ষিণ করাইয়া দান করা হইত। তাহাই নিছনি। নেউছি অথবা নিছিয়া, নির্মঞ্ছন করিয়া। প্রায় সকল বৈষ্ণব কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির একটি পদে আছে—

শ্রম পসরল বিন্দু রে।
নেউছি নড়াওল সমধন ইন্দু রে॥

অঙ্গে স্বেদবিন্দু বিকীর্ণ হইল, নক্ষত্রসনাথ চন্দ্র নির্মঞ্ছন করিয়া ফেলিয়া দিল। মুখের সহিত চন্দ্রের ও স্বেদবিন্দুর সহিত নক্ষত্রের উপমা।

রাধা অথবা রাধিকা শব্দ হইতে রাহী, রাহী হইতে রাই। তুহ মৈথিল ও হিন্দী শব্দ, তুহ হইতে তুঁহু। ডারল, ফেলিয়া দিল, হিন্দী শব্দ। ধাওয়ে, ধাবমান হয়, হিন্দী শব্দ; ধাওয়া ধাওয়ি, দৌড়াদৌড়ি। সুমতি, সম্মতি। চণ্ডীদাসের পদে—

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হইতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥

ভাদ্রমাসে শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র নষ্টচন্দ্র। বিদ্যাপতিতে এই উপমা আর এক ভাবে আছে—

কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদব চৌঠিক সসী।
ইথি দুহু মাঝ কওন মোর আনন
জে পহু হসি ন হেরসী॥

অর্থ—আমি কি সন্ধ্যার একাকিনী তারা, না ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র? এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আমার মুখ যে প্রভু হাসিয়া আমাকে দেখে না।

মৈথিল ও হিন্দী ভাষায় ভাদ্র কিংবা ভাদর বলে না, ভাদব অথবা ভাদো বলে। যেমন বিদ্যাপতির পদে—

আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাসোঁ কহি ইহ দুখ।

মাধব ব্যতিরেকে ভাদ্র আসিল এ দুঃখ কাহাকে বলিব? ভাদো মাধো দুই চলিত শব্দ। বেগর উর্দ্দু বগয়ের শব্দ—বগয়ের উস্‌কে, উহাকে ছাড়িয়া, সে ব্যক্তি না থাকিলে।

সন্ধ্যার একটি তারা দেখা অশুভ এ বিশ্বাস মিথিলাতেও আছে।

চণ্ডীদাসে,—

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল।

এই চরণে দগদগি ও পোড়নি দুই বিশেষ্য শব্দ, প্রয়োগ বড় মধুর। হৃদয়ের ক্ষত ও প্রাণের দাহ কিছুতে সারিবার নয়। দগ্‌দগে ঘা কবিতার ভাষায় দেখা যায়

না, কিন্তু হিয়া দগদগি কেমন শ্রুতিমধুর! একবার পড়িলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়।

নিদের আলসে বঁধুর ধাধসে
তাহারে করিনু কোড়ে।

ধাধস হিন্দী শব্দ, অর্থ ভ্রম। ধাঁধা এই শব্দের অনুরূপ। ঢীঠ অথবা ঢীট, নির্লজ্জ, হিন্দী শব্দ। বিহান, প্রভাত, প্রচলিত হিন্দী শব্দ, এখনো বাংলা কবিতায়, ব্যবহৃত হয়। হাম, আমি, বৈষ্ণব সকল কবিই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাও চলিত হিন্দী শব্দ।

বিধির বিধানে হাম অনল ভেজাই।

ভেজাই, জ্বালাই, এ শব্দের এখন প্রচলন নাই। তুহু, তুহুঁ, তো অর্থে তুই; তুয়, তোর।

এই সকল শব্দ চণ্ডীদাসের রচনাতেই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সকল শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র করা হইয়াছে, কিন্তু মিথিলাবাসী কবি গোবিন্দদাসের ভাষা কিংবা শব্দপ্রয়োগের বিস্তৃত কিংবা সংক্ষিপ্ত আলোচনা সাধারণভাবে কখনো হয় নাই। গোবিন্দদাস অনেক পদে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি অসামান্ত প্রতিভাশালী ও অপূর্ব্ব শব্দ-কুশলী। তাঁহার রচনায় তাঁহার ভাষার ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ প্রায় বিদ্যাপতির অনুরূপ, কয়েকটি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

চিত উমতাএল, চিত্ত উন্মাদিত করিল। আলসে রহত তনু তনু লাই—লাই শব্দের অর্থ লাগাইয়া, স্পর্শ করিয়া। যুবতী যুথ শত গাওত ঝুমরি ঝুমরি গান বেহারে ও অন্তত্র এখনও প্রচলিত আছে, বাংলায় এখনও ঝুমুর গান।

সুন্দরী রাধা আওয়ে বনি,

বনি চলিত হিন্দী শব্দ, অর্থ সাজিয়া। বনি ঠনি, সাজিয়া গুজিয়া। বাংলা বানাইয়া শব্দেরও এই অর্থ।

নীকে বনি আওয়ে হো নন্দ দুলাল,

নীকে হিন্দী শব্দ, অর্থ উত্তমরূপে। হো সম্বোধনে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে প্রযুক্ত হয়।

মাঝি। মোহন মূরতি মুরারি,

মাঝি বিস্ময়সূচক হিন্দী শব্দ, অর্থ, ও মা! অরু শব্দের অর্থ আরও কিংবা অন্য।

কী ফল পরিজন বাঁচি,

বাঁচি, বঞ্চনা করিয়া। অছু, আছে। জকর যাহার।

বিঘটল সময় পলটি নহি আওয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ।

গোবিন্দদাস সত্য কহিতেছে, যে সময় অযথা অতিবাহিত হইয়াছে তাহা ফিরিয়া আসে না।

একটি শব্দ সমস্ত পদকল্পতরুতে কেবল এক স্থানে পাইয়াছি। প্রথম শাখার দশম পল্লবে বিকৃতপাঠ, ভণিতাশূন্য, অর্থশূন্য পদ। দুটি ছত্র উদ্ধার করি—

জনু পন্নাগী গজগে জল ঢালর
পরশল সুরকিল মনে।
ঐছন হেরি তনু নাও করহ জনু
বেকত লুকাঅত কোণে॥

মিথিলা হইতে প্রাপ্ত রাগতরঙ্গিণী নামক পুঁথিতে এই পদের শুদ্ধ পাঠ পাইয়া আমি বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। শুদ্ধ পাঠ এইরূপ—

নবি পঞোনারি গজেঁ গঞ্জি নড়াইলি
পরসলি সূর কিরণে।
অইসন দেখিঅ তনু কপট করহ জনু
বেকত মুকাওব কোনে॥

অর্থ—গজগঞ্জিত (দলিত) নবীন মৃণালতুল্য নিক্ষিপ্ত হইলি অথবা সূর্য্যকিরণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছিস্ (সূর্য্যকিরণে মৃণাল শুকাইয়া যায়)। অঙ্গ এরূপ দেখিতেছি, কপট করিস্ না, যাহা ব্যক্ত তাহা কে গোপন করিবে?

শব্দটি পদকল্পতরুর পাঠে নাত, প্রকৃত শব্দ লাত অথবা লাথ। লাথ শব্দের অর্থ কপট, ছলনা, রাগতরঙ্গিণীতে কপট শব্দই ব্যবহার হইয়াছে। পদকল্পতরুর পাঠই মৌলিক পাঠ। পুরাতন লিপিতে ন ও ল প্রায় এক রকম হওয়াতে মৈথিল শব্দের ল বাংলায় লিখিবার সময় ন হইয়া গিয়াছে। শুধু এই অক্ষর সঙ্কটে কয়েকটি নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন নেহ (স্নেহ) শব্দের পরিবর্ত্তে লেহ। পঞোনারি শব্দ পদ্মনালের রূপান্তর।

পোখলী রজনী, পৌষ মাসের রাত্রি। কাহুক, কাহুকা, কাহুকো, অঁর্থ কোন্ স্থানে কাহারো, কোথাও কাহাকেও। বিদ্যাপতিতে—

কাহুকা নলিনী দল কাহুক চন্দনা,

কাহকা অর্থে কাহারো। একটি বিশেষ কৌতুকজনক হিন্দী ছড়ায় এই শব্দ পাইয়াছি—

সূমড়ী পুছে সূমসে
কেঁও বদন মলিন,
কেয়া গাঁঠিসে গির পড়া,
কেয়া কাহুকো দিন ?
ন গাঁঠিসে গির পড়া
ন কাহুকো দিন,
দেতে দেখা-অওরকো
তাসোঁ বদন মলিন।

সূম অর্থে অত্যন্ত কৃপণ, সূমড়ী অর্থে কৃপণ রমণী অথবা কৃপণের কৃপণ স্ত্রী। ছড়ার অর্থ, কৃপণের স্ত্রী কৃপণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তোমার মুখ মলিন কেন ? তোমার গাঁট হইতে কিছু পড়িয়া গিয়াছে, না কাহাকেও কিছু দিয়াছ ? উত্তরে কৃপণ কহিতেছে, গাঁট হইতেও পড়িয়া যায় নাই, কাহাকে কিছু দিইও নাই। অপরকে দিতে দেখিয়াছি তাহাতেই আমার মুখ মলিন হইয়াছে।

শব্দের কোমলতা সৃষ্টি করিতে বৈষ্ণব কবিদের তুল্য অপর কবি দেখিতে পাওয়া যায় না। মিথিলা ও বঙ্গদেশের সকল বৈষ্ণব কবি ইহাতে সিদ্ধহস্ত। তুলসীদাসের রামায়ণে সীতা নামের পরিবর্ত্তে সীয়া আছে। রসিয়া শব্দ প্রথমে বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায়; বাঙ্গালী কবিরাও ব্যবহার করিয়াছেন। বলরাম দাসের পদে আছে, রসিয়া নাগরা। এই শব্দের অর্থ রসিক। বাংলা রসিয়া শব্দের অর্থ রসযুক্ত হইয়া ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির রচনায় ভাবসম্মিলনের পদে—

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া।
পলটি চলব হম ঈসত হসিয়া॥

অঙ্গনে যখন রসিক আসিবে আমি ঈষৎ হাসিয়া ফিরিয়া চলিব। আত্মনিবেদনের পদে রাধা বলিতেছেন,

সুনু রসিয়া।
আব নই বজাউ বিপিন বসিয়া।
বার বার চরণারবিন্দ গহি
সদা রহব বনি দসিয়া।

অর্থ—শুন রসিক, বিপিনে এখন আর বাঁশী বাজাইও না, বার বার তোমার চরণারবিন্দ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা দাসী হইয়া থাকিব।

রসিয়া শব্দ প্রায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। অত্যন্ত গূঢ় ও গভীরার্থপূর্ণ একটি হিন্দী গীত মনে পড়িতেছে—

মোহন রসিয়া আয়ে বগিয়ন মে
ফুল রহি সব কলি কলি।
এক কলি হরি নাম জপত হৈ
দুসরি বোলে অলি অলি।

অর্থ—মোহন রসিক উদ্যানে আসিলেন, মুকুল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। একটি কলি হরি নাম জপ করিতেছে, আর একটি অলী অলী বলিতেছে।

এই গীত অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সম্ভবতঃ কোনো মুসলমান গুণীর রচনা। অলী পয়গম্বর মহম্মদের জামাতা ও এক মুসলমান সম্প্রদায়ের পীর। ইহারই বংশধরেরা খলিফা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গানে অতি উদার ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব আছে।

অর্থভ্রম

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদের শব্দার্থ করিতে বঙ্গদেশের টীকাকারেরা কিরূপ ভ্রমে পতিত হন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। বিদ্যাপতি-কৃত একটি পদের আরম্ভ রাগতরঙ্গিণী নামক মৈথিল সঙ্কলন-গ্রন্থে এইরূপ—

সবহু সখি পরবোধি কামিনি
আনি দেলি পিআ পাস।
জনি বাঁধি ব্যাধা বিপিন সঞে মৃগ
তেজ তীখ নিসাস॥
বৈসলি শয়ন সমীপ সুবদনি
জতনে সমুখি ন হোই।
ভেল মানস বুলএ দহো দিস
দেল মনমথে ফোই॥

পদকল্পতরুতে ফোই শব্দের স্থানে ফোয় আছে। একজন টীকাকার ফোয় শব্দের অর্থ ধিক্কার করিয়াছেন—দেল মনমথে ফোয়, মন্মথকে ধিক্কার দিতে লাগিল। এই অর্থের সমর্থনে তিনি একজন ইংরাজ কৃত হিন্দী অভিধান ও রাধামোহন ঠাকুরের টীকা উদ্ধার করিয়াছেন। ফুৎকার হইতে ফোয় শব্দের উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিদ্যাপতির ভাষাভিজ্ঞ কোনো মৈথিল পণ্ডিতের সহায়তা পাইলে টীকাকারের এরূপ ভ্রম হইত না। তাহা ছাড়া পদকল্পতরুতেই আর কোন পদে এই শব্দ পাওয়া যায় কি না টীকাকার তাহাও লক্ষ্য করেন নাই। বিদ্যাপতির আর একটি পদে আছে, কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর। ফুগইতে অর্থ খুলিতে, ফোয় ও ফুগইতে একই শব্দ। যদি ইহাতেও সংশয় থাকে তাহা হইলে জ্ঞানদাসের একটি পদে সে সংশয় একেবারে অপনীত হয়।

ফুয়ল কবরী উরহি লোল, হমের উপরে চামর ডোল।

এই পদে এই টীকাকারই ফুয়ল শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করিয়াছেন, অথচ মৈথিল ভাষা না জানাতে ফোয় ও ফুয়ল যে একই শব্দের রূপান্তর তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ফোয়, ফুয়ল, ফুগইতে তিনটি এক শব্দ। স্ফুরণ শব্দ হইতে ফুর, ফুর হইতে ফোয়। বিদ্যাপতির রচিত পদের উদ্ধৃত অংশে, বাঁধা ও খোলা দুই শব্দেই প্রযুক্ত হইয়াছে। পদাংশের অর্থ, সকল সখী প্রবোধ দিয়া কামিনীকে প্রিয়তমের নিকট আনিয়া দিল, ব্যাধ কর্তৃক বিপিন হইতে বদ্ধ মৃগীর ন্যায় তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। সুন্দরী শয্যার নিকটে বসিল, যত্ন করিলেও সম্মুখী হয় না। তাহার মানস হইল মন্মথ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে দশ দিকে ভ্রমণ করে। ব্যাধের সহিত মন্মথের ও মৃগীর সহিত রাধার তুলনা।

আর একটি পদের বঙ্গদেশের বিকৃত ও অর্থশূন্য পাঠ এবং মিথিলার শুদ্ধ ও অর্থযুক্ত পাঠ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার একটি চরণ এই—

জনু পন্নারি গজ গেহ নড়ায়ল
পরশল সুর কি রমণে।

রাগতরঙ্গিণীর পাঠ—

নবি পংক্তোনারি গজে গঙ্গি নড়াইলি
পরশলি সুর কিরণে।

টীকাকার আমার উদ্ধৃত পাঠ হইতে পন্নারি শব্দের অর্থ মৃণাল করিয়াছেন, কিন্তু পরশল সুর কি রমণে ইহার অর্থ করিয়াছেন সুরকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে স্পর্শ করিয়াছেন। এই চরণে অভিসারিণীর তুলনা মৃণালের সহিত করা হইয়াছে, মৃণালের মলিনতার কারণ হয় গজের বলপ্রয়োগ কিংবা সূর্য্য-কিরণের স্পর্শ, পদে কোথাও কৃষ্ণের উল্লেখ নাই। স্থানান্তরে এই টীকাকার মিথিলার পাঠ ও বিদ্যাপতির বংশে রক্ষিত তালপত্রের পুঁথির পাঠ অশুদ্ধ ও ভ্রান্ত বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

গোবিন্দদাসের পদেও স্থানে স্থানে পাঠবিকৃতি আছে এবং সেই সঙ্গে অর্থবিকৃতিও ঘটিয়াছে। অভিসারের পূর্ব্বাভিনয়ের একটি পদের প্রথম অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি—কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল ইত্যাদি। এই পদের একটি শ্লোক এই—

কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কন পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে।

দ্বিতীয় চরণের নানারূপ বিকৃত পাঠ পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ধৃত পাঠ—

কর কঙ্কন পনকলি মুখ বন্ধন শিখই
ভুজগ গুরু পাশে।

অপর এক সংস্করণের পাঠ—

কর কঙ্কন পন ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে।

টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন রাধা নিজের করের কঙ্কণ মূল্য দিয়া সাপুড়িয়াদিগের (ভুজগ গুরু) নিকট (মন্ত্রৌষধি দ্বারা) সর্পদিগের মুখ বন্ধন শিখিতেছেন। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাধা অভিসারের সকল রূপ আশঙ্কা রাত্রে নির্জ্জনে নিজের গৃহে অভ্যাস করিতেছিলেন, অপর কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো কথা প্রকাশ করেন নাই। রাত্রি জাগরণ করিয়া নিশাভিসারে যে সকল ব্যাঘাত তাহার অভিনয় করিতেছেন। পায় কাঁটা ফুটাইয়া, গৃহে জল ঢালিয়া পিচ্ছিল করিয়া, হাত দিয়া দৃষ্টি রোধ করিয়া অন্ধকারে চলিতেছেন, কারণ বর্ষাকালে রাত্রে এইরূপে তাঁহাকে অভিসারে যাইতে হইবে। আবার পথে চরণে সর্প জড়াইতে পারে তাহারও অভিনয় করিতেছেন। বিদ্যাপতির পদে আছে—

চরণ বেঢ়িল ফণি হিত কএ মানিল ধনি
নেপুর ন করএ রোল।

চরণে ফণী বেষ্টন করিল, ধনী হিত করিয়া মানিল, নূপুর রোল করে না।

গোবিন্দদাসের পদে রাধা নিজের করকঙ্কণ চরণে স্পর্শ করাইয়া ভুজঙ্গের কঠিন (গরুঅ) বন্ধন (পাশ) শিক্ষা করিতেছেন।

এরূপ ভ্রম অনিবার্য্য। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলী লিপিকরের প্রমাদপূর্ণ। যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি নকল করিতেন তাঁহারা মৈথিল ভাষা জানিতেন না।

স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ বিকৃতি হইয়াছে যে, কেবল অর্থশূন্য অক্ষর সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারেরাও মৈথিল ভাষা জানেন না, কিন্তু কাল্পনিক ও আনুমানিক অর্থ করিতে তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন না। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ছাড়া মিথিলায় আরও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একখানি তালপাতার পুঁথিতে আমি হরিপতি নামক কবির উৎকৃষ্ট পদাবলী দেখিয়াছি। উমাপতি আর একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদিগের রচনা বঙ্গদেশে আনীত হয় নাই এবং মিথিলা হইতে কোনো মৈথিল কবির কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। যে-ভাষায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ন্যায় কবি লোকমনোমোহন কাব্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সে-ভাষার সম্যক সমাদর তাঁহাদের স্বদেশে হয় নাই ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। মিথিলার কোনো পণ্ডিত মৈথিল ভাষার ব্যাকরণ অথবা ঐ ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস প্রণয়ন করেন নাই, বঙ্গদেশে প্রকাশিত বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলীতে যে সকল ভ্রম আছে তাহাও সংশোধন করেন নাই। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব কবি ও ভক্তগণ এই দুই কবির রচনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ না করিলে উহা লুপ্ত হইত। অতএব শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ যে আকারেই হউক এই সকল কবিতা বাঙ্গালী কবি ও বাঙ্গালী ভক্তের প্রযত্নেই রক্ষিত হইয়াছে এবং সেই কারণে তাঁহারা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

গীতি কবিতার পরাকাষ্ঠা

বৈষ্ণব কবিতার ভাষা তিন রকম, অবিমিশ্রিত মৈথিল ভাষা, মৈথিল ও বাংলা মিশ্রিত ভাষা এবং খাঁটি বাংলা ভাষা। এই তিন প্রকারের কবিতাতেই গীতি কাব্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ও উপাদান-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার সরলতা, ভাবের প্রগাঢ়তা ও ছন্দের তরলতা গীতি কবিতার প্রধান অঙ্গ। এই সকল গুণ বৈষ্ণব কবিতায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কবিতা অধিকাংশই গান, কিন্তু সুরে না বসাইলেও ইহাদের মধ্যে গানের প্রাণ পাওয়া যায়। শব্দবিন্যাসেই সুরের ঝঙ্কার, যেমন জলের প্রবাহে রাগিণী ও তালের আবেশ অনুভব করা যায় সেইরূপ বৈষ্ণব কবিতার কথায় ও ছন্দে সুরতাল জড়িত আছে। এই বৈষ্ণব কবিতার অমৃত ধারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া পান করিয়া আমরা চরিতার্থ হই। এখন যিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি, বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট যিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণব কবিতার গুণগান করিয়াছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—এ কি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম তৃষা ?

* * *

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি' কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার।

হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

সত্য ঠিক্ নিজে যেমন (by itself) সেরূপে প্রকাশ না পাইয়া অন্যথারূপে প্রকাশ পাইলেও আপনি তাহাকেও—অন্যথা প্রকাশিত সত্যকেও—সত্য বলিতে চান। শঙ্করাচার্য্যও তাহাকে বলেন প্রাতিভাসিক সত্য, অর্থাৎ যেমন স্বপ্নের ছাতি জাগ্রত কালের ছাতিরই স্বাপ্নিক প্রকাশ—তেমি phenomenal জগৎ সকলের মতেই, Noumenal সৎপদার্থেরই phenomenal appearance—Kantও বলেন, আপনিও বলেন, শঙ্করাচার্য্যও বলেন—Phenomena = Noumenaরই phenomena। শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, প্রাতিভাসিক সত্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো সত্য নাই; *i. e.* independent, আর সেইজন্য প্রাতিভাসিক সত্যকে তিনি বলেন—সৎও বটে অসৎও বটে তাহা সদসদাত্মক। ইহাতে ফলে দাঁড়াইতেছে—আপনার মতেও যেমন প্রাতিভাসিক সত্য (phenomenal সত্য) কতক অংশে সত্য—শঙ্করাচার্য্যের মতেও মায়িক জগৎ কতক অংশে সত্য তবে মিছামিছি কথা কাটা-কাটি এবং বাক-বিতণ্ডা কেন? আমি চক্ষে ঝাপসা ঝাপসা দেখি বলিয়া এইরূপ এলোমেলো ভাবে লিখিলাম—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আপনি আমার কথাটা তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাই অত বাহুল্য লিখিয়াছেন।

আমার কথাটা হচ্ছে এই—

বেদান্ত যাহাকে বলে মায়া, Kant যাহাকে বলেন Necessary illusion, নব্যেরা যাহাকে বলে—Untruth which always clings to all Relative truths like ভোঁক, Dream truth ইত্যাদি।

সবই জিনিষ এক—শব্দ নানা। আমি যদি বলি যে, "তুমি যদি আমাকে 'মিথ্যাবাদী' বলিতে তাহা আমার গায়ে লাগিত না; কিন্তু তুমি যে আমাকে liar বলিলে এটা আমার প্রাণে সহিতেছে না।"—তেমি আমাকে কাণ্টের ভাষায় illusionবাদী বলিতে চাও বলো, নব্য ভাষায় Relativity বাদী বলিতে চাও বলো, তাহাতে আমি ঘাড় পাতিয়া দিব, কিন্তু মায়াবাদী বলিলে আমার প্রতি তুমি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেছ মনে করিব।

প্রকৃত কথা এই—যে-কোনো একটা বস্তু দেখিলেই তাহাকে আমাদের মনে হয় Solid reality—জীবের এইরূপ unavoidable ভ্রমের নাম অবিদ্যা এবং মায়া তা ছাড়া আর কিছুই নহে।

(২)

প্রীতিভাজনেষু

আমাদের দেশের প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যাকে নিভৃত গুহা-গহ্বর হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া জনাকীর্ণ নগর-পল্লীতে তাহার নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে আপনার মতো সুপণ্ডিত সহৃদয় ও সদাশয় ব্যক্তিকে সহায় পাইয়া আমি যে কি আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে আমি এখন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখি—আর বেজায় গরম পড়িয়াছে বলিয়া হাতের কলমও ভাল সরিতেছে না; এইজন্য আর বেশী ভূমিকায় কালাতিপাত না করিয়া আপনার প্রথম প্রশ্নটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম; অবশিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর স্বতন্ত্র আর গোটা চারি পত্রে যথাক্রমে দিব।

প্রথম প্রশ্ন। "গীতার যে-সকল স্থানে সাংখ্য কথাটির

*পত্রগুলি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত। সতীশবাবুর বোলপুরে অবস্থানকালে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার নানারূপ দার্শনিক আলোচনা হইত। সতীশবাবু তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের "গীতাপাঠের ভূমিকা"র ইংরেজী অনুবাদ করিতেছিলেন। এই সূত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সতীশবাবুকে পত্রে লিখিয়া জানাইতেন।

প্রয়োগ আছে তাহা কি সাংখ্যশাস্ত্র নামে কোনো চিন্তাপ্রণালী বা তত্ত্বজ্ঞানের একটি শাখাকে নির্দ্দেশ করে, না কপিল মুনির সাংখ্য দর্শনের কথা এ সকল স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে ?"

উত্তর। "সাংখ্য যে পদার্থ টি কি তাহা গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্যে মোটের উপরে এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ
অহং তেভ্যোঽন্যঃ তদ্ব্যাপার সাক্ষীভূতো
নিত্যো গুণ বিলক্ষণ আত্মা ইতি চিন্তনং
সাংখ্যো যোগঃ।

ইহার বাংলা,—

"এই যে সত্ত্বরজস্তমোগুণ এগুলা দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়, আমি এই সকল দৃশ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ আর তাহাদের ব্যাপার সকলের সাক্ষীস্বরূপ নিত্য এবং নির্গুণ আত্মা—এইরূপ চিন্তনের নাম সাংখ্য যোগ।"

ত্রিগুণ যে পদার্থটি কি তাহা পত্রে বেশী বাহুল্যরূপে বলা অপেক্ষা যো সো করিয়া সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করাই এখানে সুবিধা বোধ করিতেছি।

Motion এবং Matter যে physical scienceএর মুখ্য আলোচ্য বিষয় এবং তাহাই যে জ্ঞেয় প্রকৃতির সারসর্ব্বস্ব একথা পাশ্চাত্য Scientistদিগের সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে এই যে motion ও matter ছাড়া চঞ্চলতা ও জড়তা ছাড়া—"প্রকাশ" নামক যে আর একটি পদার্থ আছে তাহাকেও জ্ঞেয় প্রকৃতির অঙ্গের সামিল করিয়া ধরা আবশ্যক। কেন না Motionই বলো, আর Matterই বলো কিছুই কিছু না, যদি না তাহা কাহারও নিকটেই প্রকাশ না পায়; আর সেইজন্য দৃশ্য বস্তমাত্রই Matter (জড়তা), Motion (চলতা) এবং তাহাদের প্রকাশ্যতা বা প্রকাশ (Kantএর ভাষায় Synthetic unity) এই তিনের সমবায়ই জ্ঞেয় প্রকৃতির সারসর্ব্বস্ব—তিনের একটি ছাড়িয়া আর দুইটি থাকিতে পারে না। "প্রকাশ" শব্দে এখানে প্রকাশযোগ্যতা [বস্তুর প্রকাশযোগ্যতা = সত্ত্বগুণ, চলতা = রজোগুণ, প্রকাশের অযোগ্যতা = তমোগুণ] সাংখ্যের মতে প্রকৃতির সেই প্রকাশযোগ্য অংশে—সত্ত্বাংশে নির্গুণ আত্মা সম্বন্ধযুক্ত হইলে সেই সত্ত্বগুণরূপী objective প্রকাশ subjective প্রকাশের রূপ ধারণ করে। আমাদের নিদ্রা-কালে যেমন আমাদের বিনাকর্তৃত্বে আপনা আপনি (automatically) চলিতে থাকে, জাগ্রত অবস্থাতেও সাধারণতঃ তাহা সেইরূপ automatically চলিতে থাকে, কিন্তু আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস তীব্রবেগেই চলুক আর মৃদুভাবেই চলুক—Conservation of energy এবং তাহারই অঙ্গীভূত Conservation of matter বলিয়া যে একটা Scienceএর গোড়ার principle আছে তাহার প্রসাদাৎ—তাহার (অর্থাৎ সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের) অন্তর্ভুক্ত বায়বীয় Matter এবং Motionএর মোট quantity কোনো কালেই পরিবর্ত্তিত হয় না; এমন কি আমাদের automatically প্রবৃত্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপরে ইচ্ছার বল প্রয়োগ করিয়া তাহার বেগ কমাই বাড়াই, তাহা হইলেও তাহার (অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস-রূপ physical phenomenonএর) মোট quantity (অর্থাৎ বায়বীয় matter এবং motionএর মোট quantity) একটুও (ইচ্ছারূপী Subjective phenomenonএর সহিত সংযোগের গুণে) বাড়ে কমে না। এটা যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জাগ্রতকালে কখনও বা Consciousness; কখনও বা Sub-consciousness এবং নিদ্রাকালে শুধুই কেবল Sub-consciousness অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে—আর Subconsciousness যখন Consciousnessএরই ন্যূনতম মাত্রা বই নূতন কোনো পদার্থ নহে, তখন, নিশ্বাস প্রশ্বাস Matter (জড়তা) Motion (চলতা) এবং Consciousnessএ প্রকাশ-যোগ্যতা—এই তিনের সমবায়, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যে অংশে নিশ্বাস প্রশ্বাসের motion বৃদ্ধি হয় সেই অংশে তাহার জড়তা এবং প্রকাশযোগ্যতা কমিয়া যায় (যে অংশে kinetic ভাবের বৃদ্ধি হয় সেই অংশে potential ভাব কমিয়া যায় and *vice versa*)। যে অংশে জড়তা বৃদ্ধি হয় সেই অংশে তাহার চলতা এবং প্রকাশযোগ্যতা কমিয়া যায়, যে অংশে তাহা

প্রকাশযোগ্য হয় সেই অংশে তাহার জড়তা এবং চলতার সামঞ্জস্য ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে যে, জ্ঞেয় প্রকৃতির গোড়ার উপাদান শুদ্ধ কেবল দুইটি মাত্র নহে—Matter এবং Motion মাত্র নহে—তমোগুণ ও রজোগুণ মাত্র নহে; পরন্তু প্রত্যেক জ্ঞেয় বস্তুতে, জড়তা, চলতা এবং প্রকাশযোগ্যতা এই তিনটি element ন্যূনাধিক পরিমাণে আবির্ভূত হয়। সকল বস্তুতেই তিন গুণই এক সঙ্গে থাকে তবে কি? না কোনটি বা বেশী ফুটিয়া বাহির হয়—কোনোটি বা চাপা দেওয়া থাকে—কোনোটি বা অর্দ্ধস্ফুট ভাব ধারণ করে। যেমন electricityতে Motion ফুটিয়া বাহির হয়—perceptibility, প্রকাশযোগ্যতা এবং জড়তা চাপা দেওয়া থাকে; আলোকে প্রকাশযোগ্যতা ফুটিয়া বাহির হয়, Motion এবং জড়তা সামঞ্জস্যভাব ধারণ করে; মৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে জড়তা ফুটিয়া বাহির হয়—প্রকাশযোগ্যতা এবং চলতা চাপা দেওয়া থাকে। Matter—তমোগুণ, Motion—রজোগুণ, প্রকাশযোগ্যতা—সত্ত্বগুণ, আর সমস্ত প্রকৃতি এই তিনের সমবেত কার্য্যকারিতার উপরে ভর করিয়া পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যে বিকশিত এবং কারণে বিলীন হইয়া পুরুষের ভোগ মোক্ষ সাধনে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে—এই কথাটি সাংখ্য দর্শনের মুখ্য মন্তব্য কথা, কাপিল সাংখ্যেরই বা—পাতঞ্জল সাংখ্যেরই বা কী আর উপনিষদ সাংখ্যেরই বা কী—যেখানে যে কোনো সাংখ্যের উল্লেখ আছে—সেইখানেই ত্রিগুণের ঐ ব্যাপারটি তাহার সারসর্ব্বস্ব।

এইখানেই এ যাত্রা ইতি করিলাম। আপনার প্রথম প্রশ্ন এবং আর আর প্রশ্ন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে—তাহা পর পরবর্ত্তী পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বর্ত্তমান প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধীয় লিখিত এবং লিখিতব্য পত্রগুলা যদি কাহাকেও দিয়া নকল করাইয়া আমার নিকটে প্রেরণ করেন তবে বাধিত হইব।

অনুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৩)

প্রীতিভাজনেষু

আপনার ২৪শে মে তারিখের পত্রে আপনার প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আপনি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন আর সেই সঙ্গে গীতাপাঠের ইংরাজী অনুবাদ যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলাম। গীতাপাঠের গোড়ার অংশের অনুবাদটি মোটের উপর আমার খুব ভাল লাগিয়াছে কিন্তু তাহা একবার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া যদি কোনো এক বা একাধিক স্থান পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক মনে হয়, তবে উহাকে সেইরূপ করিয়া গড়িয়া প্রস্তুত করিয়া আগে আপনার দৃষ্টি জন্য পাঠাইব মনে করিয়াছি; ইহা করিতে যদি একটু-আধটু বিলম্ব হয় তবে মার্জ্জনা করিবেন।

সাংখ্যকারিকা প্রভৃতি প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে সাংখ্য দর্শনের সমগ্র মতটা যেরূপ পরিপাটি শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে সাজাইয়া দাঁড় করানো হইয়াছে তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবেই (*bona fide*) কাপিল সাংখ্য একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটি বিনা তর্কে শিরোধার্য্য করিয়া আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, গীতার সাংখ্য, কাপিল সাংখ্য এবং পাতঞ্জল সাংখ্য—এ তিনের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রকার মারাত্মক রকমের মতভেদ নাই। এইটিই এখানে সবিশেষ বিবেচ্য যে, কপিল মুনি এ কথা বলেন নাই যে "ঈশ্বর নাই," বলিয়াছেন কেবল—"ঈশ্বর অসিদ্ধ," অর্থাৎ ঈশ্বর কোনো প্রকার প্রমাণের গম্য নহেন!*

(৪)

সাংখ্যাচার্য্যদের অভিপ্রেত নিরীশ্বর শব্দের অর্থ যদি হইত—"ঈশ্বর নাই", তাহা হইলেই এইরূপ বলা শোভা পাইত যে কাপিল সাংখ্য এবং পাতঞ্জল সাংখ্য পরস্পরের বিরোধী। একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যদি বলেন যে,

* এবারে আমি আপনার ছয়টি প্রশ্নের এক সঙ্গে মোট বাঁধিয়া আষ্টেপাষ্ঠে সবটার সম্বন্ধে যাহা আমার বক্তব্য তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম

Gravitationএর মূলে Electricityর কার্য্যকারিতা আছে, আর আরেকজন যদি বলেন যে, তাহা যে আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল সেই বাদাবাদের উপর ভর করিয়া একথা বলা উচিত হয় না যে, উভয়ের মত পরস্পরের বিরোধী, তেমি পাতঞ্জলি বলিতেছেন, "প্রকৃতির মূলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে" এবং কপিল বলিতেছেন যে, "তাহার কোন প্রমাণ নাই," শুদ্ধ কেবল এই দুটা কথার উপরে ভর করিয়া এরূপ বলা উচিত হয় না যে, কাপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জল সাংখ্য পরস্পরের বিরোধী, কেন না প্রকৃতি, পুরুষ, এবং উভয়ের মধ্যগত সংযোগ বিয়োগ জনিত—ভোগ মুক্তি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই কাপিল সাংখ্যের সহিত পাতঞ্জল সাংখ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ মিল রহিয়াছে, কেবল—পাতঞ্জল সাংখ্যে প্রকৃতির মূলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের কথাটি অধিকন্তু জুড়িয়া দেওয়া (super-added) হইয়াছে মাত্র। আমার এই কথাটি অনেকে অনেকরূপ ভুল বুঝিতে পারেন বলিয়া উহার প্রকৃত মর্ম্মটি আমি খুলিয়া-খালিয়া বলিতেছি, প্রণিধান করুন। Euclidএর 1st Book এর 47th Propositionটা আমি যদি Algebraর সাহায্যে এইরূপ প্রমাণ করি—

Let a, b, c represent the sides AB, BC, CA of the right-angled trangle A B C and let the hypotenuse c be divided into the two segments X and Y by the perpendicular BD let fall on the hypotenuse c. Then by reason of the similar triangles ABC, ABD, BCD,

$$a^2+b^2=cx+cy=(x+y)\,x+(x+y)y$$
$$=x^2+2xy+y^2=(x+y)^2=c^2$$

অতএব এটা স্থির that the squares based on the two sides representing the base and the height of a right-angled triangle are together equal to the square based on the hypotenuse. এই যে Algebraical প্রণালী (method of demonstration) ইহা Euclidএর প্রণালী হইতে নিতান্তই ভিন্ন—এইরূপ বোধে যদি একজন Geometrician বলেন—"তোমার প্রণালী ঠিক নহে—Euclidএর প্রণালীই ঠিক" তবে তাঁহার সে কথা সত্য—না যদি বলেন, "তোমার প্রণালীও ঠিক, Euclidএর প্রণালীও ঠিক," একথা সত্য? অবশ্য দ্বিতীয় কথাটাই সত্য। আমি তেমি বলিতে চাই যে, এই মর্ত্ত্য জীবনেই যাহাতে অস্থায়ী ক্ষণিক সুখদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সাধক মুক্তির অর্থাৎ Perfect Freedomএর রাজ্যে উত্থিত হইয়া সদানন্দচিত্তে, অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন তাহাই আমাদের দেশীয় সকল দর্শন শাস্ত্রেরই মুখ্যতম উদ্দেশ্য। তাহার মধ্যে পাতঞ্জল সাংখ্যের প্রণালী একরূপ, কাপিল সাংখ্যের প্রণালী একরূপ এবং শাঙ্কর বেদান্তের প্রণালী একরূপ—তিন প্রণালী তিনরূপ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপরি-উক্ত Algebraical প্রণালী এবং Geometrical প্রণালীর মধ্যে যেমন form-গত প্রভেদ ভিন্ন মর্ম্মগত প্রভেদ নাই, তেমি দর্শনের ঐ তিন প্রণালীর মধ্যে formগত প্রভেদ ভিন্ন মর্ম্মান্তিক কোন প্রকার প্রভেদ আমি স্বীকার করি না। এ বিষয়ে গীতার সহিত আমি একবাক্য। গীতাকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বালকেরাই সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে প্রভেদ দেখে। সাংখ্য মতে প্রকৃতিকে সম্যক্‌রূপ জানিতে পারিলেই প্রকৃতিজাত ক্ষণিক সুখদুঃখের প্রতি সাধকের বিতৃষ্ণা জন্মে-বিতৃষ্ণা জন্মিলেই সাধক প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা করেন আর সেইসঙ্গে জ্ঞানে বুঝিতে পারেন যে, "আমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র"—তাহা হইলেই সাধকের মনোবৃত্তি বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়; আর সেই গতিকে সাধক ক্ষণিক সুখদুঃখের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া—স্বাধীনতার অটল শান্তি অন্তরে অনুভব করিয়া—সদানন্দ ভাব ধারণ করেন। যোগ-শাস্ত্র বলে যে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সাধক জীবন-মুক্তি লাভ করেন। সাংখ্য এবং যোগ উভয়েরই মতে চিত্তবৃত্তিকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আপনার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই সাধকের পরম

পুরুষার্থ। সাংখ্য বলিতেছে—প্রকৃতিকে ভাল করিয়া জানা চাই—প্রকৃতিকে ভাল করিয়া জানিলেই তাহার উপরে বিরাগ উপস্থিত হইবে, বিরাগ উপস্থিত হইলেই মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে; যোগশাস্ত্রেও অবিকল তাহাই বলে এবং সেই সঙ্গে অধিকন্তু বলে যে, তাহার (অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানলাভের) প্রধান উপায় ধারণাধ্যান এবং সমাধি এবং সর্ব্বপ্রধান উপায় ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বরেতে ভক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম সমর্পণ করিলে সাধক অনাসক্ত অপরাজিত এবং সদানন্দ চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য-সকল বিধিমতে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন; এবং তাহারই নাম জীবনমুক্তি। মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, সাংখ্য = কাপিল সাংখ্য, এবং যোগ = পাতঞ্জল যোগ। কিন্তু সাংখ্য এবং যোগ উভয়েরই গোড়ার উপাদান (অর্থাৎ মালমসলা) উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে; এই উপনিষদের সাংখ্য ছাড়া মূল কাপিল সাংখ্য যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। শাঙ্কর বেদান্ত এবং কাপিল সাংখ্যের মধ্যে প্রভেদ যে কিরূপ তাহা ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে শাঙ্কর ভাষ্যে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এইরূপ—

মূলশ্লোক

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবৎ শৃণু তান্যপি॥

শাঙ্কর ভাষ্য

প্রোচ্যতে = কথ্যতে; গুণসংখ্যানে = কাপিল শাস্ত্রে। তদপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রং গুণ ভোক্তৃ বিষয়ে প্রমানং এব—পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে যদ্যপি বিরুদ্ধ্যেত।

ইহার বাংলা

গুণসংখ্যান কিনা কাপিল শাস্ত্র গুণভোক্তৃ বিষয়েই প্রমাণ - কেবল পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে তাহার প্রমাণ বিরুদ্ধ। ইহাতে এইরূপ স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, ব্যবহারত (অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে) পুরুষ যে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির ভোক্তা এ বিষয়ে শঙ্কর এবং কপিলের মধ্যে মূলেই মতভেদ নাই। মতভেদ কেবল এইখানটিতে যে সাংখ্যমতে প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর হইতে সমূলে স্বতন্ত্র, শাঙ্কর বেদান্তের মতে প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে পরমার্থতঃ (in reality) প্রভেদ নাই, যে হেতু পরমার্থতঃ ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা। বেদান্তের মতে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একই, সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রের মতানুসারে সাধক যদি শমদমাদি দ্বারা চিত্তশোধন করিয়া জীবেশ্বরের ঐক্য সম্যক্‌জ্ঞানে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন, আর সেই শুভযোগে সাধকের আত্মা পরমাত্মাতে অথবা, যাহা একই কথা, স্বরূপে, প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই সাংখ্য এবং যোগ উভয়েরই চরম অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য বলি যে, শাঙ্কর বেদান্ত পাতঞ্জল সাংখ্যের শত্রু নহে পরন্তু পরম সহায়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি পাতঞ্জল সাংখ্য কাপিল সাংখ্যের পরম সহায়, এক্ষণে দেখাইলাম শাঙ্কর বেদান্ত পাতঞ্জল সাংখ্যের পরম সহায়। সাংখ্য এবং বেদান্তের মর্ম্মস্থানীয় ঐক্যের সহিত আমি যে ঝিনুকের উপমা দিয়াছি তাহার মর্ম্মগত তাৎপর্য্য এইরূপ—

একটা ঝিনুককে যদি দ্রষ্টার সম্মুখে টেবিলের উপরে রাখা হয়, তাহা হইলে তাহার উপরের খোলাটার concave পৃষ্ঠ নীচে পড়ে এবং নীচের খোলাটার concave পৃষ্ঠ উপরে পড়ে, এই অর্থে ঝিনুকের দুই কপাট পরস্পরের বিপরীতমুখী। একই ঝিনুকের দুই কপাট যেমন পরস্পরের বিপরীতমুখী, তেমি বলা যাইতে পারে যে, একই সত্যের subjective side এবং objective side পরস্পরের বিপরীতমুখী। সাংখ্য যাহাকে objective ভাবে দেখিয়া প্রকৃতি বলেন, বেদান্ত তাহাকেই subjective ভাবে দেখিয়া ঐশীশক্তি বলেন; কাজেই আমি দুয়ের মধ্যে—কেবল পর্য্যালোচকের দৃষ্টি-ভেদ ছাড়া আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। ফল কথা এই যে, আমাদের দেশের দার্শনিক ইতিহাসকে শুদ্ধ কেবল ইতিহাসভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে এক প্রকার অনধিকারচর্চ্চা। এই জটিল পুরাতত্ত্ব পথের খ্যাতনামা অনুসন্ধানকর্ত্তারা কেবল দুই চারিটি ঐতিহাসিক milestone অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং শুদ্ধ কেবল তাহারই উপর ভর করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যাহা স্থির

করিয়াছেন—আমার মনে হয় যে, তাহার অধিকাংশই অন্ধকারে ঢ্যালা নিক্ষেপ। যে-সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের পণ্ডিতমহলে সর্ব্ববাদিসম্মত সেই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তগুলিকেই আমি আমার আলোচনা-ক্ষেত্রে স্থান দিয়াছি—অন্য সকল অঙ্ককেরে ইতিহাস তত্ত্বকে আমি প্রশ্রয় দিতে নিতান্তই নারাজ। আমার গীতাপাঠ পুস্তকে প্রধান একটি সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্বকে বিশেষ মতে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি—সেটি হচ্ছে ত্রিগুণ তত্ত্ব। Conservation and transformation of forces যেমন Physical scienceএর সর্ব্বপ্রধান গোড়ার তত্ত্ব আমি তেম্নি মনে করি যে, আমাদের দেশের পুরাতন আচার্য্যদিগের আবিষ্কৃত ত্রিগুণ তত্ত্ব Physical এবং Metaphysical সমস্ত Scienceএরই গোড়ার তত্ত্ব; এবং সেই গোড়ার তত্ত্বটি আমাদের দেশের সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদিসম্মত। আমার গীতাপাঠ প্রবন্ধে আমাদের দেশের এই পুরাতন বহুমূল্য আবিষ্কারটিকে লোকের চক্ষে বিধিমতে ফুটাইয়া তোলা আমি সব চেয়ে বেশী আবশ্যক মনে করিয়া তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি বিবরণ যাহার অধিকাংশই বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের স্ব স্ব কপোলকল্পিত—সে-সকল অঙ্ককেরে বিষয়গুলাকে আমি ভুলেই ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করি নাই—সাহসও করি না।

আমার শরীর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অপটু হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ চক্ষু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; তাহা হইবারই কথা—যেহেতু আমার বয়স বিগত ফাল্গুনে ৮২তে পদনিক্ষেপ করিয়াছে। আমার সাহায্যে আপনি যেরূপ সদয়ভাবে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে রাশি রাশি ধন্যবাদ দিয়া এইখানেই আজিকার মত ক্ষান্ত হইলাম।

গুণানুরক্ত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথের পিতা অমরনাথ চৌধুরীর বয়স হইয়াছে। বয়স হিসাবে যে খুব বেশী তা নয়, কারণ এখনো তার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তবে চক্ষের দোষ হওয়াতে কিছু অপটু হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে ছানি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, এজন্য ভাল দেখিতে পাইতেন না, শরীরও দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বিষয়-কর্ম্মের ভার ক্রমে ব্রজনাথের হাতে আসিতেছিল, কাজ-কর্ম্ম দেখা শুনা, হিসাবপত্র রাখা অনেকটা ব্রজনাথকেই করিতে হইত। ব্রজনাথ বেশ কর্ম্মঠ হইয়া উঠিতেছিল।

ব্রজনাথ বাড়ী ফিরিলে পর তাহার মাতা কর্ত্তাকে বলিলেন,—ছেলে বড় হয়ে উঠ্‌ল, তোমারও আগের মত শক্তি নেই, ছেলের বিয়ে দাও না কেন? কত জায়গা থেকে কথা আসচে, ভাল ভাল সম্বন্ধ আসচে, তুমি ত গা কর না। যত ভাবনা আমার!

অমরনাথ ধীর প্রকৃতির হাস্যমুখ মানুষ, একটু হাসিয়া কহিলেন,—ছেলে বই ত আর মেয়ে নয়, ব্রজর বিয়ের জন্য ভাবনা কি? তা বেশ ত, তুমি দেখ, ভাল পাত্রী পেলেই বিয়ে দেওয়া যাবে।

কর্ত্তার যেমন ঠাণ্ডা মেজাজ ছিল গৃহিণীর সে রকম ছিল না। তিনি বলিলেন,—এ ত যেন ছেলে, মেয়ের বিয়ের বেলাই তোমার কোনো ভাবনা ছিল? তুমি দিব্যি

বসে বসে তামাক টানো আর গায়ে বাতাস দিয়ে বেড়াও আর আমি আকাশ-পাতাল ভেবে সারা হই। টুনুর বিয়ের বেলা তুমি কি করেছিলে? আইবুড়ো মেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল, ভাবনায় ত রাত্রে আমার ঘুমই হত না, আর তোমার কি, নাকে সরষের তেল দিয়ে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুতে। এখন ছেলের বিয়ে হবে, কোথায় তুমি ঘটক-ঘটকী লাগাবে, মেয়ে দেখবে, না বেশ আরামে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছ, আর আমি সংসারের খাটুনীর উপর ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াই। ভগবান যে কেন তোমাকে পুরুষ মানুষ করেছিলেন তাই আমি ভাবি।

ব্রজনাথের মাতা ভবসুন্দরী যে লোক মন্দ ছিলেন তা নয়, তবে গৃহিণীপনার ঝাঁঝ তাঁহার একটু অধিক ছিল। মুখখানি চলিত বেশী আর বন্ধ হইত কম, আর কথাটা যেখান হইতে যাহাকেই লইয়া আরম্ভ হউক শেষ হইত গিয়া কর্ত্তার উপর। আর সকলে যেন তবলা, কর্ত্তা যেন বাঁয়া। তবলায় যেমন মৃদু মৃদু আঙুলের ঘা পড়ে বাড়ীর অপর লোকের উপর সেইরূপ গৃহিণীর কথার আঘাত পড়িত কিন্তু শমের বেলা কর্ত্তাকে পিঠ পাতিতে হইত তখন তাল পূর্ণ হইত। অমরনাথ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন, গৃহিণীর কথায় তিনি রাগ করিতেন না, বিচলিতও হইতেন না। তবে তিনি যে কাজের লোক নন এ কোনো কথাই নয়। সামান্য অবস্থা হইতে তিনি এক রকম ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন কেবল নিজের চেষ্টায় ও কর্ম্মতৎপরতায়। বাগাড়ম্বর তাঁহার কোনো কালে ছিল না, সঙ্গতিপন্ন বলিয়া কোনো অভিমানও ছিল না।

গৃহিণীর কথার কোনো উত্তর না দিয়া অমরনাথ বাহির বাড়ীতে আসিলেন। ব্রজনাথকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ ব্রজ, হিজলীতে আমাদের যে নতুন কাজ আরম্ভ হয়েছে তার আদায়পত্র একবার আমাদের নিজেদের দেখা উচিত। সেখানকার নায়েব বিশ্বাসী লোক হলেও তার যে বিশেষ বিষয়-বুদ্ধি আছে তা আমার মনে হয় না। আমরা একজন গেলে আয় আরও বাড়তে পারে। আমার শরীর ত এই দেখ্‌চ, চোক খারাপ হতে আরম্ভ হয়েচে, শরীরেও আগেকার মত সামর্থ্য নেই, আমার গেলে বিশেষ ফল হবে না। আমার ইচ্ছে তুমি একবার গিয়ে দু'চার মাস থাক, নিজে সব দেখ শুন তা হলে ভাল হয়। তবে সেখানকার জলহাওয়া তেমন ভাল নয়, শরীর যদি সুস্থ না থাকে তা হলে বেশী দিন থেকো না। এদিকে তোমার মা-ঠাকরুণ তোমার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েচেন, এইমাত্র আমাকে বল্‌ছিলেন। তা সে কথাও বটে, তোমার বাইশ বছর বয়স হ'ল, আমরা দু'জন কে কবে আছি কবে নেই, বউ-মা এসে ঘরের লক্ষ্মী হবেন। তুমি হিজলী থেকে ফিরে এলেই তোমার বিয়ে দেব।

ব্রজনাথ বলিল,—আমি দু'চার দিনের মধ্যেই হিজলী যাব, সেখান থেকে আপনাকে সব খবর পাঠাব। সেখানে জর-জাড়ি হয় বটে, কিন্তু আমার জন্য আপনি ভাব্‌বেন না, আমি সাবধানে থাকব আর কবিরাজ মহাশয়ের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে হরেরাম সর্দ্দারের কয়েকজন লোক নিয়ে যাব।

—সে কথা ভাল। পথে কোনো ভয় না থাক্‌লেও দু'চার জন শক্ত লোক সঙ্গে থাকা ভাল। আর হিজলীর পথে ভয় ত আছেই।

পিতার আদেশ-মত ব্রজনাথ হিজলী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। অর্থ উপার্জ্জন করিবার লোভে হিজলীতে অনেক লোক যাইত, কিন্তু সেখানে জরের বড় প্রকোপ, অনেকে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসিত। হিজলী যাওয়ার সম্বন্ধে একটা প্রবাদ ছিল যে যাইবার সময় লোকেরা বুক ফুলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া, সদর্পে উৎসাহের সহিত যাইত, কিন্তু ফিরিবার বেলা জরে কাঁপিতে কাঁপিতে, কুব্জদেহ হইয়া, ক্ষীণকণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে নিরুৎসাহিত হইয়া ফিরিত।

ব্রজনাথের মাতা ব্রজনাথ হিজলী যাইবে শুনিয়া রাগিয়া অস্থির। রাগও বটে, ভাবনাও বটে। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ছেলের শীঘ্র বিবাহ দিবেন আর এদিকে ছেলে চলিল আর এক দেশে। তাও কি দেশটা ভাল? পোড়া কপাল এমন দেশের! দশজন যদি যায় ত তাহার মধ্যে আট-জন জরে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসে। প্রথম রাগের সময় কর্ত্তাকে সম্মুখে না পাইয়া

ভবসুন্দরী আপনা-আপনি বকিতে লাগিলেন। সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল ছোট ছেলে ভোলানাথ। সে মায়ের আদুরে ছেলে, মাতা রাগিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। সে বলিল—মা, তুমি অমন করে' বক্‌ছ কেন? কি হয়েছে?

—দেখেছিস্ ওর আক্কেল? কোথায় ব্রজনাথের বিয়ে হবে না তাকে পাঠাচ্ছেন বনবাসে।

ভোলানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল—অমন বনবাসে আমি যেতে পেলে ত বর্ত্তাই। দাদা যাচ্ছে টাকা আন্‌তে, কত টাকা নিয়ে আসবে তখন দেখো। সে তো আর বারো বছরের জন্য যাচ্ছে না, দু'চার মাস পরেই ফিরে আস্‌বে। তখন খুব ঘটা করে' তার বিয়ে দিও। এখন এত চেঁচামেচি কর্‌চ কেন?

টাকার কথা শুনিয়া গৃহিণী একটু নরম হইলেন। কিন্তু কোনো কথা সহজে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না, বলিলেন,—তা সেজন্য যে ব্রজনাথকেই পাঠাতে হবে এমন ত কোনো কথা নেই। আর কাউকে পাঠালেই হ'ত।

—আর কে যাবে? বাবার শরীর ভাল নয়, তিনি যেতে পারেন না। অন্য লোককে দিয়ে যদি হ'ত তা হলে নায়েব ত সেখানে আছে। আমাদের নিজের এক-জনের যাওয়া উচিত। বাবা কি আর না বুঝে-সুঝে দাদাকে পাঠাচ্ছেন? তুমি সব কথায় চেঁচিয়ে বাড়ী ফাটাও। এর পর দাদা যখন টাকার তোড়া নিয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌বে তখন তোমার মুখে হাসি ধরবে না।

—টাকা কি মর্‌বার সময় আমি সঙ্গে নিয়ে যাব? টাকা ত তোদেরই জন্য।

—তা বেশ ত। তবে আমরা টাকা আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লে তুমি রাগ কর কেন?

—বেশ, তবে তোদের যা ইচ্ছে হয় কর, আমি আর কোনো কথায় থাক্‌ব না।

—সেটি তোমাকে দিয়ে কোনকালে হবে না, বলিয়া ভোলানাথ চলিয়া গেল।

তাহার পর কর্ত্তাকে পাইয়া গৃহিণী একবার তাঁহার উপর তম্বী করিলেন। কহিলেন,—এই ব্রজনাথের বিয়ের কথা হচ্ছে আর এই সময় তুমি তাকে হিজলী পাঠাচ্ছ কি বলে'? সেখানে গিয়ে যদি ছেলের অসুখ করে?

—তা হলে ফিরে আস্‌বে। সে ত আর বেশী দিনের পথ নয়। এ দিকে বিয়ের কথা হোক্, আমি কনে দেখতে বল্‌চি, তুমিও কোনো ভাল ঘটকীকে বল। মাসখানেক কি মাস দুইয়ের মধ্যে ব্রজনাথ ফিরে আস্‌বে, আমরা মেয়ে দেখে কথাবার্ত্তা কয়ে রাখি, ছেলে ফিরে এলেই বিয়ে দেব। আমরা শুধু ভাল ঘরের ভাল মেয়ে চাই, যৌতুক কিছু চাইনে।

—অমন সোণার চাঁদ ছেলে, কিছু চাইনে কেন? শুধু শাঁখা হাতে ঘরে বউ নিয়ে আস্‌বে?

—কেন, আমার যা আছে তা ত ছেলে বউরই জন্য, তুমি বউকে গহনা দেবে, আমিও গা সাজানো গহনা গড়িয়ে দেব। মেয়েটি ভাল হলেই হল।

—আমার যা গহনা আছে সে সব ত ছেলেদের বউরাই পাবে, তা বলে কি মেয়ের বাপ মেয়ে জামাইকে কিছু দেবে না?

—তার যেমন সঙ্গতি সেই রকম দেবে, কিন্তু দেনা-পাওনার কথা আমি পাড়ব না, সেজন্য কোনো রকম পীড়াপীড়ি করা আমাকে দিয়ে হবে না।

গৃহিণী উত্তমরূপে জানিতেন যে অমরনাথ হাজার ভালমানুষ হইলেও সকল বিষয়ে তিনি বাগ মানিতেন না। তাঁহার বিবেচনায় যাহা অকর্ত্তব্য কাহারও সাধ্য ছিল না যে, তাঁহাকে সেরূপ কাজে প্রবৃত্ত করে। ছেলেদের বিবাহের কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন পাত্রী ভাল চাই, টাকাকড়ির জন্য কন্যাকর্ত্তাকে কখন পীড়ন করিবেন না। সেইজন্য ভবসুন্দরী সেকথা লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লাঠিতে ভর দিয়া হরেরাম সর্দ্দার নিজের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। গ্রামের কিশোরবয়স্ক কয়েকটি ছেলে তাহাকে ক্ষেপাইতেছিল। একজন বলিতেছিল,—দেখ, সর্দ্দার, আগে তোমার দুই ঠ্যাং ছিল এখন হয়েছে তেঠেঙে, দুটো ঠ্যাং আর একটা ঠ্যাঙা।

হরেরাম ক্ষেপিবার পাত্র নয়। হাসিতে হাসিতে কহিল,—ঠ্যাঙ্গাটা যদি তোদের মাথায় পড়ে ?

—তা হলেই কুপোকাৎ, কিন্তু ঠ্যাঙ্গা তুল্‌তে গেলে যে তুমি নিজে আছাড় খাবে।

—তাও বটে, কিন্তু এককালে আমার লাঠির সাম্‌নে দাঁড়াত কে ?

—আদ্যিকালের সে-সব কথা রেখে দাও। তখন ত তুমি ডাকাতের সর্দ্দার ছিলে।

—কোথায় ডাকাতি কর্‌তাম শুনেছিস্ ?

—আমরা কোত্থেকে শুন্‌ব ? তা ডাকাতি করে' তুমি কত টাকা করেছিলে ?

—দেখ্‌ছিস্ নে এই আমার চক্‌মিলানো বাড়ী, পূজার দালান, নহবতখানা ?

ছেলেরা সব হাসিতে লাগিল।

—আর আমার গোয়াল-ঘর দেখেছিস্ ? তার ভেতর তোদের মত বাছুর পূরে রাখি।

ছেলেরা দেখিল বেগতিক। এ বুড়ার সঙ্গে পারিয়া উঠা দায়। এমন সময় ব্রজনাথ আসিয়া উপস্থিত। ছেলের দল সরিয়া গেল। ব্রজনাথ বলিল,—হরেরাম, আমাকে হিজলী যেতে হবে, আমার সঙ্গে পাঁচ-ছয়জন ভাল লোক দিতে পার ?

হরেরাম বলিল,—এস ছোটবাবু; ঘরে বসে কথা কইবে।

দরজা খুলিয়া দুইজনে ঘরে বসিল। হরেরাম বলিল,—হঠাৎ হিজলী যাবে কেন ? সে ত জায়গা ভাল নয়।

—বাবা আমাকে পাঠাচ্চেন। সেখানে আমাদের কারবার আছে, ক্রমেই বাড়চে। বাবার শরীর ভাল নয়, তাই আমাকে যেতে বলেচেন। বেশীদিন থাক্‌ব না, দু'এক মাসের মধ্যে ফিরে আস্‌ব। ফের্‌বার সময় বোধ হয় কিছু টাকা সঙ্গে থাক্‌বে। সেইজন্য জনকতক বিশ্বাসী মজবুত লোকের দরকার। তাই তোমার কাছে এসেছি। আমি দু-চার দিনের মধ্যেই যাব মনে কর্‌চি।

—বেশ ত। আমি বলি কি, তুমি দশজন লোক সঙ্গে নিয়ে যাও, তারা বিশ-পঁচিশজনের মোহড়া নিতে পারবে। ও পথে বড় ভয়, সাবধান থাকা ভাল।

ব্রজনাথ কহিল,—তা' বেশ, দশজনকেই নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে চাকর বামন, বাড়ীর দুজন দরোয়ান যাবে, তারাও শক্ত লোক। আর আমিও তোমার কাছে কিছু শিখেছি। তা ছাড়া এখন বন্দুক হয়েচে; দু-চারটে সঙ্গে থাক্‌বে। টাকাকড়ির মামলা, সতর্ক থাকাই ভাল। তোমার লোকেরা কদিনে আস্‌বে ?

—দিন-তিনেক লাগ্‌বে, এর মধ্যে তুমি আর-সব ঠিকঠাক কর। সঙ্গে সোয়ারি কি থাক্‌বে ?

—আমি ভাবচি ঘোড়ায় করে' যাব, পাল্কী বুড়ো মানুষের সোয়ারি। গোটা-দুই ঘোড়া সহিসে মুখ ধরে' নিয়ে যাবে, আর সব হেঁটে যাবে। পথে ত চটি আছে, রাত্রে চটিতে থাক্‌ব।

—ফিরে আসবার পথে সঙ্গে যদি টাকা থাকে ত চটিতে অপর কারা আছে দেখে-শুনে থেকো। অনেক চটিতে চোর-ডাকাতের আড্ডা। তুমি ছেলে-মানুষ হলেও কোনো রকম গোঁয়ারতুমি কর্‌বে না আমি জানি। তবু সাবধান থেকো যে কেউ যেন গায় পড়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া না বাধায়। যদি তেমন-তেমন দেখ তা হলে দুটো মন্দ কথা শুনেও পাশ কাটিয়ে চলে যেও। আমি বুড়ো হয়েচি তা না হলে তোমার সঙ্গে যেতাম।

—আমি তোমার সব কথা মনে রাখ্‌ব। পারৎ পক্ষে জেনে-শুনে বিপদে পা দেব না, আর নিতান্তই যদি কোনো বিপদ হয় ত তোমার আশীর্ব্বাদে উদ্ধার হব।

বাড়ীতে ফিরিয়া ব্রজনাথ হিজলী যাইবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিল। অমরনাথ পুত্রের উদ্যোগ-তৎপরতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ব্রজনাথ দুইজন বলবান দরোয়ান বাছিয়া লইল। সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিল, দুইটা ভাল ঘোড়া অশ্বশালা হইতে লইল। কতকগুলা আজেবাজে জিনিষ লইয়া লটবহর বাড়াইল না। লাঠি, তরওয়াল ও বন্দুক নিজে দেখিয়া লইল। তৃতীয় দিবস হরেরাম সর্দ্দার দশজন লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া অমরনাথ কহিলেন,—হরেরাম, তোমার বয়স হ'লে কি হয়, তোমাকে দিয়ে এখনো আমাদের অনেক কাজ হয়।

হরেরাম হাতজোড় করিয়া কহিল,—আমি আপনার অন্নে প্রতিপালিত, যেটুকু পারি করি।

ব্রজনাথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, হরেরাম বাছা বাছা লোক আনিয়াছে। দশজনই জোয়ান, প্রশস্তবক্ষ, ক্ষীণকটি, মাংসপেশী লৌহের মত কঠিন। হাতে পাকা বাঁশের তেল চক্চকে লাঠি। হরেরাম একজনকে ডাকিয়া ব্রজনাথকে বলিল,—ছোটবাবু, এর নাম গদা, এই এদের সর্দার। যা বলবার হয় একে হুকুম করবে।

গদা অমরনাথ আর ব্রজনাথকে নমস্কার করিল। ব্রজনাথ কহিল,—গদাধরের হাতে গদা ত দেখ্‌ছি। তরওয়াল খেলা জান?

গদা বিনয়ের সহিত কহিল,—আপনার কৃপায় অল্পস্বল্প জানি। এরাও সব শিখেছে।

—বেশ, তোমরা সকলে তরওয়াল পাবে। বন্দুক ছোড়া আসে?

—অল্পদিন হল একটু একটু শিখেছি।

ব্রজনাথ চাকরকে বন্দুক আনিতে বলিল, নিজে তাহাতে গুলি পূরিল। বন্দুক গদার হাতে দিয়া বলিল—তোমার কৌশল একবার দেখাবে?

—যেমন হুকুম হয়।

কিছুদূরে একটা আমগাছের উপর পরগাছা জন্মিয়াছিল, তাহার হলদে ফুল দেখা যাইতেছিল। সেই পরগাছা দেখাইয়া দিয়া ব্রজনাথ কহিল,—ওটা পেড়ে ফেলতে পার?

গদা বন্দুক তুলিয়া, লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। পরগাছার ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

ব্রজনাথ কহিল,—তোমার হাতের খুব সাফাই। আমরা কাল বেরুব। তোমরা সব তৈরী আছ?

—আজ্ঞা হাঁ, আমাদের যখন হুকুম করবেন আমরা তখনি প্রস্তুত।

পর দিবস পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া, লোকজন সঙ্গে লইয়া ব্রজনাথ হিজলীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সঙ্গীত

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যতদূর জানিতে পারা যায় তাহা হইতে বেশ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীরা সঙ্গীতের খুব অনুরাগী ছিল। বৈদিক যুগের প্রথম দিকেই দেখা যায়, নৃত্য, গীত, বাদ্য তখনকার আর্য্য স্ত্রীপুরুষদিগের নিত্যসহচর ছিল; এ তিনটী না হইলে তাঁহাদের একেবারেই চলিত না। এই তিনটীর অনুশীলন তাঁহারা এত বেশী রকম করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র-হিসাবে সঙ্গীতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটুকু তাঁহাদের নজর এড়াইত না। যজ্ঞে, উৎসবে, খেলায়, আমোদে নাচগানের খুব আদর ছিল। খুব ছোটবয়স হইতে ছেলেমেয়েদের নাচগান শেখান হইত। তবে নাচটা মেয়েরাই একরকম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮৫ সূক্ত) পাই—

'সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টেপতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।'—ঋক্ ৪০

সোম প্রথমে কন্যাকে বিবাহ করেন; তারপর গন্ধর্ব; তারপর অগ্নি বিবাহ করেন; শেষে সে মানুষের পত্নী হয়। এই বৈদিক উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, মেয়েদের প্রথমে সোমরস তৈরী করিতে শেখান হইত; তারপর তারা নাচ শিখিত; তারপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাই শিখিত; শেষে তাহাদের বিবাহ

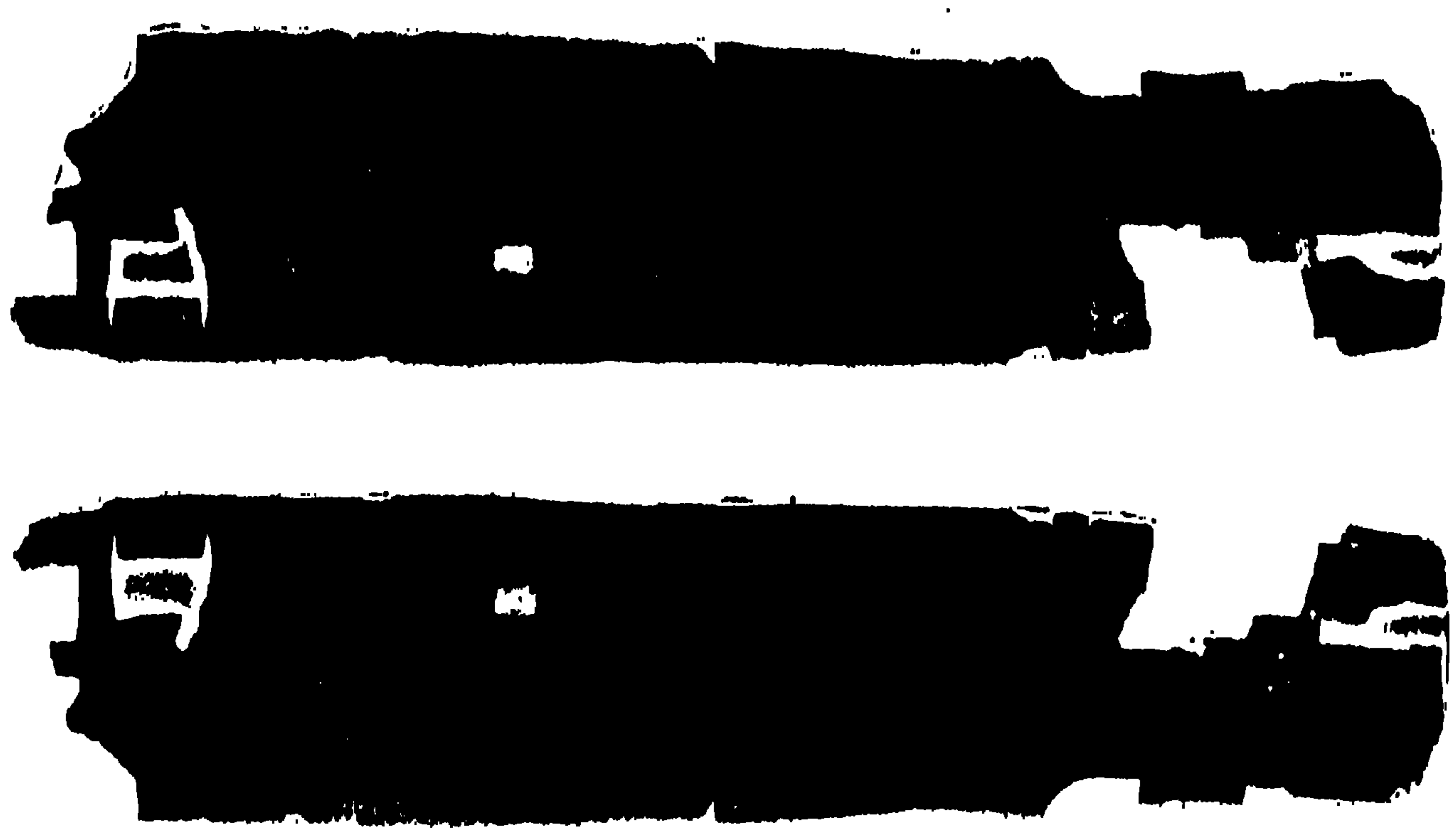

তুর্ফানে আবিষ্কৃত নাটকের দুইটী পৃষ্ঠা

হইত। মেয়েরা সোমরস তৈরী করিবার সময় যে গান করিত তাহার প্রমাণ বেদেই (ঋক্ ৯, ৬৬, ৮) পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে নাচ এমনই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, দাসীকন্যারাও বেশ উচ্চ ধরণের নৃত্য শিক্ষা করিত। কৃষ্ণযজুর্বেদে (৭, ৫, ১০) এক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়—মার্জালীয় অগ্নি জ্বলিতেছে; তাহার চারিদিকে দাসীকন্যারা জলের কলসী মাথায় লইয়া মাটিতে পা তালে তালে ঠুকিয়া নাচিতেছে। এই নাচের সঙ্গে গানও চলিতেছে। দৃশ্যটী অতি চমৎকার। যে সব পুরুষ সঙ্গীত জানিত না, মেয়েরা তাহাদের পছন্দ করিত না; তাহারা নিজেরা ভাল সঙ্গীত জানিত বলিয়াই সঙ্গীতজ্ঞ পতি প্রার্থনা করিত (কৃষ্ণযজু, ৬, ১, ৬)। তখনকার লোকেরা হাসিয়া নাচিয়া জীবন কাটাইতে চাহিত।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে (২৯।৫) স্পষ্ট লেখা আছে যে, কতকগুলি বৈদিক সূক্তের প্রধান অংশ ছিল নৃত্য গীত বাদ্য। সুপ্রাচীন বৈদিক প্রভাবকালে সামগান হইত। আর বৈদিক ঋষিদিগের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ও প্রচ্ছায়-সমীরিত সামঝঙ্কারে সরস্বতী নৃত্য করিত। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহা হইতে গীতের ছন্দোমঞ্জরী আবিষ্কার করিলেন—

"সামবেদাদিদং গীতং সঞ্জগ্রাহ পিতামহঃ।"

এসময় যজ্ঞকার্য্যে যাঁহারা অধ্যক্ষতা করিতেন আর যাঁহারা যজ্ঞদর্শন করিতেন, তাঁহারা হোতাদিগের নীরস মন্ত্র, অধ্বর্য্যুদের সমস্বরবিশিষ্ট আবৃত্তি শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। জনমণ্ডলীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের কল্পনাশক্তির উত্তেজনার কিছু দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের এই অভাব মোচন করিবার জন্য উদ্গাতা নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। ইহাদের কাজ হইল যজ্ঞে সামগান করা। এই সাম ঋগ্বেদ হইতে লইয়া সঙ্গীতের সুরে বাঁধা হইত। ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে সামবেদেই সঙ্গীতের আদি বিজ্ঞান ও কলার অস্তিত্ব। বোধ হয় তাহার পর হইতেই সঙ্গীতের ফোয়ারা ছুটিল। বৈদিক আচারে তখন সকলকেই যজ্ঞ করিতে হইত। কিন্তু সকল যজ্ঞেরই সঙ্গীত একটী বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইজন বীণাগাথী বীণা বাজাইত। একজন ব্রাহ্মণ, একজন রাজন্য। ব্রাহ্মণ দিনের বেলা বাজাইত, রাজন্যের বাজাইবার পালা ছিল রাত্রিতে। পুরুষমেধ যজ্ঞে বীণা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিত। গায়কগণ গান করিত। নৃত্যও হইত। মহাব্রতে নাচ গান বাজনার অবধি ছিল না। মহাব্রত যজ্ঞে তরুণীরা যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে নৃত্য করিত। এই নৃত্য শেষ হইবার পূর্ব্বে পুত্রবতী সধবা পুরন্ধ্রীদিগের নৃত্য হইত। ঐ যজ্ঞে কৌতুকচ্ছলে ঝগড়া ও লড়াইয়ের ভাণ করিয়া দু-একটী পালার অভিনয় পর্য্যন্ত হইত। সোম বিক্রয় ব্যাপার লইয়া কলহের অভিনয়, আর শূদ্র ও আর্য্যের যুদ্ধানুকরণের অভিনয় মহাব্রতে লক্ষ্য করিবার মত জিনিস। ঋগ্বেদে

মন্দিরা বাজাইয়া নাচের কথা আছে; মন্দিরাকে তখন 'আঘাটি' বলিত। পুরুষমেধ যজ্ঞে ঢাকওয়ালাদের ধরিয়া আনিবার কথা আছে। ঢাকওয়ালাদের 'আড়ম্বরাঘাত' বলিত। তখন অনেক রকমের বীণা ছিল। একরকম বীণার নাম 'কর্করি'। নল খাগড়ার গাঁট হইতে একরকম বীণা তৈরী হইত—তার নাম 'কাণ্ডবীণা'। এগুলি মহাব্রত যজ্ঞে বাজান হইত। মহাব্রতে শততন্তুর একরকম বীণা বাজান হইত তাহার নাম—'বাণ'। বৈদিকযুগে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা হইতেছে 'সভা' আর 'সমিতি'। সভাসমিতিতে একদিকে যেমন গ্রামের কথা, পল্লীর কথা, সমাজের কথার আলোচনাদি হইত, অন্য দিকে সেখানে তেমনই আর একটা ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। লোকে সভা-সমিতিতে আসিয়া আমোদ-প্রমোদও করিত। তখনকার সভাসমিতি অনেকটা এখনকার ক্লাবের মত ছিল। লোকে এখানে গল্প-গুজব করিত, নানাপ্রকার খেলার আমোদে মাতিত, আবৃত্তি করিত, নৃত্য গীত বাদ্যের অনুশীলন করিত, বিষয়-বিশেষ লইয়া তর্ক করিত। এই সমস্ত এবং এইরূপ আমোদের ব্যাপার লইয়া বৈদিক আর্য্যদের অনেক সময় কাটিত। তখন কিন্তু নাটক ছিল না। নাট্যশালা বা নটের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। নাটকের উৎপত্তি ঠিক কেমন করিয়া হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই কথোপকথনচ্ছলে উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারের রচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বৈদিক, পৌরাণিক এমন কি পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী রচনাতেও এই রীতি অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে এইরকম রচনা খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে প্রায়ই দেবতাদের সঙ্গে ঋষিদের কথোপকথন দেখা যায়। পুরূরবা ও উর্ব্বশী-সংবাদ (ঋগ্বেদ ১০, ৯৫), বরুণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন (৪, ৪২), যম ও যমীর কথোপকথন (১০, ১০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরাণগুলি পরস্পর কথোপকথন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উপনিষদেও অনেক কথোপকথন আছে। নাটকের অস্তিত্ব না থাকিলেও বৈদিকযুগে নৃত্য, গীত, অনুকরণাভিনয়, রঙ্গভঙ্গী, কথোপকথন—এগুলি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ক্রমশঃ বদলাইয়া অন্য ছাঁচে আসিয়া নাটকাভিনয়ে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে। আর নাচ-গান যখন অভিনয়ের একটী অঙ্গ, তখন এরূপ মনে করাও অসঙ্গত মনে হয় না। সুতরাং বৈদিক যুগেই এই কয় দিক্ দিয়া নাটক উপাদানের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়, একথা বলা যাইতে পারে। অন্য দিক্ দিয়া না হইলেও উক্তি-প্রত্যুক্তির দিক্ দিয়া ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০৮ সূক্ত) পণি ও সরমার কথায় নাটকের আভাস পাওয়া যায়। যথার্থই দুইব্যক্তি এই সূক্ত আবৃত্তি করিয়াছিল। এই সূক্তে এগারটী ঋক্। উদাহরণস্বরূপ তিনটী ঋকের তর্জ্জমা নীচে দেওয়া গেল—

পণিগণ ও সরমা

১। পণিগণ—তুমি কি ভেবে এখানে এসেচ? এ খুব দূরের পথ। এ পথে আসতে হ'লে পিছন দিকে চাইলে আসা যায় না। আমাদের কাছে এমন কি জিনিস আছে যার জন্যে তুমি এসেচ। ক'রাত্রি ধরে' এসেচ? নদীপার হ'লে কেমন করে'?

২। সরমা—ইন্দ্রের দূতী হ'য়ে আমি এসেচি। পণিগণ! তোমরা অনেক গোধন সংগ্রহ করেচ। আমার সেগুলি নেবার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করেচে। জলের ভয় হ'ল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘন করে চলে যাই। এই রকম করেই নদীর জল পার হয়েচি।

৩। পণিগণ—সরমা তুমি তো ইন্দ্রের দূতী হয়ে এসেচ? তোমার ইন্দ্র কেমন? তাঁকে দেখ্‌তে কেমন? আচ্ছা, তিনি আসুন না, আমরা তাঁকে বন্ধু বলে' স্বীকার করতে রাজি আছি। তিনি আমাদের গাভীগুলি নিয়ে অধিকার করুন।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথমে নৃত্যে কেবল তালের দিকে ঝোঁক ছিল, তারপর তালে তালে অঙ্গবিক্ষেপের দিকে ঝোঁক হয়। ক্রমশঃ নৃত্যের সঙ্গে গীত সংযুক্ত হইল। এই সময় লোকে হাব-ভাব দেখাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কালে হাব-ভাব-বিলাস-বিভ্রম প্রকাশের অভ্যাস রীতিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ক্রমে অনুকরণাভিনয়, রঙ্গভঙ্গী ও কথোপকথন সহকারে এই সমস্ত কাজ চলিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে নাট্যের উদ্ভব হয়। প্রথম প্রথম নটের কাজ ছিল চিত্তরঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করা। নর্ত্তক-নির্ণয়ে নর্ত্তনের সংজ্ঞা তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

"অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্ট্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্।
নটৈর্দর্শিতং যত্তু নর্ত্তনং কথ্যতে তদা॥"

সূত্র-সাহিত্যে নাটকের কোন আভাষ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী সাহিত্যে দু-একটা কথা আছে। পাণিনি (৪, ৩, ১১০, ১১১) দুইটী সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—একটী "নটসূত্র," অপরটী "ভিক্ষুসূত্র"। তিনি নটসূত্রকারের নাম দিয়াছেন—শিলালী; ভিক্ষু সূত্রকারের নাম দিয়াছেন—পারাশর্য্য। ভিক্ষুসূত্র নিশ্চয়ই ব্রহ্মসূত্র। নটসূত্র পাওয়া যায় না। পাণিনি প্রথম সূত্রে (৪, ৩, ১১০) "নটসূত্র" শিলালী দ্বারা প্রোক্ত বলিয়াছেন। কৃশাশ্ব নামে আর একজন ঋষিকে নটসূত্রের বক্তা বলিয়া পাণিনি পরসূত্রে (৪, ৩, ১১১) উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কেহ করেন নাই। বৈদিক সাহিত্যে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কোথাও নাই। পাণিনি 'নাট' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নটানাং ধর্ম্ম আম্নায়ো বা"—নটদিগের ধর্ম্ম বা শিক্ষারীতি। কিন্তু পাণিনির সময়ে 'নৃত্য' ও 'নাট্যে' কোন পার্থক্য ছিল কি না কিছুই জানা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় 'নট্' ধাতুস্থানে 'নৃৎ' ধাতু পাওয়া যায়। 'নৃৎ' ধাতুর অর্থ 'নৃত্য করা'। সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় করার অর্থ বোঝায় এমন কোন ধাতু পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃত ভাষায় 'নট্' ধাতু আছে, আর তার অর্থ অভিনয় করা। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দুই শ্রেণীর লোক ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের ভাষা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ভাষা হইতে পৃথক্ ছিল। • উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, আর নিম্নশ্রেণীর ভাষা ছিল প্রাকৃত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যে সকলেই সংস্কৃতে কথা কহিত তাহা নয়, যাহারা শিক্ষিত তাহারাই সংস্কৃতে কথা কহিত। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই প্রাকৃতভাষা বলিত। প্রাকৃতই জনসাধারণের ভাষা ছিল। সুশিক্ষিতের সংখ্যা চিরকালই কম; কাজেই অল্পলোকেই সংস্কৃতে কথোপকথন করিত। সুতরাং মনে হয় শিক্ষিত সমাজ হইতে নটের জন্ম হয় নাই। পরে নট-ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে নট শব্দটী শিক্ষিত-সমাজ আত্মসাৎ করিয়াছে। পাণিনির সময়ে এবং পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সময়ে শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃতে আর জনসাধারণ প্রাকৃতে বাক্যালাপ করিত। পাণিনি নট্ ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে

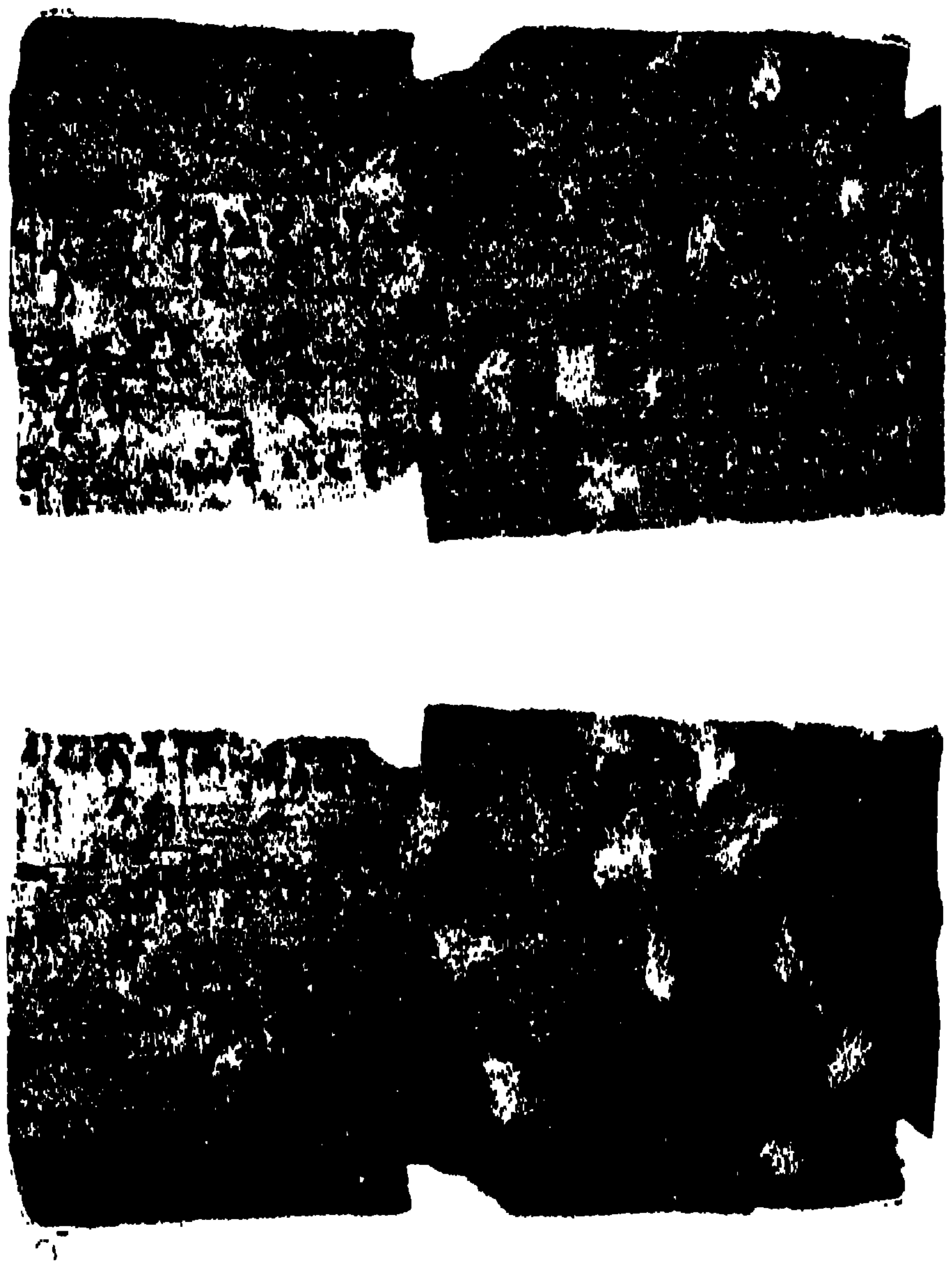

শারদ্বতীপুত্র নাটকের দুইটী পৃষ্ঠা

নট্ ধাতুর উল্লেখ আছে। পাণিনি অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের বৈয়াকরণ। পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন। কাজেই বলিতে পারা যায় খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের পরে "নট" বা "নাটকের" জন্ম হয় নাই। ভরত পাণিনির পরবর্ত্তী। ইনি বলেন, "রসভাবযুক্ত লোকবৃত্তান্ত যিনি অভিনয় করেন তিনি নট।"

"নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোকবৃত্তান্তং
রসভাবসংযুক্তং যস্মাৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ।"

নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি

মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ব্রহ্মাকে সকল বর্ণের জন্য পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন। তাই তিনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত বেদ অনুস্মরণ করিলেন। তারপর

নাট্যবেদ রচনা করিলেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য অর্থাৎ বাক্যাবলী, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ হইতে রস গ্রহণ করিলেন। তারপর ভরত মুনিকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন—এখন 'ইন্দ্রধ্বজ' উৎসব চলিতেছে, তুমি এই উৎসবে নাট্যবেদ প্রয়োগ কর। ভরতনাট্যপ্রয়োগে দেবতাদের বিজয় ও দৈত্যদের পরাজয় দেখান হইতেছিল। তাহাতে দৈত্যেরা ক্ষুব্ধ হইয়া বিঘ্ন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রাগিয়া ধ্বজ গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দিয়া প্রহার করিয়া দৈত্যদিগকে জর্জর করিলেন। ইহা হইতে ইন্দ্রধ্বজোৎসবের নাম হইল—জর্জরোৎসব।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দুইখানি নাটকাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভরত ব্রহ্মাকে বলিলেন, স্বর্গে নাট্যমণ্ডপ তৈরী হইয়া গিয়াছে, রঙ্গ-দেবতারও পূজা শেষ হইয়াছে। এখন কোন্ নাটক অভিনীত হইবে আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মার আদেশে আর সেই মণ্ডপে ব্রহ্মার রচিত নাটক "অমৃত-মন্থন" অভিনীত হয়। অভিনয় দেখিয়া দেবতারা খুব খুশী হ'ন। মহাদেব কিন্তু তখনও এই নাটকের অভিনয় দেখেন নাই। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। আশুতোষ সম্মত হইলে ব্রহ্মা শিষ্যগণ লইয়া ভরতকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চাদ্দিকে "ত্রিপুরদাহ" নাটকের অভিনয় হইল। মহাদেব অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু নাটকে নৃত্য ছিল না। তাই মহাদেব বলিলেন—

'সন্ধ্যায়ং পূর্ব্বরঙ্গস্তু ত্বয়া শুদ্ধঃ প্রযোজিতঃ।
এতদ্বিমিশ্রিতশ্চায়ং 'চিত্রো' নাম ভবিষ্যতি ॥'

—নাট্যশাস্ত্র ৪।১৪

তুমি যে 'পূর্ব্বরঙ্গ' প্রয়োগ করিয়াছ তাহা ভালই হইয়াছে। ইহার সহিত নৃত্য জুড়িয়া দিলে অভিনয় সুন্দরই হইবে সন্দেহ নাই। মহেশ্বরের কথা শুনিয়া স্বয়ম্ভূ নৃত্যের অঙ্গ-হারাদি দেখাইতে বলিলেন। তখন মহাদেব তণ্ডু মুনিকে ডাকিয়া বলিলেন—

"প্রয়োগমঙ্গহারাণামাচক্ষ ভরতায় বৈ।"

—নাট্যশাস্ত্র, ৪।১৬

মহাদেবের আদেশে তণ্ডু ভরতকে সমস্ত দেখাইয়া দিলেন। তণ্ডুর নিকট পাওয়া বলিয়া নৃত্যের সাধারণ নাম হইল—তাণ্ডব।

ইহার পর ভরত দেবলোক স্বর্গে নাট্যপ্রয়োগ করিতেন; আর দেব, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ নাটকের অভিনয় করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার অভিনেতারা বেশ কৃতী হইয়া উঠিলেন এবং নিজেরাই নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা একখানি নাটক রচনা করেন; সেই নাটকে ঋষিদের উপর যথেষ্ট কটাক্ষ থাকে। ঋষিরা সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া অপমানিত বোধ করেন এবং শতসংখ্যক অভিনেতা-দিগকে অভিসম্পাত করেন—

যস্মাদজ্ঞানমদোন্মত্তা ন চেচ্ছাবিনয়ান্বিতাঃ।
তস্মাদেতদ্ধি ভবতাং কুজ্ঞানং নাশমেষ্যতি ॥
ঋষীনাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সমবায়সমাগমে।
নির্ব্রাহ্মণো নিরাহূ (হ) তঃ শূদ্রাচারো ভবিষ্যতি ॥

—নাট্যশাস্ত্র ৩৬ অঃ

তাহাতে তাঁহারা পতিত ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'ন। তখন ভরত ইন্দ্রাদি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করেন। ঋষিগণ কৃপাপরবশ হইয়া অভিশাপের প্রথমাংশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর কিছুকাল পরে নহুষ স্বর্গ জয় করেন। স্বর্গে তিনি নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া ভরতকে তাঁহার রাজধানীতে নাটকাভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভরত শতসংখ্যক ভরতপুত্রকে পৃথিবীতে নহুষ-রাজ্যে আগমন করিতে আদেশ দেন। একশত ভরতপুত্র মর্ত্ত্যরমণীদিগের সহিত তথায় নাটকাভিনয় করেন। এই মর্ত্ত্যস্ত্রীগণের গর্ভে তাঁহাদের সন্তানাদিও হয়। এই সন্তানগণও নটনামে খ্যাত। পরে তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যান।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে নাট্য বা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। তবে নাট্যশাস্ত্র যখন লিখিত হয় তাহার পূর্ব্বে যে নাটক ও নাট্যশালা ছিল তাহা বলিতে পারা যায়। আর সে সময় অভিনয়ে যে স্ত্রীপুরুষ সাজিত তাহাও ঠিক।

পুতুল-নাচের প্রথা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন। মহাভারতেও এ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুতুল-নাচ সূত্রের সাহায্যেই হইত। যিনি সূত্রের সাহায্যে এই অভিনয়-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহাকে 'সূত্রধার' বলা হইত। পরে দেখা যায়, অভিনয়-কার্য্য জীবন্ত মানুষের দ্বারাই করা হইতে লাগিল। তখন যিনি অধিনায়কত্ব করিতেন, তাঁহাকে আর সূত্র ধরিয়া অভিনয় করাইতে হইত না। তবুও তাঁহার পূর্ব্বের সেই 'সূত্রধার' নামটী রহিয়া গেল। এই সূত্রধার হইতে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুতুল-নাচের রীতি নাটকীয় অভিনয়-প্রথার পূর্ব্ববর্ত্তী। নাটকীয় অভিনয়ের উৎপত্তি পুতুল-নাচ হইতে না হইলেও এই রীতি কিছু সহায়তা করিয়াছে। পূর্ব্বে সাধারণ লোকে তাহাদের নিজের ভাষাতেই অভিনয় করিত। কিন্তু একথা সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, অভিনয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল। অভিনয় জনসাধারণের মধ্যে যাত্রার আকারে অভিনীত হইত। 'যাত্রা' এই নামটী দিয়াই বেশ বোঝা যায়—যাত্রা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। 'যাত্রা' বলিলে কোন দেব-দেবীর উৎসব বোঝায়। জনসাধারণের মধ্যে আজও রামায়ণ-মহাভারতের দেবদেবী বা নায়ক-নায়িকার আখ্যায়িকা হইতে অভিনয়ের আখ্যান-বস্তু (plot) সংগৃহীত হইয়া থাকে। রাজাদের দৃষ্টি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবার পর হইতে নাটকের যেমন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি নাটকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে লাগিল। বসন্তোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে রাজপ্রাসাদে অভিনয় হইতে লাগিল, আর রাজকবিরাও নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের অভিনয় কিন্তু খোলা মাঠে যাত্রার আকারেই হইত।

অশোকের প্রথম পর্ব্বত-লিপিতে[১] দেখা যায় 'সমাজ' শব্দের দুইটী অর্থ। গিরনারে এইরূপ পাঠ আছে—

১। প্রজূহিতব্যং ন চ সমাজো কটব্যো বহুকং
দোসং সমাজম্হি পসতি দেবনং পিয়ো পিয়দসি রাজা।
২। অতি-পিতুএ কচা সমাজা সাধুমতা দেবানং পিয়স

অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকার[২] ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার 'সমাজ' শব্দ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ভাণ্ডারকার মহাশয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধসাহিত্য[৩] হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সমাজের দুইটী অর্থ। উদ্ধৃত অশোকের লিপির প্রথম ছত্রে যে 'সমাজ' শব্দ আছে—সেই সমাজে নৃত্য, গীত ও অন্যান্য আমোদ লোকেরা পাইত, আর অশোক এই সমাজকে সাধুসম্মত বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় এই দ্বিতীয় অর্থটী সমর্থন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও[৪] নাট্যাভিনয় অর্থে সমাজের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ইহকালধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বাৎস্যায়ন বলেন, পক্ষান্ত বা মাসান্ত দিনে তখনকার প্রথানুসারে সরস্বতী-মন্দিরের পূজারীরা সমাজের ব্যবস্থা করিবেন। অন্য স্থান হইতে অভিনেতারা আসিয়া অভিনয় করিবে। এই অভিনয়ের নাম ছিল—'প্রেক্ষণম্'। অভিনয়ের পরদিন মন্দির-সেবকেরা অভিনেতাদের অভিনন্দিত করিতেন। তারপর দরকার হইলে পুনরায় অভিনয় হইত, দর্শকদের ইচ্ছানুসারে অভিনয় বন্ধও করিয়া দেওয়া হইত।

বাৎস্যায়নের উক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমাজই একরূপ নাট্যাভিনয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক; কেননা, নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সরস্বতীর মন্দিরেই এই অভিনয় হইত।

বৌদ্ধদিগের জাতক হইতে জানিতে পারা যায়, সমাজ নাট্যাভিনয় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কণবের জাতক[৫] পড়িয়া এটুকু বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময় নটেদের এক একটা দল ছিল, আর তারা নানা গ্রামে, সহরে অভিনয় করিত। ইহারা রঙ্গমঞ্চকে 'সমাজ-মণ্ডল' বলিত।

রামায়ণে (২।৬৭।১৫) নট ও নাটকের উল্লেখ আছে।

১। Rock Edict I.

২ Indian Antiquary, 1913, pp. 255-58.

৩ Ind. Ant. 1918, pp. 221-23.

৪ কামসূত্র, পৃঃ ৪৯-৫১ [Chowkhumba Sanskrit Series]

৫ Fausboll, Jataka, Vol. III. pp. 61-2 (No. 318).

২।৬৭।৩ শ্লোকে আছে 'নাটকানিম্বাহুঃ'। ২।১।২৭ শ্লোকে 'ব্যামিশ্রকেষু' মিশ্রিত ভাষায় লেখা নাটক বোঝায়। কীথ (B. Keith) সাহেব বলেন, রামায়ণের সময়ে নাটকাভিনয়ের কোন ইঙ্গিত নাই। কথাটা ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। কেননা, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৬৭।১৫) স্পষ্টই লেখা আছে—

"নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ।
উৎসবৈশ্চ সমাজৈশ্চ বর্দ্ধন্তে রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ॥"

উৎসবে ও সমাজে অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ে নটেরা আর নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু অরাজক জনপদে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। নাট্যাভিনয়কে রাষ্ট্রবর্দ্ধন বলিয়া লোকে মনে করিত। রাজারাও বোধ হয় লোক-শিক্ষার্থ নাট্যশালার পোষণ করিতেন।

বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ির উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে খোদিত নাসিক-গুহালিপিতে এবং সম্রাট্ খারবেলের হাথীগুম্ফা-লিপিতে নাট্যাভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুলমায়ি উৎসব-সমাজের দ্বারা প্রজাবৃন্দের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। 'গন্ধব-বেদবুধ' রাজা খারবেল* তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে রাজধানীর সকলকে উৎসব-সমাজ করিয়া আনন্দ দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত নাটক কতকগুলি নিয়মে বাঁধা। তবে তাহাতে কলা-কৌশল বিশেষভাবে সম্পাদিত। নাটককারকে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিতে হয়। নাটক-রচনা বিধির জন্য নাট্যশাস্ত্র নামে বিশেষ শাস্ত্র আছে। অভিনয়-কার্য্যে দক্ষ ব্যক্তির কিরূপ গুণ থাকা উচিত, নাটকের ভাষা এবং বাক্‌ছন্দ (style) কিরূপ হইবে এবং নাটকের আখ্যান-বস্তু (plot) কিরূপ হইবে, নাট্যশাস্ত্রে তাহার বিশেষভাবে উপদেশ আছে। বাস্তব জীবনের যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করা সংস্কৃত নাটকের উদ্দেশ্য নহে। সংস্কৃত নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য রসের অবতারণা করা। সুকৌশলপূর্ণ ভাষা এবং হাবভাবের দ্বারা রসের অবতারণা করিতে পারিলেই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত নাটক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে রসজ্ঞ হইতে হয়।

সংস্কৃত নাটকের বয়স নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কোন্ সময়ে কি ভাবে নাটকের জন্ম হইল তাহা বলা সহজ নহে। সাহিত্যে নাটককে যে আকারে দেখা যায় তাহা নাটকের পূর্ণ যৌবনের অবস্থা। শৈশবে যে নাটকের কিরূপ আকার ছিল, সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে মনে হইত মৃচ্ছকটিক নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক। মৃচ্ছকটিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের রচনা বলিয়া অনেকের ধারণাও ছিল। কিন্তু Sylvain Levi'র *Le Theatre indien* বাহির হইবার পর হইতে মৃচ্ছকটিকের বয়স সম্বন্ধে এ ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন লোকে মৃচ্ছকটিকের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। তবে সাহিত্যে যতগুলি নাটক পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই নাটকখানি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের লেখা। ইহার প্রণেতা কালিদাস—বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের কবি। বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কাল ৩৭৫ হইতে ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পূর্ব্বেও যে ভাল ভাল নাটকের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা ঐ নাটকে কালিদাসই স্বীকার করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পূর্ব্বে, ধাবক, সৌমিল্ল, কবিরত্ন প্রভৃতি নাটককারের যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনা পাঠেই জানিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত এই নাটককারদিগের মধ্যে কাহারও একখানি সম্পূর্ণ নাটকও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, দাক্ষিণাত্যবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পুরাতন পুস্তকাগারে ভাস-প্রণীত নাটকের দশখানি হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেন। পরে আরও কয়খানি আবিষ্কৃত হয়। কবি ভাসের রচনা-ভঙ্গী অপূর্ব্ব। ভাসের কোন নাটকে নাট্যশাস্ত্রের পারিভাষিক বিধিনিষেধের সহিত তাঁহার পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁহার পরিভাষা

*। Journal of the Behar and Orissa Research Society, 1917, p. 455.

তাঁহার নিজস্ব। ভাসের সময় এখনও স্থির হয় নাই। কেহ তাঁহাকে খৃষ্টের পূর্ব্বে কেহ বা পরে ফেলিতেছেন। কিন্তু তিনি খৃষ্টের অন্ততঃ তিন চারি শত বৎসরের যে প্রাচীন অন্য প্রমাণ ছাড়িয়া দিলেও তাহা তাঁহার ভাষা প্রমাণ করিয়া দিবে। ভাস যদি খৃঃ পূঃ তৃতীয় চতুর্থ শতকের পরবর্ত্তী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার লেখায় রাশি রাশি অপাণিনীয় পদ থাকিতে পারিত না।

প্রাচীন ভারতের প্রথম নাটক কি তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে কবি ভাসের পূর্ব্বের কোনও নাটক এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ-যুগের কয়েকখানি নাটকের আবিষ্কার হইয়াছে।* এই নাটকগুলি সম্পূর্ণ নহে। তাল পত্রের হস্ত লিখিত পুঁথির বিক্ষিপ্ত অংশমাত্র। এগুলি প্রাচীন কুষাণ-যুগের। সে সময়ে মধ্য এসিয়া কুষাণ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই প্রাচীন নাটকগুলির মধ্যে কুষাণরাজ কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ-রচিত "শারিপুত্র-প্রকরণ বা" "শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ" নামে একখানি নবাঙ্ক বৌদ্ধ নাটকের তালপত্র লিপি কিছুকাল পূর্ব্বে তুর্ফানে (Turfan) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ নাটকখানির অস্তিত্ব পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না। তরুণ-বয়স্ক মৌদ্গল্যায়ন ও শারিপুত্র কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের অনুগ্রহ লাভ করেন এই নাটকে তাহাই বিবৃত আছে। 'শারিপুত্রপ্রকরণে' নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম বেশ বজায় আছে। গ্রন্থখানি একটী প্রকরণ। প্রকরণের নায়ক ধীরপ্রশান্ত সদ্‌ব্রাহ্মণ, মৌদ্গল্যায়নও ঐরূপ ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব, তাঁর দুই শিষ্য, কৌণ্ডিন্য ও একজন শ্রমণ গদ্যে পদ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন ; বিদূষকের ভাষা প্রাকৃত। অশ্বঘোষ এই প্রকরণে বিদূষকের অবতারণা করিয়া নাট্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অশ্বঘোষের পূর্ব্বেই নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম তৈরী হইয়াছিল, আর নাট্যকার সেগুলির ব্যভিচারও করিতেন। অশ্বঘোষ কেবল "অতঃপরম্ প্রিয়মস্তি"প্রশ্নে উত্তর-ব্যঞ্জক ভরতবাক্য দেন নাই, কিন্তু এ টুকুতেই তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই নাটকের দুইখানি তালপত্রের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক

১—মহতী খল্বাস্ত প্রাথিতো [র্]থঃ স ১ হৃদয়গতঃ সম্‌ স্থ (২)...

২—পূয়ান্ অঞ্জলিমপি করয়মানা ন জীবন্তি—ধানং—শারদ্বতী

৩—স্বপ্নমিব—ধানং—ন মে প্রিয়ং যচ্চক্রবাকমিথুনস্ত...

৪—ভোতি—নায়—পি দাসীপুত্র—ধানং—ননু কো হেতুঃ কল[হ]

খ

১-প্ত, প, গ্ল, স্ত, র্[ি] নঃ স্বত্তেন প, র্, ৭ চিত্রগন্ধুনাতপে। নিম্বষ্ট

২—[রম] ণীয়ং ণ্ কারণং ন খু বাকটৈয়ী কলহস্ত বিয় বিসিগ্-রীকা উ (প্)...

৩—য, পারাবতমিথুনস্ত ব্ ব্রূহি কথ বিগ্ গ্রহো জাতঃ—নায—শৃণু...

৪—তিবাহ্ৎ প্র [া] তি সংস্তুতবচনামেনান্ ি [ন] ব্রাবণগতাং মন্ত্রমানস্তক্ষম্

তুর্ফানের আরও দুইখানি নাটকের বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু নাটক দুইখানি নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং তাহাদের বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে নাটক দুইখানির নাম পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারা যায় নাই। ইহার একখানি নাটক রূপক—কতকটা কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ধরণের। এই রূপক নাটকের পাত্র-পাত্রী, বুদ্ধি-ধৃতি, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের শান্তি, শ্রদ্ধা, বিষ্ণু-ভক্তি, সরস্বতী প্রভৃতির অনুরূপ। এই নাটকেরও কিয়দংশের পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল :—

সম্মুখভাগ

১—য্ ভবনিবর্ত্তকেষু ক্লেষেষু ন কিঞ্চিদপি প্ গ্রহাতব্যং যস্ত নিত্যমনিত্য [ং] ব [া] ন [ি] ক [ি] ঞ্চদ [ি] ত্ত বোদ্ধব্য [ং] —ভ. ম. য. ন. ক্ষ. প্ত.১...[ম] [য] ্থ. র.২...[র], জ৩, [য] স্ত [থ্] ব [স] ত৪

২—যেনাবস্তস্ঃ পরমমমৃতমনুর্ত্তমৃতং মনোবুদ্ধিতপিংস্রহমভিমুখে শান্তিপরমে—ধৃতি—অস্তি অস্তি তং মৎপ্রভাবপরিগৃহীতৎ পুরুষ [ং] জ্ঞাকস্তেজঃ প্রাদুর্ভূত [ং]—

৩—স [প] রায়ত্তমি ৬ [দ] শব্দমিতি যত্র হি বুদ্ধিরবতিষ্ঠতে তত্র ধৃতিঃ স্থাবং ৭ লভতে যত্র চ ধৃতিরাধীয়তে তত্র বুদ্ধির্বিপার্য্যতে—কীর্ত্তিঃ—এবং গতে যুবাভ্যামায়৮

৪—[দ] ানী—ক৯...বুদ্ধিঃ—তথা ততপি চ—নিত্যং স স্বপ্ত [ই] ব মত্ত ন বুদ্ধিরস্তি নিত্যং স মত্ত ইব যো ধৃতিবিপ্রহীন

* Koeniglich Preussische Turfan-Expeditionen : Kleinere Sanskrit-Texte, Heft I. 'Bruchstuecke buddhistischer Dramen herausgeben Von Heinrich Lueders, Berlin, 1911 ; Das Sariputra-prakarana, 1911.

১। তমো যেন ক্ষিপ্তম্। ২। ময়ূখৈঃ। ৩। রজো। ৪। যস্য ক্ষপ্তম্। ৫। আবাপ্তম্। ৬। পরম্পরয়াত্তং। ৭। স্থানং। ৮। আয়ত্তাভ্যাং। ৯। ইদানীং ক।

পশ্চাদ্ভাগ

১—তিষ্ [ঠ] তি যদ[ও] কীর্ত্তিঃ—কীর্ত্তি—ক পুনরিদানীং স পুরুষবিগ্রহো ধর্ম্মঃ সম্প্রতি বিহরতি—বৃত্তিঃ—স্বাধীনায়ায়ৃত্তৌ ক পুনর্ব্বি···ব ব্যোম্নি যাতি ব্র—

২—স[ঙ্] গ [স্] ত [ব] দ—পাশ্চবিংশতি বহুধা মূর্ত্তিং বিভ [র্ত্তি] যে বর্বতাসুধানাং জলতি চ যুগপৎ সন্ধ্যাযুদ ইব যচ্ছন্দাৎ-পর্ব্ব···[ব্] রজতি চ বি [ধিব], [দ]—ধ···[যৃ] ম,[এ্] চ চ

৩—[ঙ্] গোচর :—বৃত্তিঃ—তেন হি সর্ব্বা যেব তাবদেনং বাসবৃক্ষাকুম্বঃ এষ হি সমহর্ষি—মগধপুরগো শবনেন্দ্রসম্প্রতি—গোত্র্বব্ ত্র ( ) ঋদ্ধয়দ্ধজালপাণিপা [দ]

অপর নাটকখানি গণিকা-ব্যাপার লইয়া লিখিত। ইহারও নাম জানিতে পারা যায় নাই।

সংস্কৃত নাটকের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত নাটকে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে শিব বা বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রার্থনা করা একটী সাধারণ নিয়ম। একখানি নাটকে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই নাটকখানির নাম—'নাগানন্দ'। শ্রীহর্ষ ইহার রচয়িতা। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পর অবদানশতকে (সংখ্যা ৭৫) একটী বৌদ্ধ নাটকের কথা পাওয়া যায়। ইহাতে বুদ্ধ কুকুচ্ছন্দ ও শোভাবতীর কথা আছে, ভিক্ষুদেরও কথা আছে। তিব্বতী "কা-গুয়ের"ও ইহার উল্লেখ আছে। উল্লিখিত অবদানে লিখিত আছে যে, রাজার সম্মুখে বুদ্ধনাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে নাটকাচার্য্য (directors) বুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সার আলেকজাণ্ডার কানিং-হামের কাগজপত্র ফ্লীট সাহেব কীলহরণের নিকট পাঠাইয়া-ছিলেন। ঐ কাগজপত্রের সহিত দুইখানি শিলালিপির ছাপ তাঁহার নিকটে গিয়াছিল। কীলহর্ণ ১৮৯১ সালে সেই দুইখানির বিবরণ ইণ্ডিয়ান য়্যান্টিকুয়েরীতে প্রকাশ করেন। এই শিলালিপি দুইটী দুইখানি নাটকের। একখানির নাম "ললিতবিগ্রহরাজ" নাটক, অপরখানির নাম "হরকেলি" নাটক।

'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটকখানি শাকম্ভরীর রাজা বিগ্রহ-রাজদেবের সম্মানের জন্য লিখিত। নাটকের রচয়িতা মহাকবি সোমদেব। শিলালিপিতে এই নাটকখানির সাঁইত্রিশটী ছত্র পাওয়া যায়। শিলালিপিটী খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নাগরীতে লিখিত। মহীপতিপুত্র ভাস্কর কর্ত্তৃক ইহা ক্ষোদিত। নাটকের ভাষা সংস্কৃত ও কয়েকটী প্রাকৃত। শিলালিপিতে কোথাও সময়ের উল্লেখ নাই। "হরকেলি" নাটকও একই সময়ের অক্ষরের লেখা। ইহাও ভাস্করের দ্বারা ক্ষোদিত। ইহাতে ভাস্করের, আরও একটু বেশী পরিচয় আছে। ভাস্করের পিতা মহীপতি গোবিন্দের পুত্র। এই গোবিন্দের জন্ম হুনরাজবংশে। ভোজরাজ ইহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই লিপিতে তারিখ আছে। "সংবৎ ১২১০ মার্গশুদি ৫ আদিত্যদিনে শ্রবণ নক্ষত্রে মকরস্থে চন্দ্রে হর্ষণযোগে বালবকরণে॥ হরকেলি নাটকম্ সমাপ্তম্॥ মঙ্গলম্ মহাশ্রীঃ॥ কীর্ত্তিরিয়ং মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রী-বিগ্রহরাজ-দেবস্য॥" নাটকের শেষে এইরূপ লিখিত আছে।

Annual Report Arch. Surv. of India, 1921-22, (পৃঃ ১১৭) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজকেশরী কুলতুঙ্গের একটী অনুশাসনে "নানাবিধ-নাট্যশালা"র ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। তিরুবরিয়ুর নামক স্থানে একটী অভিনয় হইয়াছিল, সেই অভিনয়ে তৃতীয় রাজরাজ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়কে এখানে 'অগমার্গম্' বলা হইয়াছে। প্রথম রাজরাজের নবম বর্ষের একটী অনুশাসনে একজন অভিনেতাকে ভূমিদানের কথার উল্লেখ আছে। এই অভিনেতার নাম কুমারণ সিকণ্টন (কুমার শ্রীকণ্ঠ)। ইনি 'আর্য্যকুত্তু' নামক সপ্তাঙ্ক নাটকের অভিনয়ের জন্য 'সট্টনূর' সমাজ হইতে ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত কথোপথকন

আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলিকাতায় আসিয়াছেন। কথাটা শুনিয়াই বহুদিনের অন্তরের সাধ জাগিয়া উঠিল—ভারত বরেণ্য এই মনীষি-সম্রাটের চরণে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিব। দুই তিনজন সহতীর্থ মিলিয়া অপরাহ্ণে যাত্রা করিলাম।

আচার্য্য শীল তো আমাদের চিনেন না। তাই পরিচয়ের ভার দিয়াছিলাম—আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ও কল্যাণকামী অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের উপর।...

ডাঃ শীল বলিলেন—"দেখ, ভারতের যে একটা কিছু দেওয়ার জিনিষ আছে, এইটাই আমি জানাতে চাই—সে জিনিষ তার খাঁটি নিজস্ব—ইউরোপের প্রতিধ্বনি নয়।"

আমরা—"রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র এই দেওয়ার বাণীই বাইরে নিয়ে এসেছেন—"

আমাদের কথা শেষ হইল না, তিনি খুব একটা গভীর বেদনার স্বরেই বলিলেন—"ইউরোপ ইহাদের বাণী শুনে প্রথমে চমকে উঠলেও তারপর ধীরে ধীরে বুঝে নিচ্ছে—এও তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া জিনিষেরই প্রতিধ্বনি—ভারতের খাঁটি মৌলিক প্রতিভার দান নয়। Slave mentality আমাদের শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রে নয়, cultural slavery ওতপ্রোতভাবে ভারতের সকল প্রতিভাকেই গ্রাস করে' বসেছে—তাই ভারত নিজের দান নিয়ে জগতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না।"

এইখানে আমাদের উপলব্ধি তাঁর জাতিদর্শনের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গেল। বলিয়া উঠিলাম—"ভিতরটা পরাধীন না হলে, একটা জাতি বাইরে পরাধীন হয় না। প্রাচ্যের, এশিয়ার সব জাতিই একে একে ইউরোপের এই সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতার স্রোতে ভেসে যেতে বসেছে—জাপান, চীন, আফগানিস্থান, তুর্ক—ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ভাবে, ভাষায়, অশনে-বসনে পর্য্যন্ত আত্মবৈশিষ্ট্য হারিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যস্ত, ভারতও কি সেইভাবে আত্মবৈশিষ্ট্য হারিয়ে আপনাকে বিক্রয় করবে? আমরা এই কারণেই অন্তর্মুখী হয়ে সর্ব্বপ্রথমে ভারতের cultural awakening চাই। তাই ভারতীয় ধ্বজকে ইষ্ট-বস্তু করে' আমরা সর্ব্বস্ব ঢেলে এই culture'এর প্রতিষ্ঠার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছি।"

আমাদের কথার মধ্যে উৎসর্গের সুরটা এইবার নিবিড়ভাবেই যেন তাঁর অন্তর স্পর্শ করিল। খুব সংক্ষেপেই তাঁর মনের ভাব জানালেন—"হাঁ, এই রকম সবখানি দিয়ে না লাগলে শক্তি হয় না।" জাপানের কথায় একটু প্রতিবাদ করিলেন—জাপান যে একেবারে আত্মবৈশিষ্ট্য হারাইবার পথেই চলিয়াছে, তাহা তাঁহার মতে ঠিক নহে। সহসা তাঁর মুখে-চোখে একটা সুদূরগামিনী দৃষ্টির আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ যেন মনদর্পণে প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি কহিলেন,—"যুগের ভাব, যুগের দান ছাড়লে চলবে না। রাজা রামমোহন বর্ত্তমান যুগ-শক্তিকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি বুঝেছিলেন—দ্বার রুদ্ধ করে' দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে আমরা বাঁচবো না। তাই তিনি নির্ভয়ে যুগোচিত ভাব ও ভাষার আবাহন করিয়াছিলেন—কিছুমাত্র দ্বিধা সঙ্কোচ করেন নি। জগতের জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিজ প্রতিভার ছাপ দিতে ভারত কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভারতের প্রতিভা অমর বস্তু—তার তো মরণের ভয় নেই।"

শেষ কথা কয়টা এমন অদম্য তেজ, অপরিমেয় বিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন, তার প্রত্যেকটি বর্ণ বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ হইয়া সমস্ত অন্তর প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। যুগ-প্রভাতের ঋষি রাজা রামমোহন অব্যর্থ সঙ্কেতে যে ভবিষ্য-ভারতের কল্পচিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তার প্রতি রেখা মানস-পটে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সে আদর্শ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, ক্ষেত্রে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তলে তলে সঞ্চরমান হইয়া, জাতিকে কোন্ মহাবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, কে জানে! রাজার কাজ আজও বুঝি ফুরায় নাই। যুগপুরুষের উত্তরাধিকারী জাতি তাঁর aggressive orientationটুকু ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি চলে, তবেই তার মুক্তির পথ অবারিত হইবে। এই Aggressive Nationalismএর বাণী ডাঃ শীল ঠিক এই রকম ভাষায় না বলিলেও, তাঁর সমস্ত অন্তরখানি অগ্নিমুখী হইয়া ইহারই তেজোরাশি আমাদের অন্তরে ঢালিয়া দিল। আবেগভরে কহিলাম—"যুগদেবতার ইঙ্গিত—এই aggressive orientation, এইটা বুঝেই আমরা একটা dynamic philosophy আমাদের জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে' তুলেছি। আমরা চাই জীবন—life—creative, divine আর উহা জাতিগত ভাবেই প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছি। জীবনের ধর্ম্ম—নির্ব্বাণ, মোক্ষ, বা লয় নয়, জীবন ভগবানেরই expression, এই বাণীটিই আমাদের জাতিকে দিবার; আমাদের সাধনার অনুভূতি ইহাই—সমাধির পরেও জীবন আছে—সেই মহাজীবনেরই অধিকারী ভারত দিগ্বিজয়ে বাহির হবে। নির্ব্বাণ মোক্ষবাদের মূল—জাতির চেতনা থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।"

তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন—দ্রুতশ্বাসে বলিলেন—"না, না—ভারতের নির্ব্বাণ বা মোক্ষবাদ এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা'হলে সনাতন ভারত সভ্যতার বনিয়াদই ভেঙে পড়বে। ও হয় না।—তবে মোক্ষ বা লয়ের নূতন interpretation দিতে পার বটে।"...

বিজয়বাবু এতক্ষণ চুপটি করিয়া বসিয়াছিলেন; এইবার মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"আমি এতক্ষণ কিছু বলিনি। এঁর সম্বন্ধে একটা কথা—ইনি চিরদিন আড়ালে থেকেই দেশকে তাঁর দান দিয়ে এসেছেন। অনেকেই জানেন না—ইনি যেসব নূতন গবেষণা ও সিদ্ধান্ত করেছেন, নানা জনে তাঁর কাছে থেকে তা শুনে নিয়ে, নিজেদের নামেই চালিয়ে দিয়েছে—এই কারণেই তাঁর চিন্তার দান কতখানি দেশ তা জানে না। এঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয়ে আমি খুবই সুখী হয়েছি!"

আচার্য্য মৃদু হাসিলেন—কহিলেন, "সত্য আমার তার নয়—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। আমার দাবী কোন সত্যেই নাই—সত্য আপনাকে আপনি আবিষ্কার করে' চলেছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।"

(প্রবর্ত্তক, বৈশাখ ১৩৩৬) আশ্রমী

—

বলশেভিকবাদ

১৯২১ সালে প্রবর্ত্তিত নূতন নীতি (N.E.P.) অনুসারে (রাশিয়ার) কৃষকগণকে তাহাদের অধিকৃত জমিতে অবাধ প্রভুত্ব দেওয়া হইল—যদিও নামমাত্র গভর্ণমেণ্টই যাবতীয় ভূমির স্বত্বাধিকারী রহিলেন। জমির উপর উদ্বৃত্ত শস্যের দাবী ছাড়িয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার বদলে কর ধার্য্য করিলেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, নিজের জমি নিজে চাষ করিতে হইবে—ভাড়া করা মজুর দিয়া কেহ চাষবাস করিতে পারিবে না। এই নিয়মও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইল। এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের ফলে রাশিয়ার কৃষিসম্পদ এখন প্রতিবৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে।

কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও Communism বা যৌথবাদের আমূল পরিবর্ত্তন করা হইল। যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কেবলমাত্র কারখানা ও বাণিজ্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই সমুদয় পরিচালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। ছোট ছোট কারখানাগুলি গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পুরাতন স্বত্বাধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। বড় বড় কারখানাগুলিও প্রাইভেট কোম্পানিকে lease অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালের মেয়াদে দেওয়া হইল। বিশেষ কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত হইলে গভর্ণমেণ্ট ঐ সমুদয় কারখানার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন।...শ্রমজীবিদের অবাধ প্রভুত্ব লোপ পাইল। যৌথবাদের নীতি অনুসারে ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, ম্যানেজার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ এতদিন শ্রমজীবিদের সমান বেতন পাইতেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রমজীবী-সংঘের নির্দ্দেশানুসারে চলিতে হইত। এখন তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি হইল এবং তাঁহারাই কারখানা চালাইতে লাগিলেন। যাহাতে প্রত্যেক কারখানা স্বাধীনভাবে চলিয়া ব্যবসায়ে লাভ করিতে পারে এখন তাহাই প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইল। কিন্তু তাহাদের লাভের অংশ গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে এরূপ নিয়ম রহিল।

যাহাতে বাহিরের অর্থ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার জন্য "Concession" অর্থাৎ ইজারা নামে আর এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইল। বড় বড় সমবায়কে (Company) বৃহৎ ভূখণ্ডের ইজারা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই ভূখণ্ডের অন্তর্গত কৃষি ও খনিজ সম্পদের অধিকার দেওয়া হইল। এইরূপে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে রাশিয়ার খনিজ-সম্পদ বৃদ্ধি হইতেছে। এই সমুদয় সমবায় যে দ্রব্য উৎপন্ন করিবে তাহার নির্দ্দিষ্ট অংশ গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য।...

দেশের বড় বড় ব্যবসায় রেলওয়ে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এবং বিদেশের সহিত বাণিজ্য এখনও গভর্ণমেণ্টের হাতে আছে, কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে ইহাদের পরিচালনভার ন্যস্ত নহে। যাহাতে প্রকৃত ব্যবসায়ের নীতি অনুসারে পরিচালিত হইয়া এইগুলি লাভবান হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে সমবায়-সমিতি (Trust) এবং কেন্দ্র-সমিতি (Syndicate) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এক প্রকার অথবা পরস্পরের সহায়কারী শিল্প ও ব্যবসায়ের সমবায় সমষ্টি লইয়া সমবায়-সমিতি এবং কতকগুলি সমবায়-সমিতি লইয়া কেন্দ্র সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞগণের হস্তেই এই সমুদয়ের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের ফলে যে ১৯২১ সনের পর হইতে রাশিয়ার শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।...

অপর পক্ষে এই সমুদয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যৌথবাদের (Communism) যে মূলনীতি বলশেভিক দল রাশিয়াতে প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। ১৯১৭ হইতে ১৯২১ সাল যৌথবাদের অগ্নিপরীক্ষার কাল। এই যুগকে চরম যৌথবাদের যুগ (militant communism) বলা হইয়া থাকে। এই যুগে রাশিয়ার চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল।...বলশেভিকেরা কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ঐ যুগের ইতিহাস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, যৌথবাদ, নীতি অথবা তথ্য হিসাবে ভ্রান্ত। যৌথবাদ যে ঐযুগে সুফল প্রসব করিতে পারে নাই তাহার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ রাশিয়ার জনসাধারণ শিক্ষা দীক্ষায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এত পশ্চাৎপদ যে, তাহারা এই নীতির মহিমা এখনও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ কল-কারখানা যে-সমুদয় দেশে অধিকদিন যাবৎ এবং অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং যে দেশে নিঃস্ব শ্রমিকের অপেক্ষা কৃষিজীবীর সংখ্যা অনেক বেশী, সে দেশ যৌথবাদ প্রথম প্রচলনের পক্ষে প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র নহে। কারণ, সাধারণতঃ নিঃস্ব শ্রমিকের দলই এই সমুদয় মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যৌথবাদ সফল না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ সমগ্র ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইউরোপের অন্যান্য দেশে ধনিকদল...যে কেবল রাশিয়ার সহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার সম্বন্ধ রহিত করিয়া তাহাকে 'একঘরে' করিয়া জব্দ করিতে চেষ্টা করিলেন তাহা নহে, উপরন্তু চক্রান্ত করিয়া ও অর্থসাহায্য দ্বারা রাশিয়ার মধ্যে অন্তর্বিরোধ ঘটাইলেন। ১৯১৮ হইতে ১৯২০ সন এই তিন বৎসরে ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকান অর্থের সাহায্যে রাশিয়ান সেনাপতি কলচাক, ডেনিকিন, য়ুডেনিচ, র‍্যাঙ্গেল চারিদিক হইতে রাশিয়া আক্রমণ করেন।...বিশেষতঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় মূলধন ও যন্ত্রপাতির অভাবে রাশিয়ার কৃষি ও বাণিজ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। আজকাল পৃথিবীর সকল দেশই পরস্পরের সহিত এমন নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে সংবদ্ধ যে, সকলে অথবা অনেকে মিলিয়া কোন দেশকে একঘরে করিলে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতি একরকম অসম্ভব হইয়া পড়ে। রাশিয়ার বলশেভিকদল যে এই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা একেবারে উপেক্ষা করিয়াছিল তাহা নহে।...তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাশিয়াতে যেমন নিঃস্ব শ্রমিকের দল স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও রণক্লান্ত শ্রমিকেরা সেইরূপ বিদ্রোহী হইয়া রাজশক্তি অধিকার করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ঐ সমুদয় দেশে শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণীও প্রচার করিয়াছে কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের আশা সফল হয় নাই।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত সফল না হইলেও এখনও তাহারা এই আশা

ছাড়িতে পারে নাই এবং ইহাই তাহাদের বহির্নীতির (Foreign Policy) মূলমন্ত্র। বলশেভিকেরা একথা বেশ জানে যে, যতদিন ইউরোপের অন্যান্য দেশে ধনিকের দল প্রবল থাকিবে, ততদিন রাশিয়াতে যৌথবাদের প্রবর্তন তো দূরের কথা, বলশেভিক রাজশক্তিও নিরাপদ নহে। সুতরাং অন্য দেশে যৌথবাদ প্রচারের চেষ্টা তাহারা আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় রূপেই গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের যৌথবাদী দলকে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে মস্কোতে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক-মহাসংঘ স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই বিখ্যাত "Third International"। এই মহাসংঘের কেন্দ্রস্থান মস্কো নগরী, এবং রাশিয়ার যৌথবাদী রাষ্ট্রশক্তিই ইহার প্রধান অবলম্বন। মধ্যে মধ্যে মস্কো নগরীতে এই সংঘের ভিন্ন জাতীয় প্রতিনিধিগণের অধিবেশন হয়, তাহাতে কি উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যৌথবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহার আলোচনা হইয়া থাকে। অর্থ এবং গুপ্তচর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলাই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। একদল উপযুক্ত গুপ্তচর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মস্কো নগরীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা ও বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। যেখানেই কোন শ্রমিকদলের ধর্মঘট হয় সেখানেই অর্থ-সাহায্য দ্বারা সেই ধর্মঘটের প্রসার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধন করাও ইহাদের অন্যতম কার্য্যপ্রণালীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।...যখন ১৯২১ সালে নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন হইল, তখন অন্য জাতির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে ভিন্নদেশে বিদ্রোহ-প্রচারের চেষ্টা পরিহার করিলেন। অতঃপর তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘই এই কার্য্যে ব্রতী রহিলেন, এবং বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ রহিল না। ইহার ফলে ১৯২২ সালে ইউরোপের অনেক দেশ রাশিয়ার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইল। ১৯২৪ সালের প্রথমে যখন শ্রমিকদলের নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী হইলেন, তখন তিনি রাশিয়ার সহিত বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন (*De jure* recognition)। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ১৯২৪ সনের মধ্যেই ইটালি, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, ডানজিগ, সুইডেন, চীন, ডেনমার্ক, মেক্সিকো, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ রাশিয়ার সহিত এই প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিল। এইরূপে ১৯২৪ সনে রাশিয়া পুনরায় ইউরোপীয় জাতি-সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইল।

কিন্তু যদিও ইংলণ্ডই এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিল, তথাপি ইংলণ্ডের সহিত এই সম্বন্ধ পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ইংলণ্ডের বর্তমান কনসারভেটিভ বা রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট কখনও বলশেভিক রাশিয়ার সহিত সম্বন্ধ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই।...ফলে রাশিয়ার সহিত ব্যবসা বাণিজ্য রহিত হওয়ায় আর্থিক হিসাবে ইংলণ্ড বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের এই লুপ্ত বাণিজ্য অধিকার করিয়া লইবার জন্য জার্ম্মাণি বিধিমত চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডের বণিক-সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং কয়েক দিন হইল তাঁহাদের একদল প্রতিনিধি কিরূপে এই বাণিজ্য-সম্বন্ধ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য রাশিয়াতে গমন করিয়াছেন। এই ব্যাপারে যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পরোক্ষ ইঙ্গিত ও সম্মতি আছে এবং ইহা যে রাশিয়ার সহিত বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ তাহা এক-প্রকার ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

—

হিন্দু-সমাজ-সম্মিলন

হিন্দু জাতির অতীত সহস্রাধিক বৎসর হইতে যে অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কারণ অনেক হইলেও, আমাদিগকে উচ্চ-নীচ-ভাব-ব্যঞ্জক বিভিন্ন-জাতি-গত বৈষম্য ও তন্মূলক একের অপরের প্রতি নীচতা, হেয়তা ও অস্পৃশ্যতাদি দুষ্ট্যজ কুসংস্কারই ঐসকল কারণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও অতি ভয়াবহ।...ইহা যে ব্যক্তি বুঝে না, বা বুঝিয়াও আজন্মসিদ্ধ জাতিনাশকর প্রাধান্য, সুবিধা ও বৃত্তির লোপের ভয়ে প্রকাশ্যে মানিতে চাহে না; শুধু কি তাহাই—ধর্ম্মলোপের ভয় দেখাইয়া অপরিশীলিত সুতরাং অনববুদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের দোহাই দিয়া এই নবজীবনসঞ্চারক উষালোককে যে ব্যক্তি গোঁড়ামীর দুর্ভেদ্য উচ্চ-প্রাচীর উঠাইয়া আবৃত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া থাকে এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতির সাহায্যে অন্তর্নিহিত বিষজ্বালাপূর্ণ কটূক্তি নিবহের বর্ষণ করিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই ব্যক্তি হইতেছে আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রধান অন্তরায়।

আমাদের বাহিরের শত্রু তত ভয়াবহ নহে। সমাজের ভিতরেই যে আমাদের প্রধান শত্রু রহিয়াছে, তাহার করাল আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সম্মিলিত হিন্দু সমাজকে সর্ব্বাগ্রে প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে। এ শত্রু কে? এ শত্রু আমাদিগের অজ্ঞান-মূলক, অত্যুদার সনাতন-হিন্দু-শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা-প্রসূত সহস্রাধিক-বর্ষব্যাপী পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কার ছাড়া আর কেহই নহে। এই কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কারকে আমরা দূর করিব। অগাধ শাস্ত্রসমুদ্রকে বিবেকরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে মথিত করিয়া তাহা হইতে উদ্ধৃত যে সত্যরূপ অমৃত তাহাই আমরা পান করিব—পান করিয়া সজীব হইব, অমর হইব। সেই অমৃতপানে অসীম-শক্তিসম্পন্ন হইয়া আমরা আবার সভ্যসমাজের বরণীয় আসন লাভ করিব। ইহাই হইল আমাদিগের এই সর্ব্বজাতি সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।...

নবযুগে বঙ্গমনীষার বরণীয় আদর্শ রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন প্রবৃত্ত হইয়াছে কিন্তু যেদিন হইতে এই আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছে সেইদিন হইতেই প্রাচীন আচার-পন্থিগণও এই আন্দোলনের অনর্থকারিতা ও সনাতনধর্ম্ম-দ্রোহিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য আড়ম্বরপূর্ণ উদ্যোগও করিয়া আসিতেছেন, ইহা আমাদের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে। সতীদাহ-নিবারণ, বিধবা-বিবাহ, বিলাতযাত্রা, অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও শুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্যকর্তব্য। সমাজ-সংস্কারনিবহের মধ্যে একমাত্র সতীদাহ-নিবারণ ব্যতিরেকে আর সকল সংস্কারই যেরূপ ভাবে যত শীঘ্র হওয়া উচিত, সেইভাবে তত শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। তাহা না হইবার প্রধান কারণ হইতেছে দুইটি—প্রথম, দেশের নেতৃপদে আরূঢ় হইয়া যাঁহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলনে সর্ব্বথা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজ-সংস্কার কার্য্যকে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মুখেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজ-সংস্কার

ব্যতিরেকে স্বরাজলাভ যে অসম্ভব, এই ধ্রুব সত্যের প্রতি তাঁহাদের যে দৃঢ়বিশ্বাস আছে ইহার কোন প্রমাণই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া জনসাধারণ এখনও বুঝিতে পারিতেছে না। বিদেশী পণ্যবর্জ্জন, খদ্দর-প্রচলন, রাজকীয় কার্য্যে অসহযোগ, খাজনা দেওয়া বন্ধ করা প্রভৃতিই তাঁহাদের নিকট স্বরাজলাভের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে।…

আমার বিনীত নিবেদন এই যে এখনও সময় আছে। দেশের বরণীয় রাজনৈতিক নেতৃগণ সর্ব্বাগ্রে হিন্দুসমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কারের জন্য দৃঢ়তাসহকারে অগ্রসর হউন, এবং বঙ্গের এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। সামাজিক আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য আর একটি গুরুতর বাধাকেও অপনীত করিতে হইবে। সে বাধা কি, একণে তাহাই বলিতেছি—জাতীয় উদার শিক্ষার বাধ্যতা-মূলক প্রবর্ত্তন আমাদিগের দেশে এখনও হইতেছে না।…

ব্যাপারটা হইতেছে এই যে সমগ্র বঙ্গদেশে এক কোটি একানব্বই লক্ষ হিন্দু বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক শতে তেরজন মাত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি, ষোলজন নবশাখ ও সচ্ছূদ্র, তেরজন করিয়া মধ্যম জাতি, দশজন করিয়া এমন জাতি আছে যাহাদিগের জল পর্য্যন্ত আচরণীয় নহে। বাকি আটচল্লিশজন এমন নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে তাহাদের জল পর্য্যন্ত স্পৃশ্য নহে। তাহারা এমনই নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে তাহাদের ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল কার্য্যে তাহারা ব্রাহ্মণের—ভূদেবের—মুখ পর্য্যন্তও দেখিবার অধিকার হইতে পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে বঞ্চিত।

আমাদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত, তাহারা কিন্তু হিন্দুর গৌরবাবহ সকল প্রকার অধিকার হইতে দূরে বিতাড়িত। তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য আমাদের মধ্যে উচ্চ জাতিগণ প্রস্তুত নহেন। তাহাদের দারিদ্র্যপীড়িত মলিন পল্লীর মধ্যে আমাদের সমাজের নেতা ভূদেবগণ কখনও প্রবেশ করেন না; তাহারা কি খায়, কি পরে, রোগে, শোকে, অন্নাভাবে, কুসংস্কারে কিরূপ লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিতভাবে দুর্ব্বিসহ জীবনভার বহন করে, তাহার খবর লইলে, তাহাদের সুখ-দুঃখের খবর লইবার জন্য অপেক্ষণীয় মেশামেশি করিলে আমাদের সমাজের জাত্যাভিমানে স্ফীত নেতৃবর্গের ধর্ম্ম রসাতলে যায়, জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়, ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী, স্বার্থপর ও কপটাচারী প্রভৃতি অশ্রাব্য কটূক্তি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রুতিবিবর পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। সনাতন ধর্ম্ম কি—ইহাদিগকে তাহা আমরা জানাইবার জন্য কোন চেষ্টা করি না; জানাইবার সাহস যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে আমাদের ধর্ম্মরক্ষকগণ হিন্দুসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতে গৌরব বোধ করেন, এবং গোঁড়া-দলের মুখপত্রের ভার গ্রহণ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের ও ব্রহ্মণ্য তেজের অসাধারণত্বের বিকট চীৎকারে বঙ্গের আকাশ পবন মুখরিত করিয়া থাকেন। হিন্দুর দেবমন্দির, হিন্দুর পুণ্য তীর্থ, অত্যাচারী অশিক্ষিত দস্যুতুল্য কামুক বিধর্ম্মিগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে এই শতকরা আটচল্লিশজন অস্পৃশ্য তথাকথিত নীচ জাতিগণই কিন্তু সর্ব্বাগ্রে লাঠি হাতে করিয়া বিপক্ষের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয় এবং আমাদের সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে তিলমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। উচ্চজাতির পায়ের জুতা সেলাই করিয়া, পায়খানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া, গমনাগমনের পথে প্রত্যহ ঝাড়ু দিয়া, উদরান্নের সংস্থানের জন্য শীতবর্ষায় আতপে জীবনান্ত করিয়া, ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইয়া ইহারা সেবা করিতেছে, শুধু এখনই করিতেছে তাহা নহে, শত শত বৎসর করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের ঐহিক অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা এমন কিছুই করি নাই, যাহার জন্য ইহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে পারে বা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে। অথচ ইহারা আমাদিগকে প্রভূত সম্মান এখনও করিয়া থাকে এবং খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান হইতেও আমাদিগকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে গৌরব বোধও করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু ইহাদিগের জন্য, ইহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য, সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পবিত্র ভাব ইহাদিগের হৃদয়ে জাগাইবার জন্য কিছুই করিতেছি না এবং আমরা তাহা করিতেছি না বলিয়াই ইহাদিগকে আপনার করিবার জন্য বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সজ্ঘবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ও প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিতেছে, এবং ইহার ফলে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই ব্রহ্মভূমিতে মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের দল কি পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছে, তাহার খবর আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই লইতে উদ্যত আছেন।…

জন্মগত বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-সকল অনিবার্য্য দোষ আসিয়া সমাজ মধ্যে প্রবেশ করে তাহার পরিহার করিতে হইলে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে ব্রাহ্মণবৃত্তসম্পন্ন নহে তাহাকে ব্রাহ্মণ কুল হইতে বহিষ্কৃত করিতেই হইবে। এইরূপ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্ত পালন করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত বিপরীত আচার করিয়া থাকে তাহাকেও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুল হইতে বহিষ্কৃত করিতেই হইবে। এইরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান না করিলে জন্মগত বর্ণব্যবস্থা দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশই সাধিত হইয়া থাকে। জন্মগত বর্ণব্যবস্থার দ্বারা সমাজকে অভ্যুদয়ের পথে পরি-চালিত করিতে হইলে অত্যাচারীকে, অসমর্থকে, অজিতেন্দ্রিয়কে, সেই সেই উচ্চ বর্ণ হইতে বহিষ্কৃত অবশ্যই করিতে হইবে, ইহাই হইল আমাদের দেশের ঋষিগণের তাৎপর্য্য।

বহুকাল হইতে উচ্চবর্ণের হিন্দু জন্মগত বর্ণব্যবস্থা মানিয়াও জন্মগত বর্ণব্যবস্থার দোষ হইতে আত্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ঋষিগণের প্রদত্ত ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। অত্যাচারী পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধু প্রভৃতিকে অনুচিতভাবে রক্ষা করিতে যাইয়া সে ঋষিগণের ব্যবস্থাকে পদদলিত করিয়াছে, তাহার এই অবিমৃষ্য-কারিতা ও এই স্বার্থপরতার পরিণামই হইয়াছে আজ ভারতে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিপর্য্যয়। আজ ভারতে 'ব্রাহ্মণ' নাম আছে মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সহস্রের মধ্যে একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

* *

আমাদের এই সর্ব্বনাশকর জাতি-বৈষম্যের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদিগকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকেই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন করিতে হইবে, কলিযুগে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদি মহাধর্ম্মের আশ্রয় করিতেই হইবে, আমাদের জাতিগত উচ্চনীচ ভাব ও তৎপ্রযুক্ত হিংসা দ্বেষ ও অহঙ্কার সত্য সত্যই ছাড়িতে হইবে। ভগবানের সেবক হইতে হইলে, প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে সকল মানব-দেহে অংশরূপে প্রবিষ্ট সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীমন্দির বিবেচনাপূর্ব্বক জাতিবর্ণকুল-নির্ব্বিশেষে সকলেরই সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে; এই ভাবের সাধনাই হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইলেই মানব প্রেমভক্তি-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে,

তখনই মানব গুণকর্ম্ম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রহস্য ও মহিমা বুঝিতে সমর্থ হয়।...

যাহাদিগের মধ্যে শতকরা আশিজন সত্যসত্যই দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের শতকরা বিশজন লোক যথেচ্ছ ভোগ-পিপাসা মিটাইবার জন্য ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, গাড়ীতে চড়িবে, ইহার নামই নৃশংসতা। ইহা অপেক্ষা জাতির শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে? যাহারা খাইতে পায় না, যাহারা শীত-নিবারণের বস্ত্র জুটাইতে পারে না, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে যাহাদের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক সদসৎ বিবেকের অনুকূল উদার জাতীয় শিক্ষা পায় না, তাহাদিগের যাহারা নেতৃত্ব করিবে, তাহাদিগের যাহারা উন্নতির পথ দেখাইবে, তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় সঙ্ঘশক্তিকে যাহারা জাগাইবে, তাহাদিগকে স্বজাতির জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসী হইতেই হইবে, জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, নিজের জাতিকে, নিজের সমাজকে নিজের সংসার করিয়া তুলিতে হইবে; এইরূপ মনোবৃত্তি যদি আমাদিগের মধ্যে না হয় তাহা হইলে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য যাহা কিছু চেষ্টা সবই নিষ্ফল হইবে; সকলই অরণ্যে রোদন মাত্রে পরিণত হইবে।...

বাংলার হিন্দুজাতি সমূহের মধ্যে একতা, ভালবাসা ও শক্তির সাধনা করিতে হইলে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মৃতসঞ্জীবনীসুধারূপ প্রেম-বন্যায় সকল জাতি মিলিত হইয়া ভাসিতে হইবে, সকল প্রকার উচ্চ নীচ ভেদ ও অমূলক বৃথা অভিমান হিংসা-দ্বেষ দূরে ফেলিয়া দিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে, ইহা যদি কখনও আমরা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের এই সর্ব্বজাতি সম্মেলন সার্থক হইবে।

(মাতৃমন্দির, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬) শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

—

কাব্যে অশ্লীলতা

আলঙ্কারিক মত

সংস্কৃত সাহিত্য শ্লীলই হোক আর অশ্লীলই হোক্, অশ্লীলতা যে কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ, সে বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা বোধ হয় সকলেই একমত।...

আমি দু একটি আলঙ্কারিকের দু-চারটি কথা ধ'রে, সে কালের বিদগ্ধমণ্ডলীর এ বিষয়ে রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়।

কাব্যের দোষগুণের একটি সহজবোধ্য বর্ণের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যাদর্শেই পাই। কাব্যাদর্শ পুরোনো গ্রন্থ, সুতরাং এ বিষয়ে প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক্। দণ্ডি বলেছেন,—

কামং সর্ব্বোঽপ্যলঙ্কারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা॥"

অর্থাৎ—যদিও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার অর্থে রসসিঞ্চন করে, তবুও অগ্রাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে। দণ্ডির মতে অলঙ্কারের সার্থকতা হচ্ছে কাব্যের অর্থের রস ফুটিয়ে তোলায়, কিন্তু অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই তা সুসাধ্য হয়। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, "সালঙ্কারতয়া রসব্যঞ্জকোঽর্থো মধুর ইতি প্রতিপাদিতম্"। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে "বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ"। অতএব দাঁড়াল এই যে, কাব্যের অর্থগত মাধুর্য্য অলঙ্কারের সাহায্যে আরও মধুর হয়, যদি না কাব্যের শব্দ ও অর্থ গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট হয়।

আমরা অশ্লীল বলতে যা বুঝি, দণ্ডি গ্রাম্য বল্‌তে তাই যে বুঝতেন, তার প্রমাণ তাঁর উদাহৃত কোন কোনও শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পাওয়া যায়। গ্রাম্য শব্দের অর্থ অবশ্য vulgar, তবে ইংরাজীতে যাকে indecent বলে তাকে vulgar বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।...

. আলঙ্কারিকদের বক্তব্য যে কি, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাঁদের মতে অশ্লীলতা দোষ হচ্ছে কাব্য-দেহের দোষ—অপর কোন বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার poetics অন্তর্ভুক্ত, ethicsএর নয়। সম্ভবতঃ এই কারণে Hall প্রমুখ ইংরাজদের মতে যে কাব্য ঘোর অশ্লীল ব'লে গণ্য, সে কাব্য আলঙ্কারিকদের কাছে সরস ব'লে মান্য হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাব্যবিচারের মার্গ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গমার্গ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকাশকার বলেছেন যে, কবির ভারতী—

'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।'

যাঁদের মতে কবির প্রতিভা নিয়তিকৃত নিয়মের অধীন নয়, তাঁরা যে কবি প্রতিভাকে মানুষের হাত গড়া সামাজিক বিধি-নিষেধের অধীন ব'লে স্বীকার করবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত; সত্য অথবা শিবের হাত ধ'রে নয়।

গ্রাম্যতা অবশ্য শব্দেরও দোষ, অর্থেরও দোষ। এ কালের মত সেকালেও ভাষা—সাধুভাষা ও ইতরভাষা—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাধু শব্দের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে, ইতর শব্দের সঙ্গে নেই বল্লেই হয়। সুতরাং শব্দের গুণদোষ-বিচার না ক'রে, আলঙ্কারিকদের মতে শব্দের অর্থগত গ্রাম্যতার পরিচয় নেওয়া যাক। সেকালে গ্রাম্যতার অর্থ এ কালের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিল। দণ্ডির মতে—

"কন্যে কাময়মানং মাং ন ত্বং কাময়সে কথম্।"

উক্তিটি অর্থের গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। অপর পক্ষে—

"কামং কন্দর্পচাণ্ডালো ময়ি বামাক্ষি নির্দ্দয়।"

এই উক্তিটি শুধু "অগ্রাম্যোঽর্থঃ" নয়, উপরন্তু রসাবহ।

এ উভয়ের ভিতর প্রভেদ কোথায়, তা ধরতে একটু চেষ্টা করা যাক্। কেন না, বিনা চেষ্টায় তা ধরা শক্ত। এক বিষয়ে এ দুয়ের ভিতর একটা মস্ত মিল আছে। এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব-ছুট। তার পর দুটিতেই একই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে, দুয়ের ভিতর প্রভেদ মাত্র এই যে, প্রথমটি স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনদের মতে কথা সোজাসুজিভাবে বললে তা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললেই, তা শুধু অগ্রাম্য নয়—রসাবহ হয়। অর্থাৎ বুক ও মুখের ভিতর chord lineই গ্রাম্য এবং loop অগ্রাম্য। সেকালের সমালোচকদের দল কি বলা হ'ল, তাতে বিচলিত হতেন না, কি ক'রে বলা হ'ল, তাই ছিল তাঁদের কাছে বড় জিনিষ। একালের ভাষায়, contentএর চাইতে formকে তাঁরা বেশী মর্য্যাদা দিতেন।...

কালক্রমে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ দোষ ব'লে গণ্য হয়। দণ্ডির পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক বামন বলেন—"লোকমাত্রপ্রযুক্তং গ্রাম্যম্।" অর্থাৎ যে কথা শুধু জন-সাধারণের মুখে শোনা যায়—কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না,—সেই কথাই গ্রাম্য। এ কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁরা লোকভাষা ও শাস্ত্রীয় ভাষাকে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা ব'লে গণ্য করতেন। অর্থাৎ লেখায় মুখের কথা চল্‌বে না,—

আর মুখে বইয়ের কথার স্থান নেই। সংক্ষেপে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এ রকমের মত এ কালের অনেক বঙ্গ আলঙ্কারিক ব্যক্ত করেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা অবশ্য এ মতের সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে গ্রাম্য পদের স্থায় 'অপ্রতীত' পদ কাব্যে অব্যবহার্য। অপ্রতীত শব্দের অর্থ কি?

"শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তমপ্রতীতম্"

অর্থাৎ "শাস্ত্রে এব প্রযুক্তং, ন লোকে, তদপ্রতীতং পদম্।" অর্থাৎ পণ্ডিতী শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ দুই কবির কাছে সমান অস্পৃশ্য। এ বিষয়ে আমাদের দেশের আলঙ্কারিকদের সঙ্গে ফরাসী দেশের classical আলঙ্কারিকদের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। তাঁরাও সাহিত্য-রাজ্য থেকে, pedantic ও vulgar শব্দ সকল বহিষ্কৃত করে দেবার জন্ত ধনুক ধারণ করেছিলেন :...

বামন বলেছেন যে, সেই বাক্য অশ্লীল যা "ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্ক-দায়ী।" অর্থাৎ যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। এই হচ্ছে এ বিষয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রের শেষ কথা। কারণ, কাব্যপ্রকাশ,সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি নামজাদা অলঙ্কারশাস্ত্রের অর্ব্বাচীন গ্রন্থ সকলে, ঐ বামনের উক্তিই পুনরুক্ত হয়েছে, এবং আমার বিশ্বাস, এই কথাই এ বিষয়ে চরম কথা। অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলে যাতে লোকের মনে লজ্জা কিম্বা জুগুপ্সার জন্ম দেয়—তাই হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এখন জিজ্ঞাস্য, কার মনে? আলঙ্কারিকদের মতে সামাজিকদের মনে। তাঁরা সামাজিক বলতে বুঝতেন সেই সম্প্রদায়ের লোক—যারা যুগপৎ সভ্য ও সহৃদয়, এক কথায় Cultured society। দেশভেদে ও যুগভেদে Cultured societyরও রুচি বিভিন্ন। Anatole Franceএর কথা ইংরাজের রুচিতে অশ্লীল ঠেকে, ফরাসীদের রুচিতে নয়। আলঙ্কারিকরা অবশ্য স্বদেশী সামাজিকদের কথা বলেছেন, বিদেশী সামাজিকদের নয়।

শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের সেকেলে মতামত একালের লোককে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেহে এখন ত আর সেকালের মত নেই! যুগে যুগে লোকের মনের পরিবর্ত্তন ঘটে, সুতরাং সে কালের বিধি-নিষেধের একালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের মতামত যে-পরিমাণে বদলায়, তার মনের প্রকৃতি সে-পরিমাণে বদলায় না। অতএব অনেক সেকেলে মতামতের অন্তরে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সে মনোভাব কস্মিন্‌কালেও একেবারে বাতিল হয়ে যায় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কার করি যে, প্রাচীন মন বর্ত্তমান মনের চাইতে একধাপ উঁচুতে উঠেছিল।...আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি, তাঁরা যার আলোচনা করেছেন, সে হচ্ছে কাব্যের রূপ। আর যার রূপ নেই, তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী :...

আলঙ্কারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেন না, তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে; কারণ, ব্রীড়া, জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায় ;—একটি বদ্-সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়। কারণ, শ্রোতার কানে তা বেসুরা লাগে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, বে-সুর তার কানেই শুধু ধরা পড়ে—যার প্রাণে ও প্রাণে সুর আছে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ; কেন না, তা সামাজিক লোকের রুচিতে বে-খাপ্পা ঠেকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলঙ্কারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক। মানুষের ভিতর কাব্য-রসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীত-রসিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। এ জাতিভেদ ডিমোক্রাসিও দূর করতে পারবে না। আলঙ্কারিকদের মতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্যরসিক সমাজের রুচি।

এখন সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়। দার্শনিক হিসাবে জার্মাণদের যেমন খ্যাতি আছে, নৈতিক হিসেবে ইংরাজদের, কাব্যরসিক হিসাবে ফরাসীদের তেমনই খ্যাতি আছে।...

অথচ ফরাসী রুচি ইংরাজী রুচির সঙ্গে মেলে না। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরাজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না ব'লে যে তা নিকৃষ্ট, এমন কথা মূর্খ ছাড়া আর কেউই বলবেন না: কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নৈতিক কিম্বা সামাজিক মতামতের উপর নির্ভর করে না। এই সত্যটিও আলঙ্কারিকরা বহু পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছিলেন।...

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা, ইংরাজীতে যাকে বলে morality তার বিশেষ বিচার করেন নি। তবুও এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে উক্তি মানুষের moral senseকে পীড়িত করে, তাও ছিল তাঁদের মধ্যে কাব্যে বর্জ্জনীয়। কবি রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন,—

"অসদুপদেশকত্বাত্তর্হি নোপদেষ্টব্যং কাব্যম্ ইত্যপরে।"

অর্থাৎ, অপর আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁর মতে "অস্ত্যয়মুপদেশঃ কিন্তু নিষেধ্যত্বেন ন বিধেয়ত্বেন"। অর্থাৎ অসাধূপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে, কিন্তু নিষেধ হিসাবে, বিধি হিসাবে নয়।...

কাব্যের প্রভাব যে লোকের মনের উপর প্রবল, সে ধারণা তাঁদেরও ছিল। রাজশেখর বলেছেন, "কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা" "সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্।" এর বাঙ্গালা—লোকের জীবনযাত্রা কবিবচনের আয়ত্ত এবং সে জীবনযাত্রার মূল হচ্ছে নিঃশ্রেয়স, ইংরাজীতে যাকে বলে virtue welfare। অশ্লীলতার স্থায় অসদুপদেশও সে কালেও কাব্যের দোষ বলেই গণ্য ছিল; তবে আমাদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এইমাত্র যে, তাঁরা অসৎ বাক্যকে aesthetic emotionএর প্রতিবন্ধক হিসেবে দুষ্ট মনে করতেন, অপর পক্ষে আমরা আমাদের সোনার সংসার ছারখারে যাবে, এই ভয়েই অস্থির। এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ। কাব্যমীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত; আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।

আমরা যে aesthetic emotionsকে আমল দিইনে, তার কারণ আমরা ইংরাজী-শিক্ষিত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে এ রসে বঞ্চিত, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমি পূর্ব্বে বলেছি, ইংরাজ জাতি ঘোর নৈতিক ব'লে গণ্য, তবে moralityকে তারা utilityতে পরিণত করেছে। আমরা ইংরাজের শিষ্য, ফলে আমাদের সুন্দর অসুন্দর, সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যার জ্ঞান, ইংরাজীজ্ঞানের অনুরূপ। কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে। আমাদের কাব্যে সুরুচি—ইংরাজী অরুচির তরজমা মাত্র।

(মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৩৬) শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

উড়িষ্যার সাম্রাজ্য

কপিলেন্দ্র দেব

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ উড়িষ্যাবাসী আমাদের নিকটে অত্যন্ত ভীরু বলিয়া পরিচিত, ওড়িয়া বা উড়িয়া উত্তর-ভারত বা হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত উড়িয়ার সম্মুখে চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া আমরা এসকল কথা স্বীকার করি বা না করি, আমরা, অন্ততঃ, অধিকাংশ উত্তর-ভারতের অধিবাসী, মনে মনে উড়িয়াকে হেয় মনে করিয়া থাকি। উড়িষ্যা দেশ যতদিন ইংরেজের সাম্রাজ্যের বাঙলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল উড়িয়া ততদিন মনে করিতেন যে কেবল বাঙালীরাই তাহাদিগকে ঘৃণা করে। পনের বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বিহারী বা যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীরাও উড়িয়াকে বাঙালীর মতই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রাষ্ট্রনীতির খাতিরে কোনো কোনো উড়িয়া হয়ত বলিতে পারেন যে, উড়িষ্যা বাঙলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহাদের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা যদি অকপট সত্যকথা বলেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উড়িষ্যার কোনোরূপ উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়াছে।

যে-উড়িয়া বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে ভীরু ও বিশ্বাসঘাতকরূপে পরিচিত, বাঙালী ও বিহারী যখন অবনত-মস্তকে মুসলমানের পাদুকা বহন করিত, সেই উড়িয়াই তখন বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজাদিগকে বারবার পরাজিত করিয়া ভাগীরথী হইতে পেন্নার নদী-তীর পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একদিন উড়িয়া রাজার প্রতাপে বাঙলার মুসলমান রাজা এবং বহমনী বংশের মুসলমান সুলতান কম্পিত হইতেন। এই উড়িষ্যার রাজা সুদূর দাক্ষিণাত্যে বিশাল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানীর উপকণ্ঠ লুণ্ঠন করিয়া সাক্ষী-গোপালের বিগ্রহ এবং জগন্নাথের রত্নবেদী নামক সিংহাসন লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিল। কাঞ্চীর রাজরাজেশ্বর মন্দির-গাত্রে উড়িয়া রাজার বিজয়-গাথা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে হুগলীর সর্ব্বাধিকারী-বংশ এবং মেদিনীপুরের মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর মহাপাত্রগণ উড়িষ্যার রাজাদিগের কৃপায় তাঁহাদের বংশগত প্রাচীন সম্মানের অধিকারী।

ভারতের অন্ধকারময় মধ্যযুগের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা হয় নাই। এই যুগ ঘনতমসাচ্ছন্ন; তুর্কী ও তাতার জাতীয় মুসলমানের তীব্র আক্রমণে প্রাচীন দ্রাবিড় ও আর্য্য সভ্যতা লুপ্তপ্রায়। আর্য্যাবর্ত্তে তখন মন্দির নির্ম্মাণ রহিত হইয়াছে, রাজপুতানার মরুময় প্রদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্র শিল্পী ও স্থপতি নিজ বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াছে, কবি প্রায় কাব্য বা প্রশস্তি রচনা পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং ইতিহাস-রচনার একমাত্র উপাদান জয়দৃপ্ত মুসলমানের আত্মগৌরব কাহিনী; তাহাতে কেবল বিজেতার আত্মশ্লাঘা এবং বিজিতের আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, কারণ মুসলমান ঐতিহাসিক তখনও সার-সত্য লিপিবদ্ধ করিতে শিক্ষা করে নাই। হিন্দুর পরাজয়, হিন্দুর মন্দির-লুণ্ঠনলব্ধ অসংখ্য রত্ননিচয় ও হিন্দুর কাপুরুষতার কাহিনীতে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতীয় মুসলমানের ইতিহাস পরিপূর্ণ। মুসলমান ঐতিহাসিক যেখানে পূর্ব্বপক্ষ সেখানে উত্তরপক্ষের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করা কঠিন। এই তমসাচ্ছন্ন যুগে ধীরে-ধীরে ক্ষুদ্র খণ্ড প্রমাণ যোজনা করিয়া উড়িষ্যার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচিত হইতেছে তাহারই কঙ্কাল মাত্র অদ্য উপস্থিত করিতেছি। এই কঙ্কালসার ইতিবৃত্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আধুনিক যুগের তথাকথিত ভীরু উড়িয়ার পূর্ব্বপুরুষগণ মহাবীর ছিলেন, তাঁহাদিগের শৌর্য্যে উত্তরে ও দক্ষিণে মুসলমান রাজগণ সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিতেন, তাঁহারা সেদিন কাপুরুষ ছিলেন না, আসমুদ্র-বিস্তৃত বিজয়নগরের সম্রাটগণকেও আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত

করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহারা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না, ধর্ম্মরক্ষার জন্য উড়িষ্যার সূর্য্যবংশের সম্রাটগণ বারবার বহমনী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া ধ্বংসোন্মুখ বরঙ্গলের কাকতীয়বংশীয় রাজগণকে রক্ষা করিয়াছেন।

বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ অবলম্বনে উড়িষ্যার এই অধুনাতমসাচ্ছন্ন গৌরবময় যুগের ইতিহাস উদ্ধারে প্রথম ব্রতী হইয়াছিলেন একজন বাঙালী। সুধীসমাজে সুপরিচিত ৺ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও আধুনিক বাঙালী পাঠকের নিকট প্রায় অপরিচিত। বহু শিলালেখ, প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া স্বর্গগত চক্রবর্ত্তী মহাশয় উড়িষ্যার সূর্য্যবংশের ইতিহাসের যে কঙ্কাল যোজনা করিয়া গিয়াছিলেন অদ্যাবধি তাহাই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস। বিগত পঁচিশ বৎসরে বহমনী সাম্রাজ্য ও বিজয়নগরের ইতিহাস, শিলালেখ ও প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে এই কঙ্কালে ঐতিহাসিক মেদ ও ত্বক যুক্ত হইয়াছে মাত্র।

গঙ্গবংশের অধিকার কাল উড়িষ্যার ইতিহাসের একটি গৌরবময় যুগ। এই যুগে নীলাচলে বা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের বিমান বা মূল মন্দির, অর্কক্ষেত্র বা কোনার্কে সূর্য্যের মন্দির এবং ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বংশের দ্বিতীয় অনঙ্গভীম ও প্রথম নরসিংহদেবের অধীনে উড়িয়াবীর বাঙালী মুসলমান-দিগকে পদ্মাতীর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়া অবশেষে রাজধানী গৌড় নগরী পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর হইতেই গঙ্গবংশের অবনতি আরম্ভ। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-বঙ্গের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম হিন্দুর করচ্যুত হইয়াছিল এবং বার, বার আক্রান্ত হইয়া উড়িষ্যারাজকে ক্রমে বালেশ্বর পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট গিয়াস্-উদ্দীন তোগ্‌লক্ শাহ তাঁহার পুত্র জুনা খাঁকে দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে প্রেরণ করেন; তিনি বরঙ্গল হইয়া ক্রমে রাজমহেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। রাজমহেন্দ্রী তখনও উড়িষ্যার অধিকারভুক্ত, এই বন্দরের প্রধান দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপরে তিনি যে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখন অব্যবহৃত ও অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সময়ে গঙ্গবংশীয় দ্বিতীয় ভানুদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন (১৩১৬-১৩২৮)। ইহার পরে অশীতি বৎসরের মধ্যে গঙ্গবংশের রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। শেষ রাজা চতুর্থ নরসিংহদেব ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষব্যাপী অরাজকতা উড়িষ্যাবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। এই সময় গঙ্গবংশের শেষ রাজার কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর নামক একজন মন্ত্রী ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধিকার হস্তগত করিয়া ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই কপিলেন্দ্র বা বা কপিলেশ্বর দেব উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজগণের অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা।

যে সময়ে কপিলেন্দ্র দেব উড়িষ্যায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন সেই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র মুসলমানের অধঃপতন ও হিন্দুর পুনরুত্থান আরব্ধ হইয়াছে। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তোগলক বংশের শাসন শেষ হইয়া গেলে সৈয়দ বংশের অধিকার মাত্র নগর-প্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলায় সদুপায়ে অথবা অসদুপায়ে ব্রাহ্মণবংশজাত গণেশ বা কংস, শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস শাহের বংশ উচ্ছেদ করিয়া নূতন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রবলপরাক্রান্ত বহমনী সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ বিজয়নগর সাম্রাজ্য পরাক্রান্ত সেনাপতি সালুব-বংশীয় নরসিংহের নেতৃত্বে আবার কিয়ৎকালের জন্য বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিমে শিশোদীয় রাজপুতগণ কুম্ভ বা কুম্ভকর্ণের অধীনে উত্তরে দিল্লী এবং দক্ষিণে গুজরাট ও মালবের মুসলমান রাজাদিগকে বার বার পরাজিত করিয়া নূতন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন।

উড়িষ্যার কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর (১৪৩৫—৭০ খ্রীষ্টাব্দ), মেবাড়ের কুম্ভ (১৪৩৩-৬৮), দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় মহম্মদ শাহ (১৪৩৩-৪৫), আলম শাহ (১৪৪৫-৫১), বহলোল লোদী (১৪৫১-৮৮), জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ (১৪০০-৪০), মহমুদ শাহ (১৪৪০-৫৬), মহম্মদ শাহ (১৪৫৬-৫৮) ও হুসেন শাহ শর্কী (১৪৫৮-৭৬) বাঙলার দনুজমর্দ্দন দেব, গণেশ, মহেন্দ্রদেব, যদু বা

জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ (১৪১৪-৩১), শমশ-উদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩১-৩৫), নাসির-উদ্দীন মহমুদ্ শাহ (১৪৪২-৫৯), রুকন্-উদ্দীন বারবক্ শাহ (১৪৫৯-৭৪), বহমনী সাম্রাজ্যের সুলতান প্রথম আহমদ শাহ (১৪২২-৩৫), দ্বিতীয় আহমদ শাহ (১৪৩৫-৫৭), আলাউদ্দীন হুমায়ুন শাহ (১৪৫৭-৬১), নিজাম শাহ (১৪৬১-৬৩), এবং তৃতীয় মহম্মদ শাহের (১৪৬৩-৮২), বিজয়নগরের বোডেয়র বংশীয় দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-৪৬), মল্লিকার্জ্জুন (১৪৪৬-৬৫) এবং দ্বিতীয় বীরূপাক্ষের (১৪৬৭-৭৮) সমসাময়িক রাজা ছিলেন।

কপিলেন্দ্র প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে গঙ্গবংশীয় শেষ রাজা চতুর্থ নরসিংহ দেবের মন্ত্রী বা পাত্র ছিলেন এবং ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ দেবের দেহাবসান হইলে তেত্রিশ বর্ষব্যাপী অরাজকতার পরে উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রৌঢ় বয়সের পূর্ব্বে কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বরের পক্ষে রাজত্বলাভ অসম্ভব। যে বৎসর তিনি উড়িষ্যার রাজা হইয়াছিলেন সেই বৎসর বাঙলার সুলতান, গণেশের পৌত্র, যদু বা জলাল্-উদ্দীনের পুত্র শমশ-উদ্দীন আহমদ শাহ নিহত হইলে, শমশ্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের বংশজাত দ্বিতীয় নাসীর-উদ্দীন মহমুদ্ শাহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। নাসির-উদ্দীন মহমুদ শাহের রাজ্যকালে দক্ষিণ-বঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। সপ্তগ্রামে ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার রাজত্বকালে নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদের শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার পূর্ব্ব বৎসরে উৎকীর্ণ আর একটি আরবী শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় মহমুদ শাহের পুত্র মালিক রুকন্-উদ্দীন বারবক্ তখন দক্ষিণ-বঙ্গের অধিকারী ছিলেন। ইঁহার পরে কোনও সময়ে বারবকের সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজী উড়িষ্যার উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর জেলার দক্ষিণাংশে ঘোড়াঘাটের নিকটে কাঁটাদুয়ার গ্রামে রিসালৎ উশ্ শুহাদা নামক একখানি ফার্সী ঐতিহাসিক গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থ অনুসারে ইস্‌মাইল গাজী ৮৭৮ হিজরায় অর্থাৎ (১৪৭৩-৭৪) খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-বঙ্গে নিহত হইয়াছিলেন। প্রবাদ অনুসারে ইস্‌মাইল গাজীর মস্তক রঙ্গপুর জেলায় কাঁটাদুয়ার গ্রামে এবং তাঁহার দেহ হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত মন্দারণ গ্রামে সমাহিত আছে। কপিলেন্দ্র ১৪৩৫ হইতে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। রিসালৎ উশ্ শুহাদায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে ইস্‌মাইল গাজী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি গজপতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। রিসালৎ উশ শুহাদায় "গজপতির" উল্লেখ দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে সে-সময় হুগলী জেলার দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ আরামবাগ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেবের অধিকারভুক্ত ছিল। "গজপতি" উড়িষ্যার রাজার নিজস্ব উপাধি এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে উড়িষ্যার রাজার তুল্য সংখ্যক রণহস্তী ভারতবর্ষে অন্য কোনও রাজার ছিল না। বহমনী বংশের সম্রাট আলাউদ্দীন দ্বিতীয় আহমদ্ শাহের ১৫০টির অধিক রণহস্তী ছিল না, কিন্তু তখন কপিলেন্দ্র দেবের দুইলক্ষের অধিক রণহস্তী ছিল। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর-উড়িষ্যা বাঙলার আফগান বা পাঠানবংশীয় সুলতান সুলেমান কররাণী কর্ত্তৃক বিজিত হইলে খুর্দা এবং গঞ্জামের সামান্য ভূস্বামীরা দীর্ঘকাল "গজপতি" রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন সুতরাং রিসালৎ উশ্ শুহাদায় উল্লিখিত মন্দারণের "গজপতি" যে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর দেব সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সময়ের পরে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আর মুসলমান-অধিকারের কোনই চিহ্ন পাওয়া যায় না। রুকন্-উদ্দীন বারবক্ শাহের পরে বোধ হয় কিছুকাল সমস্ত দক্ষিণ-বঙ্গ উড়িষ্যার রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দের পরে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কপিলেন্দ্রের পুত্র পুরুষোত্তম দেবের রাজ্যকালে বাঙলার সুলতানেরা অল্পদিনের জন্য সপ্তগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে দীর্ঘকাল সপ্তগ্রাম হইতে বাঙলার কোনও সুলতানের মুদ্রা বাহির হয় নাই। গৌড়ে হাব্‌শী

ক্রীতদাসদিগের অত্যাচার ও রাজত্বের সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গ সম্ভবতঃ পুনরায় উড়িষ্যার রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল; কারণ ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দের পরে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত আর একটি শিলালেখে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যকালে সপ্তগ্রামে একটি সেতুনির্ম্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল সপ্তগ্রামের টাকশাল বন্ধ ছিল, ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে আফগান-বংশীয় সম্রাট ফরীদ-উদ্দীন শের শাহের নামে আবার সপ্তগ্রাম টাকশাল হইতে মুদ্রা বাহির হইয়াছিল। সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ১৪৩৫ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কালের মেদিনীপুর, হাবড়া এবং হুগলী জেলার দক্ষিণাংশ মুসলমানদের করচ্যুত হইয়াছিল এবং দক্ষিণ-বঙ্গের প্রধান বন্দর ও নগর সপ্তগ্রাম কেবল মধ্যে মধ্যে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইত।

দক্ষিণে কপিলেন্দ্র ধীরে ধীরে প্রায় মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কাঞ্চী নগর এক সময়ে তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল এবং তিনি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসাম্রাজ্যের রাজধানী বিজয়নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিজয়নগর হইতে কপিলেন্দ্র সাক্ষীগোপাল নামক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ উড়িষ্যায় লইয়া আসিয়াছিলেন। সাক্ষীগোপাল পুরীর অনতিদূরে একটি নূতন মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল এবং বিগ্রহের নাম অনুসারে একটি গ্রামের এবং পুরী লাইনের একটি ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে।

এই সময়ে সালুব-বংশীয় নরসিংহ নামক একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি বিজয়নগরের সম্রাট মল্লিকার্জ্জুনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বহমনী-বংশের সম্রাট আলাউদ্দীন দ্বিতীয় আহমদ্ শাহ ও গজপতি কপিলেন্দ্র দেবের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া বিজয়নগর পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। গঙ্গাদাস-প্রতাপ-বিলাসম্ নামক সংস্কৃত নাটকে দ্বিতীয় আহমদ শাহ এবং কপিলেন্দ্র দেব কর্ত্তৃক বিজয়নগর-অবরোধের উল্লেখ আছে। পরে বহমনী-বংশের সহিত কপিলেন্দ্র দেবের বিবাদ আরম্ভ হইলে সালুব নরসিংহ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বরঙ্গল বা একশিলা নগরী কাকতীয়-বংশের রাজধানী ছিল। দিল্লীর তোগলক্ বংশের অধঃপতনের পরে বরঙ্গল আবার স্বাধীন হইয়াছিল। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলের কাকতীয় বংশীয় শেষ রাজা দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্রকে পরাজিত করিয়া বহমনী সুলতান প্রথম আহমদ্ শাহ বরঙ্গল জয় করিয়াছিলেন। কপিলেন্দ্র দেবের অভ্যুত্থানের পরে মুসলমানদের গতি রোধ করিবার জন্য দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্রের বংশধরগণ এবং কোণ্ডবিড়ুর রেড্ডি বংশীয় রাজগণ উড়িষ্যারাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীন দ্বিতীয় আহমদ শাহের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি সঞ্জর খাঁ, কপিলেন্দ্রের দুই লক্ষ রণহস্তীর ভয়ে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার নিম্নে আসিতে সাহস করিতেন না। দ্বিতীয় আহমদ্ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন শাহের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি ইতিহাসবিশ্রুত মহমুদ ইবন্ মহম্মদ গাওয়ান গিলানী বরঙ্গলের পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত দেবারকোণ্ডা নামক কাকতীয়-রাজগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দেবারকোণ্ডা এখন নিজাম-রাজ্যের নলগোণ্ডা জিলায় অবস্থিত, ইহা মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ-মরাঠা রেলপথের বেজবাডা ষ্টেশনের প্রায় ৬০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। মহমুদ গাওয়ান দেবারকোণ্ডা অবরোধ করিলে অবরুদ্ধ হিন্দুরা কপিলেন্দ্র দেবের নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক আলীবিন্ আজীজ উল্লাহ্ তবাতবা তাঁহার বুর্হান্-ই মাআ' আসীর্ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কপিলেন্দ্র দেবারকোণ্ডার অবরুদ্ধ হিন্দুসৈন্যের সাহায্য এবং হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য একশত রণহস্তী ও বহু সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কপিলেন্দ্র দেবের আগমন-সংবাদ শুনিয়া মহমুদ গাওয়ান পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে সম্মুখে উড়িয়া-সৈন্য ও পশ্চাতে দেবারকোণ্ডার কাকতীয়-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহমুদ গাওয়ান পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান সৈন্যের সমস্ত ধনসম্পত্তি হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্ব হিন্দুদের হস্তগত হইয়াছিল এবং অন্ততঃ ৬,০০০ মুসলমান যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। মহমুদ গাওয়ানের পরাজয়কালে

সুলতান হুমায়ুন্ শাহ দেবারকোণ্ডা হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কপিলেন্দ্র দেবের আগমন শুনিয়া তাঁহার আর দেবারকোণ্ডার দিকে অগ্রসর হইতে ভরসা হইল না, তিনি রাজধানীতে বিদ্রোহের অছিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনুমান হয় যে, ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে কপিলেন্দ্র মহমুদ গাওয়ানকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন শাহের মৃত্যুর পরে কপিলেন্দ্র দেব, অনুমান ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে বহমনী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে হুমায়ুন শাহের বালকপুত্র নিজাম্ শাহ বহমনী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং তাঁহার মাতা মখদুমাহ্ জহান বেগম তাঁহার অছি। এই সময়ে কপিলেন্দ্র বহমনী সাম্রাজ্যের রাজধানী বিদর নগরের পাঁচ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বহুকষ্টে মুসলমান সেনাপতিরা তাঁহাদের রাজধানী অবরোধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিদর বর্ত্তমান হয়দরাবাদ হইতে আন্দাজ ৩৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বিদর আক্রমণকালে কপিলেন্দ্র দেব বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের কামামেট, নলগোণ্ডা, হয়দরাবাদ ও মেডক জিলা লুণ্ঠন করিয়া বহু মুসলমান নরনারী ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং অসংখ্য ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজের বিদর-অভিযানের পরে কপিলেন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কোনও মুসলমান রাজা বঙ্গোপসাগরের দিকের হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতে ভরসা করেন নাই। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে অতিবৃদ্ধ বয়সে কপিলেন্দ্র দেবের মৃত্যু হইয়াছিল। মন্ত্রীর পদ হইতে তিনি নিজের বাহু ও বুদ্ধিবলে সম্রাট্ পদবীলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভয়ে বহমনী সুলতান ও বিজয়নগরের সম্রাট সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিতেন।

ব্যবধান*

থিয়োডোর স্টর্ম

গৃহে

ইষ্টারের ছুটিতে রাইন্হার্ট্ বাড়ী ফিরিল। পৌঁছিবার পরদিনই সে এলিজাবেথের সহিত দেখা করিতে গেল। হাস্যমুখী তন্বঙ্গী বালিকাকে তাহার দিকে আসিতে দেখিয়া রাইন্হার্ট্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ওঃ তুমি কত বড় হয়ে গেছ?" এলিজাবেথের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কোনো কথা বলিল না। অভিবাদন করিতে সে রাইন্হার্টের হাতে হাত দিয়াছিল, কিন্তু তারপরই সে হাত সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাইন্হার্ট্ সসঙ্কোচে তাহার দিকে তাকাইল। এমন তাহার কখনও হয় নাই। বোধ হইতে লাগিল তাহাদের মধ্যে কিসের একটা ব্যবধান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাইন্হার্ট্ দিনকতক সেখানে রহিয়া গেল, প্রত্যহ এলিজাবেথের সহিত দেখাও হইতে লাগিল, কিন্তু প্রথম-দর্শনের সেই সঙ্কোচ কিছুতেই দূর হইল না। দুজনে নিভৃতে আলাপ করিতে বসিলে মাঝে মাঝে তাহাদের কথাবার্ত্তার স্রোত আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া আসিত; রাইন্হার্ট্কে ইহা বড়ই ব্যথা দিত। এই আড়ষ্টভাব এড়াইবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিত।

ছুটির দিনগুলি আনন্দে কাটাইবার জন্য রাইন্হার্ট এলিজাবেথকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখাইতে আরম্ভ করিল—বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইন্হার্ট্ প্রথম কয়েকমাস ইহাই শিক্ষা করিয়াছিল। সকল কাজেই রাইন্হার্টের অনুসরণ করিতে এলিজাবেথ অভ্যস্ত ছিল এবং স্বভাবতঃই তাহার সকল কথা সে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইত; সুতরাং সে সহজেই রাইন্হার্টের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল। তখন হইতে

* শ্রীবঙ্কিম ঘোষ কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ হইতে অনূদিত।

তাহারা সপ্তাহে দুইচার বার বনে জঙ্গলে বেড়াইতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে এলিজাবেথ তাহার থলি ভর্ত্তি করিয়া লতাগুল্ম সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিত, কয়েক ঘণ্টা পরে রাইন্‌হার্ট্‌ও ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের একত্রে সংগৃহীত লতাগুল্মগুলি এলিজাবেথের সাহায্যে ভাগ করিতে বসিত।

একদিন রাইন্‌হার্ট্‌ আসিয়া দেখিল এলিজাবেথের সোনালী রঙের খাঁচায় একটি ক্যানারি পাখী রহিয়াছে। এ খাঁচা বা পাখী রাইন্‌হার্ট্‌ পূর্ব্বে দেখে নাই। খাঁচার মধ্যে পাখীটি ডানা নাড়িতেছিল এবং শিষ দিতে দিতে মাঝে মাঝে এলিজাবেথের আঙুল ঠোকরাইতেছিল। পূর্ব্বে এই খানে রাইন্‌হার্টের দেওয়া পাখীটিই টাঙান থাকিত। রাইন্‌হার্ট্‌ রহস্য করিয়া বলিল, "আমার সে পাখীটা মরে কি এই ক্যানারি হয়েছে?" এলিজাবেথের মা উত্তর দিলেন, "পাখীরা তো সে রকম করে না! তোমার বন্ধু এরিশ্‌ তার জমিদারী থেকে এলিজাবেথের জন্যে আজ এটা পাঠিয়েছে।"

"কোন্ জমিদারী থেকে?"

"তুমি জান না?"

"কোত্থেকে জানবো?"

"জান না যে একমাস হ'ল এরিশ্‌ ইমেন দীঘির ধারে তার বাপের ছোট জমিদারীটা পেয়েছে?"

"আপনারা ত আমাকে এসম্বন্ধে একটি কথাও জানান নি।"

"তুমিও তো কৈ একবারও তোমার বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা কর নি? সে বাস্তবিকই ভারি শান্ত সুবোধ ছেলে।"

এলিজাবেথের মা এই বলিয়া কফি প্রস্তুত করিতে বাহির হইয়া গেলেন। এলিজাবেথ তখনও সেই পাখীটি লইয়াই ব্যস্ত, রাইন্‌হার্টের দিকে তাহার পিঠ ফিরান ছিল। সে বলিল "একটু দাঁড়াও, আমার এই হ'ল বলে।" রাইন্‌হার্ট্‌ অভ্যাসানুযায়ী তাহার কথার উত্তর দিল না দেখিয়া এলিজাবেথ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। সে হঠাৎ দেখিল রাইন্‌হার্টের চোখ বেদনায় ভরা—ইহা সে পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করে নাই। তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে রাইন্‌হার্ট্‌?"

রাইন্‌হার্ট্‌ স্বপ্নাবিষ্টের মত চক্ষু-দুটি এলিজাবেথের মুখের উপর তুলিয়া বলিল "আমার?"

"তোমায় এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?"

সে বলিল, "এলিজাবেথ,—তোমার ঐ পাখীটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।"

বালিকা বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিল, তাহার কথার অর্থ সে বুঝিল না। অবশেষে বলিল, "এ ভারি অদ্ভুত তোমার।"

রাইন্‌হার্ট্‌ তাহার দুটি হাত নিজের হাতের ভিতর তুলিয়া লইল, এলিজাবেথ তাহাতে আপত্তি করিল না। ঠিক সেই সময়ে এলিজাবেথের মা আবার ঘরে ঢুকিলেন। কফি পান করিয়া এলিজাবেথের মা চরকা লইয়া বসিলেন, রাইন্‌হার্ট ও এলিজাবেথ পাশের ঘরে গিয়া তাহাদের গাছগাছড়ার শ্রেণী বিভাগ আরম্ভ করিল। তাহারা যত্ন করিয়া কেশরগুলি গণিতে লাগিল এবং ফুল ও পাতাগুলি সযত্নে বিছাইয়া প্রত্যেক রকমের পাতা ও ফুলের দুইটি করিয়া একটি প্রকাণ্ড খাতার মধ্যে শুকাইবার জন্য রাখিয়া দিতে লাগিল। তখন বৈকালে চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে এলিজাবেথের মায়ের চরকার কর্কশ শব্দ শুনা যাইতেছিল এবং থাকিয়া থাকিয়া রাইন্‌হার্ট্‌ গম্ভীর গলায় গাছগাছড়ার বৈজ্ঞানিক নাম উচ্চারণ করিতেছিল, কখনো বা এলিজাবেথ সেই সব ল্যাটিন নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছিল।

সমস্ত গাছগাছড়ার শ্রেণীবিভাগ হইয়া গেলে এলিজাবেথ বলিল, "আমি এখনও একটা lily of the valley পেলাম না।"

রাইন্‌হার্ট্‌ তাহার পকেট হইতে ছোট্ট খাতাখানি বাহির করিল এবং তাহার ভিতর হইতে একটি অর্দ্ধশুষ্ক ফুলের ডাল বাহির করিয়া এলিজাবেথকে দিয়া বলিল, "এই নাও তোমার ফুল।" এলিজাবেথ খাতাটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আরও পদ্য লিখেছ নাকি?"

রাইন্‌হার্ট্‌ খাতাটি তাহার হাতে দিয়া বলিল, "না, গল্প আর নেই।"

এলিজাবেথ দেখিল খাতাটিতে আছে কেবল কবিতা, কোনটিই এক পাতার বেশী দীর্ঘ নয়। একটির পর একটি পাতা উল্টাইয়া এলিজাবেথ কবিতাগুলির নাম পড়িয়া যাইতে লাগিল। "সে যখন গুরুমহাশয়ের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছিল", "যখন সে বনে পথ হারাইয়া ছিল", "যখন সে প্রথম আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিল" কবিতাগুলির নাম প্রায় সবই এই রকমের। রাইন্‌হার্ট্‌ একদৃষ্টে এলিজাবেথের দিকে তাকাইয়া রহিল, দেখিল খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এলিজাবেথের গণ্ডদেশে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিয়া ক্রমে তাহার সমস্ত মুখখানি রাঙাইয়া দিল। রাইন্‌হার্টের ইচ্ছা হইল একবার এলিজাবেথের চোখ দুটি ভাল করিয়া দেখিয়া লয়,—কিন্তু এলিজাবেথ একবারও চোখ উঠাইল না; সমস্ত খাতাটি দেখা শেষ হইলে সে তাহা নিঃশব্দে রাইন্‌হার্টের সামনে রাখিয়া দিল।

রাইন্‌হার্ট্‌ বলিল, "খাতাটা এম্‌নি ক'রে আমায় ফিরিয়ে দিও না!" এলিজাবেথ টিনের বাক্সের ভিতর হইতে একটি ফুল বাহির করিয়া খাতার মধ্যে রাখিয়া বলিল, "যে ফুল তুমি সব চেয়ে ভালবাস তারই ডাল এর মধ্যে রেখে দিলাম।"

ছুটির শেষ দিন আসিয়া পড়িল, পরদিন রাইন্‌হার্ট্‌কে যাত্রা করিতে হইবে। এলিজাবেথ অনেক করিয়া মায়ের নিকট হইতে রাইন্‌হার্টকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার অনুমতি পাইয়াছিল। বাড়ীর বাহির হইয়া রাইন্‌হার্ট্‌ এলিজাবেথকে তাহার হাত ধরিতে দিল। নিঃশব্দে, লঘু পদক্ষেপে সেই তন্বী বালিকার সঙ্গে সে পথ চলিতে লাগিল। গন্তব্যস্থান যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দীর্ঘদিনের জন্য বিদায়ের কাল যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই রাইন্‌হার্টের মনে হইতে লাগিল তাহার যেন এলিজাবেথকে অতি প্রয়োজনীয় একটা কথা বলিবার আছে, যাহাতে তাহার সমস্ত জীবন সার্থক ও মধুময় হইয়া উঠিবে; মন তাহার সে কথায় ভরিয়া উঠিলেও মুখে সে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। কাঁটার মত এই বেদনা তাহাকে খোঁচা দিতে লাগিল, তাহার গতি ক্রমশঃই মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। এলিজাবেথ বলিল, "তোমার দেরী হয়ে যাবে, সেন্ট মেরীর ঘড়িতে এখনই দশটা বেজে গেছে।"

রাইন্‌হার্ট্‌ কিন্তু আর একটুও জোরে চলিল না। পরিশেষে সে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, "এলিজাবেথ, দুই বৎসরের মধ্যে আমাকে আর একবারও দেখতে পাবে না,...আবার যখন ফিরে আস্‌ব তখনও কি তুমি এখনকারই মত আমায় ভালবাস্‌বে?"

এলিজাবেথ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং মুগ্ধ-নেত্রে তাহার প্রতি চাহিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "জান, আমি তোমার হ'য়ে খুব বলেছি।"

"আমার হ'য়ে? আমার কেউ নিন্দে করেছিল নাকি?"

"হ্যাঁ, মা করছিলেন। তুমি কাল সন্ধ্যে বেলা চলে গেলে আমরা অনেকক্ষণ তোমার সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম। মা বল্‌ছিলেন তিনি শুনেছেন যে তুমি নাকি আগের মত আর ভাল নেই।"

রাইন্‌হার্ট্‌ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর এলিজাবেথের হাত নিজের হাতে লইয়া, তাহার শিশু-সুলভ চক্ষের উপর নিজের বেদনাময় গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আমি ঠিক আগের মতই ভাল আছি, এটা তুমি স্থির জেনে রেখো; আমার কথা বিশ্বাস করলে তো এলিজাবেথ?"

সে বলিল, "হাঁ"। রাইন্‌হার্ট্‌ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল এবং বাকি পথটা দুজনে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। বিদায়ের সময় যতই ঘনাইতে লাগিল তাহার মুখ ততই আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এত জোরে চলিতেছিল যে এলিজাবেথ তাহার সঙ্গ রাখিতে পারিতেছিল না।

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হল কি রাইন্‌হার্ট্‌?" "আমি এক গোপন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি, কি অপরূপ সেটা!" এই বলিয়া রাইন্‌হার্ট্‌ তাহার আনন্দদীপ্ত চক্ষু এলিজাবেথের উপর স্থাপন করিল।

"দুই বৎসর পরে যখন ফিরে আসবো তখন তুমিও সেই তথ্য জানতে পারবে।"

এদিকে ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়ীও আসিয়া পড়িয়াছে। সময় আর কিছুমাত্র নাই। তবু সে আর একবার এলিজাবেথের হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল, "বিদায়, এলিজাবেথ, বিদায়; ভুলোনা একথা।"

এলিজাবেথ ঘাড় নাড়িল, বলিল "বিদায়।"

রাইন্‌হার্ট গাড়ীতে গিয়া উঠিতেই ঘোড়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। গাড়ী রাস্তার বাঁক ফিরিবার সময় রাইন্‌হার্ট দেখিতে পাইল এলিজাবেথ ধীরপদবিক্ষেপে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

চিঠি

প্রায় দুই বৎসর পরে। রাইন্‌হার্ট আলোর সামনে বই ও কাগজপত্র ছড়াইয়া তাহার এক সহপাঠী বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। রাইন্‌হার্ট ভিতরে আসিতে বলিলে বাড়ীওয়ালী তাহাকে একটি চিঠি দিয়া গেল।

সেই বাড়ী হইতে আসার পর রাইন্‌হার্ট এলিজাবেথকে কোনো পত্র লেখে নাই এবং তাহার নিকট হইতে কোন পত্র পায়ও নাই; এ চিঠিও এলিজাবেথের নহে, রাইন্‌হার্টের মায়ের। রাইন্‌হার্ট চিঠি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মা লিখিয়াছেন—

"প্রাণাধিক, তোমার বয়সে জীবনের প্রত্যেক বৎসরটাই একটা নূতন রূপ ধরিয়া আসে, কারণ যৌবন কখনও দীনতা স্বীকার করে না। তুমি যাইবার পর আমাদের এখানে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; তোমার অন্তরের কথা যদি আমি ঠিক বুঝিয়া থাকি তবে বোধ হয় সে সব শুনিলে তুমি ব্যথিত হইবে। এলিজাবেথ অবশেষে কাল এরিশ্‌কে বাক্যদান করিয়াছে; গত তিন মাসের মধ্যে এরিশ্ আরও দুইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। প্রথমে এলিজাবেথ কিছুতেই এ বিষয়ে মনস্থির করিতে পারে নাই, এইবার কিন্তু সে ইহাতে মত দিয়াছে,—আহা, মেয়েটি এখনও নেহাৎ ছোট। ইহাদের বিবাহ শীঘ্রই হইবে এবং তাহার পর এলিজাবেথের মাও এরিশের বাড়ীতে গিয়া বাস করিবেন।"

ইমেন্ দীঘি

আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বসন্তকালে একদিন মধ্যাহ্নে একটি বলিষ্ঠ যুবক বনের মধ্যে একটা ঢালু পথ ধরিয়া চলিতেছিল। যুবক তাহার প্রশান্ত ধূসর চক্ষু তুলিয়া একবার বহুদূরে দৃষ্টিপাত করিল, যেন এই একঘেয়ে বনপথটার কোথাও কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কি. না তাহাই সে দেখিতে চায়, কিন্তু পরিবর্তনের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। অবশেষে ধীরে ধীরে একটি গোযান সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক গাড়োয়ানকে হাঁক দিয়া বলিল, "ওহে কর্ত্তা, এই কি ইমেন্‌দীঘি যাবার পথ?"

লোকটি টুপিতে হাত দিয়া যুবকের প্রতি সম্মান দেখাইয়া বলিল; হাঁ, সোজা চলে যান।"

"এখনও কি বেশী দূর আছে?"

"জমিদারবাবু ঐ সামনেই আছেন। আধ্ কল্‌কে তামাক পুড়তে যা দেরী, তার মধ্যেই আপনি দীঘির ধারে গিয়ে পড়বেন, আর তার পাশেই জমিদার বাড়ী।"

গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল; যুবকটি বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্য দিয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ তাহার বামদিকে ছায়া শেষ হইল; রাস্তা সেখানে ইমেন দীঘির খাড়া পাড়ের উপর গিয়া পড়িয়াছে; পাড় এতই উঁচু যে নীচে হইতে শতাধিক বৎসরের পুরাতন ওক গাছগুলির মাথাটুকু মাত্র উপরে জাগিয়া ছিল। সেগুলির উপর দিয়া দৃষ্টিপাত করিতেই পথিক দেখিল সম্মুখে বিস্তীর্ণ ভূভাগ—রৌদ্রকিরণে স্নান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। বহু নিম্নে ইমেন্ দীঘি, স্নিগ্ধ, শান্ত, গাঢ় নীল তার জল, চতুর্দ্দিক রৌদ্রোজ্জ্বল, শ্যামল বনমালায় আচ্ছন্ন, কেবল একস্থানে একটি সঙ্কীর্ণ অবকাশ;—তাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টি দূরস্থিত পর্ব্বত শ্রেণীর উপর গিয়া পড়িতেছে। দীঘির ঠিক অপর পারে বনের ঘন পত্ররাজির ভিতর তুষারধবল কি একটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—ফলভারাক্রান্ত বৃক্ষরাজির মধ্যে উহাই

জমিদারের প্রাসাদ, তাহার সমস্তটা শাদা; কেবল ছাদটি লাল টালির। 'চিম্‌নি'র উপর একটি সারস পাখী বসিয়াছিল—সেটি হঠাৎ আসন ছাড়িয়া দীঘির চারিদিকে মন্দগতিতে চক্রাকারে উড়িতে লাগিল। পথিক বলিয়া উঠিল, "এই ইমেন্ দীঘি!" মনে হইল যেন সে তাহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে, কারণ সেইখানেই স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া সে বৃক্ষশ্রেণীর উপর দিয়া দীঘির অপর প্রান্তের দিকে চাহিয়া রহিল, যেখানে শুভ্র প্রাসাদের ছায়া ধীরে জলের উপর কম্পিত হইতেছিল। খানিক পরে পথিক হঠাৎ আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

রাস্তা ক্রমে অত্যন্ত ঢালু হইয়া নামিয়াছে; নীচের গাছগুলি আবার ছায়া দিতে লাগিল,কিন্তু দীঘিটিও তাহাতে গাছের আড়াল হইয়া গেল; মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য বৃক্ষ-শ্রেণীর ফাঁক দিয়া তাহা দেখা যাইতেছিল। আবার চড়াই আরম্ভ হইল, দুইপাশে বৃক্ষশ্রেণী শেষ হইয়া গেল, দেখা গেল কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পর দ্রাক্ষাক্ষেত্র চলিয়াছে। দুই পাশেই ফলভারাবনত বৃক্ষশ্রেণী মৌমাছির মধুর গুঞ্জনে ঝঙ্কৃত। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক পথিককে দেখিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিয়াই মাথার টুপি দোলাইয়া তিনি উল্লসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এস-রাইন্‌হার্ট্ এস, ইমেন্ দীঘির জমিদারীতে তুমি স্বাগত।"

পথিকও বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এরিশ্, তোমার অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ।"

কাছে আসিয়া তাহারা পরস্পরের করমর্দ্দন করিল। এরিশ্ তাহার পুরাতন সহপাঠীর অচঞ্চল মুখের দিকে দিকে চাহিয়া বিস্ময়াবিষ্টের মত বলিল, "এই কি তুমি।"

"তা' ছাড়া আর কে হবে? তুমি ত সেই আগের মতই রয়ে গেছ। তবে আগের চেয়েও তুমি আরও আমুদে হ'য়ে উঠেছ দেখ্‌ছি।"

এরিশের সরল মুখে প্রসন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, "তা' ঠিক বলেছ ভাই রাইন্‌হার্ট্, তখন থেকে এখন আমার কপালও অনেকটা ফিরেছে কি না, বুঝলে ত?" আনন্দাতিশয্যে দুইহাত ঘষিতে ঘষিতে সে বলিতে লাগিল, "ও খুব অবাক হয়ে যাবে; তুমি যে আস্‌ছ একথা সে ঘুণাক্ষরেও জানে না।"

রাইন্‌হার্ট্ বলিল, "অবাক হয়ে যাবে? কে?"

"এলিজাবেথ, আর কে?"

"এলিজাবেথ? তুমি তাকে আমার আসার কথা বল নি?" "একটি কথাও বলিনি ভাই রাইন্‌হার্ট; সে তোমার কথা জানে না, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণও নয়। আমি সবাইকে লুকিয়ে তোমায় আস্‌তে লিখেছিলাম, আমোদটা যাতে আরও বেশী হয়; জানই তো, আমি সব কাজ এই রকম গোপনেই করে থাকি।"

রাইন্‌হার্ট চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। যতই জমিদার-বাড়ীর কাছে আসিতে লাগিল ততই যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। রাস্তার বাম পার্শ্বে দ্রাক্ষাক্ষেত্রও শেষ হইল; তাহার পরেই শাকসব্জীর একটি বিস্তীর্ণ বাগান আরম্ভ হইল—সেটি প্রায় দীঘির ধার পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছে। যে সারস পাখীটি এতক্ষণ দীঘির উপর চক্রাকারে উড়িতেছিল সেটি এখন নীচে নামিয়া শাকসব্জীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এরিশ্ পাখীটিকে তাড়াইবার জন্য হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখেছো, চোরটা আমার ফসল চুরি করছে!" ভীত হইয়া সারসটি পক্ষ বিস্তার করিয়া শূন্যে উঠিল এবং সব্জী-বাগানের প্রান্তে একটি নূতন বাড়ীর উপর গিয়া বসিল। এরিশ্ সেই দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল,"ঐখানে মদ তৈরী হয়, এ বাড়ীটা আমিই বছর দুই আগে করিয়েছি। গোলাবাড়ীটা বাবা নতুন করে গড়িয়েছিলেন আর বসত বাড়ীটা আমার ঠাকুরদাদাই করিয়ে যান। প্রত্যেক পুরুষেই একটু একটু করে উন্নতি করা হচ্ছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা প্রকাণ্ড একটি খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল; ইহার দুই পাশে সাধা-সিধা গোলাবাড়ী এবং পিছনে জমিদার-বাড়ীটি দেখা যাইতেছিল; প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ীর দুইটি অংশ পিছনের দিকে বাগানের উচ্চ প্রাচীর দিয়া জোড়া; তাহার পিছনে ঘন বৃক্ষশ্রেণী। উঠানের উপরেও নানা স্থানে সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ দেখা যাইতেছিল। পরিশ্রমে

আরক্ত মুখ কতকগুলি মানুষ সেই খোলা জায়গাটির মধ্য দিয়া যাওয়া-আসা করিতে ছিল। তাহারা সকলেই সসম্মানে বন্ধুদ্বয়কে অভিবাদন করিতে লাগিল; এরিশ্ তাহাদের প্রত্যেককেই একটা-না-একটা ফরমাস করিতে লাগিল অথবা তাহাদের দিনের কাজ সম্বন্ধে খোঁজ লইতে লাগিল।

ক্রমে তাহারা বাড়ীতে আসিয়া পড়িল; প্রথমেই একটি ছায়াস্নিগ্ধ প্রবেশ পথ; তাহারই অপরপ্রান্ত হইতে বন্ধুদ্বয় একটি সঙ্কীর্ণ চলনা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। একটি দরজা খুলিয়া এরিশ্ প্রথমে বাগানের ধারের ঘরটিতে প্রবেশ করিল; বাগানের বৃক্ষলতায় ইহার দুই দিক আচ্ছন্ন, কিন্তু মাঝখানকার দুইটি উন্মুক্ত দরজা দিয়া বসন্তকালের উজ্জ্বল তপনের প্রখর কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িতেছিল এবং তাহার মধ্য দিয়া সুসজ্জিত একটি সুন্দর বাগান দেখা যাইতেছিল; সমস্ত বাগানটি চওড়া একটি রাস্তা দিয়া দুই ভাগে বিভক্ত। সেই পথ দিয়া দূরে দীঘি ও তাহার অপর পারের বনরাজিও দেখা যাইতেছিল। বন্ধুদ্বয় প্রবেশ করিতেই সুগন্ধ বাতাস আসিয়া তাহাদের আহ্বান জানাইয়া গেল।

বাগানের দিকের দরজার সম্মুখে একটি নারীমূর্ত্তি বসিয়াছিল—তাহার মুখ শুভ্র, পবিত্র, যেন একটি কিশোরী বালিকা। সে এলিজাবেথ। কাহারা ঘরে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া এলিজাবেথ উঠিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু আগন্তুককে দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক হাসিমুখে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। এলিজাবেথ বলিয়া উঠিল, "রাইন্‌হার্ট, তুমি? আমি ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে তুমি এখন আসবে। কতদিন হয়ে গেল আমাদের দেখা হয় নি!"

রাইন্‌হার্ট বলিল, "হাঁ, অনেক দিন বটে।" আর কিছুই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এলিজাবেথের গলার স্বর শুনিবামাত্রই সূঁচের মত কিসে যেন তাহার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিতে লাগিল। আবার এলিজাবেথের দিকে চাহিতেই রাইন্‌হার্টের মনে পড়িল, কত বৎসর পূর্ব্বে যে বালিকার নিকট সে বিদায় লইয়াছিল আজ সে-ই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—সেই তনু, সুকুমার দেহ।

এরিশ্ তখনও হাসিমুখে দরজার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। এইবার সে বলিয়া উঠিল, "এলিজাবেথ, বল, রাইন্‌হার্ট যে আস্‌বে একথা তুমি মোটেই বুঝ্‌তে পার নি, কেমন?"

এলিজাবেথ কৃতজ্ঞতাভরা চক্ষুতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এরিশ্, তুমি এত ভালো, তোমায় আর কি বল্‌বো!"

এরিশ্ তাহার প্রশস্ত হাতে এলিজাবেথের ক্ষুদ্র হাতটি লইয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিতে লাগিল, "এইবার ওকে পাওয়া গেছে, এখন আর সহজে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এতদিন তো ও কেবল দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, আপন ঘরবাড়ীর আদর যত্ন ও আমাদের এখানে দিনকতক উপভোগ করুক। একবার চেয়ে দেখ, রাইন্‌হার্ট কি রকম বদ্‌লে গেছে, যেন রাজার মত ওর চেহারা।"

এলিজাবেথ একটি সলজ্জ দৃষ্টি রাইন্‌হার্টের মুখের উপর বুলাইয়া লইল।

রাইন্‌হার্ট বলিল, "আমি কিছুই বদ্‌লাইনি, অনেক দিন দেখনি বলেই তোমাদের এই রকম মনে হচ্ছে"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি চাবির থোলো হাতে লইয়া এলিজাবেথের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রাইন্‌হার্ট? তোমার সর্ব্বান্তঃকরণে অভিবাদন কচ্ছি।" তাহার পর কথাবার্ত্তা প্রশ্নোত্তর যথারীতি চলিতে লাগিল। মেয়েরা তাঁহাদের কাজ লইয়া বসিলেন এবং রাইনহার্ট বিবিধ উপায়ে তাহার পথক্লান্তি দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল। এরিশ্ তাহার পাশে বসিয়া সিগার পান করিতে করিতে কথাবার্ত্তা ও আলোচনা চালাইয়া যাইতে লাগিল। পরদিন এরিশের সহিত রাইনহার্ট চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে বাহির হইল। সে লক্ষ্য করিল কোথাও ব্যবস্থার কোন খুঁৎ নাই। যে সব লোক ক্ষেতে এবং অন্য সকল জায়গায় কাজ করিতেছিল তাহাদের সকলেরই শরীর সুস্থ এবং মন খুসী। মধ্যাহ্নে সকলে আসিয়া বাগানের ধারের ঘরে

সম্মিলিত হইল। গৃহস্বামীর অন্য কোনো বিশেষ কাজ না থাকিলে সকলে এইখানেই বাকি দিনটা অতিবাহিত করিত।

প্রাতর্ভোজন ও সান্ধ্যভোজনের পূর্ব্বে কয়েক ঘণ্টা করিয়া মাত্র রাইন্‌হার্ট্ নিজের ঘরে বসিয়া কিছু কাজকর্ম্ম করিত। বহুদিন হইতেই রাইন্‌হার্টের অভ্যাস ছিল নূতন কোনো স্থানে যাইলে সেখানকার চাষাদের মধ্যে যে সব গান ও ছড়া প্রচলিত আছে সেগুলি সংগ্রহ করা। এখানে আসিয়াও সে তাহার সঞ্চিত ভাণ্ডার পরিবর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল।

এলিজাবেথ সর্ব্বদাই নম্র এবং অমায়িক—এরিশের সতত সযত্ন ব্যবহারে সে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িত, কথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। রাইন্‌হার্ট্ ভাবিয়া পাইল না সেই চঞ্চলা বালিকা কিরূপে এই ধীর নারীতে পরিণত হইল। এখানে আসার দ্বিতীয় দিন হইতেই রাইন্‌হার্ট্ প্রত্যহ সন্ধ্যায় দীঘির ধারে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল; এজন্য তাহাকে বাগানের ধার দিয়া রোজ যাইতে হইত। বাগানের প্রান্তে প্রকাণ্ড বার্চ্ বৃক্ষের নীচে একটি বেঞ্চি পাতা ছিল; সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্ত দেখিবার জন্য এই বেঞ্চিটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হইত। একদিন এইরূপ বেড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে পথে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রাইন্‌হার্ট্ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা গাছের পাতা ভেদ করিয়া আসিয়া তাহাকে ভিজাইয়া দিল। হতাশ হইয়া রাইন্‌হার্ট্ অবশেষে বৃষ্টির মধ্য দিয়াই ধীর পদবিক্ষেপে ফিরিতে আরম্ভ করিল। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, বৃষ্টি আরও জোর পড়িতে লাগিল। বাগানের প্রান্তে সেই বেঞ্চিটির নিকট উপস্থিত হইলে বার্চ্‌শ্রেণীর মধ্য দিয়া রাইন্‌হার্ট্ দেখিতে পাইল অদূরে একটি নারীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—স্থির, অচঞ্চল, পাষাণ প্রতিমার মত। রমণীর মুখ তাহার দিকে ফিরান ছিল, মনে হইতেছিল যেন রমণীটি কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাইন্‌হার্টের মনে হইল এ রমণী এলিজাবেথ। রাইন্‌হার্ট্ দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইবামাত্রই রমণী ধীরে মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাইন্‌হার্ট্ এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিল না, মনে মনে এলিজাবেথের উপর বিরক্ত হইল, কিন্তু তখনও তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল এ রমণী বাস্তবিকই এলিজাবেথ কি না। এলিজাবেথকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না; কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া বাগানের দিকের ঘরটিতেও সে একবার পা দিল না, পাছে এলিজাবেথকেই সে বাগান হইতে প্রবেশ করিতে দেখে!

জননী করিল কাতর মিনতি হায় গো!

দিন কতক পরে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বাড়ীর সকলে আরামে বাগানের ধারের ঘরটিতে একত্রে বসিয়াছিল। ঘরের দরজা জানালা সব খোলা, সূর্য্য সবেমাত্র দীঘির অপর পারে ঘন বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছে।

রাইন্‌হার্ট্‌কে সেদিন মফঃস্বল হইতে তাহার এক বন্ধু সেখানকার কতকগুলি গান ও ছড়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে একবার ঘরে গিয়া একগোছা সেই কাগজপত্র লইয়া আসিল, দেখা গেল গান ও ছড়াগুলি পরিষ্কার হাতে লেখা। সকলে টেবিলের ধারে বসিল, এলিজাবেথ বসিল রাইন্‌হার্টের পাশে। রাইন্‌হার্ট্ বলিল, "এগুলো এখনও আমার দেখা হয়নি, যেখানে হোক্ খুলে পড়্‌তে আরম্ভ করি, কেমন?"

এলিজাবেথ পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিয়া উঠিল, "এই যে গান রয়েছে দেখ্‌ছি! রাইন্‌হার্ট্, তোমায় এগুলো গাইতে হবে।"

রাইন্‌হার্ট্ পড়িয়া যাইতে লাগিল,—প্রথমে কতগুলি টিরোলি গ্রাম্য ছড়া; মধ্যে মধ্যে অনুচ্চকণ্ঠে সেগুলি সে সুর দিয়া গাহিতেও লাগিল। সেই গান শুনিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এলিজাবেথ প্রশ্ন করিল "কিন্তু এই সব সুন্দর গান বেঁধেছিল কারা?" এরিশ্ বলিল, "ও, সে শুন্‌লেই বোঝা যায়—দর্জ্জি, নাপিত এরাই সব এগুলো বেঁধেছে, আর কি।"

রাইন্‌হার্ট্ বলিল,—"এ গান কেউ বাঁধেনি; এরা আপনা থেকেই জন্মেছে, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, দেশে

দেশে ভেসে বেড়িয়েছে—সহস্র জায়গায়, একই সময়ে, একই ভাবে এই গান গাওয়া হয়েছে। আমাদের নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-ভালবাসা আমরা এরই মধ্যে দেখ্‌তে পাই। মনে হয় কি জান? মনে হয় আমাদের সকলের জীবনের হাসিকান্নার কাহিনী জড়িয়ে এই সব গানের সৃষ্টি হয়েছে।"

মাঝখান হইতে একটি কাগজ লইয়া রাইন্‌হার্ট্‌ পড়িতে লাগিল।

অভ্রভেদী গিরিচূড়ার 'পরে,
দাঁড়ায়ে একা সভয়ে দেখি চেয়ে।

এলিজাবেথ বলিয়া উঠিল, "আমি ওটা জানি; রাইন্‌হার্ট্‌, তুমি গাও, আমিও তোমার সঙ্গে গাইব। তারপর দুইজনে তাহারা গান আরম্ভ করিল। সে কি অপূর্ব্ব সুর! কে বলিবে তাহা মানুষের আবিষ্কার!

এলিজাবেথের মা ক্ষিপ্রহস্তে সেলাই করিয়া যাইতেছিলেন, এরিশ্‌ তাহার দুইহাত জোড়া করিয়া মুগ্ধভাবে গান শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইলে রাইন্‌হার্ট্‌ নিঃশব্দে কাগজখানি একপাশে রাখিয়া দিল। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দীঘির ধার হইতে গরুবাছুরের গলার ঘণ্টার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল; একটি বালক-কণ্ঠের গানও সেই সঙ্গে শোনা যাইতেছিল, সকলে অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। বালক গাহিতেছিল—

অভ্রভেদী গিরিচূড়ার 'পরে
দাঁড়ায়ে একা সভয়ে দেখি চেয়ে,
নিয়ে অতল গভীর সমভূমি
চৌদিকে তার তার পাহাড় আছে ছেয়ে।

মৃদু হাসিয়া রাইন্‌হার্ট্‌ বলিল, "শুন্‌লে তো? এম্‌নি করে শুনে শুনে, মুখে মুখে এ গান চল্‌তে থাকে, অনাদি অনন্ত কাল ধরে।"

এলিজাবেথ বলিল, "এ গান এখানে প্রায়ই এইরকম শোনা যায়।" এরিশ্‌ বলিল, "ও একটা রাখাল-ছেলে গরুবাছুর বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

আরও বহুক্ষণ ধরিয়া বালকের গান শোনা গেল সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিল। রাইন্‌হার্ট্‌ বলিতে লাগিল, "এ সেই আদিম মানবের গান; অরণ্যের অন্ধকারে এর সুর সুপ্ত হয়ে থাকে। কে জানে কে এসব রচনা করেছিল।"

রাইন্‌হার্ট্‌ আর একটি নূতন গান বাহির করিল। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার রক্তিম আভা তখনও দীঘির অপর পারে জলের উপর ফেণার মত বৃক্ষরাজির শীর্ষদেশে অপেক্ষা করিতেছিল। রাইন্‌হার্ট্‌ গুটান পাতাটি ছড়াইয়া ধরিল এবং এলিজাবেথ একহাত তাহার উপর রাখিয়া গানটি দেখিতে লাগিল। তারপর রাইন্‌হার্ট্‌ পড়িতে লাগিল—

জননী করিল কাতর মিনতি হায় গো,
যারে খুসী তাঁর, হিয়া স'পি' তার পায়।
ব্যথা থাক মম, গভীর হৃদয়গহনে,
পথে যেতে যেতে লভেছিনু যেই রতনে,
পাসরিব তারে, সহসা ভোলা কি যায়!
মনেই থাকুক, মন মোর কি যে চায় গো!

জননী, তোমার কত দোষ বল দিব আর,
মা যদি না শোনে মেয়ের কাতর হাহাকার!
ধর্ম্ম আমার হ'ল কলুষিত কামনা,
ভুলিবারে চাই, গাঢ়তর হয় ভাবনা,
সহজ ছিল যা, সে হ'ল বিষম দায়,
মনেই থাকুক মন মোর কি যে চায় গো!

গরব আমার ধরার ধূলায় টুটিল,
সুখ ছিল যাহা, দুখ হয়ে তাই উঠিল!
ভিখারীর মেয়ে সেও সুখী তার জীবনে—
কাঁদে না বৃথাই মিথ্যা স্বপন বপনে—
আঁকড়ি রতন কাঁদে না সে হতাশায়—
মনেই থাকুক মন মোর কি যে চায় গো!

পড়িবার সময় রাইন্‌হার্ট্‌ দেখিল গানের কাগজটি কাঁপিয়া উঠিতেছে। কবিতাটি পড়া শেষ হইলে এলিজাবেথ চেয়ারটি পিছনদিকে সরাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাগানে বাহির হইয়া গেল। তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এরিশ্‌ এলিজাবেথের সঙ্গে যাইতে চাহিল,

কিন্তু মা বলিলেন, "এলিজাবেথের ওদিকে কাজ আছে।" কেহই আর নড়িল না।

বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, বাগান ও দীঘি ক্রমে তাহাতে আচ্ছন্ন হইল। খোলা দরজার সম্মুখে দিয়া রাত্রের নানা পতঙ্গ উড়িয়া যাইতেছিল এবং বাগান হইতে ফুল ও কচিপাতার গন্ধ ক্রমে গাঢ়ভাবে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। জলের ধার হইতে ভেকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল, জানালায় একটি নাইটিঙ্গেল সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল, বাগানের ভিতর হইতে আর একটি পাখীর গান শোনা যাইতেছিল। ক্রমে চাঁদ বাগানের উপর দিয়া উঁকি দিতে লাগিল। যেদিকে এলিজাবেথ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল রাইন্‌হার্ট্‌ আরও খানিকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল; তারপর কাগজপত্র গুটাইয়া লইয়া, এরিশ্‌ ও এলিজাবেথের মাকে অভিবাদন করিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া দীঘির দিকে চলিল।

দীঘির বহুদূর পর্য্যন্ত বৃক্ষরাজির ছায়ায় অন্ধকার হইয়াছিল; মাঝখানটি কেবল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত। মাঝে মাঝে গাছের সারির ভিতর দিয়া বাতাসের তীক্ষ্ণ-শব্দ কাণে আসিতেছিল। একি বাতাস? না নিদাঘ রজনীর তপ্ত নিশ্বাস! রাইন্‌হার্ট্‌ দীঘির ধারে ধারে চলিতে আরম্ভ করিল। সে দেখিতে পাইল তীর হইতে কিছু দূরেই একটি শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলটিকে ভাল করিয়া দেখিবার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ তাহাকে পাইয়া বসিল। সে কাপড়চোপড় পাড়ে রাখিয়া জলে নামিয়া পড়িল। ধারে জল খুব কম ছিল, কিন্তু তীক্ষ্ণ কাঁটা ও পাথর তাহার পায়ে ফুটিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাঁটিয়া যাওয়ার পর তাহার সাঁতার দিবার প্রয়োজন হইল। হঠাৎ সে দেখিল পা দিয়া আর মাটি ছোঁয়া যাইতেছে না—খানিকক্ষণ পরে সে আবার ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু কোথায় সে কাপড়জামা ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহা ঠিক করিবার জন্য রাইন্‌হার্ট্‌কে খানিকক্ষণ ধরিয়া চক্রাকারে সাঁতার দিয়া ফিরিতে হইল। শীঘ্রই পদ্মটিকেও সে আবার দেখিতে পাইল—প্রকাণ্ড ছড়ান পাতার মধ্যে সেটি একলা ফুটিয়া রহিয়াছে। রাইন্‌হার্ট্‌ জোরে হাত পা চালাইয়া সাঁতার দিতে লাগিল, কিন্তু পদ্মটির কাছে আসিতেছে বলিয়া সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, মনে হইল সেটি যত দূরে ছিল এখনও ততদূরেই আছে; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল দীঘির পাড়ই কেবল অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। রাইন্‌হার্ট্‌ কিন্তু হাল ছাড়িল না, পদ্মটির দিকে সে সমানে সাঁতার দিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সে ফুলটির এত কাছে আসিয়া পড়িল যে সেখান হইতে পদ্মটির প্রত্যেক পাপ্‌ড়ি চন্দ্রকিরণে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তেই কিন্তু সে নানা আগাছার জালে আটকা পড়িয়া গেল। পদ্মের দীর্ঘ মৃণাল তাহার নগ্ন অঙ্গে জড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। রাইন্‌হার্ট চাহিয়া দেখিল এই অজানা দীঘির জল কি গভীর কালো। পিছনে একটা মাছ জল হইতে লাফাইয়া উঠিল। হঠাৎ রাইন্‌হার্টের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, প্রাণপণ চেষ্টায় আগাছার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সে দ্রুতবেগে তীরের দিকে সাঁতার দিয়া চলিল। তীর হইতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দূরে পূর্ব্বের মত সেই নিঃসঙ্গ পদ্মটি গভীর কালো জলের উপর ফুটিয়া রহিয়াছে। নিঃশব্দে কাপড় জামা আবার পরিয়া রাইন্‌হার্ট্‌ বাড়ীর দিকে চলিল। বাগান হইতে 'হল্‌' ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাইন্‌হার্ট্‌ দেখিতে পাইল এরিশ্‌ এবং এলিজাবেথের মা পরদিন কোনো বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বাহিরে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

এলিজাবেথের মা বলিয়া উঠিলেন, "এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে তুমি?"

রাইন্‌হার্ট উত্তর দিল, "আমি? আমি ঐ দীঘির শাদা পদ্মটা দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি।"

এরিশ্‌ বলিল "তোমার কথা তো বুঝলাম না। পদ্ম ফুলটা দেখবার তোমার কি দরকার পড়েছিল?"

রাইন্‌হার্ট্‌ বলিল, "এ ফুল আগে আমি জান্‌তাম, কিন্তু সে অনেকদিন হয়ে গেল।"

এলিজাবেথ

পরদিন বৈকালে রাইন্‌হার্ট্‌ ও এলিজাবেথ দীঘির অপর পারে বেড়াইতে গেল। তাহারা কখনো বনবাদাড়ের

মধ্য দিয়া কখনো বা দীঘির উঁচু পাড় দিয়া চলিতে লাগিল। এরিশ্ বাহিরে যাইবার সময় এলিজাবেথকে বলিয়া গিয়াছিল সে যেন রাইন্হার্টকে চারিদিকের দ্রষ্টব্য বস্তু সব দেখায়। এলিজাবেথ কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল, রাইন্হার্ট একটি গাছে ঠেস্ দিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল; দূরে বনের ভিতর কোথায় একটা কোকিল ডাকিতেছে শুনিয়া হঠাৎ রাইন্হার্টের মনে হইল আর একবার তাহারা দুইজনে ঠিক এই অবস্থায় পড়িয়াছিল—একটা অদ্ভুত হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল, "এই বার ফল সংগ্রহ করা হবে না কি?"

এলিজাবেথ বলিল, "এমন তো ফলের সময় নয়।"

"কিন্তু ফলের সময় তো শীগ্‌গির আসবে!"

এলিজাবেথ কথা বলিল না শুধু মাথা নাড়িল। তাহারা উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এলিজাবেথ যখন তাহার পাশে পাশে চলিতেছিল রাইন্হার্ট বার বার তাহার দিকে না তাকাইয়া পারিতেছিল না। এমন সুন্দর ভাবে সে কাহাকেও চলিতে দেখে নাই। মনে হইতেছিল যেন এলিজাবেথের পোষাকই তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। এলিজাবেথকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য রাইন্হার্ট অজ্ঞাতসারেই এক পা পিছাইয়া পড়িতেছিল। এইরূপে তাহারা ছোট ছোট আগাছায় ভরা একটি বিস্তীর্ণ সমতল জায়গায় আসিয়া পড়িল। রাইন্হার্ট নীচু হইয়া ছোট্ট একটি গাছ হইতে ডালশুদ্ধ একটি ফুল তুলিল। ফুল লইয়া আবার সে যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন একটা প্রচণ্ড বেদনায় তাহার মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "এটা কি ফুল জানো?"

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এ তো এরিকা! আমি এ ফুল বনে অনেক তুলেছি।"

রাইন্হার্ট বলিতে লাগিল, "জানো এলিজাবেথ, বাড়ীতে আমার একটা পুরানো খাতা আছে; আগে তাতে আমি কবিতা লিখ্‌তাম, কিন্তু বহুদিন আর কিছু লেখা হয় নি। সেই খাতারও পাতার মধ্যে এই রকমই একটা এরিকা ফুল আছে, তবে সেটা শুক্‌নো। মনে পড়ে এলিজাবেথ, কে আমায় তা দিয়েছিল?"

এলিজাবেথ নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িল। চক্ষু নত করিয়া সে রাইন্হার্টের হাতের সেই ছোট্ট ডালটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল; অবশেষে এলিজাবেথ যখন চোখ তুলিয়া রাইন্হার্টের দিকে চাহিল, রাইন্হার্ট দেখিল সে-চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। রাইন্হার্ট বলিতে লাগিল, "এলিজাবেথ, ঐ নীল পাহাড়ের অপর পারে আমাদের শৈশব কেটে গেছে, সে শৈশব এখন কোথায়?"

তাহারা আর কথা বলিল না। দুইজনে পাশাপাশি নীরবে আবার দীঘির দিকে ফিরিল। বাতাস যেন জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল, পশ্চিমে প্রকাণ্ড একটি কালো মেঘ দেখা দিল। এলিজাবেথ গতি দ্রুততর করিয়া বলিল "ঝড় আস্‌ছে।" রাইন্হার্ট শুধু ঘাড় নাড়িল এবং দুইজনে দ্রুতপদে চলিয়া দীঘিতে আসিয়া নৌকায় উঠিল।

দীঘি পার হইবার সময় এলিজাবেথ নৌকার কানার উপর হাত রাখিয়া বসিল। রাইন্হার্ট দাঁড় টানিতে টানিতে এলিজাবেথের দিকে মাঝে মাঝে চাহিতে লাগিল। সে কিন্তু রাইন্হার্টের পিছনে শ্যামল বনের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। রাইন্হার্টের চঞ্চল দৃষ্টি অবশেষে এলিজাবেথের হাতখানির উপর গিয়া পড়িল। এতদিন এলিজাবেথের মুখ দেখিয়াও রাইন্হার্ট যে কথা বুঝিতে পারে নাই, এই পেলব, শুভ্র হাতখানির দিকে একবার চাহিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল। কত গোপন ব্যথা, রজনীর অশ্রুধারার কথা সেই হাতখানি নিমেষে তাহাকে জানাইয়া দিয়া গেল।

এলিজাবেথ তাহার হাতের উপর রাইন্হার্টের দৃষ্টি অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে তাহা জলে ডুবাইল।

বাড়ী ফিরিয়া তাহারা দেখিল একজন শাণওয়ালা দ্রুতবেগে চাকা ঘুরাইয়া নানা যন্ত্রে শাণ দিতেছে। মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে বেদিয়াদের দুই একটা গানও তাহার মুখ হইতে শুনা যাইতেছে। দুয়ারের সম্মুখে ছিন্নবসনা একটি বালিকা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রতি অঙ্গে বিপত্ত

সৌন্দর্য্যের চিহ্ন এখনও রহিয়া গিয়াছে। বালিকা ভিক্ষার্থে দুই হাত এলিজাবেথের দিকে বাড়াইয়া দিল।

রাইন্‌হার্ট পকেটে হাত দিল, কিন্তু এলিজাবেথ তাহার পূর্ব্বেই আসিয়া ব্যাগে যাহা কিছু ছিল সমস্ত বালিকার হাতে উজাড় করিয়া দিল। তারপর এলিজাবেথ দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিল। সিঁড়ি উঠিবার সময় তাহার চাপা কান্নার শব্দ রাইন্‌হার্ট্‌ শুনিতে পাইল। তাহার ইচ্ছা হইল তখনই ছুটিয়া এলিজাবেথের নিকট যায়। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে সিঁড়ির উপরেই রহিয়া গেল। ভিখারিণী বালিকাটি তখনও স্থিরভাবে দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, লব্ধ ভিক্ষা তখনও হাতেই রহিয়াছে। রাইন্‌হার্ট্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "আরও কিছু চাই?"

ত্রস্ত হইয়া বালিকা বলিল, "না আর কিছুই চাই না।" তারপর রাইন্‌হার্টের দিকে মাথা ফিরাইয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকা বাহির হইয়া গেল। রাইন্‌হার্ট্‌ কি একটা নাম ধরিয়া ডাকিল কিন্তু বালিকা আর তাহা শুনিতে পাইল না। মাথা নীচু করিয়া বুকের উপর দুই হাত গুটাইয়া রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ীর সাম্‌নের মাঠটিও পার হইয়া গেল।

আমারি একা তুমি জাগিছে অভিমান!
মরণ মাঝে মোর একেলা অভিযান!

হঠাৎ সেই পুরাতন গান ভাসিয়া আসিয়া রাইনহার্টকে কাঁপাইয়া দিল। তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই রাইন্‌হার্ট্‌ পুনরায় নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

রাইন্‌হার্ট্‌ প্রথমে কাজ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে সমস্ত যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক ঘণ্টা অনর্থক চেষ্টা করার পর রাইনহার্ট সকলের বসিবার ঘরে গিয়া দেখিল কেহই সেখানে নাই। এলিজাবেথের সেলাইয়ের টেবিলের উপর দেখিল একটি লাল ফিতা পড়িয়া রহিয়াছে, যেটি সে সমস্ত বিকালটা গলায় পরিয়া ছিল। ফিতাটি সে হাতে লইল, কিন্তু তাহার সমস্ত মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল; রাইন্‌হার্ট পুনরায় সেটি রাখিয়া দিল। কিছুতেই আপনার উদ্বেল চিত্ত শান্ত করিতে না পারিয়া সে দীঘির দিকে চলিল এবং নৌকায় দীঘি পার হইয়া, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এলিজাবেথের সঙ্গে যে-সব জায়গায় বেড়াইয়াছিল আবার বহুক্ষণ ধরিয়া সেই সব জায়গায় বেড়াইতে লাগিল। যখন ফিরিল তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর সামনে শকটচালক ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াইতে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাইন্‌হার্ট বুঝিল এলিজাবেথের মা ও এরিশ্‌ ফিরিয়া আসিয়াছে। উঠানে পা দিয়া রাইন্‌হার্ট্‌ শুনিতে পাইল এরিশ্‌ বাগানের দিকের ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। রাইন্‌হার্ট্‌ তাহার নিকট যাইল না; এক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া গেল। এখানে জানালার নিকট ইজি চেয়ারটা টানিয়া লইয়া সে তাহাতে বসিল। বাগান হইতে নাইটিংগেলের গান ভাসিয়া আসিতেছিল, রাইন্‌হার্ট্‌ তাহাই একমনে শুনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আপন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি ভিন্ন সে আর কিছুই শুনিতে পাইল না। সমস্ত বাড়ী ক্রমশঃ সুষুপ্তি-মগ্ন হইয়া পড়িল, রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, কিন্তু রাইন্‌হার্ট্‌ কিছুই লক্ষ্য করিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে একভাবে বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া সে খোলা জানালার উপর গিয়া বসিল। পত্রাবরণের উপর শিশির বিন্দু পতনের ক্ষীণ শব্দ মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছিল, নাইটিংগেলের ডাক বহুপূর্ব্বেই থামিয়া গিয়াছে। ক্রমে রজনীর গভীর নীল আকাশের পূর্ব্ব কোণ স্বর্ণাভ হইয়া উঠিল। ভোরের নির্ম্মল বাতাস আসিয়া রাইন্‌হার্টের উত্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করিয়া দিল। তারপর ক্রমে প্রথম প্রভাত পাখী আনন্দে বিহ্বল হইয়া সু-উচ্চ কণ্ঠে দিনের বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আকাশে উড্ডীন হইল।

ত্রস্তগতিতে রাইন্‌হার্ট্‌ মুখ ফিরাইয়া টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল এবং চারিদিকে হাতড়াইয়া একটি পেন্সিল বাহির করিয়া একটুকরা কাগজে দুই এক ছত্র কি লিখিল।

তারপর কাগজটি টেবিলের উপর রাখিয়া টুপি ও ছড়ি হাতে লইয়া অতি সন্তর্পণে দরজা খুলিল এবং সিঁড়ি দিয়া উঠানে নামিয়া গেল। আশে পাশে তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই; বাড়ীর বিড়ালটা আরামে তখনও আড়ামোড়া ভাঙিতেছিল। বাগানে পাখীর দল কিন্তু তখনই কলরব করিয়া সকলকে জানাইয়া দিতেছিল যে রাত্রি শেষ হইয়াছে। হঠাৎ রাইনহার্ট শুনিল কে দরজা খুলিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে আসিতেছে; সিঁড়িতেও পায়ের শব্দ শুনা গেল। সে চোখ তুলিয়া দেখিল এলিজাবেথ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এলিজাবেথ আসিয়া তাহার হাত স্পর্শ করিল, তাহার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল, কিন্তু রাইন্‌হার্ট কোনো শব্দ শুনিতে পাইল না। অনেক চেষ্টার পর এলিজাবেথ অবশেষে বলিল, "বুঝেছি আর কখনও তুমি আসবে না; ঢেকোনা কিছু, আমি বেশ জানি, এই আমাদের শেষ দেখা।"

রাইন্‌হার্ট বলিল "না, সত্যিই আর কখনও আসবো না।" এলিজাবেথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল কোনো কথাও বলিল না। উঠান পার হইয়া সদর দরজায় গিয়া রাইন্‌হার্ট একবার ফিরিয়া চাহিল; এলিজাবেথ পাষাণ প্রতিমার মত তখনও সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চক্ষু দীপ্তিহীন। দুই বাহু বিস্তার করিয়া রাইন্‌হার্ট তাহার দিকে এক পা অগ্রসর হইল; পর মুহূর্ত্তেই প্রবল চেষ্টায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে প্রভাতকিরণস্নাত নবীন জগৎ তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, ঊর্ণাজড়িত শিশির বিন্দু মুক্তার মত ঝলমল করিতেছে। রাইন্‌হার্ট একবারও ফিরিয়া চাহিল না; তাহার পিছনে ইমেন্ দীঘির জমিদার বাড়ী ক্রমে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং তাহার সম্মুখে উদীয়মান জগৎ ক্রমশঃই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

বৃদ্ধ

জানালার সার্শির উপর হইতে চাঁদ অনেকক্ষণ সরিয়া গিয়াছে, ঘর অন্ধকার; বৃদ্ধ কিন্তু এখনও ইজিচেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে ঘরের গাঢ় অন্ধকার যেন ক্রমশঃ একটি বিস্তীর্ণ দীঘিতে পরিণত হইল। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল কালো জলের রাশি, ক্রমেই তাহা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে, দূরে—এত-দূরে যে বৃদ্ধের দৃষ্টি ততদূর যাইতেছিল না—প্রকাণ্ড ছড়ানো পাতার মাঝখানে একা একটি শ্বেত পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে।

দাসী দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং সমস্ত ঘর একটা উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বলিলেন, "বেশ করেছ, ব্রিজিৎ, আলো নিয়ে এসেছ; এখন এটাকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে যাও।" বৃদ্ধ নিজেও চেয়ারটি টেবিলের দিকে ঘুরাইয়া লইলেন এবং টেবিলের উপরকার একটি খোলা বই লইয়া অধ্যয়নে নিমগ্ন হইলেন। এই অধ্যয়নেই তাঁহার যৌবনের সমস্ত শক্তি এই অধ্যয়নেই নিঃশেষিত হইয়াছিল।*

---

* গল্পটির জার্ম্মাণ নাম 'ইমেনজে'—অনুবাদের জন্য ম্যানুসেন হইতে প্রকাশিত 'ডর ডে মাইস্টার' সিরিজের সংস্করণ ব্যবহার করা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা

(১)

বাঙলা ভাষায় অর্থবিজ্ঞান (Economics) সম্বন্ধে কোন্ গ্রন্থকার প্রণীত কি কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে? ইহার মধ্যে কয়খানি Currency and Banking সম্বন্ধে, আর কয়খানি Economic Theory সম্বন্ধে, তাহা কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল

(২)

প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা উভয়েই ফরাসী ভাষা জানিতেন। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে উক্ত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎকালে ভারতে ফরাসীদের বসতি ছিল কি না, তাহা কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীসুনীলবরণ রায়

(৩)

'আগ্রা—হিষ্টোরিক্যাল এণ্ড ডেস্ক্রিপটিভ' (Agra—Historical and Descriptive) সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল লতিফ, খানবাহাদুর প্রণীত; ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। কোথায় পাওয়া যায়?

(৪)

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম কোন্ পুস্তক কোন্ ভাষায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়? বর্ত্তমানে ভারতে কতগুলি চলিত ভাষা আছে?

মোহাম্মদ আবদুল কাসেম

(৫)

"আম্বিয়ার বাণী" রচয়িতা হায়াত মাহমুদের জীবনীবিষয়ক বিবরণ কোথায় পাওয়া যাইবে? "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" হায়াত মাহমুদের কোন উল্লেখ নাই। "আম্বিয়ার বাণী"র রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়া লেখক বলিতেছেন,—

"সন এগার শ আর চৌসট বছইরে
রচিনু আম্বিয়াবাণী এত সনান্তরে"

অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে 'আম্বিয়ার বাণী' রচিত হইতেছে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের পার্শ্বে সমাসনে হায়াত মাহমুদ কি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন?

হায়াত মাহমুদ নিজ পরিচয় দিতেছেন, "মোকে বাড় বিসিলার আমার বসতি, পরগণে বাষমার ঘোড়াঘাট খেতি।" রঙ্গপুরে এই স্থান কোথায়?

হায়াত মাহমুদের কোন বংশধর জীবিত আছেন কি? হায়াত মাহমুদ বলিতেছেন, "জে গায় গাওয়ায় এহি আম্বিয়ার বাণী, বাড়িবে সম্পদ তার খণ্ডিবে বৃক্কিণী (?)।" আম্বিয়ার বাণী কি রামায়ণের মত গাওয়া হইত? এখনও কি গাওয়া হয়?

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম-এ

(৬)

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে কোন্ কোন্ পুস্তক, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা পাঠ প্রয়োজন হইবে? ঐ সকল পুস্তক কোথায়, কত মূল্যে এবং প্রবন্ধগুলি কোন পত্রিকা বা পুস্তকে কি সূত্রে কোথায় পাওয়া যাইবে তদুল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনলিনীভূষণ দাসগুপ্ত

(৭)

শুভঙ্করী-প্রণেতা শুভঙ্কর দাসের কোন জীবনী আছে কিনা? থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীকালিপদ সিংহ

(৮)

ক। বৌঠান শব্দের উৎপত্তি, "বধূস্থানীয়া" হইতে, না "বধূ-ঠাকুরাণী" হইতে?

হিন্দুসমাজে ভ্রাতৃজায়াকে বধূস্থানীয়া মনে করা হয়। কবে হইতে এবং এই প্রথা এখনও কোথায় কোথায় প্রচলিত। মনু ইত্যাদিতে এই রীতিকে মানা হয় কি?

খ। 'মাইয়া' শব্দের উৎপত্তি কি মাতৃকা শব্দ হইতে? তাহা হইলে এই ভাবের অর্থের পরিণতি কোথায়, কখন ও কি ভাবে হইল?

গ। চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দ চাটুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে ইত্যাদিতে পরিণত হয় কেন?

খ। "অন্নদামঙ্গলে" দেখা যায় অন্নপূর্ণা বলেন—

"জানহ স্বামীর নাম নাহি লয় নারী।"

কিন্তু "মেঘদূতে" পাওয়া যায়—

"মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা—ইত্যাদি। ২।২৫

হিন্দু সমাজে স্বামীর নাম না লওয়ার প্রথা কবে হইতে প্রচলিত ?

শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত

(৯)

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে কোন মাসিক পত্র আছে কিনা, থাকিলে কোন ঠিকানায় পাওয়া যায় এবং তাহাতে ঐ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয় কিনা, বার্ষিক মূল্যই বা কত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবসন্তকুমার সাহা

(১০)

ঐতিহাসিকগণ জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধদেবতা ও পুরীকে বৌদ্ধ-তীর্থ বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু কোন্ সময় হইতে এই বৌদ্ধদেবতা ও এই বৌদ্ধতীর্থটি হিন্দু দেবতা ও হিন্দুতীর্থে রূপান্তরিত হইয়া সমগ্র ভারতের হিন্দু নরনারীর শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন ইহাই জিজ্ঞাস্য।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়

আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা

সমগ্র ভারতে বর্ত্তমান ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় কি কি আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ? প্রকাশক কে ? কোথায় পাওয়া যায়, মূল্য কত ? এবং সম্পাদক কে ?

শ্রীগোরাচাঁদ দাস

—

মীমাংসা

হিন্দী শিক্ষা করিবার পুস্তক

সম্প্রতি 'হিন্দী বাংলা শিক্ষা' নামে একটি পুস্তক 'দি পপুলার ট্রেডিং কোম্পানী', ১১৫ নং হারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটি হিন্দী শিখিবার পক্ষে খুব উপযোগী হইয়াছে। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

শ্রীসুশীলবরণ রায়

স্বর্ণালঙ্কার হইতে পারদ উঠাইবার প্রণালী

১। নাইট্রিক এসিড্ সহ ঘ্রাস্ করিলে পারদ নাইট্রেট হয় এবং উক্ত এসিডের সহিত পারদ উঠিয়া যায়। কিন্তু এই প্রণালীতে স্বর্ণের পালিস নষ্ট হয়।

২। তেঁতুল জলে ভিজাইয়া লেপী করিতে হয়। উক্ত লেপী অলঙ্কারে লাগাইয়া নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা ঘ্রাস করিলে, পারদ দূরীভূত হয়। এই প্রণালীতে স্বর্ণের পালিস নষ্ট হয় না।

৩। টার্টারিক এসিড্ দ্বারা ঘ্রাস করিলে পারদ উঠিয়া যায়। ইহাতেও পালিস নষ্ট হয় না।

৪। চিঁড়ে মুড়ি ভাজা হইবার পর খোলাতে যে বালি থাকে তাহার উপর অলঙ্কার ফেলিয়া রাখিতে হয়। পারদ বাষ্পাকারে চলিয়া যায় ও অলঙ্কারের পালিস নষ্ট হয় না। এই প্রণালীই পারদ উঠাইবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই বালি ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কারণ উক্ত প্রক্রিয়ায় উহা বিষাক্ত হইয়া যায়।

কাঁচ জুড়িবার আঠা

শ্রীযুক্ত বীরেশলোচন সেন চৈত্র মাসের প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে কাঁচ জুড়িবার আঠা প্রস্তুত প্রণালী জানিতে চাহিয়াছেন; তাঁহার বিজ্ঞপ্তির জন্য ইহার প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কোবাগুলিন নামক একটি দ্রব্য আছে, ইহা দ্বারা ভাঙ্গা কাঁচ জুড়িতে পারা যায়। কিন্তু ইহার মূল্য অধিক। এই কারণে আরও একটি দ্রব্যের পরিচয় দিতেছি। খানিকটা আইসিংগ্লাস্ (Isinglass) কড়া এসিটিক এসিডে দ্রব করিয়া গঁদের আঠার ন্যায় বা মধুর ন্যায় ঘন করিতে হইবে। ভাঙ্গা কাঁচে এই আঠা লাগাইয়া জোড়া দিলে আর খুলে না। এই আঠা স্বচ্ছ; সুতরাং এই আঠায় ভাল করিয়া জুড়িলে ভাঙ্গার দাগ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু এরূপে জোড়া দিলে পাত্র অপবিত্র হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত

রেশম-শিল্প

গত মাঘ মাসের প্রবাসীর বেতালের বৈঠক শীর্ষক জিজ্ঞাসাস্তম্ভে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত রেশমশিল্প সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তদুত্তরে জানাইতেছি যে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা, লক্ষ্মীপুর, এবং মালদহ জেলার সদর ইংরেজবাজারে রেশম সূতা ক্রয়ের অনেক মাড়োয়ারী খরিদদার আছেন। রেশম গুটীর পাইকারী ক্রেতা মুর্শিদাবাদ জেলার কুমারপুর, সাটুই, বেলডাঙ্গা, ভাবদা, লক্ষ্মীপুর, ভদ্রপুর, সোমপাড়া প্রভৃতি স্থানে বহু ব্যক্তি আছেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত পত্রব্যবহার করিলে সানন্দে ঠিকানা প্রেরিত হইবে। 'দাদন' দিয়াও অনেকে রেশম সূতা প্রস্তুত করাইয়া লন।

গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি রেশমকরের প্রতিষ্ঠান আছে। তথায় পত্র লিখিলে সকল বিষয়ের উত্তর পাওয়া যাইবে। ঠিকানা:— "ম্যানেজার শিল্প ইউনিয়ন কমিটি, ইংলিশ বাজার, মালদহ।"

শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অদৃশ্য কালি

১। কোবালটাস্ ক্লোরাইড দিয়ে কাগজে লিখলে লিখন অদৃশ্য হয়। উত্তাপে সুন্দর নীলবর্ণ ধারণ করে। ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় অদৃশ্য হয়।

২। নাইট্রিক এসিড দিয়ে লিখলে লিখন অদৃশ্য হয়। উত্তাপে সবুজ হয়। ঠাণ্ডা হইলে অদৃশ্য হয়।

৩। ডাইলিউট সলফিউরিক এসিড দিয়ে অদৃশ্য লিখন হয়। উত্তাপে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহা পাকা হয়।

স্মৃতি

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

আজ একে একে সব কথাই মনে পড়ছে। বাবা অনেক টাকা রোজগার করতেন—আমরা জীবনে কষ্ট বলে জিনিষ ভোগ করিনি কোনো দিন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জীবনের পনেরোটা বছর কোন্ দিক দিয়ে চ'লে গিয়েছিল টেরই পাইনি। আজ বায়োস্কোপ, কাল থিয়েটার, পরশু পিক্‌নিক্—হৈ-চৈ, আনন্দ-উৎসব, সাজগোছ, হাসি-তামাসায় জীবনের এক একটা দিন যেন এক একটা মুহূর্ত্তের মতো মনে হত। বাবার বড় মেয়ে ছিলাম—তাঁর, হৃদয়ের সকল ভালবাসার অধিকারী হয়েছিলাম—আব্দারের অন্ত ছিল না।

মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনার উন্নতি না হোক চাল-চলন, কায়দা-কানুন, কথাবার্ত্তায় সবই বেশ পরিপাটী হয়ে উঠ্‌ল। আজ পার্টি কাল সোয়ারে (soiree)—জীবনটা যেন অবিরাম একটা হাসির ঝরণা কল্ কল্ ক'রে ব'য়ে যেতে লাগ্‌ল। আমাদের বাড়ীতে যাঁরা আস্‌তেন তাঁদের মুখে কোনো দিন কোনো বিষাদের ছায়া দেখিনি। গাম্ভীর্য্য আমার পৈত্রিক বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে কোনো ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মার্‌লে আমরা যেন সেটা জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখের দিন মনে করতাম। বাবার আত্মীয়-স্বজন এটা কিন্তু গোড়া থেকেই কখনও পছন্দ করেন নি। মনে পড়ে মার কাকা, আমার ছোট দাদু একদিন এ নিয়ে মাকে বকেছিলেন। তা নিয়ে আমাদের বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। তার উত্তর দেওয়া হ'ল সেদিনকার সমস্ত রাত্রির উৎসবে। সারা রাত গান-বাজনা হাসি ও তাস পেটার চোটে পাড়ার লোক অস্থির হ'ল। আরো কত তামাসা চল্‌ল। মিঃ দে বিলেত-ফেরত ব্যবসাদার, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিয়ে কত ব্যঙ্গ করলেন। বাবার এক বন্ধু আসন করে বসে উপাসনা ভ্যাঙচালেন। কেউ নমাজ পড়লেন—আর একজন ঘণ্টা বাজালেন। আর একজন শাঁক ফুঁকলেন—একটা মস্ত বড় লম্বা কেক্‌কে ঈশ্বর তৈরী ক'রে তাকে বলি দেওয়া হ'ল, এবং চারটে পিণ্ডি ক'রে একটা ধর্ম্মের নামে, একটা সমাজের নামে, একটা মন্দিরের নামে ও সর্ব্বশেষটি ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হ'ল। এমনি আব্‌হাওয়ার ভেতরে আমি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠ্‌তে লাগলাম।

ষোল বৎসর বয়সে যখন সিনিয়ার কেম্ব্রিজ ক্লাসে উঠ্‌লাম তখন আকস্মিকভাবে আমার জীবনের এক পট পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। আমরা বড়দিনের ছুটিতে পুরী গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের পরিবারের বন্ধুরা। নতুন সিবিলিয়ান সেন, যুবক ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জি ও প্রফেসার রায় এঁরা ছিলেন আমার সঙ্গী,—এ ছাড়া মার বন্ধু ও বাবার বন্ধুরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা মিনিটগুলো যেন অবিশ্রাম আনন্দের লহর তুলে যেতে লাগ্‌ল। সমুদ্রে স্নান, বেড়ান, পিক্‌নিক্, তাসখেলা, গান-বাজনা, ছুটাছুটির ঘূর্ণীপাকে দিনগুলো বোঁ বোঁ করে ছুটে চলেছিল।

আমি বোধ হয় খুব সুন্দরী ছিলাম। কেন জানি না সেন রায় মুখার্জ্জি যেন আমাকে মৌমাছির মত ঘিরে বেড়াত। আমি যদি হাসতাম তারা হাস্‌ত। আমি যদি দাঁড়াতাম তারা দাঁড়াত, তারা যেন আমার কেনা গোলাম। আজ লজ্জা হয় আমি তাদের নিয়ে কি ছিনি-মিনিই না খেলেছি। সেনের একটু কাছে ঘেঁসে বস্‌লে মুখার্জ্জির চোক দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠ্‌ত। প্রফেসারের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠ্‌ত। এমনি ক'রে একবার রায়, একবার মুখার্জ্জী, একবার সেনকে নিয়ে আমি কতই দীর্ঘশ্বাস, কত ব্যথা, কত অভিশাপ পুঞ্জীভূত ক'রে তুলেছিলাম! মনে হ'লে দুঃখ হয়। তাদের অভিশাপ কি বজ্র হ'য়ে এসে আমার বুকে এত কঠোরভাবে আঘাত করলো? এমনি ক'রে দিন কেটে চলেছে।

কলকাতা ফিরবার আর চারদিন বাকি। সূর্য্যোদয়

হ'চ্ছে। ধীরে ধীরে নীল সাগরের বুকখানা দু'ভাগ ক'রে দুটো ঢেউএর মাঝখান থেকে ঐযে সোণার কলি জল্ জল্ ক'রে উঠ্‌ল—ঢেউগুলো ছল্ ছল্ ক'রে তার মুখখানি ধুয়ে দিল। সমুদ্রের বুকটা সোণালি ঢেউএ রাঙা হ'ল। আস্তে আস্তে কুয়াসা কেটে গেল। স্থির নয়নে চেয়ে আছি—নিমেষ নাই। চোখ যখন জলে উঠ্‌ল তখন চোখ রগড়াতে রগড়াতে দেখি আর একজনও আমার মতই সাগরের ঢেউএর দিকে চেয়ে আছে। কে ও! জীবনে অনেক যুবককে দেখেছি—কিন্তু এর মতো আমার প্রাণে কেউ ত' ঢেউ তোলেনি। আজকার প্রভাতসূর্য্য কি কোনো অদৃশ্য জগৎ হ'তে আমার সাম্‌নে একে রেখে গেল! অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। খানিক বাদে, সে মুখ ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে চাইতেই আমি তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরালাম। জীবনে অনেক পুরুষমানুষ দেখেছি, কিন্তু একে দেখে এত লজ্জা হচ্ছে কেন? কেন মনে হচ্ছে আমার মত কুৎসিৎ জগৎ-সংসারে নাই।

সেদিন থেকে আমার জীবনের হাসির অবসান। সমস্তদিন ধ'রে চোখ কেন ভিজে উঠ্‌ছিল। সেদিন যে আমার কিভাবে কেটেছে ভগবানই জানেন। কেন ঐ অপরিচিত লোকটির কথা আমার মনের কোণে বারে বারে আঘাত দিচ্ছিল।

সন্ধ্যায় আড্ডা জমে উঠেছে। বাবা হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ঢুকলেন। পেছনে আর একজন। এ যে সেই! বাবা মাকে ডেকে বল্‌লেন—তোমার সঙ্গে কল্যাণের পরিচয় ক'রে দিই—আমার বন্ধুর ছেলে। আমার সঙ্গেও পরিচয় হ'ল। কিছু নূতন বোধ হ'ল না—মনে হ'ল যেন কতকাল ধরে পরিচিত। কিন্তু একটি কথাও হ'ল না। সে একটি কোণে ব'সে রইল। আমারও সেদিন কোনো আমোদ-আহ্লাদ ভাল লাগ্‌ছিল না। সেন কত ক'রে একটা গান গাইতে বল্‌লেন—আমি গাইলাম না। সেন বল্‌লেন—মিস্ ঘোস্ হ'ল কি আপনার? মুখার্জ্জি ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌লেন। রায় গম্ভীর হ'য়ে সেই লোকটির দিকে চাইলেন।

এমনি করে আরও একমাস কেটে গেল। পরিবর্ত্তনের মধ্যে শুধু আমাদের কলকাতার বাড়ীর আড্ডাটির হ'ল। একজন লোক প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসে, চুপ ক'রে একটি কোণে বসে থাকে, আবার কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে যায়। আড্ডাটা আজকাল আমার দু' চক্ষের বিষ হয়ে উঠেচে। আস্তে আস্তে আমি আড্ডা ছাড়্‌তে লাগ্‌লাম। সেন, রায়, মুখার্জ্জী, বাবা, মা সকলের কাছে আমায় অপরাধী হ'তে হ'ল। সেনের দুষ্ট হাসি, মুখার্জ্জীর চোখা বাণ, রায়ের নীরব দীর্ঘশ্বাস আমি সবই মাথা পেতে নেব। কিন্তু দোহাই তোমরা আমায় মুক্তি দাও। ওখানে আমার সুখ নাই। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে বাগানের ফুলগাছগুলোই যেন শেষে আমার কতকালের হৃদয়ের ধন হ'য়ে উঠ্‌ল।

তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল। আমাদের বাড়ীর আড্ডাটা এখনও বসে বটে, কিন্তু তেমন আর জমে না। বাগানের প্রত্যেক গাছের সঙ্গে, তার ফুল পাতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জমে উঠেছে। এক একটা কুঁড়ি আমার চোখের উপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌ত—তার রূপের আলোয় সারা বাগানটা ডগ্‌মগ্ ক'রত। আবার একদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে দেখি সে কখন ঝরে পড়েছে।

একদিন এমনিভাবে বাগানে সন্ধ্যামালতীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম—সে এসে হঠাৎ দুয়ারে দাঁড়াল। এমন ত কোনো দিন করে না। আজ কি মনে করে? কিসের আকর্ষণে কখন যেন তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি টেরই পাইনি। নমস্কার কর্‌লে। তারপর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠ্‌ল। কি বল্‌লে কিছু বুঝ্‌লাম না। পেছনে পায়ের শব্দ হ'ল—তাড়াতাড়ি হতভম্ব হয়ে চ'লে গেল। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। কতক্ষণ যে অম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানিনে। "মিস্ ঘোষ কি কর্‌ছেন" বলে মুখার্জ্জী যখন গায়ের কাছে এসে দাঁড়াল তখন চম্‌কিয়ে উঠে তিন হাত পিছিয়ে পড়লাম। যেন কোনো হিংস্র জন্তুর সাম্‌নে পড়ে গেছি। সেদিনকার রাত যে কিভাবে কেটেছিল তা একমাত্র অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষই জানেন। পরদিন সকালবেলায় 'চিঠ্‌ঠি' ব'লে যখন ডাকপিয়ন বাড়ীর সামনের ফটকের কড়া নাড়্‌লে তখন মনটার ভেতর হঠাৎ যেন ভূমিকম্প হ'ল। খানসামা যতগুলো চিঠি নিয়ে এল তার মধ্যে একখানা ছিল আমার নামে।

অবাক হয়ে গেলাম। লেখাটা একবারে অপরিচিত—আশা ও আশঙ্কায় বুকের মাঝখানটায় কে যেন দোল দিতে লাগ্‌ল। খুলে দেখলাম তার চিঠি। সে কয়েকটা কথা লিখেছে মাত্র—গত সন্ধ্যার ঘটনার জন্য দুঃখিত হ'য়ে লজ্জিত হ'য়ে।

বেশীদিন যেতে পারল না। সেন ও মুখার্জ্জীর কৃপায় একদিন বাড়ীর সকলেই জান্‌লেন যে বাগানে আমি একাই থাকিনে—সেই নূতন লোকটিও—আমার বাবার বন্ধুর ছেলে। সেদিন রাত্রে খাবার সময়ে দেখ্‌লাম বাবার ও মার মুখ গম্ভীর—বাবা রাগে গর্‌গর্‌ ক'র্‌ছেন। খাওয়ার পরে বাবা মা শুতে গেলেন। আমি পাশের ঘরে শুতে গেলাম। মাঝখানকার দুয়োর ভেজান ছিল—কিন্তু বাবার গলা বেশ শোনা যাচ্ছিল। আমি দরজার কাছে গিয়ে দরজার গায়ে কান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা মাকে বল্‌ছিলেন—"তুমি যাই বল—ও কিছুতেই হ'তে পারবে না। আমার পরিবারের তাতে মুখ থাকবে না। আমার এত আদরের মেয়ে—শেষটা কি না একটা মাষ্টারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, সে হ'তেই পারবে না। আর তার ক্ষমতাই বা কি? এই সবে সেদিন এম-এ পাশ করেছে—চাকরীই হয়নি—চাকরী যদি পায়ই হয়ত বড়-জোর একশ' টাকা মাইনে পাবে। ওতে ত' অমলার কাপড়-চোপড়ই হবে না। খাবে কি?" আমার বুক ভেদ করে একটা শব্দ বেরোল—চোখের জলে বুক ভেসে গেল। আমার মাথা ঘুরছিল। আমার পায়ের তলা থেকে মেঝে স'রে যাচ্ছিল। কখন জানিনে আমার চোখের কাছে সমস্ত বিশ্বটা অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি বাবার ঘরের মধ্যে উপুড় হ'য়ে পড়ে গেলাম। তারপর কি হ'ল জানিনে। পরদিন থেকে আমার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হ'ল। বাবা মা আমাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে লাগলেন—তার আসা বন্ধ হ'য়ে গেল। একদিন বাবা বাড়ী ছিলেন না। হঠাৎ তার একখানা চিঠি এসে আমার হাতে পড়্‌ল। তারও একই অবস্থা—"বাবাকে বলতেই বাবা ভয়ানক চ'টে গেলেন—মা কাঁদতে লাগ্‌লেন। তাঁরা ধর্ম্মকর্ম্মহীন একটা পাষণ্ডের একটা বাবু-মেয়ের সঙ্গে কখনই বিয়ে দিতে রাজী নন। সমাজ ও জাতের কথা নাই বা ধর্‌লেন।......"

ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে কি কাঁটার মুকুট রেখেছিল তা আমরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। শুধু তার কালো ছায়ায় অঞ্চলখানি আমাদের জীবনের সুখ ও শান্তি ছেয়ে ফেলেছিল তাই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম। দিন এল—দিন চলে গেল। ব্যথার স্মৃতিটুকু আজ দুঃস্বপ্নের চোখের জলের মত আমার হৃদয়ের গোপন দেশে দাগ রেখে গেছে। সমাজের চোখে অপরাধী হ'তে পারি কিন্তু যা করেছিলাম তা ভগবানের রাজ্যে কি পাপ? তিনি ত জানতেন যে আমাদের দুটি দুর্ব্বল ক্ষুদ্র হৃদয় এক যোগসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। সে আমার—আমি তার—মাঝে কোনো ব্যবধান নাই। এমন কাজ ছিল না যা তার জন্যে করতে পারতাম না। সমাজ ক্রূর হাসি হেসে আমাদের কি ভয় দেখিয়েছিল? একদিন দেখেছিলাম তার রক্ত নখর রক্তদশন—লেলিহান রক্ত জিহ্বা। কিন্তু তারই বা দোষ কি? আমরা ত তার শাসনদণ্ড মাথা পেতে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম। যাক্‌।

সুযোগ খুঁজলে সুযোগ পাওয়া যায়। তার সঙ্গে হঠাৎ আমার একদিন দেখা হ'য়ে গেল। এবারকার দেখার মধ্যে একটা নূতনত্ব ছিল। দুর্ব্বলতা, চোখের জল, ভয় ও হাহুতাশ আমাদের শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। মরণযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি আমরা, আমাদের কি আর কাঁদবার সময় আছে? সেদিন ঠিক হ'ল পৃথিবীর কোনো শক্তিই আর আমাদের দূরে রাখ্‌তে পারবে না। এতে আসুক দুঃখ—আসুক লাঞ্ছনা, আসুক মৃত্যু। সহস্র রকমের অভাব ও দারিদ্র্য আজ থেকে আমাদের নিত্যসহচর হবে তাতে ক্ষতি নাই।

—শনিবার আমাদের জীবনের চিরস্মরণীয় দিন। বাবা মা সিনেমায় গিয়েছিলেন। অনেক দিন পর আজ একটু ফাঁক পেয়েছি। বুক দুরদুর করে কাঁপছিল। আকাশের দিকে চেয়ে আছি। সমস্ত আকাশটা যেন হঠাৎ চোখের সামনে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। ভগবান্‌, ভগবান্‌, যদি তোমার ইচ্ছা হয় এই বিষপূর্ণ পাত্র আমার মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আর না

হয় দাও—পুড়ে ছাই হয়ে যাই। নিষ্ঠুর দেবতা আমার কান্না শুন্‌লেন না। এ সংসারে যাকে সব চেয়ে ঘৃণ্য কাজ মনে কর্‌তাম—তাই আমাকে করতে হল। যে ভালবাসে ভগবান কি তাকে এত কঠোর পরীক্ষা করেন!

চিরসাধের কল্‌কাতা সহর—এতদিন তোমার স্নেহস্নিগ্ধ কোলে মানুষ হয়েছিলাম—আজ রাত্রির অবসানে আর তোমার প্রভাতের কোমল মূর্ত্তি আমার চোখে পড়বে না। তখন কতদূরে চলে যাব তোমায় ছেড়ে—তোমায় প্রণাম। বাড়ী, তোমায় প্রণাম—তোমার এই কক্ষে কক্ষে কত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করেছি। কত স্মৃতি তোমার সঙ্গে জড়িত আছে। আজ চিরজন্মের মত তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—তোমরা সবাই মিলে আমায় আশীর্ব্বাদ করো। বাবা মা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল না—কর্‌বারও সাহস নাই—যদি পার, তোমাদের হতভাগিনী কন্যাকে ক্ষমা কোরো।

সেদিনকার রাত্রির এক্সপ্রেস্ আমার বুকের শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলে আমায় ঠেলে নিয়ে চল্‌লো—পেছনে একটা কলঙ্ক ও অপরাধের ঘন মসীরেখা টেনে। তার কাছে সর্ব্বদা থাকতে পাব এর চেয়ে জীবনে আমার আর কিছু বড় ছিল না। তার জন্যে এমন কাজ ছিল না যা আমি করতে পার্‌তাম না, এমন দুঃখ ছিল না যা আমি হাসিমুখে সইতে পার্‌তাম না। বড়লোকের মেয়ে ব'লে আমার মনে একসময় একটু গর্ব্ব যে না ছিল তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে যখন প্রথম সংসার পাত্‌লাম তখন আধপেটে থাকার দিনগুলোর মধ্যে একটা কেমন অহঙ্কারও অনুভব কর্‌তাম। জগতের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে হ'ত—তোরা দেখে যা—তোরা দেখে যা, মানুষের সুখের সীমা দেখে যা।

সুখে হউক দুঃখে হউক দিন কারুর পড়ে থাকে না। আমাদেরও দিনগুলো ধীরে ধীরে যেতে আরম্ভ করলো। একদিন হঠাৎ কলকাতার কাগজ চোখে পড়্‌ল। চোখ বুলুতে বুলুতে দেখ্‌লাম—আমাদের "গুপ্তপ্রেম কাহিনীর" দেড় কলম লম্বা বিবরণ। পড়ে মনে হ'ল কোনো পরিচিত লোকেরই লেখা। কেননা এক একটা কথা যেন ক্ষুরধার অস্ত্রের মত আমার বুকের পাঁজরাগুলো কেটে ফেলছিল। চোখের উপর যেন সমস্ত কলকাতার সমাজটা ভেসে উঠ্‌ল। মনে হ'ল যেন সহস্র সহস্র তীব্র চক্ষু আমাদের পেছনে ছুটে চলেছে—আমাদের ধ্বংসেই যেন তাদের অসীম আনন্দ ও সুখ। সমাজের কুসুমশয্যা আমরা ত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে পাতিত্যের বন্ধুর পথের ধূলিতে আঁচল বিছিয়ে বসেছি। আমাদের লজ্জা ও অভিমান বলে কিছু ছিল না। কিন্তু একটা ব্যথার স্মৃতি আমাদের উভয়ের জীবনকে অভিশপ্ত করেছিল—সেটা হচ্ছে আমাদের উভয়ের বাপ মার কলঙ্ক ও অপমান। আমাদের আনন্দের উজ্জ্বল দিনগুলো সেই অপরাধের কালো ছায়ায় মলিন করে তুলেছিল। আমাদের পাপ যদি হয়ে থাকে তবে ঐ পাপ। পুরীর সমুদ্রতীর কার জীবনে কোন্ সার্থকতা এনেছে জানি না, কিন্তু আমাদের জীবনে যে গভীর স্থান দখল করেছিল তার কারণ একটি নয়। তার বালির পাথারে আমি জীবনে দুবার দুটি রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় দুজনে সাগরের দিকে চেয়ে বসে আছি। জীবনে ভাবনার অন্ত নাই। মনে হচ্ছিল ঐ নীল সাগরের বুক থেকে একটা ঢেউ এসে আমাদের দুজনকে যদি চিরদিনের মত শান্তির বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়ে দিত তবে তা কত আনন্দের হত! সকল ভাবনা, সকল দুঃখ, সকল ব্যথার অবসান হয়ে যেত এক মুহূর্ত্তে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। একটু দূরে এক বৃদ্ধ গদ্‌গদভাবে গান করছিলেন। তার দু-একটা পদ হাওয়ায় ভেসে এসে আমার বুকের মাঝখানে দোল দিতে লাগ্‌ল।—

"যখন পাপী বলে বিশ্বজনে ত্যজে,
তুমি তুলে নেও আমায় বুকের মাঝে!
(তা কেমনে ভুলি।)"

আমার সমস্ত হৃদয়খানা যেন একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠ্‌ল—এমন একজন কি সত্যই আছেন? তিনি যদি এত করুণাশীল হন, তবে আমাদের এত দুঃখ ও ভয় কেন? আমি কান খাড়া ক'রে আরও শোন্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম।

"যখন অন্ধকারে পাপের ভরে কাঁপি,
তুমি তুলে ধর আমায় বুকে চাপি।
(তা কেমনে ভুলি।)"

আমার মনে এই প্রার্থনা উঠ্‌ল—যদি সৃষ্টির অন্তরালে

কোনো রহস্যময় দেবতা থাক তবে শোন—তোমার কাছে আমরা কোনো পাপ করিনি। তোমার যে অলঙ্ঘ্য বিধানে অণু অণুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, একটি গ্রহ আর একটি দূরবর্ত্তী গ্রহের পশ্চাতে ধাবিত হয়, আমাদের দুটি ক্ষুদ্র হৃদয়ও তারই টানে মিলিত হয়েছে। তবে ভয়ের আমাদের অন্ত নাই কেন? যদি তুমি প্রেমময় হও, আজ তোমার দক্ষিণ হাত বাড়াও—আমাদের ক্ষত প্রাণে শান্তির হাত বুলিয়ে দাও।

আবার গান আরম্ভ হ'ল—

"আর বল্‌ব কি, যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে!
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ বিপদ
আমার দুই সমান।"

কে যেন আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সকল বোঝা নামিয়ে নিল! কত হাল্কা বোধ কর্‌তে লাগ্‌লাম। এক অলক্ষিত যোগসূত্র এসে আমাদের হৃদয় দুটি সেই বৃদ্ধের হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে দিয়ে গেল। আমরা কখন যে তাঁর পাশে গিয়ে ব'সেছি তা আমরাও জানি না।...

যখন জ্ঞান হ'ল চম্‌কিয়ে চেয়ে দেখ্‌লাম, ওমা, এযে আমার ছোট দাদু!

যে মাথা এতদিন দর্পভরে উঁচু ক'রে চলেছিলাম, হঠাৎ আজ যে তা অতর্কিতে আর একজনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ভেবেছিলাম চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধের মধ্যে কি যাদু ছিল জানিনে—আজ যে আর বাঁধ মানে না।......

অনেক দিন পরে একদিন দাদুকে জিজ্ঞেস্ করেছিলাম, আচ্ছা দাদু, তুমি ত আমায় একটা মন্দ কথাও বল্‌লে না—সমাজের কাছে এত পাপ করেছি তবুও ত তোমার বুকের মাঝে টেনে নিলে! দাদুর চোখ জলে ভ'রে গিয়েছিল—ব'লেছিলেন, আমরা সবাই অপরাধী ভাই, তোর ওপর আর কি রাগ ক'রব? ঐ বুকের মাঝে যিনি আছেন তাঁর কাছে খাঁটি থাক্—এই আমার প্রার্থনা।

দাদুর সঙ্গের ভেতর দিয়ে জীবনে প্রথম একটা আলোর সন্ধান পেলাম্। আমরা যে ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম সেখানে চোখে দেখা জগতের অতীত যে একটা লোক আছে তার কথা শুনিনি। এদেশে শুনেছি পূর্ব্বকালে পিতামাতার কোলেই শিশুসন্তানের অধ্যাত্ম-জীবনে দীক্ষা হ'ত। কিন্তু আমি যে পরিবারে জন্মলাভ করেছিলাম সেখানে তা ছিল তামাসার বিষয়। তাই এই নূতন উপলব্ধিটি আমার জীবনকে আরও স্বাদু ক'রে তুল্‌ল।

এমনি ভাবের মাঝখানে আমাদের জীবনে এক মহা-পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ল—এক নবদীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে প্রাণটা যেন কৃতার্থতায় ভ'রে উঠ্‌ল।

একদিন দাদু বল্‌লেন—দেখ, যা হবার হয়ে গেছে—আমি কয়েকজন বন্ধু ডেকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে তোমাদের নূতন জীবনে ব্রতী ক'রব।—নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখি দাদু আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেছেন। ভাব্‌লাম আবার এসব কেন? যাক্ দাদুর যদি তাতে একটু আনন্দ হয় তাতে আমাদের আপত্তি ছিল না। বিয়ের প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটা কথা আমার বুকে ঝন্ ক'রে বেজে উঠেছিল—"আমাদের উভয়ের মিলিত হৃদয় পরমেশ্বরের হউক।" এতদিন আমরা ভালবাসার এই গভীর দিক্‌টা দেখ্‌তে পাইনি। ভালবাসার এই চরম সার্থকতার জ্ঞানটি আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত ক'রে তুল্‌ল।

সংসারের এই বিশাল পারাবারে যখন আমরা জলের পানার মত ভাস্‌ছিলাম তখন দাদুর পক্ষছায়ার অন্তরালে আশ্রয়টি পেয়ে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্যে ভ'রে উঠ্‌ল। দাদুর নিঃসঙ্গ জীবনটিকে সরস ক'রে তোলাই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে উঠ্‌ল। এমনি ভাবে কিছুদিন কেটে গেল।......অনেক চেষ্টার ফলে সুদূর জয়পুর কলেজে ওর একটি দেড়শত টাকার চাকরী জুটল। এতদিন পরে বিধাতা আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন—হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠ্‌ল। কিন্তু আমার যাওয়া হ'ল না—নতুন যায়গা, সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে আমায় নিয়ে যাবে ঠিক হ'ল। শেষ বিদায়ের সময় আমার হৃদয় ভেঙে পড়্‌ছিল আমি ওর দিকে চাইতে পার্‌ছিলাম না। চোখের জলে সারা পৃথিবীটা যেন ধোঁয়ার মত হ'য়ে গিয়েছিল। কি ভেবে জানিনে সে সিঁড়ি বেয়ে নাম্‌বার সময় হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল। এ জীবনে সে হাসির

অর্থ আর বোঝা হ'ল না। তখন জানতাম না যে এই আমাদের এপারের শেষ।...

খুকু হয়েছে দুমাস হ'ল। জয়পুরে বাড়ী ঠিক হ'য়ে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ও আমাদের নিতে আসবে—তখন খুকুর নামকরণ হবে। কয়েকদিন থেকে বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি। আশায় ও আশঙ্কায় বুক দুলছে।......ঠুং ঠুং......টেলিগ্রাম। আমার দম্ বন্ধ হ'য়ে এল। আমার নড়বার ক্ষমতা ছিল না। চাকর টেলিগ্রাম নিয়ে এল। বহু চেষ্টায় মনকে পাষাণে বেঁধে খাম খুলতেই প্রথমে চোখে পড়্‌ল—Kalyan Babu seriously ill···(কল্যাণবাবু ভয়ানক পীড়িত)। সমস্ত বিশ্বটা আমার পায়ের নীচ থেকে সরে গেল। তারপর যে কি হ'ল আমি জানিনে। জ্ঞান হ'লে দেখ্‌লাম সব বাঁধাছাদা হয়ে গেছে। আমি উঠলেই হয়।......

আর এক ঘণ্টার মধ্যে জয়পুর পৌঁছাব। বুকের রক্ত জমে আস্‌ছিল। "দয়াময়, দয়াময়, তোমার দয়াল নামে বুক বেঁধেছি—হতভাগিনী অভাগিনীর দিকে মুখ তুলে চাও। আমার এ সংসারে আর যে কেউ নাই। তোমার দয়াল নামের অপমান কোরো না পিতা। আমি দোরে দোরে তোমার জয়ধ্বনি ক'রে বেড়াব।"

তখন জান্‌তাম না তাঁর প্রেমের পথ কি বিচিত্র! আমার নতুন পাওয়া বিশ্বাস ও নির্ভর কাচের চেয়েও ঠুনকো ছিল। একটুও ঘা সইতে পারার ক্ষমতা ছিল না। তাই সকল কান্না ও সকল প্রার্থনা ব্যর্থ ক'রে যখন সে চলে গেল তখন আমার হৃদয় বিদ্রোহে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। জীবনের সকল অণুতে অণুতে সে দিনের কথা—সে দিনের ছবি আঁকা হয়ে রয়েছে। গিয়ে যা দেখ্‌লাম তা এখনও মনে হ'লে চম্‌কে উঠি। প্লেগের রোগী—মৃত্যুর আপনার রূপ সেদিন আমি দেখেছিলাম। ওগো কত ক'রে ডাক্‌লাম একটাও কথা বলে গেল না—একবার চাইলেও না—যাবার সময় দিয়ে গেল শুধু এক ফোঁটা চোখের জল। আমার বুকের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে যখন সবাই তাকে নিয়ে গেলেন, তখন দাদু দয়াল নাম জপ করছিলেন।

দয়াল! মিথ্যা কথা। এর চাইতে বড় মিথ্যা কথা এ পৃথিবীতে আর সৃষ্টি হয়নি। সৃজনের ক্রূর বিধাতা তাঁর নির্ম্মম রথে সৃষ্টির বন্ধুর পথে কোন্ এক অলক্ষ্য পরিপূর্ণতার দিকে ছুটে চলেছেন। চক্ষু তাঁর বাঁধা—নিজেও জানেন না তাঁর পথ। বসন্ত দিচ্ছে তার পেলব কুসুমদল, গ্রীষ্ম দিচ্ছে সুরসাল ফল তাঁর পথে উপহার। বর্ষার সুশীতল বারি তাঁর চরণ ধুইয়ে দিচ্ছে। ছয় ঋতু তাঁর যাত্রাপথে পূজার নৈবেদ্যরূপে ফুটে উঠ্‌ছে—বিনাশেই তাদের সার্থকতা—আর ক্ষুদ্র মানুষ? সে তার রক্ত দিয়ে, পেশী দিয়ে তাঁর পথের ক্লেশ লাঘব করছে, তাঁর কঠিন চাকার তলে নিজকে আস্তরণরূপে বিছিয়ে দিয়ে। ঐ বিরাট রথের গতিবেগে কে কবে পথের পাশে বা পথের মাঝখানে ছিট্‌কে পড়্‌ছে তার খবর তিনি রাখ্‌তে ব্যগ্র নন। দয়াল! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। আমার সকল হৃদয়মন বিদ্রোহে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এবার থেকে আমার জীবনের আবার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। বাড়ী এসে আমার প্রথম কাজ হ'ল সব ধর্ম্মগ্রন্থ পোড়ান। মহাপুরুষদের ছবিগুলো ফ্রেম থেকে খুলে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছড়িয়ে দিলাম—হাওয়ার উপাসক তোমরা, ওরই মধ্যে তোমরা চরম শান্তি লাভ কর। কালাপাহাড়ের সকল শক্তি এসে যেন আমার নারীহৃদয় উদ্বেলিত করছিল। যদি তাঁর মত ক্ষমতা থাক্‌ত তবে আমিও এই পৃথিবীর বুক থেকে মিথ্যাকল্পনার উপাসনার জন্য যত মন্দির মস্‌জিদ ও গির্জ্জা হয়েচে সব উপ্‌ড়িয়ে ফেল্‌তাম।

ধীরে ধীরে আমার জীবনে আর এক সমস্যা এসে উপস্থিত হ'ল। দাদুর আর্থিক অবস্থা কোনোদিনই সচ্ছল ছিল না। আমাদের দুটি প্রাণীর ভার, তাঁর এই শেষ বয়সে অযাচিতভাবে যখন তাঁর ঘাড়ে এসে পড়্‌ল, তিনি কাতর হননি সত্য। কিন্তু আমার ত চোখ ছিল, আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম যে, এতে তাঁর কতখানি কষ্ট হচ্ছিল। কোনো ক্ষমতাও ছিল না যার দ্বারা দুটো পয়সা আমার হাতে আসবে। লেখাপড়াও শিখিনি ভাল ক'রে। কি করব এই চিন্তা করছি এমনি সময়ে বাবা মা একদিন হঠাৎ এসে বল্‌লেন—অমলা, যা হবার তা হয়েচে, চল বাড়ী চল্।

বহুকাল পরে মাকে পেয়ে আজ যেন আমার বুকে জোয়ারের বান ডেকেছিল। শোকের মধ্যে দাদুকে ছেড়ে যাওয়া আমার কাছে কেমন যেন একটা অকৃতজ্ঞতার মত হ'ল। আমি যাব না ঠিক করলাম। কিন্তু দাদুর অনুরোধেই আবার যাওয়া ঠিক হ'ল। বাড়ীর আবহাওয়া আমার আগাগোড়া থেকেই কেমন অনুকূল বোধ হ'ল না। ক'দিন থাকতেই যেন আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসার যোগাড় হচ্ছিল। সে পুরনো আড্ডা আর নাই বটে, কিন্তু তার তরল ভাবটা একেবারে যায়নি। সকলের উচ্ছ্বসিত হাসির মাঝখানে আমার অতর্কিত চোখের জলের কোনো স্থান ছিল না। দাদুর সেই বুকভরা সমবেদনা এখানে কে দেবে? কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই বাবা এসে বল্লেন —রোজ রোজ কেঁদে কেঁদে শরীরটা মাটি ক'রে ফেল্লি— এ ত জগতে হয়ই।

তারপর আস্তে আস্তে আমাকে আমোদ-আহ্লাদে নেবার চেষ্টা চল্ল। একদিন সিনেমায় যাওয়ার জন্য খুব টানাটানি হ'ল—সিনেমায় গেলে নাকি মনের ভার হাল্কা হবে। দাদুকে চিঠি লিখ্‌লাম—দাদু এখানে আমার এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না। দাদু লিখলেন—আর কদিন থেকে এস—নৈলে বড় খারাপ দেখাবে—কিছুদিন পরে গিয়ে আমি নিয়ে আস্‌ব।

আমার চিত্তবিনোদনের জন্য না কি বাবা আবার তাঁর পুরনো আড্ডার লোকদের ডাক্‌তে আরম্ভ করেছিলেন। সেন, রায়, মুখার্জ্জীর আবার গতায়াত আরম্ভ হ'ল। সেই পুরনো কালের মত আবার তারা আমাকে ঘিরে আড্ডা জমাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি পরিষ্কার বুঝলাম বাবা তাঁর মনোমত করে আবার আমার সংসার পাতিয়ে দিতে চান। আমার জীবনের যেটা একটা মস্ত ভুল বলে তিনি মনে করেন সেটার সমস্ত স্মৃতিই তিনি সুখসৌভাগ্য দিয়ে নিজে হাতে মুছে দিতে চান। এসব তারই আয়োজন। অভিমানে ও রাগে আমার মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমার সমস্ত জীবন ধসে গিয়েছে—আমি যে এখন চিরন্তন রাত্রির দেশে নিঃসঙ্গ পথিক, সে কথাটাও বুঝবার ক্ষমতা এদের হ'ল না। এদের কি হৃদয় বলে কিছু নেই?

সেই রাত্রির অবসানে আমি দ্বিতীয়বার পিতৃগৃহ ত্যাগ করলাম। এবার আর কোনো ক্ষোভ বা লজ্জা ছিল না। দুঃখও ছিল না। সৃষ্টি কি বিচিত্র রহস্য! যে পিতা-মাতার কোলে ধরণীর মুখ দেখলাম, যে-গৃহে এত সুখে পালিত হ'লাম—তারা আজ যেন আমায় আর চিন্‌তেও পারলে না। কে এই অচেনার প্রাচীর আমাদের মাঝখানে উঠিয়ে দিল!

শুনেছি কয়লার খনি খুঁড়তে খুঁড়তে না কি হীরার সন্ধান পাওয়া যায়। পিতৃগৃহের ক্লেদপূর্ণ দিনগুলোর ভেতরও তেম্‌নি আমি একজন মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম। সে কিরণশশী। আমারই মত অভাগিনী। তার এই অল্পদিনের জীবনের মধ্যেই সব হারিয়েছে। বিশ্ব-সংসারে আপনার বল্‌বার কেউ নেই। সে যেন এ জগতের লোক নয়। তার ত সবই রয়েছে ওপারে। এ পারের দিনগুলো কোনো রকমে ঠেলে ফেল্‌তে পারলেই আবার নিরন্তর আনন্দ যেন রয়েছে তার জন্যে। এই বিশ্বের অন্তরালে আর একটা আনন্দলোক রয়েছে যেখানে আমাদের সব হারান ধনগুলি কুড়িয়ে পাব—যেখানে সব ক্ষতির পূরণ হবে এই ছিল তার ভরসা।

আমার বিদ্রোহী মন কিন্তু অতখানি বরদাস্ত করতে পারলে না। অবিশ্বাসে আমার মন পূর্ণ হলেও একটা কথা আমার মনে জেগেছিল—এখানেই কি সব শেষ? এপারেতেই সব খেলার—সব ভালবাসার—সব দেনা-পাওনার শেষ? শ্মশানের তপ্ত ধূলিই কি জীবনের চরম চরিতার্থতা? যার জন্যে এত লজ্জা, ঘৃণা, দুঃখ সব সইতে হ'ল আর কি তার বুকে মাথা রেখে এই তৃষিত হৃদয় শীতল করতে পাব না?

কিছুদিন হ'ল আমি ও কিরণ দুজনে ট্রেনিং স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। হোষ্টেলের একটি ঘরে দুজনে থাকি। এ ছাড়া আর ভাল কোনো পথ আমাদের মনে হ'ল না। সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। আমি ছাদের উপর বসে খুকুকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ যেন ঐ সুদূর নীল আকাশের বুকের উপর একখানা মুখ ভেসে উঠ্‌ল—চম্‌কে উঠে দেখলাম এ যে তারই! দুটি চোখ যেন তার আমারই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখ থেকে এক

কালো আবরণ খসে গেল। মনে হ'ল যেন আমরা দুজনে হাতে হাতে ধরে ঊর্দ্ধ হ'তে এক ঊর্দ্ধতর লোকের দিকে চলেছি। আর আমাদের সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য যেন তারা, গ্রহ উপগ্রহ সকলে এক ঐকতান ধরেছে—

"নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ।"

কতক্ষণ যে এইভাবে ছিলাম জানিনে। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি কিরণ গান ক'রছে—

"তোমাতে রয়েছে কত শশীভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু—,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে নাকি তব পায়॥
অন্ন লইয়া থাকি……"

হোষ্টেলে এসে আমার বড়ই কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। দাদুর এমন কিছু অবস্থা নয় যে, আমাদের দুজনের মত খরচ মাসে মাসে দিতে পারেন। আমার দিনগুলো ভয়ানক টানা-টানির মধ্যেই যেতে লাগ্‌ল। তবুও কত বিষয়ে কিরণ কতভাবে আমাকে সাহায্য করেছে তা আর ভুলবার নয়। কিন্তু তারও ত আমার মতই অবস্থা। আমার ভয়ানক লজ্জা বোধ হ'ত, কিন্তু কিরণ আমার ভাব্‌বার আগেই আমার ভাবনা দূর ক'রে বসে থাক্‌ত। অনেক চিন্তার পর মাকে লেখা ঠিক করলাম। বড্ড আশা ছিল মা আমার প্রাণের ব্যথাটা বুঝ্‌বেন।

মা লিখ্‌লেন, "তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াতেই তোমার বাবা তোমার উপর বিরক্ত হয়েছিলেন, আবার ট্রেনিং স্কুলে পড়তে গেছ শুনে আরও বিরক্ত হয়েছেন। তুমি বাড়ী চলে এস, তোমার অভাব কি? নতুবা কিছু করা আমার পক্ষে সহজ নয়।" সব বুঝ্‌লাম। হায় রে অভাগী, তোর কপালগুণে তোর মা বাবাও তাঁদের স্নেহ হারিয়েছেন!

সে কিছু ব'লে যায়নি সত্যি। কিন্তু দুটি জিনিষ যা তার প্রাণের জিনিষ ছিল তাই আমার জিম্মা ক'রে দিয়ে গিয়েছিল। একটি হ'চ্ছে খুকু, আর একটি তার রোজগারের পয়সার বড় সাধের এক ছড়া হার। আমার গায়ে একখানা কিছু ক'রে দিতে পারেনি ব'লে তার মনে কত আপশোষ ছিল। তাই জয়পুর থেকে আস্‌বার সময় হারটা তৈরী ক'রে নিয়ে আস্‌ছিল। সে কথা সে আমায় ব'লে যেতে পারেনি আমি তার বাক্সে পেয়েছিলাম। ঐ দুটোই আমার বুকের মধ্যে ক'রে নিয়ে দিনগুলো কাটাচ্ছি। বড্ড অভাবের মধ্যেও হারগাছা ছাড়তে পারিনি। তা ছিল আমার পাঁজরার একখানা হাড়ের মত।

কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী তাদের বুদ্ধি তাদের সর্ব্বনাশ আন্‌তে পারে সত্যি, কিন্তু সব সময়ে যে তারা কাজের ফলাফল বুঝে করে তা আমার মনে হয় না। তাদের মন তারা অনেক সময় চিন্‌তেই পারে না। কিন্তু অভাবের তাড়নায় পড়ে আমি যা করেছিলাম তা আর অন্য কোনো মেয়ে ক'রত কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভগবান আমার সে পাপের পূর্ণ শাস্তি আজও তিলে তিলে দিচ্ছেন। মাথা পেতেই তা বরণ করেছি। হে পিতা, তোমার তূণীরে যত বাণ আছে এই অভাগিনীর বুকে হান'। চোখের জল আর ফেল্‌ব না।

সেবার কল্‌কাতায় বড্ড আমাশয় হচ্ছিল। একদিন দেখি খুকুরও হয়েছে। প্রথমতঃ হোষ্টেলের ডাক্তার এসে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাতে ব্যারাম একটুও না কমে বরঞ্চ দিনের দিন বাড়তে লাগ্‌ল। সকলের ভয় হ'ল। সকলেই বল্‌তে লাগ্‌লেন যে, একজন বিখ্যাত ডাক্তার ডাক্‌তে। আমার মাথায় বাজ প'ড়ল। হাজার বিখ্যাত হ'লেও ত আর কোনো ডাক্তার এই অভাগিনীর চোখের জলে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন না। তাঁকে তাঁর ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে দিতেই হবে। আমার সম্বলের মধ্যে ঐ হার-ছড়াটি ছিল—যা বেচে আমি দুটো টাকা আন্‌তে পারি। কিন্তু এ যে তার শেষ ও একমাত্র দান। ওটা ছেড়ে কি করে দিন কাটাব? আমার দুটো উপহারের একটা ছাড়তে হবে—এই চিন্তায় বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু একটা না ছাড়্‌লে যে আর একটা থাকে না। ঘোর সমস্যায় পড়ে গেলাম। মনে হ'ল যদি খুকুর সঙ্গে সঙ্গে ছোট উপহারটুকুও বাঁচাতে পার্‌তাম। আচ্ছা, সত্যিই কি কটা টাকা আমি কোথায়ও ধারও পাই না? ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটা কথা হঠাৎ মনে হ'ল—যেন ঘোর নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে একটা জ্যোতির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। পরে অশেষ

মনস্তাপের সঙ্গে বুঝেছি কেন এই আলেয়া দেখেছিলাম—ওর চেয়ে আঁধার ছিল ভাল। যাক্ তখনকার মত আমার মনে কেন যেন আশা হয়েছিল। আমার মনে হ'ল—এবং কি যেন দেখেছিলাম তাঁর ভাবের মধ্যে যাতে বিশ্বাসও হ'ল—যে যদি মিঃ সেনের কাছে আমি লিখি ত আমার প্রয়োজন-মত টাকা ধার নিতে পারি। তিনি ত আমার বন্ধুরূপে পরিচিত হওয়া ভাগ্য মনে করতেন। সুদিন এলে শোধ ক'রে দেব। এতে আর ক্ষতি কি? আমি ত আর কিছু করছি না। আমার সমস্ত মনখানা সায় দিয়ে বলে উঠ্‌ল—এই একমাত্র পথ যাতে তোমার উভয় দিক রক্ষা হয়। আমি লিখ্‌বামাত্র টাকাও সত্যি এল। ডাক্তার আনান হ'ল, চিকিৎসা চলতে লাগ্‌ল। আশায় ও কৃতজ্ঞতায় বুকখানা ভরে এল। মিঃ সেনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখলাম।

একদিন দারোয়ান এসে কার্ড দিলে—মিঃ সেন দেখা করতে এসেছেন। অনেক ইতস্ততঃ করে খুকুকে কিরণের হাতে দিয়ে বস্‌বার ঘরে গেলাম। সেন খুব দুঃখ সমবেদনা করলেন। কিন্তু গোড়া থেকেই তাঁর ভাবের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন দেখ্‌লাম। আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছিল না। খুকুর কাছে ফিরে আস্‌বার জন্য মন ছটফট্ করছিল। সেন তাঁর চেয়ারখানা খুব কাছে টেনে নিয়ে এলেন। আবোল-তাবোল বকতে লাগ্‌লেন—হঠাৎ আমার ডান হাতখানা চট্ করে তাঁর মুঠোর মধ্যে ধরে কি যেন বল্‌লেন—আমার সে কথা কানে গেল না—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার চোখের সামনে দোল খেতে লাগ্‌ল। সারা আকাশটা যেন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে একবারে নিবে গেল। আমি বন্ধু বলে সাহায্য ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর শেষ স্মৃতিটুকু রক্ষা করব বলে এ পথে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে আমার দুঃখের দেবতাকে ফেলে সুখের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ডাক্‌তে কেউ সাহস করল কি করে? কেউ ভাব্‌ল কি করে যে আমি নূতন জীবনের কথা কল্পনাও করতে পারি? আমি প্রচণ্ড বেগে হাত টেনে নিয়ে রাগে কেঁদে ফেল্‌লাম। কি কথা বলেছিলাম সব মনে নাই, শুধু এইটুকু মনে আছে—আপনি জানবেন আপনার টাকা ধার নিয়েছি—সেটা টাকা দিয়াই শোধ করব বলে।

সেদিনই প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল আমার হার বিক্রয় করা। একটা তীব্র বল এসে যেন এক মুহূর্ত্তে আমার মেরুদণ্ডটা ইস্পাতের মত শক্ত ক'রে দিয়ে গেল। দাদুর এক পাঞ্জাবী বন্ধু গান গাইতেন তার মর্ম্ম ছিল—শুক্‌নো রুটির টুক্‌রো খাব আর তোমার নাম গেয়ে বেড়াব। আমারও তাই মনে হ'ল—ভয় কি আমার, ভয় কি আমার।

কিন্তু উত্তেজনা যখন থেমে গেল তখন নিদারুণ আত্মগ্লানিতে আমার চিত্ত ভরে উঠ্‌ল। ছি, ছি, কি ক্ষুদ্র ঘৃণিত জীব আমি। সামান্য টাকার জন্য—সামান্য অলঙ্কারের মোহের জন্য আমি তার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে পারলাম না? সে না জানি কত ব্যথা পেল। ওগো, তুমি ক্ষমা করো, আমি বুঝতে পারিনি। সে ক্ষমা করেছে—পরে বুঝেছি অভাগিনীকে সে ত্যাগ করেনি। তখন আমার নিজের উপর কতখানি ঘৃণা হয়েছিল তার সাক্ষী আমার পোড়া ডান হাতখানি। কি ক'রে পাপের শাস্তি হ'বে তাই ভেবে ভেবে আমার মন আমার উপর তীব্র ঘৃণার ভরে উঠ্‌ত। নিজেকে শাস্তি দিতেও কসুর করিনি। মনের এইরূপ তীব্র জ্বালার মধ্যে একদিন লণ্ঠনের আগুনের মধ্যে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিরণ না দেখ্‌লে বেশ মজাই হ'ত।

কিন্তু ভগবান তাঁর শাস্তি পাঠিয়েছিলেন অন্যরকমে। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও খুকুর ব্যারাম দিন দিন বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। খুকুর ফুলের মত মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল, একদিন সন্ধ্যার পর থেকে খুকু আমার কান্না বন্ধ ক'র্‌ল। কিছু খেলেও না। দাদু এসেছেন। সেই রাত্রির ভোরে দাদু, আমি, কিরণ তিনজন খুকুর বিছানায় বসে আছি। আমার একটু তন্দ্রা এল। হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লাম যেন সেও এসেছে খুকুকে কোলে নিয়ে বসে আছে—খুকুকে আবার পরীর মত দেখাচ্ছে। হাসিমুখে মা মা বলে ডাক্‌ছে, আমি বুকের মধ্যে ওদের ধরবার জন্য হাত বাড়ালাম,—ওরা যেন খানিক দূরে সরে গিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগ্‌ল। আমি এগোলাম—ওরাও আমার

হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। ক্রমে বহু উর্দ্ধে উঠে গেল—আমায় সেখানে যেতে বল্‌ল। আমি পারলাম না। হায় রে হতভাগিনী—এত কাছে পেয়েও পেলাম না। আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়লাম, তন্দ্রা ভেঙে গেল।

খুকু চলে গেল। যার স্মৃতিচিহ্ন সে নিয়ে গেছে সেই একটি স্মৃতির কথা আজ সহস্র শিশুর মধ্যে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। সে অক্ষয় স্মৃতি আর কোনোদিন হারাবে না।

যাত্রী

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

বাদলের সমুখ পানে একা তুই চল রে আজি,
মনে তোর উঠবে ঘন বিজয়ের ডঙ্কা বাজি।
নীরব এই চোখের কোণে
জীবনের তড়িৎ রেখা
ঝলকি ক্ষণে ক্ষণে
হয়ে যাক আপনি লেখা।—
মাথা তোর উচ্চ করি
বেদনার মুকুট পরি
বিপদের আঘাত নে রে ভরি তোর বুকের সাজি,
বাদলের সমুখ পানে একা তুই চল রে আজি।

যত সব পথের কাঁটা,—যত সব ভয়ের কথা,
সকলই তোর গলেতে হবে বন-কুসুম-লতা।—
কারে তুই মরিস্‌ খুঁজি?—
কোথা তোর আপন জনা?—
বুকে যার অসীম পুঁজি
মাগে সেই নীবার কণা?
সাথী ঐ প্রদীপ হাতে
সদা তোর মন-ভিটাতে
নিশি দিন রয় যে জাগি নাহি তার নির্ম্মমতা।
পরশের আভাস পেলে ঘুচে ভয়-বিহ্বলতা।

কত তুই কাল কাটাবি হেথা আর এম্নি মিছে,
ভিখারীর মতন ফিরি সবাকার চলার পিছে?
তোরে আজ হেলায় ঠেলি
যারা যায় বাহির পানে,
বৃথা তুই দু' কর মেলি
তাহাদের টানবি প্রাণে।—
প্রাণে তোর সঙ্গোপনে
মরণের যে জাল বোনে
তারে তুই বাসিস্‌ ভাল থেকে আজ সবার নীচে।—
কত তোর কাল কাটাবি হেথা আর এম্নি মিছে?

শুধু কি কথার কথা আঁখিজল ব্যথার বাণী।
পোড়া এই মরুর বুকে নিঝরণ নামাও আনি।
ফোটা ফুল থর বিথরে
বেদনার কুঞ্জ বনে
একা তুই পরাণ ভরে
গা রে গান আপন মনে।
মাথা তোর পড়ল নুয়ে
লুটে আজ পড়লি ভুঁয়ে
জেগে ওঠ আপন জোরে—গ'ড়ে তোল জীবনখানি।
নহে এই কথার কথা আঁখি-জল ব্যথার বাণী।
বাদলের সমুখ পানে একা তুই চল্‌রে আজি,
মনে তোর উঠবে ঘন বিজয়ের ডঙ্কা বাজি।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্যাসের পথে

খেলার নীচে ধৌলীগঙ্গার কাষ্ঠসেতু পার হইয়া আবার যে পর্ব্বতটি সরু হইল সেখান হইতে বরাবর ব্রিটিশ সীমানার শেষ পর্য্যন্ত এই যে ভোটিয়া পরগণা তাহাতে যে সিং উপাধিধারী একটি জাতির বাস দেখা যায়, উহারা বহুকাল হইতে পাহাড়ি ভোটিয়া বলিয়াই এ অঞ্চলে পরিচিত আছে। ভোটিয়া বলিয়া অপরাপর জাতি বা হিন্দুদের কাছে পরিচিত হইলেও ইহারা নিজেদের শক্ বা শোক্ বলিয়াই জানে। যে শকেরা এক সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া প্রায় দেড় শতকের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিল, ইহারা তাহাদেরই মুষ্টিমেয় বংশাবতংশ। হিন্দুদের কাছে ইহারা ভোটিয়া, আবার তিব্বতীয়গণ ইহাদের নিকট ভোটিয়া এবং হূণিয়া বলিয়া পরিচিত যেহেতু তাহারা পুরাতন হূণ জাতির বংশধর।

এই শক্ ভোটিয়াগণ স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই নাক থাঁদা, ক্ষুদ্র-চক্ষু, লোহিতবর্ণ, ঘনকৃষ্ণসরলকেশ, এবং সর্ব্বদাই খর্ব্বাকৃতি। সুস্থতা, দৃঢ় শরীর, গালে লালের আভা, এসকলই ইহাদের শরীরের বিশেষত্ব। স্ত্রী-পুরুষে মদ্য-মাংসপ্রিয়, মাখন ও লবণ সংযোগে চা, ও হুকা ছিলিম সংযোগে তামাকু পরায়ণ। পুরুষেরা পাতলুন, কামিজ, ফতুয়া, কোট ও টুপীধারী, আর স্ত্রীলোকেরা মোটা পশমের গৃহ প্রস্তুত লুঙ্গি, উপর কালো 'উনি' আলখাল্লার মত একটি, তাহার উপর কটিতে মোটা সাদা চাদর জড়ান, মাথায় মোটা রঙীন লালফুল ও লতা-পাতা যুক্ত, ছিটের ওড়না বা মস্তকাবরণ, এবং চরণে হূণদেশীয় পশমের জুতা যাহাকে সোম্বা বলে—শয়ন ব্যতীত সর্ব্বক্ষণই পায়ে থাকে। এ অঞ্চলের নারী স্বভাবতই কোমলপ্রকৃতি, ক্ষুদ্রচক্ষু হইলেও মুখশ্রীতে সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত, গায়ের রংও কিছু উজ্জ্বল।

আজ আমরা এই ভোটিয়া পরগণায় পদার্পণ করিয়া প্রথমে পাহু নামক স্থানে এক পাঠশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। যুবক গুরুমহাশয়টি গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ। তিনি আমাদের জন্য ছেলেদের মধ্যে কাহারও দ্বারা চাল, কাহারও দ্বারা ডাল, কাঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই অল্পসময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা যেখান হইতে আসিতেছি সেইখানে অর্থাৎ আসকোট অঞ্চলে হৈজাকী বীমারীর প্রাদুর্ভাবের জন্য আমরা গ্রামের মধ্যে স্থান পাইলাম না।

পাহু হইতে বেলা দুইটা নাগাদ আমরা উঠিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌদাসের অন্তর্গত শোঁসায় পৌছিয়া দিলীপসিং পাটওয়ারীর আশ্রয়ে সেদিনকার মত মোট-ঘাট নামাইয়া লালগীর ও নাথজীর সঙ্গে মিলিত হইলাম। অনেকটা চড়াইয়ের উপর এই গ্রামখানি।

আসকোট হইতে ধারচুলা হইয়া খেলা অবধি আমাদের মাল গাঁওসেরায় আসিয়াছিল, তাহার পর এই শোঁসা অবধি নগদ কুলীতেই আনিয়াছে। এইরূপে মাল আনার ব্যাপারে আমাদের মহা অসুবিধায় পড়িতে

হইলেও ইহাতে হাত ছিল না, কারণ আসকোটে বীমারীর জন্ম ওদিককার কুলী এদিকে বেশী দূর আসিবে না। তাহা ছাড়া আসকোটের দিকে গরম, ও-অঞ্চলের কুলী খেলা পার হইবে না, যেহেতু এদিকে ঠাণ্ডা। গরমের মানুষের ঠাণ্ডায় যাওয়ার নিয়ম নাই, তাহাতে প্রাণের আশঙ্কা আছে।

যাহা হউক দিলীপ সিং আমাদের মাল দেখিয়া ভরসা দিল যে এ মাল (যাহা বরাবর দুইজন বাহকে আনিয়াছে) একজনে লইয়া যাইতে পারে, কাল ইহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। আমরা ভাবিলাম মন্দ কি!

পরদিন আমরা সাংখোলা যাত্রা করিলাম। প্রথমে প্রায় চার মাইল বেশ সমতল রাস্তা, তাহার মধ্যে দুই তিন খানি গ্রাম দেখিলাম। তাহার মধ্যে শেষের গ্রামখানির নাম তীজা। এইখানিই লালসিং পাতিয়ালের নিজ গ্রাম। ধারচুলা তাহার কর্মস্থল, সেইজন্য সেখানেও তাহার একখানি মকান রাখিতে হইয়াছে। এই গ্রাম পার হইয়া কতদূর গিয়া প্রায় দুই মাইলের উপর এক চড়াই উঠিয়া আমরা সাংখালা নামক পল্লীখানির সন্ধান পাইলাম। অনেকটা বিছুটির জঙ্গল ভাঙিতে হইয়াছিল। সহজে গ্রামের পথ না পাইয়া কতকটা ঘুরিতেও হইয়াছিল। কারণ এ রাজ্যে এমন লোক খুব কমই দেখিলাম যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ ঠিক করিতে পারি। শেষে বেলা প্রায় তিনটার সময় নয়নসিং প্রধানের আস্তানায় উঠিয়া অবসন্নশরীরে বসিয়া পড়িলাম। আমাদের মাল যে কোথায় রহিল তা ভগবানই জানেন।

বিষম উদ্বেগে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন আমরা গলাগড় হইয়া মালপা যাত্রা করিলাম। এই পথটি বড়ই বিপদসঙ্কুল, এবং ভীষণ দুর্গম। আমাদের যাত্রার মধ্যে এরূপ পথ ব্রিটিশ সীমানার মধ্যে আর পড়ে নাই।

পথে ভোটিয়া বণিকগণের মাল যাইতেছে দেখিলাম। একশত দেড়শত ছাগল ও ভেড়া পিঠে মাল লইয়া সারি দিয়া চলিতেছে। তাহাদের প্রথমে একজন, মধ্যে একজন, ও শেষে এক বা দুইজন রক্ষক কুকুর লইয়া চলিতেছে। এক একটি ক্ষুদ্র পশু দশ হইতে পনের সের পর্য্যন্ত মাল লইতে পারে। এই "ভেড়-বকরী"ই ভোটিয়া বণিকগণের বাণিজ্যব্যাপারে প্রধান সহায় ও সম্পদ। এক একটি পড়াওতে গিয়া তাহারা ছোট ছোট চটের থলে বোঝাই মাল পশুগুলির পিঠ হইতে নামাইয়া গাদা দিয়া রাখে ও উহাদের চরিয়া খাইতে ছাড়িয়া দেয়। কেবল একজন পাহারায় থাকে।

সাংখোলা এবং মালপা এই দুইটিই "জঙ্গলী পড়াও" অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত, লোকালয়ে অথবা গ্রামের মধ্যে নয়। আসকোটের পর হইতেই সব রাস্তা বিজন, কেবল মাঝে মাঝে ঐরূপ মালবাহী ছাগ বা মেষের পাল—সম্মুখে ও পশ্চাতে কুকুরওয়ালা রক্ষক চলিয়াছে। এই দৃশ্যই নজরে পড়িত, আর মাঝে মাঝে পাখীর ডাক কানে যাইত। নির্জ্জন পথে এরূপ পাখীর ডাক কিরূপ উপভোগ্য তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। যাহা হউক এই রাস্তাই সেই "টুটনেওয়ালা" পুল, যাহা টুটিলে চার পাঁচ মাইলএর ফেরে পড়িতে হইবে। এই পুলটি শীঘ্র শীঘ্র উত্তীর্ণ হইবার আশায় আমরা দ্রুত চলিয়াছি। কালীতীর দিয়াই পথ, ভীষণ দুর্গম, বিরলতৃণ, এবং বৃক্ষলতাহীন। কোথাও বিশাল অভ্রভেদী গিরিশিখর কোথাও বা চূর্ণবিচূর্ণ শিলাখণ্ড স্তূপীকৃত। ওপারে নেপালের সীমানায় পাহাড়ী ঝাউ এবং দেওদারের বেশ ঘন জঙ্গল দেখা যাইতেছে। আশীর্ষ-মূলাবধি সুদীর্ঘ কত জলধারা অবিরাম চলিতেছে, দুই দিকেই দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আমরা বিষম বন্ধুর পথে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে শুধু পদসঞ্চালনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, কোথাও বসিয়া বসিয়া পা বাড়াইয়া, কোথায়ও হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়। সে যে কিরূপ বিপদসঙ্কুল পথ এ সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তের মধ্যে বর্ণনা সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের বাহকদ্বয় অক্লেশে মাল লইয়া চলিতেছিল আবার মধ্যে মধ্যে ভীষণ দুর্গম স্থলে সঙ্গী-মহাশয়কে অনেকবার তাহাদের সুদৃঢ় বাহুর সাহায্যদানে উপকৃত করিয়াছিল। উৎরাইয়ের মুখেই যাহা কিছু দুর্গম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালীর এ পারে ব্রিটিশ, ওপারে নেপাল। এখন এই যে দুর্গম উৎরাই তাহার পরই নদীর স্রোতে রাস্তা একেবারে বন্ধ। নদীর বিস্তার প্রায় ত্রিশ হাত হইবে—এইখানেই সেই সেতুটি। কি ভীষণ

বিপদসঙ্কুল পথ

গর্জ্জন এবং বেগ কিরূপ প্রবল তাহা আর কি বলিব, যেন পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া চলিতেছে। ব্রিটিশ এলাকায় আর পথ নাই, জল হইতে একেবারে খাড়া পর্ব্বত উঠিয়াছে, সুতরাং যাতায়াতে সুবিধার জন্য এই সেতুর প্রয়োজন।

ইহা পার হইয়া নেপালের এলাকা দিয়া প্রায় আধ মাইল রাস্তা যাইয়া আর একটি সেতু দিয়া পুনরায় এপারে আসিয়া মালপার পথ ধরিতে হয়। এই পুল দুইটিই প্রতিবৎসর আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসে জলস্রোত বাড়িয়া

ভাসিয়া যায় আবার কার্ত্তিক মাসে জলের বেগ মন্দীভূত হইলে পুনরায় নির্ম্মিত হয়। এই পুল টুটিলে সাধারণের যাতায়াতের যে কি কষ্ট তাহা বলিবার নয়। কিরূপ বন্ধুর ও বিপজ্জনক পথ দিয়া আনাগোনা করিতে হয় তাহা পরে বলিব, কারণ ফিরিবার পথে সেই রাস্তায়ই আমরা ফিরিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় সেতুটি পার হইয়া মালপার চড়াই আরম্ভ হইল। সেই আরম্ভের মুখেই এক নয়নাভিমোহন দৃশ্য। একটি মুক্ত জলপ্রপাত। প্রশস্ত নীলজলের একটি ধারা ভীষণবেগে অনেকটা উপর হইতে পড়িতেছে। তাই তাহার নাম নীলধারা, নীচে উহার বিপুল ফেনময় গতি তিন চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে নামিয়া কালীর সঙ্গে মিশিয়াছে। সঙ্গমের মুখে সকল ধারাগুলি এক হইয়া বিষম বেগে পর্ব্বত কাঁপাইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়াছে, যেন মূর্ত্তিমান প্রবলতা। সে গর্জ্জন শুনিলে সমুদ্রকে মনে পড়ে। এই সকল দেখিতে দেখিতে চড়াই শেষ করিয়া উৎরাইয়ের শেষে পড়িলাম। এখানে কেবল বিশালকায় শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ স্তূপীকৃত। তাহার মাঝে মাঝে বিছুটির জঙ্গল। এমন একটি স্থানে আসিয়া একটি সমতল শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া বসিয়া পড়িলাম। ততক্ষণে ক্লান্তশরীরে সঙ্গী-মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন রাস্তা বলুন দেখি?" তিনি তাঁহার সেই ঘর্ম্মসিক্ত জামাটি খুলিয়া পাথরের উপর রৌদ্রে দিতে দিতে বলিলেন, "সে কথায় আর কাজ কি, পিতৃপিতামহের পুণ্যের জোরেই এই পথ দিয়া প্রাণ লইয়া যাইতে পারিতেছি। উঃ কি ভয়ানক, বুঝলে হা।" আমি তখন সম্মুখে, মালপার দিকে দেখাইয়া বলিলাম, "এই ত আসিয়া পড়িয়াছি, ঐ যে দেখা যাইতেছে।" কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আমরা উঠিলাম।

অল্প দূরেই একটি প্রবল নীল ধারা কালীর সঙ্গে মিলিয়াছে, সেই ধারার উপরে একটি সেতু আছে উহা পার হইয়া কালীর কোল দিয়া বরাবর পথটি উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেই পথের ধারেই একটি উচ্চ ভূমির উপর একখানি গবাক্ষশূন্য খড়ের ঘর দেখা যাইতেছিল, তাহাই মালপা নামক পড়াও এবং ডাকপিয়নের আড্ডা। যাত্রিগণ আসিয়া সেইখানেই আড্ডা করে, রুটী পাকায় আর নীচের ওডিয়ারে রাত্রি যাপন করে। এ অঞ্চলে গুহাকেই ওডিয়ার বলে নদীসঙ্গম হইতে ডাকপিয়নের কুটীর বা আশ্রমখানি প্রায় ষাট ফিট উচ্চে, উপরে উঠিবার পথের ধারে দুইটি গুহা আছে। আমরা আহারাদির পর তাহারই একটিতে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে আমরা বুদি যাত্রা করিলাম। এই যে সাংখোলা হইতে মালপা, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পথের কথা আমাদের বহুকাল স্মরণ থাকিবে, কারণ এ পথ যেমন দুর্গম তেমনি বিচিত্র দৃশ্যে পরিপূর্ণ। এ পথে আমরা অনেকগুলি গুহা, অনেকগুলি ছোট-বড় ঝরণা ও জলপ্রপাত, এবং অনেকগুলি প্রখর বেগবতী জলস্রোত পাইয়াছিলাম।

মালপা হইতে বুদি দশ মাইল, চড়াই উৎরাই বিশেষ নাই। পথে দৃশ্য মনোরম। বেলা আন্দাজ একটার সময় আমরা বুদিতে পৌঁছাইয়া পাঠশালায় আড্ডা করিলাম। এখানে জলকষ্ট, স্নানের জন্য অনেকটা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পরে রন্ধন ভোজনাদি সারিতেই অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। এখান হইতে গারবেয়াং অল্পদূর—মোটে চারি মাইল মাত্র হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা বিষম খাড়া চড়াই থাকায় সে রাত্রি বুদিতেই যাপন করা গেল।

এখানকার অধিবাসীরা বড়ই অনুদার এবং সংকীর্ণ প্রকৃতির, মদ্যপায়ী এবং যথেচ্ছাচারী। আলস্য ত ইহাদের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা। সঙ্গের বাহক দুজন না থাকিলে আমাদের বিব্রত হইতে হইত। সন্ধ্যায় সঙ্গী-মহাশয়ের কিছু দুধের প্রয়োজন হওয়ায় আধপোয়া আন্দাজ দুধের জন্য ইহাদের একজন আট আনা চাহিয়া বসিল। বাহকেরা বলিল যে, ইহারা ভদ্রতাবর্জ্জিত, আপনারা ইহাদের কাছে কিছু সুবিধার আশা করিবেন না; অনেক দূর হইতে আসিতেছেন, এবং আপনাদের প্রয়োজন বুঝিয়াই এরূপ চাপ দিতেছে।

যাহা হউক প্রভাতে উঠিয়া আমরা গারবেয়াং রওনা হইলাম। বেশ শীত লাগিল, যেন আমাদের দেশের মাঘ মাস। প্রবলবেগে বাতাসও চালাইয়াছে। সেই ঠাণ্ডায় দুই মাইল আন্দাজ খাড়া চড়াই ভাঙা বেশ শুভ যোগাযোগ বটে, কিন্তু প্রত্যেক সন্ধিতে সন্ধিতে বিষম সংঘর্ষ বাধাইয়া

তুলিল। হৃদয়মধ্যে যতটুকু শক্তি আছে সবটুকুই বুঝি ফুরাইয়া গেল। তিনবার বিশ্রামের পর আমরা ব্যাসক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। প্রভাতের সূর্য্যকিরণে দশ সহস্র ফুট উপরে নয়নমনোমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে প্রকাশ প্রথমেই চক্ষে দেখিলাম তাহাতেই পথের সকল কষ্ট একেবারেই যেন দূর হইয়া গেল। যথার্থই আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। হিমালয়ের উচ্চস্তরের মধ্যে যে পাইন দেখা যায়, চারিদিকেই সেই সকল পাইনের উপবন। দূরে চারিদিকেই চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গধর। নিম্নভূমিতে চলাচলের পথ ব্যতীত সকল দিকেই তৃণগুল্ম এবং বিবিধ বর্ণের পুষ্পরাশি বিস্তৃত। প্রভুর মহিমা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে একীভূত হইয়া জীবনকে ধন্য করিয়া দিল। আনন্দে নির্ব্বাক, পা যেন চলিতে চাহে না। গৃহ ছাড়িয়া এতটা পথ যে কি জন্য আসিলাম তাহা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ করিয়া দিল।

চারিদিকেই, ঘোড়া, গরু, মেষ, ছাগল প্রভৃতি চরিতেছে, প্রায় দুই মাইল দূরে গারবেয়াং গ্রামখানি দেখা যাইতেছে। গ্রামের কোল হইতে স্তরে স্তরে শস্যক্ষেত্র নামিয়া বহু নিম্নে একেবারে কালীগঙ্গার ক্ষীণ ধারা অবধি পৌঁছিয়াছে। দূরত্ব হেতু দৃশ্যের ক্ষীণ আভাস যেন অনন্তের বোধ প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতেছে, দেশ ও কালের ব্যবধান মানিতে চাহে না।

সঙ্গী-মহাশয় পশ্চাতে ছিলেন, কতক্ষণ পর তিনি আসিলে আমরা কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলাম। তিনি বড়ই অবসন্ন,তথাপি তাঁহার মধ্যে উদ্যম কমিতে দেন

মালপার "ওডিয়ার"

নাই। বলিলেন, "দেখ, চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা না হইলে আর আমরা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। ঘরে শান্তি থাকিতে দুর্গম পথের কষ্টটা আমরা সঙ্গে লইয়াই বাহির

হইয়াছি, বুঝলে হ্যা"। বুঝিলাম যে এই পথের চড়াই ভাঙিতে কষ্ট তাঁহার বিশেষ লাগিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, "একটি বিশেষ আনন্দ লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা বাহির হইয়াছি, বিনা হেতুতে ত বাহির হই নাই, আর তাহার সঙ্গে আমাদের জীবনের একটি সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। অন্তরের মধ্যে একটি আনন্দের আস্বাদন বিশেষ করিয়া আমরা প্রত্যেক কষ্টের পরই পাইতেছি।" তিনি বলিলেন, "আমি এই হিমালয়ে অনেক বেড়াইয়াছি, এত কষ্ট কখনও করি নাই, কাশ্মীরে গিয়াছিলাম সে ত সুখের পথ; তার পর বদরিকাশ্রমেও গিয়াছিলাম, সেও লোকের কাঁধে চড়িয়া, তাহা ছাড়া সে রাস্তাও ভাল ছিল, এ রাস্তার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সে পথে অনেক সুবিধা আছে, বুঝলে হ্যা?" এইরূপে কথায় কথায় আমরা আন্দাজ নয়টার সময় গারবেয়াং-এ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডাকঘরের দাওয়ায় আমাদের বাহকদ্বয় মালপত্র রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

ইতিমধ্যে লোকমণিজী ধারচুলা হইতে আমাদের জন্য সকল ব্যবস্থাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রামে পৌঁছিবামাত্রই দিলীপ সিং নামক একটি নবীন ভোটিয়া যুবক ইংরেজী-ভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া একেবারেই রুমা দেবীর গৃহে লইয়া তুলিল। রুমা তখন কাদা-গোবর দিয়া ঘর নিকাইতেছিল। আমাদের দেখিয়াই সে সেই কাদামাখা হাতটি কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল এবং সঙ্গে করিয়া একেবারে তাহার গৃহমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বড় ঘরখানিতে লইয়া গেল এবং হিন্দীতে বলিল, "এইখানেই আপনারা থাকিবেন।"

ব্যাসক্ষেত্র, গারবেয়াং

রুমার গৃহখানি দ্বিতল, পাহাড়ি মকান এ দিকে যেমন হয় সেইরূপ, দ্বিতলের ঘরে সম্মুখ দিকে ত্রিধা বিভক্ত বাতায়ন। আমাদের জন্য যে-ঘরখানি সে ছাড়িয়া দিয়াছিল সেটি তাহার শয়নের ঘরও বটে আবার ঠাকুরঘরও বটে। মাটির দেওয়ালের চারিদিকেই দেবদেবীর চিত্র আঁকা আছে, রাধা-কৃষ্ণ, মহাবীর, রামচন্দ্র, শিব—তাঁহার জটা দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়া চলিয়াছে তাহাতে মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে, ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আবার নীতিকথা সকল বড় বড়

রুমাদেবী

দেবনাগর অক্ষরে লেখা, মোটা কাগজে লাগাইয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে একখানিতে তুলসীদাসের একটি বচন, তাহা এইরূপ—

"দশরথনন্দন রাম ভজরে, রাম জপ, অভিমান
তজিরে।
করো মত বৈর, ঝুঠ মত ভাখই,
মত পর ধন হর, মদ মত চাখই,
জীব মত মারো, জুয়া মত খেলো, মত পর-তিরিয়া
লখরে।
ঘড়ি ঘড়ি পল ছিন অবোধ জীব তুহ সো প্রভুকে
গুণ গাবেরে।
বহুরি ন ঐসো দাব মিলেগো, রাম চরন নিত চিত
ধররে।

ঘরের কোণে একখানি খাটিয়া ছিল, সঙ্গী-মহাশয় রাত্রে সেইখানিতে শুইতেন, আর আমি মেঝেতে আসন পাতিয়াছিলাম। ভগবৎ কৃপায় আমরা অতীব সুন্দর

স্থান পাইয়াছিলাম। আমরা আসিবার দুইদিন পর নাথজী ও লালগীর আসিয়া ডাকঘরেই বাসা লইলেন। ক্রমে ক্রমে পথের খবর এইটুকু পাওয়া গেল যে, এখনও তিব্বতের রাস্তা খুলে নাই।

রাস্তা খুলে নাই অর্থে রাস্তাটি যে আগড় দিয়া বন্ধ আছে তা নয়। এখনও ভোটিয়া ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ যাহারা ব্রিটিশ অধিকারে বাস করে এবং প্রতি বৎসর তিব্বতে তাকলাখার মণ্ডিতে দোকান পাতে, তাহাদের ওদিকে যাইবার হুকুম হয় নাই। প্রতি বৎসর আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত যে হাট বসে, তাহার পূর্ব্বে এদিককার কয়েকটি মাতব্বর ভোটিয়া মহাজন আগে যাইয়া পুরাংয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে একটি মুচলেকা বা স্বীকার পত্র লিখিয়া দেয় যে, এ অঞ্চলে কোনো প্রকার রোগ, মারী বা অশান্তি নাই। তাহারা ঐরূপ লিখিয়া দিলে তিব্বত রাজসরকার হইতে ব্রিটিশ প্রজাদের পুরাংয়ে যাইবার এবং হাট বসাইবার হুকুম হয়। এবারে এখনও হুকুম হয় নাই, কারণ আসকোট অঞ্চলে 'হৈজাকী বীমারী' চলিতেছিল। সকল মহাজনই লোক-লস্কর, মালপত্র, ভেড়-বকরী লইয়া পথে অপেক্ষা করিতেছে, খুব সম্ভব দশ হইতে পনের দিনের মধ্যেই পথ খুলিবে। কাজেই আমরাও অপেক্ষা করিতে বাধ্য। এদিক হইতে ইহারা গিয়া দোকান না পাতিলে এবং থাকিবার স্থান ঠিক না করিলে আমরা গিয়া উঠিব কোথায়—আমাদের আশ্রয় ত এই ভোটিয়া মহাজনগণ। পথ খুলিতে যখন দেরী আছে তখন এই অবসরে ইহাদের আচার-ব্যবহার এবং সমাজসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলে মন্দ হইবে না।

দিলীপ সিং নামক যে যুবকটি আমাদের প্রথমে তাহার গৃহে আনিয়াছিল, সে প্রায়ই কর্ম্মাবকাশে আমাদের নিকট আসিত, বসিত, এবং নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিত। এখানে তাহারা চারি ভাই-ই শ্রেষ্ঠ বণিক এবং ধনবান। দিলীপ আলমোড়ায় ইংরেজী ম্যাট্রিক পড়িয়া এখন এখানে আসিয়া কারবারে মন দিয়াছে। অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত, এ দেশের পক্ষে সে যেন একটি নূতন মানুষ, যেহেতু এ দেশের পুরুষেরা জনে জনে, বোধ হয় শতকরা অষ্ট-নব্বুই জন অলস, মদ্যপায়ী, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী এবং তামাকু-বিলাসী। সে এ সকলের কিছুতেই বশীভূত নয়।

এ দেশের পুরুষেরা ক্ষেত্রকর্ম্মের মধ্যে শুধু হলচালনা-টুকুই করে, বাকী সমস্ত কাজ স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে।

দিলীপ সিং

বীজবপন, জমির পাট, আগাছা তোলা, কাঠ কুড়ানো, কাপড় কাচা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তামার ঘড়া করিয়া জল আনা প্রভৃতি ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ তাহারাই করে।

এখানকার মেয়েরা ভোরে উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই চা তৈয়ারী করে। উহা আমাদের দেশের লিপ্টনের চা-ও নয়, আর তাহার প্রস্তুত-প্রণালীও সাধারণ নহে। এই চা, চাল-ডাল যেমন সিদ্ধ করা হয় সেই মত সিদ্ধ করিতে হয়। জল চাপাইয়া প্রথমে নুন ও চার পাতা তাহাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে সুসিদ্ধ হইলে যখন উহা রক্তবর্ণ হয় তখন নামায়। তিন চার ইঞ্চি মোটা, দুই হইতে তিন ফিট লম্বা, আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে পিতলের তার দিয়া বাঁধানো একটি কাঠের চোঙ আছে। তাহার মধ্যে ঐ চা ঢালিয়া এক

তাল মাখন তাহাতে দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে একটি কাঠের লম্বা দণ্ড আছে, সেইটির সাহায্যে পিচকারীতে জলটানা ও ছাড়ার মত অনবরত কিছুক্ষণ হাবিশ করিতে হয়। মাখনের তালটি যখন গলিয়া চায়ের সঙ্গে মিশিয়া যায় তখন একটি প্রকাণ্ড তামার আধারে ঢালিয়া দেয়। পরে সেই চায়ের গামলা এবং এক থালা ভাজা গমের ছাতু মধ্যে রাখিয়া সকলে মণ্ডলাকারে বসিয়া এক একটি চিনামাটির কিংবা রূপা দিয়া বাঁধানো নেপালী কাঠের বাটিতে লইয়া কখনও চুমুক দিয়া কখনও ছাতুর সঙ্গে ঢেলা করিয়া গলা᾿ঃকরণ করে। এই প্রকারেই ভোটিয়ারা চা খায়। তাহা সর্ব্বাংশেই তিব্বতীয়দিগের অনুকরণ।

চা খাওয়া শেষ হইলে স্ত্রীলোকেরা সকলে একবার ক্ষেত্রে কাজ করিতে যায়, তাহার পর আসিয়া অনেক বেলায় রান্না করে। তাহার পর সকলকে খাওয়াইয়া নিজেদের ভোজনের ব্যাপার শেষ করিয়া ঝুড়ি পিঠে জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে কিংবা নদীতে বা ঝরণায় কাপড় কাচিতে যায়। এখানে ধোপা নাপিত নাই। ক্ষৌর-কর্ম্ম এবং কাপড় কাচা প্রত্যেক সংসারে নিজেদেরই করিতে হয়। খেলার পর হইতে এই যে ভোটিয়া পরগণা, ইহা যথার্থই ধোপানাপিতবর্জ্জিত দেশ। যাহা হউক কাঠকুড়ানো বা কাপড় কাচা শেষ হইলে গৃহে ফিরিয়া সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আবার তাহারা ক্ষেত্রে যায়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করে, এবং সকলকে খাওয়াইয়া নিজের খাওয়া হইলে আনন্দে আসন, গালিচা এবং পশমের অন্যান্য বস্ত্রাদি বয়ন করিতে বসে। এইরূপে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাজ করিয়া শয়ন করে। এদেশের নারীরা সাধারণত এইভাবেই জীবন যাপন করে। ইহারা সদাই সুখী, সুস্থ, হাস্যমুখী, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল;—পরদা ত নাই-ই,—কিন্তু নির্লজ্জ কোনো প্রকারেই নয় এবং সর্ব্বদাই পুরুষের সেবাপরায়ণা।

আর পুরুষ-মহাশয়েরা যতটা সময় দেশে থাকেন, ততক্ষণ মদ্যপান, তাসখেলা ও তামাকু টানাই তাঁহাদের কাজ। পিতলের হুঁকা—তাহার মুখে লম্বা একটি কাঠের নল, তাহা বোধ হয় কখনও ওষ্ঠাধরের সম্বন্ধচ্যুত হয় না। উহা নেপাল হইতে আমদানী এবং সে দেশেরই অনুকরণ। হুঁকার মাথায় একটি করিয়া ধুনুচী সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে।

ভোটিয়া পুরুষের আড্ডা
গারবেয়াং

ইহারা তিব্বতী এবং নেপালী সভ্যতার ধুয়া ধরিয়া চলিতেছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সদর রাস্তার ধারে কতকটা ফরদা প্রস্তরপ্রাচীর বেষ্টিত বসিবার স্থান আছে, সকালে বিকালে সেইখানেই গ্রামের বৈঠক বসে। সেখানে পাঁচ সাত জন, কেহ বা প্রাচীর হেলান দিয়া, কেহ কাত হইয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া, কথা কহিতে কহিতে তামাকু টানিতেছে প্রায় সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যাইত। সকাল সন্ধ্যায় প্রায় সকল গ্রামবাসী সমবেত হইয়া গ্রাম্য কথা, রাজনীতি, সাংসারিক কথা, হাস্যপরিহাস, আমোদ, ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, জ্ঞানশূন্য হইয়া স্ত্রীলোক লইয়া টানাটানি, এই সকল কাজে দিনযাপনই এখানকার পুরুষের নিত্যকর্ম্ম। যখন ইহারা কলিকাতা বা কানপুরে মাল সওদা করিতে যায় তখন বাধ্য হইয়াই একটু শরীর চালনা করিতে হয়,

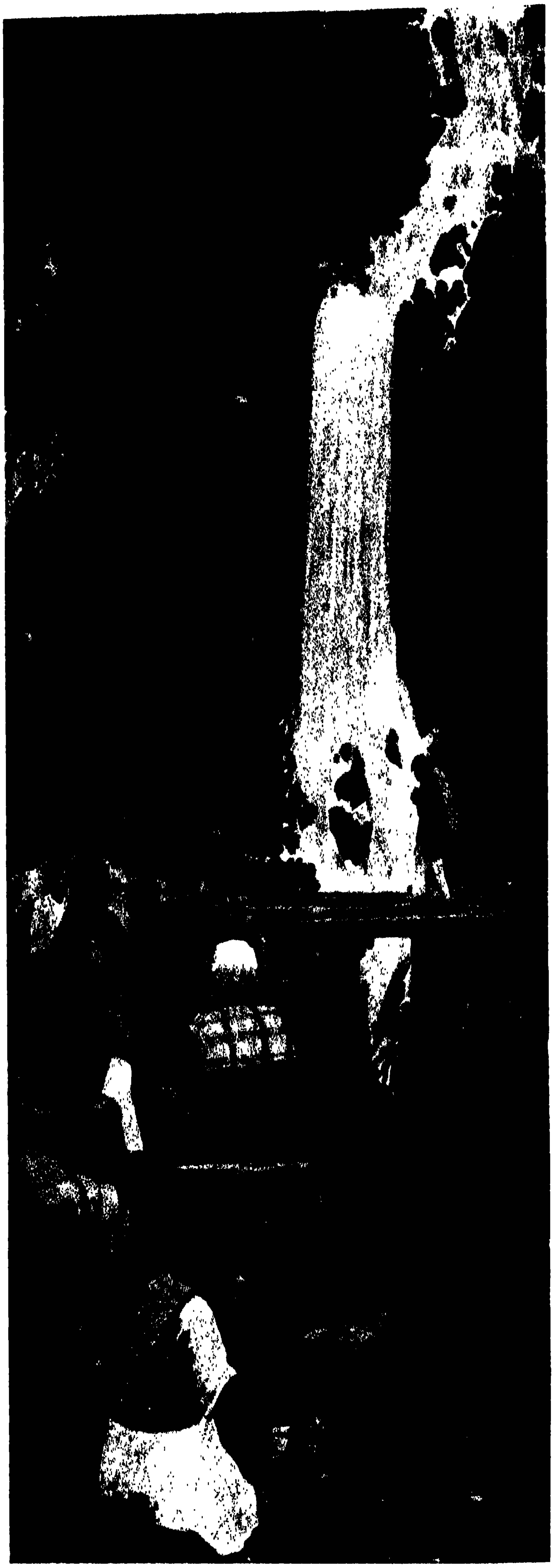

গারবেয়াং‌এর পথে
শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

না করিলে উপায় নাই। পরে দেশে আসিলে পরিশ্রমের পাট ইহাদের নাই বলিলেই হয়। আবার যখন তিব্বতে যায়, গাধা বা ভেড়-বকরীর পিঠে মাল বোঝাই দিয়া লোকজন লইয়া রাস্তাটুকু ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যেটুকু পরিশ্রম। নচেৎ সেখানে গিয়া দোকান পাতিয়া বসিলে বালিশে হেলান দিয়া তামাকু টানাই প্রধান কর্ম্ম। কার্ত্তিক মাসে যখন ইহার নামিয়া ধারচুলায় যায় তখন উহারা বিশেষ কিছু করে না, স্ত্রীলোকেরাই চরকা কাটিয়া পশমের সুতা বা দড়ি বাহির করে এবং ভাল ভাল মোটা সোটা ভোটিয়া কম্বল প্রস্তুত করে। সুদৃশ্য পুরু গালিচার আসন, তিব্বতীয় শিল্পের অনুকরণে বয়ন করিতে ইহারা সুপটু। তাহাতে দুই জনের বেশী বসা যায় না, বড়জোর একজন একটু পা ছড়াইয়া বসিতে পারে।

কন্যাগণের প্রায় যৌবনেই বিবাহ হওয়া নিয়ম, কিন্তু বিবাহের প্রণালী অনেকটা রাক্ষস ও কতকটা গান্ধর্ব্ব মতেরই মিশ্রণ। 'কোর্টসিপ' বা পূর্ব্বপরিচয় ও প্রণয় হইয়া ইহাদের বিবাহ হয়। গ্রামের মধ্যে একখানি নিভৃত গৃহ থাকে তাহার নাম "রাম বাং"। সেখানে সন্ধ্যার পর আড্ডা বসে। গ্রামের অপ্রাপ্ত, প্রায়-প্রাপ্ত ও প্রাপ্তযৌবন কুমার ও কুমারীগণ রাত্রে উত্তম বেশভূষা করিয়া সেথায় উপস্থিত হইয়া মদ্যপান, নৃত্যগীত ও হাস্যপরিহাসে আনন্দের হাট বসায়। রজনী গভীর হইলে যে যাহার মনোমত সঙ্গিনীকে লইয়া রাত্রি যাপন করে। পরে প্রাতে উঠিয়া যে যাহার স্থানে যায়। ভিন্ন গ্রামের কোনও অবিবাহিত যুবক গ্রামে আসিলে, এবং তাহাকে সেখানে রাত্রি যাপন করিতে হইলে, "রাম বাং"ই তাহার পক্ষে প্রশস্ত স্থান। মাতারা সন্ধ্যার পর কুমারীদের বেশভূষা করিয়া সাজাইয়া 'রাম বাং'এ পাঠাইয়া দেয়। ইহাদের বিবাহে পুরোহিত নাই, মন্ত্র নাই, শালগ্রাম নাই, বেদী নাই, রেজেষ্ট্রী নাই, কোনোরূপ অপ্রাকৃত নিয়মের বশে ইহারা মোটেই চলিতে শিখে নাই। যাহার সঙ্গে যাহার ভালবাসা হয় সেই তাহার বর বা কন্যা। কেবল সেই মনোমত বর কন্যাকে আংটি গড়াইতে উনিশ বা একুশটি টাকা উপহার দেয়, তখন সে তাহার পিতামাতাকে জানায়। তার পর পাত্র সুবিধামত একরাত্রে 'রাম বাং' হইতে পাত্রীকে লইয়া প্রস্থান করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। তার পর সেখানে

জল আনা

সাধ্যমত দুই চারিটি ভেড়-বকরী মারিয়া ভোজ হয়। তাহার পর হইতে রীতিমত ঘর-সংসার আরম্ভ। এখন কোথাও কোথাও এ প্রথার ব্যতিক্রম হইতেছে, পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বিবাহ চলন করিবার কেহ কেহ পক্ষপাতী হইয়াছেন।

এখানকার নারীগণ বড়ই অলঙ্কার-প্রিয়। অলঙ্কার অধিকাংশই রৌপ্যনির্ম্মিত। তাহার মধ্যে কচিৎ স্বর্ণা-লঙ্কারও দেখা যায়। কণ্ঠালঙ্কারের সঙ্গে প্রবালের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। প্রবাল ইহাদের শোভা এবং বিশেষ আদরের বস্তু। চুল বাঁধিবার বিষয়ে ইহাদের পারিপাট্য কম নহে। সম্মুখের সিঁথির দুই পার্শ্বে কতকগুলি সূক্ষ্ম

সূক্ষ্ম বিনুনী করিয়া দুই পার্শ্বের কপালটি পুরা ঢাকিয়া সাজাইয়া দেয়। সম্মুখের সেই চুলগুলির সূক্ষ্ম বিনুনী করিতে চুলবাঁধুনীর অনেকখানি নিষ্ঠীবন খরচ করিতে

কাঠ কুড়ানো

হয়। এক একবার থুথু দিয়া খানিকটা ভিজাইয়া পরে বিনাইতে থাকে, তাহা শুকাইলে 'কসমেটিকে'র কাজ করে অর্থাৎ তারের মত লাগিয়া থাকে। ইহাতে বদনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বলিয়াই তাহাদের ধারণা। নাসিকার অলঙ্কার তত বড় নয় যতটা কণ্ঠালঙ্কারের আকৃতি। বালিকারা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত টাকা, আধুলি, সিকির মালা আকৃতি অনুসারে সারি সারি সাজাইয়া সুচারুরূপে গাঁথিয়া পরে।

এদেশের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই শক জাতি আসিবার পূর্ব্বে এখানে অনেক মুনি-ঋষি বাস করিতেন। সংসারসম্পর্কশূন্য, ভোগবিলাসবর্জ্জিত সেই তপস্বী মহাত্মারা এ স্থানে যে অমৃতের আস্বাদন পাইতেন,—এই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যের অন্তরালে অনন্তমুখী যে একটি প্রেরণা নিত্যকাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, স্থানে আসিয়া না দাঁড়াইলে তাহা অনুভব হয় না। ক্রমশঃ জনসমাগম বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা রুমার আশ্রয়ে যথার্থই সুখে দিন কাটাইতেছিলাম। কোনো অসুবিধা বা অভাব ছিল না। প্রাতে আমাদের দুজনের মধ্যে যে কেহ ডাল-ভাত রাঁধিয়া লইতাম তাহাতে রুমারও আহার হইত। রাত্রে রুমা রুটি পাকাইত। সকালে রুমা সকল দ্রব্যই সরবরাহ করিত। আমাদের নিজেদের কিছুই ব্যয় করিতে দিত না। তাহার ইচ্ছা ছিল সকালেও সে আমাদের জন্য পাক করে, কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় তাহাতে রাজী হইলেন না।

আমরা কিসে সুখে থাকিব, কি হইলে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা হয়, রুমা অনেক সময় তাহার তদ্বিরেই ব্যস্ত থাকিত। প্রাতে আমাদের পর তাহার ভোজন শেষ হইলে প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে সাজসরঞ্জাম লইয়া সে আসন বা গালিচা বুনিতে বসিত। তখন সে একখানি কারপেটের আসন বুনিতেছিল। সে কাজ করিতে করিতে কত কথাই বলিত, তাহাদের দেশের কথা, তাহার নিজের কথা। দেশবাসিগণের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সে এমন সুন্দর হিন্দীতে বলিত যে, তাহাতে তাহার বিচক্ষণতা, গভীর ধর্ম্মপিপাসা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইতাম। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের কয়েক জন সন্ন্যাসী একবার কৈলাসাদি তীর্থস্থানে গিয়াছিলেন, রুমা তাঁহাদেরও এইরূপ সেবা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর কোনো-না কোনও সাধু মহাত্মা এ অঞ্চলে আসিলে রুমার অতিথি হইয়া, তাহার সেবা লইয়া পরে কৈলাসাদি স্থানে গিয়া থাকেন। ঘরে বসিয়া এই রূপে অনেক সাধুমহাত্মার সঙ্গ পাইয়া তাহার ধর্ম্মজীবনে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। আমরা যে শ্রেণীর সাধু অবশ্য অন্যান্য তীর্থকামী মহাত্মারা সেরূপ নহেন, তাঁহারা যথার্থই সাধু বা সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী। আমরা গৃহী হইলেও রুমার কাছে সেবা বোধ হয় যথার্থ সাধু, সন্ন্যাসী, ত্যাগী অপেক্ষা কিছুমাত্র কম পাই নাই। তাহার সঙ্গ করিয়া

এটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সীমা নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রী শ্রী মা-ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা লইবার জন্য রমা ব্যাকুল হইয়া দিন গণিতেছে। সেই কারণেই বাঙালী মাত্রেই রমার আপনার। বাঙালীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। রাত্রেও আহারাদির পর সে ঐরূপ আমাদের কাছে বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিত। বেশী কথা ঐ রামকৃষ্ণের সম্বন্ধেই, এই মহাপুরুষের জীবনকথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত।

এইবার ক্রমে ক্রমে আরও কিছু কিছু কৈলাসযাত্রী আসিয়া গারবেয়াংএ জমিতে আরম্ভ করিল। রমাও প্রত্যহ সকল খবর আনিয়া দিত। আমরা সকাল-বৈকালে বাহির হইয়াও খবর পাইতাম। রাস্তা খুলিতে আর দেরী নাই। কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি আর এখানে থাকিতে পারিতেছেন না, প্রত্যহই যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। মাত্র দুই একজন যাত্রীর ও-পথে যাওয়ার কত বিঘ্ন তাহা তিনি জানিতেন না। বার বার তাঁহাকে যাইবার কথা বলিতে শুনিয়া একদিন রমা তাঁহার ভ্রম ভাঙিয়া দিল। সে বলিল,—"আপনি যে যাইবেন বলিতেছেন, যাইবেন কোথা? এখানকার মহাজন সকলে না গিয়া উঠিলে, তাঁবু, ঘর প্রভৃতি না বানাইলে আপনারা উঠিবেন কোথা? কে আপনাদের স্থান দিবে? আপনাদের ও-অঞ্চলের মত তীর্থ ত এ নয়, তিব্বত বড় ভয়ঙ্কর স্থান। আর দুই চারিদিনেই পথ খুলিবে। আমাদের ব্যবসায়ী লোক তখন গিয়া বসিলে পরে আপনারা যাইবেন, মায়াবতী হইতে যদি কোন স্বামিজী আসেন তাঁহাদের সঙ্গে আপনাদের মিলাইয়া দিব এবং আমিও যাইব। আপনাদের সেবা করিব। সকলে মিলিয়া একত্রে ও-রূপ স্থানে যাত্রায় অনেক সুবিধা আছে আর তাহা বড়ই আনন্দের এবং যাত্রাও নিরাপদ হইবে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আপনারা এখন এই যে এখানে রহিয়াছেন আপনাদের সেবা করিতে পাইতেছি, সৎসঙ্গে দিন কাটাইতেছি, ইহাতে আমার কত আনন্দ! যতদিন পথ না খুলে আপনি আর নিত্য নিত্য যাইবার কথা বলিয়া দুঃখ দিবেন না।"

আমরা যে কয়দিন ছিলাম (প্রায় আঠারো দিন হইবে), তাহার মধ্যে শেষের দিকেই ক্রমশঃ বহুতর স্ত্রীপুরুষ, বেশীভাগই গৈরিকধারী বা ধারিণী আসিয়া জুটিলেন।

ভোটিয়া বালিকা

প্রত্যহই যাত্রার কথা, পথ খুলিবে কবে, কতদিনে যাওয়া যায়। অনেকেই রমার ঘরে ভিক্ষায় আসিত, সেই সুযোগে অনেককেই দেখিতাম। একদিন একজনকে দেখিলাম, অতীব ভয়ঙ্কর অবস্থা তাঁহার—যেন প্রেতমূর্ত্তি।

তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল যে দেওয়াল ধরিয়া তবে তিনি বসিলেন। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও জ্যোতিহীন, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বসিবার পর ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে ব্যাপার যাহা বলিলেন তাহা এইরূপ—বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই একজন তিনি, কাশী হইতে কৈলাস ও মানস সরোবর যাইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার সম্বলের মধ্যে কৌপীন আর একখানি পালো কম্বল। তিনি কাহারও কথা না মানিয়া আপন মনে বরাবর অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর লিপুধুরায় বর্ফানি মুলুকে পড়িয়া তাঁহার শরীর বিকল হইয়া গেল।

ভোটিয়া বালক

সেই ভয়াবহ শীত, রুক্ষবায়ু এবং তুষারক্ষেত্র তাঁহার কল্পনার অতীত। বরফের উপর দিয়া নগ্নপদে চলিতে চলিতে পদতল ফাটিয়া রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। সঙ্গে আহারাদি কিছুই ছিল না, তিনি একান্ত নির্ভর করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন, কিছু সংগ্রহ করা তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সেখান হইতে তিনি আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া অতিকষ্টে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন কিছু গরম কাপড় পাইলে তিনি এখান হইতে নামিয়া চলিয়া যান। দেখিলাম, তাঁহার পদতল এমন ফাটিয়াছে যে দেখিলে আর চর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না, যেমন প্রকাণ্ড কাঠে ফাটা দেখা যায়, সেইরূপ ফাটা। মুখের কাছে এতটা ফাঁক যে দেখিলে ভয় হয়।

না জানিয়া নাবুঝিয়া, কাহারো কথা না মানিয়া হঠাৎ তিতিক্ষার বশে অনেকেই এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি দুই একজন মারাও গিয়াছেন। সমতলবাসী, রেলের ধারে তীর্থ করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের ধারণা নাই যে এসকল তীর্থে যাইতে গেলে কি ভয়ানক বিরুদ্ধ প্রকৃতির মধ্য দিয়া এই নরশরীর লইয়া চলিতে হয়, প্রকৃতির কতটা অনুকূল যোগাযোগই বা ঘটাইতে হয়!

(ক্রমশঃ)

কলঙ্ক

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

"সব শুনেছি। এ তো আর কল্‌কাতা সহর নয়, এখানে সমাজ মেনে চলতে হবে। তাই বলছি, তোমাদের আর এখানে থাকা হতে পারে না। কথাটা বুঝলে কি?" বলিয়া শশিশেখর পিতৃহীন একমাত্র ভাগিনেয়ের মুখের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইলেন।

অনিলকুমার অকস্মাৎ মাতুলের এই নির্ম্মম আদেশ-বাণীর অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল, এমন কি গুরুতর ব্যাপার ঘটিল যে-কারণে মামা তাহাদের তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সে তার আশ-পাশ চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিল—এমন কিছুই ত মনে আসিতেছে না—যাহাতে করিয়া সহসা মাতুলের সমাজ-আতঙ্ক এত-বড় একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে পুরাতন পড়া দেখার মত সে আগাগোড়া তাহাদের দেশ ত্যাগ করিয়া আসা হইতে এ-পর্য্যন্ত অতীত স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখিয়া গেল। কিন্তু কোথাও সে এক বিন্দু অন্যায় করার মত অপরাধ খুঁজিয়া বাহির

করিতে পারিল না। তাহাকে নিরুত্তর ও চিন্তিত দেখিয়া শশিশেখর তিরস্কারের সুরে বলিলেন,—

"অপরাধ করলে যে উত্তর দেবার কিছুই থাকে না, তা আমার বেশ জানা আছে। প্রতিবাদ করলে যে বিশেষ ফল হবে না, তা এতদিন এবাড়ী থেকে বুঝতে তোমার বিলম্ব হবে না। এতদূর হতে পারে, স্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারিনি। দুধকলা দিয়ে সাপ পুষলে লোকে বলে, সে সাপ তাকেই কামড়ায়। সে কথা যে সত্য তা তুমিই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিলে।"

শশিশেখরের কথাগুলি শাণিত শরের মতই নিষ্কলঙ্ক বালকের হৃদয়ে গিয়া বিঁধিতেছিল। যে-মাতুলের সম্মুখে সে কোনোদিন মুখ তুলিয়া কথা বলে নাই—সেই মাতুলের নিকট তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের কারণ কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল তাহাই সে ভাবিতেছিল। গৃহত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সে বিন্দুমাত্রও ভীত বা চিন্তিত হইল না। আপনার দিক দিয়া দেখিয়া যখন সে তার মাতুলের অভিযোগের মোটেই কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না তখনই তার দুঃখ অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিল, সেইজন্য সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার উপর এ বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত সে বিশেষরূপে জানিত তাহার পূজনীয় মাতুল, ন্যায়-সঙ্গত হইলেও প্রতিবাদ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বরং দেখা গিয়াছে সামান্য প্রতিবাদ করিয়াই অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেইজন্য অনিল মৌন থাকিয়াই সকল অভিযোগ সহ্য করিতেছিল।

মাতুল বলিলেন, "এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে বিশেষ কোনো ফল হবে না। আমাকে আর জ্বালাতন কোরো না। যত শীঘ্র পার যাবার ব্যবস্থা করগে।"

অনিল অত্যন্ত বিনীতভাবে উত্তর করিল, "মামাবাবু, ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি পিতৃতুল্য,—আপনার অনুগ্রহেই আজো বেঁচে আছি। আমার অন্যায় আপনি না বুঝিয়ে দিলে, না দেখিয়ে দিলে, কে ধরিয়ে দেবে, বলুন। যেটা আমার প্রকাণ্ড দোষ বলে মনে করেছেন, সেটাই হয়ত আমার বোঝবার ভুলে অন্যায় বা অপরাধ বলে আমি মোটেই অনুমান করতে পারিনি; সেজন্য জোর করে বলতে পারি—যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে।" বলিতে বলিতে অভিমানে তাহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

"জোর করে তোমাকে কোনো কথা বলবার প্রয়োজন নেই—আমার এতটা বয়সেও যদি ভাল মন্দ বোঝবার মত জ্ঞান বা শক্তি না হয়ে থাকে, তবে তোমার উপদেশে যে আজ হবে—তেমন দুরাশা মোটেই নেই। যে অন্যায় করে তাকে সেটা বড় বুঝিয়ে দিতে হয় না। সে মনে মনে তার অপরাধ কতখানি ও কোথায়, এত ভালরূপ জানে যে অন্যের ব্যাখ্যা বা টীকার আবশ্যক সে বোধ করে না। কি করবে না করবে, সে কথাগুলা আর আমার মুখ থেকে নাই বা শুনলে। যাও। বৃথা তর্ক কোরো না। এটাও জেনো প্রমাণ না পেয়ে এত বড় কথাটা বলবার লোক আমি নই।"

অনিল বিস্ময়বিহ্বল কাতর দৃষ্টিতে তার স্নেহময় মাতুলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, উত্তর করিতে সাহস পাইল না। সে বুঝিয়াছিল, মামাবাবু তার কোনো কৈফিয়ৎ শুনিতে প্রস্তুত নন। তারপর সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

সেদিন তার অন্তরের মধ্যে নিপীড়িত আত্ম-সম্মান বারবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিবাদের পথ নাই, মিথ্যারও সীমা নাই—এই সত্যটাই তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল।

(২)

পাঁচ বৎসর যখন অনিলের বয়স তখন সে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া তার বিধবা জননীর সহিত মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেও আজ এক যুগের উপর হইবে। এতদিনের স্নেহের ভালবাসার সম্বন্ধ এক মুহূর্তে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এই কথাটা ভাবিতে তাহার নয়ন অশ্রুসমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। তাহার স্নেহময় মাতুল, পূজনীয়া মামী-মা, তাহার মামাতো ভাই অবিনাশ—আশৈশবের সঙ্গী, ইহাদের কাহাকেও সে আর দেখিতে পাইবে না, এই নিদারুণ সত্যটা ভাবিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মা আসিয়া ডাকিলেন; অনিল সজলচক্ষে জননীর মুখের প্রতি তাকাইল। কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

বুদ্ধিমতী জননী পুত্রের অন্তরের ব্যথা বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছিলেন। তিনি এত বড় ব্যাপারটাকে কিছুমাত্র প্রাধান্য না দিয়া অত্যন্ত সহজভাবেই বলিলেন—

"সংসারে অনেক বড় বড় কাজ এমনি মূর্ত্তিতেই দেখা দেয়—এটা ভগবানের আশীর্ব্বাদ রে, আর কিছু নয়। এটাকে তুই যত ছোট করে, হীন করে দেখবি ততই তোর মন দুঃখে, ক্ষোভে সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠবে। দু-দিন পরে এমনিই ত তোকে কলেজে পড়তে কলকাতায় যেতে হবে—সে কথাটা ভুলছিস কেন?"

অনিল বলিল, "তখন ত আর তোমার ভাবনা থাক্‌ত না - তোমায় কোথায় নিয়ে যাব? পড়বার খরচ কোথায় পাব?"

জননী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বোকা ছেলের শেষে ভাবনা হ'ল কি না আমাকে নিয়ে-ই! আমার জন্য, টাকার জন্য তোকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। ভগবান সব ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখেন। তুই যে পনর টাকা বিত্তি পাবি একথা গ্রামের কেউ কি স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পেরেছিল? না অবিনাশ ফেল হবে একথা কোনো দিন কেউ মনে করেছিল?"

জননীর মুখে অণুমাত্র বিষণ্ণতার চিহ্ন নাই—তিনি যে তাঁর পিতৃগৃহ হইতে পুত্রের অপরাধেই বিতাড়িত হইতেছেন, সেজন্য তাঁর মুখ হইতে একটি কথাও নির্গত হয় নাই। পুত্রের অপরাধ যে কি, তিনি অতি সহজেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। এরূপ অপরাধের পথ যে পৃথিবীতে কেহ কোনো দিন বন্ধ করিতে পারে নাই, তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দুঃখ করিবার মত কিছু ছিল না।

"আচ্ছা মা তোমাকে যদি প্রভার মার কাছে রেখে যাই—তা হ'লে আমার কোনো ভাবনা থাকে না। তাদের বাড়ীতে ত আর কেউ নেই—প্রভা ও তার মা ছাড়া।" বলিয়া অত্যন্ত আগ্রহে জননীর উত্তর-প্রত্যাশায় মুখের দিকে চাহিল।

"আমিও তাই ভেবেছি। প্রভার মা আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তার জন্যে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আজ একবার দুপুরে প্রভাদের বাড়ী যাব'খন, কাল সকালে ওখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলে হবে। তোর মামার ভুলের জন্য তাঁর উপর মনে রাগ রাখিস্ নে যেন, বাবা অনিল। মানুষের ভুল এমন হাজার হাজার হয়ে থাকে, আবার একদিন সুদে আসলে সংশোধন হ'য়ে থাকে।"

অনিল মার অন্তরের উদারতায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তার অন্তরাকাশের কালো মেঘ অনেকখানি সরিয়া গেল। হৃদয়ের গুরু ভার হাল্কা হইয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, মামাবাবু যখন নিজের ভুল বুঝবেন, তখন কিন্তু তিনি বড়ই দুঃখিত হ'বেন।"

"নিজের ভুল যখন নিজেই ধরে ফেলা যায়—তখন আর আপশোষ রাখবার জায়গা থাকে না রে।"

সেদিন মাতা-পুত্রের কথা এইখানেই শেষ হইল।

মোটামুটি ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ। অবিনাশ ও অনিল দুইজনে ছেলেবেলা হইতে একই ক্লাসে অধ্যয়ন সুরু করিয়া বরাবর ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত জুড়ি ছিল। শশিশেখর-বাবু পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক রাখিয়াছিলেন; তাহাতে অনিলের পড়াশুনারই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। অবিনাশ বড়লোকের ছেলে—আর অনিল ছিল বড় লোকের দরিদ্র ভাগ্নে। অবিনাশের পড়াশুনায় প্রথম হইতেই বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাহার পিতামাতার ও প্রতিবেশীদের মুখে প্রায় সে শুনিত, "তার কিসের অভাব—পাস করে তো আর তাকে চাকরী করতে দরখাস্ত হাতে আপিসের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না?"

এই অযাচিত ভবিষ্যৎ-চিত্রই তাহার লেখাপড়া শেখার পক্ষে প্রকাণ্ড অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিক্ষকের কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন সে কোনো দিন অনুভব করিত না।

ফুটবল, থিয়েটার, সখের যাত্রা, বারোয়ারী প্রভৃতির প্রধান পাণ্ডা ছিল জমিদার-পুত্র অবিনাশ—পঠদ্দশায় তার নাম অদূরবর্ত্তী দশখানি গ্রামের ভিতর জাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এই অল্পবয়সেই তার অনেক বন্ধু

জুটিয়াছিল। বন্ধুদের বয়স অবিনাশের সহিত বন্ধুত্বের পক্ষে অনেক বেশী হইলেও সে তাহা মোটেই অশোভন মনে করিত না। বিড়ি সিগারেট, তামাক লজ্জার মাথা খাইয়া প্রকাশ্য পথে অত্যন্ত গৌরবের সহিত অবিনাশের মুখে শোভা পাইত। ইহার উপরের সংবাদ অনিলকে বিদায় করিয়া দিবার পর নাকি পূরা মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

সুতরাং অবিনাশ যে কোনো দিন পাস করিতে পারিবে না, আর সে সংবাদটা অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের মত যে আসিবে না,তাহা সকলেই মনে মনে অবগত থাকিলেও সমস্ত অপরাধটা আসিয়া ব্রহ্মদৈত্যের মত অকস্মাৎ স্কন্ধে আরোহণ করিল পিতৃহীন বালক অনিলের। আর এই সত্যের সাক্ষী হইলেন গ্রামের মাতব্বর নিষ্কর্মা বৃদ্ধেরা। এঁরাই থাকিতেন সদাসর্ব্বদা শশিশেখরের বৈঠকখানা-গৃহ আলোকিত করিয়া, বিবেকবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়া সামান্য অনুগ্রহ-দৃষ্টির প্রত্যাশায়!

শশিশেখরবাবুর বৈঠকখানায় প্রতিদিন আপিসের মত নিয়মিত পাশার আড্ডা বসিত। পাশার চালের মধ্যেই গ্রামের খুঁটিনাটি সংবাদ দিত এই সকল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নিষ্কর্মার দল। তখন কোন্ কথার কি উত্তর ভাল কি মন্দ—ডিক্রী-ডিসমিস্ কাজীর বিচারের মতন নিষ্পন্ন হইত। সেই লক্ষীছাড়া পাশা খেলার আড্ডায় অনিলের মামলা উঠিতেই রায় বাহির হইয়াছিল।

বামাচরণ ছিল তাহাদের মধ্যে বড় ফরিয়াদি ও বক্তা। তাহার গুণধর পুত্রটি বিশেষ কারণে দুইবার মুচলেকা দিয়া বহুকষ্টে শ্রীঘর-বাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ধনাম-ধন্য পুত্রটিও নাকি এবার অসম্ভব উপায়ে পরীক্ষা দিয়া ছাড়পত্র পাইয়াছিল। সে কারণে গৃহিণীর হুকুমে বামাচরণ বড় কম করেন নাই। অনেকগুলি করকরে টাকা ঠাকুর-দেবতাদের ঘুষ দিয়াছিলেন। সত্যনারায়ণ নাকি অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা ও অল্পেই প্রসন্ন হন, তাই তাঁহার খোসামোদী উপলক্ষ করিয়া অনেকগুলি ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন ভাবিবার কথা হইতেছে—"এ ছেলে ফেল কিছুতেই হতে পারে না। আপনারাই বলুন ত?" উমেশ পাঠক তখন কচে বারোর আড়ি মারিয়া ভীষণ চীৎকার করিতেছিল, সুতরাং বামাচরণের কথা ভাসিয়া যায় দেখিয়া সে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

শশিশেখরবাবু বলিলেন—"বামাচরণবাবু আর বল্‌তে হ'বে না—নইলে অবিনাশ জলপানি না পেয়ে জলপানি পেলে কি না অনে—"

বামাচরণ গদ্‌গদ্ হইয়া উত্তর করিলেন, "জমিদার-মশায়, আপনার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে ঢের এই বয়সে দেখেছি। কিন্তু বাবা হাই তুল্লে বুঝতে পারে এমন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান হাজারে কেন, লাখে একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।"

উমেশ পাঠক উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল, পাশা রাখিয়া প্রায় লাফাইয়া শশিশেখরের পার্শ্বে আসিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া একবার চতুর্দ্দিক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। তারপর মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "বল্‌তে মাথা কাটা যায়। কলিকাল! কলিকাল! প্রভাকে পড়াবার অছিলে করে রোজ সন্ধ্যার পর সেখানে অনিলের আড্ডা জমে।"

সকলে উৎকর্ণ হইয়া উমেশ পাঠকের কথাগুলি অত্যন্ত আগ্রহে হজম করিতেছিল। "পাঠক মশাই—ও পাপ আর একদণ্ড বাড়ীতে রাখা মঙ্গল নয়—সব বুঝেছি, নইলে অবিনাশ ফেল হয়?"

সেদিন পাশা খেলা ভাল জমিল না সত্য, কিন্তু তার চেয়ে'বে একটা বড় মঙ্গলকর কাজ হইল সেই অপূর্ব্ব আনন্দে গ্রামের মুরুব্বিরা গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পবিত্র পল্লীগ্রামখানি সেদিন বহুকষ্টে শশিশেখর-বাবুর নিষ্ঠায় ও সুবিচারে গ্রামবাসীদের সাহায্যে ধর্ম্মের সিংহাসনে অটুট হইয়া বসিল।

পিতৃহীন ভায়ের ও বিধবা ভগ্নীর বিদায় এই ব্যাপারটিকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিল। সকলেই জমিদারের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল—প্রজাপালন ও ধর্ম্মরক্ষার্থ রামচন্দ্র কি না করিয়াছিলেন? এমন জমিদার হ'বে না!

(৩)

গ্রামের উপকণ্ঠ দিয়া ক্ষুদ্র নদী কল্যাণী প্রবাহিতা। ইহার কল্যাণে ম্যালেরিয়া বড় এখানে কিছু আধিপত্য

বিস্তার করিতে পারে নাই। নদীর দুই তটের উপর গ্রামবাসীদের বাগান—অত্যন্ত সুন্দর। মাঝে মাঝে ঘাট। অনিল বৈকালে প্রায় এই ধারে বেড়াইতে আসে। একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ যেখানে নির্জ্জনে নদীর বক্ষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—সে স্থানটি অত্যন্ত মনোহর। নানাবিধ পক্ষীর কূজনে মুখরিত। নিত্যসঙ্গী সেই বৃদ্ধ বটের ছায়ায় আসিয়া সেদিন অনিলকুমার যথারীতি উপবেশন করিল।

নানারূপ ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার মনের মধ্যে উদয় হইয়া আবার পরক্ষণেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে সে তার নির্ব্বাসনের অপরাধ কি তা শুনিয়াছিল। লজ্জায় সে মরিয়া যাইতেছিল। সতীলক্ষ্মী প্রভার মা'র অকারণ নিন্দার কথা যখনই তাহার মনে আসিতেছিল, ভাবিতেছিল কি বলিয়া আমরা আবার তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে যাইতেছি। একথা শুনিয়া পর্য্যন্ত কি যে একটা অশান্তি সে অনুভব করিতেছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। ক্রোধে এক একবার তার মনে হইতেছিল এখনি গিয়া সে উমেশ পাঠককে খুন করিয়া আসে—তার পর মনে হইতেছিল, ইহাতে উপকার হইবে না বরং নিন্দাটার মূল্য আরো বাড়িয়া উঠিবে। আবার তাহার মনে হইল কেমন করিয়া শুভ্রকেশ বৃদ্ধ উমেশ পাঠক এত বড় মিথ্যা কলঙ্কটা অসহায়া বিধবার নামে রটাইল। একবারও কি তার অন্তর কাঁপিল না? এই অপবাদের কথা শুনিয়া ঐ ফুলের মত পবিত্র নিষ্কলঙ্ক বালিকাকে কে বিবাহ করিবে? তবে কি তার বিবাহ হইবে না? কেন আমি তাহাকে পড়াইতে গেলাম? নাই বা সে লেখাপড়া শিখিত—বিবাহ ত হইত। কেন আমি তার নারী-জীবন ব্যর্থ করিয়া দিলাম,—উমেশ পাঠক তাহাদের নামে কলঙ্ক না দিয়া কেন সে সমস্ত পৃথিবীজোড়া কলঙ্কের পসরা আমার মাথায় তুলিয়া দিল না? সমাজ ধন্য তোমার প্রভাব! মিথ্যার বড়াই লইয়া এত অত্যাচার! এত অহঙ্কার—টিকিবে কি?

তখন সন্ধ্যা হয় হয়—নদীর ঘাটে লোক নাই। অদূরের একটি ঘাটে একটি বালিকা কলসীকক্ষে জল লইতে ধীরে ধীরে যেন কি ভাবিতে ভাবিতে অবতরণ করিতেছিল। সহসা অনিলের দৃষ্টি সেদিকে পড়িতেই দেখিল প্রভা জল লইতে আসিয়াছে। গ্রামের সকলেই এই নদীর জল পান করিয়া থাকে।

অনিল একবার মনে করিল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। কিন্তু কালই ত উহাদের আশ্রয়ে উঠিতে হইবে। মনে হইল ব্যবধানই মানুষের মনের মধ্যে দুর্ব্বলতা সঞ্চার করে। সে তখনি উঠিয়া ঘাটের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। ঘাটের উপর কলসী নামাইয়া রাখিয়া প্রভা ফিরিয়া দেখিল অনিলকুমার। সে তার বালিকা-সুলভ সহজ সরল হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "অনিল-দা' তুমি নাকি কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছ?"

"এ সংবাদ কে তোমাকে দিল প্রভা?"

অস্তমিত সূর্য্যের গোধূলি আলোকে তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "তুমি মনে করেছ আমি বুঝি কিছু জানি না! পিসিমা যে আজ দুপুরে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। সব শুনেছি।"

অনিলের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে কথা জোগাইতে-ছিল না।

"অনিল-দা' তুমি একটু দাঁড়াও, আমি জলটা তুলে নি।" বলিয়া প্রভা জলের দিকে আরো দুই ধাপ নামিয়া গেল।

সহসা কে যেন অনিলের মনের মধ্যে বলিয়া উঠিল—এই নির্জ্জন নদীতীরে এই সময় উচিত হয় নাই প্রভার সহিত সাক্ষাৎ করা তাহার। সে কাঁপিয়া উঠিল। এখনি যদি উমেশ পাঠক তাহার মামাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসে, তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে এবং তাহাদের মনে কি হইবে? সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিবামাত্র প্রভা বলিল, "অনিল-দা', একটু দাঁড়াও, আমার হয়েছে। ঐ আমাদের বাড়ীর কাছে বাঁশতলাটা আমার বড় ভয় করে—ওখানটা আমায় পার করে দিতে হবে।"

অনিল মনে মনে বলিল, "মরা ভূতেরা জ্যান্ত ভূতের

চেয়ে অনেক ভাল—তারা কোনো দিন এত-বড় অন্যায় করতে সাহস পায় না।"

পথে যাইতে যাইতে প্রভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কলকাতা যাবে?"

"সত্যিই যাব প্রভা।"

"কেন?"

"কলেজে পড়বার জন্য।"

"কলেজ বুঝি এখানে নেই। সে বুঝি আমাদের স্কুলের চেয়ে বড়?"

"অনেক বড়—আমি গেলে কি তোমার কষ্ট হবে প্রভা?"

"তোমার যে নিজের বোন নেই, নইলে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারতে না।" বলিয়া প্রভা অভিমানভরে কোনো উত্তর দিল না।

অনিল পথের নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া বলিল, "মা যে তোমার কাছে থাকবেন।"

অনিলের কথায় বাধা দিয়া প্রভা উত্তর করিল, "সে সংবাদ আমার কাছে মোটেই নূতন নয়।" তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার আর পড়াশুনা কিছু হবে না?"

পড়াশুনাই যে তার কাল হইয়াছে, একথাটা অনিলের বুকে শেলের মতই বিঁধিয়াছিল। অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া অনিল বলিল, "তুমি পড়া বন্ধ কোরো না। কলকাতা থেকে ভাল ভাল বই পাঠিয়ে দেব।"

আনন্দে প্রভার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল, "কে পড়া বলে দেবে?"

"তোমার পিসিমা।"

প্রভা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "পিসিমা বুঝি ইংরাজি পড়া জানেন?"

"তোমার পিসিমার কাছেইত আমি লেখাপড়া শিখেছি প্রভা।"

এই সময়ে উভয়ের আতঙ্ক জাগাইয়া পূর্ব্বকথিত বাঁশঝাড়ের ভিতর যেন মনে হইল, দুইজন লোক সতর্কে চলিয়া গেল। প্রভা সভয়ে সরিয়া গিয়া অনিলের হাত চাপিয়া ধরিল।

অনিল মনে মনে ভাবিল যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই। নিশ্চয় দুষ্টেরা আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। অনিলের মনে হইল, ফিস্ ফিস্ করিয়া কারা যেন কথা বলিতেছে। প্রভা সঙ্গে না থাকিলে সে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ধরিত এবং শাস্তি দিতে ছাড়িত না। উভয়ের মধ্যে আর কোনো কথা হইল না।

(৪)

সাত বৎসর পরের কথা। এই দীর্ঘ সাত বৎসর অনিল দেশে ফেরে নাই। মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নানের উপলক্ষ করিয়া মাকে কলিকাতা লইয়া যাইত। সেখানে মাতাপুত্রে দেখা হইত। প্রভার বিবাহের পরামর্শ হইত। পাছে কলঙ্কের বোঝা বাড়ে এই আশঙ্কায় সে দেশে আসিত না। মা তা বুঝিতেন। প্রভার জননী এ যুক্তি মোটেই অনুমোদন করিতেন না। তিনি বলিতেন, "ছেলে বাড়ী আসবে তাতে লোকের কথায় ভয় করতে হবে? পোড়া কপাল!"

অনিলের জননী উত্তর করিতেন, "ভয় না করে উপায় কি বোন? যারা সর্ব্বদা কারণে অকারণে অসহায় বিধবা নারীর উপর অত্যাচার করে আবার তাদেরই একঘরে করে রাখবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টাকে সতর্ক প্রহরীর মত সজাগ রাখে, তারাই ত সমাজের স্তম্ভ! তারাই ত সমাজধর্ম্মের চাঁই ও রক্ষক। একথা কি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে?"

সরোষে প্রভার মা বলিতেন, "তাদের ভয় করবার কিছু নেই। তারা ঠগ, তারা মিথ্যুক, তারা জোচ্চোর!"

প্রভার মার কথায় বাধা দিয়া অনিলের জননী সভয়ে বলিতেন, "চুপ কর, চুপ কর, এখনি হয়ত কেউ শুনতে পাবে—আর রক্ষা থাকবে না। চোখের উপর দেখলি ত নিজের বিধবা বোনকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে কি একটুখানি ইতস্ততঃ করেছিল?"

যে পরের কথায় নিরাশ্রয় বিধবাকে অকারণ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, সে যেই হোক তাকে প্রভার মা কোনো দিনই ক্ষমা করতে পারবে না—রক্ষা করার পরিবর্ত্তে বিপন্ন করাই দেখ্‌ছি সমাজের সব চেয়ে বড় কাজ। তখন তাকে ভয় করে ত কোনো ফল নেই; বরং ভয় করি না এই কথাটা জোর গলায় জানিয়ে দিতে পারলে সুফল ফলতে পারে, বিষদাঁত ভেঙে যেতে পারে।

অনিলের মা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "প্রশ্রয় দিয়েই ত তাদের প্রতাপ বাড়িয়ে তোলা হ'য়েছে, একথা একশো বার সত্যি। কিন্তু প্রভার দিকে চেয়ে কেমন মনটা ভয়ে মুষ্‌ড়ে পড়ে, বোন।"

প্রভার জননী বলিতেন, "প্রভার জন্য একরত্তি ভাবি না তার অদৃষ্টের উপর অত্যাচারী প্রবঞ্চক সমাজের কোনো অধিকার নেই, একথা আমি অন্তরে অন্তরে বেশ ভালো জানি। তারা যে অধিকারে আমাদের একঘরে করে রাখতে চায়, ঠিক সেই অধিকার দিয়ে আমরা যখন তাদের ঠেলে রাখতে পারব তখন তাদের গড়া সমাজ, তাদের ঘরের মতই একটু নাড়াতে ভেঙে পড়বে।"

"ধন্য তোর বুকের পাটা।"

প্রভার মা বলিতেন, "বুকের পাটা কি কম দুঃখে হ'য়েছে দিদি! যেদিন পাঁচ বৎসরের মেয়ে প্রভাকে নিয়ে বিধবা হই তারপর থেকে বলতে লজ্জা করে এই-সব অপদার্থ সমাজপতিরা কি অত্যাচার না আমার দুর্ব্বল অসহায় অবস্থার উপর করতে চেষ্টা করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য ভগবান বুকের পাটা বাড়িয়ে দেন। যারা দশজনে মিলে একজনকে বাগে পেয়ে ঠ্যাঙায় তারা মানুষ নয় বোন, পশু।"

"আজ তোমার কথায় আমার মনে বল বেড়ে গেল।"

"ওদের যত উপেক্ষা করতে পারব, ওদের অহঙ্কার ততই ভেঙে পড়বে। ওদের দয়া-আত্তি ভিক্ষা করেছ কি ওরা পেয়ে বস্‌বে, ধ্বংসের পথে ফেলে দিতে প্রাণপণ করবে।"

এমনি আলোচনায় এই দুইটি বিধবার দিন কাটিত। প্রভা এসব কিছু বুঝিত না।

(৫)

অনিল প্রতি সপ্তাহে জননীকে পত্র দিত। সেই পত্রের মধ্যে প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিত, তার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে। এক একখানি পত্রে বহু উপদেশও দিত। নূতন নূতন বই কিনিয়া পাঠাইত। প্রভা তার পিসিমার পত্রের মধ্যে কত কথাই না লিখিত। সে একবার লিখিয়াছিল, "আমার কলকাতা দেখবার বড় ইচ্ছা করে, এবার যখন পিসিমা গঙ্গাস্নান করতে যাবেন, সেই সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে লিখবেন।" আরো লিখিয়াছিল, "আচ্ছা, কলকাতায় কি আছে যে একবার গেলে আর আসতে ইচ্ছা করে না।" সে-সব পত্রের মধ্যে তার অনুযোগ ও অভিমান মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিত। অনিল যে কেন আসিতে পারে না সে কথা প্রভা ভাবিতে পারিত না।

এবার অনিল একখানি পত্রে তার জননীকে জানাইল, "মা, আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে যে ছেলেটির কথা একবার তোমাকে লিখেছিলাম তার নাম তোমার নিশ্চয় মনে আছে—বিমল—সে এখন প্রায় নেমন্তন্ন ক'রে আমাকে তাদের ভবানীপুরের বাড়ীতে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। সে তোমাকে দেখবার জন্যে ওখানে যেতে চায়। কিন্তু কি করে তা হ'তে পারে? অনেক বুঝিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি। এবার সে বলেছে আর এক সপ্তাহের ভেতর মা যদি গঙ্গাস্নান করতে না আসেন, তাহ'লে সে আমার কথা মানবে না। সে বলেছে, সে নিজেই চলে যাবে। এঁদের সংসার দেখ্‌লে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। বিমলের বাবা সুবোধবাবু হাইকোর্টের একজন বড়দরের উকীল। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বিমলের মা ঠিক তোমার মত। তিনি বলেন, 'বাসায় তোমার ভাল খাওয়া হয় না, সেখানে থাকার দরকার নেই। তুমি বাবা বিমলের সঙ্গে কলেজের ফেরৎ এখানে চলে আসবে। রাত্রে খাওয়া-

দাওয়া করে আমাদের মোটরে করে বাসায় যাবে।' তিনি বিমলকে ও আমাকে ভিন্ন দেখেন না। ওঁরা অত বড়লোক কিছুমাত্র অহঙ্কার নেই। মাটির মানুষ। মনে হয় পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষদের এনে দেখাই।

"সেদিন বল্‌লেন,'আসুক এবার দিদি গঙ্গাস্নান করতে, বিমলকে বলে রেখেছি ষ্টেশন থেকে একেবারে মোটরে করে এখানে ধ'রে আন্‌বে।' আরো বললেন, 'এমন দুষ্ট ছেলেও দেখিনি, খাওয়া-দাওয়ার দিকে মোটেই নজর নেই।' আমাকে এমনি করে শাসিয়ে রেখেছেন তোমাকে সব-কথা বলে দেবেন বলে।

"তুমি যত শীঘ্র পার আসবে। বিমলের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে। বিমলের বোন বিজয়া প্রভার চিঠি পড়ে তার সঙ্গে ভাব করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমন ঠাণ্ডা মেয়ে বড়-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন রূপ তেমন লেখাপড়া জানে।"

আর একদিনের একখানি চিঠিতে বুঝি অনিল মাকে লিখিয়াছিল, "দেখ মা প্রভা একদিন আমাকে 'আমার বোন নেই' এই কথাটা বড় জোর গলায় বলেছিল। তাকে বলো মা, আমার বোন আছে। আর সেই বোন হচ্ছে প্রভা! তার বিয়েতে দেখো মা কত ধুম করি।" প্রভা পত্র পড়িয়া লজ্জায় মুখ লুকায়। তার গাল রক্তাভ হইয়া উঠে। সে সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়। মনে মনে তার অনিল-দাদার উপর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে সারা অন্তর ভরিয়া উঠে। কিছুদিন লজ্জায় সে তার অনিল-দাদাকে পত্র লেখা বন্ধ করে। কিন্তু মার পত্রের মধ্যেই সে বিজয়াকে পত্র দেয়। লেখে "তোমার সঙ্গে জানি না কখনও দেখা হবে কি না। তবে শুনলাম আমার দাদা তোমাদের বাড়ীতে প্রায় যায়,তাকে বোলো মার সঙ্গে আমাকে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতে।" প্রভা একবার ভাবে না, তার দাদা বিজয়ার অনুরোধ রক্ষা করবে কেন? সে হয়ত মনে করে বিজয়াও প্রভার মত তার দাদার উপর অধিকার রাখে।

বিমলের পরিবারের সহিত অনিলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল। বিমলের মাকে সে মা বলিয়া ডাকিত। বিজয়ার পড়াশুনায় সে সাহায্য করিত। সে যেন এই বিশিষ্ট শান্তিপ্রিয় উকীল-পরিবারের একজন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময় অনিল এম-এ পাস করিয়া 'ল' পড়িতেছিল এবং একটি স্কুলে হেডমাষ্টারী করিতেছিল।

অনিল প্রতি মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠায়। ক্ষুদ্র পরিবারটির অত্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণ ও অনিলের মামা যতদূর সম্ভব তাহাদের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হইল এবং অন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না, তখন তাহাদের একঘরে ও পতিত করিয়া রাখিল এবং একথাও প্রচার করিল, "ওই ধেড়ে মেয়ের কি করে বিয়ে হয় দেখে নেবো।" অনিল মার পত্রে এই-সব সংবাদ পাইত। সেদিন অনিল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সে-ও দেখিবে কে কাকে একঘরে করিয়া রাখে। প্রভার বিবাহের চিন্তাই তার সবচেয়ে বড় ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের মধ্যেই প্রভার বিবাহ দিতে হইবে খুব ধুমধাম করিয়া। টাকা খরচের মমতা সে মোটেই করিবে না। উত্তেজনার মুখে এমন-সব ভাবনা তার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু যখনই টাকার প্রশ্ন আসিয়া দেখা দিত, তখন সে কখনো কখনো হতাশ হইয়া পড়িত।

(৬)

সেদিন মুসলমানদের কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে হাই-কোর্ট বন্ধ ছিল। সুবোধবাবু বাড়ীতে ছিলেন। শয়নকক্ষে বসিয়া কি একখানা মাসিকপত্র দেখিতেছিলেন, এমন সময় লতিকা স্বামীর জন্য চা ও জল খাবার লইয়া আসিলেন।

সুবোধবাবু চা খাইতে খাইতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলকে দেখ্‌ছি না? সে কি বাড়ী নাই?"

তিনি বলিলেন, "বিমল গাড়ী নিয়ে শিয়ালদা গিয়েছে অনিলের মাকে আন্‌তে।"

"বিমল কি একলা গিয়েছে ?"

"না। অনিল ও বিজয়া তার সঙ্গে গিয়েছে।"

"কাজটা ভাল হয় নি। তোমার নিজের যাওয়া খুব উচিত ছিল লতু। হয় ত তিনি এদের সঙ্গে নাও আসতে পারেন। আমাদের সঙ্গে ত তাঁর কোনো দিনের পরিচয় নাই। গাড়ি কখন ষ্টেশনে আসবে শুনেছ কি ?"

অনিল বল্‌ছিল, "সাড়ে আটটার সময় নাকি আসবে।"

সুবোধবাবু ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এখনও তিন কোয়ার্টার সময় আছে। তুমি কাপড় ছেড়ে নাও—চল তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।" বলিয়া তিনিও প্রস্তুত হইলেন।

মুহূর্ত্তের ভিতর স্বামী ও স্ত্রীতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে অনিল-সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা হইল। অনেক দিন হইতে সুবোধবাবু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন বিজয়ার বিবাহ অনিলের সঙ্গে দিবেন।

সুবোধবাবু বলিলেন, "অনিলের মত ছেলে আজকালকার দিনে বড়-একটা দেখতে পাওয়া যায় না।"

"তোমাকে ত একথা অনেকবার বলেছি। বিজয়ার সঙ্গে অনিলের বিয়ে হ'লে, মনের মত পাত্র হয়। তোমার উচিত ছিল কথায় কথায় আভাসে কথাটা পাড়া।"

"আমার সঙ্গে অনিলের একদিন তা'দের সাংসারিক অবস্থার অনেক কথা হ'য়েছিল। সে অকপটে তাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা সমস্ত বলেছিল। এমন কি তার মামার প্রাচীর ঘটনাটি পর্য্যন্ত লুকায় নাই। এমন সরল, উদার, সত্যবাদী ছেলে হাজারে একটি মেলে না। তারপর অনিলের হৃদয় যে কত উচ্চ তা বলতে পারি না লতু। সে বলেছে বিবাহে তার মা কন্যা-পক্ষ থেকে এক পয়সা নিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু তার বোন প্রভার বিবাহের জন্য তাকে বিয়ে করতে হ'বে এবং টাকাও নিতে হবে, কারণ প্রভার বিবাহে আর বেশী দেরী করলে—শত্রুপক্ষের সুবিধার পথ পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।"

"সত্যিই অনিলের মত অন্তর ক'টা লোকের আছে ? প্রভা তার মার পেটের বোন নয় তা জানি—কিন্তু কিছুতেই সে কথা বোঝবার উপায় নেই।"

সুবোধবাবু বলিলেন, "সেই বোনের বিবাহের জন্য কি আগ্রহ ! অনিল বলে, প্রভার মত মেয়ে আজকাল হয় না। আমার বিশ্বাস, অনিল যাকে ভাল বলে, সে ভাল না হ'য়ে পারে না।"

যথাসময়ে গাড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিল। তখনো ট্রেন আসিতে বিলম্ব ছিল। লতিকাকে বিমলের নিকট রাখিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন।

অনিল লতিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা আপনি আবার এলেন যে ?" তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে আমার যে নালিশ দিদির কাছে করতে হ'বে তার বন্দোবস্ত করতে। কি জানি বাবা, পাছে আগে থেকে তুমি তাঁকে অন্য কিছু বুঝিয়ে ফেলে হাত করে নাও।"

"ঠিক বলেছ মা, আমি যে তোমার সাক্ষী" বলিয়া বিজয়া অনিলের মুখের দিকে তাকাইল এবং মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

(৭)

বিজয়াকে দেখিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া অনিলের জননী একেবারে বিবাহে মত দিয়া বসিলেন। বিমলের মা'র সঙ্গে তাঁর যেন কত দিনের পরিচয় ছিল। এমনি দুইজনের ভিতর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এবার অনিলের মাকে লইয়া লতিকা সারা কলিকাতা দেখাইয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। বিজয়ার উৎসাহ দেখে কে! পড়িবার ঘরে যে আজকাল বড়-একটা আসে না, মার সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরিতেছে, মুখে হাসি ধরে না।

এই দেখা সাক্ষাতের ভিতর অনিলের জননী কন্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

সুবোধবাবু প্রভার সঙ্গে নিজ পুত্র বিমলের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অনিলের মাতুল শশিশেখর-বাবুকে তাঁহার ভাগিনেয়ের বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া পত্র দিলেন।

শশিশেখরবাবু সে পত্রের কোনোরূপ উত্তর দিলেন না।

তিনি যখন জানিতে পারিলেন অনিলের বিবাহ প্রভার সহিত হইবে না, তখন তিনি যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ততোধিক মনে মনে আনন্দিত হইলেন। গ্রামের লোকের কথা যে কতদূর মিথ্যা হইতে পারে তাহা ভাবিতে তিনি বিস্মিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, হয়ত কলিকাতায় টাকার লোভে পড়িয়া অনিল আর প্রভাকে বিবাহ করিতে চায় না। কিন্তু সে কথাটা মনেই চাপিয়া গেলেন।

যথাসময় নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহ করিয়া একঘরে নিরাশ্রয় বিধবার পুত্র অনিলের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহে কিন্তু মামা আসিলেন না। কারণ তাঁহার মনের সন্দেহ মিটে নাই।

এই ঘটনার এক মাস পরে গ্রামের মধ্যে মহা ধূম করিয়া বিমলের সহিত প্রভার বিবাহ হইল।

অনিল গ্রামের সকলকেই এই শুভবিবাহে নিমন্ত্রণ করিল। খাওয়া-দাওয়ার অভিনব আয়োজনের প্রাচুর্য্যের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার উপর কলিকাতা হইতে আর্ট থিয়েটার আসিয়া অভিনয় করিবে, একথাও ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িলে সমাজের মাতব্বররা একে একে আসিয়া দেখা দিতে লাগিলেন এবং উৎসবে আসিয়া যোগদান করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না।

বাসর-ঘরের দুয়ার ঠেলিয়া একগাল হাসিয়া সকলের সম্মুখে অনিল বলিল, "দেখ ভাই বিমল, আমার বোন প্রভার যেন কোনো দিন অযত্ন হয় না।"

চেলাঞ্চলসহ প্রভা উঠিয়া আসিয়া অনিলকে প্রণাম করিল। অনিলের দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া আসিল। সে যেমন পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া সামলাইয়া লইতে যাইবে অমনি অত্যন্ত বিস্ময়ে দেখিল, তাহার মামা শশিশেখর-বাবু অনিমেষনয়নে তাহার প্রতি তাকাইয়া আছেন—সে-দৃষ্টির অন্তরালে লুকানো ছিল, অনুতপ্ত অন্তরের ব্যথিত স্নেহ ও ভালবাসা!

অনিল হর্ষবিহ্বল-অন্তরে ডাকিল, "মা, এদিকে এসো, মামা এসেছেন!" অনিল প্রণাম করিয়া মামার পদধূলি গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ সজল-নয়নে, কম্পিতহস্তে অনিলের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনিলের জননী এদিকে পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া আসিয়া বহুদিন পরে সহোদরকে প্রণাম করিলেন।

ভাই শশিশেখর বোনের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "অনেক হ'য়েছে বোন। অনিল আমার মুখ রক্ষা করেছে—কলঙ্ক মোচন করেছে।"

অনিলের জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন, ডাকিলেন, "দাদা!"

"কেন বোন?—চল বাড়ী ফিরে চল।"

মেঘ-দূত

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

উত্তর-মেঘ

বৈচিত্র্যে যে সে পুর-প্রাসাদ তুলনাযোগ্য তোমার সহ,
চিত্র রূপসী ধরে তারা, তুমি ইন্দ্রধনু ও বিজলী বহ,
তুমিও স্নিগ্ধ গম্ভীর-ঘোষ, সেথাও মুরজে প্রহত সুর,
তুমি জলহৃদি, ভূমি মণিময়, তুঙ্গ—উভয়ে অভ্র-চূড়।

হস্তে সে লীলাকমল, অলক তরুণ কুন্দ-কুঁড়িতে ঢাকে,
পাণ্ডুতা আনে আননের শ্রী:তে লোধ্রকুসুম পরাগ-রাগে,
চূড়াপাশে নব-কুরুবক, চারু শিরীষপুষ্প কর্ণে পরে,
সীমন্তে তব-সঞ্চারে-ফোটা নীপ অলকার বধূরা ধরে ।

চিরপুষ্পিত পাদপসকল মুখর মত্ত ভ্রমর-ঘেরা,
নিত্য নলিনী পদ্মভূষিত হংসশ্রেণীর মেখলা-বেড়া,
ভবনশিখীরা কেকায় আকুল, চির-উজ্জ্বল কলাপভাতি
নিত্যজ্যোৎস্নানন্দিত সেথা প্রতিহত-তম রম্য রাতি।

আনন্দে ঝরে নয়নে সলিল সেথায়, অন্য কারণে নয়,
কুসুমশরের তাপ শুধু—তাহা প্রিয়সমাগমে বারিত হয়,
যক্ষদিগের প্রণয়কলহ ভিন্ন অন্য বিরহ নাই,
যৌবন ছাড়া অন্য বয়স নাই তাহাদের, নাই সেথায়।

তারকার ছায়াকুসুমফলিত স্ফটিকগঠিত হর্ম্ম্যদেশে
যক্ষেরা যত সেই অলকার—সুন্দরীদের সঙ্গে এসে,
নিরত সেবনে রতিফলমধু কল্পবৃক্ষপ্রসূত সীধু;
তোমার তুল্য গম্ভীরবেদী বাজে মৃদঙ্গ মন্দ মৃদু।

মন্দাকিনীর শীকরশীতল সেবিয়া সমীর তটান্তের,
মন্দার তরু ছায়ায় জুড়ায়ে আতপের তাপ-ক্লান্তি ফের,
খুঁজি খুঁজি খুঁজি মুঠি-মুঠি হেম-সিকতার তলে লুকানো মণি
খেলিয়া বেড়ায় সুর-বাঞ্ছিতা সেই অলকার কন্যাগণই।

কুবেরালয়ের উত্তরে পাবে আমাদের গৃহ, দৃষ্টিপথে
সুগোচর যাহা রামধনুচারু তোরণ-হেতু সে সুদূরে হ'তে,
প্রান্তেই বালমন্দারতরু হস্তপ্রাপ্য স্তবকভারে
অবনত, প্রিয়া পুষ্ট করিল তনয়ের মত পালিয়া যারে।

মরকতশিলানির্ম্মিত তার বাপীর সোপান, সলিল ভরা
বিকচ হৈম কমলে, স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যেই মৃণাল গড়া,
সেথায় বসতি যে-হংসদের অপগত-শোক হেরি তোমায়
যাবে না মানস-সরোবরে তারা সন্নিকটেও পাইয়া তায়।

তীরে তার ক্রীড়াশৈল, শিখর রচিত সুচারু ইন্দ্রনীলে
কনককদলী বেড়ি আছে বসি দর্শনে সুখ-তৃপ্তি মিলে।
মোর গেহিনীর প্রিয় সে যে, তাই কাতরচিত্তে ভাবিয়া হায়,
প্রান্তে প্রান্তে স্ফুরিত-তড়িৎ তোমারে হেরিয়া স্মরি যে তায়।

রক্ত অশোক চল-কিশলয়, কান্ত বকুল বিরাজে এর
গায়ে কুরুবকবৃতি-দিয়ে-ঘেরা—সমীপে মাধবীমণ্ডপের,
আমার মতই—একে অভিলাষ করে বামপাদ দোহদছলে,
অপরের পূরে আকাঙ্ক্ষা তব সখীর বদনমদিরা হলে।

এই লক্ষণসকল, হে সাধু, হৃদয়ে নিহিত করিয়া, আর
দ্বারোপান্তেই লক্ষ্য করিয়া শঙ্খ-পদ্ম লিখিতাকার,
দেখিবে অধুনা আমার বিয়োগে শ্রীহীন ভবন সত্য, মরি,
সূর্য্যবিরহে নিজ-শোভা কভু পারে কি রাখিতে কমল ধরি?

শীঘ্র প্রবেশ করিতে—তখনি করিশাবকের তনুতা ধরি,
প্রথমকথিত রমণীয়সানু সে-ক্রীড়াশৈল আসন করি,
অল্প অল্প বিভাসিত-বিভা খদ্যোৎমালাবিলাস হেন
বিদ্যুৎদ্যুতিবিকাশ-দৃষ্টি ভবন-ভিতরে ফেলিও যেন।

তন্বী তরুণী শিখরিদশনা চকিতহরিণীনয়না, আর
পক্ক-বিম্ব-অধরা, নিম্ন-নাভি, কটিতট ক্ষীণ তাহার,
নিতম্বভারে অলসগমনা, ঈষৎআনত স্তনের ভারে,
বিধাতার আদি-যুবতী সৃষ্টি সে যেন, সেখানে দেখিবে তারে।

সে মিতভাষিণী বালা একাকিনী, জেনো সে আমার দ্বিতীয় প্রাণ,
দূরে সহচর, সঙ্গিহীনা যে চক্রবাকী, সে তার সমান,
কাটাইয়া অতি উৎকণ্ঠায় গুরুভার দিন, হায়-রে জানি,
শিশিরমথিতা পদ্মিনী সম রূপের তাহার হয়েছে হানি।

নিশ্চয় সেই প্রিয়ার নয়ন প্রবল রোদনে উচ্ছ্বসিত,
উষ্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাসে তার অধরোষ্ঠের বর্ণ হৃত,
অলক অ-বাঁধা, হাতে-রাখা মাথা, বিকশিত ভাব মুখের নাই,
তব-আবরণে ক্লিষ্ট কান্তি, শুধু ইন্দুর ম্লানিমা তায়।

দৃষ্টিপথেই পড়িবে তখন ব্যস্ত পূজার লাগি সে—হয়,
বিরহে কৃশতা করি কল্পনা আঁকে আলেখ্য আমার—নয়,
পিঞ্জরস্থ মধুরবচনা সারিকারে পুছে নয়ত ডাকি,
—স্বামীকে কি মনে পড়ে-লো রসিকে,প্রিয় ছিলি তার তুইও না-কি?

দেখিবে সৌম্য, মলিনবসনা কোলে তুলি বীণা গাহিতে গিয়া
মোর নামে পদ বিরচিয়া গানে, তন্ত্রী শুধুই ভিজায় প্রিয়া
নয়নসলিলে; কোনরূপে ফের সচেষ্ট হলে সারিয়া তায়,
সে যে বার-বার যায় ভুলে যায় আপনার কৃত মূর্চ্ছনায়।

কার্য্যব্যস্ত দিবসে—আমার বিরহ তাহারে পীড়ে না তত,
ভয়—সখী তব কাজহীন রাতে হয় গুরুতর বেদনাহত,
সংবাদে প্রীত করিতে সৌধ-বাতায়নে আসি করিও দেখা
নিশীথে, যেথায় বিনিদ্র ধরাশয়নে কাতর সাধ্বী একা।

সে যে শুয়ে থাকে বিরহশয়নে একটি পাশেই বেদনাক্ষীণ,
হিমাংশু-তনু যেন প্রাচীমূলে অবশেষ-কলামাত্রে লীন,
যে আমার সাথে ইচ্ছাবিহারে রাত্রি যাপিল নিমেষপ্রায়
উষ্ণ অশ্রু-সলিলে তাহার বিরহদীর্ঘ যামিনী যায়।

বাতায়নপথ-নীত সে অমৃত-শীতল চন্দ্রালোকের পানে
পূর্ব্বপ্রীতিতে দৃষ্টি পড়িলে তখনি তা খেদে ফিরায় আনে,
অশ্রু-সলিলে ভিজে ভারি পাতা, ভারে ছেয়ে ফেলে চক্ষু ফের,
যেন-বা না-জাগা না-ঘুমন্ত সে থল-কমলিনী দুর্দ্দিনের।

অবলা সে ত্যজি আভরণ, বহু দুঃখ ভুগিয়া ভুগিয়া আর,
শয্যার কোলে এবে সে ঢালিয়া কোমল গাত্র দিয়াছে তার,
হেরি অবশ্য তোমারো ঝরিবে নবজলময় অশ্রুধারা,
আর্দ্র যাদের অন্তরাত্মা প্রায় যে করুণাবৃত্তি তারা।

হে জলদ, যদি তখন দৈবে সে লভিয়া থাকে নিদ্রাসুখ,
পশ্চাতে তার প্রতীক্ষা কোরো প্রহর-মাত্র নাদ-বিমুখ,
যদি মোরে কভু স্বপ্নে লভিয়া বাঁধে সে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে,
কণ্ঠচ্যুত কোরো-না কোরো-না ভুজলতা-ঘেরা সে বন্ধনে।

স্বজলকণিকাশীতল অনিলে জাগরিত করি তাহারে চুপে,
নূতন মালতী কোরকের সহ সমাশ্বসিয়া বিশেষ রূপে,
তুমি অধিষ্ঠিত গবাক্ষ প্রতি অবাক-নয়নে যে চাহে থির,
চাপি বিদ্যুৎ—সেই মানিনীরে মন্দ্রবচনে কহিবে ধীর:

অয়ি অবিধবে, আমি মেঘ, প্রিয় মিত্র আমার তোমার স্বামী,
তার সংবাদ হৃদয়ে ধরিয়া তোমার সমীপে এসেছি আমি,
বিরহের বেণী-মোচনে ব্যগ্র পথশ্রান্ত প্রবাসী মরি,
স্নিগ্ধ মন্দ্রে পথের ত্বরা সে পথিকদিগকে প্রদান করি।

হে আয়ুষ্মন্, আমার বচনে, পরোপকারেরো লভিতে ফলে,
বোলো রামগিরি-আশ্রমে আছে তব সহচর, অয়ি অবলে,
পুছেছে তোমার কুশল—তোমার বিরহে বিরহী, সে মরে নাই;
বিপদ সুলভ পরাণীগণের, প্রথমে কুশল শুধাবে তাই।

তোমার অধরপরশলোলুপ—সখীদের আগে যে সখা ছলে,
কানে কানে কথা কহিতে চাহিত যে-কথা উচ্চে বলাও চলে,
শ্রবণ-অতীত সে আজ, তোমার লোচনপথেরো গোচর নেই,
উৎকণ্ঠায় বিরচিত পদ আমার মুখে সে পাঠালে এই।

শ্যামা-লতায় ও অঙ্গ, দৃষ্টি—চকিতহরিণীনয়নপাতে,
কেশরাজি শিখী-কলাপে, তোমার মুখচ্ছবি ও চন্দ্রমাতে,
আর হেরি ক্ষীণ নদীহিল্লোলে ভ্রূবিলাস তব, কিন্তু হায়,
একটিমাত্র বস্তুতে সখি, সাদৃশ্য তব নাই কোথায়!

গৈরিকে আঁকি প্রণয়কুপিত মূর্ত্তি তোমার শিলায়, যাই—
আপনারে আমি সেই মূর্ত্তির চরণপতিত করিতে চাই,
বারে বারে মোর দৃষ্টি রুধিয়া উপচে নয়ন অশ্রুধারে,
চিত্রেও বুঝি ক্রূর দৈব সে মোদের মিলন সহিতে নারে।

দীর্ঘযামা এ যামিনী কিরূপে ক্ষণিকের মত ক্ষুদ্র হবে,
সকল কালেই—কেমনে এমন দিন বা অনতিউষ্ণ রবে,
চটুলনয়না, এই দুর্লভ প্রার্থনা করে আমার মন!
তোমার তীব্র বিরহব্যথায় হৃত তাহার সব শরণ।

নানা কল্পনা মনে মনে করি' আপনারে ধরি আপনাতেই,
তাই বলি, অতি কাতর হোয়ো না, অয়ি কল্যাণী, ভাগ্য এই,
অতি সুখ কি-বা একান্ত দুখ চিরস্থায়িতা কিছু না ধরে,
চক্রনেমির নিয়মে সে দশা উপরে ও নীচে গমন করে।

প্রথম বিরহে অতি-শোকাতুরা তাহারে এরূপে আশ্বাসিয়া,
শম্ভুর বৃষ-উৎখাত-চূড়া শৈল হইতে শীঘ্র নিয়া
তোমার সখীর কুশলবার্ত্তা, সঙ্গে আনিয়া অভিজ্ঞান,
রক্ষা করিও প্রভাতকুন্দপ্রসূনশিথিল আমার প্রাণ।

হে সৌম্য, এই বন্ধুকার্য্য সাধিবে কি—বলি করিলে স্থির?
'করিব' বলিয়া কথা দিলে আমি ভাবিব না তুমি সুগম্ভীর;
চাতক যাচিলে নিঃশব্দেই জলদান তুমি কর তখন,
যাচকের সাধ পূর্ণ-করাই সাধুদের সদা প্রতিবচন।

মিত্রতা—মোর কাতরতায় বা, হে মেঘ মরমে করুণা ভরি,
হেন-অনুচিতপ্রার্থনা-রত আমার এ প্রিয় সাধন করি,
বিস্তারি শোভা বর্ষায়, কোরো অভিষ্ট দেশে সঞ্চরণ,
বিদ্যুৎ সহ বিচ্ছেদ তব না হোক্ এমন, একটি ক্ষণ।*

* ১৩৩৫ সনের আষাঢ় সংখ্যায় লেখক-কৃত 'মেঘ-দূতে'র অপ্রকাশিত কাব্যানুবাদ হইতে পূর্ব্ব-মেঘের নির্ব্বাচিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার উত্তর-মেঘের কতক অংশ প্রকাশিত হইল।

মাইকেলের ছন্দ

শ্রীরামচরণ নাথ

নব্য বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ক্ষণজন্মা ছন্দ-ভগীরথ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই সমর্থ ছন্দ-শিল্পীর প্রতিভা চরিত্র অনুধ্যান করিতে প্রয়াস পাইব। প্রতীচীর দীক্ষাপথে বাঙ্গালীর বাণী-সাধনার ক্ষেত্রে মধুসূদন সিদ্ধকুলীন। ইউরোপের বাণীমন্দির হইতে নবভাব ও ছন্দের উপনয়ন গ্রহণপূর্ব্বক খৃষ্টতন্ত্রী এই বাঙ্গালী কবি তাহা স্বদেশের সাহিত্যে অবতারিত করিয়া সর্ব্বজনলোভনীয়া সারস্বতী সিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। অবিবাদেই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, বাঙ্গালীর ভাষা ও শব্দতন্ত্রের পরম মর্ম্মজ্ঞ ঋষি আমাদের এই মাইকেল মধুসূদন। আমরা দেখিতেছি, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতি প্রতীচীর ভাব ও ছন্দ-তন্ত্রের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়া থাকিলেও তাঁহার পূর্ব্ব ও উত্তর সূরিবৃন্দের মধ্যে অপর কেহই বঙ্গসরস্বতীর হৃদয়-নিহিতা এই ছন্দ-শক্তি আবিষ্কার করার গৌরব-পদবী লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্গভাষার "বিবিধ রতন" পূর্ণ ভাণ্ডার-ঘরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের মন্ত্রটি যেন বিধাতা সাগরদাঁড়ীর এই সমুদ্রচ্ছন্দা ব্যক্তিটির কানে কানে সুমাহেন্দ্রক্ষণে বলিয়া দিয়াছিলেন। সেই কল্যাণ ঘটনার উত্তরবর্ত্তিতা-সূত্রেই আমরা এই অমিত্রাক্ষর ছন্দভূষণা নিরুপমা-ভারতী প্রাপ্ত হইয়াছি।

ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনের মহনীয় উপার্জ্জন দুইটি—(১) বঙ্গভাষার পুরাতন লাচারী ও পয়ার ছন্দের সমন্বয়লব্ধ মিশ্রছন্দ; (২) অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দ। দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নিয়ে যথাস্থলে লিপিবদ্ধ করিব। মিশ্রছন্দের প্রবর্ত্তন সম্পর্কে মাইকেলের প্রতিভা-মাহাত্ম্য এইমাত্র বলিলেই স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে যে, নব্য বঙ্গের গীতি-কবিতা, যাহা রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কণ্ঠে নানাছন্দে বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেই সকল নানাঅঙ্গী মিশ্রছন্দের আদিম উদ্‌গাতা ও অবতারয়িতা আমাদের এই মধুসূদন।

সুচিরবিশ্রুত পয়ার ও নৃত্যধর্ম্মী লাচারী ছন্দের সংমিশ্রণে যে কত অগণিত মিশ্রছন্দের ধারণা সম্ভব হইতে পারে, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বাঙ্গালী কবি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিতে পাই, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শব্দমন্ত্রসাধক ও অসাধারণ ছন্দ-প্রতিভাবান্ কবি ভারতচন্দ্রও এই মিশ্রছন্দের মর্ম্মতত্ত্ব ও অসীম সম্ভাব্যতা ধারণা করিতে পারেন নাই। বঙ্গবাণী এই দীর্ঘকাল যেন এক্ষেত্রে মধু-প্রতিভা সংঘটনের জন্যই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাইকেলের "ব্রজাঙ্গনা"য় আমরা মিশ্রছন্দের প্রথম অবতারণা দেখিতে পাই। এই কাব্যে মাইকেল বঙ্গভাষার মূল ছন্দদ্বয়ের সংমিশ্রণ পথে প্রত্যেক কবিতায় নব নব ছন্দের উল্লাস দেখাইয়াছেন। পয়ার ও লাচারীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই মহাপ্রাণ কবির উদাত্ত পঞ্চমে কণ্ঠ খুলিবার অবকাশ কোথায়? তাই না তিনি পরম আগ্রহভরে বন্ধুবর ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—"ইটালীয় মিশ্রছন্দকে বাঙ্গালায় আনা যায় না কি?" অসাধারণ কবি-প্রতিভা ব্যতিরেকে সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ অভিনব উপার্জ্জন সম্ভব হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদের নিবিষ্টভাবে অনুচিন্তনীয়। মধুসূদনই ইটালীয় পেত্রার্ক, তাসো, দান্তের এবং ইংলণ্ডের সেক্সপিয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্, টেনিসন্ প্রভৃতির দীক্ষাসূত্রে সনেট্‌তন্ত্রী কবিতার অভিনব উপায়ন আমাদের সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করেন। এক্ষেত্রেও যে তিনি পূর্ণায়ত সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গভাষাকে মহিমাদীপ্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুধীমাত্রকেই স্বীকার করিতে হয়।

বঙ্গবাণীর প্রকাশরীতি-ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানরূপে সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। এই ছন্দের অন্তরাত্মা একটা মহাভাব। ইহা তিনি গ্রীসের মহাকবি হোমার, ইটালীয় ভার্জ্জিল, এবং

বিশেষভাবে, ইংলণ্ডের সিন্ধুকণ্ঠ কবি মিল্টনের শিষ্যতা-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিল্টনকে তিনি দেবতাজ্ঞানেই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারই blank verseএর শ্রুতিমহতী রাগিণীর আলাপে আকৃষ্ট হইয়া মাইকেল উহা স্বদেশের সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করেন এবং লোকায়ত প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন।

বঙ্গভাষার অমিত্রছন্দ প্রবর্ত্তনের ইতিকথা ইউরোপীয় সাহিত্যের blank verseএর সামর্থ্য ও মহিমা মধুসূদনের মনকে এমন তীব্রভাবে আকর্ষণ করিল যে, তিনি গীতি-কবিতার, বিশেষতঃ, আধুনিক বঙ্গের 'লিরিক' কবিতার ক্ষুদ্র সীমাবন্ধনীর মধ্যে আদৌ স্বস্তি বোধ করিতে পারিলেন না। "পশ্চিমের অতলস্ত সমুদ্রের" দীক্ষাপ্রাপ্ত কবির পক্ষে স্বল্পপরিসর কূপের গণ্ডীর মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিহারের অবকাশ কোথায়? বিশেষতঃ, বিগত শতাব্দীর "ইয়ং বেঙ্গল" বা "চণ্ডমুণ্ড" দলের অন্যতম পাণ্ডা মাইকেল—"Paradise Lost"এর উত্তালছন্দ রস-বিলাসী মহাকবি মাইকেল—বঙ্গীয় মিত্রছন্দের 'মেল' বন্ধনী মধ্যে "বীর রসে ভাসি মহাগীত" গাহিতে গিয়া যে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সুতরাং মাইকেলের জীবনী পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম পাদচারী শিক্ষানবীশ মাইকেল, "নাটুকে নারাণ" পরিচালিত "কবি যশঃপ্রার্থী" মাইকেল কেবলই যেন এই আক্ষেপোক্তি করিতেছিলেন,—"যদি কেবল পাখা খুলিতে পারিতাম, যদি কেবল অমিত্রচ্ছন্দ ধরিতে পারিতাম!" এদিকে বঙ্গভারতীর চরণ-যুগলে মিত্রাক্ষর ছন্দের শৃঙ্খল দেখিয়া তাঁহারই ব্যথিত কবি-হৃদয় করুণ-কণ্ঠে গাহিতেছিল,—

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা! পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপে বেড়ী কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় ঘোর জ্বলি উঠে রাগে।"

আবার;—"চীনানারী সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে?"

(মিত্রাক্ষর)

এইরূপ ক্ষোভ, অভাব ও অস্বস্তি অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে হস্তপরীক্ষাও চলিতে লাগিল।

তিনি তাঁহার পদ্মাবতী নাটকেরই স্থানে স্থানে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করিতে ছাড়িলেন না। এইরূপ হস্তপরীক্ষায় তিনি ঈদৃশী "অনর্পিতচরী" বাণী-পন্থা অনুসরণের পক্ষে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার আত্ম-প্রত্যয় ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইল। আমাদের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তন সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কবিবরের পরম উৎসাহদাতা বন্ধু হইলেও তিনি এ-সাহিত্যে উহার ভবিতব্যসিদ্ধি ও নিয়তি বিষয়ে যথেষ্ট আশান্বিত ছিলেন না। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে দৃঢ়ব্রত মধুসূদন মহারাজের সঙ্গে এক প্রকার 'বাজী' রাখিয়াই এই অভিনব ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব' লিখিতে অগ্রসর হন। এই কাব্যের কৃতিত্বগৌরবে উল্লসিত যতীন্দ্রমোহন ঋজুকণ্ঠে স্বীয় পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক নিজ ব্যয়ে উহা প্রকাশ করার ভার গ্রহণ করেন। "তিলোত্তমাসম্ভবে"র মর্ম্মে মর্ম্মে একটি নিদারুণ বিদ্রোহ!—ভাবের তথা ছন্দের রাজ্যে বিদ্রোহ। প্রচলিত পয়ারাদি ছন্দের গীতিবন্ধনীর অধীনতা হইতে ভাবকে পাখা খুলিয়া নিজ সামর্থ্য, সার্থকতা ও অর্থবত্তার সন্ধানে ছুটাইয়া দিয়া এই বিদ্রোহ! এই কারণেই "তিলোত্তমাসম্ভব" প্রকাশের সঙ্গে "গৌড়ীয়" জনসমাজে এক বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই যুগের অনেক প্রথিতযশাঃ পণ্ডিতই "মাইকেলী" অমিত্রচ্ছন্দের ধারণা করিতে না পারিয়া নানাবিধ প্রতিকূল সমালোচনা দ্বারা কবিবরের ধৈর্য্য ও মহত্ব পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না যে, সহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রথম প্রথম কিছুদিন মধুসূদনের "তিলোত্তমা"র ছন্দ-মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তিকায় "তিলোত্তমার" "রসবতীত্ব" স্বীকার-প্রসঙ্গেই "মাইকেলী নূতনবিধ ক্রিয়া পদে ব্যাকরণ দোষ" এবং "ছন্দোদোষ" নির্ম্মমভাবে দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। এইভাবেই নানাদিক হইতেই প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত-

মণ্ডলীর অনুৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু, বঙ্গভাষার অমৃততত্ত্বে তথা স্বকীয় প্রতিভা-সামর্থ্যে পরম শ্রদ্ধাশীল মাইকেল কিছুতেই দমিলেন না; কিছুতেই অনবদ্য শিল্পি-চেতনা হারাইলেন না। তিনি পরম উৎসাহ ও বিশ্ববিজয়ী সাহস ভরে মহত্তর কবি-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন;—তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি "মেঘনাদবধ" রচনা করিলেন। মহামনস্বী ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় এই প্রসঙ্গে যথার্থতঃ লিখিয়াছেন,—

"Amidst this storm of opposition and ridicule, Madhusudan stood unmoved. Never was the greatness of his genius, the loftiness of his purpose, the indomitable strength of his will, more manifest. He was resolved to prove by a higher endeavour and a loftier achievement that he was right and the whole world was wrong." (Literature of Bengal)

সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ অদম্য আত্মনির্ভর এবং মহা-প্রাণতা অতীব দুর্লভ। মধুসূদন ঋত্বিজনোচিত ঋজুকণ্ঠে একবার বন্ধুবর ৺রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন - "আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়া রাখ, অমিত্রচ্ছন্দ বঙ্গভাষায় মহীয়ান্ হইবে।" এইরূপ বিশ্বাস-বরিষ্ঠ ভবিষ্যদৃষ্টি এবং সুবিপুল চিত্তস্থৈর্য্য না থাকিলে মহাকবির পূজনীয়পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটিতে পারে না। এক্ষণে,আমরা অমিত্রচ্ছন্দের মর্ম্মপ্রকৃতি, শক্তি এবং সাধনার পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমেই দেখিতে হয়, প্রচলিত পয়ারাদি ছন্দ হইতে অমিত্রচ্ছন্দের প্রকৃত প্রস্থানভূমি কোথায়? চতুর্দ্দশাক্ষর মিত্র পয়ার ছন্দের প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে শ্লোকের চরণদ্বয়ের প্রত্যেক অষ্টম অক্ষরে স্বল্প বিরাম থাকে এবং দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস বা শেষাক্ষরে "মিল" রাখিতে হয়; অধিকন্তু, কোথাও কোথাও এক চরণের এবং প্রায়শঃ দুই চরণের মধ্যেই ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটান এই ছন্দের চিরাচরিত রীতি। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটনা কদাচিৎ সম্ভব। কিন্তু, অমিত্রচ্ছন্দের প্রায় সর্ব্বত্রই চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি থাকিলেও ইহাতে চরণ-সমূহের অন্ত্যানুপ্রাস নীতি আদৌ অনুসৃত হয় না; এবং এই প্রকাশ পদ্ধতিতে ভাব কোনো নির্দ্দিষ্ট যতি বা বিরামের অনুগত হইয়া চলে না। ভাবের স্বচ্ছন্দ বিকাশ লীলাই অমিত্রচ্ছন্দের প্রাণ। ভাবের সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই রীতিতে পূর্ণবিরাম বা ছেদের কথা উঠিতেই পারে না। ইহাতে ভাবানুবর্ত্তী অন্তর্যতি প্রয়োজনমত চরণের যে কোনও স্থলে থাকিতে পারিবে এবং কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি স্বল্পবিরামব্যঞ্জক চিহ্ন দ্বারা তাহা পরিচিহ্নিত করা হইয়া থাকে। পরন্তু, পূর্ণচ্ছেদ বা বিরামভূমি শুধু ভাবের পরিসমাপ্তিতে,—তাহা চরণের আদি, অন্ত, মধ্য যেখানে পড়ুক না কেন। অনেকের ধারণা এই যে, চরণ-সমূহের অন্ত্যানুপ্রাস বা শেষ অক্ষরের 'মিলতি' না থাকিলেই বুঝি মাইকেলী অমিত্রচ্ছন্দ সাধিত হইল। কিন্তু verse মাত্রেই যেমন কবিত্ব থাকে না, তেমনই, পয়ার মাত্রই অন্ত্যানুপ্রাসবিহীন হইলে অমিত্রচ্ছন্দী কবিতা হয় না। মাইকেলের প্রত্যেক মনোযোগী পাঠককেই এই তত্ত্বটি পরিষ্কাররূপে ধারণা করিতে হয়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব ও সৌকর্য্য এই যে, ইহার সাহায্যে ভাবকে যতদূর ইচ্ছা, হৃদয়াবেগের তালে লয়ে সঙ্গতি রাখিয়া অগ্রসর করা যায়। ভাবের সমাপ্তি পূর্ণ বিরাম-চিহ্নে অভিব্যক্তিত হয়। এই প্রকাশ-ভঙ্গীতে ভাব সুদূরবিহারী বিহঙ্গমের ন্যায় ধ্বনি ও সঙ্গীতের তালে তালে মাধুর্য্য (melody) এবং পদগতির সৌষ্ঠবের (rhythm) মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বচ্ছন্দ পন্থায় উড়িয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। ইহাতে ভাব ও তৎপ্রকাশক বাক্য যতির অনুবর্ত্তী নহে, যতিই বরং ভাব ও বাক্যের অনুবর্ত্তী। আবার, এই ছন্দে পাদপূরণার্থ যেমন অযথাস্থলে অনাবশ্যক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না, তেমনই যতিরীতির অনুবর্ত্তিতায় ভাবের পক্ষচ্ছেদ ঘটাইয়া অনর্থক অন্তর্দ্দাহ সহ্য করিতেও হয় না। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের প্রখ্যাতনামাকৃতী ছন্দশিল্পী ভারতচন্দ্রকেও মিত্রাক্ষরের গণ্ডীমধ্যেই ঘুরিতে ফিরিতে হইত বলিয়া অনেকস্থলে ভাববিহঙ্গের পাখা নিষ্ঠুরভাবে কাটিয়া কবিত্ব-রস খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। অপরের কথা আর কি বলিব? অমিত্রচ্ছন্দের লোকায়ত প্রতিষ্ঠা লাভের

রহস্য এই যে, ইহা যেন অসীম মহাকাশ অথবা অপার অতলস্পর্শী সমুদ্রের সহিতই কবির অন্তর্যোগ ঘটাইয়া তাঁহার সম্মুখে ভাব প্রকাশের অনন্তসম্ভাব্যতার ক্ষেত্র রচনা করিয়া দিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্তরঙ্গ পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, সংস্কৃত কাব্যসমূহের প্রত্যেক শ্লোক, শ্লোক-যুগ্মক বা কুলকই যেন ভাবের ও অর্থের এক একটি স্বতন্ত্র প্রকাশ! প্রত্যেকেই যেন স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে দাঁড়াইবার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু মাইকেলের "মেঘনাদবধ" কিংবা "তিলোত্তমাসম্ভবের" কাব্যরসিকগণ বিশেষভাবেই জানেন যে, এই দুই কাব্যের বাক্য-সমূহ সংস্কৃত শ্লোক-পরিব্যক্তির আদৌ অনুসরণ করিতেছে না। মধুসূদনের কাব্যে এক একটি চরণ পরবর্ত্তী চরণ-সমূহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়া মিশিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়াই অর্থের ও ভাবের একটি প্রবহমান ধারাগতির সৃষ্টি করিতেছে। মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দী কাব্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সর্ব্বপ্রথম আমাদের সাহিত্যে প্রতীচ্য কাব্যের প্রকাশভঙ্গিমার এবং তাহার প্রবাহগত মহারাগিণীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারই মধ্য দিয়া আমাদের সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম সকল প্রকার বাহ্যিক স্থিতিরীতি তথা সুচিরপুষ্ট অক্ষরগত মেলবন্ধনীর বিরুদ্ধে একটি পরম কল্যাণকর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। মাইকেলী ছন্দ ভাবের উত্তাল স্বাধীনতার স্রোতে সঙ্গীতের 'উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত' পথে ভাবাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়াছে। বাস্তবপক্ষে, কবিতার প্রকৃত ছন্দ কবির গহন মর্ম্মেই নিহিত থাকে; অভাবে বাক্যরীতির সহস্রবিধ বাহ্যিক "মিল্‌তি" সত্ত্বেও অনেক সময়ে কবিতা অসার, হীনরূপ ও হীনপ্রাণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভারতের ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাসের, কাব্যমর্ম্মে রহস্যলেই অমিত্রচ্ছন্দের অন্তর্নিবাসী এই স্বাধীনতার মহাসুর মিলিবে, যদিও তাঁহাদের প্রকাশরীতি এবং মাইকেলের প্রকাশরীতি অত্যন্তর ধর্ম্মে স্বতন্ত্র। কালিদাসের 'রঘুবংশম' হইতে এই উক্তি সমর্থনা লাভ করিতে পারে;—

"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥ ৫॥
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথা কামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল প্রবোধিনাম্॥ ৬॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসেবিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥ ৭॥
শৈশবেঽভ্যস্ত-বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যাজাম্॥ ৮॥
রঘুনামন্বয়ংবক্ষ্যে…॥ ৯॥ (১ম সর্গঃ)

এখানে একটি ভাব মাত্র ৫ম শ্লোকে আরম্ভ করিয়া নানাতন্ত্রী রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া, শ্রুতি মহতি বিভাবনা ও ধ্বনিগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া একটানা স্রোতে ৯ম শ্লোকের প্রথম চরণার্দ্ধে সমাপ্তিলাভ করিয়াছে। পাঁচটি শ্লোক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে মিলিত হইয়া একটি মাত্র ভাব-ব্যক্তি গঠন করিয়াছে।

পয়ার ও লাচারীর শক্তি বিরামচিহ্নের সঙ্কেতে নিয়মিত বলিয়া ইহাতে ভাব ও অর্থের স্বচ্ছন্দ বিলাস কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে। অনেক সময়ে অক্ষর-সংখ্যা ও বাহিরের মিল্‌তি'র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে যাইয়া পয়ারাদি মিত্রচ্ছন্দ স্বতঃই "একঘেয়ে" না হইয়া পারে না। তন্নিবন্ধন বাঙ্গালার যাবতীয় প্রাচীনতা-নিষ্ঠ কবির রচনাই নান্দী-সর্গ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিয়া পরিণাম সর্গে পৌছিতে কেমন যেন একটা বিষম অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। প্রত্যেক সচেতন মিত্রচ্ছন্দী কবিকেই সুতরাং পরম্পরাক্রমে পয়ার ও লাচারীর শরণ লইতে হইয়াছিল, দেখিতে পাই। মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী,—যিনি শব্দের যাবতীয় বাহ্য মিলনকে অগ্রাহ্য করিয়া শুধু বিরামের শক্তিসামর্থ্যের উপরে নির্ভরপূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারই অমৃতফল 'মধু'র অমিত্রচ্ছন্দী কবিতা।

শব্দগত বিষম সুর-সমূহের সমাবেশে, ও আপাতঃ প্রতীয়মান অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনে অমিত্রচ্ছন্দের সুবিপুল সামর্থ্য ও সৌষ্ঠব নিহিত। ভাবের দিকে ও ছেদের সঙ্কেতে দৃষ্টি রাখিয়া অমিত্রচ্ছন্দ আবৃত্তি করিতে হয়। এই ছন্দ আবৃত্তির প্রধান সহায় ইহার ছেদ-সমূহ। ছেদ-চিহ্ন তুলিয়া লইলে অমিত্রচ্ছন্দী কবিতার আবৃত্তি একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে। সুনিপুণ কবির অমিত্রচ্ছন্দী কবিতা সু-আবৃত্ত হইলে কি যেন হিল্লোলিত তান-লয়

সমন্বিত গদ্যের ন্যায় শুনায় ;—ভাবের টানেই এই ছন্দের গতি এবং ভাবের বিরামেই ইহার যতি। "মেঘনাদবধে"র যে-কোনো স্থল হইতে উদ্ধৃত কবিতা-সাহায্যে আমাদের এই উক্তি পরিপোষণ ও সমর্থন করা যাইতে পারে :—

"সুবর্ণ শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃতকাম সহ সহগামী।
ললাটে সিন্দুরবিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে, বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ! ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী শুচামর, কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায়রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কর-রাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি'
গেছে যেন যথাপতি বিরাজেন এবে !"

—(৯ম সর্গ, ২৬৮-২৮৩ পংক্তি)

এইরূপ, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দী কাব্য-সমূহের প্রায় সর্ব্বত্রই পাঠকালীন শ্বাস ত্যাগ ও অর্থসঙ্গতি অনুসারে যতি চিহ্ন দেওয়ার নিয়ম দৃষ্ট হইবে। প্রতিভাবান কবি এমন কৌশলে শব্দ যোজনা করিতে পারেন যে, প্রতি চরণে ৮ম অক্ষরের পর সহজভাবে শ্বাস পতিত হইবে এবং ৮ম অক্ষরটি প্রায়শঃ দীর্ঘ হইবে। মধুসূদনের নিজের একখানি পত্রেই প্রকাশ—"The melody of a line is improved when the 8th syllable is made long."

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভাব কখনও ধীর পদে, কখনও দ্রুতগতিতে, আবার কখনও বা স্থগিত হইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের হৃদয়ে আশ্চর্য্য রেখাবিন্যাস করিয়া ছুটিয়াছে।

মাইকেলী অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা-রচনা বহু সৌভাগ্য ও সাধনাসাপেক্ষ। অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান এবং সঙ্গীতে পারদর্শিতা ব্যতিরেকে এই ছন্দে হস্তপরীক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ যে কত সুকঠিন, তাহা এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যে মিল্টন্ এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহারই সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী মাইকেল মধুসূদন ব্যতীত সমগ্র প্রাচ্য বা প্রতীচ্য সাহিত্যে পূর্ণসিদ্ধিপ্রাপ্ত কবি আর তৃতীয়টির সন্ধান মিলিতেছে না। মধু বন্ধুকে লিখিতেছেন,—"প্রকৃত অমিত্রচ্ছন্দকে ধ্বনি-গৌরবেই সহৃদয়চিত্ত আকর্ষণ করা চাই।" বাণী-ক্ষেত্রে সাধনপথে আমাদের কবি যে এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, শিল্প নিপুণতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন ?

এক্ষণে, আমাদিগকে দেখিতে হয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃত শক্তি কোথায় ? সংস্কৃত কাব্যসমূহে অনুসৃত যাবতীয় প্রকাশ-পন্থার রহস্য উচ্চারণ ও মাত্রাগত ধ্বনির মধ্যেই নিহিত। কিন্তু, বাংলা ভাষা এতদিন উচ্চারণ ও মাত্রাগত নিয়ম-পদ্ধতির দিকে যথোচিত দৃষ্টি সঞ্চালন করে নাই ; শুধু চরণ সমষ্টির বাহিরের 'মিল্‌তি'র ক্ষেত্রেই স্বকীয় যাবতীয় শক্তি ও সাধনা দৃঢ়নিবদ্ধ রাখিয়াছে। মাইকেলের সচেতন কবিপ্রতিভা বিশেষভাবে বঙ্গভারতীর এই ধ্বনিগত শক্তির দিকে সমাকৃষ্ট হয়।

মধুচ্ছন্দের মর্ম্ম নিবিষ্ট পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে, স্বাধীনভাবে যতিচিহ্নের যথেষ্ট প্রয়োগ এবং হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের যথাস্থলে বিনিয়োগ এই ছন্দের মধ্যেই ইহার সুবিপুল শক্তি সামর্থ্য সুগুপ্ত রহিয়াছে এবং এইখানেই মধুসূদনের কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ-বাহুল্যের ও ধ্বনি-কৌলিন্যের রহস্যটিরও সন্ধান মিলিতেছে! ভাবাকে হৃদয়চ্ছন্দের সমতালে ছুটাইয়া যদৃচ্ছভাবে বিরাম চিহ্ন বিনিয়োগের সুবিধি এই অমিত্রাক্ষরা বাণী পন্থায় ব্যবস্থিত আছে। তাই ইহা নিপুণ কবিকে সাধনক্ষেত্রে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তোলে। ভাবকে ইচ্ছানুরূপ শব্দ ব্যূহে বন্দী করিবার,—সঙ্গীতের ধ্বনি-মূর্চ্ছনায় প্রমূর্ত্ত করিবার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ কবি মিত্রাক্ষরের "বাঁধা" পথে কদাচিৎ লাভ করিতে পারেন।

প্রবীণ কবি ও সাহিত্য-দার্শনিক অধ্যাপক শশাঙ্ক-মোহন সেন মহাশয় মধুচ্ছন্দের মর্ম্ম-গ্রন্থ সার্থক বাক্যচ্ছন্দে

ব্যক্ত করিয়াছেন;—"ওই স্বাধীন-চরণা যতির মধ্যেই যে অমিত্রাক্ষরের ছন্দ! উহার সঙ্গীত অধিবাসী আত্মা এবং আত্মার অধিবাসী সঙ্গীত; অমিত্রচ্ছন্দ সকল ছন্দের অন্তর্নিবাসী অব্যক্ত আদ্যচ্ছন্দ,আর্য্যাশক্তি এবং আদ্যাশক্তি!" (মধুসূদন—৮৮ পৃষ্ঠা)। অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই শক্তি সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য মনীষী শেরার বলিয়াছেন,—Paradise Lostর ছন্দ "is the very essence of poetry." অমিত্রচ্ছন্দের এই শক্তির ধারণা করিতে না পারিয়া এক সময়ে মহাকবি হেমচন্দ্রকেও বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছিল। "মেঘনাদবধে"র ভূমিকায় তিনি মধুসূদনের সেই

> "কাঁদেন রাঘব বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
> নীরবে;........................
> "নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
> গায়ক;........................
> "রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তাহে,
> বীরেন্দ্র,........................

প্রভৃতিতে দ্বিতীয় চরণের প্রথম পদের পরেই যতি-চিহ্নের প্রয়োগ-মাহাত্ম্যটুকু প্রকৃত প্রস্তাবে না বুঝিয়া উহাকে "ছন্দোদোষ" রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, মাইকেলের সমসাময়িক অনেক বিশ্রুতনামা সাহিত্যরসিক মনীষীই গদ্যপন্থী সঙ্গীত-অস্ত্রী অমিত্রচ্ছন্দী কবিতার রহস্তে অনুপ্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনা মধুসূদনের পরম পাবনী সারস্বতী কীর্ত্তি! পশ্চিমের অতলতল কবিতা-সিন্ধুর হৃদয়বাসী সুর ও ছন্দ অসাধারণ প্রতিভাবলে আয়ত্ত করিয়া তাহা বঙ্গসরস্বতীর করধৃত বীণায় তাহার যোজনা ও সাধনাপূর্ব্বক অমর পদে অধিষ্ঠিত এই কবি। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভাষার অন্তরঙ্গীয় আর্য্যাংশের কৌলিন্য তথা প্রাকৃতাংশের সামর্থ্য এবং অপূর্ব্বতর্কিতা ভাব-প্রমূর্ত্তনী ক্ষমতা আবিষ্কার করিয়া "পূর্ব্বসূরিবৃন্দের" অবিজ্ঞাত প্রকাশ-পন্থায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছন্দ-শিল্পীরূপে নিত্যকাল পূজিত হইতে থাকিবেন। তাঁহার পূর্ব্বে আধুনিক ভারতের অপর কোনও কবি অমিত্রচ্ছন্দের ধ্বনি ও মর্ম্মবাণী আয়ত্ত করিতে এবং স্বকীয় প্রাদেশিক ভাষায় উহার অবতারণা করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতীর সুচির-রুদ্ধ হৃদয়দ্বার প্রতীচীপথে অবারিত করিবার যাদুমন্ত্র কপোতাক্ষ সুধাপায়ী এই মধুব্রত কবিটির মর্ম্মেই লুক্কায়িত ছিল। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের প্রতিভা চরিত্র ও অন্তর্জ্জীবনের পরম মর্ম্মজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক শশাঙ্কমোহনের উক্তির পুনরাবৃত্তি করতঃ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি লিখিয়াছেন,—"'ঢিলাঢালা' এবং 'আটপৌরে' ব্যবহারের ধূলিধূসরিতা বঙ্গবাণীর সুষুপ্ত হৃদয়কন্দরে এই অনুপম এবং অপূর্ব্ব সমুদ্রসঙ্গীতের রহস্ত মর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া মধুসূদন এই বাঙ্গালী জাতির অন্তরে যে নব প্রাণোচ্ছাস জাগাইয়াছিলেন, তাহার ফল সাহিত্যে নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের সমতুল্য হইয়াছিল। দেড় শত বৎসর ইংরাজীর সহবাসে থাকিয়াও অন্য কোনো বাঙ্গালী উহার সন্ধান পায় নাই!" (বঙ্গবাণী—৯৬ পৃঃ)

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৫)

নিরঞ্জন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। তাহার বক্ষের উপর যে বেদনার পাষাণভার চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভুলিতে পারিতেছিল না। এক জন্মের ভিতরেই তাহাকে জন্মান্তর ঘটাইতে হইবে। কাল যে নিরঞ্জন দেশের বাড়ীতে ছিল, তাঁহার স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, সংসার সমাজ সকলই আছে। কিন্তু আজ সে নিরঞ্জন মহানগরীর বক্ষে একাকী দাঁড়াইয়া, তাহার

কেহ নাই, এমন কি কেহ থাকার স্মৃতি পর্য্যন্ত এত বেদনাময়, যে, উহাও সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু চাহিলেই ত পারা যায় না? আর সব ভোলা যায়, কিন্তু মায়াকে সে কি প্রকারে ভুলিবে? সে যে তাহার জীবনের মূলে আপনার ক্ষুদ্র রাজত্ব পাতিয়া বসিয়াছে। তাহার সুন্দর মুখ, তাহার পাখীর কাকলীর মত অবিশ্রাম অনর্গল কথা, তাহার নানা ভঙ্গীতে নৃত্য ও ক্রীড়া, এ সকলের স্মৃতি কি পিতৃহৃদয় হইতে বিদায় দেওয়া সম্ভবপর? সত্য বটে সে সাবিত্রীকে বলিয়া আসিয়াছে যে, মায়া বড় হইলে সে তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কে তাহা বলিতে পারে? মায়াকে আর কোনোদিন সে চোখে দেখিবে কি না তাহাই বা কে জানে? সাবিত্রীর কথা সে প্রাণপণ শক্তিতে মন হইতে দূর করিয়া দিল। যে-স্ত্রীর হৃদয়ে তাহার কোনোই স্থান নাই, তাহাকে কেবলমাত্র সামাজিক আইনের বলে দখল করিয়া রাখিবারও তাহার কোনো অধিকার নাই। সুতরাং তাহার জন্য দুঃখ পাইবারও প্রয়োজন নাই।

বাসায় আসিয়া উঠিয়া চারিদিকের বিশৃঙ্খল এবং অপরিচ্ছন্নভাবে তাহার মন আরো বিরক্ত হইয়া উঠিল। চাকর মোটেই আশা করে নাই যে, নিরঞ্জন এত শীঘ্র ফিরিবে, কাজেই সে মনের আনন্দে দিন কাটাইয়াছে, ঘরগুলি দিনে একবার ঝাঁট দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে নাই। নিরঞ্জনকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

প্রভুর নিকট হইতে দু'-চারটা চড় চাপড় উপহার তাহার মিলিতে পারিত, যদি প্রভু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু চাকরের কর্ত্তব্যে অবহেলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবার মত অবস্থা নিরঞ্জনের তখন ছিল না। "বাক্স বিছানা ভিতরে নিয়ে যা আর ঘরগুলো ঝাঁট্ দে," এই বলিয়া সে তক্তপোষের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। ভৃত্য এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে ঘরদ্বার পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল।

ছুটীর যে দুইটা দিন বাকী ছিল, তাহা হাজার ভাবনা ভাবিয়াই শেষ হইয়া গেল। বাংলা দেশে থাকিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। বাহিরের কাজের সন্ধান সে সর্ব্বদাই করিত, এখনও তাহার হাতে দুই তিনটা ভাল কাজ ছিল। এতদিন তারাসুন্দরী এবং সাবিত্রীর প্রতিকূলতায় সে এসব কাজ লইবার কথা ভাল করিয়া ভাবিতেও সাহস পায় নাই। কিন্তু এখন সে স্বাধীন। ভগবান মাকে লইয়া গিয়াছেন, পত্নী ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, তাহার আর কোন বাধা নাই। যেখানে ইচ্ছা সে যাইতে পারে, যেমনভাবে খুসি জীবন যাপন করিতে পারে।

তিনটা কাজের একটা পাঞ্জাবে, একটা মধ্যপ্রদেশে এবং একটা বর্ম্মায়। তৃতীয় স্থানেই মাহিনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিরঞ্জন বর্ম্মা যাওয়াই মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল। দেশ হইতে যত দূরে হয় ততই ভাল। ইহার পর যেভাবে সে দিন কাটাইবে, তাহাতে অর্থের প্রয়োজন যথেষ্টই হইবে। আর কোথাও কাহারও সঙ্গে তাহার আপোষ করিতে হইবে না। নিজের মতকে একবার বলি দিয়া তাহার যে পুরস্কার মিলিল, তাহাতে ও পথে যাইবার আগ্রহ তাহার চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। আর কোথাও কোনো প্রকারেই সে নিজের মতকে ক্ষুণ্ণ করিবে না। তাহাকে সমালোচনা করিবার মানুষ এখন জগতে কেই বা আছে? তাহার কার্য্যে দুঃখ পাইবারও কেহ নাই। পত্নীর সহিত সকল সম্পর্ক তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নিরঞ্জনের কার্য্যে তাহারও দুঃখ পাইতে হইবে না। ভগিনীদের মনে আঘাত লাগিলেও লাগিতে পারে। কিন্তু ভাইয়ের কথা বেশী ভাবিবার অবসর তাহাদেরই বা কোথায়? ইন্দু ত সংসারে থাকিয়াও নাই, ছোট বোন নিজের নূতন সংসারে, স্বামী-প্রেমের নূতন আস্বাদেই মজিয়া আছে। ভাইয়ের কথা মাসে একদিন তাহার মনে হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং কাহাকেও আঘাত দিবার ভয়ে নিরঞ্জনকে নিরস্ত হইতে হইবে না।

তিনটা জায়গায়ই সে কাজের জন্য দরখাস্ত করিল, কারণ বর্ম্মার কাজটা যে তাহার হইবেই এমন কোনো কথা নাই। তবে তিনটার ভিতর একটা পাওয়ার সম্ভাবনা তাহার খুবই আছে। এখানকার কাজেও সে নোটিশ

দিল। কর্তৃপক্ষ তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহার কাজ ছাড়িতে চাওয়ায় সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মাহিনা বাড়ানোর প্রস্তাবও উঠিল, কিন্তু নিরঞ্জন যাইতে বদ্ধপরিকর দেখিয়া শেষে সকলেই নিরস্ত হইল।

আসিয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতে সে কোনো খবর দেয় নাই। অন্যান্যবার আসিয়াই টেলিগ্রাম করিত। এবার সাবিত্রীর কাছে চিঠিপত্র কিছুই লিখিবে না স্থির করিয়াছিল,সুতরাং টেলিগ্রামও করিল না। দিন-পাঁচসাত পরে ইন্দুকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া নিজের কুশল এবং পৌছানর খবর দিল। তাহাদের দেশে জমিজমা হইতে যে আয় হয়, তাহাতে খাইয়া পরিয়া মোটামুটি থাকা যায়, কিন্তু হাতখরচ বা লেখাপড়ার খরচের জন্য এক পয়সাও উদ্বৃত্ত থাকে না। মনোরঞ্জন একটি ভাইকে কলিকাতায় পড়িবার খরচ দেয়। ইহাই সে যথেষ্ট মনে করে। অন্যান্য খরচ এতকাল নিরঞ্জনই চালাইয়া আসিয়াছে। বরাবরই যে উহা তাহাকে চালাইতে হইবে সে বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং আপত্তিও ছিল না কিছু। কিন্তু টাকা এতকাল মায়ের কাছে পাঠাইয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল, এখন কাহার কাছে পাঠাইবে এই হইল এক ভাবনা। ভগিনীর নিকট পাঠাইলে সাবিত্রী রাগে এবং অভিমানে তাহার এক পয়সাও স্পর্শ করিবে না, অথচ টাকার প্রয়োজন তাহার যথেষ্টই আছে। মাধ হইতে মায়া বেচারী নানা দিকে কষ্ট পাইবে। ছোট ভাইটি বালকমাত্র, তাহার উপর ভরসা নাই। জ্ঞাতি যাহারা আছে, তাহারা কেহই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, যাহার যত প্রয়োজন, তাহাকে তত টাকা আলাদা আলাদা পাঠাইয়া দিবে। তাহা হইলে কাহারও আর কিছু বলিবার থাকিবে না। সাবিত্রীর কাছে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে নিরঞ্জনের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইন্দুর নিকট হইতে শীঘ্রই উত্তর আসিল। সে মস্ত বড় চিঠি লিখিয়াছে। সকলের কুশল-সংবাদ দিয়া, এবং মায়ার অসাধারণ বুদ্ধির গুটিকয়েক নমুনা দিয়া, বাকি কাগজ সে সাবিত্রীর সাফাই গাহিয়াই ভরাইয়া দিয়াছে। সাবিত্রী হাজার হইলেও ছেলেমানুষ, বুদ্ধিও এমন কিছু প্রখর নয়, সে যদি বোকামী করিয়া অন্যায় ব্যবহার কিছু করিয়া থাকে, বা অন্যায় কথা কিছু বলিয়া থাকে, তাহাতে এতখানি ক্রুদ্ধ হওয়া কি নিরঞ্জনের উচিত? বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে কি এই সামান্য অপরাধে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করা যায়? বিশেষ তাহাদের সন্তান হইয়াছে একটি। মাকে ত্যাগ করিলে বালিকাকেও একরকম ত্যাগই করা হয়। তাহার কি অপরাধ?

"যত সব বাজে বক্তৃতা," বলিয়া নিরঞ্জন চিঠিখানা অসহিষ্ণুভাবে দেরাজের ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়া দিল। এসকল কথায় আর তাহার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিতে সে দিবে না।

দিনকয়েক পরে সে বাড়ীতে একসঙ্গে চারিটি মণি-অর্ডার করিল। একটি ইন্দুর নামে, একটি সাবিত্রীর নামে, একটি ছোটভাই প্রভাসের নামে এবং চতুর্থটি গ্রামের পণ্ডিত-মহাশয়ের নামে, যিনি মায়াকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দুর কাছে ছোট একখানা চিঠিও দিল। নিজের কুশল-সংবাদ দিল, সকলের কুশল প্রশ্ন করিল, মায়ার পড়া ঠিকমত হইতেছে কি না তাহার খবর লইল; কিন্তু সাবিত্রীর নাম উল্লেখও করিল না। তাহার বিষয়ে ইন্দু যাহা কিছু লিখিয়াছিল, তাহার কোনোই উত্তর দিল না। কথায় কথা বাড়ে, সুতরাং সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে যে যতই বক্তৃতা করুক, কাহারও কথার উত্তর সে দিবে না। এক সাবিত্রী যদি তাহার কাছে আসিতে রাজী হয়, তাহা হইলেই একথা আবার উঠিবে, না হইলে এই শেষ।

নিরঞ্জনের কপাল একদিক দিয়া মন্দ হইলেও, আর একদিক দিয়া ভালই ছিল। বর্ম্মার কাজটি তাহার জুটিয়া গেল। এখানকার সব ব্যবস্থা সে তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল, কারণ পরের মাসের প্রথমেই তাহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

একেবারে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার মনটা এখন যেন একটু পিছাইতে আরম্ভ করিল। স্বদেশ, স্বজন, সন্তান সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। অল্প অল্প অনুতাপও হইতে লাগিল, বাংলা দেশ ছাড়িলেই কি যথেষ্ট হইত না? সাবিত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকা

তাহাতেও সমানই হইত। কিন্তু আর এখন ফেরা চলে না। তাহা ভিন্ন অর্থ উপার্জ্জনের পথ ব্রহ্মদেশে যে প্রকার সুগম বলিয়া সে শুনিয়াছে, ভারতবর্ষে থাকিলে ততটা সুবিধা পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

নিরঞ্জন বাড়ী ছাড়িয়া দিল, আসবাব-পত্রও নিলাম করিয়া দিল। চাকরটাকেও বিদায় দিল, স্থির করিল আর যে-কদিন আছে এক বন্ধুর বাড়ীতেই খাইবে। সামান্য টাকা, যাহা সে সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাও পোষ্ট অফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া নিল। দেশে ইন্দুর কাছে চিঠি লিখিল, তাহাতে সব কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল। সে দূরদেশে যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে চিন্তিত হইবার কিছুই কারণ নাই। ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র অভাব নাই, তাহাদের গ্রামেরও এক ভদ্রলোক রেঙ্গুনে থাকেন। নিরঞ্জন প্রতি মেলেই চিঠি লিখিবে, যদি কখনও দৈবগতিকে নাই লিখিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ী খোঁজ করিলেই তাহার খবর পাওয়া যাইবে। কলিকাতার কত লোক যে ব্রহ্মদেশে আছে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। সুতরাং মনোরঞ্জনও তাহার খবর সর্ব্বদাই পাইবে। নিরঞ্জন টাকা ঠিক নিয়মমত পাঠাইবে, সেজন্য কোনো চিন্তা নাই। ইন্দু যেন নিয়মমত চিঠি লেখে, প্রতিবার মায়ার খবর দেয় এবং পণ্ডিত-মহাশয় তাহাকে কেমন পড়ান সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

তাহার এখানকার কাজে ছুটি হইতেই সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। মনোরঞ্জনের বাড়ী উঠিতে তাহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কারণ মনোরঞ্জন শ্বশুরবাড়ীতেই বাস করে। তবু নিজের ভাই থাকিতে অন্য কোথাও উঠিলে, দেখিতে অত্যন্ত খারাপ হয় বলিয়া সে অগত্যা মনোরঞ্জনের ওখানেই গিয়া উপস্থিত হইল।

দাদা বৌদিদি সকলেই তাহাকে খুব সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করিল। অল্প বয়সেই লেখাপড়া অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সব দিকেই বেশ উন্নতি করিয়াছে বলিয়া, এ বাড়ীতে নিরঞ্জনের খুব খাতির ছিল। মনোরঞ্জনের সহিত তাহার তুলনা করিয়া মনোরঞ্জনের স্ত্রী প্রায়ই স্বামীকে খোঁটা দিত। কাজেই এ হেন কৃতী দেবরের কোনো অনাদর হইল না।

আহারাদির পর দুই ভাইয়ে আসিয়া মনোরঞ্জনের শয়নকক্ষে বসিল। পানের ডিবা হাতে, একটু পরেই মনোরঞ্জনের স্ত্রীও আসিয়া জুটিল। স্বামী এবং দেবরকে পান মশলা দিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো, একেবারে দেশত্যাগী হয়ে চল্লে যে?"

ভিতরের কথা কাহাকেও জানাইবার ইচ্ছা নিরঞ্জনের ছিল না, সে বলিল, "দেশে থাকলে ত আলোচাল আর কাঁচকলার বেশী কিছু জুটবে না।"

বৌদিদি বলিলেন, "আহা, ও তোমার এক গা-জুরি কথা। এরি মধ্যে তিনশ পাচ্ছিলে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত বেড়ে যেত। আসল কথা আমাদের কাছে থাক্‌তে চাও না।"

নিরঞ্জন হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় বলিল, "কেন তোমরা কি আমাকে কামড়াচ্ছ?"

বৌদিদি বলিলেন, "তা কি জানি বাপু? পুরুষ মানুষের জাত শিকল কাটার জাত। বেশী দিন শেকল তাদের ভাল লাগে না, সোনার হলেও না।"

মনোরঞ্জন বিজ্ঞভাবে বলিল, "আহা, যত বাজে কথা বল কেন? বর্ম্মায় প্রসপেক্ট কি রকম! দেখ্‌তে দেখতে লাখপতি হয়ে যেতে পারে, এখানে আর কতই মাইনে বাড়ত!"

মনোরঞ্জনের স্ত্রী খানিকটা ঠাট্টা এবং খানিকটা গম্ভীর ভাবেই বলিল, "ওমা, তবে তুমিও একটু গিয়ে দেখ না? এখানে ত বিশেষ কিছু হচ্ছে না।"

দাদা পাছে স্ত্রীর কথায় আঘাত পায়, এইজন্য নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলিল, "বেশ, বেশ, বৌদি। একেই ত বলে পতিব্রতা। টাকার লোভে স্বামীটিকে পগার পার করে দিতে ব্যস্ত।" মনটা কিন্তু তাহার খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল, সব স্ত্রীই এই রকম নাকি? স্বামীকে আসলে তাহাদের কোনো প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কেবল স্বামীর টাকার।

মনোরঞ্জন অত শত বুঝিল না। সে বলিল, "কেন

মন্দই বা এমন কি হচ্ছে? এখানে কম্পিটিশন কি রকম!"

বৌদিদি কথাটা ঘুরাইয়া বলিল, "ঠাকুর-পো, জাহাজের টিকিট কিনে নিয়েছ না কি?"

নিরঞ্জন বলিল, "না, কাল যাব। এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রা, একটু ভয় ভয় করছে।"

মনোরঞ্জন বলিল, "ভয় আর কি? এ সময়ে সমুদ্র ত বেশ ভালই থাকে বলে শুনেছি। আর তুমি ত সেকেণ্ড ক্লাশে যাবে, তোমার আর কি ভাবনা। With diet টিকিট করবে, না without?"

মনের কি একটা বাধা জোর করিয়া দূর করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "With dietই করব; আবার কে অত খাওয়ার হাঙ্গাম করে?"

মনোরঞ্জনের স্ত্রী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "এত হাসির খোরাক কিসের মধ্যে পেলে বৌদি?"

বৌদিদি বলিল, "একে ত কালাপানি পার হচ্ছ, তার উপর জাহাজের শূওর গরু সব পেটে পূরতে পূরতে যাবে। মেজবৌ আর তোমায় কাছ দিয়ে হাঁটতেও দেবে না। বাড়ী ফিরবার আগে প্রয়াগে গিয়ে, গঙ্গাস্নান করে, মাথা মুড়িয়ে তবে বৌএর কাছে যেও।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "তাই করা যাবে না হয়। অত দূরেই যাচ্ছি যখন, তখন প্রয়াগ যাওয়াটা আর বেশী কথা কি?"

বৌদিদি বলিল, "কিন্তু বউকে নিয়ে যেতে পারছ না। সে শক্ত মেয়ে।"

নিরঞ্জন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, খুবই শক্ত। তা সে না হয় দেশেই থাকবে। একলা থাকা তারও অভ্যাস আছে, আমারও আছে। এক মায়াটার জন্যে ভাবনা। পড়বার ব্যবস্থা অবিশ্যি করে এসেছি, তবে কার্য্যতঃ কতটা হয়ে উঠবে বলতে পারি না।"

মনোরঞ্জন বলিল, "ছেলেপিলের এডুকেশন নিজেরা না দেখলে কিছুই হয় না। এরই জন্যে না মায়ের হাজার গাল খেয়েও আমি সহর থেকে নড়িনি!"

নিরঞ্জন বলিল, "দেখাই যাক। মেয়ে ত এখনও বাচ্ছা, মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসা চলে না। একটু বড় হলে আলাদা ব্যবস্থা করতেই হবে। একটা ত মাত্র মেয়ে, তাকেও মূর্খ করে রাখলে কিছুতেই চলবে না।"

মনোরঞ্জনের স্ত্রী বলিল, "তুমি ত থাকবে বিদেশে, মেজ-বৌ হয়ত আট বছরে গৌরীদান করে বসে থাকবে।"

নিরঞ্জন বলিল, "অতটা আর নয়। বাড়ীতে আরো মানুষ ত আছে, আমি খবর নিশ্চয়ই পাব। তা ছাড়া সাবিত্রী এমন কাজ করবে না। তার দোষ যেমন আছে, গুণও তেমন আছে। মেয়ের উপর আমার অধিকার সে পুরোমাত্রায় স্বীকার করে চলে।"

(৬)

উঠানের এক কোণে বসিয়া মায়া গভীর মনোযোগ সহকারে একটা মাটির ঢিপি তৈয়ারী করিতেছিল। পাশে কয়েকটা আধশুকনো গাছের ডাল, দুই চারি গোছা পাতা এবং গোটা-দুই ফুল পড়িয়া। পাহাড় প্রস্তুত হইলেই তাহাতে গাছপালা বসাইতে হইবে, গাছে ফুল থাকাও দরকার। গতকল্য এক খেলুড়ীর বাড়ীতে সে মাটির পাহাড়, ঘর, গাছ, নদী কত কি দেখিয়া আসিয়াছে, আজ বাড়ীতেই সে সব রচনা করিবার চেষ্টায় আছে। তবে তাহারা তিন চারজন মিলিয়া, যেমন ভাল করিয়া গড়িয়াছিল, তাহার ছোট দুখানি হাতে তেমন নিপুণ সৃষ্টি হইতেছে না; কিন্তু মায়ার তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। পাহাড় হইলেই হইল এবং দুই চারিটা গাছপাতা থাকিলেই হইল। ঘর বানাইতে সে পারিবে না, তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিল, তবে নদী কাটিবার জন্য সে ভাঙা একটা খুন্তি পিসীমার কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

হঠাৎ তাহার কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। সদর দরজার কাছে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "আমার টুকটুকে মা-মণি কোথায় গো!"

খেলা ফেলিয়া মায়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। গ্রামের পোষ্ট পিওনের সঙ্গে তাহার বেজায় ভাব। এ ব্যক্তি বাবার চিঠি আনিয়া দেয়, টাকা আনিয়া দেয়, বাবার নিকট

হইতে সুন্দর জামা,জুতা, খেল্‌না প্রভৃতি যাহা কিছু পাওয়া যায়, সব ইহার মারফতেই আসে। সুতরাং ইহার সহিত ভাব না রাখিয়া উপায় নাই।

দরজার কাছে আসিবামাত্র বৃদ্ধ বাদল একখানা পোষ্ট-কার্ড অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল,"এই যে বাবার চিঠি!"

মায়ার উৎসাহ অনেকটাই যেন কমিয়া গেল। সে ক্ষুণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মোটে একটা, এইটুকু?"

বাদল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "এর পরের বার দেখো এখন এই মোটা মোটা কত চিঠি নিয়ে আসি। এখন এই চিঠিটা পিসীমাকে দিয়ে এস ত মা-মণি।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাকে দেব না?" পিয়ন বলিল, " না, এটা পিসীমাকে দিও।"

মায়া কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া, চিঠি লইয়া ভিতরে চলিল। বাবার চিঠি মাকেই দিতে হয় বলিয়া তাহার ধারণা ছিল।

পিসীমা তখন স্নান পূজা সারিয়া সবে রান্নাঘরে তরকারি কুটিতে বসিয়াছে। মায়া দরজার সামনে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "পিসীমা, বাবার চিঠি এসেছে। বাদল বুড়ো তোমায় দিতে বল্‌ল, মাকে নয়!"

ইন্দু বঁটিখানা কাৎ করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল। পোষ্টকার্ডখানা হাতে করিয়া পড়িয়া দেখিল। তাহার পর ভাবিতে লাগিল, পোষ্টকার্ডটা সাবিত্রীকে পাঠাইয়া দিবে, না মুখেই নিরঞ্জনের পৌছান খবরটা তাহাকে দিবে। যাহাই করুক সাবিত্রীকে খানিকটা আঘাত না দিয়া উপায় নাই। নিরঞ্জন যে তাহাকে কিছু না লিখিয়া, বোনের কাছে লিখিয়াছে, ইহাতেই সাবিত্রী যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইবে। ইন্দু মনে মনে বলিল, "আচ্ছা জ্বালা বাপু! নিজেরা করবি ঝগড়া, মাঝ থেকে আমায় কেন বিপদে ফেলা!"

সাবিত্রী ঘাট হইতে ঠিক এই সময় ফিরিয়া আসিয়া ইন্দুর সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার চিঠিগা, ঠাকুরঝি?" তাহার কণ্ঠস্বরে তাহার অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিল।

ইন্দু বলিল, "কলকাতারই। দাদা ভালয় ভালয় পৌছেছে, ভাল আছে।"

"ভাল থাক্‌লেই ভাল" বলিয়া সাবিত্রী হন্ হন্ করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে, তখন তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। বৌয়ের রকম দেখিয়া ইন্দুও আর তখন কোনো কথা বলিল না, আস্তে আস্তে ফিরিয়া গিয়া আবার তরকারি কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা পিসীমার রকম দেখিয়া মায়া এতক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাবার চিঠি আসাতে অন্যান্য বারে মা কত খুসি হয়, মায়ার কথা বাবা কি কি লিখিয়াছে, সব পড়িয়া শোনায়, এবার রাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন? ছোট্ট চিঠি বলিয়া? সে ধীরে ধীরে ইন্দুর অনতিদূরে গিয়া বসিয়া ডাকিল, "পিসীমা!"

ইন্দু বলিল, "কি গো?" মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি লিখেছে, পিসীমা?"

পিসীমা বলিল, "বাবা ভাল আছে, তুমি কেমন আছ, কেমন পড়ছ, সব জিগ্‌গেষ করেছে।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা মাকে বকেছে পিসীমা?"

এ প্রশ্নের কারণটা বুঝিতে পিসীমার দেরি হইল না। সে সংক্ষেপে বলিল, "না, বকবে কেন?"

মায়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আবার কবে আসবে, পিসীমা?"

পিসীমা বলিল, "শিগ্গীরই আসবে মা। তুমি এখন যাও খেলা কর গিয়ে। আমার ঢের কাজ আছে এখন।"

মায়া অগত্যা আবার অসমাপ্ত পাহাড়ের পাশে গিয়া বসিল। কিন্তু উৎসাহ তাহার যথেষ্টই কমিয়া গিয়াছিল। খানিকক্ষণ শুধু শুধু ধূলা-বালি ঘাঁটিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সন্ধান করিয়া মাকে বাহির করিয়া তাহার নিকটে মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাবিত্রী ঘরের জিনিষপত্র গুছাইতেছিল, মেয়েকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, অত হাঁড়িমুখ হয়ে গেল কেন?"

মায়া হঠাৎ ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

সাবিত্রী আল্‌না গোছানো রাখিয়া মেয়ের কাছে আসিয়া বলিল, "এই সকালে একপেট খেলি, এরি মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল? চল্ ভাঁড়ার-ঘরে মুড়কীর মোয়া আছে, দেব এখন।"

খাওয়ার প্রয়োজন মায়ার বিশেষ তখন ছিল না, মায়ের কোলে চড়িতে পাইয়াই তাহার যাহা প্রয়োজন ছিল তাহা পাওয়া হইয়া গেল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম্ম সারিয়া ইন্দু ধীরে ধীরে সাবিত্রীর ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মায়া তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সাবিত্রী তাহার পাশে বসিয়া আকাশ-পাতাল কি ভাবিতেছিল, সেই জানে। ননদকে দেখিয়া বলিল, "কি ঠাকুরঝি?"

ইন্দু তক্তপোষের একধারে বসিয়া বলিল, "তোমাদের মান-অভিমান এমনিই চল্‌তে থাকবে না কি?"

সাবিত্রী কলহের স্বরে বলিল, "তোমার ভাইয়ের মরজি, আমি কি জানি?"

ইন্দু বলিল, "ঝগড়া বাধাতে ত জান, শেষ করতেও জানা উচিত। স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া সব ঘরেই হয়, তাই বলে এতখানি বাড়তে কেউ দেয় না। বিশেষ করে দাদা যখন বিদেশে থাকে।"

সাবিত্রী বলিল, "তোমার ভাই যখন, তখন তার দোষ ত দেখবেই না। আমি পরের মেয়ে, আমি ভাল করলেও মন্দ হয়। এই যদি ঘরবাড়ী ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে নাচ্‌তে যেতাম মেমসাহেব সেজে, তাহলেও তোমরা আমার নামে ঝাঁটা মারতে। কপাল মন্দ তার আর তোমাদের কি বলব? কিন্তু যা হবার হবে, ধর্ম্ম ছাড়তে পারব না।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা বাপু, মান্‌লাম না হয়, দাদারই দোষ। কিন্তু তাই বলে স্বামী ছেড়ে থাক্‌বি নাকি? দাদার মত মতিগতি আজকালের অধিকাংশ ছেলেরই, তাদের বউরা কি সব তাদের ছেড়ে দিচ্ছে? ওরই মধ্যে মিটমাট করে থাকে। তুমিও তাই কর না কেন? বাঙ্গালীর মেয়ে, অত তেজ দেখালে চল্‌বে কেন? স্বামী বই গতিও ত নেই।"

সাবিত্রী একটু নরম হইল, বলিল, "তা কি করতে হবে, তুমিই বল। স্বামী ছেড়ে আমার ক্ষতি বই লাভ নেই, তা কি আর আমি বুঝি না?" কিন্তু দেখছ ত তার ব্যবহারটা? গিয়ে আমায় একটা খবর পর্য্যন্ত দিল না।"

ইন্দু বলিল, "তা তুমিই লেখ না বাপু আগে! স্বামীর কাছে নীচু হতে কোনো অপমান নেই। তখন রাগের মাথায় ছিল, চলে গেছে। এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বোঝালেই বুঝবে।"

সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ বাঁকিয়া বসিল, "সে আমার দ্বারা হবে না। মেয়েমানুষ বলে কি আর একটা মান-অপমান নেই? সে যদি না লেখে, আমিই বা কেন লিখতে যাব? সব দোষ আমার না কি?"

ইন্দু বলিল, "তবে মরুগে যা! অতি বাড় আবার ভাল নয়।" সে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। নিরঞ্জনকে সে সব ভাই বোন অপেক্ষা ভালবাসিত। তাহার সাংসারিক সুখ চিরদিনের মত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনায় ইন্দু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নিরঞ্জনের নিকট নিজেই সাবিত্রীর হইয়া যথাসাধ্য ওকালতি করিয়া চিঠি লিখিল।

কিন্তু কোনো লাভ হইল না। সাবিত্রী-সম্বন্ধে কোনো কথার নিরঞ্জন উত্তরই দিল না। সাবিত্রী শুনিলে পাছে আরো চটিয়া যায়, এই ভয়ে ইন্দু চিঠি লেখার কথা একেবারে চাপিয়াই গেল।

দিনকয়েক পরে বাড়ীতে একসঙ্গে তিনটা মণিঅর্ডার আসিয়া সকলকে বেশ খানিকটা বিস্মিত করিয়া তুলিল। এ রকম করার আসল অর্থ বুঝিল কেবল সাবিত্রী। নিরঞ্জনের প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা তাহার মনে দেখা দিল। যাক্, তাহাকে শাস্তি দিবার কোনো ইচ্ছা তাহা হইলে নিরঞ্জনের নাই? না হইলে, স্বচ্ছন্দেই সে স্ত্রীকে ভগিনীর বা অন্য কাহারও অধীন করিয়া রাখিতে পারিত। যত তেজই দেখাক, সাবিত্রী কার্য্যতঃ স্বামীর অধীন ত বটেই?

আবার কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর নিরঞ্জনের ব্রহ্মদেশ-যাত্রার খবর আসিয়া পৌছিল।

ইনু চিঠিখানা সাবিত্রীর কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "এই নাও গো তেজস্বিনী, স্বামী ত সাগর পার হয়ে চল্‌ল। এখন তোমার তেজ নিয়ে ধুয়ে খাও।"

সাবিত্রী চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল। তাহার মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ঠাকুর-ঘরে গিয়া খিল দিল। সমস্ত দিন কেহ তাহাকে সেখান হইতে নড়াইতে পারিল না। মায়া বেগারী পিসীকে আশ্রয় করিয়াই দিন কাটাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

নারীনামের পদ্ধতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

কয়েক বৎসর পূর্বে 'প্রবাসী'তে শ্রীমান্ ও শ্রীমতীদের নাম-লিখন-রীতি আলোচনা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ আমায় নামের পণ্ডিত মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে দেখিলাম, সেই প্রশ্ন, 'সেনে'র পত্নীকে 'সেনা' বলা যাইবে কি না। ইদানী কোন কোন নারীনামে 'দাসগুপ্তা' লেখা হইতেছে। যদি 'দাসগুপ্ত'-বনিতা 'দাসগুপ্তা' হন, তাহা হইলে সেন-সেনা, দত্ত-দত্তা, মুখোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়া না হইবেন কেন? আমার বিবেচনায় গুপ্তা লেখা দেশাচুশিষ্ট ও ব্যাকরণ-সঙ্গত নয়, সুতরাং সেটা প্রমাণ হইতে পারে না। কেন নয়, বলিতেছি।

প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল। শ্বেতবর্ণ-ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ-ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ-বৈশ্য, ও কৃষ্ণবর্ণ-শূদ্র। কালে আর এক বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছিল। সেটা পঞ্চম বর্ণ। চতুর্বর্ণজ্ঞাপক চারিটি উপনাম ছিল, শর্মা, বর্মা, গুপ্ত, দাস। যেমন বিষ্ণুশর্মা, ভোজবর্মা, চন্দ্রগুপ্ত, অমুক দাস। পঞ্চম বর্ণের উপনাম ছিল না, এখনও নাই। প্রথম তিনবর্ণের আরও উপনাম ছিল। ব্রাহ্মণের দেব, ক্ষত্রিয়ের ত্রাতা, বৈশ্যের দত্ত ও ভূতি। শ্রেষ্ঠা অভিশয় মান্যা নারীকে দেবী বলা হইত। এই কারণে পট্টমহিষী দেবীপদবাচ্যা হইতেন। ব্রাহ্মণ ভূদেব ছিলেন, ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠা নারী, দেবী। রাজা নরদেব; তাঁহাকে দেব বলিয়া সম্বোধন করা হইত। ক্রমে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়মাত্রেই দেব ও দেবী অধিকার করিয়াছিল। বৈশ্য ও বৈশ্যার দেব-দেবী হইবার কারণ দেখিতে পাই না। উপনয়নদ্বারা দ্বিজত্ব হয়, দেবত্ব হয় না। পুরুষ দেব না হইলে নারী দেবী হইতে পারে না। শূদ্র, দাস। শূদ্রানারী দাসীবৃত্তি করিত, তাহারা দাসী। এই কারণে শূদ্রের স্ত্রীও দাসী।

এখন কেহ আপনাকে দাস কিংবা দাসী স্বীকার করিতে চায় না, দেবী ও দাসী এই দুইভাগে হিন্দুনারী বিভক্ত হইতে পারে না। বর্তমান স্বাতন্ত্র্যের দিনে, স্বনামে ধন্যা হইবার দিনে দেবী ও দাসী উপনাম সার্থকও হইতেছে না। বিশেষতঃ 'মিস্ দেবী', 'মিসিস্ দাসী', এই এই ইংরেজী নাম হাস্যজনক হইয়া পড়ে। অতএব উপায় অন্বেষণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমে আমাদের নামের পদ্ধতি চিন্তা করি। এক পরিবারে এক জাত শিশুর নামকর্ম হইল, হরিপদ; আর একের বিষ্ণুপদ, আর একের কৃষ্ণপদ, আর একের শিবপদ, ইত্যাদি।' চারিজনের চারি নাম, একজনকে ডাকিলে আর একজন সাড়া দেয় না। কিন্তু সে পরিবারের বাহিরে গেলে এই এই নামের মানুষ পাওয়া যায়। লোকে সুধায়, "তোমার নাম কি?"—হরিপদ। "তুমি কা-দের?"—দত্তদের। অর্থাৎ দত্ত-কুলের হরিপদ। তাহার পূরানাম হরিপদ দত্ত, হরিপদ নামক দত্ত। অনেক সময়ে কুল-নামেই লোক-ব্যবহার চলিয়া যায়। "কে

তুমি ?" আমি দত্তদের, দত্তকুলজাত, দত্ত-জাত, দত্তজা (ত লুপ্ত)। "দত্ত-জার মধ্যে তুমি কে ?"—আমি হরিপদ। নামকরণের এই রীতি অবিকল বিজ্ঞানের রীতি। কেহ আমগাছ চেনে না, একটা আমগাছ দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "এটা কি গাছ ?"—এটা একটা Mangifera. "কোন্‌টা ?"--Indica গাছটির পূরানাম Mangifera Indica. Mangifera কুলের নাম, Indica ব্যক্তির। কিন্তু Indica বহু ব্যক্তির নাম হইতে পারে। কুলের নাম না জানিলে লোকটি চিনিতে পারা যাইবে না।

এই যে কুলনাম, দত্ত, গুপ্ত, দাস, দে, প্রভৃতি, ইহার নাম, পদ্ধতি। গ্রাম্যভাষায়, পদ্বিং। পদ্ধতি, কি-না পঙ্‌ক্তি। দেশের মানুষগুলিকে কতকগুলি পঙ্‌ক্তিতে অর্থাৎ কুলে ভাগ করিতে পারা যায়। কতকগুলি কুলে এক এক গোত্র, কতকগুলি গোত্রে এক এক জাতি, কতকগুলি জাতিতে এক এক বর্ণ। ভাবটা এই, এক কুলের সকল মানুষ এক পিতামাতার সন্তান। এই কারণে এক পদ্ধতির সন্তানেরা পরস্পর বিবাহ করিতে পারে না। যদি করে, তাহা হইলে বুঝি কোন অজ্ঞাত কারণে দুই কুলের এক নাম হইয়া গিয়াছে, কিংবা পদ্ধতি নাম কুল-বাচক নয়। কুলের আদিপুরুষের পূর্বে গেলে গোত্রের (অন্ততঃ কল্পিত) আদিপুরুষ এক দেখিতে পাইব। এই কারণে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এখানেও কোন অজ্ঞাত কারণে দুই গোত্রের একই নাম হইয়া থাকিতে পারে। তখন সগোত্রে বিবাহ দোষের হইবে না। গোত্র ছাড়িয়া জাতির আদিপুরুষের অন্বেষণ করিতে হইলে আরও প্রাচীনকালে যাইতে হইবে। প্রত্যেক জাতির আদিপুরুষ এক মানিতে হইতেছে। নইলে জাতিভাগ মিথ্যা। যদি এক নামের জাতির আদিপুরুষ এক হয়, তাহা হইলে সজাতির মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। বস্তুতঃ শাস্ত্রকার সজাতিতে বিবাহ করিতে বলেন নাই; বলিয়াছেন সবর্ণে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ জাতিরও ঊর্দ্ধে গিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধজাতি দুর্লভ বলিলে হয়। ক্রম-ক্রমে, বৃত্তি-সাদৃশ্য দেখিয়া ও উৎপত্তি চিন্তা না করিয়া এক জাতির মধ্যে অন্য জাতি আসিয়া পড়িয়াছে, সজাতিতে বিবাহ জাত্যন্তর বিবাহে দাঁড়াইয়াছে। পূর্বকালে ও পরবর্ত্তীকালে অসমান বর্ণেও বিবাহ হইত। কাজেই যাহাকে সবর্ণে বিবাহ মনে করি, তাহারও অনেক বর্ণান্তর বিবাহ। রাজাদেশে বৈজ্ঞানিক দ্বারা জাতি গোত্র কুল নিরূপিত হয় নাই, দূরবর্ত্তী স্থানে কি হইতেছে, তাহারও সংবাদ রাখা হইত না।

উপস্থিত প্রসঙ্গে এসব বিচার আবশ্যক নয় বটে, কিন্তু পদ্ধতি নামের উৎপত্তি না জানিলেও চলিবে না। দত্ত নাম ধরি। কত দত্ত গিয়াছে, কত দত্ত আসিয়াছে। তাহাদের দত্ত নামের উৎপত্তি কি? একটা কল্পনা করি। প্রাচীনকালে একজনের নাম দেব-দত্ত কি যজ্ঞ-দত্ত ছিল। তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দেব-দত্ত এই নাম, আকস্মিক, কিন্তু তদবধি তাঁহার সন্তানেরা দত্ত নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। আর কেহ যে দেব-দত্ত ছিল না, তাহা বলিতে পারা যায় না। বরং মনে হয়, এককালে না হউক বিভিন্ন কালে, এক স্থানে না হউক বিভিন্ন স্থানে আরও লোকের নাম দেব-দত্ত ছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ দত্তকুল রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে গোপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা পিতৃনাম রক্ষার্থ নিজের নিজের নামে 'পাল' যোগ করিয়াছিলেন, ক্রমে 'পাল' একটা পদ্ধতি হইয়াছিল। হয়ত কাহারও নাম সহদেব ছিল। তাঁহার বংশীয়েরা দেব বা দে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। একজনের নাম দেব-দাস ছিল, তাহা হইতে এক কুলের নাম দাস হইয়াছে। অশ্ব-ঘোষ নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। হয়ত তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্বধ্বনির সাদৃশ্য ছিল। হয়ত ছিল না, কিন্তু যদি তাঁহার বংশ থাকে, তাহা এখন ঘোষ বংশ। ইত্যাদি। অর্থাৎ এক প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নামের শেষাংশ হইতে পদ্ধতি নামের উৎপত্তি। আজকাল নামের বহর বাড়িয়া গিয়াছে, পূর্বকালে নাম ছোট হইত, কুলনামও যোগ করা হইত না, বর্ণনাম বলিলেই যথেষ্ট হইত।

সকলের কুলনাম ছিল না। কুলতিলক যত্রতত্র মেলে না। ওড়িশায় দেখিয়াছি, জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার নাম কি ?"—অচ্যুতানন্দ। "কোন্‌ বর্ণ ?"—

মহান্তি। অর্থাৎ মহান্তি যে বর্ণের অচ্যুতানন্দও সেই বর্ণের। মহান্তি তাহার সংজ্ঞা। বাংলাতেও পদ্ধতিকে সংজ্ঞা বলে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সংজ্ঞা নাই, যদি বা থাকে সেটা বৃত্তিবাচক। যাহারা লেখা-পড়া শিখিয়াছে, ভাবিয়াছে, তাহারা দাস সংজ্ঞা লইয়াছে। হরিপদ দত্তের পূরা নাম হরিপদ দাসদত্ত।

মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধের সময়, বিবাহের সময় তাহাকে পূরা-নাম বলিতে হয়। নইলে মানুষটির পরিচয় হয় না। দত্ত, কুলনাম; কুলনাম দাসদত্ত নয়। অতএব মনে হয়, হরিপদ, দাসবর্ণের দত্তকুলজাত। কেহ কেহ নামের শেষে দাস বলে। তারাপদ'র পূরা নাম তারাপদ দত্ত-দাস। এখানে দত্ত তাহার কুলনাম, দাস বর্ণনাম। অর্থাৎ সে বলিতে চায় সে শূদ্র। প্রসিদ্ধ পুরুষের নামের শেষাংশ লইয়া কুলনাম হইয়াছে। ছিন্নপদের অর্থ থাকিতে পারে, নাও পারে। দেব-দাস এক পদ। হয়ত দেবতার কৃপায় তাহার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পুত্রেরা নামে দাস সংজ্ঞা দিলেও শূদ্রদাস হইবে না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে,কর্ণসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন না, গৌড়েশ্বরের অধীনে সামন্ত ছিলেন। অতএব সেন নামটি ঠিক হইয়াছিল, তিনি এক প্রভু স্বীকার করিয়াছিলেন। আমরা বলি ভীমসেন, কেননা তিনি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ ছিলেন। কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন, তস্য পুত্র চিত্রসেন। ইঁহার বংশ থাকিলে এক সেন-বংশ পাইতাম। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, হরিপদ দত্তের দত্ত, রাজা গোপালের পাল যেমন, কর্ণসেনের সেন তেমন নয়। উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি-ভেদ আছে।*

এই প্রভেদ পদবীনামে স্পষ্ট। পদ অর্থাৎ কর্মের নামে পদবীর উৎপত্তি। যেমন মণ্ডল। এককালে কেহ মাণ্ডলিক বা মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা এখন মণ্ডল নামে খ্যাত। কেহ ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, তাঁহার সন্তানেরা রায় পদবী পাইয়াছেন। এইরূপ, পাত্র, মহাপাত্র, চৌধুরী, নিয়োগী প্রভৃতি সেকালের পদবী চলিয়া আসিতেছে। মুসলমান আমলের মজুমদার, হাজরা, সরকার, বক্সী, প্রভৃতি পদবী অনেক আছে। যে কারণে দত্ত, গুপ্ত, সেন প্রভৃতি, পদ্ধতি হইয়া গিয়াছে, সে কারণে পদবীও পদ্ধতি হইয়া কুলবাচক হইয়াছে। যে স্থলে লোকে নিজের নিজের পদ্ধতি মনে রাখিয়াছে, সে স্থলে তাহারা দুইটা পৃথক করিয়া বলে। যেমন বলে, সরকার পদবী, গুহ পদ্ধতি; প্রতিহার বংশ, পদবী রায়। বৃত্তিবাচক নামও পদবীতুল্য। যেমন, বণিক, সাধু, সাহু (সার্থবাহ)।

কর্মহেতু পদবী, বিশেষ গুণহেতু উপাধি। যেমন ভট্টাচার্য, মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী, ইত্যাদি ব্রাহ্মণের উপাধি। ওড়িশায় প্রায় একশত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-রাজত্ব ছিল, এখনও অনেক হিন্দু-রাজা আছে। সেখানে প্রাচীন কালের শতপথী, ষড়ঙ্গী, পাণিগ্রাহী,হোতা প্রভৃতি উপাধি আছে। রাজ-দত্ত উপাধিও অনেক আছে। বঙ্গদেশেও নিশ্চয় ছিল, এখন সে সব বুঝিতে পারা যায় না। সিংহ ও শূর প্রাচীন কালের উপাধি। মুসলমান আমলে খাঁ উপাধি হিন্দুও পাইয়াছিল। ইংরেজ আমলে উপাধির অন্ত নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম্-এ উপাধি, সংস্কৃত-উপাধি-পরীক্ষার তীর্থ উপাধি, লব্ধ কিংবা স্বয়ং গৃহীত রত্ন, ভূষণ প্রভৃতি উপাধি হইতে রাজদত্ত উপাধি গণিতে গেলে বৃহৎ পঞ্জী হইয়া পড়িবে। এ সকল উপাধি বংশগত হয় না।

কেবল দেখি, যিনি রাজা উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহার পুত্র কুমার হইতেছেন। সে কালে হইলে কুমার বা কুঙার একটা পদ্ধতি হইয়া উঠিত। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্যের পুত্র ভট্টাচার্য হইয়া এককালের একজনের উপাধি এখন পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঁড়রী বংশজাত—বাঁড়রজ্যা, ইংরেজীতে বানার্জী। চট্টজাত—চট্টজা, চাটুজ্যা, চাটুর্জ্জা হইবার কথা, বানার্জীর সহিত মিলাইতে গিয়া চাটার্জী। বস্তুতঃ জী (জীব) নহে, জা; যেমন ঘোষ-জা বোস-জা। যখনই চট্টজা বলি, তখনই চট্ট নামে এক পদ্ধতি স্বীকার করি। অর্থাৎ প্রাচীন উপাধি বংশগত হয়, নবীন উপাধি হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্র থাকিলে তিনি ভট্টাচার্য

* যদি কাহারও ধৈর্য্য ও মতি থাকে, তিনি পদ্ধতির আরো গবেষণা করিতে পারেন, বহু বিচিত্র খো মিলিতে পারে।

হইতেন, বিদ্যাসাগর হইতেন না। ব্রাহ্মণের পদ্ধতি প্রবর নামে আছে, কিন্তু নামটি কথিত হয় নাই। বিখ্যাত আদি পুরুষের নাম প্রবর। এই নাম যেমন, অন্য তিন বর্ণের কুলনামও তেমন।

গ্রামের লোক প্রায়ই দেখে, এককালে এক নাম যেন দুইজনের না হয়। দৈবক্রমে দুইজন হরিপদ দত্ত থাকিলে একজন 'ছোট,' অপর জন 'বড়' কিংবা আকৃতির অন্য প্রভেদ অনুসারে দুইজনের দুই উপাধি হয়। দুইজন হরিপদ দত্ত দুই নিকটবর্তী গ্রামবাসী ও প্রসিদ্ধ হইলে, বিশেষ করিবার সময় গ্রামের নাম করিতে হয়, অমুক গ্রামের হরিপদ দত্ত। এইরূপে, ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণেতর দুই চারি জাতির গ্রামীণ দ্বারা কুলবিভাগ হইয়া গিয়াছে।

আমরা কেহ পদ্ধতি নাম, কেহ পদবী নাম, কেহ উপাধি নাম দ্বারা পৃথক হইয়াছি। তিনই কিন্তু কুলবাচক হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় প্রয়োগের সময় পদ্ধতিনাম পৃথক হইয়া পড়ে। জাতিবাচক নামে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় হয়। এই জাতি শব্দের অর্থ সমশ্রেণী। ব্রাহ্মণ-নারী কিংবা ব্রাহ্মণ-পত্নী ব্রাহ্মণী, শূদ্রবর্ণা নারী শূদ্রা, শূদ্রভার্যা—শূদ্রী, শূদ্রানী। বাংলা ভাষাতেও, বেণ্যানী, মালিনী, জেলেনী, ইত্যাদি। এই হেতু, মাষ্টারণী (নারী মাষ্টার, শিক্ষিকা)। সংস্কৃতে আচার্যা—যে নারী স্বয়ং আচার্য; আচার্যাণী—আচার্যের স্ত্রী। এইরূপ, উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ানী। এক এক পদের এক এক কর্ম বা বৃত্তি। এই হেতু বাংলায় মণ্ডলী, মণ্ডলনী, মজুমদারণী, সরকারণী, চৌধুরীণী (রাণীভ্রমে চৌধুরাণী) পদ চলিৎ আছে। কিন্তু কখনও দত্তনী, ঘোষণী, মিত্রণী শুনি নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, উপাধি ও পদবী নামে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে, পদ্ধতি নামে নয়। ইহার কারণও বুঝিতে পারা যায়। পদবী ও উপাধি নাম, বৃত্তিবাচক ও জাতিবাচকের তুল্য। কিন্তু মানুষের কি কোন জীবজন্তুর নামের লিঙ্গভেদ হইতে পারে না। রামের স্ত্রী রামী, কিংবা রামীর স্বামী রাম হইতে পারে না। পদ্ধতি এক একজনের নামের অংশ। কাজেই পদ্ধতির লিঙ্গভেদ করিতে গেলে মানুষের নামের লিঙ্গভেদ করিতে হয়। শ্রীহরিপদ দত্ত—একজনের নাম। যেমন রামের স্ত্রী রামা নয়, রামী নয়, তেমনই হরিপদ দত্তের স্ত্রী, হরিপদ দত্তা নয়, দত্তী নয় দত্তানী নয়। ব্যাকরণে লেখে, সংজ্ঞা নামে স্ত্রীপ্রত্যয় হয় না।

কিন্তু একটা না একটা যে কিছু চাই।

শ্রীযুত হরিপদ দত্তের এক কন্যা আছে। তাহার বিবাহ হয় নাই। সুধাইলাম, "মেয়েটি কে?"—দত্তদের। "নাম কি?"—নির্মলা। অতএব মেয়েটির নাম দত্তজাতা নির্মলা, দত্ত শ্রীমতী নির্মলা। কিন্তু শ্রীমতী নির্মলা দত্ত নাম কানে বাধে, ব্যাকরণে বাধে। শ্রীমতী দত্ত বলিতে যে আরও বাধে। দত্তশব্দ পুংলিঙ্গ, শ্রীমতী স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ পদের পাশের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হয়। বালিকা সুন্দর, মেয়েটি সুন্দর, সাধুভাষা নয়। শ্রীনির্মলা দত্ত, এইরূপ লিখিয়াও লিঙ্গানুশাসন এড়াইবার জো নাই। শেষে দত্ত থাকাতে নামটি পুরুষবাচী হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা শ্রীনির্মলা দত্তজা ভাল বোধ হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীমতী নির্মলা নাম্নী দত্তকুল কন্যা।

বয়ঃক্রমে নির্মলার বিবাহ হইয়াছে, তাহার বরের নাম রমেশ মিত্র। লোকে নির্মলাকে মিত্রদের বউ বলে। (এখানে বধূ, বউ অর্থে পত্নী, কোন এক মিত্রের পত্নী)। স্বামিনী নির্মলা ক্রমে গিন্নী (গৃহিণী) ও বান্নী (বর্নিণী) হইবে। সে গ্রামে অনেক বউ, অনেক গিন্নী বান্নী আছে। কেহ ঘোষের বউ, কেহ বোস গিন্নী, কেহ মুখুজ্জে বউ, ইত্যাদি। নারীর নাম ধরিয়া পরিচয় দিলে তাহার অসম্মান হয়। সম্মানিত ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকায় সম্মানের হানি হয়। অতএব নির্মলাকে মিত্রবধূ, মিত্রবনিতা, মিত্র-জনী, মিত্র-পত্নী, ইত্যাদি বলিতে হইতেছে। সংস্কৃত জনী শব্দের জ লোপ করিয়া নী রাখা চলে। তখন পদবী ও উপাধি নামে স্ত্রী লিঙ্গে নী প্রত্যয়ের সহিত সংজ্ঞা নামও মিলিয়া যাইবে, কোন্‌টা সংজ্ঞা, কোন্‌টা কি, তাহা ভাবিতে হইবে না। অতএব নির্মলার নাম শ্রীমতী নির্মলা মিত্রণী রাখা গেল। "কোন্ নির্মলা?"—মিত্রণী নির্মলা। "কে-সে মিত্রণী?"—যার নাম নির্মলা।

কিন্তু যদি সে পতিনামে পরিচিত হইতে চায়? তখন শ্রীমতী রমেশ মিত্রণী লেখা চলিবে না, কারণ রমেশ নিজেই মিত্রনী হইয়া পড়িবে।' একই সঙ্কেতের নানা অর্থ থাকিলে ভ্রমের উৎপত্তি। নী, ভার্যা বুঝাইতে প্রত্যয় করা গিয়াছে। যে বাংলাভাষা জানে, সে রমেশকে নারী ও নির্মলাকে নর ভাবিবে না বটে, কিন্তু ইদানী এমন নামও রাখা হইতেছে যে শুনিবামাত্র নর কি নারী বুঝিতে পারা যায় না। আমরা বলি, রমেশ মিত্রের স্ত্রী, রমেশ মিত্রের পরিবার। স্ত্রী শব্দে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রকাশ হয়, গ্রাম্যজনও স্ত্রী শব্দের এই রূপ প্রয়োগ অশিষ্ট মনে করে। পরিবার কি-না পরিজন, দাসদাসী; ইহাদের যিনি ঈশ্বরী, তিনি 'পরিবার'। সম্মানপ্রদর্শন জন্য এই বাক্প্রপঞ্চের উৎপত্তি। মুখে বলিলেও কেহ 'পরিবার' লেখে না। লেখে, বনিতা। আদালতের আর্জীতেও বনিতা। অতএব শ্রীমতী নির্মলা, শ্রীমতী রমেশ মিত্র-বনিতা। তিনি কন্যাকালে শ্রীমতী হরিপদ দত্তজা ছিলেন।

এখানে একটা তর্ক আসিতেছে। যখন বহু দত্ত আছে, তখন দত্ত নাম জাতিবাচক স্বীকার করিতে বাধা কি? যদি জাতিবাচক হয়, তাহা হইলে দত্ত শব্দে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ করিলেই ত গোল মিটিয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণেও দেখি, দত্তা ভার্যা যস্য—দত্তা যার ভার্যা সে দত্তাভার্য। এখানে দত্তকন্যাকে দত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু দত্তকন্যা দত্তা, এটা বিশেষবিধি। বোধ হয়, দত্ত দ্বারা বৈশ্য বুঝাইত বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বসিতে পারিত। যেমন, বৈশ্যকন্যা বৈশ্যা, দত্তকন্যা দত্তা তেমন। গুপ্তকন্যাকে গুপ্তা বলা হইত কি না জানি না। দেব-ভূতিও বৈশ্য ছিল। ভূতিকন্যা ভূত্যা হইত কি? সংস্কৃতের বিশেষ বিধিকে বাংলার সামান্য করিলে দোষ কি? দোষ এই, বাংলায় চলিৎ নাই, পদ্ধতি নামে আ প্রত্যয় যোগে কন্যা বুঝায় না। দ্বিতীয় দোষ, পদ্ধতিনাম কেবল অকারান্ত নয়, আ-ই-ঈ-উ-একারান্ত আছে। এই সকল নামে আ যোগ করিলে কটু শোনাইবে। রাহা, দাঁ, নন্দি, গাঙ্গুলী, বসু, দে প্রভৃতি নামের দশা কি হইবে? এমন বিধি করিতে হইবে, যে বিধি সকলেই মানিতে পারে। নইলে, সে বিধি চলিবে না, কেহ চালাইলে তাহার ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হইবে। দত্তজা, রাহাজা, সেনজা, বসুজা ইত্যাদি নাম শুনিলে পুরুষ মনে হয়, কিন্তু নির্মলা দত্তজা, ইরা রাহাজা, আরতি বসুজা, প্রতিভা সেনজা পুরুষ হইতে পারে না। পুরুষেরা জ ধরিলে আরও ভাল হয়।

বুঝিতেছি, শ্রীমতী নির্মলা আপনাকে শ্রীমতী রমেশ-মিত্র-বনিতা, এত বড় নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিবেন না, বিশেষতঃ, তাঁহার নামের দুইরূপ, কখন মিত্রণী, কখনও মিত্রবনিতা, ভাল লাগিবে না তাঁহার সাহেবী সই তাঁহাকে মিসিস্ বনিতা বলিয়া উপহাস করিতে পারে। অগত্যা নিয়মভঙ্গ করিতে হইতেছে। তিনি স্বনামে শ্রীমতী নির্মলা মিত্রণী, পতিনামে শ্রীমতী রমেশ মিত্রণী, উভয়স্থলেই তিনি শ্রীমতী মিত্রণী। নামের প্রথম অংশ হইতে বুঝিতে হইবে সেটা তাঁহার স্বনাম, কি পতিনাম। সঙ্কেতটি অবশ্য নূতন, কিন্তু একবার জানিয়া রাখিলে বুঝিতে ভুল হইবে না।

জা প্রত্যয় দ্বারা দুহিতা, নী প্রত্যয় দ্বারা বনিতা, এই এই স্বীকার করিলে নারী নামের পদ্ধতিলিখন স্থির হইয়া যাইবে। দুই এক স্থলে কানে ভাল শোনাইবে না। নন্দিকুলের বউ কি নন্দিনী হইবে? শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী নন্দিনী লিখিবে?

ইহার প্রতিকার নাই। শ্রীপতি চৌধুরীও দুঃখ করে, তাহার নাম লিখিতে গেলে শ্রীশ্রীপতি লিখিতে হয়। শিশুর নামকরণের সময় সকলে অবহিত হয় না। নির্মলা নাম পুরুষের নাই বটে, কিন্তু রজনী সজনী রমণী মোহিনী আছে। রজনীকান্তের কান্ত, রমণীমোহনের মোহন, শোভার নিমিত্ত। লোকে রজনী, রমণী বলিয়া ডাকে, এমন কি রজনী মিত্র, রমণীবাবুও বলে। কিরণশশী, শরৎশশী, হেমশশী নাম হইতে বুঝি নরজাতি; কিন্তু নারীজাতির মধ্যে শশী অল্প নাই। কেহ কেহ মনে করে নিজের নামের পূর্বে শ্রীমতী লেখা শিষ্ট নয়, তাহা দ্বারা অহঙ্কার প্রকাশ হয়। এটা একেবারে ভুল। শ্রীমতীদের শ্রীমতী চিরকালের অধিকার। কেহ বা মনে করে, শ্রীমতী বালিকা, শ্রীমান্ বালক। ইহাও মানিতে পারি

না। শ্রীমতী ও শ্রীমান্ আদরসূচক, তদ্দ্বারা বক্তার বাৎসল্য প্রকাশ হয় না। তবে, স্বভাবের দোষে কেহ যে শ্রীমান্ ও শ্রীমতীদের মুরব্বী হইয়া না দাঁড়ান, তাহাও নয়। পূর্ব্বকালে মাননীয় ও বিশিষ্ট পুরুষ শ্রীযুক্ত হইতেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীকালিদাস কবি যে-সে পুরুষ ছিলেন না। কিন্তু এখন শ্রী শ্রীহীন হইয়া মানুষটিকে জীবিত বুঝায়।

আর যাহা হউক, উক্ত রীতি মানিয়া চলিলে বিবাহের পূর্বে শ্রীমতীদিগকে 'কুমারী' লিখিতে হইবে না। নামের পূর্বে কুমারী লিখিয়া নিজের অনূঢ়া অবস্থা দেশময় প্রচার করার তুল্য অশিষ্ট ব্যবহার এদেশে ছিল না। ইংরেজ নারীর কেহ 'মিস্', কেহ 'মিসিস্'; কেহ অনূঢ়া, কেহ ঊঢ়া। আমাদের নারী মাত্রেই শ্রীমতী। আমাদের কন্যাকে পাণিপ্রার্থী বরের সন্ধানে ফিরিতে হয় না। যদি 'মিস্' লিখিতেই হয়, 'মিস্' লেখ, কদনুবাদ করিও না। 'মিস্' দত্ত, 'মিসিস্' মিত্র বাংলা নাম নয়, ইংরেজী নাম। শ্রীমতী দত্তজা, নিশ্চয় 'মিস্', এবং শ্রীমতী মিত্রাণী নিশ্চয় 'মিসিস্'। শ্রীমতী নির্মলার ভাই বিমল দত্ত, স্বামী রমেশ মিত্র কদাপি লেখে না, তাহার বিবাহ হইয়াছে, কি হয় নাই।

শ্রীরমেশ মিত্র গণ্যমান্য। তাঁহাকে কেহ শ্রীযুত, কেহ শ্রীযুক্ত, কেহ শ্রীযুক্ত বাবু, কেহ বা রমেশ বাবু, মিত্র মহাশয়, মিত্রজা মহাশয় বলে। শ্রীনির্মলা মিত্রাণীও গণ্যমান্যা হইয়াছেন। তাঁহার বেলায় কি শুধু শ্রীমতী, শ্রীযুক্তা মিত্রাণী মহোদয় বলা যাইবে? দেখি রমেশ 'বাবু'র অনুরূপ কিছু পাই কি না। বাপা ও বাবা শব্দ হইতে বাপু ও বাবু শব্দের উৎপত্তি। যিনি পিতৃতুল্য মান্য, তিনি আদরে বাবু। যিনি মাতৃতুল্যা মান্যা, তিনি মাঈ। বাংলা ভাষায় মাঈ শব্দ চলিৎ নাই, কিন্তু চালাইতে দোষ দেখি না। বাবু শব্দ চলিৎ ছিল না, একশত বৎসরের পূর্বে কেহ শ্রীযুক্তবাবু ছিল না। শ্রীমতী নির্মলা মাঈ, কিংবা মিত্রাণী মাঈ শুনিতে মন্দ লাগে না। আরও সম্রমে হিন্দীভাষা মাঈজী বলে। 'জী' আমাদের অজ্ঞাত নয়। বাবাজীবন, বাবাজীউ (জীব), বাবাজী, ও শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ বলা চলিৎ আছে। মহাত্মাজী ও গান্ধীজীর আবির্ভাবে জী সর্বত্রই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মারবাড়ীর বিচরণহেতু আমরাও বাবুজী হইতেছি। তথাপি, মাঈজী হিন্দী হিন্দী শোনায়।

বাঈ, আর এক শব্দ আছে। পুণ্যশীলা অহল্যা বাঈ, গিরিধারীলালাশ্রিতা মীরা বাঈ, পণ্ডিতা রমা বাঈ, অনুসূয়া বাঈ মহারাষ্ট্রদেশীয়া নারীশিরোমণির নাম অনেকে শুনিয়াছেন। বাঈ শব্দের ব্যুৎপত্তি জানি না। কোথাও বাবা হইতে বাবী নাম ছিল,—যেমন দাদা হইতে দাদী আছে, এবং দাদী হইতে দিদী,—এবং বাবী হইতে বাঈ, কিংবা মাঈ শব্দ বাঈ রূপ পাইয়াছে। যাহা হউক, বাঈ শিষ্ট শব্দ। দুঃখের বিষয় আমরা 'বাঈনাচ' শব্দ শুনিয়া ভাবানুষঙ্গে বাঈ শব্দের কদর্থ করিয়া ফেলিয়াছি। ইংরেজ প্রভুর মুখে বাবু শব্দেরও কদর্থ হইয়াছে; আমরা বাবু ছাড়িয়া শ্রীযুত হইতেছি। কিন্তু পামরের জিহ্বা দীর্ঘ ও দ্বিখণ্ডিত। কোন্‌দিন শ্রীযুতেরও অপমান হইতে পারে। তথাপি বাঈ অপেক্ষা মাঈ বলাই ভাল। নারী মাতৃসদৃশা, এই হেতু নারী মাত্রেই মা-ইয়া, মায়্যা, মেয়ে। নির্মলাকে মাঈ বলিয়া নূতন কিছু বলি না, বলি তিনি মাতৃসদৃশা পূজনীয়া।

তথাপি যদি বাংলায় প্রচলিত নাম চাই, আর্যিকা। বলিতে হয়। আয়ী নাম আমাদের কানে মধুর শোনায়। আর্যিকা হইতে আয়ী। মান্যা নারীমাত্রেই আর্যিকা। নির্মলা আর্যিকা, কিংবা শ্রীমতী আর্যিকা নির্মলা মিত্রাণী প্রথম প্রথম নূতন শোনাইবে বটে, কিন্তু আর্যিকা যে জরতী নয় তাহা বলা বাহুল্য।

কূয়োজল

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

মাঠের মাঝে ছোট্ট একটু পাহাড়ের ঢিবির উপরে আমার এই বাংলো। আশেপাশে গৃহস্থ আছে—এখানে এক ঘর, ওখানে এক ঘর, ঐ দূরে সেখানে এক ঘর, কিন্তু আমার ধন মান প্রতিপত্তির সঙ্গে খাপ খায় এমন কোনও প্রতিবেশী নেই। দু'চারজন কেরাণী, একজন ঠিকেদার নিজেদের ভদ্রলোক বলে অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে চালায় বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কেউ বাক্যালাপ করেনি। আমি যখন মোটরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে' বার হই, তারা পথ ছেড়ে দেয়, মেয়েরা ঘোমটা টেনে সরে যায়। আমার বাঙালী বেহারা বসন্ত তাদের কাছে সমাদর পায়।

কিন্তু আমার বোনের মেয়ে মিনি এসে আমার সম্ভ্রম নষ্ট করল। সে মহা সামাজিক মানুষ। নিজের বাড়ীতে শুধুমাত্র আত্মমর্য্যাদাটুকু নিয়ে তার দিন কাটে না। সে বন্ধু-বান্ধব খেলার সাথী আবিষ্কার করে' নিয়েছে। তেওয়ারীর মেয়ে মহুয়ার সঙ্গে পরিচয়টা পাকাপাকি সম্বন্ধে পরিণত করবার উদ্যোগে আছে। ঘন ঘন যাতায়াত, দেওয়া-থোওয়া চল্‌ছে। শুনলাম মিনির পশ্চিমে বরে মেয়ে দিতে আপত্তি নেই। একটু দূর—তা হোক্‌গে। বেয়ান মানুষ ভাল, যখনি নিতে চাইবে তখনি পাঠিয়ে দেবে কথা আছে।

মিনিকে বলি,—মিনি তোর মেয়ের জন্য ঘাঘ্‌রা কর্, কোর্ত্তা কর, সাড়ী ত চল্‌বে না।

মিনি কথাটা ভাল করে' বোঝে না। তার বেয়ানের ওখানে সাড়ীর চলন না ঘাঘ্‌রার রেওয়াজ অতটা সে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন মনে করেনি। জবাব করলে, "কনের জামা-কাপড় কূয়োজল তৈরী করচে।"

"কে তৈরী করচে?"

"কূয়োজল। কূয়োজলকে আমি বলেছিলুম গঙ্গাজল পাতাতে। তা সে বলে এখানে ত গঙ্গা নেই ভাই, নদীই নেই। এখানে জল কেবল কূয়োর। কূয়োজল পাতাই আমরা।"

হো হো করে' হেসে বিনুকে বললুম, "তোর মেয়ে 'কূয়োজল পাতিয়ে এসেচে। যস্মিন্ দেশে যেমনটি। কিন্তু 'ইঁদ্‌রেকো পানি' হ'লেই ত ঠিক হত মিনুমণি?"

তার মা হেসে বল্‌লে, "ওর কূয়োজল ত খোট্টা না, বাঙালী। ক'দিন হ'ল ঐ গোলপাতার বাড়ীতে একঘর বাঙালী এসেচে, ছোড়দা দেখনি?"

আমার দিনের বেশীর ভাগ কাটে আমার কারখানায়। সেখানে কাঁচামাল পাকামাল, আমদানী রপ্তানী ট্যাক্‌স্ সুপারট্যাকসের ব্যাপার। সকালে যতটুকু সময় বাড়ীতে থাকি বারান্দায় ইজি-চেয়ারে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডেবিট্ ক্রেডিট্ ভাবি। কোথায় কোন্ ক্ষুদ্র গোলাপাতার বাড়ীতে তুচ্ছ গৃহস্থ প্রতিবেশী হ'ল তা দেখ্‌বার আমার সময় নেই।

মিনিকে খুসী কর্‌বার জন্য বললুম, "বহুৎ আচ্ছা তুমরা ইঁদ্‌রেকো পানিকো হিঁয়া এক রোজ খিলায় দেও।"

মিনি তার মায়ের কাছ থেকে আমার হিন্দী বুলির অর্থভেদ করে নিয়ে মহা খুসী হয়ে তখনি ছুটে বের হয়ে গেল।

* *

মিনির কূয়োজল যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে' গেছে কি না জানি নে। কোন্ ফাঁকে বাঙালী মিনির মোমের কনের সঙ্গে বেহারী মহুয়ার কাঠের পাত্রের শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেছে তাও খেয়াল করিনি। সমারোহ নিশ্চয়ই মিনি করতে ছাড়ে নি। কিন্তু মামাজাতীয় সব অনাবশ্যক লোককে নিমন্ত্রণ করেনি।

সকাল বেলায় বারান্দায় বসে। চায়ের টেবিলেই কাগজ-পত্র নিয়ে অঙ্ককার দেখছি। কারখানায় অবস্থা

টালমাটাল। যোগ-বিয়োগ করে' লোকসানের গভীর গর্ত্তে কিছুতেই ছুই এক ঝুড়িও মাটি ফেলতে পারছি নে। যতই কাটাকাটি করি ততই যেন নীচেকার মাটি সরে গিয়ে ফাঁক আরও স্পষ্ট হয়। আর যেন ঠেকিয়ে রাখবার উপায় নেই। ঐ যে গর্ত্তের মুখ দেখা যাচ্ছে ঐ ছিদ্রপথে আমার এত পরিশ্রম লোহালক্কড়ের এতদিনকার একাগ্র সাধনা অতবড় কারখানাটা বেমালুম তলিয়ে যাবে। ভাবতে যেন মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে' ওঠে। চোখের সামনের লাখ হাজারের মোটা মোটা অঙ্কগুলো সব যেন ঝাপ্সা হয়ে আসে।

কলম রেখে শূন্যদৃষ্টিতে সাম্‌নে চেয়ে বসে আছি। ছোট্ট ফুলের বাগানের মাঝেকার লাল কাঁকর-ছড়ানো গাড়ীর রাস্তা যেন একটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে পাঁচিলের' লোহার গেটে গিয়ে মিশেচে। গেটের পরই বড় রাস্তা। রাস্তার ওপারে মিনির বেয়ান-বাড়ী। তারই লাগা দক্ষিণে আট-দশটা পলাশ গাছের তলে মিনির কুয়োজলের গোলপাতার বাড়ী। চারদিককার খোলার বা খড়ের বাড়ীর মাঝখানে ছোট বারান্দা-ঘেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোলপাতার বাড়ীখানি চোখে পড়ে আর নূতন নূতন ঠেকে। সাম্‌নে একটা প্রৌঢ় অশথ্‌ গাছ। বাঁকাচোরা কাঠের একটা অসম্পূর্ণ বেড়া দিয়ে বাড়ীটা ঘেরা। পথের দিকে কেরোসিন কাঠের গেট। তার উপরে একখানা শাড়ী রৌদ্রে মেলা।

মনের মাঝে যে অস্থিরতা গুমরে গুমরে উঠ্‌ছে সে যেন দৃষ্টিকে তাড়া করে' ফিরছে, স্বস্তি দিচ্ছে না। চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখি গোলাবাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে মিনি বের হ'ল, এবং বাঁ হাতে তার ডান হাত ধরে আর একজন যে বেরিয়ে এল তাকে আগে কখনও না দেখলেও বুঝলাম ঐ মিনির নূতন বান্ধবী। একহারা লম্বা দেহ সতেজ লতার মত বেড়ে উঠেছে। চলার ভঙ্গিমায় চাঞ্চল্য নেই। মিনিকে রাস্তাটা পার করে' দেবার জন্যই বোধ হয় তার হাত ধরে আসছিল, হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই মিনির হাত ছেড়ে দিয়ে একটা পলাশ গাছের আড়ালে সরে' গিয়ে বোধ করি মিনিকে নির্ভয়ে চলে যাবার কথাই বললে। রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া ত দূরের কথা একটা গরু পর্য্যন্ত নেই। তবু যে ভরসা দিতে বার হয়েছিল সে কিসের ভয়ে অমন করে গাছের আড়ালে পালালো পাঁচ বচ্ছরের মিনি তার কোনো কারণ খুঁজে পেল না। দুই-একবার ডাকাডাকি টানাটানি করে একলাই রাস্তা পার হয়ে ছুট্ দিল। আড়াল থেকেই সে ঝুঁকে দেখে নিলে মিনি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিল কি না। সাড়ীটা বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ে, তাই সামলাতে হাতের খানিকটা, খোলাচুলের আগাটা চকিতে একটু দেখা যাচ্ছিল। মিনি বারান্দায় উঠলে আর একবার তেমনি ঝুঁকে দেখে সে ধীরে ধীরে ফিরে গেল। তার চলনের শান্ত ভঙ্গীটি চলে গেলেও যেন সেখানে লেগে রইল।

মিনির কাঁখে কারুকার্য্য করা ছোট্ট একটি ঝাঁপি। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ধনসামগ্রী নিয়ে এলে মিনুমণি?"

মিনি গম্ভীরভাবে বললে, "তত্ত্বের জামা-কাপড়। দেখ, ছোটমামা এইটে হ'ল ছেলের জামা। এই যে জরির কাজ দেখচ, বল ত এতে ছিল কি না? ছিল না। কুয়োজল তার একটা পাড় থেকে জরি তুলে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এটা হল পাগড়ী। বাঁধা পাগড়ী। কুয়োজল জামাইয়ের মাথা মেপে বেঁধে দিয়েছে। ছোট বড় হবে না। টেনে দেখ, কেমন শক্ত। কুয়োজল বললে,—তোমার পশ্চিমে জামাই, একটা পাগড়ী না দিলে চলবে কেন? মনুয়ারা পাগড়ী পরে কি না। আর এইটে—"

সে তার ঝুড়ি উজাড় করতে লাগল। সেই অকিঞ্চিৎকর খেলনার কাপড়-চোপড়ে খাসা শিল্পনৈপুণ্য আছে। খেলনা বলে তাকে সুন্দর করবার চেষ্টার কার্পণ্য নেই। মিনি বললে, "দেখি মনুয়া মেয়েকে কি দেয়। আমি কুয়োজলকে বলে দিয়েছি ওদের কিন্তু কিছু করে' দিতে পারবে না।"

মিনি বাংলা দেশের মেয়ে। তত্ত্ব আদান প্রদানে টক্কর দেওয়া আছে, বেয়ানের অক্ষমতায় খোঁচা দেওয়া চাই, এ জ্ঞান ও বাতাসে পেয়েছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলুম, "তোর সঙ্গে আসছিল ও কে রে?"

"ঐ ত কুয়োজল।"

"ঐ তোর কুয়োজল? ও দেখি তোর চাইতে ক—ত বড়!"

মিনি তার ঝুড়ি তুলে নিয়ে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে, "তাতে কি?"

ও বাড়ীর দিকে তাকালুম। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু মনে হ'ল, কেউ ঐ ঝাঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের আলাপটি না শুনলেও ছোট্ট কোনও ছিদ্রপথে চোখ রেখে দেখে নিলে। মিনির তন্বের জামা-কাপড় আরও একটু নাড়াচাড়া করে' কেন দেখ্‌লাম না?

* * * *

পরের দিন বিকেল-বেলায় কারখানা থেকে ফিরবার পথে দুইধারের লোকের সেলামের সামনে আর তেমন করে' মাথা উঁচু করে' বুক ফুলিয়ে গাড়ী হাঁকাতে পারছি নে। আশেপাশের সমস্ত ছাপিয়ে আমি আমার কারখানা আকাশে ঠেলে তুলেছিলাম। তার চোঙটা যখন আকাশে মাথা তুলেছে আমিও সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা আকাশে তুলে ফেলেছি। আমার কি আছে না আছে লোকে তা দেখে নি। শুধু ঐ আকাশভেদী চোঙের দিকে চেয়ে আমায় সেলাম দিয়েছে। আমি খুব মস্ত লোক। আমার কারখানার চোঙ সব চাইতে উঁচু।

কিন্তু কাল, না হয় দুদিন বাদে ব্যাঙ্কের লোক এসে যখন সেই কারখানার দরজায় তালা লটকাবে, একটা কেরানী হয়ত একটা বেহারী জমাদার সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে আমার জিনিষ-পত্রের ফর্দ্দ করবে আর দাম ফেল্‌বে, তখন আজ যারা দূর থেকে নীরবে সম্ভ্রম জানাচ্ছে, কথাটি বল্‌বার সাহস নেই, তারাই অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে সহানুভূতির কথা বলবে। আঃ তার আগে এই মোটারটা উল্টে যদি—।

হুস্ করে বাংলোয় ঢুকতেই মিনি চীৎকার করে' উঠ্‌ল,—ছোটমামা রাখো, রাখো।

তাড়াতাড়ি গাড়ী বেঁধে চেয়ে দেখি সামনেই রাস্তার উপরে মিনির সংসার সাজানো। ঘুড়ি ওড়াবার একটা নাটাই হাতে, সুতোটা রাস্তা পেরিয়ে ওধারে গেছে। সেই সুতো বেয়ে চেয়ে দেখি, একটু দূরে তার কুয়োজন— দুই হাতে একখানি ঘুড়ির দুটি কোণ ধরে বোধ হয় উড়িয়ে দেবার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। লম্বা একহারা দেহের রেখায় রেখায় সাদা সাড়ীর লাল পাড়টি বিনিয়ে গেছে। হাত দুখানি অনাবৃত, মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। ঈষৎ বঙ্কিমভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়াল। মনে হল প্রথম যেন বাঙালী তরুণীকে দেখলুম। রং-বেরঙের ঘাঘরা-পরা, মাথায় ওড়না, পশ্চিমে মেয়েদের দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেমিজে সাড়ীতে বাঙালী মেয়ের রূপ যেন ভুলেই গিয়েছিলুম।

নেমে পড়ে আবদুলকে বল্‌লুম, গাড়ী ঘরে তুলে দিতে। টুপীটা হাতে করে চট্ চট্ করে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকলুম।

আমার গায়ের এই জামাটা, দেয়ালে টাঙানো ঐ আয়নাটা যেমন অভ্যেস হয়ে গেছে,—চোখে পড়ে, ব্যবহারও করি অথচ দেখি নে, বাংলোর হাতার ঐ বাগানখানিও তেমনি অভ্যেস হয়ে গেছে, আর দেখি নে। প্রতিদিন আমারই সামনে মালী ঘুরে ঘুরে গাছে গাছে জল দেয়, ঘাস ছাঁটে, পাতা ঝাঁট দেয়, কিন্তু আজ বুঝলুম তবু দেখি নে। কেয়ারী করা পাতাবাহারের সার, সবুজ ঘাস, ফুলের চারা, লাল কাঁকরের রাস্তা এবং তারই মাঝে জীবন্ত একখানি ছবি নিয়ে বাগান-খানি আজ যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুক্‌ল।

ঘরের মেঝেতে কার্পেটের উপর কাগজপত্র, বাংলা উপন্যাস, ছবির বই, খোলা ফটো অ্যালবাম এলোমেলো-ভাবে ছড়ানো। এক পাশে ভাঙা কলের গাড়ী জলতরঙ্গ বাঁশী এ ওর গায়ে পড়ে আছে। ভাণ্ডারে যা-কিছু লোভনীয় বস্তু আছে মিনি তার কিছুই তার অতিথিকে দেখাতে বাকী রাখে নি।

এই মূল্যবান কার্পেট, ঐ প্রকাণ্ড পালঙ্ক, দেয়ালের ঐ বড় বড় ছবি, ঐ বুককেস, আয়না সেল্‌ফ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লুম। মিনির গৃহিণীপনার ফাঁকে ফাঁকে কেউ কি এই একক ছন্নছাড়া জীবনের এলোমেলো ঐশ্বর্য্য-সম্ভার কৌতুকভরে দেখে নেয় নি? ঐ যে আমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা, বিছানায় ছাড়া জামা-কাপড়, ঐ যে ফটো অ্যালবাম, চিঠি ফাইল, মাসিক-পত্রিকার মাখামাখি—দেখে কেউ কি কৌতুকের হাসি হেসে যায় নি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল একটু আগে এই আয়নার বুকেই কেউ কি তার রূপটি একটু

বিশেষ করে দেখে নেয় নি? সব কিছুতে যেন তখনও কার চাপা কৌতূহল লেগে রয়েছে।

হুড়মুড় করে' ঘরে ঢুকে মিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—"ছোট মামা তুমি, তুমি এক্ষুণি এসে পড়লে কেন? তুমি ভারী দুষ্টু।"

—কেন?"

—"কেন কি? কুয়োজল চলে যেতে চাইছে যে।"

মনে মনে হেসে ভাবলুম, বেশ ত! নিজের ঘরে শুধু-মাত্র নিজের সময়মত এলে চলবে না, অন্যের অসময় বাঁচিয়ে আসতে হবে। মিনিকে বললুম,—"আচ্ছা, বিধান করচি। তোমার কুয়োজলকে যেতে মানা কর, আমিই যাচ্ছি।"

চাপা ত্রস্ত স্বরে মিনির কুয়োজল বারান্দা থেকে বিনুকে বললে শোনা গেল, "ও ভাই শোনো, তোমার মিনি ওর মামাকে চলে যেতে বলচে। কি লজ্জা—!"

বিনু বললে, "বলুক না, যাবে কোথায়?"

* * * *

সন্ধ্যাবেলা গাড়ীর রাস্তায় পায়চারী করতে করতে চেয়ে দেখলুম, গোলপাতার ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্তিমিত আলোর মৃদু রশ্মি বেরুচ্ছে। ঐ ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে হয়ত সে পান সাজছে, হয়ত বা নূতন হাঁড়ি উপুড় করে' মাটির প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে, না হয় ত অমনি একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাংসারিক কাজ সামনে করে পিতাপুত্রীর সান্ধ্যমিলন জমিয়ে তুলেছে। ধনী প্রতি-বেশীর কি সংবাদ আজ বৃদ্ধের কাছে প্রচারিত হ'ল?

তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হ'ল, আমার জীবনে একটি সন্ধ্যাও আসে নি। আমার একটি সন্ধ্যাও কাটানো হয় নি। আমার ঘরে ঘরে গ্যাসের বাতি দপ্ দপ্ করে। সন্ধ্যার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমি ইনডেন্টের হিসেব করি। পৃথিবীর লোহালক্কড়ের বাজারে কোথায় 'চো' মারব খুঁজে মরি। আমার নির্জ্জন সন্ধ্যা অলস হতে চায় না। খাটের উপরে গড়িয়ে, মেঝেতে উপবিষ্ট তুচ্ছ কাজে অর্দ্ধনিবিষ্ট মন—কারও সঙ্গে তুচ্ছ কথার আলাপ চলে না। আমার সময়ের মুখে লাগাম কষা—আটকে রাখবার জন্ম অহরহ টানাটানি করছি।

তুচ্ছ, তুচ্ছ। এতদিনকার এত গভীর চিন্তা এমন-সব ওরিজিন্যাল আইডিয়া, নূতন প্ল্যান এই ত প্রলাপ বলে' প্রমাণিত হতে চলেছে। ইস্! হয়ত আমারই দুর্ভাগ্যের চমকপ্রদ খবর নিয়ে ঐ বৃদ্ধ পিতা আর তরুণী কন্যা তাদের আজকের সন্ধ্যা জমিয়ে তুলেছে।

ফিস্ ফাস্ কানাকানি থেকে সারা সহরে জানাজানি হয়ে গেছে, দে সাহেবের কারবার তলিয়ে গেছে। কারখানায় সেই ভয়ঙ্কর তালা লটকে গেছে। চিমনীতে নিঃশেষিত অগ্নির শেষ ধোঁয়া চুইয়ে চুইয়ে উঠ্‌ছে। মারোয়াড়ী মহাজনের চাপরাশী মাথায় পাগড়ী বেঁধে আমার আপিস-ঘরে আমারই প্রবেশ রোধ করবার জন্ম দ্বার আগলাচ্ছে। "আগরওয়ালার দখল" লেখা এক সাইনবোর্ড মৃতদেহের আলিঙ্গনের মত আমার কারখানার গলায় ঝুলছে।

এই বারান্দায় অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছি। ভোর থেকে রাত অবধি লোক আনাগোনার আর শেষ নেই। মারোয়াড়ী, সাহেব, মাদ্রাজী, বাঙালী যে যেখানে ছিল টাকার ভয়ে উন্মত্তের মত ছুটে এসে ছেয়ে ফেলেছে। হিসেব-নিকেশ গরম কথার আর অন্ত নেই।

পাচিলের বাহিরে লোকের ভীড় জমে যায়। যে দাঁড়ায় সে আর নড়তে চায় না। যেন মস্ত একটা তামাসা চল্‌ছে। দেখবার এমন বস্তু আর নেই।

লোকের মাথার উপর দিয়ে পলাশ গাছের ফাঁকে প্রতিবেশিনীর ত্রস্ত পদবিক্ষেপ নজরে পড়ে—এ ঘর ও-ঘর আনাগোনার অন্ত নেই। বিনুরা যাওয়া অবধি এখানে যাতায়াত বন্ধ। এই উদ্ধত কৌতূহলী মানুষের ভীড়ের প্রতি কেমন একটা অদ্ভুত রকমের কৃতজ্ঞতাও বোধ করি।

বেলা ছুটোর সময়ে লোকজন সরে গেছে। স্নানা-হারের জন্ম একটু ফাঁক না দিয়ে পাওনাদারেও পারে নি। বাইরের ভীড়ও আর নেই। তেমন একটা কৌতুকাবহ কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে যে যার কাজে চলে গেছে। নিস্তব্ধ দুপুর শুধু প্রাণপণে অগ্নি-বর্ষণ করে' পৃথিবীর বুক থেকে রস শুষে নিচ্ছে। রৌদ্রের দিকে তাকালে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠে যেন। সদর

রাস্তায় কচিৎ একটা ভাড়াটে গাড়ী ছড় ছড় করে' চলেছে। বাইরের শুষ্কপ্রায় পুকুরটায় তিন চারটে মোষ অর্দ্ধাঙ্গ জলে ডুবিয়ে রৌদ্রের দহন থেকে আত্মরক্ষা করছে। ঘরে ঘরে দুয়োর বন্ধ—কোথাও মানুষের সাড়া নেই। পৃথিবী এই মধ্যাহ্নে এসে হঠাৎ যেন থেমে গেছে। সংসারে কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা সব যেন বন্ধ।

ও বাড়ীর ঘরে দরজা আঁটা—ঘরে মানুষ আছে এমন সাড়াটি নেই। কাজকর্ম সেরে দ্বিপ্রহরের আড়ালে কোথায় মিনির কুয়োজল লুকিয়েছে আঁচ করতে পারলুম না। একটু যেন ব্যথা বোধ করলুম। না দেখ্‌তে পেয়ে টের পেলুম—আড়াল থেকে ভাগ্যবিড়ম্বিতের খবরদারি চলছে এ আশা করছিলুম।

"মিনি আবার কবে আস্‌বে ?"

মৃদুকণ্ঠের সুস্পষ্ট প্রশ্ন। একটু ফিরে দেখলুম দরজার ফাঁক দিয়ে দেহের খানিকটে দেখা যাচ্ছে। একখানা দরজা বন্ধ করে' তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর থেকে মিনির কুয়োজল জিজ্ঞেস করছে।

সামনের দিকে চেয়েই জবাব দিলুম, "জানিনে ত। এই ত সবে সেদিন তারা গেল।"

"কাজকর্ম সব মিট্‌ল ?"

"হাঁ, এখনকার মত এক রকম—"

"স্নান করবেন না ?"

"করব বই কি। কেন বলুন ত ?"

"কখন আর করবেন ? আড়াইটে বেজে গেচে।"

"তাই নাকি ?"

হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে তাকালুম—আড়াইটে পার। বললুম, "তাইত। বসন্তটা ত ডাকেও না।"

"বোধ হয় ভরসা করে নি। সে বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েচে।"

"ও।"

একটু পরে ভিতরে যেয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নেই। একা বসন্ত সমস্ত বাড়ীর শূন্যতা পরিস্ফুট করে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম,—ও বাড়ীর ঐ—মিনির কুয়োজল চলে গেচেন ?

—"আজ্ঞে।"

"এখানে বসে বসে ঘুমোচ্ছিস্ আর এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এল। একবার ডাকলিনে ? আর-এক বাড়ির মানুষ এসে বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে যাবে। বেকুব কোথাকার।"

সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করল। কিন্তু এই কর্ত্তব্য-শিথিলতায় আজ মনে মনে তার ওপর প্রসন্ন হয়ে উঠলুম। তখনও কানে বাজছে—বসন্ত, তোমার সাহেবের স্নানের জল ঠিক কর গে।

খেতে বসে মনে হ'ল যেন আগে আগে খেতে এসেছি। কোথায় যেন মাঝে একটা ফাঁক পড়ে গেছে। স্নানের জন্য তাড়া ছিল, খেয়ে নেবার জন্য তাগিদ নেই। নাওয়ার সঙ্গে খাওয়ার যেন মিল নেই।

বারান্দায় এসে বসলুম। আমার কাজকর্ম চলা-ফেরার বিস্তৃত ক্ষেত্র গুটিয়ে এসে যেন এই বারান্দাখানিতে ঠেকেছে। মানুষ বার থেকে যেমন ঘরে ফিরে আসে, আমি তেমনি ঘর থেকে এই বারান্দায় এসে বসি। এই-খানে বসে থাকায় যেন নেশা আছে। ওদিকে নূতন বিলিব্যবস্থা, পুরাতনের গোল মিটিয়ে নূতন একটা প্রকাণ্ড প্রয়াস কেমন করে' করব তার প্ল্যান ঠিকঠাক্। ব্যবসার বাজারে কারখানা করে' কারবারে এবার অমর কীর্ত্তি। কতদিন ধরে এই প্ল্যান একটু একটু করে' মাথা থেকে বার করেছি। অথচ ক'টা দিনে সব যেন হু হু করে' বদলে যাচ্ছে। তার চমৎকারিত্বে মন আর নেচে উঠ্‌তে চায় না। সেই অসাধ্যসাধনের কল্পনায় বুক উৎসাহে ফুলে উঠতে চাইছে না। সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত ভেবে মন যেন গা ছেড়ে দিচ্চে।

* * *

বাবা চল্লিশ বছর ধরে' একমনে টাকা জমিয়ে গেছেন, মা এক রকম শূন্য ঘর আগলেছেন। যখন ইকনমিক্‌সে এম-এ পাস করলুম, মা নিশ্বাস ফেলে ক'নে সন্ধানে তৎপর হলেন। এমন ক'নে যে আমাকে টাকার নেশা থেকে তার দিকে টানতে পারে। মা বলতেন, এ সংসারে পুরুষরা সব কল, মেয়েরা পুতুল। তাই তাঁর এমন পুত্রবধূ চাই যে, তিনি যা পারেন নি সে তা পারে। আর বাবা অর্থনীতি মূলমন্ত্র করবার জন্য মত্ত হেন। তাঁর

যেখানে যে ভুলভ্রান্তি হয়েছে আমাকে দিয়ে তার শোধ তুলতে চান। আমিও ভাবি অর্থই একমাত্র মুক্তি, কিবা ব্যক্তির কিবা দেশের। কারখানার সাধনায় তন্ময় হলুম। মা বাছাই করে' করে' যতই রূপসী বিদুষী হাজির করেন, আমি ততই বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু হেসে উড়িয়ে দি। যেখানে বয়েস শুনেছি কুড়ির কোঠায়, বর্ত্তমান অবস্থান কলেজে, সেখানে আরো জাঁক করে' প্রত্যাখ্যান ক'রেছি। পছন্দ করতুম না বলে নয়। পছন্দ করতুম, মন হঠাৎ নেচেও উঠ্‌ত—সেখানে এই প্রত্যাখ্যানের হাওয়া একটু পৌছবে বলে'। যাকে চাওয়াই স্বাভাবিক, হয়ত অনেকেই চায়, তাকে চাইনে জানিয়ে দিয়ে তার অক্ষুন্ন জাঁকে অন্তত একটা আঘাত ক'রতে। এতদিনে এই তরুণী সেই মিথ্যা আড়ম্বরের অত্যন্ত সরল প্রতিশোধ দিল যেন।

সময়ের মুখে লাগাম কষে, ব্যবসার মোহে পাগলের মত দিনরাত্রি ধ্বস্তাধ্বস্তি করার চাইতে একজন কারও হাতে সময়ের হিসেব ছেড়ে দিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন বেঁধে নেবার জন্য লোভ যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে মাথা উঁচু করছে। ব্যবসা ফেল হওয়ায় বাইরে যে অসীম লজ্জা তা ঢাকবার মত মাধুর্য্যের সন্ধান ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে। নাওয়া-খাওয়ার ভুলের মাঝে এমন অনেক কিছু মেলে। ব্যবসার মাঝে সে লাভটির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এল। প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল। গোলপাতার ঘরেও আলো দেখা যাচ্ছে। উঠোনের কোণে তুলসী বেদীর উপর সলতের প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে' মিনির কুয়োজল কিছুক্ষণ হ'ল চলে গেছে। প্রদীপ এখন নিবু নিবু। ভিতরে এতক্ষণে সান্ধ্য সভা বসে গেছে। ইকনমিক্‌স্ হাইপলিষ্টিকেসের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। টুক্‌টাক্ কথার ছোটখাটো আলোচনা। আঃ, যদি ওরই এক কোণে বসে এই নির্জ্জন স্তব্ধ পাথরের মত তার সন্ধ্যেটা ভুলে যেতে পারতুম!

* * *

যে ক্ষুদ্র বাড়ীর দিকে অবজ্ঞায় ভ্রূক্ষেপ করিনি সেই তুচ্ছ কুটীরে আতিথ্য পাবার জন্য মন আজ ব্যাকুল। অথচ সেখানে প্রবেশের পথ বন্ধ। কোনও দিন খুল্‌বে কি না তাও সন্দেহ। গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা হলে সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছেন, দরিদ্র প্রতিবেশীর কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা মনে করে মাথা উঁচু করে' চলে গেছি, নজর করেও স্বীকার করি নি। সুতরাং পিছন দিয়ে বিনু মিনির পথ থাকলেও সামনে দিয়ে আমার পথ বন্ধ। আমি এতদিনকার অবহেলা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে চাই, কিন্তু কি ভাবে তা ঠাহর পাচ্ছি নে।

ঐ বাড়ীর যদি মস্ত ফটক তকমা-পরা দারোয়ান থাকত, তবে বুক ফুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা থাকত না। ড্রয়িংরুমে বসে পিতার সঙ্গে জল-হাওয়ার গল্প করতে করতে ক্রমে মেয়ের পিয়ানো বাজানো শুনতেও বিশেষ একটা কিছু প্রয়াস করতে হত না। এমন অনেক পিতা আমার আগমনে তার রুদ্ধ ফটক খুলে দিয়ে অনূঢ়া কন্যার পিয়ানো বাদ্য আগ্রহসহকারে শুনিয়েছে। সেখানে বসতে চাইনি তবু অপেক্ষা করতে হয়েছে, ভাল লাগে নি তবু শুষ্ক তারিফ্ করতে হয়েছে। অতি সাবধানে উত্থাপিত প্রস্তাবে সাফ জবাব দিয়েছি। যেখানে যেতে চাইনি সেখানকার পথ খোলা পেয়েছি। আজ যেখানে যেতে চাই সেখানকার পথ জানি নে। যে তরুণী কন্যার পিতার বাড়ীতে ফটক নেই, ড্রয়িংরুম নেই, তার ক্ষুদ্র ঘরের নিরুদ্ধ কপাট অর্গল কেমন করে' খুলবে, তার মাটির মেঝেতে কেমন করে' আসন পাব, তার অসজ্জিতা দারিদ্র্যকুণ্ঠিতা কন্যার কাছে কেমন করে স্থান হবে, কিছুই ভেবে পাই নে।

প্রতিবেশীর বিপদের সময়ে প্রতিবেশী যেমন তত্ত্ব-তলাস নেয়, সেদিন আমারও তেমনি কিছু বিপদ মনে করে সহৃদয় প্রতিবেশিনী কুণ্ঠার সঙ্গে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে' গেছে হয়ত। কিন্তু ঐ একটুখানি মাপাজোকা সহানুভূতিতে আমার আর চল্‌ছে না। আমার বহুদিনকার দেউলে হৃদয় আজ একান্ত কামনার জন্য কাঙাল। কেমন করে সেই সহজ কথাটা জানাই?

সংসারে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটত!, বন্যা বা ঝড়, কি ভূমিকম্প বা অমনি একটা কিছু যাতে জীবনযাত্রার প্রচলিত নিয়ম আপনিই হঠাৎ ভেঙে পড়ে। যা মানুষের

পরস্পরের মাঝখানে কৃত্রিম ব্যবধান হঠাৎ ঘুচিয়ে দেয়ে পরস্পরকে আসন্ন বিপদের ভয় দেখিয়ে কাছে টেনে আনে। আজ যদি এই মুহূর্ত্তে তেমনি একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটত, সমস্ত সঙ্কোচ সরিয়ে ফেলে ঐ দরজায় দ্রুত আঘাত করে' সহজস্বরে সাবধান করতে পারতুম—শীগ্‌গীর বাইরে আসুন। অভিভূত বৃদ্ধ পিতার কম্পিত হাত ধরে' আমাকে অবলম্বন করে' আমার অত্যন্ত কাছে এসে সে দাঁড়াত। এতদিনকার দূরত্ব একটি মুহূর্ত্তে ঘুচে যেত।

ঢঙ ঢঙ করে' মলিয়র সাহেবের কারখানার ঘড়িতে ছুটো বেজে গেল। আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার স্বপ্ন-মায়াজাল সেই শব্দাঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল। গভীর রাত্রির অন্ধকাররাশির উপর তারাহীন স্বচ্ছ আকাশ যেন প্রেয়সীর কালো চুলের উপর ঝুঁকে পড়ে চেয়ে আছে। মনে হ'ল বিশ্ব-প্রকৃতির সকল বাধা-বন্ধন একটু আগে যেন অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সেই অবসরে সংসারে কত না লুকোচুরি হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কিছুই হয় নি। বাইরের রাস্তা, ঐ গোলপাতার বাড়ী, যেখানে যা ছিল সেইখানে যেন শিকড় পুঁতে বসে আছে। এমন একটা সুযোগেও কোথাও একটু নড়চড় শিথিলতা ঘটে নি। চারিদিক যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোনও রকম ব্যতিক্রমের আভাসও কোথাও নেই।

* * *

ঘুম ভাঙতেই দেখি রোদ খাঁ খাঁ করছে। হুড় মুড় করে' উঠে বসেই মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম—কারখানা, ডাক। ধক্ করে' মনে পড়ল, নূতন অধিকারীর নূতন নিয়মে কারখানার তদ্বির চলছে, এতক্ষণে দিনের কাজ সুরু হয়ে গেছে। আমার জন্য সেখানকার কিছু অপেক্ষা করে নেই।

বাঁচা গেল। অলসতার আবেশ যেন সারা দেহ জড়িয়ে ধরল। সময়ের কাছে দরবার নেই। সমস্ত সকালটা যেন আমার ফুরসুতের জন্য আমার বিছানার প্রান্তে দাঁড়িয়ে।

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল গোলপাতার ঘর। দিনের আলোয় রাত্রির সমস্যা যেন অত্যন্ত হাস্যকর মনে হ'ল। এই ত এত নিকটের প্রতিবেশী, দু পা বাড়ালেই বাড়ী। ঐ ত বারান্দায় বেতের কেদারায় মিনির কুয়োজলের বাবা সবে কাগজ নিয়ে বসেছেন। ঐখানে যেয়ে 'কৈসরের খবর আজ কি দেয়' বলে' অপরিচয় অস্বীকার করা এমন কিছু শক্ত বলে' ত মনে হয় না। বৃদ্ধ হয়ত একটু বিস্মিত, একটু তটস্থ হয়ে উঠবেন। হয়ত অভ্যর্থনার কথা মনে হবে না, বসতে বলতে ভুল হবে। কিন্তু বাড়ীতে আরও ত মানুষ আছে। যে পরের বাড়ীতে এসে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে আপ্যায়ন করতে বিব্রত হয় না, সে কি নিজের বাড়ীতে একটা কিছু এগিয়ে দিয়ে বসতে বলতে বিব্রত হবে? একটা মুহূর্ত্ত একটু অস্বস্তি, একটুক্ষণের জন্য নিজেকে নিয়ে কি কার কি করি এমনি একটা কুণ্ঠা, তার পরেই কৈসরের খবর পাবার আগে তৃতীয় ব্যক্তিকে খবর দিতে হবে আমার চা-পান শেষ হয়েছে কি না। তার পরেই ত নিত্যকারের—।

"হুজুর চা"—বসন্ত বললে।

"রাখ, চা খাবো না", বলে' ঘরে ঢুকলাম। চটির ওপর পাঞ্জাবী পরে' নিতান্ত ঘরোয়া বেশে বেরিয়ে এসে দেখি, বসন্ত সাজানো ট্রে নিয়ে তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইঙ্গিতে তাকে ঘরে যেতে বলে' বেরিয়ে পড়লাম। মাটির দিকে চেয়ে জুতোর ঠোক্করে কাঁকর ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ীর সামনে এসে পড়লুম। বৃদ্ধ কাগজ থেকে মুখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে আবার কাগজে মনোনিবেশ করলেন এবং দ্বারে দণ্ডায়মান অতিথির অস্তিত্ব ভুলে গেলেন। নিজের মূর্খতাকে ধিক্কার দিতে দিতে ভাবছি এখান থেকেই, না, আরও একটু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফিরব এমনি সময়ে সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনটুকু পার হয়ে এসে কাঠের দরজাটার ওপর হাত রেখে সে বললে, "আসুন, ভেতরে আসুন।"

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। ভাববার অবসর না দিয়ে দরজাটা ভেতরের দিকে টেনে ধরে' আবার বললে, "আসুন।"

ঢুকলাম। আমার আগে আগে তার বাবার কাছে

গিয়ে তাঁর মুখের ওপর থেকে কাগজটা সরিয়ে নিয়ে বললে, "ও বাড়ীর দে-সাহেব—মিঃ দে।"

"আসুন, আসুন।"

কথার অভাব হ'ল না। পাঁচ মিনিটের মাঝে স্পষ্ট হয়ে গেল, বিষয়ের অভাবে নয়, আলাপীর অভাবেই বৃদ্ধ আলাপ করেন না। যুদ্ধের নৃশংসতা, ইংরেজের ষ্ট্র্যাটেজি, জার্মাণীর বীরত্ব, জনসাধারণের দুঃখ হতে ভারতবর্ষের উপস্থিত দুরবস্থার আলোচনার মাঝে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "কারখানাটা তা হলে ছেড়েই দিলেন?"

হেসে বললুম, "ছেড়ে আর দিলুম কই? ধরে রাখতে পারলাম না।"

"কেন?"

এক কথায় কেমন করে' জবাব দেব ভাবছি, অন্দর দরজা দিয়ে বার হয়ে এসে তার বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা, একটু চা করি?"

বৃদ্ধ আমার দিকে চেয়ে নীরবে জিজ্ঞাসা করলেন।

বললুম, "না, চায়ের আমার দরকার নেই—"

"তবে একটু সরবৎ?"—পুনরায় পিতার প্রতি প্রশ্ন। আবার আমারই জবাবের অপেক্ষা।—"না, তারও দরকার নেই।"

সে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করল। তার পরে কতক্ষণ ধরে দেশবিদেশের পলিটিকস্ এবং আরও কত কি আলোচনা চলল, সে আর এল না, যোগও দিল না। সমাজ রাষ্ট্র সম্বন্ধে তখন উৎসাহ ছিল না, ব্যক্তিগত সংবাদটা-আসটার জন্য কৌতূহল ছিল। বৃদ্ধ সে ধার দিয়েও গেলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "এখন তবে উঠি?"

বৃদ্ধও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "উঠলেন? কাজেই। মাঝে মাঝে আসবেন। এখানে কারও সঙ্গে—তা ছাড়া আপনিই ঘরের পাশের প্রতিবেশী।"

"বটেই ত। নিশ্চয়ই আসব।"

"মিনি-ওরা শীগগীরই আসচে, না?"

কখন মিনির কুয়োজল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাই নি। চলতে চলতে বললুম, "আপনি ত আপনার বন্ধুর খবর নিয়ে ব্যস্ত। সে-ও নিশ্চয়ই তার কুয়োজলের খবরের জন্য আকুল। কিন্তু আমাকে মাঝখানে রেখে খবর লেনদেনে সে গররাজী। বিশ্বাস করে না হয়ত।"

হেসে বললে, "না করবারই ত কথা। আপনাকে জানে কি না। নিজের খবরই যে রাখে না, অন্যের খবর সে দেবে কেমন করে?"

"খবর যে কত দুর্লভ, যে খোঁজে সেই জানে। মিনি তাই বোধ হয় আমাকে দয়া করেচে।"

সে খুব হেসে বললে, "তাই হবে বোধ হয়। কিন্তু আমাকে ত লেখে আপনাকে চিঠি লিখে লিখে সে নাকি হয়রান হয়ে গেছে।"

"তা-ও বটে। তার ধৈর্য্য কম, অল্পেতেই হয়রান হতে পারে। কিন্তু সে তার বেয়ানের, কুয়োজলের, সকলের খপর জানতে চায়। বেয়ানের খবর মেলে, সিগ্‌রেটের ছবি বড়জোর খরচ, কিন্তু কুয়োজলের খবর কেমন করে' মিলবে কতদিন ভাবচি, কিন্তু কিছুই মিলচে না।"

সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম। উদগ্রীব হয়ে উত্তর একটা আশা করচি এই খবর দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধে, সে বললে, "চা-টা খেলেও পারতেন, আবার বসন্ত বেচারীকে—"

"না, আমার দরকার ছিল না।"

* * *

বাড়ীর সিঁড়িতে পা দিয়ে ফিরে দেখলুম পাশের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে কুয়োজল বাবার সঙ্গে কথা বলচে—সদ্য চলে যাওয়া অতিথি-সম্বন্ধে হয়ত একটু আলোচনা চলচে। হঠাৎ মনে পড়ল কথায় কথায় মিনিদের আসবার খবরটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। কিছু একটা খবর এসেছে নিশ্চয়ই।

বসন্তকে ডেকে বললুম, "এই, চট্ করে' শুনে আয় ত ও বাড়ীর ঐ—মা-জীর কাছে বিনু-ওরা কবে আসবে, কি লিখেচে।"

বসন্ত প্রফুল্ল হয়ে বলে উঠ্‌ল, "রাঙাদিদি, মিনুমনি আসবেন ?"

"আজ্ঞে। শুনে আস্তন কবে। গর্দ্দভ কোথাকার। কবে আসবেন লিখেচে শুনে আয়।"

সে চলে গেল। বসন্ত যশোর জেলার লোক। মাঝে মাঝে নিজের বুদ্ধি খাটায়। কি বলতে কি বলবে, ডেকে ফেরালুম।

"আমি লিখে দিচ্ছি তুই জবাব নিয়ে আয়।"

ফিরে এসে বললে, "ওঁরা কিছু জানেন না।"

"জানেন না! তুই কা'কে দিয়েছিলি ?"

"কর্ত্তার কল্লে মাজীকে।"

হাসি চেপে বললুম, "তিনি কি বল্লেন ?"

"বললেন আমরা কিছু জানিনে।"

"আচ্ছা যা।"

খবর নিশ্চয়ই আস্‌চে। মিনি ও তার মা দুজনেই ওর স্পেস্যাল করেসপণ্ডেণ্ট। এমন সাফ জবাব একটুও আশা করিনি। মনে করেছিলুম জবাবটা আসবে অমুক দিন, অমুক একসপ্রেসে। সঙ্গে সঙ্গে বলা থাকবে মিনির মামাকে বলো ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে, যেন ভুলে যান না। আমার কাছে সংবাদ আসে নি, সেখানে এসেচে, তার কাছ থেকে আমাকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে—এমনি একটা উপক্রম হয়ে উঠেছিল। দিব্যি বোঝা যাচ্ছে সেইটে অস্বীকার ক'রতে এই সাফ জবাব।

ভিতরে ভিতরে যতটা এগিয়ে যাওয়া গেছে বাইরেটা কিছুতেই তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। কেবলি পিছিয়ে পড়ছে। অগত্যা চাঁদ উঠে হু হু করে মাঝ গগনে এসে পড়েচে, কিন্তু এখনও ধরণীর বুকে আলো ছড়াতে পারলে না—মাঝখানে ঘোলাটে মেঘের আবরণ। একটুখানি হাওয়ার প্রতীক্ষা, কিন্তু দেবতা কিছুতেই অনুকূল নয়।

এগিয়ে চলতে হবে। যে ফাঁকা গর্ব্ব এতদিন শূন্য বুক মিথ্যা দিয়ে ভরে রেখেছিল, তার ওপরই ত কারখানা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। সেই অন্ধকারে যে স্নিগ্ধ আলোটি জ্বলে উঠেচে তাকে বরণ করতে দুনিয়ার হাজার রকমের দ্বিধাসঙ্কোচ এখনও কেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলেচে ? সেই গর্ব্বের রেশ এখনও বুঝি ঝিমিয়ে আছে। দুনিয়ার হাটে কাড়াকাড়ি করে' হাত পেকেচে। বিশ্বের যেখানে ভিক্ষা মেগে অন্ন গ্রহণ করতে হয় সেখানে সে আনাড়ি।

পশ্চিম আকাশে তখনও রাঙা আলোর আভাস অস্পষ্ট সুখ-স্বপ্নের মত ছড়িয়ে। দিনের কাজ কিছুক্ষণ হ'ল সেদিনের মত ছুটি মেগে নিয়েচে। রাস্তার ধারে পুলের উপরে কোন্ দূরের যাত্রী সঙ্গিনীর সঙ্গে জিরিয়ে নিচ্ছে। ম্যুনিসিপালিটির জলের গাড়ী মন্থর গমনে রাস্তার ধূলোর উপরে তার জলধারার লেজ বুলিয়ে চলেচে। রাস্তার ওধারের সরকারী পুকুরটার বুকে অনেক নীচের আকাশের খানিকটে ছায়া যেন তার অজ্ঞাতে সেখানে গিয়ে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে আছে। এই শান্ত গোধূলিটি প্রকৃতির কড়া শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে যেন গা ছেড়ে দিয়েচে।

হঠাৎ মনে হ'ল বিনুকে দরকার, মিনিকে চাই। তার করলুম। আব্দুল গাড়ি নিয়ে তার করতে ছুটল।

* * * *

তখন আকাশে রংয়ের খেলা শেষ হয়ে গেছে। আধো আলো আধো আঁধারে একটা একটা করে তারা উঠছে।

বাংলোর হাতায় পায়চারী করতে করতে দেবদারু গাছ বেয়ে আঁধার নামল।

গেট পেরিয়ে সোজা পথে পেছন দিকের পলাশতলা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখি সামনেই কুমোজল। সন্ধ্যের প্রদীপ হাতে তুলসী বেদীর দিকে চলেচে—আলো দিতে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। আলোসমেত হাত কপালে তুলে নমস্কার করে' বললে, "আসুন।"

আমিও জোড়হাতে নমস্কার করে' বললুম, "আমার হাত শূন্য, তুলে ধরবার মত আলো নেই।"

একটুখানি হাসিতে তার জবাব দিয়ে বললে, "একটু দাঁড়ান, প্রদীপটে দেখিয়ে আসি।" বলে' মঞ্চের উপর সলতেটা রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে হেঁট হয়ে কোনও রকমে প্রণামটা সারতেই বললুম "ভাল করে প্রণাম করুন, আমার হ'য়ে। আজ আপনার দেবতার কাছে আমার দরবার আছে। দেবতার আনুকূল্য ভিন্ন আমার ভিতরের সঙ্গে বাইরের মিলের উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুভক্ষণে এসে পড়েচি। নিজের পুণ্যের জোর নেই। আপনার পুণ্যফলে আমি বর নেব।"

সে হঠাৎ কোনও জবাব খুঁজে পেলে না যেন। অন্যমনে প্রদীপটা একটু এগিয়ে দিয়ে বল্লে, "আমারও কোনও পুণ্যফল নেই।" পরক্ষণেই হেসে বল্লে, "দেবতার আনুকূল্যেরও অবশ্য দরকার পড়েনি।"

বারান্দা থেকে মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে বললে, "বসুন। বাবা মাঠের দিকে বেড়াতে গেছেন, এলেন বলে। একটু চা ক'রব? না, দরকার নেই?"

"আপনার হাত থেকে যা-কিছু পাই সবেতেই আমার দরকার। কিন্তু চা চাই নে। চায়ের আড়ালে যে পালাবেন সে সুযোগ দেব না।"

আর একটা মোড়ার উপর বসে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "লাটুর মা, একটু চা করে' দাও ত?"

ঘরের থেকে লাটুর মা বললে, "দিচ্ছি।" দরজার ধারে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরবাড়ী থেকে যে প্রসাদ এসেছিল—দেব?"

কুয়োজল আমার দিকে চাইলে। ঘাড় নেড়ে জানালুম, "না।"

দরজার দিকে চেয়ে লাটুর মাকে বললে, "থাক্। শুধু চা-ই দাও।"

গলা নামিয়ে বল্লে, "প্রসাদে অভক্তি দেখালে দেবতা বুঝি প্রসন্ন হন?"

"তা হবে। আমি ত আমার যোগ্যতার ওপর নির্ভর করছি নে, তোমার দয়ার ওপর। তোমার পুণ্যফলে ভাগ বসাব।"

অশথ্ গাছের ফাঁক দিয়ে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠল। সন্ধ্যার আধছায়া রাতের কোলে মিলিয়ে গেছে। মাঠের পারে শালবনে যেখানে রাত্রি ঘন হয়ে উঠেছে সেইদিকে চেয়ে কুয়োজল চুপ। একটা সহজ গাম্ভীর্য্য আমার কথার পথ আগলে দাঁড়াল। রুদ্ধশ্বাসে জবাব প্রত্যাশা করছি, কুয়োজল বললে, "বাবার আজ দেরি হচ্ছে।"

"ব্যস্ত বোধ কর ত আলো দিয়ে লোক পাঠিয়ে দি।"

"দরকার নেই। এক্ষুণি এসে পড়বেন।"

"বিনুকে তার করেচি আসবার জন্যে।"

চমকে জিজ্ঞাসা করলে, "তার? তার কল্লেন কেন?"

"তখন মনে হয়েছিল তাকে ভারি দরকার।" একটু হেসে বললাম, "তোমার বন্ধুকেও বটে।" হাস্‌লে।

রাত অলক্ষ্যে এগিয়ে চলল। সামনের দিকে চেয়ে কুয়োজল বললে, "ঐ যে উঁচু ঢিবিটা ওরই ওধারে কোণে আপনার কারখানাটা। না?"

"হাঁ। যাবে দেখতে?"

"কেন?"

"চল দেখ্‌বে। কাল?"

আস্তে আস্তে বল্লে, "গেলেও হয়। দেখে আসা যায় কি এমন বস্তুটা যা আপনাকে এমন বদলে দিলে। কিন্তু মেলা মানুষ-জন সেখানে।"

"না, মানুষ-জন থাক্‌বে না, রাত্রে। সেটা আমার আগেকার আমির কবর। আমার আত্মার উদ্ধার করতে যে এঞ্জেল সেখানে আস্‌বে তার আবির্ভাব হবে সকলের

অলক্ষিতে, রাত্রে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়। আমি ত সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আমার সকল হার মেনে নিয়েচি।" বলে' হাত বাড়িয়ে তার ডান হাতের দুটা আঙুলের আগা ধরলুম।

ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলে একটু পরে বললে, "কিন্তু তেমন শুভ রূপ যদি তার না হয়।"

"যেমন রূপই তার হোক, আমার ভাগ্যে সে অপরূপ হয়ে আসবে। তার আসাটাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চাইছি কতদিন ধরে'।"

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "এই যে বাবা এসেচেন।"

তাঁকে প্রণাম করে' বললুম, "আপনি এসে পড়েচেন। উনি ব্যস্ত হচ্ছিলেন দেরি দেখে।"

আমার প্রণামে হয়ত একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। একটু পরে প্রতিনমস্কার করে' বললেন, "দেরি হয়েচে নাকি মা?"

"একটু হয়েচে বই কি, কিন্তু আমি ব্যস্ত হইনি। উনিই আলো পাঠাতে চাইছিলেন।"

* * * *

ভোর বেলায় জানালায় দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখলুম। আমার হৃদয়-আকাশ রাঙা করে চোখের সাম্‌নে সূর্য্য উঠল। পৃথিবীর বুকে আলোর রেখায় আনন্দের বাণী লিখিত হ'ল।

দূরে কারখানার চোঙ দেখা গেল—আগাটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, মনে হতে লাগল, ওটা যেন আমাকে কেমন একভাবে ব্যঙ্গ করছে। মনে মনে বললুম, তোমার ঐ অভ্রভেদী ব্যঙ্গের নীচে আমার জীবনসত্যের বোধন প্রতিষ্ঠা ক'রব আজকের সন্ধ্যায়।

কিছুক্ষণ বাদে বা'রে আসতেই দেখি কুয়োজল হেঁট হয়ে বেড়ার ধারে তার কোন্ সখের গাছে জল দিচ্ছে, পরনের সাড়ীর পাতলা চাঁপার রং সকালের আলোর সঙ্গে মিশে গেছে। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, কোণটা বাঁ-হাতে ধরা।

তার সিক্ত হাতটা আমার রুমালে মুছে দিয়ে বললুম, "চল, তোমার বাবার কাছে।"

চলতে চল্‌তে আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌ল "কেন?"

"আমার দরকারী কথা আছে তাঁর সঙ্গে।"

"কি কথা?"

"সেখানেই শুনবে।"

চমকে দাঁড়িয়ে হাতটা টেনে থামিয়ে দিয়ে সেই হাতের আড়ালে মুখ নিয়ে বললে, "না, আজকে কোনও কথা নেই। এই একটা দিন কোনো কথা না বলে কি চলে না?"

হেসে বললুম, "বেশ। আজকে থাক্। কথা রইল আমার মনে মনে, কেবল তুমি মনে মনে তা শুনবে আজ সারাদিন। তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করে তা দেখো, তেমনি ভাবে শুনো; আমি কিছু বলব না।"

পঞ্চশস্য

অতিকায় ক্রেন—

সম্প্রতি পোর্টল্যাণ্ড সহরের একটি প্রকাণ্ড জাহাজকে নদীতে একটি অতিকায় ক্রেনের সাহায্যে ভাসান হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে

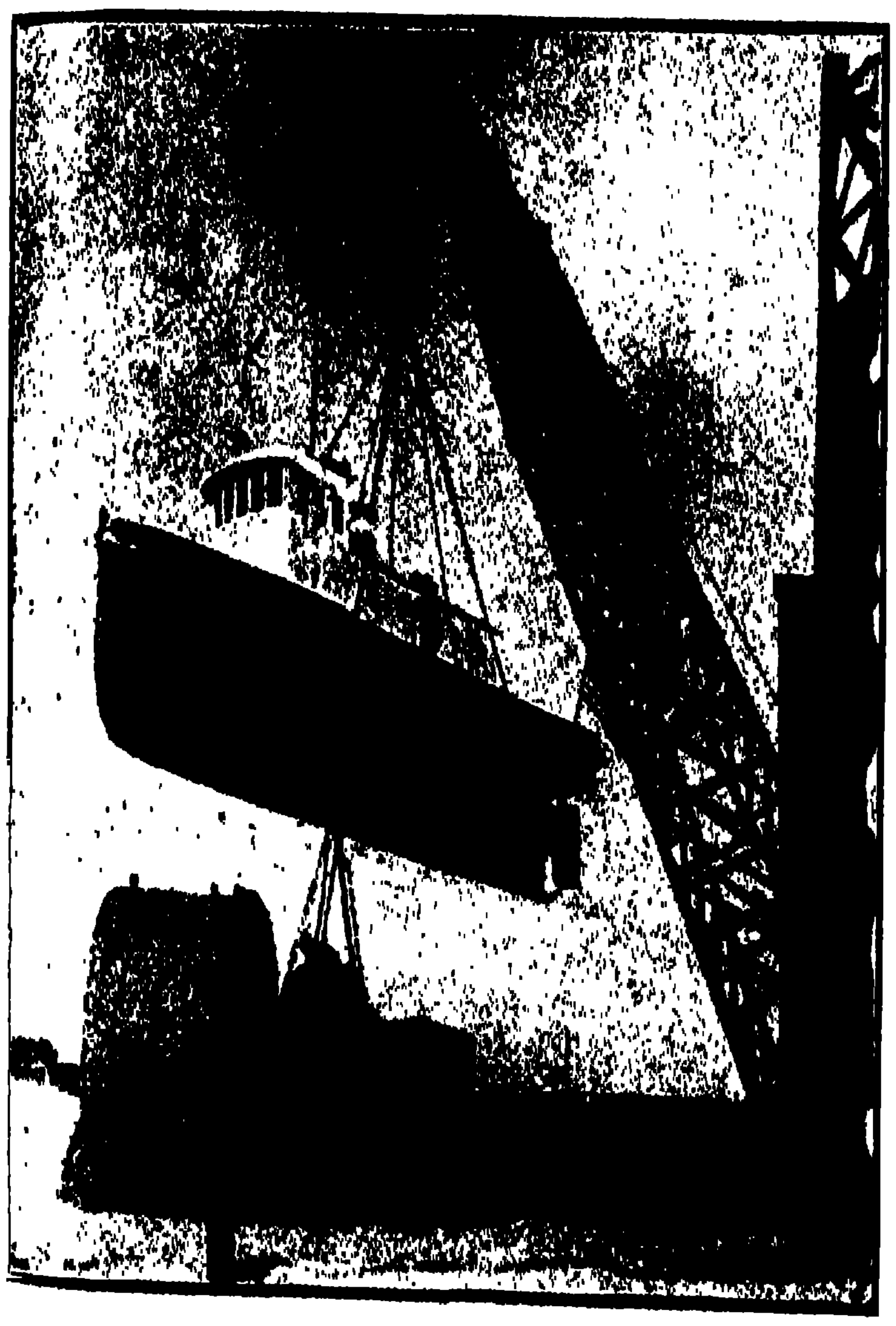

অতিকায় ক্রেন

হাজ তৈয়ার হইয়া গেলে পর বিশেষভাবে তৈয়ারি পথের উপর য়া টানিয়া বা ঠেলিয়া তাহাকে জলে ভাসান হইত।

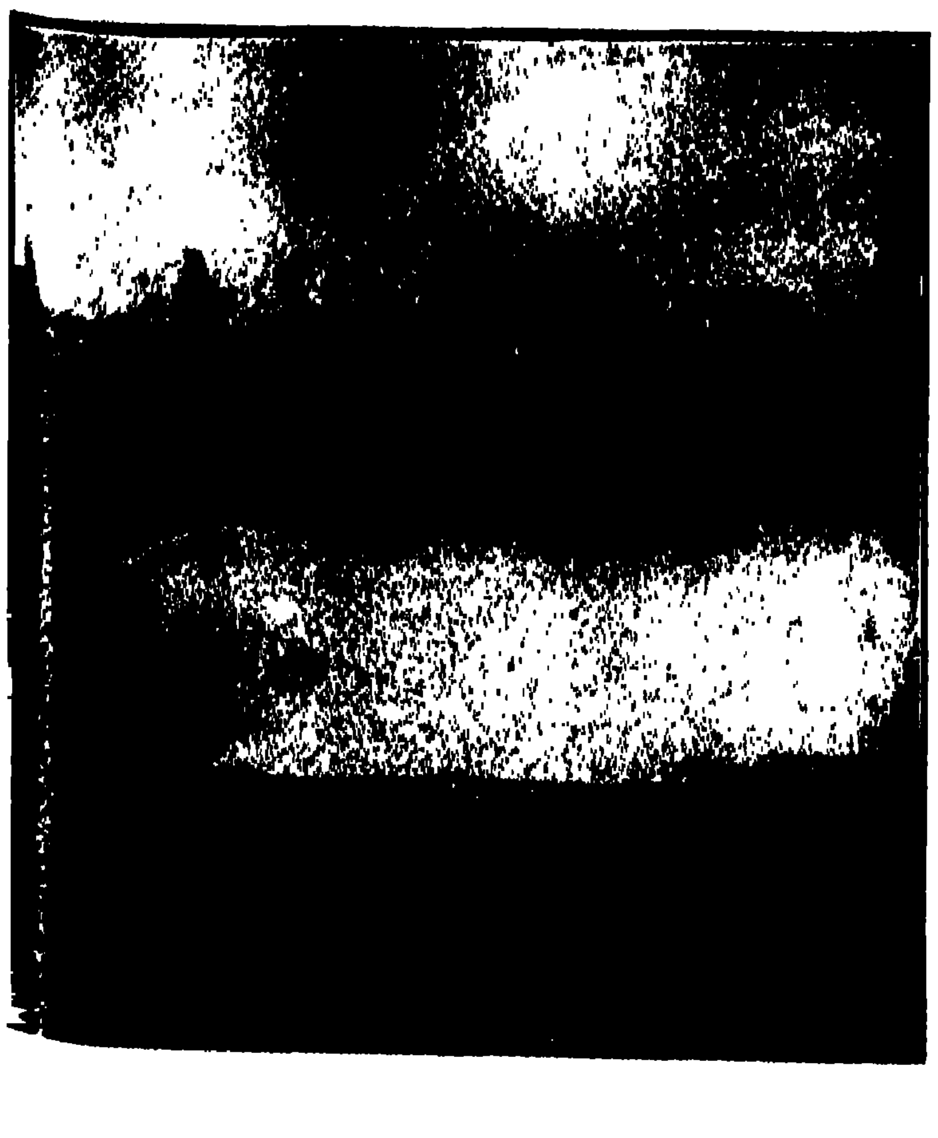

অভিনব অতিবেগশালী মোটর-বোট—

কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্লোরিডাতে মোটর-বোট দৌড় হয়। এই দৌড়ে একটি অতি অভিনব মোটর-বোট প্রথম স্থান অধিকার করে। এই মোটর-বোটের গড়ন অতি বিস্ময়কর। (ছবিতে দেখুন)। বোট চলিবার সময় মাঝে মাঝে ডিগবাজী খায় কিন্তু তাহাতে নৌকা-চালকের কোনো রকম অসুবিধা হয় নাই। নৌকার ভিতর জলও বিন্দুমাত্র প্রবেশ করে নাই।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে অদ্ভুতভাবে রক্ষা পাওয়া—

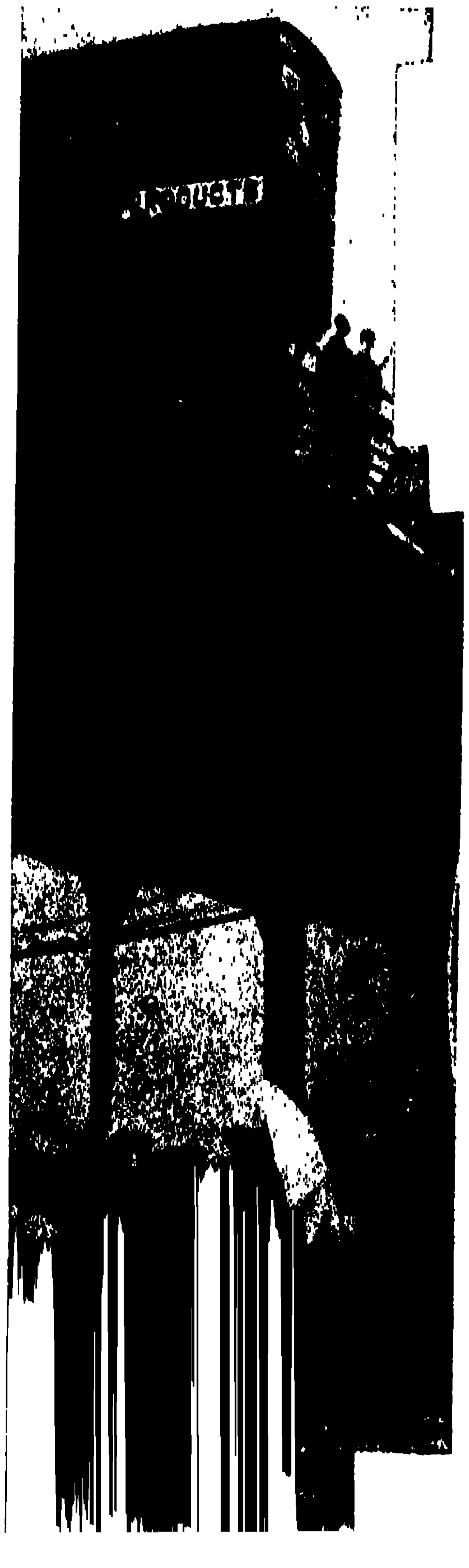

(১) পাশের ছবিতে দেখুন মোটর লরিখানি পুল ছাড়াইয়া প্রায় বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র লোহার রেলিংএ কোনো প্রকারে আটকাইয়া আছে। এরকম ভাবে গাড়ী রক্ষা পাইতে সচরাচর দেখা যায় না।

(২) আর একখানি গাড়ী দেখুন—এই লরিখানিও নদীর উপর পথ ছাড়াইয়া প্রায় শূন্যে ঝুলিয়েছে। এই লরিখানি বাঁচিবার কারণ—লরির পিচনদিকে কয়েক বস্তা বালি বোঝাই করা ছিল। বালি না থাকিলে লরিখানি একেবারে জলে গিয়া পড়িত এবং ড্রাইভার ও তাহার সহচর প্রাণ হারাইত।

বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষের কঙ্কাল—

সম্প্রতি নেব্রাস্কাতে একজন বৈজ্ঞানিক একটি অধুনালুপ্ত জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জন্তু নাকি ১০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে মাঠে চরিয়া বেড়াইত। কঙ্কালটি লম্বায় চার ফুট। ইহাদের খুব ধারাল ছোরার মত দাঁত ছিল। এই জীব হইতেই নাকি বিড়াল জাতীয় জন্তুদের জন্ম হইয়াছে।

বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষের কঙ্কাল

(৩) তৃতীয় চিত্রে দেখুন—লরিখানি পথের ধারের পাথরের দেওয়াল ভাঙিয়া প্রায় নীচের খাদে পড়িবার মত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ইহার পিছনের চাকা ভাঙা পাথর, চূণ, বালি ইত্যাদিতে আটকাইয়া যাওয়ায় লরিখানি কোনো রকমে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গিয়াছে।

৫২৩ ফুলওয়ালা চন্দ্রমল্লিকার গাছ—

টোকিও শহরের হিহিয়া উদ্যানে একটি অতি অদ্ভুত চন্দ্রমল্লিকার গাছ দেখান হয়। এই একটি গাছে মোট ৫২৩টি ফুল ফুটিয়াছে।

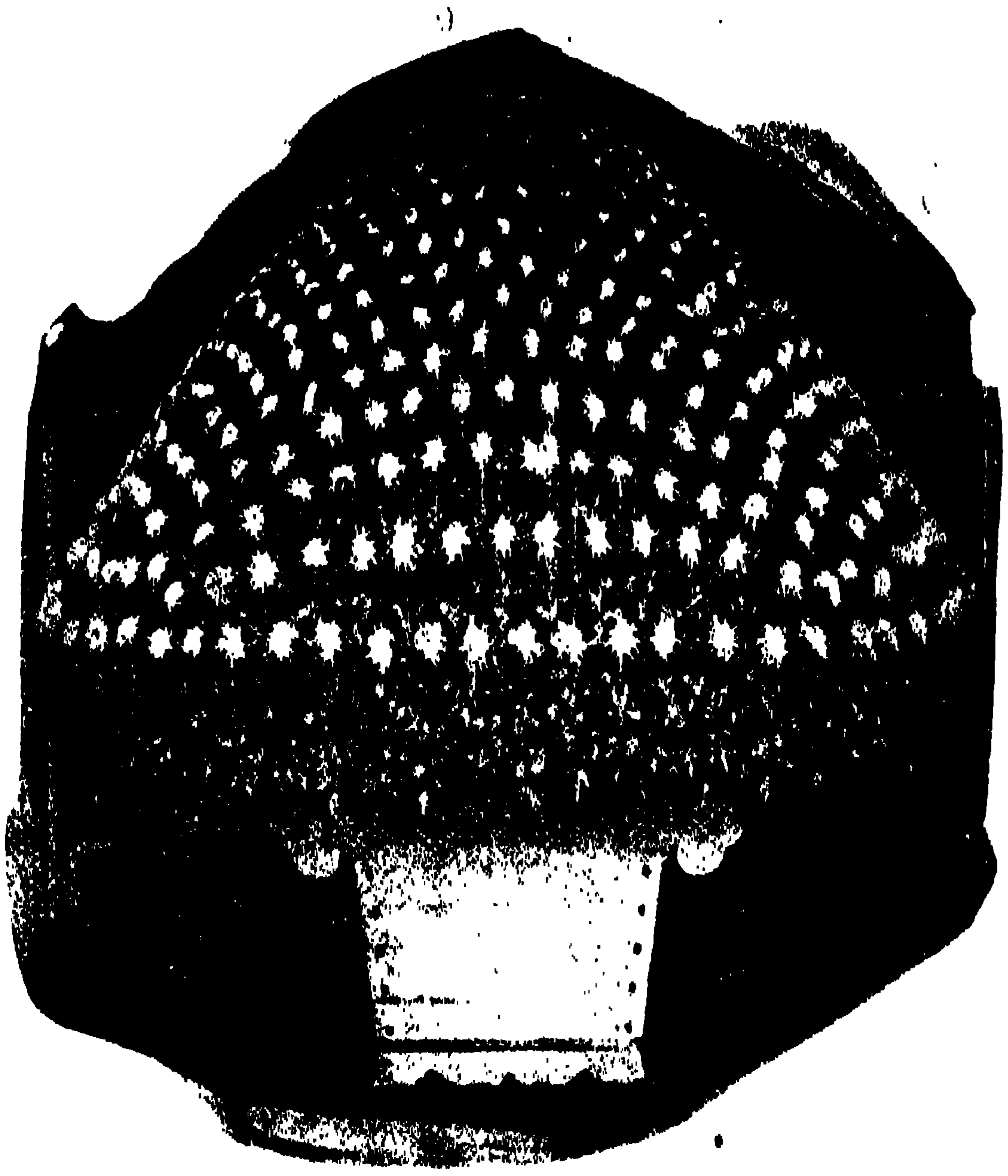

৫২৩ ফুলওয়ালা চন্দ্রমল্লিকার গাছ

ফুলগুলিকে বাঁশের ঠেকা দিয়া সোজা করিয়া রাখা হইয়াছে। এত ফুলওয়ালা চন্দ্রমল্লিকার গাছ এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় নাই।

—

ঝড়ের ফলে তিমির অবস্থা—

আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে একবার অতি বিষম ঝড় এবং বৃষ্টি হয়। এই ঝড়ের ফলে বহুসংখ্যক তিমি মাছ জলে থাকিতে না পারিয়া ডাঙ্গায় আসিয়া পড়ে। কিন্তু ঝড় আসিবার পর তাহারা জলে ফিরিবার

পূর্ব্বেই মারা যায়। সমুদ্রতীর পরিষ্কার করিবার জন্ত বিশেষ একদল লোক নিযুক্ত করিতে হয়।

—

সুটকেসে বাইসাইকেল—

নূতন একপ্রকার বাইসাইকেল বাজারে আসিয়াছে। দরকারমত এই সাইকেল খুলিয়া পাট করিয়া একটি সুটকেসে প্যাক করা যায়।

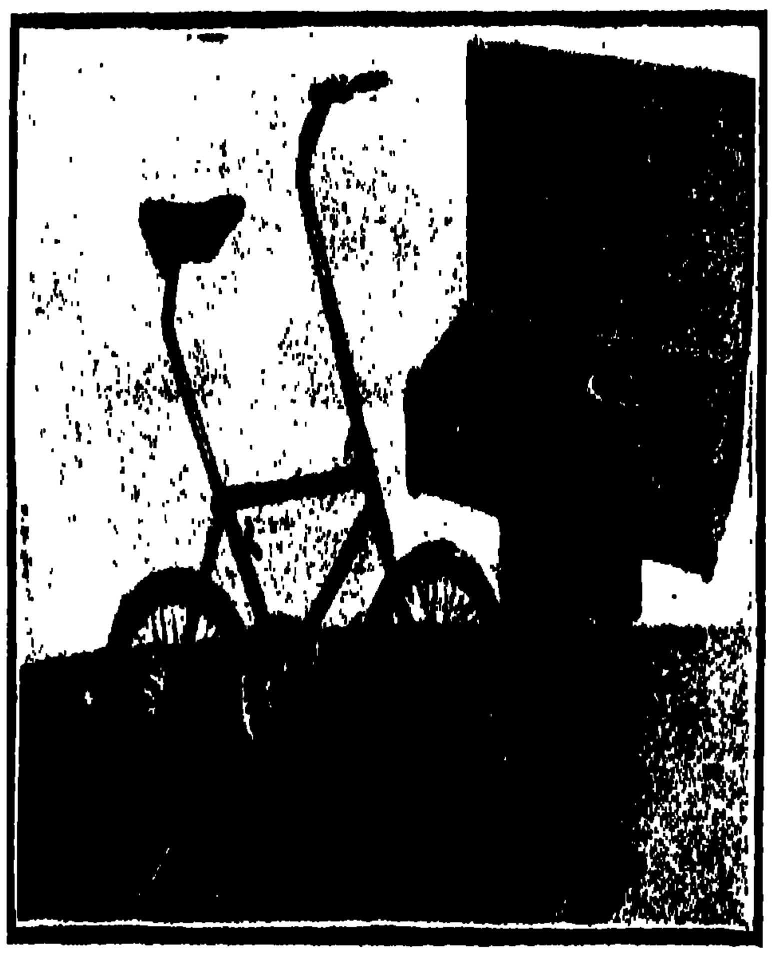

বিচিত্র বাইসাইকেল

আবার প্রয়োজন হইলে খুলিয়া ফিট করিয়া সাইকেল চড়া যায়। সাইকেলটি ঘণ্টায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে। একজন বেশ মোটা লোকও এই সাইকেল চড়িয়া বেশ আরামে যাইতে পারে।

খেয়ালীর বাড়ী—

একজন জাহাজের কাপ্তান কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের থাকিবার জন্য সমুদ্রের ধারে ছোট পাহাড়ের উপর একটি বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় বাড়ীতে ঢুকিতে

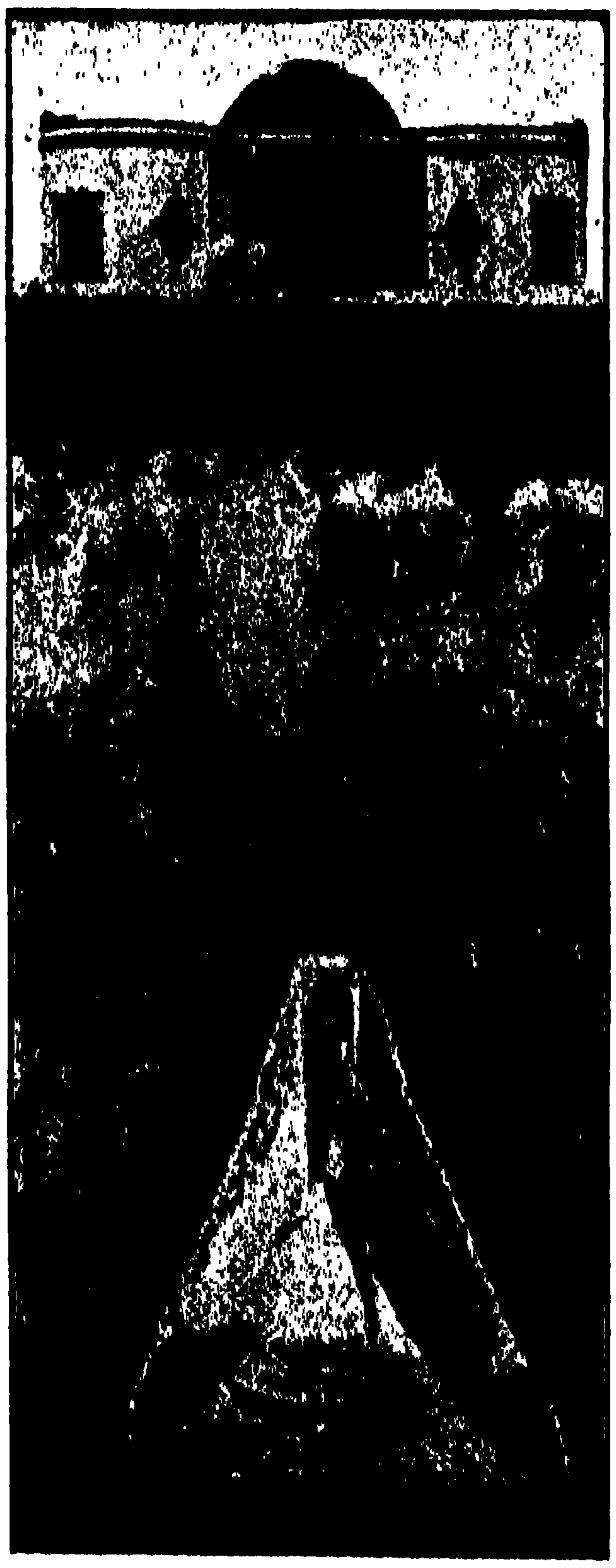

খেয়ালীর বাড়ী

হইলে পাহাড়ের গা দিয়া উঠিতে হইবে কিন্তু কাছে আসিলে দেখা যায় যে, বাড়ীর প্রায় ৩৫ ফুট নীচে পাহাড়ের গায়ে একটি সুড়ঙ্গ আছে। এই সুড়ঙ্গ দিয়া পাহাড়ের উপরের বাড়ীতে উঠা যায়। বাড়ীখানিও ঠিক একটি জাহাজের মডেলে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে জাহাজ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

—

বিচিত্র গির্জ্জা—

ডেনমার্কে একটি অতি বিচিত্র গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। গির্জ্জাটি দেখিতে 'পাইপ-অর্গ্যানে'র মত। এই বিচিত্র গির্জ্জাটি ৫৬ বৎসর

বিচিত্র গির্জ্জা

পূর্ব্বে মৃত একজন বিখ্যাত পাদরীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

সম্পাদকের চিঠি

পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে সেখানে যাইতে হইবে এইরূপ স্থির হয়। তদনুসারে আমি ২৭শে বৈশাখ রাত্রের ট্রেনে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে তথায় পৌঁছি। সেখানে শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ সরকার মহাশয়ের বাটীতে আরামে ছিলাম। তিনি নিজের অনেক সময় নষ্ট করিয়া নানা প্রকারে আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরুলিয়া মানভূম জেলার প্রধান শহর। মানভূম অনেক বৎসর হইতে ছোটনাগপুরের সামিল হইয়া আছে। এখন ছোটনাগপুর বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত। কিন্তু শাসক জাতির খেয়াল, সুবিধা ও স্বার্থ অনুসারে মানভূম যে প্রদেশের সহিতই যুক্ত হউক, উহা বাংলা দেশের অংশ। মানভূমের নানাস্থানে খনিতে কাজ করিবার জন্য বিস্তর অবাঙালীর আমদানী হইয়াছে; ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রেও এরূপ লোক অনেক আসিয়াছে। তথাপি এখনও মানভূম জেলার শতকরা ৬৭জন বাংলাভাষী; হিন্দীভাষী ১৮জন; বাকী ১৫জন প্রধানতঃ বিবিধ মুণ্ডাভাষায় কথা বলে। বাংলাভাষীর সংখ্যা যাহাতে আরও না কমিয়া যায়, তাহার চেষ্টা নানাদিক দিয়া করা যায়। বাঙালীদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে তাহাদের স্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হইবে। বাঙালীরা শ্রমিক ও বাণিজ্যিক কার্য্যক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে অগ্রসর হইলে অবাঙালীর আমদানী কম হইবে। এই-সব কার্য্যক্ষেত্র হইতে বাঙালীদের অপসারণের কারণ ইহা নহে, যে, তাহারা বুদ্ধিহীন, কিংবা অন্য ভারতীয় জাতিদের চেয়ে তাহাদের বুদ্ধি কম। কারণ অন্য নানা প্রকার। প্রধান একটা কারণ, চাকরী ও ওকালতীর দিকে বাঙালীদের অতিরিক্ত ঝোঁক। কিন্তু চাকুরো ও আইন-জীবীদের গড় আয় ব্যবসাদারদের গড় আয় অপেক্ষা কম, এবং চাকুরো ও আইনজীবীদের সর্ব্বোচ্চ আয় বণিকদের সর্ব্বোচ্চ আয়ের চেয়ে কম। সুতরাং অর্থোপার্জ্জন হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। তা ছাড়া, স্বাধীনতার কথা ধরিলে, চাকরোদের স্বাধীনতা খু্ব কম, এবং সমান-দরের উকীল ও ব্যবসাদারের মধ্যে ব্যবসাদারের স্বাধীনতা কম, ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। বণিকের সম্মানও কম নয়। আজকালকার ব্যবস্থাপক সভায় অনেক বণিক সভ্য অন্য সভ্যদের চেয়ে কম শক্তির পরিচয় দেন না। অবশ্য, ইহা ঠিক্ বটে, যে, বাণিজ্যে ব্যবসাবুদ্ধির দরকার, অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিবার এবং দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইবার সাহস থাকা চাই, এবং অবিলাসী, মিতব্যয়ী, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এসব গুণের অধিকারী হওয়া বাঙালীর সাধ্যাতীত নহে। আমরা এই-সব গুণের অধিকারী না হইলে আমাদের সংখ্যা-হ্রাস ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মানভূমে বাংলা-ভাষীর সংখ্যা বাড়াইবার আর এক উপায়, যাহাদের ভাষা সমৃদ্ধ নহে এবং যাহাদের সাহিত্য বলিতে বিশেষ কিছু নাই, তাহাদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার। মানভূমে আদিম নিবাসী এরূপ দুই লক্ষের উপর অধিবাসী আছে। তাহাদের মাতৃভাষা বাংলা না হইলেও অনেকেই বাংলা বুঝে ও বলিতে পারে। অনেকের মাতৃভাষাও বাংলা হইয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিলে সমুদয় আদিম নিবাসীকে বাংলা বহি পড়িয়া উপকৃত হইবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরের উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টিরও উল্লেখ করিয়াছিলাম।

পুরুলিয়ার সাহিত্য-মন্দিরটির নাম রাখা হইয়াছে শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ মহাশয়ের নাম অনুসারে। তিনি ইহা নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকাদির ব্যয় সমেত উৎসবের ব্যয়ও প্রধানতঃ (বা সমস্ত?) তিনি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পুরুলিয়ায় থাকিতে শুনিয়াছিলাম, উৎসবের কয়েক দিন মফঃস্বল হইতে আগত দুই তিন শত লোক তাঁহার বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন। সাহিত্য-মন্দির ছাড়া পুরুলিয়ায় তাঁহার অন্য কীর্ত্তিও আছে। অথচ তাঁহাকে ধনী লোক

বলিলে ঠিক্ বলা হইবে না। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে ত সে সন্দেহ হইবেই না। কিন্তু মানুষটির হৃদয় বড়, নজর বড়।

উৎসব উপলক্ষ্যে অন্য কাহারও কাহারও এবং আমার বক্তৃতা হইয়াছিল। বালকদের বক্তৃতার ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতা এবং চরকায় সূতা কাটিবার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। সব প্রতিযোগিতাতেই পুরস্কার ছিল। চরকা প্রতিযোগিতায় অনেক বালিকাকে দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাই নাই। বালকেরা ও পুরুষেরা অবসর সময়ে সূতা কাটেন, ভালই; কিন্তু ইহা আগে বিশেষ করিয়া মেয়েদের কাজ ছিল। এখন কি তাঁহারা অবসরশূন্য হইয়াছেন? না, তাঁহাদের অবসর অধিকতর রোজগারের কাজে যাপিত হয়?

একটি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার নূতন রকমের মনে হইয়াছিল। এইরূপ স্থির হয়, যে, যে-সব বালকবালিকা প্রত্যেকে দশজন বালকবালিকাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দিবে, তাহাদিগকে একটি করিয়া স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে। অনেকগুলি বালক তাহা করিয়া স্বর্ণপদক পাইল। দুটি বালিকা উভয়ে মিলিয়া একত্র চৌদ্দ জনকে শিখাইয়াছিল। তাহারা একটি করিয়া রৌপ্যপদক পাইল। তাহাদিগকেও স্বর্ণপদক দিলে মন্দ হইত না। যাহারা স্বর্ণপদক পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটি ছেলের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। ছেলেটি চাষী "মাহাত" জাতীয়। মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পায়, তাহাতে তাহার ও তাহার মাতার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হয়। স্কুলে ক্লাসের পরীক্ষায় সে প্রথমস্থানীয়। স্কুল হইতে তাহার বাড়ী চারি মাইল দূরে। প্রত্যহ আট মাইল যাতায়াত করিয়া সে লেখাপড়া শিখে। নিজে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিয়া তাহার ধুতি ও পিরান সে পরে। গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য আত্মনির্ভরশীল লোকদের স্বহস্তে কূপখনন করা কর্ত্তব্য, স্কুলে শিক্ষকের মুখে এই উপদেশ শুনিয়া ছেলেটি স্বয়ং কয়েক হাত কূয়া কাটিয়াছে। আরও কিছু গভীর করিলে জল পাওয়া যাইবে।

অনেক বালক ও যুবক নানা প্রকার ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং জুজুৎসু দেখাইয়াছিল। একটি বালিকা "মুক্তির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত আচারিয়ার সহিত দক্ষতা-সহকারে ছোরা-খেলার কসরৎ দেখাইল। শ্রীযুক্ত জীমূত-বাহন সেন ব্যায়ামে বিশেষ পটু বলিষ্ঠ একটি যুবককে দেখাইয়া বলিলেন, ছেলেটি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এইরূপই হওয়া চাই।

বিবাহে পণ আদায় প্রথা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য দুটি পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। তাহা উৎসবের মধ্যে একদিন দেওয়া হইল।

উৎসবের তৃতীয় দিনে অপরাহ্ণে যে সভা ও বক্তৃতাদি হইবার কথা ছিল, খুব ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় তাহা হইল না। সেইজন্য তাহার পরদিন ৩:শে বৈশাখ বিকালে ও রাত্রে, দু-দিনের কাজ একসঙ্গে করিতে হইল। কাজ বেলা ৫টার সময় আরম্ভ হইয়া আনুমানিক রাত্রি দশটায় শেষ হয়। প্রথমে জুবিলি টাউনহলের হাতায় সাহিত্য-মন্দির সম্পর্কীয় সভা হইল। তাহার অন্যান্য কাজ সমাপনান্তে বক্তৃতা করিলাম। তাহার পর ঐখানেই আর একটি সভায় স্থানীয় হিন্দুসভা অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন। এখানকার হিন্দুসভার প্রধান কর্ম্মী স্বামী শঙ্করানন্দ। টাকাকড়ির সচ্ছলতা না থাকায় এবং অন্যান্য কারণে তিনি ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতে পারেন না। তথাপি অনেক কাজ হইতেছে। অহিন্দুকে হিন্দুত্বে দীক্ষাদান, অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য সংগঠনমূলক কার্য্য, উন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের চেষ্টা, প্রভৃতি হইতেছে, এবং তাহাতে কিছু ফললাভও হইতেছে। ইহা ছাড়া এখানকার হিন্দুসভা একটি সাধারণ বালক-বিদ্যালয়, একটি সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের জন্য অভিপ্রেত বালক-বালিকাগণের একটি মিশ্র বিদ্যালয়, এবং একটি নৈশ বিদ্যালয় চালাইয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় ও অন্য স্থানের হিন্দুসমাজ হইতে অর্থ-সাহায্য পাইবার যোগ্য। হিন্দুসভার অভিনন্দনের উত্তরে আমি একটি বক্তৃতা করিলাম।

তাহার পর এই স্থানেই একটি রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে আমি "স্বরাজের

আবশ্যকতা ও তাহার যোগ্যতা” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলাম। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে তিনটি সভার কার্য্য সম্পাদন ও তাহাতে তিনটি বক্তৃতা করিয়া সাহিত্য-মন্দিরের প্রাঙ্গণে ব্যায়াম লাঠিখেলা প্রভৃতি দেখিতে গেলাম। সেখানেও কিছু বলিতে হইয়াছিল। পুরুলিয়ার সকল সভাতেই অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক সভাতে শ্রোতার সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

যে-দিন এইরূপ বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত চারিটি সভা হইল, সেইদিনই আগে খুব ভোরে (তখনও রাস্তায় মিউনিসিপালিটীর আলো জ্বলিতেছিল) মোটর-যোগে ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী লৌলাড়া নামক গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমার ভাগিনেয়দের বাস; তাহারা আমাকে লইয়া গিয়াছিল। মানভূম জেলার পাকা রাস্তাগুলি বেশ ভাল। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে কয়েকটি শিলাপট্ট খাড়া পোঁতা রহিয়াছে দেখিলাম। তাহাতে অনেকগুলি মূর্ত্তি খোদিত আছে। দেখিয়া প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি মনে হইল। মানভূম জেলায় নানা স্থানে জৈনধর্ম্মের এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রাম-বৃদ্ধেরা বলিলেন, লৌলাড়ার নিকটবর্ত্তী পাতবিড়রা গ্রামে কয়েকটি ভগ্ন মন্দির আছে, এবং একটি খুব বড় কালপাথরের মূর্ত্তি আছে যাহাকে লোকেরা এখন ভৈরব বলিয়া পূজা করে; সেখানে পাঁঠা বলিও হয়। তাহা তিন চারি মাইল দূরে। মাঠের ও জঙ্গলের পথ দিয়া মোটরে সেখানে গেলাম। একটা উঁচু ঢিবির উপর কাল পাথরের তিনটি মন্দির নিতান্ত ভগ্নদশায় রহিয়াছে। উহার পাথরগুলি কোন প্রকার মশলা দিয়া গাঁথা নহে। হেমাদ্রিপন্থ নামক যে প্রাচীন স্থাপত্য-রীতিতে বিনা মশলায় পাথর সাজাইয়া মন্দির নির্ম্মিত হইত, এগুলি সেই রীতির মন্দির মনে হইল। নিকটেই একটি খড়ের ঘরে পূর্ব্বোক্ত জৈন মূর্ত্তিটি রক্ষিত আছে। উহা কাল পাথরের, উঁচুতে পাঁচ হাত (সাড়ে সাত ফুট) হইবে। সম্পূর্ণ নগ্ন জৈন মূর্ত্তি। পাদদেশে প্রাচীন অক্ষরে অল্প কিছু খোদিত আছে লণ্ঠন আনাইয়া জ্বালাইয়া দেখিলাম; কিন্তু ঐ অক্ষর আমার জানা না থাকায় পড়িতে পারিলাম না। ঐ কুটীরেই কাল পাথরের আরো কয়েকটি ছোট সুন্দর মূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি দেবীমূর্ত্তি। পূজারী বলিলেন, অন্য একটি কুঁড়ে ঘরে একটি খুব সুন্দর দেবীমূর্ত্তি ছিল, তাহার জন্য কে একজন ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা বিক্রী না করায় পরে উহা কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। লৌলাড়ায় একটি টোল আছে। তাহার অধ্যাপক মহাশয় অতি সত্বর কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া আমার প্রতি প্রীতি জানাইলেন। টোলের জন্য গ্রামবাসীরা একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। সকল টোলে কিছু হিসাব, ভূগোল এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস শিক্ষা দিলে ভাল হয়। লৌলাড়ার নিকটেই বাগদা গ্রামে একটি নিজস্ব পাকা বাড়ীতে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যাইবার সময় তাহার কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রকে বলিয়াছিলাম ফিরিবার সময় তাহা দেখিয়া যাইব। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ফিরিবার পথে হুটমুড়া গ্রামে রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের শাখা শিল্পাশ্রম দেখিলাম। এখানে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া চরকায় সূতা কাটা এবং চাষ শিখান হয়, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগীর সেবা, ঝগড়া বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়। জলসেচন করিলে যে উঁচু ডাঙ্গা জমীতেও নানা রকম ফসল হয়, তাহা শিল্পাশ্রমের কর্ম্মীরা প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন। জলসেচনের জন্য বেশ বড় একটি কূপ আছে।

পুরুলিয়ার কুষ্ঠরোগীদের জন্য যে আবাসস্থান ও চিকিৎসালয় আছে, তাহা ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বড়। পুরুলিয়ার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী মহাশয় এবং কুষ্ঠাশ্রমের বাঙালী ডাক্তার তাহা আমাকে দেখাইলেন। একজন ইংরেজ ডাক্তার আছেন, তিনি স্বয়ং কুষ্ঠরোগী। আশ্রমে রোগী পুরুষ ৩১৬, স্ত্রীলোক ৩২৪ এবং বালক-বালিকা ৫০ জন আছে। তা ছাড়া কুষ্ঠরোগীদের ৭৯ জন পুত্রকন্যাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে অতি মহৎ ও প্রয়োজনীয় কাজ সুসম্পন্ন হইতেছে। কর্তৃপক্ষ স্থানাভাবে প্রায় প্রতিদিন নূতন রোগী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের টাকাকড়ির খুব প্রয়োজন আছে। সাহায্য মিঃ এ ডোনাল্ড মিলারের নামে পুরুলিয়ায় পাঠাইতে হয়।

পুরুলিয়া শহরের রাস্তা বাঁকুড়ার চেয়ে ভাল।

ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের সদয় আহ্বানে পুরুলিয়া হইতে রাঁচী যাই। বিদ্যালয়েই অতিথিরূপে আরামে ছিলাম। ইহা

রাঁচীর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

একটি বড় বাগানের মধ্যে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি কাশিমবাজারের বদান্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের ব্যয়ে স্থাপিত। তদ্ভিন্ন তিনি মাসিক এক হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করেন। আরও অর্থের প্রয়োজন আছে। সাধারণ লেখাপড়া ভিন্ন বিদ্যালয়ে সূতাকাটা কাপড়-বোনা এবং চাষ শিক্ষা দেওয়া হয়। ত্যাগী যোগ্য শিক্ষকদের দ্বারা বালকদের শিক্ষা তত্ত্বাবধান সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয়ে পুস্তকাগার ও পাঠগৃহ আছে। ছেলেরা নিজে একটি কূয়া অনেকটা কাটিয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনেক রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগকে নানা রম্য ও দ্রষ্টব্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। রাঁচীর মধুকোম নামক স্থানে আশ্রমের আর একটি বিদ্যালয় আছে। তাহাও সুপরিচালিত।

রাঁচীতে আড়াই দিন ছিলাম। প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা ব্যতীত শহরের দুইজন মহিলা ও অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে স্বরাজের আবশ্যকতা ও তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। শ্রোতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নহে; বিশেষতঃ শহরের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন না। তাহার কারণ জানি না। রাত্রে হিনু নামক একটি পাড়ায় বাঙালী রাজকর্ম্মচারীদের লাইব্রেরী ও ক্লাবে মাতৃভাষা সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। এখানে ভদ্রমহিলা ও পুরুষদের এবং বালক-বালিকাদের বেশ ভীড় হইয়াছিল। আসিবার দিন মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তাহাদের অনুরোধে আমার ইউরোপের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলি।

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় ভারতবর্ষের একজন প্রধান নৃতত্ত্ববিৎ। নৃতত্ত্ব-বিষয়ে ইংরেজীতে ইঁহার অনেক বহি আছে, এবং ম্যান ইন ইণ্ডিয়া (ভারতের মানুষ) নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে। রাঁচীতে তাঁহার বৈঠকখানা একটি নৃতত্ত্বের মিউজিয়াম বিশেষ। তথায় রক্ষিত জিনিষগুলি কেহ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলে নৃতত্ত্বে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। আমি এই উপায়ে কিছু শিখিয়া আসিলাম।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক পরিচালিত কোঅপারেটিভ্ ষ্টোর্সে রাঁচীতে প্রস্তুত নানারকম সূতী, রেশমী ও পশমী জিনিষ দেখিয়া প্রীত হইলাম। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে নবলব্ধ জ্ঞান কৃষকদের মধ্যে বিস্তারের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া থাকেন। এখানে সরকারী কৃষিবিভাগ দ্বারা যেরূপ পরীক্ষা ও কাজ হইতেছে, তাহার কিছু কিছু সহকারী কৃষি-ডিরেক্টর মহাশয়ের সহিত ঘুরিয়া তাঁহার সৌজন্যে জানিতে পারিলাম। সরকারী গোশালার সুপুষ্ট গাভী ও বাছুরগুলি দর্শনীয়। কাঁকে নামক স্থানে মানসিকব্যাধিগ্রস্ত ভারতীয়

ও ইউরোপীয় নরনারীর বৃহৎ হাঁসপাতাল বাহির হইতে দেখিলাম। রাঁচী শহরে তাড়িতালোক ও জলের কল নাই, এখানে আছে। মোরাবাদীতে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহ ও পাহাড়ের চূড়ায় নির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দির দেখিলাম। ইহা মানুষের প্রাণশূন্য দেহ দেখার মত। তিনি যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য বাড়ীটি দিয়া গিয়াছেন, তাহাও বাহির হইতে দেখিলাম। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, ১৯০৬ সালে কলিকাতার প্রদর্শনীর সময় মতিলাল ঘোষ মহাশয় চরকায় সূতা কাটা ও তাহা হইতে হাতের তাঁতে কাপড় বুনিবার কথা তুলিয়াছিলেন। তখন বোম্বাইয়ের ঠাকরসে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

রাঁচী শহরের অনেক অংশ খৃষ্টীয় মিশনরীদের গির্জ্জা, বিদ্যালয় প্রভৃতির দ্বারা অধিকৃত। মফঃস্বলেও তাঁহাদের অনেক প্রচারকেন্দ্র আছে। তাঁহারা মুণ্ডা ওরাঁও প্রভৃতি আদিম জাতির হাজার হাজার লোককে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। ইহাদিগকে তাঁহারা সাধারণ শিক্ষা ও নানারূপ শিল্পশিক্ষা দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্য-সমাজ ও হিন্দু মহাসভার ছোটনাগপুরে এইরূপ অনেক কাজ করিবার আছে। কিন্তু বিশেষ কিছু হইতেছে বলিয়া শুনিলাম না।

রাঁচীর লোকসংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু এক একটা পাড়া পরস্পর দূরে স্থিত বলিয়া শহরটির আয়তন বড়। রাস্তা ভাল।

কয়েকটি গুজরাটী গর্‌বা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

মূল

[কথোপকথন ও পত্রোত্তরময় প্রাচীন গর্‌বা]

মেন্দী তে বাবী মালবে,
এ নো রঙ্গ গয়ো গুজরাত রে ;
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ১ ॥

"ন্‌হানা দেরীডো লাডকো,
নে কঁই লাব্যো মেন্দীনো ছোড় রে,"
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ২ ॥

"বাটী-ঘু টীনে ভরয়া বাটকা ;
ভাভী, রঙ্গো তমারা হাথ রে।"
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ৩ ॥

"হাথ রঙ্গীনে দেরী শুঁ রে করু ?—
এনো জোনারো পরদেশ রে।"—
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ৪ ॥

"লাখ টকা আলু রোকড়া,
কোঈ জাবজো দরীয়া পার রে।"—
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ৫ ॥

"শোক্যনা সাম্‌বানে জঈ এটলুঁ কেজো,—
তারী বেণী পরণে, ঘেরে আব্য রে।"—
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ৬ ॥

"বেণী পরণে, তো ভলে পরণে—
এনী জাজা দী' রোকজো জানরে।"—
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ৭ ॥

"শোক্যনা সাম্‌বানে জঈ এটলু কেজো,—
তারো ধীরো পরণে, ঘেরে আব্য রে।"
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ৮ ॥

"ধীরো পরণে, তো ভলে পরণে,
এনী জোড়রী-জোড়জো জানরে।"—
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ৯ ॥

"শোক্যনা সাম্‌বানে জঈ এটলুঁ কেজো,—
তারী মাড়ী মরে, ঘেরে আব্য রে ॥ ১০ ॥

"মাড়ী মরে, তো ভলে মরে—
এনে বালজো বোরডী হেঠরে।"
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ১১ ॥

"শোক্যনা সাম্‌বানে জই এটলুঁ কেজো,
তারী মানেতীনী উঠী আঁখরে।"—
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ১২ ॥

"হালো সপাঈও, হালো ভাঈবন্ধীও,
হবে হলকে বাঁধো হথীআর রে।"
মেন্দী রঙ্গ লাগ্যো রে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ

মেহেদী হয়েছে বোনা মালব দেশে,
গুজরাটে রঙ তার এসেছে ভেসে—
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।
"আহ্নরে দেওর, তুমি দেরীতে এলে,
এত মেহেদীর পাতা কোথায় পেলে ?"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।
"বেটে-ঘুঁটে দেখ বাটী এনেছি ভ'রে,
বৌদি, নাও না হাত রঙীন ক'রে !"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।
"মেহেদীর রাঙা রঙ যে ভালবেসে
দেখিত আমার হাতে, গেছে বিদেশে।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।
"লাখটাকা রোক আমি দিব তাহারে,
আজ যদি যায় কেহ সাগর-পারে।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।
"সতীন-পতিরে মোর বলিবে গিয়ে,
'ঘরে ফিরে এসো, তব বোনের বিয়ে'।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।
"বিয়ে যদি-হয় হোক্ ধূম করিয়া,
পার যদি 'বরিয়াতে' রেখো ধরিয়া।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।
"সতীন-পতিরে মোর বলিবে গিয়ে,
'ঘরে ফিরে এসো, ছোট ভা'য়ের বিয়ে'।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।

"বিয়ে যদি হয় হোক্ ধূম করিয়া,
যাক সে বনেদী বরযাত্রী নিয়া।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।

"সতীন-পতিরে মোর একথা বোলো,
'মরিছে জননী তব, ঘরেতে চলো'।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।

"মরেন মা যদি কেবা রাখিতে পারে।
কুলগাছ তলে যেন পুড়িও তাঁরে।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।

"সতীন-পতিরে বোলো একথা খুলে,
'কেঁদে প্রেয়সীর চোখ গিয়েছে ফুলে'।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।

"চলহ সেপাই সব, বাঁধ হাতিয়ার,
সময় হয়েছে ঘরে ফিরি এইবার।"
—লেগেছে মেহেদী রঙ, রঙ মেহেদীর।

—

(৪)

মূল

[প্রাচীন গরবা]

হুঁ তো ভূভাগা বাণবা গঙ্গৈতী রে। রাজ্জল মারবাড়ী॥
মনে ঝেরী কাঁটো বাগ্যো রে। রাজ্জল মারবাড়ী॥ ১॥
ম্হারা সসরানে তেড়াবো রে। রাজ্জল মারবাড়ী॥
ম্হারা সসরা বৈদ তেড়াবে রে। রাজ্জল মারবাড়ী॥ ২॥
নৈ জাবুঁ, কেসরীয়া লাল, কাঁটো ঝেরী ছে॥ ৩॥
মারা জেঠনে তেড়াবো রে। লাগ-ভাগ সোঁপী দউ॥
মারো জেঠ বৈদ তেড়াবে রে। রাজ্জল মারবাড়ী॥
নৈ জাবুঁ, কেসরীয়া লাল। কাঁটো ঝেরী ছে॥ ৪॥
মারী সাহ্নে তেড়াবো রে। ঘরবার সোঁপী দউ॥
মারী সাহ্ বৈদ তেড়াবে রে। রাজ্জল মারবাড়ী॥
নৈ জাউ, কেসরীয়া লাল। কাঁটো ঝেরী ছে॥৫॥
মারা শোকানে তেড়াবো রে। পরণ্যো সোঁপী দউ॥
মারা শোক্য বৈদ্য তেড়াবে রে। রাজ্জল মারবাড়ী॥
নৈ জাউ, কেশরীয়া লাল। কাঁটো ঝেরী ছে॥ ৬॥
মারা পরণ্যানে তেড়াবো রে। ছোকরাঁ সোঁপী দউ॥
মারো পরণ্যো বৈদ তেড়াবে রে। কাঁটো ঝেরী ছে॥ ৭॥
মারা পরণ্যানো বৈদ সাচো রে। কাঁটো কাঢ়্যো ছে॥
জীবী জীবী, কেসরীয়া লাল। কাঁটো কাঢ়্যো ছে॥ ৮॥
ম্হারা জেঠনে পাছা বালো রে। লাগ ভাগ মাঁগী লউ॥
জীবী জীবী, কেসরীয়া লাল। কাঁটো কাঢ়্যো ছে॥ ৯॥
ম্হারী সাহ্নে তেড়াবো রে। ঘর-বার মাকঁছে॥
জীবী জীবী, কেসরীয়া লাল। কাঁটো কাঢ়্যো ছে॥১০॥
মারী শোক্যনে তেড়াবো রে। সাম্বো পাছে লউ॥
জীবী জীবী, কেসরীয়া লাল। সারবো মারো ছে॥ ১১॥

অনুরাগ

ফুল চয়নে গিয়েছিলেম প্রাতে,
রাজ্জল মারবাড়ী।*
বিষের কাঁটা ফুট্‌ল আমার হাতে,
রাজ্জল মারবাড়ী।
শ্বশুরকে মোর ডাক আমার কাছে,
রাজ্জল মারবাড়ী।
শ্বশুর চলেন বৈদ্য যেথায় আছে,
রাজ্জল মারবাড়ী।
বৈদ্য কহে যাবো না আমি, বাবু,
কাঁটার বিষে চাহি না হ'তে কাবু।

---

* খুব সম্ভবতঃ প্রাচীন কোনও গান হইতে গৃহীত, এবং এই গানের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক শব্দ, গানের পদ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যবহৃত।

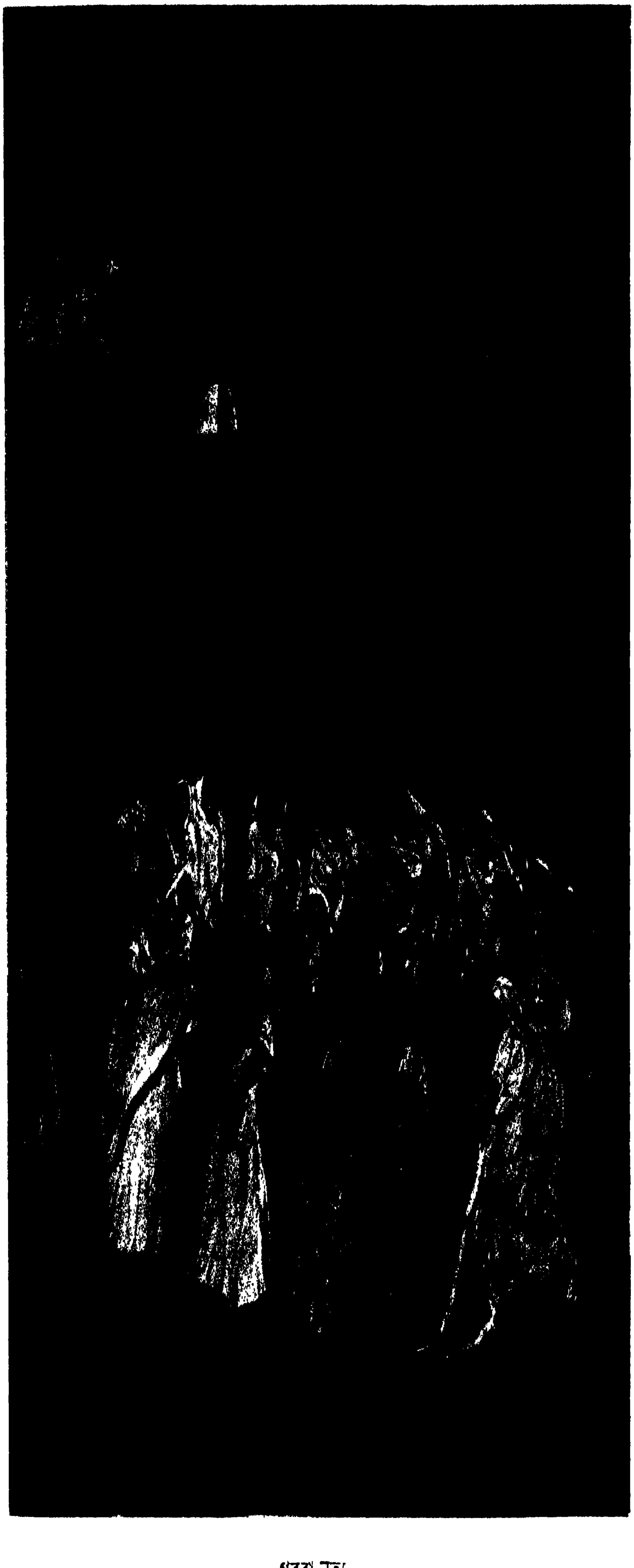

গর্‌বা নৃত্য

শ্রীকণ্ঠ দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ভাসুরে মোর ডাক আমার কাছে,
বিষয় দিব ছাড়ি,
ভাসুর চলেন বৈদ্য যেথায় আছে,
রাজল মারবাড়ী।
বৈদ্য কহে যাব না আমি, বাবু,
কাঁটার বিষে চাহি না হ'তে কাবু।

শাশুড়ী মাকে ডাকো আমার কাছে।
এ ঘর দিব ছাড়ি,
শাশুড়ী চলেন বৈদ্য যেথায় আছে
রাজল মারবাড়ী
বৈদ্য কহে, যাব না আমি মা,
বিষে কাবু হইতে চাহি না।

সতীনকে মোর ডাকো আমার কাছে
স্বামীরে দিব ছাড়ি,
সতীন চলেন বৈদ্য যেথায় আছে,
রাজল মারবাড়ী।
বৈদ্য কহে, যাব না আমি মা,
বিষে কাবু হইতে চাহি না।

পতিরে মোর ডাকো আমার কাছে,
ছেলেরা সব তাঁরই,
পতি চলেন বৈদ্য যেথায় আছে,
কাঁটার বিষ যে ভারি।
স্বামী যারে ডাকেন বৈদ্য খাঁটি
তুলিল কাঁটাগাছি।
হাতের কাঁটা তুলিল পরিপাটী,
বাঁচি গো আমি বাঁচি।
ভাসুরে ডাক বিষয় নেব ফিরে,
হয়েছে তোলা হাতের কাঁটাটিরে
বাঁচিয়া আমি আছি।

শাশুড়ী দিন ফিরিয়ে ঘর-দ্বার,
হাতের কাঁটা হইয়া গেছে বা'র,
বাঁচিয়া আমি আছি।
সতীনে ডাক ফিরায়ে নিব স্বামী,
স্বামী আমার, তাঁহারই শুধু আমি;
বাঁচি যে আমি বাঁচি।

—

(৫)

মূল

[প্রাচীন গরবা]

হাঁকে রাজ, বাবড়ীও না পাণী ভরবা গ্যাতাঁ,
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ১ ॥
হাঁকে রাজ, বড়োদরানা বৈদড়া তেড়াবো,
মনে ওসড়ীআঁ কয়াবো
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ২ ॥
হাঁকে রাজ, সসরাজীনী পাঘড়ীও রূড়াবো,
এনা পাটড়ীয়া বন্ধাবো,
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ৩ ॥
হাঁকে রাজ, সাসুজীনী সাড়ীও রূড়াবো।
আড়া পড়দা বন্ধাবো,
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ৪ ॥
হাঁকে রাজ, ঘরমাঁথী রাঁধণীয়ানে কাঢো,
মারে ধূমাড়ে আখ্যঁ দুঃখে,
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ৫ ॥
হাঁকে রাজ, সসরাজীনে চোবট করবা মেলো
মারা ঘুংঘটড়া ছোড়াবো,
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ৬ ॥
হাঁকে রাজ, সাসুড়ীনে তীরথ করবা মেলো
এ না ছোগড়ানে সোতী।
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ৭ ॥
হাঁকে রাজ, নণদীনে সাসরীয়ে বলাবো।
এ না বাঁধ্যা-বচকা সোতী,
মনে কের কাঁটো বাগ্যো ॥ ৮ ॥

—

অনুবাদ

(ও গো রাজা) গিয়েছিনু ইঁদারায় জল ভরিতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।
(ও গো রাজা) বড়োদা শহর হ'তে বৈদ্য ডাকো,
ওষুধপত্র সব হাজির রাখো;
যাহা কিছু করিবার কর ত্বরিতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।

(ও গো রাজা) মোর শ্বশুরের সব ছেঁড়ো পাগড়ী,
যেখানে বিঁধেছে বাঁধো পট্টি করি;
তাড়াতাড়ি কর মোর দুখ হরিতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।

(ও গো রাজা) শ্বাশুড়ীর ছেঁড়ো যত রঙীন সাড়ী,
মজবুত ক'রে বাঁধো পরদা তারি ;
ইঁদারায় গিয়েছিনু কেন মরিতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।

(ও গো রাজা) ঘরে থেকে রাঁধুনীরে পাঠাও দূরে,
ধোঁয়ার জালায় মোর নয়ন ঝুরে ;
কোরো না কো দেরী তারে দূর করিতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।

(ও গো রাজা) শ্বশুরে পাঠাও তাঁর সওদা-কাজে,
ঘোমটা খুলিতে আমি পারি না লাজে ;
পারি না ঘোমটা-বোঝা শিরে ধরিতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।

(ও গো রাজা) তীর্থে পাঠিয়ে দাও শ্বাশুড়ী মাকে
সঙ্গে গয়নাগাটি দাও না তাঁকে ;
না থাকে গয়না যদি দাও গড়িতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।

(ও গো রাজা) ননদে পাঠিয়ে দাও শ্বশুর-বাড়ী
পোটলা-পুঁটলী বেঁধে যা আছে তারি ;
গিয়েছিনু কেন হায় জল ভরিতে,
বিঁধিল কুলের কাঁটা আচম্বিতে।

—

(৬)

মূল

[ভজন, প্রাচীন]

হুঁ তো ঢোলে রমুঁ. নে হরি সান্তরে রে,
মারা হইড়া পড়ী পড়ী জায় রে। ঢোলে রমুঁ… ॥ ১ ॥
হুঁ তো দাতণ করুঁ, নে হরি সান্তরে রে,
মারা দাতণিয়াঁ পড়ী পড়ী জায় রে। ঢোলে রমুঁ… ॥ ২ ॥
হুঁ তো নাবণ করুঁ নে হরি সান্তরে রে।
মারা নাবণিয়াঁ ঠরী ঠরী জায় রে। ঢোলে রমুঁ… ॥ ৩ ॥
হুঁ তো ভোজন করুঁ, নে হরি সান্তরে রে,
মারা ভোজনিয়াঁ ঠরী ঠরী জায় রে। ঢোলে রমুঁ… ॥ ৪ ॥
হুঁ তো পোঢ়ব করুঁ, নে হরি সান্তরে রে,
মারী নিন্দরড়ী উড়ী উড়ী জায় রে ; ঢোলে রমুঁ… ॥ ৫ ॥

—

অনুবাদ

আমি ঢোল বাজিয়ে আনন্দে রে হরির চরণ স্মরণ করি,
হৃদয় আমার অবশ হয়ে ধূলায় যে দেয় গড়াগড়ি।
ঢোল বাজাই আনন্দে রে

প্রভাত হ'লে, দাঁতন হাতে হরির চরণ স্মরণ করি,
আমার অবশ হাতে দাঁতন কাঠি ধূলায় যে যায় পড়ি পড়ি,
ঢোল বাজাই আনন্দে রে।
সিনান কালে অবোধ আমি হরির চরণ স্মরণ করি,
স্নানের বারি হেলায় মম হয় যে শীতল ঘড়িঘড়ি।
ঢোল বাজাই আনন্দে রে।
শয়ন করি ঘুমের আশে হরির চরণ স্মরণ করি,
ঘুম আসে না, কে আসিয়া নিদ্ যে আমায় নেয় গো হরি।
ঢোল বাজাই আনন্দে রে।

—

(৭)

মূল

[আধুনিক গরবা, ৬ সংখ্যক প্রাচীন গরবার অনুকরণে]

হুঁ তো জাগুঁ জোউ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারুঁ ধন তো বিদেশ বহী জায় রে। জাগু জোউ…॥ ১॥
হুঁ তো দাতণ করুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারা 'পাউডর' পরদেশথী লবায় রে।…॥২॥
হুঁ তো নাবণ করুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারা সাবু পরদেশথী লবায় রে।…॥৩।
হুঁ তো ভোজন করুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারা বাসণ পরদেশথী লবায় রে।..॥ ৪ ॥
হুঁ তো মুখবাস করুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারা "জীন্‌তান্" পরদেশথী লবায় রে।…॥ ৫ ॥
হুঁ তো লখবা বেসুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারা কাগল পরদেশথী লবায় রে।.. ॥ ৬ ॥
হুঁ তো ফরবা জাউ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারী মোটর পরদেশথী লবায় রে।…। ৭ ॥
হুঁতো সাড়ী পহেরুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারা বায়লিয়াঁ উড়ী উড়ী জায়রে।…॥ ৮ ॥
হুঁতো গরবে রমুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারা হোজরীথা সরী সরী জায় রে।…॥ ৯ ॥
হুঁতো সাহেব দেখুঁ, নে দেশী সান্তরে রে,
মারো দেশ তো লুঁটাঈ লুঁটাঈ জায়রে।…॥ ১০
মনে স্বপ্ন মহীঁয়ে দেশী সান্তরে রে,
মারা দেশনুঁ কেম জায় রে। জাগুঁ জোউ…॥ ১১ ॥

—

অনুবাদ

জাগিয়া দেখি আমি, দেশী পণ্য স্মরি'—
আমার সম্পদ বিদেশী নিল হরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি

দন্তধাবন করি দেশী পণ্য স্মরি'—
মাজন আসে কত বিদেশী জাহাজ ভরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
স্নানের বেলা আমি দেশী পণ্য স্মরি'—
সাবান আসে কত বিদেশী জাহাজ ভরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
ভোজনে বসি আমি দেশী পণ্য স্মরি'—
ভোজন-পাত্র আসে বিদেশী জাহাজ ভরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
মুখ-সুবাস লই দেশী পণ্য স্মরি'—
জীন্‌তান আসে কত বিদেশী জাহাজ ভরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
লিখিতে বসি যবে দেশী পণ্য স্মরি'—
কাগজ আসে কত বিদেশী জাহাজ ভরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
ভ্রমণে বাহির হই দেশী পণ্য স্মরি'—
মোটর আসে কত বিদেশী জাহাজ ভরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
সাড়ী পরিধান করি দেশী পণ্য স্মরি'—
বিদেশী বেশ ফিরে বাতাসে সঞ্চরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
গরবা নাচি গাই দেশী পণ্য স্মরি'—
বিদেশী 'হোজরীয়া'* যায় যে সরি' সরি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
সাহেব-সুবা দেখি দেশী পণ্য স্মরি'—
আমার দেশ দেয় ধূলায় গড়াগড়ি—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।
সুখ-স্বপন ঘোরে দেশী পণ্য স্মরি'
স্বদেশ কলঙ্ক এ কেমনে দূর করি'—হায়রে,
শুধু জাগিয়া দেখি।

* রেশমী বস্ত্র।

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

বিলাতের নূতন মন্ত্রি-পরিষদ—

গত ৩০শে মে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচনের তারিখ ছিল। পাঁচ বৎসর পরে এই নির্ব্বাচন—সকল দলই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের জন্য বহুদিন ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। বক্তৃতা, সংবাদ-পত্র ও প্রচার-পত্র বিলি, ব্যঙ্গ ও রঙ্গ চিত্র সহায়ে বিপক্ষকে বিদ্রূপ, বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চ হইতে তুমুল বাক্-বৃষ্টি, কথা কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্ক, উত্তরের পাল্টা উত্তর,—এই সকল সুপ্রচলিত প্রাচীন রীতির সহায়ে প্রত্যেক দলই নিজেদের মতবাদ ও নিজেদের ভাবী কর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, বেতার যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতে প্রচারের এক নূতনতর পথ খুলিয়া গিয়াছে; এবারকার নির্ব্বাচনে তাই বক্তৃতামঞ্চের অপেক্ষাও বেতারযন্ত্রের আদর হইয়াছিল বেশী। এই নির্ব্বাচনে আর এক নূতনত্ব—নারী-নির্ব্বাচকের সংখ্যাধিক্য। নিজেদের প্রতিশ্রুতি মত রক্ষণশীল দল ইংলণ্ডের নারীদিগকে নির্ব্বাচন সম্পর্কে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষদের সমান অধিকার দিয়াছিলেন—ইহাকেই চলতি কথায় 'ফ্ল্যাপার ভোট' বলা হয়। ফলে, পুরুষ নির্ব্বাচক অপেক্ষা নারী নির্ব্বাচকদের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। ৩০শে মে ইংলণ্ডের ভাগ্য যদি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ইংলণ্ডের কন্যারা—বিজয়ী শ্রমিকনেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা অতি সত্য কথা।

৩০শে তারিখ রাত্রিতে যে সব কেন্দ্রের সংবাদ আসে তাহাতে দেখা গেল যে শ্রমিকদলের ভাগ্যোদয় হইয়াছে। কিন্তু সেই সব কেন্দ্রেই শ্রমিকপ্রাধান্য বেশী; তাই পরবর্ত্তী সংবাদগুলি হইতে বুঝা যায় যে, বেশী সংখ্যক সভ্য শ্রমিকদলের হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জয় একেবারে অবিসংবাদিত নয়: ৬১৫ জন পার্লেমেণ্ট সদস্যের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত শ্রমিকদলের ২৮৭ জন, রক্ষণশীল দলের ২৫৩, উদারনৈতিক দলের ৫৮ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কাজেই, উদারনৈতিক দলের নিরপেক্ষতা বা সম্মতির অভাব হইলে শ্রমিকদল পরাজিত হইবেন। এই নির্ব্বাচনের ফলে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার অধিকারী, রক্ষণশীল নেতা বল্‌ড্‌উইন্ পদত্যাগ করিয়াছেন, এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এই মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে—র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড—প্রধানমন্ত্রী, মিঃ ফিলিপ স্নোডেন—চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার, মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন—পররাষ্ট্রসচিব, মিঃ জে এইচ, টমাস—লর্ড প্রিভি সিল, মিঃ সিডনি ওয়েব—উপনিবেশ সমূহের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, লর্ড পারমুর—কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট, স্যার জন স্যাঙ্কি—লর্ড চ্যান্সেলার, মিঃ জে, আর ক্লাইন্স—স্বরাষ্ট্রসচিব, কাপ্তেন ওয়েজউড বেন—ভারতসচিব, লর্ড টমসন—বিমান বিভাগের মন্ত্রী, মিঃ টম শ—সমরসচিব, মিঃ আর্থার গ্রিনউড—স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী; মিস মার্গারেট বণ্ডফিল্ড—শ্রমিক বিভাগের মন্ত্রী, মিঃ নোয়েল বাক্সটন—কৃষি-মন্ত্রী, সার চার্লস্ ট্রেভিলিয়ান—শিক্ষা মন্ত্রী, মিঃ উইলিয়ম গ্রেহাম—বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী, মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার—নৌবিভাগের মন্ত্রী, মিঃ ডবলিউ এডামসন—স্কটল্যাণ্ডের মন্ত্রী, মিঃ জর্জ ল্যান্সবেরি—কমিশনার অফ ওয়ার্কস, স্যার অসওয়াল্ড মোসলি—ল্যাঙ্কেষ্টার ডাচির চ্যান্সেলার, মিঃ ডবলিউ জোইট—এটর্ণি জেনারেল, মিঃ জে, বি, মেলভিল—সলিসিটার জেনারেল, মিঃ এফ, ও রবার্টস্—পেন্সন

বিভাগের মন্ত্রী, মিঃ হার্বার্ট মরিসন—ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মন্ত্রী, মিঃ টম জনষ্টন—পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী ফর স্কটল্যাণ্ড, মিঃ এইচ, বি, লিস-স্মিথ—পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, লর্ড আরনল্ড—পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল। এখনও স্কট্‌ল্যাণ্ডের সলিসিটার জেনারেল ও লর্ড এড্‌ভোকেট—এই দুইটি পদ পূর্ণ করা হয় নাই।

শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের সভ্যগণ সকলেই মধ্যপন্থী শ্রমিক, তাই ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি ম্যাকডোনাল্ডের মনোনয়ন নৈপুণ্যে সন্তোষ লাভ করিয়াছে। এই মণ্ডলের অধিকাংশ সভ্যই পূর্ব্বেকার মন্ত্রিমণ্ডলেও সভ্য ছিলেন; তাই তাঁহারা কাজ-কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড নূতন-কিছু করিতে চাহেন না—তাই তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলও 'নূতন-কিছু' হয় নাই। তবে, এই মন্ত্রিমণ্ডলে ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়র নাই ও মিঃ ওয়েজউড নাই। মিঃ ওয়েজ-উড্‌ সাইমন কমিশনের বিরোধী ছিলেন, তাই হয়ত তিনি পরিত্যক্ত হইয়াছেন। নূতন ভারতসচিব হইয়াছেন মিঃ ওয়েজ্‌উড্‌ বেন্‌। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ—

"মিঃ (কাপ্তেন) ওয়েজউড বেন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি পার্লেমেণ্টের সদস্য। ১৯১০-১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ট্রেজারীর জুনিয়র লর্ড ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল রিলিফ ফণ্ডের প্রথম চেয়ারম্যান হইয়া-ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মিশর ও গ্যালীপলীতে তিনি সৈনিকের কার্য্য করেন। বৈমানিকের কার্য্যেও পারদর্শিতা দেখাইয়া তিনি পদকাদি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি 'ইন দি সাইড সো' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার।"

ক্ষিপ্রতা ও বাগ্মীতার জন্য পার্লেমেণ্টে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৯২৭ সনে তিনি শ্রমিকদলে যোগদান করেন, ভারতবর্ষ-সম্পর্কে তাঁহার কি অভিজ্ঞতা আছে জানা নাই, তবে ভারতের সেনা বিভাগ ও আফিংএর সম্পর্কে কখনো কখনো তিনি প্রশ্নাদি করিয়াছেন। বিলাতের সকল দলই এখন ভারতবর্ষকে দলের বাহিরের বিষয় বলিয়া গণ্য করিবার পক্ষপাতী; তাই ভারতবর্ষ-সম্পর্কে যাঁহারা কোনো বিশেষ মত পোষণ করেন তাঁহাদের কাহাকেও ভারতসচিব নিযুক্ত করিতে চাহেন না। ভারতবাসীও বর্ত্তমানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের কোনো দলের নিকট হইতে সুবিচার বা সুবিবেচনা প্রত্যাশা করা ভুল, তাই, যিনিই ভারতসচিব হউন, ভারত-বাসীর মতে, ভারতবর্ষের তাহাতে কিছুই যায় আসে না।

—

বাংলা

স্বর্গীয়া সরসীবালা বসু—

অত্যন্ত শোকসন্তপ্তচিত্তে আমরা 'প্রবাসীর' পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে প্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী সরসীবালা বসু আর ইহজগতে নাই। প্রায় এক বৎসরকাল রোগে ভুগিয়া তিনি মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। ষোলো বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "পুষ্পহার" প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর তিনি অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্প রচনা করিয়া কথা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার "প্রবাল" শীর্ষক উপন্যাসখানি গতপূর্ব্ববৎসর এই 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি একজন অত্যন্ত

স্বর্গীয়া সরসীবালা বসু

তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকারের সপক্ষে তিনি আজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্যও এদেশের প্রত্যেক মহিলার অনুকরণযোগ্য। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি একজন আদর্শ সুগৃহিণী ছিলেন। আমরা তাঁহার স্বর্গগত আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বামী ও পুত্রকন্যাগণকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ'-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ—

গত ২৪শে মে তারিখে কলিকাতা পুলিশ প্রবাসী কার্য্যালয় ও প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া ডাঃ জে টি সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রণীত 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' (India in Bondage) নামক পুস্তকের চুয়াল্লিশখানি কপি লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহ অপরাধে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে। গত ৪ঠা জুন এই মামলার শুনানী হইবার কথা ছিল। কিন্তু মোকদ্দমা তৈয়ারী হয় নাই বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে ১২ই জুন পর্য্যন্ত সময় লওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে পুলিশ আবার ৬ই জুন তারিখে রাজদ্রোহ-অপরাধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই মামলা ও পূর্ব্বেকার মামলার শুনানী এক তারিখেই হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী এই খানাতল্লাসীর কথা শুনিয়া এত আশ্চর্য্য হন যে, তিনি তখনই বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট টেলিগ্রাম করেন। এই টেলিগ্রামের উত্তরে রামানন্দ বাবু তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া

খানাতল্লাসী সম্বন্ধে মহাত্মা তাঁহার অভিমত ৬ই জুন তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রামানন্দ বাবু তাঁহার পত্রে পুলিশের কর্ম্মচারীরা ভদ্রব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছিলেন। মহাত্মাজী এই কথার উল্লেখ করিয় বলিয়াছেন, "পুলিশের কর্ম্মচারীরা ভদ্রব্যবহার করিয়াছে,সেজন্য তাহারা ধন্যবাদার্হ। ভদ্রব্যবহার না করিলেই নিরতিশয় অন্যায় হইত। কিন্তু খানাতল্লাসী ভদ্রভাবে হইলেও খানাতল্লাসী-ই। যাহার

শ্রীসজনীকান্ত দাস
'ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজে'র মুদ্রাকর ও প্রকাশক

আত্মসম্মানবোধ আছে তাহার কাছে সোণার শৃঙ্খল লোহার শৃঙ্খল অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইতে পারে না। এই খানাতল্লাসীর কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকদের মধ্যে নগণ্য ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। তাঁহার ও তাঁহার পত্রিকার নাম সমস্ত জগতে পরিচিত। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা ঠিক সংবাদ দিবার জন্য, এবং মতামতের সমীচীনতার জন্য বিখ্যাত। এই উচ্চাঙ্গের পত্রিকাটিতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত লেখকেরা লিখিয়া থাকেন। এই খানাতল্লাসীর কি কারণ দেখান হইয়াছে? যদি "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' রাজদ্রোহপূর্ণ হয় তবে তাহার প্রকাশকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনা হউক। কিন্তু মোকদ্দমার জন্য পুলিশের যে সকল সংবাদের প্রয়োজন ছিল তাহা এইরূপ নাটকীয় অভিনয় না করিলেও পাওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট এই সব নাটকীয় অভিনয়ই চায়। কোনও ভারতবর্ষীয় যত বড়ই হউক না কেন, তাহার মাথাও মাঝে মাঝে নোয়াইয়া দিতে হইবে—পাছে সে তাহার অবস্থার কথা ভুলিয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের 'রক্তনখর' দেখাইবার ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে মাঝে মাঝে অবমাননার দৃশ্য দেখান হইত। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী খানাতল্লাসী ও অন্যান্য যে সকল ঘটনা আজকাল এ দেশে ঘটিতেছে তাহা যেন সেই অভিনয়েরই পুনরাবৃত্তি। যতদিন না আমরা এই অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে শিখিব ততদিন উহা চলিবে।......সমগ্র একটা জাতিকে অপমানিত করিবার জন্য শাসকদের এই চেষ্টা। আমরা সমস্ত শক্তি দিয়া ইহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিব। শ্রদ্ধা অর্জ্জন করাই স্বরাজের প্রথম সোপান।"

উপরে উদ্ধৃত অভিমত প্রকাশ করিবার সময়ে মহাত্মা গান্ধী

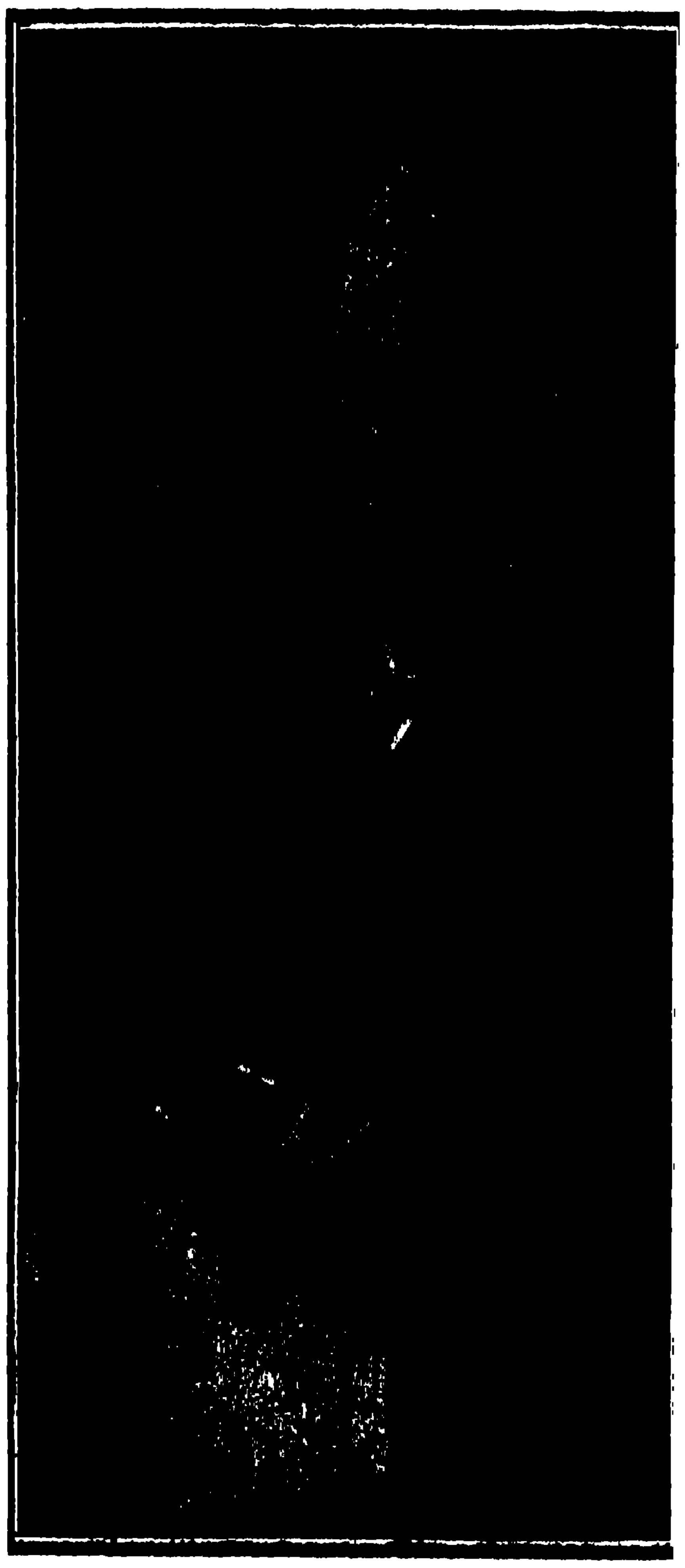

ডাঃ জে, টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের কথা জানিতে পারেন নাই।

যে বইটি লইয়া এত কাণ্ড হইতেছে তাহার প্রণেতা আমেরিকার বিখ্যাত লেখক ডাঃ জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ড। তাঁহার বয়স এখন প্রায় নব্বুই বৎসর হইয়াছে। তিনি আমেরিকার 'ইউনিট্যারিয়ান চার্চ্চের'র একজন নেতা ও কয়েকখানি সুপরিচিত গ্রন্থের প্রণেতা। ন্যায়নিষ্ঠা ও শান্তিপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃভাবের বিরোধী যে জাতি বা যে সমাজ ডাঃ স্যাণ্ডারল্যাণ্ড তাহারই বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তিনি ফিলিপাইন দ্বীপ দখল করার জন্য নিজের দেশ আমেরিকাকেও নিঃসঙ্কোচে দোষী করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি ভারতবর্ষীয়-দের স্বাধীনতালাভের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজ ও লোকাচারে যে-সকল দোষ আছে তাহাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। তিনি শুধু দোষ করিবার জন্যই দোষ ধরেন নাই। মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দিয়া বিচার করিয়া তাঁহার কাছে যে জাতিকে পরপীড়নের জন্য দোষী বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন।

বাঙালী চিত্রকরের সম্মান—

সুপরিচিত চিত্রকর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কিছুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ 'গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্'এর অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি ঐ পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

প্রথম ভারতীয়া বিমানচারিণী—

বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ পার্সী বণিক স্যার ডিনশ পেটিটের পুত্রবধূ শ্রীমতী এফ,ডি, পেটিট ভারতবর্ষীয়া মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম একাকী বিমান-চালনা করিয়াছেন। তিনি জুহু এয়ারোড্রোমে বিমান-চালনা শিক্ষা করেন।

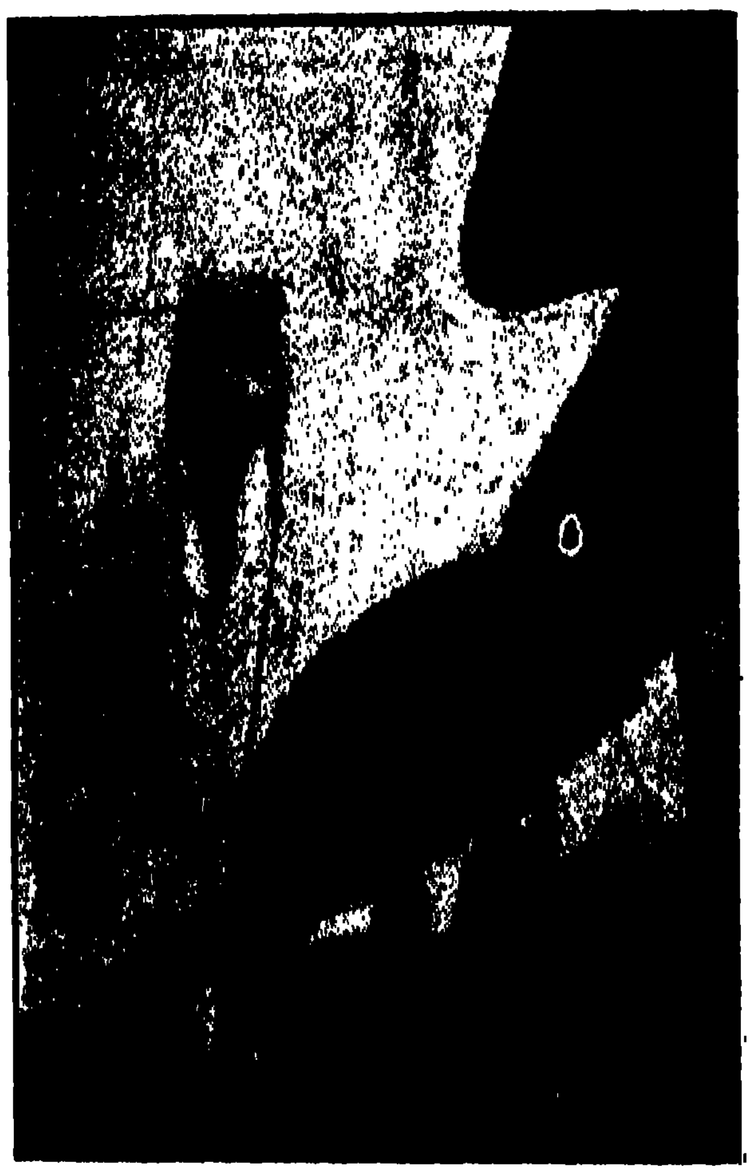

শ্রীমতী এফ, ডি, পেটিট

স্বরলিপি

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

সংগ্রাহক—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম-এ

মীরাবাঈ

নয়ন ললচাবত জীয়রা উদাসী।
শ্যামল বনমেঁ বাজে শ্যামলকী বাঁশী॥
রৈনামে শৈনামে মোর নৈনা ন লাগে।
পীতমকী শ্বাস আবৈ কুসুম সুবাসী।
ব—ওয় ইংরাজী W

মিশ্র ভীম পলশ্রী—কাহারবা

\+ ২ +
II জ্ঞা মা পা -র্সা | ণা -ণা পা া- | জ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা রা |
ন য় ন ০ | ল ০ ল ০ | চা ০০ ০০ ব |

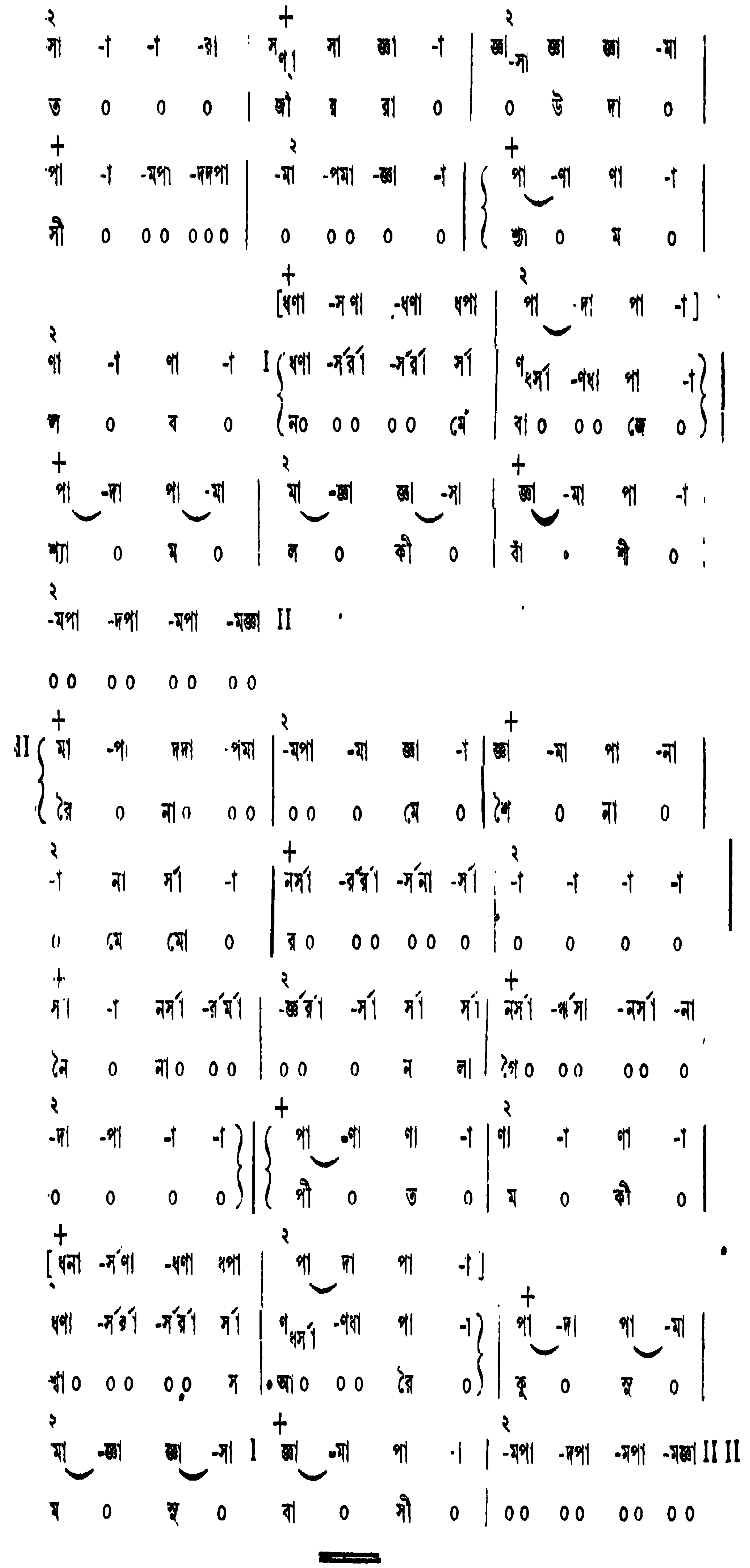

পুস্তক-পরিচয়

কালাজ্বর চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-বি প্রণীত। ২৩ বি, বেথুন রো, মানসী ও মর্ম্মবাণী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ১৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানিতে কালাজ্বর বিষয়ে যাহা জানা উচিত লেখক সহজ ভাষায় তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন। আজকাল কালাজ্বরের যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে কি সহরের, কি পল্লীগ্রামের প্রত্যেক চিকিৎসকেরই একটু সজাগ থাকা উচিত। এই সহরে কালাজ্বর নাই বা অমুক গ্রামে কালাজ্বর ছিল না বলিলে ঠকিতে হইবে। লেখক বাংলা ভাষায় পুস্তকখানি লিখিয়া অনেকের, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের চিকিৎসকগণের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে অন্য কি কি উপায়ে রোগ ধরা যাইতে পারে, প্রত্যেকবার কাগজ পেন্সিল লইয়া গুণ-ভাগ না করিয়া সহজে ঔষধের মাত্রা ঠিক করা, কালাজ্বরের সহিত প্রায় একই লক্ষণ যুক্ত কতকগুলি রোগের পার্থক্য দেখান, ইত্যাদি অধ্যায় ভাল হইয়াছে। অবশ্য লেখক নূতন কিছুই বলেন নাই। যাহা কিছু নূতন তাহা 'ট্রপিক্যাল স্কুলে'র অর্দ্ধসিদ্ধ গবেষণা।

'আঙ্গুল হইতে রক্ত লইয়া অধিকাংশ রোগীরই বীজাণু পাওয়া যায়' (৯ পৃষ্ঠা); 'কলিকাতার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে এ রোগ বেশী' (২০ পৃষ্ঠা); 'কালাজ্বরে প্লীহা নরম থাকা বিশেষত্ব' (৩২ পৃষ্ঠা); এন্টিমনি ইঞ্জেকসানের উপসর্গ 'নিওমোনিয়া হওয়া' (১০০ পৃষ্ঠা); নূতন ইঞ্জেকসানগুলিতে 'এ পর্য্যন্ত কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই (১১১ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি মতগুলি জোরের সহিত না বলাই ভাল। কারণ বাস্তব জগতে এবিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। লেখার দোষে দুই একটি সামঞ্জস্যহীন কথা রহিয়া গিয়াছে, যথা, কালাজ্বরের লক্ষণ 'ক্ষুধা বেশ আছে' (২৪ পৃষ্ঠা), আবার রোগ সারিলে ক্ষুধা বাড়ে (৯৭ পৃষ্ঠা), ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় (১২০ পৃষ্ঠা); কালাজ্বরে প্লীহা নরম থাকা বিশেষত্ব (৩২ পৃষ্ঠা) আবার রোগ সারিতে থাকিলে 'প্লীহা নরম হইয়া যায়' (৮৭ পৃষ্ঠা)।

লেখকের মতে কালাজ্বরে 'হাত পা ফোলা (২৫ পৃষ্ঠা), কোন এক অনির্দ্দিষ্ট কারণে হয়। 'এই শোথের কারণ নির্ণয় করা যায় না' (১২৯ পৃষ্ঠা)। এসব কি এনিমিয়ার জন্য নয়? কালাজ্বরে 'লার্জ মনো শতকরা ২৫ বা আরও বেশী' (৩৫ পৃষ্ঠা) 'স্মল ও লার্জ বাড়ে' (৩৭ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি বেশী বলিয়া মনে হয়, এবং এই লার্জ বাড়াকে অযথা একটা লক্ষণ করিয়া তোলা হইয়াছে। বহিখানির ছাপা, বাঁধাই ভাল। লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এরূপ পুস্তক প্রত্যেক চিকিৎসকের, বিশেষতঃ মফস্বলবাসী চিকিৎসকের, রাখা উচিত।

নি-চ ম

বিলাত ভ্রমণ—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী, মাতৃমন্দির কার্য্যালয়। ২০০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আজকালকার বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণবৃত্তান্ত গল্প ও কবিতার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। এই তিনের অজস্র প্রকাশ প্রতি-সংখ্যায় নাই, এ রকম মাসিক পত্রিকা এ যুগে খুঁজিয়া মেলা ভার। আর সেইজন্য গল্প ও কবিতার মতন দেখা যায় আজকালকার ভ্রমণকাহিনীগুলিও "অনেক লেখার অনেক পাঠকের" প্রধান একটি পাঠক একঘেয়েমিতে ভয়। তাই, উল্লিখিত বইখানা সমালোচনার জন্য পাইয়া অনাগ্রহের সঙ্গে পাতা উল্টাইয়াছিলাম। কিন্তু ভূমিকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের উচ্চপ্রশংসা দেখিয়া বইখানা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার পর সেই ভূমিকারই ভাষায় বলিতেছি "বইখানা দেখে সুখী হয়েছি।" যাঁহারা ইংরেজী জানেন ন অথচ বর্ত্তমান যুগের বিলাতের মোটামুটি একটি পরিচয় সহজে লাভ করিতে সমুৎসুক, বিশেষতঃ ইংরেজী না জানা সাধারণ বাঙালী ব্যবসায়ী যাঁরা, অক্ষয়বাবুর সরল ভাষায় লিখিত এই বিলাতভ্রমণ-খানি তাঁহাদের পক্ষে একখানা উপযোগী গ্রন্থ হইয়াছে

সু

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

স্বামী সারদানন্দ (জীবনী)—স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্য্যালয়। মূল্য ২॥০

পরাজিত (উপন্যাস)—শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডি এম লাইব্রেরী। মূল্য ১॥০

পথ ও পাথেয়—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস।

কাব্যজিজ্ঞাসা—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস। মূল্য ১।০

রূপ ও রস—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস। মূল্য ১॥০

তারুণ্য—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত, এম সি সরকার এণ্ড সন্স্।

জাহানারা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ২৲

যাজ্ঞসেনী (নাটক)—শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত। মূল্য ১৲

প্রভাতী (কাব্য)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲

বুভুক্ষা (উপন্যাস)—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। আত্মশক্তি লাইব্রেরী। মূল্য ২॥০

পথের বাঁশী—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত। মূল্য ৷৵০

মন্দির—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত। মূল্য ২৲

জমাখরচ—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১॥০

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী (২য় ভাগ)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস।

শ্রীনিগমানন্দ কথাসংগ্রহ—শ্রীশিশিরকুমার বসু প্রণীত। ডি এম লাইব্রেরী। মূল্য ১॥৵০

সচিত্র শ্রীমদ্ভাগবত গীতা—গোবিন্দভবন কার্য্যালয়। মূল্য ১৲

পারুল—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। মূল্য ॥৵০

সত্যব্রতের পরীক্ষা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন প্রণীত। মূল্য ।০

পৃথীরাজ—শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত। মূল্য ৩৲

বেপরোয়া—শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত। কুলজা সাহিত্য-মন্দির—মূল্য ১৲।

পাগলামীর পুঁথি—শ্রীগুরুসদয় দত্ত প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স। মূল্য ॥০

বাপ্পাদিত্য—শ্রীঅখিল নিয়োগী চৌধুরী। মূল্য ।৵০

পণ্ডিতের সংজ্ঞা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ। মূল্য ১।০

সমুদ্রগুপ্ত—শ্রীঅমলচন্দ্র সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। মূল্য ১॥০

বিলাতের নূতন পার্লেমেণ্ট

বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা পার্লেমেণ্টের হৌস অব লর্ডসের সভ্যেরা নির্ব্বাচিত হন না। তাঁহারা আমরণ সভ্য। হৌস অব কমন্সের সভ্যদের নূতন নির্ব্বাচন পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর হওয়া চাই-ই; তাহাই আইন। কিন্তু তাহার আগেও যদি মন্ত্রীর দল পরাজিত হন, তাহা হইলে নূতন নির্ব্বাচন হয়। সম্প্রতি এক নূতন নির্ব্বাচন হইয়াছে। ইহার আগের পার্লেমেণ্টে রক্ষণশীল দলের সভ্যদের সংখ্যা অন্য দুই দলের প্রত্যেকের ও উভয়ের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়ে বেশী ছিল। রক্ষণশীল দলের নেতারা মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন। নূতন নির্ব্বাচনে শ্রমিক সভ্যদের সংখ্যা রক্ষণশীলদের ও উদারনৈতিকদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয় নাই। কিন্তু উদারনৈতিকরা শ্রমিকদের সহিত এক যোগে কাজ করিতে রাজী হওয়ায় শ্রমিকদলের নেতা মিঃ জেমস র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ড মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। তাহাতে, আগে উদারনৈতিক ছিলেন, এরূপ কোন কোন লোক স্থান পাইয়াছেন।

বিলাতী পার্লেমেণ্টের নূতন নির্ব্বাচনে এই যে মধ্যে মধ্যে এক রাজনৈতিক দলের পরিবর্ত্তে অন্য একদল সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ ও প্রবল হইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং "গবর্ন্মেণ্ট" নামে পরিচিত হন, ইহার অর্থটি সহজবোধ্য। রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, শ্রমিক—কোন দলকেই বিলাতের লোকেরা বরাবর ক্ষমতা দিয়া রাখে না। তাহার কারণ, কোন দলের নেতারাই অভ্রান্ত নহে। কোন দলই সব বিষয়ে দেশের লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; প্রত্যেক দলই ছোট বড় ভুল করে, মধ্যে মধ্যে স্বার্থপর ভাবে দেশের টাকার অপব্যয় করে, স্বজনপোষণে খরচ করে, ইত্যাদি। তখন দেশের লোকেরা চটিয়া অন্য এক দলকে প্রবল করিয়া তাহাদিগকে গবর্ন্মেণ্টের কার্য্য-ভার দেয়। ইহারাও আবার যখন অকর্ম্মণ্যতা, অবহেলা, অপব্যয়, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট বলিয়া প্রমাণ হয়, তখন নূতন নির্ব্বাচনে আবার আর কোন দল প্রবল হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকরা নিজের দেশের কাজে অভ্রান্ততার, কার্য্য-দক্ষতার, নিঃস্বার্থতার পরীক্ষায় সব সময়ে সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয় না। এই হেতু কিছুদিন অন্তর অন্তর অন্য কতকগুলি লোকের হাতে ক্ষমতা আসে, এবং তাহাতে আগেকার দলের কোন কোন ভ্রম দোষ ত্রুটি সংশোধিত হয়।

বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞেরা এদেশে রাজ্যশাসন করিতে আসেন না। তাঁহাদের চেয়ে কম যোগ্য লোক আসেন। এই দেশটা তাঁহাদের নিজের দেশ নহে এবং ইংলণ্ডে যেরূপ লোকমতের প্রভাব ও প্রাবল্য মানুষকে কতকটা কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়বান রাখিতে পারে, এখানে সেরূপ লোকমত নাই। কিন্তু তথাপি ভারতশাসন-সম্পর্কে ইংরেজ জাতির উহ্য মত ও বিশ্বাস এই, যে, ভারতপ্রবাসী ইংরেজ রাজপুরুষরা ভ্রম করিতে পারেন না, স্বার্থপর হইতে পারেন না, কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে পারেন না, অকর্ম্মণ্য হইতে পারেন না, বা তদপেক্ষাও কোন গুরুতর দোষে দুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং ইংরেজদের মতে এই কারণে এদেশে "গবর্ন্মেণ্টের" পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দেশবাসীদের নাই, তাহা তাহাদের পাইবার দরকারও নাই।

অতএব আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, যে, যে ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞেরা স্বদেশে স্বদেশের কাজে দোষত্রুটিভ্রমঅবহেলার অতীত নহেন, তাঁদের চেয়ে

নিম্নদরের ইংরেজরা এদেশে আসিয়া এদেশের কাজে দোষক্রটিভ্রমঅবহেলার অতীত হইয়া পড়েন।

কিন্তু সত্য কথা এই, যে, কোন জাতিরই অন্য কোন জাতিকে শাসন করিবার ও তাহাদের কাজ চালাইবার মত যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও সাধুতা নাই। এই কারণে, লোকমত অনুসারে পরিবর্ত্তনীয় শাসকসম্প্রদায়বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী।

—

বিলাতী পার্লেমেণ্ট ও ভারতবর্ষ

নূতন পার্লেমেণ্টে শ্রমিকদল মন্ত্রীসভা ও "গবর্মেণ্ট" গঠন করায় কথা উঠিয়াছে, যে, তাহারা ভারতবর্ষের জন্য উল্লেখযোগ্য ভাল কোন ব্যবস্থা করিবে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর কি, তাহা রাজনৈতিকবুদ্ধিবিশিষ্ট সব ভারতীয়ই জানেন। তথাপি ইহার কিছু আলোচনা হওয়া ভাল। বিলাতের প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বলেন, "ভারতবর্ষকে আমাদের দলাদলির মধ্যে আমরা আনি না, উহার কোন সমস্যা বিলাতী দলীয় সমস্যা নহে।" শ্রমিক দলের বুলিও এইরূপ। এইরূপ বুলিদ্বারা সব বিলাতী রাজনৈতিক আমাদিগকে বুঝাইতে চান, যে, ভারতের হিতসাধন তাঁহাদের সব দলেরই উদ্দেশ্য। আমরা কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি অন্যরূপ—ভারতবর্ষকে বিলাতের অধীন রাখিয়া তাহার দ্বারা ব্রিটেনের সব রকম স্বার্থসাধন বিলাতী সব দলের লক্ষ্যীভূত। নিজেদের স্বার্থসাধন জন্য ভারত সম্বন্ধে যতটুকু ভাল ব্যবস্থা করা দরকার, তাহা তাঁহারা করিতে অনিচ্ছুক নহেন।

যাহা এত দিন চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতে তাহার পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে না, এমন নয়; সুতরাং ভবিষ্যতে ইংলণ্ডীয় কোন মন্ত্রীদলের দ্বারা ভারতের কিছু হিত হওয়া সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ও অসম্ভব নহে। কিন্তু হিত করিবে কে? নূতন মন্ত্রীদল ত করিবেন? কিন্তু বিলাতের সব প্রধান প্রধান সংবাদপত্র শ্রমিক মন্ত্রীদলের প্রশংসা করিয়াছেন—এমন কি চূড়ান্ত রক্ষণশীল কাগজ মর্নিংপোষ্ট পর্য্যন্ত। যে মন্ত্রীদলের প্রশংসা মর্নিংপোষ্ট পর্য্যন্ত করিতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই তাহার বিবেচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী রক্ষণশীল মন্ত্রীদল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, অর্থাৎ মোটামুটি তাহার সমতুল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী এই রক্ষণশীল মন্ত্রীদল ভারতবর্ষের কোন হিত করে নাই, সুতরাং তাহার সমতুল্য শ্রমিক মন্ত্রীদলও বিশেষ কিছু করিবে না, অনুমান করা অযৌক্তিক নহে।

শ্রমিক দলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও তাঁহার অনুচরগণ সাইমন কমিশনের খুব সমর্থন করিয়াছিলেন এবং এখনও করেন। ইহা হইতেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনুমান করা যাইতে পারে।

ইহার পূর্ব্বে শ্রমিক দল যখন একবার ক্ষমতা পাইয়া "গবর্মেণ্ট" গড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভারতবর্ষের লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা বা আর্থিক উন্নতির জন্য কিছু করেন নাই, বরং বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়া সহজ করিবার নিমিত্ত অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছিলেন।

গতবারে শ্রমিকদলের ভারতহিতার্থ কিছু না করিতে পারিবার কারণ তাঁহারা এই দেখাইয়াছিলেন, যে, তাঁহাদের দলের সংখ্যা অন্য দুই দলের সংখ্যাসমষ্টির চেয়ে বেশী না থাকায়, তাঁহারা তাঁহাদের সহযোগী একটি দলের মন যোগাইয়া চলিতে বাধ্য হন। এবারেও তাঁহারা সেই ওজর করিতে পারিবেন।

ভারতশাসন সম্বন্ধে শ্রমিকদলের গণতান্ত্রিকতার দিকে অগ্রসর না হইবার একটা গুরুতর কারণ আছে। ইংরেজরা মনে করে, "ভারতবর্ষের জন্য খুব জবরদস্ত শাসন দরকার এবং ভারতীয়েরা তাহাই খুব পছন্দ করে; খুব শক্ত ও দৃঢ় হইতে না পারিলে সাম্রাজ্য টিকিবে না।" অন্য দলের লোকেরা শ্রমিক দল সম্বন্ধে একটা "বদনাম" রটাইয়া থাকে, যে, তাহারা "বিপ্লবীদের" প্রশ্রয় দিয়া সাম্রাজ্যটাকে নষ্ট করিয়া দিবে। সুতরাং আগেকার বারে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও তাঁহার সহচর অনুচরদিগকে দেখাইতে হইয়াছিল, যে, তাঁহারাও খুব "শক্ত ও দৃঢ়" এবং "ব্যাঘ্রগুণশালী" হইতে পারেন। এবারও সেই প্রয়োজন অনুভূত হইবার কথা।

শ্রমিকদল যখন প্রবলতম দল হন নাই, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব গণতান্ত্রিক গোছের বক্তৃতা করিয়া ভারতে অচিরে স্বায়ত্তশাসন

প্রবর্ত্তনের আশা দিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত বটে। কিন্তু আনুমানিক তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর আশার অট্টালিকা নির্ম্মাণ বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। ন্যায়পরায়ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহা সম্ভব করিতে হইলে তাঁহাদিগকে সমঝাইয়া দিতে হইবে, যে, ন্যায়পরায়ণ না হইলে তাঁহাদের অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে।

আধুনিক ভারতের প্রথম বৈমানিক

আধুনিক ভারতের প্রথম বৈমানিক শ্রীযুক্ত পি এম কাবালী লণ্ডন হইতে "উষার পালক" নামক তাঁহার

শ্রীযুক্ত পি এম কাবালী

আকাশযানে একাকী উড়িয়া ফ্রান্স পৌঁছিয়াছেন খবর পাওয়া গিয়াছে। এই লেখাটি ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার সময় হয়ত তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছিবেন। ভারতীয় যুবকেরা আরো বেশী সংখ্যায় এইরূপ দক্ষতা ও সাহসের কাজে অগ্রসর হইলে ভাল হয়। বাঙালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বি কে সিংহ ও জে পি গাঙ্গুলী বৈমানিকের কাজে বহুপরিমাণে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অচিরে পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিবেন।

ডাক্তার রামলাল সরকার

ব্যাসদি-গাজনা নিবাসী ডাক্তার রামলাল সরকার মহাশয় পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বয়স আশীর কাছাকাছি হইয়াছিল। তিনি চীনে ব্রিটিশ বাণিজ্য-দূতের সহিত চিকিৎসকরূপে অনেক বৎসর

ডাক্তার রামলাল সরকার

ছিলেন, এবং তথাকার লোকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। চীনের রাষ্ট্রবিপ্লব ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে

তাঁহার অনেক প্রবন্ধ মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। তিনি ফোটগ্রাফী বিদ্যা জানিতেন। যে সকল ফোটগ্রাফ দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধগুলি চিত্রিত হইত, তাহা তিনি নিজে তুলিয়া পাঠাইতেন। তিনি সাতিশয় স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। যাহা কিছু লিখিতেন, সকলের মধ্যেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দেশ-হিতসাধনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকিত। আমাদের ধারণা তাঁহার কিছু কিছু লেখা এখনও ছাপা হয় নাই। সেগুলি পুস্তকাকারে বাহির হইলে ভাল হয়। চীন দেশে যাইবার পূর্ব্বে তিনি অনেক বৎসর ব্রহ্মদেশে ছিলেন। সেখানকার রীতিনীতিও তিনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় তাঁহার একটি পুস্তক সে দেশে ধাত্রীদের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সরকার মহাশয় অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার অনেক ছবি প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে চীনদেশীয় পোষাকপরা তাঁহার একটি ছবি আবার মুদ্রিত করিলাম।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা নির্ব্বাচন

যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের ফল সেইরূপই হইয়াছে। সরকারীদলভুক্ত সভ্যের সংখ্যা বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে বোধ হয়। এখন গবর্ন্মেণ্ট যদি সমুদয় মুসলমান সভ্যকে হাত করিয়া ফেলিতে পারেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে সমুদয় বা অধিকসংখ্যক মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে কয়েক জন লোকের মন্ত্রিত্ব কিছুকাল টিকিতে পারে।

কংগ্রেসওয়ালারা দলে পুরু হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু এই নিয়ম জারী করিয়াছেন, যে, তাঁহাদের কোন সভ্য যেন ভারতীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত না হন। এই নিয়মপালন দুঃখের বিষয় হইবে না যদি তাঁহারা কৌন্সিলে না গিয়া মন দিয়া দেশের অন্য কাজ করেন।

—

শান্তি ও গণতান্ত্রিকতার ধর্ম্ম

কয়েক দিন পূর্ব্বে আলবার্ট হলে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগে একটি সভা হয়। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কয়েক জন বক্তা অন্যান্য কথার মধ্যে সকল ধর্ম্মের লোকদেব মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও কিছু বলেন। সকলের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের আমরা খুব পক্ষপাতী। সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইলে বাংলা দেশে সর্ব্বাগ্রে সকল ধর্ম্মের লোকে মিলিয়া নারী-হরণ ও নারী-ধর্ষণ বন্ধ করিতে হইবে। দলবদ্ধভাবে নারী হরণ ও নারীর উপর অত্যাচার চলিতেছে, এবং গ্রামে গ্রামে দল বাঁধিয়া লোকে অত্যাচারীদিগের সাহায্য করিতেছে। এরূপ অবস্থা থাকিতে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সদ্ভাবের কথা বলা বৃথা, যদিও এ অবস্থাতেও সহিষ্ণুতা ও শান্তি রক্ষা করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, ইসলাম এবং অন্য সব ধর্ম্মের ও তৎসমূদয়ের প্রবর্ত্তকদিগের প্রশংসা করিতে আমাদের আপত্তি নাই, ইচ্ছা আছে। কিন্তু প্রশংসার মূল্য তখনই থাকে, যখন উহা সম্যক্ জ্ঞানপ্রসূত ও আন্তরিক হয়। কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সপক্ষে বিপক্ষে যে যাহা বলে তাহা জানা দরকার। এমন এক সময় ছিল যখন ইউরোপের অনেক দেশে, ঈশ্বর তিন নহেন এক ও খৃষ্ট ঈশ্বর নহেন, কেহ একথা বলিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। শুনিয়াছি, এখনও বিলাতে ঈশ্বরনিন্দা বা খৃষ্টিয়ানদিগের মতে পবিত্র কোন বস্তুর নিন্দা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, যদিও ঐ আইনের প্রয়োগ এখন আর হয় না। কিন্তু এখন সভ্য জগতের সর্ব্বত্র খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কঠোরতম সমালোচনা, খৃষ্টের নিন্দা এমন কি কুৎসা, ঈশ্বরনিন্দা, ঈশ্বরকে বিদ্রূপ লোকে অবাধে করিতে পারে এবং অনেকে করে। তাহাতে সত্যের কোন হানি হয় নাই। হিন্দু ধর্ম্মের, হিন্দুর নানা শাস্ত্রের ও আচার-ব্যবহারের সমালোচনা ও নিন্দা কুৎসা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কোন কালে ছিল কিনা জানি না; এখন নাই, ইংরেজ রোজত্ব

কখন ছিল না। হিন্দু ধর্ম্ম সমাজ ও শাস্ত্রের এইরূপ সমালোচনা নিন্দা কুৎসায় সত্যের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং হিন্দুরা আত্মদোষ পরিহার করিয়া শক্তিমান হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

এই সব কথা জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কতকটা খাটে। এই জন্য এই সকল ধর্ম্মের এবং তৎসমুদয়ের শাস্ত্র ও প্রবর্ত্তকদিগের প্রাপ্য প্রশংসা অবাধে নির্ভয় করিয়া তাহা অন্তরের সহিত করা চলে।

ইসলাম, তাহার শাস্ত্র ও প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা ঐরূপ অবাধে করিবার সুবিধা অন্ততঃ ভারতবর্ষে নাই। সত্য বটে, ইংরেজের আমলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদন নিবারণার্থ আইন কেবল ইসলাম তাহার শাস্ত্র ও প্রবর্ত্তকের সম্বন্ধেই খাটে না। কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকটা সেইরূপই বটে। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মান্ধ কতকগুলি মুসলমান ইসলামের প্রবর্ত্তকের সমালোচক নিন্দুক বা কুৎসাকারীর প্রাণদণ্ড দিবার ভার লওয়ায় অন্যান্য ধর্ম্মের যেরূপ অবাধ আলোচনা চলে, ইসলামের সেরূপ চলে না। সুতরাং মুসলমান ভিন্ন অন্য কেহ ইসলাম-সংসৃষ্ট কাহারও বা কিছুর প্রশংসা করিলে মনে জিজ্ঞাসা উঠে, ইনি কি সম্যক্ আলোচনা করিয়া সব দিক দেখিয়া শুনিয়া কথা বলিতেছেন? বস্তুতঃ অবাধে নিন্দা কুৎসা পর্য্যন্ত করিবার অধিকার কাহারও না থাকিলে তাহার নিকট নিছক প্রশংসা চাওয়া চলে না, এবং তাহা পাইলেও তাহার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কুৎসা ও অযথা নিন্দা করা গর্হিত; কিন্তু সত্য-নির্ণয়ের খাতিরে তাহাও সহ্য করা আবশ্যক। ন্যায্য সমালোচনা এবং অযথা নিন্দা ও কুৎসার মধ্যে ভেদরেখা টানা অনেক সময় কঠিন।

সেদিনকার সভায় ইসলামের গণতান্ত্রিকতার প্রশংসা হইয়াছিল। সামাজিক হিসাবে ইহা অনেকটা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। মুসলমান সমাজেও ধন ও বংশমর্য্যাদা হিসাবে শ্রেণীভেদ ও খ্যাতি প্রতিপত্তির পার্থক্য আছে। তদ্ভিন্ন খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাই মানুষকে ধরিয়া দাস (slave) করা, ধৃত দাসদিগকে বিক্রী করিবার ব্যবসা করা এবং ধৃত বা ক্রীতদাস রাখিয়া কাজ আদায় করা বিষয়ে জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা গণতান্ত্রিকতা নহে। তাহাদের শাস্ত্রের বিচার করিতেছি না, তাহা করিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই; কার্য্যতঃ যাহা দাঁড়াইয়াছে এবং যাহা ইতিহাসে পড়িয়াছি, তাহার কথাই বলিতেছি। রাজনৈতিক ব্যাপারে ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাহাই থাকুক, পরবর্ত্তী সময়ে কোন মুসলমান রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ছিল না, বর্ত্তমান সময়ে দু'একটি মুসলমান রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হইয়াছে।

সেদিনকার সভায় ইহাও কথিত হইয়াছিল, যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম্ম। খৃষ্টিয়ানেরাও বলিয়া থাকেন, যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম এবং তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শান্তির রাজা (Prince of Peace)। এই সকল উক্তির কোন আলোচনা করিব না। কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান জাতিদিগকে ঐ দাবী অনুযায়ী দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ঐরূপ দৃষ্টান্ত যত দেখিব ততই আনন্দিত হইব। এপর্য্যন্ত জগতের ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান নামধারী জাতিরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়াছে। হইতে পারে, তাহারা প্রকৃত খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান ছিল না ও নহে। তাহা হইলে তাহাদের "বীরত্বের" গৌরব প্রকৃত খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদের লওয়া উচিত নয়।

—

বঙ্গের স্বাস্থ্য-রিপোর্ট

বার্ষিক স্বাস্থ্য রিপোর্ট সত্বর বাহির হইলে তাহা পড়িয়া সাবধান হওয়া চলে। তাহা বাহির হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইলে পড়িতে আগ্রহ হয় না, এবং তাহাতে দেশের যেরূপ অবস্থা চিত্রিত থাকে, রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার সময় হয় ত তাহার কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

বঙ্গের ১৯২৭ সালের স্বাস্থ্য-রিপোর্ট দেড় বৎসর পরে এখন বাহির হইয়াছে। তাহা এখনও পাই নাই। দৈনিক কাগজে তাহার সারসংগ্রহ দেখিলাম। রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, ঐ বৎসর ওলাউঠা ও বসন্তে অধিকতর

মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গের লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। বৃদ্ধি বিশেষ কিছু হয় নাই, ১৯২৬ অপেক্ষা কমই হইয়াছে। দুই সালের জন্ম মৃত্যু ও বৃদ্ধির সংখ্যা দিতেছি।—

	জন্ম	মৃত্যু	লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি
১৯২৬	১২৭৬৩৮০	১১৫১১৯৭	১২৫১৮৩
১৯২৭	১২৮৬৮৬৩	১১৮৯৩৭০	৯৭৪৯৩

এই অঙ্কগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, ১৯২৬ অপেক্ষা ১৯২৭ সালে বঙ্গের অবনতি হইয়াছিল। এখন গতি কোন্ দিকে বলা যায় না।

১৯২৭ সালে শিশুমৃত্যু কিছু কমিয়াছিল। এক বৎসরের কম বয়সের শিশু ১৯২৬ সালে মরিয়াছিল ২৫১১৮৪জন, ১৯২৭এ মরিয়াছিল ২২৯০৭৮ জন।

ঢাকায় দুইটি ও কলিকাতায় পাঁচটি কেন্দ্র হইতে স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা ও শিক্ষিতা ধাত্রীর বন্দোবস্ত করায় শিশুর ও প্রসূতির মৃত্যু অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে বলিয়া রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে।

নানা স্থানে ধাইদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মোট ১০০টি ক্লাসে ১৯২৭ সালে অর্থসাহায্য করা হইয়াছিল। প্রত্যেক ক্লাসে ১০ জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১০৩টি ক্লাসে মোট ১১৭০জন ধাই শিক্ষা পাইয়াছে। এইরূপ ক্লাস আরো বেশী জায়গায় আরো বেশী করিয়া খোলা উচিত।

নিবার্য্য রোগে বাংলা-দেশে কত লোক মরে, তাহা ওলাউঠা, বসন্ত ও নানাবিধ জ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা হইতে বুঝা যায়। যথা—

	ওলাউঠা	বসন্ত	নানাবিধ
১৯২৬	৫৯১০৬	২৫৫৪৮	৮২২৭৭৪
১৯২৭	১১৮৩৭৭	৪২৫১৪	৭৮৯০০৬

কালাজ্বরের সংখ্যাও নীচে দিলাম।

	আক্রমণ	মৃত্যু
১৯২৬	১৫৯০৮৫ (১৯২৪ সালে)	১৪২৭৫
১৯২৭	১৮০০৭৪	১১৮৫৫

—

"এলাহাবাদের কালীবাড়ী"

গত বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি বাহির হয়, তাহাতে কয়েকটি ভ্রম আছে। একটি ভ্রম এই—"এলাহাবাদের কালীবাড়ী শুভমান কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী নিতাই বাবুর সহায়তাতেই চলিয়া আসিতেছিল।" এই কথা সত্য নহে। নিতাই বাবু জীবিত নাই। সুতরাং এবিষয়ের বিস্তারিত তথ্যের আলোচনা করিব না। প্রবন্ধটিতে রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ উকীল কুঞ্জবাবুর নাম "কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়" লেখা হইয়াছে। "কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়" হইবে।

—

পরীক্ষায় ছাত্রীদের পারদর্শিতা

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় এবার শ্রীমতী ভক্তি অধিকারী পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার পিতা অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয়ের কয়েকটি কন্যাই খুব বুদ্ধিমতী এবং পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশা অধিকারী অন্যান্য পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম-স্থানীয় হন। তিনি এখন অধ্যাপকের কাজ করেন।

কলিকাতার আই-এ পরীক্ষায় স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী রমা বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ছাত্রীরা পাস ভালই করিতেছেন; কিন্তু নারীশিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হইতেছে না। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্য অনেক প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। দেশহিতৈষীরা ইহা ভুলিবেন না।

—

ভারতের ও বঙ্গের জলপথ

যে সকল রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, উটের গাড়ী ও মোটর গাড়ী যায় তাহা প্রস্তুত করিতে এবং ভাল অবস্থায় রাখিতে অনেক খরচ হয়। ট্রাম গাড়ী চালাইবার রাস্তা নির্মাণ করিতেও বিস্তর খরচ আছে। রেলপথের খরচ আরও বেশী। ছোট-বড় নদীর স্বাভাবিক জলপথ প্রস্তুত করিতে কাহারও খরচ হয় না। তবে নদী বুজিয়া গেলে এবং তাহাতে জলের স্রোত অগভীর ও মন্দীভূত হইলে পঙ্কোদ্ধার ও খননে ব্যয় আছে বটে। কিন্তু মোটের উপর স্বাভাবিক

জলপথের খরচ সকল রকম স্থলপথের চেয়ে কম। সুতরাং যে-দেশে স্বাভাবিক জলপথ আছে, সে দেশের গবর্মেণ্ট সেগুলিকে অব্যবহার্য্য হইতে দিবেন না, এইরূপ আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাভাবিক জলপথগুলি রক্ষা করিবার দিকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যথোচিত মন দেন নাই, হয় ত "পিস্তি রক্ষা" নীতি অনুসারে কোথাও কোথাও যৎকিঞ্চিৎ মন দিয়া থাকিবেন।

জলপথগুলির যথেষ্ট উন্নতি করিবার জন্য ভারত গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া ফেডারেশ্যন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী সম্প্রতি একটি চিঠি লিখিয়াছেন। এই ভারতীয় বণিকসমিতিসকলের সমষ্টির মতে সব প্রদেশের জলপথ রক্ষা ও প্রস্তুত করিবার ভার ভারত গবর্মেণ্টের লওয়া উচিত। ভারত সরকার তাহা করিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে উহা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির কর্ত্তব্য। অবশ্য এমন কোন কোন নদী আছে যাহা কেবল একটি প্রদেশেই প্রবাহিত। কিন্তু বড় বড় সব নদী একাধিক প্রদেশের ভিতর দিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, স্থানে স্থানে কৃত্রিম খাল দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে সংযুক্ত করা আবশ্যক। এই সকল কারণে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলপথসমূহ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য করিবার ভার ভারত সরকারেরই লওয়া উচিত। এই সব জলপথের দ্বারা যে যে প্রদেশের যে পরিমাণ উপকার হইবে, সেই অনুপাতে প্রত্যেকের রাজস্ব হইতে ভারত সরকার টাকা লইতে পারেন।

রেলপথের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়ায় জলপথ অবহেলিত হইয়াছে। রেলপথের দিকে দৃষ্টি দিবার প্রধান কারণ দুটি। রেলওয়ে যে যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইবে, সেখানে বিলাতী পণ্যদ্রব্যের কাটতি বাড়িবে। এই কাজটা জলপথে ষ্টীমার চালাইয়াও কতকটা হইতে পারিত। কিন্তু রেলপথ নির্ম্মাণের অন্য উদ্দেশ্য সাধন তাহার দ্বারা হইত না। সে উদ্দেশ্য, বিলাতের লোহা-ইস্পাতের ব্যবসাদারদের ও এঞ্জিনের কারখানাওয়ালাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি এবং বিস্তর ইংরেজ এঞ্জিনীয়ার এবং ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী অন্যবিধ কর্ম্মচারী পোষণ।

বাস্তবিক কিন্তু রেলের সঙ্গে জলপথের কোন মূলগত বিরোধ নাই। জলপথ রেলের মালগাড়ীর জন্য নানাস্থান হইতে মাল আনিয়া দিতে পারে, আবার মালগাড়ী দ্বারা বাহিত জিনিষ জলপথে দেশের নানা জায়গায় যাইতে পারে। তাহাতে রেলের সুবিধা হইতে পারে।

জলপথের সুবিধা এত বেশী, যে, অন্য যে-সব সভ্য দেশে স্বাভাবিক জলপথ আছে, তাহা রক্ষা করিবার দিকে তথায় ক্রমশঃ অধিকতর দৃষ্টি পড়িতেছে, এবং যেখানে স্বাভাবিক জলপথ নাই সেখানে কৃত্রিম জলপথ প্রস্তুত করা হইতেছে।

জলপথের দ্বারা কেবল যে যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের সুবিধা হয় তাহা নহে। নদীর স্রোত প্রবহমান থাকিলে তাহার ফলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। চাষের জমীতে জলসেচনের সুবিধাও স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলপথ দ্বারা হয়। তদ্ভিন্ন মাছের সরবরাহও এই উপায়ে খুব বেশী পরিমাণে হইতে পারে।

—

আকাশপথ

দেশের মধ্যস্থিত সকল রকম স্থলপথ ও জলপথের চেয়ে আকাশপথ সস্তা। উহা নির্ম্মাণ করিতে হয় না, মেরামতের খরচও নাই। অনেক সভ্য দেশে আকাশযান দ্বারা যাত্রী এবং ডাকের চিঠি লইয়া যাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ঐ উপায়ে মাল চালানও কিছু কিছু হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে, অন্য দুই প্রকার পথ যে যে উদ্দেশ্যে ও যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, আকাশপথও তদ্রূপ ব্যবহৃত হইবে, এবং তাহা স্থলপথ ও জলপথেরই মত বা তাহা অপেক্ষাও নিরাপদ হইবে।

এই বিষয়ে ভারতীয়দিগকে অন্য সব জাতির সমকক্ষ হইতে হইবে।

—

দেশী কাপড়

বিদেশী কাপড় ব্যবহার না করিয়া দেশী কাপড় ব্যবহার করা উচিত,এবিষয়ে সকল স্বদেশপ্রেমিক একমত।

কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক কেবল মাত্র খদ্দর ব্যবহারের পক্ষপাতী, কেহ কেহ দেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করিতে চান, কেহ কেহ বা প্রয়োজন অনুসারে দুই রকম কাপড়ই ব্যবহার করিতে চান। অনেকে বলেন দেশী কাপড়ের কল আরও না বাড়াইলে শুধু চরকা ও হাতের তাঁতের দ্বারা যথেষ্ট কাপড় উৎপাদন করা যাইবে না। তাহা বোধ হয় সত্য নহে। কাপড়ের কল কোন দেশেই যখন প্রচলিত হয় নাই, তখন আমাদের দেশের অধিবাসীদের যত অংশ সূতা কাটিত ও কাপড় বুনিত, এখন যদি তত অংশ তাই করে, তাহা হইলে মিলের সাহায্য ব্যতিরেকেও যথেষ্ট কাপড় উৎপন্ন হইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। তাহাদের অধিকাংশের বৎসরের কয়েক মাস খুব অবসর থাকে, অন্য সময়েও অল্পস্বল্প থাকে। এই অবসর সময়ে তাহারা সূতা কাটিলে যথেষ্ট সূতা উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাদিগকে সূতা কাটিতে প্রবৃত্ত করা কঠিন। প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা হইতেছে।

চরকার প্রচলন সম্বন্ধে নানা আপত্তি শোনা যায়। ইহা খুব দ্রুত সূতা কাটিবার উৎকৃষ্টতম উপায় নহে স্বীকার্য্য। কিন্তু গরুর গাড়ীর চেয়ে মোটর লরী বেশী দ্রুত চলে ও বেশী মাল বহে বলিয়া কেহ কি দেশের সর্ব্বত্র গরুর গাড়ী রহিত করিতে পরামর্শ দেন বা রহিত করিতে পারিয়াছেন? যেখানে যাহাদের যে উপায় সাধ্যায়ত্ত, সেখানে তাহাদের সেই উপায় অবলম্বন করিয়া অনলস ও স্বাধীন জীবন যাপন করা উচিত। উৎকৃষ্টতর উপায় যখন সাধ্যায়ত্ত হইবে, তখন তাহা অবলম্বনীয় হইবে। সূতা কাটিয়া রোজগার কম হয় ইহাও সত্য; কিন্তু বেকার ও অলস থাকা অপেক্ষা চরকার দ্বারা বেশী রোজগার হয়, ইহাও কি সত্য নহে? অন্য অনেক কাজে বেশী রোজগার হয় বটে, কিন্তু সেই কাজ নিজের গ্রামে নিজের ঘরে বসিয়া করিবার সুযোগ না থাকিলে বেশী রোজগারের আশায় আকাশের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা কি ভাল? নিজের গ্রামে থাকিয়া কেহ যদি বেশী রোজগারের কাজ করিতে পারেন করুন, তাহাতে ত কেহ আপত্তি করিতেছে না। আর একটি কথা ভুলিলে চলিবে না। বেশী রোজগারের অন্য যত সব উপায় ও পন্থা আছে, তাহাতে গ্রাম্য অধিকাংশ লোকদের সাধ্যের অতীত মূলধনের দরকার; চরকায় মূলধন খুব সামান্যই চাই। তা ছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, সূতার ও কাপড়ের মিলের সব কল বিদেশ হইতে আসে। বৃহৎ যুদ্ধের সময়, বিদেশী কাপড়ের আমদানীর মত, কলের এবং তাহার মেরামতাদির জন্য আবশ্যক তাহার নানা অংশেরও আমদানী বন্ধ থাকিতে পারে। তাহাতে ক্ষতি অনিবার্য্য। কিন্তু চরকা যুদ্ধ বা শান্তি সকল সময়ে সকল গ্রামে দেশী উপাদানে অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হইতে পারে বলিয়া অন্য দেশ ও জাতি নিরপেক্ষ হইয়া নিজেদের কাপড় নিজেরা উৎপাদন করিবার ইহা শ্রেষ্ঠ উপায়। এই উপায় ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিবার সময় কখনও আসিলে বেশী মূলধন নষ্ট হইবে না; কেননা চরকার দাম দুই তিন টাকা মাত্র। যুদ্ধের সময় বস্ত্রাভাবে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা যদি কেহ নিতান্তই কাল্পনিক বিভীষিকা মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমেরিকার লেবার ষ্টাটিষ্টিক্সের কমিশনার মিঃ এথেলবার্ট ষ্টিউয়ার্টের একটি বক্তৃতা* হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পড়িতে অনুরোধ করি।—

The war had another effect, particularly in the remote countries of the Orient and the smaller countries of Europe. They saw that a war could be brought on by a dozen people whom their influence could not reach and yet that war could absolutely shut off their supplies, not only of clothing but of food and everything else. It aroused a determination in all of these countries to make themselves self-sustaining. During the last ten years India, China and Brazil have increased their output of cotton goods to take care of home requirements; and these were as a matter of fact our greatest customers.

While there have been a number of factories built in India, Persia, and China, *yet the people who were worst hit by the World War have placed looms in their own homes, not even daring to trust large manufacturing establishments in their own countries in the event of war. This is particularly true of China and India.* For many years China was one of the best foreign markets for piecegoods of the United States, and nine-tenths

---

* বক্তৃতাটির নাম "The Present Situation in the Textiles. By Ethelbert Stewart, United States Commissioner of Labor Statistics, Before Labor College of Philadelphia, April 27, 1929."

of the total exports from this country to China consisted of cotton goods. Now less than 5 per cent. of our exports to that country are of that character.

England's control of India made her one of the chief customers of English cotton piecegoods. During the war India was practically shut off from this source of supply; and the Gandhi movement, which has put new life into eastern India, and into cotton manufacturing as the principal industry of that country, threw the manufacture of cotton textiles back into the home. The importance of this industry to India may be measured by the fact that Gandhi's political and economic movement adopted for its symbol the spinning wheel and the hand loom. India uses for her mills the cotton she grows, and is putting up a tariff wall against imports.

This determination to be independent of war conditions over which they have no control has revived the great age-long traditions of those countries and is producing cotton cloths such as have never been surpassed. The erection of a tariff wall seems likely to produce the result that within another ten years Japan, China, and India will produce all the cotton yarns and coarse cotton cloths for the hundreds of millions of souls in China, India, Dutch East Indies, Japan, and the surrounding islands, as well as a large part of the requirements of the Philippine Islands.

In other words, let us say bluntly and plainly, even though some people will not like it, that the great World War, which was inaugurated for the purpose of commercial expansion for two of the principal contending parties and which we went into because we thought it was a war to end war, really will eventually result in the end of commercial expansion.

যাঁহারা বলেন, কেবল চরকা ও হাতের তাঁতের দ্বারা ভারতবর্ষের জন্য আবশ্যক সব কাপড় উৎপাদন করা যাইবে না, তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে অন্য এই সত্য কথাটিও মনে রাখিতে হইবে, যে, কেবল দেশী মিলগুলির দ্বারাও ভারতের প্রয়োজনীয় সব কাপড় উৎপন্ন হয় না এবং অচিরে হইবে না। উভয় উপায়েই বিদেশী কাপড় বাজার হইতে তাড়াইতে হইবে।

—

মহারাণা প্রতাপসিংহ

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছিল, ৬ই মে মহারাণা প্রতাপসিংহের জন্মদিন। উহা "৯ই মে" হইবে। তাঁহার জন্মদিনের উৎসব চান্দ্র মাস ও তিথি অনুসারে হয়। এইজন্য এবৎসর তাঁহার জন্মতিথির উৎসব বা জয়ন্তী ১০ই জুন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় ৯ই জুন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এই উপলক্ষ্যে নানা প্রকার ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। ১০ই জুন পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে আলবার্ট হলে সভা হয়। ভারতের সকল প্রদেশে অন্য অনেক স্থানেও মহাসমারোহে প্রতাপ-জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে।

মহারাণা প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে গত মাসের প্রবাসীতে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। সম্প্রতি পশ্চিমের কোন এক শহরের অত্যুদার এক ন্যাশন্যালিষ্টের প্রতাপসিংহ সম্বন্ধীয় মন্তব্য শুনিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, এরূপ অতিবিজ্ঞ লোক আরও থাকিতে পারে। সেইজন্য ঐ মন্তব্যের একটু আলোচনা করিব।

শ্রীযুক্ত ক্ষেমানন্দ রাহুত প্রতাপ-জয়ন্তী সর্ব্বত্র করাইবার জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া নানা জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত লোকটির (তাঁহার নাম জানি না) নিকট রাহুতজী গেলে তিনি বলেন, প্রতাপ সিংহ মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল করিয়াছিলেন বলা যায় না; কেন-না আকবর সমস্ত, দেশ ও জাতিকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রতাপ তাহাতে বাধা দেন। এই মতটা শুনিতে আপাতত মন্দ মনে হয় না; কিন্তু উহা বস্তুতঃ অসার।

আকবর হিন্দুর কন্যার সহিত মুসলমানের বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন এবং কয়েকটি স্থলে এই চেষ্টায় কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি (culture) আলাদা, তাহাদের মধ্যে বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাতে তাহাদের সন্তানদের ক্ষতি ত হয়ই, অধিকন্তু সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার উপর দুর্ব্বল পক্ষের (এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর) কোন অধিকারই থাকে না। যে সকল রাজপুত নারীর সহিত মুসলমানের বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদের সন্তানেরা সবাই মুসলমান হইয়াছিল, একজনও হিন্দু হয় নাই। সুতরাং এরূপ বিবাহের মানে হিন্দু জাতির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক পরাজয়। আকবর যুদ্ধ দ্বারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাজয় সাধন করিয়া তাহার উপর হিন্দু-কন্যার সহিত মুসলমানের বিবাহ চালাইয়া হিন্দুজাতির ধার্ম্মিক ও সামাজিক পরাজয়ও সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রতাপ উভয় পরাজয়েই বাধা দিয়াছিলেন। আমাদের মতে তিনি ঠিক করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মের লোকের বাস। কোন একটি

ধর্ম্মের পক্ষে অপর সব ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ভারতের ঐক্য-সাধন যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলেও হিন্দুর বিলোপ দ্বারা সেরূপ ঐক্যসাধনে হিন্দুর আপত্তিকে কখনই মন্দ বলা যায় না। ভবিষ্যৎ ভারতে বর্ত্তমানের সব ধর্ম্মই থাকিবে কিনা জানি না, অনুমানও করিতে পারি না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় একতা সম্পাদনের জন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদেরই তাহাদের ধর্ম্মের লোপে সম্মতি দানের প্রয়োজন দেখিতেছি না। সকলেই যদি নিজ নিজ ধর্ম্মের সার অংশ ভিন্ন অবান্তর সব বিষয়ে উদারতা অবলম্বন করেন ও পরমত-সহিষ্ণু হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় একতার কোন ব্যাঘাত জন্মে না।

আকবর যেমন ভারতের সব রাজাকে ও তাহার মধ্যে প্রতাপকেও বশ্যতা স্বীকার করাইতে চাহিয়াছিলেন, প্রতাপও তেমনি তাঁহাকে (আকবরকে) বশ্যতা স্বীকার করিতে বলিতে পারিতেন। তাহা তিনি করেন নাই; তিনি নিজে স্বাধীন থাকিতে ও নিজের রাজ্যকে স্বাধীন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কেহ যদি বলে, "তুমি আমার অধীন হও, আমি প্রভুত্ব করিব," এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাহাতে রাজী না হয়, তাহা হইলে তাহাকে একতাবিরোধী খারাপ লোক বলা চলে না।

বর্ত্তমান ভারতের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। এখন ব্রিটিশ-শাসিত ভারত লোকসংখ্যায় ও আয়তনে দেশী রাজ্যগুলির সমষ্টি অপেক্ষা বড়। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের নেতারা ইহা বলিতেছেন না, যে, স্বরাজের মানে এই হইবে, যে, দেশী রাজ্যগুলি ও তাহাদের রাজারা ব্রিটিশ ভারতের অধীন হইবে, কিম্বা মুসলমান হিন্দুর বা হিন্দু মুসলমানের অধীন হইবে। তাঁহারা চাহিতেছেন এমন একটি ফেডারেশ্যন বা সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রসমষ্টি যাহাতে ব্রিটিশ প্রদেশগুলির ও বড় বড় দেশী রাজ্যগুলির যথাযোগ্য স্থান থাকিবে, এবং সমুদয়ের প্রতিনিধিবর্গের মত অনুসারে সমগ্র দেশের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। আকবর এরূপ কিছু চান নাই; সেকালে তাঁহার মনে এরূপ আদর্শের আবির্ভাব হয় ত সম্ভবপর ছিল না; তিনি চাহিয়াছিলেন একছত্র সাম্রাজ্য। তাহাতে স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট অন্য কোন রাজা কেন স্বেচ্ছায় রাজী হইবেন? বস্তুতঃ তিনি যেরূপ একনায়কত্ব এবং একত্ব সমগ্র ভারতে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা স্থাপিত হইলেও টিকিত না। তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের আমলে ভারতবর্ষের যতটা অংশ একছত্র হইয়াছিল, তাহাও ত আওরংজেব বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার কারণ, মোগল শাসননীতির মূলেই এমন কিছু দোষ ছিল যাহা বহুসংখ্যক লোকের মনুষ্যত্বে আঘাত করিত। যে-নীতি কাহারও মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিতে চায়, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় একতা সেরূপ নীতির ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সেকণ্ডারী এডুকেশ্যন বিল

বর্ত্তমানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি অংশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অংশতঃ সরকারী শিক্ষাবিভাগের নিয়ম মানিতে বাধ্য। কিন্তু সেকণ্ডারী স্কুল নামে পরিচিত সরকারী, বেসরকারী, ও সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও হিতসাধন ঠিক কাহারও যেন কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভূত হয় না। এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা দূর করিবার জন্য গবর্মেণ্ট একটি সেকণ্ডারী এডুকেশ্যন বোর্ড (শিক্ষাসমিতি) গঠন করিতে চান। তাহার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই সংশোধিত বিলেও খুঁৎ আছে। তাহারই সামান্য আলোচনা করিব।

বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট (সভাপতি) নিযুক্ত করিবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার অর্থাৎ বঙ্গের লাট সাহেব। নিয়োগের পূর্ব্বে তিনি সেনেটের প্রেরিত এক বা একাধিক যোগ্য ব্যক্তির নাম বিবেচনা করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও নিযুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবেন না। বোর্ডের সভ্যেরাই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন, এইরূপ নিয়ম হইলে ভাল হইত। তদভাবে অন্ততঃ এই নিয়ম হওয়া উচিত ছিল, যে, চ্যান্সেলার সেনেটের প্রেরিত নামতালিকার মধ্য হইতেই কাহাকেও নিযুক্ত করিবেন।

এই বিলে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি মনোনয়নের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা অবাঞ্ছনীয়।

বোর্ডের অধীন ইন্সপেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারী প্রথম

দুই বৎসর (বা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট তদপেক্ষা কম সময়) গবর্ন্মেণ্ট নিযুক্ত করিবেন। এই সময় যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পেন্সন পাওয়া পর্য্যন্ত কাজ করিবেন। সুতরাং এই নিয়মটির ফল এই দাঁড়াইবে, যে, এখন দীর্ঘকাল বোর্ড (গবর্ণরের নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট এবং) গবর্ন্মেণ্ট-নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীদের দ্বারা কাজ চালাইবেন। ইহাতে উহার স্বাধীনতা কতটা রক্ষা পাইবে, সহজেই অনুমেয়।

বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ছাড়া অন্য নূতন পরীক্ষার সৃষ্টি করিয়া তাহা চালাইতে ও তাহাতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন। এই নিয়মটির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইতে পারে। যদি বোর্ড ম্যাট্রিকুলেশনের সমতুল্য কোন পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে ম্যাট্রিকুলেশনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমিবে। এই সংখ্যার হ্রাস খুব বেশী হইতে পারে, যদি এই নূতন পরীক্ষা পাস করা সরকারী চাকরীর উমেদারদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ম্যাট্রিকুলেশনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য ছাত্র কমিবে, এবং তাহাতে উচ্চ শিক্ষার প্রসার কমিবে। পরীক্ষার্থী কমিলে তাহাদের প্রদত্ত ফী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কমিয়া যাইবে, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালান কঠিন হইবে।

নিয়মে আছে বটে, বোর্ড নূতন পরীক্ষা সেনেটের সম্মতিক্রমে প্রবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু সেনেটে গবর্ন্মেণ্ট-মনোনীত সভ্যের সংখ্যাই বেশী। গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রেত কাজ তাঁহাদের দ্বারা করান কঠিন হইবে না।

প্রধান মন্ত্রীর প্রথম বক্তৃতা

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিস্থলাভের পরেই প্রথম যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহাতে সাম্রাজ্যের ও পৃথিবীর অনেক কথা আছে, কিন্তু ভারতের নামটি পর্য্যন্ত নাই। অথচ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকলের চেয়ে বেশী লোক বাস করে, এবং ভারতবর্ষ ব্রিটেনের ধনশালিতা ও শক্তিশালিতার যেরূপ মূলীভূত, অন্য কোন দেশ সেরূপ নহে।

শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে ভারতবর্ষের যে বেশী কিছু আশা করা উচিত নয়, এই বক্তৃতাটি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

নারীনির্যাতন ও তাহার জন্য লঘুদণ্ড

বঙ্গে নারীহরণ ও নারীধর্ষণের বিরাম নাই। ইহা সকল ধর্ম্মাবলম্বী বাঙালীর এবং বাংলা গবর্ন্মেণ্টের মহা কলঙ্ক। ইহা বিশেষ করিয়া তাহাদের কলঙ্ক যাহারা দল বাঁধিয়া এই পৈশাচিক কাজ করে, এবং হৃতা নারীকে সমধর্ম্মী গৃহস্থদের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে লুকাইয়া লইয়া বেড়ায়। এইরূপ নারীদের উদ্ধারসাধন ও তাহাদের নিজ নিজ সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। যেখানে এইরূপ অত্যাচরিতা হিন্দু নারীকে স্থানীয় হিন্দুসমাজ সমাজে স্থান না দেন, সেখানে তাঁহারা মহা পাপ করেন। অত্যাচরিতা নারীর কোন দোষ নাই, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নাই।

বিচারে যাহাতে দুর্বৃত্তেরা শাস্তি পায়, তাহার চেষ্টা নারীরক্ষাসমিতি যথাসাধ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সমিতির অর্থবল ও লোকবল যথেষ্ট নহে। ইঁহাদের কর্ম্মীর সংখ্যা ও অর্থবল বাড়া একান্ত আবশ্যক।

দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি কখন কখন বড় কম হয়। বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহাদের কৃত অপরাধের জন্য আইনে নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হওয়া উচিত। কোন কোন হাই-কোর্টের জজেরা লঘু দণ্ডের বিরুদ্ধে এবং কঠোর দণ্ডের সপক্ষে মত প্রকাশও করিয়াছেন।

দুর্ব্বৃত্তদের পাশব প্রবৃত্তির আতিশয্য একটা ব্যাধি। তাহার জন্য জেলে তাহাদের ভ্যাসেক্টোমী (vasectomy,) নামক অস্ত্রচিকিৎসার আইন হওয়া উচিত। তাহা হইলে দুর্ব্বৃত্তরা ব্যাধিমুক্ত হইবে, এবং তাহাদের ও সমাজের হিত হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে এবিষয়ে আমাদের অনুরোধ জানাইতেছি।

ডাকহরকরার মাথায় ছাট

এ মাসের সম্পাদকের চিঠিতে একটা কথা লিখিতে ভুল হইয়াছে। সোনাড়া হইতে পুরুলিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিয়াছিলাম, একজন ডাকহরকরা কাঁধের ঘণ্টা-বাঁধা বর্শায় চিঠির থলি ঝুলাইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে

করিতে যাইতেছে। তাহার পরনে একটি খাট ধুতি, হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত নামিয়াছে, গায়ে একটি ফতুয়া, এবং মাথায় একটি সোলা হ্যাট। সোলা হ্যাটটি সে নিজে কিনিয়াছে, কিম্বা মানভূম জেলার ডাকঘরের ব্যবস্থাই ঐরূপ, জানি না। কিন্তু আমাদের গরমের দেশে সোলার টুপির ব্যবহার খুব সুবিধাজনক। ধুতির উপর উহা ব্যবহারে কোন দোষ নাই। আমরা ইংরেজদের কোটপ্যাণ্টালুন না লইয়া হ্যাটটি লইলে ভাল করিতাম।

কলিকাতার রাস্তার মধ্যে ইংরেজ ফিরিঙ্গী পাহারাওয়ালারা দাঁড়াইয়া থাকে হ্যাট মাথায় দিয়া, এবং দেশী পাহারাওয়ালারা দাঁড়াইয়া থাকে বুকে ছাতার বাঁট আঁটিয়া ছাতা মাথায় দিয়া। ইহাতে দেশী পাহারাওয়ালার বোঝা বাড়ে, দ্রুত চলিবার ও দৌড়িবার ক্ষমতা কমে, এবং মোটের উপর সে হ্যাটধারী পাহারাওয়ালার চেয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে।

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি

২৯শে জ্যৈষ্ঠের কাগজে দেখিতেছি, স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির সভাপতি এবং স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস সহকারী সভাপতি হইবেন। স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বড় লাটের শাসনপরিষদের সভাপদের কার্য্যকাল শেষ হইলে কমিটির সভাপতির কার্য্যভার লইবেন। ততদিন স্যার পুরুষোত্তমদাস সভাপতির কাজ চালাইবেন। একজন সম্পূর্ণ বেসরকারী লোক কমিটির সভাপতি হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, তদন্তের ফলে দেশী ব্যাঙ্কগুলির স্থায়িত্ব ও উন্নতির পক্ষে সুবিধাজনক ব্যবস্থা হইলে সুখের বিষয় হইবে, নতুবা কুফলের সম্ভাবনা আছে।

কারখানায় শ্রমকালের দৈর্ঘ্য

১৯১৯ সালে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে স্থির হয়, যে, পৃথিবীর সব দেশে কারখানার শ্রমিকরা সাধারণতঃ প্রত্যহ আট ঘণ্টা ও সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশী কাজ করিবে না, এইরূপ নিয়ম নাথা। এইরূপ নিয়ম চালাইবার আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে কাজ করিতে সকলের চেয়ে বড় পণ্যদ্রব্যপ্রস্তুতকারী কারখানাওয়ালা জাতিরা যে প্রথম হইতেই রাজী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইংলণ্ড আট নয় বৎসর আগেই সম্মতি দিয়াছিলেন, নিজে রাজী হন নাই। এখন ইংলণ্ড এই দশ বৎসর পরে সম্মতি দিবেন বলিতেছেন। এই খবর আজ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ আসিয়াছে। ভারতের মজুররা বেশী খাটিয়া যাহাতে জেরবার না হয়, সেজন্য ইংরেজদের প্রাণ আগেই কাঁদিয়াছিল; কিন্তু ইংলণ্ডের মজুরদের জন্য প্রাণ কাঁদিল দশ বৎসর পরে। অন্য অনেক কারখানাওয়ালা বড় জাতিও এই বিষয়ে ইংলণ্ডের মত দোষী। দুষ্ট লোকেরা বলে, ভারতীয় কারখানায় যাহাতে বেশী জিনিষ উৎপন্ন না হয়, সেই জন্যই এদেশে কারখানার শ্রমিকদের শ্রমকালের দৈর্ঘ্য আগেই বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মীরাটে ও অন্যত্র রাজনৈতিক মোকদ্দমা

১২ই জুন ২৯শে জ্যৈষ্ঠ মীরাটে, কলিকাতায় ও অন্য কোন কোন শহরে রাজনৈতিক মোকদ্দমা হইয়াছে। এরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা এখন এত বেশী, যে, একই দিনে অনেক রাজনৈতিক মোকদ্দমা হওয়াটা আকস্মিক মল মাত্র।

৩০শে জ্যৈষ্ঠের দৈনিক কাগজে দেখিতেছি, মীরাটের মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের কৌন্সুলি মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্‌স্‌ বক্তৃতায় অন্যান্য কথার মধ্যে ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে, আসামীরা স্বাজাতিকতার বিরোধী, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি নেতাকে উপহাসবিদ্রূপ করে, ইত্যাদি। এই সব কথা বলা অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে চক্রান্তকারী রাজদ্রোহী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের স্বদেশবাসীদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিবার ও তাহাদের খ্যাতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায় থাকিলে তজ্জন্য আবশ্যক বটে। এরূপ বক্তৃতা করা ব্যবহারাজীবদের শিষ্টাচারসম্মত হইতে বা না হইতে পারে। ইহা ছাড়া আর এক উপায়ে রাজনৈতিক অভিযুক্তদিগকে আঘাত করিবার চেষ্টা হয়। এই উপায়টি হইতেছে, তাহাদের মোকদ্দমার বিকৃত রিপোর্ট বাহির করা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠের কলিকাতার একটা দৈনিকে একটি মোকদ্দমার এইরূপ রিপোর্ট বাহির করান হইয়াছে।

নায়িকা

প্রাচীন রাজপুত (পাহাড়ী) চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৬

৪র্থ সংখ্যা

শিবাজী ও আওরংজীব

স্যার যদুনাথ সরকার

(১)

ভারতের পশ্চিমে সাগর-উপকূল হইতে বার মাইল দূরে তাপ্তী নদীর তীরে সুরত নগর। অনেক আগে এখানে বড় বড় জাহাজের যাতায়াত ছিল, কিন্তু এখন নদীর মুখ এই শহর হইতে ছয় সাত ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে, কাজেই সমুদ্রগামী জাহাজগুলি সেই মুখের কাছে, সুহালিলী (ইংরাজী Swally Hole) নামক স্থানে নোঙর করিয়া থাকে, আর অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ ও নৌকা নদী উজাইয়া সুরতে আসে। তবুও, সুরত মুঘল-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। বাণিজ্যের মাশুলের আয়ে এবং ধনরত্নে এক দিল্লী ভিন্ন আর কোন নগর ইহার সমকক্ষ ছিল না। প্রাচীন হিন্দুযুগে ইহার কিছু উত্তরে নর্ম্মদার মুখের কাছে ভারুকচ্ছ (বর্ত্তমান ভরোচ, প্রাচীন গ্রীক নাম বারুগজা) শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিন চলিয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন সুরত হইতে মক্কা-মদিনায় যাত্রী লইয়া জাহাজ ছাড়িত; এজন্য ইহার নাম ছিল "ইসলামের পুণ্য তীর্থের দ্বার।" এখান হইতেই ভারতীয় মুসলমানগণ আরব দেশের জন্য তীর্থযাত্রা করিতেন।

সুরতের দুই অংশ, একটি দুর্গ ও অপরটি শহর। দুর্গটি ছোট ও সুরক্ষিত। কিন্তু শহরটি চারি বর্গ মাইল বিস্তৃত, ধনেজনে পরিপূর্ণ। লোকসংখ্যা দুই লক্ষ; বাণিজ্য-দ্রব্যের মাশুল হইতে রাজকোষে বৎসরে বার লক্ষ টাকা আয় হইত, অর্থাৎ আমদানী জিনিষের মূল্য পরিমাণে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ছিল। এ সময়ে শহরের চারিদিকে প্রাচীর ছিল না, শুধু স্থানে স্থানে বাহির হইতে আসিবার রাস্তার মুখে সামান্য রকমের ফটক এবং কোথাও কোথাও শুষ্ক পরিখা ছিল; তাহা সহজেই পার হওয়া যাইত।

সুরত শহরের ধনরত্নের তুলনা ভারতের অন্যত্র পাওয়া কঠিন। একা বহরজী বোরার সম্পত্তির পরিমাণই আশী লক্ষ টাকা, তাহার পর হাজী সাইদ বেগ ও অন্য বণিকদের ত কথাই নাই। অথচ শহর-রক্ষার বন্দোবস্ত মোটেই ছিল না। শহরের শাসনকর্ত্তা পাঁচশত রক্ষী-সৈন্যের বেতন রাজদরবার হইতে

পাইতেন বটে, কিন্তু লোকজন রাখিতেন না,—টাকাটা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতেন। নগরবাসিগণও শান্তিপ্রিয়, দুর্ব্বল এবং ভীরু, অধিকাংশই অহিংস জৈন, শুচিবাইগ্রস্ত অগ্নি-উপাসক পারসী, অথবা অর্থপ্রিয় দোকানী এবং নিরীহ গুজরাতী কারিগর। ইহারা আত্মরক্ষার জন্য কি যুদ্ধ করিবে? মহাধনী ভারতীয় বণিকগণও নিজ সম্পত্তির সহস্রাংশ ব্যয় করিয়া চৌকিদার এবং সিপাহী রাখার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই! ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বাদশাহের পক্ষে ইনাএৎ খাঁ সুরত বন্দরের শাসনকর্ত্তা ছিল; লোকটি যেমন অর্থলোভী তেমনই কাপুরুষ ও অকর্ম্মণ্য। কিন্তু দুর্গটি একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর হাতে ছিল, সে ইনাএৎ-এর অধীনতা স্বীকার করিত না।

(২)

মঙ্গলবার, ৫ই জানুয়ারি, প্রাতে সুরতবাসিগণ সভয়ে শুনিল, দুইদিন পূর্ব্বে শিবাজী সসৈন্য আটাশ মাইল দক্ষিণে পৌঁছিয়াছেন, এবং সুরতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। অমনি শহরময় সোরগোল উঠিল; আতঙ্কে লোকজন পলাইতে সুরু করিল। যে পারিল স্ত্রীপুত্র লইয়া নদী পার হইয়া দূরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে আশ্রয় লইল। ধনী লোকেরা দুর্গের অধ্যক্ষকে ঘুষ দিয়া সপরিবারে তথায় স্থান পাইলেন; তাহাদের মধ্যে শহরের রক্ষক ইনাএৎ খাঁ সর্ব্বপ্রথম!

অথচ মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় এই সময়ে আশ্চর্য্য সাহস দেখাইয়া নিজ ধন প্রাণ মান বাঁচাইতে সক্ষম হইল। সুরতের ইংরাজ ও ডচ্ বণিকগণ নিজ নিজ কুঠীতে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া শিবাজীর সমস্ত সৈন্যবলকে হটাইয়া দিল। তাহাদের কুঠীগুলি সাধারণ খোলাবাড়ী, দুর্গ নহে, চারিদিকে সীমানার দেয়াল পর্য্যন্ত ছিল না। ইংরাজ-কুঠীর প্রধান, স্যর জর্জ অক্‌সিণ্ডেন, ইচ্ছা করিলে সহজেই সুহায়িলীতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া স্বয়ং সুরতে থাকিয়া যুদ্ধের নেতৃত্ব লইলেন। সত্বর ছয়টি ছোট ছোট কামান সংগ্রহ করিয়া, সুহায়িলী হইতে জাহাজী গোরা আনিয়া, মোট একশত পঞ্চাশজন ইংরাজ এবং ষাটজন পিয়নকে সুরতের কুঠী রক্ষা করিবার জন্য সজ্জিত করা হইল। চারিটি কামান ছাদের উপর বসান হইল, তাহার গোলা পাশের দুটি রাস্তা এবং নিকটবর্ত্তী হাজী সাইদ বেগের বাড়ীর উপর পড়িতে পারিত। আর দুইটি তোপ সদর-দরজার পিছনে বসান হইল, এবং ঐ দরজায় এমন করিয়া দুটি ছিদ্র করা হইল যাহাতে তাহার মধ্য দিয়া কামানের মুখ বাহির হইতে পারে এবং রাস্তা হইতে কুঠীতে আসিবার পথে যে ঢুকিবে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায়। তাড়াতাড়ি কয়েক দিনের জন্য খাদ্য ও জল আনিয়া মজুত করা হইল। ইংরাজদের কেহ সীসা দিয়া গুলি প্রস্তুত করিতে সুরু করিল, কেহ অপর যুদ্ধ-সামগ্রী তৈয়ারে মন দিল, কেহ বা কুঠীর দেয়াল মেরামত করিয়া দৃঢ়তর করিল। প্রত্যেক লোককে নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থান চিনাইয়া দেওয়া হইল, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নেতা (কাপ্তেন) নিযুক্ত হইল। সব কাজের জন্য শৃঙ্খলা সুন্দর ব্যবস্থা এবং আগে হইতে ভাবিয়া উপায় ঠিক করিয়া রাখা হইল। বুধবার প্রাতে অক্‌সিণ্ডেন তাঁহার দুইশত অনুচর লইয়া ঢাক তুরী বাজাইয়া শহরের মধ্য দিয়া কুচ করিয়া আসিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে বলিতে লাগিলেন, "এই কয়টি লোক লইয়াই আমি শিবাজীর গতি রোধ করিব।" ডচেরাও তাহাদের কুঠী রক্ষার জন্য সজ্জিত হইল, এবং এই-সব আয়োজন দেখিয়া কতকগুলি তুর্কী ও আরমানী-বণিক নিজ নিজ সম্পত্তি একটি সরাই-এ লইয়া গিয়া তাহাকে দুর্গে পরিণত করিল। আর "ভারত? শুধু ঘুমাইয়া" রহিল।

(৩)

বাছা বাছা দ্রুতগামী অশ্বে চারি হাজার সৈন্য চড়াইয়া শিবাজী বম্বের কাছ হইতে গোপনে বেগে অগ্রসর হইয়া সুরতের নিকট পৌঁছিলেন, পথে দুইজন কোলী রাজা লুঠের ভাগ পাইবার লোভে ছয় হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। বুধবার (৬ই জানুয়ারি ১৬৬৪) দুপুর বেলা শিবাজী সুরত শহরের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং "বুর্হানপুর দরজার" সিকি মাইল দূরে একটি বাগানে

নিজ তাম্বু খাটাইলেন। মারাঠা অশ্বারোহিগণ অমনি অরক্ষিত অর্দ্ধজনশূন্য শহরে ঢুকিয়া বাড়ীঘর লুঠ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। একদল শহরের মধ্য হইতে দুর্গের দেওয়াল লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল, ভয়ে দুর্গরক্ষী বীরগণ কেহই মাথা তুলিল না, বা শহর লুঠে বাধা দিল না।

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই চারিদিন ধরিয়া শহর অবাধে লুণ্ঠিত হইল। মারাঠারা প্রত্যহ নূতন নূতন পাড়ায় ঘর জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। সে সময় সুরতে পাকা বাড়ী দশ-বিশটার অধিক ছিল না, বাকি হাজার হাজার বাড়ীর কাঠের খুঁটি, বাঁশের দেওয়াল, খড় বা খোলার চাল, এবং মাটির মেঝে। এ হেন স্থানে মারাঠাদের অগ্নিকাণ্ড সহজেই "রাত্রিকে দিনের মত উজ্জ্বল এবং ধূমবৃষ্টি দিনকে রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া তুলিল—সূর্য্যের মুখ ঢাকিয়া দিল।" [ইংরাজ পুরোহিতের বিবরণ]।

শিবাজী

ডচ্ কুঠীর কাছে সুরতের—সুরতের কেন, সমস্ত এশিয়াখণ্ডের—শ্রেষ্ঠ ধনী বহরজী বোরার প্রাসাদ অরক্ষিত জনশূন্য দেখিয়া মারাঠারা তিনদিন তিনরাত্রি ধরিয়া মেঝে খুঁড়িয়া লুঠ করিল, সমস্ত ধনরত্ন এবং আটাশ সের মোতির বোঝা লইয়া অবশেষে ঘরে আগুন দিয়া প্রস্থান করিল। ইংরাজ-কুঠীর নিকটে আরও একজন মহাধনী হাজী সাইদ বেগের বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহারা সারাদিন রাত্রি দরজা-বাক্স ইত্যাদি ভাঙিয়া যত পারিল টাকা সরাইল। গুদামে ঢুকিয়া পারদের পিপে ভাঙিয়া তাহা মাটিতে ছড়াইয়া দিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার বৈকালে যখন পঁচিশজন মারাঠা-সৈন্য ইংরাজ-কুঠীর নিকটস্থ একটি ঘরে আগুন লাগাইতে উদ্যত, সেই সময় ইংরাজেরা কুঠী হইতে বাহির হইয়া তাহাদের মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায়, সাইদ বেগের বাড়ীর মারাঠা দলও ভয়ে সরিয়া পড়িল। পরদিন ইংরাজেরা কয়েকজন নিজের লোক পাঠাইয়া ঐ বণিকের বাড়ী রক্ষার ভার লইল। এইরূপে ধনের খনি হাত-ছাড়া হওয়াতে শিবাজী চটিয়া ইংরাজ-কুঠীতে বলিয়া পাঠাইলেন "হয় আমাকে তিন লক্ষ টাকা দাও, না হয় হাজী সাইদের বাড়ী লুঠিতে দাও। নতুবা আমি স্বয়ং আসিয়া, তোমাদের প্রত্যেকের গলা কাটিব এবং কুঠী ভূমিসাৎ করিয়া দিব।" সুচতুর ইংরাজ-নেতা উত্তর দিবার জন্য কিছু সময় চাহিয়া লইয়া শনিবার প্রাতঃকাল (অর্থাৎ চতুর্থ দিন) পর্য্যন্ত কাটাইলেন, তাহার পর শিবাজীকে খবর পাঠাইলেন—"আমরা দুইটি শর্তের কোনটিতেই রাজি নহি, আপনি যাহা করিতে পারেন করুন; আমরা প্রস্তুত আছি, পলাইব না। যে সময় ইচ্ছা এই কুঠী আক্রমণ করুন। আর, এই কুঠী লইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বলিতেছেন; বেশ ত, যখন আসিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার এক প্রহর আগেই আসিবেন।" শিবাজী আর কিছুই করিলেন না; তিনি সুরত হইতে অবাধে এক কোটির অধিক টাকা পাইয়াছেন, তবে আর কেন দুই-এক

লাখের জন্য স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইংরাজদের তোপের মুখে নিজ সৈন্য নষ্ট করিবেন?

(৪)

সুরত লুণ্ঠনের ফলে অগণিত ধন লাভ হইল। বহু বৎসরেও এই সময়ের মত শহরে অর্থ রত্ন ইত্যাদি সংগৃহীত হয় নাই। মারাঠারা সোনা, রূপা, মোতি হীরা ও রত্ন ভিন্ন আর কিছুই ছুঁইল না।

সুরতবাসীদের ধরিয়া আনিয়া কোথায় তাহারা নিজ নিজ ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার সন্ধানের জন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুর পীড়নই বাকি রহিল না; চাবুক মারা হইল, প্রাণ বধের ভয় দেখান হইল, কাহারও এক হাত কাহারও বা দুই হাত কাটিয়া ফেলা হইল, এবং কতক লোকের প্রাণ পর্য্যন্ত লওয়া হইল। "মিষ্টর এণ্টনি স্মিথ (ইংরাজ-বণিক) স্বচক্ষে দেখিলেন যে, শিবাজীর শিবিরে একদিনে ছাব্বিশ জনের মাথা এবং ত্রিশজনের হাত কাটিয়া ফেলা হইল; বন্দীদের যে-কেহ যথেষ্ট টাকা দিতে পারিল না তাহার অঙ্গহানি বা প্রাণবধের আজ্ঞা হইল। শিবাজীর লুঠের প্রণালী এইরূপ, প্রথমে বাড়ী হইতে যাহা সম্ভব লইয়া, গৃহস্বামীকে বলা হইল যদি বাড়ী বাঁচাইতে চাও ত তাহার জন্য আরও কিছু দাও। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সেই টাকা আদায় হইল অমনি নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ঘরগুলি পুড়াইয়া দিলেন!" [সুরত কুঠীর পত্র।] একজন বুড়া বণিক আগ্রা হইতে চল্লিশটি বলদ বোঝাই করিয়া কাপড় আনিয়াছিল, কিন্তু তাহা বিক্রয় না হওয়ায়,নগদ টাকা দিতে না পারিয়া ঐ সমস্ত মাল শিবাজীকে দিতে চাহিল; তবুও তাহার ডান হাত কাটিয়া তাহার কাপড়গুলি পুড়াইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। অথচ একজন ইহুদী মণি-বিক্রেতা বেশ বাঁচিয়া গেল; সে 'আমার কিছু নাই' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল; মারাঠারাও ছাড়িবে না, তাহাকে বধ করিবার হুকুম হইল; তিন তিনবার তরবারি তাহার মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘাড়ে ছোঁয়ান হইল, কিন্তু সে কিছুই দিতে না পারিয়া যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে এরূপ ভাণ করিল; অবশেষে আশা নাই দেখিয়া শিবাজী তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ইংরাজ-কুঠীর কর্ম্মচারী এণ্টনি স্মিথ ছচ্ ঘাটে নামামাত্র বন্দী হইয়া তিন দিন শিবাজীর শিবিরে ছিলেন; অন্যান্য বন্দীর সহিত তাঁহারও ডান হাত কাটার হুকুম হইল; কিন্তু তিনি উর্দ্দু ভাষায় চেঁচাইয়া শিবাজীকে বলিলেন, "কাটিতে হয় আমার মাথা কাট, হাত কাটিও না।" তখন মারাঠারা তাঁহার মাথার টুপী খুলিয়া দেখিল যে, তিনি ইংরাজ; দণ্ডাজ্ঞা রদ হইল। পরে তিনশত পঞ্চাশ টাকা দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করা হয়। স্মিথ চোখে দেখিয়া শিবাজী-সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন।

(৫)

ভীরু ইনাএৎ খাঁ দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া শিবাজীকে খুন করিবার এক ফন্দী আঁটিল। বৃহস্পতিবারে সন্ধির প্রস্তাবের ভাণ করিয়া সে একজন বলিষ্ঠ যুবক কর্ম্মচারীকে শিবাজীর নিকট পাঠাইল। সে যাহা দিতে চাহিল তাহা এত অসম্ভবরূপে কম যে, শিবাজী ঘৃণার সঙ্গে বলিলেন, "তোমার প্রভু স্ত্রীলোকের মত ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। সে কি মনে করে আমিও স্ত্রীলোক যে তাহার এই হাস্যকর প্রস্তাবে সম্মত হইব?" যুবকটি উত্তর দিল, "আমরা স্ত্রীলোক নহি। আপনাকে আরও কিছু বলিবার আছে।" এই বলিয়াই সে কাপড়ের মধ্য হইতে লুকান ছোরা বাহির করিয়া সবেগে শিবাজীর দিকে ছুটিয়া গেল। একজন মারাঠা শরীর-রক্ষক তরবারির এক কোপে তাহার হাত কাটিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু যুবক বেগ থামাইতে পারিল না, সেই রক্তাক্ত কাটা হাতের কব্জা দিয়া শিবাজীকে আঘাত করিয়া দুজনে মাটিতে জড়াইয়া পড়িয়া গেল। শিবাজীর দেহে রক্তের দাগ দেখিয়া মারাঠারা চেঁচাইল—"সব বন্দীদের হত্যা কর।" কিন্তু শীঘ্রই খুনী যুবককে হত্যা করা হইল, শিবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্দীদের নিজের সামনে আনিতে বলিলেন। তাহার পর তাহাদের মধ্যে চারি জনকে বধ এবং চব্বিশজনের হাত কাটিয়া ফেলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

(৬)

রবিবার ১০ই জানুয়ারি প্রাতে দশটার পর মারাঠারা হঠাৎ সুরত হইতে চলিয়া গেল, এবং সন্ধ্যার মধ্যেই বার মাইল দূরে পৌছিল, কারণ শিবাজী খবর পাইয়াছিলেন যে, একদল মুঘল-সৈন্য সুরতে আসিতেছে। এই দল ১৭ই তারিখে পৌছিলে তবে ইনাএৎ খাঁ দুর্গের বাহিরে আসিতে সাহস পাইল। নগরবাসিগণ তাহাকে দেখিয়া ছি ছি করিতে লাগিল, কেহ বা কাদামাটি ছুঁড়িতে লাগিল। ইহাতে ইনাএতের পুত্র রাগিয়া একজন নির্দ্দোষ হিন্দু বানিয়াকে হত্যা করিল!

মুঘল-সৈন্যদল পৌছিবার পর ইংরাজ-বণিকগণ তাহার নেতাদের সঙ্গে দেখা করিলেন। শহরবাসীদের মুখে আর ইংরাজদের প্রশংসা ধরে না, তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "এই সাহেবেরা নিজের কুঠীর আশ-পাশে আমাদের অনেকের বাড়ী রক্ষা করিয়াছেন। বাদশাহ ইঁহাদের পুরস্কার দিন!" নবাগত সেনাপতিও ইংরাজদের খুব ধন্যবাদ দিলেন। অক্সিণ্ডেন সাহেবের হাতে একটা পিস্তল ছিল, তিনি অমনি তাহা সেনাপতির সামনে রাখিয়া বলিলেন, "আমরা এখন অস্ত্র ছাড়িয়া দিতেছি, কারণ ভবিষ্যতে আপনিই শহর রক্ষা করিবেন।" সেনাপতি শুনিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ইহা লইলাম, কিন্তু আপনাকে এক খেলাৎ, অশ্ব ও তরবারি দিব।" চতুর বণিকরাজ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না। ওসব জিনিষ সৈন্যদেরই সাজে; আমরা বণিক মাত্র, বাণিজ্যের সুবিধা ভিন্ন আর কোন পুরস্কার আমরা চাহি না।"

বাদশাহ সুরতের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া এক বৎসরের জন্য সমস্ত মাশুল মাপ করিলেন, এবং তাহার পরে ইংরাজ ও ডচ্‌দের পুরস্কার-স্বরূপ তাহাদের আমদানী দ্রব্যের মাশুল শতকরা এক টাকা কমাইয়া দিলেন। [এই অনুগ্রহ নবেম্বর ১৬৭৯ অবধি চলিয়াছিল]

(৭)

সুরত-লুঠের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত মুঘলপক্ষে আর কিছুই কাজ হইল না। সুবাদার কুমার মুয়জ্জম (শাহ আলম) আওরঙ্গাবাদে থাকিয়া আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ মহারাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোর, সিংহগড় দুর্গ অবরোধ করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিলেন (২৮ মে ১৬৬৪)। শিবাজীর দল নানা স্থানে লুঠতরাজ করিতে লাগিল; আজ মহারাষ্ট্রে, কাল কানাড়ায়, পরশু পশ্চিম তীরদেশে। লোকে ভয়ে বিস্ময়ে বলিতে লাগিল, "শিবাজী মানুষ নহেন, তাঁহার বায়বীয় শরীর আছে, ডানা আছে। নচেৎ, তিনি কিরূপে একই সময়ে এত দূর দূর বিভিন্ন স্থানে যাইতে পারিতেছেন?" "তিনি সর্ব্বদাই অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া দ্রুত কুচ করিতেছেন, এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদেরও সেইমত চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। সমস্ত দেশময় রাজারা তাঁহার ত্রাসে কম্পমান। দিন দিন তাঁহার শক্তি বাড়িতেছে।" [ইংরাজ-কুঠীর চিঠি]

এই সময়, ২৩ জানুয়ারি ১৬৬৪, ঘোড়া হইতে পড়িয়া শাহজীর মৃত্যু হইল। তাঁহার যত অস্থাবর সম্পত্তি এবং মহীশূর ও পূর্ব্ব-কর্ণাটকের জাগীর শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী (অথবা একোজী) অধিকার করিলেন।

(৮)

উপর্য্যুপরি এই-সব ক্ষতি ও লজ্জাকর পরাজয় ভোগ করিয়া আওরংজীব অনেক ভাবিয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য মীর্জা রাজা জয়সিংহ কাছোয়া (আম্বের, বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যের অধিপতি)কে নিযুক্ত করিলেন (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৬৬৪)। তাঁহার সঙ্গে বিখ্যাত পাঠান-বীর দিলির খাঁ, আর এক সেনানী দাউদ খাঁ, সুজন সিংহ বুন্দেলা ও অন্যান্য সেনাপতি এবং চৌদ্দ হাজার সৈন্য পাঠান হইল।

জয়সিংহ মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের এক অদ্বিতীয় পুরুষ। রাজপুত বলিলে আমরা সহজেই বুঝি, অসীম সাহসী, মানপ্রিয়, ধন ও স্বার্থে নিস্পৃহ, গোঁয়ার-গোবিন্দ বীর ও ত্যাগী। জয়সিংহ যুদ্ধপটু ভয়হীন তেজী পুরুষ হইলেও সেই সঙ্গে কূট নীতিতে, সভ্যতা-ভব্যতায়, লোকজনকে হাত করিয়া কাজ হাসিল করিবার ক্ষমতাতেও কম পরিপক্ক ছিলেন না। ফলতঃ সম্ভ্রান্ত রাজপুত ও মুঘল—দুই শ্রেণীরই সব গুণগুলি তাঁহার মধ্যে ছিল। বার বৎসর বয়সে এই পিতৃহীন

বালক মুঘল-সেনা বিভাগে প্রবেশ করেন (১৬:৭); তাহার পর জাহাঙ্গীরের শেষকাল এবং শাহজাহানের সমগ্র রাজত্বের ইতিহাস তাঁহার কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল। সুদূর আফগানিস্থানের কান্দাহার হইতে পূর্ব্বপ্রান্তে মুঙ্গের পর্য্যন্ত, আর উত্তরে অক্ষুশ্‌ নদীর তীর হইতে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মুঘল-সৈন্য লইয়া তিনি লড়িয়াছেন এবং সর্ব্বত্রই যশ লাভ করিয়াছেন। রাজনীতির চাল চালিতেও কম দক্ষ ছিলেন না। বাদশাহ সব বিপদে, সব কঠিন কাজে জয়সিংহের উপর নির্ভর করিতেন।

এই ষাট বৎসর বয়সের প্রবীণ নেতা আজ দাক্ষিণাত্যের এক জাগীরদারের পুত্রকে দমন করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবনার অন্ত ছিল না। কি মুঘল, কি বিজাপুরী সেনানী কেহই শিবাজীকে এ পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে পারেন নাই; শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত পর্য্যন্ত হারিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, উত্তর-ভারত হইতে প্রবল সৈন্যদল আসিলে, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদ্বয় মুঘলের ভয়ে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, সুতরাং জয়সিংহকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তিনি সত্য কথাই বাদশাহকে লিখিলেন, "দিনরাতের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম ভোগ করি না, অথবা যে কাজ হাতে লইয়াছি তাহার জন্য না ভাবিয়া থাকি না।"

(৮)

কিন্তু বাধা-বিপত্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরীক্ষা। জয়সিংহ অতিশয় চাতুরী ও দক্ষতার সহিত ভাবী যুদ্ধের সব বন্দোবস্ত করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি নিজ পক্ষে যথাসম্ভব লোক আনিতে এবং শিবাজীর শত্রুদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পুণায় পৌঁছিবার আগেই জানুয়ারি মাসে তিনি মুঘলরাজ্যের বাসিন্দা দুইজন পোর্তুগীজ কাপ্তেন, ফ্রান্সিস্কো এবং ডিওগো ডি মেলো'কে গোয়ায় পোর্তুগাল-রাজপ্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া শিবাজীর নৌবল আক্রমণ করিবার জন্য সাহায্য চাহিলেন। জাঞ্জিরার হাবশী রাজা সিদ্দিকেও সেই মর্ম্মে পত্র লেখা হইল। বিদনুর, বাসবপটন, মহীশূর প্রভৃতির হিন্দু রাজাদের নিকট জয়সিংহের ব্রাহ্মণ-দূতগণ গিয়া অনুরোধ করিল যে, এই সুযোগে তাঁহারা পুরাতন শত্রু বিজাপুর সুলতানের রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা আক্রমণ করুন। কোঁকনের উত্তরে কোলী-দেশের ছোট ছোট সামন্তদিগকে মুঘলপক্ষে আনিবার জন্য জয়সিংহের তোপখানার ফিরিঙ্গী সেনানী নিকোলো মানুশীকে পাঠানো হইল।

দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের সঙ্গে শিবাজীর কোন সময়ে শত্রুতা ছিল তাহাদের ডাকিয়া জয়সিংহ নিজ সৈন্যদলে স্থান দিলেন। মৃত আফজল খাঁর পুত্র ফজল খাঁ ও চন্দ্র রাও মোরের পুত্র বাজী চন্দ্ররাও পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা লইবার এই সুযোগ ছাড়িল না। সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা এবং মুঘলরাজ্যে উচ্চ পদলাভের লোভ দেখাইয়া শিবাজীর কোন কোন কর্ম্মচারীকে ভাঙাইয়া আনা হইল।

তাহার পর বিজাপুররাজকে লোভ ও ভয় দেখান হইল; যদি তিনি সত্যসত্যই মুঘলদের সাহায্য করেন তবে বাদশাহ আর তাঁহাকে শিবাজীর গোপন সহায়ক বলিয়া সন্দেহ করিবেন না, এবং বার্ষিক করের টাকাও কিছু মাপ করিতে পারেন এই আশ্বাস দেওয়া হইল। কিন্তু জয়সিংহের কৃতিত্বের সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি নিজে যে প্রণালীতে যুদ্ধ চালাইবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে বাদশাহের প্রথম আপত্তি কাটাইয়া দিয়া অনুমোদন লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি। তাঁহার পুণায় পৌঁছিতে মার্চ্চ মাস আসিল, আর জুলাই হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হইবে; সুতরাং শিবাজীকে পরাস্ত করিতে হইলে ইহার মধ্যবর্ত্তী তিন মাসেই সে-কাজটি সম্পূর্ণ করা দরকার, নচেৎ আবার আট মাস বসিয়া থাকিতে হইবে। এজন্য জয়সিংহ স্থির করিলেন, সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া সবেগে মারাঠা-রাজ্যের কেন্দ্রে প্রচণ্ড আঘাত করিবেন, অন্যত্র যাইবেন না, বা সৈন্য চারিদিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তি হানি করিবেন না। বাদশাহ বারবার ধনশালী উর্ব্বর কোঁকন প্রদেশ আক্রমণ করিতে বলেন, কিন্তু জয়সিংহ দৃঢ়তার সহিত তাহা অস্বীকার করেন এবং এই যুক্তি দেন যে, মহারাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড পুণা অঞ্চল নিষ্কণ্টক করিয়া

…াত করিতে পারিলেই কোঁকন প্রভৃতি দূরের অঞ্চলগুলি আপনা হইতে বশে আসিবে।

সর্ব্বশেষে জয়সিংহ বলিলেন যে, যুদ্ধে দুই-তিনজন প্রধানের হাতে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিলে, একমাত্র সর্ব্বোচ্চ সেনাপতির কর্ত্তৃত্বে সকলকে না রাখিলে জয়লাভ অসম্ভব। বাদশাহ এই সৎ যুক্তি মানিয়া লইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, সৈন্য-বিভাগের সমস্ত নিয়োগ, কর্ম্মচ্যুতি, উন্নতি-অবনতি, রসদ ও তোপ, সন্ধি করা ও ঘুষ দেওয়া,—সকল কাজেই একমাত্র জয়সিংহের হুকুম চলিবে, আওরঙ্গাবাদের সুবাদার কুমার মুয়জ্জমের নিকট কোন বিষয়ে মঞ্জুরী লওয়া বা আপিল করার প্রয়োজন হইবে না।

(৯)

দিল্লী হইতে বিদায় লইয়া, সৈন্যসহ দ্রুত কুচ করিয়া, পথের কোথাও অনাবশ্যকভাবে একদিনের জন্যও বিলম্ব না করিয়া জয়সিংহ ৩রা মার্চ্চ পুণায় পৌঁছিলেন। প্রথমেই পুরন্দর আক্রমণ করা সাব্যস্ত হইল।

পুণা শহরের চব্বিশ মাইল দক্ষিণে পুরন্দর দুর্গ। ইহাকে দুর্গ না বলিয়া সুরক্ষিত মহান গিরিসমষ্টি বলিলেই ঠিক হয়। নিজ পুরন্দরের চূড়া সমভূমি হইতে দুই হাজার পাচশত ফিট উঁচু; ইহাই বালা-কেল্লা বা উপরের দুর্গ, চারিপাশ খাড়া পাথর কাটা। আর ইহার তিনশত ফিট নীচে পাহাড়ের গা বহিয়া নীচের দুর্গ (যাহাকে মারাঠী ভাষায় মাচী বলা হয়)। এই মাচীতে সৈন্যদের থাকিবার ঘর ও কার্য্যালয়, কারণ এটি বেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বদিকে মাচীর কোন হইতে এক মাইল লম্বা একটি সরু পাহাড়; তাহার শেষভাগ দেওয়ালে ঘেরা রুদ্রমালা বা বজ্রগড় নামে অপর একটি দুর্গ। এই বজ্রগড় হইতে মাচীর উপর গোলা বর্ষণ করিয়া সহজেই শত্রুদের তাড়াইয়া দেওয়া যায়।

পুণায় অবস্থানকালে আবশ্যক নানা স্থানে অল্প অল্প সৈন্য দিয়া থানা বসাইয়া জয়সিংহ নিজ পথঘাট রক্ষা করিলেন; তাহার পর ২৩এ মার্চ্চ রওনা হইয়া ৩০এ তারিখে পুরন্দরের সামনে আসিয়া পৌঁছিলেন। পরদিন হইতে রীতিমত দুর্গ অবরোধ আরম্ভ হইল। বিভিন্ন বাদশাহী সেনাপতিরা নিজ দলবল সহিত পুরন্দরের নানা দিকে আড্ডা করিয়া মূর্চা খুঁড়িয়া দুর্গের উপর তোপ দাগিবার চেষ্টা করিলেন। দিন-দশের মধ্যেই সৈন্যদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং জয়সিংহের নিয়মিত তত্ত্বাবধান এবং উৎসাহদানের ফলে তিনটি খুব বড় কামান একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর টানিয়া তোলা হইল এবং রুদ্রমালের বুরুজের উপর ভারি ভারি গোলাবর্ষণ সুরু হইল। তাহার ফলে বুরুজের সামনের দেওয়াল ভাঙিয়া গিয়া প্রবেশের পথ দেখা দিল।

১৩ই এপ্রিল দুপুর বেলা দিলির খাঁ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া এই বুরুজটি দখল করিলেন; মারাঠারা হটিয়া গিয়া মধ্যের একটি বেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইল। পরদিন বৈকালে মুঘল ও রাজপুতদের বন্দুকের গুলিতে অতিষ্ঠ হইয়া মারাঠারা সমস্ত রুদ্রমাল ছাড়িয়া দিল। জয়সিংহ তাহাদের প্রাণদান করিলেন এবং তাহাদের নেতাদের সম্মানসূচক পোষাক দিয়া বাড়ী ফিরিতে অনুমতি দিলেন।

তাহার পর (২৫ এপ্রিল) দায়ুদ খাঁর অধীনে ছয় হাজার সৈন্য দিয়া তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের চারিদিকে গ্রাম লুটিতে পাঠাইলেন। আর কুতবুদ্দীন খাঁ এবং লুদী খাঁকেও নিজ নিজ থানা হইতে বাহির হইয়া নিকটের গ্রাম লুটিতে এবং গরুবাছুর কৃষক বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহার ফলে শিবাজীর প্রজাদের সমূহ ক্ষতি ও দেশের স্থায়ী অনিষ্ট হইল।

(১০)

সম্মুখে এবং চারি পাশে এইরূপ বিপদ দেখিয়া মারাঠারা পুরন্দর-অবরোধকারীদের তাড়াইয়া দিবার নানা চেষ্টা করিল। মুঘল-প্রদেশের স্থানে স্থানে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু জয়সিংহ পুরন্দর হইতে নড়িলেন না, দূরে আক্রান্ত স্থানগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু অশ্বারোহী পাঠাইলেন মাত্র। মুঘলদের অনেক ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু আসল কাজ পুরন্দর-অবরোধে কোন বাধা হইল না, সেখানে রসদ আসিতে লাগিল এবং শিবির ও সৈন্যদল নিরাপদ রহিল।

বজ্রগড় জিতিবার পরই দিলির খাঁ সেখান হইতে লম্বা পর্ব্বত বহিয়া পশ্চিম দিকে আসিয়া পুরন্দরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের উচ্চ বুরুজ ('নাম খড়কালা')র কাছে

পৌঁছিয়া নীচের দুর্গের (মাচীর) উপর গোলা ফেলিতে লাগিলেন। মারাঠারা দুই দুইবার রাত্রে বাহির হইয়া আসিয়া এইখানের মূর্চাগুলি আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু পরাস্ত হইয়া তাহাদের ফিরিতে হইল।

ক্রমে ক্রমে মুঘলদের মূর্চা পুরন্দরের "সাদা বুরুজ" দুটির নিম্নে আসিয়া পৌঁছিল; কিন্তু তখনও দেয়াল খাড়া ছিল, তাহার উপর হইতে মারাঠারা নীচে জলন্ত আল্‌কাতরা, বারুদের থলি, বোমা এবং পাথর ফেলিয়া অবরোধকারীদের আর অগ্রসর হইতে দিল না। তখন জয়সিংহ একটি উঁচু কাঠের রথ প্রস্তুত করিয়া সাদা বুরুজের সামনে খাড়া করিলেন (৩০এ মে); তাহার উপর হইতে কামান দাগা হইবে, এবং বন্দুক ছুঁড়িয়া দেওয়াল হইতে রক্ষাকারীদের হঠাইয়া দেওয়া হইবে, আর শত্রুদের গুলি রোধ করিবার জন্য রথের সম্মুখে কাঠের আবরণ থাকিবে।

এই কাঠরথ সম্পূর্ণ হইবার আগেই, সন্ধ্যার দুঘণ্টা মাত্র বাকী আছে এমন সময়, দিলির খাঁকে না জানাইয়াই রুহিলা সৈন্যদল "সাদা বুরুজ" আক্রমণ করিল। শত্রুরা তাহাদের মারিতে লাগিল, কিন্তু শীঘ্রই মুঘলপক্ষ হইতে আরও লোক আসায় ভীষণ যুদ্ধের পর মুঘলদের জয় হইল, তাহারা সাদা বুরুজ দখল করিল, মারাঠারা "কাল বুরুজের" পিছনে হটিয়া গিয়া বোমা, পাথর, ইত্যাদি ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু মুঘলেরা নড়িল না। তাহার দুইদিন পরে মুঘল-তোপের আওয়াজ সহ্য করিতে না পারিয়া মারাঠারা কাল বুরুজও ছাড়িয়া দিল। এইরূপে ক্রমে পাঁচটি বুরুজ এবং একটি কাটগড়া (ষ্টকেড্) বাদশাহী সৈন্যদের হাতে পড়িল।

(১১)

এখন আর পুরন্দর রক্ষা করা অসম্ভব। ইহার পূর্ব্বেই একদিন দুর্গস্বামী মুরার বাজী প্রভু (কায়স্থ) নিজ মাবলে পদাতিক লইয়া দিলির খাঁর পাঠানদের উপর মরিয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই পক্ষে অনেকে হতাহত হইল; মুরার বাজীর তরবারির সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিল না, অবশেষে ষাটজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া তিনি দিলির খাঁকে আক্রমণ করিলেন। দিলির বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ! উহাকে কেহ মারিও না। আর মুরার! তুমি ধরা দাও, তোমাকে উচ্চ পদ দিব।" কিন্তু মুরার থামিলেন না, তখন দিলির তাঁহাকে তীর দিয়া বধ করিলেন। মুরারের সঙ্গে তিনশত মাবলে ধরাশায়ী হইল; পাঠান-পক্ষে পাঁচশত জন। কিন্তু তবুও মারাঠাদের সাহস কমিল না; তাহারা বলিতে লাগিল, "এক মুরার বাজী মারা গিয়াছে ত কি হইল? আমরাও তাহার সমান, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে যুদ্ধ চালাইব।"

কিন্তু জয়সিংহের অধ্যবসায় এবং দুইমাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ফলে পুরন্দর-রক্ষীদের অনেক বলক্ষয় হইল। যখন রুদ্রমাল গেল, পাঁচটি বুরুজ ও একটি কাটগড়া গেল, তখন সমগ্র দুর্গটি হস্তচ্যুত হইবার দিন ঘনাইয়া আসিল। শিবাজী দেখিলেন, এখন সন্ধি না করিলে মুঘলেরা বল-প্রয়োগে পুরন্দর অধিকার করিবে এবং সেখানে যে-সমস্ত মারাঠা কর্ম্মচারী আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের বধ এবং তাহাদের স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মনাশ করিবে। আর বাহিরেও দায়ুদ খাঁ প্রতিদিন তাঁহার গ্রাম ধ্বংস করিতেছেন।

জয়সিংহ পুণায় পৌঁছিবার আগেই শিবাজী ক্রমাগত তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ-দূত ও চিঠি পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু জয়সিংহ তাহার কোন উত্তর দেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে, যতক্ষণ না শিবাজীকে বাহুবলে জব্দ করা না যাইবে ততক্ষণ তিনি সত্যসত্যই বশ মানিবেন না। কিন্তু ২০এ মে শিবাজীর পণ্ডিত রাও (অর্থাৎ দানাধ্যক্ষ) রঘুনাথ বল্লাল আসিয়া গোপনে জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি পাইলে সন্ধি করিতে প্রস্তুত?" মুঘল-প্রতিনিধি উত্তর করিলেন, "শিবাজী স্বয়ং আসিয়া বিনা শর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাহার পর তাঁহার প্রতি বাদশাহের অনুগ্রহ দেখান হইবে।"

এই শুনিয়া শিবাজী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার পুত্র শম্ভুজী আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে চলিবে কি? জয়সিংহ উত্তর দিলেন, "না, শিবাজীকে নিজে আসিতে হইবে।" অবশেষে শিবাজী চাহিলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিবার পর সন্ধি হউক বা না হউক তাঁহাকে নিরাপদে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে বলিয়া জয়সিংহ ধর্ম্ম-শপথ করুন। জয়সিংহ তাহাই করিলেন

এবং বলিয়া পাঠাইলেন, শিবাজী যেন অতি গোপনে আসেন, কারণ বাদশাহ্ রাগিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত সন্ধির কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া নির্ম্মম যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

এই বন্দোবস্ত করিয়া ৯ই জুন রঘুনাথ পণ্ডিত নিজ প্রভুর নিকট ফিরিলেন। ১১ই তারিখে বেলা এক প্রহর হইয়াছে, জয়সিংহ নিজ শিবিরে দরবার করিতেছেন, এমন সময় রঘুনাথ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, শিবাজী শুধু ছয়জন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া পালকী করিয়া অতি নিকটে পৌছিয়াছেন। জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুন্সী উদয়রাজ এবং জ্ঞাতি উগ্রসেন কাছোয়াকে শিবাজীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানাইলেন, "যদি আপনার সব দুর্গগুলি সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে আসুন, নচেৎ ঐখান হইতেই ফিরিয়া যান।" শিবাজী "আচ্ছা! আচ্ছা!" বলিয়া উঁহাদের সঙ্গে আসিলেন। শিবির-দ্বারে পৌছিলে, জয়সিংহের সর্ব্বপ্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী বখ্‌শী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনিলেন। রাজপুত-রাজা স্বয়ং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হাত ধরিয়া নিজের পাশে গদির উপর বসাইলেন। তাঁহার রাজপুত রক্ষীগণ তরবার ও বল্লম হাতে করিয়া চারিদিকে সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কি জানি যদি বা আবার আফজল খাঁর মত কাণ্ড হয়!

চতুর জয়সিংহ শিবাজীকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন তিনি দিলির খাঁ ও কীরত সিংহকে হুকুম দিয়াছিলেন যে, তাঁহার তাম্বু হইতে সঙ্কেত-চিহ্ন দেখিলেই তাঁহারা মূর্চা হইতে ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া পুরন্দরের খড়কালা নামক অংশ দখল করিবেন। শিবাজী পৌঁছামাত্র জয়সিংহ সেই সঙ্কেত করিলেন, আর মুঘলেরা লড়িয়া ঐ স্থানটি দখল করিল, আশীজন মারাঠা মারা গেল, আরও অনেকে জখম হইল। এই যুদ্ধটি জয়সিংহের তাম্বুর ভিতর হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। শিবাজী ঘটনাটা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়া বলিলেন, "আর বৃথা আমার লোকহত্যা করিবেন না, যুদ্ধ বন্ধ করুন, আমি এখনই পুরন্দর ছাড়িয়া দিতেছি।" তখন জয়সিংহ তাঁহার মীরতুজুক গাজীবেগকে পাঠাইয়া দিলির খাঁকে রণে ক্ষান্ত হইতে হুকুম দিলেন; সেই সঙ্গে শিবাজীও নিজ কর্ম্মচারী পাঠাইয়া মারাঠা দুর্গ-স্বামীকে পুরন্দর সমর্পণ করিতে বলিলেন। দুর্গবাসীরা জিনিষপত্র গুছাইতে এক দিন সময় চাহিল।

(১৩)

শিবাজী বিছানা আসবাবপত্র কিছুই সঙ্গে না লইয়া একেবারে রিক্তহস্তে আসিয়াছিলেন। সেজন্য জয়সিংহ তাঁহাকে অতিথি করিয়া নিজ দরবার-তাম্বুতে বাঁসা দিলেন। দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত দুই পক্ষে সন্ধির শর্ত্ত লইয়া দর কষাকষি চলিতে লাগিল। প্রথমে জয়সিংহ কিছুই ছাড়িবেন না; অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, শিবাজীর তেইশটি দুর্গ এবং তৎসংলগ্ন সমস্ত জমি (যাহার বার্ষিক খাজানা চারিলক্ষ হোণ অর্থাৎ বিশ লক্ষ টাকা) বাদশাহ পাইবেন, আর বারটি দুর্গ (এবং তৎসংলগ্ন এক লক্ষ হোণের জমি) শিবাজীর থাকিবে। কিন্তু শিবাজী বাদশাহের প্রজা বলিয়া নিজেকে মানিবেন এবং তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবেন।

তবে এক বিষয়ে শিবাজীকে অপমান হইতে রক্ষা করা হইল। তাঁহাকে নিজে মনসবদার হইয়া সৈন্য লইয়া বাদশাহের বা দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধির দরবারে হাজির হইতে হইবে না, তাঁহার পুত্র পাঁচ হাজারী জাগীরের অনুযায়ী (প্রকৃতপক্ষে দুই হাজার) সৈন্য লইয়া উপস্থিত থাকিবেন। উদয়পুরের মহারাণাকেও এই অনুগ্রহ দেখান হইত। জয়সিংহ জানিতেন যে, বেশী কড়াকড়ি করিলে শিবাজী হতাশ হইয়া বিজাপুরের সঙ্গে যোগ দিবেন।

পুরন্দরের সন্ধিতে আর একটি গোপনীয় শর্ত্ত ছিল। কোঁকন অর্থাৎ পশ্চিমঘাট এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী অতি লম্বা সরু কিন্তু ধনজনপূর্ণ প্রদেশটি বিজাপুরের অধীন ছিল। শীঘ্রই বাদশাহ বিজাপুর-রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তখন শিবাজী বিজাপুরের হাত হইতে তলভূমি (তল্-কোঁকন বা বিজাপুরী পাইন্-ঘাট)-এর চারি লক্ষ হোণ আয়ের জমি এবং অধিত্যকা (অর্থাৎ বিজাপুরী বালাঘাট)-এর পাঁচলক্ষ হোণ আয়ের জমি নিজ সৈন্য দ্বারা কাড়িয়া

লইবেন, এবং বাদশাহ ইহাতে তাঁহার অধিকার স্বীকার করিবেন, কিন্তু তজ্জন্য শিবাজী তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ হোণ (অর্থাৎ দুই কোটি টাকা) তের কিস্তিতে নজর দিবেন। এইরূপে জয়সিংহের কূটনীতির ফলে শিবাজী ও আদিল শাহের মধ্যে স্থায়ী কলহের বীজ রোপিত হইল!

(১৪)

দিলির খাঁ প্রাণপণ পরিশ্রম এবং রক্তপাত করিয়া পুরন্দরের অনেক অংশ দখল করিয়াছেন, আর এদিকে শিবাজী আসিয়া চুপ করিয়া দুর্গটি জয়সিংহের হাতে ছাড়িয়া দিয়া খাঁকে গৌরব হইতে বঞ্চিত করিলেন। তিনি রাগিয়া বলিলেন যে, সন্ধিতে রাজী হইবেন না, শেষ অবধি মারাঠাদের ধ্বংস করিবেন। সুতরাং জয়সিংহ পরদিন (অর্থাৎ ১২ই জুন) শিবাজীকে হাতীতে চড়াইয়া নিজ কর্মচারী রাজা রায়সিংহ শিশোদিয়ার সহিত দিলির খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই নম্রতায় দিলির খাঁ আপ্যায়িত হইলেন। তিনি শিবাজীকে নানা উপহার দিয়া সঙ্গে করিয়া জয়সিংহের তাম্বুতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া রাজপুত রাজার হাতে সঁপিয়া দিলেন। সমস্ত মুঘলসৈন্যগণ হাতীর উপর শিবাজীকে দেখিয়া বুঝিল যে, সত্যই তাহাদের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে।

তাহার পর জয়সিংহ শিবাজীকে খেলাৎ পরাইয়া তাঁহার কোমরে নিজের তরবারি বাঁধিয়া দিলেন, কারণ শিবাজী সন্ধি করিবার জন্য নিরস্ত্র হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ভদ্রতার খাতিরে কিছুক্ষণ তরবারিটা পরিয়া পরে কোমর হইতে খুলিয়া জয়সিংহের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "আমি বাদশাহের বাধ্য, কিন্তু অস্ত্রহীন দাস হইয়া তাঁহার কাজ করিব।"

এইদিন মারাঠারা পুরন্দর দুর্গ ছাড়িয়া দিল; তাহাদের চারি হাজার সৈন্য এবং তিন হাজার স্ত্রীলোক বালক ও চাকর বাহির হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু সমস্ত অস্ত্র গোলা বারুদ ও সম্পত্তি বাদশাহের জব্‌ৎ হইল। অপরাপর দুর্গ সমর্পণ করিবার জন্য শিবাজী মুঘল-কর্মচারীদের সহিত নিজ চাকর পাঠাইয়া দিলেন। ১৪ই জুন, জয়সিংহের নিকট হইতে একটি হাতী ও দুইটি ঘোড়া উপহার পাইয়া শিবাজী বিদায় লইলেন। ১৮ই তারিখে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী রাজগড় হইতে আসিয়া জয়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন।

এইরূপে জয়সিংহ আশ্চর্য্য জয়লাভ করিলেন।

(১৫)

পুরন্দরের সন্ধির শর্তগুলি জানিয়া এবং শিবাজী নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া, বাদশাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া সব মঞ্জুর করিলেন এবং নিজ পাঞ্জা-অঙ্কিত (অর্থাৎ হাতের আঙ্গুলগুলি সিন্দুরে ডুবাইয়া কাগজের উপর ছাপ দেওয়া) এক ফর্মান্ (বা বাদশাহের নিজের জবানীতে লিখিত ও সহি করা পত্র) এবং একপ্রস্থ খেলাৎ শিবাজীর জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এগুলি ৩০এ সেপ্টেম্বর জয়সিংহের শিবিরের নিকট পৌঁছিল। শিবাজী জয়সিংহের আহ্বানে কয়েক মাইল হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া বাদশাহী ফর্মানকে পথে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পত্রখানি মাথার উপর ধরিলেন! (ইহাই সে যুগের প্রথা ছিল)। সন্ধির পর হইতে এই সাড়ে তিন মাস শিবাজী অস্ত্রধারণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অপরাধী হইয়াছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাদশাহের ক্ষমা না পাওয়া যায় ততক্ষণ জেলখানার কয়েদীর মত তাঁহাকে নিরস্ত্র থাকিতে হইবে! এখন ফর্মান্ পাইবামাত্র জয়সিংহ তাঁহাকে জোর করিয়া একখানি নিজের মণিখচিত তরবারি এবং ছোরা পরাইয়া দিলেন।—যেন শিবাজীর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইল!

ইহার পর জয়সিংহ নিজ বিজয়ী সেনা লইয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবেন। কথা ছিল, শিবাজী নিজ পুত্রের মন্‌সবের দুই হাজার অশ্বারোহী এবং অতিরিক্ত সাত হাজার মাবলে পদাতিক লইয়া স্বয়ং জয়সিংহের সহায়তা করিবেন। তজ্জন্য তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইল। অবশেষে ২০এ নবেম্বর ১৬৬৫ জয়সিংহ বিজাপুর-অভিযানে রওনা হইলেন। শিবাজী এবং তাঁহার সেনাপতি নেতাজী পালকরের অধীনে নয় হাজার মারাঠা-সৈন্য মুঘলদলের মধ্যবিভাগের বামপাশে স্থান পাইল।

যাইতে যাইতে শিবাজীর ডাকে বিনাযুদ্ধে, বিজাপুরের হাত হইতে কয়েকটি দুর্গ পাওয়া গেল (যথা, ফল্টন্,

থাথ্‌বড়া, খাটাব এবং মঙ্গলভিড়ে)। এই শেষ স্থান হইতে বিজাপুর শহর বাহান্ন মাইল দক্ষিণে। ইহার অর্দ্ধেক পথ পার হইতেই বিজাপুরী সৈন্যদল মুঘলদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কয়েক বার অতি ভীষণ যুদ্ধ হইল। শিবাজী ও নেতাজী প্রাণপণে মুঘলপক্ষে লড়িলেন, আর শত্রুদের দলে শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী বীরত্ব দেখাইলেন। একদিন শিবাজী ও জয়সিংহের পুত্র কীরত সিংহ এক হাতীতে চড়িয়া মুঘল-অগ্রবাহিনী সৈন্য লইয়া বিজাপুরীদল ভেদ করিলেন, আর একদিন নেতাজী অদম্য সাহসে মুঘল-সৈন্যের ফিরিবার সময় পশ্চাদ্ভাগ শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন।

এইরূপে অগ্রসর হইয়া ২৯এ ডিসেম্বর জয়সিংহ বিজাপুর দুর্গের দশ মাইল উত্তরে পৌঁছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহার গতিরোধ হইল, এবং এখান হইতে সাত দিন পরে তাঁহাকে ফিরিতে বাধ্য হইতে হইল। বিজাপুর রাজসভার কর্ম্মচারী ও ওমরাদের মধ্যে ঝগড়ার সুযোগে তিনি তাহাদের অনেককে ঘুষ দিয়া হাত করিয়াছিলেন, সুতরাং এই সময় রাজধানী হঠাৎ আক্রমণ করিলে মদ্যপায়ী অকর্ম্মণ্য যুবক রাজা কোনই বাধা দিতে পারিবেন না, বিনা অবরোধে বিজাপুর দুর্গ অধিকার করা যাইবে; এই আশায় জয়সিংহ বড় বড় তোপ এবং দুর্গজয়ের অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে আনেন নাই। কিন্তু কাছে পৌঁছিয়া তিনি শুনিলেন যে, আদিল শাহের বীর সেনানীগণ দুর্গ-রক্ষার সমস্ত জোগাড় করিয়া, বিজাপুরের চারিদিকে সাত মাইল পর্য্যন্ত গাছ কাটিয়া জলাশয় শুকাইয়া গ্রাম ক্ষেত উৎসন্ন করিয়া মুঘলদের অগ্রসর হইবার পথ রোধ করিয়াছেন। আর একদল বিজাপুরী সৈন্য তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বাদশাহী প্রদেশে প্রবেশ করিয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন জয়সিংহ হতাশ হইয়া ৫ই জানুয়ারি ১৬৬৬, পশ্চাৎ ফিরিলেন, এবং ক্রমে নিজ সীমানায় পরেণ্ডা দুর্গের কাছে পৌঁছিলেন। বিজাপুর-অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হইল।

(১৬)

এই আশাভঙ্গ হওয়াতে মুঘল সৈন্যদল মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সকলেই এই পরাজয় ও ক্ষতির জন্য জয়সিংহকে দোষ দিতে লাগিল। দিলির খাঁ আগে হইতেই জয়সিংহকে অমান্য করিতেন। এখন তিনি বলিতে লাগিলেন যে, শিবাজীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় বিজাপুর জয় করা ঘটিল না, শিবাজীকে মারিয়া ফেলিতে হইবে; শিবাজী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, দ্রুত কুচ্‌ করিয়া অগ্রসর হইলে দশ দিনের মধ্যেই ঐ দুর্গ মুঘলদের হাতে আসিবে, এখন কেন তাহা হইল না? ইহার পূর্ব্বেও পুরন্দরের সন্ধির পর দিলির খাঁ অনেকবার জয়সিংহকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "এই সুযোগে শিবাজীকে খুন করিয়া ফেলুন; অন্ততঃ আমাকে তাহা করিতে অনুমতি দিন, আমি এই পাপের সমস্ত ভার নিজের উপর লইব, কেহই আপনাকে দোষী করিবে না।"

জয়সিংহ দেখিলেন যে, উন্মত্ত মুসলমান সেনানীদের হাত হইতে শিবাজীর প্রাণ রক্ষা করা কঠিন। অমনি পথ হইতে ১১ই জানুয়ারি শিবাজীকে নিজ সৈন্যসহ বিজাপুর-রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশটি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন, মুখে বলিলেন যে এইরূপে শত্রুসেনা ভাগ হইয়া যাইবে, মুঘলদিগের উপর সমস্ত আক্রমণটা পড়িবে না। জয়সিংহের পাশ হইতে রওনা হইবার পাঁচ দিন পরে শিবাজী পনহালা দুর্গের কাছে পৌঁছিলেন, এবং রাত্রি এক প্রহর থাকিতে হঠাৎ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্গের সৈন্যগণ আগেই টের পাইয়া জাগ হইয়া ছিল, তাহারা মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিল। শিবাজীর পক্ষে এক হাজার মারাঠা হতাহত হইয়া পড়িল। তাহার পর সূর্য্য উঠিল, এবং পর্ব্বতের গা বহিয়া যে মারাঠারা চড়িতেছিল তাহাদের স্পষ্ট দেখা গেল এবং তাহাদের উপর ঠিক গুলি ও পাথর আসিয়া পড়িতে লাগিল (১৬ জানুয়ারি)। তখন শিবাজী হার মানিয়া চৌদ্দ ক্রোশ দূরে নিজ দুর্গ খেলনায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে তাঁহার লোকদের লুঠপাট বন্ধ করিবার জন্য ছয় হাজার বিজাপুরী সৈন্য এবং দুইজন বড় সেনাপতি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

মারাঠা সৈন্যদলে শিবাজীর পরেই নেতাজী পালকর সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ। তাঁহার উপাধি "সেনাপতি" এবং তিনি শিবাজীর বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন।

লোকমুখে তাঁহাকে "দ্বিতীয় শিবাজী" বলা হইত। বিজাপুর হইতে চার লক্ষ হোণ ঘুষ পাইয়া তিনি এই সময় হঠাৎ মুঘলপক্ষ ছাড়িয়া আদিল শাহের সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং মুঘল-অধীন গ্রাম শহর লুটিতে লাগিলেন। জয়সিংহ আর কি করেন? তিনি পাঁচ হাজার মন্‌সবী, বিস্তৃত জাগীর, এবং নগদ আটত্রিশ হাজার টাকা দিয়া নেতাজীকে আবার নিজের দলে ফিরাইয়া আনিলেন (২০ মার্চ ১৬৬৬)।

ইহার পূর্ব্বে চারিদিকে বিপদ ঘনাইয়া আসতেছে দেখিয়া জয়সিংহ বাদশাহকে লিখিয়াছিলেন যে, এই সময়ে বাদশাহ্ সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিলে শিবাজীকে মুঘল-রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়া, তিনি দাক্ষিণাত্যে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আওরংজীব সম্মত হইলেন। তখন জয়সিংহ অনেক আশা-ভরসা ও স্তোভবাক্য দিয়া শিবাজীকে বাদশাহের দরবারে যাইবার জন্য রাজি করাইলেন।

[উপরের ছবিখানি ডচ্-দূত ১৭১২ সালে দিল্লী অথবা লাহোরে ক্রয় করেন। উহা এখন হলাণ্ডে রক্ষিত। ১৭২৪ সালে আসল ছবির যে ষ্টিল এনগ্রেভিং প্রকাশিত হয় তাহাই এখানে দেওয়া হইল। ইহাই ১৭৮২ সালে লণ্ডনে অর্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ভারতে সর্ব্বত্র পরিচিত ছবির মূল আধার]

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছ সেটি সহজ নয়। তার কারণ আমার নিজের লেখা আমি ভুলতে ভুলতে লিখি, নইলে লেখা এগোত না। আমার পাঠকেরা আমার লেখা যত জানে আমি তত জানিনে। তার কারণ, যে লেখে তার লেখা পিছনে পড়ে' যায়, যে পড়ে সে সামনে রেখে পড়ে। আমি কি লিখেচি যদি তার খবর নিতে চাই তাহলে লোক ডেকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। এখানে অমিয় আছে তোমার চিঠি তার হাতে দেব, আমার লেখার সব সন্ধান সে জানে। অমিয় চক্রবর্ত্তীকে তুমি বোধ হয় জানো। ব্যস্ত আছি। ইতি

৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নিবেদন

মনস্তত্ত্বের একটা রহস্য কথা বলি। রোগে বা জরায় যখন শক্তির সঞ্চয় ক্ষীণ হয়ে আসে তখন মন গৃহিণীপনার অনেক কঠোর নিয়ম জারি করেন। তার একটা প্রমাণ হচ্চে আজকাল চিঠিপত্র প্রভৃতি ছোটখাটো সমস্ত অনতি-প্রয়োজনীয় কাজে আমার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। কিন্তু একটা বড় লেখার গরজ যদি আসে তাহলে ক্লান্তির দোহাই দিয়ে ছুটি নিতে পারিনে। তখন মন তার ভাঁড়ারের দরজা খুলতে খুব বেশি দেরি করে না। অর্থাৎ এখন আমার পক্ষে দুরূহ অধ্যবসায় অপেক্ষাকৃত সহজ, সুসাধ্য খুচরো কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেচে। তাতে মনের মজুরি কিছুতেই পাইনে। মন বলে, Penny wise pound foolish হওয়াই যথার্থ wisdom। কারণ পাউণ্ডের উপর যখন দাবী আসে তখন সেই বড় হুকুম কেউ ঠেকাতে পারে না—অতএব পেনির ছোট ছিদ্রগুলি কড়া পাহারায় রোধ করাই শ্রেয়। আমি আজকাল আমার রুগ্নদশার ছায়ায় প্রচ্ছন্ন হয়ে বসে সমস্ত নিত্যকর্ম্ম থেকে সরে পড়েচি—নৈমিত্তিক কর্ম্মও খুব বড় গলায় হাঁক না পাড়লে আমার কানে পৌঁছয় না। অতএব আমাকে আজকাল কোনো রচনার বিচারের অনুরোধ করলে সে অনুরোধ ব্যর্থ হবে—তার কারণ সে রকম অনুরোধ রবার উপযুক্ত প্রচুর শক্তি আমার নেই। ইতি

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বরদাকান্ত ত কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার কন্যার বিবাহ হইল কি রকম? শুধু কি মাথায় সিন্দূর পরিলেই মেয়ের বিবাহ হয়? এ ত আর কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের বিবাহ নয় যে, মেয়ের বিবাহের পরেই জামাইয়ের আর কোনো উদ্দেশ নাই, এক বৎসর পরে টাকার লোভে ফিরিয়া আসিয়া এক রাত্রি শ্বশুরবাড়ী বাস করিবে। মেয়ের বিবাহের পর কোথায় বাড়ীতে আনন্দ হইবে, মেয়ে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী যাইবে, তত্ত্ব-তাবাস বিনিময় হইবে, না বিবাহের রাত্রি বাড়ীশুদ্ধ লোকের পক্ষে দুঃস্বপ্নের মত মনে হইত। দেখিতে শুনিতে, কথাবার্ত্তায় খাসা জামাই, বিবাহের রাত্রেই কাহাকেও কিছু না বলিয়াই পলায়ন করিল কেন? তাহার পর একেবারে নিরুদ্দেশ। বিবাহ হইয়াছিল কিছু অদ্ভুত রকমের বটে, কেন না রীতিমত সম্বন্ধ হইয়া বিবাহ হইলে জামাইয়ের ঘরবাড়ী সকলের জানা থাকিত। পথের মাঝখান হইতে জামাই ধরিয়া আনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যেমন করিয়াই হউক জামাই ত জামাই, যে মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল তেমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্বশুর বড়মানুষ, কি এমন বিপদের আশঙ্কায় জামাই অমন করিয়া চলিয়া গেল? এ সকল প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারিত না।

অতবড় বাড়ীখানার উপর যেন একটা নিরানন্দের ছায়া পড়িয়াছিল। সকলেরই যেন কিছু বিমর্ষভাব, সকলেই যেন কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চায়, অথচ মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে হয় সাহস হয় না কিংবা প্রবৃত্তি হয় না। সদরে অন্দরে বাড়ীর সকলেই যে কর্ত্তার ভয়ে তটস্থ বিবাহের রাত্রেই সে কথা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার অপ্রিয় কোনো কথা তাঁহার কানে উঠিলেই প্রলয় ব্যাপার হইবে। তাঁহার কানে কেহ যে কোনো কথা তুলিত তাহা ত মনে হয় না, কারণ তাঁহার ক্রোধের সমদর্শিতায় কোন রকম বাছবিচার ছিল না, প্রিয় অপ্রিয়ের কিছুমাত্র ভেদাভেদ ছিল না। ইস্তক বাড়ীর গৃহিণী হইতে লাগায়েৎ আস্তাবলের সহিস পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোধ-বজ্র সকলের মাথার উপর নিরপেক্ষভাবে পতিত হইত। এক পুরোহিত রাধানাথ ঠাকুর তাঁহাকে ভয় করিত না, তাহাও সকলের সমক্ষে নয়, আড়ালে যখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকিত না।

কিন্তু বিবাহের কয়েকদিন পরেই বরদাকান্ত একদিন সন্ধ্যার সময় কোথায় চলিয়া গেলেন। এ রকম তিনি মাঝে মাঝে যাইতেন, বাড়ীর কেহ কিছু জানিত না, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসাও করিত না। এক রাধানাথ ঠাকুর সব খবর রাখিত। গ্রামে কিছু দূরে তাহার বাড়ী, কিন্তু সে প্রতিদিন দু-সন্ধ্যা বরদাকান্তর বাড়ীর ঠাকুর পূজা করিতে আসিত, আর কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইত। তাহা ছাড়া, বাড়ীর যে যেখানে ছিল তাহাকে সকল কথাই বলিত। বিবাহের দিন-দুই পরে বরদাকান্ত পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ দেখ রাধানাথ, জামাই বাবাজী ত রাতারাতি দৌড় মেরেচে, কিন্তু যাদের সঙ্গে কথা পাকাপাকি হ'ল, মেয়ের গায়েহলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেল তাদের ত কোনো খবরই নেই। কার বাপের সাধ্যি আমাকে এমন করে' অপমান করে?

—ইচ্ছে করে' কি আর করেচে? হয় তাদের কোনো বিপদ হয়ে থাকবে কিংবা ছেলের কোনো ব্যারাম হয়ে থাকবে।

—তা হ'লে খবর দিলে না কেন? আমি যাচ্ছি তাদের খবর নিতে।

—সেখানে আবার না একটা গোল হয়। মেয়ের ত বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ?

—তারা কি অছিলা করে আমি একবার শুন্‌তে চাই।

রাধানাথ গলা খাটো করিয়া কহিল,—দেখ, সাবধান থেকো। সরকারের লোকেরা চারিদিকে খবর নিচ্ছে, কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না। ছেলের বাপ ভারি ধূর্ত্ত লোক, তার সঙ্গে যদি রাগারাগি হয় তা হলে সে শত্রুতা কর্‌বে।

—সে দেখা যাবে। আমি কি কোনো শালাকে ভয় করি?

রাধানাথ ঠাকুর আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকার হইলে বরদাকান্ত বাড়ীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া বড় ছিপে উঠিলেন। কুড়িজন মাঝি সশস্ত্র হইয়া নৌকায় বসিয়াছিল। তাহারা দাঁড় টানিতে জানে আবার আবশ্যকমত লাঠি তরোয়ালও চালাইতে পারে।

নৌকা সমস্ত রাত্রি চলিল। অবিশ্রান্ত দাঁড় পড়িতেছে, উঠিতেছে, উত্তরমুখী হইয়া নৌকা বেগে বাহিয়া চলিল। পর দিবস বেলা দশটার সময় নৌকা একটি গ্রামের সম্মুখে লাগিল। ঘাটে ভিড়িল না, একটু দূরে গিয়া লাগিল।

ঘাটের কাছে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া একজন লোক ছিপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। নৌকার মানুষ যখন চিনিতে পারা গেল তখন সে এক নিঃশ্বাসে ছুটিয়া গ্রামের একখানা বড় বাড়ীতে সংবাদ দিল। এই বাড়ীতে বরদাকান্তর কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া বাড়ীর লোকেরা ছুটাছুটি করিয়া ভিতরে জানাইল।

কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া আসিতে বরদাকান্তর কিছু বিলম্ব হইল। তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই বাড়ীর কর্ত্তা বামাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—আসুতে আজ্ঞে হোক। বসুন, বসুন।

বরদাকান্ত বসিলেন না, কহিলেন,—তোমাদের এ কিরকম ব্যাভার?

—আজ্ঞে, দেবতা বিমুখ হলে মানুষের কি অপরাধ? আপনার মেয়ে পুত্রবধূ হওয়া কত ভাগ্যের কথা, তা আমার ভাগ্যে নেই। বিয়ের দিন ছেলের হল বাতজ্বর, একেবারে উত্থানশক্তি রহিত। এখন জ্বর কমেছে, কিন্তু এখনও বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে।

—তা খবর দিলে না কেন?

—হাঁটা পথে যেতে দু' দিনের বেশী লাগে, বিয়ের দিন কেমন ক'রে খবর দেব? আজ লোক পাঠাব ভাব্‌ছিলুম।

—তোমার ছেলে কোথায় আছে?

—আসুন, তাকে দেখ্‌বেন।

বামাচরণ বরদাকান্তকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। বরদাকান্ত দেখিলেন, ছেলে বিছানায় শুইয়া আছে, গাঁঠে গাঁঠে চূণ হলুদের প্রলেপ, তাহার উপর আকন্দ পাতা বাঁধা। বরদাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে, উঠ্‌তে বসতে কষ্ট হয়?

ছেলে উঠিয়া বসিতে গিয়া যন্ত্রণার কাতরোক্তি করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ক্ষীণস্বরে কহিল—বসতেও পারিনে।

বরদাকান্ত বাহির বাড়ীতে আসিলেন। বামাচরণ কহিলেন,—স্নান করে' আহারাদি করুন।

বরদাকান্ত রুক্ষস্বরে কহিলেন,—আমি কি তোমার বাড়ী খেতে এসেছি?

বরদাকান্ত চলিয়া যান দেখিয়া বামাচরণ বলিলেন—কালকে দারোগা এসেছিল, কোম্পানীর লোক খুব ধর-পাকড় কর্‌চে।

বরদাকান্ত একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বামাচরণের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তা কর্‌চে কর্‌চে তোমার আমার তাতে কি?

—না কথাটা মনে এল তাই বল্‌লাম।

বরদাকান্ত চলিয়া গেলেন। তিনি কিছু দূর চলিয়া গেলে পর বামাচরণ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। যে ঘরে পীড়িত ছেলে ছিল সেইখানে গেলেন। ঘরের ভিতর বাড়ীর ছোট-বড় সব পুরুষ মানুষ। সকলে হাসিতেছে। বামাচরণ ছেলেকে বলিলেন,—কি রে, তোর বাতজ্বর সেরেছে?

ছেলে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বামাচরণ হাত তুলিয়া বলিলেন—ওরে তোরা অত

লম্ফ-ঝম্প করিস্ নে। যাকে বলে পারা যায় না তাকে কৌশলে সারতে হয়। আমি কি আগে কিছু জানতুম, তা হলে অমন লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতার নাম করতুম না। ও তো বুঝে গেল যে সত্যি রোগ হয়েছিল। শত্রু-সংখ্যা না বাড়ানই বুদ্ধির কাজ।

বরদাকান্তর বাড়ীতে সকলে যখন স্থির জানিল যে,তিনি গ্রামের বাহিরে আর কোথাও গিয়াছেন তখন সকলের মুখ খুলিয়া গেল, ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ করিবার কোনো প্রয়োজন রহিল না। যে যাহার নিজের মহলে যেমন ইচ্ছা আলোচনা করিতে লাগিল। দূর সম্পর্কে বরদাকান্তর এক ভগিনী আর কয়জনের সহিত একটা ঘরে বসিয়া এই বিবাহ-বিভ্রাটের আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, হয়ত বরদা নিজে খোঁজ করতে গিয়েছে, কিন্তু এমন অবাক কাণ্ড কেউ কখনো শোনে নি।

আর একজন বলিলেন,—লোকে কে কি বল্‌বে সে কথা এখন চুলোয় যাক্, কিন্তু ঘরের কথা একবার ভেবে দেখ দেখি। এ ত আর একরত্তি মেয়ে নয় যে কিছু বুঝতে পারবে না। অমন ডাগর মেয়ে ওরই বা মনে কি হচ্চে একবার ভাব দেখি! ভাব্‌তে গেলে আমাদেরই হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যায় তা ওর মনে কি হচ্চে কে জানে?

বরদাকান্তর ভগিনী বলিলেন,—দেখো যেন মেয়ের সাক্ষাতে কোনো কথা কারুর মুখ থেকে বেরিয়ে না পড়ে। তা হলে কিন্তু অন্যায় হবে।

—রাম বল! আমরা কি তেম্‌নি অসেয়ানা! ওর কানে একটি কথাও উঠ্‌বে না।

বরদাকান্তর ভার্য্যা হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি রাধানাথ ঠাকুরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিতেই বলিলেন—উনি কি জামাইয়ের খোঁজ নিতে গিয়েচেন?

রাধানাথ যেন কিছু জানে না, বলিল,—তা কি করে বল্‌ব? উনি কখন কোথায় যান কাউকে ত কিছু বলে যান না।

—তা ত জানি, কিন্তু উনি যখন এখানে নেই এই বেলা তুমি নিজের লোক লাগিয়ে একবার ভাল করে খোঁজ নাও না কেন? তুমি আমার বাপের মত, ঘরের সব কথা জান, এমন বিপদের সময় তোমায় নয় ত কাকে বল্‌ব? কিছু টাকাকড়ির দরকার হয় ত এখনি এনে দিচ্ছি।

হেমাঙ্গিনীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। রাধানাথ ঠাকুর কহিল,—মা, তুমি চক্ষের জল ফেলো না, অকল্যাণ হবে। টাকাকড়ি কিছু চাইনে, কিন্তু তুমি ভেব না যে আমি চুপ করে বসে আছি, কোনো চেষ্টা করি নি। আমি এখনো সব সন্ধান পাই নি, তবে জামাই নিজের দেশে চলে গিয়েছে আর তার কোনো রকম বিপদ হয় নি এ কথা আমি তোমাকে বল্‌তে পারি।

—কোথায় তাদের দেশ?

—তা জান্‌তে পার্‌লে ত সবই জানা গেল। তাও শীগ্‌গির জানা যাবে। তবে এখনি জামাইকে আন্‌তে পারা যাবে কি না, কিংবা তাদের বাড়ীর সন্ধান পেলে লোক পাঠানো যাবে কি না সে বিষয় একটু ভেবে দেখ্‌তে হবে। বাবুকে না জানিয়ে কি কিছু করা চল্‌বে?

—তা কেমন করে বল্‌ব, ঠাকুরমশাই? উনি রাগ্‌লে ত আর রক্ষা নেই, কিন্তু ওঁরও ত মেয়ে জামাই, ওঁর কি মনে কিছু হচ্চে না? আমার না হয় মায়ের প্রাণ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌চে, কিন্তু উনি অমন একটা মস্ত মানুষ, লোকে ত ওঁর নামই করবে। বল্‌বে অমুকের মেয়ের বিয়ের রাত্রে জামাই পালিয়ে গেল আর তার কোনো খোঁজখবর নেই। জামাইয়ের কোথায় বাড়ী তাও কেউ জানে না।

—সে সব জানা যাবে, সেজন্য তুমি ভেব না। আমার হাতে লোক আছে, আর না হয় আমি নিজেই গিয়ে খোঁজ নেব। তারপর কর্ত্তাকে বলে' কয়ে' জামাইকে নিয়ে আসা যাবে, তা হলেই সব গোল মিটে যাবে।

—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! আমি ঠাকুরদের পূজো মেনেছি, তুমি পূজো দিও।

গৃহিণীকে আশ্বাস দিয়া রাধানাথ ঠাকুর চলিয়া গে[ল]।

যাহার জন্য এত রকম কথা, এত [ভাব]না হইতেছিল সে ম্লান মুখে একা একা থাকিত। [তাহা]র কেমন একটা ত্রাস হইয়াছিল। ঘরে ঘরে যে[খা]

কথা হইতেছে সে কি তাহা বুঝিতে পারিত না? তাহার সাক্ষাতে কেহ কিছু বলিত না, তাহাকে কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিত না, কিন্তু বাড়ীতে একটা যে দুশ্চিন্তা আসিয়াছিল তাহার বাতাস যেন তাহার গায় লাগিত। রাধানাথ ঠাকুর তাহাকে আর কোনো কথা আড়ালে বলিত না। তাহার আদেশ মত ইন্দুলেখা কোনো কথা কাহাকেও বলিত না। জামাই চলিয়া যাইবার সময় ইন্দুলেখা জাগিয়া ছিল এ কথা রাধানাথ ছাড়া আর কেহ জানিত না। সুরমা সময় সময় ইন্দুলেখার কাছে থাকিত, কিন্তু তাহার চেষ্টা কে কোথায় কি বলিতেছে শোনে, কিন্তু সুরমাকে দেখিলেই অপর লোকের কথা বন্ধ হইয়া যাইত, কিংবা যাহারা কথা কহিতেছিল তাহারা অন্য কথা পাড়িত। ইন্দুলেখার মা মেয়েকে রোজ সাজাইয়া দিতেন, তাহার মাথায় সিঁদুর দিয়া দিতেন, কিন্তু অনেক সময় সে চুপ করিয়া একটি ঘরে একা বসিয়া থাকিত। বসিয়া বসিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে টস্ টস্ করিত, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে চক্ষের জল তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ ত হিজলী চলিয়া গেল কিন্তু হরেরাম সর্দ্দারের ঘাড়ে একটা বোঝা চাপাইয়া গিয়াছিল। ব্রজনাথের বিবাহের কথা ত ঘুণাক্ষরে কাহাকেও কিছু বলা যায় না অথচ কোথায় বিবাহ হইল, কাহার কন্যার সহিত বিবাহ হইল সে সন্ধান সংগ্রহ করিবার ভার হরেরামের উপর। ব্রজনাথের কথায় হরেরাম তখনি স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু কাজটা যে নিতান্ত সোজা তা নয়। সহজ হইলে ব্রজনাথ হরেরামকে বলিতও না। হরেরামের উপর ব্রজনাথের যতখানি বিশ্বাস আর কাহারও উপর তত নয়। বৃদ্ধের পক্ষে ইহা শ্লাঘার কথা, কিন্তু তাহার ত আগেকার মত সামর্থ্য ছিল না, ছুটাছুটি করিবার শক্তি ছিল না, এখন অপরের প্রতি তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে, আবার এ ভাবে সন্ধান লইতে হইবে যাহাতে কাহারও মনে কোনো সন্দেহ না হয়। ব্রজনাথ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া হরেরামের মনে কিছুমাত্র শিথিলতা হইল না। ব্রজনাথ দু মাসে ফিরিতে পারে, এক মাসেও ফিরিতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে যাহা বলিয়া গিয়াছে সে কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে।

হরেরাম সর্দ্দার নিজের কুটীরে তক্তপোষে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, মানুষটা কে জান্‌বার আগে জায়গাটা কোথায় একটা আন্দাজ পেলে কতকটা সুবিধে হয়। বড় বড় গোঁফওয়ালা যণ্ডা লোক ত কত আছে আর ডাকাতের সর্দ্দারী করে জমিদারও এমন অনেক আছে। গোঁয়ারগোবিন্দ দেখে হয়ত ছোটবাবু ডাকাত মনে করেচে, কিন্তু ছেলে মানুষ হলে কি হয় ছোটবাবু ভারি সেয়ানা, ধাঁ করে' অমনি একটা কিছু মনে কর্‌বার লোক নয়। রাত দুপুরের সময়, কি কত রাত্রে পুরুত ছোটবাবুকে নৌকায় তুলে দিয়েচে তার তো ঠিক নেই। যদি বোম্বেটের ছিপ হয় আর দশ জোড়া দাঁড় পড়ে তা হলে ভাঁটার একটানা গঙ্গায় পাঁচ ছয় ঘণ্টায় কতখানি যেতে পারে? আর গঙ্গার এ-পারে কি ও-পারে তাও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চি নে। ছোটবাবুর মনে হয় এই পারে কিন্তু হয়ত একটু তন্দ্রা এসে থাক্‌বে সেই সময় পাড়ি দিয়ে থাক্‌বে ছোটবাবু বুঝ্‌তে পারে নি। পুরুতটার খবর পেলে হয় যে! ছোটবাবু বল্লে, শুক্‌নো শুক্‌নো ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা, কপাল উঁচু, নাক বড়, চোক দুটো খুব জল্‌জলে। তা সে-রকম বামুন-পুরুতের তো ছড়াছড়ি। চাল-কলা-খেকো ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত নাদুস-নুদুস্ তেল চক্‌চকে চেহারা আর সংক্রান্তি ঠাকুরের মত পেট সেঁধুনো হাড় বার করা—এ দু রকম বামুনই সব দেশে কাঁদি কাঁদি ফলে। যাত্রীও তো ওরকম অনেক আছে, তবে গঙ্গার কাছাকাছি বেশী আছে কি না মনে পড়্‌চে না। আর বন! তা এ দেশে কোথায় নেই? দূর হোক্ গে, ভেবে তো ছাই কিছুই হবে না। লোক পাঠাই আর নিজেও দেখি গে।

অপর গ্রামের দুই চারিজন বিশ্বাসী লোককে হরেরাম ডাকাইয়া পাঠাইল। একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা। তাহাদিগকে গোপনে সন্ধান করিতে আদেশ করিল। তাহার পর একদিন দুপুর বেলা লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে উপস্থিত।

ঘাটের এক পাশে একটি ডিঙ্গী বাঁধা ছিল, হালের কাছে একজন মাঝি বসিয়া তামাক খাইতেছিল। মাঝির বয়স হইয়াছে, কিন্তু এখনও খুব শক্ত। হরেরামকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—সর্দ্দার, তুমি যে এতখানি পথ এলে! এস, তামাক খাও।

হরেরাম অল্প হাসিয়া বলিল,—শুধু লাঠির ভরে ডিঙ্গীতে উঠ্‌তে পারব না, একবার হাত ধর্‌তে হবে।

মাঝি উঠিয়া হরেরামের এক হাত ধরিল, আর এক হাতে লাঠি ধরিয়া হরেরাম নৌকায় উঠিয়া বসিল। দু-একবার তামাক টানিয়া একটু জিরাইয়া কহিল—দেখ, শিবু, তোমার ডিঙ্গীতে একটু বেড়াবার সাধ হয়েচে।

শিবু মাঝি একগাল হাসিয়া বলিল,—এখানা নতুন ডিঙ্গী, এমন ডিঙ্গী এখানে আর কারুর নেই। এককালে তোমাকে কত বাচ খেলিয়েচি মনে পড়ে?

—তা আর পড়ে না? সেই এক কাল গিয়েচে। এখন কি সত্যি আর বেড়াতে যাব? একটু কাজে এসেচি।

—কি কাজ শুনি?

—তা বল্‌চি। তোমার যা পাওনা হয় পাবে।

—তোমার কাছে আবার পাওনা কি?

—আরে এ তো আমার কাজ নয়, বাবুদের কাজ। তাঁরা কি বিনা পয়সায় কাজ করান?

গ্রামের সকলেই জানিত অমরনাথের বাড়ীতে হরেরাম সর্দ্দারের খুব দহরম মহরম। শিবু মাঝি বলিল—আমরা সব তো তাঁদেরই খেয়ে মানুষ।

—তবে চল, উত্তর মুখে খানিকটা যাব।

তখন ভরা জোয়ার, কল কল করিয়া স্রোত উত্তর মুখে ছুটিয়াছে। শিবু চারজন দাঁড়ী ডাকিল, নিজে হাল ধরিল। হরেরাম তাহার পাশে বসিল। জলের তর তর শব্দ, দাঁড় ঝপ্ ঝপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। হরেরাম শিবু মাঝির সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

—আচ্ছা বিশদাঁড়ে ছিপ সোঁতের মুখে পাঁচ ছয় ঘণ্টায় কত কোশ যাবে?

—তেমন ছিপ আর তেমন মাঝি হলে তিরিশ চল্লিশ কোশ যেতে পারে।

—এখানে কাছাকাছি দশ-বিশ কোশের মধ্যে ভাল ছিপ কাদের কাদের আছে?

—খড়দার মল্লিকদের আছে, ত্রিবেণীতে মুখুয্যেদের আছে, গরুপে ঘোষেদের আছে,—হালিসহরে চৌধুরীদের আছে, এমন অনেকের আছে।

হরেরাম গলা একটু খাটো করিয়া বলিল,—যারা দিনের বেলা জমিদারী করে রাত্রে আর কিছু করে তাদের ছিপের খবর রাখ?

শিবু মাঝি দাঁড়ীদের দিকে চাহিয়া, চোক টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—ও সব কথা এখন থাক্, এর পর হবে।

—বেশ কথা, বলিয়া হরেরাম অন্য কথা পাড়িল। বলিল,—গঙ্গার দু ধারেই তো বন-জঙ্গল দেখ্‌তে পাচ্চি। আরও এগিয়ে গেলে কোন কোন গাঁয়ের সামনে খুব ঘন বন?

—এপারে রিষড়ের সামনে বেশ বন, তার পর যেমন যেমন আগে যাবে তেমনি আরও বন পাবে। সোমড়ায় গঙ্গার ধারে খুব বন। আবার ও-পারে কাঁচরাপাড়ার আগে গেলে বনে বন।

—গঙ্গার কাছাকাছি বড় বড় বাড়ী আছে?

—তা আছে বই কি, কিন্তু সব গাঁয় নয়। বন কাটিয়ে গঙ্গার ধারে ক'জন আর বাড়ী করে? আর কোন্ বছর কোন্ দিকে যে চড়া পড়বে তার কিছু ঠিক নেই। গাঁয়ের কাছাকাছিই সব বাড়ী, বড় বাড়ী হলে কেউ কেউ একটু দূরে করে। তা তুমি কি এসব দেখ নি?

—অনেক দিন থেকে ত বড়-একটা কোথাও যেতে পারিনে, এর মধ্যে কত নতুন বাড়ী হয়ে থাক্‌বে তাই জিগ্‌গেস্ কর্‌চি।

—তা হয়েচে বই কি।

হরেরাম চুপ করিয়া গঙ্গার দুই ধার চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিতেছিল, সূর্য্য পশ্চিমে হেলিতেছিল, সূর্য্যরশ্মি দীর্ঘ হইয়া জলে পড়িতেছিল। হরেরাম কহিল—এইবার ফিরে চল নইলে রাত হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার সময় ডিঙ্গী ঘাটে ফিরিয়া আসিল। শিবু মাঝি কহিল,—সর্দ্দার তোমার সঙ্গে বাসা পর্য্যন্ত যাব না কি?

—তা বেশ ত চল না, কথা কইতে কইতে যাব।

ঘোর ঘোর সন্ধ্যাবেলা গ্রামের পথে বড়-একটা লোক-জন ছিল না। কতক লোক চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল, কতক গঙ্গার ধারে বসিয়াছিল।

পথে চলিতে চলিতে শিবু মাঝি জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি কথা জিস্‌গেস্ কর্‌ছিলে? দিনের বেলা জমিদার আর রাত্রে কি করে?

—কি আবার করে? ডাকাতের দলের সর্দ্দার হ'য়ে ডাকাতি করে। তুমি কি সে কথা জান না?

—কেন জান্‌ব না? তবে ওসব কথা তো সকলের সাক্ষাতে বলা যায় না। কে জানে কার মনে কি আছে?

—সে কথা ঠিক, কিন্তু একটা সন্ধান যদি দিতে পার তা হলে বাবুরা বখসিস দেবে। টাকা আমার হাতে দিয়েচে।

—টাকা নাই বা দিলে? আমাকে দিয়ে যদি কিছু হয় তা হুকুম কর্‌লেই হবে।

—কথাটা হচ্ছে এই। বিশ পঁচিশ কোশের ভিতর গঙ্গার পূব দিকে কি পশ্চিম দিকে একজন বড় জমিদার আছে। বাড়ী গঙ্গার ধার থেকে বেশী দূর নয়, বনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। বেশ বড় বাড়ী। ডাকাতের দল আছে কিনা জানা নেই তবে লেঠেল আছে, বিশ দেঁড়ে ছিপ আছে। জাতে কায়স্থ, বেশ জোয়ান, বড় বড় গোঁফ, বয়স বছর পঁইত্রিশ হবে।

—নাম কি?

—বরদা ঘোষ।

—সবই যদি জানা আছে তবে খোঁজ কিসের নিতে হবে?

—ঐ ত মজা। লোকটা যে কে আর কোথায় তার বাড়ী তা জান্‌তে পারা যাচ্ছে না। কই, এ অঞ্চলে তো বরদা ঘোষ জমিদারের নাম শুনি নি।

শিবু ঘাড় নাড়িল। উহু, আমি তো ডিঙ্গী নৌকা ক'রে এতদূর যাওয়া-আসা করি, ও নাম তো কখনো শুনি নি।

কথা কহিতে কহিতে তাহারা হরেরামের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হরেরাম দরজা খুলিয়া, চকমকি ঠুকিয়া, গন্ধকের কাঠি জ্বালিয়া প্রদীপ জ্বালিল। শিবু বলিল,—এখন তবে আমি আসি।

কোমরের গেঁজে হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া হরেরাম শিবু মাঝির হাতে দিল। পাঁচ টাকা সেকালে অনেক টাকা। শিবু বলিল—এ টাকা কি হবে?

—ও টাকা তোমার, বাবুরা দিয়েচে। তুমি ডিঙ্গী নিয়ে চলে যাও, গাঁয় গাঁয় খোঁজ কর। বরদা ঘোষের ছিপ রাত একটা কি দুটোর সময় তাদের ঘাট ছেড়ে শেষ রাত্রে আমাদের ঘাটে এসে লেগেছিল। এই হিসেব মনে রাখবে। আর একটা কথা আমার মনে নিচ্চে। লোকটার কোনো ডাকনাম থাক্‌বে সেই নাম লোকে বেশী জানে, হয়ত অনেকে ভাল নাম জানে না। এই রকম ডাকনাম শুনলে ভাল নাম জেনে নিও।

—আজ রাত্রেই আমি চল্‌লাম, বলিয়া শিবু মাঝি খুসী হইয়া চলিয়া গেল।

হিজলী যাইবার পূর্ব্বে ব্রজনাথ হরেরামের হাতে কিছু টাকা দিয়া গিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

হিজলীর পথে পথিকের সংখ্যা মন্দ নয়। স্থান ভাল নয়, পীড়িত হইয়া অনেককে ফিরিয়া আসিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, হিজলী একটা বড় ভারি রোজগারের জায়গা। অনেক মাল আমদানী রপ্তানী হইবার আড়ত, লবণের মস্ত কারবার, অনেক দিকে অনেক টাকার ব্যাপার। যাহারা যায় কেহই প্রায় শুধু হাতে ফেরে না। সকলেই কিছু ধনী হয় না, কিন্তু কিছু টাকা প্রায় সকলের হাতেই হয় আবার কতক লোকে বিস্তর উপার্জ্জন করে।

ব্রজনাথের সঙ্গে তাহার নিজের কিছু টাকা ছিল, হিজলীতে আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু সে কথা তাহার সঙ্গের লোকেরা কেহ জানিত না। অমরনাথ ব্রজনাথের স্বভাব বরাবর লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ছেলের উপর তাঁহার খুব বিশ্বাস হইয়াছিল। ব্রজনাথের বয়স অল্প হইলে কি হয়, এই বয়সেই তাহার বেশ বিষয়-বুদ্ধি হইয়াছিল, নবযৌবনের তেজ থাকিলেও কাজের বেলা খুব ধীর, সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া-সুঝিয়া কর্ম্ম

করিত। পিতা যে কাজ তাহাকে দিতেন তাহাই দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিত। টাকার কাজে কোথাও যাওয়া আসায় আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তখন কোথায় আশঙ্কা ছিল না? পথেঘাটে ত কথাই নাই, লোকের বাড়ীতেই ডাকাত পড়িত। তখন লোকে আত্মরক্ষা করিতে জানিত, প্রয়োজন হইলে স্ত্রীলোকেরাও অস্ত্র ধারণ করিত। অমরনাথ পুত্রকে নিজেই পাঠাইয়াছিলেন, তবে তাহাকে সতর্ক ও সাবধান থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সে কথা ব্রজনাথের মনে ছিল আর হরেরাম সর্দ্দারের কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিত।

পথ চলিতে ব্রজনাথের ঘোড়ার পাশে গদা থাকিত। ব্রজনাথ একটু এগাইয়া যাইত যাহাতে গদার সঙ্গে তাহার কথা দলের অন্য লোকের কানে না যায়। প্রথম দিনই ব্রজনাথ গদাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। ব্রজনাথ বলিল —আমি এত লোক সঙ্গে নিয়ে কেন যাচ্ছি, জান?

—কেমন করে' জান্‌ব? তবে আপনারা দশজনকে প্রতিপালন করেন আপনাদের সঙ্গে লোক যাবে না তো কাদের সঙ্গে যাবে?

ব্রজনাথ দেখিল গদা মোসাহেবী কিছু জানে, হরেরামের কাছে কিছু শিক্ষা পাইয়া থাকিবে। ব্রজনাথ আবার বলিল,—আজকাল সব জায়গায় লোকবল নিয়ে যেতে হয়, কারুর কাছে কিছু আছে কি না আছে না জেনেই আগেই মাথায় লাঠি মেরে বসে।

—বাবু যা বলেচেন।

—আমরা দলে ভারী আছি, সঙ্গে হাতিয়ারও আছে কিন্তু তাই বলে যে আমরা কারুর সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে চাই তা নয়। আর কেউ যদি মিছিমিছি আমাদের সঙ্গে লাগে তা হলেও আমরা চট্ করে' গোল বাধাব না।

—ঐ কথাই তো সর্দ্দার আমাদের পয় পয় বুঝিয়ে দিয়েচে। বলেচে, গোঁপ চাড়া দিলে যদি কেউ রাগ করে তো গোঁপ নামিয়ে দিবি, কেউ যদি গা ঘেঁষে যায় তো তাকে পথ ছেড়ে দিবি, কেউ যদি চোক রাঙায় ত মুখ ফিরিয়ে নিবি।

—খুব ভাল কথা। আমরা মাটির মানুষ হয়েই যাব, কিন্তু যখন বুঝব যে নরম হলে চলবে না, কিংবা সত্যি সত্যি একটা বিপদ উপস্থিত হয়েচে তখন তাদের দেখিয়ে দেবে হরেরাম সর্দ্দারের চেলাদের হাতের সাফাই। তখন দেখ আর মার্।

গদার দাঁত বাহির হইল, মুখচক্ষু ভ্রুকুটিকুটিল হইল, লাঠি চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আজ্ঞে, বাছাদের উঠে ধানে পথ্যি করতে হবে না।

ঠিক কথা, আর পথে কেহ শুধুলে বল্‌বে এক বাবু তোমাদের হিজলীতে ডেকে পাঠিয়েচে তাই তোমরা আমার সঙ্গে যাচ্ছ, তোমরা আর কিছু জান না।

—সেই তো সত্যি কথা।

—আর কাউকে কিছু না বলে রাত্রে পালাপালি করে জাগবে। আমিও সতর্ক থাক্‌ব।

—যে আজ্ঞে।

সন্ধ্যা হইলেই ব্রজনাথ চটিতে প্রবেশ করিত, রাত্রে পথ চলিত না। ব্রজনাথ মাঝখানে শয়ন করিত, তাহার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া শুইত। ঘোড়া ও সহিসদের সঙ্গে গদার একজন লোক ভরা-বন্দুক লইয়া থাকিত।

কতক লোক হিজলী চলিয়াছে, কতক ফিরিতেছে। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে রুগ্ন লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড় বড় দল বাঁধিয়া চলিয়াছে তাহাতে পথে লুটপাট হইবার ভয় অল্প, তথাপি মাঝে মাঝে কাহারও কাহারও চুরি যাইত। সন্ধ্যার সময় আর রাত্রে চটিতে সেই সব কথা হইত। ব্রজনাথ আর তাহার লোকেরা কাহারও সহিত সাধিয়া আলাপ করিত না, কিন্তু কেহ আলাপ করিলে তাহার সহিত ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কহিত। ব্রজনাথের যেন কোনো দিকে লক্ষ্য নাই, চঞ্চল তরুণ যুবকের মত থাকিত, এইজন্য অপর লোকে তাহার চতুরতা সহজে বুঝিতে পারিত না। কয়েকজন লোক প্রতিদিন ব্রজনাথেরা যে চটিতে উঠিত সেইখানে প্রবেশ করিত, কিন্তু দিনের বেলা তাহাদের সঙ্গে পথ চলিত না। কখন পাঁচজন, কখন দশজন, কখন পনরজন। ব্রজনাথের দৃষ্টি হইতে কখনো কিছু এড়াইত না, সে দেখিল যে দুই চারজন প্রতিদিন থাকে, কিন্তু অপর লোকেরা মাঝে মাঝে নূতন। ইহারা নিশ্চিত পথে স্থানে স্থানে থাকে, অপর লোকের মত সমস্ত পথ

চলে না। ব্রজনাথ বুঝিল ইহাদের একটা দল আছে, সুবিধা পাইলে দল বাঁধিয়া চুরি কি ডাকাতি করে। তাহাদের মধ্যে একজন হয়ত ব্রজনাথের চাকরকে কিংবা পাচককে বাবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। এমন অনেকে করিয়া থাকে। ব্রজনাথের লোকেরা বুঝাইয়া দিত যে এ বাবুর কোনো কাজ নাই, যে কাজ করে সে হিজলীতে আছে। সে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে বলিয়া ইহারা সকলে যাইতেছে।

একদিন পথে ব্রজনাথ গদাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই যে এরা আমাদের সঙ্গ নিয়েচে এদের কেমন মনে হয়?

—কুকুরের মতন শুঁকে শুঁকে চলেচে।

—কুকুরের মত পাতের-নাতের খেয়ে কি এদের পেট ভরবে?

—উঁহু, সুবিধে পেলে সাজানো পাতে মুখ দেবে।

—যাবার পথে এদের কাছে কিংবা আর কোনো দলের কাছে কোনো ভয় আছে তা মনে হয় না, এরা শুধু সন্ধান নিচ্চে। হিজলী যাবার বেলা তো কেউ টাকা নিয়ে যায় না, আস্‌বার সময় নিয়ে আসে। তবে আমরা এত লোক যাচ্চি এ রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাতে আমাদের সঙ্গে টাকা আছে এ রকম মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

—আমারও তাই মনে হয়।

—তাই ভেবে আমরা হুঁসিয়ার থাকব। তবে আমাদের যে কোনো রকম সন্দেহ হয়েচে ওরা যেন টের না পায়। আমরা যেমন যাচ্চি তেমনি যাব।

—আজ্ঞে, তাই হবে।

হিজলী পৌঁছিতে যখন দুই তিনদিন বাকি রহিল তখন সেই দলের একজন লোক সাহস করিয়া ব্রজনাথের সঙ্গেই কথা আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর হাত-মুখ ধুইয়া ব্রজনাথ চটিতে বসিয়া আছে, বাহিরে ব্রাহ্মণ পাক করিতেছে এমন সময় সে ব্যক্তি আসিয়া ব্রজনাথকে নমস্কার করিয়া একটু দূরে বসিল। বলিল,—আপনাদের আর বেশী পথ যেতে হবে না। পরশু হিজলী পৌঁছুবেন।

ব্রজনাথ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। লোকটা দেখিতে ধূর্ত্ত, বলবানও বটে, কিন্তু কথা কহিবার সময় দুই চক্ষু চারিদিকে ভাঁটার মত ঘোরে, মুখের দিকে চাহিয়া বড়-একটা কথা কয় না। ব্রজনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তা হ'লে তোমার এ পথে যাওয়া-আসা আছে?

গদা সে লোকটাকে দেখিয়া একটু সরিয়া আসিল যাহাতে কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

সে ব্যক্তি কহিল—আমাদের অল্প-স্বল্প ব্যবসা আছে, মাঝে মাঝে যাই।

—হিজলীতে গেলে অনেকের অসুখ-বিসুখ করে, তোমরা কেমন থাক?

—মাঝে মাঝে অসুখ করে বই কি। তখন কব্‌রেজের ওষুধ খাই।

এই রকম করিয়া সে লোকটা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসরই পায় না। কোথায় আসিল কথা বাহির করিতে, উল্টা নিজেই জেরায় পড়িল। শেষে কোনো রকম করিয়া বলিয়া বসিল,—আপনাদের এত লোকজন, আপনাদের খুব বড় কারবার আছে?

—আমাদের যাবার হুকুম হয়েচে, আমরা যাচ্চি। কারবার যাদের তারা জানে।

—তা হলেও কি আর শুধু হাতে যাচ্চেন? এই দেখুন, আমরা ত সামান্যি মানুষ তবু সঙ্গে কিছু রেস্তো আছে।

এই বলিয়া কোমরের গেঁজেতে টাকা দেখাইল। ব্রজনাথের পাশে তলওয়ার পড়িয়াছিল, বাঁ হাতে তুলিয়া ডান হাতে তলওয়ার টানিয়া বাহির করিল। আলোতে তলওয়ার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতে সে লোকটা একটু দূরে সরিয়া বসিল। ব্রজনাথ বলিল,—আমাদের সম্বল এই। আর লাঠি-বন্দুক আছে তা তুমি দেখেইচ। তুমি যে আমায় টাকা দেখালে তোমার কোনো ভয় হ'ল না?

—বাবুর যেমন কথা! মানুষ দেখ্‌লে চেনা যায় না? আপনারা কি চোর-ডাকাত?

চাকর আসিয়া বলিল,—বাবু, খাবার বেড়েচে।

সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল। দেখিল, এই ছোকরা বাবু বড় শক্ত মাটি।

আহার করিয়া ব্রজনাথ ফিরিয়া আসিতেছে—স্থান কিছু অন্ধকার—দেখিল আর একজন অন্য দিক দিয়া

আসিতেছে। ব্রজনাথের কাছে আসিতেই সে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়, খপ্‌ করিয়া দুই হাত দিয়া ব্রজনাথের কোমর জড়াইয়া ধরিল। ব্রজনাথ তাহার হাত ছাড়াইয়া দেখিল, সেই লোক। হেঁট হইয়া ব্রজনাথ দেখিল, মাটিতে জল। ব্রজনাথ যখন আহার করিতে গিয়াছিল তখন সেখানে জল ছিল না।

ব্রজনাথ সে ব্যক্তিকে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। ব্রজনাথের কোমরে নোটের তাড়া বাঁধা ছিল তাহাতে সে লোকটার হাত ঠেকিয়াছিল। শয়নের পূর্ব্বে ব্রজনাথ গদাকে চুপি চুপি গোটা-কতক কথা বলিল।

ব্রজনাথের সঙ্গে লণ্ঠন, বাতি প্রভৃতি ছিল, রাত্রে শয়নের স্থানে আলো জ্বালা থাকিত। রাত্রি দুইটার সময় আলো নিভিয়া গেল। পথের পরিশ্রমে ব্রজনাথের লোকেরা অগাধে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল না, কিন্তু আলো নিভিতেই ব্রজনাথের চোখ খুলিয়া গেল। কোনো শব্দ করিল না, কোনো কথা কহিল না, বিছানায় ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া গদার অঙ্গ স্পর্শ করিল। গদাও কোনো শব্দ করিল না, নিজের হাত দিয়া ব্রজনাথের হাত অল্প চাপিল।

ব্রজনাথ ঠিক অনুমান করিয়াছিল যে আলো নিভিবার কিছু পরে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। তলোয়ার আর লাঠি দুই-ই পাশে ছিল, তলোয়ারের আবশ্যক নাই বিবেচনা করিয়া, লাঠিগাছা বাম হাতের কাছে সরাইয়া লইল। তাহার পর অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে স্থির হইয়া রহিল। একটা হাত নিঃশব্দে ব্রজনাথের কটিতে ঠেকিল, ব্রজনাথ বুঝিতে পারিল হাতের ভিতর ছোট কাঁচি আছে। আর একটু পিছনে আর একটা লোক হামাগুড়ি দিয়া আসিতেছিল।

চকিতের মত ব্রজনাথ যে হাতখানা তাহার কটির কাছে ছিল তাহার কব্জা ধরিয়া এত জোরে মুচড়াইল যে, যাহার হাত সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল,—বাপরে! আমার হাত ভেঙে দিলে!

যে হামাগুড়ি দিয়া আসিতেছিল সে উঠিয়া ব্রজনাথের মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি মারিল। সেদিকেও ব্রজনাথের নজর ছিল। যাহার হাত ধরিয়াছিল তাহাকে টানিয়া ঢালের মত করিয়া ধরিল, লাঠি পড়িল তাহার মাথায়। তাহার চীৎকার বন্ধ হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে যে লাঠি মারিয়াছিল সে গদার লাঠির ঘায় ধরাশায়ী হইল। ব্রজনাথ, আরও কয়েকজন লাঠি হাতে উঠিল।

সেই যে লোকটা একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল তাহা-ছাড়া আর কোনো শব্দ হয় নাই। দু ঘা লাঠির শব্দ হইয়াছিল, কিন্তু ব্রজনাথের সঙ্গের লোকেরা নিঃশব্দে লাঠি হাতে উঠিয়াছিল। যাহারা চুরি করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন ঘায়েল, আর দুইজন বেগে পলায়ন করিল। ব্রজনাথ আর গদার দুইজন লোক তাদের তাড়া করিল। একজন ত এক ঘা লাঠি খাইয়া পড়িয়া গেল আর একজন এগাইয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্রজনাথ লাঠি ছুড়িয়া তাহার পায়ে মারিল। পায়ে লাগিয়া, পায়ে লাঠি জড়াইয়া সে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। ব্রজনাথ গিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

পায়ে হউক আর মাথায় হউক লাঠি ছুড়িয়া মারিতে ব্রজনাথ অভ্রান্তলক্ষ্য। ততক্ষণে চটির সব লোক জাগিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে যে দুইজন লোক ধরা পড়িয়াছিল গদার লোকেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল। আলো জ্বালা হইলে ব্রজনাথ দেখিল, যে তাহার কোমর ধরিয়াছিল সেই গাঁটকাটা। আর তিনজন তাহার সঙ্গী। কাহারও মাথা ফাটিয়া যায় নাই, কিন্তু চারজনই কাবু হইয়াছিল। চটিদারকে ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি এদের চেন?

সে বলিল—বাবু, কত লোক আসে যায় আমি কেমন করে চিনব? আমি এদেরও চিনি নে, আপনাকেও চিনি নে। আপনাদের কিছু মাল এদের কাছে পাওয়া গিয়েছে?

ব্রজনাথ লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিল, তেমন সুবিধা-মত ঠেকিল না। বুঝিল, এ সময় নরম হইলে চলিবে না। কহিল—দেখ, বাপু, মাল নেবার আগেই এরা মার খেয়েছে। রাত দুটোর সময় ওরা কি আমাদের ঘরে বেড়াতে এসেছিল? আর এই যে লোকটা আমার গায়ে হাত দিয়েছিল ওর নিজের লোকের লাঠি ওর মাথায়

পড়েছিল। লাঠি আমার মাথায় পড়্বার কথা তা কেমন ফস্কে গেল। কিন্তু তোমাকে আমার লোক ভাল বোধ হচ্ছে না। গদা, কাল সকাল বেলা যখন এদের থানায় নিয়ে যাবে এই চটিদারকেও নেবে।

চটিদারের মুখ শুকাইল। দেখিল, ব্রজনাথের সঙ্গে বাছা বাছা জোয়ান, ইহাদিগকে রাগাইলে চলিবে না। নরম হইয়া বলিল,—বাবু, আমার তো কোনো অপরাধ নেই, আমার ওপর রাগ করচেন কেন?

—আচ্ছা, সে সকাল বেলা দেখা যাবে।

পর দিবস সেই চারজনকে আরও কিছু শিক্ষা দিয়া ব্রজনাথেরা চলিয়া গেল। দুইদিন পরে তাহারা নিরাপদে হিজলী পৌছিল। [ক্রমশঃ]

নেপালী কবি ভানুভক্ত

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

বর্ত্তমান নেপালী সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে নেপালে গুর্খারাজ্যের প্রবর্ত্তনের সময়ের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। কারণ গুর্খারাজ্য স্থাপনের সঙ্গেই বর্ত্তমান নেপালী সাহিত্যের উৎপত্তি। প্রাচীন নেপালে নেওয়ারি ভাষা প্রচলিত ছিল। নেওয়ারি ভাষার অক্ষর অনেকটা বাংলা অক্ষরের মত। এখনও নেওয়ারি ভাষায় লেখা অনেক পুথি নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে আছে। বর্ত্তমান গুর্খালি ভাষা নাগরী অক্ষরে লেখা হয়।

বর্ত্তমান নেপালী সাহিত্য এখনও শিশু অবস্থায়। গত একশত বৎসরের মধ্যে নেপালী সাহিত্য উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। নেপালী সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কবি—ভানুভক্ত। ইনি রামায়ণের নেপালী অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত রামায়ণ নেপালে বিখ্যাত। বাংলা দেশে যেমন কাশীরামদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং উত্তর-ভারতে যেমন তুলসীদাসের রামায়ণ জনসাধারণের মধ্যে আদৃত, নেপালেও ভানুভক্তের রামায়ণ সেইরূপ আদর পায়। নেপালের প্রতি গ্রামে ভানুভক্তের রামায়ণ প্রত্যহ পঠিত হয়। নেপালে এমন লোক দেখা যায় না, যে ভানুভক্তের রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত নয়।

সুখের বিষয়, কোন কোন নেপালী লেখক এই প্রথম নেপালী কবির জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৮৯১ অব্দে কাশী হইতে স্বর্গীয় মোতারাম ভট্ট "ভানুভক্তকো জীবন-চরিত্র" নামক পুস্তকে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমানে ১৯২৭ অব্দে দার্জ্জিলিং নেপালী সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমার বন্ধু শ্রীসূর্য্যবিক্রম জ্ঞবালী মহাশয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা সহিত তাহা সম্পাদন করিয়াছেন।

নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠমাণ্ডুর পশ্চিম দিকে তনহু নামে একটি প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশেই নেপালী কবি ভানুভক্তের জন্ম হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র ছিল—প্রথম ধনঞ্জয়, দ্বিতীয় কাশীনাথ, তৃতীয় পদ্মনাভ, চতুর্থ তুলসী, পঞ্চম গঙ্গাদত্ত ও কনিষ্ঠ ইন্দ্রবিলাস। ইঁহারা সকলে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র ধনঞ্জয় আচার্য্যও দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি রাজার নিকট হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্রের নাম—কবি ভানুভক্ত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে কবি ভানুভক্তের জন্ম হয়। কবি নিজে লিখিয়াছেন :—

"পাহাড়কো অতি বেস দেশ্ তনহুঁমা শ্রীকৃষ্ণ বাহ্মণ থিয়া
থুপ্ উচ্চাকুল আর্য্যবংশ হুন পৈ সৎকর্ম্মা মন্ দিয়া।
বিদ্যামা পনি যো ধুরন্ধর ভই শিক্ষা সবাই দিয়া।
ইন্‌কো নাতি ম ভানুভক্ত মনি হ যো কাব্য চির্‌হি লিয়া।"

কবি ভানুভক্ত নেপালে তাঁহার কবিত্বশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি বাল্যকালে যথারীতি শিক্ষা পান ও আঠার বৎসর বয়সেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি কিরূপে কবিত্ব-শক্তি লাভ করেন সে-সম্বন্ধে একটি গল্প নেপালে প্রচলিত আছে। যখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর তিনি ঘোটা নদীর ধারে বেড়াইতে যান। সেখানে মৃদুমন্দ বাতাসে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। দুই ঘণ্টা পরে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল তখন তিনি দেখিলেন যে কিছু দূরে একটি ঘাসী ঘাস কাটিতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে আসেন ও তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া খুব দুঃখিত হন। তাহার গভীর জ্ঞান দেখিয়াও তিনি আশ্চর্য্য হন। তাহার দুঃখের কাহিনীতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং বাল্মীকি যেমন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকে কাতর হইয়া শ্লোকে ব্যাধকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তেমনি কবি ভানুভক্তও নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার হৃদয়-ব্যথা ব্যক্ত করিলেন :—

"ভর্ জন্ম ঘাঁস তির মন্ দিই ধন্ কমায়ো।
নাম কৌ রহোস্ পছি ভনের কুবা খনায়ো॥
ঘাঁসী দরিদ্রি ঘরকো তর বুদ্ধি কস্তো।
মো ভানুভক্ত ধনি ভৈ কন আজ বস্তো॥
মেরা ইনার ন ত সত্তল পাটি কৈঁ ছন্।
যো ধন্ র চীজহরু ছন্ ঘর মিত্র নৈ ছন্।
তেস ঘাঁসিলে কসরি আজ দিয়ে ছ অর্তী।
ধিক্কার হো মকন বস্ মু ন রাখি কীর্ত্তি॥

ইহার পর হইতেই কবি ভানুভক্ত কবিতা লিখিতে সুরু করিলেন। নেপালবাসীরা তাঁহাকে মহাকবি বাল্মীকির সহিত তুলনা করেন—মহর্ষি বাল্মীকি যেমন পরদুঃখে কাতর হইয়া কবিতা দেবীর আশ্রয় লইয়াছিলেন তেমনি কবি ভানুভক্তও পরদুঃখে কাতর হইয়া তাঁহার ব্যথা কবিতায় ব্যক্ত করেন। বাল্মীকি ঋষি রামায়ণ লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, কবি ভানুভক্তও নেপালী ভাষায় রামায়ণ লিখিয়া নেপালীদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এইরূপ অলৌকিকভাবে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া কবি ভানুভক্ত রামায়ণ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই রামায়ণ-রচনাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। তিনি নেপাল-দরবারে কি সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বা কি জায়গীর পাইয়াছিলেন—এখন লোকে আর সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছে না। বরং তিনি যে সুললিত ভাষায় রামায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া নেপাল-বাসীরা আনন্দ লাভ করিতেছে। বলা বাহুল্য ভানুভক্তের নেপালী রামায়ণকে কেহ যেন সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ বলিয়া ভুল না করেন। কবি ভানুভক্ত বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুসরণ না করিয়া, সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নেপালী রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার পক্ষে এই রামায়ণ রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল।

কবি ভানুভক্ত নেপালী রামায়ণ ছাড়া আরও অনেক বই নেপালী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে (১) "প্রশ্নোত্তরী", (২) "বধূশিক্ষা" ও (৩) "ভানুভক্তমালা" প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের কয়েকটি স্তোত্র লইয়া "প্রশ্নোত্তরী" লেখা হইয়াছে। দার্জ্জিলিং নেপালী সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহার "বধূশিক্ষা" বইটি পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কবি ভানুভক্তের "নেপালী রামায়ণ" নেপালে সর্ব্বজনপ্রিয়। ইহার পর "প্রশ্নোত্তরী" ও "ভানুভক্তমালা"র প্রচার খুব বেশী।

ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়, কবি ভানুভক্ত নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া নেপালী "ভাখা"য় রামায়ণ ও অন্যান্য কবিতা-পুস্তক লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে যেমন এককালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত বিষয় লিখিতেন ও বাংলা লেখাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কবি ভানুভক্তের সময় নেপালেও সেই অবস্থা ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দৃষ্টি সংস্কৃত ভাষার দিকে ছিল, নেপালী "ভাখার" দিকে ছিল না। সুখের বিষয়, ভানুভক্তই সর্ব্বপ্রথম এবিষয়ে পরিবর্ত্তন সুরু করেন। তিনি নেপালী ভাষায় কবিতা লিখিয়া, রামায়ণ রচনা করিয়া বর্ত্তমান নেপালী সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও জাতীয়তা ইহা হইতেই বেশ

স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। তিনি তাঁহার নেপালী সাহিত্য ও নেপাল দেশকে পূর্ব্বভাবেই ভালবাসিতেন। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু বা কাষ্ঠমণ্ডপকে তিনি "অমরাবতী কান্তিপুরী নগরী" "অলকাপুরি কান্তিপুরী নগরী" ও "শিবকী পুরি কান্তিপুরী নগরী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাঠমাণ্ডু দেবাদিদেব শিবের পুরী ও পশুপতিনাথের স্থান বলিয়া তিনি গর্ব্ব অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন:—

"পশুকা পতি ছন্ রথাবারী গরী।
শিবকী পুরি কান্তিপুরী নগরী।"

পিতৃদায় *

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

সোমবারে মিসেস্ এগ স্বামীকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের দুই কান উপদেশ এবং আদেশে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছিল। এগ্ মহাশয় পুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে চলিয়াছিলেন। ছেলের উচ্ছ্বাস পছন্দ নয়, সুতরাং লোকজনের সামনে তাহাকে চুম্বন ইত্যাদি করিয়া কর্ত্তা যেন অপ্রতিভ না করেন। অ্যাডাম্ যদি নাবিকের পোষাক ছাড়িয়া সাধারণ পোষাক পরিতে চায়, তিনি যেন বাধা না দেন। আর নিজে যেন আবার ক্রুক্লীন সহরের পথে হারাইয়া না যান। সেখানের বড় বড় বায়োস্কোপগুলিতে গিয়া কি কি ভাল ছবি তাহারা দেখাইতেছে, সব যেন জানিয়া আসেন। আর যে-সব ফরমাস ছিল, তাহা স্বামী কাগজে লিখিয়া লইয়াছেন কি না, তাহাও গৃহিণী দেখিয়া লইলেন। তাহার পর দস্তুরমত বিদায় লইয়া, অনুগত স্বামীটিকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া এক ছোকরা, দম্পতিকে মন দিয়া দেখিতেছিল, সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকরুণ, আপনার ওজন কত জান্তে পারি কি?"

এগ্-জায়া কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "কি জানি বাছা, অনেক কাল ওজন হইনি। তুমি যখন জন্মেছ, তার আগে হয়ে থাকব। তোমার মা কখনও তোমার মুখের ভিতরটা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করেনি না কি?"

প্ল্যাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান লোকগুলি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছোকরা তাড়াতাড়ি মাথাটা ভিতরে টানিয়া লইল। ট্রেনটা আস্তে আস্তে সশব্দে প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। শ্রীমতী এগ দাঁড়াইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ষ্টেশনের একজন কর্ম্মচারী তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "ছি, ছি, কি কাণ্ড! কোনো মহিলা যদি একটু ইয়েই হন, তাই বলে—"

এগ্-জায়া বাধা দিয়া বলিলেন, "যদি মোটা হন্? হাঁ তা আমি খুবই মোটা বটে, সঙ্গে সঙ্গে তাল গাছের মত লম্বা হওয়াতে আরো বিপদ হয়েছে। আমার বাপের গুষ্টি সবই খুব লম্বা। আমরা মোটা হলে একেবারে রাক্ষুসে চেহারা হয়। কিন্তু ছোঁড়ার মা তাকে ভাল করে মানুষ করেনি, তাহলে মায়ের বয়সী বুড়ীকে এমন কথা জিগ্‌গেষ করত না।"

আর একজন দর্শক বলিল, "কিন্তু মার্টেল, তোমার বাবা একেবারে হাড়জিরার রোগা ছিল।"

শ্রীমতী এগ্ হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "তাঁকে আমার বিশেষ মনে নেই। ছবিতে রোগাই দেখায় বটে। আচ্ছা; আমি বাড়ী চল্লাম। আজ একটা এঁড়ে বাছুর কিন্‌তে এক ভদ্রলোক আস্‌বে।"

* ইংরাজী হইতে

তিনি রেলিং এর কাছে যেখানে তাঁহার মোটরখানা দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে চলিলেন। দর্শকদের ভিতর কয়েকজন ভদ্রতা করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। তিনি চালকের আসনে বসিয়া পড়িয়া, সকলকে ধন্যবাদ দিয়া গাড়ী চালাইয়া দিলেন।

পথে দেখিলেন তাঁর দুই মেয়ে ওষুধের দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুই মেয়েই স্বামীর ঘর করে এখন। গৃহিণী মোটর থামাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে, কাল জাহাজ আস্‌ছে। তোদের বাবা ড্যামিকে এগিয়ে আন্‌তে গেলেন আজ। ঐ যা, তাঁকে ত একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। যাক্‌গে, তোরা বুধবার রাত্রে আমার এখানে খাস, বুঝ্‌লি ?"

এক মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এক দিনেই সে ছুটি পাবে কি ?"

মেয়ের বোকামিতে চটিয়া গিয়া শ্রীমতী এগ্ বলিলেন, "তা তুই কি ভাবছিস্ তাকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওরা ছাড়বে ?" বলিয়া আবার গাড়ী চালাইয়া দিলেন। রাস্তার ধারের বাদাম গাছগুলিতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। অ্যাডাম্ এই ফুল বড় ভালবাসে। রাস্তায় আরো বার পাঁচেক তাঁহাকে গাড়ী থামাইতে হইল। ছেলের বন্ধু-বান্ধব দেখিলেই তাহাদের সুখবরটা না শুনাইয়া পারিতেছিলেন না। আর একবার একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে তিনি গাড়ী দাঁড় করাইলেন। এক ছোক্‌রা তাড়াতাড়ি তাঁহার ফরমাসী চকোলেটের কুল্‌ফী লইয়া আসিল। এই ছোক্‌রা সবে দোকানে কাজে লাগিয়াছে, তাঁহার ছেলেকে সে চেনেও না, তবু তিনি হাস্যবিকশিত মুখে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার ছেলে বুধবারে বাড়ী আস্‌ছে।"

ছোক্‌রা ভদ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি নৌ-বিভাগে অনেক দিন কাজ করেছেন, না ?"

শ্রীমতী এগ্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ১৯১৭ থেকে সে কাজ করছে। গত সপ্তাহে তার একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ভাব্‌তেও অবাক লাগে।"

আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। বায়োস্কোপের সম্মুখে আসিয়া তিনি সপ্তমবার দাঁড়াইলেন। বাহিরের বিজ্ঞাপনগুলা কিছু সুবিধাজনক বোধ হইল না। সাপ্তাহিক ঘটনাবলীর চিত্রের একটা তালিকা বাহিরে টাঙানো ছিল। প্রথমে রহিয়াছে, "রোমে উৎসব," দ্বিতীয় "গোয়ান্টানামো হইতে নৌবাহিনীর যাত্রা।" এগ্-জায়া হাসিয়া উঠিলেন। এই ছবিখানা দেখিতে তাঁহাকে আসিতেই হইবে। এখন তাঁহার দাঁড়াইবার সময় নাই, ঘরে খাবার ঠাণ্ডা হইতেছে। আর রাত্রিই বায়োস্কোপ দেখিবার ঠিক সময়। তিনি আবার গাড়ী চালাইলেন। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় দোকানের বাড়ী ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। ছোট ছোট কাঠের ঘর দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ইডিথ ওয়েব তাহাদের গেট খুলিয়া বাহির হইতেছে দেখা গেল। শ্রীমতী এগ্ অষ্টমবার গাড়ী থামাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ইডিথ্, বুধবার রাত্রে ড্যামি বাড়ী আস্‌ছে।" এই সুন্দরী মেয়েটিকে লজ্জায় মুখ রাঙা করিতে দেখিতে তাঁহার খুব ভাল লাগিত। অ্যাডাম ক্রীষ্টমাসের সময় এই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া অনেক নাচের উৎসবে গিয়াছিল। শ্রীমতী এগেরও মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। বেশ মানানসই বউ হইবে।

মেয়েটি গেটের কাঠটা মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিল, "ওমা, তাই নাকি ? খুব সুখবর ত। আচ্ছা, আপনারা নাকি আগে এই বাড়ীতে থাক্‌তেন ? বাবা কাল রাত্রে বল্‌ছিলেন, এই বাড়ীতে না এর পাশের বাড়ীতে ?"

এগ্-জায়া বলিলেন, "এই বাড়ীতেই। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে আমার বাপের চেয়ে ঢের ভাল বাপ পেয়েছ। তোমার বয়সে, আমি এই বাড়ীতেই ছিলাম বটে। মাকে সেলাইয়ে সাহায্য করতাম, এবং পেট ভরে খেতেও পেতাম না। তাই বোধ হয় এখন—যাক্ গে, তা বাড়ীটা মোটের উপর ভালই। ড্যামি বুধবার রাত্রে তোমাদের এখানে দেখা করতে আস্‌বে সম্ভবতঃ।" গাড়ী আবার চলিল। সহরের সীমানা ছাড়াইয়া, দুই ধারে ক্ষেতের ভিতর দিয়া তিনি গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন। এ ক্ষেতগুলি তাঁহাদেরই। ঘাসে ঢাকা জমিতে গরু চরিতেছে। আপেল গাছগুলিও ভালই দেখাইতেছে। বড় বড় জলের ট্যাঙ্কগুলির নাম

রও তাঁহার দৃষ্টিকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেই ক্ষেতের একজন মজুর তাঁহাকে নামিতে সাহায্য করিল। তিনি এক একটা করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিলেন। মনটা তাঁহার ভার ভার লাগিতেছিল। তাঁহার মা আজ বাঁচিয়া থাকিলে নাতির কৃতিত্বে কত খুসি হইতেন। যাই হোক, বসিবার ঘরে অ্যাডামের খান ছয় ছবি সাজানো ছিল, তাহা দেখিয়া গৃহিণীর মন আবার খুসি হইয়া উঠিল। ছবিগুলা অবশ্য বিশেষ ভাল নয়। অ্যাডামের দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্ত্তি ছবিতে কিছুই বোঝা যায় না। মুখখানা সুন্দর দেখাইতেছে বটে। সাদা পোষাক পরা একটা ছবিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। একটা ছবিতে দেখা গেল অ্যাডাম কামানের উপর বসিয়া আছে। এই ছবিখানাই সব চেয়ে ভাল। কুস্তিগীরের পোষাক পরা আর একটা ছবিতে তাহাকে ঢের বেশী লম্বা দেখাইতেছে বটে, কিন্তু এ ছবিখানা গৃহিণীর পছন্দ নয়। তাঁহার কেবলি ভয় পাছে কুস্তি লড়িতে গিয়া অ্যাডাম্ কাহাকেও মারিয়া ফেলে। সাদা পোষাকের ছবিটি তিনি সঙ্গে করিয়া খাবার ঘরে লইয়া গেলেন।

রাঁধুনী খাবার পরিবেশন করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "ছেলের পোষাক জোটাতে আমার প্রাণ বেরোবে। জুতোটা বরং সহজে পাব। তার পা বিশেষ বড় নয়। দ্যাখ্, কাল সকালে আমায় মনে করিয়ে দিস্ ত, বড় একটা নারকেলের কেক তৈরী করতে হবে। ছেলে ঐ কেক বড় ভালবাসে, কিন্তু একেবারে টাটকা পছন্দ করে না। ওঁর সঙ্গে একটা কেক্ পাঠিয়ে দেব ভেবেছিলাম, তা ওঁর যা ভোলা মন! কোথায় ফেলে দেবেন এখন। এই সেদিন—"

সদর দরজার ঘণ্টাটা সজোরে বাজিয়া উঠিল। গৃহিণী মুখ মুছিয়া বলিলেন, "সেই অ্যাশল্যাণ্ডের লোক বোধ হয়, বাছুর দেখ্‌তে এসেছে। এরা খাবার সময় কেন যে আসে। আচ্ছা, যা সেভী, দরজাটা খুলে দিগে যা।"

রাঁধুনী বাহির হইয়া গেল। শ্রীমতী এগ্ চুলটা একটু ঠিক করিয়া, সতৃষ্ণদৃষ্টিতে প্লেটের অবশিষ্ট চপখানির দিকে তাকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে রাঁধুনীর গলার সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। শ্রীমতী এগ্ এক পেয়ালা দুধ পান করিয়া, লোকটার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাঁধুনী খাবার ঘরে একলাই ফিরিয়া আসিল দেখিয়া গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে সেভী?"

"লোকটা বল্‌ছে, সে নাকি—সে নাকি—আপনার বাবা!"

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বাজে বকিস্ না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পর বাবাকে কেউ চোখে দেখে নি। লক্ষ্মীছাড়া কি রকম দেখ্‌তে?"

"তালগাছের মত লম্বা, হাড্ডিসার, মাথায় টাক।"

গৃহিণীর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি খাবার ঘরের ভিতর দিয়া সামনের হলে গিয়া ঢুকিলেন। সদর দরজাটা খোলা, দরজার ফাঁকে তিনি দেখিলেন আপেল গাছগুলির সামনে কালো পোষাক পরা একটা লম্বা লোক দাঁড়াইয়া, তাহার মাথাটা চক্‌চক করিতেছে।

শ্রীমতী এগের মনে পড়িল, তাঁহার বাবার চুল খুবই পাতলা ছিল বটে। তিনি লোকটির দিকে অগ্রসর হইবামাত্র তাহার মুখ কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "ষ্টেশনে আমি খোঁজ করছিলাম, মার্টেল প্যাকার কোথায় থাকে। একজন বুড়ো বললে সে জন এগ্‌কে বিয়ে করেছে। তুমি মার্টেল নাকি?"

এগ্-জায়া বলিলেন, "আমিই বটে।" তাঁহার শরীর কেমন করিতে লাগিল। তিনি দুই হাতের আঙুল সংশ্লিষ্ট করিয়া লোকটির বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বুড়ো আবার ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, "তারা আরো বললে তোমার মা মারা গিয়েছেন। আমিও তাঁর পাশে কবরে শোবার জন্যে ফিরে এসেছি। যমদূতের হাতে ধরা দেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। জীবনে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল বটে, কিন্তু মরণে হবে না। আমি টেক্সাস্ থেকে আধাপথ হেঁটেই এসেছি। তুমি আমাকে চুমো খেতে চাইবে না নিশ্চয়ই! তোমার চেহারা হয়েছে ঠিক তোমার মায়ের মত!"

তাহার তোব্ড়ানো গালের উপর দিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সূক্ষ্ম চিবুকটা কাঁপিতে লাগিল। সে দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। শ্রীমতী এগের পিছনে দাঁড়াইয়া রাঁধুনীটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষেতের একটা মজুর, সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। গৃহিণীর শরীর কাঁপিতে লাগিল। বুড়া কান্না জুড়িয়া দিল। তাহার মাথাটা দুলিতে লাগিল। চক্চকে টাকটার দিকে চাহিয়া এগ্-জায়ার কেমন যেন ঘৃণা করিতে লাগিল। তাঁহার পিতা, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবার ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

এগ্-জায়া বলিলেন, "মা ত ১৯১০এ মারা গেছেন। তাইত এখন—আচ্ছা!"

বুড়োর কান্নার আওয়াজটা তাঁহার বুকে গিয়া বিঁধিতেছিল। ঠিক যেন শিশুর কান্নার মত।

একটা ছেঁড়া ধূলোয় ভরা ব্যাগ বুড়োর পাশে পড়িয়া, সেটার দিকে চাহিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি টেক্সাস্ থেকে এলে নাকি?"

"হ্যা মা। ছিয়াত্তর বছরের বুড়োর জন্তে জগতে কোনো কাজ নেই, মরা ছাড়া। স্যান্ আণ্টোনিওতে আমি একটা হোটেল চালাতাম। মিসিসিপির গ্রীন্‌ভিল্ থেকে লিটল্ রকে আমি হেঁটে এসেছি। সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলা আমায় গাড়ীর ভাড়া দিয়েছিলেন। এখনও জগতে সত্যিকারের খ্রীষ্টান আছে ঢের। এখানের পুরণো প্রেস্‌বিটারিয়েন্ গীর্জ্জাটা ভেঙে ফেলেছে শুন্‌লাম! ঐখানে তোমার মায়ের আর আমার বিয়ে হয়।"

এগ্-জায়া বলিলেন, "হ্যা, গত বছর ওটা ভাঙা হয়েছে। সেডী, ব্যাগ্‌টা উপরের খালি শোবার ঘরে নিয়ে যা। বাবা, চুপ কর।"

তিনি যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কথা বলিতেছিলেন। বুড়ার মাটিতে বসিয়া কান্না তাঁহার আর সহ্য হইতেছিল না। তাঁহার মনে অদ্ভুত একটা ভাবের উদয় হইতেছিল। সব যেন অবাস্তব। ধূসর রঙের হল ঘরটাও যেন বায়োস্কোপের ছবির মত দুলিতেছিল।

"বাছা, আমাকে গোয়াল ঘরে রাখ্‌লেই পার, সেই আমার উপযুক্ত জায়গা।"

গৃহিণী বলিলেন, "থাক্, ওসব কথায় কাজ নেই, বাবা। তুমি গিয়ে একটু শোও, সেডী তোমায় খাবার দিয়ে আস্‌বে।"

বুড়োর হাতের স্পর্শ গরম এবং শিথিল। শ্রীমতী এগ্ হাতখানা ধরিয়াই ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ো নতমস্তকে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গেল। রাঁধুনী উপরের ঘরে হাঁউ-মাউ করিয়া চেঁচাইতেছে শোনা গেল। গৃহিণী দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। বুধবার রাত্রে তাঁহার ছেলে আসিবে। তিনি কতবার না অ্যাডামকে বলিয়াছেন সে যেন জুয়া না খেলে, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার না করে এবং তামাক না খায়। "তোমার প্যাকার দাদামহাশয়ের মত হয়ো না।" আর সেই প্যাকার দাদামশায়ই শেষে আসিয়া হাজির!

ক্ষেতের মজুরটা সংবাদটা শুনিয়াই বাহিরে পলাইয়াছিল। এখনই উহা সারা সহরময় ছড়াইবে।

গৃহিণী বলিলেন, "হায়, হায়, ড্যামির বাড়ী আসাটা খুব আনন্দের হবে ভেবেছিলাম!"

নীরব গৃহে তাঁর গলার স্বরটা চীৎকারের মত শুনাইল। গৃহিণী খাবার ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজেকে একটু ঠাণ্ডা করিবার জন্য এক মগ দুধ পান করিয়া ফেলিলেন।

রাঁধুনী নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি কিছুই ত খেলেন না, গিন্নিমা। এক পেয়ালা চা চাইছেন। ভারি দুঃখের বিষয় না? বাইবেলের স্তোত্র আওড়াচ্ছেন। একেবারে কঙ্কালসার চেহারা। আমায় জিগ্‌গেস করছিলেন কর্ত্তামহাশয়ের মেজাজ কেমন। মাখন মাখান টোষ্ট দু একটা খেতে পারেন বোধ হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "দিয়ে দেখ্‌গে যা। আমার কানের কাছে বক বক্ করিস্‌নে। আমায় এখন ঢের কথা ভাব্‌তে হবে।"

তিনি আবার খাবার টেবিলে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাণ্ডা ভাত ঘন দুধ এবং আপেলের জেলি দিয়া খাইতে খাইতে ক্রমাগত চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাপের স্মৃতি তাঁহার মনে বিশেষ উজ্জ্বল ছিল না। একবার তাঁহার

দৈনন্দিন লিপিতে কালি ফেলার অপরাধে খুব মার খাইয়াছিলেন। তাঁহার বাবার ছুতারের কারখানা ছিল। কাকা জ্যাঠা কেহই জীবিত ছিলেন না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্যাকার নিজের পত্নী সন্তান-সন্ততি সকলকে ফেলিয়া এক সুন্দরী পরিচারিকাকে লইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার স্ত্রী সেলাই করিয়া সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহার দ্বারাই সন্তান পালন করেন। এখন সেই বাপ ফিরিয়া আসিয়াছেন। লোকে শুনিলে বলিবে কি? শ্রীমতী এগ্ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন, কর্ত্তব্যপালন করিতেও তাঁহার মন পিছাইয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে হয়ত ঐ টাকমাথা এবং সরু গলা তাঁহার সহিয়া যাইবে। সব যেন কেমন স্বপ্নের মত লাগিতেছে। তাঁহার মা পলাতক স্বামীর কথা এতই অল্প উল্লেখ করিতেন যে, সে ব্যক্তি যে বাঁচিয়া আছে, তাহা তাঁহাদের মনেই হইত না। কিন্তু আসিয়া ত হাজির হইল। পলাতক পিতা ফিরিলে কি কি করা উচিত? বাইবেলে সে বিষয়ে কোনো উপদেশ নাই।

চারিটার সময় গৃহিণী যখন খরিদ্দারকে বাছুর দেখাইতে ছিলেন, তখন তাঁহার বড় মেয়ের মোটর গাড়ী গলির মোড়ে দেখা দিল। উহাতে তিন মেয়েই বসিয়া। শ্রীমতী এগ্ খরিদ্দারটিকে বিদায় করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি আরো ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া তাঁহার নূতন গোয়াল ঘর, ফলের রস বাহির করার যন্ত্র, ইত্যাদির তারিফ করিয়া তবে বিদায় হইল। তাহাকে বিদায় দিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া গৃহিণী দেখিলেন তিন মেয়ে আগুনের ধারে বসিয়া জটলা পাকাইতেছে। তিন জনেরই চোখ একটু লাল এবং ভাবভঙ্গী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। তাঁহাকে চুম্বন করিতে তিনজনেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। গৃহিণী নিজের চেয়ারে বসিয়া কন্যাদের কোনো-মতে ঠেকাইয়া রাখিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারা সহরময় এটা ছড়িয়েছে ত? তা যাক্। দাদামহাশয়কে দেখে কি রকম লাগ্‌ছে?"

এক মেয়ে বলিল, "অত জোরে কথা বোলো না, মা।"

আর একজন বলিল, "বেচারা! এত ক্লান্ত হয়ে আছেন যে, কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মানুষ খুন করার অপরাধে প্রায় ফাঁসি যেতে বসেছিলেন, সেই কথা বল্‌ছিলেন।"

টেবিলের উপর কাঁচের ঢাকার নীচে একটা পাত্রভরা চকোলেট ছিল। উহার একটা তুলিয়া মুখে দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এতক্ষণ বেশ আমোদে কাটিয়েছিস্, দেখ্‌ছি। পাপীর অনুতাপের গল্প—"

এক মেয়ে বাধা দিয়া বলিল, "ও কি মা!" শ্রীমতী এগ্ বলিলেন, "শোন বাছা। এ বাড়ীতে ক্ষমা করা-টরার ব্যাপারের যদি প্রয়োজন ঘটে ত আমিই তা করব এখন। তোমাদের যথাসম্ভব সুখে-স্বচ্ছন্দে মানুষ করা হয়েছে। তোমাদের ঘণ্টায় তিন আনা হিসাবে কখনও সেলাই করতে হয়নি, এবং বিয়ের পোষাক কিনবার জন্যে টাকা ধার করতেও যেতে হয়নি। মানুষ খুন করা, আর হোটেল চালানোর গল্প তোমাদের কাছে বায়োস্কোপ দেখার মতই আমোদজনক। কিন্তু আমার এতে কিছু আমোদ লাগ্‌ছে না। বুড়ো হয়েছি, অনেক ঘাও খেয়েছি। এই সব নিয়ে যদি বেশী বক্ বক্ না কর ত আমি খুসি হই। বুধবারে ড্যামি আসছে, নৌবাহিনীর কাজ থেকে, আর এখন এইসব আপদ আমার ঘাড়ে এসে জুটল। সহরের যত অকর্ম্মা কুড়েকে এখানে গল্প শুনতে এবং আমার ঘরদোর নোংরা করতে আসতে দিতে আমি রাজী নই। ড্যামি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চায়। আশে পাশে যাদের দেখি তাদের অনেকের চেয়ে আমি ঢের ভাল খ্রীষ্টান, কিন্তু ঐ সব পেটের ভাতের জন্যে অনুতপ্ত হওয়ার মূল্য আমার কাছে বেশী নয়। টেক্সাসে তার যা কিছু ছিল, খেয়ে শেষ করেছে, এখন বাড়ী এসেছে—"

"মা, নিজের বাপের নামে এমন করে বলছ?"

গৃহিণী বলিলেন, "সে যাই বল। আমার মায়ের সেলাই করে করে চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, খাটুনীর চোটে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রও বিকল হয়ে গিয়েছিল। পনেরো বছর এমনি করে তাঁর কেটেছে। আমার বিয়ের পর, তোদের বাবা তাঁকে দয়া করে জায়গা দিয়েছিলেন তাই একটু বিশ্রাম পেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোনোদিন একটা কথা বলেননি। এখন তিনি স্বর্গে গেছেন। স্বামীর গুণের

কথা তাঁর মুখ থেকে কেউ শুনবে না, কিন্তু আমি যে কি করব, ভেবেই পাচ্ছি না। এবাড়ী তোমার বাবার এবং ড্যামির। এটা রাজ্যের অপদার্থের হোটেল নয়।"

"মা কি যে বল!"

"যাই বলি খাঁটি কথা। এখন আমার ঘুমের সময়।"

বড় মেয়ে সুসান প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "মা, ওঁর ছিয়াত্তর বছর বয়েস হয়েছে, যাই করে থাকুন—"

তাহার মা বাধা দিয়া বলিলেন, "স্বামী ক্লাবের থেকে একটু বেসামাল হয়ে ফেরাতে যে মহিলা তাঁকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে এত ক্ষমাশীলা হওয়াটা—" মায়ের কথা শেষ হইবার আগেই সুসান পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। গৃহিণী আর একটা চকোলেট মুখে দিয়া বলিলেন, "এটা আমার, তোমার বাবার এবং ড্যামির বিচার করবার ব্যাপার। তোমাদের উপদেশের দরকার নেই।"

মেয়েরা, গতিক ভাল নয় দেখিয়া, যে যার পথ দেখিল। গৃহিণী চকোলেটগুলি ঢাকা দিয়া, রান্নাঘরে চলিলেন। তিনি ঢুকিবামাত্র দুইজন দিনমজুর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

গৃহিণী রাঁধুনীকে সংবোধন করিয়া বলিলেন, "সেডী, অল্পকথা বললে জগতে কোনো গোলোযোগ ঘটে না, এটা মনে রেখো। আমাকে আজকের দুধের ক্রীমটা দে। কিছু মশলা দেওয়া পিঠে করে রাখি। বুধবারে বড় বেশী কাজ পড়ে যাবে। ড্যামি পিঠে একটু বাসি পছন্দ করে।"

রাঁধুনী বলিল, "গিন্নিমা, যদি আপনার ছেলেই একটা অন্যায় করে' পরে ফিরে আসত?"

গৃহিণী অত্যন্ত তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "যা বলছি কর, ক্রীমটা দে। আমায় কি করতে হবে না হবে, তোদের শেখাতে হবে না।"

কিন্তু কি যে তাঁহার করা উচিত, তাহা ক্রমেই বেশী গোলমেলে হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়, সহর হইতে তাঁহার এক বন্ধু টেলিফোন করিল যে, বায়োস্কোপে নৌবাহিনীর যে ছবি প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার মধ্যে অ্যাডামের ছবিও আছে।

গৃহিণী বলিলেন, "দূর! আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে? সত্যি বলছিস্? হ্যাঁ, তা দেখান অন্ততঃ উচিত। সে ছবিতে কি করছে? কুস্তি লড়ছে? ওমা! আচ্ছা, ম্যানেজারকে টেলিফোন কর, যেন আমার জন্যে একটা বক্স রাখে।" বন্ধুর গলা আবার শোনা গেল, "তোমার বাবা বাড়ী এসেছেন নাকি শুনলাম?"

শ্রীমতী এগ্ স্নেহের সুরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর শরীর বড় খারাপ, লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। তুমি সকলকে বলে দিও। যাক্, ড্যামির ছবি দেখাচ্ছে তা হলে? তা দেখাবার সময় হয়েছে বটে।" বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া তিনি টেলিফোন ছাড়িয়া দিলেন।

বৃদ্ধ হলঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিল। সূর্য্যাস্তের লাল আভা পড়াতে তাহার টাকপড়া মাথাটা সিঁদুরের গোলার মত দেখাইতেছিল।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ভাল বোধ হচ্ছে, বাবা?"

বৃদ্ধ বলিল, "আমার পক্ষে যতটা ভাল বোধ করা সম্ভব। মার্টেল, তোমাকে অবিকল তোমার মায়ের মত দেখাচ্ছে।" তাহার গলার স্বরে আবার কান্নার আভাস পাওয়া গেল।

এগ্-জায়া বলিলেন, "মায়ের চুল ছিল সোনালী, আর মরবার সময় পর্য্যন্ত, কখনও তাঁর ওজন একশ' পঞ্চাশ পাউণ্ডের বেশী হয়নি। রাত্রে কি খাবে?"

বুড়া ঘরের এদিক হইতে ওদিক হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার পা দুটা নড় নড় করিতে লাগিল। গৃহিণী ভুলিয়াই গিয়াছিলেন তাঁহার পিতা কি রকম দীর্ঘকায় ছিলেন বৃদ্ধের মুখখানা বলিরেখায় ভরিয়া উঠিয়াছে, চোখ প্রায় দেখাই যায় না। দয়ার পাত্র সন্দেহ নাই।

তিনি বলিলেন, "চিমনীর উপর ঐ যে ছবি দেখছ, ওটা অ্যাডামের। সে সাড়ে ছয় ফিট্ লম্বা, ছবিতে ঠিক বোঝা যায় না।"

বৃদ্ধ বলিল, "নাবিকের জীবন বিশেষ সুবিধার নয়, বাছা। আশা করি তার কোনো কুঅভ্যাস হয়নি? জগৎটা বড় প্রলোভনের জায়গা।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ঠিক। তবে অ্যামি তাস্‌টাস্ চেনে না একটুও। তাকে সাধারণ খেলা শেখাতে চেষ্টা করেছিলাম, তাও পারে না। বাপকেও হারাতে পারে না। তাহলেই বুঝ্‌ছ কেমন ছেলে!"

বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার কুঞ্চিত ললাট একটু যেন সমতল বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যদি ছেলেবেলা থেকে ঠিক পথে চল্‌তাম!"

এগ্‌-ত্রায়া বলিলেন, "বাবা, এখনও ডাইরি লেখ নাকি?"

"আমি ডাইরি লিখতাম, না? ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার মত বয়স হলে দেখ্‌বে সব জিনিষই কেমন গুলিয়ে আসে। যাক্, ভাল কিছু মনে রাখবার আমার নেইও।"

সে আবার কান্না জুড়িল। শ্রীমতী এগ্ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বায়োস্কোপ তাড়াতাড়ি সুরু হইলে বাঁচা যায়।

বুড়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, "মরবার সময় ঘনিয়ে এল। আমাকে তোমার মায়ের পাশে কবর দিও।"

রাঁধুনী আসিয়া বলিল, "খাবার তৈরি হয়ে গেছে, মা।"

খাইতে বসিয়াও জ্বালাতন। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া দুধের বাটিতে রুটি টুকরা করিয়া ফেলিতে লাগিল, এবং রাজ্যের মরা লোকের খবর লইতে লাগিল। মেয়ের দুধের ব্যবসা কেমন চলে সে খোঁজও করিল। তাহার পর বলিল, "তোমার মেয়েগুলি বেশ, মা। বড় নরম মন তাদের।"

শ্রীমতী এগ্ বলিলেন, "হ্যাঁ, খুব গল্প করতে ভালবাসে। কাঁদবার সুবিধা পেলেই কাঁদে; সত্যি কাঁদবার কারণ কখনও জোটেনি কিনা।"

বৃদ্ধ চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। চোখ এখনো বেশ তেজালই আছে মনে হইল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া গৃহিণী আরো কঠিন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিল, "ছেলেবেলায় তোমায় ঢের কাঁদিয়েছি, না মা?" চোখের জল দেখিয়া গৃহিণীর মনে একটু আঘাত লাগিল।

"আজ বায়োস্কোপে অ্যাডামের ছবি দেখাচ্ছে আমি দেখ্‌তে যাচ্ছি। তুমিও চল না, বাবা!" কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাঁহার মনে হইল, না বলিলেই ছিল ভাল। গাড়ীতে বসিয়া তাঁহার শীত করিতে লাগিল। বুড়া গাড়ীর এক কোণে কাপড়ের বস্তার মত বসিয়া রহিল। শ্রীমতী এগ্ সারাপথ চীৎকার করিয়া অ্যাডামের গল্প করিলেন এবং ড্রাইভারকে উপদেশ দিলেন। বুড়া পাছে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করে এই ভয়ই তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

বায়োস্কোপের ম্যানেজার আসিয়া তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেলেন। কিন্তু আজ বায়োস্কোপও তাঁহার ভাল লাগিল না। বন্ধু-বান্ধবদের দেখিয়া তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া সম্ভাষণ করিলেন। তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন, সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাদের দেখিতেছে। তাঁহার বিশাল দেহের আড়ালে বৃদ্ধ এক রকম ঢাকাই পড়িয়া গিয়াছিল। সে কেমন যেন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়াছিল। আটটার সময় ছবি আরম্ভ হইল, ঘর অন্ধকার করিয়া দেওয়াতে শ্রীমতী এগ্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

একবার বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছবি কেমন লাগ্‌ছে, বাবা?"

"আমার চোখ এত খারাপ মা, যে আমি ভাল করে দেখতেই পাচ্ছি না।"

সাপ্তাহিক ঘটনাবলীর ছবি আরম্ভ হইল। গৃহিণী তাঁর ভাবনা চিন্তা সব ভুলিয়া গেলেন। তিনি এবার অ্যাডামকে দেখিতে পাইবেন।

তিনি ব্যাগ হইতে একটা পেপারমিণ্ট বাহির করিয়া মুখে দিলেন, রাষ্ট্রপতির ছবি ও কোনো এক রাজদূতের নিউ ইয়র্কে আগমনের ছবি দেখিয়া খুব হাততালি দিলেন। তাহার পর পরদার উপর সবুজ অক্ষরে লেখা ফুটিয়া উঠিল, "নৌবাহিনীর গোয়ান্ টানামো হইতে যাত্রা।" তিনি সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। নোঙর করা, বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজের ছবি পরদার গায়ে দেখা দিল, ডেকের উপর শাদা পোষাক পরা নাবিকের দল। নৌকার একটা বেশ প্রথমে দেখান হইল, তাহার পর সেটা কেমন করিয়া যেন অস্ত একটা

ছবিতে মিলাইয়া গেল। এইবার দড়ি দিয়া ঘেরা কুস্তির আখড়া, তাহার চারিপাশে শার্দি পোষাকের ভীড়। দুইটি বিশাল দেহ যুবক, কুস্তিগীরের পোষাক পরিয়া দড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। চারিদিকের লোক টুপী ঘুরাইয়া তাহাদের উৎসাহিত করিতে লাগিল।

শ্রীমতী এগ্ বলিলেন, "ওমা! এই যে!" তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ছবিটা আরো বড় হইয়া উঠিল। অ্যাডামের চেহারা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে। সে যেন তাঁহার দিকে চাহিয়াই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। চারিদিকের লোক কথা বলিতে লাগিল। হাততালির শব্দ শোনা গেল, অ্যাডাম হাসিয়া মাথা নাড়িল। পর মুহূর্তেই অন্য ছবি ভাসিয়া উঠিল। শ্রীমতী এগ্ বসিয়া পড়িলেন, রাগে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বুড়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ অ্যাডাম নাকি, মা? ঐ যে প্রকাণ্ড লম্বা, মাথায় কাল চুল?"

শ্রীমতী এগ্ বলিলেন, "হাঁ, ঐ।" রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। লোকগুলা কি বিষম পাজী! তিনি মুখে এক সঙ্গে চারটা পেপারমিণ্ট ঠাসিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বায়োস্কোপওয়ালারা কি লক্ষ্মীছাড়া। লোকে যেন কতকগুলো বুড়ো নৌসেনাপতি দেখিতে ভারি ব্যস্ত। তাহার চেয়ে কুস্তি দেখিলে তারা কত খুসি হইত।

তাঁহার বাবা জিজ্ঞাসা করিল, "মার্টেল, তোমার ছেলে ওখানে কতদিন আছে?"

এগ্-জায়া বলিলেন, "১৯১৭র ১৪ই এপ্রেল থেকে।"

বাবার গলার স্বর তাঁকে আবার প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিল। বসিয়া বসিয়া তিনি ঘণ্টাখানেক হাই তুলিলেন এবং ছবি দেখিলেন। গল্পের বিষয় এক বড়লোক এবং তাঁহার ক্ষীণকায়া পত্নী। বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিল, মাঝে মাঝে একটু নড়িয়া বসিতে লাগিল। ছবি শেষ হইয়া গেল। শ্রীমতী এগ্ হল হইতে বাহির হইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বুড়া কি সব যেন নীচু গলায় বলিতে লাগিল, কিন্তু কোনো কথাই তাঁহার কাণে গেল না। বাড়ীতে গিয়া ফিল্ম্ কোম্পানীকে খুব একটা কড়া চিঠি লিখিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ছেলের অপমানে তিনি দারুণ রকম চটিয়া গিয়াছিলেন। মোটরচালককে এ কথা না বলিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। তাহারও মত একই প্রকার দেখা গেল।

মোটরচালক বলিল, "আমি মিস্ এডিথের পাশে বসেছিলাম, ঠাকরুণ।"

গৃহিণী বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এর সঙ্গে অ্যাডামির বিয়ে হবে, বাবা। হ্যাঁ, তারপর স্যাম্? ইডিথ্ কি বল্লে?"

মোটরচালক বলিল, "ছবি দেখে খুব খুসি। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।"

গৃহিণীর ইডিথ্ সম্বন্ধে ধারণা আরো উঁচু হইয়া গেল। আধখানা কমলালেবুর মত দেখিতে, চাঁদ উঠিয়া পড়িল।

গৃহিণী বলিলেন, "যাক্, ছেলে বুধবারে ঘরে আস্‌ছে সেই ঢের। এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। ওমা, সব ঘরে আলো জ্বল্‌ছে কেন? সেভীর যদি কিছু আক্কেল আছে।"

রাঁধুনীর জন্য মনে মনে বেশ কড়া বক্তৃতা তৈয়ারী করিয়া শ্রীমতী এগ্ মোটর হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু সিঁড়িতে পা দিবার আগেই হলঘরের একখানা চেয়ার হইতে বিশাল একমূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সব ক'টা সিঁড়ি একলাফে পার হইয়া তাঁহার সামনে আসিয়া পড়িল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, মা?"

এগ্-জায়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিশালাকার যুবক তাঁহাকে একেবারে কোলে করিয়া তুলিয়া ফেলিল এবং বসিবার ঘরে লইয়া চলিল। তাহার পৃষ্ঠের আশ্চর্য্য মাংসপেশীগুলি উঁচু হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সার্টটা চড় চড় করিয়া উঠিল। গৃহিণীর চোখের সামনে ঘরটা বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। অ্যাডাম তাঁহাকে নিজের টুপী দিয়া বাতাস করিতে করিতে হাসিতে লাগিল।

"এই সব রেডিওগ্রামের গোলযোগ। ছোক্‌রা বলছিল, বাবা নাকি আমায় আন্‌তে গিয়েছেন? যাক্, তাঁর একপালা বেড়ান হয়ে যাবে। মা, চুপ কর, কাঁদছ কেন?"

মা বলিলেন, "ড্যামি, বাড়ীতে তোর খাবার মত কিছু নেই। কত কি রাঁধ্‌ব ভেবেছিলাম।"

অ্যাডাম দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। মজুরের দল সরিয়া গেল। শ্রীমতী এগ্‌ কান্না থামাইয়া, রেডিওবিভাগকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। তাহারা দেখি রবিবারকে বুধবার করিয়া তুলিতে পারে। যাক্‌, অ্যাডাম তাঁহার ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই ঢের, ঘরে যাহা আছে তাহাই খাইবে। তাঁহার আনন্দ অস্ফুট শব্দে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ বুড়ার ফিস্‌ফিসে কথা শোনা গেল, "বাছা, আমি তাহলে ঘরে যাই, তুমি ছেলের সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বল্‌তে চাইবে।"

এগ্‌-জায়া বলিলেন, "ড্যামি, এই তোমার দাদামশায়।"

অ্যাডাম সিগারেট পাকাইতে পাকাইতে বৃদ্ধকে মাথা নাড়িয়া সম্ভাষণ করিল। "কেমন আছেন? ছোকরাদের কাছে শুন্‌ছিলাম বটে যে আপনি এসেছেন।" তাহার পর আবার কাজে মন দিল। সিগারেটটা ধরাইয়া সে একদৃষ্টে বৃদ্ধকে দেখিতে লাগিল। বৃদ্ধের চোখের জল আবার গড়াইতেছে দেখিয়া, অহেতুক বিদ্বেষে এগ্‌-জায়ার মন ভরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

"চল মা, দেখি গিয়ে কি কি খাবার আছে," বলিয়া অ্যাডাম্‌ তাহার মাকে চেয়ার হইতে টানিয়া তুলিল।

ভাঁড়ার ঘরে সিন্দুকের উপর বসিয়া, সে চকোলেটের কেক্‌ খাইতে লাগিল। তাহার মা ফলের রসের মগ বাহির করিলেন, এবং হাঁফাইতে হাঁফাইতে আপেলের জেলির বোতল পাড়িয়া আনিলেন। অ্যাডাম বেশী কথা বলিতেছিল না, তাহার মাও সেরূপ প্রত্যাশা করিতেছিলেন না। সে আসিয়াছে, সেই ঢের। সে খাইয়া চলিল। শ্রীমতী এগ্‌ কথা বলিয়া চলিলেন।

অ্যাডাম শুনিতে লাগিল, এবং হাসিতে লাগিল। মা আদর করিয়া তাহার চুলে হাত বুলানোতে, "যাও না," বলিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

ছয় টুকরা কেক্‌, এবং এক মগ্‌ ফলের রস পার করিয়া, অ্যাডাম্‌ বলিল, "নেভাডা জাহাজে, ফ্রিস্কো কুলী বলে একটা লোক ছিল।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা সে কি করেছিল?"

অ্যাডাম্‌ বলিল, "করেনি কিছুই। লম্বায় প্রায় আমার সমান ছিল। বেজায় রোগা, অভিনেতাদের নকল করত খুব ভাল। ১৯১৭এ তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে।"

"লোকটা কি বেশ ভাল ছিল, ড্যামি?" অ্যাডাম আবার ফলের রসের মগের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "না।" সে আবার কথা বন্ধ করিয়া খাইতে লাগিল। শ্রীমতী এগ্‌ ইডিথের কথা তুলিলেন। অ্যাডাম হাসিয়া, খাইয়া চলিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল।

অ্যাডাম বলিল, "লোকটা স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো থেকে এসেছিল বলে সবাই তাকে ফ্রিস্কো কুলী বল্‌ত। সে মুখ কুঁচ্‌ড়ে ঠিক বাঁদরের মত চেহারা করতে পারত। স্যান্‌-ফ্রান্‌সিস্কোর এক জুয়াখেলার আড্ডায় কাজ করত। এ সেই।"

"সেকি ড্যামি?"

অ্যাডাম বলিল, "নিশ্চয়ই সে। প্রথমে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি, এখন মনে পড়ল।"

এগ্‌-জায়া সিন্দুকের গায়ে ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন, ভাঙা গলায় বলিলেন, "তুমি লোকটাকে চেন, তাহলে?"

"হাঁ, কিন্তু আস্তে কথা বল, মা।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও স্যান্‌ আন্টোনিও থেকে হেঁটে এসেছে বল্‌লে, আরো—"

অ্যাডাম্‌ বলিল, "ও কক্ষনো তোমার বাবা নয়। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার। মেপ্‌ল্‌ চিনি আছে নাকি মা? ট্রেনে যা খেতে দিয়েছিল, রামঃ।"

গৃহিণী এক টিন ভর্তি চিনি বাহির করিলেন। অ্যাডাম বড় একটা টুকরা বাছিয়া লইয়া খাইতে লাগিল। শ্রীমতী এগ্‌ অবাক হইয়া ছেলেকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মেয়েরা বলে অ্যাডামের বুদ্ধি কম, কিন্তু তিনি স্বয়ং ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিনির টুকরা শেষ করিয়া অ্যাডাম উঠিয়া দাঁড়াইল। নাক সিঁটকাইয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে গন্ধকের ধোঁয়া দিচ্ছিলে নাকি, মা?"

গৃহিণী বলিলেন, "না ত! কি করতে ধোঁয়া দেব? তোর হুপিং কাশি সারার পর বাড়ীতে আর কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি।"

"কিন্তু এ ত গন্ধকের গন্ধ!"

"আমার ঘরে ত এক টুকরোও গন্ধক নেই!"

অ্যাডাম কথা না বলিয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। তারপর বলিল, "মা একটু বোসো। আমি আস্‌ছি।"

গৃহিণী ভয় পাইয়া বলিলেন, "না ড্যামি, ও হতভাগার কাছে তুই যাস্‌নে।"

"তুমি ভয় পেয়ো না, আমি কেবল উঁকি মেরে দেখে আস্‌ব।"

চুইলাফে সে ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গৃহিণীর শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনিও ঘাঘরা তুলিয়া ধরিয়া সাবধানে তাহার পিছনে চলিলেন। বারান্দায় কেহ নাই, চাঁদের আলোয় চারিদিক ধব্‌ ধব্‌ করিতেছে। এগ্‌-জায়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ একটা থাম বাহিয়া সড়সড় করিয়া অ্যাডাম্‌ নামিয়া আসিল এবং মাকে ঠেলিয়া আবার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকাইয়া দিল।

তাহার পর বড় একটা রুটির টুকরায় জেলি মাখাইতে মাখাইতে বলিল, "লোকটা বসে বসে একগাদা ছেঁড়া খাতা পড়্‌ছে। মাথায় কসে তেল মেখেছে। তেলে নিশ্চয় গন্ধক আছে, চুল উঠিয়ে ফেলবার জন্যে মাখে আর কি!"

"এতদূর থেকে গন্ধ তুই কি করে পেলি রে?" অ্যাডাম বলিল, "খাতাগুলোয় কি আছে, কে জানে?" সে সিন্দুকের উপর বসিয়া আবার খাইতে আরম্ভ করিল।

তাহার পর বলিল, "মা, এ জেলিটা নিশ্চয় তুমি তৈরি করনি?"

"ওমা বুঝতে পেরেছিস্? না, ওটা সেডী তৈরি করেছে।"

অ্যাডাম বলিল, "মা, ইডিথকে রান্না শেখাতে হবে তোমায়। সে যা রাঁধে, তা গরুতেও খেতে পারে না। যাক্‌ তার ঢের সময় আছে এখনও। কিন্তু এ পাজীটাকে ত আর এখানে থাকতে দেওয়া চলে না। চুরির মতলবে এসেছে নিশ্চয়। লোকে যে তোমায় নিয়ে হাসবে তা আমার সইবে না। তোমার বাবা ডাইরি লিখতেন, না?"

"ওমা, তাও তোর মনে আছে? হ্যাঁ, লিখতেন বটে।"

"সেইগুলোই লোকটা বসে পড়ছে। ভারি চালাক। সে নকল করতে খুব ভাল পারে, কথায় কথায় চোখের জল ছাড়তেও জানে, আশ্চর্য্য। মা, স্ট্রবেরী জ্যাম্‌টা কোথায়?"

"এই যে এখানে, বাবা। ও বোধ হয় তা হলে বাবাকে কোথাও খুন করে' তাঁর জিনিষপত্র চুরি করে নিয়ে এসেছে!"

ছেলে জ্যাম্‌ খাইতে খাইতে বলিল, "তা করে থাকতে পারে, আমি খোঁজ করছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি নীচে গিয়ে গোটা কয়েক ছোকরাকে জাগিয়ে নিয়ে আসি?"

অ্যাডাম বলিল, "না মা। সবাই তোমায় নিয়ে হাসাহাসি করবে। যত অল্প লোকে এ কথা জানে ততই ভাল। বাঃ এ জ্যামটা ত চমৎকার!" ছেলেকে মনের সুখে খাইতে দেখিয়া গৃহিণী সব ভয়-ভাবনা ভুলিয়া গেলেন। কর্ত্তা বলেন, ছেলের বুদ্ধি নাই। নাই আবার! বাড়ী আসুন, তাহার পর ছেলের কথা তাঁহাকে শোনাইতে হইবে।

নিজে যে নিতান্ত বোকা নন, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "ও যে বাবা নয়, তা গোড়ার থেকেই আমার মনে হচ্ছিল। ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মত।"

অ্যাডাম্‌ বলিল, "হ্যাঁ, আচ্ছা মা, একটু সবুর কর।" সে বাহির হইয়া গেল, তাহার মা একলা ভাঁড়ার ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অ্যাডাম খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ঘরে আলো নেই। ও ঘরটায় কি ভিতর থেকে চাবি আছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "না।" অ্যাডাম্‌ আবার বাহির হইয়া গেল।

গৃহিণী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন কাল কি রান্না করিবেন।

হঠাৎ পিছন হইতে অ্যাডাম্‌ বলিল, "মা, এই যে!"

এগ্‌-জায়া ফিরিয়া তাকাইলেন। অ্যাডাম্‌ বুকের

ধরিয়া আনিয়াছে, দুই হাতে শক্ত করিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া আছে।

"ক্রিষ্ঠো, এখন মাকে বলত, তাঁর বাবার খবর।"

তীব্র গলায় লোকটা বলিল, "ছেড়ে দাও, আমার হাত ভেঙে যাবে।"

অ্যাডাম বলিল, "ঠাট্টা রাখ, যা বল্‌ছি তা কর।"

লোকটা বলিল, "তোমার বাবা স্যান্ ফ্রান্ সিস্কোতে হোটেল চালাতেন। আমি তাঁর কাছে কাজ করতাম। গত শীতকালে তিনি মারা যান। মরবার সময় আমি কাছে ছিলাম। আমাকে ডাইরিগুলো পুড়িয়ে ফেল্‌তে বলেছিলেন। টাকাকড়ি যা ছিল, তা একটা মেয়ে-মানুষকে দিয়ে যান্। আমার চেহারা খানিকটা তাঁর মত ছিল, তাই আমি ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। এগ্, আমার হাত ছেড়ে দাও।"

গৃহিণী বলিলেন, "একে ত পুলিশে দেওয়া উচিত।"

অ্যাডাম বলিল, "পুলিশে দিতে গেলে ত দেশময় এ কথা রাষ্ট্র হয়ে যাবে।"

গৃহিণী ঘৃণাভরে লোকটাকে দেখিতে লাগিলেন। এখন আর তাহাকে বৃদ্ধ বোধ হইতে ছিল না, মনে হইতেছিল, ঠিক একটা কালো সাপ। তিনি বলিলেন, "কিন্তু এ রকম লোককে ত ছেড়ে রাখা যায় না, ড্যামি?"

"কিন্তু মা, সবাই তোমায় নিয়ে হাসবে।" গৃহিণী বলিলেন, "তা হোক্ বাছা, আমি—" বন্দী হঠাৎ অ্যাডামের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। তাহার জিব বাহির হইয়া আসিল। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুই ওকে বড় জোরে ধরেছিলি, মূর্চ্ছা গেছে নাকি? শুইয়ে দে।"

অ্যাডাম্ লোকটাকে ছাড়িয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ তীরের মত খাড়া হইয়া উঠিল। অ্যাডামের বুকের কাছে কি একটা ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল, "হাত দুটো উপরে ওঠাও।"

অ্যাডামের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে হাত দুটা অল্প একটু তুলিয়া বলিল, "তোমার জামার নীচে আমার দেখা উচিত ছিল।"

লোকটা তীব্র গলায় বলিল, "হাত তোলো, বল্‌ছি।" শ্রীমতী এগ্ দেখিলেন অ্যাডামের হাত কাঁপিতেছে। তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সে হাত তুলিবে না। গৃহিণীর চোখের সামনে ঘরটা ঘুরিতে লাগিল। লোকটা যদি গুলি করে? তিনি সশব্দে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গেল।

জ্ঞান হইলে দেখিলেন, তিনি সিন্দুকে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন এবং অ্যাডাম তাঁহার মাথায় বরফ ঘসিতেছে।

তাঁহাকে চোখ মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া ছেলে হাসিয়া বলিল, "মা, তোমার খুব বুদ্ধি যা হোক, বেশ উপায় ঠাউরেছিলে। লোকটাকে একেবারে চেপ্টা করে দিয়েছ।"

"সে কোথায় রে?"

অ্যাডাম বলিল, "জানি না মা। কাপড় পরে কোথায় পালিয়েছে। তার পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছি।"

গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কনুই দুইটা কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ক্রিষ্ঠো কুলীর কথা ভাবিয়া তিনি সান্ত্বনা পাইলেন। একবার একটা কুকুরের উপর তিনি বসিয়া পড়িয়াছিলেন, সে কথা এখনও তাঁহার মনে আছে। সারারাত তিনি কালো ভূতের স্বপ্ন দেখিলেন।

সকালে তিন মেয়ে আসিয়া হাজির। বিছানায় শুইয়া, গৃহিণী শুনিলেন, অ্যাডাম তাহাদের বলিতেছে, "মা গোড়ার থেকেই জান্‌তেন। গোলমাল কর্‌তে চাননি, তাই পুলিশে দেননি। নিজেই তাকে চ্যাপ্টা করে ছেড়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, তোমরা বোসো, মাকে কিছু খাবার দিয়ে আসি।"

মুদ্রিত পুরাতন পুস্তক

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমার লাইব্রেরীর কয়েকটি পুরাতন পুস্তকের কথা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

১। কবিতারত্নাকর। ৺নীলরতন হালদার সঙ্কলিত বিবিধ সংস্কৃত কবিতার সংগ্রহ পুস্তক।* যে-সকল সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা ও মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, বাবু নীলরতন হালদার তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সল্ট্ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় জানা যায় নাই। তিনি যে বিদ্যোৎসাহী সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থপাঠে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমার নিকটে তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক রহিয়াছে। ইহা সন ১২৭৯ সালে (১৮৭২ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ:—

"কবিতা রত্নাকর
অর্থাৎ
স্বল্পের মধ্যে
পণ্ডিতের ন্যায় বক্তৃতা ও সভ্যতা হওনের জন্য
সুগম উপায় স্থির করিয়া যে সকল
কবিতার একভাগ
ভাষা কথার মধ্যে সর্ব্বদা সকলে প্রমাণ দিয়া থাকেন
তাহার সম্পূর্ণ শ্লোক
মূলগ্রন্থ পুরাণ ও স্মৃতি ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি
শাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রাদি হইতে উদ্ধার করিয়া অথচ
যথাশ্রুত মহাজন গৃহীত বাক্য
ও সাধু বাক্য
ও কবিবাক্য প্রভৃতি উদ্ভট কবিতা একত্র করিয়া
এবং তাহার অর্থ ও আনুষঙ্গিক
ইতিহাস ও পরিহাস গৌড়ীয়
ভাষায় রচনা করিয়া
৺নীলরত্ন শর্ম্মকর্ত্তৃক যাহা সংগৃহীত হয়
তাহা ইংরাজী ভাষায়
তরজমার সহিত তৃতীয় বার
বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১২৭৯।"

'হালদার' উপাধি ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও দেখা যায়। কিন্তু "৺নীলরত্ন শর্ম্মকর্ত্তৃক যাহা সংগৃহীত হয়" আখ্যা-পত্রের এই উক্তিতে তিনি যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন ইহা অনুমিত হইতেছে। এই তৃতীয় সংস্করণে একটি ইংরাজি বিজ্ঞাপন সংযোজিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Advertisement.

This compilation of Sanskrit proverbs which have grown into popular use among the natives of Bengal was made by Baboo Neelrutna Haldar, and an edition printed at his own private press. A second edition appearing desirable, I have inserted a translation of them into English, with the hope of aiding the researches of our countrymen, into the popular language of Bengal. These proverbs consist generally of portions of Sanskrit poetry, which have been gradually incorporated with the language of Bengal to such an extent as to have become familiar even to those who are unacquainted with the source from which they are drawn. etc....

Serampore, March, 1830. J. C. M."

এই ইংরাজী বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যাইতেছে, হালদার

* ৺নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" গ্রন্থে এই পুস্তক "জ্ঞানরত্নাকর" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় নগেন্দ্রবাবু পুস্তকখানি স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মহাশয় প্রথমে কেবল বাঙ্গালা অনুবাদসহ পুস্তকখানি নিজের ছাপাখানায় ছাপিয়াছিলেন। তাঁহার এই ছাপাখানার কি নাম ছিল, তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। পরে দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য J. C. M. শ্রীরামপুর হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। J. C. M. শ্রীরামপুরের পাদ্‌রী সাহেব J. C. Marshman. ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমনের জন্য সমুদ্রপোতে আরোহণ করেন, সুতরাং রাজা দেশে থাকিতেই কবিতারত্নাকরের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। ইহার দুই চার বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় বার মুদ্রণের বিয়াল্লিশ বৎসর পরে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর বাল্মীকি প্রেস হইতে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরে এই পুস্তকের আরও সংস্করণ হইয়াছে কি না আমরা অবগত নহি।

যে সময়ে রাজা রামমোহন রায় বিবিধ শাস্ত্রীয় বিচারপুস্তক প্রচার করেন, কবিতারত্নাকরের প্রথম প্রচারও ঐ সময়ে হইয়াছিল। রাজার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই রাজার ভাষার রীতি ও রচনার প্রাঞ্জলতার বিষয় অবগত আছেন। বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি দুরূহ জ্ঞানগর্ভ বিষয় রাজা কি প্রকার সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্যরচনা নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করে নাই, এজন্য রাজাকে গদ্যপাঠের ব্যাকরণগত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। নীলরতন হালদারের রচনাভঙ্গী কিন্তু স্বতন্ত্র, তাহা সংস্কৃত শব্দ ও অনুপ্রাসবহুল। গ্রন্থের ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। একশত বৎসর পূর্ব্বের গদ্য রচনা কি প্রকার ছিল অবগত হইয়া পাঠকগণ যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিবেন সন্দেহ নাই।

"অথ কবিতারত্নাকর গ্রন্থের অনুষ্ঠান।

নিরন্তর হৃদন্তর পুরন্দরাদি বন্দারকবৃন্দ বন্দিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধ শুদ্ধান্তঃকরণ বিরাজিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক স্মরণ পরায়ণ হইয়া কবিকাব্য রসাস্বাদনে রসজ্ঞ অথচ গুণগ্রাম-গ্রাম গুণজ্ঞ বিজ্ঞ মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন। এতদ্দেশে বিশিষ্ট শিষ্টাশিষ্ট লোকের সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক মতে সাধুভাষায় কথোপকথন এবং বক্তব্য সভ্য সৌভ্যতব্য করণার্থে সংস্কৃত শ্লোকের উদাহরণ পরম্পরা সিদ্ধ প্রথা আছে, কিন্তু সংক্ষিপ্তসার মতে অনেক প্রাচীন কবিতা অবিকল কথিত না হইয়া তন্মধ্যে দ্বিপাদ কিম্বা একপাদ মহাজন গৃহীত ও সর্ব্বত্র চলিত হওনে তত্তৎ শ্লোকের সম্পূর্ণাসম্পূর্ণ ভগ্নপাদ ও অচলবৎ অচল হইয়াছে প্রস্তাব ও প্রসঙ্গ উপস্থিতকালে অবিকলে সকলে কহিতে সমর্থ হন্‌ না, পণ্ডিতের অগোচর কি যেহেতুক বহুকাল ঐ সকল প্রচলিত পদ্যের একদেশ সর্ব্বসাধারণ্যে ব্যবহার হওনে তত্তৎ কবিতার পূর্ব্বদেশ অনুদ্দেশ এবং তাহার উদ্দেশ ও নির্দ্দেশ কেহ আলস্য করিয়া করেন নাই অতঃকারণাৎ অস্মদীয় সুহৃদ্গণের উপদেশ ও আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ এতদ্বচনে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া ভগ্নপাদের পাদপূরণ এবং অচলকে সচলকরণ অত্যাবশ্যক জানিয়া যে যে শ্লোকার্দ্ধ কিম্বা চরণ পরম্পরা গ্রাম্যমতে সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত আছে এবং প্রস্তাবের পোষকতার নিমিত্তে ও দৃষ্টান্তস্থলে সর্ব্বদা ব্যবহার হয় যথা ফলেন পরিচীয়তে। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ নাস্তিগ্রামঃ কুতঃসীমা। যএব লোকঃ সএব ধর্ম্ম। ইত্যাদি বহুবিধ কবিতার পূর্ব্ব চরণ কি প্রকার তাহা সমুদ্ধার করিয়া এবং তত্তৎ শ্লোক গ্রন্থোক্ত কিম্বা ঋষিবাক্য অথবা মহাজনগৃহীত বাক্য তন্নিরূপণ করিয়া অথচ তদ্ভিন্ন অন্যান্য যাহার সম্পূর্ণ শ্লোকে প্রকাশ আছে কিন্তু দৃষ্টান্তস্থলে অতি আবশ্যক ও প্রয়োজনক তৎসমূহ কবিতারূপ পুষ্পরস মধুমক্ষিকার ন্যায় নানা শাস্ত্রোদ্যান হইতে কিঞ্চিৎ আহরণ করিয়া রসিকের রসাস্বাদনের জন্য এই সংগ্রহে সংগৃহীত করিলাম সাহস যে ঐ সকল সম্পূর্ণ শ্লোক প্রাপ্তে সভ্য মহাশয়দিগের সভাবিলাস হয় এবং তত্তৎ প্রাচীন প্রসিদ্ধ পরম্পরাচলিত সচরাচর প্রস্তাব বিহিত পদ্যোকদেশের উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ মূলগ্রন্থের নামদৃষ্টে অমূলক জ্ঞান না হয় অথচ তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরণ যাহা সকলের সকল স্মরণ হয় না, তাহার একত্রীকরণ প্রযুক্ত অনেকের আয়াসের লাঘব সম্ভবে বিশেষতঃ বালকদিগের শিক্ষোপযোগী হয় যেহেতুক

প্রচলিত অনেক শ্লোক যাহা অনেক কালে জনশ্রুতি দ্বারা শ্রুতিগোচর হয় তাহা একস্থানে উপলব্ধ হওনে সভ্যতার সম্ভাবনার অল্প ক্লেশের লেশ হইবেক না অনায়াসে অল্পেতে অনেক দর্শন হইবেক কারণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে পুরাণোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ও নীতিশাস্ত্রোক্ত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থোক্ত অথচ ঋষিবাক্য কবিবাক্য মহাজন গৃহীত বাক্য প্রভৃতি নানাপ্রকার নানা উপমার কবিতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বহুবিধ ইতিহাস ও পরিহাস সন্দেহ ভঞ্জন ও মনোরঞ্জনার্থ লিখিত হইয়াছে। অপর দোষাদোষ বিচারে বিচারক মহাশয়দিগের অবিচার কখন হইবেক না যেহেতুক উক্ত আছে যে শূর্পবদ্দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্ণন্তি সাধবঃ। দোষগ্রাহী গুণত্যাগী হ্যসাধুস্তিতউযথা॥ কিমধিকং নিবেদনমিদং॥"

এই গ্রন্থ ব্যতীত নীলরতন হালদার রচিত অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত আছে। রাজা রামমোহন রায়ের নামে যে-সকল সঙ্গীত প্রচলিত আছে তাহার অনেকগুলিই রাজার বন্ধুগণের বিরচিত। সঙ্গীত পুস্তকে গীত-রচয়িতাদের নামের সাংকেতিক চিহ্ন আছে। নীলরতন হালদারের রচিত সঙ্গীতের নিম্নে নী হা এই সংকেত আছে।

২। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড। ডব্লু অব্রাএন স্মিথ প্রণীত। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ—

"পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তে দেবতা, অসুর, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, কিন্নর, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, প্রজাপতি এবং রাজগণ, বীরপুরুষ, পণ্ডিতমণ্ডল, তথা বিভিন্ন দেশ, জাতি, পর্ব্বত, নদনদী, বৃক্ষ প্রভৃতির বিবরণ সম্প্রতি পুরাণ, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, নাটিকাদি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক যথাসাধ্য সরল ভাষায় সঙ্কলিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৭৭ সাল।"

প্রথম খণ্ডে কেবল অকারাদি শব্দ নিবদ্ধ হইয়াছে। এই পৌরাণিক অভিধানখানি সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালা ভাষার একটি মূল্যবান সম্পত্তি হইত। ইহাতে বিদেশীয় গ্রন্থকারের বিবিধ হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্যে সুগভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব অনুসন্ধান-শক্তি এবং বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার-লিখিত ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

"ইতিপূর্ব্বে আমি অভিধান প্রণালী অনুসারে এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ইংরাজি ভাষায় প্রস্তুত করিতে উদ্যত হই। পরে কতিপয় মিত্র আমার সেই সঙ্কল্প অবগত হইয়া আমাকে বঙ্গভাষায় এই পুস্তক প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। আমিও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম এ প্রকার পুস্তক * * বঙ্গভাষায় প্রকাশ পায় নাই, অতএব এই কার্য্যে * * * হইলাম। পুরাণ, উপপুরাণ এবং এতদ্দেশীয় অপরাপর প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থে কি কি উপাখ্যান প্রভৃতি লিখিত আছে তাহা জানিতে সকলেই আকাঙ্ক্ষী। পরন্তু গ্রন্থাভাব, অবকাশাভাব ইত্যাদি নানা কারণবশতঃ তাঁহাদিগের সেই আকাঙ্ক্ষা সহজে সফল হওয়া সুকঠিন। সুতরাং এই পুস্তক প্রচারে তাঁহাদিগের উপকার দর্শিতে পারিবে। এতৎ পাঠে কোন্ পুরাণে কি বিষয় কিরূপ লিখিত আছে তাহা তাঁহাদিগের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এরূপ পুস্তক প্রণয়নে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ পুস্তক পাঠে পরিচয় পাইবেন, তদ্বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত রচনা-কার্য্যে এতদ্দেশীয় প্রাচীন প্রাচীন অনেক গ্রন্থের সমালোচনা করা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় সমীচীন বুৎপন্ন উইলসন, উইলফোর্ড, কোলব্রুক প্রভৃতি মহাত্মগণের বিরচিত গ্রন্থের, এবং রাজা রাধাকান্ত দেব প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুমের সাহায্য অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইহাও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এক্ষণে কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম বলিতে পারি না।

---

* * চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট হইয়াছে।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত একেবারে সমুদায় প্রকাশ করা বহুকালসাপেক্ষ ও বহুব্যয়সাপেক্ষ, এই হেতু খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা যাইবে। এই প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে অকারাদি শব্দের বাহুল্য প্রযুক্ত কেবল অকারাদি শব্দই নিবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে 'আ' প্রভৃতি স্বরবর্ণাদি শব্দ সমুদয় সংযোজিত হইবে। পরে ককারাদি শব্দ আরম্ভ করা যাইবে।

এই দুরূহ ব্যাপারে বিস্মৃতিক্রমে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন, এবং তদ্বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়া গ্রন্থকর্তাকে বাধিত করিবেন।

ইটালী পদ্মপুকুর,
তাং ১৫ই আগষ্ট ১৮৭০। } ডব্লু অব্রাএন স্মিথ।"

গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্র স্বচ্ছ সরল ও বিশুদ্ধ। কোথাও সাহেবী বাঙ্গালার গন্ধমাত্রও নাই।

রাণুর প্রথম ভাগ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

আমার ভাইঝি 'রাণুর' প্রথমভাগের গণ্ডী পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।

তাহার সহস্রবিধ অন্তরায়ের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য,—এক তাহার প্রকৃতিগত অকালপক্ব 'গিন্নীপনা', আর অন্যটি তাহার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাহার দৈনিক জীবনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে মনে হয় বিধাতা যদি তাহাকে একেবারে তাহার ঠাকু'মার মত প্রবীণা গৃহিণী এবং কাকার মত এম-এ, বি-এল করিয়া পাঠাইতেন তাহা হইলে তাহাকে মানাইতও ভাল এবং সেও সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরবর্ত্তী ভাবী নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া যেন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীর মনটিতে আর আঁটিয়া উঠিতেছে না—রাণুর কার্য্যকলাপ দেখিলে এই রকমই একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমত শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—খেলাঘর' সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ফ্রক জামাও না, এমন কি নোলক পরাও নয়। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে—"আমার কি আর ওসবের বয়েস আছে মেজকা?"

বলিতে হয়—"না মা, আর কি, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেক্‌ল।"

রাণু চতুর্থ কালের কাল্পনিক দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মুখটা অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে।

আর দ্বিতীয়ত:—কতকটা বোধ হয় শৈশবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াই—তাহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রথমভাগে। দ্বিতীয়ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাকার আইন-পুস্তক পর্য্যন্ত আর সবগুলির সহিতই তাহার বেশ সৌহার্দ্দ আছে এবং তাহাদের সহিতই তাহার দৈনিক জীবনের অর্দ্ধেকটা সময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রথমভাগের নামেই সমস্ত উৎসাহ একেবারে শিথিল হইয়া আসে। বেচারীর মলিন মুখখানি ভাবিয়া আমি মাঝে মাঝে এলাকাড়ি দিই—মনে করি, "থাক্‌গে বাপু, মেয়ে; নাই বা এখন থেকে বইশ্লেট নিয়ে মুখ গুঁজড়ে রইল, ছেলে হওয়ার পাপটা তো করে নি; সেহাৎই দরকার বোধ করা যায়, আর একটু বড় হোক্, তখন দেখা যাবে'খন......"

এই রকম দিনগুলা রাণুর বেশ যায়; তাহার গিন্নীপনা সতেজে চলিতে থাকে এবং পড়াশুনারও বিষম ধূম পড়িয়া যায়। বাড়ীর নানাস্থানের অনেক সব বই হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হয় তাহার খোঁজ পাওয়া

দুরূহ হইয়া উঠে এবং উপরের ঘর নীচের ঘর হইতে সময়-অসময় রাণুর উঁচু গলায় পড়ার আওয়াজ আসিতে থাকে—'ঐ ক'য়ে য'ফলা ঐক্য, ম'য়ে আকার ন'য়ে হ্রস্বই ক'য়ে য'ফলা মানিক্য, বা—"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—অথবা তাহার রাঙাকাকার আইন মুখস্থ করার ঢঙে—হোয়ার অ্যাস্ ইট ইন্ ··ইত্যাদি

আমার লাগে বড় ভাল, কিন্তু রাণুর স্বাভাবিক ফূর্ত্তির এই রকম দিনগুলা বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভাল লাগে বলিয়াই আমার মতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত লঘুতাকে্ ভ্রূভঙ্গি করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মধ্যে জাঁকিয়া আসিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীরস্বরে ডাক দিই—"রাণু!"

রাণু এ স্বরটি বিলক্ষণ চেনে; উত্তর দেয় না। মুখটি কাঁদ কাঁদ করিয়া নিতান্ত অসহায় ভালমানুষের মত ধীরে ধীরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়, আমার আওয়াজটা তাহার গলায় যেন একটা ফাঁস পরাইয়া টানিয়া আনিয়াছে! আমি কর্ত্তব্যবোধে আরও কড়া হইয়া উঠি, সংক্ষেপে বলি—"প্রথম ভাগ!—যাও···"

ইহার পরে প্রতিবারই যদি নির্ব্বিবাদে প্রথম ভাগটি আসিয়া পড়িত এবং যেন তেন প্রকারেণ দু'টা শব্দও গিলাইয়া দেওয়া যাইত তো হাতেখড়ি হওয়া ইস্তক্ এই যে আড়াইটা বৎসর গেল ইহার মধ্যে মেয়েটা যে প্রথম ভাগের ও-কটা পাতা শেষ করিতে পারিত না, এমন নয়। কিন্তু আমার হুকুমটা ঠিকমত তামিল না হইয়া কতকগুলা জটিল ব্যাপারের সৃষ্টি করিত মাত্র—যেমন, এরূপক্ষেত্রে কোন-কোনবার দুই তিনদিন পর্য্যন্ত রাণুর 'টিকিটি' আর দেখা যাইত না। সে যে কোথায় গেল, কখন আহার করিল, কোথায় শয়ন করিল তাহার একটা সঠিক খবর পাওয়া যাইত না। দুই তিনদিন পরে হঠাৎ যখন নজরে পড়িল তখন হয়ত সে তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে চায়ের আয়োজনে মাতিয়া গিয়াছে, কিম্বা তাঁহার সামনে প্রথম ভাগটাই খুলিয়া রাখিয়া তাহার কাকাদের পড়ার খরচ পাঠান কিম্বা আহার্য্য দ্রব্যের বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতি সংসারের কোন একটা দুরূহ বিষয় লইয়া প্রবলবেগে জ্যাঠামি করিয়া যাইতেছে, অথবা তাঁহার বাগানের জোগাড়যন্ত্রে দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া সব বিষয়ে নিজের মন্তব্য দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার দিকে হয়ত একটু আড়চোখে চাহিল, বিশেষ কোন ভয় বা উদ্বেগ নাই—জানে এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে যেখানে সে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন।

আমি হয়ত বলিলাম—"কৈ রাণু, তোমায় না তিন-দিন হল বই আন্‌তে বলা হয়েছিল?"

সে আমার পানে না চাহিয়া বাবার পানে চায়, এবং তিনিই উত্তর দেন—"ওঃ, সে এক মহা মুস্কিল ব্যাপার হয়েচে, ও বইটা সে কোথায় ফেলেছে···"

রাণু চাপা সুরে শুধরাইয়া দেয়—"ফেলিনি—কে যে চুরি ক'রে নিয়েচে···"

"হ্যাঁ; কে যে চুরি করে নিয়েচে, বেচারি অনেকক্ষণ খুঁজেও··"

রাণু জোগাইয়া দেয়—"তিনদিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও···"

"হ্যাঁ, তোমার গিয়ে, তিনদিন হয়রান হয়েও—শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে···"

রাণু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া দেয়—"হাল ছাড়িনি ·"

"হ্যাঁ, ওর নাম কি, হাল না ছেড়ে ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাহোক্ একখানা বই আজ এনে দিও, কতই বা দাম ··"

রাগ করে বলি—"তুই বুঝি এই কাটারি হাতে করে বাগানে বাগানে বই খুঁজে বেড়াচ্ছিস্?—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে "

কাতরভাবে বাবা বলেন—"আহা, ওকে আর এ সামান্য ব্যাপারের জন্যে গালমন্দ করা কেন?—এবার থেকে ঠিক করে রাখ্‌বে তো গিন্নী?"

রাণু খুব ঝুঁকাইয়া ঘাড় নাড়ে। আমি ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাই—"তোমায় অত ক'রে

শেখাই, তবু একটুও মনে থাকে না দাদা,—কি যেন হ'চ্ছ দিন দিন…"

কখন কখন হুকুম করিবার খানিক পরেই বইটার আধখানা আনিয়া হাজির করিয়া সে খোকার উপর প্রবল তম্বি আরম্ভ করিয়া দেয়। তম্বিটা আসলে আরম্ভ হয় আমাকেই ঠেস্ দিয়া—"তোমার আদুরে ভাইপোর কাজ দেখ মেজ্‌কা, লোকে আর পড়াশুনা করবে কোথা থেকে?"

আমি বুঝি কার কাজ,—কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া থাকি।

ছুট্টু ছুটিয়া গিয়া বামালসুদ্ধ খোকাকে হাজির করে—সে বোধ হয় তখন একখানা পাতা মুখে পুরিয়াছে এবং বাকীগুলার কি করিলে সবচেয়ে সদ্গতি হয় সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। তাহাকে আমার সামনে ধপ্ করিয়া বসাইয়া রাণু রাগ দেখাইয়া বলে—"পেত্যয় না যাও দেখ, আচ্ছা এ ছেলের কখন বিদ্যে হবে মেজকা?"

আমি তখন হয়ত বলি—"ওর কাজ না তুমি নিজে ছিঁড়েচ, রাণু?—ঠিক আগেকার পাঁচখানি পাতা ছেঁড়া… যত বলি তোমায় কিছু বল্‌ব না..খান তিরিশেক বই তো শেষ হ'ল—"

ধরা পড়িয়া লজ্জা, ভয়, অপমানে, নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, নেহাৎ নৃশংস না হইলে ইহার উপর আর কিছু তাহাকে বলা যায় না। তখনকার মত শাস্তির কথা ভুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিতেই হয়—"হ্যাঁরে ছুট্টু, দিদির বই ছিঁড়ে দিয়েছিস্?…আর তুমিও তো ওকে একটু-আধটু শাসন করবে না রাণু; ওর আর কতটুকু বুদ্ধি বল.."

চাঁদমুখখানি হইতে মেঘটা সরিয়া গিয়া হাসি ফোটে; তখন আমাদের দুজনের মধ্য হইতে প্রথম ভাগের ব্যবধানটা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং রাণু দিব্য সহজভাবে তাহার গিন্নীপনার ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময়টা সে হঠাৎ এত বড় হইয়া যায় যে, ছোট ভাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাপখুড়া, ঠাকুরমা, এমন কি ঠাকুরদাদা পর্য্যন্ত সবাই তাহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং স্নেহ ও করুণার পাত্র হইয়া পড়ে। এই রকমে একটি প্রথম ভাগ ছেঁড়ার দিনে কথাটা এইভাবে আরম্ভ হইল—"কি করে শাসন করব বল, মেজ্‌কা'; আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে, খালি কাজ—কাজ—আর কাজ…"

হাসি পাইলেও গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"তা' বটে, কত দিক আর দেখ্‌বে?"

"যেদিকটা না দেখেচি সেইদিকেই গোল—এই তো খোকার কাণ্ড চোখেই দেখ্‌লে?—কেনরে বাপু, রাণু ছাড়া আর বাড়ীতে কেউ নেই?—খাবার বেলা তো অনেকগুলি মুখ; বল মেজকা?…"

"আচ্ছা কাল তোমার ঝালতরকারিতে নুন ছিল?"

বলিলাম—"না, একেবারে মুখে দিতে পারিনি।"

"তার হেতু হচ্ছে, রাণু কাল রান্নাঘরে যেতে পারে নি।—ফুরসৎ ছিল না। এই তো সবার রান্নার ছিরি।… আজ আর সেরকম কম হবে না, আমি নিজের হাতে দিয়ে এসেচি নুন।"

আমার সখের ঝালতরকারি খাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলাম—"তুমি যদি রোজ একবার ক'রে দেখ মা।"

গালদুটি অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল—"হবার জো নেই মেজ্‌কা, রাণু হ'য়েচে বাড়ীর আতঙ্ক।…'ওরে, ঐ বুঝি রাণু ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেচে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে টেনে দুধ খাওয়াতে বসেচে, দেখ্ দেখ্…তোকে কে এত গিন্নীত্ব করতে বল্‌লে বাপু?'…'হ্যাঁ মেজকা', এতবড়টা হলুম দেখেচ কখন আমায় গিন্নীত্ব করতে—কক্ষনও—একরত্তিও—?"

বলিলাম—"বলে দিলেই হ'ল একটা কথা, ওদের আর কি?"

"মুখটি বুজে শুনে যাই। একজন হয়ত বললেন—ঐ বুঝি রাণু রান্নাঘরে সেঁধোল…রাণী বেড়ালটা বলে আমি পদে আছি।—কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে রাণু বুঝি ওর বাপের…আচ্ছা মেজ্‌কা, বাবার ফুলদানিটা আমি ভেঙেচি ব'লে তোমার—একটুও বিশ্বাস হয়?"

এ ঘটনাটি সবচেয়ে নূতন; গিন্নীপনা করিয়া জল বদলাইতে গিয়া রাণুই ফুলদানিটা চুরমার করিয়া দিয়াছে

—ঘরে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না।...আমি বলিলাম —"কই, আমি তো মরে গেলেও একথা বিশ্বাস করতে পারি না—"

ঠোঁট ফুলাইয়া রাণু বলিল—"যার ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে, সে করবে না। আমার কি দরকার মেজকা, ফুলদানিতে হাত দেবার? কেন, আমার নিজের প্রথম ভাগ কি ছিল না যে বাবার ফুলদানি ঘাঁটতে যাব?"

প্রথম ভাগের উপর দরদ দেখিয়া ভয়ানক হাসি পাইল, চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম—"মিছি মিছি দোষ দেওয়া ওদের কেমন একটা রোগ হ'য়ে পড়েচে।"

দুষ্টু একটু মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর, সুবিধা পাইয়া তাহার সদ্য দোষটুকু সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া লইবার জন্য আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া আরও অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলিল—"তোমারও এ রোগটুকু একটু একটু আছে মেজ্‌কা;—এক্ষুনি বলছিলে আমি পেরথোম ভাগটা ছিঁড়ে এনেচি।"

মেয়ের কাছে হারিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

(২)

বই হারাণ কি ছেঁড়া, পেট-কামড়ান, মাথা-ব্যথা, খোকাকে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারগুলা যখন অনেকদিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে তখন দু'একদিনের জন্য, নেহাৎ বাধ্য হইয়া রাণু বইশ্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোন কিছুর জন্য মনটা খিচড়াইয়া থাকায়, কিম্বা অন্য কোন কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশী রকম সজাগ থাকে তো ধমক খাইয়া বই খোলে। তাহার পর পড়া আরম্ভ হয়। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস কি আমার ধৈর্য্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণের পরীক্ষা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ' 'আম'-র পাতা শেষ করিয়া 'অচল' 'অধম'-র পাতায় আসিয়া অচলা হইয়া বসিয়া আছে। বই খুলিয়া আমার পানে চায় অর্থাৎ বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি—"আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তো বিয়ে হলেই যখন শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে, মেজকাকা কি রকম আছে, তাকে কেউ সকালবেলা চা দিয়ে যায় কিনা, নাইবার সময় তেল কাপড় গামছা দিয়ে যায় কি না, অসুখ হ'লে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কিনা এসব কি ক'রে খোঁজ নেবে?"

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবী দুর্দ্দশার কথা কল্পনা করিয়া একটু মৌন থাকে, কিন্তু বোধ হয় প্রথমভাগ-পারাবার পার হইবার কোন সম্ভাবনাই না দেখিয়া বলে—"আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না?—আমায় একটুও ব'লে দিতে হবে না। এই শোন না—'ঐ ক'য়ে যফলা...'"

রাগিয়া বলি—"ঐ ডেঁপোমি ছাড় দিকিন, ঐজন্যই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড়,—সেদিন কতদূর হয়েছিল?—'অচল' 'অধম' শেষ করেছিলে?"

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়—'হাঁ'।

বলি—"বল তা'হলে একবার।"

'অচল' কথাটার উপর কচি আঙুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।...আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে এবং স্নেহকরুণা প্রভৃতি স্নিগ্ধ চিত্তবৃত্তিগুলা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। মেজাজেরই বা আর দোষ দিই কি করিয়া?—আজ এক বৎসর ধরিয়া এই 'অচল' 'অধম' লইয়া কসরৎ চলিতেছে; এখনও রোজই এই অবস্থা!

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি—"ছাই হয়েচে,—আচ্ছা বল—'অ—চ—আর ল—অচল'—"

রাণু 'অ'-এর উপর থেকে আঙুলটা না সরাইয়াই তিনটা অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম'ও ঐ ভাবেই শেষ হয়; অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়াছিল!

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়—"কোনটা 'অ'?"

রাণু ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আঙুলটি সরাইয়া 'ল'-য়ের উপর রাখে।

ধৈর্য্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া থাকি, বলি—"হুঁ; কোনটা 'ল' হ'ল তাহ'লে?"

আঙুল সট্ করিয়া 'চ'-য়ের উপর সরিয়া যায়। ধৈর্য্যসাধনা তখনও চলিতে থাকে; শান্তকণ্ঠে বলি—"চমৎকার!—আর 'চ'?"

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার পর বলে—"চ'?—'চ' নেই মেজ্‌কা।"

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে, পিঠে একটা চাপড় কষিয়া বলি—"তা থাকবে কেন? —তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে।...হতভাগা মেয়ে রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েচেন, আর এদিকে আড়াই বৎসরে প্রথম ভাগের আড়াইটা কথা শেষ করতে পারলে না। কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাশ করিয়ে দিলাম আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হ'ল! কাজ নেই তোর অক্ষর চিনে। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বসে বসে খালি 'অ-চ-আর ল—অচল'–অ—ধ—আর ম—অধম' এই আওড়াবি—তোর সমস্ত দিন আজ খাওয়া বন্ধ।"

বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিম্বা বই লইয়া বসিয়া যাই। রাণু ক্রন্দনের সহিত সুর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে; কিন্তু চড়টা বসাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, সেদিনকার পড়া ঐ পর্য্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সহিত কাজে লাগায়। কিছুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না; বলি—"কি হ'ল?"

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে—"নেই।"

"কি নেই?"—বলিয়া ফিরিয়া দেখি, চক্ষের জল 'অচল' 'অধম'র উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথাদুটো বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নীচের দুই তিনখানা পাতার খানিকটা পর্য্যন্ত!

কিম্বা আঙুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুটিকে চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে;—এইরূপ অবস্থাতে বলে—"আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না মেজ্‌কা।" —এই রকম আরও সব কাণ্ড!

চড়টা মারা পর্য্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্ত্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার থিওরিটা ফিরিয়া আসে; বলি—"না, তোর আর পড়াশুনা হোল না রাণু, শ্লেটটা নিয়ে আয় দিকিন—দেগে দি, বুলো। পিঠটায় লেগেচে বেশী? —দেখি।"

রাণু বুঝিতে পারে তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে—"মেজকা।"

উত্তর দিই—"কি?"

"আমি মেজ্‌কা বড় হই নি?"

"তাতো খুব হ'য়েচ, কিন্তু কৈ..."

বাধা দিয়া বলে—"তাহ'লে শ্লেট ছেড়ে ছোটকাকার মত কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আসব?—চারটে উটপেন্সিল আছে আমার। শ্লেটে খোকা বড় হ'য়ে লিখবে'খন।" হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলে—"ও মেজ্‌কা', তোমার দুটো পাকা চুল গো, সর্ব্বনাশ!—বেছে দিই?"

বলি—"দাও; আচ্ছা রাণু এই তো বুড়ো হ'তে চললাম, তুইও দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ী চললি। লেখাপড়া শিখলি নি, মরলাম কি বাঁচলাম কি ক'রে খোঁজ নিবি? —আমায় কেউ দেখে শোনে কি না রেঁধে-টেঁধে দেয় কি না..."

রাণু বলে—"পড়তে তো জানি মেজ্‌কা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না,—বড় হয়েচি কি না? ঠাকুদ্দাও তো আর পেরথোম ভাগ পড়েন না, মেজ্‌কা..."

(৩)

দাদা ওদিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব লিবারল মতের লোক ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাটা যেমন গভীর করিয়া রাখিয়াছিলেন খ্রীষ্ট এবং কবেকার জরাজীর্ণ জুরু-স্ত্রিয়ানবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানটা সেইরূপ উচ্চ ছিল। দরকার হইলে বাইবেল হইতে সুদীর্ঘ কোটেশন তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেন এবং দরকার না হইলেও যখন একবার হইতে সমস্ত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সুতীব্র

সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মমত মাত্রেরই অসারতা সম্বন্ধে অংগাঙ্গিক ভাষায় ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া যাইতেন, তখন ভক্তদের বলিতে হইত—"হ্যাঁ, এখানে খাতির চলবে না বাবা, এ যার নাম শশাঙ্ক মুখুজ্যে!"

দাদা বলিতেন—"না, গোঁড়ামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নই।"

ধর্ম্মবাদ মাত্রকেই তিনি গোঁড়ামি নামে অভিহিত করিতেন এবং না গালাগাল দেওয়াটাকে বলিতেন 'প্রশ্রয় দেওয়া'।

সেই দাদা এখন একেবারে অন্যমানুষ!—ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল খান না এবং জলের অতিরিক্ত যে বেশী কিছু খান বলিয়াই বোধ হয় না। পূজাপাঠ হোম লইয়াই আছেন এবং বাক্ এবং কর্ম্মে শুচিতা সম্বন্ধে এমন একটা 'গেল গেল' ভাব যে আমাদের তো প্রাণ 'যায় যায়' হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তেরা বলে—"এরকম হবে, এতো জানা কথাই, —এই হচ্ছে স্বাভাবিক বিবর্ত্তন; এ একেবারে খাঁটি জিনিষ দাঁড়িয়েচে..."

সকলের চেয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছে এই যে, এই অসহায় লাঞ্ছিত হিন্দুধর্ম্মের জন্য একটা বড়রকম ত্যাগ স্বীকার করিবার নিমিত্ত দাদা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন এবং হাতের কাছে আর তেমন-কিছু আপাততঃ না পাওয়ায় ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে ছোট কন্যাটির উপর।

একদিন বলিলেন—"ওহে শৈলেন, একটা কথা ভাবচি,—ভাবচি বলি কেন, একরকম স্থিরই ক'রে ফেলেচি।"

মুখে গম্ভীর তেজস্বিতার ভাব দেখিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিলাম—"কি দাদা?"

"গৌরীদান করব স্থির করেচি;—তোমার রাণুর কত বয়স হ'ল?"

বয়স না বলিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম—"সে কি দাদা! এ যুগে..."

দাদা সংযত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"যুগের 'এ' আর 'সে' নেই শৈলেন, ঐখানেই তোমরা ভুল কর—; কাল এক অনন্তব্যাপী অখণ্ড সত্তা এবং যে শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সেই কালকে..."

একটু অস্থির হইয়া বলিলাম—"কিন্তু দাদা ও যে এখন দুগ্ধপোষ্য শিশু!"

দাদা বলিলেন—"...এবং শিশুই থাকবে ও যতদিন তোমরা বিবাহবন্ধনের দ্বারা ওর আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশের অবসর করে না দিচ্ছ। এটা তোমায় বোঝাতে হলে আগে আমাদের শাস্ত্রকারেরা "

অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম—"সেতো বুঝলাম, কিন্তু ওর তো এই সবে আট বছর পেরুল দাদা, ওর শরীরই বা কতটুকু আর তার মধ্যে ওর আত্মাই বা কোথায় তাতো বুঝতে পারি না। আমার কথা হচ্চে..."

দাদা সেদিকে মন না দিয়া নিরাশভাবে বলিলেন—"আট বৎসর পেরিয়ে গেছে! তা হ'লে আর কৈ হোল শৈলেন? মনু বলেচেন—'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষেতু-রোহিণী..' জানি, অতবড় পুণ্যকর্ম্ম কি আমার হাত দিয়ে সমাধান হবে?... ছোটটার বয়স কত হোল?"

রাণুর ছোট 'রেখা' পাঁচ বৎসরের। দাদা বয়স শুনিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মৌন রহিলেন। পাঁচ বৎসরের কন্যাদানের জন্য কোন একটা পুণ্যফল ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়ার জন্য মনুর উপরই চটিলেন কিম্বা অত পিছাইয়া জন্ম লওয়ার জন্য রেখার উপরই বিরক্ত হইলেন বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন। আমিও আমার রুদ্ধশ্বাসটা মোচন করিলাম; মনে মনে কহিলাম—"যাক্, মেয়েটার একটা ফাঁড়া গেল।"

দু'দিন পরে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপস্থিত হইলে বলিলেন—"আমি ও-সমস্যাটুকুর এক রকম সমাধান ক'রে ফেলেচি, শৈলেন। অর্থাৎ তোমার রাণুর বিবাহের কথাটা আর কি। ভেবে দেখলাম যুগধর্ম্মটা একটু বজায় রেখে চলাই ভাল।"

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, হর্ষের সহিত বলিলাম, —"নিশ্চয়, শিক্ষিত সমাজে কোথায় ১৬।১৭ বছরে বিবাহ

চলচে দাদা; এসময় একটা কচি মেয়েকে—যার ন'বছরও পুরো হয় নি—তা' ভিন্ন খাট গড়ন বলে…"

"ঝাঁটা মার তোমার শিক্ষিত সমাজকে। আমি সেকথা বল্‌ছি না। বল্‌ছিলাম যে যদি এই সময়ই রাণুর বিয়ে দিয়ে দিই তো মন্দ কি?—বেশ তো, যুগধর্ম্মটাও বজায় রইল অথচ ওদিকেও গৌরীদানের খুব কাছাকাছি রইল,—ক্ষতি কি?—এটা হবে যাকে বল্‌তে পারা যায় modified (মডিফায়ড) গৌরীদান আর কি।"

আমি একেবারে থ হইয়া গেলাম। কি করিয়া যে দাদাকে বুঝাইব কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দাদা বলিলেন—"পণ্ডিত মশায়েরও মত আছে। তিনি অনেক বই ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখে বল্লেন—"কলিতে এইটেই গৌরীদানের সমফলপ্রসূ হবে।"

আমি দুঃখ ও রাগ মিটাইবার একটা আধার পাইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিলাম—"পণ্ডিত-মশায় তাহ'লে একটা নীচ মিথ্যা কথা আপনাকে বলেচেন দাদা, আপনি সন্তুষ্ট হ'লে উনি একথাও বোধ হয় শাস্ত্র ঘেঁটেই বলে দেবেন যে, মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেও আজকাল গৌরীদানের ফল হবার কথা। কলিযুগটা তো ওঁদের কল্পবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে—যখন যেটি চাইবেন পাকা ফলের মত টুপ করে হাতে এসে পড়বে।"

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমিই কথা কহিলাম—"যাক্ ওঁরা বিধান দেন, দিন বিয়ে। আমি এখন আসি, একটু কাজ আছে।"

আসিবার সময় ঘুরিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ বলে ভাবচি মাস-চারেক একটু পশ্চিমে গিয়ে কাটাব; হপ্তাখানেকের মধ্যে বোধ হয় বেরিয়ে পড়তে পারব।" বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

(৪)

অভিমানের সাহায্যে ব্যাপারটা মাস-তিন-চার কোন রকমে ঠেকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু তাহার পর দাদা নিজেই এমন অভিমান শুরু করিয়া দিলেন যে, আমারই হার মানিতে হইল। 'ধর্ম্মের' পথে অন্তরায় হইবার বয়স এবং শক্তি বাবার তো ছিলই না তবুও নাতনীর মায়ায় তিনি দোমনা হইয়া কিছুদিন আমারই পক্ষে রহিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে ওই দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। ..আমি বেখাপ্পা রকম একলা পড়িয়া গিয়া একটা মস্তবড় ধর্ম্মদ্রোহীর মত বিরাজ করিতে লাগিলাম!

রাণুকে ঢালোয়া ছুটি দিয়া দিয়াছি। মায়াবিনী অচিরেই আমাদের পর হইবে বলিয়া যেন ক্ষুদ্র বুকখানির সমস্তটুকু দিয়া আমাদের সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। পারুক না পারুক সে সমস্ত কাজেই আছে এবং যেটা ঠিকমত পারে না সেটার জন্য এমন একটা সঙ্কোচ এবং বেদনা আজকাল তাহার দেখিতে পাই, যাহাতে সত্যই মনে হয় সকলের মধ্য দিয়া মেয়েটার এবার আসল গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অসহায় মেজকাকাটি তো চিরদিনই তাহার একটা বিশেষ পোষ্য ছিলই; আজকাল আবার প্রথমভাগ-বিবর্জ্জিত সুপ্রচুর অবসরের দরুণ একেবারে তাহার কোলের শিশুটিই হইয়া পড়িয়াছে বলিলে চলে।

সময় সময় গল্পও হয়; আজকাল বিয়ের গল্পটা হয় বেশী। অন্যের সঙ্গে এবিষয় লইয়া আলোচনা করিতে রাণু ইদানীং লজ্জা পায় বটে কিন্তু আমার কাছে কোন দ্বিধাকুণ্ঠাই আসিবার অবসর পায় না; তাহার কারণ আমাদের দুজনের মধ্যে সমস্ত লঘুত্ব বাদ দিয়া গুরুগম্ভীর সমস্যাবলীর আলোচনা চলিতে থাকে। বলি—"তা' নয় হ'ল রাণু, তুমি মাসে দুবার করে শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে আমাদের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে গেলে, আর সবই করলে, কিন্তু তোমার মেজকাকাটির কি বন্দোবস্ত করচ?"

রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে; বলে—"আমরা সব বলে বলে তো হয়রান হ'য়ে গেলাম মেজকা, যে বিয়ে কর বিয়ে কর।"—তা শুনলে গরীবদের কথা? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখতে শুনতে পারবে মেজকা? এর পরে তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কার কতদিন নিজের বল?"

তোতাপাখীর মত, কচি মুখে বুড়োদের কাছে শেখা

বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব ঠিক করিতে পারি না; বলি—"আচ্ছা, একটা গিন্নিবান্নি ক'নে দেখে এখনও বিয়ে করলে চলে না? কি বল তুমি?"

এই বাঁধা কথাটি তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ী লইয়া একটি ঠাট্টার উপক্রমণিকা।—রাণু কৃত্রিম অভিমানের সহিত হাসি মিশাইয়া বলে—"যাও মেজকা আর গল্প করব না; তুমি ঠাট্টা করচ।"

আমি চোখ পাকাইয়া বিপুল গাম্ভীর্য্যের সহিত বলি—"মোটেই ঠাট্টা নয় রাণু; তোমার শাশুড়ীটি বড্ড গিন্নী শুনেচি, তাই বলছিলাম যদি বিয়েই ক'রতে হয়..."

রাণু আমার মুখের দিকে রাগ করিয়া চায়, গম্ভীর হইয়া যায় এবং শেষে হাসিয়া ফেলে; কিছুতেই যখন আমার মুখের অটল গাম্ভীর্য্য বদলায় না, তখন প্রতারিত হইয়া গুরুত্বের সহিত বলে—"আচ্ছা আমি তা'হলে, না মেজকা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করচ, যাও..."

আমি চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলি—"একটুও ঠাট্টা নেই এর মধ্যে রাণু; সব কথা নিয়ে কি আর ঠাট্টা চলে মা?"

রাণু তখন ভারিক্কে হইয়া বলে—"আচ্ছা, তা'হলে আমার শাশুড়ীকে একবার বলে দেখব'খন, আগে যাই সেখানে। তিনি যদি তোমায় বিয়ে করতে রাজী হ'ন তো তোমায় জানাব'খন; তার জন্যে ভাবতে হবে না।"—তাহার পর কৌতুকদীপ্তচোখে চাহিয়া বলে—"আচ্ছা মেজকা, পেরথম ভাগ তো শিখিনি এখনও—কি ক'রে তোমায় জানাব বল দিকিন, তবে বুঝব—হ্যাঁ।.."

আমি নানান রকম আন্দাজ করি; বিজয়িনী ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া বলে—"না, হ'ল না—কক্ষনও বলতে পারবে না—সে বড্ড শক্ত কথা..."

এই-সব হাসি-তামাসা গল্পগুজব হঠাৎ মাঝখানেই শেষ হইয়া যায়; রাণু চঞ্চলতার মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে—"থাক্, সে পরের কথা পরে হবে; যাই, তোমার চা হ'ল কিনা দেখিগে।" কিম্বা—"যাই, গল্প করলেই চলবে না, তোমার লেখার টেবিলটা আজ গুছোতে হবে—এক ডাঁই হ'য়ে রয়েচে"—ইত্যাদি।

এই রকম ভাবে রাণুকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর ভাবে আমার বুকের মধ্যে আনিয়া দিতে দিতে বিচ্ছেদের দিনটা আগাইয়া আসিতেছে।

বুঝি বা রাণুর বুকটিতেও এই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাহার অগোচরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। কচি সে বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনই আজকাল ছুটি পাইলে নিজের মনেই শ্লেট ও প্রথম ভাগটা লইয়া হাজির হয়, তখনই বুঝিতে পারি এ আগ্রহটা তাহার কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ারই একটা নূতন রূপ, কেন না, প্রথম ভাগ শেখার আর কোন উদ্দেশ্য থাক্ আর না থাক্ ইহার উপরই যে ভবিষ্যতে তাহার কাকার সমস্ত সুখ-সুবিধা নির্ভর করিতেছে রাণুর মনে এ ধারণাটুকু বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন আর একেবারেই উপায় নাই বলিয়া তাহার শিশু মনটি ব্যথায় ভরিয়া উঠে; প্রবীণার মত আমায় তবুও আশ্বাস দেয়—"তুমি ভেব না মেজকা', তোমার পেরথোম ভাগ না শেষ করে আমি কক্‌খনও শ্বশুরবাড়ী যাব না।—নাও, বলে দাও।"

পড়া অবশ্য এগোয় না। বলিয়া দিব কি, প্রথম ভাগটা দেখিলেই বুকে যেন কান্না ঠেলিয়া ওঠে। ওদিকে আবার প্রতিদিনই গৌরীদানের বর্দ্ধমান আয়োজন—বাড়ীর বাতাসে আমার যেন হাঁফ ধরিয়া ওঠে। এক এক দিন মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরি, বলি—"আমাদের কোন্ দোষে তুই এত শিগ্‌গির পর হ'তে চল্‌লি রাণু?"

বোঝে না, শুধু আমার ব্যথিত মুখের দিকে চায়। এক একদিন অবুঝভাবেই কাঁদকাঁদ হইয়া ওঠে; এক একদিন জোরগলায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে—"তোমার কষ্ট হয় তো বিয়ে এখন করবই না মেজকা; বাবাকে বুঝিয়ে বলব'খন..."

একদিন এই রকম প্রতিজ্ঞার মাঝখানেই শানাইয়ের করুণ সুর বাতাসে ক্রন্দনের লহর তুলিয়া বাজিয়া উঠিল। রাণু হৃষ্টিত আনন্দে আমার মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ কি রকম হইয়া গিয়া মুখটা নীচু করিল—বোধ করি তাহার মেজকাকার মুখে বিষাদের ছায়াটা নিতান্তই নিবিড় হইয়া তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

* * *

গৌরীদান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমাদের গৌরীর আজ বিদায়ের দিন। আমি শুভকর্ম্মে যোগদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি নাই, এ-বাড়ী সে-বাড়ী করিয়া বেড়াইতেছি। বিদায়ের সময় বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলাম।

দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার-পরা মালাচন্দনে চর্চ্চিত রাণুকে দেখিয়া আমার তপ্তচক্ষু দু'টা যেন জুড়াইয়া গেল।…কিন্তু ওযে বড্ড কচি, এত সকালে কি করিয়া বিদায়ের কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায়? ওকি জানে আজ কতই পর করিয়া ওকে বিদায় দিতেছি আমরা?

চক্ষে কোঁচার খুঁট দিয়া এই পুণ্যদর্শন শিশুদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। রাণুর চিবুকটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম—"রাণু, তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে…" আর বলিতে পারিলাম না।

রাণু শুনিয়াছি এতক্ষণ কাঁদে নাই। তাহার কারণ নিশ্চয় এই যে, সংসারের প্রবেশপথে দাঁড়াইতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপনাটা সরিয়া গিয়া, ওর মধ্যেকার শিশুটি বিস্ময়ে, কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।… আমার কথার আভাসে সেই শিশুটিই নিজের অসহায়তায় আকুল হইয়া পড়িল। আমার বাহুতে মুখ লুকাইয়া রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কখনো কচিমেয়ের মত ওকে ভুলাইতে হয় নাই। আমার খেলাঘরের মা হইয়া ওই এতদিন আমায় আদর করিয়াছে—আশ্বাস দিয়াছে; সেইটেই আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাল মানাইত। আজ প্রথম ওকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিলাম—যেমন দুধের ছেলেমেয়েকে শান্ত করে—বুঝাইয়া—মিথ্যা কহিয়া—কত প্রলোভন দিয়া।

তবুও কি থামিতে চায়? ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন যে গোপনে শুধু অশ্রুই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া থামিল। অভ্যাসমত আমার করতল দিয়াই নিজের মুখটা মুছাইয়া নিল; তাহার পর হাতটাতে একটু টান দিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"এদিকে এসো, শোনো মেজ্‌কা।"

দুজনে একটু সরিয়া গেলাম।—সকলে এই অসম মাতাপুত্রের অভিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণু বুকের কাছ থেকে, তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্য হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথমভাগের একটা বাণ্ডিল বাহির করিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল—"পেরথোম ভাগগুলো হারাই নি মেজ্‌কা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।"

গলা ভাঙিয়া পড়ায় একটু থামিল, আবার বলিল—"সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মেজ্‌কা—খু—ব লক্ষ্মী হয়ে পড়ে পড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখ্‌ব—তুমি কিছু ভেবো না মেজ্‌কা।"

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

গারবেয়াং—লিপুধুরা

আমাদের যাত্রার দিন এইবার নিকট আসিয়াছে। খবর পাওয়া গেল রাস্তা খুলিয়াছে। ক্রমেই আমরা দেখিলাম চৌদাস, বুদি প্রভৃতি স্থানের মহাজনেরা মাল লইয়া গারবেয়াং অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম লাল সিং পাতিয়ালও শীঘ্রই আসিতেছে, তাহার মাল আসিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় শ্রাবণের প্রথমেই এখানকার ডুডুং উৎসব পড়িয়া গেল। সকলকারই অনুরোধ যে, এখানকার ডুডুং না দেখিয়া আমরা যেন যাত্রা না করি।

এই উৎসবটি বৎসরের মধ্যে একবার শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে ও দ্বিতীয়বার অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা উৎসব বটে, কিন্তু আসলে শ্রাদ্ধেরই ব্যাপার। কার্ত্তিক হইতে আষাঢ়ের মধ্যে যাঁরা দেহত্যাগ করেন, এই শ্রাবণে তাঁহাদের জন্ম এই প্রেত উপাসনা বা প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান, এবং যাঁহারা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে স্বর্গে যান তাঁহাদের জন্ম অগ্রহায়ণ মাসে। ইহারা মৃত ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব মানে, তবে সেই আবির্ভাবের আধারটি অদ্ভুত রকমের। সেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সজ্জিত বা অলঙ্কৃত একটি মেষ। মৃত ব্যক্তি স্ত্রী পুরুষ ভেদে মেষেরও লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে। মানুষে যে সকল মূল্যবান বস্ত্র অলঙ্কার ব্যবহার করে, যেমন বেনারসী সাড়ি বা ধুতি, রেশমের নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্রাদি, পশমের বস্ত্র, শাল জোড়া, ঐ সকল যাহার যাহা সংগ্রহ আছে সমস্তই পরিপাটিরূপে নির্ব্বাচিত মেষটির পেট ও পিঠ বেড় দিয়া গুছাইয়া বাঁধিয়া দেয়। তাহার মুখ ও কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া পুচ্ছ পর্য্যন্ত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করা হয়। তাহার মধ্যেই ইহারা মৃত ব্যক্তির আবির্ভাব মানে। যে যে বাড়ীতে শ্রাদ্ধ আছে, সেই সকল বাড়ীতে ঢাক ঢোল বাজাইয়া সেই মেষবরকে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহাকে স্ত্রীলোকেরা অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে মণ্ডপের ধারে লইয়া যায়। সেই মণ্ডপের উপরে অনেক অনেকগুলি পিতলের পানপাত্রে প্রথম স্তরে মদ্য থাকে। তাহার পর পর স্তরগুলিতে শুষ্ক ফলাদি, চাল, ডাল, আটা, ঘি, তাহার উপরের স্তরে জামা-কাপড়, জুতা, উত্তম পশম ও রেশমের প্রাচীন বস্ত্র, সজ্জিত থাকে। তাহার উপরের কিম্বা নীচের জমিতে হুঁকা গুড়গুড়ি, পিতলের নানাপ্রকার তৈজসপত্র, সতরঞ্চ, কার্পেট, দীপাধার প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু আছে, সজ্জিত থাকে।

সেই স্থানে সেই অলঙ্কৃত মেষবরকে আনা হইলে রমণীগণ মদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি, ভোটিয়া সমাজের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, নৈবেদ্য, মালা, মৃতব্যক্তির নাম করিয়া তাহাকে খাওয়ায়, অথবা মুখে গুঁজিয়া দেয়। এইরূপে প্রত্যেক শ্রাদ্ধবাড়ির মেষটি প্রত্যেক শ্রাদ্ধবাড়িতে নিমন্ত্রণ খায়। পরে বৈকালে তাহার সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া হিন্দুদের যেমন ষাঁড় দাগিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এই ভেড়াকেও সেইরূপ লাল রং মাখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়াই নিয়ম। আমরা দ্বিপ্রহরে নিকটবর্ত্তী দুই একটি বাড়িতে সেই সজ্জিত মেষের

ভোজনের পালা দেখিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রমা আর একটা বাড়িতে লইয়া গেল। প্রত্যেক বাড়িই দ্বিতল, উপরে উঠিবার সিঁড়ি অপ্রশস্ত এবং বিশৃঙ্খল। উপরে একটি ঘরে খুবকাঠের মত একটি মূর্ত্তিকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছে, গৃহমধ্যে একটি অগ্নিকুণ্ড তাহাতে ধূপ পুড়িতেছে। আর গৃহস্বামী বিমর্ষভাবে শোকাকুলিত-

ডুডুংএর মেম্বর

চিত্তে একটি বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। চারি-দিকের দেওয়ালে বাসন-কোসন, নানা প্রকার পার্ব্বতীয় বিলাসদ্রব্য সাজানো আছে। ঘরের মধ্যে কলসে মদ, মদের উৎকট গন্ধে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। যে যাইতেছে জলযোগের মত একপাত্র না টানিয়া ছাড়িতেছে না। সেখান হইতে আমরা আর এক বাড়ি গেলাম। সেথায় এক পুরুষমূর্ত্তিকে শিরস্ত্রান প্রভৃতি যুদ্ধের পোষাকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বাকি সব সজ্জা একই ভাবেরই। ইহার পর আবার শোভাযাত্রা ছিল। সন্ধ্যার সময় প্রথমে ঢাকের আওয়াজে আমরা, শুধু আমরা নয় পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই, রাস্তার ধারে একখানি একতল গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং দেখিলাম শোভাযাত্রার দলের আগাগোড়া সকলকারই পায়ে জুতা, তাহারই উপর চুড়িদার পাজামা, তাহার উপর পশমী বাওয়া বা সাদা শালের চাপকান, কোমরে চাদর জড়ানো, মাথায় পাগড়ী—সকলি সাদা। প্রথমেই প্রকাণ্ড জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দুইজন আসিতেছে, তারপর দুইজন নাকাড়া। তারপর, দুইজন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করতাল, বিকৃত-ভঙ্গিতে অঙ্গচালনা করিয়া বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছে। তাহাদের পিছনে একহাতে ঢাল ও আর একহাতে তলওয়ার দশ-বারো জন ভোটিয়া বীর পার্ব্বত্য-তালে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছে। প্রত্যেকেই একই ভাবে একই ভঙ্গিতে একই তালে অঙ্গচালনা করিতেছে। তাহার পর আরও কতকগুলি বালক-বীর, তাহারাও মদে মত্ত অবস্থায় অগ্রগামী বীরগণের অনুকরণে নাচিতেছে। এইরূপে প্রত্যেক শ্রাদ্ধবাড়ির অঙ্গনে একবার করিয়া সমবেত হওয়া ও নৃত্যে কিছুকাল কাটাইয়া যাওয়াই নিয়ম। শেষে ক্লান্ত-শরীরে যে যেখানে পায় পড়িয়া রাত্রিটুকু কাটাইয়া দেয়। শেষের দিন একটু বিশেষ আছে।

ঐ-রূপে ভোটিয়া বীরবৃন্দ নৃত্যে উন্মত্ত হইয়া গ্রামের প্রধান রাস্তা দিয়া, একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি ধূ ধূ জ্বলিতেছে, লক্ লক্ অগ্নিশিখা বায়ুর গতিতে কখনও উর্দ্ধে, কখনও বামে, কখনও বা দক্ষিণে প্রসারিত হইতেছে। বীরগণ সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের চারিদিক বেড়িয়া নাচিতে নাচিতে পরে একধার হইতে আরও করিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়াইলেন, তখন অপর দিক হইতে চিড় কাঠের মশালধারিণী নারীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে আসিয়া সেই অগ্নিবেষ্টনপূর্ব্বক নাচিতে লাগিলেন। পরে হস্তস্থিত সেই মশালগুলি অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া, সব শেষ করিয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ডুডুং শেষ হইল, ঢাকের বাদ্য থামিল। এ অঞ্চলে যতগুলি গ্রাম আছে সব গ্রামেই পর্য্যায়ক্রমে এইভাবে ডুডুং পর্ব্ব সম্পন্ন হয়।

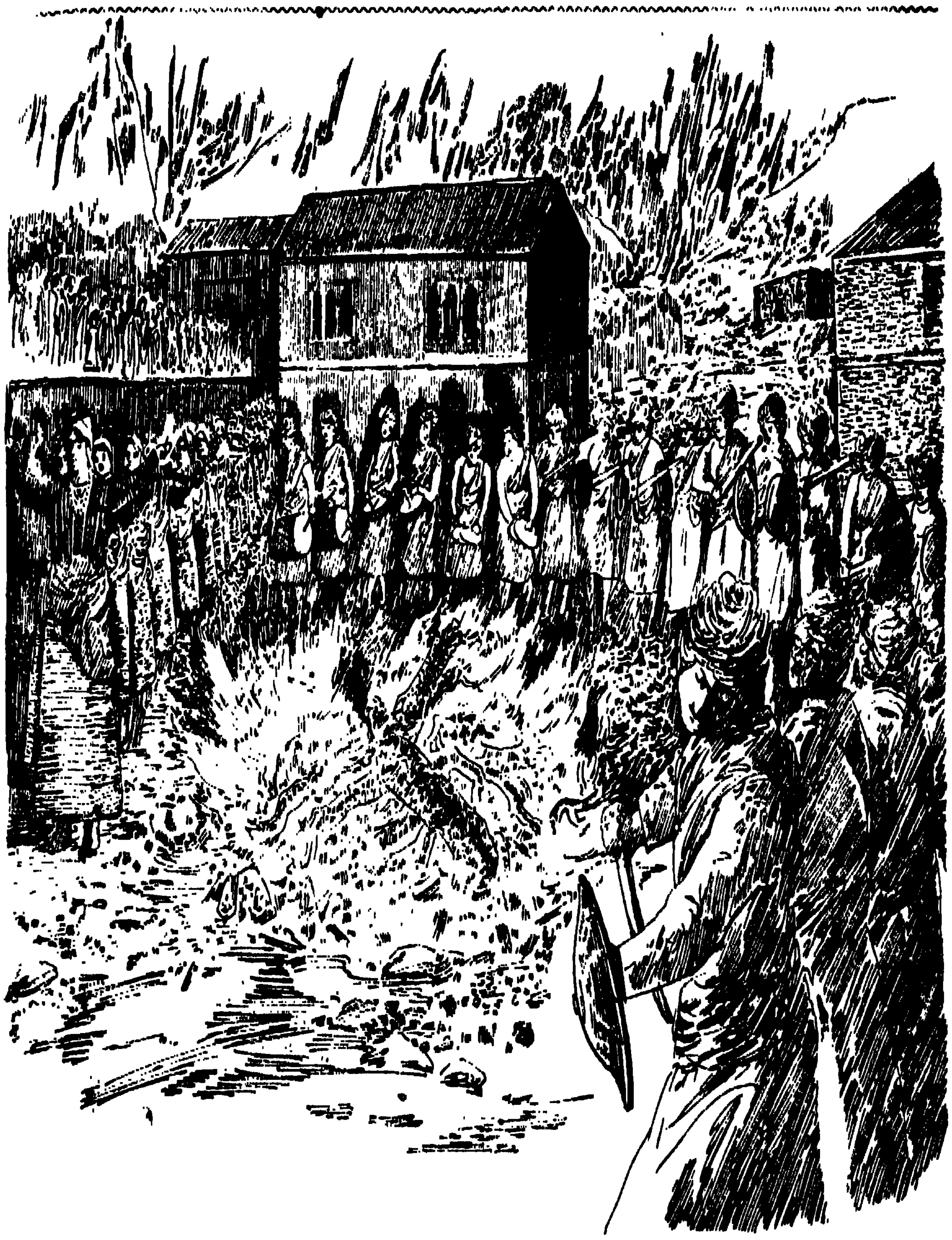

ডুডুং-এর শেষ

শ্রাদ্ধোৎসব যে রাত্রে শেষ হইল তাহার পরদিন গ্রামের রাস্তায় কাহাকেও আর দেখিতে পাওয়া গেল না, গ্রামখানি যেন অসাড়।

পরদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি দিলীপের মধ্যম ভ্রাতা একটি সুন্দর পাহাড়ী টাটুর উপরে চড়িয়া কালাপানির দিকে চলিয়াছে। দেখা হইলে নমস্কার করিয়া বলিল, "রাস্তা খুলিয়াছে, আমরা আগে চলিলাম, আপনারা দুই তিন দিন পর যাত্রা করিবেন।"

আমরা এইবার অধ্যবসায়সহকারে যাত্রার আয়োজনে লাগিয়া গেলাম। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, "এবার লিপুলাক্ "পাস" অতিক্রম করিতে হইবে, দুইজনের জন্য দুইটি ঘোড়া লওয়া যাক্, আর মালপত্রের জন্য একটা ঝাব্বু হইলেই চলিবে।" আমি বলিলাম, "নাথজী, লালগীর, ঝুমায়ুঁর চারি জন সাধু, এমন কি কর্ণপ্রয়াগবাসিনী মাতাজী, যখন হাঁটিয়া যাইবেন, আমি কেন ঘোড়ায় যাইব। আমার জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন নাই।"

এই রাজ্যে মহিষের ন্যায়, ভারবাহী কঠিন পার্ব্বত্য-পথের সম্বল একপ্রকার জীব আছে। তাহার দ্বারা একমণ দুইমণ বোঝা এই পার্ব্বত্যপথে এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে চালান যায়। পাহাড়ী গাভী মাতা এবং তিব্বতের চমরী পিতার সংযোগেই এই ঝাব্বুর জন্ম। ইহাকে "চাওর কি চেলা"ও বলে। গারবেয়াংবাসিগণের প্রত্যেকেরই দুই তিনটি করিয়া ঝাব্বু, ঘোড়া, গরু, দশবিশটা ভেড়বকরী, দুই একটি কুকুর আছে। পশুপালনে ইহাদের কোনও খরচ নাই। সারা বছর তাহারা জঙ্গলেই চরিয়া খায়। তিব্বতেও দেখিয়াছি পশুপালনে খরচ নাই। এখান

হইতে কালাপানি হইয়া তাক্‌লাখার যাইতে প্রত্যেক ঘোড়া ও ঝাব্বু জন্য দুই টাকা করিয়া লাগে। আমি ইতি-মধ্যে কলিকাতা হইতে আরও কিছু টাকা আনাইয়া লইয়াছিলাম। কাল আমাদের যাত্রা।

পরদিন যখন আমরা যাত্রা করি, রুমাদেবী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, লালসিং পাতিয়াল, তাহার মা, অন্যান্য মহাজন এবং রুমা যতদিন তাক্‌লাখারে না পৌঁছান ততদিন যেন আমরা কৈলাসের পথে যাত্রা না করি। কারণ তিব্বতীয় তীর্থের পথসকল বিপদসঙ্কুল, আমাদের মত লোকের একলা যাইবার নয়। তখন একথাটার মর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারি নাই, শেষে ভালরূপই বুঝিয়াছিলাম।

যাহা হউক গারবেয়াংএ প্রায় আঠারো দিন থাকিয়া যখন স্থানটির মায়া কাটাইয়া নাথজী ও আমি পশ্চাতে, সন্তীমহাশয় শুভযাত্রার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রে যাইয়া কালাপানির রাস্তায় পড়িলাম, তখন তিনি ঘোড়ায় উঠিলেন এবং মৃদুহাস্যে বলিলেন, "বুঝলে হ্যা, এখান থেকে যাত্রাই আমাদের ঠিক কৈলাস যাত্রা।"

কালীগঙ্গার তীরে তীরে বরাবর কয়েকটি প্রবলগতি চঞ্চল গিরিনদী অতিক্রম করিয়া আমরা তৃতীয় প্রহরের শেষে কালাপানিনামক জঙ্গলের মধ্যস্থিত পড়াওতে পৌঁছাইলাম। দেখিলাম তাক্‌লাখার যাত্রী মহাজনদের দুই তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। সাধারণের জন্য এখানে কাদামাটি, নোড়ানুড়ি, ও পাথরে গাঁথা দেওয়াল, উপরে কোনোটির আচ্ছাদন আছে কোনোটির নাই,এইরূপ আট-দশখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার ও গবাক্ষশূন্য ঘর। ভিতরে অন্ধকার। ভেড়বকরী আটকাইবার খোঁয়াড়ও কয়েকটি আছে। আমরা তিনজন একখানি ঘরে আশ্রয় লইলাম, নাথজী রুটি পাকাইলেন। আমরা ভোজনান্তে সুনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে লিপুধুরার পথে যাত্রা করিলাম।

খুব ঠাণ্ডা ছিল। যাহার যাহা কিছু ছিল গায়ে চড়াইয়া ঘোড়ায় সন্তী-মহাশয় আগে, এবং আমরা পিছনে, গুটিগুটি চলিলাম। ক্রমে গাছপালা বিরল হইতে লাগিল। আমরা যখন ক্রমোচ্চ গিরি-সঙ্কটের পথে পড়িলাম তখন একেবারে তৃণবৃক্ষলতাহীন, রুক্ষ, প্রস্তরময়, অসমতল ভূমি স্তরে স্তরে দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। প্রথমে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে শিবালিক শ্রেণী, তাহার পর কতকটা নিম্ন হিমালয়ের দ্বিতীয় স্তর—যাহার মধ্যে আসকোট, বালুয়াকোট, ধারচুলা, খেলা প্রভৃতি ভোটিয়া পরগণার কতকাংশ অতিক্রম করিয়াছি—তাহার পর হিমালয়ের উচ্চতর স্তর। এই তৃতীয় স্তরে হিমালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়—গারবেয়াং, লিপুলাক প্রভৃতি এই স্তরের অন্তর্গত। আমরা এখন ইহাই অতিক্রম করিতেছি। ইহার পর জাস্কর, তৎপশ্চাতে লাদক শ্রেণী। তাহার পরে কৈলাস শ্রেণী যাহা তিব্বতের মধ্যে।

আমরা আজ বেশ প্রফুল্লমনেই যাত্রা করিয়া আনন্দে দেড় মাইল দুই মাইল আন্দাজ আসিয়া ক্রমশঃ অনুভব করিতে লাগিলাম পা দুটি যেন ভারী হইতেছে। এই গিরি-সঙ্কটের উচ্চতা ষোল হাজার আটশত ফিট, সুতরাং প্রায় তিন মাইলের উপর আমরা উঠিতেছি। ক্রমশঃ শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন চলিতে লাগিল।

অল্প দূর যাইতে-না-যাইতে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলাম। একে ত ভয়ানক ঠাণ্ডা, তাহার উপর ঝড়ের মত শীতল বাতাস চালাইতেছে। চক্ষুতে চসমা ছিল। নাক কান মুখ পশমের টুপী ও পাগড়ীতে ও সর্ব্বাঙ্গ জামাজোড়ায় ঢাকা। তবুও বাতাস সূচের মত বিঁধিতেছে। শরীর ক্রমশঃ ভয়ানক দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণায় গলাও শুকাইতে লাগিল। এক স্থানে কিছুক্ষণ বসিয়া একটু বিশ্রামের পর কিছু জলযোগ করিয়া আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। পা যেন চলিতে চাহে না, অল্প দূর যাইয়া আবার গলা শুকাইতে লাগিল। সদ্যদ্রবীভূত তুষার অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিলাম,—শরীরে যেন বল আসিল, ক্ষণেকের তরে তৃষ্ণা মিটিল। কিন্তু হায়! বোধ হয় একদণ্ডও যাই নাই, আবার তৃষ্ণা—তৃষ্ণার কি জ্বালা! এইভাবেই চলিতে লাগিলাম।

নাথজী বলিল, "বিখ চঢ় গিয়া"।

চড়াই তত বেশী খাড়া নয়, ক্রমশঃ উঠিয়াছে, কিন্তু চলিতে বা উঠিতে যেন শক্তিতে কুলাইতেছে না।

লিপুধুরার পথ

লাঠিটাকে ধরিয়া চলিতেছি। ক্রমশঃ এত শ্বাস চলিতে লাগিল এবং এত শক্তিহীন মনে করিলাম, যে ইচ্ছা হইতে লাগিল এইখানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু জানিতাম শুইলে আর উঠিতে হইবে না। ঐ সম্মুখেই চির-তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন অতি নিকটেই। কিন্তু এই যে ব্যবধান উহা এই ক্লান্তশরীরে অতিক্রম করিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে না। এইরূপে সাত মাইল পথ শেষ করিয়া এবং সকল ক্লেশ সফল করিয়া আমরা প্রায় দুইটা নাগাদ ঘুরায় উঠিলাম। সেখানে একটি দণ্ড পোঁতা আছে। তাহার নিকটে পত্রহীন বহুশাখাযুক্ত একটি শুষ্ক বৃক্ষ, তাহাতে বিবিধ বর্ণের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সকল ঝুলিতেছে। হিমালয়ের সকল প্রদেশেই গাছে বিবিধ বর্ণের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ঝুলানোর ব্যাপার দেখিয়াছি। এটা লোকদেরই কাণ্ড, ঠাকুরকে কোনোরূপ মানসিক করিয়াই ঝুলানো হয়। এখানে যেটি, সেটি শুভযাত্রার জন্যই। অনেকেই নিরাপদে গিরি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া ইহা বাঁধিয়া দিয়াছে। এইরূপ স্থান আমিষাশী মানবের পক্ষে যতটা সহজ, নিরামিষাশিগণের পক্ষে ততটা নয়। ভোটিয়া ও হুনিয়ারা অনায়াসেই এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পায়।

যাহা হউক যখন আমরা সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে তিব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন এতটা পথের সকল কষ্ট আনন্দে পরিণত হইল। শিখর হইতে প্রায় দশবারো মাইল আন্দাজ পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত ভূখণ্ড স্পষ্টচক্ষে দেখিলাম। তাহার পশ্চাতে আরো দূরে নীল পর্ব্বতমালা ধূসরে পরিণত হইয়াছে। সে অনির্ব্বচনীয়, মনোরম দৃশ্য। তাহা বর্ণনার ভাষা নাই।

আমরা অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন পা এত লঘু হইয়াছে যে, অবলীলাক্রমে আরও আট দশমাইল অতিক্রম করিয়া আমরা সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। এখানে সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গে মিলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে একখানি গ্রামের শেষে বিশালকায় কর্ণালী নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। তাহার

পরপারে তাকলাখার মণ্ডি, যেখানে ভোটিয়া মহাজনেরা হাট বসায়। কর্ণালীর তিব্বতী নাম "মাপচু", "চু"শব্দে জল বুঝায়। উহা পার হইয়া আমরা তাক্‌লাখার মণ্ডিতে প্রবেশ করিলাম এবং চৌদাসের অন্তর্গত শোঁসার পাটওয়ারী দিলীপ সিংএর ভাই কিষণ সিংএর দোকানঘরে আশ্রয় পাইলাম। তখন দুই চারিজন মাত্র

তাক্‌লাখার

মহাজন সবে আসিয়া পাল খাটাইতেছে। কিষণ সিং বলিল, "আপনারা অনেক আগেই আসিয়াছেন। যাক্ যখন আসিয়া পড়িয়াছেন, এখানেই থাকুন।"

পুরাং জনপদ—শিম্পিলীং গোম্বা, গুরুপর্ব্ব

পুরাং একটি অতি প্রাচীন তিব্বতীয় জনপদ। এখানকার দুর্গ, বৃহৎ মঠ এবং শাসনকর্তা জুম্পান পুসোর প্রাসাদ, সকলই একত্রে একটি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত। পাদমূলে উপত্যকার মত অনেকটা বিস্তৃত স্থান, তাহাতেই তাকলাখার মণ্ডি বসে। সেই স্থান হইতে নদীগর্ভ আবার অনেকটা, প্রায় শতাবধি ফুট, নীচে। ওখানে কর্ণালী নদীটি বিশাল।

প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল একবার কাশ্মীরের সেনাপতি সুবিখ্যাত বীর জোরাওয়ার সিংহ বহুতর সৈন্য লইয়া তিব্বতের এ অঞ্চল আক্রমণ করিতে আসেন। প্রথমে অনেকটা অগ্রসর হইলেও শেষে তাঁহাকে পরাজিত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক বিজয়কাহিনী এখনও তিব্বতের লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। রণ-কৌশল ও যুদ্ধবিদ্যায় এদেশীয়গণ বিলক্ষণ পশ্চাৎপদ হইলেও সেই বিজয়ের গরিমা কম নহে।

তিব্বতের এ অঞ্চলের রাজা বা শাসককে জুম্পান পুসো বলে। তিনি উপরের কেল্লা-সংলগ্ন প্রাসাদেই থাকেন। শুনিলাম এখন এখানে নাই। তিনি রাজকার্য্যে লাসায় গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী চেম্ পুসোই এখন রাজকার্য্য সকল দেখিতেছেন। তিনিই ভোটিয়াদের এখানে মণ্ডি বা বাজার বসাইতে হুকুম দিয়াছেন। রাজা-সম্পর্কে জুম্পান পুসোই এ-অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিপত্তিশালী, যেহেতু তাঁহারই অধীনে যত সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্রাদি, এবং রাজ্যরক্ষার যত কিছু ব্যাপার। যতই সৈন্য ও অস্ত্রবল থাকুক পাশ্চাত্যের অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধসরঞ্জাম বা সুনিয়ন্ত্রিত সেনার সঙ্গে তাহাদের তুলনাই হয় না একথা বলাই বাহুল্য। বহুকাল নিরুপদ্রবে

শান্তিময় জীবন উপভোগ করিয়া ধ্বংসের পূর্ব্বে সৈন্ত-বিভাগের যে অবস্থা হয়, ইহাদেরও সেই অবস্থা। তিব্বতের ওপারে চীনরাজ্য। ইহারা বহুকালই নানা-বিষয়ে চীনের অধীন হইয়া আছে, প্রধানতঃ ধর্ম্মে, রাজনীতিতে, সমাজ-নীতিতে। চীনের সঙ্গেই ইহাদের সংস্রব বেশী, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহারা চীনসমাজেরই অনুকরণ করে। তিব্বতের পৌরাণিক নাম কিম্পুরুষবর্ষ। কিম্‌,কুৎসিৎ অর্থেই ব্যবহার,—এখনকার স্ত্রী, পুরুষ মাত্রেই কুৎসিৎ, সেই কারণেই ভারতীয় আর্য্যগণ এদেশের ঐরূপ নামকরণ করিয়া থাকিবেন। হুনো বুড়ো, হুনো বুড়ীর নাম করিয়া আমাদের দেশে যে শিশুগণকে ভয় দেখাইবার প্রথা আছে—ইহারা সেই হুনো। হনুদ্বয় উচ্চ বলিয়া ইহাদের হুনু বা হুণ বলে কি না জানি না, তবে আমরা এটুকু বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, এ অঞ্চলের তিব্বতীয়গণ স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিচারেই হনুমান এবং হনুমতী! এ দিকের লোকেরা শ্রমজীবী, চাষা-শ্রেণীর। সকলেরই মুখের বর্ণ তামাটে অথবা রৌদ্রদগ্ধ, কিন্তু জামার ভিতরে গায়ের রং অপেক্ষাকৃত সাদা। রক্তবর্ণ পোষাক ইহাদের বিশেষ প্রিয়। আবার গাঢ় নীল বর্ণের পোষাকের প্রতিও নারীগণের অনুরাগ দেখিয়াছি। ইহারা শীতের সময় পশুচর্ম্মের জামা ব্যবহার করে। ইহারা

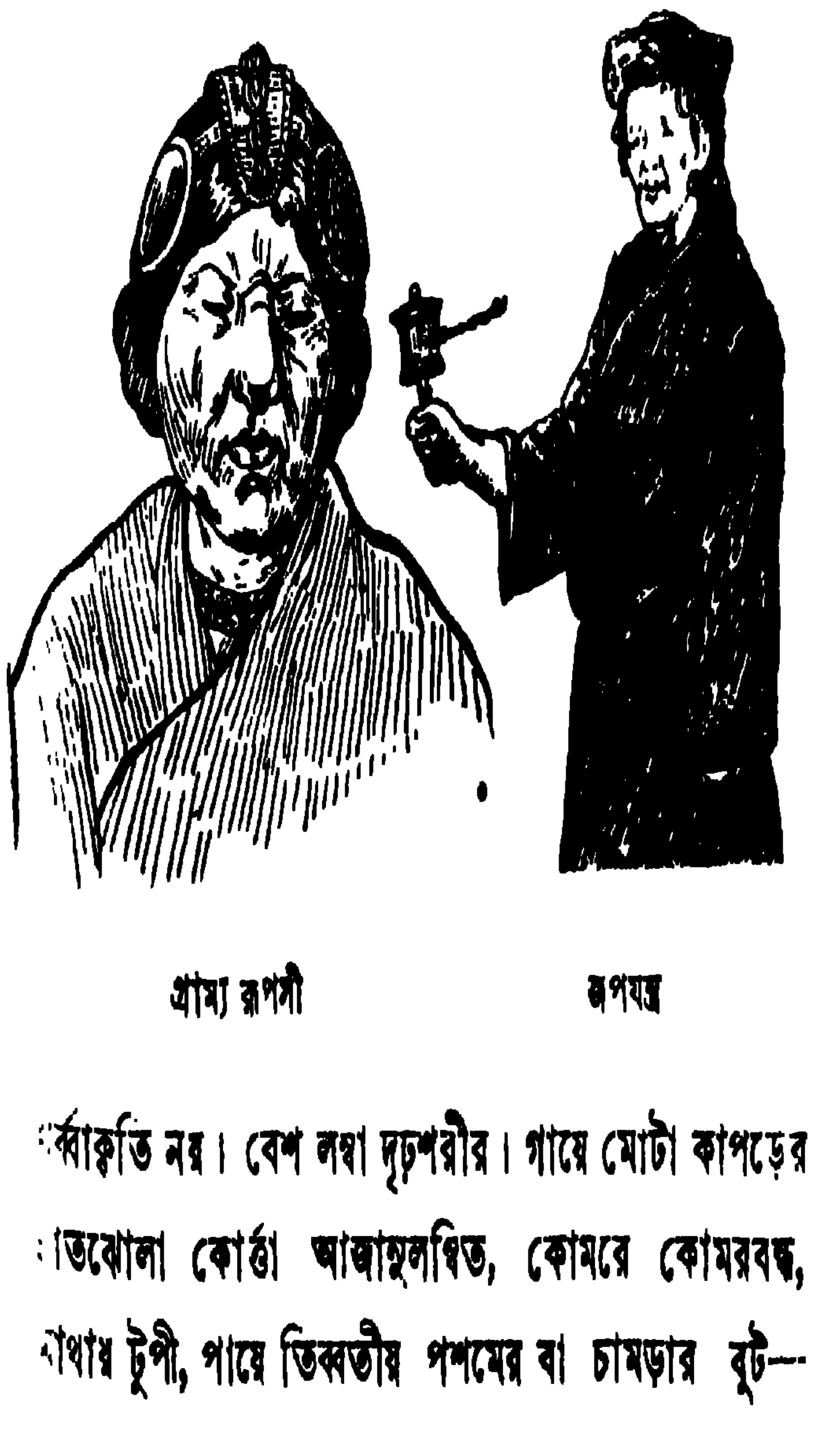

গ্রাম্য রূপসী জপযন্ত্র

খর্ব্বাকৃতি নয়। বেশ লম্বা দৃঢ়শরীর। গায়ে মোটা কাপড়ের ঝুলঝোলা কোর্ত্তা আজানুলম্বিত, কোমরে কোমরবন্ধ, মাথায় টুপী, পায়ে তিব্বতীয় পশমের বা চামড়ার বুট—তাহাকে শোখা বলে, পৃষ্ঠে বেণী। লামা ব্যতীত প্রায় সকলকার কটিতেই তলওয়ার অথবা ছোরা থাকে। স্ত্রীলোকের টুপী বা মাথার আচ্ছাদন পৃথক, পরণে পশমের লুঙ্গী, তাহার উপর কোর্ত্তা।

রূপসী পল্লীবাসিনী

পানাহার ইহাদের প্রধানতঃ জলের পরিবর্ত্তে চা, মদ্য, ছাতু, শুষ্ক মাংস ও কচিৎ রুটি। পশুপক্ষী ভেদে মাংসাহারের কোনো বিচার ত নাই-ই, পরন্তু কাঁচা রক্ত পর্য্যন্ত বাদ যায় না। ছাগল ভেড়া বা চমরী প্রভৃতি কাটিলে যে-রক্তটা পড়িল বাটি হাতে দুই চারিজন উহা ধরিয়া সেইখানেই ছাতুর সঙ্গে মাখিয়া বড়ই আনন্দে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল! নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ প্রায়ই দেখিতে কঠোর, শ্রীহীন এবং বিকটদর্শন।

অবিবাহিত যুবকগণের মাথায় টুপী নাই, পৃষ্ঠে বেণী-বিলম্বিত; এবং কুমারীগণের মাথায় কোনও অলঙ্কার এবং চুলের পারিপাট্য নাই—ইহাই দেশাচার। জন্মাবধি যেভাবে কুমার-কুমারীগণের মাথার মধ্যে নানা-প্রকার কীটপতঙ্গাদির আবাসপূর্ণ ঝোপ জঙ্গল হইয়া থাকে, বিধাতার নির্ব্বন্ধে বিবাহের সংযোগ ঘটিলে সেই সকল পরিষ্কৃত হয়। তখন পুরুষগণ পরিপাটী কেশমার্জ্জন করিয়া নানা-প্রকারের টুপী উড়াইয়া চলেন, ও নারী-গণেরও নানা-প্রকারে চুল বাঁধার ধুম পড়িয়া যায়, পরে তাহার উপর অলঙ্কার পরে। সে যে কত প্রকারের তাহা আর কি বলিব। ধাতু তাহার মধ্যে প্রায়ই থাকে না। প্রবাল, প্রস্তর, শামুক, কড়ি, শাঁক প্রভৃতি আয়তন-ক্রমে মস্তকের স্থানে স্থানে সংযুক্ত হইয়া গ্রাম্য রূপসীগণের

শোভা বাড়ায়। অবশ্য উচ্চ সমাজে বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ঘরে সোনা রূপার নানা-প্রকার অলঙ্কার গৃহলক্ষ্মীগণের শ্রী ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে। নীলবর্ণের পাথর ও প্রবাল এদেশের নারীগণের বড়ই প্রিয় বস্তু। নারীগণের নীলবর্ণের পোষাকের উপর বড়ই প্রীতি।

তিব্বতের জনসমাজে অর্থোপার্জ্জনের যে সকল পন্থা বা বৃত্তি আছে দস্যু বৃত্তি বা ডাকাতি তাহাদের অন্যতম। কোথাও মালপত্র লইয়া কেহ যাইতেছে দেখিলে এ সুযোগ তাহারা কখনও পরিত্যাগ করে না। অশ্বপৃষ্ঠে তিন চারিটি মূর্ত্তি একত্রে চলিয়াছে, পিঠে সেকেলে বন্দুক বাঁধা, কটিতে তলওয়ার, কোষবদ্ধ ছোরা ও ভোজালী এ-দৃশ্য আমরা তিব্বতের সমস্ত পথটাই দেখিতে পাইতাম।

ডাকাতি, লুট, পরস্বাপহরণ, নরহত্যা প্রভৃতি পাতক-সকল স্খালনের বিচিত্র উপায়ও উহাদের মধ্যে আছে। দুষ্কর্ম্মের মাত্রানুসারে এক, দুই, তিন, অথবা পাঁচবার কৈলাস প্রদক্ষিণ এবং চিরতুষারাবৃত শুভ্র শিখরদেশ লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিজ অপরাধের কথা উচ্চারণ করিলেই পাপস্খালন হইয়া যায়। নিজ পাপ আবার গুরুতর সাব্যস্ত হইলে আমাদের দেশে যেমন বাবা তারকনাথের কাছে হত্যা দেওয়া এবং দণ্ডবৎ করিতে করিতে পরিক্রম করিবার ব্যবস্থা আছে, ইহারাও সেইরূপ কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ঐরূপ দণ্ডবৎ করিতে করিতে কৈলাসে আসিয়া পরিক্রমণ শেষ করে। যে কোনো কারণেই হোক নিজে অশক্ত মনে হইলে অর্থের বিনিময়ে অপর একজনকে রাজী করাইয়া তাহার দ্বারা সেই কাজ করানোর প্রথাও আছে। এইরূপে পাপ কাটাইয়া আবার সে নিজকর্ম্মে রত হয়, কিছুদিন পরে আবার পাপস্খালন কার্য্য চলে।

ভোটিয়াদের মত ইহাদের মধ্যেও পুরুষ অপেক্ষা নারী সর্ব্বকর্ম্মে অধিক পরিশ্রমী। পুরুষেরা ঘোড়ায় চড়িয়া পৃষ্ঠে সেকেলে বন্দুক বাঁধিয়া দুই তিন চার জন একত্রে শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। উহাদের বন্দুক জমিতে গাড়িয়া প্রতিবারই গাদিয়া আগুন লাগাইতে হয়। ব্রিটিশ প্রজা অথবা নেপালী যাহারা তিব্বতে ব্যবসা-উপলক্ষে যাতায়াত করে তাহাদের কাছে ইংলিশ রিভলভার অথবা বন্দুক থাকে, তিব্বতীরা উহাকে বড়ই ভয় করে; কারণ উহারা বেশ জানে যে, ও-সকল আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তাহাদের সেকেলে গাদা বন্দুক কোনো কাজের নহে।

আমরা যেদিন তিব্বতে, তাকলাখারে পৌছিলাম সেই দিন এবং তাহার পরদিন বিশ্রাম করিতেই কাটিয়া গেল। তবে তাহার মধ্যেই ঘুরিয়া-ফিরিয়া জায়গাটি দেখিয়া লইলাম। অনেকেই আসিয়া পৌছায় নাই, মোটে চার পাঁচজন দোকান পাতিয়াছে। অনেকে পাল খাটাইতেছে।

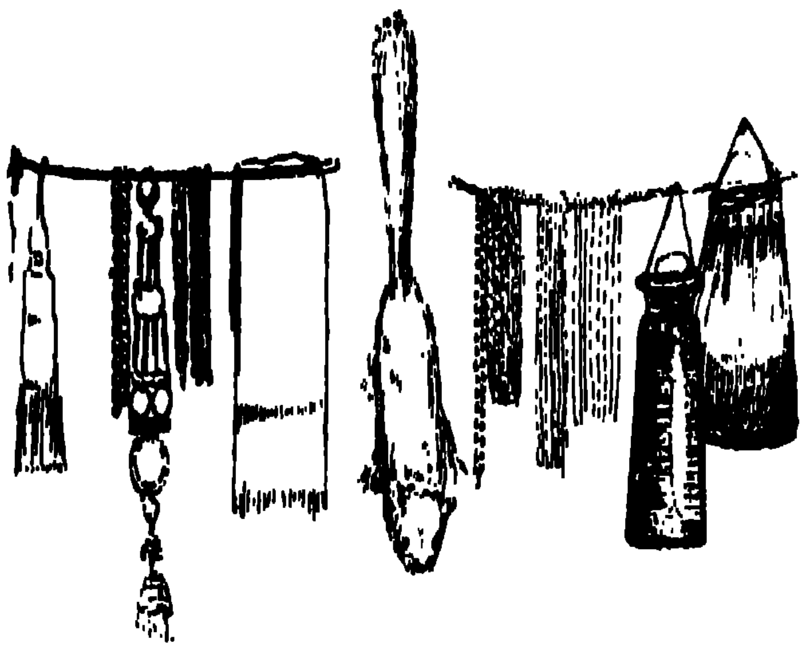

দোকানে খরিদ্দার

কেহ কেহ ঘরের দরজা আঁটিতেছে। ইহাদের সঙ্গে সকল রকম যন্ত্রপাতি থাকে, নিজেরাই সকল কাজ করিয়া লয়; যাহারা দোকান পাতিয়া বসিয়াছে তাহাদের দোকানে মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন তিব্বতীয় ছনিয়া খরিদ্দার আসা-যাওয়া করিতেছে দেখা যাইত।

এ-সময় এখানে সকাল সন্ধ্যায় আমাদের দেশের মাঘ মাসের মত শীত এবং দ্বিপ্রহরে অল্প গরম থাকে। তখন রৌদ্রের ঝাঁজ বড় প্রখর হয়। দুপুর বেলাটা ঝড়ের

পুরাংএ গুরু পর্ব্ব

মত ভয়ঙ্কর হাওয়া চালায়, সে-বায়ু এত রুক্ষ যে, গায়ে লাগিলে গা ফাটিয়া যায়। বৃষ্টি এদিকে প্রায়ই হয় না এজন্য মোটা কাপড়ের পালের নীচে ত্রিপলেই ইহাদের কাজ চলে। কার্ত্তিকমাসে যখন ইহারা নামিয়া যায়, তখন দরজা কপাট পাল দণ্ড সকল খুলিয়া পৃথক পৃথক গুহায় এখানকার চৌকীদারের জিম্মায় রাখিয়া যায়।

আমরা এখানে আসিবার দুই দিন পরে উপরের শিম্পিলীং গোম্বায় (মঠকে এরা গোম্বা বলে) গুরু নামক একটি বৌদ্ধপর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই বিপুল উৎসবের ব্যাপার দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল আমাদের আশ্রয়দাতা কিষণ সিংএর গুণে। তিনি আমাদের সঙ্গে একজন দোভাষী পথপ্রদর্শক দিয়াছিলেন।

পাহাড়ের উপরে পৌছাইতে আমরা অনেকগুলি—প্রায় বিশ পঁচিশটি—গুহা অতিক্রম করিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার।

এক একটি পাহাড় এক একটি নগর-বিশেষ বলিলেও হয়। এ দিকের পাহাড়ে মাটিই বেশী, সুতরাং কাটিয়া গুহা রচনা মোটেই কষ্টকর নয়, বেশী উপকরণেরও প্রয়োজন নাই। উপরে ত বড় বড় ইমারত আছেই। তাহার মধ্যে বড় বড় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মাঝপথে, আবার অসংখ্য গুহাশ্রেণী কাটিয়া বহু লোক বাস করিতেছে। তিব্বতীয়েরা প্রকৃতির সাহায্য সকল অবস্থায় পাইয়া থাকে, এজন্য তাহাদিগকে প্রকৃতির মহাভাগ্যবান সন্তান বলিয়া মনে হয়।

এখন উৎসবের কথা,—আমরা তিব্বতীয় নরনারীর অনেকটা ভিড় ঠেলিয়া প্রাঙ্গণে গিয়া দেখিলাম উপরে চন্দ্রাতপ। একদিকের একতলের ও দ্বিতলের প্রায় সমস্ত দেওয়াল জুড়িয়া একটি প্রকাণ্ড রেশমী বস্ত্রে চিত্রিত পট। মধ্যে উপবিষ্ট বিশালকায় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিই প্রধান। তাহার উপরে, নীচে এবং দুই পার্শ্বে নানা-প্রকার মূর্ত্তি চিত্রিত, অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে। তাহার সম্মুখে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত সোপানে স্তরে স্তরে পিত্তলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপাধার সারি সারি সাজানো আছে। পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড আধারে স্তূপাকার মাখন, উহা দীপ জ্বালাইবার কাজে লাগে। পটের সম্মুখেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উচ্চ আসন, উপরে রক্তবর্ণ পুরু গদি পাতা, প্রধান লামার বসিবার স্থান। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে সারি সারি কাষ্ঠাসন শ্রেণীবদ্ধ, তাহার উপরেও পুরু রক্তবর্ণ বস্ত্রের গদি,

অন্যান্য লামাগণের বসিবার স্থান। প্রত্যেক আসনের সম্মুখে এক একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মঞ্চ তাহাতে চায়ের বাটি প্রভৃতি রাখা আছে। তখন সকল আসনই শূন্য। অনুষ্ঠানের বিলম্ব থাকায় আমরা প্রধান লামার ঘরে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, সঙ্গে কিষণ সিংএর দেওয়া সেই দোভাষী।

যে-ঘরে এখানকার বড় লামা আছেন সেখানি ক্ষুদ্র, সর্ব্বত্র ধূলায় পরিপূর্ণ। দুই দিকের গৃহভিত্তিতে স্তরে স্তরে প্রাচীন পুঁথি সকল সজ্জিত আছে। একদিকে একটি লম্বা কাষ্ঠাসন, তাহার উপর পুরু গদি পাতা, উপরে তিনি বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটু দূরে, বিনীত-ভাবে দুইজন লামা আজ্ঞার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। এদেশে প্রধান লামাকে থুলো লামা বলে। আমরা নমস্কার করিলে তিনি আমাদের ঘাড়ে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ

শিম্পিলীং গোম্বার থুলো লামা

করিলেন ও হাতে এক একগাছি লাল রংয়ের সূতা দিলেন। সঙ্গী-মহাশয় উচ্চকণ্ঠে নিজের পরিচয় দিলেন, "হাম কাশীকা লামা হ্যায়।" থুলো লামা মৃদু মৃদু হাসিয়া আমাদের গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বলিতেছে?" সে বুঝাইয়া দিলে তিনি শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। স্থির, ধীর এবং শান্তপ্রকৃতি লামা-মহাশয়ের বয়স ষাটের কিছু উপর হইবে। মস্তক মুণ্ডিত, কিন্তু দুচার গাছি পাকা গোঁফ ও দাড়ি আছে। খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় তপক্লিষ্ট শরীর। স্থিরাসনে বসার অভ্যাসে পা-দুখানি একেবারেই শীর্ণ। সঙ্গীমহাশয় চীৎকার করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দীতে নিজের বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অপর দুজন লামা তাঁহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া বার বার চাহিতে লাগিলেন, তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, অবশেষে কেহ বুঝিল না দেখিয়া নিরস্ত হইলেন। তখনই উঠিলাম, পরে মঠাভ্যন্তরে নানাস্থানে ঘুরিয়া আমরা আবার উৎসবের প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিলাম। তখন এখানে সকল লামাগণ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের পোষাক বিলাতী ধর্ম্মযাজকগণের গাউনের মত, মাথায় গ্রীক শিরস্ত্রাণ-ধরণের পশমের টুপী। আধারস্থ সেই দীপ-গুলি এখন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে রৌশনচৌকী বাজনার সঙ্গে অস্ত্রধারী দেহরক্ষী প্রহরী-বেষ্টিত থুলো লামা আসিয়া নিজ আসনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার মাথার মুকুট এবং অঙ্গের আলখাল্লা ঠিক য়ুরোপীয় বিশপগণের মত। তিনি আসিলে সব নিস্তব্ধ হইল, ধীরে ধীরে মন্ত্রপাঠ সুরু হইল। প্রথমে বড় লামা, পরে অন্যান্য লামাগণ, প্রথমে দাঁড়াইয়া, পরে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। সকল শব্দই অনুনাসিক, তাহার উচ্চারণও বিচিত্র ধরণের। কাশীতে বেদপাঠ যেরূপ হয় অনেকটা সেইরূপ ধরণের। আবৃত্তি শেষ হইলে নিজ নিজ আসনে বসিয়া পান-ভোজনের পালা। বালকব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক প্রথমে চা পরে ছাতু ও দধি পরিবেশিত হইল। পরে অনেক দর্শকও প্রসাদ পাইলেন। পানভোজনের ব্যাপার শেষ হইলে তখন আবার অল্প কিছুক্ষণ মন্ত্র আবৃত্তি চলিল। পরে ঐক্যতান বাদনের সঙ্গে সেই দেহরক্ষী ও প্রহরী-বেষ্টিত থুলো লামা চলিয়া গেলেন, উৎসবও ভঙ্গ হইল। আমরাও স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে লামা বলিতে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বুঝায়। সন্ন্যাসী বা লামাগণ সর্ব্বত্রই মুণ্ডিতমস্তক ও রক্তবস্ত্র-পরিহিত। ভারতে শঙ্করের সম্প্রদায়ে যেমন ব্রহ্মচারী

সন্ন্যাসীদের দুইটি থাক বা শ্রেণী আছে এখানেও সেইরূপ আছে। আবার এমনও আছে আগে গৃহী ছিলেন এখন লামা হইয়াছেন, কিংবা প্রথমে কিছুদিন ব্রহ্মচারী লামা থাকিয়া পরে আবার বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। সারা তিব্বতটি লামার রাজ্য, লামাগণেরই প্রাধান্য। বিদ্যা লামাগণেরই নিকট। মঠের মোহান্ত উচ্চ-শ্রেণীর সাধক লামাগণের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হন। লাসা হইতেই অবশ্য এসকল নির্ব্বাচন হয়। সাধক লামাগণের ত্যাগ, তপস্যা সংযম পদ্ধতি অতীব বিস্ময়কর। জীবনব্যাপী কঠোর সংযম সাধন ইহাদের ব্রত। আমাদের ভারতবর্ষে মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শন, শিব, ঘেরণ্ড, অষ্টাবক্র ও যোগী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিতে যে-সকল যৌগিক ক্রিয়ার উপদেশ বা উল্লেখ আছে, ভগবান বুদ্ধের নামে শিষ্যপরম্পরায় সেই সকল অবলম্বন করিয়াই ইহারা মহাশক্তিমান। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে জপের দ্বারা উপাসনাই প্রচলিত। ইহারা অসংযত চঞ্চল মনকে সহজে কেন্দ্রস্থ করিবার জন্য এক যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহা হাতে ধরিয়া ঘুরাইতে হয়, এবং সেই আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র মনে মনে উচ্চারিত হয়।

উপরের মঠে, রাজবাড়ীতে অথবা কেল্লার মধ্যে কোথাও জলের ব্যবস্থা নাই। নীচে যেখানে গঞ্জি বসে সেখানে যে দুইটি ধারা আছে সে স্থান হইতেই গ্রামবাসিনী নারীগণ পৃষ্ঠে কাঠের বালতি বাঁধিয়া নিয়ম-ক্রমে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উপরের সকল স্থানেই জল সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাই এখানকার সনাতন প্রথা।

কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে ঝাড় ফুঁ প্রভৃতি তুক্-তাকই সমধিক প্রচলিত, যদিও এখানে কবিরাজী ধরণের একপ্রকার চিকিৎসার চলন আছে। লামাদের আশীর্ব্বাদ সকল চিকিৎসার সার। মাদুলী ও কবচের মূল্যের কথায় আর কাজ নাই, সে-সকল এখনকার ভারতবাসীর ধারণায় আসিবে না। ভিখারীর কথা পরে বলিব। মানস বা কৈলাসের দিকে যাইবার এখন কোনও সম্ভাবনা নাই। কারণ এখনও অধিক লোক আসিয়া পৌছায় নাই, তার উপর আমাদের সহায় যাঁরা, লালসিং পাতিয়াল, রুমাদেবী, তাঁহারা ত কেহই দেখা দিতেছেন না। কাজেই এই অবকাশে কোদন্নাথ তীর্থ ঘুরিয়া আসার সংকল্প স্থির করিয়া নাথজীকে লইয়া একদিন প্রাতে আমরা তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলাম। গারবেয়াং ছাড়িবার সময় হইতে নাথজী বরাবরই আমাদের সঙ্গে একত্রই আছেন, দুইবেলা রন্ধনের ভার তাঁর উপর দেওয়া হইয়াছিল।

কোদণ্ডনাথ বা কোজর যো

তাকলাখার হইতে কোদন্নাথ প্রায় দশ মাইল, যদিও এখানকার লোকেরা বলে ইহা আট মাইল মাত্র। কর্ণালী

কোদন্নাথের পথে

নদীটি পার হইয়া আমরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথটির একটু বিশেষত্ব এই যে, সারা পথটির মধ্যস্থলে গৈরিকরঞ্জিত ক্রমোচ্চ, স্তরে স্তরে সাজানো, প্রস্তর খণ্ডের স্তূপ. প্রায় তিনহাত উচ্চ, বহুদূরাবধি, বোধ করি কোদন্নাথের মন্দির পর্য্যন্ত, চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও এক একখানি বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড নানা-বর্ণে রঞ্জিত, মধ্যস্থলে তিব্বতী ভাষায়

প্রকাণ্ড বড় বড় অক্ষরে "ওঁ মণিপদ্মে হুং হ্রীং" এই মন্ত্রটি চিত্রিত আছে। কিছু বেশী দূরে দূরে কোথাও সম-চতুষ্কোণ প্রস্তর-স্তম্ভের উপর প্রস্তরাচ্ছাদন, বাহিরের দিকে নানা-বর্ণে চিত্রিত ঐ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল।

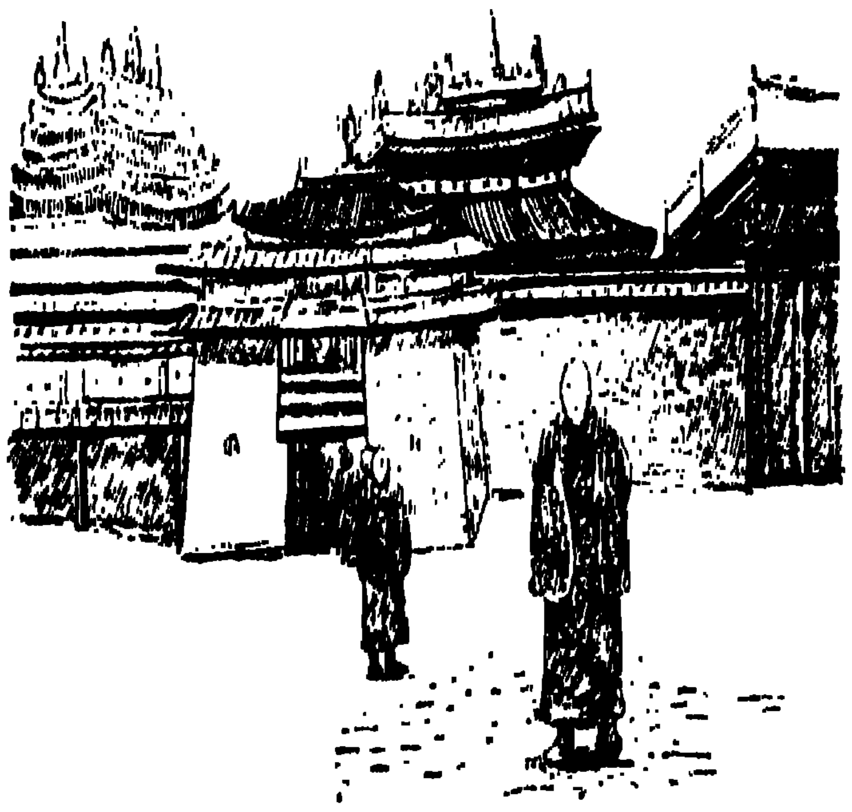

কোদন্নাথের মন্দির-দ্বার

সেগুলি কোনো কোনো লামা বা সন্ন্যাসীর সমাধি। এখানে কোনো লামা শরীর ত্যাগ করিলে প্রায়ই পথের উপর সমাধি দিবার নিয়ম আছে।

এলামাটি হইতে পীত, গৈরিক হইতে লাল এবং খড়িমাটি হইতে সাদা এই তিনটি রংয়ের ব্যবহার সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি। নীলের ব্যবহারও আছে, তবে পথে-ঘাটে তত নয়। সারা পথটি প্রথমোক্ত ঐ তিনটি রংয়ে রঞ্জিত "ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্রটি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে আমরা তিনটি বড় বড় জলস্রোত পার হইয়া প্রায় দেড়টা নাগাদ কোদন্নাথের মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। আসিতে মধ্যপথে আমরা এক অল্পবয়স্ক যুবক লামার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তিনি যৎসামান্য হিন্দী জানেন, তাঁর সঙ্গে চলিতে চলিতে নাথজী এবং আমি নানাকথায় অনেকক্ষণ কাটাইয়াছিলাম। তিনিও এখানেই আসিলেন। সঙ্গী-মহাশয় পশ্চাতে পড়ায় আমরা মন্দির-দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি আসিলেন প্রায় পনের মিনিট পরে, একেবারে গরম মেজাজ। আসিয়াই নাথজীকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাসের ভঙ্গিতে বলিলেন, "তোমলোক ঘোড়েকা মাফিক্ চলতা হ্যায়।" প্রত্যুত্তরে নির্ভীক নাথজী বলিল, "হাঁ, কোই ঘোড়েকে মাফিক্ চলত হৈ, কোই হাতীকে মাফিক, কোই উঁটকে মাফিক চলতা হৈ,—হর্ আদমিকা চলনা হর কিস্মকা হোতা হৈ।"

সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া কতকটা গেলে পর অঙ্গন পাইলাম—তাহার পর দুইটি মন্দির দেখিতে পাওয়া গেল। একটিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং অপরটিতে মহাকাল ও তারামূর্ত্তি। তাহার মধ্যে একটি যন্ত্র আছে, নিত্য পূজা হয়। এখানে তারামূর্ত্তি প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। এই তারার উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা, সাধনক্ষেত্রে যতগুলি উচ্চ অধিকারী লামা, তাঁহারা সকলেই তারামন্ত্রে দীক্ষিত। আমাদের ভারতে তারার উপাসনা পৃথকভাবে কোথাও নাই বলিলেই হয়, কিন্তু এই দেশে সর্ব্বস্থানেই তারার উপাসনাই প্রবল।

যন্ত্র বলিতে অধিষ্ঠানের স্থান বুঝায়। প্রথমে জপ, পরে ধ্যানের দ্বারা মন্ত্রকে জাগ্রত করিয়া বিশিষ্ট-রেখাঙ্কিত যে স্থানে বা কেন্দ্রে শক্তির আবাহন করিয়া আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তন্ত্রে তাহাকে যন্ত্র বলে। তিব্বতের সর্ব্বত্রই তন্ত্রের অসাধারণ প্রভাব।

সীতা-রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন এক কোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, তখন তেজোদীপ্ত, প্রশান্তবদন, গৌরবর্ণ প্রবীণ দীর্ঘকায় এক লামা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পূজারী লামার সঙ্গে তিনি প্রসন্নমনে কথা কহিতেছিলেন। আমায় ঐরূপভাবে দাঁড়াইয়া সব নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া শিস্ দিয়া ডাকিলেন। নিকটে গেলে আকারে-ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কে, কোথা হইতে আসিতেছি"—ইত্যাদি। আমি বলিলাম, "কলিকাতা"। তিনি যে কি বুঝিলেন ভগবান জানেন। আমার হাতে সংক্ষিপ্ত রেখা অঙ্কনের খাতাখানি (Sketch Book) ছিল তাহাতে আমার দৃষ্ট বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে রেখাবদ্ধ করিতাম। সেখানি তিনি আমার হাত হইতে গ্রহণ করিয়া আগাগোড়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। একস্থানে "ওঁ মণিপদ্মে হুং হ্রীং" লেখা দেখিয়া আমায় প্রত্যেক অক্ষরটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন এটা "ওঁ", এটা "ম", এটা "ণি" ইত্যাদি। তাঁর সব দেখা হইলে খাতাখানি লইয়া পরে আমি সম্মুখের

তিনটি মূর্ত্তি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সকল কাহার মূর্ত্তি?" তিনি সংখ্যাগণনার মত অনামিকার মধ্যপর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখিয়া (প্রথমে) বলিলেন, "রামচন্দ্র", (দ্বিতীয়) "লক্ষ্মণ", (তৃতীয়) "পার্ব্বতী"। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যে পার্ব্বতীর কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হিমালয় পারে তিব্বতে আসিয়া সীতা যে পার্ব্বতী হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিলাম। কোদণ্ডনাথ অর্থাৎ ধনুর্ধারী রাম হইতে কোদন্নাথ বা কোজর নাথ নামের উৎপত্তি।

যে প্রতিমা আমরা এখানে দেখিয়াছিলাম উহা বৌদ্ধ-যুগের আলঙ্কারিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, অতীব চমৎকার। সে-মূর্ত্তিই সর্ব্বপ্রথমে আমার প্রাণে ভারতীয় শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আনিয়া দিল। আমি এই-খানেই আমার অন্তরে শিল্পের এক অনির্ব্বচনীয় প্রেরণা অনুভব করিলাম।

উচ্চ মঞ্চের উপর উপযুক্ত ব্যবধানে তিনটি সুবর্ণ-নির্ম্মিত শতদল পদ্মের উপর তিনটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। মধ্যের পদ্মটি বিশাল, তাহার উপর প্রায় সাড়ে চারি হাত দীর্ঘ স্বর্ণময় প্রতিমা; অপূর্ব্ব অলঙ্কার-মণ্ডিত মুকুট ও হস্তে কোদণ্ড শোভিত কোদণ্ডনাথ; বামে সীতা বা পার্ব্বতী ও দক্ষিণে লক্ষ্মণের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সুবর্ণময় মূর্ত্তিদ্বয়, তাহাতেও ঐরূপ অলঙ্কারশোভিত মুকুট। এই সুবর্ণময় প্রতিমাত্রয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখিলাম তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। মূল বেদীর সম্মুখে, দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত কাষ্ঠাধারে নীচে হইতে স্তরে স্তরে আলোকমালা সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার পরেই যাতায়াতের পথ, পরে সারি সারি লামাগণের গদিপাতা বসিবার আসন। দুইজন লামা সর্ব্বক্ষণ মন্দিরে থাকেন। রাত্রে সন্ধ্যারতির পর দ্বার বন্ধ করিয়া যে যার স্থানে চলিয়া যান।

এ তীর্থে প্রায় পঞ্চাশজন লামা থাকেন। মন্দির হইতে প্রায় চার রশি দূরে সম্মুখেই দশ-বারখানি চুনকাম-করা তিব্বতীয় গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার থুলো লামা ঐখানেই থাকেন। অন্যান্য লামারাও সেইখানে কতক, কতক মন্দির-সংলগ্ন গৃহে বাস করেন। এখান হইতে দর্শন-শেষে আমরা থুলো লামার সঙ্গে দেখা করিতে যাই।

কোদন্নাথের থুলো লামা

সঙ্গী-মহাশয় তাঁহাকে একখানি সেই গীতা উপহার দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পুঁথি?" তখন কালা লোকের সঙ্গে যেভাবে উচ্চ স্বরে লোকে কথা কয় সেইরূপ উচ্চ স্বরে সঙ্গী-মহাশয় তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দীতে অনর্গল আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, ও লামাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধে তাঁহার যত অভিজ্ঞতা সব বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার ও ভাষা শুনিয়া থুলো লামা-মহাশয় কেবল ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেই লাগিলেন। ক্লান্ত হইয়া বক্তা যখন থামিলেন তখন আমাদের চা, ছাতু, ঘোল প্রভৃতি দিয়া অভ্যর্থনা হইল, পরে সহকারী একজন লামা আমাদের জন্য অতি সুন্দর মিহি চাউল একটি প্রকাণ্ড তামার পাত্রে, তুলার কাগজে কতকটা মাখন ও একটু নুন আনিয়া দিয়া, নীচে পরিচারকগণের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট এক গুহা দেখাইয়া আমাদের রন্ধন ভোজন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। নিকটেই জলের ধারা ছিল। একপ্রকার সুগন্ধি তৃণ এদিকে জন্মায় তাহা সংগ্রহ করিয়া

মঠের বা গৃহস্থের ঘরের ছাদে শুকাইয়া রাখা হয়। তাহাই সময়ে ইন্ধনের কাজ করে। নচেৎ শুষ্ক গোময় প্রভৃতিই তিব্বতের সাধারণ ইন্ধন। এক বৃদ্ধা এক বাজরা ঐরূপ শুষ্ক তৃণ দিয়া আমাদের রন্ধনের জন্য ইঙ্গিত করিয়া গেল।

অপরাহ্নে আমি একবার বাহির হইলাম। উদ্দেশ্য কোদণ্ডনাথের মূর্ত্তি পেন্সিলে আঁকিয়া আমার পুস্তকজাত করা। এ'বার বুঝিলাম, আলমোড়ায় লালা অস্তিরাম সা কেন আঁকিবার সরঞ্জাম এখানে আনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

সিংহদ্বার ছাড়াইয়া অঙ্গনে আসিয়া দেখিলাম ব্রহ্মচারী লামাগণ ছুটাছুটি করিতেছে, পাশের একখানি দ্বিতল গৃহের জানালা হইতে একটি বয়স্থা ভোটীয়া নারী মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। হিন্দীতে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কথা কহিলেন এবং আলাপ করিলেন। আমাদের দেশে যেমন কাশীতে, বৃন্দাবনে কিংবা পুরীতে অনেক বিধবা তীর্থবাস করে ইনিও সেইরূপ তীর্থবাসিনী। ভোটীয়া পরগণার অন্তর্গত দারমায় তাঁর নিবাস, অনাথা বিধবা, এখন এইখানে থাকেন এবং এইখানেই জীবনপাত করিবেন। দেখিলাম গার্হস্থ্য স্ত্রী-জীবনেও ধর্ম্মের প্রভাব এদিকে আমাদের দেশ অপেক্ষা কম নয়। যাহা হউক আলাপ-পরিচয়-শেষে আমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কাজের চেষ্টা করিলাম।

দ্বার হইতেই সম্মুখে যেরূপ দেখা যায় আমি ঐ ত্রিমূর্ত্তির রূপ-রেখা পুস্তকে আঁকিতে আরম্ভ করিলাম। দুই একজন যুবক লামা আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। পরে একজন আমার নিকট পেন্সিলটি চাহিয়া লইয়া আমার খাতার উপর যথেচ্ছ আঁক পাড়িতে লাগিলেন। বিরক্ত হইয়া আমি তাহার হাত হইতে পেন্সিল লইয়া পুনরায় নিজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। অল্পক্ষণ কাজ করিবার পর গুণ্ডার মত কঠোরমূর্ত্তি একজন লামা আসিয়া আমার হাত হইতে পুনরায় পেন্সিল কাড়িয়া আমায় বাহিরে যাইতে বলিলেন। তাহাতে আর আর সকলে পৈশাচিক হাসি হাসিতে লাগিল।

আমি এই সব লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম এবং পেন্সিলটি চাহিলাম, সে দিল না। তখন সেখানে সেই ভোটীয়া স্ত্রীলোকটি পুনরায় জানলায় মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" তাহাকে সকল ব্যাপার বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "আপনি এখানে কিছু আঁকিবার চেষ্টা করিবেন না। ইহারা অসভ্য হিংস্র পশু-বিশেষ, ওসব কিছু বুঝে না।" পরে তাহাদের দিকে ফিরিয়া সতেজে তিব্বতী ভাষায় কত কি বলিতে লাগিল। ক্রমে দেখিলাম তাহাতে ও লামাতে কড়া কড়া কথা হইতে লাগিল। হইতে হইতে শেষে লামা সাহেব উত্তেজিত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে আমার পেন্সিলটি সজোরে একদিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া উহা কুড়াইয়া লইলাম, দেখিলাম ফাটিয়া দুইটি হইয়া গিয়াছে, শিস্ ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছেই। উহাদের ব্যবহারে আমার ভয় হইল, পাছে ছুরি-ছোরাই বা বসাইয়া দেয়।

চলিয়া আসিবার কথা ভাবিতেছি, সেই স্ত্রীলোকটি হিন্দীতে বলিল, "আপনি এখনই এখান হইতে চলিয়া যান, দেরী করিবেন না, এখানে থাকিলে ইহারা আপনার অনিষ্ট করিতে পারে।" আমি তাহাই করিতে সঙ্কল্প করিলাম। ফিরিতেছি তখন সেই বলবান লামাটি সম্মুখে আসিয়া সজোরে আমার হাত হইতে খাতাখানি ছিনাইয়া লইল এবং তাহার মধ্য হইতে কোদণ্ডনাথের নক্সা যে পাতায় আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই পাতাখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং খাতাখানি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আমি তখন বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্মৃতি হইতে যথাসম্ভব মূর্ত্তি তিনটি পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলাম। কাহাকেও কিছু বলিলাম না বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে প্রাণের মধ্যে একটা ঘা পাইলাম।

যাহা হউক সেই রাত্রি সেখানে কাটাইয়া আমরা পরদিন তাকলাখারে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম রমা ও তাহার ভগিনীগণ আসিয়াছে, লালসিং পাতিয়াল ও আর আর আমাদের পথের দয়াময় বন্ধুগণ আসিয়াছেন, যাঁহাদের কৃপায় ও যত্নে আমাদের তিব্বতের কৈলাস ও মানস সরোবর-যাত্রা সুখেই সম্ভব হইয়াছিল।

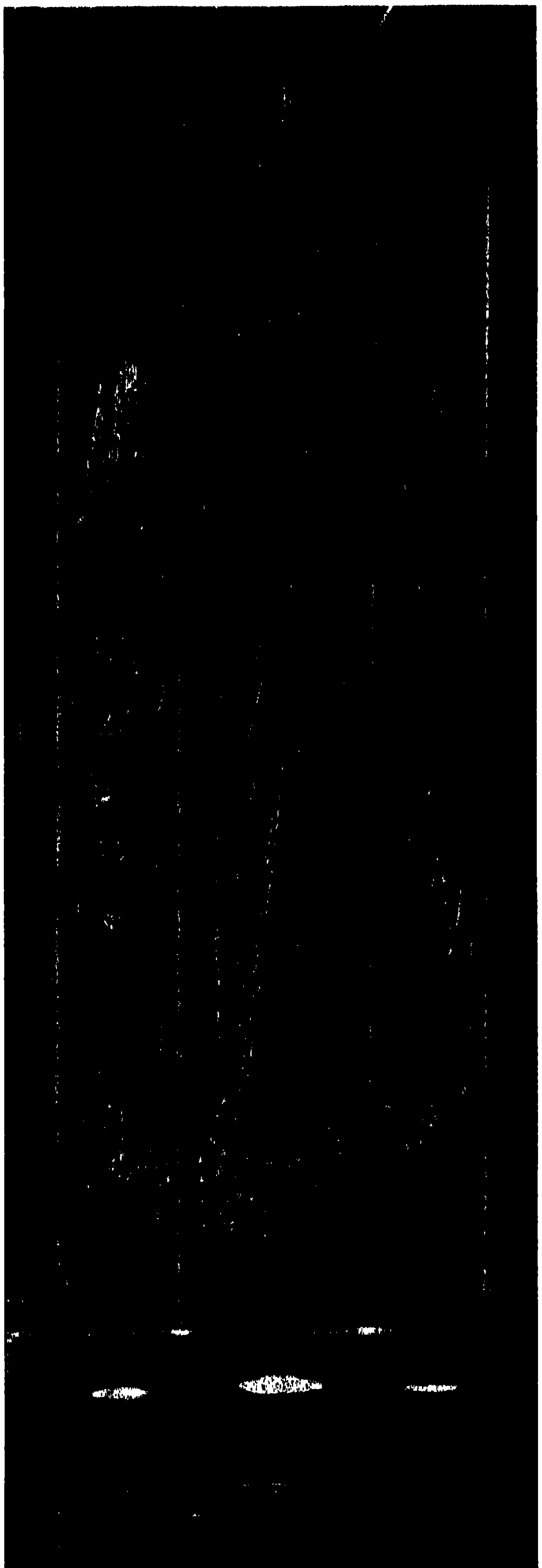

কোদণ্ডনাথ

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৭)

বর্ষাকালের দুপুর বেলা। ইহারই মধ্যে গ্রামের উপর যেন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। পথঘাট একরকম জনশূন্য, নিতান্ত প্রয়োজন না থাকিলে এক হাঁটু কাদা ভাঙিতে কেহ ঘরের বাহিরে আসিতেছে না।

কিন্তু বর্ষাই হউক, আর বাদলই হউক, ঘরের কাজ না করিয়া মানুষের উপায় নাই। গ্রামের ঘরে ঘরে কলের জল বা গ্যাসের চুলা নাই, বিজলীর বাতিরও অভাব। কাজেই ভিজা গামছা মাথায় দিয়া পুকুর হইতে জল আনা, উঠান হইতে কাঠ চেলা করিয়া আনা, এ সব পল্লীবাসিনীদের করিতেই হয়। ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামিবার আগে বাহিরের কাজ যথাসাধ্য সকলে সারিয়া রাখে, যাহাদের কপাল মন্দ তাহাদের জলে ভিজিয়া, কাদা ঘাঁটিয়া হয়রান হইতে হয়।

পথিকহীন পথ দিয়া, একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে পুকুরের দিকে চলিয়াছিল। পরণে একখানা লালপেড়ে মোটা শাড়ী, হাতে দু-গাছি সোনার রুলি, কানে এক জোড়া ইহুদি মাকড়ী। ইহাতেই তাহার যেন রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার রংটা খুবই ফরসা, তবে পাড়াগাঁয়ের জলের কল্যাণে একটু যেন ম্লান। মুখ এক রকম নিঁখুৎ বলিলেই হয়, কেবল নাকের গঠনে কিছু ত্রুটি আছে। উহা ঠিক বাঁশীর মত নয়। কিছু চাপা, তবে সুগঠিত বটে। পিঠে এক ঢাল চুল, কটীদেশ ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় চুল বোধ হয় হাতখোঁপা করিয়া জড়ানো ছিল, চলিতে চলিতে খুলিয়া গিয়াছে। এখন আর জড়াইবার উপায় নাই, কক্ষের পিতলের কলসীটি সামলাইতেই সে ব্যস্ত, চুল জড়াইবে কি করিয়া? তাহার উপর কাদার ভিতর দিয়া চলিতেও সে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

যাহা হউক, কোনোমতে সে পুকুরের ঘাটে আসিয়া পৌছিল। বৃষ্টির জলে পুকুর একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, দুই একটি সিঁড়ি মাত্র জলের উপর জাগিয়া আছে। ঘাটও জনশূন্য বলিলেই হয়, কেবল একজন বর্ষিয়সী স্নান করিতেছেন। বালিকা আসিয়া সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া ইতস্তত: করিতে লাগিল।

বর্ষীয়সী তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, মায়া নাকি রে? এমন সময় একলা ঘাটে এসেছিস্? ভয়ানক জল আস্‌ছে যে রে।"

মায়া মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "কি করব কায়েৎ দিদি। মায়ের আজ জর বেশী, কিছুতেই উঠ্‌তে পারল না। পিসিমার একাদশী, সে শুয়ে পড়ে আছে। ঘরে একটুও খাবার জল নেই, তাই আমি এলাম।"

বৃদ্ধা বলিল, "যত সব অনাছিষ্টি! একদিন চাকরে জল নিয়ে গেলে কি হত? এমন সময় মেয়েটাকে একলা পাঠিয়েছে ঘাটে। বিপদ-আপদের ভয় নেই।"

মায়া বলিল, "পিসিমা তাই বলেছিল, তা মা বল্‌লে গদা জল আন্‌লে সে খাবে না। তোমার হয়েছে কায়েৎ দিদি?"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি জল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "নে বাছা, নে। আমি দাঁড়াচ্ছি একটু। খানিকটা তোকে এগিয়ে দিয়ে যাব। তোর মায়ের এমন আক্কেল না হলে, এমন কপাল হবে কেন? এই ত সেদিন আমার লোচন লিখেছে, তোর বাপ এখন টাকার ছালার ওপর বসে আছে। স্বামীর কাছে থাক্‌লে এতদিন রাণীর হালে থাকৃত, তা নয় দশা দেখ না। হ্যাঁ রে, তোদের কাছে টাকাকড়ি আসে?"

বাপ-মায়ের আলোচনা উঠিলে মহামায়া সর্ব্বদাই চুপ হইয়া যাইত। আর সকলের মা বাবা হইতে তাহার

মা বাবা যে বেশ কিছু অন্তরকম, তাহা সে অল্প বয়সেই বুঝিতে শিখিয়াছিল। মা এবং পিসিমা বাবার কথা কেহ পাড়িলেই চুপ করিয়া যায়, ইহাই সে শৈশব হইতে দেখিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহারও এই প্রকার অভ্যাস হইয়াছিল। বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তরে, "হ্যাঁ প্রতি মাসেই আসে," বলিয়া সে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া পড়িল। বর্ষীয়সী উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়ে শীতে কাঁপিতে লাগিলেন।

মায়া আবার ডুব দিতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ওমা, ক'বার চান করবি লো, এই না সকালে একবার ডুব দিয়ে গেলি ?"

মায়া বলিল, "মায়ের খাবার জল নিচ্ছি তাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মাগো মা, বিধবার বাড়া আচার হয়েছে তোর। তোর মা সত্যিই ক্ষেপেছে দেখ্‌ছি; নে বাছা, শিগ্‌গির করে সার্, শীতে আর দাঁড়াতে পারি না।"

মায়া তাড়াতাড়ি কলসী মাজিয়া জল লইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর সিক্ত বস্ত্রেই বৃদ্ধার সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। ঝোড়ো হাওয়া হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, পথের পাশের গাছপালা থাকিয়া থাকিয়া যেন এই নিষ্ঠুর আঘাতে তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি তবে যাই, তুই পা চালিয়ে চলে যা, ঝড়বৃষ্টি আসছে।"

মহামায়া যত জোরে চলিতেছিল তাহার চেয়ে জোরে চলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। একে পূর্ণ কলসের ভারেই সে নুইয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর সিক্ত বস্ত্র পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতেছে, পথ কাদায় ভরা। তবু যথাসাধ্য জোরে সে চলিতে লাগিল, বৃষ্টি আসিয়া পড়িবার ভয়ে। পথে আর লোক নাই, কেবল বাতাসের শব্দ আর থাকিয়া থাকিয়া মেঘের গর্জ্জন।

হঠাৎ পথে আর একটি পথিকের আবির্ভাব হইল। একটি কুড়ি একুশ বছরের যুবক একটা বাড়ীর সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার পা খালি, কাপড় মালকোঁচা মারিয়া পরা, হাতে একটা ছাতা। বাহির হইয়াই সে মায়াকে দেখিতে পাইল। দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "একি মায়া? এমন সময় বেরিয়েছ একলা? বাপ্, এতবড় কলসী, এটা তোমার চেয়ে ভারি বোধ হয়। কে তোমায় পাঠিয়েছে? দাও, কলসী দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

যুবক আর একটু হইলেই কলসী ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! মায়া তাড়াতাড়ি পিছন হটিয়া গিয়া বলিল, "না, প্রভাস-দা, ছোঁবেন না, আমি মায়ের জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছি।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "তা হলেই বা। আমি ত মুচীও নই, মুদ্দফরাশও নই যে, আমার ছোঁয়া জল তোমার মা খেতে পারবেন না।"

মায়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না তা কেন। তবে ডুব না দিয়ে জল আন্‌লে, সে জল তিনি খেতে চান না।"

প্রভাস বলিল, "আকাশ থেকেই ত এখনি স্নান করাবার ব্যবস্থা হবে, কাজেই আমাকে দিলে ক্ষতি নেই। একেই ত চল্‌তে পারছ না, এর ওপর বৃষ্টি এলে আছাড় খেয়ে মরবে।"

মায়া ভীতকণ্ঠে বলিল, "না প্রভাস-দা, মা জান্‌তে পারলে ভয়ানক বক্‌বে, এক ফোঁটা জল খাবে না। আমিই নিয়ে যাই, আর বেশী দূর নয় ত।"

যুবক বলিল, "বৃষ্টিও আর বেশী দূরে নয়। আচ্ছা চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বলিতে বলিতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। যুবক তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া মায়ার মাথার উপর ধরিয়া বলিল, "যতটা পার তাড়াতাড়ি চল। তাই বলে আছাড় খেয়োনা যেন।"

মায়া বলিল, "কিন্তু আপনি যে ভিজে যাচ্ছেন?"

প্রভাস বলিল, "আমি ভিজ্‌লে কিছু এসে যাবে না। আমি একটু ভিজ্‌বার জন্যেই বেরিয়েছিলাম।"

মায়াদের বাড়ী আর বেশী দূরে ছিল না। তাহারা শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিল। প্রভাস বলিল, "গিয়ে শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে ফেল। চুলগুলোও একেবারে ভিজে গেছে। শুকতে একদিন লাগ্‌বে বোধ হয়। তোমরা মেমদের মত চুল 'বব্' কি 'শিঙ্গল্' করে ফেলনা কেন? তাহলে একটা আপদ অন্ততঃ কমে যায়।"

মায়া বলিল, "আমরা ত মেম্ নই, হিন্দুর মেয়ে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, তা যা হও, এখন ঘরে ঢুকে পড়, আর ভিজ না।" বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

মায়া প্রথম রান্নাঘরে ঢুকিয়া জলের কলসী নামাইয়া রাখিল। তাহার পর পায়ের কাছে শাড়ীর অংশটার জল খানিক নিংড়াইয়া ফেলিয়া এবং পায়ের কাদা ধুইয়া শোবার ঘরে চলিল।

বাড়ীখানির চেহারা পূর্ব্বের মতই আছে প্রায়, তবে বাড়ী এখন নীরব, নির্জ্জন। নিরঞ্জনের ভাইরা সকলেই এখন সহরে বাসা বাঁধিয়াছে, ছোটটি আইন পড়ে, অন্যটি কাজ করে। গ্রামের বাড়ীতে কেবল তিনটি রমণী—ইন্দু, সাবিত্রী আর বালিকা মায়া। ঘরের কাজ নিজেরাই সারিয়া লয়, বাহিরের কাজের জন্য ভৃত্য গদাধর আছে। সে ভাল জাতের হইলেও ঘরের কোনো কাজে প্রয়োজন হইলেও সাহায্য করিতে পারে না। সাবিত্রী আচার-নিষ্ঠায় এখন বিধবা ইন্দুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে তাহার নাম বিখ্যাত। কন্যা মহামায়াকেও সে সম্পূর্ণ নিজের মতে মানুষ করিতেছে, পান হইতে চূণ খসিলে বালিকার লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না। ইন্দু মাঝে মাঝে আপত্তি করে, তাহাতে ননদ-ভাজে এক পালা তর্কবিতর্ক ভিন্ন আর কোনো লাভ হয় না। নিরঞ্জন মাসে মাসে বেশ দরাজ হাতে টাকা পাঠায়, এবং ইন্দুকে এক একখানা পোষ্টকার্ড লেখে। বাড়ীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ঐ পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম মায়ার কাছেও লিখিত, কিন্তু মায়া চিঠির উত্তর দিতে না পারায়, এখন আর তাহার কাছে চিঠি আসে না।

ঘরের ভিতর বিছানায় সাবিত্রী শুইয়াছিল। তাহার আর পূর্ব্বের সে চেহারা নাই। শরীর শীর্ণ, গায়ের রং মলিন হইয়া গিয়াছে। মুখের ভাব কোনো কালেই বিশেষ কোমল ছিল না, এখন অত্যন্তই রুক্ষ দেখায়। হাতে দু-গাছি শাঁখা ভিন্ন কোনো অলঙ্কার নাই, পরণে মহামায়ার মতই একখানা মোটা লালপেড়ে শাড়ী।

মায়া ঘরে ঢুকিতেই সাবিত্রী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁরে, বুড়ো ধেড়ে ত হয়েছিস, তোর আক্কেল হবে কবে?"

বালিকা ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

সাবিত্রী মেয়েকে ভ্যাঙাইয়া বলিল, "কেন মা? মেমসাহেব হয়েছেন, অন্য একজন ছাতা ধরবে, তবে উনি হেঁটে আস্‌বেন! তোর লজ্জা করে না মুখপুড়ী! প্রভাসের সঙ্গে কি বলে এলি? এই নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে ত তোর পিঠের চামড়া আস্ত রাখ্‌ব না।"

মায়া কিছু উত্তর দিবার আগেই ইন্দু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, "না'ও, না'ও, চেঁচিয়ে আরো জর দু ডিগ্রী বাড়াতে হবে না। একেই ত আজ ১০৩ ডিগ্রী ছাড়িয়ে গেছে। মেয়েকে শাসন পরে করলেও চলবে, এখন মুখে দাও কিছু। ওষুধ খাবার সময় হল, মায়া। আগে কাপড়টা ছাড়, ভিজে চুপ চুপ করছে। চুলগুলো মোছ ভাল করে।"

মায়া পিসিমার আজ্ঞা পালন করিল। তাহার পর খল নুড়ী, কবিরাজের বড়ি, অনুপান প্রভৃতি লইয়া সাবিত্রীর ওষুধ তৈয়ারী করিতে বসিল। মাস-চারপাঁচ হইতে সাবিত্রী অসুখে ভুগিতেছে। তাহার জর ছাড়ে না, কোনোপ্রকার খাদ্যই প্রায় হজম হয় না। কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য মনোরঞ্জন, তাহার স্ত্রী, সকলেই লিখিতেছে, কিন্তু সাবিত্রী একেবারেই নারাজ। কবিরাজের চিকিৎসাই চলিতেছে। মাঝে একটু উন্নতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু দিনকতক খুব ঠাণ্ডা লাগানোতে অসুখ আবার বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ওষধ প্রস্তুত করিয়া মায়ের কাছে রাখিয়া মায়া জল আনিতে গেল। ইন্দু বলিল, "অনেকদিন ত হ'য়ে গেল, এখন একবার চিকিৎসা বদলে দেখ্‌লে ভাল। বড়দা, বৌ সবাই এতবার করে লিখ্‌ছে, না হয় একবার কলকাতাই চল? তাদের বাড়ী না থাকতে চাও, আলাদা বাসা ভাড়া করে থাক্‌লেই হবে। টাকার ত অভাব নেই?"

সাবিত্রী বলিল, "টাকা আছে বলে কি জলে ফেলে দিতে হবে নাকি? টাকার কাজও ঢের আছে। মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে না?"

ইন্দু বলিল, "নাড়তে চাড়তে ত ঐ এক মেয়ে। তাকে এখুনি বিদায় না করলে ঘুম হচ্ছে না বুঝি?

আর তার বিয়ের জন্যে তোমার অত ভাবনা কেন? না খেয়ে, না পরে, একশ'র মধ্যে আশীটাকা যে জমাচ্ছ, তাই দিয়েই সব কাজ উদ্ধার হবে? মেজদার ত মায়া বই সন্তান নেই, টাকা হয়েছে এক কাঁড়ি, মেয়ের বিয়ের ভাবনা সেই ভাব্‌বে। তুমি এখন নিজের প্রাণটা একটু দেখ।"

সাবিত্রী বলিল, "এতদিন যদি মেয়ের সব ভাবনা ভাব্‌তে পেরে থাকি, তার বিয়ের ভাবনাটাও ভাবতে পারব। তোমার ভাইয়ের টাকায় আমার বাবুগিরি করবার মতি যেন কোনোদিন না আসে। শাশুড়ী বিয়ে দিয়ে এনেছিলেন, তাঁকে কথা দিয়েছিলাম তাই এ ভিটে আগ্‌লে পড়ে আছি, না হ'লে কবে নিজের পথ দেখ্‌তাম। ওর টাকার থেকে কখনও এক পয়সা নিজের জন্যে খরচ করিনি, যা খরচ মায়ার জন্যেই হয়েছে। মরবার আগে ওর বিয়ে আমি দিয়ে যাব। না হলে বাপ যে ওর হাড়ি কি মুচি ধরে বিয়ে দেবে না, তার স্থিরতা নেই।"

ইন্দুরও মেজাজ কিছু গরম হইয়া উঠিল, তবে সাবিত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে আর কথা বাড়াইল না। এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া সাবিত্রী হাঁপাইতেছিল। উত্তেজনায় তাহার রক্তহীন মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। মায়া এই সময় জল লইয়া ফিরিয়া আসায় তর্কটা থামিয়াই গেল। ইন্দুরও শরীর ভাল ছিল না, সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া আবার চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

মাকে ঔষধ পথ্য দিয়া মায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, কাজেই সে অন্য একটা ঘরে গিয়া আশ্রয় রইল। বাড়ীতে ঘরের অভাব নাই এখন মানুষেরই অভাব। যদিও সাবিত্রীর কাছেই মায়াকে বেশীর ভাগ সময় থাকিতে হইত, তবু নিজের জন্য সে একটি ঘর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। কাপড়ের বাক্স একটি, বইয়ের তাক্ একটি, আর শুইবার জন্য তক্তপোষ একটি। রাত্রে অবশ্য এ ঘরে সে শুইত না, ইন্দুর সঙ্গে শুইত। অসুখ হওয়ার পর হইতে সাবিত্রী আর মেয়েকে নিজের কাছে রাখিত না। বইগুলির মধ্যে কয়েকখানি মহামায়ার পড়ার বই, বাকি কয়েকটা পুরাতন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি। সংস্কৃত, বাংলা দুই রকমই আছে। ইংরেজী বইয়ের চিহ্নও নাই। বাংলা, নাটক নভেলও নাই, কবিতার বই দু-একখানা, জীবন-চরিত, ইতিহাস প্রভৃতি আছে। সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মায়া কিছু পড়ে না, এই কয়েকখানা বই মাত্র তাহার পড়িবার সুবিধা হইয়াছে।

কাপড়ের বাক্সে সর্ব্বদা পরিবার কাপড়-চোপড়, দু-একটা ভাল কাপড় জামা, দুইটা গরম জামা। এ সকলের নীচে তাহার ছেলেবেলাকার খেল্‌না, জামা দু-চারটা সাজানো আছে। সবার নীচে লুকানো আছে নিরঞ্জনের একটি ছবি, এবং তাহার গুটিকয়েক চিঠি। এ গুলিকে মায়ের চোখ হইতে সে সযত্নে লুকাইয়া রাখে। মাতা এবং পিতার মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক নাই, তাহা সে শৈশব হইতেই জানে। ছবিখানি ইন্দুর নিকট হইতে অনেক সাধ্যসাধনায় সে চাহিয়া লইয়াছে। চিঠিগুলি তাহার নিজেরই সম্পত্তি।

(৮)

প্রভাস এই গ্রামেরই ছেলে। তাহার পিতা দূরদেশে কাজ করিতেন। পরিবারাদি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গিয়া থাকিত, বেশীর ভাগ সময় গ্রামেই থাকিত। প্রভাস গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষা দিয়া ছুটিটা সে গ্রামে কাটাইতেছে। পাশ হইলে কলিকাতায় গিয়া মেডিক্যাল কলেজে, নয়ত ল কলেজে ভর্ত্তি হইবে।

সাবিত্রীর প্রথম হইতেই এ ছেলেটিকে খুব পছন্দ। অপরূপ রূপবান না হইলেও দেখিতে শুনিতে মোটের উপর ভালই। তা পুরুষ মানুষের রূপের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই। পড়াশুনায় ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য চমৎকার। সব চেয়ে ভাল কথা এই যে, ছেলেটির সাহেবী ধরণ মোটেই নাই। নিষ্ঠাবতী স্ত্রীর হাতে পড়িলে সনাতন ধর্ম্মের গণ্ডী সে মানিয়া চলিবে। গ্রামেরই ছেলে, তাহার পরিবার-পরিজন, কুলশীল সবই জানা। ইহাকেই সাবিত্রী মনে মনে মহামায়ার পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কথা অবশ্য এখনও পাড়ে নাই। মেয়ের বিবাহ সে

আপন মতেই দিবে স্থির করিয়াছিল, নিরঞ্জনকে আগে কিছু জানাইবে না ইহাও একরকম স্থির ছিল। কিন্তু জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা শক্ত। শ্বশুর-গোষ্ঠীর ভিতরে থাকিয়া স্বামীর অজ্ঞাতে এবং অমতে কিছু করিয়া তোলা শক্ত। এইজন্য এতদিন সাবিত্রী মনের কথা মনেই রাখিয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় রোগে পড়াতে সব ব্যবস্থা উলটপালট হইয়া গেল।

প্রভাস ছেলেটি যেরকম, তাহাতে তাহাকে জামাইরূপে পাইলে যে-কোনো হিন্দু কন্যার পিতা কৃতার্থ বোধ করিত। কিন্তু নিরঞ্জনের কথা স্বতন্ত্র। সে ত আজকাল ঘোরতর সাহেব হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া শোনা যায়, টাকা করিয়াছে লাখ লাখ। অত দূরদেশ, তায় আবার ব্রহ্মদেশ, স্বভাব-চরিত্র কি আর ঠিক রাখিতে পারিয়াছে? মেয়েকে লইয়া যাইবার কথা থাকিয়া থাকিয়া তোলে, আবার কি মনে করিয়া চুপ করিয়া যায়, তাহা সেই জানে। একবার বিবাহ দিয়া ফেলিতে পারিলে নিশ্চিন্ত, তাহার পর আর কাহারও জারিজুরি চলিবে না। না হইলে মায়ার অদৃষ্টে দুঃখ আছে। বিধর্ম্মী, অনাচারী পিতার হাতে পড়িলে, তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম সব চুলায় যাইবে। বারো তেরো বছরের মেয়ে কিছু জোর করিয়া নিজের মতে চলিতে পারিবে না। তাহার পর কোনো এক বিলাত-ফেরৎ মাতাল ব্যারিষ্টারের সহিত বিবাহ হইয়া তাহার জীবনটা একেবারে মাটি হইবে।

সাবিত্রী স্থির করিয়াছিল, গোপনে প্রভাসের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া মেয়ে লইয়া সে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। সেইখানে বিবাহ হইয়া গেলে পর, স্বামীকে এবং শ্বশুর-বাড়ীর সকলকে খবর দিবে। স্বামী অবশ্য খুবই রাগ করিবে, কিন্তু তখন তাহার রাগে আসিয়া যাইবে কি? পত্নীকে ত সে ত্যাগ করিয়াই রাখিয়াছে, না হয় খোরাকীও বন্ধ করিবে। তা করুক, মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে, এক মুঠা ভাতের জন্য তাহার আটকাইবে না। বাপের বাড়ীতে গিয়া পড়িলে, তাহারা কিছু দূর করিয়া দিবে না।

এখন ছেলের বাপ রাজী হইলে হয়। মেয়ে অবশ্য খুবই সুন্দরী, পাড়াগাঁয়ে এ রকম মেয়ে সচরাচর দেখাই যায় না। সাবিত্রীর নিজের গহনাগাঁটি যাহা আছে, সব সে মেয়েকেই দিবে, এতকাল ধরিয়া টাকা জমাইয়া, সে হাজার-পাঁচ টাকা করিয়াছে, তাহাও দিবে। কিন্তু বাপের অমতে বিবাহ, ইহাতে গোলমাল আছে, সেই ভয়ে যদি পিছাইয়া যায়। নিরঞ্জনের টাকার খ্যাতি এখন দেশবিখ্যাত, সে লোভও থাকিতে পারে। কিন্তু নিরঞ্জন যে কোনোমতেই এ পাত্রের সহিত বিবাহে রাজী হইবে না, তাহা উহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত হইবে না। আজকাল বি-এ পাশ পাত্রে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, পাঁচ হাজার টাকা, সুন্দরী বড় ঘরের পাত্রী, এবং তিন হাজার টাকার গহনা সকলের অদৃষ্টেই জোটে না। এইসব ভাবিয়া তাহারা রাজী হইলেও হইতে পারে।

কিন্তু সাবিত্রীর রোগ সারিবার কোনোই লক্ষণ দেখাইতেছিল না। বরং দিনের দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তিন চার দিন হইল সে উত্থানশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবনাও শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। মেয়ের বিবাহ না দিয়া যাইতে পারিলে সর্ব্বনাশ। আর এক বিপদের সম্ভাবনায় সে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। অসুখে পড়িবার সময় সে ইন্দুকে অনেক করিয়া মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়াছিল যেন নিরঞ্জনকে তাহার অসুখের খবর না দেওয়া হয়। কিন্তু অসুখ যে প্রকার বাড়িয়া চলিয়াছে, ইন্দু ইহার পর তাহার কথা নাও রাখিতে পারে। আর সে রাখিলেও, কলিকাতার আত্মীয়গণ দয়া করিয়া খবর দিতে পারেন। নিরঞ্জন একবার যদি দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কন্যার বিবাহ দিবার আর কোনোই উপায় থাকিবে না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়িয়া যাইতেছিল। ধাক্কা সামলাইতে হইত বেচারী মায়াকে এবং খানিক পরিমাণে ইন্দুকেও।

আজ মায়াকে প্রভাসের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া সাবিত্রী কর্ত্তব্যের খাতিরে কন্যাকে গালি দিল বটে, কিন্তু মনে মনে একটু খুসিও হইল। প্রভাসের হয়ত মায়ার প্রতি মনটা পড়িয়া যাইতেও পারে; তাহা হইলে সাবিত্রীর

কাজ ঢের সহজ হইয়া যায়। ইচ্ছা করিলেই প্রভাসকে তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে ডাকিয়া সে মায়ার সহিত তাহাকে আরো খানিকটা মেলামেশা করিতে দিতে পারিত, কিন্তু তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। যে সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে চিরকাল লড়িয়াছে, নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাহার জন্য বিসর্জ্জন দিল, একটুখানি সুবিধা পাইবার আশায় তাহারই শরণ লইতে পারিবে না। সে নিজে প্রস্তাব করিয়া দেখিবে, প্রভাসকে যথাসাধ্য অনুরোধ করিবে, তাহার পিতামাতাকে অর্থের লোভ দেখাইবে তাহার পর যাহা হয় হইবে।

আর দেরি করিতে তাহার ভরসা হইতেছিল না। যেরকম তাহার শরীরের দশা, কখন কি হয় বলা যায় না। ঔষধপথ্যাদি খাইয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর ডাকিল, "মায়া, শুনে যা।"

মায়া তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই মা?"

সাবিত্রী বলিল, "দেখে আয়ত তোর পিসিমা কি কর্‌ছে।"

মায়া ইন্দুর ঘরের কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আস্তে আস্তে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পিসিমা ঘুমচ্ছে।"

সাবিত্রী বলিল, "আচ্ছা, একবার গদাকে ডেকে দে, দিয়ে তুই নিজের ঘরে যা।" মায়া কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া চলিয়া গেল।

গদা ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রী বলিল, "দেখ গদা, একবার মুখুজ্জেদের ওখানে গিয়ে প্রভাসের মাকে ডেকে আন ত। বল, মায়ের বড় অসুখ উঠ্‌তে পারে না, আপনি একবার যদি আসেন।"

গদাধর প্রস্থান করিল। সাবিত্রী মনে মনে গুছাইয়া ঠিক করিতে লাগিল, কেমন করিয়া কথা পাড়িবে, কি কি যুক্তি দিবে, কি লোভ দেখাইবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গদার সঙ্গে একটি স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রীর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "রোজই আবব আসব করি, যে বর্ষা, ঘর থেকে বের হওয়াই দায়। আজ কেমন আছ?"

সাবিত্রী বলিল, "আর কেমন! ভাল থাকার দিন পার হ'য়ে গেছে, এখন কাজ চুকিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "ষাট, ও কি কথা? তোমার কি যাবার বয়স, না যাবার অবস্থা? কদিনেই সেরে উঠবে। ভাল করে চিকিচ্ছে হচ্ছে না কি না, তাই দেরি হচ্ছে।"

সাবিত্রী বলিল, "সে যাই হোক বোন, এখন অন্য কথা আছে। মরা-বাঁচা ও ভগবানের হাত, কিন্তু নিজের কাজ সেরে নিতে চাই। আমার ত ঐ এক মেয়ে, তাকে রোজই দেখ্‌ছ। চেহারা স্বভাব-চরিত্র কিছুই তোমাদের অজানা নেই। আমাদের কুলশীল বংশ সবই জান। তোমার ছেলেটিকেও আমি ছোট-বেলা থেকে দেখ্‌ছি। ওকে যদি আমায় দাও, তাহলে আমি দায়মুক্ত হই।"

প্রভাসের মা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ওমা, তোমার মেয়েকে পাওয়া ত ভাগ্যের কথা বোন। কোনোদিকেই ত খুঁৎ নেই। বাছার যেমন রূপ তেমন গুণ। আমিই কথা পাড়ব পাড়ব কর্‌ছিলাম, তবে মায়ার বাপ এখানে নেই, তোমাদের টাকাকড়িও ঢের, হয়ত বড় লোকের ছেলে চাইবে, বলে আর ভরসা করে কিছু বলিনি। তা তোমরা যদি রাজী হও, ত আমাদের দিকের কিছু আপত্তি নেই। কর্ত্তাকে বললে তিনি এখুনি রাজী হবেন। ছেলে আমাদের বড় বাধ্য, আমরা যা বল্‌ব তাতে কখনও অমত করবে না। আর অমত করবার আছেই বা কি? মায়ার মত মেয়ে কি আর পথেঘাটে পাওয়া যায়?"

সাবিত্রী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি ভালবেসে যা বল দিদি। কিন্তু এর মধ্যে একটু কথা আছে, শুনে যদি রাজী হও, তাহলেই বিয়েটা হয়। মায়ার বাপের কথা ত তোমরা সবাই জান। দু'বছর হল গেছে একবার ঘরমুখো হয়নি। টাকা পাঠায় এই পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। মেয়েকে দেখ্‌তেও তার ইচ্ছা হয় না। বর্ম্মায় থাকে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করে।

টাকা দিয়ে কি যে সে করে তা সেই জানে। এখানে থাকতেই তাতে আমাতে বনত না, তার সাহেবী-আনার জন্যে। এখন ত শুনছি পুরো সাহেব, শুওর গরু খায়। সে কি আর এখন মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে? বুড়ো ধেড়ে করে রেখে দেবে। বিয়ে দিলেও মাতাল, নাস্তিক বিলাত ফেরতের সঙ্গে দেবে। তাই তাকে না জানিয়েই আমি মেয়ের বিয়েটা দিয়ে যেতে চাই। নইলে মেয়ের অদৃষ্টে দুঃখ আছে। এখন মেয়ে দেখে, আর আমার উপর দয়া করে যদি মত দেও।"

প্রভাসের মা একেবারেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া সাবিত্রী প্রমাদ গণিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "তাই বলে মনে কোরোনা যে তোমাদের আমি ফাঁকি দেব। অন্য জায়গায় যা পেতে এখানে তার কম কিছু পাবে না। আমার তিন হাজার টাকার গহনা আছে, এই দুগাছি শাঁখা ছাড়া কিছু পরি না, পরবও না। সব মেয়েকে দেব। হাজার পাঁচ টাকা জমিয়েছি, তাও দেব। তারপর অদৃষ্টে থাকে ত বাপের সব সম্পত্তিই সে পাবে, তারই পাওনা। এখন কি বল?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "আমি একলা ত বল্‌লেই হবে না, বোন। ছেলের বাপকে লিখে দেখি, তিনি কি বলেন। এর ভিতর একটু গোলমাল রয়েছে কিনা! তিনি যা বলেন তোমায় জানাব। তোমার মেয়েকে বউ করতে আমার কিছু অসাধ নেই।"

সাবিত্রী বলিল, "আচ্ছা, তা লিখে দেখ। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি কোরো বোন, আমার ডাক আসতে আর দেরি নেই। তোমাদের কল্যাণে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

প্রভাসের মা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "না, না, সেকি কথা! সেরে উঠ্‌বে বৈকি? আমি আজ গিয়েই চিঠি লিখ্‌ব এখন।"

সাবিত্রী বলিল, "আর একটা কথা দিদি। এ কথা যেন এখন বাইরে প্রকাশ না হয়। শ্বশুরবাড়ীর এঁরা জান্‌লে সবই মাটি হবে।"

"না, আমি কাউকে বল্‌ব না," বলিয়া প্রভাসের মা প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ইন্দু উঠিয়া সাবিত্রীর জ্বর পরীক্ষা করিতে আসিল। জ্বর আরো একটু বাড়িয়াছে দেখা গেল। শঙ্কিতচিত্তে ইন্দু থার্ম্মোমিটার তুলিয়া রাখিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। সাবিত্রীর ত ভাল হইবার কোনোই লক্ষণ দেখাইতেছে না, সব দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া সে একলা মেয়েমানুষ কতদিন বসিয়া থাকিবে? নিরঞ্জনকে কিছু না জানান কি উচিত হইতেছে? হাজার হউক তাহার স্ত্রী ত বটে? এত সাংঘাতিক অসুখ শুনিলে সে কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে? কিন্তু সে যে সাবিত্রীর কাছে কথা দিয়াছে যে, কোনমতেই নিরঞ্জনকে অসুখের কথা বলিবে না? এখন কি উপায়?

মায়া ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। জলছড়া ঝাঁট আগেই সারিয়া রাখিয়াছিল। শাঁখের আওয়াজ একবার মৃদুভাবে শোনা গেল। ইন্দু তখন উঠিয়া পড়িয়া মায়াকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিল। মায়াকে বসাইয়া বলিল, "তোর মায়ের জ্বর ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে, রে।"

মায়া ভীতভাবে বলিল, "তাহলে কি হবে পিসিমা? অন্য ডাক্তার ডাক না।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, তোমার মাটি তেমনি সোজা মানুষই বটে। ডাক্তার ডাকলেই ওষুধ খাবে। কিন্তু এমন করে ত চল্‌বে না। তোর বাবার আবার একবার আসা উচিত। মানুষের প্রাণের ত কিছু ঠিকানা নেই, কখন কি হয়।"

মায়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তুমি বাবাকে আস্‌তে লেখ।"

ইন্দু বলিল, "তোকেই লিখ্‌তে হবে। আমি বউকে কথা দিয়েছি লিখ্‌ব না বলে।"

মায়া বলিল, "আমি কোনোদিন তাঁকে চিঠি লিখিনি। কি রকম করে লিখ্‌ব?"

ইন্দু বলিল, "কেমন করে আবার? শুধু খবরটা দিয়ে দে। এই বেলা লেখ, তোর মা ঘুমচ্ছে। জাগ্‌লে ত মিনিটে মিনিটে ডাক পড়বে।"

মায়া কাগজ কলম লইয়া পিসিমার ঘরে আসিয়া বসিল। কি লিখিবে সে? শ্রীচরণেষু, বাবা, লিখিয়া সে অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। একখানা কাগজ নষ্ট হইল। সাবিত্রী পাছে উঠিয়া তাহাকে ডাকে সে ভয়ও ছিল। আর একখানা কাগজ লইয়া তাড়াতাড়ি লিখিল,

শ্রীচরণেষু—

বাবা, মায়ের ভয়ানক অসুখ। ক্রমেই বাড়ছে। তুমি বাড়ী এস। আমাদের বড় ভয় করছে। তুমি আমার প্রণাম জেনো।

ইতি

সেবিকা মায়া।

খামের মধ্যে চিঠি ভরিয়া সে ইন্দুর কাছে দিয়া আসিল। ইন্দু ঠিকানা লিখিয়া ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। সাবিত্রী তখন ঘুমের মধ্যে মায়ার বিবাহের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসূর্য্যের পাহাড়—গোয়ালপাড়া

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বারো বৎসর আগে একবার গোয়ালপাড়া গিয়াছিলাম। তখন ছিল বর্ষাকাল। সেজন্য সেখানকার পাহাড়-পর্ব্বত, বন জঙ্গল দেখিবার বা জানিবার কোনও সুযোগ হয় নাই। এবার বিশেষ কোনও ঘটনা-উপলক্ষে আমায় গোয়ালপাড়া যাইতে হইয়াছিল, কাজেই দেখিবার ও জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

পৌষের দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ধুবড়ী পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে ষ্টীমার ঘাট অনেকটা দূর। ধুবড়ী সহরটি ছোট। গোয়ালপাড়া জেলার হেড্ কোয়ার্টার। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার পথটি এত ধূলিসমাচ্ছন্ন যে পথ চলিতে পায়ে এক হাঁটু ধূলি জমে। শীতের দিনে সহর হইতে নদী অনেকটা দূরে সরিয়া যায়। পূর্ব্বে ধুবড়ী হইতে গোয়ালপাড়া যাওয়া বড়ই অসুবিধাজনক ছিল। সুন্দরবন ডেস্‌পাচ ষ্টীমার ছাড়া অন্য গতি ছিল না। এখন ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়ার মধ্যে প্রত্যহ একটি ফেরী ষ্টীমার চলে, ইহাতে যাত্রীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে। বেলা আটটায় গোয়ালপাড়ার দিকে ফেরী ষ্টীমারখানি ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমার যতই চলিতে লাগিল দুই দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য ততই আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল।

একজন সহযাত্রী ধুবড়ীর একটি ঘাট দেখাইয়া বলিলেন—ইহার নাম নেতা ধোপানীর ঘাট। এই ঘাটের নাম হইতে, অর্থাৎ কি না ধোপা বুড়ী হইতেই ধুবড়ী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধুবড়ী হইতে কিছু দূর আসিলেই রাঙামাটির পাহাড় চোখে পড়ে। এই রাঙামাটির পাহাড়ের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। ১৬৬৭-১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে এই পাহাড়ের কাছে আসামের রাজা ইন্দ্রদমনের সহিত সম্রাট্ আওরংজেবের প্রেরিত মুসলমান-সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমানেরাই হার মানিয়াছিল। আসাম বুরুঞ্জি ও আলমগীরনামায় এই যুদ্ধের কথা আছে। মুসলমান রাজারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসাম আক্রমণ করেন, প্রত্যেক মুসলমান নবাব বাদশাহই তাঁহাদের সুশিক্ষিত সেনা ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবল দ্বারা প্রথমটায় কৃতকার্য্য হইলেও তাঁহাদের কেহই আসামে রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই; শেষটায় নানা কারণে, প্রধানতঃ ভৌগোলিক অনভিজ্ঞতা, জলবায়ুর ও ব্যাধি-পীড়ার উৎপীড়নে, আসাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

আওরংজেবের একজন বড় সেনাপতি মীরজুম্লা সর্ব্বশেষে আসাম আক্রমণ করেন। তিনি যখন ঢাকা

হইতে আসাম অভিযানে আসেন, তখন এই রাঙামাটিতেই তাঁহার সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন। আজও এই পাহাড়ের উপর মীরজুম্‌লার নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ্ আছে। এই মস্‌জিদ্‌টি ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মীরজুম্‌লা যে পরিখা খনন করিয়াছিলেন ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, সেই দুর্গের প্রাচীর এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। একটি ইদ্‌গাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন রাঙামাটি পাহাড় ও বনে আকীর্ণ এবং ভয়সঙ্কুল, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের আবাস-স্থান। মোগলদের সময় রাঙামাটিতে ফৌজদার থাকিতেন। রাঙামাটি পাহাড় গৌরীপুর হইতে ছয় মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। এক সময়ে রাঙামাটি বেশ সমৃদ্ধ সহর ছিল। *

রাঙামাটির পরে, ঠিক ব্রহ্মপুত্রের পারে পাহাড়ের নীচে টিনের ছাওয়া একটি মন্দিরের মত ঘর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম এই মন্দিরটি দুধনাথের শিবের মন্দির নামে পরিচিত। গৌরীপুরের রাজার ব্যয়ে ইহার সেবাকার্য্য চলিয়া থাকে। এক সময়ে আসাম অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের যোগীরা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন শৈব। দুধনাথ শিবের নাম শুনিয়া নাথ যোগীদের কথা মনে পড়িল। গোয়ালপাড়া জেলায় নাথ যোগী সম্প্রদায়ের সংখ্যাও বড় কম নহে। মার্টিন সাহেব এই দুধনাথ শিব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"দুধনাথ শিবের মন্দির একটি বিরাট প্রস্তরস্তূপ, শিবরূপে পূজিত হয়।" মার্টিন সাহেব প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলেন এখনও তাহার বড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যোগোনাথ নামেও আর একটি শিবমন্দিরের কথা জানা যায়। এ জন্যই অনুমিত হয় যে, এক সময়ে আসাম অঞ্চলে নাথ-সম্প্রদায়ের যোগীদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

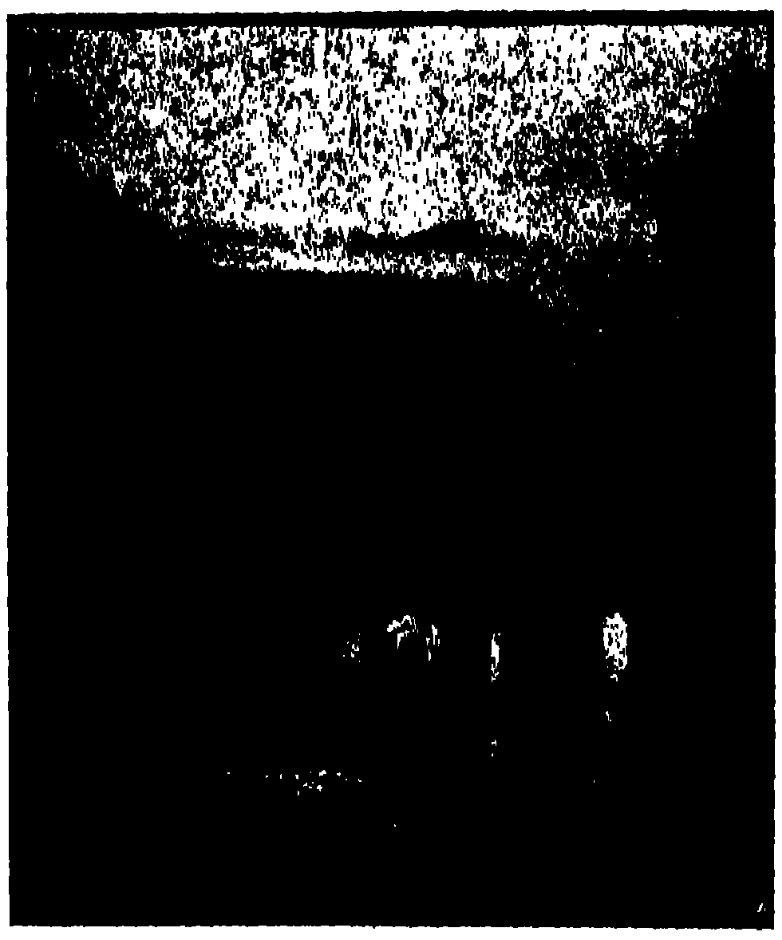

শ্রীসূর্য্যের পাহাড়

পথে কোথাও ব্রহ্মপুত্র নদ হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে, কোথাও আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুই দিকের পাহাড়ের সারি প্রহরীর মত দুই পারেই সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা যোগী ঘোপা নামক পাহাড়ের কাছে আসিলাম। এখানেও ফেরী জাহাজের একটি ষ্টেশন আছে। যোগী ঘোপা পাহাড়টি ব্রহ্মপুত্র নদের বুক হইতে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় পাথরে গড়া সবুজ শ্যামল এই পাহাড়ের বুকে অনেক ছোট বড় গোফা আছে। গোফা শব্দটি গুম্ফা শব্দেরই অপভ্রংশ। এই গোফাগুলি কৃত্রিম, মানুষের হাতে গড়া। দুই একটি ছাড়া প্রায় সকলগুলিই ছোট। কোন রকমে একজন তাপস ভিতরে বসিয়া তপস্যা করিতে পারেন। বড়গুলিতে শুনিয়াছি তিন চারিজনেরও বসিবার স্থান হয়। কিংবদন্তী এই যে অতি প্রাচীন কালে গোফাগুলির মধ্যে অনেক সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসী আসিয়া ধ্যান-ধারণা করিতেন। এই কঠিন পাহাড়ের বুক কাটিয়া যাঁহারা এমন করিয়া গোফা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

যোগী গোফার ঐতিহাসিক খ্যাতিও উল্লেখযোগ্য।

* The Mogul chief or Fauzdar took up his residence at Rangamati. In Major Rennell's time Rangamati would appear to have been a large town.* * Mogul chiefs, who occasionally visited the place, which then contained 1500 houses, among which were several inhabited by the Portuguese.** It is said that the extent from east to west was about six miles, and that in this space were included 52 markets (bazaars).** The only traces of pnblic buildings are those of a fort and mosque. Those of the former show no appearance of strength, and what is called the Nawab's palace is a mere platform of bricks.... The Mosque is small and rude. It is now ruinous, and worship is no longer performed. Beyond the town the Mogul chiefs had cleared a space of ground where probably they exercised their cavalry. It is called the *Romno*. The History, Antiquities...of Eastern India—by Montgomery Martin. vol. III, page 472. MDCCCXXXVIII.

আসামের রাজা চন্দ্রনারায়ণের সহিত যখন গোলযোগ চলিতেছিল, সে সময়ে ঢাকার নায়েব নাজিমের ভ্রাতা মীর জৈনুদ্দীন্ এই স্থানে ছাউনী করেন। এখানে আহোম রাজাদের একটি দুর্গ ছিল। মীরজুমলার আসাম অভিযানের সময়ও তিনি এই যোগী গোফায় ছাউনি করিয়াছিলেন। আসামের ইতিহাসের সহিত যোগীগোফার নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই পাহাড়ের কাছ দিয়া ব্রহ্মপুত্র একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। যোগী গোফার বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে পঞ্চরত্ন পাহাড়। পঞ্চরত্ন পাহাড়ের দুর্ভেদ্য বনানীর অন্তরালে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। গোয়ালপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেন মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একবার কোনও মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহাদের ঐ পাহাড়ে যাইতে হইয়াছিল, পাহাড়ের একটি উচ্চচূড়ে তাঁহারা দুধের মত সাদা মর্ম্মর প্রস্তরের স্তূপ দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

যোগীগোফায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভাদুড়ী নামক গোয়ালপাড়ার একজন উকীলের সহিত পরিচয় হইল। গোয়ালপাড়ায় দেখিবার কি কি আছে জিজ্ঞাসা করিতেই রমেশবাবু প্রথমেই শ্রীসূর্য্যের পাহাড়ের নাম করিলেন। তারপর ভৈরব পাহাড়, গণেশের পাহাড়, টুকরেশ্বরী ইত্যাদি অনেক পাহাড়ের নাম শুনিলাম। শ্রীসূর্য্যের পাহাড়ের নাম পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, কাজেই শ্রীসূর্য্যের পাহাড় দেখিবার জন্যই আমি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলাম। রমেশবাবু পরদিনই দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

গোয়ালপাড়া পৌছিতে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সুন্দর ছোট সহরটি। একটি উঁচু পাহাড়ের উপর আপিস, আদালত, ডাকঘর, ও মহকুমা হাকিমের বাংলা। দূর হইতে গোয়ালপাড়া পাহাড়টি বড় সুন্দর দেখায়। একশো বছর আগে এই গোয়ালপাড়া একটি বড় সহর বলিয়া পরিগণিত হইত। সেকালে আসামের লোকের কাছে একটি রাস্তার ধারে সারি সারি দোকান ও চার পাঁচশোখানি জুড়ে ঘরসমন্বিত এই গোয়ালপাড়াই ছিল একটা বড় সহর। বর্ষার সময় এঘর ওঘর করিতে নৌকার সাহায্য লইতে হইত। কাঠ ও বাঁশের ব্যবসায়ের জন্য গোয়ালপাড়ার খ্যাতি একালে ও সেকালে সমানভাবে বর্ত্তমান আছে। মার্টিন গোয়ালপাড়া পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত কতকগুলি বাড়ীঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে "গৃহগুলি সম্ভবত ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত, কারণ ইহাদের অবস্থান যুদ্ধব্যাপারের উপযোগী নয়।" আর একটি নূতন কথা এই যে—নদীর কিনারায়, পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকে পাহাড়ের গায়ে তিনি একটি বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত দেখিয়াছিলেন, সে সময়ে ঐ মূর্ত্তিটি শিবমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইত।* এই মূর্ত্তিসম্বন্ধে বা কোনও মন্দিরসম্বন্ধে আমাকে গোয়ালপাড়ার কোনও বন্ধু কিছু বলেন নাই, কাজেই এবিষয়ে আমি কোন কথা বলিতে পারি না। এইবারে আমাদের শ্রীসূর্য্য পাহাড়ের অভিযানের কথা বলিতেছি।

পরদিন ভোরের বেলা রমেশবাবু আসিয়া বলিয়া গেলেন—বেলা এগারোটায় আপনাকে রওনা হইতে হইবে। ট্যাক্সি ঠিক হইয়াছে—একেবারে পাহাড়ের তলায় গাড়ী যাইবে। প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। ভোরের বেলা সবে মাত্র চায়ের পেয়ালাটি মুখে দিয়াছি, তাহাতে এই সুসংবাদ, আনন্দের আতিশয্যে একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম, চায়ের পেয়ালাটা হইতে অনেকখানি চা গড়াইয়া পড়িল। শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে এগারোটা বাজিয়া গেল। আমি দশটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলাম। কিন্তু এগারোটা, বারোটা, একটা, এমন কি শেষটায় দু'টাও বাজিয়া গেল,—রমেশবাবুর দেখা মিলিল না! রমেশবাবু যখন কাছারি হইতে একরূপ গলদঘর্ম্ম হইয়া আসিলেন, তখন প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে। যে ট্যাক্সিওয়ালার আসার কথা ছিল, এবং যাহাকে তিনি ঠিক্ করিয়াছিলেন, সে না আসায়ই এই গোল। সে যাহা হউক—কোন রকমে একখানি ট্যাক্সি যোগাড় করিয়া যখন রওয়ানা হইলাম, তখন বেলা প্রায় তিনটা।

* "At the east side of the hill, near the river, is a piece of granite, on which is carved the figure of a Budh, which the people worship and call Sib." Martin's History of Eastern India, Page 479.

গোয়ালপাড়া সহর হইতে চারিক্রোশ দূরে এই শ্রীসূর্য্যের পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়টি "দশভূজা শম্ভেশ্বর" নামক মৌজায় লোক্যাল বোর্ডের রাস্তার ধারে বিরাজিত। এই পাহাড়ের অন্যনাম কোটি লিঙ্গেশ্বর। ট্যাক্সি ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়া বেগে ছুটিয়া চলিল। বামদিকে ব্রহ্মপুত্রের শুভ্র বক্ষ, অনেকটা দূরে শুভ্রসলিল রাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া ব্রহ্মপুত্র উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। অতিদূরে গারো পর্ব্বত-শ্রেণী নীল আকাশের গায়ে ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে। তিন মাইল পথ বেশ মন্দ নয়। তারপর দুই দিকে ঘন শালবন, কাঁচা রাস্তা—এইপথে খানিকটা যাইয়াই পার্ব্বত্যপথে ওঠা-নামা আরম্ভ হইল। একদিকে গভীর খাদ, অন্যদিকে নিবিড় বন। আসামের বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত তরু ও লতাগুল্ম বাঙলা দেশের চেয়ে সুস্পষ্ট ও বৃহদাকার। সে গভীর বনে আলো নাই—নিবিড় কালো, সূর্য্যরশ্মিও প্রবেশ করিতে পারে না, এমনি অবস্থা। প্রথমেই পড়িল রাক্ষসিনী পাহাড়। এই পাহাড় বন্যজন্তুর প্রিয় নিবাস। এখানে নির্ভয়ে ভীষণ শার্দ্দুলের দল প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করে। প্রায়ই ইহাদের কবলে নিরীহ পথিককে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। ট্যাক্সি আসিয়া একটি পার্ব্বত্য নদীর পাশে থামিল। নদীটির নাম জিনারী। ক্ষুদ্রকায়া স্রোতশালিনী স্রোতস্বিনী। দূর বন ও পাহাড় হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া এখানে জমান হয়। নানা দেশবিদেশের ব্যাপারীরা এখান হইতে কাঠ কিনিয়া নৌকা-যোগে চালান দেয়। আমরা এখানে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া খেয়া পার হইয়া নদীর ওপারে গেলাম। নদীর ওপারে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামটির নাম ডুবাপাড়া। এই গ্রামের মধ্য দিয়া শ্রীসূর্য্যের পাহাড়ের দিকে বেশ চওড়া পথ চলিয়া গিয়াছে। এ গ্রামে গারো হইতে ব্রাহ্মণ, এমন কি প্রাচীন আহোমদেরও দু'-একজন অধস্তন বংশধর, বাস করেন। এখান হইতে আমরা গোয়ালপাড়া নিবাসী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী একজন ভদ্রলোকের বাংলাতে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া তাঁহাকেও সঙ্গে লইলাম। তিনি বলিলেন—"আপনারা এমন সময়ে এলেন কেন? বাঘের বড়ই উপদ্রব। সেদিনও—" তাঁহার কথা শেষ না হইতেই সদাপ্রফুল্ল এবং উৎসাহী বন্ধু রমেশবাবু বলিলেন—"ভয় কি? পকেটে দেশলাই আছে। পথের দু'ধারের শুক্‌নো বন-জঙ্গলে ঘাসের বনে আগুন জালিয়ে দোব।" রমেশবাবু পথ চলিতে চলিতে

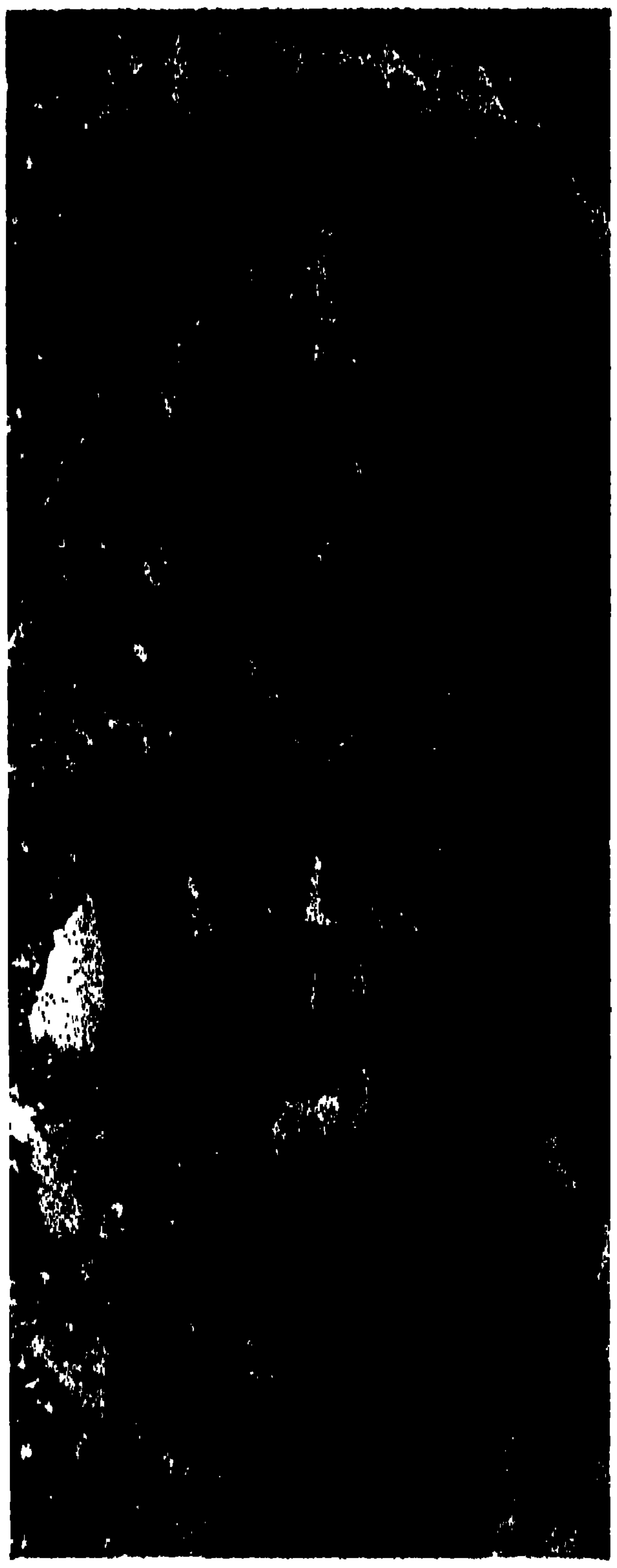

৩

দ্বাদশভূজা মূর্ত্তি

ঘাসের বনে আগুন ধরাইয়া চলিলেন। পট্ পট্ শব্দে শুষ্ক ঘাসে আগুন ধরিয়া জ্বলিতে লাগিল।

শ্রীসূর্য্যের পাহাড়ের কাছে যখন পৌছিলাম তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা ধানী জমি—কিন্তু জলে ডোবা। চারিদিক ঘিরিয়া দুর্ভেদ্য জঙ্গল। অতি ক্লেশে দুই দিকের ঘন বনজঙ্গল ও কাঁটা বনের ভিতর দিয়া পথ করিয়া পাহাড়ের নীচে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়ের পায়ের তলায় পৌছিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গেল। নির্জ্জন স্থান। ঘন শিলাকীর্ণ পর্ব্বত প্রদেশ। একটি ঝরণা উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে ঝর্ ঝর্ শব্দে নামিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের

গায়ে বড় বড় পাথর।পাথর কাটিয়া শত শত শিবলিঙ্গ কে খুদিয়া রাখিয়াছে। শিলাগাত্রে কয়েকটি গোফাও দেখিলাম। গোফাগুলি ঠিক্ যোগী গোফার মত। পাথর খুদিয়া ও কাটিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি

দ্বিভুজা মনসামূর্ত্তি

শিবলিঙ্গ বেশ সুন্দর, নিপুণভাবে খোদিত। উচ্চতায় কোনোটি এক ফুট, কোনোটি দুই তিন ফুটও হইবে। পরিধিও বেশ। জনশ্রুতি, এখানে ঊনকোটি সংখ্যক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। এখানে একটি সুবৃহৎ শিলাখণ্ডে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত। স্থানীয় লোকেরা এই দেবী মূর্ত্তিকে কেহ বলেন ভগবতী, কেহ বলেন চণ্ডীদেবী। আমাদের কিন্তু মূর্ত্তিটি দেখিয়া মনসাদেবীর বলিয়া মনে হইল। দ্বাদশভুজা, পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, দ্বাদশ হস্তে বিবিধ আয়ুধ, কিন্তু এমনি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাহা ভাল করিয়া চিনিবার যো নাই। মাথায় কিরীট। কিরীটের উপর সাতটি সাপ ফণা ধরিয়া আছে। চক্ষু, নাক, মুখ সবই অস্পষ্ট। হয়ত বা কেহ ধ্বংস করিয়াছে, নতুবা কালবশে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে জনপ্রবাদ—কালাপাহাড়ের অত্যাচারে এইরূপ হইয়াছে। মনসামূর্ত্তি নানারূপ হয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দ্বিভুজা যে মনসা মূর্ত্তির ফোটোগ্রাফ দিয়াছেন তাহাও এই সঙ্গে দেওয়া গেল, উহার সহিত শ্রীসূর্য্যের পাহাড়ের মূর্ত্তিটির অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মূল মূর্ত্তিটির নীচে পাথরের গায়ে দক্ষিণে ও বামে আরও আটটি মূর্ত্তি দেখিলাম। ঐ মূর্ত্তির কয়েকটি পুরুষের, কয়েকটি স্ত্রী মূর্ত্তি। তাহাদের একটিও চিনিতে পারি নাই, সেগুলি বিশেষভাবে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে ও আসাম প্রদেশে যে মনসা বা পদ্মার পূজা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে কথা বলিতে পারি। মনসাদেবীর নানা মূর্ত্তির নানা ধ্যান আছে। আমাদের মূর্ত্তিটির সাহিত নিম্নলিখিত ধ্যানটির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাই এখানে উহার উল্লেখ করিলাম :—

কাম্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভিনীং।
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণিময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাং।
চার্ব্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং বরাভ্যাং মুদা।
বন্দে শঙ্করপুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্ ॥

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন নেপালী সন্ন্যাসী আসিয়া এখানকার একটি শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য ও সন্ন্যাসীর আশ্রমের জন্য একখানি টিনের ছোট ঘরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সাধু এক যজ্ঞ করেন, যজ্ঞ উপলক্ষে বহু নর-নারী তীর্থযাত্রীস্বরূপ তথায় গমন করেন। আমরা মন্দিরটি ও সেই মূর্ত্তিটি দেখিবার জন্য পাহাড়ের উপর উঠিলাম। মন্দিরের তালা বন্ধ। জানালার ভিতর দিয়া দেখিলাম মূর্ত্তিটি নাই। সন্ন্যাসী মহোদয় বেশ টাকা কড়ি ও ভক্তিশ্রদ্ধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিটিও লইয়া

চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই যজ্ঞের স্থান দেখিলাম। সেখানে কয়েকটা ভুট্টাগাছ জন্মিয়াছে। দু'চারিটি গাঁদা গাছে ফুল ফুটিয়াছে। এখান হইতে চারিদিকের শোভা দেখিবার মত বটে। তখন আসন্ন সন্ধ্যা-সূর্য্যের লাল আভাটুকু দূরের একটা পাহাড়ের ছায়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। বনের পর বনের সারি—শালতরুবীথি সুদূর দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে। আরো দূরে ব্রহ্মপুত্রের রজতশুভ্র সলিলমধ্যে সূর্য্যের শেষ রশ্মি জ্বলিতেছে। অতি দূরে গারোপাহাড় স্বপ্নপুরীর মত সুদূর দিগন্তে মিশিয়া আছে। এমন নির্জ্জন বনজঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের বুকে অনেক কিছু দেখিবার আছে। আমাদের আর পাহাড়ের উপর উঠিবার সুযোগ ও সময় হইল না। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। বনে-জঙ্গলে নড়াচড়া আরম্ভ হইয়াছে। ভয়ে সচকিত চিত্তে ফিরিয়া চলিলাম। নদী পার হইয়া গোয়ালপাড়ার দিকে যখন চলিলাম তখন রাত্রি হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি—দুর্গম পথ, রাত্রি প্রায় সাড়ে-নয়টার সময় গোয়ালপাড়া পৌছিলাম।

শ্রীসূর্য্যের পাহাড়ে আরও যে সকল দেখিবার জিনিষ আছে এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। একটি উচ্চশৃঙ্গে "ব্যাসদেবের আসন" বলিয়া একটি স্থান আছে। একটি বৃহৎ সুগঠিত প্রস্তর। মনুমেণ্টের আকারে খোদিত। উঁচুতে প্রায় ছয় হাত। মূলদেশের পরিধি দশবারো হাত, শীর্ষদেশ পাঁচ ছয় হাত হইবে। উহার পশ্চাতে ক্রমোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ। সম্মুখে ঈষৎ ঢালু বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। শ্রোতৃবর্গ সম্মুখে লইয়া এই আসনে বসিয়া আলোচনাদি করা বক্তা এবং শ্রোতা উভয়পক্ষেরই সুবিধাজনক। আসনটি খাড়া, দৃঢ় এবং সমতলশীর্ষ।

'ব্যাসদেবের আসনে'র কিছু নিম্নস্থানে একটি ক্ষুদ্র ঝরণা। ঝরণাটি কয়েকটি সুবৃহৎ প্রস্তরের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। এখানেও পাথর কাটিয়া একটি শিবলিঙ্গ কে গড়িয়া রাখিয়াছে। পাশে অপর একটি প্রস্তরের গাত্রে খোদিত একটি গণেশমূর্ত্তি। গণেশমূর্ত্তিটি স্থানে স্থানে ভগ্ন, সুতরাং অসম্পূর্ণ—কিন্তু অস্পষ্ট নহে। এখান হইতে খানিকটা উপরে উঠিলে যেস্থানে পৌছা যায় তাহার নাম "স্বর্গদ্বার।" তিনদিকে তিনটি বৃহৎ প্রস্তর এবং তাহার উপর একটি অত্যন্ত বৃহৎ প্রস্তরের বিচিত্র সমাবেশে এমনই একটি বৃহদায়তন সুদৃঢ় প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার ভিতর পঁচিশ ত্রিশজন লোক অনায়াসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। প্রবেশপথটি বেশ বড়। প্রবেশমুখের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরগাত্রে কয়েকটি অক্ষর সংখ্যা ও চিহ্ন খোদিত দেখিলাম। উহা অস্পষ্ট না হইলেও খুব সুস্পষ্ট নহে। "শ্রীহরে" এই অক্ষর কয়টি পড়া যায়। আসামে এইরূপ পাহাড়ের গায় খোদিত লিপি নূতন নহে। তেজপুরের শিলালিপির কথা অনেকেই জানেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Journal of the Bihar and Orissa Research Societyতে 1917, 508) ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। প্রবেশমুখের বিপরীত দিকে দক্ষিণ কোণে বাহির হইবার পথ। উহা অত্যন্ত সংকীর্ণ। প্রথমে দেখিলে মনে হয় বিশেষ ক্ষীণকায় ব্যক্তি ব্যতীত কেহই বোধ হয় ঐপথে নির্গত হইতে পারিবেন না, কিন্তু তাহা নহে, অতি স্থূলকায় ব্যক্তিও ঐপথে বাহির হইতে পারেন।

স্বর্গদ্বারের নিকটেই "চন্দ্রদেবের" মূর্ত্তি। একখানি নাতিক্ষুদ্র প্রস্তরের উপর পূর্ণচন্দ্রের বলয়াকৃতি মূর্ত্তি খোদিত। চন্দ্রদেবের মূর্ত্তিতে তেমন বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। এখান হইতে অনেকটা পথ বনজঙ্গল ও লতাগুল্মের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিলে পাহাড়ের একটি বেশ বিস্তৃত সমতলপ্রদেশে পৌছান যায়। এইস্থানে শ্রীসূর্য্যদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। খাড়াভাবে ভূপ্রোথিত একটি নাতিবৃহৎ প্রস্তর-গাত্রে খোদিত শ্রীসূর্য্যদেবের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মূর্ত্তি। মণ্ডলাকারে বেষ্টিত রাশিচক্রাদির মূর্ত্তিমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। সমগ্র মণ্ডলটির ব্যাস একহস্ত পরিমিত। সূর্য্যদেব পাহাড়টিকে সম্মুখে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বন জঙ্গলের জন্য ঠিক্ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও আমাদের মনে হয় ব্যাসাসন হইতে স্বর্গদ্বার ও চন্দ্রদেব অদৃশ্য হইলেও প্রত্যেকেই সূর্য্যদেবের ঠিক্ সম্মুখে ও দৃষ্টিপথে অবস্থিত। বাঙলাদেশে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তির অভাব নাই। কাজেই

সূর্য্য মূর্ত্তিটির ধ্যান ও বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই মূর্ত্তিটির কারুকার্য্য ও গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। মূর্ত্তির নাসিকা ও অন্যান্য কয়েকটি অবয়ব ভগ্ন ও বিকৃত। মূর্ত্তির সম্মুখে একটি কুণ্ড ছিল ঐ কুণ্ডটি এখন বিশুষ্ক ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এক সময়ে শ্রীসূর্য্যদেব যে মন্দির মধ্যে অবস্থিত ছিলেন তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। মূর্ত্তির অনতিদূরে অর্দ্ধবিলুপ্ত পাষাণময় শ্রেণী এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত পাষাণগঠিত স্তম্ভাদির ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারই অনতিদূরে সুউচ্চতট-পরিবেষ্টিত একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা দীর্ঘকালের সংস্কারাভাবে প্রায় শুষ্কগর্ত্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

স্থানীয় অধিবাসীরা এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন—পূর্ব্বে এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ে কোনও কালে একটি বৃহৎ মানমন্দির ছিল। অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন ও অংশাদি এবং পাষাণচত্বর ও পাষাণে গঠিত জলপূর্ণ কূপ ইত্যাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। অপর একস্থানে অতি আশ্চর্য্যগুণ-বিশিষ্ট কয়েকটি বৃহৎ প্রস্তর আছে। তাহাদের শীর্ষদেশ বড় বড় বাটির আকারে খোদিত। ঐ সকল বাটিতে তেল ও দুগ্ধ ইত্যাদি যতই দেওয়া যায়, উহা নাকি কিছুতেই পূর্ণ হয় না। অথচ ঐ সকল দ্রব্য বাহির হইবার পথও নাকি দেখা যায় না। এই সকল প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ ছাড়া, পাহাড়ের প্রায় প্রত্যেক অংশেই বহুসংখ্যক ভগ্ন, অভগ্ন, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ প্রস্তরমূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমরা শুনিলাম যে, ঐস্থানে শ্রীসূর্য্য-দেবের নামে উৎসর্গীকৃত কতক দেবোত্তর জমিও ছিল। বর্ত্তমানে তাহা স্থানীয় ভূম্যধিকারী বিজনী রাজসরকারের খাস বন্দোবস্তে আছে। গোয়ালপাড়ার চতুর্দ্দিকে 'পঞ্চরত্ন', 'ভৈরব', 'যোগীগোফা', 'মহাদেব' ইত্যাদি নামের অনেক পাহাড় আছে। প্রত্যেক পাহাড়েই নাকি অনেক দেখিবার আছে, কিন্তু কে তাহার সন্ধান রাখে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে Gait সাহেবের *History of Assam* কিংবা B. C. Allen সাহেবের গোয়ালপাড়ার District Gazetteerএও শ্রীসূর্য্য-পাহাড় সম্বন্ধে কোন কথা নাই। অ্যালেন সাহেব লিখিয়াছেন—"There are hardly any archaeological remains of interest within its boundaries." বিশ্বকোষকার শুধু লিখিয়াছেন—"গোয়ালপাড়া হাবড়াঘাট পরগণায় 'শ্রীসূর্য্য পাহাড়' নামে এক পর্ব্বত আছে, এখানে একটি গোলাকার বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর খড়ির দাগের মত কতকগুলি রেখা আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এককালে এখানে একটি মানমন্দির ছিল।" এইটুকু মাত্র। আসামের গৌহাটি সহর এক সময়ে "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরী" নামে পরিচিত ছিল। কালিকাপুরাণের মতে ব্রহ্মা এইস্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হয়।

> "অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্ নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
> ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা ॥
> কালিকাপুরাণ, ৩৮ অধ্যায়।

মহাভারতেও আসামের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময়ে আসামের সীমা অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে সময়ে পশ্চিমে করতোয়া নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। Gait সাহেব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামোৎপত্তি-সম্বন্ধে বলেন—

> "নরক ও তাঁহার বংশধরগণের রাজধানী ছিল—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বর্ত্তমান গৌহাটি। প্রাক্ অর্থে পূর্ব্বেকার অথবা প্রাচ্য, এবং জ্যোতিষ অর্থে তারা, জ্যোতিষশাস্ত্র, উজ্জ্বল বস্তু বুঝায়। সুতরাং প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর নামের অর্থ প্রাচ্য জ্যোতিষের নগর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

অসুর রাজাদের সময়ই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এখানে একে একে নরকাসুর, ভগদত্ত, বাণাসুর প্রভৃতি রাজারা রাজত্ব করেন। মহাভারতেও ভগদত্তের নাম আছে। ভগদত্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনুরাগী ছিলেন। হয়ত বা তাঁহার সময়ে কিংবা তাঁহারও অনেক পরবর্ত্তীকালে আহোম রাজাদের রাজত্বকালে শ্রীসূর্য্যপাহাড়ের মানমন্দির ও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এশুধু আমার অনুমান মাত্র। খাঁটি কোনো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনও উপায় নাই। যদি ঐ সূর্য্যপাহাড়ের পাষাণগাত্রে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার হয়, তাহা হইলে হয়ত বা প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আসামের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব ভাল করিয়া লিখিত বা আলোচিত হয় নাই। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতিও এখনও নীরব। আশা করি তাঁহারা গোয়ালপাড়ার নিকটবর্ত্তী পাহাড়-পর্ব্বতের বনজঙ্গলের মধ্যে যদি অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে অনেক নূতন কথা জানা যাইতে পারে। সরকারী পুরাতত্ত্ব-বিভাগের ও আসাম গভর্ণমেণ্টেরও এইদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত।

বলিতে ভুলিয়াছি—নেপালী সাধু যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল "বৃহস্পতি যজ্ঞ।" আর যে মূর্ত্তিটির লোভ সাধু সংবরণ করিতে পারেন নাই সেই মূর্ত্তিটি ছিল একহস্ত পরিমিত উচ্চ একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। আমার এই প্রবন্ধ সংকলন-বিষয়ে বিশেষতঃ পরবর্ত্তী বিষয়গুলি শ্রীসূর্য্যপাহাড় পর্য্যবেক্ষণকারী সাহিত্যিক বন্ধু গোয়াল-পাড়ার প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি। এজন্য এই সুযোগে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

সাঁচ্চা ও ঝুঠা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১

সহর মির্জ্জাপুরে একজন বাঙালী জমিদার বেড়াইতে আসিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলে থাকিবার কথা, সেখানকার পাণ্ডারা সর্ব্বদা যাওয়া আসা করে, জমিদারবাবু দিনকয়েক পরে যাইবেন বলিতেছেন। আপাততঃ মির্জ্জাপুরে এক-খানা বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। সঙ্গে লোকজন যে খুব বেশী তাহা নয় তবে ভড়ং যথেষ্ট। দরজায় সর্ব্বদা দরওয়ান বসিয়া থাকিত, ইত্তালা না দিয়া কেহ ভিতরে যাইতে পাইত না, যাহারা দেখা করিতে আসিত তাহা-দিগকে সময়ে সময়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত, তাহার পর বৈঠকখানায় ডাক পড়িত।

শ্রাবণ মাস। বিন্ধ্যাচল মির্জ্জাপুরের কাছে, সেখানে গঙ্গায় জল বাড়িয়া, উত্তর দিকের তীর ভাসাইয়া দিয়াছে। কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, দুই নদীর জল বর্ষায় স্ফীত, প্রশস্তপরিসর হইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। সহরে অশ্বত্থ বট গাছে চারিদিকে হিন্দোলা ঝুলিতেছে, বালকবালিকা, যুবকযুবতী দুলিতেছে, ঝুলনের গান গাহিতেছে পথে ঘাটে কজরী গান শোনা যায়—

মাছর বেচে মছুইনিয়া মির্জ্জাপুরকী গলী!

সন্ধ্যার সময় জমিদারবাবু বেড়াইতে বাহির হন। এক-খানা ভাল গাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে, ফিটন গাড়ী। বাবু এক দিকে বসেন, সম্মুখে দুইজন মোসাহেব। বাবু খুব ফিটফাট, পরিচ্ছদ দিব্য পরিষ্কার, গোঁফের পারিপাট্য কিছু বেশী। গোঁফ মোটা, পাকান, উপর দিকে চাড় দেওয়া, ডগায় আতর মাখানো। কতকটা কাইসরী ধরণের গোঁফ কিন্তু অত উগ্র মূর্ত্তি নয়।

মির্জ্জাপুরের কয়েকজন রহীস দেখা করিতে আসিল। জমিদারের নাম প্যারীবাবু। তিনি রহীসদের যথেষ্ট আপ্যায়ন করিলেন। বাঙালীরা সচরাচর হিন্দুস্থানী কথা ভাল বলিতে পারে না, প্যারীবাবুর কথা অনেকটা দোরস্ত। ধরণধারণও বেশ মজলিশী। রহীসেরা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, অজী, পিয়ারীবাবু হিন্দুস্তানী তো সাফ বোলতে হৈঁ, পূরবকে লোগোঁকী ঐসী নহীঁ হোতী।

আসিতে না আসিতে কয়েক দিনের মধ্যেই পিয়ারী-বাবুর নাম চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যাইত। হঠাৎ এক দিন একজন বড় রহীসের বাড়ী জমিদারবাবুর নিমন্ত্রণ হইল। গান শুনিবার নিমন্ত্রণ। বেনারস হইতে একজন বড় তরফাওয়ালী আসিয়াছে তাহার মোজরা হইবে।

প্যারীবাবু দুই মোসাহেব সঙ্গে আসিলেন। বেশ বড়

ঘরে পুরু গালিচার উপর ফরাশ পাতা, সহরের ছোট বড় রইীস অনেক জুটিয়াছে। গৃহস্বামী প্যারীবাবুকে খুব খাতির করিয়া বসাইলেন।

আতর পান আসিল। প্যারীবাবুর সঙ্গে অনেকের আলাপ পরিচয় হইল। একজন কহিল, বাবু-সাহেব, আপ জৈসে অমীর আদমীকো শহরমেঁ কুছ সওদা করনা চাহিয়ে।

প্যারীবাবু কহিলেন, কুছ অচ্ছা সওদা মিলে তো মৈঁ খুশীসে খরীদুঁগা।

ইতক্ষণে বাইজী আসিল। সরঙ্গওয়ালারা কাঁা কোঁ করিয়া যন্ত্র বাঁধিতে লাগিল, তবলাওয়ালা হাতুড়ি দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া তবলা ঠিক করিতে লাগিল। যন্ত্র মিলিলে পর তরফাওয়ালী একটু নাচিল, বেশীক্ষণ নয়, তাহার পর মহফিলের মাঝখানে বসিয়া, প্যারীবাবুর দিকে মুখ করিয়া গান ধরিল,

বিঁদিয়া লে গই মছরিয়া!

প্যারীবাবু একটু মুখ বাঁকাইয়া পাশের মোসাহেবকে বলিলেন, এ দেশে কি মাছ ছাড়া অন্য গান নেই?

নিকটে বসিয়া একজন রইীস মুখের ভাব দেখিয়া বলিল, ক্যো বাবু সাহেব, আপকো গানা পসন্দ নহীঁ?

প্যারীবাবু কহিলেন, সাহেব, গানেকী বাত নহীঁ। মছরীকী বাত হৈ। কজরী গাতী হৈঁ তো মছরীকী বাত, তবায়ফ গাতী হৈঁ তো ভী ওয়হী মছরীকী বাত!

—জনাব, আপকে মূল্‌কমেঁ তো লোগ মছরী বহুত পসন্দ কর্‌তে হৈঁ।

—খানেমেঁ ভী অওর গানেমেঁ ভী?

আশেপাশে অল্প হাসি হইল। একজন কহিল, খুব কহা!

প্যারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বিঁদিয়া কিসকো কহতে হৈঁ?

—টিকুলীকো। গীত যহ হৈ কি জব কোই ঔরত নহানেকে লিয়ে পানীমেঁ পৈঠী, তো উসকে সিরকী টিকুলী মছলী লে ভাগী।

ক্যা খুব! তবায়ফ গাতী বহুত অচ্ছী হৈ।

উঠিয়া যাইবার সময় প্যারীবাবু বাইজীকে একটা আশরফি দিলেন। যাহারা দেখিল তাহারা বলিল, ক্যো ন হো! বঙ্গালেকে অমীর লোগ বহুত আলা নজর ঔর ফইয়াজ হোতে হৈঁ।

২

ইহার পরেই প্যারীবাবুর বাড়ী ব্যবসাদারদিগের ভিড় হইতে আরম্ভ হইল। মির্জাপুরী বাসন, গালিচা, সতরঞ্চি, বেনারসী সাড়ী, গাজিপুর জৌনপুরের আতর গোলাপ, মুরাদাবাদী নানা রকম সামগ্রী উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথম দিন কয়েক বাবু জিনিষপত্র দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন, এ সকল সওদায় তাঁহার প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহার কি আবশ্যক? দালাল আসিয়া বলিল, চুণারে গঙ্গার ধারে অতি উত্তম বাড়ী আছে, দাম অল্প, হাওয়া বদলের পক্ষে উত্তম, বাবু সাহেব খরিদ করিবেন? বাবু সাহেব বলিলেন, পরে দেখা যাইবে, এবার নয়, এবার তিনি শীঘ্রই বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যাইবেন। একজন মোসাহেব বলিল, ভাল জহরত পাইলে বাবু কিছু খরিদ করিতে পারেন।

ভাল জহরীর সন্ধান করিয়া খবর দিব, বলিয়া দালাল উঠিয়া গেল।

সে সময় কোনো অপরিচিত ব্যক্তি যদি দৈবাৎ সে ঘরে প্রবেশ করিত তাহা হইলে জমিদারবাবু ও তাঁহার মোসাহেবদ্বয়ের ব্যবহার দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইত। একজন মোসাহেব প্যারীবাবুর পাঁজরে একটা আঙুলের খোঁচা দিয়া বলিল, কিরে, কেমন বলেচি, ঠিক কি না?

প্যারীবাবু অল্প হাসিয়া কহিলেন, ঠিক বই কি! চুনোপুঁটিতে কি হবে, গাঁথি তো রুই কাৎলা!

দ্বিতীয় মোসাহেব বলিল, শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখেছিস্? এক একটা কাৎলা মাছ যেন গরুর গাড়ীর চাকা!

প্রথম বলিল, সে তো ভারি! আমরা চাই এয়ারো-প্লেনের ল্যাজের মতো এক একটা।

প্যারীবাবু বলিলেন, এখনো তো ফৎনা ডোবে নি, তোরা মনে কর্‌চিস এরি মধ্যে বুঝি ডাঙায় তুলেচিস্।

—চার তো ফেলেচি, ছোট বড় কত রকম চারদিকে কিল্ কিল্ কর্‌চে।

—কত ঠকুয়ে যায়, কত ছিপ ছিঁড়ে পালায়, না তুল্‌লে বিশ্বাস নেই।

—আমরা কি তেম্নি খেলোয়াড়, টোপ না খেলে গায়ে গেঁথে তুলি।

প্যারীবাবু ভুরু কুঁচকাইলেন। কহিলেন, ও সব হবে না, জোর জবরদস্তি করা হবে না।

—রাম বল, আমরা কি তেম্নি আনাড়ি। যা মারব তা বেমালুম, কোথাও ছড় আঁচড় লাগ্‌বে না।

—সেই তো আসল কথা! হাতের সাফাই দেখতে হবে। এ তো আর কোদাল-পাড়া নয়।

কথাগুলা কতক হেঁয়ালির মতো হইলেও কোনো শ্রোতার বুঝিতে বাকী থাকে না। বাহিরে জমিদারের ঠাট কিন্তু ভিতরের নাট আর কিছু।

ঘরে তো এই রকম কথাবার্তা আর বাহিরে যেখানে দরওয়ান বসে সেখানে আর একরকম আলাপ হইতেছিল। একজন আধা বয়সী স্ত্রীলোক, বেশ গোলগাল, মোটাসোটা, এক হাতে একটা ছোট চাঙারি আর অন্য হাত কাঁকালে দিয়া দরওয়ানের সহিত কথা কহিতেছিল। দুজনেরই ভাষা ভোজপুরী, বাংলা করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

স্ত্রীলোক বলিল, দরওয়ানজী, তুমি পূবের লোক?

—বেশীদূর নয়, গোরখপুর জেলা। তোমার বাড়ী এখানে?

—না, আরা জেলা। আমার বাপ মা এখানে এসে দোকান করে।

—কিসের দোকান?

—সব রকম জিনিষ। পুরুষদের টুপী মেরজাই, মেয়েদের চুড়ী টিকুলী, কিছু কাপড়, কিছু বাক্স পেটরা।

—তুমি দোকান ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

—আমার লোকজন আছে, আমি এই সময় গ্রাহকদের বাড়ী টাকা আদায় কর্‌তে যাই।

—তা এখানে কেন?

—তোমরা বড় আদমি, তোমরাও আমাদের গ্রাহক হতে পার।

—আমরা তো দুদিন পরে চলে' যাব।

—এরি মধ্যে কিছু সওদা হতে পারে।

—তোমার ঝুড়িতে কি?

স্ত্রীলোকটি ঝুড়ির ভিতর হইতে একটা পানের দোনা বাহির করিয়া দরওয়ানের হাতে দিল। দরওয়ান পান মুখে দিয়া কহিল, বাঃ তোফা খিলি! তুমি তো শুধু পানের দোকান খুলিলেই তোমার গুজরান হয়।

রমণী হাসিল। হাসিতে রস বড় নাই, রসের স্মৃতি আছে। তাহার পর চাঙারী খুলিয়া দেখাইল। তাহাতে পুঁতির মালা, স্ত্রীলোকের মাথার বড় বড় টিপ, ছোট গোল আরসী, কাঠের চিরুণী, মিসি, এই রকম সব ছোটখাটো জিনিষ। একটা চিরুণী ও একখানি আরসি বাহির করিয়া দরোয়ানের হাতে দিল। বলিল এ তোমার ব্যবহারের মতো জিনিষ।

দরোয়ান চিরুণী দিয়া একবার দাড়ি আঁচড়াইল, আরসীতে ঘাড় মুখ বাঁকাইয়া মুখ দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল, কত দাম?

—ওর আবার কি দাম? তোমার পছন্দ হয় রেখে দাও।

—আরে তা কি হয়। যখন বাবুর জমিদারীতে যাই তখন অনেক জিনিস মুফৎ পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে তো আমরা হাওয়া খেতে এসেচি।

—এটাও তোমার বাবুর জমিদারীর সামিল মনে কর না কেন? তোমার বাবু কি তালুকদার?

—আরে না না, বাঙলার জমিদার।

—বটে? কোন্ জেলা?

কেন্নোইয়ের গায়ে হাত ঠেকিলে সে যেমন গুটাইয়া গোল হইয়া পাকাইয়া যায়, দরওয়ান সেই রকম গুটাইয়া সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে রমণীকে দেখিতে লাগিল। কিছু পরুষ কণ্ঠে কহিল, তুমি ঔরত দোকানে মাল বেচ, তোমার অত খোঁজে কাজ কি?

রমণী আবার হাসিল, কহিল, আমরা তো অমন জিজ্ঞাসা করিয়াই থাকি তাহাতে দোষ কি? কোন্ জেলায় জমিদারী সে তো কিছু লুকানো কথা নয়।

চাঙারী হাতে রমণী অল্প হাসিতে হাসিতে, দুই তিন বার পিছন দিকে ফিরিয়া, অল্পদূর গিয়া একটা গলিতে

প্রবেশ করিল। চিরুণী আর আরসী দরওয়ানের হাতে রহিল, তাহার দাম দেওয়া হইল না

৬

যদি কেহ সেই স্ত্রীলোকের পিছু লইত তাহা হইলে সে টাকা আদায় করিতে যায় কি না জানিতে পারিত। নাও পারিত, কেন না পথের মাঝখানে কেহ ত তাহাকে টাকা দিত না আর কাহারো বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সে কি করিত তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে?

রমণী অনেক গলিঘুঁচি ঘুরিল। কখনো পিছনে ফিরিয়া তাকায়, কখনো কোনো গলির মোড় ফিরিয়া একটা দরজার আড়ালে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। যেন তাহার সন্দেহ হইয়াছে কেহ তাহার পিছনে আসিতেছে। আসিলেই বা তাহার আশঙ্কা কি?

অনেক ঘুরিয়া একটা সরু অন্ধকার গলিতে একটা ছোট বাড়ীর দরজায় রমণী আস্তে আস্তে ঘা দিল। ঘা দিবার একটা কৌশল আছে, শুধু ঠক্ ঠক্ করা নয়। বাড়ীর উপরে একটা ছোট জানালা অল্প খুলিল, আবার বন্ধ হইয়া গেল। একটু পরে একজন দরজা খুলিয়া দিল। চাকর নয়, বাড়ীর কোনো লোক হইবে।

সে কোনো কথা কহিল না, স্ত্রীলোককে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। বাহির হইতে দেখিতে যেমন ভিতরে সে রকম ছোট বাড়ী নয়। কয়েকটা উঠান পার হইয়া বেশ বড় বড় ঘর। যে ঘরে স্ত্রীলোককে লইয়া গেল সেখানে উত্তম সতরঞ্চির উপর কালীন পাতা। তাহার উপর খাসা মছলন্দে বসিয়া একজন দীর্ঘকায় বলবান পুরুষ সটকায় খাম্বিরা তামাক খাইতেছে।

স্ত্রীলোক দ্বারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সেলাম করিল। তাহার সঙ্গে যে লোক আসিয়াছিল সে চলিয়া গেল। পুরুষ বলিল, বিবি বসো।

স্ত্রীলোক আবার সেলাম করিয়া দরজার কাছে বসিল। মুখের নল আলবোলায় রাখিয়া দিয়া পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, কি সংবাদ?

—খাঁ সাহেব, বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। বাবুর জমিদারী কোন্ জেলায় জিজ্ঞাসা করাতে দরওয়ান খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল।

—হইবারই কথা। বাড়ীর উপর কে নজর রাখে?

—লোক সর্ব্বদা বদল করা হয়। একজন থাকিলে সন্দেহ করিতে পারে।

—অচ্ছী বাত। আমারও লোক মোতায়েন আছে। কাহারা বাড়ীতে আসে যায়?

সওদাগর অনেক আসে। দু-চার জন রইসেরাও দেখা করিতে আসে।

—তা জানি। তুমি বাড়ীর ভিতর যাইতে পার?

হুজুর, বাড়ীতে জনানা নাই, আমাকে নাও যাইতে দিতে পারে।

—আমি অন্য লোক নিযুক্ত করিব। তোমাকে দিয়া আর কি হইতে পারে?

—জনাব যাহা হুকুম করিবেন।

—বেশী লোক হইলে তাহারা ভড়কাইতে পারে। পাকা খবর পাইলেই আমার যাহা করিবার করিব। তোমার হাতে কোনো হুঁসিয়ার সুন্দরী ঔরত নাই?

—আছে, কিন্তু উহাদের বাড়ীতে কোনো স্ত্রীলোক যাইতে পায় না। নাচ গানেরও সখ নাই।

—যাক্, কিছু সওদা খরিদ করিতেছে?

—বেশী দামী জিনিসের কোনো খবর আসে নাই।

—দরওয়ানের হাতে কিছু দিয়া আসিয়াছ?

—একটা চিরুণী আর একখানা আরসী, দাম সামান্য।

—ভাল, একবার দাম চাহিতে যাইবে। সেইসূত্রে অন্য কথা পাড়িবে।

—কোনো কথা বাহির করা কঠিন।

—কথা অন্য উপায়ে বাহির করা যাইবে। কথার ভাব জানিতে পারিলেই হইল। ফিরিবার পথে একবার দরওয়ানজীর সঙ্গে মুলাকাত করিবে।

রমণী উঠিল। কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, সাহেব, দরওয়ানকে আমি বলিয়াছিলাম টাকা আদায় করিতে যাইতেছি।

খাঁ সাহেবের গোঁফ দাড়ির ভিতর দিয়া দাঁত দেখা দিল, কহিল, শুধু হাত দেখিলে দরওয়ান সন্দেহ করিবে? সে কথাও বটে।

পাশে বাক্স ছিল, খুলিয়া খাঁ সাহেব কুড়িটি টাকা

গণিয়া রমণীর হাতে দিল। টাকা লইয়া, সেলাম করিয়া সে চলিয়া গেল।

সে ঘরের বাহির হইতেই আর এক জন ঘরে আসিল। খাঁ সাহেব বলিল, মোবারক হুসেন!

—জনাবালি!

—তুমি ঐ ঔরতের পিছনে যাও। দরওয়ানের সঙ্গে আলাপ করিবে। পার ত তাহার মুনিবের সঙ্গে দেখা করিবে। মনে রাখিবে যে তুমি ঘোড়া বিক্রী কর।

রমণী ফিরিয়া প্যারীবাবুর বাড়ী গেল। দরওয়ান নিজের স্থানে বসিয়া আছে। স্ত্রীলোককে দেখিয়া বলিল, তুমি আবার যে এখানে?

—টাকা আদায় করিয়া ফিরিয়া যাইতেছি, এই দেখ, বলিয়া রমণী মুঠা খুলিয়া এক মুঠা টাকা দেখাইল।

দরওয়ান বলিল, ওঃ, আমার কাছে আরসী ও চিরুণীর দাম পাইবে।

—সে জন্ম কোনো তাড়া নাই। তোমার বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হয় না? তাঁহার পছন্দসই কোনো সওদা দেখাইতে পারি।

—তোমার কাছে তেমন কি জিনিস আছে? আর বাবুর কাছে ঔরতের যাইবার হুকুম নাই।

—কেন, বাবু কি ঔরতকে নফরৎ করেন?

—তা জানি না, তবে বাবু অনেক দামী মাল চায়।

—মালের সন্ধান ত দিতে পারি। এমন কি, আবশ্যক হইলে তোমাদের দেশে পাঠাইয়া দিতে পারি।

—দেশের সঙ্গে কোনো সরোকার নাই। খরিদ যদি কিছু হয় এখানেই হইবে।

—বাবুর জমিদারী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তুমি রাগ করিলে কেন?

—বলিলে তুমি কি বুঝিবে? বাবুর কত জেলায় জমিদারী আছে। তোমার সঙ্গে মিছা বক্ বক্ করিবার আমার সময় নাই। আরসী চিরুণীর কত দাম?

—আট আনা।

—তবে আমার চাই না। চার আনা হইলে কিনিতে পারি।

আচ্ছা, তাহাই দাও।

রমণী চার আনা লইয়া অগ্রসর হইল, পিছন হইতে মোবারক হুসেন আসিয়া দরওয়ানকে সেলাম করিল। চার আনা পয়সা খরচ করিয়া দরওয়ানের একটু রুক্ষ ভাব। চক্ষু পাকাইয়া কহিল, তুমি আবার কে? এখানে ভিড় করিবার হুকুম নাই।

—এমন আমীরের দরজায় ভিড় না হইবে ত কোথায় হইবে? অনেক রকম সওদা আসিবে কেনা না কেনা তোমাদের ইচ্ছা। তবে আমার মাল যদি কিছু বিক্রী হয় ত তোমাকে খুসী করিব।

—দস্তুরী ত আমরা পাইয়াই থাকি।

—শুধু সে হিসাবে নয়। তাহার উপরে কিছু দিব।

—তবে তোমার মাল খারাপ।

—দেখিলেই বুঝা যাইবে। আমি ঘোড়ার কারবার করি। এবার হরিহর ছত্রের মেলা হইতে অনেক ভাল ভাল ঘোড়া আনিয়াছি। জমিদার বাবুসাহেব যদি একবার মোলাহেজা করেন ত বড় মেহেরবানি হয়।

বাবু কি এখানে ঘোড়া কিনিতে আসিয়াছেন? আর এখন ঘোড়া কে কেনে? কলকত্তা হইতে বাবুর মোটর আসিতেছে।

—তবু জমিদারদের আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধা থাকে।

বাবুর কাছে খবর দিলে আমাকে কি দিবে?

তুমি কি চাও? মাল দেখাইবার আগেই বায়না?

—নহিলে আমি তোমাকে ভিতরে যাইতে দিব না।

—আচ্ছা, আমি আর একদিন কিছু লইয়া আসিব, বলিয়া মোবারক হুসেন চলিয়া গেল। ধীরে, ধীরে, বাড়ীর চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া, এদিক ওদিক, সম্মুখে পিছনে দেখিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। দরওয়ান ততক্ষণ নূতন আরসী ও চিরুণী লইয়া দাড়িতে কেয়ারি কাটিতেছিল।

৪

জমিদারবাবুর বাড়ীর সম্মুখে ব্যাপারীর ভিড় বাড়িতে লাগিল। বাংলা দেশ হইতে এক জন এত বড় ধনী আসিয়াছে, তাহাকে কিছু বেচিতে পারিলে কিছু লাভ নিশ্চিত হইবে এই আশা করিয়া সকল প্রকার ব্যবসাদার আসিতে আরম্ভ হইল। মোবারক হুসেন একদিন দুইটা ঘোড়া লইয়া আসিল। মোসাহেব দুইজন আসিয়া দেখিল বটে কিন্তু প্যারীবাবু নিজে নীচে নামিলেন না। এই রকম আসে যায় অনেকে, কিন্তু সওদা বড় একটা হয় না।

যে সময় প্যারীবাবু গাড়ী করিয়া হাওয়া খাইতে যাইতেন ঠিক সেই সময় দুই চার জন লোক হয় তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে কিংবা পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। বাবুকে দেখিয়া লম্বা সেলাম করিত। একজন মোসাহেব মুখ টিপিয়া বলিত, করবে না কেন? গোঁফের জোরে সব কাবু হয়ে পড়ে।

বাবু বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পথে ঘাটে সাবধানে কথা কইবে। যেখানে সেখানে বেফাঁস কথা বল্লে শেষে একটা বিপদ হবে।

এক দিন সকালবেলা বাবু বসিয়া পান চিবাইতেছেন, এমন সময় খবর আসিল দিল্লী হইতে একজন বড় জহুরী অনেক রকম জহরত লইয়া আসিয়াছে। তখনি তাহার ডাক পড়িল। জহুরীর লম্বা চেহারা, লম্বা দাড়ী, লম্বা শেরওয়ানী, দিল্লীওয়ালা জরির টুপি, দিল্লীওয়ালা লাটুদার জুতা। পোষাকে আতরের ভুরভুরে গন্ধ, সঙ্গে দুই জন লোক, তাহাদের হাতে চারিটা বাক্স। পিছনে একজন সিপাহী, কোমরে তলওয়ার বাঁধা।

ঘরে ঢালা বিছানায় চাদর পাতা। জমিদারবাবুর সম্মুখে জহুরী সেলাম করিয়া বসিল। তাহার দুই জন লোক তাহার একটু পিছনে বসিল। সিপাহী দরজায় দাঁড়াইল।

মোসাহেব দুই জন আসিয়া প্যারীবাবুর পাশে বসিল। প্যারীবাবু জহুরীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, শেখ সাহেব না খাঁ সাহেব?

জহুরী বলিল, বাবু সাহেব, আমার নাম শেখ দাউদ।

—দওলতখানা?

—আমার গরিবখানা দিল্লী। পুরুষানুক্রমে আমরা এই ব্যবসা করিয়া আসিতেছি। বাদশাহী আমলে তোষাখানার কতক ভার আমাদের হাতে ছিল।

—তবে ত তোমরা খুব বড় ব্যাপারী।

—জনাব, কোনো রকমে গুজরান হয়ে যায়। আপনাদের মত আমীররাই আমাদের প্রতিপালন করেন। আপনার কি আবশ্যক?

—তোমার কাছে কি আছে?

—সব রকম মালই আমরা রাখি, তবে খুব দামী জিনিষ দিল্লীর দোকানে থাকে, হুকুম হইলেই আমরা আনাইয়া দিতে পারি। সঙ্গেও সব রকম আছে। হীরা, পোখরাজ, লাল পান্না, নীলম, মোতি দেখাইতে পারি। তৈরী জিনিষও আছে। আংটি, হার, মালা, চুড়ি, বাজুবন্ধ, শিরোপা যাহা আবশ্যক লইতে পারেন।

—আগে আংটি দেখাও।

শেখ দাউদ হাত বাড়াইয়া একটা বাক্স লইল। ইজার-বন্ধ হইতে চাবির ছোট গোছা খুলিয়া বাক্স খুলিল। মখমলের লাইন করা খাজে খাজে আংটী সাজানো। আলো পড়িয়া আংটির পাথর সমস্ত ঝলমল করিতে লাগিল।

জহুরী বাছিয়া বাছিয়া এক একটি আংটি প্যারীবাবুর হাতে দিতে লাগিল, বাবু আঙুলে পরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, মোসাহেব দুই পাশ দিয়া, ঘাড় বাড়াইয়া বিস্ফারিত চক্ষে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

কয়েকটা আংটি পছন্দ হইল। ভাল বড় বড় মুক্তার এক ছড়া শেলী প্যারীবাবুর পত্নীর জন্য কেনা হইল।

গোটা-কতক চুনি, কয়েকখানা পোখরাজ বাছিয়া প্যারীবাবু স্বতন্ত্র রাখিলেন। দামের বেলা একটু কষাকষি আরম্ভ হইল। সমস্ত জড়াইয়া ষোল হাজার সাড়ে চার শো টাকা। প্যারীবাবু বলিলেন,—নগদ দাম দিব ষোল হাজার, খুচরা টাকাটা ছাড়িয়া দাও।

দাউদ শেখ বলিল,—মাপ করিবেন, তাহা পারিব না। পাথর আমাদের অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক স্থানে সন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। লোকজন অনেক, বাহিরে যাইতে হইলে অনেক আশঙ্কা, এই দেখুন হাতিয়ারবন্ধ সিপাহী সব সময় সঙ্গে থাকে। আমরা প্রত্যেক জিনিষের হিসাব করিয়া, নিজেদের লাভ ধরিয়া দাম ফেলি। যতদিন না বিক্রী হয় টাকার সুদ লোকসান হয়। মেহেরবানি করিয়া দরদস্তর করিবেন না। আরও এক কথা। আমরা দস্তরী কিছু দিই না, কেহ কিছু চাহিলে কিছু দিতে পারিব না।

মোসাহেব দুইজন বাবুর দুই পাশ হইতে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। চক্ষের রং ছিল সাদা, দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিল।

প্যারীবাবু হাত চালাইয়া বলিলেন,—তবে আর কি করা যাবে, নিবারণ! শেখ সাহেব কিছুই ছাড়বেন না। টাকা এনে দাও।

মোসাহেব নিবারণ উঠিয়া গিয়া তখনি টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিল। দুই হাতে তাড়া-বাঁধা নূতন নোট, সুতা ছিঁড়িয়া গণিবার সময় খড় খড় করিতে লাগিল। সব পঞ্চাশ টাকার নোট। দাউদ একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—বাবুসাহেব সব ছোটা নোট?

জমিদারবাবু বলিলেন,—খুচরা টাকা দিবার সুবিধা হয়, সেইজন্য কলিকাতার ব্যাঙ্ক হইতে আনাইয়াছি।

কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। একদিকে হীরা-জহরত অলঙ্কার সাজানো, প্যারীবাবুর আর একজন মোসাহেবের সতৃষ্ণ নিমেষশূন্য দৃষ্টি সেই দিকে। অপর দিকে দ্বিতীয় মোসাহেব ফস্ ফস্ করিয়া নোট গণিয়া পাশে রাখিতেছে, শেখ সাহেবের আর দরজার সিপাহীর লোলুপ দৃষ্টি সেইদিকে। কয়েকজন লোক যে নিঃশব্দে আসিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইল প্রথমে তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। সিপাহী তাহার পাশে লোক দেখিয়া প্রথমে চেঁচাইল,—য়হ সব আদমী কাঁহাসে আয়ে?

নবাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন সিপাহীর কটি হইতে তরবারি টানিয়া লইল, আর একজন তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। তখন ঘরের মধ্যে সকলে চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিল।

সকলের আগে ঘরে প্রবেশ করিল খাঁ সাহেব, তাহার পিছনে একজন বেঁটে রোগা লোক, তাহার পিছনে কয়েকজন পোষাকপরা কনষ্টেবল। বেঁটে লোকটি পা টিপিয়া টিপিয়া, নাচের ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া, কয়েকখানা নোট হাতে করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রাখিয়া দিল। কহিল,—জাল! তাহার পর কয়েকখানা পাথর তুলিয়া লইয়া, পকেট হইতে একটা যন্ত্র বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঝুঁঠা!

জমিদারবাবুর, মোসাহেব দুইজনের আর জহুরীর মুখ শুকাইল। খাঁ-সাহেব এক হাতে প্যারীবাবুর গোঁফ আর এক হাতে জহুরীর দাড়ি ধরিয়া দিল টান। গোঁফ-দাড়ি দুই হাতে খসিয়া আসিল।

খাঁ-সাহেব বলিল,—নোট, জবাহরাত, দাড়ী, মুঁছ সব ঝুঠে! আসামী সব সচ্চে!

ভদ্রমহিলার নটী-বৃত্তি

একটা "হেগৎ" এসেছে—charity-কল্পে এমেচার থিয়েটার করা। এখানে এমেচার অর্থে পয়সা নিয়ে, কিন্তু মাহিনা নিয়ে নয়। এই হেয়্যতের ভিতর কোন্‌টা প্রবল—charity অথবা থিয়েটার করা, তা' একটু প্রণিধান ক'রে দেখ্‌লে মন্দ হয় না।...

সাধারণ দর্শকের সমক্ষে পাদ-প্রদীপের সম্মোহন আলোকের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অভিনয় কর্‌বার জন্য সকল দেশে একটা শ্রেণীবিশেষের সৃষ্টি হয়েছে—তাদের নাম নট নটী। নট নটীর হিন্দু-সমাজে বা খৃষ্টীয় সমাজে একটা স্থান থাক্‌লেও এবং সে স্থানটা আদরের হ'লেও, গৃহস্থ বা ভদ্র নরনারীর স্থান নয়। নট নটী একদিকে ও ভদ্র নরনারী আর একদিকে, মধ্যস্থলে footlightsএর সার, এ ব্যবস্থার যে যুক্তি আছে তাকে না মেনে থাকবার যো নেই। উভয় শ্রেণীর যদৃচ্ছা ক্রমে স্থান পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়, সমীচীনও নয়।

কেন নয় তাই বল্‌বার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করেছি। ফুটলাইটের magic এবং green-room ও rehearsal-roomএর আবহাওয়া কোনটাই সুস্থপ্রকৃতি ভদ্রমহিলা ও যুবকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।...

সাধারণ রঙ্গালয়ে যে-সকল নাটক অভিনীত হয়ে থাকে, তাতে যে সকল situationএর পরিকল্পনা করা আছে, সে সকল situationকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'লে যে অভিনয়-ভঙ্গী দেখাতে হবে, তার rehearsal, পরে অভিনয় স্বাভাবিক করতে হ'লে যে মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তির রূপ ফোটাতে হবে, তা খুব পবিত্র হ'লেও অভিনেতা ও অভিনেত্রী সত্যকার পতি-পত্নী বা প্রেমিক-প্রেমিকা না হ'লে, তাঁদের মনের উপর একটা যে ছাপ রেখে যাবেই, তার প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। অভিনয়টা অভিনয় মাত্র হ'লেও, মন বলে' যে বস্তু আছে, সেটা একটা mould নিয়ে ফেল্‌বেই ফেল্‌বে। আমি Matheson Lang ও Miss Hewtin Britton-এর রঙ্গ-জীবনের অভিনয় কেমন ক'রে প্রকৃত জীবনের সত্যে পরিণত হয়েছিল, তার বিষয় একবার ভেবে দেখতে সকলকে অনুরোধ করি।...

অভিনয় যাতে অভিনয়েই শেষ হয়, সেইজন্যই নট নটীর সৃষ্টি: আর যদি না হয়, তাতেও সমাজের কোন ক্ষতি নেই, সেজন্যও নট নটীর সৃষ্টি।

আমাদের দেশের তাই বর্তমান "হেয়্যৎ"টা বড় আমার ভাল লাগ্‌ছে না। অনেক ভদ্রমহিলা যে footlightsএর আকর্ষণ একটু বেশী মাত্রায় অনুভব করছেন, সেইটাই আরও ভাল লাগ্‌ছে না। এই-সব charity অভিনয়ে, যেখানে মেয়েপুরুষের একসঙ্গে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে মেয়েরা এক-আধটি ছাড়া সব কুমারী; বিবাহিতারা তাঁদের বন্ধনের পাশ অতিক্রম করে' footlightএর পশ্চাতে দাঁড়াতে পারেন নি। তাঁদের পতিগণ সেটা নিশ্চয়ই ভাল বোঝেন নি ব'লেই অনুমতি দেন্‌ নি, এটা মনে করা অন্যায় হবে না।...শত শত মুগ্ধনেত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বার যোগ্যতা লাভের যে মোহ, শুধু সেই মোহই যথেষ্ট অনিষ্টকর—নৃত্য, সঙ্গীত, উজ্জ্বলিত নাট্যশালা, আবৃত্তি, ভাবের অভিব্যক্তি প্রত্যভিব্যক্তি, এ সকলে যদি তরুণ ও তরুণীর মন না চঞ্চল হয়, খুব শক্ত মনেরই পরিচয় পাওয়া যাবে।...

Feign বা malinger করতে করতে অনেক সময়ে মানুষ পাগল হয়ে যায়, এ কথা বিশেষজ্ঞেরা জানেন। অভিনয় করতে করতে ভাবের সত্য মূর্তিটা রঙ্গালয়ের বাহিরে প্রকট হয়ে উঠ্‌বে কি না, তাই ভেবে দেখা উচিত। ধারাবাহিকভাবে এই যে charityর স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেটার পশ্চাতে footlightএর মোহ কতখানি আছে অথবা করুণার প্রেরণা কতখানি আছে, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। খুব ভাল করে' রুচির দিক্‌ দিয়ে অনবদ্য নাটক মাত্র ভদ্র নরনারী অভিনয় করলে কোন ক্ষতি নেই, একথা যাঁরা বলেন তাঁদের প্রতি আমার বক্তব্য—এ রুচির আবরণ রসের উৎসের মুখ চাপা দিতে পারে না—এমন নাটক কই, যেথায় ষড় রসের সকল রসেরই অল্প-বিস্তর বিস্তার নাই।

এই বাচাবাছির ভিতরও তো একটু আশঙ্কার লক্ষণ রয়েছে! কিন্তু সে আশঙ্কার কারণ শুধু নাট্য-বস্তুতেই নিবদ্ধ নয়, নাট্যমঞ্চের ভিতর সে আশঙ্কার সম্পূর্ণ কারণ বিদ্যমান। অতএব চিরদিন সকল দেশে নট-নটীর কাজ নট-নটীরই থাকুক, এই ব্যবস্থাই সকলের চেয়ে অনবদ্য।

উপস্থিত আর-একটা ধুয়া মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, যে স্বাধীন জীবিকা উপার্জন করবার জন্য ভদ্রমহিলাগণ Stage as a profession গ্রহণ করতে পারেন কিনা তার বিচার হওয়া উচিত।...

আমাদের সমাজের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কটাকে একেবারে ওল্‌ট্‌-পাল্‌ট্‌ না করলে সেটা যে সম্ভব হবে না, তা বলাই বাহুল্য। সে ওলট্‌-পালটের জন্য প্রস্তুত না হয়ে ভদ্রমহিলাগণের পক্ষে Stage as a professionএর কল্পনাই আসতে পারে না।

এ সম্বন্ধে বিচার করতে হ'লে যে দেশে মেয়েরা Stage as a profession গ্রহণ করেছেন, সে দেশের স্ত্রী পুরুষের সামাজিক সম্পর্কটা প্রণিধান করে' দেখ্‌তে হয়। সে সম্পর্কটা না থাক্‌লে মেয়েদের Stage as a profession সে দেশেও সম্ভব হ'ত না, এ স্পষ্ট বোঝা উচিত। এবং ভদ্রমহিলাগণ জীবিকার্জনের জন্য রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবেন, এদেশেও সম্ভব হবে না।...

ইয়োরোপে নারীকুল আমাদের দেশের মত ভদ্র ও অভদ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। সেখানে ভদ্র ও অভদ্রের মধ্যে একটা তৃতীয় শ্রেণী আছে—তার নাম কি দেব জানি না—তাদের ভাষায় এরা unconventional অর্থাৎ সামাজিক শুচিতার বাঁধন তাঁরা মানেন না, তাঁহাদের আমি স্বৈরিণী নাম দিলাম।

এই স্বৈরিণী পদবাচ্য নারীগণ দুইভাগে বিভক্ত—প্রথম, যাঁরা স্বেচ্ছাচারিণী হয়েও ভদ্রমহিলার আচার মোটের উপর রক্ষা করে চলেন; দ্বিতীয়, যাঁরা অভদ্র নারীর ব্যবহারই গ্রহণ করেছেন, তাঁর

একটু রেখে ঢেকে—এঁদের একটা নাম দিয়েছে সে দেশের লোকে, তাঁদের বলে demimondes।

তা'হলে মোটের উপর চারটি শ্রেণীর স্ত্রী ইউরোপে বর্ত্তমান—ভদ্র, অর্দ্ধ ভদ্র, অর্দ্ধ-অভদ্র এবং অভদ্র। প্রথম তিন শ্রেণীর নারী ইউরোপীয় সমাজে প্রকাশ্যভাবে চল্‌তি হ'য়ে আছে—চল্‌তি মানে স্কুল-চল, ভোজ-চল, party-চল, ball-চল্‌, Council-চল কমিটী-চল, এবং প্রয়োজন হ'লে বিবাহ-চল পর্য্যন্ত। চতুর্থ শ্রেণী মাত্র সর্ব্বতোভাবে অচল অপাঙ্‌ক্তেয়।

আমরা Stage as a professionএর কথা বল্‌ছি। স্বাধীন জেনানার দেশ ইউরোপেও ভদ্রমহিলারা Stageএ যান না। যদি কোন Stage-struck ভদ্রমহিলার সে অভিরুচি হয় এবং তিনি পাদ-প্রদীপের পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ান (as a professional), তাঁকে Stageএর অমোঘ আব্‌হাওয়া অতি সত্বর বাকী তিন শ্রেণীর মধ্যে একটাতে টেনে নেয়। কেননা, একথা কেউ যেন এক মুহূর্ত্তের জন্ম মনে না ভাবেন, যে ইউরোপীয় Stageএ উপরি-বর্ণিত অর্দ্ধ ভদ্র, অর্দ্ধ-অভদ্র ও অভদ্র নারী ব্যতীত অন্য কেহ জীবিকার্জ্জনের জন্য গমন করেন। এখন ভদ্রমহিলার স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ ভেবে দেখবেন যে, আমাদের দেশে ভদ্র শ্রেণী নারীগণের বিভাগটাকে ফাঁলাও করে' অর্দ্ধ ভদ্র এবং অর্দ্ধ-অভদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি করা সমীচীন হবে কিনা। যদি সমীচীন হয়, তা হ'লেই তথাকথিত ভদ্রমহিলাগণের Stage as a profession গ্রহণ করা সম্ভব হবে। আমি 'তথাকথিত' বল্‌লাম এইজন্য, যে সত্যিকারের ভদ্রমহিলা—professional-actress, আর সোনার পাথরবাটী একই জিনিষ।

(প্রবর্ত্তক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)　　শ্রীচারুচন্দ্র রায়

—

রংপুরে রামমোহন রায়

বাংলা-সরকারের দপ্তরখানায় অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি যে-সব চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে রংপুরে রামমোহনের কর্ম্মজীবনের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়; শুধু তাহাই নহে, রংপুরে আসিবার পূর্ব্বে রামমোহন কি কার্য্য করিতেন, তাহারও ইঙ্গিত এই চিঠিগুলিতে বর্ত্তমান।

রামমোহনকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া, রংপুরের কালেক্টর ডিগবী সাহেব বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর সেক্রেটারীকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন,—

"আপনার গত মাসের ২৩শে [নবেম্বর] তারিখের পত্রের নির্দেশ-মত, এই আপিসের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান গোলাম শা'র...পদে আমি রামমোহন রায়কে নিযুক্ত করিয়াছি। রামমোহন অতি সম্ভ্রান্ত বংশ-জাত, বিশেষ সুশিক্ষিত এবং দেওয়ানের কার্য্য পরিচালন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহাকে আমি বহুকাল ধরিয়া জানি, সেই হেতু আমি মনে করি, তিনি সাধুতা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম-সহকারে দেওয়ানের কার্য্য চালাইতে পারিবেন।" (১৮০৯, ৫ই ডিসেম্বর)...

রংপুর কালেক্টরের পত্রের উত্তরে বোর্ড জানিতে চাহিলেন, কাহার অধীনে এবং কোন্ সরকারী কার্য্যে রামমোহন রায় কর্ম্ম করিয়াছেন... বোর্ডকে লিখিত ডিগবীর পত্র,—

"আপনার এই মাসের ১২ই [১৪ই ?] তারিখের পত্রের উত্তরে বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে সসম্মানে নিবেদন করিতেছি যে, যখন আমি রামগড় জেলায় অস্থায়িভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলাম, তখন রামমোহন রায়—এই আপিসের দেওয়ান-পদের জন্য যাঁহাকে সুপারিশ করিয়াছি—আমার অধীনে তিন মাস যাবৎ ফৌজদারী আদালতের শেরিস্তাদারের কাজ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে এবং আমার যশোহরের কালেক্টররূপে কার্য্যকালে, কোম্পানীর আইন-কানুন ও হিসাবপত্র সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের জ্ঞানের যে পরিচয় পাই, এবং তাঁহার সহিত পাঁচ বৎসরের পরিচয়ের ফলে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি কালেক্টরের আপিসের দেওয়ান-পদের বিশেষ উপযুক্ত।" (৩০শে ডিসেম্বর, ১৮০৯)

পত্রখানিতে প্রকাশ, ডিগবী যখন রামগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন তাঁহার অধীনে রামমোহন তিনমাসের জন্য ফৌজদারী আদালতে শেরিস্তাদারের কাজ করিয়াছিলেন। কোন্ সময় ডিগবী রামগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট হন, সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ নহে। ১৮০৫, ৯ই মে হইতে ১৮০৭ সালের শেষাশেষি পর্য্যন্ত ডিগবী প্রধানতঃ রামগড় জেলা-কোর্টের রেজিষ্টার ছিলেন। ১৮০৬ আগষ্ট মাসে রামগড়ের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট—মিলার সাহেব পীড়িত হইয়া পড়িলে, বোর্ড ২১শে আগষ্ট তারিখে রেজিষ্টার ডিগবীকে রামগড়ের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করিবারও ক্ষমতা দেন। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে আর-থ্যাকারে (R. Thackeray) রামগড়ের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে ডিগবী ১৮ই অক্টোবর তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া, পূর্ব্বপদে কাজ করিতে থাকেন।

বি-ক্রিস্‌প তখন বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর অস্থায়ী সভাপতি ও পুরাতন সদস্য। তিনি ডিগবীর প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন এবং মন্তব্য করিলেন,—"শুনিয়াছি, ডিগবী যে-লোকের হইয়া সুপারিশ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে ঢাকা-জালালপুরের-অস্থায়ী কালেক্টর মিঃ উডফোর্ডের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। রামগড়ে শেরিস্তাদাররূপে কার্য্যকালে রামমোহনের আচরণ-সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যও আমার কানে আসিয়াছে। এ অবস্থায় রংপুরের দেওয়ান-পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবে মত দিতে আমি অনিচ্ছুক। বাস্তবিকপক্ষে, আপত্তি-হিসাবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন ফৌজদারী আদালত রাজস্ব-বিভাগীয় কার্য্যের পক্ষে জ্ঞানলাভের শিক্ষাস্থল নয়, এবং রামগড়ের আদালতে তাঁহার তিন মাস কাল শেরিস্তাদারের কার্য্য রাজস্ব-বিভাগের গুরু দায়িত্বপূর্ণ দেওয়ান-পদ প্রাপ্তির যোগ্যতারূপে নিশ্চয়ই বিবেচিত হইতে পারে না।"...

সভাপতির মন্তব্যটি হইতে অনেক নূতন কথার সন্ধান মিলিতেছে। কেন কালেক্টর ডিগবীর উচ্চপ্রশংসা উপেক্ষা করিয়া বোর্ড রামমোহনকে দেওয়ানের পদ দিতে অসম্মত হন, তাহার উত্তর কোন লেখকই দিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে। টমাস উডফোর্ডের (Thomas Woodforde) অধীনে রামমোহনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিরূপে চাকরির কথাও এতদিন কাহারও জানা ছিল না। টমাস উডফোর্ড ১৮০২, ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ১৮০৩, ১৪ই মে—এই পাঁচমাস ঢাকা-জালালপুরে অস্থায়ী কালেক্টরের কাজ করেন। বিলাতে অবস্থানকালে বোধ হয় এই উডফোর্ড-পরিবারেরই সহিত রামমোহনের পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। ১৮০৪ আগষ্ট মাসে ডিগবী সাহেব ঢাকা সিটি কোর্টের সহকারী রেজিষ্টার নিযুক্ত হন। পুব সম্ভব ঢাকাতেই রামমোহনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়।

যাহা হউক সভাপতির আপত্তিতে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ রামমোহনকে দেওয়ান-পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।...

রামমোহনের উপর ডিগবী সাহেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না,—বোর্ডের পত্রের প্রতিবাদ করিয়া, রামমোহনকে দেওয়ানী দিবার জন্য পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন,—

"আমি আপনার ১০ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বোর্ড আমার সুপারিশ এতই তুচ্ছ মনে করেন যে, রামমোহন রায়ের চরিত্র-সম্বন্ধে এমন অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ এবং তাঁহার অতি উচ্চ গুণগ্রামের বিবৃতি-সত্ত্বেও বোর্ড মৎকর্ত্তৃক তাঁহার দেওয়ান-পদে নিয়োগে আপত্তি করিলেন।

"আপনার পত্রের প্রথম অংশ পড়িয়া মনে হয়, প্রস্তাবিত পদে রামমোহন রায়ের নিয়োগের মঞ্জুরীতে বোর্ডের অসম্মতির একটি কারণ এই,—দেওয়ান-পদ-সংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহে অনভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহারা তাঁহাকে ঐ পদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অনুপযুক্ত মনে করেন। গত মাসের ৩০শে তারিখের পত্রে আমি জানাই, যশোহর জেলায় অস্থায়ী কালেক্টর হিসাবে আমি যখন কাজ করিতেছিলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত মুন্‌শীরূপে কার্য্য করিবার কালে তিনি রাজস্ব-আদায়ের আইন-কানুন ও সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন; আমি ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই সমস্ত আপত্তি দূর হইবে। আরও আমি না জানাইয়া পারিতেছি না, কখনও সরকারী কাজ করেন নাই এমন লোকদের কালেক্টরীর দেওয়ান-পদে নিয়োগ বোর্ড সমর্থন করিয়াছেন,—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে।

আমি যে লোকটির নাম প্রস্তাব করিয়াছি, তাঁহার চরিত্র ও গুণপনা সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল্‌-কুজ্জাৎ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সীর প্রধান মুন্‌শী, এবং ঐ সকল বিভাগের অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট খোঁজ লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করি।" (৩১ জানুয়ারী, ১৮১০)...

১৮০৭, ২৩শে ডিসেম্বর ডিগবী অস্থায়িভাবে যশোহর জেলার কালেক্টরের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি ছয়মাস কাল—১৮০৮, ৯ই জুন পর্য্যন্ত ছিলেন। সুতরাং এই সময়েই রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী মুন্‌শীরূপে যশোহরে অবস্থান করেন। যশোহর ত্যাগ করিয়া, ডিগবী রেজিষ্টারের পদে ভাগলপুর গমন করেন। রামমোহনও যে এই সময় (১৮০৯) ভাগলপুরে ছিলেন, সরকারী কাগজপত্রে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। ভাগলপুরেও রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অধীন বাঙালী কর্ম্মচারীর অনুকূলে ইংরেজ সিবিলিয়ানের এরূপ উচ্চগুণগান বড় সুলভ নহে,—বিশেষতঃ সে যুগে। কিন্তু বোর্ড-অফ-রেভিনিউ তাঁহাদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিলেন না।...

রামমোহনের নিয়োগ-সম্বন্ধে লেখালেখি করিয়া যে কোন ফল হইবে না, তাহা বুঝিয়া ডিগবী দেওয়ান-পদের জন্য অন্য লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস পরে বোর্ডকে জানাইলেন,—

"বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য আমি মুন্‌শী হেমায়েৎ উল্লাকে আপাততঃ অস্থায়িভাবে এই আপিসের দেওয়ানের পদে মনোনীত করিয়াছি।" (২৮শে মার্চ্চ, ১৮১১)...

বোর্ড হেমায়েৎ-উল্লাকে দেওয়ান-পদে পাকা করিলেন। (১৮১১, ১৯শে এপ্রিল)

তাহা হইলে স্পষ্ট বোঝা গেল, রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে রংপুরের দেওয়ান হন নাই, তবে নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় দেড় বৎসরকাল অস্থায়িভাবে এই পদে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র। এই দেওয়ান-পদের বেতন তখনকার দিনে দেড়শত টাকার বেশী ছিল না...

১৮১৪ সালের শেষাশেষি ডিগবী সাহেব কিছুদিনের ছুটিতে বিলাত গমন করিলেন। ঐ বৎসরে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

(ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩৬) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাস-চর্চ্চা

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইতিহাস-বিদ্যা ভারতবর্ষে আদর ও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অথর্ববেদের পঞ্চদশ খণ্ডে আমরা সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। পরবর্ত্তিকালে শতপথব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতিতে ইতিহাস বিশিষ্ট বিদ্যাসমূহের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ ও শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র ইতিহাসকে বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণ স্পষ্টতঃ পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে যজ্ঞের হোতা প্রতিদিন একটি করিয়া দশদিনে দশটি বিশেষ বিদ্যার বিষয়ে আলাপন করিতেন। সারা বৎসর ধরিয়া এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে যে দশটি বিদ্যার পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইত ইতিহাস তাহার অন্যতম। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাস একটি বিশিষ্ট বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত এই 'ইতিহাস' বিদ্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি কি প্রকার ছিল, তাহা ঠিক জানিবার কোন উপায় নাই।...কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস বিদ্যার ব্যাপক ও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কৌটিল্য ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব ও ইতিহাস এই পাঁচটিকে বেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপর ইতিহাসের সংজ্ঞানির্দ্দেশ করে বলিয়াছেন, "পুরাণমিতিবৃত্ত মাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্ম্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ" অর্থাৎ পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র এই সমুদয় ইতিহাস। কৌটিল্য এখানে ঐ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থসমূহের সমষ্টি, অথবা যে কোনও গ্রন্থে ঐ সমুদয়ের আলোচনা থাকে তাহাকেই ইতিহাসরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা বলা শক্ত।...একই গ্রন্থে উক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অসম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে একাধারে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র সকলের আলোচনা আছে।

সে যাহাই হউক ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমরা ইতিহাস বলিতে এখন যাহা বুঝি, কৌটিল্যের যুগে ইতিহাস তাহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ছিল। বর্ত্তমান কালে রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি যে-সমুদয় বিভিন্ন বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তৎকালে ইতিহাসের অন্তর্গত ছিল।...

বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস বলিতে আমরা কি বুঝি, অথবা কি বুঝা উচিত, তাহাও নিরূপণ করা সহজ নহে।...এখন জাতি বা সমাজ-বদ্ধ মনুষ্যের কার্য্যকলাপ আলোচনাই ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য।...দেশ ও কালের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া ইতিহাস এখন বিশ্ববিদ্যায় পরিণত হইয়াছে।...বৈজ্ঞানিক জগতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন অপরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার ও নভোমণ্ডল-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ হইয়াছে, এই নূতন ঐতিহাসিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে তেমনি অতীতের অন্ধকার আকাশ হইতে মিশর, সুমের, আকাড, হিটাইট এবং মধ্য-এশিয়ার ও আমেরিকার অজ্ঞাত ও অন্যান্য বিস্মৃত-প্রায় জাতির বিলুপ্ত কাহিনী জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে...ক্রীট, এশিয়া ও ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারায় প্রাচীন গ্রীস-সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ধারণা অনেকাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।...

যে হিসাবে গ্রীস রোম ও চীনদেশের ইতিহাস আছে, সে হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই। গ্রীস্ রোম চীন ও আরব জাতি ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ভারতবর্ষে কিন্তু এই সমুদয় অথবা অন্য কোন জাতির তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নাই।... আমাদের অতীত ইতিহাস সত্য করিয়া জানিবার আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও সাহস এখনও আমাদের জাতীয় জীবনে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই। এখনও আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে স্বরচিত কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতেই ভালবাসি, নির্ম্মম সত্যের সম্মুখীন হইতে সঙ্কুচিত হই।...

বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাস-আলোচনার কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই যে সংকীর্ণ সমাজ বা ভূখণ্ডে লেখকের জন্ম তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই এই সমুদয় সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য, সত্য নির্ণয় গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র।.. লেখকের জাতি ও বাসস্থান অনুসারে সেন রাজগণ পর্য্যায়ক্রমে বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য ও সদ্গোপ জাতিতে জন্মলাভ করিতেছেন এবং তাঁহাদের রাজধানী কখনও পদ্মার পারে কখনও রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্রে দেখিলাম, সমুদ্রগুপ্তের 'কর্ত্তৃপুর' বর্ত্তমান ঐতিহাসিক ব্যাকরণের নূতন সূত্র অনুসারে 'ত্রিপুরায়' রূপান্তরিত হইয়াছে।...পুরাণো পুঁথি নূতন করিয়া সৃষ্টি হইতেছে—একখানি 'কায়স্থপুরাণ'ও ইতিমধ্যেই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।...

অন্যান্য সভ্য জাতির সাহিত্যের তুলনায় বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস বিভাগ যে কত পশ্চাৎপদ, তাহা আর বিস্তার করিয়া আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই।...ইউরোপে ঐতিহাসিক আলোচনা ও সত্য-নির্ণয়ের যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে—যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রাচীন-মিশর ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতেই এই ইতিহাস রচিত হইবে। জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি অথবা প্রাচীন সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান সমর্থনের কল্পনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র সত্য-নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই ইতিহাস রচিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে, আবশ্যক হইলে, ঐতিহাসিক কোন স্থির-সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তে ঐ সিদ্ধান্তের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে যে সমুদয় প্রমাণ আছে, তাহার যথাযথ সমাবেশ করাই ঐ গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য হইবে।...

এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ বহু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য, সুতরাং দরিদ্র বঙ্গদেশে বহু গ্রন্থের প্রচার আপাততঃ সম্ভবপর মনে হয় না। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে মাসিকপত্রের প্রাচুর্য্য আছে, সুতরাং ইহার সাহায্যে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। প্রধানতঃ দুই উপায়ে মাসিকপত্র ঐতিহাসিক আলোচনার প্রণালী সুসংস্কৃত করিতে পারেন। নির্ব্বিচারে যে-কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গ্রহণ না করা এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের ও গ্রন্থের উপযুক্ত নিরপেক্ষ সমালোচনার ব্যবস্থা করা।...প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও গড়িয়া ওঠে নাই, গঠনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।...প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহ, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক মাত্রেই ঐতিহাসিক নহেন। প্রত্নতত্ত্বের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে তদনুযায়ী শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিক্ষা-দীক্ষাই ঐতিহাসিকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাঁহার পক্ষে অন্যবিধ শিক্ষা-দীক্ষারও আবশ্যক।...যাঁহারা এই সমুদয় প্রত্ন-সম্পদ আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাঁহারা অনেক সময়েই কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া তাঁহাদের আবিষ্কারের ক্ষুদ্র ভিত্তির উপর বিরাট ঐতিহাসিক সৌধ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস করেন; ইহাতে ইতিহাসের সাহায্য না হইয়া বিপরীত ফলই প্রসব করে।... ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের দুইজন সুপ্রসিদ্ধ মহারথীকে ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। স্পুনার সাহেব প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে কতকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভের ভগ্নাংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া ভারতে জরথুস্ত্র যুগের ইতিহাস নামক যে বিশাল ঐতিহাসিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া জগতকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিলেন, তাহা কয়েকদিনের মধ্যেই জল-বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া তাহার নির্ম্মাতাকে উপহাসের পাত্র করিয়াছিল। ফলে যে প্রত্নসম্পদ স্পুনার সাহেবের ন্যায্য দান তাহার সম্বন্ধেও বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশে সুবিচার হয় নাই। প্রত্ন-বিভাগের আর-এক মহারথী ফুরার সাহেব অনেক প্রত্ন-সম্পদের বর্ণনা করিয়াছিলেন যাহা পরে অলীক প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার অবনতির কারণ ঘটাইয়াছিল।...

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি এই অন্ধভক্তি ইতিহাস-রচনার প্রধান বাধা। ইহার ফলে আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াও স্বচ্ছ হয় না এবং দৃষ্টি দূরদর্শী হইলেও উদার হয় না।...

একদিকে যেমন দেশীয় রাজনৈতিকগণ ইতিহাসকে তাঁহাদের সহায়-স্বরূপ করিতে চান, অপরদিকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শের অনুকূল করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছেন। পরলোকগত ভিন্সেণ্ট স্মিথের ভারতবর্ষের ইতিহাসই ঐ বিষয়ের প্রধান পুস্তক। সম্প্রতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রাচীন ভারতেতিহাসের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কিছু ইতিহাস চর্চ্চা হয়, তাহা প্রধানতঃ এই দুই গ্রন্থ এবং উহাদের অনুকরণকারী অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থের লেখকগণই প্রাচীন ভারত-বর্ষের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বর্ত্তমান ইংরেজ অধিকৃত হৃতবল দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষকে কিছুতেই মনশ্চক্ষু হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য মূলতঃ একই। কেম্ব্রিজ ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যে, ইংরেজ জাতি যদি ভারতবর্ষে কোনও যুদ্ধে হৃতবল হয় অথবা তাহার রণতরী পরাভূত হয়, তবে ভারতের রণভীরু জাতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত অন্য কোন জাতির পদানত হইবেই। ভিন্সেণ্ট স্মিথও হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহার এক অপ্রকৃত বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং ইংরেজ জাতি এদেশে যে হিতকারী অবাধ প্রভুত্ব (benevolent

despotism) প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষকে সুদৃঢ় হস্তে (iron grasp) শাসন করিতেছেন, তাহার অভাবে পুনরায় ভারতবর্ষের উক্ত প্রকার দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। এই সকল স্পষ্ট উক্তি ব্যতীত গ্রন্থের আগাগোড়া রচনা-প্রণালী আলোচনা করিলেও এই সমুদয় গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত মানসিক বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথের গ্রন্থে আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের বিবরণ প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা ব্যাপী, অথচ ভারতের বাহিরে ভারতবাসিগণ যে রাজশক্তি ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহার উল্লেখ মাত্র নাই।...

ইউরোপে এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ইতিহাস-আলোচনার যে জোয়ার বহিয়াছিল এখন তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। এই সমুদয় পণ্ডিতদলের মধ্যে যাঁহারা সম্প্রতি মৃত অথবা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদের স্থলে আর সেই সেই অনুপাতে নবীন পণ্ডিতের আবির্ভাব হইতেছে না। ম্যাক্সমূলার, বুহ্‌লার, কিলহর্ণের স্থান পূর্ণ হয় নাই, লুডার্স, য়্যাকোবি, লেভি, ফুসে, ম্যাক্‌ডোনাল্ড, টমাস ও র‍্যাপসনের স্থান যে পূর্ণ হইবে তাহার সম্ভাবনাও অতি অল্প। কারণ বর্ত্তমান ইউরোপে আর এ বিষয়ে পূর্ব্বের মত চর্চ্চা নাই। নাবালকের সম্পত্তি সযত্নে রক্ষা ও বর্দ্ধিত করিয়া ট্রাষ্টিগণ যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত অধিকারীকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন, ইউরোপও তেমনি ভারত-বাসীকে এই নূতন বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাই যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।...

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ইতিহাস দুইটি বিশিষ্ট দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। কোন জলাশয়ের সহিত তুলনা করিলে বলা যায় যে ইহার ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিলে আমাদের দৃষ্টি আর কেবলমাত্র হিমালয় ও কুমারিকার মধ্যে আবদ্ধ ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকে না।... এখন বৃহত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। শাস্ত্রে বলে নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ। আশ্চর্য্য এই যে, ঐতিহাসিক যাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, জনপ্রবাদ "Indo-China, Further India, Indonesia" প্রভৃতি নামের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের সহিত ঐ সমুদয় দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্মৃতি অব্যাহত রাখিয়াছে।

সম্প্রতি যবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও প্রাচীন চম্পা কাম্বোজ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। এই সমুদয় দেশের প্রত্ন-সম্পদ প্রত্যক্ষ করিলে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার এক নূতন দিক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।...যবদ্বীপে অথবা কাম্বোজে যে-সমুদয় বিশাল স্তূপ মন্দির প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে এমন কিছু যে প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল এখনও তাহার কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। সনাতন হিন্দুধর্ম্মও যে অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তাহাও এই সমুদয় দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়।...

এইরূপে যেমন একদিকে ভারতেতিহাসের ব্যাপ্তি প্রসার লাভ করিয়াছে অপর দিকে তেমনি ইহার গভীরতারও বৃদ্ধি হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতে আর্য্যগণের উপনিবেশ হইতেই কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস আরব্ধ হইত, সম্প্রতি মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে ভূগর্ভ-খননের ফলে প্রাক্ আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনার সূচনা হইয়াছে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের দৃষ্টি-কার্পণ্যের ফলে এতদিন ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত ও সঠিক বিবরণ জানিবার উপায় ছিল না। অল্প কয়েকদিন হইল এ-সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।...

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যে দুই নূতন ধারা সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইল, ইহার উভয়েরই মূলে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা বিদ্যমান। যে বৃহত্তর ভারত সমিতির যত্নে বৃহত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনার প্রথম প্রবর্ত্তনা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালীরই প্রতিষ্ঠান, আর বাঙ্গালী রাখালদাস বানার্জিই মহেঞ্জোদারোর প্রত্ন-সম্পদ আবিষ্কার করেন। ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব করার অধিকার আছে। মহেঞ্জো-দারোতে যে-সমুদয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে উৎকীর্ণ সাঙ্কে-তিক চিহ্ন অথবা চিত্রলিপি এখনও পর্য্যন্ত পঠিত হয় নাই। যেদিন ইহা পঠিত হইবে, সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের এক রুদ্ধ কক্ষ খুলিয়া যাইবে। প্রাচীন মিসর ও আসিরীয় দেশের চিত্রলিপি ও কীলকাকৃতি অক্ষরের পাঠ উদ্ধারকল্পে পণ্ডিতপ্রবর শাঁপোলিও ও রলিনসন যাহা করিয়াছেন, মহেঞ্জোদারোর অনাবিষ্কৃত লিপির সমস্যা সমাধান করিয়া তদনুরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার প্রশস্ত পথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী—আষাঢ়, ১৩৩৬) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ভারতে চলচ্চিত্র ফিল্‌ম প্রস্তুতের কারবার

পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলচ্চিত্রের ব্যবসায় যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে কষ্ট করিয়া উপন্যাস-গল্পাদি পাঠ করিয়া বা নাটকের অভিনয় দেখিয়া লোকে আর চিত্তবিনোদন করিতে চাহিবে না। সামান্য ব্যয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপন্যাস গল্প পাঠ বা নাটকের অভিনয় দর্শনের আনন্দ চলচ্চিত্রের সাহায্যেই সাধারণে লাভ করিতেছে। লোকের অবসর কম; পরিশ্রমলব্ধ আনন্দ উপভোগে প্রবৃত্তি নাই; অথচ উপভোগের ইচ্ছাটুকু যায় নাই। মানুষের সভ্যতা যে পথে চলিতেছে তাহাতে মনে হয়, যে, এই চলচ্চিত্র ব্যবসায় ক্রমশই উন্নতি লাভ করিবে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাহায্য লইয়াই ভারতবর্ষ চলচ্চিত্রের আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। অভিনয় ও ফিল্‌ম তোলা হইতেছিল

...সেই সকল দেশেই। এদেশের বায়োস্কোপ কোম্পানী-গুলি কেবলমাত্র প্রদর্শনীর মালিক হিসাবে ঐ সকল ফিল্ম ভাড়া করিয়া আনিয়া অথবা ক্রয় করিয়া নিজেরা অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশবাসীদেরও অর্থোপায়ের সুবিধা করিয়া দিতেছিলেন। এখন পর্য্যন্তও অধিকাংশ বায়োস্কোপে এরূপেই ব্যবসা চলিতেছে।

চলচ্চিত্রের প্রসার যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে দেশের বহু লোকের অন্নসংস্থান এই ব্যবসায়ের সাহায্যে হইতে পারে, দুই-একজন সাহসী ব্যবসায়ীর মনে এরূপ চিন্তা যে না উঠিয়াছে তাহা নহে। ফলে এক দুই করিয়া অনেকগুলি ফিল্ম প্রস্তুতের কারবার এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেকার-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিয়াছে। এখনও এই ব্যবসায়ের বহুবিধ অন্তরায় আছে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় সেগুলি ক্রমশঃ দূর হইতেছে।

শতমুখ রাবণ

সতী সুলোচনা

বোম্বাইয়ের "দি হিন্দুস্থান সিনেমা ফিল্ম্ কোম্পানী" এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী বলিয়া সম্মান দাবী করেন। 'পাইওনিয়ার' হিসাবে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মূল্য আছে।

বোম্বাইয়ের এই কোম্পানীটি সম্ভবতঃ এশিয়ারও প্রাচীনতম কারবার। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের অনেকেই ফিল্ম প্রস্তুত কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। "দি হিন্দুস্থান সিনেমা ফিল্ম কোম্পানী"র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ডি, জি, ফাল্কেই সর্ব্বপ্রথমে এই কার্য্যে সফল হন।

শ্রীযুক্ত ডি, জি, ফাল্‌কে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তিনি সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার ভাণ্ডারকরের অধীনে ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে আর্টিষ্ট ও ফোটোগ্রাফার হিসাবে কাজ করিতেন। ভারতবর্ষে ফিল্‌ম্ ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তিনি এই চাকরি ত্যাগ করেন ও ইংলণ্ডে গিয়া বিখ্যাত চলচ্চিত্র ক্যামেরা আবিষ্কারক মিঃ উইলিয়ামসনের নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। গোমণ্ট চিত্রশালার সহিত তিনি কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। তিনি ইতালী ও জার্ম্মানীর চিত্রশালা-সমূহও পরিদর্শন করিয়া আসেন এবং ফিল্‌ম্ প্রস্তুতের বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ আগফা কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে কাজ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ

১৯১২ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং বোম্বাই সহরের সন্নিকটবর্ত্তী দাদার নামক স্থানে একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমটা অর্থাভাবে বিশেষ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তবুও বহুকষ্টে পাঁচ বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ১৯১৩ সালে তিনি তাঁহার প্রথম ফিলম 'হরিশ্চন্দ্র' বোম্বাই বিভাগের সর্ব্বত্র প্রদর্শন করেন। এই পাঁচ বৎসরে তিনি প্রায় পঁচিশটি ফিল্‌ম্ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তখন পর্য্যন্ত তিনি তেমন খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই।

১৯১৭ সালে 'লঙ্কাদহন' নামক সুবিখ্যাত ফিল্‌ম্ প্রদর্শিত হইতেই তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তদবধি তাঁহার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

তেছে। ১৯১৭ সালেই এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১২ বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানী শতাধিক ফিল্ম প্রস্তুত করিয়াছেন। ফিল্মগুলির অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প লইয়া রচিত বলিয়া পশ্চিম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ছাড়াও বিদেশে বহুস্থলে, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ইটালী, মেসোপটেমিয়া, মরিশস্, মালয় প্রভৃতি দেশেও প্রদর্শিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণার্জ্জুন', 'কালীয়দমন' ও 'লঙ্কাদহন' এই তিনটি ফিল্ম-এর প্রত্যেকটি পঞ্চাশটির অধিক বিক্রীত হইয়াছে।

কৃষ্ণার্জ্জুন

ভক্ত প্রহ্লাদ

বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর চিত্রশালা নাসিক সহরে অবস্থিত। বোম্বাই সহরে কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয়, মাদ্রাজে শাখা কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই কোম্পানী কলিকাতায় ৩৪ নং এজরা ষ্ট্রীটে একটি কেন্দ্র খুলিয়াছেন।

আমরা এই কোম্পানীর কয়েকটি ফিল্মের চিত্র এখানে প্রকাশ করিলাম।

"দি হিন্দুস্থান সিনেমা ফিল্ম কোম্পানী" স্থাপিত হইবার পর আরও অনেকগুলি ফিল্ম প্রস্তুতের কারবার এদেশে খোলা হইয়াছে। বিখ্যাত জে. এফ. ম্যাডান কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চলচ্চিত্র তোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বাঙালীদের তত্ত্বাবধানেও দুই একটি ফিল্ম কোম্পানী খোলা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে হাজার হাজার লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। এদেশে এ ব্যবসায় সাফল্য লাভ করিলে বেকার-সমস্যার কিছু সমাধান হইবে।

—ব

নারীর দেবতা

শ্রীপঞ্চানন দত্ত

সে স্বল্পভাষী। সর্ব্বাণী কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া লইলেন—হয় দেমাকী নয় মিটমিটে ডান; নইলে রাঁধুনীর অতখানি ঘোমটা অমন গোমড়া মুখ!

ভাগ্নে-বধূ বনলতা বল্লে—না মামীমা, খুব ভাল স্বভাব, দুদিন থাকলেই দেখ্‌তে পাবেন।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সর্ব্বাণী বল্লেন—বউমা ছেলেমানুষ। মানুষ চেনবার দেরী ঢের।

বনলতা বল্লে—ভদ্দর ঘরের মেয়ে নেহাৎ অদৃষ্টের ফেরে…সর্ব্বাণী বল্লেন—হয়, অমন হয়। মানুষের দশ দশা। তখন মাটির মত হ'য়ে থাকতে হয়, নইলে মানুষের দয়া হবে কেন?

মামীমার মনুষ্য-চরিত্রের অভিজ্ঞতায় বনলতা মনে মনে হাসে।

ভাতের থালা হাতে শান্তি রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেই সর্ব্বাণী বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁগা, তুমি কেমন বামুনের মেয়ে গা? ছেলেটাকে তো গাণ্ডেপিণ্ডে গেলালে, রান্নাঘরে চুপি চুপি নিজে খেলে কিনা কে জানে, আবার এক থালা নিয়ে যাচ্ছো!

শান্তি থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সর্ব্বাণী থামিলেন না, বল্লেন—তুমি যে দু-হাতে লুট করতে আরম্ভ করেছ বাছা। বউমা নেহাৎ উদাসীন আত্মক সতীশ।

সকড়ি হাতের প্রকোষ্ঠের দ্বারা শান্তি ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিল—হয়ত অশ্রুর উৎস ঢাকা দিবার জন্য। দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া মামীমা চলিয়া গেলেন। বনলতা চুপি চুপি খিড়কীর দরজায় আসিয়া পথ আগলাইয়া বলিল—ছিঃ, কান্না কিসের ভাই? অমন অনেকে অনেক কথা বলে—মুখে চাপা দেওয়া যায় না তো?

ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে শান্তি বলিল—কিন্তু চোর…

নিজের আঁচলে চোখ মুছাইয়া দিয়া বনলতা বলিল—উনি দুদিনের কুটুম, চলে যাবেন।

শান্তি চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই বলাই মারমুখো হইয়া বলে—হারামজাদী, এত বেলা অবধি মানুষ খালি পেটে থাকতে পারে?

শান্তি বল্লে—কি করি? পরের চাকরী, কাজ শেষ না হ'লে তারা আমায় ছাড়বে কেন?

সে কথা আমি শুনতে চাইনে…দুপুরের আগে আমার ভাত চাই।

শান্তি কথা কহিল না—পরাধীনতার, পরমুখাপেক্ষার অবস্থা সে যে বেশ জানে!

আসন ও জলের গেলাস থালার পাশে রাখিয়া শান্তি বলে—খাবে এস।

বলাই গো গ্রাসে সব ক'টি ভাত উদরসাৎ করিল।

ঘরে এমন কিছু ছিল না যে, শান্তি দাঁতে কাটিয়া মুখে একটু জল দেয়। তবুও তার মুখ অবিকৃত। এক ঘটী জল ঢক্ ঢক্ করিয়া গলায় ঢালিয়া স্বামীকে বলিল—বেরিয়ে যাবার সময় ঘরটায় চাবি দিয়ে যেও।

বলাই বলিল—পয়সা সব ফুরিয়ে গেছে, অন্ততঃ চারটে দিয়ে যা।

সবিস্ময়ে শান্তি বলিল—সে কি গো! মাসের এখনও কুড়ি দিন হয়নি মাইনের টাকা এনে দিয়েচি। এরই মধ্যে ফুরুলে পাবো কোথায়?

পুরু ঠোঁট উল্টাইয়া বলাই বলিল—ওঃ ভারী তো টাকা! সে তো মাত্র চারটে—খরচ করলে ক'দিন থাকে বল্‌তো?

—সে তো জানি, কিন্তু আমাদের যে ঐ সম্বল। এখন আবার আমায় কে দেবে বল দিকিন্?

—সে আমি জানিনি। ভাল চাস্ তো বাপের সুপুত্তুর হয়ে এনে দে, নইলে জানিস তো আমাকে?

ঘরের আগড়ের বাঁশটা চাপিয়া ধরিয়া শান্তি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

—কি দাঁড়িয়ে রইলি যে?···যা—যেথান থেকে পারিস পয়সা এনে দে।

বাধ্য হইয়া শান্তি বলিল—দেখ না যদি দোকানী আজ ধার দেয়?

হি হি করিয়া বিশ্রী হাসিয়া বলাই বলিল—গাঁজার দোকানটা তোর বাবার জমিদারী কিনা!

ত্রস্তপদে শান্তি চলিয়া গেল

উচ্চকণ্ঠে বলাই বলিল—পয়সা না পেলে আজ তোকে আস্ত রাখবো না কিন্তু।—

শান্তি ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল—সর্ব্বাণী খোকাকে কোলে লইয়া বনলতার সহিত গল্প করিতেছে।

সে সভয়ে পিছাইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল ও আঁচল বিছাইয়া পুত্রকে কোলে লইয়া শয়ন করিল।

কত কথাই না বুকের মাঝে তোলপাড় করিয়া গভীর শ্বাস নাসাপথে বাহির হইয়া গেল।

পশ্চিমের ছোট গবাক্ষ দিয়া এক ঝলক রৌদ্র রান্নাঘরের দেওয়ালে আসিয়া পড়িল।

শান্তি চমকিয়া উঠিল। ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও তাহারা গল্পরত। সে ব্যস্ত হইয়া উঠে—আর একটু পরেই যে গাঁজার দোকান বন্ধ হইয়া যাইবে! নেশা না পাইলে যে মানুষের পেট ফুলিয়া যাইবে।

বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ছেলেকে রাখিয়া সে অতিষ্ঠভাবে ঘরের সম্মুখে দৌড়াইয়া গেল। কিন্তু সর্ব্বাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কণ্ঠে বাক্য ফুটিল না। ফিরিয়া হতাশভাবে পা মেলিয়া সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল।

মন শুনে না, শুধুই অকল্যাণটা মানসপটে খেলিয়া যায়। একবার পশ্চিমে-হেলা সূর্য্যের দিকে ও একবার ঘরের ভিতর সে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখে ও উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে।

সর্ব্বাণীর সাক্ষাতে বনলতাকে সে-কথা বলিতে তার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

স্বামীর সঙ্গীন অবস্থা চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

ঘোষেদের বাড়ী ঢুকিয়া ব্যস্তকণ্ঠে গৃহিণীকে সে বলিল—দিদি, চারটে পয়সা হাওলাত দেবে?

শ্লেষের হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটাইয়া গৃহিণী বলিল—হাওলাৎ! গাঁজার আড্ডা ছেড়ে বলা কাজে বেরিয়েছে নাকি লো?

শান্তি আপনার কথার মারপ্যাঁচে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকে; তবুও মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা চাহিতে পারে না।

গৃহিণী বলিল—সে তেমন বান্দাই নয় যে ঘর ছেড়ে বেরুবে! তাহ'লে গাঁজা খাবে কে···তোকে ঠেঙাবে কে?

অসহ্য হয়। শান্তি ত্রস্তপদে চলিয়া আসে।

আবার মনে জাগে স্বামীর কথা। সে আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া ছুটে, ভিক্ষার কথা মনে জাগে··· মন তিক্ত হইয়া যায়।

পুনরায় ছুটিল বনলতার ঘরের দিকে।

তখনও তাদের গল্প শেষ হয় নাই।

সে মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ও বলিল—বৌদি, চারটে পয়সা এখনি দিতে হবে!

সর্ব্বাণী স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—একি! জমিদারীর খাজনা এখানে জমা আছে নাকি যে দে বল্লেই দিতে হবে!

বনলতার বুঝিতে বাকী থাকে না। বলিল—বোধ হয় বিশেষ কোনো দরকার—

বাক্স হইতে আনি বাহির করিয়া শান্তির হাতে সে গুঁজিয়া দিল।

সর্ব্বাণীর কোনো কথা কানে যাইবার আগে শান্তি গৃহ ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিল—তীরের মত।

শান্তিকে দেখিয়া বলাই চীৎকার করিয়া উঠিল—তোর জন্যে কি আমি মরবো হারামজাদী?

শান্তির চুলের ঝুঁটি সে সজোরে চাপিয়া ধরিল।

আনিটা স্বামীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া শান্তি বলিল—ছুটে যাও—এখনও দোকান বন্ধ হয়নি নিশ্চয়।

ছাড়িয়া দিয়া বলাই ছুটিতে থাকে।

সূর্য্যদেবের দিকে চাহিয়া সজলনয়নে শান্তি বলিল—দেখ ঠাকুর, যেন দোকান খোলা থাকতেই পৌঁছুতে পারে!

বনলতার পুত্রের অন্নপ্রাশন।

বেলা বাড়ে। রান্নায় ব্যস্ত শান্তির মনে পড়ে স্বামীর কথা।

এক ফাঁকে বনলতাকে পাইয়া সে বলিল—বৌদি, তার শরীরটা বড় ভাল নয়। যদি কিছু মনে না কর তো দুটী ভাত লুকিয়ে শিগ্‌গীর তাকে পৌঁছে দিয়ে আসি!

বনলতা বিস্মিতমুখে বলে—না দিদি, সে তো হবে না। তিনি যে এখানে খাবেন—নেমন্তন্ন করেছি—আমার গুন্তীর বামুন।

শান্তি মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এই সহৃদয়া নারীটির প্রতি তার মন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া পড়ে।

নূতন কাপড় পরিয়া মাকে ডাকিতে ডাকিতে শিবু আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিতেই শান্তি সভয়ে চাহিয়া বলিল—একি রে হতভাগা,—কার কাপড় প'রে এলি?

প্রফুল্ল মুখে শিবু বলিল—মামাবাবু দিলে।

কৃতজ্ঞতায় শান্তির মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—দিদি, তোমরা না থাকলে—

বাধা দিয়া কৃত্রিম ক্রুদ্ধকণ্ঠে বনলতা বলিল—ফের! উনি যদি এসব কথা শোনেন বড্ড রাগ করবেন।

শান্তির চোখের কোণ অশ্রুভারে টল টল করিতে থাকে।

বনলতা চলিয়া গেল।

শান্তি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ধরা-গলায় পুত্রকে বলিল—বাড়ীতে যাও বাবা, কাপড় দেখাও গে।

বলাইয়ের সুমতি হইয়াছে। সেদিন রাত্রে স্ত্রীকে বলিল—শান্তি, তোর কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। পরশু আমি মঙ্গলের ঊষা বুধে পা দিয়ে বেলেঘাটায় যাই, বাবুকে ধরে কাজটায় লাগিগে। হপ্তাখানেকের খোরাকীর মত দু-টাকা আর রেল-ভাড়ার পাঁচ আনা কোন রকমে জোগাড় করে দে।

শান্তির বক্ষ আশার আনন্দে ফুলিয়া উঠে। টাকা জোগাড়ের কোনও উপায় চিন্তা না করিয়াই সে বলিল—বেশ, যেখান থেকে পারি আমি তোমাকে টাকা জোগাড় করে দেব। বেটাছেলে বেকার বসে থাকলে লোকের কাছে মান থাকে না।

বলাই চুপ করিয়া শুনে।

শান্তি মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নিকট মিনতি জানায়—মা মঙ্গলচণ্ডী...বাবা হরি...সুমতি দাও। বাবা সত্যনারায়ণ, এবার মন পেতে চাকরি করলে তোমার সিন্নি দেব।

বুধবার অতি প্রত্যূষে স্বামীর হাতে আড়াইটি টাকা ও চাদরের খুঁটে দেবতার আশীর্ব্বাদী পুষ্প বাঁধিয়া দিয়া শান্তি বলাইকে বিদায় দিতে দিতে বলিল—খুব সাবধানে থেক, দিনকাল বড্ড খারাপ পড়েছে।

বলাই চলিয়া গেল।

শান্তির মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, নেত্র-কোণে অশ্রু চক্ চক্ করিতে লাগিল। সে শিবুকে বক্ষে চাপিয়া স্খলিত কণ্ঠে ডাকে—খোকন!

শিবু সাড়া দেয়—কেন মা?

—খোকন...বাবা!

—কি মা?...একি তুই কাঁদচিস্?

—খোকন...খোকন...আরও নিবিড়ভাবে পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া শান্তি গৃহে প্রবেশ করে ও শয্যায় লুটাইয়া পড়ে।

শিবু মাকে নাড়া দিয়া ভগ্নস্বরে ডাকিতে থাকে—মা...ওমা...মাগো!

শান্তি রন্ধন করে, কিন্তু উচাটন মন ফাঁকা ঘরখানার আশে-পাশে ও গৃহছাড়া স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়। সে আপনার মনে কতই না কল্পনার জাল বুনে...হয়ত বা রঙীন্। অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে।

আবার ভাবে—যে মানুষ, হয়ত সারাদিনটা উপবাসেই কাটিয়া যাইবে!

মন তিক্ততায় ভরিয়া যায়, বুকের ভিতর টন্ টন্ করে। অসহায়ভাবে হাতের মুঠার উপর কপোল রক্ষা করিয়া সে গভীর চিন্তা করিতে থাকে।

নিজের তুষ্টির জন্য সে ভালর দিকটা ধরিয়া চলিতে চাহে, কিন্তু মন শুনে না, উল্টা পথেই ছুটিয়া যায়।

শান্তি মনে মনে কাতর হইয়া পড়ে।

সেদিন সতীশ ক্রোধে উষ্ণ হইয়া উঠিল—এতবড় মাছটা খাবো বলে সখ্ করে নিয়ে এলুম···তাই কিনা অখাদ্য হ'য়েচে!

বিরক্তির সহিত সে মাছের মুড়াটা পাতের পার্শ্বে ফেলিয়া দেয়। সর্ব্বাণী শান্তির পুত্রের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে উঠানের উপর আনিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—এতটুকু ছেলে কি চোর রে বাবা—এতবড় নারকেলটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলো!

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—চুরি করিনি মামাবাবু! গাছ থেকে পড়তে···

ঠাস্ করিয়া গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া সর্ব্বাণী বলিলেন—ফের্ মিথ্যে কথা, চোর মুখপোড়া!

রান্নাঘরে মূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্ট শান্তির বুক ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। গণ্ডূষ করিয়া সতীশ আসন হইতে উঠিয়া পড়িল।

পাতের দিকে চাহিয়া মামীমার স্নেহ উথলিয়া উঠিল। হাঁ করিয়া তিনি বলিলেন—একি রে, খাওয়া যে হ'ল না···সব ভাত··

রাগতস্বরে সতীশ বলিল—ছাইভস্ম কি খাবো? না আছে ডালে নুন · না হ'য়েছে মাছের কালিয়ার স্বাদ!

সে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া আচমন করিতে চলিয়া গেল।

প্রত্যুত্তরের অভাবে সর্ব্বাণীর ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। বলিলেন—মায়ে বেটায় যে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে যাচ্ছিস তা আমার চোখ এড়ায়নি। সাবি বামনীর চোখে ধূলো দিতে পারে এমন লোক তো এখনো দেখিনি। ভাল চাস্ তো এখুনি বেরিয়ে যা।

শান্তির সাড়া মিলিল না।

গৃহের ভিতর হইতে বনলতা দাওয়ায় ছুটিয়া আসিল, বলিল—মামীমা...মামীমা থামুন···থামুন···

ততক্ষণে সর্ব্বাণী শান্তির হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছেন।

ক্ষোভে দুঃখে বনলতা ছুটিয়া গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

সতীশের চমক ভাঙিল; বলিল,—তাইতো···তাইতো···

সর্ব্বাণী হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন—এর মধ্যে তাইতো কিছু নেই সতীশ! তুই যে পরের দ্বারা নষ্ট হ'য়ে যাবি তা আমি চোখে দেখতে পারবো না।

সতীশ চুপ করিয়া একবার ঘরের দিকে ও একবার মামীমার দিকে চাহিতে লাগিল।

সর্ব্বাণী বলিলেন—মেয়ের সংসার গুছিয়ে দিয়ে এসেছি, আবার তোরটা ঘাড়ে এসে চাপলো দেখছি।

সতীশ কিছু বলিতে পাবে না বটে, কিন্তু মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে।

কেন···কে জানে?

শান্তির মনে হইল, প্রতি পদক্ষেপ যেন তাহার বুকের উপরই বাজিতেছে···বড়ই কঠিন—বড়ই বেদনাদায়ক।

ক্রোধের বাষ্প সর্ব্বাণীর মাথায় চড়িয়া বসে, বলিলেন,—বেরো হারামজাদা মাগী!···ঘরগুষ্টী কাঁড়ি কাঁড়ি গিলবেন··মাইনে নিবেন···তার উপর আজ এটা কাল সেটা ভিক্ষে আছে আর রাঁধবার বেলা হাতে পক্ষাঘাত হয়। যা এখুনি বেরিয়ে যা!

সর্ব্বাণী দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন।

শান্তির মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়, কণ্ঠ শুকাইয়া উঠে। সে নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

শান্তি পাড়া হইতে চারিটি মুড়ি চাহিয়া আনিয়া পুত্রকে খাওয়াইয়া নিজে অভুক্ত অবস্থায় শুইয়া পড়িল।

গৃহের মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠে—শান্তির মনরাজ্যেরই অনুরূপ।

শুইয়া শুইয়া সে স্বামীর কার্য্যগতিকের ছবি মনোমধ্যে আঁকিতে চেষ্টা করে। নাসাপথে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসে, ফাঁকা মনে কান্নার সুর ধ্বনিত হয়।

আগড়ে মৃদু আঘাত হইল, শান্তি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কণ্ঠে বাক্য সরে না, কান খাড়া করিয়া পুনরাঘাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

—বউ দোর খোল্!

শান্তির শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আগড় খুলিয়া শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল—কি গো!

বলাই বলিল—চাকরী হ'ল না তাই আজই চলে এলুম।

মদের উগ্র গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। শান্তির বুঝিতে বাকী রহিল না, তবুও জিজ্ঞাসা করিল সমস্ত দিনটা খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

—না···হ্যাঁ...

শান্তি আর কিছু বলিতে পারিল না, দুঃখের দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

বলাই নিঃশব্দে গিয়া শয্যায় এলাইয়া পড়িল।

শান্তির চোখের কোণ উপ্‌চাইয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকিল।

শান্তি কাজে যায় না দেখিয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল—আজ কাজে গেলিনে যে?

নিম্নকণ্ঠে শান্তি বলিল—তারা জবাব দিয়েচে।

বলাই বলিল—তবে!

সে কথার উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ পরে শান্তি বলিল—কালকের রাহাখরচ বাদ বাকীটা দিয়ে চাল-ডাল বাজার করে আনো, নইলে আর অন্য উপায় নেই।

বলাই কথা কহে না।

শান্তির বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে থাকে। শুষ্কমুখে বলিল—কিগো, চুপ করে আছ কেন?

বলাই বাড়ীর বাহিরে যাইতে চায়।

শান্তি পথ আগলাইয়া বলিল—চলে গেলে তো চল্‌বে না?

বলাই বলিল—একটা পয়সাও নেই, খরচ হ'য়ে গেছে।

—এঁ্যা!···

বলাই চলিয়া যায়·হয়তো সমস্ত দিনটার মত।

শান্তি দাওয়ায় খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকিল।

সন্ধ্যায়ও আহার জোটে না—উপায়হীন।

ছেলেটা ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করে।

শান্তির মনে হইল এমনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বামীও এখুনি ছুটিয়া আসিবে, তাহার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। সে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়ে।

ষ্টেশন হইতে প্রত্যাবৃত্ত বহু যাত্রী তাহার চক্ষে পড়িল। তাহার মনে ভিক্ষাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল; হস্তটা প্রসারণ করিতে গিয়া পুনরায় টানিয়া বুকের উপর জোরে চাপিয়া ধরিল। ফিরিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনে জাগিল ক্ষুধাকাতর স্বামীপুত্রের কথা।

কে যেন ভিতর হইতে জোর করিয়া হাত সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল। সে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া আড়ষ্টবৎ দাঁড়াইয়া থাকে, কণ্ঠে প্রার্থনার বাণী ফুটিল না।

সহৃদয় যাত্রীরা এক-আধটা পয়সা ভিক্ষা দিয়া যায়। অন্য কেহ কেহ ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি হানিয়া বা দুটা বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া গেল।

হাত ভরিয়া উঠে না, তবুও শান্তি আশায় দাঁড়াইয়া থাকে।

চার আনার পয়সা হাতে রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরিয়া শান্তি দেখে' দাওয়ায় বসিয়া বলাই ঝিমাইতেছে, তাহার সম্মুখে মাটির উপর ঘুমন্ত পুত্র। জ্যোৎস্নার সুষমা তাহার সারা অঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে।

দুঃখের বাষ্পে প্রাণ ভরিয়া যায়। সংরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল—ওগো, একবার দোকানে যাও।

রক্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া বলাই বলিল—কেন?

—চাল-ডাল নিয়ে এস···ফুটিয়ে দি।

জড়িতস্বরে বলাই বলিল—পয়সা নেই।

—এই নাও—শান্তি চার আনা দাওয়ার উপর রাখিয়া দিল।

বলাইয়ের জমাট নেশায় পয়সাগুলা একটা ধাক্কা মারিয়া দেয়। সে রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কোথা পেলি এত রাত্রে?

লজ্জার কথাটা কণ্ঠে আসিলেও শান্তির ওষ্ঠে বাধিয়া যায়। সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

বলাইয়ের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে সগর্জ্জনে

ঝংকার করিয়া উঠিল—তোকে বলতে হবে এত রাত্রে পয়সা এল কি করে?

শান্তি বলিল—এতদিন যা করনি...আজ সে কথা জানবার এত আগ্রহ কেন বল তো? যেখান থেকে যেমন করে হোক তোমাদের অভাব না হলেই তো হল?

বলাইয়ের মগজে রক্ত চড়িয়া গেল। ক্ষিপ্ত চীৎকারে সে বলিল—হারামজাদী বেশ্যা...তুই এমনি করে এতদিন আমায় ভুলিয়ে রেখেছিস্? বেরো হারামজাদী এখুনি আমার সুমুখ থেকে!

কথাটা শেলের মত বক্ষে লাগিতেই কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তি বলিল—দুঃখদারিদ্র্য না বুঝে স্বামী হ'য়ে এমন কথাটা তুমি বল্লে?

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বলাই সজোরে পিঁড়িটা শান্তির দিকে ছুঁড়িয়া দিল ও বলিল—বেরো হারামজাদী!

—দিদি!—বলিয়া ডাকিয়া বনলতা ঠিক সেই সময়ে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

—মাগো!—বলিয়া শান্তি মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

—কি হ'ল?—বলিয়া বনলতা শান্তির নিকট ছুটিয়া গেল ও দেখিল তার নাক মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে। সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বলাইয়ের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল। জল আনিয়া চোখে মুখে দিতে গিয়া দেখে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

সভয়ে সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিল।

বনলতা মূর্ত্তিমতী করুণার মত বসিয়া রহিল—কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল অঝোর ঝরে; আর মনে জাগিতে লাগিল হায় হতভাগ্য পুরুষ, চিরদিন ঝুটো দেবতা সেজেই রইলে—নারীর মর্য্যাদা বুঝলে না!

যুগাবর্ত্তে পারস্য

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ অথবা শক্তিশালী জাতির নামানুসরণে যে সমগ্র দেশের নামকরণ হইয়া থাকে, ইহা ইতিহাসে বিরল নহে। পারস্য দেশের নামোৎপত্তিও সেইরূপে।

আজকাল যাহাকে পারস্য বলা হয়, তাহার পূর্ব্বতন নাম ইরাণ। ইহারই অন্তর্গত ফার্স (Fars) প্রদেশে পরপর এমনি দুইটি শক্তিশালী রাজশক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের রাজত্বে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সভ্যতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সমস্ত দেশটাই গৌরবের সঙ্গে এই প্রদেশের নাম গ্রহণ করিয়াছে। ক্রমে সে-নাম বিকৃত হইয়া অধুনাতন নামে পরিণত হইয়াছে।

সমগ্র পারস্য দেশটি একটি মালভূমি বিশেষ। সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা সর্ব্বত্র সমান নয়, কিন্তু সাধারণভাবে মোটামুটি দুই হাজার ফুট বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দেশের আব্‌হাওয়া শীতের সময় যেমন অতিশীত, গ্রীষ্মকালে তেমনি অতিগ্রীষ্ম। অবশ্য স্থান বিশেষের অবস্থিতি অনুসারে ইহার কিছু তারতম্য হইয়া থাকে। সীমান্ত প্রদেশগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই পর্ব্বত-সমাকীর্ণ, মাঝে মাঝে দুই একটি অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্ম আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহাও সর্ব্বত্র সুগম নহে। দেশের প্রায় মধ্যস্থলে একটি বিরাট মরুভূমি। এই মরুভূমি থাকায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, অধিবাসীদের চরিত্র ও ধর্ম্ম প্রভৃতির সময়ে সময়ে যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই মরুভূমিকে সমগ্রভাবে লুট (Lut) বলা হয়—আর ইহার লবণাক্ত স্থানগুলি কাভির (Kavir) নামে অভিহিত।

দেশে নদীর একান্ত অভাব। এমন কি সমগ্র পারস্যে নাম করিবার যোগ্য বড় নদী একটিও নাই। বৃষ্টি

সাধারণতঃ হয় না বলিলেও চলে, কিন্তু কৃষিকার্য্য অধিবাসী-দের জীবনযাত্রার একমাত্র উপায় বলিয়া কৃত্রিম সেচন-

নাখশী রুস্তমে 'একিমিনিড' নৃপতিদের সমাধি

প্রণালীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাও দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ্রদের নাম 'উরুমিয়া'—সমুদ্রতল হইতে ইহা প্রায় চারি হাজার একশত ফিট উপরে। এই হ্রদ হইতে বার মাইল দূরবর্ত্তী 'উরুমিয়া' নগরে প্রাচীন ইরাণের ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান জরথুস্ত্রদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

পারস্যের প্রাচীনতম ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৫১ সনে। এই সময়ে ফার্স প্রদেশে Achaemenian রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। Achaemenes নামক কোনও ব্যক্তি এ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই সময়কার অনেক পুরাতন শিলালিপি, মূর্ত্তি, স্তম্ভ, প্রভৃতি এখনও সে যুগের চিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অনেক-ক্ষেত্রে সে সকলের উপর নৃপতিদিগের রাজত্ব-কাহিনী ও গৌরবকথা নানাভাবে উৎকীর্ণ। আজকাল তাহা হইতে ক্রমশঃ অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতেছে।

এই যুগের নৃপতিদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ও সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন Cyrus ও Darius। এই দরায়ুসের সময়েই (৫২১ খৃঃ পূর্ব্ব) পারস্যে প্রথম "darie" নামক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। ইহার ওজন ১৩০ গ্রেণ।

এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তখন রাজারা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন ছিলেন। প্রজাদিগের জীবন-মরণ, শাসন-সংরক্ষণ সমস্তই তাঁহাদের হস্তে একান্তভাবে ন্যস্ত ছিল; শুধু একটিমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল এই যে, একবার কোনও আদেশ প্রদান করিয়া ফেলিলে, পরে, তাহা আর বদলাইতে পারিতেন না।

পারস্যে কেবলমাত্র রাজাকে কেন্দ্র করিয়াই যে সভ্যতা ও জাতীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজারা সাধারণতঃ যুদ্ধ ও মৃগয়াতে ব্যস্ত থাকিতেন—এবং যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া যাইতেন।

লোকের দেহে শক্তি ও মনে সাহস যথেষ্ট ছিল। শিশুকাল হইতে প্রত্যেক পারসিককে অশ্বারোহণ, তীর-সংযোজন ও সত্য কথন এই তিনটি শিক্ষা দেওয়া হইত—কাজেই দেশে প্রকৃত বীরের অভাব ছিল না।

অর্থের অপব্যবহার তাহাদের চিরন্তন স্বভাব, আর

পার্সিপলিসে দরায়ুসের প্রাসাদ

জাঁক-জমক ও হাস্যকৌতুকে তাহাদের প্রখর আসক্তি! কিন্তু তাহাদের আতিথেয়তা ও উদারতার প্রাচুর্য্য আজ পর্য্যন্তও লক্ষিত হইয়া থাকে। দেশে পুরুষের বহুবিবাহে বাধা ছিল না এবং ভদ্রসমাজের মধ্যে স্ত্রীলোক-দিগকে অন্তঃপুরে অবরোধ করিবার প্রথাও ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

দেশে তখন ভগবান জরথুস্ত্রদেবের প্রচারিত মজ্‌দা

...। তাঁহার ধর্ম মূলতঃ নিরাকার ভক্তিমার্গের। এই অগ্নিহোত্রী মহাপুরুষের পন্থার মধ্য দিয়া দেশে জাতীয়তার বন্ধন গড়িয়া উঠে। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'আবেস্তা' পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠভাগ 'গাথা' নামে অভিহিত। এইভাগে ভগবান জরথুস্ত্রের বাণী যথাযথ ও অবিকৃত আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উপাদানের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে ইহা একটি আদর্শ ধর্ম।

এই মহাপুরুষের জন্ম ও ধর্ম-প্রচার খৃঃ পূঃ সাতশত সালে হইয়াছে বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন। অন্যমতে ইঁহার জন্ম তাহারও বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছে। সে যাহাই হউক, ইনি যে সমগ্র আর্য্যজাতির প্রথম অবতার সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার মত কিছু নাই। সে হিসাবে 'আবেস্তা'কে আমাদের পঞ্চম বেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'আবেস্তা'র ভাষাকে 'জেন্দ' আখ্যা দেওয়া হয়; মোটামুটি ইহা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতের মত।

এই Achaemenian নৃপতিদের রাজত্বকালেই মহাবীর আলেকজান্দার পারস্য জয় করেন। খৃঃ পূঃ

'একিমিনিয়' যুগের শিলমোহর—সিংহশিকারের দৃশ্য

৩৩১ সনে তিনি ভারতবর্ষের পথে পারস্যে আসিয়া উপনীত হন এবং প্রায় অক্লেশে দেশের রাজশক্তিকে বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। রাজাদিগের সামর্থ্য এমনিই অল্প ছিল; বিশেষতঃ এই দিগ্‌বিজয়ী বীরের গতি প্রতিরোধ করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল।

আলেকজান্দার অনেক দেশ জয় করিলেন সত্য, কিন্তু তাহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যে

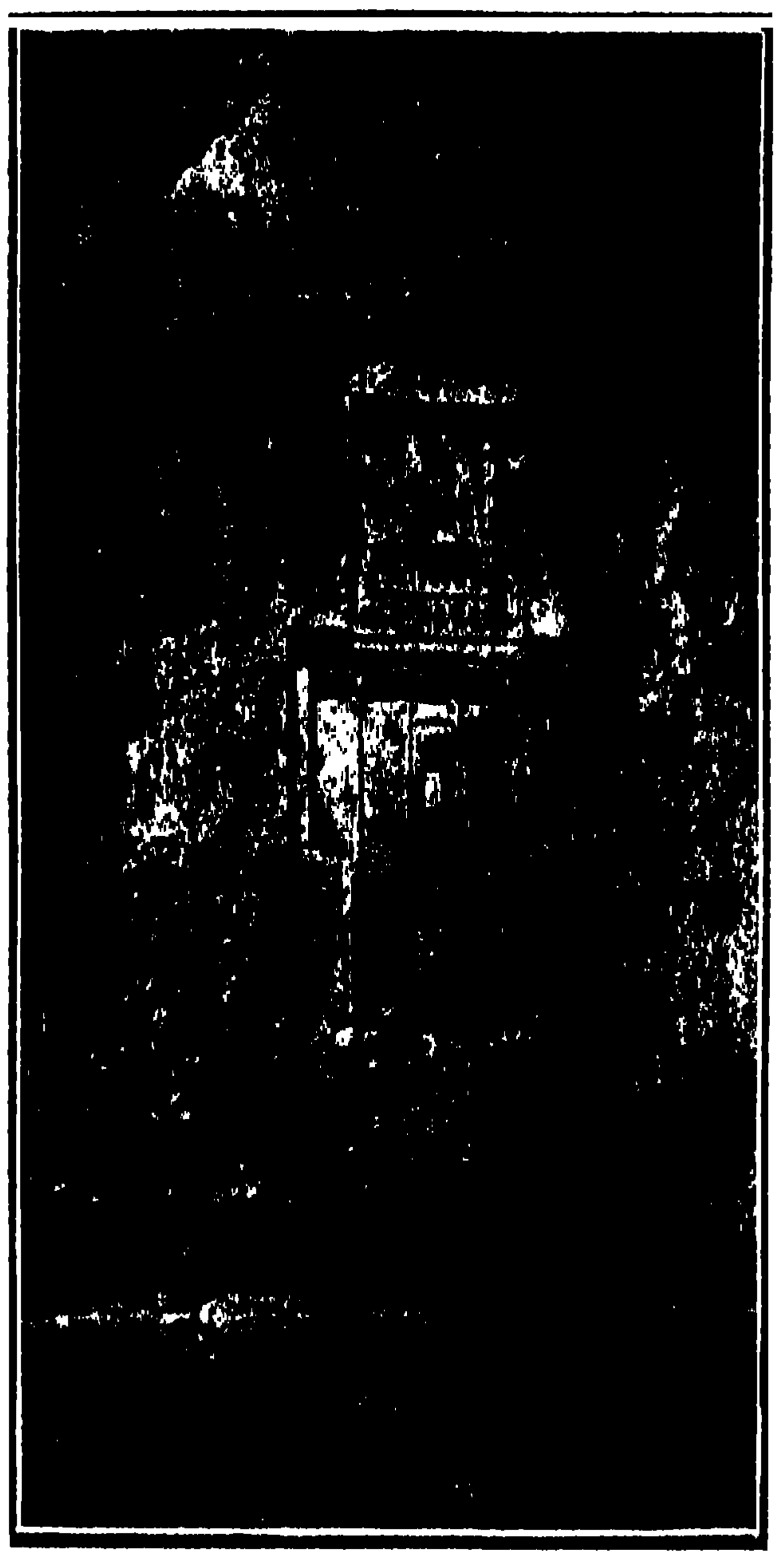

নখশী রুস্তম

গ্রীকদিগের রাজ্য ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু যোগ্য চালকের অভাবে ক্রমশঃ তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আবার পারস্য-নৃপতিদের রাজত্বই পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই রাজ্য স্থাপন করিল সেসানিয়ান (Sassanian) বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বতন Achaemenianদের বংশধর। এই সেসানিয়ান যুগে, পারস্যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এক অখণ্ড জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া, প্রত্যেক পারস্যবাসীই এই যুগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে, এমন কি ইহাকে গর্ব্বের স্থল বলিয়া মনে করে।

যদিও পারস্য বহুদিন গ্রীকদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তথাপি ইহার সভ্যতার উপরে গ্রীক-সভ্যতার বিশেষ কোনও ছাপ পড়িতে পারে নাই। যেটুকু পড়িয়াছিল, তাহাও অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, কাজেই দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অচিরেই নষ্ট হইয়া গেল। প্রাচীন গ্রীক ও পারসিকদের আচার-ব্যবহার ও সভ্যতায় তারতম্য

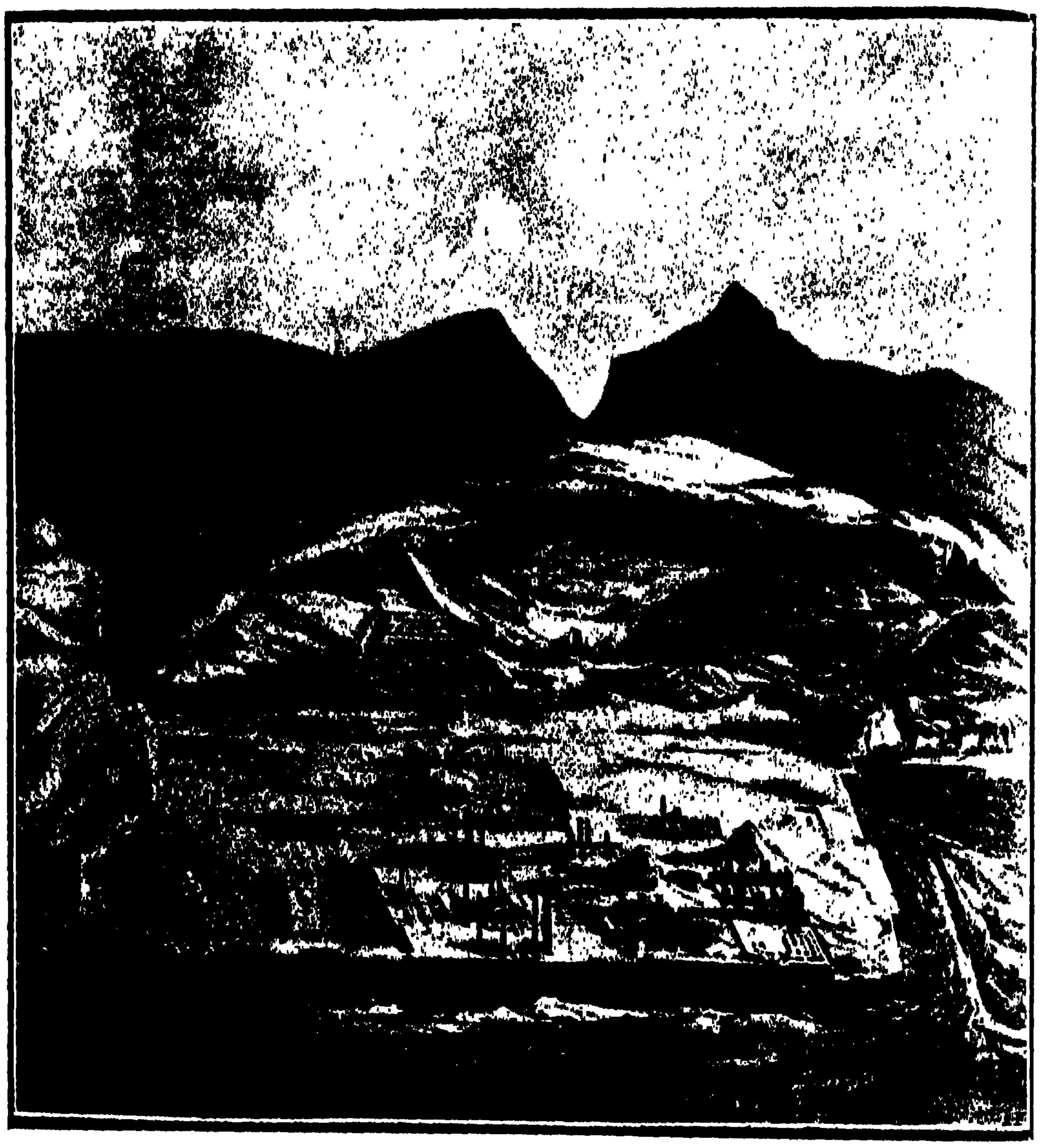

পার্সিপলিসের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য

বিশেষ ছিলনা ; কাজেই একে অন্তের মধ্যে নূতন কোনও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ঘটাইতে পারে নাই।

সেসানিয়ান যুগের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আবার ভগবান জরথুস্ত্রদেবের 'মজদা' ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। আবার দেশে বাণিজ্য, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতির প্রচার ও প্রসার পাইতে লাগিল। এই যুগে যে-সকল নৃপতি অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামতি নসীরবান্ অন্যতম। ইহার রাজত্বকাল ৫৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে। ইনি এত বিচক্ষণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন যে, প্রজাবৃন্দ ইহাকে 'ন্যায়নিষ্ঠ নসীরবান্' বলিত। ইহার রাজত্বকালে আরবদেশে ইস্‌লাম্‌-ধর্ম্ম সংস্থাপক মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ পরে বলিতেন, 'আমার বহুভাগ্যে এমন নৃপতির রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।'

মহামতি নসীরবানের রাজত্বকালে, দেশে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকারে বিভিন্নদেশের সংস্পর্শ আসিয়া পড়ে। ইহার মন্ত্রী (কাহারও কাহারও মতে চিকিৎসক) বুজুরমিহ্‌র (Buzurmihr) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইনি পহ্লবী ভাষায় সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদ করেন—বইখানির নাম হয় 'কলীল ওয়া দিম্‌না'। পরে উহা আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া পড়ে।

এই 'কলীল ওয়া দিম্‌নার' ভূমিকায় Buzurmihr যে আপনার জীবনচরিত লিখিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের দুঃখবাদের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। বিশেষতঃ তাহার মধ্যে পারস্য দেশের তদানীন্তন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে ; সে হিসাবে ইহার মূল্য সমধিক।

দেশের ভাষা ছিল পহ্‌ল্‌বী। তখনকার গ্রন্থ সমস্ত এই ভাষাতেই সৃষ্টি হয়। পহ্‌ল্‌বী পুরাতন পারশী ভাষার তদানীন্তন যুগসংস্করণ ; এই ভাষা শিক্ষা একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার ছিল। এই সময়কার অনেক শিলালিপি, গ্রন্থ প্রভৃতি সে যুগের সভ্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। তার অগ্নিহোত্রীদের ধর্ম্ম-পুস্তক ও সাহিত্য প্রভৃতি চারিদিক হইতে এযুগকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

ক্রমে সেসানিয়ান রাজবংশের শক্তি কমিয়া আসিল। ইতিমধ্যে আরবদেশে ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদকে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী জাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। মহম্মদ আরবদিগের মধ্যে জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অন্তর্মুখী বিপ্লবকে বহির্মুখী করিতে চেষ্টা পাইলেন এবং পারস্ত-বিজয়ে পাঠাইলেন মুসলিম্ সৈন্যাধ্যক্ষ খলিদকে। সেসানিয়ান বংশে রাজা তখন তৃতীয় Yezdigird। ইঁহার রাজত্বের সময়ে রাজশক্তি এত দুর্ব্বল ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, মুসলিমদিগের নবশক্তির নিকট তো দূরের কথা, যে-কোনো শক্তির নিকটই ইহার পরাভব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সেসানিয়ান রাজ্য ভাঙিয়া নব মুসলিম রাজ্য সংস্থাপিত হইল। তারপর হইতে পারস্যের মুসলিম-যুগ আরম্ভ।

প্রথম চারিজন খলিফার রাজত্বই মুসলিমদিগের ধর্ম্মরাজ্যের যুগ। তখন ধর্ম্ম ও রাজ্য-শাসনভার খলিফার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই সময় নানাপ্রকার গোলযোগে রাজ্যে কখনও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে নাই। এই কয়জন খলিফার মৃত্যুও প্রায় গুপ্তঘাতকের হস্তেই হইয়াছে। অবশ্য দূরের রাজ্য বলিয়া পারস্যে এই গোলযোগের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু সেখানেও নানাপ্রকার সাময়িক বিপ্লবের অভাব ছিল না। পরিশেষে মুসলমানদিগের মধ্যে 'ওমায়াদ' বংশ বিজয়ী হইয়া রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করে।

পারস্যদেশ ক্রমে বিস্তীর্ণ মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি অংশ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই 'ওমায়াদ' বংশের রাজত্ব-সময়ে পারসিকদিগের প্রতি অত্যাচারের একশেষ হইত। ইহার প্রধান কারণ প্রথমতঃ পারস্যে তখন কেহই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহিত না, কাজেই ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিতে অনেক ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগের দরকার পড়িত। দ্বিতীয়তঃ, ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সকলেই প্রায় 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িত। 'ওমায়াদ' বংশ 'সুন্নী' সম্প্রদায়ভুক্ত; কাজেই উভয়দের মধ্যে রেষারেষি চিরন্তনভাবে চলিতে থাকিত। আমরা ইস্‌লামের এই 'সিয়া' ও 'সুন্নী' সম্প্রদায়ের বিরোধের কথা পরে বলিতে চেষ্টা করিব।

৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আব্বাসিদ বংশ মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইয়া পড়েন। এই বংশ প্রায় পাঁচশত বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন এবং ইঁহাদের সময়ে শুধু পারস্যে

পার্সিপলিসে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড—রাজা ও অর্দ্ধসিংহ অর্দ্ধ ড্রাগন মূর্ত্তি

কেন সমগ্র রাজ্যের ভিতর শাসন-শৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে দেশের সভ্যতা, শিক্ষা,

কলাশিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি হইতে থাকে এবং এই বিরাট্ রাজত্বকালের এক ভাগকে 'ইস্‌লামের স্বর্ণযুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত দরায়ুসের নামাঙ্কিত শিলমোহর

'আরব্যোপন্যাস'-এর সঙ্গে খলিফা হারুন্-অল্-রসীদের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। ইনি এই আব্বাসিদ বংশের নৃপতি। ইঁহার সময়ে দেশের ভিতরে একদিকে শান্তি যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল অন্যদিকে দেশের বাহিরেও যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা রাজ্যপ্রসারে রাজশক্তি মোটেই অপারগ ছিল না। এই বিচক্ষণ নৃপতির নাম শুধু গ্রন্থের মধ্য দিয়া অমর না থাকিলেও তিনি ইস্‌লামের রাজ্যবিস্তারে ও রাজত্ব-সংস্কারে যে অনুরাগ ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

এই বংশের অন্য একজন খলিফার নাম মামুন। ইঁহার সময়ে রাজ্যের সমৃদ্ধি, প্রতিপত্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও বাণিজ্যের এত প্রসার লাভ হইয়াছিল যে, ইঁহারই রাজত্বকালকে 'ইসলামের স্বর্ণযুগ' বলা হইয়া থাকে। এক কথায় ইস্‌লামের জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল এই যুগে।

এই যুগে পারস্যে অনেক কবি ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের রচনা ও চিন্তাধারা বিশ্বজগতে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। ইঁহারা পারস্যের একান্ত গৌরবের বস্তু। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমেই 'রুদাগির' নাম করিতে হয়। মুসলমান-বিজয়ের পর যে-সকল কবি পারস্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম। অল্-বিরুনি, আবিথেনা (আবু-আলি বিন্ সিনা) ও অল্-গজ্জালী এই যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। আবিথেনা ও অল্-গজ্জালীর বিদ্যাবত্তা ও খ্যাতি মুসলমান সাম্রাজ্য ছাপাইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আজও ইস্‌লাম সভ্যতা ইঁহাদিগকে লইয়াই গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। আবুল কাসেম, সাধারণতঃ ফির্দ্দৌসী নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ও নিজামী এই যুগের বিখ্যাত কবি। 'ওমর খৈয়াম'ও এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। Fitzgerald সাহেবের সুললিত ও সুরচিত অনুবাদের ব্যপদেশে ইনি আজ সমগ্র পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে একজন মহাকবি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইনি পারস্যে একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াই গণ্য ছিলেন; কবির সম্মান কোনোদিনই পান নাই। নিজামীর 'শিরি ফরহাদ্' ও 'লয়লা মজনুন্' কিংবা ফির্দ্দৌসীর 'শাহ্‌নামা' যদিও এখন বিশ্ববিশ্রুত তথাপি ওমর খৈয়ামের 'রুবাই' যে কাব্য-জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

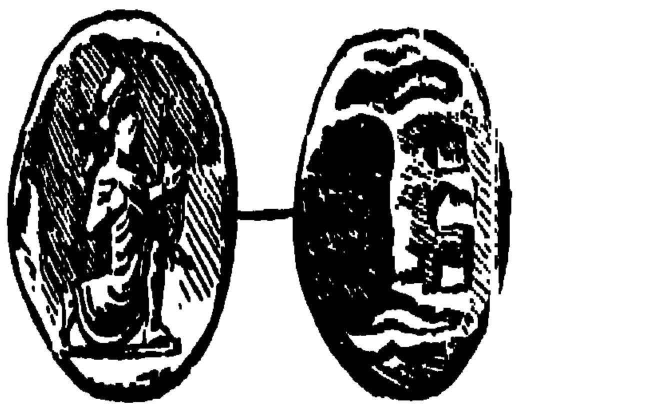

স্বর্ণ মুদ্রা

আব্বাসিদ রাজত্বের শেষের দিকে খলিফাদের ক্ষমতা ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। একদিকে দূরস্থিত রাজ্য শাসনের ক্ষমতা যেমন লোপ পাইতে লাগিল তেমন রাজ্যও ক্রমে ক্রমে বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিনায়কের শাসনাধীন হইয়া পড়িল। সে-সকল রাজ্যে না রহিল 'খলিফা'র কোনও প্রভাব, না রহিল দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিনায়কের কোনও ক্ষমতা। তারপর দেশ যতই বিভক্ত হইতে লাগিল—আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিগ্রহও ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

শুধু তাই নয়, উপর্য্যুপরি বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, বহিঃশত্রুদের মধ্যে মোগলদিগের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা বৃ

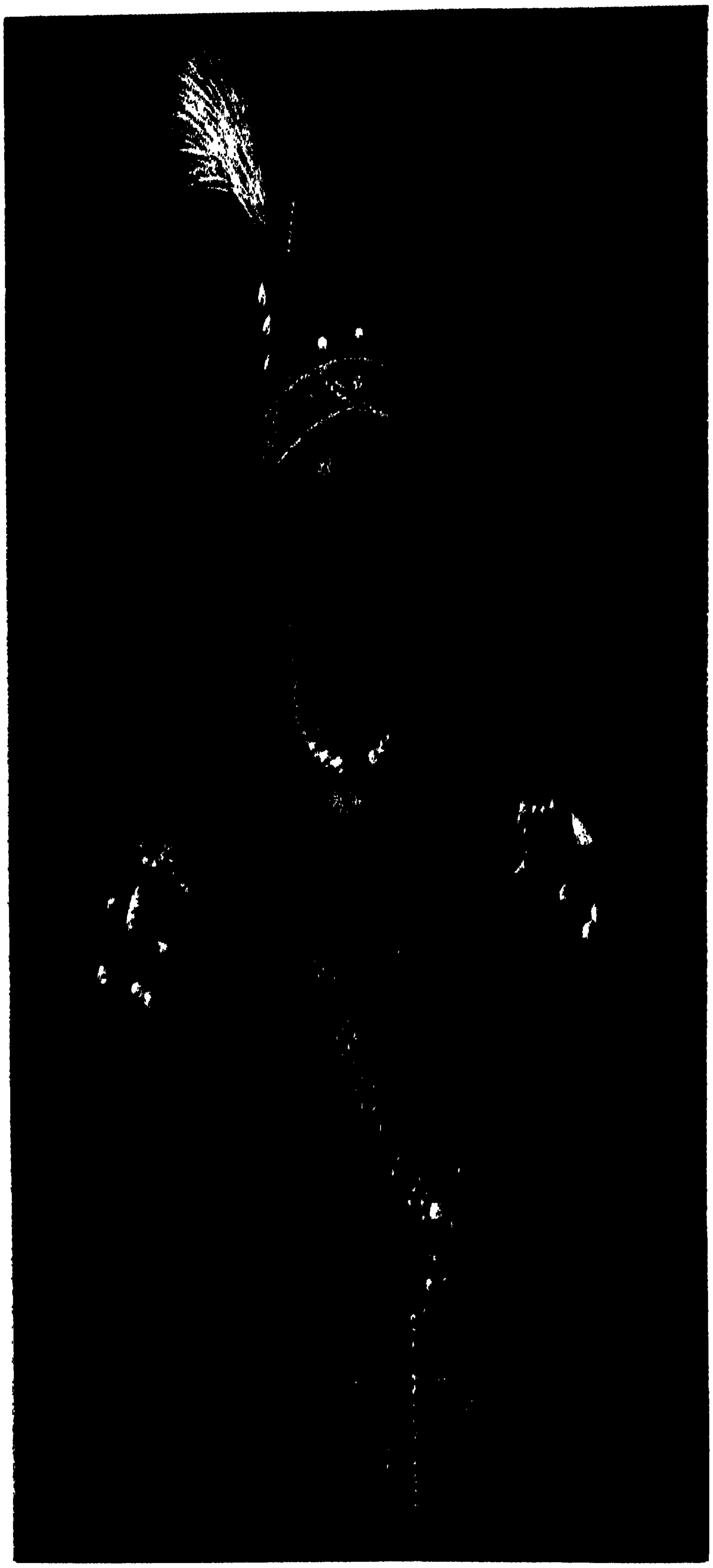

নাদির শাহ্
ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত একখানি প্রাচীন চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

পাইল। চেঙ্গিস খাঁ ইহাদের অধিনায়ক। পরিশেষে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হলাগু খাঁ রাজধানী বাগ্‌দাদ অবরোধ ও ধ্বংস করিয়া আব্‌বাসিদ বংশের পরিবর্ত্তে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার মৃত্যুর পরে প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মোগলেরা ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া পারস্যের সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিয়া ফেলিল।

ইসাসের যুদ্ধে আলেকজান্দার ও আর্টাজেরেক্সিস্

মোগলরাও যাযাবর জাতি। গোবি মরুভূমি ও বৈকাল হ্রদের মাঝে তাহাদের বসতি ছিল। কিন্তু পারস্যে তাহাদের রাজত্বও বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। শীঘ্রই তুর্কীরা আসিয়া পঙ্গপালের মত দেশ ছাইয়া ফেলিল। ইহাদের দলপতি ছিল তৈমুরলং।

এশিয়ার দিগ্‌বিজয়ী বীরদিগের মধ্যে ইউরোপে তৈমুরলংএর নামই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৈমুরলং ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পারস্যের কবিতায় তুর্কীদিগের সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয়, ইহারা একদিকে যেমন সুন্দর অন্যদিকে তেমনি ক্ষিপ্র ছিল।

তৈমুরের শক্তি ছিল অসাধারণ। সমগ্র পারস্যদেশ, মেসোপটেমিয়া, রাশিয়ার কতকাংশ আর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তই তাহার হস্তে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জয় করিবার মত অদম্য শক্তি থাকিলেও পরে তাহাকে রক্ষা করিবার মত শৃঙ্খলা তুর্কীদের ছিল না। তথাপি পারস্যে তৈমুরের বংশধরেরা

সম্রাট্ বাবর এই মোগল বংশের উজ্জ্বলমণি। ইনিই পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন আর ইহার কথা না বলিলে পারস্যের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে ইস্‌লাম ধর্ম্মের এক অভিনব শাখা গড়িয়া উঠে। ইহাদিগকে "সুফী" বলা হয়। সুফী বলিতে যাহারা উল পরিধান করে তাহাদিগকে বুঝায়। সুফীরা mystic; তাহাদের ধর্ম্মনীতি শুধু যে ইসলামের সহিত অমিল তাহা নহে, একেবারে একে অন্যের পরিপন্থী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই প্রথম প্রথম সুফীদিগকে ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ধরা হইত এবং এজন্য তাহাদিগকে যে কত প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, কতজনকে যে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষেত্রে আমাদের মন্‌সুর-অল্‌-হালাজের কথা মনে পড়ে। এই সাধক পুরুষ সাধনার অতি উচ্চস্তরে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, 'আন'ল্ হক্'—অর্থাৎ 'আমি সত্য' 'সোহহং'! কিন্তু এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় এবং তাঁহাকে জীবন্ত ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। সুফী কবিরা এই

মহাপুরুষকে কবিতার মধ্য দিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছে—পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের দুইটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,

"কসদ্ নকস্-ই আন'ল হক্' বর্জমিন্ খুন্—
চু মন্সুর অব্ কশি বর্দারঅম্ ইম্সব।"

সাসানিড যুগের রৌপ্যপাত্র—পঞ্চম বাহ্‌রাম সিংহ শিকার করিতেছেন

'যদি আজ রাত্রেই আমাকে মনসুরের মত হত্যা কর, তবে আমার রক্ত মাটিতে পড়িয়াও 'আন'ল হক্' এই কথা লিখিয়া রাখিবে।'

স্থফী ধর্মের মধ্যে সাধক ও ভগবানের মধ্যে যে ভালবাসার ভাব আছে তাহা ইস্‌লামের বিরোধী এবং ইহাই প্রায় সমস্ত বিবাদের মূল। ধর্মের বিচার যাঁহারা করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্থফী হইয়া পড়িতেন এবং এই স্থফী পন্থাকে কেন্দ্র করিয়াই যে ইস্‌লামের দর্শন-নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, একথা বলিলে কোনও মতেই অত্যুক্তি হয় না। এই স্থফীপন্থার উৎপত্তি-সম্বন্ধে চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা হয়।

ধর্মকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা অশিক্ষিত মনের কাজ; কিন্তু শিক্ষিত মন তাহার ভিতর অনেক জিনিষ পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। স্থফীপন্থাকে ইস্‌লাম চিরদিনই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া যে প্রকৃতপক্ষে ইস্‌লামের লোকগ্রাহী হইবার পথ রহিয়াছে একথা বলিতেই হইবে।

স্থফীপন্থার উৎপত্তির পরবর্ত্তীকালে পারস্যে যত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্থফী ছিলেন। 'বুস্তান' ও 'গুলিস্তান' রচয়িতা সাদী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও 'মস্‌নবী' রচয়িতা রুমি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হাফেজ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এবং তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে জামি পারস্যের তথা সমস্ত জগতের কাব্য-সম্পদ সমৃদ্ধ করেন। ইহাদের সকলের রচনাই এখন প্রায় বিশ্ববিশ্রুত, তবে সুরচিত অনুবাদের অভাবে হাফেজের রচনা যে ভারতবর্ষে আদরলাভ করিতে পারে নাই, ইহা দুঃখের কথা।

ক্রমে মোগলদিগের রাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ইহাদিগের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'সফাভি' বংশ আর একদিকে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং পরিশেষে

সাসানিড যুগের রৌপ্যপাত্র

তাহারা সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। এই বংশ প্রায় দুই শত বৎসর রাজত্ব করে। প্রাচ্যের স্থবিখ্যাত নৃপতিদিগের মধ্যে শাহ্ আব্বাস্ অন্যতম; ইনি এই

বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'সফাভি' বংশের রাজত্বকালে রাজধানী ইস্পাহান নগরে আসিয়া পড়ে।

কিন্তু দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার মত শক্তি ইহাদের ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া আফগান্ সর্দ্দারেরা প্রথমতঃ সীমান্ত প্রদেশে লুঠতরাজ, শেষে রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল; এবং ক্রমশঃ তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ দেশই অধিকার করিয়া ফেলিল। পারস্য আবার আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া আফগানদের অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল।

দেশকে আফ্গানদিগের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিলেন, নাদির কুলী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মহাবীর আপনার শক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ্ রূপে পারস্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। নাদির শাহ্ বীর ছিলেন বটে, কিন্তু নৃশংসতা তাঁহার অস্থিমজ্জার সঙ্গে গ্রথিত ছিল;—যে সকল দেশে নাদির কুলী একবার পদার্পণ করিয়াছেন তথায় সর্ব্বত্র তাঁহার নির্দ্দয়তার চিহ্ন তিনি রাখিয়া আসিয়াছেন—সে অত্যাচার ও অন্যায় কোনও দেশ ভুলিয়া যাইতে পারে না; এমন কি তাহার

সাসানিড যুগের রৌপ্যপাত্র

নিজের দেশও ভুলিতে পারে নাই। নাদির শাহের রাজ্য পরিচালনা করিবার শক্তি মোটেই ছিল না এবং কেবল এইজন্যই তিনি প্রকৃতপক্ষে পারস্যের কোনও কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিয়া যাইতে পারেন নাই, নচেৎ যে সমৃদ্ধি ও সুযোগ তাঁহার ছিল, তাহাতে তাঁহার সময়ে

তৈমুরের সম্মুখে পারস্যের বন্দী সুলতান বায়াজিদ

যে দেশের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিতে পারিত, তাহা নিঃসন্দেহ। Sir Percy Sykes বলেন,

"Had Nadir possessed any administrative capacity, he might, by employing his material resources at his command, have restored to Persia, her prosperity and happiness. But his character was spoiled by success, and the remaining years of his life are a record of ever increasing cruelty and avarice, which made him detested as a bloody tyrant by the very people, whom he had freed from the intolerable Afghan yoke."

নাদির শাহের মৃত্যুর কিছু পরে কজর্ বংশ সিংহাসন দখল করে। এই দুইটি ঘটনার মধ্যে পারস্যে যে-সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। মাঝখানে

কিছুদিনের জন্ম 'জান্দ' বংশ রাজত্ব করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল 'করিম-খাঁ-ই-জান্দের'ই নাম করা যাইতে পারে। এই সময়ে দেশের ভিতরে চারিদিকে একটা অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলা লাগিয়াই ছিল এবং দেশের শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ায় শুধু সিংহাসন লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতে লাগিল।

কিন্তু কজর্ বংশ অনেকদিন পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিতে

আলি মহম্মদ, পারস্যের ভূতপূর্ব্ব শাহ্
(ইনি ১৯০৯ সনে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন)

পারিয়াছে। তাহাদের শেষ শাহ্ সুলতান্ আহ্মদ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নামেমাত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এই সময়ে পারস্যের সৈন্যদলের অধিনায়ক রিজা খাঁ পহ্লবী তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া শাসনভার ক্রমশঃ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রিজা খাঁ পারস্যের বর্ত্তমান শাহ্।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কজর বংশের শাহ্ নসীর-উদ্-দীন-এর মৃত্যু হয়। ইহার পরবর্ত্তী শাহগণ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল কাজেই রাজ্যশাসনে বিস্তর গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ এই সকল অপদার্থ নৃপতির একছত্র শাসনে দেশের জনসাধারণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। ফলে, চারিদিকে শাসন-সংস্কারের জন্ম একটা বিরাট্ সাড়া জাগিয়া উঠিল। পরিশেষে নানা গোলযোগের মধ্য দিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সুশাসনের জন্ম দেশের নানা স্থানের প্রতিনিধি লইয়া "জাতীয় পরিষদের" সৃষ্টি হওয়াতে রাজ্যে কথঞ্চিৎ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। আজ পর্য্যন্তও সেই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে।

মির্জ্জা রেজা—পারস্যের বর্ত্তমান শাহ্

গত মহাযুদ্ধের সময়কার পারস্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, ইতিহাসও রাজনীতি-বেত্তাদের পক্ষে অত্যন্ত ঔৎসুক্য-জনক সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে শাহ কোনও দলেই যোগদান করিবেন না বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার মজলিসের অর্থাৎ'জাতীয় পরিষৎ'এর বেশীর ভাগ সভ্যই যে জার্ম্মানী-দের অনুরক্ত ছিল,ইহা সত্য। জার্ম্মান রাজনীতিবিদ্গণের কার্য্যকারিতাই ইহার মূলে ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষে, আফগানিস্থান

ও পারস্যে গোলযোগ গড়িয়া তোলা এবং পারস্যকে স্বপক্ষে আনয়ন করা। পারস্যে তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী সম্পর্কে যাহা জানা যায় তাহা এই :—

"The plan of operation, so far as Persia was concerned, was two-fold. Agents were furnished with ample funds, machine guns, and rifles and were to enlist levies and create anarchy throughout the country. They were to rob and drive out the small British and Russian colonies living in Persian towns, murdering their representatives and seizing treasures of the Imperial Bank of Persia and property of British and Russian firms."

অবশ্য এখনও সকল বিষয় অনুসন্ধানে সম্যকরূপ জানা যায় নাই, কিন্তু ইহা হইতে জার্ম্মানদের কার্য্যকলাপ মোটামুটি বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে পারস্যে একটি নূতন যুগের সূচনা দেখা যাইতেছে। কি বাণিজ্যে কি শিক্ষায়, কি সভ্যতা-বিস্তারে সর্ব্বত্রই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; ভরসা হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত জগতের সভ্যতার সঙ্গে পারস্য সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে।

রিজা খাঁর সিংহাসন-অধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচেষ্টা বাড়িয়া গিয়াছে। রিজা খাঁ পারস্যের সৈন্যদলের অধিনায়করূপে দেশ সুশাসনের জন্য ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিনা রক্তপাতে রাজ্য দখল করেন। এবং তখন হইতেই প্রায় নিজেই রাজত্ব করিতে থাকেন; অবশ্য কজর্ বংশের শেষ শাহ সুলতান আহমদ্ নামেমাত্র শাহ ছিলেন। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য তুরস্কে গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়া গেল। সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রিজা খাঁ পারস্যেও গণতন্ত্র স্থাপন করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাহাতে একটু গোল বাধিয়া উঠে।

তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খিলাফৎ উঠিয়া গেল। পারস্যে একথা উত্থাপিত হইবার সময় মোল্লারা এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, তাহা হইলে এদেশের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। ফলে, মোল্লাদের বিরুদ্ধতায় সে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল না বটে, কিন্তু সকলের মতদ্বৈধহীন ভোটে রিজা খাঁ শাহ্ হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কজর্ বংশের রাজত্বও একেবারে শেষ হইল।

পাসারগিডির উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড

বর্ত্তমান শাহ একজন সৈনিক পুরুষ; কাজেই প্রথমেই তিনি পারস্যের সৈন্য-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে সৈন্যদের সময়মত বেতন দেওয়া ত দূরের কথা, এমন কি অনেক সময় একেবারে দেওয়াও হইত না; আজকাল আর তাহা চলে না। রাজস্ব আদায়ের পর প্রথমেই সৈন্যদের বেতন দেওয়া হয়।

ফলে, পারস্যের সৈন্যশক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে এবং তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী নানা বিভাগে বর্দ্ধিত ও শক্তিমান হইতেছে।

রিজা খাঁ শাসক-হিসাবেও বিশেষ পটু। তাঁহার রাজত্বে পারস্যের পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আসিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বন্যা-পীড়িত শ্রীহট্ট-কাছাড়

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

এক বৎসর পূর্ব্বে এমনি সময় সুরমা-উপত্যকা সম্মিলনীর সভাপতিরূপে শ্রীহট্ট ও কাছাড় পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। কত বিস্তৃত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া জাহাজ কিংবা রেলযোগে গমন করিয়াছি। বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইয়াছে; আনন্দ-উদ্ভাসিত জনগণের মুখচ্ছবি দেখিয়া কত আনন্দলাভ করিয়াছি। আজ সেই সমুদয় স্থানে মৃত্যু-রোগ-অনশনজনিত হাহাকার! গ্রামসমুদয় শ্মশানে বা সাগরে পরিণত! আমাদের ঐ অঞ্চলে প্রতিবৎসর বর্ষায় কিঞ্চিৎ জলপ্লাবন হয়, কিন্তু সেই প্লাবনের ফলে নৌকা-যাতায়াতের সুযোগ এবং শস্যশ্যামলক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধি হইত। আসাম কাউন্সিলের সভ্য শ্রীমান্ বসন্তকুমার দাস বলিয়াছেন, জল-নিকাশ-ব্যবস্থা-শূন্য রেলপথের দরুণ এই জলপ্লাবন দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে। অবস্থা বর্ণনার অতীত।

শ্রীমান্ ক্ষীরোদচন্দ্র দেব, বি-এল বন্যা-পীড়িত স্থান পরিদর্শনের জন্য শ্রীহট্ট কাছাড় বন্যা-সাহায্য সমিতির সম্পাদক কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিপন্নেরা সজল নয়নে বলিয়াছিল, "দেখে যাও, দেখে যাও বাবু, কি সুখে আমরা আছি।" খাল বিল নদী পুষ্করিণী মিলিয়া এক এক প্রকাণ্ড সাগর। তাহাতে ভাসিতেছে মানুষ, জীবজন্তুর মৃতদেহ এবং বাসস্থান। জল কমিতেছে, তবু দেখা যাইতেছে কেবল টীলার (ছোট পর্ব্বত) এবং বাঁশঝাড়ের অগ্রভাগ। সালেশ্বর গ্রামে ৮০।৯০ ঘর গৃহস্থের বাস; তন্মধ্যে তিন-চারটি বাড়ী ছাড়া সবই জলমগ্ন। সালেশ্বর ছাড়িয়া কুশিয়ারা নদীর নিকট আসিতেই পরিদর্শকেরা শুনিলেন ভীষণ গর্জ্জন। নদী প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করিয়া ভীষণ বেগে মাঠে প্রবেশ করিতেছে।

পাঁচগাঁও পাহাড়ে আশ্রিত বন্যাপীড়িত পরিবার

অতি কষ্টে স্রোত ঠেলিয়া ক্ষীরোদবাবুরা অন্য গ্রামসমূহে গিয়াছিলেন। কোথাও বা বড় বড় টিনের ঘর দড়াদড়ি দিয়া গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা, কোথাও বা যে যেটুকু উচ্চ স্থান পাইয়াছে স্ত্রীপুত্র লইয়া সেই স্থানটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, কোথাও বা নৌকা ও কলাগাছের ভেলায় কলসীপূর্ণ ধান তুলিতেছে। ক্ষীরোদবাবু লিখিয়াছেন, "ক্যামেরা সঙ্গে লইয়া আমরা জুরির পোল পার হইয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছি ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। জুরির পোল পার হইয়া কুলাউড়া অভিমুখে রেল লাইনের ধারে গ্রাম

৮০।৯০টি ছোট ছোট একচালা দোচালায় ছেলে-মেয়ে লইয়া প্রায় ১৫০।২০০ লোক প্রায় ১০০।১৫০টি গরু-বাছুরের সহিত একত্রে বাসা বাঁধিয়াছে। তখন দুই প্রহরের প্রখর রৌদ্র—রেল লাইনের বহু দূর ব্যাপিয়া মানুষ ও পশুর অস্থায়ী কুঁড়েঘর—আর রেল সড়কের নীচ হইতে পূর্ব্ব পশ্চিম এবং উত্তরে দিগন্ত প্রসারিত সর্ব্বগ্রাসী হাকালুকী হাওর অসংখ্য জনপদের ধ্বংসাবশেষ বুকে লইয়া প্রলয় নর্ত্তনের শ্রান্তি বিনোদনের জন্য এখন যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আমরা এখানে পৌঁছিতেই সাড়া পড়িয়া গেল। নিবারণবাবু তাঁহার ক্যামেরা ঠিক করিতে না করিতেই চারিদিকে কোলাহল উঠিল—'ওরে তোরা ঘর থেকে বাহির হ, আমরা কেমন আছি তা দেখবার জন্য বাবুরা আমাদের ছবি তুলতে এসেছেন। বাবুরা, দেখে যাও—কি সুখে আমরা আছি!' এরা সব ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী, প্রায়

বদরপুর রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ

করিমগঞ্জ-লঙ্গাই ভেলী রেল লাইনের দৃশ্য

৩০ঘর পরিবার বেলগাঁওয়ে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছিল। সেবার সন্ধ্যার সময় শুষ্ক রাস্তা দিয়া বাজার করিয়া আসিয়া আহারাদির পর ঘরে ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ রাত্রি ১০টার পর জল বাড়িতে থাকে। রাত্রি ১২টার মধ্যে সমস্ত ঘরের ভিতর প্রায় গলা জল বাড়িয়া যাওয়ায় ধন-সম্পত্তি ধানচাল যাহা ছিল জলমগ্ন ঘরে ফেলিয়া আসিয়া কোন মতে স্ত্রী পুত্র কন্যা বৃদ্ধ মাতা পিতা সহ সেই যে রেল লাইনে আশ্রয় লইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত এইখানেই বসিয়া আছে। এই গ্রামের ৭২টি গরু বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। ১৫।১৬টি গরু সড়কে আশ্রয় পাইয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে মারা গিয়াছে। গরুর খাদ্য বাঁশের পাতা নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু উহারা বলিল যে, দুই-একদিনের মধ্যে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ ঐ সব গ্রামে যে বাঁশপাতা আছে তাহা ঐ সব গ্রামবাসীর গো-মহিষাদির জন্যই পর্য্যাপ্ত নহে। বেলগাঁওয়ের বিপন্ন লোকগুলি অবস্থাপন্ন ছিল। অনেকেরই ঘরে প্রচুর ধান ছিল, কিন্তু হঠাৎ বন্যার আক্রান্ত হওয়ায় কিছুই উদ্ধার করিতে পারে নাই। উহারা বলিল—যে চাউল তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে একদিনও চলে না। এদের ভিতর সকলেই কৃষিঋণ চায়। তারা বলে 'যে কিছু ঋণ পাইলে আপাততঃ নিজেদের ভরণপোষণ চালাইয়া নিতে পারে, নতুবা সপ্তাহে সের দেড় চাউলে তাহারা অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন

করিবে। মাস দেড় পূর্ব্বে বেলগাঁও হইতে জল সরিবে না।”

“একখানা ঘরের ছাদে দুইজন জীবন্ত মানুষ ভাসিয়া যাইতেছিল। তীরস্থ লোকজন উঁহাদিগকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া উঁহারা চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে—‘আমাদের সাতজন ডুবিয়া মরিয়াছে—আমাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিও না।’ আর একটি ঘরের ছাদে একজন স্ত্রীলোকের বাহুলগ্ন একটি শিশু অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। বরাকের স্রোত তখন এত তীব্র ছিল যে, তীরস্থ লোক ষ্টীমার লইয়াও নদী অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ‘একখানা ১৫।১৬ হাত লম্বা ঘরে দশ-বারোটি গরু-বাছুর বাঁধা অবস্থায় ভাসিয়া গিয়াছে। বরাকের এই অংশে চারিটি হাতী ভাসিয়া গিয়াছে। একটির পিঠে মাহুত ছিল। মাহুত-শুদ্ধ হাতীটা শ্রীগৌরীর লোকেরা উদ্ধার করিয়াছেন।

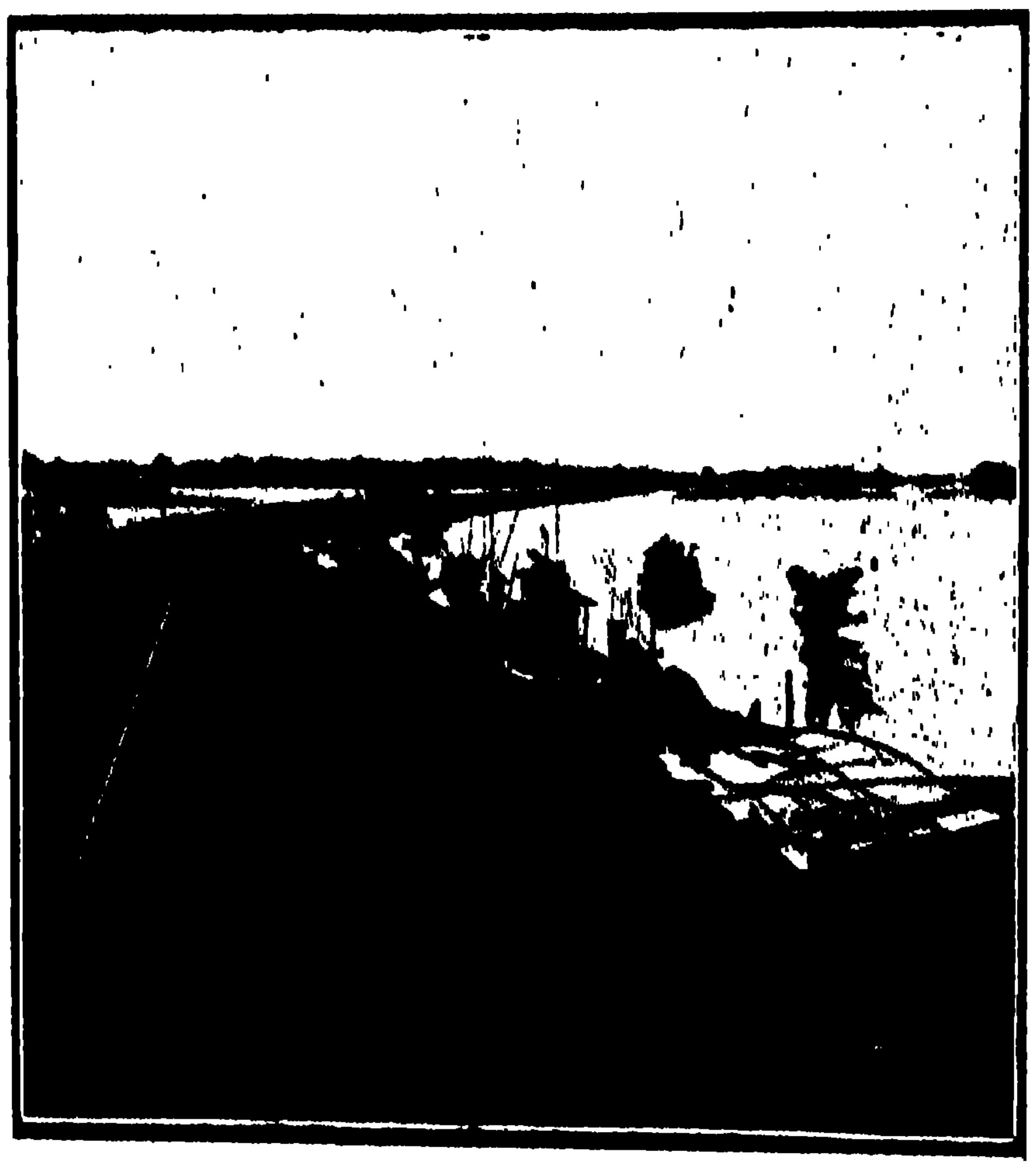

হাকালুকী হাওরের দক্ষিণ তীরে বেলগাঁওয়ের বস্তি—তিরাশিটি মুসলমান-পরিবার একচালা বাঁধিয়া বাস করিতেছে

“সুরমা উপত্যকায় ‘বন্যাপ্লাবিত স্থানগুলির মধ্যে সমগ্র কাছাড় জেলা এবং শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমাই বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। করিমগঞ্জ মহকুমা ১০৬৬ বর্গমাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ভূমি পর্ব্বতসঙ্কুল। অবশিষ্ট ভূমির মধ্যে প্রায় ৮০০ শত বর্গমাইল পরিমাণ ভূমি বন্যায় বিশেষভাবে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। করিমগঞ্জ মহকুমার লোকসংখ্যা প্রায় ৫½ লক্ষ। আজ পর্য্যন্ত যতদূর পরিবীক্ষণ হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় ৩৫৫টি গ্রাম বন্যায় বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়াছে এবং প্রায় ৩৭৫০টি পরিবার গ্রাম ত্যাগ করিয়া রেলওয়ে লাইনের ধারে এবং পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া আছে। যে-সব গ্রাম হইতে জল সরিতেছে সেখানেও শতকরা ৭০খানা গৃহই সামান্য বাতাসে কিংবা ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতেছে। করিমগঞ্জ মহকুমার হাকালুকী, শোনবিল, রাতাবিল, বালাউট, মুরিয়া হাওর প্রভৃতি অনেকগুলি বৃহৎ ‘হাওর’ আছে। ঐ ‘হাওর’গুলির প্রত্যেকটিই ২০।২৫ বর্গমাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য অনেক সমৃদ্ধিশালী পরিবার এই সব হাওরের তীরে ‘বস্তি’ বাঁধিয়া বাস করিতেছিল। হাওরের তীরস্থ গ্রামগুলি আজ পর্য্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই-সব গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীর ঘরেই ১৫০।২০০ মণ ধান জলের নীচে পচিতেছে—উদ্ধারের কোন উপায় নাই। গ্রামবাসীরা দুই-তিন মাইল দূরবর্ত্তী টীলা ও পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে।”

“১১ই জুন হইতে বন্যার খবর লোক-মুখে প্রচারিত হইতে থাকে, কিন্তু ১৮ই জুন পর্য্যন্ত করিমগঞ্জ মহকুমায় যাইবার সর্ব্বপ্রকার যান-বাহনাদি, এমন কি টেলিগ্রাম ও ডাক পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। বন্যার প্রথম প্রকোপের প্রায় আট-নয়দিন পর রিলিফ কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের আদেশে আমি করিমগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শন করিতে গিয়া যে অবস্থা দেখিয়াছি তাহার বিবরণ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে যথা-

..ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার সহযাত্রী শ্রীহট্ট সহরের ফোটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র পুরকায়স্থ করিমগঞ্জ ..কুমার বন্যাপ্রপীড়িত স্থানসমূহের যে-সব আলোক-চিত্র লইয়াছেন এই সঙ্গে তাহারই কয়েকখানা প্রতিলিপি পাঠাইলাম।

'হাকালুকী' হাওরের পূর্ব্ব তীরে প্রায় ১০.৮০টি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। খাগঠেকা, দাশঘর প্রভৃতি গ্রামবাসীরা নিকটস্থ চম্পকতলা, বড়থল প্রভৃতি পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এই-সব গ্রাম জল সরিয়া বাসোপযোগী হইতে আরও এক মাস সময় লাগিবে। গ্রামবাসীরা অবস্থাপন্ন ছিলেন।

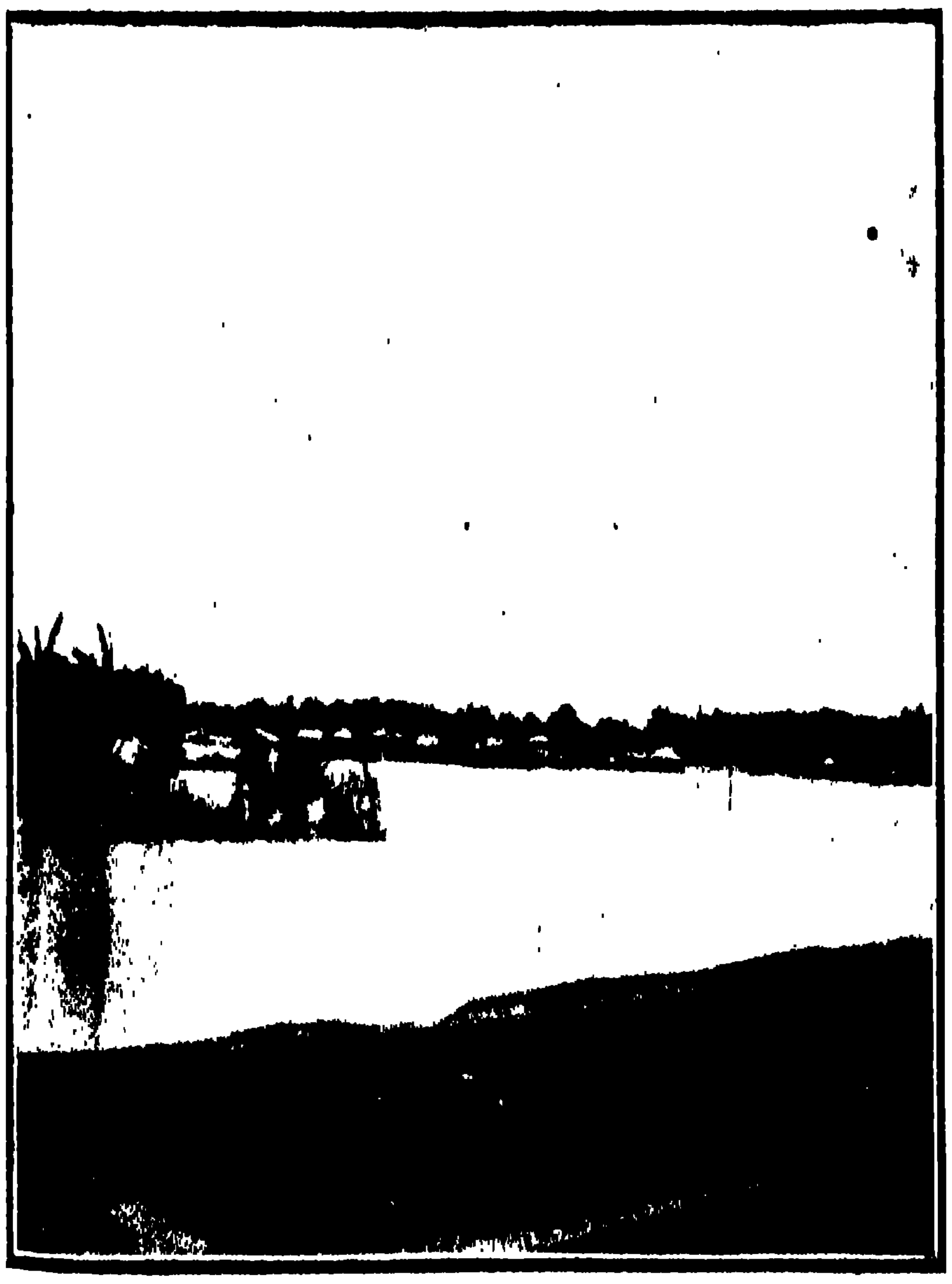

জুরী রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন বাজার

প্রত্যেকেরই ঘরে প্রচুর পরিমাণ ধান চাউল ছিল।. কিন্তু ১১ই জুন রাত্রি ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে অকস্মাৎ চার-পাঁচ ফুট জল বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারা কোনও মতে নিজেদের প্রাণরক্ষা করিয়া পাহাড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

'হাকালুকী'হাওরের দক্ষিণ তীরস্থ বেলগাঁও নামক বস্তিতে

করিমগঞ্জ হইতে কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক সাহায্য প্রেরণ

১০৩ টি মুসলমান-পরিবারের বাস ছিল। বন্যার প্রকোপে ইহারা রেল লাইনের ধারে একচালা বাঁধিয়া প্রায় .৭৫।২০০ লোক স্ত্রী পুত্রকন্যা ও গরু-বাছুর লইয়া একসঙ্গে একই ঘরে বাস করিতেছে। এখনও গ্রামের ভিতর দুই তিন ফুট জল রহিয়াছে। রেল লাইনের ধারে ৮৩টি পরিবার বাস করিতেছে। একে ত আহার নাই, তদুপরি রেল দুর্ঘটনায় ছেলে পিলে মারা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা।

জুরি রেলওয়ে ষ্টেশন কর্ম্মচারীদের বাসগৃহের ভিতরই চার-পাচ ফুট জল উঠিয়াছিল। বন্যার বারো দিন পরে বাজারের এই আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছে। এই বাজারস্থিত লক্ষ্মীচরণ রায়ের পাকা দোকান-ঘরের ভিতর

দিয়া জল-স্রোত চলিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে তিন ফুট গভীর একটি খাল কাটিয়া দিয়াছে।

প্রায় ৩৫ মাইল দীর্ঘ করিমগঞ্জ লঙ্গাই-ভেলী রেলওয়ে লাইনটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই শাখা লাইনের একটি অংশের দৃশ্য দেখা যাইতেছে। বন্যার প্রথম কোপের ১৫দিন পরে এই চিত্র লওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলে জল তখন দুই-তিন ফুট কমিয়া গিয়াছিল। রেল-লাইনের উপরে কচুরীপানা আটকাইয়া রহিয়াছে। লাইনের দু' পার্শ্বে জলের বেগ তখনও তীব্র ছিল।

বদরপুর শ্রীহট্ট-কাছাড় জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থান। বদরপুর অতিক্রম করিলেই কাছাড় জেলার পশ্চিম সীমা আরম্ভ হয়। ১৩।১৪ই জুন উপরিস্থিত বস্তি হইতে তিন পোয়া মাইল দূরে প্রবাহিত বরাক নদী দিয়া চারিটি জীবন্ত হস্তী (একটি মাহুত সহ) ভাসিয়া গিয়াছে। অসংখ্য টিনের ঘর, বড় বড় গাছ, বহু বাঁশঝাড়, ভাসমান গৃহ-লগ্ন পাঁচ-ছয়জন জীবন্ত মানুষ বরাক নদী দিয়া ভাসিয়া যাইতে বদর-ঘাটের লোকেরা দেখিয়াছেন। কিন্তু নদীর স্রোত এতই তীব্র ছিল যে, ষ্টীমারের সাহায্যেও তীরস্থ লোকেরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বদরপুর অঞ্চলে জল স্থানে স্থানে দশ-বার ফুট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ২২শে জুন তারিখে আমরা বদরপুর যাই। তখনও জল দুই-তিন ফুট ছিল। বন্যার প্রথম প্রকোপের সময় স্রোতের বেগে রাস্তার গাছগুলি তখন পর্য্যন্ত বাঁকিয়া আছে দেখিলাম।

পাচগাঁও পাহাড়ে বর্ম্মা ওয়েল কোম্পানীর তেলের খনি ও অফিসাদি বর্ত্তমান। বর্ম্মা ওয়েল কোম্পানী বহু অর্থব্যয়ে প্রায় চার-পাচ হাজার লোককে জলমগ্ন গ্রামাদি হইতে নৌকা-সাহায্যে উদ্ধার করিয়া পাচগাঁও পাহাড়ে তাহাদের বাংলো অফিস-ঘর ইত্যাদিতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ২০শে জুন পর্য্যন্ত এখানে প্রায় ৭০০।৭৫০টি পরিবার বাস করিতেছিল। ওয়েল কোম্পানী তখনও ইহাদিগকে চাউল বিতরণ করিতেছিলেন।

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটি প্রতিদিন ৩০।৪০ মণ চাউল-সহ বন্যাপীড়িত গ্রামগুলিতে নৌকা-সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু বন্যাপীড়িত গ্রামের পরিমাণ এত বেশী যে, এই সাহায্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পানীয় জলের অভাবই বিশেষ গুরুতর। সাত-আট মাইল দূর হইতে নৌকা-সাহায্যে কলসী ভরিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। লোকের ঘরবাড়ী পড়িয়া যাইতেছে;

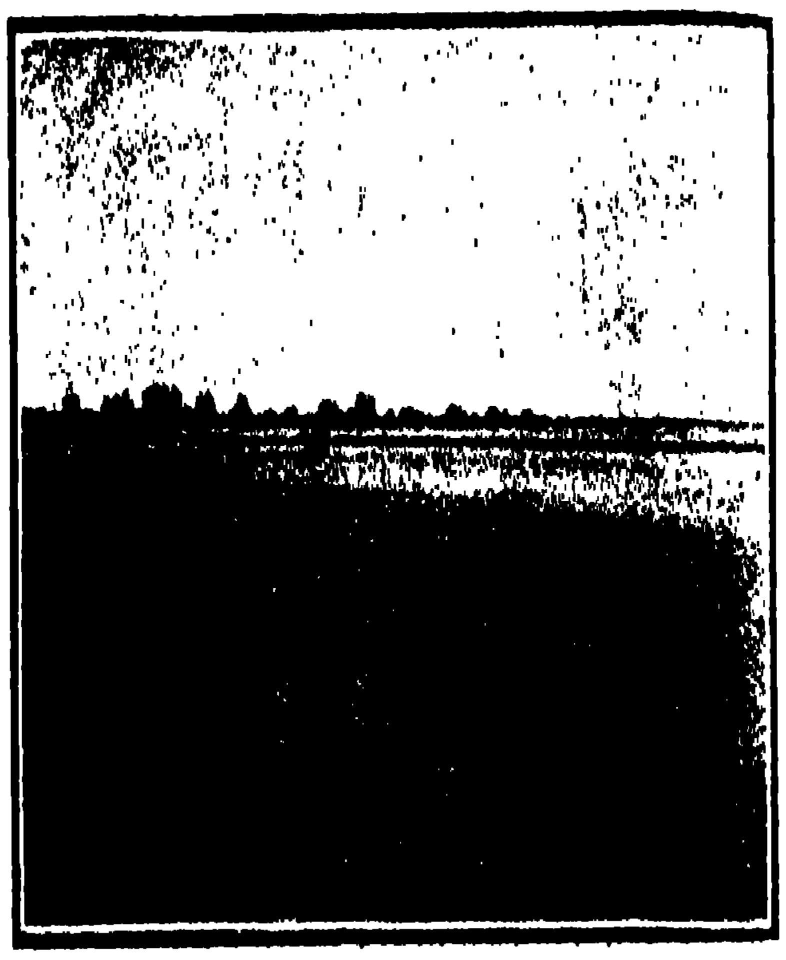

হাকালুকী হাওরের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত জলমগ্ন গ্রাম

রক্ষা করিবার অর্থের অভাব। রেলওয়ে লাইনের পার্শ্ব হইতে লোকজন না সরাইলে রেল-দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পরিত্যক্ত গ্রামের উপর দিয়া অসংখ্য পচা গরু মহিষ ভেড়া ছাগল ইত্যাদি ভাসিয়া যাইতেছে—দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া দুষ্কর। মোটের উপর করিমগঞ্জ মহকুমাবাসী দুইদিন পূর্ব্বেও এই প্রকার বন্যার কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই।"

কোন কোন স্থানের আলোকচিত্র লওয়া হইয়াছে। তাহাতেও প্রকৃত অবস্থার শতাংশও বুঝিতে পারা যায় না। ক্ষীরোদবাবু দামোদর-বন্যাপীড়িত স্থানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বন্যার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না।

গরিব শ্রীহট্ট-কাছাড়বাসিগণ আজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বঙ্গবাসীর নিকট করজোড়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। সহৃদয় ব্যক্তিগণ দেশকে আসন্ন মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

পঞ্চশস্য

জলে ঘণ্টায় ৯৪ মাইল—

কিছুকাল পূর্ব্বে মেজর সিগ্রেভ ঘণ্টায় ২৩১ মাইল বেগে মোটর দৌড়াইয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি জলে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে তাঁহার মোটর বোট চালান। সম্প্রতি গার উড্ নামক একজন আমেরিকান ঘণ্টায় ৯৪ মাইল বেগে তাহার 'মিস আমেরিকা' নামক মোটর বোট চালাইয়া মেজর সিগ্রেভকে পরাজিত করিয়াছেন।

মিঃ উড ও মেজর সিগ্রেভ

জলের উপর এত বেগে মোটর বোট চালান আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ঘণ্টায় ৯৪ মাইল এরোপ্লেন চালানও বিশেষ বাহাদুরির কথা। মেজর সিগ্রেভের সহিত মোটর বোট রেসে উড পাল্লা দিয়াছিলেন—এবং উডের বোট মেজরের বোটের বহু অগ্রে ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল—কিন্তু হঠাৎ মোটরের একটি কল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে মোটর থামাইতে হয়। এই সুযোগে মেজর সিগ্রেভ প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মিঃ উড্ একজন অতি বিখ্যাত অসমসাহসী মোটর বোট চালক। এই কার্য্যে সে কতবার তাঁহার প্রাণসংশয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

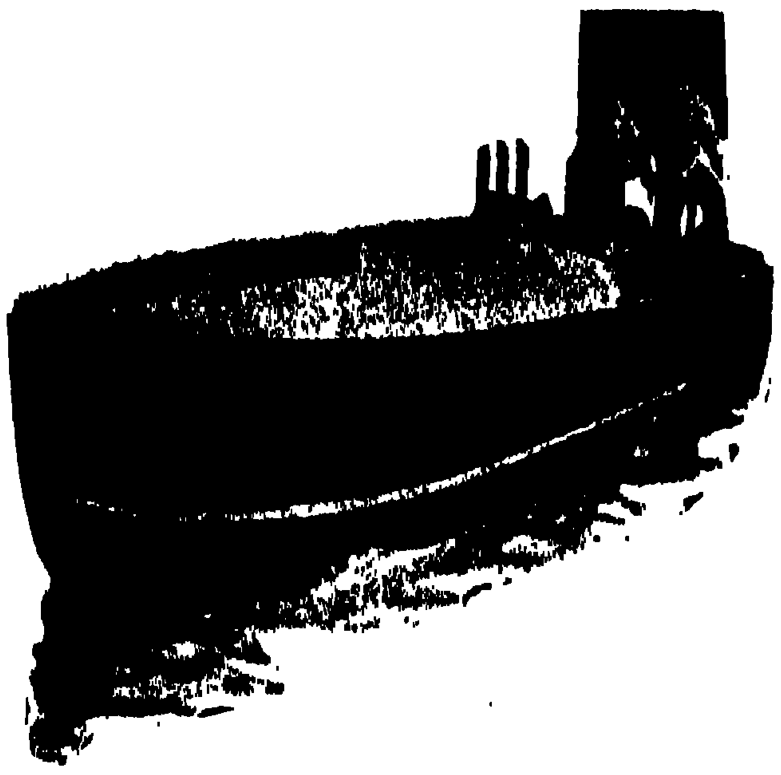

মিঃ উডের মোটর বোট—মিস আমেরিকা

মেসোপোটেমিয়ায় ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বের রথের চাকা আবিষ্কার—

অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির মিঃ এস্ ল্যাঙ্গডন্ সম্প্রতি প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত দুইটি রথের চাকা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আরও অনেকে ঐ স্থানের পুরাতত্ত্বের সন্ধানে গিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বের কিস্ শহরের ধ্বংসাবশেষের নীচে রথের

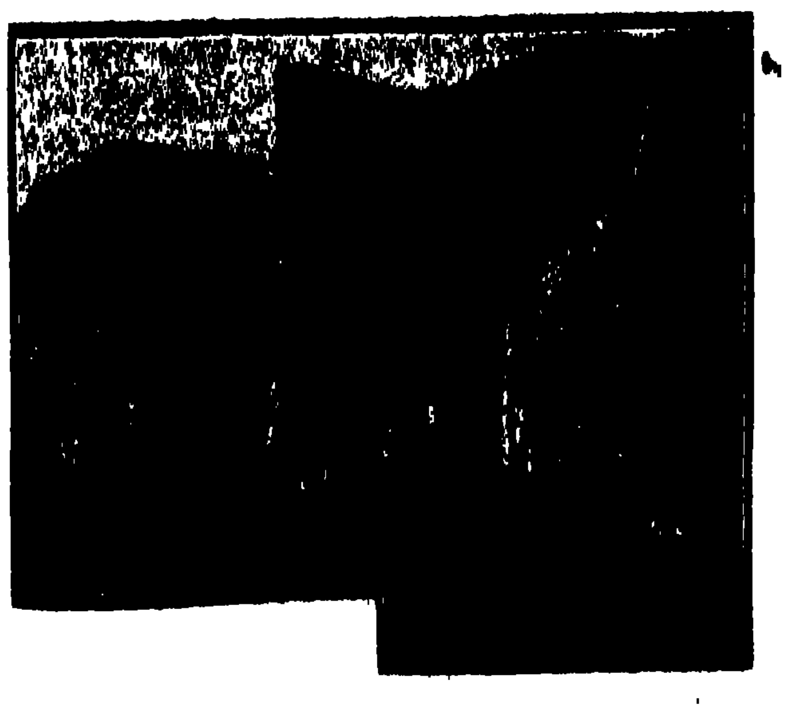

কিসের ধ্বংসাবশেষ

চাকা ছাড়া আরও অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা পুরাতন গাড়ীর-চাকা ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোথাও আবিষ্কার

হয় নাই। কিসের নিকটবর্ত্তী আরও কয়েকটি স্থানে প্রায় ৪০০০ বৎসর (খৃঃ পূর্ব্ব) পূর্ব্বের প্রাচীন সভ্যতা এবং জনপদের বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইলে অনেক আশ্চর্য্য কাহিনীর কথা লোকে জানিতে পারিবে।

লাগাম আটকাইবার আংটা

কিসে প্রাপ্ত রথের চাকা

—

নারী অসিক্রীড়ক—

জান্ ভিকাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা অসিক্রীড়ক। ইহার বয়স মাত্র ২১। এই মহিলা তাঁহার পিতার নিকট অসি খেলা শিক্ষা করেন।

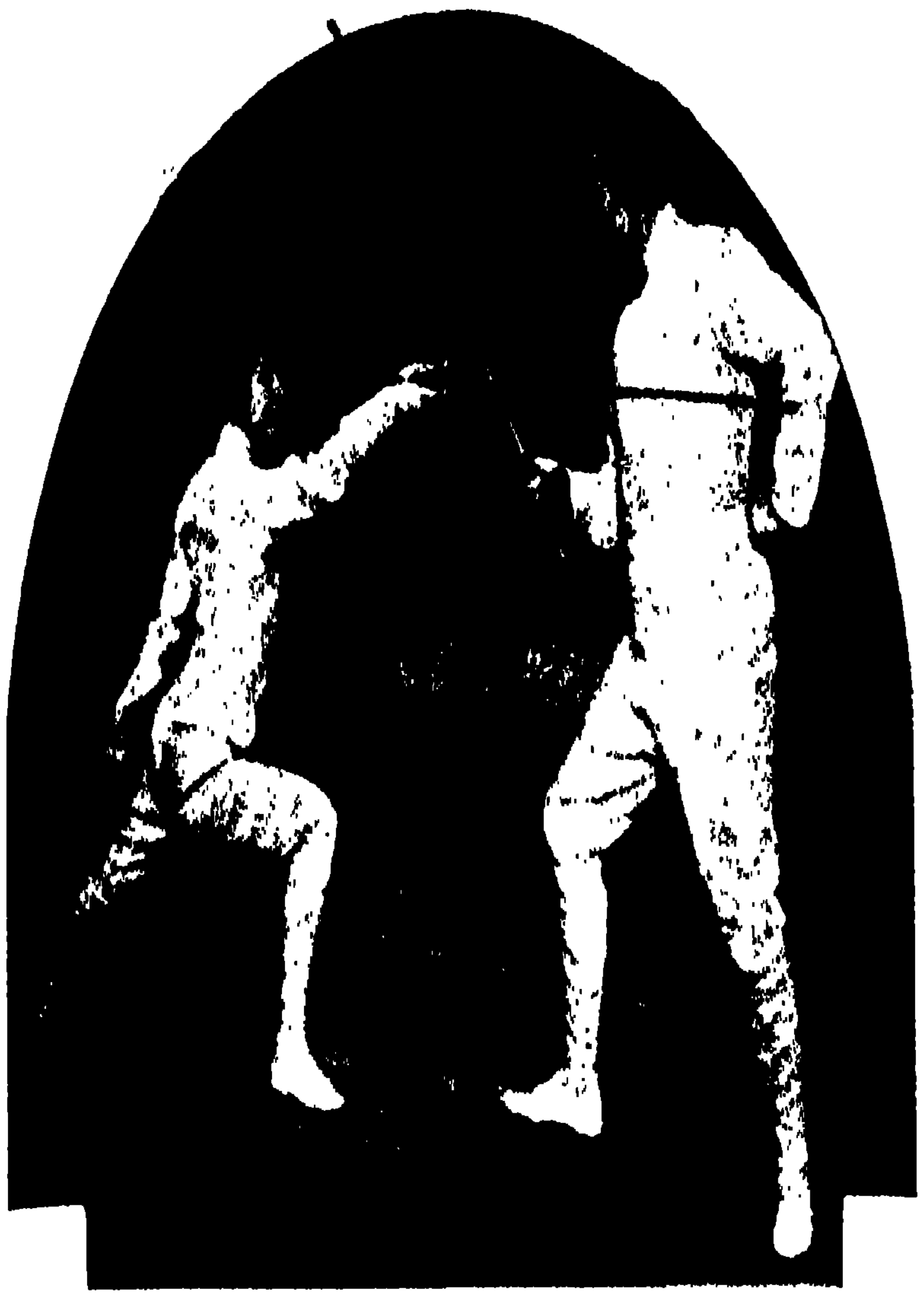

জান ভিকাল

অলিম্পিয়ায় ১৯৩২ সনের তলোয়ার খেলার প্রতিযোগিতার জন্য পিতার নিকট কুমারী ভিকাল এখন হইতেই বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

—

সিডান মোটর বোট—

সিডান মোটরকার-এর মত সিডান মোটর বোটও তৈয়ার হইতেছে বোটের উপরটি অবিকল মোটরকারের মত দেখিতে।

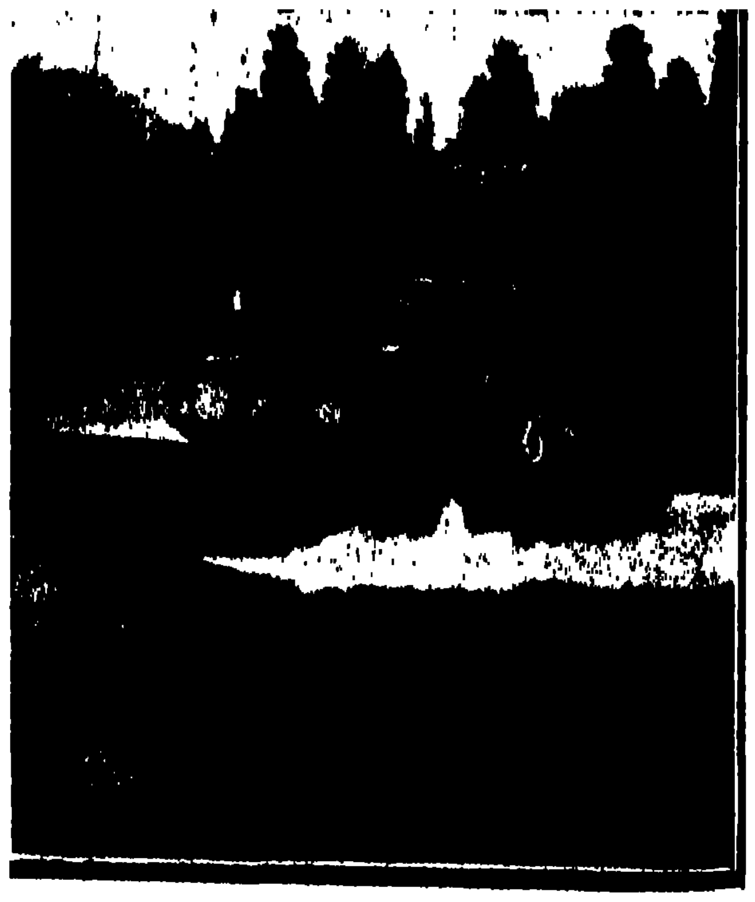

সিডান মোটর বোট

বসিবার যায়গা, গদি ইত্যাদি সবই সুন্দর এবং অতি আরামদায়ক। এই মোটর বোট ঘণ্টায় ৩২ মাইল বেগে চলিয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠ ভার উত্তোলনকারী—

লস্ এঞ্জেলস্‌এর টম টাইলার পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভার উত্তোলন করিতে পারেন। এ পর্য্যন্ত বহু লোকে তাঁহার সহিত

টম টাইলার

ভার উত্তোলনের পাল্লা দিতে গিয়া পরাজিত হইয়াছেন। ইনি ৭৫০ পাউণ্ড ভার (প্রায় ৮ মণ) অতি অল্প আয়াসেই তুলিতে পারেন।

—

হীরকের অলঙ্কার প্রস্তুত কৌশল—

হীরকের অলঙ্কার-প্রস্তুত অতি কঠিন এবং পরিশ্রমের কাজ। অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে মোমের উপর প্যাটার্ণ মত

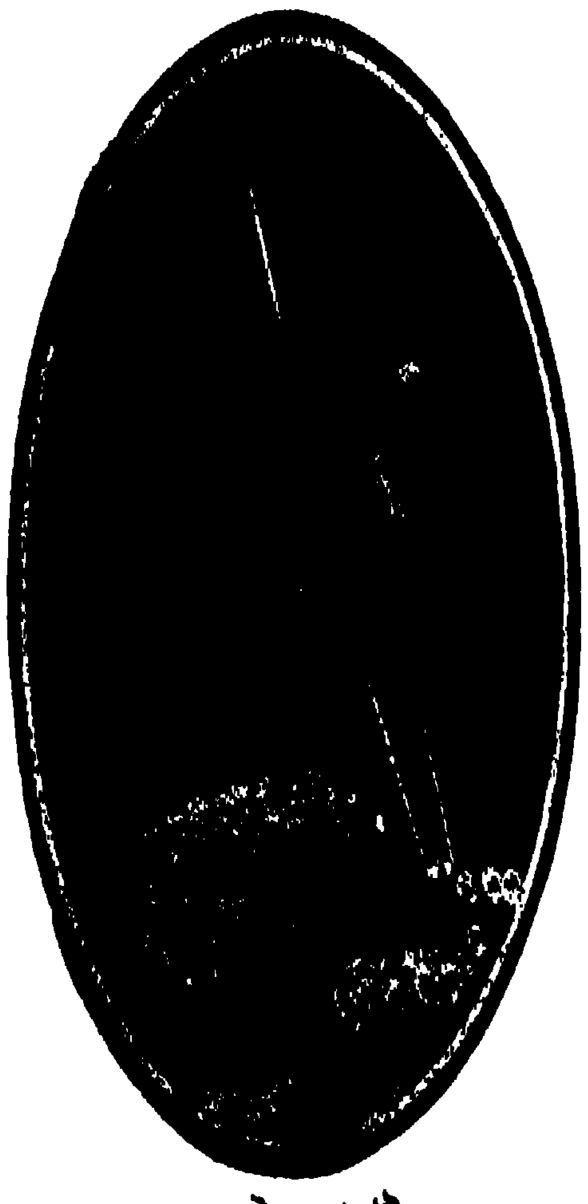

হীরক বাছাই

হীরকের টুকরাগুলিকে বসাইয়া লওয়া হয়। এই প্রকারে দরকারমত হীরকের স্থান অদলবদল করা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হীরাগুলি ঠিক স্থানে পড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে অদলবদল

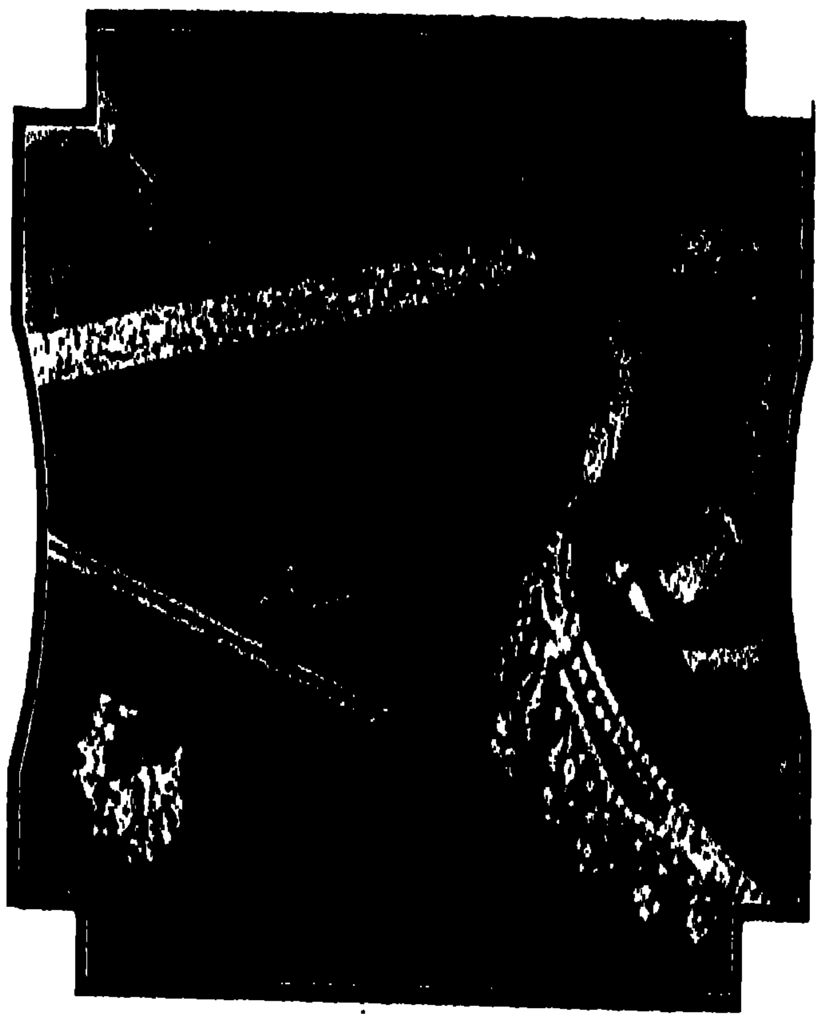

পাথর বসানো

চলিতে থাকে। হীরকের টুকরাগুলিকে গাঁথিবার বা বসাইবার পূর্ব্বে তাহাদের আকার কলে ঠিক করিয়া লইয়া পালিস করিয়া লওয়া হয়। অনেক সময় মোমের উপর হীরকের টুকরাগুলিকে বসাইয়া অলঙ্কারের ফরমাস-দাতাকে দেখাইয়া লওয়া হয়। হীরকের টুকরাগুলির স্থান নির্দ্দেশ করা পাকা জহুরীর কাজ।

—

ভবিষ্যৎ মানুষ

ওয়াশিংটন শহরের বৈজ্ঞানিক ডাঃ এলেস্ হ্রড্‌লিকা (Ales

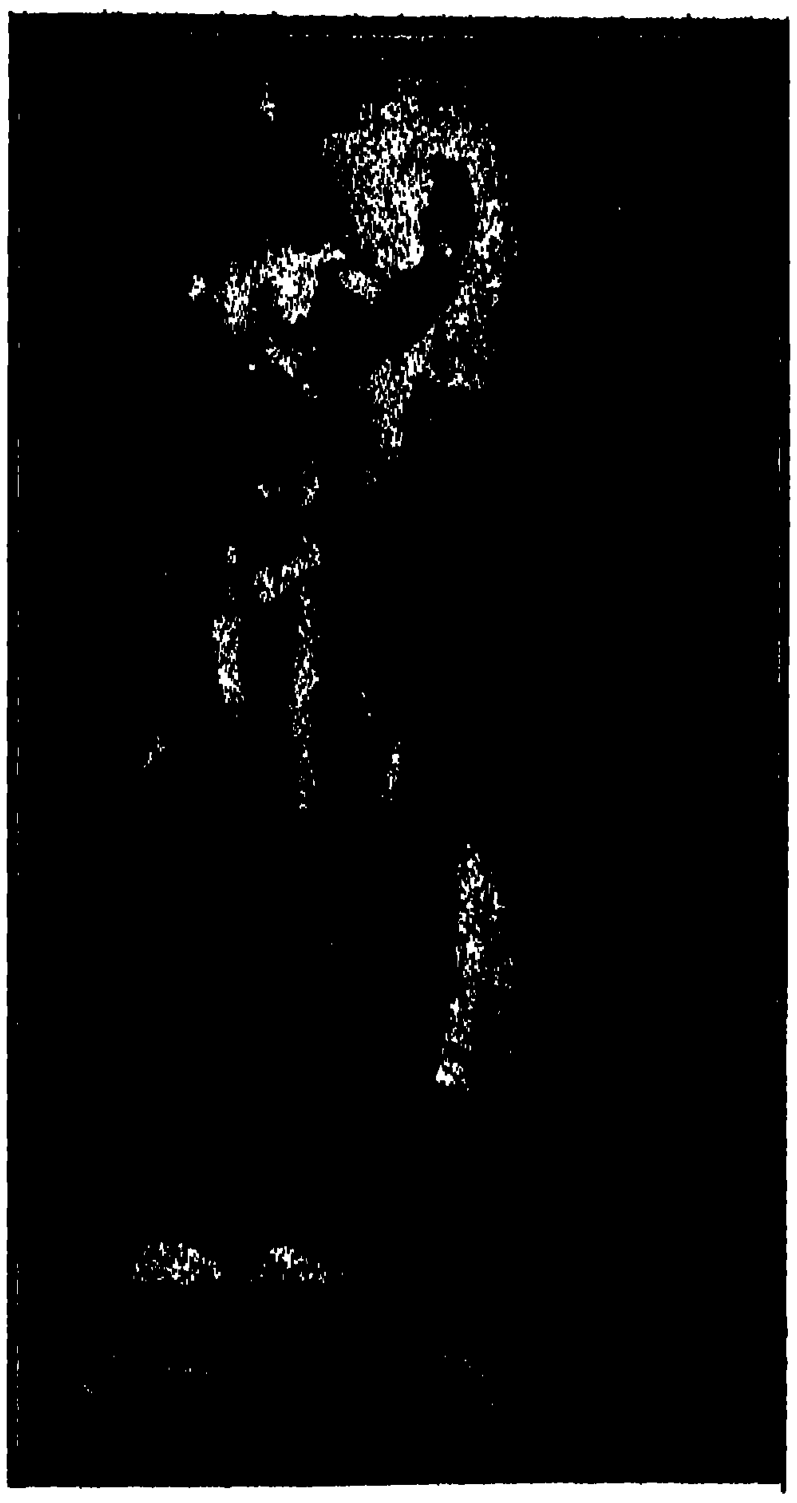

ভবিষ্যৎ মানুষ ও আপোলো বেলভিডিয়ার

Hrdlioka) ভবিষ্যৎ মানুষের দেহ কিরূপ হইবে তাহার এক চিত্র দিয়াছেন। ভবিষ্যৎ মানুষ খুব লম্বা হইবে। পা হইতে কোমর

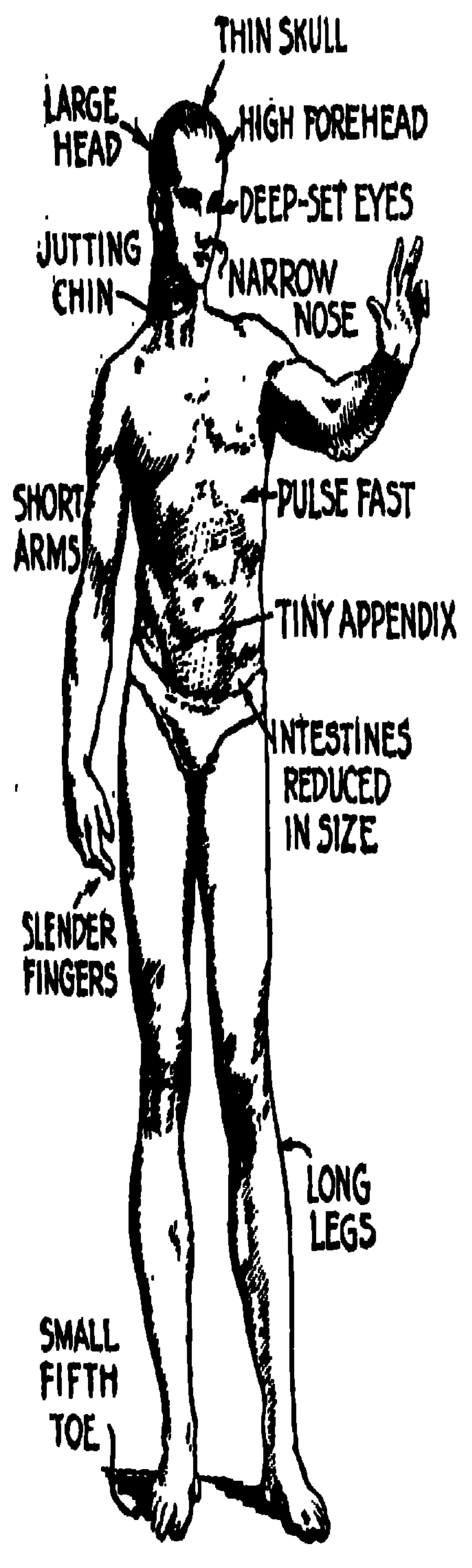

ভবিষ্যৎ মানুষের দেহ

শরীরের আন্দাজে অতিরিক্ত লম্বা এবং হাত ছোট হইবে। পেটে, বিশেষ করিয়া তলপেট, এবং পায়ের কড়ে আঙুল প্রায় না থাকার মধ্যেই হইবে। কপাল চওড়া—প্রখরবুদ্ধিজ্ঞাপক হইবে। মোটের উপর ভবিষ্যৎ মানুষ বর্ত্তমানের মানুষ অপেক্ষা ঢের বেশী সুন্দর এবং সবল হইবে বলিয়া এই বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। মানুষের জন্ম হয় প্রায় ৩০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে—এই সময় হইতে মানুষের দেহের বিভিন্ন অবয়বের ক্রমবিকাশ দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির প্রখরতাও বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। এই ভবিষ্যতের মানুষের বুদ্ধির মাপ। আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে আমাদের বুদ্ধি তাদের বুদ্ধির কাছে অতি সামান্যই হইবে এই মাত্র বলা যায়।

এই সঙ্গে ডাঃ হ্রড্‌লিকা আরও বলিতেছেন যে, মানুষের দেহের এবং বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে। মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়িবে—রোগশোকের মাত্রা এবং সংখ্যাও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইবে। তাহার হজমশক্তি কমিবে—অনিদ্রা রোগ বিশেষ পীড়া দিবে। খুব সম্ভবত চর্ম্মরোগ খুব বেশী হইবে। মানুষের পাগলামিও বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়।

বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তিও কম হইবে। এখনও অনেক ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান লোকদের পুত্রাদি প্রায়ই খুবই কম হয়—বহুস্থলে একেবারেই হয় না।

ডাঃ অস্কার রিড্‌ল্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে, সেই সময়ের অতি-বুদ্ধিমান মানুষ বিবিধ প্রকারের গ্ল্যাণ্ড-এক্স্‌ট্র্যাক্টের সাহায্যে ইচ্ছামত শারীরিক বা মানসিক অতিক্ষমতা ও অতিবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ সৃজন করিতে পারিবে।

এই ভবিষ্যৎ মানুষ ঠিক কতদিন পরে আসিবে তাহা এখনও কেহ বলিতে পারেন নাই।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ গোখ্‌লে—ইনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। শ্রীমতী গোখ্‌লে বোম্বাই সহরের মিউনিসিপ্যালিটির একজন সদস্য। বোম্বাইএ যে-সকল মহিলা সর্ব্বপ্রথমে মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য হন শ্রীমতী গোখ্‌লে তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি তিনি তৃতীয়বার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি জাতীয় দলপন্থী।

শ্রীমতী এম্-কে-নারায়ণী আম্মা—রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটি সম্প্রতি যে দুইটি "লেডী অ্যাসিষ্টাণ্ট হেল্‌থ অফিসার"এর পদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একটিতে শ্রীমতী নারায়ণী আম্মা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি তেলিচেরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ গোখ্‌লে

শ্রীমতী এন্‌-কে-নারায়ণী আম্মা

মায়া

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যে-বীণাখানি, রণিলো বাণী, আঁধারী বনছায়,
সে বাণী ধীরে পশিলো প্রাণে, জাগালো মনে দোল্ ;
শিহর-লাগা তনুটি ঘেরি', তুলিলো কলরোল,
মুখর পা·ী মনেরি তারে,—স্বপন-সীমানায় !

আজি সে পাখী, মেলিলো আঁখি, মেলিলো পাখা তার,
-শ্যামল-ঘাসে চুমিছে যেথা নীলিমা-ঝিলিমিল
ছন্দ-হারা ঘুমানো কবি খুঁজিয়া পেলো মিল্
বাঁধন টুটি', ছুটিলো পথে, পাথার পরপার !

মাধুরী-মাখা, গানের পাখা, ভুলালো তারে আজ,
ব্যাকুল বাণী গুমরি মরি তারার চোখে চায়,
কি ছবি আজি প্রকাশ লভি', আকাশে দুলি' যায়
বন-নিঝরী চপলসুরে বাজিলো মনোমাঝ !

খেলিছে মায়া, কাজলীছায়া তটিনীতটতলে,
হারানো-গীতি, উদাসীটিরে কাঁদিয়া সে কি ডাকে !
ঘুমেরি সুরে, ঝিমায়ে পড়ে কপোতী তরুশাখে,
বিবাগী চলে ; গগনতলে পথেরি শিখা জ্বলে !

অলক দোলে, কপোল কোলে, চৈতী-হাওয়া চুমি'
বনের বেণু মনেরি সাথে বাজালো কী যে সুর,
খেয়ালী কবি জাগিলো প্রাণে,—স্বপ্নভারাতুর
সুরভি-সুখে মধুরি' তোলে মনের বনভূমি !

আজিকে তা'রে, বাঁধিয়া যা'রে গানের রাখীডোরে,
মাঠেরি হাওয়া পরাগ-রেণু তারার আঁখিজল ;
স্বপন-পটে মাধবীছবি নীরবে আঁখি চল্
—আবার যবে মেলিবি আঁখি, শিশির-ঝরা ভোরে।

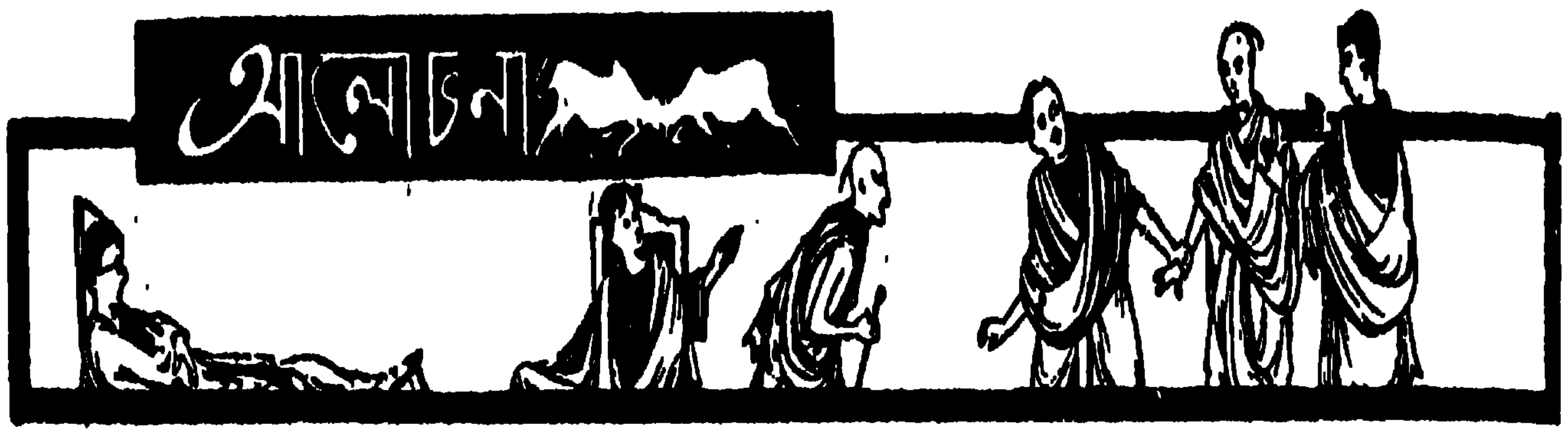

"বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা"

এই নাম দিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'প্রবাসী' পত্রে পদাবলীর পরিচয় দিতেছেন। তিনি 'বিদ্যাপতি' সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের মধ্যেও সে পরিচয় প্রচুর আছে। তা ছাড়া মৈথিল ভাষা, তালপত্রের পুঁথি, ইত্যাদিরও অভাব নাই। তাঁহার খেয়াল হইয়াছে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ কবিরাজকে তাড়াইয়া মিথিলার গোবিন্দ ঝাকে আনিয়া পদাবলী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি সম্প্রতি চণ্ডীদাস লইয়া একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। কোনো বিষয়ে না জানিয়া কিছু বলিতে প্রবন্ধে তিনি বহুবার নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু নিজের এই বিধান নিজেই অনেক স্থলে অনুসরণ করেন নাই। উদাহরণ দিতেছি।

১। 'কেশের আগ চুথয়ে টাগ ফিরিয়া ফিরিয়া বাঁধে' চণ্ডীদাসের পদের এই কলিটি লইয়া তিনি বিচার করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব চণ্ডীদাস-সম্পাদক স্বর্গীয় নীলরতনবাবু 'টাগ'শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন জঙ্ঘা, তবে ব্যুৎপত্তি দিতে পারেন নাই। গুপ্ত মহাশয় আচার্য্য অক্ষয়-চন্দ্রের সংস্করণ হইতে টীকা তুলিয়া দিয়াছেন এবং নিজে টিপ্পনী করিয়াছেন টাং ঠ্যাং আরোহ-ক্রমে টাগ হইয়াছে। পরে লিখিয়াছেন অপর এক পদে উরু শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়—উরু সে উরুতে লম্বিত কেশ ইত্যাদি। হিন্দীতে উরুকে টাং বলে কি বাঙ্গালীরা ঠ্যাং বলে এ খবর এই নূতন শুনিলাম। কিন্তু মূলে যে এই পাঠটি অশুদ্ধ গুপ্ত মহাশয় সে সংবাদ রাখেন না মনে হইতেছে। ওখানে টাগ পাঠ হইলে 'জলের কাম্বারে কেশের আম্বারে সাপিনী লাগিল মোয়' এই কলিটির অর্থ কি হইবে?

২। আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে
ঐছন দেখি উরু যুগ'

এই পদের গুপ্ত মহাশয় অর্থ করিয়াছেন আদলি—ঘৃতকুমারী। নগেনবাবু বলিতেছেন ইহাই (ঘৃতকুমারীই) যথার্থ অর্থ। হাঁটুর নীচে হইতে পা পর্য্যন্ত ঘৃতকুমারী ও উরু কদলীর সহিত উপমিত হইয়াছে। আমরা জানি ঘৃতকুমারী দেখিতে আনারস গাছের মত। গাছ বলা বোধ হয় ঠিক হইল না। যাক, ঘৃতকুমারীর পাতা যে হাঁটুর নীচে পা পর্য্যন্ত—এর সঙ্গে উপমিত হয় এও এক নূতন আবিষ্কার? তাহার কোন্ স্থানটা হাঁটুর নীচে আর কোন্ স্থানটা পা? আবার ইহার উপরে কলাগাছ পুঁতিবেন কোন্ স্থানটায়। আসলে শব্দ আতালি বা আথালি। অর্থ মঞ্চ, স্তূপ। এদেশে খড়ের ছোটখাট গাদাকেও 'আথাল' বলে। আদলি আইলও হইতে পারে, বেদীও হইতে পারে। কুমারের বাড়ীর মেয়েরা মালসা (ভেলানী—কৃষ্ণকীর্ত্তন) গড়িবার জন্ত এক রকমের ছোট মাটির ডাবর ব্যবহার করে। সেই আকারের জিনিষ, পোড়াইয়া লওয়া। ইহার মধ্যে কাঁচা মাটির তাল রাখিয়া 'ব'লে' (এক রকম মাটির নোড়া) দিয়া পিটাইয়া মালসা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকেও আতাল, আথাল, আতালি, আথালি বলে। মোটের উপর আদলির সঙ্গে নিতম্বের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। উরুর সঙ্গে কদলীর উপমা কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও আছে। নিতম্বের সঙ্গে উরুর সংযোগ আদলির উপর কদলীর সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। কদলী গাছটি যেন উপর হইতে নীচের দিকে নামিয়াছে,—জ্ঞানদাসকে স্মরণ করুন—

"উলটী কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব"

এমন প্রয়োগ বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রচুর।

৩। "চণ্ডীদাসের রচনায় শ্রীমদ্ভাগবত ও বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়"!

এ গবেষণার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বিশেষ কি? কিছুই লক্ষিত হয় কিনা সন্দেহ! গুপ্ত মহাশয় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পদাবলী-সাহিত্যে যে-সকল নূতন খবর বাহির হইয়াছে তাহার খবর রাখেন না। প্রথমত কৃষ্ণকীর্ত্তনখানা গুপ্ত মহাশয়ের একবার পড়িয়া রপ্ত করিয়া লওয়া উচিত। হিন্দী মৈথিল না জানিলে যেমন পদাবলীর অর্থ হয় না, কৃষ্ণকীর্ত্তন না পড়িলে তেমনি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যায় না। দীন চণ্ডীদাসের খবর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় দীন চণ্ডীদাসের পুঁথি আছে। এখন বিচারের সময় আসিয়াছে কোন্ পদ খাঁটি, কোন্ পদ জাল? গুপ্ত মহাশয় যেমন যত রাজ্যের পদ বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়াছিলেন—তার কে জানে রায়-শেখর, কে জানে চম্পতি, কে জানে ভূপতি সিংহ! এখন আর সে-সব চলিবে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ভাব ইত্যাদি দ্বারা পদাবলী যাচাই করিতে হইবে। সুতরাং শারদ পূর্ণিমা দেখিয়া তদগদ হইলে ঠকিতে হইবে।

চণ্ডীদাসের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব! কেন বিদ্যাপতির উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব পড়িতে নাই?

চিকুরে গলয়ে জলধারা
যেন মুখশশী ভয়ে রোয়ে আন্ধারা

বানান যাই হউক ভাবটা তো এক। আচ্ছা এর সঙ্গে—

মিলিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে পড়েছে চিকুর রাশি
কাঁদিয়ে আঁধার কনক চাঁদার শরণ লইল আসি

এ পদের কি কোনো পার্থক্য নাই? 'আঁধার'—'কলঙ্ক' দুবার বলার সার্থকতা কি? কলঙ্ক চাঁদার পাঠ ঠিক নয়, পাঠ হইবে কনক চাঁদার। 'আঁধার স্মরণ লইল আসি' এই পদে, এবং বিদ্যাপতির আঁধার কাঁদিতেছে এই পদে, অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া গিয়াছে। কোন্‌টা ভাল?

বলিবার কথা অনেক ছিল। গোবিন্দ ঝার কথা বলিতে গেলে দুই এক কথায় কুলাইবে না। রূপনারায়ণ, হরিনারায়ণকে টানিয়া বরং বা দুই চারিটা পদ গোবিন্দ ঝার বলা চলে—'কণ্টক গাড়ি' ইত্যাদি পদ ঝার কিরূপে বলা যায়? বাঙ্গালী পদকর্ত্তা শেখর, ঘনশ্যাম, গোবিন্দ কবিরাজ যে হিন্দী বা মৈথিল ভাষা জানিতেন না এ কথা কে বলিল? কোন্ প্রমাণের বলে নগেন্দ্রবাবু 'কুলমরিযাদ' ইত্যাদি পদ ঝাকে দান করিতেছেন? স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাঁর যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিব। প্রবাসরী প্রবন্ধ সম্বন্ধে আর দু'এক কথা বলিয়া আলোচনা শেষ করিতেছি।

"নবি পঞোনারি গজে গঞ্জি নড়াইলি
পরসলি সূর কিরণে"

এই পাঠই তাঁহার মতে খাঁটি, এবং ইহার অর্থ "গজগঞ্জিত (দলিত) নবীন মৃণাল তুল্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছিস্ অথবা সূর্য্যকিরণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছিস্।"

'নবি পঙ্কোনারি অর্থে নূতন পদ্মনাল' হউক, কিন্তু 'গজে' গঞ্জি' অর্থ কিরূপে "গজ কর্ত্তৃক গঞ্জিত" হয় তিনি ব্যাকরণ বিস্তারিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। 'নড়াইলি'—নিক্ষিপ্ত হইলি। ইহার মাঝখানে দুটা শব্দ দিয়া গজগঞ্জিতের সঙ্গে মিল রাখিতে হইয়াছে। পদকল্পতরুতে ১৬৫ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম-এ মহাশয় এই পাঠের পরিবর্ত্তে নীচের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—

'জনু পদ্মারি গজ গেহ নড়ায়ল
পরশল সুর কি রমণে'
(পদকল্পতরু ২৪৫ সং পদ)

"যেন হস্তী পদ্মলতাকে গ্রহণ অর্থাৎ উৎপাটিত করিয়া পরিত্যাগ করিল। সেইরূপ সুরকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী (শ্রীকৃষ্ণ) তোমাকে স্পর্শ করিয়াছেন।"

নগেনবাবু রায় মহাশয়ের নাম করেন নাই, কিন্তু 'কোনো টীকাকার বলিয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ রায়-মহাশয়ই পদকল্পতরুতে এই পাঠ গ্রহণ করিয়া নগেনবাবুর মত খণ্ডন করিয়াছেন। নগেনবাবু বলিয়াছেন, "টীকাকার (অর্থাৎ রায়-মহাশয়) আমার উদ্ধৃত পাঠ হইতে পদ্মারি শব্দের অর্থ মৃণাল করিয়াছেন' (?) সতীশবাবুর মত পণ্ডিতের প্রতি নগেনবাবুর এই কটাক্ষ সঙ্গত হয় নাই। তাঁহার সম্পাদিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকা এবং ভাষাটীকা প্রভৃতি দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। উক্ত পাঠ বিচার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "গজে গঞ্জি নড়ায়ল" পাঠ না গ্রহণ করিলে নগেনবাবুর ব্যাখ্যাই টিকিবে না। ব্যাখ্যা হইবে "নূতন পদ্মনাল গজে গঞ্জিয়া (দলিয়া) ত্যাগ করিল। 'সুর কি রমণে' পাঠই ঠিক্ হইবে, কারণ 'সুর কিরণে' পাঠে ছন্দোভঙ্গ হয়, সমগ্র পদটির কোথাও ছন্দোভঙ্গ দোষ নাই। 'সুর কি রমণে' পাঠে অর্থেরও ব্যাঘাত হয় না।

'কণ্টক গাড়ি' পদের 'করকঙ্কণ পণ, ফণিমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে' রায়-মহাশয়ের গৃহীত এই পাঠের ভুল ধরিয়া নগেনবাবু পাঠ দিয়াছেন—

"কর কঙ্কণ পরশন ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু অ পাশে"

এ পাঠেও ঐ দোষ! এই কলিটিতেই ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে। সমগ্র পদে আর কোনো কলিতেই ছন্দোপতন হয় নাই। তারপর "রাধা নিজের করকঙ্কণ চরণে স্পর্শ করাইয়া ভুজঙ্গের কঠিন বন্ধন শিক্ষা করিতেছেন?" এইরূপ অর্থ নগেনবাবু করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি সে শিক্ষাটা কিরূপ? রাধিকার হাতের কঙ্কণ কি পায়ে পরা চলিত নাকি? না রাধিকা কাঁকনটি লইয়া একবার করিয়া পায়ে ঠেকাইয়া সাপের গুরু অ পাশ অভ্যাস করিতেন! গোল কাঁকনটি পায়ে না পরিতে পারিলে শুধু ঠেকাইয়া কি বুঝা যাইবে?

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

চিত্র ও ছোট গল্পের প্রতিযোগিতা

১৩৩৬ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত সমুদায় মৌলিক ছোট গল্পের মধ্যে যে তিনটি প্রবাসীর পাঠকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাদের লেখকগণকে গুণানুসারে যথাক্রমে দুইশত, দেড়শত ও একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত বর্ষে প্রকাশিত ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলা রীতিতে আধুনিক চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্যও এক-শত টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। লেখক ও পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্মরণ রাখিবেন। পুরস্কার বিতরণ এই-সকল নিয়মানুযায়ী হইবে।

প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য ছোট গল্প ও চিত্র নির্ব্বাচন প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগ করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সম্পাদক উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করিতে অক্ষম। যে গল্প এক সংখ্যায় সমাপ্ত নয়, অথবা যাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাজার শব্দের অধিক, তাহা পুরস্কার-প্রতিযোগিতার জন্য গ্রাহ্য হইবে না। একটি কথা বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রবাসীতে প্রকাশিত ছোট গল্পমাত্রের জন্যই তাহাদের লেখকগণ পৃষ্ঠা-প্রতি তিন টাকা হিসাবে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা পাইবেন। এই দক্ষিণার সহিত পুরস্কারের কোন সম্পর্ক নাই। চিত্রকরেরাও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা পাইবেন। পুরস্কার বাবদ। প্রবাসীতে প্রকাশিত, পুরস্কারের জন্য গ্রাহ্য সমুদায় গল্প ও চিত্রের মধ্যে কোন্‌গুলি পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত তাহার বিচার প্রবাসীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ করিবেন। আগামী চৈত্রমাসের প্রবাসীতে একটি কুপন থাকিবে। তাহাতে প্রবাসীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ কোন্ তিনটি গল্প ও কোন্ চিত্রটি পুরস্কারের উপযুক্ত, সেইগুলির নাম পর পর গুণানুসারে লিখিয়া ১৩৩৬ সনের ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বে প্রবাসী কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন। প্রত্যেকটি কুপন স্বাক্ষরিত এবং গ্রাহকনম্বর ও ঠিকানা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। অস্বাক্ষরিত ও ২০শে চৈত্রের পরে প্রাপ্ত কুপন ভোট হিসাবে গণনা করা হইবে না। প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগ এই-সকল কুপন পরীক্ষা ও গণনা করিয়া যে তিনটি গল্প ও যে চিত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইবে, তাহাদের লেখক ও চিত্রকরকে পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান ভোটের সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রবাসীর সম্পাদক অথবা তাঁহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও ভোট পরীক্ষা অথবা গণনা করিবার অধিকার থাকিবে না। এই ভোট ব্যতীত পুরস্কার প্রতিযোগিতার আর কোনও বিচার হইবে না। একই লেখক বা চিত্রকর একাধিক গল্প বা চিত্র পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার পাইবেন না। প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে বিজ্ঞাপিত হইবে এবং পুরস্কার সেই মাসেই বিতরণ করা হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

শিবাজী মহারাজ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক চিত্রিত—৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য বারো আনা। প্রকাশক—এম্‌-সি-সরকার এণ্ড সন্স্‌, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এই ছোটো বইখানিতে শিবাজী মহারাজ সম্বন্ধে চারিটি ঐতিহাসিক কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে—আফজল খাঁ বধের কথা, পুণায় শিবাজীর হাতে শায়েস্তা খাঁর লাঞ্ছনা, দিল্লীতে শিবাজীর আগমন ও ঔরঙ্গজেবের কবল হইতে কৌশলে পলায়ন, এবং বীরাঙ্গনা সাবিত্রী বাঈয়ের কথা। ছোটো একটি ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এই বইয়ে "যথাসম্ভব ইতিহাসের সত্য রক্ষা করা হইয়াছে। গল্পগুলি সত্য হইলেও উপন্যাসের মত আশ্চর্য্য। আর ইহাতে শিবাজীর চরিত্র অতি সুন্দর পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।" ভারতের মুসলমান-যুগের ইতিবৃত্তের প্রথিতনামা আলোচনাকারী ও গবেষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার লেখক, ও মুসলমান-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বইয়ের গল্পগুলির ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে অনুকূল মত দিতেছেন। গল্পগুলি গল্প হিসাবে আমাদের চমৎকার লাগিয়াছে। ছেলেমেয়েদের পক্ষে এখানি বেশ উপযোগী পুস্তক হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর হাতে সেকালের যুদ্ধবিগ্রহের ও রীতিনীতির ছবিগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং গল্পগুলি হইতে নানা দিক্‌ দিয়া মহারাজ শিবাজীর চরিত্রের গৌরব অনুভব করা যায়। দেশের মহাপুরুষদের চরিত্র ছেলেমেয়েদের মধ্যে যত আলোচনা হয় দেশের সংস্কৃতি রক্ষার পক্ষে ততই মঙ্গল ; এবং এইরূপ সুলিখিত পুস্তক হইতে এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাদরে গ্রহণযোগ্য।

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর ও পরিপাটী। বিখ্যাত শিল্পী যতীন্দ্রবাবুর আঁকা কতকগুলি ছবি বইয়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। শিবাজী মহারাজের দুইখানি ছবি আছে।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সমালোচনা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবতরত্ন বি-এ, উভয়ে মিলিত হইয়া সংস্কৃত টীকা এবং ইংরাজি অনুবাদসহ একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশিত করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইহার সম্পাদক। ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন প্রেসে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান ৭।২ই পেয়ারা বাগান ষ্ট্রীট, অথবা চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি কোম্পানি, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২।৹ টাকা।

গ্রন্থখানি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পিথাপুরম্‌ নগরের মহারাজ বেঙ্কট কুমার মহিপতি সূর্য্যরাও মহোদয়ের উৎসাহে ও সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্বভূষণ মহাশয় প্রথম নয়টি অধ্যায়ের টীকাকার ও অনুবাদক এবং বেদান্তভূষণ মহাশয় শেষ নয়টি অধ্যায়ের টীকাকার ও অনুবাদক। এতদ্ব্যতীত তত্ত্বভূষণ মহাশয় ৭৮ পৃষ্ঠায় একটি ইংরাজি ভূমিকা লিখিয়াছেন।

গীতা বহুলোকে বহুভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, সকলেরই কিছু না কিছু নূতনত্ব আছে বা থাকিতেছে। এ গীতার নূতনত্ব দেবনাগর অক্ষরে টীকার ও মূলের মুদ্রণ এবং টীকাও তাহার ইংরাজি অনুবাদের সরলতা। সাধারণতঃ যে-সব সংস্কৃত টীকা দেখা যায়, তাহাতে ব্যাখ্যা ও বিচার মিশ্রিত থাকে বলিয়া মূলের অর্থগ্রহ করিতে অসুবিধা হয়, এ গীতায় টীকামধ্যে কোন বিচার না থাকায় মূলের অর্থ বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না।

বিচারের জন্য তত্ত্বভূষণ মহাশয় ভূমিকাটি লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদ, গীতাবক্তা ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ধারণা এবং ১৮টি অধ্যায়ের তাৎপর্য্য তাঁহার মতানুসারে তিনি যেরূপ অতি সরল ও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন তাহা দেখিলে যারপরনাই আনন্দই হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সমালোচনাকালে আমরা বলিয়াছি যে, তাঁহার মতবাদটি পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর হেগেলেরই মতবাদ। তবে হেগেলের মতবাদটি ক্রীশ্চান সংস্কার সংমিশ্রিত, আর তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতবাদটি হিন্দুসংস্কার-সংমিশ্রিত এইমাত্র বিশেষ। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে এই ভাবের ভিতর দিয়া গীতার ব্যাখ্যা যতদূর ভাল হইতে পারে তাহা হইয়াছে। প্রথমাবধি পাশ্চাত্য দার্শনিক সংস্কারে মণ্ডিত হইয়া হিন্দুর বেদবেদান্ত নিজে নিজে অধ্যয়ন করিলে তাহাতে যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধ জন্মে এবং যেরূপ তর্ককুশলতা ও সূক্ষ্ম বিচার প্রকটিত হয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ে সে-সব অতি পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হইবে। এরূপ স্থলে আজকালকার শিক্ষিত মণ্ডলীর নিকট এ গ্রন্থ যে অতি উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের বুদ্ধিশৌর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ-চিত্ত তাঁহাদের যে আমাদের বেদ-বেদান্তের উপর কতকটা শ্রদ্ধা জন্মিবে তাহা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমান সমাজে এই উপকারটি বড় কম লাভ নহে। তত্ত্বভূষণ মহাশয় ১২খানি উপনিষদ্‌ ও এই গীতা প্রকাশ করিয়া সমাজকে এই যে দান করিয়া গেলেন ইহাতে সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। এখন আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে আচার্য্য পদবীর জন্য যে কয়খানি গ্রন্থের ভাষ্যাদি রচনা আবশ্যক তাহা তত্ত্বভূষণ মহাশয় প্রায় সবই করিলেন, বাকি রহিল কেবল ব্রহ্মসূত্রখানি। আশা করি, তিনি ভগবানের কৃপায় সুস্থ শরীরে থাকিয়া তাহাও সম্পূর্ণ করিয়া যাইবেন এবং আচার্য্য পদবী মণ্ডিত হইয়া সমাজের পূজ্য হইয়া থাকিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সচিত্র কলেরা চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-বি প্রণীত। ২২বি, বেথুন রো, মানসী ও মর্ম্মবাণী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকে লেখক কলেরার চিকিৎসা-প্রণালী অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়াছেন। সব পরিচ্ছেদই জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। কিছুই বাদ পড়ে নাই। চিকিৎসা-প্রণালী নূতন নহে, তবে লিপিবার গুণে এতই সহজবোধ্য হইয়াছে যে কাহারও ভেনে সেলাইন দিবার ভীতি বা ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। মফস্বলবাসী চিকিৎসকগণের পক্ষে ইহা বড়ই উপযোগী হইয়াছে।

৩৮ পৃষ্ঠার নবম চিত্রের সহিত তাহার বিবরণী একটু ভিন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ লেখা আছে 'ভেন ও ক্যানিউলার উপর দিয়া একটি গেরো' ইত্যাদি, কিন্তু ছবিতে গেরোটি ক্যানিউলার উপর দিয়া দেখানো হয় নাই।

৪র্থ পৃষ্ঠায় কমা ব্যাসিলি আবিষ্কারের সময় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ ও ৮৮পৃষ্ঠায় ১৮৮৩ বলা হইয়াছে। প্রথমটাই ঠিক।

পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল। এইরূপ পুস্তক পল্লীগ্রামবাসী চিকিৎসকগণকে যে সাহস ও উৎসাহ দান করিবে, তাহাতে কোন ভুল নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

নি-চ-মি.

উদ্ভ্রান্তলতা—শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রবাসী কার্য্যালয় ; মূল্য দেড় টাকা। ৩৫৫ পৃঃ।

এই উপন্যাসখানি প্রথম সংস্করণে শ্রীসংযুক্তা দেবী প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকৃত লেখিকাদ্বয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই পরিষ্কার ও সুরুচিসঙ্গত।

ফল-লাভ—শ্রীঅসিতকুমার হালদার রচিত ক্ষুদ্র নাটিকা।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের উপযুক্ত নাটিকার বাংলা ভাষায় অভাব আছে। 'ফললাভ' এই অভাব কতকটা দূর করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। নাটিকার গানগুলি কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত। ইহাতে নাটিকাখানির সরসতা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই ও মলাটের পরিকল্পনায় বইখানি সুদৃশ্য হইয়াছে। দাম দেওয়া হয় নাই।

অ

বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক—রায় এণ্ড গুপ্ত। ২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দাম দশ আনা। ৭২ পৃষ্ঠা।

সহজ ও সরল ভাষায় সাধারণকে বেতার-শ্রবণ-যন্ত্র (Radio Receiving Set) নির্ম্মাণে সাহায্য করাই পুস্তকখানির উদ্দেশ্য। বেতারের একটু ইতিহাসও আছে, তাহাতে সুবিধা এই, যে, বিষয়টি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিজের কথা এই, "বইখানির উন্নতি করবার ঢের জিনিষ আছে। দু-একটি সামান্য ভুলও হয়ত থাকতে পারে।" তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। ক্যারাডে এবং ম্যাক্সওয়েল-এর গবেষণার ফলে হার্ট্‌জ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ব্রান্‌লির মেটালিক ফাইলিং রিসিভার, বসুর স্পাইরাল স্প্রিং রিসিভার এবং লজের কোহিয়ারার থিওরীর আভাস দিলে ভাল হইত। আচার্য্য জগদীশ বসু কোহিয়ারার থিওরী খণ্ডন করেন এবং ক্রিষ্টাল রিসিভার আবিষ্কার করেন। এই কথাগুলির উল্লেখ থাকিলে বহিখানি বাঙালী পাঠকের আরও প্রিয় হইত। মার্কণি প্রথমে ব্রান্‌লির রিসিভার ব্যবহার করিতেন, পরে তিনি দূরতর দেশে বেতার-বার্ত্তার আদান-প্রদানের জন্য বসুর ক্রিষ্টাল রিসিভার ব্যবহার করেন। মার্কণির নিজের কৃতিত্ব এরিয়েল আবিষ্কারে এবং বেতার-সাহায্যে পৃথিবীর দূরতম প্রদেশের যোগসাধনে। অবশ্য এ বিষয়ে ব্রিটিশ নৌ বিভাগ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল।

এডিসন, ফ্লেমিং প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে আজকালকার ভাল্‌ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অল্প পরিধির মধ্যে সকলের পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। তবু এই পুস্তকখানিই পথ-প্রদর্শক। আশা করি, ভবিষ্যতে বীরেনবাবু বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবেন।

ন-না

লিপিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পুনর্মুদ্রণ। মূল্য একটাকা বার আনা।

'লিপিকা' আটত্রিশটি ক্ষুদ্র গল্প ও গদ্য কবিতার সমষ্টি। গদ্যে-কাব্যে বিজড়িত এই ধরণের রচনার প্রথম সূচনা—কবির 'কথিকা'য়। 'লিপিকা'র প্রথম লেখা 'পায়ে চলার পথ'—রূপক। "আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখলুম এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।" লেখাটি যৌবনারম্ভে রচিত—কবির রাজপথের কথাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'গলির কথা'য় কবি বলিতেছেন, "তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জ্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারীর খোসা, মরা ইঁদুর—সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব।" 'সুয়োরাণীর সাধ,' 'উপসংহার, 'সিদ্ধি' 'পরীর পরিচয়' রূপকথার রূপে সমুজ্জ্বল। শাণিত তরবারির ফলকের মত তীক্ষ্ণ শ্লেষ 'কর্ত্তার ভূত' ও 'তোতা কাহিনী'র মধ্য দিয়া ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে, 'মীনু, 'ভুল স্বর্গ,' 'অস্পষ্ট,' 'নতুন পুতুল,' ও 'পুনরাবৃত্তি' প্রভৃতির মধ্যে পুনরায় নূতন করিয়া ছোট-গল্পে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই। 'লিপিকা'র লেখাগুলি যেন এক-একখানি ছবি, দু'একটি রেখা, এখানে ওখানে মৃদু রঙের একটু প্রলেপ, তাহাতেই যেন তাহারা অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অসম্পূর্ণতার মধ্যেই তাহাদের সম্পূর্ণতা। কবির ভাষায়, "রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।"

বেণুবন—শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী কলেজ। ষ্ট্রীট মার্কেট, আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলিকাতা হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বেণুবন—কাব্য গ্রন্থ। কবি বেনোয়ারীলালের কৌতুক-কাব্য খিচুড়ি এককালে সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধবয়সের 'বেণুবনে' সেই পুরাতন সুরের মৃদুমধুর প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। মঞ্জরী, পুরাতনী ও সাহিত্যিকা—এই তিনভাগে পুস্তকখানি বিভক্ত। 'সাহিত্যিকা' কবিতায় সাহিত্য সমালোচনা। 'পুরাতনী' কেশবচন্দ্র-প্রমুখ মহাত্মাদের সম্বন্ধে কাব্যে উচ্ছ্বাস। 'মঞ্জরী' কতকগুলি খণ্ড কবিতার সংগ্রহ। দুহিতা কবিতাটি করুণ ও সুন্দর।

'নয়নে ফুটন্ত স্নেহ, মুখে মৃদু-মধু হাসি,
মা আমার সোনা মেয়ে, তোরে বড় ভালবাসি।'

মহাত্মা তুলসীদাস-কৃত বিনয় পত্রিকা—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি-এল কর্ত্তৃক বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাংলা পদ্যে অনূদিত ও প্রকাশিত।

মূল্য প্রতি খণ্ড পাঁচ সিকা। লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সাহায্যে পুস্তকখানি মুদ্রিত।

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে তুলসীদাসের মূল কাব্যের সহিত পাঠকের পরিচিত হইবার কিছু সুযোগ ঘটে। অনুবাদ পয়ারে রচিত। প্রতি পৃষ্ঠার নীচে দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। প্রসিদ্ধ হিন্দী কাব্যগুলির বাংলা অনুবাদ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

চিকিৎসা-সঙ্কট—নাটিকা। শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন। এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।/০

সুবিখ্যাত পরশুরামের 'গড্ডলিকা'র 'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পটি বিখ্যাত চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় নাটিকায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। পরশুরাম স্বয়ং এই নাটিকার 'বিজ্ঞাপন' লিখিয়াছেন।

ভাল জিনিষকে খারাপ করা সোজা, কিন্তু ভাল জিনিষকে ভাল রাখা বা আরও ভালো করা কঠিন। ইহা আর্টিষ্টের কাজ। যতীন্দ্রবাবু আর্টিষ্ট, তাই তিনি 'চিকিৎসা সঙ্কট'কে বধ না করিয়া মাল মশলার সাহায্যে অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ক্লাব ও আড্ডার অভিনয় করিবার উপযোগী ছোট ছোট নাটকের জন্য যাঁহারা হাতড়াইয়া বেড়ান, তাঁহারা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন। অন্ততঃ একটা season ভাল কিছু দেখাইতে পারিবেন।

স

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

জীবনস্মৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী।

যাত্রী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲

কামন্দকীয় নীতিসার—শ্রীগণপতি সরকার।

অধ্যাত্মবিদ্যা—স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি।

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত।

হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রণালী—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী সাহিত্যভবন, বজবজ—মূল্য একটাকা।

কৃষ্ণকলি—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মজুমদার, মূল্য ॥০

কর্ম্মরহস্য—শ্রীবিধুভূষণ সরকার প্রণীত; মূল্য ১৲০

যমের মুখে—শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত; মূল্য ৷৷০

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

১৮৪৭ সালে কলিকাতা হইতে "সত্যসঞ্চারিণী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—শ্যামাচরণ বসু। এই পত্রিকাখানির কোনো সংখ্যা কাহারও নিকট থাকিলে, অথবা কাহারও উহার বিষয়ে কিছু জানা থাকিলে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলায় প্রচলিত খনার বচনের উৎপত্তি কিরূপে হইল? প্রবাদে বরাহ মিহিরের যে ভ্রাতৃবধূর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে খনার সহিত বাংলার খনার বচনের কিরূপ সম্বন্ধ? খনার মাতৃভাষা কি ছিল? ভারতের অন্য কোন ভাষায় এইরূপ খনার বচন প্রচলিত আছে কি?

শ্রীবিমলকৃষ্ণ পাল

১। রবারের চাষ কেমন করিয়া করিতে হয়?

২। রবারের বীজ বা চারা কোথায় কিনিতে পাওয়া যায়?

৩। নিম্নবঙ্গে রবারের চাষ সম্ভব কি না?

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

সিদ্ধান্ত কৌমুদী—সূত্র ও বৃত্তিসহ ইংরাজি অনুবাদ কোথায় পাওয়া যায় ও মূল্য কত কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

হরিসাধনলাল দাস

১। ভারতবর্ষের বাহিরে পৃথিবীর কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে?

২। ইউরোপ ও আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী অধ্যাপক কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন কি না? থাকিলে তাঁহাদের নাম, বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপনার বিষয় জিজ্ঞাস্য।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার চক্রবর্ত্তী

১। হিন্দু ধর্ম্মানুসারে নারী-জাতির ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যথোচিত সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা এবং 'জগদ্ধিতায়' কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে কিনা? থাকিলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও বর্ত্তমান কলিযুগে কোন্ কোন্ খ্যাতনামা নারী এরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিষয় কোন্ কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে?

শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

৺অষ্ট চণ্ডীকা পূজার বিধি ব্যবস্থা, ধ্যান, ও বীজ বিষয়ে কোনো পুস্তক আছে কিনা? অথবা কোন পণ্ডিত তাহা জানেন কিনা? জানিলে তাঁহার ঠিকানা কি?

শ্রীদীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

কাপড় কাচিবার ও গায়ে মাখিবার সাবান প্রস্তুত প্রণালীর ইংরাজী কি বাংলা. কোন পুস্তকাদি (বিস্তারিতভাবে লিখিত) আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহার মূল্য কত ও কোন্ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে? সকল রকম সাবান প্রস্তুত-প্রণালীর শিক্ষা করিবার কোন্ স্কুল আছে কি না?

শ্রীহরিধর গোস্বামী

সাধারণতঃ দেখা যায়, দুই-চার বৎসর পরেই সাদা কাগজ লালচে রং ধারণ করে। উহার কারণ কি এবং নিবারণ করিবার কোন উপায় আছে কিনা?

শ্রীকান্ত মিত্র।

১। বঙ্গদেশে কোথাও "হাড়ের"র কারখানা আছে কিনা? থাকিলে কোথায়? সেখানে "হাড়" কোথাও পাঠায়, না তাহারাই সার প্রস্তুত করে? সেখানে কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া হয় কি না? কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী

১। গৌরীশঙ্কর অভিযান সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কিনা? প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কোথায় ও কত মূল্যে পাওয়া যাইবে?

২। ঘরের ভিতর হিন্দুদিগের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিলে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ মৃতের প্রতি এবং মৃতের পরিবারের লোকের প্রতি দোষারূপ করেন। এরূপ মৃত্যুতে বাস্তবিক কোন দোষ ঘটে কিনা? ইহার অনুকূলে বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি বা শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ আছে কি?

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মীমাংসা

(১)

ভারতের জাতীয় পতাকা

ভারতের জাতীয় পতাকা ১৯২১ সন হইতে প্রচলিত হয়। এই পতাকার পরিকল্পনা ও অনুমোদন উক্ত সনে আমেদাবাদ কংগ্রেসে হয়! এ সম্বন্ধে এই বৎসরের ৫ম সংখ্যা রাষ্ট্রবাণীতে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

শ্রীচুনীলাল বসু

(২)

কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণের কোন বাংলা অনুবাদ নাই। কাব্যপ্রকাশের শ্রীগঙ্গানাথ ঝা কৃত ইংরাজী অনুবাদ আছে ও পি. ভি. কানে প্রণীত সাহিত্যদর্পণের ইংরাজী টীকা সম্বলিত সংস্করণ আছে। ঐ দুই খানা বই-ই বোম্বের যে কোন প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইতে পারে। দশরূপকের কোন ইংরাজী অনুবাদ বা টীকা নাই। খুব সম্ভব বঙ্গানুবাদও নাই।

শ্রীরেণু দাসগুপ্তা

(৩)

বাঙ্গালী বালক বালিকাগণের হিন্দী শিক্ষার উপযোগী পুস্তক

হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী কৃত "সরল হিন্দীশিক্ষা" নামে একখানি পুস্তক আছে। বই খানি বাঙ্গালী বালক বালিকাগণের হিন্দী শিখিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। মূল্য ১।০। হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, ১২৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীরমেশচন্দ্র আঢ্য

(৪)

কৈলাসযাত্রার সমস্ত বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে সন্নিহিত আছে। পুস্তকটীর নাম—

"শ্রীকৈলাসমার্গে প্রদীপিকা"

পঃ—ধর্ম্মদত্ত শর্ম্মা কৃত।

প্রকাশক

শ্রীসেট্, খুশীরামজী, মুরারীলাল ছারিয়া

প্রাপ্তিস্থান—

ললিতাঘাট, মন্দির রাজরাজেশ্বরীজী কাশী

শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এবং

শ্রীসুধীন্দ্রমোহন ও মুরলীমোহন চক্রবর্ত্তী

(৫)

যশোহর নামের ঐতিহাসিক তথ্য

ভারত সম্রাট আকবর শাহের সময় বঙ্গেশ্বর দাউদ শাহ, মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। গৌড় নগর তৎকালে বাংলার রাজ ধানী ছিল। প্রতাপ-পিতামহ ভবানন্দ রায়, মোগলের সহিত পাঠানের সংঘর্ষের ভবিষ্যত ফলাফল বিষময় জানিয়া, দক্ষিণ অঞ্চলে—নদীবহুল, দুর্গম, নিবিড় বনাকীর্ণ, হিংস্র জন্তু সমাকুল সুন্দরবন নামক প্রদেশটী দাউদ শাহের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ লইয়া তথায় সুরম্য ও সু-রক্ষিত বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই রাজ্য কালে প্রতাপাদিত্যের বুদ্ধি, বীরত্ব ও কৌশলে এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, গৌড় নগরের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য ইহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। 'গৌড় নগরের যশঃ হরণ করিয়া এই প্রদেশের নাম যশোহর হয়। বাংলার বীর ২।৩ পৃষ্ঠা)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বসু

অশুদ্ধ শোধন

আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "নারী নামের পদ্ধতি" প্রবন্ধে কয়েকটা বানান ভুল হইয়াছে।

পৃষ্ঠা	পাটী	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪২	২	১	ক্ষত্রিয়মাত্রেই	ক্ষত্রিয়ামাত্রেই
৪৪৪	১	২৩	লাটসেম	লাটসেন
৪৪৫	১	২৫	মণ্ডলী	(হইবে না)
৪৪৭	১	২৫	মিত্রণী মহোদয়	মিত্রনী মহোদয়া

নী প্রত্যয় সর্ব্বত্র নী হইবে, ণী হইবে না।

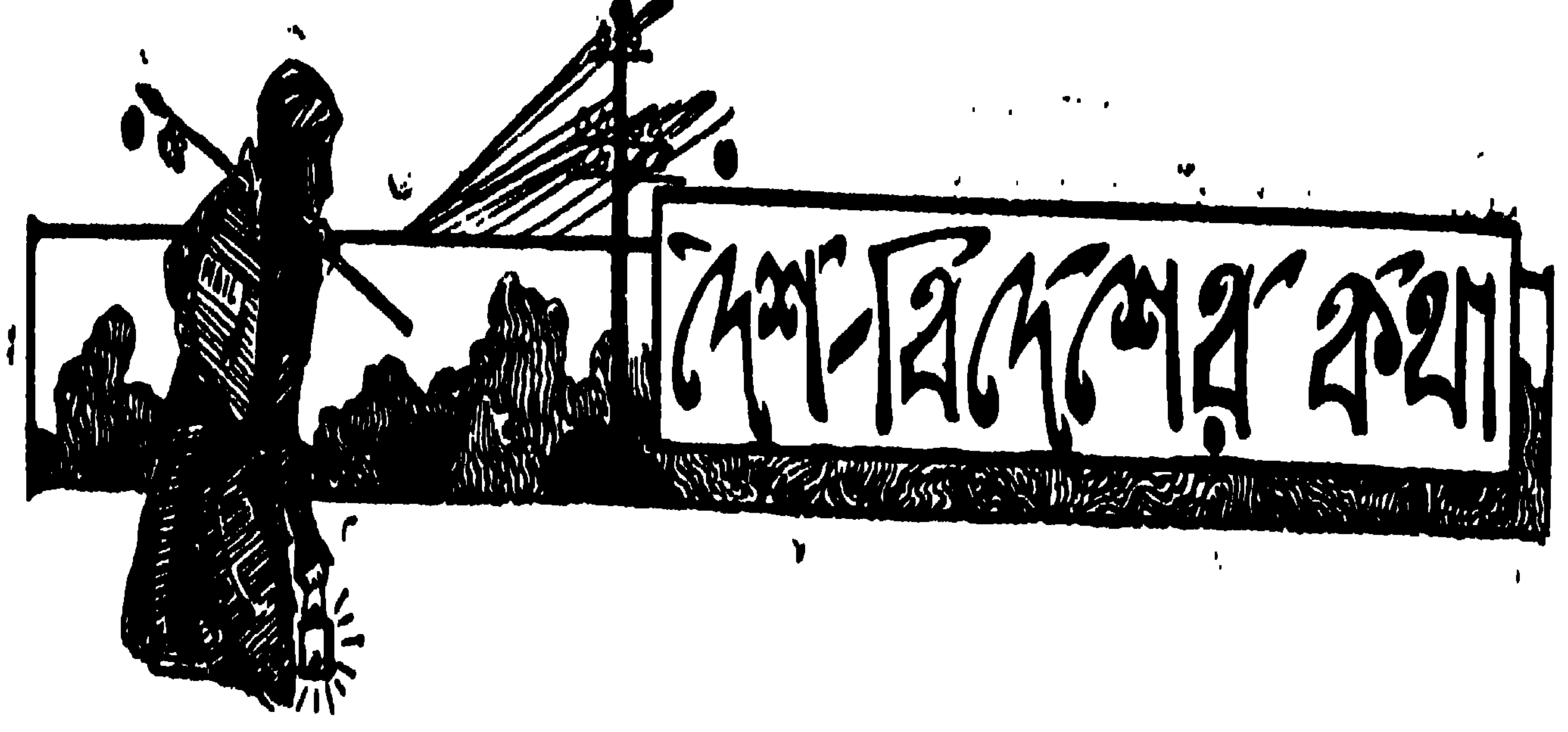

ভারতবর্ষ

পরলোকে স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—

সুপরিচিত গীতবিদ্যাবিশারদ, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই বৈশাখ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হারাইল। রামপ্রসন্নবাবু ১২৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশ সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য পুরুষানুক্রমে খ্যাত। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। রামপ্রসন্নবাবুও অতি অল্প বয়স হইতেই সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি প্রথমজীবনে নাড়াজোলের রাজবাটীতে সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। সেই সময়ে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অনুরোধে রাজা নরেন্দ্রলাল খান ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গায়কগায়িকাগণকে তাঁহার বাড়ীতে আহ্বান করিতেন এবং দেশ-বিদেশ হইতে সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ করেন। তাঁহারই অনুরোধে রাজাবাহাদুর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কারিকর ৺ননীলাল ঘোষকে মেদিনীপুরে রাখিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া ভারতীয় সকল সঙ্গীত-যন্ত্রাদি প্রস্তুত করান। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রামপ্রসন্ন বাবুর যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ে রামপ্রসন্ন বাবু বহুবার সঙ্গীতের পরীক্ষক হিসাবে আহূত হন। রামপ্রসন্নবাবুর পিতা বিষ্ণুপুরে একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়া এই বিদ্যালয়টি যাইতে বসিয়াছিল। রামপ্রসন্নবাবু এই বিদ্যালয়টির সম্পূর্ণ সংস্কার আরম্ভ করেন। বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদিস্থান বিষ্ণুপুর, এই বিষ্ণুপুরে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি কেন্দ্র করিবেন রামপ্রসন্নবাবুর ইহাই একমাত্র সংকল্প ছিল। এই কাজের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া রামপ্রসন্নবাবু বাহির হইতে বহু কর্মের আমন্ত্রণ, আর্থিক দিক হইতে লাভজনক হইলেও প্রত্যাখ্যান করেন।

রামপ্রসন্নবাবুর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি গান, সেতার, সুরবাহার, এসরার, মৃদঙ্গ, তবলা সকল বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীত বিষয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থেরও প্রণেতা। এই পুস্তকখানির নাম 'সঙ্গীতমঞ্জরী'। ইহাতে বহু পুরাতন ধ্রুপদ, খ্যাল, ঠুংরী ও টপ্পা সন্নিবেশিত আছে। হিন্দুস্থানী গানের স্বরলিপি সমেত এরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। রামপ্রসন্ন

বাবু স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদিত "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নামক মাসিক পত্রের একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ১৩২০ সালে তিনি মৃদঙ্গদর্পণ ও তবলাদর্পণ নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া প্রকাশ করেন।

সেণ্ট্রাল রোডের একটী দৃশ্য—বন্যার জল ৩ ফুট কমিয়া যাওয়ার পর　—শিলচর

বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ—

এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে আয়ুর্বেদ উক্ত প্রণায় চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে দেশীয় প্রাচীন শিল্পকলার ন্যায়

অম্বিকাপুর রোডের দৃশ্য—বৈদ্যুতিক তারের খুঁটীগুলি দেখা যাইতেছে　—শিলচর

দেশীয় আয়ুর্বেদও অনেকস্থানে হাতুড়ের হাতে পড়িয়া লোকের কাছে উচিত সম্মান পাইতেছে না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মত বৈদ্যশাস্ত্রও যে বহুগবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই জানেন না

শিলচর সেণ্ট্রাল রোডের একটী দৃশ্য—লোক ছাদে আশ্রয় নিয়াছে—নিম্নে রাস্তা দিয়া বাঁশের ভেলা চলিয়াছে

ইহার জন্য দায়ী কবিরাজ সম্প্রদায়। তাঁহারা এতদিন পর্য্যন্ত আয়ুর্বেদকে গুরুর কাছে মন্ত্র দীক্ষা লওয়ার প্রণালীতে শিখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। এযুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে ইহার যোগ সাধন করিয়া আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসাপ্রণালী আরও অগ্রসর করিতে চেষ্টা করেন নাই।

সেই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামে একটি আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। এই বৎসরে এই বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠটি নবম বৎসরে পদার্পণ করিল। এই বিদ্যাপীঠের অধ্যাপনা, পরীক্ষা, সজ্জোপকরণশালা, গ্রন্থশালা, কায়চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, অন্তর্বিভাগ, সেবা প্রভৃতি নানা বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত একটি তথ্যানুসন্ধান (research) বিভাগও আছে। এই তথ্যানুসন্ধান বিভাগ সম্বন্ধে এবৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে—

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের বার্ষিক বিবরণীতে আর একটা সংবাদ জানিলাম। এখানকার গবেষণাগারে যে সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ইহা একদিন আয়ুর্বেদ জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। বৈদ্য-চিকিৎসকগণ এ সংবাদে ত আনন্দিত হইবেনই সাধারণ লোকের নিকটেও উহা যে অতিশয় আনন্দের সংবাদ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ

ফুট জল কমিয়া যাওয়ার পর তারাপুর—তারাপুর মহল্লার ইণ্ডিয়া ক্লাব গৃহ ও মসজিদের দৃশ্য ; দূরে তারাপুরের বাসাগুলির ছাদ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে—ইহার অনেকগুলি জলের নীচে গিয়াছিল।
—শিলচর

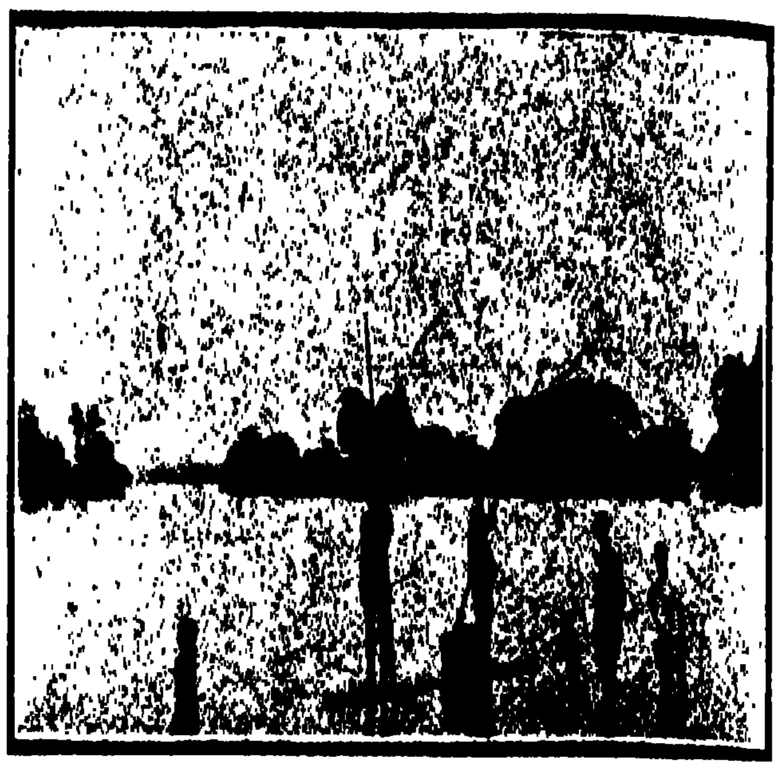

মিলিটারী ষ্টেশনের সন্নিহিত সহরের একটী উচ্চ স্থানের দৃশ্য—শিলচর

নাই। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি অসম্ভব। এই বৈজ্ঞানিক যুগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা বিশেষভাবে প্রচার না

হাইস্কুলের নিকটে রাস্তার উপরে বৃহৎ নৌকা চলিতেছে। নৌকার পশ্চাতে বরাক নদী দেখা যাইতেছে। দূরে গ্রামগুলির গাছপালার উপরিভাগ মাত্র দেখা যাইতেছে —শিলচর

দেওয়ানজী বাজারের দৃশ্য—জল অনেকটা কমিয়া যাওয়ার পর —শিলচর

করিলে আর আমাদের উপায় নাই। সেইজন্ত এই শাস্ত্রপীঠের অভিনব ব্যবস্থায় আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই বিভাগে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ কবিরাজ মহাশয় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ সেন—

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল হেমেন্দ্রনাথ সেন কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি বহরমপুরের উকীল ও বিখ্যাত কর্ম্মী স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত হেমেন্দ্রবাবুও নানারূপ দেশ হিতকর কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ও উৎসাহ ছিল।

এ বিষয়ে তিনি একদিকে দানবীর মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আর এক দিকে অগ্রজ রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের সহকর্ম্মী ছিলেন। বঙ্গদেশে যখন বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের সঙ্কল্প প্রবল হয়, তাহার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠনাথ কংগ্রেসে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বিপুল সম্পত্তি দেশবাসীর কল্যাণকর কার্য্যের জন্ত ন্যায়রূপে ব্যবহার করিয়া দেশে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদিগের সম্মিলিত চেষ্টার ফল—বঙ্গদেশে "চীনামাটির" দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানই আজ বেঙ্গল পটারিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত তিনি অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বিচলিত না হইয়া মৃত্যুকালেও তিনি তাহার জন্য নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বেঙ্গল গ্লাস-ওয়ার্কস্ তাঁহারই চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল কারখানা পর্য্যবেক্ষণ ভার লইয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; নিজের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অনাদিনাথকে কাচশিল্প শিখিবার জন্ত য়ুরোপের শিল্পকেন্দ্রে পাঠাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ঐ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কামনায় হাইকোর্টে ওকালতী ত্যাগ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রামের উন্নতিকল্পেও বহু চেষ্টা করিয়া ছিলেন। গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্ত পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবালয়

মালবিকা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ সেন

সংস্থাপন ও চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা এ সকলই হেমেন্দ্রবাবুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদ্যোগে ও অর্থে হইয়াছে।

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

শ্রীমননকুমার মৈত্র সম্প্রতি লণ্ডনের পি-এইচ-ডি উপাধি এবং 'ইম্পিরিয়েল কলেজ অব সায়েন্সে'র ডিপ্লোমা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইনি বিলাতে বিশেষ করিয়া "ইলেক্টো-কেমিষ্ট্রি' অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে এবিষয় বড় কেহ একটা অধ্যয়ন করে নাই। এদেশের শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের দিক হইতে এ বিষয়টির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি যে থিসিস এর দ্বারা পি-এইচ-ডি উপাধি পান তাহার নাম—"The Effect of Cathodic Treatment on the Dissolution of Metals in Acids." মননকুমার পরলোকগত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্রের পুত্র। তিনি কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্-সি উপাধিধারী এবং রয়েল কলেজ অব সায়েন্স ও বিলাতের ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রির সদস্য।

এবার লণ্ডনের এফ-আর-সি-এস্ পরীক্ষায় শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত

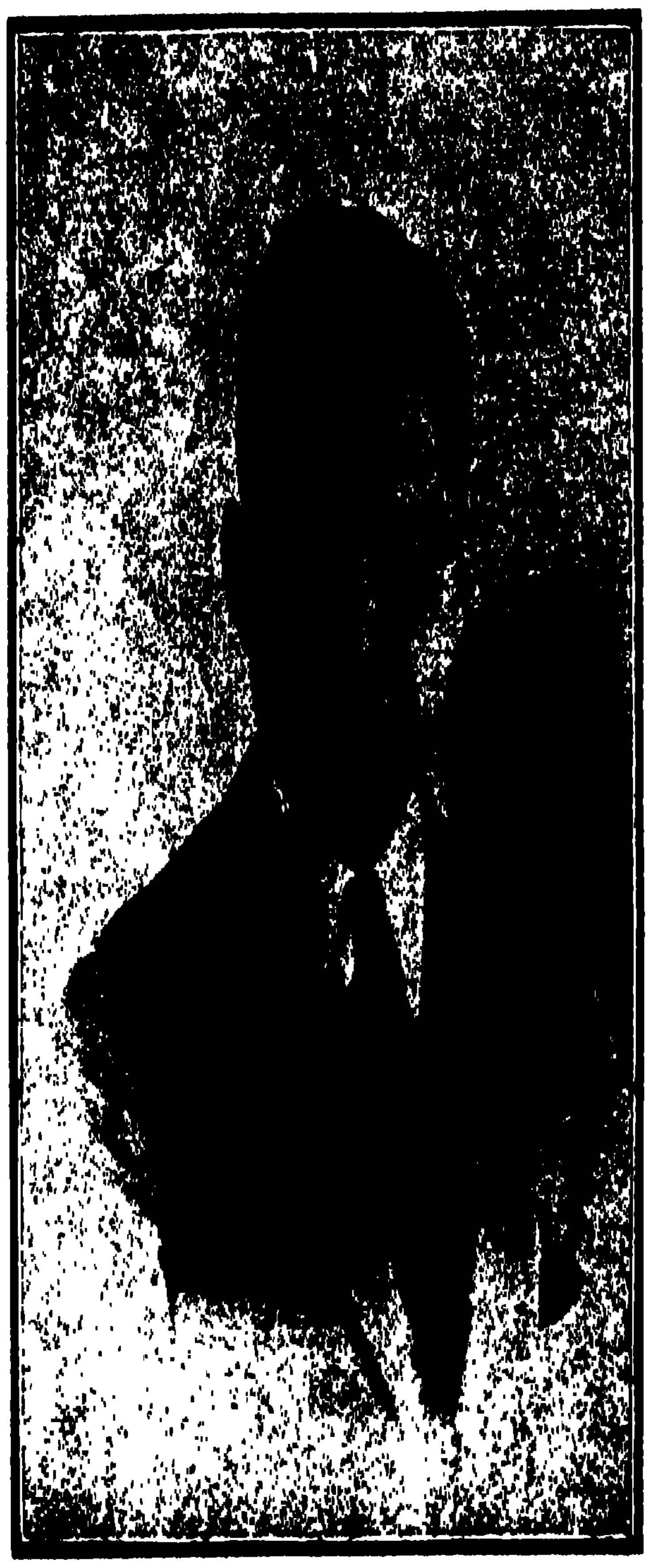

শ্রীমননকুমার মৈত্র

প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন ইডেন হাঁসপাতালে এবং প্রিন্স অব ওয়েলস্ হাঁসপাতালে প্রায় দুই বৎসর কাল হাউস সার্জ্জনের কাজ করিয়া তিনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন। বিলাত গিয়া লণ্ডনের এল-আর-সি-পি, এবং এম-আর-সি-এস্ পরীক্ষায় পাশ করিয়া তৎপর লণ্ডনের এফ-আর-সি এস্ পড়িতে থাকেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুডিভ' বৃত্তিধারী ছিলেন এবং শেষ এম-বি পরীক্ষায় ধাত্রী বিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পৈত্রিক বাসস্থান ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রামে।

আসামের বন্যা—

অন্যত্র আসামের বন্যার একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এইখানে জলনিমগ্ন শিলচর সহরের কয়েক দৃশ্য প্রকাশিত হইল।

ভ্রম সংশোধন

গত মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার ও রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যের যে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে একটু ভুল ছিল। এই সম্পর্কে মহাত্মাজী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে যাহা লেখেন তাহা মূলে এইরূপ ছিল "They will continue till we learn to resent and resist much wanton insults." ইহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল "যতদিন আমরা এই সকল অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে না শিখিব।" ইহার প্রকৃত অনুবাদ "যতদিন আমরা এই সকল যথেচ্ছ অপমানের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করিতে না শিখিব।"—এইরূপ হওয়া উচিত।

আমেরিকায় প্রাচ্যের অপমান

কানাডা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত। ঐ দেশের ভ্যাঙ্কুবর শহর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ ও কানাডার সীমান্তে অবস্থিত। কানাডা হইতে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে প্রবেশ করিতে হইলে ভ্যাঙ্কুবর একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে সব প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা হয়। এশিয়ার কোন জাতির লোককে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে পৌরঅধিকার-বিশিষ্ট স্থায়ী বাসিন্দা হইবার জন্য ঢুকিতে দেওয়া হয় না। ইউরোপীয় জাতিসকলের লোকদের ঢুকিবার ও পৌর অধিকার পাইবার বাধা নাই। কিন্তু কোন্ ইউরোপীয় দেশের কত জন মানুষকে প্রতিবৎসর ঢুকিতে দেওয়া হইবে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ আমেরিকা মহাদেশের সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও ধনী দেশ বলিয়া তাহাকেই সংক্ষেপে আমেরিকা বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ কানাডায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানেও এশিয়াবাসীদের প্রবেশের ও পৌর অধিকার লাভের বাধা আছে। কিন্তু কবি সেখানে কোন রূঢ় ব্যবহার পান নাই। কানাডার কাজ সারিয়া ভ্যাঙ্কুবরের পথে তিনি যখন আমেরিকা প্রবেশ করিতে যান, তখন সেই শহরের যাত্রী-পরীক্ষা-গৃহে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ও রূঢ় ব্যবহার করে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।

কবি ইহাকে প্রাচ্যের প্রতি আমেরিকার দুর্ব্ব্যবহার মনে করিয়াছেন। ইহা যে এশিয়ার অপমান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উপলক্ষ্যে কোন কোন খবরের কাগজ কবিকে নানা উপদেশ দিয়াছেন। কোন কোন উপদেশ হইতে মনে হয়, কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা আছে, যে, ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়াই ভারতবর্ষের লোককে এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হয়। এই ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। সম্পূর্ণ সত্য নহে বলিতেছি এই জন্য, যে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের লোকদিগকেও স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পৌর অধিকার লাভের জন্য আমেরিকায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না। স্বাধীন পরাধীন, এশিয়ার সব দেশের লোকের সম্বন্ধেই এক নিয়ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে যে প্রকার অপমান করা হইয়াছে, জাপানের কোন বিখ্যাত লোককে ত সেরূপ অপমান করা হয় না? কখনও হইয়াছে কিনা মনে পড়িতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষেরও সব বিখ্যাত লোক আমেরিকান যাত্রী-পরীক্ষক কর্ম্মচারীর দ্বারা অপমানিত হন নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পূর্ব্বে যখন আমেরিকা গিয়াছিলেন, তখন অপমানিত হন নাই; সম্প্রতি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমেরিকা প্রবেশের সময় অপমানিত হন নাই।

প্রকৃত কথা এই, যে, এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যে আইনটা আছে, তাহাই চূড়ান্ত অপমানকর; ব্যক্তিগত-ভাবে কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার হইলে তাহাতে অপমান বিশেষ কিছু বাড়ে না, শিষ্ট ব্যবহার হইলেও বিশেষ কিছু কমে না। এই অপমান সমুদয় এশিয়ার, শুধু ভারতবর্ষের নহে।

অনেকে বলিতেছেন, আমেরিকা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, আমেরিকানদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার আমাদের আছে এবং তাহা করা উচিত। অপমানের প্রতিশোধ-স্বরূপ অপমান করা ক্রুদ্ধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য কিনা এবং সুবিবেচনার কাজ হইবে কিনা,

ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে কিছু পৌরুষের অভিনয় না-করা ভাল। কারণ, কর্ত্তব্য যাহাই হউক, তাহা করিবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই, স্বরাজ লব্ধ হইলে ক্ষমতা জন্মিবে। তখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কেন প্রাচ্যের সম্বন্ধে আমেরিকার অপমানকর ব্যবস্থার প্রতিশোধস্বরূপ আমেরিকার সম্বন্ধে নিজের দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা করে নাই। এখন স্বরাজলাভের চেষ্টাই রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত। স্বরাজ পাইবার পরেও প্রতিশোধ-নীতি অবলম্বন অপেক্ষা চরিত্রে জ্ঞানে ও কর্ম্মে সুমহৎ হওয়া দ্বারা প্রাচ্য অধিক ফল পাইবেন।

রাগের মাথায় সমগ্র আমেরিকান জাতিকে গালাগালি দেওয়াও ঠিক নয়। স্বাধীন দেশেও তথাকার গবর্মেণ্ট ও তথাকার অধিবাসিবর্গ সমার্থক নহে। অনেক স্থলেই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক দেশে সকলের চেয়ে স্বার্থপর, এবং দুর্ব্বল বিদেশী জাতিদিগকে সকলের চেয়ে শোষণেচ্ছু ও লুণ্ঠনেচ্ছু লোকেরাই রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী ও পরিচালক হয়। আমেরিকার লোকদের মধ্যে যাহারা প্রাচ্যের অপমানের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারা সংখ্যায় বেশী হইতে পারে; কিন্তু তাহারা আমেরিকার সব অধিবাসী নয়, শ্রেষ্ঠ অধিবাসীও নহে। আমেরিকায় এমন লোক বিস্তর আছেন, যাঁহারা সকল দেশের সকল জাতির প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানকর আইন রদ করিতে চেষ্টিত আছেন।

আমেরিকার লোকদের এই শ্রেষ্ঠ অংশের অনেকে রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোন কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অন্তর্ভূত। সেই জন্য তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন, খ্যাতি বা সম্মানের জন্য নহে। তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান ইউরোপের নানা দেশে এবং চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি স্বাধীন প্রাচ্য দেশে যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে।

যে-দেশের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাচ্য অপমানিত, সে দেশেরও কতক লোক প্রাচ্য কোনও মনীষীর কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা অকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যে-সব আমেরিকান প্রাচ্যের উপদেষ্টা-দিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের আগে হইতে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে উপদেষ্টাদিগের কোন প্রকার অসুবিধা ও অপমান না হয়। রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা এবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ বন্দোবস্ত না করায় অপরাধী হইয়াছেন।

—

রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশ

আগেই বলিয়াছি, আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের অপমান উপলক্ষ্য করিয়া কোন কোন সাংবাদিক তাঁহাকে বেশ দু কথা শুনাইয়া দিতেছেন। তাহার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক, এবং উত্তর দিলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। কেবল এইটুকু মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কাহারও চেয়ে স্বদেশকে কম ভালবাসেন না, স্বদেশের অপমান কম অনুভব করেন না এবং স্বদেশের কল্যাণের জন্য ও গৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্ত কম পরিশ্রম করেন নাই এবং এখনও কম করিতেছেন না। সকলের কার্য্যপ্রণালী এক নহে। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে লেখনী ও বাগ্‌যন্ত্র পরিচালনা স্বদেশের সেবার একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। রাজনীতিক্ষেত্রেও কবির বাণী বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ লোককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বমানব প্রভৃতি কথা উপলক্ষ্য করিয়াও কবিকে অনেকে কটু ও অশিষ্ট কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন নহে বলিয়া সমস্ত মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর আন্তরিক কথা বলিবার ও লিখিবার অধিকার আমাদের জাতির কাহারও নাই, ইহা স্বীকার করি না। আমরাও মানবজাতির অন্তর্গত। যাহা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তাহা আমাদেরও মঙ্গলজনক। বিশ্বমৈত্রী স্বাধীনতা লাভের এবং স্বাধীনতা রক্ষার একটি উপায়। সকল জাতির পক্ষে হিতকর আধ্যাত্মিক কথা বলিবার অধিকার যদি পরাধীন দেশের কোন লোকের না থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় যে-সব

লোক বৈজ্ঞানিক বা অন্য গবেষণা করেন, তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যের ফল বিশ্বমানব পাইতে পারে বলিয়া সেই কারণে তাঁহাদেরও সত্যানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক গৎ আওড়ান উচিত।

কবি যে বিশ্বের কথা ভাবেন বলেন, বিদেশ যান, তাহার বিরোধী আমরা নহি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের মত লোকের উপর, শুধু বঙ্গের, ভারতের, এশিয়ার নহে, সমগ্র পৃথিবীর লোকের দাবী আছে। কিন্তু তিনি পৃথিবীর লোককে যে বাণী শুনাইতে চান, শান্তিনিকেতন বহু বৎসর হইতে তাহার সাধনাকেন্দ্র হইয়া আছে। বৃহৎ যজ্ঞে অনেককে নিমন্ত্রণ করিলে রন্ধনশালার চুল্লীতে ইন্ধন যোগাইবার ব্যবস্থা চাই। এই কারণে কবির স্বদেশে ও শান্তিনিকেতনে আরও দীর্ঘতর কাল অবস্থিতি বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাঁহার কাজ তাঁহার জীবিত কালের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইলে চলিবে না। পরেও যাহাতে তাঁহার আদর্শের অনুসরণ ও বিকাশ চলে, তাহার ব্যবস্থা চাই, কর্মী চাই। কর্মী সৃষ্টি করা অবশ্য একা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু কর্মী গঠন কার্য্যে ভগবান্ কবির মত উপযুক্ত মানুষের সহযোগিতা চান।

বিশ্বভারতীর জন্য কন্‌স্টিটিউশ্যন প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। নিয়মাবলী প্রাণহীন যন্ত্র মাত্র। তাহাকে প্রাণবান্ করিতে হইলে মানুষ চাই। মানুষ গড়িয়া উঠা চাই।

বিশ্বভারতীর কাজ নানা বিভাগে বিভক্ত। এই সব বিভাগের কর্মীদের মধ্যে যোগ্য, চরিত্রবান্, কর্মিষ্ঠ লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি সব বিভাগের কাজের সমঝদার গুণগ্রাহী, যাঁহাকে সব বিভাগের লোক মানেন এবং যিনি সকলের অনুরাগভাজন বলিয়া যাঁহার দ্বারা সকলের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার ভাব উদ্বোধিত হইয়া সকল বিভাগের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ও আদানপ্রদান স্থাপিত হইতে পারে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এইরূপ সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারেন। শান্তিনিকেতনে বাস করেন না, বিশ্বভারতীর বাহিরের এমন কোনও লোকও তাঁহার মত একাজের যোগ্য নহেন। অবশ্য তাঁহার অনুপস্থিতির সময় এরূপ একজন লোক চাই বটে, এবং জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাঁহার তিরোভাবের পর এই প্রয়োজন আরও অনুভূত হইবে। বর্ত্তমান সময়েও কবির অনুরাগী প্রকৃত সহকর্মী চাই। তিনি অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষ। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরাও নিঃসঙ্গভাবে একা তাঁহাদের মহৎ কাজ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, যোগ্য অনুরাগী সহচর অনুচরদিগের সাহায্যে করিয়াছেন। এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্য স্বদেশে কবির অধিক সময় যাপন করা আবশ্যক। যদি এরূপ লোক তিনি পান, তাহা হইলে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যে, কার্য্যালয়-যন্ত্র বা কোন মনুষ্য বা মনুষ্যসমষ্টি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় প্রতিরোধনীতি এইরূপ লোকের সম্বন্ধে অবলম্বন করিতেছেন কিনা।

আরও একটি কারণে তাঁহার শান্তিনিকেতনে থাকা আবশ্যক। সেখানে যেরূপ যোগ্য অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের অনেকের সমতুল্য লোক অন্যত্র একান্ত দুর্লভ নহে। অনেকে যে-সব কারণে নিজ নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষার জন্য তথায় প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে প্রধান কারণ একটি এই যে, তাহারা কবির সংস্পর্শে আসিবে। তাঁহার সাক্ষাৎ প্রভাব অনুভব করিবার অধিকার তাহাদের আছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা ও যশের উদ্ভব হয় তাঁহার প্রভাবে। এখনও তিনি আগেকার মত শান্তিনিকেতনের জন্য খাটিবেন, এরূপ আশা কেহ করে না। কিন্তু তিনি সেখানে থাকিলে ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাওয়া আসা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

কাগজে দেখিলাম, তিনি কোন পাশ্চাত্য লেখকের নিকট বলিয়াছেন, তিনি এরূপ একটি নারীবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন এখনও হৃদয়ে পোষণ করেন যেখানে নারীপ্রকৃতির বিকাশ নারীর বিশেষত্ব অনুসারে হইবে। ইহা অতি মহৎ কল্পনা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার বাস্তবমূর্ত্তিপরিগ্রহ কামনা করিতেছি। ইহার জন্যও কবির স্বদেশবাস বাঞ্ছনীয়। বিদেশে তাঁহার খ্যাতি এখন এরূপ হইয়াছে, যে, তিনি দেশে থাকিয়াও ভাল

কিছু লিখিলে তাহার প্রভাব নানা দেশে ব্যাপ্ত হইতে পারে। অবশ্য, কোথাও তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহারও পৃথক্ ফলবত্তা আছে। কিন্তু কাহারও পক্ষে ত সর্ব্বত্র যাওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং যাহা সম্ভব, তাহাকেই পর্য্যাপ্ত মানবসেবা মনে করিতে হইবে।

—

ভারতবর্ষে অসন্তোষ ও অশান্তি

লণ্ডনে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার রয়টার দ্বারা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে, ভাবতবর্ষে অসন্তোষ ও অশান্তির কারণ বহু কোটি লোকের বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্য; বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্য দূর হইলে অসন্তোষ ও অশান্তি দূর হইবে।

বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্যকে তিনি ভারতে অসন্তোষ ও অশান্তির একমাত্র কারণ বলিয়াছেন কিনা, সমস্ত বক্তৃতাটি না পাইলে বলা যাইবে না। উহা একটি প্রধান কারণ বটে। তিনি দূরদর্শিতাপ্রসূত নীতি অবলম্বন দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করিতে এবং দারিদ্র্য দূর করিতে পরামর্শ দেন। ইহা সৎপরামর্শ।

কিন্তু এরূপ নীতি অবলম্বন কেবল রাজশক্তিই করিতে পারে। দেশের লোকেরা কৃষিশিল্পবাণিজ্য বিষয়ে খুব উদ্যোগিতা দেখাইলেও পূরা ফললাভ এই সব বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতির উপর নির্ভর করিবে। দেশের কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য জাপানের গবর্মেণ্ট যে-সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট দেশকালপাত্রভেদে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন সহকারে সেইরূপ নীতি অবলম্বন না করিলে ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না, দারিদ্র্যও দূরীভূত হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশী লোকদের প্রভুত্ব স্থাপিত না হইলে, অর্থাৎ ভারতের গবর্মেণ্ট জাতীয় না হইলে, জাপানের মত কৃষিশিল্পবাণিজ্য-নীতি এদেশে অবলম্বিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বেকার সমস্যার সমাধানের ও দারিদ্র্য দূরীকরণেরও পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় পূরা ফললাভ হইবে না বলিয়া আমাদিগকে আলস্যে কালযাপন করিতে হইবে, এমন নয়। বর্ত্তমান অবস্থাতেও অনেকটা উন্নতি হইতে পারে। তাহার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। তজ্জন্য পূর্ণমাত্রায় উদ্যোগী হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ জাতীয় গবর্মেণ্ট স্থাপনের চেষ্টাও অবিশ্রান্তভাবে চালাইতে হইবে। জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে জাতীয় জীবনের ধার্ম্মিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক আর্থিক আদি সকল বিভাগেই চেষ্টা একসঙ্গে চালাইতে হইবে। এইটা আগে, ঐটা পরে, এরূপ মনে করা ভুল। সব চেষ্টাই যুগপৎ চালান আবশ্যক, যদিও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে চেষ্টা করিবার লোক আলাদা হইতে পারে ও হইবে; কেন না, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, সকল মানুষ সকল কাজ করিতে পারে না, এবং সকলের মনে ঝোঁকও সকল দিকে নহে।

বিলাতের বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্মেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ টমাস বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই, কিন্তু তাহা অবলম্বিত হইলে নিশ্চয়ই বিস্তর বেকার লোকের রোজগারের পথ খুলিয়া যাইবে। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা যে-সব জিনিষ আমদানী করি, তাহা আমরা নিজেই প্রস্তুত করিব।" তিনি পণ্যশিল্পজাত দ্রব্যের কথাই বলিয়াছেন, কাঁচা মালের নহে। কাঁচা মাল ভারতবর্ষ প্রভৃতি পরাধীন দেশে উৎপন্ন হইতে থাকিবে। তাহা ইংরেজরা সস্তায় স্বদেশে কিনিয়া লইয়া গিয়া তাহা হইতে বহুমূল্য জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ফের ভারতবর্ষ আদি দেশে রপ্তানী ও বিক্রী করিয়া ধনবান্ হইবে।

আমাদের দেশের সব রকম কাঁচা মাল হইতে যদি আমরা শুধু আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলেই ত ভারতবর্ষ প্রভূত ধনশালী হইতে পারে। তাহার উপর যদি আমাদের সব কারখানায় বিদেশে রপ্তানীর জন্যও আরও জিনিষ তৈরী হয়, তাহা হইলে ধনাগম আরও বেশী হইবে। এই সব কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ পাইবে, হাজার হাজার দোকানদার এই সব পণ্যদ্রব্য বিক্রী

করিবে। কারখানায় যাহারা কাজ পাইবে, তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পণ্যশিল্পী বা বিশেষজ্ঞ থাকিবে, ম্যানেজারের মত লোক থাকিবে, কেরানী থাকিবে, নানা রকমের যন্ত্রাভিজ্ঞ লোক থাকিবে, মিস্ত্রী থাকিবে, এবং সাধারণ মজুর থাকিবে। তদ্ভিন্ন, বৈজ্ঞানিক উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষকও থাকিবে। সুতরাং বেকারের সংখ্যা কমিয়া যাইবে।

মিঃ টমাস তাঁহার দেশের জন্য যাহা করিতে চাহিতেছেন, আমাদের দেশের জন্য তাহা করা অনেক বেশী দরকার। কারণ, ইংলণ্ড কাঁচা মালই বেশী আমদানী করে, কারখানায় তৈরী পণ্যদ্রব্য বেশী আমদানী করে না। ভারতবর্ষ কাঁচা মাল রপ্তানী খুব বেশী করে, কারখানায় তৈরী পণ্যদ্রব্যও খুব বেশী আমদানী করে। এই আমদানী বন্ধ করিয়া দেশের ধনের বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিতে হইলে ঐসব পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে প্রস্তুত করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা করিবার চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় সফল হইতে পারে যদি ভারতবর্ষের গভর্মেণ্ট জাতীয় হয়।

—

অসন্তোষ ও অশান্তি অন্য প্রধান কারণ

বেকার সমস্যার সমাধান হইলে এবং দারিদ্র্য দূরীভূত হইলেই ভারতভূমি হইতে অসন্তোষ ও অশান্তি তিরোহিত হইবে না। কেন না, বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্য এই অসন্তোষ ও অশান্তির একমাত্র কারণ নহে। আরও বিস্তর প্রধান অপ্রধান কারণ আছে। সবগুলির বর্ণনা না করিয়া প্রধান একটির উল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষের মানুষেরা যদি গোরু হইত, এবং দেশটা যদি ইংরেজদের একটা বৃহৎ গোশালা হইত, তাহা হইলে এই মনুষ্যরূপী গোরুগুলির কাজ এবং যথেষ্ট গ্রাসাচ্ছাদন জুটিলেই তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের মানুষেরা দ্বিপদ গোরু নয়, তাহারা মানুষ। সুতরাং তাহারা স্বাধীন দেশের মানুষদের মত খাড়া হইয়া হাঁটিতে চায়; চায় না যে তাহাদের মাথাটা নত হইয়াই থাকে, শিরদাঁড়াটা বাঁকা হইয়াই থাকে। তাহারা স্বাধীন দেশের মানুষদের মত নিজেদের দেশের সব কাজ নিজেরাই করিতে চায়, এবং বিশ্বাস করে যে তাহা করিবার যোগ্যতা তাহাদের আছে। তাহারা স্বাধীন দেশের মানুষের মত মানুষের চিন্তা ও ভাবরাজ্যে, মানুষের প্রত্যেক কার্য্যক্ষেত্রে যাহার যতটা বড় হইবার শক্তি আছে ততটা বড় হইতে চায়। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয়দের এই সকল দিকেই বাধা আছে; তাহাদের বড় হইবার পথে সীমা নির্দ্দেশ করা আছে—"এই পর্য্যন্ত, তার বেশী নয়।" সীমা লঙ্ঘন কেহ করিতে চাহিলে, বেশী উঁচু কেহ হইতে চাহিলে, তাহাকে পঙ্গু করিবার, তাহার মাথা হেঁট করাইবার ও মেরুদণ্ড বাঁকাইবার ব্যবস্থা আছে।

এরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র সকলেরই অসন্তুষ্ট হইবার কথা। কিন্তু যেহেতু সাধারণতঃ বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্যকেই অসন্তোষ ও অশান্তির কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অতএব ইহা দেখান দরকার, যে, যাঁহারা বেকার ও দরিদ্র ছিলেন না বা নাই, তাঁহারাই এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ সেই কারণে ইংরেজরা বলিয়া থাকে, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা জনসাধারণের প্রতিনিধি নহে—যেহেতু জনসাধারণ দরিদ্র ও নিরক্ষর কিন্তু আন্দোলকরা শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার লোক। আন্দোলকরা কাহারও প্রতিনিধি কিনা, তাহার বিচার করা এখানে অনাবশ্যক। আপত্তিকারী ইংরেজদিগকেও চিন্তিত ও অধৈর্য্য হইতে হইবে না—জনসাধারণ জাগিতেছে এবং অচিরে জাগরণের এরূপ প্রমাণ দিবে যাহাতে শ্বেত প্রভুরা বুঝিতে পারিবেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনীদের মত তাহারাও স্বাধীনতা চায়।

অসন্তুষ্ট ও অশান্তদের প্রথম নেতা আধুনিক সময়ে ছিলেন, রামমোহন রায়। তিনি বেকার ও দরিদ্র লোক ছিলেন না। তাঁহার পরবর্ত্তী সকল নেতার নাম করিতে পারা যাইবে না, তাহা আবশ্যকও নহে। দাদাভাই নওরোজীর নাম করিতে হইবে। তিনি বেকার দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন না। বঙ্গের কৃষ্ণদাস, আনন্দমোহন,

সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতা বেকার দরিদ্র ছিলেন না। অবশ্য কোন কোন রোজগারী আন্দোলককে গবর্মেণ্ট জজিয়তী ইত্যাদি দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলে তাহা চান নাই এবং তাঁহাদের মুখও বন্ধ হয় নাই। টিলক বেকার ও দরিদ্র ছিলেন না। গোখলে বেকার ছিলেন না, তাঁহার আপেক্ষিক দারিদ্র্য স্বেচ্ছাবৃত। রবীন্দ্রনাথ বেকার দরিদ্র নহেন। বিবেকানন্দ বেকার ছিলেন না, তাঁহার দারিদ্র্য স্বেচ্ছাবৃত। অরবিন্দ বেকার ছিলেন না, তাঁহার দারিদ্র্য স্বেচ্ছাবৃত। গান্ধী বেকার দরিদ্র ছিলেন না, বেকার এখনও নহেন; তাঁহার দারিদ্র্য স্বেচ্ছাবৃত। চিত্তরঞ্জন বেকার দরিদ্র ছিলেন না; তাঁহার শেষ জীবনের আপেক্ষিক দারিদ্র্য স্বেচ্ছাবৃত। প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ আরও অগণিত লোক আছেন যাঁহারা বেকার বা দরিদ্র নহেন, কিন্তু যাঁহারা নিজে অসন্তুষ্ট ও অশান্ত এবং দেশব্যাপী অসন্তোষ ও অশান্তির আংশিক কারণ।

আমাদের বিবেচনায়, যখন বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্যের পূর্ণপ্রতিকার স্বরাজ ব্যতিরেকে হইতে পারে না, এবং স্বরাজ অসন্তোষ ও অশান্তির অন্য অতিপ্রধান কারণটিরও মূল উচ্ছেদ করিতে সমর্থ, তখন স্বরাজের দাবী বাদ দিয়া বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্য বিনাশের উপায়-সম্বন্ধে কোন আলোচনা ও বক্তৃতা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে পারে না।

—

বঙ্গে পণ্যশিল্পের অবস্থা

কলিকাতা পার্লেমেণ্ট নামক একটি নকল পার্লেমেণ্ট কলিকাতায় আছে। তাহা বিতর্ক সভা মাত্র। কিন্তু তাহাতে অনেক বড় প্রশ্নের আলোচনা হইয়া থাকে। সম্প্রতি বঙ্গের পণ্যশিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ওয়েষ্টন সাহেব তথায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, বাংলা দেশে পণ্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ও বিস্তার হইতেছে না। ইহা সবাই জানে। ইহার জন্য বঙ্গের যুবা বৃদ্ধ সবাই দায়ী; কিন্তু এক মাত্র তাহারাই দায়ী নহে; গবর্মেণ্টেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে। ওয়েষ্টন সাহেবের বক্তৃতার তাৎপর্য্য এই:—

He wanted the House to realize that such a quantity as 64,000 and odd tons of hide and skins were exported from Calcutta every year principally to Germany and America; thirty tons of mill-bone were crushed and exported from Calcutta, and those who had taken the trouble to read the Agricultural Commission's report would see the lamentable story which had been revealed. The things that they bought in India were leather manufactures excluding boots and shoes, showing a total of thirteen lakhs of rupees worth of goods being imported to Calcutta alone.

Mr. Weston next gave statistics of silk, earthenware, glassware, porcelain, timber imported into and exported from India and said that the real problem of Bengal was the economic problem. The speaker agreed with Sir Jagadish Bose who in a lecture delivered at London said that if they could solve the economic problem there would be no other problem to solve, and, remarked that the human resources of Bengal were the very crux of the whole question. If the young men of Bengal and the people of this province who had the means and the vision to apply themselves to tackle this problem there was no doubt that they should see very much larger development of the industrial and natural resources of this province. There were several Jute and Cotton mills owned entirely and managed by Indian brains and he cited the examples of Dhakeswari Cotton Mill, Tollygunge factory, a factory in Entally producing electric fans, etc. and declared that there were great hopes for the future of this province.

ইহা সত্য কথা, যে, বর্ত্তমান অবস্থাতেও, শুধু বিদেশী লোকেরা নহে, বি-প্রদেশী লোকেরাও বাংলা দেশে নানা পণ্যদ্রব্যের কারখানা খুলিয়া লাভবান্ হইতেছে। সত্য বটে, তাহাদের হাতে এখন যত মূলধন আছে, বাঙালীদের তাহা নাই। কিন্তু বাঙালীরাও একেবারে মূলধনশূন্য নহে। যাহাদের টাকা আছে, তাহাদের এবং মূলধনশূন্য বিশেষজ্ঞদের উদ্যোগিতা, ব্যবসায়বুদ্ধি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সততার একত্র সমাবেশ হইলে বাঙালীরাও অনেক কারখানা খুলিয়া লাভবান হইতে পারে।

ওয়েষ্টন সাহেবের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া মোরেনো সাহেব দুঃখের সহিত বলেন:—

There was no real encouragement for young men of this country to place their products for sale. Even Government, he said, showed no real interest in the encouragement of industries. Their people were starving simply because they were rushing into the University to seek degrees and diplomas.

মিঃ ওয়ালিস্ বলেন, বাঙালীদের উদ্যোগিতা আছে, কিন্তু মূলধন নাই। এই কথার উত্তরে সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন:—

There was lack of enterprise amongst the people of Bengal. If capital was the only criterion for

which the people had suffered, it could be borrowed from abroad.

"বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে উদ্যোগিতার অভাব আছে; যদি তাহারা মূলধনের অভাবেই দুর্দ্দশা ভোগ করিত, তাহা হইলে তাহারা বিদেশ হইতে মূলধন ধার করিতে পারিত।"

কারবারের জন্য কোন স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতির লোক অন্য দেশ হইতে টাকা ধার করিলে তাহাতে দেনদার জাতির কোন ক্ষতি না হইতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বল বা পরাধীন জাতির লোক শক্তিশালী স্বাধীন দেশের লোকের নিকট হইতে টাকা ধার করিলে তাহার দ্বারা ঋণী জাতির অধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ়তর হয় এবং অধীনতাপাশ দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠে। চীনে যে এত গৃহবিবাদ ও অন্তর্যুদ্ধ চলিতেছে, তথায় যে সুশৃঙ্খলা, শান্তি ও স্থায়ী গবর্ন্মেণ্ট স্থাপিত হইতে পারিতেছে না, বিদেশীর নিকট তাহার ঋণ তাহার একটি প্রধান কারণ। মিশর দেশ যে নামেমাত্র স্বাধীন কিন্তু বস্তুতঃ পরাধীন, বিদেশীর নিকট ঋণ তাহার একটি কারণ। ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে বিদেশীদের দ্বারা যে এত বিঘ্ন উৎপাদিত হইতেছে, ভারতের বিদেশী ঋণ তাহার একটি প্রধান কারণ।

—

বন্যায় প্রাণহানি, সম্পত্তিনাশ ও নানা দুঃখ

বাংলা, আসাম ও ব্রহ্মের কয়েকটি জেলায় ভীষণ বন্যার প্লাবনে অনেক লোকের প্রাণ গিয়াছে, বহুলক্ষ লোক গৃহশূন্য আশ্রয়শূন্য ও সম্পত্তিহীন হইয়াছে, গবাদি পশু বিস্তর মারা গিয়াছে। তাহার জন্য সকল জেলায় নানা সাহায্যদাতা সমিতি কাজ করিতেছেন। গবর্ন্মেণ্টও সাহায্য দিতেছেন। আসাম গবর্ন্মেণ্টের রাজস্ব কম, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ গবর্ন্মেণ্ট অনেক সাহায্য করিতেছেন। সর্ব্বত্রই আরও অনেক সাহায্যের প্রয়োজন। কাছাড় জেলার বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত আবেদনটি আমরা পাইয়াছি।

ভীষণ বন্যায় সমগ্র কাছাড় জেলা ভাসিয়া গিয়াছে। এমন জলপ্লাবন কাছাড়ে আর হয় নাই। জেলার অর্দ্ধেকেরও বেশী গ্রাম গৃহশূন্য হইয়াছে। প্রবল জলস্রোতে মানুষ, গরু, মহিষ, এমন কি হাতীও ভাসিয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র নর-নারী গো-মহিষাদিসহ নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু যাহারা পাহাড় হইতে দূরে আছে তাহাদের অবস্থা হৃদয়বিদারক, বহু লোক গাছে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। আমরা গৃহহীন অন্নহীন সহস্র আর্ত্তের হাহাকার বাঙালার নর-নারীর কাণে পৌঁছাইতে পারি নাই। আমরা বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ লাইন, রাস্তা ও সেতু বহুস্থানে ভাঙিয়া গিয়াছে, এবং ফলে টেলিগ্রাম পাঠানোর, ডাকের ও যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বীজের ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং বহু হালের গো-মহিষ মরিয়া গিয়াছে। এই বর্ষাকালে গৃহাদি প্রস্তুত করার উপায় নাই, হৈমন্তিক ধান বপন করার বীজ না পাইলে লোকের উপায় থাকিবে না। শিলচর সহরের বহু মহল্লার বাসার চালের উপর দিয়া জলস্রোত চলিয়াছিল, সহরের মাত্র কয়েকটি স্থানে দশহাজার সহরবাসী ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহুলোক জড় হইয়া উচ্চস্থানে বা দ্বিতল গৃহে আরোহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এই ভীষণ অবস্থা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার নহে। কয়েকটি মৃতদেহ সহরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি জননী মৃত সন্তানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া ভাসিয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে নৌকা দিয়া লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চাউল বিতরণ করা হইতেছে। কিন্তু দুঃস্থ নর-নারীকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রচুর অর্থ ও দীর্ঘকালব্যাপী বিরাট আয়োজনের আবশ্যক।

এই দুর্দ্দিনে কাছাড়বাসী সমগ্র ভারতের নিকট মুক্ত হস্তের দানের জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছে। ইউরোপীয় ও ভারতবাসী সকলে মিলিত হইয়া আর্ত্তপ্রাণে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

এই কমিটি স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যে, গবর্ণমেণ্টের দেওয়া চাউল তাহাদের নির্দ্ধারিত গ্রামসমূহে বিতরণ করিতেছেন।

অল্প কয়েক দিন পরেই সমস্ত জেলার দুঃস্থ পরিবারকে কতক কালের জন্য স্থায়িভাবে চাউল দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; তজ্জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। লোকের ঘরবাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বীজের ধান, গো-মোহিষ, বস্ত্রাদি সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে। এই দুঃসময়ে সহৃদয় মহোদয়গণ যে অর্থ বা বস্ত্র দান করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। অর্থ ও বস্ত্রাদি নিম্নস্বাক্ষরকারীদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির নামে অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নবকুমার দাসের নিকট পাঠাইবেন।

বিনীত নিবেদক—

শিলচর,	শ্রীকামিনীকুমার চন্দ, অন্যতম সভাপতি।
	শ্রীদীননাথ দাস, সম্পাদক।
২২শে জুন, ১৯২৯ ইং	শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, সহকারী সম্পাদক,
	কাছাড় কমিটি।

বন্যা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার কিছু ধারণা জন্মাইবার জন্য কতকগুলি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি অন্যত্র মুদ্রিত হইল। বন্যা কিছু কমিয়া গেলে তবে ফোটোগ্রাফ তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল। এইজন্য এগুলি হইতে ঠিক ধারণা জন্মিবে না। তদ্ভিন্ন, শহর অপেক্ষা গ্রামেই বন্যার প্রলয়ঙ্কর

বৃষ্টি অধিক প্রকট হইয়াছিল। কিন্তু ফোটোগ্রাফগুলি শহরের। তাহা হইলেও ছবিগুলি হইতে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। শিলচর হইতে একজন বন্ধু প্রবাসী-সম্পাদককে লিখিয়াছেন, "আপনি সুরমা সাহিত্যসম্মিলনীর সভাপতির কাজ করিবার সময় যে গৃহে আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই ঘরের বারান্দার উপর বুক-জল হইয়াছিল। চন্দ মহাশয় ঐ দালানের ছাদের উপর একখানি টিনের একচালা করিয়া নাতি নাতনী সহ চারিদিন অবস্থান করেন। যেখানে সাহিত্যসম্মিলনের সভা হয়, সেখানে সাঁতার-জল হইয়াছিল। নদী হইতে ঐ স্থানের পূর্ব্বদিকস্থ সরকারী সড়কের উপর দিয়া জল ভীষণবেগে আসিতেছিল। আমরা আট-নয় দিনের জন্য ডাক টেলিগ্রাফ রেল প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম। ছাপাখানাগুলি জলের তলে গিয়াছিল; তাই এতদিন সাহায্যপ্রার্থনার আবেদনগুলিও ছাপাইতে পারি নাই।"

এখন প্লাবনপীড়িত সকল জায়গায় সর্ব্বপ্রথমে দরকার বিপন্ন লোকদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দান, এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা। তাহার পর গৃহহীন লোকদিগকে গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিতে হইবে। লোকে সম্ভব হইলে স্বভাবতঃ উঁচু জায়গাতেই বাড়ী করিয়া থাকে। এখন যাহার সাধ্যায়ত্ত হইবে, তাহারই আরও উঁচু জায়গায় ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করা সুবিবেচনার কাজ হইবে। যাহাদের গোরু বাছুর মহিষ মারা গিয়াছে এবং অন্য প্রকারে চাষের ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদিগকে আবার চাষবাস করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট সাহায্য দিতে হইবে।

প্লাবনহেতু ব্যাপকভাবে নানাপ্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে ত চিকিৎসার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতেই হইবে; কিন্তু তাহা যাহাতে না হয়, সে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

—

প্লাবন নিবারণের উপায়

অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নিবারণের কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অনাবৃষ্টির কুফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জলসেচনের নানা উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তেমনি, অতিবৃষ্টির কুফল হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করাও মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। মীটিয়রলজী বা আবহবিদ্যা এখনও নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় নাই। তথাপি ইহার সাহায্যে এখন মোটামুটি বুঝা যায়, যে, কোন্ অঞ্চলে কখন ঝড় বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। সরকারী একটি মীটিয়রলজিক্যাল বিভাগ আছে। ইহার পর্য্যবেক্ষণকেন্দ্র ও সংবাদপ্রচার কেন্দ্র আরও বাড়ান উচিত। এই সকল-কেন্দ্র হইতে দেশী ভাষার সকল সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে খবর পাঠান উচিত, যে, কোথায় কখন্ অধিক ঝড় বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে। খবরের কাগজের পরিচালকদিগেরও এই প্রকার সংবাদে বেশী মন দেওয়া ও তাহার প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অনেকে যথাসম্ভব সাবধান হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। এই শীতাতপঝড়বৃষ্টি আফিসগুলির ভ্রম মধ্যে মধ্যে হইতে পারে, কিন্তু ঠিক অনেক সংবাদ প্রচারিত করিয়া মানুষের উপকারও তাহারা করিতে পারিবে। বেশী আফিস খুলিতে এবং বেশী পর্য্যবেক্ষক ও অন্য কর্ম্মচারী রাখিতে গবর্ণ্মেণ্টের অনেক ব্যয় হইবে বটে। কিন্তু প্লাবনাদিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্যও কম ব্যয় হয় না; চাষের ক্ষতি হওয়ায় রাজস্ব আদায়ও কম হয়। খরচ বেশী হইলেও প্রজাদের প্রাণরক্ষা সম্পত্তিরক্ষা স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান সকল গবর্ণ্মেণ্টেরই কর্ত্তব্য।

অতিবৃষ্টি হইলেও যাহাতে নদীর জল গ্রাম নগর শস্যক্ষেত্রাদি প্লাবিত করিতে না পারে, তাহার উপায় করাও মানুষের সাধ্যের অতীত নহে। আমেরিকার কোন কোন নদীর প্লাবন এঞ্জিনীয়ারেরা বন্ধ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য বহুব্যয়সাধ্য। আমেরিকা ধনীর দেশ বলিয়া বেশী ব্যয় করিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ ধনীর দেশ না হইলেও ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে ঠিক্ দরিদ্র বলা যায় না। যুদ্ধের জন্য যখন কোটি কোটি টাকা খরচ করা যাইতে পারে, তখন প্রজাদের হিতার্থও কোটি কোটি টাকা ব্যয় অসম্ভব নহে। ভারত-সরকারের চলিত রাজস্ব হইতে যদি এত টাকা ব্যয় করা না চলে, তাহা হইলে ঋণ করা উচিত। তাহাও যদি পরামর্শসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ইংলণ্ড যে ভারতবর্ষ হইতে নানা সূত্রে ও নানা উপায়ে এপর্য্যন্ত বহু সহস্র কোটি টাকা পাইয়াছেন, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ ভারতবর্ষকে কয়েক শত কোটি টাকা দান করিতে পারেন। তাহা করিবার শক্তি ইংলণ্ডের আছে। এরূপ দান করিলে ইংলণ্ড বদান্যতার খ্যাতি পাইবেন—যদিও ইহা অংশতঃ লুণ্ঠিত ধন প্রত্যর্পণ এবং অংশতঃ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধই হইবে। টাকা সংগৃহীত হইলে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় এঞ্জিনীয়ার পাঠাইয়া কিম্বা আমেরিকা হইতে এঞ্জিনীয়ার আনাইয়া ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারদিগকে এই বিষয়ে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলিতে হইবে।

কপিলমুনি সত্যাগ্রহ

খুলনা জেলার কপিলমুনি গ্রামে একটি পুরাতন দেবমন্দির ছিল। তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় একজন ভদ্রলোক লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। সামাজিক ভ্রমবশতঃ অনেক দেশাচারাধীন লোকে যে-সব জাতির জল আচরণীয় মনে করে না, ইনি সেইরূপ একটি জাতির লোক। তাঁহার টাকায় মন্দির হইতে পারে, কিন্তু উহার সেবাইত ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন, যে, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোকের ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই! মন্দিরে প্রবেশ করিতে গিয়া কয়েক জন সুবর্ণবণিক ও অন্য জাতির লোক পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহার পর, সকল জাতির হিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ করিবার ও দেবদর্শন করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। সত্যাগ্রহীদের নেতা স্বামী সত্যানন্দকে এবং অন্য কোন কোন সত্যাগ্রহীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অধিকাংশ হিন্দু বহু দেবদেবীর পূজা করিলেও, হিন্দু ধর্ম্ম এক পরব্রহ্মে বিশ্বাস করেন। হিন্দুর বিশ্বাস পরমপুরুষ সর্ব্বঘটে সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে বিদ্যমান। সুতরাং নিকৃষ্টতম মানুষের মধ্যেও তিনি আছেন, এবং নিকৃষ্টতম মানুষও তাঁহাতে আছে। অতএব দার্শনিক বিচারে কোন হিন্দুর প্রবেশে ও দেবদর্শনে কোন দেবমন্দির অপবিত্র হইতে পারে না। কেন না, ব্রহ্ম যাহাকে স্পর্শ করিয়া আছেন এবং যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়া আছে, সে অপবিত্র নহে, এবং তাহার স্পর্শে কোন বস্তু অপবিত্র হইতে পারে না। শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারাও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দেবমন্দিরে সকল হিন্দুর প্রবেশাধিকার আছে। এই কারণে মনে করি, সেবাইতগণ ও তাঁহাদের সমর্থকগণ এই অধিকার স্বীকার না করিয়া ভুল করিতেছেন।

হিন্দুসমাজকে সংহত ও দলবদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা শক্তিশালী হইবে না, এবং উপযুক্তরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু হিন্দুসমাজ শুচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া থাকিলে এই সংহতি ও দলবদ্ধতা কখনও জন্মিবে না। সুতরাং সকল হিন্দুজাতির লোকের দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার স্বীকৃত হওয়া চাই-ই চাই। অতএব যাঁহারা এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছেন, প্রত্যেক হিন্দুহিতৈষী তাঁহাদের চেষ্টার সফলতা কামনা নিশ্চয়ই করিবেন।

সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে শিক্ষিত বিদ্বান ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বিস্তর আছেন। তাঁহারা এই সত্যাগ্রহ সমর্থন করিতেছেন। অতএব অর্থাভাবে সত্যাগ্রহ বন্ধ না হইবারই কথা। অন্য কোন কোন জাতি—যেমন চর্ম্মকার—যাঁহাদের ধনবল ও শিক্ষাবল নাই, তাঁহারাও লোকবল আগ্রহবল ও ভক্তিবল দ্বারা সত্যাগ্রহের সমর্থন করিতেছেন। সুতরাং লোকের অভাবও হইবে না।

সমগ্র ভারতীয় জাতির ও বাঙালীর সম্মুখে মহৎ সংগ্রাম রহিয়াছে। এখন কোন প্রকার মূঢ়তা ও অন্যায় ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কপিলমুনির সেবাইতগণ এবং তাঁহাদের সমর্থক ভ্রান্ত দেশাচারের দাসগণ যদি ইহা বুঝিয়া সকল হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার স্বীকার করেন, তাহা হইলে বৃথা গৃহবিবাদে শক্তিক্ষয় হয় না। যদি সে সুবুদ্ধি তাঁহাদের না হয়, তাহা হইলেও ঐ অধিকার নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইবে; নতুবা সকল হিন্দুর অধিগম্য নূতন নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়া পুরাতনগুলি পরিত্যক্ত হইবে। যে-প্রকারেই হউক, আরাধ্যের সম্মুখে সকলের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই।

সরকারী কর্ম্মচারীরা ও তাঁহাদের অধীনস্থ পুলিসের লোকেরা এই সামাজিক ও ধার্ম্মিক ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করিয়া ভাল করিতেছেন না। বিশেষ কোন দেবমন্দিরে সকল হিন্দুর প্রবেশাধিকার আছে কিনা, তাহা হিন্দু-সমাজের বিচার্য্য বিষয়। হিন্দুসমাজের লোকেরা তাহার আলোচনার জন্য সভা আহ্বান করিতে পারেন বা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। যদি এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রাজদ্বারে কেহ যাইতে চান, তাহা হইলে তিনি দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে পারেন। কিন্তু আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। কেহ শান্তি ভঙ্গ করিলে পুলিস তাহাকে ধরিতে পারেন, নতুবা নহে।

সংস্কারকেরা কোন সামাজিক কুপ্রথা উন্মূলিত করিবার জন্য আইন করিতে বলিলে সামাজিক ও ধার্ম্মিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছার ওজুহাতে "ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষ" রাজপুরুষেরা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন। ধার্ম্মিক ও সামাজিক বিষয়ে যদি তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে না চান, তাহা হইলে আলোচ্য ব্যাপারে কেন তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেছেন?

যে-সকল হিন্দু দেশাচার ও লোকাচারের ভক্ত, তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশে আইন-প্রণয়নের বিরোধিতা এই বলিয়া করেন, যে, তাঁহারা সামাজিক বিষয়ে অহিন্দু বিদেশী গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপের বিরোধী। তাহা হইলে তাঁহাদের দলভুক্ত লোকেরা আলোচ্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক ব্যাপারটিতে বিদেশী গবর্মেণ্টের বেতনভোগী পুলিস ডাকেন কেন? যাহা করিবার তাহা তাঁহারা নিজেই করুন।

ভারতবর্ষে স্বরাজস্থাপনের বিরোধী ইংরেজদের একটা যুক্তি এই, যে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা অন্যান্য জাতির লোকদিগকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের উপর অত্যাচার করে; অতএব তাহাদের হিতসাধক ও রক্ষা-কর্ত্তা রূপে ইংরেজের এদেশে প্রভু হইয়া থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে আলোচ্য ব্যাপারে ইংরেজ গবর্ম্মেণ্টের ভৃত্যেরা ধার্ম্মিকতার অহঙ্কারে দৃপ্ত ব্রাহ্মণ সেবাইতদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত জাতিসমূহের লোকদিগকে নিম্নস্থানে রাখিবার সহায়তা কেন করিতেছে?

এক্ষেত্রে গবর্ন্মেণ্টের লোকদের উচিত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত থাকা, কিম্বা "উৎপীড়িত ও অবনত" শ্রেণীর লোকদের পক্ষ অবলম্বন করা। অবশ্য কেহ শান্তিভঙ্গ করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা পুলিসের কর্ত্তব্য হইবে।

[কপিলমুনিতে কতকটা সন্তোষজনক রফা হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।]

—

উচ্চশিক্ষা কি ধনী ও প্রতিভাবানদের জন্যই হওয়া উচিত?

ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার লোকের সংখ্যা বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া এই সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা হইতেছে। খবরের কাগজে দেখিলাম, কোনও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ধনীর সন্তানদের এবং প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, এবং দেশের বালক ও যুবকদের পণ্যশিল্প শিক্ষায় অধিক পরিমাণে মন দেওয়া উচিত। শেষোক্ত কথাটি খুব ঠিক। এই উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে ছাত্রদিগকে সমর্থ করিতে হইলে পণ্যশিল্প-শিক্ষালয়ের সংখ্যা খুব বাড়ান দরকার। কিন্তু শুধু তাহা করিলেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইবে না। ছাত্রেরা এই সব শিক্ষালয়ে শিক্ষিত হইয়া কি করিবে, তাহারও ব্যবস্থা চাই। অল্প মূলধনে যে-সব পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা তৈরী করিবার বিদ্যা শিখিয়া সেই পরিমাণ মূলধন লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে কতকগুলি ছাত্র হয় ত পারিবে, অনেকে পারিবে না। যাহারা পারিবে না, তাহাদিগকে মূলধন সংগ্রহের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। বেশী মূলধনের কারখানা স্থাপন যে-সব পণ্য তৈরী করিবার জন্য আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত করিতে শিখিলে মূলধন সংগ্রহ কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহা ভাবিতে হইবে।

সাধারণশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যেমন বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে, শিল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যেও সেইরূপ বেকারের সংখ্যা বাড়িতে পারে, যদি মূলধন সংগ্রহ এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী করিবার সুবন্দোবস্ত না হয়।

যাহারা বাস্তবিক বিশেষ কোন একটি পণ্যশিল্প ভাল করিয়া জানে না, তাহারা বিশেষ জ্ঞানের দাবী ও ভাণ করিয়া অংশীদারদিগকে কাজে নামাইয়া কারখানা ফেল করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকায় অনেক দেশী ধনিক প্রকৃত জ্ঞানবিশিষ্ট কোন কোন বাঙালী পণ্যশিল্পজ্ঞের প্রস্তাবেও রাজী হন নাই। আবার এরূপ ধনিক অনেক আছেন, যাঁহারা আরম্ভকাল হইতেই প্রভূত লাভের গ্যারান্টী চান।

যাহাই হউক, এই সব বাধাবিঘ্ন আমাদের যুবক-দিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। অন্য কেহ তাহাদের কৃতিত্বের পথ পুষ্পাকীর্ণ করিয়া রাখিবে, এরূপ আশা করা অনুচিত। আমাদের দেশে জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কতকটা সুবিধা হইত বটে; কিন্তু যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ না করিয়া উদ্যোগিতার সহিত কৃষি-শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে যিনি যে-উপায়ে পারেন, প্রবেশ করুন। বাংলা দেশ বাঙালী ছাড়া আর সকলের জন্যই ধনের আকর, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

যাহারা ধনীর ছেলে এবং যাহারা খুব প্রতিভাবান্ কেবল তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইবে, এইরূপ প্রস্তাব আগেও মধ্যে মধ্যে শুনিয়াছি। আলোচনাও সম্ভবতঃ আগে করিয়াছি। কিন্তু আবার করা দরকার।

প্রথমতঃ, এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হইবে কিনা, বিবেচ্য। বর্ত্তমান সময়ে যত প্রতিভাবান্ ছাত্র শিক্ষা পায় ও খুব ভাল পাস করে, তাহাদেরও অনেকে কোন কাজ পায় না—বেকার বসিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে, প্রতিভাশূন্য অনেক ছেলেও এখন পাস্ করে এবং তাহারা নানা উপায়ে অনেক চাকরি দখল করিয়া বসে বলিয়া প্রতিভাবান্ ছেলেরা কাজ পায় না। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, সব রকম কাজের জন্য কম্পিটিটিভ অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া তাহার ফল অনুসারে কাজের সুবিধা দেওয়া উচিত। সেটা এখন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া তাহার আলোচনা করিব না। এখন কেবল বিবেচ্য এই যুক্তি যে, প্রতিভাবান ও অপ্রতিভাবান উভয় প্রকার ছাত্র শিক্ষা পাওয়ায় কাজকর্ম্ম কেবল প্রতিভাবানেরা না পাইয়া প্রতিভাশূন্যেরাও পাওয়ায় অনেক প্রতিভাবান্ যুবক বেকার থাকে।

কিন্তু যদি উচ্চশিক্ষা কেবল ধনী ও প্রতিভাবানদের

একচেটিয়া হয়, তাহা হইলেও কি সেই অবস্থা ঘটিবে না? ধনীর ছেলেরা সবাই প্রতিভাবান্ নয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও অনেকে পাস্ করিবে। এবং প্রতিভাবানেরাও পাস্ করিবে। তখন অপ্রতিভাবান ধনী ও প্রতিভাবান্ গরীব পাস্‌করা যুবকেরা কাজের চেষ্টা করিবে। তাহাতে প্রতিভাবান্‌রাই যে সফলকাম হইবে, এমন কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কতকগুলি প্রতিভাবান্ যুবক বেকার থাকিয়া যাইবে।

এই যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে, যে, ধনীর ছেলেরা কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞান, শিক্ষার জন্য শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা দ্বারা ভবিষ্যৎ অবস্থা অনুমান করা চাই। বর্ত্তমানে কয় জন ধনীর সন্তান কেবল জ্ঞানপিপাসু হইয়া কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে? অধিকাংশই কি কোন-না-কোন রকম রোজগারের জন্য লেখাপড়া শিখে না? ভবিষ্যতে যে ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবে, তাহার প্রমাণ কি?

আমরা এখানে 'প্রতিভাবান্' কথাটি উহার প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; যে-সব ছাত্র লেখাপড়ায় ভাল, পরীক্ষার ফল যাহাদের ভাল হয়, তাহাদিগকেই প্রতিভাবান্ বলিতেছি। চিন্তারাজ্যে, ভাবজগতে, গবেষণাক্ষেত্রে নূতন কিছু করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিবার সময় আসে সাধারণতঃ ছাত্রাবস্থার পর কিম্বা ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে। কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গোড়ার দিকে সেরূপ প্রতিভার পরিচয় সাধারণতঃ পাওয়া যায় না।

যাহারা ছাত্রাবস্থা পার হইয়া বা ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে অনেকে কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচের ক্লাসে, এমন কি উচ্চতম শ্রেণীতেও বেশী পারদর্শিতা দেখায় নাই, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রামানুজম্ নীচের একটা পরীক্ষায় গণিতেই ফেল হইয়াছিলেন। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, যে, যে-ছাত্র বি-এ পর্য্যন্ত সাধারণ রকম পাস করিয়াছে, সে তাহার পর খুব ভাল পাস্ করিয়াছে। যদি এরূপ সকল ছাত্রকে, খুব মেধাবী বা খুব প্রতিভাশালী নহে বলিয়া, উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

বুদ্ধিমান, মেধাবী, প্রতিভাশালী—এসব কথা আপেক্ষিক (রেলেটিভ্)। বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার কম বেশী আছে। কি পরিমাণ বুদ্ধি, মেধা বা প্রতিভা থাকিলে ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইবে বা হইবে না, কে নির্ণয় করিতে পারে? পাস্ দেখিয়া যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে ত মহা বিপদ্। অনেক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচের পরীক্ষাগুলিতে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে পাস্ হইতেছে। তাহারা কি সবাই প্রতিভাবান্? শিক্ষকেরা বলিতে পারিবেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রের চেয়ে বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী।

ধনী কথাটাও আপেক্ষিক। কত আয়ের লোককে ধনী বলা হইবে? যে-কেহ শিক্ষার বেতন দিতে পারে, পুস্তক কিনিতে পারে, পরীক্ষার ফী দিতে পারে, বাসা খরচ চালাইতে পারে, তাহাকেই যদি ধনী বলিয়া ধরা হয় (তাহা ভিন্ন অন্য কি মানদণ্ড অবলম্বন করা যাইবে?), তাহা হইলে ধনী ছাত্রের সংখ্যাও বড় কম হইবে না।

কোন দেশেই উচ্চশিক্ষা প্রতিভাবান্ ও ধনীদের একচেটিয়া নহে, এমন দেশ কয়েকটি আছে যেখানে উচ্চতম শিক্ষাও সম্পূর্ণ অবৈতনিক; অথচ সেই সব দেশে বেকারের সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে কম। এই যে বেকারের সংখ্যা কম আছে, তাহার জন্য উচ্চশিক্ষা ধনী ও প্রতিভাবানদের একচেটিয়া করিবার দরকার হয় নাই; রোজগারের নানা পথ খোলা থাকায় এরূপ অবস্থা সম্ভব হইয়াছে। স্বাধীনতা তাহা সম্ভব করিয়াছে।

এবিষয়ে আমাদের শেষ কথা এই, যে, ধনীরা যে শিক্ষা এখন পান, তাহার আংশিক ব্যয় মাত্র তাঁহারা দেন, সব ব্যয় তাঁহারা দেন না। অনেক টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে দিতে হয়। যদি ভবিষ্যতে কেবল ধনী ও প্রতিভাবান্‌দিগকেই উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ছাত্রসংখ্যা কমিবে, ছাত্রদত্ত বেতন হইতে মোট আয় কমিবে, সুতরাং সরকারী রাজস্ব হইতে আরও বেশী টাকা শিক্ষার জন্য দিতে হইবে। ইহার অর্থ এই হইবে, যে, গরীবের উৎপন্ন ধনে শিক্ষা পাইবে ধনীরা। অতঃপর যাহা লিখিতেছি, তাহা হইতে একথা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

—

শিক্ষিতদের শিক্ষাঋণ

আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় আমরা কেহই দি নাই, তাহার অনেক অংশ দেশের লোকে—বিশেষতঃ দেশের চাষী ও অন্য শ্রমিকেরা—দিয়াছে, এবং সেই কারণে আমরা দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট ঋণী। একথা আমরা অনেক বার বলিয়াছি ও লিখিয়াছি। আমরা যদি সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য বা অন্যবিধ হিতসাধনের জন্য কিছু করি, তাহা হইলে তাহা ঋণশোধ মাত্র। আমরা দাতা নহি। আমাদের সামান্য চাঁদা-দান বা পরিশ্রম অধমর্ণের ঋণশোধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এসব কথা যে আলঙ্কারিক নয়, বাস্তবিক দেনাপাওনার কথা, তাহাও অনেক বার দেখাইয়াছি।

সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯২৭-২৮ সালের বঙ্গের শিক্ষারিপোর্ট হইতে তাহা আবার দেখাইতেছি। ১৯২৭-২৮ সালে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন কলেজে ছাত্রপ্রতি গড় কত খরচ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কত টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে দেওয়া, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

কলেজ	ছাত্রপ্রতি মোট খরচ	সরকারী রাজস্ব হইতে প্রদত্ত অংশ
প্রেসিডেন্সী	৪৭১'৫	৩০১'৫
ঢাকা ইণ্টার্মীডিয়েট	৪৩১'৯	৩৪৩'৪
হুগলী	৫১৫'৫	৪২৭'২
সংস্কৃত	৫৫৬.৩	৫০৯
কৃষ্ণনগর	৫৩৫'৩	৪৩৫'৬
চট্টগ্রাম	২০৮'৪	১২০'৩
রাজশাহী	২৮৫'৩	১৯২.৬
ইসলামিয়া	২৪৮'২	১৪৯'২
সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত কলেজসমূহ	১৩৪'৭	২৮
অপ্রাপ্তসাহায্য কলেজসমূহ	১০৫'৯	শূন্য

গবর্ন্মেণ্ট কলেজগুলিতে এবং সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্য যে বাৎসরিক সরকারী ব্যয় হয়, তা ছাড়া কলেজগুলির গৃহনির্ম্মাণে, লাইব্রেরীর পুস্তক-ক্রয়ে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ক্রয় প্রভৃতিতেও বিস্তর টাকা খরচ হইয়াছে। ছাত্রদের দেওয়া বেতন হইতে সেই ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় নাই। সে টাকা সরকারী রাজস্ব, ধনীদের দান প্রভৃতি যাহা হইতেই আসিয়া থাকুক, সে ধন উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে চাষী ও অন্য শ্রমিকরা। যে-সব কলেজে নিয়মিত বার্ষিক ও মাসিক কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় না, তাহাদেরও সব খরচ ছাত্রদত্ত বেতন হইতে চলে না। ঘরবাড়ীনির্ম্মাণ, লাইব্রেরীর পুস্তক খরিদ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ক্রয় প্রভৃতি ব্যয়, হয় সর্ব্বসাধারণের চাঁদা কিম্বা সরকারী সাহায্য হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এবং সে টাকার উৎপত্তির উপায় গরীবদের শ্রম। এই সব বেসরকারী কলেজও যে সরকারী রাজস্ব হইতে টাকা পায়, তাহার প্রমাণ ১৯২৭-২৮ সালের শিক্ষারিপোর্টেই রহিয়াছে। উহার ১০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে :—

'GRANTS TO PRIVATE COLLEGES.—A sum of Rs. 1,29,000 was distributed by Government, as previously, on the recommendations of Calcutta University among private colleges mainly for the improvement of libraries and laboratories. In addition to this amount a sum of Rs. 2,80,423 was spent by Government directly in giving capital and maintenance grants to non-Government arts colleges during the year under review."

১৯২৭-২৮ সালে বেসরকারী কলেজগুলিকে সরকার রাজস্ব হইতে এই যে ১,২৯,০০০ ও ২,৮০,৪২৩ টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেশের লোকদের দেওয়া টাকা হইতে আসিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসগুলিতে ছাত্রপ্রতি যত খরচ হয়, সে ব্যয় তাহাদের শিক্ষার বেতন ও পরীক্ষার ফী হইতে নির্ব্বাহিত হয় না, ধনী লোকদের দেওয়া মূলধনের সুদ, সরকারী সাহায্য প্রভৃতি হইতেও অংশতঃ নির্ব্বাহিত হয়। এই সব টাকা আসিয়াছে শ্রমিকদের শ্রম হইতে।

সরকারী ও বেসরকারী কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে কাজ করিতে বাধ্য হন, অথচ তাঁহারা কেহ কেহ বেশী বেতনের শিক্ষকদের মত উচ্চ দুরূহ বিষয় শিক্ষা দেন। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে হইলে ছাত্রপ্রতি শিক্ষার ব্যয় আরও বাড়িত, এবং এই অতিরিক্ত ব্যয়ও চাঁদা বা ট্যাক্সের আকারে দেশের লোকদের নিকট হইতেই আসিত। অতএব, অল্পবেতনভোগী শিক্ষকরা যে পরিমাণে কম বেতন পান, তাহা তাঁহারা অনিচ্ছায় চাঁদা দেন মনে করা যাইতে পারে। এই টাকার জন্য ছাত্রেরা তাঁহাদের নিকট ঋণী।

বর্ত্তমানে ধনীর সন্তানরা যে শিক্ষা পান, তাহাও অন্য ছাত্রদের মত তাঁহারা সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে পান না, অংশতঃ গরীবের টাকায় পান।

ইউরোপের "প্রতিধ্বনি" ?

বৈশাখ মাসের "প্রবর্ত্তকে" আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত একটি কথোপকথন বাহির হইয়াছে। তাহা তাঁহার সহিত কথোপকথনের ঠিক অনুলেখন কিনা এবং তাঁহার অনুমতি ক্রমে প্রকাশিত কিনা, জানি না। তাহাতে এইরূপ লেখা হইয়াছে, যে, তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের বাণী ইউরোপের প্রতিধ্বনি, "ভারতের খাঁটি মৌলিক প্রতিভার দান নয়। Slave mentality আমাদের শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, cultural slavery ওতপ্রোতভাবে ভারতের সকল প্রতিভাকেই গ্রাস করে' বসেছে—তাই ভারত নিজের দান নিয়ে জগতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না।" এই কথোপকথনের অনুলেখনে ইহাও আছে, যে, ডাক্তার শীল বলিয়াছিলেন, "দেখ, ভারতের যে একটা কিছু দেওয়ার জিনিষ আছে, এইটাই আমি জানাতে চাই—সে জিনিষ তার খাঁটি নিজস্ব, ইউরোপের প্রতিধ্বনি নয়।" ইহাও আছে, যে, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার শীল মহাশয়ের সম্মুখে তাঁহারই সম্বন্ধে বলিলেন, "অনেকেই জানেন না—ইনি

যে-সব নূতন গবেষণা ও সিদ্ধান্ত করেছেন, নানা জনে তাঁর কাছ থেকে তা শুনে নিয়ে, নিজেদের নামেই চালিয়ে দিয়েছে—এই কারণেই তাঁর চিন্তার দান কতখানি, দেশ তা জানে না।" তাহাতে "আচার্য্য মৃদু হাসিলেন—কহিলেন, 'সত্য আমার তার নয়—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। আমার দাবী কোন সত্যেই নাই—সত্য আপনাকে আপনি আবিষ্কার করে' চলেছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।"

শীল মহাশয়ের এই বিনয়ে সকলেই যৎপরোনাস্তি প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের কেবল এই একটু নিবেদন আছে, যে, সত্য যদি ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হয়, সাধারণ সম্পত্তিই হয়, তাহা হইলে উহা জাতি-বিশেষের, মহাদেশ-বিশেষের সম্পত্তিও নয়, সমগ্র মানব-জাতিরই সম্পত্তি। এই ধরণের কথা আমেরিকান মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন। যথা—

"There is one mind common to all individual men. Every man is an inlet to the same and to all of the same. He that is once admitted to the right of reason is made a freeman of the whole estate. What Plato has thought he may think; what a saint has felt he may feel; what at any time has befallen any man, he can understand. Who hath access to this universal mind is a party to all that is or can be done, for this is the only and sovereign agent."

আমাদের প্রতিভা নাই। শীল মহাশয়ের মত পাণ্ডিত্য ত নাই-ই, সাধারণ রকমের পাণ্ডিত্যও নাই। স্মতরাং যদি রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার বলিয়া লিখিত মত আমরা কিয়ৎ পরিমাণেও গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও তাঁহাদের মনীষার ফলকে প্রতিধ্বনি বলা আমাদের মত লোকের মুখে শোভা পাইত না। কিন্তু ঐ মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাহা স্লেভ মেণ্টালিটি থাকার ফল বা না-থাকার ফল, অন্যের বিবেচ্য।

যখন পৃথিবীর কোন দেশে রেলগাড়ী, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, ছাপাখানা, টেলিগ্রাফ, বেতার বার্ত্তা, খবরের কাগজ, মুদ্রিত পুস্তক ছিল না, সে সময়েও পরস্পর দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যেও দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বনে চিন্তা ভাব আদর্শের আদান-প্রদান হইত, শুনিয়াছি। এখন ত পূর্ব্বোক্ত জিনিষগুলি থাকায় সভ্য জগতের প্রত্যেক অংশের উপর অন্য অনেক অংশের প্রভাব পড়িতেছে। পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রাচ্যের উপর বেশী পরিমাণে পড়িতেছে। প্রাচ্য কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না—বোধ করি শীল মহাশয়ও পারেন নাই। স্মতরাং ভারতবর্ষের কোনও আধুনিক মনীষীর মননের ফল অবিমিশ্র ভারতীয় হইতে পারে বা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি না। অপর দিকে প্রতীচ্যও প্রাচ্যের প্রভাব বহুবৎসর হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছে, এবং অনেক পাশ্চাত্য মনীষীর চিন্তা ও ভাবে প্রাচ্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নূতন কিছু আছে কি না। আমাদের সামান্য জ্ঞান অনুসারে মনে হয়, আছে। এই নূতনের পরিমাণ ও মূল্য কি, তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু এবিষয়ে আমরা নিঃসংশয়, যে, তাঁহারা নিছক প্রতিধ্বনি নহেন—প্রতীচ্যের প্রভাব যদিও অন্য শিক্ষিত প্রাচ্য ব্যক্তিদের ন্যায় তাঁহাদেরও উপর পড়িয়াছে।

আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির গল্পাংশের কোন্ কোন্ অংশ এবং অন্য কোন্ কোন্ জিনিষ কোন্ পুরাতন পুস্তক হইতে গৃহীত, তাহা পড়িতে হইত। কিন্তু যে-সব পণ্ডিত ব্যক্তি এই সব পুরাতন জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই শেক্সপীয়ারের মৌলিক প্রতিভা অস্বীকার করেন নাই, বা তাঁহাকে প্রতিধ্বনি বলেন নাই। শেক্সপীয়ারের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিতেছি না। কেবল এইটুকু বলিতে চাই, অন্যের নিকট হইতে শেক্সপীয়ার যত জিনিষ লইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তত লন নাই।

জগদীশচন্দ্র কতকগুলি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহা প্রতিধ্বনি নয়। অবশ্য, যন্ত্রগুলি "বাণী" নহে, কিন্তু বাণীর মতই মননের ফল। তাঁহার আবিষ্কৃত অনেক তত্ত্বও প্রতিধ্বনি নহে বলিয়া শুনিয়াছি। উদ্ভিদের প্রাণবত্তার কথা প্রাচীন কোন কোন সংস্কৃত বহিতেও আছে, কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক প্রমাণ জগদীশচন্দ্র দিয়াছেন। পাশ্চাত্য কোন কোন বৈজ্ঞানিক যদি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে আগে দিয়াছেন ও বসু মহাশয় তাঁহাদের কাছে ঋণী, এ কথা জগতের লোকের জানিতে বাকী থাকিত না; কারণ, আপনাদিগকে জাহির করিতে পাশ্চাত্যদের চেয়ে ওস্তাদ দুনিয়ায় কেহ নাই। বসু মহাশয়ের সব আবিষ্ক্রিয়া শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষাসহ না হইতে পারে, তাহাতে ভুল বাহির হইতে পারে। তাহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু অনুকরণ, ঋণ, প্রতিধ্বনি ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। তাহা সত্য হইলে অচিরে জানা পড়িবে। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত যে ঐক্যের বাণী বসু মহাশয় প্রচার করেন, তিনি তাহার সঙ্কেত প্রাচীন ঋষিদের নিকট হইতে পাইয়াছেন বলিয়া নিজেই বলিয়াছেন—পাশ্চাত্যদের নিকট হইতে নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব বাণী পাশ্চাত্যের প্রতিধ্বনি হইলে পাশ্চাত্য লোকদের তাহা সহজে ধরিতে পারিবার কথা। তাঁহার প্রতিভার ফলকে সকল পাশ্চাত্য লোকে ভারতীয় বলিয়া স্বীকার করেন কি না জানি না, কিন্তু সকলে যে তাঁহাকে প্রতিধ্বনি মনে করেন না, তাহা জানি। এবিষয়ে যে-সকল পাশ্চাত্য ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, দার্শনিক বা কাব্যিক মৌলিকতার দাবী নাই, এবং সুতরাং যাঁহাদের মনে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা না থাকিবার কথা, তাঁহাদের সাক্ষ্যের মূল্য আছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজি ম্যাকডনাল্ড সাহেব এইরূপ একজন লোক। অবশ্য, তিনি রাজনীতিজ্ঞ মাত্র; কিন্তু খুব পণ্ডিত না হইলেও লেখাপড়া জানেন, অনেক বহি পড়িয়াছেন এবং প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের সহিত তাঁহার কিছু পরিচয় আছে। তিনি তাঁহার "গবর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"To the revival of ancient culture in all its activities Rabindranath has imparted the chief stimulus. Music, poetry, fiction, politics, have been enriched by his many-sided activities, and he is India without a spot or blemish. He has assimilated the West, but has at the same time transmuted it so that it is no longer West."

ঐ পুস্তকের ২৪৫ পৃষ্ঠায় লেখক বলিতেছেন,—

"Rabindranath Tagore is known to the West almost solely as a poet. But Tagore's poetry is India. It is the product of his devotion to Indian culture; it belongs to a revival in Bengali literature which comes from the heart of Bengal far more purely than [Bankim Chandra] Chatterji's fiction. It is of the soul of a people, not merely the emotion of a man; a systematic view of life, not merely a poetic mood; a culture, not merely a tune."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বলিয়া যে-সব কথা প্রবর্ত্তকে ছাপা হইয়াছে, তিনি ঠিক সেই-সব কথা বলিয়াছিলেন কিনা, জানি না। আমরা কথাগুলির সামান্য আলোচনা করিলাম, তাঁহার ব্যক্তিত্বের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত ও সাধ্যাতীত।

—

রাজদ্রোহের মামলা

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এখন রাজদ্রোহের মামলা চলিতেছে। যুদ্ধ দ্বারা ইংরেজ-রাজত্ব লোপ করিবার জন্য চক্রান্ত অপরাধের মামলাও চলিতেছে। বিচারাধীন বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সত্য সত্যই অপরাধী কিনা, তাহা বিচারকেরা স্থির করিবেন। অনেক রাজনীতিজ্ঞের, যেমন বর্ত্তমান ভারত-সচিবের, এরূপ মত আছে বটে, যে, রাজদ্রোহের প্রমাণ থাকিলেও বেশী এরূপ মামলা করা ভাল নয়। কিন্তু আমরা নিজেও আগামী বলিয়া এই মতের সমর্থন বা আলোচনা করিব না। আমরা কেবল ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ বেকনের একটি কথা ভারত-সরকারকে ও ইংরেজ জাতিকে মনে পড়াইয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, যে, সিডিশ্যানের, অর্থাৎ রাজদ্রোহের, ম্যাটার, অর্থাৎ মূলীভূত বস্তু, দূর করা আবশ্যক। রাজপুরুষদের মতে যাহারা দোষী তাহাদের শাস্তি অবশ্যই হইবে। কিন্তু কেবল মাত্র সখের বশে বেশী লোক জরিমানা দেওয়া, জেলে যাওয়া বা প্রাণ দেওয়া পছন্দ করে বলিয়া বোধ হয় না। যে যে কারণে অনেক লোকে গবর্মেণ্টের ক্রোধোৎপাদক কাজ করে, সেই সেই কারণগুলাও দূর করা আবশ্যক।

—

লাহোরের ডাক্তার সত্যপালের শাস্তি

লাহোরের ডাক্তার সত্যপাল একজন জননায়ক। তিনি এরূপ একটি বক্তৃতা করেন যাহা গবর্মেণ্টের মতে রাজদ্রোহ-উত্তেজক হওয়ায় তাঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা না দিলে আরও ছয় মাস জেল খাটিতে হইবে। শাস্তিটা হিংস্র রকমের হইয়াছে—যদিও ডাক্তার সত্যপাল তাহাতে দমিবেন না।

—

পঞ্জাবে কঠোর শাস্তির ফল

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতে পঞ্জাব গুরুতর শাস্তির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তাহাতে, সরকার বাহাদুর যাহাকে অপরাধ বলেন, তাহা কমিতেছে না বাড়িতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে হয় না?

পঞ্জাবের জেলসমূহের বার্ষিক রিপোর্টের উপর পঞ্জাব গবর্মেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঐ প্রদেশের প্রত্যেক হাজার অধিবাসীর মধ্যে একজন জেলের বাসিন্দা, এবং তাহাতে জেলে কয়েদীদিগকে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিতে হয়। পঞ্জাব যে-ভাবে শাসিত হয়, এই তথ্যটি তাহার একটি ভাল সার্টিফিকেট বটে। যে প্রদেশে যেরূপ শাসনের ফল এরূপ মন্দ, সে প্রদেশের লোকে সেই শাসন সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিলে তাহা রাজপুরুষদের কানে রাজদ্রোহের মত শুনাইতে পারে। কিন্তু স্পষ্টবক্তাদিগকে শাস্তি দেওয়াই কি প্রকৃত প্রতিকার? ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক প্রণালীতে দেশের কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করাই আমাদের মতে প্রকৃত ফলদায়ক প্রতিকার। কিন্তু ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাপ্রিয় লোকেরা ইহা বুঝেন না, কিম্বা বুঝিয়াও বুঝেন না।

সতীন্দ্রনাথ সেনের প্রায়োপবেশন

বরিশালের জেলে সতীন্দ্রনাথ সেন স্বেচ্ছায় দীর্ঘকাল উপবাসী আছেন। তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, যে, এখন তাঁহাকে আর জোর করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টাও করা যাইতেছে না। দেশের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ইহা বড় শোকাবহ ব্যাপার। আমরা কোন পৌরুষের ও স্বার্থত্যাগের কাজ করি নাই। সুতরাং যাঁহারা ত্যাগী বীর তাঁহাদিগকে উপদেশ বা পরামর্শ দিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের মতের মূল্য যাহাই হউক, মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। আমাদের বিবেচনায় এভাবে আত্মহত্যা করা অপেক্ষা বাঁচিয়া থাকিয়া মানুষের হিতসাধন করা ভাল। তাহা করিতে গিয়া যদি অন্যের হাতে প্রাণ যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই। সতীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, অন্য প্রায়োপবেশকদের পক্ষেও তাহা সত্য।

কাগজ ছাপিতে যাইবার সময় শুনিয়া সুখী হইলাম, সতীন্দ্রবাবু উপবাস ভঙ্গ করিয়াছেন।

—

"ব্রতী বালক"

সাধারণ খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র সম্বন্ধে প্রবাসীতে আমরা কোন মত প্রকাশ করি না। কিন্তু বিশেষ রকমের সাময়িক পত্র হইলে তাহার উল্লেখ ও প্রশংসা করিতে কোন বাধা নাই। সুরুলস্থিত শ্রীনিকেতন হইতে প্রকাশিত "ব্রতী বালক" এইরূপ একটি মাসিক পত্র। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম (বৈশাখ) সংখ্যায় লেখা হইয়াছে :—

> বর্ত্তমানে বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে নানা স্থানে ব্রতীবালক সঙ্ঘের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের নিমিত্ত একখানি পত্রিকার অভাব অনেকদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি। কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তি থাকায় সে অভাব এতদিন দূর করিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি শ্রীনিকেতনের সুযোগ্য ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পল্লীসেবা-বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহোদয়ের উৎসাহে আমরা এই পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। পত্রখানিতে সাধারণতঃ ব্রতী-বালকদিগের বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্য্যবিবরণী ও কার্য্যপদ্ধতি আলোচিত হইবে। ব্রতীদলের বিভিন্ন কেন্দ্রের পরস্পরের সহিত পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই কার্য্যে আমরা যেন বিভিন্ন কেন্দ্রের ব্রতীনায়ক ও ব্রতীবালকদিগের সহযোগিতা পাই, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কাগজখানির প্রবন্ধগুলি বেশ ছোট ছোট এবং তাহাতে অনেক কাজের কথা থাকে। ইহাতে প্রকাশিত নানা বৃত্তান্ত ও সংবাদ পড়িয়া শ্রীনিকেতনের উপকারিতা বুঝা যায়। সংবাদগুলি পড়িয়া সকল জায়গার বাঙালী বালকেরা দেশহিতসাধনের একটি পথ দেখিতে পাইবেন এবং সেই পথে চলিতে উৎসাহিত হইবেন।

—

"পল্লী-স্বরাজ"

"পল্লী-স্বরাজ" এইরূপ আর একটি বিশেষ রকমের কাগজ। ইহা বঙ্গীয় ইউনিয়নবোর্ড উন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র ইহাও সুপরিচালিত হইতেছে।

—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এই শ্রাবণ মাসে দয়ার সাগর পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগমন করেন। তিনি দেশের নানা কার্য্যক্ষেত্রে নানা কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সকল কাজের চেয়ে বড় ছিল তাঁহার পৌরুষ, তাঁহার মনুষ্যত্ব। এবং সকল কাজের মধ্যে বড় ছিল, বিধবাদের বিবাহের পুনঃপ্রবর্ত্তন। কয়েক দিন পরেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অনেক শহরে ও গ্রামে সভা হইবে। তাহাতে যেন বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হয়, এবং সভার পর যেন দেশে বালিকা বিধবাদের বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

যাঁহারা বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার ও অনুবিধ আলোচনা এবং সমুদয় আপত্তির খণ্ডন সংক্ষেপে দেখিতে চান, তাঁহারা শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বিধবাবিবাহ" পুস্তক দেখিবেন। ইহা উৎকৃষ্ট পুস্তক। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান, হিন্দুমিশন, ৭নং বেচু চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বালবিধবাদের ব্রহ্মচর্য্যে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তাহা প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বেচ্ছাবৃত হওয়া চাই। দেশাচারের ও অভিভাবকদের কাপুরুষতা ও নির্ম্মতার ভণ্ড নামান্তর হইলে চলিবে না।

ইহাও বলা দরকার মনে করি, যে, ব্রহ্মচারিণী কুমারী ও ব্রহ্মচারিণী বালবিধবা অপেক্ষা সাধ্বী জননীকে আমরা একটুও নিকৃষ্ট মনে করি না। বালবিধবাদিগকে আমরা কুমারীই মনে করি। কুমারী ও বালবিধবারা বিবাহ করিয়া সাধুভাবে জননীর কর্ত্তব্য করিলে, সেই আদর্শ ব্রহ্মচারিণীর আদর্শ অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় নহে।

—

বঙ্গে নারী-নির্য্যাতন

বঙ্গের অন্তঃপুরে ও বাহিরে নারী-নির্য্যাতন সমান-ভাবে চলিতেছে। অন্তঃপুরের অত্যাচার অল্পই প্রকাশ পায়। যাহা প্রকাশ পায়, তাহাতে অনেক শাশুড়ী ননদ

ও স্বামীর পৈশাচিক ব্যবহারে স্তম্ভিত হইতে হয়। বধূকে খাইতে না দিয়া মারা, পুড়াইয়া মারা, প্রহার করিয়া মারা—কত রকম অত্যাচারই যে হয়, তাহার বর্ণনা করা যায় না। চাকরানীর উপর এরূপ অত্যাচার করা দূরে থাক্, সামান্য অত্যাচার করিতেও লোকে সাহস পায় না; কারণ তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না, এবং যে বাড়ীতে ঝির উপর অত্যাচার হয়, সে বাড়ীতে অন্য ঝি কাজ করিবে না। কিন্তু বধূ ক্রীতদাসীরও অধম। তাহাকে কিনিতে টাকা লাগে না, বরং তাহাকে ঘরে আনিবার সময় অনেক সময় টাকা পাওয়া যায়। একটি বৌ মরিলে বা তাহাকে মারিয়া ফেলিলে অন্য বৌ পাওয়া যায়। এই কারণেই হয় ত এই প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে—'অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যিমানের বৌ মরে।"

ঘরে বাহিরে নারী-নির্য্যাতন বঙ্গের ঘোর কলঙ্ক। এবিষয়ে হিন্দু-মুসলমান কেহই নিষ্কলঙ্ক নহে। দুশ্চরিত্র হিন্দু ও দুশ্চরিত্র মুসলমান উভয়েই দোষী। হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের মধ্যে দুশ্চরিত্র লোকের সংখ্যা কোন্ সমাজে বেশী তাহার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু মুসলমানেরা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেও একটি বিষয়ের প্রতি ভদ্র মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দল বাঁধিয়া বলপূর্ব্বক নারীহরণ এবং গৃহস্থ মুসলমান পুরুষ ও নারীদের সাহায্যে হৃতা নারীকে গ্রামে গ্রামে লইয়া লুকাইয়া বেড়ান—এইরূপ দুষ্কর্ম দমনে তাঁহারা তৎপর হউন। দুশ্চরিত্র হিন্দুদের দ্বারা এইরূপ কাজ যদি হয়, তাহা হইলে তাহাও দমন করা আবশ্যক।

দুর্বৃত্তদের অপরাধ প্রমাণিত হইলে কখন কখন বড় লঘুদণ্ড হয়। কয়েক বৎসর কারাবাস, বেত্রাঘাত এবং, চিকিৎসা হিসাবে, ভ্যাসেক্টোমী উপযুক্ত ব্যবস্থা।

আজকাল সব জেলায় যুবসঙ্ঘের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাসমূহ (resolutions) অনুসারে কাজ করিলে কল্যাণ হইবে। রংপুরের কতকগুলি যুবক বরিশালের বাবু চারুচন্দ্র রায়ের কন্যার সন্ধান লইয়া উদ্ধার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ছাড়া যুবকেরা আর কোথায় কোথায় নারীর সম্মান রক্ষায় তৎপর হইয়াছেন, সংবাদ জানিতে পারিলে প্রীত হইব। উত্তেজক বক্তৃতার মদিরা পান করিয়া বিভোর হইয়া থাকাই যুবসঙ্ঘের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত নয়।

অন্ততঃ দু' একজন নারীও যে দুর্বৃত্তের প্রাণবধ করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, ইহা সুসংবাদ। বঙ্গের সকল নারীর—বিশেষতঃ মফঃস্বলের ও গ্রাম-সমূহের নারীদের—অস্ত্র ব্যবহার করিবার অভ্যাস থাকা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

বরিশালের বাবু চারুচন্দ্র রায়ের কন্যা অপহৃত হওয়ায় অন্য সকলের শিক্ষা হওয়া উচিত। ঘনিষ্ঠতা করা ভাল, কিন্তু লোক বুঝিয়া। বিশেষরূপে পরীক্ষিত লোক ভিন্ন অন্য কাহারও বাড়ী কন্যা পাঠান উচিত নয়।

—

দিল্লীতে বিধবা বিক্রীর "আশ্রম"

পঞ্জাবে বিধবা বিক্রীর ব্যবসা চলে, নবদ্বীপে চলে, আরও কোথাও কোথাও চলে শুনিয়াছি। সম্প্রতি দিল্লীতে এক তথাকথিত বিধবা-আশ্রমের এইরূপ কুকাজ ধরা পড়িয়াছে। দুর্বৃত্তেরা সবাই বিধবাদের বিবাহ দিবার ছলে এই পাপব্যবসা চালায়। ইহাদের গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত।

কিন্তু শুধু দুষ্ট লোকের দণ্ড দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তাহারা যে এরূপ ব্যবসা চালাইতে পারে, তাহার দ্বারা প্রমাণ হয়, যে, অনেক বিধবারই বিবাহ করিবার আবশ্যক ও ইচ্ছা আছে। এই কারণে সব জেলায় সচ্চরিত্র লোক-দিগকে লইয়া গঠিত বিধবাবিবাহ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

—

স্বাধীনতা ও পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণাপত্র

১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনের‍্যাল, দেশী রাষ্ট্রগুলির নৃপতি এবং তাঁহার সব জাতির ও ধর্ম্মের প্রজাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহার শেষ বাক্যটি এই :—

"And with all My people I pray to Almighty God that by His wisdom and under His guidance India may be led to greater prosperity and contentment, and may grow to the fulness of political freedom."

তাৎপর্য্য। "এবং আমার সমুদয় প্রজার সহিত আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যে, তাঁহার প্রজ্ঞা দ্বারা এবং তাঁহার পরিচালনে ভারতবর্ষ যেন অধিকতর সমৃদ্ধি ও সন্তোষে নীত হয়, এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় পূর্ণতা পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করে।"

ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবর্ষের সম্মুখে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার এই যে পূর্ণতার আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন, ইহা কি বস্তু? পূর্ণ স্বাধীনতা মানে এরূপ স্বাধীনতা, যার চেয়ে বেশী স্বাধীনতা কোন দেশের নাই, আপাততঃ এইরূপ অর্থ ধরিয়া লওয়া যাক্। ভবিষ্যতে স্বাধীনতম জাতির স্বাধীনতা কি প্রকার হইবে, তাহা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। এখন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যেই স্বাধীনতা কাহার

কতটুকু আছে দেখা যাক। ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য, যে, ইংলণ্ডের যতটা স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার আছে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া বা অন্য কোন ডোমিনিয়নের তাহা নাই। সুতরাং পূর্ণ-স্বাধীনতা বলিতে ডোমিনিয়নগুলির অবস্থা বুঝায় না, ইংলণ্ডের মত অবস্থাই বুঝায়। তাহা হইলে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের মত পূর্ণ-স্বাধীন হইতে উপদেশ দিয়াছেন?

—

রাজার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের কথা নাই

ইংলণ্ডেশ্বরের একটি বক্তৃতা পাঠানন্তর বিলাতী নূতন পার্লেমেণ্টের বৈঠক আরম্ভ হয়। এই বক্তৃতা তিনি রচনা করেন না। তাহাতে কি কি জিনিষ থাকিবে, তাহা মন্ত্রীমণ্ডল স্থির করিয়া দেন। পার্লেমেণ্টে যখন যে রাজনৈতিক দল প্রবল থাকে, তখন তাহারা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করে। সেই মণ্ডলই নিজেদের কথা রাজাকে দিয়া বলান।

বর্ত্তমান শ্রমিক মন্ত্রীরা রাজাকে যাহা বলাইয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের জন্য কি করা হইবে না হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। উল্লেখ না থাকা ভালই হইয়াছে। আকাশের চাঁদ দিব বলিয়া বোমা দেওয়া ত ভাল নহেই, ছেলেদের খেলার বেলুন দেওয়াও ভাল নয়। অঙ্গীকার-রক্ষার পথে অন্তরায় থাকিলে অঙ্গীকার না করাই ভ ল।

প্রধান মন্ত্রী তাঁহার এক বক্তৃতায় ভারতবর্ষের অনুল্লেখের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখন সাইমন কমিশন দ্বারা অনুসন্ধান হইতেছে, এইজন্য কিছু বলা হয় নাই। রুশিয়ার সহিত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কথাবার্ত্তা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কেমন করিয়া আবার চালাইতে পারেন, তাহার সম্বন্ধেও আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। অথচ রুশিয়ার কথা রাজার বক্তৃতায় আছে। বিবেচনা ও অনুসন্ধানের অধীন এইরূপ আরও কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেই জন্য ম্যাকডনাল্ড সাহেবের কৈফিয়ৎটা সন্তোষজনক মনে হইতেছে না। ভারতবর্ষের লোকেরা ত তাঁহার মনিব নহে; কৈফিয়ৎ না দিলেই চলিত।

—

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য

১৯২৭ সালের বঙ্গের স্বাস্থ্য রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ বৎসর আগেকার যে-কোন বৎসর অপেক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বেশী হইয়াছিল। সব জেলার সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হয় নাই। যে ১৯৬টি স্কুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫২জন ছাত্রের কোন-না-কোন রকম দৈহিক খুঁত বা পীড়া ছিল।

পরীক্ষিত ১৯৬টি স্কুলের মধ্যে ১০৭টির ছাত্রদের জন্য যথেষ্ট স্থান ছিল, ৬২টিতে যথেষ্ট আলো ছিল না, ৪৮টিতে যথেষ্ট বায়ুচলাচল ছিল না, ১০৩টিতে মলমূত্র ত্যাগের জায়গা ছিল না। মোট ১১,৭৪৬ জন বালক পরীক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শতকরা ১৮ জন সুপুষ্ট, ৪২.৯ জন মোটামুটি রকম পুষ্ট, এবং ৩৯.১ জন অপুষ্ট ছিল। ইহা দেশের দারিদ্র্যের পরিচায়ক। শতকরা ৩০.৪ জনের পায়ে জুতা ছিল, ৬৯.৬ জনের ছিল না। ১৫ জনের পরিচ্ছদ ভাল ছিল, ৩৯.৬ জনের মোটামুটি যথেষ্ট, এবং ৪৫.৫ জনের অযথেষ্ট।

—

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা বঙ্গের কতকগুলি ক্ষয়িষ্ণু জেলার বৃত্তান্ত দিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতম বাঁকুড়া জেলার বিস্তারিত বৃত্তান্ত দিয়াছিলাম। ১৯২৭ সালের বঙ্গীয় স্বাস্থ্য রিপোর্টে ক্ষয়িষ্ণু কতকগুলি অঞ্চলের উল্লেখ আছে। কোন্ ডিবিজ্যনে হাজার-করা কত লোক ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে বাড়িয়াছিল বা কমিয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

ডিবিজ্যন	হাজার-করা	হ্রাস বা বৃদ্ধি
	১৯২৬	১৯২৭
বর্দ্ধমান	+ ৫.৭	+ ২.১
প্রেসিডেন্সী	− ২.৭	− ২.৭
রাজশাহী	− ০.৫	+ ৩.৭
ঢাকা	+ ৫.০	+ ৩.৫
চট্টগ্রাম	+ ৭.৭	+ ৩.৮

কুড়িটি জেলায় লোকসংখ্যা বাড়িয়াছিল। ১৯২৬ সালে রংপুর, দিনাজপুর, নদিয়া, রাজশাহী ও পাবনায় লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল, ১৯২৭এ বাড়িয়াছিল।

কলিকাতা, যশোর, হাবড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, খুলনা ও বাখরগঞ্জে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছিল।

—

ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়দের রাজভক্তি

সম্রাট পঞ্চম জর্জের রোগমুক্তির জন্য সংকর্মে অর্থব্যয় দ্বারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনার্থ বড়লাট ভারতবর্ষে একটি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ফণ্ড খুলেন। তাহাতে ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়েরা, সাধারণতঃ ধনী ও স্বচ্ছল অবস্থার লোক হইলেও, সামান্য টাকা দিয়াছে। তাহাতে পাইয়োনীয়ার লিখিতেছেন, ইউরোপীয়েরা ভারতীয়দিগকে রাজভক্তিতে হীন বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু নিজেরা টাকা দিবার বেলায় টাকা দেয় না। যেদিন পাইয়োনীয়ার এবিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে, সে দিন পর্য্যন্ত ফণ্ডে ৩,২৭,০০০ টাকা উঠিয়াছিল। তাহার মধ্যে দেশী রাজ্যগুলি দিয়াছিল ২,১১,০০০, সাতিশয় ধনী ইউরোপীয় অধিবাসী-সমন্বিত বাংল দেশ দিয়াছিল ১৯,৬২৮, বোম্বাই দিয়াছিল ৫,৪০৫। ভারতে অন্ততঃ তিন লক্ষ ব্রিটিশজাত লোক আছে। তাহাদের আগ্রহ থাকিলে এত কম টাকা উঠিত না। এই সমস্ত পাইয়োনীয়ার কাগজের মন্তব্য।

—

গৃহহীন ও অতি দরিদ্রদের আশ্রয়স্থান

গৃহহীন ও অতিদরিদ্রদের জন্য রাত্রিযাপনের নিমিত্ত আশ্রয়স্থান-নির্ম্মাণের প্রস্তাব বোম্বাই মিউনিসিপালিটী বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতাতেও এইরূপ লোকদের সংখ্যা কম নয়। এখানেও এইরূপ আশ্রয়গৃহ নির্ম্মিত হওয়া উচিত।

—

প্রস্তাবিত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

মৈমনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রস্তাবিত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। দাতার বদান্যতা প্রশংসনীয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা দেশের উন্নতি হইবে কিনা, তাহা ইহার উদ্দেশ্য ও অধ্যাপকদের শিক্ষার উপর নির্ভর করিবে। ইহার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর নাম গোড়ায় দেখিতেছি। তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে উদ্যোক্তারা একটি অচলায়তন নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। এই অনুমান সত্য হইলে, তাহাতে দেশের কল্যাণ হইবে না।

—

শ্রমিক মন্ত্রীর ভারত-হিতৈষণা

বিলাতী শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী ফিলিপ স্নোডেন সাহেব বলিয়াছেন, ভারতের লোকদের জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা যদি মাথাপিছু ৬ শিলিং (অর্থাৎ বর্ত্তমান বিনিময়ের হারে চারিটাকা) বাড়ে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৎসরে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড (মোটামুটি ১১৪ কোটি টাকা) বাড়িবে। ইংরেজরা আমাদিগকে তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রী করিয়া এই ১১৪ কোটি টাকা ঘরে লইয়া যাইবেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্নোডেন সাহেব ভারতবর্ষকে টাকা ধার দিয়া ভারতবর্ষের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে বলিতেছেন। কৃষির উন্নতি প্রভৃতি দ্বারা ভারতের ধন বাড়ান হউক, এই ইচ্ছা। উদ্দেশ্য, তাহার "সিংহের অংশ" বিলাতী জিনিষ ক্রয়ে আমরা ব্যয় করি। ভারতের ধনবৃদ্ধিতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু বিলাতী জিনিষ আরও বেশী কিনিবার জন্য ধনাগমে কি শ্রীবৃদ্ধি হইবে, বুঝিতে পারা যায় না।

ভারতের বিদেশী ঋণ যত বাড়িবে, তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল ততই আরও দৃঢ় হইবে। দৃষ্টান্তদ্বারা এই মন্তব্যের সমর্থন আগে করিয়াছি। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির পক্ষে প্রবল জাতির কাছে ঋণী হওয়া বড় বিপদের কথা, ইহা বুঝিতেন বলিয়াই আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা খাঁ বিদেশে টাকা ধার করিয়া স্বদেশের কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিতে চান নাই, আফগানিস্থানের টাকাতেই তাহা ধীরে ধীরে করিতে চাহিয়াছিলেন।

—

ভারতবর্ষে গম ও চাল আমদানী

পুরাকালে এবং কোম্পানীর আমল পর্য্যন্তও ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্য এদেশের অভাব পূর্ণ করিয়া বিদেশে চালান হইত। ইংরেজ-রাজত্বে এদেশের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে, প্রধানতঃ বিলাত হইতে, আমদানী হয়। কিন্তু এখনও আমাদের এই একটা ধারণা ছিল, যে, ভারতবর্ষের লোকদের জন্য যত খাদ্যশস্য আবশ্যক, তাহা এদেশে উৎপন্ন হয়; দুর্ভিক্ষ হয় তাহা কিনিবার টাকা না থাকায়, এবং কতক অংশ বিদেশে রপ্তানী হয় বলিয়া। সে ধারণাও বদলাইতে হইবে দেখিতেছি। কেন না,

গত ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে ৫৫৮৩৯০ টন গম ও ১২৫৪২৬ টন চাল আমদানী হইয়াছিল। এক টন প্রায় সওয়া সাতাইশ মণ।

আগে আগে দেশের লোকদের জন্য খাদ্যশস্য যথেষ্ট অপেক্ষা বেশী হওয়ায় অতিরিক্ত শস্য বিদেশে চালান হইত। এখন আমরা খাদ্যশস্যও আমদানী করিতে আরম্ভ করিতেছি। অপরম্ বা কিং ভবিষ্যতি!

সমগ্র দেশে আগে যত জমীতে খাদ্যশস্যের চাষ হইত, তাহা কমিয়া গিয়া, তাহার কতক অংশে কাপাস, পাট, সরিষা, তিসি প্রভৃতির চাষ হইতেছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান অবিলম্বে হওয়া উচিত। যাহাতে শীঘ্র নগদ টাকা চাষীর হাতে আসে, এরূপ ফসলের চাষে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আগে যথেষ্ট খাদ্যের চাষ হওয়া চাই, তার পর অন্য কথা।

যদি অনুসন্ধানে দেখা যায়, খাদ্যের ফসল চাষের জমী কমে নাই, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে জমীর উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে? তাহারও প্রতিকার আবশ্যক এবং সম্ভবপর।

ভারতীয়েরা আগেকার চেয়ে বেশী পেট ভরিয়া খাইতে আরম্ভ করায় শস্যাভাব হইতেছে, এমন ত মনে হয় না। দেশের ধন ত সেরূপ বাড়ে নাই।

আর এক কারণ এই হইতে পারে, যে, বিদেশীরা যে পরিমাণ জমীতে যত শস্য উৎপাদন করে, আমরা তাহা পারি না, সেই জন্য তাহারা আমাদের চেয়ে শস্তায় শস্য বেচিতে পারে। তাহা হইলে আমাদিগকে কৃষির উন্নতি দ্বারা বিঘাপ্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

খাদ্যশস্য আমদানীর কারণ যাহাই হউক, তাহা উদ্বেগজনক। কিন্তু এই অমঙ্গল অপ্রতিবিধেয় নহে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়

গবর্মেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ বৎসরের জন্য বার্ষিক যত টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বৎসর কোন প্রকারে আয়ব্যয় সমান রাখিয়াছেন; কিন্তু তাহার পর বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিতেছেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, ছাত্রসংখ্যা ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমায় ছাত্রদের বেতন, পরীক্ষার ফী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক-বিক্রীর আয় কমিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্মেণ্টের বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত। কোন কোন দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে; তাহাও বিশ্ববিদ্যালয় করুন। কোন্ কোন দিকে ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে, তাহা আমরা আগে বলিয়াছি।

—

পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব শুনিতে পাইতেছি, তাহা আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর। বিদ্যার এক এক শাখায় এক এক জন কর্ত্তা নিয়োগের কথা হইতেছে; তাঁহারা বেতন পাইবেন মাসিক ১,০০০৲, তাহার উপর শাসন-কার্য্যের জন্য মাসিক ভাতা পাইবেন ২৫০৲ এবং তদুপরি বাড়ী-ভাড়াও পাইবেন। পড়াইবেন সপ্তাহে চারিঘণ্টা মাত্র। এখন যাঁহারা কর্ত্তা আছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নিয়মিত একঘণ্টাও পড়ান না। হাজার টাকা বেতন যথেষ্ট। এমন কিছু কঠিন ও বেশী শাসনের কাজ নাই যাহার জন্য মাসে ২৫০ টাকা অতিরিক্ত ভাতা ও তদুপরি বাড়ীভাড়া দিতে হইবে। এত টাকা অপব্যয় না করিয়া ঐ টাকায় সামান্য বেতনের শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি এবং গবেষক ছাত্রদের সংখ্যা ও ভাতা বাড়াইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের অধিকতর উপকার হইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা দেশকে অন্য কোন প্রদেশ হইতে শিক্ষক আমদানী করিতে হইত না। এখনও বাঙালীর দ্বারা সব কাজই হইতে পারে। কতক-গুলি বিভাগে তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট কর্ম্মহীন মোটা বেতনের ভিন্নপ্রদেশী লোক পুষিবার কোনই প্রয়োজন নাই। নিম্নতম স্তরে বাংলাকে সায়েস্তা রাখে খোট্টা পাহারাওয়ালা, উপর হইতে সায়েস্তা রাখে ইংরেজ, মাঝখানেও সায়েস্তা রাখিবার বন্দোবস্ত বাঙালীর সুবুদ্ধিতেই কয়েক বৎসর আগে আরম্ভ হইয়াছে!

বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত উচ্চ বেতনের কাজগুলিতে বাঙালী নিযুক্ত হইলেও এরূপ অনাবশ্যক ব্যয়ে আমাদের আপত্তি আছে।

—

অমৃতলাল বসু

৭৭ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন প্রাচীন ও প্রবীণ লোক হারাইল। তিনি দক্ষ অভিনেতা, প্রহসন ও কবিতা রচয়িতা, স্বদেশী যুগের বক্তা ও কর্ম্মী, বৃদ্ধ বয়সেও রসিক বক্তা, এবং বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য-সংগ্রাহক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কৃষ্ণ-বলরাম

মোগল পদ্ধতিতে অঙ্কিত রাজপুত চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩৬

৫ম সংখ্যা

ধ্যানী জাপান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোরিয়ায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল, যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। কথা ছিল সেখান থেকে রেলপথে রাশিয়ায় যাব। সেখানে জনসাধারণকে কি ভাবে ও কি পরিমাণে অশিক্ষা থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হয়েছে সেইটি জানবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমার আয়ু চার কুড়ি বছরের মধ্যঘাটে এসে পৌঁছেছে এ কথাটা যদিচ আমিও প্রায় ভুলি এবং অন্য যাদের গরজ তারাও মনে রাখতে চায় না তবু মহাকালের হিসাবরক্ষক সতর্ক আছেন। তাই বয়সের বোঝার উপর কর্ম্মের বোঝা বেড়ে উঠে ক্লান্তিতে আমাকে অভিভূত করে দিলে। জাপানের একজন বড় ডাক্তার এসে আমার দেহটাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে বাজিয়ে নিয়ে অন্তত দশদিনের জন্যে শয়নকক্ষে আমাকে আশ্রম কারাবাসের আদেশ করে দিলেন। সেই সঙ্গে আমার সমস্ত কর্ত্তব্যের নিমন্ত্রণ বাজেয়াপ্ত হল। আগামী শরৎকাল পর্য্যন্ত জাপানে আমার আতিথ্যের প্রস্তাব ও আয়োজন ছিল। প্রতিকূল স্বাস্থ্য বাধা দেওয়াতে দেশে ফেরবার পথে যাত্রার উদ্যোগ করলেম।

তখন আমি তোকিয়োতে একটি জাপানী সুহৃদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তাঁর কাগজের কারবার, তিনি ধনী। জাপানের সঙ্গে সর্ব্বদেশের হৃদ্যতার সম্বন্ধ ঘটে এই তাঁর ইচ্ছা। এই জন্য তিনি বিস্তর অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত নন। এ ছাড়া জনসাধারণকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি বাড়ির কাছে বিদ্যালয় স্থাপন করেচেন। এ কথা শুনে অনেকে বিস্মিত হবেন যে ধ্যানচর্চ্চাও তাঁর শিক্ষাব্যাপারের একটি অঙ্গ। ধ্যান অভ্যাসের জন্যে মস্ত একটি নিভৃত ঘর তিনি তৈরি করে রেখেছেন। একদা বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে ধ্যানের প্রচার হয়েছিল। দেবপূজার সঙ্গে এই ধ্যানের যোগ নেই; মনকে স্তব্ধ করা, অবহিত করা, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিশক্তিকে দৃঢ় করার পক্ষে ধ্যানের উপযোগিতা সেখানে সকলে স্বীকার করে। সাধারণত জীবনযাত্রায় নৈপুণ্য ও সৌষ্ঠবসাধনের জন্যে ধ্যান একটা প্রধান উপায় এ কথা জাপানের সাধারণ লোকেও বোঝে। সেখানে চা-পানের একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। তাকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলা যায় না, অথচ তার ক্রিয়াপদ্ধতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের মতোই একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ

গাম্ভীর্য্য দ্বারা পরিবৃত। চা প্রস্তুত ও চা-পানের সমস্ত প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহ মনের ধ্যানসিদ্ধ সংযমকে অস্খলিতভাবে প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য বলে আমার মনে হয়েছিল। গতবারে জাপানে থাকতে এক জায়গায় শরপ্রয়োগ অনুশীলনের সুযোগ দেখেছিলাম। ব্যাপারটা কেবলমাত্র হাতের কৌশল বা দৈহিক ব্যায়াম নয়, এটাকে তারা আধ্যাত্মিক সাধনা বলেই জানে। এটা শরচালনার যোগে ধ্যানেরই অভ্যাস—মনকে একাগ্র করবার চর্চ্চাই এর মূলে। কেবল দৃষ্টিশক্তি নয় ধ্যানশক্তিতেই আন্তরিক বাহ্যিক সকল প্রকার লক্ষ্য সিদ্ধি হয় ধনুর্বিদ্যা চর্চ্চায় এই তত্ত্বকেই তারা স্বীকার করে। দ্বিতীয় বারে যখন জাপানে যাই আমার সঙ্গে পিয়র্সন ছিলেন। জাপানের একজন ডাক্তার তাঁকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। আরোগ্যলাভের পক্ষে ধ্যানের শক্তি যে একটি প্রধান উপায় এই তাঁর মত; পিয়ার্সনকে তিনি তাঁর নিভৃত আশ্রমে ধ্যানের দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ কথা সকলেই জানেন, জাপানে একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে যে সম্প্রদায়ের লোক মুক্তি সাধনার জন্য ধ্যানের প্রতিই বিশেষ আস্থা রাখেন। আমি গতবারে সেই "জেন" (ধ্যান) সম্প্রদায়ের এক মঠে গিয়ে সেখানকার প্রধান সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। ধ্যানের দ্বারা আত্মশক্তি লাভ ও আত্মশক্তির দ্বারা মুক্তির বাধা দূর করা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে আমাদের ভারতীয় সাধনারই একটি বিশেষ তত্ত্ব অনুভব করলুম। সে বারে তোকিয়ো নারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আমাকে কারাইজাওয়া পাহাড়ের উপর নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গ্রীষ্মাবকাশের সময় একদল ছাত্রী প্রতিবৎসর কোনো একজন উপদেষ্টার কাছে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন। আমার কাছে শুনতে চাইলেন ধ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে। আমি তাঁদের অনুরোধ শুনে বিস্মিত হয়েছিলেম। তখনও আমি জানতাম না যে, ধ্যানের সাধনা সেখানে সকলেরই জানা। বস্তুত ক্রমশই বুঝতে পারলেম—জাপানের সমস্ত লোকের মধ্যেই গোচরে ও অগোচরে ধ্যানের প্রভাব কাজ করছে। এই জাতের সর্ব্বপ্রধান শক্তি যেটা দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে সংযম। তাদের দেহচালনার মধ্যে আশ্চর্য্য একটি ধৈর্য্য আছে, মনের মধ্যেও তাই। বহু শতাব্দীর অভ্যাসক্রমে এরা কোনো কাজই যেমন-তেমন করে করে না, একান্ত নিবিষ্ট হয়ে ও শোভনভাবে করে, দেখে কেবলি মনে হয় কাজের সমস্ত প্রণালীর মধ্যে আগাগোড়া এরা সমস্ত মনকে স্থাপিত করতে শিখেচে। এটাই হচ্ছে কর্ম্মের মধ্যে ধ্যান। একটি সাধারণ মেয়েকে খাবার সময় লক্ষ্য করে দেখেছি—পাত্র হাতে তুলে ধরা, গ্রাস মুখে তুলে নেওয়া সমস্তই সুবিহিত যত্নে ও সংযতভাবে করে,—আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে আহার ব্যাপারে যে অসংযম ও অশোভনতা আছে এ তার একেবারেই বিপরীত। এই মেয়েটিকেই পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাতে দেখলেম—সে যেন কার আরাধনা, তাতে কত নৈপুণ্য, কত নিষ্ঠা। যথারীতি ফুল সাজাবার বিদ্যা শিখতে এদের দু' তিন বৎসর লাগে। কোবেতে একজন শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, এত অভিনিবেশের সঙ্গে এই যে ফুল সাজানো তোমরা সম্পন্ন করো, এর সম্বন্ধে তোমাদের এত যে বেশী সতর্কতা এর অর্থটা কি? তিনি আমাকে বললেন, ইতিহাস-বিখ্যাত তাঁদের একজন যোদ্ধা এরূপ বলেছিলেন যে, এই ফুল সাজানোর অনুষ্ঠানে তাঁকে তাঁর যুদ্ধ ব্যাপারে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়। আমি বুঝলুম, এই যে অবিচলিত মনের ধ্যানের দ্বারা পুষ্পপাত্রে ফুলের প্রসাধন সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেই ধ্যানের একাগ্রতাই যুদ্ধ জয়ের প্রধান শক্তি। একদিন য়োকোহামায় একজন সুবিখ্যাত আধুনিক চিত্রকরের বাড়িতে গিয়ে দেখি তাঁর একটি ঘরের পাশে বেদীতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। শোনা গেল সেই বুদ্ধের সামনে বসে ধ্যান করে তবে ছবি আঁকেন। এমন নয় যে বুদ্ধেরই ছবি—কিন্তু ধ্যানের দ্বারা চিত্রকরের রচনাশক্তির জড়তা ঘোচে, চিত্তের উদ্যম সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্যানের সাধনা চীন ও চীন থেকে জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল চীনের চিত্রকলায় তারই প্রভাব যে কত প্রবল সে সম্বন্ধে Pilgrimage of Buddhism নামক গ্রন্থে যে আলোচনা হয়েচে—তার থেকে একটা অংশ আমি অনুবাদ করে দিই :—

চা'ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব চৈন চিত্রকরদের মনকে

যখন অধিকার করলে তখন তাঁরা ফোটোগ্রাফের মতো নকল করার দিকে গেলেন না। যে কোন ভূদৃশ্য বা মানুষ বা জন্তুর রূপ তাঁরা প্রকাশ করতে চেয়েচেন প্রথমে তার মর্ম্মটুকু অন্তরের মধ্যে শোষণ করে নিয়ে তার পরে ভিতরের দিক থেকে বাইরে সেটাকে প্রকাশ করতেন। যদি একটা ঝরণা আঁকবার ইচ্ছা করতেন তা'হলে প্রহরের পর প্রহর তার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন, হয়ত একটি নক্সা মাত্র করতেন না, তার পরে সেই দৃশ্যটির উপলব্ধি হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে ঘরে ফিরতেন, অবশেষে সেই উপলব্ধিটিকে তুলি দিয়ে প্রকাশ করতেন। ২৮৭ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন চৈন চিত্রকলা সব প্রথমে সকলের চেয়ে বড়ো প্রেরণা পেয়েচে বৌদ্ধধর্ম্মের কাছ থেকে। ফেনেলোসা বলেন, বিশেষ শাস্ত্রের এবং বিশেষ অনুশাসনের বন্ধন থেকে চীন বৌদ্ধ সম্প্রদায় মুক্তি ঘোষণা করলেন। তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন যে, বুদ্ধের প্রকৃতির দ্বারা বিশ্বের সমস্তই ওতপ্রোত,—

"It was these suggestions that led the greatest painters of the Tang and Sung into those mystical and masterly interpretations of life and landscape that mark the acme of Chinese and have given to Chinese (and Japanese) painting that peculiar inwardness which marks it off from all the art of the West." (২৮৮ পৃ:)

বিশ্বব্যাপী বুদ্ধের প্রকৃতিকে ধ্যানের দ্বারা অন্তরে আকর্ষণ করে নিয়ে চিত্রকর তবেই তাঁর চিত্রকে মহত্ব দিয়েছেন। বিশ্বের অন্তরগত সেই সত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে পারলে শুধু ছবি আঁকা কেন জীবনের সকল কার্য্যই বিশুদ্ধ ও সুসম্পূর্ণ হতে পারে এই বিশ্বাসটি একদা চীনে জাপানে কাজ করেচে, এবং স্পষ্ট দেখতে পাই জাপানে আজও তার প্রভাব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রচলিত আছে। আমাকে কৃষি-অনুরাগী একজন জাপানী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে,মৈত্রী পদার্থটি বিশ্বের মূলগত সত্য, তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে মাটিকে ভালবাসার সঙ্গে চাষ করলে তবেই মাটির কাছ থেকে পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যায়।— এর থেকে বোঝা যায় সত্যের সঙ্গে ধ্যানের যোগ শুধু কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়, আধিভৌতিক সাধনাতেও তার প্রধান স্থান আছে এই তত্ত্বটি জাপান যেন নানা আকারে গ্রহণ করেচে।

আমি জাপানে বক্তৃতা সভায়, ও মেয়েদের বিদ্যালয়ে অনেকবার অনেক জনতা দেখেছি, তাদের থিয়েটারে মেয়ে পুরুষ দর্শক সমাগমের মধ্যে বসেছি—তাদের ধৈর্য্য ও স্তব্ধতা দেখে বিস্ময় জন্মেছে। প্রথমবারে জাপানে যখন গিয়েছিলাম য়োকোহামার একটি বাগানবাড়িতে আমার বাসা ছিল। শনি রবিবারে ছুটি উপলক্ষ্যে সেই বাগানে বিস্তর লোক বেড়াতে আসত। আশ্চর্য্য সংযম। গোলমাল শুনতে পাইনি। দেখিনি যে কেউ ফুল ছিঁড়চে বা লেশমাত্র আবর্জ্জনায় বনপথ আকীর্ণ করচে, অচঞ্চল শান্তির সঙ্গে সকলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভোগে নিবিষ্ট কলহের কারণ ঘটতে অনেকবার দেখেচি কিন্তু কলহ ঘটতে দেখিনি। চীৎকার শব্দে কর্কশ ভাষায় কেউ কাউকে গালিগালাজ করচে এ একবারো আমার চোখে পড়ল না। অথচ জাপানের এই ধৈর্য্য এই শান্তি একেবারেই কাপুরুষের নয় এ কথা বলা বাহুল্য। স্বভাবকে বশে রেখে চাঞ্চল্যকে নিরোধ করে জাপান যে শক্তির বিকার বা খর্ব্বতা ঘটিয়েচে এ কথা বলা চলবে না।

ধ্যানের যুগ সংযমের সাধনা সমস্ত পৃথিবী থেকেই আজ তিরস্কৃত হচ্চে। অন্তর্গূঢ় শক্তি সঞ্চয়ের দ্বারা জীবনের যে পরিণতি ও কর্ম্মের যে উৎকর্ষ ঘটে তার উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস পর্য্যন্ত চলে যাচ্চে। উদ্দামভাবে চাঞ্চল্যপ্রকাশের জয়কীর্ত্তন জাপানকেও অধিকার ও অভিভূত করবে কি না একথা আমি সেখানে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি তাতে অনেকেই উত্তর দিয়েচে যে জাপানের বহুযুগব্যাপী চরিত্রসাধনাকে কোনো কিছুতে একেবারে পরাভূত করতে পারবে এ কখনোই সম্ভবপর নয়।

ধ্যানের শক্তি আলোচনা করবার উদ্দেশে এই প্রবন্ধ লিখতে বসি নি। কোরিয়া দেশের এক জন যুবকের সঙ্গে একদিন আমার কি কথা হয়েছিল সেইটি জানাবার জন্যে কলম ধরেছিলুম। সে কথা পরে হবে।

গুজরাটে গোপীচাঁদের গান

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী, এম-এ

ব্রহ্মপুত্রের তীর হইতে পাঞ্জাবের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদমূল হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যে গৌড়বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্রের গান প্রচলিত আছে, তাহা বঙ্গের সুধীসমাজে অবিদিত নাই। যেদিন বিদেশী পণ্ডিত স্যর জর্জ্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন রঙ্গপুর জেলা হইতে এই গানটির বাংলা সংস্করণ উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীদের সম্মুখে ধরিলেন তাহার বহুপরে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অনেকে বাংলার এই প্রাচীন গাথা বঙ্গদেশের সুদূর পল্লী হইতে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলোচনাও আরম্ভ হইল। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" ইহার কিছু আলোচনা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তাঁহার "গোবিন্দচন্দ্র গীত" প্রকাশ করেন এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় রঙ্গপুরে এই গাথার একটি সংস্করণ প্রাপ্ত হন; পরে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে এই গানের আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুদূর কাথিয়াওয়াড় প্রদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃপাবারি বর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া ও জনসাধারণের হৃদয়রস আকর্ষণ করিয়া এই গান এতদিন পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি গুজরাটের লোকসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত ঝভেরীচন্দ মেঘাণী মহাশয় তাঁহার "রটীয়ালী-রাত" (সুন্দর রজনী) নামক গুর্জ্জর দেশের লোক-গাথা সংগ্রহ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র গীতিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গুজরাটে গোপীচাঁদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মেঘাণী মহাশয় এতাবৎ তিনটি গান পাইয়াছেন; তন্মধ্যে একটি বড় ও সম্পূর্ণ এবং অপর দুইটি বড় গানটির অংশ-বিশেষের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। শ্রীযুক্ত মেঘাণী মহাশয় অপ্রকাশিত গানগুলি পাঠাইয়া দিয়া এবং অনেক সময় নিজের মতামত জানাইয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। দেশীয় এবং বিদেশীয় লোকসাহিত্যে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন শ্রীযুক্ত মেঘাণী মহাশয় গুজরাটের লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডারে রক্ষিত অপূর্ব্ব রত্নসমুচ্চয় প্রকাশিত করিয়া ভারতের সাহিত্যের এক নূতন ও অতিমনোহর অধ্যায় জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধুবাদের যোগ্য এবং সর্ব্বত্র অনুকরণীয়।

প্রচলিত গোপীচাঁদের গান হইতে ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করা অতীব দুষ্কর। সমগ্র ভারতে এই গাথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও গোপীচাঁদ ও তৎসম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কোনও খবর নাই। বাংলার গানে তবুও গোপীচাঁদের রাজধানীর এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদানের সম্বন্ধে (পরস্পর বিরোধী হইলেও) কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু গুজরাটি গানে সে-সব বিষয়ের আপদ-বালাই নাই—পিতামাতার নামটা না দিলে নয় সেজন্য যেন বাধ্য হইয়া একটা গানে গোপীচন্দ্রের পিতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। গুজরাটেও এপর্য্যন্ত কেহ এই-সব গান হইতে কোন তথ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। বাংলা গোপীচাঁদের গান হইতে যে-সব ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাতে বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজ একমত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ গোপীচাঁদ সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্য গ্রাম্য জনগণ মধ্যে রক্ষিত কাব্য; ইহার ঐতিহাসিকতার দিকে কেহ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে করে নাই—গল্প-হিসাবেই লোকে ইহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। গোপীচাঁদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে সঠিক কিছু আবিষ্কার করিতে হইলে বিভিন্ন প্রদেশের গানগুলি

লইয়া প্রথম আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট হইবে না। অন্যদিক দিয়া যতক্ষণ না অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন আলোকপাত হইতেছে, ততদিন আমাদের আলোচনা ব্যর্থই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু একথা ঠিক যে গোপীচাঁদের ঐতিহাসিকতা নির্দ্ধারণ গবেষণার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র। গোপীচাঁদের সহিত গোরক্ষনাথ, কানুপা প্রভৃতি নাথপন্থী সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মগুরুগণ জড়িত আছেন। ইঁহারা একদিকে শৈব যোগী সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া সম্মানিত, অন্যদিকে আবার প্রাচীন বাংলাদেশে ও তিব্বতে বৌদ্ধ মহাযানের গুরু বলিয়া পূজিত। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান এবং আধুনিক শৈব ও অন্যান্য ব্রহ্মণ্যানুমোদিত মতের অভ্যুত্থানের ইতিহাস কেহ জানে না। গোপীচাঁদের সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা তথ্য লাভ করিব। কোন্ প্রতিভাশালী গবেষক এই সমস্যার সমাধান করিয়া আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভিত্তির পরিচয় আমাদিগকে কবে দিতে পারিবেন জানি না; কিন্তু একথা ঠিক যে যিনি পারিবেন তিনি ভাগ্যবান পুরুষ।

এই প্রবন্ধে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের অবগতির জন্য বাংলা দেশের এক রাজপুত্রের সন্ন্যাস ও বিচিত্র জীবন সম্বন্ধে যে কাহিনী সমগ্র ভারতের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই কাহিনী গুজরাটের জনসমাজে কি ভাবে প্রচলিত আছে তাহার পরিচয় অল্প একটু দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

গৌড়বঙ্গের রাজা তিলকচন্দ্রের রাণী মীনলদের * বহু বৎসর ধরিয়া কোন সন্তানাদি না হওয়াতে রাণী বারো বৎসর ধরিয়া রত্নাকর দেবতার ব্রত পালন করিলেন। অবশেষে রত্নাকর প্রসন্ন হইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাণীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে পুত্র-বর ও একগাছি মূল্যবান হার দিলেন। নয়মাস পরে বঙ্গ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী গোপীচন্দ্রের জন্ম হইল। † রাজ্যের জ্যোতিষীদের ডাক পড়িল। সকলেই একবাক্যে বলিল যে, এই বালকের ষোল বৎসর বয়স হইলে সে এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

মহাযোগী জলন্দরনাথ একদিন ঘোর অরণ্যের মধ্যে ধ্যানে মগ্ন আছেন এমন সময় চারিজন চোর তাঁহার অজ্ঞাতসারে পায়ে নমস্কার করিয়া মানত করিল যে, যদি তাহাদের এ যাত্রা সফল হয় তাহা হইলে তাহারা জলন্দর মহাযোগীকে এক মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিবে। সেই রাত্রিতে রাণীর মহল হইতে উক্ত চারিজন চোর বহুদ্রব্যের সহিত রাণীর হারটি অপহরণ করিয়া আনিয়া ধ্যানমগ্ন জলন্দরের কণ্ঠে পরাইয়া দিল। প্রভাত হইতেই রাজ্যের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। রাজার সেনা বহু অনুসন্ধানের পর অরণ্যের মধ্যে ধ্যানমগ্ন নির্ব্বাক নিস্পন্দ জলন্দরের কণ্ঠে রাণীর হার দেখিতে পাইল। রাজার নিকট খবর গেল। রাজা আসিয়া জলন্দরকে কাপড় দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া কূপে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবামাত্র জলন্দর নাথের বন্ধন খুলিয়া গেল এবং জলন্দর কূয়ার মাঝখানে পদ্মাসন করিয়া যেমন ভাবে ধ্যানে বসিয়াছিলেন তেমন ভাবে বসিয়া রহিলেন। রাজা ভাবিলেন এ মহা যাদুকর। তখন নিজের লোকজনকে জলন্দরের উপর পাথর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। এত পাথর নিক্ষিপ্ত হইল যে কূয়া ভরিয়া যাইবার উপক্রম হইল তবু একটি পাথরও জলন্দরের গায়ে লাগিল না। অবশেষে রাজার আজ্ঞায় সকলে তাঁহার উপর গোবর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গোবর এবং পাথরে কূপ পূর্ণ হইয়া গেল, জলন্দর নাথও

* বাংলা: গানে দেখিতে পাই তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতী গোপীচন্দ্রের মাতা, এবং গোপীচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র।

"ব্রাহ্মণ যবন আর প্রজার বসতি
মাণিকচন্দ্র নামে রাজা তাহার নরপতি ॥
অতি জ্ঞানমন্ত রাজা ইন্দ্রের অধিক।
জ্ঞানে শীলে ছিল রাজা গন্ধের বণিক ॥
তাহার মহাদেবী হয় ময়নামতি রাই।
চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে তাহার মৃত্যু নাই ॥
স্বামীপরায়ণা তিনি অতিশয় সতী।
তিলকচন্দ্র নামে রাজার কন্যা ময়নামতি রাই
একরাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসরে ॥
(সুকুর মামুদ– ক, বি, হইতে প্রকাশিত গাথা)

† সুকুর মামুদের রচিত গান অনুসারে গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইবার পর মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু রঙ্গপুরের অন্যান্য গানে দেখা যায় মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্রের জন্ম হয়।

সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়িলেন (১)। এইবার জলন্দরের ধ্যান ভগ্ন হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া যোগী রাজাকে শাপ দিলেন "রাজা! তুমি বিনা অপরাধে আমাকে কষ্ট দিয়াছ, সে হেতু তোমার বংশনাশ হইবে এবং ছয়মাস পরে তোমার মৃত্যু হইবে।" বলা বাহুল্য জলন্দরের বাক্য ব্যর্থ হইল না—ছয়মাস পরে তিলকচন্দ্রের মৃত্যু হইল।

পিতার মৃত্যুর পর বঙ্গেশ্বর গোপীচন্দ্র একদিন প্রাসাদের ঝরোকার নীচে বসিয়া স্নান করিতেছেন, হঠাৎ টপ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল তাঁহার গায়ের উপর পড়িল। গোপীচন্দ্র অবাক হইলেন,—

"নথী বাদলী, নথী বীজলীরে কাঁই
নথী আষাড়ীনা মেগজি।
আরে জলধারা ক্যাথী আবীনে কাঁই ॥

(মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, আষাঢ় মাসের মেঘ নাই ; এই জলধারা কোথা হইতে আসিল।)

—ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা কাঁদিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাণী বলিলেন, "এই কাঞ্চনপ্রভ শরীর তোমার পিতারও ছিল। তাঁহার সেই শরীর আজ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তোমার এই সোনার দেহও একদিন চিতাভস্মে পরিণত হইবে।"

গোপীচাঁদ বলিলেন, "মা! কি করিলে এই শরীর চিরস্থায়ী হয়?" মীনলদে কহিলেন, "এই সহর হইতে অনতিদূরে এক কূয়ার মধ্যে তোমার পিতা জলন্দর নামক এক যোগীকে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, তিনি তোমাকে অমর করিয়া দিবেন।" এই বলিয়া মীনলদে গোপীচন্দ্রকে তিনটি ডাইলের পুঁটুলি দিয়া বলিলেন, "কূয়াটি এখন একটি গুহায় পরিণত হইয়াছে। তুমি সে গুহার দ্বারে একটির পর একটি পুঁটুলি রাখিয়া জলন্দরনাথকে ডাকিও; নতুবা তোমার নাম শুনিলে তিনি এত রাগিয়া যাইবেন যে তাঁহার কোপানলে তুমি ভস্ম হইয়া যাইবে।" গোপীচন্দ্র তাঁহার মাতার কথামত প্রথমতঃ গুহার দ্বারে একটি ডাইলের পুঁটুলি রাখিয়া জলন্দরনাথকে ডাকিলেন।

গুহার ভিতর হইতে জলন্দরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" বাহির হইতে গোপীচন্দ্র উত্তর দিল, "আমি তিলকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র।" জলন্দরনাথ ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে বলিলেন, "ভস্ম হও।" অমনি দ্বারস্থ সেই ডাইলের পুঁটুলিটি ভস্ম হইল। এই ভাবে গোপীচন্দ্র জলন্দরনাথকে তিনবার ডাকিলেন, তিনবারই ডাইলের পুঁটুলি ভস্মীভূত হইল। চতুর্থবার জলন্দরনাথ সদয় হইয়া গোপীচন্দ্রকে অমর হইবার বর দিলেন। গোপীচন্দ্র অমর হইয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না; জলন্দরনাথের শিষ্য হইবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। জলন্দরনাথ বলিলেন, "তুমি রাজার ছেলে; সোনার পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া থাক। তুমি কি সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত পালন করিতে পারিবে?" গোপীচাঁদ বলিলেন,—

"সেজ পলঙ্কে আগ লগাবু গুরুজী
সুখে করু বনডা কেরাঁ রাজজী"

(শয্যা ও পালঙ্কে আগুন দিয়া সুখে বনে রাজত্ব করিব।)

রাজা গোপীচন্দ্রের মুখ হইতে এই উত্তর শুনিয়া জলন্দরের আর কিছু বলিবার রহিল না—গোপীচন্দ্রকে নিজের শিষ্য করিয়া লইলেন।

এইবার গোপীচন্দ্রের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। জলন্দরনাথের স্নানের জন্য প্রত্যহ বারো ভার জলের দরকার; গোপীচন্দ্রের উপর এই কাজ অর্পিত হইল। নদীর ঘাটে গোপীচন্দ্রকে জল তুলিতে দেখিয়া রাজপ্রাসাদের বাঁদী দয়াপরবশ হইয়া রাজাকে জল তুলিতে সাহায্য করিল। ধ্যানযোগে জলন্দর সব জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকের

(১) বৌদ্ধ সিদ্ধা বালপাদ অনেকদিন যাবৎ জলন্ধরে বাস করেন। ইহাতে তাঁহার জালন্ধরী আখ্যা হয়। বাংলা গোপীচাঁদের গানে জলন্ধর, হাড়িপা সিদ্ধার উপাধি বিশেষ এবং অনেক সময় হাড়িপার পরিবর্ত্তে কেবল তাঁহার উপাধিই ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার হাড়িপা সিদ্ধাকে গোপীচন্দ্রের মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা দুর্লভ মল্লিক ও সুকুর মামুদের গাথায় দেখিতে পাওয়া যায়।—

"রাজার আদেশে সব বেলদার আইল।
ঘোড়ার পৈগরে এক খন্দক খুড়িল ॥
সেই খন্দকের মধ্যে হাড়িপাকে থুইয়া।
বাইশ মণ পাথর দিল বুকেতে চাপিয়া ॥"

(সুকুর মামুদ—ব, বি,)

কিন্তু এই গুজরাটী গাথা অনুসারে গোপীচন্দ্রের পিতা তিলকচন্দ্রই জলন্দরকে কূয়ার মধ্যে গোবর এবং পাথর চাপা দেন। এই উভয় প্রদেশের গাথাতে জলন্দরকে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই ঘটনার মূলে কোন সত্য অত্যাচার কাহিনী বিদ্যমান। গুজরাটী গানে জলন্দরের পরিবর্ত্তে হাড়িপার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুভ্রপূত জল ফেলিয়া দিলেন। আবার কঠোর পরীক্ষা। আজ নিজ রাজধানীতে গিয়া প্রজাদের দ্বার হইতে ভিক্ষা মাগিতে হইবে। রাজধানীর কর্ম্মচারিগণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া গোপীচন্দ্রকে প্রজাদের দ্বার হইতে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করাইতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু একস্থান হইতে আহৃত ভিক্ষা জলন্দরের মনঃপূত হইল না। এইবার শেষ এবং কঠোরতম পরীক্ষার সময় আসিল। যে রাজধানীতে একদিন তিনি শত শত ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ করিতেন—যেখানে বহু-মূল্য মণিমাণিক্যখচিত অঙ্গরাখা পরিয়া সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইতেন,সে রাজধানীতে আজ মুণ্ডিতশির গৈরিক-পরিহিত গোপীচন্দ্রকে নিজের প্রিয়তমা রাণী মেনাবতীকে * মাতৃসম্বোধন করিয়া ভিক্ষা মাগিতে হইবে। গোপীচন্দ্র প্রাসাদের অঙ্গনে উপস্থিত হইলে দাসী গিয়া রাণীকে খবর দিল। আলুলায়িতকেশা মেনাবতী অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়া যাহা সম্মুখে দেখিলেন, তাহাতে প্রত্যয় হইল না—অশান্ত হৃদয়কে কোনমতেই বুঝাইতে পারিলেন না যে, তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব গোপীচন্দ্র তাঁহারই নিকটে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত। অবশেষে আর সন্দেহ রহিল না। মেনাবতী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"ভুলো রে ভুলো রে রাজা! সত রে গোপীচন্দন
পীয়া! পরদেশে ন জতা এ জী।"

(সত্যই রাজা গোপীচন্দ্র আমাকে ভুলিলে! প্রিয়! বিদেশে আর যাইও না।)

কিন্তু রাণীর অশ্রুধারা গোপীচন্দ্রের পাষাণ হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতে পারিল না।

"এ রে সেজড়িয়ে মুজকে নিদরা ন আঁবে রে
মারে মনে রাজ ন ভাবে এ জী।"

(এই শয্যায় আমার নিদ্রা আসে না; আমি এ রাজ্য চাহি না।)

যে একদিন সুরম্য প্রাসাদে সহস্র দাসদাসী পরিবৃত থাকিত—যাহার চিত্তবিনোদনের জন্য বারোশত রাণী সতত ব্যস্ত থাকিত, আজ সে নিঃসঙ্গ, পথের ভিখারী। তাঁহার এই দুঃখ রাণী মেনাবতী ব্যতীত কে বুঝিবে?

"কোন কোন রাজা তোরী সঙ্গমে চলেগীনে
কোন রে করেগী দো দো বাত হোজী
কোন কোন রাজা তোরী চরণ পখালশে রে
কাঁরে জমশো দুধ নে ভাতা হোজী।"

(তোমার সঙ্গে কে যাইবে? কে তোমার সঙ্গে দুটো কথা কহিবে? তোমার চরণ কে ধুইয়া দিবে? কে তোমাকে দুধ ভাত খাওয়াইবে?)

গোপীচন্দ্র উত্তর দিলেন—

"ধুনী নে পানী মোরী সঙ্গমে চলেগীবে
রেন করেগী দো দো বাত হোজী
গঙ্গা নে জমুনা মারা চরণ পখালশে রে
ঘের ঘের জমশু দুধ নে ভাতা হো গি॥"

(ধুনী এবং জল আমার সঙ্গে যাইবে। রাত্রি আমার সঙ্গে দুটো কথা কহিবে। গঙ্গা এবং যমুনা আমার চরণ ধুইবে। ঘর ঘর দুধ ভাত খাইব।)

যখন গোপীচন্দ্র মাতৃসম্বোধন করিয়া রাণীর নিকট ভিক্ষা চাহিল, তখন মেনাবতী এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া রাজাকে চিরতরে নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বিদায় দিলেন। বারোশত রাণীর ক্রন্দনে সমগ্র প্রাসাদ মুখরিত হইল।

ইহার পর আর কি পরীক্ষা হইতে পারে? জলন্দরনাথ গোপীচন্দ্রকে নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া সুখে রাজত্ব করিতে আদেশ দিলেন। জলন্দরের এই আদেশে গোপীচন্দ্রের বহুদিনের সাধ আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। যখন নিজের মহিষীকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন তখনই মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে হইবে না—আর আজ কোন্ মুখে নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া যাইবেন! গোপীচন্দ্র জলন্দরনাথকে আজীবন সন্ন্যাসব্রত পালন করিবার বাসনা জানাইলে জলন্দরনাথ রাজমাতা মীনলদের অনুমতি ব্যতীত তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিতে অসম্মত হইলেন। গোপীচন্দ্র তাঁহাতেও রাজি হইলেন। অবশেষে জলন্দরনাথকে সঙ্গে করিয়া গোপীচন্দ্র রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। অপুত্রক গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বাংলার সিংহাসন শূন্য

---

* বাংলার সমস্ত গাথাগুলিতে অদুনা ও পদুনা নামে দুই প্রিয়তমা রাণীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। মেনাবতী নামে গোপীচন্দ্রের কোন মহিষী ছিল না। এই মেনাবতী বোধ হয় বাংলা গানের ময়নামতী শব্দের অশুদ্ধ রূপ। বাংলা গানের গোপীচন্দ্রের শ্বশুর যদি গুজরাটী গানে গোপীচাঁদের পিতা হইতে পারেন, তাহা হইলে মাতা ময়নামতীর নামে যে গুজরাটী গানে গোপীচাঁদের পত্নীর নামকরণ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

থাকিবে, তাই মীনলদে অনুমতি দিতে কোনমতেই রাজি হইলেন না। রাজমাতার দুই চোখ দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া করুণহৃদয় জলন্দরনাথ বলিলেন, "মা কাঁদিয়া লাভ কি! তোমার পুত্র-বধূ মেনাবতীর গর্ভে এক সন্তান হইবে এবং সে-ই ভবিষ্যতে গৌড়বঙ্গের রাজা হইবে। বারো বৎসর পরে আমরা আবার ফিরিয়া আসিয়া ছয়মাস তোমাদের সঙ্গে থাকিব। সে সময়ে কুমারকে রাজকার্য্য শিখাইয়া সিংহাসনে বসাইব।" অবশেষে মীনলদে অনুমতি দিয়া বলিলেন, "গোপীচন্দ্র! অন্য যে-কোন স্থানে ইচ্ছা হয় যাও তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ধারানগরে যাইও না। সেখানে তোমার সহোদরা আছে; যদি খবর পায় তাহা হইলে তাহার দুঃখের সীমা থাকিবে না।" গোপীচন্দ্র বলিলেন, "মা! অনেক দেশ দেখিয়াছি কিন্তু ধারানগর দেখি নাই। সম্প্রতি সেখানে যাইব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। ভগ্নীর রোদনেও যদি মন অবিচলিত থাকে তাহা হইলে বুঝিব আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সফল হইয়াছে।"

গুরুশিষ্য আসিয়া ধারানগরের রাজোদ্যানে এক গাছের ছায়ায় আশ্রয় লইলেন। ধারানগরে সেদিন উৎসব। রাজমহলের একজন দাসী নদীর ঘাটে স্নান করিয়া ফিরিবার সময় গোপীচন্দ্রকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। দাসী গিয়া খবর দিল--"রাণী মা! আমাদের বাগানে এক নূতন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তিনি আপনার ভাই।" রাণী অবাক হইলেন। বহুদিন-পূর্ব্বে গোপীচাঁদ যখন শিশু ছিলেন তখন তাহাকে দেখিয়াছেন; আজ কি তাহাকে চিনিতে পারিবেন? রাণী ভাইকে দেখিবার জন্য দাস-দাসী আত্মীয়স্বজনের সহিত পুরোদ্যানে চলিলেন—আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। গোপীচন্দ্রকে বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য কত করিয়া বলিলেন, তাহাতে কিছুই হইল না—নিজের রাজ্য পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন তবুও গোপীচন্দ্রের মন টলিল না। *

শেষে যখন কিছুতেই গোপীচন্দ্রের মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন গোপীচন্দ্রকে বারো বৎসর সেই উদ্যানে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। গোপীচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। বারো বৎসর পরে গোপীচন্দ্র এবং জলন্দরনাথ বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিলেন—মহাড়ম্বরের সহিত কুমারের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। ছয়মাস পর্য্যন্ত কুমারকে রাজকার্য্য শিখাইয়া গোপীচন্দ্র এবং জলন্দর গুজরাটের তীর্থ গিরণারে চলিয়া গেলেন।

এখনও গুজরাটের লোকদের বিশ্বাস গোপীচন্দ্র অমর হইয়া গিরণারে বাস করিতেছেন। গোপীচন্দ্র এখনও সশরীরে গিরণারে বিদ্যমান আছেন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকিলেও তাঁহার করুণ মূর্ত্তি গুজরাটের হৃদয়-পট হইতে যে মুছিয়া যায় নাই। তাহার প্রমাণ এখনও গুজরাটের বাউল নামক যোগী-সম্প্রদায় একতারা-সংযোগে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিষয়ক গান গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। যে গৌড়বঙ্গের রাজার নাম এখন বাংলা দেশে অল্প-সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি ও কোন কোন অঞ্চলের পল্লীবাসী ব্যতীত অপর কেহ বড়-একটা জানে না, সেই পুণ্যশ্লোক রাজার নাম ও চরিত্র কি করিয়া সুদূর গুজরাটবাসীদের কল্পনালোকে চিরতরে আসন স্থাপন করিয়াছে তাহা অতি বিস্ময়কর কথা। গোপীচন্দ্রের জীবনের করুণতম অংশটিই - তাঁহার বঙ্গের সিংহাসনকে উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের বিষয়টিই গুজরাটের—তথা ভারতের সমগ্র অঞ্চলের হৃদয়কে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। এখনও নবরাত্রির সময়ে জ্যোৎস্নাস্নাত অঙ্গনে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের এবং মেনাবতীর বিরহ-হৃদয়-উচ্ছ্বাসের "গরবা"* গান গাহিতে গাহিতে চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে, অঙ্গের চঞ্চল নৃত্যভঙ্গী মৃদুমন্দ ভাব ধারণ করে।

* এখানেই গোপীচাঁদের গান শেষ হইয়াছে। গল্পের অবশিষ্টাংশ শ্রীমতী লীলাবতী বংশে কৃত "গোপীচন্দ্র" নামক পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত হইল।

* গুজরাটের স্ত্রীলোকেরা এই গান গাহিয়া থাকে—বিশেষতঃ দুর্গাপূজার নবরাত্রির সময়। বহুরন্ধ্র বিশিষ্ট একটি মৃৎপাত্রের ভিতর একটি আলো রাখিয়া সেই পাত্রটি মাথায় করিয়া গুর্জ্জর-সুন্দরীরা হাতে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই গান গাহিতে থাকে। সম্ভবতঃ "গর্ভদীপ" হইতে "গরবা" শব্দের উৎপত্তি।

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দশম পরিচ্ছেদ

বরদা ঘোষের এক পিসতুতো ভগিনী, নাম হরিমতী, শ্রীক্ষেত্র হইতে তীর্থ করিয়া ফিরিয়াছেন। বরদাকান্তর অপেক্ষা বৎসর পাঁচেকের বড়, শশুরবাড়ী আর এক গ্রামে। কয়েক বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন, স্বামী সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারই তত্ত্বাবধান করিতেন। সন্তানাদি হয় নাই। তিনি বড়-একটা বরদাকান্তর বাড়ীতে আসিতেন না, তীর্থ হইতে ফিরিবার পথে বরদার বাড়ী পড়ে বলিয়া দুই-চারদিনের জন্য আসিয়াছিলেন।

হরিমতীর যেমন মনের জোর তেমনি মুখের জোর। তিনি যে মুখরা কি কলহপ্রিয়া তাহা নয়, তবে যেমন বুদ্ধি সেইরূপ সাহস, ভয় কি তাহা জানিতেন না। তাঁহার নিজের বাড়ীর লোকজন, কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বিলক্ষণ ভয় করিত, জগন্নাথের সেথো পাণ্ডারা পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিল। বরদাকান্তর বাড়ীতে তিনি আসিতে বাড়ী গম্ গম্ করিতে লাগিল।

নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ী আসিবার পথেই হরিমতী সব খবর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁ বউ, এ-সব কি কথা শুন্‌ছি?

হেমাঙ্গিনীর গলা ধরিয়া আসিল, কহিলেন,—কি আর বল্‌ব, ঠাকুরঝি? তুমি ত সব শুনেছ। মেয়েটার আইবুড়ো নাম ঘুচল কি না তাই বুঝ্‌তে পার্‌চি নে। কোথায় বিয়ে হ'ল, কে জামাই, কোন্ দেশে বাড়ী, কিছুই জানি নে।

—রোসো, কথাটা একটু বুঝে দেখি। যেখানে বিয়ের কথা হয়েছিল সে বিয়ে ভেঙে গেল কেন?

—বিয়ের দিন ছেলে জরে বাতে পঙ্গু, তাকে তুলে আন্‌বার জো ছিল না। জাত যাবার ভয়ে সেইদিন সন্ধেবেলা পুরুত-মশাই একখানা নৌকা থেকে একটি ছেলেকে তার পরিচয় জেনে নিয়ে এলেন। খাসা ছেলে, দিব্যি দেখ্‌তে, কথাবার্ত্তায় বেশ, সকলে বল্‌লে বেশ জামাই হয়েচে। বিয়ের পর দিন ভোরবেলা দেখি জামাই বাসরঘরে নেই, রাত্তিরে কখন উঠে চলে গিয়েচে। কত খোঁজ করা হয়েচে কিছু জান্‌তে পারা গেল না।

—ইন্দু কিছু টের পায় নি?

—না, সে ছেলেমানুষ, ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না।

—হুঁ। ইন্দু নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। একটা কথা আমার মনে নিচ্চে, তুমি ভেবে দেখেচ কি?

—ঠাকুরঝি, আমার কি ভাববার ক্ষমতা আছে?

—এক ছেলেকে ত বিয়ের নামে বাতে ধর্‌ল, আর যে বর হ'ল সে বিয়ের রাত্তিরে পালিয়ে নিরুদ্দেশ হল। কথাটা শুন্‌তে কেমন লাগে? লোকে বল্‌বে বাড়ীর কোনো দোষ আছে কিংবা আর কোনো গলদ আছে। বরদা ত কাঙাল দুঃখী নয় যে কেউ বল্‌বে বরকে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই।

—দান-সামগ্রী, মেয়ের গহনা, বরাভরণ ত ঘরে ঠেসা রয়েচে।

—তা ত জানি, তবে বর পালালো কেন?

—হয়ত বাপ-মায়ের ভয়ে।

—ও কোনো কাজের কথা নয়। বাপ-মা যেমনি হোক্, এমন বিয়েতে আহ্লাদ কর্‌বে না কেন? বিয়ে না হয় ওঠ ছোঁড়া তোর বিয়ের মত হ'ল, কিন্তু বিয়ের সময় বাপ-মা যা চায় তা ত সব পেয়েছে। আর অমন মেয়ে পেত কোথায়? অমন মেয়ে পেলে শুধু শাঁখা হাতে সেধে নিয়ে যায়।

—মেয়ে ত যেন শুকিয়ে যাচ্চে, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, যেন ওরি কত অপরাধ।

—না, না, তোমরা সবাই মেয়েকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌বে, যেন কিছু হয় নি। বাড়ীর লোকের রকম-সকম দেখে ও ভয় পেয়েছে। বরদা ভাল ক'রে খোঁজ করাচ্চে ত?

—হ্যাঁ, দু' একদিন লোক পাঠিয়েছিলেন। উনি ত রেগেই অস্থির। তুমি ত ওঁকে জান। ওঁকে কে বোঝাবে বল? এদিকে মেয়েটার মুখের দিকে ত তাকাতে হয়।

—বরদাকে কে বল্‌বে? আমি কিসের জন্য এসেছি? বরদার বড় এলেও আমি ডরাই নে।

—উনি এখনি খেতে আস্‌বেন। যা বল্‌বার খাবার পর বলো, খাবার সময় কোনো কথা হ'লে হয়ত রাগারাগি করে' উঠে যাবেন তার পর বাড়ী সুদ্ধু লোকের খাওয়া হবে না।

—তাই বল্‌ব।

আহারের পর আচমন করিয়া পান মুখে দিয়া বরদাকান্ত বাহিরে যাইতেছেন এমন সময় হরিমতী বলিলেন,—বরদা, একটু বস না, তোমাকে একটা কথা জিগগেস করব।

—আমি দাঁড়িয়ে আছি, কি বল্‌বে বল।

—ইন্দুর বিয়ের রাত্রে বর যে কাউকে কিছু না ব'লে চলে' গেল, তার কি কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না?

অমনি বরদার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হইল, কহিলেন,—খোঁজ ত অনেক করা হ'ল, কিন্তু কিছুই হ'ল না।

—কেন, বিয়ের মন্ত্র পড়াবার সময় কার ছেলে, কোথায় বাড়ী সব ত জানা গিয়ে থাক্‌বে।

—বদমায়েস লোক হ'লে নামধাম ভাঁড়াতে কতক্ষণ?

—কি করে' তুমি জান্‌লে বদমায়েস লোক?

—চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বল্‌ছিল।

—তাকে নৌকা থেকে নামিয়ে এনে মেয়ে পাত্রস্থ করে' তোমার জাত রক্ষে হ'ল। বিয়েতে সে রাজী না হ'লে কি হত? চ্যাটাং চ্যাটাং কি কথা? বিয়ে কর্‌বার আগে কি টাকার তোড়া চেয়েছিল?

—না, না, বিয়ের পরেই তার পরদিন মেয়েকে নিয়ে যাবার কথা বল্‌ছিল।

—বিয়ের পরদিন ত সব মেয়েই শ্বশুরবাড়ী যায়। আর তার সঙ্গে বরকর্ত্তা নেই, বরযাত্র কেউ নেই, সে ছাড়া আর কে বল্‌বে? তা সেই কথায় তুমি বুঝি রেগে উঠেছিলে? তোমার ত ঐ মুখ!

মুখের উপর সকলের সাক্ষাতে এমন কথা বলিতে এক হরিমতীই পারিতেন। বরদাকান্তকে রাগ চাপিতে হইল। হরিমতী কাহারও কথা শুনিবার লোক নন। বরদার রাগ সামলাইবার আর একটা কারণ ছিল। বামাচরণের কাছে কোম্পানীর লোকের সম্বন্ধে তিনি যে কথা শুনিয়াছিলেন সে-বিষয়ে আরও অনেক কথা কানাঘুষা হইতেছিল। বরদা কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কহিলেন—তাদের কেমন অবস্থা, বাড়ীঘর আছে কি নেই কিছুই জানি নে। মেয়ে পাঠাব কেমন করে'?

—হয়ত তুমি কিছু বলে থাক্‌বে, শাসিয়ে থাক্‌বে। তোমার ত কাণ্ডজ্ঞান নেই! মেয়েটার কপালে যা আছে হবে কিন্তু তুমি এটা বোঝো না যে তোমার মাথা কতখানি হেঁট হচ্চে, লোকে তোমার নামে কি বল্‌চে? বিয়ে দেবার সময় কি চোখে কানে দেখ্‌বার ফুরসৎ ছিল? যখন মেয়ে দিয়েচ তখন শ্বশুরবাড়ী মেটে, খড়ো, ছেঁচা হোগলার, যাই হোক সেই তার ঘর। তোমার কোঠা বাড়ী তোমার থাক্‌, তোমার মেয়ের তাতে কি? তার কি রকম পোড়ার হচ্চে ভেবে দেখেচ? এটা তোমার মনে হ'ল না যে যেখানে পাকা কথা হয়েছিল সেখানে ছেলের হঠাৎ বাত কেন হ'ল, তার পর যদি কোনোমতে বিয়ে হ'ল ত বর বিয়ের রাত্রেই উঠে গেল। আমি ত মেয়েমানুষ, দেখ আমি বরকে খুঁজে বা'র করতে পারি কি না। একবার রাধানাথ ঠাকুরের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমি নিজের সব লোক লাগাব। একটা মানুষ ত আর ছুঁচটি নয় যে হাত থেকে পড়ে' গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—আচ্ছা, তাই করো, বলিয়া বরদা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাধানাথ ঠাকুরের ডাক পড়িল। সে যখন আসিল

তখন হরিমতী হেমাঙ্গিনীর ঘরে বসিয়া। সেখানে আর কেহ ছিল না। রাধানাথ ঘরে ঢুকিতে হরিমতী গলবস্ত্র হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কথা কহিবার সময় তিনি কাহারও খাতির রাখিতেন না। শুধু হক্ কথা বলিতেন না, মানুষের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিতেন। অপরের ত কথাই নাই। খোদ বরদাকান্ত তাহার কাছে নিস্তার পান নাই, সত্য কথা বলিতে হইয়াছিল। হরিমতী ঘোরপ্যাচ করিতেন না, সোজা কথা বলাই তাঁহার কৌশল। বলিলেন,—রাধানাথ ঠাকুর, তোমাকে কেন ডাকিয়ে পাঠিয়েছি বুঝ্‌তে পেরেচ ত?

– কতক কতক বুঝ্‌তে পেরেচি বই কি।

—তোমাদের কি আক্কেল দেখ দেখি! বউ ভাল মানুষ, সে আড়ষ্ট হ'য়ে রয়েচে। মেয়েটা ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে যেন তারি সব অপরাধ। বাড়ীর লোক, দেশের লোক যা মুখে আসচে তাই বল্‌চে। জামাই কোথা গেল এতদিনে তা টের পাওয়া গেল না?

—কই আর গেল?

—সব ন্যাকা কিনা! আবার বউকে তুমি ভরসা দিয়েচ যে, জামাই কোথা আছে শীগ্‌গির জেনে বল্‌বে।

—তা ত বলেচি।

—জানতে কদিন লাগে? বউকে যে যা বোঝায় তাই বোঝে, ভয়ে কাউকে কিছু বল্‌তে পারে না। আমি বাড়ীতে পা দিয়েই কেমন ক'রে সব বুঝেছি? তুমি বউকে মিথ্যে কথা বলে' ভুলিয়ে রেখেচ।

রাধানাথ ঠাকুর দেখিল এ বড় শক্ত ঘানি। আম্‌তা আম্‌তা করিতে আরম্ভ করিল। বলিল,— মিথ্যে কেন বল্‌তে যাব?

—মিথ্যে কথা নয়? বাড়ীর জামাই যেমন করেই হোক্ গাছ থেকে পড়ে হয় না। নৌকা থেকে তাকে নামিয়ে তার পরিচয় নিয়ে তুমি তাকে নিয়ে এসেছিলে। বিয়ের সময় বসে তুমি মন্তর পড়িয়েচ, কার বেটা, কোথায় বাড়ী, তুমি জান না?

—তা জানি বৈ কি।

—তবে খুঁজে বা'র কর্‌তে কতক্ষণ লাগে? ভেতরের কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পেরেচি। বরদার যেমন চোয়াড়ে বুদ্ধি, কোথায় জামাই জাত রক্ষে কর্‌লে বলে' তার বেশী আদর সম্ভ্রম হবে না বিয়ের রাত্রেই জামাইকে শুনিয়ে শক্ত কথা বলেচে, হয় ত অপমানের ভয় দেখিয়েচে, তাই জামাই রেগে চলে গিয়েচে।

রাধানাথ চুপি চুপি বলিল,—একটু আস্তে বলুন, কে জানে আড়াল থেকে যদি কেউ শোনে!

—তাও ত বটে, বলিয়াই, সোঁৎ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াই হরিমতী দেখেন কে কোথায় সম্পর্কে কি হয় দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছে। হরিমতী তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, —তোমার ভাসুরের ঘরে আড়ি পাত্‌তে এসেচ?

হেমাঙ্গিনী মুখ বাড়াইয়া বলিলেন,—ঠাকুরঝি, কর কি, কর কি, ছেড়ে দাও!

—এবার ছেড়ে দিলুম কিন্তু আবার দেখতে পেলে দেয়ালে ঠুকে মাথা ভেঙে দেব।

ঘরে ফিরিয়া হরিমতী দরজা বন্ধ করিলেন। বাগানের দিকে জানালা খোলা ছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিলে কাহারও শুনিবার সম্ভাবনা ছিল না। রাধানাথ ঠাকুর নীচু গলায় বলিল,—বাবু কিছু বলেছিলেন? এ কথা আপনি কোত্থেকে শুন্‌লেন?

—কেন, তোমাদের বাবুর মুখ থেকে। তোমরা বরদা ঘোষকে বাঘের মতন ভয় কর, আমার কোষ্ঠীতে ভয়ডর লেখেনি।

—তা আপনি যখন আসল কথা টের পেয়েচেন তখন সব কথা খুলে বলাই ভাল, কিন্তু বাবুর কানে কোনো কথা যেন না উঠে।

রাধানাথ সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বলিল। শেষে বলিল, – অপমানের ভয়ে জামাইকে আমি রাতারাতি বা'র ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দি, তা না হলে সকাল বেলা একটা কাণ্ড হত। জামাইও রাগী মানুষ আর গায়ে বিলক্ষণ শক্তি আছে। আমি ভাব্‌ছিলুম কিছু দিনে দুই দিকে রাগ পড়ে যাবে তখন জামাইকে বুঝিয়ে তার বাপ মাকে বলে' তাকে নিয়ে এলেই হবে।

—তোমার কি মনে হয় জামাই গরীব দুঃখীর ছেলে?

—না, বেশ অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। মেয়ে বেশ ভাল ঘরে পড়েছে।

—উলুবেড়ে ত আর ছ মাসের পথ নয়; এতদিন খবর নিয়ে এস নি কেন?

—পাছে বাবু রাগ করেন আর জামাইয়েরও মেজাজ কড়া। যদি বাপ-মাকে অপমানের কথা বলে' থাকে, যদি মুখের উপর বলে' বসে এ মেয়ে নেবে না, অন্য বিয়ে করবে!

হরিমতী হাত নাড়িয়া বলিলেন,—রাখ তোমার কথা! নেবে না, না পাবে না! তুমি কি মেয়ে দেখ নি?

—মেয়ের ত কথা হচ্ছে না, মেয়ের বাপের কথা।

—আচ্ছা, তুমি এইবার গিয়ে জেনে এস। ক'দিনে ফির্‌বে?

—দিন-চারেক লাগ্‌বে।

—বেশ, আমি সে ক'দিন এইখানে থাকব, তুমি ফিরে এসে সব কথা আমাকে বল্‌বে। জামাইকে বেশ করে' বোঝাবে মেয়েটার কি অপরাধ? বাপকে বলো যে ছেলের খুব ভালো বিয়ে হয়েচে, দেনা-পাওনা কি রকম দেখে নিলেই হবে।

রাধানাথ চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—ঠাকুরঝি, এখন আমার ধড়ে প্রাণ এল।

—তুমি বুঝি ভেবেছিলে জামাই নিরুদ্দেশ হয়ে নাগা সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়েছে। বাড়ী-সুদ্ধ লোক তোমরা ভয়েই আড়ষ্ট সেই জন্য এতদিন কিছু হয় নি। রোসো, এইবার আমি একবার মেয়েটাকে দেখ্‌তে যাই। তোমার আস্‌তে হবে না।

ইন্দুলেখা একটি ছোট ঘরে বসিয়াছিল, সুরমা তাহার পাশে। হরিমতী আসিয়া বলিলেন,—কি লো সুরি, বাসর-ঘর থেকে তোর বর পালাবে না ত? গাঁটছড়া ছেড়ে তার কোঁচার কাপড় ধরিস্।

সুরমা উঠিয়া দিল ছুট্। পিসীমার মুখের কাছে কে দাঁড়াইবে? হরিমতী বলিলেন,—হ্যাঁলা ইন্দু, তোর আবার এ সব কি বেআকার শুনচি! ভাল করে' খাস্-দাস্ নে, কোনের মধ্যে লুকিয়ে থাকিস্, তোর আবার কি হয়েচে?

ইন্দুলেখা স্থিরচক্ষে পিসী-মার দিকে চাহিয়া কহিল—আমার আবার কি হবে, পিসী-মা? কিছুই হয় নি।

হরিমতী ইন্দুলেখার পাশে বসিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে টানিয়া লইলেন। কানে কানে কহিলেন—আমি সব কথা জানি।

ইন্দু কোনো কথা কহিল না, পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিসীমা আবার কানে কানে বলিলেন, রাধানাথ ঠাকুর আমায় সব বলেচে, বরদা কি বলেছিল তাও জানি।

পিসীমার মুখের দিকে ইন্দুলেখা আর চাহিতে পারিল না। তাহার চক্ষু নত হইল, মুখের লাল আভা কপাল হইতে চিবুক পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠ, স্কন্ধ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ রক্তিম হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গের শোণিত যেন মুখে আসিয়া মিশিল। ইন্দুলেখা পিসীমাকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল। সে পিসিমার বড় আদুরে মেয়ে।

কিছুক্ষণ হরিমতীও কোনো কথা কহিলেন না, ইন্দু-লেখার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর ইন্দুলেখার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, বলিলেন,—মুখ না দেখতে পেলে আমি কথা কইতে পারি নে।

হরিমতীর যে-রকম দৃষ্টি তিনি ইন্দুলেখার মুখ দেখিয়াই সকল কথা বুঝিতে পারিতেন। ইন্দুলেখার মুখে লালিমার জোয়ার-ভাঁটার লীলা। হরিমতী যখন তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন তখন সে রক্তিম রাগ তিরোহিত হইয়া তাহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হরিমতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাধানাথ ঠাকুর যখন বরকে ডেকে নিয়ে গেল সে সময় তুই জেগে ছিলি?

ইন্দুলেখা কোনো কথা কহিল না, চোখ নীচু করিল। মাথা হেঁট করিবার উপায় নাই, হরিমতী তাহার মাথা ধরিয়াছিলেন।

—রাধানাথ ঠাকুর তোকে বল্‌তে বারণ করেছিল সেইজন্যে তুই কাউকে কিছু বলিস্ নি?

ইন্দুলেখার মুখে কথা নাই।

—আচ্ছা, যাবার আগে জামাই তোকে কিছু বলে গিয়েছিল?

এবার ইন্দুলেখা জোর করিয়া আবার মুখ লুকাইল। হরিমতী কহিলেন,—থাক্, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

তাহার পর হরিমতী ইন্দুলেখাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার কথা শুনিলে কে বলিত যে তিনি কঠিনপ্রকৃতি স্ত্রীলোক? তাঁহার কাছে যে সোনার কাঠি রূপার কাঠি আছে কে জানিত? তাহার সেই সোনার কাঠি তিনি ইন্দুলেখার অঙ্গে বুলাইয়া দিলেন, তাহার সব বালাই দূর হইয়া গেল। হরিমতী যখন ঘরের বাহিরে আসিলেন ইন্দুলেখা হাসিমুখে তাঁহার সঙ্গে আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজকাল হরেরামের চলাফেরা একটু বাড়িয়াছে। লাঠি ধরিয়া সে কখন কখনও অমরনাথের বাড়ী যায়, ব্রজনাথের চিঠি আসিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করে। অগ্রহায়ণ মাসেই ব্রজনাথ চলিয়া গিয়াছিল, এখন মাঘমাস পড়িয়াছে। হরেরামকে দেখিয়া অমরনাথ খুসী হইতেন। একদিন সকাল বেলা হরেরাম একখানি ছেঁড়া দোলাই গায় দিয়া আসিয়া উপস্থিত। বুড়া মানুষ, শীত ধরিয়াছে। অমরনাথ শাল গায় দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; বলিলেন,—বস।

হরেরাম পৈঠার উপর বসিল। অমরনাথ দেখিলেন, হরেরামের অঙ্গবস্ত্র অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে, বৃদ্ধ শীতে কাতর হইয়াছে। অমরনাথ বলিলেন,—বড় শীত, না?

হরেরাম ফোক্‌লা দাঁত বাহির করিয়া কহিল,—বড়বাবু, মাঘের শীতে বাঘে ডরায়, তাতে আমার আবার বুড়ো বয়েস।

অমরনাথ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওরে, এবার মুর্শিদাবাদ থেকে ক'খানা বালাপোষ এয়েচে। একখানা বড় দেখে আর ভাল দেখে নিয়ে আয় ত। আর সেই সঙ্গে এক সরা নতুন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আয়।

চাকর একখানা নূতন প্রমাণ বালাপোষ আর সন্দেশ লইয়া আসিল। অমরনাথ নিজে হাতে করিয়া হরেরামকে দিলেন। সে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বালাপোষখানা দোলাইয়ের উপর গায় দিল। সন্দেশের সরা বাঁ হাতে লইল। কহিল,—আমি আর কি বল্‌ব? আপনাদের দয়ার সীমে নেই।

—থাক্ থাক্ ও সব কথা। ব্রজনাথের চিঠি এসেচে। তাদের কারুর কোনো অসুখ করে নি। আর নায়েব গোমস্তার চিঠিতে বড় জবর খবর আছে।

—আমি কি শুন্‌তে পাই নে?

—তোমাকেই ত আগে বল্‌চি, এখনো আর কাউকে বলা হয়নি। তারা লিখেছে ছোটবাবু সেখানে গিয়ে নতুন কারবার ফেঁদেচে আর না কি হুড়্‌হুড়্ ক'রে টাকা আস্‌চে।

হরেরাম মাথার উপর লাঠি ঘুরাইয়া পৈঠার উপর দিল এক ঘা। আগেকার মত হাঁক দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা হইতে বাহির হইল কাঁপা ভাঙা আওয়াজ। কহিল,—ছোটবাবুর আস্‌বে না ত কা'র আস্‌বে? আমি ত সেই এতটুকু বেলা থেকে দেখ্‌চি ছোটবাবুকে যাতে লাগাও তাতেই সে সেরা। লাঠিখেলা, তলওয়ারে অমন জোয়ান আমি দেখিনি।

অমরনাথ হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন,—লাঠি তলওয়ার খেল্‌তে শিখ্‌লে কি টাকা রোজগার করা যায় না কি? ডাকাতী ক'রে হয় বটে, কিন্তু সেজন্যে দল বাঁধতে হয়, এক হাতে হয় না।

হরেরাম অপ্রতিভ হইল, কহিল,—আমি বল্‌ছিলেম ছোটবাবু চৌকস্, সব দিকে সমান।

—তা হবে। ফিরে এলেই তার বিয়ে দেব। ঘটক-ঘটকী লাগিয়েচি।

—ছোটবাবুর বিয়ের ত বয়স হয়েচে, বলিয়া হরেরাম কেমন অন্যমনস্ক হইল। একটু পরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ব্রজনাথের যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে সে কথা ত হরেরাম কাহাকেও বলিতে পারে না, ব্রজনাথের বারণ ছিল। কিন্তু যে সন্ধান লইবার ভার ব্রজনাথ হরেরামকে দিয়া গিয়াছিল তাহা ত এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা হয় নাই। তাহাই মনে করিয়া হরেরামের মনে একটু খটকা লাগিল। সে ত ব্রজনাথকে আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু যাহাদিগকে এ কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিল তাহারা একে একে ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। ঘরে ফিরিবার পথে হরেরাম

ভাবিতে লাগিল পরের ভরসায় ছোটবাবুকে আশ্বাস দিয়া ভাল কাজ করে নাই। না দিয়াই বা কি করিত; সাধ্য-সাধন হউক আর অসাধ্যসাধন হউক ব্রজনাথের কোনো কর্ম্ম অস্বীকার করা হরেরামকে দিয়া হইয়া উঠিত না, কেন না সে ব্রজনাথকে বড় ভালবাসিত আর তাহার বড় অনুগত ছিল। ক্ষুণ্ণমনে হরেরাম বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দেখে শিবু মাঝি হন্ হন্ করিয়া সেই পথে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া হরেরাম দাঁড়াইল।

শিবু মাঝি বলিল—এই যে সর্দ্দার, আমি তোমার কাছেই এসেচি।

—যা বলেছিলাম তার কি হ'ল?

—তাই ত বল্‌তে এসেচি।

হরেরামের গায়ের বালাপোষ শিবু ঠাহর করিয়া দেখিতেছিল। বালাপোষ হইতে আতরের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করিয়া বাহির হইতেছিল। শিবু মাঝি বলিল,—বালাপোষ বুঝি বাবুরা দিয়েচে?

—আর কে দেবে?

—তা হ'লে তোমার কাছে খবর পেলে তোমাকে শালের জোড়া দেবে।

—খবর এনেছ না কি?

—তা না হ'লে কি কর্‌তে এসেচি?

—তবে বল্‌বে এস।

হরেরাম দরজা খুলিয়া শিবুকে বসিতে বলিল। তাহার হাতে চারিটা সন্দেশ দিয়া বলিল,—একটু মিষ্টি মুখ করে' বসো।

সন্দেশ হাতে করিয়া শিবু মাঝির রসিকতা যোগাইল। বলিল—পেটে পিঠে দুই হয়েচে।

—তোমারও হবে। এখন কি বল্‌তে এসেচ বল।

সন্দেশ খাইয়া শিবু মাঝি এক ঘটি জল পান করিল। তাহার পর মুখ মুছিয়া বলিল,—তুমি যে খোঁজ কর্‌তে বলেছিলে বাবুটির নাম কি তাদ বলেছিলে?

—বরদা ঘোষ।

—ও নামে কোনো বাবুভেইয়ার পাত্তা পাইনি, কিন্তু আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি তুমি যার কথা জিগ্‌গেস করেছিলে সে ভোলাবাবু।

—অ্যাঁ বল কি হে? ভোলাবাবুকে আমি দেখিনি কিন্তু নাম ত শুনেছি। তাঁর ত দিনে জমিদারী রাত্তিরে অন্য ব্যবসা।

—তবে ত তুমি জান। আমরা ত তার ডাকনামই জানি, ভাল নাম বরদা ঘোষ হবে। ভোলাবাবু কায়স্থ বটে। আমি তেনাকে দেখে এসেচি।

—কেমন দেখ্‌লে?

—যেমন তুমি বলেছিলে। খুব ষণ্ডা গুঁফো মিন্সে, বয়স বছর সাঁইত্রিশ হবে।

—কথাটা মনে লাগ্‌চে বটে। কোথায় দেখ্‌লে? সোমড়ায়?

—হাঁ। আমি যেন মাল বোঝাইয়ের জন্যে নৌকা নিয়ে যাচ্ছি, সোমড়ার কাছে দেখি একখানা ছিপ তীরের মত এসে ঘাটে লাগ্‌ল। ছিপ থেকে নাম্‌ল ঐ বাবু। দেখেই তোমার কথা আমার মনে পড়ে গেল। ঘাটের পাশে আমি নৌকা বাঁধলুম। ভোলাবাবু ত নেমেই চলে গেল। ছিপের দু' একজন লোক চেনা ছিল তাদের বল্‌লুম, আজ রাতটা এখানে থেকে কাল আউশ ধানের বোঝাই আন্‌তে যাব। একজন এসে আমাদের নৌকায় এদিক ওদিক গপ্প করতে লাগল। খানিক পরে বলে,—যাই, একবার বাবুদের বাড়ী যাই। আমি বল্‌লুম, ভায়া, চল না, তোমাদের বাবুর বাড়ী দেখে আসি। এই কথা যেই বলা আর অম্‌নি তার চোখ কপালে উঠল। গলা খাটো করে' কে কোথায় আছে দেখে আমায় বলে, আমাদের বাবুর নাম জান? আমি যেন ন্যাকা, বল্‌লুম, কই, না। সে আমার কানে মুখ দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে, ভোলাবাবু। তারপর আমায় এমন করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল যেন আমার দাঁতকপাটী লাগ্‌বে কি ভিরমি যাব। আমি মাথা চুল্‌কে বল্‌লুম, নাম শুনেছি বই কি, ভোলাবাবুর মস্ত বিষয়-আশয়, দানধ্যান, দয়ামায়া, এই সব শুনেছি। সে ত ফ্যাল্‌ফ্যালমুখো হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পর আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না। বলে, ঠিক কথা, খবর তোমার পাকা। চল, বাবুর কাছে কিছু দান চেয়ে নেবে। আমি কাচু-মাচু হয়ে বল্‌লুম, সত্যি কি আমি বাবুর সামনে

যাব, এত বড় কিসের আমার বুকের পাটা! তা সে বল্লে, তবে চল, বাবুর সাক্ষাতে পড়লে তোমাকে আর ফিরতে হবে না। যাবার সময় দেখ্‌লুম বনের ভিতর দিয়ে পথ বটে। বেশী দূর নয়, মস্ত চকমেলানো বাড়ী। পথে সে লোকটা চুপি চুপি অনেক কথা বল্লে আর শাসালে আর কেউ টের পেলে তার আর আমার দুজনেরই মাথা যাবে। দান? আছে বই কি, কোঁৎকাদান পেট পূরে। বল্লে ভোলাবাবুর নামে বাঘ ছাগলে এক ঘাটে জল খায়। বাস্ রে! বাড়ীর লোকে বাবুকে যা ভয় করে তার কাছে যম যেন গোবেচারা। আর এক অবাক্ কথা শুনে এসেচি।

—কি?

—ভোলাবাবুর এক ডাগর মেয়ে, খুব সুন্দরী, তার এক জায়গায় বিয়ের পাকাপাকি কথা হ'ল, গায় হলুদ হল, বিয়ের দিন বর বরযাত্তরের দেখা নেই। মেয়ের, মেয়ের বাপের জাত যায় দেখে পুরুত একটা চল্‌তি নৌকা থেকে একটি ছেলে এনে মেয়ের বিয়ে দিলে। বিয়ে ত হ'ল কিন্তু সেই রাত্রেই বর চম্পট দিলে, কোথায় যে উধাও হয়ে গেল কেউ জানে না।

—ভোলাবাবুর কাণ্ড বুঝি?

—আর নয় ত কি! বিয়ের পরেই বরকে না কি শাসিয়েছিল, তার পরদিন অপমান করবে বলেছিল।

হরেরাম আহ্লাদ গোপন করিতে পারিতেছিল না। তাহার আহ্লাদ দেখিলে ধূর্ত্ত শিবু মাঝি কিছু সন্দেহ করিতে পারে মনে করিয়া হরেরাম দশটি টাকা বাহির করিয়া শিবুর হাতে দিয়া বলিল, তুমি এখন যাও, আমি নাওয়া-খাওয়ার উজ্জুগ করি।

শিবু মাঝি টাকা হাতে করিয়া কহিল,—তোমার কাছে যে টাকার আণ্ডিল!

—আমার কাছে কিছুই নেই, বাবুদের টাকা। বাবুরা এ খবর পেলে হয় ত তোমাকে আরও কিছু দেবে।

শিবু মাঝি বিদায় হইল। একটা ভার ত হরেরামের স্কন্ধ হইতে নামিয়া গেল, ছোটবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে লজ্জা পাইতে হইবে না। কোথায় ব্রজনাথের বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই হরেরাম খালাস, তাহার পর বোঝাপড়া বাপ বেটায় আর মায়েপোয়ে, কিন্তু হরেরামের মনে সে ভাব হইল না। বাপবেটায় মনান্তর হইলে হরেরাম বেটার পক্ষে হইত, বাপের নয়, তা বাপের যতই টাকা থাকুক। বিবাহের কথা প্রকাশ হইলে কি হইবে হরেরাম ভাবিতে লাগিল। ভোলাবাবু ডাকাতের সর্দ্দার বটে, কিন্তু এমন আরও অনেকে ছিল যাহারা জমিদারী ও ডাকাতী দুই করিত। তাহাতে কেহ একঘরে হইত না, কাহারও জাতি যাইত না, ছেলেমেয়ের বিবাহ বন্ধ হইত না। ব্রাহ্মণ জমিদার পর্য্যন্ত ডাকাতের দলপতি হইত। কোম্পানীর লোক পিছনে লাগিয়াছিল বলিয়া কিছু মুস্কিল হইয়াছিল, দুই চারিজন গণ্যমান্য লোক ধরাও পড়িয়াছিল। ডাকাতী করা ত তেমন দোষের ছিল না, ধরা পড়িয়া শ্রীঘরে যাওয়াই বড় লজ্জার কথা। কয়েক বৎসর হইতে ডাকাতী অনেক কমিয়া আসিয়াছিল, হয়ত ভোলাবাবুও অনেক দিন ওপাট বন্ধ করিয়া থাকিবে, কিন্তু ভেলার কালির দাগ ত ধুইলেও ওঠে না, একবার চোরনাম হইলে সাধু সাজা বড় কঠিন হয়।

হরেরাম অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। ব্রজনাথ না ফিরিলে তাহাকে এ-সংবাদ দেওয়া যায় না, ব্রজনাথ সে কথা বলিয়াও যায় নাই। হরেরাম লিখিতে জানিলে হয়ত চিঠি লিখিত, কিন্তু ও সকল কথা ত আর কাহাকেও দিয়া লিখানো হয় না; সুতরাং হরেরাম ব্রজনাথের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অমরনাথের বাড়ী আসা যাওয়া করে, কর্ত্তাকে অভিবাদন করিয়া হয় ভোলানাথের সহিত কিংবা বাড়ীর আর কাহারও সহিত গল্পগুজব করে। ভোলানাথ হরেরামকে পাইলে সহজে ছাড়িতে চায় না, কেবল ডাকাতির গল্প শুনিতে চায়। হরেরাম সত্যমিথ্যা নানা গল্প ফাঁদিয়া তাহার মনস্তুষ্টি করিত। ভোলানাথের কাছে হরেরাম শুনিল ব্রজনাথের মাতা ছেলের বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ঘটক-ঘটকী হাঁটাহাঁটি করিতেছে, কয়েকটি মেয়ে দেখিবারও কথা হইতেছে। দেনা-পাওনার কথাও না কি বাড়ীর গৃহিণী চুপি চুপি ঘটকীদের বলিয়াছেন, কিন্তু সে কথা কর্ত্তার কানে উঠিলে প্রলয় ব্যাপার হইবে। কর্ত্তা স্পষ্ট বলিয়াছেন, ভাল ঘরের

মেয়ে হইবে, লক্ষ্মীশ্রী থাকিবে, এই পর্য্যন্ত। দেনা-পাওনার কোনো কথাই নাই। গৃহিণী বলিয়াছেন ডানাকাটা পরী ভিন্ন পছন্দ হইবে না তবে যদি—বাকি কথা কিছু চোখ ঠারায়, কিছু ইসারায়, কিছু ঘটকীকে আড়ালে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলা।

দিন দুই-চার পরে বৈকাল বেলা নূতন বালাপোষ গায়ে দিয়া হরেরাম নিজের দরজা-গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। আকাশে দিব্য মেঘ ঘনাইয়া দুই চারিবার বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল; মাঘ মাসের এখনও অনেক দিন বাকী আছে তবু হরেরামের মনে সেই প্রবচন আসিল, যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। একে মাঘ মাস, তাহার উপর বৃষ্টি, একেবারে কন্‌কনে শীত আসিয়া উপস্থিত। হরেরাম বালাপোষখানা আর একটু টানিয়া ভাল করিয়া গায় জড়াইল।

দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। হরেরাম দেখিল একজন লোক ছাতি মাথায় দিয়া যাইতেছে, তাহারও গায় বালাপোষ। নিকটে আসিলে একবার হরেরামের দিকে চাহিয়া দেখিল। এ ব্যক্তি ত গ্রামের কেহ নয়, ব্রাহ্মণের বেশ, কপালে ফোঁটা। হঠাৎ হরেরামের মাথার টনক নড়িল। শুক্‌নো শুক্‌নো, ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা, কপাল উঁচু, নাক বড়, চোক জ্বলজ্বলে—ব্রজনাথ তাহাকে এই রকম একজন ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছিল না? সেই লোক না হইতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে দোষ কি?

হরেরাম ডাকিল,—ঠাকুর-মশায়, ও ঠাকুর-মশায়!

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল—আমায় ডাকচ?

—আজ্ঞে হাঁ। বিষ্টিটা বড় চেপে এসেচে, একটু দাঁড়িয়ে গেলে হত না? এই শীত, কাপড়-চোপড় ভিজে গেলে বড় কষ্ট পাবেন!

—তাও বটে, বলিয়া ব্রাহ্মণ দাওয়ায় উঠিল, ঘরে ঢুকিল না।

হরেরাম হেঁট হইয়া, যুক্তকর মস্তকে স্পর্শ করিয়া কহিল,—প্রণাম হই।

—ভক্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল—কি জাত?

আজ্ঞে, আমরা হিন্দুস্থানী রাজপুত, ক'পুরুষ হ'ল এদেশে এসেচি।

—বেশ, বেশ, বলিয়া ব্রাহ্মণ ঘরে প্রবেশ করিল।

হরেরাম ব্রাহ্মণের ছাতা লইয়া, জল ঝরিয়া যাইবে বলিয়া দরজার বাহিরে রাখিল, তক্তপোষ মুছিয়া তাহার উপর একখানি কম্বলের আসন বিছাইয়া দিল। বলিল—বস্‌তে আজ্ঞে হয়।

ব্রাহ্মণ বসিল। হরেরাম মেজেতে বসিল।

হরেরাম বলিল,—ঠাকুর-মশাইকে ত আমাদের এ গাঁয়ে দেখি নি।

—না, আমি থাকি আর এক গাঁয়ে, এই এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম।

—প্রসাদ পাওয়া হয়েচে?

—হাঁ, আমার খাওয়া হয়েচে, এই বিষ্টিটা থব্‌লেই যাব।

—হাঁটা পথে?

—কতক হেঁটে, কতক নৌকা করে'।

হরেরাম চতুর, সে কোনো কথা নিজে জিজ্ঞাসা করিল না। ব্রাহ্মণ যদি সেই লোক হয় তাহা হইলে এখানে কোনো মতলবে আসিয়াছে, বেড়াইতে আসে নাই। সে কোনো কথা পাড়ে কি না হরেরাম তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

একথা সে কথার পর ব্রাহ্মণ যেন আপনার মনে বলিল, —আমার এক ঘর যজমানের দূর সম্পর্কে এক ঘর জ্ঞাতি এখানে আছে, তাদের খবর পেলে তারা খুসী হতে পারে।

এ টোপে ঠোক্‌রাইতে ক্ষতি কি? হরেরাম বলিল,— গ্রামের ত সকলকেই চিনি, নাম শুন্‌লে বলতে পারি।

—ঐ যা, নামটাই মনে আসচে না, এমনি ভোলা মন। নামটি বেশ, সুরনাথ, দেবনাথ কি অমনি একটা কিছু।

—পদবী কি?

—সেটাও ঘুলিয়ে যাচ্ছে। রায় না মল্লিক একটা কি, কিন্তু জাতে কায়স্থ।

—চৌধুরী?

—ঠিক ঠিক, চৌধুরীই বটে।

—ব্রজনাথ চৌধুরী?

—তার বাপের নাম কি?

বলিয়াই ব্রাহ্মণ একটু অপ্রতিভ হইল। ছেলের নাম জানে অথচ বাপের নাম জানে না, এ কথাটা শুনিতে কেমন লাগে?

হরেরামের ফোক্‌লা দাঁতে একটু হাসি দেখা দিল। বলিল—ঠাকুর-মশায় আমি একটা কথা জিগ্‌গেস কর্‌ব?

—বেশ ত, কর না?

—আপনি সোমড়ায় থাকেন না?

—তুমি কেমন করে জান্‌লে?

—আমি এই বাবুদের বাড়ীর লোক, যে-সকল কথা আর কেউ জানে না আমি তা জানি। আপনি ভোলা-বাবুর বাড়ীর পুরুত বটে ত?

—ভোলাবাবু?

—ঐ যে যার নাম বরদা ঘোষ।

—তুমি ত অনেক খবর রাখ হে দেখ্‌চি।

—তা রাখি বই কি। আপনি ছোটবাবুকে—যার নাম ব্রজনাথ—নৌকা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভোলা-বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন সে খবরও রাখি। তারপর যা যা হয়েছিল তাও জানি। ভোলাবাবুর নাম আর দশজন যেমন জানে আমিও তেমনি জানি।

ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইল। কোনো কথা এখন অস্বীকার করিলে কোনো ফল নাই। বলিল,—তা হ'লে এসব কথা অমরবাবুর বাড়ীর সকলেই জানে?

—কেউ জানে না। কর্ত্তা নয়, গিন্নী নয়, বাড়ীর জনপ্রাণী নয়। ছোটবাবু কেবল আমাকে বলেচে, আর কাউকে নয়।

—তুমি বাড়ীতে কি কর?

—আমি চাকরী করি নে, বাবুরা আমাকে অনুগ্রহ করে। ছোটবাবুকে আমি লাঠিখেলা শিখিয়েছিলাম। আপনি বাবুদের বাড়ী না গিয়ে এখানে এসেচেন ভাল করেচেন। সেখানে গেলে সব ফেঁসে যেত।

—কেন?

—বাড়ীতে ত কেউ কিছু জানে না। ছোটবাবুর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে। রাধানাথ ঠাকুরের মুখ চূণ হইয়া গেল। তাহাদের যে ভয় ছিল তাহাই বুঝি বা ঘটে! কহিল,—ছেলে কি বউ নেবে না? বাপের অপরাধ হ'লে মেয়ের কি দোষ?

—বাপ মা ত জানে না যে ছেলের বিয়ে হয়েচে। কথাটা শোন, ঠাকুর। আমি যে এই তোমাদের সব সন্ধান নিয়েচি, কার কথায়? ছোটবাবুর মনে কি আছে জানি নে, কিন্তু ছেলেমানুষ হলেও সে বড় কেও-কেটা নয়, আর আমাকে বলেচে আর বিয়ে করবে না। আর মেয়ে যে খুব সুন্দরী সে কথাও ছোটবাবুর মুখে শুনেছি।

—বাঁচা গেল। তবে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করাও না, তা হলেই পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—ছোটবাবু ত এখানে নেই, কাজে হিজলী গিয়েচে। শীগ্‌গিরই ফিরবে তখন তাকে সব কথা বলব। তুমি ত এখন সব জেনে গেলে, এখন ছোটবাবুর ভরসায় থাক, সে এসে যা ভাল বুঝবে করবে। তোমরা যদি তার বাপের কানে এখন কোনো কথা তোলো ত গোল বাধ্‌বে।

—তোমার পরামর্শই ভাল। দৈবাৎ এ পথে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হল, দুর্যোগে সুযোগ হল।

—ঠাকুর, তোমার নামটি বল্‌লে না? আমার নাম হরেরাম সর্দ্দার।

—ওঃ তোমার নাম এককালে যে অনেকে জান্‌ত। আমার নাম রাধানাথ।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। রাধানাথ বাহিরে আসিয়া ছাতা তুলিয়া লইয়া পথে নামিল। যাইবার সময় হরেরাম তাহাকে প্রণাম করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যবসাবাণিজ্যের কারণ হিজলীতে অনেক লোক যাওয়া-আসা করিত, কিন্তু তাহা ব্যতীত সেখানে বেশী লোকের বাস ছিল না। যাহারা সাবধানে থাকিত, ঔষধপত্র খাইত, তাহারা রোগে বড় ভুগিত না, কিন্তু

অধিক সংখ্যক লোক অসাবধান আর নিকটে বৈদ্য কবিরাজও পাওয়া যাইত না। ব্রজনাথ বুদ্ধি করিয়া, গ্রামের একজন ভাল কবিরাজের নিকট হইতে বিস্তর ঔষধ ও পাচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ব্যবস্থা জানিয়া লইয়াছিল। নায়েব যথাসময়ে সংবাদ পাইয়া ব্রজনাথ ও তাহার লোকেদের জন্য সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রজনাথ গিয়াই নায়েবকে বলিল,—নায়েব-মশায়, আপনাকে ত বড় ভাল দেখ্‌চি নে।

—ভাল আর কই, ছোটবাবু, মাঝে মাঝে জ্বর হয়।

—তার পরে পিলে যকৃৎ হবে। ওষুধ-পত্তর খান?

—তাও ত মাঝে মাঝে খাই।

—মাঝে মাঝে খেলে হবে না, বাঁধা ওষুধ খেতে হবে। আমি সঙ্গে এনেচি, আপনাকে দেব। আমিও পাঁচন খাব, কবিরাজ কি একটা লৌহঘটিত ওষুধ দিয়েচে, মাঝে মাঝে তাও খাব। এখানে শিউলি পাতা, গোলঞ্চ, সোঁদালের আটা পাওয়া যাবে ত? আমার সঙ্গে আছে তা হলেও জেনে রাখা ভাল।

—পাওয়া যাবে না কেন? সব পাবেন।

গদাকে ডাকিয়া ব্রজনাথ বলিল,—দেখ গদা, তোমরা যে ক'জন আমার সঙ্গে এসেচ, বামুন চাকর সব কাল থেকে দু'দিন অন্তর পাঁচন খাবে আর আট দিন অন্তর ওষুধের বড়ি খাবে। তোমাদের হাতে দিয়ে বিশ্বাস নেই কেন না পাচনটা খেতে ঠিক মিছরীর পানার মতন নয় আর কবিরাজী বড়ি মুড়কি মোয়ার চেয়ে একটু নিরেস, তোমরা হয় খেতে ভুলে যাবে, না হয় ফেলে দেবে। সবাই আমার সাম্‌নে এসে খাবে। এখানে এসে জ্বরে কোঁ কোঁ করে' পড়ে' থাক্‌বার জন্য আমি কাউকে সঙ্গে করে' আনি নি। আর মনে রেখো, ফিরে যাবার পথে আমাদের আরো হুঁসিয়ার হতে হবে, জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে গেলে আমাদের লুটে মেরে নেবে।

গদা মুখ একটু বিকৃত করিয়া কহিল,—যে আজ্ঞে।

নায়েবকে একান্তে ব্রজনাথ বলিল,—দেখুন, নায়েব-মশায়, আমি এসেচি এখানে কাজে, তাও বেশী দিনের জন্য নয়। এর মধ্যে শরীর সাব্যস্ত না থাক্‌লে কর্‌ব কি? আর এতগুলো বাছা বাছা লোক এনেছি পথে চোর-ডাকাতের ভয় বলে'। আস্‌বার সময় একটা ছোট-খাট ব্যাপার হয়েও গিয়েচে, কয়েকটা লোক আমাদের পিছনে লেগেছিল, তাদের যৎকিঞ্চিৎ ধনঞ্জয় ব্যবস্থাও করে এসেচি। ফের্‌বার পথে আমরা শক্ত না থাক্‌লে আমাদের রক্ষে থাক্‌বে না।

আহারের পর ব্রজনাথ একখানা চিঠি নায়েবের হাতে দিল। চিঠিতে অমরনাথের সহি, লেখা ছিল তহবিলে যত টাকা আছে ব্রজনাথের আবশ্যক হইলে তাহাকে দিবে, অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে আরও দশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া দিবে। পড়িয়া নায়েব বলিল,—চিঠির আবশ্যক কি ছোটবাবু, আপনার হুকুম হ'লেই হ'ল।

—না, না, তা কি হয়? কাজ যেমন হওয়া উচিত তেমনি হবে। আমি এই প্রথম এসেচি, বাবা অনেকটা ভার আমাকে দিয়েচেন। তহবিলে কত টাকা আছে?

—হাজার সাতেক হবে।

—বেশ, আমার সঙ্গে দশ হাজার আছে, এই নিন্‌, তুলে রাখুন। আর টাকার দরকার হলে কি তখনি পাওয়া যাবে?

—অক্লেশে। রায়েরা সোনার বেণে, লেনদেনের কার্‌বার করে। যত টাকা চাইবেন তখনি শুধু হাতে পাবেন। একটা কথা জিগ্‌গেস করি ছোটবাবু, একেবারে এত টাকার কি দরকার?

ব্রজনাথ হাসিল। বলিল,—আমি ত বেশী দিন থাক্‌তে পারব না, বড় কারবার ফেঁদে আগলে বসে থাকা হয়ে উঠ্‌বে না। তবে আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে সাহস করে কিছুতে হাত দিলে চট্‌ করে কিছু টাকা হতে পারে।

—লোকসানের ভয় নেই?

—তা আছে বই কি। যেখানে টাকা সেখানেই লাভ লোকসানের ভয় আর ভরসা। বুঝেসুঝে সাবধানে কাজে হাত দিতে হবে, তারপর বরাত। এখানে নূনের একটা মস্ত আড়ত আছে, সব চেয়ে সেই কাজ বেশী। তার পর চাল আছে, তবে তার রপ্তানী বেশী, বাইরে থেকে আমদানী বেশী নেই, তাতে অল্প সময়ের মধ্যে যে

অধিক লাভ হবে তা মনে হয় না' কাঠের ব্যবসা বেড়ে যাচ্ছে, বাবা বল্‌ছিলেন। শাল সেগুন কাঠ অনেক ভাসিয়ে নিয়ে আসে, কিছু জাহাজেও আসে। অনেকের কাঁচা পয়সা হয়েছে, যেখানে সেখানে বড় বড় ইমারত তৈরী হচ্চে। নায়েব-মশায় ত এ সব জানেন?

নায়েব-মহাশয়ের দিবানিদ্রার অভ্যাস, অতি কষ্টে হাই চাপিতেছিলেন। কিন্তু হাই বড় জবর-দস্ত জিনিস, কিছুতেই মানা মানে না। ছোটবাবু তাহা লক্ষ্য করিল। নায়েব বলিলেন,—অল্পস্বল্প জানি। আমাদের কারবার ত তেমন ফলাও নয়, কেনা-বেচা অল্পই করি।

—দালাল আড়তদারেরা আসে না?

—কখন কখন আসে, বড় বেশী নয়।

—নায়েব-মশায়, আপনার দিনের বেলা শোওয়া অভ্যাস আছে, একটু শুতে যান, কিন্তু তার আগে আপনার বিশ্বাসী ভাল দালাল যদি কেউ থাকে তাকে ডাকিয়ে পাঠান।

—আজ্ঞে হাঁ, রামদাস বড়াল খুব কাজের লোক আর খুব বিশ্বাসী, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

একখানা চিঠিতে ব্রজনাথের পরিচয় দিয়া নায়েব রামদাস বড়ালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহার পর ব্রজনাথের অনুমতি পাইয়া একটা পাশের ঘরে গিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলেন। যদি বাহিরে কোথাও যাইতে হয় এইজন্য ব্রজনাথ কাপড় পরিয়া বসিয়াছিল।

রামদাস বড়াল আসিয়া ব্রজনাথকে নমস্কার করিয়া বসিল। বয়স অধিক নয়, দোহারা শরীর, দেখিতে চতুর, কথাবার্ত্তা বেশ। জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি আজ এসেছেন?

—আজ্ঞে হাঁ। এসেই আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। আপনার হাত দিয়ে আমি একটু কাজ করতে চাই।

—সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা। নায়েব-মশায় কোথায়?

—তিনি বিশ্রাম কচ্ছেন। তাঁকে ডাক্‌বার আবশ্যক নেই। আমার সঙ্গে আপনার কথা ঠিক হ'লেই হবে।

দালালের চক্ষু একটু ডাগর হইল। অতি তরুণবয়স্ক যুবা, ছোক্‌রা বলিলে দোষ হয় না, অভিজ্ঞ নায়েবকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ব্যবসা করিতে প্রস্তুত! ইহাতে টাকা লোকসান হইলে বিচিত্র কি? আর কোনো দালালের খপ্পরে পড়িলে কি হইত কে বলিতে পারে? রামদাস বলিল,—তা বেশ, আপনি যেমন বল্‌বেন তাই হ'বে।

—নায়েব-মশায়ের সঙ্গে যেমন আপনার কাজ হয় এ সে রকম নয়, তা হলে আপনাকে ডাক্‌বার আবশ্যক হত না।

—তবে কি রকম কাজ?

—কথাটা শুনতে ভাল নয় তবে যাকে দাঁও বলে তাই। একেবারে অনেক টাকার মাল ধরে বসতে হবে, যেটা নেব আমাদের একচেটে হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাজার কোণঠেসা হবে, আমাদের ছাড়া আর উপায় থাক্‌বে না।

রামদাস অবাক্। মনে মনে বলিল, ছোঁড়া ভেবে এসেচে রাতারাতি বড়মানুষ হয়ে যাবে। তা হতে পারলে আর ভাবনা কি ছিল? মুখে বলিল,—আপনার বয়স অল্প, ব্যবসাতে প্রথম হাত দিচ্চেন, এমন কাজে বড় বুকের পাটা চাই।

ব্রজনাথ হাসিয়া বুক চিতাইয়া বলিল,—আমার বুকের পাটা খুব কম নয়, কিন্তু আমি ত আপনাকে তামাসার কথা বলি নি আর না জেনেও কিছু বলিনি। দায় আমার, তবে আপনাকে পাকা খবর দিতে হবে, ভিতরের কথা খুব গোপন রাখতে হবে আর আড়তদারদের একটু টিপে টুপে দেখতে হবে। যে-মাল ধরা যাবে সেটা কত দিনে ছাড়া যাবে এই হ'ল আদত হিসেব। ধরে রাখাও টাকার খেলা। আপনার যা ন্যায্য পাওনা তা ত পাবেনই, তা সে আমার লাভই হোক্ আর লোকসানই হোক্, কিন্তু যদি আপনার কাছে আমার মনের মত কাজ পাই আর আমি যেমন আঁচ করেছি সেই রকম আমার লাভ হয় তা হ'লে আমি আপনাকে একটা থোক্ টাকা দেব। আড়তদারদের কিংবা আর কাউকে আমি কোনো রকম বঞ্চিত করব না। যেখানে দশ টাকার কথা হবে সেখানে আমি বারো টাকা দেব। আমার কাছে কোনো রকম, ঠকক হবে না।

—সে কথা আর বলতে হবে না, কিন্তু কিছু মনে

করবেন না, আপনার এত অল্প বয়স, এই বয়সে আপনার এমন পরিষ্কার মাথা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। মাথা আর সাহস এই হ'ল ব্যবসার আসল জিনিষ, তা দু-ই আপনার যথেষ্ট আছে।

—শুনুন, নুন আর কাঠ এই দুটো জিনিষে আমি আগে হাত দিতে চাই, চালের বাজার এখন থাক্। নুনের আমদানী কেমন বলুন ত? সোঁদরবন থেকে কি চোরাই নুন অনেক চালান হয়?

—না, না, সে কতটুকুই বা, আর যে রকম কড়াক্কড় তাতে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েচে। আড়তদারদের কাছে বেশী নুন নেই, কিন্তু আজ একখানা নুনের জাহাজ আস্‌বার কথা আছে।

—কত টাকার নুন হবে?

—তা ঠিক বলা যায় না। যদি চার হাজার টন হয় তা হলে প্রায় ষাট হাজার টাকা হবে। দু চার হাজার এদিক ওদিক হতে পারে, কেন না কোম্পানীর লোকরাও মাল রাখ্‌তে চায় না, কিছু কমজম করেও ছেড়ে দেয়।

—কোম্পানীর লোক কারা?

—একজন সাহেব আছে, দুজন নায়েব আছে, জন-চারেক দারোগা আছে।

—কথা কার সঙ্গে হয়?

—নায়েবরাই কথা কয়, তারা যাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যায় তার সঙ্গে সাহেবের কথা হবে।

—জাহাজের মাল কি একজন নেবে?

—তা হলে আর ভাবনা কি ছিল? একেবারে অত টাকা ফেল্‌তে পারে এমনতর লোক এখানে ক'জন আছে? বড়-জোর বিশ-পঞ্চাশ মণ একজন নিলে, টাকা দু তিন কিস্তিতে দেয়। একখানা জাহাজ খালাস হতে মাসাবধি লেগে যায়, আর টাকা আদায় হতে আরও মাস-দুই লাগে।

—আচ্ছা, ধরুন, জাহাজের মাল আমি একা নিলুম তার পর অন্য খরিদ্দার ও আড়তদারদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া। আপনি আড়তদারদের দালাল ত?

—আমরা যে ক'জন আছি সবাই।

—ভাল, আড়তদারদের দস্তুরীর হার কি?

—তা শতকরা এক টাকা থেকে তিন টাকা পর্য্যন্ত আছে, কত টাকার মাল বুঝে।

—যারা খরিদ করে তাদেরও ত লোক আছে?

—অনেক আছে।

—মূল মহাজনের কাছে যদি তারা মাল পায় তাতে তাদের কি আপত্তি?

—তাতে ত তাদের আরও সুবিধে? তবে আড়তদারেরা যদি আরও কম দরে দেয়।

—কি খেয়ে দেবে? আমি মহাজন, আড়তদারের দস্তুরী আমার হাতে, পাইকিরী দর আমার হাতে, আমার চেয়ে সস্তা দরে কে দেবে? এইবার যে কথা জিগ্‌গেস কর্‌চি বুঝে তার উত্তর দেবেন। বাজারে নুন ক' দিন না হলে চল্‌বে?

—বাজারে নুন কই? আড়তে যা আছে সে খরিদদারের মাল, কিস্তি বোঝাই হ'লেই হ'ল।

—এক হপ্তা যদি বাজারে নতুন মাল না থাকে তা হ'লে কি বড় টানাটানি হবে?

—এক হপ্তা কি মশাই, কাল বাজারে অন্ততঃ একশো মণ না থাকলে ভারি একটা হই চই পড়ে' যাবে। খরিদদার তয়ের, নৌকা তয়ের, গাঁয়ে গাঁয়ে সব চালান হবে। কলকেতার অত বড় আড়ত সব একেবারে খালি।

ব্রজনাথ টক্‌টক্ করিয়া মনে মনে কতকগুলা অঙ্ক কষিল। শুভঙ্করী হিসাব। এখনকার মত কালিকলম লইয়া বসিলে বেলা কাটিয়া যাইত। তাহার পর বলিল,—আপনি এ জাহাজের মাল দিন-দশেকের ভিতর বেচ্‌তে পার্‌বেন কি?

দালাল হাঁ করিয়া রহিল। একটু পরে কহিল,—আমরা যে ক'জন দালাল আছি আর আড়তদাররা মিলে হয় ত পারি। বেয়াদবি মাপ করবেন, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে একেবারে বিশ বাঁও জলে না পড়েন। আর টাকাও ত কম নয়, অত টাকা আস্‌বে কোত্থেকে?

ব্রজনাথ বিরক্তি সংবরণ করিয়া বলিল,—দেখুন, আপনি হয়ত ভাল ভেবেই বলচেন, কিন্তু আমি আমার বাপের অনুমতি নিয়ে এসেচি, সে কথা ভুলবেন না। যার কাজ তাকে সাজে, জানেন ত? ডুবি আর পার হই সে

দায় আমার, টাকা যোগাড় করা আমার কাজ। আপনার কাজ আপনি করুন। এখন আমার সঙ্গে চলুন নায়েব আর সাহেবের কাছে।

ব্রজনাথ গিয়া নিজেদের নায়েবকে ডাকিল। ঘুম ভাঙিয়া তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ব্রজনাথ বলিল,—আপনাকে যে দশ হাজার টাকা দিয়েচি বের করে' দিন।

নায়েব উঠিয়া মুখে চোখে জল দিয়া দশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিলেন। ব্রজনাথ বলিল, আমি যাচ্চি নূনের জাহাজ দেখ্‌তে, আপনার ইচ্ছে হয় আসুন।

—জাহাজ দেখে কি হবে? যা কিন্‌তে চান আড়তদারদের কাছে দু-চার দিনে পাবেন।

—তা নয়, আমি জাহাজের সব মাল কিনে নেব, তার পর সুবিধে মত ছাড়্‌ব।

—অত টাকা কোথায়? সে আপনি পেরে উঠ্‌বেন না।

—চলুন না, দেখা যাক্ কি হয়।

নায়েব আর দালালের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ব্রজনাথ গদাকে ডাকিল, বলিল,—পাঁচজন লোক সঙ্গে করে' তলওয়ার নিয়ে আমার সঙ্গে এস।

আশ্চর্য্য হইয়া নায়েব বলিল,—ওরা কি কর্‌বে?

—ওদেরও কাজ পড়্‌তে পারে।

আপিসে গিয়া নূনের নায়েবের সঙ্গে দেখা হইল। সঙ্গে পাঁচ ছয়জন তলওয়ার-বাঁধা জোয়ান দেখিয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, কোনো বড় জমিদার হইবে।

ব্রজনাথের পরিচয় দালাল দিল। ঘরে নূনের বড় নায়েব বসিয়া, বেশ কালো, বেশ মোটা, বেশ ভুঁড়ি। সংক্ষেপে বলিলেন,—কি মনে করে'?

ব্রজনাথ বলিল,—আপনাদের নূনের জাহাজ এসে পৌঁচিয়েছে।

—হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক হ'ল এসেচে।

—সমস্ত মাল আপনারা কত হ'লে ছেড়ে দেবেন?

—তুমি নেবে নাকি?

—যদি দরে বনে।

—এক লাটে সব হলে পঁইষট্টি হাজারে ছেড়ে দেব। খুচরা সত্তর পঁচাত্তর হাজার পর্য্যন্ত হবে।

—টাকা দেবার মেয়াদ কত?

—অর্দ্ধেক এখন, বাকি পনর দিন পরে।

—নায়েব-মশায়, আমি এখানে আজ এসেচি বলে' আমাদের কারবার আজ আরম্ভ হয় নি। যা পার্‌ব আপনাকে বল্‌চি। মোট ষাট হাজার টাকা, পাঁচ হাজার টাকা এখনি বায়না আর আগাম হিসাবে, বাকি টাকা দেড় মাসের মধ্যে। জাহাজের কাগজপত্র আমাকে দেখান, তারপর সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা ক'য়ে আমি একবার জাহাজে গিয়ে মালের অবস্থা দেখে আপনাদের কাগজে সহি করে দেব। যাবার সময় এক হাজার টাকা আপনার হাতে দিয়ে যাব। এবার প্রথম কাজ, আর বেশী পার্‌ব না, কিন্তু আপনার কাছে ত সর্ব্বদাই আস্‌তে হবে।

বাকি কাজ চট্‌পট্ হইয়া গেল। নায়েব প্রথমে গিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া আসিলেন, তাহার পর ব্রজনাথকে একা ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সাহেব হাসিয়া ব্রজনাথের সহিত খুব জোরে করমর্দ্দন করিলেন। ব্রজনাথের হাতের চাপ সাহেবের অপেক্ষাও কঠিন। ভাঙাচোরা বাংলা ইংরেজীর সহিত মিশাইয়া সাহেব ব্রজনাথকে উৎসাহিত করিলেন। দুই চারিটা কথার পর ব্রজনাথ নায়েবের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল ব্রজনাথের পিঠ চাপড়াইয়া সাহেব বলিলেন,—টুমি ভাল কাজ কর্‌বে। Quite a boy, too! Good lad, smart chap! আবার আস্‌বে।

বাহিরে আসিয়া নায়েব বলিলেন,—দেখ্‌লে ত, সাহেব ত সাক্ষীগোপাল।

—তা বটেই ত, আপনারা যেমন নাচান।

জাহাজে মাল ঠিক আছে দেখিয়া ব্রজনাথ নায়েব ও কাপ্তেনের অনুমতি লইয়া গদা ও অপর লোকদিগকে জাহাজে মোতায়েন করিয়া দিল। বলিয়া দিল, জাহাজের সব নূন আমি কিনেচি, এক ছটাকও মাল যেন কেউ না সরায়।

গদা তলওয়ারের মুঠায় হাত দিয়া বলিল, তবে আমরা রইলুম কি কর্‌তে?

আপিসে ফিরিয়া লেখাপড়া করিয়া ব্রজনাথ পাঁচহাজার টাকা বাহির করিয়া দিল। নায়েবের হাতে

এক হাজার টাকা দিল। ব্রজনাথের হাতে আরও অনেক নোট দেখিয়া নায়েব মোটা হাসি হাসিয়া বলিলেন,—তাই ত, মেলাই টাকা যে!

—সবই আপনাদের, আমাদের ঘরে কি যাবে?

—বেশ, বেশ, তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড় আনন্দ হ'ল। মাল এলে সব চেয়ে আগে তোমায় খবর দেব।

বাহিরে আসিয়া বাসায় ফিরিবার পথে ব্রজনাথ বলিল,—বড় মাছ মাছের টোপ দিয়ে ধর্‌তে হয়। টাকাই চার, টাকাই টোপ, টাকাই মাছ। টাকা ফেলে খেলিয়ে টাকা তুলতে হয়।

(ক্রমশঃ)

চতুরে চতুরে—শিবাজী ও আওরংজীবের সাক্ষাৎ

স্যর যদুনাথ সরকার

(১)

পুরন্দরের সন্ধিতে (১৬৬৫ জুন) শিবাজী এই একটি শর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য করদ রাজার মত তাঁহাকে স্বয়ং গিয়া বাদশাহের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে না। তবে দাক্ষিণাত্যে কোন যুদ্ধ বাধিলে তিনি বাদশাহী পক্ষকে সসৈন্য সাহায্য করিবেন। কিন্তু বিজাপুর আক্রমণের পর (জানুয়ারী ১৬৬৬) জয়সিংহ নানা যুক্তি দেখাইয়া শিবাজীকে বুঝাইলেন যে, বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার অনেক প্রকার লাভ হইবে। ফন্দিবাজ রাজপুত রাজা শিবাজীর উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এরূপ চতুর ও কর্ম্মক্ষম বীরের সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া বাদশাহ হয়ত তাঁহাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ে নিযুক্ত করিবেন, এবং সেই অবসরে শিবাজী নিজামশাহী অর্থাৎ আহমদনগরের লুপ্ত-প্রায় রাজ্যের বাকি প্রদেশগুলি দখল করিয়া তথায় তাঁহার অধিকার নিষ্কণ্টক ও স্থায়ী করিতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত কোন মুঘল সেনাপতিই বিজাপুরকে কাবু করিতে পারেন নাই, এমন কি স্বয়ং আওরংজীব যখন যুবরাজ, তখন তিনিও বিফল হইয়াছিলেন। এ কাজ কেবল শিবাজীর পক্ষেই সম্ভব।

শিবাজীরও কয়েকটি প্রার্থনা ছিল; বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হাত করিতে না পারিলে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, জাঞ্জিরার জলবেষ্টিত দুর্গ দখলে না আসিলে শিবাজীর কোঁকন-রাজ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হয় না; অথচ উহার হাবশী মালিক সিদ্দি শিবাজীর হস্তে দুর্গটি সমর্পণ করিতে একেবারে অসম্মত; শিবাজীও তাহা অধিকার করিতে গিয়া বার বার পরাস্ত হইয়াছেন। সিদ্দি এখন বাদশাহের অধীন হইয়াছে, তাঁহার ভয় ভরসা রাখে; সুতরাং বাদশাহের হুকুম পাইলে সে ঐ দুর্গ শিবাজীকে দিতে বাধ্য হইবে। এ বিষয়ে দিল্লীতে দরখাস্ত পাঠাইয়া শিবাজী কোনই ফল পান নাই। স্বয়ং সাক্ষাৎ করিলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা।

কিন্তু দিল্লীতে যাইবার কথায় প্রথমে শিবাজীর ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মনে মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। একে ত তিনি বনজঙ্গলে ও গ্রামে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত, কখন নগর বা রাজসভা চোখে দেখেন নাই। তাহার উপর, তাঁহাদের চক্ষে যবন বাদশাহ রাবণের অবতার, হাতে পাইয়া আওরংজীব যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীকে বন্দী করেন বা মারিয়া ফেলিবার হুকুম দেন, তখন কি হইবে? কিন্তু জয়সিংহ কঠিন শপথ করিয়া বলিলেন, বাদশাহ সত্যবাদী, এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রামসিংহ দরবারে থাকিয়া শিবাজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। শিবাজী দেখিলেন,

দিল্লীতে গেলে মোটের উপর ভয় অপেক্ষা লাভের আশাই বেশী।

(২)

যাহা হউক, পাছে মুঘল রাজধানীতে যাইবার পর কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় শিবাজী রাজ্যরক্ষা ও শাসনকার্য্যের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন যে, স্বদেশে তাঁহার অনুপস্থিতিতেও মারাঠাদের কোন ক্ষতি হইবে না; সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কাজ চালাইবে, অভ্যস্ত নিয়ম-মত রাজ্য রক্ষা করিবে,—কোন বিষয়ে নূতন হুকুমের প্রতীক্ষায় প্রভুর মুখ চাহিয়া অসহায় অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। শিবাজীর মাতা জীজাবাঈ রাজপ্রতিনিধি হইয়া সকলের শীর্ষস্থানে রহিলেন। তাঁহার সহকারী হইলেন তিন-জন—মোরেশ্বর ত্র্যম্বক পিংলে পেশোয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী, নীলো সোনদেব মজমুয়াদার অর্থাৎ হিসাব-পরীক্ষক, এবং নেতাজী পালকর সেনাপতি। রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, প্রত্যেক দুর্গ পরীক্ষা করিয়া, সর্ব্বত্র রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া, কর্ম্মচারিগণকে দিবারাত্র সতর্ক ও কার্য্যতৎপর থাকিতে এবং তাঁহার নিয়মাবলী পূর্ণমাত্রায় পালন করিতে বার বার বলিয়া দিয়া, শিবাজী ৫ই মার্চ্চ ১৬৬৬ তারিখে মাতা ও পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া রাজগড় হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে চলিল—পুত্র শম্ভুজী, কয়েকজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী, এবং এক হাজার শরীর-রক্ষী সৈন্য। তাঁহার পথ-খরচের জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজকোষ হইতে একলক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইল। ইহার আগেই শিবাজীর দূত-স্বরূপ রঘুনাথ বল্লাল কোরডে এবং সোনাজী পন্ত দিল্লীর বাদশাহের দরবারে যাত্রা করিয়াছিলেন।

(৩)

উত্তর-ভারতে যাইবার পথে শিবাজী প্রথমে আওরঙ্গাবাদ শহরে পৌঁছিলেন। তাঁহার খ্যাতি এবং সৈন্যদের জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জার কথা শুনিয়া নগরবাসীরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের দর্শনলাভের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু স্থানীয় মুঘল শাসনকর্ত্তা সফ্‌শিকন্ খাঁ ভাবিলেন যে, শিবাজী সামান্য জমিদার এবং বুনো মারাঠামাত্র; তিনি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং অগ্রসর না হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের মারফৎ জানাইলেন যে শিবাজী যেন তাঁহার কাছারীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই অপমানসূচক ব্যবহারে শিবাজী অত্যন্ত রাগিয়া, সফ্‌শিকন্ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় কাণ না দিয়া, সোজা শহরের মধ্যে নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; ভাবটা দেখাইলেন যেন ঐ শহরের শাসনকর্ত্তা মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত নয়। সফ্‌শিকন্ খাঁ বুঝিলেন, এ বড় শক্ত লোক; তিনি অমনি নরম হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত গিয়া শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এইরূপে নিজ মর্য্যাদা রক্ষা হইবার পর শিবাজীর আর রাগ রহিল না। তিনি পরদিন গিয়া সফ্‌শিকনের আগমনের প্রতিদান, এবং মুঘল কর্ম্মচারিদিগকে ভদ্রতায় আপ্যায়িত করিলেন।

কয়েকদিন তথায় থাকিয়া, শিবাজী আবার উত্তর-মুখে চলিলেন। বাদশাহের হুকুম অনুসারে পথে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে রসদ ও নানা উপহার আনিয়া দিল। এইরূপে তিনি ৯ই মে আগ্রার নিকট পৌঁছিলেন। বাদশাহ তখন আগ্রা শহরে বাস করিতেছেন। যে আট বৎসর শাহজাহান আগ্রা-দুর্গে বন্দীভাবে ছিলেন, আওরঙ্গজীব আগ্রায় কখন নিজ মুখ দেখান নাই,—দিল্লীতেই থাকিতেন। ১৬৬৬ সালে ২২এ জানুয়ারী শাহজাহানের মৃত্যুর পরেই তিনি আগ্রার রাজবাড়ীতে আসিয়া সমারোহে প্রথমবার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

শিবাজী আগ্রায় পৌঁছিবার তিনদিন পরেই চান্দ্র বৎসরের হিসাবে বাদশাহের পঞ্চাশত্তম জন্মদিন; স্থির হইল, জন্মদিনের উৎসব ও আড়ম্বরের মধ্যে শিবাজী বাদশাহকে দর্শন করিবেন, কারণ সেকালে শুভ দিনক্ষণ না দেখিয়া কোন কাজই করা চলিত না।

আগ্রাদুর্গের মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ-গঠিত দরবার-গৃহ দেওয়ান্-ই-আম্ আজ জন্মদিনের উৎসবে পরিপাটিরূপে সাজান হইয়াছে। দেওয়াল ও থামগুলি বহুমূল্য রঙীন কিংখাব ও শালে জড়ান, মেঝেতে উৎকৃষ্ট গালিচা বিছান। এখানে সব উচ্চশ্রেণীর আমীর-ওমরা ও রাজারা খুব জমকাল পোষাক পরিয়া নিজ নিজ শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া আছেন। দেওয়ান্-ই-আমের সামনে ও দুইপাশে

খাসে-ঢাকা নীচু আঙিনায় লাল শালু-মোড়া কাঠের ডাণ্ডার সাহায্যে শামিয়ানা টাঙান হইয়াছে। সারা আঙিনাটি শতরঞ্চ ও চাদর দিয়া ঢাকা—এখানে নিম্নশ্রেণীর হাজার হাজার মনসবদার ও সাধারণ অনুচর দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছে। দেওয়ান-ই-আম গৃহের সম্মুখভাগ ও দুই পাশ খোলা, পিছন দিক্‌টায় দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুরের দেওয়াল। এই দেওয়ালের মাঝখানে মানুষের চেয়ে উঁচু একটি ছোট বারান্দা কাটা আছে; তাহাতে বাদশাহের সিংহাসন, পশ্চাতে অন্তঃপুর হইতে আসিবার দরজা—পর্দা দিয়া ঢাকা। আর তাঁহার সামনে দরবার-গৃহের মেজেতে থাম হইতে থামে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া তিনটি কাটরা বা প্রকোষ্ঠ করা হইয়াছে। প্রথমেই সোনার রেলিং, এখানে মাত্র সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ওমরার প্রবেশের অধিকার; তাহার পিছনে রূপার রেলিং, এখানে মধ্যম শ্রেণীর মনসবদারদের স্থান; সর্ব্বপশ্চাতে রং-করা কাঠের রেলিং, তাহার মধ্যে নিম্নস্থানীয় কর্ম্মচারীদের দাঁড়াইবার ব্যবস্থা। প্রত্যেক কাটরায় একটি স্থানে রেলিং খুলিয়া লোকের যাতায়াতের পথ করা ছিল। হিন্দী-কবি ভূষণ সত্যই বলিয়াছেন, এই জন্মদিন-উৎসবের দরবারে অমরাপুরীতে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ-বেষ্টিত ইন্দ্রের মত আওরংজীব বিরাজ করিতেছিলেন।

রাজসভা লোকে গম্‌গম্‌ করিতেছে। সভাসদ্‌গণের নানাবর্ণের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বিস্তৃত গালিচা ও কিংখাব দেখিয়া স্থানটাকে রঙীন ফুলের বাগান বলিয়া ভ্রম হয়। চারিদিকে ওমরা ও করদ রাজাদের গা হইতে হীরা মতি ও নানাপ্রকার মণির আলো ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়াছেন।

রামসিংহ এহেন সভায় শিবাজী ও তাঁহার দশজন প্রধান কর্ম্মচারীকে উপস্থিত করিলেন। মারাঠা-রাজার পক্ষ হইতে বাদশাহের পায়ের নিকট থালায় করিয়া দেড় হাজার মোহর নজর, এবং ছয় হাজার টাকা নিসার * স্বরূপ উপহার দেওয়া হইল। আওরংজীব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আও, শিবাজী রাজা।" শিবাজীকে হাত ধরিয়া বাদশাহের সামনে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি তিনবার সালাম করিলেন, বাদশাহ তাহার প্রতিদান করিলেন। তাহার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে শিবাজীকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া দাঁড় করান হইল। দরবারের কাজ চলিতে লাগিল, যেন সকলেই শিবাজীর কথা ভুলিয়া গেল।

কত আদর-অভ্যর্থনার আশা বুকে ধরিয়া শিবাজী আগ্রা আসিয়াছিলেন, ইহাই কি তাহার পরিণাম? দরবারে আসিবার আগে হইতেই তাঁহার মনে দুঃখ ও সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রথমতঃ, আগ্রার বাহিরে গিয়া কোন বড় ওমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন নাই, কেবল রামসিংহ (আড়াই হাজারী) এবং মুখলিস্ খাঁ (দেড় হাজারী)র মত দুজন মধ্যম শ্রেণীর ওমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। আর, আজ বাদশাহের দর্শন মিলিবার পর তাঁহার কোন উচ্চ উপাধি, বা মূল্যবান উপহার, এমন কি প্রশংসা-বাক্যও লাভ হইল না। শিবাজী দেখিলেন, যেখানে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন সেখান হইতে বাদশাহ অনেক দূরে—সম্মুখে সারির পর সারি ওমরার দল দাঁড়াইয়া। তিনি রামসিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার স্থানটি পাঁচহাজারী মনসবদারদের মধ্যে। তখন তিনি উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি? আমার সাত বৎসরের বালক পুত্র শম্ভুজী দরবারে না আসিয়াই পাঁচ হাজারী হইয়াছিল। আমার চাকর নেতাজীও পাঁচ হাজারী। আর আমি, এত বিজয়-গৌরবের পর স্বয়ং আগ্রায় আসিয়া শেষে কেবলমাত্র সেই পাঁচ হাজারীই হইলাম!"

তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার সামনের ওমরাটি কে। রামসিংহ উত্তর দিলেন—'মহারাজা যশোবন্ত সিংহ।' শুনিয়া শিবাজী রাগে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "যশোবন্ত! যাহাকে আমার সৈন্যেরা কতবার রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছে। আমার স্থান তাহারও নীচে? ইহার অর্থ কি?"

সকলের সামনে এইরূপ তীব্র অপমানে জ্বলিয়া উঠিয়া শিবাজী উঁচু গলায় রামসিংহের সঙ্গে তর্ক করিতে

* বাদশাহের দেহ হইতে অশুভ দৃষ্টির প্রভাব দূর করিবার জন্য যে টাকা বা রত্ন থালায় করিয়া তাঁহার মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে লোকজনের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল নিসার।

লাগিলেন ; বলিলেন—"তরবারি দাও, আমি আত্মহত্যা করিব। এ অপমান সহ্য করা যায় না।" শিবাজীর কড়া কথা এবং উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গিতে রাজসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল ; রামসিংহ মহা ভাবনায় পড়িয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। চারিদিকেই বিদেশী ও অজানা মুখ, কোন বন্ধু বা স্বজন নাই—রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে শিবাজী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। দরবারে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ? চতুর রামসিংহ উত্তর দিলেন,—"বাঘ জঙ্গলী জানোয়ার। তার এখানে গরম লাগিয়া অসুখ হইয়াছে।" পরে বলিলেন,—"মারাঠা-রাজা দক্ষিণী লোক, বাদশাহী সভার আদব-কায়দা জানেন না।"

সদয় আওরংজীব হুকুম দিলেন, পীড়িত রাজাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া মুখে গোলাপ জল ছিটাইয়া দেওয়া হউক ; জ্ঞান হইলে তিনি বাসাবাড়ীতে চলিয়া যাইবেন,—দরবার শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।

(৫)

বাসায় ফিরিয়া শিবাজী প্রকাশ্যভাবে বলিতে সুরু করিলেন যে, বাদশাহ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন ; ইহা অপেক্ষা তিনি বরং শিবাজীকে মারিয়া ফেলুন। চরের সাহায্যে সব কথাই আওরংজীবের কাণে পৌছিল ; শুনিয়া তাঁহার রাগ ও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল। তিনি রামসিংহকে হুকুম দিলেন যে, আগ্রা শহরের দেওয়ালের বাহিরে, জয়পুর-রাজের জমিতে (অর্থাৎ দুর্গ হইতে তাজমহলে যাইবার পথের ডান পাশে) শিবাজীকে রাখা হউক এবং যাহাতে তিনি পলাইতে না পারেন, সেজন্য রাজসিংহকে দায়ী থাকিতে হইবে। বাদশাহের অসন্তোষের চিহ্ন-স্বরূপ শিবাজীকে পুনরায় দরবারে আসিতে নিষেধ করা হইল ; তবে বালক শম্ভূজীকে মাঝে মাঝে আসিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

শিবাজীর সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে, বাদশাহকে, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া তিনি নিজে মুক্তিলাভের চেষ্টা দেখুন। সেই মত দরখাস্ত করা হইল ; কিন্তু পড়িয়া বাদশাহ উত্তর দিলেন—"অপেক্ষা কর, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিব।" তাহার পর শিবাজী প্রার্থনা করিলেন যে, বাদশাহ যদি তাঁহাকে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে দেন তবে রাজ্য-জয়ের একটি সুন্দর উপায় বলিয়া দিবেন। একথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁ (শায়েস্তা খাঁর ভগ্নীপতি) বলিলেন,—"হুজুর, সর্ব্বনাশ ! এমন কাজ করিবেন না। শিবাজী পাকা যাদুকর, আকাশে লাফ দিয়া চল্লিশ গজ জমি পার হইয়া শায়েস্তা খাঁর শিবিরে ঢুকিয়াছিল। এখানেও সেইরূপ দাগাবাজী করিবে।" শিবাজীর আর দেখা করা হইল না।

শিবাজী তখন জাফর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দাক্ষিণাত্য-জয়ের বন্দোবস্তের আলোচনা করিলেন। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "বেশ ভাল !" কিন্তু তাঁহার স্ত্রী (শায়েস্তা খাঁর ভগিনী) অন্তঃপুর হইতে গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন,—"শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছে, শায়েস্তা খাঁর আঙুল কাটিয়া দিয়াছে, তোমাকেও বধ করিবে। শীঘ্র তাহাকে বিদায় কর।" মন্ত্রী তখন "আচ্ছা, আচ্ছা, বাদশাহকে বলিয়া সব সরঞ্জাম দিব"—এই বলিয়া তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা শেষ করিলেন। শিবাজী বুঝিলেন, তিনি কিছুই করিবেন না।

পরদিন বাদশাহের হুকুমে আগ্রার কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ শিবাজীর বাসার চারিদিকে পাহারা ও তোপ বসাইল। মারাঠা-রাজ সত্য সত্যই বন্দী হইলেন ; তাঁহার বাসা হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।

(৬)

সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শিবাজী পুত্রকে বুকে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা সান্ত্বনা দিবার অনেক চেষ্টা করিল।

কিন্তু বেশীদিন এইভাবে গেল না। শিবাজীর অদম্য সাহস ও প্রখর বুদ্ধি শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। তিনি নিজের মুক্তির পথ নিজেই বাহির করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি সকলের কাছে লোক পাঠাইয়া জানাইতে লাগিলেন যে, তিনি বাদশাহের ভক্ত প্রজা, তাঁহার অসন্তোষের ভয়ে

তিনি সম্মত। অপরাধ-মার্জ্জনালাভের আশায়, বাদশাহের নিকট সুপারিশ করিবার জন্য শিবাজী দরবারের অনেক সভাসদকে অনুরোধ করিলেন। ইতি-মধ্যে তিনি নিজ রক্ষী-সৈন্যদলকে দেশে পাঠাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; বাদশাহ ভাবিলেন, ভালই ত, আগ্রায় যত শত্রু কমে। সৈন্যেরা মহারাষ্ট্রে গেল, সেই সঙ্গে শিবাজীর সঙ্গীরাও অনেকে দেশে ফিরিল। শিবাজী এখন একা—তিনি নিজের পলায়নের পথ নিজেই দেখিলেন।

অসুখের ভাণ করিয়া তিনি শয্যার আশ্রয় লইলেন; ঘর হইতে আর বাহির হন না। ব্যাধি দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সাধুসজ্জন ও সভাসদদিগের মধ্যে তিনি প্রত্যহ বড় বড় ঝুড়ি ভরিয়া ফল ও মিঠাই বিতরণ করিতে সুরু করিলেন। প্রত্যেক ঝুড়ি বাঁশের বাঁকে ঝুলাইয়া দুইজন করিয়া বাহক বৈকালে বাসাবাড়ী হইতে বাহিরে লইয়া যাইত। কোতোয়ালের প্রহরীরা দিনকতক ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর বিনা পরীক্ষায় যাইতে দিতে লাগিল।

শিবাজী এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১৯এ আগষ্ট বৈকালে তিনি প্রহরীদের বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার অসুখ বাড়িয়াছে, তাহারা যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। এদিকে ঘরের মধ্যে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (শাহজীর দাসীপুত্র) হিরাজী ফর্জ্জন্দ,—দেখিতে কতকটা শিবাজীর মতই—শিবাজীর খাটিয়ায় শুইয়া, চাদরে গা-মুখ ঢাকিয়া, শুধু ডান হাত বাহির করিয়া রাখিলেন; তাহার এই হাতে শিবাজীর সোনার বালা দেখা যাইতেছিল। আর সন্ধ্যার সময় শিবাজী ও শম্ভুজী দুইটি ঝুড়ির মধ্যে জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিলেন, তাঁহাদের উপর বেশ করিয়া পাতা ঢাকা দেওয়া হইল; আর তাঁহাদের বাঁকের সামনে ও পিছনে কয়েক ঝুড়ি সত্যকার ফল ও মিঠাই ভরিয়া সারিবন্দী হইয়া বাহকগণ বাসা হইতে বাহির হইল; বাদশাহের প্রহরীরা কোনই উচ্চ-বাচ্য করিল না,—কেন না ইহা ত নিত্যকার ঘটনা।

আগ্রা শহরের বাহিরে পৌঁছিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে ঝুড়ি নামাইয়া বাহকগণ মজুরি লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর শিবাজী ও শম্ভুজী ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া সঙ্গে যে দুইটি মারাঠা-অনুচর আসিয়াছিল তাহাদের সাহায্যে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একটি ছোট গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার ন্যায়াধীশ নিরাজী রাবজী ঘোড়া লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানে মারাঠাদের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পুত্র শম্ভুজী, নিরাজী, দত্তাজী ত্র্যম্বক (ওয়াকিয়ানবীস্) ও রাঘবমিত্রকে সঙ্গে লইয়া শিবাজী সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া সারা অঙ্গে ছাই মাখিয়া মথুরার দিকে অগ্রসর হইলেন, বাকী সকলে দাক্ষিণাত্যের পথ ধরিল।

(৭)

এদিকে আগ্রায় ১৯এ আগষ্টের সারারাত্রি এবং পরদিন তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত হিরাজী শিবাজীর বিছানায় শুইয়া রহিলেন। প্রাতে প্রহরীরা আসিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল,—সোনার বালা পরিয়া বন্দী শুইয়া আছে। চাকরেরা তাঁহার পা টিপিতেছে। বৈকাল তিনটার সময় হিরাজী উঠিয়া নিজ বেশ পরিয়া চাকরটিকে সঙ্গে লইয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলেন; দরজায় প্রহরীদের বলিলেন, "শিবাজীর মাথার বেদনা; কাহাকেও তাঁহার ঘরে যাইতে দিও না, আমি ঔষধ আনিতে যাইতেছি।" এইরূপে দুই-তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রহরীরা দেখিল, বাড়ীটা যেন কেমন খালি খালি ঠেকিতেছে; ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন নড়াচড়ার আওয়াজও বুঝা যাইতেছে না; অন্যদিনের মত বাহিরের লোকজনও কেহ দেখা করিতে আসিতেছে না। ক্রমে তাহাদের সন্দেহ বাড়িল, তাহারা ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের চক্ষুস্থির,—পাখী উড়িয়াছে, ঘরে জন-মানব নাই!!!

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তাহারা ছুটিয়া গিয়া কোতোয়ালকে সংবাদ দিল। ফুলাদ খাঁ কয়েদীর খোঁজ করিয়া দেখিয়া বাদশাহকে জানাইল,—"হুজুর! শিবাজী পলাইয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য আমাদের কোনই দোষ নাই। রাজা কুঠুরীর মধ্যেই ছিলেন। আমরা ঠিক-মত গিয়া

দেখিতেছিলাম; তথাপি একেলা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি মাটির মধ্যে ঢুকিলেন, অথবা আকাশে উড়িয়া গেলেন, বা হাঁটিয়া পলাইলেন তাহা জানা গেল না। আমরা কাছেই ছিলাম, দেখিতে দেখিতে তিনি আর নাই। কি যাদুবিদ্যায় এমনটা হইল বলা যায় না।"

কিন্তু আওরংজীব এসব বাজে কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। অমনি চারিদিকে "ধর ধর" শব্দ উঠিল, রাজ্য-মধ্যে পথঘাটের সব চৌকি, পার-ঘাট এবং পর্ব্বতের ঘাটিতে হুকুম পাঠান হইল যেন দাক্ষিণাত্যের যাত্রীদের সকলকে ধরিয়া দেখা হয় তাহাদের মধ্যে শিবাজী আছে কি না। এই হুকুম লইয়া দক্ষিণ দিকে কত সওয়ার ছুটিল। আর আগ্রা বা তাহার নিকটে শিবাজীর যত অনুচর ছিল (যেমন ত্র্যম্বক সোনদেব দবীর এবং রঘুনাথ বল্লাল কোরডে) তাহাদের ধরিয়া কয়েদ করা হইল। মারের চোটে তাহারা বলিল যে, রামসিংহের সাহায্যে শিবাজী পলাইয়াছেন! বাদশাহ রাগিয়া রামসিংহের দরবারে আসা বন্ধ করিলেন এবং তাঁহার মনসব্ ও বেতন কাড়িয়া লইলেন।

(৮)

চতুর-চূড়ামণি শিবাজী দেখিলেন, আগ্রা হইতে মহারাষ্ট্রের পথ দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়াছে, সুতরাং সেদিকে সর্ব্বত্রই শত্রু সজাগ হইয়া পাহারা দিবে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব্বদিকের পথে কোন পথিকের উপরই সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। সেইজন্য তিনি আগ্রা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে উত্তরে, পরে পূর্ব্বদিকে—অর্থাৎ ক্রমেই মহারাষ্ট্র হইতে অধিক দূরে চলিতে লাগিলেন। প্রথম রাত্রিতে ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহারা দ্রুতগতি মথুরায় পৌঁছিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে বালক শম্ভুজী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; পথ চলিতে একেবারে অক্ষম। অথচ আগ্রার এত নিকটে থাকা শিবাজীর পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। তখন নিরাজী পেশোয়ার শ্যালক—মথুরাবাসী তিনজন মারাঠা ব্রাহ্মণকে শিবাজীর আগমন ও দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহারাও দেশ ও ধর্ম্মের নামে বাদশাহের শাস্তির ভয় তুচ্ছ করিয়া শম্ভুজীকে নিজ পরিবারমধ্যে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। আর তাঁহাদের এক ভাই শিবাজীকে সঙ্গে লইয়া কাশী পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া চলিলেন।

এই দীর্ঘপথের খরচের জন্য শিবাজী প্রস্তুত হইলেন। সন্ন্যাসীর লাঠির মধ্যে ফুটা করিয়া, তাহা মণি ও মোহর দিয়া পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; জুতার মধ্যে কিছু টাকা রাখিলেন, আর একটা বহুমূল্য হীরক এবং অনেকগুলি পদ্মরাগমণি মোম দিয়া ঢাকিয়া তাঁহার অনুচরদের জামার ভিতরে সেলাই করিয়া দিলেন, কিছু কিছু তাহারা মুখে পুরিয়া রাখিল।

মথুরায় পৌঁছিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া, গায়ে ছাই মাখিয়া, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে শিবাজী পথ চলিতে লাগিলেন। নিরাজী ভাল হিন্দী বলিতে পারিতেন। তিনি মোহন্ত সাজিয়া দলের আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তিনিই পথের লোকজনদের উত্তর দিতে লাগিলেন, শিবাজী সামান্য চেলা হইয়া নীরবে তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। তাঁহারা প্রায়ই রাত্রে পথ চলেন, দিনে নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করেন, প্রত্যহই এক ছদ্মবেশ বদলাইয়া আর এক রকম বেশ ধরেন। তাঁহার চল্লিশ পঞ্চাশজন অনুচর তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া দূরে দূরে পশ্চাতে আসিতে লাগিল, প্রত্যেক দলেরই ভিন্ন ভিন্ন বেশ।

একবার তিনি ধরা পড়িয়াছিলেন। আলী কুলী নামে বাদশাহের এক ফৌজদার সরকারী পত্র পাইবার আগেই আগ্রা হইতে নিজ সংবাদ-লেখকের পত্রে শিবাজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়া তাহার সীমানার মধ্যে সমস্ত পথিকদের আটক করিয়া তল্লাস আরম্ভ করিয়া দিল। শিবাজীও সদলে আটক হইলেন। তিনি দুপুর রাত্রে ফৌজদারের কাছে গিয়া বলিলেন,—"আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে এখনি লক্ষ টাকা দামের হীরা ও মণি দিব। আর যদি আমাকে বাদশাহের নিকট ধরাইয়া দাও, তবে এসব রত্ন তিনি পাইবেন,—তোমার কোনই লাভ হইবে না।" ফৌজদার এই ঘুষ লইয়া তখনি তাঁহাদের ছাড়িয়া দিল।

তারপর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—এলাহাবাদের পুণ্যক্ষেত্রে

স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে শিবাজী কাশীধামে পৌঁছিলেন। অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, কেশচ্ছেদ প্রভৃতি তীর্থের ক্রিয়াকলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রওনা হইবার পরই আগ্রা হইতে অশ্বারোহী দূত আসিয়া শিবাজীকে ধরিবার জন্য বাদশাহের আদেশ চারিদিকে প্রচার করিল। অনেক বৎসর পরে সুরতের নাভাজী নামে এক গুজরাতী ব্রাহ্মণ কবিরাজ গল্প করিতেন,—"কাশীতে পাঠ্যাবস্থায় আমি এক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলাম, গুরু আমাকে বড়ই খাবার কষ্ট দিতেন। একদিন ভোরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই অন্যদিনের মত নদীর ঘাটে গিয়াছি, এমন সময় একজন লোক আমার হাতের মধ্যে মোহর ও মণি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, 'মুঠি খুলিও না, কিন্তু আমার স্নানাদি তীর্থক্রিয়া যত শীঘ্র পার শেষ করাইয়া দাও।' আমি তাহার মাথা মুড়াইয়া স্নান করাইয়া দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলাম; এমন সময় একদিকে সোরগোল উঠিল যে, পলাতক শিবাজীর খোঁজে আগ্রা হইতে বাদশাহী পুলিশ আসিয়া ঢোল পিটিয়া দিতেছে। তাহার পর পূজার কাজে মন দিয়া যাত্রীটির দিকে ফিরিতেই দেখি, সে ইতিমধ্যে অন্তর্ধান করিয়াছে। মুঠির মধ্যে নয়টি মোহর, নয়টি হোণ, ও নয়টি মণি পাইলাম। গুরুকে কিছু না বলিয়া সটান দেশে ফিরিলাম। ঐ টাকা দিয়া এই বড় বাড়ী কিনিয়াছি।"

(৯)

কাশী হইতে গয়া পূর্ব্বদিকে; এই তীর্থ করিয়া শিবাজী দক্ষিণ মুখে চলিলেন। পরে গোণ্ডওয়ানা ও গোলকুণ্ডা-রাজ্য পার হইয়া পশ্চিমদিকে ফিরিয়া, বিজাপুরের মধ্য দিয়া নিজ দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। দীর্ঘ পথ হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া তিনি একটি টাট্টু (ছোট ঘোড়া) কিনিলেন; দাম দিবার সময় দেখেন, রূপার টাকা নাই, তখন ঘোড়াওয়ালাকে একটি মোহর দিলেন। সে বলিল—"তুমি বুঝি শিবাজী, নহিলে এই টাট্টুর জন্য এত বেশী দাম দিতেছ কেন?" শিবাজী থলি খালি করিয়া সব মোহরগুলি তাহাকে দিয়া বলিলেন,—"চুপ! কথাটি কহিও না।" আর ঘোড়ায় চাপিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

ক্রমে দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী-তীরে ইন্দুর-প্রদেশ পার হইয়া এই সন্ন্যাসীর দল মহারাষ্ট্রের সীমানার কাছে এক গ্রামে সন্ধ্যার সময় আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা গাঁয়ের মোড়লের স্ত্রী (পাটেলিন্)এর বাড়ীতে রাত্রির জন্য আশ্রয় চাহিল। ইহার কিছুদিন আগেই আনন্দ রাও-এর অধীনে শিবাজীর সৈন্যেরা আসিয়া এই গ্রামের সব শস্য ও ধন লুট করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পাটেলিন উত্তর করিল,—"বাড়ী খালি পড়িয়া আছে। শিবাজীর সেপাই আসিয়া সব শস্য লইয়া গিয়াছে। শিবাজী কয়েদ আছে। সেইখানেই পচিয়া মরুক," এবং তাঁহার উদ্দেশে কত অভিসম্পাত করিতে লাগিল। শিবাজী হাসিয়া নিরাজীকে ঐ গ্রামের ও তাহার পাটেলিনের নাম লিখিয়া লইতে বলিলেন। নিজ রাজধানীতে পৌঁছিবার পর পাটেলিনকে ডাকাইয়া, লুটে যাহা ক্ষতি হইয়াছিল তাহার বহুগুণ ধন দান করিলেন।

ক্রমে ভীমানদী পার হইয়া, আগ্রা হইতে রওনা হইবার পূর্ণ তিনমাস পরে নিজ রাজধানী রাজগড়ে পৌঁছিলেন (২০এ নবেম্বর)। দুর্গের দ্বারে গিয়া জীজাবাঈকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, উত্তর দেশ হইতে একদল বৈরাগী আসিয়াছে—তাহারা সাক্ষাৎ করিতে চায়। জীজাবাঈ অনুমতি দিলেন। অগ্রগামী মোহন্ত (অর্থাৎ নিরাজী) হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু পশ্চাতের চেলা বৈরাগীটি জীজাবাঈ-এর পায়ের উপর মাথা রাখিল। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, সন্ন্যাসী কেন তাঁহাকে প্রণাম করিবে? তখন ছদ্মবেশী শিবাজী টুপি খুলিয়া নিজ মাথা মাতার কোলে রাখিলেন, এতদিনের হারাধনকে মাতা চিনিতে পারিলেন! অমনি চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিল, বাজনা বাজিতে লাগিল, দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইল। মহা হর্ষে সমগ্র মহারাষ্ট্র জানিল—দেশের রাজা নিরাপদে দেশে ফিরিয়াছেন।

(১০)

শিবাজী দেশে ফিরিলেন, কিন্তু সঙ্গে পুত্রটি নাই। তিনি রটাইয়া দিলেন যে, পথে শম্ভুজীর মৃত্যু হইয়াছে।

শাজাহান ও আওরংজীব

জয়পুরে রক্ষিত একখানি প্রাচীন চিত্র

এইরূপে দাক্ষিণাত্যের পথের যত মুঘল প্রহরীদের মন নিশ্চিন্ত হইলে, তিনি গোপনে মথুরার সেই তিন ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিলেন। তাহারা পরিবারবর্গ লইয়া শম্ভুজীকে ব্রাহ্মণের বেশ পরাইয়া,কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিয়া, মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে এক মুঘল-কর্ম্মচারী তাহাদের গেরেফ্‌তার করে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহার সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ শম্ভুজীর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিল,—যেন শম্ভুজী শূদ্র নহেন, তাহাদের স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ! কৃষ্ণাজী, কাশীজী ও বিশাজী—এই তিন ভাইকে শিবাজী "বিশ্বাস রাও" উপাধি, এক লক্ষ মোহর এবং বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার জাগীর পুরস্কার দিলেন।

শিবাজীর পলায়ন আওরংজীবের মনে আমরণ আপশোষের কারণ হইয়াছিল। তিনি ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় নিজ উইলে লিখিয়াছিলেন, "শাসনের প্রধান স্তম্ভ রাজ্যে যাহা ঘটে তাহার খবর রাখা; এক মুহূর্ত্তের অবহেলা দীর্ঘকাল লজ্জার কারণ হয়। এই দেখ হতভাগা শিবাজী আমার কর্ম্মচারীদের অসাবধানতায় পলাইয়া গেল, আর তাহার জন্য আমাকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই-সব কষ্টকর যুদ্ধে লাগিয়া থাকিতে হইল।"

(১১)

জয়সিংহের পত্রাবলী হইতে শিবাজীর বন্দী-দশায় মুঘল-রাজনীতির হেরফের অতি স্পষ্ট বুঝা যায়। বাদশাহের প্রথমে অভিপ্রায় ছিল, প্রথম দিন দর্শনের পর শিবাজীকে একটি হাতী, খেলাৎ এবং কিছু মণিমুক্তা উপহার দিবেন। কিন্তু দরবারে শিবাজীর অসভ্য ব্যবহারে চটিয়া গিয়া তিনি এই দান স্থগিত রাখিলেন। এদিকে শিবাজী বাসায় ফিরিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, মুঘল-রাজসরকার তাঁহার সম্বন্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। তখন আওরংজীব জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি বাদশাহের পক্ষ হইতে শিবাজীকে কি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। উত্তরে জয়সিংহ পুরন্দর-সন্ধির শর্ত্তগুলি লিখিয়া পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে, ইহার অতিরিক্ত শিবাজীকে কোন কথা দেওয়া হয় নাই।

এদিকে আগ্রায় যখন শিবাজী কঠোরভাবে নজরবন্দী হইলেন, জয়সিংহ তখন মহাসঙ্কটে পড়িলেন। এক দিকে দাক্ষিণাত্যের আশু বিপদ লাঘব করিবার জন্য শিবাজীকে উত্তর-ভারতে সরাইয়া দিয়াছেন; অপরদিকে তিনি ধর্ম্ম শপথ করিয়াছেন যে, আগ্রায় গেলে শিবাজীর কোন অনিষ্ট বা স্বাধীনতা-লোপ হইবে না। তিনি আওরংজীবের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না, ক্রমাগত বাদশাহকে লিখিতে লাগিলেন যে শিবাজীকে বন্দী বা বধ করিলে কোন লাভই হইবে না, কারণ তিনি স্বদেশে এমন সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মারাঠারা পূর্ব্বের মতই রাজ্য চালাইতে থাকিবে; আর শিবাজী যদি নিরাপদে দেশে ফিরিতে না পারেন তবে ভবিষ্যতে কেহই বাদশাহী ওমরাদের কথা বিশ্বাস করিবে না। জয়সিংহ সেইসঙ্গে পুত্র রামসিংহকে বারবার লিখিলেন,—"দেখিও, শিবাজীর রক্ষার জন্য তোমার ও আমার আশ্বাস-বাণী যেন কোনমতে মিথ্যা না হয়, আমরা যেন প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দুর্ণামে না পড়ি।"

এদিকে শিবাজীকে লইয়া কি করিবেন তাহা আওরংজীব ভাল বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার কোনই একটা নীতি স্থির হইল না। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, জয়সিংহ বিজাপুর-রাজাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিলে, দাক্ষিণাত্য-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শিবাজীকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু সে জয়ের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিল। তখন বাদশাহ একবার বলিলেন যে, রামসিংহ শিবাজীর দায়িত্ব লইয়া আগ্রায় থাকুক, তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাইবেন। আবার বলিলেন, শিবাজীকে আফঘানিস্থানে মুঘল-সৈন্যের সহিত কাজ করিতে পাঠাইবেন; নেতাজীকে এবং পরে যশোবন্তকেও এইরূপ আফঘানিস্থানে পাঠান হইয়াছিল,—ইহা এক প্রকার দ্বীপান্তর দেওয়া। কিন্তু এ দুটির কিছুই হইল না। জয়সিংহ ও তাঁহার পুত্র একবাক্যে শিবাজীকে আগ্রায় রাখিবার ভার লইতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে

শিবাজী একমাত্র কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর জিম্মায় রহিলেন।

সেই অবস্থায় শিবাজী পলাইলেন। তাঁহার পলায়নের তিন মাসকাল এবং দেশে ফিরিবার পর প্রথম কিছুদিন ধরিয়া জয়সিংহের ভয় ও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। একে তাঁহার বিজাপুর আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে; তাহাতে বাদশাহের এবং নিজের অগাধ টাকা নষ্ট হইয়াছে, তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। ইহার উপর কষ্ট শিবাজী দেশে ফিরিয়া না জানি মুঘলদের উপর কি প্রতিহিংসা লন। এ সকলের উপর, নিজের বংশের আশা-ভরসা কুমার রামসিংহ বাদশাহের সন্দেহে পড়িয়া অপমানিত ও দণ্ডিত হইয়া আছেন। জয়সিংহের প্রথমবারকার এত যুদ্ধজয়, সরকারী কাজে নিজ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়, দীর্ঘ-জীবন ধরিয়া রাজসেবায় রক্তপাত,—সবই বিফল হইল। তাঁহার দাক্ষিণাত্য-শাসন চারিদিকে পরাজয় ও লজ্জায় পরিসমাপ্ত হইল। বাদশাহ তাঁহাকে ঐ পদ হইতে সরাইয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রম, ক্ষতি, চিন্তা ও অপমানে জর্জ্জরিত বৃদ্ধ রাজপুতবীর পথে বুর্হানপুর নগরে মরিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইলেন (২রা জুলাই ১৬৬৭)।

(১২)

বাদশাহ অবাধ্য পলাতক শিবাজীকে শাস্তি দিবার অবসর পাইলেন না। ১৬৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই পারস্য-রাজের আক্রমণের ভয়ে এক প্রবল মুঘল সৈন্যদল পঞ্জাবে পাঠানো হইল, আর তাহার পর বৎসর মার্চ্চ মাসে পেশোয়ার প্রদেশে যে ইউসুফজাই-জাতির বিদ্রোহ বাধিল তাহাতে বাদশাহের সমস্ত শক্তি বহুদিন ধরিয়া সেখানে আবদ্ধ রহিল।

দেশে ফিরিয়া, শিবাজীও মুঘলদের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহিলেন না; তিন বৎসর পর্য্যন্ত শান্তভাবে রহিলেন, নিজ রাজ্যের শাসনপ্রণালী-গঠন এবং সুচারুরূপে জমির বন্দোবস্ত করিলেন; কোঁকন-প্রদেশে নিজ অধিকার বিস্তৃত করিতে লাগিলেন।

এ অবস্থায় বাদশাহের সঙ্গে সন্ধি করায় তাঁহার লাভ। তিনি মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে লিখিলেন,—"বাদশাহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। নচেৎ আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজবলে কান্দাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দিই। আমি শুধু প্রাণের ভয়ে আগ্রা হইতে পলাইয়াছি। মির্জা রাজা জয়সিংহ আমার মুরুব্বী ছিলেন, তিনি আর নাই। এখন আপনার মধ্যস্থতায় যদি আমি বাদশাহের ক্ষমা লাভ করি, তবে আমি আমার পুত্রের সহিত সৈন্যদলকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা কুমার মুয়জ্জমের অধীনে কাজ করিতে পাঠাইয়া দিতে পারি।"

যুবরাজ ও যশোবন্ত এই প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া বাদশাহকে লিখিলেন। আওরংজীব সম্মত হইয়া শিবাজীর 'রাজা' উপাধি মঞ্জুর করিলেন। ১৬৬৭ সালের ৪ঠা নবেম্বর শম্ভুজী আসিয়া আওরঙ্গাবাদে যুবরাজ মুয়জ্জমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে প্রতাপরাও (নূতন সেনাপতি) এবং নিরাজীর অধীনে শিবাজীর একদল সৈন্য আসিয়া বাদশাহের কাজ করিতে লাগিল। তজ্জন্য শম্ভুজীকে পাঁচ হাজারী মন্‌সবের উপযুক্ত জাগীর বেরার প্রদেশে দেওয়া হইল। এইরূপে "দুই বৎসর পর্য্যন্ত মারাঠা-সৈন্য মুঘল-রাজ্যের জমি হইতে পেট ভরাইল, শাহজাদাকে বন্ধু করিল।" [সভাসদ, ৬০-৬১]

১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯ এই তিন বৎসর শিবাজী শান্তিতে কাটাইলেন,—বিজাপুর বা মুঘল-রাজ্যে কোন উপদ্রব করিলেন না। তাহার পর ১৬৭০ সালের প্রথমেই আবার বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। ইহার কারণ নানা লোকে নানা রকম বলে। এক গ্রন্থে আছে, নিন্দুকেরা আওরংজীবকে জানাইল যে শাহজাদা মুয়জ্জম শিবাজীর সহিত গাঢ় বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সাহায্যে স্বাধীন হইবার চেষ্টায় আছেন, এবং এই কথা শুনিয়া বাদশাহ শিবাজীর পুত্র ও সেনাপতিদের হঠাৎ বন্দী করিবার জন্য মুয়জ্জমকে হুকুম পাঠাইলেন; কিন্তু কুমার বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া গোপনে মারাঠাদের ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা আওরঙ্গাবাদ হইতে দলবল লইয়া রাত্রে পলাইয়া গেল।

অপর এক বিবরণ এই যে, বাদশাহ আয়বৃদ্ধি করিবার

দেয়, ১৬৬৬ সালে আগ্রা যাইবার জন্য শিবাজীকে যে একলক্ষ টাকা অগ্রিম দেন, এখন তাহা তাঁহার বেরারের নূতন জাগীর জব্‌ত্‌ করিয়া আদায় করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে শিবাজী চটিয়া বিদ্রোহী হইলেন।

আসল কথা, এই তিন বৎসরে শিবাজী বলবৃদ্ধি ও এবং রাজ্যের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, এখন দেখিতে চাহিলেন যুদ্ধে কত লাভ হয়।

সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মদেশনা

শ্রীভানুভূষণ দাশগুপ্ত

সম্প্রতি ভিক্ষু সিদ্ধার্থের সাহায্যে এবং সৌজন্যে সিংহলের ধর্ম্মদেশনা সুচারুরূপে দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। এদেশে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য এবং "মন্তব্য" বস্তুর অভাব নাই। যাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন তাঁহারাই এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। এদেশের সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু আচার-ব্যবহার এবং অনুষ্ঠান আমাদের চক্ষে নূতন এবং চিত্তাকর্ষক। কোন কোন বাঙালী পর্য্যটকের কৃপায় এবং মাসিকপত্রের সহযোগিতায় এদেশের অল্পবিস্তর পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। আজ ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি চিত্র বাঙালী পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ধর্ম্মদেশনা সিংহলী বৌদ্ধদিগের অনুষ্ঠান। বৌদ্ধধর্ম্মকে এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম বলিলেই চলে। অধিবাসীদিগের শতকরা বাসট্টি জন বৌদ্ধমতাবলম্বী। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অল্পদিনের মধ্যেই সিংহলে ইহার উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এদেশের লোকের বিশ্বাস স্বয়ং তথাগত কয়েকবার সিংহলে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মের চিহ্ন এবং চর্চ্চা খুবই ক্ষীণ, সিংহলে তাহার পতাকা দৃপ্তভাবেই উড়িতেছে। যে-সব অনুষ্ঠান আমরা এখন ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহার বেশীর ভাগই কোন কালে আমাদের দেশে জাগ্রত অবস্থায় ছিল। তখন এই ধর্ম্মদেশনার 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'—সমস্বরে বহুজনকণ্ঠে বাংলা, বিহার, কলিঙ্গ ব্যাপিয়া হয়ত ধ্বনিত হইত। মনে হয় বহু শতাব্দী পরে সিংহলে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ভারতের লোকের পক্ষে তাই ইহাদের অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষ করিয়া দেখিবার এবং বুঝিবার জিনিষ। এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীনকালে যে রূপে দেখা দিয়াছিল, সেই একই আকার এখনো বজায় আছে বলা চলে না। হয়ত সময়ের সঙ্গে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধপন্থীদের সকলেই যে গোঁড়া এবং আচারনিষ্ঠ তাহা নহে। অহিংসা মনে এবং বাক্যে সকলেই মানিয়া চলে বলা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধ বিহার বা বৌদ্ধ সঙ্ঘ (ভিক্ষুসমাজ) ইহাদের কোনটিই লুপ্ত হয় নাই। আর ইহাদের সঙ্গে র হয়াছে ধর্ম্মদেশনা বা নিমন্ত্রিত ভিক্ষুর মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার এবং ব্যাখ্যা' ইহা হিন্দুর দেবপূজা বা গির্জ্জায় খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মযাজকের উপদেশ নহে। ইহার সঙ্গে আমাদের দেশের ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনার খানিকটা আত্মীয়তা থাকিলেও, উভয়ের দূরত্ব স্পষ্ট। বৈষ্ণব কথকতার স্মৃতি এবং আভাসও কিছু ইহার মধ্যে পাইয়াছি মনে হয়,—যদিও উভয়ের স্বরূপ বিভিন্ন। ইহার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই ইহার কথা লিখিতেছি।

সাধারণতঃ কতকগুলি বিশেষ তিথিতে এই ধর্ম্মদেশনার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথি এইজন্য প্রশস্ত। এগুলিকে 'উপোসথ' দিবস বলা

হয়। 'উপবাস' শব্দের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও 'উপোসথ' তিথিতে কেবল উপবাসই নির্দিষ্ট হয় নাই; তৎসঙ্গে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানও বিহিত রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া পূর্ণিমা রাত্রিতেই এই ধর্ম্মদেশনার আহ্বান করা হয়। আজকাল অবশ্য রবিবার 'উপোসথ' তিথির সামিল করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং আমন্ত্রিত ভিক্ষু এবং সমাগত শ্রোতৃগণের সুবিধার জন্য রবিবারেই সাধারণতঃ ধর্ম্মদেশনা করা হয়। গ্রামের কোন উদ্যোগী লোক চেষ্টা করিয়া কোন ভিক্ষুকে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামস্থ বিহারে ধর্ম্মদেশনা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ভিক্ষুর আসা-যাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একলা অথবা গ্রামের অন্য লোকের সাহায্যে বহন করেন। ধর্ম্মদেশনা রাত্রি আটটা নয়টা হইতে আরম্ভ হইয়া তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া চলে। কাজেই ভিক্ষুর সেই রাত্রিতে ফিরিয়া আসিবার সুবিধা না থাকিলে, তাঁহার এবং তাঁহার ভৃত্যের থাকিবার বন্দোবস্ত গ্রামস্থ বিহারে করিতে হয়। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দ্বারা চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে ধর্ম্মদেশনার কথা প্রচার করা হয়।

আমরা যে গ্রামে দেশনা শুনিতে গিয়াছিলাম তাহা কলম্বো হইতে উত্তরে আন্দাজ বাইশ মাইল দূরবর্ত্তী। পূর্ব্বেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ছিল। ভিক্ষু সিদ্ধার্থের সঙ্গে সন্ধ্যার পর এক মোটরে আমি যাত্রা করিলাম। ২৪শে এপ্রিল পূর্ণিমা তিথি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তায় আমরা যতটা চন্দ্রকিরণ না পাইয়াছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী পাইয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবাত ও বর্ষণ। এমন কি এক সময় বর্ষণ এরূপ ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছিল যে, আমাদের কিছুক্ষণ পথিমধ্যে একস্থানে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে সিংহলে বর্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু কোন্ তারিখে তাহা শেষ হয় তাহা কোনো পঞ্জিকায় লেখে না। প্রায় সমস্ত বৎসরই অল্পাধিক বৃষ্টি দেখিতে পাই। পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম্মদেশনা না হইলেও সমস্ত বিহারেই অন্যপ্রকারের কোন-না-কোন উৎসব হয়। আমরা পথে দেখিতে পাইলাম এই বৃষ্টি-বাদল তুচ্ছ করিয়াও বহু পুরুষ এবং নারী এইরূপ কোন নিকটবর্ত্তী মন্দিরের উৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছে। প্রায় আটটার সময় আমরা গনেমূল্ল গ্রামে পৌছিলাম। যিনি উদ্যোগ করিয়া এই ধর্ম্মদেশনার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তিনি একজন সমৃদ্ধিশালী লোক, নারিকেলের প্রকাণ্ড জমিদারীর মালিক। দেখিতে পাইলাম রাস্তার দুই পাশে কিছুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত দীর্ঘ নারিকেল-বৃক্ষশ্রেণী শির উচ্চ করিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে। তিনি 'মহান্দিরম্' উপাধিধারী। ইহা আমাদের দেশের রায়-সাহেবের অনুরূপ। তাঁহার বিরাট সুরম্য হর্ম্ম্য শ্যামল পল্লীর বক্ষে গর্ব্বভরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। মহান্দিরম্ মহাশয় অতি সমাদরে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। নিজের খরচে জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো ইত্যাদি স্থাপিত করিয়া মহান্দিরম্ মহাশয় বাড়ীটিকে সভ্যতা এবং নাগরিকতার সকল উপকরণে ভূষিত করিয়াছেন।

রাত্রি নয়টার সময় ধর্ম্মদেশনা আরম্ভ হইবার কথা। ইতিমধ্যেই ভিক্ষুর আগমন-সংবাদ ভেরী এবং ঘণ্টানাদ দ্বারা ঘোষিত হইয়াছিল। আমরা গ্রামে যাইবার পরেই থাকিয়া থাকিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। ভিক্ষু বিহার-প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করামাত্র বাদ্য এবং ঘণ্টাধ্বনি করিবার নিয়ম। তারপর গ্রামের লোকেরা সারি বাঁধিয়া ছোট একটি শোভাযাত্রার আকারে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘাবাসে লইয়া যায়। সিংহলে নানা প্রকার জয়ধ্বনি শুনিয়াছি কিন্তু আমাদের দেশের মঙ্গলসূচক উলুধ্বনি কোথাও শুনি নাই। ভিক্ষু দেশনার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সঙ্ঘাবাসে বিশ্রাম করেন। সেখানে কেহ তাঁহাকে পাখার বাতাস করে, কেহ পানীয়াদি দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ফলের রস হইতেই পানীয় প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয়।

এইখানে এদেশের বৌদ্ধ-বিহারের বিভিন্ন অংশের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। বিহারের সাধারণতঃ পাঁচটি অংশ থাকে,—বুদ্ধালয়, চৈত্য, সঙ্ঘাবাস, ধর্ম্মশালা এবং বোধিদ্রুম। এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিতেই বিহার,—

যদিও প্রায়ই বিহার শব্দটি কেবলমাত্র বুদ্ধালয় (সিংহলী 'বুদুগে' অর্থাৎ বুদ্ধগৃহ) বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধালয় বিহারের কেন্দ্রস্বরূপ। এইখানে তথাগতের নানা-আকারের প্রতিমূর্ত্তি এবং প্রতিকৃতি সংরক্ষিত আছে। কোন কোন মন্দিরে অতি প্রকাণ্ড শায়িত বুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। দেওয়ালে বুদ্ধের জীবন-ইতিহাস এবং জাতকের বহু উপাখ্যান চিত্রে লিখিত রহিয়াছে। প্রত্যহ বহুলোক শায়িত বুদ্ধের চরণে পূজা নৈবেদ্য উপহার দিতে আসিয়া থাকে। মন্দিরের অভ্যন্তর যেমন পবিত্র তেমনি মনোরম। বুদ্ধালয়ের পর চৈত্য, চৈত্যের অভাবে কোন বিহার সম্পূর্ণ হয় না। ইহা অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার বিরাট একটি ইটকস্তূপ। ঘণ্টা বিপরীত করিয়া বসাইলে ইহার আকার কল্পনা করা যাইতে পারে। চতুর্দ্দিকে কোথাও একটু ফাঁক নাই, সম্পূর্ণ নিরেট করিয়া গাঁথা। অভ্যন্তরে বুদ্ধের শরীরের কোন অংশ বা ধাতু রক্ষিত আছে বলিয়া এখানে ইহার আর এক নাম ধাতুগর্ভ (সিংহলী 'ডাগোবা')। বৌদ্ধ কীর্ত্তির মধ্যাহ্নে অনুরাধপুরে যে-সব বিরাট পর্ব্বতাকার ডাগোবা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিলে আজও বিস্মিত হইতে হয়। যাত্রীরা ডাগোবা শ্রদ্ধাভরে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। বিহারের তৃতীয় জিনিষ সঙ্ঘাবাস। সঙ্ঘাবাস বিহার-সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুদিগের বাসস্থান। সিংহলী ভাষায় ইহার নাম 'পানশালা'—সংস্কৃত পর্ণশালা শব্দের অপভ্রংশ। নিমন্ত্রিত ধর্ম্মদেশক ভিক্ষুকে এই পানশালাতেই বিশ্রামের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। চতুর্থ জিনিষ ধর্ম্মশালা। ইহা নাতিবৃহৎ একটি মণ্ডপের আকারে তৈরী, চতুর্দ্দিক খোলা, অনেকটা আমাদের দেশে বহির্বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদির জন্য যে প্রকারের মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায় সেই ধরণের। এখানে ধর্ম্মদেশনা এবং অন্যান্য উৎসব ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে ধর্ম্মশালা কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার সঙ্গে ইহার কোন অর্থসংযোগ নাই। বিহারের পঞ্চম বস্তু বোধিদ্রুম। ইহা অতি পবিত্র বস্তু। শাক্য-সিংহ ইহার নিম্নে বুদ্ধত্ব বা দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, এই বৃক্ষের নাম হইয়াছে বোধিদ্রুম। অনুরাধ-পুরে যে অতি প্রাচীন এবং বিশাল বোধিদ্রুম রহিয়াছে, কথিত আছে তাহা ভারতের সেই আদি বোধিদ্রুমের শাখা-প্রসূত। প্রথম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের সময় সযত্নে একটি শাখা আনিয়া প্রোথিত করা হইয়াছিল। তারপর অন্যান্য বিহারে আবার তাহা হইতে শাখা আনিয়া রোপণ করা হয়। অধিকাংশ বিহারের বোধিদ্রুমই অনুরাধপুরের প্রবীণ পিতামহ বৃক্ষের বংশজ। সিংহলে বৌদ্ধেরা অশ্বত্থগাছ মাত্রকেই অতি সম্মান এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই পাঁচটি ছাড়াও অন্য আর একটি জিনিষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ঘণ্টাস্তম্ভ। স্তম্ভ আলাদা না থাকিলেও ঘণ্টা প্রত্যেক বিহারে থাকিতেই হইবে। ঘণ্টাস্তম্ভ বিহারের একটি আবশ্যক প্রতিষ্ঠান। খৃষ্টান গির্জ্জার ঘণ্টাস্তম্ভের (belfry) সঙ্গে ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। আমরা গ্রামে উপস্থিত হইয়া অবধি নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলাম। ভিক্ষুর আগমন-সংবাদ এইরূপে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘোষিত হইতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে হইতেই পুরুষ এবং নারী বহুসংখ্যায় ধর্ম্মশালাতে উপস্থিত হইয়াছিল। বাহিরের দুর্য্যোগ ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের দূরে রাখিতে পারে নাই। শ্রোতারা নিজেদের আসন নিজেরাই যোগাড় করিয়া লইয়া যায়; এক্ষেত্রে সাধারণ মাদুর মাটিতে পাতিয়া সকলে বসিয়া থাকে। সিংহলে পর্দ্দাপ্রথা নাই বলিয়া পুরুষ এবং নারী সকলেই পাশাপাশি বসিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ভিক্ষুর আসন উচ্চ একটি বেদীর উপরে গৃহের মাঝখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেরোসিন পেট্রোলের কৃপায় আজকাল উজ্জ্বল বাতির অভাব হয় না। ধর্ম্ম-শালাটি সুন্দরভাবে আলোকিত হইয়াছিল। ধর্ম্মশালায় ভিক্ষুর প্রবেশের একটু আগে ছোটখাট একটি নিলামপর্ব্ব দেখিলাম। ইহা আধুনিক জিনিষ। বিহারের কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে চাঁদা-আদায়ের এই অতি আধুনিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটু বিচিত্রতা আছে। সাধারণতঃ ধর্ম্মদেশনার আগে বা পরে একটি ফুলের তোড়া বা এই ধরণের কোনো জিনিষ নিলামে তোলা হয়। প্রত্যেকে যত পয়সা ডাক বাড়াইবে

তত পয়সা দিবে। যদি একজন বলে চার আনা, আর একজন তার উপরে বলে ছয় আনা, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি দুই আনা দিবে। এইরূপে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নয় আনায় উঠিলে তাহাকে তিন আনা দিতে হইবে, সমস্ত নয় আনাই নয়। কাজেই প্রায় ২৫।০ টাকা মূল্যে যখন সর্ব্বশেষে ফুলের তোড়াটি বিক্রী হইল, তার অর্থ এই নয় যে শেষ ব্যক্তি এই মূল্যে ইহা ক্রয় করিল। সে হয়ত তার পূর্ব্বব্যক্তি অপেক্ষা দুই আনা বেশী দিয়াই তোড়াটি লাভ করিল। সৌভাগ্যবান ক্রেতা সাধারণতঃ তোড়াটি বিহারেই উপহার দিয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাব বাড়াইবার জন্য শেষ ক্রেতাকে ঘড়ি ইত্যাদি কোনোরূপ আলাদা উপহারও দেওয়া হয়।

ভিক্ষুর ধর্ম্মশালায় প্রবেশ একটি সুন্দর দৃশ্য। তিনি ধীরে ধীরে ধর্ম্মশালার দিকে আগমন করেন। তাঁহার অগ্রে পশ্চাতে সারি বাঁধিয়া কয়েকজন লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়া থাকে। সোপানে পা দেওয়া মাত্র সমবেত জনমণ্ডলী দাঁড়াইয়া 'সাধু' 'সাধু' শব্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করে। অন্যদিকে ঘণ্টা এবং বাদ্যের মঙ্গলধ্বনি হয়। সোপান-নিম্নে ভিক্ষুর পা ধোয়াইয়া দেওয়া হয়। একজন জল ঢালিবে, অন্য একজন প্রক্ষালন করিবে, আবার আর একজন পরিষ্কার কাপড় দিয়া পা মুছাইয়া দিবে, এই সাধারণতঃ নিয়ম। এই সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কোনো অধিকার নাই। শাস্ত্রমতে ভিক্ষুদের কোনো বিষয়ে নারীদের সংস্পর্শে আসা বারণ। এমন কি কোনো স্ত্রীলোক পা ছুঁইয়া তাহাকে প্রণামও করিতে পারিবে না। পদপ্রক্ষালনের পর ভিক্ষুর জন্য বেদী পর্য্যন্ত শুভ্রবস্ত্র পাতিয়া দেওয়া হয়, তিনি তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যান। স্ত্রীলোকেরা কখনো কখনো রুমাল বা মূল্যবান শাল ইত্যাদি পাতিয়া দিয়া মঙ্গল এবং পুণ্য অর্জ্জন করিয়া থাকে। কদাচিৎ বা পুরুষেরা তাহাদের দীর্ঘ বেণী ভিক্ষুর পদনিম্নে লুটাইয়া দেয়। ভিক্ষু সিদ্ধার্থ আমাকে বলিয়াছেন এমন অভিজ্ঞতা তাঁহার অনেকবার ঘটিয়াছে। সিংহলে পুরুষেরাও কেশ দীর্ঘ করিয়া রাখে, যদিও বর্ত্তমানে এই রীতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোকের কেশ যে ভিক্ষু স্পর্শ করিবেন না, তাহা না বলিলেও চলে।

ভিক্ষু আসন গ্রহণ করিলে সমবেত লোকেরা আবার উচ্চৈস্বরে সাধু সাধু রব করিয়া নিজেরা ভূমিতে আসন গ্রহণ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বসিবার জন্য দর্শকেরা মাদুর বাড়ী হইতে লইয়া আসে। কেহ কেহ আপন মাদুর বিহারেই রাখিয়া যায়, পুনর্ব্বার ব্যবহার করিবার জন্য। চেয়ার ইত্যাদির প্রচলন নাই—একমাত্র ভিক্ষুর জন্য উচ্চ মঞ্চের উপরে চেয়ারে আসন নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমি মঞ্চের নিকটেই স্থান পাইয়াছিলাম। ভিক্ষু আসন গ্রহণ করিলে শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া তাঁহাকে তাহাদের নিকট ধর্ম্মদেশনা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। এই অনুরোধ উপযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত, হয় সিংহলী ভাষায় নতুবা পালি শ্লোকের সাহায্যে করা হয়; তখন সাধু সাধু রবে সভাস্থ সকলে ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিল এবং

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স

এই শ্লোক সমস্বরে তিনবার সভাকর্ত্তৃক উচ্চারিত হইল; তাহার পর ধর্ম্মদেশক শরণাগমন এবং পঞ্চশীল আবৃত্তি করিয়া তাঁহার দেশনা আরম্ভ করিলেন। ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলমন্ত্রস্বরূপ। অতি গম্ভীর ধ্বনিতে গীত হইল।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।
বুদ্ধের ধর্ম্মের এবং সঙ্ঘের অর্থাৎ ভিক্ষুগণের শরণ লইলাম।
দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
দ্বিতীয়বার বুদ্ধের, ধর্ম্মের এবং সঙ্ঘের শরণ লইলাম।
ততিয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি।
তৃতীয়বার বুদ্ধের ধর্ম্মের এবং সঙ্ঘের শরণ লইলাম।

তার পরে পঞ্চশীল।

পাণাতিপাতা বেরমণি
সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

প্রাণীহত্যা হইতে বিরত থাকিবার ব্রত গ্রহণ করি।

অদিন্নাদানা বেরমণি
সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

অদত্ত বস্তু গ্রহণে বিরত থাকিব, এই ব্রত গ্রহণ করি।

কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণি
সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

অন্যায়রূপ ইন্দ্রিয় সুখ হইতে বিরত থাকিব, এই ব্রত গ্রহণ করি।

মুসাবাদা বেরমণি
সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

অনৃতবাদ হইতে বিরত থাকিব, এই ব্রত গ্রহণ করি।

সুরামেরমজ্জ পমাদট্‌ঠানা বেরমণি
সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

সুরা ইত্যাদি প্রমাদের কারণভূত মদ্য হইতে বিরত থাকিব, এই ব্রত গ্রহণ করি।

—এই উভয় আবৃত্তি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। তারপর দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষু গাহিলেন—

সমন্তা চক্কবালেসু অত্রাগচ্ছন্তু দেবতা
সদ্ধম্মং মুনিরাজস্স সুণন্তু সগ্গ মোক্‌খদং।

সমস্ত চক্রবাল হইতে দেবতারা আগমন করুন এবং স্বর্গমোক্ষদানকারী এই বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করুণ।

সমবেত লোকসকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি সুরসংযোগে তিনবার ঘোষণা করিলেন

ধম্ম সরণ কালো অয়ং ভদন্তা।
হে ভদ্রগণ, ধর্ম্মশরণ কাল উপস্থিত হইয়াছে।

অতঃপর আবার প্রার্থনা উচ্চারিত হইল,—এইবার কেবল ধর্ম্মদেশকের কণ্ঠে—

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।
সেই পূজনীয় ভগবান সম্যক্‌ সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

এইখানেই ধর্ম্মদেশনার আদিকাণ্ডের শেষ বলিতে পারা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ উপদেশক, বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের জয়গান করিয়া পালি গাথা হইতে আরও কিছু স্তোত্র এবং শ্লোক আবৃত্তি করিয়া এই অংশের শেষ করেন।

অতঃপর দেশনার মধ্যভাগ বা ব্যাখ্যান অংশ। যেহেতু ধর্ম্মের তত্ত্ব গোপন গুহাতলে নিহিত, সাধারণের নিকট তাহার কিছু উদ্ধার করিয়া অধিগম্য করা এই ব্যাখ্যান অংশের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশাস্ত্র পালি ভাষায় লিখিত। ধর্ম্মদেশক তাহার কোনো অংশ উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতাদের নিকট তাহার বিশদরূপে অনুবাদ ও অর্থ করেন। নানাপ্রকারে নানাদিক দিয়া তিনি ইহার তাৎপর্য্য আলোচনা করেন। ভাল বক্তা এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত না হইলে কোনো ধর্ম্মদেশকের পক্ষে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অন্ধের পক্ষে অন্য অন্ধকে চক্ষুদান করার চেষ্টা বৃথা। এক্ষেত্রে ভিক্ষু সিদ্ধার্থের ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ দখল, দেশনা কার্য্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতা বহুকালব্যাপী। তিনি অতি সুন্দরভাবে অনিত্যতা, দুঃখ এবং অনাত্মতা সম্বন্ধে একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন। কখনো উচ্চ দর্শন অবতারণা করিলেন, কখনো অতি সাধারণ ভাষায় সরল গ্রাম্য লোকের উপযোগী করিয়া বুঝাইলেন। কখনো অর্থ করিলেন, কখনো তাহার সহিত উপদেশ যোগ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বিষয়টি তিনি আলোচনা করিলেন তাহা দুঃখ এবং মৃত্যু সম্বন্ধে। এরূপ কঠিন বিষয় যে অন্য কোনো লোকের পক্ষে অধিকতর প্রাঞ্জল করা সম্ভব হইত না, তাহা আমি সিংহলী শ্রোতাদের মুখে শুনিয়াছি।

শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সহিত দেশনা শ্রবণ করে। প্রথম হইতেই একজন তাহাদের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকটি বাক্য সমাপ্ত হইলেই

এহেই স্বামিনি বা এহেই হামদুরুবনে
অর্থাৎ, প্রভু, ইহাই ঠিক

এই বলিয়া মনোযোগ, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জ্ঞাপন করে। দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া এই ভাবে ভিক্ষুর বাণী সমর্থন করিয়া যাওয়া সহজ কথা নহে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশনা ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কিন্তু ভিক্ষুর মুখ হইতে নিঃসৃত একটি বাক্যও অননুমোদিত থাকে না।

দুই ঘণ্টা পরে যখন ব্যাখ্যান সমাপ্ত হইল তখন চারিদিকে উচ্চকণ্ঠে 'সাধু সাধু' ধ্বনিত হইল। ব্যাখ্যানের ভিতরেও যখনই কোনো শ্রোতাদের মনোমত লাগিল, তখনই সাধু রব উত্থিত হইতেছিল। দেশনার বিষয়টি একটু বেশী উচ্চস্তরের বলিয়া, সাধারণের উপকারার্থ মহান্দিরম্‌ মহাশয় ভিক্ষুকে মদ্যপান এবং প্রাণঘাতসম্বন্ধে তৎপরে কিছু বলিতে বিনীতভাবে অনুরোধ করিলেন। সিংহলে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এই দুইটি প্রমোদ ক্রীড়ার যথেষ্ট প্রচলন আছে। উপদেশক তদনুসারে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। দেশনার শেষে দেশককে কিছু উপহার দেওয়া রীতিসম্মত। কখনও চীবর (সিংহলী চিউর), কখনো জুতা, ছাতা, কম্বল, কুশন (cushion) ইত্যাদি অনেক রকম জিনিষ এই

উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ভিক্ষু সিদ্ধার্থের গৃহে আমি এই-রূপে প্রাপ্ত বহুপ্রকারের বস্ত্র স্তূপীকৃত দেখিয়াছি। যে-কোনো উপস্থিত শ্রোতার এই উপহার দেওয়ার অধিকার আছে। তবে নিমন্ত্রক, একেত্রে মহান্দিরম্ মহাশয়কে কিছু দিতেই হইবে, এই নিয়ম। উপহারের জিনিষগুলিকে তারপরে সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া এবং স্পর্শ করাইয়া আনা হয়। ইহার অর্থ, যেন সকলের পক্ষ হইতেই উপহার দেওয়া হইল।

এই পর্ব্ব শেষ হইলে ভিক্ষু পুণ্যানুমোদনা করিলেন। ইহাতে তিনি ধর্ম্মের গুণানুকীর্ত্তন করিলেন, যেহেতু ধর্ম্মই লোকসকলের আশ্রয়। বুদ্ধ এবং শাসন মানিয়া চলা সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিলেন। অন্যান্য কথার পরে, উপহার দেওয়ার প্রথার (ইহার বিশেষ নাম ধর্ম্মপূজা) প্রশংসা করিলেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া যাহা উপহার দেওয়া হইল তাহার অবশ্য কোনো উল্লেখ তিনি করিলেন না। ধর্ম্মপূজার উপকারিতা-সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে কিছু বলিলেন। তৎপরে তিনি অতি মনোরম প্রার্থনা করিয়া দেশনার উপসংহার করিলেন। ইহাতে তিনি দেবতাদিগকে পুণ্য সম্প্রদান করিলেন, যাহাতে তাঁহারা দেশ এবং শাসন রক্ষা করেন। সমবেত শ্রোতাদিগকে, তাহাদের আত্মীয়, বন্ধু, গুরু এবং আচার্য্য-গণকে পুণ্য অর্পণ করিলেন। এবং অবশেষে 'তোমাদের মনুষ্যলোকে সুখ হউক, তোমরা দিবিলোকে শান্তি এবং পরিশেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হও,' এই বলিয়া তাঁহার কথা সমাপ্ত করিলেন।

চারিদিকে আবার রব উঠিল সাধু সাধু। ভিক্ষু তারপরে সুর করিয়া নিম্নলিখিত পালিগাথা গাহিলেন—

আকাসট্‌ঠাচ ভুম্মট্ঠা
দেবানাগা মহিদ্ধিকা
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা
চিরাং রক্খন্তু সাসনং।

আকাশস্থ, ভূমিস্থ মহানুভবসম্পন্ন দেবনাগ সকল এই পুণ্যকে অনুমোদন করিয়া বুদ্ধের শাসন চিরকাল রক্ষা করুন।

দেবো বস্সতু কালেন
সস্সা সম্পত্তি হোতুচ
ফীতো ভবতু লোকোচ
রাজা ভবতু ধার্ম্মিক।

যথাকালে বর্ষণ হউক, শস্য-সম্পত্তি হউক, লোকসকল প্রীত হউক, এবং রাজা ধার্ম্মিক হউক।

ভিক্ষু থামিলে মনে হইল সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে এই আবৃত্তির তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

এইখানে দেশনার শেষ। তারপরে আবার অগ্রে-পশ্চাতে লোক সমভিব্যাহারে ভিক্ষুকে সঙ্ঘাবাসে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি রাত্রি যাপন করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছা করিলে সেই রাত্রেই চলিয়া আসিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মোটর প্রস্তুত থাকায় আমরা সেই রাত্রিতেই কলম্বোতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ মেঘনির্ম্মল। মধ্যরাত্রির পূর্ণচন্দ্র দিকে দিকে সুধা বর্ষণ করিতেছে। নির্জ্জন কোলাহলশূন্য গ্রাম্য রাস্তার ভিতর দিয়া নারিকেল-শ্রেণীর পথ অতিক্রম করিয়া আমরা যখন কলম্বোতে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে।

ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মদেশনা। এই মনোরম অনুষ্ঠানটির নিখুঁৎ একটি চিত্র দিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রঙে এবং রেখায় অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। যেখানে স্থান পল্লীক্রোড়ের শান্ত সুন্দর বিহার, কাল পূর্ণিমার রাত্রি, এবং পাত্রপাত্রী ভক্তিপ্লুত নরনারী, সেখানকার বাস্তব নাট্য-কথায় পরিস্ফুট করা সহজ নহে। আশা করি, সিংহলে পদার্পণ করিলে বাঙালী পাঠক-পাঠিকাগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মদেশনা দেখিয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীমতীর শিকার

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতীর সখ এবং বাসনা, তিনি একটি বাঘ মারিবেন। তার অর্থ ইহা নয় যে, সহসা তাঁর মাথায় খুন চাপিয়াছে, বা ভারতবর্ষকে নিরাপদ এবং অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য করিয়া তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থ আরো গভীর। লুনা, শ্রীমতীর প্রিয়সখী, আফ্রিকায় জনৈক আলজিরিয় চালকের নেতৃত্বে এগারো মাইল বিমান-বিহার করিয়া সম্প্রতি খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। লুনা'র সেই খ্যাতির উপর টেক্কা দিতে হইলে স্বহস্ত-নিহত বাঘের ছালের উপর দাড়ানো ছবি দেশবিদেশের কাগজে ছাপা ভিন্ন উপায় আর নাই। তাই বাঘ একটা মারিতেই হইবে।

শ্রীমতী সঙ্কল্প করিলেন, বাঘ মারিবার পর, দেশে ফিরিয়া লুনাকে তার কীর্ত্তির জন্ত অভিনন্দিত করিবার অজুহাতে তাঁর কার্জ্জন ষ্ট্রীট-ভবনে এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করিবেন—সেদিন উক্ত বাঘছালের 'রাগ' ভোজনকক্ষের মেঝের অনেকটা এবং আলাপ-আলোচনার সমস্তটাই জুড়িয়া থাকিবে! ইহাও স্থির করিলেন, লুনাকে তার আগামী জন্মদিনে উক্ত বাঘের নখের একটি ব্রূচ উপহার দিবেন; মনের মাঝে তার একটা নক্শাও আঁকা হইয়া গেল। ক্ষুধা ও প্রেমের তাড়নায় বিপর্য্যস্ত জগতে শ্রীমতী ছিলেন ব্যতিক্রম-বিশেষ; লুনার প্রতি হিংসাই তার চিন্তাধারা ও কার্য্যকলাপকে নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করিত।

বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে, উদ্যমও বেশি খরচ না হয়, এমনিভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে বাঘ মারার স্থযোগের জন্ত তিনি হাজার টাকা বকশিশ কবুল করিলেন। ভাগ্য স্থপ্রসন্ন—খবর আসিল, নিকটবর্ত্তী গ্রামে ঠিক সেই সময় উক্ত শ্রেণীর এক জীব আড্ডা গাড়িয়াছে। সম্ভ্রান্ত বনেদি ঘরের বাঘ, বয়স কিঞ্চিৎ বেশি হইয়াছে মাত্র। শিকারে অক্ষম, তাই অধুনা ছোটখাট গৃহপালিত পশু ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। একে হাজার টাকা বকশিশ, তায় বাঘ-শিকারের মজা; লোভে আর উত্তেজনায় লোকের আহারনিদ্রা ঘুচিয়া গেল। কাঁসি কাঁসর কানেস্তারা হাতে লইয়া আশপাশে বনবাদাড়ের ধারে ধারে ছেলের দল পাহারায় মোতায়েন হইল। দিনরাত্ত কড়া পাহারা, যেন শিকারের লোভে দুর্ম্মতিবশত বুড়ো বাঘ স্থানান্তরে চলিয়া না যায়, যেমন করিয়া হোক সেটা নিবারণ করা চাই! বর্ত্তমান বাসভূমির প্রতি তার আসক্তি অটুট রাখিবার জন্ত সন্ত্বাদরের ছাগশিশু সুচিন্তিত অসাবধানতার সহিত ইতস্তত বাঁধিয়া রাখা হইল। উদ্বেগের তবুও শেষ নাই। ধরো, এমনও ত হইতে পারে যে, মেমসাহেবের শিকারের নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে স্থবির বাঘ পটল তুলিয়া বসিল! সর্ব্বনাশ! তবে ত সব মাটি! বাঘের সুস্থ ও সবল থাকা একান্ত আবশ্যক, ইহা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। এমন কি দিনান্তে ক্ষেতের কাজ সারিয়া বনের মাঝ দিয়া বাঁড়ি ফিরিবার সময় চাষার মেয়েরাও ধমক দিয়া কোলের শিশুর কলভাষণ বন্ধ করিয়া দিতে সুরু করিল, পাছে সেই প্রাচীন পশু-অপহারকের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়া তার শরীর অসুস্থ হয়! উদ্বেগ এতই!

অবশেষে সেই স্মরণীয় রাত্রি সমাগত হইল—নির্মেঘ ও জ্যোৎস্না-বিভাসিত। গাছের উপর মাচা, তদুপরি দিব্য আরামে বসিলেন শ্রীমতী ও তাঁর বেতনভুক্ সহচরী মেব্‌্‌লিন্। অনতিদূরে খোটাবদ্ধ এক ছাগশিশু তীক্ষ্ণস্বরে অবিরাম ব্যা-ব্যা করিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই ধ্বনি কথঞ্চিৎ বধির বাঘের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করা উচিত। বন্দুক হাতে ধরিয়া শ্রীমতী শিকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মেব্‌লিন্ জিজ্ঞাসা করিল,—আমরা কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? আর কিছু করবার নেই বোধ হয়?

প্রশ্নটা যে ঠিক বাঘের ভয়ে করিল তা নয়—ভয় তার

পাছে বেতনের বিনিময়ে যেটুকু কাজ করা দরকার, তার চেয়ে একচুল অতিরিক্ত কাজ করিতে হয়।

শ্রীমতী বলিলেন,—ক্ষেপেছ? বুড়ো অথর্ব্ব বাঘ! এতটা লাফাতে পারলে ত?

—"তাহলে ত দরটাও আরো সস্তা হওয়া উচিত ছিল! হাজার টাকা কি কম?"

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অর্থের প্রতি মেব্‌বিনের অসীম দরদ—ঠিক যেন সহোদরা দিদির মত। তার সদাজাগ্রত হুঁসিয়ারির ফলেই শ্রীমতীর কত শত টাকা দেশবিদেশে হোটেলে-হোটেলে বকশিশরূপে উবিয়া যাইতে পারে নাই। অন্যের হাত হইতে যে অবস্থায় রেজকিগুলো নিঃসন্দেহ স্থানচ্যুত হয়, তার হাতে ঠিক তেমনি অবস্থায় সেগুলো আঠার মতন লেপটিয়া থাকে! সে যাই হোক, বার্দ্ধক্য-হেতু বাঘের বাজারদরের পড়তির আলোচনায় সহসা বাধা পড়িল আলোচ্য জীবটিরই আবির্ভাবে। খোঁটায়-বাঁধা ছাগলটি চোখে পড়িতেই বাঘ মাটিতে চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িল। এরূপ আচরণের হেতু কি? ইহা কি আত্মরক্ষার জন্য আড়াল-খোঁজার চেষ্টা মাত্র? না, তা মনে হয় না; বরং সম্ভবত ভীষণ আক্রমণ সুরু করিবার পূর্ব্বে হাত পা ছড়াইয়া বাঘ একটু আরাম করিয়া লইতেছে!

গ্রামের মোড়ল নিকটস্থ গাছের ঝোপে লুকাইয়া বসিয়া নিরাপদে শিকার দেখিতেছিল। তাহাকে শুনাইবার জন্যই মেব্‌বিন্ উচ্চকণ্ঠে কহিল,—আমার মনে হয় বাঘটা অসুস্থ!

শ্রীমতী কহিলেন,—চুপ! ঠিক সেই সময় বাঘটা ঝেলিয়া তুলিয়া ধীরপদক্ষেপে শিকারের পানে অগ্রসর হইতে সুরু করিল।

মেব্‌বিন্ ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—নাও নাও, মারো এইবার! ছাগলটাকে ধরবার আগেই সাবাড় করো—খানিকটা খরচা তবুও বেঁচে যাবে! (ছাগলটার মূল্য অতিরিক্ত দেওয়ার কথা)।

বন্দুকের মুখটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দুম্ করিয়া একটা জোর আওয়াজ হইয়া গেল। প্রকাণ্ড বাদামী রঙের জানোয়ারটা একধারে লাফাইয়া উঠিয়াই পরক্ষণে গড়াইয়া পড়িল, তারপর একেবারে স্থির নিশ্চল। দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল, চীৎকার চেঁচামেচি করিয়া তারা অবিলম্বে খোসখবরটা গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিল, এবং সেখান হইতে ঢাকঢোলের শব্দে বিজয়বার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। সেই ধ্বনি শ্রীমতীর অন্তরে প্রতিধ্বনি তুলিল—মনে হইল, কার্জ্জন-ষ্ট্রীটের মধ্যাহ্নভোজটা অগ্রসর হইয়া যেন তাঁর নাকের ডগার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

মেব্‌বিনের আহ্বানে তাঁর হুঁস হইল। ফিরিয়া দেখেন, গুলির ঘায়ে আহত ছাগলটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু বাঘের গায়ে বন্দুকের মারাত্মক কীর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই। ভুল পশুর গায়ে আঘাত লাগিয়াছে, বেশ বুঝিতে পারা গেল। তবে বাঘ মরিল কিসে? সে আর আশ্চর্য্য কি, বন্দুকের হঠাৎ-শব্দে মৃতপ্রায় জীবটার ক্ষীণ হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! এই আবিষ্কারে শ্রীমতী খুসি হইলেন না, বলাই বাহুল্য। সে যাই হোক, মরা বাঘটার তিনিই মালিক, আর পল্লিবাসীরাও হাজার টাকা হস্তগত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, ফলে শ্রীমতীই যে বাঘটা শিকার করিয়াছেন, সে-কথা তারা অবিলম্বে সানন্দে এবং সোৎসাহে স্বীকার করিয়া লইল। আর মেব্‌বিন্? সেও কি শ্রীমতীর অর্থের প্রত্যাশী নয়? সুতরাং কোনো গোল হইল না।

শ্রীমতী স্বচ্ছন্দচিত্তে 'ক্যামেরা'র সুমুখে দাঁড়াইলেন, এবং সেই চিত্র তাঁর খ্যাতির বাহন হইয়া যথাকালে Texas Weekly Snapshotএর পৃষ্ঠা হইতে Novoe Vremyaর সচিত্র সোমবার-ক্রোড়পত্রে আবির্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া শ্রীমতীর প্রিয়সখী লুনার এমন ভাবান্তর ঘটিল যে, হপ্তার পর হপ্তা সে কোনো সচিত্র কাগজের পানে ফিরিয়া তাকাইতেও পারিল না! পরে অবশ্য, বাঘনখের ক্রচ্ উপহার পাইয়া বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাইয়া এক পত্র দিল। প্রকৃত মনোভাব গোপনের এমন নিখুঁৎ চেষ্টা সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণটা সে প্রত্যাখ্যান করিল, হাজার হোক সখ্যেরও একটা সীমা আছে ত—সে-সীমা অতিক্রম করিলে বিপদ ঘটিতে পারে!

বাঘছালের 'রাগ' পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া কার্জ্জন ষ্ট্রীট

হইতে "ম্যানর-হাউসে" গিয়া পৌছিল। দেখিয়া স্থানীয় নরনারী খুব তারিফ করিলেন। তারপর শ্রীমতী উহা গায়ে জড়াইয়া Diana সাজিয়া যখন County Costume Ballএ হাজির হইলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, 'বাহবা বাহবা বেশ!' রুভিসের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি, সে প্রস্তাব করিয়া বসিল, এইবার এক 'আদিম মানুষের নৃত্যসভা'র আয়োজন হোক! সেই সভায়, সম্প্রতি যিনি যে জানোয়ার শিকার করেছেন, তিনি তারই চর্ম্মে দেহ আবৃত করে' উপস্থিত হবেন! শ্রীমতী সে-প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। রুভিস্ অবশ্য স্বীকার করিল, এরূপ ব্যবস্থা হইলে তার নিজের অবস্থা হইবে প্রায় সদ্যোজাত শিশুর মত, কারণ দু'একখানা খরগোস চর্ম্মমাত্র তার সম্বল! Dianaর বিরাট্ বপুর পানে একটা বক্রদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, তা'হলেও ওই 'কৃশ নর্ত্তকের' চেয়ে বিশেষ খারাপ দেখাবে তা মনে হয় না!

নৃত্যসভার দিনকয় পরে মেব্‌বিন্ বলিল,—ব্যাপারটা ঠিক কেমন ঘটেছিল, সবাই যদি জানতে পারে, তবে ভারি মজা হয়, কি বলো?

ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তার মানে?

—"এই, বাঘ মারতে গিয়ে তুমি কেমন করে' ছাগল শিকার করেছিলে," বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দিব্যি প্রাণখোলা হাসি, কিন্তু বরদাস্ত করা কঠিন।

—"লোকে বিশ্বাস করলে ত!" তাচ্ছিল্য-প্রকাশের ভাণ সত্ত্বেও শ্রীমতীর মুখের রং ঘনঘন বদল হইতে লাগিল।

মেব্‌বিন্ বলিল,—অন্তত লুনা করবে!

শ্রীমতীর মুখে একটা বেমানান সবুজ-সাদা রঙের পোঁচ স্থির হইয়া বসিল।

— তুমি ফাঁস করে' দেবে না ত?"

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে মেব্‌বিন্ বলিল, Dorkingএর কাছে একখানা ছোট বাংলো দেখেছি...খাসা বাড়ি...মাঝে মাঝে বেশ দু'চারদিন কাটিয়ে আসা যায়! ভারি লোভ হচ্ছে, কিনি...বেশি নয়, হাজার আটেক হলেই পাওয়া যায়! জলের দর...তবু নেবার জো কি...জানই ত আমার অবস্থা!

*　*　*

Dorkingএ মেব্‌বিনের বাংলোটি তার বন্ধুগোষ্ঠীর ভারি পছন্দ। বাংলোর চারিদিকে বাগান, গ্রীষ্মে শ্যামল তৃণের আস্তরণে আর বিচিত্র পুষ্পাভরণে সে এক অপূর্ব্ব শোভা!

সকলে বলে, অবাক কাণ্ড করলে মেব্‌বিন্...দাম বড়ো কম নয়, কি করে' যে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীমতীর আর বাঘ-শিকারের সখ নাই।

প্রশ্ন করিলে বলেন, কাঁড়ি কাঁড়ি রকমারি খরচ—পোষায় না অত!*

* ইংরেজি হইতে

উন্নতির একটি পন্থা

সমবায়

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

একসময় পাঁচজন দুগ্ধ-ব্যবসায়ী এক গ্রামে বাস করত—সহর থেকে অনেক দূরে। তারা দুধ ও মাখন বিক্রয় করতে প্রত্যহ সহরে যেত; কিন্তু তাদের সে-যাওয়া খুব সহজ ছিল না—রাত থাকতে থাকতে তাদের শয্যাত্যাগ করতে হ'ত এবং মাইলের পর মাইল পেরিয়ে পথের ধূলায় ধূসর মলিন হ'য়ে, বোঁঝের ভারে হাঁপিয়ে

কোকিয়ে, গলদঘর্ম্ম হ'য়ে সহরের দিকে ছুটতে হ'ত। তাদের কারুর এমন সামর্থ্য ছিল না যে, নিজে একখানা গাড়ী করবে। কষ্ট হ'ত; কিন্তু কি করবে? রোজগারের জন্যে, পরিবার প্রতিপালনের জন্যে তারা সে কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করত। তারা বুঝতে পারত, যে সময়টা তাদের পথ চলতে নষ্ট হচ্ছে, সে সময়টা যদি নষ্ট না হ'ত, তা হ'লে তারা আরো ঢের বেশী ভালো কাজ করতে পারত এবং তাতে রোজগারও হ'ত অধিক।

একদিন তারা সকলে মিলে' পরামর্শ করলে,—বাস্তবিকই কি এর কোন প্রতিকার নেই? একখানা গাড়ী করলেই ত গণ্ডগোল চুকে যায়। কিন্তু গাড়ী করবার সামর্থ্য নেই কারুরই। উপায় কি? হঠাৎ ভগবান তাদের মাথা দিয়ে এক চমৎকার যুক্তি বের করলেন,—সবাই কিছু কিছু করে চাঁদা দিয়ে, ভাগে একখানা গাড়ী করলেই ত তারা পারে! তারা তাই করলে। তাদের প্রচুর সময় বেঁচে গেল—তারা আরামের সঙ্গে আরো অনেক কাজ করবার সময় পেলে—তারা সমৃদ্ধ হ'ল।

এই দুগ্ধব্যবসায়ীরা সেই যুগে বাস করত—যে যুগে মানুষ ফাঁকা বড়-কথার ধার ধারত না, ফাঁকিকে ঘৃণা করত। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল তারা বাঁচবে, পেট পুরে খাবে, বিয়ে করবে, ভালোবাসবে। তারা বিপদের ধাক্কা খেয়েছিল; ধাক্কা এড়াবার পথ পেয়ে সহজ ভাবেই সেই পথ গ্রহণ করলে। সমবায়ের গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই।

সমবায়ের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হচ্ছে—"দশের লাঠি একের বোঝা"—এক সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা। কিন্তু মিলে-মিশে কাজ করা মাত্রকেই সমবায় বলা যায় না। "গ্যালী"-জাহাজের কয়েদীরাও একসঙ্গে দাঁড় টানে, একটা কারখানার মজুররাও একসঙ্গে কাজ করে,—কিন্তু তা সমবায় নয়। "গ্যালী"-জাহাজের কয়েদীরা পরস্পর শত্রুও হ'তে পারে—তারা কাজ করে তাদের 'কোড়াদার' প্রভুকে খুসী করবার জন্যে। কারখানার মজুররা কাজ করে তাদের টাকা-ওয়ালা মালিকদের স্ফীত করবার জন্যে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে। সমবায় মানে নিজেদের জন্যেই এক সঙ্গে কাজ করা গড়া-পেটা কেনা-বেচা লাভ-লোকসান সব নিজেদের। তারা পরস্পর কেউ কারুর প্রতিযোগী নয়—প্রত্যেকে সকলের জন্যে, সকলে প্রত্যেকের জন্যে। সমবায়ের মধ্যে হেঁয়ালি বা 'কাবিা' নেই;—সামাজিক অর্থনীতির দিক দিয়ে সে হচ্ছে এক সহজ সরল সুন্দর জিনিষ।

সমাজের অপ্রধান অংশের প্রতি প্রধান অংশের অত্যাচারের নামই বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র—যা ব্যক্তির সুখ-দুঃখের প্রতি বে-পরোয়া হ'য়ে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে ধনোৎপাদনের যন্ত্রশক্তিতে পরিণত করে। এর যদি কেউ পক্ষপাতী থাকেন, তা' হ'লে তিনি সেই গল্পের নায়ক—যাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর পর্দ্দানশীন পত্নীকে চাবুক মেরেও পর্দ্দার বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করবেন। এই সূত্রে সেই মুরগীর চীনে-মাটির ডিমে 'তা'-দেওয়ার কথাও মনে পড়ে। যাক্, —সমবায়ের অর্থ কিন্তু এর উল্টো। সমবায় ব্যক্তিকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে—তাকে তার প্রতি অনুরাগী ক'রে।

সমবায় ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে না; তাই মানুষ তাকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছে সংসারের ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে—কৃষিতে, ব্যবসায়ে, খুচরা-পাইকারী বিকি-কিনিতে, স্থাপত্যে, ব্যাঙ্কে, সর্ব্বত্র।

মানুষ ভুলে গেছে, এই সমবায় কোন্ সুদূর বিস্মৃত যুগে অসভ্যদের মধ্যে প্রথম ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিল। স্বাভাবিক মানব-সংস্কার থেকেই হোক, বা বংশ-জাত ভূত-প্রেতের ভয় বশতই হোক, তারা পরস্পর সহযোগিতার পথে মিলতে সুরু করেছিল। কিন্তু সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমবায় বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত সমবায়ের তুলনায় ঢের বেশী সুফলপ্রদ সত্যিকারের জিনিষ ছিল; কারণ, ধনিকদের এবং দালালদের অত্যাচার তখন আদৌ ছিল না—যা সমাজকে বিবিধ উপায়ে নির্দ্দয়ভাবে শোষণ ক'রে থাকে সে সমবায়ের প্রকৃত জন্মস্থান এবং জন্মকাল নির্দ্দেশ করা কঠিন।

আজকাল সমবায় বলতে যা বুঝায় তার জন্মকাল নিতান্ত আধুনিক। দোকানদারী ও সুদখোরের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টার ফলে এর উদ্ভব এবং পরবর্ত্তী

কালে এর কার্য্যকারিতা দেখে অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ হ'য়েছে। সামবায়িক কেনা-বেচার প্রায় সম-সাময়িক কালেই সামবায়িক ধার-প্রথারও প্রচলন হ'য়েছিল। এটা সত্য, যে, যারা ধার দিত তারা খুচ্‌রা-বিক্রেতা দোকানদারদের চেয়ে কম চালাক ছিল না এবং তাদের লাভের অংশ থেকে মোটা ভাগ বসাতে চক্ষুলজ্জা মাত্র করত না।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ সমস্ত প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে সমবায় অনুপ্রাণিত হ'য়েছে এবং 'ষ্টেট্' তাকে সমর্থন ও সাহায্য করেছে। উন্নতি-পথের অন্যান্য আন্দোলনের মতই সমবায়-সংগঠনও অভাবের উগ্রতা থেকে আত্মরক্ষা কর্‌বার এবং উন্নত হবার নির্ব্বন্ধাতিশয়েরই ফল।

১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে রক্‌ডেলের (Rochdale) "উন্নতি-কামী-দল" লক্ষ্য করেছিলেন, যে, যে-সব দালাল-খুচ্‌রা-বিক্রেতারা তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিষ জুগিয়ে থাকে, তারা অল্পদিনের জন্য ধারে দিয়ে কম দরের জিনিষে বেশী মূল্য আদায় করে। তাঁরা নিজেদের কেনা-বেচার ভার নিজেরাই গ্রহণ করেছিলেন এবং সে জন্যে বিশেষ ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়েছিলেন। এই সঙ্গে "ক্রয়কারী-সমিতি" (consumers' association) নামক সমিতি গঠিত হ'য়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই রক্‌ডেল-পন্থার অনুসরণ ক'রে সমিতির ভাণ্ডার এমনভাবে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌ল, যে, আরও অনেক নতুন নতুন ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করতে হ'ল এবং শেষে আরও ব্যাপকভাবে বেড়ে উঠে এমন সব ভাণ্ডারও গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—যেখানে সাধারণের সকল রকম চাহিদার জিনিষই তৈরি করা হ'ত।

রক্‌ডেল-শ্রেণীয় সমবায়ে প্রবেশ কর্‌বার সময় সভ্য-গণকে প্রবেশের ফি-স্বরূপ সামান্য কিছু দিতে হ'ত এবং তাদের অংশের টাকা ঐ ভাণ্ডারে তাদের ক্রয়ের 'কমিশন' থেকে (শতকরা ১২।০) ক্রমে ক্রমে গৃহীত হ'ত। তাদের অংশের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার পরও তারা বরাবর ঐ কমিশন পেত। প্রত্যেক বিভিন্ন সভ্যের ক্রয়ের একটা হিসাব রাখা হ'ত এবং প্রত্যেক তিন মাসের পর সেই হিসাব অনুসারে তাদের প্রত্যেককে অংশ-প্রতি শতকরা ৫৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দেওয়া হ'ত। বাহিরের প্রচার-কার্য্যে উৎসাহিত কর্‌বার জন্যে সভ্য ছাড়াও অনেককে লভ্যাংশ (সভ্যদের লভ্যাংশের অর্দ্ধেক) দেওয়া হ'ত। কারখানার মজুররাও লাভের একটা অংশ পেত।

আমাদের ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক্। বস্তুত, আমরা নানা ভাগে বিভক্ত, নানা-প্রকারের লোক-সমষ্টিতে গঠিত একটি বিচিত্র জাতি। এই-সব প্রত্যেক ভাগের বা দলের লোকই অনায়াসে রক্‌ডেল-প্রথায় সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারে এবং সমবায় ভাণ্ডার খুল্‌তে পারে। এখানে সব-রকম কাজের মানুষই দেখা যায়। তারা তাদের প্রত্যেক কাজের জন্যই এইরূপ সমবায় প্রণালীতে মিল্‌তে পারে। বড় বড় সহরের মেসে যারা বাস করে, তারা মিলিত হ'য়ে তাদের গৃহস্থালীর কাজ সুচারুরূপেই চালিয়ে থাকে বটে, কিন্তু আরও অনেক কিছুতেই ত, তারা হাত দিতে পারে। ছাত্রেরা সমবায় প্রণালীতে চা'র দোকান খুল্‌তে পারে এবং তা'তে তারা দোকানীর বঞ্চনা ও নোংরামি-জাত ব্যাধির হাত থেকেও পরিত্রাণ পায়। এই-সব সঙ্ঘ তার সভ্যগণকে টাকা ধার দিয়ে অভাবের সময় উপকার কর্‌তে পারে। দরিদ্র ভারতীয় কর্ম্মিদিগকে অধিকতর সাহায্য করা যায় এই উপায়েই। ইহা মানুষকে ব্যবসায়ী-সুলভ স্বকর্ম্মী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে। এর সাহায্যে সস্তায় ভালো জিনিষ পাওয়া যায় এবং অনেক বেকার সহজে কাজের যোগাড় কর্‌তে পারে। এই সমবায়-প্রথা ব্যাপকভাবে শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, পাঠাগার-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই কাজ করে। এর সভ্যদের সন্তানদের ব্যবসায় ও ব্যবহারিক শিক্ষাতেও এর প্রয়োগ চলে। "The English Co-operatve Wholesale Society Ltd." বা C. W. S., এর আদর্শ উদাহরণ। এদের পোষাক-পরিচ্ছদের, রুটি প্রভৃতি খাদ্যের, শস্যের এবং জুতোর কারখানা আছে—কারখানা কর্‌বার উপযুক্ত জমি আছে। এদের অনেক বাড়ী আছে—এদের সভ্যদের মধ্যে ভাড়া দেবার বা বিক্রী কর্‌বার জন্যে। এদের ব্যবসায় আছে, ব্যাঙ্ক আছে ;—কি নাই ?

আমরা দ্রব্যের উৎপাদনে, পাদুকা প্রভৃতির কারখানায়, ছাপাখানায়, অট্টালিকা-নির্ম্মাণে, বয়নে, কাঠের কাজে, ধাতুর কাজে এবং আরও অনেক বিষয়ে এই

সমবায়ের সমান কার্য্যকারিতা দেখতে পাই। এই প্রথায় বাড়ীভাড়া দেওয়ার ব্যবসা এবং ভাগে বাড়ী ভাড়া করার কাজও বেশ চলে।

এর কার্য্যকারিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ কতকগুলি প্রকৃত ঘটনার এবং অঙ্কের অবতারণা করা যাচ্ছে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনে ১,৫৩৭টি সমবায়-সমিতি ছিল (এর সঙ্গে উৎপাদক-সমিতিগুলিও যোগ করতে হ'বে) এবং সেগুলির সভ্য ছিল ৪,১৩১,৪৭৭ জন। ঐ বৎসর তাদের ব্যবসায় চলেছিল—৩১৪,০০০,০০০ পাউণ্ডের।

ঐ বৎসর ঐ স্থানের উৎপাদক-সমিতির সংখ্যা—৯৫; সভ্য-সংখ্যা—৩৯,৩৩১; ৭,০০০,০০০ পাউণ্ডের ব্যবসায়।

১৯২১ অব্দে ইংলণ্ডের ৳, ৳জন মানুষ ব্যাপৃত ছিল সামবায়িক পণ্যের উৎপাদনে এবং গুদাম-সাবাড়ে।

১৯১৯ সনে এক C. W. S.-এর কারখানাতেই ৪০,০০০ লোক কাজ করত এবং ২৫,০০০,০০০ পাউণ্ডের মাল উৎপাদিত হ'য়েছিল। ১৯২১ সনে সমগ্র গ্রেটব্রিটেন এবং আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে ঐ সমিতিই সর্ব্ববৃহৎ ময়দার কারবার চালিয়েছিল এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের 'ডকে' সব-চেয়ে বেশী কাঠের আমদানী করেছিল। ইংলণ্ডের সব ব্যবসায়ের কেন্দ্রেই এদের বড় বড় কারখানা ছিল—জুতোর কারখানা, রেশম-পশমের কারখানা, আস্‌বাবপত্র, কাপড়-চোপড়, খাদ্যদ্রব্য, বাসন-কোসন, সাবান, মোমবাতি, তামাক, চা, চিনি, কফি প্রভৃতি সব রকমের কারখানা। ইংলণ্ডে ৩৫,০০০ এবং কানাডায় ১০,০০০ একর জমিতে এরা গমের চাষ করেছিল। ভারতবর্ষ ও সিংহলে ৩২,০০০ একর জমিতে এদের চা'র চাষ ছিল। এরা পৃথিবীর প্রতি কোণ থেকে কাঁচা মালের আমদানী করেছে। এদের আন্তর্জাতিক বিনিময়-বাণিজ্য চলেছে পৃথিবীর যাবতীয় দেশের সঙ্গে।

এই C. W. S. সমবায়-সমিতির মত জার্ম্মাণীর Grosseinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine সমিতিও সমান কার্য্যকুশলতা দেখিয়েছে।

১৯১৯ সনে গ্রেট ব্রিটেন আয়ারল্যাণ্ডের "ক্রয়কারী" সমিতিগুলির কাজে ১,৪৫,০০০ ব্যক্তি ব্যাপৃত ছিল এবং তারা বার্ষিক ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড তনখা পেয়েছে।

যুদ্ধের সময় দালালরা যখন দু'হাতে লুটতে আরম্ভ করেছিল, তখন তার ধাক্কায় অনেকের মধ্যেই আবার নতুন ক'রে সমবায়-সংগঠনের উত্তেজনা জাগ্রত হ'য়েছিল।

নিম্নলিখিত অঙ্কগুলির দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যাবে :—

দেশ	সভ্য-সংখ্যা		উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য	
	১৯১৪	১৯১৯	১৯১৪	১৯১৯
ডেনমার্ক	২৪৪,০০০	৩১৭ ০০০	১,০৩০ লক্ষ ক্রোন	১১০০
ফ্রান্স	৮৮০,০০০	১,৩০০,০০০	৩,২২০ লক্ষ ফ্রাঁ	১০,০০০
জার্ম্মাণী	১,৭১৭,৫১৯	২,৩০৮,৪০৭	৪ ৯৩০ লক্ষ মার্ক	১০,৭৫০
নরওয়ে	৩১,০০০	৮০,০০০	১০০ লক্ষ ক্রোন	৭১০
সুইডেন	১১১,২৯৩	২২৫,৪২৩	৩৯০ লক্ষ ক্রোন	২,১৬০
সুইজারল্যাণ্ড	২৭৬,১৩১	৩৫৩,৮১১	১,৪১০ লক্ষ ফ্রাঁ	২,৯০০

উপরোক্ত দেশগুলির মধ্যে সুইডেনে সমবায় আরব্ধ হয়েছিল ১৯০৬ সালে এবং সেই থেকে তার ক্রমশই উন্নতি হয়েছে। তার কারণও আছে। সুইডেন শিক্ষায় এবং শিক্ষা-পরিচালনায় একটি অতি উন্নতিশীল অগ্রণী জাতি।

কিন্তু এই ভারতবর্ষে, আমরা কোন বিষয়েই এত দ্রুত উন্নতি আশা করতে পারি না—যতদিন পর্য্যন্ত না সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে প্রকৃত শিক্ষানুশীলন দ্বারা যুগপৎ জ্ঞানের ও চরিত্রের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত না হচ্ছে। গভর্ণমেণ্টের উপেক্ষায় এবং কাজের অসুবিধায় সমবায়-সহযোগিতা এখানে তেমন বাড়তে পারছে না। এর কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত ধারণা না থাকা এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবও বিফলতার আর একটি কারণ। প্রথম কথা, এর উপযোগী করে আমাদের স্বভাবগঠন—যা, বিশেষ অনুশীলনসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ,—সুশিক্ষিত মনোভাব।

আমাদের শিশুদের এবং যুবকদের চরিত্র সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হয় কেমন করে, তা আমরা কদাচিৎ জানি। তবে অবিবেচকের মত আলস্যে সময় কাটানই যদি জাতির পরিপুষ্টির পথ হয়,—সে পথ আমাদের অনেকেরই জানা আছে বটে। তারপর আমাদের

যুবকদের স্বভাবের সঙ্গে তাদের পৈতৃক আত্মাভিমানের সাময়িক উচ্ছ্বাস এসে মিলিত হয়েছে এবং তার ফলে তারা নতুন-কিছু গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ অপটু ও অনিচ্ছুক। কোন কোন দার্শনিক বলে থাকেন, যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা চিত্ত-শক্তি জাত হয়েছে কৃত্রিমতার মধ্য থেকে। যে শক্তির স্পর্দ্ধায় মানুষ নিজের মধ্যে ঈশ্বরত্বের আরোপ পর্য্যন্ত কর্‌তে দ্বিধা করেনি, মানুষের সেই চিন্তা-শক্তিকে কৃত্রিম বলা হয় কেন বুঝি না। এই শক্তি থেকেই সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ তার পশুত্বের ধাপ অতিক্রম ক'রে সামাজিক পর্য্যায়ে উঠে এসেছে। এবং এই বুদ্ধি-বৃত্তি-জাত সামাজিক জীবনই মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, সমাজের উপযোগী স্বভাব-গঠন নির্ভর করে শৈশব ও যৌবনের শিক্ষার উপর। যে জাতি এই স্বভাব ও সামাজিক নীতির অনুশীলনকে অবহেলা করে, সে জাতি সমবায়-সংবদ্ধ হ'য়েই হোক্ বা অম্‌নিই হোক্ জীবন-পথে অগ্রসর হ'তে পারেই না।

কিন্তু ভারতবর্ষ সত্যসত্যই সামাজিক শিক্ষায় দ্রুত উন্নতি লাভ করছে এবং ভারতবাসীদের বৈশিষ্ট্যও ক্রমশ বৃহত্তর মুক্তির পথে অগ্রগামী হচ্ছে।

এখানে শতকরা ৬০ জন বা তারও বেশী লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষক-সম্প্রদায় স্বভাবতই সাধু ও সরল, কিন্তু ঋণগ্রস্ত এবং সঙ্কীর্ণ-চিত্ত। এদের সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা বাদ দিলে এরা সমবায়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার মূলোচ্ছেদ করা বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ। এই দোষ এরা এদের অশিক্ষিত ও অপরিণত জাতীয় মনোভাব থেকে পেয়েছে। এরা চিন্তা করে, অনুভব করে এবং ইচ্ছা করে এদের সেই বিশিষ্ট কুণো মনোভাব নিয়েই; এবং অন্য কারুর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান কর্‌তে ইচ্ছা করে না। এদের কাছে আমরা আশা করি না (অন্য কারুর কাছেও না), যে, এরা সমাজের কোন মঙ্গলের জন্য এদের স্বার্থত্যাগ করবে। তবে, এ আশা আছে, এদের যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায়, যে, এতে তাদের নিজেদেরই লাভ, তা হ'লে এরা পিছ-পা হবে না নিশ্চয়ই। ভারতীয় ঐতিহ্যের দর্শনে এই সূত্রটি প্রথমে লেখা আছে,— প্রতিবেশীর উন্নতিতে প্রতিবেশীর হৃদ্‌প্রদাহ হ'তে বাধ্য। যাক্,—এখন আমাদের গোড়ার কথায় ফেরা যাক্। সুইডেনে ১৯২১ সনে ৯২৪টি ক্রয়কারী সমিতি ছিল—সভ্য-সংখ্যা ২৫৫,১৪১। চারটি জীবন-বীমা সমিতির সভ্য-সংখ্যা ছিল ২০৩,৮৮৩। Ko-operative Forbundets-এ ডিপোজিট বা আমানতী কারবার দ্বারা ১৯১৪ সনে ২৫৯,২৪০ এবং ১৯২১ সনে ৩,০৬৮,৭০৫ ডলার লাভ হ'য়েছিল। এই-সব দেখে, এরা এ বিষয়ে কত উন্নতি করেছে, বেশ বুঝতে পারা যায়।

ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন, এরা পরস্পর মিলিত ক্রয়-সমিতিও প্রবর্ত্তিত করেছে। নরওয়ের Nordisk Andelsforbund ১৯১৯ সনে স্থাপিত। ১৯২০ সনে কারবার করেছে ২,৯৮১,৫০০ ডলারের; ১৯২১ সনে করেছে ৩,০২৮,৪০০ ডলারের। এতেই প্রমাণিত হয়, যে, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ কর্‌বার গতি রাজনৈতিক সীমাকেও অতিক্রম করে চলে।

সমবায় মানুষকে সুলভে সুন্দর পণ্য সরবরাহ করে, সঞ্চয় ও ব্যবসায় শিক্ষা দেয়; স্বায়ত্তশাসনের অনুভূতি জাগ্রত করে এবং শ্রমিকদের অধিক বেতনের উৎকৃষ্ট কাজ জোগায়। আমরা দেখেছি যে, এই সমবায়-ব্যবস্থায় কারখানার মজুররাও শিক্ষার সুবিধা পেয়েছে—আমোদ-প্রমোদে অবসর-যাপনের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাই সমবায়ের শ্রেষ্ঠ দান নয়। ধনিক বণিকরাও এরূপ ব্যবস্থা প্রায়ই ক'রে থাকে। অবশ্য, তারা শ্রমিকদের শিক্ষা ও আমোদ দেয় তারা শিক্ষিত ও তুষ্ট হ'য়ে তাদের কাজ ভালো ক'রে করে দেবে বলে'। আমরা বলি,—সমবায়ের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে, সে মানুষকে পরস্পর শুভাকাঙ্ক্ষায় সম্মিলিত ক'রে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়।

পূর্ব্বকথিত মিলিত-সমবায় সমিতিগুলির রাজনীতির দিক্ দিয়েও একটা গূঢ় অর্থ আছে—যা, বিশেষ মূল্যবান।

আমরা এখন সমবায়ের পৃথক একটি শাখা নিয়ে একটু আলোচনা কর্‌ব। আমরা বলছি,—সামবায়িক ধারের কথা। ইংলণ্ডে সমবায়ের প্রথম সূত্রপাত হ'য়েছিল সমবেতভাবে ক্রয়ে; এবং পরে তার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল সমবেত উৎপাদনে, সমবেত বিক্রয় প্রভৃতিতে।

কিন্তু জার্মানীর প্রধান সমস্যা ছিল এই ধার। (ভারতবর্ষের সমস্যাও তাই)। ইংরেজ ভাব্‌ত,—"কেন আমরা ধারের ধার ধারব? এ যেন উপার্জ্জনের পূর্ব্বেই ব্যয়ের বিধান। অতএব এ কখনোই ভালো নয়!" উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ এইভাবেই চিন্তা করেছিল, কারণ জার্মানীর মতন তার তখন ধারের প্রয়োজনে বাধ্য হওয়ার মতন অবস্থা ছিল না। "ব্যয়ের জন্যে ধার ক্ষয়ের পথ, উৎপাদনের জন্যে ধার উন্নতির পথ (বোধ হয় একমাত্র পথ)"—একথা শুধু জার্মানী কেন সব দেশ সম্বন্ধেই খাটে।

১৮৪৭ অব্দে প্রুসিয়াতে "রাইফাইজেন" (Raiffeisen) তাঁর লোন ব্যাঙ্ক বা Darlehnscasse স্থাপিত করেন। ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল—অল্প সুদে বেশী টাকা কর্জ্জ করা এবং সেই টাকা 'অসীম দায়ীত্বে' (unlimited liability) সভ্যগণের মধ্যে ধার দেওয়া। অসীম দায়িত্বের অর্থ অংশীগণের অংশক্রয়জাত সমবেত অধিকার বা দায়িত্ব।

সভ্যগণকে ধার দেওয়া হ'ত বেশী সুদে, কিন্তু অসঙ্গত সুদে নয়। ব্যাঙ্ক সভ্যগণের সঙ্গে আমানতের হিসাবও খুলেছিল। টাকা ধার নেওয়ার পূর্ব্বে, যে টাকা ধার নিত তাকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হ'ত। সভ্যগণ পরস্পর উত্তমরূপে পরিচিত থাকবার জন্যে এই ধার নিরাপদ ছিল। কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা পরিশোধ করতে হ'ত, হ্যাণ্ডনোট বা ঐরূপ কিছু নিয়ে টাকা ধার দেওয়া হ'ত। সভ্যগণকে কোন ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দেওয়া হ'ত না—সমস্ত রিজার্ভ ফণ্ডে জমা থাকত। আর একটা ভালো ব্যবস্থা এই ছিল, যে, সভ্যগণের সচ্চরিত্রতার উপর লক্ষ্য রাখা হ'ত। এতে দুই উদ্দেশ্য সফল হ'ত। ব্যাঙ্কের বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হ'ত না এবং সভ্যেরা সচ্চরিত্র হ'ত।

The Schulze-Delitzsch Vorschussverein বা 'অগ্রণী-সমিতির' প্রবর্ত্তন হ'য়েছিল ১৮৫০ সনে। সে ছিল একটু অন্য প্রকৃতির সমিতি। সঙ্গতিপন্ন শিল্পীরা ছিল এর সভ্য এবং তাদের সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছিল—চুক্তিযুক্ত মূলধনের বৃদ্ধি। অর্থাৎ, এর প্রত্যেক সভ্যকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা মোটা অঙ্কের টাকা তার অংশের জন্য দিতে চুক্তি বা অঙ্গীকার করতে হ'ত এবং দিতে হ'ত। এই ক্রমবর্দ্ধিত "অঙ্গীকৃত মূলধনের" এবং সভ্যগণের "অসীম দায়িত্বের" জামিন রেখে এই সম্মিলনী অন্যত্র টাকা ধার করে। বেশী সুদে ও অল্পদিনের মেয়াদে আবার অন্যস্থানে কর্জ্জ দিত। অবশ্য কর্জ্জ দেবার পূর্ব্বে কর্জ্জকারীদের অবস্থার অনুসন্ধান করা হ'ত।

এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত তাদের জন্যই গঠিত হ'য়েছিল—যাদের অবস্থা কৃষক-সম্প্রদায়ের মত অত হীন ছিল না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের খুচরা দোকানদার-শ্রেণীর লোক দ্বারা এরূপ ব্যাঙ্কের কাজ বোধ হয় চলতে পারে। 'এরূপ যে-কোন প্রকার সামবায়িক ব্যাঙ্কের কাজে ষ্টেট্ বা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য সমধিক মূল্যবান। প্রুসিয়া এর জন্যে প্রায় ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য করেছিল।

কৃষি-সমবায় সম্বন্ধেও অনেক-কিছুই ভাব্‌বার আছে। এর মানে সহযোগিতার দ্বারা চাষবাসের কাজ নয়; এতে বুঝায়—যারা কৃষিকার্য্য ক'রে জীবন-যাপন করে, তাদের ভিতর সমবায়-সংগঠন। তারা তাদের খামারে পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু তাদের মাল বাজারে বা গঞ্জে নিয়ে যেতে, নিরাপদভাবে রক্ষা করতে বা বীমা করতে, মাল ক্রয় করতে, আড়ত প্রভৃতি খুলতে বা মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনতে তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। এই ধরণের কৃষি-সমবায়ে ডেনমার্ক এবং আয়ারল্যাণ্ড খুব উন্নতি করেছে।

ফরাসী Syndicats Agricoles—একটু অন্য রকমের প্রতিষ্ঠান। তাকে সমবায় সমিতি না বলে বাণিজ্য-সভা বলাই সঙ্গত। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও 'ষ্টেটে'র সাহায্যের মূল্য আছে।

ডেনমার্ক, কানাডা, নিউজিলাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য অনেক দেশই সামবায়িকদের জন্যে ব্যবসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন ও বিশেষজ্ঞ উপদেশকদের নিযুক্ত করেছেন। এই-সব দেশ প্রদর্শনী এবং পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেছেন; বিবরণী বিতরণ, উপযুক্ত বাজার-দর নির্ণয়, রেলের রেট ও ষ্টীমারের সুবিধার খোঁজ, গুদাম ও বরফ-ঘর নির্ম্মাণ, বিদেশে বাণিজ্য-প্রতিনিধির

বিধান প্রভৃতি সকল কাজেই সব্যসাচীর মত সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তাতে আমাদের ভারতবর্ষের কিছুই উপকার হবে না। বস্তুত, সমবায় যেন একটি খেলা—যে-খেলা উত্তমরূপে খেলতে জানেন স্বল্পবাদী, সুবুদ্ধি ও দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তিগণ। ভারতবর্ষে আমরা কৃষকদের জন্যে সমবায় সংগঠনে ব্যর্থ ও বিরক্ত হ'য়েছি। কিন্তু অন্যস্থানের কৃষকদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। পূর্ব্বোল্লিখিত উদাহরণগুলি তার চূড়ান্ত প্রমাণ। মধ্যশ্রেণীর মানুষদের দিয়ে সামবায়িক ভাণ্ডার, দোকান, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কাজ সুচারুরূপেই চলতে পারে। আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য, অন্যান্য দেশের উন্নতির উদাহরণ এদের দেখিয়ে এবং এতে যে এদেরি স্বার্থ ষোল আনা তা' বুঝিয়ে, এদের দিয়ে সামবায়িক ভাণ্ডার, রেষ্টরাণ্ট ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সূত্রপাত করা। এই রকম কাজ দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই জাতির অধিকতর হিতসাধন করতে পারে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল করতে পারলেই এতে সফল হওয়া যাবে। বাহিরের উদাহরণ উত্তেজনা ছাড়াও শিক্ষিতদের মধ্যে এর প্রচার সহজেই হ'তে পারে। কিন্তু কৃষক-সাধারণের মধ্যে এর প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে তোলাই কঠিন। তবে, যারা এর দ্বারা যে লাভবান হওয়া যায় তা বুঝতে পারবে, এর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে,—তারা এর অনুরাগী হবেই হবে।

সমবায়-সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমাদের সচেতন হ'তে হবে। আমরা দেখেছি, যে, কোন্ কোন্ প্রণালীর প্রয়োগে এর দ্বারা উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, মিলিত-মালিকি (joint ownership), বাজার, ধার, বীমা প্রভৃতি সব রকমের কাজ সম্ভব ও সফল হ'য়েছে। আমাদের একটিমাত্র বিষয় নিয়ে সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকলে চলবে না; সব রকমের কাজেই হাত দিতে হবে। নীচে আর একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি—কত প্রকারের কাজ এর দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে। ১৯১৯ সনে জাপানে ১৩,১০৬ সংখ্যক সমিতি ছিল। এই সবের মধ্যে ২,৮৯৫টি ব্যাঙ্কের ২,১৪৮টি ধার ও ক্রয়ের, ৩,৬৩০টি ধার ও ক্রয়বিক্রয়ের এবং ১,৪২৭টি ধার ও উৎপাদন-ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করত। এতে দেখা যায়, যে, জাপানের শতকরা ৮০টি সমিতি ১৯১৯ সনে একাধিক কাজ করতে অসমর্থ হয়নি।*

---

* ১৯২৩ সনের আগষ্ট মাসে "Welfare"এ প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "A Road to Prosperity—Co-operation" নামক প্রবন্ধ হইতে শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত।

সাবধানী

শ্রীহেমমালা বসু

১

দত্তপুকুর গাঁয়ের দত্তবাবুরা খুব ডাকসাইটে লোক; ভাল লোকেরা মনে করত, লক্ষ্মী সরস্বতী শুধু এঁদের বাড়ীতেই একসঙ্গে বাস করেন। সরস্বতীর বাসস্থান তো বাইরে থেকে বুঝতে পারা যায় না; তবে লক্ষ্মীর প্রত্যাশীতে ভরা সেই চকমিলানো বাড়ীখানি ও ধান-ভরা প্রকাণ্ড মরাইগুলির পানে তাকালেই লক্ষ্মীদেবী যে এখানে আছেন তা বেশ বুঝতে পারা যায়। সেই জন্যেই এই 'সাত-আনির' বাবুরা খাজনার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভয়-ভক্তিও বরাবর আদায় ক'রে আসছেন, তাঁদের তিনটি ভাইকে তিন দিক্‌পালের মতই গাঁয়ের সবাই মান্য করে।

কিন্তু দুষ্ট লোকেরা বল্‌ত, আগে এঁদের এত তালুক-মুলুক ছিল না; বর্ত্তমান জমিদারের পিতা পরলোকগত বিপিন দত্তের বুদ্ধিতেই নাকি এত সব হয়েছে। 'নয়-আনি'র কর্ত্তা মারা গেলে পরে এই কাকাবাবুটি নাবালক ভাইপোদের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তার পরেই 'নয়-আনির' ভাল ভাল তালুকগুলো নিলাম হয়ে গেল ও 'সাত-আনি' তা কিনে নিয়ে মুলুকের কর্ত্তা হয়ে পড়লো।

বিপিন দত্তের ছোট-গিন্নীর ছোটখাটো, গোলগাল, কালো মেয়েটাকে তার ঝি সাবধানী বলে ডাকৃত। সে বড় হ'লে পরও এই নামই তার রয়ে গেল, 'লতিকা' বা 'কণিকা,' এমনি একটা ভাল নাম আর রাখা হলো না। দুষ্ট লোকেরা বল্‌ত, যার কিছুতেই ভালো নেই, তার ভালো নাম রেখে কি হবে? বাড়ীর কর্ত্তা বিপিন দত্ত, এতকাল কাশির অসুখে ভুগে ভুগেও তো বেঁচে-ছিলেন, মেয়েটা মার পেটে আসবার পরই না একদিন কাশ্‌তে কাশ্‌তে দম আটকে গিয়ে একেবারে পটোল তুললেন! তা ছাড়া মেয়েটা ভূমিষ্ঠ হবার পরই ছোট-গিন্নী এমনি অসুখে পড়লেন যে, সারা বছর তাঁকে শয্যাধরা হয়েই থাক্‌তে হয়েছিল। 'এর নাম অপয়া রাখলেই ঠিক হতো!'

বুড়ো ঝির কাণে এ সব কথা গেলে আর রক্ষে ছিল না; সে তাদের সঙ্গে 'কুরুক্ষেত্র' ক'রে বাড়ী এসেও বকে মরতো। সেদিন বিকেলে ছোট-গিন্নী যখন এক ধামা তেঁতুল নিয়ে কাটতে বসেছেন, কোথা হ'তে ছুটে এসেই ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কথাই সুরু করে দিলে —'পোড়া লোকের মুখে আজকেও আগুন দিয়ে এলাম, ওরা এত মিছে কথাও কইতে পারে মা! আমি তো কত ছেলেই মানুষ করলুম, এমন লক্ষ্মীমেয়ে আর একটিও দেখিনি! কি সুবুদ্ধি মেয়ে তোমার এই সাবধানী! বিষ্টি হ'লে পরে এইটুকুন বেলা থেকেই কেমন পা টিপে টিপে চলে, কক্ষণো উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ে না; আপনার কাপড়টি জামাটি শুকুলে পরই অমনি কুঁচিয়ে এনে আলনায় রেখে দেয়। খেলনাটি পুতুল-গুলিরই বা কি যত্ন! আর ভুলো পট্‌লা—বড়-বৌদির ছেলেরা যেন সব কি রকম। বই শেলেট কি খেলব'র ঐ গুলো, কোথায় যে কি ফেলে রাখে কিছু ঠিক নেই! তোমার সাবধানীর মাথার চুলটিও সিঁথের এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারে না, এমনি তার পরিপাটি! এ মেয়ে কখনো সামান্যি নয়! আমার মনে হচ্চে ছোট-মা, কোন্ দেবতাই বা দয়া ক'রে তোমার গর্ভে এসেছেন, নইলে এই একরত্তি মানষিয়র কি এত বুদ্ধি হ'তে পারে? তুমি এই বারে ওর বে-থা দাও ছোট-মা, এই মেয়ে হ'তেই তোমার দুঃখু ঘুচ্‌বে; কথায় বলে না—

'শত পুত্তুর সম কন্যে যদি সুপাত্তরে পড়ে!'

ছোট-গিন্নী মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনলেন, অস্ত-গামী সূর্য্যের পানে চেয়ে নীরবে চোখের কোণটি মুছেও ফেললেন, মুখে কিছুই বললেন না। "কেঁদ না ছোট-মা, ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, আর কি জন্যে কাঁদবে, সুখের দিন তো এল বলে!" ব'লে ঝিও তার কাজে চলে গেল।

একলা ঘরে বসে, তেঁতুলের বীচি ছাড়াতে ছাড়াতে ছোট-গিন্নী কত কথাই ভাবতে লাগলেন; বিয়ের পরের এই বারোটা বছর এমনি করেই তার কেটে গেছে! ঝি ওর একটা কথাও কিন্তু বাড়িয়ে বলেনি। বিপিন দত্তের বুড়ো বয়সের এই মেয়েটা বুদ্ধিতে বুড়োদেরও হার মানিয়ে দেয়। তাকে যে দেখে সেই তো অবাক হয়ে যায়। আচ্ছা বুড়ো ঝির একথা কি সত্যি হ'তে পারে না—ছোট-গিন্নীর দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে কোনো দেবতা কি তার গর্ভে জন্ম নিতে পারেন না? কলিকাল বলেই না, নইলে আগেকার দিনে এমন ঘটনা কতই তো ঘটেছে!

মানুষের জীবনে কোনো দিন দুঃখের, কোনো দিন বা সুখের হয়ে আসে। সুখ কা'কে বলে ছোট-গিন্নী এখনো তা জানতেও পারেননি। গরীবের ঘরে জন্ম নিয়ে আঠারোটা বছর সেখানে কত কষ্টই পেয়েছেন। বিধবা মা বিয়ে দিতে না পেরে, শেষটা কিনা দত্তবাড়ীর সেই ঘাটের মড়াটির সঙ্গে তাঁকে গাঁটছড়া বেঁধে বিদায় করে দিয়েছেন! তার পর থেকে অমন মাকে তিনি

আর মা ব'লে মনেও করেন নি। মা হ'লে কি তিনি এমন সৎসতাতোর ঘরে, ঘরে তো নয়—সতীনকাঁটার বনে মেয়েকে বনবাস দিতে পারতেন? একটি দু'টি নয়—বুড়োটির ছেলে মেয়ে, বউ নাতিতে বাড়ী একেবারে ভর্ত্তি! তার ছেলেরাই যে মস্ত মস্ত, সব বুড়ো হ'তে চলেছে। কর্ত্তাটিকে দেখলে তাঁর মনে এত ঘেন্না হতো যে, গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করতো। পয়সা দেখে মা বিয়ে দিলেন—হায়, শুধু পয়সাতেই কি সুখ হয়? বরং সুখের যে আশাটুকু এতদিন ছিল, 'বড় ঘর ছোট বর' পাবার জন্যে তিনি যে কত ব্রত উপবাস করেছিলেন, সে আশা তো ফর্‌সা হয়েই গেল! যাক্, তার দুটি বছর পরে বুড়োটি যেই মারা গেলেন, এই গুঁড়োটিকে পেটে ক'রে তিনিও বিধবার সাজে সাজলেন; কে জানে, আর কতকাল তাঁকে এমনি হয়ে থাকতে হবে? দশটা বছর তো একাদশী করেই কাটলো! প্রেম, প্রণয়ের কথা তাঁর কাছে শুধু কথাই থেকে গেল, তার স্বাদ তিনি আর এ-জীবনে পেলেন না!

তিনি দু'চক্ষে দেখতে না পারলেও কর্ত্তাটি কিন্তু তাঁকে ভালবেসেছিলেন, নইলে আট হাজার দশ হাজার টাকার এক বাক্স গয়না—কৌটো-ভরা গিনি মোহর আর তাড়া-বাঁধা সব নোট তাঁকে দিয়ে গেলেন কেন? মনের ঘেন্নায় কর্ত্তার দেওয়া গয়নাগুলো যদিও তিনি একটি দিনও গায়ে ছোঁয়ান নি, তবু এখন এই তো তাঁর সম্বল; সাবধানীকে বিয়ে দিতে হ'বে, জীবনের অনেক পথই যে এখনো তাঁর পড়ে রয়েছে।

ছোট-গিন্নী এমন নিবিষ্টমনে এই-সব চিন্তা করছিলেন যে, সাবধানী যে ঘরে ঢুকলো তা টেরও পেলেন না; সে তেঁতুল-বীচিগুলোর দিকে হাত বাড়ালে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলো। তখন সন্ধ্যে হয়েছে, মনের সঙ্গে তাঁর ঘরখানিও আঁধারে ভরে গেছে দেখে তিনি বলে উঠলেন, "একটা আলো নিয়ে আয় তো সাবধানী, সন্ধ্যে যে বয়ে গেল!"

সাবধানী যখন উঠে গেল, ছোট-গিন্নী একটু গর্ব্বের সহিত তার দিকে চেয়ে দেখলেন। কালো হ'লেও মেয়েটি কুৎসিত ছিল না; ডুরে সাড়ীখানি ঘুরিয়ে পরে খাটো চুলের গোছা নাচাতে নাচাতে যখন সে পাঠশালাতে পড়তে যায়, পথিকরাও তার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ফরসা, মাঝারি, আর সব মেয়েদের মাঝখানে তাকে একটুও খারাপ দেখায় না।

পিদিমটি পিলসুজের ওপরে রেখে সাবধানী তেঁতুল-বীচির কাছে বসে পড়লো; ছোট-গিন্নী তাঁর চিন্তা-সূত্রটি জোড়া দিয়ে ঠিক ক'রে নিচ্ছিলেন, সে একটি কথাতেই তা একেবারে ছিন্ন করে দিলে—"শোন মা, আমি এই-মাত্তর রান্নাঘরের ধার দিয়ে আসছিলুম; দেখলুম মেজ-বৌদি রাঁধছে, আর বড় সেখানে বসে বলছে কি জান—'হ্যা সৎমা নাকি আবার মা! দুঃখের কথা কি বলব মেজ-বউ, ওঁদের বুদ্ধি থাকলে তো আসল নকল বুঝে নিতে পারবে।' আমায় দেখতে পেয়ে বড় বউ অমনি চুপ হয়ে গেল—কেন মা?"

মেয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মা বাটিটি কাৎ করে রেখে উঠলেন ও ত্রস্তপদে বারান্দায় এসেই আকাশ কাঁপিয়ে দিয়ে ঝঙ্কার তুললেন—"সৎমা যে মা নয় সে সবাই জানে। ওলো ছোটলোকের মেয়েরা, সে কথা বলে তোরা আর কি করবি? আমার যা করবার তা ভগবানই করেছেন! থাকতেন যদি আজ উনি, ও মুখ কি আর দর্শন করতুম? নাক কান কেটে ঘরভাঙানীদের তা হলে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতুম!"

রান্নাঘর নীরব হয়েই রইল; ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক শব্দ ভিন্ন যখন আর কোনো শব্দই সেখান থেকে শুনতে পাওয়া গেল না, তখন ছোট-গিন্নী বিজয়ী বীরের মত গম্ভীর মুখে ঘরে এসে জানালার ধারে গিয়ে বসলেন। তাঁর মনের গরম চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দেখে সাবধানী আর সেখানে থাকা উচিত বোধ করলে না, তেঁতুলের ধামা বঁটি সব খাটের নীচে ঠেলে দিয়ে বীচিগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সে তখন তার ঝির সন্ধানে গেল।

২

এমনি ঘটনা দত্তবাড়ীতে নিত্যই ঘট্‌তে লাগলো, কারণ সাবধানী দৌত্যকার্য্যে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। পাড়ার ওবাড়ীর লোকেরা কে কি বলে বা কে কি করে, খাবার বেলা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বড়বউ বড় মাছ

খানা কোন্ দিন কার পাতে ফেলে দিয়ে যায়, এসব জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই এখন আর ছোট-গিন্নীর অগোচর থাকে না; ফলে বউ দু'টি বড় মুস্কিলে পড়ে গেল। কলহ-বিদ্যায় তাদেরও কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা ছিল, তার পরিচয় স্বামীর কাছে দিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকত—এই ক্ষুদে শাশুড়ীটির ক্ষুরধার রসনার ধারে তারা এগোতেও পারত না, কারু কাছে বলে কয়ে কোন লাভও পেত না। শান্তস্বভাবা মেজবউকে সবই সহ্য করতে হ'ত, কারণ মেজ রবীনবাবু কানভাঙানী কথাগুলো মোটে কাণে তোলে না। বড় অসহ্য বোধ হলে বড়বউ যদি বড়বাবুর কাছে দুঃখের কথা বলতে যান, তবে কখনো শোনেন,"এখানে থাকতে হলে এ সব সয়েই থাকতে হবে!" কখনও বা "উনি আমাদের মা, ছেলের কাছে মার নিন্দে করতে এসো না তুমি!" এই আদেশ শুনেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। তাঁদের স্বামীরা আজ্ঞাবহ ভৃত্য না হয়ে আদেশ ও উপদেশ দাতা স্বামী হওয়াতে ছেলেপুলে ভিন্ন আর কারু উপরে কর্ত্তৃত্ব করতে না পেরে তাঁরা বেশ একটু মনঃক্ষুন্ন হয়েই রইলেন।

সাবধানী পরমসুখে গোপালের মত গোকুলে বাড়তে থাকলো। এখন তার চেহারার আরও উন্নতি হয়েছে। কালো রঙটি কচি কলাপাতার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মুখের লাবণ্য বেশ ফুটে বেরিয়েছে, চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে কোমরে পড়েছে দেখে ছোট-গিন্নী মেয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যেদিন তিনি ছেলেদের খাবার সময় সামনে বসে একথা সেকথার পরে সাবধানীর বিয়ের কথাটি পাড়লেন, সেদিন বড়বউ বড় আশ্বস্ত হয়ে তাঁর কথাগুলি শুনতে লাগলেন; অন্তরালস্থিতা মেজবউয়ের মুখখানিও আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো। তাঁদের বিশ্বাস, ছোটমা এমনি তো লোক মন্দ নন; কোনো দিকেই চোখ দিয়ে দেখেন না, আপন মনে আপনার ঘরটিতে থাকেন। যত অনিষ্টের গোড়া ঐ সাবধানী, ওকে বিদেয় করতে পারলেই বাড়ীর আপদ যায়। কিন্তু বড়বাবু নবীন দত্ত সাংসারিক বুদ্ধিতে একেবারেই যে নবীন, তা নইলে এমন দরকারী কথাটা তিনি কি করে হেসে উড়িয়ে দিলেন? মেয়েটা আর একটু বড় হোক না ছোটমা! বিয়ে না হয় হলো, কিন্তু এইটুকুন মেয়ে পরের ঘর করতে পারবে কি? আর তুমিই কি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

ছোট-গিন্নী তবুও বললেন, "মেয়েছেলের বাড় কলাগাছের বাড় বাবা! গেল আশ্বিনে সাবধানী এগারোয় বুঝি পা দিয়েছে, এখন থেকে চেষ্টা না দেখলে এর পরে একেবারে কাঁটার মত গলায় বিঁধে বসবে যে! তুমি হচ্ছ এই গাঁয়ের মাথা, শাস্তর মেনে না চললে তোমাকেও তো লোকের কাছে খাটো হতে হবে।"

বড়বাবু হেসে বললেন, "এখন ঘরে ঘরেই মেয়ে বড় হচ্ছে, সেজন্যে তুমি ভেব না ছোটমা! ও বেচারাকে আর কিছুদিন সোয়াস্তিতে থাকতে দাও।"

ছোট-গিন্নী নীরব হয়ে গেলেন। যার বুদ্ধি নেই, তা'কে আর কি করে বোঝাবেন! দুধের বাটিটা স্বামীর পাতের সামনে রেখে তখন বড়বউ আধ-ঘোমটার ভিতর থেকে ফিস ফিস করে বললেন, "তোমার বোন এখনো ছোটটি নেই গো, দশ বছর বয়েস হ'লে কি হবে? সে বিশ বছরের মতই বুদ্ধি ধরে; এ মেয়েও যদি পরের ঘর না করতে পারে, তবে আর পারবে কে? বাবা মেয়ে তো নয়, যেন পাকা বাঁশের ঝাঁকাটি!"

দশচক্রে পড়ে বড়বাবুও ভূত হ'তে রাজী হলেন—ঘটক ডেকে সাবধানীর বিয়ের কথা বলে দিলেন। সাবধানীর আদর এখন আরও বেড়ে গেল। ছোট-গিন্নী মশুর ডাল বাটা, সর ময়দা মাখিয়ে মেয়েকে ফরসা করতে লেগে গেলেন, সহর থেকে সাবান ও ক্রীম পাউডারও আনালেন। বড়বউ বড় মাছখানা এখন তারই পাতেই ফেলে দেন, দুধের বাটিটা বেশ কানায় কানায় পূর্ণ করে দেন, লুচি-সন্দেশ, ফল-মূল, সবই সে এখন আশ মিটিয়ে খেতে পায়। বিয়ে হবে বলে বৌদিরাও তাকে যত্ন করছেন দেখে তার মনে হলো বিয়ে জিনিষটা নিশ্চয়ই বেশ মজার। সেও মনের আনন্দে তার প্রতীক্ষা করে রইলো। মাসের পর মাস এমনি ক'রে কাবার হতে লাগলো, ঘটক সেই যে গেল, আর তো কই এলো না। ছোট-গিন্নীর ভাবনা বড্ড বেশী বেড়ে গেল।

সেদিন সকাল বেলা বুড়ো ঝিকে বাইরে থেকে ছুটে আসতে দেখে ছোট-গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, "কি হলো লো

তোর, ছাড়া গরুর মত অমন করে ছুটে বেড়াচ্ছিস কেন ?"

ঝি বসে পড়েই বললে, "একটা জিনিষ দেখে এলাম ছোট-মা, আজ বড়বাবুর বৈঠকখানায় লোক আর ধরে না! কাশী থেকে কেদার-ঠাকুর ফিরে এয়েছেন। তিনি বাইরের ঘরে বসে সক্কলের হাত দেখছেন শুনে আমি ভিড় ঠেলে দোরগোড়ায় গিয়ে দেখি তিনি বড়বাবুর হাত দেখছেন। বললেন কি জান ছোট মা, 'আপনার বড় বিপদ আসছে বাবু, বিষয়-সম্পত্তি সব একেবারে যাবার দশা হবে, এ সময়টা খুব সাবধানে থাকবেন।' এই না শুনে আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না, বড্ড ভয় করতে লাগলো। ধরো যদি তার কথাটা সত্যিই হয়—হেই মাগো, তবে আমরা কোথা যাব ?"

ঝির কথা শুনে বধূরা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন; ছোট-গিন্নী বললেন, "ঠাকুরটিকে বাড়ীর ভেতরে ডেকে আন্‌না ঝি, সাবধানীর হাতখানা দেখাবো; ওর বিয়ে হবে কি না কিছুই যে বুঝতে পারছি না!"

"ছোট-মার যেমন কথা, অমন মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা!" বলে ঝি বেরিয়ে গেল ও কেদার-ঠাকুরকে তখনি সঙ্গে করে নিয়ে এল। তাঁকে দেখেই বধূরা ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। ছোট-গিন্নী ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে আসন হাতে করে বারান্দায় উঠে দেখলেন, সেখানে একটি যুদ্ধ বাধবার যোগাড় হচ্ছে। পটলা যাত্রার দলের ভীমসেনের মত চীৎকার করে বলছে, "আমার বলটা এক্ষুণি বার করে দে সাবধানী, নইলে কত মার খেতে পারিস দেখে নেব!"

সাবধানীও জন্তু-বিশেষের মত মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিলে, "ইস্, মার অমনি পড়ে রয়েছে! জানিস আমি কে? আমায় গড় কর বল্‌ছি পটলা, আমি তোদের পিসী হই! নইলে বড়দার কাছে বলে দিয়ে মার খাওয়াবো না!"

তার পরেই যে কাণ্ড হলো, ছোট-গিন্নী ছিলেন তাই মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিলেন। তারপর আসনখানা বিছিয়ে কেদার-ঠাকুরকে দু'টি টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে সাবধানী কাঁদছে দেখে তিনি আবার তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শান্ত করতে লাগলেন। এদিকে পটলা ঠাকুরের সামনে ময়লা হাতখানা মেলে ধরে বললে, "যে মারটা মেরেছি, ও মেয়ের কান্না এখন থামছে না! আপনি ততক্ষণ আমার হাতটা দেখুন না ঠাকুর-মশাই! আমি কি হবো, ভাল পাশ-টাশ করতে পারব কিনা বলুন তো?"

কেদার-ঠাকুর হেসে বললেন, "আচ্ছা দাও দেখি। বাঃ, বেশ হাতখানি তো! রবি রেখা সুস্পষ্ট, বৃহস্পতি উচ্চস্থ—ধন, মান, বিদ্যা, যশ, আয়ু, মানুষের যা দরকার তোমার সে সবই বেশ হবে, খোকা! শুক্র পারিজাত রেখাটিও তোমার হাতে দিব্বি রয়েছে দেখছি, তুমি খুব কর্মঠ, সুখী, ভোগী হ'তে পারবে, বাবা!"

"সত্যি!" পটলা মহানন্দে লাফিয়ে উঠলো, ও "ওরে ভুলো, তোরা শুনে যা, ঠাকুর-মশাই আমার হাত দেখে কি বলচেন" ব'লেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝি সাবধানীকে ধরে এনে কেদার-ঠাকুরের সামনে বসিয়ে দিলে; ছোট-গিন্নী একটা থামের আড়ালে বসে তাঁর কথা শোনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলেন। সাবধানীর হাতখানি দেখতে দেখতে ঠাকুর-মশায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি কিছুই বলছেন না দেখে ঝি জিজ্ঞেস করলে, "আমাদের মেয়ের হাতখানা কেমন দেখলেন, বাবা-ঠাকুর?"

কেদার-ঠাকুর ধীরে ধীরে বললেন, "বলেই যাই। মা শুনুন! এই মেয়েটি শনির ক্ষেত্রে জন্মেছে, সেজন্যে সাংসারিক বুদ্ধি এর ভালোই হবে; কিন্তু রবি রেখাটি নেই বলিলেই হয়, বৃহস্পতিও নীচস্থ—তাই এর জ্ঞান, সৎবুদ্ধি বা যশ-ভাগ্য বড় ভাল হবে না। পিতৃরিষ্টির জন্যে মেয়েটি তার পিতার দর্শন পায় নি; চতুর্থে প্রবল পাপগ্রহ থাকাতে মাতার মৃত্যুর কারণ হবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর কাছ থেকে আপনি একটু তফাৎ হয়েই থাকবেন মা!"

সাবধানীর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে কেদার-ঠাকুর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে চলে যেতে দেখে ছোট-গিন্নী বলে উঠলেন, "মেয়েটার বিয়ে হবে কি না, তা তো জানতে পারলুম না ঝি!"

ঠাকুর ফিরে চেয়ে বললেন, "বিয়ে হবে বৈকি মা! এই বছরেই মেয়ের আপনার বিয়ে হয়ে যাবে, আপনি সে ভাবনা করবেন না।"

তিনি চলে গেলেন। ছোট-গিন্নী তবুও সেখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দেখে ঝি বললে, "ওঠো গো ছোট-মা, রান্না করগে যাও, বেলা হয়ে পড়েছে।"

ছোট-গিন্নীর চোখে জল টল টল করতে লাগল, তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "ঠাকুর কি বলে গেলেন ঝি, সাবধানীই আমার মৃত্যুর কারণ হবে?"

ঝি ত্রস্ত হয়ে বললে, "ও সব কথা বিশেস করচো কেন? মানুষের মুখের কথা কি কখনো সত্যি হয় ছোট-মা? কেন যে এই অলক্ষুণে বামুনকে ডেকে এনেছিলুম, মিশে একটা কথাও ভাল বলে গেল না গা!"

৩

কেদার-ঠাকুরের কথাগুলি ক্রমে ক্রমে সবাই ভুলে গেল, কিন্তু ছোট-গিন্নী ভুলতে পারলেন না। মেয়ের বিয়ের ভাবনার চেয়ে এখন এই ভাবনাই তাঁর বেশী হয়ে দাঁড়ালো। অনেক রাতে একলাটি বসে তিনি স্তিমিত দীপালোকে একবার সাবধানীর ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে দেখেন, আবার আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবেন, ভগবান! তুমি আমায় মা বাপ দাও নাই, স্বামীসুখেও বঞ্চিত করেছ; সন্তানও কি দাও নাই প্রভু? মরে-বেঁচে কত ক'রে যাকে মানুষ করলুম, তাকেই কি আমার মৃত্যুর কারণ ক'রে পাঠিয়েছ?

"ছোট-মা, ঘুমুচ্ছ না কি?" বড়বাবুর ডাক শুনে ছোট-গিন্নী বেরিয়ে এসে বললেন, "না, ঘুমুইনি এখনো। এত রাত্তিরে তুমিও কেন জেগে রয়েছ বাবা?"

"আর ছোট মা!" ক্লান্তস্বরে উত্তর হলো, "বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি আমি! ন' আনির সরিকদের সঙ্গে আমাদের যে মোকদ্দমা লেগে উঠলো। গাঁয়ে এমন কেউ নেই যে একটা সুপরামর্শ দেয়। তাই সা-নগরের মহেশ-ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলুম, তিনি যদি মধ্যস্থ হয়ে আপোষ করে দেন। এই তো সেখান থেকে ফিরে আসছি। সা-নগরের সরকারদের ছেলে খগেনকে দেখে আমার বড্ড পছন্দ হলো, তাই সব খোঁজ-খবর নিয়ে এলাম। ছেলেটি কুড়ি-একুশ বছরের হবে, বেশ চালাক চটপটে, কোঠাবাড়ী, বাগান-পুকুর সব আছে, বাপের তেজারতি কারবার এখন সেই চালাচ্ছে। খগেন পাশ-টাশ বেশী করতে পারেনি, বাপ মরে গেল কি না, তাই বাড়ী ছেড়ে সহরে গিয়ে পড়তে পারলে না. গাঁয়ের ইস্কুলেই এণ্ট্রেন্স অবধি পড়েছে বিধবা মা আর দুটি ভাই বোন নিয়ে তার সংসার। এই তো খবর, এখন তুমি যদি বল, তবে কথাটা তাদের কাছে পেড়ে দেখি, কি দাঁড়ায়।"

ছোট-গিন্নী বললেন, "যা শুনলুম, তাতে অমত হবার তো কিছু নেই। ছেলেটি লেখাপড়ায় খাটো, এই একটা কথা। কিন্তু বি-এ, এম-এ পাশ ছেলে এই কালো মেয়ে বিয়ে করবে কেন বাবা? ওরা যদি রাজী হয়, তবে তুমি এই-খানেই কথা ঠিক ক'রে ফেল। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি মোকদ্দমা করতে যাচ্ছ কেন? ন' আনির ছেলেরা তো আমাদের পর নয়, ভাই-ভাইয়ের গোল মিটাতে কতক্ষণ বা লাগবে! এত কাল এখানে এসেছি, এমন অলক্ষুণে কথা আর তো শুনিনি!"

বড়বাবু ম্লান হেসে বললেন, "বিপদ যখন আসে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, ছোট-মা! ন' আনির বাবুরা আমাদের ভাল ভাল তালুক, জমি-জমা সমস্তই নিতে চায়, বলে এ-সব তো আমাদের। আমরা নাকি তাদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছি, তারা আদালতে তাই প্রমাণ করবে। বিনা চেষ্টায় সর্ব্বস্ব ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মোকদ্দমা করা কি ভাল নয়? লড়েই দেখা যাক না কি হয়।"

বড়বাবু চলে গেলেও ছোট-গিন্নী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। একি ভীষণ সংবাদ—মোকদ্দমা! সেদিন সেই ঠাকুরটি যা জানিয়ে গেলেন, সে তো সুরু হয়েই গেল, এর পরে আরও যে কি হবে, জানি না!

কয়েক দিন পরই খগেনের কাকা দু'জন ভদ্রলোক সঙ্গে ক'রে সাবধানীকে দেখ্‌তে এলেন, বড়বাবু শুষ্কমুখে হাসি এনে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। খবর পেয়ে বধূরা খাবার করতে আর ছোট-গিন্নী সাবধানীকে সাজাতে বসে গেলেন। অতিথিদের জলযোগ হ'লে পরে সাবধানী পান দিতে গেল। তার হাত থেকে পান নিয়ে বরের কাকা বললেন, "এইটি বুঝি আপনার বোন, নবীনবাবু? বেশ মেয়েটি। মা, তোমার হাতখানা দাও তো দেখি!"

আবার হাত দেখা! কেদার-ঠাকুরের কথা মনে পড়ে

সাবধানীর মুখটি শুকিয়ে গেল, ইনি আবার কি বলবেন, কে জানে! কিন্তু তিনি তার আশঙ্কা আর বাড়ালেন না, হাতটি একটু মেলে ধরেই হেসে বললেন, "বেশ হাতটি মায়ের। এমন লক্ষ্মী ঘরে নেওয়া ত সৌভাগ্যের বিষয়, নবীন বাবু! আমাদের এ মেয়ে বেশ পছন্দ হয়েছে। এখন আপনি কবে খগেনকে পাকা দেখতে যাবেন, সেইটে শুনেই উঠ্‌তে চাই।"

বড়বাবু বললেন, "সাবধানীর হাতের লেখা দেখবেন না? শুনলুম, লেখাপড়াও না কি বেশ শিখেছে।"

এ কথা শুনে সাবধানী আবার ভয় পেল; তার সেই ব্যাঁকা-বাঁকা হাতের লেখা সে কাউকে দেখাতে চাইত না। বৃদ্ধটি যখন বললেন, "মেয়েদের হাতের লেখা, ওসব আমরা দেখতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, মেয়েটির হাতে লক্ষ্মীর কৃপা আছে কি না। একখানা চিঠি লিখতে পারলেই বা কি, না পারলেই বা কি।" তখন সাবধানী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁদের প্রণাম করে উঠে গেল। তাঁরা উঠবার উপক্রম করছেন দেখে বড়বাবু দেনা-পাওনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তা'তেও খগেনের কাকা হেসে বললেন, "ওসব দরদস্তুর আমরা মহৎ লোকের সঙ্গে করি না। আপনাদের ব'লে হাত ঝাড়লে পর্ব্বত! এমন ঘরের মেয়ে ঘরে আনাই আমরা মহালাভ মনে করি, আর কিছু চাই না নবীনবাবু!"

ভদ্রলোকটির অমায়িক ব্যবহারে বড়বাবু খুব সন্তুষ্ট হ'লেন ও অবিলম্বে সা-নগরে গিয়ে পাত্র আশীর্ব্বাদ ক'রে এলেন। সাবধানীর বিয়ের ঠিক হতেই আত্মীয়েরা এসে আমোদ করতে লাগলেন। মোকদ্দমার কথা মনে না করে বড়বাবুও এ-বিয়েতে বেশ খরচ করতে লাগলেন, বরের জন্য হীরের আংটী প্রভৃতি দামী দামী দানের জিনিষ সহর থেকে আনালেন। কনে-গয়নার কথায় তিনি বললেন, "সাবধানীর গয়না আর গড়াতে দিলুম না, ছোট-মা! তোমার গয়না থেকেই ওর পা-সাজানো সব বার করে দাও।"

ছোট-গিন্নী বললেন, "আমি গিনি দিচ্ছি, তুমি তাই দিয়ে কনে-গয়না গড়াতে দাও। আমার গয়না তো সাবধানীর গায়ে এখন লাগবে না বাবা!"

বড়বধূর বড় বড় চোখের অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে বড়বাবু তাতেই রাজী হলেন। এতই যখন দিচ্ছেন, স্যাকরার মজুরীর কয়েক শো টাকা, সে কি আর দিতে পারবেন না!

বিয়ের দিনের বিকেল বেলা খগেন সদলবলে এল ও গোধূলিলগ্নে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে গেল। শুভদিনে নূতন কাপড় গয়না পরে, মনটিও নূতন ভাবে ভরে সাবধানী নূতন স্থানে বাস করতে চললো। ঝিও তার সঙ্গে যাবে বলে তসরের সাড়ী আর তাগা দু'গাছা পরে তৈরী হয়ে রইলো। যাবার বেলা মা ও ভাই বোনরা কেঁদে মেয়েকে বিদায় দিলেন, বধূরাও কাজ ফেলে ছুটে এসে স্নেহ-সম্ভাষণ করলেন। সেখানেও শ্বশ্রূমাতা এই বড়লোকের মেয়েটিকে বড় আদরেই গ্রহণ করলেন। যত্ন, আদর, ভালবাসা, সাবধানীকে চারদিক থেকে যেন ঘিরে রইলো। বৌভাতের পর সাবধানী যখন মায়ের কাছে ফিরে এল তার মুখের হাসিটি দেখে ছোট-গিন্নী কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেললেন; বুড়োঝি তার শ্বশুরবাড়ীর এত সুখ্যাতি করলে যে, শুনে তিনি ভাবলেন, আমার কাজটি তো বেশ ভালোই হয়ে গেল—এখন আর কিছুরই জন্য আমি ভাবি না!

এদিকে বড়বাবু চোখে আঁধার দেখতে লাগলেন—সাবধানীর বিয়েতে যা ভেবেছিলেন তার ঢের বেশী খরচ হয়ে গেল, মোকদ্দমাতেও জলের মত অর্থ ব্যয় হতে লাগলো। কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই যে চললো, তিনি তা রোধ করবার কোনো উপায়ই ভেবে পেলেন না।

৪

পরের বছর ষষ্ঠীবাটার নেমন্তন্নে খগেন যখন এল, দত্তদের অবস্থা তখন বেশ খারাপ হয়ে উঠেছে। মোকদ্দমাটি জেলা কোর্ট হ'তে হাইকোর্টে নেওয়া হয়েছে, বড়বাবু বড় বেশী ভাবনায় পড়ে গেছেন—শূন্য হাতবাক্সটির পাশে ভীষণ গম্ভীর মুখে বসে তিনি সংসার শূন্যময় দেখছেন। খগেন যাবার বেলা সাবধানীকে নিয়ে যেতে চাইলে। ছোট-গিন্নী খুসী মনেই মেয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তিনি আপনার টাকা খরচ ক'রে জামাইটিকে ষষ্ঠীবাটা

দিয়েছিলেন, আরও কিছু খরচ ক'রে মেয়ের সঙ্গে সব অঙ্গের জিনিষ দিয়ে দিলেন। দিন দিন সংসারের অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, সাবধানীকে যে আর এখানে আনতে পারবেন, সে আশাও নেই। যাবার বেলা মেয়েকে বার বার ক'রে চিঠি লিখতে বলে মা চোখের জল মুছে ভাবলেন, ভাগ্যিস্ সাবধানীর বিয়েটা হয়েছিল, নইলে এখন যে কি হ'তো!

হাইকোর্টে মোকদ্দমা যাবার ছয় মাস পরেই বড়বাবু পাগলের মত হয়ে পড়লেন। খরচ কমাও, খরচ কমাও ব'লে তিনি বড়বউকে ব্যস্ত ক'রে তুললেন, "আর যে চলে না গো, হাট-বাজার, খাওয়া-দাওয়া, সব বন্ধ করে দাও।"

বড়বউ বললেন, "পেট যখন রয়েছে, তার পাটও থাকবেই। আমি তো চেষ্টা করছি, কিন্তু এত বড় সংসারের কোন্ খরচটা যে কমানো যেতে পারে, আমায় তুমি দেখিয়ে দাও।"

বেগতিক দেখে বড়বাবু নিজেই সংসারের ভার নিলেন ও দিনকয়েক বাদেই বুঝতে পারলেন, এ-সংসার বড় বিষম স্থান। তাঁর দুরবস্থা কেউ বোঝে না, আপনার পাওনা-গণ্ডা কেউ ছাড়তে চায় না। তখন বুড়ো ঝি ও গরুর চাকর নিতাই বাদে আর-সব চাকরদের জবাব দিলেন, অতিথি অভ্যাগতের আগমন, সাহায্যদান, সব বন্ধ ক'রে দিলেন। নিন্দায় দেশ ভরে গেল। চাকরদের চলে যেতে দেখে বধূরা কোনো আপত্তি করলেন না, মুখটি আঁধার ক'রে, কোমরে আঁচলখানা জড়িয়ে নিয়ে তাঁরা ঝাঁটপাট, বাসন-মাজা সব কাজই করতে লাগলেন। এ-সংসারে সুখ তো তাঁদের ছিলই না, এখন স্বাচ্ছন্দ্য-টুকুও যেতে দেখে বড়বধূ স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ অর্থাৎ ভাল মুখে কথা বলাও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু বড়বাবু অবিচল। সমুদ্রে পড়ে তিনি বেশ শক্ত হাতেই হাল ধরেছিলেন, এ সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা গ্রাহ্যও করলেন না—কি ক'রে মোকদ্দমাতে জয়ী হ'তে পারবেন, প্রাণপণে শুধু সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

বছর তিন গেলে পরে বড়বাবুর ব্যারিষ্টার লিখ্লেন, "এ-বছরেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, অবস্থা এখনই খুব সঙ্গীন। এখন যিনি মোকদ্দমাটি ঠিক ভাবে চালাবেন, তিনিই জয়ী হ'তে পারবেন।" চিঠিখানা পড়ে কপর্দ্দকহীন বড়বাবু ব্যাকুলস্বরে বলে উঠলেন, "আর এ-বছরটা তুমিই তবে চালিয়ে দাও, ভগবান!" খাজনার টাকা যা-কিছু আদায় হয়েছিল, সমস্তই মোকদ্দমার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি শূন্য বাক্সটি বন্ধ ক'রে বসলেন।

সংসার অচল হয়ে উঠলো। সরকারকে বাজারের তাড়া দিয়ে যখন ফল হলো না, তখন বড়বধূ তেল ঘি মাছ তরকারির ফর্দ্দখানা বড়বাবুর কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

সেখানা হাতে করে বড়বাবু বাড়ীর ভিতর গেলেন। তাঁকে দেখেই মেজবধূ আড়ালে সরে গেলেন, বড়বধূ গম্ভীরমুখে বসে ডালে কাটি দিতে লাগলেন। রান্নাঘরের সামনে এসে বড়বাবু বললেন, "তেল-ঘিটি যে সেদিন সব এনে দিয়েছে, এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেছে? আজ আর বাজার করবার দরকার নেই, ভাতে ভাত রেঁধে নিয়ে সবাই মিলে হবিষ্যি কর!"

এই-কথা কানে যেতেই বড়বধূ মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি ধরে উঠলেন। অস্ত্র অস্ত্রের অভাবে বাক্যবাণই বর্ষণ করতে লাগলেন, "কি, তুমি আমায় হবিষ্যি করতে বলচ? আমার শত্রু যে, সে হবিষ্যি করুক! সোনাদানা কখনো তো কিছুই দিতে দেখলুম না, রাঁধবার একটু তেল আর দুটো মাছ তরকারি তাও দিতে পারবে না তুমি?"

সুখ-দুঃখের সঙ্গিনীর সু-মুখের এই সুন্দর কথাগুলি শুনেই বড়বাবুর মুখখানা শুকিয়ে গেল, তিনি এ-কথার আর উত্তর দিলেন না। তখন মেজবধূ গলা অবধি ঘোমটা দিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'লেন ও দিদির হাতটি ধরে টেনে আড়ালে নিয়ে বললেন, "দিদি, বড়ঠাকুরের চোখমুখ দেখেছ, ভেবে ভেবে কি হয়ে গেছে? ওঁকে তুমি আর কিছু বলতে পাবে না ভাই, এই আমার মাথার দিব্যি রইল!"

বড়বধূ কেঁদে বললেন, "আজ থেকে তুই এই পোড়া সংসারের ভার নে মেজবউ, নিত্যকারের এই 'নেই নেই' আমি যে আর বরদাস্ত করতে পারি না!" ধনী পিতার আদরিণী কন্যা মেজবধূর গহনার বাক্সটা কতকগুলো নোটের ভারেও ভারী হয়ে উঠেছিল। সে আপাততঃ

সেই বাক্সটার ভার লাঘব করাই মনস্থ করলে ও মৃদু হেসে দিদি ও বড়ঠাকুরকে এই সংসারের ভার থেকে মুক্তি দিয়ে দিলে।

ছোট-গিন্নী এই-সব দেখে বুঝলেন, তাঁর একবেলার আহারও আর এ-সংসার থেকে মিলবে না। এরা হয়তো দিতে চাইবে, কিন্তু মেজবধূর বাপের টাকার জিনিষ তিনি কি ক'রে মুখে তুলবেন? কাজেই তিনিও সেদিন হ'তে আপনার দরকারী জিনিষ আপনিই আনাতে লাগলেন। এতেও কিন্তু নিস্তার পেলেন না—একদিন দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে ঘরে এসে তিনি যেমন হরতুকীর কৌটাতে হাতটি দিয়েছেন, অমনি শুনতে পেলেন, "ছোট-মা!"

মুখশুদ্ধিটুকু মুখে ফেলে দিয়ে ছোট-গিন্নী বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন, বড়বাবু সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মেজবাবু অস্থিরভাবে পা়ঃচারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। সেখানে আর কেউ না থাকলেও পাশের ঘরটিতে অনেকের অস্তিত্ব অনুভব ক'রে ছোট-গিন্নী একটু অবাক হয়ে বললেন, "আমায় ডাকছ নাকি, বাবা?"

"হ্যাঁ; বড় মুস্কিলে পড়েই আজ তোমার কাছে এসেছি, ছোট-মা! কলকাতা থেকে শচীন আরও হাজার-পাঁচেক টাকা পাঠাতে লিখেছে, আমার হাতে এখন আর একটি পয়সাও নেই!"

ছোট-গিন্নীকে নীরব দেখে বড়বাবু আবার বললেন, "এত দিন অনেক কষ্ট করেছি তবুও ধার করিনি। এখন আমায় এত টাকা কেউ ধারও দেবে না। বড়বউয়ের তো বেশী গয়না নেই—তোমার গয়নাগুলো যদি মাসকতকের জন্যে দাও, তবে আমাদের বড়ই উপকার হয়। কোথাও বাঁধা রেখে টাকাটা নিয়ে আমি নিজেই কলকাতায় গিয়ে দেখ্‌তে শুনতে পারি। শুনানীর সময়ও হয়ে এসেছে। এ-মোকদ্দমায় আমাদেরই জিত হবে, এতে তুমি একটুও সন্দেহ করো না। ছ'মাসের ভেতরেই তোমার গয়না-গুলো ছাড়িয়ে এনে দেব, ছোট-মা!"

এমন কাতর, ভিক্ষুকের মত এমন দীননয়নে বড়বাবু বিমাতার মুখপানে চেয়ে রইলেন যে, দেখ্‌লে পরে দুঃখ হয়। ছোট-গিন্নী ধীরে ধীরে বললেন, "আমায় বড্ড কঠিন সমস্যায় ফেলেছ, বাবা! আজকের দিনটে আমায় ভেবে দেখ্‌তে দাও, কাল যা হয় তোমায় জানাব।"

বড়বাবু অনুনয় ক'রে বল্‌লেন, "ভেবে দেখবার আর সময় নেই ছোট-মা! বুঝ্‌ছো তো এই মোকদ্দমার উপরেই আমাদের মরা বাঁচা নির্ভর করছে। যেমন করেই হোক, এর খরচ চালাতে হবে, এতে জয়ী হ'তেই যে হবে—তা নইলে আমাদের আর কিছুই থাকবে না।"

"বাবা, সবই বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু মনে ভরসা পাচ্ছি না। গয়না আর আছেই বা ক'খানা? যেদিন থেকে মেজ-বৌয়ের হাতে সংসার গেছে, আমার খোরাকীও যে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এই গয়না বাঁধা দিয়েই যে আপনার খরচ চালাচ্ছি। তাও যদি তোমরা নিতে চাও তো নাও—আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। কত কালের ভেতরে তোমাদের একটিবার দেখতেও পাই নি, একদিনও বল্‌তে শুনিনি, ছোট-মা কি করছ, বেঁচে আছ কি মরে গেছ। আজ দরকার পড়েছে, তাই তো দেখা দিতে এসেছ বাবা, দরকার ফুরোলেই আবার তেমনিই তো করবে!" বলেই ছোট-গিন্নী ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।

তখন অসহিষ্ণু রবীন দত্ত একবার জ্বলন্ত চক্ষে ছোট-গিন্নীর দিকে তাকালেন, তার পরে বড়বাবুর অতি ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "কেন তুমি ওঁর কাছে দুঃখ জানাতে এসেছিলে দাদা? উনি ছোট-মা, আমাদের মা নন! মিছে অপমান হয়ে গেলে! মেজবৌয়েরও তো অনেকগুলো হীরেমুক্তোর গয়না আছে, আমার ঘড়ি চেন কি হীরের আংটীগুলো নেহাৎ কম দামের হবে না। এ-সব বাঁধা দিলে যদি না হয়, বিক্রী করলে পাঁচ সাত হাজার টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তুমি তাই নিয়ে শীগ্‌গির কলকাতা চলে যাও, ভগবান দয়া করলে ওতেই কার্য্যসিদ্ধি হবে।"

এর পরে বড়বধূ আর শ্রোতা হয়ে থাকতে পারলেন না, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মহোৎসাহে স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রমাণ করতে লেগে গেলেন,—"আমি ওঁকে এ-কথা অনেকবার বলেছি ঠাকুর-পো! সৎমা কক্ষণো মা হতে পারে না! তা উনি কি কারু কথা কানে

তোলেন? তা হ'লে আজ ওঁর এ দুর্দ্দশা হতো না! সাবধানীর বের খরচা দেওয়া উচিত ছোট-মার, উনি তখন কারে পড়েছিলেন, দিতেনও। আমি ওঁকে সেকথা কতবার যে বল্‌লুম, মোকদ্দমা সুরু হয়ে গেছে, এখন এই বাজে খরচাটা করো না! উনি কিছুতেই ছোট-মাকে এই সোজা কথাটা বল্‌তে পারলেন না। বলি, এখন কেমন হলো? ঐ যে কথায় বলে না—বুদ্ধিমান দেখেই শেখে, বোকা সে যে ঠেকে শেখে, বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখতে হয় ঠেকে—এর মত সত্যি কথা আর নেই!"

৫

বধূর মুখের এই মধুর কথাগুলি শুনেও ছোট-গিন্নী চুপ করে রইলেন। তাঁর এই সহিষ্ণুতা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। বাস্তবিক, তিনি এখন খোলোস-ছাড়া সাপের মতই নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন।

ছোট-গিন্নীর ঘরের মেজেয় আঁচল বিছিয়ে ঝি শুয়ে পড়লো ও তাঁকে চিন্তামগ্না দেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, "বসে রইলে কেন ছোট-মা, শুয়ে পড় না। আজকালকার বৌরা কি আর শাশুড়ীকে মানে? ঘরে ঘরেই এই-সব কাণ্ড দেখতে পাই। তোমার তো আরও সৎসতাতোর ঘর!" তিনি তবুও বসে রইলেন দেখে ঝি মনের দুঃখে নাক ডাকাতে সুরু করলো।

ঝির ঘুম ভাঙলে পরে ছোট-গিন্নী তা'কে বল্‌লেন, "তুই এখুনি নিতাই আর তার মাকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি এক জায়গায় যাব।" ঝি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি আবার কোথা যাবে ছোট-মা?" ছোট-গিন্নী আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "সাবধানীর বাড়ী যাব রে, নিতাইকে নৌকা নিয়ে আস্‌তে বল্; আমি গেলে পরে তুই এই ঘরেই বসে থাকিস্ আর কোথাও যেন যাসনি, চারদিকে শত্তুর!"

ঝি চেঁচিয়ে উঠলো, "একি বল্‌চ গা ছোট-মা? আই আই, তুমি কেন সাবধানীর বাড়ীতে থাকতে যাবে? লোকে বল্‌বে কি তা হলে!"

ছোট-গিন্নী ধমকে বললেন, 'ষাঁড়ের মত গলা করে চেঁচাস্ নি ঝি, চুপ কর। সাবধানীর বাড়ী আমি থাকতে যাচ্ছি না কি? তা'কে অনেক দিন দেখিনি, তাই দেখে আস্‌ব ভাব্‌ছি।"

"এইবারে বুঝতে পেরেছি। ও সাহস করো না গো ছোট-মা। যাদের জান না, তাদের অত বিশেস করতে যেও না। ঘরের জিনিষ ঘরেই রেখে দাও।"

"থাম্, তোকে আর আমায় বুদ্ধি দিতে হবে না। নিতাইকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়, সে যেন তার মাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আমায় আবার সন্ধ্যের ভেতরেই আস্‌তে হবে তো!"

বুড়ী অগত্যা নিতাইয়ের মাকে ডেকে নিয়ে এল। নিতাই খালের ঘাটে নৌকা এনেছে শুনে ছোট-গিন্নী সিন্দুক খুলে গয়নার বাক্সটি বার করলেন ও গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে সেটা লুকিয়ে নিয়ে চললেন। তাই দেখে ঝি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তারা, তারা! কাজটা ভাল করলে না গো, ছোট-মা!"

নিতাইয়ের নৌকা যখন সা-নগরে খালের ধারে ভিড়লো, তখন সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে। ছোট-গিন্নী নীরবে বসে ছিলেন, এইবারে বললেন, "জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে আমার জামাইবাড়ীতে যা তো নিতাইয়ের মা, সাবধানী আর খগেনকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি এখান থেকেই তাদের দেখে যাব, বাড়ীতে আর উঠবো না।"

খবর পেয়েই সাবধানী ছুটে এসে নৌকায় উঠ্‌লো। "মা, তুমি এসেছ? কত কাল পরে তুমি আমায় মনে করলে মা!" বলে সাবধানী তাঁকে প্রণাম করলো। ছোট-গিন্নী বল্‌লেন, "ভাল আছিস্ তো সাবধানী? এবার অনেক দিন পরে তোকে দেখ্‌তে পেলুম।"

"ভাল কই, আছি একরকম; এতদিন আমায় নিতে লোক পাঠাও নি কেন মা? ওঁরা কত বলেন, মার একটি মেয়ে ঘরে এনেও কুটুমের সুখ হলো নাকো!"

ছোট-গিন্নী সাবধানীকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন, সে এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে, যৌবন তার সারা অঙ্গে কোমলতা মাখিয়ে দিয়েছে; তার পূরন্ত মুখটিতে চুম্বন ক'রে তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "কোথায় নেব মা তোমায়? সেখানকার এখন যা অবস্থা হয়েছে! তাই তো তত্ত্বটাও আর করতে পারিনি।

ওরা ভাববে আমরা পাই না খেতে, উনি মেয়েকে তত্ত্ব করছেন! ষষ্ঠী কি পুজোয় খগেনকে চুপি চুপি টাকা পাঠিয়ে দিইছি, তোকে রাঙা সাড়ী আর সন্দেশ কিনে দিতে। সে তা দিয়েছে তো, সাবধানী?"

কন্যা সলজ্জভাবে বলিল, "সে তো দিয়েইছে। তাতে এরা খুশী হয় নি মা, আরও অনেক বেশী পাবে বলে আশা করেছিল। আচ্ছা মা, এমন হলো কেন?"

"সে আমি কি ক'রে জানব? আজ ক'বছর ধরে একটা কি মোকদ্দমা করছে বলে তো শুনতে পাই। এর পরে যে আরও কি হবে, জানিনে মা। শোন্ সাবধানী, বড্ড বিপদে পড়েই আমি তোর কাছে এয়েছি; আজ বড়-কর্ত্তা আমার গয়নাগুলো বাঁধা দেবে বলে চাইতে এসেছিল, আমি দিইনি। বললে যদিও, ছ'মাস পরেই ছাড়িয়ে এনে দেব, তা নেবার বেলা সবাই অমন বলে থাকে—ও ছাই কথায় বিশ্বেস ক'রে সর্ব্বস্ব খুইয়ে শেষে কি ভিক্ষের ঝুলি সার করব? তাই আমার এই বাক্সটা তোর কাছে রাখতে এনেছি, ওখানে রাখা আর নিরাপদ নয়! এটাকে খুব লুকিয়ে রাখতে পারবি তো? তোর পোর্টম্যান্টোর একেবারে তলায় এই বাক্সটি রেখে তার ওপরে কাপড়চোপড় রাখ্‌বি, তা হলে কেউ টের পাবে না," বলে ছোট-গিন্নী চাদরের ভিতর থেকে বাক্সটি বার করতে যাচ্ছিলেন, খগেনকে আসতে দেখেই ফের ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

খগেন তাঁকে প্রণাম ক'রে সাবধানীকে বললে, "মাকে এখনো এখানে বসিয়ে রেখেছ? মা, উঠে আসুন তো! চলুন, আমাদের বাড়ী একটু পায়ের ধূলো দিয়ে আসবেন।'

ছোট-গিন্নী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, "নৌকো থেকে আর উঠ্‌ব না বাবা! অনেক দিন তোমাদের দেখিনি, তাই একটু দেখে গেলুম, বাড়ীতে আজ আর যাব না।"

"সে কি! এলেন যদি, মার সঙ্গে কি দেখাটাও করবেন না?"

"না বাবা, রাত হয়ে এল, বাড়ী যাই। আর একদিন তখন বেলাবেলি এসে বেয়ানের সঙ্গে গল্প ক'রে যাব, আজ আর আমায় সে অনুরোধ করো না! ওদিক পানে যদি যাও, আমার সঙ্গে একটু দেখা কোরো বাপ! তোমরাই আমার সব, তোমরা যদি খোঁজ খবর না নাও, তবে আর কে নেবে?"

খগেন মাথাটি নীচু ক'রে বললে, "আমি ওদিকে বড় যাই না, বাড়ীতেই আমার কাজ। তা বলছেন যখন, মাঝে মাঝে চরণ দর্শন ক'রে আসব।" ছোট-গিন্নী হাসি-মুখে তার পানে চেয়ে রইলেন। তাঁকে নীরব দেখে খগেন, "আচ্ছা, আমি তবে আসি মা!" বলে প্রণাম ক'রে নৌকা থেকে উঠে গেল।

তার পদশব্দ মন্দীভূত হ'লে পরে ছোট-গিন্নী বললেন, "আমিও যাই, রাত হয়ে গেল। এই বাক্সটি খুব লুকিয়ে নিয়ে যা সাবধানী! তোর তো খুব বুদ্ধি, দেখিস্ মা, এর কথা কাউকে জানিয়ে যেন নির্ব্বুদ্ধির কাজ করিস নি!"

সাবধানী হেসে বললে, "না না, সে ভয় তুমি কোরো না। আমি তোমার বাক্সটি এমনি ক'রে লুকিয়ে রেখে দেব, কেউ টের পাবে না! এখন আমায় তুমি কবে দত্তপুকুরে নিয়ে যাবে, তাই বলো তো মা?"

ছোট-গিন্নী কেঁদে বললেন, "তোকে কি আর সেখানে নিয়ে যেতে পারব সাবধানী? ভগবান কি সেদিন আর দেবেন? দেখি, মোকদ্দমার কি হয়। আমি তো আবার এটা নিয়ে যেতে আসব, তখন তোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। দু'বছর হতে গেল তুই এখানে এসেছিস, না সাবধানী?"

সাবধানী চোখ দু'টিকে যথাসাধ্য বড় করে বললে, "দু'বছর কি বলছ, তার চেয়েও ঢের বেশী! এখন আমায় নিয়ে যেতে পারবে না তো, কাজেই তাই-ই সই! উঠি আমি তবে, মাগো! তোমারও রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাকেও এর পরে হয় তো বকুনি খেতে হবে।"

কন্যার সঙ্গে ছোট-গিন্নীও পারে উঠে এলেন। অদূরে সাবধানীদের বাড়ীখানি অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, তিনি একবার সেদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে সাবধানী উঠে দাঁড়াতেই, বাক্সটি তার হাতে দিয়ে ছোট-গিন্নী আকুলস্বরে বল্‌লেন, "এটাকে খুব সাবধান করে রাখিস, সাবধানী! আমার সর্ব্বস্ব আজ তোর কাছে

রেখে গেলুম ; একথা খগেন কি আর কাউকে জানতে দিবিনি, আমার মাথা খাস! ওবাড়ী থেকে বড়কর্ত্তা কি আর কেউ যদি আসে, তাদেরও কিছু বল্‌বি নি বুঝলি ?"

"ইস, তা আমি বললে তো! তোমার কিছু ভয় নেই মা, বাক্সটি তোমার কাছে যেমন ছিল, এখানেও তাই থাকবে," বলে সাবধানী আঁচল চাপা দিয়ে বাক্সটি লুকিয়ে নিয়ে চললো। সে বাড়ী ঢুকলে পরে ছোট-গিন্নী নৌকায় উঠে এলেন, নিতাইও অমনি নৌকা খুলে দিলে।

ঘরের দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে সাবধানী তার বড় বাক্সের কাপড় বার করছিল। একটি লোক যে ঘরে ঢুকলো তা সে জানতেও পারে নি। কার একখানা হাত পিঠে পড়াতেই সে চমকে চেয়ে দেখে খগেন। তাকে দেখেই সাবধানী তাড়াতাড়ি সেই বাক্সের দিকে পিছন ফিরে বসলো। তার উপরে সে কাপড় চাপা দিয়েছিল, তবু ভাল ঢাকা পড়ে নি। খগেনের দৃষ্টি সেই উজ্জ্বল, মসৃণ, কালো রঙের বাক্সটির যে একটুখানি কোণ বেরিয়েছিল, তার পরেই স্থির হয়ে রইল। কিন্তু তার কথা জিজ্ঞেস না করে সে একটু হেসে বল্‌লে, "এমন সময় বাক্স খুলে কাপড়ের দোকান সাজিয়ে বসেছ কেন গো! যখুনি বাড়ীর ভিতরে আসি, তোমায় একটা কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেই দেখতে পাই!"

"কাপড়গুলো বড্ড এলোমেলো হয়েছিল, তাই একটু গুছিয়ে রাখ্‌ছি," বলে সাবধানী আরও কাপড় ফেলে বাক্সের কোণটিও ঢাকা দিলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! স্তূপাকার কাপড়ের নীচে থেকে গহনার বাক্সটি বার করেই খগেন বলে উঠলো, "বাঃ, ভারি সুন্দর বাক্সটি তো! এ-বাক্সটি কার সাবধানী?"

খগেন ছিল উপকথার মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের মত—দেখ্‌তে সে ভারি শান্ত, কিন্তু তার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিটা খাতকদের আর সাবধানীর কাছে মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়তো। সাবধানী তার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পেত। শ্বশুরবাড়ীতে, ভুলো পটলা বা বৌদিদিদের সামনে সে যে বীরত্ব দেখিয়েছে, এখানে এসে তা একদম লোপ পেয়ে গেছে। খগেনের দু'দিনের শাসনেই সেই বীর-বালিকাটি এখন ভিজে বেড়ালে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তা'কে নিরুত্তর দেখে খগেন বল্‌লে, "তোমার মা বুঝি এই বাক্সটি তোমায় দিয়ে গেছেন? তুমি যে কি করছ, এমন জায়গায় কি এই বাক্স রাখে? এখান থেকে চুরি হয়ে যেতে পারে, ও একটা ষ্টীলট্রাঙ্ক বইতো নয়! দাও, আমি এটি সিন্দুকে রেখে দিই, কেমন?"

খগেন বাক্সটি নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সাবধানী সভয়ে বললে, "মা এ-বাক্সটি আমায় একেবারে দিয়ে যান নি—"

"তোমায় রাখতে দিয়েছেন তো? তিনি যখন চাইবেন, তখন সিন্দুক থেকে বার ক'রে দিলেই হবে।" ব'লে খগেন বাক্সটি হাতে ক'রে সে ঘর থেকে চলে গেল।

৬

সে হপ্তায় ছোট-গিন্নী সাবধানীর চিঠি পেলেন। সে লিখেছে, "মা, তোমার বাক্সটি আমি বেশ ভালো ক'রে রেখেছি, তার জন্যে তুমি ভেব না। বড়দার মোকদ্দমার কি হলো, আমায় জানিও।"

চিঠিখানা পেয়ে ছোট-গিন্নী নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। দিন যেমন যাচ্ছিল, যেতে লাগলো। বিশেষ দরকার না হ'লে তিনি আর বউদের সঙ্গে কথা বলেন না, বাবুরা বাড়ীর ভিতরে এলে তাদের সঙ্গে দেখাও করেন না, আপনার মনে গুম হয়ে থাকেন। শুধু তিনি নন, বাড়ীর সবাই চিন্তাকুল, বিষণ্ণ। বিষাদের প্রতিমূর্ত্তির মত বধূরা ঘুরে ফিরে বেড়ান, তাঁদের ছেলেরাও এখন আর মন খুলে হাসি খেলা করে না। এমনি ক'রে আরও দু'টি মাস কেটে গেল।

একদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে জেগেই ছোট-গিন্নী খুব সোরগোল শুনতে পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে দেখলেন, একখানা হলদে কাগজ হাতে ক'রে বড়বাবু উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে পাড়ার অনেক লোক আনন্দকোলাহল করছে, বধূরাও হাসিমুখে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছেন। ছোট-গিন্নী কি হয়েছে ব'লে এগিয়ে যেতেই বড়বাবু তাঁর সামনে এসে বললেন, "মোকদ্দমায় আমাদেরই

জিত হয়েছে ছোট-মা! কলকাতা থেকে এই মাত্র টেলিগ্রাম এসেছে, যায় খরচাসুদ্ধ ডিক্রী পাওয়া গেছে। যাক্ সম্পত্তি তো রক্ষে হয়েছে, আর ভাবনা নেই।"

মেঘ কেটে যে রোদ উঠ্‌লো, ছোট-গিন্নীর মুখেও তা ছড়িয়ে পড়লো—"মোকদ্দমায় জিত হয়েছে?" এই কথাটির পুনরুক্তি করেই তিনি হেসে বললেন, "তুমি জিতবে বই কি বাবা! তোমার ধর্ম্মের শরীর, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষে করেছেন।"

ধীরে ধীরে বড়বাবু বারান্দার 'পরে বসে পড়লেন। বিপদ চলে গেছে—কিন্তু সে যে দাগ কেটে দিয়ে গেছে, তা বুঝি আর যাবার নয়। এই ক'টা বছরের দুঃখ, দুশ্চিন্তা, অপমানের স্মৃতিগুলি সব এক সঙ্গে মনে পড়ে বড়বাবুকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লো। তাঁর মূর্চ্ছিতের মত অবস্থা দেখে ছোট-গিন্নী তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জল এনে মাথায় চাপড়ে দিলেন, বড়বউ ছুটে এসে হাওয়া করতে লাগলেন। আনন্দধ্বনি থেমে গেল, সবাই অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে রইলো। একটু সুস্থ হয়ে বড়বাবু বিমাতার পানে চেয়ে বললেন, "একটা বছর আমার বড় কষ্টে গেছে, ছোট-মা!"

ছোট-গিন্নী ধীরে ধীরে বললেন, "জানি বাবা সব। বড় কষ্টই সহ্য করেছ তুমি—কোনোখান থেকে সান্ত্বনা বা সাহায্য কিছুই তো পাওনি! এ শুধু ভগবানই দিতে পারেন, মানুষ তা দিতেও যে পারে না! তিনি যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন আর ভাবনা কি! ওঠো, হরির লুট দাও, আমি যাই স্নান ক'রে সত্যনারাণ পূজোর যোগাড় করে দিই গে।"

সন্ধ্যা হ'তেই মহাসমারোহে হরির লুট, সত্যনারায়ণ পূজো হ'তে লাগলো। আজ কত কথা, কত হাসি, কত গান—কত লোক এসে কত রূপে বড়বাবুকে অভিনন্দিত করছে! বিপদের দিনে যারা তাঁকে ত্যাগ করেছিল, আজ তারা ফিরে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে! পূজো শেষে অনেক রাত্রে ঘরে এসে ছোট-গিন্নী দেখলেন, বড়বধূ তাঁর খাবার নিয়ে বসে রয়েছেন। তিনি যেতেই হেসে বললেন, "তোমার ছেলে এই-সব পাঠিয়ে দিলেন ছোট-মা! আজ থেকে আবার তোমার সব খরচই সংসার থেকে দেওয়া হবে। এতদিন দিতে পারেন নি বলে উনি মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন।"

ছোট-গিন্নীর খাওয়া হ'লে বধূ আবার বললেন, "কাল সাবধানী আর ঠাকুরঝিদের আনতে পাঠাই ছোট-মা, তাদের অনেক দিন জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

তিনি উত্তর দিলেন, "বড়মেয়েকে আনতে পাঠাও। আর দিন-কতক যাক, সাবধানীকে আমি তখন আপনি গিয়ে নিয়ে আসব।"

বধূ আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "তুমি যাবে মেয়ে আনতে ছোট-মা!"

"হ্যাঁ, আমাকেও একবারটি সেখানে যেতে হবে।"

নিতাইয়ের মার কাছে মা এসেছেন শুনে সেদিনও সাবধানী হাতের কাজ ফেলে ছুটে গেল, দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই ছোট-গিন্নী পায়ে উঠে এলেন। মার হাতটি ধরে মেয়ে আবদার করে বললে "এবারে তোমায় ও-বাড়ীতে যেতেই হবে মা! আমার শাশুড়ী বাড়ী নেই, তাঁকে পাড়া থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি এখুনি।"

ছোট-গিন্নী হেসে বললেন, "আচ্ছা চল্, যাচ্ছি। খগেন বাড়ী আছে তো, সাবধানী?" "আছেন" ব'লে সাবধানী মুখ নীচু করলে।

ছোট-গিন্নী নিতাইয়ের মাকে সন্দেশের হাঁড়িটি নিয়ে আসতে ব'লে মেয়ের সঙ্গে চললেন। বাড়ী গিয়ে খগেনকে না দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "খগেন কোথা সাবধানী?"

"এই যে ওঘরে ছিলেন। কোথা গেছেন হয়তো, এখুনি আসবেন।"

"আমি এসেছি শুনেও সে চলে গেল! ও, তার মাকে ডাকতে গেছে বুঝি? এ-ছেলেটি কে সাবধানী, তোর দেওর? থাক্ বাবা থাক্, আর পেরণাম করতে হবে না, এমনিই সব ভালো থাকো" ব'লে মেয়ের হাত ধরে পাশের ঘরে গিয়ে মা বললেন, "আমার বাক্সটি এখন যার করে দে না সাবধানী, কেউ কোথাও নেই, এই তো সময়।"

মায়ের মুখ পানে চেয়ে মেয়ে বললে, "সেটা তো আমার কাছে নেই।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ছোট-গিন্নী তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, "তোর কাছে নেই কি রকম?"

"সে বাক্স তো তুমি নিজেই এসে নিয়ে গেছ, মা!"

"ওমা, তুই কি বলচিস, সাবধানী! আমি আবার কবে এখানে এলুম? তোর সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হলো?"

"আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি—আমি যে সেদিন নেমন্তন্নে গেছলুম। বাড়ী এসে শুনলুম, তুমি নাকি সেই বাক্সটা নিয়ে গেছ।"

"সাবধানী, সাবধানী!" মায়ের ভীষণ মুখের পানে চেয়ে মেয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, "আমি তো মিছে বলিনি মা, যা শুনেছি তাই বলছি।"

নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে ছোট-গিন্নী বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। বাক্সটা কি তবে তোর কাছে নেই, খগেনকে রাখতে দিয়েছিলি? আমি তোকে বার বার ক'রে মানা করেছিলুম সাবধানী, কাউকে জানাতে—"

"আমি ইচ্ছে ক'রে জানাইনি মা! উনি হঠাৎ ঘরে ঢুকে বাক্সটি যে দেখে ফেল্লেন। তার পরে, 'দাও, আমি সিন্দুকে রেখে দিই—এ বাক্স ওখানে রাখলে যে চুরি হয়ে যাবে' ব'লে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। দিন পোনেরো হবে, ও পাড়ায় আমাদের নেমন্তন্ন হয়েছিল। আমি সেখান থেকে এলেই উনি বললেন, 'তোমার মা যে আজকেও এসেছিলেন, আমি তাঁকে বাক্সটা দিয়ে দিয়েছি।'"

"তাই সে আমায় দেখেই পালিয়েছে! আমি যাই সাবধানী, যে-কথা তোর মুখে শুনলুম, খগেনের মুখ থেকে তা শোনবার আগেই চলে যাই।"

সাবধানী ব্যস্ত হয়ে বললে, "না মা, তুমি এখন যেও না। তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা কি শোনোই না, আমাকে ঠাট্টা করতেও তো পারেন। মেজঠাকুরপো, যাও তো, তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এস।"

নগেন বারান্দা থেকে সব শুনছিল, এইবারে ছুটে দাদাকে ডাকতে গেল। ছোট-গিন্নী তখন আর দাঁড়াতে পারছিলেন না, মাথা ঘুরে মাটিতেই বসে পড়লেন। সাবধানীও শুকনো মুখে তাঁর পাশে বসে রইলো। দু'জনেই নীরবে কম্পিতবক্ষে খগেনের প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এল। সাবধানী আলো নিয়ে এলে ছোট-গিন্নী নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, "আমি যাই সাবধানী, ও গয়না যার হাতে পড়েছে, তার কাছ থেকে বার করা আমার কর্ম্ম নয়। মিছেই এতক্ষণ বসে রইলুম।" নির্ব্বাক কন্যার মুখ পানে চেয়ে এই কথাটি বলেই তিনি বাড়ী থেকে বার হয়ে গেলেন।

খগেন তখুনি এসে বললে, "এত ডাকাডাকি করছ কেন? কাজের সময় ডাকলে পরে বড় বিরক্ত বোধ হয়।"

তাকে দেখেই সাবধানী বলে উঠলো, "তুমি কি মাকে সেই বাক্সটি দাওনি? তার জন্যে এতক্ষণ বসে থেকে মা যে কেঁদে চলে গেলেন।"

"ডাক না তোমার মাকে, নিয়ে যান তাঁর বাক্স। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে, এতে কাঁদবার কি হয়েছে," বলে খগেন চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলতে গেল। তাই দেখে সাবধানী খগেনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে খালের ধারে এল। সেখানে তারা আর সে নৌকাখানা দেখতে পেলে না, কিন্তু নৌকা বাওয়ার শব্দ বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। লজ্জা ভয় ভুলে গিয়ে সাবধানী খালের ধার দিয়ে ছুটে যেতে যেতে ডাকলে, "মা, ফিরে এস। তোমার বাক্স বার করে দিচ্ছি, ফিরে এসে নিয়ে যাও তুমি, মাগো!"

সাবধানীর ডাক শুনতে পেয়ে ছোট-গিন্নী চমকে উঠলেন। নিতাই জিজ্ঞেস করলে, "ফিরে যাব নাকি, মা-ঠাকরুণ? খুকীদিদি আপনাকে ডাকচেন বলে যেন বোধ হচ্ছে।"

ছোট-গিন্নী কম্পিতকণ্ঠে বললেন, "সে আর আমায় ডাকবে না রে, ও আমাদের শোনবার ভুল। একবার যে ভুল করেছি, আবার তাই করব? সে যদি বলে, 'কই তোমায় আমি ডাকিনি তো—' তখন? সে হবে না

নিতাই। খুব জোরে বেয়ে চল্ তুই, যাতে শিগ্গীর বাড়ী পৌঁছতে পারি।"

ছোট-গিন্নী সাবধানীকে নিয়ে এসেছেন ভেবে সবাই ছুটে এলেন। বড়বধূ বললেন, "সাবধানীকে আর খগেন বাবুকে নিয়ে এলে না কেন, ছোট-মা?" সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি ঘরে গিয়েই দোর বন্ধ করলেন।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের বেলা তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁকে আর তখন চিনতে পারা যায় না। চোখমুখ বসে গেছে, যেন কত অসুখে ভুগছেন, চেহারা এত খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে অসহ্য বেদনায় তাঁর মন অনবরত টন টন করছিল, তিনি না বললেও তা কারো কাছেই অপ্রকাশ রইল না। পাড়ার লোকেও এ বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো। বড়বধূ বললেন, "খগেন বাবু খুব চালাক তো! আমার মনে হয় মেজবউ, এ-সব সাবধানীরই কারসাজি। ও মেয়েও তো কম চালাক নয়—এখন পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আপনি কেমন বোকাটি সেজে বসে রয়েছে।"

বাড়ীতে বড়বাবুর বোনেরা সবাই তখন এসেছেন। এ-কথা শুনেই তাঁদের ছোট বোনটি ছোটমার ঘরে ছুটে গিয়ে বললেন, "হাঁ ছোটমা, তোমার সমস্ত গয়নাই কি ওখানে রেখে এসেছ, এখানে কিছুই নেই? আহা, কি চমৎকার প্যাটার্ণের সব গয়না গো, কত হীরে মুক্তো বসানো! আমার মা যখন সে-সব পরতেন, তাঁকে একেবারে রাণীর মতোই মানাতো।"

ছোট-গিন্নীর কঠিন মুখ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে মেয়েটি এইবারে করুণস্বরে বললে, "বল না ছোট-মা, কি হলো? তোমার মুখেই সব শুনি! আমাদের মনেও যে আশা ছিল, তুমি যখন মা হয়েছ, তখন মার মতই সবাইকে সমান দেখবে। ওমা, এ কি হলো গো!"

এই ব্যাপারে ছোট-গিন্নী মেয়েজামাইকে যতই দোষী করুন, পাড়ার দুষ্টলোকেরা তাতে সায় দিলে না। তারা বলতে লাগল, "ও সব গয়না পরে তো সাবধানীই পেত, পাঁচজনার ঘর দেখে বুদ্ধি ক'রে না হয় আগেই হাত্ করেছে, এতে যদি কারো দোষ থাকে, তবে সে সম্পূর্ণ বড়বাবুর। তিনি যদি বিমাতার গয়নার ওপরে শনির দৃষ্টি না দিতেন, তবে তা কক্ষণো এমন ক'রে উড়ে যেত না!"

মেজবধূর গহনাগুলি বন্ধনমুক্ত হয়ে ফিরে এসেছে শুনে ছোট-গিন্নী সেদিন বাইরে এসে দেখ্লেন, বড়বাবু নিজেই তা নিয়ে এসেছেন। তার ঘরের সামনে সেই বাক্সটি রেখে দিয়ে তিনি বললেন, "এই ধর মা, তোমার গয়না তুমি মিলিয়ে দেখে নাও। আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমার জন্তেই আমাদের ধন মান সব রক্ষে হয়েছে। তোমার ধার আমরা কখনো শোধ করতে পারব না।"

মেজবধূ ঘর থেকে বার হচ্ছেন না দেখে বড়বধূ বাক্সটি তুলে নিয়ে তাঁকে দিতে গেলেন। যাঁরা সেখানে ছিলেন, সবাই বলতে লাগলেন, 'এমন লক্ষ্মী বউ আর হয় না, ওর দয়াতেই তো দত্তদের জমিদারীটা রক্ষে পেয়ে গেল।' ছোট-গিন্নী এক পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখলেন শুনলেন, একটি নিশ্বাস ফেলে তিনি এই ভাবতে ভাবতে ঘরে গেলেন যে, যদি তিনি সেদিন বড়বাবুকে গয়নাগুলি দিতেন, তবে তা আজ ঘরে ফিরে আসতো, সবাই তাকে লক্ষ্মী মা বলে মনেও করতো। তাঁর কি দুর্ব্বুদ্ধি হলো—বড়বাবুর মত ধর্ম্মপ্রাণ লোককে বিশ্বাস না ক'রে সাবধানীকে বিশ্বাস করতে গিয়ে তিনি সর্ব্বস্ব হারালেন। তাঁর এই বুক-ফাটা দুঃখে কারো সহানুভূতি নাই, সবাই ভাবচে, যেমন কর্ম্ম তার ফলও তেমনি হয়েচে।

কিন্তু কেন এ মনোবেদনা! ছোট-গিন্নী যার জন্তে ও বাক্সটি যত্ন করে রেখেছিলেন, সেই তা নিয়েছে। তবে কেন সে কথা মনে হলেই মনটা ঘৃণায় ভরে উঠে—সাবধানীর মুখ দেখতেও আর ইচ্ছে করে না? দুদিন ফিরে আসার পরে সবাই আবার আগেকার মত আসা-যাওয়া করছে, শুধু সে-বেচারাই আর এখানে আস্তে পারছে না। মনকে তিনি বোঝাতে চান, এ-সব খগেনের কারসাজি, সাবধানীর এতে কোনই দোষ নেই। মন তাও বুঝতে চায় না—সে বলে সব জেনে-শুনে সাবধানী কেন চুপটি করে রয়েছে, তাঁর কাছে আর চিঠিও তো লেখে না। সে চেষ্টা

করলে কি আর এতদিনে ও বাক্সটা তাঁকে দিয়ে যেতে পারত্ না? তিনি যখন সেখানে সর্ব্বস্ব রাখতে গিয়েছিলেন সে তো তাঁকে মানাও করতে পারতো, "মা, এখানে ও সব রেখো না গো, এরা লোক তেমন সুবিধের নয়।" হায়, ঘরের জিনিষ কি কুক্ষণে বার করে দিয়ে এলেন, আর তা ঘরে আনতে পারলেন না। ছোট-গিন্নী এ কথা যত ভাবেন, তাঁর মন ততই জ্বলে-পুড়ে যায়—কেবলি চেঁচিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে করে, "সাবধানী, সাবধানী! ওরে, তুই এই করলি? এইজন্যেই কি তোকে আমি বুকে করে মানুষ করেছিলুম!"

৭

এই কষ্ট ছোট-গিন্নীকে যেন অভিভূত করে ফেললে। তাঁর দেহও ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লো। প্রতিরাত্রেই জ্বর হয়, তিনি তারও কোন প্রতিকার করলেন না। জ্বর যখন তাঁকে শয্যাধরা করে ফেললে, বড়বাবু জানতে পেরে কবিরাজ নিয়ে এলেন। ছোট-গিন্নী কিছুতেই তাঁকে হাত দেখালেন না, তাঁর ওষুধ স্পর্শও করলেন না। বড়বধূ বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমি কি করছ বল তো, ছোট-মা, শেষটা অতিকিচ্ছেয় মারা যাবে না কি? আমাদের তো আর সবই হয়েছে, এই দুর্নামটুকুই এখন বাকী আছে—সাবধানীকে বলে পাঠাই, সে এসে তার মার তিকিচ্ছে করুক। না, তুমি মানা করো না, আমি আজই সেখানে লোক পাঠাব।"

অতি ক্ষীণ-স্বরে ছোট-গিন্নী বললেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি বউমা, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে, ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। যেকটা দিন আছি, আমায় শান্তিতে থাকতে দাও। তোমরা কেন এই নিয়ে এত গোল করছ? শুধু একটি অনুরোধ, সাবধানীর মুখ যেন আমায় আর দেখতে না হয়—তোমাদের কাছে আর কিছুই আমি চাই না!"

"তোমার এ-অনুরোধ রাখবার মত নয় ছোট-মা! এত রাগ করবার কিছুই তো হয়নি। ওরা ছেলেমানুষ বই তো নয়, না বুঝ্‌তে পেরে যদি কিছু অন্যায় করেই থাকে, তার কি আর মাপ নেই?"

"না, নেই। মানুষ শুধু বিচার করতেই পারে, সে মাপ করতে জানে না, বড়বউ। আমি তো জীবনে ও-কাজটা কখনো করতে পারলুম না," বলেই ছোট-গিন্নী অতিকষ্টে পাশ ফিরে শুলেন। বড়বধূ নীরবে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। তখন তাঁরও মনে হলো, সত্যই এ-জগতে মাপ নেই। তিনি তো শাশুড়ী বলেও এঁকে মাপ করতে পারেন নি, এই তেজস্বিনীর তেজ কমাবার ইচ্ছা তিনিও কত করেছিলেন।

অর্দ্ধঅচেতনের ন্যায় ছোট-গিন্নী সারারাত সেই এক কথাই বলতে লাগলেন। তাঁর জ্বরবিকারের লক্ষণ দেখতে পেয়ে বড়বাবু প্রাতে উঠেই কবিরাজকে ডেকে পাঠালেন ও আপনি সাবধানীকে নিয়ে আসতে সা-নগরে ছুটে গেলেন।

তাঁর কাছে ছোট-গিন্নীর এ-অসুখের কথা শুনে খগেন মুখটি ম্লান করে বললে, "ও, তাঁর এত অসুখ করেছে? আপনার আরো আগে আমাদের খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

সাবধানী কেঁদে বললে, "ও বড়দা, মার গয়নার বাক্সটা ওঁকে বার করে দিতে বলো না, সেটা না নিয়ে আমি যেতে পারব না!"

বড়বাবু বললেন, "ছোটমার সেই বাক্সটি নিয়ে চল খগেন। ওটা হাতছাড়া হওয়াতে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন। যাক্, যা হবার তা তো হয়েই গেছে —এখনও তিনি যাতে সজ্ঞে শান্তি পান, তাই করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

খগেন গম্ভীরস্বরে বললে, "আপনারা ইচ্ছা করলে ওটা অনেক আগেই নিয়ে যেতে পারতেন, ওর জন্যে কেন আমাকে দোষী করছেন? সাবধানীর কাছ থেকে সেই বাক্সটা নিয়ে আমি সিন্দুকে রেখে দিয়েছি, নিরাপদে থাকবে বলে। নইলে আমি কেন রাখতে যাব বলুন, আমার কিসের অভাব?"

বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তুমি একটু শীগ্‌গির করে চল খগেন, ও-সব কথার সময় এখন নয়। ওদিকে যে কি হচ্ছে, কে জানে!" খগেন তখুনি পাশের ঘরে গেল ও

বাক্সটা নিয়ে এসে বললে, "এই নিন আপনাদের জিনিষ। সাবধানীকেও নিয়ে যান, তাঁর সেবা করতে পারবে। আমি গিয়ে কি করব বলুন, আমায় দেখে তো তিনি খুশী হ'বেন না!"

বড়বাবু বললেন, "কেন খুশী হবেন না খগেন, তুমি তাঁর একটি মাত্র জামাই। ছোট-মা যদি বেঁচে ওঠেন, যত পার তখন মান-অভিমান করো। এখন শীগ্‌গির ক'রে চল, নইলে শেষ দেখাও যে হবে না।"

নৌকা থেকে নেমেই সাবধানী বাক্সটি নিয়ে ছোট-গিন্নীর ঘরে গেল। তাঁর মুখের পানে চেয়েই ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল, সে এত মলিন! মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সে আকুল-স্বরে বল্‌লো, "মা, মা! ও মা আমি এসেছি যে, চেয়ে দেখ!'

লাল চক্ষু দু'টি ঘরের উপর দিকে স্থির রেখে ছোট-গিন্নী তখন কি বলছিলেন। সাবধানীর কথা যে তিনি শুনতে পেলেন, তা বোধ হলো না। বড়বউ বললেন, "ছোটমার এখন জ্ঞান নেই। সাবধানী, চুপ ক'রে বোস্। কবিরাজ বলেছেন ঘণ্টা-দেড়েক পরেই তাঁর জ্ঞান হবে, তখন যা হয় বলিস্।"

বাক্সটি মার পাশে রেখে সাবধানী বললে, "জ্ঞান নেই বল্‌চ কি তুমি বৌদি? ওই তো মা কথা বল্‌চেন!"

"উনি বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্‌চেন, তুই চুপ ক'রে বসে শোন্!"

বড়বাবু ও খগেন আস্তে আস্তে এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। ছোট-গিন্নী তখন বলছিলেন, "জানিস ঝি, কেদার-ঠাকুর ঠিকই বলেছিলেন কিন্তু। আমি যদি তাঁর কথাটা মনে রাখতুম, তা হ'লে আর এ-কষ্টটা সইতে হতো না। বড় কষ্ট মনে রইল। সাবধানী এই করলে! আমার মেয়েজামাই আমাকেই ঠকালে! বড় যাতনা—উঃ, প্রাণ যে যায়!"

এতো প্রলাপ নয়—মার মনের ব্যথা যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে! সাবধানী কেঁদে বলে উঠলো, "মা, ওমা, তুমি ও-কথা আর বলো না! শুনে আমার বড্ড কষ্ট হয়! সাবধানী তো কিছু করে নি মা! যে করেছে সে যে তোমার সামনেই রয়েছে, তাকে যত খুশী বল। আমায় তুমি ভুল বুঝে চলে যেও না!"

খগেন চোখ পাকিয়ে সাবধানীর পানে চাইল। সে তখন আকুল হয়ে কাঁদছিল। তার সেই দৃষ্টি ব্যর্থ হ'ল দেখে খগেন বড়বাবুকে বললে, "দেখুন এইজন্যেই এখানে আমি আসতে চাইনি। এসব অন্যায় কথা কত আর শুনতে পারা যায়, বলুন!"

এই কথাটি কাণে যেতেই সাবধানীর চোখের জল শুকিয়ে গেল। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে খগেনের মুখ পানে চেয়ে সে বলে উঠলো, "আমার এ কথাটা অন্যায়? মার কথা-গুলো কাণ পেতে শোন—যা করেছ তুমি, তার ফলটা চোখ দিয়ে দেখ। এখন তো বেশ ভালোমানুষের মত দাঁড়িয়ে রয়েছ। মার এই গয়নাগুলি হাত করবার জন্যে কত ফন্দীই না এঁটেছিলে! এই বাক্সটা কেউ খুলে দাও তো, আমি দেখ্‌ব, কিসের লোভে মার সঙ্গেও বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারা যায়! দেখব, ওতে এমন কি আছে—যা মার চেয়েও বেশী বলে তুমি আমায় বোঝাতে চেয়েছিলে! এখন তুমিই আবার ন্যায়-অন্যায়ের কথা কি করে যে বলচ!"

এর পরে খগেন আর মেষচর্ম্মাবৃত হয়ে থাকতে পারলে না, সে তখন নিজ মূর্ত্তি ধরে গর্জ্জে উঠলো, "এসব তুমি আমায় কি শোনাচ্ছ সাবধানী? যেন আমি তোমার মার গয়না চুরি ক'রে খেয়ে ফেলেছি। একটা ভাঙা বাক্সে রাখ্‌তে যাচ্ছিলে, ভাল মনে ক'রে আমি সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলুম, তার জন্যে এত! তোমার মা তো আমার নিন্দে চারদিকেই রটিয়ে দিয়েছেন, আবার তুমিও তাই করছ! আচ্ছা, থাকো, এর ফল বাড়ী গিয়ে তখন দেখ্‌বে," ব'লেই খগেন সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেগতিক বুঝে বড়বাবু, "আরে শোন শোন, ও খগেন!" ব'লে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তার পেছনে চললেন।

কিন্তু খগেন আর ফিরেও চাইলে না, যে নৌকায় এসেছিল, তাতেই উঠে সে বাড়ী চলে গেল।

সকলের সারাদিনের চেষ্টায় সন্ধ্যেবেলা ছোট-গিন্নীর চেতনা ফিরে এল। তিনি চেয়ে চেয়ে সবাইকে দেখ্‌তে লাগলেন। সাবধানী শিয়রে বসে কাঁদছে দেখে তাকে বললেন, "তুই কাঁদ্‌চিস কেন রে, সাবধানী? এতদিন পরে এলি যদি, হেসে খেলে বেড়া; শুধু শুধু কাঁদতে আছে কি?"

গহনার বাক্সটি তাঁর সামনে রেখে সাবধানী বললে, "মা, এই দেখ, তোমার সেই বাক্সটি আমি নিয়ে এসেছি।"

ধীরে ধীরে, তার ওপরে একখানি হাত রেখে ছোট-গিন্নী বল্‌লেন, "এনেছিস, তা বেশ করেছিস। ওর ভেতরে যা যা ছিল, সব ঠিক আছে তো, সাবধানী?"

"তা আছে বৈ কি। তোমার বাক্স তো আমরা কখনো খুলিনি মা, ওর চাবিও আমাদের কাছে ছিল না। আমায় তুমি এইবার মাপ কর মা!"

কন্যার কাতর মুখের পানে চেয়ে ছোট-গিন্নী হেসে বললেন, "তা করব বৈ কি, তোর 'পরে রাগ করবার আমার কিছুই তো রইল না। তুই খালাস পেলি, এখন আমাকেও তাই পেয়ে যেতে দে। বাবা নবীন, তুমি এদিকে এস তো! শোন, এই গয়নার বাক্সটা তোমার মার। কর্ত্তা আমায় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এতে আমার কোন অধিকার ছিল না। সতীনের জিনিষ ব'লে তিনি বেঁচে থাক্‌তেও তা আমি কখনো গায়ে দিইনি। পরে লুকিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে যে যাতনা ভোগ করেছি, আজ তারও অবসান হয়ে যাক। এ বাক্সটা তোমরাই তুলে রাখ বাবা, আর কারো এ ভার সইবে না। আমি যাই। ছোট-মা ব'লে যদি কখনো মনে কর, তোমার বিপদের দিনে যে ভুল করেছিলুম, জেনো, আমি সৎমা ব'লেই অমন করিনি—ওটা যে আমাদের স্বভাব, পুরুষজাতকে বিশ্বাস করতে পারি না। তাই ছেলেকে বিশ্বাস না করে মেয়ের কাছে সব রেখেছিলুম। ওখানেও যে ছেলে রয়েছে, সে কথাটা তখন মনেই পড়েনি!"

বড়বাবু বললেন, "ও গয়নায় আমাদের আর দরকার নেই ছোট-মা, ও আপনি সাবধানীকেই দিন। খগেন যে রকম রেগে গেছে, এ বাক্সটা না নিয়ে গেলে ওকে হয় তো অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।"

ছোট-গিন্নী অবিচলিতস্বরে বললেন, "তা হোক; এ-জগতে আসাই তো ঐ জন্যে বাবা! তাই বলে যাবার বেলা আর অন্যায় করতে পারব না। ও-বাক্সটি তোমরা ছাড়া আর যার কাছে থাকবে, আমার মনে হচ্ছে, তার কখনো ভালো হবে না। তোমার শাশুড়ীর গয়নার বাক্সটি তুলে রেখে দাও তো বউমা। তিনি হয় তো চেয়েছিলেন, তাঁর বউ এসে এসব পরবে, তাই ওর একখানি গয়নাও কেউ ছুঁতেও পায়নি। ও নিয়ে কত কাণ্ডই যে হয়ে গেল! সন্তান ওরই জন্যে মাকে ভুললে, মাও সন্তানের চেয়ে তার অপরাধটাই বেশী করে দেখলে। ও-জিনিষ বড় ভয়ানক। সাবধানী, তোকে আমি কিছুই দিয়ে যেতে পারলুম না, কিন্তু মনে-প্রাণে আশীর্ব্বাদ করে গেলুম, ধর্ম্মে যেন মতি রাখ্‌তে পারিস।"

বড়বধূকে গহনার বাক্সটি নিয়ে চলে যেতে দেখে সাবধানী চোখে অন্ধকার দেখল। সে বুঝলো, এর জন্যে তা'কে অনেক কষ্ট পেতে হবে। খগেন কিছুতেই বাক্সটি দিতে চায়নি। সে বুঝেছিল মা নিশ্চয়ই আর সেরে উঠতে পারবেন না, সাবধানী বাক্সটি আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে। এই ভেবে সে শুধু তার দোষস্খালনের জন্যেই বাক্সটি বার করে দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনা যে রকম দাঁড়ালো, তার ফলে তার লুব্ধ স্বামীর ভীষণ ক্রুদ্ধ মুখখানা মনে হ'তেই ভয়ে সাবধানী শিউরে উঠল। ভোরের সময়, যখন ছোট-গিন্নীর প্রাণ পরলোকের পথে যাত্রা করলো, তখন সেও সেইখানে যাবার কামনা ক'রে মৃতা জননীর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র

ভরতের নাট্যশাস্ত্র ছাপা হইয়াছে। ইংরেজি ১৮৯৪ সালে কাব্যমালায় ছাপা হইয়াছে। আর ১৯২৬ সালে গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহা চার খণ্ডে পূরা হইবে, এক খণ্ড মাত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার সহিত অভিনবগুপ্তের টীকা আছে এবং ১০৮ রকম নাচের মধ্যে ৯৮ রকম নাচের ছবি আছে। চৌখাম্বা হইতেও উহার আর এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কাব্যমালার সংস্করণের সম্পাদক দুইখানি মাত্র পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাতে অনেক পাঠ ছিল না; অনেক জায়গায় পোকায় খাওয়া ছিল। সে সকল বাদ দিয়া তাঁহাকে ছাপাইতে হইয়াছে। গাইকোয়াড়ের বই পুঁথি দেখিয়া ছাপা হইতেছে। তাহার সঙ্গে টীকার পাঠও আছে। চৌখাম্বায় মূল মাত্র, কিন্তু সে মূল কাব্যমালার মূল অপেক্ষা অনেক ভাল।

...নেপালের একখানি হাতের লেখা পুঁথির সহিত কাব্যমালার পাঠ মিলাইতে গিয়া আমি দেখি প্রায় ১০ অংশের এক অংশ নাই। গাইকোয়াড়ের নাট্যশাস্ত্র বাহির হওয়ায় বুঝিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। পাঠের সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। টীকাও ভাল। কিন্তু টীকা অভিনবগুপ্তের লেখা, বড় গাঢ়। কিন্তু সে ত ৭ অধ্যায় বই বাহির হয় নাই। বাহির হইবার জন্ত লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। তাহার উপর আবার রামচন্দ্র কবি সম্পাদক লিখিয়াছেন, শেষ ভাগ যখন বাহির হইবে তখন ইংরেজিতে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা লিখিবেন।...কিন্তু তাঁহার বই বাহির হইতে এখনও বোধ হয় আট বছর লাগিবে। এই আট বছরের জন্ত পাঠকদিগের কতকটা তৃপ্তি যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি আজ ভরত-নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলিব।

ম্যাক্সমূলর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন বেদের পুঁথিগুলি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম ছান্দস, দ্বিতীয় মন্ত্র, তৃতীয় ব্রাহ্মণ, চতুর্থ সূত্র। এ চারি শ্রেণীরই লিখিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র, রীতি স্বতন্ত্র, বিষয় স্বতন্ত্র, আরম্ভ স্বতন্ত্র, শেষ স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে শেষ শ্রেণী সূত্র। বেদের সূত্রগুলি গদ্যে লেখা। আমাদের এখনকার সূত্রের মতন অত ঠাস গাঁথুনি নয়।...লেখা সোজাসুজি সংস্কৃতে যাহাকে প্রাঞ্জল বলে।...

ম্যাক্সমূলর বলেন যে, সূত্র লেখা শেষ হইয়া গেলে পর ব্রাহ্মণেরা শ্লোকচ্ছন্দে লম্বা লম্বা পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ভাষা বেদের ভাষা হইতে অনেক স্বতন্ত্র, সহজ এবং পাণিনি-সম্মত। আমি আরও দেখিতে পাই যে, এই সকল লম্বা লম্বা শ্লোক ছন্দের পুঁথি প্রায়ই একজন মুনি বলিতেছেন আর অন্ত মুনিরা শুনিতেছেন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই জিজ্ঞাসা ও উত্তরের নাম সংবাদ। শেষ দাঁড়াইয়াছিল, বট-সংবাদ না হইলে তাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করা যায় না।...ভরত-নাট্যশাস্ত্র কিন্তু এরূপ বটু-সংবাদ নয়। ইহাতে একই সংবাদ। ভরত মুনি বলিতেছেন এবং অন্ত ঋষিরা শুনিতেছেন, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন। কাহারও নাম নাই। ইহাতে নাটকের উৎপত্তির কথা আছে। কেমন করিয়া থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ারী করিতে হয় তাহার কথা আছে। থিয়েটারের বাড়ীর কত ভাগ হয় তাহার কথা আছে। ইহাতে থিয়েটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্ত থাকিত। ইহাতে দোতলা ষ্টেজের কথা আছে। ইহার সিন্‌গুলা নাড়াচাড়া করা যাইত না। সিনের চারি পাশে আঁকা থাকিত। পাশ দিয়া পাত্র-প্রবেশ হইত না। ভিতর দিক হইতে দু-পাশে দুটি দরজা থাকিত, তাহাতে পরদা দেওয়া থাকিত। সেই পর্দা সরাইয়া পাত্র-প্রবেশ হইত। ষ্টেজের উপর নাটক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক জিনিস করিতে হইত। সেগুলিকে পূর্ব্বরঙ্গ বলিত। পূর্ব্বরঙ্গে সূত্রধার আসিয়া প্রথমেই জর্জরের পূজা করিত।

জর্জর একটা ছেঁচা বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া চারটা পাব থাকিত, প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন রং থাকিত। এক এক পাবের এক একজন দেবতা থাকিত। এই জর্জর হইলেন থিয়েটারের দেবতা। সূত্রধার জর্জরের পূজা করিতেন। তারপর জর্জরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। তারপর সূত্রধার ষ্টেজের উপর নানা ভঙ্গীতে পায়চারি করিতেন, তাহার নাম "চারি" আর "মহাচারি"। তার পর নান্দীপাঠ।

সূত্রধার সুস্বরে নান্দীপাঠ করিতেন। নান্দীতে ৮টি কি ১২টি বাক্য থাকিত। অথবা ১২টি শ্লোক থাকিত অথবা শ্লোকের ১২টি চরণ থাকিত। এক একটি বাক্য পড়া হইলে পাশে দুজন লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারা বলিত "এই হউক"। নান্দীতে দেবতাদের স্তুতি থাকিত, ব্রাহ্মণদের স্তুতি থাকিত, রাজারও স্তুতি থাকিত। দেশের লোকের মঙ্গলকামনা হইতে, থিয়েটারের মঙ্গল-কামনা করা হইত। নট-নটীদের মঙ্গল-কামনা করা হইত। তাহাতে কেবল মঙ্গলের কথাই থাকিত, অমঙ্গলের কথা কিছু থাকিত না। নান্দীপাঠের পর পাত্র-প্রবেশ। এখন যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইত। কিন্তু সূত্রধার পাত্র-প্রবেশ করাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িত। মধ্যে, অর্থাৎ নান্দীর পর, এবং পাত্র-প্রবেশের মধ্যে সূত্রধার প্রেক্ষকদিগের বেশ একটু তোষামোদ করিতেন। কবির গুণের কথা বলিয়া দিতেন এবং দু-একটা গান গায়িতেন।

থিয়েটারের এই বইয়ে নাচের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। নাচের তিন অঙ্গ। প্রথম অঙ্গহার, ২য় করণ, ৩য় নাট্য। ললিত অঙ্গভঙ্গীর নাম অঙ্গহার। দুই তিন অঙ্গভঙ্গী একসঙ্গে করিলে তাহার নাম হইত করণ। অনেকগুলি করণ একত্র হইলে নৃত্য হইত।

থিয়েটারের এই বইয়ে কিরূপ পাত্রকে রাজা করিতে হইবে, রাণী করিতে হইবে, বিদূষক করিতে হইবে, চাকর করিতে হইবে, তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বিবরণ দেওয়া আছে। তারপর রং করার কথা আছে। শক, যবন, পারদদের সাদা রং দিতে হইত। দ্রাবিড় অন্ধ্র দেশের লোকদের কালো রং দিতে হইত। বাঙ্গালীদের রং অত কালো হইত না। কাশ্মিরী ও পাঞ্জাবীদের রং দুধে-আলতার

মত হইত। নানা দেশের লোকের নানা রকম রং করিতে হইত। মূল রং তো চারিটা কি পাঁচটা, সেইগুলি মিশাইয়া ২০।২৫ রকম রং তৈয়ারি করিত এবং তাই লাগাইত।

নাটকের প্রবৃত্তি বলিয়া একটা জিনিস ছিল। কোন দেশের লোক নাটকের নাচ দেখিতে ভালবাসিত। কোন দেশের লোক গান শুনিতে ভালবাসিত, কোন দেশের লোক অভিনয় ভালবাসিত। কোন দেশের লোক বক্তৃতাকেই ভাল বলিত। বৃত্তি বলিয়া নাটকের আর একটা জিনিস ছিল। সেটা লেখার ভঙ্গী, অভিনয়ের ভঙ্গী, কিরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার ভঙ্গী। কোথায় লম্বা সমাস করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে না, কেহ সোজা কথায় লিখিত, কেহ বাঁকা কথায় লিখিত, কেহ শক্ত কথায় লিখিত, কেহ দুরূহ কথায় লিখিত। ছন্দের উপর ভরতের খুব দৃষ্টি ছিল। তিনি পিঙ্গলের ছন্দগুলি অনেক ভাঙিয়া লইয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রের সব শেষ অধ্যায়ে আছে সিদ্ধির কথা ও ঘাতের কথা। ঘাত মানে যাহাতে রসভঙ্গ হয়। আর সিদ্ধি মানে যাহাতে রস জন্মে। ঘাত—যেমন অভিনয় করিতে আসিয়া রাজার মুকুটটা খসিয়া গেল। কোন নট যাহা বলা উচিত তাহার উন্টা কথা বলিল। থিয়েটার হইতেছে এমন সময় পিঁপড়ের পাল উড়িল অথবা সব স্তেজে পোকা আসিয়া পড়িল, তাহাও ঘাত; অথবা চোর ডাকাত আসিয়া পড়িল। আর সিদ্ধি—যখন রস জমিয়া উঠে, করুণ রসে হা হুতাশ করে অথবা হাস্যরসে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। দেবতার আশীর্ব্বাদ হইলে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া উঠে। সিদ্ধির পরই নাট্যশাস্ত্র একরকম শেষ হইয়া গেল। এইটাই ভরত-নাট্যশাস্ত্রের ২৭ অধ্যায়। ২৮ হইতে বাজনার কথা আরম্ভ হইল। বাজনা কয় রকম, কোন্ রসে কোন্ বাজনা ভাল লাগিবে, কোন্ সময়ে কোন্ বাজনা লাগাইতে হইবে,—তার পরের কথা, স্বরের কথা, পুরাদস্তুর সঙ্গীত-শাস্ত্রের কথা। ৩৬ ও ৩৭ অধ্যায়ে নাট্যশাস্ত্রের নট ও নটীদের, উৎপত্তি ও বিবরণ-নাট্যশাস্ত্রের একটু ইতিহাস এবং শেষ ফলশ্রুতি।…

এই যে লম্বা শ্লোক ছন্দের বই ইহার ভিতরে আর দু'খানি বই আছে। সে দু'খানি লম্বাও নয়, শ্লোক ছন্দে লেখাও নয়। সে দু'খানি পুরাদস্তুর সূত্র-শ্রেণীর পুঁথি বা তাহার কোন অংশ। প্রথম খানি নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে, ২য় খানি ২৮, ২৯, ৩০ অধ্যায়ে। একখানি রসের ব্যাখ্যা, আর একখানি গানের ব্যাখ্যা। রসের ব্যাখ্যায় যে সূত্রগুলি আছে তাহা কিন্তু নটসূত্রের অন্তর্গত। কেন না, তাহার প্রত্যেক কথাতেই কিরূপ করিয়া সেই রস বা ভাব অভিনয় করিতে হইবে তাহার সূক্ষ্ম উপদেশ দেওয়া আছে। দ্বিতীয় খানি সঙ্গীত-সূত্র। এখানি নট-সূত্রের অন্তর্গত কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এখানি সূত্র লিখিবার কালের পুঁথি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।…ভরতমুনিকে ঋষিরা পাঁচটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে পাঁচটি প্রশ্ন এই—যারা নাট্যশাস্ত্রের সমঝদার তারা রস বলিয়া একটা কথা কয়, রস কাহাকে বলে এবং কি হইলে রস হয়; ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবাইয়া দেয়; সংগ্রহ কাহাকে বলে, কারিকা কাহাকে বলে, নিরুক্ত কাহাকে বলে। এই পাঁচটি কথা শুনিয়া ভরতমুনি তাঁহাদের উত্তর দিলেন। সে উত্তরটি ৫এর শ্লোক হইতে ৩২এর শ্লোক পর্য্যন্ত; তাহার পরই নটসূত্রের মধ্যে রসসূত্র আরম্ভ।…

সূত্র এবং ভাষ্যে যে সকল জিনিস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা আছে সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলার নাম 'সংগ্রহ'। রস, ভাব, অভিনয়, পাত্র, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাজনা, গান—এই হইল রসের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল কথাই নাট্যশাস্ত্রে আছে।

কারিকা কাহাকে বলে? সূত্রে এবং ভাষ্যে যে জিনিস বিস্তার করিয়া লেখা আছে, সেই জিনিস ছোট করিয়া একটি বা দুইটি শ্লোকে বলার নাম কারিকা। এইখানে বলিয়া রাখি রসসূত্রে দুই রকম কারিকা আছে—কতকগুলি শ্লোকছন্দে, কতকগুলি আর্য্যাছন্দে। কিন্তু এইগুলি একজনের লেখাও নয়, এক কালের লেখাও নয়। কারণ, অনেক স্থলে কারিকাগুলিতে আর্য্যাছন্দের কারিকাও তোলা হইয়াছে এবং শ্লোকছন্দের কারিকাও একত্রে তোলা হইয়াছে।

নিরুক্ত কাহাকে বলে? নিরুক্ত শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ-সাধন হয় তাহার নাম ব্যুৎপত্তি, তাহারই নাম নিরুক্তি। কিন্তু এখানে নিরুক্ত বলিতে আরও একটু বেশী বুঝায়। ইহাতে কতকটা ব্যাখ্যা বুঝায়, কতকটা সিদ্ধান্ত বুঝায়, কতকটা অল্প অল্প প্রমাণ দেওয়াও বুঝায়।

এইরূপে সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত এই সম্বন্ধীয় তিনটি জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া ভরতমুনি সংগ্রহটা আর একটু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। রস কতগুলি, ভাব কতগুলি, তাহাদের নাম করিয়াছেন, ভাবের ভিতর স্থায়ী কতগুলি, ব্যভিচারী কতগুলি, সাত্ত্বিক কতগুলি, অভিনয় ক'রকম, পাত্র ক'রকম, বৃত্তি ক'রকম, প্রবৃত্তি ক'রকম, সিদ্ধি ক'রকম, স্বর কত, বাজনা কত রকম, কেমন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতে হয়, যাইতে হয়, থাকিতে হয়, তাহার কথা কিছু আছে, তাহার পর গান, এই সঙ্গে থিয়েটার-ঘর ক'রকম—সংগ্রহের মধ্যে এই সকল কথা বলিয়া ভরতমুনি বলিতেছেন, "অতঃপরম্ প্রবক্ষ্যামি সূত্রগ্রন্থ-বিকল্পনম্—" ইহার পর আমি সূত্র ও গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিব। এই গ্রন্থ শব্দের অর্থ অভিনবগুপ্ত ভাষ্যে লিখিয়াছেন। মর্ম্ম এই হইল যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩২টি শ্লোকের পর ভরতমুনি সূত্র ও ভাষ্য মিলাইয়া এবং তাহার সহিত নিরুক্ত ও কারিকা দিয়া একখানি সূত্র গ্রন্থ এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন।

বৈদিক সূত্রে শুধু সূত্রগুলি থাকিত। বেদের মত সে সূত্রগুলিও ব্রাহ্মণে মুখস্থ করিয়া লইত। ব্যাখ্যা মুখে মুখেই থাকিত। ব্যাখ্যাটা চলিত সংস্কৃতে দিত। চলিত সংস্কৃতের নাম ছিল ভাষ্য। সেইজন্য সূত্রকে ভাষায় ব্যাখ্যা করার নাম ভাষ্য। কৌটিল্য সূত্রের সঙ্গে ভাষ্য যোগ করিয়া এক রকম নূতন প্রণালীর আবির্ভাব করেন। তিনি যদিও বলেন যে, সূত্র ও ভাষ্য এক করিয়া দিতেছি, তথাপি তিনি মাঝে মাঝে নিরুক্তও দেন এবং কারিকাও দেন। সেইরূপ এই যে সূত্রগ্রন্থ ইহাতেও সূত্রভাষ্য ছাড়া অনেক জায়গায় নিরুক্ত এবং সব জায়গায় কারিকা দেওয়া আছে। ৩২শ্লোকটি বলিয়া ভরতমুনি গদ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। গদ্যের প্রথম কথা এই—"রসানেব তাবদ্ আদৌ অভিব্যাখ্যাস্যামঃ নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্তত ইতি—" …

এই যে সূত্র-গ্রন্থের এক অংশ ভরত-নাট্যশাস্ত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহার সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। আমার বিশ্বাস এটি কোন নটসূত্রের অংশ। কারণ ইহার প্রত্যেক স্থলেই প্রত্যেক রসের, প্রত্যেক স্থায়িভাবের, প্রত্যেক ব্যভিচারিভাবের, প্রত্যেক সাত্ত্বিকভাবের, নট কি করিয়া সেই রস ও ভাব প্রকাশ করিবে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া আছে। অনেক জায়গায়ই "অভিনেতব্যঃ" "অভিনয়ঃ কর্ত্তব্যঃ", "অভিনয়েৎ" এইরূপ কথা আছে। সুতরাং এই রস-ভাবের বর্ণনা দার্শনিকভাবে

হয় নাই। থিয়েটারের অনুরূপ করিয়াই করা হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিই। বড় লোকের হাসি কি করিয়া অভিনয় করিবে? একটু মুখ মুচকাইয়া হাসিবে; এমন কি তাহাদের দাঁতও দেখা যাইবে না। রাণী, সখী, মন্ত্রী ইহাদের হাসি দেখাইতে গেলে দাঁত বাহির হইবে কিন্তু শব্দ বাহির হইবে না। কিন্তু ছোটলোকের হাসি দেখাইতে গেলে হাঁ করিয়া উচ্চ শব্দ করিতে হইবে। আমি তো সংক্ষেপে বলিতেছি, কিন্তু পুঁথিতে ঢের বেশী আছে। এই সব রসে সব ভাবের অভিনয়ের ইঙ্গিত করা সহজ কথা নয়। কিন্তু নটসূত্রের এ অংশে সেটি করা হইয়াছে, যতদূরসাধ্য ভাল করিয়াই করা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে নটসূত্র কাহাকে বলে। পাণিনি আপনার সূত্রে দুইখানি নটসূত্রের নাম করিয়াছেন। দুখানিই ঋষি-"প্রোক্ত" অর্থাৎ কাহারও রচিত নয়, কৃত নয়। "প্রোক্ত" গ্রন্থের কথা কহিয়া তাহার পর পাণিনি "কৃত" গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, কোন ঋষি সেগুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহার নাম "প্রোক্ত"। আর নিজের মাথা থেকে রচনা করা হইয়াছে যাহা, তাহার নাম "কৃত"। পাণিনি যে দুখানি নটসূত্রের কথা বলিয়াছেন দুখানিই "প্রোক্ত" অর্থাৎ ঐ সকল কথা অনেক দিন ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছিল, ঋষিরা সেইগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া আসিয়াছে। আমরা আর একখানি নটসূত্র ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কারণ, কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীর দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়াছেন ভরতমুনি একজন নটসূত্রকার। তিনি স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামে এক নাটক লিখিয়াছিলেন এবং নিজে তাহার অভিনয় শিখাইয়াছিলেন। উর্ব্বশী সেই নাটক অভিনয় করিতে গিয়া "ঘাত" করিয়া বসেন,—'নারায়ণ' বলিতে গিয়া "পুরূরবা" বলেন। তাই ভরতমুনি শাপ দেন, তুমি পৃথিবীতে গিয়া থাক। সুতরাং ভরতের একখানি নটসূত্র ছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। ভরতের আরও একখানি সূত্র ছিল। সেখানির কথা ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়া গিয়াছেন। সেখানির নাম "তৌর্য্যত্রিকসূত্র" অর্থাৎ বাজনার সূত্র।

ভরত-নাট্যশাস্ত্রে যে দুইখানি সূত্র আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা বোধ হয় এই ভরতের লিখিত নটসূত্র ও তৌর্য্যত্রিক-সূত্র। একখানিতে নটদের শেখান হইতেছে, আর একখানিতে বাজনদারদের শেখান হইতেছে।

একজন নবীন লেখক বলিয়াছেন পাণিনির ব্যাকরণে দুইটি নট-সূত্রের নাম আছে। কিন্তু তাহাতে কি আছে না আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আমাদের এমনই মন্দ ভাগ্য যে, ঐ যে নটশব্দ আর সূত্রশব্দ আছে উহা হইতেই আমরা ইতিহাস অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। নট বলিতে একটা পেশা বুঝায়। একটা পেশা থাকিলেই নাটক যে তখন অনেক ছিল এ কথা অনুমান করিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে এ কথা আমরা বলিতে পারি যে, পাণিনির অনেক পূর্ব্বেও নট বলিয়া একটা পেশা ছিল এবং বহুসংখ্যক নাটক লেখা হইয়াছিল। আরও কথা আছে, যখন পাণিনির ঐ সূত্রেই নটসূত্র বলিয়া সমাস করা আছে, তখন এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পেশাদার লোকদের শিক্ষা দিবার জন্য তখন সূত্রগ্রন্থ লেখা হইয়া গিয়াছিল এবং "প্রোক্ত" হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বেও নটদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল সেই চেষ্টাগুলিকে একত্র করিয়া শিলালী ও কৃশাশ্ব সূত্রগ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, নাটক আমরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম এ কথার মূল্য কি? পাণিনি তো খৃষ্ট পূঃ ৫০০ বৎসরের এধারে আসিতে পারেন না। সূত্রগ্রন্থ তাহার অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রোক্ত হইয়াছিল। দুজন প্রোক্ত করিয়াছেন। সুতরাং দুজনকে ২০০ বৎসর দিতে হয়। তাঁহারাও আবার নিজের কথা লেখেন নাই, পুরাণো কথা লিখিয়াছেন। তাহার আগেও নাটক ছিল। কেননা, নট বলিয়া একটা পেশাই হইয়া গিয়াছে। তখন আমাদের নাটকের আদি কোথায়?

পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩৩৬] শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কালিদাসের বৃক্ষলতা

১। অরবিন্দ:—পদ্মের সাধারণ নাম। পুণ্ডরীক=শ্বেতপদ্ম। কোকনদ=রক্তপদ্ম। ইন্দীবর=নীলপদ্ম। সময় সময় নীল সালুককেও ইন্দীবর বলে। কুবলয়=উৎপল=ছোটপদ্ম। 'কুবলয়' শব্দে কোথাও নীলপদ্মকেও বলা হইয়াছে; যেমন—"কবলয়দলনীলৈ রুন্নতৈ স্তোয়নম্রৈঃ"—(ঋতু ২।২২)

কালিদাস বলিতেছেন যে, শরৎকালে শ্বেতপদ্ম প্রচুর ফোটে; যথা—"পার্থিব শ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণা।" (রঘু ৪।১৪)

নীলপদ্মও ফোটে:—"নীলোৎপলৈ র্মদকালানি বিলোকিতানি"

উৎপলও ফোটে:—"স্বচ্ছপ্রফুল্ল কমলোৎপলভূষিতানি" (ঋতু) ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, পদ্ম ও উৎপল পৃথক; তা' না হইলে একসঙ্গে "কমল" ও "উৎপল"—এই দুই মহাকবি উল্লেখ করিতেন না।...

মহাকবি ঋতুসংহারে "বিপত্রপুষ্পাং নলিনীং"—পাতাশূন্য পদ্ম—বলিয়া পুনর্ব্বার মেঘদূতে কি করিয়া ফুটন্ত পদ্মের কথা বলিলেন। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার প্রথমমুখে পদ্ম বিপত্র হয়; বৃষ্টি পড়ার পর ক্রমশঃ পত্র জন্মিতে থাকে, পদ্মও ফুটিতে থাকে। তারপর শরতেই পূর্ণ বিকাশ। অবশেষে শীতে আবার ঝরিতে থাকে। পুনর্ব্বার বসন্তে ফুটিতে আরম্ভ করে।

মৃণাল এবং বিস—ইহারা একার্থবাচক। ইহা পদ্মের গাছের মাটির মধ্যের অংশ। পদ্মের তো আর গাছের মত কিছু হয় না,—হয় নাল। নলিন অর্থে পদ্ম। নলিনী অর্থে পদ্মিনী, পদ্মময় স্থান এবং পদ্মের ঝাড়—বুঝায়।

২। অর্জ্জুন:—"আপিঞ্জরা বদ্ধরজঃকণত্বাৎ, মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেঽর্জ্জুনস্য। দগ্ধাপিদেহং গিরিশেন রোষাৎ, খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য।" ১৬।৫১ রঘু

"অর্জ্জুন গাছ ৩০।৩২ হাত উচ্চ হয়; কাণ্ড অতি স্থূল। বাংলার বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে—ইহা আরণ্যবৃক্ষ। পাতার আকার মানুষের জিহ্বার মত।

৩। অশোক:—"অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি। পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাসিঞ্জিত নূপুরেণ।" কু ৩।২৬

ইহা হইতে জানা গেল যে, বসন্তকালে অশোকের ফুল হয় ; আর ঐ ফুল মূল হইতে ফোটে। কবি-প্রসিদ্ধি আছে যে, সুন্দরী সালঙ্কারা রমণী বাম পদাঘাত না করিলে অশোকের ফুল ফোটে না—প্রাচীন ভারতে এই প্রকার আমোদজনক প্রথা ছিল।...

তরুণ অশোক বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর এবং তাহার পাতাগুলি ঐ সময় যত ভাল থাকে, বড় অশোক বৃক্ষের তেমন থাকে না। ঐ সময় যখন লাল লাল ফুল ফোটে আর বাতাসে ঝাঁকড়া পাতাগুলি একবার সরিয়া যায় আবার ঢাকা পড়ে—এইরূপ "চলকিশলয়" হয়, তখন ঐ "রক্তাশোক" স্মরবর্দ্ধকই হয়। মল্লিনাথও বলিয়াছেন যে—"রক্তোঽত্র স্মরবর্দ্ধনঃ" (উ, মেঘ টীকা ১৫ শ্লোক)—এই স্মরদীপক বলিয়াই ঋতুসংহারে কালিদাস অশোকের বিশেষণ "সশোক" দিয়াছেন।

৪। আম্র।

৫। ইক্ষু :—"ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যঃ তস্যগোপ্তুর্গোপদয়ঃ।" ৪।২০ রঘু।

ভাষানাম :—বাঃ—আক্, কুশের।

৬। ইঙ্গুদী :—"তা ইঙ্গুদীস্নেহ কৃত প্রদীপম্।" (১৪ ৮১ রঘু)

শাস্ত্রী মহাশয়কে ডেরাডুনাদি অঞ্চলে "ইঙ্গুদী" বলিতে "মৌগাছ" দেখাইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই "মৌ"-কেই ইঙ্গুদী বলেন। ইঙ্গুদীকে অমরসিংহ কেবল তাপস তরু বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য পাওয়া যায়—ইঙ্গুদীর তৈল ঋষিরা মাখিতেন, খাইতেন, প্রদীপে জ্বালাইতেন এবং কোন স্থান কাটিয়া গেলে এই তৈল দিয়া বাঁধিতেন, তাহাতেই ঐ ক্ষত আরাম হইত। মৌ-তৈলেরও নাকি ঐরূপ ব্যবহার আছে ও ঐরূপ গুণ আছে।

৭। উদুম্বর :—"নীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্।" (পূর্ব্বমেঘ ৪২)

ভাষানাম—বাঃ—যজ্ঞডুমুর। এই যজ্ঞডুমুরের গাছ সুপরিচিত। বর্ষায় উদুম্বরের ফল পাকিবার কথা কালিদাস বলিয়াছেন।

৮। এলালতা :—"তাম্বূল বল্লী পরিণদ্ধপূগা-স্বেলালতা লিঙ্গিত-চন্দনাসু। তমালপত্রাস্তরণাসু রন্তং, প্রসীদ শশ্বন্ মলয়স্থলীষু।" ৬।৬৪ রঘু

অমর—"পৃথ্বীকা চন্দ্রবালৈলা নিষ্কুটির্বহুলা।" "এলয়াত নাশয়তি মুখদোষম্"—এলাইচ্ লতা। এলাইচ দুই প্রকার—বড় এলাচ ও ছোট এলাচ।

৯। কঙ্কেলি :—"কঙ্কেলি-পুষ্পরুচিরা নবমালতী চ।" ঋতু ৩।১৮।

এই "কঙ্কেলি" লইয়া খুব গোল আছে। কঙ্কেলিকে সকলেই অশোক বলে। "অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঙ্কেলিঃ পিণ্ডপুষ্পকঃ"—ইতি রত্নকোষঃ।...কঙ্কেলিকে অশোক বলা ভুল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, যোধপুরের পুরাতন রাজধানী মণ্ডপপুর—বর্ত্তমান মণ্ডোরে প্রথমে এই কঙ্কেলি বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। একটি মাঝামাঝি রকমের গাছ শাদা ফুলে ভরে গেছে। আর ভারি বাহার হয়েছে। গাছের পাতা কতবেলের গাছের পাতার মত। সে সময় সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাস। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, উহার নাম "কঙ্কেড়" ; তখন তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কালিদাসের "কঙ্কেলি"।...অশোক হইতেছে—"বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তি" অর্থাৎ বসন্তপুষ্প। আর ঋতুসংহারে কালিদাস বলিতেছেন যে, "কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ দন্তাবভাস-বিশদ স্মিতচন্দ্রকান্তি হরতি"—কঙ্কেলি পুষ্পের সৌন্দর্য্য এবং নবমালতী দাঁতের প্রভার দ্বারা নির্ম্মল মৃদু হাসিরূপ চাঁদের শোভাকে হরণ করছে। ইহাতে প্রকাশ পাইল যে, চাঁদের শোভা শুভ্র, দাঁতের প্রভাও শুভ্র, তখন কঙ্কেলি ফুলের শোভাও শুভ্র ; সুতরাং কঙ্কেলি ফুল শাদা। কিন্তু অশোক ফুল লাল ; অতএব কঙ্কেলি কি করিয়া অশোক হয় ? তারপর অশোক হইতেছে বসন্ত-পুষ্প। আর কঙ্কেলি হইতেছে শরৎ পুষ্প ; কারণ শরৎ-বর্ণনায় কালিদাস কঙ্কেলির বর্ণনা করিয়াছেন।

১০। কদম্ব :—"কদম্ব সর্জ্জার্জ্জুন-কেতকী-বনম্"(ঋতু ২।১৭)... "নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং।" (মেঘ ১ ২১)

অভিধান :—নীপ, প্রিয়ক, কদম্ব, হলিপ্রিয়। (অমর)

মল্লিনাথের মতে কদম্ব ও নীপ দুইটি পৃথক বৃক্ষ। "কদম্ব" হইতেছে সাধারণ "কদম গাছ" এবং "নীপ" হইতেছে "স্থল কদম্ব"।... কালিদাস নীপের বর্ণনায় বলিয়াছেন—হরিত কপিশ বর্ণ। হরিৎ বলিতে সবুজ এবং কপিশ বলিতে লাল্‌চে কালো (brown) অর্থাৎ সবুজ, লাল ও কালোর মিশ্রণ। এই রং দেখিয়াই মল্লিনাথ নীপকে কদম্ব হইতে আলাহিদা করিয়াছেন। বৈজয়ন্তী তো দুইটি পৃথক করিয়াই দিয়াছে। কদম্ব—সাধারণ কদম ; আর নীপ—বড় কদম। কদম্ব ও নীপ—একই হউক বা দুই হউক—বর্ষাকালেই ফুল ফোটে।

১১। কদলী :—"ক্রীড়াশৈলঃ কনক কদলী বেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ।" (উ, মেঘ ২।১৫)

বাংলা নাম :—কলা।

১২। কন্দলী :—"কর্ত্তুং যত্র প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং" (পূ, মেঘ—১।১১) "নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈঃ আবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্"। (পূ, মেঘ ১।২১)

বাংলা নাম :—কেহ ইহাকে "ভুঁইচাঁপা" বলেন, কেহ বলেন "কলাফুল" ; আর কেহ বলেন "বেঙের ছাতা"। ইংরাজীতে ইহাকে Mushroom বলিয়াছে।...এই ছাতা শাদা এবং লাল্‌চে হয়। শুনিয়াছি লাল রঙের ছাতা লোকে খায়। কালিদাস এই লালবর্ণের ছাতারই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা একমাত্র বর্ষাতেই হয়।

১৩। কর্ণিকার :—"কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারম্।" (ঋতু ৬।৫)

কর্ণিকার হইতেছে আমাদের "সোঁদাল"। কালিদাস ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে সোঁদাল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। কালিদাস বলিতেছেন কর্ণিকারের রং হইতেছে—"আকৃষ্ট হেমদ্যুতি কর্ণিকারম্" অর্থাৎ হেমদ্যুতি ; আবার বলিতেছেন "হুত হুতাশন দীপ্তি বনশ্রিয়ঃ, প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ" অর্থাৎ হোমে আহুতি প্রদানে অগ্নির যে স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তি হয়, সেইরূপ স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট কর্ণিকার ফুল বনলক্ষ্মীর সোনার গহনার প্রতিনিধি হইয়াছিল। আর ইহা যে রমণীদিগের প্রিয় কর্ণভূষণ, তাহাও মহাকবি দেখাইয়াছেন।...আবার মহাকবি এই কর্ণিকারকে মদনের বাণ করিয়াছেন (ঋতুসংহার ৬।২৭)। ইহা করা ঠিক হইয়াছে। সোঁদাল ফুল লম্বা, শ্রেণীবদ্ধ এবং সোনার রং-এর। লম্বা বলিয়া বাণের সঙ্গে তুলনায় বেশ খাটিয়াছে।

১৪। কল্পদ্রুম :—"কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ" (রঘু ৬।৬)

মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন—এই পাঁচটি দেববৃক্ষ। ইহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না জানা নাই।

১৫। কহ্লার :—"কহ্লার-পদ্ম-কুমুদানি মুহুর্বিধুন্বং-স্তৎ সঙ্গমাদ-ধিক শীতলতামুপেতঃ।" (ঋতু—৩।১৫)...

কুমুদ ও কহ্লার বিভিন্ন; কিন্তু এক জাতীয়। অনেক সময় অভিধানকারগণ এক জাতীয় বস্তুকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। এখানেও তা'ই হইয়াছে। নীলপদ্ম পাওয়া যায় না। অনেকে নীল শালুককেই ভ্রমবশতঃ নীলপদ্ম বলিয়া থাকে। নীল শালুক অনেক পাওয়া যায়। শাদা শালুকই কুমুদ; আর গন্ধযুক্ত নীল শালুকই কহ্লার। কহ্লার শরৎকালের ফুল।

১৬। কালাগুরু :—"চকম্পে তীর্ণ লৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌-জ্যোতিষেশ্বরঃ। তদ্‌গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ।" (রঘু ৪।৮২)

কালাগুরু=কাল+অগুরু—অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ অগুরু। অতএব অগুরুভেদ।...কালিদাসের বর্ণনা হইতে পাই যে—"কালাগুরু" প্রাগ্‌জ্যোতিষের অর্থাৎ কামরূপের জব্য। বস্তুতঃ কালাগুরু কামরূপেই পাওয়া যায়।

১৭। কালীয়ক :—"প্রিয়ঙ্গু কালীয়ক কুঙ্কুমাক্তম্" (ঋতু ৬।১২)
ইহাকে সাধারণতঃ 'হরিচন্দন' বা 'পীতচন্দন' বলা হয়।

১৮। কালেয় :—"তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলাম্ আশ্যান-কালেয়-কৃতাঙ্গরাগাম্। (কু—৭।৯)
ভাষানামঃ—বাঃ—দারুহরিদ্রা।

১৯। কাশ :—"প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে।" (কু—৭।১১)
ভাষানাম :—বাং—কেশে।

২০। কিংশুক :—"উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকে।" (রঘু ৯।৩১)

পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, ত্রিপর্ণক, আস্ফোত, ব্রহ্মবৃক্ষ, হস্তিকর্ণদল এবং কৃতী- এইগুলি পলাশের নাম।

দেশভেদে নাম :—হিন্দুস্থানে—ধারা, কেসু, ঢাক, টেসু, কাংকরিয়া, পলাশ। মহারাষ্ট্রে—পঠ্‌ টস বা পল্লস। কর্ণাটে—মুত্তলু। তৈঃ—মোটুগ, মাতুকাচেটু। উৎকলে—পরাশু। বোম্বাইয়ে—খাকরো। গুঃ—খাখরো। তাঃ—পরশন্। ইং—Downy branch Butea, লাটিন্ বা বোটানিক নাম—Butea frodoza, ডাক্তারী নাম—Butia Gum বুটিয়া গাম। সিং—কেল। বাংলায় —পলাশ।

'বনৌষধিদর্পণে' পলাশের বর্ণনা—"পলাশবৃক্ষ উচ্চ হয়। কোচবিহারে যেখানে সেখানে পলাশ গাছ দেখা যায়। রাঢ়ে তেমন দেখা যায় না। দু'চার পল্লীর পর হয়ত একটা পলাশ দেখা গেল। পলাশের একবৃন্তে তিনটি পাতা থাকে বলিয়া ইহার ত্রিপত্রক নাম। সাধারণ বৃন্ত অতিদীর্ঘ।...পলাশফুল লাল ও বক্র বলিয়া নখক্ষতের সহিত তুলিত হইয়া থাকে। ইহা বসন্ত পুষ্প।

২১। কীচক :—"স কীচকৈ র্মারুতপূর্ণ রন্ধ্রৈঃ কূজদ্ভিরাপাদিত-বংশকৃত্যম্।" (রঘু ২।১২)

অভিধান :—ছিদ্রের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিলে যে বাঁশে শব্দ হয়, সেই বাঁশকে কীচক বা বেণু বলে। (অমর)

কীচক বলিতে "রন্ধ্রবংশ।" ইহা একপ্রকার বাঁশ—সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। কালিদাস হিমালয় প্রদেশে ইহার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২২। কুঙ্কুম :—"প্রিয়ঙ্গু-কালীয়ক-কুঙ্কুমাক্তম্ স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।" (ঋতু ৬।১২)...

বৈদ্যকে "কুঙ্কুম" "ঘুসৃণ" এবং "রুধির" শব্দে বহুল প্রচার। বাং—কুম্‌কুম্, হিঃ- কেসর। সিং—কোকুম্। গুঃ—কেসর। কঃ—কুঙ্কুম। তৈঃ—কুঙ্কুমপুরু। ফাঃ—লরকীমাস। অঃ—জাফ্‌রান্। ইং- স্যাফ্‌রণ্‌ saffron। বোটানিক :—Crocus sativus. উৎপত্তিবোধক নাম—"কাশ্মীর" এবং "বাহ্লীক"।...

এখন কাশ্মীর, পারস্য, স্পেন, ফ্রান্স ও সিসিলিতে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া থাকে। অবশ্য অতি প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীরে কুঙ্কুমের চাষ হইয়া আসিতেছে।...কার্ত্তিক মাসে কুঙ্কুমের গাছে ফুল হয়। উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবু রঙের। পুরাতন ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকে পীত বা কাল। 'বিলাতি কুঙ্কুমে প্রাণীর মেদ ও মাখন মিশ্রিত থাকে। চর্ব্বিমিশ্রিত কুঙ্কুম তৈলাক্ত দেখায়। এই বিলাতি কুঙ্কুম ঔষধার্থে বা দেবোদ্দেশে ব্যবহৃত হয় না। কুঙ্কুম বা জাফরাণ শীতপ্রধান দেশে ভালরূপ জন্মে। মূল আশ্বিন মাসে রোপণ করিতে হয়। ইহার ফুল অতিশয় সুন্দর।

২৩। কুটজ :—"স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার।" (পূ, মেঘ ১।৪)

'বনৌষধিদর্পণ-কার দুই প্রকার কুটজের নাম করিয়াছেন। একটি সিত কুটজ, অন্যটি অসিত কুটজ। সিত অর্থাৎ শুভ্র কুটজই পুংকুটজ। আর অসিত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ কুটজই স্ত্রীকুটজ বৃক্ষ।...সিত কুটজ বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে, কিন্তু অসিত কুটজ বঙ্গে দুর্লভ; ইহা মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, গোদাবরীতীর, এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। উৎপত্তি স্থান দেখিয়া মনে হয়, কালিদাসের যক্ষ সম্ভবতঃ এই সুরভিত অসিত কুটজ দিয়াই মেঘকে অর্ঘ্য দিয়াছিলেন।

বাং—কুড়চি বা কুরচি গাছ।

২৪। কুন্দ :—"কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং। ... হস্তে লীলাকমল-মলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্।" (মেঘ ১।৪৭, ২।২)

কুন্দ শীতকালের ফুল, কিন্তু ইহাকে বালকুন্দ বলায় বুঝিতে হইবে যে, হেমন্তে যখন প্রথম ফোটে, তখন বাল্যকাল; শীতকালে প্রৌঢ়াবস্থা। বালকুন্দ বলায় অর্থাৎ কুন্দের বাল (নবীন) বিশেষণ থাকায় ইহা হেমন্ত পুষ্প হইতেছে। এখন বোধ হইতেছে যে, হেমন্তে কুন্দ প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে, শীতে মধ্যাবস্থা এবং বসন্তে পরিণত হয়।

২৫। কুমুদ :—"শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং।" (মেঘ ১।৫৮)

২৬। কুরবক (কুরুবক) :—"চূড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং" (মেঘ ২।২)...ইহার বোটানিক নাম Barleria.

২৭। কুশ :—"কুশাঙ্কুরাদানপরিক্ষতাঙ্গুলিঃ কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ।" (কু ৫।১১)

কুশ অতি অনুর্ব্বর ভূমিতেও বেশ জন্মায়।

২৮। কুসুম্ভ :—"বিকচ নব কুসুম্ভ স্বচ্ছসিন্দুর ভাসা প্রবল পবনবেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।" (ঋতু ১।২৪)

বাং—কুসুম ফুল।...

রবিশস্যের ন্যায় কুসুম ফুলের বীজ শরতে বপন করিতে হয়। শীতে পুষ্পিত হয়। ইহার পাতা সরু, লম্বা ও কণ্টকব্যাপ্ত। ফুল প্রায় কুঙ্কুমের বর্ণ; এইজন্য ইহাকে গ্রাম্য কুঙ্কুমও বলে

২৯। কেতকী :—"পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ নীড়ারম্ভৈ র্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রাম চৈত্যাঃ।" (মেঘ ১।২৩)

বাং—কেয়াফুলের গাছ।

৩০। কেশর :—"মালাঃ কদম্বনবকেশর কেতকীভিঃ" (ঋতু ২।২০)

দেশভেদে নাম :—হিন্দুস্থানে, কর্ণাটে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে—নাগকেশর।

৩১। কোবিদার :—"চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ।" (ঋতু ৩।৬)

বাং—কাঞ্চন ফুলের গাছ।

কোবিদারের নাম যুগ্মপত্র। কারণ ইহার পত্রাগ্র ভাগ এমন ভাবে চেরা যেন দুইটি পত্র মিলিত হইয়াছে। ফুলের পাঁচটি দল বিষমাকৃতি। রক্ত কোবিদার ফাল্গুন-চৈত্রে ফোটে। শ্বেত কোবিদার শীতে, কচিৎ শরতে ফোটে। পীত কোবিদার বড় গাছ। প্রায় পর্ব্বতে জন্মায় বলিয়া ইহাকে "গিরিজ" বলে।

৩২। খর্জ্জুর :—"খর্জ্জূরী স্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্গারসুগন্ধিষু।" (রঘু ৪।৫৭)

তাল, নারিকেল, গুবাক, হিন্তাল, খর্জ্জুর, কেতকী, তালী—এই সাতটি তৃণদ্রুম; অর্থাৎ তৃণদ্রুম বলিলে ইহার প্রত্যেককেই বুঝায়। (অমর)।...খেজুর প্রসিদ্ধ গাছ। বাংলা দেশে সর্ব্বত্রই এরূপ পাওয়া যায়। দেশভেদে নাম বাঃ—খেজুর। হিঃ—খজুর। সিং—ইন্দি। মঃ—শিন্দী। গুঃ—খর্জ্জূরী। কর—ইঞ্চিল্। তৈঃ—ইন্টাচেট্টু। ফারসিতে—তমরহুব। আরবীতে—খর্মাতম। ইং—Date-palm.

৩৩। চন্দন :—"মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনম্ শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্।" (ঋ ১।২)

ঋতুসংহারে "প্রকাম-কালাগুরু-ধূপ-বাসিতম্" এই অগুরু বা কালাগুরু বলিয়া এক প্রকার চন্দনের কথা আছে। কালাগুরু ও অগুরু একপদার্থ।

৩৪। জবা :—"সাক্ষাৎ তেজঃ প্রতি নবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ" (মে ১।৩৬)

অন্য নাম :—রক্তপুষ্প, অর্কপ্রিয়া, হরিবল্লভা, সূর্য্যারাধনসাধনী, জপা, রাগপুষ্পী, প্রতিকা (পিচ্ছিলপুষ্প)।

জবা প্রসিদ্ধ ফুল গাছ। মহামায়ার পূজায় জবার বড় আদর। "জবাকুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া সূর্য্যের বর্ণনা করি ও পূজা করি। লাল জবাই খুব প্রসিদ্ধ। ঝুমকো জবাও চলে। পঞ্চমুখী জবা বড় সুন্দর। শাদা, পীত ও লাল প্রভৃতি রঙের জবাফুল হয়।...কালিদাস বর্ষাবর্ণনার মধ্যে জবাফুলের কথা বলিলেও ইহা বর্ষাফুল কিনা, তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। তিনি সন্ধ্যারাগে মেঘকে জবাফুলের লাল বর্ণ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। মহাকবি স্পষ্ট না বলিলেও তিনি যে ইহাকে বর্ষাপুষ্প বলিয়াছেন, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

৩৫। জম্বু :—"ত্বয্যাসন্নে পরিণতফল শ্যামজম্বূবনান্তাঃ সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।" (মে ১।২৩)

জম্বু আমাদের প্রসিদ্ধ জাম। অমরসিংহ জামের প্রভেদ বলেন বলেন নাই। কিন্তু বৈজয়ন্তী-রচয়িতা যাদবপ্রকাশ তিন প্রকার জামের কথা বলিয়াছেন। একটি মহাজম্বু, তাহা মহাফল অর্থাৎ বড়জাম বা বড় কালজাম। দ্বিতীয়টি রাজজম্বু, ইহা সুফল ও সুগন্ধি, সম্ভবতঃ ইহা গোলাপজাম। তৃতীয়টি কাকজম্বু, ইহা জম্বুট অর্থাৎ ছোট জাম, আবার মেঘাভ বা নীলজম্বুট অর্থাৎ কাল বর্ণের। তাহা হইলে ছোট কালজাম।

ভাষানাম : বড়জামের : বাং—কালজাম। হিঃ—জামুন। বড়িজামুন। সিং—দম্ব। মঃ—থোরজাম্ভূঠ। কঃ—নিরল্। গুঃ—রাজজাম্বু। তৈঃ—পোদ্দানেরডি।

ছোটজামের নাম : বাঃ—বনজাম বা ছোটজাম। হিঃ—করেন্দ্র, ছোটি জামুন। মাঃ—নদীজাম্ভূঠ। গুঃ—বেলয়োপাজাম্বু, ডুঙ্গরিজাম্বু। কঃ—দোড্ডুনিরল্। তৈঃ—নীরনেরডি।

কালিদাস "পরিণতফল-শ্যামজম্বূ" বলিয়া পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি কালজামের বর্ণনা করিয়াছেন। আর বর্ষাতে যে কালজাম পাকে, তাহাও ঐ সঙ্গে বলিয়াছেন।

৩৬। তমাল :—"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা" (র ১৩।১৫)

অন্যনাম :—তাপিঞ্জতমঃ, তমা, নীলতান, নীলধ্বজ, মহাবল।

এই তমাল গাছের স্কন্ধ কাল বলিয়া ইহার কালস্কন্ধ নাম। তমাল অর্থে, যাহাকে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করা যায়। হিন্দী ও বাংলা নাম—তমাল।

৩৭। তাম্বূলী :—"তাম্বূলবল্লী পরিণদ্ধপূগাস্বেলালতালিঙ্গিত-চন্দনাসু। র ৬।৬৪

অন্যনাম :—বর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, শুষ্কপত্রা, মুখরাগকরী, কামজননী, আমোদজননী, শ্রমভঞ্জনী, তীক্ষ্ণমঞ্জরী।

দেশভেদে নাম : বাঃ—পান। হিঃ—পান, নাগরবেল। মঃ—নাগবেল। কঃ—পানবেল। গুঃ—নাগরবেল, পান। তৈঃ—তমালপাকু। তাঃ—বেট্রিলী। ফাঃ—বর্গন্তবোল। অঃ—কাল। ইং—বিটেল্ লিফ। বোটানিক—Piper Betel. তাম্বূল হইতেছে Misture of arecanut picer, betel leaves, lime, betel-nut etc.। আর তাম্বূলী হইতেছে the betel plant. পানের ব্যবহার পৌরাণিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

৩৮। তালী :—"তমাল-তালীবনরাজিনীলা।" (র ১৩।১৫)

"তাল" ও "তালী" এক অর্থবোধক।...তাল স্বয়ং প্রসিদ্ধ—Borassus Flabelliformis. দেশভেদে তালের নাম : বাঃ—তালগাছ। হিঃ—তাড়। মঃ—তাড়। গুঃ—তাড়। তাঃ—পনম। ফাঃ—তাল। অঃ—তার।

৩৯। তিলক :—"ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীং ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব।" (র ৯।৪১)

ইহা আমাদের প্রসিদ্ধ তিল গাছে। ইহার তামিল নাম Manjadi. কালিদাস বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে তিলফুলের উল্লেখ করিয়াছেন।

৪০। দূর্ব্বা :—"সা গৌরসিদ্ধার্থ নিবেশবদ্ভিঃ দূর্ব্বা প্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।" (কু ৭।৭)

অভিধান :—দূর্ব্বা, অনন্তা, শতপর্বিকা, হরিতালী এবং রুহা (হেমচন্দ্র)

নীল দূর্ব্বাই আমাদের সাধারণ দূর্ব্বা। নীল ও শাদা দূর্ব্বার মধ্যে কেবল বর্ণগত পার্থক্য আছে। মালাদূর্ব্বা নীলদূর্ব্বার মত কাল, উহার ব্রততি মালাকৃতি। গণ্ডদূর্ব্বার ক্ষুপ হয়; ইহা কাল তৃণের মত। গণ্ডদূর্ব্বার ঘর ছাওয়া হয়। (বনৌষধিদর্পণ)

প্রকৃতি, ১৩৩৫-৩৬] শ্রীগণপতি সরকার

বঙ্গ কোন্ দেশ ?

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বঙ্গ নামে কোন্ জনপদ বিশেষভাবে সূচিত হইত তাহা বুঝা কর্ত্তব্য। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদর্শকঃ।

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই বঙ্গ বলিয়া কথিত। এই শ্লোকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগে কি পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাহা ঠিক বুঝা গেল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকাকার যশোধর লিখিয়াছেন "বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্ব্বেণ" অর্থাৎ বঙ্গগণ লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরবাসী। বর্ত্তমান কালেও ব্রহ্মপুত্র যমুনার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত মৈমনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিগণই বিশেষভাবে "বাঙ্গাল" বলিয়া অভিহিত হন। যশোধর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তাহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমেও যে বঙ্গদেশ বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, মধ্যম পাণ্ডব গিরিব্রজ, মোদাগিরি, পুণ্ড, কৌশিকীকচ্ছ জয় করিয়া বঙ্গরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন—"বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ।" পরে তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বট, সুহ্ম এবং সাগর তীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণকে বশীভূত করিয়া লৌহিত্য তীরে উপনীত হন। তিনি লৌহিত্য অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে গিয়াছিলেন ইহার কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং মহাভারত-রচনার যুগে বঙ্গ যে লৌহিত্যের পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ইহা সুনিশ্চিত। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ পাঠে মনে হয় যে, তাঁহার সময় বঙ্গগণ "গঙ্গা স্রোতন্তর"বর্ত্তী সমগ্র ভূখণ্ডই করায়ত্ত করিয়াছিল।

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোন্তরেষু সঃ ॥

বঙ্গগণ বশীভূত হইবার অব্যবহিত পরে মহাবীর রঘু গজময় সেতু দ্বারা কপিশা (কাঁসাই) নদী পার হইয়া উৎকল দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ কি সত্য সত্যই কোন সময়ে কপিশা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ? জৈন উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনা পাঠে কিন্তু তাহাই মনে হয়। প্রজ্ঞাপনাকার স্পষ্টতঃ "তামলিপ্তি" নগরীকে বঙ্গের অন্তর্ভূত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই স্থলে একটি সমস্যা স্বতঃই মনে উদিত হয়। দশকুমারচরিত গ্রন্থে মহাকবি দণ্ডী "দামলিপ্ত" সুহ্মের অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালিদাসের যুগে বঙ্গ কপিশা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই কথা যদি সত্য হয়, তবে রঘুবংশকার সুহ্ম ও বঙ্গ পৃথক্ বলিয়া বর্ণন করিলেন কেন ? ইহার উত্তর এই যে, দণ্ডীর সময়ের অবস্থা (খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীর ?) যাহাই হউক না কেন, প্রাচীনকালে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত যে অভিন্ন ছিল না, মহাভারতের দিগ্বিজয়পর্ব্বই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাভারতকার তাম্রলিপ্তকে সুহ্ম বঙ্গ উভয় হইতেই স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভারতের যুগে উহাই যে প্রকৃত অবস্থা ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাম্রলিপ্ত কখনও বঙ্গরাজ্যের এবং কখনও সুহ্ম-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইত, প্রজ্ঞাপনা এবং দশকুমার গ্রন্থ ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।...

মহাভারত, রঘুবংশ, প্রজ্ঞাপনা এবং যশোধর-কৃত জয়মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে স্পষ্টই মনে হয় যে "বঙ্গ" দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটি ব্যাপক, অপরটি সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বলিতে সময়ে সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব্ব হইতে কপিশা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাইত। সঙ্কীর্ণ বঙ্গ, মগধ, মোদাগিরি, পুণ্ড, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বট, সুহ্ম এমন কি সাগরানূপ হইতেও পৃথক্ বলিয়া মহাভারতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে" এবং যশোধরের টীকার "বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্ব্বেণ" প্রভৃতি বাক্যে মনে হয় বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বকূলস্থিত ভূখণ্ডই এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গ। উত্তর কালে বঙ্গ যে সাগরানূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, শক্তিসঙ্গম তন্ত্রই তাহার প্রকৃত প্রমাণ। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহ-মিহির কর্ত্তৃক রচিত বৃহৎ-সংহিতায় কূর্ম্মবিভাগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়েও সমুদ্রকূলবর্ত্তী "সমতট" ভূমি বঙ্গ হইতে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজেন্দ্রচোলদেবের তিরুমলয় লিপি ও কর্ণদেবের গোহরবাতে "বাঙ্গাল" নামক দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই অভিনব নামটি কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলা দুরূহ। প্রাচীন সাহিত্য শিলালেখ বা তাম্রপট্টে "বঙ্গ" নামেরই ব্যবহার ও প্রসিদ্ধি দেখা যায়। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় যে, দাক্ষিণাত্য ও তুরস্ক দেশাগত নৃপতিগণই মধ্যযুগে "বঙ্গাল" বা বাঙ্গলা এই অভিনব নামের প্রয়োগ আরম্ভ করেন। আইন-ই অকবরী প্রণেতা আবুল-ফজল লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র। পুরাকালে এতদঞ্চলের রাজন্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশ গজ উর্দ্ধে ও বিংশ গজ আয়ত এক একটি আল অর্থাৎ মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ আল্ এই দুই শব্দের যোগে বঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কলচূর্য্যবংশোদ্ভব বিজ্জলের অচলুর লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অভিধান-চিন্তামণি-প্রণেতা জৈন হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন "বঙ্গাস্তুহরিকেলী বা।" বঙ্গের সহিত অভিন্ন এই হরিকেল যে "বঙ্গাল" দেশ নহে, পরন্তু একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড, ডাকার্ণব গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব আবুল-ফজলের গ্রন্থে বঙ্গ ও বঙ্গাল এক দেশেরই ভিন্ন নাম বলিয়া লিখিত হইলেও পূর্ব্বে যে ঐ দুই নামে দুইটি পৃথক দেশ সূচিত হইত তাহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বঙ্গ বা হরিকেল হইতে স্বতন্ত্র "বঙ্গাল" বলিতে কোন রাজ্য বুঝাইত এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বঙ্গাল যে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়া হইতে বিভিন্ন এবং চন্দ্রোপাধি বিশিষ্ট গোবিন্দনামক নরপতির অধীন ছিল, তিরুমলয় লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধ্যাপক ব্লক্ম্যান লিখিয়াছেন যে, সুলতান সুজার রাজত্বকালে রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড "বঙ্গাল ভূম" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু Blaev, Sausson, Purchas-প্রমুখ লেখকগণের মানচিত্রে ও গ্রন্থে চট্টগ্রামের অভিমুখে অবস্থিত সাগরতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে "Bengala" নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্লকম্যান এই নগরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ ইবন্-বতুতা, মেজর ফ্রেডারিক, De Barros প্রভৃতি পর্য্যটক ও লেখকগণ ইহার কথা লিখিয়া যান নাই। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত Gastaldiর মানচিত্রে কিন্তু Bengalaর স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং সাগরানূপে সত্য সত্যই এই নামে একটি নগরী ছিল এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এই Bengala নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত রাজ্যই কি চন্দ্রোপাধিক নরপতির শাসিত "বঙ্গাল" দেশ ? শ্রীচন্দ্রের রামপাললিপি পাঠে কিন্তু তাহাই মনে হয়। উক্ত লিপিতে

শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি এবং "হরিকেলরাজ ককুদ ছত্র স্মিতা নাং শ্রিয়াং আধার" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ বলিতে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান বরিশাল এবং তৎসন্নিহিত ভূখণ্ড বুঝাইত। ইহাই শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের স্বরাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হরিকেল অর্থাৎ বঙ্গ ইহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, হরিকেল ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত। রাজশেখর-রচিত কর্পূর-মঞ্জরী নামক গ্রন্থে পূর্ব্ব দিগঙ্গনাগণের সম্পর্কে চম্পা, রাঢ়া, কামরূপ ও হরিকেলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল উক্তির সহিত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন ও যশোধরের টীকা মিলাইয়া লইলে মনে হয় যে, বিক্রমপুর ও লৌহিত্যের পূর্ব্বতীরস্থিত ভূখণ্ডই সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত "বঙ্গ" বা "হরিকেল" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সাগরতীরবর্ত্তী "সাগরানূপ" বা "সমতট" যে ইহার বহির্ভূত ছিল মহাভারত ও বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "চন্দ্রদ্বীপ" ও "বঙ্গাল" এই উভয় দেশই বঙ্গ-বহির্ভূত সাগরানূপে অবস্থিত এবং চন্দ্রোপাধিক নৃপতি শাসিত। ইহাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং চন্দ্রবংশের সহিত সংযোগ বিচার করিলে এই দুই দেশ যে অভিন্ন ইহা অনুমান করা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

বিজয়সেনের অচলুর লিপি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীচন্দ্রদেবের বিক্রমপুর বিজয় সত্ত্বেও খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গ এবং বাঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে একীকৃত হয় নাই। "রাঢ়" ও "বরেন্দ্র"ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলমান-লেখকগণ "বঙ্গ" শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে বঙ্গ স্পষ্টতঃ যাজনগর, কামরূপ ও ত্রিহুতের ন্যায় লক্ষ্মণাবতী হইতে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু রাল (রাঢ়) ও বরিন্দ (বরেন্দ্র) লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ছিল। ব্লকম্যান্ দেখাইয়াছেন যে, তোগলক শাহের রাজত্বকালেই (১৩২০) খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম মিলিত হইয়া অখণ্ড বাঙ্গলা দেশ গঠিত হইয়াছে। সৈন্যপ্রজ্ঞাপনায় এই মিলনের সূচনা দেখা যায় বঙ্গপতি পালরাজগণ এবং প্রৌঢ়া রাঢ়ার অধীশ্বর সেন নৃপতিবৃন্দ রাঢ়, গৌড় বরেন্দ্র ও বঙ্গে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ভাবী মিলনের পথ আরও সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী জয়ের ফলে এই মিলন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই।

কিন্তু তুগলক শাহ্ পুনরায় একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ী ঐক্য বিধান করেন। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গভঙ্গের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সম্রাট্ অকবরের সময়ে সুবা বাঙ্গলা সুরমা-তীরবর্ত্তী শ্রীহট্ট হইতে কৌশিকী-ধৌত পূর্ণিয়া ও গঙ্গার দক্ষিণস্থিত Kankjol (কঙ্কজল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর হিজ্‌লী, চট্টগ্রাম এবং কোচবিহার তখনও এই প্রদেশের অন্তর্ভূত হয় নাই। মেদিনীপুর ও হিজ্‌লি উড়িষ্যার এবং চট্টগ্রাম আরাকান-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোচবিহার সীমান্তবর্ত্তী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট্ শাহ্‌জহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে এই সকল ভূখণ্ড বাঙ্গলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। প্রত্যেক শ্বেতদ্বীপের মহামাত্রগণ বাঙ্গলার উত্তরসীমা হিমবন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু লৌহিত্য ও কৌশিকীর পূর্ব্বতীরস্থিত শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে সুবা বাঙ্গলা অপেক্ষা হ্রস্বায়ত করিয়াছেন।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, শ্রাবণ ১৩৩৬] শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী

কান্যকুব্জে একদিন

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

'যাত্রার সময় ঘন মেঘ ও বাদল দেখিয়াও নিরস্ত হইলাম না, কারণ চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন কান্যকুব্জে গিয়াছিলাম তখন এক দীর্ঘশিখা-ধারী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের পাল্লায় পড়িয়া বৈশাখ-মাসের রৌদ্রে বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এবার ছাত্র পড়াইতে যাইতেছি, ছাত্রের মস্তকে বিপুল শিখা, অঙ্গে গুরুভার খদ্দর, চৌকা এবং স্বপাক ভিন্ন পণ্ডিতজীর আহার হয় না। পথে সকলগুলাই বিষম বিপজ্জনক। কাশী হইতে বুলন্দ্‌সর ঘুরিয়া কানপুরে আসিলাম। তথায় ছাত্রের শ্যালিকা চৌকার বিপদ্ ঘুচাইবেন এই আশায় আসা গেল। বন্ধুবর খান্নাজীর বাসায় আমাকে ছাড়িয়া ছাত্র শ্যালিকা-ভবনে গমন করিলেন। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিষম শীত পড়িয়াছে, রাত্রিতে বাল্‌তির জলের উপরে বরফ জমিতেছে। প্রথম দিন হামিরপুরের রাস্তায় ভিতর-গাঁওয়ের বিখ্যাত মন্দির দেখিয়া আসিলাম। খান্নাজীর কৃপায় মোটর মিলিয়াছিল, সুতরাং রাজার হালে যাওয়া-আসা গেল। দ্বিতীয় দিন কান্যকুব্জে যাইতে হইবে। মোটর দেখিয়া আমার লোভ বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেদিন ছাত্রটি কিছুতেই খান্নাজীর কাছে মোটর চাহিতে সম্মত হইল না। খান্নাজী বলিলেন যে, কানপুর হইতে

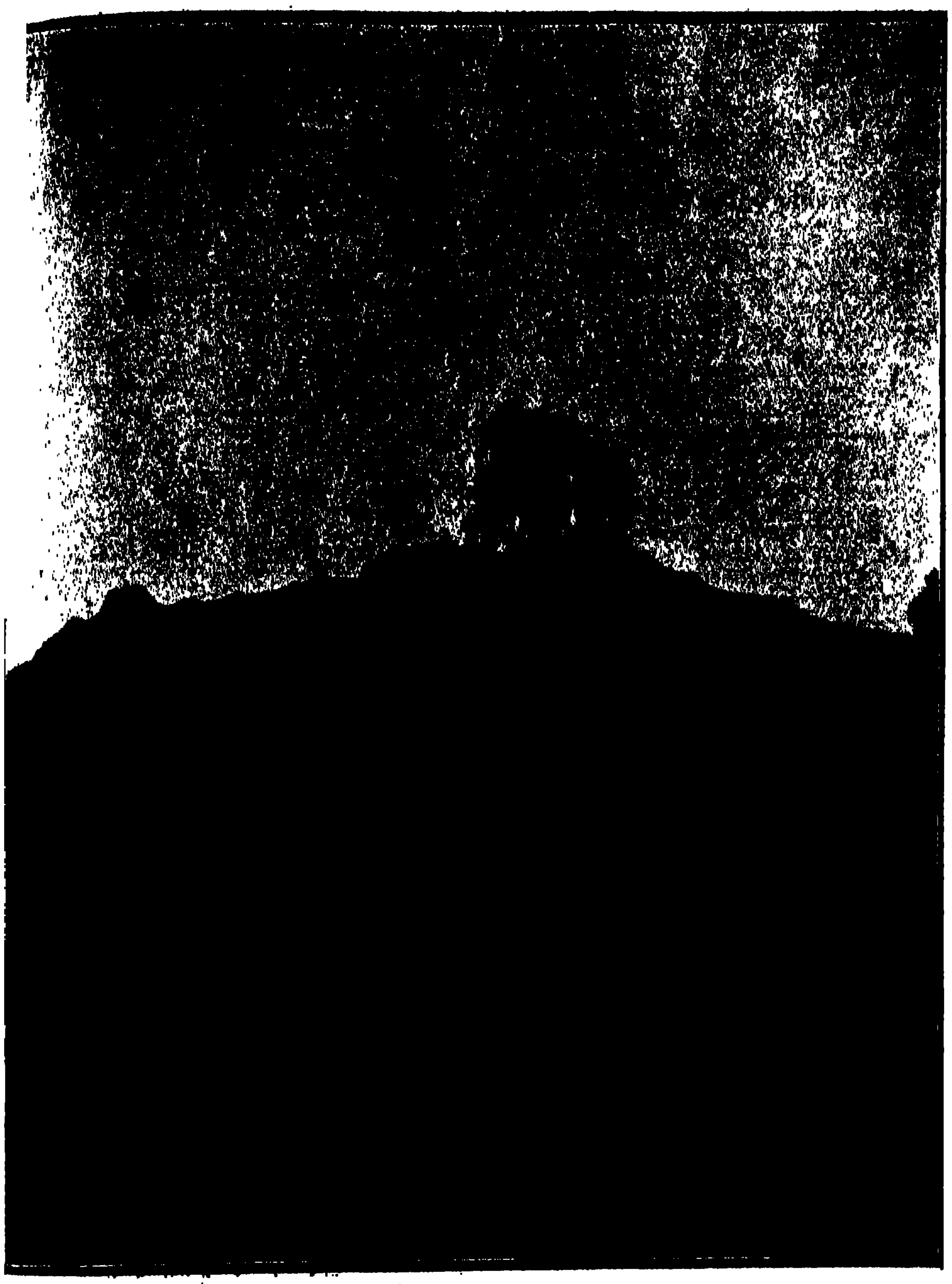

গঙ্গা ও কালিন্দীর মধ্যে অবস্থিত জয়চন্দ্রের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ
কনৌজ (জেলা ফতেগড়)

নিত্য শত শত মোটরবাস কনৌজে যায়, সুতরাং আমরা 'বাসে' যাওয়াই স্থির করিলাম।

দশটার মধ্যে স্নানাহার সারিয়া কানপুরের বাজারে কনৌজের বাসে চড়া গেল। রেলের লাইন পার হইয়া গ্র্যাণ্ড্‌ট্রাঙ্ক রোড্ ধরিলাম, গঙ্গার দক্ষিণ দিক দিয়া পথ চলিয়াছে, পথের পাশে ছোট রেল, সুন্দর রাস্তা। সোফার্ বলিল একান্ন মাইল পথ দুই ঘণ্টায় পৌঁছাইয়া দিবে। সত্য সত্যই শত শত 'বাস্' চলিতেছে। কতক কেবল কনৌজ পর্য্যন্ত, কতক বা আরও দূরে জেলার সদর ফতেগড় পর্য্যন্ত যাইবে। শোনা গেল 'বাসে'র চোটে ছোট রেলের যাত্রী হয় না, কারণ, রেল ফতেগড় হইতে ছয় ঘণ্টায় কানপুরে আসে, কিন্তু 'বাস্' চারি ঘণ্টায় পৌঁছায় অথচ তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া অপেক্ষা 'বাসে'র ভাড়া চারি আনা কম। পৌষ মাস, অথচ প্রখর রৌদ্র। রাত্রির শীত স্মরণ করিয়া পট্টুর পোষাক পরিয়া আসা হইয়াছে, সুতরাং গরম বোধ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে অনেক দূর আসা গেল। পথে একটা মাঠে পল্টনের ছাউনি পড়িয়াছে। একদল সিপাহী সরকারী পোষাকের জোরে বিনা পয়সায় কনৌজে যাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু বাসের চালক ও তাহার সঙ্গী কোনমতেই তাহাদিগকে উঠিতে দিল না; যুক্ত-প্রদেশের লোকের এত সৎসাহস এই প্রথম দেখিলাম।

সত্য সত্যই দুঘণ্টা দশ মিনিটে 'বাস্' কনৌজ ষ্টেশনে পৌঁছিল, কনৌজ সহর এখান হইতে তিন-চার মাইল, কিন্তু 'বাস্' ষ্টেশনের আগে আর যায় না। আমরা যে 'বাসে' আসিয়াছিলাম সেই 'বাসে'র সহিত চারি টাকা

ভাড়া চুক্তি করিয়া সহর দেখিতে চলিলাম। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শিক্ষক ডাঃ জ্যাঁ ফিলিপি বোগেলের (Dr. Jean Philippe Vogel, এখন তিনি লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক) সহিত প্রথম কান্যকুব্জে আসিয়া যেখানে তাম্বুতে বাস করিয়াছিলাম, সেই দিক্‌টায় গেলাম। সেটা সহরের পশ্চিম দিক এবং

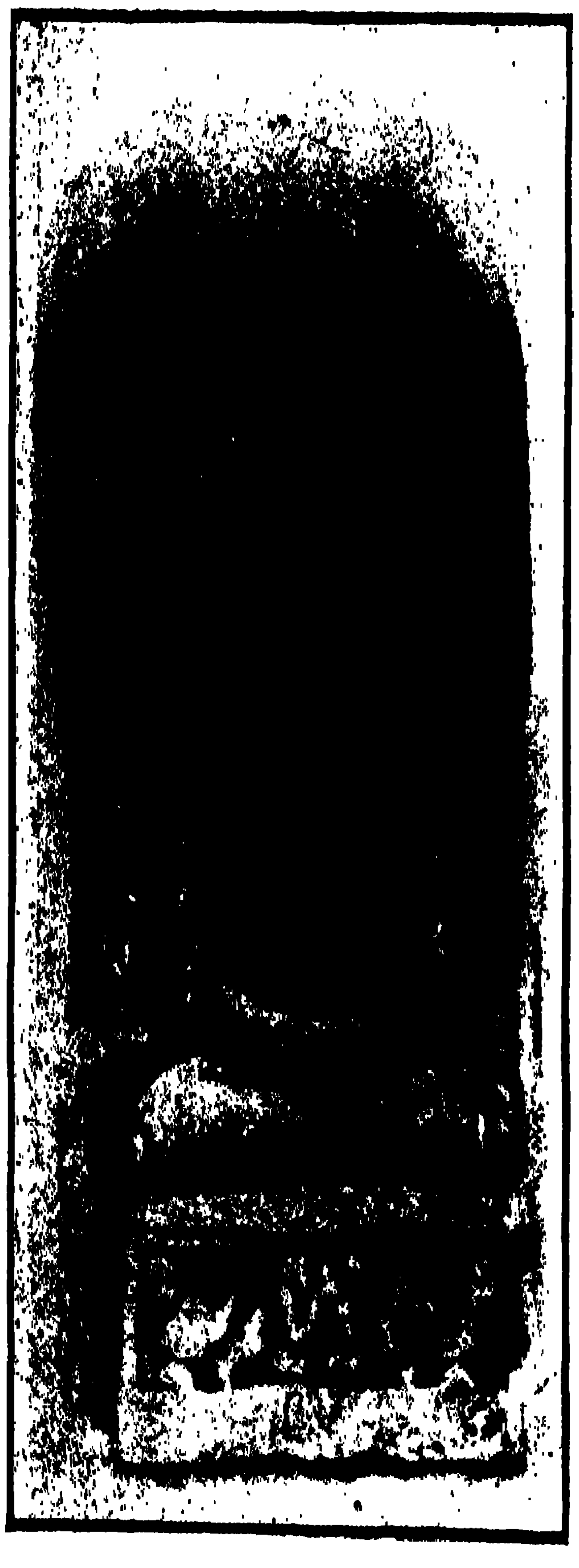

দেবী কুব্জমতীর আধুনিক মন্দিরে তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের মূর্ত্তি আস্তারেচোক—বেনারস

সেখানে মাঠের মাঝখানে একটা পুরাতন খোলা ঈদ্‌গাহ্‌ আছে। ঈদ্‌গাহের দক্ষিণে মোগল বাদশাহী আমলের একটা মুসলমান-সমাধি আছে। সহরের এই-খানটা খুব উচ্চ, নানাদিক হইতে নদী-নালা আসিয়া উত্তরদিকে গঙ্গায় মিশিতে ছুটিয়াছে। এখান হইতে সহর নদীর ধারে সরু ফালির মত পূর্ব্বদিকে লম্বা হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে কান্যকুব্জ বা কনৌজ বিশেষ বড় সহর ছিল না। খ্রীষ্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর আগে হইতে খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত পাটলিপুত্রই উত্তর-ভারতের প্রধান নগর ছিল। তখন 'নগর' বলিলেই পাটলিপুত্র নগর বুঝিতে হইত। রাজধানীর চারিপার্শ্বের জেলাগুলিকে 'নগরভুক্তি' (metropolitan division) বলিত। পাটলিপুত্রে যে-রকম দেবমন্দির তৈয়ারী করা হইত তাহার নাম 'নাগর'। তখন পুরুষপুর, তক্ষশিলা, মথুরা, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী প্রভৃতি প্রাদেশিক রাজধানী এবং ছোট ছোট নগর ছিল। খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতকে মৌখরী রাজবংশের এক শাখা কনৌজে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা অবন্তীবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত থানেশ্বরের প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল। মধ্যযুগের গোড়ায় এইখান হইতে কান্যকুব্জ বা কনৌজের ইতিহাস আরম্ভ। হঠাৎ প্রভাকরবর্দ্ধন মরিয়া গেলে গৌড় দেশের রাজা শশাঙ্ক মালব দেশের রাজার সহিত মিলিয়া থানেশ্বরের সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। শশাঙ্ক আসিয়া পৌঁছিবার আগেই মালবদেশের রাজা (তাঁহার নাম সম্ভবতঃ দেবগুপ্ত) কনৌজ দখল করিয়া গ্রহবর্ম্মাকে মারিয়া ফেলিলেন, রাজ্যশ্রী বন্দী হইলেন। তখন প্রভাকর-বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন আসিয়া দেবগুপ্তকে তাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক আসিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে মারিয়া ফেলিলেন। হর্ষ-চরিতকার বাণভট্ট বলেন যে, রাজ্যবর্দ্ধন ধর্ম্মানুরোধে অরাতিভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ হর্ষ প্রতিশোধ লইতে আসিয়া ক্রমে সমস্ত উত্তর-ভারত জয় করিয়া রাজধানী থানেশ্বর হইতে কান্যকুব্জে উঠাইয়া আনেন এবং এই সময় হইতে কান্যকুব্জ উত্তর-ভারতের রাজধানী হইল। ৬০৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কনৌজ কখনও উত্তর-ভারতের বা সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হয় নাই, এমন কি অন্তর্ব্বেদী প্রদেশের (গঙ্গা ও যমুনার

মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের) রাজধানীও ছিল না। অতি প্রাচীন-কাল হইতে যমুনাতীরবর্ত্তী কৌশাম্বী নগর এই দেশের রাজধানী।

হর্ষবর্দ্ধনের নূতন সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া কনৌজের যে পদবৃদ্ধি হইল ৬৪৭ খৃঃ অব্দে হর্ষের মৃত্যুর পরেও তাহা কমিল না। কনৌজের রাজারা নিজেদের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বড়-একটা কেহ মানিত না। হর্ষের পরে যে রাজবংশ অধিক দিন কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছেন তাহার নাম আয়ুধ বংশ। এই বংশের মাত্র তিনজন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, বজ্রায়ুধ, ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ। ৭৮৩ খৃঃ অব্দে ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন, কিন্তু বাংলার পালবংশের গৌরব-রবি ধর্ম্মপাল তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জ-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কান্যকুব্জ লইয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ঘোর যুদ্ধ চলে, অবশেষে মহারাষ্ট্র দেশের রাজা তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যে ধর্ম্মপাল রাজপুতানার প্রতীহার বংশের রাজাকে হারাইয়া দিয়া কান্যকুব্জে নিজের অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। ৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ পুনরধিকার করিয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে দ্বিতীয় গোবিন্দের মৃত্যু হয়। পালরাজাদের আমলের প্রাচীন লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ধর্ম্মপালকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সমস্ত রাজাকেই জয় করিতে হইয়াছিল।

> ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ কুরু যদু যবনাবন্তী গন্ধারকীরৈঃ
> ভূপৈর্ব্যালোল মৌলি প্রণতি পারণ তৈঃ
> সাধু সঙ্গীর্য্যমানঃ

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মপাল কুরু (মধ্য পঞ্জাব), যদু (মথুরা জেলা) যবন (পশ্চিম পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ), মৎস্য (উত্তর রাজপুতানার জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য), অবন্তী (মালব দেশ), ভোজ (মধ্যপ্রদেশের বেরার বা বহ্রাড্), গন্ধার (পেশাওর ও কাবুল নদীর উপত্যকা) এবং কীর (কাঙড়া বা জ্বালামুখী) জয় করিয়াছিলেন।

কান্যকুব্জের উপরে পালরাজবংশের আধিপত্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত রাজপুত রাজা দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র প্রথম ভোজ আবার রাজপুতানা হইতে বাহির হইয়া কান্যকুব্জ জয় করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত হিন্দুস্থান জয় করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়েই কান্যকুব্জের চরম উন্নতি। প্রতীহার বংশের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া কান্যকুব্জ প্রায় দুই শত বৎসর উত্তর-ভারতের সভ্যতার ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র হইয়াছিল। ৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রথম ভোজ কান্যকুব্জ জয় করিয়া উহা নিজের রাজধানী করিয়াছিলেন এবং ১০১৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহমূদ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে উহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। ইহার পরে চেদি বংশের রাজপুত রাজা কর্ণদেব কান্যকুব্জ জয় করিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর (১০৪১ হইতে প্রায় ১০৭১ পর্য্যন্ত) রাজত্ব করিয়াছিলেন। কর্ণের পুত্র যশঃকর্ণকে হারাইয়া দিয়া গাহড়্বাল বংশের চন্দ্রদেব যে নূতন রাজ্য আন্দাজ ১০৯০ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিয়াছিলেন, কান্যকুব্জ আবার তাহার রাজধানী হইয়াছিল। এই চন্দ্রদেবের পৌত্র গোবিন্দচন্দ্র বাংলার পালবংশীয় রাজা রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মথন বা মহনের দৌহিত্রী কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চাঁদ বা বা জয়চন্দ্র দিল্লীর চৌহান-বংশীয় পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক, এবং অবিশ্বাসযোগ্য কাহিনী অনুসারে, তাঁহার শ্বশুর। অনেকে মনে করেন যে, ১১৯৪ খৃঃ অব্দে জয়চন্দ্রের পরাজয় ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কান্যকুব্জ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু এ কথা মিথ্যা। মূল ফার্সী ইতিহাস পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, ১২২৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর প্রায় বিশ বৎসর পরে শমস্-উদ্দীন-ইল্-তুত্মিশ্ কান্যকুব্জ জয় করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই প্রাচীন কান্যকুব্জের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ কান্যকুব্জের দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইল্-তুত্মিশ সমস্ত কান্যকুব্জ নগর মরুভূমিতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই কান্যকুব্জের পুরাতন ইতিহাস।

এখন কনৌজ একটি বড় গ্রাম মাত্র। তীর্থস্থান হিসাবেও ইহার সুখ্যাতি কমিয়া গিয়াছে। পাঁচ শত

বৎসর ধরিয়া মুসলমান প্রাচীন হিন্দু-দেবমন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ লইয়া গিয়া জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ ও ফররুখাবাদ নগরে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন, সেইজন্যই জৌনপুরে ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে মৌখরী-বংশীয় ঈশ্বরবর্ম্মা ও গাহড়্‌বাল-বংশীয় বিজয়চন্দ্রের শিলালেখ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বৃত্ত বোহেলার প্রধান নগর ফতেগড় ও ফররুখাবাদে প্রতি মসজিদে গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশীয় সম্রাটদের সময়ের শিল্প-নিদর্শন রহিয়াছে এবং লক্ষ্ণৌতেও পুরাতন সহরের দু'একটি মসজিদে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান কনৌজে হিন্দুর কীর্ত্তি মাত্র তিনটি স্থানে আছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন ফুলমতী দেবীর মন্দির। ষ্টেশন হইতে কনৌজ সহরে যাইবার পথে আন্দাজ দুই মাইল দূরে মন্দিরটি পড়ে। এখনকার মন্দিরটি আধুনিক, কিন্তু ইহা বাহির হইতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে এইস্থানে একটা অতি পুরাতন মন্দির ছিল। মন্দিরের সম্মুখ দিয়া একটা নালা বহিয়া গিয়াছে, প্রতি বৎসর বর্ষার সময় নালার জল মন্দিরের ঢিবিটার খানিকটা ধুইয়া লইয়া যায়, তখন ঢিবির ভিতর হইতে চারু-কারুকার্য্য-শোভিত পাষাণখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

বাহির হইতে দেখিতে দেবী ফুলমতীর মন্দির একটি মুসলমান-সমাধি বা পীরগাহের মত। একটি বড় গাছ-তলায় অনেকটা জমি ইটের দেওয়াল দিয়া ঘেরা। দেওয়ালে একটি মাত্র দরজা। ভিতরে প্রথম মহলে চারিদিকে আস্তাবলের মত ঘর, কিন্তু এই ভিতর-বাড়ীর দেওয়ালের সর্ব্বস্থানে মূর্ত্তির টুক্‌রা খোদাই-করা পাথরের অংশ গাঁথা আছে। দ্বিতীয় মহলের সম্মুখেই একটা কূয়া, তাহার পরেই মূল মন্দির। মূল মন্দিরটির চারিদিকে অনেক সুন্দর প্রাচীন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে মন্দিরের ভিতরে গিয়া চক্ষু কপালে উঠিল। চারিকোণা ঘরটির ভিতরে অসংখ্য মূর্ত্তি। সম্মুখে একটি লম্বা তাকের উপরে অনেকগুলি জৈন মূর্ত্তির টুক্‌রা। যিনি ফুলমতী দেবী বলিয়া পূজিত হইতেছেন তিনি চতুর্ব্বিংশতিতম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমানের জননী ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলা। পাশে একটা বড় জৈনমূর্ত্তি-ফলকের এক অংশ, কোনোটা মূর্ত্তির পাদপীঠ, কোণে একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। মন্দিরের বাহিরের দিকের দেওয়ালে ছোট-বড় অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। একটি বড় জৈনমূর্ত্তি খৃষ্টাব্দের দশম শতকের—এখন মহাবীররূপে পূজিত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহারই পাশে একটি সুন্দর হরগৌরী মূর্ত্তি শিবদুর্গাই রহিয়া গিয়াছে। মন্দিরের পিছনের দিকে এক কোণে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের তলায় গরুড়ের উপরে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। অনবরত জল ঢালিয়া কনৌজের হিন্দুরা বিষ্ণুকে প্রায় ক্ষয় করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু এই তিনটি মূর্ত্তি খৃষ্টাব্দের নবম শতকের। অশ্বত্থতলে বিষ্ণুমূর্ত্তির অপর দিকে প্রায় দুই শত হিন্দু ও জৈন মূর্ত্তির টুক্‌রা সংগ্রহ করিয়া রাখা আছে।

ফুলমতী দেবীর মন্দির ছাড়িয়া এইবার কনৌজ সহরের ভিতরে ঢুকিলাম। কনৌজ খুব পুরাতন সহর, রাস্তাগুলি সরু সরু, অনেক যায়গায় মোগল-আমলের ইটের 'খাজুরা' করা। মিউনিসিপালিটি আছে বটে, কিন্তু সহরের ভিতর রাস্তাঘাট নূতন করিয়া তৈয়ারী হয় নাই। মোগল-আমলে ছোট ছোট বাংলা ইট খাড়া করিয়া সাজাইয়া রাস্তা তৈয়ারী হইত। সরকারী কাগজপত্রে ইহার নাম 'খাজুরা'। আগ্রার কাছে ফতেপুর সিক্রীতে, আকবরের সমাধি-মন্দিরে এবং লাহোরের কাছে শাহ-দারাবাগে জহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দিরে এই রকম খাজুরা-করা রাস্তা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কনৌজের বাজার ছাড়াইয়া রাস্তার নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম, অনেক দূর নামিয়া আসিলাম, দেখিলাম চারিদিক হইতে নালা বহিয়া রাস্তা সহর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সম্মুখে দুইটা ঢিবি আর তাহার পরে দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র। শুনিলাম এই শস্যক্ষেত্রই কালিন্দী নদীর বক্ষ। কনৌজের নীচে গঙ্গা দুইভাগ হইয়া গিয়াছে, যে ভাগটি ঠিক নগরের নীচে তাহার নাম কালিন্দী। ভাগলপুরের নীচে জাহ্নবী এই-রকমে দুইভাগ হইয়া যমুনিয়া ও বড় গঙ্গা নামে পরিচিত। প্রথম ঢিবিটি প্রায় একশত হাত উচ্চ, ইহার একোণে লাল পাথরের তৈয়ারী দুইটি মুসলমানের সমাধি আছে—তাহার চারিপাশে ঢিবির উপরে

প্রায় হাজার বিঘা ধরিয়া ধ্বংসাবশেষ। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে ইহাই জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্রের দুর্গ। টিবির উপরে উঠিয়া দেখিলাম, দূরে জাহ্নবীর শুভ্ররেখা সুদূর-বিস্তৃত শুষ্ক সৈকতের পরে ক্ষীণা রজতধারার মত প্রবাহিতা।

সেই বিশাল দুর্গের ভগ্নাবশেষের এক কোণে সিন্দূর-লিপ্ত কয় খণ্ড পাষাণ পড়িয়া আছে, ইহাই জয়চন্দ্রের ইষ্টদেবী জয়কালীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এখন এখানে কেবল রাজপুত ও ইতরজাতীয় হিন্দুরা পূজা করিতে আসে। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানে এমন শ্রীভ্রষ্ট কেন। কনৌজিয়া শক্তিপূজা ত্যাগ করিয়া শক্তিহীন হইয়াছে। জয়-কালী এখনও রাঠোর এবং গাহড়্বাল রাজপুত মাত্রেরই ইষ্টদেবী। ব্রাহ্মণ আর অর্থাগমের উপায় নাই দেখিয়া পণ্ডিতা বলিয়া দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু শত শত বর্ষ পূর্ব্বে সিংহাসনচ্যুত রাজপুত এখনও এই যবনপাদস্পৃষ্ট ধূল্যবলুণ্ঠিত ইষ্টদেবীর কবন্ধের সম্মুখে নতশির হইয়া থাকে।

এই কান্যকুব্জের ভীষণদর্শন দুর্গ, এইস্থানে একদিন গৌড়ের বাঙালী ও রাজপুত মরুভূমির প্রতীহার রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়া সাম্রাজ্য পদলোভে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। যখন দিল্লী, আজমীর, কালঞ্জর ও গৌড় বিজেতা যবনের পদতলে লুণ্ঠিত, তখন এই কান্যকুব্জ দুর্গশিখরে জয়চন্দ্রের পুত্র বীরবালক হরিশ্চন্দ্র গাহড়্-বালের জাতীয় কেতন সগর্ব্বে উড্ডীয়মান রাখিয়াছিল। কান্যকুব্জ-দুর্গের গৌরব-রবি অবসানের কাহিনী হিন্দু বা মুসলমান কেহই লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই। বীর হরিশ্চন্দ্র কেমন করিয়া এই ভীষণ দুর্গশিখরে প্রতি তোরণে নর-রক্তের পর্ব্বত-নির্ঝরিণীর সৃষ্টি করিয়া রাজপুতের ত্রিশত-বর্ষব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বার্থপরতার প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সুদূর পূর্ব্বে ভীরু কাপুরুষ সেনরাজ কেমন করিয়া বিক্রমপুরের বিস্তৃত জলভূমিতে লুকাইয়া ছিল, চিরবিশ্বাসঘাতক চন্দিল্য কেমন করিয়া নিবিড় বন-বেষ্টিত কালঞ্জর দুর্গে বসিয়া চিরশত্রুর প্রমাদে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল, আর সেইদিন মুষ্টিমেয় স্বামি-ভক্ত গাহড়বাল কেমন করিয়া নিজরক্তে হিন্দুর ইতিহাসের অনন্ত পত্রে প্রভুভক্তির চরম দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিল, সেকথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। একদিন হইবে, কারণ সপ্তশতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত কাহিনী এখন অগ্নির অক্ষরে জলিয়া উঠিবে, আমি কেবল সে অগ্নির ধূম মাত্র দেখিয়া গেলাম।

দ্বিতীয় টিবি অদূরে, তাহার উপরে পিনাকপাণি মহাদেবের মন্দির ছিল। মুসলমান-বিজয়ের অনতিপরে সেই দিগন্তচুম্বিত, মন্দির-শিখর ভাঙিয়া তাহার স্থলে বিরাট মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের কেবল গর্ভগৃহটি ভাঙা হইয়াছিল, কারণ মণ্ডপের স্তম্ভগুলি এখনও যথাস্থানে নিবিষ্ট আছে মুসলমান-বিজয়ের যুগে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন মস্‌জিদ্‌গুলি এইভাবেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, যথা, ত্রিবেণীর জাফর্ খাঁ গাজির মস্‌জিদ্, দিল্লীর মস্‌জিদ্ কব্বোৎ-উল্-ইস্‌লাম, আজমীরের আটাই-দিন্-কী-ঝোঁম্পড়া, খম্বায়ৎ বা কাম্বের জুম্মা মস্‌জিদ্, ইত্যাদি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কান্যকুব্জ-দর্শনও প্রায় সমাপ্ত হইল, বাকী রহিল কেবল গঙ্গাতীর। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য বোগেলের সঙ্গে আসিয়া কতকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, আজ সেগুলির মায়া কাটাইতে পারিলাম না। সছাত্র কালিন্দীর গর্ভে নামিলাম। নদী একেবারে শুষ্ক, নদীগর্ভে শস্যক্ষেত্র, প্রায় দুই মাইল রাস্তা চলিয়া কালিন্দীর সীমা ছাড়াইয়া রামঘাটে পৌছিলাম। গঙ্গা এখন ঘাট হইতে বহুদূরে, সুতরাং ঘাটের সোপানাবলী এখন প্রায় মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে, কেবল ঘাটের পাশের রাণাগুলি দেখিলে এখনও নদীর ঘাট বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াছিলাম তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর নাগা সাধুদের অনেকগুলি সমাধি আছে। তাহার মধ্যে একটা পুরাতন পাথরের থাম পড়িয়া আছে।

কনৌজ দেখা শেষ হইয়া গেল। এইবার বিষম বিপদে পড়িলাম। কারণ ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার জাতীয় হিন্দুয়ানীর তর্ক উঠিল। হালুয়াইএর দোকানে পূরী

তরকারী খাইলে একজনের জাত যাইবে না, আর এক-জনের পূরী খাওয়া চলিবে না, কিন্তু মিঠাই দিয়া তরকারী চলিবে। নানাবিধ জাতিবিচার শেষ করিয়া রাত্রি আটটার সময়ে কনৌজ ষ্টেশন হইতে রওনা হওয়া গেল। একজন ছাত্র সহর হইতে নানা রকম আতর কিনিয়া লইলেন, কারণ কনৌজের আতর বিখ্যাত। রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় কানপুরের বাজারে ফিরিলাম।

শিশুর হাসি

শ্রীজীবনময় রায়

দুধ-সাগরের উদয় সীমায় হ'ল কি চন্দ্রোদয়!
কচি কমলের দল চুমি বুঝি অনিল গন্ধ বয়!
কোথা পেলি তুই এই মধুহাসি!
লুটিয়া আনিলি কি অমৃতরাশি!
সুন্দর তোরে মন্দার ফুলে রচিল কি কিশলয়?
সুধার আবেশে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িয়াছে কি মলয়?

একি অপরূপ রূপে আনন্দ মূর্ত্তি লভিল সুখে,
সর্ব্ব অঙ্গ উছলি' জাগিল নিরাময় কৌতুকে।
শিরীষ কুসুম উঠে শিহরিয়া,
গোলাপের দল পড়িল ঝরিয়া,
রাঙা পলাশের লাজরক্তিমা ঝরে ধরণীর বুকে,
ভুবনবিলাসী গরবী কুসুম রহে লাজনত মুখে।

বুকের ভিতর ছিল কি রে ঢাকা সুধা-সাগরের বাণী!
কেমনে তাহারে মরম ছানিয়া বাহিরে আনিলি টানি'?
মধুর অধরে কি অমৃত রস?
নিখিল বিশ্ব করিলি যে বশ;
কি মায়া মন্ত্রে ভুলালি ভুবন কি মোহন বাণ হানি'?
অনিমিখ আজি চেয়ে আছে সারা জগৎ অবাক মানি।

একি প্রচণ্ড শক্তি উৎস ঐ ভোলা হাসি তোর!
সকল ভুবন ধরা দিল আসি—ওরে ও চিত্তচোর!
কার কাছে তুই শিখিলি এ মায়া?
কালো চোখে তোর নাচে কার ছায়া?
আপন খুসীর মধুরস পিয়া আপনি হইলি ভোর;
কেমনে বাঁধিলি বিশ্ব-হৃদয় বিছাইয়া মায়া-ডোর?

ওরে উলঙ্গ নাগা-সন্ন্যাসী তোর দুটি কচি মুঠি,
সকল ভুবন-বৈভব হতে নিক আজি নিক লুটি';
ডুবিয়া গন্ধে সুরভি ও দেহ,
ঘুচাক্ দ্বন্দ্ব ক্ষীণ সন্দেহ;
কণ্ঠ আঁকড়ি বাহুপাশে বাঁধি দে রে মোরে আজ ছুটি;
ঝুঠা কর্ম্মের জঞ্জাল ফেলে তোর ছায়ে পড়ি লুটি'।

মার্কিন গ্রাম্য-মহিলা

শ্রীঅমলকুমার সিদ্ধান্ত

আমেরিকার বাহিরের অনেকের ধারণা যে সে-দেশে গ্রাম বলে হয়ত তেমন কিছুই নাই। বাহিরে কেন, অনেক সহরবাসী আমেরিকানও নিজেদের দেশের গ্রাম্যজীবন-সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রদের ত এ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার কারণই আছে। তাঁরা যে-সব মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতে ওদেশে যান সেগুলির বেশীর ভাগই পল্লীগ্রামের অনেক দূরে। সুতরাং তাঁদের গ্রাম্যজীবন-সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানা মুস্কিল। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী যেমন 'অজ পাড়াগাঁ' বল্‌তে যে কি বোঝায় তা জানেন না, তেমনি মার্কিন দেশেও। তবে সে-দেশের সহরবাসীরা গ্রামের সম্বন্ধে কিছু না জান্‌লে তাদেরই ক্ষতি, গ্রামের কোন ক্ষতি নাই, আমাদের দেশে ব্যবস্থাটা একটু উল্টো রকমের। আমাদের দেশের গ্রামবাসীরা অসহায় প্রকৃতির, তারা সহরের বন্ধুদের নিকট অনেক কিছু আশা করে। মার্কিন গ্রাম্যজীবনে এরূপ অসহায় ভাব বিশেষ দেখা যায় না—তারা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে এবং সমবেত চেষ্টার উপর বিশ্বাস রেখে নির্ভয়ে কাজে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগামিতা মার্কিন জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ অলঙ্কারস্বরূপ।

অনেকের ধারণা যে নভেল, নাটক, ইতিহাস পড়েই পাড়াগাঁ সম্বন্ধে প্রচুর খবর পাওয়া সম্ভব। ইহা সত্য যে পুস্তকাদির সাহায্যে আমরা দেশের অনেক খবর সংগ্রহ করতে পারি এবং অনেক সময় নিজেকে 'বিশেষজ্ঞ' নামে ভূষিতও করি। কিন্তু এভাবে সব-সময় ভালমন্দ দুদিকটা দেখা সম্ভব হয় না—মন্দ দিক্‌টাই অনেক সময় বেশী ফুটে উঠে পুস্তকের মধ্য দিয়ে। গ্রামের লোকদের সঙ্গে কিছুদিন বসবাস না কর্‌লে, তাদের চিন্তার সঙ্গে নিজের চিন্তা মিশিয়ে কিছুদিন না থাকলে, প্রকৃত পাড়াগাঁর আবহাওয়া পাওয়া মুস্কিল। লেখকের বিশেষ সৌভাগ্য যে, তিনি আমেরিকায় দু'তিনটি প্রদেশের পাড়াগাঁয়ে বাস করার সুবিধা পেয়েছিলেন—সেইজন্যই কিছু লিখতে ভরসা পাচ্ছেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ও আদর্শের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের সার অংশ খুঁজে পাওয়া যায়, এবং এই ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক আদর্শ স্বাভাবিক আব্‌হাওয়া ছাড়া ফুটে উঠ্‌তে পারে না। এই স্বাভাবিক আব্‌হাওয়া বর্ত্তমান কর্ম্ম-কোলাহলপূর্ণ সহরে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, সেইজন্য প্রকৃত মার্কিন জীবন দেখ্‌তে হলে গ্রামে যাওয়া বিশেষ দরকার। কেবল ছোটখাট সহরে বা গ্রামেই প্রকৃত আমেরিকান্‌কে সহজে খুঁজে পাওয়া সহজ। বড় বড় সহরগুলি নানা দেশ-বিদেশের লোকে ভরা, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে সকলে সেখানে এতই ব্যস্ত, জীবনটা সেখানে এতই কল্‌কজায় ভরা যে, প্রকৃত পারিবারিক জীবন বা সামাজিক আদর্শ দেখার সুবিধা সেখানে বড় হয়ে ওঠে না। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, বোষ্টন ইত্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সহরের আশে-পাশে যে-সব ছোটখাট সহর দেখা যায়, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্কিন-পরিবারে পূর্ণ। আপিস ইত্যাদি বন্ধ হ'বার পর হাজার হাজার লোক এই-সব ছোটখাট জায়গায় চলে যায়—ওই সব জায়গাগুলি সন্ধ্যাবেলা লোকে ভরে যায়। বড় বড় সহরে অনেক পল্লীতে ইংরেজীর এক শব্দও অনেক সময় শোনা যায় না—জগতের সকল জাতিই ঐ-সব পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি করে বসবাস করে। বিদেশী লোকেরা সহরে আসে, দিনমজুরী করে সংসার চালাতে। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ক্ষেতের কাজে মন দিতে এই নব আগন্তুকেরা বিশেষ নারাজ। তা'ছাড়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করতে হলে কেবল যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা নয়, অর্থেরও

আবশ্যক। বিদেশী লোকেরা মার্কিন দেশে অর্থের ভিখারী, দিনমজুরীর উপর তাদের জীবন নির্ভর করে। মূলধন তাদের কোথায়? সেইজন্যই গ্রামের বা ছোটখাট স্থানের স্থায়ী বাসিন্দারা অধিকাংশই আমেরিকান্। সহরে যাঁরা থাক্‌তে বাধ্য তাঁরা এই সব ছোটখাট যায়গায় ভবিষ্যতে বসবাস করার চেষ্টা খুবই করেন। শেষজীবনে ছোটখাট একটা জায়গায় 'ফার্ম লাইফ' (গ্রাম্যজীবন) যাপন করার ইচ্ছা সহরবাসী প্রায় সকলেরই আছে—বিশেষতঃ বিদেশী নব আগন্তুকদের। খোলা জায়গা ও বাতাস বিনা যে জীবন গড়ে উঠ্‌তে পারে না, তা মার্কিনেরা জানে। তাই সে-দেশের সহরগুলিও এখন বাগান ও খোলা খেলার জায়গায় (বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য) পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে।

কলিকাতা থেকে বের হয়ে রেল লাইনের দুধারে আমরা অনেক গ্রাম দেখি। সে-সব গ্রাম ট্রেন লাইনের খুব কাছে অথচ একেবারে 'অজ পাড়াগাঁ'। বছর আসে, বছর যায়, অথচ এই-সব গ্রামের কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। আমেরিকায় এরূপ হওয়া একেবারে অসম্ভব। সে-দেশে যে-স্থানেই দু'দশ ঘর লোকের বাস সেখানেই মানুষের সমবেত চেষ্টার ফলে উন্নতির চিহ্ন দেখা যায়। যে-স্থানের নিকটে একটা রেলষ্টেশন আছে সে জায়গা ত দুদিনে ছোটখাট সহরে পরিণত হতে বাধ্য। মানুষের চেষ্টা ও উদ্যমের অপব্যবহার আমাদের দেশে যে পরিমাণে দেখা যায়, পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা দেখা যায় না। আমি প্রথমে যে-গ্রামে যাই সেটা রেলষ্টেশন থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে; সেখানকার এক-জন মাতব্বর লোক আমাকে বলেছিলেন, "ভাগ্যিস্ রেলটা একটু দূরে আছে, তাই আমরা ৬৬০ জন এখানে শান্তিতে আছি। নচেৎ দেখ্‌তেন যে আমাদের গ্রামে দুটোর জায়গায় দশটা গির্জ্জা, এবং বিশটা মোটরের জায়গায় হাজারটা।" এখানে বলে রাখা ভাল যে, আমেরিকায় গির্জ্জার সংখ্যা খুবই বেশী—ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রায় পাঁচশজনের জন্য গড়ে একটি করে গির্জ্জা এবং কোন কোন গ্রামে তার চেয়েও সংখ্যায় বেশী। গির্জ্জা বা মোটরের সংখ্যা দ্বারা অনেক সময় আমেরিকান সহরগুলির আয়তন স্থির করা সহজসাধ্য।

উপরোক্ত গ্রামে একটি মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনাদের গ্রাম্য-মহিলারা কি ভাবে দিন কাটান—বিশেষতঃ তাঁদের অবকাশের সময়টা তাঁরা কি উপায়ে কাজে লাগান?" এই মহিলাটির স্বামী গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান মাখন-ব্যবসায়ী। তাঁদের অনেক চমৎকার গরু, হাঁস, মুরগী আছে। অবকাশ-মত মহিলাটি হাঁস মুরগীর ব্যবসা শিখে স্বামীর সাহায্য কর্‌ছেন। উভয়ে একশত ডলার মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করে এখন ব্যবসায়টিকে প্রায় পাঁচ হাজার ডলারের মূলধনে জমা করেছেন। মহিলাটির প্রশ্ন বিশেষ কঠিন নয়। আমরা জানি যে আমাদের দেশে গ্রামের মেয়েরা অনেকেই কোন অবকাশ পান্ না এবং যদিই বা কখনও পান তবে তাঁরা সে-সময়টা বিশ্রাম করে বা পাড়া বেড়িয়ে কাজে লাগান। আমেরিকার ব্যবস্থা কিন্তু একটু অন্য রকমের।

প্রথমতঃ, প্রকৃত আমেরিকানরা বৃহৎ পরিবারের পক্ষপাতী বলে মনে হয় না। মার্কিন-পরিবারে, বিশেষতঃ গ্রামে, সন্তানাদি দুই তিনটির বেশী বড় দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকানদের খাবার বিড়ম্বনা কম। বিলাতে অন্ততঃ চার-পাঁচবার না খেয়ে ইংরেজরা টিক্‌তে পারে না, কিন্তু আমেরিকায় তিনবারই প্রধান খাবার নিয়ম—সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়। তা ছাড়া বিজ্ঞানের দৌলতে তাদের খাদ্য সহজেই পাক করা যায়। সাধারণতঃ প্রতি-বারের রান্না তৈরী করতে গড়ে দেড় ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। বাকি সময়টা ঘরের গিন্নীরা ছেলেমেয়েদের পরিচর্য্যা, তাদের শিক্ষা বা সংসারের অন্য কোন কাজে লাগাতে পারেন। অনেক সময় তাঁরা গৃহকর্ত্তার কার্য্যের সাহায্য করেন—বিশেষতঃ ক্ষেতের কাজে বা সহরে গিয়ে সবজী বিক্রী করার সময়। বাংলা দেশের মেয়েরা রান্না জিনিষটায় যতটা সময়, চেষ্টা ও শক্তি ক্ষয় করেন জগতের কোথাও অতটা সময় কেহ করেন বলে শুনি নাই। মেয়েরা সব দেশেই রান্না করতে ভালবাসেন, তবে সময়ের ভাগটা সব দেশে সমান নয় এই যা পার্থক্য।

অনেকে হয়ত বল্‌বেন যে, আমাদের মেয়েরাও কম সময়ে রান্না শেষ করতে পারেন যদি পরিবারের অবস্থা ভাল হয়, অর্থাৎ যদি আধুনিক উনুন বা রান্নাঘর ব্যবহার করা সম্ভব হয়। একবার বোষ্টনের একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনাদের দেশ শুনেছি খুবই দরিদ্র, কেন বলুন ত? আপনারা কি নিজেদের অবস্থার উন্নতি কর্‌তে চেষ্টা করেন না?" উত্তরে তাঁকে বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল, যে, আমরা অনেক সময় দারিদ্র্যকে ধর্ম্মের ন্যায় মান্য করি, 'সাংসারিক' উন্নতিকে পাপ বলে মনে করি। আমাদের পাড়াগাঁয়ের পরিবারগুলি যে দরিদ্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমাদের প্রকৃতি অলস ও সেকেলে। মার্কিন-রাজ্যের দক্ষিণের বাসিন্দা নিগ্রো চাষাদের অবস্থা খুব ভাল নয়, অথচ নিগ্রো-বীর বুকার টি ওয়াশিংটন তাঁর প্রসিদ্ধ আত্মচরিতে তৎকালীন (২৫।৩০ বছর পূর্ব্বেকার) নিগ্রোজীবনের যে চিত্র দিয়েছেন তা আমাদের গরীব গ্রাম্যজীবন অপেক্ষা হীন নয়। নিগ্রোজাতি গত ষাট বছরে এত উন্নতি লাভ করেছে আর আমরা অনেকটা একভাবেই রয়েছি—এর কারণ সন্ধান করবার স্থান এ নয়, তবে এটা বলা চলে যে, উভয় জাতির মধ্যে জীবন ও ধর্ম্মের আদর্শ—এই দুই বিষয়েই পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্যের উপর উন্নতির মাত্রা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, এই আমার বিশ্বাস।

বুকার টি ওয়াশিংটন্ পঁচিশ বছর পূর্ব্বেকার নিগ্রো-জীবনের কথা লিখ্‌তে গিয়ে কাঠ ও কয়লার উনুনের প্রাদুর্ভাবের কথা লিখেছেন। বর্ত্তমান আমেরিকায় গ্যাস ও বিদ্যুতের ষ্টোভেই সব রান্নার কাজ চলে যায়। অনেক মার্কিন অজ পাড়াগাঁয়ে বিদ্যুৎ পাওয়া মুস্কিল বটে, কিন্তু গ্যাস্ পাওয়া সর্ব্বত্রই সম্ভব। আমাদের মেয়েরা ছোট রান্নাঘরে ধোঁয়া ও গরমের মধ্যে কতই না কষ্ট পান! মার্কিন দেশে এ কষ্ট আজকাল নাই। আমাদের দেশে মন ও 'আত্মা' লইয়া আমরা এতই ব্যস্ত যে, অনেক সময় শরীরের যে কোন মূল্য আছে তা আমরা ভুলেই যাই। মার্কিন দেশে তা হবার জো নাই, তাই সে-দেশের ঘরের গিন্নীরা সহজে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সমর্থ হন।

মার্কিন পাড়াগাঁয়ে জলের সমস্যা নাই। আমাদের পাড়াগাঁয়ে গ্রীষ্মকালে বড়ই জলকষ্ট। কলের জল ত দূরের কথা, কূয়োরই অভাব। মার্কিন দেশে অজ পাড়াগাঁয়েও জলের কল আছে। এটা গৃহের গিন্নীর পক্ষে খুবই সুবিধাজনক।

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা যে, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা হয়ত সহজে স্নান করে না। ইউরোপের অনেক দেশের পক্ষে একথা সত্য হতে পারে, কিন্তু মার্কিন গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে একথা একেবারেই টিক্‌তে পারে না। এরা খুবই স্নানপ্রিয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা মার্কিন দেশে একটা বাতিকে এসে দাঁড়িয়েছে অনেকে বলেন। অতি অজ পাড়াগাঁতেও আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রচার হয়েছে। এ-বিষয়ে প্রধান প্রচারক হল দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা। স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধে আধুনিক নিয়ম সকল কাগজেই দেখা যায় এবং এই-সব কাগজ সে-দেশের সর্ব্বত্রই প্রচারিত। এই-সব কাগজ অনেক সময় গ্রামের পরম বন্ধু। কাগজের কর্ত্তারা অনেক সময় গ্রামবাসীদের নানাবিষয়ে সাহায্য করেন। গৃহনির্ম্মাণের প্ল্যান্ তার মধ্যে একটি। অনেক মাসিক পত্রিকায় গৃহনির্ম্মাণ-সম্বন্ধে চমৎকার ব্যবস্থা দেওয়া থাকে এবং এই ব্যবস্থার সাহায্যে অনেক গ্রামবাসী নিজ নিজ বসতবাটি নির্ম্মাণ করে থাকেন। আমাদের দেশের চাষারা যেমন পরিবারের সকলে মিলে বাড়ী নির্ম্মাণ করে, তেমনি সেদেশেও। পাকা ভিত্তির উপর কাঠের ফ্রেম দিয়েই বেশীর ভাগ বাড়ী তৈরী হয়। মজুরী বাদে হাজার ডলারেও তিন চার কুঠরী-ওয়ালা বাড়ী নির্ম্মাণ করা যায় (মজুরী সমেত অন্ততঃ আড়াই হাজার ডলার)। বনজঙ্গলের প্রতি গভর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি থাকায় কাঠ অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় এবং শীতপ্রধান দেশে কাঠের বাড়ীই সুবিধাজনক, কেননা সহজে গরম রাখা যায়। বাড়ীগুলি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। বাসের উপযোগী ঘরগুলি মাটির উপর। মাটির তলায় (basement) বছরের রসদ (আলু, আপেল ইত্যাদি)

থাকে, তাছাড়া তলায় কাপড়-ধোয়ার ব্যবস্থা আছে এবং শীতকালে বাড়ী গরম করার কলও সেখানে থাকে। চিলের ছাদের ঘরগুলিতে (আমাদের দেশে কোঠা ঘরের মতন) প্রধানতঃ দরকারী জিনিষপত্র জমা থাকে এবং সময়ে অসময়ে উহার মধ্যে একটি ঘর নির্জ্জনবাসের জন্য বা রোগীর ঘরের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের এইটুকু বিশেষ সুবিধা যে, তাঁদের বাড়ী পরিষ্কার রাখতে বেশী কষ্ট পেতে হয় না, কেননা সহরের ধোঁয়া বা ধূলা এখানে নাই।

পূর্ব্বেই বলেছি মার্কিন গ্রাম্যজীবন আমাদের দেশের মতন নির্জ্জীব অসহায় নয়। আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে বাস মানে অনেকটা অজ্ঞাতবাস। এখানে স্কুল নাই, ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর। খবরের কাগজ নাই, পোষ্টাপিসের অসুবিধা, চলাফেরার পথ নাই বলিলেই চলে এবং রেলষ্টেশনের অভাব, তার উপর গ্রামের স্বাস্থ্য ও জল জঘন্য। আধুনিক লোক সহরের দিকে সেইজন্যই ছুটে। মার্কিন দেশে ব্যবস্থাটা অন্য রকমের। প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ও স্বাস্থ্যবিভাগের সুব্যবস্থায় জল ও পথ ইত্যাদির বন্দোবস্ত বেশ ভাল—অবশ্য এজন্য গ্রামবাসীদের বিশেষ ট্যাক্স দিতে হয়। কোন-না-কোন রকমের স্কুল প্রত্যেক গ্রামেই আছে। বড় গ্রামগুলিতে বেশ বড় স্কুলের ব্যবস্থা। খবরের কাগজের অভাব নাই—ডাকবিভাগ বা এজেন্সির সাহায্যে দৈনিক খবর ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়, তা ছাড়া এখন 'রেডিও'র জন্য অনেক সময় তাও দরকার হয় না—অনেক 'রেডিও' কোম্পানী জগতের দৈনিক খবরের একটা চুম্বক সকলকে বলে দেয়। রেলষ্টেশন দূরে থাকিলেও কোন অসুবিধা নেই, কেননা অনেক গ্রামের নিকটে ট্র্যাম পাওয়া যায় এবং যেখানে ট্র্যাম নেই মোটরের সাহায্যে সেখান থেকে যে-কোন স্থানে সহজে যাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলেছি যে বাড়ীর গিন্নীরা সময়মত শাকসব্জী সহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা মোটরকারে মোট বয়ে নিয়ে যান। আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর যত ভাড়া প্রায় সেই খরচে মোটরের সাহায্যে সে-দেশে কাজ চালান যায়। সে-দেশে অনেকে কখনও রেলগাড়ীতে চাপেন নাই, কেননা রেলভাড়া বড়ই বেশী। মার্কিনে রেলগাড়ীতে কোন ক্লাস না থাকাতে সব এক ভাড়া (আমাদের প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার প্রায় সমান)। গরীব লোকেরা সেইজন্য রেলগাড়ীতে না চেপে মোটর গাড়ীতেই যাওয়া-আসা করে। মার্কিন দেশে মদ-বিক্রয় আইনবিরুদ্ধ হবার পর থেকে মোটরে যাওয়া-আসা করা সহজসাধ্য হয়েছে। আজকাল আমাদের দেশে বাইসাইকেল কেনা যেমন সহজসাধ্য, তেমনি মোটরও কেনা সহজ সে-দেশে। তা ছাড়া মোটরের তেল খুব সস্তা।

এখন গ্রাম্য পোষ্টাপিস সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার। মার্কিন দেশে পোষ্টাপিসের অভাব বোধ হয় না। অনেক মুদীর দোকান ও ডাক্তারখানার সঙ্গে পোষ্টাপিসের ব্যবস্থা আছে। এতে সকলেরই সুবিধা, মুদীর বা ডাক্তারের বিজ্ঞাপনের কাজ হল, গভর্ণমেণ্টের অনেক খরচ বেঁচে গেল, অধিকন্তু জনসাধারণের কতই সুবিধা। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে, বিশেষতঃ আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে এরূপ আশা করা যায় না। আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব, চেষ্টারও বিশেষ অভাব, তার উপর আমাদের ডাকবিভাগ অন্য আদর্শে গঠিত। আমাদের দেশে জনসাধারণের সুবিধা অপেক্ষা কর্ত্তাদের সুবিধাটা দেখাই বেশী মূল্যবান বলে অনেকে মনে করে থাকেন। ভগবান আমাদের সহ্য করে চল্‌বার জন্যেই যেন সৃষ্টি করেছেন, নীরবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা একটি মহৎ গুণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে কেবল সহ্য করার জন্যই সহ্য করাটা কোন কাজের কথা নয়। দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্য নীরবে সহ্য করে যদি মনে আনন্দ ও শান্তি আসে তবে সেগুলি বাদ দিতে চেষ্টা করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আমেরিকানরা অন্ততঃ এভাবে সহ্য করার পক্ষপাতী নন্—তাঁরা এতে আনন্দ বা শান্তি লাভ করেন না। এঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মানুষের শক্তি—এ দুয়ের মধ্যে কোন বিবাদ লক্ষ্য করেন না। এঁদের কাছে নিজেদের ও অপরের উন্নতি-সাধনই হল ভগবানের ইচ্ছা-পালন।

পূর্ব্বে যে গ্রাম্য-মহিলাটির উল্লেখ করেছি তিনি প্রকৃত মার্কিন-জীবনের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। 'স্বামীর আকস্মিক

মৃত্যুর পর তিনি নিজের চেষ্টায়, স্বামীর জীবন-বীমার টাকায় বসতবাড়ীর সঙ্গে একটি মুদীর দোকান খোলেন। দুটি সন্তান তাঁর, মেয়েটি ছোট কিন্তু কার্য্যতৎপর, ছেলেটি দোকানের কার্য্যে পটু। সমবেত চেষ্টায় যখন দোকানটি বেশ চল্‌তে লাগ্‌ল তখন মহিলাটি ভবিষ্যৎ উন্নতির চিন্তা কর্‌তে সময় পেলেন। ষ্টেট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের Correspondence বিভাগের সাহায্যে ক্রমে তিনি পোষ্টাপিস বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। এখন তিনি নিজের দোকানের সঙ্গে একটি গ্রাম্য ডাকঘর খোলার হুকুম পেয়েছেন। সরকার বাহাদুর একজন মহিলাকে তাঁর কাজের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই গ্রাম্যমহিলার অধীনে কাজ কর্‌ছেন। মহিলার ইচ্ছা যে ভবিষ্যতে তাঁর ছেলেটিই এই ডাকঘরের ও দোকানের সমস্ত ভার নেয়।

মহিলাটি বল্লেন, "টম্ যদি কলেজে না পড়তে যায় আমি তাকে এখানেই রেখে সব কাজের ব্যবস্থা করে দেব।" টম নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ মা, এমন সুন্দর গ্রাম ছেড়ে সহরে মরতে যাব কেন? যদিই বা কলেজে পড়ি তবুও এ কাজ ত বেশ ভাল, তা ছাড়া আমাদের গ্রাম ত একদিন সহরেই পরিণত হবে, তখন আমার দোকান ও ডাকঘরের মূল্য খুব বেড়ে যাবে।" এই কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে টমের মুখ আনন্দে ভরে উঠ্‌ল।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(১)

ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরটি আয়তনে নিতান্ত ছোট নয়, যদিও ইহার লোকসংখ্যা সে অনুপাতে নয়। নিজ সহরটি বাদে ইহার চারিদিকে সহরতলী অনেকগুলি। যাঁহারা কোনো কারণে সহরের ঠিক ভিতরে বাস করিতে চাহেন না, অথচ নগরবাসের সুখ-সুবিধা খানিকটা অন্ততঃ ভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারাই এ সকল স্থানের স্থায়ী অধিবাসী। সহর হইতে সহরতলীগুলিতে যাতায়াতের উপায় অনেক। ট্রেন আছে, ট্রাম আছে, মোটর বস্ আছে। সনাতন ঘোড়ার গাড়ী ত আছেই। তদুপরি ব্রহ্মদেশের অতিপ্রিয় যান রিক্‌শ সস্তার চূড়ান্ত, দু আনা চার আনার বেশী খরচ নাই। অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যেখানে খুসি যাওয়া চলে। সুতরাং সহর হইতে একটু দূরে থাকিলে কোনোই অসুবিধা নাই।

এখানকার ধনী এবং সাহেবীআনার পক্ষপাতী বাসিন্দারা বেশীর ভাগ কোকাইন্ নামক স্থানে বাস করেন। কোকাইন্ লেক্ নামক একটি বিল এই স্থানে থাকাতে, ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। সহর হইতে এখানে আসিবার বেশ ভাল রাস্তা আছে। সম্প্রতি এইদিকে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়া রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু স্থানটির নির্জ্জনতা এখনও দূর হয় নাই। এক একটি বাড়ীর পর অনেকদূর পর্য্যন্ত বাড়ীঘর কিছুই হয়ত নাই, খোলা মাঠ পড়িয়া। কোথাও বা দূরে বনশ্রেণী দেখা যায়, কোথাও রবার গাছের বাগান পথিকের কৌতূহল উদ্রেক করে। বাড়ীগুলির স্থাপত্য ও আকার অধিবাসীদের জাতি ও রুচিভেদে নানাপ্রকার। চীনা, ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় এই তিনজাতীয় স্থাপত্যেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। তবে ভারতীয় স্থাপত্যও এখানে ভেজাল মিশিয়া আধা ব্রহ্মদেশীয় হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি ভারতবর্ষীয় বাড়ী একটিও চোখে পড়ে না।

পথে পথিক বিরল। মাঝে মাঝে সশব্দে মোটর বস্ চলিয়াছে। মোটরকারও প্রায়ই দেখা যায়, অন্য প্রকার

যান বিরল। এই স্থানটি রেঙ্গুন সহর হইতে অনেক খানিই দূরে অবস্থিত হওয়ায় মোটর ভিন্ন অন্য প্রকার গাড়ী ব্যবহার করিয়া সুবিধা হয় না। স্থানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া, পর্য্যটকের আগমন সারাক্ষণই হয়, তাই মোটর বসগুলিতে কখনও যাত্রীর অভাব হয় না।

বর্ষাকালের সন্ধ্যায় এই পথ দিয়া একখানি মোটর গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছিল। ভিতরে কটি মাত্র আরোহী, মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। সাহেবী পোষাক পরা, তবে সাহেব যে নয়, তাহা গায়ের রংএই বোঝা যায়। রগের কাছে চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা ভিন্ন বার্দ্ধক্যের আর কোনো চিহ্ন নাই।

চারিদিকে বাগান-ঘেরা বড় একটি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। গেটের ভিতর দিয়া লাল সুরকি-ঢালা পথ গাড়ীবারাণ্ডার নীচ পর্য্যন্ত। ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র তাঁহার খাসভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া টুপী এবং ছড়ি লইয়া গেল। তাহাকে চা দিতে আদেশ করিয়া প্রভু নিজের অফিস কক্ষে ঢুকিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য ভদ্রলোক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নিরঞ্জন। ব্রহ্মদেশে আসিয়া বছরখানেক মাত্র তিনি চাকরী করিয়াছিলেন, তাহার পর কন্‌ট্রাক্টারী এবং ব্যবসা করিয়া এখন প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছেন। প্রথম প্রথম সহরে ভাড়াটে বাড়ীতেই বাস করিতেন, সম্প্রতি বছর-দুই হইল নিজে বাড়ী করিয়াছেন। সহরের মধ্যে অফিসের জন্য এখনও একটি ভাড়াটে বাড়ী আছে।

কোকাইনের বাড়ীটি অনেকখানি জায়গার উপর নির্ম্মিত, আয়তনেও বেশ বড়। কিন্তু অধিকাংশ ঘরই শূন্য। গৃহকর্ত্তার কাজ নীচের তলায়ই, রাত্রে শুইতে কেবল তিনি একবার দোতালায় ওঠেন। এতবড় বাড়ী যে তিনি কাহার জন্য করিয়াছেন, তাহা কেহ ভাবিয়াও পায় না। স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া আসিবেন ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনো চিহ্ন না দেখিয়া বিশেষ আর কেহই ভরসা করে না।

নিরঞ্জনের নিজের কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা বলা শক্ত। মায়াকে লইয়া আসিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রথম হইতেই ছিল। কিন্তু সাবিত্রীর নিকট হইতে তাহার একমাত্র সন্তানটিকেও কাড়িয়া আনিলে তাহার প্রতি বড় বেশী নিষ্ঠুরতা করা হইবে ভাবিয়া এ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এখনও আশা ত্যাগ করেন নাই, তবে এ বছর নয় পরের বছর করিয়া আসিবার দিন ক্রমেই পিছাইয়া যাইতেছে। উপরতলার দু' তিনটি ঘর মায়ার জন্য সাজানো হইয়া আছে, বড় পিয়ানো অর্গ্যান্ কেনা হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা ব্যবহার করিবার লোক নাই। একখানা মোটর আছে, আর একখানা কিনিবার মতলবও গৃহকর্ত্তার মাথায় ক্রমাগত আসে। তাঁহার গাড়ী ত কাজে সারাক্ষণ ঘুরিতেছে; মায়া আসিলে, তাহার বেড়াইবার জন্য, স্কুলে যাইবার জন্য আর একটা গাড়ীর দরকার হইবে। কাহাকে প্রাইভেট্ টিউটার রাখিবেন, কাহাকে বাজনা শিখাইবার জন্য রাখিবেন, সবই তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এখন মেয়ে আসিলেই হয়। কিন্তু তাহার আগমনের সম্ভাবনা ক্রমেই যেন সুদূরপরাহত হইয়া আসিতেছে। তাহার অভাবে এই সুসজ্জিত গৃহ যেন প্রতিমাবিহীন কাঠামোর মত শ্রীহীন হইয়া আছে। নিরঞ্জন নিজের অফিস ঘরে ঢুকিয়া কি কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর কয়েকটা চিঠি পিতলের একটি সিংহমূর্ত্তি দ্বারা চাপা রহিয়াছে। সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া, তিনি আবার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, চা দেওয়া হইয়াছে। নিরঞ্জন হাতের কাগজ আবার দেরাজে ঢুকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত জরুরী কাজ না থাকিলে, খাওয়া-দাওয়ার সময় তিনি নিয়ম-মত পালন করিয়া যাইতেন। এইজন্য তাঁহার স্বাস্থ্য এ পর্য্যন্ত অটুট।

চা খাইতে বসিয়া তিনি ছোকরাকে চিঠিগুলি বসিবার ঘর হইতে লইয়া আসিতে বলিলেন। একতাড়া চিঠি, পোষ্টকার্ড আছে, খামও আছে। বেশীর ভাগই ব্যবসা-সংক্রান্ত। সেগুলি রাখিয়া দিলেন। অন্যগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, ইন্দুর চিঠি আছে কি না। সচরাচর সে পোষ্টকার্ডেই চিঠি লেখে। এবারে কিন্তু

খামের উপর তাহার হস্তাক্ষর। সাবিত্রীর অসুখ হইয়াছে, ইহা নিরঞ্জন কলিকাতার পত্রেই জানিয়াছিলেন। তবে ইন্দু সে-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখে নাই বলিয়া তিনি ব্যাপারটাকে সামান্যই মনে করিয়াছিলেন। চিঠিতে কেবল ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাহাদের বেশী টাকার প্রয়োজন থাকিলে যেন সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহাকে জানায়। ইন্দু সাবিত্রীর নির্দ্দেশমত লিখিয়াছিল যে টাকার কোনো প্রয়োজন নাই। অতএব নিরঞ্জন স্ত্রীর অসুখের বিষয় আর বড়-একটা কিছু চিন্তা করেন নাই।

ইন্দু খামে চিঠি লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইয়া চিঠিখানা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দুর আবার বক্তৃতা করিবার সখ হইল নাকি? এতদিনে তাহার বোঝা উচিত ছিল যে, বক্তৃতায় কোনই কাজ হয় না। কিন্তু কৈ? এ ত ইন্দুর চিঠি নয়? উপরের ঠিকানাটা মাত্র ইন্দুর লেখা, ভিতরের চিঠি তাঁহার কন্যা মায়ার। এই মায়ার প্রথম চিঠি! মেয়ের হাতের লেখা প্রথম চিঠি পাইয়া নিরঞ্জনের মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, চিঠি পড়িয়া সেটুকু কিন্তু নিঃশেষে তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গেল। সাবিত্রী অত্যন্ত পীড়িত, তাই মেয়ে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে যাইতে লিখিয়াছে।

প্রথমেই মনে হইল তাঁহার যাওয়া উচিত। সাবিত্রী হয়ত বাঁচিবেই না, শেষ দেখা দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য, কিছু যদি তাহার বলিবার থাকে শুনিয়া আসা কর্ত্তব্য। সত্য বটে স্বামি স্ত্রীর সম্পর্ক তাঁহাদের মধ্যে বহুকাল চুকিয়া গিয়াছে, পরস্পরের মনেও পরস্পরের আর কোনো স্থান নাই, তবু সাবিত্রী তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, তাঁহার সন্তানের জননী। ছাড়াছাড়ি সাবিত্রীর দোষেই যদিও ঘটিয়াছিল, তবু তাহা এখন স্মরণ রাখা উচিত নয়।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এখানকার কাজকর্ম্মের কথা। এত সব ব্যাপার দেখাশোনা করিবে কে? তিনি উপস্থিত থাকিয়াই সব সময় সব দিক সামলাইতে পারেন না, উপস্থিত না থাকিলে কারবারের কি যে অবস্থা হইবে, ভাবিতেও তাঁহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশে একবার গিয়া পড়িলে, ফিরিতে কত দেরী হইবে কে জানে? এখন লম্বা ছুটি পাওয়া তাঁহার অসম্ভব। এ অবস্থায় কি করা যায়?

অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। চায়ের পেয়ালায় দু তিন চুমুক দিয়াই উঠিয়া পড়িলেন, অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য টেব্‌লে অভুক্ত পড়িয়া রহিল। ছোকরা মহানন্দে সেগুলি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। এগুলি তাহারই ভোগে লাগিবে।

নিরঞ্জনের মোটরচালক সবে গাড়ী 'গ্যারাজে' ঢুকাইয়া চাবি বন্ধ করিবার জোগাড় করিতেছে এমন সময় আবার তাহার ডাক পড়িল। বিরক্ত মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটি চট্টগ্রামবাসী মুসলমান। শার্ট এবং কোট সে খুলিয়া রাখিয়াছিল, আস্তাবল হইতে আসিবার পথেই কোনোমতে আবার সেগুলি গায়ে চড়াইয়া লইল।

নিরঞ্জন টেব্‌লে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন। চিঠিখানা শাদা একটা খামে ঢুকাইয়া, তাহার উপর তাড়াতাড়ি নাম লিখিয়া বলিলেন, "যাও, ম্যানেজার বাবুর ওখানে। চিঠি তাঁকে দাও, তিনি যদি আস্‌তে পারেন, তাহলে গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে এস।"

লোকটি চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। নিরঞ্জন দেরাজ খুলিয়া অনেকগুলি চিঠিপত্র টানিয়া বাহির করিলেন। কলিকাতার যে চিঠিতে সাবিত্রীর অসুখের খবর প্রথম পাইয়াছিলেন, সেখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে কিছুক্ষণ সময় লাগিল। চিঠিখানি সেজভাই চিত্তরঞ্জনের লেখা। বিশেষ কিছু খবর তাহাতে ছিল না। "দিদির চিঠিতে জানিলাম, মেজবৌঠাকুরাণী পীড়িতা আছেন; ম্যালেরিয়া' জর বলিয়া সকলে সন্দেহ করিতেছে। গ্রামের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছে, কারণ তিনি ডাক্তারী ঔষধ খাইতে চান না। বড়দাদা কলিকাতায় লইয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি রাজী হন নাই।"

পত্রখানির তারিখ চারমাস আগেকার। তাহার পরে আর একখানা মাত্র চিঠিতে সাবিত্রীর অসুখের উল্লেখ আছে। সে এখনও সারে নাই, এইমাত্র খবর।

নিরঞ্জন চিঠিগুলি উঠাইয়া রাখিলেন। না যাওয়াও ভাল দেখায় না, আবার যাওয়ার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত

মুস্কিল। বাড়ীতে ত পুরুষমানুষ কেহই নাই, পীড়িতা সাবিত্রীকে লইয়া ইন্দু এবং বালিকা মায়া হয়ত খুবই বিপন্ন বোধ করিতেছে। ভাইরা সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, দেশে গিয়া বসিয়া থাকিবার সময় কাহারও নাই। ম্যানেজার শিবশঙ্করবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় ঠিক করিবেন বলিয়া নিরঞ্জন অফিস-ঘরেই বসিয়া রহিলেন।

শিবশঙ্কর রায় এখানে আসার পূর্ব্ব হইতেই নিরঞ্জনের পরিচিত। আগে অন্য কাজ করিতেন, এখন নিরঞ্জনের কারবার দেখেন। বেশীর ভাগ সময় তাঁহাকে মফঃস্বলেই থাকিতে হয়, মাঝে মাঝে রেঙ্গুনেও আসিয়া থাকেন। তাঁহারও একদিক দিয়া নিরঞ্জনেরই দশা, সেইজন্য উভয়ের ভিতর শুধু মনিব এবং কর্ম্মচারীর সম্পর্কই নয়, বন্ধুত্বও আছে। শিবশঙ্করের স্ত্রী বহুকাল পূর্ব্বে একটি-মাত্র ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছেন, তিনি আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করেন নাই। ছেলেটিকে নিজেই মানুষ করিয়াছেন। দেবকুমার বছর-দুই হইল বিলাতে পড়িতে চলিয়া গিয়াছে।

বাহিরে গাড়ী থামার শব্দ হইল। জুতার শব্দে নিরঞ্জন বুঝিলেন, শিবশঙ্করই আসিতেছেন। তাঁহার মোটরচালকের জুতার এত ঘটা নাই।

শিবশঙ্কর মস্ত মোটা এক ওভারকোট পরিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "বেশ সময় ডেকে পাঠিয়েছেন যাহোক, ব্যাপারখানা কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ব্যাপার সুবিধের কিছুই নয়। বসুন, বলছি। চা খান এক পেয়ালা।"

শিবশঙ্কর একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "তা আপত্তি নেই, যা বর্ষার দিন।"

নিরঞ্জন ছোকরাকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিয়া দিলেন। তাহার পর মায়ার চিঠিখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "এতকাল পরে মায়ার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম, তাও চমৎকার সুখবর! তার মায়ের ভয়ানক অসুখ, কিছুতেই সারছে না। আমাকে অনেক করে যাবার জন্যে লিখেছে।"

শিবশঙ্কর গলাটা সশব্দে পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "সুখবরই বটে! তা যাবেন যে, এদিকের কি হবে?"

ছোকরা আসিয়া চা দিয়া গেল। চায়ের পেয়ালা অভ্যাগতের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে দিতে নিরঞ্জন বলিলেন, "সেই পরামর্শ করতেই ত আপনাকে ডাকা। আমার যাওয়া কি একেবারে চলে না? দিন-কয়েকের জন্যে? না যাওয়াটা বড় অন্যায় হবে। বাড়ীতে লোকের মধ্যে তিনটি মেয়েমানুষ, তার ভিতর একজন এরকম পীড়িত। মেয়েটাও বড় হয়ে যাচ্ছে, এর পর তার এডুকেশন আরম্ভ না করলেই নয়। আমার যাওয়াটা খুবই দরকার।"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "যাবেন না এ কথা ত আর বলতে পারি না! কিন্তু এদিককার অবস্থা সবই ত জানেন! আপনি একদিন না থাকলেই সব উলট-পালট! গেলে আপনার কত দেরি হবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ঠিক করে বলি কি করে? সেখানে গিয়ে অবস্থা যেমন দেখ্‌ব সেই অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। একমাস অন্ততঃ ধরে রাখুন।"

শিবশঙ্করবাবু বলিলেন, "অসম্ভব! মরেপিটে দু 'উইক' চালাতে পারি, তার বেশী নয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "যেতে আসতেই ত তার দশটা দিন কেটে যাবে। চারপাঁচ দিনে কি আমার ওখানকার কাজ সেরে আসতে পারব?"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "তা যাওয়া কি আপনি একেবারে ঠিক করে ফেলেছেন? ছেলেমানুষ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে লিখেছে, সত্যি অবস্থা খুব বেশী খারাপ নাও হতে পারে। টেলিগ্রাম করে দেখুন, তারপর যা হয় স্থির করা যাবে। না গেলে না যদি চলে ত যেতেই হবে, মানুষের প্রাণের চেয়ে কি আর কিছু বড়?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, তাই করে দেখি। আপনিই নিয়ে যান টেলিগ্রামটা। আর ভাল কথা, কাল সকালে মনে করে শ'চার টাকাও T. M. Oতে পাঠিয়ে দেব। অসুখ-বিসুখের বাড়ী, টানাটানি পড়ে গেছে বোধ হয়।"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "তাই দেবেন। আচ্ছা, formটা

লিখে দিন। যা মেঘের ঘটা, এর পর যাওয়া মুস্কিল হবে। এদিককার পথে সন্ধ্যের পর মোটরে যেতেও গা ছম্‌ছম্‌ করে।"

টেলিগ্রাম লিখাইয়া লইয়া শিবশঙ্কর প্রস্থান করিলেন। নিরঞ্জনও অফিস-ঘর ত্যাগ করিয়া উপরে চলিলেন। পোষাক ছাড়িয়া, ড্রেসিং গাউন আর চটি জুতা পরিয়া খানিক বাগানে ঘুরিয়া আসিলেন। বাগানটি তাঁহার বড় সখের জিনিষ। প্রায়ই নূতন নূতন চারা কিনিয়া আনিতেন, এবং তাহাদের কোন্‌টি কেমন বাড়িতেছে রোজ তাহা একবার করিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতেন। একটি উড়িয়া মালী ছিল বটে তবে বাগানে তাহার কৃতিত্ব বিশেষ কিছুই ছিল না।

(১০)

সমস্ত দিন অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া, সন্ধ্যার একটু আগে সাবিত্রী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মায়া এতক্ষণ তাহার কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছিল, কখনও বা বাতাস করিতেছিল। এখন মাকে ঘুমাইতে দেখিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ব্যথা করিতেছিল, শরীরও বড় ক্লান্ত, কিন্তু মন যেন তাহার চেয়েও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পাখাখানা আস্তে আস্তে মায়ের পাশে নামাইয়া রাখিয়া সে পিসীমার সন্ধানে চলিল। ইন্দু তখন ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া সাবিত্রীর জন্য ফলের রস করিতেছিল। তাহার মুখ বড় বিষণ্ণ। সাবিত্রীর সারিবার সম্ভাবনা যে খুবই কম, ডাক্তার আজ তাহাকে সে কথা বলিয়া গিয়াছে। ইন্দু কোথাও যেন কূলকিনারা দেখিতেছিল না। চার চারটা ভাই, তাহার ভিতর একটাও কি বাড়ীতে থাকিতে নাই? এই সব কাজ কি তাহার করিবার? নিরঞ্জনের কি একবার আসা উচিত নয়? ঝগড়াই না হয় হইয়াছে, পাঁচ ছয় বৎসর মুখ দেখাদেখি নাই, তাই বলিয়া কি মরার সময়েও দেখিবে না? মায়ার চিঠি এতদিন নিশ্চয়ই পাইয়াছে, জবাবও ত কিছু দিল না।

মায়া এমন সময় দরজার কাছ হইতে ডাক দিল, "পিসীমা।"

ইন্দু মুখ তুলিয়া চাহিল। মায়া বলিল, "মা একটু ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই বাইরে এলাম। আমায় কিছু খেতে দেবে? বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

ইন্দু বলিল, "কপাল আমার! সেই দুপুরে দুগ্রাস খেয়েছিস, এখন অবধি আমার মনেই হয়নি। বোস্‌ পিঁড়িটা টেনে, যা আছে নিয়ে আসি।"

মায়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিল। ইন্দু তাড়াতাড়ি ঘরে তৈয়ারী মুড়কী, ঘন দুধ, দুইটা আম এবং বড় একটা ক্ষীরের ছাঁচ লইয়া আসিল। মায়া বলিল, "না পিসীমা, এতগুলো খেতে পারব না।"

ইন্দু তাড়া দিয়া বলিল, "নে, নে, ন্যাকামী রাখ্‌। এর পর রাত্রে কখন ছাড়া পাবি তার ঠিকানা আছে কিছু? তোদের বয়সে আমরা এর তিন গুণ খেয়েছি।"

অন্য সময় হইলে মায়া তর্ক করিতে বসিত। এখন কিন্তু তাহার মন এতই ভার হইয়াছিল যে কথা কাটাকাটি করিতে ইচ্ছাই হইল না, নীরবে খাইতে লাগিল। ইন্দু আবার কমলালেবু লইয়া রস করিতে বসিল। পাড়াগাঁয়ে সবসময় সব ফল পাওয়াও যায় না, তাই সপ্তাহে দুতিন বার করিয়া কলিকাতা হইতে ফল আসে।

বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "কই গো, ঘরে কে আছ?"

মায়া তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলিয়া উঠিতে যাইতেছে দেখিয়া, ইন্দু বলিল, "বোস্‌ বোস্‌, আমি দেখ্‌ছি কে। দু-গ্রাস মুখে না তুলতেই দৌড়ে চলল মেয়ে।"

ইন্দু উঠিয়া গেল। বাহির হইয়া দেখিল, প্রভাসের মা দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ওমা, অমন করে বাইরে দাঁড়াবার কি দরকার? ঘরে ঢুকে এলেই পারতেন। আপনি ত আর নূতন মানুষ নয়!"

প্রভাসের মা বলিলেন, "অসুখ-বিসুখের ঘর, অমন হট্‌ করে ঢোকা যায় কি? কখন কেমন থাকে। আজ বৌএর জ্বর কেমন? কিছু কমেছে?"

ইন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর কমছে! বৌ বোধ হয় আমাদের ফাঁকি দিয়ে চল্‌ল এবার।"

প্রভাসের মা ভাঁৎকাইয়া উঠিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা! এই কি যাবার বয়স? ভাল করে ডাক্তার দেখাও! কলকাতায় নিয়ে যাও না? সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছে।"

ইন্দু বলিল, "আয়ু ফুরলে, ডাক্তারে কি করতে পারে? তবু আমাদের দেখান উচিত। কিন্তু বৌএর জেদ ত জানেন। সে মরবে তবু জেদ ছাড়বে না। এখান ছেড়ে সে নড়বে না, ছিষ্টি উলটোলেও না।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "তা ভাইকে আস্‌তে লেখ না? এসব কি আর তোমার কাজ? সে এলে দেখে-শুনে ব্যবস্থা করবে।"

ইন্দু বলিল, "চিঠি ত লিখেছি, এখন এলে হয়। আমার আর কিছু ভাল লাগে না, দিদি। কাঁহাতক এই রোগী আগলে পড়ে থাকা যায় বলুন ত। যার ভাবনা, তারা ভাবুক এসে। নিজের সংসার ত চুকেই গেছে, এখন আমার হরিনাম করে দিন কাটানোর কথা।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "সে ত ঠিক কথা। তা বৌকে দেখে যাই একবার, এলামই যখন।"

ইন্দু বলিল, "এই অল্প আগে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে এসে বসুন, ওর ঘুম ত? আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছুটে যাবে। তারপর দেখে যাবেন এখন।"

প্রভাসের মা ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘরে গিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"

ইন্দু বলিল "একটু জল খেতে বসেছে। সারাদিন ত বেচারীর বিশ্রাম নেই, মায়ের সেবা নিয়েই আছে। এখন মা ঘুমিয়েছে বলে একটু বেরিয়েছে।"

অভ্যাগতা বলিলেন, "সত্যি, ভারি লক্ষ্মীমেয়ে। কার অদৃষ্টে নাচ্‌ছে কে জানে?"

এমন সময় সাবিত্রীর তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইহারই মধ্যে সে জাগিয়া উঠিয়াছে। মায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে, "মরেছিস্ নাকি ছুঁড়ী? ডেকে ডেকে গলা ধরে গেল কারো সাড়াশব্দ নেই।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, এই হয়ে গেল ঘুম? মেয়েটা সবে দুটো মুখে দিতে বসেছিল। নিজের মুখে বল্‌তে নেই, নিজেরই ভাইঝি, কিন্তু এমন লক্ষ্মীমেয়ে সত্যি হয় না। মায়ের সেবা যা করে করছে তা ত চোখে দেখছি। তাই কি ছাই দুটো ভাল কথা আছে মায়ের মুখে? শুনলেন ত ডাকের ছিরি?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "যেতে দাও ভাই। রুগ্ন মানুষের গালমন্দ কিছু ধরতে নেই। চল, বৌকে একটু দেখে যাই।"

ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবিত্রীর ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মায়া ডাক শুনিয়াই খাওয়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে বাতাস করিতে বসিয়াছিল। তাহার বকুনি খাওয়াটা তখনও শেষ হয় নাই।

প্রভাসের মাকে দেখিয়া সাবিত্রী হঠাৎ থামিয়া গেল। কিঞ্চিৎ নরম সুরে মেয়েকে বলিল, "ডেকেছি বলে কি খাওয়া ফেলে আস্‌তে বলেছি? যা দুধটা খেয়ে আয়। আমি অসুখে পড়ে মেয়ের যা চেহারা হয়েছে!"

মায়া দুধে জল ঢালিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মায়ের কথামত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ইন্দুকেও বিদায় করা সাবিত্রীর প্রয়োজন ছিল, কি ছুতা করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। একটু ভাবিয়া বলিল, "ফলের রস হয়েছে নাকি ঠাকুরঝি? একটু কিছু খেলে হয় এখন।"

ইন্দু বলিল, "প্রায় হয়েই আছে, অল্প একটু বাকি। আচ্ছা, দিদি বসুন, আমি ফলের রসটা নিয়ে আসি।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী প্রভাসের মায়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কর্ত্তার চিঠি পেয়েছেন?"

প্রভাসের মা অতি সংক্ষেপে বলিলেন, "হুঁ।"

সাবিত্রী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "রাজি হননি বুঝি?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "কই আর রাজী হলেন? লিখেছেন সম্বন্ধ ত খুবই ভাল, এমন আর আমার ছেলের

অদৃষ্টে জুটবে না। কিন্তু বাপের অজ্ঞাতে বিয়ে হবে। এতে কি করে রাজী হই? শেষে কি বুড়ো বয়সে পুলিস কেশে পড়ব?"

সাবিত্রী শুনিয়া একেবারে যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। প্রভাসের মা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ের পাত্রের অভাব কি বোন? আমার ছেলের চেয়ে ঢের ভাল ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তোমাদের অভাব কিসের? যেমন ছেলে চাইবে তেমনি পাবে।"

সাবিত্রী পাশ ফিরিয়া শুইল। ভাঙা গলায় বলিল, "আর সময় কই? ভেবেছিলাম মেয়ের একটা সুগতি করে যাব, কিন্তু আমারই ত মেয়ে, তার কপাল আর কত ভাল হবে? এর পর যা অদৃষ্টে আছে হবে।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তবে আসি বোন।" তাঁর সাবিত্রীর সম্মুখে বসিয়া থাকিতেই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল।

সাবিত্রী বলিল, "আচ্ছা আসুন। একটা দয়া করবেন, আমি বেঁচে থাক্‌তে আর আমায় দেখ্‌তে আসবেন না।"

ভদ্রমহিলার মুখখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সুস্থ অবস্থার কোনো মানুষ এরকম কথা বলিলে, তখনই একপালা হইয়া যাইত বোধ হয়, কিন্তু সাবিত্রীর তখন এমনই অবস্থা যে নিতান্ত পাগল না হইলে কেহ তাহার সহিত ঝগড়া করিতে পারে না। সুতরাং প্রভাসের মা হন্ হন্ করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সাবিত্রী দেওয়ালের গায়ে টাঙান একখানি কৃষ্ণের ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। খানিক পরে অস্ফুট-স্বরে বলিল, "তোমার হাতে দিয়ে গেলাম তুমিই ওর ধর্ম্ম রক্ষা কোরো।"

ইন্দু ফলের রস লইয়া ঘরে ঢুকিয়া অবাক হইয়া বলিল, "ওমা, দিদি এরি মধ্যে চলে গেলেন?"

সাবিত্রী উত্তর দিল না। ইন্দু শাদা পাথরের বাটি ভরিয়া ফলের রস আনিয়াছিল, রোগিনীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "ঘাড়টা একটু উঁচু কর, তা না হলে চুমুক দিতে পারবে না।"

সাবিত্রী বলিল, "একটু পরে খাব, এখন গা-টা কেমন যেন করছে।"

ইন্দু শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ডাক্তারের কাছে একবার লোক পাঠাব?"

সাবিত্রী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "পরমায়ু ফুরোলে ডাক্তারে কি করবে?"

ইন্দু ভয় চাপা দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "পরমায়ু ফুরিয়েছে তোমায় কে খবর দিল? শুধু একটু জ্বরেই পরমায়ু ফুরিয়ে গেল? অনেকদিন ভুগ্‌ছ কিনা, তাই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ।"

সাবিত্রী কথার উত্তর দিল না। ফলের রস ঢাকিয়া রাখিয়া ইন্দু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভৃত্য গদাধর তখন কাজের অভাবে, গরুর খড় কাটিতে বসিয়া গিয়াছিল। ইন্দু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে, একবার পঞ্চানন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

ভৃত্য খড় রাখিয়া উঠিয়া গেল। মায়া বারান্দার এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। সে পিসীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পিসীমা, ডাক্তারকে এখনি ডাকতে পাঠাচ্ছ কেন? মায়ের জ্বর আবার বাড়ল নাকি?"

ইন্দু বলিল, "জ্বর ত দেখিনি। তবে শরীর কেমন্ করছে বল্‌ল, তাই ভাবলাম ডাক্তার একটু দেখে যাক্। তুই যা না ঘরে। একটু বাতাস কর গে যা।"

মায়া তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরে ছুটিয়া গেল। ইন্দু ভাঁড়ার ঘরে গিয়া কাজে মন দিল।

মিনিট-কয়েক পরে মায়া ছুটিয়া আবার বাহির হইয়া আসিল। ইন্দুর কাছে আসিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল, "পিসীমা, মায়ের জ্বর ভয়ানক বেড়ে গেছে, কিসব বল্‌ছে বুঝতে পারছি না। ডাক্তারবাবু এখনও এলেন না?

তুমি এস আমার সঙ্গে। একলা মায়ের কাছে আমার বসতে ভয় করছে।"

ইন্দু বঁটি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সাবিত্রীর কাছে আসিয়া দেখিল মায়ার কথা ঠিকই। তাহার চোখ-মুখ লাল, অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করিতেছে, অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলিতেছে। ভয়ে ইন্দুর প্রাণ উড়িয়া গেল। মায়াকে বলিল, "ছুটে যা ঘোষাল-কাকার বাড়ী, যাকে পাস্, ডেকে নিয়ে আয়।"

মায়া দৌড়িয়া গেল। সাবিত্রীর পাশে দাঁড়াইয়া ইন্দু চোখের জল মুছিতে লাগিল। বৌ তাহা হইলে সত্যই চলিল। কত আশা আনন্দ লইয়া বালিকাবয়সে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, কি রিক্ততা, কি দুঃখের ভিতর দিয়া অকালেই তাহার জীবননাট্য সাঙ্গ হইয়া গেল। দোষ তাহারই হয়ত, কিন্তু শাস্তিও সেই বহন করিয়াছে। কোনোদিন ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নাই। নিজে যাহা ভাল বুঝিয়াছিল, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। ভ্রাতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা অভিযোগ মাথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সাময়িক কলহকে সে জীবনব্যাপী করিয়া রাখিল? ঝগড়া-ঝাঁটি কোন্ স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে না হয়? কিন্তু তাহারা আবার মিটমাটও করে, একসঙ্গে বাসও করে। নিরঞ্জনের সবই অনাসৃষ্টি। স্ত্রী মরিবার সময়ও সে একবার আসিতে পারিল না।

এমন সময় গদাধরের সঙ্গে ডাক্তার এবং মায়ার সঙ্গে ঘোষাল আসিয়া পৌঁছিলেন। রোগিনীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। বলিলেন, "ওষুধ গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ভরসা বিশেষ দিতে পারি না। ওঁর স্বামীর কাছে টেলিগ্রাম করুন।"

মায়া কাঁদিয়া উঠিল। ইন্দু তাহাকে তাড়াতাড়ি টানিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আসিল। ঘোষালকে বলিল, "আমি টাকা দিচ্ছি, আপনি টেলিগ্রামটা করে দিন।"

গদাধরকে আত্মীয়-স্বজন সকলকে খবর দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

না ফুরাতে

শ্রীলজ্জাবতী বসু

না ফুরাতে দিবার স্বপন
সন্ধ্যার মলিন হাসি জ্বলে,
না ফুরাতে আঁধারের কথা
রজনী কাঁদিয়া যায় চলে।
না ফুরাতে শবদের প্রাণ
প্রতিধ্বনি বিলাপয়ে দূরে,
না ফুরাতে কালের চুম্বন
মুহূর্ত্ত শিশুটি যায় মরে।

না ফুরাতে উৎসবের ক্ষণ
সমাপ্তিটি ঘনাইয়া আসে;
বাজে যেথা আনন্দ বাঁশরী
ক্ষণেতে বিষাদ তথা পশে।
যৌবনটি না ফুরাতে জাগে
বার্দ্ধক্যের জীর্ণ আয়োজন,
আঁখি হতে ঘুম না টুটিতে
স্বপন ছায়ায় সমাপন।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৈলাসের পথে—রাবণ হ্রদ, তারচেন

কেদারনাথ হইতে ফিরিয়া আমরা তাকলাখার মণ্ডির অবস্থা আর একরকম দেখিলাম। এই দুই তিন দিনের মধ্যে অনেক মহাজন আসিয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। খরিদ্দারের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। আমরা তিনজন বরাবরই কিষণ সিংএর ওখানেই বাস করিতেছি। কিন্তু এখন ক্রমশঃ খরিদ্দারের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং অনেক লোকের যাতায়াত আরম্ভ হওয়াতে সকল সময় ওখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। একে তাহার ঘরখানির চারিদিকে বিস্তর মাল সাজানো, ফাঁকা জায়গাটুকুর একপাশে রান্নার জায়গা, মধ্যের স্থানটুকুতে মহাজনের গদি একদিকে, বাকিটুকুতে অনবরত খরিদ্দারের আসা-বসা চলিতেছে, তাহার উপর আমরা তিনজন যদি সর্ব্বক্ষণ কতকটা জায়গা দখল করিয়া থাকি তাহা হইলে বড়ই অন্যায় হয়। সেই কারণেই আমরা দুইবার আহার ও রাত্রে শয়ন ব্যতীত প্রায় সকল সময় বাহিরেই কাটাইতাম।

রুমার দৌলত সিং নামে একটি ভাগিনেয়, এখানে তাহারও একখানি দোকান আছে, রুমা সেইখানেই থাকে। নাথজী এবং আমি প্রত্যহ দৌলতের দোকানেই বসিতাম। আমার যাহা কিছু লেখাপড়া আঁকা-জোঁকা সকল কর্ম্মই সেখানে হইত। আসকোটের লালগীরও কখন কখনও ওখানে জুটিত, সঙ্গী-মহাশয়ও মাঝে মাঝে দর্শন দিতেন তবে অল্পক্ষণের জন্য। তিনি কোথাও বেশীক্ষণ বসিতে পারিতেন না। অন্তরে তাঁহার একটা অশান্তি নিরন্তর ছিল। শীঘ্র শীঘ্র এই কঠিন তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া কত দিনে দেশে ফিরিবেন এখন হইতে ইহাই তাঁহার চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ। তাঁহার ইচ্ছা যত শীঘ্র হয় কৈলাসের দিকে যাত্রা করা, কিন্তু এ পোড়া দেশে ইচ্ছা-মাত্রেই কিছু হইবার জো ছিল না। এক একটি যাত্রা সফল করিতে অনেক যোগাযোগ অপেক্ষা করে। অনেকের অনেক সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শুধু পয়সা থাকিলেই হয় না। এখানে এ-অবস্থায় কাহারও উপর আধিপত্যও চলে না, কাজেই চির-অভ্যস্ত আচরণের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম প্রতি পদে ঘটায়, বিশেষতঃ এই বয়সে নিরন্তর আরামের ব্যাঘাত ঘটাতেও তাঁহার অশান্তি সময় সময় অসহ্য রকম হইত। সেই হেতু এই আনন্দের তীর্থযাত্রার মধ্যে আমাদেরও অনেক সময় নিরানন্দ ভোগ করিতে হইত।

কেদারনাথ হইতে ফিরিয়া আমরা তিন দিন পরে তবে কৈলাসের দিকে যাত্রা করি। এই তিন দিনে আমরা এখানকার আরও অনেক দেখিতে শুনিতে পাইয়াছিলাম।

এখানে যতগুলি দোকান দেখিলাম, লালসিং পাতিয়ালের দোকানই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তাহার তিনখানি বড় বড় ঘর, লোকজনও বিস্তর। তাহার দোকানেই খরিদ্দার বেশী, এখানকার সকলেই তাহাকে বেশী মান্যগণ্য করে। আমদানী ও রপ্তানী এই দুই কাজ ইতাহার সকল মহাজন অপেক্ষা বেশী। কাজেই তাহার সহায়তা লাভ 'আমাদের সৌভাগ্যের যোগেই ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে।

এই ব্রিটিশ-ভারতীয় ভোটিয়া মহাজনেরা প্রায় সকলেই প্রতিবৎসর অন্যান্য মালের সঙ্গে এক আধমণ

ছোয়ারা বা বড় বড় শুষ্ক খেজুর লইয়া আসে। খরিদ্দার আসিলে একটি থালাতে দুই চার গণ্ডা তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। এইরূপেই ইহারা এখানকার বিশিষ্ট ক্রেতাগণকে খাতির করে। সেই ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস খরিদ্দার কথা কহিতে কহিতে আগ্রহের সহিত উহা অল্পক্ষণেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে। যেখানে বসিয়া খায়, বীচিগুলি তাহার চারিপার্শ্বেই ছড়াইয়া অপরিষ্কার করে। উহারা

ভদ্রমহিলা

ইহাকে "খস্থুর" বলে এবং অত্যন্ত ভালবাসে। এইরূপে এখানকার হনুমান হনুমতী খরিদ্দারগণ এই "খস্থুর" নামক অপূর্ব্ব বস্তুটির খাতিরে প্রায় সকল দোকানেই এক একবার পদার্পণ করিয়া যায়।

এ-অঞ্চলের তিব্বতে খুব পরিষ্কার উল বা পশম, ছাগল ও ভেড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। সে ছাগল ও ভেড়া দেখিতে আমাদের দেশের ছাগল ও ভেড়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ছাগলের গায়ে এত লোম হয় যেন মাটিতে লুটিয়া পড়ে, দেখিতে অদ্ভুত। হুনিয়ারা তাহা হইতে নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র প্রস্তুত করে। এখানে সাধারণভাবে পশমের ব্যবহার এত বেশী যে, ঘোড়া, গরু (চমরী) খাব্বু প্রভৃতি বাঁধিবার দড়ি লাগাম এ-সকলই ঐ পশমের। কোনও পশুর লোম ইহারা বৃথা নষ্ট করে না, কোনো-না-কোনো কাজে লাগাইয়া দেয়। এতটা পশমের ব্যবহার আর কোথাও দেখি নাই। অতিরিক্ত পশম ব্যবহারের ফলে বোধ হয় প্রতিক্রিয়ার বশেই ইহারা ভিন্ন দেশীয় সূতা ও রেশমের বস্ত্র সকল ব্যবহার করিতে বড়ই ভালবাসে এবং অনেক টাকা দিয়া খরিদ করে। বিদেশী রেশম বা তূলার বস্ত্র, নানা-প্রকারের শাটিন, মখমল প্রভৃতির ব্যবহার এদেশের উন্নতসমাজের চাল দাঁড়াইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারাও বিদেশী রেশম ও কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিয়া সৌখীনতার পরিচয় দেয়। শীতের সময় ব্যাঘ্রচর্ম্মের জামা-ই (বিশেষতঃ চিতাবাঘের) এখানকার শ্রেষ্ঠ সৌখীনতার পরিচায়ক।

এ-অঞ্চলে আরও একটি মণ্ডি আছে। উহা এখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তীর্থপুরী বা টাটাপুরীর পথে পড়ে। তাহার নাম জ্ঞানমা মণ্ডি। সেখানেও প্রতি বৎসর অনেক টাকার কেনাবেচা হয়, আর সেখানেও এই ভারতবাসী ভোটিয়া মহাজনগণেরই কারবার। আসলেই দেখিতেছি এ-অঞ্চলে তিব্বতের সঙ্গে এই ভোটিয়াগণই ভারতের পক্ষ হইতে ব্যবসায়সূত্রে সম্বন্ধ বা সম্পর্ক রাখিতেছে। বিদ্যাহীন এই নিরক্ষর ভোটিয়ারা সেইজন্যই সমতলবাসী বাঙালীর তুলনায় অনেক শক্তিমান, অন্ততঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রে এবং একতায়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে যত পোড়া কপাল কি এই বাঙালীর হইতে হয়!

তিব্বতীদের সঙ্গে কারবার করিয়া এই ভোটিয়া মহাজনদের যে কেবলই লাভ হইতেছে তাহা নয়, অনেক লোকসানও সহ্য করিতে হইতেছে। এ-অঞ্চলের অনেক দূরদূরান্তরের অধিবাসিগণ এই মণ্ডিতে মাল সওদা করিতে আসে। দুই চারিবার নগদ লইয়া একটু বিশ্বাস জন্মিলে তাহার পর ধারে মাল লইয়া যায়। এ বৎসরের ধার পর বৎসরেই শোধ হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি বা লেখা-পড়া থাকে। কিন্তু পর বৎসর আর তাহার দেখা পাওয়া যায় না। যাহাদের বাড়ীঘর জানা থাকে তাহারা তাগাদা দিলে বলে, টাকা নাই পরে দিব। এইরূপে এখানকার প্রত্যেক ভোটিয়া মহাজনের প্রায় তিন চারি শত টাকা

প্রতি বৎসর বাকি পড়ে। পরিচিত অপরিচিত যাহার দোকানেই গিয়াছি সকলেরই মুখে এইরূপ শুনিয়াছি।

এখানকার মুদ্রা বিচিত্র। আমাদের ভারতীয় ইংরেজী টাকার হিসাবে সাড়ে চারি আনা মূল্যের, কিন্তু দেখিতে প্রায় আধুলির আকার। তবে এতটা সুগোল নয়। এখানে নেপালী, ইংরেজী, ভারতীয়, এবং তিব্বতী-সিক্কা এই তিনটি মুদ্রাই চলে। ভারতের মুদ্রা টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি ইহাদের অতি প্রিয়, গাঁথিয়া গহনায় পরে। ভারতের মুদ্রা পাইলে আর সহজে বাহির করে না। নেপালী মুদ্রা আমাদের টাকার হিসাবে সাড়ে সাত আনার সমান। তাহার মধ্যে অনেকটা রৌপ্যের অংশ থাকে, খাদ খুবই কম। কিন্তু তিব্বতী মুদ্রায় দস্তার খাদ প্রায় চারি ভাগের আড়াই ভাগ। এখানকার খরিদ্দারেরা নেপালী ও তিব্বতী মুদ্রায় মাল খরিদ করে, ভারতীয় টাকা বড়-একটা বাহির করে না, কিন্তু যখন তাহারা পশম প্রভৃতি নিজেদের মাল বিক্রয় করে তখন ভারতীয় টাকা চায়। এইরূপে তাহারা ভারতীয় টাকা সংগ্রহ করে।

এখানকার লোকের চক্ষু শীঘ্রই নষ্ট হয়, তাহার কারণ শীতের প্রাবল্য। এখানে নিরন্তর ঝড়ের মত অতিশয় শীতল বাতাস চলে। সেই প্রবল বাতাস চক্ষে লাগিলেই চক্ষু অসুস্থ হইয়া উঠে। তাহার উপর এইস্থানে দৃশ্যের মধ্যে হরিদ্বর্ণের আভাস মোটেই নাই, কেবল শুষ্ক এবং তৃণলতা বৃক্ষহীন নগ্ন পর্ব্বত, তাহার উপর তুষারের ধবলতা। কোথাও লাল গৈরিক পর্ব্বত, কোথাও রুক্ষ ধূসরবর্ণের উচ্চভূমি, আবার তাহার উপরে পশ্চাতে তুষারমণ্ডিত ধবল গিরিশৃঙ্গ চক্ষে পড়ে। আকাশের নীলবর্ণটি না থাকিলে এখানে লোক অন্ধ হইয়া যাইত। ক্রমাগত রুক্ষ দৃশ্যের আধিক্যে মধ্যে মধ্যে আমাদেরও শিরঃপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছে। গাছপালা এত কম দেখিয়াছি যাহা গণনাতেই আসে না। এখানকার এই শীতল বাতাসে চক্ষু ফুলিয়া উঠে, জল পড়ে, বেদনা হয়। তাহার জন্য স্ত্রীলোকেরা চক্ষুর উপরে ও গালে একপ্রকার রক্তবর্ণ নির্য্যাস ব্যবহার করে, তাহাতে অনেকটা উপকার হয়। একে এখানকার রূপসীগণের যে সুন্দর রূপ, তাহার উপর সেই নির্য্যাসলিপ্ত মূর্ত্তি দেখিলে স্নায়ুমণ্ডলী সহজেই নিস্তেজ হইয়া আতঙ্ক উপস্থিত করে।

এইবার কৈলাসযাত্রার কথা বলি। কৈলাস ও

গ্রাম্য কুমারী

মানস-সরোবর যাইবার যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বাহনাদি এখানেই পাওয়া যায়। লালসিং পাতিয়াল এবং রমা আমাদের জানাইল, "কাল আপনারা যাত্রা করিতে পারিবেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা একলাই যাইব নাকি?" লালসিং বলিল, "তাহা কেন, আমাদের দলটি কাল এখান হইতে বেলা দশটা নাগাদ যাত্রা করিবে। আপনাদের ঝাব্বু ও ঘোড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, পথে যাহাতে আপনারা আরামেই যাইতে পারেন আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন।"

এখান হইতে ও-অঞ্চলে যাইতে ঘোড়া অথবা ঝাব্বুই প্রশস্ত। এক-একটি বাহন যাতায়াতের মূল্য বা ভাড়া প্রায় চারি টাকা। সঙ্গী-মহাশয়ের জন্য ঝাব্বু একটি এবং আমাদের উভয়ের মাল লইবার জন্য একটি, এই দুইটি পশু লওয়া হইল। আমি ও নাথজী হাঁটিয়া যাইব। রসদের মধ্যে আমাদের তিনজনের জন্য দশ পনের দিনের

মত রসদ লওয়া হইল। এখানে আটা টাকায় তিন সের হিসাবে, মোটা চাউলও তাই, বলা বাহুল্য উহা ভারতেরই আমদানী। আমাদের রসদের মধ্যে রুমা ও ধনিরাম নামক এক মহাজনের দানও কিছু ছিল। রুমা নিজেও ডাল, শুষ্ক মূলা, মেওয়া, ফল, আচার প্রভৃতি অনেক কিছু

অবিবাহিত গ্রাম্য যুবক

গারবেয়াং হইতে আনিয়াছিল। আনন্দে আমরা যাত্রার যোগাড় করিয়া লইলাম, আসলে লালসিংএর লোকের সাহায্যই বেশী লওয়া হইল। এবার আমরা কৈলাস ও মানস-সরোবর প্রত্যক্ষ করিতে যাইতেছি ভাবিয়া বাল্যকালে যেরূপ হইত, সেইরূপ আনন্দে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমাদের দলটি কম হইল না। পাতিয়ালের জননী, রুমা, রুমার জ্যেষ্ঠাভগিনী এবং সঙ্গী-মহাশয়—দলের এই কয়জন ঝাব্বুতে যাইবেন, বাকি সকলেই হাটিয়া যাইবেন। মান সিং এবং মণি সিং নামক পাতিয়ালের দুইজন আত্মীয় আমাদের অভিভাবক হইয়া চলিলেন। অবশ্য তাঁহাদেরও পরিবারবর্গ সঙ্গে। তিনটি তাঁবু, তিনটি দুনলা বন্দুক সঙ্গে চলিল এবং আর আর দ্রব্যাদি লইয়া আরও দুই তিনটি পশু, মোট ছয় সাতটি ঝাব্বু চলিল। এই দলে চারিজন কুমায়ুনী সাধু, তিনজন সন্ন্যাসিনী মাইজী, লালগীর রহিলেন। সকলে মিলিয়া স্ত্রী-পুরুষে কুড়ি-বাইশজন তীর্থযাত্রীর একটি দল কৈলাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সঙ্গে আমাদের টাকাকড়ি যাহা কিছু ছিল সকলই লালসিং পাতিয়ালের নিকট রাখিয়া যাওয়া হইল; যেহেতু পথে দস্যুভয় আছে, আর পথে দানকর্ম ছাড়া পয়সার আর কোন প্রয়োজন নাই। শুধু সেই মত আমরা কিছু কিছু সঙ্গে লইলাম।

এখানে একটি প্রবাদ আছে "পুরী পয়সা, সরোবর সত্তু," অর্থাৎ পুরী বা পুরুষোত্তম যাইতে হইলে পয়সাই প্রধান সম্বল, আর মানস-সরোবর যাইতে প্রধান সম্বল হইল ছাতু। এখানে পয়সার বড় দরকার নাই। এদিকে যাঁরা ভ্রমণে আসেন তাঁরা আমিষাশী হইলেই সুবিধা। এদিকের প্রচণ্ড শীত ও রুক্ষ জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খায়, শরীরও ভাল থাকে। আমরা নিরামিষাশী ছিলাম বলিয়াই বেশী ভুগিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক সকল আয়োজন শেষ হইলে পরদিন দ্বিতীয় প্রহরের প্রারম্ভেই আমরা বাহির হইলাম। তাকলাখার হইতে যাত্রার সময় সঙ্গী-মহাশয় একথা বলিতে ভুলিয়া যান নাই যে, "এই যাত্রাই আমাদের ঠিক কৈলাসযাত্রা।" এ যাত্রার সম্বন্ধে বড়-কিছু বলিবার নাই, কারণ কোনরূপ বাধা বা কষ্টদায়ক বন্ধুরতা এ পথে নাই। পথ সরল, মরুভূমির মত বিস্তৃত, বিজন এবং অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া একেবারেই সোজা চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকেই শুভ্র তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতমালা দূরে দূরে দৃষ্টির মধ্যে আসে।

কর্ণালীর উপত্যকা ছাড়াইয়া দীলারীং নামক একখানি গ্রামের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছিলাম। পরিশ্রমী গ্রামবাসিগণ কৃষিকর্ম্মের এবং নিজ নিজ গৃহকর্ম্মের সুবিধার জন্য দূর নদী হইতে খাল কাটিয়া জলধারা আনিয়াছে। এখানে সর্ব্বত্রই এই প্রকারে নদী কিংবা পর্ব্বতের ঝরণা হইতে খাল কাটিয়া গ্রামের এবং শস্য-ক্ষেত্রের জন্য জল আনার ব্যবস্থা আছে। আকাশের জলে এখানকার চাষবাসের ভরসা নাই, কাজেই এই সনাতন উপায়ের উদ্ভাবনা। বহুকাল হইতেই ইহা কার্য্যকরী। জলের কাছে কোথাও কোথাও অল্প অল্প

রাবণহ্রদ ও কৈলাসশিখর

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঘাসের মত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বর্ণ হরিৎ নয়, দগ্ধ হরিৎ বলিলেই ঠিক হয়। সে তৃণ কোমল নহে, কাঁটার মত শক্ত এবং রুক্ষ। এখানকার পশুগণ ইহা খাইয়াই প্রাণধারণ করে। আমাদের সঙ্গে যে-সকল ঝাব্বু ছিল, জলধারা পার হইবার সময় পৃষ্ঠে নরনারী বাহন লইয়া সেই তৃণের লোভে তাহারা মুখ বাড়াইয়া এক এক গ্রাস আহরণের চেষ্টা করিতেছিল। সঙ্গী-মহাশয় সেই ভোটিয়া নারীগণের সঙ্গে একত্র ঝাব্বুতে যাইতেছিলেন। তাঁহার বাহনটি চলিতে চলিতে একটু ফিরিয়া যেমন একটু বেশী নীচু দিকে মুখ বাড়াইয়া সেই কণ্টকতৃণ এক গ্রাস লইতে যাইবে, অমনি বে-তালে পড়িয়া ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া সঙ্গী-মহাশয় পশুপৃষ্ঠে বদ্ধ আসনের সহিত একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন। মেয়েরা ইহা দেখিয়া একেবারেই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। লাগিয়াছে কিনা দেখিতে গেলাম, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া 'লাগে নাই' বলিয়া জামা ঝাড়িয়া লইলেন। ততক্ষণে পশুরক্ষক আসিয়া আবার আসন (জীন) ঠিক করিয়া তাঁহাকে চড়াইয়া দিল। তিনি রেকাবে পা দিয়া চড়িতে পারেন না। একটু উঁচু স্থানে উঠিয়া কেহ সাহায্য করিলে বাহনে চড়িতেন।

আজ আমরা প্রায় আট মাইল পথ যাইয়া সাংচান নামক স্থানে একটি জলধারার নিকটে আড্ডা করিলাম। তিনটি তাঁবু গাড়া হইল, দুইটি একসঙ্গে, অপরটি পৃথক। বাহন হইতে নামিয়াই স্ত্রীলোকেরা যে যাহার থলি খুলিয়া মুড়ি, ছোলা, গমভাজা, খেজুর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি চিবাইতে আরম্ভ করিল। একটি পাত্রে রুমা আমাদেরও কিছু কিছু দিয়া গেল। সাধু সন্ত, মাইজী প্রভৃতি আরও যারা ছিল তাহাদেরও কিছু কিছু দেওয়া হইল। তাঁবু খাটানো শেষ হইলে নাথজী 'রোটী' পাকাইল। নাথজীর শরীর খারাপ ছিল, নিজে কিছু না খাইলেও আমাদের জন্য পাকাইল। আর কাহাকেও করিতে দিল না। তাহার ভিতরের কথা এই বুঝিলাম যে, আমরা তাহার আহারাদির ভার লওয়ায় সেই উপকারের জন্য বাধ্যতা বোধই ইহার কারণ। তাহার দ্বারা যেটুকু হয় সেইটুকু কায়িক উপকার না করিলে ঋণী থাকিতে হইবে, কেন সে সামর্থ্য থাকিতে কাহারও নিকট বাধ্য বা ঋণী থাকিতে যাইবে। নাথজী অতিশয় স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিল।

যাহা হউক 'রোটী' পাকানো হইলে রুমা আমাদের আর কি চাই না চাই দেখিতে আসিল। রুমা সরু বা

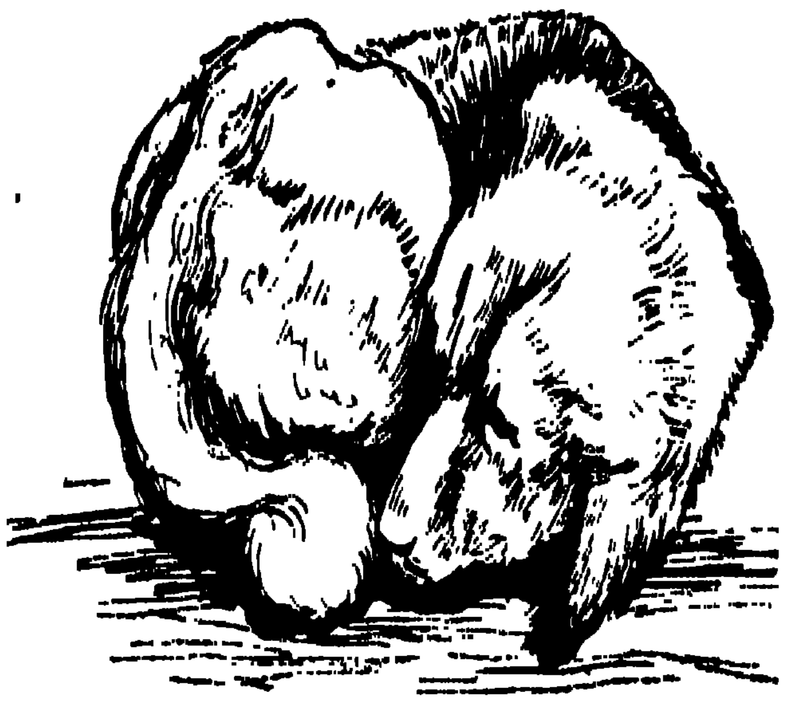

গ্রাম্য চৌকীদার

পাতলা রুটি পাকাইতেই অভ্যস্ত—রুটি পুরু হইয়াছে দেখিয়া সে বলিল বেশ রুটি হইয়াছে, "বঢ়িয়া রোটী পকায়ী নাথজী।" তারপর হাসিমুখে বলিল,—"নাথজী কী রোটী, কৈলাসযাত্রাকে লিয়ে, দো অঙ্গুল মোটী,"—শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলে সঙ্গী-মহাশয় প্রফুল্ল-মুখে হাসিতে হাসিতে তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দীতে বলিলেন, "বহুত আচ্ছা দেবীজী, আপকা এ কবিতা ভি হামারা কেতাবমে উঠ যায়েগা।" অর্থাৎ তিনি এই কৈলাস-ভ্রমণ সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিবেন তাহাতে ইহাও লিখিবেন।

যে পশুরক্ষক হুনিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল, পাকের জন্য কাঠকুটা কিংবা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করা, চুলা ধরানো, জল আনিয়া দেওয়া, এ সকল তারই কাজ। চুলা ধরানোর কাজে হাপরের ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত, একটা হাপর সকল যাত্রিদলের সঙ্গে থাকে। মোটের উপর আমাদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জামই ছিল। রাত্রে শীত খুব ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যে যার বস্ত্রাদি বিছাইয়া শয়নের জোগাড় করিয়া লইলাম। যে-সব সাধু সন্ত সঙ্গে ছিলেন, পাতিয়ালের দয়াবতী জননী তাঁহাদের সকলকেই তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "রাত্রে কাহাকেও ঠাণ্ডায় কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই।" তাঁহারা আমাদের আশেপাশে স্থান করিয়া লইলেন।

চারিজন সাধুর মধ্যে একজনের মুখ, হাতের আঙুল, কান, নাক, সকল ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয় কুষ্ঠব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ। সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন, সে বেচারা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

ছাগল

আমি তাহা দেখিয়া বলিলাম, "এই ঠাণ্ডায় কোথায় কষ্ট পাইবে, একপাশে পড়িয়া থাকিলে ক্ষতি কি? উহা ত সংক্রামক ব্যাধি নয়?" সঙ্গী মহাশয় অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তোমার ও-সব ফিলানথ্রপি এখন রেখে দাও, ও যদি তোমার এত প্রিয় হয় ত, না হয় আমিই বাহিরে যাইতেছি।" আরও অনেক কথা যাহা শ্লেষ করিয়া বলিলেন, সে সকল না লেখাই ভাল। আমি মনের মধ্যে কষ্ট পাইলাম, বলিলাম, "এরূপ অসঙ্গত কথা কেন বলিতেছেন। আমি আপৎকালের কথাই—common senseএর দিক দিয়াই বলিয়াছিলাম।" তিনি চুপ করিলেন। ভোটিয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন এই-সব দেখিয়া, বাহির হইতে সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া একধারে শুইতে বলিল।

তাকলাখারে ছিলাম ঘরের মধ্যে, এখানে একেবারে ফাঁকা মাঠের উপর তাঁবুর ভিতরে,—অবশ্য দূরে হইলেও চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা তাহার উপর হু হু শব্দে বাতাস চলিতেছে, শীতে অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপাইতেছে। রুমা আমাদের খুব পুরু এবং বড় একখানি ভোটিয়া কম্বল দিয়াছিল। তিনজন পাশাপাশি শুইয়া আমাদের যাহা কিছু আছে সব চাপাইয়া সর্ব্বোপরি সেইখানিতে আপাদমস্তক ঢাকা দিতাম। তাহাতে যে আমাদের কতটা উপকার হইত তাহা বলিবার নয়। কোনরূপে আমরা শীতে কষ্ট না পাই রুমার সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

প্রথম দিন আমরা এত ক্লান্ত ছিলাম যে শয়নমাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। এক ঘুমেই প্রভাত। অবিলম্বেই আমরা তল্পিতল্পা উঠাইয়া দল বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। বহুক্ষণ চলিয়া দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি আমরা আজ মান্ধাতার নিকটে আসিয়া পড়িলাম। কতকালের এই মান্ধাতা, ইহার তিব্বতী নাম "মিমো-নাম-নিমরী"। আমাদের দক্ষিণপার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধভাবে বরাবর সোজা উত্তর-পূর্ব্ব কোণের দিকে মানস-সরোবর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এখানে মান্ধাতা তপস্যা করিয়াছিলেন। কত যুগ যুগান্তরের কথা, এখন কেবল নামটিমাত্র রহিয়া গিয়াছে। তাঁবু খাটানো হইলে শীতল জলের সঙ্গে ছাতু ও চিনি মিশাইয়া, সেই দিনের আহার শেষ করিয়া একবার চারিদিক দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। বৃক্ষলতার নামগন্ধ নাই, সবুজ রংটি সেই কালাপানি পার হইবার পর আর চক্ষে পড়িয়াছে কিনা স্মরণ হয় না। তবুও দৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য বড়ই গম্ভীর এবং বিশাল ভাব উদ্দীপক। তাহা মনকে একাগ্র করিয়া তাহাতেই ডুবাইয়া দেয়।

এদিকে লোকালয় নাই, কেবল মাঝে মাঝে পথিক-দলেরই যাতায়াত। তাহাদের সঙ্গে যে-সকল পশু থাকে তাহারা ছাড়া পাইলে ইতস্ততঃ চরিয়া খায়। একপ্রকার কণ্টকলতা এবং তৃণ কোথাও পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মিয়াছে, দেখিলাম উহারা সন্ধান করিয়া তাহাই খাইতেছে। সেই বিজন প্রান্তরে একদল শকুন একটি উচ্চভূমির উপর সারি সারি বসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে। দাঁড়কাক দুই চারটি, ও কতকগুলি চড়ুই পাখী যাত্রিরা যে-সকল খাদ্যাংশ ফেলিয়া দিয়াছে তাহার মধ্য হইতে নিজেদের উপযোগী আহার সংগ্রহ করিতেছিল। এখানকার চড়ুই পাখী আকারে কিছু বড় এবং পিঙ্গলবর্ণ, তাহার মাঝে মাঝে কালোর রেখা বেশী গভীর। নিকটে যে জলের ধারা তাহার চারিদিকেই অল্প অল্প কাঁটা ঘাস কতকদূর অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। সেখানেও কতকগুলি ঝাব্বু চরিতেছিল।

হঠাৎ নজর পড়িল একটু দূরে, তিন চারজন ভীষণাকৃতি তিব্বতী বা হুনিয়া ছোট ছোট ঘোড়ার উপর যেখানে আমাদের তাঁবু পড়িয়াছে শনৈঃ শনৈঃ সেইদিকেই আসিতেছে। কতকটা আসিয়া দুইজন পথিমধ্যে

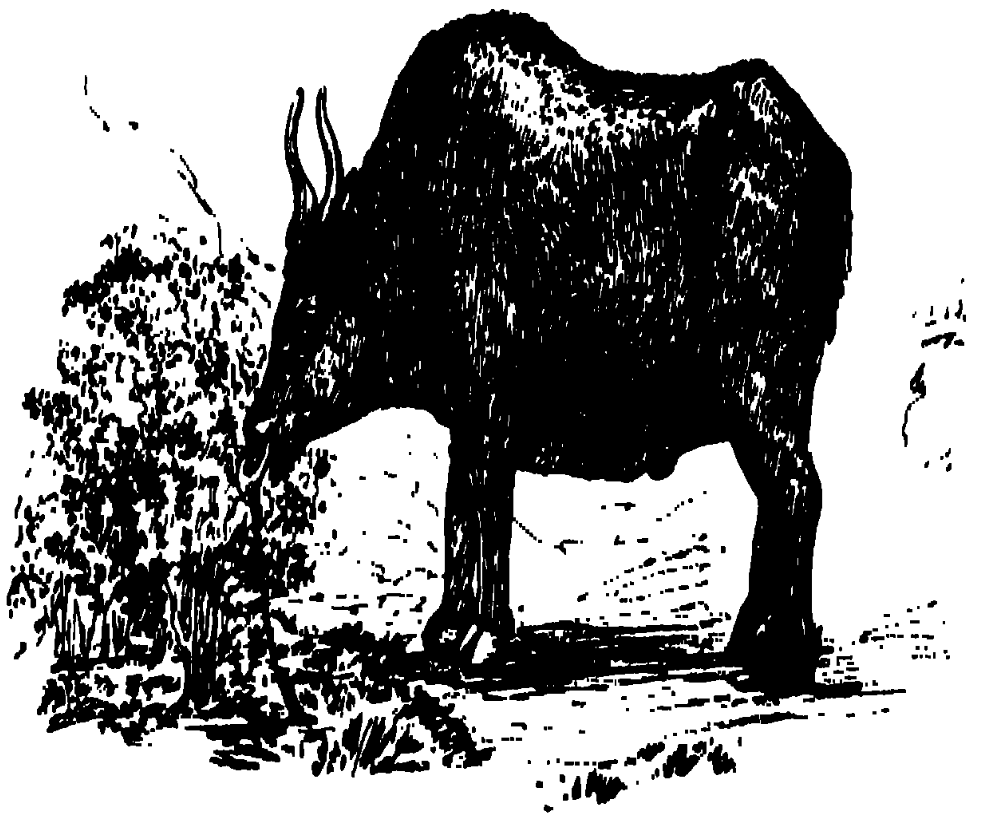

ঝাব্বু

দাঁড়াইল, বাকি দুজন অগ্রসর হইয়া একেবারে মণি সিংএর তাঁবুর নিকটে আসিয়া মালপত্র দেখিতে লাগিল। মণি সিং তখন কি করিতেছিল দেখি নাই—সে হুনিয়াদের দেখিয়া তার পাশেই দু'নলাটি রাখা ছিল, কিছু না বলিয়া কেবল সেটি হাতে তুলিয়া লইল। এইটুকুই যথেষ্ট হইল,—তাহারা কেবল দুই একটি কথা বলিয়া পিছন ফিরিল। সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। বুঝা গেল তাহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। হাতিয়ার দেখিয়াই তাহারা বুঝিল এখানে কিছু সুবিধা হইবে না।

বাহিরে শীতল বাতাস ঝড়ের মত বহিতেছে, বেশীক্ষণ থাকা গেল না, তখন তাঁবুর ভিতরে আসিলাম; দেখিলাম নাথজী জ্বরে অচৈতন্য। পূর্ব্বেও জ্বর ছিল, তবে এতটা বেশী হয় নাই। চা ও ছাতুর পানা তাঁহাকে খাওয়ানো হইল। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, "ও কিছু নয়, পথশ্রমেই হইয়াছে।" রাত্রে রুমা আমাদের জন্য রুটি পাকাইল। আহারান্তে আমরা যাত্রার কথা কহিতে লাগিলাম।

আমাদের সম্মুখেই যে পর্ব্বত দেখা যাইতেছিল, তাহার নাম গুরলা, প্রাচীন নাম গরলা—তাহারই ওপারে রাবণ হ্রদ। আমরা রাবণ অতিক্রম করিয়াই কৈলাস যাইব এবং ফিরিবার পথে মানস-সরোবর হইয়া ফিরিব। এই-রূপই সঙ্কল্প। আজ রাত্রি একপ্রহর থাকিতেই আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইবে। আমরা যে-যাহার শয্যায় আশ্রয় লইলাম। সেই সাধু চারিটি—যাহাদের একজনকে সঙ্গী-মহাশয় ভিতরে রাখিতে চাহেন নাই, তাঁহারা আজ আর কেহ আমাদের তাঁবুর মধ্যে আসিলেন না। খুব সম্ভব তাঁহারা মণি সিংএর তাঁবুতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। নাথজী চায়ের সঙ্গে একটু আদার রস পান করিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিলেন।

সেদিন বোধ হয় শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী হইবে। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে পশুরক্ষক হুনিয়া—তাহার নাম জুজু, 'উঠ, উঠ,' শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া তাঁবুর খোঁটা খুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমরা উঠিয়া দেখিলাম যে মণি সিংএর তাঁবু উঠানো ও গুছানো হইয়া ঝাব্বুর পৃষ্ঠে চড়িতেছে।

নাথজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাইতে পারিবে কি?" নাথজী বলিল, "না যাইতে পারিলে কি এইখানে পড়িয়া থাকিব?" আমরা চলিতে সুরু করিলাম। নাথজী আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। তিন চারিটি জলস্রোত পার হইয়া সম্মুখে গুরলা লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম। তখনও একটু চাঁদের আলো ছিল। বালি ও উপলখণ্ডের উচ্চ স্তূপ পার হইয়া চলিতে চলিতেই চাঁদ ডুবিয়া গেল, অন্ধকারে দিক্‌ মণ্ডল পূর্ণ হইল। সকলের চক্ষে কিছু কিছু ঘুম ছিল, যাঁরা ঝাব্বুতে যাইতেছিলেন, সকলেই ঝিমাইতেছিলেন। ঠাণ্ডায় হাত-পা জ্বালা করিতেছিল। হাতে দস্তানা, পায়ে মোটা উলের মোজা, এই প্রবল শীতে সে সকল নিষ্ফল। নাথজী জ্বরে ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে। ক্রমে আমরা গিরিসঙ্কটের মধ্যে পড়িলাম। পথটি ক্রমোচ্চ চড়াই। রুমার ভগ্নী নাথজীর অবস্থা দেখিয়া তাহার পশুটি ছাড়িয়া দিল, এবং আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক অল্প ফরসা হইয়া আসিল। যখন অল্প অল্প

ভোরের আলো সম্মুখের দিকে পড়িল তখন কি দেখিলাম!

ক্ষীণ কুজ্ঝটিকা—তাহার মধ্য দিয়া প্রথমে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্রথমে দূরে,—

দস্যুদল

নিম্নতলে একখণ্ড স্থির বিস্তৃত জল, উহা নীলাভ ধূসর, তাহা হইতে ক্ষীণ শ্বেত বাষ্প ধীরে ধীরে উঠিতেছে। ক্রমে অরুণোদয় হইতেই আরও অনেকটা দেখা গেল। কুজ্ঝটিকা আরও ক্ষীণ হইয়া যেন পর্ব্বতমালার গায়ে মিলাইয়াছে। দূরে, বহুদূরে, কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণী,—সেই শৈলমালার মধ্যস্থলে চিরতুষারাবৃত রজতশুভ্র সর্ব্বোচ্চ শিখর, প্রায় শিবলিঙ্গের আকৃতি। সেই শৈলমালার মধ্যে কৈলাস শিখর দেখিয়া প্রাণের মধ্যে যাহা হইল, তাহা আর কি বলিব। আমরা ইহারই উদ্দেশে সুদূর বঙ্গদেশ হইতে এতটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। অরুণোদয়ের ক্ষীণ সিন্দূরাভাস কৈলাসের রজতশুভ্র শিখরদেশে লাগিয়া কি মনোহর দৃশ্য হইয়াছে তাহা ভাষায় বলিবার নয়।

ক্রমে যখন গুরলার উচ্চস্তরে উঠিলাম যে দৃশ্যটুকু অন্তরালে ছিল তাহা তখন চক্ষের সম্মুখে পূর্ণরূপেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর কুয়াশা নাই। বালসূর্য্য-রশ্মি কৈলাস শ্রেণীর উপর পড়িয়া উহার আলোকিত অংশ উজ্জ্বল সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। আমরা দেখিলাম যেন রাবণ হ্রদের ও-পারেই কৈলাস, এখান হইতে বেশী দূর নয়, বোধ করি ওবেলায়ই পৌঁছানো যাইবে। কিন্তু কৈলাস সেই স্থান হইতে পুরা দুই দিনের পথ। আমরা ক্রমশঃ নামিতে লাগিলাম।

প্রায় তিন চার মাইল আসিয়া হ্রদের তীরে এক-স্থানে বিশ্রামের জন্য কিছু-ক্ষণ বসিলাম। নাথজীর জ্বর ছাড়ে নাই। তাহার উপর রমাও আবার পীড়িত হইয়া পড়িল, তাহার পুরাতন শিরঃ-পীড়া,—তাহার উপর অম্ল-রোগেও তাহাকে কাতর করিয়াছে। দলের মধ্যে এই দুটি প্রাণীর অসুস্থতা মনের মধ্যে যাত্রার আনন্দ পূর্ণরূপে অনুভব করিতে দেয় নাই। রাবণ হ্রদের তিব্বতী নাম লাংচো বা লাগাং। ভোটিয়ারা ইহাকে রাক্ষস তাল বলে। এখানে কেহ স্নান করে না, এবং তীর্থ বলিয়া কেহ মানে না, বরং অপবিত্রই মনে করে। জলের নিকট যাইবার জো নাই, চারিদিকেই চোরাবালি, পা বসিয়া যায়। দুই-একজন প্রবাসী পথিক এইরূপে প্রাণ হারাইয়াছে। ভোটিয়া যাত্রিগণের ধারণা রাক্ষসের তাল বলিয়াই উহা এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল। আমি ইহা জানিতাম না। প্রথমে সঙ্গী-মহাশয় হাতমুখ ধুইতে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "একঘটি জল আনো তো হ্যা, একটু দূর থেকে এনো, কাছের জল অপরিষ্কার।" আমি তখন ঘটিহাতে গিয়া যেমন জলে পা দিয়াছি একেবারে হাঁটুর অর্দ্ধেক বসিয়া গেল। ভাবিলাম একি! তারপর আর এক পা দিয়াছি সে পা-ও যেমন

বসিয়া যাইবার মত হইল আমি চকিতে পশ্চাতে লাফ দিয়া হটিয়া গেলাম, কিন্তু তাল রাখিতে না পারিয়া পড়িয়া গেলাম, তাহাতেই সামলাইতে পারিলাম, যদিও কাপড়-জামা কতকটা ভিজিয়া গেল।

প্রায় দ্বিপ্রহর নাগাদ আমরা আবার উঠিলাম। রমা এবার তাহার বাহনাদি, নাথজীকে ছাড়িয়া দিল, বলিল, হাঁটিলে আমি ভাল থাকিব। পাহাড়ী মেয়ে, বুট পায়ে দিয়া অতি দ্রুত চলিতে পারে।

এই বিশাল হ্রদের চারিদিকে কোথাও মনুষ্যাবাসের কোনও চিহ্ন নাই। যাত্রীরা তীর দিয়া যাতায়াত করে এই মাত্র। ইহা সমুদ্রতল হইতে ১৪,৮৫০ ফিট উচ্চ। রাত্রি চতুর্থ প্রহরে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় দশ মাইল পথ আসিয়াছিলাম, এবেলা আরও আট মাইল হইল। মধ্যে একটি চড়াইয়ের উপর হইতে আমাদের দক্ষিণে মানস-সরোবরের কিয়দংশ দেখা গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার আমরা রাক্ষস তালের শেষের দিকে আসিয়া ছাউনি করিয়া রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিলাম। নাথজী একটু ভাল আছে। গরম চা'র সঙ্গে ছাতু ও চিনি মিলাইয়া রাত্রে আমাদের আহার হইল।

প্রাতে আমরা কিছু বিলম্বে প্রায় নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া যাত্রা করিলাম। সম্মুখেই কৈলাস শ্রেণী, মধ্যে প্রায় সাত আট ক্রোশ ব্যাপী একটি মাঠ ব্যবধান। কৈলাসের পাদমূলে তারচেন্ আমাদের গন্তব্যস্থান। এই বিশাল প্রান্তর, ছোট ছোট কাঁটাগাছের ঝোপে পরিপূর্ণ, তাহার মধ্যে বেশ বড় বড় ধূসর বর্ণের খরগোস মাঝে মাঝে নজরে পড়িতেছিল আর একটি অপূর্ব্ব পাখী দেখিলাম। উহাকে শ্বেতবর্ণ কাক বলিতে পারা যায়, কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও কাকের মত আকৃতি, কেবল চঞ্চু এবং চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ। স্বর অতি ক্ষীণ।

প্রায় পাঁচ মাইল আসিবার পর একটি স্রোতের নিকটে কিছুক্ষণ বসিয়া পুনরায় আমরা একটু দ্রুতই চলিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ আকাশে মেঘের আড়ম্বর দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এখনও প্রায় ছয় মাইল বাকি, আমরা নিশ্চিতই জানিতাম যে যত দ্রুতই চলা যাক অল্পক্ষণে তারচেন্ পৌঁছাইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে যখন আর দেড় মাইল আন্দাজ বাকি—সেখান হইতে তারচেনের তাঁবুগুলি সাদা সাদা বিন্দুর মত দেখাইতেছে—তখন চট্‌পট্ শব্দে জল আসিল। এদিকে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না, হইলেও বিন্দু বিন্দু হইয়াই থামিয়া যায়। কিন্তু আমরা আশ্রয়-বর্জ্জিত মাঠের এই দেড় মাইল পথটুকু বৃষ্টির ভিতর দিয়া সোজা চলিয়া একেবারে সন্ধ্যার সময় কৈলাসের পাদমূলে তারচেন্ পৌঁছিলাম।

তাঁবু খাটানো হইলে আমরা ভিজা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া,—নিজ নিজ স্থান ঠিক করিয়া লইলাম। কথা হইল কালিকার দিনটি বিশ্রাম করিয়া পরশ্বদিন প্রাতে পরিক্রমা সুরু করা যাইবে।

পরাজয়

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, এম-এ

(১)

ব্যাপারটি অতি সাধারণ। জানকীনাথ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—সহরে ছোট্ট পাকাবাড়ী, পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি, একটি স্ত্রী ও গুটিপাঁচেক পুত্রকন্যা তাহার সম্বল। বড় মেয়েটি বিবাহযোগ্যা, বোধ হয় চোদ্দয় পড়ি পড়ি করিতেছে। বিবাহ না দিলে আর চলে না। বাঙালী পরিবারে ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু অসাধারণ এইটুকু যে, মেয়ের বিবাহের জন্য শুধু জানকীনাথই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—তাহার স্ত্রী সৌদামিনীর তরফ হইতে কোনও তাগিদই আসিল

না। সৌদামিনী গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে, ছেলে-মেয়েদের যথাসাধ্য যত্ন করে, অবসর সময় পড়শী মেয়েদের সহিত গল্পগুজব করে, আবার হয়ত চিত্তবিনোদনের জন্য গল্প উপন্যাসও পাঠ করে—কিন্তু তার বেশী আর কিছু সে করে না। কিন্তু সম্প্রতি জানকীনাথের ভাবিতে ভাবিতে রাত্রের ঘুমও লোপ পাইবার মত হইয়াছে। কন্যা সুহাসিনীকে সে অত্যন্ত স্নেহ করে, তাহাকে পরের ঘরে দিতে হইবে বলিয়া চিত্ত ব্যথিত হয়—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় এই, গরীবের পক্ষে কন্যার জন্য সুপাত্র পাওয়া অতীব দুরূহ।

সেদিন খাইতে বসিয়া জানকীনাথ স্ত্রীকে কথাটা বলিয়া ফেলিল, কহিল,—হাসি এই চোদ্দয় পড়লো, না?

সৌদামিনী ফুলবড়ি ভাজিতেছিল, হাতায় করিয়া তাহারাই কতকগুলি তুলিয়া স্বামীর পাতে ঢালিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—পড়লোই তো, কেন?

গরম দুটি বড়ি মুখে ফেলিয়া চিবাইতে চিবাইতে জানকীনাথ কহিল,—না, তাই বলছিলাম। আমাদের আপিসের হরিবাবুর মেয়ের কাল বিয়ে হয়ে গেল কিনা!

তেম্নি হাসিতে হাসিতে সৌদামিনী কহিল,—ব্যস্ত কেন? তোমার মেয়েরও হবে।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া জানকীনাথ কহিল,—তাই তো ভাবছি সদু। অবস্থা তো এই—এর মধ্যে—মেয়ের বিয়ে যে কি করে দেব—ভেবে-চিন্তে কূল পাইনে।

তবু সৌদামিনীর মুখের হাসি ম্লান হইল না। কহিল, —না হয় নাই হবে। অত ভাবনার দরকার কেন?

এইবার জানকীনাথ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—শোন কথা! তোমার বাপকে যখন ভাব্‌তে হয়েছিল, তখন আমার মেয়ের বাপই বা ভাব্‌বে না কেন শুনি?

—তা হলে ভাব। কিন্তু তোমার ভাবনার সঙ্গে আমি যোগ না দিলে রাগ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।

জানকীনাথ মনে মনে কহিল,—নিতান্ত ছেলেমানুষ! কিন্তু তাহার মনের কথাটি স্ত্রীর নিকট গোপন রহিল না, সে সহাস্যে কহিল,—তুমি ভাবছো, এ আমার ছেলে-মানুষী। কিন্তু আমার বয়সও তেমন বেশী হয়নি। পাঁচ পাঁচটা ছেলেমেয়ের মা হয়েছি বটে,—কিন্তু হাসি যখন হয় তখন আমার বয়স তেরো। শুনেছি বিলেতে নাকি আমারই মত বয়সের মেয়েদের বিয়ে হয়—বড় জোর দুই একটি ছেলে হ'তে পারে। কিন্তু পাঁচ পাঁচটি ছেলের মা। বাপরে!

স্ত্রীর মন্তব্যে জানকীনাথের মুখের উপর এক ছোপ কালি পড়িল, সে ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গেলাস জল খাইয়া ফেলিল।

সৌদামিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল—ওকি, খাওয়া এরই মধ্যে হয়ে গেল? দুধ দিচ্ছি—সব ভাতগুলো মেখে নাও। নইলে আমি রক্ষে রাখবো না।...এই বলিয়া সে ঢাকনি তুলিয়া আধ বাটি দুধ পাতের কাছে ধরিয়া দিল।

জানকীনাথ বিব্রত হইয়া কহিল—সব ভাত আমি খেতে পারবো না তো।

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া সৌদামিনী কহিল,—খুব পারবে। গল্প করতে করতে খাও—কোনও কষ্ট হবে না। আর পাঁচটি ছেলের কথা শুনেই তোমার অকারণ অতখানি জল খেয়ে ফেলা ঠিক হয়নি। ওতে আর তোমার হাত কি? এ যে আমারই বাপের মেয়ের বিয়ের জন্য—অতি ভাবনার ফল!

জানকীনাথ ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু উপায় নাই—দুধ-মাখা ভাতগুলি খাইয়া ফেলিতেই হইবে। কোনও রকমে ভাতগুলি গিলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

আপিস যাইবার সময় সৌদামিনী স্বামীর জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিতে দিতে কহিল,—দেখ, ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি—তুমি কেবল ভাব্‌ছো। আমি কিছু বলিনে, পাছে তোমার ভাবনা বেড়ে যায়। মেয়ের বিয়ের জন্য এখনই তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। হাসি এখনও ছেলেমানুষ—যে ক'দিন হেসে-খেলে বেড়াতে পায় বেড়াক।

জানকীনাথ শুধু কহিল,—তাই তো, আচ্ছা! এই বলিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে অন্যমনস্কভাবে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

(২)

সংসারে এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা কারণে-অকারণে ভাবিয়া শীর্ণ হয়। প্রবোধ দাও, সান্ত্বনা দাও, তবু তাহারা চিন্তার হাত হইতে রেহাই পাইবে না। তাহাদের মনে সর্ব্বদা একটা-না-একটা চিন্তা বাসা বাঁধিয়াই আছে। জানকীনাথও ঠিক এমনি ধরণের লোক। স্ত্রী হয়ত বলিল,—আজ ছোট খোকার সর্দ্দি হয়েছে।

জানকীনাথ অমনি সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল,—সর্দ্দি? বাপরে! অসময়ে আবার সর্দ্দি কেন!

স্ত্রী কহিল,—বর্ষাকালে ছোট ছেলেদের নিয়ে পারবার জো নেই। যে বৃষ্টি—সর্দ্দি লাগ্‌বে তার আর অপরাধ কি!

—তা হলে বর্ষাকালে ছেলেদের সর্দ্দি-টর্দ্দি লেগে যায়? তাতে কোনও ক্ষতি হয় না তো?

বাস্তবাগীশ স্বামীর মনে চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে ইহাই মনে করিয়া স্ত্রী কহিল,—ক্ষতি আবার কিসের? হয়েছে, সেরে যাবে।

—হ্যাঁ তা সারবে বৈ কি। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন। একটু তুলসীপাতার রস মধু দিয়ে খাইয়ে দাও।

স্ত্রী হাসিয়া কহিল,—সে আর তোমাকে বলতে হবে না, সে খাওয়ানো হয়েছে।

জানকীনাথ শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া কহিল,—এ্যাঁ! তবু সারে নি? তা হলে তো বিশেষ সুবিধের হচ্ছে না। যাব নাকি একবার চারু ডাক্তারের ওখানে। আগে থাকতে ওষুধ দেওয়াই ভাল।

স্ত্রী ধমক দিয়া কহিল,—পাগল হলে নাকি? একটু সর্দ্দি লেগেছে, তাতেই ছুটবে ডাক্তারের বাড়ী। ভালো দেখ্‌ছি, তোমাকে কিছু বলবার জো নেই—একটুকুতেই বিপরীত করে তুলবে।

স্ত্রীর ধমক খাইয়া তবে জানকীনাথ চুপ করিল।

আর একদিনের কথা। আপিসে জানকীনাথ 'লেটে' আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঘড়ির দিকে তাকাইতেই তাহার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! চাকুরি বুঝি আর থাকে না! তাহার মনের ভাবের সহিত আপিসের অনেকেরই পরিচয় ছিল। তাহারা কেহ কেহ জানকীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল। সেইদিকে লক্ষ্য পড়িতেই জানকীনাথ ভয়ে কাঠ হইয়া গেল—যেন তাহার চাকুরিতে একেবারে জবাব হইয়া গিয়াছে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিজের আসনে বসিয়া পাশের বিপিনবাবুকে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—বাড়ীর ঘড়িটা আধঘণ্টা স্লো মশায়, তাতেই এ কাণ্ড। আর ঘড়িরই বা দোষ দেব কি? সেটা তো ঠাকুরদার আমল থেকে আর মেরামত হয়নি। বড়বাবু ভারী চটেছেন, কি বল বিপিনবাবু? হাজরী সই করতে যাব না কি?

বিপিনবাবু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল—বড়বাবুরই বা দোষ কি মশায়, নিত্যি দেরী হলে কি চাকরি থাকে!

এ বলে কি? তা হলে কি চাকরি নাই। হায়রে স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া এখন সে কোথায় দাঁড়াইবে, কি করিয়া তাহাদের মুখে অন্ন দিবে, যেরূপ চাকুরির বাজার আর একটি জুটাইতে পারিবে কিনা তাহারই বা ঠিক কি! এক নিমেষের মধ্যে তাহার মনে শত চিন্তা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া কুস্তি সুরু করিয়া দিল। সে বিবর্ণমুখে কহিল,—তাহলে কি চাকরি—।

দীনেশবাবু বিপিনের পাশেই বসিয়াছিল, সে এইবার কহিল,—মশাই, নিজে তো দেরি করে এলেন, এখন আবার গল্প ফেঁদে আমাদের কাজের ব্যাঘাত করবেন না। আমাদের চাকরি তো আবার বজায় রাখ্‌তে হবে! এখানে বসে গল্প না করে বরং একবার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে ভাল হয়।

জানকীনাথ কোনও রকমে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইতেই ভিতর হইতে চাপা হাসির শব্দ তাহার কানে গেল, সে দুরু দুরু বক্ষে বড়বাবুর সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া ঢোক গিলিয়া বলিতে লাগিল,—আজ আসতে সার দেরি হয়ে গিয়েছে। আর কক্ষনো এমন হবে না। এবারকার মত ক্ষমা করুন নইলে গরীব মারা যায়। পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়ে—বৃহৎ সংসার! বাড়ীর ঘড়িটা—।

বড়বাবু জানকীনাথকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তাঁহার মুখ দিয়া কৌতুকের হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছে ইহা বোধ হয় অন্য কেহ হইলে বুঝিতে পারিত, কিন্তু ব্যস্তবাগীশ জানকীনাথ নিজের চিন্তাতেই বিভোর, সে কিছু বুঝিতে পারিল না। বড়বাবু বাধা দিয়া কহিলেন—আপনার কথা পরে শোনা যাবে জানকীবাবু। বড়সাহেবের ডাক আছে—এখনই দেখা করতে যান্।

বড়সাহেবের ডাক? বাপরে। তাহা হইলে সত্যই আর রক্ষা নাই। চাকুরির দফা শেষ হইয়াছে। সে বড়বাবুকে সেলাম করিয়া বিবর্ণমুখে সাহেবের কামরার উদ্দেশে চলিল। দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে প্রবেশ করিবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সাহেবের চাপরাশী হাসিয়া কহিল—সাহেব এখনই খোঁজ করছিলেন যে বাবু। যান্, যান্।

চাপরাশীর কথায় আর একবার বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল। সাহেবকে কি বলা যায় ইহাই মনে করিতে গিয়া তাহার সব গুলাইয়া গেল। কিন্তু উপায় নাই দেখিয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া সাহেবের টেবিলের সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিতেই জানকীনাথ হাতজোড় করিয়া কহিল,—বেগ্ ইওর পারডন্ সার, হাফ এন্ আওয়ার্স ডিলে। আর কক্‌খনো এমন হবে না সার—নেভার। কাচ্চাবাচ্চা অনেকগুলো সার,—থ্রি ডটার, টু সান্। বড় মেয়েটির সার ম্যারেজেবল এজ্। এমন সময় চাকুরি গেলে মারা যাব হুজুর। আর কক্‌খনো এমন হবে না।

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পেন্সিলটি অধরের নীচে টিপিয়া ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন।

জানকীনাথ প্রমাদ গণিয়া বলিতে লাগিল—আমার কোনও দোষ নাই সাহেব—নো অফেন্স। পুওর ম্যান, ঘড়ি কিনবার পয়সা জোটে না। তাই ঠাকুর-দার—গ্রাণ্ড-ফাদারের ক্লকটার উপরই ডিপেণ্ড করি। রিপেয়ার করবারও টাকা নেই—তাই ওটা ঠিক টাইম দেয় না। এতেই এই বিভ্রাট—ডেন্‌জার্ সার, নইলে আমার কোনও দোষ নাই।

সাহেব আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি জানকীনাথের কার্য্যে বরাবরই প্রীত ছিলেন এবং আপিস-সংক্রান্ত কোনও জরুরী কাজের কথা নিজে বলিয়া দিবেন বলিয়াই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমটা জানকীনাথের কথা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, এখন বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, জানকীবাবু, দোষ যখন তোমার অসভ্য ঘড়িটার, তোমার নিজের নয়—তখন ক্ষমা করা গেল। বাট্ নেভার কাম্ লেট্ উইলিংলি। দ্যাট্ ইজ এ সিরিয়স্ অফেন্স।

জানকীনাথ এইবার অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল,—না সার, এমন দোষ আর হবে না।

সাহেব তারপর কাজ-সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন এবং সেইদিনই তাহাকে একটি ওয়াচ উপহার দিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু ঘড়িটি পাইয়া জানকীনাথের চিন্তা আবার বাড়িয়া গেল। সে মনে ভাবিল—সর্ব্বনাশ! এতদিন যদি বা রক্ষা ছিল, এখন সেটুকুও লোপ পাইল। আধ মিনিট বিলম্ব হইলেই আর চাকুরি বজায় থাকিবে না।

এম্‌নি অদ্ভুত প্রকৃতির জানকীনাথের যখন মনে ধারণা হইল তাহার কন্যার বয়স বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ বিবাহ ঠিক হইল না, তখন যে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবে ইহার আর বিচিত্র কি? স্ত্রীর সান্ত্বনায়—তাহার মন তৃপ্তি পাইল না। কন্যার দিকে তাকাইলেই তাহার মন হু হু করিতে থাকে। সে যাহাকে দেখে তাহাকেই কন্যার বিবাহের কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুই একটি পাত্রের সন্ধানও সে পাইল। কিন্তু তাহাদের দাবী এত বেশী যে, বসত-বাড়ী বিক্রয় করিয়াও তাহা মিটানো অসম্ভব। তখন সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আহার ও নিদ্রার পরিমাণ অসম্ভব রকম কমাইয়া ফেলিল।

(৩)

জানকীনাথের একদিন সহসা নজরে পড়িয়া গেল—সুহাসিনী বড় বড় বই লইয়া অধ্যয়ন করিতেছে। কন্যা যে কিছু কিছু লেখাপড়া করে তাহা সে জানিত, কিন্তু

তাহার বিদ্যা যে কতদূর তাহার কোনও ধারণা ছিল না। আজ সংস্কৃত বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট চিত্ত কন্যাকে দেখিয়া সে ভড়কাইয়া গেল। জানকীনাথ কন্যাকে কহিল,—কি পড়ছিস্ মা?

সুহাসিনী মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিল,—সংস্কৃত।

বিস্মিত হইয়া জানকীনাথ কহিল,—এ্যা! সংস্কৃত?

কন্যা মৃদু হাসিয়া কহিল,—ও তো অনেকদিন থেকেই পড়ছি, বাবা।

—অনেক দিন থেকে? বটে!···জানকীনাথ আর কিছু কহিল না, কিন্তু তাহার মনে আর একটি নূতন চিন্তা বাসা বাঁধিল।

সেদিন খাইতে বসিয়া সে স্ত্রীকে কহিল,—আজ দেখ্‌ছিলাম হাসি মস্ত মোটা মোটা বই নিয়ে পড়তে বসেছে। আবার নাকি সংস্কৃতও পড়া সুরু করেছে।

সৌদামিনী এক গাল হাসিয়া কহিল,—যাহোক, তবু এতদিনে তোমার নজরে পড়লো। ছাইপাশ ভাবনা ছাড়া আর দুনিয়ার কিছুই তো তুমি দেখতে পাও না।

জানকীনাথ কহিল,—আমি ভাবছি সদু, অত লেখা-পড়া মেয়েদের দরকারই বা কি। সেই তো বিয়ে হয়ে গেলে দুইবেলা হাঁড়ি ঠেলা, বাসন-মাজা, ঘর-গেরস্থালীর কাজই করতে হবে। তার চেয়ে বরঞ্চ ঘরের কাজকর্ম শেখাও, বিয়ে হলে কাজে লাগ্‌বে। শ্বশুর, শাশুড়ী যাতে খোঁটা না দেয়—।

সৌদামিনী কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা—ও নিয়ে আর তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আগে বিয়েই হোক, তারপর দেখা যাবে।

জানকীনাথ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল,—বিয়ে একদিন-না-একদিন হবেই, চিরকালই কি আর মেয়ে আইবুড়ো থাক্‌বে। না হয় কিছু দেরীই হয়ে যাচ্ছে—আমি তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছি নে।

সৌদামিনী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—কে বল্‌ছে তুমি চেষ্টার ত্রুটি করছো? বরং মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু কম ব্যস্ত হও এই তো আমি চাই। ও আসছে-বছর ম্যাট্রিক দেবে—তার আগে বিয়ে দেওয়া আমার মোটেই ইচ্ছে নয়। কিন্তু তুমি যে-রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছ—।

জানকীনাথ চমকাইয়া উঠিয়া কহিল,—ম্যাট্রিক দেবে? কে ম্যাট্রিক দেবে? হাসি?

সৌদামিনী সহাস্যে কহিল,—তোমার চিন্তার সাগর নতুন করে উথলে উঠ্‌লো নাকি? আচ্ছা মানুষ দেখ্‌তে পাই। ভালমন্দ সব তাতেই তোমার সমান ভাবনা! মেয়ে ম্যাট্রিক দেবে, তাতে তুমি চমকাচ্ছ কেন?

জানকীনাথ শুক্‌নো ভাত একদলা মুখে ফেলিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—না চমকাইনি।—আমি ভাব্‌ছি—, আচ্ছা, অতদূর পড়লো কি করে?

—ওকি, শুক্‌নো ভাত গলায় বেধে যাবে যে! ডাল দিয়ে মেখে নাও। পড়ায় অবিনাশ মিত্তিরের ছেলে অরুণ। মেয়ে তোমার বুদ্ধিমতী, একটু দেখিয়ে দিলেই ও নিজে নিজে পড়তে পারে।

জানকীনাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল,—ও, অরুণ পড়াচ্ছে! তা বেশ!

সেদিন আপিসে গিয়া জানকীনাথ কথাটি বিপিনবাবুকে না বলিয়া স্বস্তি পাইল না। কন্যার বিবাহের জন্য সে এই বিপিনকেই মুরুব্বি ধরিয়াছে, কারণ হরিবাবুর মেয়ের বিবাহ বিপিনবাবুই ঠিক করিয়া দেওয়ায় তাহার মর্য্যাদা কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল।

জানকীনাথ কহিল,—ভাই, আবার, এক ফ্যাসাদ জুটেছে। মেয়ে নাকি ম্যাট্রিক দিচ্ছে।

বিপিনবাবু বলিল,—বটে! বটে! ইস্কুলে দিয়েছ—বুঝি? বেশ! বেশ!

—না হে না। আমি ওসব বিষয় এতদিন কিছুই জানিনে। শুনছি না কি অবিনাশ মিত্তিরের ছেলে অরুণ পড়ায়। ভাই, আমার আর একটা ভাবনা বেড়ে গেল। কোন্ ঘরে মেয়ে পড়বে তার ঠিক নাই। এত লেখা-পড়া কেন! আমার পরিবারটির কি যে খেয়াল!

মাথা ঝাঁকাইয়া মুচ্‌কি হাসিয়া বিপিন কহিল,—খেয়াল নয় রে ভাই, খেয়াল নয়, তোমার পরিবারটি মস্ত শিকারী। টোপ ফেলেছে—বুঝলে না?

জানকীনাথ চমকাইয়া উঠিয়া কহিল,—টোপ ফেলেছে! সে কি কথা?

বিপিনবাবু সহাস্যে কহিল,—তোমার মত গরু-

কচ্ছপকে নিয়ে যে স্ত্রী ঘর করতে পারে তাকে তারিফ করতেই হবে বাবা! এটুকুও তোমার মাথায় ঢোকে না?

জানকীনাথ ঢোক গিলিয়া বিবর্ণমুখে কহিল,—না।

অবিনাশ মিত্তির খুব বড়লোক এ জান তো? তার ছেলে অরুণের বিয়ে হয়নি—এও বোধ হয় জান। সেই অরুণের কাছে যদি তোমার মেয়ে পড়তে পড়তে ম্যাট্রিক দেবার যোগ্য হয়ে ওঠে—তাহলে কি অনুমান হয়?

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জানকীনাথ কহিল,—কি অনুমান হয়! তাই তো!

বিপিন হাসিতে হাসিতে কহিল,—সংসারে যে এতবড় মুখ্যু থাকতে পারে—এ আমি জানতাম না। তোমার আর ভাবনার দরকার নেই হে। সোজাসুজি অবিনাশ মিত্তিরের বাড়ী যাও, তার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব কর—তারপর কি দাঁড়ায় আমাকে কাল বলো। এ বিয়ে হতেই হবে। অবিনাশ মিত্তিরের যদি বা আপত্তি থাকে কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে এ বিয়ে না দিলে তার চলবে না।

অনেকদিন পর জানকীনাথের মুখের উপর চিন্তার মেঘখানি কাটিয়া যাইবার মত হইল—অবিনাশ মিত্তিরের ছেলের সঙ্গে হাসির বিবাহ? ইঃ! কি সৌভাগ্য! সে বিপিনবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—সত্যি বলছেন তো? আজই তা হলে প্রস্তাব করি?

তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বিপিন কহিল,—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আর দেরী নয়।

আপিস ছুটি হইবার ঘণ্টাখানেক আগে জানকীনাথ বড়বাবুর কক্ষে গিয়া কহিল,—আজ সার, ঘণ্টাখানেক আগে ছুটি দিতে হচ্ছে। মেয়ের বিয়ে একরকম ঠিকই হয়েছে,আজ পাকা কথা হবে। বরের বাপ ভারী অবস্থাপন্ন, ছেলেটিও বি-এ পড়ছে। কোনও রকমে দুইহাত এক করে দিতে পারলেই রক্ষা পাই। মেয়ের বিয়ের জন্যে যে কি বিপদে পড়েছিলুম সার, কি আর বলবো। যাহোক, ভগবান এতদিন পরে মুখ তুলে চাইলেন। একটা দুর্ভাবনা ঘুচলো। তা হলে, সার,

বড়বাবু কোনই আপত্তি করিলেন না। সে হাসিমুখে আপিস হইতে বাহির হইল। তবে যাইবার পূর্ব্বে আপিসের প্রায় সকলকেই শুনাইয়া গেল যে, এক ধনীর পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ পাকাপাকি ঠিক হইয়া গিয়াছে।

(৫)

অবিনাশবাবু বৈঠকখানাতেই ছিলেন। জানকীনাথ ছেঁড়া ছাতাটি দরজার কোণে রাখিয়া, তালি-দেওয়া জামাটি চাদর দিয়া ঢাকিয়া, নমস্কার করিয়া সঙ্কুচিতভাবে ফরাসে বসিয়া হাত কচলাইতে লাগিল।

অবিনাশবাবু প্রকাণ্ড ফরশীতে তামাক খাইতেছিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হাসিমুখে কহিলেন,—কিহে জানকী ভায়া, কি মনে করে?

বিনীতভাবে জানকীনাথ কহিল,—আজ্ঞে না, বিশেষ কিছু নয়। আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। আমার মেয়ে আসছে বছর ম্যাট্রিক দিচ্ছে!

—ম্যাট্রিক দিচ্ছে? কে, হাসি?

জানকীনাথ অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল,—আজ্ঞে অরুণই হাসিকে পড়াচ্ছে কিনা। শুনতে পাই আমার মেয়েটি ভারী ইন্‌টেলিজেন্ট—ঐ যাকে বলে বুদ্ধিমতী। বিশ্বাস না হয় অরুণকে ডেকেই জিজ্ঞেস করুন।

অবিনাশবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—কে তোমার কথা অবিশ্বাস করছে হে?

জানকীনাথ বলিতে লাগিল,—আর আমার মেয়েকেও তো দেখেছেন। রূপ তার আহামরি নয় বটে, কিন্তু একেবারে ছি ছি মন্দও নয়। আমি তো দাদা, মেয়ের বিয়ের জন্যে এই গোটা বছর হায়রাণ হলুম, কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না।

অবিনাশবাবু মাথা ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে কহিলেন, —হুঁ। মেয়ের বিয়ে দেওয়া ভারি সমস্যার কথা জানকীনাথ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি সমস্যার কথা। কিন্তু আজ বিপিনবাবু—আমাদের আপিসের বিপিনবাবু, বুঝলেন না দাদা, আমার ভুল ভেঙে দিলে। সে কি বলে জানেন? হাঃ, হাঃ!

ফরশীর নলটি মুখে পুরিয়া চোখ দুটি কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করিয়া অবিনাশবাবু কহিলেন,—কি বলে সে?

হি হি করিয়া একটু সংক্ষিপ্ত হাসি হাসিয়া জানকীনাথ কহিল,—আজ্ঞে সে বলে আমার স্ত্রী টোপ ফেলেছে!

—টোপ ফেলেছে তোমার স্ত্রী? বল কি!

হাসিতে হাসিতে জানকীনাথ কহিল,—ও একটা কথার পৃষ্ঠে। অরুণ হাসিকে পড়ায় কি না। তাই বিপিনবাবু ঠাট্টা করে—।

অসম্ভব গম্ভীর হইয়া অবিনাশবাবু কহিলেন—হুঁ!

অবিনাশবাবুর গম্ভীর ভাব দেখিয়া এতক্ষণে জানকীনাথের মনে চিন্তা দেখা দিল, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। সে বলিতে লাগিল—আজ্ঞে, যদি দয়া করে আমার মেয়েকে ঘরে নেন, তা হলে গরীব রক্ষা পায়। আর আপনিও তাতে ঠক্‌বেন না। আমরা গরীব বটে, কিন্তু বংশ মর্য্যাদা—।

অবিনাশবাবু হাত দিয়া ইঙ্গিত করিতেই জানকীনাথ থামিল। তারপর ধীরেসুস্থে ফরশীর নলটি সরাইয়া, হাই তুলিয়া, নিজের হাতে তুড়ি বাজাইয়া, অবশেষে প্রকাণ্ড তাকিয়াতে দেহ এলাইয়া দিয়া হাঁকিলেন—ওরে, কে আছিস্ একবার অরুণকে ডেকে দেতো!

জানকীনাথ এবার এইটুকু বুঝিতে পারিল যে, ব্যাপার বড় সুবিধের নয়। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

অবিলম্বে একটি সুশ্রী গৌরবর্ণ যুবক উপস্থিত হইল। অবিনাশবাবু উঠিয়া বসিয়া বালিশটি কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন—অরুণ, তুমি নাকি জানকীর মেয়েকে পড়াচ্ছ?

অরুণ কহিল—হ্যাঁ, পড়াচ্ছিই তো।—সেবার মাসীমা বলেছিলেন কিনা! কেন, তাতে কি হয়েছে? এই বলিয়া সে একবার পিতার দিকে আর একবার জানকীনাথের দিকে চাহিতে লাগিল।

অবিনাশবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—আর পড়িও না।

অরুণ ইহার হেতু ঠিক বুঝিতে পারিল না, সে জিজ্ঞাসুনেত্রে পিতার দিকে চাহিল। পিতা কহিলেন,—দরকার কি অরুণ? যাতে পাঁচজন পাঁচকথা বলবার সুবিধে পায়—সে কাজ করার দরকারই বা কি?

যে আজ্ঞে বলিয়া অরুণ চলিয়া গেল। জানকীনাথ মাথা হেঁট করিয়াছিল—নহিলে সে দেখিতে পাইত পিতার আদেশে পুত্রের মুখ তেমন প্রসন্ন হইয়া উঠে নাই।

তারপর অবিনাশবাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—ওহে জানকী, এইবার তোমার সঙ্গে কাজের কথা হোক। ছেলের বিয়ে আমি শীগগিরই দেব—কনেরও সন্ধানে আছি। কিন্তু সে যে বাড়ীর পাশেই রয়েছে—এ তো আমি জান্‌তেও পারিনি। যাহোক, তুমি যখন পাকাপাকি ঠিকই করতে চাও—আজই হয়ে যাক্। পাঁচ-সাত জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছে, তাদের কেউ হেঁকেছে আট হাজার, কেউবা নয় হাজার। শুধু হলুদ গাঁয়ের জমিদার বার হাজার অফার দিয়েছে। এখনও তাদের কথা দিইনি, তাই রক্ষে। নইলে তোমাকে আজ নিরাশ হয়েই ফিরতে হতো। তাহলে, তুমি আর দু'হাজার উঠছো তো? চোদ্দ হাজারের কমে আর কি করে হয়! তুমি বিচক্ষণ, বুঝতেই তো পারছো!

জানকীনাথ বুঝিল—ইহা প্রকাশ্য বাহ্য বিদ্রূপ, তাহার দারিদ্র্যকে উপলক্ষ্য করিয়া অসহ্য কটূক্তি। কিন্তু উপায় নাই। সে নিজে আসিয়া ফাঁদে পা দিয়াছে, এইটুকু তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। সে নিরুপায়দৃষ্টিতে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—আজ্ঞে, আমি বড় গরীব। বুঝতে পারিনি তাই!

এইবার অবিনাশবাবুর হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি কহিলেন—শুন্‌তে পাই গোয়ালার বুদ্ধি আশী বছরের আগে হয় না। কিন্তু তুমি তো সংকায়স্থের ছেলে, বয়সও কম নয়—তোমার বুদ্ধি পাকবে কবে? কর পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি, সম্বল তো ঐ ভাঙা বাড়ী, তুমি চাও মেয়েকে আমার ঘরে দিতে! যে শুনবে সেই যে হাসবে হে। আবার কথার ভণিতাও মন্দ নয়—স্ত্রী টোপ ফেলেছে! হাঃ, হাঃ! এই বলিয়া তিনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না, বরং অপমানের মাত্রা বাড়িয়াই যাইবে মনে করিয়া

জানকীনাথ উঠিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল,—আমার অন্যায় হয়েছে। আমায় ক্ষমা করবেন। এই বলিয়া সে টলিতে টলিতে চলিয়া আসিল।

বাড়ীতে আসিয়া জানকীনাথ শয্যা আশ্রয় করিল। তখনও তাহার কানে অবিনাশবাবুর বিদ্রূপের অট্টহাসি ধ্বনিত হইতেছিল। সৌদামিনী স্বামীর থম্‌থমে ভাব দেখিয়া ভাবিল—হয়ত স্বামীর মনে আর কিছু নূতন চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে। সুহাসিনী পিতার শিয়রে বসিয়া মাথার চুল নাড়িয়া দিতে লাগিল। জানকীনাথ সস্নেহে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—আজ অবিনাশবাবু যে অপমান করিয়াছে, তাহার যদি সে শোধ দিতে পারিত! সে যদি কুলে শীলে, ধনে বিদ্যায়, এমন জামাতা আনিতে সক্ষম হয় যে সে অবিনাশ মিত্রের পুত্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলেই তো তাহার মাথা হেঁট হইতে পারে। কিন্তু তাহা অসম্ভব, অসম্ভব! সে দরিদ্র, পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণী,—এ স্বপ্ন তাহার সাজে না। তাহার চোখ জ্বালা করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুহাসিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল,—ও কি বাবা?

চোখ মুছিয়া জানকীনাথ কহিল,—কিছু নয় মা!

কথাটি জানকীনাথ চাপিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু পরদিনই তাহা প্রকাশ হইয়া গেল।

সৌদামিনী গম্ভীরমুখে স্বামীকে কহিল,—কাল নাকি মিত্তিরদের বাড়ী গিয়েছিলে?

জানকীনাথ প্রমাদ গণিল, ঢোক গিলিয়া কহিল,—হাঁ গিয়েছিলাম। তাতে কি হয়েছে?

সৌদামিনী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—কিছু হয়নি! শুধু ও বাড়ীর গিন্নী এসে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল। ছিঃ, ছিঃ, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি কোনোকালে হবে না? নিজেদের অপমান সহ্য করা যায়। কিন্তু মেয়ের অপমান কি করে বরদাস্ত করি?

সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া জানকীনাথ কহিল—কি? আমার মেয়েকে অপমান! আচ্ছা, আমি দেখ নেব! এই বলিয়া সে ঘরের ভিতর দ্রুত পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। সৌদামিনী বিহ্বলভাবে স্বামীর আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জানকীনাথ উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল,—ওর কনট্রাক্টারি করে পয়সা হয়েছে—তাই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। চুরি করা পয়সা, হবেই তো! আমিও যদি ওর চেয়ে বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে না দিই—তা হলে আমি আশু ঘোষের ব্যাটাই নই।

স্বামীর উত্তেজনায় সৌদামিনী এত দুঃখেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—থাম, থাম, ঢের হয়েছে। আর লজ্জা বাড়িও না।

তেমনি সুরে জানকীনাথ কহিল,—কেন, কিসের লজ্জা! আমাদের বংশের মেয়ে কি ফ্যাল্‌না? না হয় আজকাল গরীবই হয়েছি! ওর এক পুরুষের পয়সা কিনা—তাই এত দেমাক!...তার পর একটু থামিয়া বলিতে লাগিল—ইঃ! ছেলেকে ডেকে আবার হুকুম দেওয়া হলো—আর পড়িও না! না পড়ালো তো মেয়ে আমার মুখ্যু হয়ে থাকবে! আচ্ছা, আমিও দেখে নিচ্ছি!...এই বলিয়া সে গামছা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

(৫)

সৌদামিনী লক্ষ্য করিয়া দেখিল কয়েকদিন হইতে তাহার স্বামীর মুখের ভাব ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার আননে চিন্তার যে গাঢ় কালিমা লিপ্ত থাকিত তাহা যেন ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কপালের সে কুঞ্চিত রেখা আর নাই, সদাশঙ্কিত ত্রস্তভাবের পরিবর্ত্তে যেন স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্বের কোন্ নিয়মানুসারে যে ইহা সম্ভব হইল, তাহা সৌদামিনী বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কারণ অবিনাশ মিত্রের নিকট অপমানিত হইবার পর ইহার বিপরীতই সে আশঙ্কা করিয়াছিল।

সেদিন জানকীনাথ কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক গাল হাসিয়া সৌদামিনীকে কহিল,—আজ এক সুখবর দেব, কি বকশিস্ দেবে বল।

স্বামীর উৎফুল্ল ভাব দেখিয়া সৌদামিনীও সহাস্যে

কহিল,—আচ্ছা, আজ না হয় পাঁচ তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়াব।

—সে তো নিত্যি খাচ্ছি। গরীব হলে কি হবে? খাওয়ানোর জুলুম তো তোমার কম নয়। আচ্ছা সু-খবরটা কি আন্দাজ কর তো।

—তোমার মাইনে বেড়েছে।

জানকীনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—উঁহু!

—তা হলে তোমার একটা ভাল চাকরি জুটেছে?

জানকীনাথ সহাস্যে কহিল,—হলো না।

সৌদামিনী একটু ভাবিয়া কহিল,—তা হলে—আঃ, ছাই বলই না কেন সুখবরটা কি!

জানকীনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,—হাসির বিয়ে ঠিক করে এলুম।

স্বামীর কথায় সৌদামিনীর মুখের ভাব তেমন প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইল না। তবু সে মুখের হাসি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—সে কি! একেবারে ঠিক হয়ে গেল না কি?

—সে একরকম ঠিকই। পরশুদিন মেয়ে দেখ্‌বে—তা হলেই পাকাপাকি ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ে তাদের অপছন্দ হবে না। এ আমি বলে দিচ্ছি।

সৌদামিনী ভাবিল—তাহা হইলে স্বামী তাহার নিশ্চিন্ত ছিল না। এ কয়দিন তাই তার বাহিরে বাহিরে এত ঘোরাঘুরি। সে কহিল,—ছেলেটি কেমন দেখলে?

জানকীনাথের চোখ মুখ দিয়া যেন আনন্দের ধারা উছলিয়া পড়িতে লাগিল, কহিল—ছেলে? একেবারে সোনার চাঁদ। যেমন রূপ তেমনি গুণ। এবার এম-এ দিচ্ছে কি না। দেখবো অবিনাশ মিত্তিরের তেজ কোথায় থাকে। আমি বেহাইকে বলেছি—একমাইল জোড়া প্রসেশন্ করে বর আসবে বিয়ে করতে। আর গোরার বাজ্‌না আনা চাই-ই। অবিনাশ মিত্তিরের কানে যদি তালা না লাগাই তো আমি আশু ঘোষের ব্যাটাই নই। বুঝলে না? আমাকে অপমান! এইবার দেখুক সে কোথায় তার অহঙ্কার থাকে। এতদিন ভিজে বেড়ালটি ছিলাম—যার যা খুসী করেছে। এখন আর সেটি হচ্ছে না।

স্বামীর কথায় সৌদামিনী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—তা হলে বরের বাপের অবস্থা ভাল?

—ভাল বলে ভাল! অমন দশটা অবিনাশ মিত্তিরকে সে কিন্‌তে পারে। বড়বাজারে পাঁচখানা বাড়ী—তার ভাড়াই তো পায় মাসে দেড়-দুই হাজার টাকা।

সৌদামিনী বুঝিল স্বামী যতটা বলিতেছে, অতটা সত্য নয়। তাহাকে লোকে যাহা বুঝাইয়াছে তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়াছে। তবু কথা কাটাকাটি না করিয়া মুখে কহিল,—তা হলে তো খুব ভালই হয়েছে। তা কত দিতে-থুতে হবে?

এই প্রশ্নে জানকীনাথের মুখখানি একটু বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে-ভাবটুকু চাপিয়া গিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল,—ও সে কিছু নয়, কিছু নয়। এত বড় ঘরে মেয়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু ওদিক দিয়ে ভারী সুবিধে হয়েছে। বরের বাপ অবিনাশ মিত্তিরের মত নয়—দয়ামায়া আছে। তা হলে সব ঠিকঠাক করে রাখ—পরশু দিনই ওরা আসছে কি না!...এই বলিয়া সে সাময়িক প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

সত্যই পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখিতে আসিল এবং তাহাকে পছন্দ হইয়া গেল। সৌদামিনী দেখিয়া শুনিয়া মনে করিল—সম্বন্ধটি মন্দ নয়। মেয়েকে ম্যাট্রিক পাস করাইবে ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল—সেইটুকুর ব্যাঘাত ঘটিতে পারে মনে করিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইল মাত্র।

বিবাহ পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেলে জানকীনাথের আর বাড়ীতে বসিবার অবসর রহিল না। এমন কি, বিবাহ-সম্বন্ধে সৌদামিনীর সহিত পরামর্শ করিবারও যেন তাহার ফুরসুৎ নাই।

কিন্তু তাহার বাহিরের প্রয়োজন—একদিন ধরা পড়িয়া গেল।

সুহাসিনী মায়ের হাতে কতকগুলি কাগজ দিয়া সজল-চক্ষে কহিল,—মা, এই দেখ!

সৌদামিনী একবার চোখ বুলাইয়া বুঝিতে পারিল—ইহা বাড়ী-বন্ধকের দলিল। তাহার স্বামী ছয় হাজার টাকায় বাড়ী বন্ধক দিয়েছে! দলিলটা লেখা সমাপ্ত

হইয়াছে—কিন্তু রেজেষ্টারী হয় নাই। তাহাও বোধ হয় দুই-একদিনের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

সৌদামিনী বুঝিতে পারিল—তাহার স্বামী এইভাবে কন্যার বিবাহের টাকা সংগ্রহ করিতেছে। অথচ একথা সে সে ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ করে নাই। সে অনেকবার এই টাকা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনও সদুত্তর পায় নাই। এক কন্যার বিবাহের জন্য তাহার স্বামী সমগ্র পরিবারকে পথে বসাইতে চলিয়াছে-আজ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখে কথা জোগাইল না। সে বিহ্বলভাবে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুহাসিনী সজলচক্ষে কহিল,—এ কখনও হতে পারে না মা। আমি আস্‌ছি।

তারপর পিতার নিকট আসিয়া ধরা গলায় কহিল,—বাবা, আমি কি তোমার এমনি ভার হয়ে পড়েছি যে, যেমন করে হোক দূর করতেই হবে?

জানকীনাথ প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, কহিল, —সে কি মা? ও কথা কেন?···তারপর কন্যার হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে একবার দেওয়ালে ঝুলানো জামার পকেটের দিকে আর একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল।

সুহাসিনী অশ্রুসিক্ত অথচ দীপ্ত স্বরে কহিল,—এ-সব হবে না বাবা। আমার জন্য সকলকে পথের ভিখারী হতে দেব না।

জানকীনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—সে কি হাসি? পথের ভিখারী হতে হবে কেন? ও আমি বছর-খানেকের মধ্যেই, বুঝলি মা, শোধ করে দেব।

তেম্‌নি স্বরে সুহাসিনী কহিল,—আমি কোনও কথা শুনবো না বাবা। মেয়েকে চাও তো এসব তোমায় ছাড়তে হবে।···· এই বলিয়া সে কান্না চাপিতে চাপিতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর আর জানকীনাথের বসিয়া থাকিবার শক্তি রহিল না, সে শয্যায় এলাইয়া পড়িল। যে কাজ সে নিঃশব্দে সম্পন্ন করিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া যাওয়াতে তাহার আর অনুশোচনার অবধি রহিল না। ইহার পর অগ্রসর হওয়াও যে কঠিন তাহাও সে বুঝিতে পারিল। চিন্তার মেঘ আজ পুনরায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল—সে চোখ মুদিত করিয়া মাথামুণ্ড ভাবিতে লাগিল।

কতক্ষণ সে এম্‌নি ভাবে শুইয়াছিল জানে না। সহসা চুলের ভিতর অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শ পাইয়া চোখ খুলিতেই কন্যাকে দেখিতে পাইল।

হাসি এইবার সহাস্যে কহিল—কি ভাবছো বাবা?

দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গিয়া জানকীনাথ কহিল,—কৈ, কিছুই তো ভাবিনি, মা! আর কিছুক্ষণ পর জানকীনাথ কহিল—তুই যা বল্লি, সে কি তোর মনের কথা হাসি?

শান্তভাবে হাসি কহিল,—হ্যাঁ বাবা!

জানকীনাথ এইবার উঠিয়া বসিয়া কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল—তবে তাই হোক মা, যতদিন তোর ইচ্ছা আমার কাছেই থাক। আমি জোর করে আর পরের ঘরে দেব না।

(৬)

বছর চার পাঁচ পরের কথা। এই সময়ের মধ্যে জানকীনাথের সংসারে অনেক ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। সৌদামিনী আর ইহসংসারে নাই। এই নিদারুণ আঘাতে জানকীনাথ চিরকালের মত পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। চিরকালই তাহার অভাবের সহিত কারবার। আজ ঘরে চাল নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই। কন্যার বিবাহের জন্য টাকার স্তূপ নাই, সন্তানের শিক্ষা দিবার অর্থ নাই, দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্তি নাই—কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপী নাই-নাই যে কতদূর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে তাহা জানকীনাথ স্ত্রীর অভাবে বুঝিতে পারিল। এই আঘাতে দেহ ভাঙিয়া গেল, শোকগ্রস্ত অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিল। কবে, কোন্ শুভমুহূর্তে সে স্ত্রীর সহিত পরলোকে গিয়া মিলিত হইতে পারিবে—এই চিন্তাই তাহার ধ্যানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনীর বিবাহ হয় নাই, কিন্তু তাহার জননীর মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে। সে বি-এ পড়িতেছে, আই-এ পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে। এখন সংসারের সমস্ত ভার তাহারই উপর। জানকীনাথ

বিস্মিত হইয়া কন্যার সংসার চালাইবার সুশৃঙ্খল পদ্ধতি দেখে, আর তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়। সময় সময় তাহার মনে হয়—এ ভালই হইয়াছে, হাসি যদি পরের ঘরে চলিয়া যাইত তাহা হইলে তাহার উপায় হইত কি? কিন্তু পিতার প্রাণ ইহাতেও তেমন প্রবোধ লাভ করে না।

সুহাসিনীকে এখন অনেকেই বিবাহ করিতে প্রস্তুত। জানকীনাথ কয়েকবার কন্যার নিকট ধমক খাইয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না। মনে ভাবে—আর নয়, কন্যা তাহার উপযুক্ত শিক্ষিতা হইয়া উঠিয়াছে, এখন যদি সে নিজে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করে, করিবে, এ-বিষয় লইয়া আর সে মাথা ঘামাইবে না।

কিন্তু দেহ আর বহিতে চাহিল না। জানকীনাথ ধীরে ধীরে শয্যা আশ্রয় করিল। আপিসে যাইবার ক্ষমতা নাই। বড়সাহেব লোক ভাল, ছয়মাসের ছুটি পুরা মাহিনায় মঞ্জুর করিলেন। সুহাসিনীর আর একটি কাজ বাড়িয়া গেল।

এই সময়টা জানকীনাথের তত্ত্বাবধান করিতে অবিনাশ মিত্রের পুত্র অরুণ প্রায়ই আসা-যাওয়া করিত। অবিনাশ-বাবু প্রায় বছরখানেক পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, অরুণ এম.এ পাশ করিয়া কোন এক কলেজে প্রফেসারী করিতেছে। এই দুই পরিবারের মধ্যে সেই ঘটনার পর যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—অবিনাশবাবুর মৃত্যুর পর হইতেই তাহা লোপ পাইয়াছিল। অরুণ পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে আসিত, এখন জানকীনাথের পীড়াকে আশ্রয় করিয়া এই যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল।

জানকীনাথ অরুণকে অত্যন্ত স্নেহ করে, এখনও তাহার মনে হয়—যদি ইহারই সঙ্গে হাসির বিবাহ হইত! এই অরুণের পিতাই যে একদিন তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল ইহাও যেন সে ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইয়া গেল।

একদিন অরুণই এই কথার অবতারণা করিল। জানকীনাথের রোগশয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সে বিনীতস্বরে কহিল,—আজ আমার একটা প্রার্থনা জানার যদি আমাকে অভয় দেন।

অরুণের কথার ভঙ্গীতে জানকীনাথ বিব্রত হইয়া কহিল,—সে কি অরুণ! অমন করে বল্লে যে বড় লজ্জা পাই, বাবা!

অরুণ সসঙ্কোচে কহিল,—বাবা একদিন যে অন্যায় করেছিলেন,—তার জন্য আমি অনেকদিন থেকেই ক্ষমা চেয়ে নেব ভেবেছিলুম, কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। আজ—।

জানকীনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—তোমার বাবা কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি অরুণ, আমারই বুঝবার ভুল হয়েছিল। অন্যায় যদি কারও হয়ে থাকে—সে আমারই হয়েছে।...তারপর একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—আগে কি নির্ব্বোধই না আমি ছিলুম, কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে অনেক সেয়ানা হয়ে উঠেছি। সংসারের অনেক কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

অরুণ কহিল,—কিন্তু তা বললে তো আমি প্রবোধ পাইনে। যদি—যদি—। কিন্তু কথাটা বলিতে তাহার বাধিয়া গেল।

জানকীনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব পড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—যদি, যদি কি বাবা?

—সেদিন যে প্রস্তাব নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিলেন, আজ আমি তারই পুনরুত্থাপন করতে এসেছি। আপনার কি কোনও অমত—

জানকীনাথ সহসা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া অরুণের একখানি হাত ধরিয়া কহিল,—একি সত্যই বলছো অরুণ—না উপহাস করছো?

অরুণের মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, কহিল,—উপহাস করবো আপনার সঙ্গে? এ কি আপনি এখনও বিশ্বাস করেন?

জানকীনাথ লজ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া কহিল—না, না, সে কথা নয়। তা হলে একবার হাসিকে ডেকে পাঠাই—এ তো আমার সৌভাগ্য বাবা। আমার যে বরাবরই এ আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু হাসিকে জিজ্ঞাসা না করে—।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—যদি অনুমতি করেন, আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করি।

—বেশ তো, খুব ভাল কথা। এতে আবার অনুমতির

আবশ্যক কি। এই বলিয়া জানকীনাথ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিল।

সুহাসিনী কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিবিষ্ট-মনে পিতার জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল—এমন সময় অরুণ সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া ডাকিল,—হাসি!

মুখ তুলিতেই অরুণকে দেখিয়া হাসি বিস্মিত হইল। অরুণ তাহাদের বাড়ীতে আসিত বটে, কিন্তু কি জানি কেন তাহাকে এড়াইয়া চলিত—আজ সে কিসের প্রয়োজনে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সম্বোধন করিতেছে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

অরুণ ধীরে ধীরে তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া কহিল,—তোমার বাবার অনুমতি পেয়েছি। এখন তোমার সম্মতি পেলে আর কোনও বাধা থাকে না।

সুহাসিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, মাথা নীচু করিয়া অতি সংক্ষিপ্ত অথচ কঠোর জবাব দিল,—আমার সম্মতি নেই।

এক নিমেষে অরুণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কহিল, —নেই? নেই কেন হাসি?

শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে সুহাসিনী কহিল,—একদিন যা অনায়াসেই সম্ভব হতে পারতো এখন আর তা হয় না। তোমরা কি মনে ভাব নারীকে নিয়ে চিরকালই এম্‌নি খেলা খেল্‌বে? সে কি কোনও দিনই আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে না? আর আমার অমন বাবার অপমান—সেও কি আমি এত সহজেই ভুলতে পারি?

করুণকণ্ঠে অরুণ কহিল,—কিন্তু তাতে তো আমার কোনও হাত ছিল না হাসি! আমার বাবার অপরাধের জন্য কি তুমি আমাকে শাস্তি দিতে চাও? এখন ক্ষমা চাইলেও কি তা পাবো না?

অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া হাসি কহিল,—হঠাৎ ক্ষমা চাইবার সুবুদ্ধি কোথা থেকে এল অরুণ-দা'? তোমার বাবা বেঁচে থাক্‌তে তো সাহস হয়নি?

অতি নিষ্ঠুর অথচ সত্য প্রশ্ন। অরুণের মুখে সহসা কোনও উত্তর জোগাইল না। একটু পরে সে কহিল,—তোমার একথা সত্য নয়, হাসি। বাবা যদি বেঁচেও থাকতেন তবুও আমাকে ক্ষমা চাইতেই হতো। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গিয়া সে বলিতে লাগিল,—আমার মনের সন্ধান কি করে জানবে তুমি, প্রতিদিন পলে পলে হৃদয় নিয়ে কেমন ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। এই দীর্ঘ পাঁচ বছর যে কি করে কেটেছে সে তো আমার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেউ জানে না। তুমি কি করে জানবে, কত ছলে বাপ-মার আদেশ-অনুরোধ উপেক্ষা করে আজও আমি সংসারী হইনি?

সুহাসিনীর বুক দুলিয়া উঠিল, চোখ ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, কিন্তু সে অতি কষ্টে মনের রুদ্ধ আবেগ সংবরণ করিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল।

সুহাসিনীর মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া অরুণ পুনরায় বলিতে লাগিল,—তুমি কি মনে কর হাসি, তোমাকে যত্ন করে পড়ানোর মধ্যে আমার কোনও স্বার্থ ছিল না? আমার যৌবনের স্বপ্ন তোমাকে আশ্রয় করে সফল হবে এ যদি আমার মনে না জাগ্‌তো তা হলে কে অত পণ্ডশ্রম করতো? যেদিন বাবার আদেশে সে সুযোগ হারালুম—সেইদিন থেকেও আমার মনে শান্তি নেই। তুমি ভেবেছ ওতে শুধু তোমাদেরই অপমান হয়েছে, কিন্তু কি করে বোঝাব, তার চেয়ে অপমানিত হয়েছে আমার আত্মা, আমার যৌবন-স্বপ্ন, আমার সম্মান। এতদিন যে আত্মা আমার গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদেছে সে কি কোনও দিনই শান্ত হবে না?

সুহাসিনী আবেগরুদ্ধ-স্বরে বলিয়া উঠিল,—অরুণ-দা' আর নয়, থাম।

অশ্রুসজল চক্ষে অরুণ কহিল,—তাহলে বল আমাকে ক্ষমা করেছ? বল, আমার প্রার্থনা পূরণ হবে?

দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া হাসি তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল,—না।

এতবড় আঘাত যে অরুণ আজ পাইবে ইহা সে ভাবিতেও পারে নাই। এতদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কি এম্‌নি করিয়াই সমাধি হইয়া গেল। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংবরণ করিয়া কহিল,—না? এই তোমার মনের কথা? বেশ, তা হলে চল্লুম।

অরুণ ঘরের বাহির হইতে না হইতেই সুহাসিনী

মনের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অরুণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সেই চাপাকান্নার সুর শুনিল, তারপর যখন সে ধীরপদে জানকীনাথের কক্ষে উপস্থিত হইল, তখন তাহার একচোখে হাসি, একচোখে অশ্রু!

জানকীনাথ সহাস্যে কহিল,—কি হলো অরুণ?

অরুণ করুণ-মধুর হাসি হাসিয়া কহিল,—মত পেলুম না। হাসি এখনও আমাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

জানকীনাথ উত্তেজিতভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল,—মত হলো না, ক্ষমা করতে পারেনি, এসব আবার কোন্ দেশী কথা? ওসব ছেলেমানুষী, বুঝলে না বাবা, একদম ছেলেমানুষী! যত-সব পাগলের কারবার আর কি! একবার ডাক দেখি হাসিকে, আচ্ছা না হয় আমিই যাচ্ছি। আমার আদেশ তাকে এবার শুনতেই হবে।…এই বলিয়া সত্যই সে উঠিবার উপক্রম করিল।

অরুণের মনের দ্বন্দ্ব এতক্ষণে সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে, সে স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। আমার যতটুকু পাওনা সে আমি পেয়েছি। এর চেয়ে বেশী আমার কামনা নেই।

এই বলিয়া সে ধীরপদে বাহির হইয়া গেল। জানকীনাথ কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, অরুণের কথার হেঁয়ালী সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে একবার অস্ফুটস্বরে কহিল,—তাই তো, এসব আবার কি কথা? তারপর তাহার শীর্ণদেহ শয্যা আশ্রয় করিল।

আলোচনা

১। কন্যাকাল

"ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা"য় (আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে) অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ঋগ্বেদের একটা ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া অর্থ লিখিয়াছেন,—

"সোম প্রথমে কন্যাকে বিবাহ করেন, তারপর গন্ধর্ব; তারপর অগ্নি বিবাহ করেন; শেষে সে মানুষের পত্নী হয়।"

ঋকটিতে বিদ্ ধাতু আছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ লাভ, প্রাপ্তি। বিবাহও ধরা যাইতে পারে। কন্যালাভ করা, আর কন্যা বিবাহ করা, একই কথা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কৃত অর্থে সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিনি অনুব্যাখ্যা করিয়াছেন, মেয়েরা প্রথমে সোমরস তৈরী করিতে শিখিত, তারপর নাচ শিখিত, তারপর মন্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে শিখিত, শেষে তাহাদের বিবাহ হইত।

এই অনুব্যাখ্যা ঠিক কিনা, বৈদিক পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। আমার কিন্তু সন্দেহ হইতেছে। নৃত্যগীত বালক-বালিকার স্বাভাবিক বটে, কলাকৌশল না থাকিলেও নৃত্যগীত হইতে পারে। কিন্তু সোমরস-নিষ্পাদন কিংবা অগ্নিস্থাপন বালিকার সাধ্যকর্ম ছিল কি? বেদের কালে কন্যারা নাচগান শিখিত কিনা, এখানে সে তর্ক নয়। ঋকটি হইতে কন্যার গৃহকর্ম শিক্ষা কেমনে আসিতেছে, সেটাই তর্ক।

গৃহ্যসূত্রেও আছে, কন্যাকে প্রথমে সোম ভোগ করে, পরে গন্ধর্ব, পরে অগ্নি, পরে মনুষ্য। ইহাতে বুঝি, তৎকালে প্রচলিত বিবাহ বয়সের পূর্বে কন্যার তিন কাল বা অবস্থা লক্ষ্য হইয়াছিল পরবর্তীকালের স্মৃতিশাস্ত্রেও তিন কাল পাই, গৌরী, রোহিণী, ও কন্যকা কাল।

বেদের, গৃহ্যসূত্রের, ও স্মৃতির বাক্যের অর্থ সামান্য দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করি। প্রথমে সোম কন্যাকে ভোগ করে। এখানে সোম, চন্দ্র। চন্দ্র গৌরবর্ণ। কন্যাকে সোম ভোগ করে, কন্যা গৌরবর্ণা বা গৌরী থাকে। (দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণাকন্যা ছিল না, অবশ্য ব্রাহ্মণ বর্ণের।) বয়স বাড়িলে কন্যা আর গৌরী থাকে না, একটু রাঙ্গা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে, কন্যা তখন রোহিণী, ঈষৎ রক্তবর্ণা হয়। গন্ধর্বদিগের বর্ণ কি ছিল, জানি না। হয়ত তাহারা রাঙ্গা ছিল। নতুবা গন্ধর্ব শব্দে এক জাতীয় মৃগ ও অশ্ব বুঝাইত না। অথবা, এই বয়সে কন্যার কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ ভিন্ন হয়। (গন্ধর্বদিগের কণ্ঠস্বর কেমন ছিল? গান্ধার?) গন্ধর্ব ভোগ করিবার পরে অগ্নি ভোগ করে, কন্যার দেহে তাপ জন্মে। আমরা বলি মানুষকে জ্বর ভোগ করে, মানুষের জ্বরভোগ হয়, মানুষ জ্বরাক্রান্ত হয়। কন্যার অগ্নিভোগ, ও অগ্নির কন্যাভোগ একই অর্থ। রজোদর্শনের পূর্বে কন্যা অগ্নিভোগ করে। ইহার পর কন্যার বিবাহ হইত, কন্যা মনুষ্যপত্নী হইত। ইহা হইতে বুঝি, বেদের ও গৃহ্যসূত্রের কালে গৌরীকালে কন্যাদান হইত না, পরে হইত। ইহার অন্য প্রমাণ গর্ভাধান-কর্তব্যে পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্র অগ্নিকালকে কন্যকা-কাল বলিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, কন্যকা-কালের পরে কন্যা আর কন্যা নাম পাইত না। স্মৃতিশাস্ত্রে কন্যার আট বৎসর বয়স পর্যন্ত গৌরীকাল, এবং নবম বর্ষে রোহিণী কাল। অবশ্য সকল কন্যা নবম বর্ষে রোহিণী হয় না,

অনেক কন্যা পরে হয়। স্মৃতিশাস্ত্র সংশয়ের অবকাশ না রাখিয়া ন্যূনতম বয়স ধরিয়াছেন।

—

২। আদলি উপরে কদলী

চণ্ডীদাসের এক পদে আছে,

আদলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে
ঐছন দেখি উরু-যুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ।

এটি শ্যামের রূপবর্ণনায় আছে।

কদলীবৃক্ষের সহিত উরুর উপমা প্রসিদ্ধ। কিন্তু আ-দ-লি কি বস্তু? চণ্ডীদাসের এক টীকাকার লিখিয়াছেন, আদলি ঘৃতকুমারী গাছের নাম। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও এই অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। (আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে "বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা"।)

এই অর্থে সন্দেহ হইতেছে। (১) বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী, কি অপর কোনও ভাষায় ঘৃতকুমারীর নাম আদলি আছে কি? আমার জানায়, নাই। টীকাকারের, বিশেষতঃ গুপ্ত মহাশয়ের জানা থাকিলে, সে প্রমাণের উল্লেখ দেখিতাম।

(২) কোনও ভাষায় শব্দটি না পাইলে, কেমনে অর্থ করা যাইবে? এখানে দুই উপায় আছে। (ক) কোন্ সংস্কৃত কিংবা দেশীয় প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশে কিংবা রূপান্তরে আ-দ-লি শব্দ আসিতে পারে? (খ) কোন্ কোন্ বস্তুর সহিত পেশল উরুর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে? তাহাদের মধ্যে কোন্‌টার নাম আ-দ-লি হইতে পারে? এই দুই উপায়ে যদি একই বস্তুর নির্দেশ না পাই, তাহা হইলে অর্থ অজ্ঞাত থাকিবে। টীকাকার অ-দলা শব্দ হইতে আ-দ-লা, এবং আ-দ-লা হইতে আ-দ-লি অনুমান করিয়াছেন। তা যেন হইল। কিন্তু অ-দলা শব্দের অর্থ কি? যাহার দল, কি-না, পাতা নাই? যদি এই ব্যুৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ঘৃতকুমারী হইতে পারে না। কারণ ঘৃতকুমারী পত্র-সর্বস্ব। বৈদ্যক গ্রন্থেও ইহার এক নাম স্থূলদলা—আর এক নাম দীর্ঘ-পত্রিকা।

দল শব্দে অংশ, অর্দ্ধাংশ বুঝায়। এই দুই অর্থ ধরিলেও ঘৃতকুমারীর পরিচয় পাই না। (খ) ঘৃতকুমারীর পাতার সহিত উরুর সাদৃশ্য দেখিতে পাই না, কোনও কবি দেখেন নাই। এখানে কিন্তু একটা কথা আছে। আদলি উপরে কদলী, যেমন অঙ্গুলী উপরে নখদর্পণ? দির জঙ্ঘার উপরে উরু-কদলী হইলে ঘৃতকুমারীর পাতার ঊর্দ্ধে কদলী রোপণ করিতে হয়। সে যে বিশ্রী দেখাইবে। ঘৃতকুমারীর পাতার তুল্য জঙ্ঘাও বিশ্রী। অতএব, আদলী উপরে কদলী জঙ্ঘার উপরে উরু নয়। হয়, আদলি ও কদলি, দুই-ই উরুতে বর্ত্তমান, একটির বাহিরে অপরটি; না হয় আদলি হইতে কদলী বাহির হইয়াছে। উরুকে যদি কদলী বলি, তাহা হইলে আদলিও সেখানে থাকিতে পারে না। অর্থাৎ প্রথম কল্প টিকিতেছে না। অতএব হয় জঙ্ঘা, না হয় নিতম্ব, এই দুই স্থানে আদলি খুঁজিতে হইবে। কিন্তু একটাতেও ঘৃতকুমারী মানায় না।

আদলি কি হইতে পারে? শব্দ বিদ্যা হইতে পাই, সংস্কৃত অদ্রি শব্দ অপভ্রংশে অ-দ-রি, অ-দ-লি, আ-দ-লি হইতে পারে। অদ্রি অর্থে পর্বত। কবি বলিতেছেন, "তাহার উরু দেখিতেছি যেন কেহ পর্বতে কদলী রোপণ করিয়াছে।" পর্বতে কদলীবৃক্ষ জন্মে না, এখানে তাহা সম্ভব হইয়াছে। নিতম্বদেশ পর্বতসদৃশ হইয়াছে। এই অর্থেও একটু বাধা আছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিতেছেন। পুরুষের নিতম্ব বর্ণনা কবিকুলোচিত নয়। রাধিকার হইলে বাধা থাকিত না। রাধিকার রূপবর্ণনায়, কবি বলিয়াছেন, "গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি, উরু করিকর পারা।" শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাধা হইতেছে বটে, কিন্তু আদলি কদলীর আর কোনও অর্থ সঙ্গত হইতেছে না। তা ছাড়া, যে কবি কৃষ্ণকে রম্ভোরু বলিয়াছেন, তিনি রম্ভাবৃক্ষের উৎপত্তিও বলিতে পারেন। দূর হইতে অদ্রি নবজলধরের তুল্য নীলবর্ণ দেখায়। সে বর্ণ অতসী ও কানড় (নীল উৎপল) কুসুম অপেক্ষা গাঢ় বটে, কিন্তু যে কবি নীরদবরণ কালার গণ্ডে জবাফুল, ওষ্ঠে বিম্বফল, দেখিয়াছেন তিনি নিতম্বে অদ্রির নীলিমা দেখেন নাই কি?

সংস্কৃত ভাষায় অদ্রি শব্দের আরও অর্থ আছে। এক অর্থ, সূর্য্য। কিন্তু এখানে সূর্য্য আসিতে পারে না। আর এক অর্থ, বৃক্ষ। কিন্তু, বৃক্ষের উপরে কদলী রোপণ সঙ্গত হইতেছে না। পদদ্বয়কে বৃক্ষ কল্পনা করিয়া ঊর্দ্ধভাগে কদলীসাদৃশ্য? ভাল বোধ হইতেছে না।

—

৩। শারদ পূর্ণিমায় মল্লিকা

চণ্ডীদাসের আর এক পদে আছে,

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি।

এখানে প্রথমে জিজ্ঞাস্য, শারদ পূর্ণিমা কোজাগরী পূর্ণিমা, না রাসপূর্ণিমা? কোজাগরী পূর্ণিমার এক মাস পরে রাসপূর্ণিমা। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,

রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।

পদটি ভাগবত পুরাণের রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথমেই আছে। অতএব ভাগবতকার শারদ পূর্ণিমা অর্থে রাসপূর্ণিমা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে মল্লিকার (বনমল্লিকার) পুষ্প থাকে না। বর্ত্তমান-কালে এইরূপ। দুই হাজার বৎসর পূর্বে ঋতুকাল এক মাস অগ্রে ছিল। তখনকার রাসপূর্ণিমা ঋতুতে বর্ত্তমান কোজাগরীর তুল্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কোজাগরী পূর্ণিমার সময়ে মল্লিকা ফুল পাওয়া যায় কি? মৃত্তিকা ও জলবায়ুভেদে পুষ্পকালের প্রভেদ হয়। ভাগবতকার কোন্ দেশে থাকিয়া শরৎকালে মল্লিকা উৎফুল্ল হইতে দেখিয়াছিলেন?

কিন্তু চণ্ডীদাসই বা কোথায় দেখিয়াছিলেন? তিনি মালতীকেও বিকশিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই মালতী বাংলা নামের মালতী, না সংস্কৃত নামের? সংস্কৃত ভাষায় মালতী অর্থে জাতি বা চামেলী। কোজাগরী পূর্ণিমার সময়ে চামেলী ফুল প্রায় শেষ হইয়া আসে। বাংলা ভাষায় মালতী দীর্ঘ লতা। ইহারও ফুলের শেষ কাল। ভাগবতকার মালতীর নাম করেন নাই, কেবল মল্লিকা বিকশিত হইতে দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাস, মল্লিকা মালতী (জাতি), দুই-ই দেখিয়াছেন। বসন্তের পুষ্প শরৎকালে দেখিয়া যদি কেহ বলেন, কৃষ্ণের মহিমা, তাহা হইলে কথা নাই। কিন্তু কাব্যে দোষ পড়ে। বোধ হয়, বাহ্য দৃষ্টি না করিয়া কবি মনে মনে বসন্তকাল কল্পনা করিয়াছেন। তখন "শুক পিক সারী", "ভ্রমর ঝঙ্কার", 'মলয় পবন", আর "মল্লিকা মালতী, আর জাতি যূথী", সবই আসিয়াছে।

* রাসপঞ্চাধ্যায়ের আর এক স্থানে (৪৫।১০) আছে, "যমুনা পুলিনে শরচ্চন্দ্র তিমির নাশ করিতেছিলেন, প্রফুল্ল কুন্দ ও মন্দার বায়ু সহকারে সুরভি বিস্তার করিতেছিল।" মন্দার দেবদারু সদৃশ

বৃক্ষ হইতে পারে। এই অজ্ঞাত বৃক্ষ ছাড়িয়া দি ই। কিন্তু শরৎকালে কুন্দ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে দেখি না। যদি বা কোথায় ফোটে, সে সময় শেষকাল। মৃত্তিকা ও জলবায়ু গুণে পুষ্পকালের প্রভেদ হয়, মল্লিকা ও কুন্দের এমন জাতও থাকিতে পারে, যেটা শরৎকালেও ফোটে। কেহ দেখিয়াছেন কি-না, এই কথা। রাসপঞ্চাধ্যায়ে আর একটা নূতন কথা পাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী শব্দে গোপীরা বৃন্দাবনে সমাগত হইলে তিনি সহসা অদৃশ্য হইলেন। তখন গোপীরা আকুল প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে বৃক্ষগণকে তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথমে উচ্চ মহাবৃক্ষ অশ্বথ, প্লক্ষ (পাকুড়), ও বটবৃক্ষকে; তারপর স্বপুষ্প দ্বারা বহু উপকারী, কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, ও চম্পক বৃক্ষকে; তারপর কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে; তারপর গুণশালী হইয়াও নম্র মালতী, মল্লিকা, জাতি, যূথীকে; তারপর ফলাদিহেতু সর্বপ্রাণীর প্রিয় চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, ও নীপ ও যমুনা তীরবর্তী পরার্থজীবন অন্যান্য বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কি হেতু এক এক দলের বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রীধরস্বামী বলিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, গাছগুলি চিনিতে বসি।

কুরুবক বা কুরবক রক্তপুষ্প ঝিণ্টিজাতি। নাগ, নাগকেশর। পুন্নাগ, ওড়িষ্যা হইতে দক্ষিণদেশে প্রসিদ্ধ। দেখা যাইতেছে, মালতী ও জাতি, চূত ও আম্র, কদম্ব ও নীপ, এক নয়। কথাটা শ্রীধরস্বামীকে ঠেকিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, মালতী জাতি, চূত আম্র, কদম্ব নীপ. অবান্তর জাতিভেদ। অর্থাৎ, এক এক জাতির জাত (variety)। সে অবান্তর-বিশেষ প্রদর্শনে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না, আমরাও বুঝিতে পারিতেছি না। নীপ দ্বারা দুই জাতি কদম্ব বুঝাইতে পারে। এখানে বোধ হয়, নীপ কেলিকদম্ব। মালতী কি পাহাড়ে ভূমির দীর্ঘ বল্লী জাতি? চূত কি অংশু-বহুল আম্র, যাহা চুষিয়া খাইতে হয়? কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), প্রিয়াল (পিয়াল), অসন (আসন গাছ), এই তিনও পাহাড়ে দেশের গাছ। কিন্তু এ-সকলের সঙ্গে, ছোট অর্ক (আকন্দ) মনে আসিল কেন? ইহার কোনও অংশ ত প্রাণী-সেব্য নয়। যদি ভাগবতপুরাণকার তাঁহার সর্বদা দৃষ্ট বৃক্ষগুলির নাম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি আর্যাবর্তবাসী ছিলেন না?

ভাগবতপুরাণ মুমুক্ষুর মোক্ষ শাস্ত্র। উৎকৃষ্ট কাব্যও বটে। কাব্য-অপদেশে পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। কাব্যরস ও উদ্দেশ্য ছাড়িয়া এই যে বাহ্য নীরস কোষ আস্বাদ করিলাম, মন্দমতি সংসারী জীবের কর্ম্ম ই বটে।

আষাঢ়, ১৩৩৬ — শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

"টেবুফিলিয়া"

১৩৩৫ সনের মাঘের "প্রবাসী"তে প্রবোধবাবু টেবু সম্বন্ধে যা লেখেন তাতে প্রতিবাদ্য কিছু আছে বলে মনে হয় নাই। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ অনেক সময়েই 'এ কর' 'এ করোনা' এই প্রকার যুক্তিবিচারহীন আদেশের দ্বারায় চালিত হয়। তার মধ্যে মস্ত যুক্তি থাকতে পারে, মস্ত একটা বিজ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু সে যুক্তিটা না জেনে তার দ্বারা চালিত হওয়ায় আমি যে মনুষ্যত্বের বাইরে যাই টেবুর মধ্যে বিজ্ঞানাবিষ্কারের ঝোঁকে নিবারণবাবু সেটা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। টেবুগুলিকে তিনি দু'ভাগ করেছেন—শাস্ত্র ও মেয়েলি সংস্কার। তাতে বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু মেয়েলি সংস্কার অর্থহীন আর শাস্ত্রবচন স্মরণাতীত কাল হতে চলে এসেছে—এই যে তিনি দু'টির মধ্যে বিরুদ্ধ পক্ষ (contrast) স্থাপন করতে চেয়েছেন তা হয় নাই। তার পর শাস্ত্রবচনও অর্থহীন হয় এবং মেয়েলি সংস্কারও স্মরণাতীত কাল হতে চলে আসতে পারে—তাতে কিন্তু কিছুই মীমাংসা হয় না। আসল কথা তো এই—অনেক শাস্ত্র মাত্র এক সময়ের মেয়েলি সংস্কার শাস্ত্রবচনে পরিণত করেছেন এবং অনেক শাস্ত্রবচন মেয়েলি সংস্কারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একটা অর্থহীন, অন্যটা স্মরণাতীত কাল হতে চলে এসেছে বললে কিছুই বলা হলো না।

নিবারণবাবু যে কোন কথাই ভেবেচিন্তে বলেন নাই তার পরিচয় পদে পদেই পাওয়া যায়। প্রাচীনদের মনে "বৈজ্ঞানিক শক্তির বীজ উপ্ত" থাকলে নবীনদের কি লাভ হবে তা একটুও বুঝা গেল না। 'জ্ঞান গরিমায়' প্রাচীনেরা আধুনিকদের হতে অবনত ছিলেন না তার পরিচয় পেয়ে আমাদের যে কি লাভ তা বুঝিয়ে দিলে ভাল হতো। কেন না, রামায়ণ মহাভারত বলে কোন্ যুগ বুঝায় তা যেমন তিনি নির্দ্ধারণ করে দেননি, তেমনি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে আকাশযানের সৃষ্টি হয়েছে বলে সেকালের শূন্যপথে যাতায়াতের ব্যবস্থার কি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল তার 'হকুত হাল'ও দিলি করেন নি। যেহেতু, যুদ্ধে 'ট্যাঙ্ক' আবিষ্কারের পূর্ব্বেই Well সাহেব তার আজগুবী গল্প-সকলের মধ্যে তার অবতারণা করেছিলেন; সবমেরিণের যখন কল্পনাও হয় নাই তখনকার গল্পেও সমুদ্রতলবাহী যানের বলে মানুষ দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করেছে, ছেলেদের গল্পে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। বোধ হয় নিবারণবাবুও একথা স্বীকার করবেন যে আমাদের প্রাচীনেরা গল্পলেখার কল্পনা গরিমায় পাশ্চাত্যদের অপেক্ষা কোন অংশেই অবনত ছিলেন না।

হিন্দুর প্রাণায়াম জিনিষটি যদি ফুসফুসের ব্যায়ামের একটা প্রক্রিয়াই হয় এবং প্রাচীনেরা সেটা ধর্ম্মের নামে চালাইয়া দিয়া থাকেন তবে তাঁরা খুব বিজ্ঞানসম্মত কাজ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কেন না, প্রাণায়াম করতে যে বহুলোক অতি মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়েছিল বলে শুনেছি। যা হোক, নিবারণবাবুর আর একটি যুক্তির কথা বলেই শেষ করি। যেহেতু গ্রহণাদি ঘড়ির কাঁটার মতন মিলে যাচ্ছে যাঁদের' গণনানুসারে, তাঁদেরই গণনানুসারে "ত্রয়োদশীতে বেগুন খাইতে নাই" মানিবে না কেন? আমরাও বলি, সেই শাস্ত্রানুসারে সত্যযুগে মানুষ ২১ হাত লম্বা ছিল, লক্ষ বছর বাঁচিত মানিতে আপত্তি কি? নিবারণবাবু ভুলে গিয়েছেন, পঞ্জিকায় যা কিছু আছে তার গণনা এক বিজ্ঞানের নয়, এক প্রক্রিয়ার নয়। ঘড়ির কাঁটায় মিলে যাওয়ার কথাটাও নিবারণবাবুর মনঃকল্পিত। কেন না, 'আবহ' বিষয়ে যা আছে, তা কদাচিৎ মিলে, অধিকাংশ স্থলেই মিলে না। এইরূপ আরও অনেক তত্ত্ব আছে বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা গেল না। জ্যোতিষেরও কি সব মিলে? মিলে যখন Naval Almanac অনুসারে গণনা হয়। নতুবা এদিক-সেদিক হয়। নিবারণবাবু বোধ হয় সব পঞ্জিকাগুলি নিয়ে কখনও বিচার করেন না। আমাদের পঞ্জিকা বহুদিন সংস্কৃত হয় নাই এবং গ্রহণের গতিবিধিও বহুদিনে নড়চড় হয়। এই তো ১০ই চৈত্র দিনরাত্রি সমান হয়, কিন্তু সংক্রান্তি ফেলে রাখা হয় চৈত্রের শেষদিন পর্য্যন্ত। বরাহ মিহিরের পর ১৪ শত বছরে আর সংশোধন হয় নাই, কিন্তু সূর্য্যের স্থান পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এটা অদ্ভুত যুক্তি, যেহেতু পঞ্জিকার একদিকের কথা যখন মেলে তখন সবকথাই সত্য বলে মানতে হবে। সম্প্রতি Mr. Leonard C. Wooley U1-এর খননকার্য্যে বাইবেলোক্ত জলপ্লাবনের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছেন। সুতরাং বাইবেলে যা—কিছু আছে সব সত্য। এরূপ যুক্তি প্রাচীনকালে হয় তো খাটতো! বিংশ শতাব্দীতে থেকে দশম শতাব্দীতে বাস করতে হবে, এ কথা পঞ্জিকায় লেখে না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ

জিজ্ঞাসা

(১)

পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষের যে যে দেশের যে যে নাম ছিল, তাহার বর্ত্তমান পরিচয় কোনো পুস্তকে আছে কি না? থাকিলে তাহার প্রাপ্তিস্থান কোথায় ও মূল্য কিরূপ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীরামানুজাচার্য্য গোস্বামী

(২)

নিম্নলিখিত প্রবাদটির মধ্যে যে যে ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে তাঁহারা কে? ইঁহাদিগের মধ্যে কেবলমাত্র জগৎশেঠের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়—

"বনোমালি সরকারের বাড়ী, আমিন চাঁদের দাড়ী।

গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি, জগৎশেঠের কড়ি॥"

শ্রীঅমরচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(৩)

বাংলা দেশে অথবা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের উপযোগী আধুনিক ধরণের ইংরাজী মাসিক পত্রিকা আছে কি? থাকিলে তাহার মধ্যে কোন্‌খানি শ্রেষ্ঠ? তাহার বাৎসরিক মূল্য কত, কোন্‌খানে পাওয়া যাইতে পারে, এবং সম্পাদক কে?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাস

(৪)

বাংলা দেশের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস আছে কি? থাকিলে কোথায় পাওয়া যায় এবং তাহার মূল্য কত?

শ্রীনীহাররঞ্জন বসু

(৫)

কোনও দেবকার্য্য (পূজা, দান ইত্যাদি) করিতে হইলে সাধারণতঃ দেখা যায়, পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া করে। অন্য কোনো মুখে না বসিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া পূজা, দানাদি করার উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় বা অন্য কোন যুক্তি আছে কি?

(৬)

এতদ্দেশে সংস্কার আছে যে, পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে পিতার উত্তরমুখে বসিয়া আহার করা নিষিদ্ধ, এই সংস্কারের মূলে শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি?

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৭)

প্রবাসীর কোন পাঠক নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুইটির উত্তর প্রদান করিলে অনুগৃহীত হইব।

(ক) লাইবিরিয়া এবং দক্ষিণ-আমেরিকার সার্ব্বজনীন ভাষা কি?

(খ) জ্যোতিষ (Astronomy) সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন পুস্তক আছে কি না? থাকিলে, নাম কি, মূল্য কত এবং কোথায় প্রাপ্তব্য?

শ্রীসুনীলবরণ রায়

ফকির আখ্‌তার উদ্দীন্ আহ্‌মদ

মীমাংসা

খনা

সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার দশম ভাগের (১৩১০ সালের) প্রথম সংখ্যায় খনা-বৃত্তান্ত দিয়াছিলাম। তখন সন্দেহ ছিল, খনার বচনের রচয়িতা বাগ্‌যন্ত্রের দোষে হয়ত খনা ছিলেন। পরে সে সন্দেহ গিয়াছে। তাঁহার বাগ্‌যন্ত্রের দোষ ছিল না। তাঁহার বংশপরিচয় না পাইয়া কুতূহলী মনে অপূর্ব কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে! তিনি 'ক্ষণ' (যেমন দিন-ক্ষণ) বিচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম ক্ষণা, খনা। পূর্বকালে এক শ্রেণীর জ্যোতিষীর নাম 'ক্ষণিক' ছিল। তাঁহারা শুভক্ষণ, অশুভক্ষণ বিচার করিতেন। বাংলার খনা, ক্ষণিকের সজাতি। তিনি পুরুষ ছিলেন, বোধ হয় এক নয়, অনেক। যে বচনে ক্ষণ বিচার নাই, জ্যোতিষফল নাই, সে বচন খনার নয়। সে বচন, ডাকের। সভ্য অসভ্য সকল জাতির মধ্যে বহু দর্শনের ফল স্বরূপ নীতি-বাক্য আছে। সে-সব বাক্যের কল্পিত কর্ত্তার সাধারণ নাম, ডাক। যদি বা বাঙ্গালী খনার কাল নির্ণয় সম্ভাব্য, ডাকের কাল নির্ণয় অসম্ভাব্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা

রেঃ লঙ্‌ সাহেবের তদানীন্তন দেশীয় সামরিক পত্রিকা-সংক্রান্ত রিপোর্ট (১৮৫৭ খৃঃ XLVI পৃঃ) দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, "সত্য-সঞ্চারিণী" পত্রিকা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় বৈদান্তিক সভার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা নারীশিক্ষা-প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। ইহাতে নানারূপ নীতিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার আয় কোন এক স্কুলে প্রদত্ত হইত।

লঙ্‌ সাহেবের ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের তালিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই পত্রিকার মাসিক মূল্য দুই আনা নির্দ্ধারিত ছিল এবং ইহা মাত্র দুই বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রকাশের সময় উল্লেখ নাই; তবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্রিকার নিম্নে ইহার উল্লেখ আছে।

আবার তাঁহার সাময়িক-পত্র সংক্রান্ত বিবরণীতে (XLIII পৃঃ) ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বেদান্তসভার মুখপত্ররূপে "সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা" নামক একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবার কথা উল্লিখিত আছে।

আবার "সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী" নামে নবকৃষ্ণ বসু ও ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদকতায় হিতৈষিণী সভার মুখপত্ররূপে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বৈদান্তিক বিষয়ক একখানি পত্রিকার উল্লেখ আছে, ইহার আকার দ্বাদশাংশিত ১৬ পৃষ্ঠা; বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা। ইহা পাঁচ শত করিয়া ছাপা হইত।

বাঙলা ১২৪৬ সালে ১লা আষাঢ় হইতে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "সংবাদপ্রভাকর"কে দৈনিকরূপে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় "প্রভাকরে"র লেখকরূপে ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত আমরা শ্যামাচরণ বসুর নাম উল্লেখ দেখিতে পাই।

শ্রীগৌরীহর মিত্র

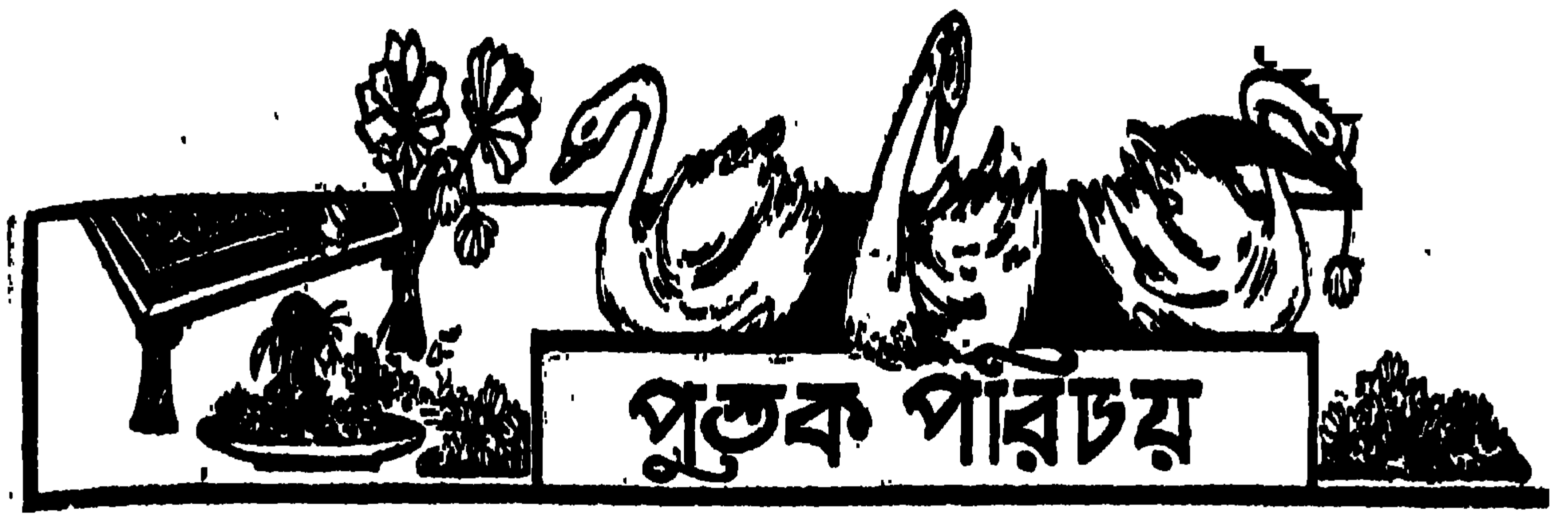

জীবনস্মৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর শান্তিনিকেতনে যে উৎসব হইয়াছিল, তখন এই পুস্তকের হস্তলিপি মহিলা অতিথি ও পুরুষ অতিথিদের নিকট কবি পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার পর ইহা মুদ্রিত হয়। মুদ্রণ কয়েকবার হইয়াছে। প্রথম হস্তলিপিতে যাহা ছিল, মুদ্রিত পুস্তকে তাহার সামান্য কোন কোন অংশ নাই। কিন্তু সেগুলি পরিমাণে কম হইলেও উৎকর্ষে কম নহে। ভবিষ্যৎ কোনও সংস্করণে সেগুলি—অন্ততঃ পরিশিষ্টে—মুদ্রিত হইলে পাঠকদিগকে আনন্দিত করিবে।

বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা বর্ত্তমান মুদ্রণ সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বহিখানি সকলেরই পুনঃ পুনঃ পঠনীয়—বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পঠনীয় যাঁহারা ইহার রচনাকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিম্বা শিশু ছিলেন।

যাত্রী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংস্করণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই বহিখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জাতীয় নহে। কবি কি যানে কোথায় যাইতেছেন, থাকিতেছেন, সে-সব উপলক্ষ্য মাত্র। ইহার প্রকৃত সারবস্তু মানবীয় বিবিধ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য। মন্তব্যগুলির প্রাণ তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্য, এবং রূপ তাঁহার অনন্যসুলভ কবিত্বপূর্ণ ভাষা। পুস্তকখানির বিস্তৃত পরিচয় পরে দিবার ইচ্ছা রহিল।

ইহা বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা হওয়ায় পড়িতে ভাল লাগে।

শ্রীনিবাসের ভিটা (রূপক নাটিকা)—শ্রীহেমলতা দেবী। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি, ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

ইহা সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। প্রাচীন গৌরবের অভিমানে বিভ্রান্ত হইয়া থাকা অনুচিত, প্রাচীন ও জীর্ণ যাহা, তাহার সংস্কার আবশ্যক; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, বর্ত্তমানে আমাদিগকেও পরিশ্রম করিতে হইবে; সেই দেশের কাজ ভাল চলে, যেখানকার লোকসমষ্টিই রাজা, এবং সেই দেশের রাজাই প্রকৃত রাজা যিনি দশের একজন;—এইরূপ নানা কথা লেখিকা এই নাটিকার আকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মেয়েদের কথা—শ্রীহেমলতা দেবী। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

নারীদের কিসে মঙ্গল হয় এবং তাঁহাদের জন্য কি করা উচিত, সে-বিষয়ে নারীদের বক্তব্য বিশেষভাবে শুনিবার যোগ্য। শ্রীমতী হেমলতা দেবী নারীর মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত আছেন, তিনি তাঁহাদের কিসে ভাল হয় সে-বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া থাকেন; তাহা করিবার যোগ্যতাও তাঁহার আছে। এইজন্য এই বহিখানি নারীহিতৈষী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। ইহার অনেক বাক্য আমরা উদ্ধৃত করিবার জন্য দাগ দিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ কেবল একটি প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"আমাদের বাঙালী ঘরে মেয়ে-জীবনের প্রধান সমস্যা তিনটি; অন্যান্য ছোটখাট সমস্যাগুলি তার অন্তর্গত। প্রথম মেয়েদি'কে অধীন রাখা ভালো কি তাদের স্বাধীন করে দেওয়া ভালো। দ্বিতীয়—শিক্ষা মেয়েদের দিতেই হবে, এটা এখন একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত, তবে তা'দি'কে উচ্চশিক্ষিতা করা ভালো কি অর্দ্ধশিক্ষিতা অবস্থায় রেখে তাদের দ্বারা সমাজের, পরিবারের, দেশের ও পৃথিবীর সেবা করানো ভালো। তৃতীয়—অজ্ঞানে, বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিয়ে ছোট থেকে তাদের শ্বশুরঘর করানো ভালো কি সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় কর্ত্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধের সঙ্গে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের গুরুভার তারা প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করবে সেটা ভালো। ভালো কোন্‌টা সেই হচ্ছে কথা। যা ভালো তাই যে সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না। এখন ভেবে দেখতে হবে, মেয়েদের নিজের জীবনের ভালো কিসে এবং পরিবার, সমাজ, দেশ, ও পৃথিবীর ভালো তারা করতে পারে কি উপায়ে।

"প্রথম স্বাধীন হওয়ার কথা। পুরুষের সঙ্গে অবাধে মিলতে মিশ্‌তে পাওয়ার নামই মেয়েদের স্বাধীন হওয়া—সাধারণতঃ এই একটা ভুল ধারণা দেশের স্ত্রীপুরুষ সকলের মনে জন্মে গেছে। পুরুষকে শুধু পুরুষ বলেই জেনে যে-মেয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশার জন্য লালায়িত, সে মেয়ে অশিক্ষিতা। তাকে শিক্ষিতা করা বিশেষ প্রয়োজন। পুরুষকে যিনি পুরুষের অতিরিক্ত মানুষ বলে দেখতে ও চিনতে শিখেছেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষিতা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁর অবাধ গতি—মেয়ে হ'য়েও তিনি সত্যিকার মানুষ। বাঙালী মেয়েরা কেবল পুরুষের সঙ্গে মিশবার জন্য স্বাধীন হতে চান—এই স্বাধীনতাই তাঁদের বাঞ্ছনীয়, তাঁদের সম্বন্ধে এই মিথ্যা ধারণাটি ভেঙে দিয়ে সত্য সত্য কোন্ অধীনতায় তাঁরা পীড়িত, মর্ম্মাহত, দুঃস্থ,—কোন অধীনতায় তাঁদের আত্মা খর্ব্ব, লাঞ্ছিত, অপমানিত,—শতশত বাঙালী মেয়ে কোন্ অধীনতায় বিপন্ন, সেটি ভেবে দেখা দরকার। সেটি হচ্ছে দায়ভাগে তাদের অনধিকার। বাঙলার হিন্দুঘরে মেয়ের বিশেষভাবে এই জন্য বিপন্ন।

"হিন্দুঘরের মেয়েরা বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বৈধব্য সকল অবস্থাতেই দায়ভাগে অনধিকারবশতঃ নানাপ্রকারে পীড়িত হয়ে থাকেন। বৈধব্য দুর্দ্দশার চরম। হিন্দুঘরের বাড়ীর কর্ত্তার মৃত্যুতে আশ্রিত বিধবা কন্যার, বিধবা পুত্রবধূদের, ভাই-ভাজ-দেবর-ভাসুরের সংসারে স্থান কিরূপ, সেই সংসারে দু'বেলা তাঁদের পেটে কি ভাবে

অন্ন যায় ভুক্তভোগীমাত্রেই তা জানেন। এই পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা, তাদের আত্মাকে কতদূর খর্ব্ব ও মনকে কতদূর সঙ্কুচিত করে ফেলে, একটুখানি চিন্তা করলেই বেশ বোঝা যায়। এই অবস্থায় তাঁরা আত্ম পর কারোই যথার্থ কল্যাণসাধনে সমর্থ হন না—হওয়া সম্ভবও নয়। কল্যাণ জিনিষটি কি? মানবজীবনে একটি অচল, অটল, স্বাধীন, সাত্ত্বিক শক্তির জাগরণের নামই কল্যাণ। কোন অধীন বা খর্ব্ব আত্মাতে এই শক্তি যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত হতেই পারে না। তাই সর্ব্বাগ্রে মানবাত্মার স্বাধীনতার প্রয়োজন। মেয়েদের যাঁরা যদি দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ চান তবে তাদের মন, বুদ্ধি:কে শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত, জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বল ও দায়ভাগে যথাযথ অধিকার দানের দ্বারা তাদি'কে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত শক্তিলাভে সমর্থ করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা তারা যথার্থভাবে মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারবে না। মেয়েপুরুষ উভয়ে মানুষ না হলে দেশেরই বা উপায় কি, পৃথিবীরই বা কল্যাণ কোথায়? যাঁরা বাল্যবিবাহনিবারণ আইন তৈরীর জন্ম ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁরা সর্ব্বাগ্রে দায়ভাগে নারীর অধিকার স্থাপন আইনের জন্ম একান্তভাবে উদ্যোগী হোন—এর ফলে বাল্যবিবাহ আপনা আপনি বহু পরিমাণে স্থগিত হয়ে আসবে—বেশী চেষ্টা করতে হবে না।

"দ্বিতীয়—শিক্ষার কথা। যে মেয়ে উচ্চশিক্ষা এবং অত্যুচ্চ শিক্ষা বা বিশিষ্ট জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার সামর্থ্য রাখেন, তাঁকে তা' হ'তে দেওয়ার মত সুযোগ ও সুবিধা সামাজিক ব্যবস্থায় করে' দিতেই হবে—না দিলে পৃথিবীর মহা অকল্যাণ ঘটবে।

"সকলের উন্নতিতেই যে পৃথিবীর উন্নতি, এ কথা জ্ঞানীমাত্রেই জানেন। অতএব, মেয়েদের উচ্চজ্ঞানলাভের পথ সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করে দিতে হবে। জ্ঞানের পথই ঈশ্বরানুমোদিত সত্য ও কল্যাণের পথ। এ থেকে জগতের কোন মানুষকে বঞ্চিত করা চল্‌তে পারে না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কথায় যারা ভীত, চিন্তিত, আতঙ্কিত, উচ্চশিক্ষিতাদের দ্বারা অধিকতর অধর্ম্মাচরণ হবে ভেবে যাঁরা শিউরে উঠেন, তাঁদের ভেবে দেখ্‌তে হবে যে, মূঢ়া, অশিক্ষিতা মেয়েদের অধর্ম্ম বা পাপ-প্রবণতাকে গৃহরুদ্ধ ও শাসনাধীন রাখ্‌লেই কি তাঁরা সাম্‌লাতে পারবেন? শিক্ষা বা জ্ঞানের দ্বারা তাদের সেই প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটানো ছাড়া উন্নতির আর কোন সত্য পথ আছে কি?

"তৃতীয়—বিবাহিত জীবনের কথা। বিবাহের দ্বারা স্বামীর পরিবারের সঙ্গে যোগযুক্ত হ'য়ে শ্বশুরঘর করা মেয়েদের জীবনের পক্ষে ভালো অর্থাৎ কল্যাণকর কিনা। এবং যদি তা ভালো হয়, তবে বড় হয়ে শিক্ষিতা হ'য়ে জ্ঞানলাভ করে মেয়েরা শ্বশুরঘর করতে গেলে পরিবারের পক্ষে সেটা ইষ্টকর হবে কিনা। বাঙালী সভ্যতার পারিবারিক সম্বন্ধ বিন্যাসরূপ প্রথা বাঙালী চিত্তের একটি উৎকৃষ্ট বিকাশ। মেয়েদের শ্বশুরঘর করা এই প্রথার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। মেয়েরা শ্বশুরঘর করতে না গেলে সম্বন্ধস্থাপন হবে কাকে নিয়ে? সুসঙ্গত সুন্দর সম্বন্ধবিন্যাস প্রথাটি বাঙালী-জীবনে যে সুখনীড় রচনা করে, সেটি ভেঙে দিলে বাঙালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য একেবারে নষ্ট করা হবে। কোন্ বুদ্ধিমতী বাঙালী মেয়ে শিক্ষিতা হ'য়ে দেশের এই চিরসুন্দর গঠন-প্রণালীটিকে নষ্ট করে তুষ্ট হবেন? যদি হন, তবে সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী নামটি যেন তিনি মুছে ফেলেন। তিনি আর সব কিছু হতে পারেন, কিন্তু বাঙালী মেয়ে ন'ন্ জান্‌তে হবে।

"শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েরা সতর্ক হোন, সচেতন হোন্—বাঙালীর এই চিরসুন্দর সম্বন্ধপ্রথা বজায় রেখে তার যথোপযুক্ত সম্মান তাঁরা রক্ষা করুন। ধৈর্য্য ধরুন, সকলকে সহ্য করুন। নিজের ও অন্ত সকলের একসঙ্গে মঙ্গল কামনা করুন। কাউকে ছেড়ে কারো মঙ্গল নাই। এই সত্য সম্বন্ধবিন্যাসরূপ প্রথার মধ্যে দিয়ে বাঙালী জগৎকে শিখিয়েছে। সে শিক্ষা থেকে শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েরা যেন ভ্রষ্ট না হন। এই শিক্ষাই বাঙালী মেয়েদি'কে দেশের কাজ, দশের কাজ, পৃথিবীর কাজে যোগ্য করে তুল্‌বে, সন্দেহ নাই। শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞানলাভ ও সম্বন্ধস্বীকার এই চারগুণের সম্মিলনে প্রকৃত কল্যাণ। বাঙালী মেয়েরা শিক্ষিতা হ'য়ে এই চারগুণে গুণবতী হ'লে তবেই সুন্দর ও সুচারুরূপে সংসারধর্ম্ম পালনে সক্ষম হবেন। সজ্ঞানে, স্ব-ইচ্ছায়, কর্ত্তব্যবোধ দায়িত্ববোধের সঙ্গে দেশের মেয়েরা এই পরম সুন্দর গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের জন্ম প্রস্তুত হোন,—এই প্রার্থনা।"

বিদ্রোহী শূদ্র—শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী: হিন্দুমিশন, ৭ নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য চারি আনা।

সকল জাতির লোকের সমান সামাজিক ও অন্ত অধিকার লাভের চেষ্টার আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এই চেষ্টা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিদ্বেষ উৎপাদন না করিয়া করা উচিত এবং করা অসম্ভব নহে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা সাধু। আমাদের অনুরোধ তিনি ভবিষ্যৎ সংস্করণে শ্রেণীযুদ্ধের ভাবটা যথাসম্ভব বাদ দিবেন। তিনি যাহা চান, বর্ত্তমান লেখকের আচরণ তদনুরূপ বলিয়া এই অনুরোধ করিতে সাহস করিলাম।

র-চ—

পাগলামির পুঁথি—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সী-এস্ প্রণীত। প্রকাশক এম্-সী-সরকার এণ্ড সন্স্, কলিকাতা।

আজকাল বাঙ্গালা দেশে সমাজের হিতসাধনাকে কর্ম্মজীবনের এক প্রধান ব্রত বলিয়া যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত তাঁহাদের একজন অগ্রণী হিসাবে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। ইঁহার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর নামের সহিত জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলি বঙ্গদেশে নারী-শিক্ষা ও নারী-মঙ্গল বিষয়ে বিশেষ উপযোগিতার সহিত কার্য্য করিতেছে। রাজকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

রাজকার্য্য ও জনসেবা ব্যতীত, সাহিত্যের দিকেও শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের প্রশংসনীয় চেষ্টা ও শক্তি আছে। ছেলেদের জন্ম ও জনগণের জন্ম ইতিপূর্ব্বেই তিনি বহু কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন। ইংরেজী ছেলেদের ছড়া ও অন্ত শিশু সাহিত্যকে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত বাঙ্গালী ছেলেদের উপভোগ্য করিয়া শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীদের হাতের সুন্দর চিত্রে ভূষিত তাঁহার "ভজার বাঁশী" নামক সুদৃশ্য ও সুপাঠ্য ছোট বইটিতে প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় শিশু-সাহিত্যে তাঁহার একটি নূতন দান। বইখানি "আবোল-তাবোল" জাতীয়। বাঙ্গালা ভাষায় কবি ও অন্ত লেখক ইংরেজী হইতে নানা ছন্দ আহরণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন—অমিত্রাক্ষর ছন্দ সনেট, তের্‌ৎসা-রীমা, মুক্ত-ছন্দ, ও নানা ইউরোপীয় পদ্যবন্ধ এখন বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইয়া এই ভাষার ছন্দগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজীর একটি চুটকী ছন্দ Limerick নামে প্রসিদ্ধ; দিগন্ত শতকের, মধ্যভাগ হইতে ছোটখাটো রসিকতা বা ব্যঙ্গের কবিতার পাঁচ লাইনের পায়ারাক্ষর এই পদ্যবন্ধটি ইংরেজীতে খুবই

ব্যবহৃত হইতেছে। 'লিমারিক্'-এ সাধারণতঃ ভূগোল-সম্পর্কীয় কোনও নামের উল্লেখ থাকে, এবং অদ্ভুত বা হাস্য-রসের কোনও ঘটনা বা অবস্থা ইহার উপজীব্য। ইহা কবিতায় 'ঘন কলমে-লেখা ব্যঙ্গ-চিত্র'। চার লাইনে ঘটনার বর্ণনা, শেষের লাইনে তাহার সমাধান, বা মন্তব্যের সহিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি—ইহাই সাধারণ নিয়ম। অন্ত্যানুপ্রাসের সমাবেশ এইরূপ—ক ক খ খ ক। তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, অন্য তিন লাইনের চেয়ে ছোটো। বাঙ্গালী চিরকাল তাহার সাহিত্যে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে, তাহার হাস্যরস বোধ বরাবরই প্রবল। 'লিমারিক্'-কে সে-সহজেই গ্রহণ করিয়া তাহার ভাষার ছন্দ-ভাণ্ডার-জাত করিতে পারে—brevity is the soul of wit, অল্প কথায় কোনও বিষয়ের সম্বন্ধে চরম মন্তব্য করিবার পক্ষে কবিতার এইরূপ ছোটো প্যারাগ্রাফ খুবই উপযোগী হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বাঙ্গালায় এই 'লিমারিক্'কে লোকপ্রিয় ছন্দ করিয়া তুলিতে সহায়তা করিবেন বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ৬২ পৃষ্ঠা আছে। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করিয়া কবিতা ও একটি করিয়া ছবি। ছেলেরা পড়িয়া বা শুনিয়া এবং ছবি দেখিয়া আনন্দ পাইবে; বয়োবৃদ্ধেরাও হাসিতে জানিলে ছেলেদের সহিত নিশ্চয়ই যোগ দিবেন।

বইখানির বাহ্যসৌষ্ঠব পরিপাটী। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ "সরোজ-নলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি"-র ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

দিগ্বিজয়ী বীর—মহাবীর আলেকজান্দারের জীবনকথা—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বী-এ প্রণীত। ১৬ নং টাউনশেণ্ড্ রোড ভবানীপুর হইতে শ্রীযুক্ত তারাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

মাসিডনের দিগ্বিজয়ী বীর আলেকসান্দরের জীবনী ও কার্য্যকলাপ যেমন এক দিকে ইতিহাসের এক প্রধান ব্যাপার, যাহার প্রভাব বহু যুগ ও বহু দেশ ব্যাপী হইয়াছিল এবং এখনও হইয়া আছে, আর এক দিকে তাহা রোমান্স্-এর অফুরন্ত ভাণ্ডার। স্বাস্থ্যবান সবল চরিত্র গঠনের জন্য ছেলেদের পক্ষে এই জীবনকথার মত রসায়ন সাহিত্য-জগতে খুবই কম আছে। ভারতবর্ষের সহিত আলেকসান্দরের যোগ থাকায় ও আলেকসান্দরের পারস্যজয় ও ভারত-অভিযানের ফলে পরবর্ত্তী যুগে গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার আদান-প্রদান সম্ভব হওয়ায়, আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষেও আলেকসান্দরের জীবনীর সহিত পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে। ৭৫ পৃষ্ঠার এই নাতিক্ষুদ্র পুস্তক ছেলেদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে। ছেলেদের জন্য যে সকল বই লেখা হয়, অনেক সময়ে তাহাতে কবিত্ব বা রোমান্সের নামে অসহ্য ন্যাকামীর আমদানী হইয়া থাকে। এই পুস্তকে ইহার বিষয়-গৌরব-হেতু তাহা সম্ভব হয় নাই। ভারতের রাজা ও দেশভক্ত বীর এবং ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী যাঁহারা আলেকসান্দরের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। দুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে গ্রন্থকার একটু অবহিত হইলে ভাল হইত; যেমন, গ্রীক দেবতাদের গ্রীক নামই দেওয়া উচিত ছিল,—লাটিন নাম দেওয়ার রেওয়াজ ইংরেজী হইতেই আজকাল উঠিয়া যাইতেছে; এবং গ্রীক ও অন্য দেশীয় নামগুলির বাঙ্গালা বানান বিষয়ে সর্ব্বত্র ইংরেজীর কদুচ্চারণ অবলম্বন না করাই ভাল ছিল। কতকগুলি ছবি ও একখানি ম্যাপ দেওয়া হইয়াছে। আশা করি এই বইয়ের যথাযোগ্য আদর হইবে।

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ—প্রথম খণ্ড—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বী-এ প্রণীত। ১৬ নং টাউনশেণ্ড্ রোড, ভবানীপুর হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৮৮ পৃষ্ঠা দাম আট আনা।

মহাভারত হইতে এগারটি উপাখ্যান ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিত। নিজ জাতির প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও অবিনশ্বর তাহার সহিত পরিচয় থাকা মানসিক উৎকর্ষের একটি প্রধান অঙ্গ। অল্প বয়স হইতেই যাহাতে আমরা এইরূপ জাতীয় সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে গেলে এইরূপ বই সে-বিষয়ে সাধারণতঃ প্রধান, ও বহুস্থলে একমাত্র সহায়ক হয়। বিশেষভাবে ছেলেদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ বই যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। শুধু ছেলেরা নহে, বুড়ারাও এইরূপ বই হইতে অনেক সময়ে প্রচুর জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতের কথা ছেলেবেলা থেকেই আমাদের নানাভাবে শেখানো হইয়া থাকে। সুখের বিষয়, মহাভারত ও পুরাণের আখ্যায়িকাগুলি, এবং বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনীগুলি আজকাল আর অনাদৃত বা কেবলমাত্র বয়োবৃদ্ধদেরই মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতেছে না। এই বইয়ের গল্প কয়টি সুলিখিত, বইখানি সর্ব্বতোভাবে ছেলেদের হাতে দিবার উপযুক্ত। মূল আখ্যায়িকাগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য সরল ভাষায় বলিয়া গেলেই অবিকৃত থাকে। গ্রন্থকার তাহাই করিয়াছেন—নিজে ভাষার কালোয়াতি দেখাইবার প্রয়াস করেন নাই। ফলে গল্পগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে।

ছেলেদের বই যেমন হওয়া উচিত—এ বইখানি সচিত্র। ইহার কতকগুলি চিত্র শ্রীযুক্ত ফণী গুপ্তের আঁকা। এই যুবক শিল্পীর কল্পনা ও অঙ্কনদক্ষতা বিশেষ প্রশংসার্হ। ছেলেদের জন্য লেখা বইয়ে ইঁহার কলমে-লেখা অনেক ছবি আমরা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি। প্রাচীন ভারতের কল্পলোক অতি মনোহরভাবে ইঁহার রেখাঙ্কিত চিত্রে ধরা দিয়াছে। ইঁহার রচনা-রীতি চমৎকার—শক্তিশালী হাতে রেখাপাত, চিত্রগত ব্যক্তি ও বস্তুগণের সুসঙ্গত ও বৈচিত্র্যময় সমাবেশ, ভাবপ্রকাশে শালীনতা ও সারল্য, এবং সর্ব্বোপরি চিত্রস্থ নর ও নারী-মূর্ত্তিতে একটি সৌষ্ঠবময় ঋজুতা ও দার্ঢ্য যাহার ফলে প্রায়ই এই মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন মহাকাব্যের পাত্রপাত্রীগণের পক্ষে উপযুক্ত একটি আভিজাত্য ও সবল শ্রী দ্বারা মণ্ডিত হইয়া থাকে—শ্রীযুক্ত ফণী গুপ্তের চিত্রাঙ্কণে এই সকল গুণ বর্ত্তমান। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ছাঁদে কলমের আঁচড়ে আঁকা মামুলী ছবির মধ্যে ইনি বহুস্থলে রসভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ ছবিতেই বইয়ের মূল্য বাড়াইয়া থাকে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আহ্লাদে আটখানা; রসকরা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুইখানিরই ছয় আনা।

সুচিত্রিত ও সুমুদ্রিত ছেলেমেয়েদের গল্পের বই। প্রথম পুস্তকখানির গল্পগুলি হিতোপদেশের আখ্যানসমূহ অবলম্বনে রচিত এবং চতুর্থ সংস্করণে মুদ্রিত। দ্বিতীয় পুস্তকখানির কয়েকটি গল্প বিদেশী আখ্যান অবলম্বনে রচিত ও দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত।

প্রবীণ লেখক মহাশয় বহুবৎসর ধরিয়া বাঙালী পাঠক-সমাজকে রস বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। শিশুচিত্তকে জয় করিবার তাঁহার যে অসাধারণ শক্তি আছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আলোচ্য পুস্তক দুইখানি

সঙ্কলিত গল্পগুলি তিনি এমন স্বতন্ত্র নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক বলিয়া মনে হয়। রচনা সরল, সহজ, মিষ্ট ও চিত্তগ্রাহী। পুস্তক দুইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন। রচনা ও ভাষা গুণে পুস্তক দুইখানিই বালক-বালিকাদিগের অত্যন্ত প্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।

গুপ্ত

মহারাজ ছত্রসাল—শ্রীগোপেন্দ্রলাল রায়। ৯৮ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। প্রকাশক—ডি-এম-লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা বুন্দেলা-পতি ছত্রসালের জীবন-চরিত। "মস্‌লেম-সাম্রাজ্যের বিষগ্রাসী কবলে পতিত হইয়া হিন্দুসভ্যতা যখন মরণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন যে-সমস্ত বীরপুরুষ এই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বুন্দেল-বীর মহারাজ ছত্রসাল তাঁহাদেরই মধ্যে একজন।" 'মহারাজ ছত্রসাল' একখানি সুলিখিত ঐতিহাসিক চিত্র। বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে ইহার আদর বাঞ্ছনীয়।

পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে গ্রন্থকারকে আমরা William Irvine's *The Later Mughals*, Vol. II, ch. IX পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে মহারাজ ছত্রসালের প্রামাণিক জীবন-কথা দেওয়া আছে। ইহা পাঠে গোপেন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধির সংখ্যা বড়ই বেশী; অনেক স্থলে তারিখের ভুলও চোখে পড়ে। ইতিহাসের পুস্তকে এরূপ হওয়া অনুচিত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১) চুম্বক, (২) তাপ—রায়-সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসীর' পৃষ্ঠায় রায়-মহাশয়ের "স্থির-বিদ্যুতের" সমালোচনা করিয়াছিলাম। তিনি পদার্থ-বিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি যেরূপ সহজবোধ্যভাবে আলোচনা করিতেছেন তাহাতে বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। "তাপ" ও "চুম্বক"—উভয় পুস্তিকাই যেমন সরল, তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বালক-বালিকারা—বিশেষতঃ যাহাদের বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক আছে—এই দুই পুস্তকের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। এই দুই পুস্তিকায় তাপ ও চুম্বক-সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যই দেওয়া হইয়াছে। দুরূহ বিষয় যে কিরূপ সহজে বোঝান যাইতে পারে, রায়-মহাশয়ের লেখা তাহার প্রমাণ।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

Burman Year Book and Directory, 1929. —Published by the Modern Publishing House, 533 Merchant Street, Rangoon, Burma. Price Rs. 12, postage extra.

যাঁহারা স্বাধীন জীবিকার জন্য কিংবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সেখানে যাইতে চান, কিংবা ব্রহ্মদেশের সহিত কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই বৃহৎ পুস্তকটিতে বিস্তর প্রয়োজনীয় তথ্য পাইবেন। ব্রহ্মদেশ-সম্বন্ধে এরূপ বহি এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

মনে রেখো—শ্রীনৃপলাল দত্ত প্রণীত। প্রকাশক মনোমোহন প্রেস, ১০ নং নবাবপুর, ঢাকা। ১০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

লেখক দৈনন্দিন ব্যাপারের ছোট-বড় আবশ্যক সংবাদগুলি এই পুস্তিকাখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কৃষি, বাণিজ্য, রেলওয়ে টাইম-টেবেল, সোনার ওজন,—ইহাতে সবই আছে। চিকিৎসা-ভাগে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, কবিরাজী সব মতেরই ব্যবস্থা আছে। বাঙালীর থাকিবার উপযুক্ত হোটেল, সরকারী বেসরকারী চাকুরীস্থলের ঠিকানা, পর্ব্বোপলক্ষে আপিস-বন্ধের তালিকা, দৈনিক মাহিনার হিসাব, আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা, এই পুস্তিকার এক একটি পরিচ্ছেদ। যে-সকল সংবাদ প্রতি মাসেই বদল হইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত অন্যান্য কথা জুড়িয়া দিবার উদ্দেশ্য বুঝা গেল না। ইহা সাধারণ ডায়েরীও নয়, পারিবারিক চিকিৎসা-গ্রন্থও নয়। অবশ্য পুস্তিকাখানিতে প্রয়োজনীয় সংবাদ কিছু কিছু আছে। ছাপা ভাল।

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত, বি-এসসি প্রণীত। যুগবার্ত্তা প্রেস, ৪নং ছকু খানসামা লেন, কলিকাতা। ১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০ আনা।

ভাইটামিন-সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, লেখক এই পুস্তিকাখানিতে সে সমস্তই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ভাইটামিন কি, এবং কেন আমরা তাহা ব্যবহার করিব,—ইহা সহজ করিয়া বুঝান আছে। কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে কি প্রকার এবং কতটা পরিমাণে ভাইটামিন আছে, এইরূপ একটি তালিকা থাকাতে পুস্তিকাখানি আরও উপযোগী হইয়াছে।

নি চ-মি

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

হিন্দুর ভূগোল বিদ্যা—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হিন্দু-বিবাহ—শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ
মানসী—মোহম্মদ আবুল কাসেম
স্বপ্ন-ছায়া—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায়
ধূপের ধোঁয়ায়—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। (আর্য্য পাবলিশিং হাউস)

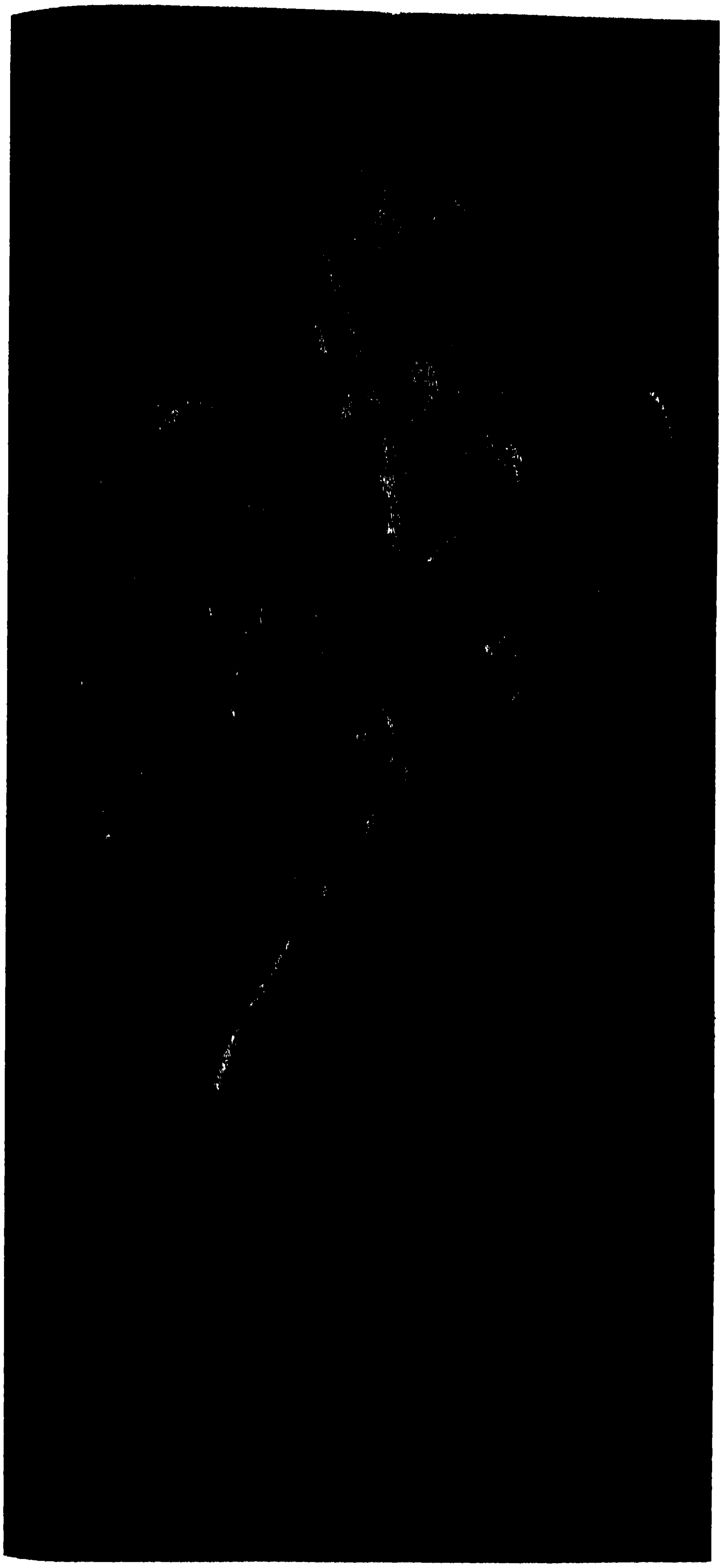

কুহকিনী*

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

প্রায় দুই শত বৎসর আগে, মেক্সিকো দেশের করদোবা নামক স্থানে একটি অতি সুন্দরী রমণী বাস করিত। তাহার গভীর কালো চোখ দেখিলে বোঝা যাইত, আফ্রিকার প্রখর সূর্য্য-কিরণ হইতেই সে এত জ্যোতি অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু দেহের রং তাহার শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র ছিল, ইহাতে বোঝা যাইত, তাহার ধমনীতে শ্বেতজাতির রক্তও আছে। সে যে কাহার সন্তান, কোথা হইতে আসিয়াছে,তাহা কেহই জানিত না। তাহার কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশরাশি, তাহার অনিন্দনীয় দেহসৌষ্ঠব, বাঘিনীর মত দৃপ্তগতি ও রক্তিম অধর দেখিয়া লোকে তাহাকে 'লা মূলাটা' বলিয়া ডাকিত। এই নামের অর্থ যে, সে শ্বেত এবং কৃষ্ণজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত।

তাহার সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিত না। স্পেনের ধর্ম্মবিচারালয় ইনকুইজিসনের তখন প্রবল প্রতাপ, নানাপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য ভয়াবহ ঘটনার কথা তখন শোনা যাইত। গ্রামে সুন্দরীর সম্বন্ধে নানাপ্রকার গুজব চলিত ছিল। কেহ বলিত লা মূলাটা কুহকবিদ্যার অধীশ্বরী, অদৃশ্য প্রেতেরা তাহার আদেশ পালন করে। রাত্রে যখন চারিদিক নিদ্রায় মগ্ন, কেবল মোরগের ডাক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, তখন রমণীর গৃহের উপর প্রকাণ্ড ডানার স্পন্দন শোনা যায়, মানুষের দৃষ্টির পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য দেখা যায়, এবং শয়তান স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ, গম্ভীরাকৃতি পুরুষের রূপ ধরিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে।

রূপসীর সম্বন্ধে ভয়াবহ নানা গল্পই শোনা যাইত। সে একেলা গ্রামের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিত। ঐ গৃহের নিকট অনেকবার মৃতপ্রায় এবং লুপ্তবুদ্ধি মানুষকে পাওয়া গিয়াছিল। এক হতভাগ্য চৌকিদারকে একবার পাওয়া গিয়াছিল, সে ভয়েই প্রাণত্যাগ করে। সে যে কি দেখিয়াছিল, তাহা বলিয়া যাইতে পারে নাই। তাহাকে যখন বলিতে আদেশ করা হইল, কিসে তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে তখন তাহার চীৎকারে আকাশ ফাটিয়া পড়িবার জোগাড় হইল। সে কেবল অনুনয় করিতে লাগিল, তাহাকে যেন শান্তিতে মরিতে দেওয়া হয়, কিছু বলিতে সে পারিবে না।

সুন্দরীর গৃহের চারিপাশে তাল এবং কমলা লেবুর গাছের সারি ছিল। ইহার অধিক নিকট দিয়া কয়েকজন দুঃসাহসী ব্যক্তি যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরে তাহাদের বিকলাঙ্গ এবং বাক্‌শক্তিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সুন্দরীর নিশ্চয়ই কোনো ভয়াবহ গোপন শক্তি ছিল, যাহার বলে সে এই-সব ঘটনা ঘটাইত। তাহার রূপেরও আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল। যে-কোনো পুরুষের দৃষ্টিপথে সে পড়িত, সে-ই তাহার জালে জড়াইয়া পড়িত।

সকলেই তাহাকে সন্দেহ করিত, তাহার চলাফেরা সমস্তই গ্রামবাসিগণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিত। সে কাহারও সহিত কথা বলিলে, হতভাগ্যের ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। কিন্তু প্রকাশে ঐ রমণীর আচরণ অতি ভদ্র ও শোভন ছিল, রাত্রে তাহার ঘরের কাছে লুকাইয়া না থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এমন সাহসী মানুষও গ্রামে দুর্লভ ছিল, যে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারে। লা মূলাটা নিয়মিতভাবে গির্জ্জায় যাইত, তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই মাটিতে নিবদ্ধ থাকিত, পোষাক-পরিচ্ছদেও সুরুচি ও লজ্জাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। কুৎসা করিবার মত কিছুই তাহার ব্যবহারে পাওয়া যাইত না।

গ্রামের প্রধান, ডন্ মার্টিন্ ঐ স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি রমণীকে অতি সন্দেহের চক্ষে

* স্প্যানিশ্ গল্প হইতে

দেখিতেন, এবং বিশ্বাস করিতেন যে, সে কুহকবিদ্যার অধিশ্বরী। কিন্তু গ্রামবাসীদের তাঁহার বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা ছিল না। তাহারা সকলেই জানিত যে, ডন্ মার্টিন প্রায় পলিতকেশ বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ রমণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাঁহার আহার-নিদ্রা সকলই ঘুচিয়া গিয়াছে, লা মুলাটাই তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ধ্যান হইয়া উঠিয়াছে। বৃথাই তিনি নিজের এই আসক্তিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, উহা তাঁহার সাধ্যের অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি যতই সুন্দরীকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেন, ততই সে উজ্জ্বলতররূপে তাঁহার স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিত। অবশেষে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায়ই যেন তিনি লা মুলাটার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিজের প্রেম ব্যক্ত করিলেন।

কিন্তু উহা বৃথাই হইল। রমণীর মুখ ফুলের মত কোমল, কিন্তু তাহার হৃদয় ছিল পাথরের মত কঠিন। অনুনয়-বিনয়, বহুমূল্য উপহার, অশ্রুপাত, চিরদিন তাহার অনুগত থাকিবার প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই তাহার মন গলিল না। সে ডন্ মার্টিনকে বিন্দুমাত্রও কোনো আশা দিল না।

তখন ডন্ মার্টিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি রমণীকে উপেক্ষা করিবেন, তাহার ব্যবহারের প্রতিশোধ দিবেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাও বৃথা হইল, সুন্দরীকে দূরে দেখিতে পাইলেও তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। যতই তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আসক্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন ডাকিনীকে ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ আরো যেন বাড়িয়া গেল। যখন স্থিরচিত্তে ভাবিতে বসিতেন, তখন এই দারুণ সর্ব্বগ্রাসী আসক্তির কোনো অর্থ তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। মানুষের মনের দুর্ব্বলতা যে তাহার বুদ্ধি-বিবেচনাকে ছাড়াইয়া যায়, তাহা তিনি ভাবিতেন না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার এই আসক্তি সাধারণ প্রেম নয়, উহা ডাকিনীর কুহকমন্ত্রজাত। তিনি মায়াবিনীর কবলে পড়িয়াছেন। এ-অবস্থায় ধর্ম্মবিচারালয়ের শরণ লওয়া ভিন্ন তিনি আর কোনো উপায় দেখিলেন না। একমাত্র উহার সাহায্যেই তিনি এই কুহকিনীর মন্ত্রবল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, অন্য পথ নাই।

একবার মনস্থির করার পর ডন্ মার্টিন আর ইতস্তত: করিলেন না। দৃঢ় অকম্পিত হস্তে তিনি অভিযোগপত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে গ্রামে যে-সকল গুজব চলিত তাহার উল্লেখ করিলেন, নিজের শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিলেন, এবং বিচারপতিদিগকে অনুনয় করিলেন, যেন তাঁহারা অবিলম্বে এই ভয়ঙ্করী কুহকিনীর হাত হইতে নিরীহ গ্রামবাসিগণকে নিষ্কৃতি দেন। অনুনয়ের অবশ্য কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেন না ধার্ম্মিক বিচারপতিগণ নূতন শিকারের সন্ধান পাইলে অত্যন্তই উল্লসিত হইতেন।

মাঝরাত্রে লা মুলাটার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বোধ হইতে লাগিল নানাপ্রকার অস্বাভাবিক শব্দ রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে, বহুলোকের পদধ্বনিও যেন শোনা যাইতেছে।

সে জানালা খুলিয়া দেখিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর ক্রমেই তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, মশালের আলো দেখা যায়, সেগুলির পিছনে নানাপ্রকার অদ্ভুত ছায়া। শীঘ্রই একদল অশ্বারোহী দেখা দিল, তাহারা উহার গৃহের দিকেই আসিতেছে। সর্ব্বাগ্রেই শাদা ঘোড়ায় চড়িয়া ডন্ মার্টিন। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া রমণী হাসিয়া উঠিল, এবং দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অশ্বারোহীদল তাহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রহরীর দ্বারা চতুর্দ্দিক বেষ্টিত হইল, এবং এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ধর্ম্মবিচালয়ের এই ঘোষণা পাঠ করিলেন। উহাতে লা মুলাটাকে বাহিরে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দেওয়া হইল, সে এখন বন্দিনী।

সুন্দরী কিন্তু আদেশ পালন করিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। একখানা শ্বেতবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া সে পিছনের একটি গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং তাহার গৃহের পশ্চাৎস্থিত এক খোলা মাঠে গিয়া পৌঁছিল। এখানে একজন পুরুষ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার প্রকাণ্ড টুপীর

ছায়ায় মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না, কেবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দুই চোখ দেখা যাইতেছিল। সে দুইটি অশ্বের বল্গা হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

লা মুলাটা লম্ফ দিয়া একটি অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিয়া পড়িল। পুরুষটিও উচ্চকণ্ঠে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অন্য ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িল। দুইটি অশ্বই সদর্পে তীব্র হ্রেষাধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইল, এবং তাহাদের খুরের আঘাতে আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। রমণী ও তাহার সঙ্গী সোজা ঐ অশ্বারোহীদলের দিকে ঘোড়া চালাইয়া দিল। ভীষণ একটা কোলাহল উপস্থিত হইল। রমণীর উচ্চহাস্যে দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রহরীর দল হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ডাইনী! কুহকিনী! থাম, ঘোড়া ফেরাও। ওদের পিছু নাও শীঘ্র, তাড়া কর।"

গোলমালে প্রহরীরা এ উহার গায়ে পড়িতে লাগিল, পরস্পরকে আহত করিতে লাগিল এবং ডন্ মার্টিনকেই প্রায় ধাক্কাধাক্কি করিয়া ফেলিয়া দিবার জোগাড় করিল। যাহা হউক কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহীদল ডন্ মার্টিনের নেতৃত্বে কুহকিনীর অনুসরণে ছুটিল। দূরে তাহারা রমণীর শ্বেত বস্ত্র এবং তাহাদের ঘোড়ার খুরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইতেছিল। অশ্বারোহীর দল ক্রমাগত অমঙ্গলনাশী সঙ্কেত করিতে লাগিল, অনেকেই ডন্ মার্টিনকে ফিরিবার জন্যও অনুনয় করিতে লাগিল। পিশাচের অনুসরণ করিয়া লাভ কি? উহারা যে মানুষ নয় তাহা নিশ্চয়, কারণ মানুষের ঘোড়ার পা হইতে কখনও আগুন বাহির হয় না।

ডন্ মার্টিন কিন্তু দাঁতে দাঁত ঘষিতেছিলেন। তিনি ক্রমাগত অনুচরদিগকে আরো জোরে ঘোড়া ছুটাইতে বলিতেছিলেন, ডাইনীকে ধরিতে তিনি ব্যস্ত, কতক্ষণে সে আগুনে পুড়িবে, তিনি তাহারই মিনিট গুণিতেছিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বোধ হইতে লাগিল যেন পলাতকদ্বয়ের ঘোড়া দুটি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, নয়ত তাহারাই শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রমণীর শুভ্র অঙ্গাবরণ খুব নিকটেই দেখা গেল, অনুসরণকারীদের হৃদয় আশায় ভরিয়া উঠিল। তাহারা আরও জোরে ঘোড়া চালাইয়া দিল, ডন্ মার্টিন সর্ব্বাগ্রে। আর একটু হইলেই তিনি ডাকিনীর শ্বেত বস্ত্র হাত বাড়াইয়া ধরিতে পারিবেন। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই লা মুলাটার অশ্ব শূন্যে লাফ দিয়া উঠিল এবং ধূলিরাশিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনুসরণকারীদের চক্ষু কিছুক্ষণের মত অন্ধ হইয়া গেল।

যখন তাহারা আবার ভাল করিয়া চোখ চাহিতে পারিল তখন দেখা গেল যে, পলাতকদ্বয় বহুদূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে ধরা আর অসম্ভব। উচ্চ বিদ্রূপের হাসি তাহাদের কর্ণে ভাসিয়া আসিল। তাহাতে উহাদের ভয় ও লজ্জা আরও বাড়িয়া উঠিল।

ডন্ মার্টিন তাঁহার সৈনিকদিগকে থামিতে আদেশ করিলেন। উহারা ঘোড়া হইতে নামিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, এবং ডাইনীকে অনুসরণ করা যে বৃথা সেই বিষয়ে বলাবলি করিতে লাগিল। ডন্ মার্টিন চিন্তা করিতে বসিলেন। লা মুলাটা এবং তাহার সঙ্গী যে মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসী নয়, ইহা তাঁহার প্রায় দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া আসিয়াছিল। উহাদের তাড়া করিয়া লাভ কি? কিন্তু ডাকিনীর বিদ্রূপের হাসি স্মরণ করিবামাত্র তাঁহার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি উচ্চকণ্ঠে অনুচরদিগকে পুনর্ব্বার অশ্বারোহণ করিতে ও ডাকিনীর অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে ডন্ মার্টিন নিজের পরিশ্রান্ত অশ্বকে থামাইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীদল এক একজন করিয়া পিছাইয়া পড়িয়াছে। এখন তিনি একেবারে একলা এক গভীর অরণ্যের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছেন, ইহার বাহিরে যাইবার কোনো পথ তাঁহার চোখে পড়িল না। এমন কি যে-রাস্তা ধরিয়া তিনি ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাও আর দেখিতে পাইলেন না। ক্রমাগত ঘোড়া চালাইয়া যাওয়া ভিন্ন তিনি আর কোন উপায় দেখিলেন না, সুতরাং শ্রান্ত অশ্বটিকে কোনোমতে আবার তিনি চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ল্যা মুলাটাকে দেখিতে বা ধরিতে পাইবার আশা তিনি অনেক আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ

তিনি ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনতিদূরেই নিজের বিপুলাকার অশ্বের পৃষ্ঠে ঐ কুহকিনী, যেন তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছে। অশ্ব বা তাহার আরোহী, কাহারও দেহে বিন্দুমাত্র শ্রান্তির চিহ্ন নাই। ডন্ মার্টিন এবং তাঁহার অশ্ব কিন্তু ধূলিধূসর ও শ্রান্তদেহ।

ডাকিনীর পশ্চাতে তাহার সঙ্গীকে দেখা গেল, ঝোপ-ঝাড়ের পিছনে সে অর্দ্ধলুক্কায়িতভাবে দাঁড়াইয়া। তাহার মুখ তখনও ছায়াচ্ছন্ন, দেহ বিশাল অঙ্গাবরণে আবৃত।

ডন্ মার্টিন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া চোখ রগড়াইতে লাগিলেন, তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? কিন্তু এই সময় রমণীর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল, ঐ স্বর মধুর ও কোমল।

"ডন্ মার্টিন, এখনও কি যথেষ্ট হয়নি? আপনি কি বুঝ্‌তে পারছেন না যে, কখনও আপনি আমাকে ধরতে পারবেন না? বৎসরের পর বৎসর আমার অনুসরণ করলেও কোনো লাভ হবে না। এখন করদোবাতে ফিরে চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে গিয়ে বিচারালয়ে আত্মসমর্পণ করব।"

ডন্ মার্টিন কোনো উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রমণীর অশ্ব এক লম্ফে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। লা মুলাটার সঙ্গীও তাহাকে অনুসরণ করিল। ধাবমান অশ্বের পদধ্বনি কিছুক্ষণ শোনা গেল, তাহার পর গভীর নীরবতা আবার অরণ্যের উপর নামিয়া আসিল। ডন্ মার্টিন কোনোমতে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাইয়া দিলেন, এবং বহু ঘণ্টা পরে করদোবাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মেক্সিকো দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। ইনকুইজিসনের বিচারপতিগণ বিচার করিয়া করদোবার ডাকিনীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইবে। ডাকিনী অতি সুন্দরী ও অতিশয় পাপীয়সী, এইজন্য তাহাকে অত্যন্ত ধূমধাম করিয়া পোড়ান হইবে, যাহাতে দেশবাসীর মনে ঐ ঘটনার স্থায়ী স্মৃতি থাকিয়া যায়।

সুন্দরীকে এক মাটির নীচের কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এখানে দিনের আলো পৌঁছিত না, একটি সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ ভিন্ন ইহাতে প্রবেশের দ্বিতীয় পথ ছিল না। বাহিরের জগতের কোনো কথা, কোনো সাড়াশব্দ এখানে পৌঁছিত না। এই ভয়াবহ স্থানে পড়িয়া লা মুলাটা নিজের অগণিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। বিচারপতিগণ তাহাকে পাপ স্বীকার করাইয়া, ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমাগতই কারাগৃহে ঢুকিতে লাগিলেন, এবং বিফলপ্রযত্ন হইয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন। সুন্দরীর মুখ হইতে কেবলমাত্র একটি স্বীকারোক্তি তাঁহারা বাহির করিতে পারিলেন। সে বলিল, বিপদের সময় শয়তান স্বয়ং আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে। ইহাকে কি করিয়া সুপথে ফিরান যায়, তাহা তাঁহারাও ভাবিয়া পাইলেন না।

লা মুলাটার জীবনের শেষদিন আসিয়া পড়িল। স্পেনদেশীয় কর্ম্মচারীর অধীনে দলে দলে ক্রীতদাস খুঁটি গাড়িয়া ডাইনীর বধের স্থান প্রস্তুত করিতে লাগিল। আগুন জ্বালিবার কাঠ ভারে ভারে আনিয়া রাখিতে লাগিল, ঐ আগুনে কুহকিনীর সুন্দর দেহ ভস্মীভূত করা হইবে।

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। লা মুলাটা নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমাইতেছিল। সে যে কারাগারে বন্দিনী তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল নিজের তালবৃক্ষবেষ্টিত গৃহে সে কুসুমশয্যায় ঘুমাইতেছে।

কাহার যেন গোপন আগমনের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল, অতি সতর্ক পদক্ষেপে কে যেন তাহার কারাকক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। শব্দ ক্রমেই নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল, অবশেষে তালায় চাবি-ঢোকানোর আওয়াজ হইল, এবং প্রকাণ্ড লোহার কপাট খুলিয়া গেল।

রমণী ভীতভাবে দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রথমে প্রদীপহস্তে কারারক্ষক ও তাহার পশ্চাতে একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। এ ব্যক্তি বিচারপতিদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, ইহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। কিছুকাল পরেই সে প্রধান শাসনকর্ত্তা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছিল।

কারারক্ষক প্রদীপ রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। যুবক

তখন কথা বলিতে আরম্ভ করিল, তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় ও কম্পিত, দুই চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। সে বলিল, "শোন, সুন্দরি! আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, গত দশ দিন যাবৎ আমি প্রতিদিনই একবার করে এখানে এসেছি, তোমার ভালবাসার বিনিময়ে তোমাকে মুক্তি দিতে, স্বাধীনতা দিতে। প্রতিবারেই আমি লজ্জায় ফিরে গিয়েছি, তোমার কাছে আসতে পারিনি। আজ আমি এসেছি। তোমাকে যখন থেকে আমি বিচারালয়ে দেখেছি, তখন থেকে ভালবেসেছি। এই ভালবাসা সাধারণ ভালবাসার মত নয়, এ যেন জ্বলন্ত আগুনের মত আমাকে পুড়িয়ে ফেলছে। তুমি আমার সঙ্গে বাইরের স্বাধীন জগতে চলে এস। আমি ধনবান্ তুমি আমার সঙ্গে দূর কোনো দেশে গিয়ে জীবন কাটাতে পারবে, সেখানে তোমার ইতিহাস কেউ জানবে না, তোমার নামও কেউ জানবে না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার সঙ্গে যখন আমি থাকি, যখন তোমার আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় চোখ আমার উপর পড়ে, তখন ভগবান, দেশ, কর্ত্তব্য সব ভুলে যাই, হৃদয় কেবল তোমাতেই ভরে ওঠে। আমাকে ভালবাস, আমার সঙ্গে এস। এই ভীষণ কারাগারের বদলে তোমাকে সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত প্রাসাদে রাখব। আমার প্রিয়তমা, আমার সঙ্গে এস।"

রমণী কিন্তু নড়িল না। সে বলিল, "মহাশয়, আপনার মুখ থেকে এ-রকম কথা শুনবার যোগ্য আমি নই। আপনি অভিজাত বংশজাত, উচ্চপদস্থ মানুষ, আমি নীচ জাতীয়া ডাকিনীমাত্র, আপনি আমাকে কি করে ভালবাসতে পারেন? আমাকে সবাই অভিশাপ দেয়, শিশুরা-সুদ্ধ আমায় দেখলে ভয়ে কাঁদে।"

যুবক বলিল, "আমি তোমায় ভালবাসি। আমার কাছে তুমি সম্রাজ্ঞীর মত সম্মানের পাত্রী। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। দয়া করে বল যে তুমিও আমায় ভালবাস।"

রমণী বলিল, "না। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন জানি, তবু আপনার সঙ্গে আমি প্রতারণা করব না। আপনার কাছ থেকে আমি আর ভালবাসার কথা শুনতে চাই না। আমি বিদায় প্রার্থনা করছি।"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ, দেহ কাঁপিতেছে। কুহকিনীর দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া সে বলিল, "নির্দ্দয়া, হৃদয়হীনা, ভাল কথাই বলেছ। কিন্তু এর শাস্তি তোমায় পেতে হবে। কেন তুমি নিজের অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দিয়ে আমাকে লুব্ধ করেছিলে? আমার এমন দশা কে করেছে? তোমাকে আর অনুনয় করা পুরুষের উচিত নয়, কিন্তু আগুনে পুড়বার সময়, আমার কথা, আমি তোমায় কি দিতে চেয়েছিলাম, সব তোমার মনে পড়বে।"

প্রদীপ উঠাইয়া লইয়া যুবক কারাগৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। রমণী তাহাকে থামাইয়া বলিল, "শুনুন, যদিও আপনি বিরক্ত হবেন, তবু আপনাকে একটি অনুরোধ করছি। যাবার আগে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। যদি ঠিক উত্তর দিতে পারেন, আপনার কথা আমি রাখব। আপনাকে ভালবাসব।"

যুবক প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রশ্ন বল?"

রমণী দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেওয়ালের গায়ে কয়লা দিয়ে আমি যে নৌকাটি এঁকে রেখেছি, দেখতে পাচ্ছেন কি? ওর একটি খুঁৎ আছে, একটি জিনিষের অভাব আছে। সেটা কি বলুন।"

হতভাগ্য যুবক ছবিখানা গভীর মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। যতই দেখে, নৌকাখানি ততই বড় ও সুন্দর মনে হয়। সে কোনোই খুঁৎ দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে-কথা বলিতে তাহার ভয় করিতে লাগিল।

লা মুলাটা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন, এর কি বাকি আছে? উত্তর দিন।"

যুবক বাধ্য হইয়া বলিল, "আমার চোখে ত এটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে। কেবল হাল ধরবার লোকের অভাব।"

"উত্তর ঠিক হয়নি। যা হোক, হাল ধরবার লোক জুটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।" এই বলিয়া রমণী দেওয়ালের নিকট অগ্রসর হইয়া গেল। যুবকের বোধ হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। কারাগারের প্রাচীর তাহার চোখের উপর মিলাইয়া গেল, নৌকাখানি প্রকাণ্ড বড় হইয়া ঢেউয়ের মধ্যে দোলা খাইতে লাগিল বাতাসে তাহার পাল

ফুলিয়া উঠিল। তাহার পর যুবক দেখিল, ধীর পদক্ষেপে সুন্দরী নৌকায় গিয়া উঠিল। নৌকায় দাঁড়াইয়া, সে হস্ত চুম্বন করিয়া যুবকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। নৌকা চলিতে আরম্ভ করিল, প্রথমে ধীরে ধীরে, তাহার পর দ্রুতবেগে এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই উহা দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল।

বহু বৎসর পরে করদোবার পথে একজন পাগলকে ঘুরিতে দেখা যাইত। তাহাকে দেখিলে বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইত। সে নিজের নাম বলিতে পারিত না, এবং কেহ তাহাকে চিনিতও না। কিছুদিন পরে তাহাকে পাগলা-গারদে বন্দী করা হইল। সেখানে সে ক্রমাগত বিড়বিড় করিয়া বকিত। কোনো এক নৌকা একি কারাগার হইতে তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই সেই হতভাগা যুবক বিচারপতি, তাহার পরিবারের সকলে তাহাকে মৃত জানিয়া শোকে দিন কাটাইতেছিল।

লা মুলাটাকে আর কোনোদিন দেখা যায় নাই। তাহার কথাও আর কেহ শোনে নাই। তবে পথেঘাটে তাহার কথা লোকে বলাবলি করিত। তাহারা বলিত শয়তান তাহাকে লইয়া গিয়াছে, সে আর মর্ত্ত্যলোকের মানুষকে বিনাশ করিতে আসিবে না।

অন্ধ

শ্রীবিভাবতী সেন

বন্ধু কহিছে, অন্ধ, তোমার
নয়নে সকলি কালো,
দেখিলে না হায় অভাগা, জগতে
কত হাসি কত আলো!
অন্ধ কহিছে, হাসি সখে, মোর
নয়নসলিলে হাসে,
ভেদাভেদ তাহে নাহি যে বন্ধু,
এক হয়ে পরকাশে!

আলোতে কালোতে মিশামিশি হয়ে
কালো হয়ে গেছে আলো
কালোর বুকেতে আলো ডুবে গেছে
আলোর বুকেতে কালো!
আলোর পিছনে কালোর মূরতি
তোমারি ও-চোখে লাগে,
আমার নয়নে আলোতে কালোতে
অশেষ আলোকে জাগে।

পঞ্চশস্য

নেমি হ্রদের রহস্য আবিষ্কার—

রোম শহর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে আলবান পাহাড়ের উপর আলবানো এবং নেমি হ্রদ অবস্থিত। এই হ্রদের সহিত বহু শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত কয়েকটি রোমান সুড়ঙ্গের যোগ আছে। এই

নেমি হ্রদে পুলিশপাহারা

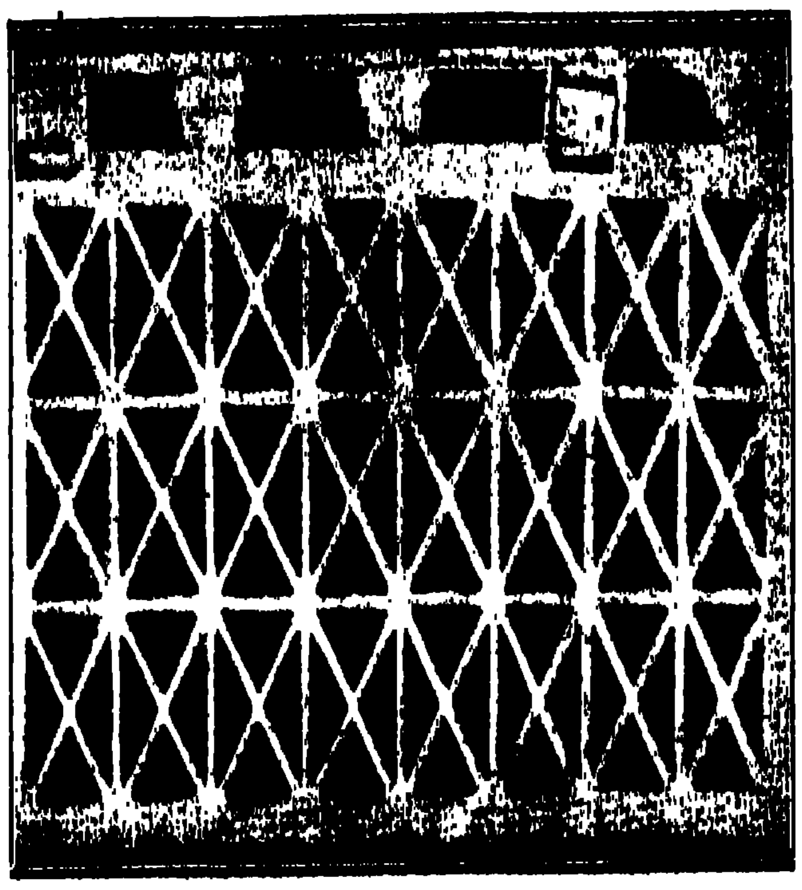

ব্রঞ্জের রেলিং

সকল প্রণালী দিয়া হ্রদের জল বাহির হইয়া যায়। লেক নেমিকে বহু লেখক "মিরর অফ্ ডায়ানা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নেমি হ্রদে প্রাচীনকালে সম্রাট কালিগুলা জলবিহার করিতেন। তাঁহার

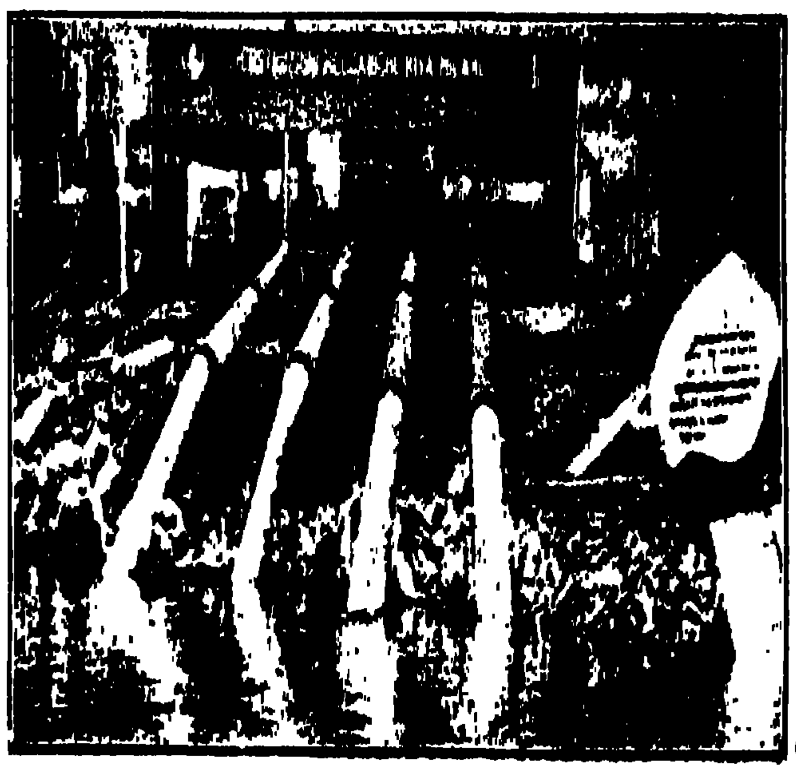

নেমি হ্রদের জল পাম্প করা হইতেছে

বিলাসের জন্য এই হ্রদে অতি মনোরম অনেক নৌকা থাকিত। সম্প্রতি ইলেকট্রিক পাম্পের সাহায্যে নেমি হ্রদের সমস্ত জল বাহির করিয়া দিয়া ইহার তলদেশে লুক্কায়িত রহস্য বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ডুবুরীর সাহায্যে ইতিমধ্যেই প্রাচীনকালের নানা-প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমস্ত জল সেচন করা হইলে পর অতি বিচিত্র এবং মূল্যবান প্রাচীন দ্রব্যাদি এই স্থানে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

নেমি হ্রদে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের সিংহমূর্ত্তি

হেলান বুরুজের কথা—

পিসার লিনিং টাওয়ারের কথা আমরা সকলেই জানি। এই

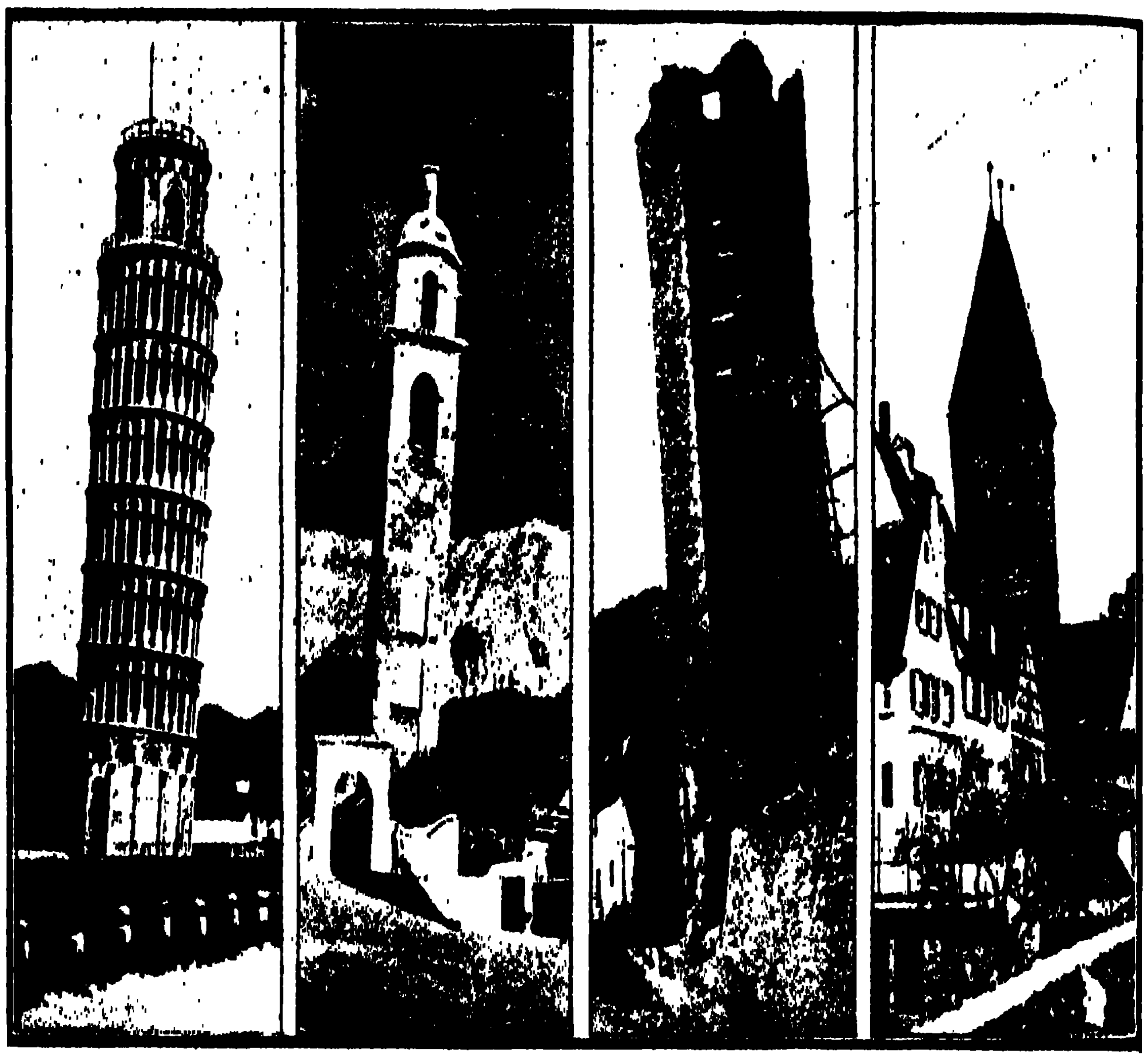

ইউরোপের নানাদেশের কয়েকটি হেলান বুরুজ—(১) পিসার ; (২) সেণ্টমরিট্সের ; (৩) এম্সের ; (৪) উল্মের

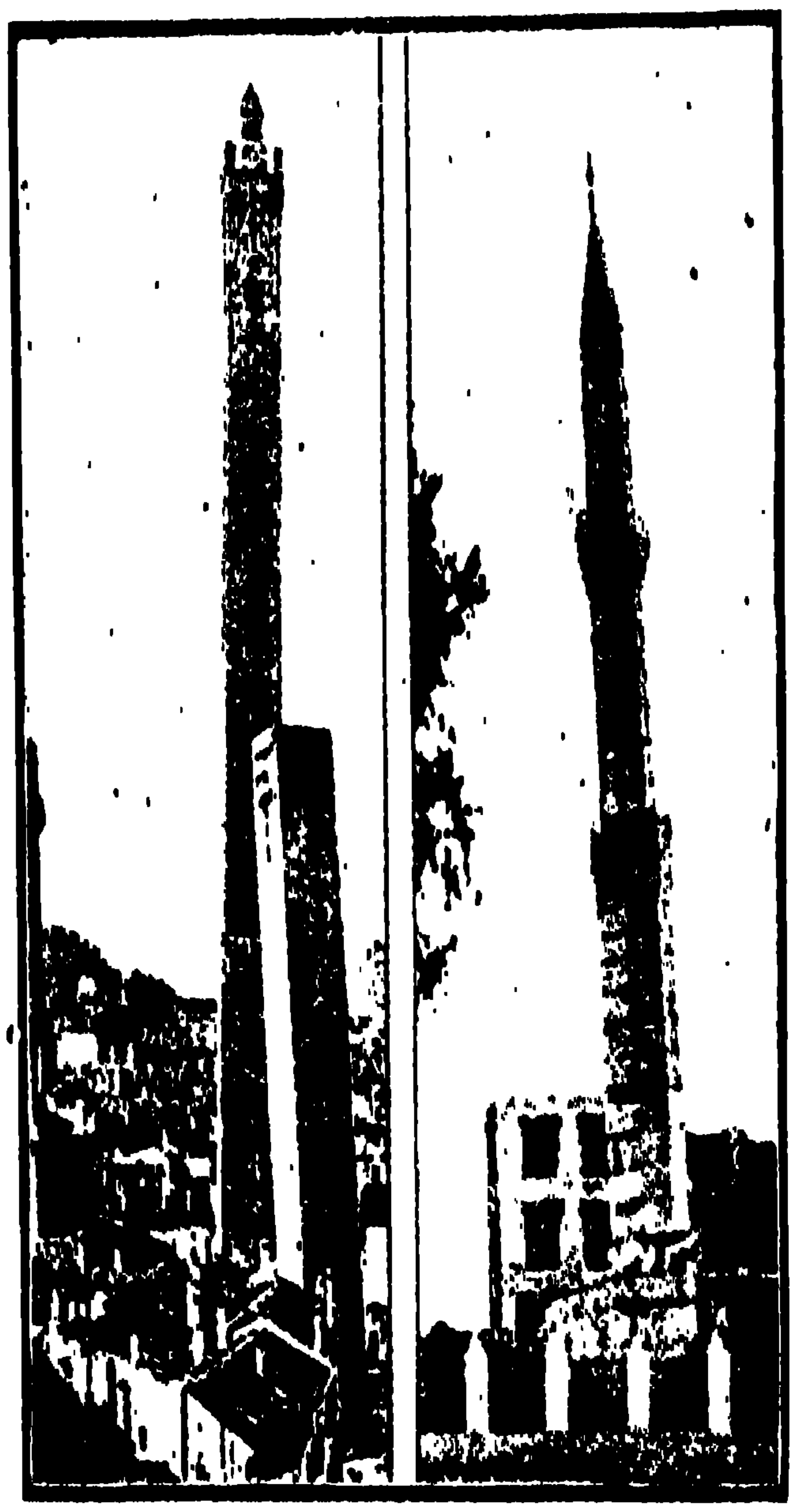

বলোনিয়ার দুইটি হেলান বুরুজ—
বামে, আসিনেলি টাওয়ার ; দক্ষিণে, গারিসেন্দা টাওয়ার

প্রকার হেলান বুরুজ আরও অনেকগুলি আছে—তাহাদের সম্বন্ধে হয়ত অনেকেই কোনো খবর রাখেন না।

সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেণ্ট মরিট্স টাওয়ার নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে এই টাওয়ারটি বাঁকা অবস্থায় আছে। ইহাকে সোজা করিবার নানা-প্রকার চেষ্টা চলিতেছে ; টাওয়ারটি একটি গির্জ্জার অংশ--গির্জ্জাটি বহু পূর্ব্বে ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে।

পিসার লিনিং টাওয়ারের নির্ম্মাণকার্য্য ১১৭৪ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়। মাত্র ১০ ফুট ভিত্তির উপর ইহা দাঁড়াইয়া আছে। ১৪শ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। তৃতীয় তলা শেষ হইবার সময় হইতেই ইহা বাঁকিতে সুরু করে। পিসার লিনিং টাওয়ার ২৫ বৎসরে এক ইঞ্চি করিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে।

ইটালির বোলোনিয়া শহরেও একটি লিনিং টাওয়ার আছে—ইহা ১২শ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার উচ্চতা ৩২০ ফুট। বর্ত্তমানে টাওয়ারটি প্রায় চারি ফুট বাঁকিয়া আছে। কিন্তু ১৪৮৮ সালে এই বুরুজের ভিত্তি আরও দৃঢ় করিয়া দেওয়ায় আর বাঁকে নাই।

গাঁথুনি শেষ হইবার পূর্ব্বেই গারিসেন্দা টাওয়ার বাঁকিতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ইহার চূড়া হইতে মাটি পর্য্যন্ত সোজা রেখা টানিলে তাহা মূল ভিত্তি হইতে ৪ ফুট ২ ইঞ্চি দূরে পড়ে। পিসার টাওয়ারে এই-প্রকার করিলে তাহা ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দূরে পড়ে। গারিসেণ্ডা টাওয়ারের উপরের কিছু অংশ টাওয়ারটিকে রক্ষা করিবার জন্য ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

ট্যাঙ্কের লড়াই—

নিউ ইয়র্কের ষ্টার্টেন আইল্যাণ্ডে কিছুদিন পূর্ব্বে দুইটি ট্যাঙ্কে ভীষণ লড়াই হয়। প্রকাণ্ড দুইটি ট্যাঙ্ক সামনা-সামনি আসিয়া ভীষণভাবে ঠোকাঠুকি আরম্ভ করে। প্রথম কিছুক্ষণ কেহ

কাহাকেও হঠাইতে পারে নাই। এই সংঘর্ষের সময় যে প্রকার ভীষণ শব্দ হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুই ট্যাঙ্কের লড়াই যেন দুইটি ভীষণ ক্রুদ্ধ দানবের যুদ্ধ। অবশেষে একটি ট্যাঙ্কের পরাজয় হইল। পরাজিত ট্যাঙ্ককে জেতা ট্যাঙ্ক মাটি হইতে খানিকটা উঠাইয়া পশ্চাতে ঠেলিয়া দিল—পরাজিত ট্যাঙ্কের সম্মুখ দিক তখন বিজেতা ট্যাঙ্কের প্রায় পিঠের উপর। জেতা ট্যাঙ্ক অবশেষে আস্তে আস্তে পিছু হটিয়া পরাজিত ট্যাঙ্ককে অসহায় অবস্থায় মাটিতে নামাইয়া দিল।

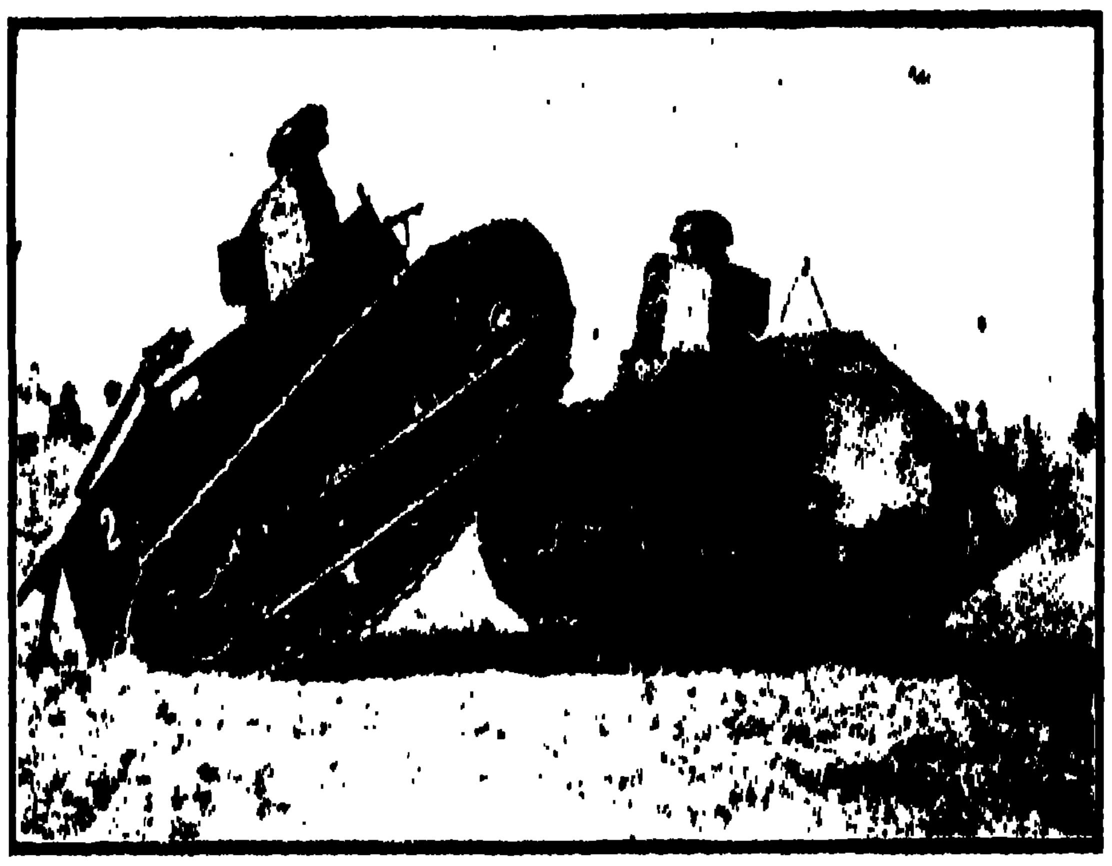

দুইটি ট্যাঙ্কের লড়াই

—

জলের উপর হাঁটা—

অষ্ট্রিয়ার ড্যানিয়ুব নদীতে বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক-প্রকার দুই-ফলাযুক্ত প্যাডেল পায়ে দিয়া জলের উপর হাঁটা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দেশের অন্যান্য নানাস্থানেও এই খেলার চলন হইতেছে।

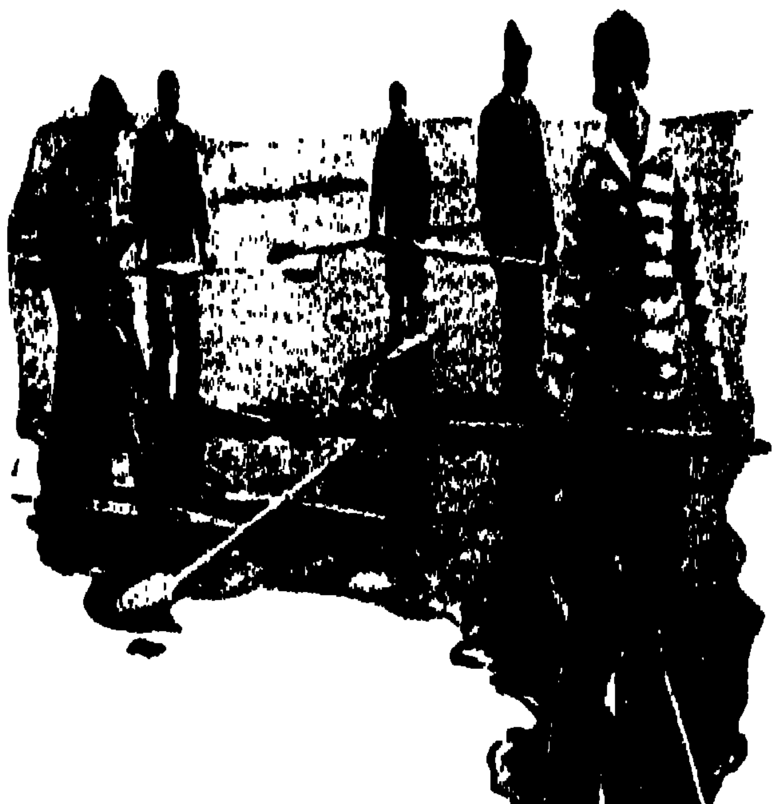

জলের উপরে হাঁটা

—

সুবৃহৎ গির্জ্জাকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরান—

আমেরিকার শিকাগো শহরে সম্প্রতি ১৮৫ ফুট লম্বা এবং ১১৫ ফুট চওড়া গির্জ্জাকে তাহার মূলভিত্তি হইতে ২০০ ফুট দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং ইহাকে দুই ভাগে কাটিয়া মাঝখানে আর একটি ৩০ ফুট অংশ যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই গির্জ্জার ওজন ১৬,০০০ টন। এই গির্জ্জাটিকে রাস্তার এক ধার হইতে অন্যধারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই স্থান-পরিবর্ত্তনের ফলে গির্জ্জার কোথাও সামান্য চূণ বালিও খসে নাই। দুয়ার-জানালা ইত্যাদি সব অটুট আছে। গির্জ্জাটিকে সরাইবার তোড়জোড় করিতে প্রায় আট মাস কাল সময় লাগে—কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তন করিতে সময় লাগিয়াছিল মাত্র আট ঘণ্টা। গির্জ্জার স্থান-পরিবর্ত্তনের সময় চার জোড়া ঘোড়া, এবং ৫০ জনেরও কম লোকের দরকার হয়। ৫০,০০০ ফুট ভারী শক্ত তক্তা, ৪০০০ জ্যাক, ৩০০০ রোলার এবং ৪০০ টন লোহার রেল এই কার্য্যে প্রয়োজন হইয়াছিল।

শিকাগোর এই বৃহৎ গির্জ্জাটিকে একস্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী জয়কলা দেবী, এম-এ—ইঁহাকে ইয়োরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতি অধ্যয়ন করিবার জন্য যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দুই বৎসরের জন্য বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড হিসাবে একটি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার বাড়ী দেরাদুনে।

শ্রীমতী জয়কলা দেবী

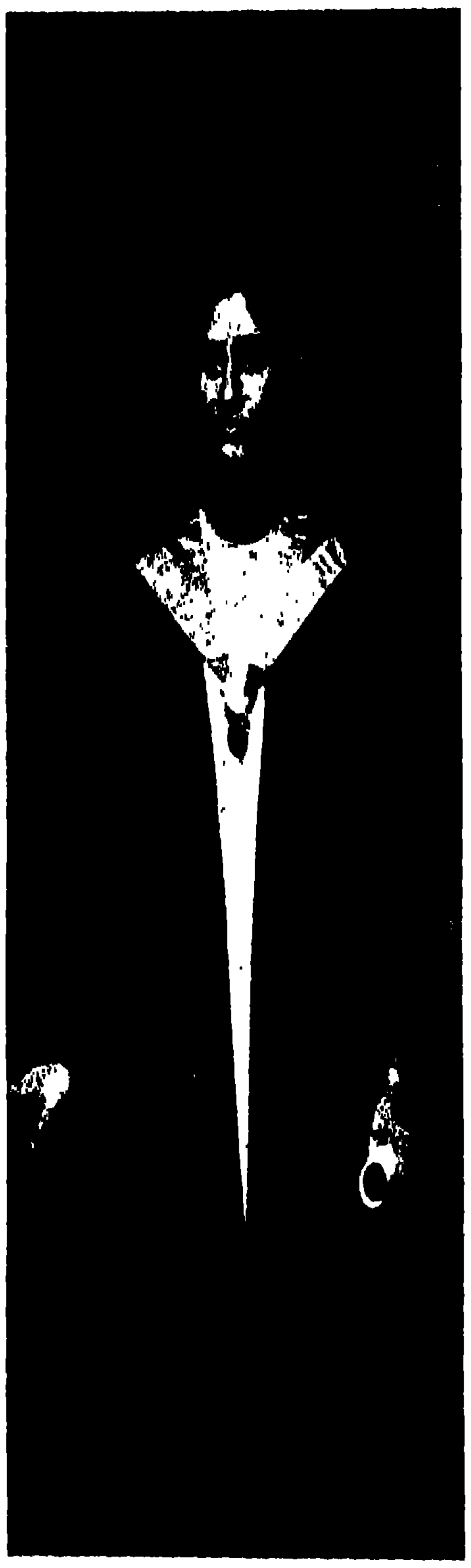

শ্রীমতী উষা বিশ্বাস

শ্রীমতী উষা বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি—ইনি পূর্ব্বে পাটনা ও মেদিনীপুরের সহকারী স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস ছিলেন। ইনি ১৯২৪ সনে ইংরেজীতে এম-এ পাশ করেন। স্কুল-ইন্‌স্পেক্ট্রেস থাকার সময়ে শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষ কর্ম্ম-কুশলতা দেখান।

শ্রীমতী ইন্দুমতী সেনজিত

শ্রীমতী ইন্দুমতী সেনজিত এম্-বি-বি-এস্—ইনি এ বৎসর বোম্বাই-এর গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ হইতে এম্-বি-বি-এস্ পরীক্ষা পাশ করিয়া লাহোর সিভিল হাঁসপাতালের হাউস-সার্জ্জন নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদেশ

মিশরের স্বাধীনতা—

আজ দশ বৎসর ধরিয়া মিশর ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, ইংলণ্ডে 'লেবার" গবর্ণমেণ্টের পদগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহার একটা সমাধান হইতে চলিল। মিশর কোনকালেই ভারতবর্ষের মত ইংরেজশাসিত ছিল না সত্য, কিন্তু নামে স্বাধীন হইলেও লর্ড ক্রোমারের সময় হইতে লর্ড লয়েডের "হাই-কমিশনর"ত্ব পর্য্যন্ত কি আভ্যন্তরীণ কি পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মিশরের অধিপতি অথবা মন্ত্রিবর্গের কোনও স্বাধীনতাই ছিল না। তাহাদিগকে সকল বিষয়েই ইংরেজ হাই-কমিশনার ও ইংরেজ "পরামর্শদাতা"দিগের আদেশ মানিয়া চলিতে হইত। যুদ্ধের পর জাগলুল পাশার নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হয় তাহার ফলে ইংলণ্ড পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হন, কিন্তু কতকগুলি সর্ত্তে। সুয়েজখালের রক্ষণাবেক্ষণ, সুদান-শাসন, বিদেশীয় লোকদের ধনপ্রাণ রক্ষা, বিদেশীয় রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ, ও অন্যান্য দুই একটি ব্যাপার ইংরেজেরা নিজেদের হাতে রাখিতে চাহেন এবং এই উদ্দেশ্যে মিশরে ইংরেজ সৈন্য রাখা প্রয়োজন বিবেচনা করেন। বলা বাহুল্য, মিশরের জাতীয়দল এই সকল সর্ত্তে সম্মত হন নাই। ১৯২৪ সনে মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড-এর মন্ত্রিত্বের সময়ে এই কয়েকটি প্রশ্নের কোনও মীমাংসা না হওয়ায় মিশর-সমস্যার কোনও সমাধান হয় নাই, রাজনৈতিক আন্দোলন পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে জাতীয়দলের আন্দোলনে মিশরের শাসনতন্ত্র প্রায় অচল হইয়া পড়ায়, হাই-কমিশনার লর্ড লয়েডের প্ররোচনায়, ইংরেজের মিত্রতাকাঙ্ক্ষী মহম্মদ মামুদ পাশা মিশরের পার্লামেণ্ট বন্ধ করিয়া সমগ্র মিশরে রাজনৈতিক আন্দোলন, সভা-সমিতি ইত্যাদি নিষেধ করিয়া দেন। এইভাবে মিশরশাসন একবৎসর-কাল নিরুপদ্রবে চলিলেও বিলাতের রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন যে, মিশরের জাতীয়দলের সহিত একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু মিশরে ইংরেজের আধিপত্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে লর্ড লয়েডের অত্যন্ত আপত্তি ছিল। এই বিষয় লইয়া বিলাতের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্রসচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেনের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয় এবং "লেবর" গভর্ণমেণ্ট যখন পদগ্রহণ করেন তখন এই বিরোধ আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। এই মতান্তরের দরুণ লর্ড লয়েড একরূপ বাধ্য হইয়াই পদত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান পররাষ্ট্রসচিব মিঃ হেণ্ডারসনের সহিত মিশরের রাজা ফুয়াদ ও মন্ত্রী মামুদ পাশার মিশরের স্বাধীনতা স্বীকারের ও নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের কথাবার্ত্তা চলে। এই আলোচনার ফলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বিদেশীদের ধনপ্রাণ রক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে ইংরেজেরা যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন সে-সকল এখন তাঁহারা ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এখন কেবলমাত্র সুয়েজখালের নিকটে ইংরেজ সৈন্য থাকিবে এবং সুদান ইংরেজের শাসনাধীন থাকিবে। এই নূতন সন্ধির প্রধান প্রধান প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলি এই নিম্নলিখিত রূপ :—(১) মিশর হইতে ব্রিটিশ সৈন্য স্থানান্তরিত করা হইবে। (২) ইংলণ্ড মিশরকে "লিগ অব্ নেশন্‌স্"-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। (৩) মিশর ও ইংলণ্ড তৃতীয় কোনও রাজ্যের সহিত এমন কোনও সম্পর্ক স্থাপন করিবেন না যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যের কোনও ব্যাঘাত ঘটে। (৪) বিদেশীয়দিগের ধনপ্রাণরক্ষার ভার মিশরের গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। (৫) কোনও যুদ্ধ ঘটিলে মিশর ইংলণ্ডকে মিশরের বন্দর, রেল, পথঘাট ইত্যাদি ব্যবহারের অধিকার দিবেন। (৬) যদি মিশরের সৈন্যবাহিনীর বিদেশী শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তবে তাহারা ইংরেজ হইবে। (৭) সুয়েজখাল রক্ষার জন্য যে সকল ইংরেজ-সৈন্যের প্রয়োজন হইবে তাহারা মিশরেই ৩২ ডিগ্রী লঙ্গিটিউডের পূর্ব্বে থাকিবে। (৮) মিশরের শাসনতন্ত্রে যে-সকল বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে তাহারা সাধারণতঃ ইংরেজই হইবে। (৯) সুদানের শাসন ১৮৯৯ সনের সন্ধি অনুযায়ীই চলিবে। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে তাহার পরিবর্ত্তন চলিবে। (১০) এই সন্ধির কোনও সর্ত্তের অর্থ লইয়া যদি কোনও মতবিরোধ উপস্থিত হয় তবে তাহার মীমাংসা "লিগ্ অব্ নেশন্‌সে'র পদ্ধতি অনুযায়ী হইবে। (১১) এই সন্ধি পঁচিশ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে।

এই সন্ধিপত্র এখনও কোন পক্ষই স্বাক্ষর করেন নাই। মিশরের জাতীয় দল যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইলেও এই প্রস্তাবিত সন্ধি মিশরের পক্ষে অসম্মানজনক নয়। মিশরের সংবাদ-পত্রসমূহ এই সন্ধির অনুমোদনই করিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডে এই সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর সম্বন্ধে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা ও আপত্তি হইবে। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি এখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গেল গেল বলিয়া একটা রব তুলিয়াছে। রক্ষণশীল দল পার্লামেণ্টেও যথাসম্ভব বাধা দিতেই চেষ্টা করিবে তবে কোনো কোনো উদারনৈতিক সংবাদপত্রের অভিমত দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা প্রস্তাবিত সন্ধির অনুমোদনই করেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান জনমত ও অন্যান্য সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সন্ধিপত্র পরিণামে স্বাক্ষরিত হইবে বলিয়াই মনে হয়।

সুন্ ইয়াত-সেনের শেষ বিশ্রামস্থান—

গত ১লা জুন ন্যানকিং-এর নিকটবর্ত্তী "নীলাচলে" এক বিরাট নব-নির্ম্মিত সমাধিমন্দিরে নব্য চীনের জন্মদাতা, চীনের পূর্ণ স্বাধীনতার পুরোহিত সুন্ ইয়াত-সেনের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে সমগ্র চীনদেশে তিন দিন ধরিয়া শোকানুষ্ঠান হয় এবং সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকে।

সুন্ ইয়াত-সেনের দেহ ১৯২৫ সনে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে পেইপিং-এর নিকটে একটি মন্দিরে রক্ষিত ছিল। সেদিন তাহা সেই

মন্দির হইতে "নীলাচলে" আনা হইয়াছে। একটি স্পেশিয়াল ট্রেনে করিয়া তাঁহার দেহ প্রথমে পেইপিং হইতে ইয়াংটজি নদীর তীরে পুকাউ-এ আনা হয়। তাহার পর একটি রণতরী শবাধারটি ন্যানকিং-এ আনে। ন্যানকিং-এ কুয়োমিনতাং এর প্রধানকেন্দ্রে

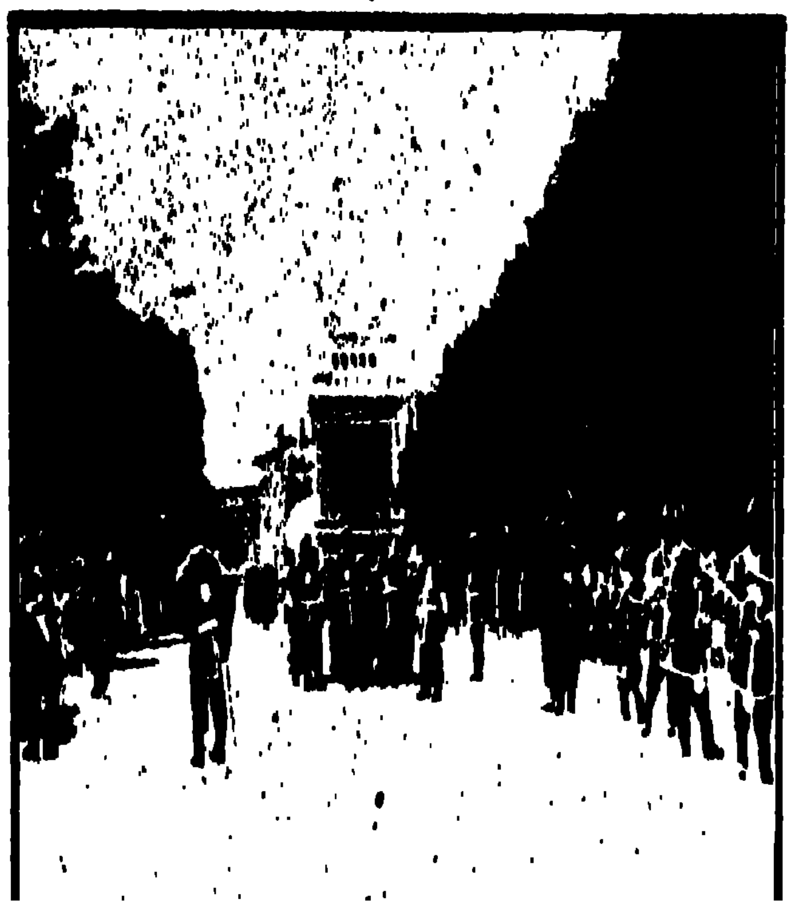

সুন্ ইয়াত-সেনের শবাধার বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে

উহা তিন দিন থাকে, এবং ১লা জুন শোভাযাত্রা করিয়া সুন্ ইয়াত-সেনের দেহ তাঁহার শেষ বিশ্রামস্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

এই শোভাযাত্রায় ইউরোপ ও এশিয়ার সমুদয় শক্তিমণ্ডলী ও জাতি যোগদান করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ভিক্ষু উত্তম কংগ্রেস-প্রতিনিধি হইয়া ও চীনদেশের ভারতীয় বিপ্লবপন্থী দলের দুই জন শিখ যান। শোভাযাত্রার মধ্যে বর্ত্তমান চীন গভর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্মচারী, বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, পুলিশ, ছাত্র, বয়স্কাউট ও গার্লগাইড, প্রভৃতি যোগদান করে। রাস্তার দুইধারে সশস্ত্র সৈনিকগণ বন্দুক হাতে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে কয়েকটি আর্ম্মারড্ কার যায়। তারপর ডাঃ সুন্ ইয়াত-সেনের শবাধার বহন করিয়া তাঁহার বন্ধু ও পরিবারবর্গ, তাঁহাদের পিছনে অন্য সকলে।

ভোর চারিটার সময় রওনা হইয়া শোভাযাত্রা দ্বিপ্রহরে সমাধি মন্দিরে পৌছে। শবাধার সমাধিমন্দিরে স্থাপিত করিবার সময়ে ইয়াংটজি বক্ষে রণতরী হইতে একশত একটি তোপধ্বনি হয়। সমাধিমন্দিরের ভিতরে সুন্ ইয়াত-সেনের শেষক্রিয়া হয়। তাহাতে কোনো ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় নাই। একে একে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ অগ্রসর হইয়া শবের সম্মুখে তিনবার নত হইয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া চলিয়া যান।

বাংলা

গগনচন্দ্র হোম—

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৯ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটের সময় গগনচন্দ্র হোম পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ময়মনসিংহ জেলার এক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই ইঁহার মেধা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই তেজস্বিতা তাঁহাকে মন্দ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে উৎসাহিত করিত এবং যাহা ভাল মনে করিতেন, সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে উন্মুখী করিত।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য ময়মনসিংহ সহরে আসিয়াছিলেন। তখন ময়মনসিংহ সহরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন সজীব ছিল।

স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অর্থহীন ও বস্ত্রহীন গগনচন্দ্র দারিদ্র্যকে ভয় না করিয়া যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই বরণ করিয়াছিলেন।

গগনবাবু যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ছাত্র তখন পণ্ডিত শ্রীনাথচন্দ্র মহাশয় কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ময়মনসিংহ হইতে "সঞ্জীবনী" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। গগনচন্দ্র তাঁহার একজন লেখক ছিলেন। সেই সময়েই তিনি সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা আগমন করেন এবং সিটি কলেজের কার্য্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ১৩ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সিটি কলেজের বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। রৌদ্রবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া অনুরাগের সহিত সেই কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাই ঐ বাটী সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

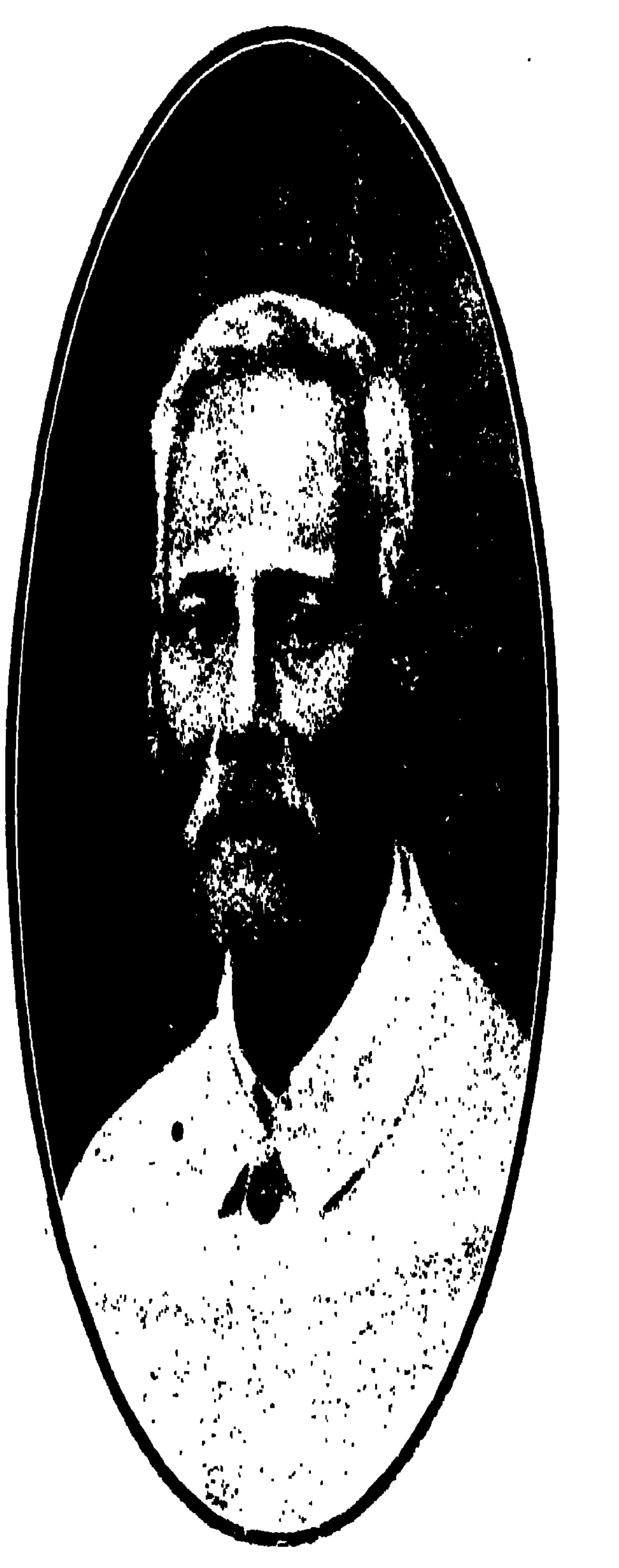

পরলোকগত গগনচন্দ্র হোম

ইহার পর তিনি প্রাচীন মেট্‌কাফ হলে "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর" সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদলাভ করায় জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন।

লাইব্রেরীর পদ ত্যাগ করিয়া তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যে কিছুকাল যাপন করিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি এডমিনিষ্ট্রেটার-জেনারেলের আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিনি এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করেন যে, অবশেষে ঐ আপিসের জমিদারী কার্য্যের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যেও তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনীর' জন্ম হয়। জন্মদিন হইতেই তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের ভার গগনবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন না, ইহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। প্রায় ১২ বৎসর কাল তিনি সঞ্জীবনীর লেখক ছিলেন। এখন মনে হইতেছে, কত দিন সারারাত্রি জাগিয়া নিয়মিতসময়ে তিনি 'সঞ্জীবনী' বাহির করিতেন।

এক সময়ে তিনি "আলোচনা" নামক একখানি মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই আলোচনা তৎকালে বহুলোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির প্রবন্ধে ঐ পত্র সাহিত্যজগতে আদরের পাত্র হইয়াছিল।—সঞ্জীবনী।

সাংবাদিক বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী—

কলিকাতার "এসোসিয়েটেড্ প্রেসের" সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে বিলাত গমন করিতেছেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদপত্রসেবা সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিলাতে ছায়াচিত্র-সম্বন্ধেও জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন। এ-বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে তিনিই প্রথম বিলাত গমন করিতেছেন। তিনি ভারতীয় ছায়াচিত্র-সম্বন্ধে অনেক গবেষণাপূর্ণ রচনা কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইঙ্গ বঙ্গ ছায়াচিত্র সম্মিলনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী।

সুন্ ইয়াত-সেনের অন্ত্যেষ্টি

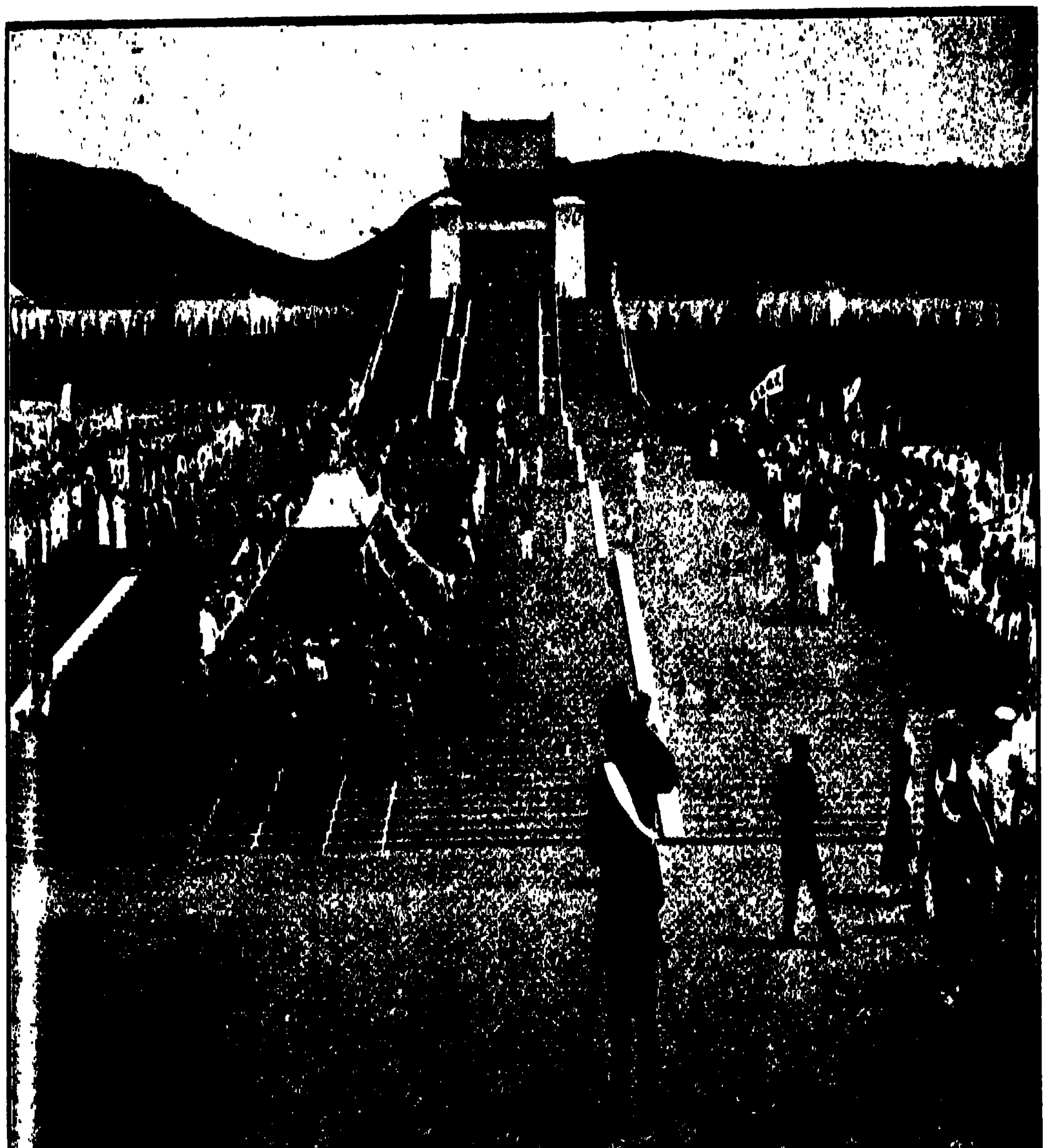

শবাধার সমাধি-মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইতেছে

শোভাযাত্রায় রাজকর্ম্মচারীগণ

শোভাযাত্রায় চীনদেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য

শোভাযাত্রায় সুন্ ইয়াত-সেনের পত্নী ও তাঁহার দুই ভ্রাতা

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ত্রয় (মধ্যে ভিক্ষু উত্তম)

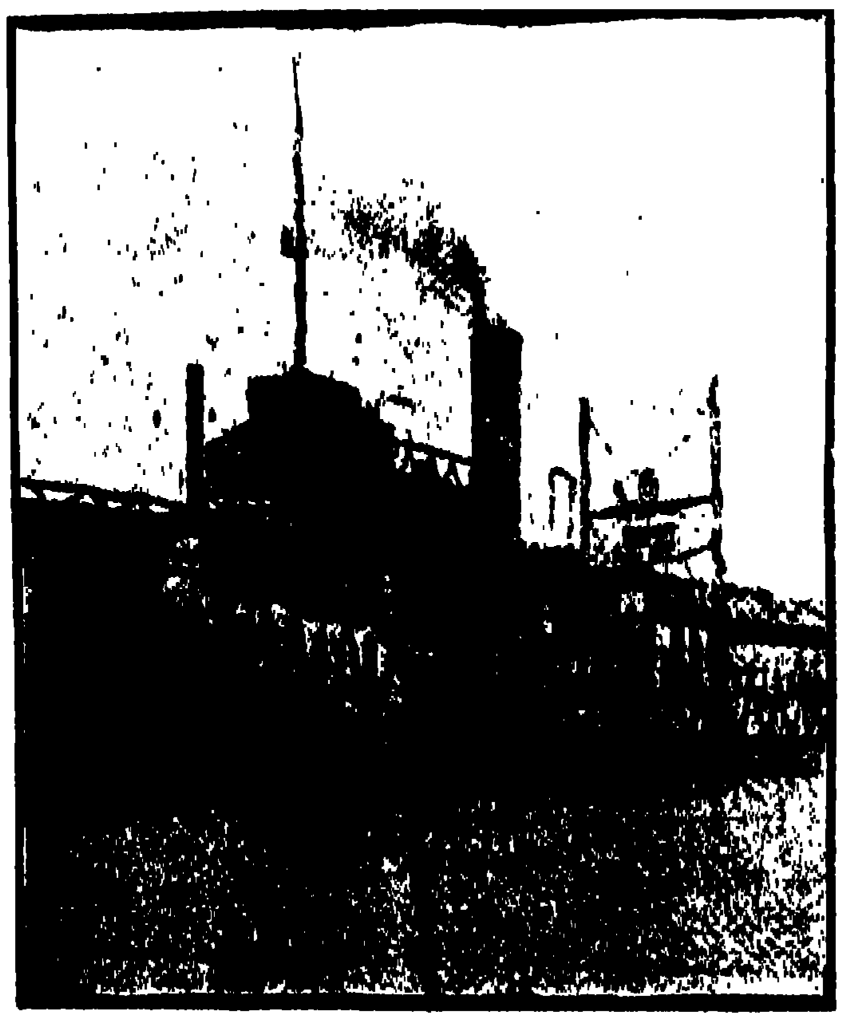

এই সুসজ্জিত রণতরীতে করিয়া সুন্ ইয়াত-সেনের দেহ
পুকাউ হইতে ন্যান্‌কিং-এ লইয়া আসা হয়

চীন দেশীয় পার্ল-গাইড়গণ

বর্ষা-মঙ্গল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৩ শান্তিনিকেতনে অভিনীত

গান

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর,
ঝঙ্কৃত তা'র ঝিল্লির মঞ্জীর।
বর্ষণ-গীত হ'লো মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির,
হে গম্ভীর।
দহন-শয়নে তপ্তধরণী প'ড়ে ছিল পিপাসার্ত্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্ত্তা।
মাটির কঠিন বাধা হ'লো ক্ষীণ, দিকে
দিকে হ'লো দীর্ণ,
নব-অঙ্কুর জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ
ছিন্ন হ'য়েছে বন্ধন বন্দীর,
হে গম্ভীর॥

বৃক্ষ-রোপণ

গান

১

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্ম্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্ম্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।
পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি'
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি' দাও রাতে সুপ্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

পর্জ্জন্য সূক্ত

অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ
স্তুহি পর্জন্যং নমসা বিবাস।
কনিক্রদদ্ বৃষভো জীরদানু
রেতো দধাত্যোষধীষু গর্ভম্॥ ১

ঋগ্বেদ্ ৫, ৮৩

(১) বর্ষণকারী ক্ষিপ্রদাতা যে পর্জ্জন্য ওষধী সকলের মধ্যে জীবন সঞ্চারী রসধারা গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতেছেন, এই সব সঙ্গীতে তাঁহাকে বন্দনা কর, তাঁহার স্তবগান কর, নমস্কারের দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর।

বি বৃক্ষান্ হন্ত্যুত হন্তি রক্ষসো
বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবতো
যৎ পর্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ॥—২

(২) তিনি বৃক্ষ সকলকে উন্মূলিত করিতেছেন, রক্ষোগণকেও বিহত করিতেছেন, বিশ্ব-ভুবন তাঁহার মহাবধে বিশেষরূপে ভীত হইয়া উঠিয়াছে। পর্জ্জন্য যেই গর্জ্জন করিয়া দুষ্কৃতকে হনন করিতেছেন নিষ্পাপও তখন সেই মহদ্‌বর্ষণকারী মহাবল দেবতার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে।

রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্
আবির্দূতান কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
যৎ পর্জ্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ ॥—৩

(৩) কশা দ্বারা অশ্ব সকলকে অভিক্ষেপনকারী রথীর ন্যায় তিনিও বর্ষণশীল মেঘ সকলকে আবির্ভূত করিতেছেন। পর্জ্জন্য আকাশকে বর্ষণশীল করিতেছেন আর দূর হইতে সিংহ গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে।

প্রবাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুৎ
উদোষধী জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে
যৎ পর্জ্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাবতি ॥—৪

(৪) বায়ুর পর বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, বিদ্যুতের পর বিদ্যুৎ পড়িতেছে, ওষধী সকল উদ্গত উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, অন্তরীক্ষ উছলিয়া পড়িতেছে, যখন জীবনরসে পর্জ্জন্য পৃথিবীকে উজ্জীবিত করেন তখন বিশ্বভুবনের অন্ন পূর্ণ হইয়া উঠে।

যস্য ব্রতে পৃথিবী নংনমীতি
যস্য ব্রতে শফবজ্ জর্ভুরীতি।
যস্য ব্রত ওষধী বিশ্বরূপাঃ
স নঃ পর্জ্জন্য মহি শর্ম্ম যচ্ছ ॥—৫

(৫) যাঁহার ব্রতে পৃথিবী সবার নীচে সংনত, যাঁহার ব্রতে পশুগণ সর্ব্বদিকে বিচরণ করে, যাঁহার ব্রতে ওষধীগণ বিশ্বরূপ, সেই পর্জ্জন্য আমাদের সকলকে মহৎ শর্ম্ম দান করুন।

ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল, ৮৩ সূক্ত।

গান

২

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে,
চল্, আমাদের ঘরে চল্।
শ্যাম-বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কলসঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।
তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বন-বল্লভে
মর্ম্মর গীত উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্ব্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল।

—

আচার্য্য কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের পক্ষ হইতে তাহাদের নিম্নমুদ্রিত প্রার্থনাগুলির আবৃত্তি। ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি রূপে সজ্জিত বালকগণ কর্ত্তৃক তাহার পুনরাবৃত্তি।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে!
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চির-সখ্যে।
অন্তরে পাক্ কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক্ পত্রী
তোমার অন্নসত্রে।

অপ

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এ'রে ডেকে
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে।

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হোক্।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
হোক্ তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি'॥

মরুৎ

হে পবন করো নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি'।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সঙ্গীতে দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লব-হিল্লোল শিক্ষা॥

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্ত্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্ত্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরু-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য॥

বৃক্ষ-রোপণ

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক্, হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধা-সিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। ল'য়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণ বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হ'য়ে, আমাদের বন্ধু হ'য়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুম বর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা-গীতিকায়,
সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ-বীথিকায়
মঞ্জুল মর্ম্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হ'তে
প্রাণ-মাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্য্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাবো আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে-যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সে-দিন বর্ষণ-মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক্ মৃত্যুহীন!
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হ'তে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব-পরিমলে॥

—

বর্ষা-মঙ্গল

গান

৩

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে।
পূর্ব্ববায়ু চলে ডেকে
শ্যামলের অভিষেকে,
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে।
নির্ঝর-কল্লোল-কলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।
শ্রাবণের বীণাপাণি
মিলালো বর্ষণ-বাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে।

—

৪

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে
ভাবনা ভাসে পূব বাতাসে,
মল্লার গান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে।
লাগ্‌লো যে-দোল বনের মাঝে,
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা-যে।
যে-বাণী ঐ ধানের ক্ষেতে
আকুল হ'লো অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে।

—

৫

বুঝি এলো, বুঝি এলো, ওরে প্রাণ!
এবার ধর্ দেখি তোর গান!
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

—

৬

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে।
ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে
নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তাঁর অঞ্চল যায় লুটে।
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নব শ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পূব হাওয়া ধায় আকাশতলে
তা'র সাথে মোর ভাবনা চলে
কাল-হারা কোন্ কালের পানে ছুটে।

—

৭

ঝড় নেবে আয়, আয়রে আমার শুক্‌নো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা' উদাসীন, যা' প্রাণহীন, যা' আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হ'য়ে যাক্ সারা,
যাবার যাহা যাক্ সে চ'লে রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমায় পাত্‌তে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন প'র্‌তে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে কূল গেলো তা'র ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুট্‌লো নিরুদ্দেশে,
পরাণ আমার জাগ্‌লো বুঝি মরণ-অন্তরালে।

—

৮

চিত্ত আমার হারালো আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চ'লেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজুলী তা'র বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।
পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালো রে অঙ্গ আমার
ছড়ালো প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি
হ'লো আমার সাথের সাথী,
অট্টহাসে ধায় কোথা সে
বারণ না মানে।

—

৯

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান?

সেই সুরেতে জাগ্‌বো আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুল্‌বো না আর সহজেতে,—
সেই সুরে মন উঠ্‌বে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে-ঝড় যেন লই আনন্দে
চিত্ত-বীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে-ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে,
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্‌

—

১০

প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল এ কী দুর্দ্দিন।
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি-তর্জ্জন।
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ।
ছাড়রে শঙ্কা, জাগ ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হের প্রশান্ত বিরাজিত,
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়-হরণ।

—

১১

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌লো
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌লো।
মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ-যে বিচ্ছেদ-
বেদনায়
অর্পিনু হাতে তাঁর
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিট্‌লো-যে পরশের
তিয়াষা।
এতদিনে জানলেম
যে-কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।

—

১২

হা রে রে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখ্‌বে ধ'রে কেরে!
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

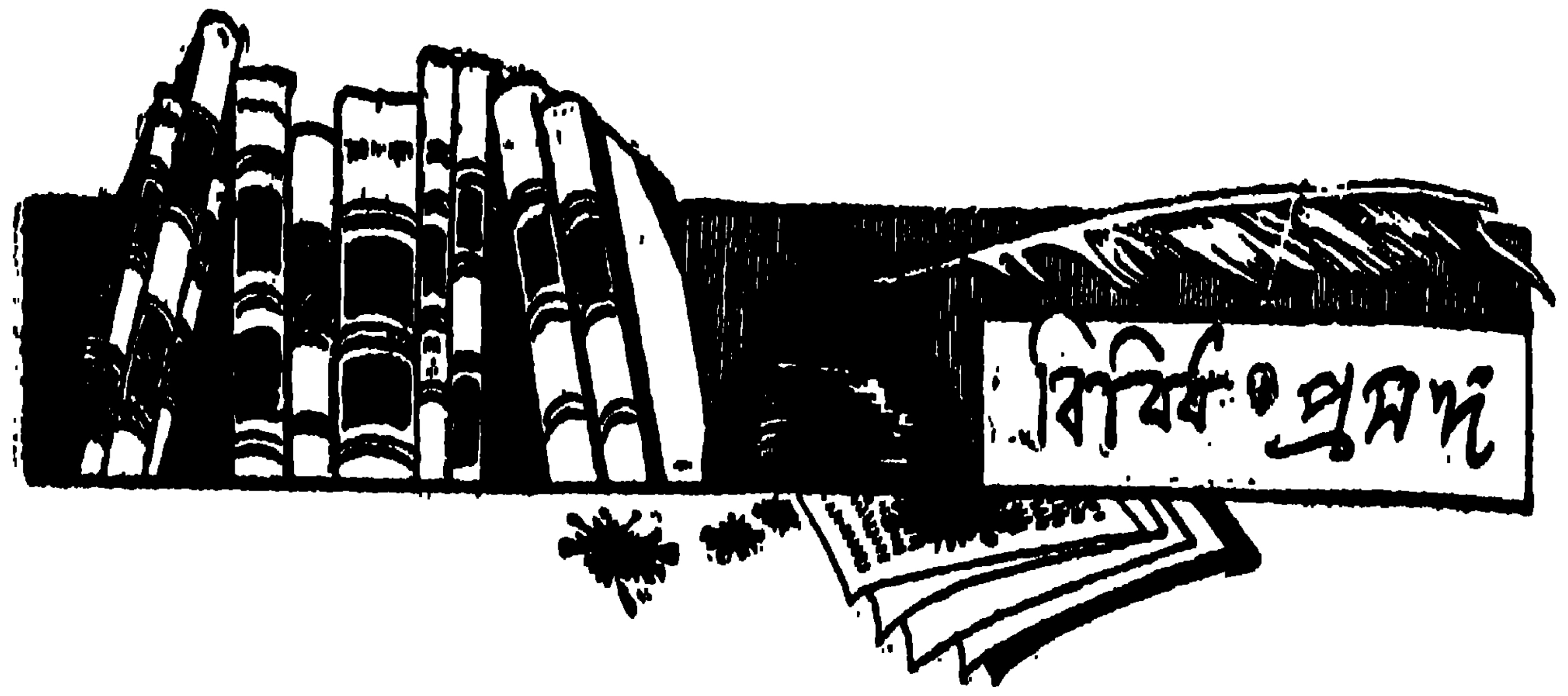

সিডীশ্যনের মামলা ও টেনিসনের "ক্রুক"

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মিঃ মোবার্লী সরকার পক্ষ হইতে উত্তর দেন, যে, গত ছয় মাসে বাংলা গবর্মেণ্ট সিডীশ্যন বা "রাজদ্রোহ" অভিযোগে পনরটিমোকদ্দমা ও তাহার আগেকার ছয়মাসে আটটি এইরূপ মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিয়াছেন, এবং একটি এখনও বাংলা সরকারের বিবেচনার অধীন আছে। তাহা হইলে হয়ত বিলাতী রক্ষণশীল দলের প্রভুত্বকালে এইরূপ যতগুলি মোকদ্দমা চালান মঞ্জুর হইয়াছিল, বর্ত্তমান বিলাতী শ্রমিক দলের প্রভুত্বকালে তাহা অপেক্ষা বেশী তদ্রূপ মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তাহা হউক বা না হউক, বিলাতী শ্রমিক প্রভুত্বের দরুণ সিডীশ্যনের মামলা কমে নাই। কমা উচিত ছিল বলিতেছি না। কথাটার উল্লেখ করিতেছি এইজন্য, যে, অনেকে আশা করিয়াছিলেন ও করেন (আমরা তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম না ও নাই), যে, শ্রমিক মন্ত্রীমণ্ডল (cabinet) রাজনৈতিক অভিযোগে মামলা চালান বন্ধ করিয়া বা কমাইয়া দিবেন। তাঁহাদের এরূপ ধারণার নানা কারণ ছিল। সাধারণ কারণ এই, যে, বিলাতী শ্রমিক দলের শীর্ষস্থানীয় অনেক রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, যাহা বলার বা উদ্ধৃত করার জন্য এদেশে লোকে শাস্তি পাইয়াছে এবং পরেও পাইবে। বিশেষ কারণ এই ঘটিয়াছিল, যে, এখন যে কাপ্তেন ওয়েজউড্ বেন ভারতসচিব হইয়াছেন, তিনি ১৯২৬ সালে বিলাতী কণ্টেম্পোরারী রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"The greatest of all State interests is the impartiality of the Law. By this is meant not the impartiality of our courts and juries alone, but the impartiality exhibited by the department of public prosecutions in the initiation of proceedings."

"Most people would concur in the view that the weapon of prosecution for sedition should not be brought out except in the most urgent cases of necessity."

এই সকল কারণে যাঁহারা রাজনৈতিক মামলা চালাইবার নীতি সম্বন্ধে শ্রমিক রাজত্বে পরিবর্ত্তনের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে, সরকারী কাজের ভার পাইবার আগে ইংরেজরা যাহা বলে, ভার পাইবার পরে তাহা করে না বা করিতে পারে না; ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলির বহির্ভূত ও তথাকার সকল দলই এদেশ সম্বন্ধে একই নীতির অনুসরণ করেন; ভুলিয়াছিলেন, যে, বিলাতী শ্রমিকদের প্রভুত্বের আয়ুষ্কালের দৈর্ঘ্য বহু পরিমাণে তাঁহাদের ভারতবর্ষে শক্ত দৃঢ় শাসন চালাইবার সামর্থ্য ও খ্যাতির উপর নির্ভর করে। শ্রমিকরা মিশরকে কিছু স্বাধীনতা দেওয়ায় রক্ষণশীল দল সরোষ কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে—যদিও ভারতবর্ষকে অধীন রাখিবার জন্য আবশ্যক সুয়েজ খাল নিরাপদ দখলে রাখা সম্বন্ধে ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্মেণ্ট যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিশরে প্রভুত্ব থাকার উপর ব্রিটেনের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য বিশেষ কিছু নির্ভর করে না; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রভু থাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া ইংরেজরা মনে করে। সুতরাং মিশরের প্রতি কিঞ্চিৎ ন্যায্য ব্যবহার করায় যখন এত গোলমাল হইতেছে, তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে "কোমল" মতির পরিচয় দিলে রক্ষণশীলেরা নিশ্চয়ই তুমুল কাণ্ড বাধাইবে।

মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করা অসম্ভব নহে; আগে সেরূপ কাজ হয় নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও হইতে পারে না, বলা উচিত

হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রভুত্বশালী মানব-সংঘের প্রকৃতি যেরূপ আছে, তাহাতে মনে হয় টেনিসনের "ব্রুক" বা নির্ঝরিণী নাম্নী কবিতায় ক্ষুদ্র নদীটি যেমন বলিয়াছে—

> "Men may come and men may go,
> But I go on for ever."

"মানুষ আসিতে পারে এবং যাইতে পারে, কিন্তু আমার প্রবাহের বিরাম নাই,"

তেমনি ভারতীয় সিডীশ্যনের মামলা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে—

> "British cabinets may come and British cabinets may go,
> But sedition trials go on all the same."

"ভিন্ন ভিন্ন ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সিডীশ্যনের মামলা থামিবে না।"

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রশ্নের উত্তরে মোবার্লী সাহেবও বলিয়াছেন, যে, তিনি যতদূর জানেন এবিষয়ে সরকারী নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

—

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রতিবাদ

আমরা গত ২২শে শ্রাবণ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইয়াছি :—

"*Prabartak* report noticed in your last issue was unauthorized. My view grossly misunderstood. Please contradict in next issue. Brajendranath Seal."

আমাদের বক্তব্য এই, যে, বৈশাখের প্রবর্ত্তকে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহার উপর আমাদের মন্তব্য আমরা শ্রাবণের প্রবাসীতে বাহির করিয়াছিলাম; যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিয়া বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের মন্তব্যে আমরা ইহাও লিখিয়াছিলাম, যে, প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত কথোপকথনটি শীল মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে ছাপা হইয়াছে কি না ও তাঁহার মত ঐরূপ কি না জানি না।

শীল মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, তাঁহার মত অত্যন্ত ভুল বুঝা হইয়াছে। তাহার অর্থ সম্ভবতঃ এই, যে, প্রবর্ত্তকের লেখকই ভুল বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু যদি আচার্য্য শীলের মতে আমরাই ভুল বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভ্রম নির্দ্দেশ করিলে তাহার আলোচনা করিব।

—

বঙ্গে নারীনিগ্রহ ও নারীহরণ

বঙ্গে নারীনিগ্রহ চলিতেছে। যে-সব কারণে বঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা হয়, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আমরা হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এই জন্য এই সমাজ সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। ইহার প্রতি আমাদের প্রাণের টানও আছে। এই জন্য ইহার কল্যাণার্থ ইহার দোষ দেখাইবার অধিকার আমাদের আছে। হিন্দু শব্দটি আমরা ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বঙ্গের অন্য কোন সমাজ সম্বন্ধে এই অধিকারের দাবী আমরা পূর্ণমাত্রায় করিতে পারি না, যদিও সকলেরই হিতচিন্তা মনে উদিত হয়। অন্তঃপুরে বঙ্গনারীর দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে সত্য। অন্য সব সমাজ সম্বন্ধে সত্য কি না, তাহা সেই সব সমাজের লোকেরা স্থির করিয়া আলোচনা করিলে তাহা হিতকর হইবে।

বঙ্গের অনেক অন্তঃপুরে বালিকা ও যুবতী বধূর প্রতি কঠোর এবং কোন কোন স্থলে নিষ্ঠুর ব্যবহার দীর্ঘ কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ ব্যবহার অতীত কালে বোধ হয় সকল পরিবারে হইত না, এখন ত নিশ্চয় করিয়াই বলা যায় যে, সকল পরিবারে হয় না। সম্ভবতঃ যে-সব পরিবারে বধূদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার হয়, তাহাদের সংখ্যা কমিতেছে। বধূদের প্রতি অত্যাচারের সত্য কাহিনী আজকাল যে বেশী পরিমাণে আদালতে পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে, তাহার কারণ বোধ হয় এইরূপ ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধি নহে; কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, আগে এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিকারের সম্বন্ধে লোকের যতটা নৈরাশ্য ছিল এখন তাহা হ্রাস পাইয়াছে। এখন, ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত ও হইতে পারে এবং পরিবারভুক্ত অত্যাচারীদের শাস্তি হওয়া উচিত ও হইতে পারে, এই বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে।

অন্তঃপুরে সধবা বধূ ছাড়া বিধবাদের উপরও দুর্ব্ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাও অবশ্য সব পরিবারে আগে হইত না, এখনও হয় না।

অন্তঃপুরে নারীর উপর অত্যাচার বাড়িতেছে, না, কমিতেছে, স্থির করিবার উপায় নাই; কিন্তু ইহা যে এখনও গুরুতর আকারে ও বহু পরিমাণে বিদ্যমান আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য একাগ্রতার সহিত অবিরত প্রতিকারচেষ্টা করিতে হইবে।

কত রকমে এই অত্যাচার এবং কখন কখন প্রাণবধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, তাহা সংবাদপত্রের পাঠকেরা জানেন। জঘন্যতম অত্যাচার, বধূকে নিজেদের অর্থাগমের জন্য পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করা, এরূপ অন্ততঃ একটা ঘটনা আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে।

অন্তঃপুরে নারীনিগ্রহের প্রতিকার সহজসাধ্য নহে। এমন কোনও একটি উপায় নির্দ্দেশ করা যায় না, কেবল যাহা অবলম্বন করিলে অত্যাচার নির্ম্মূল হইবে। অনেক দিকে লোকদের ধারণা বদলাইলে ও সামাজিক উন্নতি হইলে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার কমিবে এবং পরে লুপ্ত হইতেও পারে।

এই একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, যে, পুরুষ নারীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করে, বিবাহ-সম্বন্ধ নারীর জন্য যত আবশ্যক পুরুষের পক্ষে তত আবশ্যক নহে। এই ধারণা দূর করিতে পারিলে, অন্তঃপুরে নারীনির্য্যাতন কতকটা কমিতে পারে। ঐরূপ বিশ্বাস উন্মূলিত করিতে হইলে, বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা পরে বিবাহিতা না হইলেও সৎপথে থাকিয়া উপার্জ্জক ও স্বাবলম্বী হইতে পারে। তাহা হইলে তাহাদিগকে পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকেরা গলগ্রহ মনে করিবে না, বাধ্য হইয়া তাহাদের বিবাহের চেষ্টা করিবে না, এবং তাহারাও ভরণপোষণের জন্য বিবাহ করিতে ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইবে না। ভারতবর্ষের অন্যতম যে প্রধান আদর্শ সংযম, তাহা এই শিক্ষার একটি ভিত্তি হওয়া আবশ্যক।

জৈব প্রকৃতি অনুসারে পুরুষ নারীর সঙ্গ (এবং নারী পুরুষের সঙ্গ) চাহিয়া থাকে। সকল দেশেই মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহ-সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও অনেক পুরুষ পণ্যস্ত্রী দ্বারা এই অভাব দূর করিতে চেষ্টা করে, এবং তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকদের যেরূপ পাতিত্য ঘটে, চরিত্রহীন পুরুষদের সেরূপ কিছু হয় না। এই পণ্যস্ত্রীর ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে, এবং চরিত্রহীনতার জন্য স্ত্রীলোকদের মত পুরুষদেরও সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেকে মনে করে, পণ্যস্ত্রীর ব্যবসা বন্ধ করা অসম্ভব। তাহা ভুল। সামাজিক চেষ্টা ও আইন দ্বারা অনেক জায়গায় উহা কমান হইয়াছে। এক সময়ে অনেকে মনে করিত, দাসত্বপ্রথা বন্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু এখন পৃথিবীর কোনও সভ্য দেশে আর ক্রীতদাস নাই। পণ্যস্ত্রী প্রথাও এই প্রকারে লুপ্ত হইবে। তখন বৈধ বিবাহ-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে পুরুষদের নারীর আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ হইবে না।

বালিকা ও যুবতী বিধবাদের বিবাহ আরও বেশী করিয়া চালাইতে হইবে। ন্যায়বিচারের জন্য ইহা কর্ত্তব্য, দয়া-মমতার অনুরোধে ইহা আবশ্যক, এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়।

বালিকারা যদি শিক্ষিত হইবার পর কতকটা বেশী বয়সে বিবাহিত হয়, তাহা হইলে তখন তাহাদের শারীরিক বল বেশী হইবে, মনের দৃঢ়তাও বাড়িবে। সুতরাং বালিকাদের উপর অন্তঃপুরে অত্যাচার করা যত সহজ, তাহাদের চেয়ে অধিকবয়স্ক বলিষ্ঠতর ও অধিক সাহসী নারীদের প্রতি অত্যাচার তত সহজ হইবে না।

বালিকাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইলে অবরোধপ্রথা দূর করিতে হইবে, এবং শিক্ষিতা নারীরা যে অশিক্ষিতা-দের মত পর্দ্দার আড়ালে থাকিতে চাহিবে না, তাহা ত দেখাই যাইতেছে। অন্য নানা কারণেও পর্দ্দার বিলোপ কর্ত্তব্য ও অবশ্যম্ভাবী। তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান দেশে খুব কড়া পর্দ্দা ছিল। কিন্তু তুরস্ক হইতে উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। অবরুদ্ধা নারীদের অস্বাভাবিক লজ্জাশীলতা এবং ভীরুতা এত বেশী, যে, অনেক সময় খুব যাতনা পাইলেও তাহারা লোকলজ্জার ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদে না। অবরোধপ্রথা লুপ্ত হইলে অত্যাচারীদের পরোক্ষ সহায় এই ভীরুতা এবং অস্বাভাবিক লজ্জাশীলতা যাইবে, এবং কুলকন্যারা অধিকতর দৃঢ়চেতা ও সাহসী হইবেন। তাঁহারা ইহাও বুঝিবেন, যে, অন্তঃপুরটাই

সমগ্র জগত নহে, তাহার বাহিরেও মানুষের বাঁচিবার জায়গা আছে এবং ন্যায়বিচার ও মমতা পাইবার উপায় আছে।

নারীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব থাকাতেও অনেকে অন্তঃপুরে অন্তঃপুরিকাদের প্রতি অত্যাচার করে। নারীকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকশিত করিয়া তুলিলে তাহাকে আর কেবলমাত্র পুরুষের সুখসুবিধার জন্য সৃষ্ট স্ত্রীজাতীয় জীব মনে করা চলিবে না; তাহাকে স্বতন্ত্র আত্মাবিশিষ্ট, আত্মসম্মান-বিশিষ্ট, জ্ঞানবান মানুষ মনে করিতে হইবে।

এই রূপ নানা প্রকারে অন্তঃপুরে নারীনির্য্যাতন বন্ধ করা সময়সাপেক্ষ। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন অবশ্য চুপ করিয়া থাকা উচিত হইবে না। অত্যাচারী মাত্রকেই আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডে ও সামাজিক শাস্তিতে দণ্ডিত করিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্তি ও ভয়ে মানুষের চরিত্র সংশোধিত হয় না। অপরাধীদের চরিত্র বদলাইবার উপায় জেলে ও জেলের বাহিরে অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

—

ঘরের বাহিরে নারীনিগ্রহ

কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গে ঘরের বাহিরে নারীনিগ্রহ ভীষণ ও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। প্রভুত্ব হ্রাস ও শেষে প্রভুত্ব লোপের আশঙ্কায় ইংরেজ রাজপুরুষেরা "রাজদ্রোহ" নির্ম্মূল করিবার জন্য যতপ্রকারে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ও যত অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহার শতাংশের এক অংশ বিশেষ চেষ্টাও সমাজধ্বংসী নারীহরণ ও নারীধর্ষণ বন্ধ করিবার জন্য করিতেছেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলাও হইয়াছে যে, বিশেষ চেষ্টা করা হইবে না। তাহার কারণ অনুমান করা কঠিন নহে। তবে, ইহা মন্দের ভাল, যে, সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের সাহায্যে, সকল দুর্বৃত্ত দণ্ডিত না হইলেও, দুদশ জন বদমায়েস দণ্ডিত হইতেছে।

কিন্তু অন্তঃপুরে নারীনিগ্রহ বন্ধ করিবার উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন বলিয়াছি, যে, কেবল শাস্তি ও ভয় দ্বারা চরিত্র সংশোধিত হয় না, তেমনি কেবল শাস্তির দ্বারা ঘরের বাহিরে নারীনিগ্রহও বন্ধ করা যাইবে না—যদিও প্রত্যেক দুর্ব্বৃত্তের শাস্তির চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। নারীহরণ ও নারীধর্ষণের বিলোপ সাধন করিতে হইলে নারীর সম্বন্ধে ধারণাই বদলাইতে হইবে। নারী কেবল পুরুষদের সুখের জন্য সৃষ্ট স্ত্রীজাতীয় জীব, এই ধারণা নির্ম্মূল করিতে হইবে। তাহা করিবার কিছু উপায় আগে আলোচনা করিয়াছি। হিন্দু সমাজের নিকৃষ্ট অংশের যে-সব অধম লোকদের মধ্যে এরূপ জঘন্য ধারণা আছে, দেশহিতৈষী হিন্দুদের চেষ্টায় তাহা ক্রমশঃ কমিয়া বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় মুসলমান সমাজের নিকৃষ্ট অংশের অধম লোকদের মানসিক পরিবর্ত্তন সম্ভবতঃ হইবে না। তজ্জন্য ভদ্র চরিত্রবান্ মুসলমানদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহারা এরূপ চেষ্টার প্রয়োজন বুঝিয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না; কারণ তাঁহাদের সহিত আমাদের যোগ নাই। প্রয়োজন যে আছে, তাহার নানা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কেবল একটি আধুনিক প্রমাণ নীচে দিতেছি। ইহা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত "সঞ্জীবনী" হইতে গৃহীত। তিনি "মহাপুরুষ মহম্মদ" নাম দিয়া মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের একটি সশ্রদ্ধ জীবনচরিত লিখিয়াছেন। গত ২০শে শ্রাবণের সঞ্জীবনীতে বরিশালে একটা নারীহরণের মোকদ্দমার বৃত্তান্তে লিখিত হইয়াছে—

"মহিরুদ্দিনের মোকদ্দমা এখন বিচারাধীন। এই সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ঠিক নহে। কিন্তু বিচারের দিন বরিশালের আদালতের বারান্দা ও তাহার সম্মুখের রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া চলাচল একরূপ বন্ধ ছিল। লোকের ভিড়ে পার্শ্ববর্ত্তী আদালতেও কার্য্য করা প্রায় বন্ধ হইয়া উঠে। মোকদ্দমা শুনিবার আগ্রহে সমস্ত সহরের লোক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বরিশালের প্রদর্শনীতেও কখন এত লোক হয় নাই। দর্শকবৃন্দের অধিকাংশই মুসলমান, বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। দর্শকদিগের মধ্যে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি চলিতেছিল, যেন আসামী কোন যুদ্ধ জয় করিয়াছে, সেজন্য সকলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে।"

"আদালত-গৃহের সম্মুখে পর্য্যাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল মুসলমানগণের সংখ্যাধিক ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহাদের কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনা শুনিলে মনে হয় যেন অন্যের মেয়ে অপহরণ করা একটা মস্ত বড় বীরত্ব ও পুরুষের কাজ। ভিড় সরাইয়া দিবার জন্য পুলিশগণ লাঠি চালনাও করিতেছে, কিন্তু মনে হয় তাহারা লগুড়া-

ব্যক্তিকেও যেন একটা মস্ত সম্মানের পুরস্কার ভাবেই গ্রহণ করিতেছে। মামলার শুনানীর পূর্ব্ব হইতেই আদালত-গৃহ ও বাহিরের রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।"

আমরা এই উপলক্ষ্যে ভদ্র ও চরিত্রবান্ শিক্ষিত মুসলমানদিগকে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিতব্য A Book on Non-Indian "Moslem Mentality" ("অভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব সম্বন্ধে একটি পুস্তক") নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রবন্ধটি বিলাতের প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশকমণ্ডলী জর্জ্জ য়্যালেন এণ্ড্ আন্‌উইন কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মস্লেম মেণ্টালিটি" নামক পুস্তকের সমা-সমালোচনা। পুস্তকটি তুরস্ক প্রভৃতি অভারতীয় মুসলমান দেশ সম্বন্ধে লিখিত। সমালোচক যথাসাধ্য সংযম ও নিরপেক্ষতার সহিত প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন।

হিন্দু সমাজের নানা দোষ আগে ছিল, এখনও আছে। কোন সমাজই দোষবর্জ্জিত নহে। হিন্দু সমাজের কোন দোষই তাহার হিতৈষী হিন্দুরা অস্বীকার করেন নাই। এই সকল দোষের যে সংশোধন হইয়া আসিতেছে, হিন্দু সমাজসংস্কার যে চলিতেছে, তাহা প্রধানতঃ হিন্দুসংস্কারকদের চেষ্টার ফল। মুসলমান সমাজের সংস্কার এবং উন্নতিও প্রধানতঃ মুসলমান সংস্কারকদের চেষ্টাতেই সম্ভব হইতে পারে। বাঙালী হিন্দুদের চেয়ে এখন বাঙালী মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। অতীত কালে ও বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে অনেক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান সমাজেও অনেক সংস্কারকের আবশ্যক। তাঁহাদিগকেও হিন্দুসংস্কারকদের মত লোকনিন্দা, কুৎসা, উৎপীড়ন, সমাজ-বহিষ্কার, এমন কি প্রাণনাশভয় পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইবে। তবে যদি প্রত্যেক মুসলমানই মনে করেন, তাঁহাদের সমাজ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহা হইলে আমাদের এসব কথা লেখা বৃথা।

দুর্ব্বৃত্তদের দমন ও শাস্তির জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমবেত চেষ্টা করিলে কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সংবাদপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত নারী-হরণ ও নারীধর্ষণের লজ্জাকর ইতিহাসের কোন কোন ঘটনায় দেখা যায়, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন কোন মুসলমান নারীরক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ সংলো[কের] সংখ্যা ও প্রভাববৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

সমবেতভাবে মুসলমান সমাজের সাহায্য না পাও[য়া] গেলে হিন্দুদিগকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কি[ন্তু] এবিষয়ে হিন্দুদেরও যথেষ্ট চেতনা হয় নাই। একমা[ত্র] রংপুর জেলায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ লোকদের মধ্যে কতকটা জাগরণ দেখ[া] যাইতেছে। নারীরক্ষা ও নিগৃহীতা নারীর উদ্ধারকল্পে সর্ব্বত্র সমবেত চেষ্টা না হইলে সামাজিক ও জাতী[য়] দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

কলিকাতায় একটি নারীরক্ষা সমিতি আছে। ইহার কাজ খুব প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য। ইহা কিন্তু যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছে না। দেশের লোকের ঔদাসীন্য তাহার একটি প্রধান কারণ। কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব এবং কার্য্যপ্রণালীতেও কোন ত্রুটি আছে কিনা, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন।

নারীনিগ্রহ সম্বন্ধীয় অপরাধ সম্বন্ধে আইনের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পুলিশের লোকেরা ও ম্যাজিষ্ট্রেটরা যাহাতে অধিক তৎপর হন, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া চাই। কোন কোন পুলিশ কর্ম্মচারী ও ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে প্রশংসনীয় কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়াছেন। রাজনৈতিক অপরাধ দমনের জন্য যেমন সী আই ডী আছে, তেমনই এইরূপ অপরাধ দমনের জন্য পুলিশের একটি আলাদা বিভাগ থাকা দরকার। তাহার কোন কোন কাজে সাহসী দৃঢ়চিত্ত মহিলাদের নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। যাহারা নারীহরণ ও নারী-ধর্ষণ করে, তাহাদের লঘু দণ্ড না হইয়া আইনে নির্দ্দিষ্ট চূড়ান্ত দণ্ড হওয়া উচিত। অধিকন্তু যাহারা নারীধর্ষণ করে, আমেরিকার মত জেলে তাহাদের ভ্যাসেক্টোমী নামক অস্ত্রচিকিৎসা হওয়া উচিত। ইংলণ্ডেও এইরূপ অপরাধীদের জন্য এই প্রকার ষ্টেরিলাইজেশ্যনের অর্থাৎ বন্ধ্যাত্বাপাদনের ব্যবস্থা সমর্থিত হইতেছে। সকল দেশে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে এই সকল পশুপ্রকৃতি দুর্ব্বৃত্তদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হওয়ায় সামাজিক অধোগতি কতকটা নিবারিত হইতে পারে।

ইহা ছাড়া, যাহাদের কারাদণ্ড হইবে জেলে তাহাদের

মুশিদের ব্যবস্থা আবশ্যক। বস্তুতঃ সকল কয়েদীরই মুশিদার প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ কারাবাসের ফলে নৈতিক অপরাধে দণ্ডিত লোকদের নৈতিক উন্নতি না হইয়া অধোগতিই হয়।

যে-যে কারণে নারীহরণ ও নারীধর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।

প্রথমতঃ, পাশবপ্রবৃত্তির আতিশয্য বশতঃ কতকগুলা লোক এইরূপ অপরাধ করে। এইরূপ দুরাত্মা সকল "ধর্ম্মের" লোকের মধ্যেই থাকিতে পারে ও আছে। বাংলা দেশে প্রধানতঃ মুসলমান ও হিন্দুরা বাস করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ দুরাত্মা অল্পাধিক পরিমাণে আছে।

দ্বিতীয়তঃ, পাপ ব্যবসা চালাইবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশে ভুলাইয়া বা জোর করিয়া নারীহরণের (এবং কোন কোন স্থলে তদানুসঙ্গিক তাহাদের ধর্ষনাশের) প্রথা একদল লোক অনুসরণ করে। বাংলা দেশেও সম্ভবতঃ এইরূপ কতকগুলা লোক আছে। ইহাদের মধ্যে সব ধর্ম্মেরই লোক থাকিতে পারে, হিন্দু এবং মুসলমান আছে। হিন্দু ও মুসলমানের পরিমাণ কত, ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সংবাদপত্রে নারীনিগ্রহের বহু ঘটনায় পুনঃ পুনঃ লিখিত একপ্রকার অভিযোগ হইতে মনে হয়, এইরূপ কাজে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে মুসলমান হয় ত বেশী। কারণ, অনেক অপহৃতা নারীকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মুসলমান চাষী বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বাড়ীতে লুকাইয়া লইয়া বেড়াইবার এবং সেখানে তাহাদের ধর্ষনাশের বর্ণনা দেখা যায়। হিন্দু বদমায়েসরা এইরূপ কাজে গৃহস্থ হিন্দুদের সাহায্য পাইয়া থাকে, এরূপ অভিযোগ ও বর্ণনা দেখি নাই।

তৃতীয়তঃ, নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যও যে বালকবালিকা ও যুবতী অপহৃতা হইতে পারে, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। অন্ততঃ প্রথম হইতে এরূপ উদ্দেশ্য না থাকিলেও, পরিণামে অত্যাচরিতা কোন কোন নারীকে যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা নিশ্চিত। এই উদ্দেশ্যে হিন্দুদিগের দ্বারা মুসলমান নারী অপহৃতা হইবার কারণ নাই। হিন্দুর দ্বারা নিগৃহীতা মুসলমান নারীর মুসলমান সমাজেই স্থান হয়। দুর্ব্বৃত্ত হিন্দুদের দ্বারা মুসলমান নারীর নিগ্রহ হইয়া থাকে। তাহা করিবার মত পৈশাচিক দুঃসাহস কোন কোন হিন্দু বদমায়েসের আছে। গত ২৩শে শ্রাবণের সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত নীচের ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

"ময়মনসিংহের কয়েকজন হিন্দু দুর্ব্বৃত্ত ফুলজান নামে এক ১৩ বৎসরের মুসলমান বালিকাকে ভুলাইয়া আনিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ফুলজানের আত্মীয়গণের সহিত দুর্ব্বৃত্তগণের আপোষের কথা উঠে। তাহার জন্য তাহারা ফুলজানকে লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির করিয়া দেয়। আপোষে মিটমাট না হওয়ায় দুর্ব্বৃত্তগণ ফুলজানকে পুনরায় ধরিয়া লইয়া একেবারে নবদ্বীপে লইয়া যায় এবং তথায় সুমিত্রা নামে পরিচয় দিয়া এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে রাখে। নবদ্বীপে আসিয়াও ফুলজানের কষ্টের শেষ হয় নাই। এখানে পুলিন দাস ও কুশলা সরকার নামে দুইজন সরাইওয়ালা তাহাকে লইয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। তাহারা একদিন ফুলজানকে বিক্রয় করিতে গিয়া ধরা পড়ে। তখন ফুলজানের ইতিহাস পাওয়া যায়। মামলা চলিতেছে।"

হিন্দু কোন বদমায়েস মুসলমান নারীর ধর্ষনাশের পর তাহাকে বলিয়াছে, "তোমার জাতি গিয়াছে, মুসলমান সমাজে তোমার স্থান হইবে না, অতএব তুমি হিন্দু হও," এরূপ ঘটনা কখনও পড়ি নাই, তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজের একটি গুণ এই আছে, যে, অত্যাচরিতারা তাহার আশ্রয় পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, হিন্দুনারীরা ধর্ষিতা হইলে এবং তাহা জানা পড়িলে অনেক সময় তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ তাহাদিগকে ত্যাগ করায় তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বা পাপবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এই কারণে যে কিয়ৎপরিমাণে হিন্দু সমাজের লোকসংখ্যার হ্রাস ও কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান সমাজের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন হইতে হিন্দু সমাজে নিগৃহীতা হিন্দুনারীদিগকে স্থান দিয়া রাখিবার ইচ্ছা অনেক হিন্দুর হইয়াছে, এবং অনেক অত্যাচরিতা হিন্দুনারী সমাজভুক্ত হইয়াই আছে। অত্যাচরিতা নারীর স্থান, বিপথগামিনী কিন্তু পরে অনুতপ্তা নারীর স্থান, সমাজেই হওয়া উচিত, একথা খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানকে বলিবার প্রয়োজন নাই; উভয় সমাজে এই নিয়ম অনুসৃত

হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজকে ইহা পুনঃ পুনঃ বলিবার প্রয়োজন আছে।

কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কাহাকেও জোর করিয়া বা ভ্রমে ফেলিয়া যাহাতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করান হয়, সেই জন্য এইরূপ আইন হওয়া উচিত, যে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইলেই কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের বা বিচারকের সম্মুখে ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনার্থীকে উপস্থিত হইতে বা করিতে হইবে এবং সে যে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করিতে ও বলিতে হইবে। এরূপ নিয়মে কোন ধর্ম্মের লোকেরই আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

হিন্দু সমাজকে নারীরক্ষারূপ একান্ত আবশ্যক কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে হিন্দুনারীর প্রতি সম্মানবৃদ্ধি চাই, একতা চাই, সাহস চাই। নারী যদি "অশিক্ষিতাও" হন, তাহা হইলেও, মাতার জাতি, গৃহলক্ষ্মী, সমাজের রক্ষিকা শক্তির মূর্ত্তিস্বরূপিনী বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। তাহা হইলেও, তাঁহাদিগকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাঁহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া তাঁহাদিগকে আরও সুস্পষ্টভাবে শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে। তাঁহাদের কথা ভাবিতে হইলে, তাঁহারা স্ত্রীজাতীয় জীব-বিশেষ, প্রধানতঃ ও সর্ব্বাগ্রে এই চিন্তাটাই মনে না আসিয়া, তাঁহারা মানুষের মত মানুষ এই চিন্তাও মনে যাহাতে আসে, তাঁহাদের শিক্ষা এবং ঘরে ও বাহিরে তাঁহাদের কাজ এরূপ হওয়া চাই। হিন্দুর একতা বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায় "উচ্চ" জাতি ও "নীচ" জাতি এই ভেদের মূলীভূত কুসংস্কারের লোপ, অস্পৃশ্যতার লোপ, অনাচরণীয়তার লোপ। সব হিন্দু প্রকৃতপ্রস্তাবে কথায় ও কাজে এক, এই ধারণা জন্মিলে দীনতম হিন্দুরও সাহস বাড়িবে। আর যদি হিন্দুর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করা যায়, যে, মানুষ যতই দীন, দুর্ব্বল, অসহায় ও একাকী হউক, ঈশ্বর তাহার সঙ্গে আছেন ও সহায় আছেন এবং মৃত্যুর পরেও তাহার সহায় থাকিবেন, তাহা হইলে তাহারা কখনও ভীরুর মত আচরণ করিবে না। যে-কারণেই হউক, যে উদ্দেশ্যেই হউক, অনেক বাঙালী ছেলে প্রাণ দিয়াছে, অনেক বাঙালী যুবক উপবাস করিয়া তিল তিল করিয়া প্রাণ দিতেছে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে[ছে]। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে সাহসী [ও] দৃঢ়চিত্ত যুবকের একান্ত অভাব নাই। ক্ষণিক উত্তেজ[না] ও উৎসাহে প্রাণ দেওয়ার জন্য যত সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা[র] প্রয়োজন হয়, তিল তিল করিয়া প্রাণ দেওয়া এবং পলে পলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তদপেক্ষা বেশী সাহস ও দৃঢ়তা আবশ্যক। এইহেতু নারীরক্ষার ক্ষেত্রে সমর্থ, সাহসী ও বলিষ্ঠ যথেষ্টসংখ্যক বাঙালীর আবির্ভাবের আশা ছাড়িয়া দিই নাই। কেন তাঁহার[া] সর্ব্বত্র এই কাজে অগ্রসর হইতেছেন না, তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে তাহার আলোচনা করিতাম।

অত্যাচরিতা বঙ্গনারীরা সতীত্ব রক্ষার জন্য এবং স্বধর্ম্মে থাকিবার জন্য যেরূপ দৃঢ়তা দেখাইতেছেন ও প্রাণপণ করিতেছেন, অতিশয় পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও যে টলিতেছেন না, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়, এবং আমাদের অযোগ্যতায় লজ্জিত হইতে হয়। এই সকল নারীকে হিন্দুসমাজে সমুচিত সম্মান সহকারে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সমুদয় হিন্দুনারীকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রচালন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অনেক স্থলে এই শিক্ষা দেওয়াও হইতেছে।

আমরা কেবল হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্যই লিখিলাম, কারণ, ইহা জানি হিন্দুদের দোষ দেখাইলে কতকগুলি হিন্দু রাগ করিলেও অনেক হিন্দু আমাদের ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। আমাদের কথার উপর মুসলমানদের আস্থার সেরূপ দাবী করিতে পারি না, সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

—

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা

বঙ্গে চারি পাঁচ বৎসরের অধিক বয়সের স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় সমুদয় মানুষকে লিখনপঠনক্ষম করিতে পারা কঠিন কাজ নহে। দেড়শত বৎসরের অধিক কাল বাংলা দেশ ইংরেজের শাসনাধীন আছে। এই সময়ে

...এই কাজ অনায়াসে করা যাইতে পারিত। বঙ্গে ...স্ব আদায় আগেও যথেষ্ট হইত, এখনও হয়। কিন্তু কোম্পানীর আমলে ও তাহার পরে যুদ্ধদ্বারা যে-সব প্রদেশ ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বঙ্গের রাজস্ব হইতে হইয়াছে। এখনও বঙ্গে সংগৃহীত অধিকাংশ রাজস্ব বঙ্গের বাহিরে খরচ হয়। অন্য রাজস্ব ছাড়িয়া দিয়া যদি একমাত্র বঙ্গে উৎপন্ন পাটের শুল্কটি মাত্র বাংলা দেশকে রাখিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে সেই চারি কোটি টাকা হইতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। কিন্তু বাংলা দেশকে তাহাও দেওয়া হয় না।

বাঙালীকে সুস্থ সবল ও জ্ঞানী করিবার নিমিত্ত বঙ্গের রাজস্ব যথেষ্ট ব্যয়িত না হওয়ায় বাঙালী রোগজীর্ণ ও নিরক্ষর আছে; অধিকন্তু এই মিথ্যা ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যে, বাঙালী যথেষ্ট ট্যাক্স দেয় না বলিয়া বঙ্গে যথেষ্ট পাঠশালা স্থাপিত হয় নাই। যথেষ্ট পাঠশালা যে স্থাপিত হয় নাই, তাহা সত্য; কিন্তু তাহার কারণ রাজস্বের অভাব নহে। তাহার কারণ বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ বঙ্গের বাহিরে ব্যয়। আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, কোম্পানীর আমলে প্রথম যুগে বঙ্গে প্রতি দশহাজার মানুষের জন্য যতগুলি পাঠশালা ছিল, এখন তত নাই।

অবস্থা এইরূপ। এখন কয়েক বৎসর হইতে শিক্ষার বিস্তৃতির দাবী হওয়ায়, সরকার বাহাদুর বলিতেছেন, তোমরা শিক্ষাট্যাক্স দাও, আমরা ব্যবস্থা করিতেছি। বঙ্গে যথেষ্ট রাজস্ব আদায় হয় বলিয়া আমরা শিক্ষার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাবে কখনও সম্মত হই নাই, এখনও ইহাতে আমাদের মত নাই। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অনেক নির্ব্বাচিত সভ্যও অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন যদি গবর্ন্মেণ্ট এই উপায়ে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা দেশের প্রতিনিধিদের অনুমোদিত প্রকারের প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় করিতে সম্মত হন। কিন্তু সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা সেরূপ নয়। তাঁহারা বরাবর শিক্ষাদানকার্য্য, শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষিতব্য বিষয় নির্দ্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন, প্রভৃতি যথাসাধ্য নিজের হাতে রাখিয়াছেন। অতিরিক্ত ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত টাকার ব্যয়েও এই নীতি অবলম্বন করিতে চান।

তাহার প্রমাণও রহিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার আগেকার ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা বিল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিবার ভার একটি সিলেক্ট কমিটির উপর দেওয়া হয়। এই কমিটির সভ্যেরা অনেক পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ন্মেণ্ট যে বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত সিলেক্ট কমিটির দ্বারা সংশোধিত বিল নহে; সরকার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল একটি নূতন বিল পেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা গবর্ন্মেণ্টের হাতে রাখা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষাকমিটি কেবল পরামর্শ চাহিলে পরামর্শ দিতে পারিবেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে, ব্যবস্থাপক সভার প্রতি এই তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের ফলস্বরূপ সরকারী নূতন বিলটি আবার এক নূতন সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ঠিক্‌ই হইয়াছে। কিন্তু কমিটির সভ্য-সংখ্যা বড় বেশী হইয়াছে। যাহা হউক, শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিলে তাহা সত্ত্বেও শীঘ্র কাজ হইতে পারিবে।

সরকারী বিলটির বিস্তারিত আলোচনা করিবার এখন কোন প্রয়োজন নাই। কেবল সর্ব্বসাধারণের এখন বলা উচিত, সিলেক্ট কমিটি দ্বারা উহা কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই।

আমাদের বিবেচনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষাকমিটিকে কেবল পরামর্শ দিবার কমিটি না করিয়া যথেষ্টক্ষমতাবিশিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার কর্ত্তৃপক্ষ করা কর্ত্তব্য। এই কমিটিতে শিক্ষা-বিষয়ে অভিজ্ঞ বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা সরকারী ও সরকারের মনোনীত সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাবে আমাদের মত নাই। ভারতগবর্ন্মেণ্ট বাংলা দেশকে তাহার রাজস্বের বার্ষিক চারি কোটি টাকা ফিরাইয়া দিন; তাহা হইলেই কাজ চলিবে। যাহা হউক, সিলেক্ট কমিটি যদি নূতন ট্যাক্সে রাজী হন, তাহা হইলে আইনে এই কথা থাকা চাই, যে, এই উপায়ে যত টাকা আদায় হইবে, গবর্ন্মেণ্ট তত টাকা (বা অন্ততঃ ৭৫ লক্ষ

টাকা) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত সাহায্যস্বরূপ দিবেন; অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত সরকারী ব্যয় হয়, তাহার উপর এই টাকা দিবেন। শিক্ষা-ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত টাকা এবং পুরাতন ও নূতন সরকারী মঞ্জুরী টাকার আইনসঙ্গত ও ন্যায্য ব্যয় হইতেছে কি না, সরকারী হিসাব-পরীক্ষকদের দ্বারা তাহা ক্রমাগত পরীক্ষিত হওয়া চাই।

বঙ্গের সর্ব্বত্র যাহাতে একই ধাঁচের সাহিত্যিক ভাষার লিখিত পুস্তক পাঠশালাসমূহে ব্যবহৃত হয়, শিক্ষার বিষয় ও মান (standard) এক হয়, পুস্তকগুলিতে কোন সাম্প্রদায়িকতা না থাকে, তাহা কেন্দ্রীয় শিক্ষাসমিতি দেখিবেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাসমিতিতে এবং প্রত্যেক জেলার শিক্ষা-সমিতিতে উপযুক্তসংখ্যক বেসরকারী শিক্ষিতা মহিলা-সভ্য থাকা চাই। এখন এরূপ সভ্য পাওয়া যাইবে। গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে নিজ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত সমিতিগুলিতে সরকারী মহিলা-সভ্যও নিযুক্ত করিতে পারেন।

শহর ও গ্রাম সর্ব্বত্রই যাহাতে যথেষ্টসংখ্যক পাঠশালা স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—

প্রাথমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে মহিলাদের কর্ত্তব্য

কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গের অনেক শিক্ষিতা মহিলা ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতি করিয়া দেশে নারীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই, যে, তাঁহারা সিলেক্ট কমিটির আলোচনা ও সংশোধনের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে সংবাদপত্রসমূহে আপনাদের মত ব্যক্ত করুন। নিজের নিজের মত বলুন এবং তাঁহাদের সমিতিগুলির মতও বলুন। তদ্ভিন্ন, তাঁহাদের এই মত গবর্মেণ্টের মারফত সিলেক্ট কমিটিকেও জানান।

আমরা উপরে বলিয়াছি, যে, কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা-সমিতিতে এবং প্রত্যেক জেলার প্রাথমিক শিক্ষাসমিতিতে উপযুক্তসংখ্যক মহিলাসভ্য থাকা চাই। আশা করি আমাদের এই প্রস্তাব শিক্ষানুরাগিনী মহিলাদিগের দ্বারা অনুমোদিত হইবে। আমাদের আরও একটি বক্তব্য এই, যে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে যে উপায়ে যত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার অর্দ্ধেক বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। এপর্য্যন্ত বালিকাদের শিক্ষা অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবটি কোনক্রমেই অযৌক্তিক বিবেচিত হইতে পারে না। এই প্রস্তাবটিও মহিলারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক না হইলেও, শিক্ষাবিষয়ক আর একটি কথা মহিলাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রবাসীতে কয়েকবার লিখিত হইয়াছে, যে, বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটি করিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থাকা উচিত যাহা হইতে বালিকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে বালকদেরই মত সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন বালিকাদিগকে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ, শুশ্রূষা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য ব্যয় প্রধানতঃ বালকদের জন্যই হইতেছে। তাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হইতেছে না।

—

বঙ্গের স্বাজাতিকতার পৃথকীকরণ

ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকেরা প্রাদেশিক প্রভুত্ব (provincial autonomy) চাহিতেছেন। ইহার যেমন প্রয়োজন আছে, ইহার আতিশয্যের তদ্রূপ দোষও আছে। ভারতবর্ষ যে বারবার পরাধীন হইয়াছে, তাহার একটি কারণ দেশটির বহু স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত থাকা, সমগ্র দেশটির এক কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের অধীন না থাকা। এই জন্য সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক প্রভুত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। এমন কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বিষয় থাকা চাই যাহা কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের অধীন হইবে। তাহা হইলে ভারতীয়দের একজাতিত্ব বাড়িবে, এবং ভারতবর্ষ একটি স্বশাসক শক্তিশালী রাষ্ট্র হইতে ও থাকিতে পারিবে।

রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে যেমন, অন্যান্য বিষয়েও

তেমনি, একদিকে প্রদেশগুলির বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইবে, অন্যদিকে তাহাদের উপর একটি সাধারণ ভারতীয় আদর্শের ছাপ যাহাতে পড়ে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহারা ভারতীয় একতা ও শক্তিশালিতার বিরোধী, তাহারা ইহা চায় না। বিশেষ করিয়া তাহারা বাঙালীদিগকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে সম্বন্ধহীন ও যোগবিহীন রাখিতে চায়। একথা তাহারা সাধারণতঃ পরিষ্কার ভাষায় খুলিয়া বলে না; কিন্তু কখন কখন তাহা বাহির হইয়া পড়ে। চারি বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ১৯২৫ সালের ২২শে জুন বিলাতী টাইম্‌স্‌ পত্রিকা লেখেন :—

"The fact is that Bengal differs more from most other Indian provinces than they differ from one another. Economic, temperamental, and social causes account for this difference. Caste is less powerful; a common literary language unites over forty million Bengalis. Even the Moslem community, who form a narrow majority of the population, are indisputably less divided both socially and politically from their Hindu country-men then they are in other parts of India. The Bengali temperament, at once calculating and emotional, critical and enthusiastic, baffles other Indians almost as much as it puzzles British administrators. There have been periods when Bengal has led Indian nationalism. But this leadership has been temporary. The disappearance of Mr. Das, the rapidity with which other provinces are gaining ground educationally at the expense of what once seemed a Bengali monopoly, and the growth of 'communal' feeling throughout India may to some extent isolate the Nationalism of Bengal from the main current of Indian politics."

তাৎপর্য্য। "বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের অধিকাংশ অন্য প্রদেশগুলির পরস্পরের সহিত পার্থক্য যত বেশী, বাংলা দেশ হইতে তাহাদের পার্থক্য তার চেয়ে বেশী। এই পার্থক্যের কারণ সামাজিক, আর্থিক, এবং বাঙালীদের ধাতুগত। বঙ্গে জাতিভেদ কম প্রবল; একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষা চারি কোটির উপর বাঙালীকে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করিয়াছে। এমন কি বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ মুসলমান সমাজের, বাঙালী হিন্দুগণ হইতে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রভেদ অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুমুসলমানের প্রভেদ হইতে কম। বাঙালীর ধাতু বা প্রকৃতি যুগপৎ ক্ষতিলাভগণনশীল ও ভাবপ্রবণ এবং গুণদোষবিচারশীল ও উৎসাহোন্মত্ত বলিয়া ব্রিটিশ শাসন-কর্ত্তারা যেমন তাহা বুঝিতে পারে না, প্রায় তেমনি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশবাসীরাও বুঝিতে পারে না। কোন কোন সময়ে বাংলা দেশ স্বাজাতিকতায় ভারতবর্ষে নেতৃত্ব করিয়াছে। কিন্তু এই নেতৃত্ব অল্পকালস্থায়ী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের তিরোভাব, একদা বাঙালীদেরই একচেটিয়া বলিয়া প্রতীয়মান শিক্ষা সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের শীঘ্র শীঘ্র অগ্রগতি, এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক ভাবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বঙ্গের স্বাজাতিকতাকে ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রধান স্রোত হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে।"

বাঙালী ও তাহার স্বাজাতিকতা এই প্রকারে "একঘরো" হইয়া যায়, ইহা অবশ্য টাইম্‌স্‌ খুবই ইচ্ছা করে। এই জন্য বাঙালীকে ভারতীয় স্বাজাতিকতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ইহা খুব সহজ কাজ নয়। এক প্রকার যোগ রক্ষা আছে, যাহার মানে অন্য সব প্রদেশের নিকট বা তাহাদের মধ্যে জবরদস্ত লোকদের নিকট আত্মসমর্পণ। আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। বাঙালী নেতাদের কাছে অন্য সবাই আত্মসমর্পণ করুক, ইহাও আমরা চাহিতেছি না। বঙ্গের শিক্ষা, সেবা ও লোকসংখ্যার অনুপাতে ভারতীয় সার্ব্বজনিক সকল ব্যাপারে বাঙালীর প্রভাব অনুভূত হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। যদি বাঙালীর বিবেক ও বুদ্ধি বিবেচনা তাহাকে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সহিত একযোগে কাজ করিতে অসমর্থ করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বমতে আনিতে বাঙালী চেষ্টা করিতে বাধ্য।

কিছু দিন হইতে বঙ্গদেশকে প্রকারান্তরে তাচ্ছিল্য দেখাইবার ভাব কোন কোন প্রদেশের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের ভুল কি না, জানি না। আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া থাকিব না। আমাদের ধারণা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিব। কিন্তু যদি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে ধীর ভাবে বুঝিতে

চেষ্টা করিতে হইবে, এই তাচ্ছিল্য বাঙালীদের দোষে হইয়াছে, না, অন্যদের দোষে।

—

বাঙালী ও অবাঙালী

বাঙালী ও অবাঙালী, এই শ্রেণীভেদটাই অপ্রীতিকর। ভারতবর্ষের ভাষা যদি এক হইত এবং সব প্রদেশের সব রকমের লোকদের মধ্যে একত্র ভোজন ও বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে এই দেশের সব লোক ভারতীয় বলিয়াই পরিচিত হইত। কিন্তু এখন নানা ভাগে ও শ্রেণীতে আমরা বিভক্ত। ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি এই সব ভেদের কারণ। এই সকল পার্থক্যকে কেবলমাত্র অমঙ্গলের উৎপাদক মনে করিলে ভুল করা হইবে। পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন দ্বারা যে ঐক্য লব্ধ হয়, তাহার সমৃদ্ধি ও শক্তি খুব বেশী। কিন্তু যদি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, সকল ভাগ ও শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের ইচ্ছা সর্ব্বদা কাজ না করে, তাহা হইলে মহাজাতীয় একতা জন্মিতে পারে না।

এই হেতু বাঙালী ও অবাঙালী কথা দুটির মধ্য হইতে যে প্রতিযোগিতা ঈর্ষ্যা ও অসদ্ভাব মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, তাহা আশঙ্কার বিষয় মনে করি। প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও সদ্ভাব স্থাপন ও রক্ষা কঠিন হইলেও তাহা করিতে হইবে।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র অনেক। বাংলা দেশে বহুবিধ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে-সব কলকারখানা আছে, তাহার শ্রমিকেরা অধিকাংশস্থলে বাঙালী নহে। রেলের ও জাহাজের কুলিরা অধিকাংশস্থলে বাঙালী নহে। ট্রামগাড়ীর ও মোটরগাড়ীর চালকেরা অনেকেই বাঙালী নহে। এই সকল পরিশ্রমের ক্ষেত্র আগে দেশে ছিল না। পরে যখন কলকারখানা, রেল ও ষ্টীমার প্রভৃতিতে লোকের দরকার হইল, তখন অবাঙালী শ্রমিকরা অধিক বলিষ্ঠ,শ্রমপটু বা উদ্যোগী বলিয়া উপার্জ্জনের এই ক্ষেত্রগুলি দখল করিয়া বসিল। এই সব স্থলে বাঙালীর রোজগার কেহ কাড়িয়া লইল বলা যায় না; কেবল ইহাই বলা যায়, যে, যত ও যেরূপ শ্রমিকের দরকার বাংলা দেশ তাহা দিতে পারে নাই। অতএব অবাঙালী শ্রমিকদের সমশ্রেণীস্থ বাঙালীদের আর্থিক অবস্থা যে ভাল, তাহাও বলিবার জো নাই। এই সব শ্রেণীর বাঙালীদিগকে অধিকতর বলিষ্ঠ, শ্রমপটু ও উদ্যোগী হইতে হইবে, এবং তাহারা যাহাতে সেরূপ হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন বঙ্গের নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে করিতে হইবে।

অন্য অনেক কাজ ছিল, যাহা আগে বাঙালীরা করিত কিন্তু যাহা হইতে এখন বাঙালীরা তাড়িত হইতেছে। এইরূপ কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে এখন আর বাঙালী নাই বলিলেও চলে। কৃষিক্ষেত্রের মজুরী, নৌকার মাঝির কাজ, গৃহস্থের পাচক ও অন্য ভৃত্যের কাজ, মুদির দোকান, ময়রার দোকান, ইত্যাদি আগে বাঙালীরাই করিত। এখন এই সব উপার্জ্জনের ক্ষেত্র হইতে তাহারা হটিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। ইহার জন্য দুঃখ করিয়া রাগ করিয়া বসিয়া থাকায় কোন লাভ নাই। বঙ্গের ও অন্য কোন্ কোন্ প্রদেশের কাহাদের কি কি দোষ বা গুণ ইহার কারণ তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। নিজেদের দোষ সংশোধন এবং অপরের গুণ অর্জ্জন একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহার জন্য যে অনুসন্ধান ও চিন্তার প্রয়োজন, তাহা শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকে করিতে হইবে।

সরকারী ঘরবাড়ী, সেতু ও রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত করিবার ঠিকাদারী আগে বাঙালীরাই পাইত ও করিত। এখন তাহা অনেকস্থলে অবাঙালীদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারের উপায় অবলম্বন আবশ্যক।

ইংরেজ সওদাগরদের হৌসে বেনিয়ান মুৎসুদ্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কেরানীগিরি পর্য্যন্ত অনেক কাজ আগে বাঙালীরাই করিত; এখন অবাঙালী অনেকে তাহাতে ভাগ বসাইয়াছে। এই প্রকারে অনেক বাঙালীর রোজগারের পথ বন্ধ হইয়াছে।

পাটের কল ও অন্যান্য কলকারখানা স্থাপন প্রথমে ইউরোপীয়েরা করে। তাহাদের পন্থা অবলম্বন করিয়া মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি এইরূপ কলকারখানা স্থাপন করিয়াছে। এক্ষেত্রে বাঙালীদের উদ্যোগিতার ও দল

বাঙালীর কাজ করিবার ক্ষমতার ন্যূনতা দেখা যাইতেছে। বাঙালীর শক্তি কিয়ৎপরিমাণে এই পথে চালিত হইতেছে। আরও বেশী হওয়া চাই।

চা বাগানের মালিক ও পরিচালক আগে শুধু ইংরেজরা ছিল; এখন বাঙালীরাও এই কাজে হাত দিয়াছে এবং তাহাতে লাভবান্ হইতেছে।

কয়লার খনির কারবার আগে ইংরেজরা ছাড়া বাঙালীরাই করিত। এখন অনেকস্থলে বাঙালীদিগকে হটিয়া যাইতে হইতেছে।

বিদেশী কাপড় ও অন্য নানাবিধ বিদেশী জিনিষের বড় ও ছোট ব্যবসা বাঙালীদের হাতে ছিল। এখন বড় এরূপ ব্যবসা ত বাঙালীদের হাতে নাই-ই, ছোট ব্যবসাতেও অবাঙালীদেরই প্রাধান্য।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ মার্চ্যাণ্ট্‌স্ চেম্বার নামক দেশী বণিক্‌সমিতির নেতৃত্ব করেন অবাঙালী কলিকাতাপ্রবাসী বণিক্‌রা। ইহার সাধারণ সভ্যদের মধ্যেও বাঙালীর সংখ্যা খুব কম।

কেরানীগিরিতে বাঙালী আগে প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত ছিল। এখন সরকারী আফিস, রেলের আফিস ও সওদাগরী আফিসে মান্দ্রাজী কেরানীরা প্রতিযোগিতা করিতেছে।

সরকারী কলেজসমূহে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে দেশী অধ্যাপক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বাঙালী ছিলেন। পরে সরকারী কলেজসমূহে যে কোন কোন স্থলে অবাঙালী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা কোন বাঙালীর দ্বারা হয় নাই, তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতাও কোন বাঙালীর ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব প্রধান অধ্যাপকের পদে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অবাঙালী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে তিনি ইহা করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন। এই পদগুলির কাজ করিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষণপটুতা ও চরিত্রবত্তা কোন্ বাঙালীর ছিল না বা নাই, এমন নয়।

অবাঙালী বিস্তর সুস্থ ও রুগ্ন ভিখারী বাংলা দেশে আসিয়া বেশ রোজগার করে। তাহাতে বাঙালী ভিখারীর অন্ন মারা যায়।

প্রত্যেক দেশ ও প্রদেশের সব রকম কাজ যথাসম্ভব তথাকার লোকদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত। তাহা হইলেও, বাঙালীরা, "বাংলা দেশ বাঙালীদেরই জন্য", এই নিয়ম চালাইবার নিমিত্ত বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে কখনও অনুরোধ করে নাই—যদিও ঐরূপ নীতি বিহার প্রভৃতি প্রদেশে অনেক বৎসর হইতে চলিতেছে এবং তাহা তত্তৎপ্রদেশের লোকদের সহযোগিতা, চেষ্টা ও অনুমোদনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবাসী যে এক জাতি, এই কথা সর্ব্বপ্রথমে বাংলা দেশেই বলা হইয়াছিল। এই বাণী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে, প্রধানতঃ উত্তর-ভারতের প্রদেশগুলিতে, বাস করে ও অনেকে তথায় অর্থ উপার্জ্জন করে। আসামের বাঙালীরা অধিকাংশ প্রাকৃতিক বঙ্গের অংশীভূত ও পরে আসামের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে বাস করে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। বিহার প্রদেশের বাঙালীদের অধিকাংশও প্রাকৃতিক বঙ্গের অংশীভূত ও পরে বিহারের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে বাস করে। তাহাদের সম্বন্ধেও কিছু বলা অনাবশ্যক। খাস্ বিহার প্রদেশের নানা স্থানে যে-সব বাঙালী বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ রেলের চাকরী, সরকারী চাকরী, ডাক্তারী, ওকালতী ও বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকতা অবলম্বন করিয়া সেখানে আছে। বিহারের আগে বঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়ায় স্বভাবতই বাঙালীরা এই সব বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা অনেকেই কর্ম্মস্থানে ঘরবাড়ী করিয়া পুরুষানুক্রমে তথাকার বাসিন্দা হইয়াছে ও অর্জ্জিত অর্থ প্রধানতঃ সেখানেই ব্যয় করে। কর্ম্মস্থানের ভাষাও তাহারা বুঝিতে বলিতে পারে। সেই কারণে তাহাদিগকে বঙ্গের অধিবাসী না বলিয়া ঐসব জায়গারই অধিবাসী বলা উচিত। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে বাইশ তেইশ হাজার বাঙালী আছে। তাহার অধিকাংশ কাশী বৃন্দাবন আদি তীর্থে বাস করে। বাকী, রোজগারী, যাহারা তাহাদের পেশা খাস বিহারের বাঙালীদের মত। তাহারাও অনেকেই আগ্রা-অযোধ্যায় ঘরবাড়ী করিয়া ঐ প্রদেশের

অধিবাসী হইয়া গিয়াছে এবং হিন্দী বুঝিতে বলিতে পারে। পঞ্জাবে বাঙালী এত কম যে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

আমরা আগে একাধিক বার সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, যে, বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের যে-যে প্রদেশে যত বাঙালী আছে, বঙ্গে সেই সেই প্রদেশের লোক তদপেক্ষা খুব বেশী আছে। এক কলিকাতা সহরেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যত লোক আছে, সেই সেই প্রদেশে তাহা অপেক্ষা অনেক কম বাঙালী আছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা যে-যে প্রদেশে মোট যত রোজগার করে, সেই সেই প্রদেশের লোকেরা বঙ্গে মোট উপার্জ্জন তার চেয়ে অনেক বেশী করে। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা বাংলা দেশে যত টাকা পাঠায় বা আনে, বঙ্গ-প্রবাসী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা বাংলাদেশ হইতে নিজ নিজ প্রদেশে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাঠায় ও লইয়া যায়। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের শতকরা যত জন কর্ম্মস্থানে ঘরবাড়ী করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে এবং উপার্জ্জিত টাকা তথায় ব্যয় ও সঞ্চয় করে, বঙ্গ-প্রবাসী অবাঙালীদের শতকরা ততজন বঙ্গে ঘরবাড়ী করিয়া ইহার স্থায়ী বাসিন্দা হয় নাই এবং তাহাদের রোজগারের অধিকাংশ এখানে ব্যয় ও সঞ্চয় করে না।

বাংলা দেশের বাহিরের বাঙালীদের ও বঙ্গপ্রবাসী অবাঙালীদের মধ্যে আর দুটি প্রধান প্রভেদের উল্লেখ করিব। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা প্রধানতঃ বিদেশী গবর্ন্মেণ্টের আফিস আদালতের আশ্রয়ে ও সম্পর্কে বাংলা দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহারা অনেকটা পরানুগ্রহজীবী। বঙ্গপ্রবাসী অবাঙালীরা কলকারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, জাহাজঘাটায় ও নৌকায় শ্রমে নিযুক্ত, কিংবা কলকারখানার ও ছোট বড় কারবারের মালিক; সুতরাং তাহারা ততটা বিদেশীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না। বঙ্গের এবং বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদিগকেও এমন সব বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে স্বাবলম্বনের প্রয়োজন। বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে প্রধানতঃ যে-সব প্রদেশে গিয়াছেন, সেখানে প্রথম প্রথম তাঁহারাই শিক্ষালয় স্থাপন ও অন্যান্য দেশহিতকর কাজে নেতৃত্ব বা সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং এখনও এইরূপ সব কাজের সহিত তাঁহাদের যোগ আছে। বঙ্গপ্রবাসী অবাঙালীরা বাঙালীর জন্য শিক্ষালয় স্থাপন প্রভৃতি কাজ করেন নাই; তাঁহারা প্রধানতঃ নিজেদের রোজগারের কাজেই মন দিয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে বিধবাদের, নিগৃহীতা নারীদের ও অনাথ শিশুদের সাহায্যের জন্য এবং হিন্দু সমাজ সংরক্ষণের জন্য অল্পসংখ্যক মাড়োয়ারী অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহা অবশ্যশ্লাঘ্য। তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু কলিকাতার অবাঙালী লক্ষপতিদের সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।

বাংলা দেশে বিস্তর অবাঙালীর আগমনে বাঙালীর এই চেতনা হইয়াছে বা হওয়া উচিত, যে, বাংলা দেশ ধনের খনি, এখানে কাহারও অনাহারে থাকা অবশ্যম্ভাবী নহে। বাংলা দেশ হইতে যে এত টাকা রোজগার হইতে পারে, তাহা বাঙালীরা জানিত কি? অতএব, বঙ্গে কত প্রকারে রোজগার হইতে পারে, তাহা বঙ্গপ্রবাসী অবাঙালীদের নিকট হইতে বাঙালীদের শিখা উচিত। অবশ্য এই অবাঙালী উপার্জ্জকরা স্কুল খুলিয়া বাঙালীদিগকে নিজেদের উপার্জ্জনের বিদ্যা ও কৌশল শিখাইয়া দিবে না। কিন্তু বাঙালীদের উদ্যোগিতা ও চেষ্টা থাকিলে তাহারা তাহা আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিতে পারিবে। বুদ্ধির অভাব বাঙালীর নাই; কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের অনিশ্চিত লাভের উপর নির্ভর করিবার সাহস, অবিলাসিতা, মিতব্যয়িতা এবং শ্রমশীলতা বাঙালীকে অর্জ্জন করিতে হইবে। অনেক অবাঙালী এই সব বিষয়ে তাহাদের শিক্ষক হইবার যোগ্য।

—

নৌসারীর অন্ত্যজ সেবা আশ্রম

বরোদা রাজ্যের নৌসারীতে কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মেথরশ্রেণীর লোকদের জন্য একটি "অন্ত্যজ সেবা আশ্রম" খুলিয়াছেন। এখানে তাহাদের সন্তানেরা সাধারণ শিক্ষা পায়। তদ্ভিন্ন কুমারী তেহমিনা নারিমান, বি-এ, ও কুমারী আনন্দীবাঈ পাঠক, বি-এ, তাহাদিগকে

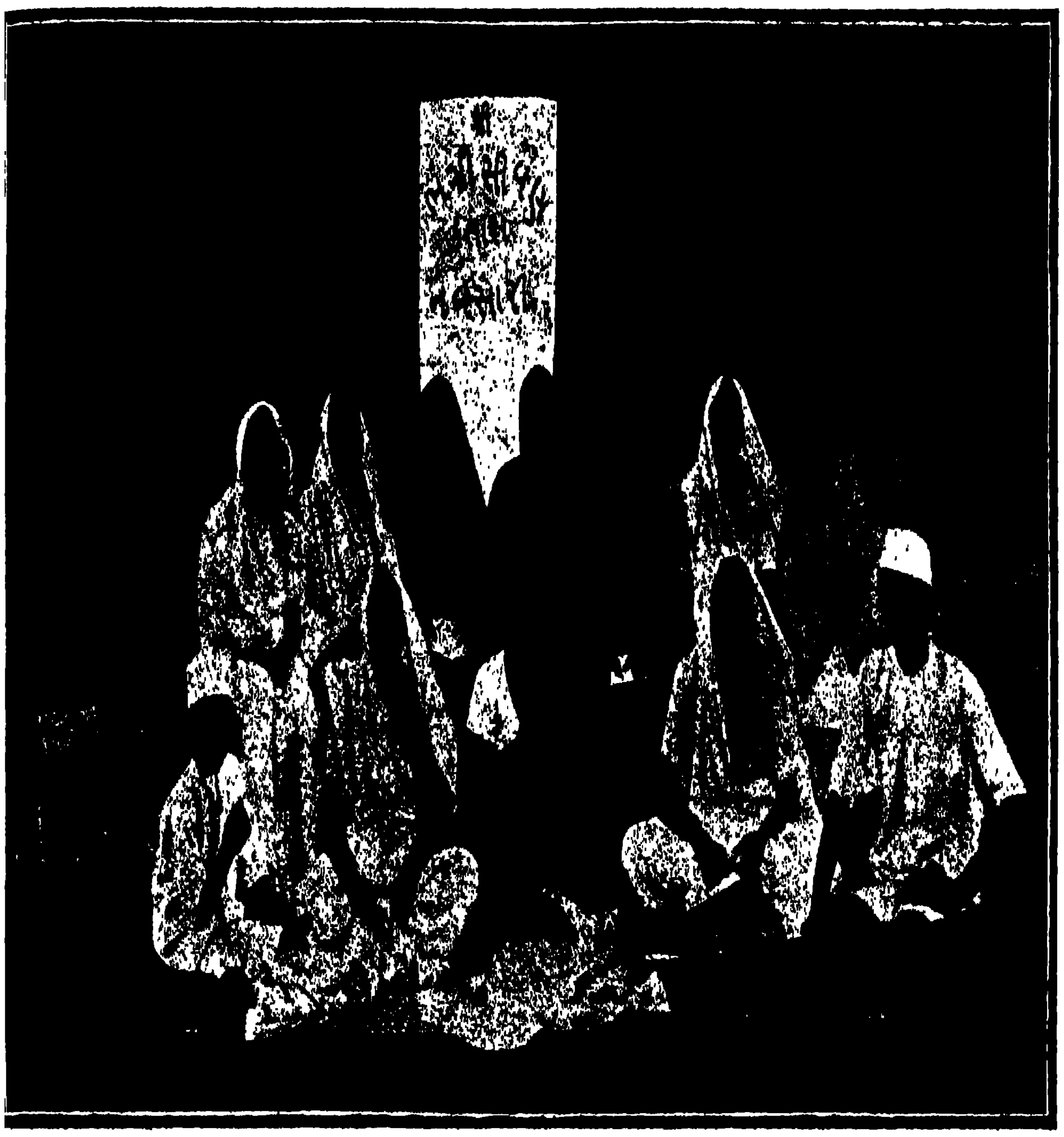

অন্ত্যজ সেবামণ্ডলের সেলাইএর ক্লাস

সেলাই ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহাতে তাহাদের ও তাহাদের গৃহস্থালীর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

—

"শৃঙ্খলিত ভারতের" জন্য দণ্ড

আমেরিকানিবাসী বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য ও গ্রন্থকার ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ড প্রণীত "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ, হার রাইট টু ফ্রীডম্" ("শৃঙ্খলিত ভারত, স্বাধীনতায় তাহার অধিকার") নামক ইংরেজী পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার অভিযোগে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের এক হাজার টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। এই দুই হাজার টাকা প্রবাসী আফিস ও প্রেসকে দিতে হইবে।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য যথাসময়ে বলিব।

—

গগনচন্দ্র হোম

শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোম মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত অন্যত্র "সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার উপর যখন গত শতাব্দীতে সিটি-কলেজের আফিসের ভার ছিল, তখন ঐ কলেজ হইতে আমি বি-এ পাস করি। তখন হইতে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম এবং বরাবর তাঁহার নিকট প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছি। তিনি সুলেখক ছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতি সপ্তাহে সঞ্জীবনীতে সম্যক্ জ্ঞান ও তেজস্বিতার সহিত প্রবন্ধ লিখিতেন। অনেক দিন তাঁহাকে উহার আফিসে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়াছি। গগনবাবু ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত লোক ছিলেন এবং কর্ম্মিষ্ঠতা ও সততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দীর্ঘকাল দুরারোগ্য পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকিলেও তাঁহার পরিবারবর্গের সুশৃঙ্খল ও সুকোমল সেবার গুণে তাঁহার রোগযন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়াছিল।

—

বিশ্বভারতীতে বর্ষামঙ্গল

বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে গত ২১শে শ্রাবণ বিশ্বভারতীর সুরুলস্থিত শ্রীনিকেতনে সীতাযজ্ঞ বা হলকর্ষণ উৎসব সম্পন্ন

হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হলচালন করেন। পরদিন শান্তি-নিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব সম্পন্ন হয়।

—

রাষ্ট্রীয় জীবনের ও সামাজিক জীবনের পূর্ণতা

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবনকে পূর্ণতা দিবার জন্য অনেক যুবক এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অনেক যুবক ইহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তাঁহাদের মানসিক বল ও সাহস হইতে বুঝা যায় ভারতবর্ষে সুকঠিন কাজের জন্য লোকের একান্ত অভাব নাই। ইহা আশার কথা। অন্য দিকে আশঙ্কার কারণও রহিয়াছে।

রাষ্ট্র মানে বিস্তৃত মাঠ ঘাট নদী পর্ব্বত অরণ্যানী ঘর-বাড়ী কলকারখানা নহে। মানুষ, তাহার পরিবার, গৃহস্থালী ও সমাজকে লইয়াই রাষ্ট্র। মানুষ যদি পরিবারবদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ সমাজে স্বাধীনভাবে বাস করিতে না পারে,তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও পরাধীনতার প্রভেদ সম্বন্ধে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। মানুষই যদি পশুতে পরিণত হইল কিংবা লোপ পাইল, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ণতার কথা কাহার জন্য ভাবা যাইবে? বঙ্গের অনেক জেলায়, অনেক শহরে ও গ্রামে নারীরা নির্ভয়ে দিবসে বা রাত্রিতে বাস করিতে পারিতেছেন না। আগে আগে অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থার নারীদের উপরই অত্যাচার হইতেছিল। ক্রমে দুরাত্মারা অধিক সঙ্গতিপন্ন ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নারীদের উপরও আক্রমণ করিতেছে। আগে যদি সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা উদ্বেগ অনুভব না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন তাঁহারা চাহিয়া দেখুন। নারীর সম্মান যদি না রহিল, পরিবারের মধ্য হইতে নারী অপহৃতা হওয়ায় যদি সমাজ নারীশূন্য হইতে চলিল, যদি সমাজই নষ্ট হইতে চলিল, তবে মেষ ও পিশাচদের জন্য তথাকথিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ করার কোন মানে আছে কি?

—

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন, সে-বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। ভারতীয় লোকদের মধ্যে যোগ্য লোকের অভাব নাই। তথাপি একটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার কোন আইনগত বাধা আছে কি না, জানি না; কিন্তু অন্য বাধা যথেষ্টই আছে। ভারতবর্ষের লোকেরা যাহা চায়, তাহা দিবার ক্ষমতা তাঁহার একলার নাই বটে, কিন্তু তিনি যে গবর্মেণ্টের মাথা তাহার আছে। সুতরাং ভারতবর্ষের লোকদের মুখপাত্র হইয়া নিজের গবর্মেণ্টের কাছে নিজেই আকাঙ্ক্ষিত জিনিষ চাহিবেন আবার নিজেই তাহা দেওয়া-না-দেওয়ারও প্রধান কর্ত্তা হইবেন, এমন হাস্যজনক অবস্থায় নিজেকে কে ফেলিতে চায়? অতএব, তাঁহার নামটা গম্ভীরভাবে বা খেলার ছলে প্রস্তাব করা ঠিক্ হয় নাই। তদ্ভিন্ন বক্তৃতায় ও বহিতে ভারতবর্ষের প্রতি দরদ তিনি দেখাইলেও কাজে ভারতের কোন উপকার তিনি করেন নাই। সকলের চেয়ে বড় আপত্তি এই, যে, ভারতবর্ষের খুব যোগ্য সন্তান থাকিতে বিদেশীর আশ্রয় লওয়া অনুচিত ও অসম্মানজনক। আমরা সত্য কথাটা নরমভাবেই বলিলাম। আমাদের মধ্যে ঐরূপ যোগ্য লোক না থাকিলেও আমাদের ভিক্ষার পাত্র বিদেশীর হাত দিয়া বিদেশের নিকট উপস্থিত করা লজ্জাকর। এবং তার চেয়েও সত্য কথা এই, যে, ভিক্ষা চাওয়াটাই অপমানের বিষয়। অনেকের মনে না থাকিতে পারে, যে, বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সাহেবকে কংগ্রেসের সভাপতি করা স্থির হইয়া যায়, তখন আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজে আপত্তি করিয়াছিলাম। আপত্তির কারণ যাহা লিখিয়াছিলাম, তৎকালে সদ্য বিলাত প্রত্যাগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, যে, সেই লেখা পড়িয়া ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেব আর সভাপতিত্ব করিতে আসিতে চান না। তখন তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এবং তাঁহার স্ত্রী মডার্ণ রিভিউ কাগজের লেখিকা ছিলেন বলিয়া এই ইংরেজী মাসিকটি তাঁহাদের নিকট যাইত।

কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য যাঁহাদের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী অবশ্য যোগ্যতম। তিনি কিন্তু সভাপতি হইতে অনিচ্ছা জানাইয়াছেন। তিনি পণ্ডিত জওয়াহর লাল নেহরুর নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। কিন্তু দেশের লোকেরা নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে তাঁহার রাজী হওয়া উচিত হইবে। লাহোরের কংগ্রেসের সভাপতি তাঁহার কেন হওয়া উচিত বলিতেছি। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ডোমীনিয়ন ষ্টাটস না দিলে কংগ্রেস নিরুপদ্রব আইন অমান্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে এরূপ প্রচেষ্টার আরম্ভ করেন গান্ধীজি; তাহা করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় তিনি কতকটা সিদ্ধিলাভ করেন। বিহারের চম্পারনেও এই রূপ উপায়ে তিনি রায়তদের অভিযোগ দূর করাইতে সমর্থ হন। গুজরাটের বারদৌলিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথা অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মী বল্লভভাই পটেল বোম্বাই গবর্মেণ্টকে খাজনাবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় ভ্রম স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিরুপদ্রব আইন অমান্য করা বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও সাফল্য সকলের চেয়ে বেশী। এই উপায় অবলম্বন যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগকে অহিংস্র সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিতে হইবে; সুতরাং তাঁহাদের নেতাকে ঐ ভাবের সাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধতম পুরুষ হইতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেরূপ মানুষ মহাত্মা গান্ধী।

জওয়াহরলালের বয়সের অল্পতা তাঁহার বিরুদ্ধে উল্লেখ-যোগ্য যুক্তি নহে—তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে। তা ছাড়া, তিনি ঠিক্ যুবাপুরুষও নহেন। তাঁহার বয়স ৩৯ কিম্বা ৪০ হইবে। নানাপ্রকারেই তিনি যোগ্য লোক। তিনি সমুদয় সময় ও শক্তি দেশের কাজে ব্যয় করেন, দেশের জন্য অনেক ত্যাগ করিয়াছেন ও কষ্ট সহিয়াছেন। কর্ম্মিষ্ঠতা, সাহস ও একাগ্রতা তাঁহার আছে। তিনি মিথ্যাবাদী কপটাচারী লোক নহেন। কিন্তু গান্ধীজির সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। তিনি বিশেষ একটি মতের এরূপ পক্ষপাতী, সমর্থক ও প্রচারক, যে, সেই কারণেই তিনি উৎকৃষ্ট "প্রপ্যাগাণ্ডিষ্ট" হইলেও, সভাপতি হইবার তেমন যোগ্য নহেন। কারণ, এখনও দেশের সব লোক, কংগ্রেসের সব সভ্য, পূর্ণস্বাধীনতাবাদী হয় নাই। সুতরাং সভাপতিকে দরকার হইলে রফায় রাজী হইতে হইবে। তিনি রফায় রাজী হইবার লোক নন। এরূপ রফায় অধর্ম্ম হয় না। অবশ্য রফা না করিলেও অধর্ম্ম হয় না। কিন্তু রফায় রাজী হইবার লোক চাই, রাজী না-হইবার লোকও চাই। আইরিশদের মধ্যে রফায় নারাজ ডি ভ্যালেরা ও তাঁহার দল থাকায় তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের মাত্রা বাড়িয়াছে, আবার রফায় রাজী লোক থাকায় তাহারা সেই অধিকার পাইয়াছে। রফা করিবার কেহ না থাকিলে হয় ত এখনও আয়ার্ল্যাণ্ডে ঝগড়াবিবাদই চলিতে থাকিত। কতকটা শীঘ্র কাজ হাসিল করিবার জন্য দু'রকম লোক থাকা মন্দ নয়।

পণ্ডিত জওয়াহরলাল সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা দরকার। তিনি কেবল পূর্ণস্বাধীনতা চান না। সেই স্বাধীনতার একটি বিশেষ মূর্ত্তি চাই—তাহা তাঁহার মতে ডিমক্র্যাটিক-সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিক অর্থাৎ প্রায় রুশিয়ার মত সাম্যবাদী সাধারণতন্ত্র যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। এরূপ সাধারণতন্ত্র ভাল কি মন্দ, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। আমাদের বক্তব্য কেবল এই, যে, দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিকমতি-বিশিষ্ট লোক এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবশ্যকতায় বিশ্বাস করে, যাহারা পূর্ণস্বাধীনতাবাদী তাহারাও সকলে সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের সাধারণ ধন হওয়ার পক্ষপাতী নহে। অতএব সভাপতি এমন কাহারও হওয়া ভাল যিনি নানা মতের সামঞ্জস্য করিতে পারেন ও করিতে রাজী আছেন।

বঙ্গে ও উত্তর-ভারতে "পণ্ডিত"

এখানে ঠিক্ প্রাসঙ্গিক না হইলেও বঙ্গে "পণ্ডিত" উপাধির এবং বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবে এই উপাধির অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল। বঙ্গে যাঁহারা ইস্কুলে ও টোলে পণ্ডিতী করেন, তাঁহাদিগকে পণ্ডিত

বলে এবং সংস্কৃতে বিদ্বান লোকদিগকে পণ্ডিত বলে। পশ্চিমে ও পঞ্জাবে পণ্ডিত শব্দের প্রচলিত অর্থ তাহা নহে। ব্রাহ্মণবংশীয় সব হিন্দুই তথায় পণ্ডিত পদবাচ্য। তাঁহারা নিরক্ষর হইলেও "পণ্ডিত" বলিয়া অভিহিত হইবেন, সংস্কৃতের বর্ণমাত্রও না জানিয়া ফারসীনবীশ বা ইংরেজী পড়া লোক হইলেও "পণ্ডিত" হইবে তাঁহাদের উপাধি। এলাহাবাদ প্রবাসকালে প্রবাসী-সম্পাদকের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পাচক ছিল এবং প্রতিবেশী এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের একজন নিরক্ষর ব্রাহ্মণ গোরক্ষক ছিল। একদিন আমাদের বাংলার বাহিরে কে একজন "এ পণ্ডিত, এ পণ্ডিত" বলিয়া চীৎকার করায় পাচক বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু তাহাকে ডাকিতেছে না, গোরক্ষককে ডাকিতেছে বলিয়া আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। তাহারা উভয়েই "পণ্ডিত"। অতএব উত্তর-ভারতে "পণ্ডিত" ব্রাহ্মণ বংশীয় হিন্দু অর্থে ব্যবহৃত হয়; তথায় "পণ্ডিত" সংস্কৃতজ্ঞ হইতে পারেন, না-ও পারেন, লেখাপড়া জানিতে পারেন, নিরক্ষরও হইতে পারেন।

—

গান্ধী-জিন্না-আলীভ্রাতাদ্বয়-সংবাদ

গান্ধীজি মিষ্টার জিন্না এবং আলীভ্রাতাদ্বয়ের সহিত কথাবার্তা কহিয়াছেন। তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কি কি সর্ত্তে স্বরাজপ্রাপ্তিতে সম্মত হইতে পারেন, অনুমান হয় তাহাই কথাবার্তার বিষয় ছিল। ঐ তিন জন মুসলমান নেতা কোন প্রকার চুক্তিতে রাজী হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের সকলে বা অধিকাংশ তাহাতে সম্মত হইবার সম্ভাবনা আছে কি? সেরূপ কোন সম্ভাবনা আছে মনে হয় না।

যাহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর অত্যাচার করুক, ইহা কোন ন্যায়বান লোক চায় না। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া সংখ্যাভূয়িষ্ঠদিগের অধিকার খর্ব্ব করাও ত ঠিক্ নয়।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধির স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাই না। সকলের প্রতিনিধির একত্র সম্মিলিত নির্ব্বাচন চাই। তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দুদের ক্ষতি হয়, সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু যদি আলাদা আলাদা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন অনুমোদিত হয়, সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য প্রতিনিধি অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হয়, এবং কোথাও কোথাও কোন কোন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতিনিধির সংখ্যা ঠিক্ তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম সকল প্রদেশে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে চালাইতে হইবে। নতুবা অন্যায় করা হইবে, এবং অন্যায় কখন সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। মুসলমানপ্রধান প্রদেশসকলে মুসলমানদের জন্য যে ব্যবস্থা হইবে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশ সকলে হিন্দুদের জন্যও সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে-যে প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় হিন্দুদের চেয়ে কম, সেই সেই প্রদেশে যদি তাহাদিগকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে যে প্রদেশে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় কম সেই সব প্রদেশে হিন্দুদিগকেও ঐরূপ বিশেষ সুবিধা দিতে হইবে। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমানদিগের উপর অত্যাচার করিতে পারে, এই সন্দেহ করিয়া যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি দেওয়া হয়, তাহা হইলে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের উপর অত্যাচার হইতে পারে, এ সন্দেহ কেন করা হইবে না, এবং সেরূপ সন্দেহ করিয়া হিন্দুরা যেখানে যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে কেন তাহাদিগকে অতিরিক্ত প্রতিনিধি দেওয়া হইবে না? অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস কি এই সাক্ষ্য দেয়, যে, সুবিধা পাইলে অত্যাচার করাটা কেবল হিন্দুদেরই স্বভাব, কিম্বা এই স্বভাবটা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে তাহাদের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় দেখা যায়? সকারণে বা অকারণে কেবল হিন্দুদের প্রতি সন্দেহের ভিত্তির উপর স্বরাজ্যের ইমারৎ নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

—

বঙ্গে হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব

ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় নেতা যাঁহারা তাঁহারা বাংলা জানেন না, পড়েন না; বাঙালী নেতারাও

তাঁহাদিগকে সম্ভবতঃ বাংলা দেশের অবস্থা খুলিয়া বলেন না। বঙ্গদেশের কেবল ইংরেজী কাগজগুলি পড়িয়া বাংলার অবস্থা বুঝা যায় না, বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব কোন কালে হইতে পারে না, যদি নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচারের প্রতিকার না হয়। বঙ্গের প্রবলতম রাজনৈতিক দলের নেতারা এ বিষয়ে উদাসীন, অরাজনৈতিক নেতারাও বিশেষ সচেষ্ট নহেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা কাহারা তাহা জানি না। মুসলমান সমাজেও নারীনিগ্রহের প্রতিকারের বিশেষ কোন চেষ্টা দেখিতেছি না। যাঁহারা নারীর সম্মান, সতীত্ব, নিরাপদ অবস্থার কথা বাদ দিয়া স্বরাজের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা নিতান্ত স্বপ্নই দেখিতেছেন। যদি তাঁহাদের স্বরাজস্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়, নারীনিগ্রহের অবসান না হইলে তাহাও ভীষণ দুঃস্বপ্ন মাত্র হইবে।

—

রাজনৈতিক "আসামী"দের প্রায়োপবেশন

লাহোরে রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের জন্ত এবং অন্ত এইরূপ বিচারাধীন ব্যক্তিদের জন্ত সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে স্থবিধাজনক ব্যবহার পাইবার জন্য প্রায়োপবেশন করায় তাঁহাদের কাহারও কাহারও মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। বিলাতে এই শ্রেণীর বিচারাধীন এবং দণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধারণ কয়েদী হইতে ভাল ব্যবহার পাইয়া থাকে। লাহোরে প্রায়োপবেশকদিগকে জোর করিয়া খাওয়াইবার জন্য বর্ব্বরতার সহিত বলপ্রয়োগ করায় কাহারও নাক হইতে কাহারও মুখ হইতে রক্ত বাহির হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রাণ যাইবার আশঙ্কা হওয়ায় কোন কোন ব্যক্তিকে আর এইরূপে খাওয়াইবার চেষ্টা করা হয় নাই। রাজনৈতিক অনেক অভিযুক্তের হাতে হাতকড়া লাগান এদেশে আর এক বর্ব্বর প্রথা।

লালা দুনীচাঁদ বলিয়াছেন প্রায়োপবেশন বন্ধ হইতে পারে, যদি রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে গলাধঃকরণের উপযোগী খাদ্য দেওয়া হয় যাহাতে মাথাপিছু দৈনিক বার আনার বেশী খরচ হইবে না, যদি তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট-ভক্ত খবরের কাগজও পড়িতে দেওয়া হয়, যদি তাহাদিগকে তাহাদের অনভ্যস্ত ময়দা পেষা বা ঘানিটানার কাজ না দিয়া অন্য কাজ এমন কি অন্ত দৈহিক শ্রমের কাজ দেওয়া হয়, এবং যদি তাহাদিগকে একা একা না রাখিয়া পরস্পরের সঙ্গে থাকিতে দেওয়া হয়।

এই সর্ত্তগুলি গ্রহণ না করিতে কোন আইন গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাহা চাহিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত লম্বা লম্বা বক্তৃতা ছাপিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের মুদ্রিত যুক্তিসমূহের একটু নমুনা দিতেছি ; সব যুক্তি ছাপিবার স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই।

> যাহাদিগকে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী বলা হয়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রথমতঃ দেখা হয়, তাহাদের অপরাধ কি ধরণের এবং দ্বিতীয়তঃ, সমাজে তাহাদের কি রকম স্থান, শিক্ষা কতদূর এবং চরিত্র কি প্রকার। সকল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আইনেই বলা হইয়াছে যে, শিক্ষা, সামাজিক স্থান এবং চরিত্র প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া যদি বুঝা যায় যে, কয়েদী সাধারণ কয়েদীদের অপ্রাপ্য সুবিধা পাইবার উপযুক্ত তাহা হইলে তাহাকেই বিশেষ কয়েদীর পর্য্যায়ে ফেলা হয়। অবশ্য এই সময় তাহার অপরাধ ঐ বিশেষ শ্রেণীতেই পড়ে কি না তাহাও দেখিতে হইবে।

বেশ কথা ; কিন্তু ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী কয়েদীদের অপরাধ, সামাজিক মর্য্যাদা, শিক্ষা, চরিত্র প্রভৃতি যাহাই হউক, তাহারা দেশী কয়েদীদের চেয়ে ভাল ও বেশী খাদ্য, পোষাক, কম্বল, আসবাব, থাকিবার ঘর, পায়খানা ও স্নানের জায়গা, এবং রাত্রে পড়িবার আলো পাইয়া থাকে। দেশী কয়েদী শিক্ষা চরিত্র সামাজিক মর্য্যাদা ধনশালিতা প্রভৃতি কারণে অনুগ্রহস্বরূপ যাহা পাইতে পারে, অতি দরিদ্র, অসচ্চরিত্র, অশিক্ষিত, সামাজিক মর্য্যাদাহীন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী কয়েদীরা তাহা অধিকার স্বরূপ সচরাচর পাইয়া থাকে।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের জেলাসমূহের সংস্কারের বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্ত যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহার বেসরকারী দেশী সভ্য দুজন এবিষয়ে সমুদয় জ্ঞাতব্য কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন, বাংলার জেলগুলিতে দেশী কয়েদীদের মাথাপিছু বার্ষিক খোরাকী খরচ ৭৬॥৴০ এবং ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী কয়েদীদের মাথাপিছু বার্ষিক আহারের ব্যয় ২১৪৶০। পোষাকের ব্যয় যথাক্রমে ৭৲ ও ২৬৷১০। প্রভাসবাবু আরও বলিয়াছেন,যে, বাংলা দেশে সাধারণতঃ রাজনৈতিক অপরাধীদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না।

এই রকম বৈষম্য সব প্রদেশেই আছে। ভারত সরকারের জেল বিষয়ক বর্ণনাপত্রেই আছে—

গত ১৯১২ সালে ভারত সরকার এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া সমুদয় নিয়ম-কানুন বিশেষ আলোচনা করিয়া পরীক্ষা এবং সংস্কার করেন। বিভিন্ন প্রদেশে খুঁটিনাটি লইয়া হয়ত একটু তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু মোটামুটি ঐসব আইন-কানুন ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য।

এই রকম বৈষম্য নিজেরাই রাখিয়া ভারতীয় কয়েদীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা নিতান্তই অশোভন। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী চোর বদমায়েসদেরও যে অধিকার আছে, তাহা ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত সচ্চরিত্র ভারতীয় রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে অনেকের প্রাণসংশয় হইত না। এখনও গবর্মেণ্ট ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করিলে অনেকের প্রাণ বাঁচে। এ বিষয়ে গবর্মেণ্টের আচরণ সাতিশয় নিন্দার্হ হইয়াছে।

যাঁহারা প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের এই কার্য্যের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, এবং তাঁহাদের মানসিক বল ও সাহস অসাধারণ। এইজন্য দেশের সর্ব্বত্র সভায় ও গৃহে গৃহে যে তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শিত হইতেছে, তাহারা সর্ব্বথা তাহার উপযুক্ত। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ও দণ্ডিত লোকদের প্রতি রাজকর্ম্মচারীদের ব্যবহারের যে নিন্দা হইতেছে, তাহাও ন্যায়সঙ্গত।

—

পাটকলের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট

কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী বহুসংখ্যক পাট-কলের দুই লক্ষের উপর শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের প্রধান অভিযোগ এই, যে, আগে যে দুবার পালা করিয়া কাজ করান হইত এখন তাহার জায়গায় একবার কাজ করাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় প্রায় ষাট হাজার শ্রমিক বেকার হইতে বসিয়াছে; এবং আগে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ করাইয়া শ্রমিকদিগকে যে মজুরী দেওয়া হইত এখন ৬০ ঘণ্টা কাজ করাইয়া তাহা অপেক্ষা বেশী মজুরী দেওয়া হয় না। তা ছাড়া শ্রমিকদের বাসগৃহাদির অপকৃষ্টতা প্রভৃতি দুঃখ ত আছেই। পাটকলের মালিক ও অংশীদাররা খুব উচ্চহারে মুনফা পাইয়া থাকে। অথচ যাহাদের শ্রমে এই লাভ অর্জ্জিত হয়, তাহারা মানুষের মত থাকিতে খাইতে পরিতে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারে না। ইহা বড়ই অন্যায়।

পাটকলের কর্ত্তারা ও তাঁহাদের সমর্থক ইংরেজী কাগজগুলা বলিতেছে, যে, বাহিরের লোকদের প্ররোচনায় ধর্ম্মঘট হইতেছে। বাহিরের লোকেরা তাহা হইলে নিশ্চয়ই জাদুকর। বাহিরের লোকদের মধ্যে আন্দোলন-ব্যবসায়ী কেহই নাই বা থাকিতে পারে না, বলিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু যাহারা উপযুক্ত মজুরী পায়, পেট ভরিয়া খাইতে পায়, ভাল ঘরে থাকে, ছেলেমেয়েদিগকে ভাল খাইতে পরিতে দিতে লেখাপড়া শিখাইতে পারে, তাহারা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং সপরিবারে উপবাসী বা অর্দ্ধোপবাসী, এরূপ বিশ্বাস তাহাদের মনে জন্মান কতকটা জাদুকরেরই কাজ।

অনেক শ্রমিকনেতাকে পাটকলগুলার ত্রিসীমায় না যাইতে সরকারপক্ষ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে, এবং নানা অছিলায় অনেকের নামে মোকদ্দমাও হইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের সাহায্যও পাটকলওয়ালারা সহজেই পায়। তাহার উপর অকস্মাৎ কতকগুলা কাবুলী বা পেশোয়ারী একটা কলের নিকট আসিয়া দাঙ্গা বাধানতে কতকগুলি লোক হত ও আহত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে এই লোকগুলার পেশা ঋণদান, টাকা আদায় করিতে আসিয়াছিল; কেহ বলে তাহারা পাটকলওয়ালাদের দ্বারা নিযুক্ত রক্ষী; কেহ বা আর কিছু বলিতেছে। বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলের

ধর্মঘটেও দাঙ্গা ও খুনের সূত্রপাত পাঠানদিগকে লইয়া হইয়াছিল।

ইংরেজ পাটকলওয়ালারা ও তাহাদের মুখপত্র দু-একটা দৈনিক কাগজ হিন্দু শ্রমিক ও মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে মতভেদ জন্মাইবার খুব চেষ্টা করিতেছে। ইহা সনাতন ভেদনীতিরই প্রয়োগ বিশেষ।

ভারতবর্ষে মানবজীবনের সকল বিভাগে এই ভেদনীতি প্রযুক্ত হইতেছে। ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, ধর্ম্মসম্প্রদায়গত নানা সংকীর্ণ স্বার্থের দোহাই দিয়া মানুষকে বিপথচালিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই সব চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সকল কার্য্যক্ষেত্রে ধীরবুদ্ধি, বিবেচক, উৎসাহী, ও নিঃস্বার্থ সাত্ত্বিক প্রকৃতির কর্ম্মীর প্রয়োজন।

—

ব্যায়াম ও সামরিক ড্রিল শিক্ষা

কয়েকদিন হইল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ সভ্যের মতে স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা এবং কলেজে সামরিক ড্রিল অবশ্যশিক্ষণীয় করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। অর্মণ্ড নামক একজন ইংরেজসভ্য এই শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি আবশ্যিক না করিয়া স্বেচ্ছাধীন করিবার প্রস্তাব করেন। তাহা গৃহীত হয় নাই। তিনি বলেন, জগতে নিরস্ত্রী-করণ ও নিরস্ত্রীভবনের আন্দোলন চলিতেছে; এখন আবশ্যিক যুদ্ধশিক্ষার কথা তোলা অসঙ্গত। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি এই যুক্তির যথোচিত জবাব দেন। বস্তুতঃ, যে রুগ্ন বা দুর্ব্বল বা নিরস্ত্র তাহার অহিংসা ও ক্ষমা, দরিদ্রের অনিচ্ছাকৃত তপস্যার মত, প্রশংসার দাবী করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের কি গতি হইয়াছে তাহার বর্ণনা করেন, এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ষ্টেপ্‌লটন সাহেবের একটা মন্তব্যের ব্যঙ্গপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন।

বিজয়বাবুর প্রস্তাব অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু গবর্মেণ্ট যে কিছু করিবেন না, তাহা নিশ্চিত। কারণ, আগে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার মুঞ্জের এই জাতীয় প্রস্তাব ও [illegible] গৃহীত এরূপ প্রস্তাব সরকারী নথীভুক্ত হইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সেদিনকার তর্কবিতর্কের সময় রাজস্বসচিব माननीय ম্যাকালিন সাহেব আর্থিক বাধার উল্লেখ করিয়া বলেন, "If any one could evolve a scheme in which the Government would not have to spend anything, he would be inclined to accept it"; "যদি কেহ এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারেন যাহাতে গবর্মেণ্টকে কিছু ব্যয় করিতে হইবে না, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে।" কথার বাঁধুনীটা দেখুন। তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন বলেন নাই, গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে বলিয়াছেন। এই "প্রবৃত্তি" মার্গ হইতে নিবৃত্তি মার্গে পৌঁছিতে তাঁহাকে ও অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে কোন অলঙ্ঘনীয় বাধা অতিক্রম করিতে হইবে না।

এখন কেহ সরকারী ফরমাইস অনুযায়ী একটা পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া মোটা রকমের চাঁদা তুলিয়া বাংলা গবর্মেণ্টকে উহা মঞ্জুর করিতে বলিলে উপযুক্ত জবাব হয়। বঙ্গের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতারা তাহা করিতে পারিবেন কি?

—

রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নূতন বার্ষিক রিপোর্ট দেখিয়া প্রীত হইলাম। এই সেবাশ্রম মহৎ ও প্রয়োজনীয় দয়ার কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত করিতেছেন। তজ্জন্য ইহা সকল সহৃদয় লোকের সাহায্য পাইবার উপযুক্ত। তদ্ভিন্ন এই সেবাশ্রমগুলি ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের, বিশেষ করিয়া বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম উৎকৃষ্ট ফল ও নিদর্শন। সেই জন্য আমরা এইরূপ সমুদয় কাজের সাফল্য ও স্থায়িত্ব কামনা করি।

—

সম্মতি বিল কমিটির রিপোর্ট

খবরের কাগজে দেখা যাইতেছে, সম্মতি বিল কমিটির রিপোর্টে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীলোকের সম্মতির বয়স ১৫ এবং অন্য লোকদের পক্ষে ১৮ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। বয়সের কোন সীমাটিই বেশী নয়।

—

"ভারতে সব কুশল"

বড়লাট লর্ড আরুইন ইউরোপে পদার্পণ করিয়াই বলিয়াছেন, "ভারতের সব কুশল।"

ভারতবর্ষে কয়েকমাস আগে হইতে এ পর্য্যন্ত যত বন্যা জলপ্লাবন তজ্জনিত গবাদি পশুর মৃত্যু, গৃহনাশ শস্যনাশ ও অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহা বড়লাটের উক্তির সত্যতার একটি প্রমাণ। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব-নাশের ষড়যন্ত্র অভিযোগে ও রাজদ্রোহের অভিযোগে যত মোকদ্দমা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আর একটি প্রমাণ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহুলক্ষ শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট আরও একটি প্রমাণ। বেকার সমস্যার সমাধান জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট কমিটি বসাইয়া যে-সব রিপোর্ট বাহির করিতেছেন, তাহা অন্যতম প্রমাণ। রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত অনেক ব্যক্তির প্রায়োপবেশনও নিতান্ত নগণ্য প্রমাণ নহে। বেশী প্রমাণ দিতে যাওয়া অনাবশ্যক।

হয়ত ভারতের কুশল আমরা যে অর্থে বুঝি, বড়লাট সে অর্থে ঐ কথাগুলি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার কথার মানে বোধ হয় এই, যে, ভারতে ইংরাজ প্রভুদের সব কুশল। কারণ "ষড়যন্ত্র" ও "রাজদ্রোহ" যতই হউক, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য যতদিন দূরীভূত না হইতেছে, ততদিন ইংরেজরা মনে করে স্বরাজ্য ঠেকাইয়া রাখা চলিবে; এবং এই অনৈক্য দূর হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

চিত্র ও ছোট গল্পের প্রতিযোগিতা

১৩৩৬ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত সমুদায় মৌলিক ছোট গল্পের মধ্যে যে তিনটি প্রবাসীর পাঠকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাদের লেখকগণকে গুণানুসারে যথাক্রমে দুইশত, দেড়শত ও একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত বর্ষে প্রকাশিত ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলা রীতিতে আধুনিক চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্যও এক-শত টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। লেখক ও পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্মরণ রাখিবেন। পুরস্কার বিতরণ এই-সকল নিয়মানুযায়ী হইবে।

প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য ছোট গল্প ও চিত্র নির্ব্বাচন প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগ করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সম্পাদক উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করিতে অক্ষম। যে গল্প এক সংখ্যায় সমাপ্ত নয়, অথবা যাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাজার শব্দের অধিক, তাহা পুরস্কার-প্রতিযোগিতার জন্য গ্রাহ্য হইবে না। একটি কথা বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রবাসীতে প্রকাশিত ছোট গল্পমাত্রের জন্যই তাহাদের লেখকগণ পৃষ্ঠা-প্রতি তিন টাকা হিসাবে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা পাইবেন। এই দক্ষিণার সহিত পুরস্কারের কোন সম্পর্ক নাই। চিত্রকরেরাও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা পাইবেন। পুরস্কার স্বতন্ত্র। প্রবাসীতে প্রকাশিত, পুরস্কারের জন্য গ্রাহ্য সমুদায় গল্প ও চিত্রের মধ্যে কোন্‌গুলি পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত তাহার বিচার প্রবাসীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ করিবেন। আগামী চৈত্রমাসের প্রবাসীতে একটি কূপন থাকিবে। তাহাতে প্রবাসীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ যে তিনটি গল্প ও যে চিত্রটি পুরস্কারের উপযুক্ত, সেইগুলির নাম পর পর গুণানুসারে লিখিয়া ১৩৩৬ সনের ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বে প্রবাসী কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন। প্রত্যেকটি কূপন স্বাক্ষরিত এবং গ্রাহকনম্বর ও ঠিকানা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। অস্বাক্ষরিত ও ২০শে চৈত্রের পরে প্রাপ্ত কূপন ভোট হিসাবে গণনা করা হইবে না। প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগ এই-সকল কূপন পরীক্ষা ও গণনা করিয়া যে তিনটি গল্প ও যে চিত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইবে, তাহাদের লেখক ও চিত্রকরকে পুরস্কার বিতরণ করিবেন। ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় স্থান ভোটের সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রবাসীর সম্পাদক অথবা তাঁহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও ভোট পরীক্ষা অথবা গণনা করিবার অধিকার থাকিবে না। এই ভোট ব্যতীত পুরস্কার-প্রতিযোগিতার আর কোনও বিচার হইবে না। একই লেখক বা চিত্রকর একাধিক গল্প বা চিত্র পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার পাইবেন না। প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে বিজ্ঞাপিত হইবে এবং পুরস্কার সেই মাসেই বিতরণ করা হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

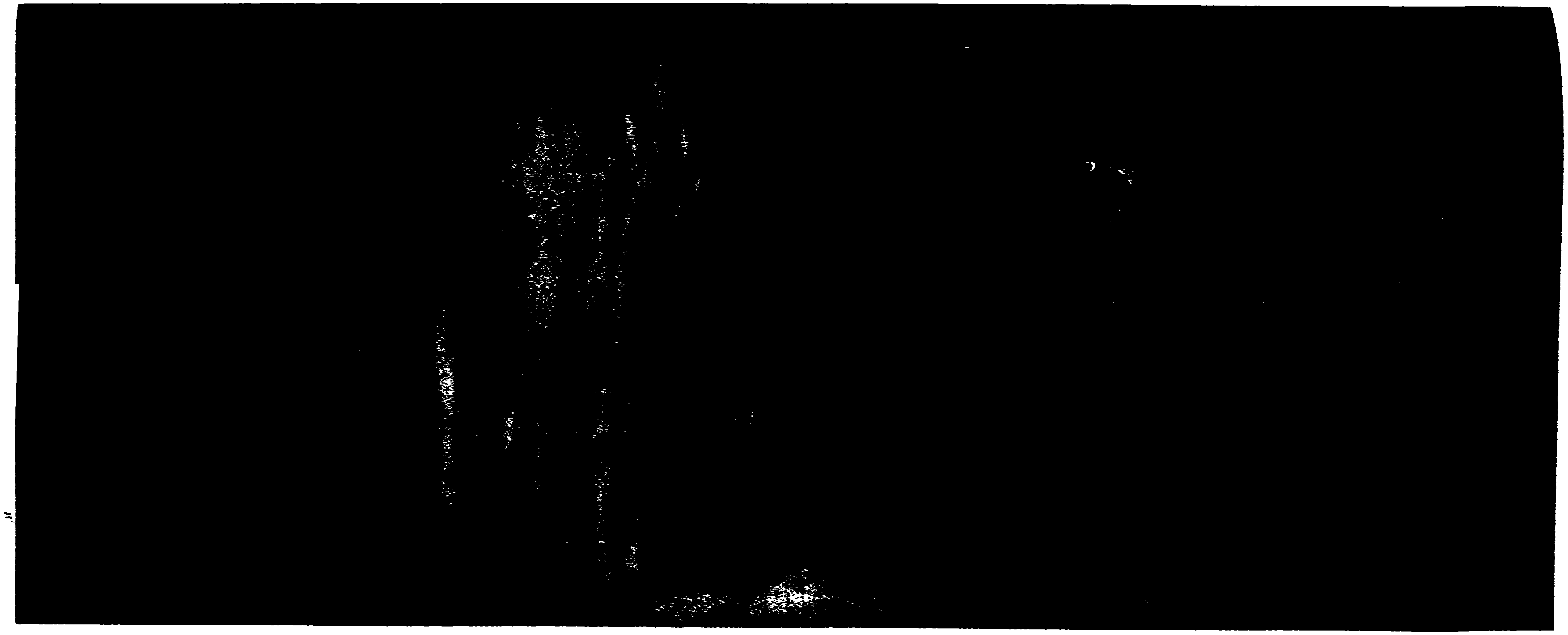

জহরব্রত

শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন

স্যর যদুনাথ সরকার

(১) দুর্গ-উদ্ধার

আওরংজীবের দরবার হইতে পলাইয়া আসিয়া শিবাজী তিন বৎসর (১৬৬৭-১৬৬৯) চুপচাপ ছিলেন। তাহার পর, ১৬৭০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল কর্ম্মচারীরা কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। শিবাজী দ্রুত-গতিতে চারিদিকে সতেজ আক্রমণ করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করায় তাহারা একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহাদের অধীন কত গ্রাম লুঠ হইল, পুরন্দর-সন্ধিতে পাওয়া সাতাইশটি দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি বাদশাহের হাতছাড়া হইল। মুঘল কর্ম্মচারীদের অনেকে নিজ নিজ দুর্গে বা থানায় যুদ্ধ করিয়া মরিল, অপরে হতাশ হইয়া স্থান ত্যাগ করিল।

ইহার মধ্যে কোণ্ডানা-জয়ের কাহিনী এখনও মারাঠা-দেশে লোকেরা মুখে মুখে গান করে। শিবাজী তাঁহার মহাকায় মাবলে সেনাপতি ও বাল্যবন্ধু তানাজী মালুসরেকে কোণ্ডানা দুর্গ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর অন্ধকার রাত্রে তিনশত বাছা বাছা মাবলে পদাতিক লইয়া তানাজী দড়ির সিঁড়ি লাগাইয়া পর্ব্বতের উত্তর-পশ্চিম গা বাহিয়া উপরে উঠিলেন; অসভ্য কোলী জাতীয় কয়েকজন স্থানীয় লোক তাঁহাকে গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিল। দুর্গদ্বারে পৌছিয়াই সেখানকার বাদশাহী প্রহরীদের নিহত করিয়া তাঁহারা ভিতরে ঢুকিলেন। উদয়ভান এবং তাঁহার রাজপুত সেনারা দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। 'শত্রু আসিয়াছে' এই চীৎকার শুনিয়া তাহারা সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু শীতের রাত্রে আফিংখোর রাজপুতরা তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে মারাঠারা দুর্গপ্রাচীরের এক অংশ বেশ দখল করিয়া বসিয়াছে। যখন রাজপুতগণ আসিয়া পৌছিল, মারাঠারা "হর হর মহাদেব" শব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। উদয়ভান তানাজীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পরস্পরের তরবারির আঘাতে দুই সেনানীই মারা গেলেন। কিন্তু তানাজীর ভাই সূর্য্যাজী সামনে আসিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ! ভাই মারা পড়িয়াছেন, কিন্তু ভয় নাই। আমি

তোমাদের নেতা হইব।" নেতার পতনে রাজপুতেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হতভম্ব হইয়া রহিল। আর অমনি মারাঠারা আবার রুখিয়া তাহাদের আক্রমণ পড়িল। ইতিমধ্যে তাহারা দুর্গের দরজা খুলিয়া দেওয়ায় আরও অনেক মারাঠী সৈন্য নীচ হইতে ভাল পথ দিয়া দুর্গে ঢুকিল। অবশেষে এই নিষ্ফল যুদ্ধে বারো শত রাজপুত মারা পড়িল, অনেকে পাহাড়ের গা বাহিয়া পলাইতে গিয়া নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

বিজয়ী মারাঠারা দুর্গের ভিতরের আস্তাবলের খড়ের ছাদে আগুন ধরাইয়া দিল। পাঁচ ক্রোশ দূরে রাজগড় হইতে সেই আলো দেখিয়া শিবাজী বুঝিলেন যে তাঁহার জয় হইয়াছে। পরদিন যখন সকল সংবাদ পাইলেন, তখন দুঃখ করিয়া বলিলেন, "গড়টা পাইলাম বটে, কিন্তু সিংহকে হারাইলাম।" তিনি কোণ্ডানার নাম বদলাইয়া "সিংহগড়" করিলেন, এবং তানাজীর পরিবারকে অনেক পুরস্কার দিলেন।

এইরূপে কোণ্ডানা, পুরন্দর, কল্যাণ-ভিবণ্ডী, মাহুলী প্রভৃতি অনেক দুর্গ শিবাজীর হাতে আসিল। মুঘল সেনাপতিদের মধ্যে একমাত্র দাউদ খাঁ কুরেশী যুদ্ধ করিয়া কিছু ফললাভ করিলেন, কিন্তু তিনি একলা কত দিক সামলাইবেন?

আওরংজীব শিবাজীর নূতন বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র আরও অনেক সৈন্য ও সেনাপতি মহারাষ্ট্রে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। গৃহবিবাদে মুঘলদের সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার কুমার মুয়জ্জম এবং তাঁহার প্রিয়-পাত্র যশোবন্ত সিংহের সহিত দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুঘল-বীর ও সেনাপতি দিলির খাঁর মর্ম্মান্তিক শত্রুতা ছিল। তাহার উপর নিন্দুকেরা বাদশাহকে বলিল যে, কুমার নিজেকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় আছেন। এ-পক্ষ ও-পক্ষের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট নালিশ করিতে লাগিল। দিলিরের ভয় হইল, সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে কুমার তাঁহাকে কয়েদ করিতে পারেন! অবশেষে (আগষ্ট ১৬৭০) গভীর বর্ষার মধ্যে দিলির প্রাণভয়ে মহারাষ্ট্র দেশ ছাড়িয়া উত্তর-ভারতের দিকে পলাইলেন। আর, মুয়জ্জম এবং যশোবন্ত তাপ্তী নদী পর্য্যন্ত সৈন্যসহ তাঁহাকে তাড়া করিয়া গেলেন, এবং এই অবাধ্য কর্ম্মচারীকে দমন করিবার জন্য শিবাজীর সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

ইহার ফলে শিবাজীর জয়জয়কার হইল; কোথাও তাঁহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। ইংরাজ-কুঠীর সাহেব লিখিলেন, "শিবাজী আগে চোরের মত গোপনে দ্রুত চলিতেন। কিন্তু এখন আর তাঁহার সে অবস্থা নাই। তিনি প্রবল সৈন্যদল, ত্রিশ হাজার যোদ্ধা লইয়া দেশ জয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। শাহজাদা যে এত কাছে রহিয়াছেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না।"

(২) দ্বিতীয়বার সুরত-লুণ্ঠন

এই বৎসর (১৬৭০) ৩রা অক্টোবর শিবাজী আবার সুরত-বন্দর লুঠ করিলেন। একমাস আগে হইতে সকলেই শুনিতেছিল যে, তিনি কল্যাণ শহরে অনেক অশ্বারোহী সৈন্য একত্র করিতেছেন এবং প্রথমেই সুরত আক্রমণ করিবেন। এমন কি ইংরাজেরা এই লুঠ সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিল যে, আগেই তাহাদের সুরত-কুঠী হইতে সব টাকাকড়ি মালপত্র এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার লোকজন পর্য্যন্ত সুহায়িলীতে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। অথচ সুরতের মুঘল শাসনকর্ত্তা এমন অলস ও অন্ধ যে অত বড় ধনশালী শহর রক্ষার জন্য সে শুধু তিন শত সৈন্য রাখিয়াছিল।

৩রা অক্টোবর প্রাতে শিবাজী পনের হাজার সৈন্যসহ সুরতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পূর্ব্বদিন ও রাত্রে সমস্ত ভারতীয় বণিক—এমন কি সরকারী কর্ম্মচারীরাও শহর ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া গিয়াছিল। ১৬৬৪ সালে প্রথম লুঠের পর বাদশাহের আজ্ঞায় সুরতের চারিদিক একটা ইটপাথরের দেওয়াল দিয়া ঘেরা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা এত সামান্য যে শিবাজীর পনের হাজার লোকের সম্মুখে তিনশত মুঘল চৌকিদার দাঁড়াইতে পারিল না, তাহারা দুর্গের মধ্যে পলাইয়া গেল।

দুইদিন একবেলা ধরিয়া মারাঠারা এই পরিত্যক্ত শহর লুঠ করিল। ডচ্-কুঠীতে খবর পাঠাইল—"যদি

তোমরা চুপচাপ করিয়া থাক তবে তোমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না।" তাহারা তাহাই করিল। ফরাসী-কুঠীর সাহেবরা মূল্যবান উপহার দিয়া মারাঠাদের খুশী করিল। সুহায়িলী হইতে আনা পঞ্চাশজন জাহাজী-গোরা (বিখ্যাত ষ্ট্রেনস্‌হ্যাম মাষ্টারের অধীনে) ইংরাজ কুঠী রক্ষা করিল; যে মারাঠাদল উহা লুঠ করিতে আসিয়াছিল ইংরেজদের অব্যর্থ বন্দুকের গুলিতে তাহাদের এত লোক মারা গেল যে আর কেহ সেদিকে অগ্রসর হইল না। পারসী ও তুর্কী বণিকদের দুর্গের মত "নূতন সরাই" ও রক্ষা পাইল।

ফরাসী-কুঠীর সামনে "তাতার সরাই"য়ে কাশঘরের পদচ্যুত রাজা আবদুল্লা খাঁ মক্কা হইতে কয়েকদিন আগে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। নিকটের কয়েকটি গাছের আড়াল হইতে মারাঠারা প্রথম দিন এই সরাই-এর উপর গুলি চালাইতে লাগিল। তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়া রাত্রে সকলে ভিতর হইতে পলাইয়া গেল। মারাঠারা রাজার ধনসম্পত্তি, আরংজীবের দেওয়া সোনার খাট এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহার সব দখল করিল।

মারাঠারা অবসর-মত অবাধে বড় বড় বাড়ী লুঠ করিয়া সুরত হইতে ৬৬ লাখ টাকার ধনরত্ন লইয়া ৫ই অক্টোবর দুপুর বেলা তাড়াতাড়ি শহর ত্যাগ করিল। লুঠের পর তাহারা এত জায়গায় আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল যে প্রায় অর্দ্ধেক শহর পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল! প্রথম দিনের আক্রমণে ইংরাজদের গুলিতে অনেক মারাঠা মারা পড়ায় শিবাজীর সৈন্যগণ প্রতিহিংসা লইবার জন্য তৃতীয় দিন ইংরাজ-কুঠীর সামনে আসিয়া "কুঠী পুড়াইব" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের নেতারা জানিত যে আবার আক্রমণ করিলে আরও লোক মারা যাইবে। শেষে একটা নিষ্পত্তি হইল। দুইজন ইংরাজ-বণিক শহরের বাহিরে শিবাজীর শিবিরে গিয়া কিছু লাল বনাত, তরবারি এবং ছুরি উপহার দিল। রাজা তাহাদের প্রতি বেশ মিষ্ট ব্যবহার করিলেন এবং তাহাদের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ইংরাজেরা আমার বন্ধু; আমি তাহাদের কোন অনিষ্ট করিব না।"

(৩) সুরতের দুর্দ্দশা

সুরত ছাড়িবার সময় শিবাজী শহরের শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান বণিকদের নামে এই মর্ম্মে এক চিঠি পাঠাইলেন যে, যদি তাহারা তাঁহাকে বৎসর বৎসর বারো লাখ টাকা কর না দেয়, তবে তিনি আগামী বৎসর আসিয়া শহরের বাকি ঘরগুলিও পুড়াইয়া দিয়া যাইবেন।

যেই মারাঠারা সুরত হইতে বাহির হইল, অমনি শহরের গরীব লোকগুলি (যাহারা পলায় নাই) সব বাড়ীতে ঢুকিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও লুঠ করিতে লাগিল। ইংরাজ-কুঠীর জাহাজী-গোরারাও এই কাজে যোগ দিল!

যখন সুরতে তিনদিন ধরিয়া এই লুঠ চলিতেছিল, তখন পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চিমে সুহায়িলী বন্দরে ইংরাজদের গুদাম এবং কুঠীতে সুরত-কুঠীর সাহেবগুলি ছাড়া সুরত শহরের শাহ-বন্দর (অর্থাৎ জাহাজী মালের দারোগা), প্রধান কাজী এবং বড় বড় হিন্দু মুসলমান ও আরমানী বণিক আশ্রয় লইয়াছিল। মারাঠারা আসিবে আসিবে বলিয়া দুই একদিন একটা জনরব উঠিয়াছিল; সকলে তাহাতে ভীত ও চঞ্চল হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজেরা জেটীর ধারে আটটা তোপ রাখিয়া বন্দর রক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিল এবং কোনই বিপদ ঘটে নাই।

এইরূপে অনকতক বিদেশী দোকানদার মারাঠাদের তুচ্ছ করিয়া নিজের বল দেখাইল; আর 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা'-র শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যগণ ভয়ে পলাইল। এই দৃশ্য দেখিয়া দেশের লোক বিস্মিত হইল। সুরতের শ্রেষ্ঠ ধনী হাজি সাইদ বেগ-এর পুত্র সুহায়িলীতে আশ্রয় পাইয়া বলিলেন, "আমি সপরিবারে বোম্বাই চলিয়া যাইব—বাদশাহী রাজ্যে আর বাস করিব না।"

একটা কথা আছে, বাঘে যাহাকে একবার থাবা করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সে লোক পরে বাঁচিলেও মরার সামিল হইয়া থাকে। শিবাজীর দুই-দুইবার লুঠের পরে সুরতেরও সেই দশা হইল। শিবাজী ঐদিকে আসিতেছেন, মারাঠা সৈন্য সুরতের পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণে কোলী-দেশে ঢুকিয়াছে,—এই সব জনরব ঘন ঘন

সুরতে পৌঁছিতে লাগিল। আর অমনি লোকজন শহর ছাড়িয়া পলাইতে সুরু করিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড বন্দর মরুদেশের মত নির্জ্জন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। ইংরাজ ও অন্যান্য সাহেব-বণিকেরা নিজ কুঠী খালি করিয়া টাকা ও মাল তাড়াতাড়ি সুহালিতে পাঠাইয়া দিলেন।

বৎসরের পর বৎসর এইরূপ ঘটিতে লাগিল। ফলে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি একেবারে লোপ পাইল।

(৪) ডিণ্ডোরীর যুদ্ধ

৫ই অক্টোবর সুরত ছাড়িয়া শিবাজী দক্ষিণ-পূর্ব্বে বগলানা প্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং মুলের দুর্গের নীচের গ্রামগুলি লুঠিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শাহজাদা মুয়জ্জম দিলির খাঁর পিছু লইয়া প্রায় বুর্হানপুর পর্য্যন্ত যাইবার পর বাদশাহের হুকুমে সেখান হইতে সবেমাত্র আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়াছেন, এমন সময় তিনি দ্বিতীয়বার সুরত-লুঠের সংবাদ পাইলেন। তিনি অমনি দাউদ খাঁকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। দাউদ খাঁ চান্দোর দুর্গের কাছে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, সেখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে ঐ লম্বা গিরিশ্রেণীর মধ্যে একটা সরু পথ দিয়া শিবাজী বগলানা হইতে নামিয়া উত্তর-মহারাষ্ট্রে (অর্থাৎ নাসিক জেলায়) ঢুকিবেন। মধ্যরাত্রে মুঘলদের চরেরা আসিয়া পাকা খবর দিল যে, শিবাজী ঐ গিরি-সঙ্কট পার হইয়া অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া নাসিকের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন, আর তাঁহার বাকি অর্দ্ধেক সৈন্য মাল ও পশ্চাৎ রক্ষা করিবার জন্য ঐ গিরিসঙ্কটের মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

দাউদ খাঁ তৎক্ষণাৎ আবার অগ্রসর হইলেন। সেদিন কার্ত্তিক শুক্লচতুর্দ্দশী; তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে চাঁদ ডুবিল, এবং অন্ধকারে মুঘল সৈন্যগণ শ্রেণী ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের অগ্রগামী বিভাগের নেতা ছিলেন— বিখ্যাত পাঠান বীর ইখ্‌লাস্ খাঁ মিয়ানা। প্রভাত হইলে (১৭ই অক্টোবর) তিনি একটি ছোট পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলেন যে, নীচের মাঠে মারাঠারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুঘল-সৈন্যগণ উটের পিঠ হইতে বর্ম্ম ও অস্ত্র নামাইয়া সাজ করিতে লাগিল, কিন্তু ইখ্‌লাস্ খাঁর বিলম্ব সহিল না, তিনি জনকতক মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া শত্রুদের আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মারাঠারা সংখ্যায় আট হাজার; তাহাদের বড় বড় নেতা—প্রতাপ রাও (সেনাপতি), আনন্দরাও প্রভৃতি উপস্থিত।* শীঘ্রই ইখ্‌লাস্ খাঁ আহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দাউদ খাঁ আসিয়া পৌঁছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আরও সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রাতঃকাল হইতে ছয় সাত ঘণ্টা ধরিয়া ভীষণ কাটাকাটি চলিল। মারাঠা বর্গীরা মুঘলদের চারিদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া ঘুরিতে লাগিল, যেন তাহাদের সব পথ রোধ করিবে। দাউদ খাঁর দলের অনেকে মারা গেল, অনেকে আহত হইল। কিন্তু বুন্দেলা রাজপুতদের বন্দুকের ভয়ে মারাঠারা বেশী কাছে আসিল না। অবশেষে দাউদ খাঁ স্বয়ং রণক্ষেত্রে আসিয়া তোপের সাহায্যে শত্রুদের তাড়াইয়া দিলেন এবং নিজ পক্ষীয় আহত লোকজনদের উদ্ধার করিলেন।

যখন বেলা দুই প্রহর তখন উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া খাইতে গেল। সন্ধ্যার আগে মারাঠারা আবার আক্রমণ করিল; তাহারা আট হাজার, আর দাউদ খাঁর সঙ্গে দু হাজার মাত্র লোক, তথাপি তোপের জোরে বাদশাহী দল রক্ষা পাইল। রাত্রিতে মারাঠারা কোঁকনের দিকে চলিয়া গেল; তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, একদিন একরাত্রি মুঘলদের সেখানে থামাইয়া রাখিয়া তাহারা সুরত ও বগলানার লুঠ নিরাপদে দেশে লইয়া যাইতে পারিল।

ডিণ্ডোরীর যুদ্ধের ফলে ইহার পর এক মাসেরও অধিক কাল মুঘল-শক্তি নিস্তেজ হইয়া রহিল। দাউদ খাঁ আহত সৈন্যদের লইয়া নাসিকে এবং পরে আহমদনগরে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু এই বৎসরের শেষে (১৬৭০) তাঁহাকে আবার এখানে আসিতে হইল।

---

* শিবাজী এই যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং কার্ণার-করের আধুনিক চিত্র প্যানেল ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী।

(৫) বেরার ও বগ্‌লানা লুঠ

সুরত-লুঠের পর মারাঠারা দেড়মাস নিশ্চেষ্ট ছিল। কিন্তু ১৬৭০ সালের ডিসেম্বরের প্রথমে শিবাজী আবার সসৈন্য বাহির হইলেন; পথে চাণ্ডোর গিরিশ্রেণীতে অহিবন্ত ও অন্যান্য কয়েকটি উঁচু পাহাড়ী দুর্গ জয় করিয়া তিনি বগলানার মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে খান্দেশ প্রদেশে ঢুকিলেন এবং তাহার রাজধানী বুর্হানপুর শহরের বাহিরের গ্রামগুলি লুঠিলেন। তাহার পর হঠাৎ পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া উর্ব্বর ও ধনশালী বেরার প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এপর্য্যন্ত মারাঠারা এতদূর আসে নাই, কাজেই বেরারের কেহই এই বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। শিবাজী অবাধে মনের সুখে কারিঞ্জা নামক খুব সমৃদ্ধিশালী শহর হইতে এক কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন,অলঙ্কার ও মূল্যবান কাপড় লইলেন। লুঠের জিনিষ চারি হাজার বলদ ও গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া এবং শহরের সমস্ত ধনী লোককে * টাকা আদায়ের জন্য বন্দী করিয়া শিবাজী বেরারের অন্যান্য শহরে চলিলেন, এবং সেখানে অগাধ ধন লুঠিলেন। সর্ব্বত্রই লোকেরা ভয়ে শিবাজীকে লিখিয়া দিল যে, তাহারা বৎসর বৎসর তাঁহাকে চৌথ, অর্থাৎ বাদশাহী খাজনার এক চতুর্থাংশ, কর দিবে।

মুঘলেরা উপযুক্ত কোনই বাধা দিতে পারিল না। বেরারের বাদশাহী সুবাদার অলস ধীর নবাবী চালে চলেন, আর খান্দেশের সুবাদার এবং কুমার মুয়জ্জমের মধ্যে এমন ঝগড়া ছিল যে যুদ্ধ বাধে আর কি।

শিবাজী স্বয়ং যখন বেরারে যান তখন আর একদল মারাঠা পেশোয়া মোরো ত্র্যম্বকের অধীনে পশ্চিম-খান্দেশ লুঠিতে থাকে। এখন শিবাজী ফিরিয়া আবার বগলানায় আসিলে, এই দল তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বিখ্যাত সালের দুর্গ জয় করিল (৫ই জানুয়ারি ১৬৭১), এবং মুলের, ধোড়প প্রভৃতি অন্যান্য বড় পার্ব্বত্য দুর্গ অবরোধ করিল, গ্রাম লুঠিল, শস্য চলাচল বন্ধ করিল। ফলতঃ এই অঞ্চলে মুঘলেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, অথচ তাহাদের আত্মরক্ষার মত বল বা বড় নেতা কেহ নাই।

(৬) শিবাজী ও ছত্রশাল বুন্দেলা

১৬৭০ সালের শেষভাগে যখন এই সব যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন বিখ্যাত বুন্দেলা রাজা চম্পৎ রায়ের পুত্র ছত্রশাল শিবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ইনিই পরে পান্না রাজ্য এবং ছত্রপুর শহর প্রতিষ্ঠা করিয়া, দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ১৭৩১ সালে মারা যান। কিন্তু এ সময় তিনি তরুণ যুবক মাত্র এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘল সৈন্যদলে অল্প বেতনের মনসবদার। এরূপ চাকরিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ছত্রশাল একদিন শিকারের ভান করিয়া সস্ত্রীক মুঘল-শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং ঘোরা পথ দিয়া মহারাষ্ট্রে পৌঁছিয়া শিবাজীর অধীনে বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনাপতির পদ চাহিলেন। কিন্তু শিবাজী দক্ষিণী ভিন্ন ভারতের অন্য প্রদেশের লোককে বিশ্বাস করিতেন না অথবা উচ্চপদ দিতেন না। তিনি ছত্রশালকে এই বলিয়া ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন—"বীরবর! যাও, নিজ দেশ অধিকার করিয়া, তথায় রাজ্য স্থাপন কর, আর শত্রু জয় কর। তোমার পক্ষে সেখানে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করাই শ্রেয়, কারণ তোমার বংশের খ্যাতির জন্য অনেকে তোমার সঙ্গে যোগ দিবে। যদি মুঘলেরা তোমাকে আক্রমণ করিতে আসে, আমি এদিক হইতে তাহাদের উপর গিয়া পড়িব; এবং এইরূপে দুই শত্রুর মধ্যে পড়িয়া তাহারা সহজেই পরাস্ত হইবে।" ছত্রশাল ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিলেন।*

(৭) বগলানা অধিকার

সমস্ত ১৬৭০ সাল ধরিয়া শিবাজীর আশ্চর্য্য তেজ ও ক্ষিপ্র গতিবিধি, নানাক্ষেত্রে জয়লাভ, এবং অতি দূর দূর প্রদেশ লুঠ করা দেখিয়া বাদশাহ আওরংজীব বড়ই চিন্তিত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি মহাবৎ খাঁকে দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে

---

* কিন্তু কারিঞ্জার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ধরা পড়েন নাই। তিনি স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া নিরাপদে পলাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যেখানে শিবাজী স্বয়ং উপস্থিত সেখানে কোন মারাঠা সৈন্য স্ত্রীলোকের উপর হাত তুলিতে সাহস পাইবে না।

* তিনি পরে কি করিলেন তাহার বিবরণ আমার *History of Aurangzib*, Vol. 5, ch. 61-এ, ও Irvine's *Later Mughals* ii. ch. 9-এ আছে।

দাউদ খাঁকে রাখিয়া দিলেন। নিজ জাতভাই এবং অন্যান্য অনেক রাজপুত সেনা সহ রাজা অমর সিংহ চন্দাবৎকে বিস্তর টাকা, গোলাবারুদ ও রসদ দিয়া মহারাষ্ট্রে পাঠানো হইল।

মহাবৎ খাঁ ১০ই জানুয়ারি ১৬৭১ আওরঙ্গাবাদে পৌঁছিয়া কিছুদিন পরে চাণ্ডোর জেলায় গেলেন, অমনি কিন্তু সহকারী দাউদ খাঁর সহিত তাঁহার ঝগড়া বাধিয়া গেল! তিন মাসে মুঘলেরা এখানে প্রায় কিছুই করিতে পারিল না। শিবাজী খোড়প দুর্গ অবরোধ করিয়া বিফল হইয়াছিলেন বটে (ডিসেম্বরের শেষ), কিন্তু পরের মাসে সালের দুর্গ জয় করিলেন। মার্চ্চ মাসের প্রথমে দাউদ খাঁ মারাঠাদের হাত হইতে অহিবন্ত গড় কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার এই গৌরবে মহাবৎ খাঁ ঈর্ষায় ক্ষেপিয়া গেলেন। তাহার পর আর যুদ্ধ করা হইল না। প্রধান সেনাপতি সৈন্যসহ নাসিক এবং পরে পার্নেরের নগরে ছয় মাস ধরিয়া বিশ্রাম করিতে এবং বাইজীদের নাচ দেখিতে লাগিলেন!

এই-সব শুনিয়া বাদশাহ বিরক্ত হইয়া অক্টোবর ১৬৭১ সালে বাহাদুর খাঁ ও দিলির খাঁকে গুজরাত হইতে মহারাষ্ট্রে পাঠাইলেন। এই দুই বিখ্যাত সেনাপতি সালের দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য ইখ্‌লাস খাঁ মিয়ানা, রাজা অমর সিংহ চন্দাবৎ এবং অন্য কর্ম্মচারীদের রাখিয়া নিজেরা আহমদনগর হইয়া পুণা জেলা আক্রমণ করিলেন। দিলির খাঁ পুণা দখল করিয়া নয় বৎসরের কম বয়স্ক বালক ছাড়া আর সব লোককে হত্যা করিলেন (ডিসেম্বর)। কিন্তু ইহার এক মাস পরেই মুঘলদের এক ভীষণ পরাজয় হইল। বগলানায় তাহাদের যে দল সালের দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, ১৬৭২ জানুয়ারির শেষে প্রধান সেনাপতি প্রতাপ রাও, দ্বিতীয় সেনাপতি আনন্দ রাও এবং পেশোয়া মোরো ত্র্যম্বক অসংখ্য সৈন্য লইয়া হঠাৎ আসিয়া সেই মুঘলদলকে আক্রমণ করিলেন; তাহারা প্রাণপণ লড়িল, কিন্তু সংখ্যায় কম বলিয়া পারিয়া উঠিল না। রাজা অমর সিংহ এবং অন্যান্য অনেক সেনাপতি এবং হাজার হাজার সাধারণ সিপাহী মারা গেল, আর অমর সিংহের পুত্র মুহকম্ সিংহ, ইখ্‌লাস্ খাঁ এবং ৩০ জন প্রধান কর্ম্মচারী আহত ও বন্দী হইল; তাহাদের সমস্ত মালপত্র ও তোপ মারাঠারা লইয়া গেল।

তাহার পরই পেশোয়া মুলের দুর্গ জয় করিলেন। ইহার ফলে সমস্ত বগলানা প্রদেশে মারাঠা আধিপত্য নিষ্কণ্টক হইল। বগলানা সুরত যাইবার পথ। চারিদিকে শিবাজীর নাম ছড়াইয়া পড়িল, সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। মুঘল সেনাপতি দুইজন (বাহাদুর ও দিলির) যুদ্ধে বিফল হইয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া নিজ সীমানা আহমদনগরে ফিরিয়া আসিলেন। পুণা ও নাসিক জেলা (অর্থাৎ মারাঠাদের দেশ) বাঁচিল।

এদিকে মার্চ্চ মাসে সৎনামী বিদ্রোহ এবং এপ্রিল মাসে খাইবার গিরিসঙ্কটের পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় আওরংজীব এত বিব্রত হইলেন যে কিছুদিন ধরিয়া দক্ষিণে আর সৈন্য ও টাকা পাঠানো অসম্ভব হইল। জুন মাসে (১৬৭২) শাহজাদা মুয়জ্জমের স্থানে বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কুমার ও মহাবৎ খাঁ দুজনেরই উত্তর-ভারতে ডাক পড়িল।

(৮) কোলী-দেশ অধিকার

তাহার পর শিবাজীর জয়জয়কার। সুরত হইতে দক্ষিণে বম্বের দিকে আসিতে যে পাহাড় ও জঙ্গলপূর্ণ দেশ পার হইতে হয়, তাহাতে কোলী নামক অসভ্য দস্যু-জাতির বাস। সে সময় এখানে ইহাদের দুইটি ছোট রাজ্য ছিল;—ধরমপুর (রাজধানী রামনগর, বর্ত্তমান নাম 'নগর', সুরতের ৬০ মাইল দক্ষিণে) এবং জওহার (রাম-নগরের ৪০ মাইল দক্ষিণে)। এই রামনগরের ঠিক পূর্ব্বদিকে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতশ্রেণী পার হইলে নাসিক জেলা বা উত্তর-মহারাষ্ট্র। ১৬৭২ সালের ৫ই জুন পেশোয়া মোরো ত্র্যম্বক জওহার অধিকার করিলেন। সেখানকার রাজা বিক্রম শাহ মুঘল-রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। ইহার অল্পদিন পরে রামনগরও দখল করা হইল, তাহার রাজা সোম সিংহ পোর্ত্তুগীজ শহর দামনে আশ্রয় লইলেন।

মারাঠারা এত কাছে স্থায়ী আড্ডা গাড়াতে সুরত শহর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রামনগরে বসিয়া পেশোয়া সুরতের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান বণিকদের নামে উপরি

উপরি তিনখানা পত্র পাঠাইয়া চারিলক্ষ টাকা কর চাহিলেন এবং বলিলেন যে, এই টাকা না দিলে তিনি সুরত দখল করিবেন। শেষ চিঠিতে শিবাজীর জবানী এইরূপ লেখা ছিল:—"আমি তিনবারের বার এই শেষবার তোমাদের বলিতেছি যে, সুরত প্রদেশের খাজনার এক সিকি অর্থাৎ চৌথ আমাকে পাঠাইয়া দাও। তোমাদের বাদশাহ আমাকে নিজ দেশ ও প্রজা রক্ষা করিবার জন্য প্রকাণ্ড সৈন্যদল রাখিতে বাধ্য করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার প্রজারাই এই সৈন্যদলের খরচ জোগাইবে। যদি এই টাকা শীঘ্র না পাঠাও, তবে আমার জন্য একটা বড় বাড়ী প্রস্তুত রাখিও, কারণ আমি গিয়া সেখানে বসিয়া থাকিব এবং সুরতের খাজনা এবং মালের মাশুল আদায় করিয়া লইব। এখন আমাকে বাধা দিতে পারে এমন লোক তোমাদের মধ্যে কেহই নাই।"

এই পত্র পাইবার পর সুরতে পরামর্শের জন্য সভা বসিল। শহরবাসী এবং আশপাশের গ্রামের প্রধান লোকদিগের উপর তিনলক্ষ টাকা চাঁদা তোলার ভার দেওয়া হইল। কিন্তু অনেক আলোচনার পর লোকেরা কিছুই দিল না, কারণ তাহারা বেশ জানিত যে শহরের মুঘল শাসনকর্তা সব টাকা নিজে খাইয়া ফেলিবে, মারাঠাদের শান্ত করিবার জন্য কিছুই দিবে না।

তাহার পর যতবারই মারাঠারা এদিকে আসিতেছে বলিয়া গুজব উঠিত, ততবারই সুরতবাসীরা পলাইবার পথ খুঁজিত। এই কাণ্ড অনেক বৎসর ধরিয়া চলিল।

১৬৭২, জুলাই মাসে পেশোয়া নাসিক জেলায় ঢুকিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিলেন। সেখানকার দুইজন মুঘল থানাদার পরাস্ত হইয়া পলাইল। অক্টোবর নবেম্বর মাসে মারাঠা অশ্বারোহীরা দ্রুতবেগে বেরার ও তেলিঙ্গানায় প্রবেশ করিয়া রামগির জেলা লুঠ করিতে লাগিল। মুঘল সেনাপতি বাহাদুর খাঁ কিছুতেই তাহাদের ধরিতে পারিলেন না। তাহারা দ্রুতগতিতে নিজদেশে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মুঘলেরা পিছু পিছু থাকিয়া তাহাদের হাত হইতে অনেক লুঠ করা ঘোড়া ও বণিকদের মাল উদ্ধার করিল। আওরঙ্গাবাদের কাছে একটি ছোট যুদ্ধে মারাঠারা পরাস্ত হইল। ফলতঃ তাহাদের এবারকার বেরার আক্রমণ প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল।

(৯) বিজাপুরের সহিত সন্ধিভঙ্গ

পর বৎসর (১৬৭৩) মহারাষ্ট্রে তেমন কোন বড় যুদ্ধ বা বিশেষ লাভ-লোকসান হইল না। সুবাদার বাহাদুর খাঁ ভীমা নদীর তীরে পেড়গাঁও-এ শিবির স্থাপন করিয়া পথঘাটের উপর লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

এই বৎসর শিবাজী নিজ জন্মস্থান শিবনের দুর্গ অধিকার করিবার এক চেষ্টা করেন। আওরংজীব এই দুর্গটি আবদুল আজিজ খাঁ নামক একজন ব্রাহ্মণ মুসলমানের জিম্মায় রাখিয়াছিলেন। সেই লোকটি যেমন বিশ্বাসী তেমনি চতুর ও কার্যদক্ষ। শিবাজী তাহাকে "পর্বতপ্রমাণ টাকার স্তূপ" ঘুষ দিতে চাহিলেন, আর সেও সম্মতির ভাণ করিয়া একটা নির্দিষ্ট রাত্রে দুর্গ ছাড়িয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। সেই রাত্রে শিবাজীর সাত হাজার সৈন্য দুর্গের কাছে পৌঁছিল। কিন্তু আবদুল আজিজ ইতিমধ্যে বাহাদুর খাঁকে গোপনে খবর দিয়াছিল। মারাঠারা আসিয়া ফাঁদে পড়িল। তাহাদের অনেকে মরিল, অনেকে জখম হইল, বাকি সকলে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

কিন্তু অন্যদিকে শিবাজীর এক মহাসুযোগের পথ খুলিয়া গিয়াছিল। ২৪এ নবেম্বর (১৬৭২) বিজাপুরের রাজা দ্বিতীয় আলী আদিল শাহ প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার স্থানে চারি বৎসরের শিশু সিকন্দর রাজা হইলেন। তাঁহার অভিভাবক পদ লইয়া বিজাপুরের বড় বড় ওমরাদের মধ্যে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। রাজ্যময় গোলমাল ও বিদ্রোহ দেখা দিল। বিজাপুরের নূতন উজীর খাওয়াস্ খাঁর সহিত শিবাজী আর পূর্ব্বের সদ্ভাব বজায় রাখিলেন না, ঐ রাজ্যে উৎপাত সুরু করিয়া দিলেন।

(১০) পনহালা-জয়

১৬৭৩, ৬ই মার্চ্চ, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রিতে শিবাজীর সেনাপতি কোণ্ডাজী ফর্জন্দ ষাটজন বাছা বাছা মাবলে পদাতিক লইয়া নিঃশব্দে পনহালা দুর্গের উপরে চড়িলেন।

তাঁহার সৈন্যগণ হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পরকে পাহাড়ের প্রায় খাড়া গা বাহিয়া টানিয়া তুলিল। চূড়ায় পৌঁছিয়া তাহারা চারিদলে ভাগ হইয়া চারিদিক হইতে ভেরী বাজাইয়া দুর্গের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিল। গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে বাহিরের সমতলভূমি হইতে নহে, দুর্গের মধ্য হইতে এই হঠাৎ আক্রমণে দুর্গরক্ষকেরা হতভম্ব হইয়া পড়িল। চারিদিকে ছুটাছুটি ও পলায়ন আরম্ভ হইল। কোণ্ডাজী স্বয়ং দুর্গস্বামীকে তরবারি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। হিসাবের প্রধান কর্মচারী নাগোজী পণ্ডিত গোলমাল শুনিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া একজন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" সে বলিল, "আরে, ঠাকুর! জান না মারাঠারা দুর্গ লইয়াছে, আর দুর্গস্বামী মারা পড়িয়াছেন?" অমনি নাগোজী সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। ধরা পড়িলে তাঁহাকে মারিয়া টাকাকড়ি আদায় করা হইত।

তখন নীচ হইতে আর সব মারাঠা সৈন্য দুর্গে ঢুকিল। ক্রমে প্রভাত হইল। সমস্ত দুর্গ শিবাজীর অধিকারে আসিল।* বিজাপুরী কর্মচারীদের নিজের এবং সরকারী সব ধনসম্পত্তি কোথায় লুকানো আছে প্রহারের চোটে জানিয়া লইয়া মারাঠারা তাহা দখল করিল। সংবাদ পাইয়া শিবাজী নিজে শীঘ্র আসিয়া দুর্গটি দেখিলেন, এবং সেখানে একমাস থাকিয়া দেওয়াল মজবুত করিয়া, আরও কামান আনাইয়া পনহালাকে নিজের অজেয় আশ্রয়স্থলে পরিণত করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পারলি এবং সাতারা দুর্গও তাঁহার লাভ হইল।

(১১) উম্‌রাণীর যুদ্ধ

এতগুলি দুর্গ হাতছাড়া হওয়ায় বিজাপুরের রাজসভায় মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। নূতন উজীর খাওয়াস্ খাঁর অবহেলায় এই সব ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সকলে তাঁহাকে দোষ দিতে লাগিল। বহলোল খাঁকে পন্‌হালা উদ্ধার করিতে পাঠানো হইল, এবং আর তিনজন বড় সেনাপতিকে দূর দূর প্রদেশ হইতে নিজ সৈন্য সহিত আসিয়া বহলোলকে সাহায্য করিবার জন্য হুকুম গেল।

কিন্তু এই সকল সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শিবাজী বহলোলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি প্রতাপ রাও পনের হাজার অশ্বারোহী সহ দুই রাত্রি গোপনে দ্রুত কুচ করিয়া আসিয়া উম্‌রাণী নামক গ্রামে (বিজাপুর শহরের ১৮ ক্রোশ পশ্চিমে) বহলোলের সৈন্যদলকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদের জলাশয়ে যাইবার একমাত্র পথ বন্ধ করিয়া দিলেন (১৫ই এপ্রিল)। পরদিন প্রাতে মারাঠারা দলে দলে ঢেউয়ের মত বার বার বিজাপুরী সৈন্যদের আক্রমণ করিল। সারাদিন যুদ্ধ চলিল; অনেকে মরিল, অনেকে আহত হইল। বহলোলের আফঘান সৈন্যগণ প্রাণপণে লড়িয়া নিজ স্থান রক্ষা করিল। অবশেষে রণক্ষেত্রে সন্ধ্যা নামিল। দুই পক্ষ ক্লান্ত হইয়া নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু বিজাপুরীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক বিন্দু জল জুটিল না।

তখন বহলোল গোপনে প্রতাপ রাওকে অনেক টাকা ঘুষ পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমাকে পলাইয়া যাইবার জন্য একদিকের পথ ছাড়িয়া দাও। তোমরা আমার শিবিরের সব জিনিষ লইও।" তাহাই করা হইল। বহলোল রাতারাতি শত্রুব্যূহের মধ্যে একটি ফাঁক দিয়া কুচ করিয়া বিজাপুরে ফিরিয়া গেলেন। একথা শুনিয়া শিবাজী অত্যন্ত রাগিয়া প্রতাপ রাওকে তিরস্কার করিলেন।

তাহার পর কয়েক মাস ধরিয়া কানাড়া প্রদেশে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন পক্ষেই বড় কিছু হইল না। শিবাজী চারিদিকে অবাধগতিতে চলাফেরা ও লুঠ করিতে লাগিলেন। ১০ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন তিনি স্বয়ং কানাড়া আক্রমণ করিতে রওনা হইলেন। কিন্তু দুই মাস পরেই বিজাপুরীরা তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরিতে বাধ্য করিল। এবার তাঁহার তেমন কিছু লাভ হইল না।

* জেধে শকাবলীতে লেখা আছে যে শিবাজী ঘুষ দিয়া (দুর্গের একদিককার রক্ষীদের হাত করিয়া) পনহালা দখল করেন। আমারও তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ এমন অজেয় দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য কোন চেষ্টাই হয় নাই।

(১২) সেনাপতি প্রতাপ রাও-এর মৃত্যু

এই পরাজয়ের অপমান মুছিয়া ফেলিবার জন্য ১৬৭৪, জানুয়ারি মাসে শিবাজী প্রতাপ রাওকে আবার পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, "বহলোল আমার রাজ্যে বার বার আসিতেছে। তুমি সৈন্য লইয়া যাও এবং তাহাকে চূড়ান্তরূপে পরাস্ত কর। নচেৎ আর কখন আমাকে মুখ দেখাইও না।"

প্রভুর তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতাপ রাও বহলোলের খোঁজে বাহির হইলেন এবং কোলাপুরের ৪৫ মাইল দক্ষিণে ঘাটপ্রভা নদীর কিছু দূরে নেসরী নামক গ্রামে তাঁহাকে পাইলেন। বিজাপুরী সৈন্য দেখিবামাত্র প্রতাপ রাও দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের উপর গিয়া পড়িলেন। শুধু ছয়জন অনুচর তাঁহার সঙ্গে চলিল, বাকি সৈন্য এই পাগলের কাণ্ড দেখিয়া পিছাইয়া রহিল। কিন্তু প্রতাপ রাও-এর পশ্চাতে দৃষ্টি নাই, কথা শুনিবার সময় নাই। তাঁহার সম্মুখে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটি সরু পথ, এবং ও-পারে বহলোলের লোক দাঁড়াইয়া। এই পথে ঢুকিয়া শত্রুবেষ্টিত প্রতাপ ও তাঁহার ছয়জন সঙ্গী শীঘ্রই নিহত হইলেন। তখন বিজাপুরীরা বিজয় উল্লাসে মারাঠাদের উপর ছুটিয়া আসিয়া অনেককে কাটিয়া ফেলিল, "রক্তের নদী বহিল।" (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৬৭৪)।

আনন্দ রাও ছত্রভঙ্গ মারাঠা সৈন্যগণকে সাহস দিয়া আবার একত্র করিলেন। শিবাজী তাঁহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "শত্রুকে পরাজিত না করিতে পারিলে জীবন্ত ফিরিও না।" তখন আনন্দ রাও তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিজাপুর-রাজ্যের মধ্যে ঢুকিলেন। দিলির ও বহলোল খাঁ মিলিত হইয়া তাঁহার পথ রোধ করিলেন। কিন্তু আনন্দ রাও প্রত্যহ ৪৫ মাইল করিয়া এত দ্রুত কুচ করিলেন যে দুই খাঁ-ই অপারগ হইয়া পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পর আনন্দ রাও দক্ষিণে ঘুরিয়া কানাড়ায় প্রবেশ করিলেন। সাঁপগাঁও শহরের বাজার (পেঠ) লুঠিয়া সাড়ে সাত লাখ টাকা পাইলেন (২৩ মার্চ্চ)। দশ ক্রোশ দূরে বঙ্কাপুর নগরের কাছে বহলোল ও খিজির খাঁর অধীনে একদল বিজাপুরী সৈন্য পরাস্ত করিয়া পাঁচ শত ঘোড়া, দুইটি হাতী এবং শত্রুদলের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বহলোল শীঘ্রই ফিরিয়া প্রচণ্ড-বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা এক হাজার ঘোড়া ও লুঠের মালের কতক ফেলিয়া দিয়া হাল্‌কা হইয়া অবশিষ্ট লুঠ লইয়া নিরাপদে নিজদেশে ফিরিল।

৮ই এপ্রিল শিবাজী চিপলুন নগরে এই-সব বিজয়ী সৈন্যদের মহলা (রিভিউ) দেখিলেন, তাহাদের অনেক পুরস্কার দিলেন, এবং হংসাজী মোহিতেকে "হাম্বীর রাও" উপাধি দিয়া প্রতাপ রাও-এর স্থানে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৬৭৩ সালের ডিসেম্বর হইতে পর বৎসরের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কোঁকনে ও অন্যত্র যুদ্ধ খুব ঢিলা তালে চলিল। দুই পক্ষেরই সৈন্যেরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া কাজে গা লাগাইল না। তাহাদের নেতারাও যুদ্ধ করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করা অপেক্ষা লুঠতরাজ অধিক লাভজনক দেখিয়া তাহাতেই মন দিল। এই বৎসর শীতকালে অতিবৃষ্টি হওয়ায় মহারাষ্ট্রে মড়ক দেখা দিল। তাহাতে অনেক ঘোড়া ও মানুষ মরিল।

বাদশাহ ৭ই এপ্রিল (১৬৭৪) দিল্লী হইতে রওনা হইয়া উত্তর-পশ্চিমে আফগান-সীমানায় গেলেন, কারণ খাইবারের আফ্রিদি জাতি ভীষণ বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। দিলির খাঁকে দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরাইয়া আনা হইল। সেখানে বাহাদুর খাঁ একা পড়িয়া রহিলেন; তাঁহার পক্ষে এত কম সৈন্য লইয়া কিছু করা অসম্ভব হইল। এই সুযোগে শিবাজী মহা আড়ম্বরে নিজের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

দুইখানি পত্র*

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

(১)

১৩ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
২৫ জুলাই ১৯১৬

...যদি বিজ্ঞান কিছু শিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহাই স্বরূপ নয়। সর্ব্বদা ভুল দেখি, ভুল ভাবি ও ভুল শুনি। আমরা ক্ষুদ্র সৃষ্ট বস্তু হইয়াও যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্নেহ মমতার চক্ষে দেখি তবে যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার মমতা আমাদের অপেক্ষা কত বেশী।

আমাদের বুদ্ধির অতীত বিষয়ে মন ক্লিষ্ট না করিয়া আমাদের করিবার অনেক আছে। হয়ত আমরাই সৃষ্টিকর্ত্তার হস্ত। আমাদের হস্ত আড়ষ্ট হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য আড়ষ্ট হইবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

(২)

Glen Eden 1
Darjeeling
8. 11. 16

...যাহা অজ্ঞাত তাহাই বিভীষিকাময়, সেইজন্যই আমরা মরণকে মিথ্যারূপে দেখি। আমার নিকট ত সমস্ত জগতই জীবন্ত।

আর এক কথা—যাহা অনিবার্য্য তাহাকে বরণ করিতেই হইবে, পৌরুষ সহকারে অথবা ভীত চিত্তে।

যদি মাতৃপ্রেম বিধাতার প্রদত্ত হয়, তবে তাঁহার স্নেহ এবং করুণা মানুষের মমতা হইতে গভীরতর। শ্রান্ত শিশু যদি মাতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে ঘুমাইতে পারে, তাহা হইলে মরণ নিদ্রাতে ভয় কি?

এই জীবন একটা মহাক্রীড়াস্বরূপ। আমরা কি একটা উপলক্ষ্য করিয়া ইহাকে পাশার ন্যায় নিক্ষেপ করিতে পারি না?—হয় জয় কিম্বা পরাজয়। আপনি জীবনকে আনন্দময় দেখিতে চান। কিন্তু ঝটিকা ও অগ্ন্যুৎপাতেও এক মহাসঙ্গীত আছে।

আমরা এখানে শান্তির ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আছি, কিন্তু অদূরেই লক্ষ লক্ষ লোক নিজেকে যন্ত্রণাময় মরণে আহুতি দিতেছে। ইহাদের নিরানন্দে হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল হইবে।

আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ, সুখ কি দুঃখ, ইহাতে কি আসে যায়?

আসল কথা পূর্ণতা অথবা অপূর্ণতা লইয়া, ইহার মধ্যে আমরা কোন্‌টা গ্রহণ করিব?

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

* এই পত্র দুইখানি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত হইয়াছিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গে এই পত্র রচিত হয়।

শিশুর মন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম-বি

শিশুর মন কি পথে চলে, কি ভাবে কাজ করে, সে-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প। মনোবিদ্‌গণ বয়স্ক ব্যক্তির মন লইয়া যতটা নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহার তুলনায় শিশুর মন সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ কিছুই করেন নাই। ইহার একটা কারণও আছে। বয়স্ক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে বলিতে পারে—তাহার মনে কি ভাব উঠিতেছে, কোন্ পথে তাহার মন চলিতেছে। এই অন্তর্দর্শনের ক্ষমতা থাকায় বয়স্ক ব্যক্তির মনোরাজ্যের অনেক খবর পাওয়া সহজ। কিন্তু শিশু এ বিষয়ে ইতর প্রাণীর তুল্য। মনোভাব সম্যক্‌রূপে তাহার ব্যক্ত

করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তাহার মন বুঝিতে হইলে বিভিন্ন অবস্থায় সে কিরূপ আচরণ করে, কি কথা বলে, তাহা লক্ষ্য করা দরকার; কিন্তু ইহাতে ভুলের সম্ভাবনা যথেষ্ট। হয়ত কোন লাল জিনিস দেখিয়া কিছু না ভাবিয়াই শিশু হাত বাড়াইল,—আমরা মনে করিলাম তাহার জিনিসটি ধরিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এইরূপ ভুলের সম্ভাবনা মনে রাখিয়া যদি শিশুর জীবনের প্রত্যেক কার্য্য বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করা যায় তবে শিশু-মনের অনেক নূতন তত্ত্বই জানা যাইবে। শিশুর ব্যবহার নিরপেক্ষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। স্নেহশীল পিতামাতা অনেক সময়ে শিশুর ব্যবহারে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পান, প্রকৃতপক্ষে হয়ত তাহার কোনই অস্তিত্ব নাই। ভালবাসা স্বভাবতই আমাদিগকে অপক্ষপাতদৃষ্টিতে কিছুই দেখিতে দেয় না। এই কারণেই একটু বিশেষ শিক্ষা ও সাবধানতার প্রয়োজন। অল্প আয়াসেই পিতামাতা বিজ্ঞান-সম্মত নিরপেক্ষ দৃষ্টি লাভ করিতে পারেন। তখন তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল মহা মূল্যবান্ তথ্য বলিয়া মনোবিৎ-সমাজে গৃহীত হইবে। প্রত্যেক শিশুর মাতা যদি সামান্য চেষ্টা করিয়া শিশুর প্রাত্যহিক জীবনের অপক্ষপাত বিবরণী লিখিয়া রাখেন, তবে শিশু-মনের অনেক তথ্যই সহজে উদ্‌ঘাটিত হইবে। এ কার্য্যে মাতাও যে যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় ডারউইনই সর্ব্বপ্রথমে শিশুর দৈনন্দিন বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বহুসংখ্যক বিবরণী হইতে,—কোন্ বয়সে এবং কি অবস্থায় শিশু প্রথম বহির্বস্তু সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়, কোন্ সময় তাহার মনে ভালবাসা, রাগ, হিংসা, বিরক্তি ইত্যাদির প্রথম সঞ্চার হয়, এবং কি করিয়া ক্রমে ক্রমে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়, লোকজনের উপর তাহার ভালবাসা কি ভাবে বিস্তারলাভ করে,—ইত্যাদি প্রশ্নের সহজেই সমাধান হইতে পারিবে।

অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও তাহার বংশগত সংস্কার (heredity) ও আবেষ্টনের (environment) দাস। ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির সংস্কার বা বীজ লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি। ইহার মধ্যে কোন্ প্রবৃত্তিটি জীবনে ফুটিয়া উঠিবে, শরীরে ও মনে কি বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইবে, কোন্ বৃত্তি নষ্ট হইবে,—এ সমস্তই নির্ভর করে আবেষ্টনের উপর। কাহারও মধ্যে কোন বিশেষ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তি পরিস্ফুট হওয়া একেবারেই সম্ভব কি না, এবং সম্ভব হইলে তাহা কতদূর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে, তাহা সেই ব্যক্তির বংশগত সংস্কারের উপর নির্ভর করে। সম্ভব হইলে, বাস্তব জীবনে সেই বৃত্তি পরিস্ফুট হইল কি না, এবং হইলেও তাহা কতদূর পরিপুষ্টিলাভ করিল, তাহা আবেষ্টনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। যে বৃত্তি মূলতঃ বংশগত নহে, তাহার প্রকাশ অসম্ভব। সহস্র চেষ্টা করিলেও মানুষের শরীরে পালক গজাইবে না, কারণ পালকের জন্মগত বীজ আমাদের শরীরে নাই। অপর পক্ষে, চেষ্টা করিলে মাংস-পেশী সুদৃঢ় ও বর্দ্ধিত করা সম্ভব, কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে। মাংস-পেশীর পরিপুষ্টি আবেষ্টনের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এই পরিপুষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহা বংশগত সংস্কার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। মোট কথা—কি হওয়া সম্ভব, কি হওয়া অসম্ভব, তাহা নির্ভর করে বংশগত সংস্কারের উপর; কি হইল, আর কি না হইল, তাহা নির্ভর করে আবেষ্টনের উপর। উদাহরণ দিলে কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যাইবে। বটবৃক্ষের বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে এবং আবশ্যক জল ইত্যাদি পাইলে তাহা কালক্রমে স্বাভাবিক আকারের বটবৃক্ষে পরিণত হইবে। কিন্তু ক্ষেত্র যদি উপযুক্ত না হয় তবে বীজ অঙ্কুরিতই হইবে না, আর যদি বা বৃক্ষ জন্মায়, হয়ত তাহা আকারে ছোট হইবে। ক্ষেত্রের উন্নতি করিতে পারিলে বৃক্ষ আকারে বাড়িবে, কিন্তু এই বৃদ্ধির একটা মোটামুটি সীমা আছে। সহস্র চেষ্টাতেও সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া বৃক্ষ আকারে বাড়িতে পারিবে না। সাধারণ বটগাছ কিছুতেই হাজার হাত উঁচু হইতে পারে না।

শিশুকে উপযুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে রাখিতে পারিলে সে সবল সুস্থ ব্যক্তিতে পরিণত হইবে। অনুপযোগী আবেষ্টনে শিশু ক্রমে হয়ত অকর্ম্মণ্য, রোগযুক্ত বা দুষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক শিশুর ভিতরেই সামাজিক

হিসাবে ভাল ও মন্দ সংস্কার রহিয়াছে। অনুকূল আবেষ্টনে সদ্‌বৃত্তি পরিস্ফুট হয়; আবেষ্টন প্রতিকূল হইলে কুস্বভাব দেখা দেয়। শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-বিহার, সামাজিক অবস্থা, জলবায়ু প্রভৃতিকেই আবেষ্টন বলা হয়। কিরূপ আবেষ্টনে শিশুর কিরূপ বৃত্তি স্ফুরিত হয়, মনোবিদের কাছে তাহা এক বিশেষ সমস্যা। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ শিশুই যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে প্রতি-পালিত হয়, তাহা তাহাদের সদ্‌বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ-লাভের পক্ষে অনুকূল নহে। চেষ্টা করিলে, সকলের পক্ষে কিছু-না-কিছু উন্নতি সাধন সম্ভব। শারীরিক বৃত্তি সম্বন্ধে চিকিৎসক বলিতে পারেন কি করিলে কি দোষ কাটিয়া যায়, বা কি করিলে শরীর নীরোগ ও সবল হইতে পারে। কি উপায়ে পেশীসমূহ সুদৃঢ় ও সবল করা যাইতে পারে, তাহাও চিকিৎসক বলিয়া দিতে পারেন। সেইরূপ, কিরূপ ঘটনায় ও কিরূপ উপায়ে মনের অসৎ বৃত্তিগুলি সংযত করা যায়, কি উপায়ে ও কি ঘটনায় সৎ প্রবৃত্তির প্রকাশ ও পরিপুষ্টি সম্ভব মনোবিৎ তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করেন।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, Child is father of the man, ভবিষ্যতে কোন্ ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র কিরূপ দাঁড়াইবে, শৈশবের আবেষ্টনের উপরই তাহা অনেকটা নির্ভর করে। শৈশবে মনে যে রেখাপাত হয়, পরিণত বয়সে তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়—সাধারণেও তাহা কতকটা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক কি প্রকার আবেষ্টনের প্রভাবে কি বিশেষ পরিণতি হয় তাহা বলা বড় শক্ত। আবেষ্টনের প্রভাব অতি জটিল। বিখ্যাত মনোবিৎ ফ্রয়েডই সর্ব্বপ্রথম এই জটিল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফলে শিশু-মনের অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণের ধারণা, যে-সকল ঘটনা বা বিষয় মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে-সমস্তই বুঝি আমাদের জ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে; ভয় পাইলে বলিতে পারি কেন ভয় পাইয়াছি; রাগিলে জানা থাকে কেন রাগ হইল। অর্থাৎ, পূর্ব্ব ঘটনার প্রভাব মনে থাকিলে সেই ঘটনার স্মৃতিও মনে থাকে। কিন্তু ফ্রয়েড দেখিলেন, এমন অনেক ঘটনা আছে যাহা আমাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে এবং যাহার প্রভাব আমাদের কার্য্যকলাপে সর্ব্বদা পরিস্ফুট হয়; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই-সকল ঘটনার কোন স্মৃতিই থাকে না। কেন রাগ হইল, কেন ভয় পাইলাম, তাহা সব সময় বলিতে পারি না; কিংবা কারণ পাইলেও তাহা বিচারে যথেষ্ট বা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। ফ্রয়েড এক নূতন মনোজগতের সন্ধান পাইলেন। ঐ জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে; কেবল সেই ঘটনার প্রভাবে আমাদের বহির্মন আলোড়িত হইতেছে। ফ্রয়েড দেখিলেন, এই অজ্ঞাত মন শৈশবের আবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া উঠে এবং ইহার প্রভাব চিরদিন থাকিয়া যায়।

একটি উপমা দ্বারা মনের এই বিভাগ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সমুদ্র-কূলে কেহ বসিয়া থাকিলে সে শুধু জলের উপরে যাহা ঘটিতেছে তাহাই দেখিবে—সিন্ধুগর্ভে যে-সকল জীবজন্তু আছে তাহাদের কোন সন্ধানই সে পাইবে না। কচিৎ কোন জন্তু জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবে, নচেৎ নহে। যে ব্যক্তি বা যে মনোবিৎ আমাদের মনের জ্ঞাত-সারে যাহা ঘটিতেছে কেবল তাহারই আলোচনা করেন, তিনি এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী দর্শকের মত। ডুবুরী যখন সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে তখন নানা অদ্ভুত জীবজন্তু তাহার নজরে পড়ে। সমুদ্রগর্ভ হইতে কোন অদ্ভুত জীবকে ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিলে তাহার সহিত পরিচিত না থাকায় তাহাকে অতিশয় ভয়াবহ মনে হইতে পারে। সেইরূপ, আমাদের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে যে-সকল প্রবৃত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহাদিগকে বহির্মনে টানিয়া আনিলে মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইবে। কোন কোন অজ্ঞাত বৃত্তিকে দেখিয়া মনে ভয় বা ক্রোধের সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। অনেক সময় আমরা এই-সব বৃত্তির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানিতে চাহি না। সভ্যজীব বলিয়া মানুষের অভিমান আছে, কিন্তু তাহার অজ্ঞাত মনে যে কত অকথ্য ও অশ্রাব্য প্রবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে তাহার খবর সে রাখে না। বিশেষ বিশেষ ঘটনায় এই-সকল রুদ্ধ প্রবৃত্তি আমাদের কার্য্যকলাপে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের স্বরূপ দেখিয়া

আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই। বলিতে কি, এমন কোনো অসৎ প্রবৃত্তি আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না যাহা আমাদের এই অজ্ঞাত মনে নাই।

সমুদ্রগর্ভে ভয়াবহ জীব বাস করুক আর নাই করুক, সাধারণ লোকের তাহাতে কিছু যায়-আসে না, কিন্তু মানব-মনের কন্দরে যে-সব অসৎ প্রবৃত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার প্রভাব হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। এই অসৎ প্রবৃত্তিগুলির সহিত সৎপ্রবৃত্তির সর্ব্বদাই সংঘর্ষ চলিতেছে যাহার কোন সংবাদই সাধারণতঃ বহির্মনে আসে না; কাজেই আমরা তাহা জানিতে পারি না। কখন বা অসৎ বৃত্তির জয় হয়, কখন বা সংবৃত্তির সহিত তাহার একটা আপোষ হয়। আপোষ হইলে অসৎ প্রবৃত্তিগুলি সদ্বৃত্তির ছদ্মবেশে দেখা দেয়। এই অজ্ঞাত মন ও বহির্মনের সংঘর্ষের ফল অনুসারে মানুষের স্বভাব-চরিত্র গড়িয়া উঠে। কে দাতা হইবে, কে কৃপণ হইবে, কে সাহসী কে ভীরু, কে হিংস্রক, কে দয়ালু আর কে-ই বা নিষ্ঠুর হইবে, তাহা সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের ফলাফলের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হয়। এমন কি কে সৈনিক, কে ডাক্তার হইবে, কে কবি বা শিল্পী হইবে, কে কেরাণী হইবে, তাহাও অনেকটা এই সংঘর্ষের ফলের উপর নির্ভর করে। সংঘর্ষের ফল কি দাঁড়াইবে তাহা শৈশবের আবেষ্টনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই কারণেই নির্জ্ঞান-মনোবিৎ শিশু-মন অনুসন্ধানে এত যত্ন প্রকাশ করেন।

বহির্মনকে আমরা সংজ্ঞান, এবং অজ্ঞাত মনকে নির্জ্ঞান বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সব সময়ে মানসিক সংঘর্ষের সংবাদ আমরা জানিতে পারি না; অর্থাৎ এই বিরোধ নির্জ্ঞান প্রদেশেই ঘটে,—কদাচিৎ সংজ্ঞানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখনই মানসিক রোগের উৎপত্তি হয়। ধরা যাক, একজনের নির্জ্ঞানে নিজেকে অপবিত্র করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। এই ইচ্ছার অস্তিত্ব সে জানে না। কিন্তু এই অজ্ঞাত ইচ্ছা সর্ব্বদাই সংজ্ঞানে ফুটিয়া সেই ব্যক্তিকে অশুচি কাজে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সংজ্ঞান তাহাতে বাধা দিলে মানসিক সংঘর্ষ উৎপন্ন হইবে। তখন এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে আপোষ হওয়ায় অপবিত্র হইবার ইচ্ছা মনে স্পষ্ট ফুটিবে না। অধিকন্তু সংজ্ঞানে পাছে এই ইচ্ছা জাগে বলিয়া সর্ব্বদা শুচি থাকিবার জন্য একটা চেষ্টা আসিবে। এইরূপে শুচিবায়ু রোগের সূচনা হয়। আপোষের ফলে অশুচি হইবার ইচ্ছা সংজ্ঞানে অন্য মূর্ত্তিতে দেখা দিবে। শুচি থাকিবার ছুতায় রোগী নানা প্রকার অপবিত্র জিনিষ ঘাঁটিবে। এরূপ রোগী জানিতে পারে যে, তাহার মনে সদাই একটা অশান্তি রহিয়াছে। এই অশান্তির মানসিক বিরোধের ফল। শুচিবায়ুগ্রস্ত রোগীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিলেও, এবং তাহার অশুচিতার ধারণার মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা বারবার বুঝাইলেও, তাহার মানসিক অশান্তি দূর হয় না। অর্থাৎ যতক্ষণ না নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছাকে সংজ্ঞানে আনা সম্ভব হইবে এবং যতক্ষণ না রোগীকে তাহা উপলব্ধি করান যাইবে, ততক্ষণ তর্ক-বিতর্কে কোনই ফল হইবে না। সেইরূপ কাহারও স্বভাব-চরিত্র সংশোধনের জন্য যদি আমরা কেবল উপদেশ ও নীতিকথার আশ্রয় লই, তবে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। নির্জ্ঞানস্থিত বৃত্তিগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে না পারিলে স্বভাবের পরিবর্ত্তন অসম্ভব। বাংলায় কথা আছে—'স্বভাব যায় না ম'লে' এই প্রবাদ আংশিক সত্য মাত্র। কারণ মনোব্যাকরণের (psycho-analysis) সাহায্যে নির্জ্ঞানস্থিত রুদ্ধ বৃত্তিগুলিকে সংজ্ঞানে আনিতে পারিলে স্বভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভব, কিন্তু এ কার্য্য অতীব আয়াসসাধ্য। সকল ক্ষেত্রেই prevention is better than cure, অর্থাৎ রোগ প্রতিষেধের চেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। নির্জ্ঞান মনের উৎপত্তি যখন অনেকাংশে শৈশব-আবেষ্টনের উপর নির্ভর করে, তখন স্বভাব বিগড়াইতে দিয়া পরে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা অপেক্ষা, গোড়া হইতেই সতর্ক হওয়া সমীচীন। শিশুর মন-অনুসন্ধানের সার্থকতা এইখানে। যেখানে পূর্ব্বেই অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এবং মানসিক বিরোধের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, সেখানে ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত মনো-ব্যাকরণে উপকার পাওয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই নির্জ্ঞানস্থিত বৃত্তিগুলিকে সংজ্ঞানে আনিয়া তাহাদের অপকারী শক্তিকে নষ্ট করা।

কি লক্ষণের সাহায্যে শিশুর মনে বিরোধ চলিতেছে বুঝা যাইবে, এখন তাহার আলোচনা করিব। শিশুর যদি কোন বদভ্যাস দেখা দেয়, যদি সে অল্পে ভয় পায়, অতিরিক্ত লজ্জাশীল হয়, যদি সে একগুঁয়ে হয়, সামান্য কারণে বিরক্তি বোধ করে, তবে বুঝিতে হইবে তাহার মনে বিরোধ চলিতেছে এবং পালনের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে। শিশুর আহার-বিহার সম্বন্ধে যত্নবান হইলে অনেক সময়ে এই-সকল দোষ সংশোধিত হইতে পারে। এতটা সতর্কতা সত্ত্বেও যদি দোষ থাকিয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে পিতামাতা বা স্বজন-বর্গের আচরণের ত্রুটিই ইহার মূল কারণ। এই-সকল সামান্য দোষ-ত্রুটি থাকিয়া গেলে অনেক সময় পরিণত বয়সে নানা অনিষ্টের কারণ হয়। দেখা গিয়াছে, পাঁচ বৎসর বয়সে পা দিবার পূর্ব্বেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন অনেকটা নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এই সময়ে শিশুপালনের দোষ-ত্রুটি ঘটিলে চিরকাল তাহার ফল-ভোগ করিতে হয়। পিতামাতার অজ্ঞতাবশেই যে পালনের ত্রুটি ঘটে তাহা নিঃসন্দেহ। এইজন্য প্রত্যেক পিতামাতারই অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শিশুপালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে পৃথিবী হইতে মানসিক রোগীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

কিরূপ আবেষ্টনে মানসিক স্বাস্থ্যের হানি হয়, বহুকষ্টে মনোবিদ্‌গণ তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,এ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। ছোট ছেলের মনে কখন কি ভাবের উদয় হয় তাহা বোঝা শক্ত। বয়স্ক ব্যক্তির শৈশবে কি কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে মনোব্যাকরণের সাহায্যে তাহা অনেক সময় ধরা সহজ হয়। যে যে ঘটনা শিশুর সংজ্ঞানে থাকে, তাহার অধিকাংশই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্ঞানে নির্ব্বাসিত হয়। এই কারণে বয়স্ক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহার শৈশবকালের মনোভাবের কথা বিশেষ-কিছু জানা যায় না। নিজ নিজ জীবন আলোচনা করিলে সকলেই দেখিবেন, বাল্যকালের কত কম কথা তাঁহাদের মনে আছে। বাল্যস্মৃতি মনে না জাগিলেও বাল্য ঘটনা যে মনকে কতটা প্রভাবান্বিত করে তাহা মনোব্যাকরণবিৎ মাত্রেই জানেন। এই-সকল ঘটনার স্মৃতি ও প্রভাব মন হইতে একেবারে লোপ পায় না,—নির্জ্ঞানে নির্ব্বাসিত হয় মাত্র। নির্জ্ঞানবিৎ চেষ্টা করিলে অধিকাংশ বাল্যস্মৃতি উদ্ধার করিতে পারেন। তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, বাল্যঘটনা পরিণত বয়সেও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মনোব্যাকরণের ফলে বয়স্ক ব্যক্তির শৈশবের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। শিশু-মন বুঝিবার জন্য কেবল এইরূপ চেষ্টা করিয়াই মনোবিদেরা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বিকার-যুক্ত বহু শিশুর জীবনও আলোচনা করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন। এই দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেও তাঁহারা উভয় ক্ষেত্রেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বয়স্ক ব্যক্তির মনোব্যাকরণের ফলে তাঁহার শিশু-মনের যে তথ্য জানা যায় তাহা পরোক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে তথ্য পাওয়া যায় তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও শিশুর মনে কখন কি ঘটিতেছে তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা অনেক সময়ই অনুমানসাপেক্ষ। শিশু নিজের মনোভাব অল্পস্বল্প প্রকাশ করিতে পারিলে আর এতটা অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় না।

অনুমান করা যাইতে পারে, জন্মের পর হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত নিজের সম্বন্ধে শিশুর কোন স্পষ্ট ধারণাই থাকে না। এই কালে তাহার অহং-জ্ঞান (ego) জন্মায় না। সে যে তখন কোন বহির্বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করে এমন কথাও বলা চলে না। তবে শিশুর শৈত্য-তাপানুভূতি ও অন্যান্য সংবেদন (sensation) থাকে, বলা যায়। শিশু যে কেবল বিভিন্ন সংবেদন বুঝিতে পারে তাহা নহে, স্তন্যপানাদির ন্যায় কতকগুলি ক্রিয়াসম্পাদনেও সে সমর্থ। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির ঐচ্ছিক ক্রিয়া (voluntary action) এবং শিশুর প্রথম অবস্থার স্তন্যপান—একই প্রকার নহে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় 'অহং' (self) ও 'ইদং' (external world) জ্ঞান আছে, কিন্তু শিশুর প্রাথমিক স্তন্যপানে এরূপ কোন জ্ঞানের স্থান নাই। তাহা পরাবর্ত্তক (reflex) ক্রিয়ার ন্যায়, অর্থাৎ চোখের সামনে

হঠাৎ হাত লইয়া গেলে বয়স্ক ব্যক্তি যেমন কিছু না জানিয়াই ইচ্ছা ব্যতিরেকে আপনা হইতেই চোখ বন্ধ করে, সেইরূপ শিশুর মুখে স্তন দিলে সে আপনা হইতেই তাহা টানিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে শিশুর যখন বহির্বিষয়ের জ্ঞান জন্মিতে থাকে ও ইচ্ছাশক্তি পরিস্ফুট হয়, তখন স্তন্যপান ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। এইরূপে শিশুর প্রায় সমস্ত সংবেদন এবং স্তন্যপানাদি ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে 'অহং' ও 'ইদং' জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। তখন সংবেদন প্রত্যক্ষে (perception) পরিণত হয় ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অহং জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে শিশু নিজেকে অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া জানিতে পারে। বাহিরের বস্তুটি লাল, তাহার নিজের হাতে ব্যথা হইয়াছে,—এইরূপ ব্যাপার শিশু তখন বুঝিতে পারে। কিন্তু শরীরের সকল প্রকার সংবেদনের দিকেই প্রথমতঃ তাহার লক্ষ্য বেশী থাকে। বাহিরের বস্তু অপেক্ষা নিজের সুখ-দুঃখ বুঝিতে সে অধিক ব্যস্ত হয়। সামান্য কষ্ট বোধ করিলেই কাঁদিয়া তাহা প্রকাশ করে; কিছু ভাল লাগিলে তাহা ছাড়িতে চায় না। কেবল সুখ পাইবার জন্যই সে তখন লালায়িত। শিশুর এই মনোবৃত্তিকে স্বতঃরতি (auto-eroticism) বলা যাইতে পারে। এই সুখের অনুভূতি প্রথমাবস্থায় শরীরের কোন অংশ-বিশেষের সহিত জড়িত থাকে না,—সাধারণভাবে শিশুর সুখবোধ বা কষ্টবোধ হয় মাত্র। স্তন্যপানকালে জিহ্বায় সুখ হইতেছে বা হাত বুলাইলে পিঠে আরাম বোধ হইতেছে, কি শরীরের স্থান-বিশেষে কষ্ট বোধ হইতেছে,—স্বতঃরতি অবস্থায় এরূপ ধারণা শিশুর থাকে না। ক্রমে ক্রমে সুখ-দুঃখবোধ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত জড়িত হয়। তখন শিশু স্বাদের মিষ্টতা বা কটুতা, স্থান-বিশেষে যন্ত্রণা বা আরাম অনুভব করিতে পারে। এই সুখ-দুঃখবোধ শরীরের স্থান-বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া শিশু স্বভাবতঃই নিজ শরীরের প্রতি খুব বেশী আকৃষ্ট হয়। তখন কিসে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সুখ অনুভব করিবে, সেই চেষ্টাই সে করিয়া থাকে। এই অবস্থাকে স্ব-রতি (narcissism) বলা যাইতে পারে। স্বতঃরতি অবস্থায় শিশু সুখ ভালবাসে, স্ব-রতি অবস্থায় সে নিজেকে ভালবাসে।

স্ব-রতির পরের অবস্থায় শিশু ক্রমে ক্রমে বহির্বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং মাতাপিতা ও অন্যান্য লোকজনকে ভালবাসিতে থাকে। বিবিধ দ্রব্যেও তাহার আগ্রহ দেখা যায়। এই অবস্থাকে বস্তু-রতি (object love) বলা যাইতে পারে। এই বস্তু-রতির সম্যক পরিপুষ্টির উপরই বহির্জগতের সহিত শিশুর আদান-প্রদান নির্ভর করে। বস্তু-রতি বিকাশের পূর্ব্বাবস্থায় শিশু কেবল সুখের সন্ধানে চালিত হয়, কিন্তু বস্তু-রতি বিকশিত হইলে সে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ জানিতে পারে। এই বস্তু-রতির উপরই শিশুর বহির্জগতের জ্ঞান নির্ভর করে। বহির্জগতের সহিত নিজেকে মানাইয়া চলিতে গেলে—কেবল আপাতসুখের সন্ধানে বা প্রেয় দ্বারা পরিচালিত হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিসে পরে অনিষ্ট হইতে পারে এবং কিরূপেই বা তাহার নিবারণ সম্ভব, এই জ্ঞান পূর্ণ বস্তুজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। বাস্তব জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে বা শ্রেয়লাভ করিতে হইলে অনেক ক্ষেত্রেই আপাতসুখের আশা ত্যাগ করিতে হয়। স্বতঃরতি ও স্ব-রতি অপেক্ষা বস্তু-রতি অধিক শক্তিশালী না হইলে আপাতসুখ পরিহার করা সম্ভব হয় না। মানুষ যখন নিজ শ্রেয় ঠিক চিনিতে পারে, তখনই তাহার অহং ও ইদং জ্ঞান পরিপূর্ণতালাভ করিয়াছে, বলা চলে।

কি করিয়া ক্রমে ক্রমে শিশুর বস্তুজ্ঞান হয় তাহা বড় বিচিত্র ব্যাপার। বস্তু-রতির পূর্ব্বাবস্থা স্ব-রতি। স্ব-রতির ফলে শিশু নিজ শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া ব্যস্ত হয়। নিজ শরীরের ধারণাতেই তখন তাহার মন পূর্ণ থাকে। কাজেই পরবর্ত্তী অবস্থায় শিশু প্রত্যেক বহির্বস্তুকে নিজের আদর্শে দেখিবার চেষ্টা করে বা নিজের মত মনে করে। সকল পদার্থই তখন তাহার কাছে নিজের মত প্রাণবান বলিয়া মনে হয়। এ অবস্থায় তাহার স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান থাকে না। ক্রমে যখন যৌন-চেতনা জাগে, শিশু তখন পিতামাতা উভয়কেই নিজের

সহিত অভিন্নলিঙ্গ মনে করে। মনোব্যাকরণবিৎ লক্ষ্য করিয়াছেন, কত অল্প বয়সে শিশুর মনে কামিতার সঞ্চার হয়। সাধারণের বিশ্বাস, কৈশোর পার হইলে তবে যৌন-চেতনার উদয় হয়; শিশুর মন বুঝি একেবারে কাম-গন্ধহীন। কিন্তু যে-কেহ শিশুর আচরণ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন কত অল্প বয়সে তাহার আচরণে কামিতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কামিতা যে হঠাৎ একদিন যৌবনে ফুটিয়া উঠে তাহা নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই কামিতার বীজ শিশুর মধ্যে থাকে এবং জন্মের পর ক্রমে ক্রমে তাহা পুষ্টিলাভ করে মাত্র। অবশ্য, শৈশবের কামিতা-বিকাশের সহিত যৌবনের কামিতার পার্থক্য আছে, তবে বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় কামিতাও সময় সময় শিশুর মনেও দেখা যায়। অনেক মনোবিৎ বলেন, শিশুর আঙুল-চোষার মূলেও কাম-চেতনা আছে।

বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে এমন কতকগুলি স্থান আছে, যাহার উদ্দীপনাজনিত (stimulation) সংবেদনে (sensation) মনে কাম-ভাবের সঞ্চার হয়। শিশুরও শরীরে এইরূপ কয়েকটি স্থান আছে যাহার উদ্দীপনা-জনিত সংবেদনে তাহার মনেও কামভাবের অনুরূপ বিকার উপস্থিত হয়। অবশ্য শিশুর এই মনোবিকার ও বয়স্ক ব্যক্তির কামভাব—উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। তবে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত এই বিকারই স্বাভাবিক কাম-ভাবে পরিণত হয়। ওষ্ঠদ্বয়, মুখবিবর, উপস্থ মলদ্বার, নিতম্ব ও স্তনদেশ ইত্যাদি শিশুর কাম-স্থান। শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইবার সময় এই-সকল স্থানে অযথা উদ্দীপনার সঞ্চার হইতে পারে। শিশুকে অপরিষ্কার রাখিলেও, এবং ক্রিমি ইত্যাদি রোগেও, এইরূপ উদ্দীপনা সম্ভব। মনোব্যাকরণের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, অতি অল্প বয়সেই শিশুর মনে কাম-ভাব দেখা দেয় এবং তাহা শিশুর ভালবাসার পাত্রের সহিত জড়িত হয়। পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসা, ভাই-ভগ্নীর প্রতি স্নেহ, বন্ধুপ্রীতি—সবগুলির মধ্যেই এই কাম-ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে এই-সকল বিভিন্ন প্রকারের ভালবাসার কামজ অংশ নির্জ্ঞানে নির্ব্বাসিত হয়। সেই কারণে বয়স্ক ব্যক্তির মাতৃপ্রেম, পিতৃপ্রেম ইত্যাদিতে কাম-ভাবের অস্তিত্ব সহজে ধরা পড়ে না। ধরিতে হইলে মনোব্যাকরণের সাহায্য দরকার। কদাচিৎ কোন ক্ষেত্রে এই কাম-ভাব সংজ্ঞানে আসিয়া পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধকেও কলুষিত করে।

যে-সকল বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া শিশুর অহং ও ইদং জ্ঞান বিকাশলাভ করে, তদনুরূপ অবস্থার মধ্য দিয়াই শিশুর কামিতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। স্বতঃরতি অবস্থায় শিশুর মন কাম-স্থানের উদ্দীপনাজনিত সুখবোধের জন্য ধাবিত হয়। স্ব-রতি অবস্থায় শিশু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাম-দৃষ্টিতে দেখে। বস্তু-রতি অবস্থায় কাম-ভাব অপর লোকজনের উপর বিস্তারলাভ করে। মাতাপিতাই শিশুর প্রথম কাম-পাত্র। প্রথমতঃ, শিশু সকলকে অভিন্নলিঙ্গ মনে করে বলিয়াই তাহার কাম-চিন্তায় সমকামিতার (homosexual) ভাব প্রবল। এই অবস্থার পর শিশুর ইদং-জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়ায় সে লিঙ্গভেদ বুঝিতে পারে; তখন তাহার মনের কাম-চিন্তা ঐতর-রতির (hetero-sexuality) আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীলোককে ভালবাসে ও স্ত্রীলোক পুরুষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সাধারণের ধারণা, পুরুষ যে স্ত্রীকে এবং স্ত্রী যে পুরুষকে ভালবাসিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এই ঐতর-কামিতার উৎপত্তি যে কত জটিল, তাহা মনোব্যাকরণবিৎই জানেন। স্বতঃরতি, স্ব-রতি, সমকামিতা প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় ইতরবিশেষে ঐতর-কামিতার পূর্ণ বিকাশ বাধা পাইতে পারে। ফলে শিশু পরিণত বয়সেও নিজ স্ত্রী বা স্বামীকে ভালবাসিতে পারে না, এবং সংসারে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই কাম-পরিণতির প্রতিবন্ধকতায় বিভিন্ন কামবিকৃতির (perversions) উদ্ভব হয়।

মনোব্যাকরণের ফলে দেখা গিয়াছে, কাম-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতির প্রতিরোধ হইতেই অধিকাংশ মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি। সময়ে সময়ে যখন শিশুর কাম-ভাব পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থাগুলির মধ্যে কোন একটিতে আবদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থাগত বিকার ঘটিয়া নানা অস্বাভাবিক মনোভাব প্রকাশ পায়। কাম-পরিণতি

স্বতঃরতি অবস্থা অতিক্রম করিতে না পারিলে শুধু কাম-সুখ কেন,—সর্ব্বপ্রকার সুখ-ভোগের অক্ষমতাও জন্মিতে পারে। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা নানা প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন ও ত্যাগ স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাঁহাদের ধারণা সুখভোগ মাত্রই অন্যায়। এই মনোবৃত্তির মূলে বিকৃত স্বতঃরতি বর্ত্তমান। নানা ধর্ম্মে এবং খৃষ্টান ও দেশীয় সাধুদের মধ্যে যে শরীর-নিগ্রহ ও বৈরাগ্যের বিধান আছে, তাহার মূলেও এই বিকৃতি। এই বিকৃতি সার্ব্বজনীন নহে বলিয়াই সকলের পক্ষে বৈরাগ্যসাধন সম্ভবপর নয়। স্ব-রতি অবস্থায় কাম-পরিণতি ব্যাহত হইলে স্বার্থপরতা দেখা দেয়। অন্য ক্ষেত্রে কাহারও বা মনে নানাবিধ কাল্পনিক ভয়ের উদয়, এবং সুস্থ শরীরে নিরাপদে থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বদা মৃত্যু-আশঙ্কা হইতে পারে। সমকামিতার বিকাশে ব্যাঘাত জন্মিলে হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই শ্রেণীর বিকারগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তির বন্ধু-প্রীতি অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইয়া নিজ পরিবার মধ্যে অশান্তি আনয়ন করে। ঐতর-কামিতারও বিকৃতি দেখা যায়। এরূপ বিকারগ্রস্ত নারী বা পুরুষ আত্মীয় ব্যতীত বাহিরের কাহারও সহিত প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপনে অক্ষম হয়। ইহারা নিজ স্বামী বা স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিতে পারে না। অকারণে আপনাকে হীন বা দোষী মনে করা, অতিরিক্ত লাজুক হওয়া, ইত্যাদি এই বিকৃতির ফল। কাম-পরিণতির প্রতিরোধে যে-সকল কাম-বিকৃতির সৃষ্টি হয়, এখানে তাহার আলোচনা করিব না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শিশুর মনে বিভিন্ন কাম-বিকৃতির বীজ বর্ত্তমান আছে। কাম-পরিণতির বিশেষ বিশেষ ব্যাঘাতে ইহাদের মধ্যে যে-কোন কাম-বিকৃতি পরিস্ফুট হইতে পারে।

শৈশবের আবেষ্টনের উপরই শিশুর কাম-পরিণতি নির্ভর করিতেছে এবং এই কাম-পরিণতির প্রতিবন্ধকতায় নানা অস্বাভাবিক মনোভাব ও মনোবিকার দেখা দেয়। অতএব শৈশব-আবেষ্টন যে-ভবিষ্যৎ জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে তাহা সহজেই অনুমেয়। শৈশবে একবার এইরূপ দোষ প্রকাশ পাইলে, বহুদিন যাবৎ তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কাম-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির উপর যে অন্যান্য মনোভাবেরও স্বাভাবিকতা নির্ভর করে,—এ কথা প্রথমটা আশ্চর্য্য ঠেকিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কামকেই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত প্রাণীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মানুষের সুখ-দুঃখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার নিজ সাংসারিক জীবনের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাংসারিক জীবন—দাম্পত্য জীবনেরই নামান্তর মাত্র। কেবল দম্পতিই যে কামজ-আকর্ষণে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হন তাহা নহে; ভাই-ভগ্নী, পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি—সকল প্রীতি-বন্ধনের মূলেই কামভাব রহিয়াছে। এই কাম নির্জ্ঞানে থাকায় শিশুর কাম-বিকার সহজে ধরা পড়ে না।

শিশুকে প্রতিপালন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা সকল পিতামাতারই জানা দরকার। কেন সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য তাহার বিচার জটিল বলিয়া উল্লেখ করিব না। তবে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক সতর্কতার কারণ কতকটা বুঝিতে পারিবেন। যাহাতে প্রথম হইতেই শিশুর আহার-বিহার ও মলমূত্রত্যাগে সদভ্যাস জন্মে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সাধারণের ধারণা নাই যে, কত অল্পবয়সে সদভ্যাস শেখান সম্ভব। চেষ্টা করিলে একমাসের শিশুকেও নির্য়মিত সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করান যাইতে পারে। আহারও নিয়মিত সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। যখন-তখন স্তন্যদান শিশুর পক্ষে মঙ্গল-দায়ক নহে। শিশু কাঁদিলেই তাহাকে খাওয়াইতে হইবে,—এ ধারণা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ক্ষুধার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে শিশু কাঁদিলে, বুঝিতে হইবে তাহার কোন অস্বস্তি হইতেছে। ভিজা বিছানা, অনুপযুক্ত পরিধান, এবং কীটাদির দংশনে শিশু কাঁদিতে পারে। শিশুর শরীর সম্বন্ধে যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার বিবরণ যে-কোন শিশুপালন-সংক্রান্ত পুস্তকে পাওয়া যাইবে; সুতরাং এখানে তাহার পৃথক আলোচনা অনাবশ্যক। তবে যে-সকল ব্যাপারের সহিত মনের সংযোগ আছে তাহারই বিচার করিব। শিশুর মুখবিবর ও মলদ্বারে স্বল্প কারণেই অযথা উত্তেজনা হইতে

পারে। নিয়মিত আহার ও মলমূত্রাদি ত্যাগের অভ্যাসে এইরূপ উত্তেজনার শান্তি হয়। চোষণ-ক্রিয়া শিশুর পক্ষে সুখকর। এইজন্য,যথাসময়ে স্তন্যপানে ক্ষুধাজনিত উত্তেজনা প্রশমিত না হইলেশিশু আঙুল চুষিয়া কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করে এবং ক্রমে আঙুল-চোষার সুখে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। স্বতঃরতি অবস্থায় এই সুখের অত্যধিক উত্তেজনায় শিশুর তজ্জনিত কাম-বিকারের উৎপত্তি হয় এবং উত্তরকালে ইহার ফল বিষময় হইয়া উঠে। আঙুল-চোষায় শারীরিক অনিষ্টেরও সম্ভাবনা আছে, কারণ অপরিষ্কার আঙুল হইতে নানা-প্রকার অনিষ্টকারী বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। এই-সমস্ত কারণে শিশুকে রবারের চুষী বা আঙুল চুষিতে দেওয়া অনুচিত। দাঁত উঠিবার সময়ে মাড়ির সুড়সুড়ি নিবারণের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শক্ত চুষিকাঠি অল্পস্বল্প দিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু পরিষ্কার করিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহার কামস্থানগুলিতে অযথা হাত না দেওয়া হয়। পিতামাতা অনেক সময় শিশুকে অতিরিক্ত আদর করেন। ঠোঁটে মুখে অতিরিক্ত চুম্বনাদি ভাল নহে। একটু বয়স বেশী হইলে গাঢ় আলিঙ্গনাদিতেও শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে। অপর পক্ষে শিশুকে একেবারেই আদর না করা ঠিক নহে। পরিমিত আদরেই শিশুর মনোবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে। যে-শিশু ভালবাসা বা আদর পায় নাই, তাহার নানারূপ মানসিক বিকার ঘটা সম্ভব। পিতা ও মাতা উভয়েরই আদর শিশুর আবশ্যক। একজন অতিরিক্ত আদর করিলে এবং আর একজনের নিকট আদর কম পাইলে শিশুর মানসিক অনিষ্ট সাধিত হয়। অল্প বয়স হইতেই শিশুকে প্রত্যহ অন্ততঃ অল্পক্ষণের জন্য একলা অন্ধকারে থাকিতে দেওয়া উচিত। শিশুর সকল আব্দারে কর্ণপাত করা উচিত নহে। আবার একেবারে না শোনাও অন্যায়। প্রথম হইতেই শিশুকে বুঝিতে দিতে হইবে যে সকলক্ষেত্রে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। পিতামাতার একমাত্র সন্তান, প্রথম সন্তান, কনিষ্ঠ সন্তান, রুগ্ন সন্তান—ইহারা অনেক সময় অপরিমিত আদর পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দেখা গিয়াছে, এই-সকল শিশুরই ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক রোগের সম্ভাবনা বেশী। শিশুকে সমবয়স্ক সাথীদের সহিত খেলা করিতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ছোট-বড় ভাই-ভগ্নীদের স্নেহযত্ন আব্দার অত্যাচারের মধ্যে শিশুর পালন ভাল। শিশুর অল্পবয়সে মাতার আবার সন্তান হইলে, অনেক সময় নবাগতের উপর শিশুর হিংসা দেখা দেয়। অভ্যস্ত আদর না পাওয়ায়, অথবা কম আদর পাওয়ায়. শিশু মনে অশান্তি ভোগ করে। এই অশান্তির মাত্রা সময় সময় এতই প্রবল হয় যে তাহাতে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। ইহাকে চলতি ভাষায়—'এঁড়ে লাগা' বলে। পিতামাতার কর্ত্তব্য, শিশুকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিয়া এই হিংসা নিবারণ করা। তখন শিশু আপনা হইতেই নবাগতকে ভালবাসিবে। মনে রাখা উচিত, শিশুর মনেও হিংসা, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতি প্রবলভাবে দেখা দিতে পারে। এই-সকল উপহতি-জনিত (emotion) কষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির কষ্টেরই অনুরূপ। বয়স্ক ব্যক্তির পুত্রশোকের যে কষ্ট, শিশুর একটা ভাল-বাসার পুতুল ভাঙিয়া গেলেও তদনুরূপ কষ্ট হইতে পারে। এইরূপ কষ্ট পাইলে সহানুভূতি দেখাইয়া যাহাতে তাহার মন অন্য ভালবাসার দ্রব্যে আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। খেলার সাথীর বিচ্ছেদও সময় সময় শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। শিশু যাহাতে আত্মীয়স্বজন ব্যতীত বাহিরের লোকের নিকটেও যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

শিশুর কৌতূহল অতি প্রবল। এই কৌতূহল দমনের চেষ্টা না করিয়া যাহাতে তাহা চরিতার্থ হয় তাহা করিতে হইবে। অবশ্য, প্রশ্নের উত্তর শিশুর বোধ-শক্তির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। জন্ম ও কাম-ব্যাপার ঘটিত নানা প্রশ্ন শিশু প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে। পিতামাতা শিশুর কোন প্রশ্নের কদাচ মিথ্যা উত্তর দিবেন না। লজ্জার বশে মিথ্যা জ্ঞান শিশুকে প্রদান করিলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যে কত অনিষ্ট উৎপাদন করে তাহা মনোব্যাকরণবিৎমাত্রই জানেন। কাম-ঘটিত প্রশ্নের

উত্তরে শিশু যেটুকু বুঝিতে পারিবে, বা যেটুকুর জন্য সে কৌতূহলী, কেবল ততটুকুই বলা কর্ত্তব্য। বড় হইয়া শিশু বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিলে তাহার নানারূপ সঙ্গদোষ ঘটিতে পারে। পিতামাতার উচিত, লজ্জা না করিয়া এ-সম্বন্ধে শিশুকে সাবধান করিয়া দেওয়া। অনেকের ধারণা, শিশুকে কাম-সম্বন্ধীয় কোন কথা না বলিলে সে বুঝি বড়ই পবিত্র থাকিবে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে শিশু স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ এই-সকল ব্যাপারের বিকৃত জ্ঞান অন্যান্য বালক-বালিকা, চাকর-বাকর ও বাড়ীর লোকের কথাবার্ত্তা, এবং পশুদের ব্যবহার হইতে আহরণ করে। এ সকল বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা নিতান্ত অনিষ্টকর—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিশু যদি প্রথম হইতেই পিতামাতার নিকট তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পায় তবে সে অসঙ্কোচে তাঁহাদের নিকট সমস্ত কথাই বলিবে, ফলে কুসঙ্গীদের সহিত মিশিবার আগ্রহ তাহার কমিয়া যাইবে।

এক বৎসর বয়সের পরে শিশুকে আর পিতামাতার সহিত এক শয্যায় শুইতে দেওয়া উচিত নহে, এবং উপায় থাকিলে দুই তিন বৎসর বয়স হইতে শিশুকে পৃথক ঘরে শুইতে দেওয়া ভাল। শিশুর পক্ষে কি আবশ্যক ও সে নিজে কি চায়, তাহা সর্ব্বদা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। শিশুর খেলার মধ্য দিয়া যাহাতে তাহার বিভিন্ন প্রবৃত্তি-গুলি চরিতার্থ হইতে পারে, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, শিশুর মনে পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছাসমূহ রহিয়াছে। কখনও শিশু বাপ-মাকে আদর করিতে চায়, কখনও বা তাঁহাদের আদর পাইতে চায়; কখনও বা সে খেলার সঙ্গীদের নেতা হয়, কখনও বা অন্য শিশুর নির্দ্দেশে চলে। এই প্রকারের পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি যাহাতে চরিতার্থ হয়, পিতামাতা তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আমার মতে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা না জন্মে, ততক্ষণ মন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় না এবং ভবিষ্যতে মানসিক রোগের বীজ থাকিয়া যায়। শিশু কি ভাবে চলে, কি করে না করে, তাহার কোন্ বিষয়ে আগ্রহ, এ সমস্তই মূলতঃ তাহার স্নেহবন্ধনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে ভালবাসার ভিতর দিয়াই তাহা দিতে হইবে। শিশু যাহাকে ভালবাসে, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাহারই কার্য্যকলাপের অনুসরণ করে। তাহার আদর্শই শিশুর নিজের আদর্শ হয়। যে-শিক্ষক ছাত্রকে ভালবাসেন, তিনি বিশেষ বিদ্বান না হইলেও তাঁহার শিক্ষাদান সফল হয়। অপর পক্ষে ছাত্রের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে মহাবিদ্বান শিক্ষকের চেষ্টাও পণ্ডশ্রম হয়। কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা অপেক্ষা কে শিক্ষা দিতেছে, তাহাই বড় কথা। কত প্রকার শিক্ষাপ্রণালী এ যাবৎ আবিষ্কৃত ও পরিত্যক্ত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবিষ্কর্ত্তার হাতে তাঁহার নিজ প্রণালী সর্ব্বদাই সুফলপ্রদ হয়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেই প্রণালী অপরে প্রয়োগ করে, তখনই তাহাতে বিফলতার সম্ভাবনা দেখা দেয়; কারণ আবিষ্কর্ত্তার উৎসাহ চেষ্টা ও ছাত্রের প্রতি মনোভাব স্বভাবতঃ অপরে বর্ত্তে না; শিক্ষকের গুণেই শিক্ষা-প্রণালী সার্থক হয়। ছাত্রেরা যে-শিক্ষককে ভালবাসে না বা ভক্তি করে না, তাঁহার নিকট কিছুই শেখে না।

এই প্রবন্ধ-পাঠে হয়ত অনেকের ধারণা হইতে পারে যে, সকল প্রকার মানসিক বিকারই বুঝি চেষ্টা করিলে আরোগ্য হয়। কিন্তু এমন অনেক মানসিক ব্যাধি আছে,যাহা মস্তিষ্কের জন্মগত দোষ বা রোগজনিত বিকৃতির ফলে উৎপন্ন; এই সকল ব্যাধিতে কোনরূপ মানসিক চিকিৎসাই ফলপ্রদ হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে ঔষধাদির দ্বারা সুফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কোন চিকিৎসাতেই কোন ফল হয় না।

বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্য যে মধ্যে-মধ্যে পরীক্ষা কর[া] দরকার, এখন অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন; অনেক স্কুল-কলেজেই এখন শারীরিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষ[া] চলিতেছে। বালক-বালিকাদিগের মানসিক স্বাস্থ্য[-] পরীক্ষাও যে আবশ্যক, তাহা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি[ই] উপলব্ধি করেন। মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্যে[র] ন্যায়ই কাম্য। দুঃখের বিষয়, চিকিৎসকদিগের মধ্যেও [এ] সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। অনেকেই ম[নে]

করেন, *mens sana in corpore sano*, অর্থাৎ শরীর সুস্থ রাখিলেই মন সুস্থ থাকিবে—এই প্রবাদ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত, তাহা মনোবিৎ চিকিৎসকমাত্রই জানেন। পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্য সত্ত্বেও মানসিক ব্যাধির ফলে মানুষ একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই মনের পৃথক চিকিৎসা আবশ্যক। আপাততঃ হয়ত সমস্ত ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ইহার ঔচিত্য সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। সম্ভব হইলে প্রত্যেক শিশুকেই মধ্যে মধ্যে মনোবিৎ দ্বারা পরীক্ষা করান বাঞ্ছনীয়। যে শিশুর কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে, তাহার মানসিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। স্মরণ রাখা উচিত, মানসিক ব্যাধির কষ্ট অনেক সময় উৎকট শারীরিক পীড়া অপেক্ষাও দুঃসহ। এই কষ্ট নিবারণ-কল্পে সমস্ত চেষ্টাই প্রশংসনীয়।

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মনের একটা চঞ্চলতা ব্রজনাথকে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ করিয়াছিল। তাহাতে সে যে কোন রকম বে-হিসাবী কাজ করিয়াছিল তাহা নয়, তবে কর্ম্মে তৎপরতা কিছু দ্রুত হইয়াছিল। মনের বল থাকা আর না থাকায় এই প্রভেদ। কেহ চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, কেহ নিবিষ্টচিত্ত হয়। ব্রজনাথের যে কোথায় বিবাহ হইয়াছে তাহা জানা যাইবেই, তাহাতে তাহার কোন সংশয় ছিল না। বিবাহ ঘটনাচক্রে তাহার পিতামাতার অজ্ঞাতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সে বিবাহ অস্বীকার করিলেও সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে কখনো স্বীকৃত হইবে না। কতটা কর্ত্তব্যজ্ঞান, কতটা বধূর চাঁদ-মুখের স্মৃতি সে বিচার সে করিত না। তবে পিতামাতার সঙ্গে কোন রকম মনান্তর হওয়াও তাহার পক্ষে বড় ক্লেশ-জনক। সে যদি এই হিজলীতে নিজের কর্ম্মপটুতা দেখাইতে পারে, অল্প সময়ের মধ্যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে তাহা হইলে তাহার বিবাহ লইয়া গৃহবিরোধ নাও হইতে পারে। বিবাহের কথা এখন ব্রজনাথ ঠেলিয়া রাখিল, যে কাজে হাত দিয়াছিল তাহাতেই মন নিবিষ্ট করিল।

ব্রজনাথদের নায়েব আর দালাল রামদাস ব্রজনাথের কাজের ব্যবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। সাহেব খুসি হইল, সাহেবের নায়েব হাতধরা হইল, জাহাজের উপর ব্রজনাথের লোকের পাহারা পড়িল। ইহার অপেক্ষা পাকা বন্দোবস্ত আর কি হইতে পারে? রামদাস গিয়া আর সকল দালাল ও আড়তদারদিগকে বলিল যে, নূনের জাহাজ বিক্রী হইয়া গিয়াছে, অমরনাথ চৌধুরীর পুত্র ব্রজনাথ দেশ হইতে আসিয়াই এই সওদা করিয়াছে।

পর দিবস ব্রজনাথ বাসা হইতে বাহির হইল না। সে যে বলিয়াছিল মাছ ধরিতে আসিয়াছে তাই বাহির জলে জাল ফেলিয়া ডাঙায় বসিয়া রহিল। মাছ পড়িলে জাল টানিবে।

প্রাতে মুখ হাত ধুইয়া ব্রজনাথ নায়েবকে বলিল,—নায়েব-মশায়, আর খানকতক মাদুর পাতিয়ে রাখুন, কি জানি যদি কেউ আসে।

—আসবে না ত যাবে কোথা? আপনি ত বলে রেখেছেন যে চারা টোপ ফেলা হয়েচে। এখন গেঁথে খেলিয়ে তুললেই হয়। এখানে ত সকলেই মালের জন্য আসে, তা একটা মালের ঘরের চাবি-কাঠি আপনার কাছে। না এসে করে কি?

সূর্য্যোদয়ের পরেই রামদাস দালাল ও অপর কয়েকজন দালাল, জনকয়েক আড়তদার ও কয়েকজন খরিদ্দার আসিল। খরিদ্দারের মধ্যে দুই-তিনজন লোকের মুখ কিছু ভার। তাহারা এতদিন জানিত যে তাহারাই বড় গ্রাহক, অনেক মাল খরিদ করিয়া কলিকাতায় চালান দেয়। আসল দোকানদারেরা কলিকাতায়, ইহারা তাহাদের লোক।

তাহাদের মধ্যে একজন বসিয়াই কিছু রুক্ষভাবে কহিল,—জাহাজ-বোঝাই নূন ত একজনের নেবার কথা নয়। আমি একশো মণ নূন নিতে গিয়ে শুনলাম আপনি সব নিয়ে জাহাজে পাহারা বসিয়েচেন।

ব্রজনাথ ধীরভাবে কহিল, বিক্রীর মাল, আপনি ইচ্ছে করলে সব কিনে নিতে পারতেন।

—সে রকম কখনো হয়নি। আপনি এসে এটি নতুন করলেন।

—নতুন করায় দোষ কি?

—তা যাই হোক্‌গে, এখন আমাকে এক শো মণ দিতে হবে।

—বেশ কথা, দেবার জন্তই ত আমি নিয়েচি। আপনার দালাল কে আর আড়তদারই বা কে?

—আমি এঁদের সঙ্গে এসেছি বটে, কিন্তু এঁদের ত কিছু পাওনা হচ্চে না। জাহাজ থেকে নেবার সময় এঁদের মারফত কাজ করতে হ'ত, কিন্তু এখন ত কারবার আপনার সঙ্গে হচ্চে।

—আপনি যদি মনে করে' থাকেন যে আমি এঁদের অন্ন মারতে এসেছি, তা হ'লে আপনি ভুল বুঝেছেন। এঁদের পাওনা যেমন এঁরা পেয়ে থাকেন সেই মত পাবেন।

—তা হলে আপনাকে নিজের লাভ ছাড়তে হবে, আমি যে দরে কিনি তার চেয়ে বেশী দেব না।

—কত দরে আপনি নেন?

—দু টাকা করে' মণ।

—সে দরে হবে না। দুটাকা চার আনার কমে পাবেন না।

—এই কথা?

—আমার কাছে দু'কথা পাবেন না।

সে ব্যক্তি রাগিয়া উঠিয়া গেল। আর যাহারা ছিল তাহাদিগকে ব্রজনাথ বলিল,—আপনারাও কি ঐ দরে কিনেছিলেন?

—হাঁ।

—দেখুন, ব্যবসা কড়া কথায় হয় না, ঐ ভদ্রলোকটি এর'পর তা বুঝতে পারবেন। আপনারা যদি এখনি নেন তা হলে সাত সিকে দরে পাবেন, হপ্তাখানেকের মধ্যে সব টাকা দিতে হবে। দালালী আড়তদারী আমি দেব। কাল যদি নেন ত দু টাকা, পরশু ন সিকে। মেয়াদ ঐ এক হপ্তা, তার বেশী হলে মাসে শতকরা আট আনা হিসাবে বেয়াজ দিতে হবে। আপনারা দর কষাকষি করবেন না, আমার কাছে এক কথা।

খরিদদারেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, দালাল ও আড়তদারদের সঙ্গে বাহিরে গিয়া অল্পক্ষণ পরামর্শ করিল। নায়েব কাঠের পুতুলের মত স্থির হইয়া ব্রজনাথের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।

ঘরের ভিতর ফিরিয়া আসিয়া একজন প্রবীণ খরিদদার কহিল,—বাবু, মাল আপনি একচেটে করেচেন, সুতরাং আপনার সঙ্গে আমরা পেরে উঠ্‌ব না। দরেও আপনি সুবিধা করে' বলেচেন, তবে টাকাটা আপনার শীগ্‌গির চাই, হয়ত আর কিছুতে খাটাবেন।

—তা হতে পারে।

—আমরা যে ক'জন এখানে উপস্থিত আছি আর বাকি সকল গ্রাহক ও আড়তদারেরা মিলে ঐ সাত সিকে হিসাবে আপনার সমস্ত মাল খরিদ করলেম। আমরা এখনি আপনাকে কুড়ি হাজার টাকা এনে দিচ্চি।

—ভাল কথা। নায়েব-মশায়, খাতায় লিখে এঁদের দস্তখত নিয়ে নিন্। আপনাদের কাছে এক অনুরোধ আছে। ঐ যে ব্যক্তি একশো মণ নূন চায় সেই একশো মণ আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আর আপনারা কথা দিন যে আপনারা কেউ তাকে মাল বেচ্‌বেন না।

অগত্যা তাহারা সকলে স্বীকৃত হইল।

ব্রজনাথ কহিল,—আপনারা টাকা এনে দিলেই আমি

নিজে গিয়ে আপনাদের মাল বুঝিয়ে দেব, আমার লোক জাহাজ থেকে সরিয়ে নেব।

তাহারা উঠিয়া যাইবার সময় ব্রজনাথ কহিল,—রামদাস বাবু, সে লোকটি যদি মাল কিনতে চায় ত যেন আপনার সঙ্গে আসে, একা এলে আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

তাহাই হইল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গ্রাহকেরা ব্রজনাথকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়া গেল। ব্রজনাথ দশ হাজার টাকা নায়েবের কাছে রাখিয়া বাকি দশ হাজার নূনের জাহাজের আপিসের হিসাবে জমা করিয়া দিল। সেখানে সাহেব আর নায়েব দুইজনই অবাক্। এমন চট্‌পট্ সওদা, এমন হাতে হাতে টাকা, ইহাতে বিস্ময় হইবারই কথা। সাহেব ব্রজনাথের সঙ্গে আড়ালে কথাবার্ত্তা কহিলেন। বলিলেন,—দিন-পনর পরে আর একখানা জাহাজ আসবে, তখন তুমি সোজা আমার কাছে আসবে, বাবুর সঙ্গে কথা পাকা হবার দরকার নেই। এবার থেকে তোমায় আমায় সওদা হবে।

বলিয়া সাহেব চোখ টিপিলেন। সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে কতক্ষণ লাগে? ব্রজনাথ বলিল,—সাহেব, এবারও আমি তোমাকে খুসী করব, আমি এখানে কেবল নিজের পেট ভরতে আসি নি।

ফিরিবার সময় ব্রজনাথ পথে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল কড়িকাঠের জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাসায় আসিয়া দেখিল রামদাস দালাল আর সেই নূনের খরিদদার তাহার পথ দেখিতেছে।

রামদাস দালালকে জিজ্ঞাসা করিল,—কালকের সেই কথা?

—আজ্ঞে হাঁ। ইনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে আপনাকে ডিঙিয়ে কিছু করতে পারবেন না।

ব্রজনাথ বলিল,—সওদা ত শুধু টাকার নয়, কথারও ব্যবসা আছে। চড়া কথায় হার, নরম কথায় জিত। যে কথা কড়া করে' কয় তাকে ঘর থেকে লোকসান দিতে হয়, আর যে মিঠে কথা কয় সে পরের গাঁট থেকে টাকা ভুলিয়ে নিয়ে আসে।

সে ব্যক্তি বলিল,—আমার দোষ হয়েছে, এখন আমায় মাল দিন।

—বেশ, টাকা দিয়ে আপনি নিয়ে যান।

—সব টাকা?

—আপনাকে আমি ধারে দেব না, খাতাতে আপনার হিসেব থাকবে না।

—তা হ'লে দরে আমাকে কিছু ছেড়ে দিন।

—তাও দেব না। আমি যে দর দিয়েছি সেই দরে আপনাকে নিতে হবে।

—তাদের সাত সিকে দিয়েছেন, আমায় না হয় দু টাকায় দিন।

—তা হবে না, আর বেশী কথাতেও কোন ফল হবে না। ন-সিকের এক পয়সা কম হবে না। আজ না নিলে কাল আরও দু আনা বেশী দিতে হবে।

দালাল ও নায়েব দুইজনে মনে মনে ভাবিতেছিল, এ বড় শক্ত ঘানি। নায়েব ভাবিতেছিলেন অমরনাথেরও বেশ ব্যবসাবুদ্ধি আছে, কিন্তু ছেলের কাছে কিছু নয়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি যে দড় সে শুধু কথার কথা নয়।

সেই মেজাজওয়ালা বাবু দালালের কাছে সকল কথা শুনিয়া শুধু হাতে আসিতে সাহস করে নাই। দু হাজার টাকা বাহির করিয়া ব্রজনাথের সম্মুখে রাখিল। পরদিবস বাকি টাকা দিয়া নূন লইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কাঠের জাহাজও ব্রজনাথ খরিদ করিয়া লইল। তাহার তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি, কাজে দক্ষতা ও আচরণের শীলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও প্রীত হইল। যে কয়জন সাহেব ছিল তাহাদিগকে হস্তগত করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। দালাল, আড়তদার, পাইকার সকলেই এই নবীন যুবার অনুগত, তাহার অজ্ঞাতে কিংবা তাহাকে বাদ দিয়া কোন বড় সওদা হয় না। ব্রজনাথের স্বভাবে লোভের লেশ ছিল না। নিজের পাওনা ছাড়িবার পাত্র সে নয়, কিন্তু আর কাহারও হক্ মারিত না, সুতরাং সকলে তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। বাজারে যখন তাহার কথা হইত সকলে একবাক্যে তাহার ক্ষমতা স্বীকার করিত। রামদাস দালাল বলিত, এ ক্ষণজন্মা ছেলে। ধূলোমুঠো হাতে করলে

সোনামুঠো হয়। এদিকে একটি পয়সার তঞ্চক নেই, কাটার মুখে নিক্তি একেবারে খাঁটি। যেমন ঘরের ছেলে তেমনি ঠাণ্ডা, কথাবার্তায় খাসা, কিন্তু যিনি চোখ রাঙিয়ে কাজ উদ্ধার করবেন মনে করেন তাঁর গলাটি টিপে ধরে।

আর একজন রামদাসের কথা শুনিয়া বলিল,—গায়ে কত সামর্থ্য দেখেচ? সেদিন একটা কড়িকাঠ তিনজন সরাতে পারছিল না, ও ছোকরা একলা সেটা সরিয়ে দিলে।

—রোজ এক ঘণ্টা করে লাঠি তরোয়াল খেলে, কসরৎ করে।

যাহাকে লইয়া এই সকল জল্পনা হইত সে কেবল নিজের ব্যবসা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিত না। শরীরের প্রতি দৃষ্টি ছিল, যেমন ব্যায়াম করিত তেমনি নিয়মিত ঔষধও খাইত যাহাতে জ্বর না হয়। সঙ্গে যাহারা ছিল তাহাদের সাবধান করিলেও দুই-চারজনের দুই-একবার জ্বর হইয়াছিল। তাহারা নির্ব্বোধ, সকল বিষয়ে সর্ব্বদা তেমন সাবধান থাকিত না। ব্রজনাথ তাহাদিগকে ধমক দিয়া, সামনে ডাকাইয়া ঔষধের মাত্রা বাড়াইয়া দিত। ব্রজনাথ লক্ষ্য রাখিত যে কোন লোক কাবু না হইয়া পড়ে।

পৌষ মাস কাটিয়া গেল। মাঘ মাসের এক হপ্তা যাইলে পর ব্রজনাথ নায়েবকে ডাকিল। নায়েব ব্রজনাথকে আর ছেলেমানুষ মনে করিত না, অত্যন্ত সম্মান করিত। তাহাকে ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে আমি যে যে কাজে হাত দিয়েছি আর কিসে কত লাভ হয়েচে সে সব কথা খুলে আপনি বাবাকে লেখেননি ত?

—আপনি বারণ করেচেন কেমন করে' লিখ্‌ব? কিন্তু লিখ্‌তে দোষ কি? তাঁরা ত জান্‌লে আহ্লাদ করবেন।

—আমি গিয়ে 'নজে বল্‌তে চাই। বরং আমার সঙ্গে আপনি একখানা চিঠি দেবেন তাতে সব কথা খুলে লিখে দেবেন। এখন লিখ্‌বেন কাজকর্ম্ম যেমন চল্‌ছিল তেমনি চল্‌চে।

—তাই লিখ্‌ছি।

—আমার হিসেবে আশী হাজার টাকা লাভ হয়েছে, তাই কি ঠিক?

—আজ্ঞে হাঁ, ঠিক।

—এখন যে-কটা সওদা হাতে আছে তাতে আরও কুড়ি হাজার টাকা পাওয়া যাবে। লাখ টাকা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাব। এ টাকা ত দিন দুই তিনের মধ্যে পাওয়া যাবে, তা হলে দিন পাঁচ ছয় পরে ফিরব।

—আর কিছুদিন থেকে গেলে হ'ত না?

—কেন, এর মধ্যে কি লাভ মন্দ হয়েচে?

—না, না, সে কি কথা! আপনি মাসখানেকে যা করেচেন, দশ বছরেও তা হয়নি। বাজার ত আপনার হাত ধরা, কারুর এমন সাধ্যি নেই যে আপনার কথায় টুঁ শব্দটি করে।

—তবে আর কিসের জন্য বসে থাকা? ফাগুন মাস পড়লেই আবার জ্বর আরম্ভ হবে, শেষে কি হিজলী যাত্রীর মত জ্বর নিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দেশে ফির্‌ব? তার চেয়ে বরং আর বছর আবার দেখা যাবে। এখানে আপনি কিছু টাকা খরচ করে' ঘরদোর একটু বড় করুন। মাঝে মাঝে দেশ থেকেও কিছু ব্যবসা করতে পারি, কিন্তু আমার কলকেতায় কাজ করবার ইচ্ছে আছে।

যাবার দিন স্থির হইলে ব্রজনাথ একখানা ভাল দেখিয়া নৌকা ভাড়া করিল। নৌকায় মালের মধ্যে কয়েক মণ চাউল ও কয়েক বস্তা নূন। রওনা হইবার পূর্ব্বে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সকলকে বলিল, বাড়ীতে কাজ আছে আবার কোন সময়ে হিজলী আসিবে। নূনওয়ালী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে সাহেব শেকহ্যাণ্ড করিবার সময় ব্রজনাথের হাত খুব চাপিয়া ধরিল। ব্রজনাথও এমন জোরে সাহেবের হাত টিপিয়া ধরিল যে তাহার আঙুলে আঘাত লাগিল। সাহেব ভারি খুসী। বলিলেন,—টুমি খুব strong আছে। Quite a Samson! ডেশে কেন যাবে?

—সাহেব, দেশেও ত আমাদের কাজ আছে, আর এখানে ত আমাদের লোক আছে।

—ডেখ, চৌড়ুরী, টুমি ক্যালকাটায় আমাদের অফিসে বড়বাবু হোবে? আমি লিখ্‌বে।

—না সাহেব, চাকরী আমাকে দিয়ে হবে না, আমাদের মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান আছে।

—Ah, that's right, that's the proper spirit! আচ্ছা ফের জলদি আসবে।

—কাজ পড়লেই সাহেব, আসব।

বাসায় ফিরিয়া ব্রজনাথ গদাকে ডাকিয়া গোপনে কিছু আদেশ করিল। ঘোড়ার সঙ্গে দুই-তিনজন লোক হাঁটা-পথে যাইবে, বাকি সকলে নৌকায়। নায়েব ব্রজনাথকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—টাকা?

—আমি নিয়ে যাব, তার আবার ভাবনা কি? সব নম্বরী নোট ত? খাতায় সব টোকা আছে?

—তা আছে; কিন্তু এত টাকা আপনার হাতে দিতে সাহস হয় না। আপনি বেঁচে থাক্‌লে কত টাকা হবে। আমাদের অনেক লাভ হয়েচে সে কথা ত আর ছাপা নেই। জলপথে ডাঙা-পথে সমান ভয়।

—ভয় ত সমান, তা ট্যাকে কিছু থাক্‌ আর নাই থাক্‌। আগে ত ট্যাকে হাত দিয়ে দেখবে না যে রেস্ত কিছু আছে কি না, আগে দেবে লাঠির ঘা কিংবা তলোয়ারের কোপ। বন্দুক বড় বেশী ওদের কাছে নেই। এখানে যখন আসি তখনো শুধু হাতে আসিনি।

—হুজুর, সে ত দশ হাজার টাকা।

—দশ হাজার টাকা কি ডাকাতে পেলে ছেড়ে দেয়? অত টাকাই বা ওরা কোথায় পায়? আস্‌বার সময় আমি জন-কয়েককে শিক্ষে দিয়ে এসেছি, এবার এলে দু'চার জনকে আর ঘরে ফিরতে হবে না। আমার সঙ্গে যারা আছে তারা বিশ পঁচিশজন ডাকাতকে মেরে তুলোধুনো করে দেবে।

নায়েবের মুখ বন্ধ হইল। যাইবার সময় ব্রজনাথ নোটের তাড়া কোমরে, বুকে, পিঠে বাঁধিল, তাহার উপর সেকালের বন্ধক দেওয়া মির্জ্জাই, তাহার উপর বালা-পোষ ফেরতা দিয়া কোমরে বাঁধা। কোমরে তলওয়ার, হাতে বন্দুক। গদা ও তাহার সঙ্গীরা গোঁফে চাড়া দিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নৌকায় উঠিল।

ঘাটে ব্যবসাদারেরা দাঁড়াইয়াছিল। ব্রজনাথ ও তাহার দলবলকে দেখিয়া তাহারা বুঝিল ইহারা মরদ বটে, বোম্বেটে কি ডাকাতের ভয়ে পলায়ন করিবার লোক নয়। তবু তাহারা বলিল,—বাবু, বুঝে-সুঝে সাবধানে যাবেন, পথ বড় খারাপ।

ব্রজনাথ নৌকায় দাঁড়াইয়া, হাতজোড় করিয়া কহিল,—আপনাদের আশীর্ব্বাদ আর মধুসূদনের কৃপা। তবে বিপদের সময় মালা জপার চেয়ে তলোয়ার ঘোরানো বেশী কাজ দেখে।

—তা বটেই ত, তা বটেই ত। দুর্গা শ্রীহরি!

নৌকা ছাড়িয়া দিল। ব্রজনাথ কেন যে বৈকাল বেলা হিজলী হইতে যাত্রা করিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরে বাতাস, তাহাতে জলে অল্প ঢেউ উঠিয়াছে। জলের ধারে নিবিড় বন, মাঝে মাঝে গ্রামের চিহ্ন। শীতে সকলে জড়সড় হইয়া বসিল।

ব্রজনাথের দৃষ্টি বরাবর তীরের দিকে ছিল। রাত্রি অনুমান নয়টার সময় এক জায়গায় ঘাটের মত দেখিতে পাইয়া ব্রজনাথ সহসা আদেশ করিল,—ডাঙায় ভিড়াও।

মাঝি প্রথমে বুঝিতে পারিল না, অবাক্‌ হইয়া বলিল,—কেন বাবু, এখানে নৌকো ভিড়িয়ে কি হবে?

—সে কথা পরে বল্‌ব। এখন নৌকো লাগাও যেন ঘাট না পেরিয়ে যায়।

মাঝি হাল ফিরাইল আর দুইজন জলে লগী ফেলিয়া, নৌকা ঠেলিয়া কিনারায় লাগাইল। ব্রজনাথ ও তাহার লোকেরা নৌকা হইতে নামিল।

মাঝি জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু এখানে নাম্‌লেন কেন?

—আমরা নৌকাতে আর উঠ্‌ব না, অন্য পথ দিয়ে যাব তুমি নৌকা নিয়ে বরাবর উলুবেড়ে যাও, সেখানে আমার লোক মাল নামিয়ে নেবে। এই নাও তোমার ভাড়ার টাকা।

—সে কি কথা বাবু? আপনারা না থাকলে ত পথে মাল লুটে নেবে।

—তা নিক্‌ গে। তোমরা কিছু বলো না, তাদের যা ইচ্ছে হয় করবে। কিন্তু নৌকো খালি হলেও তোমরা উলুবেড়ে নিয়ে যাবে।

ব্রজনাথ আর কোন কথা না কহিয়া লোকজন সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল। মাঝি আবার নৌকা ফিরাইয়া

উত্তর মুখ চলিল। মাল্লারের শুনাইয়া বলিল,—নৌকো করে' যদি না যাবে তা হলে নৌকো করা কেন?

একজন বলিল,—ও বাবু বড় সেয়ান, কিছু একটা মতলব এঁটেচে।

গ্রামে না গিয়া ব্রজনাথ লোকজন সঙ্গে বড় রাস্তায় উঠিল। কিছুদূর গিয়াই যাহারা ঘোড়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদের সঙ্গে দেখা হইল। নিজের সঙ্গে এত টাকা লইয়া এমন পথে চলা অসম সাহসের পরিচয়, কিন্তু ব্রজনাথ অত্যন্ত সাহসী হইলেও গোঁয়ার নয়। নৌকায় খানিক আসিয়া তাহার পর পথে চলা একটা কৌশল। সকলে দেখিল ব্রজনাথ নৌকায় রওয়ানা হইল। যাহাদের সে খবর জানা দরকার তাহাদের জানিতে বিলম্ব হইল না। নৌকায় যাইতে সময় অনেক লাগে, ব্রজনাথের অত দীর্ঘ কাল ধৈর্য্য কিছুতেই থাকিত না। লোকজনকে ছাড়িয়া যাইবার ত উপায় নাই, তাহা নহিলে সে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া যাইত। জলপথের অপেক্ষা স্থলপথে অনেক সত্বর যাওয়া যায় আর দেশে ফিরিবার সকলেরই সমান তাড়া। ব্রজনাথ ঘোড়ায় চড়িল না, বলিল,—আজ রাত্রি তোমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাব, কিন্তু রাত্রে কোথাও থাকা হবে না। সকাল বেলা দেখা যাবে।

এ প্রস্তাবে সকলে স্বীকৃত হইল। সকলে প্রায় নিঃশব্দে চলিতে লাগিল, কেবল পায়ের জুতা ও ঘোড়ার খুরের শব্দ। রাত্রি অন্ধকার, নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে,পথের দুই ধারে বড় বড় গাছের সারি। কিছুদূর পথ চলিতেই কাহারও আর শীত বোধ হইল না। ভারী রাত্রে একটা চটির সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল কিন্তু সকলের হাতে লাঠি দেখিয়া বড় নিকটে আসিল না। ব্রজনাথের দল যেমন চলিতেছিল সেইরূপ চলিতে লাগিল।

দেড় দিনের পথ তাহারা এক রাত্রে চলিয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের পর তাহারা এক চটিতে উপনীত হইল। চটিতে অপর যাহারা রাত কাটাইয়াছিল তাহারা কতক দেশের অভিমুখে ফিরিতেছিল, কতক হিজলী যাইতেছিল। ব্রজনাথের দল দেখিয়া সকলেই অবাক্। যাহারা যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিল তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না, কিন্তু চটিদার ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবুমশায়, এমন সময় আপনারা কোথা থেকে?

ব্রজনাথের মনে খুব স্ফূর্ত্তি। ভাবিতেছিল, জলের পথে ত ফাঁকি দিয়েছি, ডাঙ্গার পথটা কাটালে হয়। হাসিয়া বলিল,—পথ থেকে আর কোত্থেকে! ঘর থেকে বেরিয়েচি সে অনেক দিনের কথা।

—অল্পদিন হল আপনাকে দেখেছি মনে হচ্চে। তখন হিজলী যাচ্ছিলেন না?

—তাই হবে। আবার এই পথ দিয়ে জগন্নাথক্ষেত্রও যাওয়া যায়।

—আপনাদের সঙ্গে ত পাণ্ডা ছিল না।

—তাও ত বটে। তোমার যে অনেক দিকে নজর দেখ্‌চি।

—তা রাখ্‌তে হয় বই কি। পথের ধারে বসে বসে আর কি কর্‌ব? কিন্তু রাত্রে পথ চলা বিবেচনার কাজ হয়নি।

—কেন, পথে মেরে নিত?

—এ পথে যে ভয় সে কথা ত সকলেই জানে।

—ভয় আমাদের, না যারা আমাদের কাছে আস্‌ত তাদের?

—এ কি তামাসার কথা?

—কে বল্লে তামাসার কথা? গদা!

—আজ্ঞে।

—তোমরা পাঁচ সাতজন এক একবার তলোয়ার ঘোরাও ত।

দশখানা তলোয়ার খাপের ভিতর হইতে বাঁকা বিদ্যুতের মত বাহির হইল, ব্রজনাথের সকলের আগে। চটিদার তাড়াতাড়ি পিছাইয়া পড়িল। তলোয়ার দশখানা দেখিতেই পাওয়া যায় না, কেবল ইস্পাতের ফলকের উপর নবীন সূর্য্যালোকের খেলা, চক্ষে ধাঁধা লাগে। চটিতে আর যাহারা ছিল তাহারা স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল।

ব্রজনাথ হাঁকিল,—থাক্! মুহূর্ত্তের মধ্যে অসি কোষে ফিরিয়া গেল।

চটিদারের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, শুককণ্ঠে ঢোক গিলিয়া বলিল,—আপনারা কি, আপনারা কি—

ব্রজনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—না, আমরা ডাকাত নই, গৃহস্থ। সামান্য কাজে হিজলী গিয়েছিলাম এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি। রাত্রে পথ চল্‌তে আমাদের কোন ভয় নেই কেন না আমরা ডাকাতের যম।

—তা ত দেখ্‌চি।

—তোমার একটা ঘর আমার চাই। খাওয়া-দাওয়া করে খানিক ঘুমিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়্‌ব। ঘোড়া দুটোর জন্য ছোলা আর ঘাস দাও।

গোটা দুই তিন ঘর ব্রজনাথ দেখিল। কোনটাই ভাল করিয়া বন্ধ করা যায় না। কোনটার হুড়কা ভাঙা, কোনটার কবজা আল্‌গা। ঘরের বাহিরে দাওয়া। ঘর কয়টা দেখিয়া ব্রজনাথ একটা ঘর বাছিয়া লইল। চটিদারকে বলিল,—আমার লোকদের যা আবশ্যক হয় দাও।

আহারাদির পর ব্রজনাথ সেই ঘরের দরজা কোন-রূপে বন্ধ করিয়া শয়ন করিল। গদা আর তাহার সঙ্গীরা দরজার বাহিরে পাশাপাশি নিদ্রিত হইল।

হিজলীর অনেক সংবাদ চটিদারেরা জানিত, কারণ সেখান হইতে ফিরিবার পথে অনেকে অনেক কথা বলিত। ব্রজনাথ কে, এত লোক লইয়া, এত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কেন যাইতেছে তাহা চটিদার ঠিক অনুমান করিতে পারিল না। ইহাদের সঙ্গে টাকাকড়ি আছে কি না তাহাও বুঝিতে পারিল না, কিন্তু এ পথ দিয়া কেহ ত টাকার তোড়া বাঁধিয়া লইয়া যাইত না, হয় অন্য উপায়ে পাঠাইয়া দিত কিংবা নোট লইয়া যাইত। এক-জন অল্পবয়স্ক যুবক অল্পদিনের মধ্যে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে এ কথা সকলের মুখেই শোনা যাইত। চটিদার অপর লোকের সঙ্গে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিল। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল হিজলী হইতে অনেক টাকা লইয়া এই দল দেশে ফিরিতেছে। যাহারা শুনিতেছিল তাহাদের মধ্যে কয়েক জন উঠিয়া গেল।

নিদ্রা হইতে ব্রজনাথ সকলের আগে উঠিল, উঠিয়া আর সকলকে জাগাইল। গদাকে কহিল,—আজ আর সমস্ত রাত চলা হবে না, কিন্তু আর খানিকটে পথ এগিয়ে যেতে হবে।

—যত এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। এখন আমরা বাড়ীমুখো, যত শীগ্‌গীর ফিরতে পারি ততই ভাল।

ব্রজনাথ চটিদারকে ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিল,—এর আগের চটি কত দূর?

—ক্রোশ-সাতেক হবে।

—তার আগের চটি?

—সে আরও পাঁচ ক্রোশ হবে।

—তোমার পাওনা চুকিয়ে নাও। আমরা এখনি বেরুব।

—একটা কথা আপনাকে বলি, ভারী রাত্তিরে পথ চলবেন না।

—পথে আমাদের মেরে নেবে?

—সে ভয় না থাকলেও মিছিমিছি একটা হাঙ্গামা হতে পারে।

ব্রজনাথের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া চটিদারের মুখে পড়িল। আমাদের কথা এখানে হচ্ছিল? ব্রজনাথ কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

চটিদার ব্রজনাথের মুখের দিকে না চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—অমন ত কথা হয়েই থাকে। তাতে আপনি এত লোকজন নিয়ে এত অস্তরশস্তর নিয়ে যাচ্ছেন দেখে আরও কথা ওঠে।

—ভাল, তোমার কথা আমার মনে থাক্‌বে।

চটি হইতে খানিক দূর গিয়া ব্রজনাথ সকলকে বলিল,—আমার মনে হচ্ছে আজকেই একটা কিছু হবে। যাবার সময় চটিতে চুরি কর্‌বার চেষ্টা করেছিল এবার বোধ হয় পথেই ডাকাত পড়্‌বে। আমাদের কাছে হাতিয়ার আছে, সাম্‌নে দিয়ে আস্‌বে না, পাশ থেকে কি পিছন থেকে।

গদা বলিল, আমরা তৈরী আছি, আসুক্।

—যেই সঙ্কেত হবে অমনি চারজন খোলা তলোয়ার হাতে নোব, চারজন বন্দুক নেবে, আর সবাই লাঠি।

ঘোড়া দুটো দু পাশে, পিছনে নয়, কেন না পিছন থেকে তাড়া পেলে আমাদেরই ঘাড়ে এসে পড়্‌তে পারে। আমি ঘোড়ায় চড়্‌ব না, দূর থেকে কিছু ছুঁড়ে মার্‌তে পারে।

ঘোর ঘোর হইতেই সকলে আদেশ-মত অস্ত্র গ্রহণ করিল। আগে লাঠি হাতে চারজন, পশ্চাতে দুইজন বন্দুক ও দুইজন তলোয়ার লইয়া, অবশিষ্ট কয়েকজন দুই পাশে। সহিসেরা ঘোড়ার মুখ মজবুত করিয়া ধরিয়া চলিল। ব্রজনাথ পশ্চাতে, ভরা বন্দুক হাতে, গদা পাশের দিকে, তাহারও হাতে বন্দুক।

ক্রমে বেশ অন্ধকার হইয়া আসিল, রাত্রি হইল। ব্রজনাথের অনুমান তাহারা পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়াছে, আর ঘণ্টাখানেকে চটিতে পৌঁছিবে।

কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই, সকলে সতর্ক হইয়া অথচ দ্রুতপদে চলিয়াছে। অশ্বের ক্ষুরের শব্দ, মানুষের পদধ্বনি, কখন কখন পেঁচার ডাক কিংবা শৃগালের রব। পথ অন্ধকার হইলেও কিছু দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পথের দুই পাশে বন, সেখানে নিবিড় অন্ধকার।

ব্রজনাথ এক একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার লক্ষ্য ছিল পথের দুই পাশে। গাছের নীচে বড় বড় ঘাস ও গুল্ম। তাহারই প্রতি ব্রজনাথের দৃষ্টি। গদাও নিজের পাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। স্থানে স্থানে ঘাসে অল্প চঞ্চলতা দেখিয়া ব্রজনাথ বুঝিতে পারিল ইহার ভিতর মানুষ লুকাইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। গদারও তীক্ষ্নদৃষ্টি, সেও দেখিতে পাইয়াছিল।

সহসা পথের দুই দিক দিয়া দুই দল দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এক দলের হাতে লাঠি, আর এক দল তলোয়ার লইয়া। কেবল একজনের হাতে বন্দুক। সে বন্দুক উঠাইতেছে, এমন সময় ব্রজনাথ তাহাকে গুলি করিল। সে বন্দুক-সুদ্ধ পথের মাঝখানে পড়িয়া গেল। গদাও একজনকে আহত করিল। চার পাঁচজন ঘায়েল হইয়াছে দেখিয়া ডাকাতেরা দাঁড়াইল। যাহার হাতে বন্দুক ছিল সেই ব্যক্তি সর্দ্দার। ব্রজনাথ হাঁক দিল,—মার বেটাদের, যেন একজনও না পালায়!

লড়াই অধিকক্ষণ হইল না। দলপতি প্রথমেই জখম হইয়াছে দেখিয়া ডাকাতেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল, আর ব্রজনাথ ও গদার দলের তুলনায় তাহারা হীনবল। সংখ্যায় কিছু অধিক হইলে কি হয়, অস্ত্রকৌশলে তাহারা ব্রজনাথের দলের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। যাহারা আহত অথবা হত হইয়াছিল অবশিষ্ট দস্যুরা তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃক্ষমূলে পা লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, গদা তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল।

চটিতে পৌঁছিতে রাত্রি দশটা হইল। সেখানে একটা ভারি হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সন্ধ্যা রাত্রে ত ডাকাতের উপদ্রব বড়-একটা শুনিতে পাওয়া যায় না, আর এবার ত ডাকাতরাই মার খাইয়াছে, ব্রজনাথের দল অক্ষত শরীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চটিতে পান্থ ও অপর লোকেরা বিস্মিত হইল। যে ডাকাতকে গদা ধরিয়া আনিয়াছিল তাহাকে ব্রজনাথ শাসন করিয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বরদাকান্ত দুর্ম্মুখ, কোপনস্বভাব, নিষ্ঠুর, কিন্তু প্রকৃত সাহস তাহার বিশেষ ছিল না। যতক্ষণ নিজের কোন আশঙ্কা নাই ততক্ষণ খুব হাঁকডাক, কিন্তু নিজের কোন ভয় উপস্থিত হইলেই তর্জ্জন-গর্জ্জন বন্ধ হইয়া যাইত। লোকে জানিত বরদাকান্ত জমিদার, কিন্তু তাঁহার যে ডাকাতের দল আছে সে কথাও অনেকে জানিত। তবে নিজের গ্রামের নিকটে তিনি লুটপাট করিতেন না বলিয়া গ্রামে তাঁহার শত্রু ছিল না। ভয় তাঁহাকে সকলেই করিত, তবে কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিত না। কোম্পানীর লোক ডাকাতের দলের সন্ধানে ফিরিতেছে জানিতে পারিয়া তাঁহার বড় ভয় হইল। কবে কোন্ গোয়েন্দা তাঁহার পিছনে লাগিবে, কোন্ শত্রু কবে তাঁহাকে ধরাইয়া দিবে এই দুর্ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

প্রথম কাজ তাঁহার দল ভাঙিয়া দেওয়া। রাত্রে দলের লোককে বনের মধ্যে ডাকিয়া বরদাকান্ত তাহাদিগকে

আশঙ্কার কারণ জানাইলেন। বলিলেন,—এখন কিছুদিন আমাদের চুপচাপ করে' থাকতে হবে, তা না হলে সব ধরা পড়্‌বে। যে যার নিজের কাজে লেগে থাক্, কেউ কারুর সঙ্গে দেখা করিস্ নে, একসঙ্গে জড় হয়ে জটলা করিস্ নে। কিছুদিন তো কেটে যাক্ তার পর দেখা যাবে।

তাহাই হইল। দলের লোকেরা নিজের নিজের ঘরে গিয়া, শান্তশিষ্টভাবে আপন আপন কাজ করিতে লাগিল। বরদাকান্ত জমিদারী কাজে নিবিষ্ট হইলেন, কিন্তু চারিদিকে নজর রাখিতেন, সব খবর রাখিতেন। পাশের গ্রামের পুলিশের দারোগাকে পূর্ব্বে তিনি গণনার মধ্যে আনিতেন না, এখন তাঁহার পুষ্করিণী হইতে বড় বড় রুই কাৎলা মাছ দারোগাবাবুর বাসায় উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। দুই চারিবার বরদা দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, দারোগাও মাঝে মাঝে বরদার কাছারী-বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন বৈকাল বেলা বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া বরদাকান্ত তামাক খাইতেছেন এমন সময় রাধানাথ ঠাকুর উপস্থিত। রাধানাথ কর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, পাশ কাটাইয়া, অন্দর মহলে যাইতেছিল এমন সময় বরদাকান্ত বলিলেন,—কি হে, তোমার এত তাড়া কিসের? বসে দুটো কথা কইতে নেই?

রাধানাথ কি করে, তক্তপোষের একপাশে বসিল। বরদা বলিলেন,—কদিন তোমায় দেখ্‌তে পাইনি কেন

—একটা বরাতে গিয়েছিলাম।

—যজমানের বাড়ী না কি?

—না, আমি উলুবেড়ে গিয়েছিলাম।

অমনি বরদার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, চক্ষের দৃষ্টি কঠিন হইল। কহিলেন,—উলুবেড়ে কেন? সেখানে তোমার কি বরাৎ?

—জামাইয়ের খোঁজ নিতে। পিসিমা আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

—উনি মেয়েমানুষ, তবু সকলের উপর টেক্কা দেবেন। এ বাড়ীতে কি হয় না হয় সেজন্ত ওঁর অত মাথা-ব্যথা কেন?

—উনি ত ভালর জন্তই চেষ্টা করচেন।

—থাক্ গে। তুমি কি খোঁজ নিয়ে এলে?

—তুমি যে ঠাউরেছিলে জামাইয়ের চালচুলো নেই সেটা ভুল। তার বাপের বেশ ভাল অবস্থা, লোকজন কোঠাবাড়ী সবই আছে। তবে জামাই এখন দেশে নেই, হিজলীতে কারবার করতে গিয়েছে।

—হ্যাঁ, ঐ তো ত্যাঁদড় ছোঁড়া, কারবারের ও কি বুঝবে?

—সে কথা তার বাপ জানেন। তিনি কি আর না জেনে ছেলেকে পাঠিয়েছেন?

—তুমি গিয়ে কি করে এলে?

—আমি কিছুই করিনি, তাদের বাড়ীও যাইনি।

—এখন কি কর্‌তে হবে?

—মেয়ের বিয়ে দিলে যা কর্‌তে হয়। জামাই দেশে ফিরে এলে তাদের বউ তারা নিয়ে যাবে।

—সে যা হয় হবে। এখন তুমি আমার একটা কাজ কর্‌বে?

—কি?

—কোম্পানীর লোক নাকি চারিদিকে সব সন্ধান নিয়ে বেড়াচ্চে। আমাদের কথা কিছু জান্‌তে পেরেচে কি না সে খোঁজ নিতে পার?

—দলের লোক সব কোথায়?

—দল আমি ভেঙে দিয়েচি। তারা সব নিজের নিজের কাজে লেগেচে।

—এ বাড়ীতে কিছু মালপত্র আছে? যদি খানাতল্লাসী করে?

—তাতে কিছু পাবে না। আমি এখানে কিছু রাখিনি।

—তা হলে দলের কোন লোক কোন কথা না ভাঙলে ভাবনার কারণ নেই। আমি ভাল করে' সন্ধান নিয়ে তোমাকে সব বল্‌ব।

সেই ভাল কথা।

রাধানাথ ঠাকুর বাড়ীর ভিতর গেল। হরিমতী আর হেমাঙ্গিনী তাহাকে ডাকিয়া একটা ঘরে লইয়া গেলেন। হরিমতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুর, কি হল?

একখানি প্রাচীন পারস্যদেশীয় চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

—উলুবেড়েতে গিয়ে তাদের বাড়ী দেখে এসেছি। মেয়ে বেশ ভাল ঘরে পড়েছে। জামাইয়ের বাপের বেশ ভাল অবস্থা, বিষয়আশয় আছে, দিব্য বড় পাকা বাড়ী, গ্রামের লোকের কাছে বেশ মানসম্ভ্রম আছে।

হরিমতী বলিলেন,—ভাল হলেই ভাল। জামাই কি করে?

—সে বাপের সব দেখে শোনে। কি একটা কারবারের জন্য হিজলী গিয়েছে।

—হিজলী? আমি ত এই হিজলী হয়ে এলাম। শুন্‌লাম সেখানে না কি বড় ব্যারামত্যারাম হয়।

—ব্রজনাথ সেখানে বেশী দিন থাক্‌বে না, শীগ্‌গীর ফিরে আস্‌বে।

হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাদের বাড়ীতে সব কি বল্‌লে?

—তাদের বাড়ী আমি যাইনি, সেখানে গেলে সব ফেঁসে যেত। তাদের একজন পুরাণো লোক আছে, সে তার নিজের ঘরে থাকে, তার কাছে সব কথা জেনে এসেছি।

—কি জান্‌লে?

—ব্রজনাথের যে বিয়ে হয়েচে সে কথা সে বাড়ীতে বলেনি। তার মা না কি তার বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌চেন।

হেমাঙ্গিনীর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল, কহিলেন,—তা হলে' হয়ত আমাদের মেয়েকে নেবে না। যদি শ্বশুর-ঘর কর্‌তেই না পায় তা হলে আর ইন্দুর আইবুড়ো নাম ঘুচে কি হল?

—সব কথা না শুনেই আপনি ভাব্‌চেন কেন? এখান থেকে গিয়েই দিনকতক পরে ব্রজনাথ হিজলী চলে গিয়েচে, সেই জন্যে বোধ হয় বাড়ীতে কোন কথা প্রকাশ করেনি। কিন্তু ঐ যে পুরাণো লোকটির কথা বল্‌লাম তার কাছে সব কথা খুলে বলেচে। তাকে বলেচে যে সে আর বিয়ে কর্‌বে না, আর মেয়ে যে পরমাসুন্দরী সে কথাও বলেচে।

হরিমতী বলিলেন, এইবারে পথে এস। জামাইয়ের কি চোখ নেই? শুভদৃষ্টির সময় কেমন চলচলে মুখখানি দেখেছিল তা কি তার মনে নেই? এমন বউ পেয়ে কোন্ পুরুষমানুষ তার গলায় সতীন গেঁথে দেয়?

রাধানাথ বলিল,—আপনাদের সোনার চাঁদ জামাই হয়েচে। তাদের সে বুড়ো লোকটি দশ মুখে তার সুখ্যাতি কর্‌ছিল। জামাইয়ের মনের ভাব ত জানা গিয়েচে, তার উপরই এখন সব ভরসা। প্রথম কথা তার সঙ্গে কইতে হবে, তাদের বাড়ী গিয়ে এখন তার বাপের কাছে কথা পাড়্‌লে হিতে বিপরীত হতে পারে।

—জামাই দেশে ফির্‌তেই ত তার সঙ্গে কথা কইতে হবে। আর বাপ-মাকেও সব বল্‌তে হবে।

—জামাই নিজেই বল্‌বে। সে ফিরে এলেই আমি আবার উলুবেড়ে যাব। তার পর জামাই যদি বলে ত তার বাপের সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

—তুমি আবার কবে যাবে?

—ফাগুন মাস পড়্‌তেই যাব। এবার জামাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে ফির্‌ব না।

—তুমি তাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে না?

—তার কি মত হয় জেনে সে কথা ঠিক হবে। বাপ-মা সকল কথা জান্‌লে পর ছেলেকে এখানে পাঠাবে, কি তাদের বউ নিতে লোক পাঠাবে তা কেমন করে জান্‌ব?

হরিমতী বলিলেন,—আচ্ছা, আমি এখন বাড়ী যাই, সেখান থেকে একজন লোক পাঠিয়ে দেব। যদি জামাই এখানে আসে তা হলে আমি আবার আস্‌ব, আর যদি তারা মেয়ে নিয়ে যায় তা হলে আমার আর আস্‌বার দরকার নেই।

রাধানাথ বাহির বাড়ীতে আসিতে বরদা তাহাকে আবার ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের কি কথাবার্ত্তা হল?

—জামাই দেশে ফিরে এলে আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব। পিসিমা এখন নিজের বাড়ী যাচ্চেন, যদি জামাই এখানে আসে তা হলে তিনি আবার আস্‌বেন।

—উনি ভাবেন উনি না হলে কোনো কাজ হয় না।

—এ কাজ ত ওঁর বুদ্ধিতেই হল। উনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন বলেই জামাইয়ের বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল।

—জামাই আসে ত নিজে আস্‌বে, আমি লোকজন পাঠাব না।

—ও রকম কথা বল্‌লে এখন আর চল্‌বে না। মেয়ে দিলেই মেয়ের বাপকে নরম হ'তে হয়। তারা ইচ্ছে কর্‌লে ছেলের আবার বিয়ে দিতে পারে, তাদের কি দায় পড়েছে যে তারা সাধাসাধি কর্‌বে? তা ছাড়া, তোমার এখন নিজের ভাবনা রয়েচে। তোমার মেয়ের বিয়ের পর জামাই নিরুদ্দেশ হয়েচে তাতেও লোকে নানা কথা বল্‌চে। মেয়ে যদি শ্বশুরবাড়ী যায় তা হ'লে তাদের মুখ বন্ধ হবে। আর আমি তোমায় স্পষ্ট কথা বল্‌চি যে, আবার যদি রাগারাগি কর ত আমার দ্বারা তোমার কোনো কাজ হবে না।

অন্য সময় হইলে বরদা রাগিয়া উঠিতেন, কিন্তু এখন তাঁহাকে ক্রোধ সংবরণ করিতে হইল। এমন সময় রাধানাথ-ঠাকুরকে হাতছাড়া করা কোনোমতে পরামর্শসঙ্গত নহে। রাধানাথ বরদার সকল কথা জানে, পাঁচ সাত গ্রামে তাহার আসা-যাওয়া আছে, তাহাকে কেহ সন্দেহ করিবে না, সে অক্লেশে অনেক কথা জানিতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বরদা কহিলেন,—তোমরা যেমন ভাল বোঝো সেই রকম করো, তবে আমার যাতে মাথা হেঁট না হয় সেটা দেখো। আর আমি তোমাকে যা বল্‌লাম তার কি কর্‌বে?

—তার ব্যবস্থা আমি এখনি কর্‌চি। এক জায়গায় নয়, দশ জায়গায় সন্ধান নেব, যেখানে যা জান্‌তে পারি তোমাকে জানাব।

রাধানাথ ঠাকুর চলিয়া গেল। হরিমতীও পর দিবস আপনার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পথ চলিতে ব্রজনাথ গদাকে বলিল,—যাবার পথে একবার,ফের্‌বার পথে একবার,এই দুবার ডাকাত ভায়াদের সঙ্গে দেখা হ'ল। এখন তারা আমাদের পথ ছেড়ে দেবে, আর দিন-দুপুরে রাহাজানিরও কোনো ভয় নেই। ঐ যে লোকটাকে ছেড়ে দিয়েচি তাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে, সে বলে' বেড়াবে যে, আমাদের না ঘাঁটানোই ভাল। তাই বলে আমাদের অসাবধান হ'লে চল্‌বে না, দিনরাত সাবধান থাক্‌তে হবে।

ব্রজনাথের অনুমান সত্য। অবশিষ্ট পথ তাহারা নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিল। তাহাদের নিকটে বড়-একটা কেহ ঘেঁষিত না, চটিতে চটিতে তাহাদের পরাক্রমের কথা নানারূপে অলঙ্কৃত হইয়া রটিত হইল। ব্রজনাথ নির্ব্বিঘ্নে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

বাড়ীতে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া ব্রজনাথ গদা ও তাহাদের সঙ্গীদের বলিল,—তোমরা আজ আমাদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে' শুয়ে থাক্‌বে। কাল সকাল বেলা বাড়ী যেও কিন্তু আমি তোমাদের কাউকে জবাব দিচ্চিনে। যদি আমার কাছে কাজ কর্‌তে চাও ত আমি তোমাদের সকলকেই রাখ্‌ব। হিজলীতে যা মাইনে পেতে এখানেও তাই পাবে। দিনকতক পরে আমি কল্‌কেতায় গিয়ে কারবার কর্‌ব, তোমরা জনকতক আমার সঙ্গে যাবে, বাকি এখানে থাক্‌বে। তবে রাত্রে ঘোরাফেরা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

গদার দল গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—ছোটবাবুর জয় হোক্!

গদা হাসিয়া বলিল,—আপনার চাকরী পেলে আমাদের দিনে কি রাত্রে আর কোথাও যেতে হবে না। আমাদের গাঁটে যে টাকা আছে তাতে আমরা ছ' মাস পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' খেতে পার্‌ব।

—বাড়ী গিয়ে তোমাদের আরও কিছু দেব।

বাড়ীর বাহিরে মাঠে ভোলানাথ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কপাটি খেলিতেছিল। হাডুডুডু বলিয়া সে যেমন ছুটিয়া যাইতেছে অমনি দলবল সঙ্গে ব্রজনাথকে আসিতে দেখিয়া সে খেলা ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বড় ভাইকে প্রণাম করিল, তাহার পর ছুটিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিতে গেল।

অমরনাথ বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরে একা বসিয়া-ছিলেন। ব্রজনাথ আসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

অমরনাথ কহিলেন,—পথে কোনো কষ্ট হয়নি ত? সেখানে বরাবর ভাল ছিলে ত?

—আজ্ঞে, কোনো কষ্ট হয়নি। সেখানে শরীর ভাল ছিল।

—তুমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে কাপড় ছেড়ে জল খাবার খাও, কথাবার্ত্তা তার পর হবে।

ব্রজনাথ বাড়ীর ভিতর গেল। ভোলানাথ মা'র কাছে দাঁড়াইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া ব্রজনাথের আগমনের বর্ণনা করিতেছিল। ব্রজনাথ মাতাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ভবসুন্দরী পুত্রের মাথায় হাত দিয়া, তাহার অঙ্গে স্নেহহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। আনন্দে তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। কহিলেন,—ভালয় ভালয় ফিরে এসেছিস্, আমাদের কত ভাগ্যি! তুই কালো হয়ে গিয়েছিস্, বড্ড রোগা দেখ্‌ছি।

ব্রজনাথ বলিল,—রোগা হব কেন? সেখানে ত আমার অসুখ-বিসুখ হয়নি। আর পথের ধূলোতে ত ময়লা দেখাবেই।

ভোলানাথ হাসিয়া বলিল, মার ঐ রকম কথা! উনি সবাইকে কেবল রোগাই দেখেন।

ভবসুন্দরী বলিলেন,—সারাদিন রোদ্দুরে পথ চলে বাছার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। তুই মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আয়, আমি খাবার নিয়ে আসি।

ব্রজনাথ কিছু ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়া একটা ডাবের জল পান করিল। মাতা সম্মুখে বসিয়াছিলেন। কহিলেন, এইবার তোর বিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। একটি বেশ সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গিয়েচে, সেইখানে সম্বন্ধ ঠিক কর্‌ব।

ব্রজনাথ চুপ করিয়া রহিল। ভোলানাথ কহিল,—তুমি বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না? দাদা যেই বাড়ীতে পা দিয়েচে আর অমনি বিয়ের কথা! হিজলীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার না? হ্যাঁ দাদা, হিজলীর পথে না কি বড় ডাকাতের ভয়?

ব্রজনাথ বলিল,—সে সব কথা পরে হবে। বাবার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি, তাঁকে সেখানকার কাজকর্ম্মের কথা বলি গিয়ে।

ব্রজনাথ উঠিয়া বাহিরে গেল। ঘরে আলো জলিতেছে, অমরনাথ বারান্দায় পাইচারি করিতেছিলেন।

ব্রজনাথ বলিল,—হিজলীর কারবারের সম্বন্ধে গোটা কতক কথা এখন শুনবেন?

—বেশ ত। ঘরে এসে বল।

অমরনাথ ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। ব্রজনাথ তাঁহার সম্মুখে নোটের তাড়া বাহির করিয়া রাখিল।

অমরনাথ বলিলেন,—কি ও?

—আজ্ঞে, টাকা।

—কত টাকা?

—এক লক্ষ।

অমরনাথ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জানিতেন ব্রজনাথ কারবারে বেশ উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে যে সে এত টাকা লাভ করিয়াছে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—তোমার যে এ রকম লাভ হয়েচে নায়েব ত খুলে সে কথা আমাকে লেখেনি।

—আমি বারণ করেছিলাম। আপনাকে সব কথা নিজে বল্‌ব বলে'। নায়েব-মশায় আমার হাতে চিঠি দিয়েচেন তাতেও সব লেখা আছে।

নায়েবের চিঠি বাহির করিয়া ব্রজনাথ পিতার হাতে দিল। অমরনাথ চিঠি হাতে করিয়া কহিলেন, এত টাকা তুমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এলে, পথে যে চোর-ডাকাতের বড় উপদ্রব।

—আজ্ঞে হাঁ, সেই জন্য অত লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। পথে ডাকাতের দল আমাদের আট্‌কাবার চেষ্টা করেছিল, আমার লোকেরা তাদের মেরে ভাগিয়ে দিয়েছিল।

অমরনাথ অল্প হাসিলেন, বলিলেন,—তুমি কিছু করনি?

—আজ্ঞে, বিপদে আত্মরক্ষা কর্‌তে হয়। আমিও দু-একজনকে মেরেছিলাম। আমাদের কেউ জখম হয়নি।

—কাল তোমার সঙ্গে সব কথা হবে। আজ রাত্রে এ টাকা তোমার মার কাছে রেখে দাও।

নোটের তাড়া তুলিয়া ব্রজনাথের হাতে দিয়া অমরনাথ

নায়েবের চিঠি পড়িতে বসিলেন। চক্ষের দৃষ্টি তেমন ভাল নয়, পড়িতে বিলম্ব হইল।

ব্রজনাথ বাড়ীর ভিতর গিয়া নোটগুলা মাতার হাতে দিল, বলিল,—মা, এ টাকা তুমি রেখে দাও, এর পর জমা করে দেওয়া যাবে।

—হিজলী থেকে বুঝি এই টাকা এনেছিস্? কত টাকা রে?

—এক লাখ টাকা।

—আমার সঙ্গে তামাসা কর্‌চিস? অত টাকা কোথায় পেলি?

—কারবারে। তুমি টাকাটা গুণে দেখ না।

ভোলানাথ মাতার হস্ত হইতে নোটের বাণ্ডিল লইয়া গণিতে আরম্ভ করিল। বলিল,—এই দেখ, সব হাজার টাকার নোট।

ভোলানাথ একশো খানা নোট গণিল। তাহার পর নাচিতে আরম্ভ করিল। হাততালি দিয়া বলিল,—দাদা লক্ষপতি হয়েচে!

ব্রজনাথ বলিল,—চুপ কর্। টাকা আন্‌তে গিয়েছিলাম, টাকা এনেছি। তাই বলে কি বাড়ী মাথায় করতে হবে? তুই যেন বলে বেড়াস্‌নে যে আমি অনেক টাকা এনেচি। আর দেখ মা, এই এক লক্ষ টাকা থেকে আরও টাকা হবে। আমি কলকেতায় গিয়ে বড় কার্‌বার কর্‌ব।

ভবসুন্দরীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বলিলেন,—তুই যা ভাল বুঝ্‌বি তাই কর্‌বি, আমরা আর কি বল্‌ব? তোর টাকার ত মুখ দেখ্‌লাম, এখন তোর বউয়ের মুখ দেখ্‌তে পেলেই আমার সব সাধ মেটে।

ভোলানাথ বলিল,—দাদা, আমি তোমার সঙ্গে কলকেতায় যাব।

—তা যাবিই ত। সেইখানে পড়াশুনা কর্‌বি। একটা ভাল বাড়ী পেলে বাবা মাকেও নিয়ে যাব।

ভবসুন্দরী বলিলেন,—সে যখন হয় হবে, এখন আমি কালীঘাটে গিয়ে খুব ঘটা করে' পূজো দেব।

(ক্রমশঃ)

আত্মবাদ ও অনাত্মবাদের লক্ষ্য

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তাসমূহের মধ্যে পরস্পর অতিবিরুদ্ধ দুইটি মত দেখা যায়। এক মতে বলা হয় যে, আত্মা আছে; কিন্তু অন্যমতে বলা হয় যে, তাহা নাই। বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান ভেদ এইখানেই। অন্যান্য দার্শনিকগণের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র আত্মা, কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকগণের তাহা হইতেছে অনাত্মা, আত্মা বলিয়া কিছু নাই। আত্মার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি কি তাহা এখানে আলোচ্য নহে। ইহা একটি সত্য কথা, এবং ইহা আমরা এখানে মানিয়া লইতে পারি যে, বেদপন্থী বা আত্মবাদীদের দর্শনের মূল কথা আত্মা হইলেও বৌদ্ধেরা তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করিতে পারেন না। আমাদের সম্মুখে প্রশ্নটা এই—কেন একদল আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং কেনই বা অন্যেরা তাহা স্বীকার করেন না? তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে তাঁহারা বিভিন্ন দিক্ যাত্রা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন কোথায়? তাঁহাদের কি কখনো সাক্ষাৎ হইয়াছিল? উত্তরের জন্য আমরা একটু চেষ্টা করিয়া দেখি।

যেমন কোনো বৃক্ষের শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির একমাত্র অবলম্বন হইতেছে তাহার মূল, তাহাই আশ্রয় করিয়া ঐ সমস্ত থাকে, তেমনি মানবের সমস্ত

নির্ভর করিতেছে তাহার নিজের উপরে, আত্মার উপরে; তাহার সমগ্র জগতের মূল হইতেছে সে নিজে, তাহার আত্মা। তাহা না থাকিলে তাহার কিছুই নাই, তাহা পাইলে সে সমস্ত পায়। এইরূপে দেখাইতে পারা যায় যে, দার্শনিকেরা দেখিয়াছিলেন বা বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মা আছে।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলিয়াছেন, যে একেকে ভাল করিয়া জানে সে সবকে ভাল করিয়া জানে; যে সবকে ভাল করিয়া জানে সে একেকে ভাল করিয়া জানে। জানা দুই রকমে হয়; সবকে জানিয়া একেকে জানা, আর একেকে জানিয়া সবকে জানা। একেকে জানিয়া যদি সবকে জানা যায় তো সেই উপায়ই ভাল। এক-একটি করিয়া সবকে জানা তো সহজ নহে, সব যে অপরিমেয়, এক জীবনে লোক কয়টাকেই বা জানিতে পারে। তাই একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন,"কাহাকে জানিলে সব জানা হয়?" উত্তর হইয়াছিল 'নিজেকে', আত্মাকে।

মানুষ যাহা কিছু ভাবে, বা করে সেই সকলেরই মূলে, স্পষ্টতই হউক বা অস্পষ্টতই হউক, তাহার নিজের বা আত্মার জ্ঞানটি, 'আমি আছি' এই জ্ঞানটি স্বতঃসিদ্ধ-ভাবেই থাকে, না থাকিলে তাহার কিছু ভাবা বা করা সম্ভব হয় না। আত্মাকে ছাড়িয়া থাকিবার তাহার জো নাই। সে যদি কিছু চায় তো তাহা দ্বারা নিজেকেই, আত্মাকেই চায়। ভাল, ভাবিয়াই দেখা যাউক না, সে বস্তুত কি চায়। যাহা তাহাকে ভাল লাগে, যাহা তাহাকে আনন্দ দেয়, যাহা তাহার প্রিয়। যাহা তাহার নিকট যত প্রিয় সে তাহা তত চায়। কিন্তু তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কি? সে নিজে, তাহার আত্মা। যত প্রিয়ই হউক, সে সমস্ত ছাড়িয়া দিতে পারে, ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সে নিজেকে ত্যাগ করার কথাও সহ্য করিতে পারে না। কেন-না সে নিজে নিজের অত্যন্ত প্রিয়। নিজের বা আত্মার সম্বন্ধ থাকে বলিয়াই অন্য জিনিসও তাহার প্রিয় হয়। একজন প্রাচীন ঋষি নিজের ধর্ম্মপত্নীকে এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন—"ওগো, নিশ্চয়ই পতির ইচ্ছার জন্য[১] পতি প্রিয় নহে, আত্মারই ইচ্ছার জন্য পতি প্রিয় হয়। ওগো, নিশ্চয়ই জায়ার ইচ্ছার জন্য জায়া প্রিয় নহে, আত্মারই ইচ্ছার জন্য জায়া প্রিয় হয়। ওগো, নিশ্চয়ই পুত্রের ইচ্ছার জন্য পুত্র প্রিয় নহে, আত্মারই ইচ্ছার জন্য পুত্র হয়, ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২-৪-৫)। তাই মানব স্বভাবতই নিজেকে, আত্মাকে চায়, কেন-না ইহা তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ইহা তাহার বিত্ত হইতে প্রিয়তর, পুত্র হইতে প্রিয়তর, এই সমস্ত হইতে প্রিয়তর।" ২

মানুষ যে, কেবল আত্মাকে চায় তাহা নহে, সে আনন্দকেও চায়। সে আত্মা ও আনন্দের যোগ চায়। কেবল আত্মা বা কেবল আনন্দে তাহার কাজ নাই, সে চায় আনন্দ-সহিত বা আনন্দময় আত্মাকে।

আবার, আনন্দও থাকিল, আত্মাও থাকিল, কিন্তু ঐ উভয়ই, বা অন্যতরটি যদি অস্থায়ী হয়, নিত্য না থাকে, তবে তাহার চলে না, তাহার তৃপ্তি হয় না। এইজন্যই সে আত্মা ও আনন্দকে অথবা আত্মা ও আনন্দের যোগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে। প্রিয়-বিয়োগের চিন্তাও দুঃসহ। যদি প্রিয়তম আত্মারই বিনাশ হয় তবে তাহার থাকিল কি? যদি কেহ তাহাকে সমগ্র পৃথিবীরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়া, বলে 'তুমি ইহা গ্রহণ কর; কিন্তু এখনি তোমাকে বধ করা হইবে', সে কাঁপিয়া উঠিবে। থাক্ তাহার পৃথিবীরাজ্যের আধিপত্য, সে নিজে বাঁচিয়া থাকিলেই যথেষ্ট। তাই মানুষ যেমন নিজেকে—আত্মাকে চায়, আনন্দকে চায়, সেইরূপ উভয়ের স্থায়িত্বও চায়, নিত্য অমর হইতে চায়।

প্রাচীন ঋষিগণের এই ভাবনা হইতে ক্রমশ পরবর্ত্তী দর্শনসমূহের এই তিনটি মূল চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, আত্মা, আনন্দ বা সুখ, ও নিত্য। ক্রমটি একটু পরিবর্ত্তন করিলে বলা যায় নিত্য, সুখ (= আনন্দ), আত্মা। এখানে আমরা এক শ্রেণীর পরবর্ত্তী দার্শনিক অর্থাৎ বৌদ্ধগণের মূল তিনটি কথা মনে করিতে পারি, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা। ইহা পূর্ব্ব উক্তির ঠিক বিপরীত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব এই উভয়েরই গতি একই লক্ষ্যে।

১। অর্থাৎ পতিকে পাইবার ইচ্ছার জন্য। পরবর্ত্তও এইরূপ।

২। "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" বৃহদারণ্যক, ১.৪.৮।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, মানবের যত রকম ইচ্ছা হইতে পারে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে তাহার নিত্য বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা; সে যা কিছু প্রার্থনা করুক না, সমস্তই নির্ভর করিতেছে তাহার বাঁচিয়া থাকার উপর। অতএব সে স্বভাবতই নিত্য, অমর ("অমৃত") হইতে চাহে। একটি ঋষির কথায় তাহার প্রার্থনা জানা গিয়াছে—"মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া চল!" ১ তাহার এই ইচ্ছা একটি ব্রহ্মবাদিনীরও কথায় এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—"যাহাতে আমি অমৃত হইতে পারিব না তাহা দ্বারা কি করিব?" ২ এখানে প্রশ্ন উঠে, কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? স্পষ্টত বা স্বভাবতই মানবের মৃত্যু হইয়া থাকে, সে অমৃত হইবে কিরূপে? সে বিবিধ দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর অতীত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা না হইলেও তো সে অমৃত হইবার আশা পোষণ করিতে পারে না। সে ভাবিল, যদিও ইহা ইহলোকে অসম্ভব, তথাপি পরলোকে সম্ভব হইতে পারে। স্বর্গ তাহার ইহা ঘটাইয়া দিবে। কিন্তু সে স্বর্গের যে চিত্র কল্পনা করিল তাহাতে তাহার সন্তোষ হইল না। ক্রমে সে বুঝিল মৃত্যুর সম্বন্ধ কেবল দেহের সহিত, আত্মার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা বা জীব যখন দেহকে ছাড়িয়া দেয় তখন সেই দেহেরই মৃত্যু হয়, আত্মার বা জীবের মৃত্যু হয় না।৩ সে আত্মাকে অন্বেষণ করিতে করিতে পাইল, বুঝিল, অনুভব করিল, পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। সে আত্মার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।৪

এক শ্রেণীর প্রাচীন ভাবুকেরা (বৌদ্ধগণ) যাত্রা আরম্ভ করিলেন একবারে বিপরীত দিকে। তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল মানবের দৈনিক জীবনের দিকে। এখানে কি দেখা যায়? ইহা কি সত্য নহে যে, এই জীবন দুঃখ-পূর্ণ? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ দুঃখ, যাহা চাওয়া যায় অথচ পাওয়া যায় না তাহা দুঃখ, যাহা চাওয়া যায় না অথচ আসিয়া পড়ে তাহাও দুঃখ। এইরূপে জীবনে দুঃখের ইয়ত্তা নাই। মানুষ স্বভাবতই এই দুঃখ হইতে মুক্তি চায়।

দুঃখ আছে ইহা যেমন সত্য, দুঃখের কারণ আছে ইহাও তেমনি সত্য। ইহাও সত্য যে, দুঃখের ধ্বংস আছে, এবং এইজন্য দুঃখ-ধ্বংসের যে উপায় আছে ইহাও তেমনি সত্য।৫

এখানে গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে—এই দুঃখের মূল কারণ কি? বুদ্ধ রূপকভাবে বলিয়াছেন, ইহা হইতেছে 'গৃ হে র নি র্ম্মা তা' ("গহকারক"),৬ স্পষ্টভাষায় ইহার নাম কা ম, এবং ইহারই নামান্তর তৃ ষ্ণা ("তণ্হ")। তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে কামের নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। কামের এই নিবৃত্তি বা ধ্বংসের নাম নৈ ষ্ক্রা ম্য ("নেক্‌খম্ম), বি রা গ, বা তৃ ষ্ণা ক্ষ য় ("তণ্হক্খয়"); এবং এই সমস্ত শব্দেরই অর্থ হইতেছে নি র্ব্বা ণ। ইহারই নামান্তর অ মৃ ত। ইহাই মানবের জীবনের লক্ষ্য। ইহাই অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু কি রূপে? নিশ্চয়ই কামের মূলকে উচ্ছেদ করিয়া। কামের মূল কি আমরা অবিলম্বেই পরে দেখিতে পাইব।

১। "মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" বৃহদারণ্যক, ১.৩.২৮। বেদে ও উপনিষদে এরূপ ভাবের অনেক কথা পাওয়া যায়।

২। "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" বৃহদারণ্যক, ২.৪.৩।

৩। "জীবাপেতং কিলেদং বাব ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।" ছান্দোগ্য, ৬.১১.৩।

৪। "আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ।" ছান্দোগ্য, ৭.২.৫২।

৫। মহাবগ্‌গ, ১.৬.১৯।

৬। ধম্মপদের নিম্নোদ্ধৃত দুইটি গাথার (১৫৩-১৫৪) মধ্যে এই কথাটি অতিরমণীয় ভাবে বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে, এই গাথা দুইটি বুদ্ধদেবের প্রথম উক্তি।

"অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্‌ঝগা॥"

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিজের বৌদ্ধধর্ম্মে (১৩৩০, পৃ. ২৫) ইহার ভাবার্থটি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

"জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাই নি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর,
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

কাম যে, সকলের আদিতে, ইহা যে, বিবিধ দুঃখ বা অনর্থের কারণ, এবং নৈষ্কাম্যই যে মানবকে নির্ব্বাণ বা অমৃতে লইয়া যাইতে পারে তাহা অবৌদ্ধ বা বেদপন্থী আচার্য্যগণেরও শাস্ত্রে প্রচুর দেখা যায়। কিরূপে নৈষ্কাম্য লাভ করিতে পারা যায় তাঁহারা তাহার বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের (১০. ১২৯. ৩) নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটির প্রত্যেকটি পদ প্রণিধানের যোগ্য—

"অগ্রে তখন মনের বীজ(-স্বরূপ) কা ম ছিল। কবিগণ প্রজ্ঞা দ্বারা হৃদয়ে অন্বেষণ করিয়া সতের বন্ধনকে অসতে জানিয়াছিলেন।"৭

ঋষি বলিয়াছেন—

"যখন ইহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কা ম সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়, মর্ত্ত্য তখনই অমৃত হয়। সে এইখানেই ব্রহ্মকে অনুভব করে।"৮

বাহুল্যভয়ে অধিক কিছু না বলিয়া কেবল ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ভগবদ্গীতা এই ভাবে পরিপূর্ণ। ইহা হইতেই নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

"যেমন পরিপূর্ণ স্থির সমুদ্রে জলসমূহ প্রবিষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ কা ম-সমূহ যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করে (লীন হইয়া যায়), তিনিই শান্তি লাভ করেন, যিনি কামভোগ ইচ্ছা করেন তিনি তাহা পান না।"

"যে ব্যক্তি সমস্ত কা ম পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্পৃহ, নির্মম, ও নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করেন তিনি শান্তি লাভ করেন।"৯

সমস্ত পাপ ও দুঃখের মূল বলিয়া কামকে মহাশত্রু বলিয়া গণ্য করা হয়,১০ এবং মা র বা মৃত্যু১১ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বুদ্ধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কা ম, বা মা র, বা মৃত্যুকে জয় ও বিনাশ করিতে পারেন নাই ততক্ষণ তিনি বুদ্ধত্ব, বা অমৃত, বা নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এই কাম- বা মার-বিজয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে বুদ্ধের চরিত্র-বর্ণনায় অতি সুন্দর ভাষায় ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত এই আখ্যায়িকাকেই বা এই তত্ত্বকেই কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার সংবাদে বিভিন্ন আকারে ও ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। কালিদাসও কুমারসম্ভবে এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি সেখানে দেখাইয়াছেন, কাম যতক্ষণ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত না হইয়াছিল, ততক্ষণ পার্ব্বতী মৃ ত্যু ঞ্জ য় (=মা র জিৎ) শিবকে লাভ করিবার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তলের শেষ অঙ্কে যখন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উভয়েরই হৃদয় নিষ্কাম, এবং সেইজন্যই পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল তখনই ঋষি মারীচের আশ্রমে তাঁহাদের যথার্থ ও শিবময় সংযোগ হইয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে, এই জগতের যে-দিকেই তাকান যাউক, এত সমস্ত জিনিস রহিয়াছে যে, সহজেই চিত্ত তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় ইহা কি সম্ভব যে, চিত্ত নিষ্কাম হইবে? ইহার কি কোনো পথ আছে?

৭। "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥"

এই জাতীয় আরো অনেক কথার মধ্যে অথর্ব্ববেদের (৩.২৯.৭) নিম্নলিখিত বাক্যটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে পারা যায়—

"ক ইদং কস্মা অদাৎ
কামঃ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা
কামঃ সমুদ্রমা বিবেশ ॥"

'কে ইহা কাহাকে দিল? কাম কামকে দিল। কাম দাতা, কাম প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল।'

সায়ণের মতে 'কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল', এই চতুর্থ চরণের ইহাই তাৎপর্য্য যে, কাম যেন ঠিক সমুদ্র, কেন না সমুদ্রের ন্যায় ইহার অন্ত নাই। "সমুদ্র ইব হি কামো, নৈব হি কামস্যান্তোঽস্তি।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২. ২. ৫. ৬।

৮। "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥"
বৃহদারণ্যক, ৪. ৪. ৭; কঠ, ৬. ১৪।

৯। "আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥"
ভগবদ্গীতা, ২. ৭০-৭১।

১০। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ঐ, ৩৭।
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥" ঐ, ৩৯।
"পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।" ঐ, ৪১।
"জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।" ঐ, ৪৩।

১১। মা র ও মৃ ত্যু বস্তুত একই, এবং একই মৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তুলনীয়—"মা র ধেয্যং পহাতবে" (ধম্মপদ, গাথা ৩৪); "ম চ্চু (=মৃত্যু)-ধেয্যং সুদুত্তরং" (ঐ, গাথা ৮৬)। দ্রষ্টব্য Oldenberg: *Buddha* (Eng. Tran.) Calcutta, 1927, p. 57.

ইহার সম্ভাবনা খুবই আছে। ইহার পথ আছে। এই পথ দুই দিক্ দিয়া গিয়াছে; একটি বিষয়ের দিক্ দিয়া ও অন্যটি (যে বিষয়কে গ্রহণ করে সেই) বিষয়ীর দিক্ দিয়া। দ্বিতীয়টির কথা পরে বলিব, আগে প্রথমটিরই কথা বলা যাউক।

বিষয়-সংক্রান্ত পথটিকে ভিন্ন-ভিন্ন দার্শনিকেরা ভিন্ন-ভিন্ন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, যে বিষয় বা যে পদার্থ আমাদের নিকটে ভাল বলিয়া মনে হয় না, আমাদের চিত্ত তাহা হইতে ফিরিয়া আসে, তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। মানুষ এমন একটি অবস্থা চায় যাহাতে দুঃখ না থাকে, সে চায় নিত্য সুখ। যাহা দ্বারা ইহা পাওয়া যাইতে পারে সে তাহাও চায়—যদিও তাহা পাইতে দুঃখ হইতে পারে। লৌকিক পদার্থসমূহ যে চিরস্থায়ী নহে, তাহা সুস্পষ্ট। সংসারের এই অনিত্যতাকেই মূল ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কি বৌদ্ধ কি অবৌদ্ধ, ভারতীয় দার্শনিকগণ দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, যাহারা দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ বা নিত্য আনন্দ ইচ্ছা করে, সংসারে উপভোগ্য পদার্থসমূহ তাহাদের যোগ্য নহে; কেন-না অনিত্য হইতে নিত্য কিছু পাওয়া যায় না।

মানুষ যখন গভীরভাবে বিষয়-ভোগের অনিত্যতা ভাবনা করিতে আরম্ভ করে, তখন স্বভাবতই ধীরে ধীরে বিষয়-ভোগের প্রতি তাহার আসক্তি কমিয়া আসে, এবং ক্রমশ শেষে তাহার চিত্ত নিষ্কাম হইয়া উঠে। কাম-জয়ের একটি উপায় এই।

অন্যেরা আর এক রকম চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কামের উদ্রেক তখনই হয় যখন বস্তুত তাহার কোনো বিষয় থাকে, যদি কোনো একটা বস্তু থাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারা যায়। কিন্তু যখন সুস্পষ্ট জানা যায় যে, বস্তুত মূলেই কোনো পদার্থ নাই, তখন তাহার প্রতি ইচ্ছা বা কাম হয় না। মায়াবাদীদের মতে এই জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি তাহা মায়ামাত্র। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, বাহ্য জগতের কোনো বাস্তব সত্তা নাই, ইহা বিজ্ঞানের পরিণাম-মাত্র, বিজ্ঞানই সেই সেই বস্তুর আকারে দেখা যায়, ঠিক স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায়। মাধ্যমিকগণ উপদেশ দেন যে, দৃশ্যমান জগৎ শূন্য; অর্থাৎ যেরূপে ইহা দেখা যাইতেছে বস্তুত ইহা সেরূপ নহে। স্বভাবত ইহার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা স্বয়ং কখনো থাকে না, থাকিলে নিত্য হইত; হেতু ও অনুকূল অবস্থা (হেতু-প্রত্যয়) আবশ্যক হইত না। অথচ দেখা যাইতেছে হেতু না থাকিলে, অনুকূল অবস্থা না থাকিলে কোনো বস্তুর সত্তা থাকে না। তাই দৃশ্যমান কোনো বস্তুরই স্বতন্ত্র বা স্বায়ত্ত কোনো সত্তা নাই। যখন ইহার স্বতন্ত্র সত্তাই না থাকিল তখন অন্যের নিকট হইতে কিরূপে ইহার সত্তা থাকিতে পারে। তবেই বুঝিতে হয়, কোনো বস্তুরই স্বভাব বলিয়া কিছু নাই (নিরাত্মক, নিঃস্বভাব); এবং সেইজন্যই ইহা যেরূপ দেখা যাইতেছে বস্তুত সেরূপ নহে। অতএব যিনি এই তত্ত্ব জানেন, এই বাহ্য জগৎ তাঁহার কোনোরূপ আসক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, বরং আসক্তিকে নষ্টই করে, এবং ইহাতেই নির্ব্বাণ লাভ করা যায় ("সঙ্কক্ষয়শ্চ নির্ব্বাণাবাপ্তি-কারণম্")। ভক্তিবাদীরা বলিবেন যে, সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশ সুপ্রসিদ্ধ। সেখানে বলা হইয়াছে, মানবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু কামকে এইরূপেই পরাভব করিতে পারা যায়। মীমাংসকেরা নানা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান লইয়া থাকেন। তাঁহারা বিশেষভাবে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, আমরা যেন কাম্য কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত থাকি যে কর্ম্মের দ্বারা কোনো কামনার সিদ্ধি হয় তাহার নাম কাম্য কর্ম্ম। ইহা পরিবর্জ্জনীয়। তন্ত্রবাদীরা বলেন কাম-উপভোগেরই দ্বারা কামকে জয় করিতে হইবে। তাঁহাদের উপদেশ হইতেছে এই ১২—

১২। নিম্নে উদ্ধৃত কথাগুলি একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুস্তকে পাওয়া যায়। ইহার নাম চি ত্ত বি শু দ্ধি প্র ক র ণ। এই নামটি জানা যায় সু ভা ষি ত স ং গ্র হ (C. Bendall,1905, p 37) হইতে। তিব্বতী-অনুবাদে (তেঙ্গুর, গ্যু, ৩৩, ৯) ইহাকে বলা হইয়াছে চি ত্তা ব র ণ বি শু দ্ধি প্র ক র ণ (সেমস কিয় সগ্রিব প র্নম পর স্‌বোঙ্‌ ব ঢ়স ব্য ব'ই রব তু ব্যেদ প)। বলা হয় ইহা আর্য্যদেবের রচিত। ইহার মূল সংস্কৃত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন (JASB, 1893, No. 2, pp. 175 ff)। এই সংস্করণে বিবিধ ত্রুটি আছে বলিয়া বিশ্বভারতীতে আমার অন্যতম ছাত্র শ্রীমান্ প্রভুভাই পাটেল তিব্বতী অনুবাদের সহিত ইহার একটি নূতন সংস্করণ করিয়াছেন। আশা করা যায় ইহা শীঘ্র ছাপা হইবে।

জল দিয়াই যেমন কানের জল বাহির করা যায়, কাঁটা দিয়াই যেমন কাঁটা বাহির করা যায়, সেইরূপ মনীষীরা কাম-ভোগেরই দ্বারা কামকে অপনয়ন করিয়া থাকেন। রজক যেমন মলেরই দ্বারা বস্ত্রকে নির্মল করে, বিদ্বান্‌ও সেইরূপ মলেরই দ্বারা নিজেকে (আত্মাকে) নির্মল করিবেন। যেমন ধূলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে দর্পণ অতি-বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ, বিজ্ঞগণ যদি অনুষ্ঠান করেন তবে দোষও দোষকে বিনাশ করে। লৌহপিণ্ডকে জলে ফেলিলে তাহা ডুবিয়াই যায়; কিন্তু তাহা দ্বারা যদি পোত১৩ প্রস্তুত করা যায় তবে তাহা নিজেও তরিয়া যায় আর অন্যকেও তরাইয়া দেয়। এই প্রকার প্রজ্ঞা ও উপায়ের বিধানে চিত্তকে উপযুক্ত করিয়া কাম উপভোগ করিলে তাহাতে লোকে নিজে মুক্ত হয়, এবং অপরকেও মুক্ত করে। দুর্বিজ্ঞেরা উপভোগ করিলে কাম বন্ধন হয়; কিন্তু যদি সুবিজ্ঞেরা উপভোগ করে তবে কাম মোক্ষ সাধন করে।১৪ যেমন যথাবিধি সেবিত হইলে বিষও অমৃতের ন্যায় হয়, কিন্তু বালকেরা১৫ অবিহিত ভাবে ভোজন করিলে ঘৃতপূর১৬ প্রভৃতিও বিষের ন্যায় হইয়া থাকে।১৭ মধু ও ঘৃত সম অংশে মিশ্রিত হইলে বিষ হয়, কিন্তু তাহাই যদি যথাবিধি মিশ্রিত হয় তবে উৎকৃষ্ট রসায়ন হইয়া থাকে। ১৮ তাম্রে পারদ লাগাইলে তাহা যেমন নির্দোষ স্বর্ণ হইয়া থাকে, তেমনি বিজ্ঞজনের ক্লেশসমূহ (রাগ, দ্বেষ, মোহ) কল্যাণ সাধন করে।১৯

আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে এইবার বিষয়ীর দিক্ হইতে দেখা যাউক। দুই প্রকারে ইহা দেখিতে পারা যায়, আত্মা আছে ইহা মানিয়া, আর ইহা নাই এই মানিয়া। যাঁহারা আত্মা মানেন, সেই আত্মবাদিগণের মধ্যে যাঁহাদের কথা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইতেছে তাঁহাদের মতে আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন; ইহা এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী (বিভু)। আত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই। এখন আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যদি কাহারো কাছে সে ছাড়া আর কোনো পদার্থ থাকে, তা তাহা সত্যই হউক আর কাল্পনিকই হউক, তবে তাহা হইতে তাহার ভয় হইতে পারে। মানুষ ও বাঘ এই দুই থাকিলে, বাঘ দেখিয়া মানুষ ভয় পায়; অন্ধকারে একখানা দড়িকে সাপ মনে করিয়া লোকের ভয় হয়। উপনিষদে (বৃহদারণ্যক, ১.৪.১-২) একটা চমৎকার গল্প আছে:—পূর্ব্বে কেবল এক আত্মাই ছিলেন। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। তিনি ভীত হইলেন। লোক একা থাকিলে ভয় পাইয়াই থাকে। পরে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন 'আমা ছাড়া তো আর কিছুই নাই, আমি ভয় করি কেন? দ্বিতীয় আর কিছু থাকিলে তো ভয় হয় ("দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি")।' তাঁহার ভয় চলিয়া গেল। ঠিক এইরূপেই মানুষ যখন ভাবনা করিয়া অনুভব করিতে পারে যে, সে নিজে ছাড়া বা তাহার পূর্ব্ববর্ণিত আত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই তখন সে কি কামনা করিবে?'

১৩। 'পাত্র'—যানপাত্র, জাহাজ।

১৪। "কর্ণাজ্জলং জলেনৈব কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।
রাগেণৈব তথারাগমুদ্ধরন্তি মনীষিণঃ॥
যথৈব রজকো বস্ত্রং মলেনৈব তু নির্মলম্।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাত্মানং মলেনৈব তু নির্মলম্॥
যথা ভবতি সংশুদ্ধো রজোনিঘৃষ্টদর্পণঃ।
সেবিতস্তু তথা বিজ্ঞৈর্দোষো দোষবিনাশনঃ॥
লৌহপিণ্ডো জলে ক্ষিপ্তো মজ্জত্যেব তু কেবলম্।
পাত্রীকৃতং তদেবান্যং তারয়েৎ তরতি স্বয়ম্॥
তদ্বৎ পাত্রীকৃতং চিত্তং প্রজ্ঞোপায়বিধানতঃ।
ভুঞ্জানো মুচ্যতে কামং মোচয়ত্যপরানপি॥
দুর্বিজ্ঞৈঃ সেবিতঃ কামঃ কামো ভবতি বন্ধনম্।
স এব সেবিতো বিজ্ঞৈঃ কামো মোক্ষপ্রসাধকঃ"
শ্লোক ৩৭-৪২

১৫। 'মূর্খেরা,' এই অর্থও হইতে পারে।

১৬। 'ঘৃতপূর' এক প্রকার সন্দেশ; আটা, দুধ, নারিকেল ও ঘি দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

১৭। "যথৈব বিধিবদ্ভুক্তং বিষমপ্যমৃতায়তে।
দুর্ভুক্তং ঘৃতপূরাদি বালানাং তু বিষায়তে॥" ৪৫

১৮। "ঘৃতং চ মধু সংযুক্তং সমাংশং বিষতাং ব্রজেৎ।
তদেব বিধিবদ্ভুক্তমুৎকৃষ্টং তু রসায়নম্॥" ৫০

১৯। "রসস্পৃষ্টং যথা তাম্রং নির্দোষং কাঞ্চনং ভবেৎ।
জ্ঞানবিদস্তথা সম্যক্ ক্লেশাঃ কল্যাণকারকাঃ॥ ৫১

ভালই হউক আর মন্দই হউক, কোনো বস্তুই যে তাহার সম্মুখে নাই। কামের বিষয়ই যে তাহার নাই। আত্ম-বাদীরা এই জন্যই বলিয়াছেন "'এই আমি' ("অয়মস্মি") এইরূপে মানুষ যদি নিজেকে জানিতে পারে তবে সে কি ইচ্ছা করিয়া, কাহার কামনায় শরীরের অনুসরণে দুঃখ অনুভব করিবে?"২০ তাঁহারা আরো বলিয়াছেন, যিনি সমস্ত ভূতকে নিজের মধ্যে, এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে নিজেকে দেখেন, সমস্ত ভূতই যাঁহার নিকট নিজ বা আত্মা বলিয়া প্রকাশিত হয়, সমস্ত ভূতের মধ্যে যিনি একত্ব দর্শন করেন, তাঁহার ঘৃণা, শোক, মোহ থাকে না। ২১ দ্বিতীয় আর একটি কিছু থাকিলেই এই সব সম্ভব হয়।

এইবার আমরা অনাত্মবাদীদের কথা আলোচনা করিয়া দেখি। তাঁহারা বলেন, সমস্ত দুঃখের মূল হইতেছে কাম, এবং এই কামের মূল মানুষের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি ('অহঙ্কার','মমকার'); অপর কথায় 'আত্মা,' ও 'আত্মীয়' এই বুদ্ধি। এই যে 'আমি' ও 'আমার' বা 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' বুদ্ধি,ইহাকে সৎকায়দৃষ্টি ২২ বলা হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে সৎকায়দৃষ্টির অর্থ পঞ্চ স্কন্ধকে 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' বলিয়া মনে করা, বা 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া বিশ্বাস করা। আরো সহজে বলিতে হইলে বলা যাইতে পারে সৎকায়দৃষ্টির অর্থ আত্মবাদ। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সৎকায়দৃষ্টিকে মহাপর্ব্বত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা নিজের কুড়িটি শিখরের দ্বারা সমস্ত দিক্ আবৃত করিয়া থাকে। একমাত্র 'নৈরাত্ম্যবোধ' অর্থাৎ আত্মা নাই এই জ্ঞান-রূপ বজ্রের দ্বারা ইহাকে

২০। "আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥"
বৃহদারণ্যক, ৪. ৪. ১২।

২১। "যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ॥"
ঈশোপনিষৎ ৬, ৭।

২২। সৎকায়দৃষ্টি, পালি সক্কায়দিট্‌ঠি শব্দটির বিবিধ ব্যাখ্যা আছে। এ পদের শেষ শব্দটিতে (দৃষ্টি) কোন গোলমাল নাই, ইহা অতিস্পষ্ট, যত কিছু সন্দেহ ও তাহা ভঞ্জনের জন্য বিচার সমস্তই প্রথম শব্দটিকে (সৎকায়) লইয়া। পণ্ডিতদের বিচারে ইহার তিনটি ব্যুৎপত্তি দেখা যায়, (১) সৎ-কায়, (২) স্ব-কায়, (৩) স্বৎকায়। (১) প্রথম ব্যুৎপত্তিতে সৎ শব্দটি দুই প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে, (ক) অস্ ('হওয়া') ধাতু হইতে, ও সদ্ ('অবসন্ন হওয়া', 'শীর্ণ হওয়া', বা 'নষ্ট হওয়া') ধাতু হইতে। এই উভয় ধাতুর মধ্যে শেষোক্ত ধাতুটিই তিব্বতী ('জিগ') ও চীনা (হোয়াই) অনুবাদের দ্বারা সমর্থিত হয়। যাঁহারা বলেন অস্ ধাতু হইতে সৎ হইয়াছে, তাঁহাদের মতে সৎকায়দৃষ্টির আক্ষরিক অর্থ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কায়ে অর্থাৎ দেহে (অথবা স্কন্ধসমূহে) দৃষ্টি অর্থাৎ 'আমি' বা 'আমার', অথবা 'আত্মা' বা 'আত্মীয়' এই দর্শন; বর্ত্তমান দেহকে 'আমি' বা 'আমার', অথবা 'আত্মা' বা 'আত্মীয়' বলিয়া দেখা। আর যাঁহারা বলেন যে, সৎ শব্দ হইয়াছে সদ্ ধাতু হইতে তাঁহাদের মতে সৎকায়দৃষ্টি শব্দের অর্থ বিনাশশীল (আক্ষরিক—যাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে) দেহকে 'আমি' বা 'আমার', অথবা 'আত্মা' বা 'আত্মীয়' বলিয়া দেখা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সৎকায়দৃষ্টি পালিতে সক্কায়দিট্‌ঠি। যদি আমরা এই পদটির প্রথম অংশকে যেমন দেখিতেছি (সৎকায়), বস্তুতও তেমনি স্বীকার করি তবে তাহা হইতে পালি সক্কায় শব্দটি সহজেই হইতে পারে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সংস্কৃত সৎকায়, পালিতে সক্কায়। পালি শব্দটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া Childers প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিতে চাহেন যে, মূল শব্দটি হইতেছে (২) স্ব-কায়। এই স্ব-কায় শব্দ পালিতে সাধারণ নিয়মে স-কায় এইরূপই হইবার কথা। কিন্তু দেখা গিয়াছে অনেক স্থানে বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া থাকে, যেমন সংস্কৃত অনুদয় শব্দ পালিতে অনুদ্দয় হইয়া থাকে। এইরূপেই সংস্কৃত স্ব-কায় পালিতে সক্কায়। উত্তর-ভারতের সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রের রচয়িতারা সক্কায় শব্দের মূল অর্থটি, বা তাহার ব্যুৎপত্তিটি বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমবশত অনুবাদ করিয়াছেন সৎ-কায়।

অধ্যাপক Walleser বলিতে চাহেন (ZDMG, vol. 64, p. 581 ff), সংস্কৃতে প্রচলিত সৎ-কায় শব্দটির মূল হইতেছে (৩) স্বৎ-কায়। ইহা হইতে পালির সক্কায় সহজেই হইতে পারে। তিনি বলেন স্বৎ হইতেছে স্ব শব্দেরই রূপান্তর। যদ্ ও মদ্ এই দুইটি সর্ব্বনাম শব্দ এখানে তুলনা করিতে পারা যায়। (যদ্, তদ্, এতদ্, অন্যদ্ ইত্যাদি শব্দও দ্রষ্টব্য।) অধ্যাপক Walleser স্বমত সমর্থনের জন্য নিম্নলিখিত পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পালিতে (কথাবত্থু, PTS, p. 86) আছে "অনুপ্পত্তসদত্থ, আর সংস্কৃতে (অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা, Bib. Ind, পৃ. ৩) পাওয়া যাইতেছে "অনুপ্রাপ্তস্বকার্থ"। এই শব্দটি আরো দুইখানি সংস্কৃত পুস্তকে (মহাব্যুৎপত্তি, Bib. Budh. ৪৮. ১২; শতসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা, Bib. Ind. পৃ. ২৩) আছে। এখানে সংস্কৃতের "স্বকার্থ" স্থানে পালিতে "সদত্থ" প্রযুক্ত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে পালিতে স্ব-অর্থে স্বদ্ শব্দ দেখা হইয়াছে। নাগার্জুন মধ্যমককারিকার এক স্থানে (২৩.৫) স্বকায়দৃষ্টি লিখিয়াছেন। চন্দ্রকীর্ত্তি নিজের প্রসন্নপদা-নামক টীকায় ইহার অর্থ করিয়াছেন "স্বকায়ে দৃষ্টিরাত্মাত্মীয়দৃষ্টিঃ।" বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—Poussin : Abhidharmakosa, V. 7.

বিদীর্ণ করা যাইতে পারে।২৩ তখন ইহা প্রদীপের নিকটে অন্ধকারের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।২৪

বাহিরে বা ভিতরে কোনো বস্তুরই উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কার বা 'আমি' এই বুদ্ধির যে ক্ষয় তাহাই অনাত্মবাদী আচার্য্যগণের মতে তত্ত্ব। ২৫ পৃথক্ যখন সৎকায়দৃষ্টির লোপ হয় তখনই এই অহঙ্কারের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই সংসারের মূল সৎকায়দৃষ্টি, এবং সৎকায়দৃষ্টির মূল 'আত্মা' বা 'আমি' এই বুদ্ধি। এখন যদি কেহ অনুভব করে যে, আত্মা বলিয়া কিছু নাই, তখন তাহার আর সৎকায়দৃষ্টি থাকে না। সৎকায়দৃষ্টি গেলে রাগ-দ্বেষ-মোহ-রূপ ক্লেশও চলিয়া যায়। সৎকায়-দৃষ্টি হইতে কি প্রকারে আমাদের দুঃখ হয়, অনাত্মবাদিগণ তাহা আমাদিগকে বলিয়াছেন:—দুঃখের কারণ অহঙ্কার বা 'আমি' এই বুদ্ধি। যাহা বস্তুত আত্মা নহে তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে করিলে ("আত্মমোহে") দুঃখের কারণ অহঙ্কার বাড়িয়া উঠে।২৬ যদি কেহ জানে যে, আত্মা আছে তবে তাহার অহঙ্কার কখনো যায় না, এবং ইহা না যাওয়ায় তাহার দুঃখেরও কখনো নিবৃত্তি হয় না। যখন কাহারো মনে হয় যে, আত্মা আছে, তখন সে নিজের দেহের সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিয়া বলে 'এই আমি' এবং তাহাতে তাহার নিত্য প্রীতি দেখা যায়। সেই প্রীতিবশত সে সুখকর বিষয়ে তৃষ্ণা অনুভব করে। তৃষ্ণা তাহার অভিলষিত বিষয়ের দোষ-সমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সে তাহার দোষ দেখিতে পায় না, কেবল গুণই দেখে। গুণ দেখিয়া ইহা আমার এই মনে করিয়া সে তাহা পাইতে চায়, এবং কিরূপে তাহা পাওয়া যাইতে পারে এই ভাবে তাহার উপায় অবলম্বন করে। এইরূপে যতদিন আত্মা বা আমি এই বুদ্ধিতে অভিনিবেশ থাকে সংসারও ততদিন থাকে। 'আত্মা' বা 'আমি' এই বুদ্ধি থাকিলে অন্যের সম্বন্ধে 'পর' এই বুদ্ধি হয়। নিজ ও পর এই ভেদ হইতে আসক্তি ও দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইহা হইতেই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়।২৭ এই জন্যই যোগিগণ সৎকায়দৃষ্টি হইতে উৎপন্ন ক্লেশ ও দোষ-সমূহ বিচারপূর্ব্বক দর্শন করিয়া

২৩। "বিংশতিশিখরসমুন্নতাতিপৃথুসৎকায়দৃষ্টিমহাশৈলপরিবেষ্টিত-সর্বদিঙ্মুখম্।"—চন্দ্রকীর্ত্তিকৃত প্রসন্নপদা-নামক মধ্যমকবৃত্তি, পৃ. ২১৪; "বিংশতিশিখরসমুদ্গতং সৎকায়দৃষ্টিশৈলং জ্ঞানবজ্রেণ ভিত্বা।"—কারণ্ডব্যূহ, সত্যব্রত সামশ্রমী, শকাব্দ ১৭৯৪, পৃ. ১৩;

"এতানি তানি শিখরাণি সমুদ্গতানি
সৎকায়দৃষ্টিবিপুলাচলসংস্থিতানি।
নৈরাত্ম্যবোধকুলিশেন বিদারিতস্মা।
ভেদং প্রযাতি সহসৈব তু দৃষ্টিশৈলঃ॥"
সুভাষিতসংগ্রহ (C. Bendall, 1905, p. 21).

সৎকায়দৃষ্টি-পর্ব্বতের কুড়িটি শিখর কি তাহা মহাব্যুৎপত্তিতে (Bib. Budh.) পৃ. ৬৪ (§২০৮) এইরূপ লিখিত হইয়াছে: "রূপম্ আত্মা স্বামিবৎ। রূপবান্ আত্মা অলঙ্কারবৎ। আত্মীয়ং রূপম্ ভৃত্যবৎ। রূপে আত্মা ভাজনবৎ। এইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার, ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও; যথা বেদনাত্মা স্বামিবৎ, ইত্যাদি।
এই সৎকায়দৃষ্টির প্রতিকূলে এইরূপ উত্তর দেওয়া যায়:—

রূপং নাত্মা রূপবান্ নৈব চাত্মা।
রূপে নাত্মা রূপমাত্মস্থমস্ত ॥
সুভাষিত সংগ্রহ, পৃ. ২১

২৪। তত্ত্বসংগ্রহে (GOS) উক্ত হইয়াছে:—
"প্রত্যক্ষীকৃতনৈরাত্ম্যে ন দোষো লভতে স্থিতিম্।
তদ্বিরুদ্ধতয়া দীপ্রে প্রদীপে তিমিরং যথা॥"
শ্লোক ৩৩৩৪।

২৫। "আধ্যাত্মিকবাহ্যাশেষবস্তূপলম্ভেনাধ্যাত্মং বহিশ্চ যঃ সর্বথাহঙ্কারপরিক্ষয় ইদমত্র তত্ত্বম্।" মধ্যমকবৃত্তি, পৃ. ৩৪০।

২৬। "দুঃখহেতুরহঙ্কার আত্মমোহাত্তু বর্দ্ধতে॥"
বোধিচর্য্যাবতার, ৯, ৭৮।

২৭। "যঃ পশ্যত্যাত্মানং তস্যাহমিতি শাশ্বতঃ স্নেহঃ।
স্নেহাৎ সুখেষু তৃষ্যতি তৃষ্ণা দোষাংস্তিরস্কুরুতে॥
গুণদর্শী পরিতৃষ্যন্ মমেতি তৎ সাধনান্যুপাদত্তে।
তেনাত্মাভিনিবেশো যাবৎ তাবৎ তু সংসারঃ॥
আত্মনি সতি পরসংজ্ঞা স্বপরবিভাগাৎ পরিগ্রহদ্বেষৌ।
অনয়োঃ সম্প্রতিবদ্ধাঃ সর্বে দোষাঃ প্রজায়ন্তে॥"
বোধিচর্য্যাবতার-পঞ্জিকায় (পৃ. ৪৯২) প্রজ্ঞাকরমতি এই কারিকা তিনটিকে আচার্য্যপাদের (=নাগার্জ্জুনের) বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাতেও (Bib. Ind. পৃ. ১৯২) গুণরত্ন ইহা ধরিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য—তত্ত্বসংগ্রহ, পৃ. ১০৪। এই প্রসঙ্গে তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-কার (ঐ, পৃ. ১০৫) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

সাহঙ্কারে মনসি ন শমং যাতি জন্মপ্রবন্ধো
নাহঙ্কারশ্চলতি হৃদয়াদাত্মদৃষ্টৌ তু সত্যাম্।
অন্যঃ শাস্তা জগতি ভবতো নাস্তি নৈরাত্ম্যবাদী
নান্যস্তস্মাদুপশমবিধেস্ত্বন্মতাদস্তি মার্গঃ॥"

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের টীকায় (বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ. ৬১) এই শ্লোকটি আগম বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে কতকগুলি ভুল পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

এবং সংকায়দৃষ্টি আত্ম-বুদ্ধি হইতেই হয় ইহা অবগত হইয়া আত্মাকে খণ্ডন করিয়াছেন।২৮ তীর্থিক বা অবৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভিমত আত্মা যে নাই ইহা অনাত্মবাদী বৌদ্ধগণের কেবল কল্পনা নহে। তাঁহারা বলেন বস্তুতই ইহা থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে ইঁহারা বহু যুক্তি দিয়াছেন।২৯ যখন 'আত্মা' বা 'আমি' এই বুদ্ধি যায় তখন 'আত্মীয়' বা 'আমার' এই বুদ্ধিও চলিয়া যায়, ঠিক যেমন রথখানি পুড়িয়া গেলে তাহার চাকা প্রভৃতিও পুড়িয়া যায়,৩০ এবং এইরূপে মানুষ 'নির্মম' ও 'নিরহঙ্কার' হয়। ইহা হইলে, সংকায়দৃষ্টি থাকিতে পারে না, এবং তাহা না থাকিলে মূল কারণ৩১ না থাকায় আর জন্ম হয় না।৩২

এইরূপে দেখা যায়, আত্মবাদী ও অনাত্মবাদী পরস্পর বিরুদ্ধ দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলেও শেষে একই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

২৮। "সংকায়দৃষ্টিপ্রভবানশেষান্
ক্লেশাংশ্চ দোষাংশ্চ ধিয়া বিপশ্যন্।
আত্মানমস্যা বিষয়ং চ বুদ্ধা।
যোগী করোত্যাত্মনিষেধমেব ॥"

চন্দ্রকীর্ত্তি, মধ্যমকাবতার, ৬. ১২০।

এই শ্লোকটি মধ্যমকবৃত্তিতে (পৃ. ৩৪০) উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৯। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সেই সমস্ত যুক্তি এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে না। এ সম্বন্ধে অন্য বহু পুস্তকের মধ্যে পাঠক মূল-মধ্যমককারিকা ও তাহার বৃত্তি (অষ্টম প্রকরণ) দেখিতে পারেন।

৩০। "আত্মন্যসতি চাত্মীয়ং কুত এব ভবিষ্যতি।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ শমাদাত্মাত্মনীনয়োঃ ॥"

মূলমধ্যমককারিকা, ১৮. ২।

"আত্মানুপলম্ভাদাত্মপ্রজ্ঞপ্ত্যুপাদানং স্কন্ধপঞ্চকমাত্মীয়মিতি সুতরাং নোপপদ্যতে।"

চন্দ্রকীর্ত্তি, ঐ।

৩১। ইহার পারিভাষিক শব্দ উ পা দা ন। ইহা চতুর্বিধ ; কাম, দৃষ্টি অর্থাৎ ভ্রান্ত দর্শন, যে বস্তু যেরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপে দেখা ; শীলব্রত অর্থাৎ ব্রতাদি আচরণের দ্বারা শুদ্ধি হয় এই বিশ্বাস, ও আত্মবাদ।

৩২। "মমেত্যহমিতি ক্ষীণে বহির্ধ্যাত্মমেব চ।
নিরুধ্যত উপাদানং তৎক্ষয়াজ্জন্মনঃ ক্ষয়ঃ ॥"

মূলমধ্যমককারিকা, ১৮. ৪।

স্বপ্ন-সনেট

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সনেটে গেঁথেছি গীতি-স্বপনের মালা,
খানিক বাস্তব তার, কল্পনা খানিক,
ছায়ার সম্পাতে ঢাকা আলোর মাণিক,
মমতার মায়া-স্নিগ্ধ জীবনের জ্বালা।
অর্দ্ধ-শূন্য পড়ে আছে প্রাণের পেয়ালা,
কতক করেছি পান,—জানি নাকো ঠিক,
গরল তাহাতে কিম্বা অমৃত অধিক ;
মত্ততার অবসানে অবসাদে আলা।

তন্দ্রায় জড়ানো তাই জাগরণ আজ।
সুরধুনী-স্রোতোবেগে ঐরাবৎ সম
সুরের প্রবাহে ভেসে যায় ভাবা মম ;
তবু ভাব বন্দী ছন্দ-বন্ধনের মাঝ।
কলা ও কল্পনা মিলে কথা হল কম,
স্বপন ধরিল তাই সনেটের সাজ।

উৎসব

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আকাশের চোখে ভরা সুনীল স্বপন,
সোনালী নেশার ঘোরে রাঙা হল রোদ,
ফিরে আসে আসে না-কো বাতাসের বোধ,
শিউলি শিউরে মরে পরশে গোপন ;
সলিলে লেগেছে কার হিয়ার কাঁপন,
কণ্টকিত কেয়া-বনে পথ হল রোধ।
রয়ে গেল অদৃষ্টের ঋণ-পরিশোধ,
রহস্যের দ্বারে করি জীবন-যাপন।

প্রাসাদে প্রাচীর নাই, তোরণে প্রহরী,
উন্মুক্ত বিশ্বের দ্বার, নাহিক বারণ ;
কে আসিবে ? কেহ নাহি শুধাবে কারণ।
উচ্ছ্বসিত—উৎসবের আনন্দ-লহরী ;
দিকে দিকে করি' তার মন্ত্র উচ্চারণ
মলয় মর্ম্মরি উঠে, বিহঙ্গ কুহরি।

কল্মি

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

মাতৃহীন যতিভূষণ মাসীমার বাড়ী আসিয়া আশ্রয় পাইল। পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয়ার আগমনে সংসারে নব নব অতিথির আবির্ভাব হইতে লাগিল। এক একটি করিয়া নূতন অতিথি আসে—আর পুরাতন অতিথিদের সেবা-যত্ন ও তত্ত্বাবধানের ভার কিশোর যতিভূষণকে গ্রহণ করিতে হয়। যতিভূষণের জন্য পিতার মনের একটি গোপন অংশে অর্দ্ধবিস্মৃতা অনলদগ্ধার কয়েকটি শেষ কথা ক্রমশ পরিস্ফুট হইতে থাকে। যতিভূষণ যেন মানুষ হয়! অনেক ভাবনা-চিন্তার পর যতিভূষণকে তিনি তাহার মাসীমার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

বাংলার বাহিরে পশ্চিমের একটি ছোট সহর। কর্কশ কঙ্কর ও নিকষ-কৃষ্ণ প্রস্তর-শিলার দেশ—যতদূর দৃষ্টি যায়, অসমতল রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপর নতোন্নত তরু-শীর্ষ মাটির কাঠিন্যকে যেন অনেকখানি কোমল স্নেহাবরণে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। কিশোর যতিভূষণ একদিন বৈশাখ-প্রভাতে একটি ছোট টিনের বাক্স ও অনতিকায় বিছানার লাগেজ লইয়া এই নগরের ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিতে ট্রেণ হইতেনামিল। বাংলা দেশের বাহিরে সে এই প্রথম আসিল। জনবহুল রাজপথ,—নানা রঙ-বেরঙের পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া পথের ধারে ধারে সমান্তরাল সমুচ্চ পল্লবঘন বৃক্ষশ্রেণী পর্য্যন্ত তাহার কাছে নূতন মনে হইল। গণ্ডীবদ্ধ বালকের মনে এই নূতন পারিপার্শ্বিকের ছায়া পড়িল।

মাসীমাকে দেখিয়া মা'র কথা মনে পড়ে কি? মা'র মুখ যতিভূষণের মনে ছিল না—শৈশবের অস্ফুট স্মৃতির কুহেলিজাল ছিন্ন করিয়া মাসীমার স্নেহ-করুণ মুখচ্ছবি যেন বিস্মৃতপ্রায় মাতৃমুখ মনে করাইয়া দেয়। মুখের বাহিরের সুস্পষ্ট রেখায় জননী-নারীর প্রীতিশুভ্র আনন-শ্রী বড় মহিমময়ী—যতিভূষণ মাসীমাকে মা বলিয়া ডাকে!

মেসোমহাশয়কে দেখিলে যতিভূষণের বড় ভয় হইত। এই পাষাণ-দেশের আব্‌হাওয়ায় বাহিরের রঙটি যেন প্রস্তরের মতই ঘনকৃষ্ণ। মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। সর্ব্বদাই একটি চশমা নাকের অগ্রভাগে আঁটিয়া বাহিরের ঘরে ফরাসের ঢালা বিছানার উপর বসিয়া লালরঙের নানারকম খাতাপত্রের মধ্যে বিলুপ্তচিত্ত। ভৃত্য ঘন ঘন তামাক সাজিয়া দিয়া যাইতেছে। হাঁটু পর্য্যন্ত লালধূলিতে সমাচ্ছন্ন, মাথায় নানাধরণের টুপি ও পাগ্‌ড়ি পরা কয়েকজন দেশীয় লোক একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে। তামাকের ধূমে আচ্ছন্ন ও দুর্ব্বোধ্য ভাষার অবিশ্রাম কলকোলাহলে মুখরিত বাহিরের ঘরখানি হইতে যতিভূষণ সর্ব্বদাই দূরে দূরে থাকে।

মাঝে মাঝে খড়মের শব্দ হয়। মাসীমা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। রান্নাঘরের প্রাণীগুলি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নিজেদের কাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠে। মাসীমার জ্যেষ্ঠপুত্র মহীতোষ অকস্মাৎ যতিভূষণের গালে সশব্দে এক চড় কসাইয়া দেয়—বলে, 'পড়্‌ না রে গাধা! একেবারে নিরেট; পড়্‌ পড়্‌—কেবলি অন্যমনস্ক!' আকস্মিক চড়ের চমকে যতিভূষণের অন্যমনস্কতা দূর হইয়া যায়—সুর করিয়া পড়িতে থাকে,—

> Cannon to right of them,
> Cannon to left of them,
> Cannon in front of them
> Volleyed and thundered ;—

চড়ের গুরুত্বে সমস্ত রক্ত গালের উপর উঠিয়া আসে। মুখের সমস্ত শিরা-উপশিরা চন্ চন্ করিয়া উঠে। মাসীমার কাছে গিয়া নালিশ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কার্য্যত তাহা হইয়া উঠে না। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে মুখ মুছিয়া ফেলিবার ভাণে চোখের উদ্গত অশ্রুও মুছিয়া ফেলে।

খড়মের শব্দ ক্রমে বিলীন হইয়া গেলে মহীতোষ উঠিয়া যায়। যতিভূষণ তখনও পড়িতে থাকে।

একদিন দাদার অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিল। যতিভূষণ কোনোরকমে আত্মরক্ষা করিয়া অন্তঃপুরের দিকে দৌড় দিল। মাসীমার কাছে গিয়া যাহা বলিবে ভাবিয়াছিল, সবই গোলমাল হইয়া যায়। মাসীমা তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে ভূষণ, কি হ'য়েছে?—কাঁদ্‌ছিস্ কেন বল্‌ত!'

পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া তাহাকে প্রহার দেওয়া হইয়াছে—এই কথা কয়টি যতিভূষণ বলিতে চায়। বলিতে পারে না। শুধু পিঠখানি দেখায়—সেখানে বেত্রাঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কালশিরার দাগে সমস্ত পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। মাসীমা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—একেবারে মেরে ফেলেছে যে—কে এমন করলে বল্ দেখি!—কেন কি করেছিলি তুই!

'—সকালে ফুলগাছে জল দেওয়া হয় নি—তাই দাদা মেরেছে!

'মহী এমন করেছে!—হতভাগা পাজী—দুঃখে ও উত্তেজনায় মাসীমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না! অত্যন্ত গম্ভীর মুখে যতির পিঠে ঔষধ লেপন করিয়া বলিলেন.—তুই চুপ করে শুয়ে থাক্‌গে যা।

যতি বুঝিল ঝড় আসন্ন। ভাবিল, মাসীমাকে না বলিলেও চলিত। হয়ত দাদা আরও অত্যাচার করিবে।

পরদিন যতি দেখিল, মহী খুব শান্ত-শিষ্টভাবে তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। সে উত্তাপ, আক্রোশ আর নাই। কে যেন প্রবল অগ্নিশিখার উপর শীতল জল ঢালিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মহীর বাহিরের রূপ অপেক্ষা অন্তরের রূপ ভীষণতর। পিতামাতার একমাত্র সন্তান সে। এতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে স্নেহরাজ্যে একেশ্বর হইয়াছিল—কোথা হইতে একটি অন্নের কাঙাল আসিয়া তাহার মা'র হৃদয়ের একাংশ জয় করিয়া লইল। হইলই বা সে তাহার ভাই—সে ত তাহার সহোদর ভাই নয়! তাহার জন্য মা'রই বা এত দরদ কেন? অমন ত কতজনের বাড়ীতে কতজন আসিয়া থাকে! মা তাহাকে ডাকিয়া যখন কঠোরস্বরে ভর্ৎসনা করিলেন, তখন তাহার স্নেহলালায়িত মনে গূঢ় অভিমানের উদ্রেক হইল। মা'র এ রূপ সে কখনও দেখে নাই—তাহার একেশ্বর আধিপত্যে কোথায় যেন গোলযোগ ঘটিয়াছে। সে বাহিরে শান্ত হইল, কিন্তু অন্তরে তাহার সাগর-তরঙ্গ দুলিতে লাগিল। এই ঘটনাটিকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

প্রহর-দীর্ঘ গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে পশ্চিমের বালুতপ্ত বায়ু বহিতেছিল। যতিভূষণ ছুটির দিনে মেঝের উপর বসিয়া স্কুলের দেওয়া পড়াশুনা করিতেছিল। সেই ঘরের পাশেই তাহার মাসীমার ঘর। মধ্যাহ্ন-আহারাদির পর মেসোমহাশয় সেই ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। দুইখানি ঘরের মধ্যে একটি জানালা মাত্র ব্যবধান। পড়িতে পড়িতে যতির একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ওপাশের ঘরে মাসীমা ও মেসোমহাশয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছিল—সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। অর্দ্ধতন্দ্রামগ্ন অবস্থায় তাহার মনে হইল, বুঝি তাহার সম্বন্ধেই সব কথাবার্ত্তা হইতেছে। কারণ, বারে বারে তাহার কানে 'যতি' 'যতে' প্রভৃতি শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। সে সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিল; অত্যন্ত মনোযোগের সহিত জানালার দিকে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

—ওর বাবা কি মনে করে যে, আমিই ওর সব খরচ পত্র চালা'ব! কি ক'রে তা' সম্ভব আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি!

—ওর জন্য কি-ই বা তুমি খরচ করেছ? ওর স্কুলের মাহিনা থেকে কাপড়-চোপড়ের দাম সব ত আমি-ই দি!

—সেই হ'ল—একই কথা! হয় তুমি, না হয় আমি, যে কেউ একজন দিলেই হ'ল!

—বাঃ কি বুদ্ধি তোমার? ওর খরচ কি আমি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নি?

—সে থাক্—তবু ভেবে দেখ্‌তে হ'বে গিন্নী; সংসারের খরচপত্র থেকে তুমি যা বাঁচাও, তা' ওকে দিতে

যা'বে কিসের জন্য। সেটা থাকলে ত মহীরই সুবিধা! এ-সব ছোটখাট সোজা কথা তোমরা বোঝ না, এইত আমার দুঃখ।

তার পর কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শোনা গেল না। পরে মাসীমার স্বর একটু উচ্চ হইয়া উঠিল—মনে হইল তিনি যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন—'আমি ও-সব পারব্ না। যতিকে দিয়ে ও-সব নোংরা কাজ আমি বেঁচে থাকতে হ'তে দেব না। ওকে দিয়ে যদি এই-সব করিয়ে নেবার ইচ্ছে থাকে, তা'হ'লে ওর বাবার কাছে ওকে পাঠিয়ে দাও। ছেলেটা কোথায় সংমার কাছে থাকতে না পেরে আমার কাছে এল—আর ওকে কিনা তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে—'

শেষ-দিকে মাসীমার কণ্ঠস্বর একটু আর্দ্র হইয়া উঠিল। যতি আর সেখানে দাঁড়াইল না। সেই খর মধ্যাহ্নের রৌদ্রদাহে উত্তপ্ত পথে খালিপায়ে বাহির হইয়া পড়িল। যতদূর দৃষ্টি চলে, উন্নত অবনত কাঁকরের পথ জলন্ত রৌদ্রে এক মৃত অতিকায় বিচিত্র অজগরের মত পড়িয়া আছে! বিরলপত্র সুদীর্ঘ ইউকালিপ্টাস্ আর ঘনসবুজ রৌদ্রমুহ্যমান দেবদারু তরুর সারিকে মাঝে মাঝে সচকিত করিয়া কোন্ এক জ্বরতপ্ত দৈত্যের পুঞ্জীভূত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত পশ্চিমের 'লু' বহিয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ অনাবৃত পদে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া যতিভূষণ সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরিয়া আসিল; দিবসের উত্তাপ তখনও শেষ হয় নাই! তাহার সর্ব্বশরীরে তখন ভীষণ জ্বালা! মাথার চুল বিশৃঙ্খল—এই অবস্থায় মাসীমা তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন;—'কোথায় গিয়েছিলি রে! সারাটা দুপুর বুঝি কাঁচা আমের শ্রাদ্ধ ক'রে এলি!—' বলিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিলেন!—'একি তোর যে জ্বর হ'য়েছে। গা যে আগুন! না বাপু, তোকে নিয়ে আর আমি পারি না!' যতিভূষণ তাহার ভীতচকিত সরল দৃষ্টি মাসীমার মুখের উপর ফেলিয়া বলিল,—মা, আমি গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ী; সেখান থেকে এই জ্বর নিয়ে ফিরছি!

—গেলি বন্ধুর বাড়ী, আমাকে ব'লে গেলি নে কেন তুই? আর এই দু'পহর রৌদ্রে খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়ে এলি—চ'ল শুবি চল্!'

একটি মাস রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া যতিভূষণ ক্রমে উঠিয়া বসিতে পারিল। তাহাকে যেন আর চিনিতে পারা যায় না—একখানি চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল দেহ—শুধু পূর্ব্বের সেই তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল দৃষ্টি যতিভূষণের অনেকটা সাদৃশ্য লইয়া আসে। রোগশয্যার পাশে শুধু সে মাসীমা ও ডাক্তার ছাড়া আর কাহাকেও কখনো দেখিতে পায় নাই। জলে নিমজ্জমান মানুষ সামান্য একটি অবলম্বন পাইলে যেমন তাহাকে প্রাণপণ বলে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়, তেমনি যতিভূষণের রোগযাতনা-ক্লিষ্ট দেহমন মাসীমাকে দৃঢ়বলে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। কিন্তু পূর্ব্বের সেই গৌরকান্তি নিষ্প্রভ; বয়স যেন এই এক মাসের মধ্যে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে—তুচ্ছ ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতাও নিতান্ত কম হয় নাই। বেশী কথা সে কখনো বলিতে পারে না; এখন গাম্ভীর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দীর্ঘ দুই মাস কাটিয়া গেল, যতির পূর্ব্বের সেই বলিষ্ঠ দেহ আর ফিরিয়া আসিল না।

মহীর ছুটি শেষ হইয়া গিয়াছে। পড়াশুনার জন্য সে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। যতির অসুখ সারিয়া যাওয়ার পর মেসোমহাশয় মাঝে মাঝে তাহার ঘরে আসেন। বলেন,—যতি, একটু-আধটু উঠে হেঁটে বেড়িও বাবা, নইলে মোটেই শরীর সারবে না। এ দেশ ত অসুখ সারানোরই দেশ! খুব ভোরে উঠে বেড়াতে চ'লে যাবে! ঘরে ব'সে থাকলে কি আর শরীর সারে!,

মাসীমা-ও সেই কথাই বলেন। তাই যতিভূষণ সকালে উঠিয়াই বেড়াইতে বাহির হয়। কিছুদূর গিয়াই তাহার মাথার মধ্যে একটি অদ্ভুত আলোড়ন সুরু হয়। অন্তরলোকের নিভৃততম অংশ হইতে অসংখ্য কণ্ঠে কাহারা যেন অবিশ্রাম কোলাহল করিতে থাকে। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে বাহিরের জগৎ যেন লুপ্ত হইয়া যায়। বাহিরের দিবাজাগ্রত কোলাহল, অন্তরের নিভৃত অংশে সমুত্থিত কোলাহলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাকার

হইয়া যায়। মস্তিষ্কের মধ্যে যেন কোন্‌ দুরন্ত শিশু উচ্চ কলকণ্ঠে দাপাদাপি করিয়া বেড়ায়। যতিভূষণ আর চলিতে পারে না; একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়ে। বহুক্ষণ পরে চোখের ও মনের স্থিরতা পাইলে, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে।

মেসোমহাশয় বলেন,—কি বাবা বেড়িয়ে এলে? নাও, এইবার এক কাজ কর দেখি! এই ফুলগাছগুলিতে আস্তে আস্তে জল দিতে থাক! কোনো পরিশ্রম নেই—কিছু নেই;—এতে কি আর শরীর সারে?'

যতিভূষণকে ফুলগাছে জল দিতে হয়; এমনি করিয়া দিনের পর দিন ছোটখাট কাজ হইতে বড় বড় কাজে যতিভূষণের ক্রমোন্নতি হয়। দিনের অধিকাংশ সময়েই মাথার সেই গোলমাল লাগিয়া থাকে। কাজের ব্যস্ততার মধ্যে কোনো কোনো দিন সেটি বৃদ্ধি পায়—আবার কোনোদিন একেবারেই সেটি হয় না। কাজ শেষ করিয়া বিশ্রামের সময় হঠাৎ তাহার অতর্কিত আক্রমণ সুরু হয়। শ্রমক্লিষ্ট যতিভূষণ তাহাতে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ইচ্ছা করে, অন্তরের সেই অসুস্থ ব্যাধিচঞ্চল লোকটিকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া তাহার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লয়! ইচ্ছা করে, প্রবল পীড়নে তাহাকে নিপীড়িত করিয়া একেবারে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়! কিন্তু সে ইচ্ছাকে সে আর দৃঢ় ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে না। বাহিরের সব কোলাহল ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। জলপ্রপাতের ধূম্রধার ও কলোচ্ছ্বাস যেমন একসঙ্গেই ইন্দ্রজাল ও অনাহত ঝর্ঝর শব্দের সৃষ্টি করে, তেমনি যতিভূষণের নিরুদ্ধ অন্তরলোকে একটি অন্তহীন কলশব্দ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ালোকের মহোৎসব চলিতে থাকে। নিষ্ক্রিয়, শিথিল দেহ যতিভূষণ শয্যায় লুটাইয়া পড়ে।

মাসীমা যদি তাহার এ-কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহার একটা ব্যবস্থা হইত। কিন্তু যতিভূষণ এ-কথা আর কাহাকেও জানিতে দিল না। জননী যেমন আপনার দুরন্ত শিশুকেও অতি যত্নে লালন করিয়া তুলেন, তাহার চঞ্চলতার জবাবদিহি যেমন তাঁহারই একান্ত নিজের কাছেই চলিতে থাকে, যতিভূষণেরও তেমনি মনে হইত, ইহাকে নিষ্ঠুরের মতো বাহিরে প্রকাশ করিয়া কোনো লাভ নাই। ক্ষতিও নাই—কেন না, সে তাহার মনের এই অতি-সঙ্গোপন কলধ্বনির মধ্যে একান্ত সমাহিতচিত্ত হইয়া থাকিতে পারিত। মনের কত অংশে কতজন লুকাইয়া থাকে, অন্তরের মধ্যে যেন কোন্‌ এক সদ্যজাগ্রত পুরুষ এই কলধ্বনির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে!

কয়েক বৎসর পরে। মহী পড়াশুনা শেষ করিয়া পিতার কাজকর্ম্ম শিখিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন পিতামাতা তাহার বিবাহের আয়োজন লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এক শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণের মধ্যে মহী তাহার নবপরিণীতাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বাসন্তী বসন্তের একটি পুষ্পিতা লতার মত। কিন্তু লতার একটি সঙ্কুচিত গতি, একটি অনির্ভীক পরাবলম্বনের গোপন স্পৃহা থাকে। রৌদ্রের প্রখরতার মধ্যে যে নব নব পল্লব মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, লতার সেই সপল্লব নয়নাভিরাম গ্রীবাভঙ্গী যেন একটি দৃঢ় ও প্রবল আশ্রয়কে মুগ্ধ করার জন্যই। লতার লালিত্য বাসন্তীর—লতার সুসরল মনোরম গ্রীবাভঙ্গী বাসন্তীর; কিন্তু সে অনির্ভীক নয়; সে তাহার কোমল চরণতলে রক্তাশোক ফুটাইবার কবি-কল্পনাকে অঙ্কুরিত করিতে আসে নাই; তাহার গতিভঙ্গীতে সে যেন সম্রাজ্ঞী!

উৎসব-কোলাহলের মধ্যে যতিভূষণ কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের কোলাহলে সে যেন আরও অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উঠে। মাসীমা যখন তাহাকে বলিলেন, 'বৌ দেখ্‌বি আয়'—তখন সে প্রায় অর্দ্ধমৃত। যে ঘরটিতে সে বৌ দেখিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল, সে ঘরটিতে গতরাত্রির কুসুম-শয়নের কেতকী-পরিমল তখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেই সুশীতল সৌরভে তাহার মুহ্যমান অবস্থা অনেকটা কাটিয়া গেল। অনেক মহিলা মেঝের উপর বসিয়া আছেন। পালঙ্কের একটি পার্শ্ব ধরিয়া সালঙ্কারা বধূ দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মাসীমা বলিলেন,—'মা, এই তোমার দেওর,

যতিভূষণ ; বড় লাজুক ; ভীরু ছেলে, মা, কিছুতেই আসতে চায় না।

যতিভূষণ দেখিল, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতার দীর্ঘায়ত কালো চোখ দুটিতে একটি সকৌতুক হাসি খেলিয়া গেল। অতি সূক্ষ্ম আরক্ত ওষ্ঠাধরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি অবজ্ঞামিশ্রিত মনোভাবের আভাস সুস্পষ্ট। যতিভূষণ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার দৃষ্টিকে অবনত করিয়া বাসন্তীর অলক্তকরঞ্জিত ক্ষুদ্র পদতল দু'টি দেখিয়া লইল। মনের মধ্যে কে যেন গুঞ্জন করিয়া উঠে,—আমার দৃষ্টি দিয়া আমি তোমাকে প্রণাম জানাইয়া গেলাম।

উষালোকের একটি মায়া আছে। সে মায়া, নিদ্রাতুর মানুষকে একটু সচকিত করিয়া দিয়া যায়। আলোক-স্নানের জন্য তোমরা জাগিয়া উঠ—এই বাণী লইয়া উষা পূর্ব্বাচলের শিখরে নামিয়া আসে। নিদ্রাতুর যতিভূষণের মনের তোরণদ্বারে তেমনি আসিয়া দাঁড়াইল—বাসন্তী! মনের যে অংশ হইতে অস্ফুট কোলাহল উঠিয়া তাহাকে মূর্চ্ছাহত করিয়া রাখিত, সেখানে একটি বীণাতন্ত্রীর প্রথম গুঞ্জনের মত সুর উঠিতে লাগিল। সেই সুর-সাধনার পশ্চাতে কোথা হইতে একটি অভূতপূর্ব্ব শক্তির আস্বাদ সে পাইল ; একটি মাত্র চিন্তাকে কেন্দ্র করিয়া সে শক্তির অপ্রতিহত গতি ;—আমাকে দেখিয়া তুমি অবজ্ঞার হাসি হা'সয়াছিলে, তোমার সেই অবজ্ঞাকেই আমি আমার যাত্রাপথের পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

শাশুড়ীর কাছে যতিভূষণের যে পরিচয় বাসন্তী পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার মন একেবারেই তৃপ্ত হইল না। যে পুরুষ, সে যে কি করিয়া ভীরু ও লাজুক হয়, এ ব্যাপার তাহার কাছে একটা সমস্যা হইয়াছিল। ফুল-শয্যার পর আরও সাতদিন সে শ্বশুরবাড়ীতে ছিল। এ কয়দিনের মধ্যে একদিনও সে যতিভূষণকে দেখিতে পায় নাই। যাহারা অত্যন্ত নিকটে আছে, অনুক্ষণ যাহাদের কথাবার্ত্তায় হাসি-তামাসায় পর্য্যাপ্ত পরিচয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহারা যেন তাহার কাছে স্ফুলিঙ্গস্রাবী তুবড়ির মতই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সে এ বাড়ীতে আসিয়াছে বলিয়াই, যে ব্যক্তি বাড়ীর মধ্যেই আসিতে চাহে না, সর্ব্বদাই দূরে দূরে সময় কাটাইতে চায়—সর্ব্বোপরি যে ভীরু ও লাজুক, তাহার সঙ্গে একবার কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল। পিত্রালয়ে যাইবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাহাকে সে দেখিতে পাইল না ; তাই সেই রাত্রে মহীর সঙ্গে দেখা হইলে, তাহাকে সে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা ঠাকুরপো বাড়ীতে থাকে না কেন? ও কোথায় যায়?

যতিভূষণের সম্বন্ধে মহীর মনের অসহিষ্ণুতা এখনও কাটিয়া যায় নাই। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে সে বলিল,—'কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—পাছে ওকে বিয়ে-বাড়ীর কাজকর্ম্ম করতে হয়—এই ভয়! ও একটা অপদার্থ—বুঝলে! কুঁড়ের চূড়ামণি—দিবারাত্রি নিজের ঘরে বসে বসে কি ভাবে, তা ওই জানে! কাজকর্ম্ম করতে হ'লেই ওর যত মুস্কিল!' স্বামীর এই অসহিষ্ণুতার সুরটি বাসন্তীর বুদ্ধিশক্তিকে এড়াইয়া গেল না। নিতান্ত ঔৎসুক্যভরে সে স্বামীর কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্নে যতিভূষণের সব কথা জানিয়া লইল। যতিভূষণের নাম উচ্চারণ করিতেও যেন মহীর বাধে। পুনঃ পুনঃ তাহার কথাই আলোচনা করিতে বসিয়া তাহার সহিষ্ণুতার সীমা শেষ হইল। স্বামীর সংসারের পরিজন-সম্বন্ধে নববধূর যে একটা ঔৎসুক্য বা কৌতূহল থাকিতে পারে—এ চিন্তা মহীর মনে স্থান পাইল না। তাই যতিভূষণ-সংক্রান্ত আলোচনায় সে একটি পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিল। বলিল,—'বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো ছেলে এ বাড়ীতে এসে যে একটা আশ্রয় পেয়েছে, এই ওর পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করা উচিত। তা না ক'রে কেবলি ওর কথায় কথায় অভিমান, আর কপট গাম্ভীর্য্য—এ আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে।'

বাসন্তী এই কথার পর একটি অদ্ভুত কথা বলিয়া ফেলিল,—তা মন্দ নয় ; আচ্ছা আমিও ত বাপ-মা'র কাছ থেকে এসে তোমাদের এখানে আশ্রয় পেলাম, আমার অভিমানও কি তোমরা সহ্য করতে পারবে না!

মহী বাসন্তীকে কাছে টানিয়া বলিল, 'তোমার অভিমান ত আমার কাছেই কেবল! অভিমান আমার

অসহ্য মনে হ'লেও, তোমার অভিমান আমি সহ্য ক'রে নিতে পারব।' বাসন্তী খুশী হইল না! স্বামী অভিমান সহ্য করিতে পারেন না জানিয়া বাসন্তীর মনে মনে অভিমান হইল। কিন্তু উত্তাপ আর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কাজেই সে-রাত্রির মত সে আলোচনা শেষ করিল।

পরের দিন বেলাশেষে। বাসন্তীর সঙ্গে মহীও তাহার পিত্রালয়ে চলিল। সহরের এক প্রান্ত দিয়া ট্রেণ চলিয়াছে। তখনও গতি মৃদুমন্দ। বাসন্তী জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দৃশ্যাবলী দেখিয়া লইতেছিল। একস্থানে কতকগুলি পলাশগাছ অস্তমান সূর্য্যালোকের বিষণ্ণপ্রভায় যেন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদেরই একটির নীচে মলিন-বসন পাণ্ডুরমুখ একটি লোক অত্যন্ত শ্রান্তদেহ এলাইয়া শুইয়া আছে!

বাসন্তীর মনে হইল, 'কে ও যতিভূষণ না!' কথা কয়টি সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল।

মহী পাশেই ছিল। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ট্রেণ বহুদূরে চলিয়া গেল। মহী বলিল, —না না, ও যতি নয়। অন্য কেউ বোধ হয়!

মাসীমা ভাবিয়াছিলেন, যতিভূষণ মানুষ হইবে। পরলোকগতা ভগিনীর একটি সন্তানকেও তিনি মানুষ হইতে দেখিবেন—এই আশা তাঁহার ছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার চোখের সম্মুখে যতিভূষণ যেন ততই বিগড়াইতে লাগিল। সময়ে খাওয়া নাই, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। চেহারায় কেমন একটা অস্বাভাবিক কৃশতা ও পাণ্ডুরতা—এ সব মাসীমা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মানুষ মানুষের মত হইবে, তাহার আকারে ও ব্যবহারে একটি সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা থাকিবে—সর্ব্বোপরি সে কর্ম্মক্ষম হইবে—বিদ্বান্ হইয়া দশের একজন হইবে—মাসীমার গঠনের আদর্শ ছিল এইরূপ। যতিভূষণকে তিনি যতই লক্ষ্য করেন, ততই তাঁহাকে নিরাশ হইতে হয়। তাই, একদিন তাহাকে কাছে পাইয়া বলিলেন, 'হা রে যতি, তুই দিন দিন কি হচ্ছিস্ বল্ ত দেখি; একবার আয়নায় তোর চেহারাটা দেখ দেখি। এমন ক'রে তোর আর ক'দিন চল্‌বে শুনি!' মাসীমা হঠাৎ এ-প্রশ্ন করিয়া বসিবেন—এমন কল্পনা যতি কোনো দিন-ই করে নাই! অকস্মাৎ মাসীমার মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া তাহার মনে হইল, তাই ত, সে কি হইয়াছে! উচ্ছৃঙ্খলতা, অনিয়মিত আচরণ, অমনোযোগ, সব দোষ কয়টিই যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে—এখন উপায়! মাসীমা আরও আগে বলিলেন না কেন? মাসীমার উপর তাহার অভিমান হইতে লাগিল। বলিল, 'যেমন ক'রে চল্‌ছে, তেমনি-ই চল্‌বে!'—আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না!

মাসীমা যতিভূষণকে চিনিতেন। বুঝিলেন, ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে। তিনি আর বিশেষ কিছু বলিলেন না; শুধু বলিলেন,—তোরা এখন বড় হয়েছিস্—নিজেদের চিন্তা নিজেরাই ভালো ক'রে কর্‌তে পারবি। আমরা আর ক'দিন! তোদের একটু ভালো দেখে মর্‌তে পারলেই আমাদের মঙ্গল।

তাহার পর আর কোনো কথা হইল না। কিন্তু যতিভূষণ প্রবল শক্তিতে তাহার জীবনের গতি ফিরাইল। সে শক্তি ব্যর্থ হইল না। মাসীমা মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু উদ্দাম জলস্রোতের গতিকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত খালের মধ্যে প্রবাহিত করিলে যেমন হয়, যতিভূষণেরও তাহাই হইল। তর-তর বেগে লোকচক্ষুর প্রীতিকর পথে তাহার জীবন চলিতে লাগিল। সর্ব্বগ্রাসী উদ্দামতার যে বিরাট সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য যতিভূষণের মনে আর রেখাপাত করিল না।

বাসন্তী পিত্রালয় হইতে ফিরিয়াছে। বিবাহের পর এক বৎসর সে পিত্রালয়ে ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই সে মহীকে চিঠিপত্র দিয়াছে। মহী যেমন গ্রহণ করিয়াছে, তেমন সমর্পণ করিতে পারে নাই। ব্যাবহারিক জগতের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা এত বেশী, কর্ম্মব্যস্ততাকে সে কারণে-অকারণে এত বেশী সৃষ্টি করিয়া লইত যে, বাসন্তীর বিকাশোন্মুখ সুকুমার হৃদয়-বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করার কিংবা তাহার

সঙ্গে পরিচয়টিকে নিবিড় করিয়া তুলিবার কোনো মোহই তাহার মনে স্থান পায় নাই। দিবারাত্রির স্বাভাবিক উদয়-বিলয়ের সহজ গতি যেমন অনাড়ম্বর এবং অক্লিষ্ট, মহী ভাবিত মানুষের সব কর্ম ও চিন্তার মধ্যে তেমনি একটি বিস্ময়-বহির্ভূত, অত্যন্ত পরিচিত ঋজু পন্থা আছে—এমন কি নারী-হৃদয় সম্বন্ধেও তাহার কোনো সংশয়-সমস্যা ছিল না। তাই বাসন্তী অতি যত্নে চিঠি লিখিয়া লিখিয়া তাহার ঈপ্সিত কোনো শব্দমাত্রও মহীর চিঠি হইতে আবিষ্কার করিতে পারিল না। আবিষ্কার করিয়া জয়লাভ করা শক্তির পরিচায়ক বটে, কিন্তু অনাবিষ্কারের বিফলতাকে অবলম্বন করিবার শক্তি সকলের থাকে না। কিন্তু বাসন্তী স্বামীর সেই সামান্য চিঠিগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিল—প্রীতিমুগ্ধ জীবনের দু'চারিটি চিহ্ন বলিয়া নয়—যে কুঁড়িটি ফুটিয়া উঠিবার ব্যাকুলতা লইয়া প্রাণবান্ বৃন্তের উপর রহিয়াছে, উদ্দাম সমীরের অনাদর স্পর্শটিকেও বোধ হয় সে ভুলিতে পারে না।

বাসন্তী স্বামীগৃহে আসিল। মহীর এই সদাচঞ্চল কর্ম্মব্যস্ততা তাহার বড় ভালো লাগিত। মনে মনে ভাবিত, স্বামী বুঝি তাহারই জন্য সংসারের কর্ম্মসাগরে সন্তরণ করিতেছেন। তাহারই জন্য বুঝি সম্মুখের পথ হইতে কণ্টক সরাইয়া সরাইয়া ক্ষতবিক্ষত দেহ; তাই তাহার আর আপনাকে আড়ালে রাখিবার কোনো প্রয়োজন হইল না। ছোট দু'টি কঙ্কণকণিত হস্তে বৃহৎ সংসারের ক্লান্তিহীন সেবার ভার সে অনায়াসে গ্রহণ করিল। শাশুড়ী বলিলেন,—মা যেন আমার লক্ষ্মী!'

কিন্তু বাসন্তী যতিভূষণকে আর পূর্ব্বের মতো দেখিতে পাইল না। দেখিল, যতিভূষণের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ আর নাই। দৃঢ় নিয়মের গণ্ডীবদ্ধ যতিভূষণ যেন রাশীকৃত পুস্তকের মধ্যে কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আপনাকে সে যেন আর উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখিতে চাহে না। যে পথ সে ধরিয়াছিল, সে পথ হইতে যেন সে তাহার গতি ফিরাইয়াছে—এবং যে পথে সে চলিতেছে, সে পথেও যেন তাহার তিলার্দ্ধ তৃপ্তি নাই—তাই অনুসন্ধানেরও আর শেষ নাই বুঝি!

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসন্তী যতিভূষণের ঘরে অবিন্যস্ত পুস্তকগুলি উল্টাইয়া দেখিতেছিল। যতিভূষণ বাড়ীতে ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, মনের মত কোনো বই পাইলে লইয়া গিয়া অবসর সময়ে পড়িবে; অনেক উল্টাইয়া অনেক দেখিয়া একখানি বই সে বাছিয়া লইল; তাহার মধ্য হইতে সে কতকগুলি অপূর্ব্ব বস্তু আবিষ্কার করিয়া বসিল। কতকগুলি অর্দ্ধ-ছিন্ন কাগজের উপর সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে কবিতা রচিত হইয়াছে, কৌতুকময়ী বাসন্তী সেগুলি একনিঃশ্বাসে পড়িয়া গেল—

ছিলে কি দূরে গহনপুরে আলোকবাসিনী,—
চরণতলে হের কি ছলে, মঞ্জুভাষিণী,
কত না ফুল ফুটিছে ধীরে
কোমল পদ-কমল ঘিরে
ব্যাকুল অলি পড়িছে ঢলি' নিশীথ-নাশিনী!
—আলোক বাসিনী!

এমনি ছোট ছোট কবিতার টুক্‌রা পুস্তকখানির মধ্যে অজস্র রহিয়াছে। সব শেষের একটি টুক্‌রায় মাত্র কয়েকটি চরণ রহিয়াছে—

সারাটি বেলা সুরের খেলা করি—
দূরের মায়া নিল কে মোর হরি'!
আমারে কি গো তুলিয়া নিলে রথে
অলস লতা-বিতান-ছায়া হ'তে!
গভীর গান শুনিনু প্রাণ ভরি'
দূরের মায়া তাই ত' নিলে হরি'।

তখন সন্ধ্যার ঘোর ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাসন্তী বইগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত ক'রয়া মনোনীত বইখানি হাতে লইয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

৬

বাসন্তী কবিতা প'ড়তে ভালবাসিত। কিন্তু সে কাহাকেও ক'বতা লিখিতে দেখে নাই। প্রসিদ্ধ কবিদের অধিকাংশ কবিতাই তাহার অনেকবার পড়া ছিল। সব কবিতারই সে মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত না, কিন্তু যে-কবিতার মধ্যে সে সঙ্গীতের সুরের মত একটি মো'হনী মাদকতার আভাস পাইত সে-কবিতা তাহার শীঘ্রই কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। যতিভূষণ যে গোপনে কাব্য-সাধনা করে, এ-সংবাদ সে-ই বোধ হয় প্রথম আবিষ্কার করিল। তাই

যতিভূষণের এই প্রকাশিত কাব্য-চর্চার মূলধারা অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার বারে বারে মনে হইল, এই পুস্তক-নিমগ্ন কর্ম্মহীন ছেলেটিকে বেশ একটু আঘাত দিতে হইবে; তাহা হইলেই তাহার কাব্য-সাধনার মানসিক ভিত্তির দৃঢ়তা যে কতখানি তাহা সে জানিতে পারিবে।

দ্বিপ্রহর বেলার তৃপ্তিময় অবসরের মধ্যে একদিন বাসন্তী যতিভূষণকে ডাকিয়া পাঠাইল; যতিভূষণ সেদিন তাহার ঘরখানিতে আসিয়া সুবিন্যস্ত বইগুলির মধ্যে তাহার নিজস্ব বইখানি আর খুঁজিয়া পায় নাই। বাসন্তী যে তাহার ঘরে আসিয়া বইখানি লইয়া গিয়াছে, এ ধারণা তাহার একেবারেই হয় নাই। বইখানির জন্য এবং তাহার ভিতরকার গোপনতম কাগজের টুক্‌রাগুলির জন্য তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; চাকরদের একবার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোনো সন্ধানই সে করিতে পারিল না। এমন সময়ে বাসন্তীর আহ্বান আসিল।

বাসন্তী এ বাড়ীতে আসার পর তাহার সঙ্গে দুই একবার মাত্র দেখা হইয়াছে—বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা হয় নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাসন্তী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি কি করবে?' এই সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ প্রশ্নের উত্তরে যতিভূষণের নির্ব্বাক হইয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বাসন্তীর কৌতুকহাস্যবিকশিত মুখের দিকে চাহিয়া যতিভূষণ সসঙ্কোচে মাত্র একটি কথা বলিতে পারিয়াছিল, 'হয়ত কিছুই না!' তারপর, সে আর বাসন্তীর মন্তব্য শুনিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই; ধীরে ধীরে সে সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছিল।

আজ বাসন্তী তাহাকে ডাকিয়াছে—কিন্তু আবার যদি তেমনি করিয়া, কৌতুকহাসি নয়—বিদ্রূপহাস্যে ঝলমল মুখে তাহাকে নূতন কোনো কর্ত্তব্যপথের প্রশ্ন করিয়া বসে, তাহা হইলে? কিন্তু এ-সমস্ত তাহার মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। অত্যন্ত শিথিলগতিতে সে বাসন্তীর ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তী বসিয়াছিল, সম্মুখে একখানি আসন দেখাইয়া দিয়া বলিল,—বসো ঠাকুরপো! তোমার বইখানি আমিই নিয়ে এসেছি!

'ও, আপনিই এনেছেন; আমি বইখানি খুঁজে না পেয়ে একটু চিন্তিত হ'য়েছিলাম।' বইখানি বাসন্তীর করতলগত হইয়াছে জানিয়া মনে মনে যতিভূষণ প্রমাদ গণিল। কবিতাও তাহা হইলে আর গোপন রহিল না।

—তোমার কবিতা পড়লাম। কিন্তু এ-ভাবে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি?

আবার সেই প্রশ্ন। যতিভূষণ নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিল; মনে মনে ভাবিল, তোমার তূণ আজ নিঃশেষ হইয়া যাক্; আর যেন কোনো দিন প্রশ্নবাণের আঘাত সহ্য করিতে না হয়। বাসন্তী বলিল,—আমার কথার উত্তর দিতে হ'বে তোমাকে! আমি জানি তুমি বল্‌বে, কবিতা লেখা সময় নষ্ট করা নয়! আমার ধারণা কিন্তু উল্‌টো!' যতিভূষণের এইবার কিছু বলার প্রয়োজন হইল। কিন্তু সে একটি ক্ষীণ প্রতিবাদের অবতারণা করিতে যাইতেছিল। বাসন্তী বলিতে লাগিল,—তোমার এই কর্ম্মহীনতা আমার একেবারেই ভালো লাগে না! তোমার কবিতা কি সকলে বুঝতে পারবে? যদি বল, নিজের আনন্দে লিখছ, তা হ'লে আমার মত এই যে, এ সময়টুকু অন্য কোনো কাজে দিলে এর চেয়ে ঢের বেশী ফল পেতে!

যতিভূষণের নীরবতা অটুট! বাসন্তী দেখিল, তাহার অস্ত্রগুলি বিফল হইতেছে, তাই সে একবার শেষ চেষ্টা করিল—'আমি দেখছি, তোমার পক্ষে কোনো কাজ করা'ই সম্ভব নয়। তোমার আলস্য, তোমার ভীরুতা পদে পদেই তোমাকে আঘাত দেবে!'

যতিভূষণ শুধু বলিল,—আপনি কি এইজন্যই আমাকে ডেকেছিলেন?

বাসন্তী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—না,—এমনি, —এই বইখানি তোমাকে দিয়ে দেব; আর—আর, ঐ কয়টি কথা তোমাকে বল্‌বার ছিল

—দেখুন, কবিতা লিখ্‌তে নিষেধ করা আপনার পক্ষে নিষ্ঠুরতা নয় কি? আর কাজকর্ম্ম বল্‌ছেন, আমার ত মনে হয়, এর চেয়ে বেশী কাজকর্ম্মের আমার আর প্রয়োজন কি?

বাসন্তী মুহূর্ত্তমধ্যে সুর পরিবর্ত্তন করিয়া লইল,

—আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমাকে আমি একটা কাজ দেব, পারবে কি? অবশ্য আমি তোমায় সাহায্য করব।

—আমার পড়াশুনা ও লেখার পর যে সময়টুকু থাকে, সে সময়টুকুতে যদি সম্ভব হয়, পারব।

বাসন্তী তাহার চূর্ণালকবেষ্টিত মুখখানি ঈষৎ উন্নমিত করিয়া বলিল, 'দেখ ভাই, আমার একটা বাগান করবার সখ আছে; কিন্তু আর কেউই আমাকে সাহায্য করবে না!' যতিভূষণ এইবার হাসিয়া উঠিল; বলিল,—দেখুন, বাগানের জন্য যে সময়টুকু দেবেন, ওতে আপনার অন্য অনেক কাজ হ'তে পারে ত!

—কেন, বাগান ত আমি লুকিয়ে করছি না! বাগান সৃষ্টি ক'রে আমার আনন্দ আছে, কিন্তু সে আনন্দ আমি স্বার্থপরের মতো একা একা সঞ্চিত ক'রে রাখ্‌তে চাই না!

—আমি যেমন কবিতা লুকিয়ে লুকিয়ে লিখি—কাউকে শুনাই না—এই ত আপনি বল্‌তে চান্!

—না, তা' কেন, তবে, এবার থেকে যদি সাবধান হও, তাহ'লেই এই বইখানি দেব নইলে—

—পা'ব না!—এই ত, আচ্ছা এবার থেকে আপনিই আমার একমাত্র শ্রোতা হ'বেন!

—কিন্তু আমার বাগান!—

—হ্যাঁ, আপনার বাগানের আমি ব্যবস্থা করব।

'মাটি কোপা'তে পারবে ত? ফুলগাছে জল দেওয়াটা বোধ হয় অভ্যাস আছে, কেমন?' যতিভূষণ বহুদিন পরে একটু প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল! বলিল, 'হ্যাঁ সব পাবব!' 'তুমি পারবে ব'লেই ত তোমাকে বল্‌ছি—তবে তার আগে আমার একটা কথা আছে। আমি তোমাকে 'তুমি' বলব, আর তুমি আমাকে 'আপনি' বল্‌বে,—এ ভালো দেখায় না।'

—আচ্ছা, আজ থেকে আপনি 'তুমি'! তাহ'লে বইখানা দাও; আমি উঠি এইবার!

বই লইয়া বাহির হইতেই যতি দেখিল, সদ্য আপিস-প্রত্যাগত মহী গম্ভীর মুখে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। 'এই যে দাদা, বাইরে কেন? ঘরে যাও,'—যতি এই কথা বলিতেই মহী আর সেখানে দাঁড়াইল না! নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিল। যতি ধীরে ধীরে আপনার ঘরখানিতে ফিরিয়া আসিল।

বাসন্তীর সহিত যতির কথাবার্ত্তার মধ্যে যতির শেষ কথা কয়টি মহী শুনিয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়িতে ছাড়িতে নিতান্তই বিদ্রূপভঙ্গীতে সে বাসন্তীকে বলিল,—তা হ'লে এবার 'আপনি' 'তুমি' হচ্ছ! মন্দ নয়, কি বল?

বাসন্তী বুঝিল, কিন্তু এ পরিহাস নূতন নয়; তাই সে অত্যন্ত সহজ সুরে বলিল; 'তুমি হাত-পা ধোও; আমি খাবার নিয়ে আসি!'—বলিয়া সে ধীর গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মহী বলিল,—কি গো যতির সঙ্গে কাব্য-চর্চ্চা হচ্ছিল না কি? যতি কবিতা লেখে, তা জান না বুঝি!

বাসন্তী চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কৃত্রিম ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমি তা' হ'লে ভাই-এর অনেক খোঁজ-খবর রাখ দেখ্‌ছি! কই, তুমি ত এমন ছিলে না।

শেষ কথাকয়টি তীরের মত মহীর বুকে বাজিল। তাই সে আর কোনো কথা বলিল না; ইত্যবসরে বাসন্তী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেবার গ্রীষ্ম-শেষ হইতেই মাসীমা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ঔষধ-পত্রের শিশি ঘরে যতই বাড়িতে লাগিল, ডাক্তার-ও তত ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। যতি মাসীমার শয্যাপ্রান্ত হইতে নড়িতে চাহিত না! একদিন মেসোমহাশয় বিবর্ণ পাংশু মুখে ঘরে আসিলেন—কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন আছ?

—বেশ ভালো আছি, এইবার সেরে উঠ্‌ব। আর মিছামিছি ডাক্তার-খরচ কেন?—বলিয়া রোগশীর্ণ মুখে মাসীমা একটু হাসিলেন। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশে যেন অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান রশ্মির রক্তাভা ছড়াইয়া পড়িল।

—বৌমা আর মহীকে একবার ডাক্ দেখি যতি!

বাসন্তী ও মহী আসিল।

মাসীমা সকলকেই বলিলেন, 'তোমরা আমার কাছে এসে বস।' দাহশুষ্ক পশ্চিমের কঠিন মাটির উপর তখন প্রথম বর্ষার শ্যামগম্ভীর অভিযান চলিয়াছে। জানালার সার্সিতে বৃষ্টির ছাট্ আসিয়া লাগিতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যতির চোখের সম্মুখে মাসীমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল!

বারিধারাধৌত শ্মশানে রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া চিতাগ্নির লেলিহান শিখা যেন মহাশূন্যে শাণিত রক্তাভ ছুরিকা খেলিতে লাগিল। বাসন্তী তখন শূন্য গৃহের ধূলি-লিপ্ত মেঝের উপরে অবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছে। রক্ষক-স্বরূপ পাশে বসিয়া আছে নবাগতা দাসী কলমি।

দাহ-শেষে যতি, মহী ও মেসোমহাশয় যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। মাসীমার শূন্য শয্যার উপরে নবারুণের এক ঝলক রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে—যেন বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট সৃষ্টির একটি নবীন উপহাস-হাস্য! যতি সেই ঘরখানিতে আসিয়া নিরশ্রু নয়নে অত্যন্ত শুষ্ক কঠিন মুখে সেই পরিহাসময় নবীনতার মাঝখানে বসিয়া রহিল। মাথার মধ্যে আবার যেন কাহারা কোলাহল করিয়া উঠে, চক্ষুর সম্মুখে রাত্রির অন্ধকার-বিদারী অগ্নিশিখা যেন দুরন্ত সর্পশিশুর মত খেলা করিতে থাকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সমস্যার পর সমস্যা কেবলমাত্র অন্ধকার রহস্যের লীলাকেই বর্দ্ধিত করিয়া তুলে! শ্মশান-বৈরাগ্যের গেরুয়ায় যেন দেহমনপ্রাণ সকল মায়ামমতাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে; মাঝে মাঝে কোন অন্তরগুহালীন মায়াহীন বৈরাগীর গৈরিকাভ উত্তরীয় বিশ্বজগতের সব রঙ, সব শ্যামলতার উপর দিয়া কোন্ এক অদৃশ্যলোকের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। এমন সময়ে বাসন্তী আসিয়া তাহার হাত ধরিল, বলিল, ওঠ' ঠাকুরপো, অনেক বেলা হ'য়েছে!

মৃত্যু আসিতেছে—কিন্তু ধরিত্রীর নব নব কুসুম, মৃত্যুর কঠিন ভ্রূভঙ্গীকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীনতর রূপে রসে আবৃত করিয়া ফেলিতেছে; মৃত্যু আসিতেছে, কিন্তু মৃত্যু-অপহৃত প্রিয়জনের স্মৃতিকে কেহ দীপশিখার মত চিরজাগ্রত ও সমুজ্জ্বল করিয়া রাখে না, রাখিতে পারে না। মৃত্যু-মায়ায় যতিভূষণ যখনি বিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিত, বাসন্তী তাহার হাত ধরিয়া উঠাইত; বহু চেষ্টায় ও যত্নে যে বাগানটি তাহারা করিয়াছে, সেইখানে তাহাকে লইয়া যাইত। রাজ্ঞী যেমন অনুগত ভৃত্যকে আদেশ দেয়, তেমনি করিয়া বাসন্তী যতিভূষণকে বাগান-সংক্রান্ত নানা কাজে লিপ্ত রাখিত।

বাগানের কাজ করিতে করিতে একদিন যতিভূষণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বদিকে চাহিয়া রহিল। বাসন্তী নিকটেই বসিয়াছিল, বলিল—কি হ'য়েছে ঠাকুরপো, অমন অবাক হ'য়ে কি দেখ্‌ছ?

—ঐ মাঠের দিকে একখানি বাড়ী উঠেছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না?—পাতায় ছাওয়া ছোট্ট দু'খানি ঘর! ওখানে আবার কে এল?

—ও, ঐ দেখ্‌ছ তুমি? ও বাড়ী কলমির—আমাদের বাড়ীতে যে ঝি'র কাজ করে, তা'র নাম কলমি; সে-ই ঐ ঘর করেছে!

'তা হ'বে—'বলিয়া যতিভূষণ আবার কাজে মন দিল। ফুলগাছগুলি বহুদিন জল না পাইয়া শুকাইয়া উঠিয়াছে। যতিভূষণ ও বাসন্তী, দুজনেই জল আনিয়া ফুলগাছের মূলদেশে জল দিতে লাগিল। সদ্যঅঙ্কুরিত কতকগুলি পুঁইশাক ও ঝিঙার চারা মাত্র দু'টি কি তিনটি পল্লব বিকশিত করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। পরিশ্রান্ত যতিভূষণ তাহারি কিছুদূরে বসিয়া পড়িল, বলিল, 'আমাকে অনেক খাটিয়েছ; এবার আমি তোমাকে আদেশ দি,—কি বলো বৌদি!' বাসন্তী সরল ও উচ্চ-হাস্যে স্থানটি মুখরিত করিয়া বলিল,—দাও ত দেখি, তুমি কেমন আদেশ দিতে পার!

যতিভূষণ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল,—যাও ত, জল তুলে নিয়ে এস, যে যে গাছে জল দেওয়া হয় নি,—বলিয়াই সে হাসিয়া উঠিল, বলিল,—আমি ঠিক পারি না, আমার যেন মনে হয়, আদেশ দেবার জন্য আমি আসি নি।

—হ্যাঁ তা ত জানি, তুমি কেবল আদেশ পালন করবার জন্যই এসেছ!

সেদিন রাত্রে বাসন্তী শয়নগৃহে আসিয়া দেখিল, মহী

কি একখানি বই পড়িতেছে। দম্‌কা হাওয়ার মত বাসন্তী আলোর কাছে গিয়া, বই ও আলোর মাঝখানে নীলাম্বরীর আঁচলটি তুলিয়া ধরিল। আলো নীলাম্বরীর অতি সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক উজ্জ্বল শুভ্রতা ভুলিয়া তরল নীলাভ রশ্মিতে পরিণত হইল। পুস্তক-পাঠকের মুখে আসিয়া সে নীল আলো প্রতিফলিত হইল। বিস্মিত বাসন্তী দেখিল সে মুখে হাসি নাই—বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট; বোধ হয় ঘৃণাও সে মুখে তাহার ছায়া ফেলিয়াছিল!

—বিরক্ত ক'রো না আমাকে; দেখছ না, আমি পড়ছি।

বাসন্তী তাহার বহু পূর্ব্বেই আঁচল সরাইয়া লইয়াছে; জানালার কাছে গিয়া অভিমানিনী বাসন্তী একেবারে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই মহী বই বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল। অভিমান মহী মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। তাই সে-ও চুপ করিয়া রহিল। কিছু পরে অত্যন্ত তীব্রকণ্ঠেই সে বলিল,—আমি যাঁকে হ'চক্ষে দেখতে পারি না, তাঁ'র সঙ্গেই দিবারাত্রি গল্প আর হাসি-তামাসা!

বাসন্তী তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্রোধে উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর তখন দারুণ শীতার্ত্তের মতই কাঁপিতেছে, কিন্তু মহী তাহা দেখিতে পাইল না; সে বলিল,—আজ কি হচ্ছিল বাগানে দাঁড়িয়ে? গল্প করবার স্থান কি আর বাড়ীতেও হয় না!

বাসন্তী তখন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—অশ্রুজড়িত ভগ্নকণ্ঠে সে বলিল, 'দেখ, আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু মনের নীচতাকে আমি সহ্য করিনি কখনো, এখনও করব না।' বলিয়া সে সেখানে আর দাঁড়াইল না; ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

অপরদিকে সেই রাত্রে বাহিরের ঘরে যতিভূষণ একখানি মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছিল। শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু একখণ্ড ঘনকৃষ্ণ মেঘে চন্দ্র আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই নিবিড় অন্ধকারে বহিঃপ্রকৃতি যেন কোন্ অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের আসন্ন আয়োজনে অন্তর্নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে বসিয়াছে। স্মৃতি-বিস্মৃতির অর্দ্ধাবলুপ্ত চেতনায় যতিভূষণের মোটেই নিদ্রা হইতেছিল না। সামান্য একটি বৃক্ষপত্র-পতনের শব্দও যেন তাহার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল।

সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারের গাঢ়তা ভেদ করিয়া অতি সুস্পষ্ট খড়মের খট্‌-খট্‌ শব্দ যতিভূষণের তন্দ্রাচ্ছন্নতা দূর করিয়া দিল; সে উঠিয়া বসিল; মনে হইল, কে যেন বহির্দ্বার খুলিল, তারপর আবার সেই খট্‌-খট্‌ শব্দ ক্রমেই অস্ফুট হইতে অস্ফুটতর হইয়া বহুদূরে মিলাইয়া গেল। যতিভূষণ উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্য হইতে আলো জ্বালিয়া আনিল—বহির্বাটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল—শব্দের কোনো কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। আলো লইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিল; দেখিল রান্নাঘরের মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া বাসন্তী শুইয়া আছে। বাসন্তী ঘরে না শুইয়া কেন বাহিরে শুইল জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল। কিন্তু গভীর নিদ্রাভিভূতা বাসন্তীকে সে আর জাগাইল না। নিঃশব্দে আলো লইয়া মেসোমহাশয়ের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। যতিভূষণের সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি কোনো চোর বাড়ী হইতে বাহিরে চলিয়া গেল; তাই সে মেসোমহাশয়কে জাগাইতে আসিয়া দেখিল, ঘরে মেসোমহাশয় নাই। শয্যা শূন্য এবং চৌকীর নীচে পাদুকাদ্বয়ও অন্তর্হিত।

মনের অদম্য কৌতূহল যতিভূষণ মনেই পোষণ করিয়া রাখিল। সকালে উঠিয়া সে দেখিল, সংসারচক্র তেমনি গতিশীল। পাদুকা পায়ে দিয়া মেসোমহাশয় তেমনি কাজেকর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। মহী-ও গম্ভীরমুখে আপিস চলিয়া গেল। বাসন্তী-ও সদাপ্রফুল্লমুখে বাহিরের কাজকর্ম্ম লইয়া আছে। নবাগতা দাসী কল্মি বাসনের স্তূপ লইয়া মাজিতে বসিয়াছে। রাত্রির কৌতূহল ও অন্তর্বিপ্লব যেন দিবালোকের প্রখরতায় একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আবার সেই রাত্রি আসিল। আজ আর মেঘ নাই।

একাদশীর চন্দ্র তাহার বিমলিন আলোকে চরাচরকে যেন স্বপ্নময় করিয়া তুলিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। যতিভূষণ তখনো জাগিয়া আছে। গতরাত্রির কৌতূহল আবার এই মুহূর্ত্তে তাহার মনকে অভিভূত করিয়া তুলিল। কোন্ এক অতর্কিত বিস্ময়ের আবির্ভাবের ঔৎসুক্যে যতিভূষণ প্রতিটি মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আবার সেই শব্দ, স্বপ্ন নয়, বিস্ময় নয়, যতিভূষণ দেখিল, মেসোমহাশয় একখানি শুভ্র চাদরে আপাদমস্তক মণ্ডিত করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ধীরে ধীরে মাঠের পথ ধরিয়া পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন। বিস্ময়াভিভূত যতিভূষণ বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—ধীরে ধীরে মেসোমহাশয় মাঠের প্রান্তে সেই ঘর দু'খানিতে প্রবেশ করিলেন। তারপর আবার সেই নিঃশব্দতা! আবার সেই চন্দ্র তাহার বিষণ্ণ পাণ্ডুর আলোকে মাঠ বন ও বাড়ীকে প্লাবিত করিতে লাগিল।

যতিভূষণ এ কথা আর কাহাকেও বলিল না। বহু-দিন পরে স্নেহময়ী মাসীমার মৃত্যুমলিন মুখচ্ছবি তাহার মনে পড়িল। অক্লান্ত সেবা, অসীম সহিষ্ণুতা, অপরিসীম বুদ্ধি—তারপর মৃত্যুশয্যা—সবই একে একে মনে হইতে লাগিল। সে ভাবিয়াছিল, মৃত্যুকে বুঝি সে ভুলিয়াছে—কিন্তু আজ তাহার মনে হইল, পৃথিবীর সকলেই মৃত্যুকে ভুলিয়াছে,—আর সে শুধু তারকালোকের প্রান্ত হইতে চিরদুঃখিনী ধরিত্রীর শৈলবনানীশীর্ষ পর্য্যন্ত অকরুণ মৃত্যুর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতরেখার সন্ধান পাইয়াছে।

মাথার মধ্যে আবার সেই বহুদিন-বিস্মৃত কোলাহলের আভাস সে যেন পাইতে থাকে। কিন্তু বাসন্তী হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়; বলে,—ঠাকুরপো এত কি ভাবছ? কোনোকালেই ভাবনার শেষ নেই ভাই, তুমি ত জান!

যতিভূষণের পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বাসন্তীর সেই ট্রেণে যাত্রার কথা মনে পড়িল। বাসন্তীর কথায় যতি যেন সচেতন হইয়া বলিল,—হাঁ, অসহায় অবস্থায় বোধ হয় ভাবনা ছাড়া আর কিছু নেই; কিন্তু মেসো-মহাশয়কে লক্ষ্য করেছ কি? শরীর ওঁর দিন দিন যেমন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে,—

—যত্নের ত কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না; যথাসাধ্য আমি করছি—ধ্বংসের গতিকে রোধ করবার সাধ্য কা'র আছে ভাই!

আর কোনো কথা নাই; কিন্তু ধ্বংস তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত দংষ্ট্রাকরাল মুখ ক্রমশঃ অগ্রসর করিতে থাকে। বার্দ্ধক্যজীর্ণ মেসোমহাশয়ের শরীর ক্রমশ শীর্ণ হইতে হইতে শয্যার সহিত যেন বিলীন হইয়া যায়। তারপর একদিন সেই বহুকাল-বিস্মৃত মৃত্যুপথযাত্রিনীর কথা তাঁহার মনে হয়। জরাবার্দ্ধক্যেও সেই চিরন্তন পশুটার মৃত্যু হয় নাই; যে অমর স্মৃতিমণ্ডিত প্রতিমাকে ধূলিতে টানিয়া আনিয়াছিল, মৃত্যুর গম্ভীর ছায়ায় সে নিমেষ মধ্যে অবলুপ্ত হইয়া গেল। তারপরে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা আর নিয়তির সংগ্রাম—অবশেষে নিয়তিই জয়ী হইল; যে মৃত্যুকে তিনি ভুলিয়াছিলেন, সেই মৃত্যুই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়া গেল যে, তাহাকে ভুলিয়া থাকা যায় না।

আবার বিস্মৃতির অভিযান। কিন্তু শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রিতে যতিভূষণ অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে,—এক শুভ্রবস্ত্রে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তি বাড়ীর বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকের মাঠের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। পাদুকার খট্ খট্ শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়।

কর্ম্মি এই বাড়ীতেই রহিয়া গেল। যৌবনোজ্জ্বল সুস্থ সবল দেহ; বাসন্তীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা গল্প করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বর্ণনা করে।

বাসন্তীর বাগানে বেলফুল গাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে। পুঁই ও ঝিঙার চারাগুলির উপর মাচা উঠিয়াছে। সারা বর্ষার বারিধারাপুষ্ট লতাগুলি ঘনসবুজ পরিপূর্ণতায়

আভাস বহন করিয়া বাতাসে দুলিতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঝিঙার মাচার উপর পল্লব-পত্রগুলির মধ্য হইতে হরিদ্রাভ ফুলগুলির শোভা যেন প্রথম শরতের মায়া বিস্তার করিতে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় গাছগুলিতে জল দিতে দিতে বাসন্তী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—ও ঠাকুরপো, আমাকে কিসে কাম্‌ড়ে দিল। অন্ধকারে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না ভাই—

যতিভূষণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল—কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া বাসন্তীর বাম পদতলের কিছু উপরে খুব কঠিন বাঁধন বাঁধিয়া দিল। তারপর তাহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া আসিয়া আলো জালিয়া দেখিল, পদতলের শুভ্র চর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া রক্তস্রাবী দংশন-চিহ্ন জল জল করিতেছে।

মহী আসিল; ডাক্তার, ঔষধ, ওঝা, সকলেই আসিল। যতি বাসন্তীর শিয়রে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শরতের চন্দ্রালোকিত দ্বিপ্রহর রাত্রে প্রফুল্ল বাসন্তীকুসুম তীব্র বিষঘোরে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্মশানের রক্তিম চিতার আলোকে, মুহ্যমান যতিভূষণ বাসন্তীর মৃত্যুম্লানমুখে শেষ হাসির রেখাটি দেখিয়া আসিল। বাসন্তী যেন হাসিতে হাসিতে তাহার জীবনকে একটি উপহারের অঞ্জলির মত সমর্পণ করিয়া গেল।

যতিভূষণ আর উঠিতে পারে না। শীর্ণ দেহ আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় উঠিয়া আপনার পুঁথিপত্রের মধ্য হইতে একখানি বই বাহির করিয়া লইল। বাকি বইখাতাগুলি চাকরকে ডাকিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে বলিল।

আশৈশবের সহস্র স্মৃতি-জড়িত শ্মশানবৎ গৃহে সে আর কিছুতেই মন বাঁধিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর মস্তিষ্কের সেই অসুখটি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিবারাত্রি সেই চির-পরিচিত অগণ্যকণ্ঠোত্থিত কোলাহল তাহার মাথার মধ্যে যেন মহাবিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিল। নয়নে আর নিদ্রা নাই। মাকে আর মনে পড়ে না। চিতানলদগ্ধা মাসীমার মুখ মনে পড়ে; তাহার পরেই আসে বাসন্তীর সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী—বাসন্তী যেন হাসিয়া হাসিয়া বলে, 'ভাব্‌ছ কেন ভাই, ভাবনার কি আর শেষ আছে?' ভাবিতে ভাবিতে যতিভূষণ পাগলের মত গভীর রাত্রিতে পদচারণা করিয়া বেড়ায়। সংসার যেন বিরাট প্রেতভূমি—অনির্ব্বাণ চিতানলের পাশে তাহার বুভুক্ষু আত্মা যেন প্রেতের মতই বিচরণ করিতে থাকে।

সেদিন রাত্রিতে আবার মেঘ করিয়া আসিল। বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে শবাসীনা শর্ব্বরী যেন কাহার ধ্যানে বসিয়াছে—যতিভূষণ ভাবিল মেঘগুলি বুঝি সেই উন্মাদিনী রাক্ষসী রাত্রির কেশভার! কিন্তু ও কি ও?—আবার সেই শব্দ শোনা যায় না! কে যেন বাহিরে আসিল—কিন্তু এবারে ত শুভ্র বস্ত্র দেখা যায় না! খড়মের শব্দ ত নয়! কিন্তু বাহিরের দরজা কে যেন খুলিতেছে না! যতিভূষণ ছুটিয়া বাহিরে আসিল—দেখিল, চলিয়াছে,—সেই পূর্ব্বমাঠ বাহিয়া তেমনি নিঃশব্দ গতিতে একটি মনুষ্যাবয়ব ধীরে ধীরে বহুদূরে বিলীন হইয়া গেল! মূর্চ্ছাহত যতিভূষণ কি স্বপ্ন দেখিতেছে? স্বপ্ন কি এমন হয়! এ যে প্রত্যক্ষ জাগ্রত বাস্তব! এ যেন অতীত স্মৃতির তিলার্দ্ধ জীবিত রাখিতে চায় না। এ যে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল; স্মৃতির শ্মশানভূমিতে বাস্তবের উন্মত্ত নৃত্যবিলাস দেখিয়া যতিভূষণের মস্তিষ্কবিকৃতি হইল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, প্রতি গৃহ হইতে এমনি নিস্তব্ধ নিশীথের নীরন্ধ্র অন্ধকারে এক একজন করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে—শ্লথ নিঃশব্দ চরণে পূর্ব্বমাঠ পার হইয়া কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রাণের নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখাকে কেহই আর বুকের আঁচলে ঢাকিয়া রাখে নাই! সদ্য-জাগ্রত ঝঞ্ঝার উর্দ্ধোত্থিত কেশর-কলাপের মত ঘনকৃষ্ণ মেঘ অবিশ্রাম বারিধারা বর্ষণ করিয়া করিয়া সেই ক্ষীণায়ু দীপ-শিখাকে অবলুপ্ত করিয়া দেয় বুঝি!

ভীতচকিত যতিভূষণ তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল! তখন পূর্ব্বাকাশের অন্ধকাররাশির সীমায় সামান্য একটু

আলোকরেখা দেখা দিয়াছে! কিন্তু যতিভূষণের হৃদয়ের সীমান্ত পর্য্যন্ত কোথাও আলোকরেখার চিহ্ন মাত্র নাই। যে স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে সবল মানুষ অধিকতর বলিষ্ঠ হইয়া উঠে—সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে যতিভূষণ একেবারে সর্ব্বরিক্ত নিঃস্ব হইয়া গেল।

সুপ্ত বিহগের কলধ্বনি তখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। শরৎ-প্রদোষের শীতল বায়ুতে যতিভূষণ সেই বইখানি চাদরের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া পথে বাহির হইল। নগরের শেষপ্রান্তে আসিয়া সেই কঙ্করবিকীর্ণ পথ দিয়া উন্মাদ পথিক চলিতে আরম্ভ করিল। দূর গিরিবনরাজির নীলাঞ্জন-রেখার অন্তরালে যতিভূষণের শীর্ণ দীর্ঘ দেহ ক্রমে ক্রমে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!

দুর্গাপূজা

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ

বাল্মিকীর রামায়ণে আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িলে অগস্ত্য তাঁহাকে "আদিত্য স্তব" পাঠ করাইয়া উৎসাহিত করিয়া তোলেন। সুতরাং ব্যাপারটা 'Solar-myth"এর অন্তর্গত হইয়া পড়িল। চারিখানা রামায়ণের মধ্যে অকালে বোধন করিয়া দুর্গোৎসবের কথা কোথায়ও নাই। পুরাণেও নাই—আছে দুই একখানা উপপুরাণে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীই ইহার প্রচারক। এ কথা সকলেই জানেন যে, গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ধরিয়া মানুষ যুগ-যুগান্তর কাল নানা আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। এইরূপ একটি আচারের যখন কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া "অকালবোধন" শ্রীরামচন্দ্রের ঘাড়ে চাপাইয়া পণ্ডিতেরা আপনাদের মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কেন, এই প্রশ্ন যখন উঠিল—বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনবগত থাকায় পুরাণ (myth) সৃষ্টি করিয়া তার উত্তর প্রদত্ত হইল। অকালবোধনের আখ্যায়িকায় কিন্তু কিঞ্চিৎ গোল বাধিয়া গিয়াছে। অবশ্য, একথা ঠিক যে আশ্বিন মাসে ঘটা করিয়া এমন একটা পূজার ব্যবস্থা হয় না। কেন-না, উহা দেবতাদের নিদ্রার ছয় মাসের অন্তর্ভূত। ইহা আমাদিগকে সেই দেশে লইয়া যাইতেছে যেখানে ছয় মাস রাত্রি অর্থাৎ নিদ্রার কাল। সে কথায় প্রবেশ না-ই করিলাম। কিন্তু আশ্বিন মাসে পূজা করিতে হইলে নিদ্রিত দেবতাকে জাগাইতে হইবে—নিদ্রিত দেবতার পূজা হয় না। আসল পূজা কখন? ভারতচন্দ্র বলেন—"চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে" অর্থাৎ বাসন্তীপূজা। সে আর এক তত্ত্ব, আর এক মিথ্। ইহা বাসন্ত বিষুবৎঘটিত। চৈত্র মাসের পূজা এখন আশ্বিনে হইতেছে। কথাটা কি ঠিক? না, সর্ব্বৈব মিথ্যা। ব্যাপারটা যে মিথ্ তা এইখানে ধরা পড়িতেছে। পূজার উপকরণ সকলই শরতের, বসন্তে তার একটিও মিলিবে না। শরতের একটি আচার ও উৎসবের ঘাড়ে একটি পূজা ও মূর্ত্তি চাপাইতে যাইয়া পণ্ডিতেরা অর্ব্বাচীন গল্পের সৃজন করিয়াছেন বটে, কিন্তু higher criticismএর হাতে পড়িয়া এখন নাকানি-চুবানি খাইতেছেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ শরতের, কিন্তু প্রয়োজনবশতঃ তাকে প্রথমে বসন্তে স্থাপন করিয়া আবার শরতেই আনয়ন করা হইয়াছে। একটা গল্পের মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে, আর একটা মূর্ত্তির আমদানি হইয়াছে, ব্যাপারটা যেখানে ছিল সেই-খানেই রহিয়া গিয়াছে। ইহা সংবাদপত্রের "Kill a boy" কিয়ৎক্ষণ পরে "Revive him" জাতীয়। কাগজের স্তম্ভ পূর্ণ হয় না দেখিয়া একটা গল্প রচনা করা গেল যে, অমুক সময়ে অমুকের গাড়ীর চাপায় অমুক বালক হত হইয়াছে। তাহাতেও যখন স্তম্ভ পূর্ণ হয় না, বিশেষতঃ পুলিসের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তখন

বলা হইল, প্রেসে যাইবার সময় শুনিলাম এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। অর্থাৎ এ গল্পে কোথাও কিছু পরিবর্তন হইল না, কেবল পাদ-পূরণ হইল। অকাল-বোধনেও তাহাই হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, দুর্গাপূজার প্রতিমাটা একটা অবান্তর বস্তু। আদিতঃ শারদীয়োৎসব গাছপালা লইয়া আনন্দ করিবার একটা আয়োজন মাত্র ছিল। এই তো সেদিন বোলপুর বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-উৎসব হইয়া গেল। আমাদের দুর্গা-পূজাও আদিতে তাৎকালিক শিক্ষা ও আচারানুমোদিত ঐরূপই কোন উৎসব ছিল। বর্ষাগমে নবজাত বৃক্ষ-লতার শোভায় মুগ্ধ মানুষ লতাপাতা লইয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। নবপত্রিকার পূজা, যাহা দুর্গাপূজার এক সর্ব্বপ্রধান অবয়ব, তাহা এইজন্যই আচরিত হইয়া আসিতেছে। নবমূর্ত্তি-সমন্বিত প্রতিমার আমদানিতে কুমারটুলীর কাজ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু নবপত্রিকা পশ্চাৎ হইতে উঁকি মারিয়া গুমর ফাঁক্ করিয়া দিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বসন্তকালের পূজা শ্রীরাম অকালে করিয়াছিলেন, ইহা মিথ্যা কথা। নবপত্রিকার পূজা বসন্তকালের সৃষ্টি নহে, তৎকালে ঐ সকল লতাপাতা দুষ্প্রাপ্য। তবে এত জাঁকজমক্ করিয়া প্রতিমা আনিয়া বসাইবার সার্থকতা কি? স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মতে, প্রতিমার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই—প্রতিমা আরাধ্য নহে, উহা ঘর-সাজান সামগ্রী। তিনি বাহির হইতে ভিতরে যাইতে বলেন। বাহিরের এ সকলই তামসিক—আমোদ-প্রমোদের জন্য। ইহাতে মানুষের ধর্ম্ম হয় না। তবে যে পুতুল গড়া, ভোগরাগ দেওয়া—পশুমাংসের ষোড়শোপচার করা, এ সকলই সামাজিক সম্মিলনের জন্য। উহা উৎসব, পূজা নহে। পূজার জন্য পুতুল নহে, আমোদের জন্য। আসল দুর্গা-পূজা—যদি উহা পূজা হয়, তবে উহা ষট্‌চক্র ভেদ, কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা—উহাই বোধন। অকাল-বোধনে বসন্তের প্রতিমা শরতে আনয়ন নহে। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যার ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, তার মূর্ত্তিপূজা মিথ্যার মিথ্যা। ব্রহ্মদর্শনে মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তাহাই বাহিরে প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রতিমার সৃষ্টি। এ প্রতিমা একজন আর একজনের জন্য গড়িয়া দিতে পারে না। আগে মানস প্রতিমা পরে বাহিরের মূর্ত্তি। ইহা symbol মাত্র, স্মরণের সহায়,—তামসিক পূজার আশ্রয় নহে। ইহার পরেও বাঙালী যদি পূজার জন্য কুমারটুলীর দিকে তাকায় তবে তাহাতে তার আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব বজায় থাকে না।

তবে প্রতিমাখানার নিদান অনুসন্ধান না করিলে মন তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। এমন সুচিত্রিত সুন্দর দীপ্তি-শালী প্রতিমাও তো নক্ষত্র-খচিত আকাশ ছাড়া আর কোথাও মিলিবে না। অনেক দুর্গাপ্রতিমার 'চালে' নক্ষত্রখচিত আকাশের চিত্রই অঙ্কিত করা হয়। কুম্ভকার ও চিত্রকর অবশ্য জানে না কি করিতেছে। যাঁহারা দেখেন তাঁহারাই কি বুঝেন? মহাভারতে দুর্গার যে স্তব আছে, তাহাতে ভগবতীর মুখ মানুষের মুখ নহে। সেখানে প্রতিমার সকল অবয়বও পাওয়া যায় নাই। গ্রীকদিগের ঐরূপ একটি প্রতিমা দেখিয়াছি যাহার মুখাকৃতি মহাভারত-বর্ণিত মুখাকৃতির মতন। কোথাকার জল যাইয়া কোথায় দাঁড়াইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আর দাঁড়াইব না, আরব্ধ কথাই শেষ করি।

প্রতিমার চাল যে নক্ষত্রখচিত আকাশের চিত্র তাহা নিরর্থক হইতে পারে না। দেখিয়াছি চিত্রকর চাল-খানিতে আকাশের রং ফলাইতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতেছেন। চালখানি অর্দ্ধগোলাকৃতি—অর্দ্ধাকাশ জুড়িয়াই যে প্রতিমাখানির বিস্তৃতি সেইজন্য প্রতিমার সঙ্গে এই চালখানি এত অপরিহার্য্য। দুর্গাপূজার উপাদান ও উপকরণ কত জায়গা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বোধ হয় কাহারও সাধ্য নাই, থাকিলেও সুদূরপরাহত। কিন্তু প্রতিমাখানা যে আকাশ হইতে কল্পিত সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর্দ্রানক্ষত্রই রুদ্র, পাশেই অবস্থিত বৃষরাশি। সকলেই সব চিত্রে মহাদেবের পাশে বৃষকে দেখিয়াছেন। কালপুরুষই (orison)এই চিত্রে মহিষাসুরের স্থান অধিকার করিয়াছে। সিংহ ও কন্যা তো পাশাপাশিই পাওয়া যাইতেছে।

দুর্গাপূজা কন্যাপূজা বা কুমারীপূজারূপেই ঘরে ঘরে আচরিত হয়—কয়জন প্রতিমা বানাইয়া পূজা করিতে সমর্থ। আশ্বিন মাসে কিন্তু কন্যারাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি। কত দিক হইতে উপাদান আসিয়া জুটে। যাক্, এক মিথুন এ-পাশে কৃত্তিকা (ছয় নক্ষত্রই দৃষ্ট হয় সুতরাং ষড়ানন) ও রোহিণী (ব্রহ্মার কন্যা সুতরাং সরস্বতী); ওপাশে আর এক মিথুন—পুনর্ব্বসু নক্ষত্র (অনেক পঞ্জিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষও নারীরূপে চিত্রিত)। দুর্গাপ্রতিমার মধ্যে সর্পের সমাবেশ হইল কোথা হইতে তাহা পুরাণ অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। সাপের সঙ্গে পার্ব্বতীর কি সম্বন্ধ? আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া কিন্তু সকল সংশয়ের অবসান হইয়া গেল। পাশেই এতবড় সর্পনক্ষত্র অশ্লেষা, তাহাকে বাদ দেওয়া চলে না। আর চারিদিকে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের এত ছড়াছড়ি যে কাহারও আসন বাহনের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশেই গণেশের বাহন ইন্দুর, কিন্তু বম্বেতে গণপতি উৎসবে দেখিয়াছি এমন জন্তু নাই যাহা গণেশের বাহনরূপে কল্পিত হয় নাই। যাহা হউক, অর্দ্ধাকাশ জুড়িয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য—চালসহিত প্রতিমাখানিও অর্দ্ধগোলক। আবার চালে যে নানা দেবতার, যথা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির আকৃতি দেওয়া হয় তাহারও সার্থকতা আছে। আকাশের নক্ষত্রগুলির অধিপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি এক একটি দেবতা। যে কবির কল্পনায় আসিয়াছিল, যে চিত্রকর আঁকিয়াছিল তাঁহারা অমর হইয়া রহিয়াছেন। এ চিত্রে কার না মন গলে? চিত্রানুযায়ী আধ্যাত্মিক ভাবও যে যোগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয় নাই, তাহা নহে। তবে ব্রহ্মদর্শনের পর চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, কিন্তু চিত্র দর্শন করিয়া ব্রহ্মভাব অর্পণ করা হইয়াছে। চিত্রানুযায়ী পুরাণ (myth) যে কল্পিত হইয়াছে, তাহা পুরাণ-কল্পনার পৌর্ব্বাপর্য্যায় অনুসারে—না হইয়া যায় না। সে-কথা আর বলিব না। আমরা পাঠকের বাড়ীতে প্রতিমা পৌছাইয়া দিলাম, তাঁহাকে আর কুমারটুলীতে যাইতে হইবে না। আমরা এখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

জীবন ও মৃত্যু

শ্রীবিভাবতী সেন

জীবন মৃত্যু চলিয়াছে পাশাপাশি,
জীবন চাহিছে আকুল নয়নে
মৃত্যু চাহিছে হাসি।

মৃত্যু ডাকিয়া জীবনেরে কয়,
নাহি সংশে, আর নাহি কোন ভয়,
পেতেছি শয্যা বক্ষ-মাঝারে
বিশ্রাম লভ' আসি'।

রূপহীনা

শ্রীসীতা দেবী

মিত্র-গিন্নী মুক্তকেশী সবে ছ্যাঁচড়াটা উনান হইতে নামাইয়াছেন, এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

"কাজের সময় যত সব মরতে আসে। ও লতু, লতু, বলি কানের মাথা কি খেয়েছিস্? এক হাতে কত করব? একটু দরজাটাও খুলে দিতে পারিস না?"

উপর হইতে একটি সতেরো আঠারো বৎসরের মেয়ে নামিয়া আসিল। সদর দরজা খুলিয়া দিয়া, আগন্তুককে বলিল, "মা রান্নাঘরে আছেন।"

মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে? আমার ত এখন মরবার সময় নেই। কর্ত্তা ত এই চান করে এলেন বলে। এখনও ওদের ডালনা বাকি।"

মেয়েকে আর উত্তর দিতে হইল না। একটি কালো মোটাসোটা প্রৌঢ়া রমণী রান্নাঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি গো, মা। যতই কাজ থাক, মেয়ের মায়ের ঘটকীর সঙ্গে কথা কইবার সময় হবেই। আর এক জায়গায় যাচ্ছি, এই পথ দিয়ে, তা ভাবলাম তোমার সঙ্গেও দুটো কথা বলে যাই।"

মুক্তকেশী কড়ায় খানিকটা তেল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "বোসো, বাছা। ঐ পিঁড়িখানা টেনে নাও। তা মেয়ের ত এত দিন অসুখই গেল, সবে উঠেছে। ওরা মেয়ে দেখা-টেখার কথা কিছু বলেছে নাকি?"

ঘটকী বিধু বলিল, "হ্যাঁ, আজ একটা পাকা কথা বলে আসতে হবে। তা তোমাদের দিকের সব ঠিক ত? তিন হাজারের কমে মেয়ে কিছু পার হবে না। ওতে হয় ত ঢের। মেয়ের এই অসুখে চেহারা ত খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখলাম। দাগও মুখে অনেকগুলো হয়েছে মনে হল।"

মুক্তকেশী মনে মনে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। নিজে গিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া আসিলেই ত হইত? এখন এ মাগী বরের বাড়ী গিয়া কি বলিতে কি বলিবে তাহার ঠিকানা কি? মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, প্রথম প্রথম দাগগুলো বড় বেশী দেখায়। তারপর দিন যেতে যেতে মিলিয়ে যায়, ডাবের জল দিয়ে ধুলে শেষে আর চিহ্নও থাকে না। এই দেখ না, আমার দিদির মেয়ে বিন্তু, তার মুখ একেবারে দাগে দাগে ভরে গিয়েছিল, কিন্তু ডাবের জল দিয়ে ধুয়ে দু' বছরের মধ্যে আর একটি দাগ রইল না। লতিকেও রোজ মুখ ধোয়াচ্ছি, ডাক্তারে কি একটা ওষুধ দিয়েছে, তাও মুখে মাখছে। ও দাগ থাকবে না তুমি দেখো।"

বিধু ঘটকী বলিল, "আমি না হয় সে কথা বুঝলাম, এখন তারা বুঝলে হয়। কলকাতায় ত মেয়ের অভাব নেই মা, কত জায়গায় সুন্দর সুন্দর মেয়ে, গা-ভরা গহনা তারা পাবে।"

গৃহিণী একদিকে খুন্তি চালাইতে লাগিলেন, আর একদিকে কথাও চালাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুমি একটু বুঝিয়ে বললে কি আর না বুঝবে? আমার মেয়ের গায়ের রংই একটু ময়লা, মুখের চেহারা ত মন্দ নয়? চুল ছিল এক ঢাল, তা এ পোড়া অসুখে, তাও অনেক উঠে গেছে। ও আবার হবে। দেখছ ত আমার চুল? বয়স ত চল্লিশের কাছাকাছি হল, এখনও হাঁটুর কাছে পড়ে। আমার মেয়ে আমারই চুলের মাথা পেয়েছে। আর আজকাল কি আর লোকে শুধু চেহারা দেখে? লেখাপড়া দেখবে, গান শুনবে, সেলাই দেখবে। তা আমার লতু একটা পাশ দিয়েছে, সবাই বলছে খুব ভাল করে পাশ হবে। সেলাইয়ে সব্বার প্রথম হয়ে কত প্রাইজ পেয়েছে, হারমোনিয়ম দিব্যি বাজায়, সেতারও একটু একটু বাজাতে পারে। এ সব ত ওরা দেখবে?"

ঘটকী হাসিয়া বলিল, "সব বুঝি গো মা, সব বুঝি

কিন্তু তারা প্রথম দেখবে চেহারা, তারপর টাকা, বাদ-বাকি সব পরে।"

মুক্তকেশীর মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তবু একেবারে হাল ছাড়িবার পাত্রী তিনি নন; বলিলেন, "আচ্ছা, বলে কয়ে দেখ তবু। মেয়ে দেখতে আসুক, তারপর সব কথা হবে এখন।"

ঘটকী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা মা, আসি তবে এখন। ওরা কি বলে ওবেলা এসে তোমায় জানিয়ে যাব।"

সে দরজা পার হইতে না হইতেই গৃহস্বামী যোগেশ মিত্র, হড় মুড় করিয়া আসিয়া ঢুকিলেন। কলের জলে স্নান করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না, প্রায়ই গঙ্গাস্নান করিয়া আসেন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায় পৌছিয়াছে, মাথা-জোড়া টাক, শীর্ণকায় ছোটখাটো মানুষ।

গামছাখানা উঠানের দড়ির উপর ছুঁড়িয়া দিয়া, ব্যস্তভাবে বলিলেন, "শীগ্‌গির ভাত বাড়,রাস্তায় অনেক-কাল পরে মাণিক ঘোষের সঙ্গে দেখা, সেও কলকাতায় এসেছে মেয়ের বিয়ে দিতে। কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল।"

গিন্নী বলিলেন, "আর পাঁচ মিনিট সবুর করলে ডালনাটাও হয়ে যেত।" কর্ত্তা রসিকতা করিবার প্রয়াস করিয়া বলিলেন, "ও সবে কাজ নেই। ওদের ডাল্‌না খেতে গিয়ে শেষে বড়বাবুর গলাধাক্কা খেতে হবে। যা হয়েছে, দিয়ে দাও। ডাল্‌না বাটিতে একটু ঢেকে রেখো, বিকেলে এসে রুটি দিয়ে খাওয়া যাবে এখন।"

মুক্তকেশী অগত্যা ডাল ভাত, বেগুন ভাজা দুখানা, আর একরাশ ছ্যাঁচড়া দিয়াই স্বামীকে খাইতে বসাইয়া দিলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আহারের সখটি এখনও বিলক্ষণ আছে। সেই জন্য ঘরে ভালমন্দ যাহাই রান্না হউক, স্বামী তাহা না খাইতে পাইলে গৃহিণীর মন ভার হইয়া ওঠে। দশটার মধ্যে যাহাতে সব রান্না হইয়া যায়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দৈবাৎ কোনো তরকারি না হইয়া উঠিলে, সে তরকারি আর তাঁহার মুখে রোচে না।

কর্ত্তা বাহির হইয়া যাইতেই গিন্নী ছেলেমেয়ের স্নানের জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। বড় ছেলে নীরদ বি-এ পাশ করিয়া ল'কলেজে পড়িতেছে, তাহার খাওয়ার তত তাড়া নাই। তবু মাকে ছুটি দিবার জন্য সেও আসিয়া অন্যদের সঙ্গে বসিয়া গেল। নীরদের পর গৃহিণীর একটি মেয়ে মারা গিয়াছে, তাহার পিঠে এই মেয়ে লতিকা। লতিকার পরেও এক ছেলে এক মেয়ে আছে। খোকা ষোল বৎসর বয়সেও খোকাই থাকিয়া গিয়াছে। সে এখন হেয়ার স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে। মধ্যে বছর সাত আট গৃহিণীর সন্তানাদি হয় নাই, কোলের মেয়েটির বয়স বছর আট হইবে। সকলেই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইল। সর্ব্বশেষে গৃহিণী স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। তাঁহার খাওয়া চুকিতে সময় লাগিল অনেক। হাঁড়ি হেঁশেল উঠাইয়া, বিকালের তরকারি মাছ ইত্যাদি গুছাইয়া তাকে ঢাকিয়া রাখিয়া, দুটা পান মুখে দিয়া তিনি দোতলায় উঠিয়া গেলেন।

বাড়ীখানি ছোটই, কালীতলার এক গলির মধ্যে। নীচে শুধু রান্নাঘর, কলের ঘর ও পায়খানা। দোতালায় একটি বড় শুইবার ঘর ও ছোট একটি ঘর। তিনতলায়ও খানিকটা ছাদ এবং অতি ছোট এক টুকরা একটি ঘর। এইখানে নীরদের আড্ডা। সে এখন ভদ্রলোক হইয়া উঠিয়াছে, ভাইবোনের সঙ্গে একত্রে বাস করা আর তাহার চলে না। মাঝে মাঝে দু একজন বন্ধু-বান্ধবও আসে, তাহাদের বসাইবার বা এক পেয়ালা চা খাইতে দিবার একটা জায়গা ত থাকা চাই? দোতলার ঘরে লতিকার আড্ডা, সেখানে বাহিরে কাহাকেও লইয়া যাওয়া চলে না। নীরদ নিজে মোটেই গোঁড়ামীর ভক্ত নয়, তাহার বন্ধুদের সঙ্গে বোনের আলাপ করাইয়া দিতে পারিলে সে সুখীই হইত। তবে মা তাহা হইলে ঝাঁটা লইয়া আসিবেন, এই যা ভয়। বাবার নিকট হইতেও বেশী কিছু সহায়তা পাইবার আশা নাই।

যে বাড়ীর কর্ত্তা-গৃহিণীর মতামত এত সেকেলে, সে বাড়ীর মেয়ে স্কুলে পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছে এটা একটু ভাবিবার কথা বটে। কিন্তু ইহারও একটা কারণ ছিল। গৃহকর্ত্তার এক পিসতুতো ভাই শচীন দত্ত কলিকাতায় বড় কাজ করিতেন। টাকাকড়ি বেশ ছিল, কিন্তু ভোগ

করিবার মানুষ ছিল না। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই জেদে লতিকাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। গৃহিণীর বিশেষ মত ছিল না, তবে ধনবান জ্যাঠার সুনজরে থাকিলে আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি তখন মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। পরে মেয়ে ক্লাশে যখন সর্ব্বদাই প্রথম, দ্বিতীয় হইতে লাগিল, বৎসরে বৎসরে প্রাইজ্ লইয়া আসিতে লাগিল, তখন তাঁহার গর্ব্বও যে কিছু হয় নাই তাহা বলা যায় না। মেয়েকে বি-এ, এম্-এ পাশ করাইয়া মাষ্টারণী বা লেডী ডাক্তার করাইবার ইচ্ছা অবশ্য তাঁহার ছিল না, চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই, মেয়ের বিবাহের জন্য তাগিদ দিয়া তিনি স্বামীর কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিলেন। তবে গরীব গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিবাহ কিছু মুখের কথা খসাইলেই হয় না, বিশেষ মেয়ে যদি সুন্দরী না হয়। ভালমত সম্বন্ধ পাইলেই লতিকাকে স্কুল ছাড়াইয়া লইবেন, ইহা গৃহিণী স্থিরই করিয়া রাখিয়াছিলেন। ততদিন পড়ুক না, বেচারীর যখন পড়ায় এত মন? ইহাতে বিবাহের সুবিধা হইলেও হইতে পারে। আজকালকার বরদের শিক্ষিতা মেয়েই ত পছন্দ? আসল কথা ভাসুরকে চট করিয়া রাগাইয়া দিতে তাঁহার ভরসা হইতেছিল না। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের বেশীর ভাগ নিজের ছেলেমেয়েরাই পাইবে, এ আশা তাঁহার খুবই ছিল। ঘটক-ঘটকীর সঙ্গে কথা চলিতে লাগিল, যোগেশবাবু গৃহিণীর নৈশ বক্তৃতায় দুই কান বোঝাই করিতে লাগিলেন, এবং ইতিমধ্যে জ্যাঠা-মহাশয়ের সহায়তায় লতিকা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটাও দিয়া বসিল।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় কেমন যেন সব ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। শচীন দত্ত দুই দিনের অসুখে মারা গেলেন, এবং উইল করিয়া যাইবারও কোনো অবকাশ পাইলেন না। টাকাকড়ি তাঁহার এক ভগিনীর পুত্রের দখলে চলিয়া গেল।

মুক্তকেশী কপালে চড় মারিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই জ্যাঠার ভরসাতেই না তিনি মেয়েকে বুড়ী করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিলেন? এখন ইহার বিবাহের খরচ কোথা হইতে আসিবে? মেয়ে পাশ হউক বা ফেল হউক, তাহাকে আর স্কুলমুখো হইতে দিবেন না। বিবাহ দুই চারি মাসের মধ্যে যেমন করিয়া হউক দিয়া ফেলিতে হইবে। মুক্তকেশী দ্বিগুণ উৎসাহে ঘটকীদের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এক জায়গায় এক পাত্রের সন্ধান পাওয়াও গেল। তাহারা শিক্ষিতা মেয়েই চায়, অপরূপ সুন্দরী না হইলেও চলিবে।

কিন্তু বিপদ কখনও একলা আসে না। লতিকাকে একদিন স্নানের জন্য তাগিদ দিতে খুকীকে পাঠাইতে সে ফিরিয়া আসিয়া মাকে খবর দিল, "দিদি নাইবে না মা, তার অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে।"

"কি অসুখ হল আবার। হাড় জ্বালিয়ে খেল আপদ-গুলো।" বলিয়া বকিতে বকিতে গৃহিণী উপরে উঠিয়া গেলেন।

লতিকা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। মাকে দেখিয়া বলিল, "মাথাটা ভয়ানক ধরেছে মা। খুব জ্বর এসেছে বোধ হয়।"

"তবেই কেতাত্ত করেছ আর কি? আমার কাজের ভারী অভাব কিনা, তাই যে যত পার রোগ কর। খুকী, যা উপর থেকে তোর দাদাকে ডেকে আন। থারমো-মিটার দিয়ে একটু দেখুক।"

নীরদ নীচে নামিয়া বোনের জ্বর পরীক্ষা করিয়া দেখিল ১০৪ এর কাছাকাছি। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ডাক্তার ডাকতে হবে। খুব বেশী জ্বর যে দেখছি।" পাড়ার কুমুদ ডাক্তার আসিয়া দেখিল। মুক্তকেশীর উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "জ্বর হতে হতেই কি আর কিছু বোঝা যায়? দুদিন গেলে বোঝা যাবে কি ব্যাপার। সম্প্রতি এই ওষুধটা করিয়ে আনান, তিন ঘণ্টা অন্তর একবার দেবেন। মাথায় বরফ দিতে পারেন, একশ' দুইয়ের নীচে নাম্‌লে আর দেবেন না। ছেলে মেয়েদের টীকে হয়েছে ত?"

শোনা গেল বছর দুই তিন আগে একবার হইয়াছিল, তাহার পর আর হয় নাই। "কালই অন্য সব ছেলে মেয়েদের টীকে দিয়ে যাব, আপনারাও নেবেন। সাবধান

থাকা ভাল, সহরে বসন্ত টসন্তও বেশ হচ্ছে," বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

আর সকলের টীকা দেওয়া হইল। লতিকার কিন্তু দ্বিতীয় দিন হইতেই অবস্থা সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের গুটি দেখা দিল। ভয়েও সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, বিশেষ করিয়া মুক্তকেশীর। মেয়ে না বাঁচিতে পারে, সে ভয় ত ছিলই, কিন্তু বাঁচিলেও এই দারুণ রোগ কন্যার সর্ব্বাঙ্গে নিজের আগমন চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। একেই ত মেয়ের রং কাল বলিয়া তাহার বিবাহের সম্বন্ধ কোথাও পাকা হইতেছে না, তাহার উপর এই বিপদ। মুক্তকেশী আহার নিদ্রা ভুলিয়া কেবল মাথা কুটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভগবানের কৃপায় লতিকা সারিয়া উঠিল, কিন্তু নিষ্ঠুর রোগ তাহার দেহ এবং মুখ হইতে সমস্ত শ্রী যেন অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। যোগেশ মিত্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মেয়ে ভাল হইয়া গিয়াছে আর ভাবনা কি? আফিসের বাবুদের একদিন খাওয়াইতে শুদ্ধ প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময় গৃহিণীর কঠিন তাড়া খাইয়া থামিয়া গেলেন।

এই সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণী উপরে উঠিতেছিলেন। ঘটকী মাগী না জানি ওবেলা আসিয়া কি বলিবে! যদি তাহারা মেয়ে দেখিতে আসিতে রাজী হয়, তাহা হইলে এখন হইতে তাহার জোগাড়ে লাগিতে হইবে। দু' পয়সা খরচ আছে ত? কর্ত্তা ত যা মানুষ, তাঁহার ডান হাত, বাঁ হাত জ্ঞান নাই। সংসারের সব ভাবনা চিরকাল তাঁহাকেই ভাবিয়া আসিতে হইতেছে

লতিকা শুইয়াছিল, তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, শুয়ে যে? আবার অসুখ-বিসুখ কিছু হল নাকি?"

লতিকা বলিল, "না মা, এমনি। একটা বই পড়ছিলাম, তাই একটু ঘুম আসছে।"

মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুয়েছিলি?"

লতিকা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে ধোয় নাই।

মুক্তকেশী জলিয়া উঠিলেন, "তা ধোবে কেন? মুখের ঐ বাঁদুরে ছিরি করে থাক, রাজার বাড়ীর থেকে সম্বন্ধ আসবে একেবারে।"

লতিকা অপমান সহিতে পারিত না, বাঙালীর মেয়ে হইলে কি হয়? সেও বিরক্তির সুরে বলিল, "না এল ত বয়েই গেল।"

মুক্তকেশী আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ইস্কুলে পড়ে ত গুণ হয়েছে কত! চোপার ডালি। মায়ের মুখের উপর কথা কইতে লজ্জা করে না? শ্বশুরবাড়ী গিয়ে এই রকম মেজাজ দেখালেই হয়েছে আর কি?"

লতিকা চুপ করিয়া রহিল। কথায় কথা বাড়ে, তাহার এখন মায়ের বকবকানি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। মুক্তকেশী বকিতে বকিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বিকাল বেলা বিধু ঘটকী ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইল। মুক্তকেশী তখন মস্ত একটা লাউকে টুকরা করিতেছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, কি বল্‌লে তারা?"

বিধু বিকশিত দন্তে বলিল, "সু-খবর আছে গো মা, এখন থেকে বখ্‌শিশের জোগাড় কর। তারা মেয়ে দেখতে আস্‌তে রাজী। কর্ত্তাটি বড় ভাল, তাঁর ইচ্ছে একটি লেখাপড়া জানা বৌ আসে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কবে আসবে, কিছু বলেছে নাকি?"

বিধু বলিল, "সে কথা কিছু হয়নি। এখন আপনাদের বাবু গিয়ে একটু কথাবার্ত্তা কইলে ভাল না? এত দিন ত শুধু আমার মুখেই কথা শুনছ।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বেশ। ওঁকে কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব এখন। ওদের হাঁক বেশী নয় ত? জান ত বাছা, আমাদের অবস্থা? কেরাণী মানুষ, দিন আনে দিন খায়, ব্যাঙ্কে বিশ পচিশ হাজার কিছু জমা নেই।"

ঘটকী বলিল, "তা ত জানিই। তবে ওসব কথা আমার সঙ্গে হয়নি কিছু, কর্ত্তা গেলে হবে আর কি? এই ছেলেটি মেজ, বড় ছেলের বিয়েও এমনি গেরস্ত ঘরেই হয়েছে। তাই মনে হয়, খাঁই বেশী নয়।"

মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বৌটি দেখতে কেমন গা? খুব সুন্দরী নাকি?"

ঘটকী বলিল, "খুব সুন্দরী আর কোথায়? কিছু

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত এম্ সরকার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এমন আরমানী বিবি নয়। তবে রংটা তোমার মেয়ের চেয়ে একটু পরিষ্কার হবে বোধ হয়।"

মুক্তকেশী নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। মেয়েটা একটু যদি দেখিতে ভাল হইত।

রবিবার সকালে যোগেশবাবু মেয়ের সম্বন্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। কি কি বলিতে হইবে, কোন কথার উত্তরে কি বলিতে হইবে, গৃহিণী সব বার বার করিয়া তাঁহাকে শিখাইয়া দিলেন। নিজে যাইতে পারিলে যে কাজ হাঁসিল করিয়া আসিতে পারিতেন, সে বিষয়ে মুক্তকেশীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহা যখন হইবার নয়, তখন ভালমানুষ কর্ত্তাটিকে পাঠাইয়া দিয়া দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, সেবারকার মত কর্ত্তা কাজ ভণ্ডুল করিলেন না। কথা লইয়া আসিলেন, মঙ্গলবার দিন তাহারা মেয়ে দেখিতে আসিবে। মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তাহা হইলে দেনা পাওনা লইয়া বেশী কষাকষি হইবে না, এই প্রকার একটা ইঙ্গিতও নাকি বরকর্ত্তার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

মুক্তকেশী মনে মনে খুবই খুসি হইলেন, তবে মুখে সেটা প্রকাশ করিলেন না। আগে বিবাহটা ভালয় ভালয় হইয়া যাক, তাহার পর আহ্লাদ করিবার সময় ঢের পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি বরের বাড়ীর লোকের কাছে খেলো না হইতে হয়, এমন ভাবে সব আয়োজন করিতে হইবে।

বাড়ীর মধ্যে ভাল ঘর কেবল একটি, দোতলায় তাঁহার শুইবার ঘরখানি। ঐখানেই বসিবার জায়গা করিতে হইবে। সেদিনকার মত বাক্স প্যাটরা, তক্তপোষ, বিছানা সব বাহির করিয়া পাশের ঘরে ঠাশিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহাদের ঘরে ভাল আস্‌বাব কিছুই নাই, পাড়ার চৌধুরী বাড়ী হইতে একখানা গালিচা, কয়েকটা টেবিল চেয়ার প্রভৃতি চাহিয়া আনিতে হইবে, ঘর সাজাইবার জন্য। একটা বড় টেবিল্‌ল্যাম্পও আনিতে হইবে। জলখাবার তৈয়ারী করার ভার তিনি নিজেই লইবেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে শিখাইতে পারে, এমন কেহ এ পাড়ায় নাই। তবে মেয়েকে সাজাইবার জন্য পাড়ার কয়জন বৌঝিকে ডাকিয়া আনিতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের হাতযশ বিন্দুমাত্র নাই। বয়সকালে যাও বা কিছু কিছু জানিতেন, এখন তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। সখীরা তাঁহাকে কত ঠাট্টা করিয়াছে, কর্ত্তা পর্য্যন্ত হাসিয়াছেন। পাশের বাড়ীর ছোট বৌটার সাজগোজ সম্বন্ধে নাম খুব। যেখানে যায়, যেন পটের বিবিটি সাজিয়া যায়, অন্যকে সাজাইতেও নিশ্চয় ভালই পারিবে। তাহাকেই ডাকিয়া আনিবেন বলিয়া গৃহিণী মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

নীরদ বাড়ী ফিরিবামাত্র গৃহিণী তাহাকে কাজে লাগাইয়া দিলেন। গোটা কয়েক ফরমাশ্ খাটিয়া সে যে পলায়ন করিল, আর সন্ধ্যার আগে বাড়ীমুখো হইল না। মুক্তকেশী অগত্যা খোকাখুকীর সাহায্যেই কোনো-মতে কাজ চালাইতে লাগিলেন। মাঝে একটা দিন মাত্র, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কি করিয়া?

মঙ্গলবার দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। সকাল হইতে বাড়ীতে কাহারও নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। কর্ত্তার আপিসের বড়সাহেব মা বাপ মরিলেও কাহাকেও ছুটি দিতে চায় না; কাজেই মেয়ে দেখিতে আসিলে যে দিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তিনি আফিস গেলেন, অবশ্য তিনটার মধ্যে কোনোগতিকে পলাইয়া আসিবার জন্য গৃহিণী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিলেন। নীরদ, খোকা, খুকী, কেহই কলেজ বা স্কুলে গেল না। জিনিষপত্র কেনা, কাটা এবং ধার করিয়া আনার কাজ দুই ছেলেতে করিতে লাগি[ল]। গৃহিণী বড় মেয়েকে লইয়া খাবার তৈয়ারী করিতে বসিয়া গেলেন। সব খাবার মেয়ের তৈয়ারী বলিয়া বরপক্ষীয়দের তাক্ লাগাইয়া দিবার মতলবও তাঁহার ছিল। কথাটা নেহাত নিছক মিথ্যা কথা হয়, এ ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। লতিকা অগত্যা মুখ হাঁড়ি করিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সিঙাড়া, পানতুয়া করিতে বসিয়া গেল। খুকীরই বাড়ীতে সব চেয়ে আরামে কাল কাটিতে লাগিল। ধারকরা গালিচার উপর প্রথম সে খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া লইল, তার পর একটা চেয়ারে উঠিয়া বসিল। শোয়াবসা যখন আর পছন্দ হইল না,

তখন রান্নাঘরে গিয়া সব রকম খাবার চাখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা দুইটা আড়াইটার সময় পাশের বাড়ীর ছোট-বউ আসিয়া হাজির হইল। লতিকাকে উনানের পাশে দেখিয়াই সে একেবারে ঝাঁংকাইয়া উঠিল। বলিল, "ও কি খুড়ীমা? মেয়েটাকে আজ আগুন-তাতে ভাজা ভাজা করছেন কেন? যা রং খুলবে।"

গিন্নী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যা যা লতি, উঠে যা। আর বাছা, একলা হাতে কি আর সব পারি, তাই মেয়েটাকেও একটু বসিয়েছিলাম।"

ছোট-বউ বলিল, "লতু যা, গা টা ধুয়ে আয়। আমি উপরে যাচ্ছি।" সে হাতে করিয়া ছোট একটা বাক্সে সাজসজ্জার সব সরঞ্জাম লইয়া আসিয়াছিল। এ বাড়ীতে যে প্রসাধনের উপকরণ বিশেষ কিছু মিলিবে না, তাহা তাহার জানাই ছিল।

লতিকা সকাল হইতেই অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া ছিল। ভাল করিয়া পড়াশুনা করিবার তাহার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। জ্যাঠামশায় বাঁচিয়া থাকিলে, কেহ তাহাকে এমন করিয়া ঘাড়ে ধরিয়া বিবাহ দিতে পারিত না। সেই পরলোকগত স্নেহশীল মানুষটিকে মনে করিয়া কেবলি তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। জড়-পুঁটুলীর মত পড়িয়া পড়িয়া গাল খাওয়া আর উপেক্ষা ভোগ করা ইহাই ত বাঙালী মেয়ের জীবন? এটাকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিত। তাহাই ত শেষে তাহার অদৃষ্টেও ঘটিতে চলিল। জড়-পুঁটুলীরা বরং এক রকম থাকে, তাহারা ইহাই ভাগ্যের লিখন বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু সে যে খানিকটা স্বাদ পাইয়া বঞ্চিত হইবে, সে কি করিয়া সহিয়া থাকিবে? বিবাহিত জীবন যে তাহার সুখের হইবে না, তাহা সে ধরিয়াই লইয়াছিল। কিসের জোরে হইবে? তাহার নিজের দেহে রূপ নাই, এবং বাপমায়ের টাকা নাই। সুতরাং তাহাকে কোনো শ্বশুরবাড়ী বিশেষ আদর করিয়া বরণ করিবে না নিশ্চয়। কিন্তু উপায় নাই, তাহাকে মুখ বুজিয়া সহিতে হইবে। জগতে তাহার পক্ষে এখন একটি মানুষ নাই। বিবাহের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে মা হয়ত তাহার মুখে ঝাঁটার বাড়িই বসাইয়া দিবেন। একেই তাহার অপরাধের অন্ত নাই। সে রূপহীনা, তাহার বয়স হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, সর্ব্বোপরি সে বসন্ত করিয়া মুখময় দাগ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার উপর বড় বড় কথা বলিলে কি আর রক্ষা আছে?

ছোট-বউ তাহার মাথার পিছনে মস্ত একটা খোঁপা সৃষ্টি করিয়া, নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আর কাহাকেও না পাইয়া খুকীকেই ডাকিয়া বলিল, "দেখ, খুকী, দিদির কত বড় খোঁপা।"

খুকী বলিল, "ঠিক একটা চারপয়সার বেলুনের মত।"

ছোট-বউ দেখিল খুকীকে ঠিক রসিক বলা যায় না। সে তখন লতিকার হাতে মুখে ক্রীম্, পাউডার প্রভৃতি ঘষিয়া, তাহার রংএর উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইল। রংটা একটু ফরসা দেখাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বসন্তের দাগ কিছুতেই ঢাকা গেল না। সে হতাশ হইয়া বলিল, "একেবারে পেণ্ট্ করে দিলে হত, দাগগুলো বড় বোঝা যাচ্ছে।"

লতিকা তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "আমি ত আর বাইজী নই যে মুখ পেণ্ট্ করব।"

ছোট-বউ বলিল, "তোমার এক ঢংএর কথা। বাইজী ছাড়া কেউ বুঝি মুখ পেণ্ট্ করে না? আজকাল ঘরে ঘরেই হচ্ছে।"

মুক্তকেশী এই-সময় আসিয়া ঢোকাতে লতিকা আর কথা বলিল না। ছোট-বউ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ খুড়ীমা, তাদের খুব হালফ্যাশানের মেয়ে পছন্দ বলছিলেন না?"

মুক্তকেশী বলিলেন, "তাই ত শুনছি। খুব লেখাপড়া-গানবাজনা-ওয়ালা মেয়ে চায়।"

ছোট-বউ বলিল, "তাহলে গহনাগাটি বেশী পরাব না। পায়ে আল্‌তাও দেব না, আমার জরী দেওয়া নাগ্‌রা জুতোজোড়া এনেছি, সেইটেই পরিয়ে দেব। ওর পায়ে ঠিক হবে এখন। বেনারসী পরিয়েও কাজ নেই, ওর সেই রেশমের ব্লাউস্ আর আমার এই জরীপেড়ে মান্দ্রাজী শাড়ীটা ঠিক ম্যাচ্ করবে।"

মুক্তকেশী কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "অত সাদামাটা করে সাজালে ভাল দেখাবে কি ?"

ছোট-বউ বলিল, "আপনি জানেন না, খুড়ী মা, বেশী জবড়জং করলে ওদের পছন্দ হবে না। বল্‌বে লেখাপড়া শেখা মেয়ের এমন রুচি।"

মুক্তকেশী চুপ করিয়া গেলেন। সাজসজ্জার বিষয়ে ছোট-বউ নিশ্চয়ই তাঁহার চেয়ে বেশী বোঝে। তাঁহার নিজের অবশ্য ইচ্ছা ছিল লাল বেনারসী এবং গহনাগাটি পরাইয়া লতিকাকে দস্তুরমত সাজাইয়া দেওয়া হয়।

সব আয়োজনই এক রকম করিয়া হইয়া গেল। লতিকাকে এক রকম মন্দ দেখাইতেছিল না, মুখের দাগগুলা না থাকিলে রীতিমত ভালই দেখাইত। যদি তাহারা গান শুনিতে চায়, সেইজন্য একটা বন্ধ হারমোনিয়মও জোগাড় করিয়া আনা হইল।

বরের বাবা, একজন মামা, এবং আর দুইটি ভদ্রলোক বেলা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশবাবু সৌভাগ্যক্রমে যথাকালে আপিস হইতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি গভীর বিনয় সহকারে সকলকে বসাইলেন। কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, পাড়ার দুই চারি জন ভদ্রলোকও আসিয়া জুটিলেন। ছোট-বউএর শাশুড়ীও আসিয়া মুক্তকেশীকে খাবার গুছাইতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। লতিকা পাশের ছোট ঘরটায় বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল, ছোট-বউ দরজার ফাঁক দিয়া অভ্যাগতদের দেখিতে লাগিল।

প্রথম জলখাবার খাওয়ানো হইল। তাহার পর নীরদ আসিয়া লতিকাকে লইয়া গেল। মুক্তকেশী এবং অন্য গিন্নীটিও ছাড়া পাইয়া দোতলার ছোটঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

মেয়েকে দস্তুর মাফিক গুটিকয়েক প্রশ্ন করা হইল। লতিকা ঘাড় হেঁট করিয়া জবাব দিয়া গেল। তাহার সেলাই অনেকগুলি দেখান হইল। বরের বাপ সেগুলির প্রশংসা করিলেন। আর এক ভদ্রলোক গান শুনিতে চাহিলেন। লতিকা হারমোনিয়ম্ সহযোগে কোনমতে একটা গান গাহিয়া দিল। বিশেষ সুবিধার হইল না। বরের মামা বলিলেন, "গান শিখেছে বটে, তবে গলাটা বেশ দরাজ নয়।"

মুক্তকেশী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, "মেয়ে যেন সং! বাড়ীতে এর চেয়ে ঢের ভাল করে।"

লতিকা প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে বলিয়া শোনা গেল। যোগেশবাবু ইউনিভার্সিটীর কোনো এক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এ খবরে লতিকার মুখ যেন আরো ভার হইয়া গেল।

ইহার পর যত সব দেনাপাওনার কথা, মেয়ের বসিয়া থাকিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। সে আর দোতলায় না দাঁড়াইয়া সোজা তেতলায় নীরদের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল।

দেনাপাওনা লইয়াই যত গোলমাল সব ক্ষেত্রে হয়, এখানেও তাহাই হইল। বরের বাবা বলিলেন, মেয়ে তাঁহার একপ্রকার পছন্দই হইয়াছে, যদিও মুখের দাগগুলা না থাকিলেই হইত। তাঁহার একলার পছন্দে ত সংসার চলে না কিনা; আবার গৃহিণী আছেন, পুত্র স্বয়ং আছেন। যাহা হউক, বড়ছেলের বিবাহে সব ছাড়িয়া কেবল ক'নের রূপ দেখিতে গিয়া তিনি অত্যন্তই ঠকিয়াছেন, সে বউকে লইয়া পদে পদে মুস্কিল বাধিতেছে, সে না জানে কথা বলিতে, না জানে যথাযথ ব্যবহার করিতে। সুতরাং এবারে আর চেহারার খুঁৎ তিনি ধরিবেনই না। কিন্তু সব দিক দিয়া ত দাবী ছাড়িতে পারেন না, ইত্যাদি।

অর্থাৎ কিনা চার হাজার টাকার কমে বিবাহ হইবে না। মুক্তকেশীর মুখ আঁধার হইয়া আসিল। চার শ' টাকাও ত তাঁদের জমা নাই? গহনা বিক্রী করিয়া, দেশের ভিটাটুকু বাঁধা দিয়া টাকা যোগাড় করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আড়াই হাজার বড় জোর হইবে। বাড়ী বিক্রয় করিলে হয়ত আরো কিছু বেশী হইতে পারে, কিন্তু একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কি করিয়া? এখনও খোকার পড়াশুনা বাকি, খুকীর বিবাহও আছে।

পাশের বাড়ীর গিন্নী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "অত ভাবছ কেন বোন? চার হাজার বলে সুরু করেছে

বলে কি চার হাজারই থাকবে? ঐ আড়াই হাজারেই নাম্‌বে এখন। আমার ভোমার বেলা দেখলে না ছ' হাজার সাত হাজার, বিলাত যাওয়ার খরচ কত কি চাইলে, শেষমেষ ঐ সাড়ে চার হাজারেই মেয়ে পার করলাম না? ও সব দর করা আর কি?"

ঘণ্টাখানেক পরে বরপক্ষীয়েরা প্রস্থান করিলেন। বাড়ী গিয়া পরামর্শ করিয়া দুই একদিনের মধ্যে পাকা কথা দিবেন বলিয়া গেলেন। মেয়ের একটি ফটোগ্রাফ লইয়া গেলেন।

তাহার বিবাহ দিতে গিয়া বাবা মাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে শুনিয়া লতিকার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছিল। কি প্রয়োজন ছিল তাহার এমন বিবাহের? তাহাকে পড়াইতে ইহার চেয়ে ঢের কম টাকা লাগিত এবং সে পরে রোজগার করিয়া ইহার প্রতিদানও দিতে পারিত। ভাই বোনকে মানুষ করায় কত সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু না, এখনই ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে পার করিতে হইবে। মানুষে যদি আত্মহত্যা করিতে চায়, কে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে? মুখ দিয়া তাহার অনেক কথা ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু অভিমান ও রাগ তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিল। অন্ধ দেশাচারের কাছে পরিবার সুদ্ধ বলিদান হইতেছে, অথচ ইহার বিপক্ষে কথা বলিবার মানুষ নাই।

দিন দুই পরে পাত্রপক্ষের পাকা কথা আসিল। মেয়ের চেহারা কাহারও বিশেষ পছন্দ হয় নাই। বড়-বউএর পাশে ইহাকে অত্যন্তই কালো দেখাইবে। তবে তিনি বিবাহ দিতে এখনও প্রস্তুত, যদি টাকাকড়ি লইয়া গোলমাল না হয়। গহনার ফর্দ্দও একটা আসিল।

মুক্তকেশী বলিলেন, "কোথায় পাব চার হাজার টাকা? আমাদের বেচ্‌লেও হবে না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তবে অন্য সম্বন্ধ দেখা যাক্‌, এটা ছেড়ে দিই।"

গৃহিণী বলিলেন, "হাঁ, সম্বন্ধ রাস্তায় গড়াচ্ছে কি না? যা তোমার রূপসী মেয়ে! এইখানেই বলে কয়ে দর কমাও।"

কথা চলিতে লাগিল। অনেক হাটাহাটি বকাবকির পর তিন হাজারে রফা হইল। ইহাতেও খাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন না, এবং তাঁহার অসন্তোষ যে লতিকার উপরই বর্ষিত হইবে, তাহাও বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বাড়ী বাঁধা দিয়া এবং মুক্তকেশীর সব ক'খানি গহনা নিঃশেষে বিক্রয় করিয়া দুই হাজার সাতশত টাকা হইল। আরও তিনশ' টাকা খুব মোটা সুদে অনেক কষ্টে যোগেশ-বাবু ধার করিয়া আনিলেন।

লতিকার বিবাহ হইয়া গেল। সে ছাড়া সকলেই খুব স্ফূর্তি করিল। গোলমাল, বাজনা খাওয়া-দাওয়া, আলো, ফুল, সব মিলিয়া বিবাহোৎসবটা মন্দ জমিল না। লতিকাই কেবল মুখ আঁধার করিয়া রহিল। শুভদৃষ্টির সময় বর তাহার দিকে তাকাইয়াই ভীষণ ভ্রূকুটী করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। নিজের সমস্ত ভবিষ্যতের চেহারা লতিকার কাছে সেই ভ্রূকুটীর মধ্যেই ফুটিয়া উঠিল।

বাসর-ঘরে আমোদ মোটেই জমিল না। বরকে কেহই হাসাইতে বা কথা বলাইতে পারিল না। মেয়েরা বিরক্ত হইয়া অবশেষে এক এক করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

লতিকার দিকে ফিরিয়া, তাহার স্বামী তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে এমন করে ঠকাবার কি দরকার ছিল তোমাদের?"

লতিকার বুক ফাটিয়া আসিতেছিল,—এই তাহার সঙ্গে স্বামীর প্রথম কথা! অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ঠকানো হয়েছে?"

বর বলিল, "তোমার চেহারা এমন তা কেউ আমাকে বলে নি। ছবি পাঠান হয়েছিল, তাতে ত অন্য রকম দেখতে। তোমাকে আমি বন্ধু-বান্ধবের সামনে স্ত্রী বলে বার করব কি করে?" লতিকার ইচ্ছা হইল বলে, "নাই বা বার করলে?" কিন্তু বাঙালীর মেয়ে সে, অগত্যা চুপ করিয়াই রহিল।

পর দিন বর-ক'নে বিদায় হইয়া গেল। মুক্তকেশী কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন, মেয়ে কিন্তু শুষ্কমুখে চুপ করিয়াই রহিল। ছোট-বউ বলিল, "বড়সড় হয়ে বিয়ে হয়েছে, এখন কি আর মাকে ছেড়ে যেতে কাঁদবে? স্বামীর কাছ ছেড়ে আসতেই কাঁদবে বরং।"

মেয়ের বিবাহ দিয়া মুক্তকেশী যেন হাঁফ ছাড়িয়া ছিলেন। সব এক রকম খোয়াইতে হইল বটে, কিন্তু মেয়ের ত একটা গতি হইল? তাহার জন্য আর ভাবনা রহিল না। ছোট মেয়ের বিবাহের এখনও দেরি আছে, ততদিনে দুই ছেলে মানুষ হইয়া উঠিবে। মেয়ের বাপ বেচারা কিন্তু বড়ই অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন; —লতুমা তাঁহার ঘর একেবারে আঁধার করিয়া দিয়া গেল।

কিন্তু সংসারে মন ভালই থাক বা খারাপই থাক, দিন ত বসিয়া থাকে না। কাজও সমানেই করিতে হয়। যোগেশবাবু নিয়মমত আপিস যাইতে লাগিলেন। তবে আজকাল তাঁহার কাপড়চোপড়, জুতা, খাতাপত্র সবই লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। কাপড় যেখানে ছাড়েন, সেইখানেই পড়িয়া থাকে, ধোপার বাড়ীর কাপড় চেয়ারের উপর পড়িয়া ময়লা হয়, কেহ বাক্সে তোলে না। গৃহিণী রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর লইয়াই ব্যস্ত, এ-সব দেখিবার সময় তাঁহার নাই। খুকীর দ্বারা এখনও কোনো কাজই হয় না। বিশৃঙ্খলায় মুক্তকেশীর চড়া মেজাজ আরও চড়িয়া উঠিতে লাগিল। রাস্তায় মেয়েস্কুলের গাড়ীর দরোয়ান, "গাড়ী আয়া বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিলে, নিজের অজ্ঞাতেই তাঁহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিত।

লতিকা যাওয়ার পর চার পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার আলো সবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় গলির মুখে একটা গাড়ী আসিয়া থামিল। দরজা খুলিয়া একটা ঝি নামিয়া পড়িল, তাহার পিছনে একটি তরুণী। তাহাদের সঙ্গে একটা বড় কাপড়ের পুঁটুলী।

ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন বাড়ী বউদিদি?"

তরুণী লতিকা, তাহা বোধ হয় পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। সে বলিল, "গলির ভিতরে চল, ঐ যে ঐ বাড়ী। গাড়োয়ান দাঁড়াও, আমি পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ঝি বলিল, "আমি তবে আসি গে, বাড়ীর ভিতর আর যাব না, তোমার মা দেখলে গালমন্দ দেবে এখন। গাড়োয়ান তোমার কাপড়ের বোঁচ্‌কা দিয়ে আসুক।"

লতিকা বলিল, "আচ্ছা।" ঝি চলিয়া গেল।

মুক্তকেশী হেঁট হইয়া টিন হইতে লঙ্কা মরিচ বাছিয়া বাহির করিতেছিলেন, এমন সময় পরিচিত কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিয়া উঠিল, "মা, ছ' আনা পয়সা দাও ত? গাড়োয়ানকে দিতে হবে।"

মুক্তকেশীর হাত হইতে টিন পড়িয়া গেল। তিনি বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, দরজার কাছে তাঁহার মেয়ে দাঁড়াইয়া, পিছনে বোঁচ্‌কা হাতে গাড়োয়ান।

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "ও কি রে? এমন করে এলি যে?"

মেয়ে বলিল, "সব বল্‌ছি মা, আগে গাড়োয়ানকে বিদায় কর।"

গাড়োয়ান পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। লতিকা চৌকাঠের উপরই বসিয়া পড়িল। মুক্তকেশী আবার প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে, এ কি কাণ্ড? একলা এলি যে?"

লতিকা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে নিয়ে তোমার জামাই ঘর করতে পারবে না মা, আমি বড় বিশ্রী দেখতে। লোকের সামনে আমাকে স্ত্রী বলে বার করতে তার লজ্জা হয়, বড় জায়ের পাশে, ননদের পাশে, দাঁড়ালে আমাকে নাকি হাব্‌সীর মেয়ে মনে হয়।"

মুক্তকেশী পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তবে বিয়ে দিল কেন, লক্ষীছাড়া মুখপোড়ারা? আমার সব ত লুটে নিয়ে গেছে। আমি থানা পুলিশ করব, সহজে ছাড়ছি না। ও আসুক বাড়ী। অলক্ষুণে মিন্‌সে নির্ব্বংশ হোক, এমন করে মানুষকে ঠকায়! তোকে কি তাড়িয়ে দিয়েছে? আমি খোরপোষের নালিশ করব।"

লতিকা বলিল, "তাড়ায় নি মা, আমি নিজেই চলে এসেছি।"

মুক্তকেশী মেয়ের উপর চটিয়া উঠিলেন, "আ মোলো যা, ন্যাকা ছুঁড়ি, চলে এলি কেন? এর পর ওরা যদি আর ঘরে না নেয়? একেবারে একলা এসেছিস্?"

লতিকা বলিল, "একলাই আস্‌ছিলাম, ওদের বাড়ীর একটা ঝি দয়া করে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ওরা ঘরে নিতে চাইলেও আমি আর যাব না। মানুষের প্রাণে যতখানি অপমান সয়, তা আমার সওয়া হয়ে গেছে।"

মুক্তকেশী বলিলেন, "পাগলের মত বকিস্ না। আমরা

চিরকাল বেঁচে থাকব না, তখন তোর দশা কি হবে?"

লতিকা বলিল, "ওখানে গেলে যা দশা হবে, তার চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। আমি উপরে গিয়ে একটু শুই মা, পরে কথা বলব এখন।"

কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া সে উপরে চলিল। মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যারে গহনাগাঁটি সব খুলে নিয়েছে বুঝি?"

লতিকা বলিল, "সে ত যেদিন গেছি, সেইদিনই ওজন করবার জন্যে শাশুড়ী খুলে নিয়েছেন, তারপর আর দেননি।"

লতিকা উপরে চলিয়া গেল। মুক্তকেশী ক্রমাগত গালিবর্ষণ করিয়া চলিলেন, রান্নাও কোন মতে করিয়া চলিলেন।

যোগেশবাবু বাড়ী আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মুক্তকেশীর গালাগালির ভিতর দিয়া অনেক কষ্টে সত্য আবিষ্কার করিতে পারিলেন। নীরদও এইসময় আসিয়া জুটিল। চেঁচামেচি শুনিয়া পাড়াপ্রতিবেশীও দুই চারিজন হাজির হইল।

লতিকা ঘুমাইতে পারে নাই, শুইয়াছিল। তাহাকে আবার নামাইয়া আনা হইল। যোগেশবাবু তাহার নত মুখ তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এমন করে চলে এলি মা? ওরা ত এই নিয়ে ভয়ানক গোলমাল করবে।"

লতিকা স্থিরকণ্ঠে বলিল, "বাবা, যখন থেকে ও-বাড়ীতে ঢুকেছি, তখন থেকে শুনছি, আমি কালো, কুৎসিৎ, রাক্ষসীর মত দেখতে। তোমরা ঠগ্, জোচ্চোর, বোকা পেয়ে ছেলের বাপকে ঠকিয়েছ। আমি তাদের বাড়ীর ঝি হবার যোগ্য নই, তাদের মেথরানীও নাকি আমার চেয়ে দেখতে ভাল। যিনি দেখে শুনে বিয়ে দিইয়ে নিয়ে গেলেন, সেই শ্বশুরও আমার হয়ে একটি কথা বললেন না। যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ, তিনি বললেন, বাবা মা তাকে ত্যাগ করলেও এই কাফ্রীর মত বউ নিয়ে তিনি ঘর করতে পারবেন না। শাশুড়ী শুনে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন 'কোথাকার পেত্নী ডাইনী এসে আমার ছেলেকে প- করে দিলে। দূর হ, বেরো বাড়ী থেকে!' আ- বাঙালীর মেয়ে হলেও ত মানুষ মা? আর পারলাম না, চলে এলাম।"

নীরদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বেশ করেছিস্! হতভাগা রাস্কেলের মাথা আমি একদিন রাস্তায় গুঁড়ো করে দেব। নিজে ত য়্যাপলো বেলভেডিয়ারের মত দেখতে কি না? শুকনো বাদুড়ের মত চেহারা!" যোগেশবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে কথার ঝড় বহিয়া চলিল।

পর দিন শ্বশুরবাড়ী হইতে লোক মারফত খুব তর্জ্জন আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা ভদ্র লোকের ঘর জানিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়ের ব্যবহার দেখিয়া বংশ সম্বন্ধে নাকি তাঁহাদের সন্দেহ হইতেছে। যোগেশবাবু যদি অবিলম্বে মেয়ে লইয়া আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ছেলের অন্য বিবাহ দিবেন।

মুক্তকেশী বলিলেন, "তাই যাও না হয়। জগতে ধর্ম নেই। তা না হলে এমনটা হয়? মেয়ের জন্ম দিয়েছ যখন, তখন মাথা হেঁট করতেই হবে।"

লতিকা বাঁকিয়া বসিল; বলিল, "তোমরা দুখানা করে কেটে ফেললেও আমি আর ও-বাড়ী যাব না। খেতে দিতে না পার, বার করে দাও, আমি চাকরী করে খাব।"

নীরদ বলিল, "কে তোকে খেতে দেবে না? আমি আজই একটা ট্যুইশনি নিচ্ছি ত্রিশ টাকার। তোর খাওয়াও চল্‌বে, পড়ার খরচও চল্‌বে।" যোগেশবাবু ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমি বেঁচে থাকতে আমার মায়ের খাওয়ার ভাবনা হবে না; বাবা মরার পর কে দেখবে?"

নীরদ বলিল, "ওকে এমন করে মানুষ করব, যে, ঐ দশটা মানুষকে দেখতে পারবে। কত দেশের কত মেয়ে আজীবন অবিবাহিত থেকে, দেশের কাজ, সমাজের কাজ করছে, বাঙালীর মেয়ে কিছু সৃষ্টিছাড়া নয়, যে, সে তা পারবে না।

মুক্তকেশী বলিলেন, "আচ্ছা, তা আজ না হয় থাক, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। আজকে লিখে দাও, যে, মেয়ের ভয়ানক জ্বর, সারলে পরে পাঠাব।"

যোগেশবাবু তাহাই লিখিয়া দিলেন।

দিন কতক আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাহার পর হঠাৎ গোলাপী খামে এক বিবাহের নিমন্ত্রণ আসিয়া পৌঁছিল। লতিকার স্বামী আবার বিবাহ করিতেছে।

মুক্তকেশী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া গালি দিয়া, পাড়া মাথায় করিয়া তুলিলেন।

লতিকা কলেজে যাইবার জন্য বই গুছাইতেছিল। সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে মা?"

মুক্তকেশী বলিলেন, "তোর সর্ব্বনাশ হয়ে গেল রে! মরুক্ নরকে গিয়ে, আজই মরুক, নূতন বৌ নিয়ে আর যেন ঘরে ঢুকতে না হয়!"

লতিকা চিঠিখানা পড়িয়া দেখিল। বলিল, "ভালই হল মা। যে-ঘর ছেড়ে এসেছি, সে-ঘরে ফিরবার আর কোনো উপায় রইল না। জানি কোন কালেই সে-ঘর আমার সুখের হত না, তবু মানুষের মনের আশা মরে না। আজ থেকে সমস্ত মন দিয়ে নিজেকে মানুষ করার চেষ্টা করতে পারব।"

খোকা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদির বর আবার বিয়ে করছে জান মা? নিজে দেখে করছে। বাছাধন যা জব্দ হবেন!"

মুক্তকেশী কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে?"

খোকা বলিল, "আমাদের ক্লাশের মাধবের কাকার মেয়ের সঙ্গে মা। সে মেয়ের রং বেশ ফরসা, কিন্তু বোবা কালা।"

মুক্তকেশী বলিলেন, "এবারে নিব্বংশে বুড়ো দেখতে যায় নি?"

খোকা বলিল, "সেই ত মজা! বাবুসাহেব তাকে রাস্তা থেকে দেখে পছন্দ করেছেন। ওরা ত খুব খুসি! আমি সব কথা বলায় মাধব বল্লে, 'তোর দিদি ত আর যাবেনা ওর কাছে? ফাঁকতালে আমাদের একটা উপকার হয়ে যায় ত ক্ষতি কি? যারা এত পাজী, তাদের ঠকালে পাপ নেই'।"

বীরভূমের বিবিধ শিল্প

শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এ

১—স্থপতি-শিল্প

বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী রাজনগর এবং বীরভূমের অন্যান্য বহুস্থানের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলি তদানীন্তন-কালের স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজনগরে হিন্দুরাজগণের কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠান ফৌজদারগণ নির্ম্মিত আবাসগৃহ, মস্‌জিদ্, তোষাখানা প্রভৃতির যে ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা মুসলমান-শিল্পীরই কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে।

বীরভূমের রসা, দুবরাজপুর প্রভৃতি বহুস্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তারাপুর, ডাবুক, কঙ্কেশ্বর, ভাণ্ডীরবন প্রভৃতি স্থানের সুবৃহৎ দেবমন্দিরগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইহাদের মধ্যে অনেক মন্দিরই দেড়শত হইতে দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত—ততোধিক কালের নহে। ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরগাত্রে ছাঁচে নির্ম্মিত পোড়া-মাটির বহু পৌরাণিক ছবি সংলগ্ন আছে। সেই সকল ছবিগুলি এখনও বেশ সুস্পষ্ট ও শিল্পীর শিক্ষাগৌরবের নিদর্শন।

কাষ্ঠতক্ষণ-শিল্প স্থাপত্যশিল্পেরই অন্তর্গত। মৃন্ময়

গৃহে চালের সাজে নানাবিধ মূর্ত্তি গঠন করিয়া সূত্রধর গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিত। পূর্ব্বে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের তাদৃশ প্রচলন ছিল না। এখনও কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে বাস করেন। মৃন্ময়গৃহের চালের সাজে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া ধনিগণ সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণের সখ মিটাইতেন। এই সুযোগে সূত্রধরগণ মৃন্ময়গৃহে ও কাষ্ঠের উপর নানাবিধ উপায়ে তক্ষণশিল্পের নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারিত।

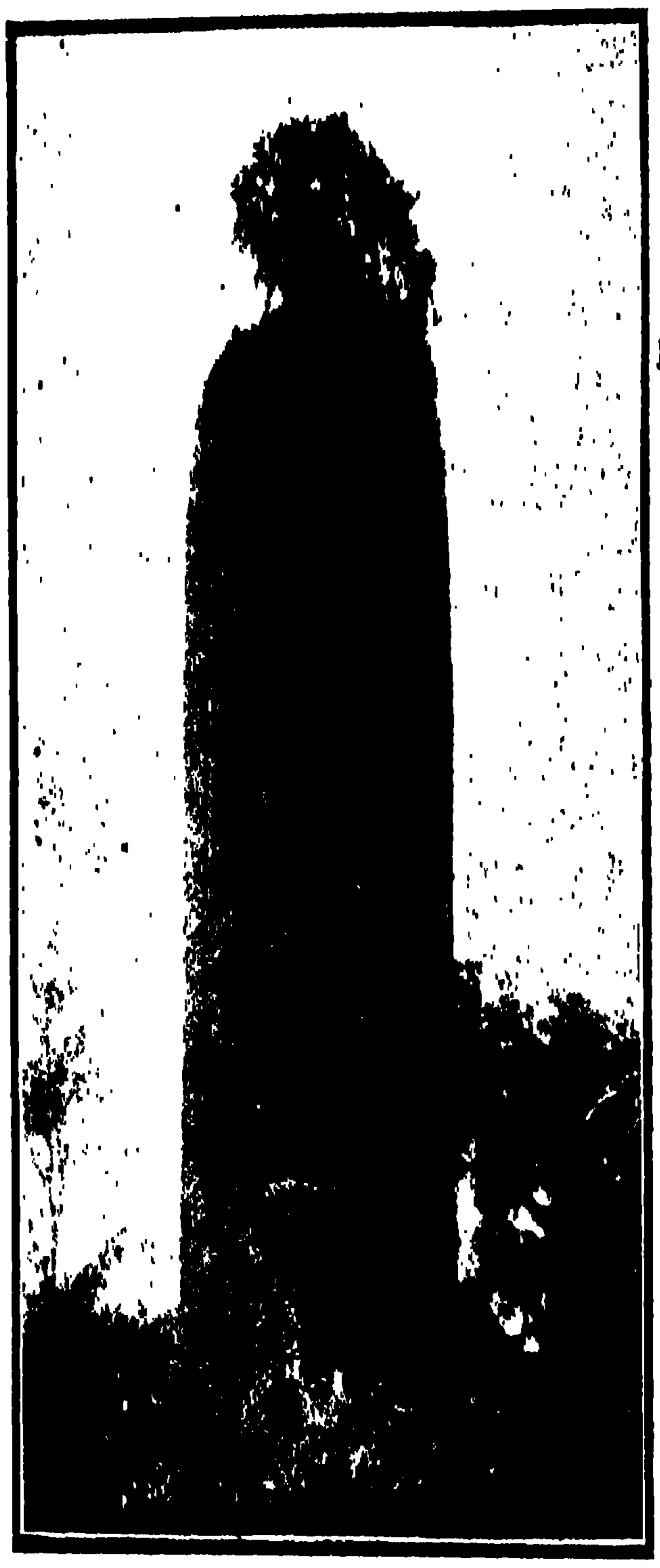

ঢেকুরে ইছাই ঘোষের দেউল

কাষ্ঠনির্ম্মিত সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য রথ প্রস্তুত করিয়া সূত্রধরগণ নিজ নিজ শিক্ষা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে যত্নপর হইয়াছে।

বক্রেশ্বরের নিকটে তাঁতিপাড়া, করিধ্যা, সিউড়ী প্রভৃতি স্থানের সূত্রধরেরা কড়ি, বরগা, দুয়ার, জানালা, কপাট, চৌকাঠ, গাড়ী ইত্যাদি মোটা, ও ব্রাকেট, ঝাড়, চেয়ার, টেবিল, আল্‌না, ছবি বাঁধিবার ফ্রেম, শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণমুখ, দোয়াতদানী প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম কাজ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছে।

কাঠ খোদাই চিত্রপদ্ধতিও এখানে অনেকদিন যাবতই আছে। মাটির ছবির মুখ এবং নানারূপ পশুপক্ষীর আকৃতিগুলি কাঠের কিংবা পাথরের ছাঁচের সাহায্যেই

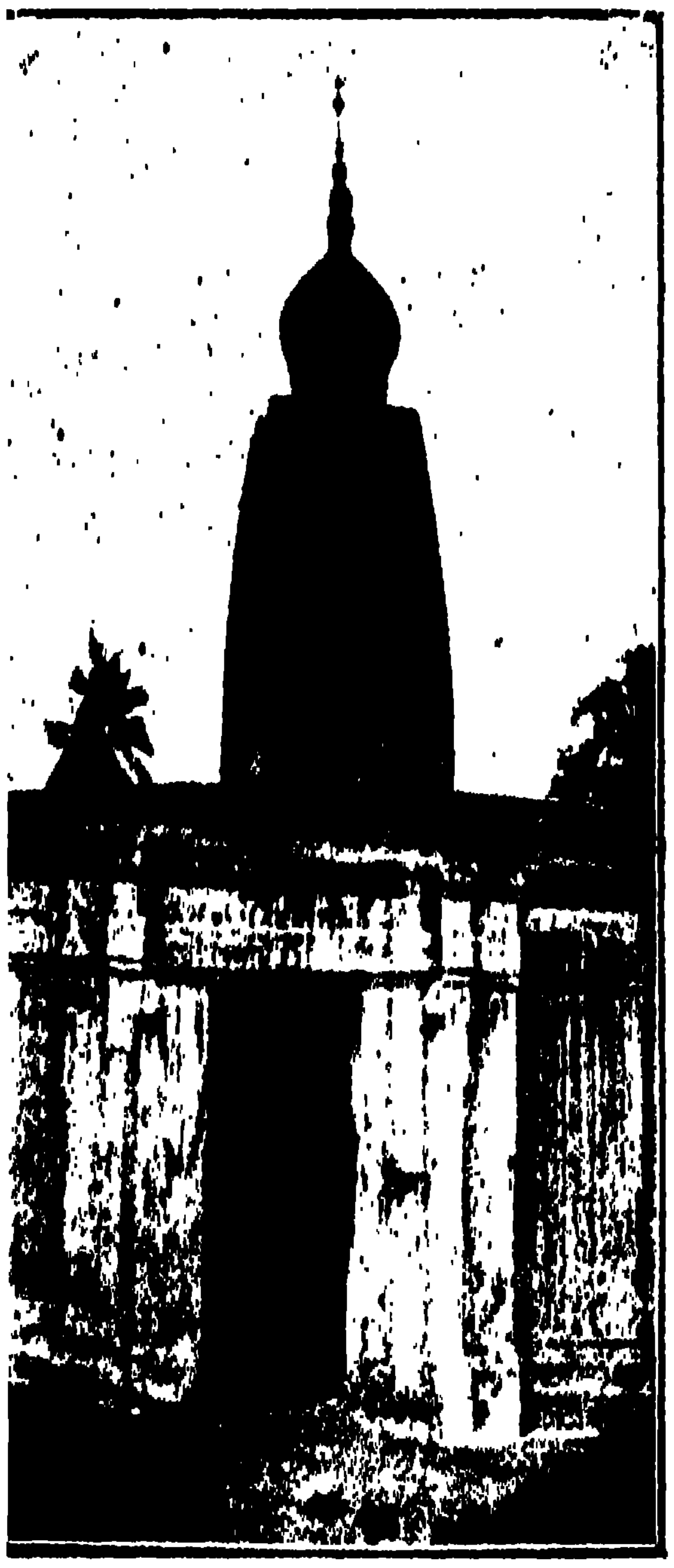

বক্রেশ্বর—শ্রীশ্রী৺বক্রনাথের মন্দির

গড়া হয়। মালাকারদের চাঁদমালার ছবিগুলিও কাঠের উপর খোদাই করা ছাঁচ দিয়াই ছাপা। এখানকার সূত্রধরেরা এইরূপ ছাঁচ খোদাই করা ছাড়া আম, আতা, লিচু, মাছ, গোলাপ ফুল, তালবীচি ইত্যাদি বহু প্রকার দ্রব্যাদির ছাঁচ কাষ্ঠের উপর খোদাই করিতে পারে। এই খোদাই কার্য্যে শিল্পকারীর শিল্প-নৈপুণ্যের ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপ ছাঁচ তৈয়ারী করিবার সময় শিল্পকার সাধারণতঃ সেগুণ কাঠের উপর দাগ করিয়া লইয়া ছোট বাটালির দ্বারা কুরিয়া কুরিয়া অনুরূপ চিত্র খোদাই করে। সময় সময় দাগ কাটিয়া না লইয়াও শিল্পকারী ঠিকমত ছাঁচ খোদাই করিতে পারে। আম আতা প্রভৃতির এক জোড়া ছাঁচ খোদাই করিতে

শিল্পীর বিশ ত্রিশ মিনিটের অধিক সময় লাগে না। অথচ এইরূপ একজোড়া ছাঁচের মূল্য দশ পয়সা হইতে বার পয়সা। সকাল ছয়টা হইতে দশটা এবং বেলা একটা হইতে পাঁচটা এই আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া শিল্পকারী কম পক্ষে আট জোড়া ছাঁচ খোদাই করিতে পারে। অর্থাৎ বিশ্রাম করিয়াও শিল্পী ঐরূপ সময়ে ছাঁচ খোদাই করিয়া তিন টাকা উপায় করে। শিল্পী সর্ব্বদাই এইরূপ খোদাই-কার্য্যে লিপ্ত নহে, তবে বরাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বরাতমত ছাঁচ খোদাই করিয়া দিতে পারে।

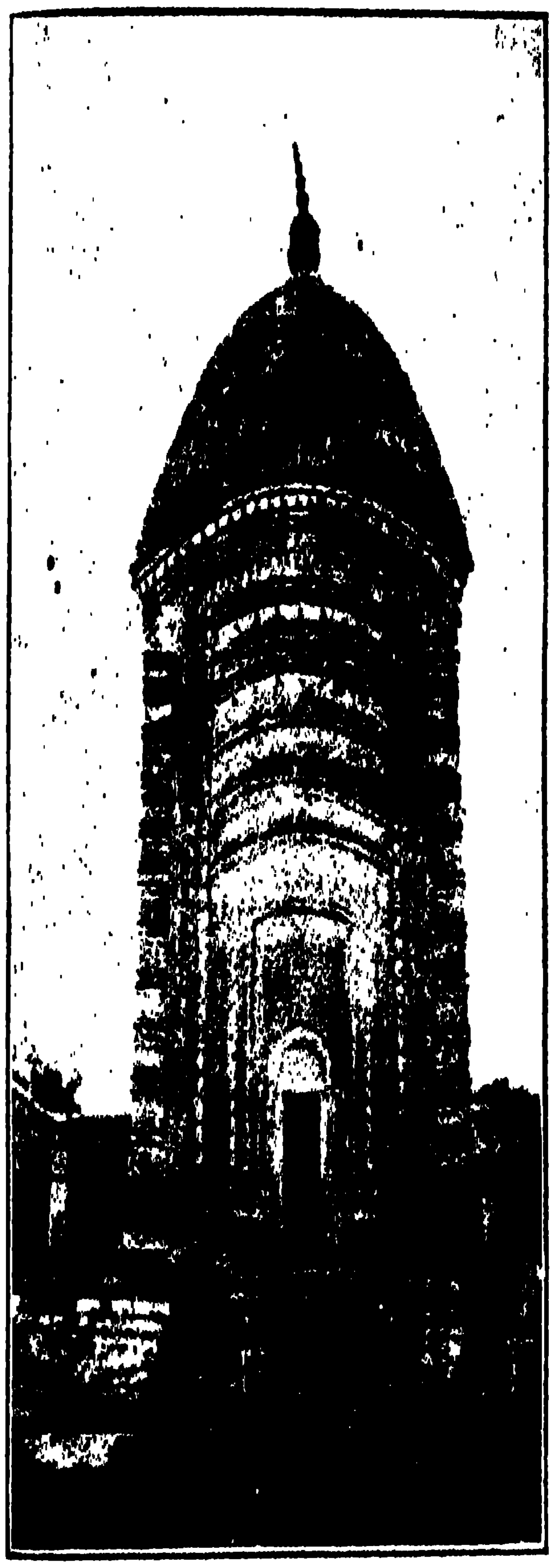

ডাবুকেশ্বরের মন্দির

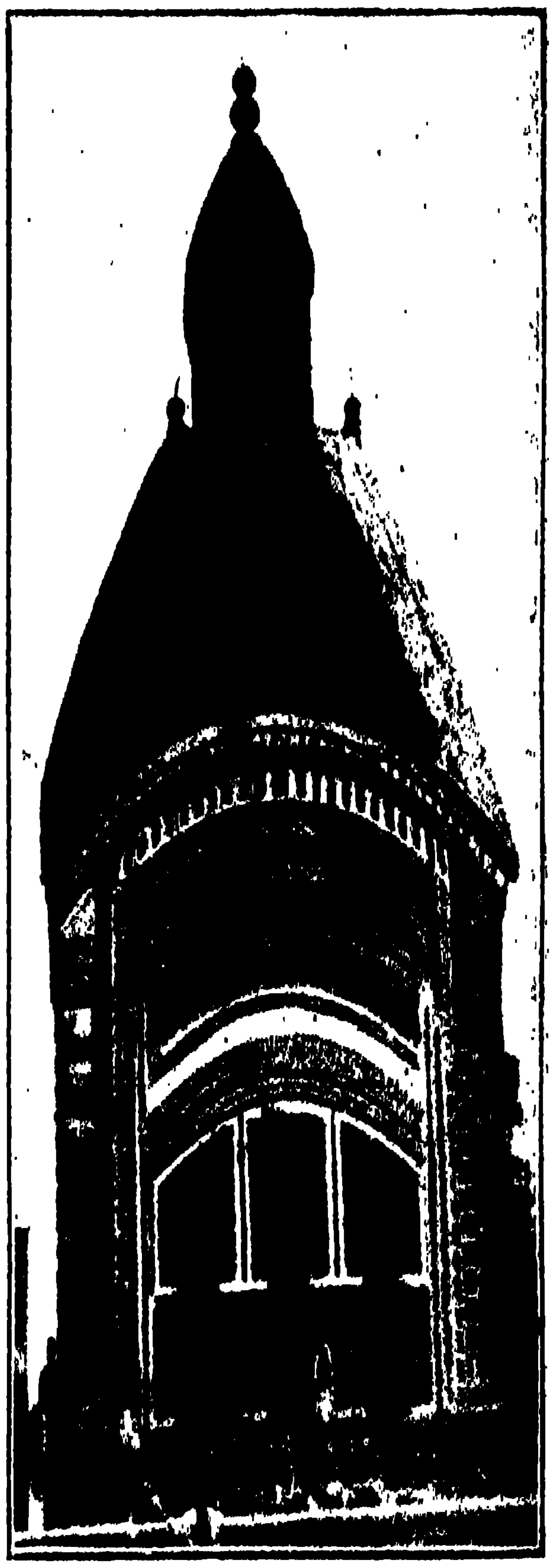

তারাপুরের তারাদেবীর মন্দির

২—ভাস্কর্য্য ও মূর্ত্তি-শিল্প

বীরভূমের বহুগ্রামে প্রস্তর-খোদিত অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি তদানীন্তন-কালের ভাস্কর্য্য-শিল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। এই মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই বৌদ্ধযুগের নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এইস্থলে কয়েকটি মূর্ত্তির ও মূর্ত্তির প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ করিলাম—এই মূর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি পুরাতত্ত্ববিৎগণের এতকাল অজ্ঞাত ছিল।

(১) ভদ্রকালী গ্রামে তিনহাত লম্বা ও দুইহাত চওড়া কৃষ্ণপ্রস্তরের খোদিত অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি ;

(২) বীরনগরের দক্ষিণে মথুরাপুর বা মহুয়াপুর গ্রামে একটি অতি প্রাচীন হরগৌরীর ছোট আকারের যুগলমূর্ত্তি ;

(৩) ভাদীশ্বর বা ভদ্রেশ্বর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে হরগৌরীর আর একটি সুন্দর যুগলমূর্ত্তি ও একটি মনসা মূর্ত্তি ;

(৪) ভাদীশ্বর গ্রামের দুই মাইল পূর্ব্বে প্রাচীকোট-

বা পাইকোড় গ্রামে নরসিংহ অষ্টদুর্গাদেবী, সূর্য্যমূর্ত্তি, একটি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ও অন্যান্য অনেকগুলি ভগ্নমূর্ত্তি ;

(৫) নলহাটির নিকট বালা বা বারানগরের ভুবনেশ্বরী, অষ্টভুজা, সূর্য্য ও অন্যান্য কয়েকটি মূর্ত্তি ;

(৬) তিলোরা গ্রামে ব্রহ্মা, হিরণ্যকশিপু ও গঙ্গামূর্ত্তি ;

বারাগ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভুজামূর্ত্তি

(৭) সাগরদীঘির সূর্য্যমূর্ত্তি ;

(৮) কুমারষাণ্ডাগ্রামে গঙ্গামূর্ত্তি ;

(৯) ভদ্রপুরে অবলোকিতেশ্বর ও তৎসন্নিকট দেব-গ্রামের বুদ্ধমূর্ত্তি ;

(১০) অজয় তীরবর্ত্তী দণ্ডেশ্বরের ফুলবেড়ের ফুলেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি ;

(১১) তারাপুরে পার্ব্বতী ও সূর্য্যমূর্ত্তি ;

(১২) মৌরেশ্বরে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি ;

(১৩) বক্রেশ্বরে হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি ;

(১৪) নান্নুরে বিশালাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি ;

(১৫) সিউড়ীর ডোমগৃহে কালী বলিয়া পূজিত বাসুদেব মূর্ত্তি ;

(১৬) কোটাসুর ও ডাবুকের বাসুদেব মূর্ত্তি ;

বক্রেশ্বরে প্রাপ্ত হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি

(১৭) নন্দীগ্রামের গণেশজননীমূর্ত্তি ;

এই সমস্ত মূর্ত্তির সকলগুলিই বীরভূমের ভাস্কর দ্বারা প্রস্তুত কিনা তাহার স্থিরতা নাই। কতকগুলি মূর্ত্তি স্থানান্তর হইতে আনীত এবং কতকগুলি স্থানীয় ভাস্কর দ্বারা প্রস্তুত বলিয়াই অনুমান হয়।

তাঁতিপাড়া, কড়িধ্যা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে শাঁখের শাঁখা তৈয়ারি হয়। শাঁখারিরা শাঁখার উপর নানারূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদাই এবং অনুরূপ চিত্র খোদিত

করিতে পারে। মসৃণ ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট শাঁখাগুলি জোড়া প্রতি যথাক্রমে দেড়-দুই টাকা ও চার-পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

৩—ধাতু-শিল্প

বীরভূমের প্রায় অনেক গ্রামেই কংসবণিকের বাস। নলহাটি, দুবরাজপুর, ইলামবাজার, হাজরাপুর প্রভৃতি গ্রামের কাঁসারীদিগকে কাঁসা ও পিত্তলের নানারূপ বাসন গড়িতে দেখা যায়। কাঁসার জিনিষগুলি চার পাঁচ টাকা সের দরে বিক্রয় হয়। কাঁসা পিত্তলের বাসন ছাড়া দুবরাজপুরে জাঁতী কাঁচি এবং ছুরিও গড়া হয়। জাঁতীগুলি পাঁচ আনা হইতে আট আনা দরে বিক্রয় হয়। থালা, বাটি, গেলাস, ইত্যাদি গড়িতে হইলে প্রথমতঃ কাঁসা গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া লয়। পরে উহা চাঁচিয়া-ছুলিয়া পালিশ করে। বীরভূমের বাৎসরিক কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীতে এই স্থানের কারিকরেরা তাহাদের কার্য্যে এইরূপ নিপুণতা দেখাইয়া অনেকবার অনেক মেডেল ও প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছে।

খয়রাশোলে লোহার অতি সুন্দর সিন্দুক ও খড়্গ গড়া হয়। টেকর লোহার গাড়ুর সুখ্যাতির কথা নানাদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

দুবরাজপুরের সন্নিকট শঙ্করপুরের কারখানায় জগদেচেলের প্রচুর ছুরী তৈয়ারী হয়। এই ছুরীগুলি সাত-আট টাকা হইতে দশ-বার টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

বীরভূমের পুরাতন রাজধানী রাজনগরের ছয় মাইল দক্ষিণে লক্ষ্মীপুর বা লোকপুর গ্রামে কাঠের নির্ম্মিত সের-পাই (bowls) ইত্যাদির উপর কাঁসা পিত্তলের কারুকার্য্য-দ্বারা মণ্ডিত করা হয়। এই মাপগুলি এখন দশ সের হইতে এক ছটাক পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে সেট বাঁধিয়া সম্প্রতি ইংরাজ ও ধনিগণ গৃহসজ্জারূপে অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। একসেট দশ সের হইতে এক ছটাক পর্য্যন্ত আটটি পাত্রের মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ সের হইতে এক ছটাক পর্য্যন্ত এক সেটের মূল্য ত্রিশটাকা। একসেট আড়াই সের হইতে এক ছটাক পর্য্যন্ত ছয়টি পাত্রের মূল্য বিশ টাকা এবং এক সেট এক সের হইতে এক ছটাক পাঁচটি পাত্রের মূল্য দশটাকা। যাহা এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য ছিল, তাহা এখন ধনিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় অতি উচ্চদরে বিক্রয় হইতেছে। বীরভূমের কুত্রাপি এরূপ সেরপাই প্রস্তুত হয় না। তবে ঢেকারু ও লোহার প্রভৃতি জাতিগণ পিত্তলের সহিত খাদ মিশাইয়া সেরপাই ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলি ঢালাই করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

নন্দীগ্রামে প্রাপ্ত গণেশজননী মূর্ত্তি

৪—মৃৎ-শিল্প

পুরাতন ও আধুনিক মৃৎশিল্পের আদর্শ দেখিয়া এখানকার এই শিল্পের প্রাচীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান লাভ করা যায়।

মৃৎশিল্পের প্রচলন একরূপ লোপ পাইলেও বিশেষভাবে রাজনগরের কুমোরেরা এখনও নানারূপ দেবদেবী, জীবজন্তু

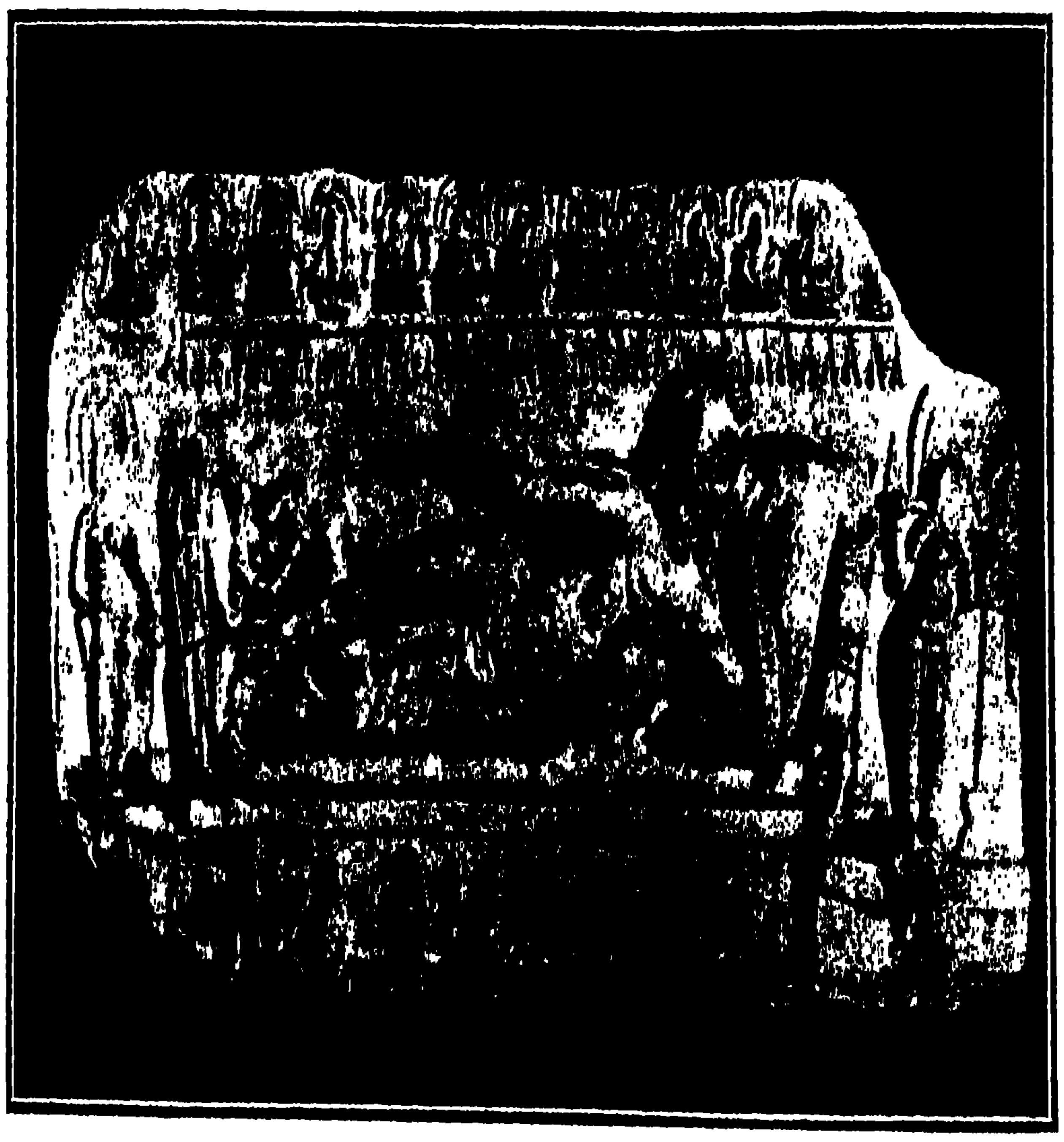

লাহাকর গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণজননী মূর্ত্তি

ফলমূলের এবং ছোট ছোট ভাঁড়বিশিষ্ট ঝাড় গড়িয়া মেলায় বিক্রয় করে। এই শিল্পগুলি সাধারণতঃ ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলনারূপেই ব্যবহৃত হয়।

এই পুত্তলিগুলি পোড়ান হইলে পর বেল বা তেঁতুল-বীচির আঠার সহিত ইচ্ছামত রঙ্ মিশাইয়া রঙ্ করা হয় এবং পরে হরিদ্রাবর্ণের মাটি, আম গাছের ছাল চূর্ণ ও সাজিমাটি মিশাইয়া পালিশ করা হয়। যে ছবিগুলি রঙ করিবার আবশ্যক হয় না সেগুলি ঘামতেল মাখাইয়া অভ্রচূর্ণ দিয়া বিক্রয়ের উপযোগী করিয়া তোলে।

গুগুণপুর, ভেজ্ঞেনা, বজ্রপুর, বেয়েরা, বসন্তপুর, আমাইপুর, কচুজোড়, কালীতলা, জিউই, দোড়ে, রাতগড়া, লাঙ্গুলে প্রভৃতি স্থানের কুমোরেরা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্য না করিয়া সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় হাঁড়ি, হোলা, ভাঁড়, কড়াই, কল্‌কে, জালা, জেলো, গেলাস, বাটি, প্লেট, কুঁজো, পিলসুজ, চালভাজাখাপুরি, কূপের পাট বা বারা, ছাদের টালি, নল, ফুলের টব প্রভৃতি জিনিষগুলিই গড়িয়া থাকে।

হাঁড়ি, হোলা ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে মাঠের বা নদীর ধারের এঁটেলমাটি আনিয়া তিন চারি দিন জল দিয়া পচাইয়া পরে সামান্য ছাই ও বালি মিশ্রিত করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়।

সুবিধামত ঘরের ভিতর বা চালাতে চার হাত ব্যাসের গর্ত্ত করিয়া একটি তেঁতুলগাছের গোঁজ আল্‌গাভাবে বসাইতে হয়। এই গোঁজের উপর এমনভাবে চাকা বসান হয় যে চাকা একটু নাড়া পাইলেই যেন ঘুরিতে পারে। চাকার এক স্থানে একটি ছিদ্র থাকে; তাহাতে ছোট লাঠি লাগাইয়া চাকা ঘোরান হয়। চাকার কেন্দ্র-স্থলে মাটি রাখিয়া চাকা ঘুরাইয়া শিল্পী হাত দিয়া নিজের ইচ্ছামত জিনিষ গড়িয়া ফেলে। জিনিষ তৈয়ারী হইলেই শক্ত সূতা দিয়া কাটিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। দরকার হইলে এই সময় কারিকর পাত্রটিকে দাগ দিয়া নানারূপ চিত্র-বিচিত্র করে।

সমস্ত জিনিষই চাকা দিয়া গড়া হয় না। কূপের পাটা বা বারা, জালা ইত্যাদি জিনিষগুলি প্রথম হইতেই হাত দিয়া পিটাইয়া গড়িতে হয়। তবে ইহার মুখ বা কানাগুলি চাকা ঘুরাইয়া গড়িয়া লইতে হয়। হোলা, কড়াই ইত্যাদি জিনিষগুলি কুমোরদের মেয়েরা হাতেই গড়িয়া থাকে। এই সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী করিতে আদৌ চাকার সাহায্য লইতে হয় না। এইরূপ হোলা কড়াই তাহাদের মেয়েরা দৈনিক বিশ পঁচিশটি করিয়া গড়িতে পারে। আজকাল কড়াই ও হোলার দাম দুই পয়সা হইতে চার পয়সা; সুতরাং গৃহকর্ম্ম সারিয়া মেয়েরাও দৈনিক মন্দ উপায় করে না।

৫—চারু ও কারু-শিল্প

আমাদের দেশের মেয়েরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের অভাবাদি মিটাইয়া অবসর সময়ে পুরাতন কাপড়ের কত কাঁথা, লতাপাতা-বিশিষ্ট সুজ্‌নি, খাঞ্চাপোষ, জালের গেঞ্জি, মোজা, চিত্রবিশিষ্ট মখমলের জুতা, নানাপ্রকার লতাপাতা ও চিত্রিত করা বালিস ঢাকনি, ছোট ছেলেমেয়েদের জামা, প্যান্ট, রুমাল, নানাপ্রকার লেস, আসন ইত্যাদি বহুপ্রকার কারুশিল্প প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মহিলাগণ এবম্বিধ শিল্পকার্য্যে আবহমানকাল অভ্যস্ত।

মাটির দেওয়ালে গেরিমাটি, খড়িমাটি, কাঠকয়লার কালি প্রভৃতির দ্বারা চিত্রাঙ্কন দেখিতে অতিশয় সুন্দর।

৬—চর্ম্ম-শিল্প

লুপ লাইনে অবস্থিত নলহাটি গ্রামে চর্ম্ম সংস্কারের বৃহৎ কারখানা আছে। এখানে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, বনবিড়াল, নানা জাতীয় সাপ, কুমীর ইত্যাদি সরীসৃপের চর্ম্ম সংস্কার করা হয়। এইস্থানের চর্ম্ম-সংস্কারকগণ বীরভূম কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে চর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্যে নিপুণতা ও কৃতিত্ব দেখাইয়া বহু প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছে। এইস্থানের চর্ম্ম-শিল্প দিন দিন প্রচার ও প্রসার লাভ করিতেছে।

তাঁতিপাড়া গ্রামেও এই চর্ম্মসংস্কার-কার্য্যের একটি কারখানা খোলা হইয়াছে।

দেশবিখ্যাত ঠনঠনিয়ার চটির নির্ম্মাতাদের অধিকাংশই বীরভূম অন্তর্গত নাকড়াকোন্দা অঞ্চলের চর্ম্মকারগণ।

৭—বাঁশের কাজ

বীরভূমের প্রায় সর্ব্বত্রই অগণিত ডোমের বাস। দুবরাজপুর, বিষ্ণুপুর, সিউড়ী, ভাণ্ডীরবন প্রভৃতি গ্রামের ডোম, মৌলী ও অন্যান্য নীচ জাতি বাঁশের টোকা, পেছে, চালুনী, কুলো, পাখা, টাপা, চিক, বাজুই, খলপা, মোড়া, চেয়ার, লাঠাই, ডোল, ঝাঁচি, ঝাকড়ি, খারুই, মাথালি প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে আবার পাখা, কুলো, টোকা, পেছে, মাথালি প্রভৃতি জিনিষগুলি সাধারণতঃ ডোমেদের মেয়েরাই তৈয়ারী করিয়া থাকে।

ডোমেদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে একত্রে কাজ করিয়া দৈনিক গড়ে বার আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

৮—চিত্র-শিল্প

এখানকার পটুয়াগণ প্রায় পঁচিশ ত্রিশহাত লম্বা কাপড়ে পাতলা মৃত্তিকালেপের উপর কাগজ আঁটিয়া রামলীলা বা কৃষ্ণলীলার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি চিত্রিত করে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে সমগ্র রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার চিত্র প্রদর্শনকালে স্বরচিত গান করিয়া চিত্রিত বিষয় পরিস্ফুট করিয়া তোলে। তাহারা স্বরচিত গানসহ এইরূপ চিত্র প্রদর্শন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই চিত্রপটের শেষভাগে সামাজিক রহস্যমূলক চিত্র এবং যমালয়ের দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া তাহারা জনসাধারণের জ্ঞানোন্মেষ করিবার চেষ্টা করে।

বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এখনকার মত ঘরে ঘরে কাঁচে ঢাকা ফ্রেমে আঁটা ছবি বা তস্‌বীর প্রচলন ছিল না। বাঁশের কাবারী বাঁধিয়া মৃত্তিকালেপ-সংযুক্ত বস্ত্রের উপর পটুয়াগণ রামলীলা বা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্র অঙ্কিত করিয়া পুরাতন বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে গৃহস্থগণকে ইহা প্রদান করিত। পল্লীবাসী গৃহস্থগণ তাহাই দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত। এইরূপ চিত্র এখনও প্রাচীন পল্লীগৃহে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুঁথির পাটাতে ময়দা, খইল, বেল বাব্‌লার আঠা ইত্যাদি লেপন দিয়া পটুয়া, সূত্রধর ও মালাকারগণ চিত্র অঙ্কন করিত। এই চিত্র ভারতীয় কলার নিদর্শন-স্বরূপ এখন সমাদর লাভ করিতেছে।

কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ বীরভূমের বহুস্থানে আছে। সেই রথগাত্রে পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্রাবলী ঐ পটুয়া বা সূত্রধরগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়া থাকে।

অনেক দেবায়তনের নাটমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে চিত্রকরগণ বহুবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার শোভাবর্দ্ধন

করিত। ইহার নিদর্শন এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য এই সকল শিল্পী বা চিত্রকরগণ পূর্ব্বপ্রথা বা চিত্রাঙ্কন প্রতিভার কোনরূপ উন্নতি দেখাইবার চেষ্টা করে না।

৯—সঙ্গীত-শিল্প

সঙ্গীত বেদ বা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এখনও তাহাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইভাবে ভারতের সর্ব্বত্রই সঙ্গীতের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের বঙ্গে এই সঙ্গীতের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা আলোচনায় বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন-সঙ্গীত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বীরভূমে জগদ্বিখ্যাত ভক্তকবি জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন বা সঙ্গীত এখনও জনসমাজে অতুলনীয় আদরে গীত হইয়া আসিতেছে। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ে কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মনোহরসাহী গরানহাটি ও রেনেটি এই তিনটি মূল এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ধারার কথা জানিতে পারা যায়। ভাবুক ও সঙ্গীতজ্ঞগণ যে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই কীর্ত্তন-সঙ্গীতের বিশিষ্টতার ছাপ অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহাই কীর্ত্তন সঙ্গীতের মনোহরসাহী কীর্ত্তনের ধারা বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই মনোহরসাহী কীর্ত্তনীয়াগণের উত্তর-বংশীয় এক শাখা বীরভূমের অন্তর্গত খয়রাসোল থানার অধীন ময়নাডাল গ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। মিত্রঠাকুর-বংশীয়গণ এই কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মনোহরসাহী ধারার তাল, মান ও সঙ্গীতের অপূর্ব্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কণ্ঠসঙ্গীতে এবং মৃদঙ্গবাদ্যে একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছেন। বহুদেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া এখানে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিদেশ হইতে আগত শিক্ষার্থিগণ আহার এবং বাসস্থানও বিনাব্যয়ে প্রাপ্ত হন।

বীরভূমের রামবাটি নিবাসী পরমানন্দ অধিকারী (অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দী) শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রার পালা রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত।

যাত্রাসঙ্গীত

নীলকণ্ঠের দলের প্রধান গায়ক বীরভূমের ইটণ্ডা নিবাসী গদাধর দাস (১২৬৪-১৩১৪) যাত্রাসঙ্গীতের যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কালীগায় প্রভৃতি ওস্তাদি সঙ্গীতে সমধিক অগ্রসর ছিলেন।

কবিসঙ্গীত

বীরভূমের কবিওয়ালাগণের মধ্যে লালু নন্দলাল, বরুণ নিবাসী রসিহারি রায় (১১৫০-১২৫৬) ও তাঁহার পুত্র রাধাচরণ (মৃত্যু ১৩০১), নিতাই দাস, রাইচরণ রায়, রামানন্দ চক্রবর্ত্তী, কাঁকুটিয়ার বৈদ্যবংশীয় চৌকি ঠাকুর (সৃষ্টিধর ঠাকুর), বাঁশশঙ্কী নিবাসী রাজারাম গণক, পুরন্দরপুর নিবাসী চাকরমুণী, মঙ্গলডিহির বনোয়ারি চক্রবর্ত্তী ও বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোরাজ, মল্লিকপুরের কৈলাস ঘটক ও তাঁহার পুত্র চণ্ডীকালী ঘটক, রাইপুর নিবাসী রামানন্দ বা রামাই ঠাকুর, মুড়ামাঠ নিবাসী গদাধর পাল প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা কবি—কবি সঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের এই বিভাগের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ইঁহাদের রচিত অনেক গান বঙ্গ-সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিবে।

শ্যামাবিষয়ক ও অন্যান্য ভক্তিমূলক গান রচনা করিয়া কালীপ্রসন্ন ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

কেন্দগড়িয়া নিবাসী নীলমণি ও কলেশ্বর নিবাসী গোপীনাথ রায়ের রচিত রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, প্রভৃতি গ্রন্থ অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি গান এখনও প্রায় প্রতি পল্লীতেই সময় বিশেষে দলবদ্ধভাবে গীত হইয়া থাকে। এই বীরভূম অঞ্চলে বিষ্ণুপাল রচিত মনসামঙ্গলের গান প্রচলিত। মনসামঙ্গল-রচয়িতা বিষ্ণুপালের নাম এখনও বঙ্গসাহিত্যে স্থান পায় নাই। কেন-না ইঁহার রচিত সুবৃহৎ পুস্তক এখনও অপ্রকাশিত। বিষ্ণুপাল বীরভূমেরই অধিবাসী। ইনি অনুমান দেড়শত হইতে দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

ঝুমুর-সঙ্গীত

ঝুমুর-সঙ্গীত বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। বীরভূমের মল্লারপুর গ্রামের নীচজাতীয় স্ত্রী ও

পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া দলবদ্ধভাবে গান করিয়া এই শাখায় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চলেও এই ঝুমুরের দল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঝুমুর দলের সহিত কবিদলেরও লড়াই প্রচলিত আছে। ঝুমুর-সঙ্গীত এখন অধোগামী হইলেও নিরবচ্ছিন্ন অশ্লীলতাদুষ্ট বা একেবারে অশ্রাব্য নহে। ইহার মধ্যে অনেক ধর্ম্ম-সঙ্গীত, পৌরাণিক আখ্যায়িকা-মূলক সঙ্গীত ও আলোচনা আছে।

"সঙ্গীত দামোদর" বলেন—"আদিরসের বহুলতা দ্রাক্ষাজাত সুরার মত মধুরতা ও মৃদুতা, আর বর্ণাদি যোজনার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকাই ঝুমুর গানের প্রকৃষ্ট লক্ষণ।"

তর্জ্জাগান

তর্জ্জাগান এখানে সমধিক প্রচলিত না থাকিলেও বীরভূমের অধিবাসী কেহ কেহ দল বাঁধিয়া তর্জ্জার পালা গাহিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা কবি বা ঝুমুরওয়ালাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে গান করিয়া থাকে। ইহারা সঙ্গে সঙ্গে আসরে দাঁড়াইয়া গান রচনা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্তর-প্রত্যুত্তর দেয়।

বাউল-সঙ্গীত

নানাবিধ উৎকৃষ্ট বাউল-সঙ্গীতও বীরভূমের বহু কবি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু সন্দর্ভ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান মন্দিরা-সংযোগে যুগী ভিখারিগণ দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়ায়। এই সকল পৌরাণিক উপাখ্যান বা সন্দর্ভ বীরভূমের নিরক্ষর পল্লীকবি-বিরচিত। এই সন্দর্ভ বা উপাখ্যানগুলির সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

"গজভুক্ত..."

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

সকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশটা আবার ঘোর করিয়া আসিতেছে; যদি নেহাৎ এখন বৃষ্টি না-ই নামে তো রাত্রি পর্য্যন্ত কোন-একটা রীতিমত দুর্য্যোগ সৃষ্টি হইবেই তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আকাশের গতিক দেখিয়া মেসের কেহ আর বাহির হয় নাই। দু'একজন নিজের নিজের ঘরেই বসিয়া ছিল;—বাকি মেম্বর সব শচীনাথের ঘরে আড্ডা জমাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; আজকাল অবসরকালে এই ঘরেই বেশী জমায়েৎ হইয়া থাকে, কারণ ছোকরার নূতন বিবাহ হওয়ায় ঘরটি শ্বশুরবাড়ীর সম্পদে ও ভাবে সমৃদ্ধ।

মেসের কবি কুলদাচরণ জানালার ধারে বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে মেঘের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। মেঘ হইতে চোখ না ফিরাইয়াই বলিল,—"আচ্ছা শচীবাবু বলুন তো আজকের রাত্তিরটা সার্থক হয় কি হলে?"

শচীনাথ লজ্জিতভাবে একটু হাসিল, উত্তর দিল না। গণপতি নিজের বামবাহুর সুপুষ্ট পেশীটা পাকাইয়া পাকাইয়া নানা ভঙ্গি সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সেইরূপভাবেই বলিল—"এই খিচুড়ি আর-গলদা চিংড়ীর কালিয়া হলে..."

কুলদা তাহার পানে একটা বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া মেঘের কাব্য উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু গণপতির কথাটা মাঠে মারা গেল না—কারণ ঘরটায় কাব্য-রসিকের চেয়ে ঔদরিকের সংখ্যাই অধিক ছিল—অন্ততঃ এমন বর্ষায় সংখ্যাটা বাড়িয়া গিয়াছিল এরূপ বলা যায়। কেহ বলিল—"বাঃ খাসা

মতলব—" আর একজন বলিল—"গণপতির মাথা আছে।" মৃত্যুঞ্জয় 'মাথার' লোভে বলিল—"আমিও খিচুড়ীর কথা বলব বলব করছিলাম।"

ফর্দ্দ হইল। মেসের ভোজের ফর্দ্দ—প্রত্যেক মেম্বরের পছন্দের কিছু কিছু রক্ষা করিতে করিতে টোটাল প্রথমে ৫০ টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইল। যাহারা ঝুঁকিয়া দেখিতেছিল, একটু পিছাইয়া গেল। সকলের মতানুযায়ী আবার কাটছাঁট করিতে করিতে ১৭ টাকায় দাঁড়াইল। তৃতীয়বারে সতর্কভাবে বাড়াইয়া বাড়াইয়া ৩৩ টাকায় হিসাবটা কায়েম করা হইল। যাহার হাতে পেন্সিল ছিল সে পেন্সিল ফেলিয়া হাত পা গুটাইয়া বলিল—"এর কমে হ'লে, ঝালচানা খেয়ে বর্ষার সথ মেটাইতে হয়; ফিষ্টি হয় না।"

ষোলজন মেম্বর, ২৵০ করিয়া পড়িবে। মাসের ২৯ তারিখ। সকলে মৌনভাবে বসিয়া রহিল। কেহ বে-পরোয়া ভাবটা জাগাইয়া রাখিবার জন্য একটু শিষ দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন বলিল—"কেউ ছুটো টাকা ধার দেন তো বাকি এক আনা পয়সা বাক্স ঝেড়ে বের করতে পারি।"

একজন উত্তর করিল—"আপনি তো তা'হলে খুব solvent মশায়,—হিংসে করে।"

শচীনাথ মনে মনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ করার পর তাহার খাওয়ান বাকি ছিল। অনেক তাগাদা ঠেকাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু আজ মেসের এই দারুণ বুভুক্ষা এবং সেইসঙ্গে ততোধিক দারুণ দৈন্যের দিনে আর ঠেকান অসম্ভব। তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। ইহাদের একবার কাহারও মনে পড়িলে হয়;—কেন পড়িতেছে না সেইটাই আশ্চর্য্য......।

যেমন বসিয়াছিল সেইরূপ থাকিয়া গেলে কি হইত বলা যায় না; সে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াই সব মাটি করিল। চৌকাঠের নিকট পা দিতেই একজন টেবিলে একটা প্রচণ্ড চাপড় দিয়া বলিল—"হয়েছে শচীবাবু! ...."

শচীনাথ বিমর্ষমুখে ফিরিয়া চাহিল।

যে ডাকিয়াছিল সে বলিল—"আসুন, ফাঁকি দিলে চলবে না। বিয়ের খাওয়াটা আজই হয়ে যাক্।"

সমর্থনস্বরূপ ঘরটাতে একটা ভীষণ আনন্দ-কলরব উঠিল। তাহাতে লাজুক বেচারার ক্ষীণ আপত্তিটুকু শোনাই গেল না। একজন আবার বলিল—"পরশু আবার একটা মোটা মণিঅর্ডার এসেচে।"

শচীন্দ্র নামক একজন মেম্বর বলিল—" শ্বশুরবাড়ী থেকে। মোবলিক ৮০টি রজত খণ্ড—নামের একটু মিল আছে কিনা—তাই প্রথমে আমারই হাতে গিয়ে প'ড়েছিল্। হায়, এমনি যদি অদৃষ্টেরও মিল থাক্‌তো!"

একজন বলিল—"তবে সেই ৫০ টাকা যেমন ধরা হ'য়েছিল তেমনি থাক্ না কেন? শচীবাবু সেই খাওয়াচ্ছেন অথচ চিরজন্মের মত ওঁর মনে একটা খুঁৎখুঁতুনি থেকে যাবে;—সেটা কি হ'তে দেওয়া উচিত আমাদের?"

শচীনাথ অকৃতজ্ঞভাবে তাহার দিকে একবার চাহিল, তাহার পর কাহারও দিকে না চাহিয়া বলিল—"৭০৲ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে; দশ টাকা আছে প'ড়ে; যাবার ভাড়া রেখে পাঁচ টাকা কোন রকমে বের করে দিতে পারি..."

অনেক টানাটানি কষাকষির পর পঁচিশ টাকায় রফা হইল। শচীনাথের কিন্তু আপাততঃ সেই তেত্রিশ টাকাই দিতে হইল।—কেহ এক টাকা, কেহ আট আনা, কেহ বার আনা, কেহ চারি আনা, কেহবা তাহারও কম ঋণ লইয়া সমস্ত টাকাটা বাহির করিয়া লইল।

(২)

যাঁহাদের নূতন বিবাহ, নববধূর আব্দার জিনিষটা যে কি তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন; যাঁহাদের পুরাণ হইয়া আসিয়াছে তাঁহাদেরও দু'একটা উদাহরণ মনে থাকিতে পারে; সুতরাং এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না।

শচীনাথের উপর অনেক হুকুম ছিল। বউটি নিতান্ত ছেলেমানুষ;—তাহার আব্দারের না আছে একটা বাঁধুনি, না আছে কিছু। বাড়ীতে থাকিতে বেচারা পতি দেবতাটিকে কি কি ঝক্কি সামলাইতে হয় সেসব কথা ছাড়িয়া দি; আপাততঃ এইটুকু বলিলেই চলিবে যে বাড়ী ছাড়িবার সময় হুকুম হইয়াছিল যে একদিন বর্ষার দিন ছুটি

লইয়া আসিয়া বধূর হাতের খিচুড়ী খাইয়া যাইতে হইবে এবং আসিবার সময় একখানা প্রেমপত্রাবলী, ও মিত্তিরদের মেজবউয়ের মত কলম, চিঠির কাগজ আর খাম সঙ্গে আনিতে হইবে।

দুই-তিনটি বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে। বেচারা নিজের অসুখ, মৃত ঠাকুরমা মৃত্যুশয্যায়—সব রকমেরই দরখাস্ত দিয়া হারিয়া গিয়াছে। বধূটির পত্র আসিয়াছে; এক-টুকরা ছেঁড়া শ্রীরামপুরী কাগজের একপৃষ্ঠে লেখা। তাহার অপর পৃষ্ঠে এক ইঞ্চি সাইজের অক্ষরে ইস্কুলের জন্য হাতের লেখা রহিয়াছে—মাষ্টারের দস্তখৎ-সুদ্ধ। পত্রের শেষে পুনশ্চ করিয়া লেখা আছে—"দেখছ?—সত্যিই আমার কাগজ নেই। তাই ছোটঠাকুরপোর ইস্কুলের খাতা ছিঁড়ে কাগজ নিয়েচি। আচ্ছা, তুমিই বল না এ কাগজে কি বরকে লেখা চলে? আমার যেমন কপাল।"

চিঠিটা পাইয়া অবধি শচীনাথ যেন বিপন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "আমার যেমন কপাল"—আহা কথাটাতে যেন ছোট্ট বুকখানির সমস্ত বেদনা উজোড় করিয়া ঢালা। আবার আসিবার সময় সেই মিনতি—অভিমান—আব্দার-মাখান কচি মুখখানি মনে পড়ে। তাহার পর চিঠিখানিতে পাঁচ জায়গায় শুধু একবার যাবার ফরমাস; তাহাতে আবার নানান রকমের প্রায় গোটা দশেক শপথ দেওয়া!—বিপদ কি আর গাছে ফলে?

এ অবস্থায় নানা চিন্তার পর সাধারণ যুবক যাহা স্থির করে শচীনাথও সেইরূপই স্থির করিয়া বসিয়া আছে—অর্থাৎ সে এই দু'এক দিনের মধ্যে যাইবেই।

চাকরী যায়?—অমন শশুর রহিয়াছে কি করিতে?... আর নোতুন বিয়ের কাছে চাকরী?—হুঃ ..

এইরকম গোছের প্রশ্নোত্তরে এই রকম মীমাংসা করিয়া আজ তাহার মনটা অনেক হাল্‌কা ছিল, তাই অল্প চাপের উপর তিনখানা নোট টেবিলের উপর খস্ খস্ করিয়া বিছাইয়া দিয়া তদুপরি তিনটা টাকা ঠন্ ঠন্ করিয়া বাজাইয়া দিল।

ভজহরির হাতে এ-মাসের ম্যানেজারি ছিল। দুই-খানা পাঁচ টাকার নোট তুলিয়া লইয়া বলিল—"মৃত্যুঞ্জয় বাবু খাঁড়ী-মুসুরের ডাল আর তরিতরকারিগুলো কিনে নিয়ে আসুন—হিসেবী লোক; আর কেউ গিয়ে হগ্-সাহেবের বাজার থেকে ভাল টেবিল রাইস, বাছাই করা বোম্বাই আম, ঘি, সের-কয়েক গলদা চিংড়ি আর পাউণ্ড-দশেক গ্র্যামফেড মট্‌ন্ কিনে নিয়ে আসুন না, বাজে জায়গা থেকে ভুষী মাল কিনে আনা—সে আমার ম্যানে-জারিতে হোতে দোব না। আমি দই আর সন্দেশের ভার নিচ্ছি—সব বোঝা আমার ঘাড়ে চাপালেই চলবে কেন? আর গণপতি..."

গণপতি গুলা পাকাইতেছিল; তাহার স্বভাব-উগ্র চোখে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ—গণপতি কি?—বলে ফ্যাল্ "

ভজহরি সামলাইয়া লইয়া বলিল—"না—এই তোমার গিয়ে বলছিলাম—তোর আর এই দুর্যোগে কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই।"

কুলদা বলিল—"গ্র্যামফেড মট্‌ন্ হ'লে আমি কোর্ম্মা রাঁধবার ভার নিচ্ছি। একবার দেখাব আজ..."

গণপতি সকলকেই তুই-তোকারি করে, ঘুরিয়া বলিল—"আবার তুই ঢুকিস্ তো রান্নাঘরে তোর সেই বীরভদ্র কেতাবটা নিয়ে। তোকে তা'হলে আর আস্ত রাখ্‌ব না; সেদিনকার পাঁঠার শোক আমার যায়নি। যতক্ষণ রান্না হবে তুই ঘরে বসে—কি বলে গিয়ে "

পাশ থেকে কে হুকুমের টোনে কথাটা পূরণ করিয়া দিল—"বউকে চিঠি লিখ্‌তে থাক্‌বি।"

শচীনাথ কি ভাবিতেছিল, বলিল—"হগ সাহেবের বাজারের দিকে না হয় আমিই যাব, একটু কাজ আছে আমার ওদিকে।"

গণপতি বলিল—"আটকে যাবি না তো? কেউ সঙ্গে যাক্ না।"

শচীনাথ একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল—"পাঁচ মিনিটের কাজ, না, সঙ্গে যেতে হবে না; একটা কুলি কোরে নিয়ে আসব'খন।"

তাহাই ঠিক হইল। ভজহরি বলিল—"দেখবেন বৃষ্টি হলে বরং একটা ট্যাক্সি ক'রে নেবেন। আপনি না আসা পর্য্যন্ত সমস্ত বন্ধ থাকবে। আজ আবার ঠাকুরের সেই শশুর-ব্যাটা আর শালাটা এসেছিল;

অনুরোধে প'ড়ে ঠাকুরকে তাদের জন্ম দুটি ভাত ফুটিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিলাম—ব্যাটারা পনেরজনের ডাল-ভাত সাবড়ে সটকে পড়েছে—থাকলে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করতাম। মাসের শেষ—হদ্দ কাল সকাল পর্য্যন্ত চাল হোত—এখন মুঠো-কয়েক পড়ে আছে। আর সবার পকেটের অবস্থা তো দেখলেনই—কালও আপনারই ভরসা—"

শচীনাথ ফিষ্টের দরুণ নোট থেকে দশ টাকার দুই-খানা নোট আর দুইটি টাকা পকেটে পুরিল, বাক্স খুলিয়া আরও একখানা নোট লইল, পাঞ্জাবীটা গায়ে দিল, আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় দুটা চিরুণীর টান দিল, শ্বশুরবাড়ীর জুতাটা পরিল; তাহার পর ছাতা ভুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তাহার কাজ—বউয়ের জন্ম চিঠির কাগজ আর একটা ফাউণ্টেন পেন লইবে।

কুলদা ছাতার কথা বলিতে যাইতেছিল;—"ছা…" করিতেই গণপতি তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল—"আবার পেছু ডাকা কেন বাবা?—একেই তো ঐ লোক।"

(৩)

শচীনাথ হন্ হন্ করিয়া রাস্তা দিয়া চলিল। মনশ্চক্ষুর সামনে ক্রমাগতই বধূর আব্দারভরা, ঠোঁটফোলান মুখখানি জাগিয়া উঠিতেছে। শচীনাথ কল্পনায় নিজেও কত আব্দার, অভিমান লুকোচুরি করিল—মুখভার আর যায় না। তখন সে মন-ভোলান কলমটা বাহির করিল। সাহেব-বাড়ীর লেবেল দেওয়া চিঠির প্যাডটা সামনে ধরিল—সোহাগভরে দুটাকে সোনার হাতে তুলিয়া দিতেই ঠোঁটদুটি হাসিতে এলাইয়া পড়িল। শচীনাথ একটা চুম্বন বসাইতে যাইতেছিল—অবশ্য কল্পনাতেই—তাহার পূর্ব্বেই একটা বাস্তব ল্যাংড়া আমের বড় খোলায় পা পড়ায় শানবাঁধা ফুটপাথের উপর সড়াৎ করিয়া খানিকটা পিছলাইয়া গেল। ইহাতে মনটা কল্পনালোক হইতে আমাদের মরজগতে ফিরিয়া আসিলে শচীনাথ লক্ষ্য করিল পথিকদের মধ্যে সকলেই যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামনে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিক ঝাপসা করিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টির ধারা ছুটিয়া আসিতেছে, লাট-সাহেবের বাড়ীর ওপর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে—আর মিনিটখানেকের মধ্যেই ভিজাইয়া দিবে। এতক্ষণে মনে পড়িল ছাতা আনা হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে এটুকু ভাবিয়াও অস্থির হইয়া পড়িল যে, পকেটে খান-তিনেক নোট!

ধর্ম্মতলা দিয়া আসিতেছিল, মোড় ঘুরিয়া চৌরঙ্গি হইয়া ছুটিল। লিডওয়ে কোম্পানির দোকানের সামনে যখন পৌঁছিল তখন আর অগ্রসর হইবার জো নাই; পথের একটা থাম ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"খেও সব খিচুড়ী আজকে।"

খিচুড়ীর কথায় আবার বধূর কথা মনে পড়িয়া গেল। যদিও সবে আষাঢ় মাস পড়িয়াছে, তথাপি এই বিরহ-বিধুর নূতন বরটি ভাবিতে লাগিল—বর্ষা তো হ'য়ে গেল, আমার খিচুড়ী খাওয়ার নেমন্তন্ন তো এখনও রক্ষা করা হ'ল না।· কি করব বল সুরমা, এত পরাধীনের ভগবান কেন যে বিয়ে দেন জানি না।…সেখানেও নিশ্চয় এমনি বর্ষা প'ড়েচে—অভিমানে চাঁদমুখখানি ভার হ'য়ে আছে,…মিত্তিরদের মেজবৌয়ের মত চিঠির কাগজ চাই? —চিঠির কাগজ এমন নিয়ে যাব মেজবৌ কখনও চক্ষেও দেখেনি—দেখবেও না…

হঠাৎ হুঁস্ হইল সে সবচেয়ে সেরা সাহেবী দোকানের সামনেই দাঁড়াইয়া! ভাবিল হগ সাহেবের বাজারে গিয়ে খরিদ করার চেয়ে এইখানেই নেওয়া ভাল হইবে নাকি? বাজারের উৎকৃষ্ট জিনিষই যদি প্রিয়ার হাতে তুলিয়া দিতে হয় তো এই তো তার জায়গা। খরচ?—হাঁ, তা একটু বেশী পড়িবে বৈকি। শচীনাথ একটু ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দুইটি জিনিষ মনটাকে নিরবশেষ করিয়া জুড়িয়া বসিল—মানের ভরে ঘাড়-কাৎ করা একটি ডবডবে মুখ আর তাহার পাশে মিত্তিরদের মেজবৌয়ের কাল্পনিক ঐশ্বর্য্য! টাকাটাও শ্বশুরের—স্বভাবতই যার জন্ম বেশী দরদ থাকে না।—শচীনাথ ঘাড় বাঁকাইয়া দোকানের অপূর্ব্ব পণ্যশ্রী খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর গট্‌গট্ করিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

সাহেবের দোকানে এই প্রথম আসা; ভিতরে গিয়া

একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। বাংলায় বেচাকেনা বলিতে হুড়াহুড়ি চেঁচামেচির মধ্য দিয়া যে ব্যাপারটা বোঝায় তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। বর্ষার জন্য সেদিনে আবার দোকানে খরিদদার খুবই কম—কাজেই সচরাচর যেটুকু সজীবতা থাকে সেদিন তাহারও অভাব ঘটিয়াছিল। রাশি রাশি জিনিষ অত্যন্ত নিপুণতার সহিত গোছান রহিয়াছে, সেগুলাকে স্থানচ্যুত করিয়া কখনও যে বিক্রয় করা হয় একথাটা বিশ্বাস করা শচীনাথের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল। তখন ধাঁ করিয়া তাহার মনে হইল—বড় দোকান, যদি পাটের কিংবা তিশির গদিয়ানদের মত শুধু পাইকিরি বিক্রয়ই করে এরা!

'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া একজায়গায় দাঁড়াইয়া বিহ্বলভাবে চারিদিকে কাতরদৃষ্টি হানিতেছিল, এমন সময় একজন ফিরিঙ্গি আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি চাই আপনার?"

"কলম আর প্যাড।"

"ষ্টেশনারি ডিপার্টমেণ্ট; ওইদিকে গিয়ে বাঁ-দিকটা ঘুরে যাবেন।...আচ্ছা চলুন আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি।"

শচীনাথ পিছনে পিছনে খুচরা-পাইকিরির কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সন্দিগ্ধমনে চলিল।...

ষ্টেশনারি ডিপার্টমেণ্টের চার্জে একজন যুবতী। ফিরিঙ্গি শচীনাথকে দেখাইয়া বলিল—"একজন খদ্দের তোমার" বলিয়া 'ধন্যবাদ' লইয়া চলিয়া যাইতেছিল; একবার ঘুরিয়া হাসিয়া বলিল—"আমার কমিশন চাই কিন্তু, মনে থাকে যেন।"

মেয়েটি কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল—"naughty naughty chap" (—দুষ্টু কোথাকার)

—বলিয়া স্মিতমুখে শচীনাথের দিকে চাহিল। বর্ষায় আর সমস্তদিন একরকম তাহার বিভাগে বিক্রয় নাই; তাহার উপর এই যুবক খদ্দেরটিকে বেশ শাঁসালো বলিয়া বোধ হইল; ঘাড় হেলাইয়া বলিল—"এগিয়ে আসুন, কি চাই আপনার?"

বোধ হয় য়িহুদী। ঢলঢলে দুটি কালো চোখ। কালো কোঁচকান ঘন চুল; হালফ্যাসানে কানের কাছে ঘোরানো জুলফি করিয়া ছাঁটা। বেশী করিয়া ধরিলে বছর আঠার কি উনিশ বয়স হইবে। সমস্ত শরীরটি এবং গতিবিধির মধ্যে একটি বেশ সুললিত স্বচ্ছন্দ ভাব মাখান।... চোখটা একবার পড়িলে ইচ্ছামত সরাইয়া লওয়া যায় না।

শচীনাথ আধমন-বাঁধা পা দু'টা টানিয়া একটু অগ্রসর হইয়া আসিল—"একটা ফাউণ্টেন পেন আর একটা প্যাড চাই।"

"দি; আপনি ততক্ষণ এই চেয়ারটায় বসুন, ফ্যানটাও খুলে দি এই।"

কথাবার্ত্তা অবশ্য ইংরাজিতেই হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিতেছিল মেয়েটির মিষ্টি মিষ্টি ইংরাজি উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দি; কিন্তু তাহা হইলে তাহার সঙ্গে শচীনাথের পেটেণ্ট ইংরাজিও তুলিয়া তাঁহাদের বিড়ম্বিত করিতে হয়; সুতরাং বাংলাতেই তর্জ্জমা করিয়া দিতেছি—

"আগে কলম দেখাই; কি রকম ধরণের কলম চাই বলুন তো?"

বধূর পদ্মকোরকের মত মুষ্টিতে কি রকমটি মানাইবে, শচীনাথ একটু কল্পনা করিয়া বলিল—"একটু দেখতে শুনতে বাহারে হয়—"

মেয়েটি খোলা কাঁধের উপর জামার পটি তুলিয়া বসাইয়া দিয়া একটু জেরা সুরু করিয়া দিল—"নিজের জন্য, না উপহার?"

শচীনাথ একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল—"না উপহারের জন্য।"

"মনিবকে না বন্ধুকে?"

নববধূ কিসের পর্য্যায়ে পড়ে একটু দেরী করিয়া মনে মনে তাহার মীমাংসা করিয়া শচীনাথ বলিল—"না, মনিব না; এই একরকম বন্ধুকেই—"

"পুরুষ না স্ত্রীলোক?"—মেয়েটি এখানে নিজেও একটু লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল।

শচীনাথ বলিল—"স্ত্রীলোককেই; বস্তুতঃ আমার স্ত্রীর জন্যই কিনতে এসেচি।"

মেয়েটি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। একটু অভিমানের সুরে বলিল—"দেখুন তো, তা' এতক্ষণ বলতে হয়।

আমার উকিলের অভিনয় করিয়ে ছাড়লেন আপনি; ফিস্ চাই কিন্তু হি—হি—হি…। নিশ্চয়ই টুকটুকে ছোট্ট একটি মেয়ে সে। তার জন্ম জিনিষ পছন্দ করা তো আপনার এলাকা নয়। আমি নিজে যা পছন্দ ক'রে দোব—তাই নিয়ে যাওয়া উচিত।…আচ্ছা, দামের একটা আন্দাজ…।"

শচীনাথের দামের বিশেষ একটা আন্দাজ ছিলই না; যাহা কিছু ছিলও বা সেটুকু পর্য্যন্ত এই সুন্দরীর কথাবার্ত্তা হাবভাবের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল—"এই একটু বাহারে, মানানসই……"

মেয়েটি ছোট্ট মাথাটি দুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—"ঠিক, ঠিক, মেয়েটি স্বামীভাগ্যে খুব ভাগ্যবতী দেখছি…"

শচীনাথ একটু ফুলিয়া গেল। ভাবিল—এই প্রশংসার বাণীট—আবার এমন একখানি মুখের বাণী—যদি একবার বধূর কানে উঠিত তবে তো!

টেবিলের উপর কাগজের, ইমিটেশন লেদারের নানান রকম কেসে গোটা দশ বার কলম আসিয়া পড়িল। মেমসাহেব সুভঙ্গিম অঙ্গুলি দিয়া সেগুলো একে একে খুলিয়া সাজাইয়া দিল।—রোল্ড গোল্ডের, রূপার, সেলুলয়েডের—কাল, বাদামি, সোনার ব্যাণ্ড আর ক্লিপ আঁটা চমৎকার চমৎকার জিনিষ সব! দুটো কম দামি—এ মজলিসে 'হংসো মধ্যে বকো যথা'—গোছের কলমও ছিল। সে-দুটা যুবতীর স্পর্শ সুখও ভাল করিয়া পাইল না।

শচীনাথ বিলিতি সোনার একটা কলম উঠাইয়া লইয়া বলিল—"এটা কত?"

"পঞ্চান্ন টাকা; তবে আজকাল Grand clearance sale চলেচে—চুয়ান্ন টাকা পনের আনাতে পাবেন। উপহারের পক্ষে এমন…"

পঞ্চান্ন টাকা!—শচীনাথের গল গল করিয়া কালঘাম ছুটিল। এইরকম দামের জিনিষ সব বাহির করিয়াছে! সর্ব্বনাশ!—পকেটে তাহার বত্রিশটি টাকা পড়িয়া। তাহার মধ্যে আবার—এতক্ষণ স্বর্গবাসে যে কথা সে বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছিল—বাইশটা টাকা ফিটের দরুণ। —সে বেচারিরা তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া আছে…

শচীনাথ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মেয়েটার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। একবার মাথার উপর পাখাটা ঠিক ঘুরিতেছে কিনা দেখিয়া লইল। তাহার পর সে কলমটা রাখিয়া দিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল—"ইয়ে-আর কিছু না—তার হাতের পক্ষে এটা নেহাৎ বড় হবে।"

মেয়েটি রোজ এই কাজ করিতেছে। বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমিও ঠিক সেই কথা বল'তে যাচ্ছিলাম; তবে আপনি নেহাৎ তুলে নিলেন। আচ্ছা এইটে দেখুন তো। ওরই জুনিয়ার, হাতে ঠিক মানাবে। কত বয়স?…চোদ্দ?—হয়েচে; আচ্ছা বলুন তো রংটা আপনার মত, না কাল?"

শচীনাথ যেন অকূলে কূল পাইল। সে নিজেই বেশ কাল; বধূটি ঢের ফরসা। তথাপি রংটা কাল বলিলে যদি এ যাত্রা পরিত্রাণ পাওয়া যায়;—এ মোহিনীর মতে কালোর হাতে যদি খেলো, কমদামী জিনিষই মানানসই হয়—এই ভাবিয়া বলিল—"না, আমার চেয়ে বেশ একটু কালই হবে।"

সে যে আবার কি বস্তু তাহা ভাবিয়া চতুরা যুবতী একটি ছোট্ট হাসিকে ঠোঁটে চাপিয়া মিলাইয়া লইল; তাহার পর একটু চিন্তিতভাবে বলিল—"তাহ'লে আপনাকে এই সোনারটিই নিতে হয়। কালো হাতে রূপোর জিনিষও মানাবে না, বাদামি সেলুলয়েড তো নয়ই; আর কালো?—তাইলে আপনার স্ত্রী আপনাকে কখনই ক্ষমা ক'রতে পারবেন না; এ তাঁকে সাংঘাতিক বিদ্রূপ করা হবে (It will be nasty joke at her expense).

বাঃ, একেবারে উল্টা উৎপত্তি!—মিথ্যাটা যেন ফণা ঘুরাইয়া তাহাকে একটা ছোবল দিল। যদিও বুঝিল সত্য কথা বলিলেও মেমসাহেবের রায়টা সোনার কলমের দিকেই বাহাল থাকিত তথাপি তাহার অনুতাপ-দুর্ব্বল মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল—বোধ হয় 'ফরসা' বলিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত।—আ-হা-রে…

মেসে সে'বেচারারা এতক্ষণ মিনিট গুণিতেছে। এ বাড়িকল থেকে পরিত্রাণের কোন উপায়ই না দেখিয়া

শচীনাথ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। হতাশায় মরিয়া হইয়া নিরস্ত্র কলম দুইটার মধ্যে একটা তুলিয়া লইয়া বলিল—"এটা কেমন হবে ?"

মেয়েটা শচীনাথের ফিটফাট বেশভূষার দিকে একটা সসম্ভ্রম দৃষ্টি বুলাইয়া অপরাধিনীর মত বলিল—"ওটা আমায় দিন ; এ দুটো আপনার যুগ্যি নয়—"

—পাঁচ সাত টাকা দামের নেহাৎ খেলো জিনিষ—বের ক'রেই আপনার প্রতি অন্যায় করেছি, তজ্জন্য ক্ষমা ক'রবেন—"

বেটাছেলে হইলে শচীনাথ বোধ হয় ঘুষি মারিয়া বসিত,—'অন্যায়' করিয়া ফেলার জন্য নহে, তাহার প্রতি এই সৌজন্য দেখনোর জন্য।... যুবতীকে শুধু বলিল—"না, না, সে কি কথা, আপনি দয়া ক'রে এত আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছেন আমার জন্যে..."

যাদুকরী সুগন্ধি একটি রুমাল বাহির করিয়া, কপালের উপর উড়িয়া পড়া একটা চুলের স্তবক মাথার উপর তুলিয়া দিয়া বলিল—"আপনার অভিমতের জন্য ধন্যবাদ। আমাদের কর্ত্তব্যই খদ্দেরের জিনিষ মননে যথাসাধ্য সাহায্য করা। তার ওপর জিনিষটা আপনার বালিকা-বধূর জন্য যখন শুনলাম, তখন আমি আপন ভুলেই একটু অধিক আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেচি। যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে...হ্যাঁ দামটা,—অর্থাৎ সেল প্রাইস্‌ আটাশ টাকা চার আনা"—কৌটায় বন্ধ করিয়া শচীনাথের সামনে সরাইয়া দিল।

(৪)

একটা চলিত কথা ব্যবহার করিতেছি ;—শচীনাথ একেবারে ভেড়া হইয়া গিয়াছিল। কোনমতেই সে এই যাদুশক্তির বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছিল না। ফিটের ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট করিয়া মনে পড়িল—অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে ছুটিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া যায়, কিংবা কমদামী কলমের মধ্যে একটা খুব মনের জোর দিয়া আবার তুলিয়া লয়—অথবা, অন্ততপক্ষে এ অমানুষিক অত্যাচারের জন্য দু'টা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া মনটা হালকা করে। কিন্তু কার্য্যত সেসব কিছুই না করিয়া ভালমানুষের মত পকেট হইতে তিনখানা নোট বাহির করিয়া দিল।...কথাটা কি খুব আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ?

যুবতী হাসিয়া বলিল—"মিসেস্‌-মিসেস্‌..."

শচীনাথ বলিল—"হালদার।"

"মিসেস্‌ হালদারকে বলবেন এমন সুন্দর পছন্দ তাঁর স্বামীর যে তাঁকে কন্‌গ্র্যাটুলেট না ক'রে থাকতে পারলাম না।...হ্যাঁ, একটা প্যাড্‌।—সেটাও তাঁরই জন্যে নাকি ?"

শচীনাথ ঢের মিথ্যাকথা বলিয়াছে ; কিন্তু খুব প্রয়োজন হইলেও এক্ষেত্রে পারিল না। বলিল—"হ্যাঁ তারই জন্যে ; তবে প্যাড আপাতত না হলেও চলে।"

যুবতী আব্দারের জবরদস্তি দেখাইয়া, মাথাটি একটু দুলাইয়া বলিল,—"না নেন, দাঁড়িয়ে একটু দেখুনই না ;—অবশ্য যদি আমার এ কোণটুকু আপনার নেহাৎ অপ্রীতিকর বলে না বোধ হয়—"

রং-বেরংএর পাঁচ ছয়খানা প্যাড আসিয়া পড়িল। শচীনাথ কলমের যোগ্য ভাল ভাল তিনখানা উঠাইয়া লইল—এর আর কতই মূল্য হইবে—জিজ্ঞাসা করিল—"দাম এগুলার ?"

"একটাকা চার আনা, একটাকা বার আনা, আর এটা দুটাকা ছয় আনা"—শেষেরটার পাতা খুলিয়া সামনে আগাইয়া দিয়া বলিল—"এর কাগজটা একবার দেখচেন একেবারে নূতন জিনিষ ; ভারতবর্ষে আমরাই প্রথম আমদানি করিয়েচি,—আপনাদের মত অভিজাতদের জন্য।"

শচীনাথ দেখিল—প্যাডেও তো বিপদ সামান্য নয়, অন্তত ইহার কাছে। সে ভাবিয়া ছিল যেখানে আটাশ টাকা লম্বা হইয়া গেল সেখানে না হয় আরও গণ্ডা বারো-চোদ্দ, কি জোর একটা টাকাই যাইবে ; বিশেষ করিয়া যখন কলমের সঙ্গে সঙ্গেই প্যাডের ফরমাসটা দিয়া ফেলিয়াছিল। তা' নয়, কোথায় আড়াই টাকার একটা প্যাড ! তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছে বেটি !

শচীনাথের প্রপিতামহ একজন বিচক্ষণ মোক্তার ছিলেন ; বোধ হয় সেই উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার মাঝে

মাঝে একটা আশ্চর্য্যরকম কূটবুদ্ধি জোগাইয়া যাইত। এর আগে জোগায় দেশে একটা দুরন্ত হনুমানকে জব্দ করিতে—শচীনাথের ডানহাতের পেশীতে এবং বাঁ দিকের পাঁজরায় তাহার এখন পর্য্যন্ত নিশানা আছে।...এর চেয়ে ভাল প্যাড তো ইহার ভঁাড়ারে নাই?—মনে মনে কহিল—এইবার তোমায় আমার কাছে হারতে হবে চাঁদ।

বলিল—"এ-প্যাডটার প্রশংসা করতে হয়; তবে আমি খুঁজচি এর চেয়ে সেরা জিনিষ—দাম আর একটু বেশী হলেও ক্ষতি নেই। একবার আর্মিন্তাভির ওখান থেকে একজোড়া কিনেছিলাম—চিফ্ জাষ্টিসের স্ত্রীকে ভেট্ দেওয়ার জন্য।..এটা রেখে দিন; সেইখানেই একবার দেখি গিয়ে। আমার যে তা' হ'লে হ'ল—তিরিশ থেকে আটাশ টাকা চার আনা গেলে ....."

মেয়েটি উৎসাহদীপ্ত চোখে শচীনাথের পানে চাহিয়া বলিল—"একটু অপেক্ষা করুন, মিঃ হালদার; আপনাকে আমার ডিপার্টমেণ্ট থেকে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হবে না। ক্ষমা ক'রবেন, আপনার মত সৌখীন লোকের প্রতি অবিচার করেচি। আসি, দাঁড়ান—"

"আচ্ছা, এ'দুটো পরখ করুন তো; নিশ্চয় এই জিনিষের কথাই বলেছিলেন আপনি—" বলিয়া দু'খানি নূতন ধরণের প্যাড শচীনাথের হাতে তুলিয়া দিয়া টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল। সফলতার আনন্দে মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

শচীনাথের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিল এবং সে অবসন্নভাবে সামনের টেবিলটায় একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। পাপ করিতে ধরণী আর দ্বিধা হয় না,—শচীনাথ মনে মনে বলিল—"হে অট্টালিকা তুমি ভেঙে পড়—তোমার এই ঐশ্বর্য্যের মায়াজাল নিয়ে তুমি মর, সম্মোহনের সহস্র বিদ্যা নিয়ে এই মায়াবিনী মরুক, আর মোহমুগ্ধ, পদার্থ লেশহীন আমিও মরি। হায়রে ভেবেছিলাম, অন্তত চালটা কিনে নিয়ে যাব; বলব—মটন গলদাচিংড়ি ওসব পাওয়াই গেল না।—কি কুক্ষণেই যে..."

যুবতী একটু দেহলতাটিকে দোলা দিয়া বলিল—"কেমন,যা খুঁজচেন তাই নয় কি?...দেখতে হবে না;—আসল মরক্কো চামড়া,—ও ক্লিপটা চোদ্দ ক্যারেট সোনা। প্যাডের কাগজগুলো যখন ফুরিয়ে যাবে, অন্য প্যাড কিনে...আঃ কি জালা। দেখুন তো মিঃ হালদার!...চুলের সঙ্গে কানের দুলের কি চিরকালই শত্রুতা থাক্‌বে?—আমি তো আর এদের মধ্যস্থতা করে উঠতে পারি না।" বলিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া দুল আর চুলের জোট খুলিতে লাগিল; আর কোন একটা উত্তর না পাইয়া ভাবিতে লাগিল লোকটা কি বেরসিক রে; ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে এদের এইখানেই তফাৎ।"

শচীনাথ বেচারার চক্ষে তখন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্যই নিবিয়া গিয়াছিল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"কত দাম?"

"গ্রাণ্ড ক্লিয়ারেন্স সেলে তিনটাকা সাত আনা তিন টাকা নয় আনা।—কোনটা দি?"

শচী নিজের ওপর বিজাতীয় রাগে তিন টাকা নয় আনাটা বাড়াইয়া দিল। পকেটের টাকা দুইটা বাহির করিয়া দিয়া অস্পষ্টভাবে বাংলায় বলিল—"ক্লিয়ারেন্স সেলটা কি আমার পকেট লক্ষ্য করে? গাঁটকাটা সব,—ডাইনি!"

যুবতী ক্যাশ-মেমোর উপর তিন আনা পয়সা রাখিয়া—সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—"তাহলে আপাততঃ আসুন বাবু, নমস্কার।"

(৫)

বাহিরে আসিয়া শচীনাথ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—তাহাতে তাহার বুকটা যেন পকেটের মতই খালি হইয়া গেল। ভাবিল—এখন উপায়!

অত্যন্ত ক্রোধ হইল—প্রথমত মেয়েটার উপর; কিসের জন্য সে সয়তানী অমন করিয়া—"

কিন্তু 'অমন করিয়া' কি তাহার কোন স্পষ্ট আকার না পাইয়া আরও চটিয়া উঠিল। একেবারে সপ্তমে উঠিল যখন মনের এককোণে আবার তাহার বিবেকটা মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল—"কৈ, সে বেচারি তো মাত্র নিজের কর্ত্তব্য"

শচীনাথ এই ক্ষীণ আওয়াজটুকু চাপিয়া দিয়া বলিল—

পড়িনু না! আমি ওকে দেখে নেব একবার। ইহাতে একটু সান্ত্বনাও পাইল। আর রাগ হইল নিজের উপর। এমন লক্ষ্মীছাড়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন তুই! এতবড় একটা আমাদের ভার—চুলোয় যাক্ আমোদ—অন্তত রাত্রে সবাইকে একমুঠো করে গিলতে তো হবে—আর তুই কিনা একটা তুচ্ছ মেয়ের আরে ছ্যা ·· ছাই সুন্দরী ··

সবার শেষের ঝোঁকটা গিয়া পড়িল বউয়ের উপর। কি ভীষণ স্বার্থপর আর অবুঝ এরা। একটা সামান্য কলম আর খানকতক চিঠির কাগজের জন্য সময় নেই অসময় নেই—ঘ্যানর, ঘ্যানর—শেষে একটা অঘটন ঘটিয়ে তবে ছাড়লে। মুখ তোলো হাঁড়ি তো হ'য়েই র'য়েচে। এ কাগজে কি বরকে লেখা চলে? আমার যেমন কপাল— কেন, তোমার কপাল তো ঠিকই আছে—লক্ষ টাকা দামের কাগজ কলমে দাগড়া দাগড়া অক্ষরে কাঁদুনি গাইবে'খন এইবার;—কপাল পোড়া এই অভাগা বেটাছেলেগুলোর। সাতজন্মে কেউ যেন বিয়ে না করে…

এখন মেসে ঢুকিবে কি করিয়া সেই এক মহাচিন্তা! আষাঢ়ান্ত বেলা—এখনও একবার ট্যাক্সি করিয়া গিয়া টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় আছে; কিন্তু যাওয়ার নামেই তাহার বুকটা গুড় গুড় করিয়া উঠিল। মটন্ ঘি আম টেবিল রাইস্ আর গলদাচিংড়ির বদলে যখন সে মরক্কো লেদারের বাঁধা প্যাড আর আটাশ টাকা দামের সোনার কলম লইয়া উঠিবে তখন প্রথম ঝোঁকটা সেই পনেরটা হন্তে কুকুরের হাতে তাহার কি নাকালটাই হইবে ভাবিয়া সে দমিয়া গেল। কিন্তু এ-ভিন্ন আর উপায়ও নাই। শচীনাথ পাশের একটা দোকানে গিয়া একটা বড় গ্লাসের এক গ্লাস সরবৎ পান করিল, তাহার পর আসিয়া আবার পর্চের নীচে দাঁড়াইল। প্রায় আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার চিন্তা করিয়া ও কোনো যুতসই মতলব স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে হার মানিয়া একটা ট্যাক্সি ডাকিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ তাহার বাল্য বন্ধু নন্দের কথা মনে পড়িয়া গেল।

—এই মিডল্টন্ ষ্ট্রীটে বাড়ী তাহার। বড়মানুষের ছেলে,এক কথায় পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে। ভাবিল—কেন যে কথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নাই!

দুর্ভাবনাটা কাটিয়া গিয়া শরীরটা অনেকটা হাল্কা হইল। কলমটা এবং প্যাড্‌টার উপর দরদ জমিয়া উঠিল; যে বিক্রয় করিয়াছে তাহার সুন্দর সরল মুখখানি মনে পড়িল,—আর যাহার জন্য কেনা সে তো আবার হৃদয়-সিংহাসনে রাণী হইয়া জাঁকিয়া বসিলই। মনটা রসিকতা করিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিল—'দু'-দুটো সুন্দরীর পাল্লায় পড়েচ, বন্ধুদের কথা কি মনে থাকে?…

বৃষ্টিটা একটু ধরিয়াছিল, শচীনাথ উৎসাহভরে বাহির হওয়া মাত্রই আবার মুষলধারে নামিল। বেচারী ফিরিয়া আবার আশ্রয়ে ঢুকিল ও ঝাড়া এক ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া আসিয়া, ডান হাতে প্যাড এবং বাম হাতে জুতাজোড়াটা ও কোঁচা তুলিয়া ছপাৎ ছপাৎ করিয়া চলিল; এবং আরও গোটা দুই তিন মাঝারি গোছের বর্ষণ কাটাইয়া রাত প্রায় আটটার সময় নন্দের বাড়ীর ফটকে গিয়া প্রবেশ করিল।

বাড়ীর দরোয়ান রামবৃছ্ দুবে বর্ষাজনিত ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে দক্ষিণ কর্ণের উপর হাত চাপিয়া এবং বাম চক্ষুটা প্রাণপণে বুজিয়া—"হা—আঁ-আঁ·" করিয়া সবেমাত্র তাহার ছাপ্‌রেয়ে মল্লারের তান উঠাইতে যাইতেছিল; শচীনাথকে দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল—"আরে আঁই—আঁই শচ্‌নাথ বাবু—আজকে ইন্দির মহারাজ গোস্‌সা হয়েচে, বাঙালী মাশাদের অম্‌রাবতীকে পাতালে সেঁদিয়ে দিবে।…আর নন্তবাবু কোথা আছে?—কেমোন খাওয়া দাওয়া বোন্‌লো?—নয়া সাদী ক'র্‌লে, গরীব রামবৃছের বক্‌শিশ·"

শচীনাথ ভীতভাবে বলিল—"বাবু?—নন্দবাবু যাবে কোথায়?—বাড়ীতেই আছে…"

রামবৃছ্ তাহার সমস্ত দন্তপাটি বিকশিত করিয়া কহিল—"হেঁ—হেঁ—আছে বৈকি—রামবৃছের কাছে চালাকি?—সেতো তোমার বাড়ী বর্ষার নেওতা খেতে গেছে—হেঁ—হেঁ· আমার সামনেই তো সে আর লগীন্ বাবু মতলব ঠিক করলে—আমাকে ফাঁকি দিতে আছো বাবু?…"

শচীনাথ কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তাহার এদিকে মনই ছিল না; কোন উত্তরই দিল না।…কি কুক্ষণেই তাহার

নন্দের কথা মনে পড়িয়াছিল !—এতক্ষণে সে বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া জিনিষপত্র লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিত। কি কুগ্রহই পড়িয়াছে আজ !…ওরে লক্ষীছাড়া নন্দ, শেষ পেট্‌টা তাহ'লে তুই-ই দিলিরে…

"এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার দুবেজি ?" বলিয়া সে হতাশ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল…

নিরাশার অন্ধকার যখন নিতান্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, শচীনাথ মনের এককোণে যেন একটা ক্ষীণ আলোক অনুভব করিল। বুঝিল—এ সেই তাহার প্রপিতামহের মোক্তারি বুদ্ধির সূক্ষ্ম রেখা—তাহার জন্মগত সংস্কার ! · আলোটি ক্রমে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং জলটা যতক্ষণে পান করিল ততক্ষণে বেশ একটা চতুর প্ল্যান সেই আলোর মধ্যে রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিল।

গেলাস রাখিয়া শচীনাথ দরোয়ানকে বলিল—"রামবৃছ দুবের বক্‌শিশটা অনেকদিন থেকে প'ড়ে আছে, না ? আচ্ছা, কাল একবার—ফুরসৎ করে সন্ধ্যার সময় মেসে যেও। হ্যাঁ, আর দেখ, যাবার সময় এই মোড়াটা হাতে করে নিয়ে যেও ; কি জানি বৃষ্টিতে ভিজে যেতে পারে।…আর দেখ নন্দ কি বাড়ীর আর কাউকে মোড়াটা দেখিয়ে কাজ নেই আর বোলেও কাজ নেই যে শচীনাথ এসেছিল—এর মধ্যে একটু মজা আছে, তুমি সমজদার লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ…"

রামবৃছ, অসমঝদার হইয়া পড়িবার ভয়ে কোন প্রশ্ন না করিয়া সেয়ানার মত ঘাড় দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"সে আমি জমান কাটিয়ে দিলেও বোলবে না।"

"তা'হলে কাল বকশিশটা নিয়েই এসো। কৈ, তোমার ছাতাটা দেখি একবার—কাল নিয়ে এসো'খন। ·· হ্যাঁ, এই বর্ষার ঠিক এই ছাতা—বাঃ—"

ফটক পর্য্যন্ত জুতা পায়ে আসিয়া শচীনাথ আবার জুতা খুলিয়া পূর্ব্ববৎ চলিল। হগ্‌সাহেবের বাজারে যেখানে মটন কিনিবার কথা তাহারই কাছাকাছি একটা মনিহারির দোকানে গিয়া প্রশ্ন করিল—"একটা ছোট কাঁচি পাওয়া যাবে ?"

"দু' আনা দেবেন"—বলিয়া দোকানী একটা একআনা দামের যোড়া কাঁচি বাহির করিয়া দিল।

শচীনাথের আজ দোকানী জাতটার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার মেজাজ ছিল না ; দু' আনা পয়সা ফেলিয়া দিয়া কাঁচিটা লইয়া বাহিরে আসিল, এবং মেসের রাস্তা ধরিল।

মাঝামাঝি আসিয়া একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালা নির্জ্জন গলির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহারও মধ্যে যেখানে বেশ জমাট গোছের অন্ধকার ছিল, সেখানটায় গিয়া দাঁড়াইল। বুকের ভিতর তাহার এমন ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতেছিল যেন সদ্য খুন করিয়া ফেরার হইয়াছে।

একবার এদিক ওদিক চাহিল, তাহার পর বাঁ-হাতে ডানদিকের পকেটের থলিটা টানিয়া ধরিয়া কাঁচি দিয়া কুচ কুচ্‌ করিয়া এপার ওপার কাটিয়া দিল ··

ঠিক এই সময় পাশের বাড়ীর দোর খোলার শব্দ হইল এবং শব্দকর্ত্তা বাড়ীর মালিককে বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল—"ওহে, কর্পোরেশনকে বলে তোমাদের গলিটার একটা কিনারা ক'রতে পারলে না ? - রাত্তিরে যে গাঁটকাটার ভয় করে…"

শচীনাথ ত্রস্তভাবে হন্‌ হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাড়াতাড়িতে কাঁচিটা আর কাপড়ের টুকরাটা যে বাঁদিকের পকেটেই রাখিয়া দিল, তাহা আর জ্ঞান হইল না।

(৬)

মেস্‌ এদিকে আগুন হইয়া আছে !

মাঝে মাঝে এক একজন মেম্বরের উগ্র অভিমতের আকারে এক একটা শিখা উঠিতেছে, কিন্তু সকলেরই পূর্ণ উত্তাপ লইয়া দুরাচার শচীনাথকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকায় কেহ আর উত্তাপের অপব্যয় করিতে চাহিতেছে না। প্রায় সকলে গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে কিংবা একদৃষ্টে কোনোদিকে চাহিয়া ক্রোধটাকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

কুলদাচরণ নিজের ঘরে বসিয়া প্রথম উৎসাহে তাহার "বাবুর্চি" নামক বইটার মাংসের অধ্যায় প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিল ; তাহার পর শচীনাথের ব্যবহারে মনটা করুণ-রসসিক্ত হইয়া উঠায় বউয়ের নামে খানিকটা বিরহগাথা লিখিল। এখন আবার মনের অবস্থা বদলাইয়া যাওয়ায় মেঘনাথবধ কাব্য পড়িতেছে।…গণপতি ক্রমাগত বাহিরে

যাইতেছে আর শচীনাথের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছে—"এ দমবাজির সাজা যদি না দেওয়া হয় তো বুঝব সব ভেড়ার দল—cowards!..

রান্নাঘরের অবস্থাটা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়। পটলভাজা নামিয়াছে, চাটনী নামিয়াছে; আর কিছু চড়েও নাই, নামেও নাই। এদিকে মাংস, গলদাচিংড়ি আর ভুনিখিঁচুড়ীর জন্য বাটামসলা তাল তাল পড়িয়া আছে। কোণে দই সন্দেশ ঢাকা।

মৃত্যুঞ্জয় এই তৃতীয় বার সকলের নিকট চাল আর ডালের জন্য পয়সা চাহিয়া হারিয়া বসিয়া আছে।...দু' একজন একটু উষ্মার সহিতই বলিয়াছে—জেনেশুনে আর ঠাট্টা করবেন না মশায়; আজ মেজাজটা ঠিক নেই"

গণপতি কি একরকম মুখ করিয়া শচীনাথের বরবেশে তোলা যুগল ফোটোর দিকে চাহিয়া ছিল, টেবিলে ঘুষিটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"উঃ, পাই একবার এই সময়...

এমন সময় রাস্তার দুয়ারে দুইটা লঘু আঘাত পড়িল এবং জড়িত কণ্ঠে আওয়াজ শোনা গেল—"ঠাকু—র।"

"ঐ এসেচে!!!" বলিয়া সমস্ত মেস কাঁপাইয়া একটা হিংস্র রব উঠিল এবং গণপতি দুয়ারের দিকে ছুটিল—"আমি দরজা খুলে দোব।"

দুই তিনজনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দু'একজন ক্ষমাশীল মেম্বর বলিল—যাক্, জিনিষ তো এসে পড়েচে, ফৌজদারি করে আর কি হবে?"

সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া নামিয়া আসিল। ওদিক থেকে শচীনাথও আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। প্রথম ঝোঁকে যাহার যাহা মনে আসিল শ্লীলতা অশ্লীলতা বিচার না করিয়া একচোট বলিয়া লইল। কুলদা 'বাবুর্চ্চি' বইটার ভিতরে একটা আঙুল দিয়া নামিয়া আসিল, বলিল—"উঃ, মস্ত একটা জিনিষ বাদ পড়ে গেছে;—এতে বলছে, কোর্মা রাঁধতে হ'লে...কই কুলি বেটা কোথায়? চম্পট দিলে না তো?—সেটাকে চোখের আড়াল"

শচীনাথ এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল—"কুলি নেই—জিনিষ কিছুই আসে নি...

"এ্যাঁ জিনিষ আসেনি!—মটন্! গলদা!!—"

ইত্যাকারে আবার একটি নারকীয় কলরব উঠিতেছিল।... শচীনাথ আপনার কাটা পকেটের মধ্য দিয়া সমস্ত হাতটি চালাইয়া দিল ও অঙ্গুলি পাঁচটা ছড়াইয়া হাতটা সবার সামনে তুলিয়া ধরিল, বলিল—"একটি আধ্‌লা ছেড়ে যায় নি।"

—কলরবটা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং প্রথম বিস্ময়ের মূঢ়তায় সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল...

এ পর্য্যন্ত শচীনাথের প্ল্যানটা বেশ খাটিয়া গেল এবং সে মনে মনে মোক্তার প্রপিতামহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পরম ভক্তিভরে একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

ওদিকে কিন্তু আদ্দির ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবীর অন্য পকেটের দুইকোণ দিয়া কাঁচির দাড়া দুইটা বাহির হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। মোক্তার প্রপিতামহের বুদ্ধির সহিত কেরাণী শচীনাথের নিজের বুদ্ধিও খানিকটা মিশিয়া গিয়াছিল—তাড়াতাড়িতে কাঁচিটা পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল—সেটা যে ফেলিয়া দেওয়া দরকার সমস্ত রাস্তায় সে হুঁস্‌টাই একেবারে হয় নাই। প্রথমে নজরে পড়িল ঠাকুরের—সে পকেট হইতে কাঁচিটা সযত্নে টানিয়া বাহির করিল এবং নিজের বিচার অনুযায়ী রহস্যটার মীমাংসা করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে কহিল—এঃ, ফিন্ ই পকেটভি কাট্‌তে গিয়েছিল, তাড়াতাড়িতে কাঁচিটা ফেলিয়ে গিয়েছে।"

শচীনাথ শুষ্ককণ্ঠে কহিল—"তাই ত দেখচি"—বলিয়া ভূতগ্রস্তের মত আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেল।

সকলে আবার একবার অন্যভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। গণপতি যেন হঠাৎ ঘুমের ঘোর হইতে জাগিয়া বলিয়া উঠিল—"কাঁচি—কাঁচিই সই—দাওতো ঠাকুর দেখি একবার।..."

কয়েকজন সতর্ক ছিলই—তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

সে ঠাণ্ডা বর্ষারাত্রে দই-সন্দেশের সহিত পটলভাজা আর আলুবোখারার চাটনীর নূতনবিধ এক অতিসংক্ষিপ্ত ফিষ্টের সময় নানান রকম গাঁটকাটার গল্প চলিল;—তাহার মধ্যে নিজের গাঁট নিজেই কাটার দু'একটা রহস্যময় এবং রোমাঞ্চকর গল্পও শোনা যাইতে লাগিল...।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৈলাস পরিক্রমা ও তাহার ফল

কৈলাসক্ষেত্রে আসিলে প্রদক্ষিণ হইল প্রধান কাজ, আর এই তারচেন্ হইল যাত্রীদের প্রধান বিশ্রামস্থান। এখানে আসিয়া আমরা একটি দিন ও দুইটি রাত্রি বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় দিনে পরিক্রমায় যাত্রা করি। যে দিনটি এখানে ছিলাম সেইদিনে এই তারচেনে যাহা কিছু দেখিবার দেখিয়া লইলাম।

তারচেন্ ঠিক কৈলাসের পাদমূলেই অবস্থিত। এখানে একটি গোম্ফা বা মঠ আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক একশত লামা, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী বাস করেন। মঠটি খুব বড় নয়। এখানেও অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে। পুস্তকাগারও আছে, তাহার মধ্যে রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত বহু হস্তলিখিত পুঁথিও সংগৃহীত আছে। ধ্যান-ধারণার জন্য পৃথক পৃথক গুহা বা নির্জ্জন শ্রেণীবদ্ধ কক্ষ সকল আছে। যাত্রিগণের যাতায়াতও কম নয়।

মঠের চারিধারেই তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবু যাহাদের, তাহারা কারবারী ও তীর্থযাত্রী উভয়ই বটে। এখানে তাহারা রথদেখা ও কলাবেচা দুই কাজই করে। দেখিলাম এখানে তিন-চারজন ভোটিয়া মহাজন দোকান খুলিয়া তাঁবুর মধ্যেই কারবার লাগাইয়া দিয়াছে। সঙ্গে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি সবই আছে। মার্কিন, বিলাতী ও জার্ম্মান মালের গাদা আর হুনিয়া খরিদ্দারের আনাগোনা।

আমাদের তাঁবুর পার্শ্বেই চিরতুষারাবৃত কৈলাস শিখর হইতে সদ্যদ্রবীভূত তুষারের একটি প্রখর বেগবতী নির্ঝরিণী গর্জ্জন করিতে করিতে নামিয়া, দ্রুতগতি পশ্চিমের মালভূমির মধ্যে কায়া বিস্তার করিয়াছে। একটি কাষ্ঠ-সেতুর সাহায্যেই পারাপার করিতে হয়। ওপারেও দুই তিনটি 'ছোলদারী' পড়িয়াছে দেখা গেল। কৈলাস প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া এই সেতু দিয়াই ফিরিতে হয়। দেখিলাম, এক ব্যক্তি, মুণ্ডিত মস্তকে, অতি দীন বেশে

কৈলাস প্রদক্ষিণকারী

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে সেই সেতুটি অতিক্রম করিতেছে। শুনিলাম তাহার এক চক্র প্রদক্ষিণ শেষ হইল।

এখন এখানে এই শ্রাবণ মাসে, দিনমানে দশটার পর ...তে অল্প গরম থাকে, দ্বিপ্রহরে সেই গরম প্রচণ্ড হয়, পরে প্রায় দুইটা হইতে বড়ই ভীষণ বেগে শীতল হাওয়া চলিতে থাকে, প্রায়ই পশ্চিম দিক হইতে বাতাস আসে, তাহার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা পড়ে। দিবা তৃতীয় প্রহরে মাঘ মাসের জঙ্গলী শীত, পর দিন বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত। রাত্রে শীতে মজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়।

দিনমানে দ্বিপ্রহরের পর বাহির হইলেই চক্ষের উপর অতীব প্রবলবেগ শীতল বায়ুর আঘাত এখানে সকলকেই সহ্য করিতে হয়। তাহা ছাড়া দৃশ্যাবলী সর্ব্বত্রই বৃক্ষশূন্য, রুক্ষ পর্ব্বতমালা। প্রান্তরের মধ্যে ইতস্তত সামান্য তৃণলতা যাহা দেখা যায়, তাহাতে সবুজ রংয়ের লেশমাত্র নাই। শীতের সময় ত কথাই নাই, চারিদিকে তুষারসমষ্টি ব্যতীত কিছুই দৃষ্টির মধ্যে আসে না। এই সকল কারণেই এখানে চক্ষুরোগ অত্যন্ত প্রবল।

এখানে ভিখারী অসংখ্য। আমাদের বাংলা দেশে কালিঘাটে যে প্রসিদ্ধ কাঙ্গালী বা ভিখারীর ডিপো আছে, কৈলাসের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। এখানকার ভিখারীর উৎপাতও বিষম। ভোজনে বসিলে সারি সারি বালকবালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, শিশুকোলে জননী, এবং সন্তানের হাত ধরিয়া জনক, তাঁবুর মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করিয়া অতি দীনভাবে হাত পাতিয়া,—যাহাতে করুণার উদ্রেক হয় এরূপ ভঙ্গীতে—একেবারে ভোজন-পাত্রের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়। সকলকে এক এক গ্রাস দিতে গেলে কাহারও খাওয়া হয় না। দ্বার অর্গলবদ্ধ না করিলে নির্ব্বিঘ্নে ভোজন শেষ করিবার উপায় নাই। কোথাও কাহাকে কিছু খাইতে দেখিলে, তাহাদের চক্ষু ভোজ্য ও ভোজনের ব্যাপার ছাড়া আর অন্য কোনো দিকে যাইবে না। অর্দ্ধভুক্ত ছিন্ন অংশটুকুও তাহাদের পরম প্রীতির দান। সম্ভ্রম দেখাইতে এই ভিক্ষুকগণ অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী সহকারে দুই কাণে দুই হাতের তালু রাখিয়া জিহ্বা বিস্তৃত করিয়া দেখাইয়া থাকে।

এইবার পরিক্রমার কথা। আমাদের দলটি পরিক্রমায় যাইবার পূর্ব্বে, সঙ্গের মালপত্র কি ভাবে থাকিবে সেই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, এখানে ইহাদের পরিচিত একজন ভোটিয়া বণিকের জিম্মায় সকলকার মালই রাখিয়া যাওয়া হইবে। পরিক্রমায় ঝাব্বু ঘোড়া প্রভৃতি বাহন অথবা তাঁবু বা শয্যাদ্রব্যাদি কেহ লইয়া যায় না। এই

নমস্কার

পথে কোনও বোঝা বা ভারী জিনিষ না লওয়াই নিয়ম, কারণ পথের শেষদিকে কিয়দংশ এরূপ কঠিন যে, সেদিকে কোনও বাহন লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা, একা যাওয়াই বিপদজনক। তীর্থযাত্রীরা আরও একটি কারণে হাঁটিয়া যায়,—একটু কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া দেবতার দয়া বা কৃপা লাভ হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবার রীতিও আছে। তাহাতে দেবতার কৃপা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যদি কেহ ও রূপ করিতে নিজে অশক্ত হয়

তাহা হইলে অপরের দ্বারাও সে কাজ চলিতে পারে—তাহাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া। এখানে একশ্রেণীর লোক পাওয়া যায় যাহারা মূল্য লইয়া তোমার হইয়া ঐ কাজ করিয়া দিবে ;—ফল নিঃসন্দেহ তোমারই পূর্ণরূপে লাভ হইবে।

পরিক্রমায় যাইবার বিষয়ে সঙ্গী-মহাশয়ের প্রথমে সন্দেহ ছিল। জিপ্লাক গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার পরই তাঁহার শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বেশী রকম হইতেছিল। এদিকের রুক্ষ জলবায়ুর সহিত তাঁহার শরীরের মিল হইতেছিল না, তাহাতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বড়ই অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। শরীরটি কিছু স্থূল, তাহাতে মেদের সংস্থান হেতু তাঁহার পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম বড়ই কষ্টকর হইত। সেইজন্য তারচেনে আসিয়াই শরীরের অবস্থা বুঝিয়া তিনি রমা দেবীকে বলিলেন, "দেবীজী, পরিক্রমামে আপলোক সব যাইয়ে, হাম ইহাঁসে শিউজীকো দরশন করেগা। হাম্ যানে নহি শিকেগা। ইহাঁ হামকো কোইকে পাস রাখকে যাও।" পরে যখন আমাদের সকলের যাইবার তাড়া পড়িয়া গেল, এবং নাথজী তাঁহার অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল এবং এতগুলি বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তাহাদের মধ্যে কাহারও বয়স সত্তরের কোঠায় চলিতেছে—তাহারাও যাইতে প্রস্তুত হইল তিনিও তখন যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "আপলোক সবকোই যায়েগা, অউর হাম ইহাঁ রহেগা? শিউজী মোকরে হামতো যায়গা। দেবীজি ক্যা বোলো?"

সেইদিন প্রাতে আমাদের জন্য রমা ভাত রাঁধিয়া আর সেই ভাতের ফেন শাকের সঙ্গে মিলাইয়া একটি অতি সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিল। সঙ্গী-মহাশয় ভোজনান্তে অতীব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিলেন, "দেবীজি! আপতো অন্নপূর্ণা হো, ক্যা আচ্ছা বানায়া, বহুত স্বাদিষ্ট হুয়া, হামতো বহুত তৃপ্ত হুয়া, আপ হামারা বাস্তে জঙ্গলমে মঙ্গল বানায়া।" যাহা হউক আমাদের সকলের আহারাদি শেষ হইলে মালপত্র সরাইয়া তাঁবু গুটানো হইল—আমরা উহা যথাস্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া যাত্রা করিলাম। মেয়েদের শীতবস্ত্র কম্বলাদি লইয়া সঙ্গে কেবল একজন ভুনিয়া চলিল।

"কৈলাস ভূধর অতি মনোহর, কোটি শশী পরকাশ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর অপ্সরাগণের বাস,"—ইহাই কৈলাস সম্বন্ধে আমাদের বাল্যকালের ধারণা। বোধ হয় পৌরাণিক কৈলাস সম্বন্ধে ঐরূপই একটা ধারণা ভারতবাসী অধিকাংশ হিন্দুরই আছে। কৈলাসে চিরবসন্ত বিরাজ করিতেছে, অন্য কোন ঋতুর এবং কামাদি কোন রিপুরও অধিকার সেখানে নাই, সেখানে গো, মৃগ, শশক, সিংহ, শার্দ্দূল একত্র খেলা করে ইত্যাদি পুরাণ অথবা কাব্যবর্ণিত কৈলাসের সহিত, এই যে ভৌগলিক কৈলাস, ইহার আসলে একটি বিষয় ব্যতীত আর কিছুরই মিল নাই, মিল আছে শুধু স্থির, প্রশান্ত, নিস্তব্ধতায়।

চিরতুষারাবৃত কৈলাসের উচ্চতম শৃঙ্গটি দূর হইতে দেখিতে প্রায় অর্দ্ধ ডিম্বাকৃতি। যেন একটি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্দ্ধাংশ। সমুদ্রতল হইতে উহা ২২,৫০০ ফিট উচ্চ; অতটা উচ্চে সাধারণ তীর্থযাত্রী কেহই যাইতে পারে না। শুনিয়াছি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া একজন ইউরোপীয় উহার একশত ফিট নিম্ন দেশে পৌছিয়াছিলেন। তিব্বতীয় জনসাধারণ কৈলাসশিখরকে "গাংরী" বলে। কৈলাস সন্নিহিত এই অঞ্চলের তিব্বতী নাম গাংরিম্বোচি। 'চ' অক্ষরটির উচ্চারণ অনেকটা "শ"র মত। শিখরদেশটি কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় বত্রিশ মাইল বিস্তৃত অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের পার্ব্বত্য দেশ পরিক্রমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার নাম পাঁকর এবং পূর্ণ দুইটি দিনে উহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই আজ বাহির হইয়াছি। কেন্দ্রস্থ শুভ্র তুষারমণ্ডিত শিখরদেশটি সর্ব্বদা দক্ষিণে রাখিয়াই ঘুরিতে হয় সুতরাং পথটি বামাবর্ত্ত। এই পথের মধ্যে চারিদিকে চারিটি গোম্বা বা মঠ আছে। তাহার মধ্যে তারচেনের ঠিক উপরেই প্রথমটি, তাহার নাম গাংডা। আমরা পশ্চিম মুখে যাত্রা করিয়া প্রদক্ষিণ সুরু করিলাম। পথ প্রশস্ত এবং প্রায়ই সমতল। কিয়দ্দূর গিয়া বামে, দূরে, রাক্ষসতালের কিয়দংশ দেখা গেল, যেন একখানি নীল বস্ত্রাঞ্চল বিস্তৃত রহিয়াছে।

আরও কিছুদূর গিয়া দেখিলাম একজন লামা অশ্বারোহণে আমাদের বামে রাখিয়া খর খর করিয়া চলিয়া গেলেন। এখান হইতে ক্রমে ক্রমে যে সকল দৃশ্য একটির

পর একটি নয়নগোচর হইতে লাগিল তাহার প্রত্যেকটিতে ভয়, বিস্ময় এবং আনন্দ পূর্ণমাত্রায় চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে যেন একটি শূন্য

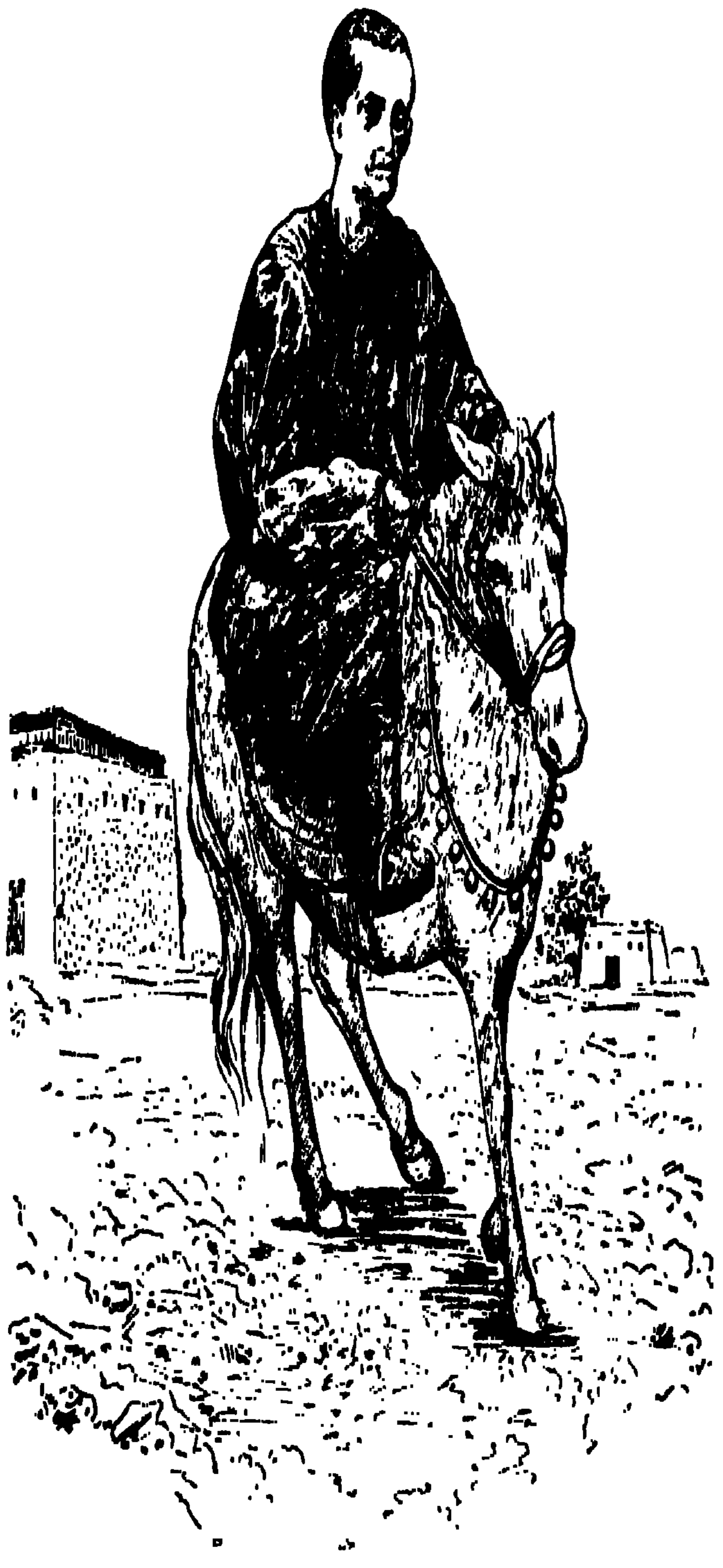

অশ্বপৃষ্ঠে লামা

ভাব যাহা পূর্ব্বে জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। দৃশ্যমান বিশালকায় নগ্ন প্রস্তরসমষ্টি অবলম্বন করিয়া যেন কত কালের সঞ্চিত কত কত স্মৃতি দ্রষ্টাকে কত প্রকার ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

আমরা প্রায় তিন মাইল যাইয়া উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত একটি জলস্রোতের সম্মুখে পড়িলাম। এই নদীটি উত্তরে কৈলাস হইতে নামিয়া সমুদায় পশ্চিম দিকের পথ ব্যাপিয়া আছে। আমরা এইখানে ঘুরিয়া সেই বিশাল নদীবক্ষের উপর দিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলাম। অল্পপরিসর জলধারা, বোধ হয় দশহাতের বেশী হইবে না, খরতর বেগে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই বালুকা অগাধ, ও বিচিত্র উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ। বিস্তৃত নদীবক্ষের দুইদিকেই গগনস্পর্শী পর্ব্বতচূড়াগুলি নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট। বাঁকের মুখেই আমরা এক সাধু মহাত্মার সমাধি দেখিলাম। উপরে প্রস্তরসমষ্টি, তাহাতে গৈরিকবর্ণে তিব্বতী অক্ষরে নানাবর্ণে নানা মন্ত্র চিত্রিত। শীর্ষে একটি দণ্ড বা ধ্বজা, তাহাতে নানাবর্ণের পতাকা ঝুলিতেছে। দলের স্ত্রীলোকেরা সকলেই প্রদক্ষিণ করিয়া লইল এবং শেষে তাহারাও সেই ধ্বজায় নানাবর্ণের বস্ত্রখণ্ড বাঁধিতে লাগিল। সেই সমাধির পার্শ্বেই একটি কুটীর, তাহাতে একজন শিল্পী বাস করে, পাথরের উপর চিত্র করাই তার পেশা।

এখানে মধ্যে মধ্যে এক নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিলাম। তিনি তিব্বতীয় চিরকুমারী সিদ্ধযোগিনী এবং মহাশক্তিশালিনী। তিনি ইচ্ছামত শরীর হইতে বাহির হন এবং ইচ্ছামত শরীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার সঙ্গে একজন লোক থাকে, সে তিব্বতী। যখন যোগিনী শরীর হইতে বাহির হন তখন সেই ব্যক্তিই তাঁহার দেহ রক্ষা করে। দেহটি মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকে। তাহা তখন স্পর্শ করা নিষেধ। এইরূপে তিনি শরীর হইতে বাহির হইয়া যখন পুনঃপ্রবিষ্ট হন তখন অনেক স্থানের অনেক কথা বলিয়া থাকেন। অনেক লোক সম্বন্ধে অনেক গুহ্য কাহিনী তিনি বলিয়াছেন। এই অদ্ভুত সিদ্ধি তাঁহার জন্মগত। তিনি যখন যেখানে থাকেন তখন অনেক দূরদূরান্তর হইতে অনেক নরনারী তাঁহাকে দেখিতে আসে। তিনি সম্প্রতি এখান হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা আরও মাইলখানেক গিয়া বামে নদীতীরে পাহাড়ের উপরে দ্বিতীয় মঠ পাইলাম। তাহার নাম নিয়ান্দি পো গোম্ফা। অনেকটা চড়াই উঠিতে হইবে, তাই রমা গেল না, সঙ্গী-মহাশয়ও গেলেন না, তাঁহারা নীচে নদীতীরে একটি বিস্তৃত শিলাখণ্ডের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আমরা নাপজীকে লইয়া প্রায় পনেরো ষোলজন উপরে উঠিলাম। প্রথমেই মঠসংলগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এই প্রকাণ্ড ঘরটিতে, ছাদের উপরে কতকটা খোলা জায়গায় কাঁচ লাগানো; সেইখান হইতেই যাহা কিছু আলো ঘরের মধ্যে আসিতেছে; তাহাতেই বিস্তৃত মন্দিরগৃহের সকল দ্রব্যই বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সম্মুখেই একটি উচ্চ প্রশস্ত বেদী, তাহার

মধ্যস্থল দারুময়, উপরে সোনালী রং করা একটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড বহুপুরাতন গজদন্ত রাখা আছে। উহা চিত্রিত এবং উভয়প্রান্তে সুবর্ণমণ্ডিত। অন্যান্য মঠে যেমন দেখিয়াছি এই মঠেও তেমনি মূল বেদীর সম্মুখেই বস্ত্রমণ্ডিত চারিটি সোপানের ন্যায় স্তর, তাহাতে আলোকাধার শ্রেণীবদ্ধ। তাহার পর একটি আধারে স্তূপাকার মাখন। একদিকের দেওয়ালে কয়েকখানি চিত্র তাহার মধ্যে বজ্রপাণি, মৈত্রেয় বুদ্ধ এবং তারামূর্ত্তি আছে। তারামূর্ত্তি দেশের সকল মঠেই আছে, মূল বেদীর সম্মুখে, কিছু দূরে সারি সারি গদীপাতা বহু আসন। সেগুলি এখানকার লামাদের জন্যই।

এই সকল মামুলী আসবাব ছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও কিছু আমরা দেখিলাম। যে দেওয়ালে ঐ সকল চিত্র সেই-স্থানেই কতকগুলি নরঅস্থি-নির্ম্মিত মালা ঝুলানো রহিয়াছে। উহা কোন লামার কঙ্কাল বা অস্থি হইতেই প্রস্তুত। এখানে কোন ধর্ম্মাত্মা দেহত্যাগ করিলে কোন কোন স্থলে তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মাংসগুলি পশুপক্ষীকে খাওয়ানো হয়। পরে অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া নানাপ্রকার অলঙ্কারে পরিবর্ত্তিত করা হয়। সেই সকল অলঙ্কার পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কোনও মঠে সযত্নে রাখা থাকে। আবার কোথাও কোথাও ভক্তগণ উহা অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত নানাভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহা সাধনার সহায় বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। কোথাও কোথাও উহা আপদ উদ্ধারের কবচ। কোন কোনও লামার দেহ বৃহৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আধারে লুনের মধ্যে রাখিয়া একস্থানে সমাহিত করা হয় এবং তাহার উপর গোম্ফা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তিব্বতে যতগুলি মঠ আছে তাহাদের অধিকাংশই কোন-না-কোন মোহান্ত লামার সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

যে-কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে কিছু না কিছু উপহার দিয়া প্রণামাদি করিতেছে। আমাদের সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, অন্য কিছু দ্রব্য না থাকায় এখানকার রজতখণ্ড দিয়াই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। নানা উপহার সঙ্গে লইয়া অনেকগুলি গ্রাম্য নারীও আসিয়াছিল। তাহারা পূজারী লামার নিকট সেই সকল নিবেদন করি; ভারতবর্ষের মত এখানেও দেবমন্দিরে নারীর জনতা।

গ্রামবাসিনী নারীগণ এখানকার লামাকে যে সক বস্তু উপহার দিতেছে তাহার মধ্যে কঠিন দুগ্ধ এক বিশে দেখিবার বস্তু। দেখিতে সাদা অনেকটা কুমড়া বড়ীর মত, কিন্তু গন্ধ তাহার ভাল হয়। উহা এত কঠিন হয় যে, হাতুড়ির ঘা মারিলেও ভাঙে কি না সন্দেহ। উহা সিদ্ধ করিয়াই খাইতে হয়। আবার কেহ কেহ অনেকক্ষণ মুখে রাখিয়া একটু নরম করিয়া চিবাইয়া খায়। যেস্থানে এই সকল উপহার রাখা আছে তাহার পশ্চাতে দেওয়ালের গায়ে কারুকার্য্যবিশিষ্ট অতি প্রকাণ্ড ঢালের মত পিত্তলনির্ম্মিত একজোড়া করতাল ঝুলিতেছে। উহাকে বিজয়করতাল বলে। প্রায় দুই হাত তাহার ব্যাস। জানি না উহা কখনও বাজান হয় কি না।

আমরা প্রধান মন্দিরগৃহ এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া একটা মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম ঠিক সম্মুখেই নদীপারে পর্ব্বতশ্রেণীর উপর শুভ্র কৈলাস-শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। এই উচ্চ স্থান হইতে শিখরদেশটি এরূপ স্পষ্ট দেখা যাইবে আমরা কেহ আশা করি নাই। অপূর্ব্ব মনোহর এবং চিত্তাকর্ষক সেই দৃশ্যটি আমরা কতক্ষণ তন্ময় হইয়াই উপভোগ করিতেছিলাম, হঠাৎ খল খল হাসির শব্দে চমকিত হইলাম। পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র ঘর, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ—তাহার উপরের দিকে কয়েকটা ঘুলঘুলির মত ছিদ্র ছিল, তাহার মধ্য দিয়াই আওয়াজ আসিতেছে। ভিতরে কতকগুলি লোকের হাসিতামাসা চলিতেছিল। ক্রমে শুনিলাম তাহাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি চলিতেছে, সে হুটপাট শব্দের মধ্যে ভয়ের আভাসও পাইলাম। ভাষা ত কিছুই বুঝি না কেবল উত্তেজিত অবস্থার বাক্যবিনিময়। তারপর দুমদাম শব্দ আর ভীষণ শব্দে দ্বার খুলিয়া যাওয়া। পরক্ষণেই মুণ্ডিত-মস্তক লোহিতবস্ত্রে আবৃত এক যুবা লামা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া মন্দিরের দিকে ছুটিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে আরও দুই-তিনজন যুবা বাহির হইয়া সেইদিকেই ছুটিল। শেষের লোকটির কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্তস্রাব হইতেছিল। তিন চারজন আমাদের দলের মরদও এই

সকল দেখিয়া সেইসঙ্গেই ছুটিল। আমরা ভীতমনে স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের লোকগুলি ফিরিয়া আসিলে তাহাদের মুখে ব্যাপারটি শুনিলাম। চার পাঁচজন বিদ্যার্থী লামা বা ব্রহ্মচারী একত্র একস্থানে পাঠাভ্যাস করিত। একজনের উপর আর একজনের কিছু আক্রোশ ছিল। মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বচসা হইত। আজ তাহারা একত্র হাসি-পরিহাস করিতেছিল, ক্রমে দুইজনে তর্ক বাধিয়া যায়, পরে তর্ক ঘনীভূত হইয়া ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে। রক্তা-রক্তিতেই তর্কের পরিসমাপ্তি যে এখানে প্রায়ই ঘটে, আবার সেটা নিরক্ষর এবং অক্ষরসম্পন্ন উভয় শ্রেণীর মধ্যে নিঃসঙ্কোচেই অনুষ্ঠিত হয়, তাহা এখানে আমরা কয়েক বারই দেখিয়াছিলাম।

আমরা এইরূপে নিয়ান্দি পো গোম্বা দেখিয়া এবং কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যথাস্থানে অর্থাৎ সেই নদীর ধারে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইলাম।

প্রায় সারাদিনই আমরা সেই প্রশান্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলাম। বামে দক্ষিণে দুই দিকের গগনস্পর্শী পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে নানা ভাবে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। তাহাদের নানা প্রকার আকৃতি, অদ্ভুত রূপ—কোনটি যেন একটি বিশাল গজমুণ্ড, কোনটি যেন অশ্বপৃষ্ঠে সংযুক্ত জিনের মত, কোনটি বা উপবিষ্ট হনুমানের মূর্ত্তির মত, দূর হইতে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল।

আমরা এ পর্য্যন্ত যত পথ চলিয়া আসিয়াছি এবং পথের মধ্যে দৃশ্যবস্তুর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছি, এই কৈলাস পরিক্রমার পথেই তাহার চরম হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৈলাসের প্রত্যেক দৃশ্যটি বিচিত্রতাশূন্য, কেবলমাত্র বিভিন্ন আকারের রুক্ষ পাষাণময় শরীর ও তাহার বিশালতা—যাহা অনুভবসাপেক্ষ। আমরা ভারতবাসিগণ অনেকেই অনেক তীর্থ পর্য্যটন করি। কিন্তু হিমালয় পার হইয়া এই তীর্থে বড় অল্পলোকেই আসেন। অবশ্য কিম্বদন্তী-মূলক দুর্গম পথের কথা শুনিয়াই অনেকে পশ্চাৎপদ হন। কিন্তু পথের ক্লেশটুকু স্বীকার করিলে যে একটি অমূল্য বস্তু লাভ হয় তাহার তুলনায় পথকষ্ট অতি সামান্য বলিয়াই মনে হইবে। এখানে আসিয়া দাঁড়াইলে একবার মুক্তকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা করে, হে তীর্থপ্রিয় ভারতবাসিগণ, তোমরা পুরাণোক্ত অনেকগুলি প্রাচীন আর্য্যদেবগণের লীলাভূমি দেখিয়াছ। গয়া, বারাণসী, দ্বারকা, বৃন্দাবন, রামেশ্বর, পুরুষোত্তম দর্শন করিয়াছ, কঠিন হিমালয়ের মধ্যেও হরিদ্বার, হৃষীকেশ, গঙ্গোত্রী, কেদার ও বদরিকা প্রভৃতি বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া দর্শন করিয়াছ, কিন্তু এই চিরপ্রাচীন, ভোগবিলাসবর্জ্জিত, প্রকৃতির কর্তৃত্বে রম্য, স্বতঃই সমাহিত, প্রশান্ত সৌন্দর্য্যশালী শিবের সমাধিক্ষেত্র কৈলাস দেখিয়াছ কি? সেই দিগম্বরের ক্ষেত্রটি একবার দেখিবার সাধ রাখিও। রাখিলে কোন সময়ে তাহা পূর্ণ হইবে। তখন আসিয়া এই কৈলাসপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিও,—এই বিশাল হিমালয়ের প্রান্তে, বৃক্ষলতাদিশূন্য নগ্ন এবং শ্রীহীন প্রস্তরসমষ্টির অন্তরালে কি এক মহান্ শক্তি জাগ্রত ভাবে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি এখান হইতে একটি নূতন জন্ম লইয়া যাইবে।

যখন বেলা প্রায় চতুর্থ প্রহর তখন চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। এমনই সময়ে আমরা এক বাঁকের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আর একটি স্রোত উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে আসিয়া এই নদীটির সঙ্গে মিলিয়াছে। আমরা প্রথম নদীর গতি ধরিয়া পূর্ব্বমুখে ফিরিলাম। এখানে আবার অনেকগুলি প্রবল জলস্রোত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে নদীগর্ভ অনেকটা প্রশস্ত হইয়াছে। এখানে আমাদের দলের সকলেই একত্র হইল, কারণ দুই তিনটি প্রবল স্রোত সাবধানে পার হইতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা সকলে পারিবে না। লালসিং পাতিয়ালের মা পারিবেন না। আর কুমায়ুনী যে চারিজন সাধু, তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা আছেন, তিনিও পারিবেন না। তাহা ছাড়া আরও দুই তিনজন অশক্ত।

কাণ্ডারী হইল দুইজন, সঙ্গে যে হূনিয়া বাহক দস্যু, স্ত্রীলোকের কম্বল ও বস্ত্রাদি আনিয়াছিল সে, আর আঁসকোট রাজওয়াড়ার সেই লাংগীর। সে সর্ব্বত্রই নির্ভীক এবং অকুণ্ঠিতচিত্ত। বুড়ী দুইজনকে একে একে সযত্নে তাহার পৃষ্ঠে লইয়া এপারে রাখিয়া আর কাহাকেও পার করিতে

হইবে কিনা—সে একবার ফিরিয়া দেখিল। তখন প্রসন্ন-নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া সঙ্গী-মহাশয় হাত বাড়াইলেন, তৎক্ষণাৎ সে আবার ফিরিল এবং তাঁহাকে অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পার করিল। এইরূপে, সঙ্গী-মহাশয় যাঁহাকে এতদিন ঘৃণাই করিয়াছেন, এই কঠিন পারাপারের ব্যাপারে তাহাকেই কাণ্ডারী করিলেন। সকলে পরপারে একত্র হইলে আমরা আবার পূর্ব্বমুখে দ্রুতগতি পা চালাইলাম। আকাশে ঘন মেঘ ক্রমশই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বোধ হয় দুই মাইল আন্দাজ চলিয়াছি এমন সময় চট্‌পট্ শব্দে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরে দেখিলাম যাহা পড়িতে লাগিল তাহা ঠিক জল নয়—তুষার। পূর্ব্বে আমি তুষার দেখি নাই এই প্রথম দেখিলাম। আমরা ঘাড় গুঁজিয়াই ছুটিতে লাগিলাম। সঙ্গী-মহাশয়ের ছাতা ছিল। তুষার-বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঝড়—তাহার এতটা বেগ যেন টানিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কি শীতল বাতাস। যে

যাত্রীর দল

যেদিকে পাইল দৌড়াইতে লাগিল। শুনিলাম মঠ আর বেশী দূর নয়। এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে প্রায় একপোয়া পথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখে মঠের লাল পতাকা দেখিতে পাইলাম। জমির উপর তখন প্রায় তিন চার ইঞ্চি তুষার জমিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। সকলেরই গা মাথা সাদা। আমরা রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে মঠের বড় দরজায় আসিয়া দেখিলাম দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া অপর দিকের আর একটি দ্বারের অর্দ্ধাংশ খোলা দেখিতে পাইলাম এবং সকলে মিলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম।

আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম, আর প্রকৃতিও শান্ত হইয়া গেল। তুষারে কাপড়-জামা বেশী ভিজে নাই, উপরের জামাটি খুলিয়া ঝাড়িতেই সব তুষার ঝরিয়া গেল। তখন দুইজন লামাকে সিঁড়ির নীচে দেখিলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই তাঁহাদের একজন উপর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন এবং সেই সিঁড়ি দিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমরা সদলে উপরে উঠিয়া একটি বড় ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে দুই চারিজন যাত্রী চুপচাপ বসিয়া আছে। দ্বারের নিকট এককোণে আমরা তিনজন স্থান করিয়া কম্বল বিছাইয়া বসিলাম। সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা সেই ঘরের অপর দিকে তাহাদের স্থান করিয়া লইল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই অতবড় ঘরখানি সরগরম হইয়া উঠিল।

প্রদক্ষিণের পথে এই তৃতীয় গোম্ফা বা মঠের নাম দীরিপু। অন্যান্য মঠে যাহা আছে এখানেও সেই সকল বস্তুই আছে। সেই বিশাল পদ্মের উপর স্বস্তিকাসনে বুদ্ধ-মূর্ত্তি, সেইরূপ পুস্তকাগার, সেইরূপ ধ্যান-ধারণার আসন সমূহ, তারা, মহাকাল, অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। স্তরে স্তরে দীপাধার, বৃহৎ পাত্রে মাখন স্তূপাকৃতি সাজানো; দেওয়ালে প্রধান চিত্রাদি বহুলপরিমাণে পাষাণ ও ধাতবমূর্ত্তি সুসংযতভাবে রক্ষিত এবং মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

এখানেও রমা নিজের অসুস্থ শরীর লইয়া আমাদের প্রতি যত্নের ত্রুটি করে নাই। আমরা নিজ নিজ স্থানে জুত করিয়া বসিয়াছি দেখিয়া রমা আসিয়া বলিল—"আমি আপনাদের জন্য খাবার তৈরী করিয়া আনি, আপনারা এখন এইখানেই থাকুন কোথাও যাইবেন না।" এই মঠের রন্ধনশালা হইতে সে আমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিল। এখানকার পরিক্রমার যাত্রিগণ যাহারা

কৈলাস পরিক্রমা

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাত্রিবাস করে তাহারা অনেকেই মঠের পাকশালা হইতে কিছু কিছু খাদ্য পাক করিয়া লয়। পাকশালায় গিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড একটি মাটির চুলা আট দশ ফুট লম্বা, চার পাঁচ ফুট চওড়া, অর্দ্ধগোলাকার, উপরে মাটির প্রলেপ দেওয়া, স্থানে স্থানে পাত্র বসাইবার ছিদ্র আছে, ভিতরে অগ্নি জ্বলিতেছে। একসঙ্গে আট দশটি খাদ্যদ্রব্য পাক হইয়া যায়।

আমরা আহারাদি সারিয়া মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিতে গেলাম। বহুলপরিমাণে ধূপের গন্ধে সেই প্রধান মন্দির-গৃহ আমোদিত। দীপসকল জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরোহিত বা পুজারী লামা আসিয়া প্রণাম করিলেন, সেই সঙ্গে প্রধান লামার সহিত দলবদ্ধ অপর লামাগুলি আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং সারি সারি আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠ করিলেন এবং শেষে পুনরায় মন্ত্রপাঠ করিয়া যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহাই এখানকার সন্ধ্যারতি। সেই রাত্রে আমরা প্রায় দুইশত তীর্থযাত্রী দীরিপু মঠে রাত্রি যাপন করিয়া রাত্রি তৃতীয়প্রহরের শেষে যাত্রা করিলাম।

যাত্রীদের তাঁবু

শেষরাত্রে চাঁদ ছিল তবে চারিদিকে কুজ্ঝটিকার আচ্ছন্ন, দৃষ্টি বড় চলিতেছিল না। পাশে পাশে স্ত্রীপুরুষ পুঁটলি-পোঁটলা কম্বল পিঠে করিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতেছিল। দোলমা গিরিসঙ্কটের পথে চড়াই খাড়া নয়। লিপুলাক 'পাকে'র মত ক্রমোচ্চ বিশৃঙ্খল প্রস্তররাশির উপর দিয়া পথ। রুমার জ্বর ও শিরঃপীড়া তাহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়াছে। তাহাতে এই পথের কষ্ট বড়ই লাগিয়াছিল। সঙ্গী-মহাশয়েরও শরীর বড়ই খারাপ হইয়া গেল, শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তাঁহাকে বার বার বিশ্রামের জন্য বসিতে হইতেছিল। এইরূপে প্রায় দুই মাইল চলিবার পর প্রভাত হইল।

শ্বাসকষ্ট অল্পাধিক সকলকারই হইতেছিল। আমরা প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার ফুটের উপর উঠিতেছি। ধীরে ধীরে চলিতেছি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে বুকে টান ধরিতেছে ও গলা শুকাইতেছে। মিছরী, মরিচ, পুরাতন তেঁতুল, কাসুন্দি প্রভৃতি কঠিন পার্ব্বত্য পথে শুষ্ক কণ্ঠ সরস করিবার জন্য যে সকল ঔষধ সঙ্গে ছিল তাহার ব্যবহারেও কিছুমাত্র স্বস্তি নাই উপসমও নাই। নাথজী স্থিরপ্রকৃতি, তিতিক্ষাপরায়ণ এবং ত্যাগী। তাঁহার মুখে ক্লেশের কোনও চিহ্ন নাই কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে রুমা যে অত কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে সাহায্য করিবারও শক্তি নাই। সকলেই নিজের তাল সামলাইতে ব্যস্ত। কে কাহাকে সাহায্য করিবে, সকলেই এস্থানে দুর্ব্বল!

দুইটি রক্তবস্ত্রধারী লাসা-নিবাসী লামা উচ্চৈস্বরে বুদ্ধের স্তুতিগান করিতে করিতে আমাদের পশ্চাতে আসিতেছিলেন। দুইজনই দীর্ঘকায় শক্তিমান যুবক। আমরা এখন যেখানে বিশ্রামার্থ বসিলাম তাঁহারাও সেইখানেই আসিয়া বসিলেন।

রুমার ভগ্নী রুমতি,—সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে 'দেখন-হাসি' বলিতেন,—কারণ সে কেবলই হাসিত। বিশেষতঃ সঙ্গী-মহাশয়ের কাঁচা-পাকা দাড়ি ও উদরটি ছিল তাহার কটাক্ষের বস্তু; ঐ দুইটি বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার যাহা কিছু হাস্যপরিহাস। সে তাঁহাকে "থুলে পণ্ডাৎ" বলিত। এ ক্ষেত্রে সে সঙ্গী-মহাশয় ও রুমাকে বিপন্ন দেখিয়া, তাহাদের সেই অবস্থার কথা পার্শ্বে উপবিষ্ট ঐ

আমাদের গোচর করিল এবং যাহাতে তাঁহারা এই দুই-জনকে হাত ধরিয়া লইয়া যান সেজন্য অনুরোধ করিল। এই কথা শুনিয়া সেই দুইজন লামা দয়ার্দ্র হইয়া রুমা এবং সঙ্গী-মহাশয়কে হাত ধরিয়া অনায়াসেই লইয়া চলিলেন এবং শিখরদেশে পৌঁছাইয়া দিলেন। এই ব্যাপারটি সঙ্গী-মহাশয় ফিরিবার পথে পরিচিত সকলের নিকট এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, "কৈলাসপতি প্রসন্ন হইয়া দুইজন স্বর্গের দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আমাকে ঐ স্থানটি সহজেই পার করিয়া দিল।"

আমরা দিবা প্রায় একপ্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া শিখরে উঠিলাম,—তখন সকল ক্লেশ সার্থক হইল। সকলে তখন বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া পথের কথা লইয়াই পরস্পর আলাপ করিতে ব্যস্ত। আমি সেখান হইতে শুভ্র কৈলাস-শৃঙ্গ যতটা দেখা যায় তাহার হিসাবেই ব্যস্ত ছিলাম। স্থানটিকে হিন্দুরা গৌরীকুণ্ড বলে কিন্তু হুনিয়ারা ইহাকে বলে দোলমা। এখানে কিছু দূরে নীচের পথে চির-তুষারাবৃত একটি হ্রদ আছে; তাহাকে হিন্দুরা গৌরীকুণ্ড বলে। তাহার পূর্ব্ব তীর দিয়াই পথ। প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর নামিতে আরম্ভ করিলাম।

আমরা এইবার দক্ষিণ মুখে প্রায় পাঁচ মাইল গিয়া পরে পশ্চিমমুখে ঘুরিলাম এবং আরও প্রায় চার মাইল গিয়া এক নদীতীরে কতকটা ক্ষেত্রের মত স্থান দেখিলাম। যণ্ডুপো নামক চতুর্থ মঠটি এইখানেই। মঠ বা গোম্বার ব্যাপার সকলই একরূপ। আর চক্ষে কিছুই বিশেষ নূতন বলিয়া লাগে না! আমরা নদীতীরে একস্থানে বসিয়া একটু

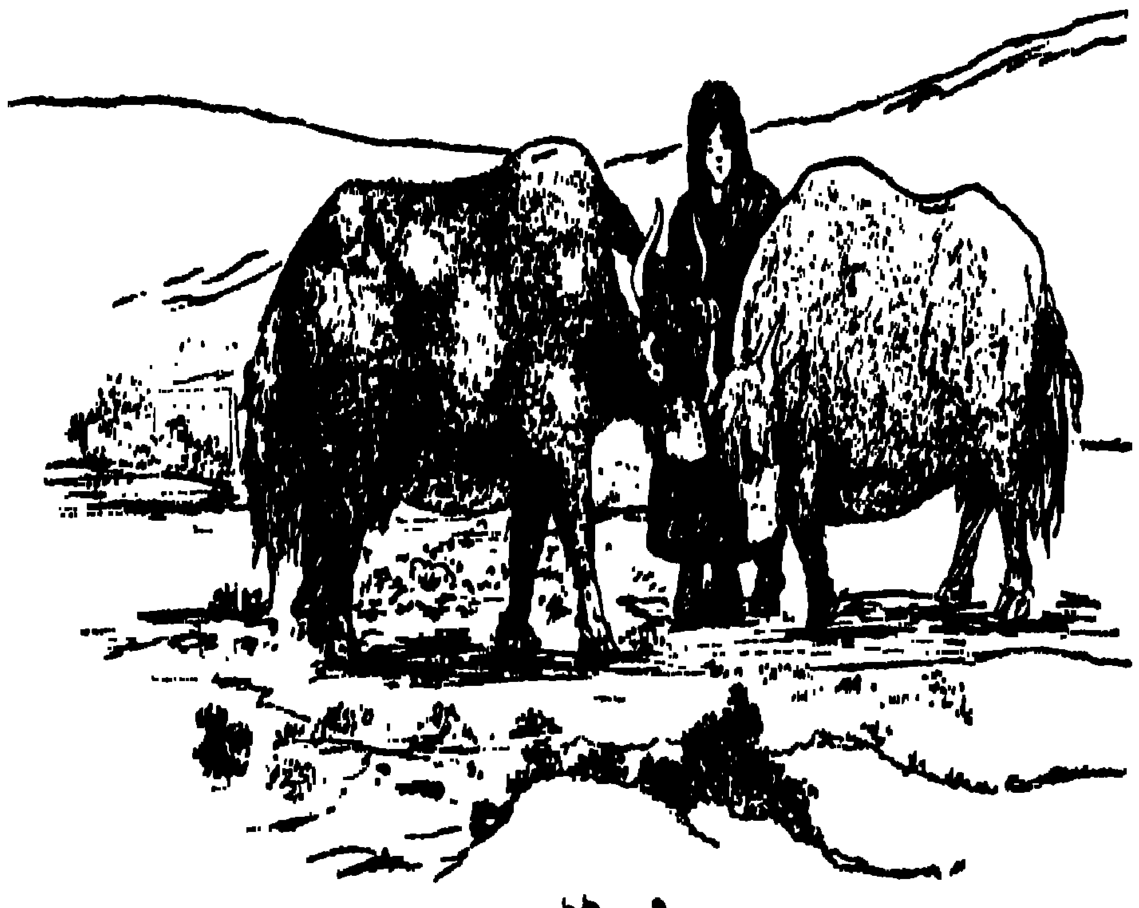

দুইটি চমরী

বিশ্রামের পর আবার উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। রুমা বড়ই কাতর হইয়া এইখানে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে এখানে তারচেন-যাত্রী এক হুনিয়ার একটা ঘোড়া ভাড়া পাওয়া গেল। ভাড়া একটা ভারতীয় টাকা। তারচেন পৌঁছিবার পূর্ব্বে, কৈলাসের পাদপ্রান্তে এক গহ্বর হইতে সকলেই মাটি পাথর প্রভৃতি লইতে লাগিল। ইহা সর্ব্বসন্তাপহর এবং কল্যাণপ্রদ। সেখান হইতে নীলাভ মানস সরোবরের কতক অংশ দেখা যাইতে লাগিল।

আমরা পশ্চিম মুখেই আসিতেছিলাম, বেলা প্রায় অপরাহ্ণ, কি ভয়ানক প্রবল বাতাস চলিতেছিল! তাহার বেগ মনে হইলে এখনও হৃৎকম্প হয়। উহা এত শীতল যে, বুকের মধ্যেও কন্ কন্ করিতে লাগিল। তারচেনে পৌঁছিবার পর মাথাটা বিষম ভার হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই শরীরও ভার এবং অসুস্থবোধ হইতে লাগিল। তাঁবু খাটানো হইবা মাত্র শয্যা গ্রহণ করিলাম। কৈলাস পরিভ্রমণ সম্পন্ন হইল ভাবিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই রাত্রেই প্রবল জ্বর আসিল।

পরদিন বেলা যতই বাড়িতে লাগিল জ্বরও ততই বাড়িতে লাগিল। চক্ষু চাহিতে মাথায় বিষম বেদনা বোধ হইতে লাগিল। প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অচৈতন্য ছিলাম। পরে দেখিলাম রুমা ও নাথজী দুজনে আমার অতি নিকটেই বসিয়া। রুমা আজ ভাল আছে বটে কিন্তু আমার প্রবল জ্বর দেখিয়া তাহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। নাথজী জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা তকলীফ হৈ?" আমি মাথা দেখাইয়া

লাম। রুমা তখন আমার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। সঙ্গী-মহাশয় তখন জানি না কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিলেন। জুতা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "বুঝলে হ্যা, ও কিছু না! একটু কিস্‌মিস্‌ ও খানিকটা গরম দুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

জ্বরে আমার ততটা কাতর করে নাই যতটা কাতর করিয়াছিল এই ভাবনায় যে, আমি কি ইহাদের যাত্রার প্রতিবন্ধক এবং অশান্তির কারণ হইলাম। পরদিন আমাদের যে মানস সরোবরের নিকট উষ্ণ প্রস্রবণের দিকে যাইবার কথা, বেশী ভাবিতে পারিলাম না,—আবার অচৈতন্য হইলাম।

এইভাবে সমস্ত দিন কাটিল—আবার যখন রাত্রে জাগিলাম, তখন তাঁবুটি নিস্তব্ধ, একদিকে আগুন জ্বলিতেছে, তাহাতে কতকটা স্থান আলোকিত হইয়াছে। নাথজী আমার বামপার্শ্বে সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গে বসিয়া আছেন আর আমার দক্ষিণপার্শ্বে একজন লামা বসিয়া তাঁহার কোচ নয়নে আমার মুখের উপর তীব্রদৃষ্টির খোঁচা মারিতেছেন! আমি লামার মূর্ত্তি দেখিয়াই চমকিত হইলাম। এখানে লামা কেন? তিনি আমার জাগ্রত দেখিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বাহির করিলেন এবং তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা আমার সমস্ত কপাল এমন জোরে রগড়াইতে লাগিলেন যে, তাহার ঘর্ষণে ছাল উঠিয়া যাইবার যোগাড় হইল। যন্ত্রণায় মুখে আমার উঃ আঃ—এইরূপ একটা শব্দ বাহির হইল, চক্ষু চাহিতে পারিলাম না!

রুমা ও তাহার ভগ্নী শিয়রে বসিয়াছিল। আমি দেখিতে পাই নাই। ব্যগ্রভাবে তখন রুমা বলিল, "পিতাজী, অব কুছ মৎ করো, সব আরাম হো জায়গা। আপ চুপচাপ সোতে রহিয়ে,—লামা ফুঁক দেগা।" কাজেই তখন ব্যাপার বুঝিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম।

এইবার লামা ফুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। সে ফুঁকের কথা আর কি বলিব। কপালে সেই কঠোর অঙ্গুলী-পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে, লামা-মহাশয় জড়িতকণ্ঠে অস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আর এক-একবার মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশরীরে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। লামাজীর সম্মুখের উপর-পাটির দুইটি দাঁত ভাঙা ছিল। আরোগ্যকামনায় তাঁহার সেই কল্যাণপ্রদ, সর্ব্বতাপহর ফুৎকারের চোটে রোগের কিছু উপশম হোক না হোক আপাতত সবেগ নিষ্ঠীবনাবন্দুতে আমার মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। একে ত রোগের যন্ত্রণা, তাহার উপর আবার এইরূপ নিতান্তই দুঃসহ এক ব্যাপারে জ্বালাতন হইয়া আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম। রুমা অমনি "নহী নহী পিতাজী, ঐসা মৎ করো,—ফুঁক বা লেও, জলদী আরাম হো জায়গা, বো অচ্ছা গুণী লামা হৈ,"—বলিয়া আমার মাথাটি জোর করিয়া আবার ফিরাইয়া দিল। তখন লামা আবার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি ফুঁকিতে লাগিলেন—আর আমি স্নেহের দায়ে সকাতরে ও নির্ব্বিবাদে সেই দুঃসহ ফুঁগুলি হজম করিতে লাগিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে লামা-মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন,—আমিও পাশ ফিরিয়া শুইয়া বাঁচিলাম। তখন রুমা ও তাহার ভগ্নী দুজনেই "অব থোড়া আরাম মালুম হোতা হৈ কি নহীঁ, শিরকা দরদ কমতী হুয়া কি নহীঁ তাপ কমতী হুয়া কি নহীঁ" ইত্যাদি প্রশ্নে আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। তাহাদের প্রশ্নধারা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বলিলাম "থোড়া আরাম হৈ" তখন রুমার ভগ্নী রুমতি বলিল, "সব অচ্ছা হো যায়গা, বো বহুত অচ্ছা লামা হৈ।"

গভীর রাত্রে প্রবল রকম ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল এবং পরদিন প্রাতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। ভগবৎ কৃপা ভাবিয়া প্রাণের মধ্যে যে আনন্দ হইল তাহা বলিবার ভাষা নাই।

বলা বাহুল্য আজই আমরা উষ্ণ প্রস্রবণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

স্ফোটন দিয়া সম্বলন করিয়া নামাইও। বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয় ছেলের জন্ম রাখিও, পদদ্বয় তোমার, মুণ্ডটি আমি খাইব।'

রাক্ষস বলিল—'মাতঃ, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ কেমন শিকার আনিয়াছি।'

রাক্ষসী বলিল—'ও আর দেখিব কি। সব মানুষই সমান, ভাল করিয়া রাঁধিলে কে ঋষি কে চণ্ডাল টের পাওয়া যায় না। আমার এখন সময় নাই, চুল বাঁধিতেছি।'

রাক্ষস বলিল—'চুল বাঁধা এখন থাক্, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ।'

পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রাক্ষসী বাহিরে আসিল। ভীমকে দেখিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া কহিল—'ওমা আর্য্যপুত্র যে! ছি ছি লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর্ বেটা।'

ভীম বলিলেন—'কে ও, দেবী হিড়িম্বা? প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।'

রাক্ষসী কি খাইল ভাস তাহা লেখেন নাই।

'দেহলতা এলাইয়া দিল'

উপেক্ষিতা

বাহিরে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। ড্রয়িংরুমে পিয়ানোর কাছে উপবিষ্ট গরিমা গাঙ্গুলী, তার সম্মুখে ইজিচেয়ারে চটক রায়। ঘরে আসবাব বেশী নাই, কারণ গরিমার বাবার বদলির হুকুম আসিয়াছে, অধিকাংশ জিনিষ প্যাক হইয়া আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

এই চটক ছেলেটি যেমন ধনী তেমনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী বাধ্য, চিম্‌টি কাটিলেও আপত্তি করে না,—যাকে বলে লেডিজ্ ম্যান। না হইবে কেন, সে যে পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকিয়া স্রেফ এটিকেট অধ্যয়ন করিয়াছে। এমন সুপাত্র আজকালকার বাজারে দুর্লভ। গরিমার পিতা মাতা কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বেই কন্যাকে বাগ্‌দত্তা দেখিতে চান, তাই তাঁরা যাত্রার পূর্ব্বরজনীতে ভাবী দম্পতিকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া দোতলায় বসিয়া সুসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু আলাপ তেমন জমে নাই। গোটা-পনর গান শেষ করিয়া গরিমা তৃতীয়বার জানাইল—'কাল আমরা যাচ্ছি।'

চটক বলিল—'ও।'

গরিমার কণ্ঠ যোগাইতেছে না। অগত্যা বলিল—'সেই ভুটানী গজলটা গাইব কি?'

'নাঃ, এইবার ওঠা যাক।'

'সে কি হয়, আগে বৃষ্টি থামুক।'

চটক চেয়ারে বসিয়া নীরবে উসখুস করিতে লাগিল। মিনিট-দুই পরে আবার বলিল—'এইবার উঠি।'

গরিমা ভাবিতেছিল—কবি বৃথাই লিখিয়াছেন 'এমন দিনে তারে বলা যায়।' হায়, এই বাদল সন্ধ্যা কি নিষ্ফল হইবে? চটকের কী হইল? কেন সে পালাইতে চায়? তার কিসের অস্বস্তি, কিসের অস্থিরতা? গরিমার মোহিনীশক্তি আজ তাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সেই ভেট্‌কী-মুখী বেহায়া মেনী মিত্তিরটা চটককে হাত করে নাই ত? হবেও বা। গরিমা তাহার প্রবল অভিমান দমন করিয়া বলিল—'আর একটু বসুন।'

কিন্তু চটক বসিল না। চেয়ার ছাড়িয়া বলিল—'গু, চন্দ্রম, গুডনাইট।'

বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঝমঝমানি ভেদ করিয়া চটকের মোটর গর্জ্জিয়া উঠিল। গেল, যাহা বলিবার তাহা না বলিয়াই চলিয়া গেল,—ভোঁপ ভোপ্—দূরে, বহুদূরে…

গরিমা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চটকের পরিত্যক্ত চেয়ারে দেহলতা এলাইয়া দিল। তার পরেই এক লাফ। ভীষণ সত্য সহসা প্রকট হইল। বেচারী চটক!…

চেয়ারে অগুণ্‌তি ছারপোকা।

উপেক্ষিত

শহর ফতেহাবাদ, সময় অপরাহ্ন। শাহজাদী জবরউন্নিসা দিলতোড়বাগ উদ্যানে বসিয়া আছেন। সমান্তরাল তরুশ্রেণীর শীর্ষে অস্তরাগ ঝিক্‌মিক করিতেছে, ডালে ডালে হাজার বুলবুলের কাকলি, গোলাবের ফোয়ারায় রামধনুর রংবাহার, ফুলে ফুলে চারিদিক ছয়লাপ। শাহজাদীর হাতে একটি রবাব, তাহাতে তিনি ঝঙ্কার তুলিয়া মৃদুস্বরে গাহিতেছেন—'আয়সে বেদর্দীকে পালে পড়ী হুঁ।' তাঁহার প্রিয় ব্যাঘ্র হেমকান্তি কিরোখশের পদপ্রান্তে বসিয়া থাবা দিয়া তাল দিতেছে এবং মাঝে মাঝে স্বামিনীর বিজাপুরী লাল চটিজুতা চাটিতেছে।

সহসা একটি পুরুষমূর্ত্তির আবির্ভাব। গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, বক্রাগ্র দাড়ি, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কটিবন্ধে তলোয়ার। ইনিই কোফ্‌তা খাঁ; বাদশাহের সেনাপতি ও দক্ষিণহস্ত।

জবরউন্নিসা চমকিত হইয়া বলিলেন—'একি, কোফ্‌তা খাঁ, তুমি এখানে?'

সেনাপতি কহিলেন—'হাঁ সুন্দরী। আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাই। তুমি বহুকাল আমাকে ছলনা করিয়াছ, আজ জবান খুলিয়া স্পষ্ট করিয়া বল আমাকে বিবাহ করিবে কি না।'

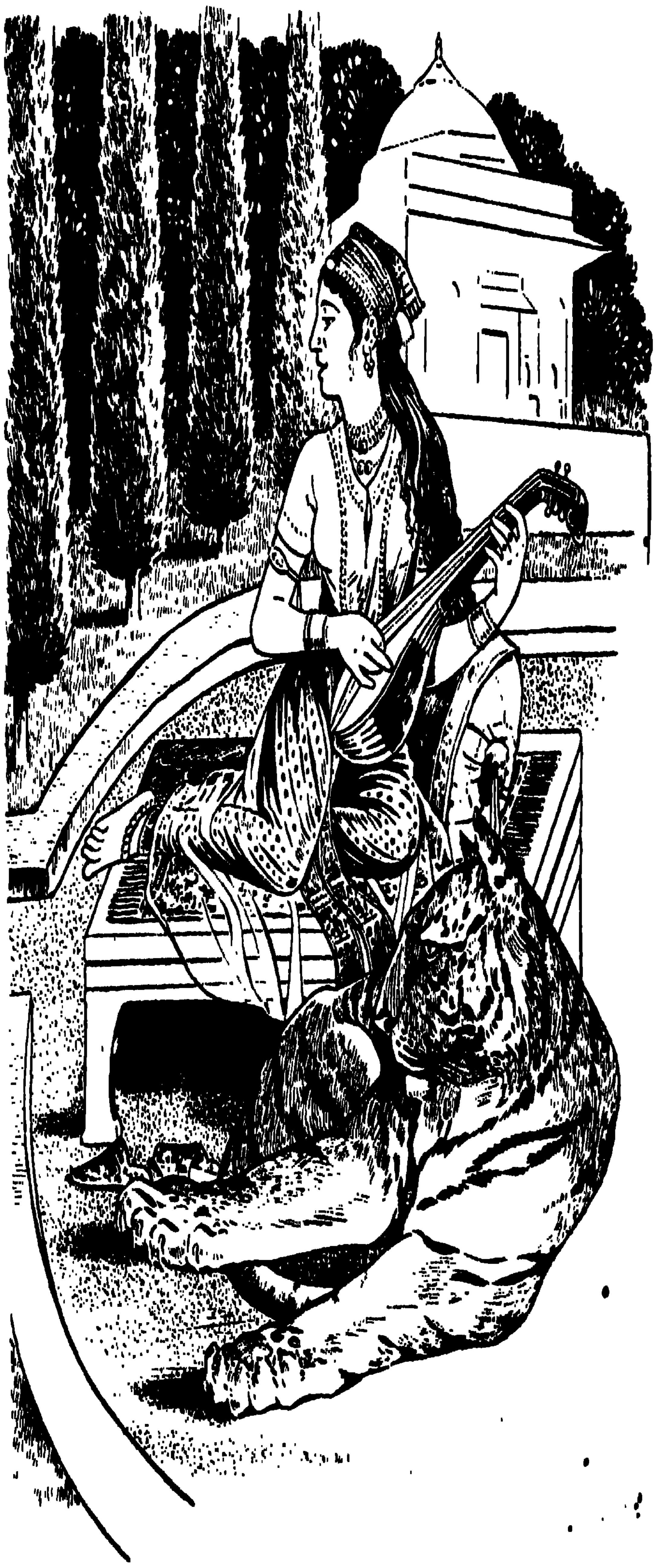

শাহজাদী জবরউন্নিসা

জবরউন্নিসা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'বেওকুফ, তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? ছিলে ক্রীতদাস,

বাদশাহের দয়ায় সেনাপতি হইয়াছ। বস্, ঐখানেই ক্ষান্ত হও, অধিক ঊর্দ্ধে নজর দিও না।'

কোফ্‌তা খাঁ যথোচিত ভীষণতা সহকারে একটি অট্টহাস্য হাসিলেন। বলিলেন—'শাহজাদী, কে তোমার পিতাকে তখ্‌তে চড়াইয়াছে? মারহাট্টার আক্রমণ কে বার-বার রোধ করিয়াছে? কাহার অনুগ্রহে তোমার এই ভোগৈশ্বর্য্য, এই হীরাজহরৎ, এই লীলা-উদ্যান, এই হাজার বুলবুল মুখরিত কুঞ্জ? ইন্‌শাল্লাহ্! জানো, একটি অঙ্গুলির হেলনে সমস্ত ভূমিসাৎ করিতে পারি? রাজ্যের প্রকৃত মালিক কে? তোমার অক্ষম পিতা, না এই মহাবীর রস্তম-ই-হিন্দ্ কোফ্‌তা খান্ ফতে-জঙ্গ্?'

জবরউন্নিসা বলিলেন—'কুত্তার গর্দ্দানে লোম গজাইলেই সে সিংহ হয় না।'

সেনাপতি বলিলেন—'বিস্‌মিল্লাহ্! এ কথা আর কেহ বলিলে এই মুহূর্ত্তে তাকে কতল্ করিতাম। কিন্তু তুমি আমার দিল্ গ্রিফতার করিয়াছ, এবারকার মত মাফ করিলাম। যাহা হোক, এখনও বল তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হইবে কি না।'

জবরউন্নিসা মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—'কোফ্‌তা খাঁ, তুমি কি কবি হাফেজের সেই বয়েৎটি জানো না?—কুকুর বার-বার ঘেউ-ঘেউ করে, কিন্তু সিংহী একবারই গর্জ্জায়।'

ইহার পর কোনো পুরুষই স্থির থাকিতে পারে না, বিশেষতঃ সেই মুঘল যুগে। কোফ্‌তা খাঁ হুঙ্কার করিয়া কহিলেন—'ইল্‌হম্‌দলিল্লাহ্! শাহজাদী, তবে আল্লার নাম স্মরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।' কোষ হইতে সড়াক করিয়া অসি নির্গত হইল।

শাহজাদী বলিলেন—'কোফ্‌তা খাঁ, তুমি আমাকে নিতান্তই হাসাইলে!'

অসহ্য। কোফ্‌তা খাঁর নিষ্ঠুর হস্তে উদ্যত তলোয়ার ঝলকিয়া উঠিল। শূন্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিল, একটি হিল্লোলিত কাঞ্চনকায়া নিমেষের তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার ভূতলে পড়িল। একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ, একটু ছটফটানি, তারপর সব শেষ···

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে। জবরউন্নিসা তখনও গাহিতেছেন—'আয়সে বেদর্দীকে পালে পড়ী হুঁ।' তাঁহার পোষা বাঘটি ভোজন সমাপ্ত করিয়া পরমতৃপ্তির সহিত স্বক্কনী পরিলেহন করিতেছে। তাহার বাঁয়ে কোফ্‌তা খাঁর পাগড়ি, ডাহিনে ছিন্ন ইজার কাবা জোব্বা, সম্মুখে কিঞ্চিৎ হাড়।

রাতারাতি

রাত বারোটা। বৃদ্ধ গোবিন্দবাবু দোতলার ঘরে খাটের উপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

সহসা তাঁর চোখে একটা তীব্র আলোক পড়ায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলেন—চাপা গলায় কে বলিতেছে—'খবরদার, চেঁচালেই গুলি ক'রব। লোহার আলমারির চাবি—শীগ্‌গির।'

গোবিন্দবাবু বুঝিলেন, আধুনিক চোর। একটা স্থবির চাকর ছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, তিনি নিজেও বাতে পঙ্গু। অগত্যা বলিলেন—'চাবি ত আমার কাছে নেই, গিন্নীর কাছে। তিনি ভাইয়ের বাড়ি গেছেন।'

চোর বলিল—'মনিব্যাগ? ঘড়িটড়ি?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'ঐ ড্রেসিং টেবলের টানার মধ্যে।'

টর্চ্চের আলো ঘরের চারিদিকে ঘুরাইয়া চোর টেবিল খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে চোর বলিল—'উঃ।'

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'কি হ'ল?'

সাড়া নাই। কিছুক্ষণ পরে চোর আবার 'উঃ' করিল। গোবিন্দবাবু ভাবিত হইলেন। খাটের পাশেই একটা বাতির সুইচ, সেটা টিপিয়া ঘর আলোকিত করিলেন। দেখিলেন—চোর টেবিলের পাশে মেজেতে বসিয়া আছে। তার কোমরে হাত, মুখে কাতর ভঙ্গী।

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমারো বাত না কি?'

চোর বলিল—'উঁহু। চার দিন হ'ল ডেঙ্গু থেকে উঠেছি,—হঠাৎ আবার কোমরে খিল ধরেছে।'

'ওষুধপত্র খাচ্চ ?'

'এখন আর খাই না।'

'অন্যায় ক'রচ, ডেঙ্গু বড় খারাপ ব্যারাম। দিন-কতক নেবুর রস দিয়ে কুইনীন খেয়ে দেখ দিকি, ভারী উপকারী। যদি এ সময় পুরী গিয়ে থাকতে পার ত আরো ভাল।'

চোর হাসিয়া বলিল—'পুরী না শ্রীঘর ?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'তাও ত বটে, বুড়ো মানুষ, ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু ভয় নেই, পুলিস কেস-টেস আমার দ্বারা হবে না। সাজা যা দেবার আমিই দেব, তবে'বাতে কাবু করেচে এই যা মুস্কিল।'

চোর এইবার একটু সুস্থ হইয়া আস্তে আস্তে উঠিল। গোবিন্দবাবু বলিলেন—'বোসো ঐ চেয়ারটায়।'

তরুণ চোর। বড় বড় চুল, চশমা আছে, গোঁফ নাই। গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিস্তলটা কত দিয়ে কিনলে ?'

'ছ আনা। মুর্গিহাটা থেকে।'

'বড়বাজার টু-থ্রি-ওয়ান-সেভ্ন্—'

'স্বদেশী ডাকাত ?'

'ভবিষ্যতে তাই হয় ত হ'তে হবে। আপাতত পেটের দায়ে।'

'বাপ নেই ?'

'আছেন, তাড়িয়ে দিয়েচেন।'

'আস্পর্দ্ধা কম নয়। কি ক'রেছিলে বাপু, বিদ্রোহ ?'

'আজ্ঞে হাঁ। বাবার বাল্যবন্ধুর মেয়েকে বিয়ে ক'রতে চাইনি তাই। বাবা হচ্চেন সেকেলে জবরদস্ত পিতা। হঠাৎ একদিন বল্লেন—এই চেয়ো, আস্‌চে মাসে রাখালের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে। রাখালবাবু মরবার আগে তাঁকে না কি বাবা কথা দিয়েছিলেন।'

'মেয়েটা বিশ্রী বুঝি ?'

'শুনেচি তা নয়। কিন্তু যার হৃদয়ের সংবাদ জানি না, তাকে বিয়ে করি কি ক'রে বলুন ত ? বাপ-মা-মরা মেয়ে, বিদেশে মামার কাছে মানুষ হয়েচে, মামাও শুনেচি একটি আস্ত পাগল, ভাগ্নীটিকে জন্তু বানিয়েচেন। আমার মানসী প্রিয়া অন্য প্যাটার্নের।'

'কি রকম শুনি।'

চোর সোৎসাহে বলিল—'শুনবেন ?' পকেট হইতে কবিতার খাতাখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল—

'জান্‌তে চাও কি হৃদয়রাণী
অদেখা ঐ মূর্ত্তিখানি,
রূপে গুণে কাল্‌চারেতে
কেমন হ'লে ধন্য মানি—'

'থাক্ থাক্। মেয়েটার নাম কি ?'

'ডাকনাম নেড়ী, ভাল নাম জানি না।'

'বল কি হে ? চারুচন্দ্রের হৃদয়রাণী হবে নেড়ী! নেলী হ'লেও বা কথা ছিল।'

নীচে মোটর থামার অস্ফুট আওয়াজ হইল, তার পর ঘরের বাহিরের বারান্দায় খুট্ খুট্ পদশব্দ। গোবিন্দবাবু হাঁকিলেন—'কেরে, নেড়ী এলি ? এত রাত্তির হ'ল যে ?'

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর আসিল—'মামা এখনো

জেগে আছ? কি ভোজটাই খাইয়েচে, একেবারে টপিং!'

একটি সালঙ্কারা অনবদ্যাঙ্গী তরুণী ঘরে ঢুকিয়া চিত্রার্পিতাবৎ দাঁড়াইল। চোর হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'তার পর কি বলছিলে হে ছোকরা? রূপে গুণে কাল্চারেতে? নেড়ী, বানান কর্ ত—প্রতিদ্বন্দ্বী—'

নেড়ী বলিল—'পয় রফলা তয় হস্সি' ইত্যাদি।

'দুইয়ের স্কোয়ার রুট কত হয় রে?'

'১'৪১৪২৫—'

'বস্ বস্। তোর মতে আধুনিক লেখকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে?'

'যদি কঁতিনতাল অথর বল, তবে মঁল্লাঁর কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক উপোসী সাহিত্যের ইনিই সবচেয়ে বড় এক্সপনেণ্ট্। কেমন একটা করুণ বিশ্বলুট ভাব, যেন একটা দড়িছেঁড়া পিয়াসী বুভুক্ষা,—ভারী মিষ্টি লাগে কিন্তু। আর, এঁর ঠিক উল্টো হচ্চেন জাপানী রেনেসাঁসের কবি ফুজিয়ামা। এঁর লেখায় কেমন একটা ঔদরিক ঔদার্য্য, যেন একটা পূর্ত্তির পুলক, যেন একটা হৃষ্ট হ্রেষা,—ভারী অবাক লাগে কিন্তু।'

'আচ্ছা। শেষের কবিতার শেষ কবিতার মোদ্দা-কথাটা কি রে?'

'উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।'

'বাঃ। তুই এইবার একটা কিছু বাজা দিকি।'

নেড়ী পিয়ানোতে গিয়া টুং টাং করিতে লাগিল। চোর গোবিন্দবাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—'নাইন্থ সিম্ফোনি?'

'উঁহু, বোধ হয় সালা-লুট-লিয়া বাজাচ্চে। নেড়ী, নাইন্থ্, সিম্ফোনিটা শুনিয়ে দে ত।'

'যাও, এখন আমি পারি না। ঘুম পায় না বুঝি? আচ্ছা মামা, ইনি কে তা ত' বল্লে না—'

'ইনি একজন চোর। হঠাৎ কোমরে খিল ধরায় বাধা পেয়েচেন।'

'অ্যাঁ—চোর? এতক্ষণ বল্তে হয়—।' নেড়ী চট্ করিয়া টেলিফোনটা তুলিয়া বলিল—'বড়াবাজার টু-থ্রি-ওয়ান-সেভ্ন্—হ্যালো, মুচিপাড়া থানা?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'আঃ কি করিস, স্থির হয়ে বোস না।'

'বা রে, চোরকে অম্নি ছেড়ে দেবে? তোমার সেই চাবুকটা কোথায়, আমিই না-হয় ঘা-কতক লাগিয়ে দিচ্চি—'

'খবরদার, এ আমার চোর, তুই মারবার কে? যা লক্ষ্মীটি, খানকতক গরম গরম কাটলেট ভেজে আন, আর পাশের ঘরে এঁর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দে। এত রাত্রে বেচারী যায় কোথা।'

নেড়ী মামার আজ্ঞা পালন করিতে গেল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'কেমন দেখ্লে বাবাজী?'

'চমৎকার!'

'মানসী প্রিয়ার সঙ্গে মিল্চে?'

'হুবহু!'

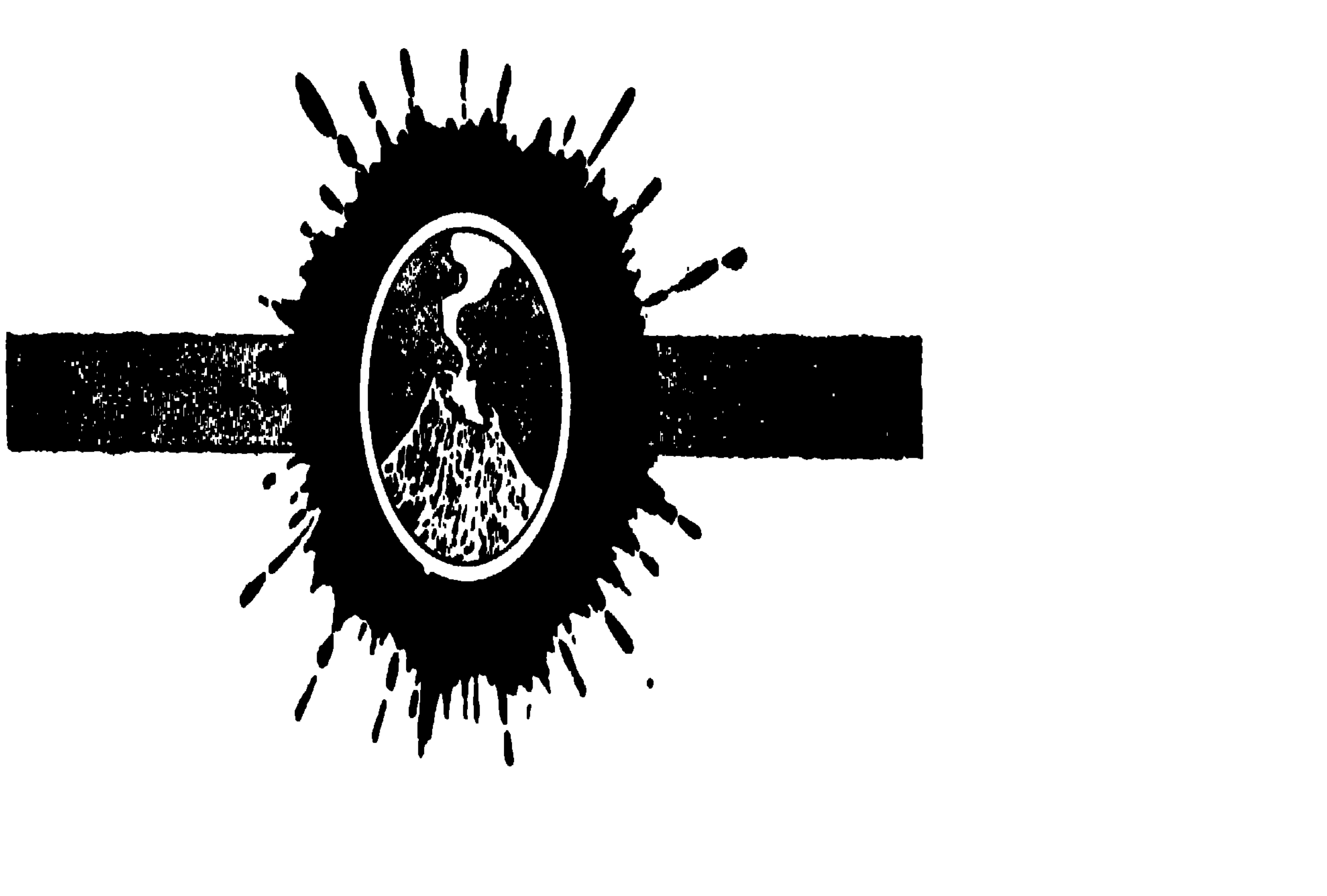

সীমার দুঃখ

ইতিহাসের চলমান ধারার মধ্যেই আমরা সত্যের জয়যাত্রাকে দেখ্‌ব। সেই যাত্রা ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় বিশেষ আকারে আটকা পড়েছে, সেইখানে সে তার চরম গন্তব্যে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, এই কথা যদি বা কল্পনা করি তবে সেই কল্পনা নিয়ে গৌরব করা আনন্দ করা চল্‌বে না। থামাই হচ্ছে মৃত্যু, সেই থেমে যাওয়া থেকেই বিকৃতি। যখনি মানুষ সত্যকে নিশ্চল ক'রে ব্যবহার কর্‌তে গেছে তখনি সে দুর্গতি লাভ করেছে, বারে বারে তার প্রমাণ পেয়েছি।

সমস্ত মানুষের তপস্যাকে এক ক'রে দেখ্‌লে তবে আমরা তার অর্থ পাই। সেই তপস্যা যাত্রার তপস্যা। কোন্ প্রাচীন যুগে মানুষ সেই যাত্রায় বেরিয়েছে, তখনো রাত্রি অন্ধকার; তখনো তারার আলোক প্রভাতের সূচনা করেনি; তখন সেই অন্ধকারে কত ছায়া কত বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরেছে। সেই অস্পষ্টতার কুহকে মানুষ বাস্তবে অবাস্তবে মিলিয়ে নিজের মনকে নানা রকমে নানা ভাবে ভুলিয়েছে: কিন্তু সেই সমস্তের মধ্যে আসল সত্য হচ্ছে তার যাত্রা। যখন অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছিল না তখনো মানুষকে ভিতর থেকে কে বল্‌ছিল পথ বের করতে হবে। কেন? কেননা, যে-টুকুর মধ্যে রয়েচ সে টুকুর মধ্যে তোমাকে ধরে না। আরো যেতে হবে, আরো পেতে হবে। সেই একটি আরোর উদ্দেশে তার সমস্ত ভক্তি, সমস্ত পূজা। মনে যা সে কল্পনা করেচে তা সমস্ত সত্য নয়, মুখে যা সে বলেচে তা সমস্ত সত্য নয়, কর্ম্মে যা সে প্রতিষ্ঠিত করেচে তাও সমস্ত সত্য নয়। কিন্তু তার সত্য হচ্ছে তার যাত্রায়, সেই যাত্রায় সে জেনে এবং না জেনে স্বীকার করচে অসীমকে। সে বল্‌চে আমি চাই। যাকে পেয়েছে তাকে নয়, যাকে পাওয়া যেতে পারে তাকেও নয়, তার চেয়েও বড়কে। তার সমস্ত ইতিহাস দিয়ে সে এই কথাই বল্‌চে—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

অর্থাৎ সে বল্‌চে যাঁকে মনও পায় না, বাক্যও পায় না, তাঁকেই জান্‌লে তবে আনন্দ, তবে অভয়। কিন্তু মানুষের একটা ছোট দিক আছে সে দিকটা তার বিষয়ী; সে লোভী, সে কেবলি বলে হাতে পাওয়া চাই। এইজন্যে যখন সে বাঁধা মতে বাঁধা সম্প্রদায়ে এসে ঠেকে তখন ব'লে ওঠে, পেয়েচি। শুধু তাই নয়, সে গর্ব্ব ক'রে বলে এই পাওয়ার মধ্যেই জগতের সমস্ত মানুষকে এনে ঠেকাতে হবে, বাঁধতে হবে। কিন্তু এমন কথা ব'লে কোনো মানুষ কোনো সম্প্রদায় কখনই সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আজ পর্য্যন্ত সাড়া পায়নি। তাতে সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্যের বিষয়ী লোকেরা রাগ করেচে; তারা সবাইকে ভ্রান্ত বলেচে; অনেক সময়ে যাকে তারা ভ্রম ব'লে স্থির করেচে তাকে গায়ের জোরে ভাঙতে চেয়েচে। যেমন রাজ্যলোলুপেরা যুদ্ধ ক'রে রাজ্য বিস্তার করতে চায়, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যলোলুপেরাও নিন্দা ক'রে আঘাত ক'রে রক্তপাত ক'রে দল বৃদ্ধি করতে চায়। তার একটি মাত্র কারণ, তারা মনে স্থির ক'রে বসেচে, সত্যকে পেয়েচি, চিরকালের মত নিশ্চল ক'রে পেয়েচি। তা হোক তবু তারা গায়ের জোরে মানবের ইতিহাসের মর্ম্মগত এই বাণীকে রুদ্ধ করতে পারেনি,—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

"বাক্য যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে, মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে তাঁকে যে জানে তার ভয় নেই।" একথা শুনে সাম্প্রদায়িকেরা, ধর্ম্মরাজ্যের বিষয়ী লোকেরা রাগ করে, তারা বলে তবে তাঁকে জান্‌ব কি ক'রে? তার উত্তর হচ্ছে, আনন্দের দ্বারা। এই উত্তর পাগলের উত্তর হ'ত জগতে প্রত্যহ যদি এর প্রমাণ না পাওয়া যেত। কোথায় প্রমাণ পাই? যেখানে আমাদের ভালবাসা সেইখানেই। সাধারণত মানুষের সঙ্গে আমাদের যে ব্যবহার তার একটা হিসাব আছে। যে ভৃত্য আমার যে পরিমাণের ও যে প্রকৃতির কাজ করে তার একটা হিসাব আমার মনে আছে; সেই হিসাবটা যে পরিমাণে নির্ভুল হয় তার সম্বন্ধে আমার পরিচয়টাও সেই পরিমাণে নির্ভুল হয়; ডাক্তারকে উকিলকে বিদ্বানকে কোনো না কোনো তুলাদণ্ডে আমরা ওজন ক'রে জানি; একদিকে তারা এবং আরেক দিকে আমার বাটখারা, এই দুয়ের মিল ক'রে তবে আমরা বলি তাদের চিনেচি এমন ক'রে এখনো যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি তাদের সম্বন্ধেও এটুকু জানি যে, এমনি ক'রেই রূপ গুণ ধন বিদ্যা প্রভৃতির ওজনের দ্বারা তাদের ঠিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষকে যেখানেই বিষয়ের মত ক'রে দেখি সেখানে তাদের এমনি ক'রেই জানি এমনি ক'রেই পাই।

কিন্তু মানুষকে যেখানে ভালবাসি তুলাদণ্ডে সেখানে তার ওজন পাইনে। মানুষের রূপ গুণ ধন মান সমস্তই পরিমেয়, কিন্তু ভালবাসা মানুষ পরিমেয় নয়। এই জন্যে ভবভূতি বলেচেন—

স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ।

অর্থাৎ যে মানুষটি প্রিয় সে যে কি তা মনেও ভাবা যায় না, মুখে বলা যায় না,—কেননা সেইখানেই মানুষের অসীমকে আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু এই প্রিয় মানুষকে আমরা বিষয়ের ওজনে ওজন করতে পারিনে ব'লেই এ'কে ডাক্তারের চেয়ে উকিলের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ক'রে জানি। মন এবং বাক্য এ'কে না পেয়ে ফিরে আসে ব'লে এর মধ্যে আমাদের এত আনন্দ। তার কারণ, মানুষের মনের পা পাওয়াটাই বাধা, সুনির্দ্দিষ্ট পরিচয়টাই বাধা; সে এমন এক অনির্ব্বচনীয়তাকে চায় যেখানে কোনো কালেই তার সঞ্চিত অন্ত থাকে না; যেখানে তার চির-নূতন, অর্থাৎ যেখানে পরিচয়ের সীমা নেই।

জগতে এই যে অনির্ব্বচনীয়তাকে সে ক্ষণে ক্ষণে চেনেচে, এ চরম সত্য পরম সত্যরূপে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সকল পথে সকল কেই মানুষ উপলব্ধি করতে বেরিয়েচে। এই যে উপলব্ধি এ এ প্রবহমান ধারা; কোনো বিশেষ কালে ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনায় আবদ্ধ হয়নি; অসংখ্য তরঙ্গের মধ্যে স্রোতের ঐক্যের মত এর সমগ্র

মধ্য দিয়েই একটি অখণ্ড রসের ঐক্য আছে। সেই হচ্ছে সমস্ত মানুষের পূজার রস, ভক্তির রস, সেই হচ্ছে তার যথার্থ মুক্তির রস। কিসের থেকে মুক্তি? না-পরিচয়ের বন্ধন থেকে, পাওয়ার বন্ধন থেকে, সীমার বন্ধন থেকে। মানুষের ভক্তির ইতিহাসের মূল তত্ত্বটাই হচ্ছে এই,—মানুষ বলচে আমার আত্মা বিষয় থেকে মুক্তি চায়; অর্থাৎ যাকে পাওয়া যায়, মাপা যায়, আসক্তির দ্বারা যাকে আঁকড়ে থাকা যায়, চারিদিকে তার দ্বারা নিবিড়ভাবে বেষ্টিত থেকেও মানুষের আত্মা তাঁকেই সত্য বলচে, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

কিন্তু তবু মানুষের বিষয়বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে তার আত্মাকে ফাঁকি দিতে চায়; কতকগুলো বাঁধা মত বাঁধা শাস্ত্রের খড়কুটো দিয়ে একটা সম্প্রদায় বেঁধে, সে বলে সত্যকে এতকাল পরে আমরাই পেয়েচি এবং তাকে দড়াদড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে ফেলেচি। তখন থেকে নানা উপচারে সেই বাঁধন-দেবতার পূজা করি, সেই বাঁধন-দেবতার নামে উৎসব করি, এবং সেই বাঁধন-দেবতার কাছে নানাভাবে নরবলিও দিতে থাকি। তখন শৃঙ্খলটাকেই খুব বড় ক'রে স্বর্ণময় ক'রে তৈরী করি, এবং যে আত্মা মুক্তি চায় তাকে বলি এই ত তোমার মুক্তি, দেখ এ কত বড়, দেখ এর কত দাম! এমনি ক'রে বন্ধনই যখন ভূমার ছদ্মবেশ ধ'রে আসে তখন আমাদের সব চেয়ে বড় বিপদ: বিষয় যখন ধর্ম্মের নাম গ্রহণ করে তখনই ভয়ানক ঠকবার দিন আসে।

(বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৬) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

কোন্ মোল্লায় অভক্তি?

আমাদের অভক্তি—সে-মোল্লা শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়—সে মোল্লায় না, যে মোল্লা গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয়—সেই মোল্লায়। মওলানা কেরামত আলি সাহেব এবং হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ সাহেব ওরফে দুধু মিয়া মরহুম মগফুরদের ন্যায় মোল্লা আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহারা আমাদের মাথার তাজ।

আমাদের অভক্তি কেবল অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ধর্ম্মব্যবসায়ী মোল্লার প্রতি।

দোভাষী পুঁথিতে "বেদারুল গাফেলীন" যে মোল্লার বর্ণনা করিয়াছে—

"কাঠ মোল্লা,
জবেহ্ ক'রে খায় কল্লা—
যদি কেহ মানা করে,
কাঠ-মোল্লা গোস্বা-ভরে,
পোট্টা কহে—কেয়া কহ্‌তে হো তোম?
বরাবর সে এহি চাল,
নাহি হোগা আজ কাল
এয়ছা বাত নেহি শুনতে হাম।"

আমাদের অভক্তি সেই মোল্লায়।

মোল্লা-প্রিয় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বলেন যে, মোল্লার কল্যাণে পল্লীগ্রামে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-সমাজ বাঁচিয়া আছে। কথাটা আংশিক সত্য।

কিন্তু দুই হাজার মোল্লায় মুসলিম-সমাজের যে গৌরব রক্ষা করিয়াছে, একা সৈয়দ আমীর আলী সাহেব মরহুম ইংরাজী ভাষায় "Spirit of Islam" লিখিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইসলামের উপকার করিয়াছেন। দশ হাজার মোল্লায় যে কাজ করিতে পারিতেছে না, একা খাজা কামাল-উদ্দিন সাহেব ইংলণ্ডে বসিয়া তাহা সাধন করিতেছেন। ইঁহারা দুজনেই ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে মোল্লা ফতোয়া দেয়—সেই মোল্লায় আমাদের অভক্তি। এই ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য মরহুম স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব প্রথমে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, সেই মহাপ্রাণ স্যার সৈয়দ আহ্‌মদকে যাহারা কাফের বলিত আমরা সেই মোল্লার উচ্ছেদ কামনা করি।

পরলোকগত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন অতি কষ্টে বঙ্গ ভাষায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ করায় যাহারা বলিয়াছিল—"গিরীশবাবু কাফের হইয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়াছে, বাঙালায় অনুবাদ করিয়াছে; সুযোগ পাইলে আমরা সে কাফেরের মাথা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইব" আমরা সেই-সব মোল্লার ধ্বংস কামনা করি।

এক কথায়, যে মোল্লার দল অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান-সমাজকে বোকা বানাইয়া আরও অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে, তাহাদেরই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে নিজেদের উদর পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পীর-পূজা করিতে শিক্ষা দিতেছে, তাহাদের দ্বারা গাজী মাদারের বাঁশ নাচাইতেছে, মহরমের সময় বীভৎস উৎসব করাইতেছে, শবই-ই-বরাতের সময় বাজি পোড়াইয়া অর্থ নষ্ট ও স্থলবিশেষে প্রাণ নষ্ট করাইতেছে,—আমরা সেই মোল্লার বিনাশ কামনা করি।...

বুজুর্গীওয়ালা মোল্লায় আমাদের অভক্তি।

যে-সকল মোল্লা স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়া আমাদিগকে ইংরাজী ও বাঙলা ভাষা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে চির-মূর্খ করিয়া রাখিয়াছে, ভারতের বিশ লক্ষ মুসলিম ললনাকে অবরোধ-কারায় বন্দিনী করিয়া অসহায়া অবলা করিয়া রাখিয়াছে, আমাদিগকে অতি-জঘন্য অপমানসূচক "আওরত" নামে অভিহিত করিয়া আমাদের অবমাননা করিয়াছে,—আমরা তাহাদের উচ্ছেদ কামনা করি।

টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার ১৭ই মে ১৯২৯—তারিখের সংখ্যায় জানা যায় যে, কাঠিয়াওয়াড়ে জনৈক মওলানা মৌলবী আবদুস শকুর খিরাজী আছেন—যিনি হদিসের নাম করিয়া এই ফতোয়া জারি করিতেছেন যে, স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হারাম,—বিশেষতঃ লেখা শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে বেশী জোরের সহিত ফতোয়া দিতেছেন। এই খিরাজী সাহেব বাচ্চা-ই-সাক্কা—তথা শয়তানের চেলা ব্যতীত আর কিছু নহে—আমরা এই সকল মোল্লার অধঃপাত কামনা করি।

প্রসিদ্ধ "মিরাতুল উরুস" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা মওলানা নজীর-উদ্দীন আহমদ সাহেব উর্দ্দু ভাষায় কোরাণ শরীফের অতি-সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন, সেই জন্য যে সকল মোল্লা তাঁহাকে "কাফের" বলিয়াছে সেই সকল মোল্লায় আমাদের অভক্তি।

শুনিতে পাই, মোল্লারা না কি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) অতি-বিশ্বাসী আজ্ঞাবাহক উম্মত। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাই যে, প্রিয় নবীর আর-সমস্ত আদেশ শিকায় তুলিয়া রাখিয়া কেবল স্ত্রী-সংখ্যায় চারি—এই এজাজতই হইতেছে মোল্লাদের শিরোধার্য্য!

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ, মওলানা নজীর-উদ্দীন আহ্‌মদ, আধুনিক খাজা হাসান শাহ নেজামী প্রভৃতি যে-কোন ব্যক্তি যখনই কোন প্রকার সমাজের তথা ইসলামের কল্যাণকর কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই মোল্লারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া জারি করিয়াছে। কোন স্ত্রীলোক সমাজের হিতসাধন করিতে উদ্যোগী

হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে "বে-পর্দ্দা" হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে; এত কাণ্ড করিবার পরও যদি সাধারণ মোল্লারা প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় উম্মত হয় তবে তাঁহার অপ্রিয় উম্মত কাহারা?

গত বৎসর কলিকাতা মাদ্রাসায় সামান্য দাড়ি-সমস্যা লইয়া রক্তপাত হইয়া গেল—তিনদিন পর্য্যন্ত রক্তপাত চলিল। "দাড়িবিদ্রোহ" যে "প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ"—এ কথা শুনিয়া আমরা (দাড়িহীনা নারী জাতি) শিহরিয়া উঠিলাম।

যাহা হোক, আশা করি এখন পাঠিকা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন—কোন্ মোল্লায় আমাদের অভক্তি।

(সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৬)   ওমদাতন্নেসা খাতুন

—

বঙ্গীয় স্থাপত্য-শিল্প

আজ বঙ্গের ভাস্কর্য্যও লুপ্ত, স্থাপত্য-শিল্পেও বঙ্গের নিজস্ব কিছুই নাই। কিন্তু একসময়ে বাঙ্গালা দেশে ঐ দুটাই যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই।...চারি পাঁচ শতক ধরিয়া বঙ্গের অসংখ্য ভাস্কর যে অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, শক্ত সুচিক্কণ নিকষে নির্ম্মিত কৃষ্ণকমলসদৃশ সেই শ্রীমূর্ত্তিগুলি খানা ডোবা নালা ও পুকুর হইতে সমগ্র বঙ্গে অগণিত সংখ্যায় বাহির হইয়া প্রত্যেক বৎসরই আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিতেছে।...

বাঙ্গালা দেশের প্রাক্-মুসলমান-যুগের মন্দিরগুলি নিঃশেষেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে মন্দির নির্ম্মাণে পাথরের ব্যবহার কি একেবারেই ছিল না? কিছু ছিল বলিয়াই তো বোধ হইতেছে। বিক্রমপুরে সোনারঙ্গ গ্রামে একটি দেউল বা প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। তাহাতে বরঙ্গের জন্য মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বারুইগণ হঠাৎ এক প্রকাণ্ড পাথরের স্তম্ভ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। স্তম্ভটি ১৭ ফুট ৪॥ ইঞ্চি উচ্চ এবং চৌকা গোড়ার মাপ ২ ফুট×২ ফুট। ওজনে বোধ হয় দুই শত মণের কম হইবে না।...স্তম্ভটি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হইতেছে। গণমূর্ত্তি-চিহ্নিত যে চৌকা বালু পাথরের সুবৃহৎ বেদিকার উপর সাধারণতঃ প্রস্তর-স্তম্ভগুলি স্থাপিত হয়, তাহারও একটি এই দেউল হইতে পাওয়া গিয়াছে। একটি বৃহৎ পাথরের চৌকাঠের নিম্ন কাষ্ঠটিও এই দেউল হইতে পাওয়া গিয়াছে, এটিও ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।...

বিক্রমপুরে সেন রাজধানী রামপালের সন্নিহিত বাবা আদমের মসজিদের খিলানগুলি দুইটি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এই দুইটি যে কোন্ হিন্দু মন্দির হইতে গৃহীত তাহা উহার গাত্রস্থিত কয়েকটি প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে অনুমিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ঢাকা জেলায় লক্ষ্যা নদীর পারে নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকস্থ বন্দরের মসজিদে, এবং উহারই ৫৷৬ মাইল উত্তরে মজুমপুর মসজিদেও প্রস্তর-স্তম্ভ আছে।...

মন্দির-নির্ম্মাণে প্রস্তর-ব্যবহারের এই সকল উদাহরণ সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, প্রস্তর বাঙ্গালা দেশের জিনিস নহে। বাঙ্গালা দেশে ব্যবহৃত পাথর আসিত রাজমহল পাহাড় হইতে। আনিবার খরচ খুব বেশী পড়িয়া যাইত, তাই মূর্ত্তি-নির্ম্মাণেই প্রস্তর-ব্যবহার প্রশস্ত ছিল। মন্দির-নির্ম্মাণে ইষ্টকই প্রধান উপকরণ ছিল। কিন্তু প্রাক্-মুসলমান যুগের মন্দির তো একটিও আজ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া নাই। বঙ্গের ইষ্টক-স্থাপত্য কি রকম ছিল, তাহা কি জানিবার কোন উপায় নাই? আছে।...

বিক্রমপুরের মহাকালী গ্রাম হইতে প্রাপ্ত একখানা বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে ধ্যানাসনস্থ মূর্ত্তির উপরে একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। সোনারঙ্গ দেউলে যে প্রকাণ্ড স্তম্ভটি পাওয়া গিয়াছে ঠিক তাহার আকৃতির দুইটি স্তম্ভের উপর একটি ত্রিভঙ্গ খিলান। খিলানের দুই ধারে দেখা যায়, ধাপে ধাপে মন্দির উঠিয়া গিয়াছে। শেষ ধাপ বা তলটির দুই ধারে কতকটা জায়গা ছাড়িয়া একটি পঞ্জরময় মন্দির-চূড়া উঠিয়াছে।...

উড়িষ্যায় সাধারণতঃ দুই রীতির মন্দির দেখা যায়। ক্রম-হ্রস্বায়মান পীঠ বা পীঢ়যুক্ত এক শ্রেণীর মন্দির আছে, উহাদিগকে ভদ্র বা পীঢ়া দেউল বলে।...আর একশ্রেণীর দেউলকে রেখ-দেউল বলে। উহার অঙ্গ রেখাকৃতি পঞ্জরময় এবং পঞ্জরগুলি মাটি হইতে শীর্ষস্থ আমলক পর্য্যন্ত উঠে।...

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ভাস্কর বুদ্ধমূর্ত্তির উপরে যে মন্দিরের প্রতিকৃতি আঁকিয়াছে তাহা আদর্শমূলক নহে, কাল্পনিক মাত্র—কারণ পীঢ়া ও রেখ-দেউলের এমন জগাখিচুড়ী রীতি যে সত্যই দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা সহসা বিশ্বাস করা কঠিন। খুঁজিতে খুঁজিতে চোখে পড়িল, বাঙ্গালা দেশে প্রাপ্ত আরও কয়েকখানি মূর্ত্তিতে এই শ্রেণীর মন্দিরের প্রতিকৃতি আছে। ডাক্তার কুমারস্বামী তাঁহার History of Indian and Indonesian Art নামক পুস্তকের ৭১তম চিত্রে একখানা অরপচন মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তির ছবি দিয়াছেন। মূর্ত্তিখানি বঙ্গদেশে প্রাপ্ত। এই মূর্ত্তিখানাতেও অবিকল একই রীতির মন্দিরের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে।...

অন্য স্থাপত্য রীতিও দেশে প্রচলিত ছিল, উহাদের তুলনা উড়িষ্যায় এখনও মিলে। কিন্তু রেখ ও ভদ্র দেউলের অদ্ভুত সমন্বয় এই বঙ্গীয় রীতি যে বঙ্গের ইষ্টক-মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা এখন কতকটা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়।...

এই রীতির মন্দির তো ব্রহ্মদেশের প্রাচীন পেগান নগরের ধ্বংসাবশেষে আজিও বর্ত্তমান আছে।...ফার্গুসন সাহেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে বঙ্গদেশ ও উত্তর-ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর (II. 365)।...

পেগানের তাজমহল বিখ্যাত আনন্দ-মন্দির ১০৯০ খৃষ্টাব্দে বা উহারই নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল (প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক বিবরণ, ১৯১৩—১৪, পৃঃ ৬৪)।

বঙ্গীয় মূর্ত্তিগুলি হইতে বঙ্গপ্রচলিত স্থাপত্য-রীতির যে আদর্শ উপরে দেখাইয়াছি, তাহা হইতে এখন আর সন্দেহ মাত্রও থাকা উচিত নহে যে, পেগানের বিস্ময়কর মন্দির সমূহ বঙ্গীয় স্থাপত্য-রীতি অনুসারেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে এই রীতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।...

স্থূলতর প্রমাণ না হইলে যাঁহারা সন্তুষ্ট হন না, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের জন্য তাহাও পাওয়া গিয়াছে।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে একটি উচ্চ স্তূপ বর্ত্তমান ছিল। অধুনা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক এই স্তূপের খনন-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ১৯২৫ ২৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে এই স্তূপ খননে আবিষ্কৃত মন্দির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—

(মর্ম্মানুবাদ) "মূল মন্দিরটীর প্রত্যেক ধারে এক একটি করিয়া পাগ আছে। উত্তরের পাগটিই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ।…মন্দিরটির নক্সা নিতান্ত সরল। ইহা একটি ত্রিতল-বিশিষ্ট মন্দির, নিম্নতল একটি ক্রুশের আকৃতি। এই ক্রুশের দীর্ঘতম বাহু ছিল উত্তর দিকে এবং উহার উপর দিয়াই সিঁড়ি ছিল। দ্বিতীয় তলটি প্রথম তলের মতই নিরেট …(ইহার উপরে) মূল মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। ইহা নিরেট ছিল না এবং ইহার উপরে ছাদ ছিল। এই মূল মন্দিরের প্রত্যেক কোণে এক একটি মণ্ডপ ছিল।" (পৃ: ১০৮—১০৯)।…শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহোদয় একটি বিবরণী প্রস্তুত করেন।—

(মর্ম্মানুবাদ) "মন্দিরটি বর্ত্তমানে যেমন আছে তাহাতে উহা উত্তর-দক্ষিণে ৩৬১ ফুট লম্বা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩১৮ ফুট বিস্তৃত ছিল দেখা যায়। বর্গক্ষেত্রের আকৃতিতে মন্দিরটি নির্ম্মিত কিন্তু প্রত্যেকধারেই কতকটা অংশ বাড়ান আছে। উত্তর ধারের বর্দ্ধিত অংশ অপেক্ষাকৃত লম্বা, কারণ উহার উপর দিয়া সিঁড়ি গিয়াছে। তিনটি ক্রমহ্রস্বায়মান-তলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ; উত্তর দিকের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরের তলগুলিতে উঠা যায় …

"পাহাড়পুর মন্দিরের স্থাপত্যের নক্সা সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। অনুগাঙ্গ প্রদেশে ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যপ্রথায় নির্ম্মিত মন্দির প্রায় নাই বলিলেই হয়। তাই যাঁহারা এই প্রথা কি রকম ছিল তাহার অনুশীলন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কাজ বড়ই কঠিন। এই বিশ্বাস অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে যে, জাভার বর-বুদর মন্দির এবং ব্রহ্মদেশের ক্রমহ্রস্বায়মানতল-যুক্ত মন্দিরগুলির মূল ভারতবর্ষের কোথাও বিশেষতঃ বঙ্গদেশে খুঁজিতে হইবে, কারণ ভারতীয় সভ্যতা বঙ্গদেশের মধ্য দিয়াই আরও দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রসারিত হইয়াছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের নক্সা, উহার ধারগুলির মধ্যের পাগ, উহার ক্রমহ্রস্বায়মান তল…দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নয় যে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য প্রথায় এই এক আদর্শ, যাহার সহিত ব্রহ্মদেশ যবদ্বীপ ও কম্বোজের স্থাপত্য-কীর্ত্তিগুলির সবিশেষ যোগ আছে।"

দীক্ষিত সাহেব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহারও দৃষ্টিতে পাহাড়পুরের মন্দিরের সহিত বৃহত্তর ভারতের মন্দিরগুলির সাদৃশ্য ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাস্তবিক যবদ্বীপের বিখ্যাত বর-বুদর মন্দির এবং কম্বোজের বিখ্যাত আঙ্কোর ভাট মন্দির এই একই প্রথায় নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।…উত্তর-ভারতে এই প্রথার আদর্শ খুঁজিয়া পাইলে ফার্গুসান ইত্যাদি মহামহারথিগণ পেগানের মন্দিরের মূল খুঁজিতে বেবিলন হইতে সারা ভারতময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন না। পাথরের মূর্ত্তিতে খোদিত প্রতিকৃতি হইতে দেখাইয়াছি যে, এই স্থাপত্য প্রথা বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশেরই প্রথা। পাহাড়পুরের মন্দিরেও সেই প্রথারই আদর্শ পাওয়া গিয়াছে। যখন মনে করা যায় যে, এই সুকুমার স্থাপত্য প্রথা কালে ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপে এবং কম্বোজে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তখন বাঙ্গালার জন্ম এই প্রথায় স্বামিত্ব দাবি করিতে সর্ব্বহারা বাঙ্গালী আমরা—আমাদের কণ্ঠ কাঁপিয়া যায়।

(পঞ্চপুষ্প, শ্রাবণ ১৩৩৬) শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

বাংলার পাট ও সমবায় প্রচেষ্টা

বাংলার কৃষি সম্পদের মধ্যে পাট সর্ব্বপ্রধান। ইহা বাংলার একচেটিয়া সম্পত্তি। পৃথিবীর মধ্যে এক বাংলা দেশ ব্যতীত কোথাও সুবিধামত পাট জন্মায় না। বিহারে, পূর্ণিয়া জিলা, উড়িষ্যায়, কটক ও বালেশ্বর জিলা এবং আসামের কয়েক স্থানে কিছু পাট উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের পাট অপেক্ষা তাহা নিকৃষ্ট জাতীয়। পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষ মার্কিণ মুলুকে, এইরূপ আঁশযুক্ত গাছ জন্মাইবার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোথাও সফল হয় নাই। প্রথমতঃ, উপযুক্ত মাটি, পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি ও বিশেষ আবহাওয়ার উপর পাটের ফলন নির্ভর করে। যদিও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে পাট উৎপন্ন করা যাইতে পারে কিন্তু পাট পচাইতে ও জলের মধ্যে পাট কাচিতে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহা সহ্য করিতে অন্য দেশের কৃষক ও মজুররা রাজি নহে। যদিও বা রাজি হয়, তাহা হইলে এত অধিক পারিশ্রমিক দাবি করে যে বাংলার কৃষকের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয় না। সুতরাং যতদিন না পর্য্যন্ত এই জাতীয় কোন দ্রব্য স্বল্পমূল্যে উৎপন্ন করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় ততদিন বাংলা দেশ পাটের একাধিকার ভোগ করিবে।

পাট-শিল্পের পূর্ব্বকথা :—বাংলা দেশে বহু শতাব্দী যাবৎ পাটের আবাদ চলিয়া আসিতেছে। তবে বর্ত্তমানে যেরূপ বিস্তৃত হইয়াছে পূর্ব্বে এতটা না হইলেও পাটের আবাদ বাংলা দেশে যে খুব সামান্য ছিল তাহা নহে। পাট উৎপন্ন করিয়া সেই পাট বা কোষ্টা হইতে দড়ি, দড়া, কাছি, রশি, ছালা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। নৌকা ও জাহাজের পাল পাটের সূতায় প্রস্তুত হইত। দেশবিদেশে এই সকল দ্রব্য চালান দিয়া বাংলার জাতীয় ধন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত। যেমন বস্ত্রবয়ন বাংলার একটি প্রধান শিল্প ছিল, তেমনি এই পাটজাত শিল্প বাংলার নিজস্ব এবং একচেটিয়া শিল্প ছিল। তখন পল্লীগ্রামে প্রত্যেক ঘরে চরকার সহিত টেকো ও চ্যারা চলিত। টেকো ও চ্যারায় পাট কাটিয়া সূতা প্রস্তুত হইত। সেই সূতা সংগ্রহ করিয়া যুগী, জোলা, কাপালি এবং তাঁতীগণ চট, থলিয়া, নৌকার পাল প্রভৃতি বয়ন করিত। আকবর বাদশাহের আমলে পাট-শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ছিল। আইন-ই-আকবরীতে এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা, এমন কি সুদূর বোম্বাই প্রদেশ হইতে বহু লোক পাটের থলিয়া প্রভৃতি খরিদ করিবার জন্য বাংলায় আসিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাটের ব্যবসার কিরূপ প্রসার ছিল তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিবরণী হইতে জানা যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে ১২,৯,৬১,৪৪১ খণ্ড থলিয়া এবং ২৩,৮,০১৯ থান চট কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। সে সময় ইহার মূল্য ২৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫১ টাকা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকায় যথেষ্ট থলিয়া রপ্তানি হইত। পাটজাত শিল্পের রপ্তানি মূল্য এসময় বাৎসরিক গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ছিল। এই সমস্ত কারবার তখন বাঙ্গালীর নিজস্ব এবং একচেটিয়া ছিল। এই টাকাটা পাইত বাঙ্গালী পাটচাষী, বাঙ্গালী তাঁতী জোলা এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ী।

বর্ত্তমান পাটকলের উৎপত্তির কথা :—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রক্সবার্গ বাংলার এই অমূল্য শিল্পের পরিচয় পাইয়া ইহার নমুনা বিলাতে প্রেরণ করেন। স্কটল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা ইহাতে আকৃষ্ট হয়। কিছুকাল পরে পাটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বুঝিয়া বাংলার এই উন্নতিশীল শিল্প তাহারা পাটবয়নকারীদিগের নিকট হইতে ছিনাইয়া লয়, কলিকাতা ও ডাণ্ডী সহরে বড় বড়

পাটকল স্থাপন করে এবং বাংলার কৃষকদিগকে নানা রকমে প্রলুব্ধ করিয়া খাদ্যশস্যের আবাদ হ্রাস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ক্রমশঃ পাটের আবাদ বৃদ্ধি করায়। এইরূপে বস্ত্রশিল্পের মত বাংলার আর একটি অমূল্য শিল্প লুপ্ত হয়।...

পাটকলের বৃদ্ধি :—১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের নিকট রিষড়া নামক স্থানে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। অল্পদিন পরে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর এবং হুগলী জিলায় গরিফা নামক স্থানে পাটকল স্থাপিত হয়। এই সকল কল হইতে এত অধিক লাভ হইতে লাগিল যে অল্পকালের মধ্যে ভাগীরথীর উভয় কূল পাটকলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে পাটকল কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত হিসাব হইতে উপলব্ধি হইবে।

১৯০০	সালে	ছিল	৪৭টি	কল
১৯১০	„	„	৬০টি	„
১৯২০	„	„	৭৬টি	„
১৯২৫	„	হইয়াছে	৯০টি	„

পাটকলের লাভ :—১৮৪৫ সালে পাটকল হইতে দৈনিক ৮ টন বা ২২০ মণ পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইত, ১৯২৪ সালে দৈনিক ৪ হাজার টন্ বা ১ লক্ষ ১০ হাজার মণে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বৎসর উক্ত কলসমূহের লাভের অঙ্কও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।...

এই বৎসর অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ সালে খরচ-খরচা বাদে নিট্ লাভ হইয়াছে সওয়া সাত কোটী টাকা।

এই সকল কলের মালিক সব বিদেশী। বাঙ্গালীর একটিও পাটকল নাই। এই সকল কলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মজুর কাজ করে ৫ লক্ষের উপর। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী নয়।

কলিকাতায় পাট আমদানির যানবাহন :—কলিকাতায় যত পাট আমদানি হয় তাহার মধ্যে

শতকরা	৫০ ভাগ	রেলযোগে
„	৪৫ ভাগ	ষ্টীমারযোগে
„	৪ ভাগ	দেশীয় নৌকাযোগে
„	১ ভাগ	গোযানে আনিত হয়।
৫০ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা	৪৫ ভাগ	দেশীয় নৌকাযোগে
„	৩৫ ভাগ	রেলযোগে
„	১২ ভাগ	ষ্টীমারযোগে
„	৮ ভাগ	গোযানে আমদানি হইত।

দেশীয় নৌকা, বিদেশীয় রেল ও ষ্টীমার দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে। গোযান একরকম দূরীভূত হইয়াছে। পাট বহন করিয়া যে প্রচুর আয় হয় তাহা বিদেশীয় রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীসমূহ ক্রত দখল করিয়া লইয়াছে।

পাট ফসলের পরিমাণ :—বাংলায় এখন প্রতিবৎসর গড়ে ৩০ লক্ষ একার বা ৯০ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ হয়। গত ৫ বৎসরের উৎপন্ন হইতে দেখা যায় প্রতি বৎসর গড়ে ৯৫ লক্ষ বেল্ (৫ মণে এক বেল্) বা গাঁইট বা ৪ কোটী ৭৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বাংলার লোক-পিছু একমণ। এই ৯৫ লক্ষ গাঁইটের মধ্যে সাধারণ বৎসরে ৮৫ লক্ষ গাঁইট খরচ হয়। ইহার কতক পরিমাণ স্থানীয় কলগুলিতে ব্যবহার হয়, কতক পরিমাণ বাছাই পাট ডাণ্ডী, মার্কিন, জার্ম্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, চেকোস্লাভিয়া প্রভৃতি মুলুকে চালান যায়। অবশিষ্ট পাট ঘরোয়া কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

বিদেশে পাটজাত শিল্পের কথা :—বিলাত, জার্ম্মানী, মার্কিন, ইটালী, জাপান প্রভৃতি মুলুকে যে কাঁচা পাট চালান যায় তাহার অনেক পরিমাণ পাট নকল আলপাকা, নকল রেশম প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। কতক পরিমাণ পশুলোমের সহিত মিশ্রিত হইয়া গরম কাপড় চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এদেশে যে নকল রেশম, আলপাকার শাড়ী প্রভৃতি ঐজাতীয় নানা প্রকার দ্রব্য বহুপরিমাণে আমদানি হয়, তাহা বাংলার পাট হইতে বিদেশে প্রস্তুত হয়। ১০৲ টাকা মূল্যের পাট দুই চারিটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর নব কলেবর ধারণ করিয়া ২৭৫৲ টাকা মণ দরে আমাদেরই নিকট বিক্রয় হইতে আসে। জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতিবৎসর যে বহু-পরিমাণ শীতবস্ত্র এদেশে আমদানি হয় তাহাতে পাটের ভাগ বহু-পরিমাণে বিরাজ করে।

(ভাণ্ডার, শ্রাবণ, ১৩৩৬) শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—

ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের কারণ

খৃষ্টীয় প্রথম শতক এবং খৃষ্টীয় বিংশ শতক! এই দুই সহস্র বৎসরে ভারতে শিল্পকলার কি বিষম অধঃপতন হইয়াছে।...

এদেশের শিল্পকলা খ্রীঃ দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর উন্নত, প্রথম মুসলমানযুগে বিধ্বস্ত, দ্বিতীয় মুসলমান (মুঘল) যুগে পুনর্গঠিত, এবং বিভিন্ন প্রকার নূতন পথে চালিত, এবং খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকে ক্ষয়ভাবাপন্ন হইয়া খ্রীঃ ঊনবিংশ শতকে অবনতির পথে চলিতে থাকে। এই অধোগতি প্রায় শতাব্দী কাল ধীরে ধীরে চলিবার পর বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে অতিশয় দ্রুত হইয়া পড়ে।...১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনীতে ভারতবর্ষ শিল্পজগতের সর্ব্বোচ্চ স্থলে স্থিত। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক শিল্পকলা-প্রদর্শনীতে (প্যারিস) ভারতবর্ষের স্থান কোথায় ছিল তাহা বলিতে লজ্জা হয়।

শিল্পের এইরূপ দ্রুত অবনতির যে কয়টি কারণ সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে, সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

প্রথম কারণ এদেশে রেলওয়ের প্রসার। যেখানেই রেলওয়ে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্যের দালাল সেখানেই দেশী শিল্প-দ্রব্যের নিকৃষ্ট কিন্তু স্বল্পমূল্যের বিদেশী নকল লইয়া গিয়াছে।...

দ্বিতীয় কারণ এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের অনুকরণ-স্পৃহা। ইংরাজমাত্রেরই সর্ব্বকালের মূলমন্ত্র "British and therefore best" অর্থাৎ "ইহা ব্রিটিশ এবং সেই কারণে শ্রেষ্ঠ।" ইংরাজের যথার্থ অনুকরণ করিবার জন্য এই উক্তির বিশ্লেষণ করিলে, তবে দেখা যাইবে ইহার অর্থ "যেহেতু ইহা আমার স্বদেশজাত, অতএব আমার নিকট ইহা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" দুঃখের বিষয়, ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতীয় ইংরাজীনবীশ ইংরাজের সুরে সুর মিলাইয়া বলেন, "British and therefore best", এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরই মত এদেশের যা কিছু দেখেন সে সকল জিনিসকে (রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা বাদে) হেয় জ্ঞান করেন।...প্রত্যেক সুশিক্ষিত ইংরাজই (বা ইয়োরোপিয়) যে এদেশের শিল্পকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন আমার এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, আমি বিদেশীয় শিল্পকলাবিদ্ বা রূপরসজ্ঞ বলিয়া খ্যাত যত লোকের পুস্তক বা মতামত পাঠ করিয়াছি—এবং এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই ভারতবর্ষ বা ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধীয় নহে—তাঁহারা সকলেই শিল্পকলা এবং

রূপরসের প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্পের প্রশংসা কোথাও না কোথাও করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে থাকা সত্ত্বেও অনেকে এইরূপ লিখিয়াছেন বলিয়া "বাধ্য" শব্দ ব্যবহার করিলাম।...

তৃতীয় কারণ বিদেশী শিল্পীর অধ্যবসায় ও উদ্যম এবং ভারতীয় শিল্পীর ঐ দুই গুণের অভাব। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ক্রেতার স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহদানের প্রবৃত্তি এবং এদেশীয় ক্রেতার তাহার বিপরীত ভাবেরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এদেশে একদিকে শিল্পী স্থাণুভাবাপন্ন হওয়ায় কালের গতির সঙ্গে অগ্রসর হয় নাই, অন্য দিকে ক্রেতার অভাবে নিরন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; অতএব তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।...

ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান শোচনীয় দৈন্যদশার জন্য শিল্পী ও ক্রেতা উভয়েই দোষী; কিন্তু ক্রেতার মধ্যে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকের অভাব নাই, শিল্পীর শিক্ষা ও অর্থ দুইয়েরই দারুণ অভাব। সুতরাং এখন ক্রেতারই উচিত শিল্পীকে উৎসাহ ও শিক্ষাদান করা।...

এদেশের শিল্পী কেবলমাত্র দুই প্রকারের পদার্থ প্রস্তুত করে। প্রথম, অতি উৎকৃষ্ট; দ্বিতীয় নিকৃষ্ট। যে দ্রব্যটি সে স্বচ্ছন্দমনে স্বাভাবিক কৌশলের সহিত করে তাহা সাধারণতঃ অতি উৎকৃষ্ট হয়, আবার যাহা তাহার অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সহজে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত তাহা "খেলো"। বিদেশীর ন্যায় বাহিরে "চটকদার" এবং ভিতরে "বাজে" পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার বিদ্যা তাহার নাই। কাজেই বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় তাহার শিল্পসামগ্রী হয় বহুমূল্য, নহিলে অসার হয়।

কিন্তু দেশী উৎকৃষ্ট পদার্থের মূল্য ও গুণের যাচাই কি ক্রেতা কখনো করিয়া দেখেন? করিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, বিদেশী শিল্পী চতুর্গুণ মূল্যেও উহার তুল্য পদার্থ দিতে পারে না।...

এদেশের ক্রেতা যে সৌন্দর্য্য বা রূপরসজ্ঞানশূন্য তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না।...

কলিকাতার বড় বড় পথ দিয়া চলিলে অনেক ধনী লোকের গৃহদ্বার দেখা যায়। আমি প্রায় সকল ট্রাম ও বাসের পথে গিয়াছি। কিন্তু একমাত্র বসু-বিজ্ঞানমন্দির ভিন্ন অন্য কোথাও একটি সুন্দর দ্বার দেখি নাই। অন্য সবই "হাল ফ্যাসনের" বিলাতী "গেট" বা "ডোর"।

স্থপতিবিজ্ঞান বা সৌধ-শিল্পের কথা আমার পক্ষে না বলাই ভাল। ...তবে প্রাসাদ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া প্রাসাদের অংশ-বিশেষের কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।...আজকাল গৃহের বাহিরের শোভাবর্দ্ধনের জন্য বিদেশী 'ব্যালকনি'-জাতীয় অলিন্দের খুবই প্রচলন হইয়াছে।...যাঁহারা উদয়পুর, জয়পুর বা প্রাচীন দিল্লীর কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরের অলিন্দ বা কাশ্মীর ও নেপালের কাষ্ঠের অলিন্দ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বলিতে পারিবেন দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কত।

গৃহের বাহিরের অবস্থা তো এই প্রকার। গৃহের ভিতর আরও অপরূপ। আসবাবপত্র সবই বিলাতী প্রসিদ্ধ ছাঁদের (Sheraton, Chippendale, Louise Quinze ইত্যাদি) অতি জঘন্য অনুকরণে প্রস্তুত।...গালিচা তো প্রায় সবই ব্রুসেল্‌স্‌, আক্সমিনষ্টার ও অন্য বিদেশীয় কারখানায় প্রস্তুত। অথচ বিদেশের লোকে মির্জাপুরি, মণ্টগোমেরি ইত্যাদি ভারতীয় গালিচার যথেষ্ট খাতির করে।...

গজদন্ত, শৃঙ্গ, কচ্ছপের খোলস, ইত্যাদি পদার্থ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির গৃহশোভা বর্দ্ধনের ক্ষমতা কি কিছুমাত্র কম? এই সকল শিল্পে ভারতের শিল্পীর কলাকৌশল এখনও অদ্ভুত। তবে ধনীর গৃহে ইহাদের স্থান এতই সঙ্কীর্ণ কেন?

পিত্তল, কাংস, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি ধাতুর কার্য্যে এদেশের বাহিরে কোথায় এত নিপুণ কারু-কৌশলী শিল্পী পাওয়া যায়?... দিল্লীর ও হুগলী জেলার চিকণ ও অন্য সূচের কাজ, নানাপ্রদেশের রঙ্গীন ও ছাপান কার্পাস এবং রেশমী বস্ত্রাদি ধনি-গৃহিণীর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন আর করে না কেন? সৌন্দর্য্যে এই সকল দ্রব্য বিদেশী অপেক্ষা অধিকতর মনোরম এবং স্থায়িত্ব হিসাবে বিচার করিলে মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম।

উপরে যে সকল শিল্প-সামগ্রীর কথা বলিলাম, সে সকলেরই বিলাতী সংস্করণ এ দেশের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে এবং সে সকলের জন্য বিদেশীকে কিছু কি কম মূল্য দিতে হইতেছে? তাহাও নহে। সুতরাং অর্থের অভাবের যুক্তির কোনই মূল্য নাই। অভাব সুরুচির, জ্ঞানের এবং স্বদেশ-প্রীতির। এই তিনটির অভাবে দেশের শিল্প সবই একে একে লোপ পাইতেছে।...

ঢাকার মসলিন বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। সুদূর রোমে ইহা Ventus textilis or nabula নামে বিক্রীত হইত। তাহারও বহু পূর্ব্বে এদেশের প্রাচীন পুস্তকে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন কার্পাস বস্ত্র হিসাবে ইহা অতুলনীয় এবং এ শ্রেণীর বস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। ট্যাভরণীয়েরের আমলেও (খৃঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে) ইহা জগদ্বিখ্যাত এবং সর্ব্বত্র আদৃত হইত। তখন পনের গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া একখণ্ড সাধারণ মসলিনের ওজন হইত তিন বা চার তোলা মাত্র।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ মসলিন ঐ মাপের হইলে তাহার ওজন হইত পাঁচ হইতে সাত তোলা মাত্র। সে সময়ের দশ গজ লম্বা এবং এক গজ চওড়া মলমল খাসের খণ্ডে ১০০০ হইতে ১৮০০ সূতা টানায় থাকিত। ইহার ওজন হইত ১৪০০ হইতে ১৫০০ গ্রেণ, অর্থাৎ চার হইতে পাঁচ তোলার মধ্যে।...

এই অজেয় শিল্প-গৌরব এখন আর আমাদের নাই। ক্রেতার অনাদরের জন্য তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(পঞ্চপুষ্প, শ্রাবণ, ১৩৩৬) শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

দুর্য্যোধন

যবদ্বীপের ছায় নাটের মূর্ত্তি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

দ্বীপ-ভারতের নাট্যকলা

শ্রীকালিদাস নাগ

ভরতের নাট্যশাস্ত্র নিয়ে আজকাল অনেক আলোচনা চল্‌ছে। পাণিনি যুগের 'নটসূত্র' থেকে আরম্ভ করে দশম একাদশ শতক পর্যান্ত যত প্রাকৃত ও সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে সেগুলির খবর মোটামুটি অনেকে রাখেন, কিন্তু ভরতের নাট্যকলা ও অভিনয় পদ্ধতির সমাদর ও প্রসার ভারতের বাইরে কতটা হইয়াছিল সে-বিষয়ে অনেকের ধারণা নেই। সেজন্য যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপ পরিভ্রমণ করবার সময় সেখানকার অভিনয়াদি দেখে যে সব কথা মনে হয়েছিল তার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করছি।

যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপে নাট্যাভিনয় প্রভৃতির প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা দরকার।

(১) মানুষ নটনটী মিলে রামায়ণ মহাভারত অভিনয়—প্রধানত নৃত্যের সাহায্যে। এটি দেখে আমাদের পৌরাণিক যাত্রার কথা খুব মনে হয়। জাভার লোকেরা এর নাম দেয় Wayang Orang অথবা Wayang Wong.

(২) মুখোস প'রে নৃত্যাভিনয়ের নাম Wayang Topeng; এটি অতি প্রাচীন কাল থেকে জনসাধারণের প্রিয় বস্তু। বলীদ্বীপে এর প্রচার বেশী। বলীর প্রাচীন 'তন্ত্রী' সাহিত্য ও 'পঞ্জী' পুরাণ অবলম্বন করে পালা রচনা হয় এবং উত্তর-ভারতের রামলীলা ও কেরল দেশের কথাকলি যেরকম নানা পৌরাণিক আখ্যানবস্তু অবলম্বন করে অভিনীত হয় প্রায় সেই রকমেই বলীদ্বীপের নটেরা অভিনয় করে। গিয়াঙার-এর (Gianyar) অধিপতির কোন আত্মীয়ের শ্রাদ্ধবাসরে এই জাতীয় অভিনয়ের দুটি পালা দেখেছি—গজক্রম ও চতুর্মন্ত্রী উপাখ্যান।

(৩) পুতুলনাচের ভিতর দিয়ে পালার অভিনয়। এই পুতুল নানা রকমে প্রস্তুত হয়। বলীদ্বীপের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে একজায়গায় দেখি মঞ্চের উপর শৈব ও বৌদ্ধ পুরোহিত মন্ত্র পাঠাদি করছেন এবং মঞ্চের নীচে একদল মানুষ বসে পুতুল নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং হিন্দুশ্রাদ্ধের কুশপুত্তলিকার সঙ্গে এই-সব পুতুলের অনুষ্ঠানগত কোন যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

(৪) অভিনয়ের পুতুলগুলির মধ্যেও একটা ক্রমবিকাশ হয়েছে তাহা লক্ষ্য করেছি। অতি প্রাচীনকালে খড় কাঠ মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী হ'ত, তার দুএকটি নমুনা শূরকর্ত্তা নগরের চিত্রশালায় দেখেছি। খড়ের পুতুল প্রায় দুষ্প্রাপ্য তবে কাঠের উপর গিল্‌ট করা পুতুল অনেক দেখা যায়—নাম Wayang Krucil—চেপ্‌টা মোটা কাঠের উপর খোদাই করা সব মূর্ত্তি। এই-সব পুতুলকে বেশভূষা পরিয়ে নাচান হয়—মধ্যপশ্চিম জাভায় এই পুতুলের নাচের আদর বেশী, নাম Wayang Golek, আমাদের দেশের পুতুল নাচের সঙ্গে এর বিশেষ প্রভেদ নেই।

(৫) কিন্তু Wayang Kulit অর্থাৎ চেপ্‌টা চামড়ার টুক্‌রো কেটে যে-সব পুতুল ওদেশের শিল্পীরা তৈরী করে তার সাথকতা অভিনয়ের দিক দিয়ে যেমন সবচেয়ে বেশী, কারুকার্য্য হিসাবেও তেমনি। দ্বীপ-ভারতের এই পুতুলগুলির সাহায্যে যে ছায়ানাট্যের বিকাশ হয়েছে সে-বিষয়ে ওলন্দাজ পণ্ডিত Kats একখানি মস্ত বই লিখেছেন। তার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই ছায়ানৃত্যের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে—একটি ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে গড়া, অন্যটি স্থানীয় ঐতিহ্য ও পুরাণ—'পঞ্জি'-সাহিত্য থেকে মালমশলা নিয়ে রচিত। প্রথমটির নাম Wayang P[illegible] (সংস্কৃত পর্ব্বের অপভ্রংশ ?), দ্বিতীয়টির নাম Wayang Gedok.

এই নানা-প্রকার অভিনয় পদ্ধতির চরম বিকাশ হয়েছিল মধ্য জাভার বিরাট শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ও বরবুদর মন্দিরের আশপাশে। যোগ্যা কর্ত্তা (Jogya Karta)

ও শূর কর্তা (Sura Karta)র সুলতানদ্বয় ধর্মে এখন মুসলমান হলেও প্রাচীন হিন্দু জাভার রাজকুলেরই বংশধর এবং রামায়ণ মহাভারতের ও বিশেষভাবে প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই দুই রাজবংশের

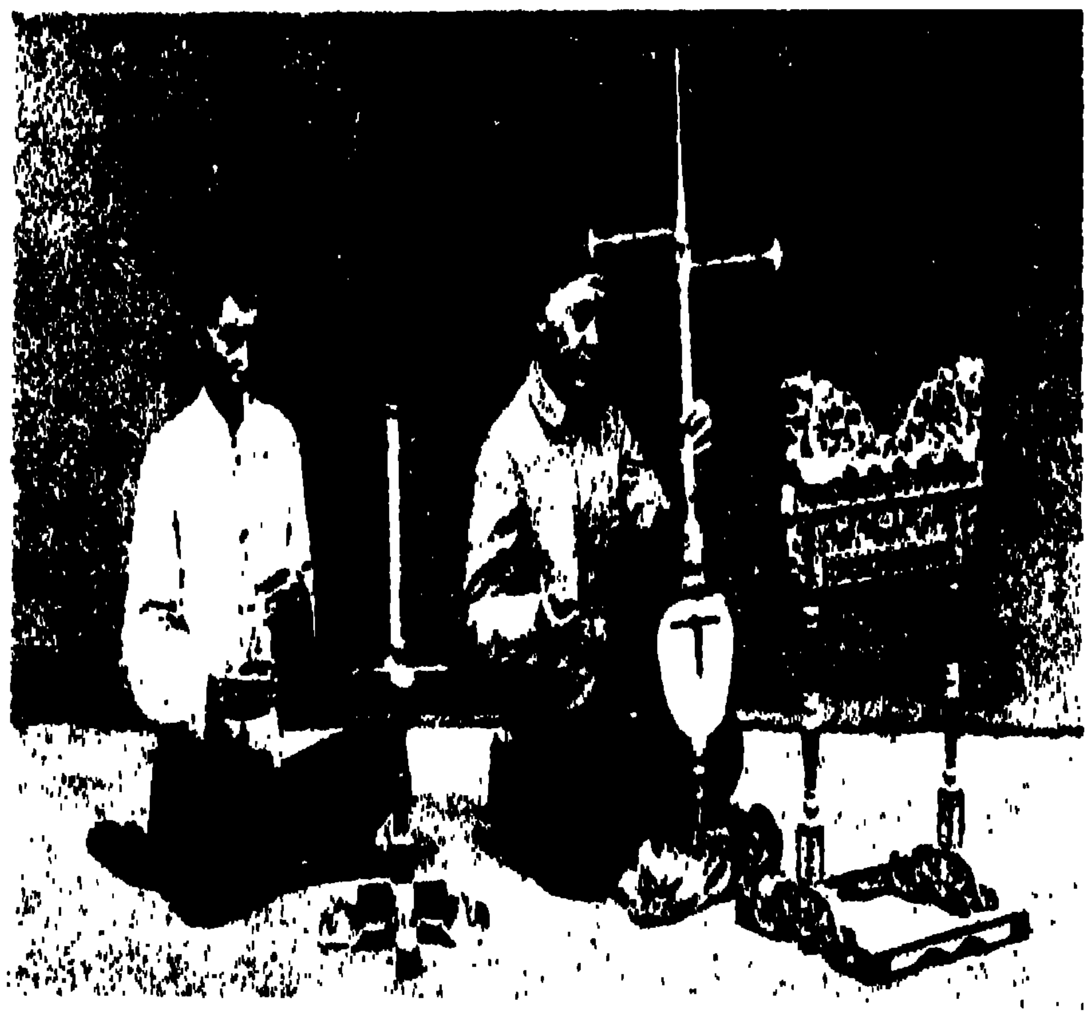

বংশী ও রবার বাদক

মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সেটা অনুভব করেছি। সুলতানদের দুজনেই বহু অর্থ ব্যয় করে নট গোষ্ঠির ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মানুষ নটনটীর অভিনয়ের কথা বারান্তরে আলোচনা করা যাবে। উপস্থিত ছায়ানটদের কথাই বলা যাক্।

শূর কর্তা নগরে পৌঁছে ডাক্তার বিদ্যাদিনিংগ্রাৎ (Wediadiningrat)এর সাহায্যে আমি স্থানীয় সুলতান্ Pangeran Adipati Arya Prabu Mangku Negara এবং Pangeran Hrya Wadiwidyoyo প্রভৃতির দরবারে নিমন্ত্রণ পাই। মানুষ নটনটীর অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ হয়েছে ঐখানে। প্রাচীন ভারতীয় নাট্য-কলার সঙ্গে তার যোগ কত

গভীর ও প্রয়োগবিজ্ঞানের বিকাশ কি অসাধ্য, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত অনুপম ভাষায় ব... করেছেন। মাঙ্কুনগরের দরবারে যাত্রা দেখবার সময় খবর পাই যে, ছায়ানাট্যের সম্বন্ধে সব চেয়ে ব... গুণী ও বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন Pangeran Arya Kusumatiningrat, Susuhunan সুলতানের ভ্রাতা। এ দেশের যাবতীয় শিল্পের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও সেই শিল্প-কলার রক্ষা ও উৎকর্ষ বিধান করে এঁর মত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় কম লোকই করেছেন। এঁদের পরিচালিত একটি শিল্প চক্র আছে Surakartasche Kunstkring—সেখানে এক দিন আমায় নিমন্ত্রণ পাঠালেন বক্তৃতা দিতে হবে—"Rabindranath and the Art-renaissance of India" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। তারপর শিল্প সমজদার গোষ্ঠীর চূড়ামণি কুসুমাতিনিংগ্রাতের

গম্বাঙের বাদ্যযন্ত্র

প্রাসাদে সাদরে নিয়ে গেলেন। প্রবীণ ধীরোদাত্ত মূর্তি—বছর পঞ্চাশ বয়স—শান্ত গম্ভীর স্বরে আহ্বান করে কাছে

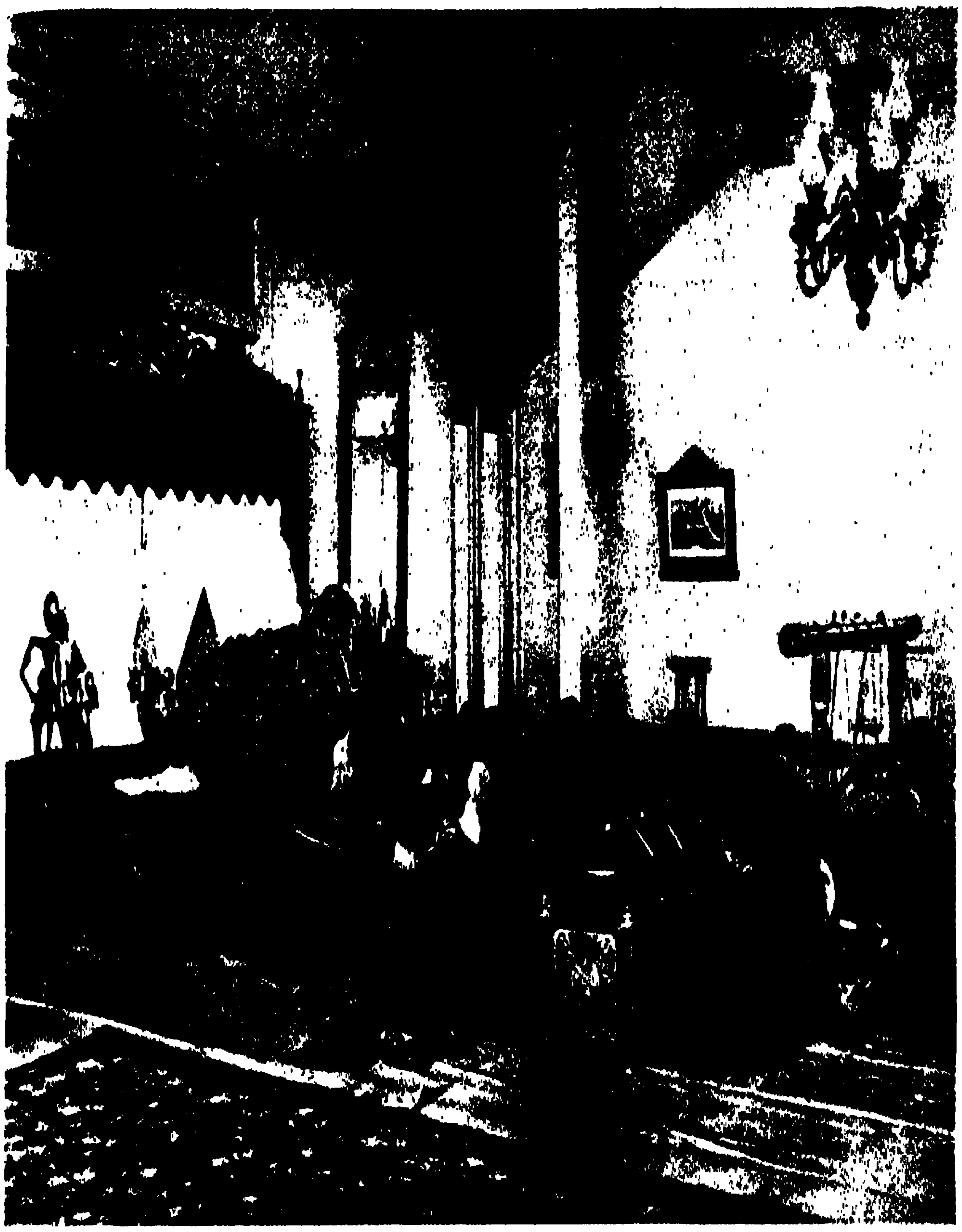

প্রেক্ষাগৃহের দৃশ্য

বসালেন এবং দ্বীপ-ভারতের শিল্প ও সভ্যতার সম্বন্ধে কত অপূর্ব্ব তথ্য বলে যেতে লাগ্‌লেন। এমন অমায়িক মানুষ রাজবংশে এখনও দেখা যায়—পোযাক প্রাচীন-পন্থী স্বদেশী ধরণের—জাতীয় ভাষায় আলোচনা করছিলেন এবং ডাঃ বিদ্যাদিনিঙ্‌গ্রাৎ আমায় ফরাসীতে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। বেশ কিছু জলযোগের ব্যবস্থা বসবার টেবিলের উপরই করা হয়েছিল, কারণ ছায়ানাট্য আমাদের দেশের উৎসবের মত প্রায় সারারাত ধরে চলে।

সাম্‌নে দেখি একটি সাদা চাদরের পর্দ্দা ঝুলছে—দুধারে শালুর মত জিনিষ ও বাটিক্ কাপড়ে কাজ করা। পর্দ্দার ঠিক মাঝখানে তেলের প্রদীপ জ্বলছে—সেই আলোয় প্রত্যেক পুতুলটির তুচ্ছতম অঙ্গভঙ্গী নড়াচড়া ছায়াচিত্র-প্রবাহের সৃষ্টি করে। পর্দ্দার সাম্‌নে একটা কলা গাছ, শায়ান—তার মধ্যে কতক পুতুল গোঁজা কতক হেলান। দুপাশে এই পুতুল-নটের দল নিয়ে মাঝে বসেছেন কথক-গুরু Dalang; তাঁর পাশে একটু নীচে একটা কাঠের সিন্ধুক, তার মধ্যে আরও অনেক পুতুল শোয়ান মজুত আছে। আমাদের দেশের কথকদের মতন দালঙ্‌রাও জনশিক্ষার পাণ্ডা; যত আখ্যান কথা অবলম্বন করে নিরক্ষর নরনারীর প্রাণে শাশ্বত হিন্দু নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা যুগের পর যুগ দিয়ে আস্‌ছেন—মুসলমান রাজ্যের মধ্যেও তার বিরাম নাই। কথকতা আরম্ভের পূর্ব্বে বাড়ীর কর্ত্তা ও শ্রোতৃবর্গের তরফ থেকে অর্ঘ্য উপহারস্বরূপ কিছু কথককে দেওয়া হয়। আজকাল চাল, নারকেল, তালের মিছরি, তামাক, সুপারী ও মুরগী প্রভৃতি দেওয়া হয় দেখ্‌লাম। পূর্ব্বকালে শুন্‌লাম অন্য জিনিষ দেওয়া হত, তার মধ্যে চাল, সুগন্ধ ঘাস, তুলসী পাতা, চন্দন কাঠ ও চার রঙের হাতে কাটা সুতো—লাল, নীল সবুজ ও

পুতুল-নাচে মহাভারতের অভিনয় ঘটোৎকচ

হলুদে। অর্ঘ্য উৎসর্গের পর মন্ত্রোচ্চারণ করে কথক সুর করে বন্দনা আরম্ভ করেন। তারপর ক্রমশঃ পালা গান ও সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানাট্যের অভিনয় চলতে থাকে।

ছায়ানাট্য সুরু হবার কিছু আগে থেকে কথক-ঠাকুরের পাশে এক বিরাট যন্ত্রসঙ্গত বসে। তামা কাঁসার নানা আকারের ঘণ্টা ও কাঁসরজাতীয় পদার্থ, কাঠের যন্ত্র, ঢোলক, স্থানীয় বেহালা, বাঁশী প্রভৃতির সাহায্যে এক রীতিমত "অর্কেষ্ট্রা" আলাপ করতে থাকে, জাভার লোকেরা বলে (Gamelan) গামেলান। ছায়ানাট্যের সঙ্গে ছন্দ রেখে যদি কোন সঙ্গত চলতে পারে সে একমাত্র এই গামেলান। সেই স্তিমিত আলোয় ছায়া-ছবির নর্ত্তনের সঙ্গে তাল দিয়ে যন্ত্রীরা যেন একটি স্বপ্নলোক গড়ে তোলে। এই বাইরের বাস্তব জগৎটা যেন ছায়ার সমুদ্রে তলিয়ে যায়. সত্যি সিন্ধুতরঙ্গের শ্রুতি গামেলানের প্রত্যেক আলাপে ঝঙ্কৃত হতে থাকে, তখন হয়ত কথক-ঠাকুর অর্জ্জুন ও নাগকন্যা উলুপীর প্রণয় কাহিনী অথবা ভীমের পাতাল-প্রবেশ গোছের কোন একটা পালার অভিনয়ে ব্যস্ত—সেই ছায়ার সঙ্গে সুর মিলে মিশে গিয়ে কল্পনাকে যেন জীবন্ত ক'রে তোলে। কথকের মুখের কথাবস্তু ভারতের দান; সেই পরিচিত কৃষ্ণ বলদেব কংস, সেই ভীষ্ম দ্রোণ বিরাট শকুনি দুর্য্যোধন ঘটোৎকচ, সেই রাম সীতা জটায়ু রাবণ হনুমান অথচ তার মূলে রয়েছে যেন অন্য সুর অন্য ছন্দ অন্য ঠাট। সত্যি এগুলি ভারত পুরাণের পলিনেশীয় অনুবাদ,—আর্য্যযুগের চেয়ে ঢের প্রাচীন দিনের স্মৃতি এই Wayang-এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ভারতে এরকম ছায়ানাট্য কোথায়ও দেখা যায় কিনা জানি না। শুনেছি কোন কোন পাহাড়ী জাত এখনও নাকি মধ্যে মধ্যে এরকম পুতুল খেলা করে। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের আভাষ এখন শুধু একটি রাগিণীর নামে—ছায়ানট, আর প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে—যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ,—বিরাট ছায়ার কবিতা।

কুমার কুসুমাতিনিঙগ্রাৎ প্রশ্ন করছিলেন ভারতে এই রকম জিনিষ আছে কি না; তাঁর প্রশ্নের জবাব তখন দিতে পারিনি; তাই আজ সাধারণের সাম্‌নে উপস্থিত করছি। গত বৎসর কোচিনের দেওয়ান বাহাদুরের আনুকূল্যে 'কথাকলি' অভিনয়ের নানা পদ্ধতি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার কিছু কিছু এর সঙ্গে মেলে, কিন্তু চামড়ার পুতুলের ছায়ানৃত্য কোথায়ও দেখিনি। যদি এ-বিষয়ে কেউ সন্ধান দেন বিশেষ উপকৃত হব।

অতি প্রাচীনকালে হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমাদের পলিনেশীয় ভ্রাতারা নিজেদের দেবতা ও উপদেবতার অধুনালুপ্ত পুরাণ নিয়ে এই নাট্য অভিনয় করত। পরে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের মধ্যে মস্ত পরিবর্ত্তন আসে। Zeus এর চেয়ে প্রাচীন দেবতাদের নিয়ে যেমন গ্রীক কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন আর্য্যেরা তেমনি করে নিজের দেবকুলকে কেন্দ্র করে' এক বিরাট মিশ্র দেবগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাদের কাহিনী আজও তাই দ্বীপ-ভারতের অধিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। পালা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ হিসাবে একখানি পট প্রথমেই দেখান হয়, কখনও এক বনস্পতির ছায়া, কখনও পর্ব্বতের। নানা জীব জন্তু, সেগুলিকে আশ্রয় করে জীবন-নাট্যের সূচনা করে দেয়; অনেকে বলেন ঐ বৃক্ষের শাখা মাটি জুড়ে থাকে আর শিকড় থাকে আকাশে—গীতার কথা মনে পড়ে যায়—

উর্দ্ধ মূলমধঃ শাখম্—কে ঐ তত্ত্ব কবে ওদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে? পাহাড়ের ছায়া পর্দ্দার উপর ফেলে কথক Dalang ব্যাখ্যা করেন: ঐ পাহাড়ের মধ্যে আছে এক গহ্বর, যখন বাসনার বাতাস একটুকুও বিচলিত না করে তখনই ঐ গুহার সন্ধান্ আমরা পাই। সেই গুহা আবিষ্কার করবার জন্তই মিস্ত রাগ (বিগত রাগ) অর্জ্জুনের তপস্যা। সে সন্ধান পেলে আদি ও অন্তের মোহ কেটে যায়, জীব শাশ্বতকে পায়। কিন্তু সেই পাওয়ার পথে অনেক বাধা, অনেক শত্রু—বায়াঙ্ নাট্যে তাদের নাম রাক্ষস ও দানব। এদের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হবে। তাদের বিকট অঙ্গভঙ্গী ও রুদ্র তাণ্ডব বীর অর্জ্জুনের একটি হাতের অমোঘ মুদ্রাভিনয়ে কোথায় পরাস্ত হয়ে লুকোয়—এক ছন্দ যেমন হাজার অছন্দের উপর, এক সুর যেমন লক্ষ বেসুরের উপর জয়ী হয়। এমন অর্জ্জুন ভীম যুধিষ্ঠির (বা ধর্ম্ম-কুসুম) প্রভৃতি প্রত্যেককে নিয়ে কত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, কত নীতিকথা, কত উপাখ্যান রচনা করেছে এই দ্বীপ-ভারতের কথক-ঠাকুররা—কে তার সন্ধান রাখে? পূর্ব্ব মহাসাগরের এই দ্বীপগুলির সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সত্যি আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছিলেন বলেই এই বিরাট উপ-দ্বীপকে দ্বীপভারত ('Insulindia) নাম দেওয়া হয়েছে। সেমার (Semer) পেৎরো (Petro) নালাগারেঙ্ (Nalagareng) প্রভৃতি উপদেবতা অথবা ভাঁড়েদের কথা হয়ত স্থানীয় কথকের সৃষ্টি, কিন্তু ভারতের পরাশর মৎস্যগন্ধার (জাভায় নাম দুর্গন্ধিনী) উপাখ্যান ও-দেশে গিয়ে যে অতটা বদলে গিয়েছে তার কারণ সব সময় ও-দেশের লোকেদের কল্পনা-প্রবণতা নয়। এ বিষয়ে প্রবীণ ওলন্দাজ পণ্ডিত Callenfels (জাভায় ইনি বৃকোদর নামে প্রসিদ্ধ, দৈহিক সাদৃশ্যের জন্ত!) অনেক খোঁজখবর করেছেন। তাঁর সঙ্গে Batavian Societyতে আলাপ করে জানলাম তিনি এক বিষয়ে কতকটা স্থিরসিদ্ধান্তে এসেছেন। ভারতের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদির সঙ্গে যখনই দ্বীপ-ভারতের আখ্যানগুলির অমিল দেখা যেত তখনই সেকালে ওঁরা ধরে নিতেন যে, প্রভেদটার কারণ হচ্ছে দ্বীপবাসীদের মৌলিক রচনা-শক্তি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, তুলনা করবার সময় শুধু সংস্কৃত মূলের সঙ্গেই করা ঠিক নয়। কারণ উক্ত ভারতীয় গ্রন্থের উপাখ্যানগুলির ভাষা-সংস্করণ (vernacular) থেকে অনেক নূতন সৃষ্ট আখ্যান ও-দেশে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ সেই vernacular versionগুলি এপর্য্যন্ত ভাল করে অধ্যয়ন করে মেলানই হয়নি। শুধু লিখিত গ্রন্থ নয়, মুখে মুখে সে-সব গল্প ভারতের গ্রাম্য কবি ও তরজা-ওয়ালা, বিশেষতঃ কথকরা রচনা করে' অথবা রক্ষা করে' এসেছেন সে সম্বন্ধে Callenfelsকে কিছু খবর আমি দিই—শুনে তিনি বিশেষ উৎসুক হন সেইগুলির সঙ্গে

মেলাবার জন্ত। এ কাজ করতে হলে ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে ও-দেশের পণ্ডিতদের এক সঙ্গে কাজ করা উচিত এবং এই পন্থা ধরে কাজ করলে কত বড় এক লোক-সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠ্‌তে পারে তার আভাসমাত্র দিয়ে Wayang বা দ্বীপ-ভারতের ছায়ানাট্যের কথা উপস্থিত শেষ করি।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(১১)

সকাল হইতে বাড়ীখানার উপর একটা ভয়াবহ নীরবতা বিরাজ করিতেছে, অথচ মানুষের অভাব নাই, কাজকর্ম, চলাফেরাও শেষ হয় নাই। কলিকাতা হইতে মনোরঞ্জন সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইন্দুর কনিষ্ঠা ভগিনীও বৌদিদির এরূপ সঙ্কট অবস্থা শুনিয়া স্বামীর কাছে কান্নাকাটি করিয়া কোনোপ্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার অবশ্য মেয়াদ বেশী দিনের নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ইন্দু এবং মায়া দুজনেই আজ ছুটি পাইয়াছে। রান্না-বান্নার ভার লইয়াছে মনোরঞ্জনের সঙ্গে আগত বামুন-ঠাকুর, এবং রোগিনীর শুশ্রূষা ও পথ্যাদি প্রস্তুতের ভার লইয়াছেন বড়বৌ। মনোরঞ্জন বাহিরের ঘরে বসিয়া লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সাবিত্রীর অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ, ডাক্তার জবাব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার জ্ঞান নাই। একজন এলোপ্যাথ ডাক্তারকে মনোরঞ্জন ডাকাইয়া আনিয়াছেন। তিনি শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতেছেন। গ্রামের লোক বাড়ীতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পুরুষরা বৈঠকখানায় মনোরঞ্জনের কাছে খবর লইয়া যাইতেছে, দুই একজন বসিয়া কথা-বার্ত্তাও চলিতেছে। মেয়েরা ভিতরে হয় ভাঁড়ার ঘরে ইন্দুর সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে, না হয় শয্যায় শায়িতা মায়ার পাশে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। রোগিনীর ঘরে ডাক্তার লোকের ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে দরজার কাছ হইতে উঁকি মারা ভিন্ন উপায় নাই। ঘরের ভিতর বড়বৌ ও তাহার ছোট ননদ রোগিনীর শুশ্রূষা করিতেছে।

মায়া এতদিন একলা দুইটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের কাজ চালাইয়াছে। আজ কিন্তু তাহার সব বল যেন লুপ্ত হইয়াছে। সকাল হইতে সে বিছানা ছাড়িয়া ওঠে নাই, বালিশে মুখ লুকাইয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছে। মায়ের অবস্থা বুঝিতে তাহার দেরি হয় নাই। জগতে এই মাতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া উঠিতেছিল। কোথায় যাইবে সে, কি হইবে তাহার? সব যে অচেনা, অজানা, কুয়াসাচ্ছন্ন। পিতাকে সে চেনে না, মায়ের কাছে তাঁহার যে বর্ণনা সে শিশুকাল হইতে পাইয়া আসিতেছে, তাহাতে তাঁহাকে ভয় না করিয়া সে থাকিতে পারে না। ভালবাসা দিয়া মনে মনে যে পিতার মূর্ত্তি সে সৃজন করিয়াছে, বাস্তবিক তিনি কি তাই, না একেবারে অন্য মানুষ?

ইন্দু আসিয়া একবার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "ওঠ রে মায়া, বেলা অনেক হল, স্নান করে দুটো মুখে কিছু দে।"

মায়া মাথা না তুলিয়াই বলিল, "আজ থাক্ না পিসিমা। উঠ্‌তে এখন একেবারে ইচ্ছে করছে না।"

ইন্দু আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, "না, মা, ওঠ, কিছু খেয়ে নাও। তারপর তোমার মায়ের কাছে যাও একটু। সকাল থেকে ত ও-ঘরে যাওনি একবারও।"

মায়া বলিল, "না পিসিমা, আমি আর ও-ঘরে যাব

না, মায়ের মুখের দিকে চাইলে আমার ভয় করে। তাঁকে আর চেনাই যায় না যে?"

ইন্দুর চোখও জলে ভরিয়া গেল। সে ভাঙা গলায় বলিল, "আজ অসুখটার একটু বাড়াবাড়ি যাচ্ছে কিনা, তাই চেহারা ও-রকম হয়েছে। আবার একটু কমার মুখে গেলেই যেমন চেহারা তেমনি হবে।"

মায়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা আর ভাল হবে না, পিসিমা। তোমরা আমায় ঠকাচ্ছ, আমি কিন্তু সব বুঝতে পেরেছি।"

ঘরের ভিতর সকলের চোখই সজল হইয়া উঠিল। ইন্দু তবু মায়াকে বৃথা সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "কি যে বলিস, পাগলি! কেন ভাল হবে না? নিশ্চয় ভাল হবে। নূতন ডাক্তার খুব ভাল, কত সাজ্যাতিক রোগ সে সারিয়েছে। তুই ওঠ, খা কিছু। স্নান না হয় নাই করলি।"

টানাটানিতে মায়া উঠিয়া বসিল। ইন্দু বামুন-ঠাকুরকে ভাত আনিতে আদেশ করিয়া, মায়ার রুক্ষ চুলের রাশ জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

একজন প্রতিবেশিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা, তোমার মেজদা আসবেন না নাকি?"

ইন্দু বলিল, "জাহাজে ত পরশু চড়েছে, এখনও এখানে এসে পৌঁছতে দু তিন দিন।"

প্রতিবেশিনী ঠোঁট উল্টাইয়া মাথা নাড়িলেন, অর্থাৎ তাহা হইলে আসা, না-আসা সমানই।

বামুন-ঠাকুর ভাত দিয়া গেল। মায়া উঠিয়া গিয়া আসনে বসিতেই একটি যুবতী অস্ফুটস্বরে ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারে কি বলে ইন্দুমাসী? কোনো ভরসা দিচ্ছে কি?"

ইন্দু বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িল। বলিল, "এখন ভগবানই ভরসা। ডাক্তারের সাধ্যের মধ্যে আর নেই।"

যুবতী বলিল, "আহা, কি বা বয়স! এই কি যাবার সময়? কোথায় মেয়ের বিয়ে দিয়ে কত সাধ আহ্লাদ করবে, না সংসারের মায়া কাটিয়ে চলল। আজকের রাত কাটবে ত মাসী?"

ইন্দু বলিল, "হরিই জানেন। ডাক্তারে ত কোনো ভরসা দিচ্ছে না। বৌয়ের চেহারা যা হয়েছে, তা থাকবার চেহারা না। এই বয়সেই যমের সঙ্গে খুব চেনা-শোনা হয়ে গেছে বাছা, তার ডাক এলে মুখে যে ছাপ দিয়ে যায়, ত ভুল করবার নয়।"

মায়া অন্ন দু এক গ্রাস মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িল। ইন্দু বলিল, "ও কি রে? ভাত ত সব ফেলে দিলি?"

মায়া বলিল, "আর পারছি না আমি, আমার গলায় যেন সব জড়িয়ে যাচ্ছে। ও-বেলা আর আমার জন্যে রেঁধো না, শুধু একটু দুধ খাব।"

ইন্দু বলিল, "যা একবার তোর মায়ের কাছে, যদি জ্ঞান হয়ে থাকে তোকে না দেখলে মনে কষ্ট পাবে।"

মায়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোগিনীর ঘরের দিকে চলিল। দরজার কাছে আসিয়াই দেখিল তাহার ছোট পিসি বাহির হইয়া আসিতেছে। উৎসুক ভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ ছোট পিসিমা, মা এখন কেমন আছে? ঘুমচ্ছে?"

ছোট পিসি বলিল, "একটু যেন ভালই বোধ হচ্ছে রে। জ্ঞান হবে বোধ হয়।"

মায়া একটু আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার জ্যাঠাইমা তখন পাখাখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "একটু বাতাস কর ত মায়া, আমি আসছি এখুনি।"

মায়া ভীতভাবে বলিল, "না জ্যাঠাইমা, আমি একলা এ ঘরে থাকতে পারব না: আমার ভয়ানক ভয় করে।"

তাহার জ্যাঠাইমা বলিলেন, "আরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি এসে পড়ব, কিসের এত ভয়? ছোট ঠাকুঝিও এখুনি আসবে।"

মায়া অগত্যা মায়ের মাথার পাশে বসিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট দুই পরে হঠাৎ রোগিনীর চোখ খুলিয়া গেল। এদিক ওদিক কিসের সন্ধানে যেন তাকাইয়া, মেয়েকে দেখিয়া বলিল, "মায়া, ওরা সব কোথায়?"

মায়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কারা মা? জ্যাঠাইমা?"

সাবিত্রী বলিল, "না রে। ঘরভরা লোক ছিল না?

আমি যেন দেখলাম, শাদা পোষাক পরা কত মানুষ, আলো-হাতে আমার বিছানার চারদিকে ঘুরছে। কেউ কি আসেনি?"

ভয়ে দুঃখে বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। তবু সে কোনোমতে বলিল, "ও-রকম কেউ ত আসেনি মা। শুধু জ্যাঠাইমা আর ছোটপিসিমা এ ঘরে ছিল।"

সাবিত্রী খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্ত তুলিয়া দেয়ালের গায়ে ঝোলান কৃষ্ণের পটখানি দেখাইয়া বলিল, "দেখ্ মায়া, তোকে ওঁর হাতে দিয়ে গেলাম। ঠাকুর কখনও মানুষকে ভোলেন না, কিন্তু তুইও যেন কখনও ভুলিস্ না। তোকে আর দেখবার কেউ রইল না। তুই আমার মেয়ে মনে রাখিস্। সব ছেড়েছিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িনি। তুইও যেন ছাড়িস্ না। তোর বাপ হয়ত জোর করবে, কিন্তু জোরের কাছে হার মানিস্ না।"

মায়া ইহার অর্দ্ধেক কথাও ভাল করিয়া বুঝিল কিনা সন্দেহ। তাহার দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। মায়ের বালিশে মাথা গুঁজিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো মাগো, তুমি আমায় ফেলে যেও না। আমি থাকতে পারব না।"

কান্নার শব্দে যে যেখানে ছিল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরঞ্জনের স্ত্রী তাড়াতাড়ি মায়াকে ঘর হইতে টানিয়া লইয়া গেলেন। বলিলেন, "কচ্ছিস্ কি রে? রোগীমানুষের ঘরে ওরকম করে কাঁদে?"

মায়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল, "ঠাকুর, মাকে ভাল করে দাও, আমার আর কেউ নেই। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

সাবিত্রীর জ্ঞান বেশ ফিরিয়া আসিয়াছিল, জা ননদ সকলকে চিনিতে পারিল, সকলের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। ইন্দু বলিল, "বৌ অত কথা বোলো না। দুর্ব্বল শরীর, কি হতে কি হয়ে বসবে।"

সাবিত্রী বলিল, "আর কথা বলবার সময় পাব কখন? তোমরা কি আমায় কচি খুকী পেয়েছ? নিজের অবস্থা আমি বুঝি না নাকি? এতদিন ভুগে, এতক্ষণ অজ্ঞান থেকে, হঠাৎ যখন জ্ঞান হয়েছে, তখন আর আশা নেই আমার। নিজের মাকে যেতে দেখেছি, শাশুড়ী ঠাকরুণকে যেতে দেখেছি। যাক্ গে, কাজ যা ছিল, করে ত যেতে পারলাম না। মেয়েটাকে তোমরা দেখো।"

ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাদের দেখতে হবে কেন বৌ? তার অমন বাপ, যে দুশো মানুষকে অন্ন দিচ্ছে সে কি আর নিজের মেয়েকে দেখবে না?"

সাবিত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তার দেখাকেই আমার ভয় গো, না-দেখাকে নয়। তোমার ভাইয়ের নামে তোমার কাছে আর কি বলব।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আমার বড় ট্রাঙ্কটার ভিতর সব গহনা আছে, আমার মেয়ের বিয়ের সময় দিও। বেনারসী শাড়ী দুখানা, অন্য সব কাপড়চোপড় যা আছে, তাও দিও। কেবল দুধে গরদের লাল পেড়ে শাড়ীখানা, ওটা আমার মায়ের পূজোর শাড়ী ছিল, ওখানা দিও না। আমায় যখন পাঠাবে, ঐ শাড়ী পরিয়ে দিও। টাকাকড়ি যা কিছু, তার কাগজ-পত্র ঐ হাতবাক্সের ভিতর আছে। তোমার ভাই এলে দিও, সে-ই ব্যবস্থা করবে। তারই টাকা মেয়ের বিয়ের জন্যে আমি জমিয়ে রেখেছিলাম।"

ইন্দু বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, সাবিত্রীর কথার কোনো উত্তর দিল না। খানিক পরে বড়বৌ আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিল।

ঘণ্টা খানিক কাটিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ সমস্ত বাড়ী যেন শিহরিয়া সজাগ হইয়া উঠিল। চেঁচামেচি, ছুটাছুটি লাগিয়া গেল। ডাক্তার আসিল, এবং মিনিট পাঁচ পরে মুখ কালি করিয়া রোগিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মায়াকে সকলে টানিয়া বিছানা হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিল। সে কিছুতেই উঠিল না। বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া বুকফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে ফেলিয়া সকলে ছুটিয়া গিয়া সাবিত্রীর ঘরের ভিতর দরজার সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু খাটের শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সাবিত্রীর দৃষ্টি একবার যেন তাহারই অন্বেষণে উপরে উঠিল, তাহার

পর একেবারে স্থির হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল।

(১২)

রেঙ্গুনের জাহাজ ধীরে ধীরে উটরাম ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যাত্রীর দল জিনিষপত্র গুছাইয়া, ডাঙায় নামিবার জন্ত সাজসজ্জা করিয়া ডেকের উপর আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি পরিচিত সৌধশ্রেণী, অতি পরিচিত পথঘাট, গড়ের মাঠ, সব ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

জাহাজ আরো কাছে আসিয়া পড়িল। যাত্রীদের অভ্যর্থনা করিতে ঘাটে লোকসমাগম হইয়াছে প্রচুর। প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রিয়জনটিকে বাছিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। শুধু চোখে দূরের মানুষের মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় না। যাহাদের কাছে দূরবীণ আছে, তাহারা দূরবীণ কষিয়া দেখিতেছে। অন্তরা ঝুঁকিয়া পড়িয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে যদি কাহাকেও চেনা যায়।

নিরঞ্জনও অন্ত সকল যাত্রীদের সঙ্গে ডেকে দাঁড়াইয়া কলিকাতার তীরভূমির দিকে চাহিয়া ছিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর পরে তিনি দেশে ফিরিতেছেন। আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে পাইবার আশায় তাঁহারও মনে একটু আনন্দের আভাস দেখা দিতেছিল, আবার পরক্ষণেই নিজের আগমনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া মনটা বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গিয়া কাহাকে কেমন দেখিবেন কে জানে? মায়া কি এখন তাঁহাকে চিনিতে পারিবে? এই অপরিচিত পিতা কি তাহার ভালবাসা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিবে? সে এখন কেমন হইয়াছে কে জানে? তাঁহার মনে যে অনিন্দ্যসুন্দর শিশুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার সহিত বেশী বিবাদ হইবে না ত?

জাহাজ আসিয়া ঘাটে ভিড়িয়া গেল। মিনিট কুড়ি পঁচিশ কেবল হৈ হৈ, রৈ রৈ, কুলির দৌড়, যাত্রীর চীৎকার, মাল ফেলার ধুপ ধাপ শব্দ। থার্ডক্লাশ যাত্রীর দল নামিয়া যাওয়ার পর একটু যেন কান পাতা গেল। তখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকলে ধীরেসুস্থে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া নামিতে আরম্ভ করিল। নিরঞ্জনের সঙ্গে জিনিষপত্র অতি অল্পই ছিল, সুতরাং নামিয়া পড়িতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হইল না।

মনোরঞ্জন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, তাহা জাহাজ হইতেই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। কাস্টম্‌সের কর্ম্মচারীদের মাল পরীক্ষা করার উৎপাতে তাহার আরো খানিক দেরি হইল। গেটের মুখেই দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল।

নিরঞ্জন ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সময়ে এসে পৌছতে পারিনি না? তোমার মুখ দেখে তাই যেন মনে হচ্ছে।"

মনোরঞ্জন বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "ঠিকই বুঝেছ। মেজ-বৌমাকে আমরা রাখতে পারিনি।"

নিরঞ্জন নীরব হইয়া গেলেন। ভিড় ঠেলিয়া, বাহিরে গিয়া মনোরঞ্জন একখানা ট্যাক্সি জোগাড় করিলেন। দুই ভাই উঠিয়া বসিবার পর নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে গেল?"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "তিন দিন হল।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিকিৎসার কোনো ত্রুটী হয়নি ত? টাকাকড়ির জন্যে আমাকে ইন্দু কিছুই লেখেনি, তবু আমি চারশ' টাকা ক'দিন আগে পাঠিয়েছিলাম।"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "জানই ত, তাঁর কি রকম জেদ ছিল। ডাক্তারী চিকিৎসা করতেই দেননি মোটে। হোমিওপ্যাথী ওষুধবিষুধ খাচ্ছিলেন। আমি খবর পেয়ে শেষ সময়ে যখন গিয়ে পড়লাম, তখন আর কিছু করবার ছিল না। তবু তখন ডাক্তার আনিয়েছিলাম। সে কিছু করে উঠতে পারল না। টাকাকড়ির অসুবিধা কিছু হয়নি সম্ভবতঃ, মেজবৌমা তোমার পাঠানো টাকার অনেকটাই জমিয়ে রেখে গেছেন শুনলাম।"

নিরঞ্জন মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া কোথায়? কেমন আছে?"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "এখানেই সব' 'পাঁচ দিনই সকলকে নিয়ে চলে এলাম, আর কি? বাড়ী এখন তালাবন্ধ, চাকর দুটো শুধু আছে। মায়া ভালই আছে শারীরিক, তবে তার মন বড় ভেঙে পড়েছে। মা ছাড়া কিছুই জানত না একেবারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি আসিয়া মনোরঞ্জনের গৃহের দ্বারে লাগিল। তিনি এখন স্বতন্ত্র বাড়ীতেই বাস করেন। শ্বশুর কয়েক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, তাঁহার নিজেরও প্র্যাক্‌টিশ কিছু বাড়িয়াছে। বাড়ীখানি বিশেষ বড় নয়, তবে ব্যবস্থা ভাল এবং হালফ্যাশানের।

দুই ভাই নামিয়া পড়িলেন। সদর দরজা খোলাই ছিল। একজন ভৃত্য বাহির হইয়া আসিয়া জিনিষপত্র নামাইতে প্রবৃত্ত হইল।

বড়বৌএর সঙ্গে ইন্দু নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নিরঞ্জনকে দেখিয়াই সে মুখে কাপড় চাপা দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বড়বৌ বলিলেন, "আহা, কি কর ঠাকুরঝি। এখন কেঁদে আর লাভ কি? এতটা পথ আসছে, এখন একটু সুস্থির হতে দাও। চল ঠাকুরপো উপরে।"

ইন্দু দাদাকে একটা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেই লাগিল। নিরঞ্জন তাহাকে শুদ্ধ ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ ঘরে কেহই কথাবার্ত্তা বলিল না। বড়বৌ অবশেষে বলিলেন, "মায়াকে নিয়ে আসি, ঠাকুরপো? বেচারী মা যাবার পর বড় কাতর হয়ে পড়েছে। এক মা ছাড়া কাউকে ত এতদিন জানেনি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নিয়ে এস।"

বড়বৌ বাহির হইয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে মায়াকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মায়া, তোর বাবাকে প্রণাম কর।"

মায়াকে দেখিয়া নিরঞ্জনের বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কি অপার দুঃখের ছায়া তাহার সজল চোখ দুটির মধ্যে, মুখের কি অসহায় ভাব! মেয়ে দেখিতে মায়ের মত সুন্দরীই হইয়াছে, বর্ণে, গঠনে, মুখশ্রীতে এ সেই কিশোরী সাবিত্রীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়—কিন্তু বড় যেন অনাদরে লালিত। লক্ষপতি পিতার একমাত্র সন্তান, তাহার এ দশা কেন? পরণে মোটা শাড়ী, ছেঁড়া সেমিজ, রুক্ষচুলের রাশ মুখের চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাতৃবিয়োগের তিন দিন পরে কেহ অবশ্য সাজিয়া গুজিয়া থাকে না, কিন্তু ইহাকে দেখিলে মনে হয় এই ভাবেই যেন সে সর্ব্বদা থাকে। হাতে দুগাছি অতি সরু রুলী ভিন্ন কোনো গহনাই তাহার নাই।

মায়া সাহেবী পোষাক পরা বাপের দিকে তাকাইয়া দেখিল। পিতার যে মূর্ত্তির ক্ষীণ স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, তাহার সঙ্গে একটু যেন সাদৃশ্য আছে। একটু আশ্বাস অনুভব করিয়া সে কম্পিত পদে নিরঞ্জনের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

নিরঞ্জন বালিকাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্নেহের স্পর্শে মায়ার চোখের জল আবার ফাটিয়া পড়িল। মা হারানোর দুঃখ যেন পিতাকে পাইয়া তাহার আরো বেশী করিয়া মনে পড়িয়া গেল। ইন্দু খানিক পরে তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, বলিল, "একটু শান্ত হ মায়া। আর কেঁদে কি হবে? তোর মা স্বর্গে গেছে, তার জন্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "থাক, থাক, নিয়ে যাবার দরকার নেই। কেঁদে মনটা একটু হাল্‌কা হতে দাও।"

মিনিট কয়েক পরে মায়া নিজে হইতেই উঠিয়া পাশের চেয়ারে বসিল। বড়বৌ তখন দেবরের স্নানাহারের জোগাড়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইন্দু মায়াকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আবার সকলে বসিবার ঘরে আসিয়া জুটিল। বড়বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরপো কি খুব শীগ্‌গিরই ফিরে যাবে নাকি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হ্যাঁ, এখন আর থাকবার দরকারও কিছু নেই। তোমাদের সঙ্গে দেখাও এখানেই হয়ে গেল, নইলে একবার দেশে যেতাম। যত দেরি করব, তত ওদিকে আমার কাজের ক্ষতি। তিন চার দিন পরেই ফিরব মনে করছি।"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "দেশের বাড়ীঘরের জমিজমার কি ব্যবস্থা হবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দিও। আমি আর কি বলব? বাড়ীটা বন্ধ থাকলে ত নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু থাকবার লোকও ত দেখছি না।"

চিত্তরঞ্জন বলিল, "পাড়াগাঁয়ে ভাড়াটে পাওয়া যায় না। তবে একঘর লোক থাকতে চাইছে দিদির কাছে শুনছিলাম। তাদেরই দিয়ে দাও না?"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, ঐ যে ঘোষাল-কাকার বোন নিস্তারিণী পিসি, বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী এসে পড়েছে। ঘোষাল-কাকা বৈ তাঁরও আর আপনার জন কেউ বড় নেই। তাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাইয়ের কাছেই থাকতে চান। কিন্তু ওদের বাড়ীতে ত তিল ফেলবার জায়গা নেই, তার উপর ঘোষালকাকার সঙ্গেও পিসির বিশেষ বনে না। তাই বলছিলেন বাড়ীটা যদি তাঁকে দেওয়া হয়, তাহলে বড় ভাল হয়। ভাড়া অবশ্য কিছু দিতে পারবেন না, তবে ঘরদোর খুব যত্নে থাকবে, গরুবাছুরগুলোও দেখবেন তিনিই। বাড়ীঘর যখন যা মেরামত করা দরকার হবে, তিনিই করাবেন। আমি ত বলি ভালই হয় দিলে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই দিয়ে দাও। পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হবে?"

বড়বৌ বলিলেন, "মায়া ত তোমার সঙ্গেই যাবে এবার?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যে ইন্দুকেও নিয়ে যাব ভাবছি।"

ইন্দু বলিল, "আমাকে আর কেন মেজদা? এতদিন ত তোমার সংসার আগলালাম, এখন আমায় ছুটি দাও। আমার আর মন টেঁকে না ঘরে, একটু তীর্থ করতে বেরব মনে করছি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তীর্থ ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না? গেলেই হবে এখন কিছু দিন পরে। এখন আপাততঃ আমার সঙ্গে চল্, তা না হলে ঐ টুকু মেয়ে একলা অচেনার মধ্যে থাকতে পারবে কি করে?"

মায়া ব্যগ্রভাবে পিসির মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সে কি বলে শুনিবার জন্যে। ইন্দু যখন বলিল, "আচ্ছা, তা না হয় মাস কয়েক থেকেই আসি," তখন যেন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বড়বৌ বলিলেন, "তা দু তিন দিন পরে যদি যাও, তাহলে এখন থেকে জোগাড় করতে হয়। মেয়ে এতদিন পাড়াগাঁয়ে ছিল, কাপড়চোপড় তেমন কিছুই নেই। সব ত করাতে হবে। ষ্টীমারে যাবে, জুতোমোজাও নেই, কিছু না। খানকয়েক ভাল শাড়ী মেজবৌএর বাক্সে আছে, কিন্তু সেমিজ পেটিকোট ব্লাউস্ সব করাতে হবে। জুতামোজা বোধ হয় এখন পরবে না, তা রেঙ্গুনে গিয়েই কিনো এখন। ষ্টীমারে খালি পায়ে খুবই অসুবিধা হবে, তা আর কি করা? ট্রাঙ্কও একটা কিনতে হবে। বিছানা ভালই আছে। শুধু একটা ভাল শতরঞ্চি কি হোল্ড্অল্ কিনে নিলেই হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সব আজই অর্ডার দিয়ে দাও। কিনবার জিনিষ যা কিছু তা আমি বিকেলে বেরিয়ে কিনে নিয়ে আসব। ইন্দুরও বোধ হয় কাপড়চোপড় দরকার হবে কিছু। অন্ততঃ গরম জামাটামা কয়েকটা ষ্টীমারের জন্যে ত লাগবেই।"

ইন্দু বলিল, "আমার ও সবে দরকার নেই বাপু, পরা অভ্যাসও নেই। র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দেব এখন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ও সব রাখ এখন। বৌদি, আপনার দরজী থাকে ত ডেকে পাঠান।"

বড়বৌ কন্যা জয়ন্তীর সন্ধানে চলিলেন। দরজী ডাকান, কাপড়চোপড়ের প্যাটার্ণ ঠিক করা, অর্ডার দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সেই তাঁহার সহায়। জয়ন্তী স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে, সে নিতান্ত একটা কেও কেটা নয়। মায়ার চেয়ে সে বছর দুইয়ের বড়।

জয়ন্তী আসিয়া বলিল, "দরজীকে আর ডাকতে হবে না, আজই সে আমার ব্লাউস নিয়ে আসবে। লোকটার খুব কথার ঠিক, যা বলে তা করে। তবে দুদিনে অত জিনিষ করে উঠতে পারবে কি না জানি না। কিছু কিছু রেডিমেড কিনে নিলে হয় না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তোমার দরজী না পারলে তাই নিতে হবে বৈকি?"

মায়া বসিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। এবার সে একেবারে অচেনার উদ্দেশে চলিল। দেশ নূতন, জীবনের ধারা নূতন, পরিবারপরিজন সবই নূতন। পিসিমাও ত তাহাকে রাখিয়া চলিয়া আসিবে। তখন কেমন করিয়া, কি ভাবে তাহার দিন কাটিবে কে জানে?

নিজের বিগত জীবনের জন্য তাহার মমতায় বুক টন্ টন্ করিতে লাগিল। সে জীবনকে ত সে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিল। কালে হয়ত অবজ্ঞাভরে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিবে। তাহার মা মরিবার সময় তাহাকে কত কি যে বলিয়া গিয়াছিল। সব কথা কি তাহার মনে আছে? সে কি সে-সব রক্ষা করিতে পারিবে? বাবা যদি বিরক্ত হন? যদি বারণ করেন? তাহার সাধ্য হইবে না, বাবার কথার উপর একটি কথা বলিতে। পিসিমা যদি থাকিত, তাহা হইলেও বা ভরসা ছিল। সে মায়ের মত অত গোঁড়া না হইলেও, হিন্দুরই মেয়ে ত? কিন্তু বাবার সঙ্গে একলাই সে থাকিবে, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই হয়ত তাহাকে করিতে হইবে।

এমন সময়ে পিসিমার একটা কথায় তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। ইন্দু বলিতেছিল, "একেবারে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে গেলে ভাল হত, ওখানে বিদেশ বিভূঁয়ে কি সুবিধা হবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা কিছু অসুবিধা নেই। ওখানেও দুর্গাবাড়ী আছে, পুকুর আছে, সবই আছে। হাজার হাজার বাঙালীর বাস ওখানে, সব কিছুরই ব্যবস্থা করা যাবে। গিয়েও পৌঁছবে সময় মত, কিন্তু শুক্রবারের ষ্টীমারটা ঠিক ধরা চাই। তা না হলে দেরি হয়ে যাবে।"

ইন্দু বলিল, "তুমি টিকিট কেন না, আমাদের জন্যে দেরি হবে না।"

নিরঞ্জন অবিলম্বে ষ্টীমার আপিসে একখানি কেবিনের জন্য চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ইন্দু খানিক পরে বলিল, "আর এক কথা, মেজদা। আমাকেও নিয়ে যেতে চাচ্ছ, কিন্তু হিন্দুঘরের বিধবার অনেক ঝঞ্ঝাট জান ত?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কোন্ ঝঞ্ঝাটের কথা বল্‌ছিস্? রান্নাবান্নার?"

ইন্দু বলিল, "রান্নাবান্না ত নিজেই করব, কিন্তু জলটল আনবার লোক ত চাই? তোমার চাকরবাকর কি সব?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বাঙালী চাকর একটা ঠিক করে রাখতে না হয় এখনই টেলিগ্রাম করছি। এখন যারা আছে সব মাদ্রাজী, নয় মুসলমান।"

বড়বৌ বলিলেন, "বিদেশে সবই চলে। আমাদের ইনি যে কিছুই মানেন না, তবু চাকরবাকর রাখার বেলা ভাল জাতের দেখেই ত রাখতে হয়। আত্মীয়-স্বজনের মুস্কিল না হলে।"

(ক্রমশঃ)

গেঁয়ো নদীর তীর

জসীম উদ্‌দীন

সেই এক গেঁয়ো নদী,—
গলা ধরি তার দুটি বাঁকা তীর হাসিতেছে নিরবধি!
কাশবন তার বেণী এলাইয়া রৌদ্র পোহায় হেসে,
তারি পাশে গেছে সরু পথখানি, ধানক্ষেত তার শেষে;
সেই ধানক্ষেত গিয়াছে চলিয়া নদীটির বরাবর;
কাঁচা পাকা ধান হেলিছে-দুলিছে তাহাতে করিয়া ভর;
সেইখান দিয়ে সে আসিত হেসে, হেরিতাম দূর হ'তে—
কমল-কুসুম ভাসিয়া আসিছে সবুজ গাঙের সোতে!

সেথা আমাদের কত কথা হ'ত একেবারে অবিরাম—
সময়েরে গেলে টেনে বড় করা—মোরা তাই করিতাম!
ওপারে ভাসায়ে সন্ধ্যা-কমল আহত দিনের খুনে,
দিগ্‌বালা তার বলয় ভাঙিত গাঁয়ে গাঁয়ে দীপ বুনে!
বৌরা যাইত ঘট লয়ে কাঁখে—গাঙ যেন ঘট ধরে—
তাহাদেরি সাথে বেড়াতে যাইত গেঁয়ো কৃষাণের ঘরে!
আজিকার দিনে ফিরে দাও সেই নদীটির তীর—
আমি ভুলে যাব যত হাসি-গান ধনজন ধরণীর!

ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

নাট্যশালায় নাটকাদির অভিনয় হয়। এখানে নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাব, ভাব, বিলাস প্রভৃতি চৌষট্টি কলার কয়েকটি কলা-শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশালায় এগুলির অনুশীলন হয়—রসাস্বাদন হয়। এখানে অভিনয় দেখিয়া লোকে আমোদ উপভোগ করে। অভিনেতারাও অভিনয় করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

নাট্যশালা আজকালকার তৈরী একটা নূতন জিনিস নয়। ইহা অতি প্রাচীনকালের সৃষ্টি। ভারত, গ্রীস ও রোম—এই তিন দেশেরই নাট্যশালা খুব পুরানো। চীন ও এসিয়া-মাইনরের নাট্যশালাও কমদিনের নয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নাট্যপদ্ধতির একটি গল্প আছে। ত্রেতাযুগে দেবতারা সকলে ব্রহ্মার নিকটে যান। তাঁহারা তাঁহার কাছে চক্ষু ও কর্ণের সমান প্রীতিপ্রদ কিছু প্রার্থনা করেন। এটি হইবে পঞ্চম বেদ। তবে এখানি চতুর্বেদের মত দ্বিজগণের একচেটিয়া হইতে পারিবে না; শূদ্রেরাও ইহার অধিকার পাইবে। ব্রহ্মা তখন কোমর বাঁধিলেন। আবৃত্তি করিবার মত ধাতু লইলেন ঋগ্বেদ হইতে—সামবেদ হইতে গানের উপযোগী অংশ; যজুর্বেদ হইতে লইলেন কুশীলব-কলা; আর রস-ভাব গ্রহণ করিলেন অথর্ববেদ হইতে। তারপর তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট কলাকে কাজে লাগাইবার জন্য ভরতকে উপদেশ দিয়া দিলেন। ব্রহ্মার এই অভিনব সৃষ্টি দেবতারা আনন্দে গ্রহণ করিলেন। এইবার নাট্যকলার রচনায় মহেশ্বর ও বিষ্ণুর পালা। শিব দিলেন তাঁর 'তাণ্ডবনৃত্য'। পার্ব্বতীও চুপ করিয়া রহিলেন না—তিনি তাঁর মৃদু নৃত্য 'লাস্য' প্রদান করিলেন। বিষ্ণু চারিটি নাটকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া নাট্যকলার প্রবর্ত্তন করিলেন। তখন ভরতের উপর ভার হইল—তিনি নাট্যশাস্ত্ররূপ এই দৈব পঞ্চমবেদ পৃথিবীতে লইয়া যান।

শকুন্তলা নাটকের দৃশ্য
(ভিটা মেডালিয়ন)

'সঙ্গীতদামোদরে' এই গল্পের একটু রকমফের আছে। এই গল্পে ব্রহ্মার নিকট দেবতারা যান নাই—ইন্দ্রই গিয়াছিলেন। গল্পাংশে অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই।

প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা নাট্যপদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। ভরতঋষি ব্রহ্মার প্রণালী অবলম্বন করিয়া বনে ঋষিদের শিক্ষা দেন, নাট্যশাস্ত্রও প্রণয়ন করেন। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় অভিনয় দেখাইবার জন্য তিনি উর্ব্বশী ও মেনকাকে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত শিক্ষা দেন। পৃথিবীতে ইনিই নাট্যের প্রথম স্থষ্টিকর্ত্তা। তাই নাটকের নাম "ভরত-স্থত্র," নটের নাম "ভরত-পুত্র"। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে নাট্যপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এই গ্রন্থ অভিনয়ের জন্য তিন রকমের নাট্যমণ্ডপের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"বিকৃষ্টচতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ"—২।৯

(১) 'বিকৃষ্ট'—চতুষ্কোণ (rectangular)

(২) চতুরস্র—সমচতুষ্কোণ (square)

(৩) ত্র্যস্র—ত্রিকোণ (triangular)

আর নাট্যমণ্ডপের পরিমাণও তিন রকমের—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

'তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্ ॥"
—২।৯

বিকৃষ্ট প্রেক্ষাগৃহ 'জ্যেষ্ঠ' ('জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ম্'—২।১৪)। এটি শুধু দেবতাদের জন্য নিরূপিত ('দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠম্'—২।১২)। এই প্রেক্ষাগৃহ দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত* ('অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠম্'—২।১১)। চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহ 'মধ্যম' ('চতুরস্রং তু মধ্যমম্'—২।১৪)। রাজারাজড়াদের জন্য এটি নির্দ্ধারিত ('নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ'—২।১২)। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত ('চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্'—২।১১)।

ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহ 'কনিষ্ঠ' ('কনীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রম্'—২।১৪)। ইহা সাধারণ লোকেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ('শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে'—২।১২)। এই প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবাহুর পরিমাণ ৩২ হাত ('কনীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে'—২।১১)।

লোকে সচরাচর দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও বিস্তারে ৩২ হাত নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করে। লম্বা চওড়ায় ইহার বেশী করা উচিত নয়; প্রেক্ষাগৃহের আয়তন ইহা অপেক্ষা বড় করিলে নাট্য অস্ফুট হইয়া পড়িবে। মণ্ডপ আরও বড় করিলে অভিনেতাদের আওয়াজ কিছুই শোনা যাইবে না, আর শোনা গেলেও শ্রোতাদের কাছে অভিনেতাদের স্বর বিস্বর বোধ হইবে। তা ছাড়া, অঙ্গভঙ্গী ও দৃষ্টি দ্বারা অভিনেতা যে-সকল লাস্যগত ভাব দর্শকদের দেখাইতে চেষ্টা করিবে, আয়তন অত্যন্ত বড় হওয়ায় দূরস্থ দর্শকদের নিকট সে-সমস্ত ভাব অস্পষ্ট, অব্যক্ত হইয়া পড়িবে; কাজেই প্রেক্ষাগৃহের আয়তন মধ্যম পরিমাণের হওয়া দরকার। আর তাহাতে 'পাঠ্য' ও গান ভালই শোনা যাইতে পারিবে।

তারপর ভরত রঙ্গপীঠ (stage) তৈরী করিবার বিধি করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"ভূমেবিভাগং পূর্বংতু পরীক্ষেত প্রয়োজকঃ।"
"ততো বাস্তু-প্রমাণেন প্রারভেত শুভেচ্ছয়া"
—২,২৭

প্রেক্ষাগৃহের ভূমিভাগ আগে পরীক্ষা করিয়া বাস্তুপ্রমাণ গৃহারম্ভ করা প্রয়োজন। নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবার উপযোগী ভূমি দেখিয়া তাহাতে নাট্যমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ ভূমি পাঁচ রকমের—সম, স্থির, কঠিন, কৃষ্ণ ও শ্বেত।

"সমা স্থিরা তু কঠিনা কৃষ্ণা গৌরী চ যা ভবেৎ।
ভূমিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।"
—২,২৮

তারপর ভূমিকে শোধন করিতে হইবে; লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিয়া অস্থি, কীলক, কপাল, তৃণ ও গুল্মাদি উৎসারিত করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। তারপর

"শোধয়িত্বা বসুমতীং প্রমাণং
নির্দ্দিশেত্ততঃ।"
—২,৩০

---

* আমরা সাধারণতঃ হাত বলিলে যাহা বুঝি তাহা ধরিলে চলিবে না। এ মাপকাঠি অন্য রকম। অণু, রজঃ, বাল, লিখ্যা, যুকা, অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড—এই কয়টি দিয়া মাপ করিবার নিয়ম।

১ দণ্ড=৪ হস্ত, ১ যব=৮ যুকা, ১ বাল=৮ রজঃ, ১ হস্ত=২৪ অঙ্গুল, ১ যুকা=৮ লিখ্যা, ১ রজঃ=৮ অণু, ১ অঙ্গুল=৮ যব, ১ লিখ্যা =৮ বাল।

ছেদ নাই এমন রজ্জু দিয়া বিশেষ সাবধান হইয়া ভূমি মাপ করিবার ব্যবস্থা। মাপ করিবার নিয়ম এই—

দড়ি দিয়া মাপিয়া ৬৪ হাত লম্বা জমি করিয়া লইতে হইবে। ইহাই হইবে মণ্ডপের দৈর্ঘ্য। তাহাকে আবার দুইভাগ করিতে হইবে। এই দুইভাগ করা ভাগের পিছনে যে ভাগ থাকিবে, তাহাকেও আধাআধি ভাগ করিতে হইবে। ইহারই একভাগে 'রঙ্গপীঠ' নির্ম্মাণ করা হইবে।

এইবার মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, শঙ্খাদির ধ্বনি করিয়া গৃহ-স্থাপন করা হয়। ইহার পর 'ভিত্তিকর্ম্ম'। ভিত্তিকর্ম্ম শেষ হইলে 'স্তম্ভস্থাপন'। শুভ সূর্য্যোদয়ে আচার্য্যের সাহায্যে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা উচিত। সেই রাত্রে 'বলির' ব্যবস্থা।

নাট্যশালা দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ দর্শকদের বসিবার জন্য, অপরভাগে রঙ্গ (stage)—এখানে অভিনয় হয়। দর্শকদের স্থান আবার স্তম্ভ দিয়া চিহ্নিত করা। সম্মুখে সাদা রঙের থাম—নাম ব্রাহ্মণ-স্তম্ভ—এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেহ বসিতে পারিবে না। তারপর ক্ষত্রিয়দের জন্য লাল রঙের থাম। উত্তর-পশ্চিমে হলদে রঙের স্তম্ভ—এখানে বৈশ্যেরা বসিবে। উত্তর-পূর্ব্বে নীলকৃষ্ণ স্তম্ভ। এটি শূদ্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

ব্রাহ্মণ-স্তম্ভের নীচে সোনা, ক্ষত্রিয়-স্তম্ভের নীচে তাঁবা, বৈশ্য-স্তম্ভের নীচে রূপা, আর শূদ্র-স্তম্ভের নীচে লোহা দিতে হইবে। কিন্তু সকল স্তম্ভের মূলে লোহা দেওয়া চাই-ই। তারপর রঙ্গপীঠ করিবার নিয়ম। বসিবার আসনগুলি কাঠের ও ইটের। এগুলি থাক্ থাক্ করিয়া সারি দিয়া সাজান থাকিত। সামনে রঙ্গের (stage) পাশে চারিটি স্তম্ভের উপর বারাণ্ডা- এটিও বোধ হয় সম্ভ্রান্ত দর্শকদের জন্য। দর্শকদের সম্মুখে রঙ্গ (stage) চিত্র ও মূর্ত্তি দিয়া সাজান। এটি একটি বর্গক্ষেত্র—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই ৮ হাত করিয়া। রঙ্গের শেষদিক্‌টার নাম—'রঙ্গশীর্ষ'। ইহাও নানা রকম মূর্ত্তি দিয়া সাজান। রঙ্গশীর্ষে ছয়টি কাঠের খুঁটি (স্থাণু) থাকা দরকার। এইখানে রঙ্গদেবতার পূজা হয়। রঙ্গশীর্ষের গর্ত্ত কালো রঙের মাটি দিয়া ভরাট করা। সেই মাটিতে কাঁকর বা ঢিলপাটকেল থাকিবার জো নাই।

রঙ্গপীঠ আদর্শতলবৎ করাই নিয়ম—কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত অথবা মৎস্যপৃষ্ঠাকার হইবে না। রঙ্গপীঠের উপর দিকে—মাথায় কতকগুলি রত্ন বসাইতে হয়। যেখানে বসাইতে হয় সেই স্থানের নাম 'রঙ্গশির'। ইহার পূর্ব্বদিকে হীরক, দক্ষিণে বৈদূর্য্য, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল, মধ্যে কনক দিতে হয়। এইরকম করিয়া রঙ্গশির তৈরী করিয়া তবে তাহাতে কাঠের কাজ করিতে হয়। কাঠের কাজকে 'দারুকর্ম্ম' বলা হইত। কাঠে নানারকম শিল্প-রচনা করিতে হইত। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু, অট্টালিকা, নানারকম পুতুল, বেদি, যন্ত্রজালগবাক্ষ, কুট্টিমের উপর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া কাঠের কাজ শেষ করা হইত।

রঙ্গের পিছনে 'যবনিকা'। এটি একটি রঙ্ করা পর্দ্দা। ইহার নাম 'পটি' বা 'অপটি'। আরও দুইটি নাম আছে, 'তিরস্করণী'—'প্রতিশিরা'। যখন একজন তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে, অপটি বেশ জোরে টানিয়া লওয়া হয়; ইহার নাম 'অপটিক্ষেপ'। যবনিকার রঙ্ সকল সময় লাল হইয়া থাকে। কোন কোন মতে যবনিকার রঙ্ প্রয়োজন অনুসারে নানা রকমের হইত। আদিরসে শুভ্র, বীররসে পীত, করুণরসে ধূম্র, অদ্ভুতরসে হরিৎ, হাস্যরসে বিচিত্র, ভয়ানক-রসে নীল, বীভৎস রসে ধূমল, ও রৌদ্ররসে রক্তবর্ণের ব্যবস্থা কেহ কেহ করিতেন। কিন্তু কোন মতে আবার যবনিকা সকলক্ষেত্রেই লাল। আজকাল অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে প্রতি অঙ্কের শেষে যবনিকা দিয়া রঙ্গের সম্মুখ ভাগ ঢাকিয়া রাখা হয়। পুরাকালে যবনিকা দুইভাগে বিভক্ত থাকিত; কোন ভূমিকায় অভিনেতার প্রবেশের সময় যবনিকার দুটি খণ্ড দুইটি সুন্দরী কুমারী দুই পাশ দিয়া গুটাইয়া লইত। এখনকার মত কপিকলের সাহায্যে ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেওয়া হইত না। এই সুন্দরীদ্বয়ের কাজ ছিল যবনিকা ধরিয়া থাকা। পর্দ্দার পিছনে 'নেপথ্য-গৃহ'। ইহা সাজঘর—অভিনেতাদের অধিকৃত। নেপথ্য-গৃহ হইতে দৈববাণীর ব্যবস্থা হয়। একসঙ্গে অনেকের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি প্রভৃতি এইখান হইতেই করা হইয়া

থাকে। যে সকল অভিনেতার রঙ্গে উপস্থিতি অসম্ভব অথবা অনভিপ্রেত তাহাদের কণ্ঠস্বর এইখান হইতেই উচ্চারিত হইত। নেপথ্য-গৃহের দুইটি পীঠদ্বার করিতে হয়। সাজঘর ও রঙ্গপীঠের মাঝখানে দুইটি দরজা দিয়া সাজঘর হইতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিতে হয়। নেপথ্য বলিতে যদি রঙ্গের অপেক্ষা উন্নত কোন স্থান কেহ বোঝেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। কেননা, ব্যুৎপত্তি অনুসারে (নি-পথ) নেপথ্য বলিতে নিম্নগামী পথই বোঝায়। নেপথ্য রঙ্গাপেক্ষা নিম্নভূমিতে অবস্থিত।

সাধারণতঃ নেপথ্য রঙ্গের কিছু উঁচু হয়। তাই অভিনেতাদের রঙ্গে প্রবেশ করার নাম 'রঙ্গাবতারণ'। রঙ্গাবতারণ বলিতে সহসা মনে হইতে পারে, যেন কোন উচ্চ স্থান হইতে রঙ্গে নামিয়া আসা হইয়াছে। এটি ভুল।

রঙ্গ হইতে নেপথ্যে যাইবার দুইটি দ্বার থাকিত। অর্কেষ্ট্রার স্থান এই দ্বারদ্বয়ের মধ্যেই ছিল।

"কার্য্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।" ২।৬৯

নাট্যমণ্ডপের আকার পর্ব্বতগুহার মত হইত; আর দোতলা (দ্বিভূমি) হইত। দোতলা হইবার সার্থকতা এই যে, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষের অভিনয় উপরের তলায়, আবার মর্ত্ত্যভূমির যা কিছু অভিনয় সমস্তই নীচের তলায় হইত। রঙ্গপীঠের বাতায়ন ছোট ছোট হইত। নহিলে বাদ্যযন্ত্র ও অভিনেতাদের 'গম্ভীরস্বরতা' নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। নিবাত ধীর শব্দ-স্থান হইতে স্বর গম্ভীরতর হইয়া বাহিরে শোনায়। কাজেই বাতাস বেশী চলা-ফেরা না করিতে পারে এইরূপ করিয়া জানালা তৈরী করা দরকার। প্রাচীর ভিত্তি শেষ হইলে 'ভিত্তিলেপ' (plastering) করা হইত। তারপর চুনকাম করাকে 'সুধাকর্ম্ম' বলিত। ভিত্তি বেশ সমানভাবে মাজাঘসা হইলে তাহাতে নানা রকমের চিত্র, লতাবন্ধ, স্ত্রীপুরুষ রচনা করা হইত।

নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণের এই গেল সাধারণ পদ্ধতি।

তারপর চতুরস্র মণ্ডপের বিশেষ লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চতুরস্রমণ্ডপ চার কোণা, আর চারিদিকেই ৩২ হাত। বাহিরের চারিদিকে ইটের দেওয়াল রচনা করিয়া, ঘিরিয়া, ভিতরে রঙ্গপীঠ নির্ম্মাণ করা হইত। রঙ্গপীঠের চারিদিকে দশটী স্তম্ভ থাকিত; এই স্তম্ভের বাহিরে দর্শকদিগের বসিবার জন্য আসন তৈরী করা হইত। আসনগুলির আকার হইত সিঁড়ির মত। এগুলি হয় কাঠের নয় ইটের। এক এক পঙ্‌ক্তি বা সারি অপর পঙ্‌ক্তির চেয়ে এক হাত উঁচু করিয়া সাজান হইত।

এই দশটি স্তম্ভ ছাড়া মণ্ডপের অন্যান্য দিকে আর দশটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইত। স্তম্ভগুলির উপর আট হাত পরিমাণ পীঠ নির্ম্মাণ করার রীতি ছিল। ঐ স্তম্ভগুলি শাল কাঠের তৈরী, আর সেগুলি স্ত্রীমূর্ত্তি দিয়া অলঙ্কৃত থাকিত। এই ছয়টি স্তম্ভের নাম—'ধারণী-ধারণ'। ইহার পর নেপথ্য-গৃহ। ইহাতে একটি মাত্র দ্বার। এ ছাড়া রঙ্গের দিকে আর একটা 'জনপ্রবেশন' দ্বার থাকিত। এই রঙ্গপীঠ সবসুদ্ধ আট হাত। ইহা চতুরস্র ও সমতল। ভিতরে একটা বেদিকা দিয়া সাজান থাকিত। তার পাশ দিয়া "মত্তবারণী" বাহির করা হইত। মত্তবারণী বেশ চিত্র করা বারাণ্ডা। বারাণ্ডা ধারণ করিবার জন্য চারিটি স্তম্ভের ব্যবস্থা থাকিত; ইহার পর রঙ্গশীর্ষ। ত্র্যস্রমণ্ডপ ত্রিকোণ। ইহার মাঝখানে ত্রিকোণ রঙ্গপীঠ। দরজাও ত্রিকোণ। রঙ্গপীঠের পিছনে আর একটি দরজা থাকিত। সম্মুখে ভিত্তির উপর স্তম্ভ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পর্ব্বতগুহাকারে নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইত। প্রাচীনকালে গুহা যে নাট্যশালার জন্য ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের রামগড়ের গুহালিপিতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, "প্রেক্ষাগৃহ" নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্ম্মিত ছিল। কখন কখন নাট্যাভিনয়ের জন্যই পৃথক্ গৃহের বন্দোবস্ত থাকিত। এরূপ ঘরের নাম ছিল "প্রেক্ষাগৃহ"। পালি সাহিত্যে ইহার নাম 'পেক্খ'। 'সমন্তপাসাদিকা' ও 'সুমঙ্গল-বিলাসিনী'তে প্রেক্ষা-গৃহ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৭৯২ সালে সরকার বাহাদুরের সুরগুজার উপর প্রথম নজর পড়ে। তখন হইতে উসলী, ডালটন, বল, বেগলার কানিংহ্যম প্রভৃতি অনেকেই সুরগুজায় রামগড় পাহাড় দেখিয়া বিবরণ প্রকাশ করেন। পরে ডক্টর ব্লখ সুরগুজায় রামগড় পাহাড়ে 'সীতাবেঙ্গরা' ও 'যোগীমারা' নামক দুইটি গুহার

ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। এ দুটি যে প্রেক্ষাগৃহ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নাট্যশালা যে পর্ব্বতগুহার আকৃতিবিশিষ্ট হইবে ইহার উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রেও আছে।

গুহাতে যে শুধু যোগীরা ধ্যানই করিতেন তাহা নয়; নাচগান আমোদের জন্য প্রাচীনকালে এগুলির যে ব্যবহার ছিল কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার সাহিত্যিক প্রমাণও আছে। অধ্যাপক লুডের্স্ কতকগুলি এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন (Indian Antiquary, ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ১৯৯-২৮০)। ঔরঙ্গাবাদে একটি বৌদ্ধ-গুহাতে একেবারে মন্দিরেই নাচের যে বন্দোবস্ত ছিল, পাশের ছবিটি দেখিলেই বেশ উপলব্ধি হইবে (Arch. Surv. Western India. Vol III, pl liv, fig 5)।

নাসিকেও এই-রকম নাচগানের জন্য ব্যবহৃত দুইটি গুহা আছে। আজও গুহা দুইটি দেখিলে দর্শকের চোখে

'কুদা'-গুহার একটি চিত্র
(৬নং গুহা)

নৃত্যগীতের দৃশ্য জীবন্তভাবে ফুটিয়া ওঠে। জুনাগড়ের উপরকোট গুহার দৃশ্য আমাদের এই কথাই সপ্রমাণ করিয়া দেয়। কুদা ও মহাড়ের গুহাতেও নাচগানের ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাহাই নয়, দেখা যায় এই গুহা দুইটির তিনধারে বসিবার আসনের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে এই গুহা দুইটি সম্ভবতঃ অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হইত (ফার্গুসন ও বর্জেস-সঙ্কলিত 'Cave Temples' pls iv, V, I; XIX, XXVI &c, এবং Arch.

মন্দিরে নৃত্য

Surv. Western India, Vol IV pls VII—X)। মথুরার একটি প্রাচীন শিলালিপিতে একজন গণিকার দানের একটা ফিরিস্তি আছে। এই গণিকার নাম 'নাদা'। নাদা শিলালিপিতে আপনাকে 'লেনশোভিকা

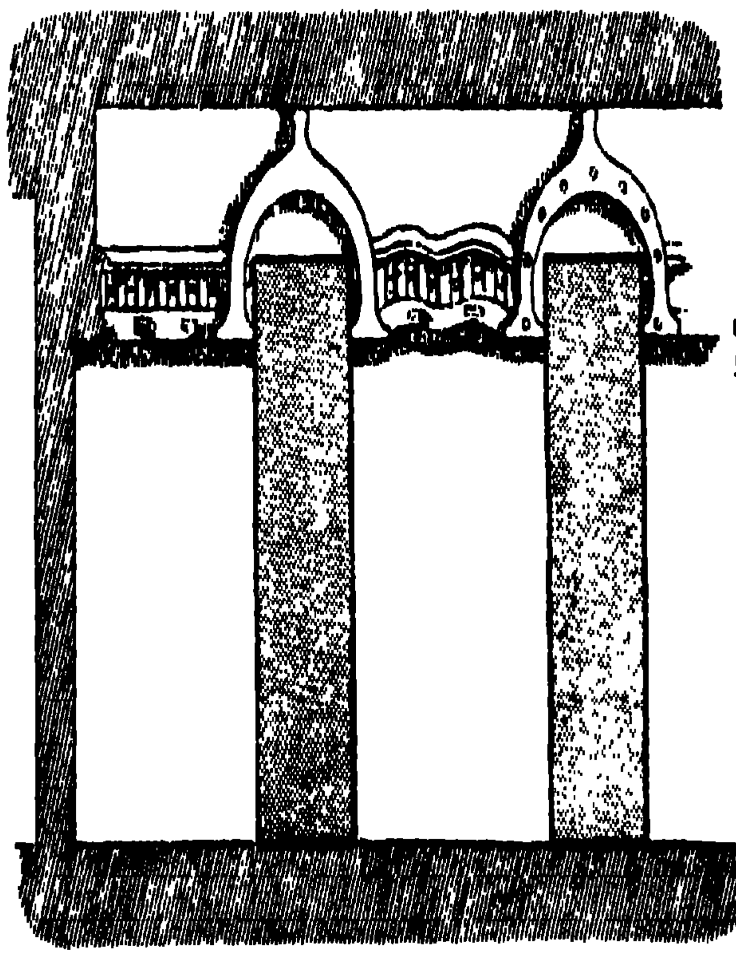

নাসিকের গুহা প্রাচীর—১৫নং গুহা

দন্দা'র কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'লেনশোভিকা' শব্দের অর্থ "গুহাভিনেত্রী"। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংশবধ' ও 'বলিবন্ধ' নাটকাভিনয়-প্রসঙ্গে—"যে অভিনয় করে" এই অর্থে 'শোভিকা' শব্দের উল্লেখ আছে, (পাণিনি ৩।১।২৬ ; বার্ত্তিক ১৫)। গুহাতে শুধু মুনিঋষিরা

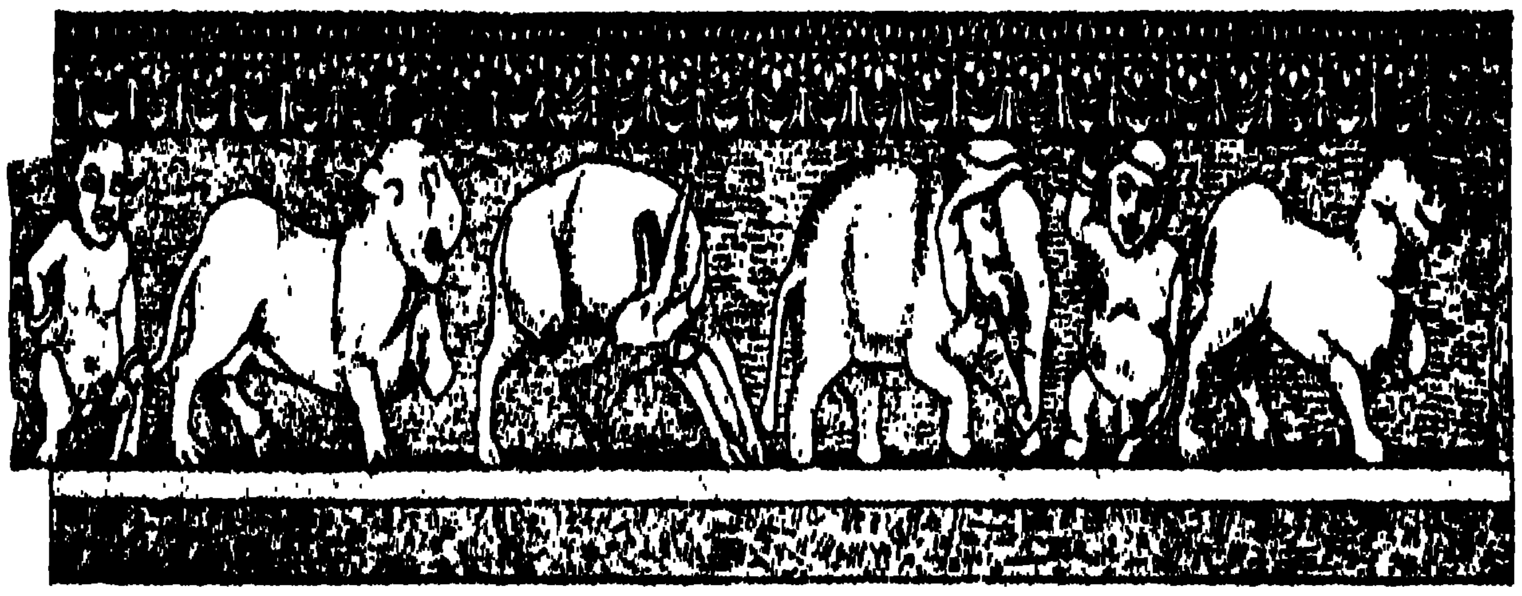

কুদা-গুহার নৃত্যশালার রেলিং
(৬নং গুহা)

:কিতেন না, গণিকারা, লেনশোভিকারা—আর তাহাদের গয়াস্পদেরাও থাকিত।

রামগড়ের গুহায় এইরূপ নাট্যশালার ব্যবস্থা আছে। কটা রীতি আছে যে, রঙ্গালয়ে যক্ষলিপি থাকিবে।

'কুদা'-গুহা আর একটি চিত্র
(৬নং গুহা)

:খানে সীতাবেঙ্গরা গুহাতেও একটি লিপি আছে। খুব :বতঃ তাহা যক্ষলিপি।

সীতাবেঙ্গরা গুহার প্রবেশ-পথের উত্তর পার্শ্বে গুহার দের ঠিক নীচেই একটি ক্ষোদ্ধিত লিপি আছে। লিপিটি :ত্র দুই ছত্র। প্রতি ছত্র তিন ফুট আট ইঞ্চি লম্বা।

এক একটি অক্ষর প্রায় ২॥ ইঞ্চি। দুইটি ছত্রেরই শেষের দিক্‌কার অক্ষরগুলি সিমেণ্টে বুজিয়া গিয়াছে।

ব্লখ সাহেবের ধৃত পাঠ এইরূপ—

১। অদিপয়ন্তি হদয়ং সভাব-গরু কবয়ো এরাতয়ং···

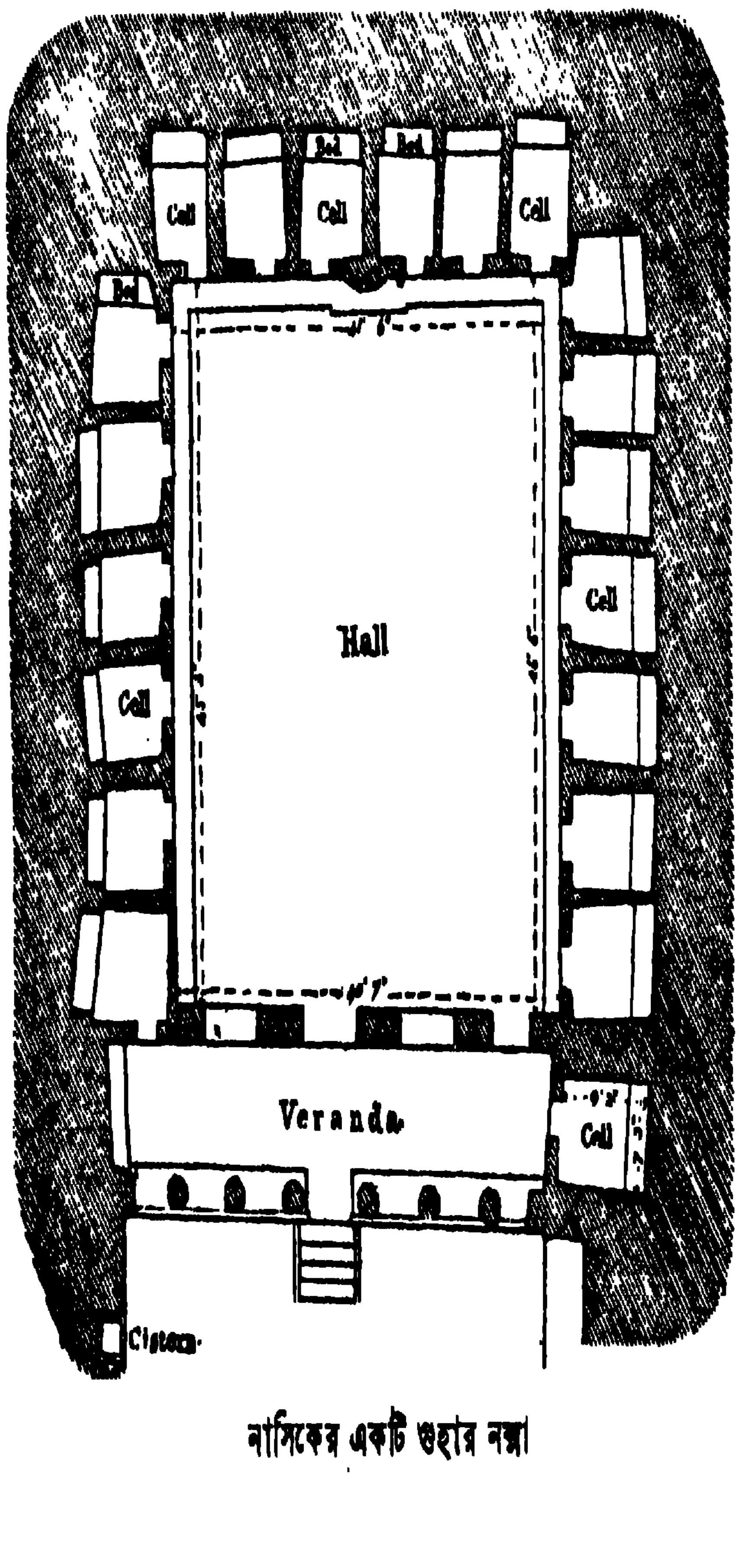

নাসিকের একটি গুহার নক্সা

২। দুলে বসংতিয়া হাসাবানুভূতে কুদস্ফতং এবং অলং গ [ত],

এই শ্লোকের তিনি যে তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহা এই—

"Poets Venerable by nature kindle' the heart, who..."

রামগড়ের নাট্যশালা

"At the swing festival of the vornal full moon, when frolics and music abound, people thus (?) tie (around their necks garlands) thick with jasmine flowers."

ইহার পর যোগীমারা গুহায় যে লিপি আছে ব্লখ তাহারও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠ এই—

(১) শুতনুক নম

(২) দেবদাশিক্যি

(৩) শুতনুক নম। দেবদাশিক্যি

(৪) তং কমম্বিথ বল ন শেয়ে

(৫) দেবদিনে নম। লুপদখে।

এই কথাগুলির ব্লখ সাহেবের অনুবাদ এইরূপ—

(1) "Sutanuka by name,

(2) "a Devadasi '

(3) "Sutanuka by name, a Devadasi.

(4) "The excellent among young men loved her

(5) "Devadinna by name, Skilled in Sculpture."

উপরে ব্লখ সাহেবের গৃহীত এই সকল লিপির প্রতিলিপি দেওয়া হইল :—

বোইয়ে (A. M. Boyer) কিন্তু উপরের দুইটি লিপির অন্যরূপ পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। অদিপয়ন্তি হৃদয়ং। স [ধা] ব গরক [१] বয়ো
এতি তয়ং···দুলে বসং তিয়া
হি সাবানুভূতে কুদস্ ততং এব অলং গ [তা]

২। সুতনুকা নম। দেবদাশিক্যি।
তং কমম্বিথ বলূ ন শেয়ে
দেবদিনে নম। লুপ দখে।

[Journal Asiatique, Xieme Ser, tom. II:
Pp 478]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশ

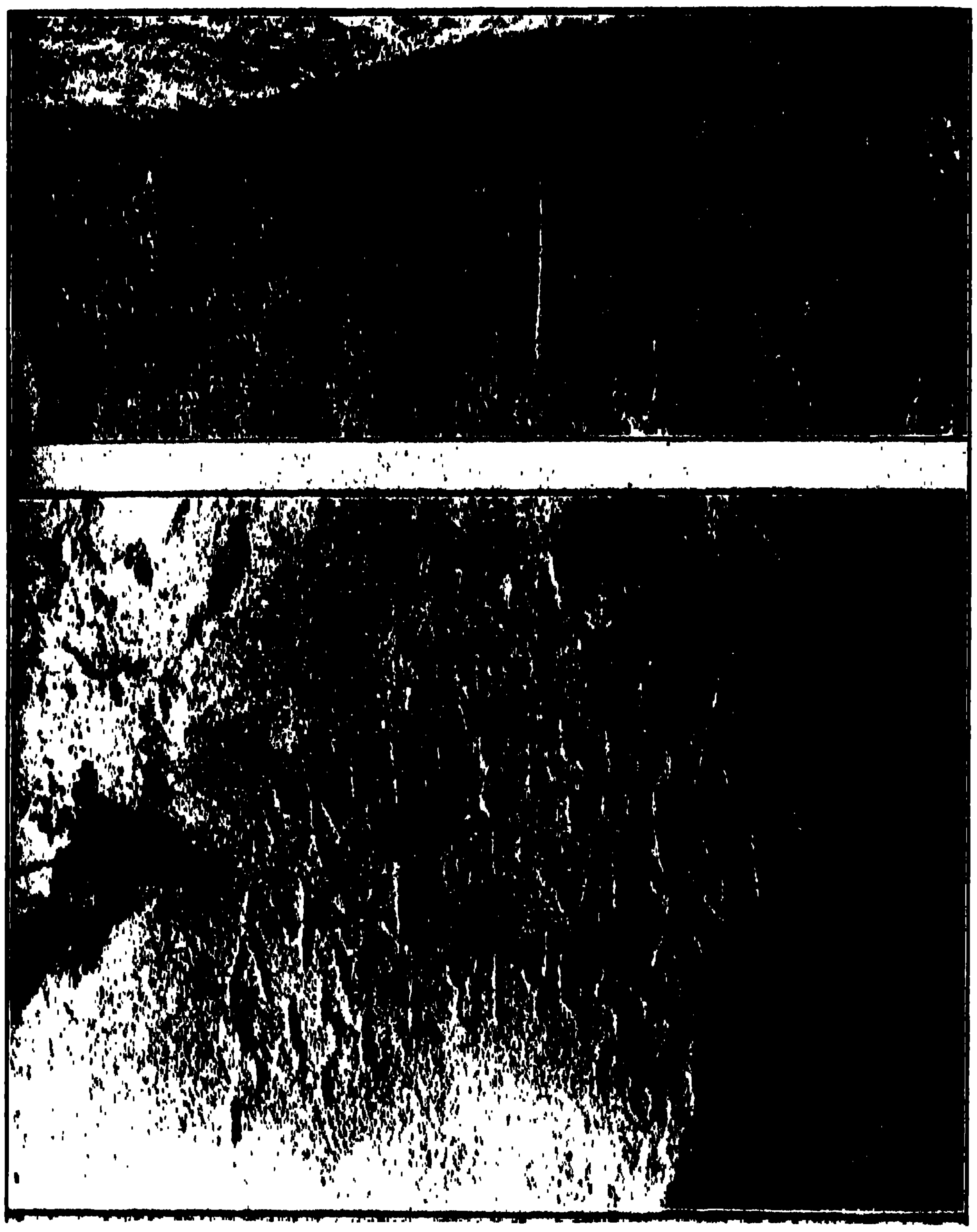

সীতাবেঙ্গরা ও যোগীমারা গুহার ক্ষোদিত লিপি

এ দুইটি লিপির পাঠ অন্যরূপ করিয়াছেন। যদিও তিনি তাঁহার পাঠ দেন নাই, কিন্তু যে অনুবাদ দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার পাঠ যে ভিন্ন তাহা বেশ ধরা যায়। নিম্নে তাঁহার কৃত অনুবাদ দিলাম।

প্রথম লিপির শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদ—

"I salute the beautifully-formed one who shows us the gods. I salute the beautiful form that leads us to the gods. He is much in quest at Varanasi. I salute the god-given one for seeing his beautiful form."

দ্বিতীয় লিপির অনুবাদ—

"The heart of a lady living at a distance (from her lover) is set to flames by the following three—Sadam, Bagara and the poet. For her this eave is excavated. Let the God of love look to it."

[J. A. S. B. Proceedings, 1902, pp. 90–91]

সীতাবেঙ্গরা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, সীতা দেবী এইখানে বাস করিতেন। সীতাবেঙ্গরা গুহা ভিতরের দিকে ছয় ফুট উচু। মাঝে মাঝে ছয় ফুটেরও কম। গুহার একেবারে ভিতরে দেয়ালের চারিপাশ উচু বেদি দিয়া ঘেরা। একটি বড় নালী ঐ বেদির নিম্ন দিয়া দেয়ালের দিকে চলিয়া গিয়াছে। মেঝের উপর কতকগুলি গর্ত্ত বেশ যত্ন সহকারে কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। গুহার ভিতরে প্রবেশের পথ ১৭ ফুট চওড়া। গুহাটি সর্ব্বসমেত ৪৪১ ফুট। মধ্যভাগে ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া, আর প্রায় ৬ ফুট উচ্চ। চারিদিকের দেয়াল কাটিয়া প্রস্তুত। দেয়ালের চারিদিকে পাথরকাটা উচু উচু মঞ্চাসন। তিনদিকে দুই সারি মঞ্চাসন। ভিতরের অংশ বাহিরের অংশের চেয়ে দুই ইঞ্চি উচু। যে দিক্‌টার

সম্মুখ প্রবেশ-পথের দিকে দুই সারি মঞ্চের (double bench) সেই দিক্‌টা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। প্রবেশপথের পশ্চাদ্ভাগের মঞ্চাসনগুলি অপেক্ষাকৃত নীচু; প্রাচীরের দিকে ছোট ছোট পাথর কাটা মঞ্চাসন আছে। এই প্রবন্ধের শেষে (পৃঃ ৯১৯) ব্লখপ্রদত্ত নক্সা দেওয়া গেল।

এই নক্সা হইতে ইহার অবিকল ধারণা না হইতে পারে। কিন্তু তিনি আর একটি যে চিত্র দিয়াছেন—তাহাতে চিত্র আরও সুস্পষ্ট। এই চিত্রটি ৯২০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

প্রথম চিত্রের নীচের দিকের শেষ রেখা মালভূমির প্রান্তদেশ নয়, এখানে জমি কিছু নামিয়া গিয়াছে। ব্লখ বলেন, এই ক্ষুদ্র পাথরকাটা ডিম্বাকার নাট্যশালার সম্মুখে রঙ্গপীঠ (stage) স্থাপনের জন্য প্রচুর স্থান আছে। আর মঞ্চাসনগুলিতেও পঞ্চাশ ষাটজন দর্শকের বসিবার

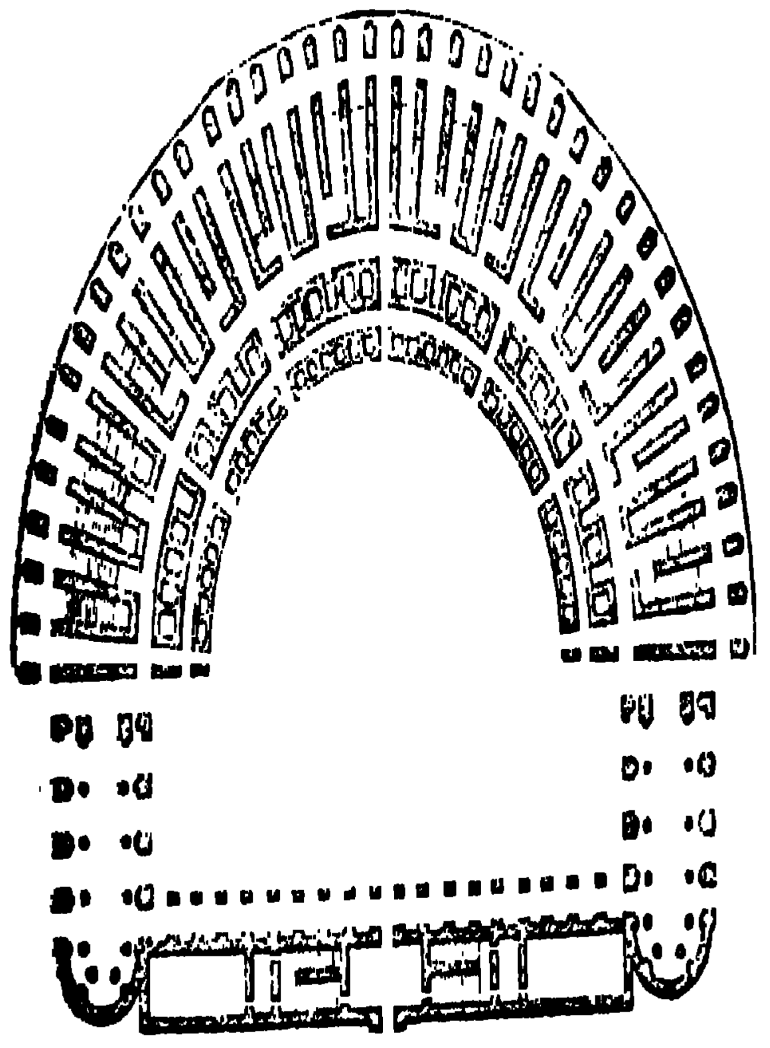

'মারসেলাস' থিয়েটারের নক্সা

জায়গা হয়। অভ্যন্তর দেশ ৪৬ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া একটি আয়তচতুরস্রাকৃতিবিশিষ্ট (oblong) স্থান। তিনদিকেই পাথরকাটা সুপ্রশস্ত বসিবার জায়গা; এগুলি ২। ফুট উচ্চ, ৭। ফুট প্রশস্ত; সম্মুখভাগ কয়েক ইঞ্চিমাত্র নীচু করিয়া আসনগুলি চাতালের আকৃতিবিশিষ্ট করা হইয়াছে। প্রবেশ-পথের নিকটস্থ ভূমি আসনের কোণের ভূমির চেয়ে কিছু নীচু।

১৯০৩-৪ সালের Arch. Surveyর Annual Reportএ (পৃঃ ১২৩—১৩১) ব্লখ সাহেব রামগড় নাট্যশালার সচিত্র বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান

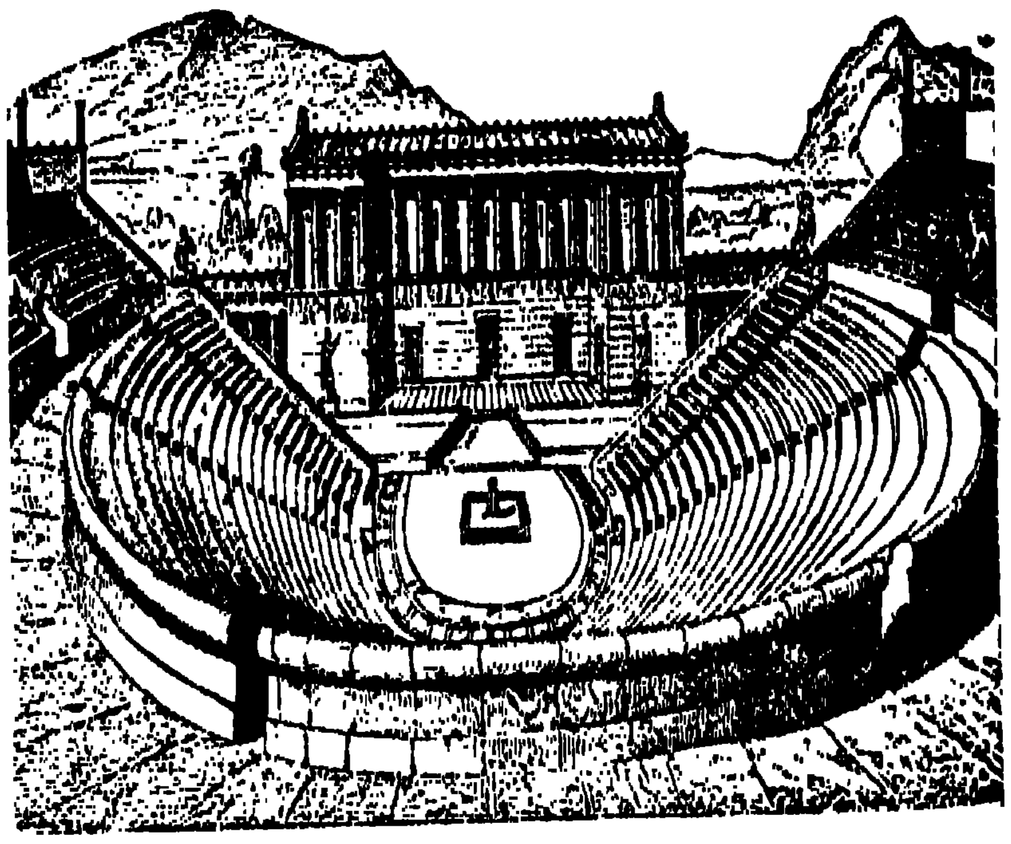

সেগেষ্টার ষ্ট্রাক (strack)—সংরক্ষিত

প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্র ও নক্সা ব্লখের এই বিবরণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। ব্লখ ১৯০৪ সালে ৩০এ এপ্রেল তারিখে রামগড়ের রঙ্গালয় সম্বন্ধে একখানি পত্র ভিণ্ডিশকে (E. Windisch) লেখেন। ইহাতে তিনি ভারত-নাট্যশালার গ্রীক প্রভাব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। পত্রখানি Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft নামক প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পত্রে (১৯০৪, পৃঃ ৪৫৫—৪৫৭) প্রকাশিত হয়। ভিণ্ডিশ নানা যুক্তিসহকারে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতীয় নাট্যশালার উৎপত্তি গ্রীক আদর্শ হইতে। কিন্তু তাঁহার যুক্তিতে সারবত্তা আদৌ নাই। ভারতীয়-নাট্যশালার গ্রীক সম্পর্ক প্রমাণিত করিতে হইলে প্রথমে গ্রীকদের নাট্যশালা সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা আপাততঃ গ্রীক ও রোমান নাট্যশালা সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন হিসাবে সামান্য কিছু বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বারান্তরে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পুরাতন গ্রীস ও রোমের দুইটি সাধারণ স্থান বড় প্রিয় ছিল—একটি মন্দির, অপরটি নাট্যশালা। এই দুইটি স্থানে গ্রীক ও রোমানদের দুই রকম ক্ষুধা মিটিত। প্রাচীন গ্রীক নাট্যশালার দুইটি ভাগ ছিল। একটি Orchestra, অপরটি Theatron (থিয়েটার)। নাট্যশালা তৈরী করিবার জন্য প্রায়ই পাহাড়ের ঢালু

জায়গা পছন্দ করা হইত। দর্শকদিগের বসিবার আসন পাহাড় কাটিয়া করা হইত। এই আসনগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিত। আসনগুলি এমনই করিয়া তৈরী যে, একটি আসনশ্রেণী আর একটির চেয়ে উঁচু। ইহাতে

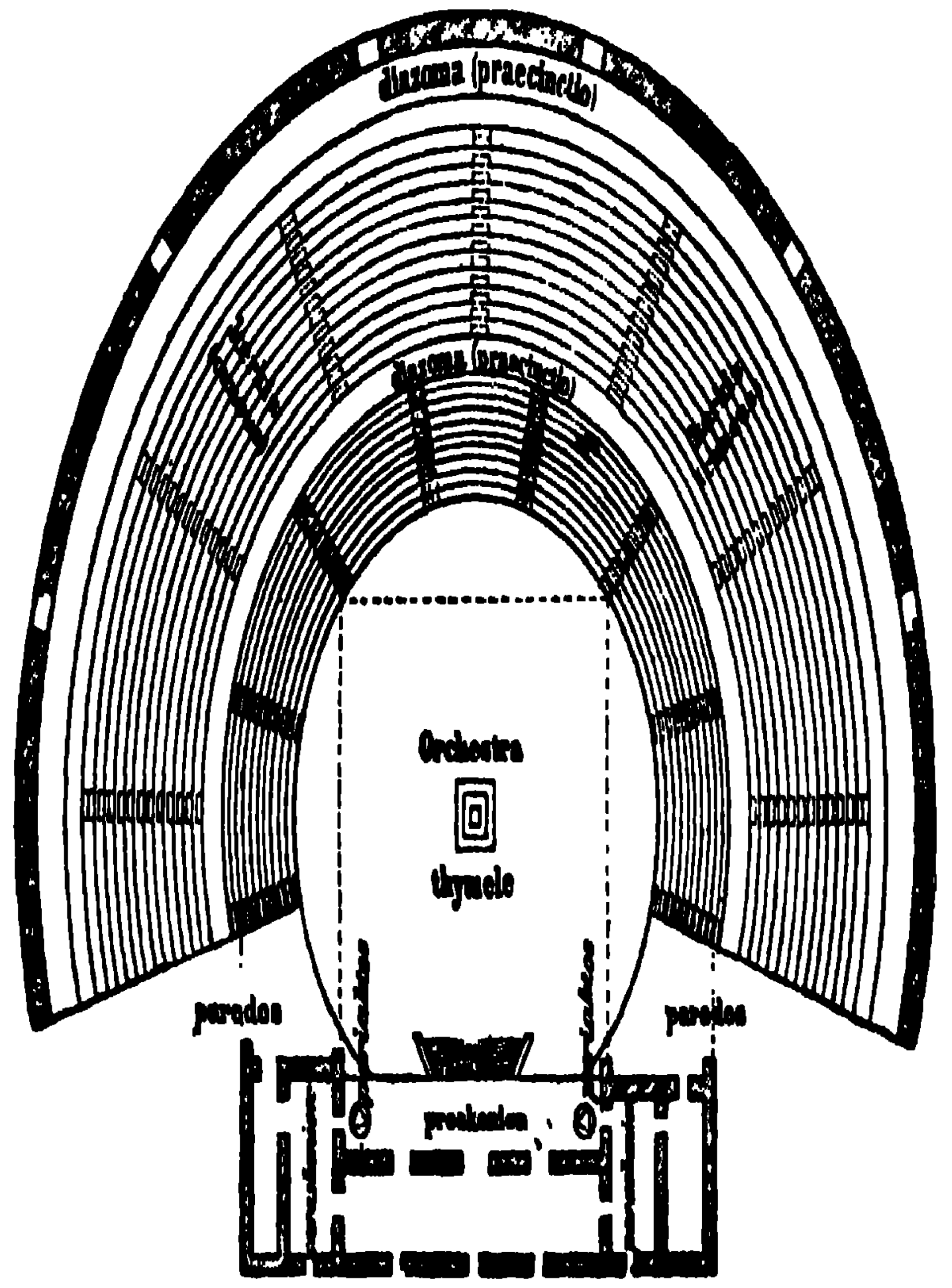

গ্রীক থিয়েটারের নক্‌সা

দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হইত। আসন-শ্রেণীগুলি কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ চক্রাকারে বাহিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক চক্রাংশের পরিমাণ একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের ১/৬ অংশ। এইগুলির মধ্যে মধ্যে আবার যাতায়াতের জন্য খানিকটা করিয়া জায়গা ফাঁক রাখা হইত। যাতায়াতের পথগুলির দুইপাশে বসিবার আসনগুলি (bench) পরস্পর সমান্তরাল রেখায় থাকিত। যখন রঙ্গালয়ে ভিড় হইত, দর্শকগণ অগত্যা যাতায়াতের পথগুলি অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতে বাধ্য হইত। সকলের নীচের বা সম্মুখের আসনশ্রেণী হইতে সকলের উঁচু বা একেবারে পিছনের আসনশ্রেণীর মাঝে মাঝে সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকিত। দর্শকদিগের এই বসিবার জায়গার সম্মুখেই একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্র থাকিত। ইহারই নাম Orchestra। এই জায়গাটি ঐক্যতান বাদন ও নৃত্য প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রটি তক্তা দিয়া ঢাকা; ইহার মধ্যস্থলে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর দেবতা Dionysusএর বেদির (thymele) স্থান। কখন কখন এটি আবার সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের নেতা, বংশীবাদক বা উত্তর সাধকের দ্বারা অধিকৃত হইত। Orchestraর পিছনেই নাট্যমঞ্চ বা Stage। এটি কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। সম্ভবতঃ বাদক-সম্প্রদায় Orchestra হইতে নাট্যমঞ্চে আরোহণ করিত। নাট্যমঞ্চের পিছনে কয়েকটি দ্বারযুক্ত একটি প্রাচীর থাকিত। ইহাকে তাহারা বলিত Skene (Lat. Scæna) এবং Orchestraর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম ছিল Proskenion (pros-cenium)। কথাবার্ত্তার সময় এইটি অভিনেতাদিগের দাঁড়াইবার স্থান। দৃশ্যপট বা Scene বলিতে যাহা বুঝায়, তখনকার থিয়েটারে সেরূপ কিছুই ছিল না। তবে যে স্থান সম্পর্কে অভিনয় চলিতেছে এইটুকু নির্দ্দেশ করিবার জন্য তখনকার Scænaকে চিত্র-বিচিত্র করা হইত। নাট্যশালার কোন অংশ ছাদ দিয়া আচ্ছাদিত ছিল না। কাজেই অভিনয়ের সময় বৃষ্টি হইলে দর্শকদিগকে বাধ্য হইয়া নাট্যশালার চারিপাশের বারান্দার নিম্নে আশ্রয় লইতে হইত। অভিনয় প্রায় দিনের বেলাই হইত। সুতরাং রৌদ্র-নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে চাঁদোয়ার ব্যবস্থা থাকিত। গ্রীক থিয়েটারের নির্ম্মাণ-পদ্ধতির একটি বিশেষ দোষ ছিল। দর্শকদিগের মধ্যে যাহাদের সকলের পিছনে বসিতে হইত, তাহারা সম্মুখের কিছুই দেখিতে পাইত না। তাহাদের নজর নাট্যমঞ্চের পাশের দিকে পড়িত। গ্রীক নাট্যশালাগুলি খুব বড় ছিল। এত বড় করিবার উদ্দেশ্য সহরের সমগ্র অধিবাসীকে একসঙ্গে অভিনয় দেখিবার সুযোগ দেওয়া। বিরাট্ নাট্যশালায় বহুলোকের স্থান সঙ্কুলান হইত বটে, কিন্তু অতি অল্পলোকই অভিনেতাদের কথা শুনিতে বা তাহাদের মুখের ভাবভঙ্গী সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত। অনেককেই এ সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইত। তবে

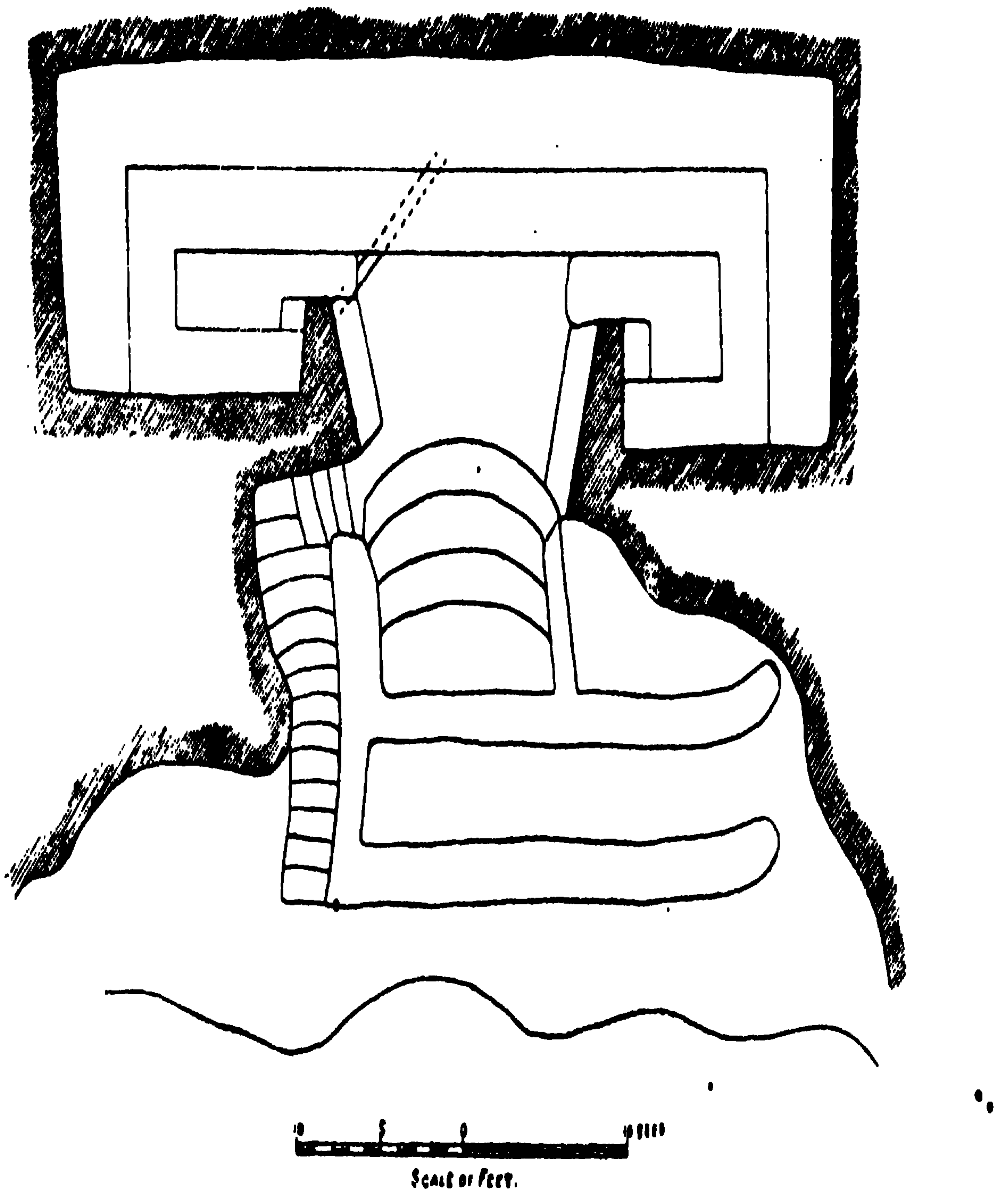

তাহাদের নাট্যশালার এই সমস্ত ত্রুটি আমাদের যতটা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় ততটা বোধ হইত না। ইহার কারণ এই যে, আমরা নাট্যকে এখন যেভাবে বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহারা তখন সেভাবে বুঝিতে অভ্যস্ত ছিল না। প্রাচীনকালের অভিনেতৃবর্গ ধাতু-নির্ম্মিত এক রকম মুখোস পরিত; এটি প্রকারান্তরে Speaking trumpet এর কাজ করিত। অত্যন্ত দূরের দর্শকগণ অত্যন্ত ছোট দেখিবে বলিয়া, একটু বড় দেখাইবার জন্য তাহারা খুব উঁচু গোড়ালীওয়ালা জুতা পায়ে দিয়া শরীরটাও padএর সাহায্যে বৃহৎ করিয়া নাট্যমঞ্চে নামিত।

আধুনিক থিয়েটারের পূর্ব্বাবস্থায় যেমন সকল অভিনেতাই পুরুষ ছিল, গ্রীক থিয়েটারেও সেইরূপ অভিনয় কেবল পুরুষেই করিত। স্ত্রীলোকেরা তখন থিয়েটার দর্শনে বঞ্চিত ছিল; তবে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইবার বাধা ছিল না। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চাশ শতকে তাহারা পৃথক্ স্থানে বসিয়া অভিনয় দেখিত।

অভিনয় প্রাতঃকালেই আরম্ভ হইত। পর পর দুই-তিনটি নাটকের অভিনয় হইত। শেষে একটা প্রহসন হইয়া অভিনয় শেষ হইয়া যাইত। পূরা অভিনয় শেষ হইতে দশ বার ঘণ্টা লাগিত।

সম্মুখের আসন-শ্রেণীতে কেবল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, পুরোহিত ও রাজদূতেরাই বসিতে পাইত। যাহারা বেশী পয়সা খরচ করিতে পারিত, তাহারাই অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে বসিবার অধিকারী হইত। কিন্তু পেরিক্লিসের সময় হইতে গরীবেরা বিনা খরচে থিয়েটার দেখিতে পাইত। সাধারণ কোষাগার হইতে তাহাদের খরচ যোগান হইত। শেষে নগরবাসী সকলেই সেই সুবিধা ভোগ করিয়াছিল।

প্রায় ৪২৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে এথেন্স্ নগরে প্রথম পাথরের থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। ইহার পর হইতে চারিদিকে থিয়েটারের ধুম লাগিয়া গেল। গ্রীস, এসিয়া-মাইনর এবং সিসিলির সকল নাট্যশালাই এথেন্সের নাট্যশালার

অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। তবে এইগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছিল।

রোমে ২৪০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঠিক অভিনয় হয় নাই। এই সময় একটি কাঠের রঙ্গমঞ্চও তৈরী হয়। প্রত্যেকবার অভিনয়ের পরে আবার সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত। ১৯৪ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের সেনেটররা নাট্যমঞ্চের পরেই বসিতে পাইত। কিন্তু তাহাদের নিরূপিত কোন আসন ছিল না। যাহাদের বসিবার দরকার হইত তাহারা নিজেদের চেয়ার আনিত। কখন কখন সরকারের হুকুমে বসিয়া অভিনয় দেখা বন্ধ হইত। ১৫৪ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট আসনযুক্ত স্থায়ী থিয়েটার করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু সেনেটের আদেশে থিয়েটার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। ১৪৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে গ্রীস-বিজয়ের পর গ্রীকদের অনুকরণে থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। এগুলিও কাঠের। একবারের বেশী তাহাতে অভিনয় হইত না। পাথরের তৈরী প্রথম রোমান থিয়েটার ৫৪ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে হয়। Pompey এই থিয়েটার করেন। ১৭,৫০০ বসিবার আসন ইহাতে ছিল।

১৩ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে আগস্টস (Augustus) তাঁহার ভাইপো মারসেলাসের (Marcellus) নামে একটি থিয়েটার করেন। এই থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান।........

গ্রীক ও রোমান থিয়েটারে সাদৃশ্যও যেমন ছিল, পার্থক্যও তেমনই ছিল।

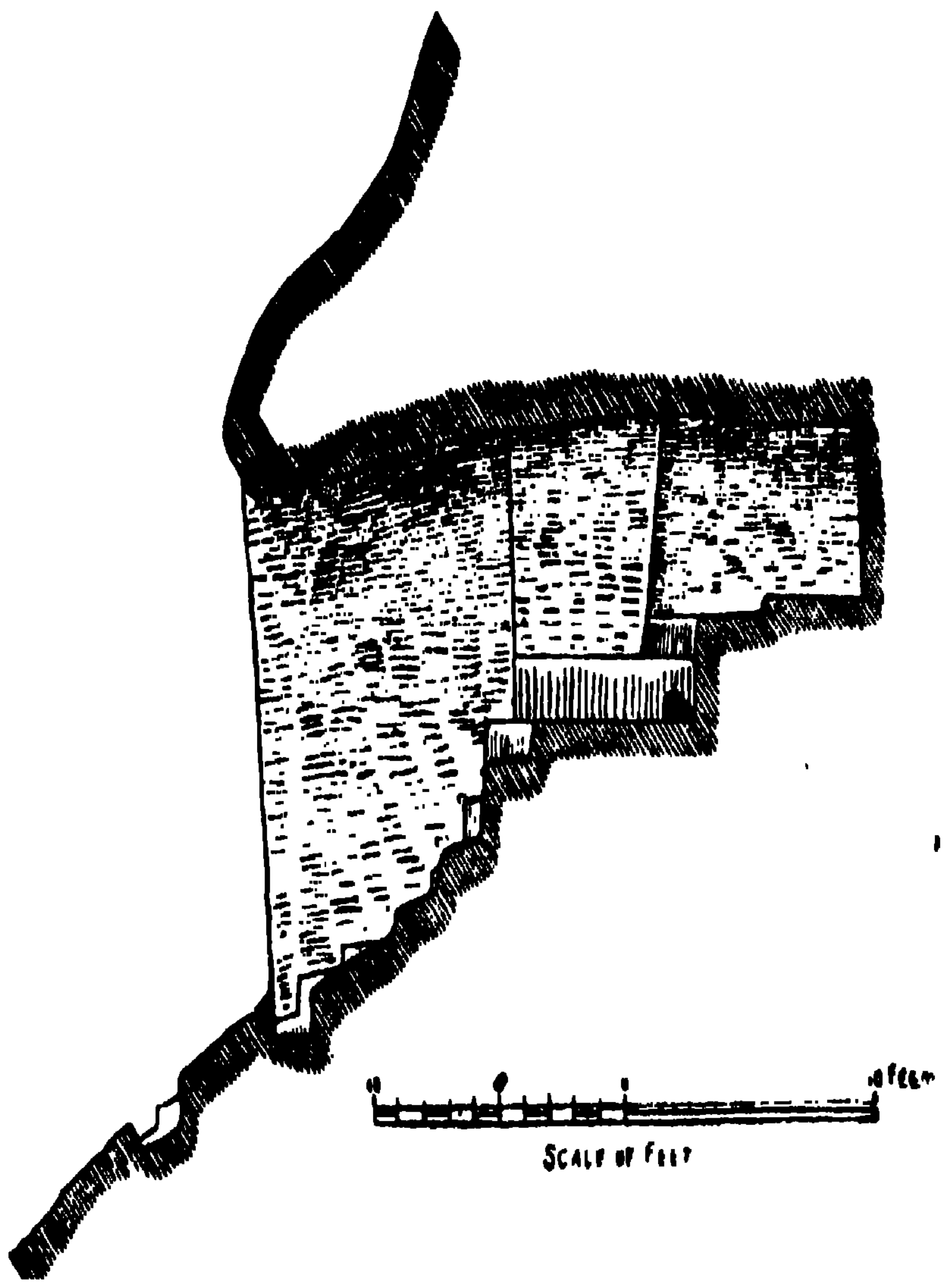

পার্থক্য ছিল দর্শকদিগের স্থান লইয়া। গ্রীকদের মতন এটিও সমান্তরাল পথ ও সিঁড়ি দিয়া বিভক্ত ছিল। তবে এই ভাগগুলি সমানভাবে গ্রীকদের মত ছিল না, ছিল অর্দ্ধবৃত্তাকারে। আর ইহার ব্যাসের শেষে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের প্রাচীর ছিল। গ্রীকরা অর্দ্ধবৃত্তের অপেক্ষা বড় করিয়া এইটিকে তৈরী করিত। রোমানদের থিয়েটারের সর্ব্বোচ্চতলের স্তম্ভগুলির আবরণের উচ্চতা সমান ছিল।

বৃকোদর

যবদ্বীপের ছায়ানাট্যের মূর্ত্তি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

ভারতীয় চিত্রকলা ও কাষ্ঠ-খোদন পদ্ধতি

শ্রী:কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্কনের প্রথম দিকের ইতিহাসে দেখা যায় যে, আলেখ্যকারী প্রথমে কেবলমাত্র রেখাপাত ও রেখা সন্নিবেশ দ্বারা কোনও বাস্তব বা কাল্পনিক পদার্থের বা বিষয়ের প্রতিরূপ রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। পরে বর্ণ-প্রয়োগ দ্বারা তাহার রূপবৃদ্ধি বা তাহাতে বাস্তবতার অনুভূতি আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর যুগে যুগে,

সাওতাল কুটীর

ললিতকলার উৎকর্ষের সহিত চিত্রাঙ্কনের নানারূপ পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। রেখা-আলেখ্য, বর্ণরঞ্জিত রেখাঙ্কন, বর্ণচ্ছায়া সমাবেশে চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি বিভিন্নরূপ পদ্ধতি এখন প্রচলিত এবং প্রত্যেকটিই ললিতকলার ক্ষেত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষলাভ করিতেছে।

মনুষ্য সাধারণের চিত্রের সৌন্দর্য্য অনুভব করার ক্ষমতাও যুগে যুগে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বোধ হয় মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতি এ বিষয়ে যতটা সাহায্য করিয়াছে অন্য কিছুই ততটা করে নাই।

কোনও কোনও প্রসিদ্ধ চিত্রের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে আসল চিত্রখানি দেখিয়া আসা সম্ভব হয় না। কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে এই বাধা কতক পরিমাণে লাঘব হয়।

চিত্রের প্রতিরূপ মুদ্রণ প্রথমে খোদিত কাষ্ঠফলক হইতেই হয়।

পরে আলোকচিত্রের সাহায্যে "হাফটোন" ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ও সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় কাষ্ঠফলক খোদন পদ্ধতি ধীরে ধীরে ব্যবসায়ক্ষেত্র * হইতে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কয়েকটি মৌলিক গুণের জন্য এই পদ্ধতি এখন ললিতকলার ক্ষেত্রে অন্যান্য চিত্রাঙ্কন রীতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে।'

শান্তিনিকেতনের তরুবীথি

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি দ্বারা বহুসংখ্যক প্রতিরূপে চিত্রকরের আলেখ্যের মৌলিকতা অবিকৃতভাবে পাওয়া

---

* প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৪, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিত "আধুনিক কাঠ খোদাই চিত্র" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যায়, যদি চিত্রকর স্বয়ং কাষ্ঠফলক খোদন করেন। যদি মুদ্রণও তাঁহারই হাতে হয় তবে সে মৌলিকত্ব আরও বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে আলোক ও ছায়ার সমাবেশে রেখাঙ্কন বিশেষভাবে সৌন্দর্য্যযুক্ত হয়। সাধারণ রেখাঙ্কনের সৌন্দর্য্য সচরাচর রেখার লালিত্য ও বিষয়ের নিজস্ব শোভার উপরই নির্ভর করে।

এই পদ্ধতির আর একটি গুণ এই যে, কাষ্ঠফলকের স্বাভাবিক দানা (grain) মুদ্রিত চিত্রের জমীতে একটি নূতন ভাব দেয়।

কলিকাতার গলি

আমাদের দেশে এই শিল্প বহু প্রাচীন। বৃন্দাবন, কালিঘাট, পুরী ইত্যাদি তীর্থে যে ছাপা নামাবলী কাপড় ইত্যাদি বিক্রয় হয় সে-সবই এইরূপ কাষ্ঠফলক হইতে মুদ্রিত। কিন্তু কাগজের উপরের চিত্র মুদ্রণে এই পদ্ধতির ব্যবহার এদেশে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি হাফটোন ও ঐ জাতীয় নূতন প্রথার চলনে কাষ্ঠ-খোদন পদ্ধতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

পল্লীগৃহ

সুখের বিষয় এদেশে ললিতকলা সম্বন্ধে নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নানা শিল্পকলা বিষয়ে অনেকে নূতন প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। কয়েকজন চিত্রশিল্পী সম্প্রতি এই দেশে এই প্রাচীন চিত্রকলা পদ্ধতির অনুশীলন করিয়াছেন।

বোলপুর শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও তাঁহার দু'একজন ছাত্র এই পদ্ধতির বিশেষ চর্চ্চা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (অধুনা কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষক) এই ছাত্রবর্গের অন্যতম। ইনি অনেক দিন যাবৎ এই রীতিতে চিত্রাঙ্কন করিতেছেন।

ইঁহার চিত্রে আমরা এদেশেরই নানা দৃশ্যের ভারতীয় চিত্রকলার দর্পণে প্রতিফলিত রূপ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার কয়েকটি ছবির লাইন-ব্লক দেওয়া গেল। সে সকল হইতে পাঠক ইঁহার আলেখ্যের কিছু পরিচয় পাইবেন।

শান্তিনিকেতনের তরুবীথি, গ্রামের হাটতলা আমাদের অনেকেরই কাছে সুপরিচিত; কিন্তু যে আলো ও ছায়ার সমাবেশ আমাদের চক্ষে নিমেষের জন্য শোভন রূপে দেখা দিয়াছিল, শিল্পীর দৃষ্টি ও শিল্পীর

যমুনাতীরের আশ্রম

আলমোড়া

ঢেঁকীশালে

কৌশলে আমরা তাহার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিবার সুযোগ পাইতেছি।

কলিকাতার বা পুরাতন লক্ষ্ণৌয়ের গলি সাধারণের চক্ষে কেবলমাত্র বীভৎস রসের সঞ্চার করে, চিত্রকরের রেখা-পাতে তাহার মধ্যে যেটুকু সুন্দর তাহাই কেবল আসে, সুতরাং আমরা তাহা নূতন চক্ষে দেখিতে পাই। কাষ্ঠ-খোদন পদ্ধতিতে চিত্রকরের নৈপুণ্য প্রধানতঃ আলোকিত (সাদা) অংশের প্রসারণে ও সঙ্কোচনে, এখানে প্রসারণের দরুণ ঐ গলিতে আলোকের অংশ অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হওয়ায় তাহার রেখাগুলির শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার আলমোড়ার ছবিতে ছায়ার অংশ নিবিড় হওয়ায় আমরা পাহাড়ের ঘন সংহতির ভাব, ও পাহাড়ের কোলের পথের সঙ্কীর্ণতা এবং পথের ধারে গৃহ-সকলের ঘন সন্নিবেশের একটা আভাস পাই।

এইরূপ চিত্রাঙ্কনের চিত্রশোভা বা অলঙ্কার হিসাবে মূল্য যে কতটা তাহা পাঠক যমুনাতীরের আশ্রমের চিত্রে, হিমালয়ের পথে চটি ও হিমালয়ে সাধুর নিবাসের চিত্রে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পল্লীগ্রামের চিত্রাবলীর যে কয়খানি এখানে প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে রমেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি, রেখাঙ্কনের নৈপুণ্য এবং আলো ও ছায়ার সমাবেশের কৌশল—এই তিনটিরই বেশ সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার অনেকাংশ ইংরাজীতে

গ্রামের হাটতলা

যাহাকে decorative art বলে (যাহার বাংলা প্রতিশব্দ কোথাও পাই নাই) সেই পর্য্যায়ভুক্ত। এই প্রকার চিত্র ও আলেখ্য প্রধানতঃ রেখাপাতের ও রেখা-সংযোজনের নৈপুণ্যের অনুপাতে উৎকৃষ্ট বা বিপরীত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ-খোদন পদ্ধতিতে চিত্রকরের সম্মুখে সম ও ভগ্ন রেখা বিন্যাসের প্রশস্ত ক্ষেত্র বিস্তৃত আছে। সুতরাং এই পদ্ধতি ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষ উপযোগী।

কৃষ্ণানদীর জেলে

সম্প্রতি এদেশে ললিতকলা ও কলাশিল্পের জাগরণ দেখা দিয়াছে। এই জাগরণের ফলে যদি এদেশের কলাবিদ্যা ও শিল্পের প্রগতি সর্ব্বতোমুখী হয় তবেই এই নবীন উদ্যম সফল হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে নূতন ধারা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহা বিদেশে, যথা জাপানে, বিশাল স্রোতে পরিণত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, তিনি এবং তাঁহার ন্যায় অন্য যাঁহারা এই বিশিষ্ট চিত্রকলায় ব্রতী আছেন সকলেই ইহার চর্চ্চায় সফল হইবেন এবং ফলে জাপানের ন্যায় ভারতবর্ষও এই কলায় বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করিবে। রমেন্দ্রবাবুর কার্য্য বিশেষ আশাপ্রদ, সেইজন্য মনে হয় যে, যদি তিনি উপযুক্ত এবং উৎসাহী

পুরাণা লক্ষ্ণৌ

ছাত্রের সহায়তা লাভ করেন, তবে কাষ্ঠ-খোদন পদ্ধতি কলিকাতা আর্ট স্কুলের একটি বিশেষ খ্যাতির বস্তু হইতে পারে।

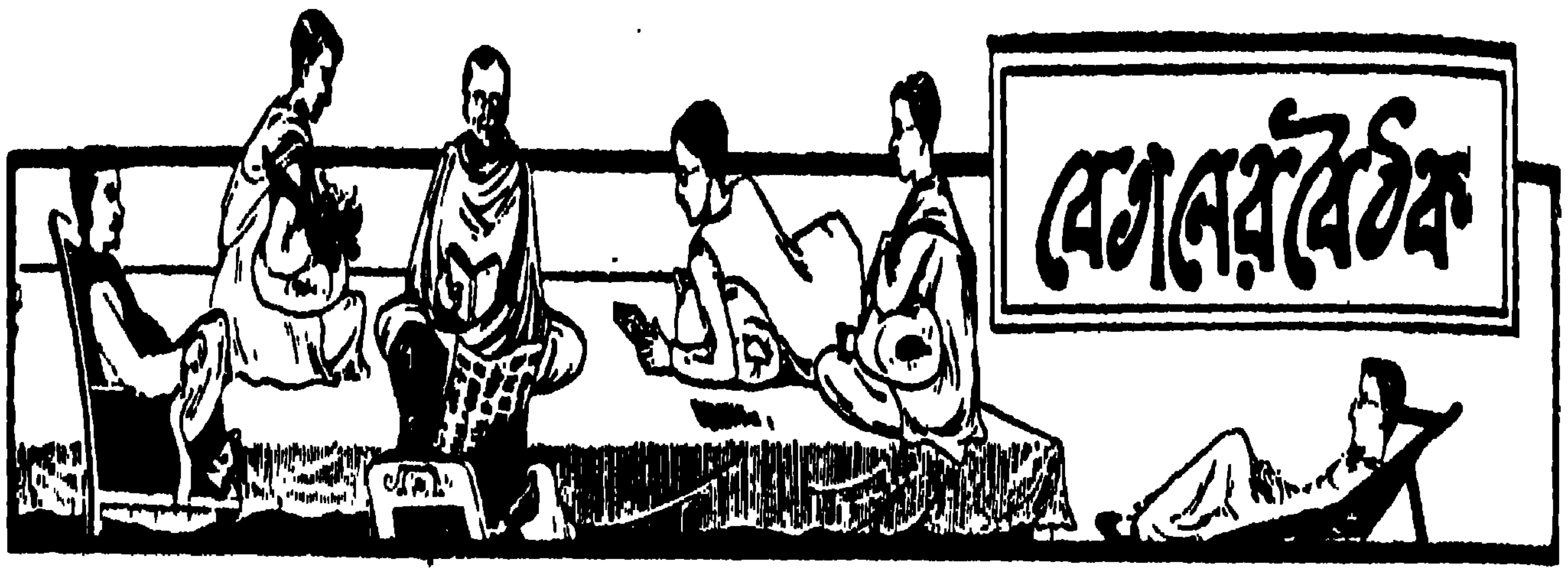

জিজ্ঞাসা

(১)

কায়স্থ শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং উহা কোন্ সময় হইতে প্রচলিত ?

(২)

দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার কোন উপায় আছে কিনা, থাকিলে তাহা কি ?

(৩)

চিত্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় কোন মাসিক পত্রিকা আছে কিনা ? থাকিলে তাহার ঠিকানা কি, এবং মূল্য কত ?

শ্রীঅবনীকান্ত মজুমদার

(৪)

সাধারণতঃ সংস্কৃত অধ্যাপনার স্থান, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি 'টোল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি এবং উহা কোন্ ভাষান্তর্গত কেহ জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

(৫)

বাঙ্গালা ভাষায় গবেষণাপূর্ণ শরীরচর্চ্চাবিষয়ক কোনও পুস্তক আছে কিনা। থাকিলে কাহার কৃত, মূল্য কত এবং কোথায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

(৬)

বর্দ্ধমান জেলায় চীনাবাদামের চাষ হয় কি না ? যদি হয় তাহা হইলে কি প্রণালীতে এবং কোন্ সময়ে কি রকম জমিতে চাষ করিতে হয় তাহা কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীজগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

(৭)

এনামেল করা সাইনবোর্ডে ভুল থাকিলে কি উপায়ে তাহা সহজে সংশোধন করা যায়। অর্থাৎ অল্প ভুল থাকিলে সেই অংশের এনামেল কি উপায়ে তুলিয়া তাহার স্থানে রং লাগান যাইতে পারে।

শ্রীবনবিহারী বসু

(৮)

কলিকাতায় অথবা বঙ্গ-দেশের প্রসিদ্ধ অন্য কোন সহরে অথবা পল্লীতে হিন্দী শিক্ষার কোন বিদ্যালয় অথবা অন্য কোন সুবন্দোবস্ত আছে কিনা ? থাকিলে কোথায় আছে কেহ বিস্তারিত ভাবে জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ হালদার

(৯)

ভারতে হিন্দুরাজত্বের সময়—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, অন্ধ্র, মগধ প্রভৃতি যে-সব দেশ বিভাগ করা ছিল, তাহার সীমান বর্ত্তমানে কোন্ জেলার কতটা স্থান লইয়া হইবে ? তাহার কোনো ম্যাপ বা বিবরণ আছে কি ?

(১০)

আমি একটি বংশাবলীতে পড়িয়াছি :—

"দিল্লীর বাদশা যবে জাহাঙ্গীর ছিল
বাঙ্গালার রাজধানী—ঢাকায় আনিল।
নবাবের সহকারী সুবার দেওয়ান
আছিলেন নরশ্রেষ্ঠ "ইন্দ্রনারায়ণ"।

কোন্ নবাবের সময়ে কোন্ সালে এই ইন্দ্রনারায়ণ সুবার দেওয়ান ছিলেন তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি ?

উক্ত বংশাবলীতে আরও আছে যে, ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র, রামদেবের মৃত্যুর সময়ে রাজবল্লভ জীবিত ছিলেন এবং রামদেবের বিধবার সম্পত্তি (যাহার সদর জমা ২ লক্ষ টাকা নবাব সরকারে প্রতিবৎসর দিতে হইত) দেওয়ান রাঘব বসুর বেইমানীতে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হওয়ায়, রাজা রাজবল্লভ উক্ত বিধবা ও তাহার শিশুপুত্রকে ৬০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়া বাকী সম্পত্তি নিজে গ্রহণ করেন। এবং উক্ত নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন।

ইহার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ আছে কি ?

শ্রীঅনন্তলাল ঘোষ

(১১)

চাণক্য ও বিষ্ণুশর্ম্মা কি একই ব্যক্তি, না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কেহ যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলে বাধিত হইব।

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

—

মীমাংসা

পৌরাণিক যুগের দেশের নাম

ভাদ্র সংখ্যার বেতালের বৈঠকের প্রথম প্রশ্নে শ্রীরামানুজাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় পৌরাণিক যুগে ভারতের কোন দেশ কি নামে অভিহিত হইত তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের জানা মতে এইরূপ সম্পূর্ণ পুস্তক নাই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চৌধুরী এম-এ মহাশয় Geographical tradition in the Puranas" সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার গবেষণার ফলও শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। গোস্বামী মহাশয় যদি বিশেষ কিছু জানিতে চাহেন তবে তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন।

শ্রীসুশীলচন্দ্র সেন, এম-এ

আজকাল পৌরাণিক যুগের দেশের নাম অর্থাৎ পুরাণোক্ত ভৌগোলিক নামের ধারাবাহিক তালিকাযুক্ত কোনও পুস্তক আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু স্কুল-পাঠ্য "ভারত ইতিহাসে" (পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ—এই সকল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের ভারতেতিহাস দ্রষ্টব্য।) অল্পবিস্তর ভৌগোলিক নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানাভাব বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রশ্নকর্তা প্রাগুক্ত ইতিহাস হইতে পৌরাণিক যুগের বহু নাম সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

তদ্ভিন্ন সুবল মিত্রের "সরল বাঙ্গালা অভিধানে," বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" নামক সুবৃহৎ শব্দ-কোষের পৃথক্ এক অধ্যায়ে ভৌগোলিক নামের বহু তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালার ধারাবাহিক ইতিহাস

বাঙ্গালার ধারাবাহিক ইতিহাস জানিতে হইলে, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সুলিখিত ও সুচিন্তিত "বাঙ্গালার ইতিহাস-" খানি দ্রষ্টব্য। উহা প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে বঙ্গের ধারাবাহিক ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস আর দেখা যায় না। ইহার মূল্য প্রতি-খণ্ড ২॥০ টাকা হিসাবে ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্; ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় পুস্তক

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে, জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। যথা :—

১। মথুরেশ-কৃত "জ্যোতিঃসাগর সার-গ্রন্থ"। মূল্য ৬৲ টাকা। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

২। "জ্যোতিষ-প্রভাকর"—পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব দ্বারা সঙ্কলিত। মূল ও বঙ্গানুবাদ একত্র ৪॥০ টাকা। যে কোন পুস্তকের দোকানে পাওয়া যাইবে।

৩। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত "জ্যোতিষ-রত্নাকর"। ইহা প্রাচীন জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও আধুনিক জ্যোতিষের সার-সংগ্রহ। মূল্য ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। ৬নং ভবানীদত্ত লেন, "বঙ্গবাসী" আপিস হইতে প্রকাশিত "জ্যোতিষতত্ত্ব" দাম ২৲ টাকা।

তদ্ভিন্ন "জ্যোতিষতত্ত্ব-বারিধি" (দাম ২॥০ টাকা), "জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান রহস্য" (দাম ২॥০ টাকা) প্রভৃতি পুস্তকও দ্রষ্টব্য।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই এই সকল পুস্তকে আছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা

১৩৩২ সালের 'প্রবাসী' ২য় খণ্ডে কাজী আব্দুল ওদুদ লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ," "রবীন্দ্রনাথের-কাব্য প্রতিভা" ইত্যাদি মৌলিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ও কবিতার বিশেষ সমালোচনা আছে।

যশোহর নামের ঐতিহাসিকতা

বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যশোহর নামের উল্লেখ দেখা যায়। যশোহর পূর্ব্বে যশোর নামে আখ্যাত হইত। ইহার প্রমাণ যথা—

(১) দিগ্বিজয় প্রকাশ—

"উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুতাঃ ॥"

(২) ভবিষ্যপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে—

"দশ যোজন মানঞ্চ যশোরস্ত চ পত্তনং।
যশোর দেশ বিষয়ে যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমে ॥"

(৩) পীঠমালা—

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥"

এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, যশোহর একটি প্রাচীন দেশ। কিন্তু কানিংহাম সাহেবের মতে উহা প্রাচীন নহে। তাঁহার মতে মুসলমান আগমনের পরে যশোহর নামের উৎপত্তি। তিনি বলেন 'যশর' আরবী শব্দ, অর্থ সেতু। যশোহর নদীসঙ্কুল প্রদেশ, একারণে 'যশোর' নাম হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুমান সমীচীন বোধ হয় না। কারণ পুরাণাদি গ্রন্থ মুসলমানগণের আগমনের পূর্ব্বেই রচিত। কাহারও মত প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক যশোহরের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বেও "যশোর" ছিল। আইন-ই আকবরীতে 'যশোর' রসুলপুর বলিয়া বিখ্যাত। যশর সরকার খালিফতাবাদের একটি মহাল ছিল। এই মহালের রাজস্ব আদায় খুব বেশী ছিল। Westland সাহেবের Reporte (পৃঃ ২৩) দেখা যায় যশোহর অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা যশঃশালী। তিনি লিখিয়াছেন। * * * "I Think it possible that 'Yashohara' is intended merely to express the idea supremely glorious * * *

সহঃ গ্রন্থাধ্যক্ষ
তরুণ শক্তি সাহিত্য-মন্দির, কাশীপুর
যশোহর

কলিকাতার অনাথালয়

১। 'ক্যালকাটা অরফেনেজ। এখানে অল্পবয়স্ক অনাথ বালক-বালিকা ও শিশুদিগকে রক্ষা ও লালন-পালন করা হয়। ঠিকানা "সেক্রেটারী, ক্যালকাটা অরফনেইজ," শ্যামবাজার, কলিকাতা।

২। কলিকাতা অনাথাশ্রম। এখানেও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা ও শিশুদিগকে রক্ষা করা হয়।

ঠিকানা—১২।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এতদ্ব্যতীত বালবৃদ্ধনারী সম্বন্ধীয় যে কোনো অনাথাশ্রমের খবর জানিতে হইলে, অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
পোঃ রাজৈর(?) (ঢাকা)

বাঙ্গালা ভাষায় অর্থবিজ্ঞান গ্রন্থ

১। টাকার কথা।
২। রাজস্বের কথা। } শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।
৩। ব্যাঙ্ক-রহস্য।

উক্ত বই কয়খানার কথা আমার জানা আছে।

হিন্দীশিক্ষা করিবার পুস্তক

'হিন্দীবাংলা শিক্ষা' ও 'সরল হিন্দীশিক্ষা' ব্যতীত 'হিন্দী শব্দ ও অনুবাদমালা' নামে আর একখানা বহি আছে। এই বইখানাকে বালক-বালিকাদের প্রথম হিন্দী শিক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। মূল্য ।।৹ আনা। ভবানীপুর হিন্দীপ্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত 'হিন্দী সাহিত্য-পাঠ' ১ম ভাগ (মূল্য ।৹ আনা। 'হিন্দী বাঙ্গলা অভিধান' নামক আরও দুইখানা বহি ইহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িলে অধিক ফল পাওয়া যাইবে। উক্ত পুস্তকগুলির প্রাপ্তিস্থান হিন্দী পুস্তক এজেন্সী। ১২৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মাথার খুস্কী নিবারণ

স্নানের সময় কাঁচা দুগ্ধ দিয়া ৩,৪ দিন মাথা উত্তম রূপে ধোয়াইয়া ফেলিলে খুস্কী দূর হইয়া থাকে।

কাচ জুড়িবার আঠা

হংসডিম্বের শ্বেতাংশ ও কলিচূণ সমভাবে মিশ্রিত করিলে কাঁচ জুড়িবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজলভ্য আঠা প্রস্তুত হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

আলোচনা

"আদলি" শব্দের অর্থ

ভাদ্রের প্রবাসীতে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি, এম-এ মহাশয় "আদলি" শব্দের অর্থ বিচার করিয়াছেন। সুখের বিষয় তিনি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'আদলি' অর্থে 'ঘৃতকুমারী' গ্রহণ করেন নাই। আদলি যে নিতম্বকে বুঝাইতেছে শ্রাবণের প্রবাসীতে আমি সে কথা বলিয়াছি, রায় বাহাদুরও সে-মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রায় বাহাদুর যে বলিয়াছেন 'অদ্রি' হইতে আদলি হইয়াছে, আমরা এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের মতে "অর্দ্ধস্থালীকা" শব্দ হইতে আদলির উৎপত্তি হইয়াছে। অমরকোষে কয়েকপ্রকার মৃৎপাত্রের পৃথক্ পৃথক্ নাম পাওয়া যায়। যথা—

"অলিঞ্জর স্যাম্মণিকঃ কর্কর্য্যালু গলন্তিকা।
পিঠরঃ স্থাল্যুখা কুণ্ডং কলসস্তু ত্রিষু দ্বয়োঃ॥
ঘট কূট নিবাপস্ত্রী সরাবো বর্দ্ধমানকঃ।

—ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে হাঁড়ির নাম "পিঠর, স্থালী, উখা, কুণ্ড"। হাঁড়ির উপরার্দ্ধ ভাঙ্গিয়া দিলে নিম্নার্দ্ধের আকার যেমন হয় সেইরূপ পাত্র 'অর্দ্ধস্থালীকা' নামে পরিচিত ছিল। এইরূপ পাত্রে ক্ষুপ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি রোপণ করিয়া গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হইত। পল্লীগ্রামে আজিও ইহার প্রচলন আছে, এবং এইরূপ পাত্র ঐ কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। এই পাত্রের সঙ্গে কবি নিতম্বের তুলনা দিয়াছেন। এইরূপ পাত্রে কলাগাছ কেহ পোঁতে না, তাই বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"আদলি উপরে কেবা
কদলী রোপিল রে"

ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে কলাগাছটি কে উণ্টা করিয়া পুঁতিয়াছে? এই উণ্টা কদলী বা উলট কদলী বা বিপরীত কদলীর উদাহরণ কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে, পদাবলীতেও আছে।

"উরু শোভে বিপরীত রাম কদলী"
(কৃষ্ণকীর্ত্তন, ৪৮ পৃষ্ঠা)
"উলট কদলীতরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পঁহু জীয়ে ঐ অবলম্ব॥"
(জ্ঞানদাস, পদাবলী)

অর্দ্ধস্থালীকা হইতে আদলী এইরূপে নিষ্পন্ন হয়—

সংস্কৃত 'অর্দ্ধ+স্থালিকা' > প্রাকৃত 'অদ্ধ'+'থালিয়া'='অদ্ধ-হালিয়া' > অপভ্রংশ 'অদ্ধহালিঅ' > প্রাচীন বাঙ্গলা * 'আধহালী' * আধালী > মধ্যযুগের বাঙ্গালা 'আধলী,' 'আধলি,' 'আদলি'।

তারকা-চিহ্নিত রূপ অনুমান করিয়া লইয়াছি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
(ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায়)

তিন হাজার ফিট উপর হইতে পড়িতে কেমন লাগে—

"আমি শূন্যের মধ্য দিয়া পড়িতেছিলাম। আমার কাণের পাশ দিয়া বাতাস বোঁ বোঁ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। কতক্ষণ ধরিয়া সোজাভাবে পড়িবার পর আমি উল্টাইয়া পড়িলাম। আমার মাথা তখন নীচের

কোপ মাটিতে পড়িতেছেন

দিকে, পা উপরে। কোনও প্রকারে হাত বাড়াইয় প্যারাস্যুটের আংটা ধরিয়া আমি একটা টান দিলাম। হঠাৎ মনে হইল কে যেন আমার নীচে একটা তুলার বস্তা পাতিয়া দিয়াছে, আমি তাহার উপরে পড়িয়া আছি। উপর দিকে চাহিয়া দেখি প্যারাস্যুটটা খুলিয়া গিয়াছে। আমি যেন দোলায় দুলিতেছি।

"মাটি যেন ধীরে ধীরে আমার দিকে উঠিয়া আসিতে লাগিল। আমি আর একবার দড়ি ধরিয়া টান দিলাম। দোলা বন্ধ হইয়া গেল। আমি শূন্যে প্রায় স্থির হইয়া রহিলাম। পর মুহূর্তেই আমার পা মাটিতে ঠেকিয়া গেল। আমি বসিয়া পড়িয়া প্যারাস্যুটটাকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া হাওয়া বাহির করিয়া দিলাম। লোকেরা বলিতে লাগিল যে, আমি প্রায় ৩,০০০ ফিট পড়িবার পর প্যারাস্যুটটা খুলিয়াছিল।"

ইহা জ্যাক কোপের নিজের ভাষায়, তিনি কি করিয়া এরোপ্লেন হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন তাহার বর্ণনা। তিনি প্রায় দুই

জ্যাক কোপ এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িতেছেন

হাজার বার এরোপ্লেন হইতে ঝাঁপ দিয়াছেন, এত বারের মধ্যে কখনও কোনও দুর্ঘটনা হয় নাই। যে পড়ার কথা উপরে উদ্ধৃত হইল এইটিই

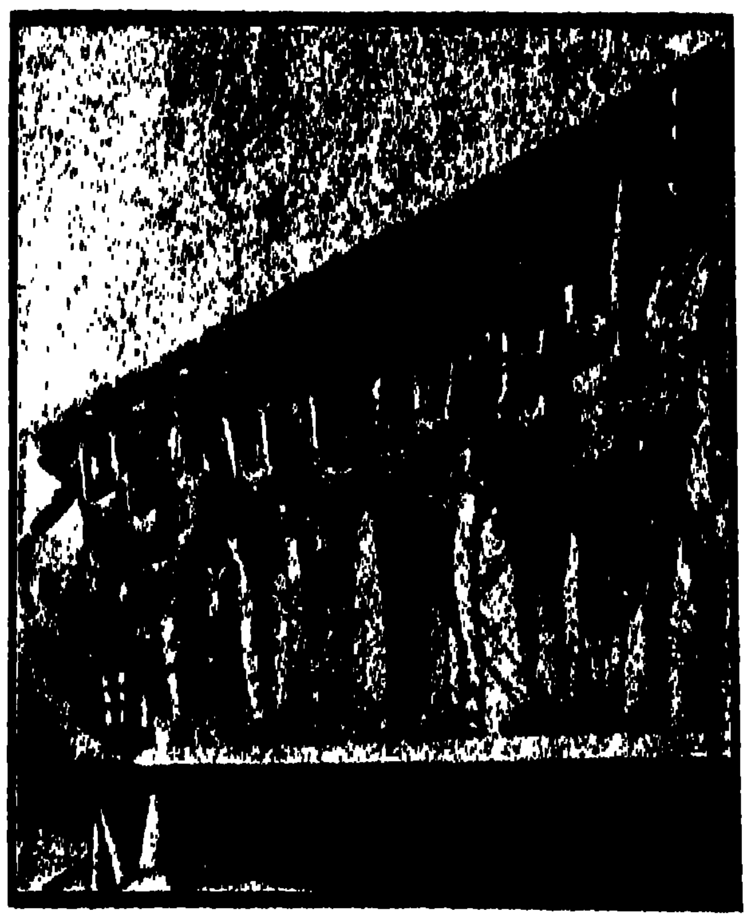

একদল শিক্ষার্থী—প্যারাস্যুট লইয়া পড়া শিখিতেছে

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু হইতে পড়া। এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি প্যারাস্যুট লইয়া ঝাঁপ দেওয়া অভ্যাস করিতেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এরোপ্লেন হইতে ঝাঁপ দেন। ইহার পূর্ব্বে

লোকে এইরূপ দুঃসাহসের কাজ একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে করিত

তিনি বলিয়াছেন, "এতটা উঁচু হইতে পড়িবার সময় আমার

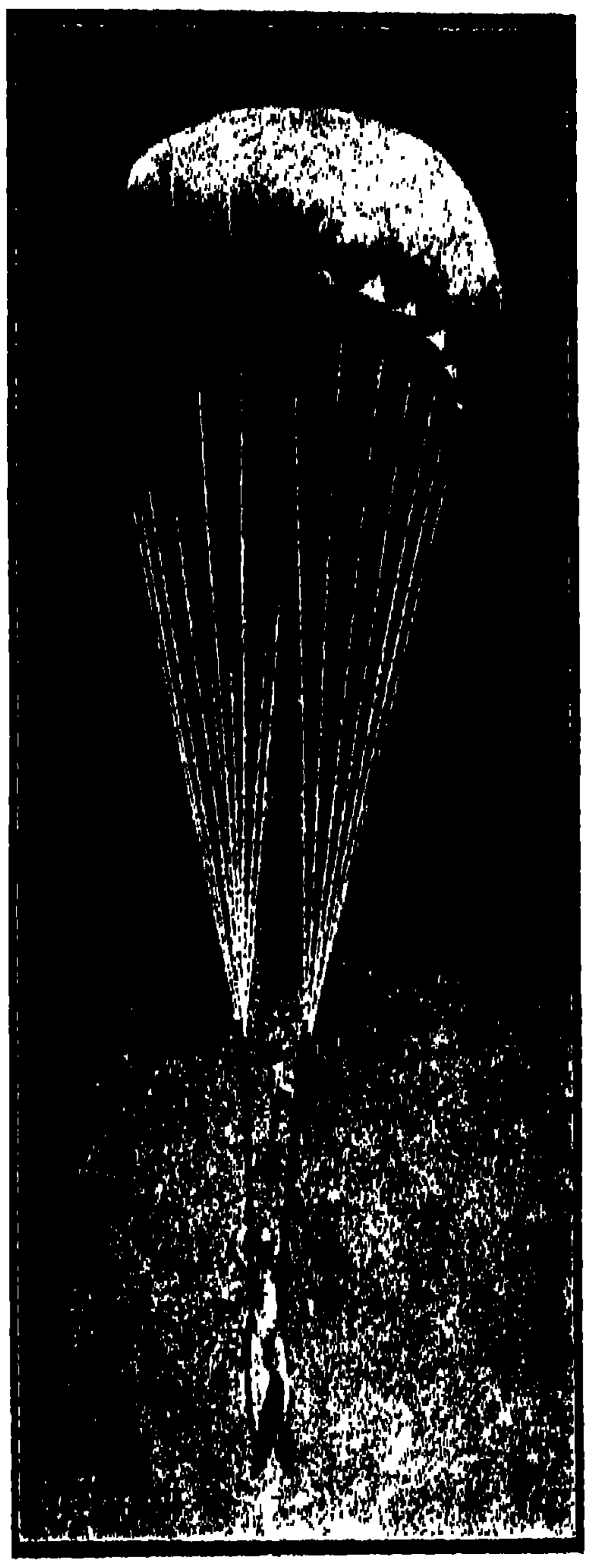

কোপ প্যারাস্যুট ধরিয়া ঝুলিয়া আছেন

এক মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান লোপ হয় নাই। আমি হাত বাড়াইয়া যতদূর নাগাল পাওয়া যায় এরোপ্লেনের যে কোনো অংশ ছুঁইতে পারিতেছিলাম, উপরে এরোপ্লেনটা যে ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে নামিয়া আসিতেছে তাহাও দেখিতে পাইতেছিলাম। বাতাসের বেগ কাণের কাছে একটু টন্ টন্ করিতেছিল বটে, কিন্তু ঐটুকু ছাড়া আর কোনও কষ্ট হয় নাই। প্যারাস্যুট খুলিবার সময়ে যে হেঁচকা টান লাগে তাহাতে আমার কোনও আঘাত লাগে নাই। সাজসরঞ্জাম ভাল করিয়া আঁটা থাকিলে কাহারও লাগিবার কথা নয়।

"এত উঁচু হইতে লাফাইয়া পড়া একটা লোক-দেখান কাজ মাত্র। বাস্তবজীবনে কাহারও এরূপ কোনও কাজ করিতে হইবে কিনা সন্দেহ। এরোপ্লেনে চড়া আজকাল এত নিরাপদ যে, এখন আর প্যারাস্যুটের বিশেষ প্রয়োজনও নাই।

"ক্রমে ক্রমে প্যারাস্যুট হইতে পড়াও আর বেশী বাহাদুরীর কাজ বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ ইহাতে বিপদের আশঙ্কা বিশেষ নাই। তবে আরও কিছুদিন ইহা এরোপ্লেনচালকদের কাজে লাগিবে। কর্ণেল লিণ্ডবার্গকে তিনবার ইহা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।"

কামান হইতে মানুষ-গোলা—

উচ্চ মঞ্চ হইতে খুব নীচে জলে লাফ দিবার নানা-প্রকার কসরৎ অনেক খেলোয়াড় দেখাইয়া থাকে। সম্প্রতি হুগো জ্যাকসিনি নামক আমেরিকান সার্কেস পার্টির এক খেলোয়াড় অতি অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছে। বড় কামানের মুখে গোলার বদলে সে নিজেকে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তারপর কামান ছুড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকসিনি গোলার মত আকাশে বাহির হইয়া কিছু দূরে স্থাপিত জালের উপর গিয়া পড়ে। খুব সম্ভবত কামানের মধ্যে একটি বিশেষভাবে স্থাপিত

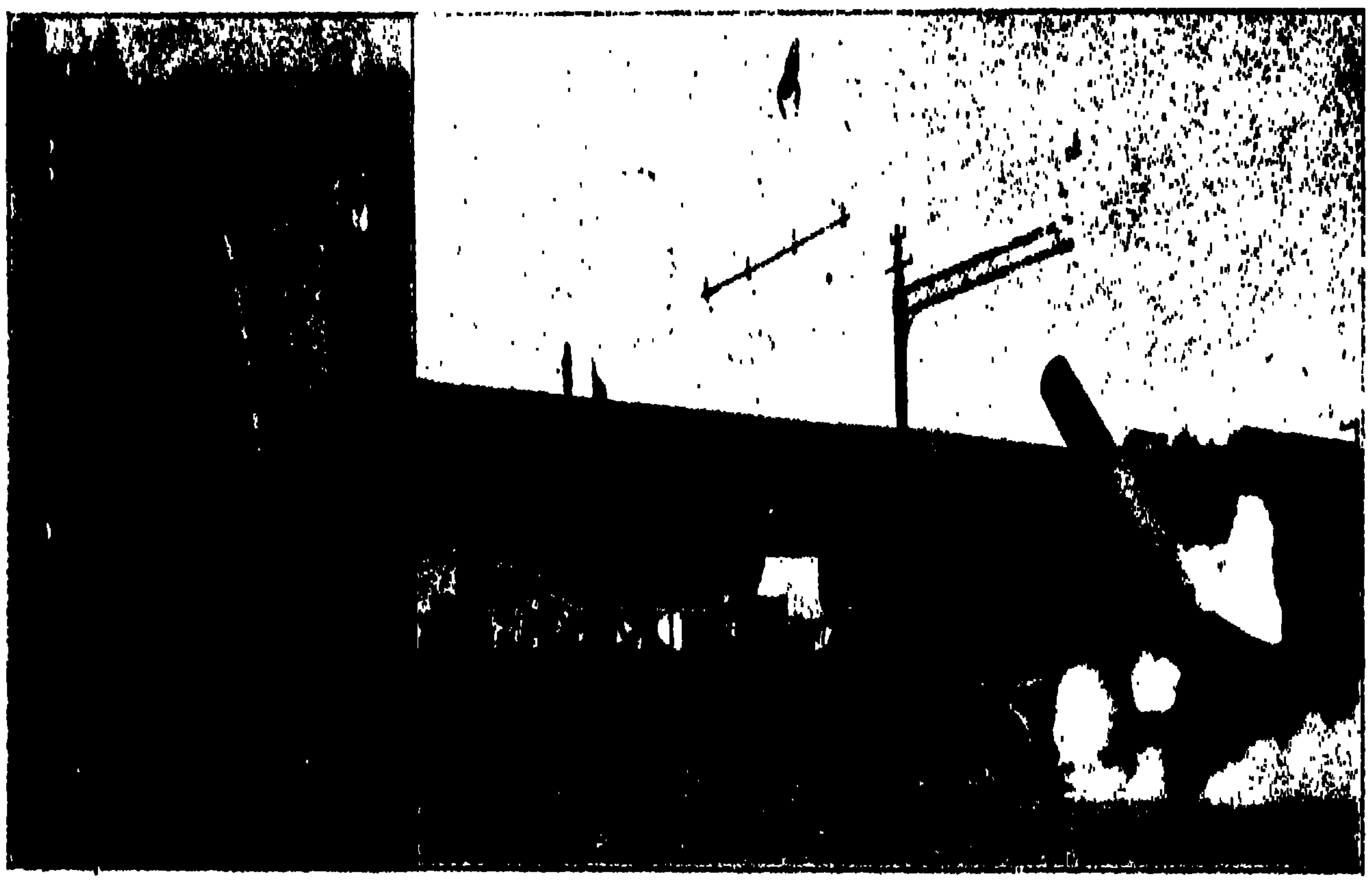

হুগো জ্যাকসিনি

যে কামান হইতে তাহাকে ছোঁড়া হয়

স্প্রিং আছে। এই স্প্রিং তাহাকে কামান ছুড়িবামাত্র ধাক্কা দিয়া ছিটকাইয়া বাহির করিয়' দেয়।

ডাইনোসরের পায়ের হাড়ের টুকরা আবিষ্কার—

মিঃ ই বি কেবার নামক এক ভদ্রলোক কোলোরাডো নামক স্থানের নিকটবর্তী স্লেট পাথরের পাহাড় হইতে ডাইনোসরের পায়ের এক টুকরা হাড় বাহির করিয়াছেন। হাড়ের টুকরাটি প্রায় ২২ ইঞ্চি লম্বা। এই স্থানে ডাইনোসর নামক অধুনা-লুপ্ত অতিকায় জন্তুর বহু

ডাইনোসরের পায়ের হাড়ের টুকরা

কঙ্কাল আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রাপ্ত হাড়ের টুকরাটি জুরাসিক্ যুগের কোনো ডাইনোসরের।

চীনদেশের কবরীবন্ধন—

চীনদেশের রমণীগণ প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা বিচিত্র-ভঙ্গীতে কেশরচনা করিয়া আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে অভিজাত গৃহের নারীগণের কবরীর ছাঁদ এক প্রকার, নিম্নশ্রেণীর নারীদের আর এক প্রকার। দরিদ্র রমণীরা তাঁহাদের সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা ভগিনীদের মত কেশরচনায় সময় কিংবা অর্থ কিছুই ব্যয় করিতে পারেন না, সুতরাং তাহাদের কবরীবন্ধন অপেক্ষাকৃত কম জটিল। উচ্চবংশীয়া মহিলাদের কবরী শুধু যে জটিল এবং আয়াসসাধ্য তাহাই নয়, দেখিতেও খুবই সুন্দর। কেশরচনা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির একটা প্রধান সহায়। চীনদেশের নারীদিগকে এ-বিষয়ে পৃথিবীর সকল নারীর অগ্রগণ্য বলা যাইতে পারে। বহুকালের সাধনা ও চেষ্টার ফলে তাঁহারা কবরীবন্ধনের যে-সকল ছাঁদ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার অপেক্ষা সুন্দর কোনোও রীতি আবিষ্কার করা সহজ হইবে না।

কবরীরচনায় চেহারার বিশেষত্ব, গায়ের রং, দেহের উচ্চতা, সকলই মনে রাখিতে হয়। তাহা না হইলে কেশরচনা সুসমঞ্জস হয় না। চীনের রমণীগণ ইয়ুরোপীয় নারীদের তুলনায় ময়লা ও খর্ব্বকায়। সুতরাং তাহাদের কেশরচনার ধরণও ইয়োরোপীয় ধরণ হইতে বিভিন্ন। তাঁহারা বয়স, রুচি অথবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ছাঁদের কবরী রচনা করিয়া থাকেন। চীনদেশের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের নিদর্শনের মধ্যে আমরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই নানা-প্রকারের কেশরচনার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মাঝে মাঝে পরচুলাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরোপে যত, তত নয়। এক সময়ে চুল অসংখ্য ছোট ছোট বিনুনীতে বদ্ধ করিয়া কবরী বাঁধা হইত। অপর একযুগে প্রাচীন মিশরের রমণীদের মত কেশরচনার পদ্ধতি দেখা দিল। এইরূপে কেশরচনার নানারূপ প্রথার ভিতর দিয়া আধুনিক চীন-দেশীয় তরুণীরা 'বব'করা চুলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। যে কেশকলাপের স্তুতিগান করিয়া, যাহার ছবি আঁকিয়া প্রাচীন কবিগণ হস্তলিখিত পুঁথি পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা গদ্যময় খাটো চুলে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন ছাঁদের কবরীর নাম ও বর্ণনা দেওয়া হইল। সঙ্গের চিত্র হইতে সেগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

১। চেঙ্গ-ফেঙ্গ-চি অথবা ফিনিক্স কবরী। সম্রাট ইউ ওয়াংএর প্রিয় মহিষী পাও-স্থ (খৃঃ পূঃ ৭৮১—৭৭১) এইরূপে কবরীবন্ধন করিতেন। ইহাতে ফিনিক্স পাখীর পুচ্ছের ছয়টি পালক লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই পালক হইতেই এই কবরীর এই নাম হইয়াছে। রাজসভার মহিলারা তাঁহাদের পদের অনুযায়ী ফিনিক্সের পালক ব্যবহার করিতে পাইতেন। সর্ব্বোচ্চপদের মহিলারা নয়টি পালক পরিতেন, তাঁহাদের নিম্নতন মহিলারা সাতটি পরিতেন। এইরূপে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর মহিলারা মাত্র একটি পালক পরিতে পাইতেন। সভাসদ্‌দের সম্মান যেরূপ রাজকীয় পদদ্বারা সূচিত হইত মহিলাদের পদও সেইরূপ এই পালকের সংখ্যা হইতে বুঝা যাইত।

২। হিয়াং-ফেঙ্গ-চি অথবা উড্ডীয়মান ফিনিক্স। এই কবরী অনেকটা প্রথম ছাঁদেরই মত, তবে চুল উঁচু করিয়া না দিয়া সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। চীন-হুয়া-চি অথবা পিতল বা সোনার পাতের কবরী। এই কবরীতে পিতল অথবা সোনার পাতের অলঙ্কার পর হইত, এইজন্য এই কবরীর এইরূপ নাম হইয়াছে। এই কবরী চাং রাজ্যের ব্ উর পত্নী চি-চিয়াংএর দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহা খৃঃ-পূঃ ৭৭৪ অব্দে আবিষ্কৃত।

৪। গুঁড়-ইউন-হুয়ান অথবা পঞ্চমেঘ কবরী; খৃঃ-পূঃ ৭৩৯ অব্দে আবিষ্কৃত। ৫। ফেঙ্গ-চি অথবা ফিনিক্স কবরী খৃঃ-পূঃ ৩৩০ অব্দে আবিষ্কৃত। ৬। চুই মা চি অথবা উল্টানকবরী, হান বংশের সময়ের পদ্ধতি। ৭। ওয়াং-হো চি বা সংযুক্ত কবরী, খৃঃ-পূঃ ৬৭২ অব্দে আবিষ্কৃত। ৮। জু-ই-চি "যেমন-অভিরুচি" কবরী। ৯। লো ফেঙ চি অথবা চূড়াবাঁধা কবরী; হিয়া-চি কর্ত্তৃক খৃঃ পূঃ ৫৯০ অব্দে প্রবর্ত্তিত—ইনি পর পর তিনজন সম্রাট ও সাতজন অমাত্যের পত্নী হইয়াছিলেন। ১০। কুই হুয়া-চি। অথবা হলিহক ফুলের মত কবরী। খৃঃ পূঃ ৬৮১ অব্দে আবিষ্কৃত। ১১। টো-ইউন-চি। অথবা পুঞ্জমেঘ কবরী। অন্যান্য কবরীগুলির নাম দেওয়ার প্রয়োজন নাই। চিত্র হইতেই পাঠকপাঠিকাগণ তাহাদের রচনা করিবার পদ্ধতি বুঝিতে পারিবেন।

১। ফিনিক্স কবরী

২। উড্ডীয়মান ফিনিক্স কবরী

৩। পিতল বা সোনার পাত-কবরী

৪। পঞ্চমেঘ কবরী

৫। ফিনিক্স কবরী

৬। উণ্টান কবরী

৭। সংযুক্ত কবরী

৮। "যেমন অভিরুচি" কবরী

৯। চুড়াবাঁধা কবরী

১০। "হলিহক" কবরী

১১। পুষ্পমেঘ কবরী

১২। ঘুরানো খোঁপা

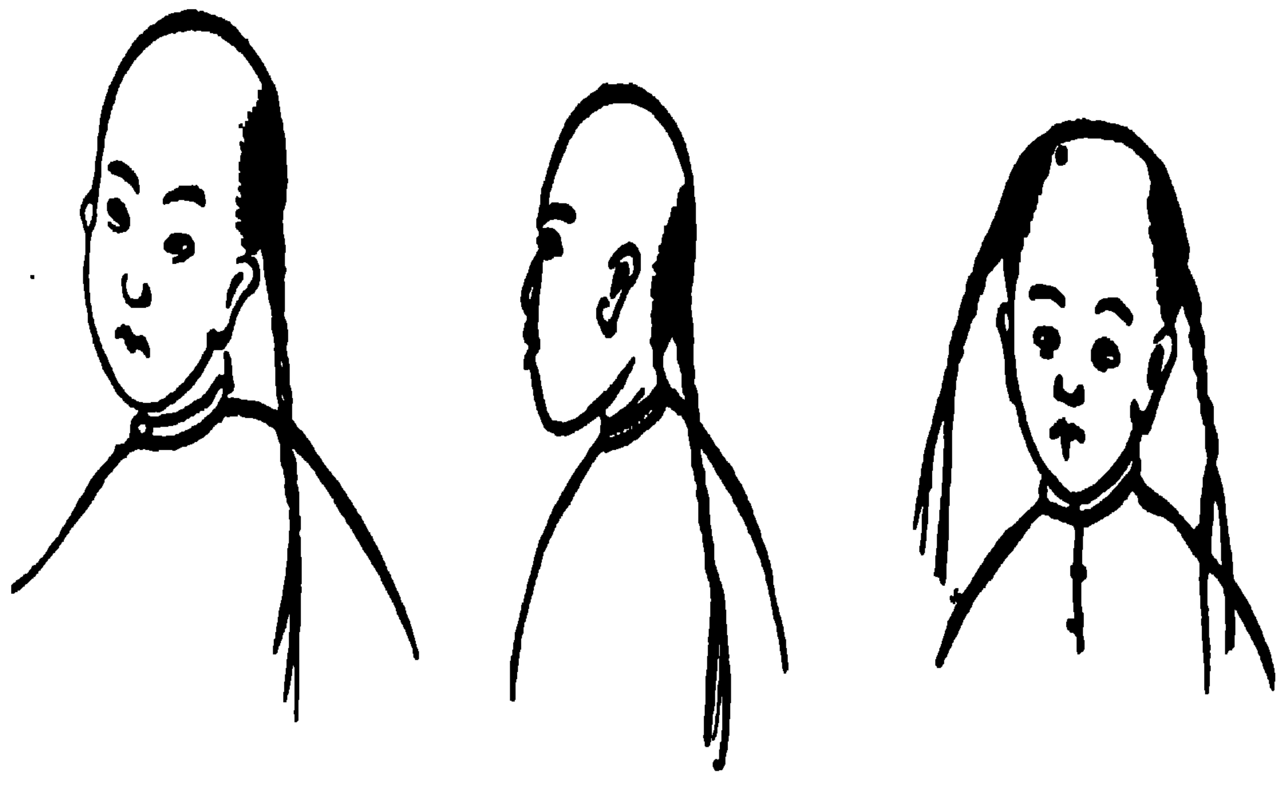

ছেলেদের চুল বাঁধা

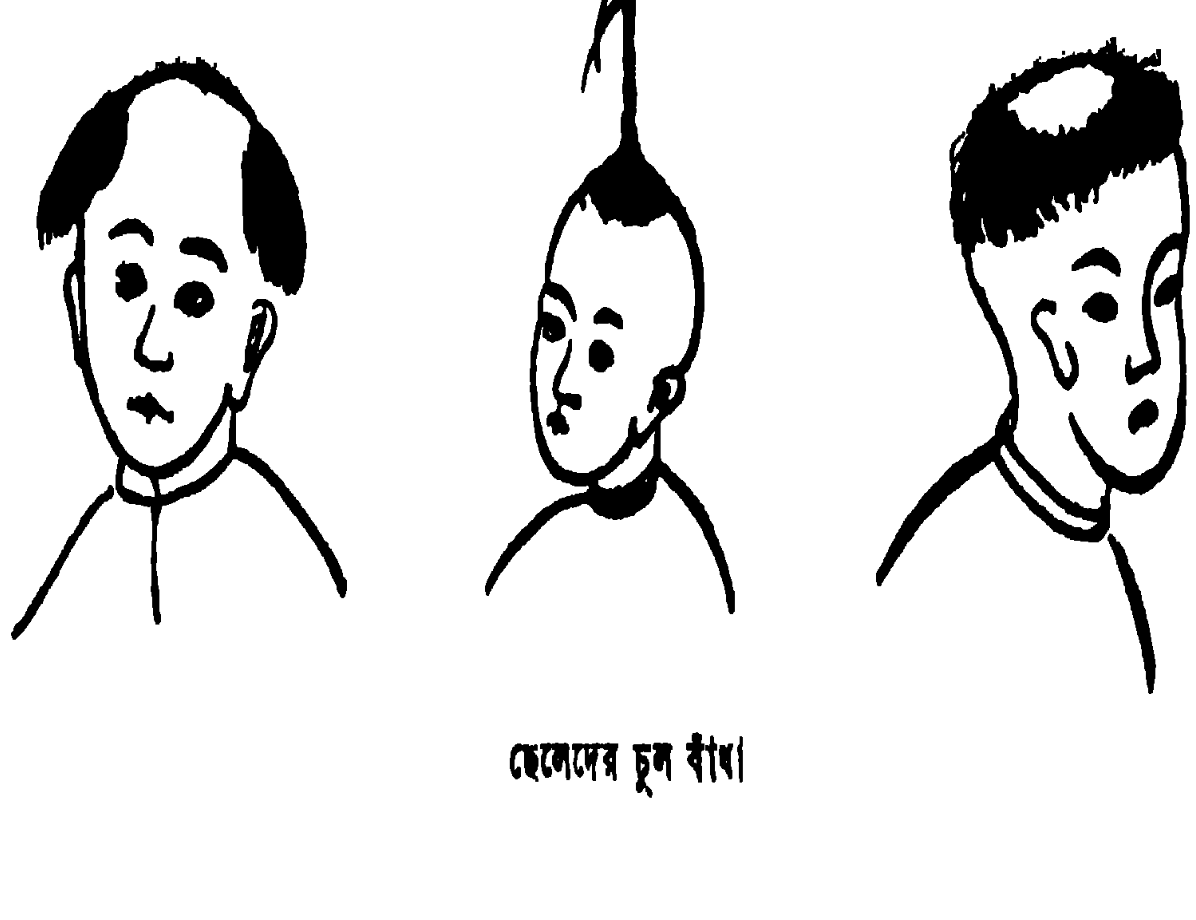

ছেলেদের চুল বাঁধা

কমলকলিকা কবরী

জোড়া খোঁপা

"স্থ-লি-চি"

অল্পবয়স্ক ছেলে ও মেয়েদের খোঁপা

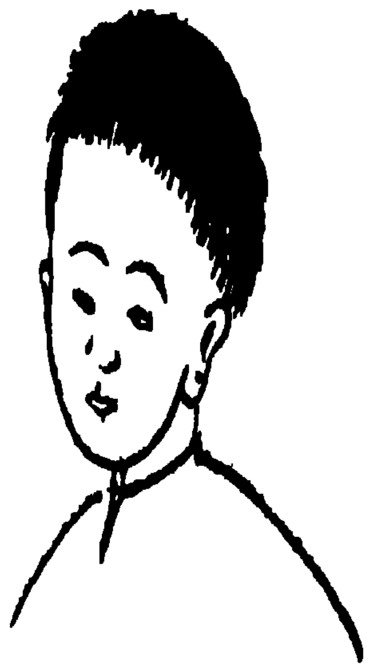

ছোট ছেলের চুল ছাঁটা

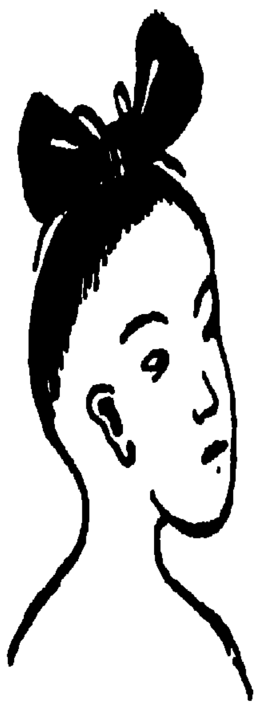

"ঘণ্টা" খোঁপা (ছেলেদের)

"ঘণ্টা" খোঁপা (মেয়েদের)

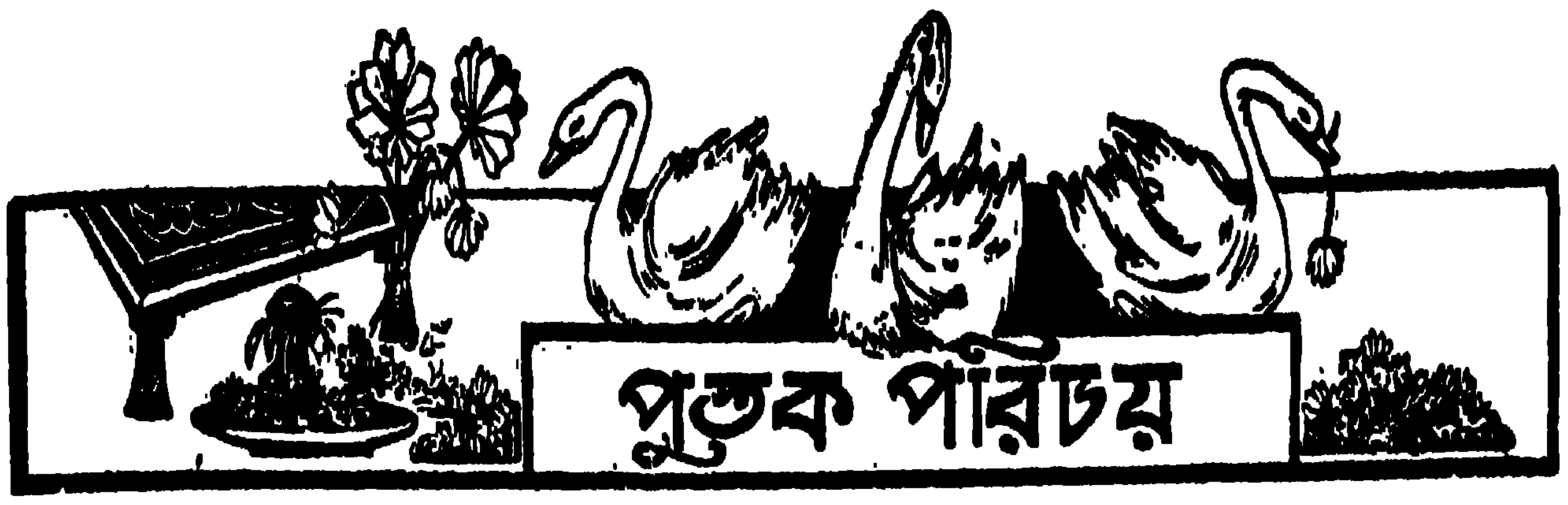

অধ্যাত্ম-বিদ্যা—স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি প্রণীত। হরিদ্বার, লালতারা বাগ ভোলানন্দাশ্রম হইতে স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ গিরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ।০+৯৯ ; মূল্য ৷৷০ (কাগজে বাঁধাই)।

পুস্তকে তেরটি অধ্যায় (বল্লী) ; আলোচ্য বিষয়—গুরু শিষ্য, সাধন, মায়া, ব্রহ্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি। অর্থ পরিষ্কার করিবার জন্য স্থানে স্থানে উপাখ্যানও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বামী ভোলানন্দ গিরির শিষ্য ; তিনি এই গ্রন্থে স্বামীজীর মতামতই বিবৃত করিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সমুদ্রগুপ্ত—শ্রীঅমলচন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল্ প্রণীত, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানি ষোড়শ সর্গে সমাপ্ত। ইহা কথাকাব্য কি নাটক, তাহা ভাল বুঝিতে পারা গেল না। এক-একবারে অন্তত দুই পৃষ্ঠা-ব্যাপী উচ্ছ্বাস ছন্দে আবৃত্তি না করিয়া কোন পাত্রপাত্রী থামে নাই। একদা এক রাজার খেয়াল হইল যে, তিনি নানা বিক্ষিপ্ত খণ্ডরাজ্য জয় করিয়া ভারতে এক মহা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবেন। অতএব তিনি অবিলম্বে ঘোর যুদ্ধে এবং ঘোরতর জয়ে মাতিয়া উঠিলেন। পরে পত্নীপুত্র-পরিবৃত হইয়া সফলকাম সম্রাট পরমানন্দে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজাটির নাম—সমুদ্রগুপ্ত। 'সমরাদিত্য', বিজয়-দুন্দুভি,' 'ভারত সাম্রাজ্য', অথবা এমনি ধারা যে-কোন একটা নাম বইখানির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া যাইত, কেন-না 'সমুদ্রগুপ্ত' আখ্যাধারী ঐতিহাসিক ব্যক্তিটির সঙ্গে পুস্তকের সম্বন্ধ অতি অল্প। লেখকের কবিত্বরসটুকু যোলটি বিপুল সর্গের তলায় চাপা পড়িয়া গেছে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ ভাল।

মানসী—ডাঃ মোহম্মদ আবুল কাসেম প্রণীত ও খুলনা, দৌলতপুর হইতে কবি শেখ মোহম্মদ ইস্মাইল হোসেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিতার বই। শোকোচ্ছ্বাস। শোকের সমালোচনা চলে না। কোন বিখ্যাত গ্রন্থের নামানুসারে নবপ্রকাশিত পুস্তকের নামকরণ না করিলেই ভাল হয়। প্রথম কবিতার প্রথম লাইন,—

"কোন্ আকাশের তারা তুমি, কোন্ কাননের ফুল।" অতএব পরামর্শ দিয়া লাভ নাই।

স্বপ্ন-ছায়া—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, এবং ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

কবিতা-পুস্তক। গোড়াতেই এক অদ্ভুত অবতরণিকা, যথা, 'কবিতাও চিরদিন তাই অচেতনমুখী অতিচেতনের।' 'স্বপ্ন' হইতে আরম্ভ করিয়া 'শূন্যতা' পর্য্যন্ত আটচল্লিশটি কবিতা আছে।

'আমি যদি তাই বাই দিব এতখানি—
তুমি মোর স্বপনখানি বুনিও তাঁতে হে রাণী!'

'সখীরে চাই চাই—সখীরে নাহি চাই,
... ... মিলনে পাই পাই।'

অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

ধূপের ধোঁয়ায়—৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, এবং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, আর্য্য সাহিত্যভবন হইতে প্রকাশিত।

এখানি নাটিকা। নাট্যে পুরুষ নাই, সবই নারী, এক মালী ছাড়া, সে-ও স্ত্রীবেশী। সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি—অযোধ্যার এই কয়জন তরুণী রাজবধূই নাটিকার প্রধান চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে কনিষ্ঠা শ্রুতকীর্ত্তিই গল্পের নায়িকা। সীতা আদর করিয়া ছোট বোনটিকে 'শ্রুতি' বলিয়া ডাকেন। রাজপুত্রেরা চার ভায়ে মিলিয়া বধূদের কিছু না বলিয়া-কহিয়া বুঝি কোথায় যাইবার অভিসন্ধি করিয়া নগরের বাহিরে গিয়াছেন। লুকোচুরি শ্রুতির সয় না, তাই চব্বিশ ঘণ্টার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, রাগে অভিমানে বালিকা বিষম গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল। অবশেষে, দম্পতি-কলহে দৈব—নব কৌতুকে নাটিকার পরিসমাপ্তি।

'মনে হয় স্বপ্ন যেন চক্ষু মেলে দেখেছি দিন-দুপুরে।' বসন্তোৎসবের আগের দিন। গুমোট গরম। তার উপর ধূপের ধোঁয়া। সেই ধূপের ধোঁয়ায় এই নিদাঘ মায়ার উদ্ভাবনা।

'গায়ে সই সইবে না রোদ
শুকিয়ে নে চুল ধূপদানীতে :
জোছনা নিছিয়ে-নেওয়া
নিছান তোর মুখখানিতে।'

প্রেম, অভিমান, বিরহ, মিলনোৎকণ্ঠা, কল্পনা, ক্ষণিকতা, কৌতূহল, কৌতুক, যৌবনোচ্ছ্বাস, কথা, গান, একাল এবং সেকাল,—নাটিকার মধ্যে এই সমস্ত মিশাইয়া এক হইয়া গিয়া এক স্বপ্নময় রঙীন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাগমতী এক নূতন সৃষ্টি। 'মাথাতে যার বরণছত্র, সমুদ্র যার সেনা। মীণাঙ্ক যার ঝাণ্ডা নিশান' ইত্যাদি ভাগমতীর ভেল্‌কির বোলের তুলনা নাই। কিন্তু বধূনাট্যের দলকে ইহার মধ্যে আনিয়া ফেলা মোটেই সঙ্গত হয় নাই। শুধু অবান্তর নয়, নাটকের স্বপ্ন-সরস প্রকৃতির সঙ্গে ইহাদের শ্লেষ-তীক্ষ্ণ কথা ও গান খাপ খায় না। সুকুমার খেয়াল-নাট্য হিসাবে রচনাটির জুড়ি মেলে না। লেখার মধ্যে এতটুকু গুরুভার কিছু নাই। কথাবার্ত্তা, গান, গল্প, রসিকতা এ সকলেরই ভঙ্গী, তরল, লঘু, সাবলীল। "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত স্বর্গীয় কবির এই মিষ্ট নাট্যরচনাটি পুস্তকাকারে দেখিবার আগ্রহ অনেক সাহিত্য-রসিকেরই ছিল। প্রচ্ছদপটে—ধূপাধারের লীলায়িত ধূমে সিক্ত কেশপাশ সুরভি করিতেছে এক লাবণ্যময়ী তরুণী, সঙ্গে তাহার সুন্দরী সহচরী। চিত্রের রেখায় রেখায় সুপরিচিত শিল্পীর ছাপ রহিয়াছে। ইহা যে শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেনেরই অঙ্কিত, নাম না থাকিলেও ছবি দেখিয়া তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে না।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জ্যোতিঃ সোপানম্—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঃ-শাস্ত্রী প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা, প্রাপ্তিস্থান জ্যোতিষকুটীর, ময়মনসিংহ।

পুস্তকখানিতে সরল বাংলায় জ্যোতিষশাস্ত্র সাধারণের শিক্ষোপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। আজকাল এই শাস্ত্র একদিকে যেমন দুর্জ্ঞেয় অন্যদিকে তেমনই অল্পশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাসী লোকজনের কাছে সীমাবদ্ধ। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় শিক্ষিত সমাজে এই শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রচারের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

চক্র

অজয়—শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত, প্রকাশক—রঞ্জন প্রকাশালয়, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

এই উপন্যাসখানা বোধ হয় ইয়োরোপীয় অতি-আধুনিকতার সমধর্ম্মী নয় তবে তাহার মুখ ও গতি সেই দিকেই। তাই, ইয়োরোপীয় উপন্যাসজগতের যুগ-বিবর্ত্তনের সন্ধান রাখা ভালো। এই গ্রন্থখানা বাংলা অতি-আধুনিকতারও অনুরূপ নয়—হয়ত স্বগোত্র হইতে পারে। ভাব ও ভাষার অমিতাচার অতি-আধুনিকদের রচনাকে যতটা 'অশ্লীল' করুক বা না করুক অনেকাংশে হাস্যোদ্দীপক করিয়াছে। বর্ত্তমান লেখক মিতাচারী—তিনি কর্ত্তা ক্রিয়া কর্ম্মহীন অতি-আধুনিক টেলিগ্রাফ্ ভাষারীতি অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সেই ভাষা যেন শিথিলগ্রন্থী হইয়া হীনরূপ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক। তাঁহার ব্যাখ্যান 'অতি-আধুনিক' প্রণালীর ; কিন্তু, তিনি বেশ সচেতন যেন এই ব্যাখ্যান লোকের মনে প্রত্যয় জন্মাইতে পারে। তাঁহার গ্রন্থের ভাববস্তুও বাংলা ভাষার পক্ষে নূতন—কিন্তু তিনি এই ভাবটিকে একটি সংযত ও সু-সীম রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হয়ত ভাব-জগতে তিনি আধুনিক, কিন্তু তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছে প্রাচীনের নিকটে। তাই, তাঁহার লেখা অর্ব্বাচীন হয় নাই যে অর্ব্বাচীন কালের সঙ্গেই শেষ হইবে।

এই কথা ঠিক যে, (ইয়োরোপের তরঙ্গাঘাতেই সম্ভবত) বাংলার মনোজগতে একটি যুগান্তর আসিয়াছে। এ যুগের ভাব-জীবন গত যুগের ভাব-জীবন হইতে স্বতন্ত্র। হয়ত এই যুগ জীবনের নিগূঢ় সত্যকে নগ্নরূপেই দেখিতে চায়, তাহার নির্ব্বিশেষ পরিচয় কামনা করে। সাহিত্যে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। জীবনের রহস্য শুধু নিগূঢ়ই নহে, তাহা বিচিত্র, অতলস্পর্শী ও অপরিসীম। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের ও তাঁহার ন্যায় এ যুগের অনেকেরই কাছে জীবনের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদই মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও অত্যন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে—যেখানে মানব-জীবন অনন্ত রহস্যময় প্রণয়-বেদনায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাঁহার চিত্রের পটভূমিকায় রহিয়াছে মোনা লিসার চিররহস্যময় হাসি। কুশলী শিল্পী না হইলে এই রহস্যকে রূপ দান অসম্ভব—বর্ত্তমান লেখক অনেকাংশেই সার্থক হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে তাঁহার ভুল, সেখানেও উদ্দাম বীভৎসতা নাই, সেই ভুল এই যে, মাঝে মাঝে তিনি শিল্পীসুলভ নির্লিপ্ততা (ডিটাচ্‌মেণ্ট) হারাইয়া আবেগকাতর হইয়া পড়িয়াছেন। হয়ত তাঁহার সুন্দর খণ্ড-কবিতার গুঞ্জন তাঁহাকে কবিতার শেষেও মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

গ্রন্থখানির উপজীব্য একদিকে একটি অপরিণত ভাবোন্মত্ত মনের প্রণয়-বেদনা ও অপরদিকে তাঁহার কবি-মনের কল্পনা-তন্ময়তা। এই দুইটির তাগিদে ও বিশেষ করিয়া চারিটি বালিকা ও তরুণীর সংস্পর্শে নায়কের চিত্ত কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তাহাই লেখক বিবৃত করিয়াছেন। চরিত্রাঙ্কন সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু চরিত্র কয়টি বিভিন্ন ছাঁদের বলিয়া সন্দেহ রহিয়া যায়—ছাঁদের বাহিরের সম্পূর্ণ মানুষ যেন পাইয়াও পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার, কিন্তু ইহার অনিন্দ্য প্রচ্ছদ বাঙালী পাঠক ও প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কি ? অলঙ্করণ নিখুঁত হইয়াছে, কিন্তু মোনা লিসার চিত্রই কি এই গ্রন্থের আরো উপযুক্ত প্রচ্ছদ হইত না ?

বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থের কিরূপ সংবর্দ্ধনা হয় আমরা তাহা লক্ষ্য করিব। লেখকের ভাব ভাষা ব্যাখ্যান, সব জিনিষই যেন সাহিত্যের নিকষে সত্যরূপে যাচাই করিয়া লওয়া হয় ইহাই আমাদের কামনা।

ভারদ্বাজ

মেঘদূত—শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য চার টাকা।

নরেন্দ্রবাবু এবার বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে মেঘদূতের অনুবাদ উপহার দিয়াছেন। বইখানি উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ও সুন্দররূপে বাঁধান উপরন্তু বহু রঙীন ছবিতে ভূষিত। নরেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার প্রকাশক শ্রম, যত্ন ও ব্যয়ের কোথাও সংক্ষেপ করেন নাই। ইঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়।

নরেন্দ্রবাবু মেঘদূতের মূল বিষয়টি "সরল বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা" করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ভাষা অধিকাংশ স্থলে, সরল হইয়াছে এবং ছন্দেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট তবুও আমাদের বিশ্বাস তাহাতে 'মেঘদূত' কাব্যের বৈশিষ্ট্যের হানি হইয়াছে। কেন-না মেঘদূতের সৌন্দর্য্য কেবল মাত্র তাহার ভাবে নহে। ছন্দের গতি ও লালিত্য, শব্দ ও স্বরের যথাযথ বিন্যাস, ভাষার গাম্ভীর্য্য, এবং উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট দৃশ্য-বর্ণনের ইন্দ্রজাল—এই সকলই মেঘদূতের মৌলিকত্ব। নরেন্দ্রবাবু বোধ হয় এই সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই।

ক. চ.

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

১। জানোয়ারের কাণ্ড—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। সিটি-বুক সোসাইটি। মূল্য ১৲

২। ছোটদের চিড়িয়াখানা—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটি। মূল্য ১৲

৩। সবুজপাখী—শ্রীসুখময় বসু চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৲

৪। বৌদ্ধ রমণী—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ ডি প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ২।০

৫। শ্রীবৎস—শ্রীমন্মথ রায়, এম এ প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১৲

৬। কর্ম্মভূমি—শ্রীনবচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত। মূল্য ১৲

৭। সোণার পাহাড়—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। আর-এইচ শ্রীমাণি এণ্ড সন্স। মূল্য ২৲

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী মেরি জন, বি-এ—ইনি ত্রিভাঙ্কুরের 'মহারাজা কলেজে' বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। সম্প্রতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট

শ্রীমতী মেরি জন, বি-এ

ইঁহাকে বিলাতে অধ্যয়ন করিবার জন্য বৃত্তি দিয়াছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর 'অনার্স' লইয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

—

শ্রীমতী এফ্. মুথম্মা থিলয়ম্পলম্, পি-এইচ-ডি।—শীঘ্রই আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ও লক্ষ্ণৌএর ইসাবেলা থবার্ণ কলেজে জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিবেন।

সিংহলের জাফনা নামক স্থানে শ্রীমতী থিলয়ম্পলমের জন্ম হয়, এবং তিনি সেখানেই ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাহার পর তিনি লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে অধ্যয়ন করেন। ১৯২০ সনে এম-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করেন এবং তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২২ সনে একটি বৃত্তি লইয়া তিনি আমেরিকায় গমন করেন। তিন বৎসর সেখানে অধ্যয়নের পর ১৯২৮ সনে যখন তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "রীডার ইন জুয়লজি" পদে নিযুক্ত করেন। সেই বৎসরই তিনি "Scolidon (The Common Shark of the Indian Seas)" নামে একখানি পুস্তক এবং "Indian Animal Types" নামে আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় পুস্তকটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক তাঁহার পি-এইচ-ডি পরীক্ষার থিসীস্ রূপে গ্রাহ্য হয়। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম-

শ্রীমতী এফ্. মুথম্মা থিলয়ম্পলম্

ভাগে তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য পুনরায় নিউ ইয়র্কে যান এবং জুন মাসে উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ইনিই প্রথম উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বে ভারতীয় মহিলাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার যোগ্যতা সূচিত হইতেছে।

—

শ্রীমতী দাহিগৌরী দেবী—ইনি বড়োদা মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী দাহিগৌরী দেবী

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ—ইনি পূর্ণিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্‌স্ জজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ঘোষের কন্যা। পাটনা হইতে বি-এ পাশ করিয়া 'টীচার্স ট্রেনিং কলেজে' অধ্যয়ন করেন। ইনি বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি লইয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ

শ্রীমতী প্রভাবতী দাসগুপ্তা, পি-এইচ-ডি—কলিকাতার

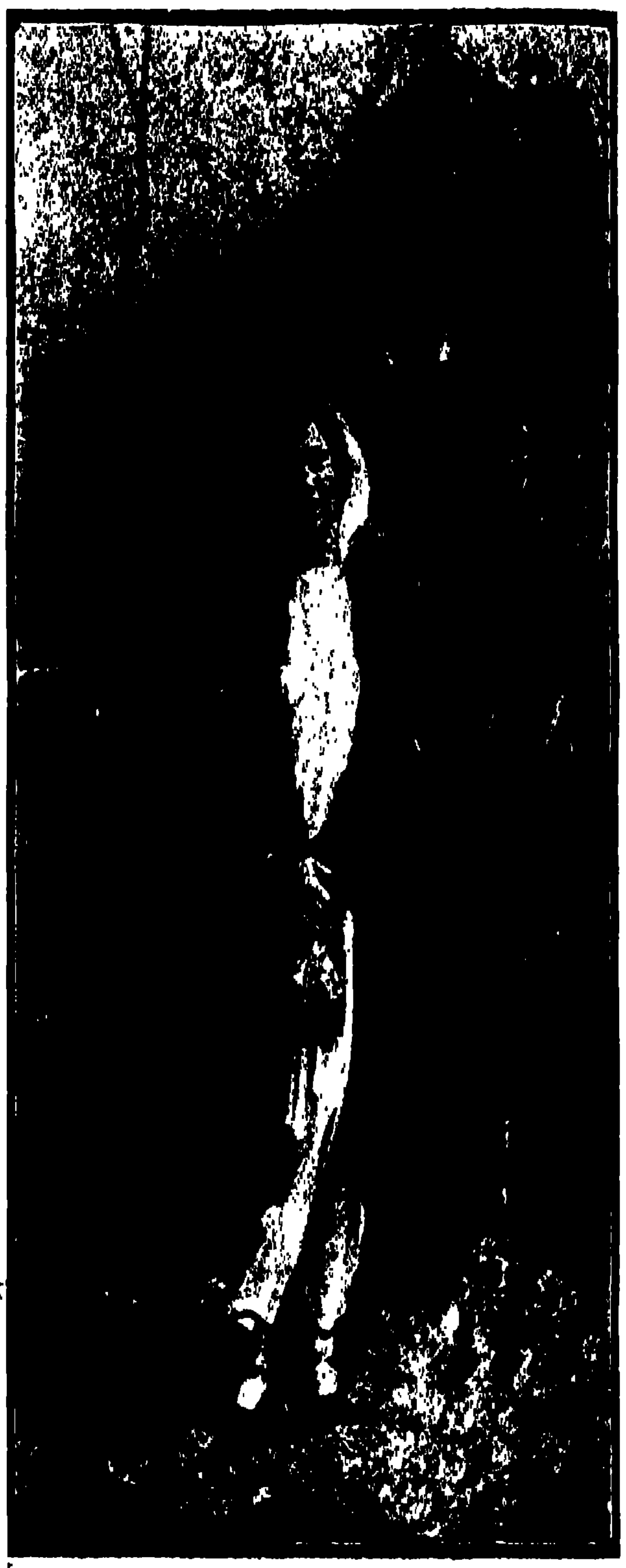

শ্রীমতী প্রভাবতী দাসগুপ্তা, পি-এইচ-ডি

নিকটবর্ত্তী পাটকলগুলির ধর্ম্মঘটে শ্রমজীবীদের জন্য অক্লান্ত চেষ্টার জন্য মজুররা তাঁহাকে মাতাজী আখ্যা দিয়াছে।

শ্রীমতী সি কৃষ্ণা আম্মা—ইনি সৈদাপেট মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

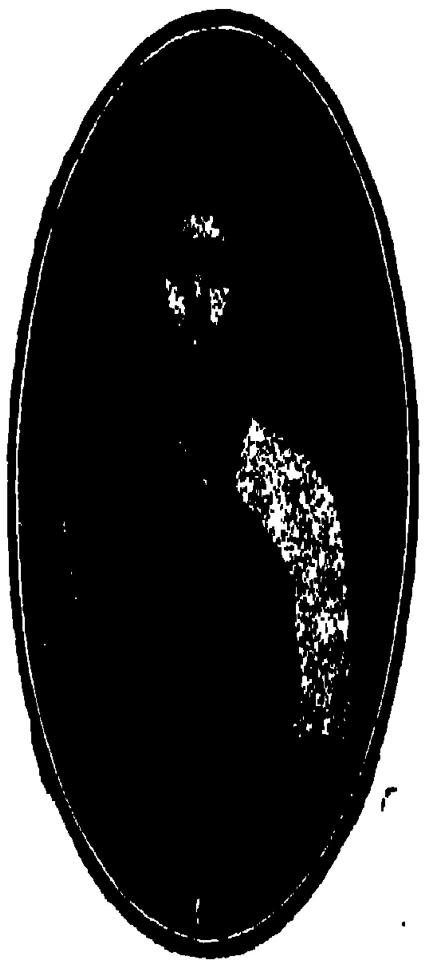

শ্রীমতী সি কৃষ্ণা আম্মা

বিদেশ

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট—

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বলিয়াছেন যে, বিলাতের বর্ত্তমান শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট কিছুই করিতে পারিবে না, এ কথাটা বলা এবং ইহা লইয়া ব্যঙ্গ করা খুব সহজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গভর্ণমেণ্ট হাউস অফ্ কমন্সে সম্পূর্ণ 'মেজরিটি' না থাকা সত্ত্বেও অনেক সমস্যারই উদ্যমের সহিত মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার ও ইংলণ্ডের বেকার সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। কথাটা ঠিক। আমাদের পক্ষে শুধু ভারতবর্ষের দিক হইতেই শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের বিচার করা স্বাভাবিক। কিন্তু এই দিক হইতেও একটা কথা মনে করিয়া রাখিবার আছে। যখন 'সাইমন কমিশন' প্রথম নিযুক্ত হয় তখন ইংলণ্ডের সকল রাজনৈতিক দলেরই উহাতে সম্মতি ছিল। ভারতবর্ষের লোক যে এরূপভাবে ইহার বিরোধী হইবে তাহা তখন কেহই অনুমান করিতে পারে নাই। শ্রমিক দল 'সাইমন কমিশন' সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতেই আবদ্ধ আছে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে এখন 'সাইমন কমিশন'কে নাকচ্ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের একটা গুরুতর সমস্যার ব্যাপার হইলেও, আরও কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে উপস্থিত আছে—তাহাদের মধ্যে প্রধান ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা এবং তারপরই ইংলণ্ড ও আমেরিকার সম্বন্ধ। এই দুই প্রশ্নেরই সমাধানের জন্য ইংলণ্ডের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট পদ-গ্রহণের পর হইতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এই সকল দিক হইতে আজ পর্য্যন্ত মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারিয়াছেন তাহার একটা হিসাব লওয়া ভাল।

প্রথমতঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকার সম্পর্কের কথা। গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যে ব্যাপার লইয়া প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে তাহা নৌবহরের আকৃতি ও সংখ্যা। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন এই ব্যাপার লইয়াই ইংলণ্ড ও জার্ম্মেনীর মধ্যে ১৮৯৫ সন হইতে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে কুড়ি বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড ও জার্ম্মেনীর শত্রুতা এরূপ জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায় যে, ১৯১৪ সনের ঘটনা না ঘটিলেও কয়েক বৎসরের ইংলণ্ড ও জার্ম্মেনীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিতই। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম নৌবাহিনী রাখিতে হইবে ইহা ইংলণ্ডের প্রতিজ্ঞা ছিল। তাহার কারণ কিয়ৎ পরিমাণে জাতীয় গর্ব্ব ও আংশিকভাবে পৃথিবীবিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মেনীর নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত হইল বটে কিন্তু আর একটি নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া দেখা দিল—সে আমেরিকার যুদ্ধপ্রবেশ। যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের রণপোত যে কোনও জাতির বাণিজ্যপোত খানাতল্লাসী করিয়া তাহাতে জার্ম্মেনীর জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম যাইতেছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিত। ইহাতে আমেরিকার অত্যন্ত আপত্তির কারণ হয়। যদি সাবমেরিণের অত্যাচারের জন্য আমেরিকা ও জার্ম্মেনীর মধ্যে বিরোধ না ঘটিত তবে হয়ত অবশেষে আমেরিকার জার্ম্মেনীর সঙ্গে যুদ্ধ না বাধিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গেই বাধিয়া যাইত। যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার ফলে আমেরিকার

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী—মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড

এক দল 'বৃহৎ নৌবহর পন্থী' প্রচার করিতে আরম্ভ করেন যে, আমেরিকারও ইংলণ্ডের সমান অথবা তাহার অপেক্ষাও বড় নৌবাহিনী চাই। তাহার ফলে প্রচুর ধনশালী আমেরিকা এক বিরাট রণপোত-বহর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকার অবশ্যম্ভাবী জয় এবং তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া সকলেরই বৃথা অর্থব্যয় দেখিয়া ১৯২১ সনে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানের মধ্যে ওয়াশিংটনের সন্ধি স্থাপিত হয় তাহাতে স্থির হয় যে,

আমেরিকা ইংলণ্ডের সমসংখ্যক বৃহৎ রণপোত (capital ships) নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। কিন্তু এই সন্ধিতে অন্যান্য রণপোতের কোনও উল্লেখ ছিল না, সুতরাং ১৯২১ সনের পর হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে ক্ষুদ্রতর রণতরী (cruiser) লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্রুজারের সংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলিবার দুই তিন বার বৈঠক বসে। কিন্তু জেনিভা কন্‌ফারেন্স ভাঙিয়া যাওয়ার পর ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে একটা মিটমাটের সম্ভাবনা প্রায় লোপ পায়। সম্প্রতি আমেরিকা ও ইংলণ্ড দুই দেশেই গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভার পদগ্রহণ করিয়াই নিজের দায়িত্বে আমেরিকার কংগ্রেস কর্ত্তৃক পাশ করা আইন মুলতবী রাখিয়া ক্রুজার নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিয়াছেন এবং যুক্তপ্রদেশের দূত জেনারেল ডজকে নৌ-বাহিনী সম্বন্ধে একটা রফা করিবার জন্য আলাপ করিতে আদেশ করেন। এদিকে মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডও এই সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তিনি জেনারেল ডজএর প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ইঁহাদের আলাপের ফলে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সম্প্রতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড লীগ অব্ নেশন্সের সমক্ষে বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে রফা প্রায় হইয়া গিয়াছে। তিনটি বিষয় ছাড়া আর সকল প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে।

কিন্তু এই ব্যাপারে ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্যারিসের দুইটি প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রের দুইজন লেখক বলিতেছেন যে, আমেরিকার সঙ্গে এইরূপ কথা-বার্ত্তা চালাইয়া মিঃ মাকডোনাল্ড ইউরোপে অশান্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়াইতেছেন মাত্র। ইঁহাদের ভয়ের কারণ অবশ্য এই যে, তাহারা মনে করেন ইংলণ্ড ও আমেরিকা একত্রিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতে চাহিতেছে। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য, কারণ অ্যাংলো স্যাকশন জাতির একতা এবং পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য আমেরিকার না হউক ইংলণ্ডের স্বপ্ন।

'লেবার' গভর্ণমেণ্ট এখনও ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিশেষ কোনও ফল দেখাইতে পারেন নাই। তবে এ বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, কয়েকটি উপনিবেশ ইংলণ্ডের বেকার লোকদিগকে জমি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

আর এক দিক হইতে ইংলণ্ডের আর্থিক টানাটানির লাঘব করিয়া বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট খুব জনপ্রিয় হইয়াছেন। ১৯১৯ সনের সন্ধি অনুযায়ী জার্ম্মেণীর নিকট হইতে যে খেসারত আদায় করা হইতেছিল তাহার অধিকাংশই ফ্রান্স পাইতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিরাট দেনা-পাওনার ব্যাপারের একটা মিটমাট করিয়া ফেলিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন একজন আমেরিকান। তিনি জার্ম্মেণীর মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং তাহার নিকট হইতে কোন রাজ্য কত টাকা নিতে পারিবে তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও ইংলণ্ডের ভাগে সর্ব্বাপেক্ষা কম টাকা পড়ে। হেগ্ কন্‌ফারেন্সে ইংলণ্ডের রাজস্বসচিব "ইয়ং প্ল্যানে"র ব্যবস্থা ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ অসমনুমোদিত বলিয়া প্রবল আপত্তি তুলেন এবং আরও বলেন যে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ হইলে ইংলণ্ড জার্ম্মেণী হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহার আপত্তির ফলে ইংলণ্ডের অনেক আর্থিক সুবিধা হইয়াছে, ফলে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট আরও জনপ্রিয় হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইনে সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

প্যালেষ্টাইন 'লীগ অফ নেশন্‌সে'র 'ম্যাণ্ডেট' অনুযায়ী ইংরেজ কর্ত্তৃক 'রক্ষিত', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মত ইংরেজেরই অধীন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের মত সেখানেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিরোধের কারণ ইহুদী ও আরবদের মধ্যে বিরোধ। প্যালেষ্টাইন প্রাচীনকালে ইহুদীদের মাতৃভূমি ছিল। পরে নানা কারণে তাহারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে এবং যেদেশে বসবাস করিতে যায় তাহারই আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। গত যুদ্ধের সময় যখন সকল জাতিরই জাতীয়তা বোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তখন এই পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে ইহুদীজাতিও যোগ দেয়। তখন তুরস্কের সহিত মিত্র-শক্তিবর্গের যুদ্ধ চলিতেছে। প্যালেষ্টাইন তুরস্কের অধীন, সুতরাং শীঘ্রই ইংরেজ অথবা অন্য মিত্রশক্তির অধীনে আসিবার সম্ভাবনা। এই সুযোগ বুঝিয়া ইহুদীগণ দাবী করে যে, তাহাদিগকে একটি দেশ দেওয়া হউক যাহাকে তাহারা তাহাদের জাতির মাতৃভূমি বলিতে পারে। এই আন্দোলনের ফলে ১৯১৭ সনে তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব লর্ড (তখন মিঃ) ব্যালফুর ইহুদীগণকে আশ্বাস দেন যে যুদ্ধের শেষে তাহাদিগকে তাহাদের জাতীয় রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য প্যালেষ্টাইনে জায়গা-জমি দেওয়া হইবে। ইহার ফলে যুদ্ধের পর বহু ইহুদী প্যালেষ্টাইনে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্যালেষ্টাইন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে মুসলমান আরবদের অধীন, আরব প্রভাবে ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আধিপত্য লোপ হইয়া সেখানে আরব রীতিনীতি আচার ব্যবহারই প্রচলিত হইয়াছে। এই অবস্থায় প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের পুনরাগমনে আরবদের মধ্যে ঘোরতর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়াই এই বিরোধ অল্পবিস্তর চলিয়া আসিতেছিল, মাঝে মাঝে রক্তপাতও হইয়াছিল। আরবদের বিশেষ করিয়া লর্ড ব্যালফুরের উপর রাগ ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ব্যালফুর যখন ফরাসীশাসিত সিরিয়ায় বেড়াইতে যান তখন আরব ছাত্রেরা তাহাকে আক্রমণ করে। দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়ে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড ব্যালফুরকে গোপনে অন্যত্র পাঠাইয়া দেন। এতদিনের কলহ এইবার ভীষণরূপে দেখা দিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনের শাসনকর্ত্তা সার-জন চ্যান্সেলারের অনুপস্থিতির সময়ে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে জেরুজালেমের একটি পীঠস্থান লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ ক্রমে সমগ্র প্যালেষ্টাইনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই সম্প্রদায়ের বিরোধে বহু নিরপরাধ নরনারী বালক-বালিকা নিহত হইয়াছে। ইহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের দোষ দিতেছে। আরবগণ ইহুদীদের দোষ দিতেছে। আরবগণ বলিতেছে যে, ইহুদীদের অন্যায় অধিকার দাবীর ফলে প্যালেষ্টাইনে আরবদের দাবী ক্ষুণ্ণ হইতেছে। তাহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও লীগ অব নেশন্‌সের নিকট আবেদন জানাইয়াছে।

এদিকে সংবাদ পাইয়া হাইকমিশনার প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া গিয়াছেন। বহু সৈন্য এবং রণতরী প্যালেষ্টাইনে প্রেরিত হইয়াছে। শীঘ্রই একটি কমিশন এবিষয়ে তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্যালেষ্টাইনে প্রেরিত হইবে। সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, এ পর্য্যন্ত ১০৯জন ইহুদী, ৮৩জন মুসলমান এবং ৪জন খৃষ্টান প্যালেষ্টাইনে নিহত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ

হিন্দুসংগঠন—

ঢাকায় হিন্দুসম্মেলনের অধিবেশনে ডাঃ মুঞ্জে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাহা হিন্দুমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য।

হিন্দুর জীবন মরণের প্রশ্ন এই সংগঠনের প্রস্তাব সমর্থন করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত। আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, স্বরাজ হিন্দুর নিকট সংগঠনে কেন্দ্রীভূত। যে স্বরাজের জন্য আমরা বাঁচি মরি, ভারতবর্ষে যে স্বরাজ অর্থ হিন্দুর বাসস্থান, হিন্দুস্থানের স্বরাজ, তাহা প্রকৃত হিন্দুস্থানেরই থাকিবে। আগামী কল্য যদি হিন্দুস্থান খ্রীষ্টানস্থান বা মুসলমানস্থানে পরিণত হয় এবং আমরা যদি সেই সর্ত্তে স্বরাজ পাই, তবে সে স্বরাজ আমি চাহি না। আমি ২২ কোটি হিন্দুকে বাদ দিয়া স্বরাজ চাহি না, আমি চাহি সংগঠিত ২২ কোটি হিন্দুর স্বরাজ।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যানুপাত ছিল ৫৫ এবং ৪৫, আজ দাঁড়াইয়াছে ৪৫ এবং ৫৫এ। হিন্দুর সংখ্যা যদি এই ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে এবং ২৫ বৎসর পর যদি বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ১০ বা ৫এ দাঁড়ায় তবে স্বরাজে লাভ কি? আমার কথা আমি বলিতে পারি, আমি সে স্বরাজ চাহি না। হিন্দুস্থানকে হিন্দুস্থান রাখিবার জন্যই স্বরাজ লাভ করিতে হইবে, হিন্দুস্থানকে মুস্লিমস্থানে বা খৃষ্টানস্থানে পরিণত করা জন্য নহে।

বঙ্গদেশে সংগঠনের একটা বিশেষ মূল্য আছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের নিকট উহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাহারা যদি এখন হইতে সতর্ক না হয় তবে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সংগঠনের অর্থ হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক হিন্দুকে মুসলমানের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাঙ্গলার সকল সমস্যার চরম সমস্যা নারীহরণ। এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের কোনো স্থানে যদি তোমরা যাও এবং সেই স্থানের লোক যদি জানিতে পারে যে, তোমরা তোমাদের নারীজাতিকে, স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে, ভগ্নীগণকে, এবং জননীগণকে রক্ষা করিতে পার না অথচ স্বরাজ চাহিতেছ, তবে তাহারা বিশ্বাস করিবে না যে, তোমরা মানুষ। তোমাদের প্রতি তাহাদের ঘৃণার সীমা থাকিবে না।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক হিন্দুকে সৈনিক হইয়া জন্মিতে হইবে, তাহাকে নারীর রক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নারীদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই, শুধু পুরুষদেরই উপর নির্ভর করিও না। আত্মরক্ষা করিতে শিখ। কোনো সময় হয়ত এরূপও হইতে পারে যে, স্বামী বা ভ্রাতা গৃহে নাই। সে তোমাদের উপর আক্রমণ হইতে পারে। সে সময় তোমাদের মধ্যে যাহারা যুবতী তাহারা যেন গৃহ ও শিশুদিগকে রক্ষা করিতে পার।

একাদশ বর্ষীয়া একটি বালিকাকে পাঁচ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেখিয়া আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই উদাহরণ দৃষ্টে যদি বালিকাদিগকে লাঠি, তরবারি এবং ছোরাচালনা শিক্ষা দেওয়া যায় তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাহারা আত্মরক্ষার্থ অধিকতর প্রস্তুত থাকিবে, অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত আত্মীয় ও প্রতিবেশী পুরুষগণ তাহাদের সাহায্যার্থ না আসিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। সংগঠনের অর্থ ইহাই। বিভিন্ন প্রদেশে ইহার বিভিন্ন দিক আছে। সংগঠনের আর একটা দিক এই যে, প্রত্যেক স্থানে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে, অন্য লোককে হিন্দুসমাজে টানিতে হইবে। জীবনসংগ্রামে হিন্দুরা যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যদি নারীগণকে রক্ষা করিতে পারে তবে ভগবান তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, সমগ্র ভারতকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

কাশীর স্ত্রীমহামণ্ডল—

গত ১ই ভাদ্র কাশী ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন নির্ব্বাহ হইয়াছে। সভাস্থলে প্রায় দুইশত ভদ্রমহিলা ও বালিকাগণ সমবেত হইয়াছিল। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সভানেত্রী ও শ্রীমতী স্নেহলতা চৌধুরী সম্পাদিকা ও শ্রীমতী নির্ম্মলা সান্যাল শিল্প-বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষার সাহায্যে এই মণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। শ্রীমতী শোভনা নন্দী প্রথমে দুইবৎসর সহকারী সম্পাদিকার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন এই মণ্ডলের আরও ১৩জন মহিলা মেম্বর আছেন তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করেন। ইহাতে প্রতি মাসে একবার করিয়া অধিবেশন হয়। তা ছাড়া সাপ্তাহিক সম্মিলনীও হইয়া থাকে। সেখানে শিল্প, সেলাই, কাট-ছাঁট, ইতিহাস ধর্ম্মগ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি পাঠ হইয়া থাকে অপর কয়েকটি বিধবাকে সাহায্যদ্বারা লেখাপড়া, তাঁত এবং ছাঁট-কাট সেলাই শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী স্বাবলম্বী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া গরীব বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য করা হয়।

স্বরলিপি

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II পা র্সা র্সা । র্স না ধা পা I পা -ক্ষা ধা। ধ পা পা -ক্ষা I
য ব বি জ য়ে র কে ০ ত ন উ ০

I গক্ষা -গা গা। গা -া -ক্ষা I নধা -া ধা। ধনা -া ধা I ধর্সা -া র্সা।
ড়া ও হে শূ ০ ০ ন্যে ০ উ ড়া ও উ ড়া ও হে

॥

।র্সা র্সা না I ধপা -া পা। প ক্ষা পা -া I ধা -া পা। প ধা পা -ক্ষা I
প্র ব ল প্রা ণ্ ধূ লি রে ০ ধ ০ ন্য ক র ০

I পাঃ -ক্ষধঃ পা। প মা মা -া I -া -া মা। মা মা -া I মা -া মা। মা -া মা I
ধ ০০ ন্য ক র ০ ০ ০ ক রু ণা র্ পু ০ ণ্যে ধ ০ ন্য

I মগা মা -গা। গক্ষা পা -া I সা -া সা। রা রা -সগা I গা -া -া। -া -া -া II
ক র ০ ক ০ র ০ হে ০ কো ম ল ০০ প্রা ০০ ০ ০ ণ্

-া। -া -া -া II র্সা -া র্গা। র্গ র্রা র্সা -া I র্সা -না র্রা। র্র র্সা নধা -পা I
০ ০ ০ ০ মৌ ০ নী মা টি র্ ম র্ মে র গা ন্

I পা পা -ধা। -না -া -া I নর্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা না। -া -া -া I
ক বে ০ ০ ০ ০ উ ঠি বে ধ্ব নি য়া ধ্ব নি য়া ০ ০ ০

I না -া র্রা। র্র র্সা র্সা না I ধনা ধপা -া। -া -া -া I পর্সা র্সা না। ধা পা পা I
ম র্ ম র র ব র বে ০ ০ ০ ০ মা ধু রী ভ রি বে

I পক্ষা পধা ধপা। মা মা -া I মা মা -া। মা মা -া I মা -গা -পক্ষা।
ফু লে ফ লে প ল্ ল বে ০ ফু লে ০ ফ ০ ০০

।পা -া -া I পর্গ -া র্গা। র্গা র্গা -া I র্রা -া র্সা। র্সা র্সা -া I র্গ না -া র্রা।
লে ০ ০ হে ০ মো হ ন ০ প্রা ণ্ ধূ লি রে ০ ধ ০ ন্য

।-র্র র্সা র্সা -না I ন ধা -র্সা র্সনা। ন ধা পা -া I -মা -া মা। মা মা -া I
ক র ০ ধ ০ ন্য ক র ০ ০ ০ ক রু ণা র্

I মা -া মা। মা -া মা I মগা মা -গা। গপক্ষা পা -া I সা -া সা। রা রা -সরা I
পু ০ ণ্যে ধ ০ ন্য ক র ০ ক র ০ হে ০ কো ম ল ০০

গা -া -া। -া -া -া II
প্রা ০ ণ্ ০ ০ ০

II { মা মা মা। মা -া মা I মা -পা -মা। পা পা -মা I মা পা -ধপা। ^পমা পা ধা I
পথি ক ব ন্ধু ছা য়া র্ আ স ন্ পা তি ০০ এ স ০

I ^মমা পা মা। পা ^পমা -পা I মা -পা -া। -া -া -া } I { মা পা পা।
এ স শ্যা ম সু ন্ দ র্ ০ ০০০ এ স বা

। পা পা -মা I পা ধা না। না ^নধা -না I ধা ধা -না। ^নধা পা -ধা } I
তা সে র্ অ ধী র খে লা র্ সা থী ০ এ স ০

I মা পা -া। পধা ^ধপা -া I মগা -া -া। -া -া -া I র্সর্গা র্গা -া। র্রা র্রা -না I
মা তা ও নী লা ম্ ব ০ র্ ০০০ উ ষা র্ জা গা ও

I নর্রা ^র্সর্সা -া। না ধপা -া I পা পধা -না। না -া -া I র্সা -া র্সা। -া র্সা -া I
শা খা য়্ গা নে র্ আ শা ০ ০ ০ ০ স ন্ ধ্যা র্ আ ০

I না -া -া। ধনা -র্সনা -ধনা I ধপা -া -া। মা -া -া I মা মা মা। মা মা মা I
লো ০ ০ আ ০০ ০০ লো ০ ০ ০ ০ ০ বি রা ম গ ভী র

I মা মা -া। মা মা -া I মা -া -া। মা -পা -পমা I পা -া -া। -া -া -া I
ভা ষা ০ র চি ০ দা ০ ও রা ০ ০০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া পা। ধা পা মা I মধা পা -া। মা মা -পা I গপা -া -া।
স্ব প্ ন গী তে র্ বা সা ০ র চি ০ দা ০ ও

। -া -া -া I পর্গা -া র্গা। র্গা র্গা -া I র্রা -া র্সা। র্সা র্সা -া I ^র্সনা -া র্রা।
০ ০ ০ হে ০ উ দা র ০ প্রা ণ্ দি য়ে ০ ধ ০ ন্য

। ^র্রসা সা -না I ^নধা র্সা র্সনা। ^নধা পা -া I -মা -া মা। মা মা -া I
ক র ০ ধ ০ ন্য ক র ০ ০ ০ ক ল্ পা র্

I মা -া মা। মা -া মা I মগা মা -পা। গপমা পা -া I সা -া সা।
পূ ০ র্ণ ধ ০ ন্য ক র ০ ক র ০ হে ০ কো

। রা রা -সরা I গা -া -া। -া -া -া II II
ম ল ০০ প্রা ০ ণ্ ০ ০ ০

স্বাধীনতা লাভের উপায়

যাহারা স্বাধীনতা কথাটা বা নিজেদের ভাষায় উহার প্রতিশব্দ শুনে নাই বা উচ্চারণ করে নাই, কিম্বা উহার মানেও বুঝে না, তাহারাও শৈশব হইতে বাস্তবিক স্বাধীন হইতে চায়—নিজেরা নিজেদের চেষ্টায় কিছু করিতে ও হইতে চায়। স্বাধীনতার ইচ্ছা স্বাভাবিক। পরাধীন ভারতীয়েরা স্বাধীন হইতে চায়। কিন্তু কি উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ঠিক কোন একটি অব্যর্থ উপায়ের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না।

কেহ কেহ দেশের জন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান, কেহ বা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস্ বা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। যাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান, তাঁহারাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অনেকে একেবারেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান, মাঝখানের কোন ধাপ চান না, আবশুক মনে করেন না, বরং এরূপ আধ-রাস্তার কোন প্রকার অধিকারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের একটা বাধা মনে করেন। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকেই লক্ষ্যস্থল মনে করি। যদি তাহার সমস্তটা এক কিস্তিতেই লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহা ত খুব সুখের বিষয়। কিন্তু যদি তাহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কিছু পাওয়া—যেমন ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস্ পাওয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার পথে একটা বাধা মনে করি না। কেন না, আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় যখন আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্ত আন্দোলন ও চেষ্টা করিতে পারিতেছি, তখন ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস পাইলে সেই আন্দোলন ও চেষ্টা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিব। ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস পাইলেই যে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার ইচ্ছা বিলীন হইবে, তাহাও সত্য নহে। এ বিষয়ে সত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত কল্পনা বা অনুমানের প্রয়োজন নাই। কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলি বিদেশী স্বাধীন দেশে দূত প্রেরণ, তাহাদের সহিত বাণিজ্যিক সন্ধি স্থাপন প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতির অধিকার অনুযায়ী কাজ ক্রমে ক্রমে করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে; তাহারা নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া নিশ্চেষ্ট ও অলস নাই।

কিন্তু আমরা একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার সমর্থনই করি, তাহার বিরোধী নহি—অবশ্য যদি তাহা অহিংস হয় এবং অন্ত সব দিকে ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে করা হয়। আমাদের মতের বিশেষত্ব এইটুকু, যে, আমরা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস লাভকে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের একটা বিঘ্ন মনে করি না। যাঁহাদের মত আমাদের মতন, এরূপ লোক ভারতবর্ষে আরও হয় ত আছেন।

অল্প বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপায় সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা লাভকে প্রধান সব দলই বাদ দিয়া রাখিয়াছেন। আমরাও বাদ দিয়া রাখিয়াছি। কারণ, ইহা ইতিহাসসম্মত উপায় হইলেও, স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম ও যুদ্ধের জন্ত শিক্ষিত যথেষ্ট সাধারণ সৈন্ত ও নেতা সংগৃহীত নাই এবং সংগ্রহ করাও বর্ত্তমান অবস্থায় অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। তদ্ভিন্ন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিক আপত্তিও মহাত্মা গান্ধী ও অন্ত কোন কোন নেতার আছে। আমাদের অন্ত রকমের আপত্তিও আছে। কিন্তু সকলেই যুদ্ধের বৈধতা বা সাফল্যে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে মনে করিলে ভুল করা হইবে। এই অল্প দিন আগেও অন্ধ্রদেশীয় যুবক রামরাজু যুদ্ধ দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে গবন্মেণ্টের

কিছু সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা যে ব্যর্থ হইবে তাহা যুদ্ধবিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেরা আগে হইতেই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা হইতে বুঝা যায়, যে, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিবার অন্ততঃ কিছু লোক দেশে আছে। তাঁহাদের সাহস, স্বদেশপ্রেম ও চেষ্টাকে সফলতার পথে চালিত করা নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য।

উদারনৈতিকেরা মনে করেন, জনমতের চাপের দ্বারা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে মন্দ কি? কিন্তু আমাদের ধারণা অন্য রকম। যাহা হউক, যদি জনমতের দ্বারাই কতকটা স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই ব্যাপক ও প্রবল জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য উদারনৈতিকরা ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন না? এরূপ একটা কথা শোনা যায়, যে, আজকাল কংগ্রেসওয়ালা অর্থাৎ স্বরাজী ছাড়া আর কাহারও কথা কেহ শুনিতে চায় না। কিন্তু সেটা ভুল। কংগ্রেস বা স্বরাজীদলের নহে, এমন অনেক কাগজেরও বেশ কাটতি আছে। কংগ্রেসওয়ালা বা স্বরাজী নহে এমন বক্তাদের বক্তৃতাও লোকে শুনে, ইহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। সুতরাং উদারনৈতিকদেরও রাজনৈতিক বিষয়ে জনশিক্ষার যথেষ্ট জায়গা আছে। অবশ্য ধামাধরা হইলে চলিবে না।

অসহযোগী, কংগ্রেসওয়ালা ও স্বরাজীদের মত একটু অন্য রকমের। তাঁহারা মনে করেন, যে, যদি বিলাতী পণ্যদ্রব্যের (প্রধানতঃ বিলাতী কাপড়ের) কাটতি বন্ধ করিয়া বা খুব কমাইয়া কার্য্যতঃ প্রমাণ করা যায়, যে, ভারতে ইংরেজের প্রভুত্ব রক্ষা আর যথেষ্ট লাভজনক নহে, এবং তদুপরি অহিংসভাবে আইন অমান্য করিয়া শাসন-যন্ত্র অনেকটা বিকল করিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্বরাজ্য লব্ধ হইতে পারে। স্বাধীনতালাভের এই উপায়ের সপক্ষে অনেক বলিবার আছে। বিদেশী পণ্যকে অনাবশ্যক করিয়া তোলার চেষ্টা অনেক উদারনৈতিকও সমর্থন করেন। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালা স্বরাজীরা এবিষয়ে প্রবল চেষ্টা অন্ততঃ এখন করিতেছেন না। সরকারী বা বেসরকারী কোন লোকের উপর শারীরিক বল প্রয়োগ বা অন্তবিধ কোন বিদ্বেষমূলক যন্ত্র প্রয়োগ না করিয়া আইন অমান্য বা লঙ্ঘন করিবার ব্যাপক প্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলে যে অদম্য স্বাধীনতালিপ্সা, দুঃখসহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার ও সাত্ত্বিকতার প্রয়োজন, তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার বিশেষ কোন চেষ্টা দেখিতেছি না। স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইংরেজীতে শব্দাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

—

মোকদ্দমার বাহুল্য ও চারিত্রিক পরিবর্ত্তন

ষ্ট্যাম্প বিক্রী করিয়া গবর্মেণ্টের যে আয় হয়, তাহা প্রধানতঃ মোকদ্দমা হইতেই হয়। দলিল রেজিষ্টারী করিবার জন্য, নানাবিধ দলিল আইনসিদ্ধ করিবার জন্য, রসীদ দিবার জন্য, টাকা ধার করিবার জন্য এবং আরও কোন কোন রকম বৈষয়িক ব্যাপারে ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু মোকদ্দমার জন্যই ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। ডাকমাশুলের ষ্ট্যাম্পের সরকারী আয় আলাদা।

ষ্ট্যাম্প বিক্রী হইতে সরকারী আয় গত ১৯১২-১৩ সাল হইতে কিরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখাইব। কেবল সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের এবং বঙ্গের অঙ্কগুলিই দিব। অন্যান্য প্রদেশের আয়ের সহিত বঙ্গের আয়ের বিস্তারিত তুলনা করিব না; কেবল বলিয়া রাখি, বঙ্গেই সকলের চেয়ে বেশী ষ্ট্যাম্প বিক্রী বরাবর হইয়া আসিতেছে।

বৎসর	ভারতবর্ষ	বাংলা দেশ
১৯১২-১৩	৭৬০৩৬৭২৬	২০৭৪৩৮৫৩
১৯১৩-১৪	৭৯৭৭৪৩৮৭	২১৯১০৮৩১
১৯১৪-১৫	৭৬২৩০৬৫০	২০২৬৮২৬৫
১৯১৫-১৬	৮১৫০৪৪৮৭	২২৪৩৭৩৪০
১৯১৬-১৭	৮৬৬৫০৪৩৭	২৪১৫১৯৭০
১৯১৭ ১৮	৮৫৯১১৮৩০	২৫২১১৮৩০
১৯১৮-১৯	৯০২৮৪৬৫৩	২৪৯৬৫২৫০
১৯১৯-২০	১০৯১১৭৬৬৫	৩০০৫৭৮৮৪
১৯২০-২১	১০৯১৬৮৪৮৩	২৮২২৯১৭৪
১৯২১-২২	১০৮৮০৬৮৫২	২৭৩৮৪৪৯০
১৯২২-২৩	১১৯৫১৬৭৪০	৩০২২৩৬১৯
১৯২৩-২৪	১২৭১০৫৫৭৩	৩১৬৭৪৭৩৫
১৯২৪-২৫	১২২৬৯১৩০১	৩৩৬৬৭৭৫৭
১৯২৫-২৬	১৩৬৫৭৯৮১০	৩৫৭৯৮১০৯
১৯২৬-২৭	১৩১৯৬২০৭২	৩৩১৬০০৭১

সমুদয় ভারতবর্ষের ১৯২৬-২৭ সালের পরবর্ত্তী কোন বৎসরের ষ্ট্যাম্পবিক্রীর হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

ষ্ট্যাম্পের আয় সমগ্র ব্রিটিশভারতে বা বঙ্গে এ যাবৎ কেবল বাড়িয়াই চলিতেছে, এরূপ বলা যায় না। কারণ, কোন কোন বৎসর তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা আয় কম হইয়াছে। কিন্তু কোনও পাঁচ ছয় বা নয় দশ বৎসরের হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে, ষ্ট্যাম্পের আয় বাড়িয়াই চলিতেছে। ১৯১২-১৩ সালে সমগ্র ভারতে এই আয় ছিল ৭৬০৩৬৭২৬; তাহা বাড়িয়া ১৯২৬-২৭ সালে হয় ১৩১৯৯২০৭২। বঙ্গে ১৯১২-১৩ সালে ২,৭৪৩,৫৩ টাকা ছিল; তাহা বাড়িয়া ১৯২৬-২৭ সালে হইয়াছিল ৩৩১৬০০৭১।

পাঠকেরা আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। সরকারী আদালত বর্জ্জন অসহযোগ আন্দোলনের কার্য্যতালিকার অন্তর্গত ছিল। কতকগুলি প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ আইন-জীবী আইনের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক বাদী ও বিবাদীও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মোটের উপর তাহাতে মোকদ্দমা আদি হইতে গবর্ণমেণ্টের যে আয় হয়, তাহা কমে নাই দেখা যাইতেছে—যদিও আমরা অসহযোগ আন্দোলনের প্রবলতম অবস্থার সময়ে শুনিয়াছিলাম, যে, মোকদ্দমা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিছু যে কমিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু হ্রাসের পরিমাণ সম্বন্ধে অনুমান ঠিক্ হয় নাই।

মোকদ্দমার ষ্ট্যাম্পের জন্য সর্ব্বসাধারণের যে ব্যয় হয়, তাহার অনেক অংশ যে জাতীয় অপচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, লোকেরা যদি ন্যায়পরায়ণ হইত, তাহা হইলে অনেক বিবাদের কোন কারণ ঘটিত না। বিবাদ ঘটিলেও যদি তাহা আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত, তাহা হইলে ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা হইত না। ষ্ট্যাম্পের ব্যয়ই মোকদ্দমার একমাত্র ব্যয় নহে। ব্যারিষ্টার উকীল মোক্তারদের পারিশ্রমিক, সাক্ষীদের আইননির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য প্রভৃতিও উহার অন্তর্গত। মোকদ্দমা না হইলে আইনজ্ঞেরা তাঁহাদের প্রাপ্য পাইতেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী লোকেরা অন্য প্রকারে স্বীয় ও জাতীয় ধন বৃদ্ধি করিতে পারিতেন।

মোকদ্দমা করিলে, এবং সেই কারণে বিচার বিক্রয় করিয়া সরকারের আয় বাড়িলে, তাহাতে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে মনে করিবার কোন কারণ নাই।

সকল ব্যাপারের দুটা দিক্ থাকিতে পারে। মোকদ্দমা বৃদ্ধি এবং বিচার বিক্রয় দ্বারা সরকারী আয় বৃদ্ধিরও ভাল মন্দ দুটা দিক্ থাকিতে পারে। একটা ভাল দিক্ সম্ভবতঃ এই হইতে পারে, যে, আগে হয়ত এমন অনেক লোক ছিল যাহাদের অভিযোগ থাকিলেও তাহারা প্রবলের বিরুদ্ধে, ধনীর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে সাহস পাইত না, নীরবে সহ্য করিত; এখন তাহাদের সাহস বাড়ায় তাহারা নালিশ করিতেছে, সুতরাং মোকদ্দমা বাড়িতেছে। সত্য সত্যই ইহা মোকদ্দমা বৃদ্ধির একটা কারণ কি না বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও দেখিতে হইবে, আদালতে ন্যায়বিচার শতকরা কতগুলি মোকদ্দমাতে হয়, কতগুলিতে হয় না। এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাদের পক্ষে মত প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তবে আমরা শুনিয়াছি, যে, অনেক স্থলে যে বেশী টাকা খরচ করিতে পারে, তাহারই জিতিবার সম্ভাবনা ঘটে; সুতরাং সে সব স্থলে ন্যায়বিচারের সম্ভাবনা খুব বেশী বলা যায় না। যদি বেশী টাকা খরচ করিলে মোকদ্দমা জিতিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ধনী ও প্রবল লোকদের চরিত্রে অন্যায়প্রিয়তা বাড়িবার একটা কারণ জন্মে, এবং অপেক্ষাকৃত গরীব ও দুর্ব্বলের ভীরুর মত অন্যায় সহ্য করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস জন্মে। ইহা জাতীয় চরিত্রের অবনতির একটি কারণ হইয়া উঠিতে পারে।

ঘোড়দৌড়ে বাজী রাখিয়া জিতিবার আশা যেমন একটা নেশায় পরিণত হয়, মোকদ্দমায় জিতিবার অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মোকদ্দমাপ্রিয়তা সেইরূপ অনেকের একটা নেশা। গ্রাম্য জীবনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা বেশী না থাকায় শহরে আসিয়া মোকদ্দমা চালান কতকগুলি লোকের এক রকম ব্যসন। যাহারা মোকদ্দমার বাদী বা বিবাদী, আসামী বা ফরিয়াদী নহে, কতকগুলি এমন লোককেও এই ব্যসন

পাইয়া বসে। ইহাতে পল্লীসমাজের ও জাতীয় চরিত্রের অধোগতি হয়।

ব্রিটিশ ন্যায়বিচার যে মহার্ঘ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিজেরা আপোষে বিবাদ মিটাইতে না পারা এবং তজ্জন্য উচ্চমূল্যে আদালতের বিচার ক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায় গৌরব বৃদ্ধি হয় না। অবস্থা অন্তরূপ হইলে তাহাতে জাতীয় আত্মসম্মান বাড়িত।

প্রাচীন কালে কোন কোন বিদেশী পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের লোকদের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা সত্যবাদী। এখন এ বিষয়ে অধোগতি হইয়া থাকিলে তাহা নানা কারণে ঘটিয়াছে। চাতুরী, প্রতারণা, মিথ্যাকথন. দুর্ব্বলের আত্মরক্ষার ও বাঁচিয়া থাকিবার একটা উপায়। কোন জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিলে তাহার চরিত্রে এই দোষগুলি জন্মে। আদালতে মোকদ্দমা জিতিতে হইলে যেরূপ সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, তাহাতে মিথ্যাবাদিতা বাড়িবার সম্ভাবনা ঘটে। আমাদের মামলা মোকদ্দমার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য। সুতরাং যাহা লিখিতেছি, তাহা বেশীর ভাগ শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া। একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী বিচারক বলিতেন, "No case can lie unless the parties lie", "উভয়পক্ষ মিথ্যা না বলিলে কোন মোকদ্দমা দাঁড়াইতে পারে না।" এই উক্তির মধ্যে ব্যঙ্গের অংশ কতটা এবং খাঁটি তথ্য কতটা বলিতে পারি না। কিন্তু কথাটা বোধ করি সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। যাঁহারা বিচারক নহেন, নিজেদের জন্য মোকদ্দমা করেন না, সামাজিক হিতের জন্য অত্যাচরিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমা চালান, এরূপ লোকদের মুখে শুনিয়াছি, সম্পূর্ণ সত্য ঘটনাকেও আদালতে বিশ্বাসযোগ্য করিতে হইলে কিছু সাজাইতে হয়। বস্তুতঃ আদালতে বিচারকেরা অনেকস্থলে ঘটনাবলী যেরূপ ন্যায়শাস্ত্রসম্মত ভাবে ঘটিলে তাহা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, বিশ্বাস করিতে হইলে মানুষের শান্ত বা উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্ত্তা যেরূপ হওয়া দরকার মনে করেন, ঘটনাবলী ও কথাবার্ত্তা ঠিক সেরূপ হয় না, কিংবা মানুষ তেমন করিয়া মনে রাখে না। সুতরাং আদালতে সত্যের অপলাপ ঘটে। এই কারণে জাতীয় চরিত্রের কিছু অধোগতি ঘটিয়া থাকিবে।

রাজনৈতিক মামলা ও জাতীয় চরিত্র

রাজনীতিঘটিত আইন এবং তদনুযায়ী মোকদ্দমাতেও জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটে। শাসনপ্রণালী ও তাহার ফল, শাসকসম্প্রদায় ও তাহাদের কার্য্যের ফল, শাসন-প্রণালী ও শাসকসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও তাহার ফল—এই-সব সম্বন্ধে এমন অনেক সত্য কথা আছে, যাহা বলিলে দুঃখ পাইতে হয়, আইন অনুসারে দণ্ডিত হইতে হয়। এই কারণে, মানুষ সোজাসুজি স্পষ্ট সত্য কথা না বলিয়া তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে শিখে, কিংবা আরও বেশী কপট হইয়া সত্যের বিপরীত মিথ্যা বলে। একেবারে চুপ করিয়া থাকিলেও এক প্রকার কপটাচরণ হয়। এই যে ভীরুতা ও কপটাচার, ইহা পরাধীন দেশে বেশী দেখা যায়।

কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধ সম্বন্ধীয় আইনের বেশী কঠোরতার বা অধিক পরিমাণে প্রয়োগের প্রতিক্রিয়াও হয়। ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে সিডিশ্যন (বা "রাজদ্রোহ") নামক অপরাধের জন্য নির্দ্দিষ্ট শাস্তি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আইনের ধারায় কিছুই কমান হয় নাই। এবং আগে সিডিশ্যন অপরাধে যত লোকের মোকদ্দমা হইত ও যত লোকের শাস্তি হইত, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী লোকের শাস্তি হইতেছে। কিন্তু তথাপি উত্তরোত্তর বেশী লোকে স্পষ্ট সত্য কথা বলিতেছে। হয়ত আগে প্রথম প্রথম লোকে সিডিশ্যনের জন্য শাস্তি হওয়ার ভয় পাইত; এখন ক্রমশঃ অধিকতর লোকের সেই ভয় ভাঙিয়া যাইতেছে, এবং তাহারা তাহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিতেছে। সুতরাং সিডিশ্যন আইন ও সিডিশ্যনের মামলা মানুষকে কেবল যে আতঙ্কগ্রস্তই করিয়াছে, তাহা নয়।

—

ভারতবর্ষে প্লেগ

অসাধারণ হওয়াটা কখন গৌরবের, কখন বা অগৌরবের বিষয়।

আধুনিক সময়ে প্লেগ্ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ অসাধারণ দেশ। ত্রিশ বৎসরের উপর হইল ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগে প্লেগের আবির্ভাব হয়। এখনও উহা তিরোহিত হইল না। এ যুগে অন্য কোন দেশে এই ব্যাধি এত বৎসর ধরিয়া নিজের সংহার কার্য্য করিতেছে না।

১০ই আগষ্ট ২৫শে শ্রাবণ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতবর্ষে ১০৭০ জনের প্লেগ হইয়াছিল এবং ৫৯৯ জনের প্লেগে মৃত্যু হইয়াছিল।

—

বঙ্গে নারীনিগ্রহ

বাংলা দেশে অনেক পরিবারের মধ্যে অন্তঃপুরে যে নারীনির্য্যাতন হয়, তাহার অধিকাংশের জন্য আদালতে মোকদ্দমা হয় না, সে সকলের বৃত্তান্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না। ঘরের বাহিরে যে সকল অত্যাচার হয়, তাহারও সবগুলির বৃত্তান্ত লোকে জানিতে পারে না। লোকনিন্দার ভয়ে, দুর্দ্দান্ত দুর্বৃত্তদের ভয়ে, কিংবা মোকদ্দমা চালাইবার মত আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় অনেকে নীরবে অত্যাচার সহ্য করে। তাহা সত্ত্বেও যত অত্যাচারের মোকদ্দমা হয়, বা যাহার খবর কাগজে বাহির হয়, তাহার সংখ্যাও সাতিশয় ভয়াবহ। "সঞ্জীবনী" পাঁচ বৎসরের এইরূপ ঘটনার তালিকা দিয়াছেন। তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। "সঞ্জীবনী" লিখিতেছেন :—

"বাংলার পুরুষদের কলঙ্ক কালিমা।

"নারীনিগ্রহের শোচনীয় বিবরণ।

"১৩২৯ সাল হইতে ১৩৩৩ সাল পর্য্যন্ত নিগ্রহের তালিকা।

"যে সকল নারী নিগ্রহের সংবাদ আমরা পাইয়াছি, তাহারই তালিকা প্রকাশিত হইল। ইহা ব্যতীত কত বিবরণ অপ্রকাশিত রহিয়াছে ও অজ্ঞাতে আরও কত নারী নিগ্রহ হইয়াছে, তাহা কে জানে। পাঁচ বৎসরে মোট ১০৩৩ জন নারী নিগৃহীত হইয়াছে।"

ইহার পর তালিকাগুলি দিতেছি।

নিগৃহীতা কুমারী		নিগৃহীতা সধবা		নিগৃহীতা বিধবা	
বয়স	সংখ্যা	বয়স	সংখ্যা	বয়স	সংখ্যা
৩ বৎসর	১ জন	১১ বৎসর	১ জন	১৩ বৎসর	১ জন
৪ "	১ "	১২ "	৬ "	১৪ "	৯ "
৫ "	৫ "	১৩ "	১৮ "	১৫ "	৬ "
৬ "	৫ "	১৪ "	২৯ "	১৬ "	৯ "
৭ "	৫ "	১৫ "	২৮ "	১৭ "	১ "
৮ "	১৫ "	১৬ "	২৬ "	১৮ "	৪ "
৯ "	৮ "	১৭ "	১৩ "	২০ "	৩ "
১০ "	১৪ "	১৮ "	১৫ "	২২ "	৪ "
১১ "	৬ "	১৯ "	৪ "	২৪ "	১ "
১২ "	৭ "	২০ "	৫ "	২৫ "	৫ "
১৩ "	৭ "	২১ "	৪ "	৩০ "	৩ "
১৪ "	৬ "	২২ "	২ "	৩৫ "	১ "
১৫ "	৩ "	২৪ "	১ "	৪৫ "	২ "
		২৫ "	১ "		
		৩০ "	১ "		
		৩৫ "	১ "		
অজ্ঞাত	১৮ "	অজ্ঞাত	৩১০ "	অজ্ঞাত	৮২ "
মোট	১০১ জন	মোট	৪০৭ জন	মোট	১৩৯ জন

৮ ও ১০ বৎসরের বালিকাই অধিক সংখ্যক নিগৃহীত হয়। সুতরাং নিগৃহীতা কুমারীর মধ্যে শতকরা ১৫ জনের বয়স ৮ বৎসর এবং শতকরা ১৪ জনের বয়স ১০ বৎসর।

শতকরা ৬'২ জন ১৪ বৎসর বয়সের সধবা, শতকরা ৬ জন ১৫ বৎসর বয়সের ও শতকরা ৫'৬ জন ১৬ বৎসর বয়সের সধবা নিগৃহীত হয়।

শতকরা ৬১ জন ১৪ ও ১৬ বৎসর বয়সের বিধবা নিগৃহীত হয়।

কুমারী, সধবা ও বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন কুমারী, ৪৫২ জন সধবা ও ১২'৭ জন বিধবা নিগৃহীত হয়।

যাঁহারা নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও খবর রাখেন, তাঁহাদের ও আমাদের এইরূপ ধারণা আছে, যে, বিধবাদের উপর অত্যাচারই দুর্বৃত্ত লোকেরা বেশী করিয়া থাকে। কিন্তু তালিকাতে দেখা যাইতেছে, অত্যাচরিতাদের মধ্যে সধবার সংখ্যাই বেশী। পরের একটি তালিকায় দেখা যাইবে, যে, কুমারী, সধবা, কি বিধবা, জানা নাই, এরূপ অত্যাচরিতাদের সংখ্যা ৩৩৪। সম্ভবতঃ ইঁহাদের অধিকাংশই বিধবা। এরূপ হওয়াও সম্ভব, যে, অনেকস্থলে অত্যাচরিতা বিধবা বলিয়া অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য মোকদ্দমা করা হয় না, কিম্বা তাহার বিষয় সংবাদ-পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠান হয় না। কারণ, লজ্জার সহিত ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, সমাজে বিধবারা অনেকস্থলে অবহেলিতা ও উপেক্ষিতা।

নিগৃহীতার সংখ্যা

কুমারী ১০১	হিন্দু	৬৪
	মুসলমান	২৯
	খৃষ্টান	৪
	ধর্ম্ম অজ্ঞাত	৪
সধবা ৪৬৭	হিন্দু	৩৩১
	মুসলমান	১২২
	খৃষ্টান	২
	ধর্ম্ম অজ্ঞাত	১২
বিধবা ১৩১	হিন্দু	১১৮
	মুসলমান	৮
	ধর্ম্ম অজ্ঞাত	৫
কুমারী, সধবা কি সধবা জানা নাই, ৩৩৪	হিন্দু	২১২
	মুসলমান	৬৫
	খৃষ্টান	৮
	ধর্ম্ম অজ্ঞাত	৪৯
	মোট	১০৩৩

অর্থাৎ নিগৃহীতা নারীগণের মধ্যে শতকরা ৪৫.২ জন সধবা এবং সধবার মধ্যে শতকরা ৭০.০ জন হিন্দু সধবা। নিগৃহীতার মধ্যে শতকরা ১২.৭ জন বিধবা এবং বিধবার মধ্যে শতকরা ৯০ জন হিন্দু বিধবা। নিগৃহীতার মধ্যে শতকরা ৯.৮ জন কুমারী ও কুমারীর মধ্যে শতকরা ৬৪ জন হিন্দু কুমারী।

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, যে, অত্যাচরিতাদের মধ্যে হিন্দু নারীর সংখ্যাই বেশী। এই কারণে অত্যাচার নিবারণের জন্য হিন্দুরা বেশী তৎপর হইলে তাহা অস্বাভাবিক নহে; না হইলেই বরং তাহা সাতিশয় লজ্জার বিষয় হইবে।

নিগ্রহের সংখ্যা

হিন্দু কর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীলোকের নিগ্রহ	২৫২টা
হিন্দু কর্ত্তৃক মুসলমান " "	১৪টা
হিন্দু কর্ত্তৃক খৃষ্টান " "	১টা
হিন্দু কর্ত্তৃক অজ্ঞাত " "	২১টা
মোট	২৮৮টা

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীলোকের নিগ্রহ	৩১৭টা
" " মুসলমান " "	১৭০টা
" " পার্শী " "	১টা
" " খৃষ্টান " "	৬টা
" " বৌদ্ধ " "	১টা
" " অজ্ঞাত " "	১৭টা
মোট	৫১২টা

হিন্দু ও মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীলোক নিগ্রহ	৪৮টা
" " " মুসলমান " "	৫টা
" " " অজ্ঞাত " "	১টা
মোট	৫৪টা

মিলিত খৃঃ ও হিঃ কর্ত্তৃক হিন্দুনারী নিগ্রহ	১টা
" খৃঃ ও মুঃ " মুসলমান "	২টা
মোট	৩টা

অজ্ঞাত কর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীলোকের নিগ্রহ	১০০টা
" " মুসলমান " "	৩২টা
" " খৃষ্টান " "	১টা
" " অজ্ঞাত ধর্ম্মাবলম্বী "	৩২টা
মোট	১৬৫

খৃষ্টান কর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীলোকের নিগ্রহ	৪টা
" " মুসলমান " "	২টা
" " খৃষ্টান " "	৩টা
" " অজ্ঞাত " "	২টা
মোট	১১টা
সর্ব্ব মোট	১০৩৩টা

উপরের তালিকায় অত্যাচারী দুরাত্মারা কোন্ কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক, তাহা দেখান হইয়াছে। দুষ্ট লোকদের বাস্তবিক কোন ধর্ম্ম নাই; তাহারা হিন্দু, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, বা অন্য কোন ধর্ম্মেরই লোক নহে। কিন্তু যে যে-সমাজে জন্মে ও বাস করে, তাহার আচরণের দ্বারা সেই সমাজের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি হয়।

উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে, অত্যাচারীদের মধ্যে মুসলমান-সম্প্রদায়জাত লোকদের সংখ্যা বেশী। "সঞ্জীবনী"তে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে-সকল তালিকা বাহির হইতেছিল, তাহাতে অত্যাচারী ও অত্যাচরিতাদের নাম ও "ধর্ম্ম" যথাজ্ঞাত দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান তালিকা-গুলি ঐ সকল তালিকা হইতে "সঞ্জীবনী" সঙ্কলন করিয়াছেন।

দলবদ্ধ নিগ্রহ

নিগ্রহকারী হিন্দুর দল	১৩১টা	৯৫টা ২ হইতে ৫ জনের দল
		৩৬টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল
নিগ্রহকারী মুসলমানের দল	৩৩৭টা	১২৬টা ২ হইতে ৫ জনের দল
		২১১টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল

নিগ্রহকারী খৃষ্টানদের দল ১টা	১টা	২ হইতে ৪ জনের দল
মিলিত হিন্দু ও মুসলমান নিগ্রহকারী দল ৫৪টা	২১টা	২ হইতে ৪ জনের দল
	৩৩টা	৫ হইতে অধিক জনের দল
খৃষ্টান ও হিন্দু ১ দল খৃষ্টান ও মুসলমান ২ দল		৫ হইতে অধিক জনের দল
অজ্ঞাত ধর্ম্মাবলম্বী নিগ্রহকারীর দল ১১৬টা	১৫টা	২ হইতে ৪ জনের দল
	১০১টা	৫ হইতে অধিক লোকের দল
মোট দল ৬৪২টা	২৫৮টা	২ হইতে ৪ জনের দল
	৩৮৪টা	৫ হইতে অধিক লোকের দল

প্রত্যেক দল একজন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।

একক নিগ্রহ

হিন্দু দ্বারা	...	১৫২
মুসলমান ,,	...	১৮০
অজ্ঞাত ,,	...	৩৪
অন্যান্য ,,	...	১৫
খৃষ্টান ,,	...	১০
	মোট	৩৯১
মোট		৬৪২+৩৯১=১০৩৩টা

ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের গত অধিবেশনে নারী নির্য্যাতন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পরে করিব। এখানে তদ্বিষয়ক অন্য একটি কথা বলিতে চাই। খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, সম্মেলনের বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার সময় এক ব্যক্তি বলেন, যে, তিনি নারীহরণের অনেক মামলায় উকীল নিযুক্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, অধিকাংশ স্থলেই নারীরা স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। খবরের কাগজের এই রিপোর্ট নির্ভুল কিনা জানি না। সত্য অনুমানে কিছু বলিতেছি। এই মনুষ্যটিকে আমরা চিনি না। তাঁহার সহিত তর্ক করার কোন সার্থকতাও নাই। তথাপি অন্য লোকদের অবগতির জন্য বলা দরকার, যে, এই ব্যক্তি বঙ্গের নানা স্থানের নারী-হরণের সব বা অধিকাংশ মোকদ্দমায় উকীল নিযুক্ত হন নাই; সুতরাং "অধিকাংশ স্থল" সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট উপকরণ ছিল না, অধিকারও ছিল না। তদ্ভিন্ন, যদি মানিয়াও লওয়া যায়, যে, ঐ ব্যক্তি যে-সব মোকদ্দমায় যে পক্ষে উকীল ছিলেন, সেই সেই পক্ষ তাঁহাকে নারীদের স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যাওয়ার প্রমাণই দিয়াছিল, তাহা হইলেও অন্য সব মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? অন্তঃপুরে ও পরিবারে কোথাও কোথাও যেরূপ অত্যাচার হয়, তাহাতে কোন কোন নারীর স্বেচ্ছায় বা কুলোকের ফুসলানিতে গৃহত্যাগ অসম্ভব নহে; অল্পসংখ্যক এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। কিন্তু খবরের কাগজে যত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত বাহির হয়, যত মোকদ্দমায় হিন্দু ও মুসলমান জুরি বা এসেসরদের সকলের বা অধিকাংশের মতে দুর্ব্বৃত্তেরা দণ্ডিত হয়, তাহা বিবেচনা করিলে, এবং অত্যাচরিতা ও অপহৃতাদের অনেকের কচি বয়স বিবেচনা করিলে ঢাকার পূর্ব্বোক্ত উকীলপুঙ্গব সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করিলে অন্যায় হইবে না, যে, সেই ব্যক্তি বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনেও নারীহরণ অপরাধে অভিযুক্ত লোকদের পক্ষে ওকালতীই করিতেছিলেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের হিন্দু-সভ্যের কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন না।

—

দ্বিচারী রাজনৈতিক

অনেক রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা পাইবার আগে যাহা বলেন, ক্ষমতা পাইবার পরে তাহা করেন না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলাতী রাজনৈতিকরা যে এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা অনেক বার বলা হইয়াছে। ইহা যে আমরা ভারতীয়েরাই বলি তাহা নয়। বিলাতের লোকেরাও কেহ কেহ এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। মিঃ নর্ম্যান এঞ্জেল একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি তাঁহার সম্পাদিত ফরেন এফেয়া'র্স নামক কাগজের আগষ্ট সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

"When in opposition, Socialist and 'Left' critics generally assail the whole attitude of capitalist governments towards colonial or Asiatic problems, declaring it to be marked by aggression, militarism, imperialism, and proclaim on behalf of oppressed peoples the right of independence and self-determination. These critics usually present the issue

as a simple one of right or wrong. If India, or Egypt or Ireland want independence, they are entitled to it and the way to solve the problem is to grant it: if the Chinese desire us to clear out of Shanghai or Hongkong, we have nothing to do but clear out. If there is interference in China or Nicaragua, or Haiti or Egypt, such interference can only be the result of dictation by avaricious capitalist concession-hunters, and should stop. The principles of non-interference, of independence of all peoples, the respect of their sovereignty and self-determination, are quite simple, unassailable principles and governments have only to adhere to them. Such usually is the daily indictment brought by Socialists and Radicals.

"Then, somehow, when parties to which such critics belong take office, no such simple and rapid solution is applied. There is, as a rule, no clearing out; the 'Imperialist' situation continues, new cruisers sometimes are voted, military occupations are continued, military expeditions sanctioned—and the new Left Governments are accused by rank-and-filers of betraying their principles: of being corrupted by power, or overawed by Imperialist or Capitalist forces when at close grips with them. And the 'forward' sections of the party are apt to wax sarcastic and 'indulge in violent invective directed at the chiefs."

তাৎপর্য্য। গবর্ন্মেণ্টের বিরোধীদলভুক্ত থাকিবার সময় সামাজিক-সাম্যবাদী সোশ্যালিষ্টরা এসিয়ার বা উপনিবেশসমূহের সব সমস্যা সম্বন্ধে ধনিক গবর্ন্মেণ্টের ভাবগতিকের খুব কড়া সমালোচনা করেন এবং অত্যাচরিত লোকদের স্বাধীন হইবার ও নিজ নিজ শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার ঘোষণা করেন। তাঁহারা সমস্যাটাকে সহজ ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন বলিয়া উপস্থিত করেন। যদি ভারতবর্ষ, মিশর বা আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীনতা চায়, তাহাতে তাহাদের অধিকার আছে, এবং সমস্যার সমাধানের উপায়, তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া; যদি চীনেরা আমাদিগকে শাংঘাই বা হংকং হইতে চলিয়া আসিতে বলে, তাহা হইলে আমাদের সেখান হইতে চলিয়া আসা ভিন্ন অন্য কিছু করিবার নাই। যদি চীন, নিকারাগুয়া, হাইটি বা মিশরের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাহিরের কোন জাতি হস্তক্ষেপ করে, তাহা অর্থগৃধ্নু ধনিকদের হুকুমে হয়, এবং তাহা বন্ধ হওয়া উচিত। কোন দেশের কাজে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ না করা, সব জাতির স্বাধীনতা, তাহাদের স্বদেশে প্রভুত্ব ও স্বীয় শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচনের অধিকার মানা—এইগুলি সোজা অনাক্রমণীয় নীতি এবং সব গবর্ন্মেণ্টের এগুলির অনুসরণ করা উচিত। ইহাই সোশ্যালিষ্টদের প্রাত্যহিক নালিশ, কিন্তু যখন তাহারা শাসনক্ষমতা পায়, তখন সমস্যার এরূপ সহজ সমাধান সম্ভব করা হয় না। নিজেদের অধীন দেশ হইতে কোন গবর্ন্মেণ্ট চলিয়া আসে না, বিদেশে "সাম্রাজ্য" চলিতে থাকে, যুদ্ধের নূতন সাজসরঞ্জাম আয়োজন অভিযান মঞ্জুর হয়। তখন "গবর্ন্মেণ্ট"পদে অধিষ্ঠিত লোকদিগকে তাহাদের ভূতপূর্ব্ব দলভুক্ত সহচর অনুচরেরা নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকে।

ব্যাপারটি ত এই রকম। কিন্তু রাজনৈতিকরা ক্ষমতা পাইবার আগে যাহা বলেন, ক্ষমতা পাইবার পরে কেন তাহা করেন না? সাধারণতঃ এই ব্যাখ্যাই করা হয়, যে, ক্ষমতা ও উচ্চপদ মানুষকে বিগড়াইয়া দেয়, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজ করিতে গেলে পাছে তাহাদের ক্ষমতা ও উচ্চপদ না থাকে, সেই ভয়ে তাহারা কিছু করে না। কিন্তু মিস্টার নর্ম্যান এঞ্জেলের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। তিনি বলেন :—

"What the reciprocal rights and obligations of the nations should be is not an easy problem to solve. Simple self-determination, absolute Nationalism, each nation being complete master in its own territory, does not solve the problem at all. Yet this absolute Nationalism, the 'right' of each to be 'free and iedependent,' is the principle which by implication the Socialist critic usually offers as the only alternative to the imperialism against which he protests. Such absolute Nationalism will not work and the responsible Governments of dense populations, faced by the problems of subsistence, simply will not accept it.

"If the Suez Canal is blocked, or trade with India or Australia is made impossible, children in certain streets of Manchester or Liverpool die. In the discussion of 'rights' it might with deference be suggested that these children too, their food and well-being, have to be considered, have 'rights' to be taken into account, as much as the spiritual rights of desert tribesmen to object to the presence within their 'national' borders of infidel contrivances like canals and steamships."

তাৎপর্য্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্য-বাধকতা কি কি হওয়া উচিত, তাহা সহজে সমাধেয় সমস্যা নহে। সোজা স্ব স্ব শাসন প্রণালী নির্ব্বাচনের অধিকার, অবিমিশ্র স্বাজাতিকতা, প্রত্যেক জাতির তাহার নিজের এলাকায় পূর্ণ প্রভুত্ব—এসব দ্বারা সমস্যাটির সমাধান মোটেই হয় না। অথচ এই রকমের চূড়ান্ত স্বাজাতিকতা, প্রত্যেক জাতির মুক্ত ও স্বাধীন হইবার অধিকার—ইহাকেই সোশ্যালিষ্ট সমালোচকেরা তাঁহাদের প্রতিবাদের পাত্র সাম্রাজ্যিকতার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত করিবার যোগ্য বলিয়া উপস্থিত করেন। কিন্তু এরূপ চূড়ান্ত স্বাজাতিকতা চলিবে না—খুব ঘনবসতি দেশসকলের দায়িত্বপূর্ণ গবর্ন্মেণ্টসমূহ স্বজাতির খাদ্য সংগ্রহ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া এরূপ চূড়ান্ত স্বাজাতিকতা গ্রাহ্য করিবে না।

যদি সুয়েজ খালে জাহাজ যাতায়াত বন্ধ হয়, বা ভারতবর্ষ বা অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বাণিজ্য অসম্ভব করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টার ও লিভারপুলের কোন কোন রাস্তার শিশুরা উপবাসে মারা পড়িবে। "অধিকার" সম্বন্ধে আলোচনার সময় সসম্মানে ইহাও বলা যায়, যে, যেমন মরুভূমির জাতিদের এলাকার সীমার মধ্যে কাফেরদের খাল ও ষ্টীমার থাকার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার "আধ্যাত্মিক" অধিকার আছে, তদ্রূপ ঐ শিশুগুলির খাদ্য ও মঙ্গল বিবেচনা করিতে হইবে; তাহাদের "অধিকার"ও বিবেচনা করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন :—

"Absolute self-determination, or sovereignty, or independence, is incompatible with 'civilisation."

"The remedy for Imperialism is not Nationalism which threatens to Balkanise the world, but Internationalism, which is not the denial of Nationalism but its orderly organisation."

তাৎপর্য্য। প্রত্যেক জাতির অন্যনিরপেক্ষ প্রভুত্ব, স্বাধীনতা এবং শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচনের অধিকার সভ্যতার সহিত খাপ খায় না।

স্বাজাতিকতা সাম্রাজ্যিকতার প্রতিকার নহে; অন্তর্জাতিকতা তাহার প্রতিকার। অন্তর্জাতিকতা স্বাজাতিকতাকে অস্বীকার করে না, কেবল উহাকে সুশৃঙ্খল করে।

রোমান কাথলিকদিগের ও ইংলণ্ডীয় খৃষ্টীয় মণ্ডলীর পুরোহিতদিগকে প্রীষ্ট বলে; প্রেস্‌বিটীরিয়ান মণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহকদিগকে প্রেস্‌বিটার বলে। ইংরেজ মহাকবি মিল্টন প্রীষ্ট ও প্রেস্‌বিটার উভয়ের মনোভাব ও কার্য্য-প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"Presbyter is but priest writ large," "প্রেসবিটার প্রীষ্টেরই নামান্তর, কেবল প্রেসবিটার লিখিতে কয়েকটা বেশী অক্ষরের দরকার হয়।"

আমরাও তেমনি এঞ্জেল মহাশয়ের অন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে বলিতে পারি, "Internationalism is but Imperialism writ large," "অন্তর্জাতিকতা সাম্রাজ্যিকতার নামান্তর, কেবল তাহা লিখিতে কয়েকটা বেশী অক্ষর লাগে।"

এঞ্জেল মহাশয় বলিতেছেন, ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের বাণিজ্য অসম্ভব করা হইলে লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেষ্টারের শিশুরা মরিতে পারে। কিন্তু দুর্ভিক্ষে এবং সাধারণ অন্য সময়েও দারিদ্র্যবশতঃ ভারতবর্ষের অগণিত শিশু মরিয়াছে ও মরিয়া থাকে। সিবিলিয়ান লিলি সাহেব তাঁহার "India and its Problems," "ভারতবর্ষ ও তাহার সমস্যাসমূহ," নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "During the first eighty years of the nineteenth century, 18,000,000 of the Indian people perished of famine," "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আশী বৎসরে ভারতের এক-কোটি আশী লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছিল।" ঐ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে ১৮টা দুর্ভিক্ষে দেড় হইতে আড়াই কোটি লোক মরিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া-ছিল। তা ছাড়া, প্লেগ ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি নিবার্য্য রোগে বহু কোটি লোকের মৃত্যু আছে। আমরা ইংলণ্ডের শিশুদের মৃত্যু কামনা করি না; তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া স্বদেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ করুক, ইহাই চাই। এবং তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ভারতের শিশুদের মৃত্যু অনিবার্য্য, ইহাও সত্য নহে। ইংরেজরা ইচ্ছা করিয়া দুর্ভিক্ষ ঘটায়, মহামারী ঘটায়, ইহা কেহ বলে না, মনেও করে না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, ভারতবর্ষের ধনে ও খাদ্যে ভারতবর্ষের শিশু যুবা ও বৃদ্ধদের প্রথম অধিকার, ইংলণ্ডের ধনে ও খাদ্যে ইংলণ্ডের লোকদের প্রথম অধিকার; ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্য ইংলণ্ডকে মারিবার কিম্বা ইংলণ্ডকে বাঁচাইবার জন্য ভারতবর্ষকে মারিবার কাহারও অধিকার নাই, আবশ্যকও নাই। ভারতবর্ষের লোকদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে। তাহা কিনিয়া খাইবার মত টাকা অনেক লোকের না থাকায় দুর্ভিক্ষ হয়। বিদেশ হইতে আমদানী যে-সব পণ্যদ্রব্য ভারতীয়েরা কিনিতে বাধ্য হয়, তাহা তাহারা নিজে প্রস্তুত করিলে সব সময়ে খাদ্য কিনিবার মত যথেষ্ট টাকা তাহাদের হাতে থাকিতে পারে এবং দুর্ভিক্ষে মৃত্যু নিবারিত হইতে পারে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই উপায় অবলম্বন করিতে চান।

মিস্‌টার এঞ্জেলের কথার ভাবটা এই, যে, ভারতের স্বাজাতিকতার ও স্বাধীন প্রভুত্বের দাবী স্বীকার করিলে তাহার সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ হইবে, এবং তাহা বন্ধ হইলে ইংলণ্ডের লোকেরা মরিবে; অতএব ইংলণ্ডের বাণিজ্য রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের পূরা স্বাজাতিকতা ও জাতীয় প্রভুত্বের অধিকার স্বীকার করা চলিবে না; ভারতবর্ষে যে কেবল ভারতীয়দেরই অধিকার তা নয়; অন্য জাতিদেরও (বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের!) আছে। ইহার নাম অন্তর্জাতিকতা। স্যার উইলিয়ম জয়েনসন্‌-হিক্স, অন্যান্য সাম্রাজ্যসমর্থকদের মত, বলিয়াছেন, ইংলণ্ড তাহার পণ্যদ্রব্য, বিশেষতঃ কাপড় ও সূতা বিক্রির জন্য ভারতবর্ষের উপর দখল রাখিয়াছে। একথা সত্য হইলে এঞ্জেলের অন্তর্জাতিকতা এবং জয়েন্সন-হিক্সের সাম্রাজ্যিকতায় প্রভেদ কি?

মিঃ এঞ্জেলের কথার মানেটা এই, যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতির শাসনব্যবস্থা শুধু ভারতবর্ষের স্বার্থ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, অন্য সব জাতিদের স্বার্থও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার ধনে অন্য সব জাতি

(বিশেষতঃ গ্রেট ব্রিটেন!) ভাগ বসাইতে অধিকারী। বেশ কথা। তাহা হইলে ব্রিটেনের ধনে অন্য সব জাতিদিগকে (বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে!) কেন ভাগ বসাইতে দেন না, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে ভারতবর্ষকে ও অন্যান্য জাতিকে কেন দেওয়া হয় নাই? কোন জাতি এরূপ কথা তুলিলে তাহার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা কেন হইতে পারে?

মিঃ নর্ম্যান এঞ্জেলের মত অন্য অনেক ইংরেজ মনে করেন, যে, ভারতবর্ষের উপর ব্রিটেনের প্রভুত্ব গেলে তাহার সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইবে। বন্ধ চিরকালের নিমিত্ত নিশ্চয়ই হইবে না। যদি বন্ধুভাবে ইংলণ্ড প্রভুত্ব ত্যাগ করেন, তাহা হইলে একদিনের জন্যও বাণিজ্য বন্ধ হইবে না। তবে বাণিজ্য হয় ত কিছু কমিতে পারে, কিম্বা এখন যে যে জিনিষের যত বেশী আমদানী রপ্তানী আছে, তাহা কমিয়া বাড়িয়া অন্য কোন কোন জিনিষের আমদানী রপ্তানী কম বেশী হইবে। কিন্তু যদি ঝগড়া বিবাদ দ্বারা বা কোন অন্তর্জাতিক যুদ্ধ বশতঃ ব্রিটেন ও ভারতের ছাড়াছাড়ি হয় তাহা হইলে বাণিজ্য অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না। ১৮১৮ সালের ১৭ই মে ভারতের তৎকালীন বড় লাট মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস তাঁহার প্রাইভেট রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন, যে, অনতিদূর কালে ইংলণ্ড ভারতের উপর প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিবেন। তখন ভারতবর্ষের লোকেরা তাহাদের উপকারী ইংরেজ জাতির সঙ্গে সততার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক রক্ষা করিবে। ইংলণ্ড স্বেচ্ছায় ভালভাবে প্রভুত্ব ত্যাগ করিলে এরূপ ফল নিশ্চয় ফলিতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছায় ত্যাগের ত কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না।

—

বঙ্গের স্বরাজীদের দলাদলি

বঙ্গের স্বরাজীরা সব রকম দেশহিতকর কাজের সমস্তটা নিজেরা করিতে পারেন না, কোন দলের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর নহে। তাহা দোষের বা নিন্দার বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহাদের দলের বাহিরের কেহ কোন ভাল কাজ করিলে তাহাও দোষের বিষয় নহে; তাহা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। অল্পস্বল্প খ্যাতি তাহাদের হইলে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কাল নিরবধি, এবং পৃথিবীও বিপুল। যাহা হউক, যাঁহারা স্বরাজী নহেন, তাঁহারা নিজের ভাবনা নিজেরা ভাবিবেন। এখন অন্য এই কথাটা বেশী করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, যে, স্বরাজ্য দলেই একাধিক উপদলের মধ্যে রেষারেষি আছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন, যে, সুভাষ বাবুর উপদল আপনাদিগকে প্রবল রাখিবার জন্য ভিন্নমতাবলম্বী লোকদিগের কংগ্রেসের সভ্য হওয়ায় পরোক্ষভাবে বাধা দিয়া থাকেন। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাই না। তাহা করিবার মত খবর আমরা রাখি না। ঝগড়া মিটিয়া গিয়া কংগ্রেসের প্রকৃত দেশহিতৈষী উৎসাহী সভ্য বাড়িলে সুখী হইব।

—

মাদক দ্রব্য সেবনে ভারতবর্ষের ক্ষতি

মোকদ্দমায় ভারতবর্ষের কত টাকা লোকসান হয়, তাহার একটা আন্দাজ পূর্ব্বে দিয়াছি। শুধু বাংলা দেশেই যে তিন কোটি টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মোকদ্দমার জন্য লোকে কেনে, সেই টাকায় বঙ্গে প্রাথমিক অবৈতনিক শিক্ষা সব জেলায় শহরে ও গ্রামে চালান যাইত। কিন্তু কোন কোন মোকদ্দমা অনিবার্য্য, এবং হয়ত তাহা করা কর্ত্তব্যও হইতে পারে। অনিবার্য্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য মামলার নিষ্পত্তি কি পরিমাণে সালিসদের দ্বারা বিনা ব্যয়ে হইতে পারে, তাহার আলোচনা এখানে করিব না।

মোকদ্দমার ব্যয় সম্বন্ধে যাহাই বলা যাক, ঔষধার্থে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির জন্য ব্যতীত সুরা আফিং প্রভৃতির উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার যে দৈহিক, নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতির কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ক্ষতি সম্বন্ধে একটা আন্দাজ দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের ও বাংলা দেশের আবগারী রাজস্বের একটা তালিকা নীচে দিতেছি।

বৎসর	ভারতবর্ষ	বাংলা দেশ
১৯১২-১৩	১২,৪১,৬৮,৭৮৭	১,৩৭,৫৯,০৪৫
১৯১৩-১৪	১৩,৩৪,১৪,৫০৫	১,৫৩,৮৮,৫৭৮
১৯১৪-১৫	১৩,২৮,৫৩,২১৪	১,৫৩,৭৪,৬২৪
১৯১৫-১৬	১২,৯৪,৮৩,১৩২	১,৫১,৪০,০৭৪
১৯১৬-১৭	১৩,৮২,৩৮,৪৯৫	১,৪৪,৪৪,২২৯
১৯১৭-১৮	১৫,২৪,২৫,৬০০	১,৫৬,৩৬,২২২
১৯১৮-১৯	১৭,৩৩,৬২,৭৭৩	১,৭৬,৬৩,৭১১
১৯১৯-২০	১৯,২৫,৯৪,০২৯	১,৮১,৪৮,৬৫৭
১৯২০-২১	২০,৪৩,৬৫,৩৫৯	১,৯৬,৬৭,৫৮৮
১৯২১-২২	১৭,১৮,৬১,৯১৪	১,৮৩,০০,৮৮৮
১৯২২-২৩	১৮,৫৫,২১,৬৫৬	২,০১,০৯,৭৪৭
১৯২৩-২৪	১৯,৪০,৫১,৬৮৯	২,০৯,৮৫,৫৭২
১৯২৪-২৫	১৯,৫১,৬৮,৪৩০	২,১৫,০৭,৩৪২
১৯২৫-২৬	১৯,৮৯,৮৬,৫৩২	২,২৮,০২,৪৫১
১৯২৬-২৭	১৯,৮২,৬৮,৩৬৩	২,২৫,১৭,১৩৩

তালিকাতে পাঠকেরা দেখিবেন, ১৯২০-২১ সালের পর সমগ্র ভারতে ও বঙ্গে হঠাৎ আবগারী রাজস্ব বেশ কমিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এত কমিয়া যাওয়ার কারণ জানি না। তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে পাঠকদিগকে জানাইব। যাহা হউক, তাহার পর আবার বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯২৬-২৭ সালের পরের হিসাব সমগ্র ভারতের এখনও পাই নাই। কিন্তু ঐ সালের হিসাব অনুসারেই দেখা যাইতেছে, সমগ্র ভারতে লোকে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা মাদক দ্রব্য সেবনে অপব্যয় করে, এবং বাংলার লোকেরা সওয়া দুই কোটি টাকা অপব্যয় করে।

আবগারী রাজস্ব সকলের চেয়ে বেশী আদায় হয় মান্দ্রাজে—১৯২৬-২৭ সালে ৫,১০,৫২,৬৯৬ টাকা; তার পর বোম্বাইয়ে—ঐ সালে ৪,০৯,৩৯,৩৩৫ টাকা।

আমেরিকায়, ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের জন্য ব্যতীত, সুরা আদি মাদক দ্রব্য উৎপাদন বিক্রয় ও ব্যবহার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ আইন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, আমেরিকার লোকদের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে সুরাপান নিষিদ্ধ নহে, এবং কিছু দিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই মদ খাইত। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম অনুসারে সুরাপান নিষিদ্ধ, এবং এখনও এদেশের অধিকাংশ লোক মদ খায় না। কিন্তু গবর্ণ্মেণ্টের আবগারী নীতি আমেরিকার মত না হওয়ায় সুরার ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং জাতীয় ধনের অপব্যয়ও বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও নৈতিক অবনতি হইতেছে, শ্রমশক্তি কমিতেছে, এবং যত ধন উৎপন্ন হইতে পারিত, তাহা হইতেছে না।

—

ম্যালেরিয়ায় লোকক্ষয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বলেন, যে, যশোর জেলায় ১৯০১ সালে লোকসংখ্যা ১৭৭১৮২৬ ছিল। তাহা কমিয়া ১৯২১ সালে ১৭০০৯২৪ হয়। ১৯২১ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, ঐ কয় বৎসরে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা ৫৮৩০৯ বেশী হইয়াছে। ম্যালেরিয়া যে এইরূপ লোকক্ষয়ের একটি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯২৬ সালে প্রেসিডেন্সী ও রাজশাহী ডিবিজনে লোকসংখ্যা কমিয়াছিল। ১৯২৭ সালে রাজশাহী ডিবিজনে লোক বাড়িয়াছে, প্রেসিডেন্সীতে আরও কমিয়াছে।

সকল জেলা হইতেই ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ করা একান্ত আবশ্যক।

—

ম্যালেরিয়া ও লীগ অব নেশ্যন্স্

লীগ অব নেশুন্সের মুরুব্বি ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতি চার-পাঁচটি দেশের পরেই লীগকে সকলের চেয়ে বেশী টাকা দেয় ভারতবর্ষ। অথচ লীগ এপর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের জন্য কিছু করে নাই। একথাটা হিসাব ও প্রমাণসহ ভারতবর্ষে প্রথম প্রচারিত হয় প্রবাসীর সম্পাদকের দ্বারা। তাহার পর লীগে ভারতের সরকারী প্রতিনিধিদের সর্দ্দার লর্ড লিটনও ইহা গত বৎসর স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষ টাকা দেয় বেশী, অথচ লীগ হইতে কোন উপকার পায় না, ইহা জানা পড়ায়, যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, যে

কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি ম্যালেরিয়া কমিশন ভারতবর্ষে আসিতেছে, তখন স্বভাবতই ভারতীয়েরা মনে করিয়াছিল, যে, এই কমিশন ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া বিনষ্ট কিরূপে হইতে পারে, সেবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এদেশেই কিছু পরামর্শ দিবেন। কিন্তু ইঁহার ভারত আগমনের উদ্দেশ্য তাহা নহে। প্রকৃত তথ্যটি এই। ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ অংশে স্থিত কয়েকটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দেশে কেমন করিয়া তাহা নির্মূল করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত ১৯২৩ সালে এই কমিশন গঠিত হয়। এই জন্য ইহা এবিষয়ে নানা তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ও অপকৃষ্ট ম্যালেরিয়ার আড্ডা বলিয়া এখন ইহার সভ্যেরা এই দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। এখানে তাঁহারা পরামর্শ লইবেন, দিবেন না; শিখিবেন, শিখাইবেন না। জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবেন ইউরোপের দক্ষিণ অংশে স্থিত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দেশ সকলে। ইহাই ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা। টাকা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে দোহন করিয়া লইয়া গিয়া ব্যয় করিতে হয় অন্যত্র। সবাই জানেন, লীগের সকলের চেয়ে বড় মুরুব্বি ব্রিটেন। ব্রিটেন ভারতবর্ষের কোন একটা কাজ ভাল করিয়া করিতেছেন না বা করিতে অসমর্থ, লীগ কেমন করিয়া সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাহা মানিয়া লইয়া কিছু করিতে সাহস পাইবে? ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া নাশের জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক ও সম্ভব, ইংরেজরা তাহা করিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করাই বরং লীগের পক্ষে স্বাভাবিক। সেই জন্য লীগের কমিশন শিখিতে আসিয়াছে, শিখাইতে নহে।

ভারতবর্ষের এখন দীনহীন দশা। ভারত সামান্য কৃপা, সামান্য রেহাইয়ের জন্য কৃতজ্ঞ হইতে বাধ্য। তাই কেহ কেহ হয় ত আশা করিতেছেন, যে, কমিশনের সভ্যেরা কৃপা করিয়া ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এদেশে কিছু উপদেশ ও পরামর্শ বর্ষণ করিবেন। আমরা সেরূপ কোন কৃপা চাহিতেছি না। কিন্তু আমরা তাঁহাদের প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হইব যদি তাঁহারা ইউরোপে ফিরিয়া গিয়া বলিয়া না বেড়ান, যে, ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া আছে ও তাহা নষ্ট হইতেছে না কেবলমাত্র অধিবাসীদের (বিশেষ করিয়া হিন্দুদের এবং ব্রাহ্মণ হিন্দুদের) দোষে, এবং ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইয়াছে ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মের নানা জাতির লোক বাস করে বলিয়া, তাহারা নানা ভাষায় কথা বলে বলিয়া, তাহারা নানা রকম পরিচ্ছদ পরে বলিয়া ও তাহাদের রীতিনীতি হরেক রকমের বলিয়া।

খদ্দর কেন ব্যবহার করা উচিত

বোম্বাইয়ের বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কমিটি লিখিয়াছেন, "আপনি খাদি ক্রয়ের জন্য যাহা খরচ করেন, তাহার প্রত্যেকটি টাকা আপনার গরীব দেশবাসীর মধ্যে নিম্ন-মুদ্রিত তালিকা অনুসারে স্বতই বিতরিত হইয়া যায়—

কাপাসের চাষী	৶১৫
" পরিষ্কর্ত্তা	৻১০
ধুনুরী	/১৫
সুতাকাটুনী	৶১৫
ধোবা	৻১০
ফেরিওয়ালা	/০
তাঁতি	।১৫
	১৲

টাকার মধ্যে একটি পাইও বিদেশে যায় না।"

যাঁহাদের রোজগার বেশী তাঁহাদের চক্ষে দু-এক পয়সা বা দু-এক আনা সামান্য রোজগার; কিন্তু গরীবদের পক্ষে তাহা তুচ্ছ নহে।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কমিটি আরও লিখিয়াছেন:—

"ভারতবর্ষে

কলকারখানা, রেলওয়ে প্রভৃতির শ্রমিকদের সংখ্যা—১৫ লক্ষ লোক,

হাতের তাঁতে কাজ করে ২০ লক্ষ লোক,

কৃষির উপর নির্ভর করে ২২৯০ লক্ষ লোক।

যে কৃষক-পরিবারে চরখা চলে, তাহার দ্বারা তাহাদের আয় শতকরা ১২ হইতে ২৮ বাড়ে। সূতা কাটিয়া এই আয়বৃদ্ধি গরীব চাষীদের পক্ষে সামান্য নয়। কাটুনীরা কখন কখন দশ মাইল হাঁটিয়া খাদি ভাণ্ডার হইতে তুলার পাজ আনিতে ও তথায় সূতা দিতে যায়। কেন?

যেহেতু সূতা কাটার সামান্য অতিরিক্ত আয়টুকু তাহদের পক্ষে মূল্যবান্।

কারণ—

আমেরিকানদের জন প্রতি গড় দৈনিক আয়			৬৲
অষ্ট্রেলিয়ানদের	"	"	২।০
ইংরেজদের	"	"	২৲
কানাডাবাসীদের	"	"	১৷৹
কিন্তু ভারতীয়দের	"	"	/১"।

হিন্দুনারীনিগ্রহ সম্বন্ধে হিন্দুদের সভা

কিছু দিন হইল, হিন্দুনারীদের নির্য্যাতনের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত কলিকাতার আলবার্ট হলে হিন্দুদের একটি সভা হয়। তাহাতে আমাকে

সভাপতি মনোনয়ন করা হইয়াছিল। সভা যেদিন সন্ধ্যায় হইবে, সেইদিন সকালে একখানি দেশী ইংরেজী কাগজে উদ্যোক্তাদের এই বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছিল, যে, "তাঁহারা কোন মুসলমান বক্তার নাম বিজ্ঞাপনে দেন নাই; মুসলমানদিগকে কেন বাদ দেওয়া হইল?" ইত্যাদি। ইহার উত্তর অতি সহজ। হিন্দু নারীদের নির্য্যাতন নিবারণ হিন্দুদের একটি সামাজিক কাজ। হিন্দুদের এরূপ সামাজিক কাজে মুসলমানদিগকে ডাকিবার একান্ত কোন প্রয়োজন নাই, এবং মুসলমানদের তাহাতে আহূত হইবার কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। অবশ্য নারীনির্য্যাতন নিবারণ সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের বিশেষ কোন উৎসাহ লক্ষিত হইয়া থাকিলে মুসলমান বক্তাদের নিমন্ত্রণ করার কথা উঠিতে পারিত। কিন্তু তাহা লক্ষিত হয় নাই। আলবার্ট হলের সভা হিন্দুসভার উদ্যোগে আহূত হয়। হিন্দুসভার সংজ্ঞা অনুসারে ব্রাহ্মেরাও হিন্দু। এই জন্য ব্রাহ্ম বক্তারাও আহূত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, নারীনিগ্রহ নিবারণে পরম উদ্যোগী বলিয়াও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত মহেশ-চন্দ্র আতর্থীর আহূত হইবারই কথা।

সভাপতি রূপে আমি বলিয়াছিলাম, নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধে মোটের উপর দেশের সব সম্প্রদায়ের লোকেরই কতকটা ঔদাসীন্য আছে। তবে, তাহার মধ্যে হিন্দুদের কিছু চেতনা দেখা যাইতেছে। এইজন্য তাঁহারা সভা আহ্বান করিয়াছেন। যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও এইরূপ কতকটা জাগিয়া নিজেদের সভা আহ্বান করেন, তখন সকলের সম্মিলিত সভা আহূত হইলে তাহা এক এক সমাজের একা একা কাজ করা অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক হইবে। এই মত আমি এখনও পোষণ করি। ইহার ভ্রম যদি কখনও বুঝিতে পারি, তখন তাহা স্বীকার করিব।

সভার কাজ আমি যে-ভাবে চালাইয়াছিলাম, সে বিষয়ে আমার এই দোষ ধরা হইয়াছে, যে, আমি সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবের সংশোধন উপস্থিত করিতে ও তাহার সমর্থক বক্তৃতা করিতে দি নাই। ইহা সত্য কথা। আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম, যে, "গবর্মেণ্টকে একটি অনুসন্ধান-কমিটি নিয়োগ করিবার অনুরোধ মূলক যে প্রস্তাব সভার সম্মুখে ছিল, তাহা 'আবেদন নিবেদন,' এবং 'আবেদন নিবেদন' অসম্মানকর ও ব্যর্থ বলিয়া তেমন অনুরোধ করা অনুচিত," সংশোধকদের আপত্তি এই রূপ। 'আবেদন নিবেদনে' আমার যে খুব উৎসাহ আছে, তাহা নয়। কিন্তু নারীনির্য্যাতন নিবারণ গবর্মেণ্টের সাহায্য ভিন্ন হইবে না; গবর্মেণ্টের সাহায্য স্বাবলম্বনের নিষেধক নহে, বরং আমাদের স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে গবর্মেণ্টও সম্পূর্ণ সফলপ্রযত্ন হইতে চাহিলেও হইতে পারিবেন না; সংশোধকদের সংকল্পিত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের দ্বারা রেজলুশুন পাস্ করানও আবেদন নিবেদনের পর্য্যায়ভুক্ত; এবং এবিষয়ে কোন বেসরকারী সভ্য আইন করাইতে চাহিলেও তাহার জন্য এবং আইন প্রণীত হইলে তদনুসারে কাজ করাইবার জন্য সরকারের সাহায্য আবশ্যক হইবে; যে রাজনৈতিক দলের লোকেরা আপত্তি করিয়াছিলেন ও সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই দলের লোকেরা গবর্মেণ্টকে অন্যবিষয়ক কমিটি নিয়োগ করিতে অতীত কালে অনু-রোধ করিয়াছেন; সেই দলের লোক সরকারনিযুক্ত কমিটির সভ্যের কাজ করেন; এবং তাঁহারা স্থলবিশেষে গবর্মেণ্টের সহযোগিতাও করেন। এইরূপ নানা কারণে আমি প্রস্তাবিত কমিটি নিয়োগের জন্য অনুরোধে কোন দোষ দেখি নাই, এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথা কাটা-কাটি করিয়া কোন লাভ হইবে না বলিয়া সভাপতির ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলাম। আমি এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, যাঁহারা স্বাবলম্বন ও অবিমিশ্র বীরত্বের পক্ষপাতী, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কাজে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইতেছে না। এখনও তাহাই বলিতেছি।

সভাস্থলে একজন মুসলমানের দেহে হস্তক্ষেপ বা হস্তক্ষেপের চেষ্টা হইয়াছিল, ইহা সত্য কথা। কিন্তু মুসলমান সম্পাদক ও সভাকারীরা ইহা জানেন না বা গোপন করিতেছেন, যে, সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গোলমাল থামাইয়া মুসলমান লোকটিকে সভাপতির কাছে বসাইয়া রাখিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরে সভা ত্যাগ করিবার সময় আর একবার চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু তাহা নিবারণেও হিন্দুদের হাত ছিল।

—

"নারীনির্য্যাতন" সম্বন্ধে মুসলমানদের সভা

১০ই ভাদ্রের "বঙ্গবাণী"তে দেখিতেছি,—

গত ২৫শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে মুসলমানদের এক জনসভার অধিবেশন হয়। বর্ত্তমান নারী নিগ্রহ নিবারণ আন্দোলনে মুসলমানের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য উক্ত সভা আহূত হইয়াছিল। কিন্তু এই মূল বিষয়ে সভায় বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, "বর্ত্তমানে ঐ আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমান জাতির ও এস্লাম ধর্ম্মের উপর প্রকাশ্য ভাবে যে সকল আক্রমণ চালান হইতেছে, তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ।"

এই বিষয় লইয়া সভায় অনেক উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা হয়।

গত বৃহস্পতিবার হিন্দু সভার উদ্যোগে এলবার্ট হলে যে সভা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বেশী। প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতায় ঐ কথাটাই বেশী ফুটিয়াছিল।

আমরা এই সভায় উপস্থিত না থাকায় ইহার সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। সভাপতি মৌলানা আক্রম খাঁর বক্তৃতা ভিন্ন অন্য কাহারও বক্তৃতার চুম্বকও কাগজে দেখিলাম না। তাঁহার বক্তৃতা ও রিপোর্ট দুখানি কাগজে প্রায় একই রকম দেখিলাম। এই জন্য অনুমান করিতেছি, তিনি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া থাকিবেন। তাহা ভাল। কারণ মৌখিক বক্তৃতার রিপোর্ট কদাচিৎ যথাযথ হয়। "বঙ্গবাণী" হইতে তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

অখণ্ড মাতৃজাতির এক এ৽টা অংশের নাম—নারী, সুতরাং বংশের, বর্ণের ও ধর্ম্মের সকল বৈষম্য হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া নারী মানুষ মাত্রে৽ই সম্মানের পাত্র। এই সম্মান দিতে যে কুণ্ঠিত, সে মানুষ নহে। এই সম্মান হানি করার সাহায্য করে যে, সেও মানুষ নহে। কিন্তু দুনিয়ার সকল দেশে ও সকল সমাজে সদাশয় মানুষের পাশে পাশেই নরাকার পশুরাও চিরকাল স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে। এই শ্রেণীর নররূপী শয়তানদিগের মধ্যে নারীর সম্মান বা সতীত্বের উপর আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয় যে পাষণ্ড, সে মানুষ কখনই নহে—মুসলমান ত অনেক দূরের কথা। মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে, এহেন পাষণ্ডের একমাত্র দণ্ড—প্রকাশ্য দিবালোকে জনসাধারণের সম্মুখে, সহস্র হস্তে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর আঘাতে নিশ্চিহ্ন করিয়া পিষিয়া ফেলা। সম্মতিক্রমে বা অসম্মতিক্রমে বলিয়া সেখানে কোন পার্থক্য নাই। সতীত্বহানি করা ত দূরের কথা, কেহ কোন নারীর চরিত্রের প্রতি অপবাদ দিলে তাহার প্রতি ৮০ কষাঘাতের ব্যবস্থা। আর জীবনে কোন অবস্থায় তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না বলিয়া হুকুম।

মৌলানা সাহেবের বিদ্বান ও ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি আছে। সুতরাং তিনি মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত কথাই বলিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে বাধা নাই। কিন্তু কোন ধর্ম্মের শাস্ত্রে কোন ভাল কথা লেখা থাকিলেই সেই ধর্ম্মের সব বা অধিকাংশ লোক তদনুসারে কাজ নিশ্চয়ই করে, বর্ত্তমান ও অতীত ইতিহাস ইহা বলে না। অতএব, উপরে মুদ্রিত মুসলমান শাস্ত্রের উপদেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কারণ, অজ্ঞতা বশতঃ সব ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই অনেক লোক তাহাদের শাস্ত্রবিধি অনুসারে কাজ করে না; অনেকে জানিয়া শুনিয়াও করে না।

নারীর সম্মান বা সতীত্বের উপর আক্রমণের যে শাস্তির উল্লেখ মৌলানা সাহেব করিয়াছেন, তাহা ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজের আইন অনুসারে দিবার জো নাই। কিন্তু মুসলমানেরা অপরাধীকে সামাজিক দণ্ড দিতে পারেন। আমরা খবরের কাগজে মুসলমান সমাজের লোকদের দ্বারা মুসলমান নারীর উপর অত্যাচারের জন্য অপরাধীর দণ্ড-প্রাপ্তির সংবাদ মধ্যে মধ্যে পড়িয়া থাকি। সম্ভবতঃ সব মামলায় কুচক্রী হিন্দুদের কোন ষড়যন্ত্র নাই। সুত এই সব মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত অন্ততঃ কতকগুলি লোক মুসলমান সমাজ দোষী মনে করিতে পারেন। মুসলমা সমাজ তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, তা দিগকে কখনও সাক্ষী মানে কিনা, মৌলানা সা উচিত মনে করিলে তাহার সন্ধান লইতে পারেন।

মৌলানা সাহেব তাঁহার বক্তৃতার শেষ দি বলেন :—

নারী রক্ষার নামে বর্ত্তমানে যে দেশে আন্দোলন উপ করা হইয়াছে, তাহার ও তাহার নায়কগণের প্রতি কোন দ কোন মতের মুসলমানের একটুও আস্থা নাই। বরং তাঁহারা স সমান ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, একটি ভীষণ রাজনৈতিক অ সন্ধিকে সম্মুখে রাখিয়া আন্দোলনের কর্ত্তৃপক্ষ এই উপলক্ষ্যে মোস নির্যাতনের একটা নূতন উপায় বাহির করিয়া লইয়াছেন মু নারীরক্ষা আন্দোলন যাঁহারা উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের চিরস্থায়ী প্রবেশ নিষেধ। কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ তাঁহাদের কাজে যোগদান করিতে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব

আমরা অমুসলমান যাঁহারা নারীরক্ষার আন্দো করি, তাঁহাদিগকে কোন মুসলমান বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু মুসলমানেরা নিজেদের মু নারীনির্য্যাতন নিবারণার্থ দল বাঁধিয়া আন্দোলন করি তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে। এ বিষয়ে হিন্দুদের কো মৃদু বা ভীষণ রাজনৈতিক অভিসন্ধি নাই। মুসলমানেরা বিশ্বাস না করিতে পারেন। তাঁহারা হিন্দু নারী-রক্ষা আন্দোলনে তাঁহাদের যোগদান নিষিদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐ উদ্দেশ্যে স্বতঃ কাজ করিবার কি বাধা এত কাল ছিল বা এখন আছে

—

দ্রুত লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য ও দুর্ভি

অনেক বিদেশী লেখক বলিয়া থাকেন, যে, ভার মধ্যে আর যুদ্ধবিগ্রহ হয় না, শান্তি বিরাজ করি এই জন্য এই দেশের লোকসংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বেশী বা যাওয়ায় দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়াছে এবং অনেক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কারণ আলোচনা করিব না। যে-সব দেশে দুর্ভিক্ষ হয় যাহারা ভারতবর্ষের মত দরিদ্র নয়, তাহারা ভা অপেক্ষা ঘনবসতি, না বিরলবসতি, তাহাই আগে যাক্।

ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে প্রতি বর্গমাইলে লোক বাস করে, জাপানে প্রতি বর্গমাইলে লোক বাস করে। অন্য দিকে ভারতবর্ষে প্রতি বর্গমা

১৭৭ জন লোক বাস করে—ব্রিটিশ ভারতে ২২৬জন, দেশী রাজ্য সকলে ১০১ জন। অথচ ইংলণ্ড ও জাপান ভারতবর্ষের চেয়ে ধনী; ঐ দুই দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

ইংলণ্ড ও জাপানের ভূখণ্ডের মোট যত অংশ চাষের যোগ্য, ভারতবর্ষের চাষের যোগ্য অংশ তাহা অপেক্ষা কম নয়। ভারতবর্ষের জমী মোটের উপর পূর্ব্বোক্ত দুই দেশের জমীর চেয়ে কম উর্ব্বর নহে। আমাদের চাষীরাও পরিশ্রমী। চাষের জ্ঞান যদি তাহাদের কম, তাহা হইলে শিক্ষাদান দ্বারা তাহা বাড়াইতে পারা যায়।

এখন দেখা যাক্ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়াছে কি না।

১৮৭১ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা ছিল ২২৭১২২৬৬। পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা বাড়িয়া ১৯২১ সালে ৩৭৮৮৬৬৯৯ হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরে ঐদেশে লোকসংখ্যা শতকরা ৬৬র উপর বাড়িয়াছে।

১৮৭২ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ২০৬১৬২৩৬০। উনপঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা বাড়িয়া ১৯২১ সালে ৩১৮৯৪২৪৮০ হইয়াছিল। কিন্তু এই দুটি সংখ্যা ভারতবর্ষের একই ভূখণ্ডসমষ্টির নহে। ১৮৭২ সালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত এমন অনেক জায়গার লোকসংখ্যা গণনা করা হয় নাই যাহাদের লোকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ও ১৯২১ সালে গণিত হইয়াছিল। এই পাঁচ বারের গণনাতে নূতন নূতন জায়গার মোট ৪৩৪০৫০৫৮ জন লোক গণিত হয়। অতএব ১৮৭২ সালে যে-যে জায়গার লোক গণিত হয়, ১৯২১ সালে সেই সেই জায়গার লোক কত ছিল জানিতে হইলে ৩১৮৯৪২৪৮০ হইতে এই ৪৩৪০৫০৫৮ বাদ দিতে হইবে। তাহা করিয়া দেখা যায় ১৮৭২ সালে যে-সব জায়গার মোট লোকসংখ্যা ২০৬১৬২৩৬০ ছিল, ১৯২১ সালে তাহাদের লোকসংখ্যা ছিল ২৭৫৫৩৭৪২২। অতএব ৪৯ বৎসরে লোকসংখ্যা শতকরা ৩৩এর উপর বাড়িয়াছে। যদি উপর্য্যুক্ত রূপ বাদ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি শতকরা ৫৪র বেশী হয়। ইহা বিলাতের শতকরা ৬৬র চেয়ে কম। অথচ বিলাতে ভারতবর্ষের মত দারিদ্র্য নাই, দুর্ভিক্ষও নাই।

প্রকৃত কথা এই, ঘন বসতি ও বিরল বসতি আপেক্ষিক শব্দ। দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি লোকের জীবিকা উপার্জ্জনের নানা উপায় বাড়িতে থাকে এবং লোকেরা তদনুসারে রোজগার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দারিদ্র্য বাড়ে না, দুর্ভিক্ষও হয় না। ইংলণ্ডে ও জাপানে সমাজের অবস্থা এইরূপ। কিন্তু ভারতবর্ষে লোকের বসতি ঐ দুই দেশের মত ঘন না হইলেও, লোকেদের রোজগারের পথ কম। ভারতবর্ষের প্রাচীন বিস্তর পণ্যশিল্প নষ্ট হইয়াছে। তাহার জায়গায় কল-কারখানায় সাধ্য যে-সব পণ্যশিল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ধনিকদের ব্যাপার। তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক শ্রমিক সামান্য মজুরী পায় মাত্র। এই কারণে অধিকাংশ লোকের নির্ভর হইয়াছে সেকেলে রকমের চাষের উপর। তাহাতে আর কত লোক পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে? অনেকের চাষেরও উপায় নাই।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণ একটি নয়, অনেক। তাহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত নিবন্ধিকায় হইতে পারে না।

—

বঙ্গীয় হিন্দুসভায় শারদা বিল

খবরের কাগজের সাহায্যে ভারতময় এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে অধিকাংশ প্রতিনিধি আইন দ্বারা বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। সুতরাং ঐ সম্মেলন রায়সাহেব হরবিলাস শারদা মহাশয়ের বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাতুরী দ্বারা এই ব্যাপারটি ঘটান হইয়াছে। যাহারা কোন জায়গা হইতেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় নাই, সমাজসংস্কার বিরোধী এরূপ অনেক লোক কৌশল-পূর্ব্বক প্রতিনিধিদের লাল টিকিট কিনিয়াছিল। তাহারা ভোট দেওয়ায় সংস্কারার্থীরা পরাজিত হন। এই চাতুরী ভোট লইবার পূর্ব্বেই জানা পড়িয়াছিল। সুতরাং প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সভাপতি ভোট না লইতে পারিতেন। তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল।

—

যতীন্দ্রনাথ দাস

অদ্য ২১শে ভাদ্র প্রাতঃকালের সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাসের অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগই করিতে হয়। তথাপি আশা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। অনেক অসম্ভব ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক, সাহসী, দৃঢ়চিত্ত যুবক দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া দেশের সেবা করুন, এই প্রার্থনা স্বতঃই হৃদয়ে উত্থিত হয়।

গবর্মেণ্ট রাজনৈতিক অভিযুক্তদের দাবী সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন বিলম্বে, কমিটির কাজ শেষ হইতেও বিলম্ব হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাসকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিতেও অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছে। ঈশ্বর না করুন, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে লোকে স্বভাবতই মনে করিবে, তাঁহার মুক্তি

এমন সময় হইয়াছে যখন তাহার আর প্রয়োজন ছিল না;—কেননা বিধাতা অবিলম্বে তাঁহাকে ভববন্ধন হইতেই মুক্তি দিয়াছেন। [যতীন্দ্রনাথকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়ার সংবাদ মিথ্যা, তাহা পরে জানা গিয়াছে।]

লাহোরে যাঁহারা প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ তাহা আরম্ভ করিয়াছেন।

—

ভারতীয়ের বৈজ্ঞানিক সম্মান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ রোমের ইটালীয় বিজ্ঞানসভার ম্যাটিউচী পদক পাইয়াছেন। ইহা উচ্চ সম্মান। পদার্থ-বিদ্যার আধুনিক শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ইহা দেওয়া হয়।

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন

পূর্ব্বে পূর্ব্বে হেল্মহোল্টস্, এডিসন, মার্কোনি, কুরী, রদারফোর্ড, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা ইহা পাইয়াছেন। অধ্যাপক রামন্ ইহা লইবার জন্য রোম গিয়াছেন। তাহার পর তিনি ব্রিষ্টলে ফ্যারাডে সোসাইটী দ্বারা আহূত এক অন্তর্জাতিক সভায় তাঁহার কোন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিবেন।

—

কলিকাতায় ছাত্রচাঞ্চল্য

কলিকাতায় প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে ও সেণ্ট-জেভিয়াস্ কলেজে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। পরে অন্য কোন কোন কলেজেও সহানুভূতিব্যঞ্জক ধর্ম্মঘট হইয়াছে। নিরপেক্ষ লোকদের দ্বারা ইহার কারণ অনুসন্ধিত হইয়া তাহাদের অভিযোগ দূর করিলে, এবং ছাত্রেরা অন্যায় কিছু করিয়া থাকিলে তাহার জন্য তাহারা ত্রুটি স্বীকার করিলে বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে। সাধারণভাবে ইহা বলা ব্যতীত আমরা এখন বেশী আর কিছু লিখিতে পারিতেছি না। কারণ, সব ঘটনা সম্বন্ধে খবর লইতে পারি নাই। কিন্তু ইহা পড়িয়াছি ও বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়াছি, যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ব্যারো সাহেবকে কতকগুলি ছাত্র প্রহার ও অপমান করিয়াছে। এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত।

—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শারদা বিল

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ বালিকার তদপেক্ষা কিছু কমসংখ্যক বালকের যেরূপ অল্প বয়সে বিবাহ হয়, তাহা বাড়াইয়া ন্যূনতম একটি বয়স নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীযুক্ত হরবিলাস শারদা মহাশয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া সভার সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। আলোচনা উপলক্ষ্যে দুর্লক্ষণের অভাব নাই। কিঞ্চিৎ সুলক্ষণ এই, যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের মত গোঁড়া হিন্দুও আইনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। ত... আইনের দ্বারা বেশী বয়স আঁটিয়া দিবার পক্ষে... নহেন—যদিও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার মত ... বালিকাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স হওয়া উচিত বো... হিন্দু মহাসভাও তাঁহার সভাপতিত্বে এই মত প্র... করিয়াছেন। ডাক্তার হাইদার বিলটির সমর্থন করিয়াছে... সমর্থক আরো অনেক আছেন। মহাত্মা গান্ধীর ... বালিকাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ এবং বালকদের ২৪ হওয়া উচিত। বিলটির আলোচনা পুনর্ব্বার ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩রা আশ্বিন আরম্ভ হইবে।

বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ ও বেশী

বিবাহ উভয়েরই সমর্থক প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। প্রাচীনতর ও অধিকতর প্রামাণিক শাস্ত্রে এবং প্রাচীন মহাকাব্য ও কাব্যসমূহে অধিক বয়সের বালিকাদের বিবাহেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সুশ্রুত ষোল বৎসরের কম বয়সের বালিকার সন্তানসম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সম্ভাবনা বন্ধ করিতে হইলে তাহার কম বয়সের বালিকাদের বিবাহ বন্ধ করা দরকার। মানুষের অকালমৃত্যু ও স্বাস্থ্যনাশ নিবারণ করিবার জন্য সামাজিক বিষয়ে আইন নিশ্চয়ই করা উচিত। সামাজিক বিষয়ে আইন আগেও হইয়াছে। আইনের সাহায্য না লইয়া বিবাহের বয়স বাড়াইবার চেষ্টা সমাজ-সংস্কারকেরা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা কেবল অল্পসংখ্যক লোকদের মধ্যে সফল হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা আইন করার পক্ষপাতী। অন্যদিকে যে-সব লোকাচারাধীন লোকেরা সামাজিক মত গঠন দ্বারা বিবাহের বয়স বাড়াইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই, তাঁহারা আইন দ্বারা বিবাহের বয়স বাড়াইবার চেষ্টারও বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন।

বালিকাদের অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের সুশিক্ষার, রক্ষণাবেক্ষণের এবং আত্মরক্ষাসামর্থ্যলাভের সুবন্দোবস্তও করিতে হইবে। সমাজহিতৈষীরা সে চিন্তা না করিতেছেন এমন নয়। আরও বেশী করিয়া চিন্তা করা এবং চিন্তালব্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা আবশ্যক।

লোকাচারপরায়ণ লোকেরা, বালিকাদের যত অল্প বয়সে সন্তান হইতে পারে, তত অল্প বয়সেই তাহাদের মাতৃত্ব চান। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, যে, তাহাদের দেহের কিছু পূর্ণতা এবং মা হইবার মত মানসিক বিকাশও ত চাই। সুশ্রুত এই জন্যই ষোল বৎসর বয়স মাতৃত্বের ন্যূনতম বয়স বলিয়াছেন। পুরুষদের দেশীয় প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী উভয়েই মানসিক স্ফূর্তির আবশ্যকতা, অন্ততঃ মুখে, স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য সাংসারিক কারণেও ক্রমশঃ বালকদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া আসিয়াছে। এখন শিক্ষিত সমাজে বালকদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স এরূপ দাঁড়াইয়াছে, যে, অনেকে জানেন না বা ভাবেন না, যে, পুরুষদেরও অল্প বয়সে সন্তান হইতে পারে। অল্পবয়স্ক বালকের সন্তান হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা জানি। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ তাহা অপেক্ষা ভাল। নেপালের নৃপতি সাক্ষীগোপাল মাত্র, প্রধানমন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা। বর্ত্তমানে এই সাক্ষীগোপাল নৃপতির নাম মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম জং বাহাদুর শাহ বাহাদুর শমশের জং। ১৯০৬ সালের ৩০শে জুন তাঁহার জন্ম হয়, এবং তিনি ১৯২০ সালের ১১ই জুন একটি পুত্র লাভ করেন।* অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসরের কিঞ্চিৎ কম বয়সে তাঁহার পুত্রলাভ হয়। আজকাল শিক্ষিত সমাজে বালকদের ঐরূপ বয়সে পুত্রলাভ কেহ চান না; তাহার কারণ, তাহাতে তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু বালিকাদের সন্তানলাভ আরও কম বয়সে হইতে পারে, অতএব তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যের দরকার নাই, শিক্ষার দরকার নাই, দৈহিক ও মানসিক দৃঢ়তার দরকার নাই, এটা কি রকম যুক্তি? যাঁহারা বলেন, বালিকাদিগকে কচি বয়সে বিবাহিত না করিলে তাহাদের চরিত্রভ্রংশ হইবে, তাঁহারা তদ্দ্বারা স্বীকার করেন, যে, সমাজে দুষ্টলোকের প্রাচুর্য্য আছে। সেই দুষ্ট লোকদের সংখ্যাহ্রাস ও মতিপরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া বালিকাদের শিক্ষাসুযোগলোপ, স্বাস্থ্যনাশ, আয়ুহ্রাস ও প্রাণনাশের অনুকূল রীতি প্রচলিত রাখা কোনও সমাজহিতৈষীর কর্ত্তব্য নহে।

—

বঙ্গের জলপথ-বোর্ড

বঙ্গের জলপথগুলি সুসংস্কৃত ও কার্য্যোপযোগী রাখিবার জন্য একটি জলপথ-বোর্ড গঠন করিতে বাংলা গবর্ন্মেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন। ইহা যদি ইংরেজ বণিকদের ঈপ্সিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল খনন করাইবার ফন্দী না হয়, এবং যদি ইহা আলোচনা ও রিপোর্ট বাহির করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া কাজে কিছু করে, তাহা হইলে বোর্ড নিয়োগে কিছু সুফল ফলিতে পারে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, যশোর-খুলনার ভৈরব নদের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাতে আবার স্রোত বহাইবার ব্যবস্থা হইতেছে বা হইবে। পরে শুনিয়াছিলাম, সব নক্সা ও ব্যয়ের অনুমান প্রস্তুত। কিন্তু কাজে কিছু হইয়াছে কি?

শুধু এক একটি প্রাদেশিক বোর্ডের দ্বারা প্রদেশগুলি বা সমগ্র ভারতের জলযানচালনোপযোগী জলপথগুলি ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখা যাইবে না। অনেক জলপথ একাধিক প্রদেশের ভিতর দিয়া গিয়াছে। সকল প্রদেশকে একযোগে কাজ করাইবার এবং সকলের কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভারত গবর্ন্মেণ্টের অধীন একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডেরও প্রয়োজন আছে।

—

তুরস্কের প্রগতি

তুরস্কের স্বাজাতিক নেতারা গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে, যাহাতে দেশের উন্নতি হয়, এইরূপ নানা

* The Statesman's Year book for 1928, page 1131.

ব্যবস্থা করিতেছেন। অতীতের ও প্রচলিতের প্রতি মোহ বশতঃ তাঁহারা আবশ্যক পরিবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না। নারীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও মানসিক বল বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা ঘোমটা বোরখা ও পরদা তুলিয়া দিয়াছেন। শিক্ষার সৌকর্য্য ও বিস্তারের নিমিত্ত তাঁহারা আরবী লিপির পরিবর্ত্তে রোমক লিপি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহাদের আইনগুলি শরিয়াতের অনুসরণ না করিয়া দেওয়ানী আইন সুইজার্ল্যাণ্ডের, বাণিজ্যিক আইন জার্মেনীর এবং ফৌজদারী আইন ইতালীর আইন অনুসারে নূতন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। অল্পসংখ্যক মোল্লা এখনও আছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল মসজিদে উপাসনা করেন; বিদ্যালয়সকলের উপর তাঁহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তুর্ক গবর্মেণ্ট সমুদয় শিক্ষালয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। আইন দ্বারা বহুবিবাহ রহিত করা হইয়াছে। ফুটবল প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষির উন্নতি করিবার চেষ্টা হইতেছে। সরকারী ব্যয়ে অনেক রেলওয়ে নির্মিত হইতেছে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত অনেক বাণিজ্যজাহাজ নির্মিত হইতেছে। পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বালকবালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া তুর্ক গবর্মেণ্ট নিরক্ষরতা দূর করিবার নিমিত্ত প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত লোকদের জন্য আবশ্যিক শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তুরস্কের কন্‌ষ্টিটিউশন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভিত্তীভূত বিধি হইতে, "ইসলাম তুরস্কের ধর্ম্ম", এই বাক্যটি বাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং মিশনারীদের স্থাপিত বিদ্যালয় হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে অখৃষ্টিয়ানদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিবার নিয়ম হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া হাউসের জন্য ভারতীয় চিত্রকর

ভারতবর্ষের ব্যয়ে নির্ম্মিত লণ্ডনস্থ নূতন ইণ্ডিয়া হাউস চিত্রভূষিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী, রণদাচরণ উকীল, ধীরেন্দ্র দেব বর্ম্মা ও ললিতমোহন সেনকে সরকারী বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমে বিলাত গিয়া এক বৎসর সাউথ কেনসিংটনের রয়্যাল কলেজে দেওয়াল-চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করিবেন। পরে তাঁহারা ইউরোপের ইটালী ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিয়া তথাকার সুকুমার শিল্প পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তদনন্তর তাঁহারা ইণ্ডিয়া হাউস ভূষিত করিতে আরম্ভ করিবেন।

এই কাজের জন্য ভারতীয় চিত্রকর নির্ব্বাচিত করা ভালই হইয়াছে। কিন্তু বিদেশে তাঁহাদিগের শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের আর্টে ভারতীয়ত্ব কতটা থাকিবে বলা যায় না।

"শৃঙ্খলিত ভারত" বাজেয়াপ্ত

ভারতবন্ধু সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" বা "শৃঙ্খলিত ভারত" নামক পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য আমাদের যে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে, তাহা গত সংখ্যায় লিখিয়াছি। তাহার পর গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, যে, ঐ বহি বাজেয়াপ্ত করা হইল। তদনুসারে আমাদের আফিস হইতে বাঁধা ও অবাঁধা মোটামুটি ৪৫০ খানা বহি পুলিসের লোক লইয়া গিয়াছে।

মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি

কয়েক মাস পূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল, যে, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা শিখিবার জন্য জার্মেনীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তিন জন ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দিবেন। তাহার জন্য মিউনিকে কর্ত্তৃপক্ষ ৮৪টি দরখাস্ত পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতীয় ছাত্রেরা এই দরখাস্তগুলি পাঠাইয়াছিলেন। বৃত্তিদাতারা জানাইয়াছেন, যে, অধিকাংশ বৃত্তিপ্রার্থী বেশ যোগ্য লোক। জার্ম্যান বিদ্বানদের এই মন্তব্য হইতে মনে হয়, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সকল ছাত্রেরই শিক্ষা খারাপ হয় না।

বৃত্তি পাইয়াছেন—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু। ইনি জীববিদ্যাসংশ্লিষ্ট রসায়নীবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

৩। যাদবপুরে স্থিত বঙ্গীয় এঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্‌নলজী কলেজের শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাচরণ সেন এঞ্জিনীয়ারিং বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ক গবেষণা করিবেন।

সম্মতির বয়স কমিটির রিপোর্ট

গবর্মেণ্টনিয়োজিত সম্মতির বয়স কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিটির সকল সভ্যের সমুদয় মত ও সিদ্ধান্ত এবং কোন কোন সভ্যের স্বতন্ত্র মত ও সিদ্ধান্ত সকল পাঠক গ্রহণ না করিতে পারেন। কিন্তু বহিখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, আলোচ্য বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু তথ্য, শাস্ত্রবচন, ও যুক্তি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বহিখানি ৭৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত, ভাল কাগজে পরিষ্কার ছাপা। পাতা

প্রবাসীর মত লম্বা, চৌড়ায় কিছু কম। মূল্য ।১৵০ মাত্র। কলিকাতার বড় বড় ইংরেজী বহির দোকানের মারফতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহাদের মনের গতি যাহাই হউক, বহিখানি তাঁহাদের একবার পড়া উচিত। পড়িলে সংস্কারবিরোধীরা খণ্ডনোপযোগী সংস্কারকদের সব যুক্তি এক জায়গায় একত্র পাইবেন। সংস্কারকরা পড়িলে নিজেদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য ও মত প্রচার করিবার জন্য অনেক উপকরণ পাইবেন।

এই বহির উপকরণগুলি কেবল ইংরেজীজানা লোকদের অধিগম্য থাকা উচিত নয়। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষায় ইহার অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। গবর্মেণ্ট তাহা করাইলে ভাল হয়। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমাজসংস্কারক সভাগুলি তাহা করাইবার চেষ্টা করুন। তৎপূর্ব্বে সামজসংস্কারসমর্থক পত্রিকাস-ম্পাদকেরা ইহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে পারেন।

মোহিনী মিলের শাড়ী

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল মিহি সূতার কাপড় বুনিবার জন্য আগে বিলাতী সূতা আমদানী করিত। সম্প্রতি কিছু দিন হইতে এই মিলের কর্ত্তৃপক্ষ মিলেই মিহি সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিতেছেন। আমরা এই মিহি সূতায় বুনা শাড়ী দেখিয়াছি। সূতা বেশ সূক্ষ্ম ও মসৃণ, এবং শাড়ীটির বুননও বেশ ঘন।

আগ্রা-অযোধ্যায় কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা

গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ৬০,০০০ ব্যক্তি কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ঐ যুক্ত-প্রদেশে ৪৬টি জেলা আছে; তাহার মধ্যে কেবল ২৭টির সভ্যসংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। বাকীগুলির সংখ্যা পাওয়া গেলে মোট সভ্যসংখ্যা আরও বাড়িবে।

বঙ্গের লোকসংখ্যা আগ্রা-অযোধ্যা অপেক্ষা বেশী, এবং এই প্রদেশে শিক্ষার বিস্তারও বেশী হইয়াছে। অতএব বঙ্গের সভ্যসংখ্যা অন্ততঃ এক লক্ষ হওয়া উচিত। কত হইয়াছে?

মহাত্মা গান্ধী ও নিরুপদ্রব আইন-অমান্য

একজন পত্রপ্রেরক মহাত্মা গান্ধীকে লেখেন, "ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ের দিন ১লা জানুয়ারী সত্বর আসিতেছে, কিন্তু আপনি আপনার খাদি খাদি খাদি মন্ত্র জপ করিতেছেন —দেশকে ফলদায়ক নেতৃত্ব দিতে অস্বীকৃত হইতেছেন।" উত্তরে গান্ধীজি ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন :—

"ইহা সত্য নহে, যে, দেশের সব লোক অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার জন্য অধীর হইয়া আমার নেতৃত্বের অপেক্ষা করিতেছে কিন্তু আমি পশ্চাৎপদ হইয়া আছি। আমার সর্ত্তে জনগণ অহিংস আইনভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইলে কেমন করিয়া তাহাদের নেতৃত্ব করিতে হয়, তাহা আমি জানি। আমি সেরূপ প্রস্তুতির কোন চিহ্ন দেখিতেছি না; কিন্তু আমি তাহার আশায় বাঁচিয়া আছি। আমি আশা করিতেছি, যে-আঁধার আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে, ১লা জানুয়ারী তাহা হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।"

গান্ধীজি আরও লিখিয়াছেন :—

"সরদার বল্লভভাই পটেল সম্বন্ধে বলিতেছি, নিরুপদ্রব আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার অনুমতি তাঁহাকে দেওয়াই আছে; কিন্তু তাঁহার নেতৃত্ব সফল করিবার জন্য তিনি একটি বারদোলি চান। দেশে কয়টি বারদোলি প্রস্তুত আছে? তাহার প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্ত সীমাবদ্ধ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার জন্য বারদোলিকে সাত বৎসর ধরিয়া নীরবে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা লাভার্থ পূর্ণ আত্মাহুতি দিবার জন্য বারদোলিও আজ প্রস্তুত কিনা সন্দেহস্থল। সরদার এবং আমি উভয়েই বারদোলির উপর খুব ভরসা রাখি, কিন্তু স্পষ্টই তাহার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপ দিবার সময় এখনও আসে নাই। তাহারও তপস্যা চলিতেছে।"

শারদা বিল সম্বন্ধে মহিলাদের মত

দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় শারদা বিলের আলোচনার সময় বহুসংখ্যক মহিলা পতাকা হস্তে দল বাঁধিয়া সভ্য-দিগকে ঐ আইনের সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতে-ছিলেন। কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে ও আলবার্ট হলে সম্প্রতি দুটি মহিলা-সভা হইয়া গিয়াছে। দুটিতেই শারদা বিলের পূর্ণসমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

"রক্তমাখা পূর্ব্বাভাস"

প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীতে যে মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে এবং আরবদের দ্বারা যে লুটতরাজ হইতেছে, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া ইংরেজ রক্ষণশীল রাজনৈতিক মিঃ চার্চিল কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন :—

The outbreak in Palestine was a "bloody foretaste" of what would happen in Egypt and India, if Britain's protecting and guiding hand were withdrawn. He believed that Palestinian Arabs had taken Baron Lloyd's dismissal and the Labour Government's proposal to remove the British garrison at Cairo and Alexandria as weakness.

তাৎপর্য্য। ব্রিটেনের রক্ষক ও চালক হস্ত সরাইয়া লইলে ভারতে ও মিশরে কি ঘটিবে, প্যালেষ্টাইনের উপদ্রব তাহারই রক্তাক্ত পূর্ব্বাস্বাদ। তাঁহার বিশ্বাস, ব্যারন লয়েডের পদচ্যুতি এবং কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ব্রিটিশ সৈন্য সরাইয়া লইবার ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের প্রস্তাব আরবেরা দুর্ব্বলতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

আরবেরা কি মনে করিয়া প্যালেষ্টাইনে খুন জখম লুট ও অন্যান্য অত্যাচার করিতেছে, সে সম্বন্ধে মিঃ চার্চিলের অনুমান বা বিশ্বাসের আলোচনা করিবার আমাদের দরকার নাই। তাঁহার প্রথম উক্তিটাই আমাদের বিচার্য্য।

ভারতবর্ষ ও মিশর হইতে রক্ষক ও চালক ইংরেজরা চলিয়া গেলে কিরূপ রক্তারক্তি হইবে, বক্তা প্যালেষ্টাইনের ঘটনাগুলিকে তাহারই নমুনা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তিতে একটা স্থূল ভুল রহিয়াছে। এখনও প্যালেষ্টাইনে ইংরেজরাই রক্ষক হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তাঁহারা সেখান হইতে সরিয়া যান নাই। তাঁহাদের রক্ষক ও চালক হস্ত সেখানে থাকিবার সময়েই রক্তারক্তি লুণ্ঠন হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত কোন দেশ হইতে চলিয়া গেলে কি ঘটিবে, তাহার প্রমাণ এরূপ কোন দেশের ঘটনা হইতে পাওয়া যাইবে না যেখানে তাঁহারা সশরীরে প্রবলপ্রতাপে নিজ মূর্ত্তিতে আগে হইতে এখন পর্য্যন্ত বিরাজমান আছেন। তাঁহারা ভারত হইতে চলিয়া গেলে (চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণ ত দেখিতেছি না) কি ঘটিবে, তাহার নমুনা যদি প্যালেষ্টাইন হইতে সংগ্রহ করিতে চান, তাহা হইলে সেই দেশ হইতে আগে তাঁহারা সরিয়া যান; তাহার পর নমুনা সংগ্রহ করিবেন।

ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানে যে-সব দাঙ্গা ঘটে, তাহা হইতেও সাম্রাজ্যিক ইংরেজরা এইরূপ তর্ক করে, "আমরা কেমন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে যাই বল? তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান যে পরস্পরের গলাকাটাকাটি করিয়া রক্তের স্রোত বহাইবে।" তাহার উত্তরে আমরা বলি, "তোমরা চলিয়া গেলে কি ঘটিবে, এগুলা ত তাহার নমুনা নয়; তোমাদের রাজত্বে কি ঘটিতেছে, এগুলা তাহারই ইতিহাসের অংশ।" প্রত্যুত্তরে ইংরেজ বলিতে পারেন, "আমরা থাকিতেই যখন এরূপ ঘটিতেছে, তখন আমরা চলিয়া গেলে আরও রক্তারক্তি ঘটিবে।" সে সম্বন্ধে আমরা বলি, "তোমরা চলিয়া গেলে প্রথমতঃ রক্তারক্তি বাড়িবেই না, এমন বলা যায় না। কিন্তু এমনও হইতে পারে, যে, তোমরা চলিয়া গেলে বা তোমাদের প্রভুত্ব না থাকিলে, ভারতবর্ষের উভয় প্রবল পক্ষ হয় মারামারি কাটাকাটি করিয়া কিম্বা আপোষে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইবে; হিন্দুর কিম্বা মুসলমানের কিম্বা সকল পক্ষের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

ইউরোপের নানা দেশে, অষ্ট্রিয়ায় স্পেনে বাল্কান দেশসকলে, সে দিনও মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আবার থামিয়া গিয়াছে। সে-সব দেশে ত ব্রিটেনের "রক্ষক ও চালক হস্ত" নাই? কয়েক বৎসর আগে ইংলণ্ডেই রোমান কাথলিক ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে ভীষণ দাঙ্গার পর দাঙ্গা হইয়াছিল। তাহার তারিখ ও বৃত্তান্ত আমার "স্বরাজের অভিমুখে" নামক ইংরেজী পুস্তকে মুদ্রিত আছে। সেখানে ত ব্রিটেন ছিলেন ও আছেন। সেখানে ওরূপ ঘটনা কেন ঘটিয়াছিল ও আবার ঘটিতে পারে? কিন্তু অতীত বৎসরের কথা না বলিয়া গত মাসের, ১০ই আগষ্টের, লিটার্যারী ডাইজেষ্ট নামক প্রসিদ্ধ আমেরিকান সাপ্তাহিক হইতে এক টুকরা সংবাদ নীচে তুলিয়া দিতেছি।

SOUTHERN "MOBS" HUNT OUT individual bad Negroes, but Northern "mobs" tend to make whole Negro colonies suffer for the guilty one, say many Southern papers in comment upon the "injustice and barbarity" of the recent "race riot" at North Platte, Nebraska. Typical is one editorial on "The Nebraska Diversion" in the Charlotte (N. C.) *Observer*, which repeats the news reports that "because a Negro killed a police officer in a Nebraska town, the entire Negro population of over 200 was driven out, and had to go, regardless of salvaging of household goods. This was after the murderer was trapped in a basement, which was drenched with gasoline and fired, the Negro defeating the proposed torture by killing himself." Continues *The Observer*:

"The Nebraska mob, like mobs in the North, was not satisfied with singling out the guilty man and giving him punishment of the kind usually meted out by mobs, but directed its vengeance upon the entire population. That is the mob law in the North and West, as distinguished from mob law in the South. Now, will Oswald Villard, and Northern editors of his type, whose mission in life is to fan sectionalism, and especially to direct prejudice against the South, give this section a brief resting spell?"

সংবাদটিতে বলা হইয়াছে, একজন নিগ্রো একটা অপরাধ করায় শহরের সব নিগ্রো তাড়িত হইয়াছে; তাহাদের জিনিষপত্র পর্য্যন্ত তাহাদিগকে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। বিনা বিচারে নিগ্রোদিগকে পুড়াইয়া ফাঁসী দিয়া মারিয়া ফেলা ত মধ্যে মধ্যে আমেরিকায় হয়। তাহার উপর এই প্রকার দাঙ্গা। এই প্রকার এবং এর চেয়েও ভীষণ দাঙ্গা আমেরিকায় নিগ্রো, রোমান ক্যাথলিক ও

ইহুদীদের বিরুদ্ধে হইয়া থাকে। এখানে ত অসভ্য হিন্দু মুসলমান রক্তারক্তি করে না। সুসভ্য খৃষ্টিয়ান শ্বেতকায় আমেরিকান্‌রা তাহা করে। সেদিকে মিঃ চার্চিল তাঁহার ব্রিটিশ "রক্ষক ও চালক হস্তটি" প্রসারিত করিতে সাহস পাইবেন কি? সে বড় কঠিন ঠাঁই।

—

নারীহরণ ব্যবসা সম্বন্ধে অনুসন্ধান

আলবার্ট হলে নারীনিগ্রহসম্বন্ধীয় সভাতে যাঁহারা তদ্বিষয়ক অনুসন্ধানকমিটি নিয়োগের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা জানেন কি না বলিতে পারি না, অনেক দেশে পাপব্যবসার জন্য নারী ও বালিকা সংগ্রহের যে ব্যবসা আছে, তদ্বিষয়ে লীগ অব্ নেশুন্স বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। তাহার নাম—"Report of the Special Body of Experts on Traffic in Women and Children." অনুসন্ধান নিম্নলিখিত দেশগুলিতে হইয়াছিল :—

আর্জেন্টাইন, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, ব্রাজিল, কানাডা, কিউবা, চেকোস্লোভাকিয়া, মিশর, ফ্রান্স, আলজীরিয়া, টিউনিস, জার্মেনী, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, হাঙ্গেরী, ইটালী, লাটভিয়া, মেক্সিকো, হল্যাণ্ড, পানামা, পোল্যাণ্ড ও ডাণ্টজিগ, পোর্তুগাল, রুমেনিয়া, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এবং উরুগোয়ে। সেই সেই দেশের গবর্মেণ্টের সাহায্যে এই অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

—

ভারতীয় রাজপথবিস্তার বোর্ড

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রস্তাবে শীঘ্রই 'ইণ্ডিয়ান রোড বোর্ড' বা ভারতীয় রাজপথ বিস্তার বোর্ড গঠিত হইবে। মোটরগাড়ী চালাইবার জন্য যে পেট্রল নামক খনিজ তেল ব্যবহৃত হয়, তাহার উপর প্রতি গ্যালনে দুই আনা করিয়া অতিরিক্ত শুল্ক বসান হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে, যে, তদ্দ্বারা সংগৃহীত অর্থ হইতে ভারতের সব প্রদেশে রাস্তা ও পুল নির্ম্মিত হইবে। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা সকল প্রদেশের মধ্যে বেশী। এখানে ধনী ইউরোপীয়, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, কচ্ছী প্রভৃতিরা এবং ধনী বাঙালীরাও মোটরগাড়ী ব্যবহার করে; ব্যবসার জন্য মোটরলরী ও ট্রাক্ ব্যবহৃত হয়; এবং যাত্রী চলাচলের জন্য মোটরবাস্ ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত এই সকলের সংখ্যা বঙ্গে অন্যান্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী সুতরাং পেট্রলের খরচ এবং তাহা হইতে আদায়ী শুল্কও বেশী। বাংলা দেশে সংগৃহীত এই অর্থ যাহাতে বঙ্গেই রাস্তা ও পুল নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়িত হয়, রাজপথ-বোর্ডে বঙ্গের সভ্যগণের সেই চেষ্টা করা উচিত। ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ অন্যত্র ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। এই অন্যায়ের নূতন প্রসার বন্ধ করা উচিত!

বিজ্ঞপ্তি

বৈশাখ ১৩৩৬ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৬ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রবাসী ফুরাইয়া যাওয়াতে ভবিষ্যতে যাঁহারা গ্রাহক হইতে চাহেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য যাণ্মাষিক সডাক ৩।০ চাঁদা লইয়া তাঁহাদিগকে কার্ত্তিক ১৩৩৬ হইতে ছয় মাসের জন্য গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হইবে। কেহ ইচ্ছা করিলে পূর্ণ বৎসরের চাঁদা দিয়া ভাদ্র, আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে এক বৎসরের জন্যও গ্রাহক হইতে পারেন। অবশ্য যতদিন পর্য্যন্ত গত কয়েক মাসের প্রবাসী একেবারে ফুরাইয়া না যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত গ্রাহকদিগকে এ বৎসরের প্রথম হইতেই গ্রাহক করা হইবে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীর বিজ্ঞাপন আমরা ৩রা আশ্বিন হইতে ছাপা আরম্ভ করিব। পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতারা যদি তাঁহাদের বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে নূতন কাপি ২রা আশ্বিনের মধ্যে আমাদের আফিসে পৌঁছাইয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,—প্রবাসী

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত